র নরনারী

...বি......

কাহিনীর সূত্রপাতেই লেখক ইন্দিরার
...ভাবের পরিচয় জ্ঞাপন করিয়াছেন। 'অনেক-
...পরে ইন্দিরার হঠাৎ বড় মানুষ শ্বশুর
...লইতে ঘটা করিয়া পাল্কী-বেহারা
...ছেন। ইন্দিরার পিতা বলিতেছে
...
...ফলো কলাগাছ

# কবিতাগুচ্ছ

শ্রীজাহাঙ্গীর ভকিল

শ্রীযুক্ত ...গীর ভকিল পার্শী সমাজের অন্তর্ভুক্ত। অক্সফোর্ড
...বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া শ্রীযুক্ত ভকিল বিশ্বভারতীতে
...অধ্যাপকরূপে যোগ দেন। শান্তিনিকেতনে থাকিবার
...বাংলা ভাষায় কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন—ইংরাজি
...লিখিতেন। এখন তিনি বোম্বাই প্রদেশে বাস করেন।

শিশু যবে আমি, হাতে চেয়েছিনু গগনের
পূর্ণ-শশি মুখখানি।
মানুষ হইয়া, বুকে চেয়েছিনু ভুবনের
এক পূর্ণ মুখখানি।

...পক্ষে সখী, তৃতীয়ার চন্দ্র যবে
...স্বচ্ছ নীলিমায়, বসে ভাবি তবে,
কথা—বিশ্বকর্মা কোন অভিনব
...গড়েছে পেলবচরণ তব।

...ধি বিজন রাত,
তারাহীন ঘোর তমো,
...ক্লিষ্ট হৃদয়ের অন্তরে বাণীসম,
...একে অবশিষ্ট বৃষ্টি বিন্দুপাত।
আঁধারের নদীতীরে
সূচিসম শুভ্র-নীরে
কার কথা
খোঁজে কথা?

### পূর্ণিমারাতে

...খি ওগো সখি,
...স্মরি নিত্য-পূর্ণশশি,
...তুমি যদি
নিরবধি
...মুখটি ফিরায়ে দেখ বসি'
আকাশের পূর্ণ-শশি,
...মি তবে সখি,
...দেখিব কি?

### অসাধ্য সাধনা

ত্রস্ত-মনে ভাবি এই কথা...
কোন নিঠুর দেবতা...
অসাধ্য এ সাধনায়
নিশিদিন আমারে খাটায়।
ধ্যানরত সন্ধ্যা নদীসম
স্থির স্বচ্ছ গানের দর্পণে মম
যতনে ধরিতে
তব অপূর্ব মনের বৃন্তটিতে
প্রস্ফুটিত, এই অমরাবতীর
পদ্মতুল্য তোমার শরীর।

...কামিনী
...নীর দিদির
...—মরণ আর কি!'
...কোথায় সে একটু
...মেয়েও কামিনীর
...না! এ গেল
...উপসংহারেও
...যেমন
...যোগ্য
...লিশ
...র

### অনাহূতা

কত প্রিয়জনে বেসেছে আমায় ভাল,
ভুলায়েছে কত রাতি তারায় তারায়,
পাখীর পাখায় সিক্ত প্রদোষের আলো,
উদিয়াছে কত রাকা পল্লবে পাতায়।
দেখিয়াছি কত শত মানবের জাতি,
সভ্য ও অসভ্য, কত বিভিন্ন আচার।
রাগের, দ্বেষের, ঘরে জ্বালায়েছি বাতি
একা; নিভায়েছে লোকে তারে বারবার।

এলেম যখন ক্লান্ত এত বোঝা নিয়ে,
তুমিই প্রথম মোরে চিনেছিলে প্রিয়ে,
স্খলিত জীবন মম বাঁধি প্রেম-ডোরে
...নিজে বিরাজিলে মোর হৃদয়ের ঘরে।

সফল সৌন্দর্য আজ তোমারেই পূজি
তোমার রহস্য মাঝে অসীমেরে খুঁজি।

কথা না বলিয়া নিধরেসে লইল বিদায়
নির্জীব থামটিরে করি বাহুতে বেষ্টন।—
দ্বিগুণ এ অপমান, বল তুমি মন,
কি করিয়া সহ্য যায়?

তাহারা হয় কুলত্যাগ করে নয় প্রাণত্যাগ করে—বিবাহবিচ্ছেদের সুলভ পন্থা তো সমাজে নাই।

কিন্তু লবঙ্গলতার মত মেয়েরাই শিল্পের সম্পদ্। তাহারা মনের আধখানা সংসারের দিকে স্থাপন করে—সংসারের সুখের আলোতে তাহা ভাস্বর হয়,—আর বাকি আধখানায় চাপা দুঃখের চিরন্তন অন্ধকার, যেমন আলো আঁধারে পূর্ণশশী আপনার দুই দিককে চিরদিন ভাগ করিয়া রাখিয়াছে। পূর্ণশশী স্বরূপিনী লবঙ্গলতাই রজনীর নায়িকা। তাহাকে উজ্জ্বল করিয়া দেখাইবার উদ্দেশ্যেই অন্ধকার রজনী এবং অন্ধ রজনীর সৃষ্টি। রজনীর যখন চোখ ফুটিয়া ভোরের আলো হয়—পূর্ণশশী কি তার আগেই অস্ত যায় না? উপন্যাসে রজনীর দৃষ্টি পাইবার পরে লবঙ্গলতাকে আর দেখিতে পাই না, সে অস্তমিত, অমরনাথের বিদায়ের দিগন্তে কখন্ তাহারও বিসর্জন ঘটিয়াছে। গ্রন্থের শেষতম পরিচ্ছেদ লবঙ্গলতার কথিত সেই 'লোকান্তর'—

অমরনাথ শুধাইয়াছিল—"যদি লোকান্তর থাকে, তবে?"

লবঙ্গ বলিয়াছিল—"আমি স্ত্রীলোক, সহজে দুর্বলা। আমার কত দুঃখ, দেখিয়া তোমার কি হইবে? আমি ইহাই বলিতে পারি, আমি তোমার পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।" প্রতাপও প্রায় অনুরূপ ভাষা ব্যবহার করিয়াছিল।

লবঙ্গলতা দুর্বল, দুর্বল বলিয়াই তাহার বন্দে প্রকাশ মনোহর। অন্তর্লীন দুঃখের তাপে ভাস্বর এমন মনোহর মূর্তি বঙ্কিমচন্দ্র অধিক দৃষ্টি করেন না।*

*বঙ্কিমচন্দ্রের রজনী

# বক্সা ক্যাম্প

**অমলেন্দু দাশগুপ্ত**

(পূর্বানুবৃত্তি)

বৎসর ঘুরিয়া আর একটা নূতন বৎসর আসিল, আমাদের সুখের সংসারে ভাঙ্গন দেখা দিল। ১৯৩২ সালের প্রথমভাগেই বিপ্লবীদের আঠারজন নেতাকে 'ডেটিনিউ' হইতে তিন নম্বর রেগুলেশনের রাজবন্দীরূপে পরিবর্তিত করা হইল, তারপর তাঁহাদিগকে বাংলার বাহিরে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জেলে চালান করিয়া দেওয়া হইল। এই আঠারোজনের মধ্যে সাতজনেই ছিলেন বক্সা ক্যাম্পের।

সঙ্গে সঙ্গে দুইটা জিনিস আমাদের কাছে জলের মত পরিষ্কার হইয়া গেল। আমরা দিব্যদৃষ্টিতে দেখিলাম যে, এ-ভাঙ্গন এখানেই শেষ হইবে না; ইহা শুধু আরম্ভ মাত্র এবং অদূর ভবিষ্যতেও আমাদের মুক্তি দিবার তেমন কোন ইচ্ছা ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের নাই, আমাদের সম্বন্ধে তাঁহারা মনস্থির করিয়া ফেলিয়াছেন। যেন নদীর ভাঙ্গনপাড়ে ঘর বাঁধিয়াছি, এমন ভাবেই আমরা দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলাম।

কিছুদিন যাইতে না যাইতেই আতঙ্কজনক কানাঘুষা শোনা গেল যে, আমাদের জন্য বাংলার বাহিরে থাকা বন্দোবস্ত হইতেছে। বাংলায় আমাদের রাখা সরকার নিরাপদ মনে করেন না, আমাদের কোথায় রাখিয়া তাঁহারা একটু সুস্থির হইতে পারেন, অধুনা সেই বাঞ্ছিত স্থানের অনুসন্ধান চলিতেছে।

দুপুরবেলা, খাওয়া-দাওয়া সারিয়া আমরা জটলা করিতেছিলাম, বীরেনদা (চ্যাটার্জি) আসিয়া দেখা দিলেন।

ঘরে ঢুকিয়াই সাহেবী বাংলায় সকলকে শুনাইয়া তিনি সন্তোষ গাঙ্গুলীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইউ সন্তোষ জংলী, টোম্বাকটো জানে?"

গাঙ্গুলী শব্দটা বীরেনদার সাহেবী উচ্চারণে "জংলী" রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল।

সন্তোষবাবু কহিলেন, "টোম্বাকটো? সে কি বস্তু, খায় না গায়ে মাখে?"

বীরেনদা কহিলেন, "টুমি ডেকছি, কিচ্ছু জানে না।"

তারপর আমাদের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "টোমরা টৈয়ার ঠাকে, টোম্বাকটো যেটে হোবে।"

আমাদের চোখমুখের ভাব দেখিয়া বীরেনদা বুঝিলেন যে, তাঁহার 'টোম্বাকটো' আমাদের মালুম হইতেছে না। তিনি চটিয়া গেলেন, তাঁহার সাহেবী উচ্চারণ খসিয়া খাস বাঙ্গালী বুলি জিভ হইতে বহির্গত হইল।

কহিলেন, "গোপেশ্বরের (আশু মুখার্জি) গোয়ালের যত গরু, কিচ্ছুই শেখনি দেখছি। এই জংলী, জিওগ্রাফিটা একটু নাড়াচাড়া কোর, টোম্বাকটো হোল একটা দ্বীপ, বুঝলে মূর্খ।"

আমরা সংবাদে যথারীতি ভীত হইলাম। সৌরিন ঘোষ বলিলেন, "দোহাই আপনার, দ্বীপান্তরে পাঠাবেন না, তা হলে পেরাণ নিয়ে ফিরতে পারব না।"

বীরেনদা আশ্বাস দিলেন, "ভয় নেই, ফিরবার প্রয়োজন হবে না। ওখানেই পেরাণ নিয়ে ঘরবাড়ী বেঁধে, স্থায়ী বাসিন্দা হোতে পারবে, সেই ব্যবস্থাই করা হচ্ছে।"

দিনকতক পরে এমনই এক দুপুরের ব্যাপার, অফিস হইতে পত্রিকা আসিয়া গিয়াছে, কিন্তু তখন পর্যন্ত ঘরে ঘরে বিলি করা হয় নাই। বীরেনদা একটা 'ষ্টেটসম্যান' পত্রিকা টান দিয়া তুলিয়া লইলেন।

কিছুক্ষণ পরেই তিনি সোল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "জয় মা বিশালাক্ষী, ফাঁড়া কেটে গেছে।"

কিরণদা (মুখার্জি) বারান্দা ধরিয়া খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া আগাইতেছিলেন। বলিলেন, "এই শুয়োর, এত আনন্দ কিসের?"

কিরণদা ছোটবড় সকলকেই উক্ত প্রকার মধুর সম্বোধন করিয়া থাকেন। বীরেনদা জবাব দিলেন, "টোম্বাকটো যেতে হবে না, বেঁচে গেলেন।"

তারপর ঘোষণা করিলেন, "রাজপুতনার মরুভূমিতে ব্যবস্থা হচ্ছে। মিঃ ফিনী খোঁয়াড়ের স্থান নির্বাচনে বেরিয়েছে। নেও, চেঁচিয়ে পড়ে শুনাও," বলিয়া 'ষ্টেটসম্যান' পত্রিকাখানা যতীন দাশের হাতে দিলেন এবং স্থানটুকু আঙ্গুল দিয়া চিহ্নিতও করিয়া দেখাইলেন।

কয়েক ছত্রের ছোট্ট সংবাদ, আজমীর হইতে 'ষ্টেটসম্যান'-এর নিজস্ব সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, বাংলা গবর্ণমেণ্টের পদস্থ পুলিশ কর্মচারী মিঃ ফিনী তথায় গিয়াছেন। বাংলার ডেটিনিউদের ব্যাপার সম্পর্কেই তাঁহার এখানে আগমন।

মিঃ ফিনী আমাদের ভূতপূর্ব কমাণ্ডাণ্ট এবং ডেটিনিউ সম্পর্কে তিনি ইতিমধ্যেই গবর্ণমেণ্টের নিকট বিশেষজ্ঞ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। দুই আর দুই যোগ করিলে চার পাওয়া যায়, আমরাও এই নিয়মে ফল পাইয়া গেলাম যে, রাজপুতনাতে আমাদের জন্য পাকা বন্দোবস্ত করিবার দায়িত্ব দিয়াই ফিনী সাহেবকে ওখানে পাঠানো হইয়াছে।

সত্য সত্যই একদিন পালে বাঘ পড়িল। সারা ক্যাম্পটা চাঞ্চল্যে আন্দোলিত হইয়া উঠিল।

বাথরুমে ছিলাম। হৈ হৈ শুনিয়া বাহির হইয়া আসিলাম। হন্তদন্ত হইয়া পাহাড় ভাঙ্গিয়া তিন নম্বর ব্যারাকে উঠিয়া আসিলাম। দেখিলাম, সেখানে একটা মহোৎসব লাগিয়া গিয়াছে।

আজমীড় হইতে মাইল সত্তর-আশি দক্ষিণে রাজপুতনার মরুভূমিতে দেউলী নামক স্থানে একটি ক্যাম্প খোলা হইয়াছে, এই হইল প্রথম সংবাদ। দ্বিতীয় সংবাদ, বাংলা হইতে বাছিয়া বাছিয়া সাংঘাতিক বা খারাপ চরিত্রের একশত

## ২

অটলবাবু এবং যোগীন ডাক্তার রাত আটটার পরও বেড়ান। শহরে নতুন ইলেকট্রিক আলো হওয়ার এই সুবিধা। পাকা সড়ক ধরে দু'জন গল্প করতে করতে অনেক দূর চলে যান।

নিশানাথের বাবা অটলবাবু নিশানাথের মত উঁচু, লম্বা। শক্ত মজবুত গড়ন। এখন একটু ভেঙ্গে পড়েছে। যেন হঠাৎ ভেঙ্গে পড়েছেন তিনি। পঞ্চাশ পার হননি, তবু। দেখলে বোঝা যায়, ঐ চেহারার ওপর দিয়ে অনেক ঝড় ঝাপটা দুঃখ কষ্ট ও হতাশার বন্যা বয়ে গেছে।

সত্যি, ডাক্তার যত কথা বলে অটলবাবু তত বলেন না, হাত নাড়েন কম, নিশ্বাস ফেলেন আস্তে।

হাঁটতে না কথা বলতে গিয়েও কি যেন ভাবেন। আর তিনি হাসেন কম। অটলবাবু ধরতে গেলে একরকম হাসেনই না। ধীর স্থির।

বলতে কি, অটলবাবু নিজের অবস্থা, অভাব ও দৈন্য সম্পর্কে বড় বেশি সচেতন। তিনি জানেন উকিলদের মধ্যে তিনি সবচেয়ে গরিব। তিনি স্কুল ফাইনাল এগ্‌জামে তিনি জল-পানি পেয়েছিলেন। এই অঞ্চলে তাঁর মত ভাল ছেলে কেউ ছিল না।

আর পাঁচটি উচ্চাভিলাষী ভাল ছেলের মত তিনিও রাতারাতি ওকালতি পাশ ক'রে ছুটে এসেছিলেন এই শহরে।

তিনি জানতেন ব্রিটিশ আমলে বিনা পুঁজিতে বড়লোক হওয়ার এই সোজা রাস্তা। ব্যবসার লাইনে এর চেয়ে ভদ্র ব্যবসা (ডাক্তারী ছাড়া) আর কিছু ছিলও না তখন ভদ্রলোকের ছেলের জন্য।

অটলবাবু চোখের ওপর দেখেছেন ভূদেববাবু ওকালতি ক'রে শহরে বিরাট দালান ফেঁদেছেন।

উকিল শশধর কী না করেছেন এ জীবনে। এমনকি তিনি মন্ত্রী হয়েছেন বুদ্ধি ও বুদ্ধি অর্জিত পয়সার জোরে।

মেধাবী অটলবাবু যেই তিমিরে সেই তিমিরে।

তাঁর বৈঠকখানায় দু'টো ভাঙ্গা বেঞ্চিতে ধুলো পড়ে রইল সারাজীবন।

ছাত্রাবস্থায় একখানা কাপড় ছিল পরার, এখনও তা-ই। ছেঁড়া চটি, হাঁটুর ওপর কাপড় প'রে অটলবাবু যখন যোগীন ডাক্তারের সঙ্গে হাঁটেন তখন বিমর্ষ বিমূঢ় হয়ে থাকেন ভদ্রলোক।

তার ওপর একমাত্র ছেলে দিয়ে কোনো আশাই তিনি করতেন না। কোনোদিনই না। ফোর্থ ক্লাসের ছেলে নিশানাথ সিগারেট টানতে শিখেছিল। কেমন ক'রে ছেলের মধ্যে খারাপ জিনিসগুলি আগে ঢুকেছিল অটলবাবু বুঝতেই পারলেন না, আজও পারেননি।

অবশ্য, মাঝে মাঝে তিনি ভাবেন, এমন পরিষ্কার ক'রে বই-এ লেখা ওকালতির কূট-নীতিগুলি যখন তাঁর মাথায় ঢুকল না তখন বই-এ না-লেখা সংসারের বিচিত্র কূট নিয়ম-গুলো কি ক'রে ঢুকবে।

ছেলে খারাপ হওয়া সেই কূট নিয়ম-গুলিরই তো একটি অঙ্গ। অটলবাবু হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলেন, একটা ষোল বছরের ছেলে কত-খানি দুরন্ত হয়ে উঠতে পারে,—দৌরাত্ম ও অত্যাচার করতে পারে নিজের ওপর প্রতি-বেশী ওপর।

ভূদেব বিদ্যাসাগর অটলবাবুর আদর্শ।

এর বাইরে, অর্থাৎ নীতিগত আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এমন ছেলে কোনোদিন বড় হবে বা হয়েছে তিনি বিশ্বাস করতেন না। চোখে দেখলেও না।

ছেলে ভাল চাকরী করছে দেখেও এখন পর্যন্ত তাঁর সন্দেহ বা সংশয় কাটেনি। যে কোনো একটা দুর্বুদ্ধি এসে ওকে নিঃসংশয়ে তলিয়ে দেবে যেন এই আশঙ্কাই করছেন তিনি বরাবর। কানের কাছে সহচর যোগীনবাবুর ইদানিং নিশানাথ সম্পর্কে যখন অজস্র প্রশংসা-বাণী শুনেছেন তখনও।

যোগীনবাবু বলেন, 'আমি জানতুম আপনার ছেলে শাইন্ করবে। এরকম ছেলেরাই আজকাল উন্নতি করছে, দাদার। একটু বখাটে হওয়া ভাল এদিনে।'

'মরাল ডিগ্রেডেশান', রাস্তায় একটু ধুলো উড়ছিল, অটলবাবু নাকে রুমাল দিতে দিতে বললেন, 'যুগটাই যেন বদ্‌লে গেছে। আমাদের সময়ে কিন্তু ওরকম ছিল না।'

'আপনাদের সময়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কম ছিল। এখন একটা লোকের শুধু ভাত খেতে একশ টাকার বেশি লাগে। আদর্শ বজায় রেখে সুদিন আসবে ব'লে ঘরে বসে চুপ করে থাকতে হ'লে পেটে হাত দিয়ে ব'সে থাকতে হয়। একটু চালাক চঞ্চল দুরন্ত হওয়া ভাল এদিনে। একটু জাঁপিটে না হলে পেট মান দুইই যায়। বুঝছেন না?' বলে টেকো-মাথা ফর্সা যোগীন ডাক্তার গম্ভীর বিমর্ষ অটল রায়ের মুখের দিকে বাঁকা চোখে তাকায়।

অটলবাবু আরও বেশি গম্ভীর হয়ে থাকেন।

'আপনার ছেলে নিশানাথ জীবনে একটা কিছু করবেই আমার বরাবরের ধারণা।' যোগীনবাবু কেন জানি কথাটায় বেশ জোর দিয়ে বলেন।

চুপ করে থাকেন অটলবাবু। ডাক্তার তার-পরও অনর্গল কথা বলে, বিষয়, বর্তমান যুগের ছেলেমেয়ে কোন্ ধাতুতে গড়া। 'তারা চঞ্চলতা চায় হৈ চৈ চায়। জীবনবোধের সচেতনতায় দিশাহারা হয়ে ভালমন্দ একটা কিছু আঁকড়ে ধরবেই। আমি এটা পছন্দ করি। এই ধরুন আপনি। একটা গোল্ড মেডেলিস্ট। বাঁধাধরা চাকরীর চেয়ে মাথা খাটিয়ে ওকালতি করে পয়সা করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও এখানে এসে আপনার মাথা খাটল না, খাটাতে পারলেন না। এর কারণ আপনার নীতিবোধ এবং আপনার আদর্শ আপনাকে কোনঠাসা ক'রে রেখেছে। জগতের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলে আসতে দিলে না, আপনি প্রতিযোগিতায় হেরে গেলেন। তাই নয় কি?' কথা শেষ করে ডাক্তার প্রচণ্ড শব্দ করে হাসে। শক্তিমান জোয়ান পুরুষ। স্বাস্থ্য এত ভাল যে, অটলবাবুর পাশে দেখলে তাকে অটলবাবুর ছেলের মত মনে হয়। অথচ দুজন প্রায় সমবয়সী। গম্ভীর এবং আদর্শ-বাদী অটলবাবু জীবনে কিছু করতে পারেননি, ইদানিং নিশানাথের যদি কিছু হয় এবং ছেলের ভাগ্যে বাপের কিছু আসে এমন একটা মনের ভাব নিয়ে, অথবা সন্দিগ্ধ আশার আলো সামনে রেখে মনমরা হয়ে বসে আছেন।

ডাক্তার বেশ দু'পয়সা ক'রে ফেলেছে এর মধ্যেই। ডাক্তার সৌখীন লোক। আশাবাদী। বিদ্যা না-ই থাক ডাক্তারিতে পসার জমিয়েছে খুব তাড়াতাড়ি। বিদ্যার মধ্যে সবচেয়ে বড় বিদ্যা তিনি লোকের সঙ্গে মিশতে পারেন অফুরন্ত। এবং সকল বয়সের, অথবা তার চেয়েও যেটা বড় কথা পুরুষ নারী সকলের সঙ্গেই সমানভাবে। যোগীন ডাক্তার এ শহরের কোন্‌টার মধ্যে নেই। সর্বদলে এবং সকল দরবারে তিনি উপস্থিত। ছেলেরা থিয়েটার

করছে সেখানে ডাক্তারবাবু। বড়রা মানে শহরের সম্ভ্রান্ত প্রবীণদল টাউনহলে সমবেত হয়েছেন দেশের এক মহাপুরুষের শততম মৃত্যুবার্ষিকী করতে, সেখানেও যোগীনবাবু, দেখা গেল তিনিই শোকসভার উদ্যোক্তা এবং সকলের চেয়ে তাঁর উৎসাহই বেশি।

খেলার মাঠে এ বয়সেও কেডস পরে গায়ে হাফ-সার্ট চড়িয়ে লাল ফিতে-বাঁধা বাঁশী মুখে গুঁজে পূর্ণ-উদ্যমে শহরের ব্যাচেলার বনাম ম্যারিড দলের ফুটবল-ম্যাচে ডাক্তার রেফারি-গিরি করে।

এ শহরে এরকম প্রতিদ্বন্দ্বিতা গত তিন-বছর ধরে নিয়মিতভাবে চলছে। এবং প্রতি বছর আষাঢ় মাসের চিক্‌চিকে বর্ষার জল নামতে অন্য আর পাঁচটি প্রৌঢ়-সঙ্গ ছেড়ে ডাক্তার সোজা মাঠে নেমে যায়।

সঙ্গীরা হাঁ করে চেয়ে থাকে। ভাবে লোকটা পাগল।

গৌরবর্ণ চেহারা শরীর। মাথায় টাক। পুরু কব্জিতে হাতঘড়ি, হাতে সুদৃশ্য ডাক্তারী ব্যাগ, আর মুখে মোটা বর্মা চুরুট। ঠোঁট কালো হয়ে গেছে যা টেনে টেনে।

এখানকার মহিলা-সমিতিতে ডাক্তার মোটা চাঁদা দিয়েছে। অসহায় অনাথ হয়ে পড়েছে এমন কোনো মেয়েকে অথবা মেয়ের পরিবারকে ডাক্তার কোনো না কোনো ব্যবস্থা করে দিয়েছে, তার দৃষ্টান্তও আছে। ডাক্তারের নাম ডাক আছে শহরে। একটা আশ্রয়, একজন বন্ধু বটে।

আর ডাক্তার বলতে, অর্থাৎ যেটা তাঁর আপন পেশা, লোকে যোগীনবাবুকে জানে বেশি। চেনে অধিক। ভাল ডাক্তার কি মন্দ ডাক্তার বলে নয়।

ওঁর ওপর বিশ্বাস আছে সকলের। বাড়ির ছেলে থেকে বুড়ো সবাই যোগীন-ডাক্তারের চিকিৎসা চায়, তাঁর ধূসর মোটা রঙের পার্কার কলমের প্রেসক্রুপশন লেখা ওষুধ খেলে রোগ ভাল হয়ে যাবে। সবাইর ধারণা।

চোখে কালো গগ্‌লস।

গগ্‌লস, পার্কার কলম, সুদৃশ্য রিস্টওয়াচ, বর্মা চুরুট, ব্যাগ এবং টাক নিয়ে যোগীন ডাক্তার শহরে ভয়ঙ্কর পরিচিত।

এ শহরের সরকারী ট্রেজারীর ইটরং দালানের মত। কলেজের সামনের একমাত্র খেলার মাঠটির মত, কি শহরের মাঝখানের পার্কের মধ্যে সমচতুষ্কোণ লালদীঘিটির মত। কাউকে বলে দিতে হয় না ইনি ডাক্তারবাবু।

পার্কে বেড়াতে এসে ডাক্তারের ছুটোছুটি দেখে তাঁর বয়স-ঘেঁসা লোকেরা কেউ কেউ অবশ্য চোখ টেপাটেপি ক'রে হাসে, বলাবলি করে 'বুড়ো শালিক।' একটু বেশি যাঁদের বয়স, বলেন, লোকটি রসিক, স্বাস্থ্যটি এখনো ভাল আছে, ভুঁড়ি বেরোয়নি, চামড়া ঢিলে হয়নি। মন্দ কি। ইয়ং থাকতে পারা কম কি।

আর যারা নবীন, এই শহরের যারা নবীনা তাদের মুখে মুখে তিনি কাকাবাবু ছাড়া আর কিছু না।

তিনি ভাল কি মন্দ তা ওরা বলে না, বলে তিনি দরকারী। বলে, যোগীন ডাক্তার শহরে আছে বলেই শহরটায় প্রাণ আছে।

শহরে যে সভ্যতার ছিট লেগেছে, জীবন্ত সুন্দর হয়ে উঠেছে এর চেহারা সিনিয়রদের মধ্যে ডাক্তারকে দেখলেই সকলের আগে মনে হয়। বাকি সব গার্জিয়ান এখনো ষোলআনা সেকেলে, ভয়ানক ব্যাকোয়ার্ড। ছেলেমেয়েরা অশান্ত হ'ল কি উচ্ছৃঙ্খল এই দুশ্চিন্তাই যদি অভিভাবক কি অভিভাবিকাদের না কাটল তো শহর আর এগুলো কি। যে তিমিরে সেই তিমিরে। এ শহরের ছেলেমেয়েরা এজন্যে অসন্তুষ্ট।

ডাক্তার সাহসবাণী শোনায়, 'না একটু এগিয়ে আসুন আপনারা, একটু সাহস করুন, তবে তো ছেলেরা আর একটু বেশিদূর এগোবে।' আলাপের মোড় ফেরাবার জন্যে যোগীন ডাক্তার অটলবাবুর হাতে মৃদু চাপ দেয়, হাত ধ'রে ঈষৎ আকর্ষণ করে। 'আসুন সন্ধ্যে-বেলা আজ একটু রেস্টুরেণ্ট করা যাক্।'

অর্থাৎ অটলবাবু ডাক্তারের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে 'প্যারাডাইজ'এর দরজায় এসে গেছেন তখন।

শহরের সবচেয়ে নতুন রেস্তোরাঁ এটি।

টি-পয়, সুদৃশ্য চেয়ার, মেঝের ওপর বিছানো পুরু গালিচা, আর আলাদা আলাদা কামরা, পর্দা-খাটানো, পাখা লাগানো, যেন একটি ছেলে ও একটি মেয়ে বা দু'টি মেয়ে ও দু'টি ছেলে একসঙ্গে বসে একটু চা খাবার খেতে পারে মুখোমুখি, সংগোপনে, নিরিবিলি। রেডিও বসানো হয়েছে রেস্টুরেণ্টে সম্প্রতি।

বয়স্করাও কেউ কেউ এখানে আসছেন সন্ধ্যাবেলা অথবা সন্ধ্যার পর দিল্লী কোলকাতার খবর শুনতে। বেড়াতে বেড়াতে।

অটলবাবু শুধু এক কাপ চা খাবেন। তা-ই সই, যোগীনবাবু বন্ধু অটলবাবুকে জোর ক'রে ঠেলে রেস্টুরেণ্টে ঢুকিয়ে পরে নিজে ঢোকে। তারপর অর্ডার দেয় দু'খানা চিংড়ি কাট্‌লেট দু' কাপ চা। আর সশব্দে হাসে।

অটলবাবুর প্রতিবাদ অগ্রাহ্য হয়েছে। নতুন বয়। চুরুট ধরিয়ে যোগীন ডাক্তার নীচু গলায় বলল, "টেনিস খেলে ফিরছিলাম ওপাড়া থেকে। দেখলুম, রায়ের গাড়ি চালাচ্ছে আপনার ছেলে।"

'ওই আনন্দেই আছে ছোকরা।' বিমর্ষ চোখ তুলে বিমলিন একটু হেসে অটল দত্ত ডাক্তারের মুখের দিকে তাকান।

'তা হোক' মুখ থেকে চুরুট নামিয়ে ডাক্তার মাথা নাড়ল। দেখতে হবে কতটা আপন ক'রে নিয়েছে নিশানাথকে ওরা। কাল দেখলাম—'

ডাক্তারের কথা থেমে গেল। দু'টি মেয়ে ঢুকেছে ভিতরে এই মাত্র। সুন্দর সেজেগুজে অরুণা সেন সুশীর হাত ধরে রেস্টুরেণ্টে এল খেতে।

ওদিকে তাকাতে গিয়ে অটলবাবু চোখ নামালেন। তিনি যখন স্কুলের সেক্রেটারী ছিলেন তখন শিক্ষয়িত্রীদের এভাবে বাইরে আসার রেওয়াজ ছিল না। অন্য মেয়েরাও বড় একটা আসত কি।

একটা লম্বা নিঃশ্বাস ছাড়লেন অটলবাবু।

ডাক্তার উৎসুক চোখে চেয়ে আছে এইজন্য যে, যে-টেবিলে ওরা দু'জন এসে বসল সেই টেবিলের এক পাশে মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান মোহিনী নন্দী ও সাব-রেজিস্ট্রার মুরারি হাজরা বসে চা খাচ্ছিল। যোগীন ডাক্তার উৎসুক হয়েছে এবং বেশ উস্‌খুস্‌ করছে, অটলবাবু তা লক্ষ্য করলেন। তার সঙ্গে না বসলে ডাক্তার এতক্ষণে ছুটে যেত সেই দলে। অটলবাবু জানেন। কেবল তিনি ছাড়া, শহরের প্রায় সবাই, ছোট বড় সব, প্রগতির আলোয় নতুন ক'রে স্নান ক'রে উঠছে। অটলবাবু বেশ ভাল ক'রেই এটা উপলব্ধি করছেন।

কেবল তিনিই অন্ধকারে রয়ে গেছেন, তাঁর দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা নিয়ে। বাকি সবাই প্রগ্রেসিভ।

কোনোরকমে খাওয়াটা সেরে অটলবাবু ডাক্তারকে মুক্ত ক'রে দিলেন।

'আমি এবার উঠি ডাক্তার।' ব'লে অটল-বাবু উঠলেন।

হেসে ডাক্তার মাথা নাড়ল। অর্থাৎ আপত্তি নেই।

ডাক্তার বলল, 'আমায় একটু ক্লাবে যেতে হবে। গিন্নীর বই না নিয়ে গেলে আজ আমায় ঘরে ঢুকতে দেবে না।'

মৃদু হেসে অটলবাবু বললেন, 'না দেয়াই তো উচিত,—আচ্ছা চললুম।' বলে তিনি ধীরে ধীরে সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। ডাক্তার অনেকটা স্বস্তিবোধ করে। যেন মনে মনে বলে, কি ভয়ংকর 'বোরিং' এই লোকটি। এবং কালবিলম্ব না ক'রে যোগীন টেবিল পরিবর্তন করে। সহাস্যে ও সশব্দে ছুটে গিয়ে চেয়ারম্যান ও সাব-রেজিস্ট্রারের সঙ্গে মিলিত হয়, সেখানে আর একটা চেয়ার আনিয়ে ব'সে পড়ে।

সুশীলা ও অরুণা খুব আস্তে, অত্যন্ত ধীরে ধীরে একটা দু'টো কথা বলছিল। তা-ও প্রবীণদের প্রশ্নের উত্তরে। অনেকটা যেন ভয়ে ভয়ে। কেননা তিনজনই স্কুল-কমিটির সদস্য। দু'জন ভাবতেই পারেনি এ সময় এই রেস্তোরাঁয় ছেলেরা ছাড়াও বুড়োরা আসে।

অবশ্য আড়ষ্ট ভাবটা দু'জনেরই কেটে গিছল রেস্টুরেণ্টের ভিতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে। চেয়ারম্যানের সহাস্য সম্বর্ধনা এবং

সাব-রেজিস্টারের আনন্দোদ্ভাসিত দন্তহীন কৃশ মুখমণ্ডল ও নিষ্প্রভ চোখে যুগপৎ স্নেহ ও অভিনন্দনের অভিব্যক্তি বড় সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছিল। বুড়ো সাব-রেজিস্টার নিজে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। কেবল শিক্ষয়িত্রী ব'লে নয়, মহিলা ব'লে। পৃথিবীর যে-কোনো সভ্য দেশের মতো এই ছোট্ট শহরেও নারীর প্রতি সম্মানবোধ প্রকট হ'য়ে উঠেছে। মিস অরুণা সেন তা উপলব্ধি করল। 'বয়' দু'টো অতিরিক্ত চেয়ার বাবুদের টেবিলের পাশে রাখতে দু'জন বাধ্য হ'য়ে বসল সেখানে। কর্তব্যবোধে সম্ভ্রমবোধে।

কিন্তু তারপরও দু'জন আস্তে, বড় বেশি সমীহের সুরে কথা বলছিল। চব্বিশ ও উনিশ বছরের দু'টি মেয়ে।

ডাক্তারের স্বভাবসুলভ কলহাস্যে আবহাওয়া হঠাৎ তরল হয়ে গেল।

'আলুর দর বাড়ছে, চপের সাইজ ছোট হচ্ছে, এতে আমাদের লাভক্ষতি যা-ই হোক আপনার পক্ষে কিন্তু ভালই হ'ল, মোহিনী-বাবু।'

চেয়ারম্যান ডাক্তারের মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসেন।

'সাব-রেজিস্টারের দাঁত নেই কিনা তাই চিংড়ি মাছ ও মাংস ফেলে প্রথমেই ভেজিটেবল চপ হেঁকে বসল, আমি বললাম, যোগীনবাবু এখানে রয়েছেন আমায় আলু খেতে দেখলে এখুনি তেড়ে আসবেন।'

'একটা চপ্ খেয়ে তোমার সুগারের মাত্রা যদি বেড়ে যায় আর তাতে তুমি শয্যাশায়ী হও তবে তা-ই হোক। ফিফ্‌টির ঘরে পা দিতে না দিতেই যে তুমি এমন অকর্মণ্য সেজে বসে আছ ধরখানা দেখলে কি কেউ বিশ্বাস করবে,—কি বল ডাক্তার।' সাব-রেজিস্টার ডাক্তারের দিকে মুখ ঘোরান।

সাব-রেজিস্টারের চেয়ে চেয়ারম্যানের শরীর আকারে অনেক বড়। সাব-রেজিস্টার মুরারি হাজরা অত্যন্ত বেঁটে, ছোটখাট, গায়ের রং মেটে, তাই দেখতে নাকি একটা ইঁদুরের মত মনে হয় মুরারিকে, মোহিনীবাবু মাঝে মাঝে বলেন। অথচ দু'জন ছোটবেলা থেকে, খুব শৈশব থেকেই বন্ধু। এবং দু'জনেরই দেহাকৃতির এই আকাশ-পাতাল পার্থক্যও নাকি তখন থেকে।

তখনকার দিনে ছেলেরা যেমন মোহিনী নন্দী ও মুরারি হাজরাকে এক সঙ্গে পাশাপাশি পথ চলতে দেখলে ঠাট্টা করত এখনকার ছেলেরাও চেয়ারম্যান ও সাব-রেজিস্টারকে আড়ালে আবডালে প্রচুর ঠাট্টা করে। ছেলেরা বলে 'লরেল হার্ডি।'

দু'জনের অন্তরঙ্গতার মত মুহুর্মুহু কলহও স্বতঃসিদ্ধ।

তাই চপ-প্রসঙ্গে মোহিনীবাবু যেই সাব-রেজিস্টারের দাঁত নিয়ে খোঁচা দেন অমনি সাব-রেজিস্টার তোলেন মোহিনীর শর্করাবহুল অকর্মণ্য বিপুল দেহের কথা।

হেসে ডাক্তার সমস্যার মীমাংসা করে দেয়।

'বেশ তো এর সঙ্গে দু'জনেই একটু বেশি ক'রে স্যালাড্ খান। তাতে দু'জনেরই উপকার হবে।—বো-য়।'

'বয়' এসে সামনে দাঁড়াতে ডাক্তার অতিরিক্ত দু' প্লেট স্যালাডের অর্ডার দিয়ে মিটিমিটি হাসতে থাকে।

ডাক্তারের এই রসিকতায় চেয়ারম্যান ও সাব-রেজিস্টার না হেসে পারেন না।

সুশী ও অরুণা এই প্রথম মুখ টিপে হাসল।

কেবল স্যালাড্ নয়, সেই সঙ্গে যোগীন আর দু'খানা চপ ও চায়ের অর্ডার দেয় লেডীজদের জন্যে। এবং নিজের জন্যে আবার এক কাপ চা।

আবহাওয়া রীতিমত অন্তরঙ্গ হয়ে উঠল।

'আপনার শরীর এখানে এসে সত্যি বেশ ভাল হয়েছে মিস সেন, definite improvement.'

অরুণা উৎফুল্ল চোখে ডাক্তারের মুখের দিকে তাকাল। 'জায়গাটা আমারও খুব ভাল লাগছে ডাক্তারবাবু, এখানে এসে ক'দিনের মধ্যেই বেশ—' অরুণা থামল। সুশীলা লক্ষ্য করছিল এই দেড় মাসে অরুণা একটু মোটা ও ফর্সা হয়েছে। শুকনো চেহারা ছিল ব'লে ওর নাকটাকে আগে খাড়ার মত দেখাত, এখন ভরভরাট চেহারায় ভারি সুন্দর লাগে অরুণার মুখখানা।

'আমার গলার দোষটা এখনও ভাল ক'রে সারল না, কাকাবাবু।' সুশীলা বলল, 'আমার স্বাস্থ্য এখানে মোটেই টিঁকছে না।'

'তুমি এখানকার জলহাওয়ায় মানুষ কিনা।' ডাক্তার একটু হাসল এবং পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে গেল। 'গার্গল্ করার জন্যে ওষুধটা দিয়েছিলাম, ফুরিয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ।' ঈষৎ ঘাড় নেড়ে সুশীলা ডাক্তারের চোখে চোখে তাকাল। অরুণা চুপ ক'রে থাকে।

'আচ্ছা,—কাল ত যাচ্ছি আমি।' ডাক্তার সোজা হয়ে বসল। 'ইলেক্‌শনের ব্যাপারে ক'দিন আর যাওয়াই হয়নি তোমাদের ওখানে। হ্যাঁ কাল যাব, কাল আবার ওষুধ দেব।'

চুপ ক'রে সুশীলা খেতে আরম্ভ করল। চুপ ক'রে রইলেন এঁরাও এতক্ষণ,—চেয়ারম্যান ও সাব-রেজিস্টার। কমিটি অনুমোদনক্রমে যোগীনবাবু এ বছর গার্লস স্কুলের ডাক্তার নিযুক্ত হয়েছেন। সপ্তাহে একদিন তাঁকে স্কুলে ও টিচার্স কোয়ার্টারে গিয়ে মেয়েদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হয়। একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা অর্থাৎ স্বাস্থ্য-প্রসঙ্গ সমাপ্ত হয়েছে যখন বোঝা গেল তখন চেয়ারম্যান অন্য প্রসঙ্গ তুললেন। তিনি হেড মিস্‌ট্রেস্-এর সঙ্গে স্কুল-কমিটির আগামী মিটিং-এর বিষয় আলোচনা করলেন। প্রত্যেকটি কথা অত্যন্ত সুন্দরভাবে বেশ বিচক্ষণতার সঙ্গে অরুণা ব'লে গেল। আগামী মিটিং-এ উপস্থাপনীয় জরুরী কতকগুলি নতুন প্রস্তাব পর্যন্ত তুলল অরুণা নিজে থেকে। সাব-রেজিস্টার, চেয়ার-ম্যান, ডাক্তার মুগ্ধ হয়ে গেলেন মেয়েটির ব্যবহারে, কথাবার্তায়, বুদ্ধি বিবেচনা এবং সর্বোপরি স্কুল সম্পর্কে ওর অপরিমিত উৎসাহ দেখে। হ্যাঁ, এমন একজন হেড মিস্‌ট্রেসই তাঁরা চেয়েছিলেন।

'তবে আমার কথা হ'ল এই যে' সাব-রেজিস্টার এবার আলাপের উপসংহার টানলেন, 'সকল কাজের আগে উচিত এখন হস্‌পিট্যাল রোড ও টিচার্স কোয়ার্টারের মাঝামাঝি রাস্তাটার নিচে আর একটা বড় কালভার্ট বসানো এবং অই রাস্তার পুরোনো বাতিটা বাতিল ক'রে দিয়ে নতুন একটা আলো বসানো। কি বল ডাক্তার?'

হেসে যোগীন ডাক্তার ঘাড় নাড়ল। অর্থাৎ মিউনিসিপ্যালিটির নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান বন্ধু মোহিনীর ওপর সাব-রেজিস্টার আবার এক হাত নেবার চেষ্টা করছেন, উপস্থিত কারোর বুঝতে বাকি রইল না।

মোহিনী নন্দীর মুখেও উত্তর তৈরী ছিল। গম্ভীর হয়ে বললেন, 'কেন, বড় একটা কালভার্ট না বসিয়ে ছোট দু'খানা বসালে তোমার যাতায়াতের অসুবিধা কি। বরং আমি ত জানি ওরা সরু সুড়ঙ্গপথই বেশি—'

'চুপ!' সাব-রেজিস্টার চিৎকার ক'রে ওঠেন। তোমরা কবে সভ্য হবে আমি জানতে চাই, এখানে লেডীজ রয়েছেন আর যা খুশি মুখে আসছে বলে যাচ্ছ। তুমি এর প্রতিকার কর যোগীন।'

মূষিক শব্দটা উহ্য রেখেও চেয়ারম্যান সা-রেজিস্টারকে কেমন চটাতে পারেন কতটা উত্তেজিত করতে পারেন পরীক্ষা শেষ ক'রে মুখে রুমাল চাপা দিয়ে তিনি উঠে দাঁড়ান। চাপা হাসির ধমকে, মোহিনীর বিপুল দেহ কাঁপছে। আর অসহ্য ক্রোধে ছোট ছোট হাত দুটি শূন্যে আন্দোলিত ক'রে সাব-রেজিস্টার বিড় বিড় করতে করতে উঠে দাঁড়ান। 'ভাল্‌গার, কালচারের ছিঁটেফোঁটা তোমার মধ্যে দানা বাঁধেনি। আর নয়,—আমারই দোষ, অনেকদিন আগেই তোমার সংস্রব আমার বর্জন করা উচিত ছিল, মোহিনী।' ব'লে, সব চেয়ে যেটা বিস্ময়ের জিনিস, মোহিনীবাবু সকলের কাছ থেকে যখন বিদায় নেন তখন সাব-রেজিস্টারও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে পড়েন। এক মিনিট আর অপেক্ষা

করেন না। যেন মোহিনী সংগে না থাকলে মুরারি হাজরা রাস্তা চিনে বাড়ি যেতে পারবেন না।

'আশ্চর্য দুটি বন্ধু।' অরুণা বলল।

'হ্যাঁ, এমনি ঝগড়া করতে করতে এক সংগে দু'জন বকুলবাগান গিয়ে পেণছবে।' ডাক্তার তখনও হাসছে। 'সত্যিকারের বন্ধু দুটি।

'দু'জন এক পাড়াতেই থাকেন বুঝি?'

'হ্যাঁ, এ'রা দু'জন, আর আমাদের অটলবাবুও থাকেন ওপাড়ায়। একটু আগে আমার সংগে বসে যিনি চা খাচ্ছিলেন। সবাই পুরোনো অঞ্চলের বাসিন্দা এ'রা।'

'অটলবাবু মানে নিরঞ্জন রায়ের ব্যাঙ্কের ম্যানেজার নিশানাথের বাবা?'

'হ্যাঁ।' ডাক্তার অরুণার চোখে চোখে তাকাল। 'নিশানাথকে আপনি দেখেছেন?'

'না দেখবার আছে কি। হস্পিট্যাল রোড ধ'রে তো রোজ অফিসে যান।'

'তা-ও বটে।' বয় বিল নিয়ে সামনে দাঁড়াতে ডাক্তার তা মিটিয়ে দিতে দিতে বলল, 'ছোট্ট শহরের সুবিধা এই। চট্ ক'রে প্রত্যেকেই প্রত্যেককে চিনতে পারে।'

সুশীলা দরজার বাইরে তাকিয়ে অন্যমনস্কের মত কি ভাবছিল। অরুণা তা লক্ষ্য ক'রেও চুপ ক'রে রইল। যোগীন ডাক্তারের নজরে তা পড়ল না বা পড়লেও এ নিয়ে ভাববার মত মন বা মনের অবস্থা তার কোনদিন নেই। আমুদে লোক। ভাবে কম। হাসে বেশি।

বাইরে এসে ডাক্তার বলল, 'চলুন, আমিও আপনাদের সংগে যাচ্ছি।'

'কষ্ট ক'রে অতটা পথ আপনি হাঁটবেন কাকাবাবু?' সুশীলা সংকুচিত হ'ল। 'বা-রে আমাকে যে ক্লাবে যেতে হবে।—এক রাস্তা।'

অরুণা কিছু বলল না। সুশী অরুণার পিছনে। সকলের আগে ডাক্তার। মুখে মোটা বর্মা চুরুট। পায়ে নতুন ক্রেপ্-সোলের জুতো ব'লে অত ভারি মানুষ ডাক্তারের রাস্তা চলতে শব্দ হয় না। অরুণার পায়ে উঁচু হিলের জুতো ও সুশীর পায়ে স্যাণ্ডেল। ওদের চলার খুট্‌খুট ছপ্‌ছপ শব্দ হয় কেবল। একটু বেশি রাত হ'তে হস্পিট্যাল রোড বেশ নির্জন হ'য়ে যায়। কেমন ফাঁকা। (ক্রমশ)

# উর্বশী

শ্রীঅশোক সেন

যুগে যুগে কবিগণ সুন্দরের বন্দনা গান গাহিয়া গিয়াছেন। কাব্যালোচনা করিতে গিয়া একটা কথা আমরা প্রায়ই ভুলিয়া যাই—সে হইল এই যে কবি আর দার্শনিকের স্বভাববিভিন্ন পথকে আমরা এক করিয়া দেখি। দর্শন প্রজ্ঞাজ্ঞানের জগৎ—ইহা আমাদের Ultimate reality of things-এর স্বরূপ বোঝাইবার চেষ্টা করে, আর বিজ্ঞান reality of things লইয়া ব্যস্ত অর্থাৎ সাধারণভাবে যাহা দেখা যায় সেই জগৎ লইয়াই বিজ্ঞানের কারবার। বিজ্ঞানের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ বস্তুকে লইয়া, আর দর্শন ব্যস্ত অসীমকে লইয়া। দর্শন এবং বিজ্ঞানের মাঝে সেতুর মত বিরাজ করে সাহিত্য। সীমা এবং অসীম, অখণ্ড এবং খণ্ড, ভাব এবং বস্তুর মিলনে যে অপরূপ সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয় শিল্পীর কাজ তাহার রূপ দেওয়া। সোজা কথায়, দার্শনিকের কাজ তত্ত্বের নির্দেশ দেওয়া আর কবির মেলা সৌন্দর্য সৃষ্টি করা। অবশ্য কাব্যের মধ্যে তত্ত্ব থাকিলেই যে সে কাব্য যথার্থ কাব্য নহে তাহা মনে করা ভুল হইবে। সে ক্ষেত্রে আমরা কবির কাছ হইতে কিছু উপরি পাইলাম—সৌন্দর্য এবং সেই সঙ্গে তত্ত্ব। তবে তত্ত্ব দিতে গিয়া যে কবি সৌন্দর্যের বিকৃতি ঘটান তিনি পণ্ডিত বা দার্শনিকের দৃষ্টিতে বড় হইতে পারেন কিন্তু সত্যকার শিল্পরসিকের চোখে অনেকখানি নামিয়া যান।

সুন্দরের বর্ণনা করিতে গিয়া বলা হইয়াছে—সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্—অর্থাৎ যাহা সত্য তাহাই শিব এবং তাহাই সুন্দর। আরো একটু বিশদভাবে ইহার ব্যাখ্যার প্রয়োজন। সত্য কি? সত্যের অর্থ যে কোন জিনিস বা বস্তুর চরমরূপ। এই চরমরূপ নিরূপণ করিতে গেলে দেখা যায় প্রত্যেক বস্তুর ভিতরই অন্তর্নিহিত ভাবে রহিয়াছে ছন্দের অপরূপ নৃত্য। সে নৃত্য উপভোগ করিতে হইলে মনকে হইতে হইবে দেবতার মত স্বর্গীয় সৌন্দর্যমণ্ডিত। আবার যাহা সত্য তাহাই শিব। শিব একদিক দিয়া জ্ঞান এবং শক্তির প্রতীক তিনি নটরাজ। আবার অন্যদিকে তিনি ধ্যানী, উদাসীন—বিষপান করিয়া তিনিই আবার নীলকণ্ঠ। শিবের যথার্থ রূপ যে বুঝিতে পারিবে, সে সুন্দরকে যোগীর দৃষ্টিতে দেখিবে—সৌন্দর্যের প্রকৃতরূপকে সেই উপলব্ধি করিতে পারিবে। কিন্তু সুন্দরকে যে বিকৃতরূপে দেখিবে, সে সৌন্দর্য হইতে আহরণ করিবে হলাহল—তাহার লালসা হয়ত চরিতার্থ হইবে, কিন্তু বস্তুকে ছাড়িয়া সে বস্তুর অতীতে যাইতে পারিবে না, সীমার মধ্যেই আবদ্ধ থাকিবে, অসীমকে পাইবে না, দেহ ছাড়িয়া দেহাতীতে কখনও পৌঁছিতে সমর্থ হইবে না। ওদেশের কবিও সুন্দরের বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন—

Beauty is truth, truth beauty.

আমাদের দেশের পৌরাণিক কল্পনায় উর্বশী স্বর্গের ছন্দ ও নৃত্যের পরিপূর্ণ মূর্তি এবং সৌন্দর্যের আদর্শ প্রতীক। সকল দেবতা তাঁহার বন্দনা করেন এবং দেবরাজ ইন্দ্রের তিনি সখী।

আদর্শ সৌন্দর্যের বন্দনা এবং বর্ণনা করিতে গিয়া কবি রবীন্দ্রনাথ পুরাণ হইতে গ্রহণ করিলেন এই কাল্পনিক নটী উর্বশীকে। কবি চিরকালই দেহের মধ্য হইতে দেহাতীত, খণ্ড হইতে অখণ্ড এবং সীমার মধ্য হইতেই অসীমকে উপলব্ধি করিয়াছেন। এই জন্যই তিনি abstract beauty সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করেন নাই। শেলীর Intellectual Beauty-র সংগে এইখানেই তাঁহার তফাৎ।

মানুষের শ্রেষ্ঠরূপের বিকাশ নারীদেহের মধ্য দিয়াই হইয়াছে। এই জন্যই অন্যত্র কবি বলিয়াছেন—

যে ভাবে রমণীরূপে আপন মাধুরী
আপনি বিশ্বের নাথ করিছেন চুরি।
('রমণী', স্মরণ)

কিন্তু একথাও ঠিক জাগতিক নারীদেহের মধ্যে সমস্ত সৌন্দর্যের সমন্বয় আমরা কখনও দেখিতে পাই না। সে সমন্বয় পাইতে হইলে কাল্পনিক নারীসৌন্দর্যের মূর্তি সৃষ্টি করা আবশ্যক। রবীন্দ্রনাথের উর্বশী তাঁহার কল্পনার দূতী—নারীর রূপমহিমার যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ তাহার সমন্বয় হইয়াছে এই উর্বশীতে। এই জন্যই Prof. V. Lesny বলিয়াছেন—

The poem Urbasi shows an unusually powerful poetical effect. It is as if the perfect ideal of beauty was being called into existence before the eyes of the reader by the magic of his words.

এইত গেল ভূমিকা—এইবার কবিতাটিকে ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করা যাক্—

প্রথমেই কবি বলিতেছেন—'তুমি মাতা, কন্যা বা বধূ নহ—তুমি আনন্দলোকবাসিনী।' তুমি স্বর্গোদ্যান নন্দনকাননের সুন্দরী রূপসী উর্বশী।' নারীরূপের এক একটা দিক্ মাতা, কন্যা বা বধূতে পাওয়া যায়। উর্বশী সৌন্দর্যের আদর্শ প্রতীক। একটা বিশেষ রূপের বা সম্বন্ধের মধ্য দিয়া দেখিলে তাঁহাকে সীমাবদ্ধ এবং ক্ষুদ্র করা হইবে। তাঁহার সত্যকার রূপের অনেকখানিই বাদ পড়িবে—কারণ সমস্ত রূপ এবং সৌন্দর্যের সমন্বয় হইয়াছে এই উর্বশীতে। উর্বশীর মনে কোন সরম বা লজ্জা নাই, তিনি উষার উদয়সম অনবগুণ্ঠিতা এবং অকুণ্ঠিতা, কারণ সৌন্দর্য পবিত্র এবং কালিমা-মুক্ত—তাহাতে সংকোচের গ্লানি থাকিতে পারে ... এই সৌন্দর্যের সঙ্গে শিশুমনের পবিত্রতার ...না করা যায়।

পুরাণে আছে যে সমুদ্রমন্থনে উর্বশীর ...ত্তি—তাঁহার দক্ষিণ হস্তে ছিল সুধাপাত্র বাম হস্তে বিষভাণ্ড—কবি তাঁহার ...র্দৃষ্টির সাহায্যে এই কাহিনীকে নূতন-...প দেখিয়াছেন। উর্বশী যেন বৃন্তহীন ...ষ্পের মত আপনাতে আপনি বিকশিত ...য়াছেন—কবে কে জানে? সৌন্দর্য কোথা ...ইতে কি কারণে উদ্ভূত হয় সে খবর কেহ বলিতে পারে না। তাহার সমস্ত পরিচয় তাহার নিজের মধ্যে। সমুদ্রমন্থনে উর্বশীকে লাভ করা হয়- ইহার কারণ সমুদ্রের বক্ষে আমরা প্রতিক্ষণ যে তরঙ্গের নৃত্য দেখিতে পাই তাহা ত' ছন্দ-নৃত্যেরই রূপ। এই ছন্দ হইতেই সৌন্দর্যের সৃষ্টি। সৌন্দর্যের চরম প্রতীক উর্বশী সাগররূপে ছন্দমন্থন হইতে সৃষ্ট, এই কথাই ...েন কবি বলিতে চাহিয়াছেন। তা ছাড়া ...সীমের রূপে যখন সীমাতে বদ্ধ হয় তখনই সৌন্দর্যের সৃষ্টি। অসীম সাগর যেন ...জের সৌন্দর্যের প্রকাশের জন্য ...সীম সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠ প্রতীকরূপে আবির্ভূতা হইলেন উর্বশীরূপে। কবি বলিতেছেন—'কবে কোন্ আদিম বসন্ত-প্রাতে হে উর্বশী, তুমি সাগর ...ইতে উঠিয়াছিলে—তোমার সৌন্দর্যে বিমোহিত ...ইয়া সাগর যেন তাহার লক্ষশত ফণা অবনত ...রিয়া ঐ পদপ্রান্তে আত্মনিবেদন করিল। তুমি ...ন্দফুলের ন্যায় শুভ্র—তোমার কান্তি নগ্ন—...র্থাৎ শিশুর মত সরল ও পবিত্র—এমন কি ...বরাজ ইন্দ্রও তোমাকে বন্দনা করিয়া থাকেন। ...মার সৌন্দর্য অনিন্দ্যনীয়।'

উর্বশী যখন পৃথিবীতে আবির্ভূতা ...ইলেন তখন তিনি পূর্ণযৌবনা—পূর্ণ ...স্ফুটিত পুষ্পের মত তিনি বিকশিতা। ...ন্তযৌবনা উর্বশী কি কখনও যৌবনের ...র্বাবস্থার ভিতর দিয়া আসেন নাই? ফুলকে ...ন ফুলরূপে প্রস্ফুটিত হইবার পূর্বে ...কুলরূপের মধ্য দিয়া আসিতে হয় তেমনি ...শীকেও কি যৌবনবিকশিতা হইবার পূর্বে 'বালিকা বয়সের মধ্য দিয়া আসিতে হয় নাই? অন্ধকার সমুদ্রতলে নির্জনে কাহার ঘরে বসিয়া উর্বশী শৈশবকালে মণিমুক্তা লইয়া খেলা করিতেন? মাণিক্যের দীপ্তি দ্বারা উদ্ভাসিত কক্ষে, সমুদ্রের কল্লোলের সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে অকলঙ্ক হাস্যমুখে, প্রবালের পালঙ্কে কাহার অঙ্কে শুইয়া তিনি নিদ্রা যাইতেন? এই স্তবকে কবি যেন এই প্রশ্নই তুলিতেছেন যে জাগতিক অন্যান্য জিনিসের মত সৌন্দর্যেরও কি বিবর্তনের ভিতর দিয়া বিকাশ লাভ করিতে হয়? কবিকল্পনা এখানে আদর্শ-সৌন্দর্যের পরিণত রূপের পূর্বাবস্থা বর্ণনা করিতে গিয়া কয়েকটি বড় সত্যের ইঙ্গিত দিয়াছেন—আঁধার পাথারতলে একেলা বসিয়া যেন উর্বশী শৈশবের খেলা করিতেন।

'প্রান্তিকে' কবি বলিয়াছেন—

দেখিনি অদৃশ্য আলো আঁধারের স্তরে স্তরে অন্তরে অন্তরে, যে আলোক নিখিল জ্যোতির জ্যোতি।

সৌন্দর্য পূর্ণভাবে বিকশিত এবং প্রস্ফুটিত হইবার পূর্বে যে এই আঁধারের মধ্যেই আবৃত্ত থাকে। সৌন্দর্যের চরম প্রতীক উর্বশী ছন্দের রাণী এবং সঙ্গীতময়ী—তাই শৈশবে তিনি যেন অকলঙ্ক হাস্যমুখে সমুদ্র-কল্লোল শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িতেন।

'হে অপূর্বসুন্দরী উর্বশী, যুগ যুগান্তর ধরিয়া সারা বিশ্ব তোমাকে প্রেয়সীরূপে পূজা করিয়া আসিয়াছে। কত মুনি ঋষি তোমার সৌন্দর্যে মোহিত হইয়া ঐ রাতুল চরণ বন্দনার জন্য তপস্যার ফল জলাঞ্জলি দিয়াছেন। ত্রিভুবনে যে যৌবনের চাঞ্চল্য দেখা যায় তাহারও প্রকৃত কারণ তোমারই নয়ন কটাক্ষঘাত। তোমার অঙ্গবিচ্যুত গন্ধ মাদকতা-পূর্ণ এবং অন্ধ বায়ু সেই মদির আবেশ চারিদিকে ছড়াইয়া দেয়। তোমার সৌন্দর্যের মধু পান করিয়া মুগ্ধচিত্ত কবি ভ্রমরের ন্যায় চারিদিক সঙ্গীতে ভরিয়া দেন। বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চলা তুমি নূপুরের গুঞ্জনধ্বনি করিতে করিতে অঞ্চল টানিয়া নৃত্য করিতে করিতে চলিয়া যাও।'

সৌন্দর্যবোধ মানুষের জীবনের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। কবে প্রথম মানুষের হৃদয়ে সৌন্দর্যবোধের উদয় হয় সেকথা আমরা বলিতে পারি না—যতদিন মানবসভ্যতা থাকিবে ততদিন মানুষ সুন্দরের উপাসনা করিবে। এইজন্যই সৌন্দর্য অনাদি এবং অনন্ত, এই-জন্যই উর্বশী কালশাসনের অতীত।

চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ, অর্থাৎ যাঁহারা ধ্যানে মগ্ন থাকেন, তাঁহারাই ত প্রকৃত মুনি। সৌন্দর্যের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া এই সব ধ্যানীগণ আত্মসমাহিত অবস্থা ত্যাগ করিয়া সেই সৌন্দর্যকে নিজেদের সৃষ্টির মধ্য দিয়া সকলের সামনে ধরিয়া দিতে চেষ্টা করেন। সৌন্দর্য তাঁহাদের ধ্যানভঙ্গ করে এবং এই সুন্দরের পদে তাঁহারা নিজেদের সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করেন। এই পংক্তিতে কবি সৃষ্টি-রহস্যের একটি খুব গূঢ় তত্ত্বের আভাষ দিয়াছেন। সৃষ্টি অর্থেই সুন্দরের রূপদান। যে সৃষ্টি সুন্দর নয় তাহাই ত' অনাসৃষ্টি। সৃষ্টির পূর্বে স্রষ্টাকে একটা অবস্থার ভিতর দিয়া যাইতে হয়, যাহাকে সহজ কথায় বলা যাইতে পারে চিন্তা বা ধ্যানের অবস্থা বা স্তর। এই সময়টি কবি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের মতে 'Reflection in tranquility'র সময়।

সৌন্দর্যের ভিতর একটি আবেশ করা ভাব থাকে যাহা চারিদিক মদির করিয়া রাখে। সৌন্দর্যই সঙ্গীতস্রষ্টা কবির প্রাণ সঙ্গীতময় করিয়া তোলে। সৌন্দর্যের মধ্যে অন্তর্নিহিত-ভাবে রহিয়াছে ছন্দনৃত্য। এইজন্যই উর্বশীকে নৃত্যপরা রূপে কল্পনা করা হইয়াছে। সৌন্দর্য বিদ্যুতের মত হঠাৎ নিজ রূপ প্রকাশ করিয়া তাহার পরেই মিলাইয়া যায়।

'তুমি যখন দেবসভাতলে পুলকের উল্লাসে তরঙ্গভঙ্গে নৃত্য করিতে থাক—সে আনন্দ, সে সৌন্দর্য প্রতিফলিতভাবে দেখিতে পাই সিন্ধু-তরঙ্গের ছন্দোময় নৃত্যে, দেখিতে পাই কাঁপিয়া-উঠা শস্যশীর্ষের শিহরণে।'

নৃত্যরতা উর্বশীর স্তনহার হইতে বিচ্যুত হইয়া নভঃস্থলে খসিয়া পড়ে তারকা, সে অতুলনীয় সৌন্দর্যের দৃশ্যে পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা হইয়া উঠে—দেহের রক্তধারা যেন নাচিতে থাকে। দিগন্তে নানা রঙ-বেরঙের সুন্দর খেলা দেখা যায়। কবিকল্পনায় এ যেন দিগন্তে নৃত্যরতা উর্বশীর মেখলা টুটিয়া যাওয়াতে তাঁহার অসম্বৃতা অঙ্গরাগের প্রকাশ এবং আভাস। উপরিউক্ত পংক্তিগুলি গ্রীকদের কল্পিত Music of the spheresএর কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়।

সুরসভাতলে যবে নৃত্য করো পুলকে উল্লসি—সৌন্দর্যের রাণী উর্বশী দেবসভাতলে আনন্দের আবেগে নৃত্য করেন—সুন্দরের অন্তর্নিহিত ছন্দোময় রূপ উপভোগ করিতে পারেন তাঁহারাই, যাঁহাদের চিত্ত পবিত্র এবং শুভ্র, অকলঙ্ক এবং স্বর্গীয়। সৌন্দর্যকে ত' যে সে বুঝিতে পারে না। এ অধিকার যে পায় তাহার চরিত্র হয় দেবতার মতই সুন্দর, মহৎ এবং সর্বজ্ঞানের আকর। যে ব্যক্তি বস্তুকে ছাড়াইয়া বস্তুর অতীতে যাইতে পারে নাই, দেহকে ছাড়াইয়া দেহাতীতে পেঁ'ছিতে অপারগ, সীমার মধ্যেই অসীমের ইঙ্গিত আছে একথা যে বুঝে না, সে ত' সৌন্দর্যবোধের অধিকার লাভ করে নাই—তাহার মন অজ্ঞানের অন্ধকারে পূর্ণ, সংকীর্ণ—সেই ত' প্রকৃত অসুর—উর্বশীর নৃত্য দেখিবার অধিকার তাহার নাই। সত্যকে বুঝিতে হইলে সুন্দরকেও বুঝিতে হইবে—এবং সুন্দরকে বুঝিতে হইলে নিজেকেও সুন্দর হইতে হইবে। গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর মতে—

The path to the knowledge of Reality lies through discipline ...

character and intellectual training (largely in the sciences and in philosophy). But there is also an approach through Beauty in its many forms.

ছন্দে ছন্দে নাচি উঠে......ধরার অঞ্চল—

প্লেটো বলিয়াছেন—

Of all the 'ideas' Beauty has the most universal and strongest appeal, and the beauty of earth moves men because it is a reflection of an eternal beauty and wakes the sense of it in them.

আবার অন্যত্র Plato বলিয়াছেন—

A man begins by appreciating the beauty of one beautiful object or shape. His capacity then advances to the stage in which he can appreciate several beautiful objects, and realises that the beauty in one is the same as the beauty in another. The next stage is the appreciation of abstract beauty, that is, the beauty of laws and institutions.

প্রকৃত সৌন্দর্যরসিক সিন্ধুতরঙ্গের ছন্দ-নৃত্যে শস্যশীর্ষের শিহরণে উর্বশীর বা আদর্শ সৌন্দর্যেরই খণ্ডরূপ দেখিতে পান—খণ্ড সৌন্দর্য যেন আদর্শ সৌন্দর্যের নৃত্যাবেগে উদ্বুদ্ধ হইয়া নিজেও নৃত্যময় এবং প্রাণময় হইয়া উঠে। এই প্রসঙ্গে এই কথাটাও মনে রাখা উচিত যাহা সুন্দর তাহাই প্রাণবন্ত। প্রাণের প্রধান লক্ষণ গতিবেগ। এই তিনের পরস্পরের সম্বন্ধই নৃত্যের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হয়।

অকস্মাৎ পুরুষের........অসম্বৃতে—আদর্শ সৌন্দর্যের স্বরূপ যে পুরুষ উপলব্ধি করিতে পারে—যে বুঝিতে পারে যে সেই চরম এবং পরম সৌন্দর্যেরই প্রকাশ নানা দিকে নানা ভাবে জলে স্থলে আকাশে বাতাসে, সে নিজের মধ্যেও সুন্দরকে ধরিতে সক্ষম হয়; তাহার ধমনীতে ধমনীতে শিরায় শিরায় রক্তপ্রবাহ যেন নৃত্য করিতে থাকে, তাহার চিত্ত আত্মহারা হইয়া যায়। সৌন্দর্য-উপলব্ধি অকস্মাৎই হয়—এইজন্যই "অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা" এবং "দিগন্তে মেখলা তব টুটে আচম্বিতে।" কবি অন্যত্র বলিয়াছেন—"চকিত আলোকে কখন সহসা দেখা দেয় সুন্দর......"

'পৃথিবী তোমার রূপমুগ্ধ—জগৎকে তুমি তোমারি সৌন্দর্যের অংশ দিয়া মোহিনী রূপে সাজাইয়া রাখিয়াছ—স্বর্গের উদয়াচলে তুমি মূর্তিমতী ঊষা। তোমার দেহসৌন্দর্য জগতের অশ্রুধারায় স্নাত বলিয়াই এত পবিত্র এবং মাধুর্যপূর্ণ, তোমার চরণের যে রক্ত আভা তাহা ত্রিলোকের হৃদয়ের রক্তের ধারায় রঞ্জিত। তোমার কেশরাশ মুক্ত—তোমার বসন স্খলিত। তোমার লঘুভার কমল চরণযুগল জগতের সৌন্দর্য পিপাসু রসিকদের মনঃপদ্মে ন্যস্ত। পৃথিবীবাসী মানবদিগের মানসস্বর্গে তুমি অন্তহীন লীলা এবং রঙ্গ করিয়া বেড়াও; আমরা স্বপ্নের ভিতর দিয়া তোমার সঙ্গসুখ উপভোগ করি।'

স্বর্গের উদয়াচলে ইত্যাদি—সংস্কৃতে কবিরা ঊষার সঙ্গে উর্বশীর তুলনা করিয়াছেন। প্রত্যেকটি ঊষা এবং আনন্দ, দুঃখ এবং অন্ধকারের ভিতর দিয়া আসে। রবীন্দ্রনাথও প্রথম স্তবকে বলিয়াছেন—"ঊষার উদয়সম অনবগুণ্ঠিতা।"

জগতের অশ্রুধারে ধৌত তনুর তনিমা—স্নানে অঙ্গের মলিনতা দূরীভূত হইয়া অঙ্গ-সৌন্দর্য যেন বাড়িয়া উঠে। উর্বশী আমাদের কল্পনাপ্রসূত শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্যের নারী রূপ—তিনি যে জলধারায় স্নান করিয়া অঙ্গ শুদ্ধি করেন তাহা ত' সাধারণ জল হইতে পারে না—

সে জগতের অশ্রুধারা। অশ্রুর সংজ্ঞা দিতে গিয়া জার্মানীর বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক Gerhart Hauptmann বলিয়াছেন—All the joys and all the sorrows of the world taken together make a tear. তাছাড়া দুঃখকে বাদ দিয়া ত' আনন্দের বা সুন্দরের কল্পনা করা চলে না। অন্ধকারকে ভেদ করিতে পারিলেই ত' আলোকের সন্ধান মেলে—নচেৎ নয়। "ব্যথার দ্রাবক রসে" আস্নাত না হইলে উর্বশীরও সৌন্দর্য পূর্ণভাবে প্রস্ফুটিত এবং বিকশিত হইতে পারে না। চরম আনন্দ এবং সুন্দরকে জগতের কোন বড় কবিই দুঃখ হইতে বাদ দিয়া দেখেন নাই—

(1) "The music, yearning like
a God in pain."
*(The Eve of St. Agnes,* Keats)

(2) "....in the very temple
of delight
Veil'd Melancholy has her
sovra'n shrine."
*(Ode on Melancholy,* Keats)

"Our sincerest laughter
With some pain is fraught;
Our sweetest songs are those
that tell of saddest thought."
*(Skylark,* Shelley).

ত্রিলোকের হৃদিরক্তে আঁকা তব চরণ-শোণিমা স্বর্গ, মর্ত এবং পাতালের তুমি বরেণ্যা এবং আরাধ্যা দেবী। এইজনাই তাহাদের হৃদয়ের রক্তধারা রঞ্জিত হইয়াছে তোমার চরণের লালিমা। যাহা আমাদের জীবনের সর্বাপেক্ষা কাম্য বস্তু তাহাকে লাভ করিতে হইলে যথেষ্ট সাধনার প্রয়োজন। সে সাধনা অতি কঠোর, অতি ভয়ঙ্কর। 'কল্পনার' 'অশেষ' কবিতায় কবি বলিয়াছেন—

"বলো তবে কী বাজাব, ফুল দিয়ে কী সাজাব
তব দ্বারে আজ—
রক্ত দিয়ে কী লিখিব, প্রাণ দিয়ে কী শিখিব
কী করিব কাজ।"

মুক্তবেণী বিবসনে—সৌন্দর্য আবরণ এবং আভরণহীন—মুক্ত, উদার এবং পবিত্র—নগ্নতার পবিত্র সৌন্দর্যমণ্ডিতা।

বিকশিত বিশ্ব-বাসনার......লঘুভাব—চরম সৌন্দর্যকে লাভ করিবার জন্য বিশ্বের যে একান্ত বাসনাই যেন রূপ লইয়াছে পদ্মফুল রূপেই পদ্মের উপর পাদপদ্ম রাখিয়া তুমি মানা।

অখিল স্বর্গে অনন্তরঙ্গিণী—উর্বশী স্বর্গের নটী। স্বর্গ কোথায়? মানুষেরই মনে সাধনায় সেই স্বর্গ সৃষ্টি হইতে পারে। সু— পাইতে হইলে মনকে পবিত্র করিতে হইবে, নির্মুক্ত করিতে হইবে—তবেই সে স্বর্গীয় উঠিবে—

The is its own place,
and in itself
Can a Heaven of Hell,
a Hell of Heven
*('aradise Lost I,* Milton.)

হে নর্মসঙ্গিনী—উর্বশী আমাদের কল্পনার আদর্শ—নারী-সৌন্দর্যের চরম এবং পরম। যে রূপের খণ্ড খণ্ড প্রকাশ আমরা দেখি পাই পৃথিবীর নানা সুন্দরী রূপসীদের তাহারই আদর্শ সমন্বয় এই উর্বশীতে, জন্যই উর্বশী স্বপ্নসঙ্গিনী।

'তোমার জন্য দিকে দিকে, পৃথিবীতে এবং স্বর্গে ক্রন্দন রোল শোনা যায়। কিন্তু নিষ্ঠুর তু সে ক্রন্দনের রোল তুমি শুনিতে পাও না। সেই পুরাতন আদি যুগে যেভাবে তুমি সিক্তবেশে অতল অকূল সমুদ্র হইতে উঠিয়াছিলে সেই অবস্থায় কি আর কখনও এ জগতে ফিরিয়া আসিবে? প্রথম প্রভাতে তোমার তনুখানি প্রথম দেখা দিয়াছিল—সকলে তোমার সৌন্দর্যে অবাক বিস্ময়ে তোমার দিকে চাহিয়া হল—তাহাদের দৃষ্টির আঘাতে তোমার অঙ্গ যেন রোদনে ভরিয়া উঠিল। তোমার ঐ আদি সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ হইয়া মহাসাগর অপূর্ব সঙ্গীতে তরঙ্গলীলা আরম্ভ করল।

ওইদুন দিশে দিশে......উর্বশী—পৃথিবী এবং স্ব যেন সুন্দরকে লাভ করিবার জন্য ক্রমাগত ক্রন্দন করিতেছে। কিন্তু উর্বশী সে আবেদন শুনিতেছে না। তাহাকে ত' সহজে লাভ করা যায় না। তাহাকে পাইতে হইলে যেমন মনকে স্বর্গীয় এবং পবিত্র করিতে হইবে তেমনি সাধনারও প্রয়োজন।

আদিযুগ পুরাতন......রবে তরঙ্গিতে—

কবি খেদ করিতেছেন যে, প্রথম সেই আদি যুগে যখন উর্বশী সমুদ্রমন্থনে উঠিয়াছিলেন, তাঁহার সেই আদি অকৃত্রিম রূপ জগৎ আর কখনও দেখিতে পাইবে না। আমাদের এই জগৎ ক্রমাগতই কৃত্রিমতার পথে অগ্রসর হইতেছে। এই জন্যই আদি অকৃত্রিম সৌন্দর্য আর কখনও এ জগতে ফিরিয়া আসিবে কিনা সে বিষয়ে মনে সংশয় জাগে। আর কখনও উর্বশীকে আমরা ফিরিয়া পাইব না। আমাদের সেই গৌরবের চন্দ্র অস্তমগ্ন। সেই কারণেই এখন পৃথিবীতে বসন্তের আনন্দের মধ্যেও একটা উদাস ভাব মিশ্রিত ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। এ যেন উর্বশীর বিরহজনিত দীর্ঘশ্বাস—যাহা বাতাসের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া আছে। পূর্ণিমা রাত্রে যখন সকলে আনন্দে মগ্ন—উর্বশীর বিরহজনিত স্মৃতি যেন ব্যাকুল বাঁশির রবে চক্ষে জল আনিয়া দেয়। কিন্তু এই প্রাণের ক্রন্দনের মধ্য দিয়াও উর্বশীর আশা আমরা ত্যাগ করিতে পারি না—যদিও জানি উর্বশী মুক্তির দূতী, তাহাকে বন্ধনে আবদ্ধ রাখা অসম্ভব।

ফিরিবে না ফিরিবে না ইত্যাদি—

আদি অকৃত্রিম সৌন্দর্যকে আর কখনও এই কৃত্রিম, জটিল পৃথিবীতে ফিরিয়া পাওয়া যাইবে না। পৃথিবী তাহাকে চিরকালের জন্য হারাইয়া ফেলিয়াছে।

তাই আজি ধরাতলে ইত্যাদি—

কৃত্রিম জগৎ তাহার সমস্ত আনন্দ এবং সৌন্দর্যের মধ্যেও কিসের অভাব বোধ করে। যে সহজ সরল অনাড়ম্বর সৌন্দর্যকে সে হারাইয়াছে এ যেন তাহারই বিরহ জনিত দুঃখ।

তবু আশা জেগে থাকে ইত্যাদি......রবীন্দ্রনাথের কবিতার একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য এই আশার বাণী। যে সৌন্দর্যকে আমরা হারাইয়াছি তাহাকে ফিরিয়া পাওয়া যাইবে না জানিয়াও তিনি সৌন্দর্যের দেবীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—তোমাকে বন্ধনের মধ্যে পাওয়া অসম্ভব জানি—তবু তোমাকে পাইবার জন্য প্রাণের মধ্যে যে ক্রন্দন অনুভব করি তাহা আশা-বিমুক্ত নহে—তোমাকে পাইবার এই আশাই আমাদের সান্ত্বনা।

# বিক্ষুমুখের কথা

উৎসব ও অনুষ্ঠান পালন করা সামাজিক মানুষের ধর্ম। তাতে সামাজিক মেলা-মেশার সুযোগ পাওয়া যায়, মনে আনন্দ ও তৃপ্তি আসে। কাল গুণে অবশ্য তাদের চেহারা বদলে যায়। কখনো আসে আতিশয্য যার ফলে একটা উচ্ছৃংখল ভাব মনকে অধিকার করে বসে। কখনো বা অতিরিক্ত মার্জিত রুচির বশে অকৃত্রিম আনন্দের উৎসমুখ আমরা চেপে ধরি। নয়তো কাটাই ছাঁটাই করে কোনো একটি প্রাচীন অনুষ্ঠানের এমন রূপান্তর করে ফেলি যে, অনেক সময় বোঝাই যায় না, এটা কি বস্তু।

এই মাসে দুটি অনুষ্ঠান দেখবার সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্য আমার ঘটেছে। প্রাচীন ভারতে মদন ত্রয়োদশী তিথিতে সুবসন্তক কিংবা কার্তিকী পূর্ণিমায় যক্ষরাত্রি উৎসবের কথা পড়েছি। সহকারভঞ্জিকা, নবপত্রিকা কিংবা পাঞ্চালানুযান প্রভৃতি রঙ্গক্রীড়ার কথাও শুনেছি। সে কালের নাগরিকরা এই সব উৎসব-কৌতুক কিভাবে পালন করতেন তার মোটামুটি বর্ণনাও সংস্কৃত সাহিত্যের দৌলতে পাওয়া যায়। এ সব জিনিস আজকাল নেই। কিন্তু যেগুলি আছে, তাদের অনুষ্ঠান কিভাবে পালন করা হয়, তাদের চাক্ষুষ পরিচয়ও সম্প্রতি পেলাম। সাধারণের অবগতির জন্যে তাই এ প্রসঙ্গ অবতারণা করছি।

হোলি আমাদের দেশের একটি প্রাচীন উৎসব। শ্রীকৃষ্ণের দোললীলা মুখ্যতঃ একটি ধর্মমূলক অনুষ্ঠান। কিন্তু কালক্রমে এই উৎসব বৈষ্ণব গণ্ডীর সীমা অতিক্রম করে হিন্দু ভারতের একটি প্রধান আনন্দ অনুষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়েছে। শুধু হিন্দু নয়, মুসলিম শাসনকালেও হোলির কদর কমে নি। শোনা যায় শায়োন-উৎসবে হিন্দুদের সঙ্গে অনেক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারও যোগদান করতেন। দোলা খাটিয়ে, কাজরী গান গেয়ে হিন্দু মুসলিম জাতিধর্মনির্বিশেষে একদিন নগর-গ্রাম-পল্লী সংগীতমুখর করে তুলেছিলেন। তখন ইউরোপীয় মানুষ তাদের কাঁচের পেয়ালা, লেস্, ছুরি-কাঁচি, পিস্তল আর রঙ-বেরঙের বনাত নিয়ে সবে ভারতে আমদানী হতে শুরু করেছে। 'ইউনিটি' কথাটা তখনও সৃষ্টি হয় নি, সাগর-পার থেকে আমদানী হয় নি। কাজেই এই বিলিতি 'ইউনিটি'র অভাবে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক অসদ্ভাব তৈরি হয়নি। শাসক এবং শাসিত হয়েও তাঁরা একসঙ্গে পাশাপাশি থাকতেন। একত্র বাসের ফলে উভয়ের মধ্যে একটা সহজ-সরল সামাজিক আত্মীয়তার বন্ধন গড়ে উঠেছিল। তখনকার দিনে হিন্দুরা সত্যপীরকে সত্যনারায়ণ বলে পুজো করতেন, গাইয়ের প্রথম দুধ দরগায় পাঠাতেন। এমন কি শোনা যায়, অনেক সম্ভ্রান্ত হিন্দু মহররমে তাজিয়া বার করতেন। অপরপক্ষে মুসলমান পরিবার থেকে হিন্দুদের সঙ্গে সামাজিক মেলামেশায় কোনও কুণ্ঠা ছিল না। হিন্দুদের পৌত্তলিক পূজা-পার্বণে তাঁরা অংশগ্রহণ না করলেও শ্রাবণে হিন্দোলায় দুলতে দুলতে কাজরী গাইতেন। নব-বসন্তে ফাল্গুনে তাঁরা হোলি গাইতেন, ফাগ খেলতেন। পরস্পরের বাড়ি আবীর-কুমকুমের সঙ্গে ব[illegible]পেস্তা, মনোক্কা-মোরব্বার ভেট্ পাঠানো হত। অনেক মুসলিম সংগীতজ্ঞ হোলির গানের কদর করতেন, কেউ কেউ বা 'কাহ্ন্যাইয়া-লালা'র রঙ্গলীলা অবলম্বন করে উচ্চাঙ্গ সংগীতের পদ-সৃষ্টি করে গেছেন। হোরি ধ্রুপদ ধামার, হোলি খেয়াল, বসন্ত-ভৈঁরো-[illegible]-পরজ প্রভৃতি সুর ও গায়ন-পদ্ধতি এই হোলিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে।

কিন্তু সংগীত অথবা সমাজবিবর্তনের কথা যাক্। বর্তমানে কি দেখলুম, সে কথাই বলি। গত দুয়েক বছর ধরে এই উৎসবের নামে শহরে যে তাণ্ডবলীলা চলে থাকে, সেটা যে কোনও সভ্য দেশের সামাজিক কলঙ্ক। যে উৎসবে প্রত্যাশা করা যায় আনন্দ, রুচি ও ভদ্রতার পরিচয়, তাতে এসেছে এমন অশোভন, অভব্য বিশৃঙ্খলা যে হোলির নামে এখন সাধারণ মানুষের মনে ত্রাস-সঞ্চার হয়। জাতধর্মের রীতি-নীতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ভূতের মতন সেজে, সারাদিন পাগলের বেশে হৈ-হুল্লোড় করে বেড়ানোই হল বর্তমান দিনের দোললীলা। নবলব্ধ স্বাধীনতার যে এমন অপপ্রয়োগ কোনোদিন হতে পারে সুস্থ মানুষ তা কল্পনাও করেননি। যে স্বাধীনতা আনে সংযম, মর্যাদাজ্ঞান এবং আন্তরিক পূর্ণতা, আমাদের বেলায় সেটা দাঁড়িয়েছে একটা বিশ্রীরকমের উগ্র, বেপরোয়া মনোভাবে। অপরের সুবিধা-অসুবিধা, সংস্কার এমন কি ব্যক্তিগত রুচি ও স্বাধীনতাকে পদদলিত করাই যেন দোললীলার আন্তরিক পরিচয়। মাইফেল-জলসার দিন না হয় চলে গেছে। বাঙলা দেশ থেকে সংগীত-সংস্কৃতিও না হয় বিদায় নিয়েছে, তার বদলে হয় তো এসেছে নতুন ধরণের একটা উচ্ছৃংখল রাষ্ট্র-চেতনা। কিন্তু তাই বলে একটি বহুদিনের সমাদৃত উৎসব-অনুষ্ঠান যে গুণ্ডামিতে পরিণত হয়ে যাবে, পাড়ায় পাড়ায় মারামারি চলতে থাকবে এবং উত্তেজিত, রঙ্গমত্ত মানুষদের ধরপাকড় করে চালান দিতে হবে—এমন সামাজিক চিত্র অনুমান করা সমাজ-নেতাদের পক্ষে সত্যিই অসম্ভব ছিল।

আর একটি ঘটনা। কিছুদিন পূর্বে একজন পরিচিত ভদ্রলোক এসে নিমন্ত্রণ জানিয়ে গেলেন। কিন্তু কি উপলক্ষে নিমন্ত্রণ, সেটা বললেন না। বরঞ্চ মনে হল যেন একটু গোপন করলেন। পূর্বেও একাধিকবার বিড়ম্বনা ঘটেছে, উৎসবের কারণ না জানার ফলে বিনা উপহারে নিমন্ত্রণ-সভায় উপস্থিত হয়ে লজ্জিত ও সংকুচিত হয়েছি। কিন্তু এবারে চেষ্টা করেও জানতে পারলুম না। ভদ্রলোক আমতা-আমতা করে বললেন, "তেমন কিছু ঘটার ব্যাপার নয়। একটু কীর্তন গান-টানের ব্যবস্থা এবং লঘু জলযোগের আয়োজন......"

সভায় উপস্থিত হয়ে কেমন যেন মনে খট্‌কা লাগল। সভামণ্ডপ নিখুঁতভাবে সাজানো। রঙ-বেরঙ কাপড়ে, শালু-মোড়া খুঁটিগুলো ফুলের মালায় জড়ানো। প্যান্ডালের এক দিকে ফরাস্ বিছানো, অপর দিকে চেয়ার সাজানো। মধ্যে আসর, জাজিম-পাতা। সুন্দর এবং সুরুচিকর ব্যবস্থা। তবে ভাবলুম, বিশেষ কোনও উপলক্ষ না হলে এমন আয়োজন যেন অসংগত ঠেকে। বাইরে ক্রমশঃ গাড়ির ভিড় বাড়তে লাগল এবং নানাধরণের স্ত্রী-পুরুষ, যুবক-যুবতী সভামণ্ডপে প্রবেশ করতে লাগলেন। তারপর আসরে একদল সুসজ্জিতা তরুণী আসন গ্রহণ করলেন, অপর দিকে ঠিক মুখোমুখি একদল সুবেশ তরুণ সার বেঁধে বসলেন। সময়ে এবং পেটা ঘড়ির নির্দেশ মত হঠাৎ কোরাস্ গান সুরু হল আধুনিক ঢঙে। তারপর কীর্তনের পালা। দ্বৈত-কীর্তন। তরুণের দল ধুয়ো ছাড়লেন তো তরুণীর দল উতোর গাইলেন। মধ্যে মধ্যে বিরতি। পান, সিগরেট ও চা অকৃপণভাবে বিতরিত হল। কীর্তন শেষ হলে নৃত্য আরম্ভ হল। ঠিক বিষয়-বস্তুটা বুঝতে পারলুম না, তবে অনুমান করলুম কি একটা করুণ ব্যাপার নিয়ে মূক নৃত্যাভিনয় চলছে। রাত দশটার পর সভা ভঙ্গ হল। গৃহকর্তা এগিয়ে এসে সমাদরে পাশের আর একটি জায়গায় আমাদের জলযোগের জন্য নিয়ে গেলেন। আহার-পর্ব চুকে গেলে যখন বিদায় নিচ্ছি তখন তাঁকে প্রশ্ন করলুম, ব্যাপার কি বলুন তো? তিনি একটু শোক-গম্ভীর মুখের ভাব ফুটিয়ে, দেয়ালে ঝোলানো পুষ্পশোভিত একখানি ফটো দেখিয়ে বললেন, "আমার কাকা। আজ আদ্য-শ্রাদ্ধ......"

স্তম্ভিত হলুম। এ-ও এক রকম সামাজিক বিবর্তন!

# চীনে কম্যুনিস্ট প্রভুত্বের কারণ

শ্রীঅমর লাহিড়ী

কম্যুনিস্ট পার্টি চীনের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রধান শক্তিরূপে পরিণত হওয়ায় সুদূর প্রাচ্য সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বিন্দুমাত্র বিস্মিত হন নাই। কারণ ১৯৩৬ সালের "সিয়ান ঘটনার" পর হইতেই লাল দলের রাজনৈতিক ও সামরিক কার্য-কৌশলের ফলে যে কুওমিণ্টাঙ্-এর (জাতীয়তাবাদী দল) প্রভাব হ্রাস পাইবে তাহা তাঁহারা পূর্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। যুদ্ধকালীন কম্যুনিস্ট-কুওমিণ্টাঙ্ সন্ধি এবং যুদ্ধোত্তরকালে মাঞ্চুরিয়া ও উত্তর চীনে কম্যুনিস্টদের আধিপত্য কম্যুনিস্ট পার্টির উত্থানের পথ

ডাঃ সান ইয়াৎ সেন

প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিল এবং কুওমিণ্টাঙের ভাঙ্গনের পথ দ্রুততর করিয়াছিল।

জাতীয়তাবাদীদের ভাঙ্গনের ফলে কম্যুনিস্ট পার্টির প্রভাব বৃদ্ধি স্বাভাবিকভাবেই হইয়াছিল। অপর দিকে কুওমিণ্টাঙের দক্ষিণ-পন্থী নেতারা যে সাধারণতন্ত্রবাদকে প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন তাহাকে দুর্বলতর করিয়া "জনসাধারণের গণতন্ত্রকে" প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য কম্যুনিস্ট নেতারা বর্তমানে নূতন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রচনায় ব্যস্ত আছেন।

চীনের "জাতীয় বিপ্লবের জনক" সান ইয়াৎ সেনের শিষ্য চিয়াং কাইশেক গৃহযুদ্ধের অবসান এবং কম্যুনিস্ট-কুওমিণ্টাঙ্ শান্তি চুক্তিকে ত্বরান্বিত করিবার জন্য সাময়িকভাবে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। একটা চরম সন্ধিক্ষণে চীনের এই দীর্ঘদিনের ডিক্টেটর এবং সমর বিভাগের সর্বাধিনায়ক প্রেসিডেণ্টের পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন। এইভাবে পদত্যাগ করিলে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পন্ন হইবে বলিয়া মনে করিয়াছেন। তাহা হইতেছে : (১) ইহাতে কুওমিণ্টাঙ্ দলে ভাঙ্গন রোধ হইবে এবং সদস্যগণের দলত্যাগ বন্ধ হইবে এবং (২) কম্যুনিস্টরা তাহাদের যুদ্ধের উদ্দেশ্যস্বরূপ যে চিয়াং-এর শাসনের অবসান দাবী করিয়াছিল তাহা পূর্ণ হওয়ায় তাহাদের দাবী আর বৈধ থাকিবে না। চিয়াং গভীরভাবে এই দুইটি মুখ্য উদ্দেশ্যের বাস্তব পরিণতি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। আজ তাই চীনের জনসাধারণ, সে কম্যুনিস্টই হউক অথবা কুওমিণ্টাঙ্পন্থীই হউক, শান্তিস্থাপন ও কেন্দ্রে কোয়ালিশন শাসন প্রবর্তনের জন্য দাবী জানাইতেছে।

কম্যুনিস্ট পার্টি কুওমিণ্টাঙের সহিত কোয়ালিশন সর্ত নির্দিষ্ট করিতে এখনও ইতস্তত করিতেছে, কারণ, উত্তর ও মধ্য চীনের যে সব স্থান তাহাদের দখলে আছে, সেখানে তাহাদের আধিপত্য এখনও ভালভাবে কায়েম করিতে পারে নাই। আজ মাঞ্চুরিয়া, উত্তর চীন, উত্তর-পশ্চিম ও মধ্য চীনের বৃহদাংশ কুওমিণ্টাঙের হস্তচ্যুত হইলেও বিভিন্ন "স্ট্র্যাটেজিক পকেটে" লালফৌজীদের নিজস্ব নীতি অনুসরণ করিয়া গেরিলা যুদ্ধ চালাইবার মত সামর্থ্য তাহাদের রহিয়াছে। কম্যুনিস্ট নিয়ন্ত্রিত এলাকায় কুওমিণ্টাঙ সমর্থক লোক-জন রহিয়াছে। কেন্দ্রে সত্যিকারের জনগণের সরকার স্থাপনের জন্য কম্যুনিস্টগণ যাহা বলিতেছে, তাহার সহিত তাহারা সহযোগিতা করিতেছেন, কারণ, কেন্দ্রে কম্যুনিস্ট-জাতীয়তাবাদী মিলিত শাসনব্যবস্থার জন্য যে চেষ্টা চলিতেছে তাহা সার্থক হইবে বলিয়া তাহারা মনে করিতেছে। এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইলে কম্যুনিস্ট পার্টি যদি কম্যুনিস্ট কেন্দ্রীয় সরকার স্থাপনের চেষ্টা করে তাহা হইলে কুওমিণ্টাঙপন্থী ঐসব লোকজন খুব সম্ভব জাতীয়তাবাদী হাইকমাণ্ডের নির্দেশে মাঞ্চুরিয়ায়, উত্তর, উত্তর-পশ্চিম ও মধ্য চীনে কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ আরম্ভ করিবে। এই অবস্থায় কুওমিণ্টাঙ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম চীন নিয়ন্ত্রণ করিয়া একটি সমান্তরাল কেন্দ্রীয় সরকার স্থাপন করিয়া লালফৌজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া যাইবে। কম্যুনিস্ট অলিগার্কি এই সম্ভাবনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন বলিয়া রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আপনাদের প্রভুত্ব বজায় রাখিবার জন্য কুওমিণ্টাঙের সহিত ভারী দরদস্তুর করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। কুওমিণ্টাঙের বর্তমান মনোভাব দেখিয়া মনে হয় যে, কম্যুনিস্ট দলের হস্তে 'ন্যায্য রাজনৈতিক ক্ষমতা' ছাড়িয়া দিতে তাহারা অসম্মত নয়, কিন্তু ঐ দল দেশে নিষ্ক্রিয় অধস্তন দল হিসাবে থাকিতে সম্মত নহে। এই পারস্পরিক বিভেদ একটা আপোষ-রফা দ্বারা বিদূরিত না হইলে শীঘ্র গৃহযুদ্ধের অবসানের সম্ভাবনা দেখা যায় না।

চিয়াং কাইশেকের অবসর গ্রহণ এবং চীনের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার যে নীতি মার্কিন রাষ্ট্র গ্রহণ করিয়াছে, তাহাতে চীনকে কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রে পরিণত করার ব্যাপারে সোভিয়েট ইউনিয়ন প্রত্যক্ষ ও কার্যকরী কোন ব্যবস্থা করিতে পারিতেছে না। অর্থাৎ, সোভিয়েট ইউনিয়ন খোলাখুলিভাবে চীনের কম্যুনিস্ট দলকে সাহায্য করিতে পারিতেছে না, কারণ তাহাতে এইভাবে সাহায্য করিলে চীন বিরোধ মীমাংসার জন্য সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ পরিষদকে

চিয়াং কাইশেক

হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য করিবে। অপর দিকে, কুওমিণ্টাঙ সরকারের সহিত সামরিক চুক্তি করিয়া চীন কম্যুনিস্ট দলের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইবার পক্ষে আমেরিকারও "ন্যায়সঙ্গত কারণ থাকিবে।" এইভাবে তৃতীয় শক্তির হস্তক্ষেপ সোভিয়েট ইউনিয়ন অথবা মার্কিন রাষ্ট্র পছন্দ করেন না। কারণ উভয়েই চীনকে তৃতীয় মহাসমরের রণক্ষেত্র করিতে নারাজ।

মার্কিন ও সোভিয়েটের এই মনোভাবের জন্য চীনের কম্যুনিস্ট জাতীয়তাবাদী লড়াই বিশেষভাবে "আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে"ই পরিণত হইয়াছে। কম্যুনিস্ট পার্টি সমান সম্মান দিয়া কুওমিণ্টাঙের সহিত আলোচনা করিতে সম্মত না হইলে ঐ দ্বন্দ্বের পরিসমাপ্তি সম্ভবপর নহে। অপর দিকে কম্যুনিস্ট দল কুওমিণ্টাঙের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী হওয়ায়, সে সম্পূর্ণ-ভাবে কেন্দ্রে লালশাসন প্রবর্তন করিতে পারে, অবশ্য তাহাতে চীনে শান্তি আসিবে না। ইহা

সুনিশ্চিত যে, কুওমিণ্টাঙ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম চীনে আড্ডা গাড়িয়া কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে লড়াই চালাইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে কম্যুনিস্ট নিয়ন্ত্রিত এলাকাসমূহে জাতীয়তাবাদী পার্টিজান সৈন্যদল দ্বারা গেরিলা যুদ্ধ চালাইবে, উপরন্তু লাল-বিরোধী অভিযান চালাইবার জন্য আবার হয়ত চিয়াংকে ডাকিয়া আনা হইবে ফলে কম্যুনিস্টদের বিতাড়িত করিয়া চাকা ঘুরাইয়া দিবার জন্য কুওমিণ্টাঙ দলের মধ্যে দৃঢ় সঙ্ঘবদ্ধতা দেখা দিতে পারে।

কম্যুনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভুত্ব লাভে সাহায্য করিয়াছে তিন শ্রেণীর কারণ, যথা—জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক। অবশ্য বর্তমান সাফল্যের পশ্চাতে রহিয়াছে দীর্ঘ ২৫ বৎসরের বিরামবিহীন আদর্শের সংগ্রাম। অতীতের প্রতিটি সামরিক বিপর্যয়ে স্থায়ী দৈন্য, নির্যাতন ও দুরবস্থার

প্রেসিডেণ্ট লি সুঙ্ জেন

মধ্যেও তাহাদের যুদ্ধের সংকল্পকে দৃঢ়তরই করিয়াছে। চিয়াং কাইশেকের কম্যুনিস্ট নিধন যজ্ঞ কম্যুনিজমকে ধ্বংস করিতে পারে নাই, তাহার প্রধান কারণ হইতেছে কম্যুনিস্ট-নায়কগণ অপরিবর্তনীয় উদারতার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া নবলব্ধ রাজনৈতিক আদর্শবাদের প্রতি একনিষ্ঠ ছিল। তাহারা মরিয়াছে, কিন্তু আদর্শ ত্যাগ করে নাই। বস্তুত চিয়াং কাইশেকের সেই যুদ্ধে হাজার হাজার কম্যুনিস্ট মৃত্যুবরণ করিয়াছে, কিন্তু একদিন সাম্যবাদ চীনের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ করিবে এই বিশ্বাসেই তাহারা যুদ্ধ করিয়াছে। তাহাদের বিশ্বাস দ্রুত বাস্তবে পরিণত হইতেছে। ইহা দ্বারা কম্যুনিস্ট পার্টির পৌরুষ প্রমাণিত হইতেছে।

সোভিয়েট পরিকল্পনাকারী ভারটিনস্কি ১৯২০ সালে সাংহাইতে আগমন করেন সেই সময়েই চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির সৃষ্টি হয়। "সুদূর প্রাচ্যে কম্যুনিস্ট আদর্শ প্রচার সম্পর্কে নীতি নির্ধারণের" জন্য কোমিনটার্ন হইতে তাঁহাকে বিশেষভাবে প্রেরণ করা হয়। সৃষ্টি হইবার ৬ বৎসরের মধ্য ১৯২৬ সালে দলটি ক্ষমতায় আরোহণ করে, সভ্য সংখ্যা ৫ লক্ষ ছাড়াইয়া যায়। দলের দ্রুত উন্নতির আংশিক কারণ সান ইয়াৎ সেনের আনুকূল্য এবং চীন-সোভিয়েট বোঝাপড়া সম্পর্কে এবং শ্রমিক ও চাষীকে সাহায্য করা ব্যাপারে সানের নীতি গ্রহণ করায় তাহাদের ঔৎসুক্যও আংশিকভাবে দায়ী। সান কম্যুনিজমকে জাতীয় রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে স্বীকার করায়, কম্যুনিস্ট পার্টি কুওমিণ্টাঙের ইউনিট হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। ফলে নিজেদের শক্তি সংহত করার ব্যাপারে তাহারা কুওমিণ্টাঙকে কাজে লাগাইয়াছে। চিয়াং কাইশেকের উত্থানের পূর্বেই কম্যুনিস্ট পার্টি চীনে কার্যত প্রধান ক্ষমতার অধিকারী হইয়া পড়িয়াছে। ইহাদের এত শক্তিশালী হইবার কারণ হইতেছে, প্রথমত কুওমিণ্টাঙের মধ্যে ভাঙ্গন। দ্বিতীয়ত নব সৃষ্ট "ওয়ার লর্ডদের" সামরিক সংঘর্ষের ফলে চাষী, কারখানার শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বেতনভোগীগণের অধিকাংশই কম্যুনিস্টদের সঙ্গে যোগদান করায় তাহাদের যথেষ্ট সুবিধা হয়। কিন্তু পরে চিয়াং কাইশেক কুওমিণ্টাঙ নিয়ন্ত্রিত ইয়ান সরকারের সার্বভৌম ক্ষমতা গ্রহণ করিলে কম্যুনিস্ট পার্টি এক কেন্দ্রিক বিরোধিতার সম্মুখীন হয়।

কম্যুনিস্টদের কার্যকলাপের প্রতিবাদ করিয়া চিয়াং কাইশেক পরিচালিত জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীগণ কম্যুনিস্টদের ক্ষমতাচ্যুত করিবার চেষ্টা করে। চিয়াং শীঘ্রই কম্যুনিস্টদের বিতাড়িত করিয়া নানকিং সাংহাই এলাকার নিয়ন্ত্রণ ভার গ্রহণ করেন। অতঃপরই আরম্ভ হয় তিক্ততাময় কম্যুনিস্ট জাতীয়তাবাদী সংঘর্ষ। এদিকে চিয়াং কম্যুনিস্টদের কৌশল ব্যর্থ করিবার জন্য হুয়ান হইতে রাজধানী নানকিংয়ে অপসারিত করেন। এইভাবে নানকিং চীনের রাজধানী এবং কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান কর্মস্থল হয়। কিন্তু চিয়াংএর এই অভাবনীয় উন্নতি কেবলমাত্র যে কম্যুনিস্টরাই অপছন্দ করিতেন তাহা নহে, কতিপয় জাতীয়তাবাদীও উহা পছন্দ করিতেন না; ফলে চিয়াং জাপানে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। কিছুদিন সেখানে থাকিয়া তিনি আবার প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং ১৯২৭ সালের এপ্রিল মাসে "কম্যুনিস্ট বিতাড়ন লড়াইতে" জাতীয়তাবাদীদের নেতৃত্ব করিতে লাগিলেন। চিয়াংয়ের এই অভিযান এত কঠিন হইল যে কম্যুনিস্ট পার্টিকে বাধ্য হইয়া গুপ্ত পথ ধরিতে হইল। সেই সময়ও ১৯২৭ সালের ডিসেম্বর মাসে কম্যুনিস্টরা ক্যান্টন কম্যুনের আয়োজন করিলেন এবং ১৯৩০ খৃঃ চাংসা সোভিয়েটের প্রতিষ্ঠা করিলেন।

প্রথম হইতেই কম্যুনিস্ট দল নিজেদের সশস্ত্র করিয়াছিলেন এবং সামরিক প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছিলেন তাই চিয়াংএর পক্ষে চূড়ান্ত সামরিক জয়লাভ অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। একমাত্র এই কারণেই কম্যুনিস্ট পার্টিকে বে-আইনী ঘোষণা করার পরেও, ক্যান্টন ও চাংসায় ইহাদের লাল শাসন ব্যবস্থা চালু করার ক্ষমতা ছিল এবং এই কারণেই কম্যুনিস্ট পার্টির লালফৌজ ১৯৩০ খৃঃ চিয়াং-এর সমস্ত সামরিক অভিযান প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে কম্যুনিস্ট পার্টি কিয়াংসি প্রদেশের জুইচিন-এ 'রেড গবর্ণমেণ্ট' স্থাপন করিলে পর চিয়াং-এর নানকিং সরকার কুওমিণ্টাঙ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার জন্য কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বনের

কম্যুনিস্ট নেতা মাও সে তুং

প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিলেন। চিয়াং সরকারের সর্বাত্মক ব্যবস্থা অবলম্বন করার সময় মাঞ্চুরিয়াতে চীন-জাপান হাঙ্গামার সৃষ্টি হইল, ফলে সে স্থান সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার জন্য চিয়াংকে সর্বাত্মক আক্রমণ পরিকল্পনা বন্ধ করিতে হইল।

স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, মাঞ্চুরিয়ার গণ্ডগোলে কম্যুনিস্ট পার্টির খুব সুবিধা হইয়া গেল কারণ জরুরী অবস্থা উদ্ভব হওয়ায় চিয়াংকে কম্যুনিস্ট বিরোধী অভিযান স্থগিত রাখিতে হইল। এদিকে মাঞ্চুরিয়াস্থিত জাপ যুদ্ধের ফলে কম্যুনিস্টরা উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম চীনে নিজেদের শক্তি সংহত করিতে লাগিল। জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া দখল রোধ করিবার মত ক্ষমতা চিয়াং-এর না থাকায়, তাঁহাকে সাময়িকভাবে পূর্বাঞ্চলের এই ক্ষতি স্বীকার করিয়া লইতে হইল। চিয়াং-এর অক্ষমতাকে কম্যুনিস্ট দলের প্রথম শ্রেণী নেতারা, যেমন মাও

সে তুং, চু তে, চৌ এন লাই, নিজেদের কাজে লাগাইলেন। তাহারা "চীনকে জাপানী সাম্রাজ্যবাদের দাস" হইতে দিবেন না এই ধ্বনি তুলিয়া উত্তর চীনে কম্যুনিজম প্রচার করিতে লাগিলেন। কম্যুনিস্টদের এ প্রকার দুরভিসন্ধিমূলক কার্যাবলী বন্ধ করিবার জন্য চিয়াং ১৯৩৪ সালে কম্যুনিস্ট-উচ্ছেদ যুদ্ধ আরম্ভ করিতে বাধ্য হয়। তিনি জুইচীন হইতে লালফৌজকে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হইলেও লালফৌজের প্রধান ধ্বংসের হাত এড়াইয়া উত্তর-পশ্চিম পার্বত্য অঞ্চলে পলায়ন করিতে সক্ষম হয় এবং ইনেন-এ কম্যুনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠা করে।

এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, মাঞ্চুরিয়ায় চীন-জাপান যুদ্ধের পূর্বে কম্যুনিস্টগণ নিজেদের শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করার জন্য জাতীয় রাজনৈতিক কারণসমূহ এবং চীন-জাপান

মাদাম চিয়াং কাইশেক

সম্বন্ধের উপর গড়িয়া ওঠা আঞ্চলিক কারণগুলিকে কাজে লাগায়। মাঞ্চুরিয়ার গণ্ডগোলের ফলে আন্তর্জাতিক গুরুত্বসম্পন্ন একটি আঞ্চলিক ব্যাপারকে কাজে লাগাইবার সুযোগ কম্যুনিস্ট পার্টি পাইয়া যায়। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে নিজেদের শক্তি সংহত করিবার জন্য তাহারা চীন সম্পর্কে জাপানের নীতিকে কাজে লাগায়। তাহারা বুঝিতে পারে যে, "চীনে জাপানী সাম্রাজ্যবাদের" নিন্দা করিয়া এবং আমেরিকার উপর চিয়াং-এর ক্রমবর্ধমান নির্ভরতাকে আক্রমণ করিয়া এমন রাজনৈতিক অবস্থার সৃষ্টি করিতে পারে যাহাতে কৃষক ও শ্রমিকদের অধিকাংশ তাহাদের পক্ষে যোগদান করিবে। ঐ উদ্দেশ্যকে কার্যকরী করার সঙ্গে সঙ্গে কম্যুনিজম মতবাদের প্রসারের সুযোগ সৃষ্টির জন্য অতিরিক্ত ব্যবস্থা হিসাবে তাহারা টোকিও-নানকিং বিরোধকে স্থায়ী করিতে নানা প্রকার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

চীন জাপান বিরোধ প্রধানত আঞ্চলিক ব্যাপারই ছিল—উহা ঐ দুইটি দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। দুইটি বিভিন্ন কারণে কম্যুনিস্ট পার্টি এবং কুওমিণ্টাঙ—উভয়েই এই বিরোধকে আন্তর্জাতিক ব্যাপার করিয়া তুলিয়াছিল। কুওমিণ্টাঙ জাপানের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সাহায্যের আশা করিতেছিল। অপরদিকে কম্যুনিস্ট পার্টি ভাবিতেছিল যে, আন্তর্জাতিক শক্তিবর্গের হস্তক্ষেপের ফলে জনগণের সমর্থন তাহার পক্ষে যাইবে কারণ সে তখন তাহাদিগকে দেখাইয়া দিতে পারিবে যে, নানকিং সরকার কর্তৃক বৈদেশিক সাহায্য চাওয়া চীনের স্বার্থ-বিরোধী।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে কম্যুনিস্ট পার্টি চীন-জাপান সম্বন্ধ ছিন্ন করিবার কাজে লাগিয়া গেল। কেন্দ্রীয় বাহিনী পরিদর্শনের জন্য চিয়াং কাইশেক সেনশি প্রদেশের রাজধানী সিয়ান গেলে পর চ্যাং শু-লিয়াং এবং ইয়াং হু-চেং তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া আটক করিয়া রাখেন। "সাম্রাজ্যবাদী জাপানের বিরুদ্ধে জাতীয় সংগ্রাম" চালাইবার জন্য কম্যুনিস্টরা যে পরিকল্পনা করিয়াছিল, তাহতে সম্মতি দান করিয়া চিয়াং নিজের মুক্তি ক্রয় করেন। এই সম্মতি লাভের ফলে কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষে উত্তর চীনকে কম্যুনিস্ট ভাবাপন্ন করিয়া তোলার পথ পরিষ্কার হইয়া গেল। তারপর ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে চীন ও জাপানের মধ্যে সংগ্রাম আরম্ভ হইলে চীনে কম্যুনিজম প্রচার করিবার সুবর্ণ সুযোগ কম্যুনিস্ট পার্টি পাইয়া গেল।

জরুরী অবস্থার সম্মুখীন হইয়া চিয়াং সরকার কম্যুনিস্টদের সহিত হাত মিলাইলেন। লালফৌজ জাপানী বাহিনীর বিরুদ্ধে উত্তর এবং মধ্য চীনে অভিযান চালাইল। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, লালফৌজ পৃথকভাবে জাপানীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছিল। লালফৌজ প্রধানত গেরিলা যুদ্ধ চালাইয়া যাইতেছিল এবং কেন্দ্রীয় সরকার হইতে যে সব অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ পাইতেছিল, তাহা সঞ্চয় করিয়া রাখিতেছিল। তারপর ব্রিটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করিলে পরিণামে তাহাদের পরাজয় হইবে ইহা ধরিয়া নিয়া কম্যুনিস্ট পার্টি উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিম চীনে আপনাদের শক্তি কেন্দ্রীভূত করিতে লাগিলেন। কম্যুনিস্ট পার্টি যুদ্ধোত্তর কার্যাবলীর জন্য প্রস্তুত হইতেছে বুঝিতে পারিয়া তাহাদের তৎপরতা বন্ধ করিবার বৃথা চেষ্টা করিলেন। ১৯৪৩ ও ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে চিয়াং-এর নির্দেশে কেন্দ্রীয় সেনা বাহিনী লালফৌজের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়াও উত্তর-চীনের লালফৌজের সামরিক ক্ষমতা খর্ব করিতে পারিল না।

জাপানের পরাজয়ের পর কম্যুনিস্ট পার্টি কুওমিণ্টাঙের সহিত যুদ্ধকালীন মিত্রতার বন্ধন ছিন্ন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কম্যুনিস্ট সামরিক সংস্থান সংহত করিবার জন্য লালফৌজ মাঞ্চুরিয়া ও উত্তর চীনে সামরিক অভিযান আরম্ভ করে। জাপান আত্মসমর্পণ করিলে উহার সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র তাহারা সোভিয়েট রাশিয়ার নিকট হইতে পাইল। তাছাড়া মাঞ্চুরিয়াতে ও উত্তর চীনে কম্যুনিস্ট শক্তিকে দৃঢ় করণের জন্য মাও সে তুং একটি "নূতন কম্যুনিস্ট গণতান্ত্রিক নীতি"র প্রস্তাব করিলেন। [illegible]

চীনা জাতীয় সরকারের জনৈক পদাতিক সেনা

জন্য কুওমিণ্টাঙ সরকার তাড়াতাড়ি একটি "গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র" ঘোষণা করিলেন। কিন্তু কম্যুনিস্ট পার্টির দক্ষ কূটনীতিজ্ঞ চৌ এন লাইয়ের চতুর কৌশলে উহা বাতিল করা হইল। ইত্যবসরে, কম্যুনিস্ট কুওমিণ্টাঙের মধ্যে আপোষ রফার জন্য ওয়াশিংটন হইতে মার্শাল মিশন প্রেরিত হইয়াছিল, কিন্তু ঐ মিশন ব্যর্থ হয় কারণ লালফৌজ পূর্ব ও উত্তরে অঞ্চলে নিজেদের প্রভাব বৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছিল, সুতরাং তাহাদের পক্ষে কোন আপোষ রফা স্বীকার করিয়া নেওয়া প্রয়োজন ছিল না।

১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে গোপন ইয়ালটা চুক্তির ফলে চীনে

কম্যুনিস্টদের ক্ষমতা লাভের পথ সহজ হইয়া গিয়াছিল। সোভিয়েট রাশিয়া, ব্রিটেন ও আমেরিকার মধ্যে সম্পাদিত এই গোপন চুক্তির সর্তানুযায়ী মাঞ্চুরিয়ায় সোভিয়েট রাশিয়ার যে বিশেষ অধিকার ও মর্যাদা ছিল তাহা ফিরাইয়া দিতে চিয়াং কাইশেককে বাধ্য করা হইল। রুশিয়ার অধিকার প্রত্যর্পণের সর্তে সম্মত হইয়া ব্রিটেন ও আমেরিকা উভয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে চীনে কুওমিণ্টাঙ স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। ঐ চুক্তির অবশ্যম্ভাবী ফল ১৯৪৫ সালের আগষ্ট মাসে রুশ-সোভিয়েট বন্ধুত্ব ও মৈত্রী চুক্তি। ইহার পর যুদ্ধোত্তর যুগে কম্যুনিজম্ প্রচারের পথ রোধ করা চিয়াং কাইশেকের পক্ষে অসম্ভব হইয়াছিল।

কম্যুনিস্ট পার্টি কর্তৃক ধীরে ধীরে মাঞ্চুরিয়া দখলের জন্য রুশিয়া ঐ চুক্তি ও সন্ধিকে কাজে লাগাইল। কম্যুনিস্ট পার্টি অচিরেই দুর্ধর্ষ প্রতিযোগী হইয়া উঠিল। চিয়াং রাজত্বের প্রভুত্ব নষ্ট করিবার জন্য কম্যুনিস্ট পার্টি যে গৃহযুদ্ধের উপর উত্তরোত্তর নির্ভর করিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি! চাইনিজ রেড আর্মিকে যদি মাঞ্চুরিয়ায় যুদ্ধ করিতে না দেওয়া হইত তবে হয়ত গৃহযুদ্ধ কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষে যাইত না। একদিকে ইঙ্গ-মার্কিন কূটনৈতিক ব্যর্থতা এবং অপর দিকে কুওমিণ্টাঙ-কম্যুনিস্ট ব্যর্থ আলোচনা আরম্ভ হইবার পূর্বে উত্তর চীনে চিয়াং কর্তৃক কম্যুনিস্টদের প্রথম আঘাত হানিতে পারার অক্ষমতাই চীনে কম্যুনিস্ট দলের প্রভাব বৃদ্ধির কারণ।

তিনটি আঞ্চলিক রণক্ষেত্রে, যথা, মাঞ্চুরিয়া, উত্তর চীন ও মধ্য চীনে গৃহযুদ্ধ চালাইয়া যাওয়াতেই কম্যুনিস্টরা সামরিক দিক হইতে সাফল্য লাভ করিতেছে। উত্তর চীনে এবং পীত নদী এলাকায় লাল ফৌজ জাতীয় বাহিনীর আক্রমণোদ্যোগে বিশৃংখলা সৃষ্টি করিতে যেমন মনোনিবেশ করিয়াছে তেমনি মধ্য ও দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ায় লাল ফৌজের সামগ্রিক আক্রমণ ফেঙ্‌টিয়েন প্রদেশে জাতীয়তাবাদীদের প্রতিরোধাত্মক রণক্ষেত্র বেষ্টন করিতে সমর্থ হইয়াছে। ফেঙ্‌টিয়ান রণক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদীদের বিপর্যয়ের ফলে লাল ফৌজ উত্তর ও মধ্য চীনে "যোগাযোগ স্থাপনের যুদ্ধ" সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতে পারিতেছে। মধ্য চীনের জাতীয়তাবাদীদের প্রতিরোধ ব্যবস্থার মূলে ঘাঁটিতে আঘাত হানিবার জন্য লাল ফৌজ একই সঙ্গে ইয়াংসি বদ্বীপ ও অববাহিকার স্ট্রাটাজিক কেন্দ্রে আক্রমণ চালাইয়াছে। এই সব সামরিক অভিযানে বিজয় লাভ করিবার ফলে কম্যুনিস্ট পার্টি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক শক্তিতে পরিণত হইয়াছে। কম্যুনিস্ট পার্টি নিজের শক্তিকে এত সংহত করিয়াছে যে, কুওমিণ্টাঙের এত ক্ষতির পর আর তাহার পক্ষে ইয়াংসি বদ্বীপ ও পীত নদী এলাকা হইতে লালফৌজকে বিতাড়নের জন্য সর্বাত্মক সংগ্রাম আরম্ভ করা সম্ভবপর নহে। অস্ত্রশস্ত্রের দিক হইতেও কম্যুনিস্টরা আজ আর ন্যূন নহে কারণ কুওমিণ্টাঙ্ বাহিনীর বহু যুদ্ধাস্ত্র তাহারা দখল করিয়াছে।

কম্যুনিস্টদের উত্থানের কারণগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করা যাইতে পারেঃ (১) উৎকৃষ্ট সংগঠন ক্ষমতা এবং উদ্দেশ্যের প্রতি নিষ্ঠা; (২) ভয়াবহ অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে কিষাণ ও কুওমিণ্টাঙ সমর্থকদের অনেকে কম্যুনিস্ট দলভুক্ত হইয়া পড়ে; এবং (৩) "মুক্ত অঞ্চলে" কম্যুনিস্টরা যে চিত্তাকর্ষক ভূমি ও অর্থনৈতিক সংস্কার সাধন করে তাহাতে তাহাদের পক্ষে গণসমর্থন অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। কুওমিণ্টাঙ সরকার যদি সাধারণ লোককে নিম্নতম জীবনযাত্রার মান দেওয়ার মত অবস্থার সৃষ্টির জন্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন করিতে পারিতেন এবং সরকারী দুর্নীতি দমন করিতে পারিতেন তবে বোধ হয় লালফৌজ এত সহজে মধ্য চীনে প্রবেশ করিতে পারিত না। অপর দিকে উত্তর চীনে অবস্থিত কেন্দ্রীয় বাহিনীকে কুওমিণ্টাঙ সরকার সক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন নাই। ঐ বাহিনীর বহু অংশ হয় স্বেচ্ছাকৃতভাবে কম্যুনিস্টদের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে অথবা কম্যুনিস্টরা তাহাদের জয় করিয়া লইয়াছে। এমতাবস্থায় কুওমিণ্টাঙ বাহিনীর পরাজয় খুব আশ্চর্যের কিছু নহে।

কুওমিণ্টাঙ যদি কার্যকরী ভাবে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম চীন নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিত এবং অবিলম্বে ব্যাপক কৃষি, শিল্প ও অর্থনৈতিক সংস্কার সাধন করিতে পারিত এবং আরও ভাঙ্গন বন্ধ করিবার জন্য শাসন ও দেশরক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠন করিতে পারিত তবে স্থায়ী কেন্দ্রীয় লাল শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য কম্যুনিস্ট পরিকল্পনাকে বিফল করিয়া দিতে পারিত। কম্যুনিস্ট পার্টি দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব চীনে কুওমিণ্টাঙ প্রভাবকে তাচ্ছিল্য না করিয়া পার্টির পদস্থ নেতারা রাজনৈতিক ব্যবস্থা দ্বারা কুওমিণ্টাঙকে ধ্বংস করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। দক্ষিণমুখী অভিযানের সুবিধার্থে কম্যুনিস্ট পার্টি হয়ত বামপন্থী গ্রুপের বিরুদ্ধে দক্ষিণ-পন্থী কুওমিণ্টাঙের অংশ গ্রহণ করিতে পারে কারণ তাহাতে উভয়ের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হইবে। কম্যুনিস্টদের রাজনৈতিক কূটকৌশল লালফৌজের সামরিক আক্রমণের মতই শক্তিশালী। সুতরাং কুওমিণ্টাঙ যদি কম্যুনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক চাল বন্ধ করিতে পারে তবে তাহার পক্ষে নবলব্ধ রাজনৈতিক ক্ষমতা সহ কম্যুনিস্ট পার্টির নিকট কম্যুনিস্ট-কুওমিণ্টাঙ কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের দাবী করা সহজতর হইবে। কুওমিণ্টাঙের প্রভাব বহুলাংশে হ্রাস হইলেও তাহার হাতে যে ক্ষমতা আছে তাহাতে কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষে কুওমিণ্টাঙকে শান্তি গ্রহণে বাধ্য করা এখনও সম্ভবপর নহে।


## বিনা অস্ত্রে চক্ষু ছানি

ডিজন্স "আই-কিওর" (রেজিঃ) চক্ষু ছানি এবং সর্বপ্রকার চক্ষুরোগের একমাত্র অব্যর্থ মহৌষধ। বিনা অস্ত্রে ঘরে বসিয়া নিরাময় সুবর্ণ সুযোগ। গ্যারাণ্টী দিয়া আরোগ্য করা হয়: নিশ্চিত ও নির্ভরযোগ্য বলিয়া পৃথিবীর সর্বত্র আদরণীয়। মূল্য প্রতি শিশি ৩৲ টাকা, মাশুল ৸০ আনা।

**কমলা ওয়ার্কস** (দ) পাঁচপোতা, বেঙ্গল।



## সতর্ক হউন!

আমাদের জনপ্রিয় প্রসাধন সামগ্রীগুলির বিশেষ করিয়া **মার্গো সোপ, কান্তা ক্যাণ্টরল, ভৃঙ্গল** প্রভৃতির বহু প্রকারের নকল বাজারে বাহির হইয়াছে এবং ইহা দ্বারা আমাদের অনেক পৃষ্ঠপোষক প্রতারিতও হইয়াছেন। অতএব আমরা পৃষ্ঠপোষকগণকে অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা যেন বিশ্বস্ত ও পরিচিত দোকান ছাড়া আমাদের প্রসাধন সামগ্রী ক্রয় না করেন এবং ক্রয় করিবার সময়ে জিনিষগুলি যেন পরীক্ষা করিয়া লন; নকল সন্দেহ হইলে তাঁহারা যেন উক্ত মাল এবং দোকানের নাম, ঠিকানা এবং ক্যাশ মেমো (যদি থাকে) প্রভৃতি আমাদের নিকট পরীক্ষার জন্য পাঠান।

আমাদের প্রসাধন সামগ্রীগুলির নকল বা জাল দ্রব্য প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতাগণকে এই প্রসঙ্গে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইতেছে যে, তাঁহাদের এইরূপ সম্পূর্ণ অসঙ্গত ও বে-আইনী কাজের জন্য আইনের আশ্রয়ে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে।

দোকানদারগণকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন আমাদের অফিস অথবা বিশ্বস্ত পাইকারী মাল বিক্রেতা (দোকানদার) ছাড়া বাহিরের অপরিচিত কাহারও নিকট আমাদের প্রসাধন সামগ্রী ক্রয় না করেন।

**দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ**

৩৫, পণ্ডিতিয়া রোড — কলিকাতা ২৯।

# "ক্ষুরস্য ধারা"—

## সমরসেট ম'ম

অনুবাদক—**শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়**

**(পূর্বানুবৃত্তি)**

কিছুক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছিলাম কাফেতে অধিকতর ঘন ঘন লোক সমাগম হচ্ছে। আমাদের কাছেই এক ভদ্রলোক ইভনিং ড্রেসও পরে বসেছিলেন, তিনি বেশ মোটা রকমের ব্রেক্‌ফাস্টের অর্ডার দিলেন। তার মুখাকৃতিতে ক্লান্তি মাখানো যৌন-তৃপ্তির ছাপ, ইনি সেই ধরণের লোক যারা বিগত রজনীর শৃঙ্গারানন্দ স্মরণ করে সন্তোষ অনুভব করেন। বৃদ্ধ বয়সে ঘুম কম, কয়েকজন ভোরে উঠে পড়া বুড়ো ভদ্রলোক কফি ও দুধ পান করছেন, আর পুরু কাঁচওয়ালা চশমার ভিতর দিয়ে প্রভাতী সংবাদপত্রে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছেন। যুবকরাও আসছে, তাদের কারো বা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোষাক আবার কারো বা গায়ে শত-ছিন্ন জামা, অফিস বা দোকানে যাওয়ার পথে কাফেতে ঢুকে তাড়াতাড়ি কিছু খেয়ে নিচ্ছে। একজন বৃদ্ধ একতাড়া সংবাদপত্র বগলে নিয়ে যতদূর দেখলাম বৃথাই টেবিলগুলির চারধারে ঘুরে গেল—জানালার বিরাট কাঁচের ভিতর দিয়ে লক্ষ্য করলাম চারিদিক বেশ ফর্সা হয়ে গেছে দু এক মিনিট পরে ইলেক্‌ট্রিক বাতি নিভিয়ে দেওয়া হল, শুধু সেই বিশাল রেস্তোরাঁর পিছন দিকে দু একটা বাতি জ্বলতে লাগল, আমার হাতঘড়িতে দেখলাম সাতটা বেজে গেছে।

বল্লাম: "একটু ব্রেকফাস্ট খেলে কি হয়?"

কফি ও দুধ আর টাট্‌কা অর্ধ-চন্দ্রাকৃতি পিঠা পাওয়া গেল। আমি অত্যন্ত ক্লান্ত ও শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম, বেশ বুঝছিলাম আমাকে বিধাতার অভিশাপের মত দেখাচ্ছে, কিন্তু লারীকে বেশ তাজা দেখাচ্ছে। তার চোখ দুটি উজ্জ্বল, সেই মসৃণ মুখে একটিও কুঞ্চন রেখা নেই, আর তাকে পঁচিশের এক বিন্দু বেশী বয়স বলে মনে হচ্ছে না। কফিতে আমার প্রাণ যেন সঞ্জীবিত হল।

"লারী আমার একটা উপদেশ শুনবে?—ও জিনিসটা আমি বড় একটা দিই না।"

দন্ত বিকশিত করে হেসে লারী জবাব দেয়—"আর আমিও বড় একটা গ্রহণ করি না।"

"তোমার ঐ যা সামান্য কিছু আছে তা বিতরণ করার পূর্বে একটু ভালো করে ভেবে দেখবে? যখন যাবে তখন চিরদিনের জন্যই যাবে, এমন এক সময় আসতে পারে যখন অর্থের ভীষণ প্রয়োজন হবে, নিজের জন্য হতে পারে অপরের জন্যও হ'তে পারে—তখন এই নির্বুদ্ধিতার জন্য তোমাকে অনুতাপ করতে হবে।"

তার মুখে বিদ্রুপের রেখা খেলে গেল, তবে তার ভিতর জ্বালা নেই।

বলল: আপনি দেখছি টাকার ওপর আমার চাইতেও বেশী গুরুত্ব দিয়ে থাকেন।"

আমি তিক্তভাবে বল্লাম: "আমি তা বুঝি তোমার বরাবরই টাকা ছিল, আমার ছিল না, এতদ্দ্বারা আমার কাছে জীবনের চাইতেও যা মূল্যবান সেই বস্তু পাওয়া সম্ভব হয়েছে, অর্থাৎ স্বাধীনতা। যদি মনে করি ত' পৃথিবীর যে কোন প্রাণীকে বলতে পারি চুলোয় যাও, এ যে কতোখানি স্বস্তি তা তুমি ভাবতে পারো না।"

"কিন্তু আমি ত' পৃথিবীর কাউকেই বলতে চাইনা যে চুলোয় যাও, আর তা যদি চাইতামও তাহ'লে ব্যাঙ্কে টাকা না থাক্‌লেও আমার বলা আটকালো যেত না। জানেন, টাকা আপনার কাছে স্বাধীনতা আমার কাছে তা বন্ধন।"

"লারী, তুমি অবাধ্য জন্তু—"

"জানি, কিন্তু উপায় নেই, কিন্তু যাই হোক্ যদি ইচ্ছা করি তাহ'লে মত পরিবর্তন করার প্রচুর অবসর পাব। আমি বসন্তকালের আগে আমেরিকায় ফিরছি না। আমার শিল্পী বন্ধু আগস্তে কস্তেৎ স্যানারীতে একখানি কুটির আমার জন্য ছেড়ে দিয়েছেন, আমি সেইখানে শীত কাটাবো।"

স্যানারী, রিভেয়ারার একটি ছোটখাটো স্বাস্থ্যকর জায়গা। জায়গাটি বাঁদল ও তুলোঁর মাঝামাঝি, যে সব সাহিত্যিক ও শিল্পীরা সেণ্ট টপেজের জমকালো আবহাওয়া অপছন্দ করেন তাঁরাই এখানে বেড়াতে আসেন।"

"ভালো লাগবে বটে, তবে খাবার জলের মতই একঘেয়ে মনে হবে।"

"আমাকে ওখানে কাজ করতে হবে। অনেক মালমসলা সংগ্রহ করেছি, একটা বই লিখব।"

"কি তার বক্তব্য বিষয়?"

ও হেসে বলে:—"যখন বেরোবে দেখতে পাবেন।"

"তুমি যদি শেষ করার পর আমার কাছে পাঠিয়ে দাও তাহ'লে আমি প্রকাশের ব্যবস্থা করতে পারি।"

"সে ভাবনা আপনাকে করতে হবে না—আমার কয়েকজন আমেরিকান বন্ধু প্যারীতে ছোট একটা প্রেস চালাচ্ছেন, তাঁদের সঙ্গেই বইটি ছাপাবার বন্দোবস্ত করে নিয়েছি।"

"কিন্তু ওভাবে বই প্রকাশ করে তার বিক্রীর ব্যবস্থা করতে পারবে না, তা ছাড়া তেমন কোনো সমালোচনাই হবে না।"

"কাগজে সমালোচনা হোক্ আর নাই হোক তাহ'লে আমার কিছু এসে যায় না—আর বিক্রী যে হবে তা আশা করি না। আমি শুধু আমার ভারতবর্ষীয় বন্ধুদেরও এই গ্রন্থে যাদের আগ্রহ আছে এমনই আরো দুচারজনকে পাঠাবার উপযুক্ত সংখ্যক বই ছাপছি। সমস্ত মালমসলা সংগৃহীত করে রাখার জন্য বইটি লিখছি, আর প্রকাশ করার কারণ এই শুধু ছাপা হওয়ার পরই বক্তব্য বিষয় পরিষ্কার করে বোঝানো যায়।"

"তোমার উভয় যুক্তির যাথার্থ্য বুঝতে পারছি।"

আমাদের ব্রেকফাস্ট ইতিমধ্যে শেষ হয়ে এল, ওয়েটারকে বিল আনতে বল্‌লাম, বিল আসার পর লারীকে দিয়ে বল্লাম:

"তোমার সব টাকাকড়ি যদি থানায় ফেলে দিতে পারো তাহলে আমার ব্রেকফাস্টের দামটাও দিয়ে দিতে পারো।"

লারী হেসে দাম দিয়ে দিল। এতক্ষণ বসে থাকার জন্য শরীর কাঠ হয়ে গিয়েছিল, আমার দুটি পাশে বেদনানুভব করছিলাম। সেই শরৎ প্রভাতের মুক্ত বায়ুতে বেরিয়ে ভালো লাগ্‌ল। আকাশ নীল, আর এ্যাভিন্যু দ্য ক্লিচি, রাতের সেই নোংরা পথে এখন বেশ মৃদু চটকদার হয়ে উঠেছে। যেন রংমাখা কুৎসিৎ স্ত্রীলোক তরুণীর ভঙ্গীতে চলেছে, দেখাচ্ছে মন্দ নয়। একটা চলন্ত ট্যাক্সি ডাকলাম।

লারীকে বল্লাম: "তোমাকে একটা লিফট্ দেব নাকি?"

"না, আমি সীনের ধারে একটু বেড়িয়ে কোনো স্নানাগারে ঢুকে স্নান সেরে নেব, তারপর 'বিব্‌লিওথেকে' গিয়ে কিছু গবেষণা করতে হবে।"

উভয়ে করমর্দন করলাম, সেই লম্বা লম্বা পা ফেলে মৃদুগতিতে লারী যেতে লাগল দেখ্‌লাম। ওর চেয়ে আমি কমজোর প্রাণী তাই ট্যাক্সিতে উঠে হোটেলে ফিরলাম। বস্‌বার ঘরে ঢুকে দেখি আটটা বেজে গেছে।

১৮১৩ খৃষ্টাব্দ থেকে (কাঁচের আবরণের ভিতর) যে নগ্ন নারী-মূর্তি ঘড়ির ওপর

অত্যন্ত অসুবিধাজনক অবস্থায় শায়িত রয়েছেন তাঁকে উদ্দেশ করে বল্লামঃ "আমার মত বৃদ্ধের পক্ষে বাড়ি ফেরার এই চমৎকার সময়"—

সেই নগ্ন রমণী তার গিল্ট করা ব্রোঞ্জের মুখখানি—গিল্টের আয়নায় মুখ দেখতে লাগল —আর ঘড়ি শুধু বলল: টিক্, টিক্। উষ্ণ জলে স্নানের আয়োজন করলাম, জল একটু গরম না হওয়া পর্যন্ত তার ভিতর পড়ে রইলাম, তারপর ঘুমের বড়ি একটা গিলে নিয়ে ভ্যালেরির Le Cimitiere Marin নিয়ে শুয়ে পড়লাম, ঘুম না আসা পর্যন্ত পড়া যাবে।

## সপ্তম পরিচ্ছেদ

### ( ১ )

ছ মাস পরে, এপ্রিল মাসের এক সকালে আমার কাপ ফেরাটের বাড়ির ওপরে লেখার কাজে ব্যস্ত আছি এমন সময় আমার চাকর এসে জানালো সেণ্ট জীনের (আমার পাশের গ্রাম) পুলিসের লোক আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য নীচে অপেক্ষা করছে। এইভাবে বাধা পেয়ে আমি বিরক্ত হলাম, ওরা যে কি চায় বুঝেলাম না। আমার অবশ্য ভয় ছিল না বেনিভোলেণ্ট ফণ্ডে ইতিমধ্যেই চাঁদা দেওয়া আছে, তার বদলে একখানি কার্ড পেয়েছি, সেখানি গাড়িতে রেখে দিয়েছি, যদি অতিরিক্ত স্পীডের জন্য কখনো ধরা পাড়ি বা রাস্তার উল্টো দিকে গাড়ি পার্ক করার অপরাধে আটকায় তাহলে ড্রাইভিং লাইসেন্সের সঙ্গে ঐ কার্ডখানি অনিচ্ছাসত্ত্বেও বার করে দেখালে মৃদু সতর্কবাণী দিয়ে ওরা ছেড়ে দেবে।

ভাবলাম এমনও হতে পারে আমার চাকরদের কারো কাগজপত্রে গোলমাল থাকায় হয়ত পুলিশের কবলে পড়েছে (ফ্রান্সে এ বিপদ নানাবিধ সুবিধার অন্যতম)—কিন্তু পুলিশের সঙ্গে আমার সদ্ভাব থাকায় (—বিশেষতঃ তাদের একপাত্রে মদ্যপানে আপ্যায়িত না করে আমি কখনও বাড়ি থেকে যেতে দিই না—) বিশেষ কোনো বড়দরের হাঙ্গামার আশংকা মনে জাগল না। কিন্তু ওরা, —বরাবর যুগলেই আসেন—সম্পূর্ণ অন্য সংবাদ নিয়ে এসেছেন।

পরস্পর করমর্দন এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কিত প্রশ্নাদির পর উভয়ের মধ্যে যিনি উচ্চপদস্থ—(তাঁকে ব্রিগেডিয়ার বলে সম্বোধন করা হচ্ছিল আর অমন জাঁকালো গোঁফ আমি কদাচিৎ দেখেছি)—পকেট থেকে নোটবুক বার করলেন। নোঙরা বুড়ো আঙুলে দিয়ে পাতা উল্টিয়ে প্রশ্ন করলেন, "সোফী ম্যাকডোনাল্ডের নাম কি আপনার মনে পড়ে?"

বেশ সতর্ক হয়ে জবাব দিলাম—"ও নামে একজনকে জানি বটে।"

"এইমাত্র তুলোঁর পুলিশ স্টেশন থেকে টেলিফোন পেলাম—চীফ ইনস্পেক্টর অবিলম্বে আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে অনুরোধ জানিয়েছেন।

আমি প্রশ্ন করলাম—"কারণটা কি? আমি মিসেস ম্যাকডোনাল্ডকে সামান্যই জানি।"

অনুমান করলাম হয়ত আহিফেন ঘটিত কোনো হাঙ্গামায় সোফী জড়িয়ে পড়েছে, কিন্তু আমাকে এর মধ্যে টানছে কেন তা বুঝতে পারলাম না।

"সে আমার জানা নেই। তবে এই স্ত্রীলোকটির সঙ্গে আপনার নিশ্চয়ই মেলামেশা ছিল। জানা গেছে ওর বাসা থেকে গত পাঁচদিন যাবৎ ওকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না, হারবার থেকে একটি মৃতদেহ তোলা হয়েছে, পুলিশের বিশ্বাস দেহটি তার। আপনাকে দিয়ে সনাক্ত করাতে চায় আর কি।"

আমার গা বেয়ে শীতল শিহরণ প্রবাহিত হ'ল। খুব বেশী অবশ্য বিস্মিত হইনি—খুবে সম্ভব যে জীবন ও যাপন করছিল কোনো হতাশায় মুহূর্তে তা অবসান করার ওর ঝোঁক হয়ে থাকবে।

বল্লামঃ "তা ওর কাপড় চোপড় বা কাগজ-পত্র দিয়েও ত' সনাক্ত করা যেতে পারে।"

"সম্পূর্ণ নগ্ন ও গলাকাটা অবস্থায় ওর লাশ পাওয়া গেছে।"

আমি ভয়ার্ত কণ্ঠে বললামঃ "হা ভগবান!" এক মুহূর্ত ভেবে নিলাম। জানতাম পুলিশ আমাকে জোর করে নিয়ে যেতে পারে, তার চাইতে সহমানেই যাওয়া ভালো। বল্লাম, "বেশ, প্রথম ট্রেন যা ধরতে পারব তাইতেই যাচ্ছি।"

টাইম টেবল দেখলাম—একটা ট্রেন ধরা যায় তাতে পাঁচটা থেকে ছটার ভিতর তুলোঁ পৌঁছব। ব্রিগেডিয়ার বল্লেন, চীফ ইনস্পেক্টরকে সেই মর্মে তিনি ফোন করবেন আর আমাকে উপদেশ দিলেন সোজা পুলিশ স্টেশনে চলে যেতে। সেদিন প্রভাতে আর কাজ করলাম না। সুটকেশে কয়েকটি প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে লাঞ্চের পর স্টেশনে পাড়ি দিলাম।

### ( ২ )

তুলোঁ পুলিশ স্টেশনে উপস্থিত হতেই আমাকে সোজা চীফ ইনস্পেক্টরের ঘরে নিয়ে যাওয়া হ'ল। টেবলের সামনে মোটা সোটা ভদ্রলোক বসেছিলেন, দেখে কর্সিকান বলে মনে হয়। তিনি আমার দিকে, হয়ত অভ্যাস বশে একটা সন্দিগ্ধ দৃষ্টি হানলেন। কিন্তু লিজন দ্য অনারের রিবনটা লক্ষ্য করে (আমি হুঁশিয়ার হয়ে সেটি বাটন হোলে গুঁজে এসেছিলাম) স্মিত হেসে আমাকে বসতে বললেন, এবং আমার মত একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে এই ব্যাপারে ডাকতে হয়েছে বলে মার্জনা চাইলেন।

সেই সুরেই আমিও বললাম তাঁদের কাজে যদি এতটুকু সাহায্য করতে পারি তাহলেই আমি সবচেয়ে খুশী হব। তারপর তিনি তাঁর ফাইলের দড়ি খুলে কাগজপত্র দেখে উদ্ধত ভঙ্গীতে শুরু করলেনঃ

"এ সব বড় নোঙরা ব্যাপার। দেখা যাচ্ছে এই ম্যাকডোনাল্ড স্ত্রীলোকটির অত্যন্ত দুর্নাম ছিল। নেশা করত, আফিম খেত, আর কামোন্মাদ ছিল। শুধু জাহাজের নাবিকদের সঙ্গেই যে রাত কাটাত তা নয় শহরের বাজে লোকদের সঙ্গে সে অবাধে শয্যা নিত। এই রকম চরিত্রের স্ত্রীলোকের সঙ্গে আপনার বয়সী একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কি করে পরিচয় হ'ল?"

বলবার ইচ্ছা ছিল তাতে আপনার মাথা-ব্যথা কিসের—কিন্তু শত শত ডিটেক্টিভ কাহিনী পড়ে এইটুকু জ্ঞান হয়েছিল যে, পুলিশের সঙ্গে নম্র ব্যবহার করাই ভালো। বল্লামঃ "ওকে অল্পই—জানতাম। ছোটবেলায় সিকাগোয় প্রথম দেখি, পরে ওখানে একজন পদস্থ ব্যক্তির সঙ্গে ওর বিবাহ হয়। এক বছর না তার কিছু আগে উভয় পক্ষীয় বন্ধুদের ভিতর প্যারীতে ওর সঙ্গে আবার দেখা হয়।"

ভাবছিলাম কি করে সোফীর সঙ্গে আমার যোগাযোগ ওরা ধরল—কিন্তু ইতিমধ্যে আমার দিকে একখানি বই এগিয়ে দিয়ে বল্লেনঃ

"এই বইখানি ওর ঘরে পাওয়া গিয়েছে। উৎসর্গ পৃষ্ঠাটি অনুগ্রহ করে দেখলেই আপনি যে রকম অল্প পরিচয়ের কথা বলছেন ঠিক তা বোঝা যায় না।"

বই-এর দোকানের জানলায় আমার যে গ্রন্থটির অনুবাদ দেখে সোফী আমাকে উৎসর্গ লিখে দিতে বলেছিল এটি সেই বই। আমার নিজের স্বাক্ষর দিয়ে লিখেছিলাম, "Mignonne, allons voir si la rose", কারণ ঐ কথাটিই সর্বাগ্রে আমার মনে এসেছিল। কথাগুলি অবশ্য কিঞ্চিৎ ঘনিষ্ঠতার পরিচায়ক।

বল্লামঃ "যদি মনে করে থাকেন আমি ওর প্রেমিক, তাহলে ভুল করেছেন।" চোখে হাসির ঝলক টেনে উনি বল্লেনঃ "এতে আমার এতটুকু মাথাব্যথা নেই, তবে কোনো কিছু বলতে চাই না, আপনার বিরুদ্ধে কোনো ইঙ্গিত করতে চাই না, কারণ ঐ স্ত্রীলোকটির কার্যকলাপ যা শুনেছি তাতে এটুকু বুঝেছি, আপনার উপযুক্ত ও মোটেই নয়। কিন্তু এটুকু বোঝা যায় যে, সম্পূর্ণ অপরিচিতাকে আপনি ত' 'Mignonne' (প্রিয়তমে) বলে সম্বোধন করবেন না।"

"মঁসিয়ে কমিশেয়র রনসার্দের এক বিখ্যাত কবিতার ঐটি প্রথম লাইন। আপনার মত শিক্ষিত ও সংস্কৃতিসম্পন্ন ভদ্রলোকের কাছে নিশ্চয়ই ও কটি লাইন পরিচিত। ও কটি লাইন এই ভেবে লিখেছিলাম যে, কবিতাটি

হয়ত ওর স্মরণ হবে ও পরের লাইন কটি সোফীর মনে পড়বে। সেই লাইনগুলিতে যে-জীবন সোফী যাপন করছে, তা যে অবিবেচনার কাজ হচ্ছে এই ইঙ্গিত হয়ত তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।"

"নিশ্চয়ই স্কুলে রনসার্দ পড়ে থাকব, তবে এতই কাজকর্ম করতে হয় আপনি যে লাইন ক'টির কথা বলছেন তা আমার স্মরণ নেই।"

আমি কবিতাটির প্রথম স্তবক আবৃত্তি করলাম, ভালো করেই জানতাম আমার কাছে শোনার পূর্বে কোনোদিন রনসার্দের নামও উনি শোনেন নি, তাই আশংকা ছিল না যে, কবিতাটি ওর মনে পড়তে পারে, কারণ কবিতার শেষের ক'লাইন মোটেই সৎভাবে থাকার প্রেরণা জোগায় না।

"স্ত্রীলোকটির দেখা যাচ্ছে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দীক্ষা ছিল। কারণ ওর ঘরে অনেকগুলি ডিটেকটিভ কাহিনী পাওয়া গেছে, দু এক খণ্ড কবিতার বইও ছিল, বদলেয়র ও রিমবদের বই। তা ছাড়া এলিয়ট বলে কার একখানা ইংরাজী বই। লোকটি কি খ্যাতনামা?"

"সবিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন।"

"আমার কবিতা-টবিতা পড়ার সময় নেই। তা ছাড়া আমি ইংরাজী পড়তেই পারি না। যদি ভালো কবি-ই হ'ন—তা'হলে কেন যে ফরাসী ভাষায় লেখেন না বুঝি না, তা'হলে শিক্ষিত লোকেরা তাঁর কবিতা পড়তে পারতেন।"

এই চীফ ইনস্পেক্টর "The Waste Land" পড়বেন কথাটি ভাবতেও বেশ আমোদ লাগল। সহসা একখানি 'স্ন্যাপ্সট' আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে উনি বল্লেন, "এই লোকটিকে জানেন নাকি?"

তখনই লারীকে চিনতে পারলাম। স্নানের পোষাক পরা লারীর সাম্প্রতিক চিত্র, অনুমান করলাম যে, গ্রীষ্মকালটি লারী দিনার্দে গ্রে ও ইসাবেলের সঙ্গে কাটিয়েছিল তখনকারই ছবি। প্রথমটা মনে হ'ল বলি জানি না—এই জঘন্য ব্যাপারে লারীকে জড়াতে আমার মোটেই বাসনা ছিল না, কিন্তু ভাবলাম, পুলিশ যদি ওকে খুঁজে বের করতে পারে, তা'হলে আমার এই অস্বীকৃতিতে সন্দেহ হবে যে, হয়ত গোপন করার মত কিছু আছে।

বল্লামঃ "ও একজন মার্কিন নাগরিক, ওর নাম লরেনস্ ডারেল।"

"স্ত্রীলোকটির ঘরে এই একটিমাত্র ফটোগ্রাফ পাওয়া গেছে, উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধটা কি?"

"সিকাগোর একই গ্রামে ওদের বাড়ি, উভয়েই বাল্যবন্ধু।"

"কিন্তু এই ফটোটি তেমন প্রাচীন নয়, মনে হয়, উত্তর বা পশ্চিম ফ্রান্সের কোনো সমুদ্রতীরে তোলা। ঠিক জায়গাটা সহজেই জানা যাবে, এই ভদ্রলোক কি করেন?"

আমি বেশ সাহসভরে বল্লামঃ "লেখক।" ইনস্পেক্টর ভ্রূ কুঞ্চিত করে আমার মুখের পানে তাকালেন। বুঝলাম, আমাদের সমগোত্রীয়দের তিনি খুব সুনীতিসম্পন্ন প্রাণী বলে মনে করেন না। তাই কথাগুলি আরো জোরালো সম্ভ্রান্ত করার জন্য যোগ করলাম, "বেশ স্বাধীন অবস্থাসম্পন্ন লেখক।"

"এখন উনি কোথায় আছেন?"

পুনরায় জানি না এই কথা বলার লোভ হ'ল, কিন্তু তখনই মনে হল তা বল্লে বিষয়টি আরো হয়ত ঘোরালো হয়ে উঠবে। ফরাসী পুলিশের অনেক দোষ থাকতে পারে বটে তবে তাদের এমনই ব্যবস্থা আছে যে, অতি অল্প সময়ের ভিতর যাকে দরকার তাকে ওরা খুঁজে বার করতে পারে।

বল্লামঃ "ও এখন স্যানারীতে আছে।"

ইনস্পেক্টর আমার মুখের দিকে তাকালেন, বোঝা গেল, কৌতূহলী হয়ে উঠেছেন, বল্লেনঃ

"কোথায়?"

আমার স্মরণ ছিল লারী আমাকে বলেছিল, আগসূতে কটেটের দেওয়া বাসায় ও থাকবে, ক্রীস্‌মাসে ফিরে এসে আমার কাছে থাকার জন্য ওকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম, আর ও যা ভেবেছিলাম তাই করল, আমার নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করল। ইনস্পেক্টরকে ওর ঠিকানা দিলাম।

"আমি স্যানারিতে ফোন করে ও'কে ডেকে পাঠাচ্ছি, ওকে জেরা করলে হয়ত অনেক কথা জানা যাবে।"

একথা না ভেবে পারা গেল না যে, ইনস্পেক্টর ভেবেছেন যে, এই একটি সন্দেহ করার যোগ্য লোক পাওয়া গেছে, কিন্তু আমার শুধু হাসি পেল, কারণ আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম যে, লারী সহজেই প্রমাণ করতে পারবে যে, এ ব্যাপারে ওর করার কিছুই ছিল না।

একটা হোটেলে একখানা ঘর নিয়ে রইলাম। পরদিন প্রাতে পুলিশ স্টেশনে আবার গেলাম। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর ইনস্পেক্টরের ঘরে যাওয়ার অনুমতি পাওয়া গেল। ঘরে ঢুকে লারীকে দেখলাম, গম্ভীর ও ক্লিষ্ট মুখ, পূর্ব-দিন আমি যে চেয়ারে বসেছিলাম সেই চেয়ারটিতে বসে আছে। ইনস্পেক্টর আমাকে সানন্দে অভ্যর্থনা জানালেন, আমি যেন ও'র দীর্ঘ দিনের হারানো ভাই।

বল্লেনঃ "আচ্ছা, ম শের ম'সিয়ে, আপনার বন্ধুটি কর্তব্যের খাতিরে আমি যা কিছু প্রশ্ন করেছি যথাসম্ভব অকপটে তার জবাব দিয়েছেন। উনি যে গত আঠারো মাসের ভিতর এই দুর্ভাগা স্ত্রীলোকটিকে দেখেন নি, একথা আমি বিশ্বাস না করার কোনো হেতু পাই নি। বিগত সপ্তাহে ও'র গতিবিধির হিসাব নিকাশ বেশ ভালোভাবেই দিয়েছেন, ওর ঘরে যে ফটোগ্রাফ পাওয়া গিয়েছে তারও জবাব পাওয়া গেছে। দিনার্দে ফটোটি তোলা হয়েছিল, একদিন ওর সঙ্গে লাঞ্চ খাওয়ার সময় ফটোটি আপনার বন্ধুর পকেটে ছিল। স্যানারি থেকে ওর সম্বন্ধে ভালো রিপোর্ট পেয়েছি, তাছাড়া দম্ভ না করেই বলছি, আমি নিজেও একজন ভালো চরিত্র-বিচারক। উনি এই ধরণের অপরাধ করতে পারেন না এ বিষয়ে আমি দৃঢ়মত। ও'র একজন বাল্য বান্ধবী, ভালো পারিবারিক পরিবেশে যে মানুষ, তার এই শোচনীয় পরিণামের জন্য আমি আন্তরিক সহানুভূতি জানিয়েছি। কিন্তু এই ত জীবন!—আচ্ছা, সজ্জনবৃন্দ—আমার একজন কর্মচারী আপনাদের মর্গে নিয়ে যাবে, সেখানে দেহ সনাক্ত করার পর আপনারা যথা ইচ্ছা সময় কাটাতে পারেন। যান, ভালো করে লাঞ্চ খেয়ে নিন, আমার কাছে তুলোঁর সবচেয়ে ভালো রেস্তোরাঁর কার্ড রয়েছে, আমি দু এক লাইন লিখেও দিচ্ছি, মালিকের কাছে উপযুক্ত সমাদর পাবেন। এই ভয়ংকর অভিজ্ঞতার পর এক বোতল মদ আপনাদের উভয়েরই উপকার করবে।"

এখন শুভেচ্ছায় যেন ভদ্রলোক উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন। আমরা পাহারাওয়ালার সঙ্গে লাশঘরে গেলাম। ওখানকার কারবার দেখলাম মন্দা চলেছে। একটিমাত্র লাশ রয়েছে দেখলাম। আমরা তার কাছে যেতেই লাশঘরের কর্মচারী তার মুখের ঢাকা খুলল—সে দৃশ্য মোটেই মনোরম নয়, সমুদ্রের জল তার সেই রঞ্জিত রূপোলি চুলের কুঞ্চন মুছে দিয়েছে, আর মাথার ওপর পলেস্তারা পড়েছে। মুখখানি বিশ্রী ফুলে উঠেছে, অতি বিশ্রী দেখাচ্ছে। তবে সে মুখ যে সোফীর তাতে আর সন্দেহ রইল না। পরিচায়ক ঢাকনাটি আরো একটু খুলে যে দৃশ্য আমাদের দেখা উচিত ছিল না তাই দেখাল—বিশ্রীভাবে গলাটি এ কান থেকে ও কান পর্যন্ত কাটা।

আমরা পুলিশ স্টেশনে ফিরে গেলাম। চীফ্ ইনস্পেক্টর ব্যস্ত ছিলেন, আমাদের যা বলার ছিল একজন সহকারীকে বললাম; তিনি আমাদের ছেড়ে কতকগুলি কাগজপত্র নিয়ে আবার ফিরে এলেন। আমরা সেইগুলি নিয়ে শব-সংকারকের কাছে গেলাম।

আমি বল্লামঃ "এইবার একটু মদ্যপান করা যাক, লারী।"

পুলিশ স্টেশন থেকে বেরিয়ে লাশঘরে যাওয়া এবং ফিরে আসা পর্যন্ত লারী একটিও কথা বলেনি, ফিরে এসে শুধু বলেছিল যে, লাশটি সোফী ম্যাকডোনাল্ডের বলেই ও সনাক্ত করছে। আমি জাহাজঘাটার ধারে একটি কাফেতে ওকে নিয়ে গিয়ে বসলাম, একদিন এইখানেই সোফীর সঙ্গে বসেছিলাম। জোরে

Mistral বা শীত উত্তরানিল* বইছিল, আর হারবার যদিও স্বভাবতঃই শান্ত থাকত, আজ শাদা ফেনায় উদ্ভাসিত।

জেলে-নৌকাগুলি ধীরভাবে দুলছে,—উজ্জ্বল সূর্যালোক, আর এই শীত-উত্তরানিল বইলে যা হয় সব কিছু বস্তুই আশ্চর্য রকম উজ্জ্বল ও পরিষ্কার দেখাচ্ছে। যেমন কাঁচের ভিতর দিয়ে কোনো বস্তুকে স্পষ্ট ও নিখুঁত-ভাবে দেখা যায়। যা কিছু দেখা যায় মনের ভিতর কেমন একটা স্নায়ু আন্দোলক, ও শক্তি-স্পন্দনকারী ভাব আনে। আমি ব্রাণ্ডি ও সোডা পান করলাম, কিন্তু লারীর জন্য যা অর্ডার দেওয়া হয়েছিল ও তা স্পর্শ করল না, নীরবে গম্ভীরভাবে লারী বসে রইল, আমিও তাকে বিরক্ত করলাম না।

কিছুপরে ঘড়ি দেখলাম।

বল্লাম: "এইবার উঠে আমাদের কিছু খেয়ে নিলে ভালো হয়। দুটোর ভিতর লাশ ঘরে যেতে হবে।"

"আমার ক্ষিধে পেয়েছে, সকালে ব্রেকফাস্ট খাইনি।"

চীফ ইন্সপেক্টর কোথায় ভালো খাদ্য পাওয়া যায় বলে দিয়েছিলেন তাই ওর মুখ দেখে সেই রেস্তোরাঁয় লারীকে নিয়ে গেলাম—লারী কদাচিৎ মাংস খায় জেনে আমি ওমলেট ও গলদা চিংড়ির তরকারী অর্ডার দিলাম, তারপর মদ্য তালিকা চেয়ে নিয়ে পুলিশের ইন্সপেক্টরের উপদেশানুসারে দ্রাক্ষারসের সুরা অর্ডার দিলাম। সুরা আসতে লারীকে বললাম:

"ওটা পান করো, হয়তো দু এক কথা বলতে পারবে, আলোচনার সূত্র খুঁজে পাবে।"

আমার কথা বেশ মন দিয়ে লারী শুনলো।

সে মৃদু গলায় বললে: শ্রীগণেশ বলতেন নীরবতাও একরকম আলাপ আলোচনা।"

"কেম্ব্রিজ য়ুনিভার্সিটির বিদগ্ধ ছাত্রদের সোস্যাল গ্যাদারিং-এর কথা মনে পড়ে।"

সে বল্লে: "শব-সংকারের সব খরচাই দেখছি আপনাকেই বহন করতে হবে, আমার টাকা-কড়ি নেই।

আমি জবাব দিলাম: "বেশ আমি রাজী আছি," তারপর ওর বক্তব্যটা হঠাৎ কানে লাগলে,—বল্লাম:—"তুমি কি এর মধ্যেই সব টাকা উড়িয়ে দিয়েছ নাকি?

লারী জবাব দেয় না, ওর চোখে সেই খেয়ালী ভঙ্গী ফুটে উঠল।

"তুমি কি টাকাকড়ি সব বিতরণ করে দিয়েছ?"

"পাই পয়সাটি পর্যন্ত দিয়ে দিয়েছি, শুধু জাহাজ না আসা পর্যন্ত যেটুকু খরচের জন্য দরকার তাই রেখেছি।"

"জাহাজ আবার কি?"

"আমার বাসার পাশেই যে ভদ্রলোক থাকেন তিনি কয়েকখানি মাল জাহাজের মার্সাইল্স এজেন্ট, এই জাহাজগুলি নিকট প্রাচ্য থেকে ন্যুইয়র্ক যায়। আলেকজান্দ্রিয়া থেকে কেবল এসেছে অসুস্থতার জন্য। মার্সাইতে যে জাহাজ আসছে তার দুজন লোককে ছাঁটাই করতে হবে, তাদের জায়গায় আরো দুজনকে ঠিক করে রাখতে বলেছে। লোকটি আমার বন্ধু, আমাকে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। আমি আমার প্রাচীন সিয়োয়োখানি তাঁকে উপহার দিচ্ছি। যখন জাহাজে উঠবো তখন আমার পরিহিত পোষাক ও থলের ভিতর কিছু জিনিসপত্র ভিন্ন আর কিছুই সঙ্গে থাকবে না।"

"তোমার টাকা তুমিই ব্যবস্থা করেছ, এখন তুমি মুক্ত—কোনো বাঁধন নেই।"

"মুক্ত কথাটাই ঠিক। এত খুশী ও এত স্বাধীনতা আমার জীবনে আর অনুভব করি নি। যখন ন্যুইয়র্কে পৌঁছব আমার হাতে মাইনের টাকা থাকবে, আর তম্বারা আর কোনো চাকরী না পাওয়া পর্যন্ত চলে যাবে।"

"তোমার বই-এর কি হ'ল!"

"শেষ হয়ে গেছে এবং ছাপাও হয়েছে, যাদের কাছে পাঠাতে চাই তাঁদের নামের একটা তালিকা করেছি, দু একদিনের ভিতরই আপনি একখণ্ড পেয়ে যাবেন।"

"ধন্যবাদ!"

আর বেশী কিছু বলার ছিল না, নীরবে আমাদের আহার শেষ করা গেল। কফি অর্ডার দিলাম। লারী পাইপ জ্বালল, আমি সিগার ধরালাম। তার দিকে চিন্তাকুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। ওর ওপর আমার চোখ রয়েছে অনুভব করে আমার মুখের পানে লারী তাকাল। তার মুখখানিতে একটা শয়তানি ঝিলিক খেলে যাচ্ছে।

বল্লে: "যদি মনে করেন আমি একটা নিরেট বোকা, তাহ'লে ইতস্তত না করে বলে ফেলুন, আমি কিছুই মনে করব না।"

"না, ঠিক তা মনে করি না। আমি শুধু ভাবছি যদি তোমার বিবাহ হ'ত এবং আর সকলের মত সন্তানাদি থাকত তাহলে জীবনটা কি অন্য আকার নিত না, হয়ত অধিকতর সার্থক হ'ত।"

লারী হাসল, এবই নির্ভরযোগ্য'ও মধুর সেই হাসি-এত মনোরম, তম্বারা ওর চরিত্রের সৌরভ ও সততা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে, ওর হাসির মাধুর্যের কথা অন্ততঃ আমি আরো কুড়িবার উল্লেখ করেছি আবার তা উল্লেখ করছি, এই হাসি বিষাদমণ্ডিত ও কোমল।

বললে "এখন আর সময় নেই। বিয়ে করতে পারতাম একমাত্র সোফীকে।" আমি সবিস্ময়ে ওর মুখের পানে তাকালাম।

"যা সব ঘটে গেল তার পরেও এই কথা বলছ?"

"ওর মন ছিল অতি চমৎকার, মহৎ আশাময়—উচ্চ আদর্শ ছিল তার, এমন কি ওর এই দেহাবসানের ভিতরও একটা দুঃখকর মহত্ত্ব বর্তমান, যেভাবে আত্ম-বলিদান দিয়েছে তার ভিতরও হৃদয় আছে।"

আমি নীরব রইলাম। এই অদ্ভুত উক্তিতে যে কি বলব ভেবে পেলাম না।

প্রশ্ন করলাম: "তাহ'লে কেন ওকে বিয়ে করো নি!"

"ও ছোট ছিল, তা ছাড়া সত্য কথা বলতে কি যখন ওর দাদামশায়ের বাসায় গিয়ে ওর সঙ্গে একত্রে এল্ম গাছের তলায় বসে কবিতা পড়তাম তখন ওই শীর্ণা মেয়ের ভিতর যে আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য আছে এ খেয়াল হয় নি।"

এই সময়ে ইসাবেলের কথা উল্লেখ না করায় আমার আশ্চর্য লাগল। উভয়ে যে বাগদত্ত ছিল একথা নিশ্চয়ই সে বিস্মৃত হয়নি, তবে মনে হ'ল এখন সে পর্ব অপরিণত বয়সের নির্বুদ্ধিতা মনে করে হয়ত। নিজেদের মনকে তখন ঠিক মত বোঝা যায় না। আমার বিশ্বাস হল যে লারীর জন্যই সোফী এতকাল যে হৃদয় জ্বালায় জ্বলেছে এ সন্দেহ আজকের মত এমন করে আর কোনোদিন ওর মনে জাগেনি।

আমাদের যাওয়ার সময় হয়েছিল। লারী যেখানে তার গাড়িখানি রেখেছিল সেইখানে গেলাম, গাড়িটি এখন বড় নোংরা দেখাচ্ছে, সেই গাড়িতে লাশঘরে গেলাম। শব-সংকারক লোকটি তার কথার মত কাজের লোক। যেরকম রীতিগতভাবে সেই জমকালো আকাশের তলায় সব কিছু সম্পাদিত হ'ল, উত্তাল হাওয়ায় আন্দোলিত গোরস্থানের সাইপ্রেস্ ঝাউ গাছগুলি এই বিভীষিকাময় ঘটনার যেন উপযুক্ত উপসংহার। সব শেষ হয়ে যাওয়ার পর শব-সংকারক, আমাদের করমর্দন করল।

লারী জানতে চাইল তার' আর কিছু করার আছে কি না।

"কিছু নয়।"

যত শীঘ্র সম্ভব স্যানারি ফিরে যেতে চাই।"

বল্লাম: "আমাকে হোটেলে নামিয়ে দেবে?"

পথে একটিও কথা হ'ল না, পৌঁছে আমি নেমে এলাম। করমর্দন করার পর ও চলে গেল। বিলের টাকা দিয়ে একটা ট্যাক্সিতে স্টেশনে ছুটলাম।

আমিও চলে যেতে চাই।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

* ফরাসী দেশের ভূমধ্যসাগর সন্নিহিত প্রদেশ-সমূহে প্রবাহিত শীত উত্তরানিল।

মীনাক্ষী আবার তেমনিভাবে কেঁদে উঠল। কিন্তু এবারকার কান্না একটু স্বতন্ত্র ধরণের। বেপরোয়া কীল, চড়, ঘুঁষি,—দুমদাম আওয়াজ;—নারী কণ্ঠের তীব্র আর্তনাদ; হঠাৎ মিনিট দুই তিনের মধ্যে একেবারে চুপচাপ! মিনিট পাঁচেক পরে কেউ বুঝতেও পারবে না, মাত্র কয়েক মিনিট আগেই এখানে কোন পুরুষ ও নারীকে কেন্দ্র ক'রে পারিবারিক জীবনের এমনই বিসদৃশ ব্যাপার ঘটে গেছে, যার বিষয় ভাবতেও নাকি শরীরের মধ্যে ঝিমঝিমানি আসে।

বাঙালী ঘরের নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে এ-ধরণের ঘটনা প্রায়ই ঘটে থাকে। কোলকাতার মত এত বড় শহরে এ-সমস্ত তুচ্ছ পারিবারিক অশান্তির হিসাব কে রাখে? মানুষ এখানে আত্মকেন্দ্রিক—অপরের খবর রাখবার সুযোগ তার বড় একটা মেলে না।

●

আমি একজন বাসাড়ে, মেসবাড়িতে থাকি। পাশের বস্তির খবর রাখা আমার কাজ নয়, নির্ঝঞ্ঝাটে দিনগুলো কাটিয়ে দিতে পারলেই বাঁচি। কিন্তু এখানে আসা অবধি পাশের বস্তির চেঁচামেচি দিন দিন বেড়েই চলেছে। দিন নেই, রাত নেই, সময় নেই, অসময় নেই—এ যেন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। আর কারুর খবর বলতে পারি না, আমি নিজে যেন এই ক'দিনে একেবারে হাঁফিয়ে উঠেছি।

"মেরে ফেললে, আমায় মেরে ফেললে"—প্রশান্ত রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেদ করে' নারী-কণ্ঠের অসহায় কাতরোক্তি তীক্ষ্ম শলাকার মত কানে এসে বিঁধে গেল।

বেরিয়ে এলাম নিজের ঘর থেকে। মিনিট খানেক কান পেতে যা শোনা গেল তাতে এইটুকু বুঝলাম, এই যে নিপীড়ন তা কোন নারী ও পুরুষকে কেন্দ্র করে'—নারীটির নাম মীনাক্ষী, পুরুষটি দ্বিজপদ। মনে মনে এদের সম্পর্কটা অনুমান করে' নিলাম, কিন্তু এই অশান্তির উৎপত্তি কোথায়, নিষ্পত্তিই বা হবে কি কোরে,—সবটুকু যেন অস্পষ্ট রয়ে গেল। সব চেয়ে বিস্ময়ের, বস্তিতে তো আরও কয়েক ঘর ভাড়াটে আছে, কিন্তু এ পর্যন্ত কেউই এতটুকু চেষ্টা করল না এদের ঝগড়াটা মিটিয়ে দেবার।

কাছে গিয়ে খোঁজ নিলাম। ভাড়াটেরা আগে নির্লিপ্ত ছিল, আমাকে দেখে যেন একটু সজাগ হয়ে উঠল। কী ব্যাপার ওদের জিজ্ঞাসা করলাম, জবাব পেলাম না ঠিকমত। দরজায় ঘা দিয়ে ভেতরকার খবর জানবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু ভেতর থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। মিনিট দুয়েক পরে সব চুপচাপ হয়ে গেল;—বাঁচা গেল ঝগড়াটা তা হলে থেমে গেছে।

হঠাৎ দরজা খোলার শব্দ কানে গেল। পিছন ফিরে দেখি, একটি মাঝারি বয়সের মহিলা। বুঝতে বাকী রইল না এই-ই মীনাক্ষী। মীনাক্ষী সবাইকে শুনিয়ে ব'লে চলল,—আমাদের কথায় থাকা কেন বাপু? আমরা কি কারু কথায় থাকি?

আমার দিকে চোখ পড়ায় একটু অপ্রস্তুত হয়ে মীনাক্ষী ঘরের দিকে ফিরে গেল। শুনতে পেলাম, মীনাক্ষী ঘরের ভেতরে কাকে উদ্দেশ্য করে' বলছে,—"মিনসের কেমন কাণ্ড, পাঁচজন ভদ্রলোক শুনলে কি বলবে?"

কাউকে বিপন্ন করবার দুরভিসন্ধি আমার নেই। নির্লিপ্ততাই আমার জীবনের একমাত্র কাম্য। তবু মাঝে মাঝে বিব্রত হই বিচিত্র ধরণের মানুষের সংস্পর্শে এসে। তাদের সুখ-দুঃখ, তাদের হাসি-কান্না, জন্ম-মৃত্যু, সব কিছুর মধ্যে সঙ্গতির চেয়ে অসঙ্গতিই খুঁজে পাই বেশী। সময়ে-অসময়ে, কারণে-অকারণে ওরা আমার মনকে আচ্ছন্ন করে' তোলে,—নিজেকে হারিয়ে ফেলি ওদের জীবনের রহস্যময় জটিলতার মধ্যে। তাই মাঝে মাঝে মনে হয়, মানুষ সহজ ও সরল নয়। ওরা নিকটকে দূরে সরিয়ে রাখে, দূরকে কাছে টানে।

বহুদিন পরে সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল। এবারে রাতে নয়, একেবারে দিন দুপুরে। ভেবেছিলাম, মীনাক্ষীদের সম্বন্ধে দুর্ভাবনার কোন কারণ নেই। ওদের সমস্যা ওরা নিজেরাই সমাধান করতে জানে। দ্বিজপদবাবু সম্বন্ধে

বলতে পারি না, কিন্তু মীনাক্ষীর সেদিনকার আচরণে এই ধারণাই মনে বদ্ধমূল হয়ে ছিল, সে নেহাৎ বুদ্ধিহীনা নয়।

ওদের ঝগড়ার ফাঁকে ফাঁকে দু'চারটে কথা আমার কানে এসে পৌঁচাচ্ছিল। নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ে মনটা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলাম। ঝগড়া চলতেই লাগল।

হঠাৎ দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হল। দরজা খুলে দেখি, বস্তির তিন চারজন ভাড়াটে।

প্রশ্ন করলাম,—তোমরা কেন?

ভাড়াটেরা অভিযোগ পেশ করল মীনাক্ষীদের বিরুদ্ধে। নিজেদের ঘরের ঝগড়া নিয়ে আর সবাইকে গালিগালাজ করবে, এ কেমন কথা!

বললাম,—তাতে আমার কী করবার আছে?

ওরা জানাল, পাঁচজন ভদ্রলোক না দাঁড়ালে এর মীমাংসা হবে না। ইচ্ছার বিরুদ্ধে ওদের সঙ্গে গেলাম। আমাদের আবির্ভাবে মীনাক্ষীদের ঝগড়াটা সাময়িকভাবে থেমে গেল। জানি না, এতে আমার হাত কতটুকু!

ঘরে পা দিয়েই আমার আগের ধারণা অনেকটা পাল্টে গেল। ঘরের বাসিন্দা শুধু মীনাক্ষী আর দ্বিজপদবাবু নয়, এ-ছাড়া আরও আছে একটা ১৭।১৮ বছরের মেয়ে,—পরে নাম জেনেছি, চিত্রলেখা। বস্তির ভাড়াটে বলতে আমরা সাধারণতঃ যা বুঝি, এরা তার থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র ধরণের। মনে হয়, আগে এদের অবস্থা ভাল ছিল, অভাবের তাড়নায় আজ এখানেই আশ্রয় নিতে হয়েছে। দ্বিজপদবাবু লোকটিও মন্দ নয়; ভাড়াটেদের কাছ থেকে এ'র সম্বন্ধে অন্যরকম শুনেছিলাম;—এখন যেন মনের মধ্যে কেমন সম্ভ্রম বোধ হল।

ভাড়াটেরা বচসা শুরু করে' দিলে দ্বিজপদবাবুদের সঙ্গে: রাতদিন ঝগড়া আর চেঁচামেচি, কান ঝালাপালা হয়ে গেল। তার ওপর, আবার আজ কলতলা থেকে বাসন চুরি, কাল রান্নাঘরের ধোঁয়া, পরশু কে দু'বালতি কলের জল বেশী খরচ করেছে,—এই সব নিয়ে তো রোজই লেগে আছে! আগের ভাড়াটেরা তো এমন ছিল না! যাদের না পোষায়, তারা উঠে যাক না, বাপু; আর পাঁচজন অন্ততঃ শান্তিতে থাকুক।

উত্তেজিতভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন দ্বিজপদবাবু। কটুভাষায় কি একটা মন্তব্য করতে যাচ্ছিলেন দ্বিজপদবাবু,—আমার দিকে লক্ষ্য পড়ায় নিজেকে সংযত করে' নিলেন।

সবাইকে থামাবার চেষ্টা করলাম। বললাম, —রাতদিন যদি এমনিভাবে কানের ধারে চেঁচামেচি চলবে, তা হলে আমরা তিষ্ঠই কি কোরে?

দ্বিজপদবাবু নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন,—মশাই, ভেতরে এসে বসুন, সব কথা বলছি।

ঘর জোড়া একটা তক্তপোষ পাতা। তারি একধার ঘেঁষে বসে পড়লাম।

ভাড়াটেদের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে দ্বিজপদবাবু শুরু করলেন: জানেন মশাই, এই হতভাগারাই আমার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে। একে নিজেদের দুঃখ-কষ্ট, নিজেদের ধান্দায় সময় করে' উঠতে পারি না, তার ওপর আবার এদের একশ' রকম অভাব-অভিযোগ। আজ কলের জল নেই, কাল পায়খানায় দুর্গন্ধ, আবার পরশু কাপড় চুরি,—নিত্যি লেগে আছে খুঁটিনাটি নিয়ে।

একজন ভাড়াটে কি বলতে যাচ্ছিল, কথাটা চেপে দিয়ে বললাম,—তোমরা এখন যাও তো; আমি পরে তোমাদের সঙ্গে কথা বলব।

ভাড়াটেরা ক্ষুব্ধ হয়েই সেখান থেকে চলে গেল। দ্বিজপদবাবুকে উদ্দেশ্য করে' বললাম, —মশাই, আপনিই কোথায় সবাইকে মানিয়ে নিয়ে চলবেন, তা নয়, আপনার ঘরেই নিত্য চেঁচামেচি!

ভদ্রলোক এর কোন জবাব না দিয়ে একগাল হেসে উঠলেন।

হাসিটা থামিয়ে বললেন,—তবে শুনবেন?

বললাম,—না, না, আজ যাক। আর একদিন শোনা যাবে।

উঠতে যাচ্ছিলাম, ভদ্রলোক আমার হাতটা টেনে ধরে' বললেন,—না, না, উঠলে চলবে না। আপনাকে শুনতেই হবে।

তারপর ঘরটার দিকে একবার ভাল কোরে চেয়ে নিয়ে বললেন,—জানেন মশাই, পর সামলে কি করব, ঘর নিয়েই জ্বলে পুড়ে মরছি। ঐ যে বসে আছে মীনা, মানে—আমার বিয়েকরা স্ত্রী,—ও একেবারে সাংঘাতিক। যেমন মুখরা, তেমনি ডানপিটে,—দরকার হলে আপনাকে খুন কোরেও ফেলতে পারে।

এবারে হেসে ফেললাম। দ্বিজপদবাবু সেটুকু লক্ষ্য কোরে দ্বিগুণ উৎসাহে বলতে শুরু করলেন,—আপনি হাসবেন না। ও'র অনেক গুণ, একেবারে রূপে-গুণে মনোহর। যা করতে বলবেন, ঠিক তার উল্টোটা করে' বসবে। বলতে যান, একেবারে হাঁ-হাঁ করে' তেড়ে আসবে।

তারপর দ্বিজপদবাবু গলাটা একটু চেপে নিয়ে আমার কানের ধারে মুখটা নিয়ে গিয়ে বললেন,—ওঁর আরও একটি মহৎ গুণ আছে,—কিছু হাতটান।

মীনাক্ষী এতক্ষণ চুপ করে' বসে ছিল। এইবার ফুঁসিয়ে উঠে ঠিক যেন প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল। কিছু দূরে সতের-আঠার বছরের যে মেয়েটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একমনে আমাদের কথাবার্তা শুনছিল, বাধা দিয়ে বলে উঠল,—দাও না মা, ওঁকে প্রাণখুলে যা ইচ্ছে তাই বলে যেতে। ভদ্রলোক তো সব বুঝছেন।

দ্বিজপদবাবু ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে উঠলেন। স্ত্রীর প্রসঙ্গ ছেড়ে দিয়ে মেয়েটির বিষয় শুরু করলেন।

এ আলোচনা ভাল লাগছিল না। কিন্তু দ্বিজপদবাবুকে নিরস্ত করা গেল না।

তিনি আবার শুরু করলেন, ঐ যে মেয়েটা দেখছেন, ও আমার মেয়ে চিত্রলেখা। মেয়েটা খুবই ভাল ছিল এদ্দিন, কিন্তু আজকাল যেন কেমন হয়ে গেছে। এখন মার হোয়ে কোমর বেঁধে আমার সঙ্গে লড়তে আসে। আমি এখন কোথায় যাই, বলুন তো!

চিত্রলেখা আমার দিকে চেয়ে একটু ম্লান হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মীনাক্ষীকে চঞ্চল হোয়ে উঠতে দেখলাম। উদ্দেশ্য করে বললাম,—আপনার যদি কোন কাজ না থাকে তো এখানে আর অপেক্ষা করেন কেন?

মীনাক্ষী এইবার কথা শুরু করলে,—বললে, দাঁড়ান আমার কথাটাও শুনে যাবেন।

দ্বিজপদবাবু রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। আমার সামনেই একটা বিসদৃশ ব্যাপার ঘটে যেত। ও'রা অনেক কথা আমাকে শোনাতে চাইছিলেন।

আলোচনাকে চাপা দিয়ে উঠে চলে এলাম। দ্বিজপদবাবু আমাকে কিছুটা এগিয়ে দিলেন। আসবার সময় ভাড়াটেদের চাপা মন্তব্য শুনতে পেলাম: ভদ্রলোক এদের জালে জড়িয়েছে!

দ্বিজপদবাবু এবং মীনাক্ষীর পারিবারিক জীবনের যে খাপছাড়া দিকটা সেদিন প্রত্যক্ষ করেছিলাম, ভেবেছিলাম এর পরিণতি আর বেশীদূর এগোবে না। কিন্তু আমার মনটা সেদিন গভীর হতাশায় ভরে গেল, যেদিন খবর পেলাম দ্বিজপদবাবু কয়েকদিন হল নিরুদ্দেশ হয়েছেন। প্রথমটা বিশ্বাস করতে পারিনি; পরে অবাক হোয়েছি। একী অদ্ভুত মানুষ দ্বিজপদবাবু! ভেবে কূলে কিনারা পাই না, সেদিনকার মানুষটি কেমন করে নিশ্চিন্তভাবে নিজের দায়িত্বকে এড়িয়ে চলতে পারে।

এক টুকরো কাগজে লিখে পাঠিয়েছে চিত্রলেখা: মা আপনাকে একবার দেখা করতে বলেছেন।

ওদের খবর নিতে গেলাম। দেখলাম, মা ও মেয়ে চুপ করে ঘরের মধ্যে বসে আছে।

আমাকে দেখতে পেয়ে মীনাক্ষীর চোখ দুটো জলে ভরে এল। নিজেকে সামলে নিয়ে বললে,—দেখুন, আপনাকে আমি দাদার মত ভাবি। তাই আপনাকে বলতে দ্বিধা নেই, আমাদের মত দুঃখী খুব কম আছে। কদিন হল মানুষটা বাড়ি থেকে বেরিয়েছে, আজও পর্যন্ত কোন খবর নেই। কাকে দিয়েই বা খবর নিই, তাই ক'দিন ধরে ভাবছিলাম...।

মীনাক্ষীর কথাকে চাপা দিয়ে বললাম,—আপনি নিশ্চিন্ত হন, আমি দু' এক দিনের মধ্যেই খোঁজ খবর আনছি।

মীনাক্ষী নিজেকে সামলাতে পারলে না,—দু' চোখ বেয়ে টপটপ করে জল পড়তে লাগল।

পরক্ষণেই মীনাক্ষী সেখান থেকে উঠে গেল। যাবার সময় দরজার গোড়া থেকে বলে গেল,একটু বসুন চা নিয়ে আসি।

ওকে বারণ করবার সময় পেলাম না। চিত্রলেখা ফস করে আমার কাছে এগিয়ে এসে চুপিচুপি বললে, মাকে যেন বলবেন না যে, আপনাকে চিঠি দিয়েছি।

বললাম,—না।

মিনিট খানেক সাহস সঞ্চয় করে চিত্রলেখা আবার অনুরোধ জানালে,—একটা টাকা দিতে পারেন?

ঘটনাটা এমনই আকস্মিক যে, কোন জবাব দিতে পারলাম না। বিমূঢ়ের মত পকেট থেকে একটা টাকা বের করে চিত্রলেখার হাতে দিলাম। চিত্রলেখা খুশী মনে আগের জায়গায় ফিরে গেল।

এক কাপ চা নিয়ে ফিরে এল মীনাক্ষী। দেখলাম, সে নিজেকে বেশ সামলে নিয়েছে। চোখ দুটো তার হিংস্র শ্বাপদের মত জ্বল জ্বল করছে, মুখে অপূর্ব দৃঢ়তা।

বেশ শান্ত ও সহজভাবে মীনাক্ষী বলে চললু,—ওঁকে এতটুকু বিশ্বাস করবেন না। ওঁর সব মিথ্যে,— সব ফাঁকি। সম্প্রতি ওঁর চাকরী নেই, কিন্তু কাউকে তা জানতেও দেন না। চারিদিকে কেবল পাওনাদারের ভীড়—অপমান সহ্য করতে হয় শুধু আমাকেই। এদিকে আবার ঘাড়ের ওপর ঐ মেয়েটা চেপে রয়েছে, এতটুকু ভাবনা-চিন্তা নেই!

মিনিট খানেক চুপ করে থেকে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মীনাক্ষী আবার শুরু করলে,—তা ছাড়া, আমাদের তিনটি পেট, তাইই বা চলে কি করে?

চিত্রলেখা মীনাক্ষীকে বাধা দিয়ে বললে,—কী যে ছাইভস্মের কথা বল, মা! যাঁর ভাবনা তিনি যদি না ভাবেন, ওঁকে শুনিয়ে কি হবে?

চিত্রলেখার দিকে একবার চেয়ে নিয়ে মীনাক্ষীকে উদ্দেশ্য করে বললাম,—বিপদের সময় কি লজ্জা করা সাজে?

পকেটে সামান্যই ছিল, মীনাক্ষীর হাতে গুঁজে দিয়ে বললাম, প্রয়োজন হলে চেয়ে নিতে ভুলবেন না যেন।...

মীনাক্ষী কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল। একটু ম্লান হেসে জবাব দিল,—লজ্জা করবার আর কি আছে? তবু উনি বলেন, কারুর কাছে হাত পাতবার দরকার নেই আমাদের।

কোন জবাব দিলাম না। দেখলাম, চিত্রলেখা অন্যমনস্কভাবে দরজার দিকে চেয়ে আছে।

ফিরে এলাম নিজের মেসে। উঠে আসবার সময় মীনাক্ষী বললে,—আপনি যদি ওঁর দেখা পান তো সবাইকে জানিয়ে দেবেন, উনি একটি মস্তবড় ধাপ্পাবাজ, অসাধু। বললাম,—ছি ছি, অমন কথা মুখে তুলতে নেই।

সব কিছু যেন আমার গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। একী অদ্ভুত চরিত্রের মানুষ এঁরা! এর কোনটা সত্য, কোনটা মিথ্যা কিছুই বোঝা যায় না,—সবই রহস্যময়।

ভাড়াটেদের এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছি। তারা বলে : দ্বিজপদটা ভবঘুরে; কিন্তু মীনাক্ষীর যা দেমাক! মাগী খেতে পায় না, তবু সাজ-গোছের বাহার কী! দেখলে গা জ্বালা করে। এদিকে মেয়েটির পরনে না জোটে কাপড়, মাথায় না আছে তেল। দ্বিজপদটা যা বাজারহাট করে আনে, তাতে আবার মাগীর মন ওঠে না। এতে ঝগড়া লাগবে না তো কী!

বললাম,—চিত্রলেখা কি করে?

—করবে কি আর? দুমবো মেয়ে, খায় দায়, আর বাপমার ঝগড়া দেখে খিল খিল করে হাসে।

বললাম,—সে কি?

ভাড়াটেরা হেসে ফেটে পড়ল।

দিন পাঁচ সাত পরের কথা। দেখলাম,—একটা রেস্টুরেণ্টে বসে চা খাচ্ছেন দ্বিজপদবাবু। আমাকে দেখতে পেয়ে ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন।

জিজ্ঞাসা করলাম,—কি খবর দ্বিজপদবাবু?

আমার কাছে ঘেঁষে এসে দ্বিজপদবাবু নীচু গলায় বললেন, —চলুন এগিয়ে যাই, অনেক কথা আছে। আজ রাত্রে আমাদের বাড়িতে যাবেন। উপস্থিত গা-ঢাকা দিয়ে আছি।

বললাম,—এখন যাবেন কোথায়?

দ্বিজপদবাবু ম্লান হেসে জবাব দিলেন,—যাবার আর জায়গা কোথায়! ভাবছি, যদি কিছু মনে না করেন, কয়েকটা টাকা দিতে পারেন?

পকেটে একখানা পাঁচ টাকার নোট ছিল, বের করে বললাম,—এতে চলবে তো?

ভদ্রলোক দ্বিরুক্তি না করে আমার হাত থেকে নোটটা তুলে নিয়ে মুহূর্তের মধ্যে অন্তর্ধান হয়ে গেলেন।

রাত্রে আবার মীনাক্ষীর কান্নার আওয়াজ কানে গেল। ব্যাপার কী জানতে গেলাম।

দেখলাম, দ্বিজপদবাবু ঘরের এক কোণে চুপ করে বসে আছেন আহত সৈনিকের মত; অপরদিকে মীনাক্ষী ও চিত্রলেখা,—দুজনেরই চোখে জল। বুঝলাম, সবেমাত্র একটা দারুণ ঝড় এদের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে; তারি প্রতিক্রিয়া সবাকার চোখে-মুখের অবসাদের মধ্যে পরিস্ফুট।

আমাকে দেখে দ্বিজপদবাবু দপ্ করে জ্বলে উঠলেন। নতুন করে' শুরু হল এঁদের পারিবারিক কলহ।

বললাম,—কী করছেন দ্বিজপদবাবু!

দ্বিজপদবাবু উত্তেজিতভাবে জবাব দিলেন,—এরা নিজেরা পারেনি, আবার লোক পাঠিয়েছে ধরে আনবার জন্যে।

বললাম,—ভুল করছেন দ্বিজপদবাবু। আপনার ইচ্ছে না থাকলে কি আপনি আসতেন? এই যে আপনি নিজের ইচ্ছেয় চলে গিয়েছিলেন, ওদের কি ক্ষমতা হয়েছিল আপনাকে ধরে রাখবার?

দ্বিজপদবাবু একটু শান্ত হলেন বলে মনে হল। হঠাৎ অগ্নি স্ফুলিঙ্গের মত জ্বলে উঠল মীনাক্ষী। চেঁচিয়ে উঠে বলতে শুরু করল,—বাড়ি ছেড়ে পালাবে না? —চারিদিকে যে পাওনাদারের তাগাদা। এদের থেকে গা ঢাকা দিতে হবে না?

একটু থেমে আমার দিকে চেয়ে আবার বলতে শুরু করলে—জানেন, আমার কত টাকা দেনা এই বস্তির ভাড়াটেদের কাছে! সংসার চলবে কি করে?

মিনিটখানেক নিস্তেজ হয়ে পড়লেন দ্বিজপদবাবু।

হঠাৎ ওঁর মাথায় কী ভূত চেপে বসল। মুহূর্তের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন মীনাক্ষীর দিকে। কী বেপরোয়া কীল, চড়, ঘুঁষি! মানুষ যে এতদূর নেমে আসতে পারে তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না।

চুপ করে' থাকতে পারলাম না। দ্বিজপদবাবুর একখানা হাত ধরে বাইরে টেনে নিয়ে এলাম। দৃঢ় কণ্ঠে বললাম,—এখান থেকে আপনাকে বেরিয়ে যেতে হবে, দ্বিজপদবাবু। আপনার এখানে মুহূর্তের স্থান হবে না।

মীনাক্ষী আমার হাতখানা চেপে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললে,—দাদা, ওঁকে ক্ষমা করুন।

ক্ষুণ্ণ মনে ফিরে আসছি। আসবার সময় শুনতে পেলাম চিত্রলেখা আমাকে উদ্দেশ্য করে বলছে, এ হতচ্ছাড়া জায়গায় আর আপনি আসবেন না কোন দিন।

অনেকদিন হয়ে গেল দ্বিজপদবাবুদের কোন খোঁজ খবর নিইনি। মীনাক্ষীর কান্নাও তেমন আর শুনতে পাই না। পাঁচ ছ'মাস আগের কথা, মীনাক্ষী কয়েকবার অভাব-অভিযোগের কথা জানিয়েছিল, কিছু সাহায্যও করেছিলাম। তারপর থেকে আর কোন খবর পাইনি। মাঝে একদিন ওদের সঙ্গে পথে দেখা হয়েছিল। দেখলাম, দ্বিজপদবাবু, মীনাক্ষী, চিত্রলেখা গল্প করতে করতে সিনেমা থেকে ফিরছে।

চোখাচোখি হতে জিজ্ঞাসা করলাম,—এই যে দ্বিজপদবাবু, আপনাদের খবর কি?

দ্বিজপদবাবু এক গাল হেসে ঘাড় নাড়লেন, মীনাক্ষী মুচকি হেসে অন্য দিকে মুখ ফেরাল। যাক, এতদিনে ওদের মনোমালিন্য ঘুচেছে, এইটেই মস্ত বড় কথা!

দীর্ঘদিন বাদে আজ আবার মীনাক্ষী কেঁদে উঠল। কিন্তু এবারকার কান্না আগের মত নয়,—একঘেয়ে, একটানা সুর অন্ধকারের বুক চীরে ক্রমাগত কানে এসে পৌঁছুতে লাগল। মনে মনে ভাবছি, ওদের দাম্পত্য কলহের মধ্যে আমার যাওয়া উচিত হবে কিনা। চেষ্টার ত্রুটি করিনি, কিন্তু আমার সে প্রচেষ্টা 'বার বার ব্যর্থ' হয়েছে, যতক্ষণ না মিটিয়ে নেবার তাগিদ এসেছে ওদের নিজেদের অন্তর থেকে। কাজে কাজেই ভেবে দেখছি, কোন সার্থকতা নেই আমার দিক থেকে ওদের ঝগড়া মেটাতে যাওয়ার।

তবু, মীনাক্ষী একভাবেই কেঁদে চলল।... কতক্ষণ চুপ করে থাকা যায়? একবার শেষ চেষ্টাই করা যাক।

বেরুতে যাচ্ছি, দেখলাম বস্তির কয়েকজন ভাড়াটে হন্তদন্ত হয়ে আমারি কাছে আসছে।

বললাম,—তোমাদের আবার কি হল এই রাত্রে?

—আমাদের সর্বনাশ হোয়েছে বাবু,—একবার দেখবেন, আসুন, বস্তিকে পুলিশ ছেঁকে ধরেছে।

বললাম,—সে কি!

কে একজন চাপা গলায় বললে,—আজ্ঞে হ্যাঁ। দ্বিজপদটা এবার মরেছে,—চিত্রলেখা আফিম খেয়ে আত্মহত্যা করেছে।
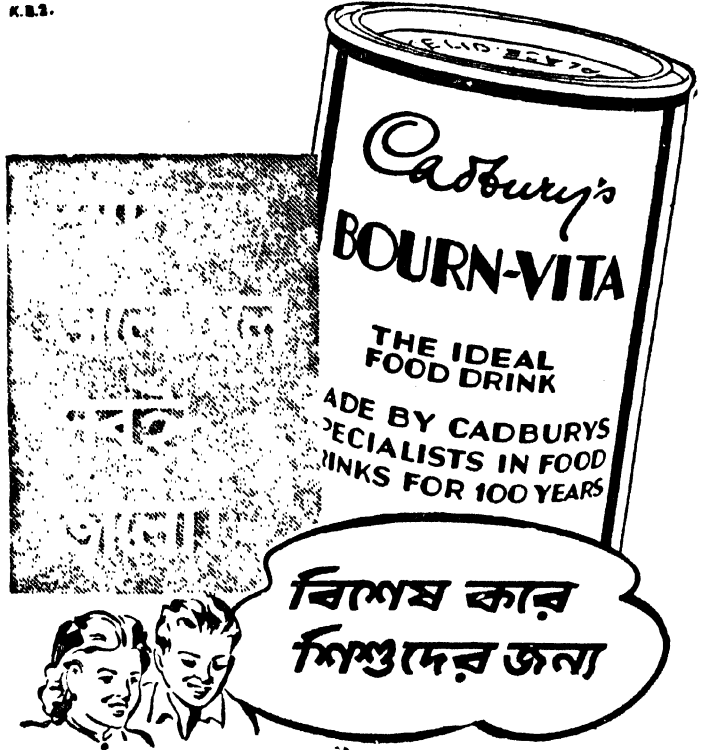

ক্যালসিয়ম ও ভিটামিন আছে বলে বোর্নভিটা বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের হাড় পেশী পুষ্ট করে। বোর্নভিটা খেলে বড়োদেরও ভালো ঘুম হয় এবং অফুরন্ত কর্মোৎসাহ আসে।

# জীবন-তৃষা

## আর্ভিঙ্ স্টোন

অনুবাদক—**অদ্বৈত মল্ল বর্মন**

৩

সন্ধ্যার খাওয়া সেরে, চেয়ারখানা পিছনে ঠেলে দিতে দিতে ভিনসেণ্ট বলল, "মাদমোয়াজেল উরসুলা, শুনছ, ছবি তোমার এনেছি।"

উরসুলা একটা রংচঙে নক্সা করা পোষাক পরছিলো। সেটা পরতে পরতেই বলল, "শিল্পী তাতে খুব ভাল একটা নাম লিখে দিয়েছে তো?"

"একটা বাতি জেবলে আনতো, ছবিটা আমি ইস্কুলঘরে টাঙিয়ে দিই।"

একটা অপূর্ব চুম্বনের ভংগীতে যেন উরসুলার ওষ্ঠদ্বয় বঙ্কিম হয়ে উঠেছে! সে ভিনসেণ্টের দিকে আড়চোখে তাকাল। বলল, "মার একটা কাজে আমাকে এখুনি গিয়ে হাত লাগাতে হবে। আধঘণ্টার মধ্যে সেটা গিয়ে সেরে ফেলব কি?"

ভিনসেণ্ট তার ঘরে আলনার গায়ে কনুইয়ে ভর করে আয়নার দিকে তাকাল। তার চেহারার খুঁটিনাটি সবই সে ভালো করে ভেবে রেখেছে। হল্যাণ্ডে থাকতে এসব ভাববার কোনো গুরুত্বই বোধ করত না। সে লক্ষ্য করেছিল, ইংরেজের তুলনায় তার মাথা ও মুখ অনেক প্রশস্ত। টানা ভুরুর নীচেকার গভীর খাদে চোখদুটি অনুপ্রবিষ্ট। নাসিকা উন্নত, চওড়া এবং সিধা। প্রসারিত ভুরুদেশ থেকে মদির মুখবিবর পর্যন্ত যতখানি উঁচু, গোলাকার কপালখানাও তার ঠিক ততখানিই উঁচু। চোয়াল সবল ও সুপ্রসারিত। ঘাড় মোটা। তার অতিপ্রশস্ত চিবুক ডাচ্ বৈশিষ্ট্যের যেন এক জীবন্ত স্তম্ভ।

আয়নার সামনে থেকে ঘুরে গিয়ে সে খাটের কোণে অলসভাবে বসে পড়ল।

যে পরিবারে সে মানুষ হয়েছে, তার আবেষ্টনী নিতান্ত কাঠখোট্টা ধরণের। ইতিপূর্বে কোনো মেয়ের ভালবাসায় সে পড়েনি। এ ধরণের দৃষ্টি দিয়ে আজ অবধি কোনো মেয়ের দিকে তাকায়নি পর্যন্ত। নরনারীঘটিত, ব্যাপার নিয়ে একটিও রসিকতা আজ পর্যন্ত তার মুখ দিয়ে বেরোয়নি। উরসুলার প্রতি তার মনে যে প্রেম জেগেছে, তাতে কাম বা লিপ্সা কিছুই ছিল না। সে তরুণ, সে আদর্শবাদী; এই তার প্রথম প্রেমানুভূতি।

ঘড়ির দিকে তাকালো সে। মাত্র পাঁচ মিনিট অতিক্রান্ত হয়েছে। সামনে আরো পঁচিশটি মিনিট, কতক্ষণে কাটবে ঠিক নেই। মার চিঠিখানার সংগে তার ভাই থিয়ো'রও একখানা চিরকুট ছিল। ভিনসেণ্ট সেটা বের করে আবার পড়ল। থিয়ো ভিনসেণ্টের চার বছরের ছোট। হেগ শহরে গুপিলদের যে দোকান আছে, থিয়ো সেখানে ভিনসেণ্টের জায়গাতে নিযুক্ত হচ্ছে। থিয়ো আর ভিনসেণ্ট তাদের বাপ থিয়োডোরাস এবং খুড়া-ভিনসেণ্টের মতোই আবাল্য ভ্রাতৃপ্রণয়াবদ্ধ।

ভিনসেণ্ট একখানা বই টেনে নিয়ে তার উপর কিছু কাগজ রেখে থিয়োকে একখানা চিঠি লিখল। আলনার উপরের ড্রয়ার টেনে কতকগুলো অসমাপ্ত স্কেচ্ বার করল। টেমস নদীর বাঁধে বসে এগুলি সে এঁকেছিলো। থিয়োর নামলেখা একখানা খামে সেগুলি পুরল। সেই সংগে জ্যাকুয়েটের আঁকা "তরবারীহস্তে তরুণী" শীর্ষক একখানা ছবির ফটোগ্রাফও খামখানাতে পুরল।

"কি সর্বনাশ! উরসুলার কথা বেমালুম ভুলেই বসে আছি!" উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠল ভিনসেণ্ট। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল এরই মধ্যে তার পনেরো মিনিট দেরী হয়ে গিয়েছে। একখানা চিরুণী তুলে নিল। ঢেউতোলা, লাল, জটপাকানো চুলগুলিকে সোজা করার চেষ্টা করল। তারপর সিজার দ্য কুকের ছবিখানা টেবিল থেকে তুলে নিয়ে এক ঝটকায় দরজাটা খুলে ফেলল।

সে বসবার ঘরে এসে পেঁছুনো মাত্র উরসুলা তাকে বলল, 'আমি ভাবলাম, তুমি আমাকে ভুলেই গিয়েছ।" সে কতকগুলো কাগজের খেলনা জোড়া লাগাচ্ছিল। বলল, "আমার ছবি এনেছ তো? দেখতে পারি ছবিটা?"

"তোমাকে দেখাবার আগেই আমি ছবিটা টাঙিয়ে ফেলতে চাই। এখানে একটা লণ্ঠন জবালতে বলেছিলাম, তার কি করলে?"

"লণ্ঠনটা মার কাছে রয়েছে যে।"

ভিনসেণ্ট যখন রান্নাঘর থেকে ফিরে এল উরসুলা তার হাতে নীল রঙের একটা 'স্কার্ফ' তুলে দিয়ে বললে, "নাও, ওটা আমার কাঁধের উপর দিয়ে জড়িয়ে দাও।" স্কার্ফটার রেশমী স্পর্শটুকুতে তার চিত্তে দোলা লাগল। বাগা আপেল ফুলের কুঁড়িগুলোর গন্ধে বাতা ভরপুর। পথটুকু আঁধারে ছাওয়া উরসুলা তার আঙুলের ডগাগুলো দিয়ে ভিনসেণ্টের খসখসে কালো কোটের আস্তিন আলতোভাবে ধরে চলছিল এক সময়ে তার পা ফস্কে গেল; তখন সে ভিনসেণ্টের হাতখানা শক্ত করে জড়িয়ে ধরল তারপর নিজের এই অসম্বৃত আচরণে খিল খিল করে হেসে উঠল। ভিনসেণ্ট বুঝতে পারল না, আছাড় খেয়ে পড়ে যাওয়ায় আমো কোথায়? তবে তমসা-ঘেরা পথের উপ এই হাস্যচপল চলমান নারীমূর্তির সঙ্গ তারও মনে মাদকতা এনে দিচ্ছিল। সে আগ বাড়িয়ে উরসুলার জন্য ইস্কুলঘরের দরজা খুলে দিল। উরসুলা যখন দরজা গলিয়ে ঘ ঢুকছে, তার ননীর মত নরম মুখখানি ভিন্ সেণ্টের মুখে প্রায় লাগে লাগে। উরসু সুগভীর দৃষ্টিতে তার চোখ দুটির দিবে নিজের চোখ মেলে ধরল। যেন, ভিন্সেণ্টে যে-প্রশ্ন এখনো তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় নি তারই উত্তর তার চোখদুটিতে জাজ্বল্যমান হ উঠেছে।

ভিন্সেণ্ট লণ্ঠনটা টেবিলের উপ বসিয়ে দিল। জিজ্ঞাসা করল, "ছবিটা কোন খানটায় টাঙালে তোমার পছন্দসই হবে ব দাও।"

"আমার ডেস্কের উপরে টাঙালেই ঠিক হবে তাই না?"

ঘরটা আগে ছিল একটা গ্রীষ্মাবাস। তা মধ্যে গোটা পনেরো নীচু চেয়ার টেবি গড়াগড়ি যাচ্ছে। ঘরের এক প্রান্তে একটুখানি খালি জায়গা—সেইখানেই উরসুলার ডেস্ক সে এবং উরসুলা দুজনাতে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে —ছবির যথাস্থানে স্থাপনা সম্বন্ধে তার নিরতিশয় ভাবনাতুর। ভিনসেণ্ট বিচলি হয়ে পড়ল। তার তর সইছে না। দেয়ালে গায়ে পেরেক লাগিয়ে মাপ জোখ না নিয়ে তাড়াতাড়ি বসিয়ে দিল। উরসুলা তার দিবে চেয়ে প্রশান্ত, হৃদ্যতার ভংগীতে হাসল।

"এইখানে ঠুকতে হবে। তড়বড়ে কোথাকার। দেখি, আমার হাতে দাও এবার।"

উরসুলা তার যুগল বাহু মাথার উপর দিয়ে ওপরে ওঠাল। দেহস্তনিমার প্রতিটি পেলব পেশীকে সঞ্চালিত করে কাজ করে

[illegible]। কাজ করতে তার অঙ্গ সঞ্চালন খুব দ্রুত হয়, তখন তাকে দেখতে বেশ কমনীয় লাগে। ভিনসেণ্ট চেয়েছিল বাতির এই অনুজ্জ্বল, প্রভাহীন আলোকে তার নিজের বাহুর উপরে উরসুলাকে একবার তুলে ধরে এবং একটা সুনিশ্চিত দৃঢ় আলিঙ্গনের দ্বারা এ সমস্ত যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপারগুলির নিষ্পত্তি করে দেয়। কিন্তু যদিও এই অন্ধকারের মধ্যে উরসুলা বার বার তাকে স্পর্শ করেছে, তবু একবারের জন্যও আলিঙ্গনের অনুকূল অবস্থায় তাকে ধরা যাচ্ছে না। সে যখন ছবির লেখাগুলি পড়তে লাগল, ভিনসেণ্ট তখন বাতিটা উঁচু করে ধরল। উরসুলা খুশি হয়ে হাততালি দিয়ে উঠল, গোড়ালির উপর দাঁড়িয়ে দেহ দোলাতে লাগল। তার চঞ্চল দেহ-সঞ্চালনের জন্যে ভিনসেণ্ট তাকে কায়দা করে ধরবার সুযোগই পেল না।

উরসুলা জিজ্ঞাসা করল, আমার ছবির শিল্পী আমার একজন বন্ধুও হয়ে গেল, তাই না? একজন শিল্পীকে জানতে আমি সব সময়েই চেয়েছি।"

ভিনসেণ্ট এর উত্তরে মোলায়েম করে কিছু বলতে চেষ্টা করল—এমন কিছু বলতে চেষ্টা করল, যা বললে তার বিয়ের প্রস্তাব তোলার পথ সহজ হয়ে আসবে। উরসুলা আধো-ছায়ায় তার মুখখানা ভিনসেণ্টের দিকে ঘুরিয়ে আনল। বাতির আলোতে তার মুখে বিন্দু বিন্দু আলোর দাগ পড়েছে। তার মুখখানা যেন আঁধারের ফ্রেমে বাঁধা একখানি ছবির মতো ফুটে উঠেছে। মসৃণ চামড়ার অনুজ্জ্বল শুভ্রতা ভেদ করেই যেন তার রক্তবর্ণ, রসপুষ্ট ঠোঁট দুটি জেগে রয়েছে—দেখে ভিনসেণ্টের মনের মধ্যে এমন একটা ভাব আন্দোলিত হয়ে উঠল যাকে ভাষায় রূপ দেওয়া সম্ভব নয়।

খানিকক্ষণ নীরবে কাটল। কিন্তু এই নীরবতার মধ্যেই যেন কত অর্থ নিহিত রয়েছে। উরসুলার সান্নিধ্য ভিনসেণ্ট এমনি-ভাবে অনুভব করছে যেন উরসুলা তার দিকে আপনাকে প্রসারিত করে দিয়েছে, যেন ভিন-সেণ্টের মুখে প্রেমের অর্থহীন প্রলাপবাক্য-গুলি উচ্চারিত হওয়ার প্রতীক্ষায় তার দিকে মুখ বাড়িয়ে রেখেছে। ভিনসেণ্ট জিব দিয়ে বারকয়েক তার ঠোঁট দুটি ভিজিয়ে নিল। উরসুলা মাথা ঘুরিয়ে নিল; কাঁধ একটুখানি উঁচু করে ভিনসেণ্টের চোখ দুটির মধ্যে দৃষ্টি ডুবিয়ে কি দেখল; তারপর ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল।

সুযোগ হারিয়ে যাচ্ছে এই ভয়ে অভিভূত হয়ে ভিনসেণ্টও তার পিছু পিছু দৌড় দিল। উরসুলা আপেল গাছের তলায় গিয়ে মুহূর্তের জন্য থামল।

"উরসুলা, একটিবার কথা শোনো।"

উরসুলা ফিরল। একটু কম্পিতভাবে তার দিকে তাকাল। আকাশে তুষারাবরণে তারাগুলি অনুজ্জ্বল—যেন ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে। অন্ধকার গভীর কালো রাত। ভিনসেণ্ট বাতিটা সেইখানেই ফেলে এসেছে। রান্নাঘরের জানলা দিয়ে একটুখানি অনুজ্জ্বল আলো যা আসছে সেইটুকুই সম্বল। উরসুলার চূর্ণ অলকের মদির গন্ধ তার নাসারন্ধ্রে অকৃপণভাবেই প্রবেশ করছে। উরসুলা রেশমী স্কার্ফটা কাঁধে শক্ত করে টেনে দিল এবং হাতদুটি বুকের উপরে 'ক্রসে'র আকারে স্থাপন করল।

ভিনসেণ্ট বলল, "তোমার ঠাণ্ডা লাগছে?"

"হ্যাঁ। এস, ভিতরে চলে যাই।"

"না। একটিবার শোনো। আমি......"

সে উরসুলার পথ রোধ করে শক্ত হয়ে দাঁড়াল।

উরসুলা তার আনত চিবুক স্কার্ফের উষ্ণতার মধ্যে ডুবিয়ে দিল। তারপর বিস্ফারিত বিস্মিত চোখ তুলে তার দিকে তাকাল। "ওকি, মঁসিয়ে ভ্যান গোঘ্! আমার ভয় করছে, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না যে!"

"আমি তোমার সঙ্গে মাত্র কথা বলতে চেয়েছি। শোনো—আমি...কথা মানে..."

"দোহাই তোমার এখন কিছু বলো না। আমার ভীষণ ভয় করছে।"

"কিন্তু তোমাদের জানা দরকার। আজ থেকে আমার চাকুরীতে উন্নতি হয়েছে। আমাকে লিথোগ্রাফের ঘরে দিয়েছে। এক বছরে আমার এই নিয়ে দুবার পদোন্নতি হল।"

উরসুলা এক পা পিছনে সরে গিয়ে স্কার্ফটা খুলে ফেলল এবং দৃঢ়পদে দাঁড়াল। রাত্রিকাল। ঠাণ্ডা নিবারণযোগ্য দেহাবরণ ছাড়াও তার উষ্ণতা অব্যাহত আছে।

"জিজ্ঞাসা করি মঁসিয়ে ভ্যান গোঘ্, কি আপনি বলতে চাইছেন, তাই বলুন না।"

তার স্বরে নিষ্প্রাণ আবেগহীনতা অনুভব করে ভিনসেণ্ট নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বলল, 'হায় আমি এমনি অকর্মা!' তার মধ্যে এতক্ষণ যে ভাবসম্বেগ ছিল, সহসা তা মন্দীভূত হয়ে এল। সে নিজের মধ্যে স্থৈর্য ও ধৈর্যের ভাব অনুভব করল। মনে মনে সে কতকগুলি স্বর আউড়ে নিয়ে সব চাইতে মিষ্টি লাগল যেটা, সেটাকে অবলম্বন করেই বলল।

"শোন উরসুলা, আমি তোমাকে এমন একটা কিছু বলতে চাচ্ছি যা তুমি আগে থেকেই জান। আমি বলতে চাচ্ছি, আমি তোমাকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসি। তুমি যদি আমার স্ত্রী হও, তবেই আমি সুখী হতে পারি।"

তার এই আচমকা প্রেমনিবেদনে উরসুলা কেমন চমকে উঠলো ভিনসেণ্ট তা লক্ষ্য করল। তাকে বাহু বেষ্টনে আবদ্ধ করা উচিত হবে কি না ভিনসেণ্ট তা স্থির করতে পারল না।

"আপনার স্ত্রী হব? উরসুলার স্বর কয়েক পরদা চড়ে গেল, "শুনুন মঁসিয়ে ভ্যান গোঘ্, সে হয় না—অসম্ভব।"

ভিনসেণ্ট তার দিকে এমনি ভাবে তাকাল যেন পাহাড়ের খাদ থেকে সে-দৃষ্টি উৎসারিত হচ্ছে। অন্ধকারেও তার চোখদুটি উরসুলা স্পষ্ট দেখতে পেল। "আমি বুঝতে পারছি সে আমারি দোষ......"

"আমি এক বৎসর থেকে বাগদত্তা। আপনি যে তা জানেন না সেইটেই আশ্চর্য!"

ভিনসেণ্ট কতক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকল, বুঝতেই পারল না; তার চিন্তা তার অনুভূতি সবই যেন তাকে ছেড়ে গেছে। সে শুধু জড়ের মতো উচ্চারণ করল, "কে সে?"

"ও, আমার বাগদত্তের সঙ্গে আপনার বুঝি কখনো দেখা হয় নি? আপনি আসবার আগে আপনার ঘরটিতে সে-ই তো থাকত। আমি ভেবেছিলাম আপনি বুঝি জানেন।"

"আমি কি করে জানব?"

উরসুলা পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে উঁকি মেরে রান্নাঘরের দিকে তাকাল। "আমি ভেবে-ছিলাম কি—আমি ভেবেছিলাম কেউ না কেউ একথা আপনাকে জানিয়ে রেখেছে।"

"তুমি যখন জান আমি তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি, তখন সারা বৎসর ধরে আমার কাছে ও-কথা কেন গোপন করে রেখেছিলে?" তার স্বর এখন একেবারে দ্বিধাসঙ্কোচহীন। অকম্পিত।

"আপনি আমার প্রেমে পড়েছেন সে দোষ কি আমার? আমি আপনার বন্ধু হতেই চেয়েছি মাত্র!"

"আমি যতদিন থেকে এ বাড়িতে আছি, এর মধ্যে সে কি তোমাকে দেখতে এখানে এসেছে কখনো?"

"না, আসেনি। সে এখন ওয়েলসে আছে। তবে আসবে। গ্রীষ্মের ছুটিটা এখানে আমার সঙ্গে কাটিয়ে যাবে সে।"

"এক বৎসরের ওপর হল তুমি তাকে দেখনি, তাই বললে না? তবে তো তুমি তাকে ভুলেই গিয়েছ। এখন তুমি যাকে ভালবাসছ সে তো আমি।"

ভিনসেণ্ট তার জ্ঞানগম্যি পাত্রাপাত্রবোধ হাওয়ায় বিসর্জন দিয়েছে। উরসুলাকে নিজের দিকে সবলে আকর্ষণ করল। উরসুলা মুখ ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা করল। কিন্তু ভিনসেণ্ট তাকে জোর করে ধরে তার মুখচুম্বন করল। উরসুলার ওষ্ঠের লালিমা, মুখের রস-মাধুর্য তার কেশের সুবাস ভিনসেণ্ট এ সমস্তরই আস্বাদ পেল; তার প্রগাঢ় প্রেম আজ উদ্দাম হয়ে জেগে উঠেছে।

"তুমি তাকে ভালবেসো না উরসুলা। আমি দেব না তোমায় তাকে ভালবাসতে। তুমি আমারি স্ত্রী হবে। তোমাকে হারানোর বেদনা আমি সইতেই পারব না। যতদিন পর্যন্ত তুমি তাকে ভুলে না যাবে এবং আমাকে বিয়ে না করবে, ততদিন আমি যে নিরস্ত হতে পারিনে উরসুলা।"

উরসুলা এবার জোরে হেসে উঠল, তোমাকে বিয়ে করব? এজগতে যতজন আমাকে ভালবেসে ফেলবে তাদের প্রত্যেককেই কি বিয়ে করতে হবে আমায়? নাও, হয়েছে, বার ছাড় আমায়। শুনছ, ছাড় বলছি, নইলে চেঁচিয়ে লোক জড়ো করব।"

সে সবলে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে অন্ধকার পথে রুদ্ধশ্বাসে দৌড়োতে লাগল। সিঁড়ি অবধি পেঁছে গিয়ে, থেমে, একবার ফিরল; তারপর মৃদু চাপা কণ্ঠে শুধু বললে, লাল-মাথা বেয়াকুফ!" কথাটা তীরের মতো তাকে এসে সজোরে আঘাত করল।

৪

পরের দিন রাত পোহাল; কিন্তু কেউ তাকে ডেকে জাগাল না। বিছানা থেকে সে ক্লান্ত আলস্যভরে দেহ-ভার টেনে তুলল। মুখের চারপাশে ক্ষুর চালিয়ে চালিয়ে ক্ষৌরকার্য শেষ করল। প্রাতরাশ খাওয়ার সময়ে আজ আর উরসুলা কাছে এলো না। ভিনসেণ্ট তার পর গুপিলদের দোকানের উদ্দেশে শহরের দক্ষিণাভিমুখে রওয়ানা হল। পথ চলতে চলতে চলমান লোকজনদের দেখল। গতকাল যাদের দেখেছিল আজও তাদের দেখল। তারা যেন আগেকার লোকই নয়—তারা একেবারে বদলে গিয়েছে বলে তার বোধ হল। তারা সব যেন নিঃসঙ্গ আত্মা; নিষ্ফল খাটুনির কাজে তারা ত্রস্তপদে ছুটে চলেছে। পথের পাশে লেবারনাম ফুলের কলিগুলো পাপড়ি মেলেছে; রাস্তার দুধারে বাদাম গাছ সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে—এসব কিছুই আজ ভিনসেণ্টের চোখে পড়ল না। গতকালের চেয়ে আজ সূর্যের কিরণও অধিক তেজালো। তাও সে জানতেই পারল না।

সারাদিনে সে কুড়িখানা ছবির কপি বিক্রি করল। সেগুলো ইনগ্রেসের অনুকরণে 'ভেনাস আ্যানাডায়োমেনি'র রঙে আঁকা। এই ছবিগুলি বিক্রি হওয়াতে দোকান-দারের প্রচুর লাভ হল। কিন্তু ছবি বেচে মুনাফা করার যে আনন্দ, তার কোনো অনুভূতিই আজ ভিনসেণ্টের মনে সাড়া দিল না। ছবি যারা কিনতে আসছে তাদের সঙ্গে মেজাজ ঠিক রেখে কথা বলার ধৈর্যটুকুও তার আজ উবে গিয়েছে। তারা কিছু বোঝে না। কেবল তারা আর্টের ভালোমন্দ জ্ঞান থেকে যদি বঞ্চিত হত, তবু না হয় সহ্য করা যেত; ভালো আর্ট ফেলে যা নাকি মেকি, সস্তা আর রংচঙে সেগুলি কিনবার দিকেই তাদের ঝোঁক বেশি। তাদের জ্ঞানবুদ্ধিতে সেগুলিই নাকি উত্তম।

সহকর্মীরা তাকে কোনোদিন হাসতে দেখেনি। কিন্তু ভিনসেণ্ট তাদের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াবার জন্য খোশমেজাজ দেখাতে কখনো কসুর করেনি। আজ তাকে দেখে একজন সহকর্মী অপরজনকে ডেকে বলল, "ভ্যান গোখ্ বংশের গুণবান ব্যক্তিটির আজ হল কি হে? তোমার কি মনে হয়?"

"আমার বোধ হচ্ছে আজ সকালে বিছানায় উলটো দিক থেকে তিনি উঠে এসেছেন।"

"না না তা নয়। সুদিন এসেছে তার। তবে অনেকগুলো খোশখবর একই সময়ে এসে উপস্থিত হয়েছে কিনা তাই তিনি বিব্রত হয়ে পড়েছেন। তাঁর কাকা ভিনসেণ্ট ভ্যান গোখ্ প্যারিসে, বার্লিনে, ব্রুসেলসে, হেগ-এ আর আমস্টারডামে গুপিলদের যত ছবির গ্যালারি আছে সবগুলির মালিক তা জানো তো? সেই বুড়ো রোগশয্যায় পড়েছে। তাঁর তো কোনো সন্তানাদি নেই। তাই সকলেই বলাবলি করছে কারবারের অর্ধেক তিনি একেই লিখেপড়ে দেবেন।"

"কারো কারো ভাগ্য এমনি করেই খুলে যায়।"

"শুধু তাই নয় হে, আরো আছে। তার আরেক কাকা, হেণ্ডরিক ভ্যান গোখ্, ব্রুসেলস আর আমস্টারডামের বড়ো বড়ো ছবির দোকানের মালিক। আরো এক কাকা, কর্নেলিয়াস ভ্যান গোখ্ হল্যাণ্ডের সবচেয়ে বড়ো যে ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান, তারই বড়োকর্তা। আর একথা কে না জানে যে, সারা ইউরোপে ছবির সবচেয়ে বড়ো ব্যবসাদার এই ভ্যান গোখ্ পরিবার। আজ ওইখানে আমাদেরই পাশের ঘরে, মাথায় লাল চুল যে বন্ধুটি বসে কাজ করছেন, একদিন দেখবে সারা কণ্টিনেণ্টাল আর্ট সত্যি সত্যি এঁরই হাতে পরিচালিত হবে।"

সেই রাত্রে ভিনসেণ্ট লয়ার পরিবারের ভোজন-কক্ষে গিয়ে শুনতে পেল উরসুলা আর তার মা চাপাগলায় কি-সব বলাবলি করছে। সে এসেছে টের পেয়েই তারা থেমে
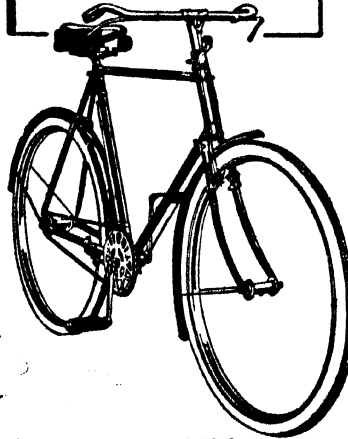
গেল, তাদের আলাপ মাঝপথেই থেমে রইল।

উরস্‌লা দ্রুত পদে রান্নাঘরে চলে গেল। মাদাম লয়ার চোখে মুখে ঔৎসুক্য ও কৌতূহল মাখিয়ে তাকে এসে 'গুড্ ইভেনিং' জানালেন।

অত বড় খাবারের টেবিলে ভিনসেণ্ট আজ একা বসেই খাওয়া-দাওয়া করল। উরস্‌লার এই আঘাত তাকে বিচলিত করলেও পরাস্ত করতে পারল না। উরস্‌লার "না" উত্তর সে কিছুতেই মেনে নেবে না। সে তার মন থেকে তৃতীয় ব্যক্তিটিকে অপসারিত করবেই করবে।

উরস্‌লার সঙ্গে তার যে দূরত্বের ব্যবধান আজ সৃষ্টি হয়েছে, এই সেদিনও—সপ্তাহখানেক আগেও তা ছিল না। সেদিনও তাকে সে নিজের কাছে আটকে রেখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলতে পারত; তার সান্নিধ্য উপভোগ করতে পারত। আজ এক সপ্তাহ ধরে ভিনসেণ্ট আহার নিদ্রা প্রায় ছেড়েই দিয়েছে। আহার নিদ্রার নিস্পৃহা থেকে তার স্নায়ুদৌর্বল্য দেখা দিয়েছে। দোকানে তার বিক্রির পরিমাণ অনেক কমে গেছে। তার চোখ দুটি থেকে সবুজ আভাটুকু অন্তর্হিত হয়েছে, রয়েছে শুধু বেদনাবিধুর একটুখানি ম্লান নীলিমা। আগেই সে কথা বলত কম। এখন এমন হয়েছে যে, কিছু বলতে গেলে, ভাষাই জোগায় না, তাই সে খেই হারিয়ে যায়।

রবিবারের দুপুরের খাওয়া বেশ জাঁকজমক করে হয়। খাওয়ার শেষে উরস্‌লাকে বাগানের দিকে যেতে দেখে ভিনসেণ্টও তার অনুসরণ করল।

বলল, "মাদ্‌মোয়াজেল উরস্‌লা, সে রাতে তোমাকে খুব চমকে দিয়েছিলাম, না?

উরস্‌লা বড় বড় চোখ করে তার দিকে তাকালো। সে যে এখনো তার সঙ্গ ছাড়েনি, তারই জন্য সে-চোখে বিস্ময় জেগেছে।

"ও, সেই কথা। তা তাতে হয়েছে কি। সে আর এমন কি গুরুতর ঘটনা। ভুলে গেলেই চলে। ভুলে যান না কেন?"

"তোমার প্রতি যে হঠকারিতা আমি দেখিয়েছি, সেটা আমি ভুলেই যেতে চাই। কিন্তু যা আমি বলেছি সে সব তো মিথ্যে নয়।"

সে উরস্‌লার দিকে আরো এক পা এগিয়ে এল। উরস্‌লা এক পা সরে দাঁড়াল। বলল, "আবার ও সব কথা কেন বলছেন আপনি। আগাগোড়া সব ঘটনাই আমি বেমালুম ভুলে গিয়েছি যে।" উরস্‌লা তার দিকে পিছন করে রাস্তায় পা বাড়ালো। সেও দ্রুতপদে এগিয়ে এল উরস্‌লার কাছে।

"আমার কথাটা আবার বলতেই হবে। উরস্‌লা, তোমাকে আমি যে কি পরিমাণ ভালবাসি, তুমি তা বুঝতে পারবে না। তুমি জান না উরস্‌লা এ সাতটা দিন আমি কি করে কাটিয়েছি, কত কষ্ট পেয়েছি। আমার কাছ থেকে কেন তুমি পালিয়ে বেড়াচ্ছ?"

"নিন, ভিতরে চলুন। মা হয়তো এক্ষুনি ডেকে বসবেন।"

"এই তৃতীয় ব্যক্তিটিকে যে ভালবাস বলে তুমি বলছ, এ কথা সত্যি হতেই পারে না। যদি তুমি সত্যি সত্যি ভালবাসতে, আমি তা হলে তোমার চোখ দেখেই তা বুঝতে পারতাম। তোমার চোখেই তা ধরা পড়ত।"

"এখানে আর থাকতে পারছি নে। সময় নেই। এখন যেতে হয়। ছুটিতে আপনি কবে না বাড়ি যাবেন বলছিলেন?"

ভিনসেণ্ট ধরা গলায় বললে, "জুলাই মাসে।"

"কি ভাগ্যি আমার! আমার বাগদত্তও ঠিক জুলাই মাসে আসছে এখানে। আমার সঙ্গে ছুটি কাটাবে। আপনার ঘরটাও আমাদের ফিরে পাওয়া দরকার। এই ঘরেই আগে সে থাকত কি না।"

"আমি তার হাতে তোমাকে ছেড়ে দেব না—কক্‌খনো না, এ তুমি জেনে রাখ উরস্‌লা।"

"এ ধরণের কথাবার্তা আপনার বন্ধ করতেই হবে। যদি না করেন, মা বলে দিয়েছেন আপনাকে অন্য কোথাও জায়গা দেখতে হবে।"

এর পরের দু মাস সে উরস্‌লার মন পাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে করতে কাটিয়েছিল। তার আগেকার চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি সবই ফিরে এসেছিল তখন। যতক্ষণ উরস্‌লার সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত থাকত, ততক্ষণ সম্পূর্ণ আত্মসমাহিত হয়ে থাকত সে। একা একা থাকত। উরস্‌লার ধ্যানে নিমগ্ন মধুর মুহূর্তগুলি আর কেউ যাতে নষ্ট করে দিতে না পারে। চাকুরিস্থলের সহকর্মীদের সহিত তার প্রণয়-ভাব আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। ক্রেতাদের সঙ্গেও তার হৃদ্যতার ভাব অন্তর্হিত হয়েছিল। উরস্‌লার প্রতি প্রেমোদ্‌গমের স্পর্শ পেয়ে যে অজ্ঞাত জগৎ তার সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়েছিল, শীঘ্রই আবার তা অর্গলবদ্ধ হয়ে গেল। বাল্য বয়সে জুণ্ডার্টে যখন সে পিতামাতার নিকট থাকত, তখন থেকেই সে সারাক্ষণ চিন্তাতুর আর বিমর্ষ হয়ে থাকত। এখনও সে আবার অবিকল সেই রকমই হয়ে গেল।

জুলাই মাস এসে গেল, সঙ্গে সঙ্গে তার ছুটিও এগিয়ে এলো। মাত্র দু সপ্তাহের জন্য লণ্ডন ছেড়ে অন্যত্র যাওয়ার তার ইচ্ছা ছিল না। সে যতদিন এই ঘরে থাকবে, উরস্‌লা ততদিন অন্য কাউকে ভালবাসতে পারবে না, এই রকম একটা ধারণা, তার মনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল।

সে উরস্‌লাদের বসবার ঘরে গিয়ে ঢুকল। উরস্‌লা ও তার মা সে ঘরে উপবিষ্ট ছিলেন। তাকে দেখে তাঁরা দুজনে অর্থপূর্ণভাবে দৃষ্টি বিনিময় করলেন।

সে বলল, "শুনুন মাদাম লয়ার। আমি কেবল একখানা ব্যাগ মাত্র সঙ্গে নেব, আর সবই যেমন আছে তেমনি আমার ঘরে রেখে যাচ্ছি। আমি দু সপ্তাহের জন্য বাইরে যাব। এই নিন দু সপ্তাহের ঘর-ভাড়া।"

মাদাম বললেন, "মঁসিয়ে ভ্যান গোঘ্, তুমি বরং তোমার সব কিছু জিনিসপত্র নিয়েই চলে যাও, সেইটেই ভাল হবে।"

"কেন? এ কথা কেন বলছেন?"

"সোমবার সকাল থেকে তোমার ঘর খালি করে দিতে হবে। অন্য লোক আসবে এখানে। কাজেই তুমি অন্যত্র গিয়ে থাক। তাই চাইছি আমরা।"

"আমরা?"

সে উরস্‌লার দিকে মুখ ফেরাল; ভুরুর নীচেকার খাদে-বসা চোখ দুটি থেকে তার দিকে গভীরভাবে তাকাল। তার এই দৃষ্টিতে কোনো আবেদন ছিল না, ছিল শুধু একটা প্রশ্ন।

"হাঁ, আমরা।" মা উত্তর দিলেন। "আমার মেয়ের ভাবী স্বামী চিঠি লিখে জানিয়েছে তুমি এখান থেকে চলে চাও এই তার ইচ্ছা। আর শোনো মঁসিয়ে ভ্যান গোঘ্, এখন বুঝতে পারছি, তুমি যদি এখানে আদৌ না আসতে, তা হলেই ভাল হত।"

(ক্রমশ)

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান সচিব হইয়া ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় যে সকল কথা শুনাইয়াছিলেন, তাহার মধ্যে মৎস্য বিভাগ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন—আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে মাছ কেবল মানুষের খাদ্য নহে, পরন্তু যে মাছ অতিরিক্ত থাকে, তাহাকে পশু খাদ্য করিলে গো-মহিষের দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়, আর তাহা সারে পরিণত করা অবশ্যই যায়। তিনি মানুষের প্রয়োজনাতিরিক্ত মাছের কথাই অবশ্য বলিয়াছেন। তিনি মৎস্য বিভাগকে কৃষির সহিত সম্পর্কশূন্য একটি স্বতন্ত্র বিভাগে পরিণত করিয়াছেন। মানুষের যে মৎস্য খাদ্য হিসাবে প্রয়োজন, তাহা যে পশ্চিম বঙ্গের লোক পাইতেছে না, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আমেরিকা সরকার মৎস্য বৃদ্ধির জন্য যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়া সাফল্য লাভ করিয়াছেন, পশ্চিম বঙ্গ সরকার সে সকল অবলম্বন করেন নাই। কাজেই মৎস্য পূর্ববৎ দুর্মূল্য—সুতরাং দুষ্প্রাপ্য। সম্প্রতি পাকিস্থান সরকার সিদ্ধাত করিয়াছেন—তথা হইতে যে মাছ রপ্তানি হইবে, তাহার উপর মণ প্রতি ৫ টাকা শুল্ক আদায় করা হইবে। এই শুল্কের ফলে পশ্চিমবঙ্গে মাছের মূল্য কত ৫ টাকা বাড়িবে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

কিন্তু মানুষ অপূর্ণ আহারে থাকিলেও যে হরিণঘাটায় সরকার লোককে উদ্বাস্তু করিয়া প্রায় কোটি টাকা ব্যয় (বা অপব্যয়) করিয়াছেন, তথায় প্রধান সচিবের উক্তি কার্যে পরিণত করিবার চেষ্টা হইতেছে। নবগঠিত প্রচার বিভাগের প্রথম অবদানে প্রকাশ— তথায় মাছকে পশুপক্ষীর খাদ্যে পরিণত করিবার প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে—এমন কি মাছের ডানা প্রভৃতি হইতে আঠা প্রস্তুত করিবার কৌশলও আবিষ্কৃত হইয়াছে। মানুষের আবশ্যক মাছ যোগাইবার চেষ্টা কিন্তু সফল হয় নাই। মেদিনীপুরের কাঁথি অঞ্চলে ট্রলারে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরিবার কল্পনা ট্রলারের অভাবে কার্যে পরিণত করা সম্ভব হয় নাই। তবে পশ্চিম বঙ্গ সরকার আশা ছাড়েন নাই, তাঁহারা আমেরিকা হইতে ট্রলার আনিবার জন্য দালাল লাগাইয়াছেন। আমরা শুনিয়াছি, বোম্বাই হইতে বড় বড় নৌকা আমদানীর চেষ্টাও হইয়াছিল, কিন্তু চেষ্টা অতল তলে ডুবিয়া নষ্ট হইয়াছে। অবশ্য বিধান বাবু সে সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ দিতে পারিবেন। বাঙলার নৌকায় এত কাল যে কাজ হইয়াছে, এখন আর তাহাও হয় না। কারণ, এখন দপ্তরে যেমন চাকুরীয়ার সংখ্যা বাড়িয়াছে—সমুদ্রের জলে তেমনই হাঙ্গরের সংখ্যা বাড়িয়াছে। ধীবরগণ নাকি একবার জাল ফেলিয়াই ১৮টি হাঙ্গর ধরিয়াছে। একবার জাল ফেলিয়া ১৮টি হাঙ্গর ধরা যদি সম্ভব হয়, তবে কি হলওয়েল বর্ণিত "অন্ধকূপে"—১৮ বর্গ ফিট গারদ ঘরে ১৪৬ জন ইংরেজ নরনারীকে আটক করাও সম্ভব হইতে পারে না?

গো-মহিষের খাদ্যের কথা বলিতে পারি না বটে, কিন্তু হাঁস মুর্গী যে মাছ খায় এবং মাছের কাঁটায় যে আঠা প্রস্তুত হয়, ইহা সর্বজনবিদিত; কাজেই কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের মত গৌরবজনক নহে।

গত ৩০শে ফাল্গুন—সংক্রান্তির দিন ভারত সরকারের পরিকল্পনানুসারে "মহারাজা" জাহাজ পূর্ব বঙ্গ হইতে আগত একশত ৩২টি পরিবারের ৫ শত লোককে লইয়া কলিকাতা হইতে আন্দামান যাত্রা করিয়াছে। বিস্ময়ের বিষয় এই যে—ইহারা যে হিন্দু, তাহার উল্লেখ কোথাও নাই। সে কথার উল্লেখ কি নিষিদ্ধ? যাত্রার পূর্বে আশ্রয় শিবিরে পুনর্বসতি সচিব তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া দেশত্যাগকে অভিযান বলিয়া অভিহিত করিতেও দ্বিধানুভব করেন নাই। যাত্রার পূর্ব দিন রাত্রিকালে প্রধান সচিব জাহাজে তাঁহাদিগকে দর্শন দিয়াছিলেন। যদিও ভারত সরকারের পুনর্বসতি মন্ত্রী শ্রীমোহনলাল শাকসেনা বলিয়াছেন, আন্দামান দ্বীপ অতঃপর হিন্দু পুরাণ-প্রসিদ্ধ বীর হনুমানের নামে হনুমান দ্বীপ নামে অভিহিত হইবে। তথাপি —কেন জানি না—বিধানবাবু বলিয়াছিলেন, যেহেতু সুভাষচন্দ্র প্রথমে ঐ দ্বীপে স্বাধীন ভারতের বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছিলেন, সেই জন্য উহা অতঃপর সুভাষ দ্বীপ নামে অভিহিত হইবে! বিধানবাবু বলিয়াছিলেন,, স্বাধীন ভারতে কারাগার ভাঙ্গিয়া ফেলা হইতেছে! যাত্রীরা বিদেশে যাইতেছেন না—ভারত রাষ্ট্রের এক অংশ হইতে অন্য অংশে যাইতেছেন মাত্র। কিন্তু যদি আন্দামান দ্বীপ পশ্চিম বঙ্গ সরকারের শাসনাধীন করিয়া তথা হইতে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের ব্যবস্থা পরিষদে প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা করা হইত, তবেই একথা শোভন হইত। পশ্চিম বঙ্গ সরকার ভারত সরকারের নিকট দাবী করিয়া বিহারের বঙ্গ ভাষাভাষী জিলা কয়টিতেও এই সকল বাঙ্গালীকে বাসস্থান দিতে পারেন নাই—ইহাও অস্বীকার করা যায় না।

যেদিন সচিব নিকুঞ্জবিহারী মাইতি যাত্রীদিগকে দেখিতে গমন করেন, সে দিনের ২টি ঘটনা আমরা বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করি—

(১) একজন যাত্রী বলেন—অতীতের অভিজ্ঞতায় তাঁহারা সকল কাজেই সন্দেহানুভব করেন—তাঁহারা আন্দামান সমৃদ্ধিশালী করিবার পরে স্ব স্ব অধিকারে বঞ্চিত বা অত্যধিক রাজস্ব দিতে বাধ্য হইবেন না ত?

(২) একজন অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে বলেন, স্বদেশ ত্যাগ করিয়া যাইতে তাঁহাদিগের হৃদয় বেদনায় মুহ্যমান। যে বাঙলায় তাঁহারা পুরুষানুক্রমে বাস করিয়া আসিয়াছেন—সে বাঙলা সম্বন্ধে তাঁহারা মনে করিয়া আসিয়াছেন—

"পিতামহদের অস্থিমজ্জা যত—
এই ধূলি সাথে রয়েছে মিশ্রিত;
এই ধূলি হতে হইবে উত্থিত
ভাবী কালে যত ভবিষ্য সন্তান"—

আজ স্বাধীন ভারতে স্বদেশে তাঁহাদিগের স্থান হইল না। তাঁহারা বোধ হয় আর বাঙলার পুণ্য ভূমি দেখিতেও পাইবে না—তাই তাঁহার অনুরোধ, যাত্রার পূর্বে তাঁহাদিগের একবার গঙ্গাস্নানের ও কালীঘাটে কালী দর্শনের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হউক।

বক্তার হৃদয়ের বেদনা সচিবরা অনুভব করিতে পারিয়াছেন কিনা, জানি না; তবে নিকুঞ্জবাবু প্রথম বক্তাকে বলেন—ভারত সরকারের সদুদ্দেশ্যে সন্দেহ পোষণ করা অসঙ্গত কার্য; দ্বিতীয় বক্তাকে তিনি গঙ্গাস্নানের ও কালী


আমেরিকান মডেল

বক্স ক্যামেরা

শক্তিশালী লেন্স সমন্বিত এমন কি শিক্ষার্থিগণও সহজে ব্যবহার করিতে পারেন। অতি উত্তম ফটো তোলা যায়। ১২০নং ফিল্মে ২¼" × ৩¼" আকারের অত্যুত্তম ফটো তোলা যায়। সম্পূর্ণ সন্তুষ্টিলাভের গ্যারাণ্টী। আজই একটির জন্য অর্ডার দিন। মূল্য ১৮৸৹ আনা। অতিরিক্ত ব্যয় ১৸৹ টাকা।

বেঙ্গল ক্যামেরা হাউস,
(ডি ডব্লিউ সি) পি ও বক্স ২১,
আলীগড়, ইউ পি।

র্পনের ব্যবস্থা করিয়া দিতে প্রতিশ্রুতি প্রকাশ করিয়াছিলেন।

সকল আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া পাকিস্থান সিদ্ধান্ত করিয়াছে—পাকিস্থান ইসলাম রাষ্ট্রই হইবে। বলা হইয়াছে বটে যে, সরিয়ৎ সম্মত ব্যবস্থা কেবল মুসলমান অর্থাৎ পাকিস্থানের সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসীদিগের জন্য, কিন্তু তাহাতে যে সংখ্যালঘিষ্ঠগণ নির্ভয় হইবেন বা নির্বিবাদে আপনাদিগের আচার ও দেবার্চনা করিতে পারিবেন, এমন মনে করা যায় না।

সম্প্রতি ঢাকায় সংঘটিত একটি ঘটনার উল্লেখ আমরা করিতেছি। শ্রীচিন্তাহরণ দাস ঢাকা শহরে লালবাগ থানার এলাকায় সিদ্ধেশ্বরীতে বাস করেন। তিনি ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে যখন কার্যব্যপদেশে বরিশালে ছিলেন, তখন ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্র রাজা মিঞা ওরফে আবদুল খয়ের মফিকুজ্জমান তাহার ভৃত্য শেখ নূরুর সহিত একযোগে চিন্তাহরণের চতুর্দশ বর্ষীয়া কন্যাকে বলপূর্বক লইয়া গিয়াছে। চিন্তাহরণের অনুপস্থিতিতে তাঁহার আত্মীয় রাধারমণ সেন ৩রা ফেব্রুয়ারী লালবাগ থানায় এজাহার দিয়াছিলেন এবং টেলিগ্রাম পাইয়া চিন্তাহরণ স্বয়ং ঢাকায় ফিরিয়া লিখিত আবেদন—লালবাগ থানার দারোগার নিকট পেশ করেন। তিনি ঢাকার অতিরিক্ত পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও ঢাকার পুলিশ ইনস্পেক্টরকেও ঘটনার বিষয় জানাইয়াছেন। তদ্ভিন্ন তিনি বহু সম্ভ্রান্ত মুসলমানকেও ঘটনার বিষয় জানাইয়া প্রতিকার প্রার্থনা করেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই। তিনি বলিয়াছেন—

(১) যাহাদিগের বিরুদ্ধে তিনি অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন, তাহারা স্বচ্ছন্দে শহরে বেড়াইতেছে।

(২) রাজা মিঞা মেডিক্যাল বিদ্যালয়ে যাইতেছে;

(৩) রাজা মিঞার পিতা মামলায় সাক্ষ্য নষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং চিন্তাহরণকে ও তাঁহার গৃহস্থদিগকে ভয় দেখাইতেছে।

চিন্তাহরণ প্রার্থনা করেন—অভিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে গ্রেপ্তারের জন্য ওয়ারেণ্ট জারী করা হউক এবং বালিকাটির উদ্ধার সাধন জন্য অনুসন্ধানের আদেশ করা হউক। কিন্তু অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে রিপোর্ট দিতে বলিয়াছেন—অভিযোগে পুলিশের সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ কথা থাকায় ঘটনা যেন কোন প্রবীণ পুলিশ কর্মচারীর দ্বারা তদন্ত করা হয়।

পাকিস্থান কংগ্রেস কমিটির সভাপতি, ঢাকা জেলা সংখ্যালঘিষ্ঠ সভার সম্পাদক প্রভৃতিকেও এই বিষয় জানান হইয়াছে। পূর্বে পাকিস্থানের রাজধানী ঢাকা শহরে যে এইরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছে এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ভুক্ত আবেদনকারী কোনরূপ প্রতিকার পাইতেছেন না—তাহাতে কি মনে করা যায়? এই ঘটনায় পূর্ব পাকিস্থানে হিন্দুদিগের মনে আশঙ্কার উদ্ভব যে অনিবার্য, তাহা বলা বাহুল্য।

যখন ঢাকা সহরেও এইরূপ ঘটনা ঘটিতে পারে, তখন সুদূর পল্লীগ্রামে হিন্দুরা কিরূপ অসহায় অবস্থায় দিন যাপন করিতেছে, তাহা মনে করা কি ভারত রাষ্ট্রের ও পশ্চিমবঙ্গের শাসনকার্য পরিচালনকারীরা বিবেচনা করা প্রয়োজন মনে করেন না? না—তাঁহারা এ বিষয়ে আপনাদিগকে অক্ষম বলিয়া মনে করিয়াই বলিতেছেন—পূর্ববঙ্গত্যাগী হিন্দুরা পূর্ব পাকিস্থানে ফিরিয়া না যাইলে বাস্তুত্যাগীদিগের সমস্যার সমাধান সম্ভব নহে? এই সমস্যা যে সমগ্র ভারত রাষ্ট্রের সমস্যা, তাহা কি বলিয়া দিতে হইবে?

দিল্লী নগরে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এবার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি—ভারত সরকারের অন্যতম মন্ত্রী শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়; সভাপতি—কলিকাতার শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত। দিল্লী ভারত রাষ্ট্রের রাজনীতিক রাজধানী। সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশনে রাজনীতির প্রভাব অল্প পরিলক্ষিত হয় নাই। সভাপতি অতুলবাবু রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে মত প্রকাশ করেন—প্রাদেশিক কার্য পরিচালন জন্য প্রাদেশিক ভাষার ব্যবহার অক্ষুণ্ণ রাখিয়া রাষ্ট্রের প্রয়োজনে—দুইটি ভাষা রাষ্ট্রভাষারূপে ব্যবহার করিলে সঙ্গত হয়। দক্ষিণ ভারতের অধিকাংশ লোকই যে হিন্দী বুঝে না এবং মাদ্রাজে হিন্দী বা হিন্দুস্থানী শিক্ষা প্রচলনের চেষ্টাই যে শ্রীরাজাগোপালাচারীকে লোকের উপর কঠোর ব্যবহার করিতে হইয়াছিল, তাহা মনে রাখা প্রয়োজন। সেই কারণেই অতুলবাবু বলিয়াছেন—রাষ্ট্রিক কার্যে উত্তর ভারতে একটি ও দক্ষিণ ভারতে একটি ভাষার ব্যবহার বাঞ্ছনীয়। হিন্দী ভাষার সমর্থকগণও যখন অন্যকে হিন্দী শিখিতে বলিতেছেন, তখন তাঁহাদিগের পক্ষে রাষ্ট্রিক প্রয়োজনে, আর একটি ভাষা শিখিতে অসম্মত হইবার কোন কারণ থাকিতে পারে না। গুপ্ত মহাশয় হিন্দী সাহিত্য সম্বন্ধে পরোক্ষভাবে মত প্রকাশ করেন—রাষ্ট্রভাষা বলিয়া গৃহীত হইলেই যে হিন্দী অন্য সকল ভাষার উপর প্রাধান্য লাভ করিবে, এমন মনে করিবার কোন কারণ থাকিতে পারে না। যত দিন হিন্দী সাহিত্যসেবীরা হিন্দী সাহিত্য সমৃদ্ধ করিতে না পারিবেন, ততদিন লোক—বাধ্য না হইলে—হিন্দী শিখিতে আগ্রহশীল হইবে না। রাজনীতিক কার্যে ব্যবহৃত হইলেই কোন ভাষা জাতির বা রাষ্ট্রের গৌরবজনক হয় না।

শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের দীর্ঘ অভিভাষণে ১৩৫০ বঙ্গাব্দের দুর্ভিক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্গ বিভাগ পর্যন্ত বাঙালীর দুর্ভোগের উল্লেখ বিশেষভাবে করিয়াছেন। তিনি শেষে বলেন—বাঙলা সাহিত্যের সম্পদসমূহ দেবনাগরী আখরে প্রচার করা হইলে ভাল হয়। ইংরেজরা কেহ কেহ যেমন বাঙলা পুস্তক "রোমান লিপিতে" প্রকাশের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তেমনই তখন সে সকল পুস্তক দেবনাগরী অক্ষরে প্রকাশের প্রস্তাব তিনি করেন। প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে দেবনাগরী লিপি রাষ্ট্র ভাষার বাহন হইবে—বলেন। তবে তিনি হিন্দুস্থানী অর্থাৎ উর্দু সম্মেলনে সৃষ্ট হিন্দুস্থানীর মায়া ত্যাগ করিতে পারেন নাই; বলিয়াছিলেন—রাষ্ট্রভাষা হিন্দীই হউক, আর হিন্দুস্থানীই হউক তাঁহার জন্য দেবনাগরী লিপি ব্যবহৃত হইবে।

কেন্দ্রী ব্যবস্থা পরিষদের সভাপতি শ্রীমাভলাঙ্কারও এক ভাষা ও এক লিপির সমর্থন করেন।

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বলেন, তিনি কৃষকরূপে জীবনের কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন—এখন সৈনিক। কিন্তু তিনিও প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে বক্তৃতা করিয়াছিলেন এবং বাঙলা সাহিত্য সম্বন্ধে কোনরূপ মন্তব্য না করিয়া বাঙলার অধিবাসীদিগের সেবায় আত্মনিয়োগের সঙ্কল্প জ্ঞাপন করেন; কারণ—বাঙালীরাও এদেশে স্বাধীনতালাভ প্রয়াসের পাবনীধারা প্রবাহিত করেন এবং সম্প্রতি বাঙলা যে অত্যাচার ভোগ করিয়াছে, তাহা কেহ ভুলিতে পারে না। তিনি কলিকাতায় মোসলেম লীগের "প্রত্যক্ষ সংগ্রামের" ও নোয়াখালীর অত্যাচারের উল্লেখ করিয়া বল্লেন, তিনি বাঙলা সাহিত্যের জন্য নহে—বাঙলার সম্বন্ধে সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতে সভায় উপস্থিত হইয়াছেন।

বাঙলা সাহিত্য রাষ্ট্রভাষা নির্ধারণে কোন স্থান পাইতে পারে কিনা, সে বিষয় আলোচিত হয় নাই। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু বাঙলা ও বিহারের সীমান্ত নির্ধারণের কোন কথাই বলেন নাই।

পর্ণতরুর ছায়া আর শ্যামলতা দিয়ে ঘেরা দেবশর্মার এই সুন্দর গৃহনীড় রুচির কাছে কারাগারের মতই দুঃসহ মনে হয়। এক বনমৃগীর উদ্দাম স্বপ্নকে যেন এখানে কাঁটার বেড়া দিয়ে বন্দী ক'রে রাখা হয়েছে। রুচি মনে করে, ছায়াময় গৃহনীড় নয়, দেবশর্মার এই সংসার যেন ক্ষুদ্র এক মরু-খণ্ড; শুধু জ্বালা আর উত্তাপ। নাই সজল বরষণ; নাই গোধূলি; নাই জ্যোৎস্না, নাই কুহেলিকার সুখমন্থর তন্দ্রা। বৃথা এই স্বর্ণবর্ণ কেতকীর সৌরভবিলাস, বৃথা মেঘমেদুর মধ্যাহ্নের এই নীপরজ ও নবজলকণার উৎসব। সন্ধ্যার মল্লিকা ফোটে অকারণে, শালনির্যাসের গন্ধে মদির প্রভাত বায়ু বৃথা করে ছুটাছুটি। ব্যর্থ জীবন, ব্যর্থ যৌবন। প্রতি মুহূর্তের অনাদরে সুন্দরাঙ্গনা রুচির অনঙ্গমাধুরী এখানে যেন ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। প্রতি মুহূর্তের মরু-জ্বালায় এক তরুণী নারীর শত কামনার পুষ্পদল শুকিয়ে পুড়ে ভস্ম হয়ে যাচ্ছে। দুঃসহ এই নিষ্ঠুর বন্ধন। মুক্তি খোঁজে রুচি।

স্বামীকে ভালবাসতে পারেনি রুচি, কেন ভালবাসবে, তার কারণও খুঁজে পায় না। দেব-শর্মার এই ক্ষুদ্র গৃহনিকেতনের বাইরে কত তরুণের মুগ্ধচক্ষুর দৃষ্টি তাকে অভ্যর্থনা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে, সেকথা জানে রুচি। শ্রেষ্ঠ রূপসী নামে এত বড় লোকখ্যাতি লাভ করেছে যে নারী, শ্রেষ্ঠ রূপবানের পাশেই তার স্থান হওয়া উচিত। এ শুধু রূপস্তাবক তরুণ সমাজের ধারণা নয়, রুচি নিজেও মর্মে মর্মে বিশ্বাস করে এই কথা। এরই নাম বুঝি ইন্দ্রমায়া।

হ্যাঁ, ইন্দ্রমায়ায় পড়েছে রুচি। জীবনের কামনাকে ক্রীতদাসীর মত দেবশর্মার মত একটি রূপ-যৌবনে অকিঞ্চন পুরুষের পদপ্রান্তে চির অবনত করে রাখতে চায় না রুচি। এ জীবন যেন চির অভিসারের এক বাধাবন্ধহীন অবারিত পথ, যার প্রতি ছায়াকুঞ্জের অভ্যর্থনায় তরুণী নারীর সত্তা চির বাসরিকার মত মিলন অন্বেষণ করে ফিরবে।

এই তো প্রেমের জীবন, কামনানন্দিত চির উৎসবের মত। প্রেমের জীবনে বন্ধন ব'লে যদি কিছু থাকে, সে বন্ধন কুসুমমাল্যের মতই, যে কুসুম পুষ্পধন্বার শরমুখে বিহ্বল কামনার পরাগ ছড়িয়ে দিয়ে যায় প্রতি ফাল্গুনের বাতাসে।

তাই, মুক্তি খোঁজে রুচি। উটজ দ্বারের কাছে এক সপ্তপর্ণীর অঙ্গে অঙ্গভার সঁপে দিয়ে দূর পথ প্রান্তের দিকে তাকিয়ে থাকে। কার প্রতীক্ষায়?

এ প্রতীক্ষার অর্থ জানেন দেবশর্মা। পর-প্রণয়িণী রুচির অন্তরাত্মা কেন এই পথের ধ্যানে ডুবে রয়েছে, তার রহস্য দেবশর্মার কাছে অজানা নয়। প্রভাতের কুহেলিকার অন্তরালে এই পথেই এক সুন্দরদর্শন প্রণয়ী ক্ষণিকের মত দেখা দিয়ে সরে যায়। স্মিত জ্যোৎস্নার পুলকে বিগলিত রজনীর প্রতি প্রহরে এই পথেই তার পদধ্বনি শোনা যায়; কিন্তু দেখা যায় না। এক অশরীরী প্রেম যেন অস্থির হয়ে কাকে অন্বেষণ করে ফিরছে। কত ছদ্মরূপে সে মায়াবী আসে আর যায়। ঐ নবকাশ বনে তাকে দেখা যায়, শ্বেতবাসে সজ্জিত অঙ্গ, দূর সপ্তপর্ণী তলে যেন সুচিত্রিত এক নারী মূর্তির দিকে তাকিয়ে আছে। দেবশর্মা তাকে চেনেন, তারই অনুরাগে প্রতি মুহূর্তে উন্মনা হয়ে আছে রুচি। তারই নাম পুরন্দর।

ক্ষমা করতে পারেননি দেবশর্মা। ইন্দ্রমায়ায়

চঞ্চল এই প্রগল্‌ভ যৌবনা নারীকে সতর্কতার এক পাষাণ প্রাচীর দিয়ে কঠোরভাবে বন্দী ক'রে রাখতে চান। প্রত্যেকটি মুহূর্তের ওপর যেন প্রহরা রেখেছেন দেবশর্মা। সুযোগ পায় না মায়াবী পুরন্দর, সুযোগ পায় না রুচি।

বনমৃগীর এই উদ্দাম স্বপ্নকে এত সতর্কতা দিয়ে বেঁধে রাখার প্রয়োজন কি, মুক্ত ক'রে দিলেই তো পারেন দেবশর্মা। কিন্তু পারেন না, মন চায় না। অপমান যা হবার তা তো হয়েই গেছে, তাঁর স্বামীত্বের অধিকারকেই চরম ঘৃণায় তুচ্ছ ক'রে দিয়েছে রুচি। কিন্তু হেরে গিয়েও তবু হার মানতে চান না দেবশর্মা। পুরন্দরের মায়ার ষড়যন্ত্রকে কঠোরভাবে প্রতিরোধ করার জন্য যেন তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন।

সপ্তপর্ণী তরুচ্ছায়ায় বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পারে না রুচি। দেবশর্মার কঠোর আহ্বানে কুটীরের অভ্যন্তরে চলে যেতে হয়। সরোবর সোপানে নিঃশব্দে বসে হিল্লোলিত রক্ত কোকনদের দিকে নিষ্পলকভাবে তাকিয়ে থাকে রুচি। বেশীক্ষণ নয়, দেবশর্মা এসে ডেকে নিয়ে যান। মধ্য নিশীথে স্বপ্ন ভঙ্গের বেদনায় সুপ্তোত্থিতা রুচি বাতায়নবর্তিনী হয়, দেব-শর্মা এসে বাতায়ন রুদ্ধ ক'রে দিয়ে চলে যান।

রুচির অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। মুছে ফেলে অঙ্গরাগ, কবরীমাল্য দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। যেন নির্মম আক্রোশে ক্ষণিকের জন্য এক রূপলতিকাকে কণ্টকতরুর মত শোভাহীন করে তোলে। তবু একটুও বিচলিত হন না দেবশর্মা।

মাঝে মাঝে যেন অবসন্ন হয়ে পড়েন দেব-শর্মা। বড় অর্থহীন বলে মনে হয় এই সংগ্রাম। রুচি তাঁকে ভালবাসবে না, ভালবাসতে পারে না, কারণ প্রেমকে রূপযৌবনের উৎসব বলেই মনে করেছে রুচি। কামনার বন্ধন ছাড়া আর কোন বন্ধন স্বীকার করবে না রুচি। তাঁর গর্ব করার মত রূপ নেই, যৌবনও নেই, তবু রুচি নামে গৃহ-সঙ্গিণী এই নারীকে কেন যেন ভাল লাগে দেবশর্মার। তাও কি সম্ভব? আশ্চর্য হন, রহস্য

ঘুমে উঠতে পারেন, তবু তিনি রুচিকে ভালবাসেন বলেই তো মনে হয়। তাই তো হেরে গিয়েও হার মানতে চান না। রুচি মুক্তি খুঁজলেও তিনি মুক্তি দিতে পারেন না।

যজ্ঞের নিমন্ত্রণে কটা দিনের জন্য বাইরে যেতে হবে, বিমর্ষ হয়ে বসেছিলেন দেবশর্মা। প্রতি মুহূর্তে শুধু এক পরপ্রেমিকা নারীর প্রতিটি আকুলতাকে বাধা দিয়ে দিয়ে অর্থহীন জীবনের অনেকগুলি দিন কেটে গেছে। বড় জ্বালা ও অপমানে ভরা অনেকগুলি দিন। তবু আজ প্রবাসে যাবার সময় বিস্মিত হয়ে বুঝতে পারেন দেবশর্মা, তাঁর সমস্ত অন্তর বেদনায় ভরে উঠেছে। দেবশর্মা জানেন, ফিরে এসে এই জ্বালাভরা দিনগুলিকেও আর ফিরে পাবেন না। মুক্তির সুযোগ পেয়ে যাবে রুচি। বনমৃগীর উদ্দাম স্বপ্ন অবাধ আনন্দে এই বেড়া ভেদ ক'রে চলে যাবে। সার্থক হবে রুচির ইন্দ্রমায়া, সফল হবে পুরন্দরের অভিসার।

অনেকক্ষণ ধরে নিবিড় চিন্তার মধ্যে যেন একটা পথ খুঁজছিলেন দেবশর্মা। যাবার সময়ও নিকট হয়ে আসছে। দেবশর্মা ব্যস্তভাবে ডাকলেন—বিপুল।

পাঠগৃহ থেকে অধ্যায়নরত বিপুল উপাধ্যায়ের এই ব্যস্ত আহ্বান শুনতে পেয়েই সম্মুখে এসে দাঁড়ায়।

দেবশর্মা বলেন,—কটি দিনের জন্য যজ্ঞের নিমন্ত্রণে আমাকে বাইরে যেতে হচ্ছে বিপুল। কিন্তু যেতে মন চাইছে না।

দেবশর্মার কণ্ঠস্বরে বড় বেশী বেদনার সুর ছিল। বিপুলও সমবেদনার সুরে প্রশ্ন করে—কেন গুরু?

তবুও চুপ করে থাকেন দেবশর্মা। যেন বহু দ্বিধা ও লজ্জার মধ্যে তাঁর মুখের ভাষা পথ হারিয়ে ফেলেছে। বিপুলেরই সাগ্রহ এবং বারংবার অনুনয়ে মনের ভার যেন একটু লঘু হয়ে ওঠে। বলেন—আমার একটা অনুরোধ আছে বিপুল।

—অনুরোধ নয় গুরু, বলুন নির্দেশ।

—প্রতিশ্রুতি দিতে হবে বিপুল, আমার সেই নির্দেশ তুমি পালন করবে।

—সর্বস্ব বিসর্জন দিয়েও পালন করবো গুরু।

দেবশর্মা শান্তভাবেই বলেন—তুমি জান বিপুল, রুচি আমাকে ভালবাসে না?

চমকে ওঠে বিপুল—না গুরু, এই প্রথম শুনলাম।

দেবশর্মা—তুমি জান, ইন্দ্রমায়ায় পড়েছে রুচি, পুরন্দরকে সে ভালবাসে?

ব্যথিতভাবে তাকিয়ে থাকে বিপুল, গুরুর এ অপমানের জ্বালা শিষ্যের অন্তরেও যেন বেদনা সৃষ্টি করে।—এই প্রথম জানলাম গুরু।

দেবশর্মা—পুরন্দরের পথ চেয়ে বসে আছে রুচি। আমি সেই পথে পাষাণ প্রাচীরের মত শুধু বাধা তুলে দিয়ে বসে আছি। জানি না, কেন তাকে এত বাধা দিই, কেন এত কঠোর বন্ধনে বন্দী করে রাখি। কিন্তু.........।

কিছুক্ষণের মত নীরব হয়ে থেকে দেবশর্মা আবার ধীর স্বরে বলতে থাকেন—কিন্তু, আজ আমাকে প্রবাসে যেতে হচ্ছে। ফিরে এসে এ গৃহে আর যে রুচিকে দেখতে পাব, বিশ্বাস হয় না বিপুল।

বিপুল—আমি প্রতিশ্রুতি দিলাম গুরু, আপনি যতদিন না ফিরে আসেন, কোন পুরন্দরের ইন্দ্রমায়া আমার গুরুপত্নীর দেহ স্পর্শ করতে পারবে না।

দেবশর্মাকে প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়ায় বিপুল। দেবশর্মা চলে যান।

রুদ্ধ হলো পাঠগৃহের দ্বার। ক্ষান্ত হলো অধ্যয়নের পালা। দেবশর্মা চলে যেতেই অপূর্ব অদ্ভুত এক দায়িত্বের কথা স্মরণ ক'রে শঙ্কিত হয়ে ওঠে তরুণ ব্রহ্মচারী বিপুল। পৃথিবীর কোন শিষ্যকে এমন গুরুভার দায়িত্ব নিতে হয়েছে বলে শোনা যায় নি।

পরপ্রণয়িনী এক নারীর কামনাকে পাহারা দিয়ে বন্দী করে রাখার ভার গ্রহণ করেছে বিপুল। পারদারিক পুরন্দরের গোপন অভিসার ব্যর্থ করে দেবার দায়িত্ব নিয়েছে বিপুল। তরুণ ব্রহ্মচারী বিপুল, জীবনে কোন নারীর যৌবন-শোভার দিকে মুখ তুলেও তাকিয়ে দেখেনি, অনুরাগের লীলাকলা আর রীতিনীতি যার কাছে একেবারেই অজানা, তাকেই আজ থেকে গ্রন্থ বন্ধ করে এক ক্ষমাহীন ও কঠোর স্বামীর মতই কৌতুহল সংশয় আর আগ্রহ নিয়ে এক নারীর জীবনে বন্ধন রচনা করে রাখতে হবে।

* * * * *

পর্ণতরুর ছায়া আর শ্যামলতা দিয়ে ঘেরা এই গৃহনিকেতন আজ আর কারাগার বলে মনে হয় না, রুচির অবরুদ্ধ সত্তায় যেন মুক্তির বাতাস লেগেছে। যে মুক্তির লগ্নকে এতদিন ধরে প্রতিমুহূর্তের চিন্তায় কামনা করে এসেছে, তাই আজ আসন্ন হয়ে উঠেছে। সারা সকাল ধরে প্রতি কুঞ্জে ঘুরে ফিরে পুষ্প চয়ন করে রুচি। অন্তরাল থেকে এক ব্রহ্মচারীর সতর্ক দৃষ্টি কুঞ্জচারিণী সেই নারীর উনমদ অঙ্গশোভা অনুসরণ করে ফিরতে থাকে, যেন মুহূর্তের মতও চোখের বাইরে না চলে যায়। গুরুর নির্দেশ।

সরোবর সলিলে স্নান করে রুচি। অনুপম এক রক্ত কোকনদের গায়ে যেন জলের হিল্লোল সতর্ক দৃষ্টি দিয়ে সে দৃশ্যকে বন্দী করে রাখে বিপুল। যেন ডুবে না যায়! গুরুর নির্দেশ।

সন্ধ্যা হয়ে আসে। দীপ জ্বলে রুচির ঘরে। একান্তে দাঁড়িয়ে অতি সন্তর্পণে সেই দীপালোকে পুলকিত কুটীর অভ্যন্তরে প্রসাধনরতা এক যৌবনগরবিনীর মূর্তির দিকে বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে বিপুল। সে মূর্তির যবাঙ্কুরের কর্ণপুরে মন্দানিলের লুব্ধ পরশ ক্ষণে ক্ষণে লাগে। কেতকীরজ অঙ্গরাগে সুবাসিত তনু, তার ওষ্ঠাধরে বন্ধুক পুষ্পের অরুণতা। বেণী প্রান্তে দোলে সায়ন্তন মল্লিকার গুচ্ছ। নিরঙ্ক কুঙ্কুম পঙ্কে আলিম্পিত বাহু, অলক্তে সেবিত চরণ, মৃদুছন্দে স্পন্দিত বক্ষোপটে শ্বেতচন্দনের পত্রাবলী, ইন্দ্রমায়ার এক পরম রমণীয় অর্ঘ্যরূপে প্রস্তুত হয়ে আছে রুচি।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। গন্ধধূমে আচ্ছন্ন উটজ প্রাঙ্গণের অলস বাতাস সৌরভে মূর্ছিত। গগনপটে আঁকা রাকা হিমকর নিখিল মহীতলের রূপ আলোকাপ্লুত ক'রে শুধু সপ্তপর্ণীতলে একখণ্ড ছায়াময় অন্ধকারের নিবিড়তা রচনা করে রেখেছে। তারই মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে তস্করের মত এক পুরুষের মূর্তি। পুরন্দর।

ব্যস্ত হয়ে ওঠে বিপুল। তার প্রতিশ্রুতি ব্যর্থ করার জন্য ঐ ভয়ানক ছায়া সকল শক্তি নিয়ে আজ প্রস্তুত হয়ে আছে। দেবশর্মার গৃহনিকেতনের সকল পুণ্য গ্রাস করে, দীপশিখাটী চরমভাবে নিভিয়ে দিয়ে চলে যাবে ঐ ভয়ানক ছায়া।

কোন্ শক্তি দিয়ে আজ ইন্দ্রমায়ার এই ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করবে বিপুল? অস্ত্রবলে? না, সম্ভব নয়। আবেদন ক'রে? না, বিশ্বাস হয় না। বনমৃগীর এই উদ্দাম স্বপ্নকে আজ কোন লোহার শিকলেও বেঁধে রাখতে পারবে না বিপুল।

সপ্তপর্ণী তরুতলে সেই ভয়ানক ছায়া অস্থির হয়ে উঠেছে দেখা যায়। চরম সঙ্কটের লগ্ন যেন ঘনিয়ে এসেছে। দীপ নিভিয়ে দিয়ে প্রাঙ্গণের জ্যোৎস্নালোকে রুচি এসে একবার দাঁড়ায়। সপ্তপর্ণীর ছায়ার দিকে তাকায়। পরমুহূর্তে চমকে ওঠে।—একি? তুমি এখানে কেন বিপুল?

পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে বিপুল। ইন্দ্রমায়ার ছলনাকে আজ সে ছলনা দিয়েই পরাস্ত করবে। গুরুর নির্দেশ ব্যর্থ হতে দেবে না। তার প্রতিশ্রুতির সত্যকে সর্বস্ব দিয়েও রক্ষা করবে তরুণ ব্রহ্মচারী বিপুল।

ভ্রূকুটিকুটিল দৃষ্টি তুলে যেন কঠিন ধিক্কারের সুরে রুচি বলে—

—বুঝেছি বিপুল। গুরুভক্ত তুমি, গুরুর নির্দেশে আমার পথরোধ করে দাঁড়িয়েছ। ভুল করো না, আমার অভিশাপ থেকে যদি বাঁচতে চাও, তবে দূরে সরে যাও।

অনেকক্ষণ মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকে বিপুল। দূরে সরে যাবার শক্তিও বোধ হয় নেই। এক রূপগরীয়সী মূর্তির কাছে যেন পূজারীর মত বুকভরা আগ্রহ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিপুল।

রুচি শান্ত স্বরেই প্রশ্ন করে—কি বলতে চাও বিপুল?

বিপুল মুখ তুলে তাকায়—গুরুভক্ত নই আমি, আমি তোমারই ভক্ত রুচি।

বিস্ময়ে অভিভূত দৃষ্টি তুলে বিপুলের সেই সম্মোহিত তরুণ মুখচ্ছবির দিকে তাকায় রুচি—আমার ভক্ত তুমি? কোন দিন শুনিনি একথা।

বিপুল—আজ শোন রুচি।

রুচি—বল।

বিপুল—তুমিই আমার প্রথম বিস্ময় আমার আকাঙ্খার জগৎ বন্দী হয়ে ছিল এই পাঠগৃহের কারাগারে। সে জগতের মুক্তি এনেছ তুমি। তুমিই আমার সে জগতের প্রথম মাধুরী, প্রথম কামনার দীপ। তুমি ছাড়া, আমার সব ধ্যান, সব তপস্যা বৃথা।

প্রাঙ্গণের মৃত্তিকা যেন অদ্ভুত এক মন্ত্র-পূতে বেদিকার মত হয়ে উঠেছে। তার ওপর দাঁড়িয়ে আছে যৌবনগরবিণী রূপসীর প্রসাধিত মূর্তি, সম্মুখে প্রসন্নতাপ্রার্থী এক তরুণ পূজারী।

এক মরুস্থলীর মধ্যে নির্বাসিত জীবনে যেন এতদিন ধরে এক স্বপ্নরাজ্য লুকিয়ে পড়েছিল। আজ হঠাৎ আবিস্কৃত হয়ে গেছে। রুচির নিশ্বাস চঞ্চল হয়, দুই চক্ষের দৃষ্টি নিবিড় হয়ে ওঠে।

—কি চাও বিপুল?

—অনন্তকাল এ জীবনকে তোমারই মন্দির করে রাখতে চাই রুচি।

বিপুলের আলিঙ্গনে লুটিয়ে পড়ে রুচি। সপ্তপর্ণী তরুতলের ছায়া কেঁপে ওঠে। এগিয়ে আসে। দেবশর্মার প্রাঙ্গণে এক নূতন ছলনায় ইন্দ্রমায়ার ছলনা পরাভূত হয়ে গেছে। একান্তে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে সেই দুঃসহ দৃশ্য দেখতে থাকে পুরন্দর। চোখে জ্বালা লাগে, ঝঞ্ঝা-তাড়িত মেঘখণ্ডের মত ছুটে পালিয়ে যায়।

বাহুবন্ধনে যেন এতক্ষণ রুচিকে বন্দী করেই রেখেছিল বিপুল। পুরন্দরের রথচক্রের শব্দ দূরান্তে মিলিয়ে যেতেই রুচিকে সেই নিবিড় ছলনার আলিঙ্গন থেকে মুক্ত করে দেয় বিপুল।—ক্ষমা কর।

রুচি বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করে—কেন বিপুল?

প্রশ্নের উত্তর দেবার সময় আর ছিল না, সুযোগও ছিল না। দেবশর্মা এসে কুটীরে প্রবেশ করেন। বিপুল এগিয়ে গিয়ে গুরুকে প্রণাম করে।

* * * * *

পর্ণতরুর ছায়া আর শ্যামলতা দিয়ে ঘেরা দেবশর্মার গৃহনিকেতনে আবার প্রভাত হয়। বিপুল তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছে, ইন্দ্রমায়া ব্যর্থ হয়ে গেছে, সবই শুনতে পেয়েছেন দেবশর্মা। শুনে খুসী হয়েছেন। যেখানে যেমনটি রেখে গিয়েছিলেন, সবই ফিরে পেয়েছেন। রুচি আছে, বিপুল আছে, সেই সপ্তপর্ণী আছে। কিন্তু সেই পুরাতন দিন-গুলিকে আর ফিরে পেলেন না দেবশর্মা। সেই বন্ধনের সাধনা, প্রত্যহের সংশয় আর অপমানের জ্বালায় ভরা দিনগুলি, বনমৃগীর উদ্দাম স্বপ্নকে কাঁটার বেড়া দিয়ে বন্দী করে রাখার সাধনা।

আর কোন প্রয়োজন নেই। বনমৃগী যেন এই গৃহপ্রাঙ্গণেই তার স্বপ্নরাজ্য লাভ করেছে। সপ্তপর্ণীর ছায়ায় দাঁড়িয়ে দূরে পথের ধ্যানে আর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় না রুচিকে। আর সংশয়ের কোন অবকাশ নেই, বাধা দেবার কোন প্রয়োজন নেই, এই গৃহপ্রাঙ্গণেই সারা-দিনের আনাগোনার আনন্দে ধন্য হয়ে আছে রুচি।

কিন্তু দেবশর্মা অনুভব করেন, তাঁর অন্তর যেন শূন্যতার মধ্যে ডুবে আছে। বুঝতে পারেন না কেন। তাঁর কাজ ফুরিয়ে গেছে মনে হয়, কি যেন তার হারিয়ে গেছে। রুচিকে প্রতিমুহূর্তে শুধু কঠোর শাসনে বেঁধে রাখার দিনগুলি আর ফিরে পাবেন না। সুখী হবারই কথা, কিন্তু যেন আরও উদাস ও অসহায় হয়ে গেছেন দেবশর্মা। তাঁর জীবন যেন শ্রান্ত হয়ে পড়েছে।

রুচি এসে স্মিতমুখে সম্মুখে দাঁড়ায়—আমার একটা অনুরোধ আছে।

দেবশর্মা—আমার কাছে?

রুচি—হ্যাঁ।

দেবশর্মা—বল।

রুচি—একটি জিনিস উপহার চাই।

দেবশর্মা—কি?

রুচি—গন্ধর্ববধূ যে দিব্যগন্ধ চম্পক ফুল কবরীতে ধারণ করে, সেই ফুল।

অনুরোধ শুনে দেবশর্মার পক্ষে সুখী হবারই কথা। কিন্তু আশ্চর্য, দেবশর্মার সারা মুখে যেন অতি বিষণ্ণ ও বেদনার্ত ছায়া ছড়িয়ে পড়ে, যেন আরও অসহায় হয়ে গেছেন তিনি, আরও স্পষ্ট করে বুঝতে পারেন, সব হারিয়ে গেছে।

দেবশর্মা ডাকেন—বিপুল।

পাঠগৃহের নিভৃত থেকে গুরুর আহ্বানে চমকে ওঠে বিপুল। তার মনের গোপনে লালিত কতগুলি দুর্বলতা যেন চমকে উঠেছে।

কেন চমকে ওঠে বিপুল? সত্যি কি সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেনি? গুরুপত্নী রুচি তো ইন্দ্রমায়ার গ্রাস থেকে রক্ষা পেয়েছে; কিন্তু এক ছলনা থেকে আর এক ছলনায় রুচির তৃষ্ণা কি নতুন করে হারিয়ে গেছে? তাই চমকে ওঠে বিপুল, গুরুর কাছে এই নতুন ছলনার ইতিহাস সবই সে গোপন করেছে। কেন? রূপাভিসারিকা এক নারীকে ছলনা দিয়ে বন্দী করতে গিয়ে তার অঙ্গরাগের কেতকীরেণু কি তরুণ ব্রহ্মচারীর অন্তরে ক্ষণিক মধুরতার কুহক সৃষ্টি করেছিল? নইলে চমকে ওঠার কি কারণ আছে?

গ্রন্থ তুলে রেখে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, একটা অভিশপ্ত স্মৃতির সঙ্গে যেন মনে মনে বোঝা-পড়া করে নেয়। তারপর দেবশর্মার সম্মুখে এসে দাঁড়ায়।

দেবশর্মা বলেন,—রুচি উপহার চাইছে বিপুল। দিব্যগন্ধ চম্পক ফুল, কোথায় আছে জানি না। তুমি নিয়ে এস।

বিপুল চলে যায়, প্রাঙ্গণ ছাড়িয়ে সপ্তপর্ণী তরুতল দিয়ে উটজ দ্বার পার হয়ে। সেই পথের দিকে কিছুক্ষণ নিষ্পলক দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে থাকে রুচি।

* * * *

আবার দীপ জ্বলে রুচির ঘরে। নতুন পথের ধ্যানে ডুবে আছে রুচির মন, যে পথে এই সন্ধ্যায় আকুল হয়ে দেখা দেবে দিব্যগন্ধ চম্পকের অভিসার।

কিন্তু সে দিব্যগন্ধ চম্পক পড়েছিল দেব-শর্মার পায়ের কাছে। সম্মুখে দাঁড়িয়ে বিপুল। পরিশ্রান্ত ও বিষণ্ণ।—এবার আমায় বিদায় দিন গুরু।

দেবশর্মা—কেন?

—আমি ভুল করেছি।

—কি ভুল?

ইন্দ্রমায়ার ছলনাকে দূর করতে গিয়ে আমিই নতুন ছলনা হয়ে উঠেছি।

দেবশর্মা নিস্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন। বিপুলের চক্ষু বাষ্পায়িত হয়ে ওঠে। দেবশর্মার পায়ে হাত রেখে বিপুল বিচলিত স্বরে বলে—বিশ্বাস করুন গুরু, আমি ছলনা মাত্র, তার বেশী কিছু নই। আমি গুরুভক্ত শিষ্য ছাড়া কিছু নই। শুধু গুরুপত্নীকে রক্ষা করেছি। প্রণয়ের অভিনয় করেছি শুধু, তার মধ্যে হৃদয়ের কোন স্পর্শ ছিল না গুরু।

দেবশর্মার শান্ত মুখে অদ্ভুত এক ক্ষমাময় প্রসন্নতা দেখা দেয়।—ভালই করেছ বিপুল। হৃদয়হীন বলেই তো ছলনা এত সুন্দর। সারা জীবন ধরে এই ছলনার জন্যই তৃষ্ণার্ত হয়ে রয়েছে রুচি। আমিই বাধা দিয়ে ভুল করেছি।

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে থাকেন দেবশর্মা। তারপর বলেন—রুচিকে আর শাস্তি দিতে চাই না বিপুল, মুক্তি দিতে চাই।

বিপুল চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে দেখে দেবশর্মা অনুরোধের সুরেই বলেন—এই দিব্যগন্ধ চম্পকের উপহার আমার জন্য চাইনি বিপুল। যে চেয়েছে তাকে দিয়ে এস। যাও।

বিপুলের মনে হয়, এতদিন পরে সত্যই যেন হৃদয়হীন হয়ে গেছেন দেবশর্মা। রুচির জীবনে এক ছলনাকে আর বিপুলের জীবনে এক শাস্তিকে চিরন্তন করে রেখে দিয়ে, চির-কালের মত মুক্ত হয়ে যাচ্ছেন দেবশর্মা। বিচলিত হয় বিপুল, সমস্ত অন্তর শঙ্কাতুর হয়ে ওঠে। পরমুহূর্তেই কর্তব্য স্থির করে নেয়

বিপুলে। চরম পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়। পর্ণতরুর ছায়া আর শ্যামলতা দিয়ে ঘেরা এই গৃহনীড় থেকে ছলনার অভিশাপকে চিরকালের মত নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে। গুরুভক্ত শিষ্য বিপুল চরম সংকল্প নিয়ে, দিব্যগন্ধ চম্পকের উপহার তুলে নিয়ে চলে যায়।

রুচির ঘরে দীপশিখা কেঁপে ওঠে। দিব্যগন্ধ চম্পকের উপহার নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে বিপুল। —নাও তোমার ফুল।

বিপুলের কথাগুলিতে কেমন একটা রূঢ়তার সুর ছিল। বিস্মিত হয় রুচি। —এই কি উপহার দেবার রীতি!

—উপহার নয়, গুরুর আদেশ।

নির্মম আঘাতে যেন রুচির সমস্ত সত্তা চমকে ওঠে—গুরুর আদেশ?

—হ্যাঁ।

—যে বুকভরা আহ্বানের মায়ায় ইন্দ্রমায়া ব্যর্থ হয়ে চলে গেছে, সে কি সকলই ছলনা?

—হ্যাঁ।

—যাও।

বিপুল চলে যায়, দীপ নিভে যায়। দিব্যগন্ধ চম্পকের উপহার মাটিতে লুটিয়ে পড়ে থাকে। আর লুটিয়ে পড়ে থাকে রুচি। ছলনা, সকলই ছলনা। এই রূপ আর যৌবন জীবনের কয়েকটি প্রমত্ত বসন্তের ছলনা। একটি ধিক্কারে যেন আজ স্বপ্নরাজ্য চূর্ণ হয়ে গেছে রুচির, তার অস্থির আত্মা আজ এই অন্ধকারের সমাধিতে একটুকু হৃদয়ের আশ্রয় খুঁজছে।

চোখের জলে যেন নতুন করে এক স্বপ্ন দেখতে পায় রুচি। সন্ধ্যামেঘের ক্ষণিক রক্তিমার মত এই রূপ আর যৌবন মুছে গেছে জীবনের আকাশপট হতে, তবু প্রেম আছে, সে প্রেম হৃদয়ের ডোরে বাঁধা। সব ফুরিয়ে যায়, হৃদয় ফুরিয়ে যায় না। তাই তো হৃদয়ের বন্ধনেই ভালবাসা চিরন্তন হয়। তটশিলার কঠিন বন্ধন সত্য; তাই সত্য তটিনীর রূপ। আর সবই গোপনের ইন্দ্রমায়া, ক্ষণিকের ছলনা, মরীচিকার মত সুন্দর ও মিথ্যা।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায় রুচি। দিব্যগন্ধ চম্পকের উপহার হাতে তুলে নেয়। আজিকার এই দীপহীন অন্ধকারে সত্যই যেন এক চির-কালের প্রেমিকের সন্ধানে নতুন করে আবার অভিসারে যাত্রা করে রুচি। কক্ষদ্বার পার হয়ে প্রাঙ্গনে এসে দাঁড়ায়, এগিয়ে যায়, আর একটি কুটীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে।

দেবশর্মার পায়ের ওপর শুধু দিব্যগন্ধ চম্পকের অর্ঘ্য নয়, পুষ্পের চেয়েও কোমল অলকস্তবকের অর্ঘ্য নিয়ে রুচির মাথাও লুটিয়ে পড়ে। কিসের অর্ঘ্য? দেবশর্মা বিচলিত হয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়ে সে অর্ঘ্য স্পর্শ করতে গিয়েই রুচির মাথা স্পর্শ করেন। দুই হাত দিয়ে দেবশর্মার হাত চেপে ধরে রুচি।

দেবশর্মা বিস্মিত হন—এ কি রুচি? তোমাকে তো আমি মুক্ত করে দিয়েছি।

রুচি—মুক্তি চাই না।

দেবশর্মা—কি চাও বল।

রুচি—চাই তোমার বন্ধন, চাই তোমার দেওয়া শাস্তি, চাই তোমার বাধা। চাই তোমার শাসন।

দেবশর্মা—কোন দিন যা চাওনি, আজ তাই কেন চাইছ রুচি?

রুচি—কোন দিন যা বুঝিনি আজ তাই বুঝতে পেরেছি।

দেবশর্মা—কি?

রুচি—তুমি সহৃদয়, আর সবই ছলনা।

কয়েকটি মুহূর্তে শুধু স্তব্ধ হয়ে থাকেন দেবশর্মা। তারপর যেন সান্ত্বনার সুরেই বলেন—ওঠ রুচি।

রুচি ওঠে। দীপ জ্বালে। সে দীপের আলোকে দেখা যায় দেবশর্মার পদস্পর্শে পূত দিব্যগন্ধ চম্পক রুচির অলকস্তবকে গাঁথা রয়েছে।

**রবীন্দ্র নাট্য প্রবাহ—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী।** এ মুখার্জি এণ্ড কোং, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৩৷৷৹

রবীন্দ্র-সাহিত্যের সমালোচনায় শ্রীযুত প্রমথ বিশী মহাশয়কে ইহার পূর্বে আমরা পাইয়াছিলাম 'রবীন্দ্র কাব্য-প্রবাহে'র গতিবৈচিত্র্যে বিশ্লেষণে; প্রবাহের অগ্রসরণকেই অনুসরণ না করিয়া তিনি মাঝখানে আবার এই প্রবাহের উৎস মুখে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, সেখানে ফিরিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন 'রবীন্দ্র কাব্য নির্ঝরে'র। এবারে তাঁহার চোখে পড়িয়াছে 'রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ'; সম্প্রতি অবশ্য তাহাকে খণ্ডাংশরূপে পাইলাম; কিন্তু চারিখণ্ডে ইহার পূর্ণরূপ আমাদের চোখে পড়িবে, এই আশ্বাসও আমরা মুখ বন্ধে পাইয়াছি। সুতরাং প্রথমেই যে কথাটা ভাবিয়া বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেছি তাহা এই যে, রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্বন্ধে শ্রীযুত বিশীর দৃষ্টি প্রসারিত, তাঁহার কৌতূহল নিত্য-নূতন; বিভিন্ন দিক হইতে রবীন্দ্র প্রতিভার ক্রমবিকাশের বৈচিত্র্য এবং বৈশিষ্ট্য তাঁহার মনকে দোলা দিয়াছে। ইহার সহিত লেখকের সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে উচ্চ অধিকারের কথা স্মরণ করিয়া আমরা আশান্বিত হইতেছি।

আলোচ্য গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য, কাব্যনাট্য, নৃত্যনাট্য, ঋতুনাট্যগুলিই বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। ঋতুনাট্যের আলোচনা প্রসঙ্গে লেখক বিভিন্ন যুগের রবীন্দ্রনাট্যে ঋতুগুলি যে স্থান পাইয়াছে 'ঋতুচক্র' শিরোনামায় সে সম্বন্ধেও বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন।

মোটামুটিভাবে আলোচনা করিলে এই গ্রন্থের ভিতরে রবীন্দ্রনাথের যে নাটকগুলি স্থান পাইয়াছে সেগুলিকে কাব্যনাট্য বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে—বিশেষ করিয়া বাঙলা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে এগুলিকে আমরা রবীন্দ্রনাথের বিশেষ দান বলিয়া স্বীকার করিতে পারি। যেমন ব্যবহারিক জীবনে, তেমন কাব্য-জীবনে রবীন্দ্রনাথ অনেকখানি ছিলেন জাত-না-মানার দলে। কোন ক্ষেত্রেই এই ব্রাত্যধর্ম গ্রহণকে তিনি পতন মনে করিতেন না। তিনি এইটাকেই মনে করিতেন প্রসার। সাহিত্যের ক্ষেত্রে নাটক জাতিটিকে সর্বদাই যে কাব্যেতর হইয়া থাকিতে হইবে, অথবা কাব্যকে নাট্যেতর হইয়া থাকিতে হইবে রবীন্দ্রনাথের স্বাধীন মন এই স্মার্ত-বিধিকে মানিয়া লইতে রাজি হয় নাই। তাহার ফল কি হইয়াছে সেই কথাটিই বিচার্য। ফলে যদি 'বিশুদ্ধ' নাটক রচিত না হইয়া থাকে তাহাতে আপ-শোষের কিছু নাই; তাহাদের মিশ্রধর্ম লইয়া যদি তাহারা রসবৈচিত্র্য দান করিতে পারিয়া থাকে তবেই সে সৃষ্টি সার্থক। এক্ষেত্রে নৈষ্ঠিক বিশুদ্ধির প্রশ্নটা অনেক ক্ষেত্রেই একটা অনড় সংস্কার মাত্র।
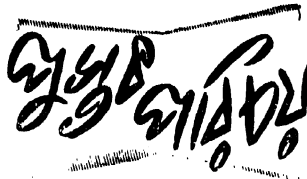
লেখক রবীন্দ্র নাটকের এই মিশ্রধর্মটি অতি নিপুণভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন, বিশ্লেষণের মন লইয়াও—রসিক মন লইয়াও। এই মিশ্রধর্মের জন্য রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় নাটকগুলিকে দুইদিক হইতে আলোচনা করিতে হয়, ইহাদের কাব্য প্রকৃতির দিক হইতে এবং ইহাদের নাট্য-কৌশলের দিক হইতে। কাব্য-প্রকৃতির আলোচনা করিতে গেলেই ইহার ভিতর দিয়া প্রতিভাত কবি-মানসের পরিচয় লইতে হয়, আর সে কাজ করিতে গেলেই রবীন্দ্রনাথের মৌলিক কবিধর্ম এবং ভাবধারার সহিতও এগুলিকে মিলাইয়া লইতে হয়। অপর-দিকে রূপায়ণে ইহারা নাটক; অতএব নাট্যকৌশল কিভাবে কতটা গৃহীত হইয়াছে এবং ফলশ্রুতির দিক হইতে তাহারা কোথায় কতখানি সার্থক হইয়া উঠিয়াছে না উঠিয়াছে তাহারও আলোচনা হওয়া দরকার। সবগুলি নাটকের আলোচনায়ই প্রমথবাবু এই উভয়দিকে লক্ষ্য রাখিয়াছেন; আমাদের মতে এইখানেই তাঁহার আলোচনার পূর্ণাঙ্গতা। একটি আলোচনা অবশ্য আরও একটু স্পষ্ট এবং পূর্ণাঙ্গ হওয়া দরকার। রবীন্দ্রনাথ এই যে বহুস্থানে কাব্য-বস্তুতে নাট্যকৌশল গ্রহণ করিয়াছেন সাহিত্য-স্রষ্টা হিসাবে এখানে তাঁহার একটা বিশেষ প্রয়োজনবোধ ছিল; সেই প্রয়োজনবোধ কি এবং তাঁহার অনুসৃত পন্থায় তাহা কতখানি সিদ্ধ হইয়াছে তাহা বিবেচ্য এবং বিচার্য। প্রসঙ্গক্রমে এ-কথার আলোচনা লেখক অনেক স্থানে করিয়াছেন, স্পষ্টতর এবং পূর্ণতর আলোচনা তাঁহার গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে (যাহাতে রবীন্দ্রনাট্য সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক সাধারণ আলোচনা থাকিবে) পাইব আশা করি।

গ্রন্থের শেষদিকে 'মূল কাহিনীর রূপান্তর' শীর্ষক আলোচনাটি অতি সঙ্গত এবং সুন্দর হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্য-নাট্যগুলির বিষয়বস্তু অনেক সময়ই ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্য হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। প্রাচীন বস্তু নূতন যুগে গৃহীত হইলেই তাহার রূপান্তর স্বাভাবিক। এই রূপান্তরের ভিতরে সূক্ষ্ম পরিচয় থাকে লেখক-ধর্মের। রবীন্দ্রনাথের কবিধর্মকে সুষ্ঠু-রূপে বুঝিতে হইলে এই রূপান্তরকে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতেই লক্ষ্য করিতে হয়। এ বিষয়ে লেখকের আলোচনা আমাদিগকে তথ্য ও আনন্দ দুই-ই দিয়াছে।

## অতলান্তিক চুক্তি

গত ১৮ই মার্চ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ক্যানাডা, লুক্সেমবুর্গ ও হল্যাণ্ড—এই সাতটি রাজ্যের রাজধানী থেকে একই যোগে প্রস্তাবিত অতলান্তিক চুক্তির ধারাগুলি প্রকাশিত হয়েছে। আজকের দিনে বিশ্বরাজনীতির এইটেই হল সবচেয়ে বড় খবর। যে চুক্তি সম্পাদনের জন্যে গত আট মাসকাল যাবৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের গোপন সলাপরামর্শ চলেছিল, তা আজ সত্যই বাস্তবে পরিণত হতে চলেছে। চুক্তির উদ্যোগকারী উল্লিখিত সাতটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিবৃন্দ এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটনে মিলিত হচ্ছেন এবং ইতিমধ্যে কোন অসম্ভব দৈব-দুর্ঘটনা না ঘটলে ৪ঠা এপ্রিল এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ে যাবে। নরওয়ে, ডেনমার্ক, আইসল্যাণ্ড, পর্তুগাল ও ইটালী—এই পাঁচটি দেশকেও অতলান্তিক চুক্তিতে সই করার জন্যে আমন্ত্রণ করা হয়েছে এবং কিছুদিনের মধ্যে তারাও যে চুক্তি স্বাক্ষর করবে—সে বিষয়ে কোন সংশয় নেই। ইউরোপ ও আমেরিকার জটিল রাজনীতি ক্রমশ যে যুদ্ধাভিমুখী হয়ে উঠছে—অতলান্তিক চুক্তি তার জ্বলন্ত উদাহরণ। এই চুক্তি সম্পাদনের ফলে ভাবী বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতি আরও একধাপ অগ্রসর হয়ে যাবে। চুক্তিটি অবশ্য সম্পাদিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই কার্যকরী হবে না, তার জন্যে বিভিন্ন রাষ্ট্রের আইনসভায় এর অনুমোদন আবশ্যক হবে। এটা নিছক গণতান্ত্রিক রুটিনগত ব্যাপার হলেও এর জন্যে কমপক্ষে আরও দু মাস সময়ের প্রয়োজন হবে বলে মনে হয়।

ভাবী বিশ্বযুদ্ধের মারাত্মক সম্ভাবনায় আজ পৃথিবী যে সুস্পষ্ট দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, অতলান্তিক চুক্তি তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। একদিকে ইঙ্গ-মার্কিন ব্লক ও অপরদিকে সোভিয়েট ব্লক আজ দ্রুত সামরিক উদ্যোগ আয়োজনে নিযুক্ত। এই দুটি পরস্পরবিরোধী ব্লকের তীব্র মতবিরোধের ফলে সম্মিলিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠান প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর জাতি সঙ্ঘের মতই নিষ্ক্রিয় ও নিবীর্য হয়ে উঠেছে। এর জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী ব্লক দুটি দোষারোপ করছে পরস্পরের বিরুদ্ধে। কোন পক্ষই আজ সম্মিলিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের উপর কোন আস্থা রাখে না বলে মনে করার কারণ আছে। তা যদি থাকত, তবে সোভিয়েট রাশিয়া তার অনুবর্তী পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি নিয়ে যেমন জোট পাকাতো না—তেমনি পশ্চিম ইউরোপের রাজ্যগুলিও অতলান্তিক চুক্তির মাধ্যমে মার্কিন সমরশক্তির ছত্রছায়ায় আশ্রয় নেবার প্রয়োজন বোধ করত না। অতলান্তিক চুক্তির সর্তাবলী সরকারীভাবে ঘোষণা প্রসঙ্গে বৃটিশ পার্লামেণ্টে পররাষ্ট্র সচিব মিঃ আর্নেস্ট বেভিন যে

বিবৃতি দিয়েছেন, তার মধ্যে কথাটা প্রায় তিনি খুলেই বলেছেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেছেন ঃ "আমরা সম্মিলিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানকে পরিপূর্ণ সমর্থন করেছি এবং রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠান যদি প্রয়োজনানুরূপে নিরাপত্তা ও সঙ্ঘবদ্ধ দেশরক্ষা ব্যবস্থা করতে পারত, তবে আমাদের চেয়ে অন্য কোন জাতি বেশী আনন্দিত হত না। এখন পর্যন্ত সেরূপ কোন ব্যবস্থা হয়নি।" এর মধ্যে স্পষ্টতই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের ব্যর্থতা স্বীকৃত হয়েছে। সম্মিলিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠান যে ব্যর্থ হয়েছে, অন্যান্য অনেক দিক থেকেও সেকথা ইতিমধ্যে প্রমাণিত হয়ে গেছে। তাই যদি হয় তবে এই ব্যর্থ প্রহসনকে এভাবে বাঁচিয়ে রাখার কি অর্থ হতে পারে? যে ৫৮টি জাতি এই বিশ্বপ্রতিষ্ঠানটির সদস্য তাদের প্রত্যেককেই এর পিছনে জাতীয় ধনভাণ্ডার থেকে প্রচুর অর্থব্যয় করতে হয়। প্রচুর অর্থব্যয় এবং মহামূল্য সময় অপচয় করে নিছক বিতর্কের জন্যে এরূপ একটি বিরাট আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিয়ে রাখার কোন হেতুই আমরা খুঁজে পাই না।

১৩টি ধারাসমন্বিত অতলান্তিক চুক্তির ভূমিকায় কিন্তু বার বার করে সম্মিলিত রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠানের সনদ ও আদর্শের প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপন করা হয়েছে। অথচ রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠানের ৫১নং ধারার দোহাই দিয়ে অতলান্তিক চুক্তির মাধ্যমে সম্ভাবিত আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার যে ব্যবস্থা করা হল, তা স্পষ্টতঃই রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। অতলান্তিক চুক্তির মূল ধারা হল ৫ নম্বরেরটি। এই ধারায় বলা হয়েছে যে, চুক্তি স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে কোন রাষ্ট্র যদি অপর কোন রাষ্ট্রের দ্বারা আক্রান্ত হয়—তবে চুক্তি স্বাক্ষরকারী সকল দেশই তার সাহায্যে অগ্রসর হতে বাধ্য হবে এবং প্রয়োজন হলে শত্রুর বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ সামরিক শক্তি নিয়োগ করবে। যে কোন দেশ এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করে এর সদস্য হতে পারবে। অতলান্তিক চুক্তি স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রসমূহ আশঙ্কিত আক্রমণের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করবে না করবে—সেকথা তারা স্বস্তি পরিষদকে জানাবে এবং স্বস্তি পরিষদ কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করলে এরা নিজেদের অবলম্বিত ব্যবস্থা বাতিল করে দেবে। চুক্তি স্বাক্ষরকারী দেশগুলির সঙ্গে বিশ্বের অন্যান্য দেশের যেসব স্বতন্ত্র সন্ধি বা চুক্তি আছে, অতলান্তিক চুক্তির বলে সে সবের কোন ক্ষতি হবে না। ৯নং ধারায় বলা হয়েছে যে, চুক্তি স্বাক্ষরকারী দেশগুলি একটি কর্মপরিষদ গড়ে তুলবে এবং এই পরিষদে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক রাষ্ট্রের প্রতিনিধি থাকবেন। এমনভাবে এই পরিষদ গঠন করা হবে, যাতে প্রয়োজন হলে সঙ্গে সঙ্গে পরিষদের বৈঠক বসতে পারে। এই কর্মপরিষদের প্রধান কর্মকেন্দ্র হয় ওয়াশিংটনে নতুবা ব্রুসেলসে হবে বলে প্রকাশ। ১২নং এবং ১৩নং ধারায় চুক্তির মেয়াদ ও চুক্তি পুনর্বিবেচনার সর্তাদি দেওয়া হয়েছে। অতলান্তিক চুক্তির মেয়াদ হবে বিশ বৎসরকাল। বিশ বৎসরের আগে চুক্তি স্বাক্ষরকারী কোন দেশের পক্ষে এই চুক্তির দায়িত্ব অস্বীকার করা সম্ভব হবে না। বিশ বৎসর পরে চুক্তির দায়িত্ব অস্বীকার করতে চাইলেও এক বৎসরের নোটিশ দিতে হবে। দশ বৎসরের পূর্বে এই চুক্তির সর্তাদি পরিবর্তনের কোন দাবী তোলা চলবে না। চুক্তি স্বাক্ষরকারী দেশগুলির কর্মপরিষদের আওতায় যথাসম্ভব শীঘ্র একটি দেশরক্ষা কমিটি গড়ে তোলা হবে। মোটামুটি এই হল অতলান্তিক চুক্তির মূল ধারা।

অতলান্তিক চুক্তি ঘোষণা প্রসঙ্গে চতুর্দিক থেকে শান্তির বুলি আওড়ানো হয়েছে। কিন্তু এই চুক্তির ফলে যে শান্তি আসবে, তা হবে সশস্ত্র শান্তি। এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার সঙ্গে সঙ্গে স্বাক্ষরকারী দেশগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে অস্ত্রাদি সাহায্য পাবে এবং সেই অস্ত্রাদির সাহায্যে তারা নিজেদের দেশরক্ষা ব্যবস্থাকে দৃঢ় করে তোলার ব্যবস্থা করবে। সাংবাদিক সম্মেলনে ফরাসী পররাষ্ট্র সচিব মঁসিয়ে সুম্যান্ একথাটি স্পষ্ট করেই বলেছিলেনঃ "অতলান্তিক চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে স্বাক্ষরকারী দেশগুলি নিশ্চয়ই তাদের সমরশক্তি বাড়াবে।" শীঘ্রই আমেরিকা থেকে অস্ত্রাদি আসবে, এ ভরসাও তিনি দিয়েছেন। কি ধরণের অস্ত্রাদি আসবে এবং কখন আসবে —এই জাতীয় একটি প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছেনঃ "আপনারা এই মাস শেষ হবার আগেই এ সম্বন্ধে সংবাদ পাবেন।" বিশ্বরাজনীতিতে একদিকে সোভিয়েট রাশিয়া ও অপরদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আজ একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী। অন্যান্য ছোট রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একদল এপক্ষের তল্পীবাহক—অপর দল ও পক্ষের। ভারতবর্ষ প্রভৃতি যে কয়টি রাষ্ট্র নিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করেছে, তারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন বলে স্বতন্ত্র কোন দল গড়ে তুলতে পারেনি। শুধু স্বতন্ত্র দায়িত্বে নিজেদের নিরাপত্তা বজায় রেখে চলেছে মাত্র। যারা ভয় করেছিল যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আবার বিশ্বরাজনীতি থেকে জাল গুটিয়ে স্বদেশে ফিরে যাবে এবং আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী নিয়ে মাথা ঘামাবে না—অতলান্তিক চুক্তির ফলে তাদের ভুল ভাঙবে আশা করি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ব-নেতৃত্ব চায় এবং অতলান্তিক চুক্তির মধ্যে তারই স্থায়ী স্বাক্ষর দেখা গেল। প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান যেদিন ট্রুম্যান-নীতি নামে প্রসিদ্ধ বৈদেশিক নীতি ঘোষণা করেছিলেন,

সেদিনই মার্কিন স্বাতন্ত্র্যবাদের অবসান ঘটেছে। গত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তিনি যদি বিজয়ী হতে না পারতেন, তাহলে অবশ্য আশঙ্কার কারণ দেখা দিত। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান সেদিন বলেছিলেন: "যেসব স্বাধীন জাতি সশস্ত্র মাইনরিটী বা বাইরের চাপের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নিজেদের স্বাধীনতা বজায় রাখার জন্য সংগ্রাম করছে, তাদের সমর্থন করাই হবে আমেরিকার নীতি।" অতলান্তিক চুক্তি সেই ট্রুম্যান-নীতির অন্যতম বহিঃপ্রকাশ মাত্র। অতলান্তিক চুক্তিতে বার বার বাইরের আক্রমণের প্রশ্ন আছে। কিন্তু কে আক্রমণ করবে—সে সম্বন্ধে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। তবে মূল লক্ষ্য কে, তা বুঝতে বিলম্ব হয় না। মূল লক্ষ্য হল সোভিয়েট রাশিয়া। সোভিয়েট রাশিয়া ছাড়া আজ ইউরোপে এমন কোন শক্তি নেই যে, ইউরোপের শান্তিভঙ্গ করতে পারে। তাই সোভিয়েট রাশিয়া অতলান্তিক চুক্তিকে তার বিরুদ্ধে সমরায়োজনের ইঙ্গিত বলেই ধরে নিয়েছে এবং মস্কো বেতার থেকে এই চুক্তির তীব্র নিন্দা করা হয়েছে। অতলান্তিক চুক্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন দেশে কম্যুনিস্টদের মনোভাব দেখেও একথা স্পষ্ট বোঝা যায়। ইটালীয় পার্লামেণ্টে অতলান্তিক চুক্তি আলোচনা প্রসঙ্গে সিনর টোগলিয়াট্টির কম্যুনিস্ট দল ও সিনর নেন্নির বামপন্থী সোস্যালিস্ট দল তো রীতিমত দক্ষযজ্ঞের সূত্রপাত করেছিলেন। অতলান্তিক চুক্তির এই তোড়জোড় দেখে সোভিয়েট রাশিয়াও চুপচাপ বসে নেই। নরওয়ের উপর সোভিয়েট চাপ কিভাবে ব্যর্থ হয়েছে, তা আমরা জানি। এবার সোভিয়েট রাশিয়া চাপ দেওয়া আরম্ভ করেছে সুইডেন ও ফিনল্যাণ্ডের উপর। পরস্পরের বিরুদ্ধে এভাবে সমরায়োজন চলতে থাকলে তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হবে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে। নতুন মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব মিঃ ডীন অ্যাকেসন অতলান্তিক চুক্তির সর্তাদি আলোচনা প্রসঙ্গে আক্রমণের যে ব্যাখ্যা করেছেন, তাতো রীতিমত আশঙ্কার কারণ। তিনি বলেছেন যে, বার্লিনে সরবরাহ রত একখানি বিমান যদি আক্রান্ত হয়, তবে সেটাও অতলান্তিক চুক্তি অনুসারে সামরিক অপরাধ বলে গণ্য হতে পারে এবং তার থেকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধারম্ভ হতে পারে। কোন দেশের অভ্যন্তরীণ বিপ্লবকে আক্রমণ বলে গণ্য করা হবে না। তবে এই ধরণের বিপ্লবের পিছনে যদি বাইরের উস্কানি থাকে, তবে তাকে আক্রমণ বলে গণ্য করা হতে পারে। কিন্তু বাইরের উস্কানি আছে কিনা, তা বিচার করবে কে? নিশ্চয়ই অতলান্তিক চুক্তি স্বাক্ষরকারী দেশগুলি। অতলান্তিক চুক্তির ফল যে কত মারাত্মক হতে পারে, মিঃ ডীন এ্যাকেসনের এই উক্তিই তার প্রমাণ। অতলান্তিক চুক্তির বিরুদ্ধে সোভিয়েট রাশিয়া আবার নতুন কি সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বন করে, তাই জানার জন্যে বিশ্ববাসী উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে।

## ডাচদের টালবাহানা

ইন্দোনেশিয়ার সমস্যা নিয়ে ডাচরা যে টালবাহানা আরম্ভ করেছে, তার ফলে ইন্দোনেশিয়া সম্পর্কিত স্বস্তি পরিষদের ২৮শে জানুয়ারীর প্রস্তাব ব্যর্থ হয়ে গেছে বললে অত্যুক্তি হয় না। এ পরিণতি যে ঘটবে, তা আমরা পূর্বাহ্নেই জানতাম এবং সেরূপে ভবিষ্যদ্বাণীও করেছিলাম। স্বস্তি পরিষদ প্রথম থেকেই ডাচ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতি যে দুর্বলতা দেখিয়ে আসছেন, তাতে সাম্রাজ্যবাদীদের দুঃসাহস বেড়ে যাবারই কথা। হয়েছেও তাই। স্বস্তি পরিষদের প্রস্তাবের একটি নির্দেশও ডাচ সাম্রাজ্যবাদীরা কার্যকরী করে নি। ডাঃ সুকর্ণ, ডাঃ মহম্মদ হাত্তা প্রমুখ ইন্দোনেশিয়া রিপাব্লিকের নেতৃবৃন্দ এখনও বাঁকা দ্বীপে বন্দী। স্বস্তি পরিষদের প্রস্তাবে নির্দেশ ছিল, তাঁদের অবিলম্বে মুক্তি দিয়ে যোগজাকার্তায় স্বাধীন রিপাব্লিকের প্রতিনিধিরূপে কাজ করার অধিকার দিতে হবে। কিন্তু ডাচরা স্বস্তি পরিষদের এ নির্দেশ তো মানেই নি—বরং স্পষ্ট ভাষায় স্বস্তি পরিষদকে জানিয়ে দিয়েছে যে, এ নির্দেশ তারা মানতে পারবে না। স্বস্তি পরিষদের নির্দেশ অবজ্ঞা করেই তারা তাঁবেদার ফেডারেলিস্ট নেতাদের সহায়তায় হেগে গত ১২ই মার্চ একটি গোলটেবিল বৈঠকের ব্যবস্থা করেছিল। এই বৈঠকে যোগদানের জন্যে বন্দী রিপাব্লিক নেতাদের উপর অত্যধিক চাপ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা সে প্রস্তাবে রাজী হননি। তাঁরা স্পষ্টই তাঁদের জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁদের আগে মুক্তি দিয়ে যোগজাকার্তায় রিপাব্লিক পুনঃ প্রতিষ্ঠার অধিকার দিতে হবে। তবেই তাঁরা গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেওয়া না দেওয়ার প্রশ্ন বিবেচনা করে দেখতে পারেন। ফলে ইন্দোনেশিয়ায় আবার সম্পূর্ণ অচল অবস্থার উদ্ভব হয়েছে।

ইন্দোনেশিয়া প্রসঙ্গ নিয়ে আবার তাই লেক সাকসেসে স্বস্তি পরিষদের বৈঠক বসেছিল। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, স্বস্তি পরিষদের সুস্পষ্ট নির্দেশ এভাবে অবহেলা করার জন্যে সাম্রাজ্যবাদী হল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে নিন্দামূলক সামান্য একটি প্রস্তাবও গৃহীত হয়নি। ভারত, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি কয়েকটি দেশ স্বস্তি পরিষদে সুস্পষ্ট দাবী জানিয়েছে যে, ইন্দোনেশিয়ার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোনরূপ আলাপ-আলোচনা আরম্ভ হবার পূর্বে রিপাব্লিককে তাঁর পূর্ণ মর্যাদায় যোগজাকার্তায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সাম্রাজ্যবাদী হল্যাণ্ড স্বাভাবিকভাবেই এর বিরুদ্ধতা করতে গিয়ে জোর দিয়েছে লাল জুজুর ভয়ের উপর। হল্যাণ্ডের ভাবখানা এই যে, সে তো ইন্দোনেশিয়াকে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দেবার জন্যে হাত বাড়িয়েই আছে। কিন্তু মূর্খ রিপাব্লিক তার প্রসারিত হাত কিছুতেই গ্রহণ করছে না। তাই তো তাকে সুপথে আনার জন্যে হল্যাণ্ড সামরিক অভিযান চালিয়ে রিপাব্লিকের অবসান ঘটিয়েছে। এখন আবার যদি রিপাব্লিককে পূর্ব মর্যাদায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা হয়, তবে কি আর রক্ষা থাকবে? সন্ত্রাসবাদে সারা দেশ ছেয়ে যাবে। স্বস্তি পরিষদের স্বার্থবাদী বড় দেশগুলি হল্যাণ্ডের এই কুযুক্তির ফাঁদেই পা দিয়েছে এবং কানাডা কর্তৃক উত্থাপিত যে প্রস্তাবটি স্বস্তি পরিষদে গৃহীত হয়েছে, তার মধ্যে যোগজাকার্তায় রিপাব্লিককে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার কোন ইঙ্গিত নেই। যা আছে, তা হল এই যে, প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হবার আগে ইন্দোনেশিয়ায় রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠানের প্রেরিত সদিচ্ছা কমিশনের মধ্যস্থতায় রিপাব্লিক নেতৃবৃন্দ ও ডাচদের একটি মিলিত বৈঠক বসবে। এখানে পারস্পরিক আলোচনার দ্বারা একটি কার্যক্রম স্থিরীকৃত হবে। সদিচ্ছা কমিশনকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে যারা অতর্কিতে রিপাব্লিকের উপর বর্বর আক্রমণের ব্যবস্থা করতে পারে, তাদের সম্বন্ধে আজও স্বস্তি পরিষদের মোহ ভাঙল না দেখে আমরা বিস্মিত। এতে ইন্দোনেশিয়ার সমস্যা সমাধানের কোন ব্যবস্থাই হবে না—বিলম্বকামী ডাচ সাম্রাজ্যবাদীরা টালবাহানার আরও বেশি সুযোগ পাবে বলেই আমরা মনে করি।

২০-৩-৪৯

---


### কলিকাতার দরে বই কিনুন

আমাদের প্রকাশিত Guide to Bengali Books (Catalogue) এ নানাবিধ পুস্তকের বিস্তৃত সন্ধান পাইবেন। প্রত্যেক শিক্ষিত গৃহের ও লাইব্রেরীর অপরিহার্য। ডাকব্যয় সহ মূল্য ।/০ অগ্রিম M. O.তে প্রেরিতব্য। এতদ্ব্যতীত মফঃস্বলবাসীদের যাবতীয় পুস্তক মূল্যের অর্ধাংশ দিলেই ভিঃ পিঃতে সরবরাহ করা হয়। ডাকব্যয় স্বতন্ত্র। **কুণ্ডু পাব্লিসিটি সোসাইটি অব্ ইণ্ডিয়া,** ১৪৬, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬।
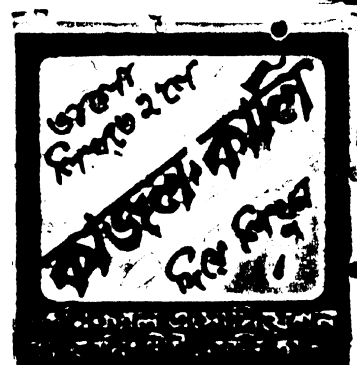
ভবঘুরে

## বিশ্বাস করুন আর নাই করুন

সাউথওয়ার্ক প্রাচীন লন্ডনের একটি পল্লী, শোভাবাজার যেমন কলকাতার। এই সাউথওয়ার্কে খুঁজে বেড়ালে দু'হাজার বৎসর পর্যন্ত পুরাতন কৃষ্টির নিদর্শন পাওয়া যেতে পারে, সেই রোমান যুগ থেকে আরম্ভ করে সেক্সপিয়রের ব্যাংসাইড পর্যন্ত। সাউথওয়ার্কে যে গির্জা আছে সেটি ইংলন্ডের অন্যতম পুরাতন গির্জা আর এই সাউথওয়ার্কেই ছিল গ্লোব থিয়েটার যেখানে সেক্সপিয়ার নিজের নাটক প্রযোজনা করতেন।

হঠাৎ মৃত্যু মমীকৃত হয়ে গেছে।

কিছুদিন পূর্বে সাউথ ওয়ার্কের প্রাচীন কয়েকটি নিদর্শনের একটি প্রদর্শনী হয়ে গেছে। এই প্রদর্শনীর অন্যতম আকর্ষণ ছিল এই সঙ্গে দেওয়া কুকুর ও দুটি ইঁদুরের মমীকৃত (মামমীফায়েড) মূর্তি। ছবিতে দেখা যাচ্ছে কুকুরটি একটি ইঁদুরকে পা দিয়ে চেপে ধরেছে আর অপর একটিকে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরেছে, ঠিক এই মুহূর্তেই প্রাণী তিনটির কোন্ অজ্ঞাত কারণে হঠাৎ মৃত্যু হয়। তাদের দেহ কিন্তু মমীকৃত হয়ে যায় এবং মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে পরে কোনো এক সময়ে পাওয়া যায়। সম্পূর্ণ ঘটনাটি যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না।

## অন্ধ আবার দৃষ্টি ফিরে পেল!

স্যোন হেডিন আমার মতো ভবঘুরে নন। তিনি স্বদেশ সুদূর সুইডেন থেকে চীন ও তিব্বতের এবং ভারতবর্ষেরও বহু দুর্গম অঞ্চল ঘুরে বেড়িয়েছেন ভবঘুরের মতো উদ্দেশ্যহীনভাবে নয়, একটা উদ্দেশ্য নিয়েই। কোথায় সেই মানস সরোবর, সাংপো (ব্রহ্মপুত্র) নদীর উৎসমুখ। তাক্‌লা মাকান আর গোবী মরুভূমি, সব তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন। এ হেন যে স্যোন হেডিন, যিনি প্রথম মহাযুদ্ধে কাইজার উইলহেলমকে আর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে অ্যাডলফ হিটলারকে সাহায্য করেছিলেন, তিনি কয়েক বৎসর পূর্বে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। কিছুদিন হ'ল খবর পাওয়া গেছে যে, তিনি তাঁর দৃষ্টি-শক্তি পুনরায় ফিরে পেয়েছেন। আরও খবর আছে। এখন তাঁর বয়স ৮৩ এবং দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েই আর্জেন্টাইনার কয়েকটি অঞ্চলে অভিযানে যাবার আয়োজন করছেন।

স্যোন হেডিন

## গোঁফের রেকর্ড

ভারতবাসী হলেও বোম্বাইয়ের মসুদিবা দীন্ এখনও ভারতবিখ্যাত হয়ে' ওঠেনি কিন্তু শীঘ্র হবে বলে মনে হচ্ছে। কেন না মাত্র ৩৭ বৎসর বয়সে, নয় বৎসর পরিচর্যার ফলে দীনুজী পৃথিবীতে দীর্ঘতম হ্যান্ডেলবার গোঁফ গজাতে সক্ষম হয়েছেন। এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ফিতে ধরে মাপলে তার গোঁফের দৈর্ঘ্য হয় ৭৬ ইঞ্চি। ভবিষ্যতে আরও বাড়বার আশা ত' নিশ্চয় আছে। অসুবিধে এই যে বেচারী, এমন যে গোঁফ তাকে মোম্ দিয়ে শক্ত করে সোজা রাখতে পারে না। কুণ্ডলী করে পাকিয়ে কানের ওপর ঝুলিয়ে রাখতে হয়। গোঁফের জন্য তেল সাবান ইত্যাদি তাকে কিনতে হয় প্রতিমাসে বারো টাকার।

কেশরীদের কেশ যেমন, গুম্ফজোড়া, মোদের তেমন

## হযবরল ও নৃত্যানুষ্ঠান

গত রবিবার সকালে নিউ এম্পায়ার মঞ্চে শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীগণের উদ্যোগে একটি জলসার অনুষ্ঠান হয়। জলসার মধ্যে আকর্ষণ ছিল নৃত্য, গীত ও সুকুমার রায় রচিত 'হযবরল'র অভিনয়।

নৃত্য, গীত ও অভিনয়ের দিক থেকে শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যে কি অনবদ্য প্রতিভা পরিব্যাপ্ত হয়েছে সেদিনের জলসায় তার একটি প্রমাণ পাওয়া গেলো। তাছাড়া এ ধারণাটাও দৃঢ়তর করার একটা সুযোগ পাওয়া গেলো যে, যে যাই মত পোষণ করুন, একথা অবিসম্বাদিতভাবে সত্য যে, এই সম্প্রদায়ের শিল্পীদের কাছ থেকে কলা ও কৃষ্টির যে বিকাশ দেখা যায়, তা আজও কোন পেশাদারীদের মধ্যে পাওয়া যায় নি। পেশাদারীরা বাজার চালিয়ে যাচ্ছেন সত্যি কথা, কিন্তু তারা যে কতো বাজে, তা এইসব অনুষ্ঠান থেকে ধরা পড়ে যায়। মনও খারাপ হ'য়ে যায় এই ভেবে যে, বাজার চলেছে বাজে জিনিস নিয়ে, আর সত্যিকারের ভালো জিনিস রয়েছে একটা বার্ষিক মিলন-অনুষ্ঠানের মধ্যে গোষ্ঠিবদ্ধ হয়ে।

সেদিনের অনুষ্ঠানলিপির প্রথমার্ধে ছিলো আটটি ভিন্ন ভিন্ন নাচ ও গান আর চিত্রাঙ্গদার একাংশ। এর মধ্যে সবচেয়ে বিস্ময়কর ও অনবদ্য কৃতিত্বের পরিচয় দেন অসমীয়া লোক-নৃত্যে প্রতিভা ও প্রতিমা বড়ুয়া ভগিনীদ্বয়। আবহ পল্লী-গানের সহযোগে নাচটি অপূর্ব হয়েছিল এবং ঐটেই সেদিনের সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ হয়ে দাঁড়ায়। চিত্রাঙ্গদার নৃত্যাংশটিও কথায় ও গানে মনোরম হয়েছিল—অবশ্য কেলু নায়ারের নৃত্যভঙ্গীটা মাঝে মাঝে বেশ দৃষ্টি-কটু ঠেকেছে। গানেতে খুবই তৃপ্তি পাওয়া গিয়েছে সুচিত্রা মিত্রর 'সার্থক জনম আমার' আর শান্তিদেব ঘোষের 'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি' থেকে। কমলা বসুর 'ও চাঁদ চোখের জলে লাগলো জোয়ার' গান, বাণী গুজের 'ফল ফলাবার আশা আমি মনে রাখি নিরে' গান সহযোগে নাচ ও গীতা নাহার 'খেলার সাথী বিদায়' গানও আসরকে জমিয়ে রেখেছিলো।

দ্বিতীয়ার্ধের আকর্ষণ 'হযবরল'। মঞ্চ-অনুষ্ঠানের দিক থেকে এটি একটি অনবদ্য সৃষ্টি। সুকুমার রায়ের লেখা তো সম্পদ বটেই, তাকে রূপায়িত করতেও বেশ উঁচুদরের প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। নাটকটি পরিচালনা করেছেন রামকিঙ্কর বেইজ। পরিকল্পনা, সাজপোষাক, দৃশ্যসজ্জা উপস্থাপন কৌশল সর্বদিক থেকেই নাটকখানি বেশ একটা অভিনবত্ব ফুটিয়ে তুলেছে। 'হযবরল' বাঙলা মঞ্চের ইতিহাসে একটি বিশেষ কীর্তি ব'লে পরিগণিত হবার যোগ্য।

অভিনয়ের দিক থেকে সবচেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন কাকরূপী অমিতাভ চৌধুরী, হিজিবিজবিজএর ভূমিকায় তপেন নিয়োগী, আর ব্যাকরণ সিংয়ের ভূমিকায় সত্য ব্যানার্জী। অন্যান্যের অভিনয়ও নিন্দনীয় নয়। 'হযবরল' রসিক সমাজকে একটি নতুন মনোরম অভিজ্ঞতা সঞ্চারে সহায়তা করবে।

সেদিনের সমগ্র অনুষ্ঠানের মধ্যেই এমন একটা সাংস্কৃতিক আবহাওয়া পরিব্যাপ্ত হতে দেখা গেলো, যা আর কোন অনুষ্ঠানের মধ্যেই পাওয়া যায় না। কেন এবং কি করে এই আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়, পেশাদার প্রমোদকারদের সেটা ভেবে দেখতে বলি।

## 'হঠাৎ হাসির ঝলকানি'

গত শুক্রবার কালিকা মঞ্চে বর্তমান বাঙলার শ্রেষ্ঠতম আটজন হাস্যরসিক এবং নৃত্যবিদ্ মিলে মিত্র-সেন-দাশগুপ্তের প্রযোজনায় একটি রঙ্গানুষ্ঠানের আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানলিপির গৌরচন্দ্রিকাতে এরা অনুষ্ঠানটিকে আমেরিকার vaude-ville-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন। এ দাবীটা অবশ্য বাড়াবাড়ি হয়েছে, যেহেতু vaude-ville-এর যে-রূপ আমরা দেখবার সুযোগ পেয়েছি এবং অভিধানেও তাকে নৃত্যগীত ছিটানো যে ধরণের হাসির নক্সা বলে অভিহিত করা হয়েছে, তার সঙ্গে এ অনুষ্ঠানের সামঞ্জস্য বলতে কিছুই নেই। অনুষ্ঠানটিকে অভিনবও বলা যায় না। সরস্বতী পুজো বা ঐ রকম সব পর্ব উপলক্ষে এ ধরণের অনুষ্ঠানের হিড়িক অনেকদিন আগে থেকেই চলে আসছে। তবে 'হঠাৎ হাসির ঝলকানি' নামটাই ঠিক; কারণ অনুষ্ঠানটি হাসির ঝলক তোলার জন্যেও বটে, আর অনুষ্ঠিতও হয়েছে একেবারে হঠাৎই। তবে লোকের মনকে হালকা করে তোলার প্রচেষ্টায় ব্রতী হওয়ার জন্যে মিত্র-সেন-দাশগুপ্ত ও অন্যান্য সব শিল্পীই সাধারণের কাছে এই অনুষ্ঠানটির জন্যে ধন্যবাদ লাভ করতে পারবেন এবং তাঁরা নিয়মিতভাবে এ ধরণের অনুষ্ঠান করে গেলে রসপিপাসুদের কাছ থেকে সাড়া পাবেন নিশ্চয়ই। এটা হওয়াও দরকার।

অনুষ্ঠানের ন'জন হাস্যরসিক হচ্ছেন রঞ্জিত রায়, নবদ্বীপ হালদার, অজিত চট্টো-পাধ্যায়, জহর রায়, যশোদাদুলাল মণ্ডল, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রোঃ ব্যাণ্ডো ও অমূল্য সান্যাল। কোন বিশেষ একটি নক্সার মধ্যে সবাইকে একজোট করা হয় নি—সকলেই আলাদাভাবে পর পর এসে যার যা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেছেন। শিল্পীদের সকলেরই যার যা নিজস্বতা আছে। রচনায় যেমন, প্রকাশভঙ্গী ও অভিব্যক্তিতেও তেমনি। তাই একজনের সঙ্গে আর একজনের কৃতিত্ব মেপে তুলনা করা যায় না। তবে প্রায় সকলেই একরকম ফাঁকি দিয়েছেন নিজেদের সব পুরনো রচনাগুলির পুনরাবৃত্তি করে। লোকের হাসির মাত্রা থেকে কৃতিত্ব বিচার ক'রলে অজিত চট্টোপাধ্যায় ও জহর রায়ের 'ননসেন্স রিদ্‌মে' আবোলতাবোল ঢঙে দ্বৈত-নাচগান হয় প্রথম যদিও বেলেল্লাপনাটা একটু বেশী হয়ে পড়েছে। তারপরই আসে শীতল বন্দ্যো-পাধ্যায়ের 'বাড়ীর নম্বরের চেয়ে সে-বাড়ীর মেয়ের নাম ক'রলে বাড়ী চেনা যায়' ব্যাঙ্গোক্তি, রঞ্জিত রায়ের 'দাঁত-পড়া' ও 'ভূতপূর্ব বাবা এবার হলো মেসো' গান দুখানি, যশোদা মণ্ডলের 'মডার্ন বেকার তরুণী' গান, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় 'মোক্তারের ইংরিজী' কৌতুক এবং স্বরবাঙ্গে অমূল্য সান্যালের 'রেডিও', প্রোঃ ব্যাণ্ডোর 'ভেণ্ট্রিলোকিজম্' বেশী আনন্দ দিয়েছে; নবদ্বীপ হালদারকে পুরণো হয়ে গিয়েছেন মনে হলো। এ ধরণের বিশেষ অনুষ্ঠানে সকলেরই উচিত ছিলো নতুন রচনা নিয়ে আসরে অবতরণ করা।

পরিশিষ্টে অনাদিপ্রসাদের নায়কত্বে 'পুতুল নাচ'টি বেশ বৈচিত্র্য এনেছে; সাজ-পোষাক ও নৃত্যভঙ্গীতে এটি অভিনব পরিকল্পনা—একেবারে শেষে না দিয়ে গোড়ার দিকে কোথাও দিলে বোধ হয় ভাল হতো।

আর একটি কথা হচ্ছে এ ধরণের অনুষ্ঠানে ঘোষক অর্থাৎ বিদূষকই আসরকে মাতিয়ে রাখে সবচেয়ে বেশী। তার পারিহাস ও ব্যাঙ্গোক্তি যত কিছু ফাঁক পূরিয়ে তুলতে সহায়তা করে। এ অনুষ্ঠানে ওদিক একেবারে ফাঁকা গিয়েছে। যাই হোক এ ধরণের আনন্দ পরিবেশণ যে লোকে খুবই চায়, সেদিনের পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহই তার প্রমাণ। সুতরাং এ অনুষ্ঠানের যে পুনরাবৃত্তি হওয়া উচিত, তা বলাই বাহুল্য। তবে শিল্পীরা নতুন রচনা নিয়ে নামলে লোকে খুশী হবে আরো বেশী।

## রাঙামাটি

(এসোসিয়েটেড ডিষ্ট্রিবিউটার্স—রাধা ফিল্মস)—কাহিনী ও পরিচালনা—প্রণব রায়; আলোকচিত্র—অজয় কর; শব্দগ্রহণ—শচীন চক্রবর্তী; শিল্প-নির্দেশ—বীরেন নাগ; সুরযোজনা—কমল দাশগুপ্ত। ভূমিকায়—জহর গাঙ্গুলী, সত্য চৌধুরী, নীতিশ মুখোপাধ্যায়, কানু বন্দ্যোঃ, সন্তোষ সিংহ, রবি রায়, শ্যাম লাহা, কৃষ্ণধন, তুলসী চক্রঃ, বেচু সিংহ, নৃপতি চট্টোঃ, মাস্টার শম্ভু, চন্দ্রাবতী, সুপ্রভা

মুখোপাধ্যায়, শিপ্রা, অপর্ণা, নমিতা প্রভৃতি। ছবিখানি এসোসিয়েটেড ডিস্ট্রিবিউটার্সের পরিবেশনে মিনার-বিজলী-ছবিঘরে মুক্তিলাভ করেছে।

সময়ের সঙ্গে তাল ফেলে চলাটা সিনেমার পক্ষে যে কতখানি দরকার, 'রাঙামাটি' ছবিখানি দেখতে দেখতে সেই কথাই মনে পড়ে যায় প্রতি-পদেই। মূল প্রতিপাদ্যটা অবশ্য একটা শাশ্বত বিষয় থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু তাকে বিকশিত ক'রে তুলতে যে আবহাওয়া সৃষ্টি ও পারিপার্শ্বিক পট অবলম্বন করা হ'য়েছে, সেইটিই হয়েছে বর্তমান সময়ের একটি বীত-অনুভূতির বিষয়। তাই প্রণব রায় তাঁর কাব্যিক মন দিয়ে বেশ একখানি রাঙা ছবি তৈরী ক'রতে গিয়েও সময়ের সঙ্গে গতি রাখতে না পেরে মাটি করে ফেলেছেন।

'রাঙামাটি'র যোগ ছিলো ছেচল্লিশ নয়তো বড়জোর সাতচল্লিশ সাল পর্যন্ত এবং সে সময়ের মধ্যে ছবিখানি খুবই অভিনন্দন পাবার যোগ্য হতে পারতো। এখনকার দিনে ওর দেশোদ্ধারী নিনাদ ও আর্তনাদব্রত মনকে তেমনভাবে নাচিয়ে তোলে কি? 'রাঙামাটি'র ঐটেই হলো দোষ, আর ঐটেই গুণ।

কাহিনীটি হচ্ছে অরুণ নামক এক পিতৃহীন জন্মপ্রতিভাকে নিয়ে। তার জীবনের বড় ব্রত হলো সংগীত, আর তার চেয়েও বড় দেশোদ্ধার। দুটোতেই মশগুল হয়ে সে বড় হয়ে উঠতে থাকে। ওর বড় হওয়ার সহায়ক হয় পিতৃবন্ধু মাস্টারমশাই, আর বাল্যসঙ্গিনী আশা। অরুণ রাঙামাটি গ্রামের ছেলেমেয়েদের নিয়ে সমিতি প্রতিষ্ঠা ক'রে রাজনীতিক কাজে মেতে ওঠে। কাজেই সে গ্রামের জমিদারের কুদৃষ্টিতে পড়তে বাধ্য হলো; জমিদারের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধলো—ফলে অরুণের ঘর পুড়লো এবং পুলিসও পিছনে লাগলো। বিপদ থেকে বাঁচাবার জন্যে মাস্টার মশাই অরুণকে নিয়ে কলকাতায় চলে এলেন। ঘটনাচক্রে অরুণ এক আসরে আহূত হয় গান গাইবার জন্যে এবং সেখানে আলাপ হলো জয়ন্তী নামক এক মহিলার সঙ্গে। জয়ন্তী আস্তে আস্তে অরুণকে গ্রাস করলে। মাস্টার-মশাই ওকে বাঁচাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু অরুণের কাছে তখন জয়ন্তীর আকর্ষণ অনেক তীব্র। জয়ন্তী জানালে যে, শিল্পী সুন্দরের পূজারী, শিল্পীর কোন দেশ নেই, আর্টের পূজাই তার একমাত্র ব্রত এবং সে অরুণকে সেই পথেই এগিয়ে নিয়ে যাবে। মাস্টারমশাই ফিরে যেতে বাধ্য হলেন। ওদিকে রাঙামাটিতে আশা খাজনা বন্ধ কর আন্দোলন শুরু করে দিয়েছে। সংগ্রাম তীব্র হয়ে উঠেছে, কিন্তু অধিনায়ক নেই। অরুণকে ফিরিয়ে আনতেই হবে। আশা নিজেই চলে এলো কলকাতায় এবং খানিকটা তর্ক ও খানিকটা সেন্টিমেন্টের লড়াইয়ে জয়ন্তীকে পরাস্ত করে অরুণকে তার আকর্ষণ ও মোহ থেকে মুক্ত করে আনতে সমর্থ হলো। অরুণ দেশের কাজকেই আর্টের চেয়ে বড় ব্রত মেনে নিয়ে মুক্তি-আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

এমনিতে কাহিনীটি বেশ আবেগময় ও রসপুষ্ট বোধ করা যায়। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের শাখাপ্রশাখাগুলোকে এত বেশী বাড়িয়ে তোলা হয়েছে, যাতে মূল গুঁড়িটাই গিয়েছে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে ঢাকা পড়ে। জয়ন্তীকে দেখা গেলো একটা কালচারাল আসরের নায়িকারূপে, কিন্তু ব্যক্তিটি কে ও কি, তা রহস্যের মধ্যেই থেকে যায়।

পরিচালনায় প্রণব রায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন আবার দুর্বলতা ও ত্রুটিও বড় কম পাওয়া যায় নি। তবে একথা অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে, তিনি খুব একটা কিছু অযোগ্যতার পরিচয়ও দেন নি। তাঁর কাছ থেকে উন্নততর কৃতিত্ব আশা করা অন্যায় আবদার হবে না।

'রাঙামাটি'র মধ্যে সবচেয়ে বেমানান হয়েছেন অরুণের ভূমিকায় সত্য চৌধুরী। কোন দিক থেকেই নিজেকে ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি, এমন কি তাঁর গাইবার প্রতিভাকেও নয়। ছবিখানির জোর তার জন্যে কমে যেতে বাধ্য হয়েছে অনেকখানি। জহর গাঙ্গুলীর মাস্টারমশাই ছবিখানিকে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত ধ'রে রেখেছে অনেক পরিমাণে অবশ্য তাকে সহায়তা করেছেন মাঝে মাঝে সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়ের অরুণের মা ও আশারূপিণী শিপ্রা। চন্দ্রাবতীর অভিনয়দীপ্তি অনেক ম্লান দেখা গেলো। জয়ন্তীর প্রথম প্রিয়পাত্ররূপে নীতিশ মুখোপাধ্যায়ও তেমন ছাপ দিতে পারেন নি।

ছবিতে গান আছে আটখানি। রবীন্দ্রনাথের 'ও চাঁদ তোমায় দোলা' বাদে সব কখানিই প্রণব রায়েরই রচনা। আশার একখানি ছাড়া সব কখানিই অরুণের গান। কিন্তু সংগীতে অসাধারণ একটি প্রতিভার মতো গাওয়া হয় নি একখানিও। সুরের দিক থেকেও কমল দাশগুপ্ত মাতিয়ে তোলার মতো কৃতিত্ব দেখাতে অক্ষম হয়েছেন।

আলোকচিত্র কয়েকটি ক্ষেত্রে খুবই খারাপ, কৃতিত্বেও পরিচয়ও অবশ্য যথেষ্ট পাওয়া যায়। শব্দগ্রহণ বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই সংলাপকে অস্পষ্ট করে ফেলেছে। শিল্প-নির্দেশে কৃতিত্ব পাওয়া যায়।

**নতুন মহরৎ**

গত ১১ই মার্চ ইন্দ্রপুরি স্টুডিওতে বোসার্ট প্রডাকসন্সের দ্বিতীয় ছবি বঙ্কিম-চন্দ্রের 'রাধারাণী'র শুভ মহরৎ সুসম্পন্ন হয়। পরিচালিক দেবকী বসু অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এবং সজনীকান্ত দাস প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। বহু বিশিষ্ট পরিচালক, সাংবাদিক ও অন্যান্য ভদ্রমহোদয় অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। ছবিখানি পরিচালনা করেছেন সুধীশ ঘটক এবং সুরযোজনা করেছেন অনিল বাগচী।

* * * * *

গত দোল পূর্ণিমার দিন পঞ্চপাণ্ডবের প্রথম অর্ঘ 'উপেক্ষিতা'র শুভ মহরৎ অনুষ্ঠিত হয় ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে। ছবি-খানি পরিচালনাও করেছেন পাঁচজনে মিলে, পঞ্চপাণ্ডব এই ছদ্মনামে এক আলোকচিত্র ও শব্দগ্রহণের ভার গ্রহণ করেছেন কৃষ্ট মুখার্জী ও বাণী দত্ত।

## সাহিত্য-সংবাদ

(ক) প্রবন্ধ : (১) স্বাধীন ভারতে সমাজ-সেবা (যে কেহ প্রতিযোগিতা করিতে পারেন); (২) কি হ'লে আমি ভাল ছেলে হতে পারি (কেবল স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য)। (খ) আবৃত্তি : (১) আজ আমার প্রণতি গ্রহণ কর পৃথিবী—দ্রঃ সঞ্চয়িতা, পৃথিবী (যে-কেহ প্রতিযোগিতা করিতে পারেন)। (২) অসম সময় ধারা বেয়ে মন চলে শূন্যপানে—দ্রঃ সঞ্চয়িতা, ওরা কাজ করে। (গ) বিতর্ক : জাতীয়তাবাদ বনাম সমাজতন্ত্রবাদ (যে-কেহ প্রতিযোগিতা করিতে পারেন)।

প্রত্যেক বিষয়ে তিনটি করিয়া পুরস্কার। রূপার কাপ ও বই। প্রতিযোগিতায় নাম পাঠাইবার শেষ তারিখ ১০-৪-৪৯। বিশিষ্ট সাংবাদিক এবং সাহিত্যিকদিগের সমক্ষে আগামী ৪ঠা বৈশাখ, ১৩৫৬ প্রতিযোগিতা গ্রহণ করা হইবে। সম্পাদক, মিলন সঙ্ঘ, মালা, ফলতা, ২৪ পরগণা।

---

## ডিটেক্টিভ্

ডিটেক্টিভ্ ২য় সংখ্যা বেরুল—সংবাদপত্রের উচ্চপ্রশংসা নিয়ে। প্রথম সংখ্যাতেই ডিটেকটিভ্ পাঠক-পাঠিকাদের মন কেড়ে নিতে পেরেছে—তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি এর অসম্ভব চাহিদা থেকে। এর জন্যে আমরা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি পাঠক-পাঠিকাদের কাছে। রহস্য ও রোমাঞ্চ নিয়ে এ ধরণের আধুনিকতম মাসিক পত্রিকার প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ অভিনব সন্দেহ নেই। এই মাসিক পত্রিকার পাতায় প্রতি মাসেই থাকে রহস্য ও রোমাঞ্চক কাহিনী, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ। আর থাকে ঐতিহাসিক ঘটনা, দেশ-বিদেশের বিপ্লব ও ষড়যন্ত্র কাহিনী, চাঞ্চল্যকর রাজনৈতিক মামলা, দুঃসাহসিক অভিযানের কথা। তাছাড়া থাকে অপরাধতত্ত্বের সম্বন্ধে লেখা। 'যুগান্তকারী' বলতে সাহস নেই, তবে ডিটেকটিভ্ চলেছে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে একথা সবাই বলছেন।

**আনন্দবাজার** বলেন—দেশী ও বিদেশী দুঃসাহসিক ঘটনাবলীর উপর আলোকপাত এবং গোয়েন্দাকাহিনী পরিবেশনই পত্রিকাখানির লক্ষ্য...।

**যুগান্তর** বলেন—ডিটেকটিভ আপন স্বকীয়তায় সমুজ্জ্বল। আমরা নবাগতকে অভিনন্দন জানাই...।

**নেসন বলেন**—ডিটেকটিভ বাংলা সাহিত্যে নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে।

সম্পাদক : শ্রীদীনেশ সরকার

গ্রাহক এবং এজেণ্ট হবার জন্য আজই লিখুন—

প্রতি সংখ্যা ।৷০ — ডিটেক্টিভ অফিস
বার্ষিক চাঁদা—সডাক ৬৷৵০ — ১৪নং বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট,
ষান্মাসিক ... ৩৷৵০ — কলিকাতা—৪

## দেশী সংবাদ

**১২ই মার্চ**—সিউড়ীর (বীরভূম) নিকট তিলপাড়ায় ভারত সরকারের পূর্ত, খনি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ সচিব শ্রীযুত এন ভি গ্যাডগিল ময়ূরাক্ষী নদীতে পরিকল্পিত বাঁধ নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিতে ১৪ কোটি টাকা ব্যয় হইবে।

**১৩ই মার্চ**—পূর্ববঙ্গাগত আশ্রয়প্রার্থিগণের প্রথম দল অদ্য কলিকাতা হইতে আন্দামানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। স্বাধীন ভারতের অধিবাসীরূপে স্থানান্তরে উপনিবেশ স্থাপনের জন্য ইহাই বাঙালীর প্রথম অভিযান।

নয়াদিল্লীতে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের ষড়-বিংশতিতম অধিবেশন আরম্ভ হয়। শ্রীযুত অতুলচন্দ্র গুপ্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

ভারত সরকারের দেশীয় রাজ্য দপ্তরের রাজনৈতিক উপদেষ্টা শ্রীযুত ভি পি মেনন ঘোষণা করেন যে, কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য একত্র সম্মিলিত হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে।

ইন্দোরে প্রাপ্ত এক খবরে প্রকাশ, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বহু পুলিশ ও সমর বিভাগীয় লোকজন ভূপালে প্রবেশ করিয়াছে। ইহাতে সূচিত হয় যে, ভূপাল অনতিবিলম্বে ভারত সরকারের শাসনাধীন হইতেছে।

**১৪ই মার্চ**—নয়াদিল্লীতে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের আলোচনা বৈঠকে ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, কৃষ্টির ক্ষেত্রে কোথাও প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্থান নাই।

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্য আলোচনা বৈঠকে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, বাঙলা দেশ যাহাতে পুনরায় ভারতের নেতৃত্ব লাভ করিতে পারে, তজ্জন্য উহাকে শক্তিশালী করিয়া তুলিতে হইবে। বাঙলা দেশ পিছনে পড়িয়া থাকিলে ভারতবর্ষ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিবে না।

**১৫ই মার্চ**—পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে শিক্ষামন্ত্রী রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর এক প্রস্তাবক্রমে মাধ্যমিক শিক্ষা বিল সম্পর্কে সিলেক্ট কমিটির চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিলের তারিখ আগামী ২৩শে মার্চ পর্যন্ত বাড়াইয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই দিন পরিষদে পশ্চিমবঙ্গ গুড় নিয়ন্ত্রণ বিল এবং কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট সংশোধনী বিল নামে দুইটি সরকারী বিল গৃহীত হয়।

নয়াদিল্লীতে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের তিনদিনব্যাপী অধিবেশন সমাপ্ত হইয়াছে। সাধারণ অধিবেশনে ভাষা সম্পর্কে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার শিক্ষার্থীদের জন্য মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়।

**১৬ই মার্চ**—ভারতীয় পার্লামেণ্টে অর্থ দপ্তরের জন্য অর্থ-বরাদ্দের মোট ২৯টি দাবী মঞ্জুর হইয়াছে। এই দাবীগুলির মোট পরিমাণ ১৪৭ কোটি টাকারও অধিক। অর্থ সচিব ডাঃ জন মাথাই তাঁহার দাবী পেশ করিয়া এই আশা প্রকাশ করেন যে, এপ্রিল মাসের শেষ দিকে দেশে খাদ্যশস্যের মূল্য হ্রাস পাইতে থাকিবে।

পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় রাজপথে যানবাহন চলাচল পরিকল্পনা খাতে মোট ১ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা ব্যয়-বরাদ্দ মঞ্জুরের দাবী উত্থাপন করিয়া ঘোষণা করেন যে, প্রাদেশিক গভর্নমেণ্ট পশ্চিমবঙ্গ, কলিকাতা ও উহার চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থানসমূহে যানবাহন চলাচল ব্যবস্থা জাতীয়করণের প্রথম ধাপ স্বরূপ একটি স্বয়ং শাসিত আইন সৃষ্ট ট্রান্সপোর্ট সৃষ্টি করিতে মনস্থ করিয়াছে।

**১৭ই মার্চ**—ভারতীয় পার্লামেণ্টে সহকারী প্রধান মন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল স্বরাষ্ট্র ও দেশীয় রাজ্য দপ্তর খাতে ব্যয়-বরাদ্দের দাবী পেশ করেন। দাবী দুইটি গৃহীত হয়। সর্দার প্যাটেল বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার দিক দিয়া বলিতে গেলে এক্ষণে দেশের সম্মুখে কোন গুরুতর আশঙ্কার কারণ নাই। তবে সতর্কতা বা হুঁশিয়ারীর কড়াকড়ি হ্রাস করা হইবে না।

পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে রাজস্ব সচিব শ্রীযুত বিমলচন্দ্র সিংহ ভূমি রাজস্ব খাতে ৩৭ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা ব্যয়-বরাদ্দ মঞ্জুরের দাবী উত্থাপন করিয়া বক্তৃতা প্রসঙ্গে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ সম্পর্কে সরকারী মনোভাব বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন যে, এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্ট আর্থিক সাহায্যদানে অসামর্থ্য জ্ঞাপন করায় পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেণ্ট সমগ্র প্রদেশে জমিদারী সহ সর্বপ্রকার খাজনা আদায়ী স্বত্বের উচ্ছেদ পরিকল্পনা বর্তমানে কার্যকরী করিবার আমূল পরিবর্তন করিয়াছেন।

**১৮ই মার্চ**—ভারতীয় পার্লামেণ্টে শিক্ষা খাতে ব্যয়-বরাদ্দের দাবী মঞ্জুর সংক্রান্ত বিতর্কের উত্তর দান কালে শিক্ষা সচিব মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ঘোষণা করেন যে, মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষাদানের প্রসঙ্গ বিবেচনাকল্পে শীঘ্রই প্রাদেশিক শিক্ষা সচিব ও শিক্ষাবিদদের এক সম্মেলন হইবে।

**১৯শে মার্চ**—ভারতীয় পার্লামেণ্টে খাদ্য ও কৃষি খাতে ব্যয়-বরাদ্দের দাবী পেশ করিয়া খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রী শ্রীযুত জয়রামদাস দৌলতরাম ঘোষণা করেন যে, ভারত সরকার দুই বৎসরের মধ্যে খাদ্যে স্বাবলম্বী হইতে বদ্ধপরিকর। ১৯৫১ সালের পর গভর্নমেণ্ট বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানী করিবেন না।

পূর্ববঙ্গ হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থীদের পুনর্বসতির ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেণ্ট যে পরিকল্পনা করিয়াছেন, কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্ট সেই সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেণ্টকে পাঁচ কোটি টাকা ঋণ দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

কলিকাতায় লাট ভবনে পশ্চিমবঙ্গের নব-নিযুক্ত মন্ত্রী শ্রীশ্যামাপ্রসাদ বর্মণের শপথ গ্রহণের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

**২০শে মার্চ**—ভারত সরকারের খাদ্য দপ্তরের রিপোর্টে প্রকাশ, ১৯৪৮ সালে ভারতবর্ষে ২ কোটি ৮৪ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানী করা হইয়াছে এবং উহার মূল্য বাবদ প্রায় ১৭০ কোটি টাকা দিতে হইয়াছে।

## বিদেশী সংবাদ

**১২ই মার্চ**—চীনের আইন পরিষদ অদ্য প্রধান মন্ত্রীরূপে জেনারেল হো ইং চীনের নাম অনুমোদন করিয়াছে।

**১৪ই মার্চ**—ব্রহ্ম সরকার অদ্য ঘোষণা করিয়াছেন যে, কারেন বিদ্রোহিগণকে মার্জনা করা হইবে এবং তাহাদিগকে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সুযোগ দেওয়া হইবে। কারেন বিদ্রোহীরা মান্দালয় শহর সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়াছে।

**১৬ই মার্চ**—দক্ষিণ কোরিয়ার প্রধান মন্ত্রী লী বুক অদ্য ঘোষণা করেন যে, কোরিয়ার দক্ষিণ প্রান্ত হইতে প্রায় ৫০ মাইল দূরে চেহু দ্বীপে কম্যুনিস্টদের নেতৃত্বে পাঁচশত লোক বিদ্রোহ করিয়াছে।

রেঙ্গুণের এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, মান্দালয়ে কম্যুনিস্টদের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

**১৭ই মার্চ**—চীনা সরকারের জনৈক সামরিক মুখপাত্র ঘোষণা করেন যে, প্রায় এক লক্ষ লোক লইয়া গঠিত এবং মার্কিন ও জাপানী বড় কামান দ্বারা অস্ত্র সজ্জিত কম্যুনিস্ট গোলন্দাজ বাহিনী উত্তর দিক হইতে ইয়াংসী নদীর দিকে অগ্রসর হইতেছে।

বৃটেন আজ বুলগেরিয়া, রুমানিয়া ও হাঙ্গারীর বিরুদ্ধে এই বলিয়া অভিযোগ করিয়াছে যে, তাহারা শান্তি চুক্তির সর্তাবলী উপেক্ষা করিয়াছে।

ব্রহ্ম গভর্নমেণ্ট বিদ্রোহীদের অপরাধ মার্জনা করার যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, ইনসিনস্থ কারেন বিদ্রোহীরা তাহার কোন উত্তর দেয় নাই। অদ্য সকাল ৮টায় উত্তরদানের নির্ধারিত সময় উত্তীর্ণ হইয়াছে।

**১৮ই মার্চ**—আটমাস গোপনে আলোচনা চালাইবার পর আটলাণ্টিক চুক্তির খসড়া পশ্চিমের সাতটি দেশের রাজধানীতে প্রকাশ করা হইয়াছে। এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারীরা অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইবে যে, তাহাদের মধ্যে কেহ আক্রান্ত হইলে অন্যান্য সদস্য একত্রে তাহার সাহায্যে অগ্রসর হইবে এবং প্রয়োজন হইলে সশস্ত্র বাহিনী নিয়োজিত করিবে। আগামী ৪ঠা এপ্রিল ওয়াশিংটনে বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, কানাডা, লুক্সেমবুর্গ এবং হল্যাণ্ড কর্তৃক বিশ বৎসরের জন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবে।

**২০শে মার্চ**—চীনা সরকারের নৌ বিভাগীয় জনৈক মুখপাত্র বলেন যে, গতকল্য রাত্রে দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ার হুলুতাও বন্দরে সরকারী বোমারু বিমানবহর 'চুংকিং' ক্রুজারের উপর হানা দিয়া উহা ডুবাইয়া দিয়াছে। গত মাসে ক্রুজারটি কম্যুনিস্ট পক্ষে যোগ দেয়।

প্রতি সংখ্যা—চারি আনা    বার্ষিক মূল্য—১৩৲    ষাণ্মাসিক—৬৷৷৹

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক :—আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সম্পাদক ঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন
সহ সম্পাদক ঃ শ্রীসাগরময় ঘোষ

ষোড়শ বর্ষ ]  শনিবার, ১৯শে চৈত্র, ১৩৫৫ সাল।  Saturday, 2nd April, 1949.  [ ২২শ সংখ্যা

**ভূমে দমন-নীতি**

"বিহারের সংহতি নষ্ট করিবার জন্য ভূমে যাহারা আন্দোলন করিতেছে, যে কোন র্নমেণ্ট তাহাদিগকে কামানের গোলায় ।ইয়া দিত"—গত ২৪শে মার্চ বিহার স্থা পরিষদে বিহার পরিষদের অন্যতম স্য শ্রীমুরলীমনোহর প্রসাদের এই উক্তি াদিগকে একটুও বিস্মিত করে নাই। কারণ ১৫ই মার্চ পুরুলিয়ায় যে ব্যাপার ঘটিয়া াছে, তাহাতে ইহার নমুনা পাওয়া । দোলের রং দেওয়াকে উপলক্ষ্য ায়া পুলিশের সহযোগিতায় গুণ্ডার দল গ্র শহরে তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করে এবং ালীদের উপর মারপিট চালাইতে থাকে। য়াখালির পুনরাভিনয় করা হইবে বলিয়া ালীদিগকে ভয় দেখানোও হয়। শান্তি তষ্ঠার জন্য পুরুলিয়ার বিশিষ্ট ালী কর্মিগণ প্রবৃত্ত হইলে পুলিশ তাহা-াকে বেপরোয়াভাবে গ্রেপ্তার করে। তুত গত ১৪ই এবং ১৫ই পুরুলিয়ায় বাঙালী সমাজের উপর দ্রভাবে যে জুলুমবাজী অনুষ্ঠিত য়াছে, তাহা ডারবানে ভারতীয়দের উপর লুদের অত্যাচারের কথাই আমাদিগকে স্মরণ াইয়া দেয়। ভারত গভর্নমেণ্টের ন্ত্রণাধীনে বাঙলারই একটি প্রতিবেশী ষ্ট্র বাঙালীদের উপর এই ধরণের দুর্ব্যবহার ং দৌরাত্ম্য কিভাবে চলা সম্ভব হয়, ভাবিয়া মরা বিস্মিত হই। কিন্তু মানভূমের এই পারকে আকস্মিকও বলা যায় না। ভারত ধীনতা লাভ করিবার পর হইতে বিহারের শষ্ট কংগ্রেসকর্মীরা তথাকার বাঙালী গ্রেস-সেবকদের উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠেন। ালীদের প্রধান অপরাধ এই যে, তাহারা মাতৃ-ষার অনুরাগী এবং জাতীয় সংস্কৃতির ত শ্রদ্ধাসম্পন্ন। বিহার সরকারের কর্মচারীবর্গ সাক্ষাৎ-সম্পর্কে প্রাদেশিকতার এই আগুনে ইন্ধন যোগাইতে থাকেন। বাঙলা ভাষার সমর্থনমূলক সভা-সমিতি নিষিদ্ধ করা হয়, যাঁহারা বঙ্গ সংস্কৃতিমূলক কোনরূপ আন্দোলনের সঙ্গে কোনভাবে সংশ্লিষ্ট আছেন, তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাঁহাদের বিরুদ্ধে নানারূপ মিথ্যা আজগুবি অভিযোগ আনয়ন করিয়া তাঁহাদিগকে অপদস্থ করা হইতে থাকে। অবশেষে হিন্দীর মাধ্যমে বাঙালী ছেলেমেয়েদিগকে শিক্ষালাভে বাধ্য করিয়া ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। এই সঙ্গে বাঙালীরা বিহারীদের বিরোধী এবং তাহারা বিহারের সংহতি ক্ষুণ্ণ করিতে উদ্যত হইয়াছে, এসব প্রচারকার্যও চলে। সেদিন শ্রীমুরলী-মনোহর প্রসাদের মুখে আমরা সেই প্রচার-কার্যেরই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইয়াছি। নতুবা তাঁহার উক্তিকে আমরা তেমন কোন গুরুত্ব দিতাম না। তাঁহার মত দুই-একজন উত্তেজনাপ্রবণ লোকের হঠতাকে বাঙালী সমাজ উপেক্ষা করিতে পারে। কিন্তু বাঙালী-দের বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক ভ্রান্ত অভিযোগের প্রচারকার্য সমগ্র বিহারের আবহাওয়া দূষিত করিয়া তুলিয়াছে। অথচ অভি-যোগের কোন ভিত্তি নাই। বাঙলার সংস্কৃতি কোনদিন প্রাদেশিকতা স্বীকার করে নাই। মানভূমের বাঙালী কংগ্রেসকর্মীরা শোণিতের অক্ষরে বাঙলার এই সংস্কৃতিকে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন। প্রকৃত-পক্ষে মানভূমের বাঙালী কংগ্রেসকর্মিগণ কংগ্রেসের আদর্শ হইতে কোনদিন বিচ্যুত হন নাই। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিশুদের শিক্ষা বিধানের নীতি কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত এবং ভারত সরকারের দ্বারাই অনুসৃত হইয়াছে। এক্ষেত্রে মানভূমের বিশিষ্ট বাঙালী কংগ্রেস-কর্মীরা শুধু সেই নীতির মর্যাদা রক্ষা করিতেই অগ্রসর হইয়াছেন। সুতরাং বিহারের ঐক্য এবং সংহতি বিনষ্ট করিবার অভিসন্ধি ইঁহাদের বিরুদ্ধে আরোপ করা একান্তই উদ্দেশ্যমূলক। এইরূপ ভ্রান্তভাবে বাঙালী-বিদ্বেষ প্রচার করিবার ফলে কতকটা অনর্থ পাকাইয়া উঠিয়াছে। দোল উপলক্ষে দুই দিনের ব্যাপারেই আমরা তাহার পরিচয় পাইয়াছি। বস্তুত বিহারের কংগ্রেস-কর্মীরা সেখানকার রাজপুরুষদের সঙ্গে যোগ দিয়া বাঙালীদের বিরুদ্ধে বিহারী সমাজের যে বিদ্বেষের আগুন জ্বালাইয়া তুলিয়াছেন, তাহা যে কোনদিন বিহার ও বাঙলা জুড়িয়া ভীষণ অনর্থ সৃষ্টি করিতে পারে। অবস্থার এই গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া মানভূমের বিশিষ্ট কংগ্রেস-নেতা শ্রীযুত অতুলচন্দ্র ঘোষ এ সম্বন্ধে সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বনে উদ্যোগী হইয়াছেন। মানভূম লোকসেবক সঙ্ঘের নেতৃ-স্বরূপে তিনি ৬ই এপ্রিল হইতে সত্যাগ্রহ করিবার সংকল্প প্রকাশ করিয়াছেন। বস্তুত বিহারের কংগ্রেসকর্মী এবং বিহার সরকারের শুভবুদ্ধিকে উদ্রিক্ত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। প্রাদেশিকতার বিষ বিহারের সমাজ-জীবনকে যেভাবে দূষিত করিয়া তুলিয়াছে এবং তাহার ফলে ব্যাপক যে অনর্থ সৃষ্টির প্রতিবেশ পাকা হইয়া উঠিতেছে, ঘোষ মহাশয়ের ন্যায় আদর্শ-নিষ্ঠ কংগ্রেসকর্মীর বিবেকবুদ্ধি ইহাতে ব্যথিত হইয়া পড়িয়াছিল। এই বিপদ যাহাতে প্রতিহত হয় এবং প্রাদেশিকতার বিষ হইতে তথাকার সমাজ-জীবন মুক্ত হয়, সেই জনাই তাঁহার এই উদ্যম। আমরা আশা করি,

বিহারের কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দ এখনও বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করিবেন এবং ৬ই এপ্রিলের মধ্যেই যাহাতে এই ব্যাপারের একটা সন্তোষজনক মীমাংসা ঘটে, তেমন ব্যবস্থা করিবেন। সে মীমাংসার অঙ্গস্বরূপে সেদিন পুরুলিয়ার যাহারা উপদ্রব করিয়াছে এবং শান্তিরক্ষকের উর্দি পরিয়া যাহারা অশান্তি ঘটাইয়াছে, তাহাদিগকে সাজা দিতে হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য; কিন্তু তাহাই যথেষ্ট নয়। বাঙলাভাষাভাষীদের বিরুদ্ধে বিহার সরকার শিক্ষাসম্পর্কিত যে নীতি অবলম্বন করিয়া চলিতেছেন, অশান্তির মূল কারণ তাহাই। বিহার সরকারের সে নীতির সংস্কার সাধন করা একান্তই প্রয়োজন। বস্তুত বাঙলার প্রতি তাঁহাদিগকে আমরা এই বিশেষ অনুগ্রহ দেখাইতে বলিতেছি না; পক্ষান্তরে তাঁহাদিগকে আমরা এ সম্বন্ধে সচেতন করিয়া দিতে চাই যে, বিহারের কল্যাণের জন্যই তাঁহাদের ইহা করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে শ্রীযুত অতুলচন্দ্র ঘোষ মহাশয় সেই কল্যাণ-বুদ্ধিকেই জাগাইতে চান। এখনও যদি তাহা না জাগে এবং এই ব্যাপার লইয়া বিহার সরকারের বিরুদ্ধে সত্যই তাঁহাকে সত্যাগ্রহ অবলম্বন করিতে হয়, তবে অবস্থা জটিল হইয়া উঠিবে।

**যুক্তির অভিনবত্ব**

বাঙলাভাষাভাষী অঞ্চলগুলির উপর বিহারের দাবী প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য অভিনব যুক্তি অবলম্বন করা হইতেছে। বিহারের একদল কংগ্রেস-নেতা তাঁহাদের অতীতের যুক্তি এবং প্রতিশ্রুতি বেমালুম বিস্মৃত হইয়াছেন। তাঁহারা এখন এই ধুয়া তুলিয়াছেন যে, বিহারীদের উপর জোর করিয়া বাঙলা ভাষা চাপান হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে বিহারের সর্ব সম্প্রদায়ের মৌলিক ভাষা হিন্দী ছাড়া আর কিছু নয়। বিগত আদম সুমারীতে মানভূমের অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৮৭ জন বাঙলাভাষাভাষী বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। এই হিসাবের যাথার্থ্য ই'হারা গায়ের জোরেই উড়াইয়া দিতে চাহেন। প্রাদেশিকতার সংস্কার ই'হাদিগকে এমনভাবেই অভিভূত করিয়াছে। ই'হারা নিজেদের জিদ্ কিছুতেই ছাড়িতে প্রস্তুত নহেন, সেজন্য যুক্তি-বুদ্ধিকে সকল রকমে অগ্রাহ্য করিতে প্রস্তুত হইয়াই আছেন। পুরুলিয়ার ব্যাপারের কৈফিয়ৎস্বরূপে সেদিন বিহার পরিষদে বিহারের শিক্ষামন্ত্রী আচার্য বদরীনাথ শর্মার উক্তিতেও এমন উৎকট মনোভাবেরই আমরা পরিচয় পাইয়াছি। শিক্ষাসচিব শর্মা মহাশয় এ প্রসঙ্গে মানভূমের প্রাচীন ঐতিহ্যের অবতারণা করিয়াছেন। ইতিহাস-পণ্ডিতের ভূমিকায় বিহারের শিক্ষা সচিবের আহাম্মকী মুরলীমনোহর প্রসাদের গোয়ার্তুমীকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। তিনি আমাদিগকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, মানভূমের অধিবাসীদের ভাষা আগে বাঙলা ছিল না। বাঙালী রাজকর্মচারীদের পাল্লায় পড়িয়া অধিবাসীরা বোল বদলাইয়া ফেলিয়াছে। এমন যুক্তির বলিহারী দিতে হয়। কিন্তু কোন্ যুগে মানভূমের ভাষা প্রাকৃত ছিল, কি পাশী বা মাগধী ছিল এক্ষেত্রে সে প্রশ্ন একেবারেই উঠে না। বর্তমানে মানভূমে বাঙলাভাষাভাষীদের ছেলেমেয়েদের উপর প্রাথমিক শিক্ষার বাহনস্বরূপে হিন্দীকে জোর করিয়া চাপানো হইতেছে, ইহাই অভিযোগ। শিক্ষাসচিব সুকৌশলে সে অভিযোগ এড়াইয়া গিয়া অবান্তরভাবে প্রলাপোক্তি করিয়াছেন। কলিকাতার কোন স্কুলে হিন্দী ভাষাভাষী সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার মাধ্যমে বাঙলা ভাষা চাপানো হইতেছে, তিনি এমন একটি নজীরও উপস্থিত করিতে পারেন কি? মানভূমের কমিশনারের কাজ তিনি অকুণ্ঠিত ভাষায় সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার যুক্তি এই যে, মানভূমকে বাঙলার অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য একদল লোক অশান্তি সৃষ্টির উদ্যোগে আছে, ডেপুটি কমিশনার শান্তি এবং আইন রক্ষার উদ্দেশ্যেই ইহাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। বলা বাহুল্য, স্বৈরাচারী বৃটিশ শাসকগণ শান্তি এবং আইন রক্ষার যে ধরণের মামুলি কৈফিয়ৎ উপস্থিত করিতেন, এক্ষেত্রেও আমরা তাহারই পুনরাবৃত্তি শুনিতে পাইয়াছি। কিন্তু এই ধরণের যুক্তি কোন বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিকেই সন্তুষ্ট করিতে পারে না। বিহারের বাঙলাভাষাভাষী অঞ্চলে তাঁহারা ক্রমাগত অবিবেচিত উৎপীড়ন-নীতি সম্প্রসারিত করিতেছেন, তাহা বাঙালী সমাজকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছে, ইহা তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত। তাঁহাদের উপলব্ধি করা দরকার যে, সহ্য গুণেরও একটা সীমা আছে এবং তাঁহাদের আচরণ ইতিমধ্যেই বাঙালীর সহ্য-সীমাকে অতিক্রম করিয়া ফেলিয়াছে। বাঙালী অন্যায় কোন দাবী করিতেছে না। মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার যে অধিকার ভারত সরকার তাঁহাদের নীতি হিসাবে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, তাহারা তাহাই চাহিতেছে। ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের নীতি কংগ্রেসের বিঘোষিত নীতি, বাঙালী তাহারই মর্যাদা মানিয়া লইতে বলিতেছে। বিহারের কংগ্রেস-কর্মীরা প্রাদেশিকতার বশে যতটাই অন্ধ হন না কেন, তাঁহারা নিশ্চিতভাবে ইহা জানিবেন যে, বাঙলার সংস্কৃতি যথেষ্টই বলিষ্ঠ। তাঁহারা জোর করিয়া বাঙলা ভাষাকে বিলুপ্ত করিতে পারিবেন না। পক্ষান্তরে তেমন অপ-প্রচেষ্টায় আর বেশি অগ্রসর হইলে তাঁহাদের নিজেদের অনর্থ এবং সমগ্রভাবে ভারতীয় রাষ্ট্রের অনর্থকেই বিহারীরা ডাকিয়া আনিবেন। ফলতঃ সাম্প্রদায়িকতার অভিসম্পাত আমরা ষোল আনাই ভোগ করিয়াছি, কিন্তু প্রাদেশিকতা ততোধিক অনর্থের আতঙ্ক সৃষ্টি করিয়াছে। তাঁহারা সমগ্র ভারতের বৃহত্তর স্বার্থের দিকে তাকাইয়া বাঙালী-বিদ্বেষের দুর্বুদ্ধি হইতে নিবৃত্ত হউন।

**শহীদ ক্ষুদিরাম**

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ২রা এপ্রিল মজঃফরপুরে ক্ষুদিরাম বসুর স্মৃতির ভিত্তি স্থাপন করিতেছেন। বাঙলার অগ্নিযুগের আত্মদাতা বীরের স্মৃতি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। বাঙলার কবি ক্ষুদিরামের আত্মদানকে উপলক্ষ করিয়া লিখিয়াছিলেন—হে অমর নব সন্তান, তব গৌরব-গাথা হবে না নীরব' চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সে উক্তি সার্থক হইয়াছে। ক্ষুদিরামের গৌরব-গাথা নীরব হয় নাই। বাঙলার বীর সন্তানের চিতার আগুন সর্বত্র দ্বিগুণ হইয়া জ্বলিয়াছে এবং বিপ্লবের বহ্নিশিখা বিস্তার করিয়া বিদেশীর প্রভুত্ব ভস্মীভূত করিয়াছে। আত্মদাতার শোণিতোৎসর্গ কোনদিন ব্যর্থ হয় না। আজ ভারতের রাষ্ট্রীয় সংগ্রামের হিংসা এবং অহিংসার বিচিত্র গতির ভিতর দিয়া এই সত্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। ক্ষুদিরাম মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইয়া অমরত্বের অধিকারী হইয়াছেন। তাঁহার ত্যাগ-মহিমায় বাঙালী জাতি ধন্য হইয়াছে। আমরা সকলে গৌরবান্বিত হইয়াছি। এই প্রসঙ্গে বিহারের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুত শ্রীকৃষ্ণ সিংহের একটি উক্তি আমাদের স্মরণ হইতেছে। দুই বৎসর পূর্বে জাতীয় সংগ্রামের বাঙলার অবদানের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "রাষ্ট্রীয় সাধনায় বাঙলার কথা আমরা বিস্মৃত হইতে পারি না। আমাদেরই অদূরে বালক ক্ষুদিরাম যেভাবে দেশের মুক্তিযজ্ঞে আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছিল, আমরা কি তাহা বিস্মৃত হইতে পারি?" ভারতের স্বাধীনতা আজ আসিয়াছে; কিন্তু বাঙলার দেশপ্রেমের সেই গৌরবময় ঐতিহ্যের স্মৃতি এবং অগ্নিময় তাহার প্রেরণা প্রাদেশিকতায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে, ইহা একান্তই দুঃখের বিষয়। সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রীয় সাধনায় অনুপ্রাণিত হইয়া বাঙলার বীর সন্তানেরা যে কিভাবে প্রাণ দিয়াছিল, বাঙলার প্রতিবেশী রাষ্ট্রের নিয়ামকেরা তাহা সত্যই বিস্মৃত হইতে বসিয়াছেন। পক্ষান্তরে বাঙালীরা প্রাদেশিক মনোবৃত্তি লইয়া চলে, তাহারা ভারতের সংহতি বিচ্ছিন্ন করিতে চায়, এই ধরণের অভিযোগ উত্থাপন করিতেও ই'হারা ইতস্তত করিতেছেন না। ক্ষুদিরামের স্মৃতিপূজায় এই দুর্দৈবের নিরসন হোক্। বাঙলার বীর সন্তান বিহারের গণ্ডকী-তীরে যে 'গৌরব-ভরা কীর্তি-পসরা' রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রভাবে জাতি প্রাণবন্ত হইয়া উঠুক এবং সব সংকীর্ণতা হইতে

মুক্তিলাভ করুক, এই প্রার্থনা অন্তরে লইয়া আমরা এই উপলক্ষে শহীদ ক্ষুদিরামের স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

**পূর্ব পাকিস্থানের পুলিশ**

সেদিন পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থা-পরিষদে পুলিশের ব্যয়বরাদ্দ মঞ্জুরী লইয়া যে বিতর্ক হইয়া গিয়াছে, তাহার কয়েকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। পাকিস্থানের শাসন-নীতি সাম্প্রদায়িক, পূর্ব-বঙ্গের প্রধান মন্ত্রীকে সেদিন এ কথাটা প্রত্যক্ষ-ভাবে না হোক্, অন্ততঃ পরোক্ষভাবে স্বীকার করিতে হইয়াছে। পূর্ববঙ্গের শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে জনাব নুরুল আমীন বলেন, মুসলিম লীগের প্রচেষ্টাতেই পাকিস্থান প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইয়াছে; সুতরাং পাকিস্থানকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার পবিত্র দায়িত্ব এখনকার মত মুসলিম লীগের উপরই রহিয়াছে। কিন্তু সেজন্য সংখ্যা-লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের আতঙ্কের কোন কারণ নাই। বলা বাহুল্য, রাষ্ট্রের শাসন-নীতি যদি সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা প্রভাবিত হয়, তবে এই ধরণের আশ্বাস যে শাসন-সম্প্রদায়ের সব স্তরে কার্যকর হয় না, পূর্ববঙ্গের প্রধান মন্ত্রী এই সহজ সত্যটি এক্ষেত্রে চাপা দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু রাষ্ট্রনীতির এই মৌলিক সত্যটি চাপা দিলেও বাস্তব অবস্থাকে তিনি অস্বীকার করিতে পারেন নাই। পাকিস্থান প্রবর্তিত হইবার পর পূর্ববঙ্গের পুলিশ বিভাগের যে কিছুটা অবনতি ঘটিয়াছে, জনাব নুরুল আমীনকে একথা স্বীকার করিতে হইয়াছে। তিনি জনসাধারণের সহিত ব্যবহারে পুলিশ বিভাগকে ভদ্রতা ও শালীনতা রক্ষা করিয়া চলিতে বলেন এবং পুরাতন দৃষ্টিভঙ্গী পরিহার করিতে উপদেশ দেন। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হইতেছে এই যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্র-দায়ের রাষ্ট্রগত চেতনার উপর শাসন বিভাগের সততা এবং বিশুদ্ধি প্রধানত নির্ভর করে। বস্তুত জনসাধারণ যদি নৈতিক দায়িত্বে জাগ্রত না হয়, তবে শাসকদের হাতে ক্ষমতা গেলে তাহার অপব্যবহার ঘটিবেই। রাষ্ট্রনীতিতে ইহা বাস্তব সত্য এবং এক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষের ভাবপ্রবণতার কোন মূল্য নাই। এই জনচেতনাই ক্ষমতার অপ-প্রয়োগ হইতে শাসকদিগকে সংযত রাখে। পূর্ববঙ্গের শাসননীতিতে সংখ্যা-গরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের এই বোধ প্রতিফলিত হইতেছে না। সাম্প্রদায়িকতাকেই লীগ একমাত্র আদর্শ স্বরূপে গ্রহণ করিয়াছিল এবং উগ্র সাম্প্রদায়িক ভেদবাদই পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার প্রধান উপায় স্বরূপে গৃহীত হয়। পূর্ব বঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মন এবং বুদ্ধিতে সেই ভেদবাদের পাকই জড়িত রহিয়াছে। জীবন্ত অন্য কোন বৃহত্তর আদর্শ এ পর্যন্ত তাহা অপসৃত করিতে পারে নাই। একমাত্র কংগ্রেসই সমগ্র ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিয়াছে, রক্ত ঢালিয়াছে। পাকিস্থান ভারতের স্বাধীনতার জন্য কিছুই করে নাই। পক্ষান্তরে সাম্প্রদায়িকতার ভাব জাগাইয়া তাহার প্রতিবন্ধকতাই করিয়াছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের এই সাম্প্রদায়িক বৈষম্যমূলক মনোবৃত্তি পূর্ব পাকিস্থানে আজও শাসকদিগকে ক্ষমতার অপপ্রয়োগে প্রণোদিত করিতেছে। নোয়াখালির গান্ধী শিবিরের কর্মীদের উপর পুলিশের জুলুমবাজী ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। শিবিরের কর্মীরা সেবাধর্মী এবং গান্ধীজীর নির্দেশিত পবিত্র কর্তব্যের দায়িত্ব লইয়াই তাঁহারা কাজ করিতেছেন। ইঁহারা জনসাধারণের স্বার্থের বিরোধী কোন কাজ করিবেন, দেশের লোক তাহা বিশ্বাস করে না। প্রকৃতপক্ষে ইঁহাদের কাহারো বিরুদ্ধে এ পর্যন্ত কোন অভিযোগ প্রমাণিতও হয় নাই। কিন্তু উগ্র সাম্প্র-দায়িক মনোবৃত্তিসম্পন্ন একদল লোক এইসব নিরীহ কর্মীদিগকেও অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে। এই সম্পর্কে নোয়াখালি হাঙ্গামায় কুখ্যাত গোলাম সারোয়ারের নাম বিশেষভাবে শোনা যাইতেছে। বস্তুত লীগ প্রভুত্বের সাম্প্রদায়িক প্রতিবেশ ইহাদিগকে স্পর্ধিত করিয়া তুলিয়াছে। ইহারা নিজেদিগকে রাষ্ট্রের হর্তাকর্তা বিধাতা বলিয়া মনে করে। শাসনবিভাগীয় কর্মচারীদের মধ্যে যাঁহারা ভাল লোক, তাঁহারাও ইহাদের কুটচক্রের পাক কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছেন না। সংখ্যাগরিষ্ঠদের দ্বারা শাসননীতি পরি-চালিত হয় সেই সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মধ্যে যেখানে সাম্প্রদায়িকতা বোধ প্রবল এবং রাষ্ট্রীয় চেতনা বিকাশ পাইবার মত সুযোগের একান্তই অভাব, সেখানে এমনটা ঘটিবেই। সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত লীগের কর্তৃত্ব শাসনবিভাগকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে পুরাদস্তুর চলিবে, অথচ অসাম্প্র-দায়িক উদার আদর্শ শাসন-ব্যবস্থার নিম্নতম বিভাগগুলিতে সম্প্র-সারিত হইবে এবং পুলিশেরা পর্যন্ত সর্বসম্প্রদায়ের স্বার্থ সম্বন্ধে সমবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া সেবাব্রতে প্রবৃত্ত হইবে, এমন আশা একান্তই অবাস্তব।

**উদ্বাস্তুদের পুনর্বসতি বিধান—**

ভারত গভর্নমেণ্টের পুনর্বসতি বিধান বিভাগের মন্ত্রী শ্রীমোহনাল শকসেনা সম্প্রতি পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের সম্বধে ভারত সরকারের অবলম্বিত নীতির তাৎপর্য স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্থান হইতে ব্যাপকভাবে বাস্তু-ত্যাগের জন্য লোকে যাহাতে উৎসাহী হয়, গভর্নমেণ্ট এমন কিছু করিতে চাহেন না; কিন্তু অবস্থার চাপে পড়িয়া তাহারা বাস্তুত্যাগ করিতে বাধ্য হইলে, তাহাদের সাহায্য বিধানের সম্পর্কে পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্থানের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করা হইবে না। অবশ্য শকসেনা মহা-শয়ের একটি উক্তিতে এক্ষেত্রে পার্থক্যের কথা কিছু সূচিত হইয়াছে। ভারতীয় পার্লামেণ্টে এতৎসম্পর্কিত বিতর্কের উত্তর প্রসঙ্গে তিনি এই কথা বলিয়াছেন যে, পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্থানের উদ্বাস্তুদের সম্বন্ধে অবলম্বিত নীতিতে কিছু পার্থক্য থাকিবেই; কারণ পূর্ব পাকিস্থানের উদ্বাস্তুরা অনেকে এখনও পূর্ব-বঙ্গে যাওয়া আসা করিতেছে। ইহাদের পুনর্বসতি বিষয়ের দায়িত্ব লওয়া গভর্নমেণ্টের পক্ষে সম্ভব নয়। ভারতের পুনর্বসতি বিধান বিভাগের মন্ত্রীর এ উক্তির সত্যতা আমরাও স্বীকার করি; কিন্তু যাঁহারা স্থায়ীভাবে পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের পুনর্বসতি বিধানের সরকারী দায়িত্ব ইহাতে কমে না এবং সেই দায়িত্ব প্রতিপালনের গুরুত্বের দিকেই আমরা পুনঃ পুনঃ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। শ্রীযুক্ত শকসেনা আমাদিগকে এত-দূর পর্যন্ত আশ্বাস দিয়াছেন যে, উদ্বাস্তুদের প্রত্যেক পরিবারের জন্য সরকার গৃহের ব্যবস্থা তো করিবেনই, অধিকন্তু তাহাদের জীবিকা অর্জনেরও সুবিধা করিয়া দিবেন। উদ্বাস্তুদের গৃহ নির্মাণের জন্য অবিলম্বে জমির ব্যবস্থা করা হইবে। প্রকৃতপক্ষে উদ্বাস্তুদের জন্য গৃহের সংস্থান এবং গৃহ নির্মাণের নিমিত্ত জমি বিলির ব্যবস্থা করাই আমরা প্রথমে প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুদের সম্বন্ধে এইদিকে এ পর্যন্ত কোন কাজই করা হয় নাই। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ কাজে অর্থ ব্যয় না করিয়াছেন, এমন নয়, কিন্তু উদ্বাস্তুদের বাস্তুবিধানের জন্য সুনির্দিষ্ট কোন পরিকল্পনা লইয়া অগ্রসর না হওয়ার দরুণ তাঁহাদের সে অর্থব্যয় স্থায়ীভাবে উদ্বাস্তুদের সমস্যা সমাধানের পথে সামান্য কাজেই আসিয়াছে। অবশ্য এ সম্বন্ধে সরকারের পক্ষে অসুবিধাও যে অনেক আছে আমরা সে কথা অস্বীকার করিতেছি না; কিন্তু ইহাদের প্রত্যেকের জন্যই যে প্রাসাদ তৈয়ারী করিয়া দিতে হইবে, এমন কথা কেহ বলিতেছে না। প্রকৃতপক্ষে মাথা গুঁজিবার জায়গাটুকু পর্যন্ত ইঁহাদের নাই। অনেকেই একান্ত নিরাশ্রয় অবস্থায় পতিত হইয়া এখানে সেখানে ঘুরিতেছে। আগে ইঁহাদিগকে দাঁড়াইবার জন্য একটু জায়গা দেওয়া দরকার। সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের অন্য সব পন্থা পরেও হইতে পারে। কিন্তু মাথা রাখিবার জায়গাটুকুও অন্ততঃ আগে চাই। এই উদ্দেশ্যে গ্রাম অঞ্চলে এবং যেখানে সুবিধা শহরের উপকণ্ঠভাগে উদ্বাস্তুদের স্থায়ীভাবে বসতি বিধানের ব্যবস্থা করা অবিলম্বে প্রয়োজন।
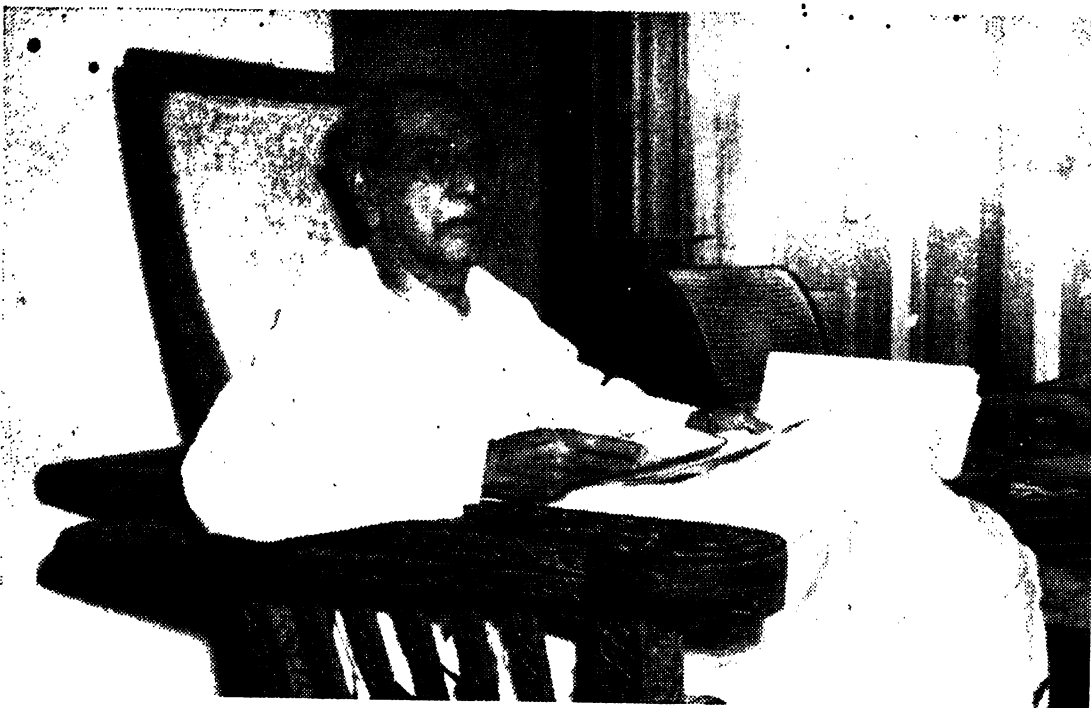
শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ-জয়ন্তী দিবসে গৃহীত চিত্র

অবনীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে কলিকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ কর্তৃক শিল্পীগুরুকে অভিনন্দন জ্ঞাপন

রসের আবেগভরে চিরন্তন রূপের আকৃতি,
মর্মে মর্মরিত চির বোবা অনুভূতি,
প্রাণ ভ'রে নিয়ে যাব এই।
অন্ত নেই কোনো কালে, অন্ত নেই নেই
জন্মে জন্মে লোকে লোকে।
প্রাণের বাহিরে এই অনিন্দ্য আলোকে
মূর্তিমন্ত করিলাম যত প্রাণনিধি,
[ আবেগগদ্‌গদ হায় হৃদি ]
বাগর্থমণ্ডিত করি গীতিমূর্ছনায়
স্বপন সাধ অনুরাগ যত কেন সাধিলাম হায়,
রয়ে গেল চিরন্তন রূপের আকূতি—
মর্মরিত বোবা অনুভূতি—
প্রাণ ভরে নিয়ে যাব এই।
মরি রে, কোথাও অন্ত নেই
ভুবনে ভুবনে।

ফিরে ফিরে জাগে আজ মনে
রুদ্ধ মন্দিরেতে ক্ষুদ্র ভবনের কোণে
পড়ে যা রয়েছে প'ড়ে থাক্।
ভীরু মূঢ় মানবেরা বিস্ময়ে অবাক্
আরাধনা করে যদি তারে—
ধূপ দেয়, দীপ দেয়, নিত্য ধুলো ঝাড়ে—
আমি যে শুনেছি নিত্য নবীনের ডাক।
পড়ে যা রয়েছে প'ড়ে থাক্।

চিরচঞ্চলের অনুসারী
ধূলে ধূলে ফুলে ফুলে পদচিহ্ন তারি
নিশিদিন খুঁজি।
চকিত সে পদস্পর্শে বুঝি
ফুটে ভাবভাষা;
কায়ার আকৃতি লয়ে কম্পমান আশা
প্রাণের, নিমেষে ফুটে অভিনব রূপে—
রেখার ভঙ্গীতে ভরে, বর্ণের সঙ্গীতে চুপে চুপে
অপূর্ব অনুপ
নির্নিমেষ নেত্রে কেন ওঠে বেজে বেজে। হায়, রূপ!
হায় ভাষা! হায় আশা! ক্ষণরসাবেশ!
পরশনস্মৃতি-ভরা সঙ্গীতের রেশ
নীলাম্বরে তখনি মিলায়

চিরচঞ্চলের অনুসারী
চরণসঙ্গীতে তার চিরমূর্তি দানিতে কি পারি
আমি কবি, আমি রূপকার!

ধর্ম, নীতি, পরউপকার,
আমার তাহাতে নাই কাজ।
যে দেবতা রূপে রূপে করিছে বিরাজ,
দেবতা ব'লেও সদা বুঝিতে পূজিতে নাহি পারি,
অহরহ আরাধনা তারি—
মুগ্ধ দুটি দৃষ্টিদীপে প্রীতি উদ্‌ভাসিয়া,
প্রাণে প্রাণে পটে পটে আনন্দনিষ্যন্দী তুলি দিয়া
আঁকিয়া আঁকিয়া।

সজ্জননিন্দিত পথে তাই অভিসার
প্রাণের আমার।
সোনা মণি সঞ্চয়ের নাই কোনো তৃষা;
জড় ও যে। তর্কে কভু নাহি পাই দিশা;
সূক্ষ্ম সত্য কখনো খুঁজি না।
আমি তো বুঝি না
ভক্ত কেন চক্ষু মুদে রয়।
নিরুদ্ধইন্দ্রিয় যোগ উপাসনা নয়—
নয়নে শ্রবণে ঘ্রাণে অঙ্গে অঙ্গময়
সুন্দরের আরাধনা। হায় গো কবীর,
হাসি পায়, তৃষিত যে গহন গভীর
সলিল-বিহারী মীন।
অহরহ সুন্দরের অঙ্কে রহি লীন,
সুন্দরের সন্ধানেই ফিরি প্রতিদিন—
সীমাহীন এই তো কৌতুক।
বিরস গম্ভীর মুখ—
ধর্ম, নীতি, পরউপকার
নয় গো আমার।

দিশে দিশে কাঁদে ওরা, দাও দাও ভাষা,
চিরবিরহীরে তব বক্ষে দাও বাসা;
যে হও সে হও
অপরূপ ক্ষণটিরে ছিনাইয়া লও

মৃত্যু হতে; সুচিরনূতন
অনুপমদীপ্তিভরে তারার মতন
যুগান্তরঅন্ধকার বিদ্ধ যেন করে
মানবের হৃদয়অম্বরে।
গিরি বন দশদিক কাঁদে পশুপাখি;
কাঁদে ধূলি; কাঁদে ফুল; ছিন্নবস্ত্রআবরণে থাকি
অনাদৃত ভিক্ষুণীযৌবন,
ভস্মে হুতাশন;
হাটুরে বাটুরে;
গৃহহীন বেদে ভবঘুরে;
গুণ্ঠিত কুণ্ঠিত বধূ লজ্জিত বাসরে;
পূজারিণী অর্ঘ্যথালা সুসজ্জিত ক'রে
মন্দিরসোপানে বসি; লুব্ধ যেই ছাগ
চুরি করে দেবতার ভাগ;
কাজরীউৎসবে তরুণীরা;
বলাকাচকিত ঘন; যমুনা সে নীপকুঞ্জতীরা;
আর, এই দীপ্ত দ্বিপ্রহর—
দিশে দিশে মধুচক্রগুঞ্জিত শহর;
পথে পথে জনস্রোতে যানস্রোতে ভাসি
ক্ষণে ক্ষণে কত কান্না হাসি,
রূপের ঝলোক;
কত মুখ কত চোখ;
যুবক কিশোর; সোনা
জননীর অঙ্কনিধি দিলে যেন চারু চাঁদকোণা।
স্নেহের প্রেমের দুঃখে সুখে
যে ব্যথা বহিয়াছিল মহাশ্বেতা বুকে,
যে ব্যথায় শাজাহান বিশ্বের সম্মুখে
বিকাশিল মর্মরকুসুমে,
সেই ব্যথা মূক চিত্ত চুমে'
পথভিক্ষুকের।
বিশ্বময়
সম্মিলিত কণ্ঠে ওরা কয়ঃ
মানববুকের
দাও ওগো দাও বাসাখানি,
দাও ভাষা আনি।
যে গুণীর পদস্পর্শ লাগি
যুগে যুগে বসুন্ধরা নিত্য আছে জাগি
নীলসিন্ধুবস্ত্রপরিহিতা
আকাশবিস্মিতা
হিমাচলচূড়ে,
দূরে হায় দূরে
কোন্ গ্রহনক্ষত্রের পুরে
আজি সে ঘুমায়?

কবে নবপ্রভাতের আলোকচুমায়
জাগিবে সে এই মর্ত্যপরে
মানবের ঘরে?
ভাষা দিবে মূক ত্রিভুবনে,
অমৃতমুরতি দিবে দুঃখসুখচঞ্চলিত ক্ষণে
জীবনে জীবনে।
[যে ভাষা দিয়েছি, আজও, কিছু হয় নাই।
কী রূপ রচিনু, ছাই,
প্রাণঅনুরাগে!]
ধরণীর গূঢ় মর্মে জাগে
কী আহ্বান! তাহে মিশে থাক্
আমার এ ডাকঃ
এসো মহাভবিষ্যৎ হতে
ধরণীর এই ধূলিপথে
অরূপের অনুসারী রূপঅভিসারে!
এসো তুমি এসো এ সংসারে!
প্রাণ তব প্রস্ফুটিত ফুল,
মধুময়, সৌরভব্যাকুল—
বিশ্ব আসে সংগোপনে সেই মধু পীতে;
সেই মধুগন্ধে স্বর্ণপরাগদীপ্তিতে
যবে পুন জাগে
ভালো তুমি বাসো অনুরাগে
নিখিল ভুবন।
এসো তুমি এসো! ওগো, তোমার নয়ন
যেন স্মিত শুকতারা দুটি
বিশ্বভুবনের 'পরে সদা আছে ফুটি
আনন্দকিরণে। তব পদস্পর্শ লাগি
বসুন্ধরা নিত্য আছে জাগি।

যাই তবে যাই—প্রাণে নিয়ে রূপের আকূতি
রসের আবেগভরে, মর্মরিত বোবা অনুভূতি।
আর কিছু নয়।......
ভাবি সবিস্ময়ঃ
দূরে হায় দূরে
কোন্ গ্রহনক্ষত্রের পুরে
রূপস্রষ্টা শিল্পী সে ঘুমায়!
ঘুমায় কি মোর মুগ্ধ চিতে?
কোন্ পৃথিবীতে
কোন্ নবপ্রভাতের আলোকচুমায়
জাগিবে সে?
ডাক দিয়ে চলিলাম শেষে।

# বিড়াল (দ্বিতীয় পর্ব)

নির্মল চট্টোপাধ্যায়
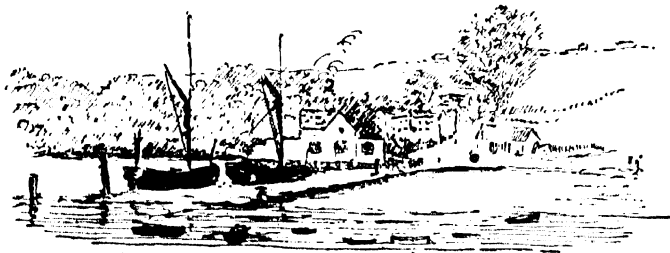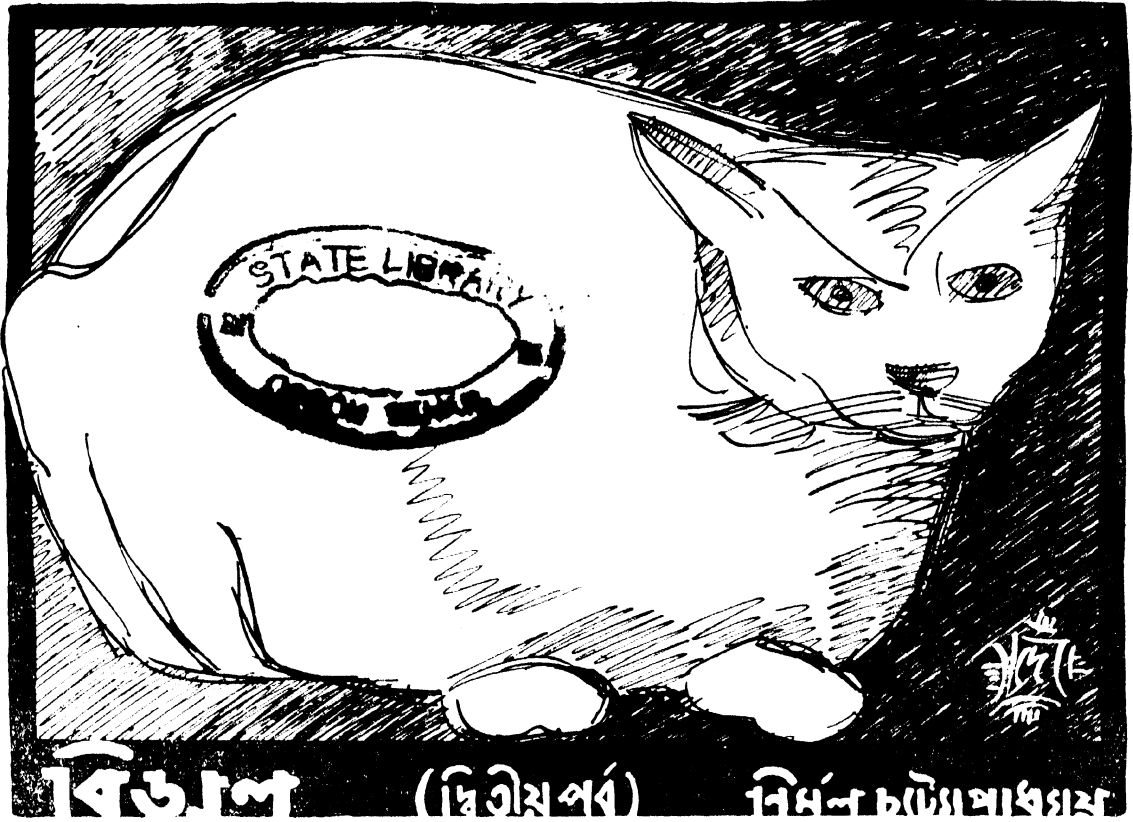
রাত্রি অনেক হইবে বোধ হয়। চারদিক স্তব্ধ হইয়া পড়িয়াছে। আমার ক্ষুদ্র কোঠে কাগজ-কলম হাতে নিয়া চুপ করিয়া সিয়া আছি। একটি প্রবন্ধ কিভাবে শুরু রিব, তাহা ভাবিতেছিলাম। ভাবিতে ভাবিতে ন্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। চোখ বুজিয়া রাজ-ীতি, সমাজ-নীতি, অর্থনীতির চিন্তা-মুদ্রের অন্ধকার গর্ভে মুক্তা খুঁজিতেছিলাম াত। এমন সময়—'ম্যাও।'

চাহিয়া দেখি, আমার অদূরে ভগ্ন বেতের য়ারটির উপর গুটিসুটি মারিয়া একটি বতাঙ্গ মার্জার বসিয়া আছে। এই বিড়ালটি াথা হইতে জুটিয়াছে জানি না। মাঝে ঝে খেয়াল-খুশিমত ঘরের ভিতর আসিয়া াজির হয়। সকাল বেলা চা খাইবার সময় য়েকদিন দু-এক টুকরা বিস্কুট প্রসাদ লাভ িরিয়া আস্কারা পাইয়াছে। বিড়ালের দিকে কাইয়া আপন মনেই বলিলাম, 'এখন ম্যাও রলে কি হবে, বিস্কুট নেই।' বিড়াল সম্মুখের কটি পা তুলিয়া মুখের উপর রাখিয়া ফিচ-চ করিয়া অদ্ভুত এক শব্দ করিল। আমার ন হইল যেন হাসিয়া উঠিল। তারপর যাহা ুনিলাম, তাহাতে আর সন্দেহের অবকাশ রহিল না যে, বিড়াল সত্যই হাসিতে পারে। শুনিলাম বিড়াল বলিতেছে, 'তোমরা, মানুষেরা, বড় স্বার্থপর। স্বার্থের দিক থেকেই তোমরা সব জিনিস চিন্তা কর। বিস্কুটের লোভ ছাড়া কি আমি আর আসতে পারি না? তুমি একা বসে আছ, তোমার সঙ্গে দু'দণ্ড গল্প করতে ত' আসতে পারি।'

নিশ্চিত বুঝিলাম স্বপ্ন দেখিতেছি। আমি ত' আর কমলাকান্ত চক্রবর্তী নই যে, অহিফেন প্রসাদাৎ দিব্যকর্ণ লাভ করিয়া মার্জার পণ্ডিতের বক্তৃতা শুনিতে পারিব। বিস্মিতভাবে চারিদিকে তাকাইতে লাগিলাম। বিড়াল আমার মুখের উপর দৃষ্টি রাখিয়া বলিল 'বুঝেছি, আশ্চর্য হয়েছ।'

বলিলাম—'আশ্চর্য নয়, ভাবছি স্বপ্নটা কি রকম?'

'না, না, স্বপ্ন নয়।' বিড়াল বলিল, 'তোমার টেবিলের উপর আলপিন রয়েছে, তারি একটা গায়ে ফুটিয়ে দেখ না।'

'হোক স্বপ্ন, এ-স্বপ্ন ভাঙতে চাই না। বিড়ালের কথা শুনবার সৌভাগ্য এক কমলাকান্তর হয়েছিল, আর হল আমার। তবে কমলাকান্ত আফিম খেয়ে নেশায় বুঁদ হয়ে—'

বিড়াল আমাকে শেষ করিতে দিল না, আবার ফিচফিচ করিয়া হাসিয়া উঠিল; হাসিতে হাসিতে বলিল—'কমলাকান্তকে পাগল নেশাখোর বলে তোমরা উড়িয়ে দিতে চাও, না? তোমাদের আত্মপ্রসাদ দেখে হাসি পায়। সে-যুগে বাঙলা দেশে কমলাকান্তর চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান আর একটি মানুষ খুঁজে বের কর দেখি। খেয়াল রেখ, বুদ্ধিমান মানুষ বলছি শুধু, প্রাণী বলছি না। জানই ত' আমারই এক পূর্ব-পুরুষের সাথে তর্কে সে কিরকম নাস্তানাবুদ হয়েছিল। বিড়ালের সাথে সে তর্কে পারবে কেন?

মনুষ্য জাতির উপর এই বক্রোক্তির জন্য ক্ষুব্ধ হইলাম; বলিলাম—'খুব দম্ভ যে!'

'কেন হবে না বল। যাট-পঁয়যট্টি বছর আগে বাঙলা দেশের পণ্ডিতেরা যখন ক্যাপিট্যালিজমেরও অ-আ, ক-খ শেখে নি, তখন সোস্যালিজমের বক্তৃতা দিয়ে গেল এক বিড়াল। কমলাকান্ত চক্রবর্তীর মত বুদ্ধিমান ব্যক্তিও সে-বক্তৃতা শুনে চুপ মেরে গিয়েছিল, মাথা তুলে তর্ক করতে পারে নি।'

অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কাগজ-কলমে সাক্ষ্যপ্রমাণ রহিয়াছে, স্বয়ং কমলাকান্ত

রাখিয়া গিয়াছে। অস্বস্তিবোধ করিতে লাগিলাম। একবার ইচ্ছা হইল, রাগিয়া বিড়াল বংশকে লক্ষ্য করিয়া কয়েকটি কড়া কড়া কথা শুনাইয়া দিই। কিন্তু আমার ভগ্ন বেতের চেয়ারটির উপর মার্জারপ্রবর এমন শান্তশিষ্ট নির্বিকার ভঙ্গীতে বসিয়া আছে, আর গৃহ-মধ্যস্থ আবহাওয়াটি এমনই নিশীথ-স্তব্ধ যে আমার উষ্মা প্রকট হইবার পারিপার্শ্বিক সমর্থন খুঁজিয়া পাইল না। মনে মনে স্থির করিলাম, চটাচটিতে কাজ নাই, বিড়ালের সাথে বন্ধুর মতই কথাবার্তা চালাইব। জিজ্ঞাসা করিলাম—'আচ্ছা, সত্য বল ত', আমি দিব্যকর্ণ লাভ করেছি, না, তুমি দিব্য জিহ্বা লাভ করেছ?'

'আমরা কেউ কিছু লাভ করিনি।'

'তবে? এ আমি কেমন করে বিশ্বাস করি বল যে, জাগ্রত অবস্থায় আমি বিড়ালের সাথে কথা বলছি।'

'কেন পারবে না? স্বচক্ষে দেখছ, স্বকর্ণে শুনছ।'

'আর সেই জন্যই ত' নিজের ওপর সন্দেহ হচ্ছে, চেয়ারের হাতলে হাত রেখে দেখছি বেশ শক্তই ঠেকছে, স্বপ্ন বলে ত বোধ হচ্ছে না। আফিম ত দূরের কথা, সিগারেটটি পর্যন্ত আমি ছুঁই না। সুতরাং—

সুতরাং আমি কিভাবে কথা বলছি সেটা তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না, গুপ্ত রহস্যটা কি জান? সব বেড়ালই কথা বলতে জানে। তোমাদের সংসারে থাকি, দিনরাত তোমাদের কথাবার্তা শুনি, আর আমাদের মত বুদ্ধিমান জীব তোমাদের ভাষাটুকু শিখতে পারবে না, তবে কথা বলি না কেন? বলি না তোমাদের সংসারের শান্তিরক্ষার জন্য।

চুপ করিয়া বিড়ালের কথা শুনিতে লাগিলাম। যাদুমন্ত্রে যেন আরব্যোপন্যাসের রজনীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। আজ রাত্রিতে সব অদ্ভুত ব্যাপারই যেন বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করিতেছে। বিড়াল বলিয়া চলিল—স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে স্বামী এবং স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্ত্রী তাদের বন্ধুদের কাছে যেসব কথা বলাবলি করে তা যদি আমি আবার পরস্পরকে জানিয়ে দেই, তবে কি তারা আর কোনদিন পরস্পরের মুখদর্শন করতে চাইবে।

'দেখ, আমার স্ত্রী নেই, একা মানুষ। সুতরা নির্ভয়ে তুমি কথা বলতে পার।' 'কিন্তু তোমার বান্ধবী আছে।'

'বান্ধবী!' হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়াছিলাম বোধ হয়।

'সেদিন যে মহিলা এবং ভদ্রলোকটি এখানে এসেছিলেন, তারা নিঃসন্দেহে তোমার বন্ধুস্থানীয়।'

মনে পড়িল কয়েকদিন আগে সুরমা ও বিনোদ হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল বটে। আমাদের এই পাড়ায় এক আত্মীয়ের বাড়িতে ওরা আসিয়াছিল, ফিরিবার পথে আমার এখানে পদার্পণ করিয়াছিল। বিনোদ আমার কলেজ-জীবনের অন্তরঙ্গ বন্ধুদের একজন। সুরমা বিনোদের ভগ্নি। সম্প্রতি সুরমা ও আমার ভিতর ভালবাসা জাতীয় একটা মনোভাবের উদয় হইয়াছে বলিয়া অনুভব করিতে পারিতেছি। সুরমার মারও ইচ্ছা যে, শীঘ্রই আমার সাথে সুরমার বিবাহ দিয়া আমাকে সংসারী করেন। এই বিবাহে কাহারও কোন আপত্তি করিবার কারণ নাই। তবে কানাঘুষায় শুনিয়াছি বিনোদ ব্যক্তি হিসাবে আমায় অতি পছন্দ করিলেও আমার দারিদ্র্য তার নিতান্ত অপছন্দ এবং এজন্য সে নাকি বিবাহ প্রস্তাবটি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করিতে পারে নাই। তা না পারুক, বিনোদের অমত আপত্তিতে কিছু আসিবে যাইবে না। সুরমার সম্মতি অবিচল থাকিলেই হইল।

বিড়ালের কাছে ওদের পরিচয় দিলাম—'ওই যুবকটি আমার বন্ধু। আর তার সাথে যে মেয়েটি এসেছিল, সে আমার বন্ধুর বোন। নাম সুরমা। ওর সঙ্গে আমার বিয়ের ব্যবস্থা হচ্ছে।'

'তা আর বলতে হবে না। ওদের কথাবার্তায় তা বুঝতে পেরেছি।

'কি বলল তারা?'

বিড়াল তার শান্তশিষ্ট নরম গলায় বলিয়া চলিল, যেন কোন ঘটনার বিবরণী নির্বিকার স্বরে পাঠ করিয়া চলিয়াছে—'বিকেলটা ছিল মেঘলা মেঘলা। তুমি তোমার টেবিলে ঝুঁকে পড়ে লিখছিলে, আর আমি তোমার ঘরের এককোণে তোমার বই-খাতার জঞ্জালের এক-পাশে শুয়ে শুয়ে ঝিমুচ্ছিলাম। এমন সময় হল ওদের আবির্ভাব। তুমি ওদের অভ্যর্থনা করে এখানে বসিয়ে রেখে বাইরে চলে গেলে দোকান থেকে খাবার ও চা কিনে আনতে। তোমার অনুপস্থিতিতে তোমার বন্ধুটি ঘরের চারদিকে তাকিয়ে বলল—এই ত রমেনের ঘর, দারিদ্র্যের ছাপ সব জায়গায়। বিয়ে ক'রে ও স্ত্রীকে খাওয়াবে কি?'

উত্তরে সুরমা কি বলিল শুনিবার জন্য কৌতূহলে উদ্‌গ্রীব হইলাম—'মেয়েটি কি বলল?'

'মেয়েটি একটু হেসে উত্তর দিল—তা ওর একটু অভাব-অনটন আছে বই কি। বিয়ের পর ওকে একটা ভাল চাকরি-বাকরি দেখে নিতে হবে। তোমার তো এত জায়গায় জানাশোনা, দাও না একটা জোগাড় ক'রে।'

সুরমা এই কথা বলিয়াছে! মাথাটা গরম হইয়া গেল। আজীবন অবিবাহিত থাকিতে হইলেও কেরাণীগিরি করিতে পারিব না। ছাত্র পড়াইয়া, এদিক ওদিক মাসিকে সাপ্তাহিকে কিছু কিছু লেখা দিয়া মোটামুটি একরকম দিন কাটাই। বিবাহ করিলে না হয় আর দুইটা টুশোন হাতে নেব, কিন্তু তাই বলিয়া দশটা পাঁচটা কলম পেষা—কস্মিনকালেও না।

'মেয়েটি বুদ্ধিমতী' বিড়াল বলিয়া চলিল, ঠিক কথাই বলেছে। বিয়ের পর কেন, বিয়ের আগেই তোমার আর্থিক অবস্থাটা একটু ভাল করে নেওয়া দরকার। সকালবেলা বিস্কুটের ভগ্নাংশ না দিয়ে একখানা আস্ত বিস্কুট যাতে আমার দিকে ছুঁড়ে দিতে পার, সে-চেষ্টা কর।'

'বেড়াল, তোমায় একটা কথা জানিয়ে রাখছি,—আমি বিয়ে করব না। বেশ টাকা-পয়সাওয়ালা পাত্র দেখে সুরমা পাত্র বেছে নিক।

'উহুঁ, এটা ভাল নয়। বিয়ে কর। বিয়ে করাটা পীড়াদায়ক সন্দেহ নেই কিন্তু বিয়ে না করাটা আরো পীড়াদায়ক। সুতরাং রাগে অভিমানে বিয়ে করব না বলে প্রতিজ্ঞা ক'রে বস না।'

টেবিলের উপর সাদা অলিখিত খাতার দিকে তাকাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম কিছুক্ষণ। বিড়াল স্তব্ধতা ভঙ্গ করিল,—'শেষ পর্যন্ত সবই এসে ঠেকছে অর্থে। সমাজের ধনবণ্টনের একটা সুব্যবস্থা করে দাও দেখবে, সব গোলমাল অসুবিধা দূর হয়ে যাবে। তুমিও তখন একটি বিয়ে ক'রে সুখে দিন কাটাতে পারবে।'

'দেখ, বেড়াল, তোমরা মানুষেতর প্রাণী। তোমাদের যত বুদ্ধিই থাক, তোমরা একপথে চিন্তা কর, একরোখা জীব তোমরা। তুমি সেই এক দাওয়াই পেয়ে বসেছ—সোস্যালিজম যে-কোন রোগে যে-কোন অসুবিধায় তুমি সোস্যালিজমের দাওয়াই দেবে। দুধ চুরি করে খেয়ে তোমারই এক পূর্বপুরুষ চমৎকার এক সাম্যবাদী বক্তৃতা দিয়ে কমলাকান্তকে বোকা বানিয়ে সরে পড়ল। আর আজ যখন আমি ভালবাসা, রোমান্স, বিবাহ প্রভৃতি গভীর সমস্যায় মগ্ন তখনও তুমি হালকাভাবে সোস্যালিজমের দাওয়াই কপচে চলে যেতে চাও। সোস্যালিজম খুব ভাল জিনিস জানি কিন্তু তোমার আমার দেশে সোস্যালিজম হ'তে কত যুগ লাগবে কে জানে। অন্ততঃ কাল পরশুর ভেতর ত' হচ্ছে না।

'কি ক'রে জানলে?' বিড়াল আরো নির্বিকার ভঙ্গিতে প্রশ্ন করিল।

'কি ক'রে জানলাম মানে? দেশ, বিদেশের অবস্থা দেখে।' কণ্ঠে বিরক্তি প্রকাশ করিলাম।

'ধর, যদি ভগবানের ইচ্ছায় রাতারাতি—'

প্রায় লাফাইয়া উঠিলাম—'তুমি ভগবান মানো? তুমি না বস্তুবাদী সমাজতান্ত্রিক?

'জনসাধারণের ইচ্ছা মানেই ভগবানের ইচ্ছা সেই যে ফরাসী বচন আছে শোন নি—জন সাধারণের বাণীই ঈশ্বরের বাণী।

বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়া গেল। কেবল বাক্যালঙ্কার হিসাবে বিড়াল ভগবানের নাম করিতেছে। বলিলাম—'তুমি এত পণ্ডিত, আর এটুকু বোঝ না যে, জনসাধারণের কোন ইচ্ছা নেই, তারা অসহায়, নির্বোধ।'

'জনসাধারণের ইচ্ছা মানেই জনসাধারণের হয়ে যারা চিন্তা করে, তাদের ইচ্ছা।

আর ইচ্ছা মানেই শক্তি। নীটশে পড় নি? অথবা সোপেনহওয়ার?'

'তুমি বড় বড় বুলি আর নাম আউড়ে যুক্তির প্যাঁচ এড়িয়ে যেতে চাও। তোমার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা।'

বিড়াল আবার তার অভদ্রভঙ্গীতে ফিচ্ ফিচ্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিলাম—'হাসলে যে?'

'বড় বড় বুলি না কপচালে, কোটেসন না আওড়ালে তোমরা যে আমলই দাও না। সত্যি কথা বলতে কি, আমি একখানা বইও পড়ি নি। তোমাদের মুখেই ওসব বড় বড় নাম শুনে শুনে মনের মধ্যে গেঁথে গেছে। তারই দু-একটা যখন তখন ঝেড়ে দিয়ে তাক লাগিয়ে দেই। তোমরা একগাদা বই পড়ে গলদঘর্ম হয়েও যে জিনিসটা বুঝতে পার না, আমরা সাদা চোখে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে সেটা অনায়াসে বুঝে নিতে পারি। কমলাকান্তের চোখে আঙুল দিয়ে যে বেড়াল ধনতন্ত্রবাদের অন্যায়, অপকারিতা দেখিয়ে দিয়েছিল, সে একখানা কেতাবও মুখস্থ করে নি, অথচ কমলাকান্তর নখদর্পণে ছিল সে যুগের ধর্ম, ইতিহাস, দর্শন। তোমাদের চোখের নীচে যা ঘটছে, তা তোমরা দেখতে বা বুঝতে চাও না। মত আর মতবাদের সংস্কারে তোমাদের মন অন্ধ। সমাজের ধন-ঐশ্বর্য মোটামুটি সকল লোকের ভেতর সমান ভাগ করে দিতে হবে, এটা বুঝতে আবার কেতাব পড়তে হয় নাকি? হায়, তোমরা যদি বেড়ালের মস্তিষ্ক পেতে!'

'তুমি যদি এভাবে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতে থাক, তবে তোমাকে এখানে বেশীক্ষণ বসতে দিতে পারব না। আমি কোনদিনই রাগী মানুষ নই বটে, কিন্তু আমারও একটা সহ্যের সীমা আছে—'

'বিশেষত যখন এক বেড়ালের সাথে কথায় কিছুতেই এঁটে উঠতে পারছ না। আচ্ছা, তোমাদের একটু দোষ-ত্রুটি দেখিয়ে দিলেই তোমরা ক্ষেপে যাও কেন বল ত? না, তোমরা এখনো সব শিশু যাক্—আমি যাচ্ছি। কাল সকালে আবার আসব বিস্কুট খেতে।'

বিড়াল গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া আড়মোড়া ভাঙিল, মুখ বিস্তীর্ণ করিয়া হাই তুলিল, তারপর জানলার কাছে আস্তে আস্তে গিয়া আমার দিকে ঘাড় ফিরাইয়া বলিল। যাবার সময় দুটো অনুরোধ জানিয়ে যাই। প্রথমত—' আমার সকালবেলাকার বিস্কুট বরাদ্দটি ঠিক রেখ; দ্বিতীয় বিয়ে কর, তা সুরমা দেবীকেই হোক বা অন্য কোন মেয়েকেই হোক।'

'তোমার চোখে অবিশ্যি সুরমা দেবী আর অন্য একজন মেয়ের ভেতর কোন পার্থক্য নেই, কিন্তু—

'বিয়ের পর তোমার চোখেও থাকবে না। এত লোকের এত উদাহরণ দেখেও তোমাদের শিক্ষা হয় না?

'যথেষ্ট হয়েছে। এবার তুমি যাও। আমার অনেক সময় নষ্ট করেছ, কিছু লিখব ভেবেছিলাম; কিন্তু এখন মাথার মধ্যে সব এলোমেলো হয়ে গেছে।'

'এক কাজ কর না; আমার সাথে তোমার যে কথাবার্তা হল, সেটা লিখে পাঠিয়ে দাও।'

'বেড়ালের সংলাপ, সম্পাদক মশাই ছাপবেন নাকি তার কাগজে?

'কেন, ছাপবেন না? সম্পাদক মশাই তোমার মত বেরসিক নন। আর তা ছাড়া পূর্ব নিদর্শন রয়েছে যে। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র।

আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করিয়া বিড়াল জানলা দিয়া বাহিরের অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল।

# ইন্দ্রজিতের চিঠি—

## পান্তির মাঠ

আমি খুব যখন ছেলেমানুষ—বয়স বোধকরি আট ন' বছর হবে তখন পূর্ববঙ্গের এক পাড়া গাঁ থেকে প্রথম কলকাতায় আসি। কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের পাশ ঘেঁসে যে গলিটি গেছে সেই গলির একটা বাড়িতে থাকতাম। ও জায়গাটা তখন সমাজপাড়া বলে পরিচিত ছিল। যদ্দুর জানি এখনও সেই নামটা বজায় আছে। প্রবাসী আপিস তখন ঐ গলির ভেতরে ছিল। বৃদ্ধ রামানন্দবাবুকে রোজ দেখতুম নিচের তলার ঘরে বসে কাজ করছেন। তিনি তখনও তেমন বৃদ্ধ হননি। তারপরেও তাঁকে প্রায় তিরিশ বছর ধরে দেখেছি, কিন্তু তখনই তাঁকে কেমন বৃদ্ধ মনে হত।

গলিটার ঠিক উল্টো দিকে কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের ওপারে বেশ খানিকটা ফাঁকা মাঠ মতো ছিল। জায়গাটার নাম ছিল পান্তির মাঠ। ওখানটায় এখন বিদ্যাসাগর কলেজের হোস্টেল হয়েছে। সারা কলকাতা শহরেই ফাঁকা যায়গা-গুলো বুজে আসছে বোধকরি প্রকৃতি দেবীর মতো কলকাতা শহরও abhors vacuum.

পান্তির মাঠ নামটা কি করে হল তা আমার জানা নেই। কৃষ্ণ পান্তির সঙ্গে এর যোগ আছে কিনা তাও আমি জানিনে, ব্রজেন বন্দ্যোপাধ্যায় মশায় হয়তো বলতে পারবেন।

ঐ মাঠটার সঙ্গে আমার বালককালের অস্পষ্ট স্মৃতি কিছু কিছু জড়িয়ে আছে। পাড়ার ছেলেদের ওটাই ছিল খেলার জায়গা। ও পাড়ায় এখনও নিশ্চয় ছেলেপিলে আছে, কিন্তু তারা খেলে কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। ইট পাথরের সভ্যতা এসে খেলার জায়গাটিকে গ্রাস করেছে। সভ্যতার জুলুম ছেলেপিলে এবং অসহায়ের ওপরেই সবচাইতে বেশি। শিশুরা সভ্য নয়, তারা আদিম। Adult Franchise-এর যুগে সভ্যতা adult-দের জন্যই। শিশুদের খেলার প্রয়োজনীয়তাকে যে সভ্যতা অগ্রাহ্য করেছে সে সভ্যতা শিশুদের বৃদ্ধ করে তুলেছে। আজকের ছেলেরা সাধে কি অকালপক্ক হয়েছে? গড়ের মাঠে গিয়ে খেলা হয় না, খেলা দেখা হয়। আজকালের ছেলেরা খেলা দেখেই খেলার আনন্দ উপভোগ করে।

ও মাঠের সম্পর্কে আমার আরেকটা কথা মনে আছে। একটি লোক প্রায়ই এসে ওখানটায় ম্যাজিকের খেলা দেখাত। একটা সতরঞ্চি পেতে বসে ডুগডুগি বাজিয়ে লোক জড় করত। ছেলেদেরই ভিড় হত বেশী। টিকিটের বালাই ছিল না। খেলার শেষে একটা পাত্র হাতে সবার সম্মুখে একবার ঘুরে যেত। যার ইচ্ছে দু একটা করে পয়সা ওরই মধ্যে ফেলে দিত। বড় হয়ে আনাতোল ফ্রাঁসের Ladies Juggler গল্পটা পড়ে পান্তির মাঠের সেই বাজিকরের কথা প্রায়ই আমার মনে পড়ে যেত।

আমি যখন দেখেছি তখনই পান্তির মাঠের আকৃতি অনেকখানি সঙ্কুচিত হয়ে এসেছে। তার আগে এখানে যে বড় বড় জনসভা হত ইতিহাসে তার প্রমাণ আছে। কলকাতা শহরটা ক্রমে চারিদিকে যত হাত পা ছড়াচ্ছে ওর বুক তত খালি হয়ে যাচ্ছে। বুক খালি হচ্ছে মানে এই নয় যে, ওর মাঝখানটা ফাঁকা হচ্ছে। আগেই তো বলেছি ফাঁকা জায়গাগুলো বরং বুজে আসচে। বলতে চাচ্ছিলাম যে, ওর যে সমস্ত পুরোনো স্মৃতি ও এতকাল বুকে করে আগলে ছিল সে সব স্মৃতি ক্রমে লোপ পেয়ে যাচ্ছে। কলকাতার অলিতে গলিতে পাড়াতে পাড়াতে কত ইতিহাসের টুকরো ছড়িয়েছিল ইট পাথরের তলায় চাপা পড়ে সে সব লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গেছে। কালের স্রোত চলতে চলতে কেবলি পাক খেয়ে চলে। সে আবর্তে স্মৃতির টুকরোগুলো ছিটকে বহুদূরে চলে যায়।

আজ যেখানে বিদ্যায়তন কাল সেখানে যে মেছোবাজার হবে না সে কথা কে বলতে পারে? আবার কেউ কেউ অবশ্য ঠাট্টা করে বলে থাকেন,

বাজারটা আগে ছিল নীচে, এখন উঠেছে উপরে।

উল্টোটাও হয়। আজকের আশুতোষ বিল্ডিং হয়েছে মাধববাবুর বাজারের ওপরে। যাই হোক গোল দীঘিকে কেন্দ্র করে বাঙলা দেশের শিক্ষা সংস্কৃতির ইতিহাস গড়ে উঠেছে। ধরুন একদিন যদি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দপ্তর এবং বিদ্যায়তন এখান থেকে সরিয়ে শহরের বাইরের দিকে নিয়ে যাওয়া হয় (এবং তাই নেওয়া উচিত) তাহলে কি আর গোল দীঘির মানমর্যাদা অতটা থাকবে? সরস্বতীর সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মীও অন্তর্ধান করবেন। গোল দীঘি তখন লক্ষ্মীছাড়া হবে।

পান্তির মাঠেরও সেই দশাই হয়েছে। আজকের ছেলেরা তার নামই জানে না। বয়স্করা যাঁরা জানতেন তাঁরাও ভুলে যাচ্ছেন। অথচ বললে অনেকে অবাক হয়ে যাবেন যে, ঐ পান্তির মাঠে দাঁড়িয়ে স্বদেশী যুগে একদিন (২৩শে কার্তিক, ১৩১২) রাজা সুবোধ মল্লিক জাতীয় শিক্ষার জন্য এক লক্ষ টাকা দান করেছিলেন। কাল এবং পাত্রের কথা যদিবা স্মরণ থাকে স্থানটির কথা আমরা ভুলে যাচ্ছি। আমাদের শিক্ষা কতখানি বিজাতীয় হয়েছে এসব কথা ভুলে যাওয়ার মধ্যেই তার প্রমাণ। এই মাঠটিকে কেন্দ্র করে সেই যুগে একটি শিক্ষা, সংস্কৃতি ও স্বাদেশিকতার আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। গোড়াতেই তো বলেছি সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের ঠিক সম্মুখেই এই মাঠ। ব্রাহ্ম সমাজের গৃহটিই বাঙলা দেশের মস্ত বড় একটা সামাজিক বিপ্লবের নিদর্শন। শুধু সামাজিক বললে ভুল করা হয়, আমাদের রাষ্ট্রিক আন্দোলনেও ব্রাহ্ম সমাজের দান বড় কম নয়। সেদিনের যাঁরা অগ্রগামী দল তাঁরা অনেকেই মুখ্য কিম্বা গৌণভাবে ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সেইজন্য এই পাড়াটাতেই বিশেষ করে বাঙালী জীবন নানাভাবে পল্লবিত হয়ে উঠেছিল।

পান্তির মাঠের গা ঘেঁষে কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের ওপরে ছিল বিখ্যাত ফিল্ড এন্ড এ্যাকাডেমী সভাগৃহ। এ সভাগৃহ তখনকার রাজনৈতিক আন্দোলনের একটি প্রধান কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এই সভার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর কোন কোন রাজনৈতিক প্রবন্ধ ফিল্ড এন্ড এ্যাকাডেমী ভবনেই প্রথম পড়া হয়। পি মিত্র প্রভৃতি বিপ্লবী নেতারাও এই সভার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কার্লাইল সার্কুলারের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ সভা (৭ই কার্তিক, ১৩১২) এই গৃহেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। পান্তির মাঠের ঠিক পেছনেই শিবনারায়ণ দাসের গলি। এরই ১৪ নম্বর বাড়িতে থাকতেন ডন্ সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সতীশ মুখোপাধ্যায়। ওখান থেকেই ডন্ সোসাইটি ম্যাগাজিন প্রকাশিত হত। রবীন্দ্রনাথ এই প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। ডন্ সোসাইটির ছাত্রদের সম্বোধন করে তিনি একাধিকবার বক্তৃতা করেছেন। বিংশ শতাব্দির প্রথম দশকে বাঙালী শিক্ষিত সমাজে ডন্ সোসাইটি অসীম প্রভাব বিস্তার করেছিল। এইমাত্র কয়েক মাস আগে কাশীধামে সতীশ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যু হয়েছে। বাঙলা দেশে তাই নিয়ে বিশেষ কোন চাঞ্চল্য দেখা যায়নি। অনেকে তাঁর নামই জানে না। আজীবন ব্রহ্মচারী এই অদ্ভুতকর্মা পুরুষের জীবনবৃত্তান্ত উপন্যাসের ন্যায় বিচিত্র। তাঁর শিষ্যতুল্য অধ্যাপক বিনয় সরকার, ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি যদি সবিস্তারে সেই জীবন-কাহিনী প্রকাশ করেন তবে বাঙালী পাঠকসমাজ বিশেষভাবে উপকৃত হবে।

পান্তির মাঠের সম্পর্কে আরো দু একটি প্রতিষ্ঠানের কথা আপনি মনে এসে যায়। এই মাঠের লাগোয়া একটি বাড়িতে ছিল মজুমদার লাইব্রেরী নামে এক বই-এর দোকান। দোকানের মালিক শৈলেশ মজুমদার ছিলেন রবীন্দ্রনাথের বন্ধু শ্রীশ মজুমদারের ভ্রাতা। এই দোকানটিতে একটি ঘরোয়া সাহিত্য-সভা গড়ে উঠেছিল, নাম ছিল আলোচনা সমিতি। আলোচনা সমিতির উদ্যোগে মাঝে মাঝে প্রকাশ্য সভার আয়োজন হত। রবীন্দ্রনাথের বহু সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ এই সব সভায় পড়া হয়েছে।

এ ছাড়া আরেকটি প্রতিষ্ঠানেরও উল্লেখ করা প্রয়োজন। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের পাশেই ছিল সংগীত সমাজের গৃহ। গান বাজনা নাটক ইত্যাদি নির্দোষ আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা সেকালে বড় একটা ছিল না। জোড়াসাঁকো কিম্বা পাথুরেঘাটা ঠাকুরবাড়িতে যে নাটকাদির ব্যবস্থা হত তাতে সাধারণের গতিবিধি সহজ ছিল না। সংগীত সমাজ শিক্ষিত সাধারণের সে অভাব দূর করেছিল। বলতে গেলে আমাদের দেশে এইখানেই ক্লাব নাটকের আরম্ভ। রবীন্দ্রনাথ সংগীত সমাজের একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন। তাঁর কোন কোন নাটক এখানেই প্রথম শিক্ষিত সাধারণের দ্বারা অভিনীত হয়। শুনেছি 'গোড়ায় গলদ' নাটকখানা সংগীত সমাজের সভ্যদের জন্যই বিশেষ করে লেখা হয়েছিল এবং তাঁরাই প্রথম অভিনয় করেছিলেন। কবি স্বয়ং প্রতিদিন রিহার্সেলে উপস্থিত থেকে এঁদের অভিনয় কৌশল শিক্ষা দিতেন। রিহার্সেল শেষে কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট থেকে জোড়াসাঁকোয় ফিরতে অনেক রাত হয়ে যেত, কোন কোন দিন দেড়টা দুটো বাজত। এইসূত্রেই রসিকতা করে একদিন বন্ধুদের বলেছিলেন, রোজ রোজ বাড়ি ফিরে দেখি খাবার ঠাণ্ডা গিন্নী গরম। কথাটা পরে সংগীত সমাজের বন্ধু মহলে একটা প্রচলিত রসিকতায় দাঁড়িয়েছিল। যাক্ যে কথা বলছিলাম। 'গোড়ায় গলদ' অভিনয়ে কবি নিজে কোন ভূমিকায় নাবেননি। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটি কৌতুককর ঘটনা ঘটেছিল। নাটকের শেষ দৃশ্যে চন্দ্রবাবুর একটি গান ছিল, কিন্তু যিনি চন্দ্রবাবু সেজেছিলেন তাঁর গানের গলা ছিল না। শেষ পর্যন্ত স্থির হল রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং কোন ছলে স্টেজে এসে গানটি গেয়ে দেবেন। শেষ দৃশ্যের অভিনয়সূত্রে চন্দ্রবাবু রঙ্গমঞ্চস্থ অন্য অভিনেতাদের উদ্দেশ করে বললেন, আমার বন্ধু কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আজ এখানে আসবার কথা আছে। আপনারা একটু অপেক্ষা করুন, ওঁর সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেব। পরমুহূর্তেই কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবেশ। পরিচয়াদি হবার পরে অভিনেতাদের মধ্যে একজন বললেন, শুনেছি রবিবাবু খুব ভালো গাইতে পারেন, উনি যদি একটি গান করে শোনান তো বড় আপ্যায়িত হই। নিশ্চয়, নিশ্চয় বলে বাকি অভিনেতারা সমস্বরে ঐ প্রস্তাব সমর্থন করল। রবীন্দ্রনাথ বিশেষ আপত্তি না করে একটি গান ধরলেন। বলা বাহুল্য ঐ গানটিই চন্দ্রবাবুর গাইবার কথা ছিল।

খুব সংক্ষেপে পান্তির মাঠের সামান্য একটু ইতিহাস বললুম। অবশ্য লৌকিক অর্থে এটা ইতিহাস নয়। যুদ্ধ বিগ্রহ না থাকলে ইতিহাস হয় না। পলাশীর যুদ্ধটা ইতিহাস অর্থাৎ যেখানে বাঙলা দেশ মরেছে সেটা ইতিহাস, যেখানে বাঙলা দেশ গড়ে উঠেছে সেটা ইতিহাস নয়। যে প্রচণ্ড ঝড়টা ডাল ভাঙে, গাছ ওপড়ায়, ঘরদোর ফেলে দেয় এমন কি প্রাণনাশ করে তার কীর্তিকলাপ লেখা থাকে, কিন্তু যে মৃদু বসন্ত বাতাস ফুলের রেণু ছড়িয়ে যায়, নূতন সৃষ্টির বীজ বপন করে তার কথা ইতিহাসের বিষয়বস্তু নয়। যথেষ্ট পরিমাণে কলরব করতে না পারলে কোন ব্যাপারই ঐতিহাসিক হয়ে ওঠে না। ইতিহাসের মুখরতা যতখানি মূর্খতাও ততখানি। জানে না যে, সংসারের পরম বিস্ময় পরম নিঃশব্দে ঘটে।

যাক্ সে পান্তির মাঠও নেই সে কলকাতাও আর নেই। সাবেক কলকাতার অত্যন্ত মলিন মূর্তি। চারপাশে অনেক সব হালফ্যাশানের নতুন পাড়া গড়ে উঠেছে। কায়দাকানুনে সাবেক কলকাতা এদের কাছেও ঘেঁষতে পারে না, কিন্তু কৌলিন্যের দিক থেকে এরা নিকৃষ্ট। চেহারাটাই ফচ্‌কে ছোড়ার মতো, সম্ভ্রম আদায় করবার মতো একেবারেই নয়। প্রাচীনে আর অর্বাচীনে যে তফাৎ এও তেমনি। বালিগঞ্জের চেহারা আপস্টার্টের চেহারা। এমন কি চোরবাগানের যে কৌলিন্য বালিগঞ্জ গার্ডেনস্-এর সে কৌলিন্য কোন কালে হবে কিনা সন্দেহ।

# পশুপাখীর ভাষা

পৃথিবীর নানা দেশের নানা জাতির ও সম্প্রদায়ের মানুষের যেমন নানা ভাষা, থবীর পশুপাখীরও তেমনি নানা ভাষা, ার পশুপাখীর একই জাতের মধ্যে শ্রেণী-দ নানা রকমের ভাষা রয়েছে। পশু-পাখীর আমাদের বোধগম্য নয়, কিন্তু তাতে র্য হবার কিছু নেই, কারণ পৃথিবীর এক তর ভাষা অন্য জাতির কাছে সাধারণত গম্য নয়। পৃথিবীর এক দেশের, জাতির সম্প্রদায়ের মানুষের ভাষা অপর দেশের, তর বা সম্প্রদায়ের লোকে বুঝতে পারে, হণ করতে পারে সেই ভাষার অনুশীলন করে। পশুপাখীর ভাষারও অর্থ না হোক, তার তাৎপর্য বুঝতে পারা যায়, তা বিশেষভাবে অনুধাবন করলে।

মানুষ সবচেয়ে উন্নত শ্রেণীর প্রাণী বলেই তার ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু প্রাণিজগতের নিকৃষ্টতর শ্রেণী পশু-পাখীর ভাষায় সাহিত্য-সৃষ্টি হয় নাই এবং তার সম্ভাবনার কল্পনাও হাস্যকর বলেই যে তাদের আওয়াজ বা ভাষা অর্থহীন, এমন নয়। পশু-পাখীর বিভিন্ন ধরণের আওয়াজ বিভিন্ন ভাব-ব্যঞ্জক। তারা কোন আওয়াজে ক্রোধ, কোন আওয়াজে উল্লাস, কোন আওয়াজে বিরক্তি, কোন আওয়াজে বা ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথা বুঝিয়ে থাকে। প্রত্যেকটি আওয়াজেরই পৃথক অর্থ আছে। গৃহপালিত পশুপাখীদের আচরণ ও আওয়াজ থেকে আমরা তা অনেকটা বুঝতে পারি।

পশুপাখীদের ভাষা 'রেকর্ড' করে, সেই রেকর্ড থেকে তাদের আপাত অর্থহীন ভাষা পুনরুচ্চারিত করে, যদি তাদের শুনানো দেওয়া যায়, তবে তারা তা শুনে বিস্মিত হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাতে সাড়াও দেবে। সিংহের গর্জন রেকর্ড করে, যদি কোন সিংহকে সেই গর্জন আবার শুনিয়ে দেওয়া যায়, তবে রেকর্ডের গর্জন-শ্রবণকারী সিংহ বিস্ময়ে সিংহনাদ ছাড়তে ভুলবে না।

**জল থেকে কাঠের পাটাতনের উপর উঠে এসে 'মাইক্'-এর সামনে স্ত্রী-কুমীর ফোঁস ফোঁস করছে: পুরুষ-কুমীরকে নীচে দেখা যাচ্ছে।**

এই ধরণের একটা ব্যাপার ঘটেছিল ডেট্রয়েটের পশুশালায় (ডেট্রয়েট জুওলজিক্যাল পার্কে)। পশুশালার সাধারণ অধ্যক্ষ আর্থার গ্রীণহল একদিন সকালবেলা একটা সিংহের

'মাইক্' দেখে বিস্মিত খোকা-শিম্পাঞ্জীটি যেন প্রশ্ন করছেঃ "ব্যাপারখানা কি বলত?"

পশুশালার অধ্যক্ষ আর্থার গ্রীনহল ও তত্ত্বাবধায়ক লয়েড সোয়ার্জকে যেন বলছেঃ "একটা বক্তৃতা দিতে হবে? এ আর এমন কি?"

খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে মাইক্রোফোনে কথা বলতে লাগলেন। প্রায় দশ মিনিট যাবৎ সিংহটি নিদ্রাজড়িত ঔদাসীন্যের সঙ্গে তাঁকে একরকম গ্রাহ্যই করল না। কিন্তু ৯টা ২৫ মিনিটের কয়েক সেকেন্ড আগে অধ্যক্ষ আর্থার গ্রীনহল একটু থেমে রেকর্ড করবার যন্ত্রটা তাঁর কনুইয়ের নীচে ঠিক করে ধরে মাইক্রোফোনটা সবচেয়ে কাছের সিংহের খাঁচার গরাদের কয়েক ইঞ্চি দূরে ঘুরিয়ে ধরতেই সেই সিংহটি ও অন্যান্য সিংহ এমনভাবে গর্জন করে উঠল যে, তিনি পড়ে যেতে যেতে নিজেকে সামলে নিলেন, আর সৌভাগ্যের বিষয়, তাঁর মাইক্রোফোন ও রেকর্ড করবার যন্ত্রটিও সে প্রচণ্ড গর্জনের প্রবল আঘাত সহ্য করতে পেরেছিল। অল্প কিছুক্ষণ পরে যখন রেকর্ড-করা সেই গর্জন সিংহগুলিকে শুনিয়ে দেওয়া হল, তখন তারা নিজেদের আওয়াজ বুঝতে পেরে আবার গর্জন করে উঠল।

পশুপাখীর আওয়াজ নিয়ে এই ধরণের শত শত পরীক্ষা আর্থার গ্রীনহল করেছেন এবং গবেষণার দ্বারা তিনি পশুপাখীর আওয়াজ থেকে তার অর্থ ও তাদের মেজাজ বা মানসিক অবস্থা নির্ণয় করতে চেষ্টা করছেন। কিন্তু সিংহের গর্জন নিয়ে তাঁর এই গবেষণা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়েছিল, কারণ ডেট্রয়েট পশুশালার সিংহেরা নির্দিষ্ট সময়ে—বিশেষ করে খাওয়ার সময় হলেই প্রচণ্ড আওয়াজে হাঁক দেয়। ৯টা ২৫ মিনিটে খাওয়ার সময় বলেই সিংহগুলি তখন স্বভাবসুলভ গর্জনে তত্ত্বাবধায়ককে তাদের ক্ষুধা ও আহার্যদানের

নিজের আওয়াজে নিজে হেসেই আটখানাঃ গ্রীনহলের মাইকে আওয়াজ ধরা পড়ে পাশের যন্ত্রে রেকর্ড হচ্ছে।

খোকা-শিম্পাঞ্জি এবার গম্ভীর হয়ে যেন বক্তৃতা শুরু করেছেঃ "মাননীয় সভাপতি মহাশয়, উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ......"

...থা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল। সিংহেরা ...বিশ্যি ঘড়ি দেখতে জানে না, কিন্তু যে সময়ে ...রা খাবার পেতে অভ্যস্ত, সে সময়ের কথা ...রা তাদের সহজাত ও স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান বা অনুভূতি থেকেই বুঝতে পারে। কাজেই ডেট্রয়েট পশুশালার সাধারণ অধ্যক্ষ আর্থার গ্রীনহলকে যদি সিংহের গর্জন রেকর্ড করতে হয়, তব তাঁকে সকাল ৯টা ২৫ মিনিটের সময় গিয়ে দাঁড়ালেই চলতে পারে, কারণ নির্দিষ্ট সময়ে সিংহগুলি হাঁক দেবেই, আর 'মাইক' দেখেও ঘাবড়াবার বা বেয়াড়াপনা করবার মত জীব পশুরাজ সিংহ মোটেই নয়।

কিন্তু অন্যান্য পশুপাখীর আওয়াজ রেকর্ড করা এক মুস্কিলের ব্যাপার। এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার এত লাজুক ও একগুঁয়ে যে, 'মাইক' দেখলে মুখ খুলতেই চায় না। কোন কোন অতি-মুখর পশুপাখীও 'মাইক' ও রেকর্ড করবার যন্ত্রপাতি দেখলে মূক হয়ে যায়, বহু সাধ্য-সাধনা ও কায়দা-কৌশলেও মুখ খোলে না, মুখে ভাষা ফুটিয়ে তা রেকর্ড করতে দু-তিনদিন সময়ও লেগে যায়।

এসব সত্ত্বেও গ্রীনহল অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও অটুট ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে বহু পশুপাখীর বহুরকম আওয়াজ রেকর্ড করতে সমর্থ হয়েছেন। আমেরিকার ব্যাঘ্রজাতীয় 'পিউমা'র ঘড় ঘড় শব্দ থেকে আরম্ভ করে যৌনমিলন-অভিলাষী পুরুষ-কুমীরের প্রণয়-নিবেদনসূচক মৃদু-গম্ভীর আওয়াজ পর্যন্ত—বহু পশুপাখীর বহু ধরণের বহু মানসিক অবস্থাকালীন আওয়াজের রেকর্ড করতে তিনি সমর্থ হয়েছেন। এই সমস্ত আওয়াজের রেকর্ড কেবল তাঁর গবেষণা ও বক্তৃতার পক্ষেই প্রয়োজনীয় নয়, পশুশালার কর্মচারীরাও পশুপাখীর বিভিন্ন মানসিক অবস্থা এবং নানাপ্রকার পশুপাখীর প্রকৃতিগত পার্থক্য বোঝবার ব্যাপারে এই সমস্ত রেকর্ড থেকে যথেষ্ট সুযোগ ও সহায়তা লাভ করেন।
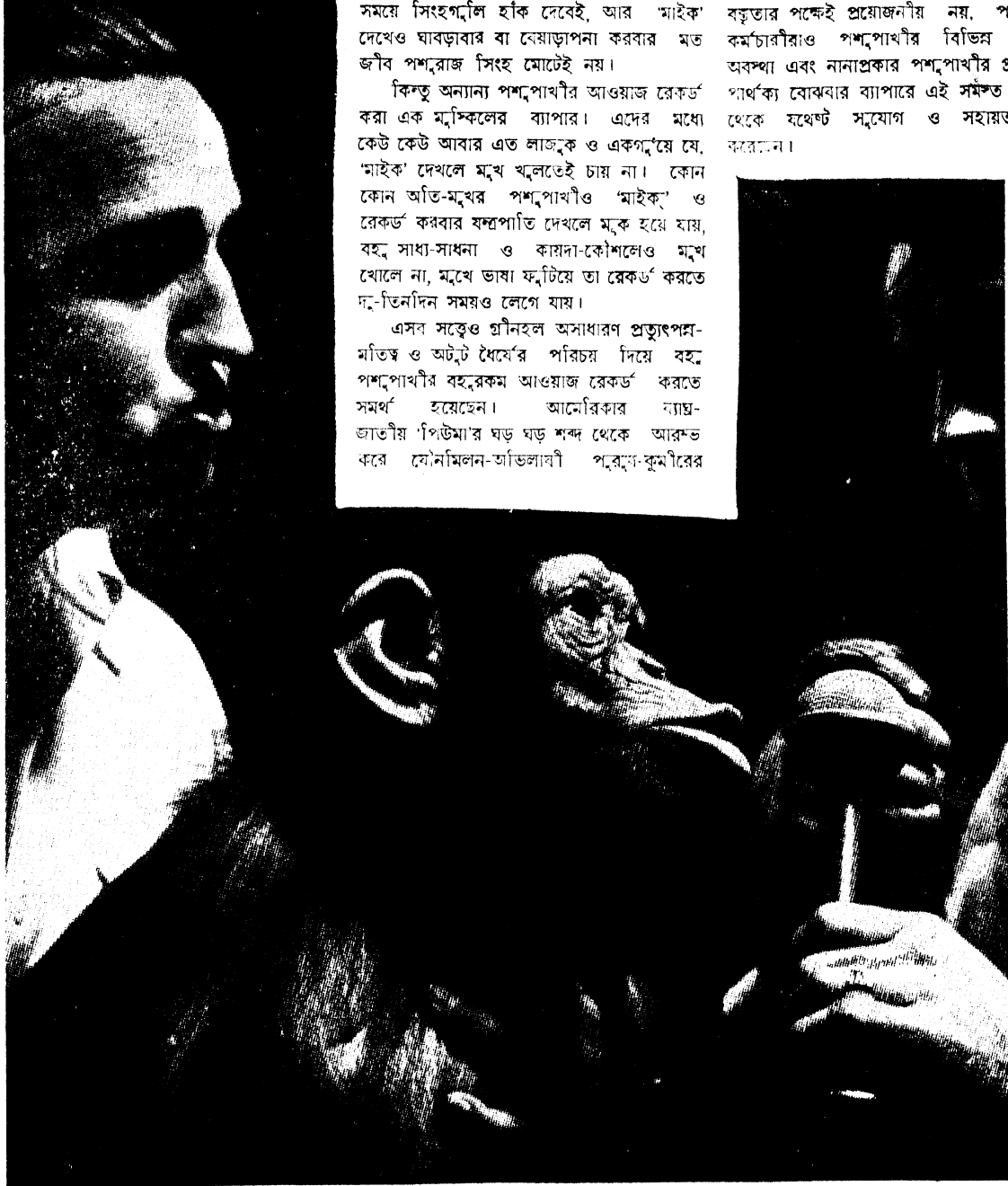
পশুশালার তত্ত্বাবধায়ক লয়েড সোয়ার্জ (বাঁ দিকে) খোকা- শিম্পাঞ্জির বক্তৃতা তন্ময় হয়ে শুনতে শুনতে নিজের অজ্ঞাতসারেই বক্তার মুখভঙ্গীও অনুকরণ করে ফেলেছেন!

পশু ও পক্ষিশালার তত্ত্বাবধানের কাজের জন্য যাঁরা নূতন নিযুক্ত হন, তাঁরাও এ সমস্ত রেকর্ড থেকে পশুপাখীর মেজাজ সম্বন্ধে অনেক শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করে থাকেন। তাঁরা এই সমস্ত রেকর্ডের আওয়াজ থেকে বুঝতে পারেন, শিম্পাঞ্জি যদি ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ করে, তবে তার মেজাজ ভাল আছে, কিন্তু যদি কিচিরমিচির আওয়াজ করে, তবে তার মেজাজ ভাল নেই; বিরক্তির কারণ ঘটলে হাতী শিঙার মত আওয়াজ করে, আর কুমীর ক্রুদ্ধ হলে জোর ফোঁস ফোঁস শব্দের সঙ্গে চড়বড় করে ঘন ঘন অস্পষ্ট আওয়াজ করতে থাকে, তার চোখের কোণ দিয়ে বায়ুপূর্ণ বুদ্বুদ শ্রেণী ছুটে বেরিয়ে এসে মিলিয়ে যায়।

আর্থার গ্রীনহল এ পর্যন্ত যত রকমের পশুপাখীর আওয়াজ রেকর্ড করেছেন, তার মধ্যে সবচেয়ে অদ্ভুত হল দক্ষিণ আমেরিকার 'রীয়া' (Rhea) পাখীর ডাক। 'রীয়া' পাখী দেখতে অনেকটা উটপাখীর মত। 'রীয়া' পাখীর ডাক অবিকল যান্ত্রিক ধ্বনি বলে ভুল হয়। যারা কোনদিন 'রীয়া' পাখীর ডাক শোনে নাই, তারা তার ডাক, অথবা তার ডাকের রেকর্ড শুনলে মনে করবে, সমুদ্রে বিপজ্জনক স্থানে কুয়াসার সময় যে ঘণ্টাধ্বনি করে জাহাজকে বিপদের সংকেত জানান হয়, এ বুঝি সেই ঘণ্টারই ধ্বনি।

ডেট্রয়েট জুওলজিক্যাল পার্কের সাধারণ-অধ্যক্ষ আর্থার গ্রীনহলঃ তাঁর পাশে এক অতিকায় সামুদ্রিক কচ্ছপের মাথার খুলির উপর পশুপাখীর আওয়াজ রেকর্ড-করা ফিতে প্যাঁচানো রয়েছে।

সাইবেরিয়ার বাঘ 'মাইক্' দেখে প্রচণ্ড হাঁক দিয়ে এসে দাঁড়িয়েছেঃ খাঁচার সামনে 'মাইক্' হাতে গ্রীনহল।

গ্রীনহলের হাতে 'মাইক্' দেখে রাশিয়ার ভালুকী তার বাচ্চাকে যেন সাবধান করে দিচ্ছেঃ "খবরদার! ওদের বিশ্বাস নেই।"

প্রান্তরচারী ভরতপাখী (Meadow-Lark) গ্রীনহলের রেকর্ডে নিজের ভাষা শুনে ছুটে এসেছে তার উত্তর দিতে।

আওয়াজ ঠিকমত রেকর্ড করা হ'ল কিনা, তা পরীক্ষা করবার জন্যে অধ্যক্ষ গ্রীনহল অনেক সময় রেকর্ড থেকে এক জাতীয় প্রাণীর আওয়াজ অন্য জাতীয় প্রাণীকে শুনিয়ে থাকেন এবং তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেন। যেমন, রেকর্ড-করা সিংহের গর্জন শোনালে বানরেরা সত্যিকারের সিংহ উপস্থিত হয়েছে মনে করে' ভীতি-বিহ্বল হয়ে পড়ে।

'মাইক্' দেখলে সবচেয়ে বেশী ভয় পায় গণ্ডার। গণ্ডারের চামড়া এত শক্ত যে, তা দুর্ভেদ্য; চক্ষুলজ্জাহীন ব্যক্তির সঙ্গে গণ্ডারের চামড়ার একটি প্রচলিত উপমাও আছে, কিন্তু 'মাইক্' দেখলে গণ্ডার যত ঘাবড়ে যায়, এত আর কেউ নয়। গ্রীনহল অনেক সময় গণ্ডারকে অদ্ভুত রকমের আওয়াজ করতে শুনেছেন, কিন্তু 'মাইক' দেখলেই তারা একেবারে বোবা বনে যায়।

যেমন সবচেয়ে বেশী চপল বানর, 'মাইক' দেখলে মুখরতাও তার বেড়ে যায় তেমনি। রেকর্ড করার যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে শিম্পাঞ্জির কৌতূহল অত্যন্ত বেশী। একবার শিম্পাঞ্জীর দুটি বাচ্চা গ্রীনহলের 'মাইক'-এর কাছে আসতে না পেরে একেবারে যেন ক্ষেপে গিয়েছিল।

কোন ইংরেজ প্রাণিতত্ত্ববিদ্ শিম্পাঞ্জির ৩২টি শব্দ-বিশিষ্ট ভাষা আছে বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। গ্রীনহল শিম্পাঞ্জির ভাষার এই ৩২ প্রকার শব্দের সবগুলিই এখনও রেকর্ড করতে পারেন নি, তবে তিনি এ সম্বন্ধে চেষ্টা করছেন। পশুপাখীর বিশেষ বিশেষ মানসিক অভিব্যক্তি বা আবেগ এবং বিশেষ বিশেষ আওয়াজের মধ্যে প্রকৃতই কোন সম্বন্ধ আছে কিনা, তা শেষ পর্যন্ত তিনি আবিষ্কার করতে পারবেন বলে আশা করেন। লাঙ্গুলহীন বানরের ডাক ও প্রকৃত ভাষার মধ্যে কোনরূপ মিল আছে কিনা, তা নির্ধারণ করবার জন্য তিনি একজন নৃতত্ত্ববিদ ও একজন ভাষাতত্ত্ব-বিদেরও সাহায্য গ্রহণ করবেন।

আর্থার গ্রীনহল প্রথমে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কোনরূপ গবেষণার জন্য পশু-পাখীর ডাক রেকর্ড করতেন না; লুকিয়ে-রাখা পশুপাখীর আওয়াজের রেকর্ড থেকে নানারকম পশুপাখীর আওয়াজ বের করে তিনি নিজের পরিবারের লোকজনকে ও বন্ধুবান্ধবকে চমকে দিয়ে নিছক কৌতুক সৃষ্টি করতেন মাত্র। এই রকম কৌতুক-সৃষ্টির প্রেরণা ক্রমে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় রূপান্তরিত হয়। তাঁর পশুপাখীর আওয়াজ রেকর্ড-করা ফিতে একটি বিরাট সামুদ্রিক কচ্ছপের মাথার খুলির উপরে-রাখা যন্ত্রে প্যাঁচানো থাকে। ডেট্রয়েট পশুশালায় রক্ষিত চার হাজার প্রাণীর অনেকগুলিরই আওয়াজ তিনি রেকর্ড করেছেন।

# বর্তমান সাম্যবাদ

**শ্রীমানবেন্দ্রনাথ রায়**

গত বছরের ডিসেম্বর মাসের গোড়ায় পৃথিবীর উৎসুক দৃষ্টি চীনের ওপর পড়েছিল। মনে হয়েছিল দক্ষিণ দিকে কম্যুনিস্ট বাহিনীর অভিযান রোধ করা যাবে না। চীনের বৃহৎ নদী ইয়াংসীর উত্তরে সর্বত্রই চিয়াং কাইশেকের ভীরু সৈন্যদল হয় পালিয়ে যাচ্ছিল, অথবা দ্রুতগামী শত্রু তাদের ঘেরাও করে ফেলছিল, আর কোথাও বা চীনের বিশিষ্ট ভঙ্গীতে তারা নানাকিংএর দুষ্কলঙ্ক শাসনের ডুবন্ত জাহাজ ছেড়ে বিজয়ী সাম্যবাদের চলন্ত গাড়িতে উঠে বসেছিল। তখন মনে হয়েছিল কম্যুনিস্টরা সমস্ত চীনে ছড়িয়ে পড়তে আর কয়েকদিন মাত্র নেবে। তারপর কী হবে? ভয়ে ভয়ে এই প্রশ্ন চারিদিক থেকে করা হয়েছিল। পাশাপাশি দেশগুলিতে কম্যুনিস্ট পার্টিগুলি কি রকম শক্তিশালী?

সে সময় আমি বলেছিলাম যে ভয় বা আনন্দের কারণ তখনও আসেনি, ইয়াংসীর উত্তরে চীনের কম্যুনিস্ট বাহিনীকে কোথাও থামান যাবে না, কিন্তু তারা আরও দক্ষিণে নেমে যেতে বিশাল জলের বাধা অতিক্রম করবে না। সুতরাং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া প্রচণ্ড লাল আগুনের ঝলকে পুড়ে যাবে এ ভয়ও অমূলক। অনেকেই আমার এ কথা হেসে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। আমি কিন্তু একথা বলেছিলাম যে, বহুদূর পর্যন্ত বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে যাবার আশঙ্কা আছে, যদিও সে বিশৃঙ্খলায় বিপ্লব হবে না।

ইয়াংসীতে কম্যুনিস্টদের দৃঢ় অভিযান কে থামাবে? আমেরিকা চীনের গৃহযুদ্ধে প্রত্যক্ষ অংশ নিয়ে রাশিয়ার সঙ্গে একা লড়াইয়ে নেমে পড়বে, এ সম্ভাবনা ছিল না। বাস্তবে গত বছরের শেষ ভাগে আমেরিকা তার তাঁবেদার চিয়াং কাইশেককে ত্যাগ করেছিল। তাহলে সমগ্র চীন অধিকার করবার প্রায় নিশ্চিত সুযোগ ত্যাগ করে বিজয়ী কম্যুনিস্ট বাহিনী ইয়াংসীর কূলে থেমে যাবে কেন? যাই হোক আমার আশানুযায়ী তারা তাই করেছিল। সেখানে তাদের কেউ থামিয়ে দেয়নি? আজও তারা সহজেই নদী পার হয়ে দক্ষিণ দিকে তাদের বিজয় অভিযান চালাতে পারে। কিন্তু বোঝাই যাচ্ছে সে রকম কিছু করার তাদের ইচ্ছা নেই। স্বভাবতঃই তারা যতটা হজম করতে পারবে তার বেশী তাদের যাবার ইচ্ছা নেই এবং যতটা তারা ইতিমধ্যে খেয়েছে ততটা হজম করতে পারবে কিনা সন্দেহ। বর্তমান পরিস্থিতি হচ্ছে, চীন দুই প্রতিপক্ষের মধ্যে মধ্যবর্তী ভূমি। একদিকে রাশিয়া তার অগ্রবর্তী বাহিনীর ক্ষেত্রকে আগিয়ে নিয়ে এসেছে, অপর দিকে আমেরিকা উত্তরে জাপান এবং দক্ষিণে অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত এক নূতন প্রতিরোধ পথ তৈরী করেছে।

### বৃহৎ রণ-কৌশল

চতুর্দিকে বিশ্ব-সাম্যবাদের বৃহৎ আত্ম-রক্ষার বা পশ্চাদপসরণের যে নীতি চলেছে তাই দিয়ে চীনের কম্যুনিস্ট বাহিনীর গতি নির্ণয় করা হচ্ছে। চীনে অগ্রসরের উদ্দেশ্য হচ্ছে বৃহৎ রণাঙ্গনে কৌশলে পশ্চাদপসরণের পূর্বে কোন একস্থানে প্রতি-আক্রমণ করা। বিশ্ব-সাম্যবাদের অবস্থা বা উদ্দেশ্য আজ সামরিক ভাষায় বর্ণনা করতে হবে, কারণ রাশিয়ার রেড আর্মির আড়াল ছাড়া কোন দেশেই অন্তর্বিপ্লব সফল হতে পারে না। সর্বহারাদের বিশ্ব-বিপ্লবের রণ-নীতি পুনর্জাগ্রত সাম্যবাদী আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ কর্তৃক নির্ণীত হয় না, রাশিয়ার সমর বাহিনীর অধ্যক্ষদের দ্বারা চালিত হয়।

চীনে কম্যুনিস্ট বাহিনীর আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল দুনিয়ার দৃষ্টি বার্লিন হতে দূরে সরিয়ে নেওয়া। গত বছর বার্লিনে রাশিয়ার ধাপ্পা ধরা পড়ে গিয়েছিল। ফ্রান্স ও ইতালীতে কম্যুনিস্ট পার্টিদের দুর্গতির জন্য হৃত-গৌরবকে ফিরিয়ে পেতে রাশিয়া পশ্চিম দেশীয়দের বার্লিন হতে হটিয়ে দিতে চেয়ে-ছিল এবং লড়াইয়ের হুমকী দিয়ে সমস্ত জার্মানী দখল করার চেষ্টা করেছিল। এই লড়াই অবশ্য তারা নিজেরা করতে চায়নি। এটা একটা খুব বড় ধাপ্পা ছিল এবং ইউরোপের পশ্চিমদেশীয় শক্তিগুলি রাশিয়ার চ্যালেঞ্জ মেনে নিয়ে ধাপ্পা ফাঁস করে দিয়েছিল। ইউরোপে ধাক্কা খেয়ে রাশিয়া চীনে আঘাত হানল এবং আশা করেছিল যে, আমেরিকা তার সামরিক বাহিনী ও আয়োজন দূরে পূর্বে নিয়োগ করবে। আমেরিকা চীন হতে সরে গিয়ে এ

আঘাত এড়িয়ে গেল এবং চীনকে সংকটের মুখে ফেলে দিল।

চীনে কম্যুনিস্ট বিজয় কিন্তু বেশীর ভাগ মনে হয় খুব দাম দিয়ে পাওয়া হয়েছে এবং ক্ষণস্থায়ী হবে। স্বর্ণগোলকের প্রচুর আমদানিতে চীনের রণ-নেতারা চীন দেশকে বিশৃঙ্খলার মধ্যে রাখতে উৎসাহ পাবেন। বহুদিন স্থায়ী সামাজিক সংকটের স্থির জলেই সমরনায়কত্বের দুষ্ট ক্ষতের জন্ম হয়। জাতীয় সেই দুর্ভাগ্যের সুযোগে রাজনৈতিক লাভের অঙ্ক বাড়িয়ে কম্যুনিস্টরা সেই ক্ষত দূর করতে পারবে না। সুতরাং আমেরিকা চীনকে কম্যুনিস্টদের কাছে সমর্পণ করেনি, বিশৃঙ্খলার মুখে ফেলে দিয়েছে যাতে গণ্ডগোলে সে কিছু সুবিধা করে নিতে পারে। আভ্যন্তরিক সমস্যায় যথেষ্ট জড়িত হবার পর চীনের কম্যুনিস্টগণ পাশাপাশি দেশগুলিতে বিপ্লব ছড়াবার বিশেষ কোন সুযোগই পাবে না। অপর পক্ষে চীনে কম্যুনিস্ট বিজয়ে ইউরোপে রাশিয়ার সামরিক সুবিধার কোন উন্নতি হবে না। সুতরাং বিশ্ব-সাম্যবাদের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল নয়, যদিও চতুর্দিকে বিশৃঙ্খলা হবার পরিবর্তে এক সম্ভাবনা আছে।

### ইউরোপে পশ্চাদপসরণ

ইউরোপে কম্যুনিস্টদের প্রভাব ১৯৪৭ সালের শেষ ভাগে খুব উঁচুতে উঠেছিল। সেই বৎসরে শরৎকালে ফ্রান্সে সাধারণ ধর্মঘটের শোচনীয় অবস্থায় এই প্রভাবের মোড় ঘুরে গিয়েছিল সত্য, কিন্তু ইতালীতে কম্যুনিস্টরা নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতা লাভ করবে এটা প্রায় নিশ্চিত ধরে নেওয়া হয়েছিল। বিশ্ব বিপ্লব অর্থাৎ রেড আর্মির সমরনায়কদের রণ-কৌশল আর অপেক্ষা করতে প্রস্তুত ছিল না এবং চতুর্দিকের সমরক্ষেত্রে আক্রমণ চালাবার সিদ্ধান্তই নিয়েছিল। ফ্রাঙ্কোর স্পেনের সহায়তায় আমেরিকার আক্রমণ রোধ করার জন্য রাইন নদীর উপকূলে রেড আর্মি হাজির হবার আগে কম্যুনিস্টরা ফ্রান্সে ক্ষমতা হস্তগত করতে পারেনি। কিন্তু জার্মানী হতে রেড আর্মি তার বাঁ দিক বিপন্ন রেখে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হতে পারে না। সেই আশঙ্কা দূর হত যদি ইতালীতে কম্যুনিস্টরা ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসের নির্বাচনে নিশ্চিত জয়লাভ করত। কম্যুনিস্টদের ভাগ্যাকাশে পরম সুযোগ এসেছিল এবং চরম আঘাত হানার সময় উপস্থিত হয়েছিল। চেকোশ্লোভেকিয়ার ওপর আঘাত পড়ল। জার্মানীর অন্তঃস্থলে পৌঁছিবার সুযোগ সম্পূর্ণ পেয়ে রেড আর্মি পশ্চিম দিকে অভিযানের পূর্বে ইতালীতে কম্যুনিস্ট বিজয়ের অপেক্ষা করছিল। পরবর্তী চাল ছিল ফ্রান্সে ক্ষমতা লাভের জন্য সশস্ত্র বিদ্রোহ সংঘটন করা। ১৯৪৮ সালের গোড়ায় এই পরিস্থিতি ছিল। ইউরোপ সাম্যবাদের তুফানে ডুবে যাবার দাখিল হল।

ইতালীর নির্বাচনের ফলকে এক প্রবচনের ভাষায় বলা যায়—বাড়া ভাতে ছাই পড়ল। বিশ্ববিপ্লবের কৌশলের প্ল্যান সব উল্টে গেল। তখন হতে ইউরোপে কম্যুনিস্টরা পিছু হটতে শুরু করেছে। জার্মানীর বাইরে একটি এবং ইয়াংসীর কূলে আর একটি এই দুটি ফ্রণ্ট বা রণক্ষেত্র সুরক্ষিত হতে পারে এবং তাদের পিছনে সাম্যবাদের শক্তিগুলি এসে জড় হতে পারে। কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য অংশের ঘটনাস্রোতের গতি রোধ করা যাবে না। বস্তুতঃ বিশ্ব-সাম্যবাদের ভবিষ্যৎ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জঙ্গলে দস্যুবৃত্তির দ্বারা গড়ে তোলা যাবে না, তার ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে ইউরোপ ও আমেরিকায় সর্বহারাদের বৈপ্লবিক কাজের ওপর। এই উদ্দেশ্যে সাধারণতঃ ফ্রান্স ও ইতালীর দিকে নজর পড়বে। যুক্তরাষ্ট্রে "কম্যুনিস্ট জঞ্জালের" প্রতি কোন ধীর পর্যবেক্ষক গুরুত্ব দেন না। ধনতন্ত্রবাদের ধ্বংসের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বৃটেনেও এর গুরুত্ব নেই। ফ্রান্স এবং ইতালীতেই কম্যুনিজমের ভবিষ্যৎ গড়বে না হয় ডুববে। সেদিন পর্যন্ত এই দুই দেশ কম্যুনিস্টদের আওতায় ছিল, কিন্তু দুদেশেই সাম্যবাদ তার প্রভাব হারাচ্ছে। ১৯৪৬ সাল হতে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত এই স্বল্প সময়ের জন্য কম্যুনিস্ট পার্টি সোভিয়েট ইউনিয়নের বাইরে ইতালীতেই সর্ববৃহৎ ও শক্তিশালী দল ছিল। এই একমাত্র দেশ যেখানে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের প্রায় সকলেই সাম্যবাদের ডাকে উৎসাহের সঙ্গে সাড়া দিয়েছিল। ১৯৪৭ সালে কম্যুনিস্ট পার্টির সভ্যসংখ্যার এক তৃতীয় ভাগ এই মধ্যবিত্তদের মধ্যে ছিল আর একথাও ঠিক যে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীই তরুণ সমাজের মন গঠন করে। কোন দেশে কম্যুনিস্টরা আর কোন ভাল সুবিধাজনক ক্ষেত্র অধিকার করেনি; কিন্তু গত এক বৎসরে ইতালীতে কম্যুনিস্টরা মধ্যবিত্তদের বিশ্বাস হারাচ্ছে এবং ফলে পার্টি খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে। ফ্রান্সেও কম্যুনিস্টরা শ্রমিক ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে হেরে যাচ্ছে।

### সাম্যবাদের ভবিষ্যৎ

এই দুই দেশেই সর্বহারা শ্রেণীর বাইরের লোকেদের বিশ্বাস হারিয়ে কম্যুনিস্ট পার্টি নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতালাভ করার আশা করতে পারে না এবং নিশ্চিত পরাজয়ের সম্ভাবনাকে সামনে রেখে বহুখ্যাত সশস্ত্র বিদ্রোহের পথ কেউ অনুসরণ করতে পারে না। রেড আর্মির শক্তিশালী সহায়তা ছাড়া সশস্ত্র বিপ্লব কোথাও সম্ভব হয়নি। আধুনিক ইতিহাসের এইটেই হচ্ছে সবচেয়ে বড় শিক্ষা। কম্যুনিস্টরা এই তিক্ত অভিজ্ঞতা নিশ্চিত মেনে নেবে নতুবা তাদের বিপদ আছে। রেড আর্মি ফ্রান্সে এবং ইতালীতে সাক্ষাৎ সাহায্য পাঠাতে পারে না, কারণ তাতে আন্তর্জাতিক সশস্ত্র সংঘর্ষকে কাছে টেনে নেওয়া হবে। সুতরাং আমাদের যুগে সর্বহারাদের বিপ্লবের অর্থ হচ্ছে বিশ্বসংগ্রাম আর সে সংগ্রামে সাম্যবাদ আসবে না, আসবে সম্পূর্ণ ধ্বংস। হতাশায় হয়ত তারা সেই প্রলয়কে আমন্ত্রণ জানাবে; কিন্তু বর্তমান শক্তিগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধে বেশ বোঝা যায় তাতে তাদের জয়ের কোন আশা নেই।

ইউরোপ হিটলারের অধীনে মধ্যযুগীয় বর্বরতার অন্ধকারে মগ্ন হবার আগে ইউরোপকে বাঁচিয়ে রাশিয়া সভ্য জগতের যে নৈতিক নেতৃত্ব অর্জন করেছিল তা তাদের অভাবিত নির্বুদ্ধিতায় নষ্ট হয় এবং সাম্যবাদের ভবিষ্যৎও অপরিবর্তনীয় ভাবে ধ্বংস হয়। এখনও কম্যুনিস্ট নীতিতে একটার পর একটা দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা যেতে পারে আর এশিয়ার দেশগুলিতেই বিশৃঙ্খলার সহজ ক্ষেত্র পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু তাতে ক্রমান্বয়ে বিশৃঙ্খলা বা যুদ্ধ রচনা ছাড়া অন্য কোন সম্ভাবনা নেই। এর মধ্যে হৃদয়স্পর্শী কোন আবেদনও নেই। সুতরাং শক্তি সে হারাবেই এবং এর পরিবর্তে সমাজ-শিল্প এবং রাজনৈতিক ব্যবহারে সাধারণ বুদ্ধির প্রয়োগই দেখা দেবে।

কম্যুনিজম তার খেই হারিয়ে ফেলেছে, কিন্তু যুদ্ধপূর্ব অবস্থাও মৃত অতীতে মিশে গিয়েছে। কম্যুনিজম না হয় ফ্যাসিজম, এই দুইয়ের মধ্যেই আমাদের পথ বেছে নিতে হবে না। বর্তমান সংকট হতে নতুন পথ বার করতে মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি নিশ্চয়ই সক্ষম হবে। কম্যুনিজমের এই দুর্লক্ষণ মানব-মন ও কল্পনার সৃজন-শক্তি স্ফুরণের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। হয়ত এটা একটা সত্যকারের নবযুগের অভ্যুদয় সূচনা করবে।

—এম, পি, এস, এর সৌজন্যে

[পূর্বানুবৃত্তি]

একটু বেশি রাত ক'রে অটলবাবুর খাওয়া অভ্যাস। খাওয়ার অব্যবহিত পরেই শুয়ে পড়া তিনি অপছন্দ করেন। সেই ছাত্রাবস্থা থেকে। এবং রাত জেগে যে তিনি এখন আইন-ই পড়েন তা-ও না। কোনো বইই পড়েন না। বারান্দায় পিঠতোলা চেয়ার বিছিয়ে চুপচাপ বসে থেকে রাস্তার দিকে চেয়ে থাকেন। বাড়িতে কেউ ঢুকলে প্রথম টেরই পায় না অটলবাবু জেগে বসে আছেন। গৃহস্বামী জাগ্রত। বাড়ির সামনে মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তার পিলার ঘেঁষে প্রকাণ্ড এক নিমগাছ। কতকালের এই গাছ। যখন এ শহর ছোট ছিল। যখন শহর বলতে প্রায় কিছুই ছিল না। তখনকার আমলের। যখন স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে অটলবাবু নিমগাছটার তলায় এসে রোজই ভাবতেন ও থমকে দাঁড়াতেন,—পেন্সিলটা কি তিনি ভুলে স্কুলে ফেলে এসেছেন, না স্কুলের ডেস্কে রাখা রয়েছে, না রাস্তায় পড়ে গেল। ঠিক করতে পারতেন না হঠাৎ।

নিমগাছটার দিকে তাকালে অটলবাবুর এখনও সেসব কথা মনে পড়ে। সেই দিন।

আগে রাত আটটার পর এ রাস্তায় আর লোক চলত না। এখন রাত বারোটা একটার পরও লোকজন যাওয়া-আসা করে, গাড়ি-ঘোড়া চলে। রাত সাড়ে এগারোটায় তো সিনেমা ভাঙে। দলে দলে সিনেমা-ফেরৎ ছেলেমেয়ে অটলবাবুর বৈঠকখানার সামনের রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফেরে, ছেলে-বুড়ো, হ্যাঁ শহরের বুড়োরাও সিনেমা দেখতে আরম্ভ করেছে বৈকি। সবাই তো আর অটলবাবুর মত সর্বদিক থেকে নিস্পৃহ নিরাসক্ত সেজে বসে থাকেনি। কেনই বা থাকবে। অটলবাবু রাস্তার দিকে চেয়ে থেকে ভাবেন। রিক্সা, ঘোড়ার গাড়ী, দুটো একটা মোটর গাড়ী পর্যন্ত এতরাত্রে ভিড়ের মাঝখান দিয়ে হর্নের তূর্য-নিনাদ তুলে তীব্র সার্চলাইট ফেলে এগিয়ে যায়। তারপর ভিড় পাতলা হতে হতে আর একটি প্রাণী রাস্তায় থাকে না। বকুলবাগানের রাস্তা অবধি ইলেক্‌ট্রিক আসেনি। নিমগাছের ওধারে মিউনিসিপ্যালিটির কেরোসিন বাতিটা দপ্‌ দপ্‌ করতে করতে হঠাৎ একসময়ে যখন নিভে যায় অটলবাবু অপার শান্তি পান।

অন্ধকার ভালো। ভাবেন তিনি। তাঁর জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছেয়ে আছে অন্ধকার। অন্ধকার তাঁর প্রিয়সঙ্গী। আলোর সকল সংশ্রব থেকে নিজেকে ছিনিয়ে এনেছেন তিনি, আনতে হয়েছে। কেন এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে অটলবাবু নিজেও এক এক সময় স্তব্ধ হয়ে থাকেন। কেন এর উত্তর কথার আকারে দিতে গিয়ে অটলবাবু লক্ষ্য করেছেন কথাগুলো কেমন ভেঙে ভেঙে যায়, আলগা হয়ে পড়ে, একটা অব্যক্ত বিষণ্ণতা ছাড়া মনের অন্ধকারদেশে আর কোনো শব্দ তিনি খুঁজে পান না। তাই অটলবাবু নিজের কাছে এবং সকলের কাছে এত নীরব, এমন গম্ভীর। নিঃশব্দে রাস্তা দিয়ে হাঁটেন। রাস্তায় কারো সঙ্গে দেখা হোক তা তিনি চান না। যোগীনডাক্তার গায়ে পড়ে কথা বলে, জোর করে ধরে নিয়ে যায় চায়ের দোকানে। তাঁর ধূসর বিবর্ণ জীবনে একটা উজ্জ্বল আশার আলো দীর্ঘ বিলম্বিত রেখা ফেলে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে তাকি তিনি দেখতে পান না। হ্যাঁ নিশি, তাঁর ছেলে নিশানাথ। শহরের সব ক'টি ছেলের চেয়ে উজ্জ্বল দীপ্ত, একটি রত্ন। এ সত্য অটলবাবু অস্বীকার করছেন কেন। বাইশ বছর বয়সে অটলবাবু ঘরের একখানা বাঁশ পাল্টে সেখানে দুখানা ইঁট বসানোর সংকল্প দূরে থাক স্বপ্নেও কি কোনোদিন দেখতে পেরেছিলেন? কাল বিকেলে নিশানাথ প্ল্যান করছিল। বিল্ডিং হবে। এখানে। এই জমিতে। অটল রায়ের কাঁচা ভিটে পাকা হবে। ওকি, তুমি বিশ্বাস করছ না, বাবা? আমাকে বিশ্বাস করতে পারছ না এখনো, এমন ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছ কি? চোখ নামিয়ে অটলবাবু কাগজের ওপর নীল পেন্সিলের দাগ-কাটা দালান দেখছিলেন। বৈঠকখানা, লাইব্রেরী, তোমার শোবার ঘর, আমার শোবার ঘর। এটা পূর্বদিকের বারান্দা, —হ্যাঁ ওধারে কিচেন্ শেড্। এধারে বাথরুম। যুবকের সুপুষ্ট সুদৃঢ় দীর্ঘ তর্জনী বার বার এসে নক্সার ওপর ঠেকছিল। আশ্চর্য, তখনও ঠিক সে সময়েও অটলবাবু ভাবছিলেন উচ্ছৃঙ্খল অবুঝ বারো বছরের এক কিশোরের কথা। অবাধ্য, অশিষ্ট। 'আদর দিয়ে তুমি ওর মাথা নষ্ট করে দিয়েছ, এবার শাসন করো।' মৃত্যুশয্যায় শুয়ে হেমনলিনী শেষে একদিন বলেছিল। স্ত্রীর কথামত ছেলেকে অটলবাবু শাসন করতে গেছেন পরে, নিশানাথ দাঁত বসিয়ে দিয়েছে তাঁর হাতে আঁচড়ে দিয়েছে মুখ গলা। তথাপি অটলবাবু ছেলেকে শাসন করতেন, শাসন ক'রে শোধরাতে পারতেন সবে বিগড়ে যাওয়া বালকচরিত্র। কোথা থেকে একদিন ছুটে এসেছিল ছেলের মাতুল অবিনাশ। 'মারধর করে তুমি ছেলেকে শোধরাতে পারবে কি?' বড়লোক মাতুল ভগ্নিপতির সংসারের চেহারা দেখে অনেকদিন পর আবার বিদ্রূপ করে উঠেছিল, 'যথেষ্ট খেতে দাও পরতে দাও, প্রাচুর্যের মধ্যে বাড়তে দাও, তবে তো ছেলে বড় হবে মানুষ হবে। তা না করো ছেলেকে আদর করো, বুকে ভরে স্নেহ দাও—মারধর করলেই সন্তান বিগড়ে যায় বেশি, ভগিনী তথা ভাগ্নের প্রতি মমত্ববোধই অবশ্য এই বিদ্রূপের কারণ। অটলবাবু বুঝতেন। তাঁর দারিদ্র্যের প্রতি কটাক্ষ তাই বিদ্রূপের মধ্যেও একটা সত্য তিনি আবার খুঁজতে চেষ্টা করলেন। হ্যাঁ, তারপর তিনি ছেলের গায়ে আর একদিনও হাত তোলেননি। কিন্তু তারপর হল কি? আদর করে অবিনাশ, অবিনাশ ঠিক নয় তার স্ত্রী, নিশির মামী, পাটনার কেনা বড় চামড়ার সুটকেস থেকে সুন্দর সুট বার করে দিয়েছিল নিশানাথকে পরতে। অবিনাশের ছেলে রাতদিন ওইরকম সুন্দর পোষাক পরে থাকে। পরিচ্ছন্ন সুন্দর সেই ছেলের হাত, পা, নোখ। সুশৃঙ্খল পরিপাটি মুখ, চুল। নিশির সমবয়সী। সারাদিন বিলোলকুমারের সঙ্গে নিশি সুট্ পরে হাঁটল, কথা বলল, নিমগাছের তলায় গিয়ে দুজনে খেলল। ক্যামেরা দিয়ে ফটো তুলল মোহিনী নন্দীর কোন্ একটি ফ্রক-পরা মেয়ের। স্থির স্তব্ধ চোখে অটলবাবু সবই দেখলেন। না, চৌদ্দ বছর যখন ছেলের বয়স তখন ওর বালিসের নীচে সিগারেটের বাক্স দেখে অটলবাবু বিস্মিত হননি, কি স্কুল পালিয়ে ওর ম্যাটিনী শো দেখার কাহিনী শুনে। সবে নতুন আমদানী হয়েছে সিনেমা এই শহরে তখন। ওর ড্রয়ার হাতড়ে অটলবাবু একদিন এক বাণ্ডিল মেয়েদের চিঠি, মেয়েদের কাছ থেকে পাওয়া, ডজন দুই রুমাল, ছবি ও চুলের রিবন্ দেখেও তিনি পরমাশ্চর্য বোধ করেন নি।

অবিনাশের কথানুযায়ী আদর করতে শুরু করেছিলেন ছেলেকে, তার সুফল তিনি পাননি বললে মিথ্যা বলা হত না কি? বাইরে থেকে ছেলে শান্ত হয়ে গেছে। অসম্ভব শান্ত হয়ে গেছল নিশি। এখন আর প্রতিবেশীর বাগানে ঢুকে ফল চুরি ক'রে আনে না কিম্বা কাছারিতে চলছেন বুড়ো উকিল বনবিহারী

মুখুজ্যের শামলায় পিছন থেকে রাস্তার লাল ধুলো খামোকা ছিটিয়ে দিয়ে মেহেদির বেড়ার ঝোপে দাঁড়িয়ে হাসে না। সেই দুরন্তপনার ছিঁটেফোঁটা নেই। শান্ত শিষ্ট। বলার আছে কি। নিয়মিত স্কুলে যাচ্ছে, আসছে। পাড়ার পাঁচটি ছেলের সঙ্গে মাঠে হৈ-হুল্লোড় করে ডাংগুটি খেলা ছেড়ে দিয়ে শান্ত ভদ্র হয়ে ব্যাড্‌মিণ্টন খেলেছে প্রতিবেশী মোহিনী নন্দীর বাড়ির সামনের মসৃণ লনে। তারপর সন্ধ্যাবেলা নিজের পড়ার ঘরে চুপচাপ বসে নিঃশব্দে লেখাপড়া করেছে নিশানাথ।

অটলবাবুর পরিষ্কার মনে আছে কোন্ বয়স থেকে ছেলে চীৎকার করে পড়া তৈরী করা ছেড়ে দিয়ে বইয়ের দিকে চোখ রেখে চুপ করে পড়া প্রস্তুত করত। ওর জানালা দিয়ে মোহিনীবাবুর বাড়ির সামনেটা দেখা যেত।

তথাপি একদিন অটলবাবু, যতটা সম্ভব নম্র সংযত গলায় মন্তব্য করেছিলেন। অপ্রিয় কটুভাষণ শুনে, ছেলে সেদিন রাগ করেনি, দাঁত বসিয়ে দেয়নি অটলবাবুর হাতে পিঠে, খামচে দিতে ছুটে আসেনি। শান্ত মসৃণ গলায় হেসে উত্তর করেছিল, 'চরিত্র চরিত্র করে তুমি লাফালাফি করছ বাবা। জানো, বিলোল বলেছে তার বাবা ড্রিঙ্ক করেন এবং আরো অনেককিছু করেন। অতিরিক্ত ভাল ছেলে হয়ে তুমি নাকি জীবনে কিছুই করতে পারলে না। মামাবাবুর দুখানা গাড়ী আছে। ওদের মত এমন সুন্দর, প্যাটার্নের বিল্ডিং পাটনা শহরে আর একটিও নেই।' অইটুকুন ছেলে বিলোলকুমার কিশোর নিশানাথের কানে কানে বলে গেছে। শুনে অটলবাবু বিস্মিত হননি। তিনি জানতেন এই হবে।

প্রাপ্তেতু ষোড়শবর্ষে,—ছেলের ষোল বছর বয়স পূর্ণ হয়েছিল। তাই অটলবাবু আরো বেশি চুপ করে রইলেন সেদিন।

নিঃশব্দ অধঃপতনের পরিণাম অটলবাবু জানতেন। তিনি জানতেন টেক্সট বই ও মোহিনীবাবুর জানালার মধ্যে জানালার জয় অবশ্যম্ভাবী। দু' দুবার পরীক্ষায় ফেল করার পরও নিশানাথ তাই বাঁকা হেসে বাবাকে বুঝিয়েছিল, 'এগ্‌জামিন ফেল করলেই কি আর জীবন নষ্ট হয়, বাবা। তুমিও তো গোল্ড-মেডেলিস্ট। কিন্তু তাতে হয়েছে কি। সতেরো বছরের গ্যাস্‌ট্রিক আল্‌সারটা সারাবার মত ক'টা টাকা একত্র করতে পারলে না, পারছ না। এমন ভাল ছেলে না হওয়াই তো আমি ভাল মনে করি।'

পুত্রের মুখনিঃসৃত বচন শুনে লজ্জায় অধোবদন হয়েছিলেন পিতা। কিন্তু অটলবাবু জানতেন, তিনি জানতেন না কি তাঁর লজ্জার মাত্র শৈশব ছিল সেটা? নিজের মত ক'রে ছেলে গড়ে উঠ্‌ছে, গড়ছিল নিজেকে। অটলবাবু আশা করছিলেন লজ্জার পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ এসে একদিন তাঁকে ঢেকে দেবে, তিনি চিরতরে ডুবে যাবেন পুত্রের কৃতকর্মের গুণে। যেন প্রস্তুত হয়ে ছিলেন অটলবাবু। এখানে এই বৈঠক-খানায় একদিন সন্ধ্যার পর ছুটে এসে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছিলেন মোহিনীবাবু। অটলবাবুর হাতে ধ'রে অসহায় শিশুর মত কাঁদছিলেন।

রাত্রে, একটু বেশি রাত্রে ছেলেকে প্রশ্ন করতে নিশানাথ সুন্দর জবাব দিয়েছিল। 'তোমরা এখনো নাইণ্টিন্থ সেঞ্চুরীতে আছ বাবা। তুমি, মোহিনীবাবু। ভুলে যাচ্ছ এটা বিংশ-শতাব্দী, বিজ্ঞানের যুগ। এক ড্রপ্ মেডিসিনই যথেষ্ট। লিলি রাজী আছে। কিন্তু তাই বলে, তাই বলে তো এখুনি আমি একটা বিয়ে করতে পারিনে। অর্থ প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা। জীবনে আমার অনেক কিছু করবার আছে, বুঝলে।' শান্ত ভদ্র ছেলে অল্প অল্প হাসছিল বাপের মুখের দিকে চেয়ে। 'তুমি ভাবছ আমি শেষ হয়ে গেছি, কিছুই হ'ল না আমাকে দিয়ে। তাই ত? সত্যি আমি শেষ পর্যন্ত কিছু করি কিনা,—করতে পারলাম কি না সেদিন বুঝবে। দেখবে সেদিন।'

অটলবাবু কি কাল বিকেলে 'সেদিনে'র মুখোমুখি হয়ে খুব বেশি চম্‌কে উঠেছিলেন?

ব্লু-প্রিণ্ট গুটাতে গুটাতে নিশানাথ অল্প অল্প হাসছিল, বলছিল তখন, 'রায় আমাকে পার্টনার করবে তার কারবারে। বলে, তোমার মত এমন সুন্দর স্পেকুলেটার আর আমি দেখিনি। তোমাকে হাতছাড়া করলে আমার ক্ষতি হবে।'

অটলবাবু ছেলের দিকে তাকিয়েছিলেন।

তেমনি শান্ত ভদ্র সুবেশ! তেমনি বুদ্ধি-মার্জিত ঈষৎ বাঁকা হাসি ঠোঁটে। পাঁচবছরে একটু মোটা হয়েছে, রঙটা কালো হয়েছে বেশি। আর পরিবর্তনের মধ্যে তিনি লক্ষ্য করলেন নিশি গম্ভীর হয়েছে বেশ।

না, আরো একটা পরিবর্তন হয়েছিল এবং সেটা অটলবাবুর নিজের। তিনি আর প্রশ্ন করেননি, এই কাগজের বাড়ি কবে উঠবে এখানে: তুমি তো এখন মাত্র তিনশ টাকা মাইনে পাচ্ছ শুনলাম: রায়ের ব্যাঙ্কের এই ব্রাঞ্চের ম্যানেজারি করে।

হবে, হচ্ছে। যেন নিশানাথ বলছিল। আমায় দিয়ে তো তুমি কোনকালেই কিছু আশা করতে না, কিন্তু তোমার সেই ভুল আমি ভাঙ্গব।

অটলবাবু কি দেখতে পাচ্ছেন না নিশানাথ বাড়িতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর একুশ-বছরের ভাঙ্গা চশমার ফ্রেম নতুন হয়ে গেছে। এতকাল পর তাঁর দৈনিক একসের দুধ জুটেল গ্যাস্‌ট্রিক আল্‌সারের যথোচিত পথ্যস্বরূপ। একটা চাকর রাখা হয়েছে। সেই স্ত্রী-বিয়োগের পর থেকে অটলবাবু নিজহাতে রেঁধে খাচ্ছিলেন। ভাত আর কচু বা আলুসিদ্ধ। দু'বেলা।

• এতটাই যে হবে অটলবাবু কোনোদিন আশা করেছিলেন কি?

তথাপি অটলবাবু ভাবেন। বারান্দায় চেয়ারে বসে গভীর রাত পর্যন্ত তিনি ভাবছেন। কালও এমনি তিনি ভেবেছিলেন, পরশু ভেবেছেন,—নিশি যেদিন বাড়িতে আসে সেদিনও ভেবেছিলেন। না, তার আগেও তিনি ভেবেছেন। একদিন নয়, রোজ। কৈশোরের কয়েকটা বছর বাদ দিয়ে, অর্থাৎ ছেলে একটু বড় হয়েছে পর থেকে আজ অবধি ক্রমাগত নিমর্ষ বিমূঢ় চিত্ত অটলবাবু কেবলই ভাবছেন। কিসের এই আশঙ্কা, কেন ভয়।

উত্তর ছিল না বলেই অটলবাবু আরো বেশি নিস্তেজ ম্রিয়মান হয়ে আছেন।

রাত বারোটায় এপাড়ার সাবরেজিস্ট্রার-বাবুর কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ জেগে থাকে না। একটু আগে নিরঞ্জন রায়ের আর্দালী এসে খবর দিয়ে গেছে ম্যানেজারবাবু রাত্রে ওখানে খাবেন, আর রাত বেশি হয়ে গেলে তিনি ফিরবেন না। সাহেবের বাংলোয় থেকে যাবেন।

জেলখানার পেটা ঘড়িতে ঢং করে একটা বাজল। অটলবাবু একটু চমকে উঠে আবার স্থির হয়ে চেয়ারে বসে রইলেন। অন্ধকার আকাশে জ্বলন্ত নক্ষত্র থেকে নক্ষত্রে তাঁর বিনিদ্র চক্ষু দুটি ঘুরে বেড়ায়।

চেরীর জন্যেই চেরীর বাপ মাকে পাহাড় থেকে সমতলে নেমে আসতে হয়েছে।

চেরীর জন্মের পর থেকে নীহারনলিনী, মানে যোগীন ডাক্তারের স্ত্রীর হার্টের ব্যারাম।

হার্টের দোষ নিয়ে টিলার ওপর থাকা বিপজ্জনক।

চেরী নাম চা-বাগানের বুড়ো ম্যানেজার কার্টার সাহেবের দেওয়া। বাঙালী শিশুর অত্যধিক ফর্সা রং দেখে খুশি হয়ে সাহেব এই নামকরণ করেছিল কি কার্টারকে খুশি করবার জন্যে ডাক্তার বলে কয়ে মেয়ের জন্যে সাহেবের স্বদেশী নামটা আদায় করেছিল ঠিক জানা যায় না। তবে দুষ্টলোকে বলে এই মেয়ে বুড়ো কার্টারের। ডাক্তারের নয়। অবশ্য যোগীনডাক্তার এত ভালমানুষ যে তার মুখের ওপর পরম-শত্রুও একথা বলতে গররাজী হবে, হয়েছে। নীহারনলিনীর কানে এই অপবাদ তুলবার সাহস বাগানের কারোর ছিল না। কেননা তা হ'লে ফল অন্যরকম দাঁড়াতো। নীহারনলিনী অপবাদকারীকে তেড়ে মারতে যেতো ঠিক, নীহারনলিনী তেজস্বিনী। কিন্তু তার আগে আরম্ভ হয়ে যেতো ওর হার্টের ব্যারাম।......... একটা হৈ চৈ কাণ্ড বেধে যেতো এবং কুৎসা-রটনাকারীকেই হয়ত তখন তাড়াতাড়ি জলের

ট ও পাখা নিয়ে বসে পড়তে হত রোগিনীর শুশ্রূষা করতে। এই ধরণের ঘটনা বাগানে হয়েছে। ক্লার্কবাবুর স্ত্রী নীপবালা, অবশ্য ব অপবাদ নয়, নীহারনলিনীকে একবার খের ওপর মিথ্যাভাষিণী বলে ফেলেছিল। রণ নীহার তার সুরাঠী শাড়ির দাম ক্লার্কের ীর কাছে যা বলেছিল ডাক্তার নাকি ক্লার্ককে র আগেই আসল মূল্যটা বলে ফেলেছিল, র্থাৎ নীহারনলিনীর দামের অর্ধেকেরও কম। ন্তু নীহারকে মিথ্যুক বলার ফল দাঁড়িয়েছিল । বেচারা এখন যায় তখন যায়। নীপবালা য় খুনের দায়ে পড়ে আর কি। হাতপাখা ং জল নিয়ে তখনি তাকে বসতে হয়েছিল াগিনীর শুশ্রূষায়। এরকম।

. যাক্ সেসব কথা।

এখন চেরীর জন্মের পর থেকেই নীহারের টের দোষ হল কি করে। একটানা সতেরো টা নাকি থাকতে হয়েছিল ওকে লেভারের পর। আর সে কি অসহ্য পেইন। তিনদিন ন রাত্রি আহার নিদ্রা ত্যাগ করে যোগীন-ক্তারকে প্রসূতির সেবা করতে হয়েছিল। তেরো বোতল পোর্ট খেয়েছে নীহার চেরীকে সব করার পর। এবং তাতে নাকি নীহার য় সেরে উঠেছিল, একবারে সেরে যেতো ওর কের সবরকম দুর্বলতা। কিন্তু কথায় বলে, পালে ভোগ থাকলে তুমি তা খণ্ডন রবে কি করে। নীহার এক এক সময় দুঃখ রে নিজেই নিজের কথা বলে। জঠরের ঘুমন্ত রী যে ব্যথা দিয়েছিল ঘুম থেকে জেগে উঠে চতুর্গুণ ব্যথা দিতে শুরু করল। একটু বড় তে না হতে একবছর কি, দু'বছর বয়সেও ঝা যায়নি মেয়েকে। তিন বছরেও না। তিন কে যখন চার বছরে পা দেয় তখন থেকেই ঝা গেছে।

আশ্চর্য, এমন সুন্দর ফিট্‌ফাট্ ফর্সা হারা কার্টারের কাছে নিয়ে গেলেই চেরী ৎকার করে উঠত, যেমন জল দেখে জলাতঙ্ক াগী চীৎকার করে ওঠে। এবং সাহেবের ংলোয় একদিন মেয়েকে কোলে করে নিয়ে বার সময় বিপদ ঘটল। চেরী ডাক্তারের গলায় ত বসিয়ে দিয়েছিল রেগে। হ্যাঁ, অতটুকু য়ে।

তারপর অবশ্য ডাক্তার আর চেষ্টা করেনি য়েকে সাহেবের বাংলোয় নিয়ে যেতে।

কুলি দেখলে, কুলিকামিন কেউ সামনে এসে াঁড়িয়েছে দেখলে মেয়ে ছুটে গেছে ওদের কালে। সেই গভীর কৃষ্ণ রঙের অসভ্য নোংরা ক একটা মানুষ দেখে ও কেবল ছটফট রেছে কতক্ষণে কাছে যাবে। সাত বছর বয়স খন চেরীর। আবিষ্কার করলেন একদিন ার্কবাবু। দুপুরবেলা, বাবুদের কোয়ার্টার থকে বেশ দূরে, একটা ঝোপের পাশে সর্দার কুলি নাথুরামের দশ-বারো বছরের ছেলে মোংরার কোলের ওপর চুপচাপ বসে আছে ফ্রক্‌পরা ফুটফুটে মেয়ে। ক্লার্কবাবু দেখেই অবশ্য চিনতে পারেন ডাক্তার-তনয়া। মোংরার পরনে কাপড়চোপড় ছিল না। সম্পূর্ণ উলঙ্গ। ওর দুই হাঁটুর মাঝখানে বসে চেরী খুব হাসছে আর মোংরা কালো কালো আঙুলে দিয়ে চেরীর লাল টুকটুকে ঠোঁট দুটো ফাঁক ক'রে খোসা-ছাড়ানো আঁশফল তুলে দিচ্ছে চেরীর মুখে। না, ক্লার্কবাবুর চোখে দৃশ্যটা তত খারাপ ঠেকত না যদি কুলির বাচ্চাটা এমন অকাট উলঙ্গ না থাকত আর ডাক্তারের মেয়ের পরনে না থাকত লেস্-তোলা সুন্দর ফ্রক। দুটো মিলে দৃশ্যটা কেমন বিসদৃশ ঠেকছিল।

কথাটা যোগীন ডাক্তারের কানে গেল। নীহারনলিনীও শুনল। মেয়েকে চোখে চোখে রাখার ব্যবস্থা হ'ল। ডাক্তার তো আর কাজ-কর্ম ফেলে ঘরে বসে মেয়ে আগলাতে পারে না,—নীহারকেই সেই ভার নিতে হয়।

খুব কাছেও সে মেয়েকে বাইরে যেতে দিত না একলা।

আট বছর বয়সে চেরী চীৎকার, রাগারাগি, দাঁত বসানো, কি নোখ দিয়ে আঁচড়ানো এসব বন্ধ করল। গুম্ মেরে বসে থাকতে শিখল। আট থেকে ন'বছর বয়স অবধি এই করেছে আর মা যখনই একটু গালমন্দ করেছে সাবধানে সতর্ক চোখে ও বার বার তাকিয়েছে সদরের দিকে। বাবা তালাবন্ধ করে বাইরে যায় দেখতো রোজ এবং তখন আরো যেন বেশি গুম্ মেরে থাকত চেরী।

যোগীন ডাক্তার বলত, 'গম্ভীর হওয়া ভাল। মেয়ে সন্তানের একটু গম্ভীর হওয়া মন্দ কি।'

'একটু বেশি আগে গম্ভীর হয়ে গেছে নাকি?' নীহার বিড় বিড় করত। ডাক্তার বলত সব ঠিক হয়ে যাবে। 'ঠিক হবে না। জন্মকালে যে মেয়ে এত ব্যথা দেয়, চিরটাকালই ও জ্বালায়।' নীহার বলত। কেননা মেয়ের ধরণধারণ ওর মোটেই ভাল লাগছে না। নিজে ফিটফাট ছিমছাম পরিচ্ছন্ন মেজাজের মানুষ। আর দিন থেকে দিন মেয়েটার অদ্ভুত স্বভাব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ও লক্ষ্য করছিল। ফিতে দিয়ে চুল বেঁধে দিলে ফিতে খুলে ফেলে। স্নান করাতে পারে না ব'লে-কয়ে। মুখ কালো ক'রে একলা চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে মাটির ওপর কখন ঘুমিয়ে পড়ে। তা-ও ভাল ছিল। এক-দিনের একটা দৃশ্য দেখে নীহারনলিনীর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। ভেবেছিল ও চেরী বুঝি সেদিন সারাটা সকাল গুম্ মেরে বসে থাকার পর দুপুরবেলা পিছনের বারান্দায় পড়ে ঘুমোচ্ছে। উল দিয়ে একটা মাফ্‌লার বুনছিল নীহার ক'দিন ধরে ডাক্তারের জন্যে। সেদিন দুপুরে হঠাৎ কি খেয়াল হতে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ও। পিছনের দরজার পর্দা একটু ফাঁক করে দেখল মেয়ের কাণ্ড। একটা বড় বেতের মোড়া বরাবরই বারান্দায় পাতা থাকে। আর, অনেকদিন চোখে পড়েছে নীহারের প্রকাণ্ড একটা হুলো, কাদের বেড়াল কেউ জানে না, এ বাড়িতেও এসে মাঝে মাঝে ঢোকে। বেশিরভাগ দুপুরবেলা। হয়ত এসেই প্রথম মাছের ঘরে ঢুকল কি দুধের কড়াইয়ের কাছে গিয়ে ঘুর ঘুর করতে শুরু করল। টের পেলেই নীহার তৎক্ষণাৎ হুলোটাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু নীহারের রুচি আর মেয়ের রুচি তো এক নয়। রুদ্ধশ্বাস নীহার পর্দার ফাঁক দিয়ে সেদিন দেখল চেরীর কীর্তি। বেড়ালটাকে কৌশল করে ঢুকিয়েছে মোড়ার তলায়। আর তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে একমনে মেয়ে বেতের জালির ফাঁক দিয়ে একটা কাঠি গলিয়ে গলিয়ে হুলোর শরীরের একটা বিশেষ অংশ নেড়ে চেড়ে দিচ্ছে। আহ্লাদে হুলো লেজ ফুলিয়ে চোখ বড় করে চেরীর মুখের সামনে মুখ এনে গরুর শব্দ করছে। ছুটে গিয়ে নীহার তখনি অবশ্য মেয়ের পিঠে ক'ঘা বসিয়ে দিয়েছে এবং বেড়ালটাকে লাথি মেরে দূর করে দিয়েছে পাঁচীলের বাইরে। চেরীকে আর একলা দুপুরবেলা কোনদিন বারান্দায় বসে থাকতে দেয় নি নীহার। কিন্তু সেই অদ্ভুত দৃশ্য তার মন থেকে মুছল না।

রাত্রে ডাক্তারকে বলতে ডাক্তার ড্যাব-ড্যাব করে স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে থেকে কতক্ষণ পর বলল,—'এ সবের অর্থ কি?'

'অর্থ আর কি?' অস্ফুট শব্দ করল নীহারনলিনী, 'অর্থ যা-ই থাক, মেয়েকে সামলাতে হবে আমাকেই, তুমি তো আর সময় পাও না। মেয়ে চোখে চোখে রাখবার দায় আমার।'

(ক্রমশঃ)


**AMERICAN CAMERA**
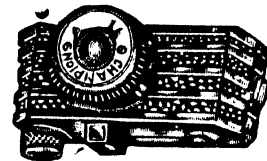
এমন কি সাধারণ অজ্ঞ লোকও এই ক্যামেরার সাহায্যে বিনা ঝঞ্ঝাটে, সুন্দর সুন্দর ফটো তুলিতে পারিবেন। প্রতি ক্যামেরার সহিত ১৬ খানা ছবি তুলিবার ফিল্ম, একটি লেদার কেস্ বিনামূল্যে দেওয়া হয়। মূল্য ১৫্ টাকা। ডাকব্যয় ১৷৹ আনা

**পার্কার ওয়াচ কোং**

১৬৬নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা—৭।

# "ক্ষুরস্য ধারা"—
## সমরসেট ম'ম

অনুবাদক—**শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়**

**(পূর্বানুবৃত্তি)**

( তিন )

কয়েকদিন পরে ইংলণ্ড যাত্রা করলাম। আমার বাসনা ছিল সোজা যাই, কিন্তু যা ঘটে গেল তারপর বিশেষ করে ইসাবেলকে দেখার প্রয়োজন ছিল, তাই প্যারীতে চব্বিশ ঘণ্টা থামবে স্থির করলাম। ওকে তার করে জানালাম অপরাহ্ন শেষে ওর কাছে গিয়ে ডিনার পর্যন্ত থাকতে পারি কি না; যখন হোটেলে পেঁাছলাম, একটা চিঠিতে জানলাম যে গ্রে ও ইসাবেল সেদিন বাইরে ডিনার খাবে, কিন্তু আমাকে দেখতে পেলে সে খুশি হবে, তবে সাড়ে পাঁচটার পূর্বে নয়, তখন আবার অন্য ব্যাপার আছে।

বেশ ঠাণ্ডা, মাঝে মাঝে বেশ জোরে বৃষ্টি হচ্ছিল, তাই অনুমান করলাম গ্রে হয়ত মরতফ'তেনে গলফ্ খেলতে যাবে না। আমার পক্ষে সময়টা তেমন খাপ খায় না, কেননা ইসাবেলকে একা দেখারই বাসনা ছিল আমার, কিন্তু ওদের ওখানে পেঁাছতে সর্বাগ্রেই সে শোনালো গ্রে "ট্রাভেলার্স" ব্রীজ খেলছে।

ইসাবেল বলে, "আমি ওকে বলেছি যদি আপনাকে দেখার ইচ্ছা থাকে তাহ'লে যেন বেশী দেরী না করে। তবে আমরা ন'টার আগে ডিনার খাবো না, তার মানে সাড়ে ন'টার পূর্বে ওখানে যাওয়ার প্রয়োজন নেই, তাই কথা বলার প্রচুর অবসর পাওয়া যাবে। আপনাকে বলার মত অনেক কথা আছে।"

বাড়িটা ওরা অপর একজনকে ভাড়া দিয়েছে, এলিয়টের সংগ্রহাবলীর নীলাম এক পক্ষের ভিতরই হবে। ওরা সেই নীলামে যাবে—আর 'রিজ' হোটেলে উঠে যাচ্ছে। তারপর আমেরিকা পাড়ি দেবে। ইসাবেল এলিয়টের এনটিবের বাড়ির আধুনিক চিত্রাবলী ছাড়া সব কিছুই বিক্রী করবে। যদিও সেগুলি সম্পর্কে ওর তেমন আগ্রহ নেই তবুও এটুকু ঠিক বোঝে যে, ওদের ভবিষ্যৎ বাসগৃহে সেগুলি সম্ভ্রম বৃদ্ধি করবে।

"মামা বেচারা তেমন আধুনিক ছিলেন না যে—শুধু পিকাসো, মাটিসে আর রুয়াউলট্। আমার মনে হয় ওদের দিক দিয়ে অবশ্য ছবি ভালোই, তবে মনে হয় কেমন যেন সেকেলে দেখায়।"

"আমি তুমি হ'লে ও নিয়ে আর মাথা ঘামাতাম না, কয়েক বছরের ভিতরই অন্যান্য চিত্রশিল্পীর উদ্ভব হবে—আর পিকাসো বা ম্যাটিসে তোমার ইম্প্রেসনিস্টদের চেয়ে আধুনিক দেখাবে না।"

গ্রে ব্যবসাঘটিত আলোচনা চালাচ্ছে, আর ইসাবেল প্রদত্ত মূলধনের বলে একটা উন্নতিশীল ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ভাইস-প্রেসিডেন্টের পদ পাবে। ব্যবসাটি তৈল সংক্রান্ত, তাই ওদের 'ডাল্লাসে' থাকতে হবে।

"প্রথমেই আমাদের একটা ভালোমত বাড়ি ঠিক করে নিতে হবে। একটা ভালো বাগান চাই, কারণ খেটেখুটে এসে গ্রে বাগানে বেড়াতে পারবে। আর আমার একটা বড় বসবার ঘর চাই, অনেক লোকজনকে যাতে আদর-আপ্যায়ন করতে পারি।"

"এলিয়টের আসবাবপত্র নিয়ে যাচ্ছ নাকি!"

"—না, তেমন উপযোগী হবে না। আমি সবটাই আধুনিক ধরণের আসবাব করব, মাঝে মাঝে একটু মেক্সিক্যান স্পর্শ দেব জৌলুষ বাড়াবার জন্য! ন্যুইয়র্কে পেঁাছেই খবর নেব এখন কোন্ সজ্জাকরকে সবাই ডাকে।"

ইসাবেলের চাকর এণ্টয়িন একটি ট্রে-তে বহু বোতল সাজিয়ে নিয়ে এল, আর নিয়তকুশলা ইসাবেল জানত যে দশজনের ভিতর ন'জন পুরুষের অন্তত ধারণা যে তাঁরা ভালো ককটেল মেশাতে পারেন (সে ধারণা ঠিকও)—তাই সে আমাকে দুটি ককটেল মেশাতে বলল। আমি জিনের সঙ্গে নইলি-প্রাট্ মিশিয়ে এক বিন্দু এ্যাবসিন্থে দিয়ে দিলাম, তার ফলে ড্রাই মার্তিনি এমনই সুপেয় হয়ে ওঠে যে, সুরলোকে দেবতারাও তাঁদের স্বর্গজাত অমৃতোপম সোমরস ত্যাগ করে এই পানীয় গ্রহণ করবেন, আমার বরাবরই ধারণা এই পানীয় 'কোকো-কোলা'র সমজাতীয়। ইসাবেলের হাতে গ্লাসটি দিতে গিয়ে দেখলাম টেবলের ওপর একখানি বই রয়েছে।

আমি বল্লাম, "বা রে—এ যে লারীর বই দেখছি।"

"হ্যাঁ, আজ সকালে এল, কিন্তু আমি এতই ব্যস্ত, লাঞ্চের আগে হাজারটা কাজ, তারপর বাইরে লাঞ্চ খেয়েছি, তারপর দুপুরে মলিনো গিয়েছি, কখন যে ওটা নেড়েচেড়ে দেখবার সময় পাব জানি না।

বিষাদমগ্ন চিত্তে ভাবতে লাগলাম লোক কিভাবে কত সময় ব্যয় করে, হয়ত হৃদয়ের রক্ত ঢেলে দিয়ে বই লেখেন আর পাঠক সেটি টেবলে ফেলে রেখে দেয়, যখন তার আর করবার কিছুই থাকে না তখন অবসর যাপনের জন্য অনুগ্রহ করে সেটি পড়বে। তিনশ পাতার বই, চমৎকার ছাপা ও বাঁধাই।

ইসাবেল বলে : "লারী সারা শীতকালটা স্যানারিতে ছিলেন, আপনার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছিল নাকি?"

"হ্যাঁ, এই সেদিন তুলোঁয় আমরা একসঙ্গে কাটালাম।"

"তাই নাকি? কি করছিলেন ওখানে?"

"সোফীকে কবর দিচ্ছিলাম!"

ইসাবেল চীৎকার করে উঠল : "সে মরেছে নাকি?"

"না মরলে তাকে কবর দেওয়ার ত' কোনো হেতু নেই।"

"মজার কথা নয়।" তারপর এক মুহূর্ত থেমে বলে, "দুঃখিত হওয়ার ভাণ করবো না, তবে মদ আর আফিমের সংমিশ্রণে বুঝি এমন হ'ল!"

"না, সম্পূর্ণ নগ্ন ও গলাকাটা অবস্থায় ওর দেহ সমুদ্রে ফেলে দিয়েছিল।"

সেণ্ট জীনের ব্রিগেডিয়ারের মত আমিও নগ্নতা সম্বন্ধে অতিশয়োক্তি করার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না।"

"কি ভয়ংকর! আহা বেচারা! অবশ্য ও যে জীবন যাপন করত তাতে এই শোচনীয় পরিণতিই স্বাভাবিক।"

"তুলোঁর কমিশার দ্য পুলিসও এই কথাই বলেছিলেন।"

"কে করেছে এই কাণ্ড, ওরা জানেন কি!"

"না তা জানে না, কিন্তু আমি জানি। তুমিই তাকে হত্যা করেছ এই আমার ধারণা।"

আমার মুখের পানে ও সবিস্ময়ে তাকিয়ে রইল—বলে :—

"কি বলছেন আ প নি?" তারপর মুখ টিপে হেসে বলে, "আমার স্বপক্ষে 'alibi' আছে—ঘটনাকালে আমি অন্যত্র ছিলাম।"

"গত গ্রীষ্মকালে সোফীর সংগে তুলোঁতে দেখা হয়ে যায়। অনেকক্ষণ কথাবার্তা হল।"

"প্রকৃতিস্থ ছিল?"

"যথেষ্ট। লারীর সংগে বিবাহের মাত্র দু' একদিন আগে কেন ও অকারণে নিরুদ্দেশ হয়েছিল সেই কাহিনী আমাকে বলেছিল।"

লক্ষ্য করলাম ইসাবেলের মুখভাব কঠোর হয়ে উঠল। সোফী যা যা আমাকে বলেছিল ওকে বলতে লাগলাম। সে হুঁশিয়ার হয়ে শুনতে লাগল।

"আমি তখন থেকেই ওর কাহিনী বিশেষ বে ভেবেছি, আর যতই সে কথা ভেবেছি তই বুঝেছি যে এর ভিতর কেমন একটা লা ব্যাপার আছে। আমি এখানে অন্তত ড়িবার লাঞ্চ খেয়েছি, কখনো লাঞ্চের সময় মি মদ রাখোনি,—সেদিন তুমি একাই লাঞ্চ য়েছিলে, কফি কাপের সংগে ট্রে-তে হঠাৎ ; ভ্রভকার বোতল থাকবে কেন?"

"এলিয়ট মামা সবে ওটি পাঠিয়েছিলেন। মার চেখে দেখার বাসনা হল যে 'রিজে' মনটি লেগেছিল সেই স্বাদ পাওয়া যায় না।"

"হ্যাঁ, আমার মনে আছে তখন তুমি কি ন্ডটাই না করেছিলে। আমি বিস্মিত হয়েলাম, কারণ লিকিয়োর মদ ওভাবে তুমি নো খাও না, তোমার শারীরিক আকৃতির র কড়া নজর আছে বলেই তুমি লিকিয়োর খাও, সেই সময়েই আমার মনে হয়েছিল ফীকে প্রলুব্ধ করার জন্যই তুমি অমন করছ, বেছিলাম হয়ত বা ওটা বিদ্বেষপ্রসূত।"

"ধন্যবাদ।"

"মোটামুটি পূর্বনির্ধারিত সময় তুমি লোভাবেই মেনে থাক, তাহলে যার বিবাহের যাক কিনে দিতে তুমি আগ্রহান্বিত হয়ে ছ, সেই সোফীর জীবনের পরমতম মুহূর্তে ন তুমি কথার খেলাপ করে বাইরে যাবে ?"

"সে ঐ কথা আপনাকে বলেছে না কি! নের দাঁত নিয়ে আমি অস্বস্তি বোধ ছিলাম, আমাদের ডেণ্টিস্ট ভারী ব্যস্ত কন, তাই তিনি যে সময় ঠিক করে দিলেন, ম সেই সময় নিতে বাধ্য হলাম।"

"লোকে যখন ডেণ্টিস্টের বাড়ি যায়, তখন পরের কাজটাও ঠিক করে যায়।"

জানি, কিন্তু উনি সকালে আমায় ফোন লেন যে, আগেকার সময়ের পরিবর্তে টার সময় ঠিক করেছেন, আমাকে তাই টাই নিতে হল।"

"গভর্নেস কি জোনকে নিয়ে যেতে ত না?"

"আহা বেচারী ভয় পেয়েছিল, ভাবলাম, ম সংগে গেলে হয়ত বেচারা খুশি হবে।"

"ফিরে এসে যখন দেখলে জ্রভকার বোতল ভাগ খালি, আর সোফী নেই, তখন কি চর্য হওনি?"

"আমি ভাবলাম ও অপেক্ষা করে ক্লান্ত পড়ে নিজেই মলিনোয় চলে গেছে। কিন্তু ওখানে গিয়ে শুনলাম সে সেখানে মোটেই নি, তখন অবশ্য অবস্থাটা ঠিক যে কি লাম না।"

"আর জ্রভকা?"

"—হ্যাঁ, আমি অবশ্য লক্ষ্য করলাম, কখানি শেষ হয়েছে—ভাবলাম এণ্টয়িন হয়ত শেষ করেছে, এমন কি আমি ওকে প্রায় বলে বসেছিলাম, তবে এলিয়ট মামা ওর মাইনে দিতেন আর ও জোসেফের বন্ধু তাই আমি উপেক্ষা করে গেলাম। চাকর হিসাবে ও খুব ভালো, কাজেই মাঝে সাঝে দু'এক চুমুক টানলে আমি ওকে কিছু বলার কে?"

"ইসাবেল তুমি কি মিথ্যাবাদী!"

"আপনি আমাকে বিশ্বাস করেন না?"

একবিন্দুও নয়।"

ইসাবেল উঠে পড়ে চিমনীর ধারে গেল,—সেখানে কাঠের আগুন জ্বলছে, এমন দিনে আগুনটা ভালোই লাগে। একটি কনুই সেলফের ওপর রেখে মাধুর্যমণ্ডিত ভংগীতে দাঁড়িয়ে রইল, আকৃতিতে মনোভাব চেপে এমনভাবে দাঁড়ান তার মনোহর ভঙ্গিমাবলীর অন্যতম। অধিকাংশ বিশিষ্ট ফরাসী মহিলার রীতি অনুসারে দিনের বেলায়ও কালো পোষাক পরে থাকে, সে রঙ ওর অপূর্ব গায়ের রঙের সংগে আশ্চর্যরকম খাপ খায় আর এখন সে যে পোষাকটি পরে আছে তার ব্যয়বহুল সরলতা ওর তন্বী দেহের সংগে চমৎকার মানিয়েছে। সে এক মিনিট সিগারেট টেনে নিয়ে বলেঃ—

"আপনার কাছে আমার অকপট না হওয়ার কোনো কারণ নেই।—সত্যি ওভাবে আমার চলে যাওয়াটা পরিতাপের বিষয়, আর এণ্টয়িনের কোনো কারণেই কাফির সরঞ্জাম ও মদ টেবলে রাখা উচিত হয়নি। আমি বাইরে যাওয়ার সংগেই ওগুলি নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। ফিরে এসে যখন দেখলাম বোতলটা প্রায় নিঃশেষিত তখনই বুঝেছি কি হয়েছে, আর যখন সোফী নিরুদ্দিষ্ট হল, তখন বুঝলাম সে ফুর্তি করতে বেরিয়েছে। এ বিষয়ে কাউকে কিছু বলিনি—তার কারণ ভেবেছিলাম লারী হয়ত কষ্ট পাবে। ওরা বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়েই ছিল।

"বোতলটা তোমার নির্দেশেই টেবলে পড়েছিল না, এ বিষয়ে তুমি নিঃসন্দেহ!"

"নিশ্চয়ই।"

"আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না।"

ক্ষিপ্ত হয়ে ইসাবেল সিগারেটটা ছুঁড়ে আগুনে ফেলে দিল। রাগে ওর চোখ কালো হয়ে উঠল, বল্লেঃ—বেশ যদি সত্য কথাই শুনতে চান তা হ'লে তাই জেনে রাখুন—আর আপনি চুলোয় যান। আমি ইচ্ছে করেই করেছি আর আবার করব। আমি ত' আপনাকে বলেইছিলাম যে লারীর সংগে ওর বিয়ে বন্ধ করতে আমি কিছু করতেই বাকী রাখব না। আপনারা কিছুই করবেন না, আপনি বা গ্রে, আপনারা শুধু—কাঁধ নেড়ে বল্লেন—ভীষণ ভুল করছে। আপনারা গ্রাহ্যই করলেন না, তাই আমাকেই ব্যবস্থা করতে হ'ল।

"ওকে যদি একাই ছেড়ে দিতে তাহলে আজ সে বেঁচে থাকত।" "লারীর সংগে বিয়ে হ'ত, লারীর জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠত। লারী ভেবেছিল ওকে এক নতুন স্ত্রীলোক করে তুলবে। পুরুষগুলো কি ভীষণ নির্বোধ! আমি জানতাম আজ বা কাল সোফী ভাঙবেই। স্বচক্ষেই ত' রীজে দেখলেন কেমন একটা বেয়াড়া ভাব। ও যখন কফিতে চুমুক দিচ্ছিল তখন আপনি ওর দিকে তাকিয়েছিলেন আমি লক্ষ্য করেছি। ওর হাত এমন কাঁপছিল যে এক হাতে কাপটা ধরতে ওর ভয় করছিল; দু হাত দিয়ে ধরে তবে মুখে তুলেছিল। ওয়েটার যখন গ্লাসগুলি ভর্তি করছিল তখন সে মদের দিকে তাকিয়েছিল। বোতলের ওপর ওর সেই ঘোলাটে চোখ মেলে ও সাপ যেমন তার শীকারের পানে ধাওয়া করে তেমনই ভাবে তাকিয়েছিল। আমি বুঝেছিলাম একপাত্র মদের জন্য ও প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারে।"

ইসাবেল আমার মুখের পানে তাকাল, তার চোখ উত্তেজনায় জ্বলছে, কণ্ঠস্বর কর্কশ হয়ে উঠেছে, তাড়াতাড়ি মুখে কথা আসছে না।

সে বলেঃ "এলিয়ট মামা যখন পোলিস' লিকিয়োর সম্বন্ধে অত ঢঙ করতে লাগলেন তখনই আমার মাথায় এই ফন্দিটা জাগল। জ্রভকা আমার অতি কদর্য লাগল, কিন্তু এমন ভান করলাম যে, এমন অদ্ভুত জিনিস আর আস্বাদ করিনি। আমি নিশ্চিত ছিলাম ও যদি সুযোগ পায় তাহলে কোনোমতেই লোভ দমন করতে পারবে না। তাই ওকে ড্রেস শোতে নিয়ে গিয়েছিলাম। তাই ওকে বিয়ের পোষাক উপহার দিতে চেয়েছিলাম। সেইদিন যখন পোষাকটা ঠিকমত হয়েছে কিনা দেখবার জন্য যাওয়ার কথা আমি এণ্টয়িনকে বল্লাম—লাঞ্চের পর একটু জ্রভকা খাব, আর একজন মহিলা আসবেন আশা করছি, তিনি যদি আসেন তাঁকে অপেক্ষা করতে বোলো, কফি দিও, আর জ্রভকাটা ওখানেই থাক যদি তাঁর প্রয়োজন হয় তাহলে তিনি এক আধ গ্লাস নিতে পারেন। আমি জোনকে নিয়ে ডেণ্টিস্টের কাছে গিয়েছিলাম বটে কিন্তু আগে থেকে ব্যবস্থা না থাকায় দেখা হল না। তাই জোনকে নিয়ে নিউজরীল দেখাতে গেলাম। ঠিক করেছিলাম সোফী যদি মদ না ছোঁয় তাহলে যা ভালো হয় তাই করব, ওর সংগে ভালো করেই বন্ধুত্ব বজায় রাখব। একথা সত্য, আমি শপথ করছি। কিন্তু বাড়ি গিয়ে বোতল দেখেই বুঝলাম আমার অনুমান সত্য। —সে চলে গেছে আর ও যে চিরদিনের মতই গেছে এ বিষয়ে আমি এতই নিঃসন্দেহ ছিলাম যে ও বিষয়ে যে কোন অঙ্কের টাকা বাজী রাখতে পারতাম।"

কথা শেষ করে ইসাবেল প্রকৃতই হাঁফাতে লাগল।

আমি বল্লাম, "আমিও অল্পবিস্তর এই রকমই অনুমান করেছিলাম, দেখছ ত আমার কথাই সত্য, তুমিই তার গলা কেটেছ, নিজের হাতেই তার গলায় ছুরি চালিয়েছ।"

"ও অতি খারাপ, খারাপ, খারাপ—মরেছে আমি খুশী হয়েছি।" এই বলে সে চেয়ারে এলিয়ে পড়ল—বল্লেঃ "আমাকে একটা ককটেল দিন।"

আমি আর একটা ককটেল মেশালাম।

আমার হাত থেকে গ্লাসটা নিতে নিতে ইসাবেল বলে, "আপনি অতি ছোটলোক", তারপর সে একটু হাসল,—ছোটদের দুষ্টামি-ভরা মধুর হাসি, যাতে রাগ করা চলে না,—বলে—লারীকে কখনো বলবেন না ত?"

"স্বপ্নেও ভাবি না ও কথা—।"

"দিব্যি করুন, পুরুষদের বিশ্বাস করা যায় না।"

"আমি প্রতিজ্ঞা করছি বলবো না, আর বলার বাসনা হলেও তা সম্ভব হবে না, সে সুযোগ পাওয়া যাবে না, কারণ আমার জীবনে তার সঙ্গে দেখা হবে কিনা জানি না।"

সে তৎক্ষণাৎ সোজা হয়ে বসল।

"তার মানে, কি বলছেন আপনি?"

"এতক্ষণে সে মাল জাহাজে ডেক কর্মচারী বা কয়লা খালাসী হয়ে নুইয়র্কের পথে যাত্রা করেছে।"

"সত্যি বলছেন? কি অদ্ভুত প্রাণী লারী! কয়েক সপ্তাহ আগে ওর বইএর জন্য পাবলিক লাইব্রেরীতে কি পড়াশোনা করার জন্য সে এখানে এসেছিল, কিন্তু ওযে আমেরিকায় যাচ্ছে সে বিষয়ে একটি কথাও বলেনি। যাক আমার আনন্দ হচ্ছে, তবু আমাদের দেখাশোনা হবে।"

"সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে, তার আমেরিকা আর তোমার আমেরিকার ভিতর গোবী মরুভূমির মত দূরত্বের ব্যবধান থাকবে।"

তারপর ওকে বল্লাম কে কি করেছে, আর কি করতে চায়। হাঁ করে ইসাবেল আমার কথা শুনলো, তার মুখে ভয়বিহ্বলতার ছাপ, মাঝে মাঝে আমার কথায় বাধা দিয়ে বলতে লাগলে "ও পাগল, বদ্ধ পাগল!" যখন আমার বলা শেষ হল দেখি ও মাথা নামিয়েছে—চোখ থেকে দু ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

বলে: "এতদিনে আমি ওকে সত্যই হারালাম।"

আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে পিছনে মাথা রেখে ইসাবেল কাঁদতে লাগলে। তার সেই মনোরম মুখখানি শোকে আকুল হয়ে উঠল, সে ভাব গোপন করার চেষ্টা করল না। আমার কিছুই করার ছিল না। জানি না কি মিথ্যা আশা সে মনে মনে পোষণ করত আমার এই সংবাদে তা নির্মূল হয়ে গেল। আমার একটা অস্পষ্ট ধারণা ছিল যে মাঝে মাঝে লারীর সঙ্গে তার দেখা হতেও পারে; কিন্তু সে যে ইসাবেলের জাতেরই একটা অংশবিশেষ এই কথাটুকু মনে করে ইসাবেলে যে সংযোগসূত্রে সে লারীর সঙ্গে জড়িত আছে মনে করত, আমার একথায় তা থেকে সে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত হল। আমি ভাবতে লাগলাম কি বৃথা শোকে ও কাতর হয়ে পড়েছে। ভাবলাম এখন ওর পক্ষে কাঁদাই ভালো। লারীর বইখানি টেবল থেকে তুলে নিয়ে সূচীপত্র দেখতে লাগলাম। আমার কপিটা আমি রিভেয়ারা ছাড়া পর্যন্ত এসে পৌঁছায়নি—এখন কিছুদিনের ভিতর পাওয়ার আশা নেই। কিন্তু এই ধরণের বই আমি আশা করিনি। লিটন স্ট্র্যাচি লিখিত Eminent Victorians-এর প্রবন্ধাবলীর দৈর্ঘ্যে রচিত কয়েকজন প্রখ্যাতনামা ব্যক্তি সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ সংগ্রহ। তার পছন্দে আমি বিস্মিত হলাম রোমান ডিক্টের সুল্লা—যিনি সকল ক্ষমতায় বলীয়ান হয়ে সব ত্যাগ করে নিজস্ব জীবনযাত্রা বেছে নিয়েছিলেন তাঁর ওপর একটি প্রবন্ধ, মোগল সম্রাট আকবরের সম্বন্ধে আরেকটি, রুবেনস্, গ্যয়টে, এমনকি লর্ড চেস্টারফিল্ডের ওপর একটি করে প্রবন্ধ—প্রতি রচনাটি প্রচুর অধ্যয়নের পরিচায়ক, তাই এই বই লিখতে লারী এত সময় লাগাতে আমি আর বিস্মিত হলাম না, কিন্তু কেন এত সময় ব্যয় করেছে ও কেন এইসব ব্যক্তিদের জীবন কথা ওর পছন্দ হল তাই ভাবতে লাগলাম। তারপর আমার মনে হল, যে এই সব ব্যক্তি জীবনের সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভ করেছিলেন, তাই লারী তাঁদের চরিত্রে আগ্রহান্বিত হয়ে উঠেছে। পরিণামে তার মূল্য কি তা দেখার জন্য লারীর মনে কৌতূহল জেগেছিল।

এক আধ পাতা পড়ে দেখলাম ও কেমন লিখেছে। চমৎকার পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনাভঙ্গী,—নতুন লেখকের রচনার ভেতর যে সব ভঙ্গী থাকে লারীর রচনায় তা নেই। এলিয়ট টেম্প্‌লটন যেমন সম্ভ্রান্তদের সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিল, লারীর রচনা পড়ে মনে হবে যে এইসব মনীষীদের জীবনকথা সম্বন্ধে সেও তেমনই ওয়াকিবহাল। ইসাবেলের দীর্ঘশ্বাসে আমার চমক ভাঙল, সে এতক্ষণে সেই মৃদু উষ্ণ ককটেল পান করল। বল্লেঃ

"আমি যদি এখন না কাঁদি তাহলে আমার চোখ দুটি বিশ্রী দেখাবে, আজ রাতে বাইরে ডিনারে যাচ্ছি।" তার ব্যাগ থেকে একটা আর্শী বার করে উদ্বিগ্নচিত্তে ইসাবেল মুখ দেখতে লাগল। সে বল্লেঃ "আধ ঘণ্টা চোখের উপর আইসব্যাগ রাখলেই ঠিক হয়ে যাবে,—মুখে পাউডার ঘসে মুখের পানে চিন্তাকুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে—"আমার এই কাণ্ডের জন্য আমাকে কি বড় খারাপ মনে হচ্ছে?"

"তাতে কি তোমার কিছু এসে যায়?"

"আপনার কাছে অদ্ভুত লাগতে পারে, কিন্তু আপনি আমার সম্বন্ধে ভালো ভাবেন আমি তাই চাই।"

আমি হাসলাম।

তারপর জবাবে বল্লাম, "কিন্তু আমি অতি অসাধু প্রাণী। আমি যখন যাকে ভালোবাসি তার অনুষ্ঠিত গর্হিত কাজের ফলে আমার ভালোবাসা লোপ পায় না। তোমার দিক থেকে তুমি খারাপ মেয়ে নও, তোমার আকৃতিতে মাধুরী ও মনোহারিত্ব আছে। নির্মল দৃঢ়তা ও সুরুচি কিভাবে তোমার মধ্যে সম্মিলিত হয়ে আছে জানি বলেই তোমার সৌন্দর্য আমার কাছে কম উপভোগ্য নয়। সম্পূর্ণ মায়াবিনী হতে তোমার মধ্যে একটি জিনিসের অভাব।"

ইসাবেল হেসে আমার কথা শোনার অপেক্ষা করে।

আমি বল্লাম: "কোমলতা।"

তার ঠোঁট থেকে হাসি মিলিয়ে গেল, প্রসন্নতার সকল চিহ্ন তার সে মুখ থেকে মুছে গেল। কিন্তু জবাব দেওয়ার মত তৈরী হওয়ার পূর্বেই গ্রে এসে ঘরে ঢুকল। এ ক'বছর প্যারীতে থেকে ওর ওজন অনেক পাউণ্ড বেড়ে গেছে, আর মেজাজও খুব ভালো। আমাকে দেখে ও ভারী খুশী। গ্রের কথাবার্তায় সাহিত্যে ব্যবহৃত কথার প্রাচুর্য থাকলেও সে এমনভাবে তা প্রয়োগ করে যেন সেই সর্বপ্রথম এই কথা ভেবেছে।

সে বিস্তারিতভাবে যে ব্যবসায় ও ঢুকছে সেই বিষয়ে বলতে লাগলে, আমি ওসব কথা তেমন বুঝি না, শুধু বুঝলাম যে ও প্রচুর পয়সা কামাবে। সে এতই উৎসাহিত হয়ে উঠল যে কথার ভিতর ইসাবেলকে বলে উঠল:

"শোনো, ও সব বাজে পার্টিতে না গিয়ে চলো আমরা "Tour d' Argent"এ গিয়ে তিনজনে বসে একসঙ্গে খাওয়া খাই, তুমি কি বলো?"

"না তা করা যায় না, দেখ আমাদের জন্যই ওরা পার্টিটা দিচ্ছে।" আমি বাধা দিয়ে বল্লাম, "না না আমি এখন যেতে পারব না, তোমাদের আগে থাকতে সন্ধ্যাটা ঠিক করা আছে জেনে আমি সুজান রুভায়ারকে ফোন করে তাকে নিয়ে বেরোব ঠিক করেছি।"

ইসাবেল বল্লেঃ "সুজান রুভায়রটা কে?"

তাকে বিরক্ত করার জন্য বল্লামঃ "ও লারীর 'মেয়েমানুষদের' অন্যতমা।"

গ্রে বল্লেঃ "আমার বরাবরই ধারণা লারীর রক্ষিতা আছে।"

ইসাবেল বাধা দিয়ে বলেঃ "ননসেন্স, লারীর যৌন জীবন সম্পর্কে আমি সবই জানি। ওর জীবনে কোনো মেয়েমানুষই নেই।"

গ্রে বল্লেঃ "আচ্ছা, তাহলে যাবার আগে আর একপাত্র খাওয়া যাক।"

আমরা একপাত্র খেয়ে নিয়ে ওদের বিদায় জানালাম, ওরা আমার সঙ্গে হল পর্যন্ত এল, আমি যখন কোট গায়ে দিচ্ছিলাম তখন ইসাবেল গ্রে গলায় হাত জড়িয়ে তার চরিত্রে যে কোমলতার অভাব বলে অনুযোগ করছিলাম মুখে সেই কোমলতা এনে বলেঃ

"আচ্ছা গ্রে সত্যি করে বলো ত আমি কি বড় কড়া প্রকৃতির?"

"না প্রিয়ে, মোটেই নয়, কেন কেউ কিছু বলেছে?"

"না—"

গ্রে যাতে দেখ্‌তে না পায় এইভাবে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে এলিয়টের মত অ-মহিলা-জনসুলভ ভঙ্গীতে আমাকে জিভ্‌ বার করে দেখাল।

বাইরে বেরোবার সময় দরজা ভেজাতে গিয়ে আমি আস্তে আস্তে বল্লাম, "ঠিক সেই-রকম নয়।"

পুনরায় যখন প্যারীর ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলাম তখন মাতুরিনরা চলে গেছে। এলিয়টের বাড়িতে অন্য লোকজন থাকে। ইসাবেলকে পেলাম না, তাকে চমৎকার দেখ্‌তে ছিল, কথা বলতেও ভালো লাগ্‌ত,—আর ওর সঙ্গে দেখা হয়নি।

সুজান রুভায়ারের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হ'তাম, সহসা তার জীবনের এক অপ্রত্যাশিত পরিবর্তনে সেও আমার জীবন থেকে চলে গেল। সব ঘটনা এই মাত্র বর্ণনা করলাম তারই প্রায় বছর পরে একদিন অপরাহ্নে অডিয়নে বই পড়ে কিছু সময় কাটাবার পর, ইচ্ছা হ'ল সুজানের কাছে যাই। তাকে ছ' মাস দেখিনি। তাকে গিয়ে ডাকতেই সে দরজা খুল্‌লো, হাতে রঙের পাত্র, দাঁতে পেণ্টব্রাস চেপে রেখেছে, পরণে রূপীর আলখাল্লা, তাতে বিচিত্র রঙ মাখানো। বল্লেঃ "Ah, c'est Vous, Cherami. Entorez, Je Vous en porie" (ও তুমি প্রিয়তম! এসো দয়া করে ভেতরে এস)।

তার এই লৌকিক আপ্যায়নে আমি কিঞ্চিৎ বিস্মিত হলাম। সাধারণতঃ আমরা আরো ঘনিষ্ঠভাবে কথাবার্তা বলি। আমি ওর সেই সম্মিলিত স্টুডিয়ো এবং বসার ঘরটিতে ঢুকলাম। ইজেলে একটি ক্যান্‌ভাস টাঙানো।

"এতই ব্যস্ত, কি যে করি জানি না, তুমি জানো, আমি কাজ করে যাই, এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করার নেই। হয়ত বিশ্বাস করবে না আমি Meyerheim-এ একটা এক্জিবিশন খুল্‌ছি। সেখানে অন্ততঃ ত্রিশটি ক্যান্‌ভাস্‌ টাঙাতে হবে।"

"এ্যাঁ—Meyerheim-এ? আশ্চর্য! কি করে বন্দোবস্ত করলে?" কারণ Meyerheim আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সম্ভ্রান্ত চিত্রশালা। তারা যে শিল্পীকে আশ্রয় দেয় তার অবস্থা ফিরে যায়।

"ম'সিয়ে একিল তাঁকে আমার কাজ দেখাতে নিয়ে এসেছিলেন, তাঁর ধারণা হয়েছে যে আমার প্রতিভা আছে।"

আমি জবাবে বল্লামঃ "A d'antres, ma Vicille" তার অনুবাদ কর্‌লে দাঁড়াবে—এ সংবাদ সর্বত্র ঘোষণা করে দাও।"

আমার পানে তাকিয়ে খিল্‌ খিল্‌ করে হেসে সুজান বলেঃ

"আমি যে বিয়ে কর্‌ছি।"

"Meyerheim-কে?"

"বোকার মত কথা বোলো না,—" প্যালেটে ব্রাস্‌ রেখে বলে "সারাদিন কাজ করেছি, এখন বিশ্রাম নেওয়া দরকার। এসো এক গ্লাস পোর্ট খাওয়া যাক্‌। সব বল্‌ছি তোমাকে।"

ফরাসী জীবনের মজা এই, যে-কোনো সময়েই ওরা পোর্ট খেতে বল্‌বে। সুজান একটি গ্লাস জোগাড় করে এনে দুটি গ্লাস পূর্ণ করল; তারা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বসলঃ

"শোনো, ব্যাপারটি বলি,—ম'সিয়ে একিলের স্ত্রী এই বছরের গোড়ায় মারা গেছেন। স্ত্রীলোকটি ধর্মপরায়ণা ছিলেন, কিন্তু ম'সিয়ে তাকে স্বেচ্ছায় বিয়ে করেন নি, বিয়ে করেছিলেন ব্যবসার খাতিরে, আর যদিও তিনি তাঁর প্রশংসা করতেন, শ্রদ্ধা করতেন তবু তাঁর মৃত্যুতে যে ম'সিয়ে শোকাহত হয়েছেন তা বলা-বাহুল্য হ'বে। তাঁর ছেলের বিয়ে হয়ে গেছে—একটা বড় ফার্মের সঙ্গে সে সংযুক্ত রয়েছে, একজন কাউণ্টের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে স্থির হয়েছে। এইসব বিবাহাদি হলে লিলির প্রকাণ্ড প্রাসাদে ম'সিয়ে একিল একদম নিঃসঙ্গ হয়ে থাক্‌বেন, তাই শুধু ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নয়, বিরাট সংসার দেখার জন্য তাঁর একজন কাউকে চাই,—ছোট করে বলতে গেলে বলি এখন উনি তাঁর প্রথমা স্ত্রীর শূন্য স্থান আমাকে দিয়ে পূর্ণ করতে চান। উনি বলছিলেন—"প্রথমবার বিয়ে করেছিলাম ব্যালটিকে দৃঢ় সূত্রে বাঁধবার জন্য, কিন্তু আত্ম-তৃপ্তির জন্য দ্বিতীয়বার বিবাহ না করার কোনো হেতু নেই।"

আমি বল্লাম—"অভিনন্দন জানাচ্ছি।"

"এতে আমার স্বাধীনতা অবশ্য ক্ষুণ্ণ হবে, তবে আমাকে ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবতে হবে ত। নিজেদের মধ্যে বল্‌তে কি আমার চল্লিশ বছর বয়স আর ফিরবে না—ম'সিয়ে একিলের এখন ভয়ংকর বয়স, উনি যদি এখন একজন কুড়ি বছরের মেয়ে নিয়ে মাতেন ত' আমি কোথায় দাঁড়াব? আর বিবাহের পর আমি কঠোরভাবে সতী হ'ব, কারণ দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় জেনেছি সুখী বিবাহিত জীবন যাপন করতে হলে উভয়ের মধ্যেই চারিত্রিক সততা চাই।"

"বেশ সুনীতিসম্মত কথা, আর ম'সিয়ে একিল কি পক্ষান্তে একবার করে প্যারীতে আসবেন?"

"আ—হা হা! আমি কি কচি খুকী নাকি? স্পষ্ট বলে দিয়েছি যখন প্যারীতে আসবেন তখন আমিও সঙ্গে থাকব। আর একা একা বিশ্বাস করব না। উনি বল্লেনঃ 'এই বয়সে কি আর আমি বাঁদ্‌রামো করব?' আমি বল্লাম, ম'সিয়ে একিল আপনি এখন পূর্ণ যৌবনে প্রতিষ্ঠিত, আর আপনার কামনাতুর প্রবৃত্তির কথা আমার চাইতে বেশী কেউ জানে না। স্ত্রীলোককে সন্তুষ্ট করার সব কিছু সম্পদ আপনার আছে, তাই আপনাকে প্রলোভনের মুখে ফেলতে চাই না। অবশেষে উনি ও'র প্যারীর বাসা ছেলেকে দিলেন, স্থির হল বোর্ডের মিটিং-এ সেই আসবে। আমার কথাগুলি অবিবেচকের মত মনে হলেও উনি খুবই সন্তুষ্ট হলেন।"

"ভালোই হয়েছে এই তোমার যোগ্য পুরস্কার, তুমি চিরদিনই ভালো মেয়ে।"

— উপসংহার —

আমার কাহিনীর এই শেষ। লারীর সম্বন্ধে আর কিছু শুনিনি, আশাও করিনি কিছু শোনবার,—কারণ চিরদিনই ও যা বলে থাকে তা করে, তাই মনে হয় হয়ত এতদিনে আমেরিকায় ফিরে গিয়ে গ্যারেজে চাকরী নিয়েছে, ট্রাক চালিয়ে যে দেশ থেকে ও এতদিন বাইরে ছিল তার অন্তরঙ্গ পরিচয় পেয়েছে। এইসব করার পর ওর সেই বেয়াড়া প্রস্তাবানুযায়ী হয়ত ট্যাক্সি ড্রাইভার হয়েছে। একথা সত্য যে কাফের টেবলে বসে রহস্যচ্ছলে সে এই ইচ্ছা এলোমেলোভাবে প্রকাশ করেছিল, তবে সেই কথামত যদি লারী কাজ করে থাকে তাহলে আমি বিস্মিত হব না। আর তারপর নুইয়র্কে ভালো করে ড্রাইভারের মুখের পানে লক্ষ্য না করে আমি আর কোনোদিন ট্যাক্সিতে উঠিনি। যদি ভাগ্যক্রমে ল্যারীর সেই সদা হাস্যময় মুখ, গভীর চোখ দেখতে পাই, কিন্তু তা আর দেখতে পাইনি। আবার যুদ্ধ বাধলো। বিমানে ওঠার মত বয়স আর লারীর নেই, তবে আবার হয়ত ট্রাক চালাচ্ছে, ঘরে বা বাইরে যুদ্ধের কাজে নেমেছে। হয়ত বা কোনো কারখানায় কাজ করছে। আরো ভাবি অবসর সময়ে হয়ত বই লিখছে, সেই গ্রন্থে জীবন ওকে কি শিক্ষা দিয়েছে সেই অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ করছে বা সহযোগীদের জন্য বাণী রচনা করছে, আর তাই যদি করে তাহলে সেই গ্রন্থ শেষ হতে এখন অনেক দেরী আছে। ওর প্রচুর অবসর, কারণ সুদীর্ঘকাল ওর শরীরে কোনো ছাপ রাখেনি—সব দিক থেকেই ও তরুণ।

ওর কোনো উচ্চাশা নেই, যশের কামনা নেই, পাঁচজনের একজন জননেতা হওয়া ওর কাছে

অরুচিকর। তাই ও নিজের পরিকল্পিত জীবন যাত্রাই নির্বাহ করে নিজস্ব সত্তা বজায় রেখেছে। অপরের কাছে আদর্শ স্বরূপ হয়ে উঠতে সে চায় না, তার ভব্যতায় বাধে। তবে এ হতে পারে কিছু অনিশ্চিত আত্মা ওর কাছে প্রদীপের কাছে পতঙ্গের মত চরম তৃপ্তিতেই মানুষের আত্মার তৃপ্তি—লারীর এই বিশ্বাসের অংশ গ্রহণ করতে আসবে। স্বার্থহীন ও সর্বত্যাগী হয়ে লারীর নিজস্ব মত সার্থকতর হয়ে উঠবে। আর বই লিখে বা বক্তৃতা দিয়ে অসংখ্য জনগণের সেবা করতে পারবে।

কিন্তু এই সব হল আমার অনুমান মাত্র। আমি পৃথিবীর মানুষ, জাগতিক লোক। এই-রকম একজন দুষ্প্রাপ্য ব্যক্তির জ্যোতির্ময় রূপ আমি প্রশংসা করতে পারি, মুগ্ধ হতে পারি, কিন্তু তার পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারি না। সাধারণ শ্রেণীর মানুষের সঙ্গেই যোগাযোগ স্থাপন করা আমার পক্ষে সম্ভব। স্বীয় বাসনানুযায়ী লারী মানব-সমাজের বিরাট জড়ীভূত স্তূপের ভিতর মিশিয়ে গেছে। সৎ ও অসৎ, বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী, সদয় ও নির্দয় প্রভৃতি যেসব বিভিন্ন ধারার লোক নিয়ে যুক্ত-রাষ্ট্রীয় জনসমাজ গঠিত তরই ভিতর লারী মিশিয়ে গেছে। ওর সম্বন্ধে এইটুকুই বলতে পারি। জানি এ অতি অসন্তোষজনক অবস্থা, কিন্তু কোনো উপায় নেই।

কিন্তু এই বই শেষ করার সময় অস্বস্তিকরভাবে আমি সচেতন আছি যে, আমার পাঠকদের আমি শূন্যেই রাখলাম, আর তা এড়িয়ে যাওয়ার কোনো রাস্তাই দেখতে পাচ্ছি না।—আমার এই দীর্ঘ কাহিনী সম্বন্ধে মনের গহনে অনুসন্ধান করে দেখ্‌ছি এর চাইতে অধিকতর সন্তোষজনক সমাপ্তি সম্ভব-পর কিনা—কিন্তু গভীর বিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম যে, আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি অল্পবিস্তর একটা সফলতার কাহিনীই লিখে গেছি।

যে সব প্রাণীর সঙ্গে আমি সংশ্লিষ্ট তারা সবাই প্রায় যা বাসনা ছিল তা পেয়েছে। এলিয়টের সামাজিক প্রতিপত্তি, প্রচুর বিত্তবতী হয়ে এক সক্রিয় ও সংস্কৃতিসম্পন্ন সমাজে ইসাবেল সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গ্রের লাভজনক স্থায়ী কর্মলাভ, সুজান রুভায়রের নিরাপত্তা, সোফীর মৃত্যু, আর লারীর শান্তি ও স্বস্তি। উন্নাসিক সম্প্রদায় যতই চালাকী করে কলরব করুক না কেন, আমরা সবাই মনে প্রাণে একটা বেশ সফল গল্পই চাই, তাই হয়ত আমার এই পরিসমাপ্তি তেমন অসন্তোষজনক হবে না।

**সমাপ্ত**

ইংরেজের শাসনকালে পুলিসের সম্বন্ধে অভিযোগে সরকার পুলিসের সমর্থন করিতেন—এই অভিযোগ আমরা উপস্থাপিত করিতাম। কিন্তু সেদিন পশ্চিমবঙ্গের ব্যবস্থা পরিষদে প্রধান সচিব পুলিসের অকর্মণ্যতার ও দুর্নীতিপরায়ণতার যে কারণ দেখাইয়াছেন, তাহা নূতন। তিনি বলিয়াছেন—পুলিসের যোগ্যতা ও সাধুতা সমাজের সাধুতা ও যোগ্যতার উপর নির্ভর করে কারণ, সমাজ হইতেই পুলিস নিযুক্ত করিতে হয়; কাজেই সমাজের সংস্কার সাধন প্রয়োজন। তাঁহার এই উক্তি আক্ষেপ-ব্যঞ্জক হইতে পারে; কিন্তু ইহার ফলে পুলিসের বুক কিরূপ ফুলিয়া যাইবে, তাহা কি তিনি বিবেচনা করিয়াছিলেন? লোক কি আশা করিতে পারে না যে, শাসনকমতা যাঁহারা পরিচালিত করিবেন, তাঁহারা উপদেশের ও আদর্শের দ্বারা সমাজের ত্রুটি সংশোধন করিবেন? তাঁহারা যদি সমাজে দুর্নীতির দোহাই দিয়া কর্মচারীদিগের দুর্নীতির গুরুত্ব অস্বীকার করেন, তবে যে কোন কালেই বাঞ্ছিত সংস্কার সাধিত হইবে না, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

পশ্চিমবঙ্গের এই দারুণ দুর্দিনে যাঁহারা শাসনকার্য পরিচালনের ভার পাইয়াছেন, তাঁহারা কঠোরহস্তে দুর্নীতি দমিত করিবেন—লোক যদি এই আশা করে, তবে কি তাহা অসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে? আমরা পশ্চিমবঙ্গের সচিবদিগকে এ সকল বিষয়ে এমন আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিতে বলি যে, কেহ তাহা লক্ষ্য করিয়া নিন্দার পঙ্ক নিক্ষেপ করিলে তাহা সেই সমুচ্চ আদর্শের সান্নিধ্যেও উপনীত হইতে পারিবে না, তাহা কলঙ্কিত করা ত পরের কথা।

পশ্চিমবঙ্গের অতি দুর্দিনে বর্তমান সচিবরা কার্যভার লইয়াছেন। এই দুর্দিনের প্রথম দ্যোতক খাদ্যাভাব। গত ২২শে মার্চ বেসামরিক সরবরাহ সচিব বলিয়াছেন,—

We must all tighten our belts and make sacrifices.

বর্তমানে আহারের মাত্রা হ্রাসে বিপদের কারণ পূর্বাপেক্ষাও অধিক। কারণ, তখন তাহা আরম্ভ—আর তাহার পর কয় বৎসর আহার্য প্রয়োজনানুরূপ না হওয়ায় বাঙলার নরনারীর দেহে জীবনীশক্তি হ্রাস পাইয়াছে; সমগ্র জাতির ধ্বংস অনিবার্য হইয়াছে, অথচ সচিব বলিতেছেন—আহার হ্রাস কর! কার্যভার গ্রহণকালে বিধানবাবু বলিয়াছিলেন লোককে "রেশনে" যে পরিমাণ খাদ্যোপকরণ দেওয়া হয়, মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য তাহার দ্বিগুণ প্রয়োজন। কিন্তু যদি কখনও দামোদরের ও ময়ূরাক্ষীর জল নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা না হয়, তবে, কিম্বা তাহা হইলেও, ততদিনে বাঙালীর অবস্থা কিরূপ হইবে?

জনসাধারণ—খাদ্যাভাবে শীর্ণ, চিন্তাজ্বরে জীর্ণ জনসাধারণ যে দেশের জন্য, স্বাধীনতার জন্য ত্যাগ করিতেই আগ্রহশীল, তাহার প্রমাণের অভাব নাই। কিন্তু স্বাধীনতা ও অভাব যে স্বতন্ত্র হইতে পারে, তাহা তাহাদিগকে কে বুঝাইবে? আজ যদি ইংরেজ বা জার্মান বা আমেরিকান আসিয়া ভারতবর্ষকে স্বাধীনতার বিনিময়ে অন্ন ও বস্ত্র দিতে চাহে, তবে কি দেশের লোক তাহাতে সম্মত হইবে? কিন্তু লোক যে প্রকৃত স্বাধীনতার জন্য ত্যাগ স্বীকার করিতেছে, তাহা তাহারা অবস্থা হইতে বুঝিতে পারে।

লোকের অনেক অভিযোগের যে কারণ আছে, তাহা আশা করি, সচিবরাও স্বীকার করিবেন। কিন্তু সেই সকল কারণ দূর করিবার জন্য তাঁহারা যদি তৎপর হইয়া চেষ্টা করেন, তবে সেই চেষ্টার স্বরূপ তাঁহারা লোককে বুঝাইয়া দিতে পারেন না কেন?

এ বিষয় বুঝাইবার জন্য আমরা কয়টি কথা বলিব—

(১) বীজ ও গাছের চারার উপর বিক্রয়-কর ধার্য করিয়া সরকার মাত্র কয়েক সহস্র টাকা বার্ষিক রাজস্ব লাভ করিতে পারেন। কিন্তু সে কর যখন খাদ্যোপকরণ উৎপাদনের পথে বিঘ্ন স্থাপন করে, তখন কেন তাহা বর্জন করা হয় না?

(২) খাদ্যোপকরণ বৃদ্ধি বাবদে যে গত বৎসর সরকারের অনেক টাকা ব্যয় হইয়াছে, সরকারের সচিব স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তাহার ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি হইয়াছে কিনা, তাহা তিনি বলিতে পারেন নাই। লোক কি ইহাতে উত্যক্ত হইতে পারে না?

(৩) সরকার স্বীকার করিয়াছেন, এদেশে াক আবশ্যক পরিমাণ দুগ্ধ পায় না। এমন মাতার স্তনেও দুগ্ধের অভাব। ইহার কারণ ক তাহা সহজেই অনুমেয়। গর্ভধারিণীর ুষ্টিকর খাদ্যের অভাব ঘটিলে, তাঁহার স্তনে ুগ্ধের অভাব ঘটে। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবের ন্য যে সরকারের বেসামরিক সরবরাহ বিভাগই ধানতঃ দায়ী তাহা অস্বীকার করিবার উপায় াই। সরকার হরিণঘাটায় প্রায় এক কোটি টাকা য় করিয়া যে গোগৃহ রচনা করিয়াছেন, াহাতে অর্থব্যয়ই হইয়াছে—লাভ এপর্যন্ত কছুই হয় নাই।

পশ্চিমবঙ্গের বেসামরিক সরবরাহ সচিব না হিসাব দিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস রিয়াছেন—আপাততঃ ৫।৭ বৎসরে পশ্চিম-ঙ্গে লোকের আবশ্যক খাদ্য প্রাপ্তি সম্ভব হে। আশার কথা এই যে, তাঁহার হিসাব যে নর্ভরযোগ্য হইবেই এমন মনে করিবার কোন ারণ নাই। পূর্বে একবার আমরা দেখাইয়া য়াছিলাম, তিনি বলিয়াছিলেন—

(১) পশ্চিমবঙ্গে দাইল উৎপন্ন হয় না।

(২) পশ্চিমবঙ্গে একটিও চিনির কল াই। আমরা পশ্চিমবঙ্গের জিলায় জিলায় কত াইল উৎপন্ন হয়, তাহা সরকারী রিপোর্ট হইতে দ্ধৃত করিয়া দেখাইয়া দিয়াছিলাম—তাঁহার াক্ত মিথ্যা। আর তিনি ইহাও জানেন না যে, শ্চিমবঙ্গে অন্ততঃ দুইটি চিনির কল আছে। সই দুইটির একটি (বেলডাঙগায়) যে বন্ধ ইয়া আছে, তাহার প্রতিকারার্থ পশ্চিমবঙ্গ রকার কোন ব্যবস্থাই করেন নাই। যখন শ্চিমবঙ্গে চিনির প্রয়োজন যথেষ্ট, তখন রকার যদি অর্ডিন্যান্স করিয়া উহা লাইবার ব্যবস্থা করিতেন, তবে তাহা জাতীয় রকারের উপযুক্ত কাজ হইত। কারণ, ঐ কল ন্ধ থাকায় কেবল যে পশ্চিমবঙ্গের অধি-াসীদিগের শর্করা সম্বন্ধে পরমুখাপেক্ষিতা ধিত হইয়াছে, তাহাই নহে—ঐ অঞ্চলে যে কল কৃষক ঐ কলে ইক্ষু বিক্রয়ের আশায় —পূর্ব পূর্ব বৎসরের মত ইক্ষুর চাষ করিয়া-ছল, তাহারা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। াহারা সে কথা কৃষি সচিবকে জানাইয়াছিল। কন্তু তিনি বলেন,—অর্থসচিব নিশ্চয়ই সে প্রস্তাবে সম্মত হইবেন না। ঐ কথা বলিয়াই ক তিনি তাঁহার কর্তব্য শেষ হইল মনে করিয়াছিলেন?

একথা কি সত্য যে, ২৪ পরগণা জিলায় আবাদযোগ্য পতিত জমির পরিমাণ আবাদী জমির পরিমাণের দশ ভাগের এক ভাগ? সেই আবাদযোগ্য পতিত জমিতে চাষের কোন ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন করিতেছেন না—তাহা কে বলিবে?

যদিও হিন্দু সমাজে সংস্কৃত শিক্ষার প্রভাব অল্প নহে, তথাপি সংস্কৃত এখন অপ্রচলিত এবং তাহার পঠন-পাঠন ব্যাপক নহে। সমগ্র সমাজে সংস্কৃত শিক্ষার আদরও অল্প। ভারত-বর্ষের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষাও বাঙলায় সংস্কৃত ব্যবসায়ী ও শাস্ত্রালোচনা রত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ সংস্কৃত চর্চার দীপশিখা জ্বালাইয়া রাখিয়া আসিতেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার আজও প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতা-মূলক করিতে পারেন নাই, এখনও তাঁহারা মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন জন্য বিধি প্রণয়ন করিতে পারেন নাই, যাহাকে উচ্চ-শিক্ষা নামে অভিহিত করা হয়, তাহার আবশ্যক সংস্কার সাধন করিতে পারেন নাই, এমন কি, তাঁহারা এখনও বিদ্যালয়সমূহে মিথ্যায় দুষ্ট ইতিহাসের প্রচলন বন্ধ করিতে পারেন নাই। এই অবস্থায় কেন যে তাঁহারা প্রদেশে সংস্কৃত শিক্ষার পুরাতন পদ্ধতির পরিবর্তন সাধনে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। তাঁহারা পশ্চিমবঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষার যে কাজ করেন, তাহাই যে উপযুক্তরূপে সম্পন্ন করিতে পারেন না, তাহার প্রমাণ—এবারও উপাধি পরীক্ষার কাব্যের ও স্মৃতির প্রশ্ন পরীক্ষার পূর্বে প্রকাশ হইয়া যাওয়ায় মধ্যপথে পরীক্ষা বন্ধ রাখা হইয়াছে। যে ভোটের ফলে নানারূপে দুর্নীতিদমন করা দুষ্কর হইয়াছে, সংস্কৃত এসোসিয়েশন গঠন জন্য তাঁহারা টোল, চতুষ্পাঠীর পণ্ডিতদিগের সেই ভোটের ব্যবস্থা করিয়াছেন। অথচ এই এসোসিয়েশন থাকিতেও যখন ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ও এসো-সিয়েশনের পরিচালক সেই সময় 'কলিকাতা গেজেটে' পরীক্ষায় উত্তীর্ণদিগের নামের জাল তালিকা প্রকাশিত হইয়াছিল! যে ভোটার তালিকার ভিত্তিতে এবার ভোট গৃহীত হইবে, তাহা ত্রুটিতে পূর্ণ; তাহাতে বহু যোগ্য ব্যক্তির নাম ত্যক্ত ও বহু অযোগ্যের নাম ভুক্ত হইয়াছে। যাঁহারা সেই তালিকা প্রণয়নের ভার পাইয়া-ছিলেন, তাঁহাদিগের অন্যতম—পণ্ডিত শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ বলিয়াছেন, ভোটার নির্ধারণে তাঁহাদিগের সমবেত সিদ্ধান্ত ত্যক্ত হইয়াছিল এবং তালিকা অসম্পূর্ণ ও ত্রুটি-দুষ্ট। সে অবস্থায় বিলম্ব না করিয়া ঐরূপ তালিকায় নির্ভর করিয়া কাজ না করিলে কি ভাল হয় না? আমরা আশা করি, শিক্ষা সচিব এ দিকে দৃষ্টি দিবেন।

বিহারের বাঙালী বিদ্বেষ বিষ বিসর্পণের বিরাম নাই। ১৯১২ খৃস্টাব্দে যে শ্রীসচ্চিদানন্দ সিংহ, দীপনারায়ণ সিংহ, পরমেশ্বরলাল, নন্দকিশোরলাল ও মহম্মদ ফকরুদ্দীনের সহিত একযোগে বিবৃতি প্রদান করিয়াছিলেনঃ—

সমগ্র মানভূম জিলায় ও সিংভূম জিলার ধলভূম পরগণায় বঙ্গ ভাষাভাষীদিগের বাস—সেই দুইটি স্থান বাঙলাভুক্ত হওয়া সঙ্গত—ছোটনাগপুরের অবশিষ্ট অংশ বিহারে থাকিবে। সাঁওতাল পরগণার যে সকল অংশে বাঙলা ভাষা চলিত, সে সকল বাঙলার অঙ্গীভূত হইবে ও হিন্দী ভাষাভাষীদিগের অধ্যুষিত অংশ বিহারে থাকিবে। বাঙলা ও বিহার উভয় প্রদেশই এই ব্যবস্থায় সম্মতি দিবে।

ডক্টর সচ্চিদানন্দ ১৯১২ খৃস্টাব্দে শ্রীসচ্চিদানন্দের সেই মতের বিষয় ভুলিয়া গিয়াছেন, কি তিনি বলিবেন—'বদলে গেল মতটা' তাহা আমরা বলিতে পারি না। তবে আমরা দেখিতেছি, তিনি এখন অতিরিক্ত দৃঢ়তা সহকারে বলিতেছেন—মানভূম, ধলভূম, সাঁওতাল পরগণার বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চল কিছুই পশ্চিম-বঙ্গকে দেওয়া যায় না—সেগুলি ছাড়িলে বিহারের ক্ষুধা মিটিবে না।

পাছে পশ্চিমবঙ্গ হইতে প্রদেশ সীমা পরিবর্তন জন্য কয়জন প্রতিনিধি যাইয়া পশ্চিমবঙ্গের দাবী জ্ঞাপন করেন এবং কোন দুর্বল মুহূর্তে ভারত সরকার সে দাবী সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করেন, এই ভয়ে ডক্টর সচ্চিদা-নন্দ সিংহ প্রধানমন্ত্রীর নিকট তার করিয়াছেন, —সেরূপ কার্য নিয়মানুগ হইবে না। দেখা যাইতেছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস নেতৃগণ বিহারের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চল পরিচালকদিগকে বিব্রত করিতে অনিচ্ছায়ই শিথিল প্রযত্ন হইয়াছেন। বোধ হয় শিশুরাষ্ট্র পরিচালকদিগকে বিব্রত করিতে অনিচ্ছাই ইহার কারণ। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে লোকের মনে যদি অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠে, তবে তাহা যে রাষ্ট্রের পক্ষে কল্যাণকর হইবে না, তাহা কি উপেক্ষনীয়? পূর্ববঙ্গ হইতে যে সকল আশ্রয়প্রার্থীকে সরকার স্থানাভাবে আন্দামানে পাঠাইয়াছেন, তাহাদিগকে কি বিহারের যে অংশে পশ্চিমবঙ্গের দাবী একান্ত সঙ্গত তাহাতে বাসের ও চাষের জমি দেওয়া সম্ভব ছিল না?

# জীবন-তৃষা

## আর্ভিঙ স্টোন

অনুবাদক—অদ্বৈত মল্ল বর্মন

[ পূর্বানুবৃত্তি ]

থিয়োডোরাস ভ্যানগোঘ ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে ব্রেডা স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন পুত্রকে এগিয়ে নেবার জন্য। তাঁর গায়ে ধর্মযাজকের কোট, ভারী এবং কালো রঙের। তার উপরে প্রশস্ত, ভাঁজ-করা ওভারকোট, মাড় দিয়ে শক্ত করা শাদা সার্ট। ভিনসেণ্ট চকিত দৃষ্টিতে পিতার দিকে তাকিয়ে নিল। পিতার মুখখানিতে দুটি লক্ষ্য করার বিষয় তার চোখে পড়ল; ডান চোখের পাতা বাম চোখের থেকে অনেকখানি নীচুতে নেমে এসেছে; তার জন্য চোখের অনেকখানি জায়গা ঢাকা পড়ে গিয়েছে। আর মুখের বাম দিক বসে গিয়েছে, কিন্তু ডান দিক ভরাট। চোখ দুটি অনুজ্জ্বল সে চোখের আবেগহীন দৃষ্টি যেন এইটুকু মাত্র জানিয়ে দিচ্ছে, 'দেখ, আমি কি হয়েছি।'

জণ্ডার্টের বাসিন্দারা প্রায়ই বলতঃ গীর্জার ধর্মযাজক থিয়োডোরাস যদি কলেজের প্রফেসারী নিতেন, তা হলেও ভালো করে কাজ চালাতে পারতেন।

তিনি কেন যে জীবনে আরো সাফল্যলাভ করেন নি, তা আজও—এই মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়েও—বুঝে উঠতে পারেন নি। তাঁর ধারণা, আমস্টারডম বা হেগ শহরে বড় ধর্মযাজকের দায়িত্বপূর্ণ কাজ নেবার জন্য বহু বৎসর পূর্বেই তাঁকে আহ্বান করা উচিত ছিল। ধর্মযাজক হিসাবে তিনি যে উত্তম ব্যক্তি, গীর্জার অন্যান্য সদস্যরা সকলেই তা একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তিনি উত্তমরূপে শিক্ষাপ্রাপ্ত তাঁর প্রকৃতি কমনীয়। আধ্যাত্মিক গুণাবলী তাঁর মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান। সর্বোপরি, ভগবৎ কার্যে তিনি অক্লান্ত। তবুও পঁচিশ বছর ধরে তিনি এই ক্ষুদ্র পল্লী জণ্ডার্টের মধ্যেই নিবরাবদ্ধ ও বিস্মৃত হয়ে পড়ে রয়েছেন। ভ্যানগোঘ ভ্রাতারা সংখ্যায় ছজন। তাঁদের আর সকলেই স্ব স্ব জীবনে প্রভূত উন্নতি লাভে সক্ষম হয়েছেন। কেবল তিনিই কিছু করতে পারেন নি।

জণ্ডার্ট গ্রামের গীর্জা-সংলগ্ন যে গৃহে ভিনসেণ্টের জন্ম হয়েছিল, সে গৃহটি কাঠের ফ্রেম দ্বারা নির্মিত। বাজার থেকে যে রাস্তা গিয়েছে, তারই উপরে সে গৃহ অবস্থিত। রন্ধনশালার পশ্চাতে একখানি বাগান। তাতে কাঁটায় জড়ানো 'আকাশা' ফুলের গাছ। গাছ-গুলোর ফাঁকে ফাঁকে, ফুলগুলির যত্ন করবার উদ্দেশ্যে রচিত ছোট ছোট পা ফেলবার পথ। বাগানের ঠিক পরেই দারু-নির্মিত গীর্জা-গৃহ। গৃহটি গাছে গাছে একেবারে আবৃত হয়ে পড়েছে। গীর্জা-গৃহের দুই পাশে কারুকার্যহীন শাদা কাচের দুইটি গথিক-ধরণের ছোট গবাক্ষ। কাঠের মেঝের উপর দশ-বারোটি অমসৃণ বেঞ্চি পাতা রয়েছে। মেঝের তক্তার সঙ্গে স্থায়ীভাবে বাঁধা রয়েছে অনেকগুলি আগুন পোহাবার লোহার কড়া। গৃহের পিছনের অংশে সিঁড়ি, সিঁড়ির পর বেদী, সেখানে বহুদিনের পুরোণো একটি হাতে-চালানো অর্গান। স্থানটি একাধারে ভয়নক গাম্ভীর্যপূর্ণ অথচ অনাড়ম্বর উপাসনা গৃহ। ধর্মগুরু কালভিনের আত্মা যেন এখনও এখানে অবস্থিত। তাঁর ধর্ম-সংস্কারের ছাপ যেন এখনও এখানে বিরাজমান।

ভিনসেণ্টের গর্ভধারিণী অ্যানা কর্নেলিয়া সামনের জানালায় দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়েছিলেন। গাড়িখানা থামবার আগেই তিনি দরজা খুলে দিলেন। ভিনসেণ্টকে তিনি পরম স্নেহে বুকে টেনে নিতে নিতেও বুঝতে পারলেন, তাঁর পুত্রের কিছু একটা হয়েছে।

তাঁর স্খলিত কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হল, ওরে আমার মাণিক! আমার ভিনসেণ্ট।"

তাঁর চোখ দুটি সর্বদাই বিস্ফারিত এবং নিষ্পলক। সে চোখ কখনও নীলাভ কখনো সবুজ। কাঠিন্যের লেশমাত্র নেই সে চোখে। যার দিকেই তাকায় তাকেই মমতায় অভিসিঞ্চিত করে সেই চোখ। তাঁর নাসারন্ধ্রের দুই পাশ থেকে দুইটি ম্লান বলিরেখা মুখবিবরের দুই কোণ পর্যন্ত বিলম্বিত। বয়সাধিক্যের সঙ্গে সঙ্গে রেখা দুটি ক্রমেই গভীর হয়ে এসেছে। আর সে রেখা যতই গভীরতর হয়েছে, স্মিত-হাস্যে ঈষদোন্নত মুখখানাও যেন ততই স্পষ্টতর হয়ে আসছে।

অ্যানা কর্নেলিয়ার পিত্রালয় হেগ নগরে। সেখানে তাঁর পিতা রাজ-সরকারের বই-বাঁধাইয়ের কাজ করতেন এবং "রাজার বুক-বাইণ্ডার" এই পরিচয়লিপি বহন করতেন। তাঁর ব্যবসা বেশ জাঁকিয়ে উঠেছিল। হল্যাণ্ডের প্রথম শাসনতন্ত্রের পুস্তক বাঁধাইয়ের জন্য তাঁকেই মনোনীত করা হয়েছিল। সেই থেকে তিনি দেশের সর্বত্র পরিচিত হয়ে পড়েন। তাঁরই একটি কন্যাকে আঙ্কল ভিনসেণ্ট ভ্যানগোঘ বিবাহ করেছিলেন। তাঁর তৃতীয় কন্যার বিবাহ হয়েছিল আমস্টারডামের সুপরিচিত ব্যক্তি রেভারেণ্ড স্ট্রিকারের সঙ্গে। কন্যারা সকলেই সুশিক্ষিতা ছিলেন।

অ্যানা কর্নেলিয়া ছিলেন সত্যিকারের ভাল মানুষ। সব কিছুর ভালোর দিকটাই তিনি দেখতেন। সংসারের মন্দ দিকটা তাঁর চোখেই পড়ত না। এ জগতে খারাপ কিছু আছে বলে তিনি জানতেনও না। তিনি কেবল জানতেন দুর্বলতা, প্রলোভন, কৃচ্ছ্রতা, বেদনা—এগুলোকে। থিয়োডোরাস ভ্যানগোঘও লোক হিসেবে খুবই ভালো ছিলেন। তবে পাপ তাঁর চোখকে ফাঁকি দিতে কখনও পারত না। যেখানেই পাপের ছাপ দেখেছেন, সেখানেই কম্বুকণ্ঠে তিনি তার নিন্দা করতে দ্বিধা করেন নি।

ভ্যান গোঘদের বাড়ির মধ্যস্থলে তাঁদের ভোজনকক্ষ। সেখানে, আহার-শেষে ভোজ্য-পাত্রগুলো সরিয়ে নেবার পর প্রশস্ত টেবিল-খানা হয়ে পড়ে তাঁদের পারিবারিক জীবনের কেন্দ্রস্বরূপ। অর্থাৎ সন্ধ্যাটা কাটাবার জন্য তৈলপ্রদীপের চতুষ্পার্শ্বে তাঁরা প্রত্যেকেই সমবেত হয়ে থাকেন। ভিনসেণ্টের জন্য অ্যানা কর্নেলিয়া চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ভিনসেণ্ট শুকিয়ে গিয়েছে; ভয়ানক একরোখা হয়ে গিয়েছে সে। কেমন যেন রগ-চটা, খিটখিটে মেজাজের হয়ে গিয়েছে।

সে রাত্রে আহারের পর অ্যানা কর্নেলিয়া জিজ্ঞাসা করলেন, "তোর কি হয়েছে রে ভিনসেণ্ট? তোকে তো তেমন ভালো দেখাচ্ছে না।"

ভিনসেণ্ট টেবিলের চারপাশে দৃষ্টিপাত করল। অ্যানা, এলিজাবেথ, উইলেমিয়েন—এই তিনটি অপরিচিতা তরুণী সেখানে উপবিষ্ট। আর এরা সবাই তার বোন।

"না না, আমার কিছু হয় নি।" বলল সে।

থিয়োডোরাস বললেন, "লণ্ডনে তোর স্বাস্থ্য ঠিক থাকছে তো রে? সেখানে তোর

ভালো না লাগলে বল, তোর কাকাকে বলি, প্যারিসের কোন একটা দোকানে তোকে বদলি করে দিক।"

ভিনসেণ্ট খুব উত্তেজিত হয়ে উঠল। বলল, "না না না, তা করতে হবে না। লণ্ডন ছেড়ে আর কোথাও যেতে চাই না আমি। আমি......" সে কিঞ্চিৎ আত্মসম্বরণ করল। পরে বলল, "কাকা যদি আমাকে বদলি করতে চান, আমি বলব, তাঁর নিজের বদলিটাই যেন তিনি আগে করিয়ে নেন।"

"যা তোর ইচ্ছা তাই কর," থিয়োডোরাস বললেন।

অ্যানা কর্নেলিয়া আপনমনে বললেন, "আমি বুঝতে পারছি, সব অনিষ্টের গোড়া ঐ মেয়েটা। ছেলের চিঠিপত্রের কেন গোলমাল হত, বুঝতে এখন আমি পারছি।"

জুণ্ডার্ট গ্রামের কাছ ঘেঁষে খোলা প্রান্তর। সেখানে পাইন বন ও ওক-বৃক্ষের সারি। সেই মাঠে-ময়দানে একা একা বেড়িয়ে ভিনসেণ্টের দিনগুলি কাটতে লাগলো। মাঠের বুকে বুকে অনেক ডোবা-পুকুর। ভিনসেণ্ট সে সব খানা-ডোবার জলে দৃষ্টি ডুবিয়ে চেয়ে থাকে। এই-ভাবেই দিনের পর দিন কেটে যেত। যখন এসব তার ভাল লাগত না, মনে নূতনত্ব আনবার জন্য সে তখন বসে বসে ড্রইং করত। বাগান, গীর্জাঘরের জানালা থেকে দেখা শনিবার বিকেলের বাজারের দৃশ্য, তাদের বাড়ির সামনের দরজা—এসবের অনেকগুলো স্কেচ সে এঁকেছিল। এগুলো যখনি সে আঁকতে বসত, তার মন কিছুক্ষণের জন্য উরসুলার চিন্তা থেকে মুক্ত থাকত।

থিয়োডোরাস মনে বরাবর একটা নৈরাশ্যের ভাব ছিল; তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে নি; তিনি যে কাজ জীবনে অবলম্বন করেছেন, সেটাকে অবলম্বন না করে সে অন্য পথে চলে গিয়েছে—এইটেই তাঁর নৈরাশ্যের কারণ। একদিন তাঁরা ব্যাধিগ্রস্ত একজন কৃষককে দেখতে গেলেন। দেখে ফিরে আসবার সময় মাঠের মধ্যে দুই পিতা-পুত্র গাড়ি থেকে নেমে কতদূর পর্যন্ত হেঁটে চললেন। পাইন গাছগুলোর মাথার উপর দিয়ে অস্তমান সূর্য থেকে লাল আভা ছড়িয়ে পড়ছে। ময়দানের পুকুরগুলিতে সন্ধ্যার আকাশ প্রতিফলিত হয়েছে। মাঠ, মিলিয়ে প্রকাশ পেয়েছে একটা রূপময় ঐক্যতান।

"শোন্ ভিনসেণ্ট। আমার পিতা ধর্মযাজক ছিলেন। তুইও এই ধারা বজায় রাখবি, এইটেই ছিল আমার সবচেয়ে বড়ো আশা।"

"আর এ ধারা আমি বদলে দিতে চাচ্ছি, এ ধারণাই বা আপনার কেমন করে জন্মাল বলুন ত।"

আমার কোন ধারণা জন্মায় নি রে। আমি কেবল কথার কথা বলছি। যদিই কোন কারণে তুই অন্য রকম হয়ে যাস্।.........তুই যদি ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হোস্, তা হলে আমষ্টারডামে তোর ভ্যান কাকার সঙ্গে থাকতে পারবি। তোর পড়াশুনোর দিকে খুব যত্ন নেবেন বলে রেভারেণ্ড স্ট্রিকার নিজে থেকে আমাকে লিখে জানিয়েছেন।"

"গুপিলদের ওখানে যে কাজ করছি, সেটা ছেড়ে দিতে বলছেন কি আপনি?"

"তা আমি বলছি না রে। আমি বলছি কি, সেখানে তোর যদি ভাল না লাগে...... লোকে চাকরি কি আর বদলায় না?"

"তা আমি জানি; কিন্তু গুপিলদের কাজ ছেড়ে দেওয়া আমার ইচ্ছে নয়।"

যেদিন ভিনসেণ্ট লণ্ডন পাড়ি দেবে, সেদিন মা ও বাবা তাকে ব্রেডা স্টেশনে এগিয়ে দিতে এলেন। অ্যানা কর্নেলিয়া ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি রে ভিনসেণ্ট, তোর চিঠিপত্র আগেকার ঠিকানাতেই পাঠাব তো?"

"না। আমি অন্য জায়গাতে উঠে যাচ্ছি।"

মা বললেন, "তুই তা হলে লয়ারদের বাড়ি ছেড়ে দিচ্ছিস! আমি খুব খুশি হয়েছি শুনে। তারা লোক সুবিধার নয়। তাদের সম্বন্ধে নাকি অনেক বদনাম আছে।"

কথাগুলি ভিনসেণ্টের মনে মোটেই কোনো পরিবর্তন আনল না। সে অনমনীয় হয়ে রইল। মা আবেগভরে তার একখানা হাত নিজের হাতে নিলেন; থিয়োডোরাস যাতে শুনতে না পান, এমনি মৃদুস্বরে বললেন, "তুই দুঃখ পাসনে, জানলি? যাক না দিন; টাকাকড়ি রোজগার করে যখন দশজনের একজন হবি তুই তখন সুন্দরী দেখে একটি ডাচ মেয়েকেই বিয়ে করবি—তাতেই তুই সুখী হবি। উরসুলা মেয়েটা কি তোর যোগ্য? তোর সঙ্গে ও মেয়ে মানাবে না। তুই যেমন, সে তেমন নয়।"

মা কি করে এত কথা জানলেন, ভেবে ভিনসেণ্ট আশ্চর্য হয়ে গেল।

সে লণ্ডনে ফিরে এসে কেনসিংটন নিউ রোডে যে ঘর ভাড়া নিল, আসবাবপত্রে তা রীতিমত সাজানো। বাড়ির কর্ত্রী দেহে খাটো একজন বৃদ্ধা মহিলা। প্রত্যেকদিন সন্ধ্যা আটটা বাজতে না বাজতেই তিনি খেয়েদেয়ে শয্যা গ্রহণ করেন। সারা বাড়ি তখন নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে। প্রত্যেকটি রাত্রি ভিনসেণ্টকে তার মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে কাটাতে হয়। লয়ারদের বাড়িতে ছুটে যাবার জন্য সর্বচেতনা তার উদগ্রীব হয়ে ওঠে। ঘরের কবাট নিজের হাতে বন্ধ করে দিয়ে সে মনে মনে দৃঢ়সংকল্প করল এবার সে নিশ্চয়ই শয্যা-গ্রহণ করবে। কিন্তু কি আশ্চর্য! পনেরো মিনিট পরেই সহসা আত্মসচেতন হয়ে সে দেখতে পেল, সে রাস্তা অতিক্রম করছে, উরসুলাদের বাড়ির দিকে সে দ্রুত এগিয়ে চলেছে।

ওদের বাড়ির একাংশে পা দিয়ে তার এক অদ্ভুত অনুভূতি জাগল। তার মনে হল, সে যেন উরসুলার এক নিরবয়ব অপচ্ছায়ার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়েছে। তাকে এইভাবে উপলব্ধি করার জন্য তার খুব বেদনাবোধ হল। সে ধরা ছোঁয়ার কত বাইরে চলে গিয়েছে, এ অনুভূতি যে আরো বেদনাদায়ক। তার উপর, এই আইভি কটেজে অবস্থান করে এই অপ-চ্ছায়ায় আবৃত উরসুলার সত্য সত্তার সান্নিধ্য না পাওয়া তার চাইতে হাজার গুণ যন্ত্রণাদায়ক।

এই নির্যাতন তার মধ্যে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল তা বড় অদ্ভুত। এ তাকে অন্যের বেদনা সম্বন্ধে অত্যন্ত স্পর্শকাতর করে তুলল। তার চার পাশের জগৎ-সংসারে যা-কিছু থেলো, যা কিছু নির্গুণ পদার্থ অন্ধের মত লোকে ভালো বলে মেনে নিয়েছে সেগুলির প্রতি সে অত্যন্ত অসহিষ্ণু হয়ে উঠল—সেও এই নির্যাতনেরই ফল। ফলে ছবির দোকানের গ্যালারিতে তার আর কোনো মূল্য রইল না। ক্রেতারা যখন কোনো ছবির প্রিণ্ট হাতে নিয়ে জিজ্ঞাসা করত, ছবিটা কেমন, সে তখন দ্ব্যর্থ-হীনভাবে জানিয়ে দিত, ওটা মশাই ছবিই নয়। শুনে তারা ছবি রেখে দিত, কিনত না। তবে সব ছবিকেই যে সে পদার্থহীন মনে করত তা নয়। যেসব ছবিতে শিল্পীরা প্রাণ ভরে বেদনা, নির্যাতনের ভাব ফুটিয়ে তুলত, কেবল মাত্র সেইগুলিই তার কাছে ছবিপদবাচ্য; কেবল সেইগুলিতেই বাস্তবতা ও অনুপ্রেরণার গভীরতা দেখতে পেত।

অক্টোবর মাসে এক মেট্রন ছবি কিনতে এল। সে এক বিচিত্রভূষণা সবলা নারী। তার উচ্চ লেস-কলার, উন্নত বক্ষঃস্থল; গায়ে বাদামি রঙের পশুলোমের কোট, মাথায় গোলাকার ভেলভেটের হ্যাট, তার উপরে এক গুচ্ছ নীল রঙের পালক। সে শহরে নতুন বাড়ি করেছে, তারই গৃহসজ্জার উপযোগী ছবি চাই, ঢুকেই একথা জানাল এবং ছবি দেখাতে বলল ভিনসেণ্টকেই।

বলল সে, "তোমাদের দোকানে সবচেয়ে ভাল ছবি যা আছে, আমি তাই চাই। দামের জন্য তোমাদের মাথা ঘামাবার দরকার নেই। ঘরের নক্সাগুলি এই, বুঝে নাও। বৈঠকখানা ঘরে পঞ্চাশ ফুট করে দুটো টানা দেওয়াল—তার একটি দেওয়ালে দুটো জানলা, মাঝখানে খানিকটা ফাঁক......"

তার কাছে ছবি বেচতে গিয়ে ভিনসেণ্ট প্রায় সারাটা অপরাহ্নই কাটিয়ে দিল: সে তাকে রেমব্রাণ্টের ছবির কিছু এচিং, টার্ণারের আঁকা ভিনিসীয় জল-রঙা দৃশ্যের একখানি

উৎকৃষ্ট প্রতিলিপি, থাইসম্যারিসের ছবির কতকগুলো লিথোগ্রাফ এবং কবোট ও ডাবিগ্নির ছবির কিছু ফটোগ্রাফ বিক্রীর জন্য সর্বক্ষণ চেষ্টা করল। কিন্তু স্ত্রীলোকটির রুচি অন্য ধরণের। ভিনসেণ্ট যতগুলি ছবি তাকে দেখায়, তার সবগুলির মধ্যেই স্ত্রীলোকটি শিল্পীর কলাজ্ঞানের অত্যন্ত অভাব খুঁজে পায়। ছবিগুলিতে শিল্পীর ভাবব্যঞ্জনার নিদারুণ দৈন্য তার বুদ্ধিতে বিচক্ষণভাবেই ধরা পড়ে। ভিনসেণ্ট যে-গুলোকে প্রামাণ্য বলে জানত, সেগুলিকে সম্পূর্ণ মেকি বলে প্রথম দৃষ্টিতেই বাতিল করে দেবার বিচক্ষণতাও তার মধ্যে দেখা গেল। এইভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল। ক্রমে স্ত্রীলোকটির স্বরূপ ভিনসেণ্টের নিকট প্রতিভাত হয়ে উঠল। এই খর্বদেহ, মেদমাংসে স্থূল, নিম্নরুচি বুদ্ধিহীনা নারীটি তার কাছে মধ্যবিত্ত সুলভ অবিদ্যা ও রূপ-উপজীবনের পূর্ণাঙ্গ প্রতীকরূপে প্রতীয়মান হল।

স্ত্রীলোকটি এক সময়ে আত্মসন্তুষ্টির ভাব দেখিয়ে বলল, "এতক্ষণ পরে ভাল ছবি পাওয়া গেল।"

ভিনসেণ্ট বলল, "তার চেয়ে আপনি চোখ দুটো বুজে যা হাতে ঠেকে তাই যদি তুলে নিতেন সেও এর চাইতে ভাল হত।"

স্ত্রীলোকটি ভারিক্কীভাবে টান হয়ে উঠে দাঁড়াল, ভেলভেটের বিশদ স্কার্ফ-বসন সবলে আন্দোলিত করল। তার উন্নত বক্ষস্থল থেকে লেস-কলারের নিম্নে গলদেশ পর্যন্ত একটা উদ্ধত রক্তস্রোত প্রবহমান তরঙ্গ তুলেছে ভিনসেণ্ট সেটা দেখতে পেল।

"কি? কি বললে, গেঁয়োশুয়োর!"

স্ত্রীলোকটি ঝটিকাবেগে কক্ষ ত্যাগ করল। তার ভেলভেটের টুপির উন্নত পালকগুচ্ছ একবার সম্মুখে একবার পশ্চাতে আন্দোলিত হয়ে গেল।

এ ব্যাপারে মিঃ ওব্যাক খুব উত্তেজিত হলেন। তিনি ভিনসেণ্টকে ডেকে বললেন, "তোমার হল কি বলতো? এ সপ্তাহের সবচেয়ে বড়ো বিক্রিটাই তুমি মাটি করে দিলে। স্ত্রীলোকটিকেও অপমান করতে ছাড়লে না!"

"মিঃ ওব্যাক, আমার একটা প্রশ্ন আছে, তার উত্তর দিন আগে।"

"হাঁ, বল কি বলতে চাও। আমার নিজেরও কিছু বলবার আছে তোমায়।"

স্ত্রীলোকটির পছন্দ করা ছবিগুলোকে এক ধারে সরিয়ে দিয়ে, টেবিলের দুই কিনারায় দু' হাত রেখে ভিনসেণ্ট বলল, "এবার বলুন আমায়, নিরেট নির্বোধ লোকেদের কাছে ছবি-নামের অযোগ্য যা তা বিক্রি করে জীবন কাটানোর কি প্রয়োজন! জীবন তো একটি বই দুটি নেই। সেটাকে এমন অকাজে নষ্ট করার কি যুক্তি আছে বলুন।"

ওব্যাক এ-কথার কোনো উত্তর দেবার চেষ্টা করলেন না। তিনি বললেন, "আবার যদি এরকম করার চেষ্টা কর তো তোমার কাকাকে জানাতে বাধ্য হব এখান থেকে তোমাকে অন্য ব্রাঞ্চে বদলি করে নিতে, বুঝলে?"

ওব্যাক রোষে ফুলছিলেন। তার নিঃশ্বাস সবেগে বেরুচ্ছিল। ভিনসেণ্ট একটু পাশ ঘুরে বলল, "আচ্ছা মিঃ ওব্যাক, যা-তা ছবি বিক্রি করে এত মোটা মুনাফা করার কি হেতু থাকতে পারে বলুন তো। আর ছবি কিনতে এখান পর্যন্ত যারা আসতে পারে তারাও আবার এমন লোক যে, খাঁটি আর মেকি সম্বন্ধে কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানই তাদের নেই—সেইটেই আশ্চর্যের বিষয়। এর কারণ কি? অর্থবান বলেই কি তারা বুদ্ধির দিক দিয়ে নিরেট? যারা গরীব, অথচ যারা আর্ট বোঝে, ভাল ছবির গুণগ্রাহী, পয়সার অভাবে ছবি কিনে ঘর সাজাতে তাদের সামর্থ্য নেই—এইটেই বা হয় কেন বলতে পারেন?"

ওব্যাক তার দিকে বিদ্রূপের দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, "এটা কি হচ্ছে, সোস্যালিজম হচ্ছে নাকি?"

বাড়িতে পৌঁছেই সে রেনাঁর গ্রন্থখানা হাতে নিল। টেবিলের উপর পড়েছিল সেখানা। একটি পৃষ্ঠাতে চিহ্ন দিয়ে রেখেছিল। সেখানটায় পাতা খুলে পড়তে বসল। সেখানে লেখা আছেঃ "এ সংসারে ভালো কাজ করতে চাও তো নিজের মধ্যে নিজের মৃত্যুদণ্ড ভোগ করো। মানুষ কেবল সুখভোগের জন্য সংসারে আসেনি। কেবলমাত্র সৎ হয়ে চলতেও কেউ সংসারে জন্ম নেয়নি। সংসারে তাকে মানবতার খাতিরে অনেক বড়ো বড়ো জিনিস বুঝতে হবে, তাকে মহত্ব অর্জন করতে হবে—যে কুৎসিত বর্বরতার আবর্তে জগতের সর্বাধিক লোক অস্তিত্ব টেনে চলেছে, সেটাকে অতিক্রম করতে হবে।"

খৃস্টমাস-দিবসের এক সপ্তাহ আগে লয়ার-পরিবার বাড়ির সম্মুখের জানালায় খুব মনোরম একটি "খৃস্টমাস বৃক্ষ" স্থাপন করেছিলেন। তার দুই রাত্রি পরে এক সময়ে পথ চলতে গিয়ে ভিনসেণ্ট দেখতে পেল বাড়িটা আলোকমালায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আরো দেখল প্রতিবেশীরা সদর দরজা দিয়ে বাড়ির ভিতর ঢুকছে। ভিতরে হাস্যপরিহাস হচ্ছে, তার শব্দও সে শুনতে পেল। লয়াররা আজ বড়দিনের উৎসব উপলক্ষে নৈশভোজ দিচ্ছে। ভিনসেণ্ট বাড়িতে ছুটে গিয়ে তাড়াতাড়ি দাড়ি কামিয়ে ধোপদুরস্ত জামা ও টাই পরে দ্রুত পা চালিয়ে ক্র্যাফামে ফিরে এলো। নিঃশ্বাস নেবার জন্য সিঁড়ির গোড়াতে কয়েক মিনিট থেমে দাঁড়াতে হল তাকে।

খৃস্টমাসের উৎসব এটা। দয়া ও ক্ষমার একটা জীবন্ত ভাব যেন হাওয়ার সঙ্গে ভেসে বেড়াচ্ছে আজ। ভিনসেণ্ট সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে লাগল। দরজায় জোরে কড়া নাড়ল। শুনতে পেল, পরিচিত পদধ্বনি হল-ঘরের মধ্য দিয়ে এগিয়ে আসছে। পরিচিত কণ্ঠস্বর বসবার ঘরের কাকে যেন কি বলছে, সে স্বরও তার কানে এলো। দ্বার উন্মুক্ত হল। প্রদীপ থেকে আলো এসে তার মুখখানা উদ্ভাসিত করল। সে চোখ তুলে চেয়ে দেখল উরসুলাকে। উরসুলার পরিধানে আস্তিনবিহীন সবুজ 'পোলোনাজ'—সেটা বডিস ও স্কার্ফ একত্র জুড়ে তৈরী একটা পোষাক, তাতে রয়েছে রামধনু আকারের বড়ো বড়ো বাঁক, আর রয়েছে ঢেউ-তোলা লেসের কাজ। তাকে এত সুন্দর আর কোনোদিন দেখেনি ভিনসেণ্ট।

"উরসুলা!" ডাকল সে।

উরসুলার মুখে একটা ভাব খেলে গেল। ভিনসেণ্টের সে-ভাব পরিচিত। সেদিন বাগানে উরসুলা যা যা তাকে বলেছিল, সেই কথাগুলিই আবার তার মুখ-ভাবে ফুটে উঠল। তার দিকে চেয়ে সে-কথাগুলি ভিনসেণ্টের মনে পড়ল।

"চলে যাও এখান থেকে।" উরসুলা তাকে বলল।

উত্তরের অপেক্ষা না করেই তার মুখের উপর উরসুলা সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিল।

তার পরদিন সকালেই ভিনসেণ্ট লণ্ডন ছেড়ে হল্যাণ্ডে চলে এলো। [ক্রমশঃ]

# বিজ্ঞমুখের কথা

মৃত্যু ভয় জিনিসটা বড় সাংঘাতিক। কথাটা খুবই সোজা এবং সকলেই জানেন। কিন্তু এই ভীতি কিভাবে আমাদের সমস্ত জীবনটাকে নিয়ন্ত্রিত করছে, আমাদের বিশ্বাস আচার অনুষ্ঠান এবং যাবতীয় সংস্কারকে কতখানি অজ্ঞাতসারে পরিবর্তিত করে ফেলেছে এবং এমন কি অনাগত ভবিষ্যৎ চিন্তাকে পর্যন্ত প্রভাবিত করছে সেটা তলিয়ে দেখলে একটু বিস্মিত হতে হয় বৈকি! যদি কেউ বলে—আপনি ভীষণ গোঁড়া লোক, পাঁজি না দেখে এক পা নড়েন না, তখন আপনি মনে মনে কিছুটা অসন্তুষ্ট হলেও মেনে নেবেন। কিন্তু যদি কেউ বলে, আপনার এই অন্ধ সংস্কারটা আসলে মৃত্যুভয় থেকেই আসছে, আপনি সহসা সেটা স্বীকার করতে চাইবেন না। তবু কথাটা সত্যি। যাত্রা, শুভকর্ম প্রভৃতি কাজে যোগিনী, ত্র্যহস্পর্শ, নক্ষত্রদোষ প্রভৃতি জিনিসগুলোর যখন খোঁজ করেন, বারবেলা কালবেলা প্রভৃতি অশুভলক্ষণ এড়িয়ে যেতে চান, তখন পাছে কিছু অমঙ্গল ঘটে, নিজেরই হোক বা আর কোনও বিশিষ্ট আত্মীয়েরই হোক, কোনও আপতিক বাধা না পড়ে, এই মনোভাবটাই তখন আপনার সাবধানতার পিছনে কাজ করছে। আবার সেই সাবধানতা আসছে মৃত্যুভয় সম্পর্কে অতি ন্যায্য সতর্কতা থেকে। গ্রহ বৈগুণ্য খণ্ডাবার জন্যে শান্তি স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা এবং রুষ্ট শনির প্রীত্যর্থে নানাবিধ ক্রিয়া-কলাপ অনেকেই করে থাকেন এবং এসব চেষ্টা যে নিছক মৃত্যুভয়-প্রসূত সেটা বলে দেবার দরকার করে না।

ভূতের ভয় একটা অত্যন্ত সাধারণ মনোবৃত্তি। মুখে স্বীকার করি আর না করি, অকারণে অশরীরী আত্মা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে তেমন ইচ্ছুক আমরা নই। কারণ সেই একই, অজানার বিভীষিকা। মৃত্যুর পরে কোথায় যাবো, কি করবো, কি অবস্থা হবে- এই চিন্তাগুলো যখন আমাদের স্নায়ু-মন পীড়িত করে, তখনই অজ্ঞাত পরলোকের অস্বস্তিকর ভাবনা এড়াবার জন্যে কয়েকটা কাজ করি, কয়েকটা বিধি-ব্যবস্থা অবলম্বন করি এবং পার্থিব আশ্রয়ের ভিতর দিয়ে একটা স্থায়ী, পারলৌকিক সান্ত্বনা খুঁজি। এটা মানবমনের সহজাত প্রবৃত্তি। যিনি বৈদান্তিক, যিনি বৈজ্ঞানিক, যিনি বিশুদ্ধ বুদ্ধিবাদী, তিনি অবশ্য কোনও সংস্কারেই বিশ্বাস করেন না। যুক্তিতর্ক দ্বারা অবচেতন মনের সঞ্চিত ভয় ও সংস্কারকে খণ্ডন করে দেন। যে জিনিস অপ্রত্যক্ষ, যে অস্তিত্ব প্রমাণ-সাপেক্ষ নয়, যে ভয় অজ্ঞাত অবাস্তবকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠছে, তাকে স্বীকার তিনি কখনো করেন না। কিন্তু সাধারণ মানুষ, এমন কি শিক্ষিত মানুষ পর্যন্ত এই মৃত্যুভয় এবং তারই আনুষঙ্গিক ক্রিয়াকলাপ কাটিয়ে উঠতে পারেন না। যে বৈজ্ঞানিক জগতের অত্যাশ্চর্য ব্যাপারগুলিকে অমোঘ প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা ব্যাখ্যা করেন, যিনি বৈদ্যুতিক শক্তি দ্বারা ব্রহ্মের সন্দেহজনক অস্তিত্ব অপ্রমাণ করতে উদ্যত, তিনি অবশ্য পরলোকে বিশ্বাস করেন না, করতে পারেন না। পদার্থতত্ত্ববিদ্ পরমাণুর বিস্ময়কর গঠন ও শক্তি নিয়ে গবেষণা করেন, পরমাণুর ভগ্নাংশকে প্রচণ্ড এক বিশ্ব-শক্তির মূলীভূত আধার রূপে ব্যবহারিক প্রয়োগে সার্থক করবার চেষ্টা করেন। কখনো কখনো হয়তো পরমাণুবিদ্ ক্ষুদ্রতম এই শক্তিবিন্দুর আচার-ব্যবহারে একটা অব্যক্ত, বিস্ময়কর অনুভূতির অধিকারী হন, যেমন জ্যোতির্বিৎ কোটি কোটি যোজন বিস্তৃত মহাশূন্যে বিরাট নক্ষত্রমণ্ডলী ও অদৃশ্য নীহারিকাপুঞ্জের ধ্যান-ধারণায় একটা আধ্যাত্মিক মানসিক পর্যায়ে উন্নীত হন। কিন্তু সজ্ঞানে অথবা প্রাক্তন সংস্কারে আস্থাবান্ হয়ে, মৃত্যুর পরে অজ্ঞাত প্রেতলোকের অবস্থিতি সম্পর্কে মাথা ঘামাবার সময় অথবা প্রবৃত্তি তাঁদের নেই। না থাকার প্রধান কারণ শুধু যুক্তিবাদী মনোভাব নয়, বিজ্ঞানসাধনার অনন্যদৃষ্টি এবং উপযুক্ত অবসরের অভাব। প্রচণ্ড যুক্তিশক্তির অধিকারী হয়েও তিনি যদি বিজ্ঞান-চিন্তায় অথবা গবেষণায় সর্বক্ষণ নিযুক্ত না থাকতেন, অর্থাৎ যদি অবসর পেতেন, তা হলে তাঁর মন অধ্যাত্ম চিন্তার দিকে ঝুঁকত কিনা কে জানে! বৈজ্ঞানিক না হয়ে হয়তো তিনি দার্শনিক হতেন এবং দার্শনিক হয়ে, দৃশ্য জগতের স্বরূপ নির্ণয় প্রসঙ্গে অ-দৃশ্য এবং অ-দৃষ্টের তত্ত্বানুসন্ধানে নিরত থাকতেন।

বৈদিক যুগের তত্ত্বজ্ঞ এবং সত্যান্বেষী মানুষ আর বর্তমান যুগের সংসারে বীতরাগ, পারমার্থিক সাধনায় নিযুক্ত মানুষ, উভয়েই সেই একই প্রাথমিক তথ্য অথবা তত্ত্ব-চিন্তায় আকৃষ্ট হয়েছেন। পৃথিবীর ইতিহাসে, বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন মানুষ যত বিভিন্ন উপায়ে তত্ত্ব-সাধনা করেছেন, তার হিসাব-নিকাশ করলে বোঝা যায় পথের তফাৎ থাকলেও গন্তব্য একই। মানুষের মন দেহ-কষ্ট, ব্যাধি, জরা ও মৃত্যুভয় কি করে কাটিয়ে উঠে অপার্থিব সুখের অধিকারী হতে পারে, আত্মজ্ঞান অথবা ব্রহ্মজ্ঞানের সাহায্যে মৃত্যু যে মাত্র একটি নিতান্তই শারীরিক অবস্থান্তর এই সত্য উপলব্ধি করে মরণোত্তর নবজীবনের জন্য প্রস্তুত হতে শেখে, পৃথিবীর অধিকাংশ ধর্ম ও দর্শন সেই প্রচেষ্টারই ইতিহাস। উপনিষদের ঋষি, বুদ্ধ, খৃষ্টান মিস্টিক, বৈষ্ণব মরমিয়া, সুফী সকলেই মৃ[illegible] বিভীষিকা জয় করবার চেষ্টায় সাধনা করেছেন আত্মার অমরত্ব আর দেহের নশ্বরত্ব—এ দ্ব[illegible] তত্ত্বই মৃত্যু চিন্তা থেকে আসছে। মৃত্যুর মত এমন একটা সহজ, সাধারণ, জৈব বিবর্তন যে এত জটিল তত্ত্বচিন্তায় মানুষকে আকৃষ্ট করেছে বিভিন্ন ধর্ম অথবা দর্শনের সৃষ্টি করেছে যে ভাবতে আশ্চর্য লাগে। খুব সহজ একটা শারীরিক অবস্থা বিপর্যয় বলেই মৃত্যু এত ভীষণ।

একদিন সকালে উঠে সূর্য আর দেখা যাবে না; রাতের আকাশ, বসন্তের হাওয়া, চাঁদের আলো উপভোগ করবার জন্য এই দেহ-মন থাকবে না; পৃথিবীর চিরপরিচিত পথে অপরিচিত মানুষ হেঁটে বেড়াবে, সংসারের চাকা চলবে নিয়মিত অভ্যস্ত মসৃণ গতিতে; সাময়িক অভাবের বিলাপে শূন্য ঘর কিছুদিন স্তব্ধ ও ভারি হয়ে থাকবে, তারপর "আত্মার আত্মীয়" গা ঝেড়ে উঠবেন, যথানিয়মে বড়ি দেবেন অথবা ভাঁড়ারের তদারক করবেন; অতি প্রিয় খাদ্য বেশ-ভূষা অব্যবহৃত থাকবে; প্রিয়তম আত্মীয়ের হৃদয়ে এই দারুণ মৃত্যুশোক ক্রমশ বিলীয়মান একটা দুঃস্বপ্নের স্মৃতিতে পর্যবসিত হবে। বহুদিনের সঞ্চিত অভ্যাস, ভালো-লাগা, মন্দ লাগা প্রভৃতি ব্যক্তিগত রুচি, অভিজ্ঞতা, এমন কি এই শরীরকে কেন্দ্র করে যে বুদ্ধি, যে অন্তঃকরণ, যে কল্পনা, যে ব্যক্তিত্ব এত দিন ধরে বেড়ে উঠেছিল, দেহাবসানের সঙ্গে সঙ্গে সেসব হঠাৎ বিলুপ্ত হয়ে যাবে—এই সব চিন্তা সত্যিই মারাত্মক। চিন্তাগুলো নিছক আত্ম প্রীতির নমুনা, সন্দেহ নেই। কিন্তু পৃথিবীতে মানুষের যা কিছু কর্ম ও চিন্তা, সবই তো আভিমানিক। যিনি এই আত্মকেন্দ্রিকতা জয় করে' জীবন তথা শারীরধর্মের তুচ্ছতা উপলব্ধি করেন, প্রসারিত করেন আপনার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চিন্তাকে কাল পরিমাণহীন অনন্ত কর্মের আর জ্ঞানের প্রেরণায়, তিনিই মহাপুরুষ এক কথায় তিনি মৃত্যুভয় জয় করেছেন কেন না মৃত্যুভয়প্রসূত যে সমস্ত চিন্তা আর জীবনের প্রতি অসীম মমত্ববোধের ফলে যে সমস্ত চেষ্টা মানুষের দৃষ্টিকে খণ্ডিত করে সত্তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে, সেগুলোকে তিনি দূরে সরাতে পেরেছেন। বহু কষ্ট করে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে হয়। জগতে এমন মনীষী নেই বললেই হয় যাঁকে আত্মনিগ্রহ ভোগ করতে হয়নি। টেনিসনের 'ক্রসিং দি বার' অথবা রবীন্দ্রনাথের 'সম্মুখে শান্তিপারাবার' অনা‍য়াসলব্ধ মুক্তির শান্তি নয়। আর আমরা সাধারণ মানুষ? সময় থাকতে ভোগ করে নিই নয়তো ভবিষ্যতের সংস্থান চিন্তায় মোটা অঙ্কের জীবনবীমা করি কিংবা আশ্বাসপূর্ণ শাঁসালো এক গুরু সংগ্রহ করি।

## টেলিগ্রাফের সাহায্যে দাবা খেলা

গত ৫ই মার্চ তারিখে কেবল্ বা সামুদ্রিক টেলিগ্রাফের সাহায্যে আন্তর্জাতিক দাবা খেলার ম্যাচ বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়ে গেছে নিউইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জ আর আমস্টারডাম স্টক এক্সচেঞ্জের প্রতিনিধিদের মধ্যে। নিউইয়র্ক দলের হয়ে প্রথম চাল চালেন এক্সচেঞ্জের সভাপতি এমিল স্ক্যাম। ঐ সময়ে হল্যান্ডে প্রথম চাল চালেন—আমস্টারডাম এক্সচেঞ্জের

**টেলিপ্রিণ্টারের সাহায্যে দাবার চাল পাঠানো হচ্ছে**

অস্থায়ী সভাপতি উইলিয়াম স্রাইকার। এই ম্যাচের দুই পক্ষের প্রতিটি চাল টেলিটাইপ যন্ত্রের সাহায্যে সঙ্গে সঙ্গে দুই দেশের দুই খেলোয়াড় দলের কাছে দেওয়া-নেওয়া হয়। টেলিগ্রাফের সাহায্যে এক দেশ থেকে আর এক দেশের খেলোয়াড়ের সঙ্গে দাবা খেলার এই অভিনব ব্যবস্থা এই প্রথম, এবং এই ব্যবস্থার ফলে আন্তর্জাতিক দাবা প্রতিযোগিতা—এবার সারা পৃথিবীতে চাঞ্চল্য এনেছে। সঙ্গের ছবিতে দেখুন মিঃ স্ক্যাম দাবার প্রথম চাল চালছেন—তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আছেন নিউইয়র্কস্থ নেদারল্যান্ডের কনসাল জেনারেল ডক্টর উইলেম ওন্‌প কুপম্যানস্। আর আর সি-এ টেলিটাইপ যন্ত্রের সাহায্যে মিস্ বেটি ক্লেগ হল্যান্ডে তাঁর চালের বর্ণনা পাঠাচ্ছেন। যাঁরা দাবা খেলেন তাঁরা এ খবরে নিশ্চয়ই খুশি হবেন।

## কান বিক্রীর বিজ্ঞাপন !

সম্প্রতি লস্ এঞ্জেলসের এক পত্রিকায় মিস কক ভ্যান জেণ্ট নামে এক মহিলা শিল্পী এই বলে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন যে, তিনি তাঁর বাঁ কানটি ২৪ হাজার ডলার পেলে বিক্রী করতে রাজি আছেন এবং এই কান বিক্রী করে তিনি যে অর্থ পাবেন তা দিয়ে তাঁর জীবিকা অর্জনের পথ তৈরী করবেন। কানটি কে কিনবেন তা অবশ্য এখনও জানা যায়নি।

## কুকুর-মায়ের পোষ্য সন্তান !

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের আটলাণ্টা প্রদেশের জর্জিয়া শহরের এক পরিবারে "মিস্টি" নামে একটি ককার স্পানিয়েল কুকুরের একটি মাত্র বাচ্ছা হওয়ার পরই বাচ্ছাটি মরে যায়। বাচ্ছা মরে যাওয়াতে "মিস্টি" খুবই মনমরা হয়ে পড়ে। খায়না দায়না চুপটি করে বসে থাকে। কিন্তু গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী যখন তার মনিব একুশটি মুরগীর ছানা কিনে নিয়ে বাড়ি ফিরলেন। তখন দেখা গেল—'মিস্টি' যেন একটু চঞ্চল হয়ে উঠলো। খানিকক্ষণ পরে দেখা গেল পাশের ঘর থেকে "মিস্টি" খুব সন্তর্পণে এক একটি করে মুরগীর বাচ্ছা মুখে করে তুলে নিয়ে এসে ছেড়ে দিলে তার নিজের বিছানার ওপর। মুরগীর ছানাগুলোও বেশ নির্ভয়ে তার সামনে ঘুরে ফিরে বেড়াতে লাগলো। 'মিস্টি'ও বেশ খুশী হয়ে উঠলো। তার মালিক ও তাঁর পরিবারবর্গ এ ব্যাপার দেখে অবাকও হয়ে গেলেন। আপনারা শুনে আরও অবাক হবেন যে, "মিস্টি" সেদিন থেকে ঐ ২১টি মুরগীর ছানাকে ঠিক মায়ের মত আগলে আগলে বেড়াচ্ছে—কাউকে ঐ বাচ্ছাগুলিকে ধরতে দেয় না। কুকুর মা 'মিস্টি'র

**মিস্টি আর তার পালিত মুরগীর ছানারা**

সান্ত্বনা এখন ঐ মুরগীর ছানারাই। তাদের নিয়েই সে এখন সদাসর্বদা ব্যস্ত থাকে।


সর্বপ্রকার বিশুদ্ধ ঔষধ এবং ডাক্তারী সরঞ্জামের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ট্রেড মার্ক

# পাল ফার্মেসী

৩০০নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২
রেঙ্গুন আফিস—৩৪২নং মোগল ষ্ট্রীট

মফঃস্বল অর্ডার এবং ডাক্তারী প্রেসক্রিপশান্ বিশেষ যত্ন সহকারে সরবরাহ করা হয়।

# শ্রীরামকৃষ্ণের কতিপয় ত্যাগী ও গৃহী ভক্ত

**শ্রীআশুতোষ মিত্র**

### বিপিন ডাক্তার

এই বিপিন ডাক্তারের নিবাস কোন্নগরে ছিল। ইঁহার অনুরূপ নামের অপর এক বিপিন ডাক্তার ছিলেন, যিনি কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার বিপিনচন্দ্র ঘোষ। তাঁহার বিষয় পরে বলা যাইবে। এক্ষণে প্রথমোক্ত বিপিন ডাক্তার অর্থাৎ কোন্নগরের বিপিন ডাক্তারের বিষয় বলিতেছি।

এই বিপিনচন্দ্রে উল্লেখযোগ্য কিছু অসাধারণত্ব দেখি নাই; তবে এইটুকু লক্ষ্য করিয়াছি যে, ইনি সাধুসঙ্গ করিতে ভালবাসিতেন, আর সেই উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে মঠে আসিয়া দিনকয়েক থাকিয়া যাইতেন। একবার একাদিক্রমে মাসকয়েক ছিলেন এবং সেই সময় বেলুড় গ্রামের দুঃস্থ ও পীড়িত ব্যক্তিদিগকে মঠের পক্ষ হইতে বিনামূল্যে ঔষধাদি দ্বারা চিকিৎসা করিয়াছিলেন। সেই সময় ঐসব গরীব লোকেরা ইঁহাকে "ডাক্তার মহারাজ" বলিয়া ডাকিত। মঠে অবস্থানকালে নিত্য ইনি ঠাকুরঘরে গিয়া শ্রীঠাকুরকে প্রণাম করিয়া আসিতেন।

ডাক্তার বিপিনচন্দ্র একটু-আধটু গাহিতে ও বাজাইতে পারিতেন। তাঁহার সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল একটি গানের দুইটি পংক্তি মাত্র। আমরা তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। প্রথমতঃ তিনি গাহিতে আরম্ভ করিলে ঐ দুইটি কলি প্রতিবারেই গাহিতেন, আর আমাদের শুনিতে শুনিতে কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছিল—

"গভীর বেদনায় অস্থির প্রাণ,
কোথা আছ শান্তিদাতা,
করহে শান্তিদান॥

### পল্টু কর

পল্টু করের ডাক নাম ঐরূপ থাকিলেও তাঁহার প্রকৃত নাম প্রমথচন্দ্র কর ছিল। তিনি স্বয়ং এটর্নি ছিলেন এবং সুপ্রসিদ্ধ সলিসিটর্স ঘোষ এণ্ড কর ফার্মের অংশীদার ছিলেন। তিনি কম্বুলিয়াটোলা নিবাসী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হেমচন্দ্র করের পুত্র এবং পঠদ্দশায় অধ্যাপক মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত প্রণেতা শ্রীম—) ছাত্র ও লেখকের মধ্যমাগ্রজ স্বামী ত্রিগুণাতীতের সহপাঠী ছিলেন। শ্রীম'র সাহায্যে তিনি শ্রীঠাকুরের নিকট যাতায়াত করেন।

তাঁহাকে কয়েকবার মঠে উৎসবাদিতে এবং বহুবার তাঁহার গৃহে, অফিসে ও অন্যত্র দেখিয়া থাকিলেও বা তাঁহার সহিত মিশিয়া থাকিলেও সাধন ভজনের দিক দিয়া তাঁহার বিষয়ে আমাদের কোন অভিজ্ঞতা নাই। তবে তাঁহাতে যে সদ্গুণরাশি বিদ্যমান দেখিতে পাইয়াছি এবং যাহা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি, তাহাই এখানে বলিতে প্রয়াস পাইতেছি।

তিনি শ্রীঠাকুরের ভক্তমাত্রকে, বিশেষতঃ মঠবাসীদিগকে অতিশয় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন এবং ভালবাসিতেন। পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ দ্বারা মঠের ট্রাস্ট ডীড প্রণয়নে এবং বালি মিউনিসিপ্যালিটির সহিত মঠের মোকদ্দমায় তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমের সহিত সাহায্য করিয়াছেন। রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ হইতে দুর্ভিক্ষমোচন কার্যসমূহে এবং সেবাশ্রম সমূহে তিনি সাধ্যাতীত অর্থ সাহায্যও করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত মঠের বাৎসরিক মহোৎসবে প্রতি বৎসর অর্থ সাহায্য করিতেন।

মঠসংক্রান্ত কার্যব্যপদেশে তাঁহার সহিত লেখকের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা থাকিলেও তিনি তাহাকে কখনও তাহার নাম ধরিয়া ডাকিতেন না অথবা নাম জানিতেন না। তিনি সকল সময়েই তাহাকে 'সারদার (স্বামী ত্রিগুণাতীতের গৃহের নাম) ভাই' বলিয়াই সম্বোধন করিতেন। যখনই তাঁহার সমীপে উপনীত হইয়াছি, তখনই তাঁহার স্নেহদৃষ্টিপূর্ণ চক্ষু দুইটি আমাদের উপর পতিত পাইয়াছি আর দেখিয়াছি শত কার্য উপেক্ষা করিয়া তাঁহার সেই কোমল হস্ত দুইটি আমাদিগকে সাহায্য দানে সদাই প্রসারিত, মুখে ব্যগ্র হইয়া বলিতে শুনিয়াছি "কিরে কি সারদার ভাই, কি করতে হবে, আমায়?" তাঁহার স্নেহের, তাঁহার সাহায্যের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আজ মনে পড়িতেছে, কিন্তু এখানে মাত্র ২।১টি দিয়া ক্ষান্ত হইতেছি—

একবার মঠের ঘাট নির্মাণকল্পে মহাকবি গিরিশচন্দ্রের প্রেরণায় মিনার্ভা থিয়েটার কোং একটি সাহায্য-রজনীর উদ্যোগ করেন। সে রজনীর টিকিট বিক্রয়ের ভার মঠ হইতে লেখকের উপর ন্যস্ত হইলে সে পল্টুবাবুর আশ্রয় লয়। তিনি তৎক্ষণাৎ নিজের নামে দুইখানি বক্স লইয়া রয়েল বক্সটি কুমার মন্মথনাথ মিত্রের নামে রিজার্ভ করিতে বলেন। অধিকন্তু সুপ্রসিদ্ধ ঔষধ বিক্রেতা 'বটকৃষ্ণ পালের পুত্র ভূতনাথ পালকে একখানি পত্র দিয়া আমাদিগকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দেন। আমরা তাঁহার নিকট গেলে তিনি দুইখানি বক্স লইয়া আমাদের সহিত এতটা সৌহার্দসূত্রে আবদ্ধ হয়েন যে, পরে কনখলে শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম এবং অপর একটি দাতব্য চিকিৎসালয় খুলিলে যাবতীয় ঔষধ বিনামূল্যে আমাদিগকে পাঠাইয়া দেন।

ওদিকে অভিনয় রজনীতে দেখা যায়, কুমার মন্মথনাথের পরিবর্তে পল্টুবাবুর সহিত স্যার এস পি সিংহ (পরে লর্ড সিংহ) আসিয়াছেন। কুমার মন্মথনাথের অনুপস্থিতির কারণ দর্শাইয়া পল্টুবাবু স্বীয় সঙ্গীকে লইয়া রয়েল বক্সে উঠিলেন আর আমাদিগকে রয়েল বক্স এবং নিজ নামে ক্রীত দুইখানি বক্সের ভাড়া চুকাইয়া দিলেন। অধিকন্তু শেষোক্ত বক্স দুইখানি তখনও শূন্য থাকায় আমাদিগকে ক্রেতা থাকিলে পুনরায় বিক্রয় করিবার অনুমতি দেন। আমরা তাঁহার অনুমত্যানুসারে একখানি মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের গৃহচিকিৎসক ডাঃ নিতাই হালদারকে এবং অপরখানি বাঁশতলা স্ট্রীটের পূর্ণচন্দ্র শেঠকে পুনর্বিক্রয় করি।

ইহার পর কয়েক বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। আমরা এক অপরাহ্নে কনখলে জনৈক স্থানীয় সওদাগরের দোকানে রাস্তার ধারে বসিয়া আছি—দুইজন অশ্বারোহী যাইতেছে, অপ্রত্যাশিতভাবে তথায় অশ্ব সংযত করিতে আমাদের দৃষ্টি তাঁহাদের উপর পড়ায় একজনকে চিনিলাম—তিনি পল্টুবাবু, অপরটি ইংরাজ—অপরিচিত। আমাদের উঠিয়া তাঁহার নিকটবর্তী হইবার পূর্বেই পল্টুবাবু জিজ্ঞাসিলেন—'তুমি না সারদার ভাই? আমায় চিনতে পাচ্ছ?'

'আজ্ঞা হ্যাঁ। আপনি পল্টুবাবু—আপনি যে এখানে!'

"হ্যাঁ। বেড়াতে বেরিয়েছি। তোমার দেখা পেয়েছি—ভালই হয়েছে। তা এখানকার দেখবার যায়গাগুলি আমাদের দেখিয়ে দেবে এস। আর তোমাদেরও নাকি এখানে একটা আশ্রম আছে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—সেবাশ্রম।"

"তা বেশ—সেখানে সবশেষে যাব। আমার সঙ্গীটিকে তুমি চেন না—উনি হাতোয় স্টেটের ম্যানেজার।" ইহা কহিয়া সাহেবের সহিত আমাদের পরিচয় করাইয়া দিলেন।

অতঃপর অশ্ব দুইটি দোকানে বাঁধিয়া রাখিয়া পদব্রজে কনখলের পৌরাণিক স্থলগুলি দর্শনান্তর সেবাশ্রমে উপস্থিত হইলেন তখন সেবাশ্রমের শৈশবাবস্থা। নিজ বাটী কিছু কিছু নির্মিত হইয়াছে। যাহা হউক উভয়ে প্রতি রোগীর শয্যাপার্শ্বে গি[য়া] তাহাদের শয্যা ও পরিচর্যাদি দেখিয়া সন্তু[ষ্ট] হইয়া দর্শকগণের মতামত লিখিবার বহি[তে] নিজ নিজ অভিমত লিখিলেন এবং বিদা[য়]

কালে পল্টুবাবু ২৫, টাকা এবং সাহেব ১০, টাকা সেবাশ্রমে দান করিয়া গেলেন।

ঐ প্রকারে শ্রীঠাকুর আমাদিগকে পল্টুবাবুতে নিষ্কাম কর্মযোগী দেখিবার সৌভাগ্য দান করিলেন।

**রামচন্দ্র দত্ত**

আমাদের পঠদ্দশায় রামবাবুকে আমরা ২।৩ বার দেখিয়াছি স্টার থিয়েটারে শ্রীঠাকুরের জীবন বিষয়ে বক্তৃতা করিতে। আজও সেই সুদূর অতীতের ক্ষীণ রশ্মি স্মরণ-পথে উদিত হইতেছে—তাঁহার বক্তৃতার পূর্বে বা পরে কীর্তন হওয়া আর সেই কীর্তনে শ্রীঠাকুরের নামে কীর্তনিয়াদের ভাব হইতে দেখা। প্রকৃতপক্ষে, ভাব হওয়া জীবনে প্রথম ঐখানেই দেখি।

রামবাবু কাঁকুড়গাছিতে একটি বাগান ক্রয় করেন যাহার নাম তিনি রাখিয়াছিলেন—"যোগোদ্যান"। শ্রীঠাকুরের তিরোধানে তাঁহার পূত অস্থি লইয়া গিয়া ঐ বাগানে সমাধি দেন। কি করিয়া তিনি ঐ অস্থি শ্রীস্বামীজি ও তদীয় গুরু ভ্রাতাদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত হয়েন, তাহা তাঁহাদিগের শ্রীমুখে শুনিয়াছি এবং অন্যত্রে সে বিবরণ প্রকাশিত হওয়ায় বর্তমান প্রবন্ধে তাহার পুনরুল্লেখ করিলাম না। তদবধি ঐ যোগোদ্যানে প্রতি বৎসর জন্মাষ্টমীর দিন শ্রীঠাকুরের তিরোধান উৎসব নামে একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

রামবাবু শ্রীঠাকুরের একখানি জীবনী ও একখানি উপদেশের পুস্তক লিখেন। "তত্ত্বমঞ্জরী" নামে একখানি মাসিক পত্রও ঐ যোগোদ্যান হইতে প্রকাশিত হয়।

**মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত**

যে কয়টি গৃহী ভক্ত শ্রীঠাকুরের ঘনিষ্ঠভাবে সঙ্গ ও সেবা করিয়াছেন, ইনি তাঁহাদের অন্যতম। কালে "শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত" নামে যে বহুল প্রচারবিশিষ্ট পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, ইনিই শ্রীম নামে তাহার রচয়িতা। যাঁহারা ইঁহার সঙ্গে বিশেষভাবে মিশিয়াছেন, যাঁহারা ইঁহার ঘরের কথা সব জানেন, তাঁহারাই উক্ত কথামৃত পাঠে বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ইনি নিজেকে ঐ পুস্তক মধ্যে তিনটি স্বতন্ত্র নামে প্রকাশ করিয়াছেন, যথা—"শ্রীম", "মণি" (ইঁহার বাল্যকালের ডাকনাম) এবং "মাস্টার"। কথামৃতের ইংরেজী অনুবাদ, যাহা Gospel of Sri Ramkrishna" নামে প্রকাশিত হইয়াছে তাহার রচয়িতা হইয়াছেন—ইনি 'M' নামে। বাস্তবিক বলিতে গেলে শ্রীঠাকুরের বিষয়ে এ যাবৎ যত পুস্তক বাহির হইয়াছে, কথামৃত লোকের নিকট সর্বাপেক্ষা আদরের স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহার কারণ, ইহা রচয়িতার নির্লিপ্ত হইতে লেখা। অতএব খাঁটি জিনিস।

ইনি স্কুল ও কলেজের অধ্যাপক থাকায় শ্রীঠাকুরের প্রায় সকল ত্যাগী ও গৃহীভক্ত ইঁহাকে 'মাস্টার মহাশয়' নামে অভিহিত করিতেন। আমরাও ইঁহাকে ঐ নামে ডাকিতাম। শ্রীঠাকুরের অধিকাংশ ভক্ত ইঁহার ছাত্র এবং ইঁহারই মারফতে শ্রীঠাকুরের সন্নিধানে আসিয়াছেন। এজন্য ঐসব ছাত্রদের অভিভাবকেরা "ছেলে ধরা মাস্টার" বলিয়া ইঁহার বদনাম করিতেন।

মাস্টার মহাশয়ের প্রথম দর্শন আমরা পাই —সানকীভাঙ্গায় ভবানী দত্তের লেনে। তথায় তিনি একটি ভাড়াটিয়া বাটীতে সপরিবারে বাস করিতেন এবং সারদা মহারাজ (স্বামী ত্রিগুণাতীত) তাঁহার অতিথিরূপে বাহিরের ঘরে থাকিতেন। আমাদের পঠদ্দশায় আমরা কয়েকদিন সেখানে সারদা মহারাজের নিকট গিয়াছি। সেই সূত্রে মাস্টার মহাশয়ের দর্শন পাইয়াছি। প্রথম দর্শনেই তাঁহাকে অমায়িক পুরুষরূপে পাই। তাঁহার স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি, স্নেহপূর্ণ বাক্যে আলাপ কখনও ভুলিবার নহে। আমাদের বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইতে পাইতে অবশেষে চূড়ান্ত সীমায় পেঁছে, যখন আমরা শ্রীমার সেবায় রত ছিলাম সে ঘনিষ্ঠতার কতকটা আভাস নিম্নে দিতে প্রয়াস পাইব।

মাস্টার মহাশয়কে মঠে, কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে, তাঁহার ঝামাপুকুর গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেনে নিজস্ব বাটীতে, রাজা দিগম্বর মিত্রের নবগোপাল ঘোষের নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্রের বলরামবাবুর, ললিত চট্টোপাধ্যায়ের ও শ্রীমার বাটীতে, বিষ্ণুপুরে এবং পুরীধামে কতবার যে দর্শন করিয়াছি, তাহার ইয়ত্তা নাই; আর সর্বসময়েই তাঁহার সেই একই ভাবের স্নেহপূর্ণ কোমল দৃষ্টি ও মধুর আলাপ লক্ষ্য করিয়াছি; কখনও উহার ব্যতিক্রম আমাদের চক্ষুগোচর হয় নাই। এরূপ অসাধারণ হওয়ার কারণ প্রথমে আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই; কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এবং মঠবাসীদের সহিত সঙ্গ লাভ করিবার ফলে তাঁহাকে দেখিবামাত্র মনে আসিতে থাকে সেই প্রবাদবাক্যের সত্যতা, যাহাতে বলা হইয়াছে যে, চাউল যত সিদ্ধ হইতে থাকে, ততই নরম হয়, তেমনই মানুষও যত সিদ্ধ হইবার পথে অগ্রসর হইতে থাকে, ততই সে নরম প্রকৃতির হয়। এই কারণেই মাস্টার মহাশয়তে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার সঙ্গ করিয়াছি। এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, তাঁহার সন্নিকটে গেলে সর্বদাই মনে হইত যেন একটু জুড়াইবার স্থল পাইয়াছি।

একটা কথা কতকটা অবান্তর হইলেও এখানে বলিলে একেবারে রসভঙ্গ হইবে না ভাবিয়াই লিখিতেছি। আমরা মাস্টার মহাশয়ের বিষয় যতটুকু উপরে লিখিয়াছি, মাত্র তাহাই শুনিয়া তাঁহার জনৈক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় আমাদের নিকট হইতে উত্তর প্রাপ্তির আশায় একটি শঙ্কাসূচক প্রশ্ন করেন—"এত উন্নত হয়েও মৃত্যু অত কষ্টদায়ক কেন হয়? প্রশ্নটি আমাদের মনে হয়, মাস্টার মহাশয়ের স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়াই করা হইয়াছে; কেননা, শুনিয়াছি, তিনিই শেষ সময়ে পক্ষাঘাতে আক্রান্তা হইয়াছিলেন। যাহা হউক, প্রশ্নকর্তার উত্তরে আমাদিগকে স্বামীজীর সেই অমূল্য বাণী উদ্ধৃত করিতে হয়—

"যত উচ্চ তোমার হৃদয়,
তত দুঃখ জানিহ নিশ্চয়।
হৃদিবান্ নিঃস্বার্থ প্রেমিক!
এ জগতে নাহি তব স্থান;
লৌহপিণ্ড সহে যে আঘাত,
মর্মর-মূরতি তা কি সয়?

* * *

হয়ে বাক্য-মন অগোচর,
সুখে দুঃখে তিনি অধিষ্ঠান,
মহাশক্তি কালী মৃত্যুরূপা,
মাতৃভাবে তাঁরি আগমন।
রোগ, শোক, দারিদ্র্য-যাতনা,
ধর্মাধর্ম শুভাশুভ ফল,
সব ভাবে তাঁরি উপাসনা,
জীবে বল কেবা কিবা করে?
ভ্রান্ত সেই—যেবা সুখ চায়,
দুঃখ চায় উন্মাদ যে জন—
মৃত্যু মাঙ্গে সেও যে পাগল,
অমৃতত্ব বৃথা আকিঞ্চন।
যত দূর দূরে যাও,
বুদ্ধিরথে করি আরোহণ,
এই সেই সংসার-জলধি,
দুঃখ সুখ করে আবর্তন।

যাক্ এসব অপ্রাসঙ্গিক কথা। এখন আমরা যে বিষয়ের অবতারণা করিয়াছি, তাহাতে আমি পূর্বেই বলিয়াছি, আমরা মাস্টার মহাশয়তে একটি শান্তিময় জুড়াইবার স্থল পাইতাম। আমরা যখনই তাঁহাকে নিভৃতে পাইয়াছি, তখনই তিনি শ্রীঠাকুরের বিষয় কিছু না কিছু বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, আর আমরা তাঁহাকে উস্কাইয়া তাঁহার নিকট হইতে সেই সব মহামূল্য অমৃতময়ী কথা বাহির করিতে প্রয়াস পাইয়াছি, যাহার ফলে সেই কথাবার্তা এতদূর জমিয়া গিয়াছে যে, বক্তা ও শ্রোতা উভয়েই বিভোর হইয়া নিজ নিজ কার্যান্তরের বিষয় একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন, আর সেই সব কার্যে যোগদান করিতে রীতিমত বিলম্ব হইয়া পড়িয়াছে।

সেই সব কথাবার্তার ভিতর কখন কখন ভাববশে তিনি গুণ গুণ করিয়া শ্রীঠাকুরের গীত গান গাহিতেন। তাঁহার গানে সুর-তালের সমাবেশ না থাকিলেও গলার মিষ্টতা থাকায় উহা শ্রোতাকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিত। তিনি গাহিতেন—

শ্যামা ধন কি সবাই পায়।
(অবোধ) মন বোঝে না একি দায়॥
শিবের অসাধ্য সাধন,
মন মজানো রাঙা পায়॥

ইন্দ্রাদি সম্পদ সুখ,
তুচ্ছ হয় যে ভাবে মায়,
সদানন্দ সুখে ভাসে,
শ্যামা যদি ফিরে চায়॥
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র ইন্দ্র,
যে পদ না ধ্যানে পায়।
নির্গুণে কমলাকান্ত
তবু সে চরণ চায়॥

আবার কখও বা গাহিতেন—

মজল আমার মন-ভ্রমরা
শ্যামাপদ নীলকমলে।
যত মধু তুচ্ছ হল,
কামাদি কুসুম সকলে॥
চরণ কালো, ভ্রমর কালো,
কালোয় কালোয় মিশে গেল।
(তাহে) পঞ্চতত্ত্ব প্রধান মত্ত,
রঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিলে॥
কমলাকান্তের মনে,
আশাপূর্ণ এতদিনে।
সুখ-দুঃখ সমান হলো
আনন্দ সাগরতলে॥

আর কখন বা আমাদিগকে "ভবান্যাষ্টক" স্তোত্রটি শুনাইতে বলিতেন। আমরা তাঁহার আদেশে তাঁহার ভাবরক্ষা হেতু গাহিতাম—

ন তাতো ন মাতা, ন বন্ধুর্নদাতা,
ন পুত্রো ন পুত্রী, ন ভৃত্যো ন ভর্তা।
ন জায়া, ন বিদ্যা, ন বৃত্তির্মমৈব,
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি॥
ভবাব্ধাবপারে মহাদুঃখভীরো
পপাত প্রকামী প্রলোভী প্রমত্তঃ।
কুমার্গ কু রজ্জু প্রবন্ধঃ সদাহং
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি॥
ন জানামি দানং ন চ ধ্যানযোগং
ন জানামি তন্ত্রং ন চ স্তোত্র মন্ত্রং।
ন জানামি পূজাং ন চ ন্যাসযোগং
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি॥
ন জানামি পুণ্যং ন জানামি তীর্থং
ন জানামি মুক্তিং লয়ম্বা কদাচিৎ।
ন জানামি ভক্তিং ব্রতম্বাদি মাতর্গতিস্ত্বং
গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি॥
কুকর্মী কুসংগী কুবুদ্ধিঃ কুদাসঃ
কুলাচারহীনঃ কদাচারলীনঃ।
কুদৃষ্টিঃ কুবাক্যপ্রবন্ধঃ সদাহং
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি॥
প্রজেশং রমেশং মহেশং সুরেশং দিনেশং
নিশীথে শ্বরম্বা কদাচিৎ।
ন জানামি চান্যং সদাহং শরণ্যে,
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি॥
বিবাদে বিষাদে প্রমাদে প্রবাসে
জলে চানলে পর্বতে শত্রুমধ্যে।
অরণ্যে শরণ্যে সদা মাং প্রপাহি
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি॥
অনাথো দরিদ্রো জরারোগযুক্তো,
মহাক্ষীণ দীনঃ সদা জাড্যবক্তঃ।
বিপত্তিং প্রবিষ্টঃ প্রবন্ধ সদাহং
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি॥

মাস্টার মহাশয়কে কৌপীনবস্ত হইয়া এবং আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত করিয়া নিভৃত কক্ষমধ্যে ধ্যান করিতে আমরা তাঁহার অলক্ষ্যে বহুবার দেখিয়াছি। আবার দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীমূলে, মঠের বিল্ববৃক্ষতলে এবং পুরীধামে সমুদ্রতীরে সকলের অজ্ঞাতসারে বসিয়া ধ্যানস্থ হইতেও দেখিয়াছি। সময় সময় মাস্টার মহাশয় স্ত্রীপুত্রপরিবার ত্যাগ করিয়া সপ্তাহকাল দক্ষিণেশ্বরে থাকিয়া সাধনভজনেও কাটাইতেন। দক্ষিণেশ্বরের মন্দির তাঁহার হৃদয়দেবতার পীঠস্থান বলিয়াই সে স্থানটি তাঁহার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের কোন ভাগ প্রকাশিত হইবামাত্র তিনি সর্বাগ্রে একখানি পুস্তক আনিয়া নিজ হস্তে শ্রীমাকে দিয়া যাইতেন এবং পরে যাহারা তাঁহার প্রিয় ছিল, তাহাদিগের প্রত্যেককে ও মঠের সকল কেন্দ্রে বা সেবাগ্রামে এক একখানি পাঠাইয়া দিতেন।

আমরা যখনই মাস্টার মহাশয়ের দর্শনে যাইতাম, তিনি কিছু না কিছু না খাওয়াইয়া ছাড়িতেন না। তাঁহার দুই একটি প্রিয় দোকান ছিল, যেখানে সর্বদা খাবার তৈয়ার হইত আর সেজন্য খাবার ও ঘি গরম ও ভাল থাকিত। খাবার আসিলে তিনি স্পর্শ করিয়া দেখিতেন, উহা গরম আছে কি না। ঐরূপে পরীক্ষা হইয়া গেলে তিনি আমাদিগকে খাইতে দিতেন। আবার নিজ হাতে কুঁজা হইতে জল গড়াইয়া উহার শীতলতা পরীক্ষান্তে দিতেন। এতই তিনি ভক্তদিগকে খাওয়াইতে ভালবাসিতেন। কেবল ইহাই নহে, আমরা কোন তীর্থ পর্যটনে যাইব শুনিবামাত্র পাথেয়স্বরূপে সাধ্যাতীত সাহায্য করিতেন। এতদ্ব্যতীত তিনি মঠে এবং শ্রীমার সংসারে মাসিক সাহায্য করিতেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের হিন্দী অনুবাদ করাইবার মাস্টার মহাশয়ের খুবই ইচ্ছা ছিল এবং ঐ কার্যে লেখককে নিযুক্তও করিয়াছিলেন। সে একটি পরিচ্ছেদ অনুবাদও করিয়াছিল, কিন্তু সে সময় ইংরাজী অনুবাদ লইয়া একটা গোলযোগ উপস্থিত হওয়ায় তাঁহাকে ঐ বাসনা ত্যাগ করিতে হয়।

মাস্টার মহাশয় আমাদিগকে কতটা স্নেহচক্ষে দেখিতেন, নিদর্শনস্বরূপে তাঁহার একটি ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত এখানে দিতেছি। লেখক সুদূর হরিদ্বারের নিকটবর্তী কনখল নামক স্থানে একটি পাঠশালা খুলিয়াছিল, যেখানে স্থানীয় বালকগণ বিনা বেতনে হিন্দী, উর্দু এবং ইংরাজী ভাষায় শিক্ষাপ্রাপ্ত হইত। মাস্টার মহাশয় ইহা লোকমুখে শুনিয়া একবার শারদীয়া পূজাবকাশে তথায় গিয়া উপস্থিত হয়েন। অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁহাকে পাইয়া আমরা আনন্দে অধীর হই। তখন পাঠশালার কার্য পুরামাত্রায় চলিতেছিল। অতএব তিনি একে একে সকল শ্রেণীতে বেড়াইয়া কার্যাবলীদৃষ্টে সুখী হইয়া অবশেষে লেখকের ঘরে আসিলে ছাত্রেরা একে একে সকলে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া গেল। তিনি অধিকতর সন্তুষ্ট হইয়া লেখককে নিভৃতে জিজ্ঞাসা করিলেন—এদের ভেতর ঠাকুরের ভাব ঢুকিয়ে দিচ্ছ ত? কথামৃত আছে, না পাঠিয়ে দেব? উত্তরে আমরা কথামৃত আছে বলিয়া তাঁহাকে পার্শ্বস্থ কক্ষে লইয়া গেলাম। তিনি শ্রীঠাকুরের প্রতিমূর্তির তলে পত্রপুষ্প দেখিয়া অতীব প্রীত হইলেন এবং সাষ্টাঙ্গে প্রণামান্তে বলিলেন,—আমি জানি যে, তুমি যেখানে আছ, সেখানে এসব হবেই। বুঝতে পেরেছি ছেলেরা সকালে এসে প্রথমে ঠাকুরের পূজা করে তারপর পড়তে বসে।

আমরা বলিলাম,—আপনি ত থাকিবেন, সন্ধ্যায় আরও দেখিতে পাইবেন। তিনি সেদিন রহিয়া গেলেন। সন্ধ্যায় দেখিলেন, জনৈক ছাত্রকে শ্রীঠাকুরের আরত্রিক করিতে এবং তৎপরে শতাধিক ছাত্রকে জোড়হস্তে শ্রীঠাকুর সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া সমবেত কণ্ঠে বিশুদ্ধ সুললিত সুরে প্রার্থনা করিতে—

ওঁ-হ্রীং ঋতং ত্বমচলো গুণজিৎ গুণেড্যঃ
ন-ক্তন্দিবং সকরুণং তব পাদপদ্মম্।
মো-হঙ্কষং বহুকৃতং ন ভজে যতোহহং
তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো! ১।
ভ-ক্তির্ভগশ্চ ভজনং ভবভেদকারি
গ-চ্ছন্ত্যলং সুবিপুলং গমনায় তত্ত্বং।
ব-ক্ত্রোদ্ধৃতোহপি হৃদয়ে ন মে ভাতি কিঞ্চিৎ
তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো! ২।
তে-জস্তরন্তি তরসা ত্বয়ি তৃপ্ততৃষ্ণাঃ
রা-গে কৃতে ঋতপথে ত্বয়ি রামকৃষ্ণে।
ম-র্ত্যামৃতং তব পদং মরণোর্মিনাশং
তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো! ৩।
কৃ-ত্যং করোতি কলুষং কুহকান্তকারি
ষ্ণা-ন্তং শিবং সুবিমলং তব নাম নাথ।
য-স্মাদহং ত্বশরণো জগদেকগম্য
তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো! ৪।

ঐ সব দেখিয়া শুনিয়া মাস্টার মহাশয় এতটা অভিভূত হইয়া পড়িলেন যে, যে ছাত্রটি আরতি করিয়াছিল, তাহার পৃষ্ঠদেশে হাত বুলাইয়া আদর করিতে করিতে জিজ্ঞাসিলেন, —আচ্ছা, তোমরা হিন্দুস্থানী হয়ে আমাদের বাঙলা দেশের ঠাকুরের পূজা করছ কেন, বলতে পার কি? ছাত্রটি হিন্দীতে উত্তর করিল—ত্রেতা যুগকে রামচন্দ্রজী দ্বাপর মেঁ শ্রীকৃষ্ণ হুয়ে রহে অউর অব্ ইস যুগ মেঁ রামকৃষ্ণ রূপসে প্রগট হুয়ে হেঁ।

উহা কহিয়াই সে তাঁহার কথার প্রমাণ স্বরূপে সুমধুর কণ্ঠে আবৃত্তি করিল,—
"আচণ্ডালাপ্রতিহতরয়ো যস্য প্রেমপ্রবাহঃ
লোকাতীতোহপ্যাহ ন জহৌলোককল্যাণমার্গম্

ত্রৈলোক্যেঽপ্য প্রীতিমমহিমা জানকী প্রাণবন্ধঃ
ভক্ত্যা জ্ঞানং বৃতবরবপুঃ সীতয়া যো হি রামঃ॥
স্তব্ধীবত্য প্রলয়কলিতস্বাহাবোধং মহান্তং
হিত্বা রাত্রিং প্রকৃতি সহজামন্ধতামিস্র মিশ্রাম্।
গীতং শান্তং মধুরমপি যঃ সিংহনাদং জগর্জ
সোঽয়ং জাতঃ প্রথিতপুরুষঃ
রামকৃষ্ণস্তিদানীম্॥

শ্রীমা কলিকাতায় থাকিলে তাঁহার বাটীতে মাস্টার মহাশয় প্রায়ই আসিতেন। বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াই তিনি সর্বাগ্রে দেওয়ালে মস্তক স্পর্শ করাইয়া শ্রীমার উদ্দেশে প্রণাম করিতেন। তারপর আমাদের নিকট আসিয়া বসিতেন। উপরে শ্রীমার নিকট অপর ভক্তদের ন্যায় বড় একটা যাইতেন না। আমরা ইহা বরাবর লক্ষ্য করিতাম। একবার থাকিতে না পারিয়া এই বৈপরিত্যের কারণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বসি। উত্তরে তিনি যাহা বলেন, তাহা কখনও ভুলিবার নহে। তিনি বলিলেন,—আমরা গেলে মাকে চাদরমুড়ি দিয়ে দাঁড়িয়ে প্রণাম নিতে হয় —এতে তাঁকে কষ্ট দেওয়া হয় ত! প্রণাম করা ত এখান থেকেও হতে পারে। তবে বলতে পার—প্রণাম করাটা ত বাড়ী থেকেও উদ্দেশে হতে পারে। তা মানি। তবু কেন আসি জান? কণিকামাত্র প্রসাদের জন্য। প্রসাদে অন্তর্শুদ্ধি হয়ে থাকে।

তাঁহার অমূল্য কথাগুলি আমাদের এত ভাল লাগিল যে, আমরা তৎক্ষণাৎ উপরে গিয়া শ্রীমার নিকট হইতে প্রসাদ আনিয়া দিলাম। তিনি প্রসাদ পাইয়া হাত না ধুইয়া নিজ মস্তকে মুছিলেন, জলও খাইলেন না। তদবধি তিনি আসিলে তাঁহাকে প্রসাদ দেওয়া হইত। তাঁহার ইচ্ছা হইলে তিনি উপরে যাইতেন—আমরা পীড়াপীড়ি করিতাম না।

এ পর্যন্ত একা মাস্টার মহাশয়ের বিষয়েই বলিয়াছি—তাঁহার সহধর্মিণী নিকুঞ্জ দেবীর নিকট সমভাবে ঋণী হইয়াও সেই পূতচরিত্রের বিষয় কিছুই বলি নাই। সেজন্য দোষদুষ্ট হইতে পারি। তাই এক্ষণে সেই দেবীমূর্তি সমীপে যথাশক্তি শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে প্রয়াস পাইতেছি। ঐরূপ করায় আমাদের পক্ষে কোন ত্রুটি এবং রুচি বিগর্হিত অবান্তরতা ঘটিবার আশঙ্কাও থাকিবে না।

নিকুঞ্জ দেবীকে শ্রীমা হইতে আরম্ভ করিয়া আমরা সকলেই নটীর * মা বলিয়া ডাকিতাম। মাস্টার মহাশয়ের নিকট হইতে যে স্নেহরাশি আমাদের মস্তকে বর্ষিত হইয়াছে, ততোধিক না হইলেও সমপরিমাণে আমরা নটীর মার নিকট হইতে পাইয়াছি। নটীর মা কথঞ্চিৎ শুচিবাইগ্রস্তা ছিলেন এবং বাড়ীর ধোয়া-পোঁছায় তাঁহার অনেকটা সময় যাইত, কিন্তু আমরা গেলে তাঁহার সে ছুঁৎমার্গের ভাব অন্তর্হিত হইয়া যাইত। আমাদিগকে কোথায় বসাইবেন, কি খাওয়াইবেন ইত্যাদি লইয়াই ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন। তাড়াতাড়ি একখানি হাতপাখা লইয়া আসিয়া তাহার বাতাসে আমাদের শ্রম দূর করিতেন—আমাদের আহারের জন্য কন্যাদি থাকা সত্ত্বেও স্বহস্তে পাক করিয়া নানাবিধ অন্ন-ব্যঞ্জন লইয়া আসিতেন আর নিকটে বসিয়া সেই পাখাখানি দ্বারা বাতাস করিতেন। ঠিক স্নেহময়ী মাতার ন্যায় আর দুটি ভাত এনে দিই, মা ঠাকরুণের (শ্রীমার) কাছে শুনিছি—পোস্ত চচ্চড়ী খেতে ভালবাস, তাই রেঁধেছি—আর একটু এনে দিই ইত্যাদি কহিয়া সেই সব দ্রব্য পুনরায় আনিয়া দিতেন। আহার হইয়া গেলে স্বহস্তে আচমনের জল দিতেন। আবার আমাদের তীর্থ পর্যটনে যাইবার কথা শ্রীমার শ্রীমুখে শুনিয়া পাছে আমরা লইতে অস্বীকার করি, এই আশঙ্কায় শ্রীমারই মারফতে আমাদিগের পাথেয়তে সাহায্য করিতেন। তাঁহার এই স্নেহের অধিকারী যে কেবল লেখকই হইয়াছিল, তাহা নহে; শ্রীমার তিনটি সেবকই সমভাবে হইয়াছে, ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। নটীর মার ধারণা, শ্রীঠাকুর এবং শ্রীমার সেবকমাত্রেই সাধারণ মনুষ্য মধ্যে গণ্য নহেন—তাঁহাদের আসন অনেক উচ্চে, ইহা আমরা তাঁহার মুখে বহুবার শুনিয়াছি। প্রত্যুতঃ তিনি আমাদিগকে নিজ পুত্রগণাপেক্ষা অধিক স্নেহ করিতেন, ইহা আমরা অনুভব করিয়াছি। তিনি পূজার সময় শ্রীমার প্রতি সেবককে একখানি নূতন বস্ত্র দিতেন।

মাস্টার মহাশয় যেমন মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে গিয়া সপ্তাহকাল কাটাইতেন, নটীর মাও তেমনি শ্রীমার নিকট আসিয়া দিন-কয়েক থাকিয়া যাইতেন। একবার আমরা শ্রীমাকে লইয়া পুরীধামে মাসাধিককাল থাকি, নটীর মাও সেবারে আমাদের সঙ্গিনী হয়েন। শুনিয়াছি, শ্রীঠাকুরের অবস্থিতিকালেও তিনি মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে গিয়া শ্রীমার নিকট নহবৎখানায় থাকিতেন।

গুপ্ত দম্পতীর সময়ে সময়ে ঐরূপ সংসার ত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্রভাবে গুরুস্থানে গিয়া বাস করিবার কারণ, আমাদের মনে হয়—গৃহীগণের প্রতি শ্রীঠাকুরের মাঝে মাঝে নির্জনে গিয়া তপস্যা করিবার নির্দেশই নিজ নিজ জীবনে পালন করা।

বিংশাধিক বর্ষ পরে লোকমুখে শ্রীমার কোন এক সেবকের সংবাদ পাওয়ায় নটীর মার হৃদয়ে পূর্ব স্নেহ জাগিয়া উঠে আর তিনি "কোথায় আছে, কেমন আছে, কি করছে" ইত্যাদি প্রশ্ন দ্বারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সেবকের খবর লয়েন।

**কালীপদ ঘোষ**

শ্রীরামকৃষ্ণ যুগে যে কয়টি উজ্জ্বল তারা নভোমণ্ডলে উদিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে কালীপদ ঘোষ অন্যতম। ইঁহার দর্শন আমাদের ভাগ্যে কয়েকবার হইয়াছে। ইনি সংসারে সুপ্রসিদ্ধ কাগজ বিক্রেতা মেসার্স জন ডিকিন্সন কোংর একপ্রকার হর্তাকর্তা বিধাতা ছিলেন। এমন কি, উক্ত কোংর কাগজ বিলাত হইতে ইঁহার মুদ্রাঙ্কিত হইয়া আসিতে আমরা দেখিয়াছি আর শুনিয়াছি, শ্রীঠাকুরের ভক্ত মাত্রই ঐ অফিসে স্থান খালি থাকিলে চাকুরী পাইতেন—এমনই ইঁহার আধিপত্য ছিল। কোম্পানী বিলাতী হইলেও অফিসের দেওয়ালে শ্রীঠাকুরের প্রতিমূর্তি সজ্জিত থাকিত। বস্তুতঃ বিদেশী সওদাগরী অফিসে ইঁহার ন্যায় কৃতিত্ব অপর কোন বাঙালী অর্জন করিতে পারিয়াছেন বলিয়া আমাদের স্মৃতিপথে ত নাই।

ইঁহাকে মঠে আর বিশেষ করিয়া কাঁকুড়-গাছির উৎসবে আমরা দেখিতে পাইতাম। প্রকৃতপক্ষে ইনি কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানের একটি স্তম্ভবিশেষ ছিলেন। যখন যোগোদ্যানের কীর্তনীয়েরা ইঁহার স্থূলে শরীরটিকে বেষ্টন করিয়া নাচিতে নাচিতে—

এসেছে কাঙালের ঠাকুর কাঙালের তরে
তোরা কে যাবি পারে আয়রে ত্বরা করে ইত্যাদি

অথবা

ভজ রামকৃষ্ণ, কহ রামকৃষ্ণ, লহ রামকৃষ্ণের নামরে
যেজন রামকৃষ্ণ ভজে সেই মোর প্রাণরে—ইত্যাদি

গাহিতেন, দর্শনমাত্রেই তখন উহা দেখিয়া বিমোহিত হইতে হইত।

আমাদের কেবল যে ইঁহারই সহিত পরিচয় হইয়াছে, তাহা নহে; বরং ইঁহাকে লইয়া চারি পুরুষের সহিত ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে। ইঁহার তিনটি পুত্র, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র বরেন্দ্র অবিবাহিত থাকিয়া প্রাপ্তবয়সে দেহত্যাগ করেন। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পুত্র হরেন্দ্র ও শ্রীযুত ধরেন্দ্র বিবাহ করিয়া সংসারী হয়েন। ইঁহাদের পুত্রকন্যা এবং পৌত্র-পৌত্রী এক্ষণে বর্তমান। এই চারি পুরুষের সকলেই শ্রীঠাকুরের বিশেষ ভক্ত। এই ভক্ত পরিবারকে দেখিলে চক্ষু সার্থক হয় এবং জীবন ধন্য হয়। কালীপদ ঘোষ মহাশয়ের একটি ভগ্নী ছিলেন, যাহার শরীর ত্যাগ সম্প্রতি হইয়াছে। তিনিও শ্রীঠাকুরের ভক্ত ছিলেন। তাঁহাকে আমরা শ্রীমার নিকটেও আসিতে দেখিয়াছি। কলিকাতার শ্যামপুকুর স্ট্রীটে এই ঘোষ পরিবারের বাটী।

নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্র এবং কালীপদ ঘোষ মহাশয়কে একত্রে দেখিলে এবং ইঁহাদের চরিত্র অধ্যয়ন করিলে স্বতঃই মনে আসিত, বুঝিবা ইঁহারাই শ্রীচৈতন্যাবতারে জগাই ও মাধাইরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন—এতটা সাদৃশ্য জগাই-মাধাই এবং ইঁহাদের চরিত্রে!

একবারের কথা মনে পড়িতেছে। আমরা হাওড়া রামকৃষ্ণপুরে নবগোপাল ঘোষ মহাশয়ের* বাটীতে বাৎসরিক শ্রীরামকৃষ্ণ উৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়া বসিয়া আছি। কিছুক্ষণ পরে গিরিশচন্দ্র

---

* নিকুঞ্জ দেবীর জ্যেষ্ঠ পুত্রের ডাক নাম 'নটী'।

* ইনিও শ্রীঠাকুরের একজন বিশেষ ভক্ত।

পূর্ব হইতেই কাঁকুড়গাছি ভক্তবৃন্দ দ্বারা বেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছেন। কিছুক্ষণ পরে গিরিশচন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আগমনে উক্ত ভক্তবৃন্দ উল্লসিত হইয়া খোলে চাঁটি দিতে থাকিলেন—সংগে সংগে খরতালে ঘা পড়িতে আরম্ভ হইল। এই সময় আমরা শ্রীঠাকুরকে প্রণাম করিবার উদ্দেশ্যে উপরে যাই।

নামিয়া আসিয়া দেখি, গিরিশচন্দ্র ও কালীপদ উভয়ে নগ্নগাত্রে পাশাপাশি দণ্ডায়মান আর তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া কীর্তনীয়ারা মহোল্লাসে শ্রীঠাকুরের নাম গাহিতেছেন। দেখিতে দেখিতে নবগোপাল দুই ছড়া শ্রীঠাকুরের প্রসাদী মালা আনিয়া দুইজনের গলদেশে দিলে উভয়েরই পাণিবন্ধ হইয়া যায়। তখন তাঁহাদের সেই পূর্বের মাদকতা দূরে চলিয়া যায় আর তার পরিবর্তে তাহাদের চক্ষুগুলি মুদ্রিত হয় এবং ধীর স্থির ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া থাকেন। ক্রমে উভয়ের মুখমণ্ডল এক নৈসর্গিক আনন্দে দীপ্ত হইয়া উঠে আর মাঝে মাঝে মুখদ্বয় হইতে রামকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ শব্দ নিঃসৃত হয়। এতদ্দৃষ্টে কীর্তনীয়াদের ভিতর একটা অভূতপূর্ব উৎসাহ আসিয়া উঠে আর তাঁহারা তাঁহাদের জগাই মাধাইকে বেড়িয়া বেড়িয়া কেবল শ্রীঠাকুরের নাম গাহিতে গাহিতে উদ্দাম নৃত্য করিতে থাকেন। ফলে সেই নিম্নতলস্থ কক্ষের দ্বারদেশ ও গবাক্ষ পথ স্থানীয় আবালবৃদ্ধে ভরিয়া যায়—সকলেই নির্বাক নিস্পন্দ হইয়া কীর্তনানন্দ ভোগ করিতে থাকেন।

বহুক্ষণ এই ভাবে কীর্তন হইবার পর উহার যবনিকা পতন হয়, যখন প্রসাদ প্রাপ্তির আহ্বান আসে। প্রসাদ পাইবার পর যখন পুনরায় আসি তখন জনৈক গায়ককে (ইঁহার নাম স্মরণ নাই) সুমিষ্ট কণ্ঠে কয়েকখানি গান গাহিতে শুনি। গানগুলি আমাদের মনে নাই। তবে একখানি গান, যাহা গাহিয়া গায়ক সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন এবং যাহা শুনিয়া কালীপদকে বলিতে শুনি, "গিরিশদা, এ তোমার গান", সেই গানের যতটা আমাদের স্মরণ আছে, ততটা এখানে দিতেছি—

যাই গেল্প ওই বাজায় বাঁশী
প্রাণ কেমন করে।
(সে যে) একলা এসে কদমতলায়
দাঁড়িয়ে আছে আমার তরে॥
যত বাঁশী বাজায় তত পথ পানে চায়,
পাগল বাঁশী ডাকে উভরায়—
(আমি) না গেলে সে কেঁদে কেঁদে,
চ'লে যাবে মানভরে!!

ঐ দিনের আনন্দ, যাহা সকলের ভাগ্যে ঘটিয়াছে, লেখনীর দ্বারা বর্ণনা করিবার শক্তি আমাদের না থাকিলেও হৃদয়ে আজও গাঁথিয়া রহিয়াছে। সে আনন্দ কখনও ভুলিবার নহে—কেহ ভুলিতেও পারে না।

কালীপদ ঘোষ ইহধাম ত্যাগ করিবার পরও গিরিশচন্দ্র তাঁহাকে ভুলিতে পারেন নাই—এমনই অচ্ছেদ্য সূত্রে গাঁথা উভয়ের জীবন! আমাদের এ কথার প্রমাণ আমরা গিরিশচন্দ্রের লেখনীতে পাইয়াছি, যখন তিনি তাঁহার যুগান্তকারী ধর্মমূলক নাটক "শংকরাচার্য" কালীপদ ঘোষের নামে উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। সে উৎসর্গটি নিম্নে যথাযথ উদ্ধৃত করিতেছি—

আনন্দময় সহচর আনন্দধামবাসী—

কালীপদ ঘোষ

ভাই,

আমরা উভয়ে একত্রে বহুবার শ্রীদক্ষিণেশ্বরে মূর্তিমান বেদান্ত দর্শন করেছি। তুমি এখন আনন্দধামে, কিন্তু আমার আক্ষেপ তুমি নরদেহে আমার "শংকরাচার্য" দেখলে না। আমার এ পুস্তক তোমায় উৎসর্গ করলেম, তুমি গ্রহণ কর।

গিরিশ

## পূর্ণচন্দ্র

পূর্ণচন্দ্র শ্রীঠাকুরের নিকট অল্প বয়সেই আসিয়াছিলেন। শুনিয়াছি তিনি মাস্টার মহাশয়ের ছাত্র ছিলেন এবং তাঁহারই মারফতে আসিয়াছিলেন। প্রাপ্ত বয়সে তিনি ভারত গভর্নমেণ্টে চাকুরি করিতেন এবং চাকরিহেতু তাঁহাকে প্রতি বৎসর গ্রীষ্মকালে বড়লাটের দপ্তরের সংগে সিমলা যাইতে হইত। তখন কলিকাতাই ভারতের রাজধানী ছিল। সেজন্য বড়লাট কলিকাতা এবং সিমলায় থাকিতেন। অতএব পূর্ণচন্দ্রকে দর্শনের সুযোগ আমাদের তখনই হইত, যখন তিনি শীতকালে কলিকাতায় থাকিতেন—সুবিধা হইলে মঠে কালেভদ্রে আসিতেন। আবার মঠে তাঁহার স্থিতি বেশীক্ষণের জন্যও হইত না—দুই-চারি ঘণ্টার নিমিত্ত মাত্র। তাঁহার এই ক্ষণস্থিতির দরুণ আমাদের বিশেষ সুবিধা হয় নাই, তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার। তথাপি এইভাবে যতটা আমরা মিশিতে পারিয়াছি এবং তাঁহার পবিত্র চরিত্র যেভাবে আমাদের চক্ষু সমক্ষে প্রতিভাত হইয়াছে, সেই বৃত্তান্ত এখানে দিতে প্রয়াস পাইতেছি।

আমরা দেখিয়াছি, পূর্ণচন্দ্রের চক্ষু দুইটি ছল ছল করিয়া আসিতে যতবারই তিনি মঠে নৌকা হইতে অবতরণ করিয়াছেন এবং সেই ছলছলানি ততক্ষণ স্থায়ী হইত, যতক্ষণ তিনি মঠে থাকিতেন। আমরা দেখিয়াছি—তাঁহাকে মঠে আসিয়া একবার সকলের সংগে দেখা-সাক্ষা[ৎ] করিবার পর একান্তে নিজমনে বসিয়া থাকিতে[ন]। আমরা তাঁহার সেই নীরবতা ভংগ করিয়া য[খন] কখন তাঁহার নিকট শ্রীঠাকুরের কথা কিছু শুনিবার আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছি, তখনই লক্ষ্য করিয়াছি তাঁহার চক্ষু দুইটি অধিকতর ছল ছল করিয়া আসিতে তিনি ইচ্ছা করিয়া উড়াই[য়া] দিয়াছেন—আমি কি জানি? ও'দের (মঠে[র] বড়দের) কাছে শোনো। আর আমরা তাঁহ[ার] ঐ কথায় সন্তুষ্ট না হইয়া হয়ত তাঁহাকে পীড়[াপীড়ি] করিয়া বসিতাম, কিন্তু তাহাতে য[াহা] অন্যরূপ হইয়া দাঁড়াইত—তাঁহার চক্ষু[দ্বয়] হইতে ধারার পর ধারা বাহির হইত, ত[খন] তিনি কিছু না কহিয়া তথা হইতে উঠি[য়া] যাইতেন। —এ শ্রীঠাকুরের শ্রীহস্তে গড়া [এক] অপূর্ব চরিত্র!

**বন্দীর প্রশ্ন—শ্রীঅমলেন্দু দাশগুপ্ত।** প্রকাশক—মডার্ন বুকস্‌, ১৬০।১এ, বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা—৯। মূল্য ২৷৷৹ টাকা।

বন্দী জীবনের কাহিনী লইয়া অনেকেই পুস্তক রচনা করিয়াছেন। অমলেন্দুবাবুও ইতিপূর্বে 'ডেটিনিউ' লিখিয়া বাংলা সাহিত্য সমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এই আলোচ্য পুস্তকখানি 'ডেটিনিউ' বা কারা সাহিত্যের স্বগোত্র হইলেও স্বতন্ত্র ধরণের। এখানে কারাজীবনের টুকরা ঘটনাবলী সরস হাস্যরস পরিবেশন করিয়াছে বটে, কিন্তু সেগুলি বড়ই ক্ষণস্থায়ী। টুকরা ঘটনা শুধু কারাজীবনকে বারংবার স্মরণ করাইয়া দিয়াছে। তাঁহার বিচিত্র প্রতিভাময় মন জীবনের নানা প্রশ্নের মধ্যে বিচরণ করিয়া আপনার মুক্তির সন্ধান খুঁজিতেছে; রাজনৈতিক, আধ্যাত্মিক, সামাজিক প্রশ্নের অন্তহীনতার মধ্যে তাঁহার মন যেন জীবনের গভীর রহস্যের রসাস্বাদন করিতেছে। এইদিক দিয়া পুস্তকখানি অপূর্ব।

বন্দীর প্রশ্নের ভাষা স্বচ্ছ, সাবলীল ও কবিত্ব ধর্মী। রচনাশৈলীও নিজস্ব বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এবং সহজে পাঠকচিত্তকে আকৃষ্ট করে।

**দুর্গম হয় পন্থা—শ্রীঅশোক সেন** প্রণীত। প্রকাশক—সেঞ্চুরী পাবলিসার্স, ২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ১৪৩। মূল্য আড়াই টাকা।

দুর্গম হয় পন্থা পুস্তকটি তিনটি ক্ষুদ্র নাটকের সমষ্টি। প্রথম নাটকের নাম দুর্গম হয় পন্থা এবং অপর দুইটির নাম কেন এমন হয় ও অভিনেতা। নাটক তিনটির বিষয়বস্তু উহার নাম হইতেই সুপরিস্ফুট।

আলোচ্য পুস্তকের কলেবর সংক্ষিপ্ত হইলেও উহার বিষয়বস্তু সীমাবদ্ধ নহে। জীবনদর্শন, ইতিহাস, রাজনীতি ও অর্থনীতির বহু অমীমাংসিত প্রশ্ন নায়ক নায়িকার জীবনে ভীড় করিয়া আসিয়াছে। যে সব সমস্যা আমাদের চলার পথকে বারে বারে বিঘ্নিত করিয়া তুলিয়াছে রক্ত-মাংসে গড়া মানুষেরই প্রতিচ্ছবিরূপে নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে তাহা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। শ্রদ্ধেয় শিশিরবাবুর (ভাদুড়ীর) ভাষায় বলিতে পারি "লেখক ঐ সব সমস্যাকে নিজের বুদ্ধি ও প্রাণ দিয়ে আলোচনা করেছেন। ধার করা নীতি বা কথা বা তত্ত্ব জোর করে ঢুকিয়ে নাটকের বিষয়বস্তু আড়ষ্ট করে তোলেননি।" এবং এজন্যই পুস্তকটি অন্যান্য নাটক হইতে সুষ্ঠু ও সুন্দর হইয়াছে।

নাটকের প্রাণ 'অ্যাকশন' ও 'ডায়ালোগ'। এই দুইটির সুসামঞ্জস্যে নাটক প্রাণবন্ত হইয়া উঠে। খরস্রোতা নদীর মত নাটককে সমাপ্তির পথে টানিয়া লইয়া যায়। এ বিষয়ে লেখক যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়াছেন। তাহার 'ডায়ালোগ'ও তীক্ষ্ণ, তীব্র তাই নাটকটি কোথাও ঝুলিয়া পড়ে নাই।

'অযাত্রা পথে যাত্রী যাহারা চলে' এর মত বর্তমান নাটকটিও জনপ্রিয়তা লাভ করিবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। ১১।৪১

**জেনানা ফাটক—শ্রীরাণী চন্দ,** মডার্ণ বুকস্‌, ১৬০।১এ বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা। মূল্য চার টাকা।

কারাভোগী দেশপ্রেমিকদের অনেকের কলমের গুণে কারা জীবনের ইতিহাস জানিতে পারা গিয়াছে। সম্প্রতি জেনানা ফাটকের কাহিনী কিছু কিছু জানিতে পারা যাইতেছে। শ্রীরাণী চন্দের জেনানা ফাটক মহিলা বন্দীদের কারা জীবনের ইতিহাসের মনোরম বিবরণ। রাজনৈতিক কারণে যাঁহাদের কারা ভোগ করিতে হয় নাই, জেল জীবন তাঁহাদের কাছে এক রহস্যময় বস্তু—জেনানা ফাটক নিবিড়তর রহস্যময়—শ্রীরাণী চন্দের বিবরণ সেই রহস্য ভেদে সাহায্য করিবে। ইতিপূর্বে শ্রীযুক্তা চন্দ আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ লিখিয়া রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিত্বের একটা দিককে প্রকাশ করিয়াছেন। তারপরে অবনীন্দ্রনাথের সাহায্যে 'ঘরোয়া' এবং 'জোড়াসাঁকোর ধারে' তাঁহার সাহিত্য খ্যাতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। তখনই বুঝিতে পারা গিয়াছিল যে, এক শ্রেণীর সাহিত্য রচনায় তাঁহার অপরিসীম কৃতিত্ব।

বর্তমান গ্রন্থখানিতে তিনি অন্য এক শ্রেণীর রচনায় সমান—অনেকের মতে অধিকতর—কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। আগস্ট বিপ্লবের সময়ে শ্রীযুক্তা চন্দ কয়েকজন সঙ্গিনী সহ গ্রেপ্তার হইয়া দীর্ঘকাল কারাভোগ করেন। এই গ্রন্থ মূলতঃ তাহার বিবরণ। কিন্তু রচনার গুণে রচনার প্রসার মূলকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। ইহাকে কেবল কারা-জীবনের বিবরণ বলিয়া মনে করিলে চলিবে না—কারাভ্যন্তরে সুখদুঃখময় যে মানব জীবন জাহ্নবী প্রবাহিত—এই গ্রন্থে তাহারই শিল্পসম্মত সার্থক ছবি অঙ্কিত। ছবি শব্দটি ইচ্ছা করিয়াই ব্যবহার করিয়াছি যে হেতু ছবি রচনার পদ্ধতিতেই পুস্তকটি লিখিত। যে লেখনীর এক দিকে তুলি অন্য দিকে কলম তাহাই শ্রীযুক্তা চন্দের প্রকৃতি প্রদত্ত যন্ত্র। এই যন্ত্রের সাহায্যে তিনি সঠিক চিত্রাবলী রচনা করিয়াছেন—জেনানা ফাটক তাহার নাম।

শ্রীযুক্তা রাণী চন্দ যশস্বিনী চিত্রশিল্পী। তাঁহার চিত্র প্রতিভার পরিচয় গ্রন্থখানিতে আছে। লেখিকার অঙ্কিত ছবি কয়েকখানির কথা বলিতেছি না—সমস্ত পুস্তকখানিই চিত্র শিল্পীর দৃষ্টিতে দেখিয়া সাহিত্য শিল্পীর দৃষ্টিতে লিখিত। চিত্রশিল্পীর দৃষ্টি আর সাহিত্য শিল্পীর দৃষ্টি ভিন্ন। সাহিত্য শিল্পীকে বলিলেই হয় যে কানে কুণ্ডল আছে। চিত্রশিল্পীকে বলিতে হয় কুণ্ডলটি কানের কোথায় আছে। এইখানে উভয়ের প্রভেদ। জেনানা ফাটকের মানব জীবন বর্ণনায় লেখিকাকে চিত্রশিল্পীর সেই দৃষ্টিকে ব্যবহার করিতে হইয়াছে। আবার রঙের চোখও লেখিকার অসাধারণ। স্বভাবতঃ তিনি চিত্রশিল্পী না হইলে এ বই ঠিক এইভাবে লিখিত হইত কি না সন্দেহ। কিন্তু কি হইতে পারিত সে বিষয়ে জল্পনা না করিয়া যাহা হইয়াছে তজ্জন্য তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। জেল জীবনের কাহিনী অনেক সময়েই নীরস মতবাদে পূর্ণ, এমন যে হয় তাহার কারণ রচনা শক্তির অভাব লেখক মতবাদের দ্বারা পূর্ণ করিয়া লইতে চেষ্টা করেন। শ্রীযুক্তা চন্দকে তাহা করিতে হয় নাই, কারণ রচনা শক্তির প্রাচুর্য তাঁহার আছে। যিনি জেল জীবনের কৌতূহলী পাঠক—এ বই তাঁহার অবশ্যই ভালো লাগিবে, কিন্তু যাঁহার কৌতূহল সুখ দুঃখময় মানব জীবনের প্রতি—তিনি ইহাকে মানব জীবনের এক অজ্ঞাত অংশের দিগ্‌দর্শন বলিয়া মনে করিবেন। জেনানা ফাটকের বন্ধ জানালা খুলিয়া দিবার জন্য শ্রীযুক্তা রাণী চন্দকে অশেষ ধন্যবাদ জানাইতেছি।

**কঙ্কাবতী—ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়—**শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত, ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী, ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা, মূল্য চার টাকা।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের কঙ্কাবতী কাহিনী অনেকদিন দুষ্প্রাপ্য অবস্থায় ছিল। সম্প্রতি অধ্যাপক শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য, এম এ ডি ফিল মহাশয়ের প্রযত্নে ও সম্পাদনায় এই চির নূতন কাহিনীটি নব কলেবরে প্রকাশিত হইয়াছে। সম্পাদক একটি সুদীর্ঘ ভূমিকায় কঙ্কাবতীর তথা বাঙলা সাহিত্যের হাস্যরসের একটি মনোরম বিশ্লেষণ গ্রন্থের সহিত সংযোজিত করিয়াছেন। সাধনা পত্রিকা পরিচালনার সময়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ কঙ্কাবতীর আলোচনা করিয়াছিলেন। সম্পাদক সেই আলোচনাটিকেও গ্রন্থের সহিত সংযুক্ত করিয়া তাহার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। ফলে পুস্তকখানি একাধারে সাধারণ পাঠকের এবং তত্ত্বান্বেষী পাঠকের অবশ্য পাঠ্য হইয়া উঠিয়াছে।

কঙ্কাবতীর গুণপনা আলোচনা করিবার স্থান ইহা নহে, প্রথম কারণ স্থানাভাব, দ্বিতীয় কারণ তাহা সুবিদিত হইবার কথা। তবে এ পর্যন্ত বলা যায় যে, বাঙলা সাহিত্যের ক্লাসিকসগুলির সঙ্গে কঙ্কাবতী আপন স্থান করিয়া লইয়াছে। রচনার শক্তি এবং কল্পনার উর্ধগতি থাকিলে একটি সামান্যরূপ কথাকে কিরূপ অসামান্য অপরূপ করিয়া তোলা যায় কঙ্কাবতী তাহার বিস্ময়কর দৃষ্টান্তস্থল। যাঁহারা বইখানি আগে পড়িয়াছেন, তাঁহাদের পুনরায় এবং যাঁহারা এখনো পড়েন নাই, তাঁহাদের অবিলম্বে কঙ্কাবতী পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি। আমাদের বিশ্বাস পাঠান্তে তাঁহারা একই সঙ্গে লেখক ও সম্পাদক দুজনকেই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতে বাধ্য হইবেন।

**অগ্নিসংস্কার (ভস্মাবশেষ) : শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ** রায় প্রণীত; প্রকাশক—রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ২৫।২, মোহনবাগান রো, কলিকাতা; মূল্য—৪ টাকা; পৃষ্ঠা সংখ্যা—৩৩১।

মণীন্দ্রবাবুর "অগ্নিসংস্কার"-এর প্রথম খণ্ড "প্রধূমিত বহ্নি" পাঠ করিয়া উপন্যাসখানির রসোত্তীর্ণ সাফল্যের সম্ভাবনা সম্বন্ধে যে আশা পোষণ করিয়াছিলাম, এবার দ্বিতীয় খণ্ড "ভস্মাবশেষ" পাঠ করিয়া আমাদের সে আশা সফল হইয়াছে বলিয়া আনন্দিত হইয়াছি। উপন্যাস-খানির প্রথম খণ্ডে কাহিনীর যে ধারা আরম্ভ হইয়া রূপপরিণতির দিকে অগ্রসর হইয়াছিল, দ্বিতীয় খণ্ডে তাহাই পূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে; কিন্তু তৎসত্ত্বেও প্রতিটি খণ্ড স্বয়ংসম্পূর্ণ বলিয়া মনে হয় এবং পৃথকভাবে পড়িয়া যাইতে অসুবিধা হয় না।

মূল কাহিনীটি রাজনীতির কাঠামোর উপর দাঁড় করানো হইলেও, উপন্যাসখানির দুইটি খণ্ডই রাজনীতিসর্বস্ব নয় এবং এই জন্যই তাঁহার

উপন্যাসের এই আলোচ্য খণ্ড প্রথম খণ্ডের মতই মতবাদবিশেষের শুষ্ক নীরস প্রচারমূলক সাহিত্যে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছে বলিতে হইবে। উপন্যাসখানির যেখানে যেখানে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িয়াছে, সে সব স্থানেও তিনি ব্যর্থ প্রেমের করুণ কাহিনীর নেপথ্য-সংগীত রচনা করিয়া চলিয়াছেন এবং প্রেমের ব্যর্থতা, দ্বন্দ্ব-সংঘাত পাঠকের সংবেদনশীল মনকে আকর্ষণ করে, অভিভূত করে। এইদিক দিয়াই রাজনীতি এই উপন্যাসে গোণ এবং মতবাদের বৈপরীত্যের সংগে সংগে প্রেমের বৈচিত্র্য, প্রতিযোগিতা, ব্যর্থতা পাঠকের কাছে সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় ও আকর্ষণীয় হইয়াছে। এই হিসাবে "ভস্মাবশেষে" যেখানে রুগ্ন প্রতুলবাবুর সম্মুখে অনামিকা ও সুভদ্রার উপস্থিতিতে অরুণাংশুর সহসা আবির্ভাব এবং সুভদ্রা ও অরুণাংশুর বিহ্বল ভাব বর্ণিত হইয়াছে, সেইখানেই কাহিনী 'ক্লাইম্যাক্সে' পৌঁছিয়াছে এবং সেখানেই যেন কাহিনীর স্বাভাবিক পরিসমাপ্তি হইয়া যায়।

প্রতুলবাবু, রমেনবাবু, মহামায়া, অরুণাংশু, সুবোধ, শ্যামাচরণ, অনামিকা, সুভদ্রা, কমলা—প্রত্যেকটি চরিত্রই স্পষ্ট, সজীব। আরও একটি জিনিস চোখে পড়ে, তাহা হইতেছে এই যে, লেখক কোন চরিত্রকেই একেবারে খাটো করিয়া দেখান নাই। চপলচিত্ত, বিশেষ মতবাদ-বিভ্রান্ত অরুণাংশু সুভদ্রার কলংক ও তাহার অননুমোদিত মাতৃত্বের জন্য দায়ী হইলেও, শেষ পর্যন্ত সুভদ্রাকে গ্রহণ করিবার জন্য অরুণাংশুর ব্যাকুলতা এবং সুভদ্রার অনিচ্ছাসূচক উত্তরে সুভদ্রার জন্য তাহার গৃহদ্বার সর্বদাই উন্মুক্ত, একথা তাহার মুখ দিয়া বলাইয়া লেখক অবশেষে তাহার চরিত্রে কিছুটা মহত্ত্ব আরোপ করিয়া তাহার প্রতি সুবিচার করিয়াছেন। সুভদ্রা-সম্পর্কে আদর্শচরিত্র সুবোধের দুর্বলতা, সে জন্য সুবোধের অনুতাপ, সুভদ্রার অবৈধ সন্তানের পিতৃত্ব স্বীকার করিয়া লওয়ার প্রস্তাব ইত্যাদি প্রদর্শন করিয়া লেখক সুবোধের চরিত্রকে সজীব ও স্বাভাবিক এবং আরও মহনীয় করিয়া তুলিয়াছেন। সরল একনিষ্ঠ শ্রমিককর্মী শ্যামাচরণের চরিত্রও সুন্দররূপে ফুটিয়াছে।

মণীন্দ্রবাবুর ভাষায় অলঙ্করণ নৈপুণ্য না থাকিলেও তাহা সরল, সাবলীল এবং পড়িতে কোথাও ক্লান্তি আসে না। ছাপা, বাঁধাই, প্রচ্ছদ মনোজ্ঞ।

১৪১।৪৮

**পি এম বাক্‌চীর ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা** ১৩৫৬—প্রকাশক শ্রীতারকনাথ বাক্‌চী, ১৯নং গুলু ওস্তাগর লেন, কলিকাতা। মূল্য—১৸৵০ আনা।

বাঙলা ১৩৫৬ সালের পি এম বাক্‌চীর ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজের দুষ্প্রাপ্যতার দরুণ ইহার ডাইরেক্টরীর অংশ কিছুটা হ্রাস করা হইয়া থাকিলেও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। জ্যোতিষবচন, নিত্য প্রয়োজনীয় স্মার্ত-ব্যবস্থা, পূজা ও ব্রতাদির প্রকরণ—দিন-পঞ্জিকা ছাড়াও এইগুলি প্রদত্ত হইয়াছে। সনাতনী হিন্দু সমাজের নিকট পঞ্জিকাটি পূর্বের ন্যায় সমাদৃত হইবে।

৩০।৪৯

**মহিলা মহল** (পাক্ষিক পত্র)—শ্রীগীতা বোস পরিচালিত ও শ্রীঅঞ্জলি সরকার এম-এ সম্পাদিত। কার্যালয়—কথা-সাহিত্য মন্দির, ১৬-এ, ডফ্ স্ট্রীট, কলিকাতা। আলোচ্য সংখ্যাখানি শিশু ও মাতৃ-মঙ্গল বিশেষ সংখ্যা। মূল্য—আট আনা।

আমরা 'মহিলা মহল' পাক্ষিক পত্রের এই বিশেষ সংখ্যাখানি পাঠ করিয়া আনন্দিত হইয়াছি। পত্রটির সম্পাদনা ও মুদ্রণ পারিপাট্যে উচ্চ রুচিবোধের পরিচয় দেয়। পত্রখানা মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত এবং প্রধানতঃ মহিলাদের জন্যই উহা প্রকাশিত হইয়া থাকে। তবে পাঠ করিয়া মনে হইল, সাধারণ মেয়েদের রান্নাঘর, কুটীরশিল্প প্রভৃতির পরিচয় দেওয়াই পত্রখানার উদ্দেশ্য নহে। শিক্ষা ও সংস্কৃতিসম্পন্না মহিলাদের উপযোগী করিয়াই উহা সম্পাদিত হইয়া থাকে। আলোচ্য সংখ্যাতে শিশু ও মাতৃমঙ্গল সম্পর্কিত নানা বিষয়ের প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে এবং সেই সেই বিষয়ে বিশেষজ্ঞা মহিলাগণ কর্তৃক এ সকল প্রবন্ধ লিখিত। পত্রখানার শ্রীবৃদ্ধি ও দীর্ঘজীবন কামনা করি।

**পুনরাবৃত্তি**—শ্রীমতী বাণী রায় প্রণীত। প্রকাশক—মিত্রালয়, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—আড়াই টাকা। দ্বিতীয় সংস্করণ।

'পুনরাবৃত্তি' গল্পের বই। জোরালো ভাষায়, বলিষ্ঠ ভংগিতে গল্পগুলি পাঠকের মনকে সহজেই আকৃষ্ট করে। গল্পের পাত্রপাত্রীরা প্রধানতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী। তাহাদের যৌন-সংবেদনের নানারূপ বিশ্লেষণ গল্পগুলিতে নিপুণ-ভাবে দেখানো হইয়াছে। অশ্লীল গল্প বাঙলা সাহিত্যে ইতিপূর্বেও অনেক লেখা হইয়াছে। তবে সে সব গল্প ও আলোচ্য বইয়ের গল্পের মধ্যে পার্থক্য আছে। ভাষার জোর ও রচনার বলিষ্ঠতায় এই গল্পগুলি দীর্ঘকাল পাঠকের মনে থাকিবে।

২৮৭।৪৮

**অম্লমধুর**—শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চন্দ্র প্রণীত। প্রাপ্তি-স্থান—কংগ্রেস পুস্তক-প্রচার কেন্দ্র, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—এক টাকা আট আনা।

"অম্লমধুর" একখানি তিন অঙ্কের নাটক। লেখক বিশেষ করিয়া সৌখীন নাট্য-সম্প্রদায়ের জন্য নাটকখানি রচনা করিয়াছেন। বইটি আমাদের ভালো লাগিয়াছে। যাঁহারা সখের নাটকাদি অভিনয় করিয়া থাকেন, আশা করা যায়, তাঁহাদের দৃষ্টি বইটির প্রতি আকৃষ্ট হইবে।

৪৩।৪৯

**গান্ধীজী ও কংগ্রেসের পরবর্তী বিপ্লব**—শ্রীননীগোপাল ভট্টাচার্য প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীস্বরাজবন্ধু ভট্টাচার্য, ২।১, নবীন কুণ্ডু লেন, কলিকাতা।

আলোচ্য পুস্তিকায় "গান্ধীজী" ও "কংগ্রেসের পরবর্তী বিপ্লব" এই দুইটি প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছে। পুস্তিকাটি হস্তনির্মিত কাগজে মুদ্রিত।

৪২।৪৯

**হুগলী জেলার ইতিহাস**—শ্রীসুধীরকুমার মিত্র বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—শিশির পাব্লিশিং হাউস, ২২।১, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। ১০০০ পৃষ্ঠা। বাঁধাই। মূল্য—পনের টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থ হুগলী জেলার বিস্তৃত ইতিহাস। একটি জেলার মধ্যে ইতিহাস রচনায় এমন বিচিত্র ও বিপুল পরিমাণে উপাদান থাকিতে পারে এই গ্রন্থ প্রকাশের পূর্বে ইহা ধারণা করা সাধারণের পক্ষে অসম্ভব হইত। গ্রন্থকার দীর্ঘ-কালব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রমে এবং বহু ক্লেশ স্বীকারপূর্বক এ সকল বিস্মৃতপ্রায় অমূল্য উপাদান সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। গ্রন্থখানি হুগলী জেলার কেবল ইতিহাসমাত্রই হয় নাই, ইহা হুগলীর শিক্ষা, সংস্কৃতি, লোকজন, প্রাকৃতিক সম্পদ, সাহিত্য, ভূগোল, পুরাতত্ত্ব সব কিছু লইয়া একখানি সুখপাঠ্য সাহিত্য-গ্রন্থে পরিণত হইয়াছে।

বাঙলার তথা ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতির গোড়াপত্তন এই হুগলী জেলাতেই হইয়াছিল, ইহা আশা করি অত্যুক্তি বলিয়া বিবেচিত হইবে না। শিক্ষায়, সাহিত্যে ও সভ্যতায় হুগলী দেশে নূতন আলোকপাত করিয়াছিল। এ জেলায় ইংরেজ আমলের প্রারম্ভে নব্য শিক্ষার গোড়াপত্তন হইয়াছিল। এ জেলা শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, সাধকশ্রেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ বিপ্লবীর জন্মদান করিয়াছে। এক কথায় বাঙলার প্রাণকেন্দ্র জুড়িয়া এই জেলার অবস্থান। এইজন্য ইহার ইতিহাসকেও বাঙলাদেশের প্রাণ-কেন্দ্রের ইতিহাস বলা যাইতে পারে। গ্রন্থকার এই বিস্তৃত ইতিহাস প্রণয়ন করিয়া বঙ্গবাসীকে বহু ঋণে আবদ্ধ করিলেন। তাঁহার দৃষ্টান্তে প্রবুদ্ধ হইয়া বাঙলার অন্যান্য জেলাতেও অনুরূপ বিস্তৃত ইতিহাস প্রণীত হওয়া বাঞ্ছনীয়। বাঙলাদেশ সম্বন্ধে বলা ভাষায় সুবিস্তৃত ও সুশৃঙ্খল ইতিহাস গ্রন্থের অভাব খুবই অনুভূত হয়। অথচ এদেশে ইতিহাসের উপাদান-প্রাচুর্যের অভাব নাই। বাঙলার শহর, পল্লী, নদী, দেবালয়, প্রাচীন স্মৃতিচিহ্নাদি, পল্লী-গীতিকা ও কিংবদন্তী প্রভৃতি জড়াইয়া যে বিপুল পরিমাণ উপাদান ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, তাহা অবলম্বন করিয়া রাশি রাশি গ্রন্থ রচিত হইতে পারে। বর্তমান সময়ের কথা ছাড়িয়া দিলেও বিগত শতাব্দীতে বাঙলাদেশে যত মনীষীর জন্ম হইয়াছে, কেবলমাত্র তাঁহাদের কর্মধারা আলোচনা করিয়াও রাশি রাশি সদ্‌গ্রন্থ রচিত হইতে পারে। হুগলী জেলার ইতিহাস এবং বিক্রমপুরের ইতিহাস রচয়িতার অনুসরণে বাঙলার প্রত্যেক জেলার বিস্তারিত ইতিহাস প্রণীত হইলে তাহা হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া ভবিষ্যতে বাঙলা-দেশের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা সম্ভবপর হইতে পারে। বর্তমানে বাঙলাদেশে দেশবিশ্রুত ঐতিহাসিকের অভাব নাই। তাঁহারা ঐতিহাসিক গবেষণায় অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও অলোকসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাঁহাদের দ্বারা কিংবা তাঁহাদের প্রেরণায় অন্যের দ্বারা বাঙলাদেশের বড় ইতিহাস রচনা সম্ভবপর হয় নাই কেন, তাহার কারণ সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। বাঙলার ইতিহাসের উপাদান গবেষকের গবেষণা শালায় কতটা আছে জানি না, কিন্তু তাহা যে বাঙলার নগরে পল্লীতে বনে জঙ্গলে এবং সাধারণ লোকজনের মধ্যে ছড়াইয়া রহিয়াছে একথা ঠিক। এই সকল উপাদান সংগ্রহ করিতে আজ গবেষকের যত প্রয়োজন, তার চাইতে বেশী প্রয়োজন শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত শ্রীসুধীরকুমার মিত্রের ন্যায় অক্লান্ত পরিশ্রমীর। যাঁহারা কেবল পাণ্ডিত্যে ও ঐতিহাসিক জ্ঞানে প্রবুদ্ধ হইয়া নহে, কেবল দেশের ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহের অনির্বাণ কামনায় প্রবুদ্ধ হইয়া পল্লীর পথে-ঘাটে হাটে-বাজারে দেবালয়ে দিন রাত্রি ঘুরিয়া বেড়াইতে পারেন এবং একটিমাত্র ঐতিহাসিক নিদর্শনের সন্ধান পাইলে মাইলের পর মাইল হাঁটিয়া যাইতে ক্লান্তি-বোধ করেন না।

পূর্বেই বলিয়াছি, আলোচ্য গ্রন্থটি হুগলী জেলার বিস্তৃত ইতিহাস। গ্রন্থটি বহু দুষ্প্রাপ্য চিত্রাবলীতে সুসজ্জিত। জেলার অতীত ও বর্তমান নানা ঘটনার, নানা লোকজনের, নানা স্থানের হৃদয়গ্রাহী বিবরণীতে গ্রন্থটি সুসমৃদ্ধ। বইটি অন্যান্য জেলার লোকেরও অবশ্য পাঠ্য। তবে বিশেষ করিয়া হুগলী জেলার শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই উহার একখণ্ড সংগ্রহ করিয়া রাখা উচিত।

১৩।৪৯

# ভারতের ইন্ধন সমস্যা

**শ্রীদীনেশ সেন**

ইন্ধন বা ইংরেজিতে 'ফুয়েল' বলিতে যাহা সাধারণত বোঝায়, তাহা বাতাসের অক্সিজেন বা শুধু অক্সিজেনের সহিত রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে দরকারমত তাপ উদ্গীরণ করিতে পারে। ইহা হইবে সহজদাহ্য, অতি অল্প আয়াসে দহন বজায় থাকিবে, দামে হইবে সস্তা এবং সহজলভ্য। ইহা 'কঠিন' আকারে যেমন কয়লা কাঠ ইত্যাদি, 'তরল' আকারে যেমন পেট্রল, আলকোহল, 'বায়ব' আকারে যেমন 'টাউন গ্যাস,' হাইড্রোজেন গ্যাসরূপে চলিত।

সাধারণত কাঠ কাঠ-কয়লা, পাথুরে কয়লা, আলকাতরা, পিচ, পাওয়ার আলকোহল বা সুরাসার, 'টাউন গ্যাস' প্রচলিত ইন্ধন।

সূর্যই আমাদের সর্বশক্তি এবং তাপ-শক্তির মূল। পাথুরে কয়লা, খনিজ তেল, আলকাতরা, পিচ ঐ সৌরশক্তিই আপন আপন অঙ্গে তাপ-দানক্ষম নানাপ্রকার দ্রব্যরূপে যুগ যুগ ধরিয়া সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। কাঠ, উদ্ভিজ্জ তেল, সুরাসার মূল শ্বেতসার বা শর্করা বিশিষ্ট বৃক্ষ বর্তমানকালের সৌর কিরণ সংগ্রহের ফল। প্রথমোক্তগুলি যেমন আমাদের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি, ঐগুলির ব্যবহার ঐরূপে সম্পত্তির মতনই হওয়া উচিত; শেষোক্তগুলি আমাদের যেন বর্তমানকালের আয়, উপযুক্তভাবে আয়-ব্যয় করিতে জানিলে ভাবনার কোন কারণ নাই।

ইন্ধনের প্রয়োজনীয়তা সকলেই সম্যক উপলব্ধি করেন। যদিও ইহার উপযুক্ত ব্যবহার সম্বন্ধে আমরা সকলেই সম্যক অবহিত নহি। বর্তমানকালের 'সব কষ্টের' দিনে জলে ভেজানো গুঁড়ো মাটির সঙ্গে মেশানো পাথুরে এবং কাঠকয়লার সঙ্গে একালের গৃহিণীদের বিশেষ পরিচয় আছে। কারণ উহাই হইল আমাদের দৈনন্দিন ইন্ধন।

বিভিন্ন শিল্পে ইহার বিভিন্ন রূপ এবং গুণানুযায়ী প্রয়োজন এবং ব্যবহার অত্যন্ত বেশী। এক শিল্পে ব্যবহার্য 'ইন্ধন' সচরাচর অন্য শিল্পে ব্যবহার্য নহ। বর্তমানের শিল্প সম্প্রসারণের যুগে ইহার যথোপযুক্ত ব্যবহার এবং প্রয়োজন অত্যধিক। ইহার যথোপযুক্ত ব্যবহারে দক্ষতা, অভিজ্ঞতা এবং চিন্তাকুশলতার প্রয়োজন।

'লৌহচুল্লী'তে যে শ্রেণীর পাথুরে কয়লা বা 'কোকে'র দরকার রেল ইঞ্জিনে তাহার প্রয়োজন নাই। গৃহস্থের সাধারণ ব্যবহারের জন্য 'গৃহচুল্লী'তে, লৌহচুল্লী' বা রেল ইঞ্জিনের 'কোক' বা কয়লা ব্যবহার কষ্টসাধ্য এবং নিরর্থক। ধাতু ঢালাই কারখানার চুল্লীর কয়লা উপরোক্ত কয়লাসমূহ হইতে পৃথক্।

লৌহচুল্লীর কয়লাতে থাকিবে, উদ্বায়বীয় অংশ কম, ছাইয়ের পরিমাণ নিবদ্ধ, ছাইতে কতকগুলি মৌলিক বা যৌগিক পদার্থের উপস্থিতি আপত্তিজনক, কতকগুলি পদার্থের উপস্থিতি প্রয়োজনীয় এবং হিতকর। উপরোক্ত কয়লা বা কোকের অন্যত্র ব্যবহার অতিশয় আপত্তিজনক এবং এই জাতীয় কয়লার অভাব ভাবীকালের লৌহ শিল্পের অগ্রগতি রুদ্ধ করিবার সম্ভাবনা।

রেল ইঞ্জিনের কয়লার অত গুণাবলীর দরকার নাই। কিন্তু, ইহারও অন্যান্য গুণ দরকার। ইহাতে কিছু উদ্বায়বীয় অংশ থাকিবে, যাহা সদ্য উদ্ভূত গ্যাসরূপে ইঞ্জিন চুল্লীতে জ্বলিয়া 'তাপ' দান করিবে, ছাইর পরিমাণও একটা থাকিবে, ছাইর মধ্যে কোন কোন পদার্থের উপস্থিতি এবং তাহাদের পরিমাণ বাঁধা থাকিবে।

গৃহচুল্লীর কয়লাতে 'উদ্বায়বীয়' অংশ থাকিবে খুব কম, যাহাতে ধোঁয়া খুব কম হয়, ছাই সম্বন্ধে অত কড়াকড়ি নাই। এমনি অন্যান্য শিল্পে তাহাদের চুল্লীতে প্রয়োজনীয় কয়লার বাঁধা ধরা নিয়ম আছে।

অনুরূপভাবে পেট্রল চালিত ইঞ্জিনে, পেট্রলই ব্যবহার্য। সেখানে 'ডিসেল বা মোটা তৈল' ব্যবহার নিরর্থক। প্রত্যেক ইন্ধনের ব্যবহারের একটা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র আছে।

যুধ্যমান জাতির পক্ষে বিশেষ 'চলমান' সৈন্যদলের, খাদ্যের অনুরূপ 'ইন্ধন'ও এক বিশেষ চিন্তার বস্তু। আজকালকার দিনের সৈন্যদলের 'যান্ত্রিক গতি' পেট্রলের উপরেই নির্ভর করে। যুদ্ধোপকরণ সরবরাহকারী কলকারখানাগুলি, যুদ্ধকালে যুদ্ধের 'স্নায়ু'-স্বরূপ। কলকারখানার কার্যক্ষমতা ও তাহাদের উৎপাদন শক্তি, উহাদের বিভিন্ন 'এনজিন' এবং 'চুল্লীর' কার্যক্ষমতার উপর নির্ভর করে। এগুলির কার্য-ক্ষমতা সরাসরি নির্ভর করে ব্যবহৃত ইন্ধনের উপর।

ভারতে প্রচলিত এবং প্রাপ্তব্য ইন্ধন হইল কাঠ, কাঠকয়লা, পাথুরে কয়লা, পিচ, আলকাতরা, খনিজ তৈল, পেট্রল ইত্যাদি, সুরাসার এবং উদ্ভিজ্জ তেল। ঘুঁটে বা গোবর নির্মিত ঘুঁটে একটি বিশিষ্ট 'ভারতীয় ফুয়েল'। আলকাতরা, পিচ, সুরাসার ব্যবহারের খুব প্রচলন নাই। টাউন গ্যাস মাত্র কলিকাতা এবং বোম্বাই শহরে তৈরী এবং ব্যবহার হয়। গৃহ-কার্যে ঘুঁটে, কাঠকয়লা এবং পাথুরে কয়লা এবং শিল্পে পাথুরে কয়লারই বেশী ব্যবহার হয়। অধিকাংশ স্থানেই দেখা যায়, নির্দিষ্ট ভাবের ইন্ধন অন্য স্থানে অব্যবহার হইতেছে।

ঘুঁটের ব্যবহার বর্তমান যুগে অত্যন্ত অবৈজ্ঞানিক, এবং জাতীয় স্বার্থের ক্ষতিকর। দেশের মাটিকে তাহার অতি প্রয়োজনীয় সার হইতে বঞ্চিত করিয়া দিতেছে। কিন্তু যতদিন না অন্য 'ইন্ধন' ঘুঁটে অপেক্ষা সস্তা বা সহজলভ্য না হয়, ততদিন এই দরিদ্র দেশে, ইহার ব্যবহার বন্ধ করা সুকঠিন।

কাঠ বা কাঠকয়লা। বনপ্রধান বা বন সন্নিধান প্রদেশে ইহার ব্যবহার অধিক। আমাদের অভ্যাস দোষে এবং জাতীয় স্বার্থের প্রতি অনাদরতা বশত ইহার অবস্থা খুব ভাল নহে। আমরা যেন বন হইতে, বা যেখানে দেখি বা পারি সেখান হইতে, গাছ কাটিবার অধিকার পাইয়াছি। কিন্তু নূতন বৃক্ষ রোপণ করিয়া উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ করিবার দায়িত্ব পাই নাই। ফলে, আমাদের কাষ্ঠ সম্পদ এবং অন্যান্য বন-সম্পদ কমিয়া যাইতেছে, পল্লীগ্রাম অঞ্চলগুলিও ক্রমশ কাষ্ঠবিরল হইয়া উঠিতেছে।

ইহার আশু প্রতিকার প্রয়োজনীয়। বন সংরক্ষণ নীতি আরও সুষ্ঠু এবং ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য। কাঠকয়লার উৎপাদনও আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে করা উচিত। মাটির উপর কাষ্ঠের স্তূপে আগুন লাগাইয়া, বা স্বাভাবিক স্বেচ্ছাপ্রণোদিত দাবানলের উপর নির্ভর করিয়া বহু ক্ষতি হইতেছে।

পাথুরে কয়লা,—গত 'কোল কমিশনে'র রিপোর্ট, পূর্বাপর রিপোর্ট, 'জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া'র বুলেটিন ও রেকর্ডস এবং অন্যান্য পুস্তক এবং পুস্তিকা পাঠে জানা যায়, আমাদের দেশে সব রকম কয়লার পরিমাণ খুব বেশী নহে, প্রথম শ্রেণীর কোকিং কোল মোটেই যথেষ্ট নহে। কোন কোন পণ্ডিতের মতে ভারতে যত লৌহ-পাথর আছে তাহা গলাইবার মত উপযুক্ত 'কোকিং' কয়লা নাই। কাহারও বা এস্টিমেট, ভারতীয় শিল্প সম্প্রসারণ রীতিমত চলিলে, বড় জোর ৫০ কি ৭৫ বছরের ব্যবহারের উপযুক্ত পরিমাণ কয়লা আছে।

কয়লাকে 'কোকে' পরিণত করিবার ব্যবস্থা অনেক জায়গাতে অত্যন্ত অবৈজ্ঞানিকভাবে করা হয়। 'কোক' করিবার জন্য কয়লার স্তূপে আগুন লাগাইয়া দেওয়া হয়। ইহা হইতে আলকাতরা, পিচ, বেনজল এবং অন্যান্য অনেক বস্তু গ্যাসের আকারে যাহা বাহির হয়, তাহা ধরিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করা হয় না। সব কয়লা আধুনিক 'কোকিং প্ল্যাণ্টে' 'কোক' করা উচিত বা উল্লিখিত মূল্যবান তরল এবং বায়ব জিনিষ-গুলিকে বাতাসে নষ্ট হইতে দেওয়া উচিত নহে।

আলকাতরা এবং পিচ চোলাইয়া বিভিন্ন 'টার অয়েল' সংগ্রহ করা উচিত। এমনি আলকাতরা এবং পিচের অন্য ব্যবহার ছাড়া 'ইন্ধন' হিসাবে বিশেষ ক্ষেত্রে এবং চুল্লীতে ব্যবহার আছে। চোলাই করা বিভিন্ন অংশগুলি গত যুদ্ধে জার্মানী 'ডিসেল অয়েল' এবং 'লেভিফুয়েল অয়েল' হিসাবে ব্যবহার করিয়াছে প্রচুর। বেনজল 'পেট্রল ইঞ্জিনে' ব্যবহার চলে।

খনি অঞ্চলে অনেক কয়লা গুঁড়া বা 'ডাস্ট' রূপে নষ্ট হয়। উহার সহিত পিচ এবং আলকাতরা মিশাইয়া যন্ত্র সাহায্যে ছোট ছোট ইঁট তৈরী করা যায়। ঐ ইঁটগুলি বা 'ব্রিকেট'-গুলি বহু দেশে আদরের সহিত নানা জায়গায় ইন্ধনরূপে ব্যবহার হয়। 'ডাস্ট' বা গুঁড়া কয়লাগুলির অপচয় হয় না। আমাদের দেশে উৎপাদিত ব্রিকেট খুব বেশী নহে। ইহার প্রচলনও অধিক নহে। যদিও কয়লা গুঁড়ার অভাব মোটেই নাই এবং উহার সদ্ব্যবহারও হয় না।

সর্বত্র আধুনিকভাবে 'কোক করা' বা কয়লার 'পূর্ণ বৈজ্ঞানিক' ব্যবহার হয়ত চলিত প্রথার বিপক্ষে, বা উক্তরূপ করিলে হয়ত খনির মালিকদের লাভের অংশ কম হইবে। এরূপ ক্ষেত্রেও জাতীয় স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সরকারের 'কোকিং প্ল্যাণ্ট' ব্যবহার, ব্রিকেট চলন বা অন্যান্য বৈজ্ঞানিক ব্যবহার বাধ্যতা-মূলক করিতে হইবে। কোন কোন স্থানে হয়ত কিছু অর্থসাহায্যও করিতে হইতে পারে। আমাদের দেশে কয়লার স্বল্পতা হেতু সরকারের এদিকে পূর্ণ জাগ্রত দৃষ্টি আশু প্রয়োজনীয়।

খনিজ তৈল, পেট্রল, কেরোসিন ইত্যাদি অবিভক্ত ভারতে আসাম ও পাঞ্জাবে পাওয়া যাইত। ভারত বিভাগের ফলে এখন একমাত্র আসামেই আসাম। ভারতের চাহিদা আসামের উৎপাদনের বহু গুণ বেশী। বহু মিলিয়ন গ্যালন আমদানী করিয়া আমাদের স্বাভাবিক প্রয়োজন মিটাইতে হয়। যে দেশে প্রকৃত খনিজ তৈল দানে একটু কৃপণ, তথায় তাঁহারা অন্য ব্যবস্থা করিয়াছেন। কয়লা আলকাতরা হইতে 'হাইড্রোজেনেশন' পদ্ধতি দ্বারা কৃত্রিম পেট্রল তৈরীর ব্যবস্থা আছে। গত যুদ্ধে জার্মানী বহু মিলিয়ন গ্যালন তেল বৎসরে উৎপাদন করিয়া কৃতকার্যতার সহিত এরোপ্লেনে এবং অন্যত্র ব্যবহার করিয়াছে। আমাদের দেশেও জার্মানীর অনুসরণ করা উচিত।

বর্তমানের জাতীয় গভর্নমেণ্টের কৃত্রিম পেট্রলের পরিকল্পনা কিছুদিন আগে বাহির হইয়াছিল, উহা যত শীঘ্র হয়, ততই মঙ্গল।

তা'ছাড়া পেট্রল নিয়ন্ত্রণ, সংরক্ষণ এবং ইহার পরিবর্তে ব্যবহার্য বস্তুর অনুসন্ধান করা উচিত। যে সব জায়গায় পেট্রল ব্যতিরেকে চলিতে পারে তথায় পেট্রল নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। যেমন যাত্রী এবং মালবাহী বাস এবং লরী সার্ভিসগুলি। ইহাতে অনেক পেট্রল বাঁচিয়া যাইবে। যাত্রী এবং মালবাহী সার্ভিস-গুলি 'প্রডিউসার' বা 'কাঠকয়লার' গ্যাসে পরি-চালিত করা যাইতে পারে অনায়াসে।

আমাদের দেশে শ্বেতসার এবং শর্করাসম্পন্ন গাছের খুব অভাব নাই। 'পাওয়ার আলকোহল' বা সুরাসার ব্যাপকভাবে অনায়াসে উৎপাদন বা ব্যবহার করা যাইতে পারে। ইহার জন্য ইঞ্জিনের • এবং সিলেণ্ডারের হয়ত অল্প গঠন পার্থক্য দরকার। এই বিশিষ্ট প্রকারের সুরাসারে চলনোপযোগী ইঞ্জিন হয়ত বাহির হইতে আমাদের মিলিবে না, এইরূপ ইঞ্জিন নির্মাণ আমরা বিশেষ চেষ্টা করিলে জাতীয় সরকারের সাহায্যে নির্মাণ করা কষ্টসাধ্য নয়। হয়ত কিছু সময় লাগিবে। সুরাসারের প্রচলন হইতে 'অন্যথায় নষ্ট' চিনি-শিল্পের 'চিটে গুড়'গুলিরও সদ্ব্যবহার হয়।

নানাপ্রকার উদ্ভিজ্জ তেল আমাদের দেশে প্রচুর পাওয়া যায়। কিছুকাল ভারতে উৎপন্ন চীনাবাদামের এবং বাদাম তেলের বিনিময়ে উপযুক্ত মূল্যে পাওয়া যাইতেছিল না। উদ্ভিজ্জ তৈল, বিশেষ প্রক্রিয়া করিয়া 'ডিসেল' অয়েল হিসাবে বিদেশের শিল্প অভিজ্ঞ এবং বৈজ্ঞানিকগণ সুফল পাইয়াছেন। অনেক উদ্ভিজ্জ তেল 'ভাঙিগয়া' বা 'ক্র্যাক' করিয়া পেট্রলের মত উদ্বায়বীয় অংশ পাইয়াছেন। আমরাও তাহা করিতে পারি। এক্ষেত্রে গবেষণা খুব পূর্ণ নহে। ইহার ব্যবহারের ক্ষেত্রও বিরাট। আমাদের কৃষিপ্রধান দেশে ইহার সম্ভাবনাও খুব বেশী।

প্রকৃতি আমাদের প্রাকৃতিক খনিজ ইন্ধন দানে অপেক্ষাকৃত কৃপণতা করিয়াছেন, পরিবর্তে দিয়াছেন প্রচুর সৌরকিরণ এবং উর্বরা মৃত্তিকা এবং এই মৃত্তিকার বক্ষে অসংখ্য শ্বেতসার এবং শর্করা এবং তৈলবীজবাহী বৃক্ষ, লতা এবং গুল্ম। ইহারা অহরহ নিজ অঙ্গে সর্ব ইন্ধনের মূল সূর্যকিরণ রূপান্তরিত করিতেছে। আমাদের এইদিকেই সমধিক জোর দেওয়া উচিত।

আমাদের দেশে প্রাপ্ত এবং প্রাপ্তব্য অধিকাংশ ইন্ধনেরই উপযুক্ত ব্যবহার হয় না। লৌহচুল্লীর কাজে উপযুক্ত কোকিং কোল অনেক স্থানে বাজে খরচ হয়। এমনি প্রায় সর্ব ইন্ধনেরই। এইরূপ ব্যবহার যে কোন উন্নতি-কামী স্বাধীন জাতির পক্ষে ক্ষতিকর। প্রত্যেক উন্নতিকামী স্বাধীন জাতিই আমাদের দেশের প্রাপ্ত এবং প্রাপ্তব্য ইন্ধনের যথোপযুক্ত ব্যবহার এবং অপ্রাপ্তব্য ইন্ধনের পরিবর্তে অন্য ইন্ধনের দ্বারা স্থান পূরণ এবং তাহার উৎপাদন সম্বন্ধে দৃষ্টিশীল। প্রত্যেক সভ্য দেশের সুনিয়ন্ত্রিত 'ইন্ধন' ব্যবহার 'পলিসি' আছে, এবং সে দেশের গভর্নমেণ্ট তাহার জন্য দায়ী। কারণ 'ইন্ধন' জাতির একদিকে প্রাণস্বরূপ। আমাদের দেশে গভর্নমেণ্টের বাধ্যতামূলক কোন ইন্ধন ব্যবহার পলিসি নাই। যে যাহা খুসী করিতে পারে। যদিও আমরা ভবিষ্যতে কয়লা এবং বর্তমানে পেট্রলের জন্য বাহিরের মুখাপেক্ষী।

সুতরাং আমাদের একটি উপযুক্ত জাতীয় ইন্ধন ব্যবহার পলিসি থাকা দরকার। কৃত্রিম পেট্রল উৎপাদন, কয়লার বৈজ্ঞানিক ব্যবহার, পেট্রল এবং অন্য খনিজ তৈলের যোগ্য অনুসন্ধান। সুরাসার উৎপাদন এবং ব্যবহার, এবং উদ্ভিজ্জ তেলের ব্যবহার সম্ভাবনা অনুধাবন করা উচিত। ইহা যত শীঘ্র হয়, ততই মঙ্গল। দেশের নেতৃবৃন্দ, বৈজ্ঞানিক, শিল্পপতি এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিদের এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

STATE LIBRARY ... BEHAR

সর্দার প্যাটেল বলিয়াছেন—

"Those who want to serve the country should open their mouths less wide and less often."

বিশুখুড়ো বলিলেন—"যারা নানা কারণে

খাবি খেতে বাধ্য হচ্ছে তাদের অনিচ্ছাকৃত মুখব্যাদন আশা করি সর্দারজী ক্ষমা করবেন"!

* * * * *

দিল্লীর আরউইন কলেজের সমাবর্তন উৎসবে পণ্ডিত জওহরলাল মেয়েদের আশীর্বাদ করিয়া বলিয়াছেন—"সমাজসেবাই তোমাদের জীবনের ব্রত হউক"। কিন্তু মেয়েদের মধ্যে যারা "সমাজ সংসার মিছে সব" নীতিতে বিশ্বাস করেন তারা পণ্ডিতজীর আশীর্বাদ কি মনে গ্রহণ করিয়াছেন তা বলা শক্ত।

* * * * *

গ্রামাঞ্চলে নিত্যনূতন যে সমস্ত ঘটনা ঘটিতেছে তার কোন প্রতিবিধান না হইলে May God save us from the situation" —এই মন্তব্য করিয়াছেন পূর্ব পাকিস্থান পরিষদের বিরোধীদলের সভ্য শ্রীযুক্ত মুকুন্দ-বিহারী মল্লিক। কিন্তু ইহা যে অত্যন্ত দুর্বল "বিরোধ" তা স্বীকার করিতেই হইবে কেননা—God বা Source of All Energyর ব্যক্তি স্বাধীনতা আজ প্রায় সমস্ত রাষ্ট্রেই খর্ব!

* * * * *

অন্য এক সংবাদে প্রকাশ, ভারত রাষ্ট্রের পতাকা বা জাতীয় ভাবোদ্দীপক শ্লোগান সম্বলিত কোন ছায়াচিত্র পূর্ব পাকিস্থানে প্রদর্শন করা চলিবে না।—"তারা চান Sin-e-ma, pure and simple"—মন্তব্য করিলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * * * *

ভারতীয় পার্লামেন্টের খবর—

Sj. Ramnarain Singh asked Govt. to enact legislation requiring every able bodied person from the Governor-General down to the Chowkidar to do at least one hour's work in the field.

—বিশুখুড়ো বলিলেন—"ঐ সঙ্গে আইন করে পার্লামেন্টের সভ্যদের এক ঘণ্টা খৈ ভাজতে বাধ্য করলে দেশের মস্ত বড় একটা কাজ সুসম্পন্ন হয়"!

* * * * *

পণ্ডিত জওহরলাল বলিয়াছেন—খাদ্য ব্যাপারে আমরা বিদেশের সাহায্যের উপরই নির্ভর করিতেছি। আজ যদি পৃথিবীর কোথাও যুদ্ধ বাধে তাহা হইলে আমাদের অবস্থা কি দাঁড়াইবে তা একবার ভাবিয়া দেখুন। খুড়ো বলিলেন—"এমন কী আর হবে, চোরাকারবারীরা হরিরলুট দেবেন আর আমরা হয়ত বলব—বল হরি, হরিবোল"!

* * * * *

উড়িষ্যার পরিষদের এক সংবাদে জানা গেল যে, পরিষদ কক্ষে অতঃপর কাহাকেও
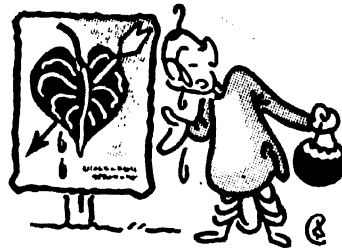
পান খাইতে দেওয়া হইবে না। পান-হীন বিতর্ক অতঃপর প্রাণহীন হইতে বাধ্য।

* * * * *

রক্ষণশীল দলের ডেপুটি লিডার মিঃ এন্টনী ইডেন সম্বন্ধে, Shankar's Weekly বলিতেছেন—

"Eden is reported to know a lot of Gulistan by heart."

—"গুলতানিও রক্ষণশীল দলের বিশেষ গুণ" মন্তব্য করিলেন জনৈক সহযাত্রী।

সুদানের এক সংবাদে প্রকাশ যে সেখানে এক ব্যক্তি নাকি কুমীরদের সঙ্গে কথা বলিতে পারেন। আমরা অবশ্য এতদূর অগ্রসর

হইতে পরি নাই, তবে কুমীরের মত অশ্রুপাত করিতে আমরা অনেকেই পারি!

* * * * *

MICE racing in Hollywood—একটি সংবাদ। Organised by Cats কি না তা সংবাদে বলা হয় নাই।

* * * * *

রাশ্যার জনৈক ভদ্রলোক দুইবার বিবাহ করেন। তাঁর দুই পক্ষের স্ত্রীর একসঙ্গে সন্তানের সংখ্যা নাকি সাতাশী জন।—"ভদ্রলোককে জাতির জনক বলতে বাধা আছে কি?" জিজ্ঞাসা করেন খুড়ো।

* * * * *

শ্রীযুক্ত মানবেন্দ্র রায় নাকি বলিয়াছেন—

"Communism has missed the bus"

—খুড়ো বলিলেন—"ঠিক miss করেনি পা-দানে ঝুলে যাচ্ছে"।

* * * * *

কে নাকি গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ১৭ই মার্চ পৃথিবী মহাপ্রলয়ে ধ্বংস হইয়া যাইবে। শ্যামলাল বলিল—"আমরা সে সংবাদ পাইনি। আমরা ৯ই মার্চের খণ্ডপ্রলয়ের কথাই শুনেছিলাম, তবে সে-টাও প্রলয় না হয়ে প্রলাপেই পর্যবসিত হয়েছে"!

## সামরিক প্রস্তুতি

বিশ্বের চতুর্দিকে সামরিক প্রস্তুতির যেরূপ একটা হিড়িক পড়ে গেছে তার সবখানি যদি সত্য হয় তবে একথা অস্বীকার করার উপায় থাকে না যুদ্ধ অতি নিকটবর্তী। বিরাট ক্ষয়ক্ষতিসমাকীর্ণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তির পর মাত্র চার বৎসর যেতে না যেতেই তৃতীয় একটি বিশ্বযুদ্ধের কথা ভাবাও অনুচিত। কিন্তু বিশ্বের রাজনৈতিক ও সামরিক পরিস্থিতি ক্রমেই এমন জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠছে যে, একথা না ভেবেও পারা যায় না। মরুভূমির বালুকার মধ্যে মাথা ডুবিয়ে রেখে উটপাখী যেমন মরু-ঝড়ের হাত থেকে বাঁচতে পারে না, তেমনই চারদিকে সামরিক প্রস্তুতি চোখে দেখেও আমরা যদি শান্তির রঙীন চশমা চোখে পড়ে বসে থাকি তাতে আত্মবঞ্চনা করা হয়তো সাময়িকভাবে সম্ভব হবে কিন্তু সর্বধ্বংসী তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের হাত থেকে আত্মরক্ষা করা যাবে না। ভবিষ্যতে যুদ্ধ একটা বাধবে এবং যুদ্ধ লাগলে কার বিরুদ্ধে কে লড়াই করবে তাও প্রায় স্থির হয়ে গেছে। তদনুযায়ী উভয় পক্ষে লড়াই-এর জোর উদ্যোগ আয়োজনও আরম্ভ হয়ে গেছে। এই প্রস্তুতির গতি অব্যাহত থাকলে অদূর ভবিষ্যতে প্রতিদ্বন্দ্বী উভয় পক্ষই সামরিক দিক থেকে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হয়ে উঠবে। তখন যুদ্ধ লাগাটা একটা কথার কথা মাত্র হয়ে দাঁড়াবে। যে কোন ছল ছুতোয় যুদ্ধ লাগলেও তখন বিস্ময়ের কিছু থাকবে না। বারুদের স্তূপ প্রস্তুত থাকলে তাতে একটু অগ্নি-সংযোগের প্রয়োজন হয় মাত্র। সমরশাস্ত্র যদিও বলে যে, আত্মরক্ষার প্রস্তুতি যুদ্ধ এড়াবার ও শান্তিরক্ষার বড় উপায়—তবু মনে হয় যে, এর মধ্যে একটা বড় ভুল আছে। সামরিক প্রস্তুতির সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণাত্মক মনোভাবটাও যায় বেড়ে এবং তারই ফলে সূত্রপাত হয় বিরোধের।

পৃথিবীর এদিকে ওদিকে তাকালে আমরা আজ কি দেখতে পাই? দেখতে পাই যে, মানুষের দৃষ্টি আজ আর যুদ্ধদীর্ণ দেশগুলিকে পুনর্গঠিত করার দিকে নেই—মানুষের দৃষ্টি ক্রমশ আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে একটা অদ্ভুত রণচেতনায়। সর্বত্র যেন একটা সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। মার্কিন নেতৃত্বে পশ্চিম ইউরোপের রাজ্যগুলি অতলান্তিক চুক্তির জন্ম দিয়েছে। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই সে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ে যাবে। কিন্তু শেষ এইখানেই নয়—অতলান্তিক চুক্তি সম্পন্ন হতে না হতেই পাশ্চাত্যের দৃষ্টি পড়েছে প্রাচ্যের জাতিপুঞ্জের দিকে। আজকের দিনে যুদ্ধের সূত্রপাত যেখানেই হোক আর যে জাতিই যুদ্ধ সৃষ্টি করুক—তা শেষ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে বিশ্বের সর্বত্র। তাই বিশ্বের সর্বত্রই আগে থেকে আঁট ঘাট বাঁধার প্রয়োজন আছে। তাই আজ পাশ্চাত্যের শক্তিপুঞ্জ চেষ্টা করছে প্রাচ্যের জাতিপুঞ্জকে নিয়ে অতলান্তিক চুক্তির ধরণে একটি প্রশান্ত মহাসাগরীয় চুক্তি গড়ে তোলার। এ পরিকল্পনা এখনও অবশ্য ভ্রূণাবস্থায়। এরই মধ্যে এ পরিকল্পনা নিয়ে প্রাথমিক কার্যারম্ভ হয়ে গেছে। এতো গেল এক পক্ষের ব্যাপার—ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষে। এদের বিপরীত পক্ষও কিন্তু চুপচাপ বসে নেই। ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষের মত বিশ্বের সকল দেশের সঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়ার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থের টানাপোড়েন নেই বলে তার সামরিক প্রস্তুতির ব্যাপকতা ও গভীরতা বোঝার উপায় নেই। তবে ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষের তুলনায় সোভিয়েট রাশিয়ার বড় একটা সুবিধা রয়ে গেছে—সেটা হল তার বিশ্বব্যাপী পঞ্চম বাহিনী। পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক দেশেই সোভিয়েট রাশিয়ার অনুগামী এক একদল কম্যুনিস্ট আছে। এরা সোভিয়েট রাশিয়ার পক্ষ নিয়ে পঞ্চম বাহিনীর কাজই করে থাকে। আজ অতলান্তিক চুক্তি নিয়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে কম্যুনিস্টদের সঙ্গে জাতীয়তাবাদীদের যে বিরোধ চলেছে তার থেকে এই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হবে। তা ছাড়া ইউরোপের বিভিন্ন দেশের কম্যুনিস্টরা ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছে যে, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধলে এবং সে যুদ্ধ যদি সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইঙ্গ-মার্কিন গণতন্ত্রবাদীদের যুদ্ধ হয়, তবে তারা মাতৃভূমির সাহায্য না করে, সোভিয়েট রাশিয়ার সাহায্যই করবে। এর পরে আর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। সোভিয়েট রাশিয়ার প্রভাববৃত্ত যতটুকু আছে তার মধ্যেও সোভিয়েট রাশিয়া চুপ করে বসে নেই। পশ্চিম শক্তিপুঞ্জের প্রস্তুতির প্রত্যুত্তরে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ করে সোভিয়েট রাশিয়াও নিজের সামরিক শক্তি বৃদ্ধিতে কসুর করছে না। পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিকে নিয়ে পারস্পরিক সাহায্যের ভিত্তিতে সোভিয়েট রাশিয়া ইতিমধ্যেই একটি পরিষদ গড়ে তুলেছে। নরওয়ে, ফিনল্যাণ্ডের মত সামরিক গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলি নিয়ে একদিকে সোভিয়েট রাশিয়া এবং অপর দিকে ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষের কি টানাহেঁচড়া চলেছে তাতো আমরা চোখেই দেখতে পাচ্ছি। পররাষ্ট্র সচিবের পদ থেকে এম্ মলোটোভকে সরিয়ে এম্ ভিস্নিভস্কিকে বসানো, সশস্ত্র বাহিনীর ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর পদ থেকে মার্শাল বুল্গানিনকে সরিয়ে মার্শাল ভ্যাসিলেভ্স্কিকে বসানো প্রভৃতি সোভিয়েট রাষ্ট্র দপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ রদবদলকে বিশ্ববাসীরা যে দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখুক—এর একটা অর্থ যে সোভিয়েটের আত্মরক্ষা ব্যবস্থাকে দৃঢ়তর করে তোলা সে বিষয়ে কোন সংশয় নেই। এ সব দেখলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, দুপক্ষ থেকে একটা তাল ঠোকাঠুকির চেষ্টা চলেছে।

জানা গেছে যে, প্রেসিডেণ্ট টুম্যান শীঘ্রই কংগ্রেসের কাছে তাঁর যে ভাবী কর্মতালিকা পেশ করবেন তার মধ্যে প্রধান দাবী হবে ইউরোপের অতলান্তিক চুক্তি স্বাক্ষরকারী দেশগুলিকে অস্ত্রশস্ত্র জোগানোর ব্যাপক ক্ষমতা। মার্কিন কংগ্রেসের তরফ থেকে এ বিষয়ে তিনি বিশেষ কোন বাধা পাবেন না বলেই ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা। মার্কিণ সেনা-সচিব মিঃ কেনেথ্ রয়্যাল ঘোষণা করেছেন যে, যুদ্ধ বাধবার সম্ভাবনা আছে এবং তাঁর মতে মার্কিন সেনাবাহিনীর সৈন্য সংখ্যা কম পক্ষে ৮৩৭০০০ হওয়া উচিত এবং জাতীয় রক্ষী বাহিনীর সংখ্যা হওয়া উচিত ৭৫০০০০। এ ধরণের

---


# বিবাহে বা প্রীতি উপহারে

**সস্তা হলেও দেবার মত।**

সুইজারল্যাণ্ড হইতে আমদানী সঠিক সময়-রক্ষক জুয়েলযুক্ত লিভার রিষ্ট ওয়াচ
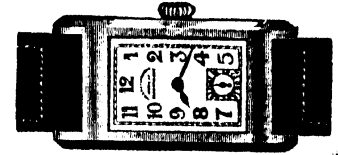
**Rectangular Shape**

সম্পূর্ণ নূতন। ১০ **বৎসরের লাষ্টিং গ্যারাণ্টী।** রাউণ্ড বা স্কোয়ার ক্রোম কেস—১৬৲, রোল্ড গোল্ড—১৮৲, ৪ জুয়েলযুক্ত ছোট ফ্ল্যাট নিউ সেপ ক্রোম কেস—২২৲, লেডিস্ ফ্যান্সি সেপ ক্রোম কেস—২২৲, রোল্ডগোল্ড ২৪৲। চিত্রানুরূপ—৪ জুয়েলযুক্ত ক্রোম কেস—২৮৲, রোল্ড গোল্ড—৩৩৲। ১৫ জুয়েলযুক্ত ক্রোম কেস—৫০৲, রোল্ড গোল্ড ৫৮৲। সদ্য আমদানী জাপানী সুপিরিয়র এলার্ম টাইম পিস ক্রোম কেস—১৮৲। ডাক মাশুল ফ্রী।

**দ্রষ্টব্য—এক বৎসরের মধ্যে ঘড়ি খারাপ হইলে বিনা খরচে মেরামত করিয়া দেওয়া হয়।**

## ইনসিওরেন্স ওয়াচ কোম্পানী

১১১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার, কলিকাতা—৪

সামরিক উদ্যোগ আয়োজন নিরর্থক নয়। সোভিয়েট রাশিয়াও যে চুপ করে বসে নেই তার প্রমাণ মিলেছে তার এবারকার বাজেট বরাদ্দ থেকে। বাজেট বরাদ্দের শতকরা ১৯ ভাগ ব্যয়-বরাদ্দই ধরা হয়েছে সামরিক বিভাগের দরুণ। উভয় পক্ষের সামরিক প্রস্তুতি যেদিন পূর্ণাঙ্গ হবে সেদিন যুদ্ধও হয়ে উঠবে অনিবার্য। দুই পক্ষই যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে কিন্তু কেউ সে দায়িত্ব নিতে রাজী নয়। সোভিয়েট রাশিয়া বলছে যে, ইঙ্গ-মার্কিন ধনতন্ত্রবাদীরাই যুদ্ধ বাধানোর ষড়যন্ত্র করছে আর ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষের কর্মকর্তারা বলছেন যে, কম্যুনিস্ট সোভিয়েট রাশিয়া সারা বিশ্ব গ্রাস করার ষড়যন্ত্র করেছে বলেই তাঁদের আত্মরক্ষার জন্যে প্রস্তুত না হয়ে উপায় নেই। আর এই পরস্পর-বিরোধী দাবী প্রতিদাবীর ঝড়ে পড়ে শান্তি-কামী বিশ্বের সাধারণ মানুষরা উঠছে হাঁপিয়ে। তারা শুধু সশংকচিত্তে দিন গুনছে।

## শ্বেত অস্ট্রেলিয়া

প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে অবস্থিত, ভৌগোলিক দিক থেকে এশিয়ার জাতিপুঞ্জের সংগে সম্বন্ধযুক্ত এবং রাজনৈতিক দিক থেকে বৃটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্গত অস্ট্রেলিয়া দেশটি জাতি গর্বের দিক থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার চেয়ে কোন অংশে কম নয়। দক্ষিণ আফ্রিকার জাতি বৈষম্যমূলক নীতি নিয়ে আজ সারা বিশ্বে সমালোচনার ঝড় উঠেছে। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার শ্বেত নীতির বিরুদ্ধে কাউকে একটি কথাও বলতে শোনা যায় না। তার এক-মাত্র কারণ হল এই যে, দক্ষিণ আফ্রিকার মত অস্ট্রেলিয়াও শ্বেতাঙ্গ শাসিত রাষ্ট্র হলেও অস্ট্রেলিয়ায় কৃষ্ণাঙ্গ আদিবাসীদের সমস্যা তত প্রবল কোন দিন ছিল না—এখনও নেই। শ্বেতাঙ্গ বৃটিশরা যখন গিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় উপ-নিবেশ স্থাপন করেছিল তখন যে লক্ষাধিক আদিবাসী ছিল—শতাধিক বৎসরের শ্বেত-শাসনের ফলে তাদের সংখ্যা কমে আজ ৬০।৬৫ হাজারে মাত্র দাঁড়িয়েছে। এই ৬০।৬৫ হাজার কৃষ্ণাঙ্গ আদিবাসীও নিরক্ষর ও রাজনীতি সম্বন্ধে অচেতন। সুতরাং তাদের দিক থেকে শ্বেতনীতির বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদই ওঠে না। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকা-বাসীদের সংখ্যা শ্বেতাঙ্গ শাসক সম্প্রদায়ের চেয়ে অনেক বেশী। তা ছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকায় আছে বহিরাগত কৃষ্ণাঙ্গ ভারতীয় সমস্যা। অস্ট্রেলিয়ায় অনুরূপ কোন সমস্যাও নেই। তার একমাত্র কারণ হল এই যে, শ্বেতাঙ্গ অস্ট্রেলিয়াবাসীরা প্রথম থেকেই অস্ট্রেলিয়ায় কৃষ্ণাঙ্গ এশিয়াবাসীদের কোনক্রমে নাক ঢোকানোর অধিকার দেয় নি। আজও তারা সেই একই নীতি অনুসরণ করে চলেছে। অস্ট্রেলিয়ার লোকবসতি অত্যন্ত বিরল। এ দেশে বহু লক্ষ নরনারী এখনও স্বচ্ছন্দে নতুন করে বসবাস করতে পারে। কিন্তু অস্ট্রেলিয়াবাসীরা কোন কৃষ্ণাঙ্গকেই স্থায়ী বসবাসের অধিকার দিতে রাজী নয়। ডাঃ মালান বা স্মাট্‌সের মত তারা শ্বেতপ্রভুত্ব বজায় রাখার কথা মুখে অবশ্য বলে না। তারা বলে যে, অস্ট্রেলিয়াবাসী শ্বেতাঙ্গদের জীবন ধারণের মান এত বেশী উন্নত যে কৃষ্ণাঙ্গদের অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসের অধিকার দিলে তাদের এই জীবনধারণের মান ব্যাহত হবে। এ যে কত ছেঁদো যুক্তি তা না বললেও চলে।

এর একমাত্র হেতু হল শ্বেত প্রভুত্ব বজায় রাখা। তারা ইউরোপের সকল দেশ থেকে অস্ট্রেলিয়ার অধিবাসী আমদানীর চেষ্টা করছে—কিন্তু এশিয়ার কোন দেশ থেকে তারা একটি লোকও নেবে না। ভারত স্বাধীন হবার পর ভারত থেকে কতকগুলি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পরিবার অস্ট্রেলিয়ায় বসবাস করার উদ্দেশ্যে গিয়েছিল। তাদের অনেককেই অস্ট্রেলিয়া থেকে ফেরৎ পাঠানো হয়েছিল এই কারণে যে তারা শ্বেতাঙ্গ নয়। সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ায় মিসেস্ ওকিজে নামে এক ইন্দোনেশীয় ভদ্রমহিলাকে নিয়ে এক গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল। ইনি প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধের সময় নিজের স্বামী ও কয়েকটি ছেলে মেয়ে নিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেখানে তাঁর স্বামীর মৃত্যু ঘটে ও তিনি এক শ্বেতাঙ্গ অস্ট্রেলীয় ভদ্রলোককে বিবাহ করেন। সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ার গভর্নমেণ্টের তরফ থেকে এই ভদ্রমহিলার উপরে আদেশ জারী করা হয়েছিল যে কৃষ্ণাঙ্গ বলে তাঁকে অস্ট্রেলিয়ায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে দেওয়া হবে না। মিসেস ওকিজে এই অন্যায় আদেশের বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়ার হাইকোর্টে মামলা রুজু করেছিলেন। তিনি এই মামলায় জিতেছেন। কিন্তু জিতলে কি হয়—অস্ট্রেলিয়ার শ্বেতনীতির ধারকেরা এতে সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। অস্ট্রেলিয়ায় অধিবাসী আমদানীকারী দপ্তরের সচিব মিঃ ক্যালওয়েল সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন যে, কৃষ্ণাঙ্গ বিতাড়ন বিষয়ে আইনে যে ফাঁক ও ফাঁকি আছে তা আর রাখা হবে না। তিনি আরও বলেছেন যে, বিশ্ববাসীরা যাই বলুক—অস্ট্রেলিয়ায় শ্বেতাঙ্গদের পতাকা কখনও অবনমিত হতে দেওয়া হবে না। অস্ট্রেলিয়ার শ্বেতনীতির মহিমা এর থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়।

## ইরাণ

সোভিয়েট রাশিয়া ইরাণস্থিত তার কন্সাল অফিসগুলি নাকি তুলে দিচ্ছে। এটা সোভিয়েট ইরাণ কূটনৈতিক সম্পর্কের অবসানের পূর্বাভাস কিনা তা অবশ্য জানা যায় নি এবং এ সম্বন্ধে সোভিয়েট পক্ষ থেকে কোন ঘোষণাও প্রচারিত হয়নি। তবে এর পিছনে যে গূঢ় কারণ আছে তা বোঝা যায়। কিছুদিন থেকে সোভিয়েট বেতারে ইরাণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রচারকার্য চলেছে। সোভিয়েট প্রচারের মূল বক্তব্য হল যে, ইরাণ ক্রমশঃ ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করছে এবং তারা ইরাণকে একটা বিরাট সোভিয়েট বিরোধী ঘাঁটি রূপে গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। মার্কিন পক্ষ থেকে অবশ্য এই সোভিয়েট প্রচারকার্যের বিরোধিতা করে বলা হয়েছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরাণের রাজনৈতিক ব্যাপারে আদৌ কোন হস্তক্ষেপের চেষ্টা করেনি। তবে ইরাণ গভর্নমেণ্টের অনুরোধক্রমে ইরাণের পুলিশ ও মিলিটারিদের শিক্ষাদানের জন্যে মার্কিন রাষ্ট্রদপ্তর কয়েকজন সামরিক অফিসার ধার দিয়েছেন মাত্র। ইরাণের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতেও ইতিমধ্যে কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটে গেছে। শাহ্ রেজা শাহ্ পহলবী আততায়ীর দ্বারা আক্রান্ত হবার পর ইরাণের মন্ত্রিসভায় কিছুটা রদবদল হয়ে গেছে। তা ছাড়া রাজনীতিতে শাহের প্রভাব প্রতি-পত্তিও বেড়ে চলেছে বলে প্রকাশ। শাহ্ যে নতুন শাসনতন্ত্র ঘোষণা করেছেন সেই শাসন-তন্ত্রে মজলিস্ বা ইরাণী পার্লামেণ্টের ক্ষমতা সংকোচের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং শাহের ক্ষমতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে সোভিয়েট রাশিয়ার আতঙ্কিত হবারই কথা। গণতন্ত্রের পথ থেকে ইরাণ চলেছে বিপরীত দিকে—রাজতন্ত্রের অভিমুখে। অন্যদিকে মার্কিন রাষ্ট্রসচিব মিঃ ডীন্ অ্যাকেসন্ ঘোষণা করেছেন যে, আতলান্তিক চুক্তি সম্পাদনের ফলে গ্রীস, তুরস্ক বা ইরাণ সম্বন্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রহ একটুও কমেনি। না কমবারই কথা। ইরাণের তৈল সম্পদ তো আছেই—তা ছাড়া তার ভৌগোলিক অবস্থিতিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ইরাণে সোভিয়েট কন্সালগুলি তুলে দেবার অর্থ কি এই যে, কূটনৈতিক খেলায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে সোভিয়েট রাশিয়া পরাজিত হয়েছে?

## টিকিটের মূল্য নির্ধ[illegible]

নতুন বর্ধিতহারে প্রমোদকর বহাল হওয়াই সাব্যস্ত হয়ে গেলো। গত ২১শে মার্চ সোমবার শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকারের অধিনায়কত্বে বি এম পি-এর প্রতিনিধি অর্থ-সচিব শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকারের কাছে দরবার করেছিলেন, কিন্তু কোন ফল পাওয়া যায়নি। প্রমোদ-কর ১লা এপ্রিল থেকেই বহাল হবার আদেশ জারী হয়ে গিয়েছে।

বর্তমান সময়ে কর বৃদ্ধি যুক্তিযুক্ত কি না, তা নিয়ে বিগত সপ্তাহ কয়েক নানাভাবেই আলোচনা করা হয়েছে। এখানে তার পুনরাবৃত্তির কোন প্রয়োজন নেই। এখন কিভাবে সব দিক মানিয়ে নেওয়া যেতে পারে, তারই আলোচনা দরকার।

দেখা যাচ্ছে যে, কর ব্যাপারে সরাসরিভাবে জড়িত হচ্ছে তিনটি পক্ষ—(১) প্রাদেশিক সরকার, (২) বাঙলা ও ভারতের চিত্রশিল্প ও ব্যবসা, (৩) বাঙলার জনসাধারণ। আর্থিক আয় তিন পক্ষেরই এখন দুর্গতির মধ্যে পড়েছে, আবার এদের পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা থাকাও হয়ে দাঁড়িয়েছে একান্ত দরকার। রাষ্ট্র আমাদের নিজেদেরই। তাকে চালানোর খরচ-খরচাও বহন করবার দায়িত্ব দেশের সবায়েরই—সে বিষয়ে অসহযোগিতার ভাব দেশদ্রোহিতারই সমান। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ শিল্পের কাছ থেকে যে সাহায্য চাইছে, তা প্রদান করাই হচ্ছে কর্তব্য। তাতে শিল্পের ওপর ও জনসাধারণের ওপরে চাপ পড়তে পারে, কিন্তু তা মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। নয়তো রাষ্ট্রের অভাব পূরণ হবে কিসে এবং কোত্থেকে? কাজেই সরকারী আয় অব্যাহত রাখার দিকে দৃষ্টি রাখতেই হবে!

দ্বিতীয়ত, চিত্রশিল্পের অবস্থা খারাপ, তার আয়ের গতি নিম্নগামী। তারও তাই আজ সাহায্য প্রয়োজন, অন্তত তার গতির মোড় ফিরিয়ে উঁচু ধাপে বসানোর সম্ভাবনা এখন অন্তর্হিত হলেও, আরও নীচে যাতে না নামতে পারে, সেদিকে দৃষ্টি দিতেই হবে।

তারপরের কথা হচ্ছে জনসাধারণকে নিয়ে। লোকের আয় কমে গিয়েছে এবং ব্যয়ের মাত্রার সঙ্গে সমতা রেখে চলা তাদের পক্ষে ক্রমশই দুরূহ হয়ে উঠছে। এ অবস্থায় তাদের ওপর কোনরকম চাপ দেওয়ায় ফল খুবই খারাপ হবে। অর্থাৎ তিন পক্ষকেই সামলে চলা দরকার, যাতে কারুরই কোন ক্ষতি না হয়। ব্যাপারটা খুবই জটিল। • কিন্তু তবুও এমন একটা মীমাংসা খাড়া করতে হবে, যতদূর সম্ভব তিনপক্ষের প্রত্যেকেরই ক্ষতি বাঁচিয়ে যাওয়া যেতে পারে। লোকের ঝোঁক এখন সস্তার দিকে, তাদের সেই ঝোঁককে প্রশ্রয় দিয়ে যাওয়াই হবে যে কোন ব্যবস্থার মূল সূত্র।

নতুন করের জন্যে চিত্রগৃহসমূহের আসনের মূল্য নির্ধারণ করার প্রয়োজনে গত ২৩শে মার্চ বি এম পি-তে প্রদর্শকদের এক সাধারণ সভা হয়। শোনা গেলো যে, এই তালে আসনের দামও বাড়িয়ে নেওয়া হোক এবং আসনের দাম না বাড়িয়ে শুধু বর্ধিত করটুকু মাত্র এখনকার দামের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হোক, এই বিতর্ক নিয়ে দু-দলের মধ্যে হট্টগোলের সৃষ্টি হয় এবং কোন মীমাংসা না হয়েই সভা ভেঙে যায়। আরও শোনা গেল যে, মধ্য-কলকাতার হিন্দী চিত্রগৃহগুলি সকলেই টিকিটের দাম বাড়িয়ে দেওয়াই স্থির করেছে এবং ইংরেজি চিত্রগৃহগুলি ঠিক করেছে কেবলমাত্র করটুকু বাড়িয়ে দেওয়ার। আগেই আমরা বলেছি যে দাম বাড়িয়ে লোকের ক্রয়-ক্ষমতাকে সংকুচিত করে দেওয়া কোন পক্ষের পক্ষেই লাভজনক হতে পারে বলে মনে হয় না। ও পথ না ধরেও কিভাবে সামঞ্জস্য আনা যায়, তা ভেবে বের করতেই হবে। কি করে তা সম্ভব হতে পারে একটা হিসেব করে দেখা যাক। ধরলুম একটা ৭০০ আসনওয়ালা চিত্র-গৃহের কথা। এই ধরণের চিত্রগৃহগুলির গড়পড়তায় আসন ব্যবস্থা ও আয়ের পরিমাণ ১লা এপ্রিলের আগে ছিলো কতকটা এইরকম:

| শ্রেণী | আসন সংখ্যা | নীট বিক্রয় | কর |
|---|---|---|---|
| ।৵০ | ৭৫ | ২৩।৶০ | ৪॥৶০ |
| ॥৵০ | ১৭৫ | ৮৭॥০ | ২১৸৵০ |
| ১৲ | ২০০ | ১৬২॥০ | ৩৭॥০ |
| ১।৵০ | ১২৫ | ১৪০॥৵০ | ৩১।০ |
| ১৸০ | ৭০ | ১০০॥৵০ | ২১৸৵০ |
| ২।৶০ | ৪০ | ৮৭॥০ | ২০৲ |
| ৩।০ | ১৫ | ৪১।০ | ১১।০ |
| মোট | ৭০০ | ৬৪৩।৶০ | ১৪৮।৶০ |

এটা হচ্ছে পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ একটিমাত্র প্রদর্শনীর আমদানী। সাধারণভবে প্রতি চিত্র-গৃহের আসনের মর্যাদা ধরা আছে উচ্চশ্রেণী ও নিম্নশ্রেণী বলে। উচ্চশ্রেণী বলতে বোঝায় বেশী দামের বড়লোকদের আসনকে—ওপরের ছকে ধরতে নীচের তিনটি শ্রেণীকে যার প্রদর্শনী পিছু আমদানী ক্ষমতা হচ্ছে ২২৯।৵০ অর্থাৎ মোট আমদানীর এক-তৃতীয়াংশের একটু বেশী। আর নিম্নশ্রেণী বলতে বোঝায় উচ্চ-মধ্যবিত্ত থেকে গরীব লোকদের আসনগুলোকে—ওপরের ছকে প্রথম চারটে শ্রেণী, যার প্রদর্শনী পিছু আমদানী ৪১৪/০ আনা। দেখা যাচ্ছে এবং সেইটেই সত্য যে, চিরকালই সিনেমাকে পৃষ্ঠ-পোষকতায় বাঁচিয়ে রেখে দিয়েছে ঐ চার শ্রেণীর দর্শকসমষ্টি। যে কোন ছবির চলার একটা গড়পড়তা হিসেব ধরলে এ কথাটা আরও স্পষ্ট সত্য হয়ে ধরা পড়ে।

ছবি প্রথম আরম্ভ হলে ওপরের শ্রেণী ও নীচের শ্রেণী সমান দর্শক আকর্ষণ করে, কিন্তু দিন যতো যায়, দর্শক ততই কমতে থাকে ওপরের শ্রেণী থেকেই এবং ছবির দীর্ঘ চলা নির্ভর করে নীচের শ্রেণীতে দর্শক আসার স্থিরতার ওপরে। এই মত ধরে ওপরের মতো একটা চিত্রগৃহে একখানা ছবির ছ-সপ্তাহ চলার গড়পড়তা হিসেব দেখা যাবে:—

| সপ্তাহ | নিম্ন শ্রেণী | উচ্চ শ্রেণী | মোট |
|---|---|---|---|
| ১ম | ৪১৪/০ | ২২৯।৵০ | ৬৪৩।৶০ |
| ২য় | ৪১৪/০ | ২০০৲ | ৬১৪/০ |
| ৩য় | ৪১৪/০ | ১৫০৲ | ৫৬৪/০ |
| ৪র্থ | ৩৭৫৲ | ১০০৲ | ৪৭৫৲ |
| ৫ম | ৩২৫৲ | ৭৫৲ | ৪০০৲ |
| ৬ষ্ঠ | ২৭৫৲ | ৫০৲ | ৩২৫৲ |
| মোট | ২১১৭৶০ | ৮০৪।৵০ | ৩০২১॥/০ |

মাঝারি ধরণের ছবি থেকে গোটা পাঁচেক চিত্রগৃহের গড়পড়তা আমদানী দেখে ঐ রকমই একটা হিসেব পাওয়া যায়। এতে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে উঁচুশ্রেণীর চেয়ে নিম্নশ্রেণীর দর্শকরা পৃষ্ঠপোষণা করছে তিনগুণ বেশী। এখন দেখা যাক কর বৃদ্ধির জন্যে আসনের মূল্য বাড়িয়ে দেবার যে প্রস্তাব হয়েছে, তাতে ফল কি দাঁড়ায়। হিসেবের সুবিধের জন্যে আমরা ওপরের ঐ একই চিত্রগৃহকেই টানছি। দর বাড়াবার যারা পক্ষে, তাঁরা চাইছেন সর্বনিম্ন মূল্য দশ আনাতে পরিণত করতে। তাতে দেখা যায়:—

| শ্রেণী | আসন সংখ্যা | নীট বিক্রয় | কর |
|---|---|---|---|
| ॥৵০ | ১৭৫ | ৮৭॥০ | ২১৸৵০ |
| ৸৶০ | ২০০ | ১৫০৲ | ৩৭॥০ |
| ১।০ | ১৭৫ | ১৭৫৲ | ৪৩৸০ |
| ২।০ | ৭৫ | ১১২॥০ | ৫৬।০ |
| ৩৲ | ৫০ | ১০০৲ | ৫০৲ |
| ৪॥০ | ২৫ | ৭৫৲ | ৩৭॥০ |
| মোট | ৭০০ | ৭০০৲ | ২৭৬৸০ |

এই বর্ধিত মূল্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে, পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ প্রদর্শনী থেকে ১লা এপ্রিলের আগের তুলনায় চিত্রগৃহের লাভ হচ্ছে ৫৬॥/০ আনা, আর প্রমোদ-কর বাড়ছে ১২৮/০ আনা। এ পর্যন্ত হিসেব ভালোই। কিন্তু অসুবিধেতে পড়ছে পৃষ্ঠপোষকরা। প্রথমত, ছআনাতে যে দরিদ্র ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণী আগেতে মাসে চারখানা ছবি দেখার হিসেব ধরে রেখেছিল, ওপরের ব্যবস্থায় টিকিটের সর্বনিম্ন মূল্য দশ আনা হয়ে যওয়ায় তাকে তার প্রমোদ-বাজেট মতো চলতে গেলে দুখানার বেশী ছবিতে মাসে তার যাওয়া হয় না। এর জন্যে তার অবশ্য চার আনা বাঁচতে পারছে, কিন্তু তার ঐ বাঁচানো হয়ে দাঁড়াচ্ছে চলচ্চিত্র শিল্পের

লোকসান। গভর্নমেণ্ট অবশ্য ঐ দুটো প্রদর্শনী থেকেই ওর কাছ থেকে আগের বরাদ্দ চার আনাই তুলে নিতে পারছে।

দশ আনার আসনের যারা খরিদ্দার ছিলো নতুন ব্যবস্থায়ও তারা ঐ দামের আসনই পাবার চেষ্টা করবে। কিন্তু ছআনা তুলে দেওয়ায় আগের তুলনায় ঐ আসনের খরিদ্দার বেড়ে যাওয়ায় এবং ঐ মত আসন বৃদ্ধি না পাওয়ায় তাকে যদি বাধ্য হয়ে ওরই ওপরের শ্রেণীতে অর্থাৎ পনেরো আনার টিকিটে যেতে হয় তাহলে খরচের বাজেট মতো চলতে তার পক্ষেও এখন মাসে দুখানার বেশী ছবি দেখা সম্ভব নয়। তাতে তার দশ আনা বাঁচতে পারচে যেটা আবার শিল্পের কাছে দাঁড়াচ্ছে লোকসান হয়ে। গভর্নমেণ্টেরও এই খরিদ্দার বাবদ মাসে দুআনা লোকসান হয়ে যাচ্ছে।

যে লোক আগে তেরো আনার খরিদ্দার ছিলো, এখন তার প্রথম ঝোঁক হবে দশ আনার দিকে, যেহেতু সে ক্ষেত্রে সে মাসে বারো আনা করে বাঁচাতে পারবে। আর সেক্ষেত্রে সাফল্য-লাভ না করতে পারলে চেষ্টা করবে পনেরো আনার আসন পেতে এবং মাসে একবার ছবি দেখা কমিয়ে সাত আনা বাঁচিয়ে যাবে, শিল্পের ক্ষতি হলেও। আর তা নয়তো মাসে দুবার ছবি দেখে বারো আনা বাঁচিয়ে যাবে।

এর পরের শ্রেণী, এক টাকা চার আনার আসনের বেলাতেও ব্যাপার ঐ একই দাঁড়াবে। আয় কমে যাওয়ায় লোকের মনোবৃত্তিই এখন এমনি যে, বরং বারে ছবি দেখা কম করে দেবে তারা তবু সামান্য বেশী খরচও তাদের কাছে অগ্রাহ্য হয়ে যাবে। ফল তাতে এই হচ্ছে যে, সরকারী আয় অন্তত আগের মতো থাকবেই, কিন্তু লোকসান খাচ্ছে চিত্রশিল্প ও ব্যবসা। মোট লোকসানের সম্ভাবনা কিন্তু আরও বেশী। তার কারণ আগেতে এক টাকা ছআনা পর্যন্ত ধার্য নিম্নশ্রেণীর প্রদর্শনী পিছু মোট আমদানী ছিল ৪১৪/০, এখন তা হচ্ছে ৪১২॥০ আনা। আসনের সংখ্যাও যেভাবেই গুছিয়ে দেওয়া হোক না কেন আগের চেয়ে নিম্নশ্রেণীতে আয় কিছু কমতে বাধ্য। এখনকার হিসেবে লোকের মনস্তত্ত্ব ও ঝোঁক বিবেচনায় ধরলে একখানা মাঝারি ছবির ছ-সপ্তাহের হিসেব একটি প্রদর্শনীতে কতকটা দাঁড়ায় এইরকমঃ—

| সপ্তাহ | নিম্নশ্রেণী | উচ্চশ্রেণী | মোট আয় |
|---|---|---|---|
| ১ম | ৪১২॥০ | ২৮৭॥০ | ৭০০, |
| ২য় | ৪১২॥০ | ২৫০, | ৬৬২॥০ |
| ৩য় | ৩৭৫, | ২০০, | ৫৭৫, |
| ৪র্থ | ৩২৫, | ১৫০, | ৪৭৫, |
| ৫ম | ২৭৫, | ৭৫, | ৩৫০, |
| ৬ষ্ঠ | ২০০, | ৫০, | ২৫০, |
| | ২০০০, | ১০১২॥০ | ৩০১২॥০ |

এ হিসেবে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে, আগের চেয়ে আসনের দাম বাড়ানো সত্ত্বেও আয় যথেষ্ট কমে গিয়েছে উঁচু আসনের বিক্রী বেশী করে ধরেও। কেন কমলো তা আগেই বলা হয়েছে—বেশীদামের দিকে লোকের ঝোঁক না থাকা সত্ত্বেও উচ্চশ্রেণীর আসনের মাত্রা বাড়ানোর জন্যে এবং নীচু শ্রেণীতেও দাম বাড়াতে দর্শক কম আকর্ষিত হওয়ার জন্যে।

হাস্যকর মনে হলেও এ সংকট থেকে উদ্ধার পাবার একমাত্র উপায় যা হিসেবে দাঁড়াতে পারে তা হচ্ছে লোকের বর্তমান ঝোঁক অনুযায়ী আসনের দাম আগের চেয়ে বরং কম করে দেওয়ার মধ্যে। এর জন্যে প্রদর্শকদের ভুয়ো মর্যাদা খানিকটা ত্যাগ করতেই হবে। তা যদি তারা পারেন তো নীচের হিসেবে আগে যে তিন পক্ষের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাদের সবাইকেই তুষ্ট করা যায়। ঐ ৭০০ আসনওয়ালা চিত্র-গৃহটিকেই ধরা যাক্—

| শ্রেণী | আসন সংখ্যা | নীট বিক্রয় | কর |
|---|---|---|---|
| ।/০ | ৫০ | ১২॥০ | ৩৸০ |
| ॥৵০ | ২০০ | ১০০, | ২৫, |
| ৸৶০ | ১৭৫ | ১৩১।০ | ৩২৸/০ |
| ১।০ | ১৭৫ | ১৭৫, | ৪৩॥ |
| ২।০ | ৫০ | ৭৫, | ৬২[illegible] |
| ৩ | ৩৫ | ৭০, | ৩৫, |
| ৪॥০ | ১৫ | ৪৫, | ২২॥০ |
| | ৭০০ | ৬০৮৸০ | ২২৫/০ |

আপাতদৃষ্টিতে এ হিসেবে দেখা যাচ্ছে যে ১লা এপ্রিলের আগে চিত্রগৃহের যে আয় ছিলো তা সামান্য কম হয়ে গিয়েছে, তাতে প্রদর্শকদের আপত্তি উঠতে পারে এবং সে আপত্তি অন্যায়ও নয়। কিন্তু এতে একটা বিষয় প্রণিধান করবার হচ্ছে এই যে এ ব্যবস্থায় নিম্ন শ্রেণীর আসন দেওয়া হয়েছে বাড়িয়ে, কাজেই টাকা আমদানীর বেশি ঝুঁকি পড়ছে নিম্ন শ্রেণীর আসন বিক্রীর ওপরে। চিত্রব্যবসায়ে যারা লিপ্ত আছেন তারা একথা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে উঁচু শ্রেণীর চেয়ে নীচু শ্রেণীর বিক্রী পরিমাণে বেশি সব সময়েই হয়। শুধু তাই নয়, দেশের আর্থিক অবস্থা অনুসারে নীচু দামের টিকিটের চাহিদা অনেক বেশি এবং তার বিক্রীও অনেক বেশী নিশ্চিত। তা ছাড়া গরীব হোক, মধ্যবিত্ত হোক আর ছোটখাটো বড়লোকই হোক সকলেরই আজ দৃষ্টি কম দামের দিকে। সে দিক থেকে বেশি দামের টিকিট সংখ্যায় কম হওয়ায় উঁচু শ্রেণীর দর্শকরাও কম দামের টিকিট কেনার দিকে ঝুঁকতে বাধ্য হবে। সুতরাং তাদের মধ্যে আগেতে যার ছবি দেখার জন্যে মাসে বরাদ্দ ছিলো উঁচু শ্রেণীর হিসেবে সাত টাকা থেকে চোদ্দ টাকা তারা ঐ বরাদ্দ বজায় রাখতে বাধ্য হয়ে নীচু দামের টিকিটে আসছে এবং সংখ্যায় বেশিবার ছবি দেখার সুযোগ পাচ্ছে তাতে। তা ছাড়া সর্বনিম্ন মূল্যও কমে যাওয়ায় নীচু শ্রেণীর দর্শকরা আগের চেয়ে খুব নামমাত্র বেশি খরচ করে বেশিবার ছবি দেখার একটা প্রলোভনের মধ্যে পড়ছে। তাতে গরীব ও মধ্য-বিত্তদের [illegible] দর্শক সংখ্যা বেড়ে যাওয়া হবে স্বাভাবিক। এইকথা মনে রেখে আগের মতো ছ সপ্তাহের হিসেব নিলে দেখা যাচ্ছেঃ—

| সপ্তাহ | নিম্ন শ্রেণী | উচ্চ শ্রেণী | মোট |
|---|---|---|---|
| ১ম | ৪১৮৸০ | ১৯০, | ৬০৮৸০ |
| ২য় | ৪১৮৸০ | ১৭৫, | ৬৯৩[illegible] |
| ৩য় | ৪০০, | ১৫০, | ৫৫০, |
| ৪র্থ | ৩৭৫, | ১২৫, | ৫০০, |
| ৫ম | ৩৫০, | ১০০, | ৪৫০, |
| ৬ষ্ঠ | ৩২৫, | ৭৫, | ৪০০, |
| মোট | ২২৮৭॥০ | ৮১৫, | ৩১০২॥০ |

ওপরের ঐ হিসেব থেকে ১লা এপ্রিলের চেয়ে চিত্রশিল্প ও ব্যবসা, গভর্নমেণ্ট উভয়েরই লাভ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা গিয়েছে। সেই-সংগে জনসাধারণের সাশ্রয়েরও সুযোগ দেওয়া হয়েছে। হিসেবটা অকাট্য বলে কেউ যেন না মনে করেন। তবে একথা বলা যায় যে, আর্থিক অবস্থার গতি বিবেচনায় ঐ রকম কম দামের আসনের দিকে ঝোঁক দেওয়া হবে সর্বদিকের পক্ষে সন্তোষজনক। তাড়াহুড়ো করে টিকিটের যা তা একটা মূল্য বেঁধে না দিলে চিত্র-ব্যবসায়ীরা সবদিক বিবেচনা করে যেনো দেখেন।

### চিত্রশিল্পের ওপর আরও ট্যাক্স

প্রমোদ-কর ছাড়াও চিত্রশিল্পের ওপর আরও অনেক দিকেই অনেক রকম ট্যাক্স আছে এবং সবরকম ট্যাক্সই সবাই বাড়িয়ে দিচ্ছে। সিনেমার জন্যে লাইসেন্স নিতে আগে যে জায়গায় বছরে দুশো টাকা ছিলো এখন তা দাঁড়িয়েছে প্রায় ন'শো টাকায়। এখন আবার শোনা যাচ্ছে যে মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স এবার থেকে চিত্রগৃহের আসনের সংখ্যা হিসেবে ধার্য হবে এবং তার হার হবে আসন পিছু তিন টাকা প্রতি কোয়ার্টারে।

### ফিল্ম ডিভিসনের ছবি

গত ২৬শে মার্চ কেন্দ্রীয় পরিষদে মন্ত্রী মিঃ আর আর দিবাকর জানিয়ে দিয়েছেন যে আগামী মে মাস থেকে ভারতের চিত্রগৃহগুলিতে ফিল্ম ডিভিসনের তোলা সংবাদ-চিত্র ও নথি-চিত্র দেখানোর বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা প্রবর্তন হবে। সংবাদটি চিত্রামোদীদের আনন্দ দেবে—এ ব্যবস্থায় জনশিক্ষা ব্যাপারেও আমরা এক ধাপ এগিয়ে যেতে পারবো। কিন্তু দেখাবার জন্যে চিত্রগৃহগুলির কাছ থেকে যে হারে ভাড়া আদায় করা হবে বলে শোনা যাচ্ছে সে খবরটি সত্যি হলে চিত্রগৃহের ওপর আর এক প্রচণ্ড আঘাত আসছে বলতে হবে। শোনা যাচ্ছে যে, ভাড়ার হার হবে—সাপ্তাহিক বারো হাজার টাকা বা তদূর্ধ্ব যে চিত্রগৃহের আমদানী তার জন্যে সপ্তাহে ১৫০, টাকা; এ থেকে বারো হাজার পর্যন্ত সপ্তাহে ১১০, টাকা; ছয় থেকে ন হজার ৯০, টাকা এবং তার নীচে ৬০, টাকা। চিত্র-ব্যবসায়ীদের পক্ষে এটাও একটা শঙ্কিত হবার মতো খবর।

## ক্রিকেট

—বোম্বাই ক্রিকেট দল পঞ্চমবার আন্তঃপ্রাদেশিক রনজি ক্রিকেট কাপ বিজয়ীর সম্মান লাভ করিল। বোম্বাই দলের এই সাফল্য প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই, তবে অপ্রত্যাশিত নহে। প্রতিযোগিতার প্রথম হইতেই বোম্বাই দল ব্যাটিং, বোলিং সর্ব বিষয়েই অপূর্ব নৈপুণ্য প্রদর্শন করে। বিশেষ করিয়া বোম্বাই দল সেমি-ফাইন্যাল খেলায় যেভাবে মহারাষ্ট্র দলকে পরাজিত করে, তাহার পর কেহই আশা করে নাই যে, ফাইন্যালে বরোদা দল বোম্বাই দলকে পরাজিত করিতে পারিবে। সেইজন্য ফাইন্যাল খেলায় বোম্বাই দল ৪৬৮ রানে বরোদা দলকে পরাজিত করিলে কেহই বিস্ময় প্রকাশ করে নাই। তবে সকলেই বরোদা দলের দৃঢ়তাপূর্ণ খেলারও প্রশংসা করিয়াছে।

ফাইন্যাল খেলার মীমাংসাও পূর্বের সেমি-ফাইন্যালের ন্যায় সপ্তম দিনে হয়। পর পর ২টি খেলায় বোম্বাইয়ের খেলোয়াড়দের সাত দিন ধরিয়া খেলিতে হইয়াছে ইহা চিন্তা করিয়া অনেকেই প্রশ্ন করিয়াছেন—"ইহা যুক্তিসংগত হইয়াছে কি?" এই সকল প্রশ্নের জন্য ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি মিঃ এ এস্ ডি'মেলো পুরস্কার বিতরণী উৎসবে ঘোষণা করেন যে, পরিচালকগণ ভবিষ্যতে সেমি-ফাইন্যাল খেলা ও ফাইন্যাল খেলা যথাক্রমে চারি দিনব্যাপী ও পাঁচ দিনব্যাপী করিবার বিষয় চিন্তা করিতেছেন। মিঃ ডি'মেলোর চিন্তা কার্যকরী হইলেই আমরা বিশেষ আনন্দিত হইব। দীর্ঘদিন ধরিয়া খেলার জন্য খেলোয়াড়দের স্বাস্থ্যহানি হওয়া কোনরূপেই বাঞ্ছনীয় নহে। এই প্রসঙ্গে আমরা ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডকে অনুরোধ করিব, তাঁহারা রনজি প্রতিযোগিতা ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যেই শেষ হয়, তাহার জন্য ব্যবস্থা করেন। মার্চ মাসের শেষ পর্যন্ত জের টানায় হকি খেলার যথেষ্ট ক্ষতি করা হয়।

রনজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইন্যাল খেলার ফলাফল নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ—

**বোম্বাইঃ**—প্রথম ইনিংস্—৬২০ রান (কে সি ইব্রাহিম ২১৯ রান, দাল্ভি ১১০ রান, এম কে মন্ত্রী ৭০ রান, ডি ফাদকার ৫০ রান, রামচাঁদ নট আউট ৫৫ রান; সোহনী ১১৭ রানে ৩টি, বিজয় হাজারে ৭৮ রানে ২টি ও অধিকারী ৪৮ রানে ২টি উইকেট পান)

**বরোদাঃ**—প্রথম ইনিংস্—২৬৮ রান (বিজয় হাজারে ৯৮ রান, সোহনী ৬৩ রান, ভিখারী ৫৬ রান; ফাদকার ৪৯ রানে ৬টি, উমরিগর ৫৬ রানে ২টি ও তারাপোর ১০৩ রানে ২টি উইকেট পান)

**বোম্বাইঃ**—দ্বিতীয় ইনিংস্—৩৬১ রান (উদয় মার্চেণ্ট ৭০ রান, উমরিগর ৪৫ রান, ডি ফাদকার ৬৩ রান রামচাঁদ নট আউট ৮০ রান; সোহনী ৮৬ রানে ৫টি, গুলমহম্মদ ৪৮ রানে ৩টি উইকেট পান)

**বরোদাঃ**—দ্বিতীয় ইনিংস—২৪৫ রান (বিজয় হাজারে ১১৫ রান, ভিখারী ৪৬ রান; ফাদকার ৫১ রানে ৩টি, উমরিগর ৩৫ রানে ৪টি উইকেট পান)

## হকি—

বাঙলার হকি খেলার স্ট্যাণ্ডার্ড ক্রমশই যে নিম্নস্তরের হইতেছে ইহা আমরা বহুবার উল্লেখ করিয়াছি, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় বাঙলার হকি পরিচালকগণ এই দিকে কোন দিনই দৃষ্টি দেন নাই। কবে যে দিবেন তাহারও কোন সম্ভাবনা দেখি না। সর্বাপেক্ষা বেদনাদায়ক হইয়া উঠিয়াছে বাঙলার মাঠে অবাঙগালী হকি খেলোয়াড়দের অধিক প্রাধান্য লাভের সুযোগ দেখিয়া। এই বিষয়ও আমরা বিভিন্ন ক্লাবের পরিচালকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। শেষ পর্যন্ত ইহাও বলিয়াছি, যদি বাঙলার ছেলেরা খেলায় উন্নততর নৈপুণ্যের অধিকারী না-ই হইতে পারিল, তবে এই খেলা পরিচালনা করিয়া লাভ কি? মাঠে খেলার ফলাফলের জন্য যদি পরিচালকগণ ব্যস্ত থাকেন, খেলা শিক্ষার ব্যবস্থা না করেন, তবে বাঙলার তরুণ হকি খেলোয়াড়রা কোনদিনই উন্নততর নৈপুণ্যের অধিকারী হইতে পারে না। এই প্রসঙ্গে স্কুল ও কলেজের ছাত্ররা দলে দলে যাহাতে হকি খেলায় যোগদান করে তাহার ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করি। কিন্তু আমাদের সেই সকল কথা পরিচালকদের অন্তরে কোনরূপ রেখাপাত করিতে পারে নাই ইহাই অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। এই সকল লোক কি যে চান এবং কেনই যে পরিচালনার গুরুদায়িত্ব লইয়া বসিয়া আছেন বোঝা কঠিন।

আন্তঃপ্রাদেশিক হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে বাঙলা দল পূর্ব পাঞ্জাবের নিকট ২—০ গোলে পরাজিত হইয়াছে। বাঙলার এই পরাজয় অনেকের আশ্চর্যের কারণ হইলেও আমরা আশ্চর্য হই নাই। আমরা জানি বাঙলার দল নির্বাচন একেবারে শেষ সময়ে করা হইয়াছে। বাঙলার নির্বাচিত খেলোয়াড়-গণ একত্রে খেলিবার একরূপ সুযোগই পান নাই। ভাল খেলোয়াড়ের দল গঠন করিলেই ভাল ফল পাওয়া যায় না। দলের প্রত্যেক খেলোয়াড়ের মধ্যে বোঝাপড়ার উপর দলের সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করে। পূর্ব পাঞ্জাব দলের নির্বাচিত খেলোয়াড়গণ এই বিষয় তাঁহাদের পরিচালকদের নিকট হইতে যথেষ্ট সুযোগ ও সুবিধা লাভ করিয়াছিলেন। ফলে তাঁহারা সহজেই অধিকতর শক্তিশালী বাঙলা দলকে পরাজিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। বাঙলার হকি পরিচালকগণ এই বৎসরের অভিজ্ঞতা স্মরণ রাখিয়া ভবিষ্যতে যদি কার্য করেন আমরা খুবই সুখী হইব।

### কলিকাতা হকি লীগ প্রতিযোগিতা

কলিকাতা হকি লীগ প্রতিযোগিতার প্রথম ডিভিসনের চ্যাম্পিয়ানসিপ লইয়া বর্তমানে দুইটি দলের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে একটি দল হইতেছেন গত বৎসরের চ্যাম্পিয়ান পোর্ট কমিশনার্স দল ও অপরটি পাঞ্জাব স্পোর্টস দল। কে চ্যাম্পিয়ান হইবে পূর্ব হইতে বলা কঠিন। তবে আশা করা যায়, গত বৎসরের চ্যাম্পিয়ান পোর্ট দলই তাহার অর্জিত গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবে। মোহনবাগান দল সম্পর্কে অনেকেই উচ্চ আশা পোষণ করেন, কিন্তু সে ধারণা কখনই ফলবতী হইতে পারে না। দল পরিচালনা বিষয়ে যথেষ্ট ত্রুটিবিচ্যুতি পরিলক্ষিত হইতেছে।

## ভারোত্তোলন—

বঙলার ভারোত্তোলন পরিচালকমণ্ডলী সম্পর্কে আমরা চিরকালই ভাল ধারণা পোষণ করিতাম, কিন্তু সম্প্রতি কতকগুলি ঘটনা লক্ষ্য করিয়া আমাদের আশঙ্কা হইতেছে এই মণ্ডলীর মধ্যেও দলাদলি বেশ ভাল করিয়াই সংক্রামিত হইয়াছে। এশিয়াটিক ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতার রজত জয়ন্তী উৎসব মাত্র কয়েকটি ব্যায়ামবীরের উপর নির্ভর করিয়া অনুষ্ঠিত হওয়ায় আমাদের আরও আশ্চর্য করিয়াছে। পরিচালকগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া কোনরূপ সদুত্তর পাওয়া যায় নাই। বাঙলার খ্যাতনামা ভারোত্তোলনকারীরা কেন যোগদান করিল না? কোথায় তাহারা অসুবিধা অনুভব করিল? কে তাহাদের প্রতিযোগিতায় যোগদান না করিতে প্ররোচিত করিয়াছে, ইহা কেহই স্পষ্ট করিয়া বলিতে নারাজ। ব্যক্তিগত কোন কারণ না থাকিলেও পরিচালনার মধ্যে কোথাও যে গলদ আছে ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। দীর্ঘ ২৫ বৎসর প্রতিযোগিতা পরিচালিত হইবার পরও বাঙলা দেশে শত শত ভারোত্তোলনকারী সৃষ্টি হইল না ইহাই আশ্চর্যের বিষয়। তাহা ছাড়া সারা এশিয়ার ভারোত্তোলনকারীদের যখন কোন বৎসরই পচালক-গণ একত্রিত করিতে পারেন নাই তখন "এশিয়াটিক" কথাটি তুলিয়া দিলেই বোধ হয় ভাল হইবে। "এশিয়াটিক" প্রতিযোগিতার নাম হইবে আর এশিয়ার বিভিন্ন দেশের প্রতিযোগিগণ যোগদান করা দূরের কথা, সারা ভারতের, এমন কি সারা বাঙলার অধিকাংশ ভারোত্তোলনকারী যোগদান করিবেন না ইহা সত্যই লজ্জার বিষয়। আমরা পরি-চালকদের অনুরোধ করিব যদি তাঁহারা ঠিকমত ব্যবস্থা না করিতে পারেন, তবে যেন প্রতিযোগিতার নাম পরিবর্তন করেন।

## সন্তরণ—

বাঙলার সন্তরণ মরশুম শীঘ্রই আরম্ভ হইবে। বাঙলার সন্তরণ পরিচালকমণ্ডলী সাধারণ সভার অনুষ্ঠানের পর হইতে এই পর্যন্ত যে কি করিতেছেন বোধহয় এই বৎসরেও তাহা আমাদের জানিবার সৌভাগ্য হইল না। দীর্ঘ সাত আট বৎসর ধরিয়া তাঁহারা যে নীতি অনুসরণ করিতেছেন তাহারই বোধহয় এই বৎসরেও পুনরাবৃত্তি হইবে। যদি হয় আমরা পরিচালকদের অনুরোধ করিব তাঁহারা যেন গুরুদায়িত্ব হইতে অবসর গ্রহণ করেন। বাঙলা সন্তরণে ভারতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থানের অধিকারী ছিল সে তাহা হারাইয়াছে এবং তাহার জন্য দায়ী বাঙলার পরিচালকগণ। দেশের মান সম্মান লইয়া ছিনি-মিনি করিবার তাঁহাদের অধিকার নাই। বৈদেশিক শাসনাধীনে যতদিন দেশ ছিল ততদিন সাধারণ ক্রীড়ামোদিগণ ইহার যথোপযুক্ত প্রতিবাদ করিতে পারে নাই, কিন্তু স্বাধীন দেশে ইহা আর চলিতে পারে না।

বাঙলার সন্তরণের ভবিষ্যৎ সকল সময়েই কলিকাতার বিশিষ্ট সন্তরণ ক্লাব সমূহের উপর নির্ভর করে। এই সকল ক্লাবের পরিচালকগণ যদি ঠিক মত শিক্ষার ব্যবস্থা করেন তাহা হইলেও কিছুটা অবস্থার পরিবর্তন দেখা যায়। কিন্তু ইহারাও ঠিকভাবে ক্লাব পরিচালনা করেন না। সকল সময়েই বাঙলার পরিচালকমণ্ডলীর নির্দেশের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকেন। পরিচালকমণ্ডলীর মধ্যে যে অন্তর্কলহ বর্তমান আছে তাহাতেও অংশ গ্রহণ করেন। ফলে উৎসাহী সাঁতারুগণ সকল কিছু সাহায্য ও সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত থাকিয়া নিজ নিজ প্রচেষ্টায় অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। এই সকল সাঁতারু এতদিন সব-কিছু সহ্য করিয়াছেন। কিন্তু আর করিবেন বলিয়া মনে হয় না।

## দেশী সংবাদ

**২১শে মার্চ**—ভারত সরকারের আগামী বৎসরের অর্থনৈতিক পরিকল্পনাসমূহ কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে রচিত ফাইন্যান্স বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণের জন্য অর্থসচিব কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাব লইয়া অদ্য ভারতীয় পার্লামেণ্টে আলোচনা হয়। শ্রী টি প্রকাশম্ বিতর্কের উদ্বোধন করিয়া বক্তৃতা প্রসঙ্গে কম্যুনিস্ট উপদ্রব প্রতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে দেশের বিভিন্ন অংশে বাধ্যতামূলক সৈনিক বৃত্তি গ্রহণের ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য গভর্নমেণ্টকে অনুরোধ জানান।

পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে শিক্ষামন্ত্রী রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী প্রদেশের মধ্যে অন্য ভাষাভাষী সংখ্যালঘু ছাত্রদের শিক্ষার মাধ্যম সংক্রান্ত প্রশ্ন সম্পর্কে বলেন যে, স্কুলের শিক্ষায় কোন স্কুলে অন্য ভাষাভাষী বালক বালিকাদের সংখ্যা যথাযোগ্য হইলে নিজস্ব মাতৃভাষাতেই শিক্ষালাভের সুযোগ তাহাদিগকে দিতে হইবে; তবে মাধ্যমিক শিক্ষার পর্যায়ে তাহারা যে প্রদেশে বাস করে সেই প্রদেশের ভাষাও শিক্ষা করিবে।

**২২শে মার্চ**—এডমিরাল নিমিৎসকে কাশ্মীরের গণভোট পরিচালক নিযুক্ত করা হইয়াছে। অদ্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের কাশ্মীর কমিশন কর্তৃক প্রচারিত এক ইস্তাহারে ইহা ঘোষণা করা হইয়াছে। ভারত ও পাকিস্থান উভয়েই এডমিরাল নিমিৎসের মনোনয়ন অনুমোদন করিয়াছেন।

ভারতে আগত রয়টার শুভেচ্ছা কমিশনের নেতা লেটন, রয়টারের জেনারেল ম্যানেজার মিঃ সি চ্যান্সেলার এবং মিশনের অন্যান্য সদস্যগণ অদ্য ী হইতে বিমানযোগে কলিকাতায় পৌঁছেন।

কয়েকদিন পূর্বে পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে স্থ মুসলমান সদস্য মিঃ আবুল হাসিম পশ্চিম-র বিচার বিভাগীয় মন্ত্রী শ্রীযুত নীহারেন্দু মজুমদারের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ উত্থাপন াছিলেন, অদ্য পরিষদের অধিবেশনে বিচার- শ্রীযুত দত্ত মজুমদার সেই সব অভিযোগ করিয়া এক বিবৃতি দেন।

**২৩শে মার্চ**—গভর্নমেণ্টকে অত্যাবশ্যক দ্রব্যের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ১৯৫০ সালের ৩১শে মার্চ ্য আরও এক বৎসর বলবৎ রাখার ক্ষমতা দিয়া ভারতীয় পার্লামেণ্টে একটি বিল গৃহীত ছ। শিল্প ও সরবরাহ সচিব ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ র্জি উক্ত বিল উত্থাপন করেন। নিয়ন্ত্রিত ল হইতেছে খাদ্যদ্রব্য, সূতি ও পশম বস্ত্র, পেট্রল, লোহা, ইস্পাত, অভ্র এবং লত যানের টুকরা অংশসমূহ।

ারতীয় পার্লামেণ্টে প্রশ্নোত্তরকালে প্রধান পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বলেন যে, চলতি বৎসরে আণবিক শক্তির গবেষণা কার্যে প্রায় টাকা ব্যয় হইবে।

জ কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান ভবনে রশনের পরিচালন কর্তা শ্রীযুত এস এন এক সাংবাদিক সম্মেলনে কর্পোরেশনের র যে বিবরণ দেন, তাহাতে দেখা যায় যে, ৫০ সালে কর্পোরেশনের সোয়া সাত লক্ষ টতি হইবে।

শে মার্চ—বিহার ব্যবস্থা পরিষদে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া শ্রীযুত শ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে, মানভূমে বাঙালীদের অবস্থার সুযোগ লইয়া রাজনৈতিক কারণে প্রতিহিংসার বশবর্তী হইয়া হিন্দী ভাষা প্রচলন করা হইতেছে। এই জেলায় বাঙলা ভাষাভাষী অধিবাসী-দিগকে নির্যাতন করিবার উদ্দেশ্যে একদল অফিসার পাঠানো হইয়াছে। শ্রীযুত মুরলী মনোহর প্রসাদ পরিষদে বলিয়া উঠেন, বিহারের সংহতি নষ্ট করিবার জন্য মানভূমে যাহারা আন্দোলন করিতেছে, যে-কোন গভর্নমেণ্ট তাহাদিগকে কামানের গোলায় উড়াইয়া দিত।

পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে সাধারণ শাসনকার্য পরিচালনা খাতের বিতর্কের উত্তরে প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সরকার-বিরোধী পক্ষের সদস্যগণকে সেরূপ সাহস থাকিলে বর্তমান মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করিবার চ্যালেঞ্জ জানান। পরিষদে সাধারণ শাসন-কার্য পরিচালনা খাতে ২,১১,১৮,০০০৲ টাকা ব্যয় বরাদ্দের দাবী মঞ্জুর হয়।

*আনন্দবাজার পত্রিকা ও হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডের পক্ষ হইতে অদ্য রয়টারের শুভেচ্ছা মিশনকে কলিকাতা ফারপো রেস্তোরাঁয় এক চায়ের মজলিসে সম্বর্ধনা করা হয়।*

**২৫শে মার্চ**—ভারতীয় পার্লামেণ্টে রাজস্ব বিল সম্পর্কে সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট পেশ করা হইয়াছে। নূতন বৎসরের জন্য ভারত সরকার যে কর ধার্যের প্রস্তাব করিয়াছেন, উহাতে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করা হইয়াছে। প্রত্যেক হিন্দু একান্নভুক্ত পরিবারের ক্ষেত্রে তিন হাজার টাকার উপর আয়কর ধার্য না করিয়া সাড়ে তিন হাজার টাকার উপর আয়কর ধার্য করিতে কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন। দেড় লক্ষ টাকার ঊর্ধ্বে আয়ের উপর সুপার ট্যাক্সের হার কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কমিটি ডাক মাশুলের হার বৃদ্ধি অনুমোদন করিয়াছেন।

প্রকাশ পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেণ্ট পূর্ববঙ্গের দুই লক্ষ উদ্বাস্তু পরিবারের দশ লক্ষ লোকের পুনর্বসতির জন্য একটি অস্থায়ী পরিকল্পনা করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করার নিমিত্ত ২৪ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে।

ভারতীয় পার্লামেণ্টে প্রশ্নোত্তরের সময় খাদ্য সচিব শ্রীযুত জয়রামদাস দৌলতরাম ঘোষণা করেন যে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ৬১৮টি শহরে খাদ্যশস্য সম্পর্কে পুনরায় নিয়ন্ত্রণাদেশ বলবৎ করা হইয়াছে।

২৬শে মার্চ—আজ সকালে দক্ষিণ কলিকাতায় লেক বাজারের বিপরীত দিকে হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ-এর শাখা অফিসে এক সশস্ত্র ডাকাতি হয় এবং দুর্বৃত্তরা উক্ত ব্যাঙ্ক হইতে নগদ ও অলঙ্কারে প্রায় ৬০ হাজার টাকা লইয়া উধাও হয়।

খাদ্যদ্রব্যের মূল্য ক্রমশঃ হ্রাস করিয়া যুক্তিসম্মত মূল্য ধার্য করিবার জন্য ভারত গভর্নমেণ্ট যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তদনুযায়ী বিভিন্ন স্থানে রবি-শস্যের কিরূপ মূল্য ধার্য করা যায়, সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য নয়াদিল্লীতে খাদ্য দপ্তরে দুই দিনব্যাপী এক সম্মেলন হইয়া গিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে সাত-জন স্বতন্ত্র মুসলমান সদস্য লইয়া পরিষদে "পার্লামেণ্টারী বিরোধী দল" নামে একটি বিরোধী দল গঠনের কথা ঘোষিত হয়।

ভারতীয় পার্লামেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত সিলেক্ট কমিটি ছেলেদের বিবাহযোগ্য বয়স ১৮ হইতে ২০ বৎসর এবং মেয়েদের বিবাহযোগ্য বয়স ১৪ হইতে ১৫ বৎসর পর্যন্ত বাড়াইবার প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছেন।

২৭শে মার্চ—কলিকাতায় নব্য ভারতের রূপ-শিল্পের পথিকৃৎ শিল্পগুরু শ্রীযুত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জয়ন্তী দিবস উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে প্রাতঃকালে বহু শিল্পী, সাহিত্যিক এবং নাগরিক শ্রীযুত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বরাহনগরস্থ বাসভবন "গুপ্ত নিবাসে" সমবেত হন এবং তাঁহার প্রতিভাদীপ্ত কর্মময় জীবনের উদ্দেশে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেন।

অদ্য ব্যারাকপুর হইতে ২ মাইল দূরবর্তী পলতায় এক বিমান দুর্ঘটনার ফলে মেজর জেনারেল জে এন চৌধুরীর ভ্রাতা উইং কম্যাণ্ডার শ্রীযুত হেম চৌধুরী এবং ইউনাইটেড স্টেটসের কলিকাতাস্থ ভাইস-কন্সাল মিঃ ডবলিউ টমাসন মারা যান।

## বিদেশী সংবাদ

**২১শে মার্চ**—জাতীয়তাবাদী চীনের দুইটি সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক প্রতিষ্ঠান অদ্য প্রধান মন্ত্রী জেনারেল হো ইং চিং-এর নূতন মন্ত্রিসভা অনুমোদন করিয়াছেন।

**২৩শে মার্চ**—ইসরাইল এবং লেবাননের মধ্যে এক যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। এই চুক্তি অনুযায়ী উভয় রাষ্ট্রের সীমানা স্থির হইয়াছে। চুক্তি অনুসারে লেবাননের ১৪টি গ্রাম হইতে ইসরাইল তাহার সৈন্য দশ দিনের মধ্যে সরাইয়া লইবে।

লেকসাকসেসে নিরাপত্তা পরিষদে ইন্দোনেশিয়া সম্পর্কে কানাডার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। উক্ত প্রস্তাবে নিরাপত্তা পরিষদকে অনুরোধ করা হইয়াছে যে, পরিষদ যেন ইন্দোনেশিয়ান কমিশনকে নিম্নের দুইটি বিষয়ে ওলন্দাজ ও ইন্দোনেশিয়ান প্রজাতন্ত্রিগণ যাহাতে একমত হইতে পারেন তজ্জন্য চেষ্টা করিতে নির্দেশ দেন—(১) যোগাকর্তায় প্রজাতন্ত্রী গভর্নমেণ্টের পুনঃ প্রতিষ্ঠা ও (২) একটি স্বাধীন ইন্দোনেশিয়ান যুক্তরাষ্ট্র গঠনের উদ্দেশ্যে হেগে একটি গোলটেবিল বৈঠকের ব্যবস্থা।

**২৪শে মার্চ**—ব্রহ্মের সরকারী সৈন্যরা মান্দালয়ের ৯০ মাইল দক্ষিণে আর্মি হেড কোয়াটার্স মিটকিলা পুনরায় দখল করিয়াছে।

**২৫শে মার্চ**—মস্কো বেতারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, সোভিয়েট সশস্ত্র সৈন্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব মার্শাল বুলগানিনকে অপসারিত করা হইয়াছে। মার্শাল ভেসিলিভস্কি তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছেন।

২৬শে মার্চ—চীনের কম্যুনিস্ট বেতারে বলা হইয়াছে যে, ১লা এপ্রিল তারিখে পিপিং-এ শান্তি বৈঠকে যোগদানের জন্য পাঁচজন সদস্য লইয়া এক প্রতিনিধি দল গঠিত হইয়াছে। পররাষ্ট্র বিশেষজ্ঞ চু এন লাই কম্যুনিস্ট প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করিবেন।

প্রতি সংখ্যা—চারি আনা    বার্ষিক মূল্য—১৩৲    ষাণ্মাসিক—৬৷৷০
**স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক ঃ—আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ স্ট্রীট, কলিকাতা।**
**শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।**

সম্পাদক ঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন
সহ সম্পাদক ঃ শ্রীসাগরময় ঘোষ

> "আজ দেশই আমাদের একমাত্র আরাধ্য দেবতা। তাঁর পূজার নৈবেদ্য সকলকেই সাজিয়ে আনতে হবে। কারও দুধ চেয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকলে রাজার পুকুরে দুধ ঢালাবার মত দুধ আর এসে পৌঁছবে না,—আসবে শুধু জল। তাই আজ মনের ভক্তি ও দেহের শক্তি দিয়ে মায়ের সিংহাসন সাজিয়ে দিতে হবে। এ পূজায় সবারই সমান অধিকার। সকলকেই এ পূজার উপকরণ জোগাড় করে আনতে হবে। হিন্দু-মুসলমান হৃদয়ে হৃদয়ে মিলিয়ে সত্যধর্মকে প্রতিষ্ঠা করবে।"
>
> —আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়
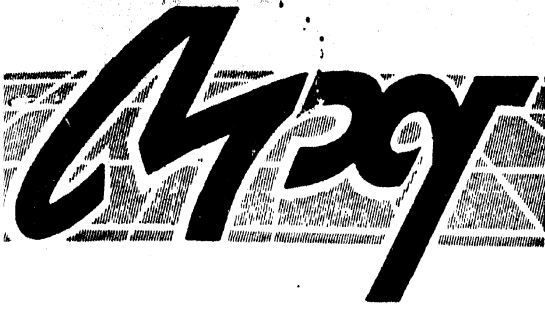
ষোড়শ বর্ষ ] শনিবার, ২৬শে চৈত্র, ১৩৫৫ সাল। Saturday, 9th April, 1949. [ ২৩শ সংখ্যা

**জাতীয় সপ্তাহের ব্রত**

স্বাধীন ভারতে জাতীয় সপ্তাহ উদ্‌যাপনের জন্য দ্বিতীয়বার আহ্বান আসিয়াছে। রাষ্ট্রপতি সীতারামিয়া এ সম্বন্ধে দেশবাসীকে অবহিত করিয়াছেন। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের অগ্নিময় প্রেরণা বাঙলা দেশ হইতেই প্রথমে ভারতে সর্বত্র বিকীর্ণ হয়। বাঙলার মনস্বী সাধকগণের অগ্নি-বীণায় যে দীপক রাগিণী বাজিয়া উঠিয়াছিল, অসংখ্য আত্মদাতা সন্তানের প্রাণময় অবদানের ফলে তাহার মনোময় প্রভাব ক্রমে স্থাবিষ্ঠ মূর্তি পরিগ্রহ করে এবং স্বাধীনতার জন্য সাধনাকে বলিষ্ঠ করিয়া তোলে। জালিয়ানওয়ালাবাগের পবিত্রভূমিতে হিন্দু-মুসলমান-শিখের শোণিত-স্রোত সমভাবে মিশিয়া যে সাধনার শক্তি দুর্নিবার হইয়া উঠে। মহাত্মা গান্ধীর পরিচালনায় আত্মোৎসর্গের বৈভব-বৈচিত্র্যে ভারতের ইতিহাসকে তাহা উদ্দীপ্ত করিয়া ৩০ বৎসর পরে এ দেশের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। আমরা স্বাধীনতা পাইয়াছি। কিন্তু স্বাধীনতা পাওয়াই বড় কথা নয়, তাহাকে রক্ষা করা আরও কঠিন। জাতির উপর এখন এই গুরুতর দায়িত্ব আসিয়া বর্তিয়াছে। সমস্যাও অনেক দেখা দিয়াছে। বস্তুতঃ স্বাধীনতার জন্য বিদেশী প্রভুশক্তির সঙ্গে আমরা যখন সংগ্রামে প্রবৃত্ত ছিলাম, তখন কংগ্রেসের আদর্শ আমাদের মধ্যে যেমন জীবন্ত ভাবে প্রেরণা সঞ্চার করিত, যেভাবে মনুষ্যোচিত বৃত্তিসমূহ আমাদের কর্মজীবনে উজ্জীবিত হইয়া উঠিত, বর্তমানে সে শক্তি যেন ক্ষুন্ন হইয়া পড়িতেছে। রাষ্ট্রপতি তাঁহার বিবৃতিতে এ আশঙ্কা ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "সংগ্রামের সময় কংগ্রেসে কোনরূপ অন্তর্বিরোধ ছিল না বলিলেই হয়; কিন্তু এক্ষণে বিভিন্ন প্রদেশে অন্তর্বিরোধ দেখা দিয়াছে। ফলে শক্তিহানি ঘটিতেছে এবং অপ্রত্যাশিত ভাবে কংগ্রেসের মর্যাদা হ্রাস পাইতেছে।" বলা বাহুল্য, সত্যকে স্বীকার করিয়া লওয়াই ভাল, চাপা দিয়া লাভ নাই। কংগ্রেসের আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাবুদ্ধি ক্ষুন্ন হওয়াতে জাতির অগ্রগতির পথ অস্পষ্ট হইয়া পড়িতেছে এবং আমাদের মনে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নানারূপ সংশয়ের সৃষ্টি হইতেছে। রাষ্ট্রপতি ডক্টর পট্টভি সীতারামিয়া ইহার কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন, "ইহা প্রধানতঃ নীতিগত সমস্যা, রাজনীতিক, অর্থনৈতিক বা শাসনতান্ত্রিক সমস্যা নহে। এই নূতন ব্যাধি বিদূরিত করিবার জন্য এ বৎসরের জাতীয় সপ্তাহে জাতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবে—ইহাই একান্ত কাম্য। আমাদিগকে উপলব্ধি করিতে হইবে যে, দুর্নীতি দেশপ্রেমের পরিপন্থী। ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য যদি কাহারও অধঃপতন ঘটে, তবে একমাত্র দেশপ্রেমের উন্মেষেই তাহার প্রতিকার সম্ভব।" রাষ্ট্রপতির এই নির্দেশের যাথার্থ্য আমরা সম্পূর্ণরূপেই স্বীকার করি। প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রসাধনার ক্ষেত্রে যদি আমরা নীতিবোধকে জাগ্রত করিয়া তুলিতে পারি, যদি আমরা কংগ্রেসের সেবা এবং ত্যাগের আদর্শে নিষ্ঠিত হই, তবে আমাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সবই সরল হইয়া আসিবে। কংগ্রেসের আহ্বানে জাতির জনসাধারণ কোন দিনই দুঃখকষ্ট বরণ করিয়া লইতে সঙ্কুচিত হয় নাই। স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহারা অম্লান বদনে দুর্দৈবকে বরণ করিয়াছে। সে মনোবল জাতি আজও হারায় নাই, কংগ্রেসকর্মীরা যদি তাঁহাদের জীবনাদর্শে নীতিবোধকে প্রোজ্জ্বল করিয়া তুলিতে পারেন, তবে তাঁহাদের আহ্বানে জাতির মুক্তির জন্য জনসাধারণ একদিন যেমন আগাইয়া আসিয়াছিল, আজও তেমনই সে মুক্তিকে মঙ্গলময় করিয়া তুলিবার জন্য দুঃখকষ্ট স্বীকার করিয়া লইয়াও তাহারা অগ্রসর হইবে। ক্ষুদ্র স্বার্থের হিসাব আমাদের যেসব সমস্যাকে জটিল করিতেছে, সেগুলি তখন আর পদে পদে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিবে না।

**স্বাধীনতা ও সামরিক স্পৃহা**

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের তরুণদের মধ্যে সেনাবিভাগে যোগদানের জন্য যথোপযুক্ত আগ্রহ দেখা যাইতেছে না। সেনা-বিভাগের অফিসার নির্বাচন কমিটির ডিরেক্টর ব্রিগেডিয়ার বিলিমোরিয়া সম্প্রতি সাংবাদিকদের নিকট এই মর্মে একটি বিবৃতি দিয়াছেন। যথেষ্ট ছাত্র ভর্তি না হওয়াতে অনেক শিক্ষার্থীর আসন খালি রহিয়াছে। ব্রিগেডিয়ার বিলিমোরিয়া এ সম্পর্কে যে তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় সেনানীর কাজে নূতন শিক্ষা গ্রহণের জন্য এ পর্যন্ত দিল্লী, পাঞ্জাব এবং যুক্তপ্রদেশ হইতে ২৪০টি আবেদন পাওয়া গিয়াছে। উক্ত তিন প্রদেশের প্রত্যেকটি হইতে ৮০ খানা করিয়া আবেদন আসিয়াছে, ভারতের অবশিষ্ট অংশ হইতে সর্বসাকুল্যে মোট ৬০টি আবেদন পাওয়া গিয়াছে। বাঙলা হইতে সেনা-বিভাগে এই বিশেষ শিক্ষা লাভের জন্য মাত্র ১১ খানা আবেদন গিয়াছে। ব্রিগেডিয়ার বিলিমোরিয়া আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, সৈন্য বিভাগের অফিসার শিক্ষার্থীর শতকরা ৭৫ জন যদি এইভাবে দিল্লী, পাঞ্জাব, এবং যুক্তপ্রদেশ হইতে গৃহীত হয়, তবে সামরিক জাতি এবং অসামরিক জাতি পুনরায় এই সমস্যার উদ্ভব ঘটিবে। বিলিমোরিয়ার উক্তি বাঙলার পক্ষে বিশেষভাবেই চিন্তার কারণ

সৃষ্টি করিয়াছে। ব্রিটিশ শাসকেরা বাঙালীর সমর সাধনাকে পিষ্ট করিতেই সর্বদা আগ্রহপরায়ণ ছিলেন। বাঙালীকে মনুষ্যত্বহীন এবং নির্বীর্য করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাদের সমর বিভাগীয় নীতি কৌশলের সঙ্গে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। বাঙলাদেশে ক্ষাত্রবীর্য যদি জাগে, তবে তাঁহাদিগকে লটবহর গুটাইয়া সরিয়া পড়িতে হইবে, তাহারা সদাসর্বদা এমন জুজুর ভয়ে কাঁপিয়াছেন। এজন্য বাঙালীদিগকে তাঁহারা অসামরিক জাতির গোত্রের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু বিদায় তাঁহাদিগকে শেষটা লইতেই হইয়াছে। দেশের অবস্থা এখন আর তেমন নাই। বর্তমানে সেনা বিভাগের দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত। ভারত সরকার সামরিক এবং অসামরিক জাতির কৃত্রিম ব্যবধান রহিত করিয়াছেন। কিন্তু বিভিন্ন প্রদেশের তরুণদের মধ্যে যদি সমর শিক্ষা গ্রহণের জন্য যথেষ্ট সাড়া না জাগে এবং উত্তর ভারতের কয়েকটি প্রদেশের মধ্যেই তাহা সীমাবদ্ধ থাকে, তবে ব্রিটিশ শাসকদের আরোপিত কৃত্রিম অবস্থা পনরায় উদ্ভব হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে। আমাদের মনে হয়, প্রচারকার্যের ত্রুটি এজন্য প্রধানত দায়ী। তরুণদের চিত্তে স্বদেশপ্রেমকে দীপ্ত করিয়া তোলাই এক্ষেত্রে প্রধানত প্রয়োজন এবং তদুদ্দেশ্যে বলিষ্ঠ প্রেরণা সঞ্চার করা দরকার। প্রচারকার্যের ভিতর এমন কৌশল প্রযুক্ত হওয়া উচিত যাহাতে দেশরক্ষার দায়িত্ববোধ তরুণ সমাজে প্রখর হয়। সামরিক বল না থাকিলে স্বাধীনতা ও যে থাকে না, নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয় না, এ সম্বন্ধে তরুণদিগকে সচেতন করিয়া দিতে হইবে। দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলির ভিতর দিয়া সামরিক স্পৃহা জাগাইয়া তুলিতে হইবে। বস্তুতঃ শিক্ষার ক্ষেত্রে সংস্কৃতির অর্থনৈতিক এবং সুকুমার বৃত্তির দিকটার উপরই কেবল জোর দিলে চলিবে না। দৈহিক শক্তি বা শারীরিক বল, পশুবল আমাদের রাষ্ট্রনীতিক আধুনিক সংস্কৃতির মধ্যে এই রকম একটা ভ্রান্ত ধারণা গড়িয়া উঠিতেছে, ইহা আগে দূর করা দরকার। প্রকৃতপক্ষে দেশের জন্য, জাতির জন্য শক্তি-সাধনার পথেই যে প্রকৃত মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা ঘটে এবং দুর্বলতা বা ভীরুতা পশুত্বেরই মূলীভূত কারণ তরুণ সমাজে এই বোধ জাগাইবার ব্রত আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে এবং তাহাদিগকে সর্বপ্রকার দুর্বলতাকে ঘৃণা করিবার শিক্ষা দিতে হইবে।

**কাশ্মীর সমস্যার মূলে**

কাশ্মীর সমস্যা সমাধান প্রচেষ্টা বর্তমানে শেষ সংকটের সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়। কাশ্মীর কমিশন এ সম্পর্কে যদিও আশার কথা আমাদিগকে শুনাইয়াছেন, তবুও ভিতরের ব্যাপারটা কোথায় আসিয়া ঠেকিয়াছে বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না। ভারত সরকার আগাগোড়াই এই দাবী করিয়াছেন যে, পাকিস্থান কর্তৃক অন্যায়ভাবে অধিকৃত ও পরিত্যক্ত অঞ্চলে তাঁহারা জম্মু ও কাশ্মীর গভর্নমেণ্ট ছাড়া অপর কাহারো সার্বভৌম ক্ষমতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। কমিশন সুস্পষ্ট ভাষাতেই ভারত সরকারের এই দাবী স্বীকার করিয়া লন। কিন্তু পাকিস্থান গভর্নমেণ্ট শেষটা এ সম্বন্ধে অনুরূপ মনোভাব অবলম্বন করেন। তাঁহারা "আজাদ কাশ্মীরের" বেনামীতে ভোট গ্রহণের সময় কাশ্মীরের কতকটা অঞ্চলে নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রাখিতে চাহেন। বলা বাহুল্য, তাঁহারা যদি এই মনোভাব পরিত্যাগ না করেন, তবে কাশ্মীরের সমস্যা সমাধানের কোন আশা আছে বলিয়া মনে হয় না। কারণ সেক্ষেত্রে গণভোটের সার্থকতাই থাকে না। প্রকৃত প্রস্তাবে গণভোটকে যদি তাঁহারা কাশ্মীর সমস্যা মীমাংসার একমাত্র পথ মনে করিতেন এবং কাশ্মীরের জনসাধারণ সত্যই পাকিস্থানে যোগ দিতে চায়, এমন বিশ্বাস যদি তাঁহাদের থাকিত, তবে সেনাবাহিনীর জোরে বে-আইনীভাবে অধিকৃত অঞ্চল ত্যাগ করিতে এই অন্যায় এবং অযৌক্তিক আপত্তি তাঁহারা কখনই উত্থাপন করিতেন না। তাঁহারা আজাদ কাশ্মীর সরকার নামে যাঁহাদিগকে চালাইয়া নিজেদের কাজ হাসিল করিতে চাহিতেছেন, কাশ্মীরের শাসনতান্ত্রিক দিক হইতে সত্যই তাহাদের কোন মূল্য নাই। তাহারা হানাদার দস্যুদল মাত্র। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে যিনি কাশ্মীর সম্বন্ধে বিবেচনা করিবেন, তিনি এ কথা বলিবেন এবং এইসব জুলুমবাজদের উপদ্রব হইতে কাশ্মীরের অধিবাসীবৃন্দ যাহাতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনভাবে নিজেদের ভোটের অধিকার পরিচালনা করিতে পারে, সে পক্ষে যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিবেন। এই প্রসঙ্গে আমরা মিশরীয় সাংবাদিক প্রতিনিধি দলের অভিমত উল্লেখ করিতে পারি। এই সাংবাদিক দল একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদিগকে লইয়াই গঠিত; সুতরাং তাঁহারা কাশ্মীরের মুসলমানদের স্বার্থের বিরোধী কথা বলিবেন, কোন মূর্খেরও এমন ধারণা হওয়ার সম্ভাবনা নাই। এই দলের মুখপাত্রস্বরূপে মিঃ আহম্মদ কাসম গোদা সেদিন এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, কাশ্মীরের অধিবাসীরা অত্যাচারী জুলুমবাজদের ক্রীতদাসত্ব করিবে, না তাঁহারা সেখ মহম্মদ আবদুল্লার এবং তাঁহার সহকর্মীদের অনুগমন করিবেন, বর্তমানে এই সমস্যা দেখা দিয়াছে। সেখ মহম্মদ আবদুল্লা কাশ্মীরে নূতন জীবনের সঞ্চার করিয়াছেন, কাশ্মীরের জনগণ যে তাঁহাকেই সমর্থন করিবে, তাঁহাদের এই বিশ্বাস। ফলতঃ ভারত ও পাকিস্থান উভয় রাষ্ট্রের বৃহত্তর স্বার্থ সম্বন্ধে অবহিত হইয়া কাশ্মীর সম্বন্ধে পাকিস্থান রাষ্ট্রের নিয়ামকদের অযৌক্তিক জিদ পরিত্যাগ করা উচিত। তাঁহাদের মধ্যযুগীয় সাম্প্রদায়িকতান্ধ নীতি ইতিমধ্যেই ভারত সীমান্তে তাঁহাদের প্রতিকূলে প্রবল প্রতিবেশ গড়িয়া তুলিতেছে। এ সম্বন্ধে সচেতন হইয়া জনমতের প্রতি মর্যাদাবুদ্ধি অবলম্বন করা তাঁহাদের কর্তব্য। নতুবা পাকিস্থান রাষ্ট্রের ভিত্তিমূল পর্যন্ত বিপর্যস্ত হইয়া পড়িবে, এমন আশঙ্কার কারণ রহিয়াছে।

**ক্ষুদিরাম-স্মৃতি**

কালের দীর্ঘতর পরিপ্রেক্ষায় মানুষের সত্যকার স্বরূপ মৃত্যুর পরে সমধিক ফুটিয়া উঠে, বর্তমানের সাময়িক ঘটনার পরিবর্তনশীল অনিত্যতার আবিলতায় এই সত্য আচ্ছন্ন থাকে। এই ভাবে অতীত স্মৃতির পথেই সাধকদের জীবনের মূলীভূত শক্তিটি প্রকৃত মহিমায় আমাদের কাছে অভিব্যক্ত হয়। ঘটনার ভালমন্দের বিচারের দ্বন্দ্বমোহ হইতে মুক্ত মনে তখন আমরা মানবতার আদর্শের পূজা করিয়া কৃতার্থ হই। বাঙলার বীর সন্তান ক্ষুদিরামের আত্মোৎসর্গের মূলীভূত মহত্ত্ব কালের নিকষ পাষাণে পরীক্ষিত হইয়াই আজ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। দেশ, কাল এবং তৎসম্পর্কিত নীতির গণ্ডীকে অতিক্রম করিয়া তাঁহার অবদান অবিতর্কিত এক সনাতন সত্যকে উদ্দীপ্ত করিয়াছে। ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল আদর্শের এই অখণ্ড পরিপ্রেক্ষায় ক্ষুদিরামের আত্মদানের গুরুত্ব সোজাসুজি স্বীকার করিতে সংকোচ বোধ করিয়াছেন দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইয়াছি। গত ২রা এপ্রিল মজঃফরপুরে ক্ষুদিরামের স্মৃতিস্তম্ভের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে স্থির হইয়াছিল যে, পণ্ডিতজী স্বয়ং এই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করিবেন; তদনুযায়ী উদ্যোগ আয়োজনও সম্পন্ন হয়; কিন্তু শেষ মুহূর্তে তিনি এই কাজে তাঁহার অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। পণ্ডিতজীর এ অসম্মতির কারণ কি, সাক্ষাৎ সম্পর্কে এ সম্বন্ধে তাহার নিকট হইতে তাহা জানিবার সৌভাগ্য আমাদের ঘটে নাই; তবে সংবাদে দেখা যায়, তিনি "হিংসা এবং অহিংসার নীতিগত পার্থক্যের কথা উল্লেখ করিয়াই এই স্মৃতিরক্ষার কার্যে অংশ গ্রহণ করিতে সম্মত হন। এ প্রসঙ্গে কিন্তু হিংসা ও অহিংসার নীতিগত পার্থক্যের প্রশ্ন আমাদের কাছে অবান্তর বলিয়াই মনে হয়। বাঙলার এই উনবিংশ বৎসরের বালক সেদিন হাসিমুখে বধ্যমঞ্চে আরোহণ করিয়াছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামে অহিংস নীতি অবলম্বনের ঔচিত্য বোধ সেদিন ভারতে জাগে নাই। মহাত্মা গান্ধী রাষ্ট্রনীতিক সংগ্রামে

অবতীর্ণ হন নাই। এরূপ অবস্থায় ক্ষুদিরামের সম্পর্কে যদি হিংসা ও অহিংসার প্রশ্ন তুলিতে হয় তবে জগতের ইতিহাসে দেশ এবং জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামে যাঁহারা প্রাণ দিয়াছেন, তাঁহাদের অধিকাংশের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনও অহিংসার নীতি-নিষ্ঠদের পক্ষে অনুচিত হইয়া পড়ে। প্রকৃত প্রস্তাবে ক্ষুদিরামের ফাঁসির পর ৪০ বৎসর পার হইয়া গিয়াছে। তাঁহার সেদিনকার কর্মের গুরুত্ব কি, তাঁহার আত্মত্যাগের মূল্য কতখানি, ইতিহাসে সে সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষের রাজনীতিক ইতিহাস এই আত্মবলিদানকারী কিশোরকে ভুলিয়া যাইতে পারে নাই। টেররিষ্ট বা বোমাওয়ালা বলিয়া লোকে ক্ষুদিরামকে স্মরণ রাখে নাই। ক্ষুদিরামের প্রবল প্রাণধর্মই এ দেশের জনমানসে তাঁহাকে অপরিম্লান মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। পরাধীনতার তৎকালীন প্রতিবেশের অন্ধকারে বাঙলার বিপ্লব বন্দীরা নিজেদের অস্থিপঞ্জর জ্বালাইয়া যে হোম-শিখা উদ্দীপ্ত করিয়াছিল, তাহার অগ্রণীস্বরূপে ক্ষুদিরামকে লোকে স্মরণে রাখিয়াছে। বিশেষ নীতির প্রশ্ন দূরে সরিয়া গিয়াছে। ক্ষুদিরামের আদর্শ, তাঁহার দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগ,—মনুষ্যত্বের এই স্থায়ী মূল্যেই ক্ষুদিরামের ত্যাগ উজ্জ্বলতা লাভ করিয়াছে। এই হিসাবে তাঁহার স্মৃতি আজ হিংসা ও অহিংসার বিচারের ঊর্ধ্বে। পণ্ডিত জওহরলাল কংগ্রেসের নেতা। তিনি অহিংসা-নীতিতে নিষ্ঠাবুদ্ধিসম্পন্ন। কিন্তু মহদুদ্দেশ্যে আত্মদানের মহিমার দিক হইতেই তিনি ক্ষুদিরামের প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদন করিতে পারিতেন। ইহা নূতন কিছুও নয়। ১৯৩১ সালে করাচী কংগ্রেসের কথা আমাদের এখনও স্মরণ আছে। এই কংগ্রেসে সর্দার ভগৎ সিং ও তাঁহার সঙ্গিগণের প্রাণদণ্ডের সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। স্বয়ং পণ্ডিতজী এই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি বক্তৃতাপ্রসঙ্গে ভগৎ সিংয়ের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া অকুণ্ঠ ভাষায় এবং উচ্ছ্বসিত আবেগে ভগৎ সিংহের আত্মত্যাগ ও অকুতোভয়তার প্রশংসা করিয়াছিলেন। এক্ষেত্রেও তিনি তাহা করিতে পারিতেন এবং আমরাও সান্ত্বনা লাভ করিতাম।

### সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতা

বিহার রাজনীতিক সম্মেলনে বক্তৃতাকালে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সাম্প্রদায়িকতার তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। তিনি বলেন, আমরা সকল রকমে সাম্প্রদায়িকতা বিচূর্ণ করিতে সঙ্কল্পবদ্ধ হইয়াছি। এবং এ কাজে অনেকটাই সফলকাম হইয়াছি। কিন্তু এই পাপ সম্পূর্ণরূপে দূর করিতে হইলে গভীরভাবে নিজেদের অন্তর অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। পণ্ডিতজীর এই উক্তির গুরুত্ব আমরা সম্পূর্ণই উপলব্ধি করি। আমাদের মতে সাম্প্রদায়িকতা সভ্যতা বা সংস্কৃতির পরিচায়ক নয়, তাহা বর্বরতারই নামান্তর মাত্র। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা পাপের চেয়ে, আর একটা পাপ কোন কোন প্রদেশে অধিকতর উৎকট আকার ধারণ করিতেছে। বিহারের কথা এ সম্পর্কে বিশেষভাবে বলা চলে। বিহারের যাঁহারা লব্ধপ্রতিষ্ঠ কংগ্রেসকর্মী, দেখিতেছি, তাঁহারা বাঙালী-বিদ্বেষের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। বাঙলা ভাষা এবং সংস্কৃতিকে উৎখাত করিবার উদ্দেশ্যে কংগ্রেসের বিঘোষিত নীতি লঙ্ঘন করিতে তাঁহাদের বিবেকে একটু বাধিতেছে না। মানভূমে বাঙালী সমাজের উপর বর্তমানে যে উৎপীড়ন এবং অত্যাচার চলিতেছে, আমরা তাহা বিস্মৃত হইতে পারি না। বলা বাহুল্য মাত্র বাঙালী সমাজে ইহা বিক্ষোভের উপাদান ধীরে ধীরে জমাইয়া তুলিতেছে। কিন্তু বিহারের জননেতাদের মুখে বাঙালী সমাজের অভিযোগের সুবিচার সম্বন্ধে কোন আশ্বস্তিই আমরা শুনিতে পাইতেছি না। প্রাদেশিক মনোবৃত্তিতে প্রভাবিত নেতাদের দৃষ্টিতে বাঙালীর যেন উপেক্ষারই বিষয়ীভূত হইয়া পড়িয়াছে। ভারত বিভক্ত হইবার পর বাঙলার সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপর প্রচণ্ড আঘাত পড়িয়াছে, পশ্চিম বঙ্গ বর্তমানে ভারতের ক্ষুদ্রতম প্রদেশে পরিণত, কিন্তু সেহেতু বাঙলার প্রাণশক্তি কমে নাই। তাঁহার সংস্কৃতিও ক্ষীয়মান হইবার নয়। প্রাদেশিকতার মনোভাব বর্জন করিয়া পশ্চিম বঙ্গের প্রতিবেশী রাষ্ট্রের নেতারা যদি বাঙালীদিগকে আপনার করিয়া লন, তবে সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রনীতিক অভ্যুন্নতি সুনিশ্চিত হইবে।

### প্রাদেশিক সংস্কৃতি ও সংহতি

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বিহার রাজনৈতিক সম্মেলনে তাঁহার অভিভাষণে প্রসঙ্গক্রমে বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গের সীমানা সম্পর্কিত বিরোধের কথা উত্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে কোন বিশেষ প্রদেশের কোন একটা অংশ সে প্রদেশের ভিতর থাকিল কি অন্য প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হইল ইহাতে কিছুই আসিয়া যায় না, সুতরাং ইহা লইয়া বিতর্ক একান্তই অনর্থক। কারণ সব প্রদেশই ভারতীয় রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত। পণ্ডিতজী তাঁহার কথা স্পষ্টভাবে বুঝাইবার জন্য ইহাও বলেন যে, তিনি যুক্তপ্রদেশের লোক, কিন্তু ভারতের সংহতি বোধ যদি আমাদের সকলের মধ্যে জাগ্রত থাকে, তাহা হইলে যুক্ত প্রদেশের দুই তিনটি জিলা অপর কোন প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করা হইলে তিনি বিন্দুমাত্র দুঃখিত হইবেন না। বাস্তবিকপক্ষে পণ্ডিতজীর এই যুক্তি কতকগুলি ভ্রান্ত ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই আমরা মনে করি। ভারতের সংহতিবোধটা দৃঢ় রাখাই বর্তমানে প্রথমে প্রয়োজন। তাঁহার এই অভিমত আমরাও সমর্থন করি, কিন্তু সেইজন্যই আমরা ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশসমূহের পুনর্গঠন কামনা করি। প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সংস্কৃতির ভিতর দিয়াই সমগ্র ভারতের এই সংহতিবোধকে জীবন্ত করিয়া তোলা সম্ভব হইতে পারে, আমাদের এই বিশ্বাস। পক্ষান্তরে বিশেষ একটা প্রাদেশিক সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত এবং সুগঠিত কোন অঞ্চলের উপর যদি অপর প্রদেশের ভাষা, সাহিত্য বা সংস্কৃতি জোর করিয়া চাপাইবার চেষ্টা করা হয়, তবে ভারতের সংহতিবোধের মূলীভূত যে আন্তরিকতা তাহার উপরই আঘাত পড়ে। নিজস্ব বিশেষ প্রাদেশিক সংস্কৃতির সহজ ধারা হইতে বঞ্চিত হওয়াতে লোকের মনে পরত্ব বোধটা পাকাইয়া উঠিতে থাকে এবং তাহার ফলে প্রদেশ বিশেষের রাষ্ট্রনীতিক শাসন-সংস্থানের মধ্যেও নানা রকমের অনর্থ দেখা দিবার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। ইহাতে ভারতের সংহতি বোধ যেমন দুর্বল হয়, সেইরূপ প্রাদেশিক রাষ্ট্রের সমুন্নতির পক্ষেও বিঘ্ন ঘটে। ব্রিটিশ শাসকেরা এই তত্ত্বটি বেশ ভালভাবেই বুঝিয়াছিলেন এবং এক সঙ্গে ভারতীয় সংহতি বোধকে দুর্বল ও মতানৈক্য সৃষ্টি করিয়া প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থায় স্বেচ্ছাচারের সুযোগ লাভ করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই তাঁহারা কৃত্রিমভাবে কতকগুলি প্রদেশ গঠন করিয়াছিলেন। বাঙলার কতকগুলি অঞ্চল এই কূট রাজনৈতিক প্রয়োজন সিদ্ধির উদ্দেশ্যেই তাঁহারা একদিকে বিহার এবং অন্যদিকে আসামের অন্তর্ভুক্ত করেন। কংগ্রেস ব্রিটিশ শাসকদের এমন কূটনীতির অনিষ্টকারিতা সম্যকরূপেই উপলব্ধি করে। ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশসমূহের পুনর্গঠনের নীতি কংগ্রেস কর্তৃক বিঘোষিত হয়। মহাত্মাজী ভারতীয় মহারাষ্ট্রের জনক। তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশসমূহের পুনর্গঠনের নীতিকে সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। গান্ধীজী নানাভাবে ইহার যৌক্তিকতার প্রতি জাতির দৃষ্টি বারংবার আকর্ষণ করিয়াছেন। বাঙালী সমাজ কংগ্রেস বিঘোষিত সে নীতির উপর ভিত্তি করিয়া আজ বিহারের বঙ্গ ভাষাভাষী অঞ্চলগুলি সম্পর্কে দাবী উপস্থাপিত করিয়াছে। ভারতের সংহতিহানির নিতান্ত অবান্তর যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিয়া সমস্যাটিকে কেন জটিলতর করিয়া তোলা হইতেছে, আমরা বুঝি না।

পথের সাথী (কাঠ-খোদাই) শিল্পী: সুখময় মিত্র

# প্রতীক্ষা

বিরাম মুখোপাধ্যায়

এইখানে ব'সে আছি আমি—
ব'সে আছি আমার ভাই আর বোনের মাঝখানে
—পাহাড় আর সমুদ্রের মাঝখানে।

মনে রেখো, আমরা তিনজন
নির্জনতা আর নিঃসঙ্গতায় এক ও অভিন্ন;
আমরা জড়িয়ে আছি অপরূপ প্রেমের এক ও অভিন্ন গ্রন্থিতে।
গভীর এই প্রেম
মধুর আমাদের প্রেম
অপরূপ আর অদ্ভুত।

যদি বলি
আমার বোনের সমুদ্র-গভীর গোপনতার চেয়ে
অতল-গম্ভীর এই প্রেম,
ভাই-এর পাহাড়-কঠিন পেশির চেয়েও বলিষ্ঠ
আর আমার উন্মাদনার চাইতেও অদ্ভুত,—
হয়তো কিছুই বলা হয় না,
অনুপম প্রেমের ব্যাখ্যা ও বিশেষণে
কৃপণ উপমার কতোটুকুই বা ব্যঞ্জনা!

মনে আছে সেই কুজ্ঝটিকা,
সেই আদি-প্রভাতের কুন্তলিত ধূসরিমা
আমাদের প্রথম পরিচয়ের পরমলগ্ন।
তারপর অনেক বছর জীর্ণ হয়েছে
কালের জঠরে,
দেখেছি অনেক পৃথিবীর জন্ম
আর যৌবন
আর মৃত্যু
—সৃষ্টি স্থিতি সংহারের সংখ্যাতীত প্রহসন।

তবু আছি আমরা
আমরা তিনজন—আসঙ্গ-উৎসুক
চির-যৌবনের প্রতীক।

আমরা আছি
আর আছে ঘন-রাত্রির প্রশান্তি,—
রাত্রির গভীরে ভগ্নীর কুমারী-ওষ্ঠে অস্ফুট উচ্চারণ
—এক অগ্নিদেবতার অজানা নাম,
ভাই-এর বুকে জ্যোতিষ্মতী দূর-সাবিত্রীর প্রার্থনা
আর আমার সুপ্তিতে কামকন্যার পদধ্বনি।

জানিনা
কখন আসবে সেই অজানা অগ্নিদেবতা
আমার বোনের ঠাণ্ডা শূন্য বাসরশয্যায়,
জানিনা কোন্ নারী-বন্যায় তৃপ্ত হবে ভাই-এর পাষাণ-তৃষা
আর কবে জ্বলবে নীল কপিল পীত পিঙ্গল রশ্মিপ্রদীপ
আমার স্বপ্নের অন্ধকারে—
আর আমাকে ধন্য করবে
পূর্ণ করবে কে সে নারী
জানিনা, জানিনা।

তবু ব'সে আছি আমি—
ব'সে আছি আমার ভাই আর বোনের মাঝখানে
—পাহাড় আর সমুদ্রের মাঝখানে;
নির্জনতা আর নিঃসঙ্গতায়
আমরা তিনজন এক ও অভিন্ন।

---

KAHLIL GIBRAN-এর 'THE GREAT LONGING' কবিতা অবলম্বনে।

আদালতে ইউরোপীয়ান ও আমেরিকান অপরাধীদের সম্বন্ধে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার বিলোপ সাধনের জন্য সর্দার প্যাটেল একটি বিল পাশ করাইয়াছেন। আশা করা যায় অতঃপর ইউরোপীয়ান ও আমেরিকানরা একমাত্র আদি ও অকৃত্রিম ভারতীয় অপরাধ ছাড়া অন্য কোন অপরাধে লিপ্ত হইবেন না।

* * *

একটি সংবাদে বলা হইয়াছে—Government of India proposes to introduce a no delay service scheme for long distance telephone. বিশুদ্ধ

খুড়ো বলিলেন—short distance telephone এর Delay Service Scheme) অবশ্যি আগের মতোই চলতে থাকবে।"

* * * *

শ্রীযুক্ত দিবাকর বলিয়াছেন—"ভারতে বেতার প্রচার ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা হইবে।" আশা করি তিনি "রেকর্ড" ভঙ্গ করতে পারবেন—মন্তব্য করিলেন আমাদেরই এক সহযাত্রী।

* * * *

শ্রীযুক্ত মোহনলাল সকসেনা বলিয়াছেন—"Vested interests have grown round relief camps". বিশুখুড়ো বলিলেন—Grow more food fail করলেও মাটির গুণে vested interest-গুলো ঠিক গজিয়েছে।"

* * *

সদস্যদের মধ্যে কথা কাটাকাটির প্রসঙ্গে কেন্দ্রের স্পীকার বলিয়াছেন—"Use of strong language cuts no ice"—

"কিন্তু কর্দম নিক্ষেপের কাজ তাতে বেশ চলে"—বলিল শ্যামলাল।

* * *

কাশ্মীর গণভোটের পরিচালক নির্বাচিত হইয়াছেন এডমিরাল নিমিৎস্। "নিমিত্তের ভাগী তিনি হবেন না বলেই আমরা আশা করি"—বলিলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * * *

মান্দ্রাজ ব্যবস্থা পরিষদে একটি প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে যে, মহিলা বাস-কণ্ডাকটারদের পক্ষে সুন্দর মুখশ্রী একটি বিশেষ গুণ। বিশুখুড়ো বলিলেন—"সংবাদ সত্যি হলে—সিনেমা আর বাসের কল্যাণে ছাদনাতলাটাকে অচিরেই সুন্দরীর ঘাটতি অঞ্চল বলে ঘোষণা করতে হবে।"

* * *

মান্দ্রাজের অন্য এক সংবাদে প্রকাশ সেখানে জনৈক ব্যক্তি নাকি চিড়িয়াখানার সিংহের খাঁচার মধ্যে লাফাইয়া পড়িয়া সিংহ কর্তৃক মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হইয়াছে। সিংহের মামা নরহরিদাসের সঙ্গে এ ব্যক্তির কোন সম্পর্ক আছে কিনা তা অবশ্য সংবাদে বলা হয় নাই।

"WOMEN Home Guards in Bombay".—

একটি সংবাদ। "কিন্তু এ সংবাদের দাম বম্বের কাছে থাকলেও আমাদের কাছে নেই, এখানে মালক্ষ্মীরা এ কাজটি বহুদিন আগে থেকেই করে আসছেন"—মন্তব্য করিল আমাদের শ্যামলাল।

* * *

"POLICEMEN spring big surprise" অন্য এক সংবাদ। "চোরাকারবারী ধরে নয়, পোর্ট কমিশনার দলকে হকিতে হারিয়ে"—পোর্ট কমিশনার দলকে হকিতে হারিয়ে"—বুঝাইয়া বলেন জনৈক ক্রীড়ারসিক।

* * *

SEVEN Western nations have given notice that they intend to fight aggression in Europe—"অভিমন্যুটি কে হবেন তা-ও একরকম স্থির হয়েই গেছে, এখন শুধু নারদ, নারদ বলার অপেক্ষা"—মন্তব্য করিলেন বিশুখুড়ো।

* * * *

Russian Hero" নামে একটি ঘোড়া বিলাতে Grand National বাজি মারিয়াছে। সংবাদে বলা হইয়াছে—একমাত্র কমিউনিস্ট পেপার ছাড়া কেহ এই ঘোড়ার নাম করে নাই।—ভারতে "Russian Bandit" নামে একটি ঘোড়া ছুটিতেছে। তাহার সম্বন্ধে কমিউনিস্টরা কি বলেন?

মেয়েকে দুধ খাওয়ান লইয়া পুতুল একেবারে উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। সে নাকি কিছুতেই দুধ খাইতেছে না, মুখে লইয়া ফেলিয়া দিতেছে বার বার। বকিয়াঝকিয়া আদর করিয়া সস্নেহে বুকে চাপিয়া ধরিয়া শান্তি নাই—জুজুর ভয় দেখাইয়াও নিস্তার নাই। মেয়ে তার যে কি বায়না ধরিয়াছে তাহা বুঝিয়া উঠিবার ক্ষমতা পুতুলের ঐ ক্ষুদ্র মাতৃহৃদয়ে কিন্তু এখনও জন্মায় নাই। তাই তার বিরক্তি যখন একেবারে চরম সীমায় আসিয়া ঠেকিয়াছিল তখন সম্পূর্ণ অসহায় বোধ করিয়া বুঝি একবার ঘরের ও কোণ হইতে চীৎকার করিয়া আমার উদ্দেশ্যে বলিয়াছিল—উঃ বাবাঃ, মরে গেলুম, দেখনা বাবা, মেয়েটা যে কিছুতেই দুধ খাচ্ছে না—ও বাবা! আমি তখন ঘরের এ কোণটিতে একখানি ডিটেক্‌টিভ্ উপন্যাসের রহস্যজালে বোধ করি বাহ্যচিন্তাশক্তি রহিত হইয়াই ছিলাম, তাই তার কোন কথাই বিশেষ মনোযোগ দিয়া শুনিতে না পাইলেও পুতুলের বিরক্তির কারণটা বুঝিতে পারিয়া-ছিলাম এবং বলিয়াছিলাম, বেশ করে ক'ষে দুঘা মার দিকি তাহলেই খাবে।

এরপর কি যে কাণ্ড ঘটিয়াছে তাহা জানিবার বা লক্ষ্য করিবার খেয়াল আমার ছিল না, মশগুল হইয়াছিলাম খুনীকে ধরিবার জন্য।

খেয়াল হইল, পুতুল যখন তার মেয়ের একটি হাত ধরিয়া ঝুলাইয়া ঘরময় ফোঁটায় ফোঁটায় জল ছড়াইয়া একেবারে আমার পাশে আসিয়া আমাকে নাড়া দিয়া ডাকিয়া বলিল—বাবা, একবার নিশাপতির কাছে যাও না, আমার মেয়ের জন্যে একটু ওষুধ এনে দাও—কেবল হাঁচছে আর সর্দি হয়েছে।

তাকাইয়া দেখি, ইতিমধ্যে সে কখন বাহির হইতে তার মেয়েকে জলে ডুবাইয়া চুবাইয়া আসিয়াছে, জল পড়িতেছে টপ্‌টপ্ করিয়া। বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—অমন করে জলে ভেজালি কেন? আমি যে মারতে বললুম! উত্তরে প্রবীণার মত গাম্ভীর্যে পুতুল বলিল—না বাপু, সে আমি পারব না, ঐটুকু মেয়েকে কি মারতে পারি?

গাম্ভীর্য বজায় রাখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—কিন্তু জলে ভেজালি কেন?

উত্তরে পুতুল বলিল—ভেজাতে যে হয়। সেদিন ঘুম থেকে উঠে বকুল ভীষণ কাঁদছিল, ভাল মা বৌমাকে ডেকে বললেন—ওকে চান করিয়ে দাও, ব্যস্ অমনি কান্না থেমে গেল। আমার মেয়েও ত আর কাঁদচে না, কিন্তু ভারী সর্দি হয়ে গেছে, নাক দিয়ে কাঁচা জল পড়ছে, দেখছ না? দেখিলাম সত্যই, কাঁচা জল শুধু নাক দিয়াই নয়, তার সর্বাঙ্গ দিয়াই ঝরিতেছে।

নিশাপতি আমার বন্ধু এবং আমার গৃহের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক; অতএব নিশাপতির কাছে যাইব এই আশ্বাস আমাকে দিতেই হইল।

একটি চ্যাপ্‌টা গোলাকার মাথা, একটি মোজার উপরিভাগের কিয়দংশ লাগাইয়া, একটি জীর্ণ দস্তানার চারটি বড় আঙ্গুলের অংশ জুড়িয়া ছেঁড়া বালিশের তুলা ভরিয়া পুতুলের মা এটি তাহাকে করিয়া দিয়াছিল তাহার রোগ-শয্যায় শুইয়া। সেই মেয়েকে লইয়াই পুতুলের অধিকাংশ সময় কাটিত। মাঝে মাঝে যখন সে এ জাতীয় কোন বিপদে পড়িত তখনই ছুটিয়া আসিয়া রোগশয্যায় শায়িত মা'কে বিরক্ত করিত বিপদ উদ্ধারকল্পে। মা তাহাকে অতৃপ্ত স্নেহ-ব্যাকুল আগ্রহে অতি ধৈর্য সহকারে তার মত করিয়া বিপদ উদ্ধারের উপায় বাৎলাইয়া দিত—সেও সেই পরামর্শ গ্রহণ করিয়া হাসিমুখে ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইত।
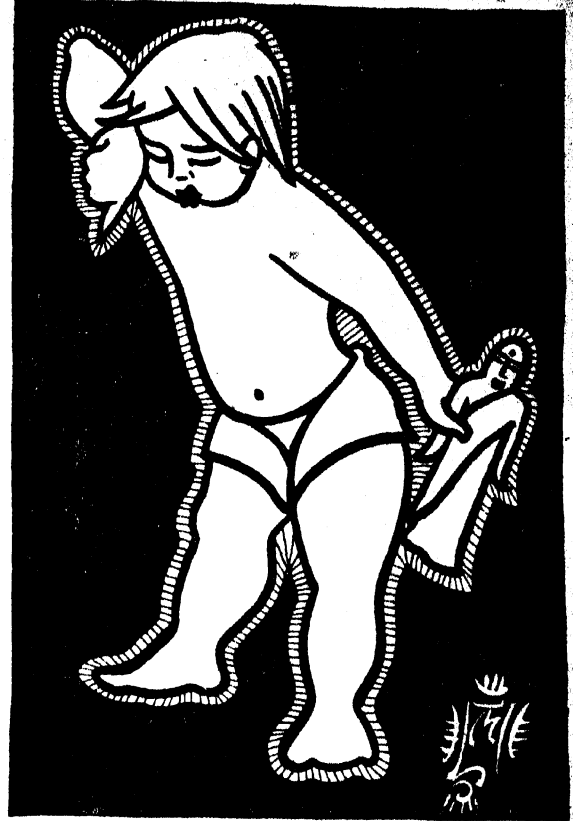
উৎকট ব্যাধিপীড়িত মা হইতে বিচ্ছি থাকিয়াও পুতুল তাহার এই খেলার পুতুলটি মাধ্যমে মার সহিত যোগসূত্রটি মনে প্রাণে রক্ষ করিয়াছিল অতি সন্তর্পণে।

আজ কিন্তু তাহার মা নাই। ব্যাধিপীড়ি জরাজীর্ণ অকর্মণ্য দেহ লইয়া সাধারণ মধ বিত্তের একান্নবর্তী সংসারে বাঁচিয়া থাকা চেয়ে সরিয়া পড়াই যে শ্রেয় তাহা উপলব্ধি করিয়া সে মানে মানে চলিয়া গিয়াছে; উপা প্রাপ্য হিসাবে সিন্দুররঞ্জিত সিঁথি এবং আলত রঞ্জিত চরণে লইয়া গিয়াছে নারী জীবনের চর সার্থকতার গৌরব—চিরসধবার এয়োতিপুণ সেই হইতে আমাকেই এখন পুতুলের মেয়ে লইয়া সকল প্রকার সমস্যা ও বিপদের সমাধ করিয়া দিতে হয়। কিন্তু আমি তাহা পা কৈ? আমি যে সে শক্তির কতটুকুর অধিকা তাত' সে বোঝে না, বুঝি শুধু আমি অ আমার অন্তর্যামী।

আমি মাতৃহৃদয়ের অসীম ধৈর্য ও বিপ স্নেহ যথাসাধ্য আহরণ করিয়া তাহার সমস সমাধানে প্রবৃত্ত হই বটে, কিন্তু জগতের কোন পিতা কি গর্ব করিয়া বলিতে পারে যে, সে ত মাতৃহারা সন্তানের সমস্ত দুঃখদ্বন্দ্ব মোচ

করিয়াছে, মায়ের অভাব সম্পূর্ণ দূর করিয়াছে? তাই যখন তার সমস্যা সমাধান আমার সাধ্যাতীত হইয়া প্রকট হইয়া ওঠে তখন আর আমি তাহার পানে চাহিয়া কোন কথাই বলিতে পারি না, ব্যাকুলবাহু বেষ্টনে তাহাকে জড়াইয়া কোলে তুলিয়া স্নেহচুম্বনে ভরিয়া আপনার উদ্গত অশ্রু লুকোইবার চেষ্টা করি।

কিন্তু মা তাহার সন্তান সম্বন্ধীয় কোন কথাই ভুলিতে পারে না; পুতুলও ভোলে না। প্রশ্নের নিকট সদুত্তর না পাইলেই মনে তার জাগিয়া ওঠে নিজের মায়ের স্মৃতি। করুণ দৃষ্টি মেলিয়া আধ-আধ কথায় জিজ্ঞাসা করে—আচ্ছা বাবা, মা হাসপাতাল থেকে কবে আসবে? তুমি ত মাকে নিয়ে আসছ না? আমি তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলি—অসুখ সেরে গেলেই আসবে মা, আসবে বৈ কি। মাতৃহারা শিশুর মনে এই চিন্তা বেশীক্ষণ স্থায়ী হইতে দিতেও সাহস পাই না; প্রসঙ্গ বদলাইবার জন্য আবার তাহার খেলার পুতুলের জের টানিয়া যাহা হোক একটা কিছু বলিয়া অব্যক্ত বেদনার জ্বালা হইতে পরিত্রাণের চেষ্টা করি। সেই কারণে পুতুলের বর্তমান সমস্যাটি যাহাতে বিশেষ প্রকট না হইয়া পড়ে সেই আশঙ্কায় কখন কি করিব, কি বলিব ভাবিতেছি এমন সময় পুতুলের ভাল মা অর্থাৎ আমার মা আসিয়া তাহাকে ডাকিয়া লইয়া গেলেন; আমি বাঁচিলাম।

পুতুল এই সবে পাঁচে পড়িয়াছে। গায়ের রঙ পাইয়াছে ঠিক তার মায়ের মত ধবধবে ফর্সা, নাকটিও হইয়াছে ঠিক তদ্রূপ সুডৌল ও ক্ষুদ্র; পায় নাই শুধু তার মত কাল ঘনপল্লব-বেষ্টিত ভাসা ভাসা আয়ত চোখ—সে চোখের দৃষ্টিতে চপলতা নাই, আছে প্রশান্তি,- সে চোখের দৃষ্টি কিছু বলার চেয়ে লুকাইয়া রাখে অনেক বেশী। আকৃতি-প্রকৃতিতে সে অবশ্য আমারই ধারা পাইয়াছে, দীর্ঘাঙ্গী, ছিপ্‌ছিপে, পাতলা। আজ কয়েক মাস পূর্বে পুতুলের মা ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে। শবদেহ লইয়া যাওয়ার বিভীষিকাময় দৃশ্যাবলী হইতে ঐ শিশুকে বাঁচাইবার জন্য সর্বনাশের কয়েক ঘণ্টা পূর্বে পুতুলকে আমি আমার এক আত্মীয়ার বাড়ি পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। তারপর এদিককার সমস্ত পর্ব চুকিয়া যাইলে গভীর রাত্রে ঘুমন্ত অবস্থায় তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়াছিলাম। প্রথম প্রথম সে কিছু বিশেষ বুঝিতেও পারে নাই আর তাহাকে বুঝিতে না দেওয়ার জন্য সকলে মিলিয়া সযত্নে সে প্রশ্ন এড়াইয়াও গিয়াছিলাম। মা তাঁর হৃদয়ের যে অদৃশ্য শক্তি বিকীর্ণ করিয়া যোজন দূরে হইতেও সন্তানকে বিপন্মুক্ত করেন, তাহার মঙ্গল কামনা করেন, সে শক্তি উৎস সন্তানের অজানিতে নির্মূল হইয়া গেলেও অন্তরে অন্তরে সন্তান নিশ্চয়ই তার অভাব ক্রমশই উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করে—এই বোধ হয় প্রকৃতির নিয়ম। পুতুলও তার মার মৃত্যুর চার পাঁচ দিন পরে একদিন তার ভাল মাকে প্রশ্ন করিয়া বসিল—ভাল মা, মা কোথায়? ঘরে ত নেই, দরজা ত বন্ধ!

ভাল মা তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বুঝাইয়াছিলেন, যে মা হাসপাতালে গিয়াছে, অসুখ সারিলেই চলিয়া আসিবে। তারপর হইতেই সে জানে, মা তার ফিরিয়া আসিবে। এই আশায় উন্মুখ হইয়া তার ক্ষুদ্র অন্তর বাহিরের সকল অভিব্যক্তির আড়ালে প্রতিটি মুহূর্তে তার মার অপেক্ষায় উদ্গ্রীব হইয়া বসিয়া থাকে। বাড়ির অন্যান্য সকলে পুতুলের মনে যাহাতে কোন প্রকারে তার মাতৃস্মৃতি জাগরূক হইতে না পারে সে বিষয়ে বিশেষ যত্নবান ছিল। সহসা সে প্রশ্ন উঠিয়া পড়িলে যে কোন উপায়ে তাহাকে চাপা দিয়া ফেলিত। ইহার ফলে একটি জিনিস সে বুঝিয়াছিল যে, মা সম্বন্ধে কোন কথাই তাহার বাড়ির কেহ শুনিবেও না আর কহিবেও না। তখন হইতে প্রয়োজন হইলে সে একমাত্র আমারই কাছে ছুটিয়া আসিত এবং আমাকে একলা পাইলেই আমার ঘাড়ের ওপর নিজের হাল্কা শরীরটিকে একান্ত নির্ভরে এলাইয়া দিয়া হয়ত বলিত—বাবা, মার বাক্সটা খোল না, আমার সেই হারটা নোব'—অথবা বলিত—বাবা, মাকে তুমি দেখতে যাও? মা আমায় দেখতে চায় না?

সরল শিশুর ঐ প্রশ্নের উত্তরে আমি তাহাকে কি বলিব? মিথ্যা বলিয়া যাহোক একটা কিছু বুঝাইতে আমার প্রাণ ফাটিয়া যায়, অথচ সত্য বলিয়া ঐ শিশুর হৃদয়ে চরম আঘাত হানিবার কথা আমি কল্পনাও করিতে পারি না।

সে হার যে একদিন তার মার চিকিৎসার জন্য আমি নিজের হাতে পোদ্দারের দোকানে তুলিয়া দিয়া আসিয়াছি, আর দেখা-শোনা অথবা খোঁজ খবরের সীমার বাহিরে লইয়া চিতায় তুলিয়া গঙ্গানীড়ে নিজের হাতেই ভাসাইয়া দিয়া আসিয়াছি সে খবর পুতুল রাখে না।

এইভাবে মাস কয়েক কাটার পর পুতুল আর বিশেষ তার মার কথা জিজ্ঞাসা করিত না। কিন্তু লক্ষ্য করিতাম, মাঝে মাঝে খেলাধূলা ছাড়িয়া অত্যন্ত বিমর্ষ মনে আমারই আশে-পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। জিজ্ঞাসা করিলে বলে—ভাল লাগছে না।

এই ভাল না লাগার কোন প্রতিবিধানই আমি আবিষ্কার করিতে পারি নাই; তাই পিতাপুত্রীতে মিলিয়া বসিয়া বসিয়া বিগত-জনের বিভিন্ন কথায় সেই ভাল-না-লাগাটাই পরম বেদনায় উপভোগ করিতাম।

মাস ছয় সাত ধরিয়া পুতুলের এই বিমর্ষ বিমনা ভাব লক্ষ্য করিয়া ভারী চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলাম। ভাল মা এবং বাড়ির অন্যান্য সকলে সাধ্যাতীত করিয়াছিলেন তাহাকে আনন্দে রাখার জন্য, কিন্তু ঠিক সেই পূর্বেকার পুতুল আর ফিরিয়া আসিল না, তার মনের কোথায় যেন একটি তার ছিঁড়িয়া গিয়াছিল শত চেষ্টা সত্ত্বেও যেন আর সুরে বাঁধা হইয়া উঠিল না। কন্যাকে লইয়া আমার মনে সদা চিন্তিত বিষণ্ণ ভাব লক্ষ্য করিয়া একদিন সুযোগ বুঝিয়া আমার মা কথাটা পাড়িলেন। বলিলেন—অত ভাবছিস কেন বাবা? আমি বলছি তুমি বিবাহ কর'—মা বলে তাকে ডাকলে শুরু করলেই মেয়ে আবার ঠিক হয়ে যাবে। এমন কি লোকের হয় না, না তারা দ্বিতীয়বার বিয়ে করে না?

অতএব ছয় সাত মাস পরে লজ্জার মাথা খাইয়া একদা অপরাহ্নে আমি পুতুলের জন্য আবার একটি নূতন মা লইয়া ঘরে উঠিলাম। পুতুলকে তার হাতে সমর্পণ করিয়া বলিলাম—তোমাকে এনেছি শুধু মাত্র পুতুলের জন্যে; অতএব দেখো তার যেন কোন কষ্ট না হয়। লজ্জাশীলা নূতন বধূ ঘোমটার অন্তরালে মুখ টিপিয়া একটু হাসিয়াছিল কিনা বলিতে পারি না, তবে মাথা নাড়িয়া আমার আদেশ শিরোধার্য করিয়া লইয়াছিল। নূতন মায়ের সেবা ও আদর যত্নে পুতুল সত্যই অনেকটা বদলাইয়া গেল। আর তেমন বিমর্ষভাবে ভাল্‌-লাগছে-না বলে না। সদাচঞ্চল প্রফুল্লতায় নূতন মার সহিত তাহার নিজের মেয়ের সংসার লইয়া ব্যস্ত থাকে।

পুতুলের এই পরিবর্তনটি ঘটিয়া গেল অতি অল্পদিনের মধ্যেই। বাড়ির সকলেই পুতুলের নূতন মার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিল। আমিও একদিন রাত্রে তাহাকে কৃতজ্ঞতা জানাইলাম; সেও আমার বুকে মাথা রাখিয়া ধীরস্বরে বলিল—আমাকে লজ্জা দিচ্ছ কেন? আমি ত কিছু করিনি, সবইত তুমি করেছ। অন্তরে যেন নিজের অজ্ঞাতসারেই একটি বিজয়গর্ব বোধ করিলাম। আর পুতুল যে তার বিগত মায়ের স্মৃতি ভুলিয়া আবার সহজ সরল হইয়া উঠিয়াছে তাহা ভাবিয়া সম্পূর্ণ নিশ্চিন্তও হইলাম।

নূতন বধূকে ঘরে আনিয়া নূতন করিয়া ঘর বাঁধিবার পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টায় আমার দিনগুলি অতি ব্যস্ততার মধ্যে কাটিতে লাগিল। সচেতন ও অবচেতন মনের কেন্দ্রস্থলে নববধূর সলজ্জ প্রেমময়ী মুখখানিই নিরন্তর ভাসিতে লাগিল। সে এক ভীষণ আচ্ছন্ন অভিভূতের কাল গিয়াছে; বাহিরের কোন কিছুতেই যেন আর দৃষ্টি পড়ে না, সমগ্র বিশ্বের অস্তিত্ব যেন একই কালে দানা বাঁধিয়া আমার নবপরিণীতার মধ্যে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছিল। এমন কি আমার বিগতা প্রথমা স্ত্রী—যাহার ভীষণ বিচ্ছেদে একদা আত্মহত্যা করিবার সঙ্কল্পও মনের ওপর ভর করিয়াছিল বেশ কয়েকদিনের জন্য—সেই স্ত্রীর স্মৃতিও যেন মুছিয়া গেল সন্ধ্যার প্রদীপ্ত সূর্যের অস্তগমনের স্বাভাবিকতার মত—; অন্ধকার নিশীথ রাত্রে সূর্যের জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করা যেমন মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ

...া আর কিছুই হয় না, বিরহের সেই ...তিকে উদ্দীপ্ত করিয়া মনের একান্ত গুপ্ত ...ক বেদনা বোধ করাও যেন তেমনি ধারা ...হীন, ন্যাকামি বলিয়া প্রতীয়মান হইল। ...তুলকে দেখিয়া একদিনের জন্যও মনে হইল যে সে যত সুখেই থাকুক না কেন, তথাপি ...ে মাতৃহারা!

...কালে সব কিছুই ভুলিয়া যাওয়া বোধ হয় ...ুষের উপর ভগবানের শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ। ...ে মানুষ সবই ভুলিয়া যায়, তাই এই ...নুষিক অত্যাচারিত নিষ্ঠুর পৃথিবীতে ...বগোষ্ঠীর অস্তিত্ব আজও অক্ষুন্ন রহিয়াছে। ...তুলও নিশ্চয়ই ভুলিয়াছে। আজকাল পুতুল ...ড়তে বসে। অ, আ, ক, খ, গড়গড় করিয়া ...ড়য়া যাইতে শিখিয়াছে। নূতন মাকে সে ...ে ভাল মার অনুরূপ বৌমা বলিয়া ডাকে। ...দিন বাজার হইতে ফিরিবার পর আমি যখন ...ন করিতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইতেছি তখন দেখি পুতুল তার মেয়েকে লইয়া পড়াইতে বসিয়াছে। মেয়েটির তার চেহারা ফিরিয়াছে লক্ষ্য করিলাম। গায়ে নূতন জামা উঠিয়াছে, স্থানে স্থানে যে ক্ষত বাহিয়া রক্ত মাংস ঝরিতেছিল অর্থাৎ তুলা বাহির হইতেছিল সেগুলি সূচিকার্যের দ্বারা সারিয়া গিয়াছে।

পুতুল তাহার নিজের পাঠ্যপুস্তকখানি খুলিয়া সম্মুখে রাখিয়া মেয়েকে জিজ্ঞাসা করিতেছে—বল্ এটা কি? ওটা কি? আমি বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তাহাকে লুকাইয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিলাম। এমন সময় বৌমা আসিয়া তাহাকে বলিল—পুতুল এইবার চান করবে চল। বৌমাকে উদ্দেশ্য করিয়া পুতুল বলিল—দেখছ, দেখছ বৌমা, মেয়েটা আজ কিছুতেই পড়ছে না, খুব বকেছি, আর খেতে দোব না বলেছি; ঠিক হবে—যেমন দুষ্টু!

বৌমা বলিল—আচ্ছা বেশ, এখন ওকে ছেড়ে দাও তুমি চান করবে চল।

পুতুল অমনি মেয়েকে শাসন করার কথা ভুলিয়া গিয়া বলিল—বৌমা আমার মেয়েটাকেও নিয়ে যাই, চান করিয়ে আনি, এ্যাঁ?

বৌমা বলিল—আচ্ছা বেশ চল।

পুতুল মেয়েকে লইয়া দৌড়াইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিল, আমি বলিলাম—দেখো, সেদিনকার মত যেন জলে একেবারে চুবিয়ে ফেলো না, তা হলে আবার সর্দি হবে।

পুতুল অমনি পাকা গৃহিণীর মত ভঙ্গীতে বলিয়া উঠিল—না বাবা, চান ত' করাব না, মাথাটা ধুইয়ে গা মুছিয়ে দোব'—ওর যে ঠান্ডা লেগেছে।

হাসি চাপিয়া বলিলাম—আচ্ছা যাও।

পুতুল মেয়ের একটি ঠ্যাং ধরিয়া ঝুলাইয়া লইয়া নামিয়া চলিয়া গেল। নূতন বধু মুখে আঁচল চাপা দিয়া হাসিতে লাগিল। পর মুহূর্তে বলিল—উঃ যে পাকা মেয়ে তোমার! ওর সঙ্গে কথা কইতে কইতে আমার মুখ ব্যথা হয়ে যায়!

তাহার পানে চোখ তুলিয়া বলিলাম—তাই নাকি? ভারী বকায় না?

হ্যাঁ, এক মুহূর্তও ফাঁক নেই। আবার উত্তর না দিয়ে চুপ করে থাকলে মেয়ের আবার রাগ হয়, জানলার ধাপিটার ওপর চুপটি করে বসে থাকেন।

আমি বলিলাম—না না চুপ করে থেকো না। যতটা পারবে ওকে ভুলিয়ে রাখবে।

আশ্বাস দিয়া নিশ্চয়তার স্বরে নতুন বধু বলিল—ও, সে সব? কবে ভুলে গেছে—মার কথা আর মুখেও করে না।

কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার পানে তাকাইয়া বলিলাম—তুমি বলেই তা সম্ভব হয়েছে, অন্য কেউ হলে হয়ত উল্টোটিই হ'ত। কথার উপর বাধা দিয়া বলিল,—হ্যাঁ, তোমার কেবল ঐ এক কথা! বলিতে বলিতে ঘর হইতে দ্রুত পায়ে সে বাহির হইয়া গেল। আমিও পুতুল সম্বন্ধে দ্বিগুণ আশ্বস্ত হইয়া স্নান সারিতে চলিলাম।

স্নানের পর খাওয়া দাওয়া সারিয়া জামা জুতা পরিয়া প্রস্তুত হইলাম অফিসে বাহির হইব। পুতুল-পুতুল বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে নীচে নামিলাম। দেখিলাম এইমাত্র সে স্নান করিয়া একখানি ছোট গামছা পরিয়াছে এবং তাহার মেয়ের কোমরেও একখণ্ড ভিজা ন্যাকড়া জড়াইয়া দিয়াছে। আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই আমি তাহার মুখ চুম্বন করিয়া বলিলাম—যাই বাবা। পরমুহূর্তেই তাহার এক হাতে তাহার মেয়ের গলা টিপিয়া উঁচু করিয়া ধরিল। আমি আবার নীচু হইয়া সেই দুর্গন্ধময় পচা স্নেহের পিণ্ডটিকে কোন প্রকার নিশ্বাস বন্ধ করিয়া চুম্বন করিলাম। সদর দরজার দিকে পা বাড়াইতেছি এমন সময় সে আবার 'বাবা' বলিয়া ডাকিয়া পিছনের জামা ধরিয়া টান দিল। মুখ ফিরাইতেই বলিল—বাবা, মেয়েটা আজ বড্ড কাঁদছিল, আসবার সময় বিস্কুট, লবঞ্চুষ এনোত। অফিসের দেরী হইয়াছিল ভীষণ, তথাপি বিরক্তি প্রকাশ করা চলিবে না। ওরে দুষ্টু, ভারী চালাক তুমি......বলিয়া তাহার টুকটুকে লাল গাল দুটি টিপিয়া আদর করিয়া বাহির হইয়া গেলাম।

ট্রাম রাস্তায় পৌঁছাইতেই কিন্তু চোখে যেন একটু ঝাপসা বোধ করিলাম। এক মুহূর্তেই বুঝিলাম চশমা আনিতে ভুলিয়াছি। বিরক্তির আর সীমা রহিল না, একে অফিসের দেরী হইয়াছে প্রচণ্ড তার ওপর আবার এই বিভ্রম। কি করি? বাড়ির দিকে দৌড় দিলাম। তিন লাফে সিঁড়ি ক'টি উত্তীর্ণ হইয়া ঘরে প্রবেশ করিতেছি এমন সময় কানে আসিল একটি চাপা মৃদু স্বরে কে যেন বলিতেছে—আমার মাকে ভাল করে দাও ঠাকুর; হাসপাতাল থেকে ফিরিয়ে এনে দাও ঠাকুর। কথা কয়টি আমার কানে প্রবেশ করিয়া বুকের মধ্যে গিয়া যেন সজোরে আছাড় খাইয়া পড়িল। মাথার মধ্যে সাগর গর্ভের তুমুল আলোড়ন শুরু হইল, চোখের সামনে অস্পষ্ট ধোঁয়ার আবর্তে চারিদিক অন্ধকার হইয়া গেল। কয়েকটি মুহূর্ত মাত্র স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া ধীর পদে ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখি অদূরে দেওয়ালে টাঙ্গানো ঠাকুরের ছবির সামনে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া মাথা নোওয়াইয়া প্রণাম করিতেছে পুতুল আর তাহার পাশে উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে তাহার মেয়ে। আমার প্রবেশে তপস্বিনীর ধ্যানভঙ্গ হইল। তাড়াতাড়ি মাথা তুলিয়া দুই হাত জোড় করিয়া প্রণাম সারিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আপিস গেলে না বাবা?

চক্ষু মেলিয়া তাহার দিকে তাকাইতে আমার সাহস হইল না। ঐ উপস্বিনীর পবিত্র দৃষ্টির সামনে নিজেকে মহাপাপী বলিয়া মনে হইল। বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া ভাবিলাম, এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অলক্ষ্যে তার ক্ষুদ্র হৃদয়ের একান্ত নিরালা কক্ষে সে তার মাতৃস্মৃতিরূপ জ্বলন্ত শিখাটিকে বাহিরের সকল ঝড় ঝাপটা হইতে বাঁচাইয়া আগলাইয়া রাখিয়াছে, একটি মুহূর্তের জন্যও স্তিমিত হইতে দেয় নাই। চক্ষের পলকে ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া নিজেকে যেন নিদারুণ এক লজ্জা হইতে বাঁচাইলাম। অফিস যাওয়ার পথে ট্রামে বসিয়া এলোমেলো চিন্তার মাঝে একটি নূতন বস্তু চোখের সামনে পরিষ্কার উদ্ঘাটিত হইল এই যে, সন্তানের মুখের ঐ ছোট্ট 'মা' ডাকটির অন্তরালে পুতুল তার মাতৃস্মৃতিটিকে কি অদ্ভুত, কত গম্ভীরভাবে প্রতিষ্ঠা করিয়া রাখিয়াছে, অথচ আমার মত একটি তথাকথিত স্বামী তার হৃদয় আসনে একদা প্রতিষ্ঠিত প্রেমময়ী স্ত্রীর চরণে আত্মদানের এক বিরাট মহাকাব্য রচনা করিয়াও আজ তার অবর্তমানে তাহাকে সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছে; আজ সেই একই সিংহাসনে বসাইয়া, আত্মদানের সেই একই মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া পূজা করিতেছে অন্য এক দেহ-প্রতিমার!

[পূর্বানুবৃত্তি]

আরো একটা বছর পর চেরীর দুরন্ত টাইফয়েড হয়।

টাইফয়েডের পর সেরে উঠে মেয়ের যা চেহারা হল দেখে নীহারনলিনীর মাথা ঘুরে গেল। রোগা কুৎসিতের কথা নয়। রোগা শরীর হ'লে নীহার বে'চে যেতো। নিজে সে দীর্ঘাঙ্গী, পাতলা, ছিপছিপে মানুষ। অসুখের পর একটা মাস পার না হ'তে চেরী বেলুনের মত ঢাকাই বেগুনের মত ফুলে উঠছে। ওর কটা চোখ বা লাল চুল নীহারের মন খারাপ করেনি। মেয়েকে স্থূলে থেকে স্থূলতর হ'তে দেখেই নীহার সব আশা ছাড়ল। তার ওপর মেয়ের এই বুদ্ধি এই রুচি। অসুখের পর থেকে যেন আরো বেশি বোকা মনে হ'তে লাগল।

ডাক্তার বলল, 'তেমন আর মোটা হয়েছে কি। পুরুষের চোখে মেয়েদের এমন মোটা শরীর মন্দ লাগে না।'

নীহার দেয়ালের দিকে চোখ ফিরিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল। 'সবচেয়ে বড় কথা ছোট-বেলায় ওর যেমন রাগ ছিল, বদমেজাজ ছিল এখন তা নেই। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কেমন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে' ডাক্তার বলছিল। নীহার উত্তর করেছিল, 'মেয়েরা ঠাণ্ডা কি গরম চেহারা দেখে তুমি টের পাবে নাকি।' কাজ কি অত কথায়, তুমি বাইরে বাইরে আছ বাইরে থাক। দেখতে যখন আমাকেই হবে।'

দুশ্চিন্তায় নীহারের হার্টের দোষ তখন বাড়ছেই কেবল।

এমন সময়ে যোগীন ডাক্তারের শ্বশুর অথবা নীহারনলিনীর বাপ বাগানে বেড়াতে যায়। ডাক্তার-জামাইকে শ্বশুর বেশ কড়া কথা শুনিয়ে দেয়। এ দিনে এই বিদ্যা নিয়ে কেউ পাহাড় জঙ্গলে পড়ে থাকে নাকি। বাঁধা-মাইনের চাকুরীতে আছে কি এখন? নীচে এমন সব উঠতি শহর পড়ে আছে। লোক গিস্গিস করছে, রোগ বাড়ছে, পলিটিকস্ হচ্ছে। পসার প্রতিপত্তি পয়সা জমানোর সুবিধা কত সেসব জায়গায়। চাকরী করে কেরাণী। ডাক্তারী মানে ব্যবসা। ঝোপ্ বুঝে কোপ না বসালে ব্যবসা ফাঁপবে কেন।

এত সব বলেও শ্বশুর ক্ষান্ত হয়নি। তা ছাড়া মেয়ে বড় হয়েছে, বিয়ে দিতে হবে না? পাহাড়ে পাত্র জোটাবে কি করে? আছে তো কেবল কুলি আর চা-চারা।'

এবং তার পরও শ্বশুর যুক্তি দেখাল। নীহারের হার্টের দোষ। জায়গা পরিবর্তনের বিশেষ দরকার। টিলার ওপরে আর দু মাস থাকলে ওকে বাঁচানো যাবে না।

ডাক্তার ভাবনায় পড়ল। নীচে নামবার যুক্তিগুলি একটাও ফেলনা নয়। তবুতো, কথায় বলে, চা-বাগানের ডাক্তার। রোগীর রোগ হয়েছে বললে তোমার চাকরী যাবে। স্রেফ্ পায়ের ওপর পা তুলে বসে থাকতে হবে ডিস্পেন্সারীতে। ওষুধ না দিয়ে জল দিতে হবে, কুইনাইনের বদলে এরোরোট পিল্। আর বিনি পয়সায় পাচ্ছ জঙ্গলের এন্তার জ্বালানী কাঠ, মুর্গী, ধান, কলা, কচু।

'কলা কচু খেতে তুমি এখানে থাক। আমি চললাম।' যেন বাপের সঙ্গে নীহার নীচে নামতে চলছিল, এক গাড়িতে। 'আমার শরীর বড় কি তোমার জিহ্বা বড়, মেয়ের চেয়ে জঙ্গলের জ্বালানী কাঠ ও মুর্গী বেশি কিনা যে-কোনো তৃতীয় ব্যক্তিকে ডেকে এনে জিজ্ঞাসা করো। আর জিজ্ঞেস করবেই বা কাকে। তোমার মত পেটবিলাসী ক্লার্কবাবু ছাড়া আর কুলি ছাড়া এখানে কোনো লোক আছে নাকি কিছু জিজ্ঞেস করার।' দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল নীহার অনেক দুঃখে।

তথাপি ডাক্তার থেকে যেতো জঙ্গলে, পাহাড়ের গা-ঢাকা অন্ধকারে, ঢিলে-ঢালা জীবন, স্বল্প আয় ও প্রচুর শান্তি নিয়ে। নীচের শহর তাকে টেনে নামাতে পারত না যদি না চেরী আবার হঠাৎ ওই কাণ্ড করে বসত। তাও যাকে তাকে নিয়ে নয়, মুল মানুষ নিয়ে।

বিকেলবেলা। কার্তিকের হিম পড়তে নীহারের একটু জ্বর হয়েছে। ডাক্তার গে বাইরে। নীহার শোবার ঘরে ঘুমোচ্ছে।

রান্নাঘরে রুটি সে'কছিল চেরী মার জন্য। এমন সময়, হঠাৎ ও শুনল যেন কুকুরে গলার ঘুঙুর বাজছে বাইরে, সদরের কাছে। কালও চেরী শব্দটা শুনেছিল নিশ্চয়। কিন্তু মা জেগে ছিল। তাই শোবার ঘর ডিঙ্গিয়ে সামনের বারান্দায় যেতে সাহস পায়নি।

তপ্ত তাওয়া উনুন থেকে নামিয়ে তখনি চেরী উঠে দাঁড়ায়। ফর্সা লাল মুখ কাপড়ের আঁচলে মুছে আস্তে আস্তে শোবার ঘর পার হয়ে ও ওদিকের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন নীহারনলিনীর ঘুম ভেঙ্গে যায়। তার আগেই ঘুম ভেঙ্গে গেছল। চেরী যখন রুটি সে'কার পাত্রটা উনুন থেকে মাটিতে নামিয়ে রাখে, খুট্ করে একটা শব্দ হয়েছিল।

চেরী বারান্দায় দাঁড়াতেও নীহার কিছু বলেনি। জেগে চুপ ক'রে চেয়ে দেখছিল মেয়ে কি করে শেষ পর্যন্ত। চেরী বড় হয়েছে আর অসুখের পর থেকে বেজায় ঠাণ্ডা হয়ে গেছে অজুহাতে ডাক্তার ইদানীং সদরে তালা লাগিয়ে যেত না। তাই দেখছিল নীহার সদর খোলা থাকলে মেয়ে কি করে। বড় হয়েছে পর থেকে দরজা খোলা আছে ও আর দেখেনি। নীহারের বেশ কৌতুহলই হয়েছিল প্রথমটায়। তারপর তো দেখল যা দেখবার।

রাত্রে ডাক্তারের কানে ফিস্ফিস্ করে নীহার যখন কথাগুলি বলছিল তখন রীতিমত কাঁপছিল ও।

ডাক্তার বলছিল, 'বুড়ো কার্টার তো বরাবরই এমন সময় বাগান থেকে ফেরে। এই রাস্তা দিয়ে বাংলোয় যায়।'

'ফেরে তো আমিও দেখি, এখানে এসে অবধি দেখছি। সদরের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে কি কোনদিন?' নীহার তার পরের দৃশ্যটা বর্ণনা করল কাঁপতে কাঁপতে। 'বরং সাহেব বেশ একটু এগিয়ে চলে গেছল। বারান্দার সিঁড়ি পার হয়ে ও গিয়ে গেটের কাছে দাঁড়াতেই তো সাহেব ঘুরে দাঁড়াল।'

'তারপর?'

'ও দিব্যি গেট্ খুলে বাইরে গিয়ে জলপাই গাছের গুঁড়ি ঘে'সে দাঁড়ায়।'

'তারপর?' ডাক্তার সিগারেট ধরাল। তখন সিগারেট খেত, এখানে এসেছে পর থেকে বর্মা চুরুটের অভ্যাস।

'তারপর আর কি। প্রথমে ও সাহেবের কুকুরটাকে আদর করতে গেছল। হুলো বেড়ালের পর কুকুরকেই তো ও আদর করবে। যেমন হতচ্ছাড়ি মেয়ের স্বভাব।' বলে চুপ করল স্ত্রী।

হাসতে গেছল ডাক্তার। নীহারনলিনীর মর্মভেদী দীর্ঘশ্বাস শোনা গেল অন্ধকারে, 'আমি জানতাম, আমি জানি, যে মেয়ে সাত বছর

বয়সে লাকিয়ে কুলির কোলে গিয়ে বসে থাকে সে এমন করবে না তো করবে কে।' বলে নীহার আবার থামল।

'সাহেব চুপ করে দাঁড়িয়েছিল বাঝি?' ডাক্তার হঠাৎ প্রশ্ন করল।

'না, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবে কেন। এমন অবস্থায় ওরা দাঁড়িয়ে থাকে নাকি। আর, কেমন নির্জন হয়ে যায় চারদিকটা তখন তুমি তো জানো?'

ডাক্তার 'হ‍ু' করে একটা শব্দ করেছিল।

অন্ধকারে নীহার কেমন অদ্ভুত করে যেন হাসল। 'সাহেব ওর গায়ে হাত দিতে গেছল কেবল, যেন বাঘ দেখেছে, চীৎকার ক'রে মেয়ে একলাফে ছুটে এসে ঢুকেছে ঘরে, ছি ছি—'

ডাক্তার স্তব্ধ হয়ে গেছল।

তারপরও সারারাত নীহার থেকে থেকে বলেছে, আমি জানতাম। যেদিনই ও সুযোগ পাবে দরজার বাইরে যাবে। গেল ত? গেট্ খোলা পেয়েছে কি কুকুরের ঘুঙুর শুনে বাইরে ছুটে গেল না কি,—ছি ছি।'

ডাক্তার ভেবে পায়নি নীহার দুবারই কেন ছি ছি করছিল। কুকুরের ঘুঙুর শুনে মেয়ের বাইরে যাওয়া ওর ভাল লাগেনি। না কি সাহেব চেরীর গায়ে হাত দিতে গেছে আর ও চীৎকার করে ছুটে ঘরে এসেছে বলে রাগে দুঃখে নীহার নিজের মৃত্যু কামনা করছিল।

কিন্তু সেকথা তো আর ডাক্তারের জিজ্ঞেস করা হয়নি। তার সময় ছিল না। সারারাত্রির উত্তেজনার পরিণাম স্বরূপ পরদিন সকাল হতে নীহারের অবস্থা এখন যায় কি তখন।

সেদিনই বাগানের চাক্‌রীতে ইস্তফা দিয়ে যোগীন ডাক্তার নেমে আসে নীচে।

নতুন হস্‌পিট্যাল রোড ও শহরের পুরোণো অঞ্চল অর্থাৎ সাবরেজিস্ট্রার, উকিল অটলবাবু এবং চেয়ারম্যান মোহিনী নন্দীরা যেখানে থাকেন সেই বকুলবাগানের সন্ধিস্থলে সামনে বাদাম গাছওয়ালা মেহেদীর বেড়া-ঘেরা পরিচ্ছন্ন একতলা বাড়িটা নীহার ও ডাক্তার দুজনেরই বেশ পছন্দ হয়েছিল।

তখন থেকে ডাক্তার এ বাড়িতে। আর বাড়ি বদলানো হয়নি।

সন্ধ্যেবেলা গোরুর গাড়ি থেকে মালপত্র নামানো হয়েছিল এবং ঝরঝরে ঘোড়ার গাড়ি থেকে স্ত্রী কন্যার হাত ধরে যেদিন ডাক্তার নামল, সাব-রেজিস্ট্রার বাদাম গাছের নিচে দাঁড়িয়ে ছিলেন। গলায় কুম্ফর্টার জড়ানো পায়ে মোজা, বেতের ছড়ি হাতে। শহরের প্রাচীন ভদ্রলোক হেসে ডাক্তারকে বলছিলেন, 'চা-বাগান থেকে আসছেন কিনা। তাই ভাবলাম চারদিকের এই মেহেদীর চারাগুলো থাক্—হঠাৎ ফাঁকা জায়গায় এসে মন খারাপ লাগবে।' ভদ্রলোকের এই রসিকতায় হেসে ডাক্তার ঘাড় নেড়ে বলেছিল, 'না তাতে কি। এখন বাড়ি পাওয়াই মুশকিল। বেশ আছে।'

অর্থাৎ ডাক্তারের শ্বশুর আর সাব রেজিস্ট্রারের মধ্যে কবে নাকি কোন্ জায়গায় একত্র চাকরি করতে করতে বন্ধুত্ব হয়েছিল।

সেই সূত্রে শ্বশুর মশায় সাব-রেজিস্ট্রার-বাবুকে এই শহরে ডাক্তার-জামাইয়ের জন্যে বাড়ি খুঁজে দিতে অনুরোধপত্র দিয়েছেন আর সাব-রেজিস্ট্রার সযত্নে ডাক্তার-জামাইয়ের বাড়ি খুঁজে রাখেন। কেবল খুঁজে রাখেননি। অগ্রিম ভাড়া ক'রে রেখেছেন। চুণকাম করিয়েছেন। আগাছা সরিয়েছেন এবং মেহেদীর বেড়া সুন্দর করে ছাঁটিয়ে দিয়েছেন। কেবল বন্ধুর অনুরোধপত্রের জন্যে না। আধুনিক শহরের দায়িত্বসম্পন্ন নাগরিক হিসাবে শহরে নতুন একজন ডাক্তারকে গ্রহণ করা এবং তাঁর প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করা প্রয়োজনীয় কর্তব্য বিবেচনা করে মুরারি হাজরা কাজটি করেছেন।

'আগে এখানে কুমুদবাবু থাকতেন। আদালতের নাজীর। ভদ্রলোক উঠে গেছেন—কিছুদিন আগে, তাঁর এক মেয়ে মারা যাবার পর—সাবরেজিস্ট্রার বাড়ির ইতিহাস শোনাচ্ছিলেন, আর ডাক্তার দেখছিল নতুন জায়গা। ভারি চমৎকার দেখাচ্ছিল। অর্ধেক পীচ ও অর্ধেক সুরকি ঢালা লাল-কালো রাস্তা দুটো সামনের ছোট্ট মাঠের ওপারে। মাঠে কার একটা ঘোড়া স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে এদিকে। নীহার-নলিনী বাড়ির চারদিকের গলা-উঁচু মেহেদীর বেড়া দেখা শেষ ক'রে আড়-চোখে দেখছিল চৌদ্দ বছরের চেরীকে।

'ওই মাঠ কি আর মাঠ থাকছে', সাব-রেজিস্ট্রার আঙুল বাড়িয়ে বলছিলেন, 'ডেভলাপমেণ্ট আরম্ভ হয়ে গেছে। দেখছেন না। হস্‌পিট্যাল রোডের ওখান থেকে সিনেমা হাউস উঠছে। আপনার এই বাদামতলা অবধি স্টল আসবে, রেস্টুরেণ্ট হবে, সেলুন হবে। এ জায়গাটা হল হার্ট অব দি টাউন। বুঝলেন না। আপনাকে আমরা হার্টের মধ্যে এনে বসালেম। শব্দ ক'রে হেসে উঠেছিলেন ক্ষীণকায় সাব-রেজিস্ট্রার। জঙ্গল থেকে এক লাফে একেবারে শহরের মাঝখানে এসে গেলে কার না ভাল লাগে। নীহারের ভাল লেগেছিল, ডাক্তারের ভাল লাগছিল। আধুনিকতার মোলায়েম গন্ধ প্রথম দিনই নাকে লেগেছিল দুজনের। চেরী হা করে তাকিয়ে দেখছিল, কোন্ দিক থেকে উড়ে এসে এক ঝাঁক পাখী বাদামগাছে এসে ভিড় জমিয়েছে। তারপর পাঁচ বছর কাটল। পাঁচ বছরের পর্দা তুলতে একদিন দেখা যায় নীহার-নলিনী একটা ইজি চেয়ারে চুপচাপ শুয়ে আছে। কোলের ওপর একটা বই। শিয়রে টেবিলের ওপর শেড্ পরানো ল্যাম্প জ্বলছে। অনেকক্ষণ সন্ধ্যা হয়েছে। ঘড়ির কাঁটা সাতটা। পশ্চিমে। পূর্বদিকের জানালা খোলা। বাদাম গাছের কালো কালো পাতা দেখা যাচ্ছে। পাখীর কিচিরমিচি শব্দটা থেমেছে এই কিছুক্ষণ হল। ইজি চেয়ারের ওপর আধখানা হয়ে শুয়ে নীহার ভাবছে। ঠোঁটের প্রান্তে মৃদু হাসির রেখা। পাঁচ বছরে ওর শরীরের এত বেশি পরিবর্তন হয়েছে যে, দেখলে হঠাৎ চেনা যায় না। ছিপছিপে শরীরে মাংস লেগেছে, গাল ভরে গেছে গলার দুদিক মসৃণ নিটোল হয়েছে। যেন বয়স কমে গেছে নীহারের।

তার চেয়েও বড় পরিবর্তন, চোখেমুখে সন্তোষ ও পরিতৃপ্তির ঘন গাঢ় প্রলেপ। চিন্তা কুল ছায়াটা করে কোন্ দিক্ দিয়ে যেন সরে যাচ্ছে।

এখনাকার নদীর মাছ, গোরুর দুধ পালং শাক ও খেজুর গুড় খেয়ে শরীরের চেহারা ভাল না হয়ে যায় কখনও। নীহার বলে, 'পাহাড়ী হরিণ খেয়ে কি রকম শুকিয়ে গেছলাম।

কিন্তু এ ছাড়াও আর একটি কারণ আছে, নীহারনলিনীর শরীর ও মন ভাল হওয়ার। ডাক্তার মাঝে মাঝে চিন্তা করে।

চেরী সম্পর্কে নীহারের দুশ্চিন্তাটা কেটে গেছে। নতুন জায়গা। বেশি লোকজন। তা ছাড়াও নানা লোকের সঙ্গে মেলামেশা। প্রত্যেক দিন পাড়ার মেয়েরা আসছে নীহারের কাছে।

আজ বিকেলেও এসে গেছে।

এবং শ্বশুর মশায়ের আশানুযায়ী ডাক্তার অল্প দিনেই ভাল পসার প্রতিপত্তি ও পয়সা জমিয়েছে। চেহারা ফিরে গেছে সংসারের।

বাগানের কুলি দিয়ে রান্না করানো নীহারের নানা কারণে আপত্তি ছিল বলে খারাপ শরীর নিয়ে নিজের হাতেই সব করত। এখানে কুলির পরিবর্তে নিশ্চিন্ত মনে বামুন ঠাকুর রাখছে সে। নতুন সব ফার্ণিচার করিয়েছে নীহার নিজে দেখেশুনে।

রেডিও আসছে। শহরের আর দশটি স্বচ্ছল পরিবারের মত নীহারও রেডিওর ফরমাস দিয়েছে। চিরদিনই অবশ্য নীহারনলিনী ছিমছাম রুচিসম্পন্না। কিন্তু বাগানে থাকতে যদিও ওর পরনে দেখা গেছে মোটা জমির সবুজ মারাঠী শাড়ি এখানে পরছে পাতলা চিকণপাড় ধপছায়া সুরাঠী। আগে দু'কানে ছিল বলু এখন হাস্‌হানা ফুলের ছাঁদের সরু লেডীজ দুল। রুলির পরিবর্তে চুড়ি হয়েছে, আর প্রথমটায় অবশ্য নীহারের লজ্জা করত—কিন্তু কথায় বলে চোখের অভ্যাস, ওর চেয়ে বয়সে অনেক বড় সাব-রেজিস্ট্রার স্ত্রীর মোহিনী বাবুর গৃহিণী ও আরো পাঁচজনকে দেখে দেখে অনায়াসে অক্লেশে সে এখন পাফ্‌হাতা ব্লাউজ পরছে। যেন এটাই স্বাভাবিক। এ না হলে অসামাজিক হবে।

নীহার হবে অসামাজিক।

চুপচাপ অন্ধকার জানালায় চোখ রেখে সেদিন সন্ধ্যা থেকে ও ভাবছিল। ঠোঁটের কিনারে হাসির মৃদু রেখা। চেয়ারম্যান মোহিনী নন্দীর মেয়ে লিলি নন্দী, সাব-রেজিস্ট্রারের মেয়ে অপরাজিতা, পুলিশ ইন্সপেক্টারের মেয়ে ডলি এবং জুনিয়ার উকিল রাধানাথ ও শ্যাম নাহার স্ত্রী এ'রা সব এসেছিলেন নীহার-নলিনীকে অনুরোধ করতে সমিতির কার্যকরী কমিটির সদস্য হতে সে রাজী আছে কিনা। "কাকাবাবু আমাদের ভয়ঙ্কর উৎসাহ দিচ্ছেন এ শহরে মহিলা সমিতি গড়া দরকার," সবচেয়ে অগ্রণী ও উৎসাহিনী হয়ে বড় বড় চোখ তুলে লিলি বলছিল, "আপনার অমত হবার কোনো কারণ নেই মিসেস সেন।"

যোগীনবাবুকে কাকাবাবু এবং যোগীন-বাবুর স্ত্রীকে কাকিমা না বলে মেয়েটি যে মিসেস সেন বলল, তাতে নীহার ভারি সন্তুষ্ট হয়েছিল। সুন্দর ঝকঝকে মেয়ে লিলি। রবারের হাতলের মতন গোল, বেঁটে, পাকানো বেণী কানে দুদিকে। তেঁতুল বীচির মত ছোট্ট কালো ফিতে পরানো ঘড়ি কব্জিতে। "আপনাকে একজিকিউটিভ কমিটিতে থাকতেই হবে"। বেণী দুলিয়ে লিলি সাদা ধবধবে দাঁতে হাসছিল।

অনিচ্ছা প্রকাশ করবে নীহার! তবে আর ডাক্তার কে, ডাক্তারের মাথায় এই আইডিয়া তুলে দিয়েছে কে। কে যোগাচ্ছে উৎসাহ উদ্যম অফুরন্ত প্রেরণা। "এই সময় এই সুযোগ", রাতদিন স্বামীর কানের কাছে চিৎকার করছে নীহার। "প্রচার করো নিজেকে,—প্রতিষ্ঠার সব চেয়ে সোজা উপায় জনপ্রিয়তার রাজপথে জোর কদমে এগিয়ে যাওয়া"। ডাক্তার স্থানীয় ক্লাবের সেক্রেটারী নিযুক্ত হয়েছে, এখানকার স্পোর্টস ইউনিয়ন তাকে প্রেসিডেন্ট করল সেদিন;—কারা একটা ডেয়ারী ফার্ম খুলেছে। যোগীন ডাক্তারের ওপর ভার পড়েছিল ফার্ম উদ্বোধন করার।

"আচ্ছা, আজ, এখুনি তো আমি মত দিতে পারছি না;—হ্যাঁ, আমার সহানুভূতি আছে পূর্ণ সমর্থন করছি, তোমাদের এই প্রচেষ্টা" বলে নীহারনলিনী অল্প হেসেছিল। খুশি মনে মেয়েরা চলে গেছে।

সেই হাসির রেশ এখনও মিলিয়ে যায়নি নীহারের ঠোঁট থেকে,—থেকে থেকে ও সারা সন্ধ্যা ভাবছিল সমিতির কথা।

কোথায় ছিল নীহার এতকাল, কোথায় পড়ে থাকত যোগীন ডাক্তার। না, পাহাড়ের যুগটা তাদের কলঙ্কের যুগ ব্যর্থতার দিন। সেই দিনের কথা নীহার ভুলে থাকতে চায়, স্রেফ মুছে ফেলতে চায় মন থেকে।

অবিচার তারা শুধু নিজের ওপর করেনি, সবচেয়ে বেশি অবিচার করেছে মেয়ের ওপর। কেন ওকে আটকে রাখা হত?

এই লিলি ডলির মত চেরীও কি এমন সুন্দর সহজ ফুরফুরে একটি মেয়ে হতে পারত না? টুক টুক করে ঘুরে ওদের সঙ্গে চাঁদা তুলতে পারত না। কোথায় ছিল সেই জঙ্গলে এই আবহাওয়া।

নীহার এখানে এসেই মেয়েকে মিশনারী স্কুলে ভর্তি ক'রে দিয়েছে। বিলম্বে পড়া আরম্ভ। এখানকার আধা সরকারী মেয়ে-স্কুলের ছোট মেয়েদের সঙ্গে বেমানান ঠেকাবে তাই মেম সাহেবের ওখানে মেয়ের পড়ার ব্যবস্থা।

নীহার চেরীকে বলে, তোমার যেখানে খুশি বেড়াতে যেও, একলা বা চাকর ভোলাকে সঙ্গে নিয়ে। রাত হবার আগে ঘরে ফিরলেই যথেষ্ট।"

চেরী স্কুলে যাওয়া ছাড়া আর কোথাও বেরোয় না, একেবারেই না। এজন্যে নীহারের বেশ দুঃখ হয় মাঝে মাঝে।

রাস্তার ধারের মেহেদীর বেড়া ধ'রে দাঁড়িয়ে থাকে মেয়ে। যেন বাইরে যেতে ওর ভয়।

ডাক্তার বলে, 'ঠাণ্ডা স্বভাবের মেয়ে কিনা তাই অত ঘোরাঘুরি পছন্দ করে না।'

"ঠাণ্ডা কি গরম তুমি বুঝবে কি।" উষ্ণ হয়ে উত্তর করে নীহার। 'কুকুর বেড়াল আর কুলির দেশে থেকে স্বভাব হয়েছে মেয়ের বুনো, এখানে ভাল ভাল মানুষ দেখে দূরে সরে থাকে।"

যেন মেয়ে বাইরে যাচ্ছে না। দুঃখে এখন আবার নীহারের হার্টের দোষ হবে, বাগানে থাকতে অসুখ বাড়ছিল, মেয়ে বাইরে যাবে আশঙ্কায়। ডাক্তারের এই ভয়। তাই মেয়ের হয়ে ওর কর্তব্যের ক্ষতিপূরণস্বরূপ, নিজেই যতটা পারছে, ডাক্তার সোশ্যাল হবার চেষ্টা করছে। নীহার কতকটা শান্তি পাবে ভেবে। ওর শরীর ভাল থাকবে। তাই কি?

অবশ্য ডাক্তারের বাড়ির সামনেটাও খারাপ না। রাস্তার ওপারে "মেনকা-মিনারে"র গায়ে বেগুণী লাল ইলেকট্রিক আলোর ফুল ঝলসে ওঠে সন্ধ্যা থেকে। সে যে কত সুন্দর দেখতে! বড় শহরের প্যাটার্ণে তৈরী ছোট শহরের এই সিনেমা হল। সকলের মুখে শুনছে নীহার। হলের ফ্লাস লাইট্ এখান অবধি ধুয়ে দেয়, ডাক্তারে বারান্দা, সিঁড়ি। মেহেদী বেড়ার গায়েও এসে ছিটকে পড়ে, আঁজলা আঁজলা আলো। আর বেড়ার গা ঘেঁসে তুমি দাঁড়াও, দেখতে পাবে মেনকা-মিনার-এর দু'ধারে সুন্দর সাজানো সব মণিহারী দোকান, চা-এর স্টল, চুল কাটার সেলুন, ডাইং-ক্লিনিং। ডাইং-ক্লিনিং-এর নাম হয়েছে 'মলিন-মুক্তি', কাপড়-ধোয়া দোকানের এমন সুন্দর নাম হতে পারে নীহার জানত না। সেলুনের নাম দেয়া হয়েছে 'প্রসাধন'; চা-এর স্টলগুলির নাম প্যারাডাইস, অবসর, বিশ্রাম-কুঞ্জ এইসব।

ক'দিন আর লাগল, দেখতে দেখতে এসব হয়ে গেল, নীহারের চোখের ওপর। নীহার দেখছে আর ভাল লাগছে ওর। কোথায় ছিল সে, কি ক'রে কাটিয়ে এসেছে এ্যাদ্দিন সেই তিমিরে ভেবে অবাক হয়।

চেরী বলে, 'কাজ কি বাইরে গিয়ে। এখানে আমাদের এই বেড়ার ধারে দাঁড়ালে সব কিছু তো দেখা যায়।'

'হ্যাঁ, সব দেখা যায়, বোঝা যায় নতুন, আধুনিক এক শহরে আমরা এখন বাস করছি।'

নীহার স্বীকার করে। মেয়েকে বলে, 'দেখা তো যাবেই। আমরা আছি যেখানটায়, সেটাই হার্ট অব দি টাউন। শহরের বুকের মাঝখানে রয়েছি।' তাই মেয়েকেও সময় সময় উপদেশ দেয়, 'বেশ তো, বাইরে না যাও, ওখানটায়, গেটু-এর কাছে গিয়ে বিকেলে একটু দাঁড়িয়ে থাকলেও তো পার। ঘরে বসে থাকলে চোখ-মুখ ফোটে কখনও। এমনিতে তোমার দেরীতে লেখা-পড়া আরম্ভ। কত লোক, কত ছেলেমেয়ে আসছে ওখানটায়।'

ক'দিন ধরে চেরী তা-ই করছে।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে বেড়ার ধারে। রাত হলেও নীহার মেয়েকে ঘরে ডাকে না। এ সময়েই সিনেমায় গানগুলো দেয়। গানগুলো পরিষ্কার শোনা যায়। ক'দিন ধরেই শুনছে নীহার। বলে মেয়েকে 'বরং ওখানে দাঁড়িয়ে গান ক'খানা যদি শিখে নিতে পারিস মা। আহা কি সুন্দর সুর, কথা—'বলে মা নিজেই গুণ গুণ করে ওঠে। নীহার চুপ করে জানালার দিকে চেয়ে থেকে এতক্ষণ একটা গান শুনছিল। চেরী বাইরে দাঁড়িয়ে শুনছে। কতকটা এই কারণে এবং লিলিরা দল বেঁধে আজ এসেছিল, তাই বিকেল থেকে নীহারের মনটা বড় বেশি ভাল লাগছিল।

না, আরো একটা কারণ।

গোলাপের কলির মত একটা আশা জেগে উঠেছে নীহারের বুকে।

রিক্সা করে ছেলেটি যখন অফিসে যায়, চেরী কি খুব মনোযোগ দিয়ে দেখছিল না? চৌকাঠের এপারে দাঁড়িয়ে নীহার লক্ষ্য করেছে।

অটলবাবুর ছেলে। নাম নিশানাথ। খুব ভাল চাকরি করছে। কেবল তাই নয়। ভারি চালাক-চতুর। জীবনে উন্নতি করবে এই ছেলে, সবাই তো বলছে।

ডাক্তারকে বলে দিয়েছে নীহার যদি আজ অটলবাবুর কাছে কথাটা তুলতে পারে। 'ছেলে হিসেবে এর চেয়ে ভাল ছেলে তুমি আশা করতে পার নাকি। তোমার মেয়ের নাক মোটা, বুদ্ধি মোটা। গায়ের রং ফর্সা বলেই তো আর নিশ্চিন্ত মনে বসে থাকতে পার না।' ডাক্তার হেসে ঘাড় নেড়েছে। বলেছে, 'চেষ্টা করব।'

কেননা, চেরী-সংক্রান্ত ব্যাপারেই নীহারের সকল অসুখের উৎপত্তি, সব ভুললেও ডাক্তার এ তথ্যটি ভুলত না এবং এ তথ্য উল্টাতে গিয়ে কতবার বিপদ ঘটেছে তা-ও ডাক্তারের মনে আছে। তাই সেবারের বড় অসুখের পর থেকে আর কিছু না হোক, অন্তত চেরী সম্পর্কে নীহার করণীয় ও অকরণীয় যখন যে সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছে ডাক্তার তাই মেনে নিচ্ছে। তবু স্ত্রী ভাল থাক। ডাক্তার-গিন্নী বারো মাস অসুস্থ লোককে শুনলে বলবে কি।

নীহার এখন তা-ই ভাবছিল।

হয়ত আজ ভদ্রলোকের একটা মতামত নিয়েও আসতে পারে ডাক্তার।

ঘড়ির কাঁটা যখন আটটা-নটা এবং দশটার কাঁটা পার হয়ে সাড়ে দশটার কাছাকাছি এসে ঝুলতে লাগল, বই বুকে নিয়ে তেমনি স্থির নির্বিকার হয়ে নীহার ইজিচেয়ারে শুয়ে রইল।

সিনেমার গান থামল। এখনও সব আলো নেভেনি। এখন পর্যন্ত চেরী বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ধৈর্যভরে রাস্তা দেখছে জেনে নীহার পুলকিত হয়ে উঠছিল। 'মেয়ের সুবুদ্ধি হোক, মেয়েকে সুবুদ্ধি দাও, ভগবান।' বলছিল মা মনে মনে।

ক্রমশ

# স্বাস্থ্য প্রসঙ্গ

## দুধের অভাব কে[illegible]

সুশান্ত সরকার
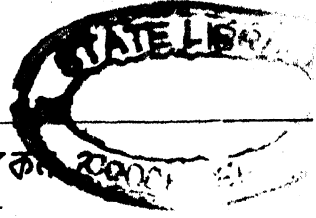
গান্ধীজী গরুর দুধ পান করতেন না, এ আপনারা সকলেই জানেন। সমগ্র দেশের গোজাতির ওপর নির্দয় অত্যাচার হয় এরই প্রতিবাদরূপেই তিনি গরুর দুধ পান করতেন না। গরুর ওপর যে অত্যাচার চলে, সে কথা মিথ্যা নয়, অনেকে হয়ত বলবেন যে, "আরে মশাই, নিজেরাই পেট ভরে খেতে পাই না ত গরুকে আবার খেতে দোব?" কিন্তু একটু ভেবে দেখুন আমাদের এই গরীব দেশে যার গরু রাখবার ক্ষমতা আছে, তার পেট ভরে খাবারও ক্ষমতা আছে। কিন্তু গরুর যত্ন তাঁরা অথবা যাঁরা খুব অর্থশালী তাঁরাও করেন না। গোয়ালাদের কথা বাদই দিলুম, তারা ত যে কোন উপায়েই হোক্, কম খরচে গরুর কাছ থেকে সর্বাপেক্ষা বেশী দুধ আদায় করে নেয় আর সেই গরু যখন আর দুধ দিতে পারে না, তাকে কসাইয়ের কাছে বেচে দেয়। গরুর প্রতি অযত্ন এত বেশী বেড়ে গেছে যে, দুধ নামক বস্তু ক্রমশ যেন অদৃশ্য হতে চলেছে। বহু পরিবার আছে যেখানে শিশু না থাকার জন্য জল-মিশ্রিত খাঁটি দুধও প্রবেশ করে না, এমন কি চায়ের জন্যও না, কেননা আজকাল ত গুঁড়ো দুধ কিনতে পাওয়া যায়। অথচ মজা দেখুন যে দেশের শিশুরা দুধের অভাবে মারা যাচ্ছে, সে দেশে ময়রার দোকানে ছানার প্রস্তুত মুখরোচক মিষ্টদ্রব্য রসগোল্লা, সন্দেশ ইত্যাদি যে কোন পরিমাণ সরকার বিক্রয় করতে দিচ্ছেন—অথচ মজা দেখুন এই সকল মিষ্টদ্রব্য বিক্রেতারা বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন যে, সরকার বিক্রয়-কর ধার্য করে "গরীবের গ্রাসাচ্ছাদনের ওপর হস্তক্ষেপ করছেন।" গরীবরা যেন সন্দেশ ইত্যাদি খেয়েই জীবনধারণ করে।

যাই হোক নানা কারণে এখন দেশে দারুণ দুগ্ধাভাব দেখা দিয়েছে অথচ দুধ না হলেও চলে না। মানুষ শুধু ভাত খেয়ে বাঁচতে পারে না, শুধু ফল খেয়ে বাঁচতে পারে না, শুধু মাছ-মাংস খেয়ে বাঁচতে পারে না, কিন্তু আর কোন খাদ্য না পেলেও মানুষ শুধু দুধ খেয়ে বাঁচতে পারে। দুধকে এই জন্যই বলা হয় "পূর্ণাঙ্গ খাদ্য।" তাই সকল খাদ্যের মধ্যে দুধই হল প্রকৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ দান।

দুধ দুষ্প্রাপ্য, দুর্মূল্য, খাঁটি দুধ পাওয়া যায় না ইত্যাদি দুধের বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ জমে উঠেছে, তথাপি বলতে হয় প্রতিদিন যেটুকু দুধ পাওয়া যায়, সেইটুকু দুধই পান করা উচিত, তার জন্য প্রয়োজন হয় আর অনোপকারী মুখরোচক কোন খাদ্য তালিকা থেকে বাদ দিতে হবে। প্রয়োজন হয় কয়েকটি পরিবার মিলে সমবায় পদ্ধতিতে গাভী প্রতিপালন করতে হবে। দেশের দুগ্ধসম্পদ বাড়াবার জন্য ইতিমধ্যে সরকারের ওপর চাপও দিতে হবে। সরকারের উদ্দেশ্য যাতে দ্রুত সিদ্ধ হয়, তার জন্য তার সংগে সহযোগিতা করতে হবে।

এমন যে সুখাদ্য দুধ তাতে কি আছে দেখা যাক্। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, শিশুরা দুধ না পেলে তাদের সম্যক্ পুষ্টি হয় না, তাদের শরীর যথোপযুক্ত বাড়তে পায় না, তা ছাড়া তারা রোগপ্রবণ হয়ে ওঠে, প্রায়ই তারা কোন না কোন রোগে ভোগে। পরিমাণমতো দুধ পেলে তাদের স্বাস্থ্য বেশ ভালই থাকে, শরীরেও বেশ একটা স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য দেখা যায়। এই দুধের অভাবের জন্যই আমাদের শিশুরা দুর্বল ও রুগ্ন।

দুধে আছে প্রচুর পরিমাণে সেই জাতীয় প্রোটিন, যে জাতীয় প্রোটিন খেলে উঠতি বয়সের ছেলেদের সুপুষ্টি হয়, আর বয়স্কদের অর্জিত স্বাস্থ্য বজায় থাকে। এই প্রোটিনের নাম হল ল্যাক্টালবুমিন ও কেজিন। বলা বাহুল্য, যে খাদ্যে প্রোটিন নেই, সে খাদ্য খাদ্য হিসেবে অত্যন্ত দুর্বল, তাতে কোন পুষ্টি নেই।

ল্যাক্টোজ নামে একপ্রকার শর্করাজাতীয় উপাদান, যা আর কোন স্বাভাবিক খাদ্যে পাওয়া যায় না।

দুধে আছে চমৎকার স্নেহজাতীয় খাদ্যোপকরণ। এই স্নেহ দুধ থেকে মাখন-রূপে বার করে নেওয়া হয়। এই মাখন যে কত ভাল খাদ্য, সে বিষয়ে বলা কিছু নিষ্প্রয়োজন। এই মাখন গালিয়ে যে ঘি প্রস্তুত হয়, তা আমাদের অত্যন্ত প্রিয় এবং তা যে আমাদের কত প্রিয়, তা বলা বাহুল্য মাত্র। ঘি যে কত জনপ্রিয়, সে বিষয়ে একটি গল্প প্রচলিত আছে। গল্পটি এখানে উল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

এক দরিদ্র বিধবার সবেধন নীলমণি পুত্রটি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। রোগ থেকে সেরে ওঠবার পরই কবরেজ মহাশয় ছেলেটিকে ভাতের সংগে গাওয়া ঘি খাবার নির্দেশ দিলেন। বিধবা অতি কষ্টে কোন এক প্রতিবেশীর কাছ থেকে একটু গাওয়া ঘি সংগ্রহ করে নিয়ে এল। ছেলেটি সেদিন ভাত খেতে বসেছে, বিধবা ছেলের ভাতে অল্প একটু ঘি দিয়েছে। ছেলেটিও সবেমাত্র দু-এক গ্রাস ভাত খেয়েছে। বিধবাও প্রায় সেই সংগেই জিজ্ঞাসা করল—"কি বাবা! একটু বল পাচ্ছ?"

গল্পটি হয়ত এমন কিছু অসাধারণ নয় কিন্তু ঘিয়ের ওপর আমাদের কতখানি দৃঢ় বিশ্বাস আছে, এটি তারই একটি উদাহরণ।

শরীর রক্ষার জন্য আমাদের খাদ্যে কিছু কিছু ধাতব লবণ থাকা প্রয়োজন। দুধে তার অভাব নেই। প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম দুধে আছে, আর আছে ফস্ফেট। ছেলেদের হাড় শক্ত করতে ক্যালসিয়ামের প্রয়োজন, আবার শরীরের মধ্যে যে অসংখ্য জীবকোষ আছে সেগুলিকে সজীব ও সক্রিয় রাখতে ক্যালসিয়াম ও ফস্ফেট উভয়েরই প্রয়োজন। পাঁচ গ্রে[ন] ওজনের চল্লিশটি বড়িতে যে পরিমাণ ক্যালসিয়াম থাকে, পাঁচ পোয়া আন্দাজ খাঁটি

দুধে সেই পরিমাণ ক্যালসিয়াম আছে। কয়েক প্রকার মাত্র শাকসব্জিতে এই পরিমাণ ক্যালসিয়াম থাকে। এই দুটি ছাড়া দুধে কিছু ম্যাগনেসিয়াম, লোহা ও গন্ধক আছে।

দুধে আছে প্রায় সব রকমেরই ভিটামিন, তবে ভিটামিন 'সি' কিছু কম পরিমাণে থাকে। যে সব গরু মাঠে চরতে পায় না, গায়ে রোদ লাগে না, সর্বদা বন্ধ খাটালে আবদ্ধ থাকে, তাদের দুধে ভিটামিন "ডি"-এর অভাব দেখা যায়। এই গরুর দুধ খেলে শিশুদের রিকেট হতে পারে, যদি না তাদের অন্য উপায়ে ভিটামিন ডি খাওয়ানো না হয়।

এ সমস্ত ছাড়া গরুর দুধে আরও নানা-রকম উপকরণ আছে যা অত্যন্ত উপকারী। তবে দুগ্ধের উপাদান কিংবা তার গুণ নির্ভর করে গরু কি অবস্থায় থাকে এবং কি তাকে খেতে দেওয়া হয়। মোট কথা, তাকে যদি প্রচুর রোদ হাওয়ায় থাকতে দেওয়া হয়, মাঠে চরতে দেওয়া হয়, আর ভাল খাদ্য দেওয়া হয়, তবে সে ভাল থাকবে তার দুধের সম্পদও বাড়বে, তা নইলে কেবলমাত্র জল আর ভূষি খেয়ে থাকলে আর কি হবে

আমাদের দেশে মোট যে পরিমাণ দুধ উৎপন্ন হয়, তা ভাগ করতে গেলে প্রতি লোক পিছু যৎসামান্যই পড়বে, অথচ গরুর সংখ্যা আমাদের দেশে বড় কম নয়। অনেক দেশে আমাদের চেয়ে গরুর সংখ্যা কম হলেও তারা এতই দুধ উৎপন্ন করে যে, নিজেরা খেয়েও অন্য দেশে উদ্বৃত্ত দুধ গুঁড়ো অথবা ঘনীকৃত করে চালান দেয়।

পাঞ্জাবীদের ভাগে সর্বাপেক্ষা বেশি দুধ জোটে, তারা মাথাপিছু প্রায় আড়াই পোয়া দুধ পায়, সৌরাষ্ট্রের লোকেরাও প্রায় কাছা-কাছি যায়, রাজস্থানের ভাগ্যে জোটে প্রায় আধ সের, আর আমাদের ভাগ্যে জোটে দেড় ছটাক। তবে সমস্ত দেশের হিসেব ধরলে আমাদের মাথাপিছু দুধ জোটে আড়াই ছটাক, ইংলন্ডের লোকেরা সেখানে দুধ পায় মাথাপিছু এক সের দু ছটাক, আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঁচ পোয়ারও অধিক।

পূর্ববঙ্গে দুধের একদা প্রাচুর্য ছিল অত্যন্ত বেশি, কিন্তু এখন সেখানেও দুগ্ধাভাব। গত মহাযুদ্ধের সময় লাভের জন্য এক শ্রেণীর ব্যক্তি ব্যাপক গো-হত্যা আরম্ভ করে, আইনের সাহায্যে এই নির্বিচার গো-হত্যা বন্ধ করা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া দুর্ভিক্ষের বৎসরও নানা কারণে বহু গরু মারা যায়। গরুর সংখ্যা অনেক কমে গেল, গরুর দামও বেড়ে গেল, সেই সঙ্গে বাড়ল গরুর খাদ্যের দাম। বহু ব্যক্তি গরুর খাদ্য সংগ্রহ করতে না পেরে কঙ্কালসার গরুগুলি কসাইদের কাছে বিক্রয় করে দিলে। দেশে দুধের দুর্ভিক্ষ দেখা দিল এবং সে দুর্ভিক্ষ এখনও চলছে। ইতিমধ্যে বিদেশ থেকে টিনে ভর্তি গুঁড়ো দুধ এসে না পড়লে কত শিশু যে মারা পড়ত, কে বলতে পারে? ভাল করে অনুসন্ধান করলে গরুর ও দুধের অভাব কেন হল, তার হয়ত আরও কারণ পাওয়া যাবে, কিন্তু তাতে দুধের সমাধান কোথায়। এখন চেষ্টা করতে হবে কিসে দুধ বাড়ে।

এদিক দিয়ে বোম্বাই সরকার কিছু অগ্রবর্তী হয়েছেন, তাঁরা একটা পথও দেখিয়ে-ছেন। কিঞ্চিদধিক সাড়ে চার কোটি টাকা ব্যয়ে তাঁরা এক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। যার দ্বারা বোম্বাই সরকারের সমস্ত গরু শহরের বাইরে নিয়ে যাওয়া হবে। শহরের বাইরে ত্রিশটি গোশালা এবং ডেয়ারী থাকবে, প্রতি গোশালায় ৫০০টি গরু থাকবে। গরুর মালিকের পরিবর্তন হবে না, মালিক যে ছিল, সেই থাকবে। ইতিমধ্যেই সাতটি গোশালা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে এবং আশাপ্রদ ফল পাওয়া গেছে। আরও আশা করা যাচ্ছে যে, নির্দিষ্ট সময়ের আগেই পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। দেখা গেছে যে, এর দ্বারা বোম্বাই শহরের প্রত্যেক লোক ন্যায্য মূল্যে উপযুক্ত পরিমাণে নির্দোষ খাঁটি দুধ পাবে। গোশালা বৃদ্ধির সঙ্গে গো-খাদ্য চাষ করবার জমির পরিমাণও বাড়ানো হচ্ছে এবং প্রায় নয় হাজার বিঘা জমিতে কেবলমাত্র পশু-খাদ্যের চাষ করা হবে। বোম্বাই শহরে দুধ বিলি করবার জন্য ইতিমধ্যে তিনশ'টির বেশি দুগ্ধ বিতরণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দুগ্ধ পরীক্ষা করবার জন্য একটি ল্যাবরেটারীও স্থাপিত হয়েছে।

বিদেশে গরুকে বিশেষ জাতীয় ঘাস যথা, লুমার্ন, নেপিয়ার (এদের বীজ আমাদের দেশেও বিক্রয় হয়) খাইয়ে, মশার কামড় ও মাছির উৎপাত থেকে রক্ষা করে, গরুর মড়ক নিবৃত্তি করে এবং সুপ্রজননের দ্বারা কি করে গরুকে ভাল রাখা হয়, তা আমাদের শিখতে হবে ও শেখাতে হবে। যথেষ্ট পরিমাণে থানায় থানায় গো-চিকিৎসক ও পশু- চিকিৎসালয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। অবশ্য এসব ব্যবস্থা ব্যক্তিগত উপায়ে সম্ভব নয়, সরকারকেই করতে হবে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

ইতিমধ্যে সরকারকে দেখতে হবে, দুধের অপচয় না হয় এবং যে দুধই পাওয়া যাক না কেন, তা যেন খাঁটিই থাকে। পচা পুকুর ও হাইড্রান্টের নোংরা জল ত' দেওয়া হয়ই, তাছাড়া দুধে আরও কত কি যে দেওয়া হয়, তার উল্লেখ না করাই ভাল। আমাদের মনে হয়, দেশের ও শিশুদের মুখ চেয়ে ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরা এদিকে কিছু দৃষ্টি দিলে অনেক বিষয়েরই প্রতিকার হতে পারে এবং রোগ-সংক্রমণও কমতে পারে।

কিছুকাল পূর্বে বাঙালোরের বিজ্ঞান পরিষদ সয়াবিন থেকে দুধ প্রস্তুত করে-ছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন যে, এই দুধ খাদ্য হিসেবে মোটেই নিকৃষ্ট নয়, পরন্তু গো-দুগ্ধের সমতুল্য পুষ্টিকর। এই দুধের সঙ্গে শতকরা ২৫ ভাগ গরুর দুধ মিশিয়ে দিলেই স্বাদে ও গন্ধে তা গরুর দুধের অনুরূপ হবে। এই দুধ উৎপন্ন করতেও বেশি খরচ হয় না। জাপানে সয়াবীনের দুধের ব্যাপক প্রচলন ছিল।

# ব্রিটেনে হস্তনির্মিত মৃৎশিল্পের পুনরুজ্জীবন

**চার্লস মেরিয়ট**

ব্রিটিশ হস্তনির্মিত মৃৎপাত্র শিল্প লইয়া যদিও অধুনা নূতনভাবে পরীক্ষা করা হইতেছে, তবু ইহা স্বচ্ছন্দে বলা চলে যে, এই শিল্পটির ঐতিহ্য বহু পুরাতনপ্রায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত 'হস্তনির্মিত' বলিতে বিশেষ কোন অবস্থাকে বুঝাইত না; কারণ, সমস্ত মৃৎপাত্রই হাতে তৈয়ারী করা হইত অর্থাৎ মৃৎশিল্পীর যে চক্রে মাটির ডেলা চূর্ণ ও মিশ্রিত করিত, তাহা হইতে মাটি নিয়া পাত্রাদি প্রস্তুত করা হইত।

'খালি হাতে' এই কথাটার মধ্যে হস্তনির্মিত মৃৎশিল্পের পুনরুজ্জীবনের কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। অন্যান্য যে কোন প্রকার খালি হাতে কাজের মত হস্তনির্মিত মৃৎশিল্পেও শিল্পী তাহার চাকচিক্যময় কল্পনা ও ভাবাবেগকে প্রত্যক্ষভাবে রূপ দিতে পারেন ফলে নির্মিত বস্তুর মধ্য আকৃতিগত সামঞ্জস্য না থাকিলেও শিল্পীর থাকে অবাধ অধিকার এবং ভারসাম্য রক্ষার সুবিধা।

রেনেসাঁর ফলে ক্ল্যাসিকাল নক্সা বা অংকনের প্রতি মানুষের যে ঝোঁক দেখা যায়, তার জনাই খালি হাতে নির্মাণ পদ্ধতির ধারাবাহিকতা আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে বর্জিত হয়। ক্লাসিক্যাল অংকনে একটা অংগসৌষ্ঠব ও ধারাবাহিকতা ছিল, যা খালি হাতের পদ্ধতিতে দেখা যায় না।

যোশিয়া ওয়েজউড (১৭৩০-১৭৯৫) ক্লাসিক্যাল নক্সার প্রতি ঝোঁকটাকে পূর্ণতার পথে লইয়া যান। তিনি সাধারণভাবে রবার্ট এডামের (১৭২৮-১৭৯২) নির্মাণ-কৌশলের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া কাজ করিতেন। তাঁহার প্রস্তুত মৃৎপাত্রাদির আলঙ্কারিক নক্সা আঁকিবার জন্য তিনি জন ফ্লাক্সম্যানকে আর. এ. (১৭৫৫-১৮২৮) নিযুক্ত করেন।

ওয়েজউডের রুচি ছিল চমৎকার। তিনি বৃটিশ মৃৎশিল্পের কারিগরি গুণের দিকটা যথেষ্ট উন্নতি করেন, কিন্তু ছাঁচ ও লেদ মেশিন ব্যবহার করার ফলে পুরাতন পদ্ধতির সহিত নূতন পদ্ধতির যে পার্থক্য ছিল, তার অনেকটা স্বচ্ছতা ও সজীবতা তিনি হারাইয়া ফেলেন।

স্ট্যাফোর্ডশায়ার পটারিগুলিতে এবং ফুলহ্যাম ও ল্যাম্বেথ প্রভৃতি স্থানে তখনও পুরাতন পদ্ধতিতে পাত্রাদি নির্মিত হইতেছিল। তাছাড়া এখনও পরম্পরাগত সেই হাত দিয়ে মাটির পাত্র গড়ার কাজ যে চলিতেছে, এমন দুইটি স্থানের নাম অন্তত করা যাইতে পারে। সেলিসবেরীর নিকটে ভেরউড পটারিতে আজও অসংস্কৃত মাটির বাসনাদি প্রস্তুত হয়। ঐসব বাসনের গায়ে হাতল লাগাইবার সময় বুড়ো আঙুলের ছাপ পড়ে যায়। এটা মধ্যযুগীয় পদ্ধতিরই চিহ্নবিশেষ। কাম্বারল্যান্ডের পেনরিথ শহরে ওয়েদারিগ পটারিতে কটা রঙের চকচকে বড় বড় প্যান ও জগ প্রস্তুত হয়। ঐসব মাটির ভাঁড়ের গায়ে থাকে শাদা শাদা রেখা আর বিভিন্ন ধারার কারুকার্য।

স্বভাবতঃই শিল্পে ও সাহিত্যে রোমান্টিক আন্দোলনের র‍্যাফেল-পূর্ব পর্যায় হস্তনির্মিত মৃৎশিল্পের পুনরুজ্জীবনের পথ প্রশস্ত করিয়াছিল। পাত্রের গায়ে যেসব কারুকার্য থাকে, প্রথমত তাহাই পরিবর্তন হয়। চীনের মৃৎশিল্পের সঙ্গে আর্টের দিক দিয়া ইংরেজ মৃৎশিল্পীদের পরিচয় হয় সেই যুগের শেষের দিকে। তাঁহারা বিদেশী শিল্পীর নিকট হইতে পাত্রে বিচিত্র কারুকার্য অংকনের রীতিটাই গ্রহণ করেন।

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকে বৃটেনের মৃৎশিল্পের সত্যিকারের পরিবর্তন সাধিত হয়। এই পরিবর্তনে উৎসাহ যোগায় চীনের পুরাতন মাটির পাত্রসমূহ। ঐসব পাত্রের কিছু সংগ্রহ এখনও পরলোকগত জর্জ ইউমোর্ফোপোলসের গৃহে রহিয়াছে। ঐসব চীনা-বাসনপত্রগুলি পরীক্ষা করিয়া, বিশেষভাবে সুঙ্ বংশের (খৃঃ ৯৬০-১৩৭৯) একরঙা প্রস্তরপাত্রগুলি পরীক্ষা করিয়া বৃটেনের মৃৎশিল্পীদের এই ধারণা হয় যে, কেবলমাত্র সুদৃশ্য কারুকার্যের উপরই পাত্রের সৌন্দর্য নির্ভর করে না। এজন্য প্রয়োজন পাত্রের কার্যকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা অনুসারে তাহার আকৃতি নিয়ন্ত্রণ।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, পুরাতন চৈনিক বাসনপত্র হইতে সূক্ষ্ম কারুকার্য করার যে পদ্ধতি শিক্ষা করা হইয়াছিল, তাহার সহিত ওয়েজউড-পূর্ব রীতির মিলনের ফলেই এই শিল্পের পুনরুজ্জীবন সম্ভব হইয়াছিল। রুচি বিজ্ঞানের দিক হইতে সমসাময়িক বৃটিশ হস্তনির্মিত মৃৎশিল্পকে ভাবাত্মক ভাস্কর্যের রূপায়নের সহিত উপযোগবাদের সংযোগ, যা কেবলমাত্র প্রতিরূপকও হইতে পারে বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে।

পাত্রের কার্যকারিতা ভেদে ঐ বৈশিষ্ট্যের বহু পরিবর্তন সাধিত হয়। কোন কোন মৃৎশিল্পী পাত্রের উপযোগিতা বৃদ্ধির দিকেই নজর দেন, আবার কেহ কেহ হয়ত পাত্রের নমনীয় প্রকাশের দিকেই দৃষ্টি দেন বেশি, ফলে উহার কার্যকারিতা বহুলাংশে ক্ষুণ্ণ হয়।

সাধারণভাবে বলা যায় যে, সমসাময়িক বৃটিশ হস্তনির্মিত মৃৎশিল্পের গঠন খুবই সাদাসিধা এবং বর্ণ গাম্ভীর্যপূর্ণ। পাত্রের

মৃৎশিল্পী মিঃ বার্ণার্ড লিচ। ব্রিটেনের মৃৎশিল্পের উন্নয়নে তাঁহার দান অবিস্মরণীয়

**ব্রিটেনের আধুনিকতম হস্তনির্মিত মৃৎপাত্রের নিদর্শন**

গাত্রে যেসব রঙ ব্যবহার করা হয়, তাহার মধ্যে ঈষৎ পীত, পিঙ্গল, হরিৎ, পাটল ও ধূসর বর্ণই প্রধান। অবশ্য পোর্সেলিন প্রভৃতি পাত্রে বর্ণাঢ্যের কোন অভাব হয় না। সাধারণত পুরু করিয়া বার্নিশ ব্যবহার করা হয়। ইহার ফলে একটা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ত্রুটি থাকিয়া যায়। ইহা হইতেছে অনেকটা অজ্ঞতাজনিত ত্রুটি; যেমন, গ্রামে অবসর বিনোদনেচ্ছু নগরবাসী মোটা পোষাক আর ভারি জুতায় নিজেকে সজ্জিত করিয়া নেয়, অথচ এমন সাবধানতার প্রয়োজন আছে বলিয়া গ্রামবাসী মনে করে না।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ভাবধারার সহিত সংযোগ সৃষ্টিকারীদের নাম উল্লেখ করিয়া পুনরুজ্জীবনের নায়কদের কথা বলা বোধ হয় সঙ্গত হইবে। সে হিসাবে আমরা বার্নার্ড লীচের নাম করিতে পারি। তিনি ১৮৮৭ খৃঃ হংকং-এ জন্মগ্রহণ করেন। লণ্ডনের স্লেড আর্ট স্কুলে পড়াশুনা করিবার পর তিনি দশ বৎসর জাপান ও চীনে অতিবাহিত করেন। সেই সময় তিনি স্থানীয় মৃৎশিল্পীদের সঙ্গে কাজ করেন। ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি কর্নওয়ালের সেণ্ট ইভস-এ একটি কুম্ভকারশালা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি স্থানীয় কর্দম হইতে প্রস্তর বাসন—ইহা মাটি ও পোর্সেলিনের বাসনের মাঝামাঝি দ্রব্য ও শিলপওয়ার প্রস্তুত করিতে থাকেন।

শিলপওয়ার অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যযুগ হইতেই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ইহা কপিশ অথবা খুব গাঢ় সবুজ বর্ণের চকচকে মৃন্ময় পাত্র। এই পাত্রগুলির উপরিভাগে ক্রীমের মত পাতলা মাটি দিয়া আস্তরণ লাগান হয়, এটা অনেকটা কেক-এর উপর দেওয়া চিনির আস্তরণের মত।

প্রাচ্যের রীতি ভালভাবে রপ্ত করিয়া লীচ স্বদেশীয়ের কার্যের উপযোগী করিয়া জগ, মগ, পানপাত্র, চা ও কফির এবং নানা প্রকার কারুকার্যখচিত ও অলঙ্কৃত পাত্র প্রস্তুত করিতে থাকেন। তিনি গৃহনির্মাণের জন্য চকচকে টালিও প্রস্তুত করেন।

সমসাময়িক মৃৎশিল্পীদের তুলনায় উইলিয়ম স্টেইট মারে যদিও মৃৎপাত্র নির্মাণ শিল্পকে সহজ নমনীয় ভঙ্গির দিকে আগাইয়া দিয়াছেন তবু বলা যায় যে, সৌন্দর্য বিচারের দিক হইতে লীচ ও মারের মধ্যে খুব বেশি সাদৃশ্য কিছু নাই। মারে ছিলেন একাধারে চিত্র ও মৃৎশিল্পী। ১৮৮১ খৃঃ তিনি লণ্ডনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বহু বৎসর লণ্ডনের রয়েল আর্ট কলেজের মৃৎশিল্পের শিক্ষক ছিলেন। বর্তমানে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় আছেন।

মারের প্রস্তুত দ্রব্যাদির গঠন যে খুবই সূক্ষ্ম ও অর্থবোধক, মৃগশিশু, সুরধ্বনি বসন্তের হাওয়া এবং বৃষ্টি প্রভৃতি নাম হইতে ইহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। ইহা দ্বারা অবশ্য একথা বোঝায় না যে পাত্রগুলি প্রাকৃতিক গঠনাকৃতির অনুকরণ অথবা নামের প্রতিপূরক, বরঞ্চ ইহা দ্বারা পাত্রগুলির সাধারণ আকৃতি বা ধরণ বোঝায়।

মাইকেল কারডিউ ধারাবাহিকতার শেষ সীমানায় গিয়াছিলেন। তিনি ডিভন ও কর্নওয়ালে অবস্থিত কুম্ভকারশালা পরিদর্শন করেন। এই দুই স্থানে ভেরউড ও পেনরিথের মত কটা রঙের কলস ও প্যান প্রস্তুত হইতে। তিনি কিছুদিন সেণ্ট ইভস-এ লিচের সহিত থাকিয়া প্রাচ্যের টেকনিক সম্পর্কে গবেষণা চালান। পরে তিনি কটসওল্ডস-এ উইঞ্চকম্ব-এ একটি ক্ষুদ্র কুম্ভকারশালা নেন এবং স্থানীয় কাদা দিয়া ডিনার পরিবেশনের উপযোগী শিলপওয়ার, চা ও কফি পাত্র, রাঁধিবার ও পরিবেশন করিবার মাটির পাত্র, মদের মগ ও জগ এবং শয়ন কক্ষের জগ ও বেসিন প্রস্তুত করিতে থাকেন। অধুনা কারডিউ পশ্চিম আফ্রিকায় কাজ করিতেছেন। তিনি স্টোন-ওয়ার টেকনিকের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছেন।

**বার্নার্ড লিচ ও মাইকেল কারডিউ কর্তৃক নির্মিত বিভিন্ন ধরণের মৃৎপাত্র**

মৃৎপাত্রে চিত্রাঙ্কনের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ডোডিন ১৭৬১ খৃঃ উহা অঙ্কিত করিয়াছেন। পাত্রটি ব্রিটিশ যাদুঘরে রক্ষিত আছে

যুদ্ধের পূর্বে আর যাঁহারা হস্তনির্মিত মৃৎশিল্পে নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে ক্যাথেরিন প্লেডেল বোভারী, নোরা ব্রাডেন, ডোরা বিলিংটন, উইলিয়াম গর্ডন ও উরসুলা মরটাইন সুপরিচিত। ইঁহার মধ্যে ডোরা বিলিংটন লণ্ডনের সেণ্ট্রাল স্কুল অব আর্টস এণ্ড ক্র্যাফটসের শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। যুদ্ধের ফলে যে বাধার সৃষ্টি হয় তাহার পরে সকলের পক্ষে আর মৃৎশিল্পে আত্মনিয়োগ করা সম্ভবপর হয় নাই।

এখানে বিশেষভাবে চার্লস ও নেল ভিসের নাম উল্লেখ করিতে হয়। শ্রীমতী ভিস একজন রসায়নবিৎ ছিলেন। তাঁহার সাহায্যে মিঃ ভিসের পক্ষে চীনের সুন্দরতম মাটির বাসনের মত চক্চকে বাসন প্রস্তুত করা সম্ভবপর হইয়াছিল। গঠনের দিক দিয়া তাঁহাদের নির্মিত পাত্রগুলি কেমন ভোঁতা আর বিসদৃশ, যদিও মূর্তিশিল্পী হিসাবে এবং চক্চকে মৃৎপাত্র নির্মাতা হিসাবে চার্লস ভিসের যথেষ্ট দক্ষতা রহিয়াছে।

নবীন ভাস্করদের মধ্যে কেহ কেহ সাধারণত জন্তু জানোয়ারের মূর্তি প্রস্তুত করিতেছেন। স্টাইলের দিক দিয়া ঐগুলি সূক্ষ্ম ও কল্পনায় চেলসা পোর্সেলিন বাসনপত্রাদি এবং পুরাতন স্ট্যাফোর্ডশায়ার ও ব্রিস্টল হইতে যেসব মৃৎপাত্র তৈয়ারী হয় তাহার মাঝামাঝি।

যুদ্ধের পরে আরও কয়েকজন নবীন মৃৎশিল্পীর পরিচয় জানিতে পারা গিয়াছে। স্টেইট মারের ছাত্র এইচ ফনন হ্যামণ্ড ফার্নহাম আর্ট স্কুলে শিক্ষকতা করিতেছেন। তিনি বাসনের রূপসজ্জা ও গঠনের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া প্রস্তরবাসনপত্রাদি প্রস্তুত করিতেছেন। মার্গারেট লিচ বার্নার্ড লিচের ছাত্র- তাঁদের ভিতর কোন রক্তের সম্পর্ক নেই। তিনি মনমাউথের কাছে ব্রকওয়ারে শিল্পওয়ার প্রস্তুত করিতেছেন। জন বো ও রেজিনাল্ড মার্লো বিচিত্রভাবে অঙ্কিত ডিস প্রস্তুত করিতেছেন।

ইংলণ্ডে হস্তনির্মিত মৃৎশিল্পের পুনরুজ্জীবনের পর ব্যবসা বাণিজ্যে ইহার প্রভাব ছড়াইয়া পড়িয়াছে। গৃহে ব্যবহারের জন্য যে সব বাসনপত্র পাইকারী ভাবে প্রস্তুত হইতেছে তাহাতেও কারুকার্যের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে। প্রতিযোগিতামূলক মূল্য দ্বারা হস্তনির্মিত ও ফ্যাক্টরীতে প্রস্তুত মাটির বাসনপত্রের মূল্যের মানের ফাঁক পূর্ণ করার চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু দ্রুত নির্মাণের ফলে উৎপাদনে কিছুটা ঝুঁকি থাকিয়াই যায়। তবে ঐ পুনরুজ্জীবনের ফলে হস্তনির্মিত ও কলে প্রস্তুত দ্রব্যাদির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিশ্লেষণ করার সুযোগ হইয়াছে।

উভয় প্রকারে নির্মিত বাসনপত্রেই সুঅঙ্কন সম্ভব, কিন্তু হস্তনির্মিত দ্রব্যাদিতে

সৌন্দর্যমণ্ডিত জলপাত্র। ষোড়শ শতাব্দীর মৃৎপাত্রের নিদর্শন

যত সুন্দর করিয়া কারুকার্য করা সম্ভব কলে প্রস্তুত দ্রব্যাদি তাহার তুল্য হইতে পারে না। এ প্রশ্নের মীমাংসার জন্য সব কিছু তাল-গোল না পাকাইয়া শ্রম বিভাগ করাই উচিত।

গুরু-সংগ্রহ করা যে অন্যায় কাজ, তা বলতে চাই না। বরঞ্চ যথাসময়ে দীক্ষা গ্রহণ একটি সংস্কার বিশেষ, ধর্মজীবন আর সদাচার প্রভৃতি মানসিক উচ্চবৃত্তিরই পরিচয়। গুরু গ্রহণের স্বপক্ষে যেসব যুক্তি আছে, সেগুলো বোঝা এমন কিছু কঠিন নয়। প্রত্যেক সভ্য-সমাজেই ধর্মের বিশিষ্ট স্থান আছে। এবং সে ধর্ম পালন করার জন্য, তার যথার্থ ব্যাখ্যার জন্য একজন উপদেষ্টার প্রয়োজন। পাদ্রী, মৌলবী, গুরুর জন্ম এই কারণেই সম্ভব হয়েছে। কিন্তু অধ্যাত্ম সাধনার পথ চিনে নেবার জন্য বিজ্ঞ ও হিতার্থী গুরুর উপদেশ এক জিনিস; আর ব্যক্তি নিরপেক্ষ, অহেতুক এবং অন্ধ গুরুভক্তি আর এক জিনিস। যিনি বুদ্ধিবাদী, যুক্তি ও বিচারপন্থী, তিনি জ্ঞানমার্গ ছাড়া অন্য পথ অবলম্বন করতে নারাজ। কেন না তিনি বিবেককে চোখ ঠেরে, বুদ্ধিকে ঘুম পাড়িয়ে, গুরুভক্তির মতন মৌতাত সেবনে অনিচ্ছুক। অবশ্য স্বামী বিবেকানন্দের মতন ধীমান, সংশয়বাদী ব্যক্তিকেও পরমহংসদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে হয়েছিল। কিন্তু এই ধরণের অসাধারণ ঐশ্বরিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষের কথা হচ্ছে না। পৃথিবীতে যীশু, বুদ্ধ, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ একবারই আবির্ভূত হন। গান্ধীজীকেও শিষ্য সংগ্রহ করতে বেরুতে হয়নি। অবর্ণনীয় ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে স্থূল, জড়বাদী ও কুটিল সত্তাও আপনা হতেই মাথা নত করে মহাত্মার কাছে।

জনসাধারণের গুরুপ্রীতি এবং অন্ধ, অর্ধোন্মাদ, কামনাপূর্ণ ব্যাকুলতার কথা উত্থাপন করছি এই কারণে যে, এ জিনিসটা উন্নতির সহায় না হয়ে চারিত্রিক অবনতির কারণ হয়ে দাঁড়ায় অনেক সময়ে। মানুষ নিজে কিছুমাত্র ভাবতে শেখে না। যা বলেন, যা করান গুরুদেব। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একজন কুলগুরু থাকেন এবং যথাসময়ে তাঁর কাছে সস্ত্রীক দীক্ষিত হওয়া গার্হস্থ্য আশ্রমধর্মের অঙ্গবিশেষ। এতে কোনও আপত্তির কারণ নেই। কিন্তু আপত্তি ওঠে যখন নিতান্তই পার্থিব কামনা নিয়ে বিপদে-আপদে গুরুদেবের শরণাপন্ন হই। গুরু যদি প্রকৃত গুরু হন, তিনি শিষ্যকে নিষ্কাম ধর্মাচরণ দ্বারা আত্মাকে শুদ্ধ ও সংযত করতে শিক্ষা দেবেন। কিন্তু মোটামুটি দেখতে পাই, গুরু শিষ্যদলের প্রীতি ও সন্তোষ বিধানের জন্য অকারণ বাগবাহুল্য করছেন এবং ব্যয়-বাহুল্য করাচ্ছেন। দৈবশক্তির প্রত্যক্ষ পরিচয় পেতে মানুষ, সর্বদাই উন্মুখ। তাই গুরুর মারফৎ শিষ্য চান "মিরাকল।" আপনার প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য অনেক গুরুকে তাই নীচু ধরণের কৌশল অবলম্বন করতে হয়। যদি অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন থাকে, তাহলে গুরুর অনুষ্ঠিত প্রক্রিয়া অথবা ভবিষ্যৎ বাণী সফল হয় নিতান্তই ঘটনার আকস্মিক পরম্পরায়। তখন শিষ্যরা অন্ধ ভক্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে স্তুতিগান জুড়ে দেয়। যিনি খাঁটি সাধক প্রকৃতির মানুষ, তিনি গুরুর কাছে পারমার্থিক শান্তি ও কল্যাণ ছাড়া অন্য কিছু কামনা করেন না। আর যিনি সত্যিকারের গুরু, তিনিও উপদেশ ছাড়া অন্য কিছু বিতরণ করেন না। বিভূতির মায়া দেখিয়ে তিনি আপনাকে খেলো করেন না অথবা ঈশ্বরকে অবমাননা করেন না।

আমার মনে হয়—কথায় কথায় গুরুদেবের কাছে ছুটে যাওয়া, তাঁর পাদোদক সেবন করা ইত্যাদি কাজগুলি মানুষ স্বেচ্ছায় করে না। অনেকটা যন্ত্রচালিত হয়ে মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় করে। গুরুর কাছে মানুষে লজিক চায় না, চায় ম্যাজিক। চায় এমন ঐশীশক্তির নমুনা—যাতে বিপদ পালায়, সৌভাগ্য করতলগত হয়, চোখ বুজে অল্পদিনের মধ্যেই ব্রহ্মলাভ হয়। বিপদের সময় লোকে যেমন যায় জ্যোতিষীর কাছে ভাগ্য-গণা করাতে কিংবা কোষ্ঠী-বিচারে অশুভ রিষ্টি খণ্ডন করাবার জন্যে শান্তি স্বস্ত্যয়ন প্রভৃতির ব্যবস্থা করে, গুরুদেবের কাছেও তেমনি শিষ্যদল ছোটে অনেকটা এই মনোভাব নিয়ে। তাই অনেক বুদ্ধিমান গুরুকে জানতে হয় 'নিউরসিস্' পীড়িত শিষ্যদের গোপন আকাঙ্ক্ষা আর দুর্বল মুহূর্তগুলিকে। তাতে সুবিধা আছে। পারিবারিক ব্যাপারে; সম্পত্তির বণ্টনে, উইল তৈরি অথবা মামলা চালানো প্রভৃতি কাজেও আধুনিক যুগের গুরুরা অনেকে সময়ে আসরে নেমে পড়েন। হয় তো দেখেছেন—বহু সংসারে মনোমালিন্য প্রবেশ করেছে, এমন কি সাংসারিক সুখ-শান্তি নষ্ট হয়ে গেছে কর্তার গদগদ গুরু-ভক্তিতে আর গুরুর অহেতুক মধ্যবর্তিতায়। স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনও ভেঙ্গে গেছে এক পক্ষের গুরুভক্তি-রূপ স্নায়ু দৌর্বল্যে এবং গুরুর অকারণ হস্তক্ষেপে।

বলা বাহুল্য এসব গুরু গুরু নয়, অন্য কিছু। দুটি পা থাকলেই যেমন মানুষ হয় না, দুখানি পাখা থাকলেই যেমন পাখী হওয়া যায় না, তেমনি গলায় রুদ্রাক্ষের মালা পরে শিষ্যদের কানে 'হ্রীং ক্রীং' মন্ত্র দিলে আর কোমলাঙ্গী শিষ্যাদের মধুর সেবাস্পর্শ নিলেই গুরু হওয়া যায় না। বর্তমান যুগে গরুর ঘাস থেকে জ্ঞান চর্চা পর্যন্ত সব কিছুর মধ্যেই ভেজাল ঢুকেছে। জাতীয় চরিত্রের অবনতিক্ষণে ছাত্র-শিক্ষক, মক্কেল-উকীল, রোগী-ডাক্তার আর শিষ্য-গুরুর পারস্পরিক সম্পর্কের রূপান্তর ও অর্থান্তর ঘটেছে। তাই অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন অষ্ট-শ্রী-মণ্ডিত বহু তীর্থ পরিভ্রমণকারী গুরুদেব বিজ্ঞাপন দেখতে পাই কাগজে-কলমে। কিন্তু কাছে গিয়ে অনেক সময়ে পাই কথামৃতের রসাস্বাদ নয়, ছেঁদো কথা আর চতুরালির ঘোলা জল। আমার মনে হয়—যাঁরা সদগুরু, তাঁরা লোকচক্ষুর অন্তরালে প্রচ্ছন্নই থাকেন নয়তো হাল-চাল দেখে, উৎকট এবং অন্ধ সংস্কারের মানসিক বিকারগ্রস্ত শিষ্য-শিষ্যাদের কবল থেকে পালিয়ে বাঁচেন।

সম্প্রতি এমনতর একটি ঘটনা স্বচক্ষে দেখে বিচলিত হলুম। আর সেই প্রসঙ্গে এত কথার সৃষ্টি হল। গিয়েছিলুম স্টেশনে একজন বিশিষ্ট আত্মীয়কে গাড়ীতে তুলে দিতে। আমরা উভয়েই অন্যমনস্ক ছিলুম। তাই একটি কম্পার্টমেন্টের সামনে অকারণ জনসমাগম তেমন লক্ষ্য করিনি। পরে অনুসন্ধান করে জানলুম ঐ কম্পার্টমেন্টেই আমার আত্মীয়ের বার্থ। অনেক কষ্টে মালপত্র নিয়ে কুলীর সাহায্যে আমি একলাই গাড়ীতে প্রবেশ করলুম। আমার নিরীহ আত্মীয়টি তখনও পাদানিতে পদার্পণ করতে পারেন নি। তার কারণ, ইতিমধ্যে গাড়ির সামনে বিশ গজের মধ্যে এত নরনারী বালক-বালিকার ভিড় জমে গেছে যে ত্রিসীমানায় আসা অসম্ভব। অনেকক্ষণ লক্ষ্য করে একজন নগ্নপদ চন্দন-চর্চিত, মুণ্ডিতমস্তক ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলুম, ব্যাপারটা কি? তিনি জবাব দিলেন না। বিছানাটা বার্থের ওপর ছুঁড়িয়ে দিয়ে প্রথম যৌবনে যে কৌশলে ক্যালকাটা-মোহনবাগানের ফাইনাল খেলায় ঢুকেছিলুম, সেই কৌশল অবলম্বন করেই গাড়ির শ্বাসরোধকারী ভিড়ের ভিতর থেকে প্ল্যাটফর্মে বেরিয়ে এলুম। দেখলুম সকলের মুখেই একটা অধীর প্রতীক্ষা, ব্যাকুলতার ছাপ। পরে জানতে পারলুম সাধু-বাবা আজ চলে যচ্ছেন। সকলেই তাঁর কৃপাশ্রিত অথবা কৃপাপ্রার্থী। কিন্তু কেউই বলতে পারলেন না, তিনি কে, তাঁর নাম কি, তিনি কোন প্রদেশের অধিবাসী আর কোথায়ই বা তিনি চলেছেন। একজন অন্তরঙ্গ বৃদ্ধ শিষ্য কেবল বললেন, "ওঁর সম্বন্ধে কেউ কিছুই জানে না। বছরে একবার আসেন, তার পর আমাদের কাঁদিয়ে চলে যান। এত ভাষা জানেন যে কোন্ দেশের লোক বলা শক্ত। বয়স জানা কঠিন, চল্লিশ বছর আগেও ওঁকে ঠিক এই রকমই দেখেছি। কোনও পরিবর্তন হয়নি। কথা বলা ছেড়ে দিয়েছেন বছর পঁচিশ আগে। এখনও মৌনী।"

সাধুবাবা এলেন, নিমেষে পথ হয়ে গেল এবং সে সুযোগে আমি ও আত্মীয় দুজনেই ঢুকে পড়লুম তারপর গাড়ি ছাড়া পর্যন্ত সে কী দৃশ্য। অর্ধোন্মাদ শিষ্য-শিষ্যার সে কি হুড়ো-হুড়ি, বারবার প্রণাম, পা জড়িয়ে শুয়ে থাকা আর কান্না! তিনি নিরুপায়। স্মিতমুখে হাত-জোড় করে বসে আছেন। শ্রদ্ধা হল। দূরে থেকে নমস্কার জানালুম। মনে মনে বল্লুম—বুঝেছি সাধুজি! কিসের ঠেলায় মৌনী হয়েছেন আর ঠিকানা না দিয়ে পালিয়ে বেড়ান।

**স্বায়ত্তশাসনশীল** প্রদেশসমূহের ভিত্তির উপর রাষ্ট্রসংঘ গঠিত হইবে। কিন্তু ভারতরাষ্ট্রে সেই ভিত্তি—ঈর্ষা ও সন্দেহে কিরূপ দুর্বল হইতেছে, তাহা লক্ষ্য করিয়া ভারত সরকারের সাহায্যদান ও পুনর্বসতি সচিব শ্রীমোহনলাল সাকসেনা বলিয়াছেন—সাহায্যদান ও পুনর্বসতি কার্যে সরকারের চেষ্টা আশানুরূপ ফলবতী হয় নাই, কিন্তু বাঙালীরা যেন বাঙালী ও অবাঙালী অঞ্চল লইয়া কোন বিতর্ক উত্থাপিত না করেন। তিনি বলেন—পূর্ব পাকিস্তানের আশ্রয়প্রার্থীদিগকে আসামে ও বিহারে স্থানদানের কথা বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু আসামের জননায়কদিগের ভয়—বহুসংখ্যক বাঙালী আসামে যাইলে আসাম আর আসামী প্রদেশ থাকিবে না—বাঙলা হইয়া যাইবে। বিহারীদিগের মনেও অনুরূপ আশংকা থাকিতে পারে। রাষ্ট্রের ভিন্ন ভিন্ন অংশে যদি এইরূপ প্রাদেশিক ভাব থাকে, তবে যে সে সকল অংশের রাষ্ট্র সম্বন্ধে কর্তব্যবোধ দৃঢ় নহে, তাহা অবশ্য-স্বীকার্য। শ্রীমোহনলাল সাকসেনা যে আশংকার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাই যে আসাম ও বিহার উভয় প্রদেশের সরকারের বাঙালী নিপীড়নে উগ্র উপায় গ্রহণ করিয়াছে এবং কেন্দ্রী সরকার তাহার প্রতীকার করিতে পারেন নাই, তাহা অস্বীকার করিয়া কোন লাভ নাই। কেন্দ্রী সরকারে যাঁহার প্রভাব প্রবল, সেই বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ যে বিহারের বঙ্গ-ভাষাভাষী অঞ্চলে বঙ্গ-ভাষাভাষীদিগকে হিন্দী ভাষাভাষীতে পরিণত করিবার জন্য আবশ্যক ব্যবস্থা না করায় হিন্দী সমিতিকে তিরস্কার করিয়াছেন, তাহা সকলেই জানেন। বিহার সরকার বিহারে বঙ্গ-ভাষাভাষী অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গভুক্ত করিয়া কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতি রক্ষার চেষ্টাকারীদিগের প্রতি খর দৃষ্টি রাখিবার জন্য পুলিশকে যে নির্দেশ দিয়াছেন, তাহাও অপ্রকাশ নাই।

গত দোলযাত্রা উপলক্ষ্য করিয়া মানভূম, পুরুলিয়ায় যে ব্যাপার ঘটিয়াছে, স্বর্গীয় নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রতিষ্ঠিত 'মুক্তি' পত্রে তাহা "ভাষা ও বর্ণনার অতীত" বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। আমরা আশা করি, যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিহারে পূর্ববঙ্গ হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থীদিগের শতাংশের একাংশকেও বাস করাইবার ব্যবস্থা করিতে অক্ষম হইয়া কয়শত হিন্দুকে আন্দামানে পাঠাইয়াছেন, সেই সরকার মানভূমের সহযোগীর প্রদত্ত বিবরণ পাঠ করিবেন। তাহা হইলে তাঁহারা স্বীকার করিবেন যে, ঘটনা অতর্কিত নহে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সহযোগী সম্পাদকীয় প্রবন্ধে মন্তব্য করিয়াছেনঃ—

"হোলীর দুইদিনব্যাপী যে ঘটনা ঘটিয়া গেল, তাহা আগাগোড়া ভাল করিয়া পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, একদিক হইতে একটা পূর্বনির্দিষ্ট ব্যবস্থা ও কার্যক্রম অনুযায়ী, একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারেই ঘটনার প্রবাহ চলিয়াছে। জনসাধারণের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়া একটা গোলমাল বাধাইয়া তাহার সুযোগ লইয়া পুরুলিয়ার বাঙলা ভাষাভাষী জনসাধারণকে একটা নৈতিক শিক্ষা দিবার অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্যে হোলীর সমস্ত অভিযান পরিচালিত হইয়াছে।"

এই নৈতিক উদ্দেশ্য কি, তাহা পিশাচ জেনারেল ডায়ার পাঞ্জাবে ওডয়ারী শাসনে ব্যক্ত করিয়াছিল। তাহার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। মানভূমে বাঙালীদিগের প্রতি যে দুর্ব্যবহার হইতেছিল, তাহা দেখিবার জন্য শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ যখন গান্ধীজীকে তথায় যাইতে অনুরোধ করেন, তখন তিনি উত্তরে লিখিয়াছিলেনঃ—

"ভাই অতুলবাবু, আমি কি করিতে পারি? চিরকাল যুবক থাকিতে পারি না। সেইজন্য যে সেবা আমি এক স্থানে বসিয়া করিতে পারি, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকুন। মানভূমবাসীদিগকে বলিবেন যে, অহিংসার দ্বারা আমি সব কিছুই করিতে পারি এবং উহার প্রতীক -চরকা। বাপুর আশীর্বাদ।"

এই অহিংসার মর্যাদা আজ কিভাবে রক্ষিত হইতেছে, তাহা বিহারের ব্যবস্থা পরিষদে শ্রীনুরলীমনোহর প্রসাদের উক্তিতে বুঝিতে পারা যায় "অন্য কোন সরকার হইলে মানভূমের (বাঙালী) আন্দোলনকারীদিগকে তোপে উড়াইয়া দিত।" আজ তবে অহিংসার প্রতীক আর চরকা নহে- কামান।

স্বাধীনতা ভারতবাসীর প্রাণবায়ু, তাহা দূষিত করিবার জন্য যে প্রচেষ্টা চলিতেছে, তাহা হইতে তাহাকে মুক্ত করিবার কাজই বর্তমানে ধর্ম মনে করিয়া মানভূমবাসীরা সত্যাগ্রহের আয়োজন করিয়াছেন। মানভূম জিলা কংগ্রেস সমিতির পদত্যাগী সভাপতি ও জিলার লোকসেবক সঙ্ঘের সভাপতি শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ সে সম্বন্ধে এক বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। তাহা হইতে কয়টি অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইলঃ—

(১) "স্বরাজ-জীবনে আমরা এক নূতন রূপে সত্যাগ্রহ-সংগ্রামের দিকে অগ্রসর হইয়াছি। ইহা আজ আমাদিগের জীবনে অপরিহার্যরূপে উপস্থিত হইয়াছে।"

(২) অন্যায়ের ও দুর্নীতির প্রতীকারের প্রয়োজন আজ দেখা দিয়াছে। অন্যায়ের প্রতীকার প্রতীক্ষা করিয়া অন্যায় সহ্য করিতে থাকা জনগণের আত্মশক্তি ক্ষুন্নকারী। তাহাতে আত্মশক্তিবোধ ও আত্মমর্যাদা জাগৃতি লোপ পায়।........মানভূমের জীবনে অন্যায়ের যে গুরু অবস্থা দেখা দিয়াছে, তাহাতে আজ সত্যাগ্রহ আমাদিগের অবশ্য করণীয়।"

(৩) "আজ মানভূমের জনগণকে বহুভাবে বিনষ্ট করিবার চেষ্টা হইতেছে। তাহাদিগের নৈতিকবল নষ্ট করিয়া, তাহাদিগের মধ্যে হিংসা দ্বেষ প্রবর্তিত করিয়া, তাহাদিগকে বিশৃঙ্খল জীবনের পথে প্ররোচিত করিয়া মানভূমে অরাজকতা আনিবার চেষ্টা চলিতেছে। আজ ব্যাপকভাবে দ্রুত জনসংযোগ করিয়া জনগণকে ঐ সকল পথ হইতে নিবৃত্ত করিয়া জিলার জীবন শান্তিপূর্ণ ও শৃঙ্খলাসম্পন্ন করিতে হইবে। এই বিপজ্জনক অবস্থা আমাদিগকে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করার উপযোগিতা বিশেষভাবে অনুভব করাইয়াছে। আমরা ইতোপূর্বেই এক কার্যে অগ্রসর হইব, মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু যাঁহারা বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা ঘটাইয়া অবাঞ্ছিত উদ্দেশ্য সাধন করিতে চান, তাঁহারা আমাদিগের শান্তিপূর্ণ কল্যাণকর প্রচেষ্টা তাঁহাদিগের অন্যায় কার্যের বিঘ্ন মনে করিয়া আমাদিগের জনসংযোগের পথে বাধা সৃষ্টি করিয়াছেন। বাধা সৃষ্টির জন্য ইঁহাদিগের হাতে অস্ত্র আছে—নিরাপত্তা আইন। আমাদিগের জনসেবার কর্তব্য আরম্ভ হইলেই এই আইনের দ্বারা আমাদিগের কার্যে ব্যাঘাত যে আসিবে, ইহা সহজেই অনুমেয়। নিরাপত্তা আইনের অনুমতি চাহিবার কথা আজ আমাদিগের কাছে নাই।"

সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইলে যে স্বদেশী শাসকদিগের দ্বারা উৎপীড়ন হইবে ইহা জানিয়াই এই সঙ্কল্প গৃহীত হইয়াছে। এখন কি হয়, তাহা দেখিবার জন্য আমরা উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিব। মুক্তি লিখিয়াছেন—

"যাহাদের হাতে শাসনের দায়িত্ব, শান্তি-রক্ষা করিবার ভার ও ক্ষমতা থাকে—তাহাদেরই হাতে যদি দেশবাসী জনসাধারণের নিরাপত্তা বিপন্ন হয়—শান্তিরক্ষা করার জন্য অর্পিত ক্ষমতা অশান্তি ও অসদুদ্দেশ্যে অনিয়ন্ত্রিত ভাবে ও অবাধে প্রযুক্ত হয়, তবে তাহা অপেক্ষা চরম দুর্দৈব কোন দেশেই আর হইতে পারে না।"

বিহারের ব্যবস্থা পরিষদে মানভূমে বাঙালীর প্রতি অত্যাচার ও অনাচারের বিষয় বাঙালী সদস্যাদিগের দ্বারা বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছিল। সরকার পক্ষ সে সকলের প্রতিবাদ করিতে পারেন নাই। বাঙলা যাহাদিগের

মাতৃভাষা তাহাদিগকে মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের জন্মগত অধিকারে বঞ্চিত করিবার কোন যুক্তিই সরকার পক্ষ দেখাইতে পারেন নাই। তাঁহারা কেবল ইংরেজদিগের মত জপমালা করিয়া বলিয়াছেন—মানভূম জিলার বাঙলা অধিকাংশ অধিবাসীর মাতৃভাষা নহে। আর মুরলী-মনোহর প্রসাদ উদ্ধতভাবে বলিয়াছেন, বিহারে বাস করিলে হিন্দী ভাষা শিখিতেই হইবে।

বিহারে বাস করিতে হইলে যদি হিন্দী ভাষা শিক্ষা করা বাধ্যতামূলক হয়, তবে কি পশ্চিমবঙ্গে বাস করিতে হইলে বিহারী, উড়িয়া, মারবারী প্রভৃতির পক্ষে বাঙলা ভাষা শিক্ষা করা বাধ্যতামূলক বিবেচনা করিলে, তাহা কি অসঙ্গত হইবে? যখন বিহারে সরকারের ব্যবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছিল, তখন সে কাজের ভার একজন বাঙালী পাইয়াছিলেন। তিনি ভূদেব মুখোপাধ্যায়। শিক্ষার প্রচার জন্য তিনি বিহারীদিগকে তাহাদিগের মাতৃভাষা হিন্দীতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তখন বিহার বাঙলার অন্তর্ভুক্ত। হিন্দী ভাষার দৌর্বল্য ও হিন্দী সাহিত্যের দারিদ্র্য বিবেচনা করিয়া ভূদেববাবু অনায়াসে বিহারে বাঙলা ভাষাকে প্রাথমিক শিক্ষার বাহন করিতে পারিতেন। কিন্তু শিক্ষাব্রতী ভূদেববাবু তাহা করেন নাই। কলিকাতা কর্পোরেশন তাঁহার পরিচালিত অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়-সমূহে হিন্দী ভাষাভাষীদিগের পুত্রকন্যাদিগকে হিন্দীতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বিহারে মুরলীমনোহর প্রভৃতির উদ্ধত ও অসঙ্গত ব্যবহারে কি কলিকাতার করদাতারা দাবী করিতে পারেন না—কলিকাতায় অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে হিন্দীতে শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা বন্ধ করা হউক? বাঙালীরা মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা বিস্তারের পক্ষপাতী। তাঁহাদিগের বিশ্বাস—

"The forming of an alien language only serves to dry up, at their very sources, the very fountain springs of national power and thus impoverishes the nation on the side of initiative and originality."

বিহারে যদি বাঙালীদিগকে সেই দুর্ভোগ ভোগ করিতে হয়, তবে কি বাঙালীরা অন্য ভাষায় লোককে শিক্ষা প্রদান অর্থের অপব্যয় বলিয়া বিবেচনা করিতে পারেন না? হিন্দী রাষ্ট্র ভাষা হইবে কি না, সে বিষয়ে এখনও সন্দেহ আছে। গান্ধীজী যখন হিন্দুস্থানীর (উর্দু বহুল হিন্দীর) পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন, তখন তাহার কারণ ছিল—তখনও ভারতবর্ষকে হিন্দুস্থানে ও পাকিস্থানে বিভক্ত করিবার কল্পনা মুসলিম লীগের প্রবর্তক-দিগের অসম্ভব কল্পনা বলিয়াই বিবেচিত হইত। কিন্তু তখনও সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বহুমতের অধিকারী হইয়াছিলেন। এখন ভারতবর্ষ বিভাগের পরে হিন্দুস্থানী বনাম হিন্দীর কথা আর উঠিবে না, ইহাই অনেকে মনে করিয়াছিলেন বটে। কিন্তু দেখা যাইতেছে, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এখনও হিন্দুস্থানীর প্রতি মমত্ববোধ বর্জন করিতে পারিতেছেন না। কাজেই হিন্দী যে রাষ্ট্র ভাষা হইবে, এমনও মনে করিবার কারণ নাই। যদি
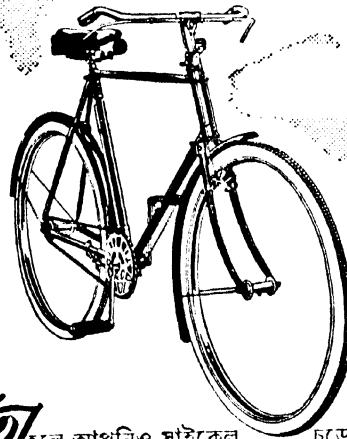

তাহলে আপনিও সাইকেল চড়ে সত্যিকার আনন্দ পাবেন। পঞ্চাশ বছরের উপরে সাইকেল ও সাইকেলের সরঞ্জাম তৈরির কাজে অভিজ্ঞ একটি আধুনিক কারখানায় বিশেষ করে এদেশের রাস্তায় চলার উপযোগী করে এই সাইকেল তৈরি। অত্যন্ত টেকসই এই সাইকেলে কখনো আপনাকে কোনোরকম ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হবে না, আরামে চালাতে পারবেন। কিনতে হলে ফিলিপ্‌সই কিনুন।

J. A. PHILLIPS & CO., LTD., BIRMINGHAM, ENGLAND

KP 6

তাহাই হয়, তবে বিহারে বাঙালীর কেন হিন্দী শিখিতে বাধ্য হইবে? অবশ্য কংগ্রেসের মত আজ তাঁহারা কংগ্রেসের নামে ক্ষমতা পরিচালনা করিতেছেন, তাঁহারা অনেক ক্ষেত্রে অনায়াসে লঙ্ঘন করিতেছেন: এমন কি হিংসাশ্রয়ী দেশের জন্য আত্মত্যাগীদিগের প্রশংসা কীর্তন করিতেও কংগ্রেসী নেতারা আজ দ্বিধানুভব করিতেছেন না। তাঁহারা আজ ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন সম্বন্ধে কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতি অনায়াসে পদদলিত করিতেছেন; সুতরাং মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষালাভ যে বাঙালী শিক্ষার্থীর জন্মগত অধিকার তাহাও হয়ত তাঁহারা আর স্বীকার করিবেন না। বিহারে বাঙালীর উপর যত অত্যাচারই কেন হউক না—বিহার বাঙলার সীমা নির্ধারণ সম্বন্ধে আলোচনা যখন পণ্ডিত জওহরলালের অভিপ্রেত এবং ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের সমর্থক ডক্টর পট্টভি সীতারামিয়াও যখন—কংগ্রেসের সভাপতি হইবার পরে—বাঙলা-বিহার সীমান্তের সমস্যা ভয়ানকরূপ জটিল বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন, তখন কি হইবে বলা যায় না। যে ডক্টর সচ্চিদানন্দ সিংহ ১৯১২ খৃষ্টাব্দে সমগ্র মানভূম, সিংভূমের ধলভূম পরগণা প্রভৃতি বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চল স্বীকার করিয়া বাঙলাকে দিতে বলিয়াছিলেন, তিনি আজ তাহার বিরোধী হইয়াছেন। সেদিন বিহার ব্যবস্থাপক সভায় বিহারের শিক্ষা সচিব খৃস্টান পাদ্রী হইতে য়ুরোপীয় ডেপুটি কমিশনার পর্যন্ত কয়জন বিদেশীর উক্তি—বেদ, বাইবেল, কোরাণ, জেন্দাবেস্তার মত মনে করিয়া উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন,—মানভূমে বাঙালী নাই বলিলেই হয়—তথায় বাঙালী উকিল, ডাক্তার, জমিদার, রাজকর্মচারী প্রভৃতি আসিয়া বাঙলা প্রচলিত করিয়াছেন। আমরা জানি, এইরূপ যুক্তিবলে ইংরেজ লেখকরা বলেন, আলেকজাণ্ডার ভারতে আসিবার পূর্বে ভারতবাসীরা গৃহ নির্মাণে প্রস্তর ব্যবহার করিতে জানিত না। তিনি বলিয়াছেন,—

"The continuous usage of Bengali language had made the people feel they were Bengali-speaking whereas actually they were not."

রাজশেখরবাবুর চিকিৎসকের সেই কথাই ইহাতে অনেকের মনে পড়িবে 'অয় জানিত পার না।' ●

বিহারের শিক্ষা সচিব বলিয়াছেন,—ছাত্রদিগকে তাহাদিগের মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হইবে। যদি তাহাই হয়, তবে আমরা পূর্বে যাহা বলিয়াছি, তাহাই বলিব। বিহারের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলে বাঙালীরা ছাত্র-ছাত্রীদিগকে বাঙলার সাহায্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করুন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাঙলা সরকার সে সকল প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদিগের পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করুন।

পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে এবার যেরূপ কথা কাটাকাটি হইয়াছে, তাহা সময় সময় শিষ্টাচারের সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে। অবশ্য যে দেশের আদর্শ আমরা শ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রহণ করি, সে দেশের পার্লামেণ্টেও যে সময় সময় শিষ্টাচারের সীমা লঙ্ঘিত হয় না, তাহা নহে। র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড যখন বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী তখন একদিন একজন সদস্য তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া বলিয়াছিলেন, তিনি

"mauntibank, swine and low dirty cur, who ought to be horse-whipped and slung out of public life.

কিন্তু সেরূপব্যবহার কখনই এদেশে অনুকরণযোগ্য হইতে পারে না। এবার ব্যবস্থা পরিষদে মিস্টার হাসেম কোন সচিবের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থাপিত করিলে প্রধান সচিব বলিয়াছিলেন, ঐ সচিবের অনুপস্থিতিতে অভিযোগ উপস্থাপিত করা শিষ্টাচারসম্মত হয় নাই। কিন্তু বৃটেনে পার্লামেণ্টে প্রধান মন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে উদ্ধৃত উক্তি করা হইয়াছিল। মিস্টার হাসেম অভিযোগ উপস্থাপিত করার পরে অভিযুক্ত সচিব যেমন তাঁহাকে মোসলেম লীগের লোক বলিয়াছিলেন—তিনি তেমনই সচিবকে মতপরিবর্তনকারী বলিতে ত্রুটী করেন নাই। এইরূপ ব্যাপার যে পরিতাপের বিষয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। ব্যবস্থা পরিষদে প্রকাশ করা হইয়াছে—পরিষদে একটি বিরোধী দল গঠিত হইল। গণতান্ত্রিক প্রথায় বিরোধী দল প্রয়োজন। কিন্তু দেখা গিয়াছে, পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে যে বিরোধী দল গঠিত হইয়াছে, তাহার সকল সদস্যই মুসলমান। বিরোধী দল যদি সাম্প্রদায়িকতার প্রভাবে প্রভাবিত হয়, তবে তাহা কখনই লোকমতের সমর্থনলাভ করিতে পারিবে না এবং তাহার সার্থকতাও থাকিবে না। সেইজন্য আমরা আশা করি, এই দলের সদস্যগণ সাম্প্রদায়িকতা বর্জন করিতে পারিবেন।

গত ৩০শে মার্চ বাঙলার জমীদার সভা—বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনে সভাপতি মহারাজাধিরাজ উদয়চাঁদ মহাতাব পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের সীমা নির্ধারণ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—তিনি আশা করেন, ভারত রাষ্ট্রের প্রসিদ্ধ নেতৃগণের সাহায্যে বিহারের নেতারা শিষ্টভাবে বাঙলাকে তাহার জন্মগত অধিকার প্রদান করিবেন। বিহারের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গকে প্রদান না করিলে ভারত রাষ্ট্রের অশান্তি অনিবার্য। তিনি আরও বলেন,—জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ পদে লোক নিয়োগে বাঙালীদিগের দাবী যেন অবজ্ঞাত না হয়। তিনি অন্য কোন প্রদেশের ক্ষতি করিয়া বাঙলা ও বাঙালীদিগের কোন দাবী উপস্থাপিত করিতে চান না; তিনি বলেন, রাজনীতিক প্রয়োজনে যখন বাঙলাকে পূর্বের প্রদেশের এক-তৃতীয়াংশে পরিণত করা হইয়াছে, তখন যেন ভারত রাষ্ট্রের ব্যাপারে বাঙলাকে অবহেলা করা না হয়।

মহারাজাধিরাজ উদয়চাঁদের কথায় অনেকেরই পরলোকগত গোপালকৃষ্ণ গোখলের উক্তি মনে পড়িবে। তিনি বঙ্গবিভাগবিরোধী আন্দোলন-কালে বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় বলিয়াছিলেন—

"With Bengal uncouncilated....there will be no real peace, not only in Bengal but in any other province in India."

সেই বক্তৃতাতেই গোখলে মহাশয় বলিয়াছিলেন—

"The Bengalees are in many respects a most remarkable people in all India."

কিন্তু আজ অবাঙালী নেতারা বাঙালীর সেই বৈশিষ্ট্য ভুলিয়া যাইতেছেন।

কলিকাতা বড়তলা থানার এলাকা হইতে একটি হৃদয়বিদারক ঘটনার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রফুল্লবালা বসু, রহ্মের ভূতপূর্ব পোস্ট মাস্টারের পত্নী। তাহার বয়স ৪০ বৎসর—সে ৮টি সন্তানের জননী। আয়ে ব্যয়-সংকুলান করিতে অসমর্থ হইয়া—সন্তানদিগের কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া প্রফুল্লবালা আত্মহত্যা করিয়াছে। এইরূপ ঘটনা পশ্চিমবঙ্গে প্রতিদিন কত ঘটিতেছে, তাহা কে বলিতে পারে? এ সম্বন্ধে সমগ্র জাতির যে কর্তব্য আছে, তাহা উপেক্ষা করা যায় না। দেশের সরকারকে সে বিষয়ে অবহিত হইতে হইবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলিকাতায় অনির্দিষ্ট-কালের জন্য ১৪৪ ধারা বহাল রাখিলেন—ঘোষণা করিয়াছেন। এই ব্যবস্থা জনগণের পক্ষে যেমন সরকারের পক্ষেও তেমনই প্রশংসার কথা নহে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নির্দেশে যেভাবে চতুষ্পাঠীর তালিকা প্রস্তুত হইয়া ভোটদানের ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে অধ্যাপকদিগের আপত্তির বিষয় আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। চতুষ্পাঠীর তালিকা রচনায় অধ্যাপকদিগের আপত্তির কারণ কি, তাহা বুঝাইবার জন্য আমরা বাঁকুড়ার একখানি পত্রে লিখিত বিষয় উল্লেখ করিতেছি। তথায় যে টোলে ৫০ টাকা বৃত্তি মঞ্জুর হইয়াছিল, প্রকাশ, বাঁকুড়া জিলা ইনস্পেক্টর ২ বার পরিদর্শনে যাইয়া কোন অধ্যাপকের বা ছাত্রের দেখা পান নাই! আমরা আশা করি, বর্তমান তালিকার সংশোধন না করিয়া ঐ তালিকার ভিত্তিতে কাজ করা হইবে না।

## ক্ষুদে বিমানে পাঁচ হাজার মাইল!

জানা গেছে বিল ওগেম নামে এক আমেরিকান বৈমানিক সম্প্রতি এক ইঞ্জিন-বিশিষ্ট ক্ষুদে একটি বিমানে চেপে না থেমে—একেবারে পাঁচ হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে মাত্র ৩৬ ঘণ্টায় হনলুলু থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সি অঞ্চলের টিটারবোরো

বিল ওগেম ও তার বিমান

অঞ্চলে পৌঁছেছেন। ছোট্ট ইঞ্জিন বিশিষ্ট বিমানের সাহায্যে না থেমে এত দূরপাল্লার পাড়ি আজ পর্যন্ত আর কেউ দিতে পারেনি—তাই বিল ওডোম নতুন রেকর্ড স্থাপনা করেছেন বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এই রকম দুঃসাহসিক অভিযানের পথে পা বাড়িয়ে সত্যিই তিনি বাহাদুরী দেখিয়েছেন।

## চোরের হাতে পাহারাওয়ালা গ্রেপ্তার!

মনট্রিলের এক মামলায় প্রকাশ হয়েছে যে রাত্তিরে পাহারা দেওয়ার সময় ইমানুয়েল ডেম্ বলে এক পাহারাওয়ালাকে চোররা আচমকা এসে ধরে বেঁধে ফেলে এবং তারপর সর্বস্ব চুরি করে নিয়ে যায়। ব্যাপারটা যেভাবে ঘটে তা খুবই মজার! কারণ ইমানুয়েল পাহারা দেওয়ার সময় একটা "অপরাধ তত্ত্ব" সংক্রান্ত পত্রিকা পড়ায় যখন তন্ময় হয়ে ছিল—ঠিক সেই সুযোগেই চোররা তাকে ঘিরে ধরে বেকায়দা করে ফেলে, এই কথা

আদালতে ইম্যানুয়েল খোলাখুলিভাবে বলেছে। অপরাধী ধরার চেয়ে অপরাধতত্ত্বের জ্ঞানার্জনের চেষ্টা প্রশংসনীয় নয় কি?

## ব্যবস্থা পরিষদে বিয়ের প্রস্তাব!

সম্প্রতি আমেরিকার ইডাহো প্রদেশের ব্যবস্থা পরিষদে ভারী একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে। ঘটনাটা হচ্ছে স্টেটের প্রতিনিধি মিঃ এডুইন স্নো কয়েকদিন আগে ব্যবস্থা পরিষদের সভায় উঠে দাঁড়িয়ে—পরিষদের সভাপতির অনুমতি নিয়ে বললেন "আমি প্রস্তাব করি স্টেটের অন্যতমা মহিলা প্রতিনিধি এডিথ মিলার আমাকে বিবাহ করুন।" প্রস্তাব শুনে পরিষদের সদস্যদের মধ্যে খুব একটা হট্টগোল শুরু হয়ে গেল, কিন্তু শ্রীমতী এডিথ মিলার উঠে দাঁড়িয়ে ধীর ও স্থিরভাবে জবাব দিলেন "আমার ব্যক্তিগত সুখ সুবিধা বিচারে আমি মিঃ স্নো'র প্রস্তাব গ্রহণ করলাম।" এমন ব্যবস্থা না হলে ব্যবস্থা পরিষদ নামই বৃথা, কি বলেন?

## চৌদ্দ মাস মোটরের কোটরে বাস!

সম্প্রতি ডন হেইন নামে এক ঊনচল্লিশ বছরের নাবিক—অদ্ভুত এক মোটর গাড়ী চেপে সানফ্রান্সিসকোতে পৌঁছেছেন। গাড়ীটির দরজাগুলি একেবারে ঝেলে বন্ধ করা; না ভেঙে কোনওভাবেই খোলবার উপায় নেই। জানালাগুলো গরাদ দিয়ে আঁটা। ব্যাপারটা হচ্ছে কয়েক সপ্তাহ ধরে ঐ নাবিকটি ঐভাবে বন্ধ মোটরেই একলাটি আছেন—গরাদের ফাঁক দিয়ে খাবার দেওয়া হয় তাই খেয়েই তিনি থাকেন, এবং গাড়ীর ভেতরেই বিছানা, পায়খানা ও স্নানের যে ব্যবস্থা আছে তাতেই কাজ চালিয়ে নেন। এমনটা কেন তিনি করছেন? তিনি জানিয়েছেন এইভাবে যদি তিনি চৌদ্দটি মাস ঐ মোটর গাড়ীর মধ্যে কাটাতে পারেন—তা হলে শেষ কালে হয়তো এক হাজার ডলার থেকে পঁচিশ হাজার ডলার পর্যন্ত মোটামুটি বাজীর টাকা জিততে পারবেন। বাজি জেতার জিদ নিয়ে আমেরিকানরা এমন ধারা অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড প্রায়ই যে করে—তা তো জানেনই।

## সুইজারল্যাণ্ডের সং উৎসব !

সুইজারল্যাণ্ডের সং-উৎসব সম্প্রতি হয়ে গেছে—মার্চ মাসের পয়লা তারিখে। ঐ তারিখেই পড়েছিল "শ্রোভ্ মঙ্গলবারের পুণ্যদিন।" তার পরের দিন থেকেই শুরু হয় ইস্টার উপলক্ষে সেখানকার খৃষ্টানদের উপবাসের দিনগুলি, এই কারণে শ্রোভ্ মঙ্গলবারে সুইজারল্যাণ্ডের লোকেরা আশ মিটিয়ে ফুর্তি ও হল্লা করে—ছেলেবুড়ো রকমারী সাজে সেজে সংয়ের দল গড়ে রাস্তায় রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে—নাচ গান হাসি মসকরায় সবাইকে মাতিয়ে তোলে। এবারকার ঐ উৎসবে জুরিকের রাস্তায় "মার্চ অফ্ দি ড্যাণ্ডিজ" বা "ফতোবাবুদের অভিযান" নামে এক সংয়ের দল বেরিয়েছিল। সেদল কেমন সেজেছিল—ছবিতে দেখে নিন।

"ফতো বাবুদের অভিযান"

# বাংলা সাহিত্যের নরনারী

**প্র.না.বি.....**

## রাবণ

মেঘনাদ বধ কাব্যের রাবণ চরিত্র বাঙলা সাহিত্যের নরনারীদের মধ্যে বোধ করি বৃহত্তম চরিত্র। দশাননের আকৃতির কথা বলিতেছি না, সে তো আছেই, সেতো বাল্মীকির কীর্তি, তার জন্যে মধুসূদনের বিশেষ কৃতিত্ব নাই। আমি বলিতেছি অতলস্পর্শী শোকের গৌরবে ত্রিদিব বিজয়ী রাবণ এক প্রকার মাহাত্ম্য লাভ করিয়াছে, সমুদ্রোপকূলবর্তী তরঙ্গাভিঘাত অভিষিক্ত মহীধর যেমন স্বাভাবিক উচ্চতার চেয়ে উচ্চতর, স্বাভাবিক অটল তার চেয়ে অটলতর মনে হয় অনেকটা তেমনি। তার উপরে অস্তগামী সূর্য যখন আবার বেদনার আগ্নেয় কিরীট পরাইয়া দেয়—তখন আর তাহাকে লৌকিক বলিয়া মনে হয় না,, মনে হয় কোন্ স্বয়ং কিরীটিত অলৌকিক মহিমা মানব নয়নের সার্থকতা সাধনের উদ্দেশ্যে ক্ষণকালের জন্য রূপ পরিগ্রহ করিয়া দেখা দিয়াছে। বাস্তবিক রাবণ চরিত্রকে কোন মহীধর বলিয়াই মনে হয়, তাহাকে মানব হস্ত নির্মিত, মানব চিত্ত পরিকল্পিত মনে হয় না। পাষাণের মূর্তি যত প্রকান্ডই হোক না কেন—তবু তাহাতে মানব স্পর্শ বিদ্যমান। কিন্তু যে গিরিবর প্রকৃতির লীলাসম্ভূত, বহু কোটি বর্ষাঋতু অদৃশ্য নিপুণতায় যাহাকে একটা বিশেষ আকৃতি দিয়াছে, বহু কোটি শরৎ যাহার স্কন্ধে কুয়াশা-উত্তরী নিক্ষেপ করিয়াছে, বহু কোটি শীত সযত্নে যাহার শীর্ষদেশে তুষার উত্তরী বাঁধিয়া দিয়াছে—আর অবশেষে সকল প্রসাধনের উপসংহারে বহু কোটি বসন্ত পুষ্পাভরণে যাহাকে সজ্জিত করিয়া দিয়াছে, বহু লক্ষ ভূমিকম্প যাহার কঠিন পাষাণরাশি স্খলিত করিয়া দিয়া নিদারুণ আর্ত মন্দ্র জাগাইয়া দিয়াছে, কাছে দাঁড়াইলে যাহা শিলাস্তূপ মাত্র, দূরে হইতে যাহা বিশিষ্ট আকৃতি, অর্ধেক অস্পষ্ট, অর্ধেক ইঙ্গিতময়,—খানিকটা পার্থিব, অনেকটাই অপার্থিব, যাহার সৃষ্টিকার্যে স্বয়ং প্রকৃতি ধৃত-খনিত্র—মানব জাতির যে অগ্রজ এবং মানব জাতি লোপ পাইবার পরেও যে বিরাজ করিতে থাকিবে—মেঘনাদ বধ কাব্যের রাবণ সেই সেই রকম একটি অমানবীয় সামগ্রী।

মাইকেলের রাবণ প্রাকৃতিক শক্তির (elemental force) সৃষ্টি। প্রাকৃত শক্তি যেমন এখনো মাঝে মাঝে এক আধটা গিরিচূড়া ঠেলিয়া খাড়া করিয়া দেয়—এক আধটা উপসাগর অকস্মাৎ খনন করিয়া দেখায়, রাবণ চরিত্র তেমনি প্রাকৃত শক্তির একটা কাজ—লবণাম্বুভিহত দুর্ধর্ষ গিরিচূড়ার ন্যায় সে দণ্ডায়মান। এমন যে হইতে পারিল কোন কোন সময়ে সমাজে প্রাকৃতিক শক্তি প্রবল হইয়া ওঠে। শ্যামল সুবিন্যস্ত ভূপৃষ্ঠের অন্তরে নিত্য বিরাজিত অগ্নিদ্রব্যের ন্যায় সমাজের নীচের তলায় প্রাকৃতিক শক্তি সতত ক্রিয়াশীল হইলেও সদা-সর্বদা তাহা প্রবলরূপে প্রত্যক্ষ গোচর হয় না—তজ্জন্য ভূমিকম্পের আবশ্যক। সামাজিক ভূমিকম্পের ফলেই রাবণ সদৃশ প্রাকৃতিক (elemental) চরিত্র সৃষ্ট হইয়া থাকে—একা মানুষের সাধ্য কি তাহাদের সৃষ্টি করে। 'ডিভাইন কমেডির অনেকগুলি' চরিত্রেই প্রাকৃতিক শক্তির প্রকাশ—অথচ অল্পকাল পরে লিখিত ডেকামেরোন গ্রন্থ দিব্য সুস্থ মেজাজের রচনা। মারলোর টেম্বারলেন একটি প্রাকৃতিক চরিত্র—মারলোর অঙ্কিত অধিকাংশ চরিত্রেই অল্পাধিক পরিমাণে প্রাকৃতিক শক্ত সক্রিয়,—তুলনায় সেক্সপীয়রের দু' একটি চরিত্র বাদে, লীয়রের কথাই এখন মনে পড়িতেছে, অধিকাংশই সুস্থ মেজাজের কল্পনা। গেটের ফাউস্ট চরিত্রে প্রাকৃতিক লীলা থাকিলেও মারলোর ডক্টর ফস্টাসের চেয়ে অনেক অল্প। ব্রণ্টি ভগ্নীগণ স্বল্পায়ু ও স্বভাব রুগ্ন হইলেও তাহাদের অনেক রচনাতেই এই প্রবল শক্তিটি সক্রিয়—'ওয়াথারিং হাইটস'-এ প্রাকৃতিক শক্তি চরিত্র সৃষ্টি করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই—অশরীরী মূর্তিতে, স্থানীয় আবহাওয়ারূপে নিজেও যেন বিদ্যমান, জেন আয়ারে তাহা অপেক্ষাকৃত স্তিমিত। পরবর্তীকালের লেখকদের মধ্যে হার্ডির অনেকগুলি উপন্যাস ও 'দি ডাইনাস্টস' নামে মহাকাব্য প্রাকৃতিক শক্তির লীলারসে উদ্ভূত। বাঙলা সাহিত্যে মেঘনাদ বধের রাবণ ব্যতীত প্রাকৃত চরিত্র তো দেখি না।

উপরে যে সমস্ত লেখকের নাম করা হইল তাহাতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, প্রাকৃতিক চরিত্র যাঁহারা সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহারাই প্রতিভায় অপরের চেয়ে মহত্তর—এমন প্রমাণ হয় না। দান্তের সঙ্গে বোকাচিওর তুলনা হয় না বটে, তেমনি আবার সেক্সপীয়রের সঙ্গেও মারলোর তুলনা হয় না, আর মারলোর ডক্টর ফস্টাসের চেয়ে গেটের ফাউস্ট অনেক উচ্চতর শ্রেণীর সৃষ্টি। আসল কথা প্রাকৃত চরিত্রের সৃষ্টি একটা বিশেষ সামাজিক অবস্থার উপরে নির্ভর করে। সেই বিশেষ সময়ের দাবীকে বিকাশ করিবার জন্য বিশেষ এক প্রকার প্রতিভার প্রয়োজন। তাহা কাহারো থাকে, কাহারো থাকে না, কাহারো অল্প থাকে। মানুষের মনকে যদি দুই ভাগ করিতে পারি, তবে একটা অংশ প্রাকৃতিক একটা অংশ ব্যক্তিগত, একটা আদিম কালের বাহন; একটা অর্বাচীন কালের বাহক, একটা সংস্কার মুক্ত, অপরটা সংস্কৃতি সম্পন্ন। অল্পাধিক দুটা ভাগই সকলের মনে আছে, কাহারো কোনটা প্রবল কাহারো কোনটা দুর্বল। মাঝে মাঝে সমাজে উপপ্লবের সময় আসে, তখন লেখকদের মনের প্রাকৃত অংশটা নাড়া খায় এবং অনেক সময়ে, অনেক সৌভাগ্যে এক আধটা মহৎ প্রাকৃত চরিত্র সৃষ্ট হইয়া দেখা দেয়। মেঘনাদ বধের রাবণ এই রকম একটা সৃষ্টি।

২

মাইকেল মধুসূদনের সমকাল বাঙলাদেশের সামাজিক ইতিহাসে একটা উপপ্লবের সময়, এমন উপপ্লব বাঙলা দেশের সমাজে অনেক কাল ঘটে নাই। তখনকার অনেক উচ্চ ইংরাজি শিক্ষিত লোকে কেবল যে বিলাতি মদ খাইত এমন নয়, ইংরাজি সভ্যতাও তাহাদের মনে মদের প্রক্রিয়া করিত। প্রত্যেক ইংরাজি বই তাহাদের চোখে মদের বোতল ছিল। তাহারা বাঙলা ভাষা ভুলিল, সহেব হইবার আশায় খৃষ্টান হইল, ঐ আশাতেই নিজের নামটি অদ্ভুত ইংরাজি বানানে লিখিয়া বিকৃত করিয়া তুলিল, ইংরাজীতে স্বপ্ন দেখিবার কল্পনা তাহারা পোষণ করিত 'রাম ও তাহার অনুচর-গণের' প্রতি ঘৃণা, রাবণ ও মেঘনাদের চিন্তা-মাত্রে কল্পনার উদ্দীপনা—এ কেবল মাইকেলের মনোভাব নয়—তাঁহার সমকালীন অনেকেরই মনের ভাব ছিল। দেশীয় সব কিছুই হেয়, বিলাতি সব কিছুই বরেণ্য—ইহাই ছিল সাধারণ আবহাওয়া। এ হেন অবস্থার মূর্ত প্রতীক রাবণ ও তাহার পুত্র। রাবণের ঐশ্বর্য, রাবণের বীরত্ব, রাবণের রাম-বিদ্বেষ, রাবণের স্বর্ণলঙ্কা তাহাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিল। মাইকেল মুখে স্বর্ণলঙ্কা বলিলেও মনে মনে ইংলণ্ডের কথাই ভাবিতেন। উপরিউক্ত মনোভাবকে, সামাজিক অবস্থাকে গুলাইয়া লইয়া ইংরাজী শিক্ষিতের প্রতিনিধিরূপে মাইকেল রাবণ চরিত্র ঢালাই করিয়াছিলেন। রাবণকে তিনি এত প্রকান্ড করিয়া গড়িয়াছিলেন যে, তার চেয়ে বড় করা সম্ভব ছিল না—তাই তুলনায় রাম ও লক্ষণ ছোট হইয়া গেল। বাল্মীকির পরে অনেক ভারতীয় কবি রামায়ণ কাহিনী লিখিয়াছে—কিন্তু মাইকেলের কাব্যের সঙ্গে তাহাদের কাব্যের মূলগত প্রভেদ এই যে তাহারা কেহই রাবণের জয়ধ্বনি করে নাই। মাইকেল প্রথমে রাবণের জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

কিন্তু শুধু এইটুকু মাত্র বলিলে মাইকেলের রাবণকে ছোট করিয়া ফেলা হয়—কারণ যে রাবণ একটা বিশেষ সময়ের সামাজিক অবস্থার দুর্গে বন্দী সে আমাদের কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করিতে অক্ষম। আমরা অপরকালের আদিবাসী, আমরা মাইকেলের সমকালীয় আদর্শের প্রতি বিশ্বাসহীন, তাঁহারা ছিলেন ইংরাজী শেখার আরম্ভে আর আমরা রহিয়াছি ইংরাজী ভুলিবার সূচনায়। তৎসত্ত্বেও যে রাবণ আমাদের রসলোক উন্মথিত করিতে পারে তার অন্য

কারণ আছে। মাইকেল রাবণের মহিমার সহিত অপর একটি উপাদান মিশ্রিত করিয়া দিয়াছিলেন, সেটি অপরিমেয় বেদনা। সেই বেদনার জ্বালাতেই রাবণ আজ আমাদের সমবেদনার পাত্র—আজ আমাদের সগোত্র। আজ ইংরাজী শিক্ষার মোহ অপগত, ইংরাজ শাসনের ব্যর্থতাই আজ শুধু বিদ্যমান। মহিমার অত্যুচ্চ চূড়ায় আসীন হইয়াও পার্শ্ববর্তী সুগভীর খাদটাই কেবল রাবণের চোখে পড়িয়াছে। এত ঐশ্বর্য, এত প্রতাপ সত্ত্বেও সর্বনাশ যে কেন শনৈঃ শনৈঃ নিকটবর্তী হইতেছে সে বুঝিতেই পারে নাই—তাই সে প্রত্যেকটি বিপৎপাতের পায়ে এই মর্মে খেদোক্তি করিয়াছে—

কি পাপে লিখিলা
এ পীড়া দারুণ বিধি রাবণের ভালে?
এবং
বিধির বিধি কে পারে খণ্ডাতে?

কি পাপে তাহার দণ্ড সে যেমন জানে না তেমনি সে দণ্ড হইতে যে নিষ্কৃতি নাই, তাহাও জানে। এই দুটি উক্তিতেই মেঘনাদ বধ কাব্যের রাবণ চরিত্রের ধুয়া নিহিত।

এ ধুয়া মাইকেল শুনিতে পাইলেন কোন্ মন্ত্রবলে? তাঁহার সমকালে বাঙালীর তো এমন দুর্দশার কারণ ছিল না। স্বাধীনতা গিয়াছিল বটে, কিন্তু ইংরাজ শাসনকে তৎকালে কেহই আশঙ্কনীয় মনে করিত না। তখনকার দিনে কুড়িটা ইংরাজি শব্দ লিখিতে পারিলে চাকুরি জুটিত, দুখানা ইংরাজি বই পড়িলেই লোকে পণ্ডিত মনে করিত। হিন্দুসমাজ তখন ইংরাজের সুয়োরাণী ছিল, পরবর্তীকালের মতো মুসলমান সমাজকে সে পদ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়া বুকচাপড়ানো শুরু করে নাই। তবে এ খেদোক্তির তাৎপর্য কি? সেকালের ইংরাজি শিক্ষিত সমাজের প্রতিনিধি রাবণের মুখে তবে এ বিলাপ, এ নৈরাশ্য কেন? সমাজের মধ্যে সে ব্যর্থতা সে বেদনা তো ছিল না।

এখানেই মাইকেলের যথার্থ কবি-দৃষ্টি, ইহাতেই তাঁহার ভবিষ্যৎ দর্শনের পরিচয়। মাইকেল হ্যামলেটের মতো বলিতে পারিতেন—'Oh Prophetic soul of mine!' তিনি সেকালে বসিয়া দূরকালকে, তাঁহাদের সময় হইতে আমাদের সময়কে, ইংরাজ শাসনের প্রারম্ভ হইতে তাহার উপসংহারকে, বাঙালী সমাজের উন্নতির সূচনা হইতে তদীয় অবনতির সূত্রপাতকে যেন দেখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, আর সেইজন্যেই রাবণের চরিত্রে ঐশ্বর্যের সঙ্গে বিষাদকে, প্রতাপের সঙ্গে নৈরাশ্যকে, দম্ভের সঙ্গে সকরুণ খেদোক্তিকে মিশ্রিত করিয়া দিয়াছেন। এহেন বিষম উপাদানে গঠিত বলিয়াই রাবণ দুটি অসমকালের প্রতীক হইতে পারিয়াছে—রাবণ সেকালেরও প্রতিনিধি, একালেরও বটে। এই কারণেই রাবণ চরিত্র অতিশয় 'মডার্ন'। এই কারণেই রাবণের সঙ্গে, রাবণের স্রষ্টা মাইকেলের সঙ্গে বর্তমানকাল নূতন করিয়া আত্মীয়তা অনুভব করিতেছে।

একালের আমরা কি রাবণের মতো নিরন্তর খেদ করিতেছি না! কি পাপে আমাদের বর্তমান দুর্দশা তাহা কি আমরা বুঝিতে পারিতেছি? কিসে মুক্তি তাহা কি বুঝিতে পারিতেছি? একটার পরে একটা দুর্ভাগ্যের আঘাতে আমরা কি বলিতেছি না—

কি পাপে লিখিলা
এ পীড়া দারুণ বিধি আমাদের ভালে?

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর হইতে বাঙালী সমাজের সুখ-সৌভাগ্যে ভাঁটার টান শুরু হয়। প্রথমে পাট গেল, তারপরে ইংরাজ শাসনকর্তার প্রশ্রয় গেল, সেই সঙ্গে সুলভ চাকুরি গেল—

"কি পাপে লিখিলা
এ পীড়া দারুণ বিধি আমাদের ভালে?"

তারপরে আসিল সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা। লীগ মন্ত্রিমণ্ডলীর শাসন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, নিষ্প্রদীপ মন্বন্তর, মহামারী, কণ্ট্রোল রেশন, চোরাবাজার, কলিকাতার হাঙ্গামা, নোয়াখালি, বঙ্গবিভাগ, উদ্বাস্তুতা! শ্রেণীবদ্ধ দুর্ভাগ্যের আর যেন শেষ নাই!

"কি পাপে লিখিলা এ পীড়া দারুণ বিধি আমাদের ভালে?" কিন্তু এখানেই কি দুর্ভাগ্যের অবসান? আসামে, বিহারে, উড়িষ্যায়, দার্জিলিংয়ে, বঙ্গান্তরে সর্বত্র আজ বাঙালী লাঞ্ছিত। এ লাঞ্ছনা যে চূড়ান্ত পর্যায়ে পেশছিয়াছে মনে হয় না, মনে হয় এখনো

"বিধি প্রসারিছে বাহু
বিনাশিতে লঙ্কা মম, কহিনু তোমারে।"

আজ লঙ্কার অর্থ বাঙলা দেশ, সেদিন লঙ্কার অর্থ ছিল ইংলণ্ড! অপগত ঐশ্বর্যের দিকে তাকাইলে কপালে করাঘাত করিয়া আমরা রাবণের মতোই বলিতেছি না?

"কি পাপে হারানু আমি তোমা হেন ধনে?
কি পাপ দেখিয়া মোর, রে দারুণ বিধি,
হরিলি এ ধন তুই? হায়রে, কেমনে
সহি এ যাতনা আমি?"

মাইকেলের কাল আমাদের কালের দিকে তাকাইয়া বলিতে পারিত,

ছিল আশা, মেঘনাদ, মুদিব অন্তিমে
এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে
সঁপি রাজ্যভার, পুত্র, তোমায় করিব
মহাযাত্রা! কিন্তু বিধি, বুঝিব কেমনে
তাঁর লীলা? ভাঁড়াইলা সে সুখ আমারে।"

মেঘনাদ বধ কাব্য এক দেহে বাঙালীর উত্থান ও পতনের মহাকাব্য। সৌভাগ্যের উষায় যে-কাব্যের পটে বাঙালী আপনার গৌরবময় মধ্যাহ্নকে দেখিয়াছিল, সৌভাগ্যের সন্ধ্যায় আজ আবার তাহারই পটে নৈরাশ্যের অন্ধকারকে প্রত্যক্ষ করিতেছে। দুর্ভাগ্যের পরিপ্রেক্ষিতে মেঘনাদ বধ কাব্য আজ নূতন গভীরতা লাভ করিয়াছে। এখনই মেঘনাদ বধ কাব্য বুঝিবার প্রকৃত সময়; কারণ এ কাব্য প্রৌঢ় বয়সের কাব্য, দুঃখের অভিজ্ঞতা ভারি হইয়া উঠিলে তবেই ইহার যথার্থ রস গ্রহণ সম্ভব হয়, তবেই রাবণের শোকের মর্ম গ্রহণ সম্ভব হয়, তবেই বীরের ক্রন্দন কি যে মর্মন্তুদ দৃশ্য বুঝিতে পারা যায়। শোকের আঘাতে বাঙলা সাহিত্যের বৃহত্তম চরিত্রটি ও বাঙালী সমাজ আজ কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে—তাই পরস্পরকে আজ কতকটা বুঝিতে পারিতেছে। শিল্পের সম্মিলিত জাতির আসরে মেঘনাদ বধ কাব্যের রাবণই বর্তমান বাঙালী সমাজের যথার্থতম প্রতিনিধি।*

## প্রমীলা

মাইকেলের অঙ্কিত নারীচরিত্রগুলির মধ্যে মেঘনাদ বধ কাব্যের প্রমীলা সব চেয়ে পূর্ণাঙ্গ। বীরাঙ্গনা কাব্যের পত্রিকাগুলির নায়িকা রমণী—কিন্তু তাহারা কেহই প্রমীলার পূর্ণতা পায় নাই—তাহাদের আসর সঙ্কীর্ণ। শর্মিষ্ঠা ও কৃষ্ণকুমারী পূর্ণাঙ্গ বটে, কিন্তু নাটক মাইকেলের প্রতিভার অনুকূল না হওয়ায় তাহারা অনেকটা বিকল। তিলোত্তমা ছায়াপ্রায়। কেবল প্রমীলাকেই সম্পূর্ণ ও সজীব বলা চলে। এমন যে হইল—তার কারণ মেঘনাদ বধ কাব্যের আসর প্রমীলার ব্যক্তিত্বের বিকাশের পক্ষে যথেষ্ট প্রশস্ত, আর কাব্য ও অমিত্রাক্ষর হইতেছে মাইকেলের প্রতিভার যথার্থ বাহন। তা ছাড়া, ঘটনার বহুলতার দ্বারাই চরিত্রের বিকাশ সাধন মাইকেলের প্রতিভার রীতি—মেঘনাদ বধ কাব্যে ঘটনাবাহুল্যের অভাব ঘটে নাই।

প্রমীলার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য কি? সে বীর রমণী, কিন্তু তাই বলিয়া নিরবচ্ছিন্ন বীর নহে, মেঘনাদের সাক্ষাতে সে লতার ন্যায় কোমল, তাহার অসাক্ষাতে, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সে মহীরুহের ন্যায় দৃঢ়, কোমল-কঠোরের ছায়াতপে সে গঠিত। ছায়াতপকে প্রমীলার চরিত্রে মাইকেল সুকৌশলে ব্যবহার করিয়াছেন। বীরত্বের দ্বারা সে পাঠককে বিস্মিত করে, কোমলতার দ্বারা সে পাঠককে মুগ্ধ করে—আর বীরত্ব ও কোমলতার দ্বন্দ্বে পাঠকের বিস্ময় ও মোহকে বর্ধিত করে। এইভাবে ক্রমবর্ধমান বিস্ময় ও মোহের তরঙ্গশিখরে পাঠকের চিত্ত আন্দোলিত হইতে হইতে নবম সর্গে আসিয়া দেখিতে পায়, প্রমীলা আর আগের প্রমীলা নাই—চিতানলের অগ্নিময় স্যন্দনারূঢ়া সে দেবী, তাহার চরিত্রে মানবী, দানবী ও দেবীর সমন্বয় সংঘটিত। কোমলতায় সে মানবী, বীরত্বে সে দানবী আর স্বেচ্ছাকৃত আত্মবিসর্জনে সে দেবী। এইজন্যেই তাহার চরিত্রে এমন একটি পূর্ণতা

* মেঘনাদবধ কাব্য।

ধ যাহা মাইকেল অঙ্কিত অন্য নারীচরিত্রে ল।

প্রথম সর্গে মেঘনাদের যুদ্ধগমনের য়াজনে সে শঙ্কিত—সে বলিতেছে,

কোথা, প্রাণসখে,
রাখি এ দাসীরে, কহ, চলিলা আপনি?
কেমনে ধরিবে প্রাণ তোমার বিরহে
এ অভাগী?

ীয় সর্গে মেঘনাদের বিরহে সে ব্যাকুলা—

ওই দেখো, আইলো লো তিমির যামিনী,
কালভুজঙ্গিনীরূপে দংশিতে আমারে,
বাসন্তি! কোথায়, সখি, রক্ষকুলপতি,
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ, এ বিপত্তিকালে?
এখনি আসিব বলি গেলা চলি বলী;
কি কাজে এ ব্যাজ আমি বুঝিতে না পারি।
তুমি যদি পারো সই কহলো আমারে।

তারপরে মেঘনাদের মিলন-আশায় লঙ্কায় বেশের বিপদের আশংকা শুনিয়া তাহার ন্ত বীরত্ব জাগিয়া উঠিয়াছে—

কি কহিলি, বাসন্তী? পর্বত-গৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশ্যে,
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি?
দানব নন্দিনী আমি; রক্ষ-কুল-বধূ;
রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,
আমি কি ডরাই সখী ভিখারী রাঘবে?
পশিব লঙ্কায় আজি নিজ ভুজবলে;
দেখিব কেমনে মোরে নিবারে নৃমণি?

সখী সনাথা প্রমীলার লঙ্কা প্রবেশের উদ্যোগ ও দৃশ্য সর্বজনবিদিত, সবিস্তার পরিচয় দিবার আবশ্যক করে না। কিন্তু লঙ্কা প্রবেশের পরে ইন্দ্রজিতের সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র তাহার দৃঢ়তা অন্তর্হিত।

পঞ্চম সর্গে প্রাতঃকালে মেঘনাদ কর্তৃক প্রমীলার ঘুম ভাঙানোর দৃশ্যটি মনোরম ও বিচক্ষণ।

ডাকিছে কূজনে,
হৈমবতী ঊষা তুমি, রূপসি তোমারে
পাখী কুল। মিল, প্রিয়ে, কমললোচন।

প্রমীলার ইচ্ছা স্বামীর সংগে যে যজ্ঞাগারে যায়—কিন্তু অন্তরায় তাহার শ্বশ্রূঠাকুরাণী।

ভেবেছিনু যজ্ঞগৃহে যাবো তব সাথে;
সাজাইব বীর সাজে তোমায়। কি করি?
বন্দী কীরু স্বমন্দিরে রাখিলা শাশুড়ী।
রহিতে নারিনু তবু পুনঃ নাহি হেরি
পদযুগ।

তোমার বিহনে,
আঁধার জগৎ নাথ কহিনু তোমারে।

অবশেষে নবম সর্গে প্রমীলার জীবনের চরম লগ্ন সমাগত। চিতায় আরোহণ করিবার পূর্বে সে সখীগণের উদ্দেশে বলিতেছে—

লো সহচরী, এতদিনে আজি
ফুরাইল জীবলীলা জীবলীলাস্থলে
আমার। ফিরিয়া সবে যাও দৈত্যদেশে।
কহিও পিতার পদে এ সব বারতা,
বাসন্তি। মায়েরে মোর—

আর সে বলিতে পারে না, শোক-সম্বরণ করিয়া আবার আরম্ভ করিল—

কহিও মায়েরে মোর, এ দাসীর ভালে
লিখিলা বিধাতা যাহা তাই লো ঘটিল
এতদিনে। যাঁর হাতে সঁপিলা দাসীরে
পিতামাতা, চলিনু লো আজি তাঁর সাথে;
পতি বিনা অবলার কি গতি জগতে?
আর কি কহিব সখী? ভুলো না লো তারে
প্রমীলার এই ভিক্ষা তোমা সব কাছে।

শুধু সখী কেন, পাঠকেরাও তাহাকে ভুলিতে পারিবে না। শুধু কোমলকে ভোলা যায়, শুধু কঠোরকে আরও অনায়াসে ভোলা যায়—কিন্তু কোমলে-কঠোরে সুখ-দুঃখের ছায়াতপে গঠিত মানুষকে ভোলা সুখ-দুঃখের জীব মানুষের পক্ষে বোধ করি অসম্ভব।

প্রমীলা চরিত্রের পরিকল্পনায় মধুসূদন অসাধারণ মানব মনোজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। প্রমীলা বীর পত্নী। প্রকট ব্যক্তিত্ববান পুরুষেরা ছায়ার প্রতি রৌদ্রের ন্যায় প্রচ্ছন্ন ব্যক্তিত্ব নারীর প্রতি স্বভাবতই আকৃষ্ট হইয়া থাকে। নিজের মধ্যে যে দুঃসহ জ্বালা বর্তমান, তাহার সান্ত্বনা ঐ নারীর মাধুর্য। এই জন্যেই দুই অসম স্বভাবের মধ্যেই প্রকৃত ভালবাসা প্রতিষ্ঠিত হয়—সম-স্বভাব পরস্পরকে আকর্ষণের পরিবর্তে বিকর্ষণ করিয়া দূরে ঠেলিয়া দেয়। তাই বলিয়া একথা বলি না যে, বীরপুরুষ ভীরু রমণীকে পছন্দ করে—মোটেই না। সে দৃঢ়সংকল্প রমণীকেই পছন্দ করে—কিন্তু আশা করে যে, দৃঢ়তাটুকু স্বামীর পরোক্ষে বিকশিত হইয়া স্বামীর প্রত্যক্ষে সে কেবল কোমলতারূপেই প্রতিভাত হইবে। বীরের পত্নী, উগ্র ব্যক্তিত্ব-বানের পত্নী যদি সমান বীর হয়, সমান উগ্র ব্যক্তিত্ববতী হয়, তবে গ্রহে গ্রহে সংঘাতের ন্যায় দুইজনের সঙ্ঘর্ষে যে আগুন জ্বলিয়া ওঠে, তাহাতে সংসার ধ্বংস হয়, শান্তি ধ্বংস হয়—তাহারা নিজেরাও পুড়িয়া খাক হইয়া ধ্বংস হয়। মনস্তত্ত্বের এই সংবাদটি মাইকেল জানিতেন বলিয়াই প্রমীলাকে দৃঢ়তা দিয়াও, বীরত্ব দিয়াও মেঘনাদের সমক্ষে সে সব প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন। আপন বীর্যের প্রতিষেধকরূপে পুরুষ মাধুর্যের অনুসন্ধিৎসু—সে নারীকেই প্রার্থনা করে—ছদ্মবেশী বৃহন্নলা তাহার কাম্য নয়।

এবারে প্রমীলার চরিত্র পরিকল্পনা সম্বন্ধে একটা ইঙ্গিত করিতে চাই। মাইকেল প্রমীলা চরিত্রের আভাস কোথায় পাইলেন? অপর কোন নারী চরিত্রে কি অনুরূপ কিছু দেখিতে পাইয়াছিলেন? আমার কেমন যেন ধারণা প্রমীলা চরিত্রের প্রাথমিক ইঙ্গিত মধুসূদন তাঁহার পত্নী হেনরিয়েটা চরিত্রে দেখিয়াছিলেন। হেনরিয়েটা ও প্রমীলার মূলগত মিল আছে, দুজনেরই স্বভাব দৃঢ় হইলেও স্বামী সকাশে দৃঢ় স্বভাব নয়—অত্যন্ত কোমল, একেবারে স্বামীগত প্রাণ। হেনরিয়েটার অন্তর্নিহিত দৃঢ়তা কিছু পরিমাণে প্রকট হইলে মধুসূদনের শেষ জীবন এমন শোচনীয় হইত না, অর্থাভাব এমন দারুণ হইত না। কিন্তু স্বামীর ইচ্ছা ও প্রবণতার বিরুদ্ধে কিছু করিবার এমন কি স্বামীর মঙ্গলের জন্যও কিছু করিবার চিন্তা হেনরিয়েটার মনে কখনও প্রবেশ করিত না। তিনি সম্পূর্ণভাবে স্বামীর ব্যক্তিত্বে আত্মমজ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার দৃঢ়তা, বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্ব অল্প ছিল না। তাঁহার জীবনে অন্তত দুবার সে পরিচয় পাওয়া যায়। একবার অনাহারের মুখ হইতে পুত্রকন্যাদের ছিনাইয়া লইয়া তিনি মধুসূদনের সংগে মিলিত হইবার আশায় ইউরোপে গিয়াছিলেন—আর একবার ইউরোপে অনুরূপ অবস্থায় পড়িয়া পুত্র-কন্যাদের লইয়া ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিলেন। মনে রাখা দরকার যে, দুবারেই মধুসূদন অনুপস্থিত। সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়, কাজ দুটি নিতান্ত সহজ ছিল না, প্রখর বুদ্ধি ও উগ্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী না হইলে কেহই এমন কাজে সফল হইত না। হেনরিয়েটার বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্ব যে এত প্রবল মধুসূদনের অভাবেই কেবল তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। স্বামী সমক্ষে সে কোমলা, স্বামীর অভাবে সে প্রবলা—ইহাই হেনরিয়েটা চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, আবার ইহাই প্রমীলা চরিত্রেরও বৈশিষ্ট্য। ঘরের মধ্যে যে আদর্শ বিরাজিত প্রমীলা চরিত্র অঙ্কনকালে মধুসূদনকে তাহা একেবারেই প্রভাবিত করে নাই—একথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। তবে বিষয়টাকে প্রমাণসহ করিতে আরও খুঁটাইয়া দেখা আবশ্যক—কেহ চেষ্টা করিলে বাঙালী পাঠকসমাজ উপকৃত হইবে—আমি ইঙ্গিত দিয়াই খালাস।*

---

* মেঘনাদবধ কাব্য।

অনুবাদ সাহিত্য

# মর্মবাণী

### জোসেফ ওয়েসেনহফ

শ্রীমতী এলজবিএটা শয়নঘরে প্রবেশ করে নীচু সোফাটার উপর শুয়ে পড়ল। লজ্জারুণ দীপ্তিতে তার সুন্দর কোমল গাল-দুটি গোলাপী হয়ে উঠেছে। তার বুকের ভিতরে এখনও চলেছে ঝড়ের মাতামাতি। ছোট ছোট পা দুখানি চঞ্চলভাবে নড়ছে। আকাশের মত ধ্যানমগ্ন স্বপ্নাতুর কালো চোখদুটি জানালার বাইরে পপলার গাছের চূড়ায় ঘুঘু-গুলোর দিকে স্থির-নিবদ্ধ। তাদের দিকে তাকিয়ে ভাবছে এলজবিএটা গ্রীষ্মের এই শেষের দিকটায় বাতাসে আনন্দের উপকরণ থাকা সত্ত্বেও কেউই সুখী নয় পুরোপুরি—কেবল ঐ ঘুঘু পাখীগুলো ছাড়া। গাছের চূড়ায় আকাশের নীচে বসে ওরা মিলনের আনন্দ ঘোষণা করছে কলকাকলীতে; তাইত মনে হয় ওরা প্রকৃতই সুখী।

"কে ওখানে—এণ্টনী নাকি?"—দরজায় আঘাত শুনে জিজ্ঞেস করল এলজবিএটা।

"হ্যাঁ মা ঠাকরুণ; বাবুরা আমায় পাঠিয়ে দিলেন আপনাকে জানাতে যে, আপনি ওখানে না থাকায় তাঁদের ভাল লাগছে না"—ঘরে প্রবেশ করে বৃদ্ধ ভৃত্যটি বলল। —"আঃ দয়া করে বলে দাও যে তাঁদের সাহচর্য আমার বিশ্রী লাগে বলেই আমি চলে এসেছি"—উত্তর দিল এলজবিএটা। মনোরম একটি ভঙ্গী করে জানালার দিকে এলিয়ে দিল তার দেহ—তার অনিচ্ছাটা স্পষ্ট করেই এণ্টনীকে দেখাবার জন্য। বিমুগ্ধ এণ্টনী রইল দাঁড়িয়ে। প্রদীপ্ত বিরক্তিশূন্য চোখে এলজবিএটা ফিরে তাকাল ভৃত্যের দিকে, বলল—তাঁদের বলে দাও...... আচ্ছা দাঁড়াও, তাঁদের বল যে আমি তাঁদের জন্য খাবার তৈরী করতে ব্যস্ত আছি।"

এমন একটি অসম্ভব অজুহাত দেখিয়ে নিজেই হেসে ফেলল এলজবিএটা। সকলেই জানে যে, শ্রীমতী এলজবিএটা কার্যত ঘরের কর্ত্রী নয়। গৃহের সুব্যবস্থার জন্য ভৃত্যেরাই ধন্যবাদের পাত্র। প্রভুপত্নীর আদেশ শিরোধার্য করে ভৃত্যটিও হেসে চলে গেল।

শ্রীমতী এলজবিএটার কর্মবিমুখ মন এই সংসারে একটা আলোচনার বিষয়। তার যে পরিবারে জন্ম, যে অবস্থায় সে মানুষ অর্থাৎ ভাগ্যের লিখনানুযায়ী তার কর্মকুশলী হওয়াই' সমীচীন ছিল। পিতৃগৃহে কাডনোস্কি পরিবারে এলজবিএটার ছিল বৈমাত্র ভাইবোন আর কাকারা। তাদের সম্মান প্রতিপত্তি লাভ করার ছিল প্রবল একটা মোহ। সম্পত্তি বৃদ্ধির জন্যই অবশ্য এর প্রয়োজন। এক সময়ে সে পরিবারে এল-জবিএটারূপে আশ্বাসবাণী নেমে এল ভাগ্য-বিধাতার কাছ থেকে। সুন্দর শিশুটি আত্মীয়দের মনে সান্ত্বনা এনে দিল। উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে কাডনোস্কি বংশের সম্পত্তি আর প্রধান অবলম্বনরূপেই গণ্য হতে লাগল মেয়েটি; বড় হতে লাগল অপরূপ লাবণ্য নিয়ে। অল্প বয়স থেকেই আত্মীয়রা কল্পনা করে রাখল ওর পাত্র হবে রূপকথার রাজপুত্র। কিন্তু রূপকথার রাজপুত্র ত এখন দুর্লভ আর ওদের পরিবারের পক্ষে দুষ্প্রাপ্য। তবুও কাডনোস্কি পরিবারকে জাগতে হবে তো, বর্তমান পুরুষ বেঁচে থাকতেই—এ সমৃদ্ধি বংশধরদের জন্য ফেলে রাখলে চলবে না। আর সেই জন্যই দরকার পরিবারের সুন্দরী কন্যার জন্য সম্পত্তিশালী পাত্র জোগাড় করা। এই উচ্চাকাঙ্ক্ষার পরিপোষকরূপে সতের বছর বয়সের এলজবিএটার পাত্র ঠিক করা হল মিএসিলেভ হিউমনস্কিকে। হিউমনস্কি কোটি পতির ছেলে—সম্পত্তিটাও তার হাতেই এসেছে —এবং তা বাড়বার সম্ভাবনা আছে প্রচুর।

মিএসিলেভ অল্প বয়সের যুবক; যদিও এরই মধ্যে অনেক বিত্ত, শেয়ার আর কারখানা হাতে এসেছে উত্তরাধিকারসূত্রে পিতার মৃত্যুর পরে। তার পিতাই ছিলেন হিউমনস্কি পরি-বারের সৌভাগ্য প্রতিষ্ঠাতা। মিএসিলেভ সুদর্শন যুবা এজন্যই জোর গুজব তার এই সৌন্দর্য কোন রাজপুত্রের দান। প্রকৃত হিউমনস্কির ছেলে এরূপ সুন্দর হতে পারে না। হতে পারে মিএসিলেভের ঘোড়দৌড়ের রুচি এবং উচ্চসমাজে মিশবার আকাঙ্ক্ষা রাজ-বংশের উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া। অন্যদিকে কিন্তু তার টাকাপয়সার দিকে নজর এবং ব্যবসায়ে ঝোঁক দেখে তাকে পিতার পুত্র বলেই মনে হয়। মোটের উপর মিএসিলেভ এলজবি-এটার উপযুক্ত স্বামী।

* *

দু-বছর হল ওদের বিবাহকার্য সমাধা হয়েছে মহা সমারোহে। শোনা যায় বিয়ের রাত্রে এলজবিএটা গির্জায় আসার পথে পালাতে চেষ্টা করেছিল। আরও শোনা যায় গির্জার বেদীর সামনে যখন তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল —এ বিয়ে তার ইচ্ছানুসারে হচ্ছে কি না—তার উত্তরে সে বলেছিল—"না"। পিতৃমাতৃহীনা অনাথা হলেও মেয়েরা অনেক সময় বোকামির পরিচয় দিয়ে থাকে। যাই হোক, ওদের বিয়ে হয়ে গেল এবং হিউমনস্কি পরিবারের সঙ্গে আত্মীয়তা বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে কাডনোস্কি পরিবারের সমৃদ্ধি বাড়ল।

কিন্তু শ্রীমতী এলজবিএটা কোন বিষয়েই তার পদমর্যাদার উপযুক্ত প্রমাণিত হল না। 'প্রিয় এসিলেভ'এর মূল্যবান সম্পত্তির উপর তার শ্বশুরকুলের দাবী কখনও আশানুরূপ পূরণ হত না। এলজবিএটার কাছ থেকে এ বিষয়ে কোন সাহায্যও পাওয়া যেত না।

অপরপক্ষে মিএসিলেভও হল অসন্তুষ্ট যখন দেখা গেল সুন্দরী স্ত্রীর অভিভাবকরূপে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধার সম্ভাবনা ছিল, তাকে দিয়ে তা পূরণ হল না। সুন্দর সম্পত্তিরূপে গণ্য হলেও মূল্য তার নেই। ঘোড়দৌড়ের ব্যাপারে, অফিসার মহলে, প্রভাবা-ন্বিত ব্যক্তিকে হাতে রাখতে এলজবিএটার কাছ থেকে কোন সাহায্য পাওয়া সম্ভব নয়। বড়ই একগুঁয়ে স্বভাবের—সহায়তাপ্রাপ্তির চেষ্টা-মাত্রেই আপত্তি জানায় এলজবিএটা। অথচ শ্রীমান হিউমনস্কির পক্ষে ব্যবসায়ে উন্নতিকল্পে কোন সংকটময় মুহূর্তে স্ত্রীর সাহায্য প্রার্থনা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

এসব ছাড়াও এলজবিএটার অন্যান্য ত্রুটি ছিল। যার জন্য এ পরিবারে সে নৈরাশ্য সৃষ্টি করল। বুদ্ধিসম্পন্ন অবস্থাপন্ন ঘরের লোকেদের সাধারণত টাকাপয়সার প্রতি থাকে একটা শ্রদ্ধার ভাব। কিন্তু এলজবিএটার টাকা সম্বন্ধে সে ভাব ছিল না মোটেই। তার হাতখরচের টাকাটা বাজেই ব্যয় হত। এ পরি-বারের পক্ষে অবোধ্য সব বই, শিল্পরুচিসম্মত আসবাবপত্র ইত্যাদিতে অপব্যয় হত তার টাকাগুলি। এগুলিও তত বাজে নয়—কিছু তো এর বাজার দর আছে। মারাত্মক জিনিসটি হল তার যাকে তাকে—ভিক্ষুক, বেকার, কৃষক, চরিত্র সংশোধনাভিলাষী—সকলকেই নির্বিচারে টাকা দিয়ে সাহায্য করা। চরিত্র সংশোধকদের মধ্যে একাধিক ব্যক্তি চুরি ব্যবসায়ে লিপ্ত।

সুতরাং দুই পরিবারের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন—এমন উপযুক্ত মিলন ক্রমশই শিথিল

হয়ে এল—সংশোধনের অযোগ্য বোন আর শাসনের বাইরে স্ত্রীর অদ্ভুত খেয়ালের জন্য।

সম্প্রতি স্বামী স্ত্রীর মনোমালিন্যটা একটু প্রকট হয়ে উঠেছে। কি অবুঝ এই মেয়েটি। নিজের স্বার্থসিদ্ধির উপায়স্বরূপ পরিবার পরিজনকেই অবলম্বনরূপে গণ্য করা তো অভিজাত সমাজের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। এইখানেই এলজবিএটার আপত্তি।

'ইজিডর রডিন কোম্পানী' নামে একটি ফার্ম রাশিয়ার রেল-লাইনে গ্যাস স্টোভ সরবরাহ করতে ইচ্ছুক। এর জন্য নির্ভর করতে হবে পিটার্সবার্গের কোন সম্ভ্রান্ত কর্মচারীর মর্জির উপর। এই ব্যক্তিটির সাথে মিএসিলেভ এবং বিশেষ করে কাউণ্ট উইটোল্ড, যিনি এই উদ্দেশ্যে হিউমনস্কি পরিবারে পরিচিত হয়েছেন, এ'দের দুজনের খুব পরিচয় আছে। এক ভোজসভায় মহামান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিটির সঙ্গে পরিচয় হয়েছে এলজবিএটার। সেই থেকে তিনি পোল্যাণ্ডের এই সুন্দরী মহিলার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত। একথা তিনি স্পষ্টই বলেছেন যে, এলজবিএটার যে কোন দাবী মিটাতে তিনি প্রস্তুত। এই সুযোগটির সদ্ব্যবহারের এখনই উপযুক্ত সময়। তাই মিএসিলেভ এবং উইটোল্ড এলজবিএটাকে সাথে নিয়ে যাবে পিটার্সবার্গ সেই মহামান্য কর্মচারীর সঙ্গে দেখা করে গ্যাসস্টোভের ব্যাপারটা মিটমাট করতে। এজন্য ইজিডর রডিন কোম্পানী থেকে উপযুক্ত পারিতোষিকের সম্ভাবনা আছে। এলজবিএটার সহযোগিতা ভিন্ন এই ব্যবসায় সম্পর্কিত কথাবার্তা চালানোও সম্ভবপর নয়। কারণ কর্মচারীটি জানিয়েছেন যে, তিনি এলজবিএটার চারুহস্তেই তাঁর স্বীকারপত্র দাখিল করবেন। কিন্তু মুশকিল বাধাল এলজবিএটা এ বিষয়ে সে কোন সাহায্য করতে নারাজ। 'ফেবার্জ স্যাকরার' তৈরী সুন্দর গহনা পুরস্কারের সম্ভাবনা জেনে ভয়ানক রেগে গেছে। যদি সে পিটার্সবার্গ যেত আর সেখানের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সাথে পরিচিত হত, ফেবার্জের মূল্যবান গহনাটা নিয়ে আসত, কি এমন ক্ষতি হত তার? সৌন্দর্যের এতখানি অপব্যয়।

হিউমনস্কি আর তার বন্ধুদের এই মনোমালিন্যের জন্যই এলজবিএটা অসময়ে এসেছে শয়নকক্ষে। চোখে ঘৃণার আভাস নিয়ে সে সোফায় শুয়েছিল। তথাকথিত উচ্চসমাজের সঙ্গে তার নতুন বন্দোবস্তের কথা মনে পড়ে ঘৃণা ফুটে উঠছে চোখে। কিন্তু জানালার বাইরে উদ্যান, গাছপালার স্নিগ্ধশীতল ছায়া আর স্বচ্ছ সুনীল গহন আকাশের দিকে চেয়ে তাঁর ঘৃণার ভাব উড়ে যায়। মনের ভিতরে যখন চলেছিল আলোড়ন, সেই মুহূর্তে প্রকৃতির সামঞ্জস্য আর স্বর্গীয় পবিত্রতা তাকে সান্ত্বনা এনে দিল।

আবার এণ্টনী ঘরে প্রবেশ করে অনিচ্ছায় জানাল যে, একটি কৃষক দেখা করতে চায় এলজবিএটার সাথে। কৃষকদের কখনও ফিরে যেতে হয় না এলজবিএটার কাছে এলে। কৃষকটিকে সে ভিতরেই আনতে বলে দিল। এণ্টনীর কিন্তু অনিচ্ছা ওকে ভিতরে নিয়ে আসতে। সেই জন্যই ও লোকটিকে বলেছিল এলজবিএটা এখন ব্যস্ত অতিথিদের নিয়ে, কিন্তু কৃষকটি নাছোড়বান্দা।......"এমন একটা বিশ্রী চেহারার লোকের সঙ্গে দেখা করা......"। বলল এণ্টনী—"কেন কি হতে পারে তাতে।" —"কিছুই হয়ত হবে না; কিন্তু এমন একটা অদ্ভুত লোক মনে হয় একটা আসামী।"

ভিতরে লোকটিকে আনতে হলে ও কাছে থাকবে, প্রয়োজন হলে উচিত শিক্ষা দেওয়া যাবে—জানাল এণ্টনী। এলজবিএটা প্রতিবাদ করে বলল যে, একাই সে দেখা করবে আগন্তুকের সাথে, কারণ ওর কিছু গোপনে বলার বিষয় থাকতে পারে।

অস্বাভাবিক ভারী পদশব্দে কক্ষান্তর সচকিত করে অনতিবিলম্বেই দ্বারদেশে একটি কৃষকের মূর্তি দেখা দিল। চেহারাটা অদ্ভুতই বটে। যথারীতি অভিবাদন জানিয়ে নীরবে এলজবিএটার পায়ের নীচে কার্পেটের উপর দৃষ্টি রেখে দাঁড়াল লোকটি। পাইন বৃক্ষের মত লম্বা চেহারা পোষাক পরিচ্ছদ রুথেনিয়ান কৃষকদের মত। বয়সে নিতান্ত যুবক হলেও মুখে ওর বিষন্নতার ছাপ আর চোখে বন্য দৃষ্টি। মুখ আর চিবুক নেড়ে ও যেন কি বলতে চাইছে। হাত দুটি কাটা ডালের মত ঝুলে আছে দুদিকে। ওকে দেখে এলজবিএটার ফাঁসীর আসামী বলেই মনে হল।

নীরবতা ভেঙ্গে দরদী সুরে এলজবিএটা ওর সাথে আলাপ আরম্ভ করল। প্রশ্ন করে জানা গেল ও বন থেকে এসেছে আর ওর নাম "ইয়েন ক্রুডা"। এ উত্তরে কিছুই বোঝা যায় না। শুধু ওর ভাব দেখে বুঝতে পারে এলজবিএটা কৃষকটি মনে মনে কিছু একটা বেদনা পোষণ করছে, খারাপ উদ্দেশ্য ওর কিছু নেই। এলজবিএটার প্রশ্নের উত্তরে এবার ও বলল যে, বন থেকে ও পালিয়ে আসেনি; বিবেকের বাণী শুনে চলে গিয়েছিল বনে, সেখানে তিন বছর কাটিয়ে এখন এলজবিএটার কাছে এসেছে ওর কথা নিবেদন করতে, কারণ ও শুনেছে যে এলজবিএটা পুণ্যময়ী।

এলজবিএটার ভয় হল—লোকটি পাগল নয় তো? ওর কথাবার্তা, ভাবসাব দেখে ওকে ছিটগ্রস্তই মনে হল। তবু আগ্রহভরেই শুনে চলল ওর কথা। এলজবিএটার কাছ থেকে বারংবার অভয়বাণী পেয়ে লোকটি নির্ভয়ে বিবৃত করল ওর আগমনের হেতু। লোকটি ছিল বনের পাহারাদার। বনে কোন অঘটন ঘটলে জানাতে হত উপরওয়ালাকে। রাত্রে ও খুব সতর্কই থাকতো। কিছুই ওর চোখে এড়াত না। একদিন কাঠ কাটার শব্দ শুনতে পেল। আসামীরা লোকটিকে দেখে ওর হাতে গুঁজে দিল দশটি টাকা, নিষেধ করল ওদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে। টাকা ও গ্রহণ করল আর আদালতে মিথ্যা শপথ করল। ........ বড় গরীব ও। কাজ করে জমাতে পারে না কিছুই। স্ত্রীর অসুখ; ছেলেরা বড় হয়েছে—গেলিসিয়া গির্জায় দীক্ষা দেওয়া ওদের ব্যয়সাপেক্ষ; অথচ কোন উপায় নেই। সেই জন্যই ওদের দেওয়া টাকা ও গ্রহণ করেছিল; কিন্তু পারেনি সে টাকা স্পর্শ করতে। স্ত্রীর অসুখে ডাক্তার ডাকা হয়নি, ছেলেদের হয়নি দীক্ষা দেওয়া। এ টাকা পুরোহিতকে দিয়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা—তাও সম্ভব হল না; কারণ রাশিয়ার পোপের কাছে গিয়ে ছোট হওয়া ওর ইচ্ছা নয়। সুতরাং ও বনেই চলে গেল। সেখানে শুনতে পেল বিবেকের বাণী। তিন বছর সেখানেই ও ছিল। ঠিক এই বসন্তের সময়ে ও বিবেকের আদেশ লাভ করল টাকাগুলি এলজবিএটাকে ফিরিয়ে দিয়ে তার দয়া ভিক্ষা করার জন্য।

দুমড়ান নোটগুলি এলজবিএটার কাছে তুলে ধরে কৃষকটি অনুরোধ করল এলজবিএটাকে টাকাগুলি গ্রহণ করে ওকে ভারমুক্ত করতে। নোটগুলি ওর হাত থেকে তুলে নিয়ে পিছনে ছুঁড়ে দিল এলজবিএটা। লোকটি তার পায়ের তলে বসে পড়ে হাঁটু জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করল—"ভগবান কি আমায় ক্ষমা করবেন, দেবি?"

"তোমার পাপ গুরুতর। কিন্তু তুমি যে বিবেকের বাণী শুনেছ, এই জন্যই ভগবান তোমায় ক্ষমা করবেন, ভাই।" এলজবিএটা নুয়ে ওর মস্তকে একটি চুম্বন এঁকে দিল।

যুক্ত করে চোখ বুজে প্রার্থনার ভঙ্গীতে বসে রইল লোকটি। মুখে শান্তি আর আনন্দের আভাস। মনের ভার ওর হাল্কা হয়ে গেছে। আর একবার অশ্রুসিক্ত চোখে এলজিবিএটার পা জড়িয়ে ধরল। তারপরে উঠে ছোট একটি নমস্কার করে চলে গেল কৃষকটি—বিবেকের দংশন থেকে মুক্তির আরাম নিয়ে।

প্রদীপ্ত মুখে উদ্ভাসিত চোখে এলজবিএটা দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। চিন্তাধারা ঘুরে বেড়াচ্ছে মনিব থেকে বন, আর বন থেকে মনিব পর্যন্ত। 'বনের অধিবাসীদের মধ্যে আত্মা এখনও বেঁচে আছে।'—মুখ থেকে বেরুল এই একটিমাত্র কথা।

সেদিন সন্ধ্যায় এলজবিএটা রইল অন্যমনস্ক। তার স্বামী বা কাউণ্ট কেউ তুলতে পারল না গ্যাস স্টোভের বিষয়টি। অন্য বিষয় আলোচনা করেও কোন সাড়া পাওয়া গেল না তার পক্ষ থেকে। একেবারে উদাসীনা। একটি কথা শুধু ওর মুখ থেকে বেরিয়েছিল—যাব,

সাথে ওদের মত উচ্চ সমাজের লোকদের কোন সম্পর্ক নেই। "হাঁ, এখনও এদের মধ্যে...... ধনের লোকদের মধ্যে অন্তত আত্মা বেঁচে আছে।"

এই অবোধ্য বাক্যটি কৌতূহল জাগাল সকলের মনে; সন্দেহ নিরসনের জন্য অনুসন্ধান আরম্ভ হল। ভৃত্যদের মধ্যে একজন ইয়েন ক্রুডার সঙ্গে এলজাবিএটার কথা-বার্তার সময় আড়ি পেতে দেখে থাকবে সব কারণ অবিলম্বেই ছড়িয়ে পড়ল যে, শ্রীমতী এলজাবিএটা কৃষকদের চুম্বন করে থাকে।

অনুবাদঃ বেলা দাশগুপ্ত

---

* পোলিশ গল্পের ইংরেজী অনুবাদ 'The Voice'-এর ছায়াবলম্বনে।

# আধুনিক কবিতার ভূমিকা

অনিমা দেবী

বর্তমান সংস্কৃতিক্ষেত্রে বিশেষভাবে ওলোটপালট হোয়েছে, যেমন হোয়েছে শিল্প আর সংগীতে তেম্নি হোয়েছে সাহিত্যে। যুদ্ধোত্তর সংস্কৃতিকে বিশেষভাবে বলা যেতে পারে যেটাকে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন 'The intellectual age'। সেই intellectই বর্তমান সাহিত্যে ছবিতে প্রকাশ পেয়েছে। আগে যে জিনিস ছিলো ঢালাই করা পালিশ করার কাজ, এখন তাতে এসেছে আবছা দুরতিক্রমের গতি। যেটাকে বুঝতে হ'লে মননশক্তির বিকাশ চাই, যার ভিতর ঢুকতে গেলে তোমার চিন্তা আর দৃষ্টিটাকে পরিমার্জিত করতে হ'বে। আধুনিক কবিতার যে ক্ষেত্র সে ক্ষেত্র এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বাদ যায়নি। আধুনিক কবিতা সম্বন্ধে এলিয়টের উক্তি

"The poet's mind is in fact a receptable for seizing and storing up numberless feelings, phrases and images'

রবীন্দ্রনাথও 'প্রান্তিকে'র কাব্য নিয়ে এরকমই উক্তি করলেন। 'এরা বসন্তের ফুল নয় এরা হয়তো প্রৌঢ় ঋতুর ফসল, বাইরে থেকে মন ভোলাবার দিকে এদের ঔদাসীন্য। ভিতরের মননজাত অভিজ্ঞতা এদের পেয়ে বসেছে।' আধুনিক কবিতার আদিভূমি এটুকুই। আর বাঙলা কবিতায় আধুনিকতার আরম্ভ প্রেমেন্দ্র মিত্র থেকে। প্রথম আমাদের চেষ্টা চলেছিলো রবীন্দ্র প্রতিভার আওতা থেকে সরে এসে নতুনতর কবিতার প্রকৃতি সৃষ্টি করা, তার থেকেই আরম্ভ আধুনিক কবিতার যুগ, তবে রবীন্দ্রনাথ থেকে আধুনিক কবিতা সরে আসতে পেরেছিলো কিনা সে বিষয় বাদবিসম্বাদ থাকলেও (কারণ রবীন্দ্রনাথ মৃত্যু পর্যন্ত আধুনিক ছিলেন) একটা নতুনতর আইডিয়া ও টেকনিক সৃষ্টি করেছে যা আমাদের বাঙলা কবিতায় ছিলো না। এই বাঙলা কবিতার নতুন দৃষ্টিভঙ্গী পাই সাগরপার থেকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর ইংলণ্ডীয় কবিতায় এলিয়ট এমন একটা ধারা তুল্লেন আর দেখালেন কবিদের কাছে যে জিনিসটা খুঁজছিলো সবাই। এই কবিতায় তাঁরা দেখতে পেলেন তখনকার সময়ের বিদ্রোহের সূচনা। যে ডিকাডেন্সের সূচনা করেছে তখন যুদ্ধপর্ব তারি আলোড়ন এলিয়টের কবিতায় পাওয়া গেলো। এলিয়ট থেকেই আধুনিক কবিতার সূচনা; অডেন স্পেণ্ডর প্রভৃতি তার ভিতর বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য নিয়ে আধুনিক কবিতাকে আরও বিকাশতর করেছে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র থেকে আধুনিক কবিতার যে পত্তন হ'লো, সেই সাড়া নিয়েই বাঙলায় আধুনিক কবিতার সৃষ্টি হ'লো আর সঙ্গে এক কবিগোষ্ঠীর সৃষ্টি হ'লো যাঁদের কবিতা প্রথম বদ্ধীকৃত ছিলো নিজেদেরই মধ্যে। আর সে কবিতা নিয়ে বাদবিসম্বাদ চললো—একদল স্বপক্ষে আর একদল বিপক্ষে। স্বপক্ষের মুখপত্রস্বরূপ বেরুলো 'কবিতা' ত্রৈমাসিক পত্র। সেখান থেকেই বাঙলায় আধুনিক কবিতা ব্যাপ্ত হ'তে ব্যাপ্ততর হোয়েছে এবং সাম্প্রতিকে একেবারে প্রতিষ্ঠিত। এতে বলতে হ'বে আধুনিক কবিতা যে সংবেদনা সৃষ্টি করেছে তার স্থান হচ্ছে জনগোষ্ঠীর ভিতর। আধুনিক কবিতা আরও প্রসারতর হচ্ছে আর হ'বেও। কিন্তু আধুনিক কবিতার ভিতর প্রথমে এমন কি ছিলো যেটা প্রথমে অপাংক্তেয়রূপে ছিলো? এর উত্তরস্বরূপ এই কথাটাই মনে হয়, সমাজ-বিপ্লবের ক্ষেত্রে রক্ষণশীলপন্থী, যে পরিবর্তন আসছে, তার প্রতিবন্ধকরূপে দাঁড়িয়ে যায়। এখানে সেই প্রতিক্রিয়া পরিস্ফুট। বিবর্তনবাদী মন শুধু সৃষ্টির ক্রিয়াটাই দেখে না আর গতির প্রাবল্যটাকেও স্বীকার করতে চায়। এই গতির স্বীকৃতিটাই দেখেছি আধুনিক কবিদের ভিতর। আরও আশ্চর্য, এই স্বীকৃতি নিয়ে যাঁরা একদিন বেড়ে ওঠেন তাঁরাই আবার একদিন বিবর্তনবাদক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হোয়ে দাঁড়ান। যে মোহিতলাল একদিন রবীন্দ্রমানস ছেড়ে নতুন স্পন্দনের স্থিতি দিলেন সেই মোহিতলালকেই বিরুদ্ধবাদী হোয়ে দাঁড়াতে দেখি আধুনিকতার ওপর। এর কারণ সৃষ্টিকার্যে রক্ষণশীলতার মোহ।

কিন্তু আশ্চর্য ব্যতিক্রম দেখেছি রবীন্দ্রনাথে। দেখেছি আমাদের কবিতার পুরোনো ক্ষেত্র, যার ভিতর ছিলো সাধারণ সংগতিসম্পন্ন শ্রুতিসুখকর শব্দসম্পদ আর ছন্দের লালিত্য। বিহারীলাল চক্রবর্তী পর্যন্ত এ মাপকাঠি দেখেছি (মাঝখানে মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ব্যতিক্রম), কিন্তু রবীন্দ্রনাথে সব কিছু ধোপে-ধাপে বদল হোতে লাগলো। রবীন্দ্রনাথের প্রথম অধ্যায় যদিও পুরনো যুগের মাপকাঠিতেই বদ্ধ ছিলো, কিন্তু নতুন যুগের পত্তন হ'লো 'বলাকায়'। সেখান থেকেই বাঙলা কবিতায় ছন্দময় লালিত্যের যুগে এক সঞ্চরণশীল বিস্ময়কর ছন্দের আবির্ভাব। তারপরেই রবীন্দ্রনাথের কাব্যে নতুন থেকে নতুনতর বিকাশ ঘটেছে। মানুষের মন এবং যুগ যখন বিবর্তনবাদের ছন্দে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত তখন বিবর্তনবাদক্ষেত্রে নতুন ক্ষেত্র এনে মানুষের জীবনযাত্রাকে সুমহান করার প্রচেষ্টা—এটা প্রতিভার বিষয়বস্তু। একজন আধুনিক কবি আধুনিক কবিতা সম্বন্ধে বলেছেন—এ যুগের কবি কৃত্তিবাসের ছন্দ নিয়ে পরিতৃপ্ত থাকতে পারে নি; সে একটা নতুনতর ধারা চেয়েছে যা এ যুগের চক্রে অবস্থিত। এটা চিরন্তন সত্য। রবীন্দ্রকাব্যে তারই পরিচয় পেয়েছি। গীতাঞ্জলির তর্জমা তখন য়ুরোপের ক্ষেত্রে সুমহান ভিত্তি দিয়েছে। তার ভিতর অন্তরের স্বাদ পেয়ে বিদগ্ধ চিত্তের মন বিরসিত হোয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ মানুষের ভিতর আশা এনেছিলো, হয়তো যুগান্তর আসবে এবং সেই যুগান্তর পৃথিবী সঠিক পর্যায়ে নেমে আসবে। এই সচঞ্চল গতি পৃথিবীর নতুন স্থিতির পরিচয়—'বলাকা'য় সেই ছায়া পড়লো।

চলমান গতির ধ্বনি। যুগের ধাবন অসীমের দিকে, মিলনের প্রান্তরে।

কিন্তু গত যুদ্ধের পর দেখা গেলো পরিবর্তন হয়নি কিছুই। মানুষের জীবনের যে অভাব আর শূন্যতা—সেটা দ্বিগুণতর হোয়েছে। বিজ্ঞানযুগের ওপর মানুষের বিরাগ ঘটালো, বর্তমান বিজ্ঞানের গতি মানুষের উন্নতির দিকে না ধ্বংসের দিকে। এই প্রশ্নই স্থান পেলো। তাই ওয়েস্ট ল্যান্ড'এর ওপর আধুনিক কবিতার পত্তন। মানুষের চিরন্তন অন্যায়ের ওপর বিক্ষুব্ধ হোয়ে এ'দের গতি বদলালো আর সঙ্গে সঙ্গে বলার টেকনিকও বদলে এলো। এ'দের উত্তর হচ্চে যেখানে জীবনের ক্ষেত্রে লাবণ্য নেই—সে লাবণ্য জীবনে খোঁজা নিষ্ফল। য়েট্‌স্‌ এলিয়ট সম্বন্ধে বল্লেন—

He has described men and women that get out of bed or go into it from mere hobit, in describing this life that has lost heart, his art seems grey, cold, dry.

কিন্তু পুরনো কাব্যরসিকদের ধাঁধা লাগালো, সনাতনীদের কাছে মনে হোলো এ উচ্ছৃংখল যাত্রা। সুইনবার্নের sweet poetical emotion' কিম্বা সংস্কৃত কাব্যের রস—সেই ধৃতি নেই। রবীন্দ্রনাথের মনও এক সময় সন্দিগ্ধ হ'লো। কিন্তু কবিতার একটা দিক হচ্ছে—জীবনের সাথে সহযোগ, জীবনকে দেখার প্রশ্ন নিয়ে চলা—এই ক্ষেত্র যদি থাকে, সেখানে কোন গোলও থাকে না বোধ হয়। তাই রবীন্দ্রনাথকে বলতে শুনি, ভিক্টোরিয়ান যুগের রোমান্টিক আবহাওয়া ছেড়ে এসে জীবনের সহজ ক্ষেত্রটাকে চিনে নেওয়া এটাই স্বাভাবিক। 'নবজাতক' কাব্যের ভূমিকায় বলতে দেখি, 'কাব্যে এই যে হাওয়া বদল থেকে সৃষ্টি বদল, এতো স্বাভাবিক, এমনি স্বাভাবিক যে, এর কাজ হ'তে থাকে অন্যমনে।'

কিন্তু আধুনিক কবিতা দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি করেচে এর দুর্বোধ্য প্রাকার দিয়ে। শব্দের কিম্বা প্রতীকের অভূতপূর্ব নির্ধারণে। এ দুর্বোধ্যতার অনুযোগ যখন আজকেও শোনা যায় তখন ভাবা উচিত এর সত্য কতখানি। একদল আগেও বলেছেন এখনও বলছেন কাব্যের ভঙ্গী হ'বে সহজ সরল যাতে সর্বজনগ্রাহ্য হয়। কিন্তু এ কাব্য তার উল্টো। 'সর্বজনগ্রাহ্য' কথাটা হয়তো মিথ্যা নয়, এই মিথ্যা নয়, প্রমাণের জন্যে সর্বজনের মনটাও হয়তো দরকার। আমরা ছোটতে যে মন নিয়ে চলেছি সে মনটা আজ বদলে গেছে। কেন বদলে গেছে তার কারণটা যদি না জানি, পথচলার সামর্থ্য থাকলেও সীমান্তের দিশা মিলবে কিনা সন্দেহ। একটা সময় ছিলো যখন আমরা সময়ের প্রকৃতি নিয়ে খুব মেতেছি। সেটা হচ্ছে রূপ-গন্ধ-স্পর্শ-শিহরণে আবেগ সঞ্জাত বস্তুরূপে গঠিত রূপকলা নিয়ে। এই রূপগঠনও কালের ধাক্কায় রূপান্তরিত হ'তে লাগলো। এই রূপান্তর আমরা বাঙলা কবিতায় চিনি নি, চিনলেও আমরা আলোচনা করি নি। আলোচনা করি নি ব'লেই মোহিতলাল বাঙলা কবিতায় একটি সময়ের দিগ্‌দর্শন হোয়েও আজকে সাধারণের কাছে অনালোচিত। তাঁর চিন্তার বেগ, তাঁর প্যাশন, তাঁর ভিগার পরবর্তী কাব্য যুগের অনুসরণ পেয়েছে—এটা আমরা জানি নি। মোহিতলাল থেকে নজরুল পর্যন্ত রবীন্দ্র কাব্যের ব্যক্তিত্ব ছাড়িয়ে নতুন ব্যক্তিত্বের সন্ধানী এবং সে সন্ধান যে সার্থকতা পেয়েছে এটা আলোচনা হ'লেও সাধারণের অজ্ঞাত। এই 'অজ্ঞাত থাকার' কারণ—কবিতার প্রতি নির্লিপ্তিতে আর একটা কবিতার প্রকৃতি নিয়ে সঠিক মূল্য-দর্শন চিন্তার অভাব। আর একটা হচ্ছে, কথা সাহিত্যের বিশেষ প্রসার। বঙ্কিমচন্দ্রের পর থেকে বাঙলা সাহিত্যে কথাসাহিত্যের অগ্রগণ্যতা। এই প্রাধান্য পাবার দরুণ জনসাধারণের কাছে কবিতায় রসাকাঙ্ক্ষার বোধ নির্মূলিত। এই নির্লিপ্ততায় আধুনিক কাব্যের বিবর্তন-পরিচয় ঘটে নি। যদি ঘটতো বুদ্ধদেব বসুর কবি চেতনার মূল উদ্ধার করতে পারা যেতো। মোহিতলালকে যদি জানতাম তাঁর এই কবি চেতনাকে বুঝতে পারতুম। নজরুলের জীবন উপলব্ধির ইমোশন প্রেমেন্দ্র মিত্রে যে আরও ঘন সন্নিবেশ ঘটেছে এটা বুঝতে পারতুম।

কিন্তু এই অনুভূতির মাধ্যমে আর একটা কাণ্ডও আছে। পৃথিবীর রূপ পরিগ্রহ। নিউটনীয় কাল থেকে আপেক্ষিকীয় কাল। কাল এবং স্থানের সংজ্ঞা। আর একটু সহজ করে বলা যেতে পারে ইতিহাস চেতনা আর বর্তমান জাগতিক দ্বন্দ্ব—এলিয়টীয় সংজ্ঞানুসারে যে ঐতিহ্যবোধ তারি প্রতিরূপ। এখানে পুরোপুরি ইনটেলেক্টই কর্মধর্মী নয়, এখানে জীবন আর ইনটেলেক্টের ঘনীভূত রসচেতনা। এটা আমাদের দেশে নতুন। একেবারে আনকোরা। আর এই চেতনার ব্যঞ্জনা সেখানেই পুরোপুরি মিলতে পারে—যেখানে কলালক্ষ্মী প্রজ্ঞার সাহচর্য পেয়েছে। সুধীন দত্ত এই শিল্পিমনের প্রথম অনুধ্যানী। কিন্তু সুধীন দত্তর সব চেয়ে বড় গলতি এখানে তিনি য়ুরোপীয় চিন্তায় বর্ধিত যেন। এখানে যে এদেশীয় মাটীও আছে, গাছ আছে, আকাশ আছে—এ চিন্তা যেন তাঁর জীবন থেকে উহ্য। কিন্তু জীবনানন্দে এর পূর্ণ বিকাশ দেখতে পাই। তাঁর আত্মা এদেশীয় মাটীর স্বাদ আর ওদেশের অধুনাতন কাব্য দীক্ষায় মণ্ডিত। তাই তার সার্থকতার স্বীকৃতি আছে, স্বীকৃতি আছে পরবর্তীকালের কবিসুরীদের। তাঁর আত্মার সুর যেন যখন তখন প্রকাশিত এখানেও।

তাই আধুনিক কবিতা নিয়ে বাদবিসম্বাদ করার আগে দেখা উচিত তার বিবর্তনবাদের পরিচয়। এও দেখেছি ব্রাউনিং ও হপকিন্সের কবিতা এক সময় য়ুরোপে দুর্বোধ্যতার জন্যে বিক্ষুব্ধতা এনেছিলো—আর সেই দুর্বোধ্যতাও এক সময় সহজ হয়ে এলো, যখন নির্ণীত হ'লো এ দুর্বোধ্যতার কারণ 'অন্বয়ের দুস্করতা'। এখানেও আমরা যেখানে আছি সেই মন—আর আধুনিক কবিতা যে দৃষ্টি নিয়ে আছে, সেই দুই মনের যদি বিচার করি—তবে বোধ হয় গোল চুকে যায়। ক্রোচের art is the expression of impression যদি স্বীকার করি, আধুনিক কবিতার impression-এর কারণ খুঁজে পেলেই সব সহজ হোয়ে আসে।

**টরে টরে টক্কা**—শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী প্রণীত। প্রকাশক—চন্দ্রবিন্দু, ৫১, মির্জাপুর স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দশ আনা।

"টরে টরে টক্কা" একখানি ক্ষুদ্র-কবিতার বই। মাত্র কয়েকটি লাইনের দ্বারা এক একটা সরস কৌতুকময় ভাবের ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। কবিতাগুলি আমাদের ভাল লাগিয়াছে। নমুনা-স্বরূপ একটি কবিতা উদ্ধৃত করা গেলঃ—

যাহারে দেখিলে পরে প্রাণ শুধু হাসে
মন উড়ু উড়ু,
সকলি মধুর লাগে যখনি সে আসে
নাই লঘু গুরু,
আলাপ করিতে গেলে মরে তবু ত্রাসে,
বুক দুরু দুরু,
তখনি বুঝিবে সখা, কহি তব পাশে
প্রেম হল সুরু।

**বিদ্যানিধি পঞ্জিকা**—প্রাপ্তিস্থান, ৯৩।৪, হরি ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য চারি আনা।

আমরা নূতন বৎসরের অর্থাৎ বাংলা ১৩৫৬ সালের বিদ্যানিধি পকেট পঞ্জিকা সমালোচনার্থ পাইয়া প্রীতি হইলাম। সর্বদা নিকটে রাখিবার পক্ষে এবং তিথিনক্ষত্র তারিখাদি দেখিবার পক্ষে পঞ্জিকাখানি বিশেষ উপযোগী হইয়াছে।

৭৩।৪৯

**মানুষই ভগবান**—শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দশ আনা।

মানুষের মধ্যে ভগবত্তার আরোপ করিয়া লিখিত একটি দীর্ঘ কবিতা। কবিতাটির মধ্যে অনেক নীতি কথা আছে। ৭৪।৪৯

**সুসিদ্ধান্ত পঞ্জিকা**—১৩৫৬ সালের সুসিদ্ধান্ত পঞ্জিকা নিখিল বঙ্গ জ্যোতিষ সমন্বয় ও সংস্কার সমিতির সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীদ্বিজপদ গোস্বামী ভাগবত জ্যোতিঃশাস্ত্রী কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ।৷৹ আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—ভাগবত ভবন জ্যোতিষ চতুষ্পাঠী, ১০২।৩, বকুলবাগান রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা—২৫।

প্রকাশক জ্যোতিঃশাস্ত্রী মহাশয় পঞ্জিকার ভূমিকাতে এই পঞ্জিকা প্রকাশের প্রয়োজনীয়তার বিষয় বিবৃত করিয়াছেন। প্রকাশকের বিবৃতি অনুসারে এই পঞ্জিকাখানি বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভার নিযুক্ত সারণী সমিতির সিদ্ধান্তানুযায়ী রচিত "করণবল্লভ" ও "পঞ্চাঙ্গ দর্পণ" সারণী অবলম্বনে গণিত হইয়াছে। ইহার গণনাফল পাশ্চাত্য নাবিক পঞ্জিকার গণনাফলের সঙ্গে এক। প্রকাশক মহাশয় তাহা অঙ্ক কষিয়াও দেখাইয়াছেন।

**ছোটদের ল্যাবরেটরী**—মনোজ সান্যাল প্রণীত। প্রকাশকঃ পূরবী পাবলিশার্স লিঃ, ৩৭।৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা। পৃঃ ৮২। দাম এক টাকা।

আমদের দেশে শিশু ও কিশোরদের জন্য বহু বই বেরিয়েছে এবং বেরুচ্ছে। প্রকাশিত বইগুলির অধিকাংশই ছেলেমেয়েদের হাতে তুলে দেওয়ার অনুপযুক্ত। কারণ তাতে এমন সব আজগুবী ও অবাস্তব বিষয়ের অবতারণ করা হয়েছে যে তা পড়লে পড়ুয়াদের কোন উপকার তো হবেই না বরঞ্চ উল্টো ফল হবার সম্ভাবনা বেশী। এ সভাবনার হাত এড়াতে হলে সুপরিকল্পিত ভাবে শিশু-সাহিত্য পরিবেশনের দায়িত্ব নিতে হবে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের। দেখতে হবে যে শুধু মাত্র রহস্য এ্যাডভেঞ্চার বা এই জাতীয় পুস্তক পড়ে যেন শিশুর কল্পনাশক্তি বা জানার আগ্রহ মিইয়ে না পড়ে।
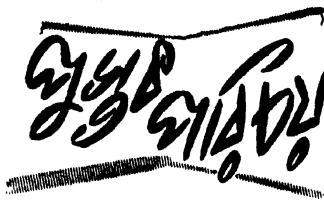
এদিকে লক্ষ্য রেখেই ছোটদের বিজ্ঞানী দাদা মনোজ সান্যাল আলোচ্য পুস্তকটি রচনা করেন। আলোর নানা ক্রিয়কলাপ নিয়ে ছোটরা যাতে নিজে-দের ল্যাবরেটরীতে গবেষণা চালাতে পারে তিনি তারই হদিস দিয়েছেন। পুস্তকটি তাই একাধারে খেলার ও শিক্ষার সঙ্গী। বাজে এ্যাডভেঞ্চারের পুস্তক থেকে ছোটরা যে এই বইটি অধিকতর আগ্রহে পড়বে এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। 'মৌমাছি'র সঙ্গে আমরাও বলি, 'ছোটদের হাতে এ বইটি সকল বাপ মাই তুলে দেবেন', কারণ ভাবী জাতিকে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের আলো দেখাতে হবে ছোটবেলা থেকেই। ২৫।৪৯

**আন্দামান বন্দী**—শ্রীঅনন্ত ভট্টাচার্য, প্রকাশকঃ বিমলারঞ্জন পাব্লিশিং হাউস, পোঃ খাগড়া, মুর্শিদাবাদ, পৃঃ ৪৬, মূল্য এক টাকা।

এককালে যেসব বন্দিশালা মানুষের মনে বহু ভাবের সৃষ্টি করিত আলোচ্য পুস্তকের লেখক নিপীড়িত রাজবন্দী অনন্ত ভট্টাচার্য তাহারই দুইটি স্থানের ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন। ঐ কারাগার দুইটি হইতেছে মেদিনীপুর এবং আন্দামান। 'ব্যাস্টিলে'র সঙ্গে তুলনীয় না হইলেও মেদিনী-পুরের ১০০ ডিগ্রী এবং আন্দামানে সেলসমূহ কোন অংশে ন্যূন নহে। ইহাদের দেওয়ালের প্রতি রন্ধ্রে যে নির্যাতন কাহিনী রক্তাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে তাহা যদি কোন দিন প্রকাশিত হয় তবে সভ্য সমাজের সভ্য জাতিকে যে লজ্জায় মাথা নত করিতে হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

লেখক রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন এবং সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যক্রমে মেদিনীপুর ও আন্দামানের কারান্তরালে দিন যাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সঞ্জাত বলিয়া বইটি গুরুত্বপূর্ণ হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি পুস্তকটি হইতে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিবেন। ৬।৪৯

**যে মালা গাঁথিনু**—দিলীপকুমার মজুমদার, প্রকাশকঃ ডাঃ টি এন বসু, ১৪৩, নেতাজী সুভাষ রোড, হাওড়া। পৃঃ সংখ্যা ১২০, দাম দেড় টাকা।

আলোচ্য পুস্তকটি কতকগুলি কবিতা, গান ও গল্পের সমষ্টি। লেখক অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাঁহার আত্মীয়স্বজন উদ্যোগী হইয়া পুস্তকটি প্রকাশ করিয়াছেন। সব লেখা সমান না হইলেও কতকগুলি লেখায় লেখকের মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। ৩৬।৪৯

**India on Planning**,—By A. K. Shaha. Published by the Globe Library, 2, Shyama Charan De Street, Calcutta 12. Pp. 238. Price Rs. 7-8 as.

আজকের পৃথিবীর ছোট বড় সব দেশগুলোই মেনে নিয়েছে যে বেঁচে থাকতে হলে, বাড়তে হলে গোড়ায় থাকবে সুকল্পিত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা। অনুন্নত দেশগুলোর ভেতর যাদের রয়েছে অফুরন্ত প্রাচুর্যের সম্ভাবনা অর্থনৈতিক পরিকল্পনা তাদের খুব কম সময়ে কি করে বিস্ময়কর প্রসারতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে সোভিয়েট রাশিয়া সে কথা প্রমাণ করেছে। জার শাসিত রাশিয়া আর আজিকার ভারত প্রায় একই পর্যায়ে পড়ে। সোভিয়েট রাশিয়া তাই আজ নানাভাবে ভারতের পক্ষে অনুকরণীয়।

আলোচ্য পুস্তকের লেখক একজন যন্ত্রবিৎ। রাশিয়ায় তিনি হাতেকলমে কাজ করেছেন। অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতাও তাঁর আছে। সুতরাং স্বাধীন ভারতের উন্নয়নের জন্য তিনি যেসব ইঙ্গিত করেছেন তা সংশ্লিষ্ট দপ্তর বিবেচনা করে দেখবেন বলে আশা করি। তাঁর ইঙ্গিতে কিছু কিছু অস্বাভাবিকতা থাকলেও চিন্তার খোরাক আছে।

ডাঃ সাহার রাশিয়ান বন্ধু ও স্ত্রী শ্রীমতী টাটিনা সাহা সেডিনা বারোটির ভিতর পাঁচটি পরিচ্ছেদ লিখেছেন। প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদ সুলিখিত এবং বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও তথ্য-বহুল। আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে লেখিকার জ্ঞান যে কত গভীর তা লেখার মধ্যে সুপরিস্ফুট। পরিচ্ছেদ-গুলি পড়তে পড়তে ভুলে যেতে হয় ডাঃ সাহার অস্তিত্বটা। শ্রীমতী সাহার লেখায় যে অসঙ্গতিটা চোখে পড়ে সেটা হচ্ছে সোভিয়েট কাঠামোকে পুরোপুরি ভারতের অর্থনীতিতে স্থাপনের জন্য তাঁর আগ্রহ। ভারত ও রাশিয়ার অর্থনৈতিক দুরবস্থা ও সামাজিক ও ভৌগোলিক ঐক্যই তাঁহার মধ্যে বোধ হয় এই আগ্রহের সৃষ্টি করেছে, ফলে তিনি ভুলে গিয়েছেন যে উভয় উপমহাদেশের মধ্যে অনৈক্যের সংখ্যাও কম নহে। সুতরাং এক দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো অন্য দেশে চালু করা সম্ভবপর নয়। এই সহজ সত্যটা মনে রাখলে বইটি আরও চিত্তাকর্ষক হত।

যা হোক ভারতের উন্নতিকামী চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ বইটির সদ্ব্যবহার করতে পারবেন বলে আমরা আশা করি। ১৯৭।৪৮

**পদ্মা**—দ্বিতীয় সংস্করণ। লেখক—শ্রীপ্রমথ-নাথ বিশী। প্রকাশকঃ সাহিত্যিকা, ১২৯।২এ, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য সাড়ে তিন টাকা। বাণীবনের হংসমিথুনের পাখা থেকে বাগ্‌দেবীর প্রসাদপূত দুটি পালক লাভ ক'রে প্রমথনাথ এই কথাকাব্যখানি লিখেছেন। পালক দুটির একটিতে রেখা আর একটিতে রঙ ক্ষরণ করে, একটিতে হাস্য আর একটিতে করুণা, একটিতে চিন্তা আর একটিতে ভাবুকতা। ফলত এই প্রায় দুশো পৃষ্ঠার বইখানি কাব্য না উপাখ্যান না চিত্র বলা দুরূহ, আমার মনে হয়—তিনই। গল্পচ্ছলে কবিতা লেখা—একবার স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র এ কাজ করেছিলেন, তাই কপালকুণ্ডলার সৃষ্টি। প্রমথ-নাথও অনুরূপ সাহস করেছেন এবং সিদ্ধকাম হয়েছেন; ফলে কালনাগিনী পদ্মার উদ্ধত ফণা-ছত্রের তলে কঙ্কণের ছবি। এই সুবর্ণ কঙ্কণ এই অনিন্দ্যপ্রতিমা কপালকুণ্ডলার মতোই। নাট্যের পঞ্চমাঙ্কের পর মুহূর্তে রহস্যক্রূর অপার অগাধ জলে নিমজ্জিত হলেও সেই প্রলয়দীপ্ত-উদ্ভাসিত চিত্র কখনো মুছে যাবার নয়। কপালকুণ্ডলার সহোদরা ভগ্নী ব'লে উল্লেখ করায় কঙ্কণকে কেউ তারই অনুকৃতি না মনে করেন। অনিবার্য নিয়তি-ক্রমে ঘটনাবর্তের কতকটা একই রূপ পরিণাম হওয়া

স্বত্ত্বেও প্রমথনাথের এই একেবারেই স্বতন্ত্র, একেবারেই তাঁর নিজস্ব প্রতিভার সৃষ্টি। সেই প্রতিভার সাহস স্বাতন্ত্র্য। উৎকর্ষ ও সিদ্ধি লক্ষ্য করেই একটি কথা আমার বলবার আছে—প্রমথনাথের রচনা পাঠকালে বঙ্কিমচন্দ্রকে এমন কি রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করাও বিচিত্র নয়; একটি বিশেষ গুণে এই দুইজন মহাকবি বর্তমান লেখকের অগ্রগামী ও অনুকরণযোগ্য, সে তাঁদের সংযম, লেখার চেয়ে না লেখা। কাদম্বরী কাব্যের তুলিকর বাণভট্টের মতোই প্রমথনাথের চিত্রনৈপুণ্য, সেজন্য বাঙলা-সাহিত্য লাভবান সন্দেহ নেই (তবে বাণভট্ট বা ভবভূতির মতো বর্তমান বিংশ শতকের কোনো লেখকই নিরবধি কালের অধিবাসী নন; প্রত্যহ প্রাতঃকালে চায়ের টেবিলে খবরের কাগজটি এনে প্রতিটি সাল তারিখ ও তার নিরর্থক ঘটনারাজি উঁচিয়ে নিরীহ ভদ্রলোককে চোখে খোঁচা দিয়ে সচেতন করে তোলে। দীর্ঘচ্ছন্দে বিলম্বিত লয়ে গল্প বলার সময় আজ কারও নেই। সেটা হয়তো খেয়েরই বিষয়। কিন্তু আসল সংযম ছন্দগত বা আয়তনগত নয়, বস্তুগত।)—পাঠকের চক্ষের সম্মুখে পদ্মাবক্ষে ও হিমাচল কটিতে যে চলচ্চিত্রাবলি উন্মোচিত হয়েছে তাতে সে মুগ্ধই, উপরন্তু স্মিত পরিহাস বা নিষ্ঠুর কৌতুক আধুনিক কালের সহজাত কবচকুণ্ডল—যা হয়তো আবশ্যক ছিল না অন্তত বাণভট্ট ব্যবহার করেননি। প্রমথনাথের সংযমের অভাব বা সহৃদয়তার ত্রুটি লক্ষ্য করি সেইখানেই যেখানে তাঁর শক্তিও। অধ্যাপক রায়ের ড্রয়িং রুমে যে কটি চরিত্রের সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় হল (অবশ্য, এই উপাখ্যানে তাদের প্রয়োজন গৌণ বলা চলে) তারা অনেকেই এই গল্পের অন্যান্য জীবন্ত চরিত্রের এক শ্রেণীর নয়; তাদের জন্যে লেখক নিজের মস্তিষ্ক থেকে যেসব বাঁধা বুলি ও বাঁধা অঙ্গভঙ্গী উদ্ভাবন করেছেন, তাতে পরিহাস্যতা থাকলেও সে হল তাদের প্রতি সুতরাং লেখকের নিজের প্রতিভার প্রতিও অবিচার। অবশ্য, বর্তমান আলোচকের এটা ভ্রান্ত বিচারও হতে পারে এবং 'পদ্মা' এমনই অনন্য সৃষ্টি, এতই চমৎকার যে এরূপ দু'একটা ত্রুটি (দু একটা ছাপার ত্রুটির মতোই) শেষ পর্যন্ত মনে থাকবে না। কেবল মনে থাকবে একটা সুরের রেশ, একটা রসের আবেশ।

রচনার কয়েক স্থল উদ্ধৃত করবার আমার ইচ্ছা ছিল, তাই পড়তে পড়তে দাগ দিয়ে চলে-ছিলেম। দেখছি দাগ অনেক বেশি দিয়েছি। সমস্ত বইটি বোধ হয় 'দেশ'এ উদ্ধৃত করে দেওয়া চলবে না, কাজেই কৌতূহলী পাঠকদের বইখানি ক্রয় করে, ধার চেয়ে বা চুরি করেও সংগ্রহ করে পড়তে হবে। কয়েকটি রাত্রির বর্ণনা যেন রাত্রির নিকষকৃষ্ণপটে জ্যোতিষ্কের তুলি দিয়েই লেখা —'সঙ্কীর্ণ গিরিপথের একটি মাত্র রন্ধ্রের মধ্য দিয়া বর্ষার দুরন্ত স্রোতস্বিনী যেমন আপনাকে নিঃশেষে নিঃসারিত করিয়া দিবার চেষ্টাতে অজস্র ফেনপুঞ্জের সৃষ্টি করে, তেমনি লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি গ্রহ উপগ্রহ চন্দ্র তারা সূর্য একটি ক্ষুদ্র আকাশের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে গিয়া এই অলৌকিক জ্যোতিষ্কজাল বিস্তার করিয়াছে।' ঋতুতে ঋতুতে বিচিত্ররূপিণী মুহূর্তে মুহূর্তে বিভিন্ন ভাবিনী পদ্মার বর্ণনা তো এই গ্রন্থের সর্বত্র—কাশিয়াং থেকে দেখা চিরন্তনী বঙ্গজননীর যে অপূর্ব ভাবচ্ছবি প্রমথনাথ অঙ্কিত করেছেন তার উদ্দেশেও প্রণামে মাথা আপনি নত হয়ে পড়ে। একটি কথা প্রথমেই বলা উচিত ছিল। ব্যক্তিত্বের ছাপকে স্টাইল বলে, এরূপ শুনেছি। সংসারে ব্যক্তি যেহেতু দুর্লভ, স্টাইলও তাই সহস্রের মধ্যে হয়তো একখানা বইয়ে দেখা যায়। এ বই সেই সহস্রের মধ্যে বিশেষ একখানি। চন্দ্রচূড়

**মধুপর্ক**—শ্রীঅমলানন্দ ব্রহ্মচারী প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী বি-এ, কালিকাশ্রম, পোঃ বেলুড় মঠ, হাওড়া। মূল্য এক টাকা।

শ্রীশ্রীকালিকাধ্যান, শ্রীশ্রীকালিকা সুধাধারা স্তোত্রম, শ্রীশ্রীললিতা-ত্রিসতী, শ্রীশ্রীতারা ত্রৈলোক্য-মোহন কবচম্—এই কয়টি স্তব ও কবচ আলোচ্য পুস্তকখানাতে সংকলন করা হইয়াছে। পরিশিষ্টে কতকগুলি ভজন গান তালরাগিণীর নাম সহ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ৪৮।৪৯

**শ্রীশ্রীচণ্ডী**—শ্রীঅশোককুমার ভঞ্জ চৌধুরী বি-এ সাহিত্য-শ্রী প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—গ্রন্থকারের নিকট, ২৪।এ, নিমতলাঘাট ষ্ট্রীট (২৮নং ঘর), কলিকাতা। মূল্য দুই আনা।

আলোচ্য পুস্তিকায় শ্রীশ্রীচণ্ডীর মূল বিষয়-বস্তু ও উহার দার্শনিক তত্ত্ব সংক্ষেপে গল্পাকারে বিবৃত করা হইয়াছে। ৪৯।৪৯

# দুই 'নেশন'

শ্রীঅরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়

টার্-ম্যাকাডামাইস্ড্ রাস্তা
কাঁচের মত মসৃণ,
চলে গিয়েছে সোজা
দূর হতে দূরান্তরে;
মাঝে মাঝে ছুটে চলেছে মটর-গাড়ি।

তার এ পাশে নগরী,
ভারতের নবতমা মহানগরী,
'প্রদীপ্ত মণিখণ্ডবৎ জ্বলিতেছে'।
যেখানে 'চক্রতীর্থে' তরুণ-তরুণীর ভীড়।
তরুণদের হাফশার্ট বা বুশ-শার্ট ও প্যান্ট পরা;
তরুণীদের অঙ্গে সস্তা সিল্কের পোষাক,
বিলাতী মার্সীলাইজড্ কাপড়ের পোষাক,
মুখে রুজ, পাউডার, লিপ্‌স্টিক;
বিলাতী হালফ্যাশনে ঢেউ-তোলা চুল;
পায়ে হাই-হিল জুতা;
বদনে ভাঙা ভাঙা ইংরাজী বুলি
যেটা তাঁদের কাহারই মাতৃভাষা নয়।

রাস্তার ওপারে
বন, জঙ্গল, ক্ষেত, খামার,
লাঙল, গরু, গরুর গাড়ি—
যে গরুর গাড়ির মধ্যে
লোহার সমাবেশ খুবই কম,
যার সবটাই দেশি।
লোকগুলি দীর্ঘ-দেহ, মলিন;
আর তাঁদের পরণে
মলিন অবিলাতি সম্পূর্ণ স্বদেশী গাড়া
অর্থাৎ খাদি, অর্থাৎ খদ্দর;
সেবা দেশী দা'কাটা তামাক
সম্পূর্ণ দেশী হুকা ও গড়্গড়ায়।
তারা কথা কয়
ষোলো আনা দেহাতি ভাষায়।
মাটির দেওয়ালের উপর চাল-দেওয়া
ছোট বড় ঘর-গুলো দাঁড়িয়ে আছে—
কেউবা সোজা,
কেউবা জ্যামিতিক কোণে হেলে।
পাড়ার কুকুরগুলো
ভদ্রলোক দেখ্‌লেই তাড়া করে
অসন্তোষের কলরব করতে করতে।

একই রাস্তার দু'ধারে
দু'টি 'নেশন' বাস করে।
এ'দের ওধারে
ওদের এধারে
দেখতে পাওয়া যায় না। [উত্তরা, পৌষ ১৩৫৫

# আণবিক শক্তির পরিণতি

শ্রীনন্দলাল ঘোষ

বিশ্ববিখ্যাত পরমাণুবিদ্ অধ্যাপক পি এম এস ব্ল্যাকেট সম্প্রতি আণবিক শক্তি সম্বন্ধে একখানি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। লেখকের ভাষায়—

"The origin of the book was an attempt to find a rational basis for a policy for the United Kingdom in relation to atomic energy."

১৯৪৫ সালে বৃটিশ রাজ আণবিক শক্তি সম্বন্ধে একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করেন। লেখক সেই কমিটির সদস্যরূপে প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত অনেক তথ্যের পরিচয় পেয়ে শেষ পর্যন্ত যে মত পোষণ করেন, তা উপদেষ্টা কমিটির অন্যান্য সদস্যদের মতের সঙ্গে অনৈক্য দেখা দেয়। তাই তাঁর নিজস্ব মত পুস্তকাকারে প্রকাশ করেছেন। পুস্তকটিতে আছে প্রচুর তথ্যের সন্ধান আর একজন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকের বিশ্লেষণ পদ্ধতির পরিচয়।

মুখবন্ধে লেখক বলছেন অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে তার মতের পার্থক্য মূলতঃ দুই ক্ষেত্রে। প্রথমতঃ ভবিষ্যত যুদ্ধে আণবিক বোমার স্থান ও ফলাফল সম্বন্ধে আর দ্বিতীয়তঃ এই প্রসঙ্গে বর্তমানে আন্তর্জাতিক রাজনীতি কি হওয়া উচিত সেই সম্বন্ধে।

পৃথিবীতে যখনই কোনও নূতন মারাত্মক অস্ত্রের আবিষ্কার হয়েছে একদল লোক ধরে নিয়েছে যুদ্ধ ব্যাপারে এইটাই হবে শেষ-কথা আর একদল লোক বিশেষ কোনও চাঞ্চল্য প্রকাশ করেনি। সত্য অবশ্য এই দুয়ের মাঝখানে কোনও জায়গায় আছে। জার্মানী যখন প্রথম সাবমেরিণ আবিষ্কার করল অনেকেই ধারণা করেছিল নৌযুদ্ধে জার্মানীর সঙ্গে আর কেউ পেরে উঠবে না। এই ধারণা মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যখন জঙ্গীবিমান প্রথম দেখা দিল তখনও লোকে এই রকমই ভেবে ছিল। তারপর এক এক করে অনেক কিছুই আবিষ্কার হয়েছে। হালকা জঙ্গী বিমান থেকে ভারী বোমারু বিমান Messermichdt, Fortress, Superfortress অনেক কিছুই কাজে লাগান হয়েছে—কিন্তু যুদ্ধ এখনও চলেছে। জার্মানীর ভি, বা ভি-টু রকেট তাও আয়ত্তের মধ্যে এসে পড়েছে। শেষ পরিণতি হয়েছে বর্তমানের অ্যাটম বোমায়।

স্বীকার করতেই হবে অ্যাটম বোমার ... জার্মানী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে blusler বোমা ব্যবহার হয়েছিল তার ধ্বংস-শক্তিও বড় কম ছিল না। কিন্তু লেখক দেখিয়েছেন, প্রচুর সর্বধ্বংসী-বোমা ব্যবহার করা সত্ত্বেও জার্মানীর যুদ্ধাস্ত্র-শিল্পের উৎপাদন ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত বরাবর বেড়েই গিয়েছে—তার পর থেকে উৎপাদন পড়তে শুরু করে এবং খুব তাড়াতাড়ি পড়েও যায়। কিন্তু লেখকের মতে তার কারণ এই নয় যে, জার্মানীর মনোবল ক্ষুণ্ণ হয়ে গিয়েছিল। লেখক এর কারণ বিশদভাবে আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে, অন্ধকারে যথেচ্ছভাবে বোমা ফেলে শহরের লোক নিশ্চিহ্ন হলেও শিল্প ব্যাহত হয় না। পরন্তু, দিনমানে শক্তিশালী

বৈজ্ঞানিক ব্ল্যাকেট

বোমারু দল নিয়ে শত্রুর দেশে শিল্প ঘাঁটি-গুলি বিশেষভাবে আক্রমণ করা সম্ভব যখন হোল তখনই জার্মানীর শিল্পোৎপাদন কমতে শুরু করে। আবার তেল কম থাকায় জার্মানীর জঙ্গীবিমান বহর দুর্বল হয়ে পড়ল তাই দিনমানে বোমা ফেলা সম্ভব হয়েছিল। অর্থাৎ লেখকের মতে indiscriminate bombing করে লোকের মনোবল নষ্ট করে যে যুদ্ধে জয়লাভ সম্ভব হয়েছে তা ঠিক নয়। লেখক পুঁথিপত্র দিয়ে এই যুক্তি প্রতিপন্ন করেছেন। কারণ আণবিক বোমার অসম্ভব ধ্বংস ক্ষমতা সত্ত্বেও যে কোনও শক্তিকে যে সহজেই নিশ্চিহ্ন করা যাবে বা জাপানে যা আপাতঃ-দৃষ্টিতে সম্ভব হয়েছে, ভবিষ্যৎ যুদ্ধে যে সেটা সম্ভব হবে, তা লেখক মনে করেন না। আমেরিকা আর রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ। এই যুদ্ধের সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমেরিকা ও রাষ্ট্র-সঙ্ঘে ইতিমধ্যেই অনেক রকম জল্পনা বা মতামত প্রকাশিত হয়েছে এবং এর কারণও লেখক দেখিয়েছেন।

মিত্রশক্তির সদস্যরূপে যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট একসঙ্গে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রীতির ও সৌহার্দ্যের যে প্রাচুর্য্য ছিল না জাপানে আণবিক বোমা ফেলার ব্যাপারে সেটা বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। Potsdam চুক্তি অনুসারে রাশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে স্থির হয়। এর ফলে প্রস্তুত হয় রাশিয়া ঝটিতি—মাঞ্চুরিয়া ও শাখালীন দ্বীপ ছেয়ে ফেলে ৮ই আগস্ট ১৯৪৫ সালে। হিরোশিমাতে প্রথম অ্যাটম বোমা পড়ে ৬ই আগস্ট সকাল ৮টা ১৫ মিনিটে—বিমান আক্রমণের all clear সঙ্কেতের ৪৫ মিনিট পরে। সাধারণ শ্রমিকরা তখন সকলেই কাজে ব্যস্ত, কেউই নিরাপদ আশ্রয়ে ছিল না। ৪.৪ বর্গ মাইল স্থান সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ হয়ে যায়। লোক মরে ৭০—৮০ হাজার। ৯ তারিখে নাগাসাকিতে যে বোমা পড়ে তার শক্তি শতকরা ১৫ ভাগ বেশী ছিল। নাগাসাকির লোকসংখ্যাও হিরোশিমার চেয়ে প্রায় ½ ভাগ বেশী। কিন্তু লোকে সতর্ক ছিল। এখানে হতাহতের সংখ্যা হল ৩৫—৪০ হাজার। লেখক বোঝাতে চান আণবিক বোমার ধ্বংস-শক্তি সম্বন্ধে যে ধারণার সৃষ্টি হয়েছে তা অনেকাংশে অতিরঞ্জিত। ভবিষ্যৎ যুদ্ধে ধ্বংসের পরিমাণ এত বেশী নাও হতে পারে। কিন্তু আসল কথা যে যুক্তরাষ্ট্রের জাপানকে হার স্বীকার করানোর জন্যে আণবিক বোমার সাহায্য নেওয়ার আদৌ কোনও আবশ্যক ছিল কি না। যদিও যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্ট প্রচার করেছেন এই আণবিক বোমাই যুদ্ধ শেষ করেছে আর এতে প্রায় দশ লক্ষ আমেরিকানের জীবন বেঁচেছে। লেখক বলেন এই ধারণার সৃষ্টি করা হয়েছে ইচ্ছে করে, লোককে ভুল বোঝাবার জন্যে। কারণ তা না হলে যে বর্বরতা ওর মধ্যে নিহিত আছে তার ক্ষালন হয় না; আর তার অপর আণবিক বোমা ব্যবহারের আসল কূটনৈতিক উদ্দেশ্য সর্ব-সমক্ষে প্রচার হয়ে পড়ে।

লেখকের মতে, যুক্তরাষ্ট্র বেশ ভালভাবেই খবর পেয়েছিল যে জাপানের অবস্থা অত্যন্ত

পান রাশিয়াকে মধ্যস্থ মেনে সন্ধির সর্ত জছিল—এমন কি এও শোনা যায় যে ণবিক বোমা না পড়লে Prince moyeকে পাঠান হত বিনাসর্তে হার কারের প্রস্তাব নিয়ে। এর কারণ বুঝতে কষ্ট হয় না। ইতিমধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের ন্যদল আশেপাশের দ্বীপগুলি অধিকার র ফেলেছিল—সমুদ্র পথ ঘিরে ফেলায় রবরাহে ভয়ানক টান পড়েছিল এবং তেলের ভাবে জঙ্গীবিমান অকেজো হয়ে গিয়েছিল স্তুতঃ যার জন্যে আণবিক বোমা বয়ে পান পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া সম্ভব হল)—পানের সামরিক শক্তি যে নিঃশেষ ও স্তেজ হয়ে পড়েছে এ সম্বন্ধে সন্দেহ কার কোনও কারণই ছিল না। তবুও ণবিক বোমার মত বর্বর অস্ত্র জনবহুল হরের ওপর ফেলার হঠাৎ কি যে তাগিদ ল তা বুঝতে পারা যায় না, যদি না এর লে যে কূটনৈতিক উদ্দেশ্য আছে এটা ধরে ওয়া যায়। এর আগেই অণুবৈজ্ঞানিকদের নেকে তাঁদের আবিষ্কারের ভয়াবহ সম্ভাবনা খে বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন এবং Frank portএ আণবিক বোমা ব্যবহারের বিরুদ্ধে ত দিয়েছিলেন। জাপানে আণবিক বোমা ফলার ইতিহাস বিশ্লেষণ করে লেখক দখিয়েছেন যে পাছে রাশিয়া জাপান অধিকার রে তার উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে সেই ম্ভাবনা রোধ করাই আণবিক বোমা ফেলার লে উদ্দেশ্য।

যুদ্ধ যখন শেষ হল, হিরোশিমা ও নাগাসাকির খবর যখন চারদিকে প্রচার হয়ে পড়ল তখন আমেরিকানরাই ভবিষ্যৎ যুদ্ধে কি করে আণবিক বোমার হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে সেই চিন্তায় ব্যস্ত হয়ে উঠল। কারণ আণবিক বোমা যুদ্ধ ব্যাপারে যে কি উপকারে লেগেছে সেটা বোঝাতে গিয়ে আণবিক বোমা সম্বন্ধে লোকের ভীতি শতগুণ বেড়ে যায়। তাই আত্মরক্ষার চিন্তা তাদের চেপে ধরল। যুদ্ধের শেষে রাষ্ট্রশক্তি বলতে বোঝায় দুটি দেশ, এক যুক্তরাষ্ট্র অপর রাশিয়া। রাশিয়ার লোকবল ও ভবিষ্যৎ শিল্পোন্নতির ক্ষমতা আমেরিকার তুলনায় খুব কম নয়—লোক বল ত বেশীই। রাশিয়ার পক্ষে কয়েক বৎসরের মধ্যে আণবিক বোমা তৈরী করে ফেলা যে খুবই সম্ভব এটা অনেকেরই ধারণা। তা ছাড়া রাশিয়ার হাতে নাকি জীবাণু বোমা প্রভৃতি জনবিধ্বংসী অস্ত্র তৈরীই আছে—রাশিয়ার সঙ্গে যদি যুদ্ধ করতেই হয় বেশী দেরী করা আমেরিকার পক্ষে আত্মঘাতী হবে। এই সব জল্পনা কল্পনা দ্রুত প্রসার লাভ করল। কিন্তু লেখকের মতে আণবিক বোমা হাতে থাকা সত্ত্বেও আমেরিকার কর্ণধারগণ বুঝেছিলেন রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালান ভয়ঙ্কর অসুবিধাজনক, বিপজ্জনকও বটে, আর দ্বিতীয় কথা জীবাণু বোমা প্রভৃতির ভয়। এর ফলে রাষ্ট্র সঙ্ঘের আণবিক বোমা কমিশনের কাছে যুক্তরাষ্ট্র "বারুচ পরিকল্পনা" বা Baruch Plan নামে এক পরিকল্পনা পেশ করল। এই পরিকল্পনার মূল কথা, রাষ্ট্র সঙ্ঘ থেকে একটি পরিষদ গঠন করা হোক যা বিশ্বের সমস্ত দেশে আণবিক শক্তি তৈরীর মাল মসলা ও অন্যান্য মারাত্মক নূতন অস্ত্রশস্ত্র সম্বন্ধে নিখুঁত সন্ধান নেবে—আণবিক শক্তির উৎপাদনে সম্পূর্ণ আধিপত্য করবে। বেসামরিক উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশের শিল্পোন্নতির জন্য quota মত মাল মসলা বণ্টন করবে, কিন্তু এমন পরিমাণে যাতে কেউ লুকিয়েও আণবিক শক্তি সামরিক কাজে না লাগাতে পারে। যদি কেউ লুকিয়ে কিছু করে সে রাষ্ট্রকে ধ্বংস করে শাস্তি দেওয়া হবে। করছে কি না সেও ঠিক হবে ঐ পরিষদে। আর এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হলে আমেরিকা জগতের সকল দেশের কাছে আণবিক বোমা প্রস্তুতের রহস্য উদ্ঘাটন করতে প্রস্তুত আছে। যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিকরা ভেবেছিলেন রাশিয়া আণবিক বোমার ভয়ে আমেরিকার এই প্রস্তাব সহজেই গ্রহণ করবে আর যদি না করে আপাতঃদৃষ্টিতে যুক্তরাষ্ট্রের এই মহানুভবতার বিরুদ্ধাচরণ করে পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রের সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হবে। আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্রের এই চাল অনেকটা সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে সন্দেহ নেই। এই প্রস্তাবের উত্তরে রাশিয়া প্রস্তাব করল, হ্যাঁ আমরা এই ব্যবস্থায় রাজি আছি যদি সর্বপ্রথমেই যুক্তরাষ্ট্র তার সঞ্চিত আণবিক বোমা ও আণবিক বোমা তৈরীর কারখানাগুলি নষ্ট করে ফেলে ও শাস্তি দেওয়ার ব্যাপার রাষ্ট্র সংঘের নিয়মানুসারে নিরাপত্তা পরিষদের সমস্ত সদস্য একমত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা অনুসারে প্রথমতঃ এই ব্যাপারে আণবিক পরিষদই হবেন সর্বেসর্বা এবং majority voteএ ঠিক হবে কে দোষী ও কে দোষী নয়। লেখকের মতে পরিকল্পিত আণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ জগতের উন্নতির পরিপন্থী এবং এতে রাশিয়ার আপত্তির সঙ্গত কারণ আছে। শিল্পের দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্র এখন পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উন্নত তার কারণ জনপ্রতি যে শক্তি কাজে লাগাতে পারছে অন্যান্য দেশের তুলনায় তা অনেক বেশী। শক্তি উৎপাদনে যেসব দেশ পেছিয়ে আছে যেমন রাশিয়া কিংবা ভারতবর্ষ তারা যদি সাধ্যমত আণবিক শক্তি ব্যবহার করে শিল্পের ও সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান বর্ধিত করতে চায় পরিকল্পিত আণবিক নিয়ন্ত্রণ তার পথ রোধ করে দাঁড়াবে। কারণ যথেষ্ট আণবিক শক্তি প্রস্তুতের উপাদান না থাকলে এই রকম বিরাট দেশে উন্নতি সম্ভব হবে না আর এইখানেই কূটনৈতিকেরা আপত্তি করে বসবেন আণবিক শক্তির সামরিক ব্যবহার হচ্ছে। কারণ বর্তমান রাষ্ট্রে সামরিক শক্তি ও শিল্পশক্তি বিশেষভাবে জড়িত—একে অন্যের উপর যে বহুলাংশে নির্ভর করে তার বিশদ ব্যাখ্যা করা অনাবশ্যক।

এ ছাড়া কূটনৈতিক কারণেও রাশিয়ার আপত্তি থাকতে পারে "বারুচ পরিকল্পনায়"—যদিও জগতের কাছে একে যুক্তরাষ্ট্রের সদাশয়তা ও মহত্বের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসাবেই প্রচার করা হচ্ছে। পরিকল্পনায় প্রথম কাজ হবে পৃথিবীর সমস্ত দেশে বিশেষ করে রাশিয়ায় সঠিক খোঁজ নেওয়া কোথায় কত ইউরেনিয়াম কি থোরিয়াম, যা দিয়ে আণবিক বোমা তৈরী হতে পারে, তার খোঁজ নেওয়া এবং রাশিয়ার সৈন্য-ব্যবস্থা, যুদ্ধ সরঞ্জাম ও বৃহৎ শিল্প কোথায় কিভাবে চলছে তার খবর নেওয়া। এর পরে পরিষদ ঠিক করবেন কার কতখানি আণবিক শক্তির প্রয়োজন, হয়ত ৪।৫ বছর পরে আমেরিকা তাঁর আণবিক শক্তির রহস্য প্রকাশ করতে পারেন। ইতিমধ্যে তথ্যানুসন্ধান শেষ হওয়ার পরে যদি যুদ্ধ বেধে যায়—সুযোগ ও সুবিধা খবর সমস্তই পাবে আমেরিকা উপরন্তু আণবিক বোমাও কাজে লাগাবে। রাশিয়া যে এটা গ্রহণ করবে এটা আশা করাই ভুল নয় কি?

এত সব জল্পনা কল্পনা সমস্তই হচ্ছে এই ভেবে যে যুদ্ধ প্রায় অনিবার্য। লেখকের মতে রাষ্ট্রসংঘের এই ব্যাপারে খুব চটপট একটা ব্যবস্থা করার আবশ্যক নেই কারণ যুদ্ধে নামতে কেউই প্রস্তুত নয়। অনেক কারণ বিশ্লেষণ করে লেখক দেখিয়েছেন রাশিয়া যুদ্ধ চায় না অন্ততঃ যতদিন ঠেলে রাখতে পারে সেই চেষ্টাই করবে। অপর পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রে একদল লোক আণবিক বোমার সাহায্যে সত্বর কাজ হাসিল করতে চাইলেও যুক্তরাষ্ট্র গভর্নমেণ্ট বেশ ভেবে চিন্তে দেখেছেন যুদ্ধ বাধলে তার ফলে কোথাকার জল যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা অত নিঃসন্দেহে বলা আদৌ সোজা নয়। তাই তারাও চান না যে, এখনই যুদ্ধ বাধুক। তাই তিনি বলেন আর কিছুদিন গেলে যখন রাশিয়ার শক্তি আরও কিছু বেড়ে উঠবে তখন এই ব্যাপারে একটা ন্যায়সঙ্গত চুক্তি সম্ভব হতে পারে—ইতিমধ্যে আণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ করে পৃথিবীর জনসাধারণের উন্নতির পক্ষে বাধা সৃষ্টি করা সঙ্গত হবে না।

অনুবাদক—**অদ্বৈত মল্ল বর্মন**

[ পূর্বানুবৃত্তি ]

খৃস্টমাসের সময়ে গুপিলদের গ্যালারিতে ছবি-বিক্রির যে-রকম মরশুম পড়ে, বৎসরের অন্য কোন ঋতুতে সে-রকম হয় না। মিঃ ওব্যাক ভিনসেণ্টের কাকাকে এই বলে এক চিঠি লিখলেন যে, ভিনসেণ্ট কাজে কামাই করেছে, কিন্তু ছুটি গ্রহণের ভব্যতাটুকুও দেখায় নি সে। চিঠি পেয়ে কাকা স্থির করলেন, ভাইপোকে তিনি প্যারিসের রু চ্যাপেলের প্রধান গ্যালারিতে নিয়ে আসবেন।

কিন্তু ভিনসেণ্ট নির্বিকারচিত্তে জানিয়ে দিল, আর্টের ব্যবসাতে সে আর থাকবে না। শুনে তিনি হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন, মর্মান্তিক আঘাত পেলেন মনে। তিনিও জানিয়ে দিলেন, ভিনসেণ্টের যা ইচ্ছে তাই করুক, তার ভবিষ্যৎ নিয়ে আর কখনো তিনি মাথা ঘামাবেন না।

কিন্তু ছুটি শেষ হওয়ার পরেই তিনি মাথা ঘামাতে সুরু করলেন এবং অনেকদিন ধরেই ঘামালেন ডোরড্রেখের 'ব্লাসে ও ব্রামে'র বইয়ের দোকানে ভাইপোর একটি কেরানীর কাজের জন্য। খুড়ো-ভাইপো দুজনেরই এক নাম। এই দুজনই ভিনসেণ্ট ভ্যান গোঘের মধ্যে বোঝা-পড়া এইখানেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। এর পর আর কেউ কারো জন্য কখনো মাথা ঘামান নি।

ডোরড্রেখে সে চা'র মাস মাত্র ছিল। এখানে সে সুখীও হয় নি, দুঃখও পায় নি, কৃতকার্যতাও দেখায় নি, অকৃতকার্যও হয় নি। সে নিরালম্ব অবস্থায় ছিল। অর্থাৎ দেহমাত্র সেখানে ছিল, মন তার সেখানে ছিলই না। একদিন শনিবারের রাত্রিতে ডোরড্রেখ থেকে শেষ ট্রেন ধরে আও ভেনবশ্ এলো এবং সেখান থেকে পায়ে হেঁটে জুণ্ডার্ট-এর বাড়িতে চলে এলো। বিস্তৃত প্রান্তরে রাত্রির স্তব্ধতা। শীতল নিশীথ বায়ুতে মাঠের প্রাণ-চঞ্চল গন্ধ। তার খুব ভাল লাগল এসব। রাত্রি অন্ধকার। তবু সুদূরপ্রসারিত পাইনবন ও দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তর চিনতে তার ভুল হলো না। এই দৃশ্য দেখে বড়মারের ছবির প্রিণ্টখানা তার মনে পড়ল। ছবিখানা তার পিতার পাঠকক্ষে টাঙানো আছে। আকাশ সে রাত্রে মেঘপূর্ণ, কিন্তু মেঘের মধ্যে দিয়েও তারার জ্যোতি দেখা যাচ্ছিল। জুণ্ডার্টের গীর্জা-প্রাঙ্গণে এসে যখন উপস্থিত হয়েছে তখন রাতের শেষ যাম। সুদূরের নবোদ্গত শস্যের কালিঢালা ক্ষেতগুলি থেকে পাখির গান প্রভাতী বাতাসে ভেসে আসছে, সে তা স্পষ্ট শুনতে পেল।

পিতামাতা দুজনই বুঝতে পারলেন, ভিনসেণ্টের এখন বড় খারাপ দিন যাচ্ছে। বড় কষ্টকর সময় তাকে কাটিয়ে উঠতে হবে। গ্রীষ্মে তাঁরা পরিবারসুদ্ধ ইটেনে চলে গেলেন। জুণ্ডার্ট থেকে মাত্র কয়েক ক্রোশ দূরে, হাট-বাজারওয়ালা ছোট একটা শহর সেটা। থিয়োডোরাসকে এখানেই ধর্ম-যাজকের পদবী দেওয়া হয়েছিল। ইটেনে এল্‌ম-এর বেড়া দেওয়া খুব বড়ো একটা পার্ক ছিল সর্বসাধারণের জন্য। বাষ্পচালিত রেলগাড়ি দ্বারা ব্রেডা শহরের সঙ্গে এই ক্ষুদ্র শহরটির যোগাযোগ রক্ষা হত। থিয়োডোরাসের পক্ষে জায়গাটি একটু যেন বেশি আধুনিক।

প্রথম বর্ষণ শুরু হয়ে গিয়েছে, ভিনসেণ্টকে নিয়ে কি করা যায় তার জন্য আবার একটা সিদ্ধান্ত করা প্রয়োজন। উরসুলার বিয়ের এখনো বাকি আছে।

পিতা বললেন, "ভিনসেণ্ট, শোন্, এসব দোকানদারীর কাজ তোকে দিয়ে পোষাবে না, তা আমি বেশ বুঝতে পেরেছি। তোর মন কি চায় তা আমি জানি। তোর অন্তর তোকে ধর্মের দিকে, সাক্ষাৎ ভগবানের কাজের দিকে চালিয়ে নিয়ে এসেছে।"

"আমি তা জানি বাবা।"

"জানিস যদি, তবে আমস্টারডামে চলে যা না, পড়াশোনায় লেগে যা না সেখানে গিয়ে।"

"আমিও যেতেই চাই বাবা, কিন্তু—"

"তোর অন্তর থেকে সন্দেহ কি অন্তর্হিত হয়নি এখনো? এখনো কিন্তু রয়েছে?"

"হাঁ বাবা। এখন তা আমি প্রকাশ করে বলতে পারছি না। তোমরা আমাকে আরো কিছু সময় দাও।"

খুড়ো জ্যান সেদিন যাওয়ার পথে ইটেনে এসেছেন, তিনি বললেন "আমস্টারডামে আমার বাড়িতে তোর জন্যে একটা ঘর 'খালি রেখেছি, ভিনসেণ্ট।"

সঙ্গে সঙ্গে তার মা বললেন, "রেভারেণ্ড স্ট্রিকার চিঠি লিখে জানিয়েছেন তিনি তোর জন্য ভাল ভাল শিক্ষকের ব্যবস্থা করে দেবেন।"

উরসুলার কাছ থেকে বেদনার দান যেদিন সে গ্রহণ করল, সেদিন থেকে, জগতে যাদের কেউ নেই, সে তাদের জন্যই উৎসর্গীকৃত। সে জানত, আমস্টারডামে বিশ্ব-বিদ্যালয়েই সে সর্বোত্তম শিক্ষা পেতে পারে। ভ্যান গোখ্ ও স্ট্রিকার-পরিবার সেখানে তাকে নিয়ে রাখবেন, উৎসাহিত করবেন, অর্থ ও পুস্তকাদি দিয়ে সাহায্য করবেন এবং সহানুভূতি দেখিয়ে তাকে অবিচলিত রাখবেন। কিন্তু তবু তার মন সম্পূর্ণ মেঘাপসৃত হয় না। ইংলণ্ডে উরসুলা এখনো অবিবাহিত রয়েছে। এই হল্যাণ্ডে থেকে সে তার সঙ্গে সকল সম্পর্ক হারিয়ে বসেছে। পত্র লিখে সে কতকগুলি ইংরেজি খবরের কাগজ আনিয়ে নিল, তার বিজ্ঞাপনের কয়েকটা জবাব দিল, এই করে করে শেষ পর্যন্ত র‍্যামসগেটে একটা শিক্ষকের কাজ যোগাড় হয়ে গেল। স্থানটি সমুদ্রের তীরে, লণ্ডন থেকে রেলগাড়িতে সাড়ে চার ঘণ্টার রাস্তা।

মিঃ স্টোক্‌স্-এর স্কুল গৃহ একটি স্কোয়ারে অবস্থিত। স্কোয়ারটির মধ্যস্থলে লোহার রেলিং ঘেরা বিস্তৃত লন। স্কুলে দশ থেকে চৌদ্দ বছরের মোট চব্বিশটি বালক পড়ুয়া। ভিনসেণ্টের কাজ হল বালকদের ফ্রেঞ্চ, জার্মাণ ও ডাচ্ ভাষা শেখানো, স্কুলের সময় ছাড়া অন্য সময়েও তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখা, এবং প্রতি শনিবার রাত্রিতে তাদের প্রার্থনা-উপাসনায় সাহায্য করা। তার থাকা এবং খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া হলো; কিন্তু কোনো মাইনে দেওয়া হলো না।

র‍্যামসগেট জায়গাটি বড়ো নিরানন্দের। কিন্তু ভিনসেণ্টের প্রকৃতির সঙ্গে সেটা বেশ খাপ খেয়েছে। সে দুঃখকেই করেছিল জীবনের সাথী। তার প্রকৃতির অনুকূল এই বিষাদময় স্থানটি সম্পূর্ণ নিজের অজানতেই তার জুটে গিয়েছে। এই বিষাদের মধ্য দিয়েই উরসুলার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য সে সর্বক্ষণ উপলব্ধি করছে। জীবনের একমাত্র প্রেমাস্পদার সঙ্গে সে যদি মিলিত হতে না পারল, তাহলে যেখানেই সে বাস করুক না, তাতে তার কিছু এসে যায় না। তার দেহে ও মনে উরসুলা যে প্রবল প্রেমোন্মাদনা জাগিয়ে দিয়েছে, তার সঙ্গে প্রত্যাখ্যানের যে জ্বালাময় অনুভূতির

আস্বাদ তাকে দিয়েছে, তাকে সে নিরুপদ্রবে পালন করতে চায়। সে চায় না যে, তার ও তার এই অনুভূতির মাঝখানে আর কেউ এসে শান্তি ভঙ্গ করে।

ভিনসেণ্ট জিজ্ঞেস করল, "মিঃ স্টোক্‌স্, আমাকে সামান্য কিছু মাইনে দিতে পারেন। যাতে আমার তামাক আর কাপড়-চোপড়ের খরচটা পুষিয়ে যায়, এমনি কিঞ্চিৎ অর্থ আমায় হাতখরচা হিসেবে পারেন দিতে?"

"না, পারি না। নিশ্চয় পারি না।" স্টোক্‌স্ জবাব দিলেন। "এই থাকা-খাওয়া দিয়েই বহু শিক্ষক পাওয়া যায় তা জান?"

প্রথম যে শনিবার এলো সেদিন সকালবেলা ভিনসেণ্ট খুব ভোরে উঠে র‍্যামসগেট থেকে পায়ে হেঁটে লণ্ডন অভিমুখে রওনা হল। অনেক দূরের পথ। তার উপর আবার গরম পড়েছিল, বিকেল নাগাদ তার উত্তাপ কমলো না। শেষ পর্যন্ত সে ক্যাণ্টারবেরী পর্যন্ত পেঁাছাল। সেখানে মধ্যযুগের গীর্জাগুলি পুরোনো গাছ-গাছড়ায় পরিবেষ্টিত। সে সব গাছের ছায়ায় বসে সে বিশ্রাম করল। খানিক বিশ্রামের পর আবার যাত্রা সুরু হল। শেষে একটা পুকুরের কাছে বীচ্ ও এল্‌ম্ গাছের তলায় এসে থামল। সেখানে ঘুমিয়ে পড়ল সে। ভোর চারটে পর্যন্ত সে সেখানে ঘুমালো। ঊষাকালে পাখীদের গান সুরু হল, সে গানে তার ঘুম ভাঙ্গল। সেখান থেকে হাঁটা আরম্ভ করে যখন চ্যাথাম পেঁাছাল, সময় তখন অপরাহ্ন। সেখান থেকে দূরে দৃষ্টিপাত করে আংশিক জলমগ্ন নীচু ময়দানের মধ্যে দিয়ে টেমস নদী দেখতে পেল। জাহাজে জাহাজে আছে ছেয়ে সে নদী। সন্ধ্যার দিকে ভিনসেণ্ট লণ্ডনের সুপরিচিত সহরতলীর নাগাল পেল। প্রভূত শান্তি ও ক্ষুৎপিপাসা সত্ত্বেও সে সেখান থেকে উরসুলাদের বাড়ির দিকে প্রচণ্ড বেগে চলতে লাগল।

যে-জন্যে তার লণ্ডন ফিরে আসা—অর্থাৎ উরসুলার সান্নিধ্য সম্ভোগ—যে মুহূর্তে তার বাস ভবন দৃষ্টিগোচর হল, সেই মুহূর্তে সে-ইচ্ছা তার শতগুণ বেড়ে গিয়ে তাকে একেবারে অভিভূত করে ফেলল। ইংলণ্ডে এখনো উরসুলা তারই রয়েছে, আর কারো না, কেননা, উরসুলা এখনো তার উপলব্ধির সামগ্রীই।

বক্ষের দ্রুত স্পন্দন অবাধ্য হয়ে উঠেছে। তাকে কিছুতেই শান্ত করা যাচ্ছে না। একটি গাছে ভর দিয়ে দাঁড়াল সে। একটা অব্যক্ত বেদনা তাকে অভিভূত করে ফেলেছে। মানুষের চিন্তা জগতের ভাব প্রকাশক যে ভাষা তার মধ্যে এমন শব্দ নেই যার দ্বারা এই বেদনাকে প্রকাশ করা যেতে পারে। বুক ভরা এই বেদনার বোঝা নিয়ে সে দাঁড়িয়ে থাকল। অবশেষে উরসুলার বসবার ঘরের প্রদীপ নিবল, তারপরে নিবল তার শোবার ঘরের প্রদীপ। সমগ্র ভবনটি তখন অন্ধকারমগ্ন। ভিনসেণ্টে প্রভূত অনিচ্ছার সহিত সেখান থেকে ফিরে চলল এবং ক্লান্ত স্খলিত পদে ক্ল্যাফামের রাস্তা ধরে চলতে লাগল। বাড়িটি যখন দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গিয়েছে, তখনই তার ধারণা হল উরসুলাকে আবার বুঝি সে হারিয়ে ফেলল।

উরসুলার সঙ্গে তার বিয়ে হওয়ার ছবিখানা মনে মনে অঙ্কিত করল সে। উরসুলাকে এখন আর ছবি-ব্যাপারীর স্ত্রী-রূপে ভাবল না; এখন তাকে সে একজন ধর্মযাজকের বিশ্বাসী ও সন্তোষপরায়ণা পত্নীরূপে দেখতে পেল। দেখতে পেলঃ বস্তির দরিদ্রদের সেবায় আত্মনিবেদিত ভিনসেণ্টের পাশে থেকে সহধর্মিণী উরসুলা নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে চলেছে।

সেই থেকে প্রত্যেক শনিবার সে লণ্ডন পাড়ী দেবার চেষ্টা করত। কিন্তু পরে দেখল যথাসময়ে সেখান থেকে ফিরে এসে সোমবার সকালে স্কুল করা অসম্ভব হয়ে পড়ছে। কোনো কোনো দিন সারা শুক্রবার এবং শনিবার রাত্রিভর সে হেঁটে লণ্ডন যেতো—রবিবার সকালে উরসুলা গীর্জায় যাওয়ার জন্য ঘর থেকে বেরুবে, সেই অবসরে তাকে দেখবে বলে। পয়সার অভাবে কিছু কিনে খাওয়া তার ভাগ্যে জুটত না; প্রয়োজন মতো কোথাও আশ্রয় নেওয়াও তার অর্থাভাবের দরুণ অসম্ভব ছিল। এইজন্য, শীত পড়লে সে ভয়ানক কাশিতে ভুগতে লাগল। একদিন সোমবার ভোরবেলা র‍্যামসগেটে ফিরে গিয়ে কম্পজ্বরে পড়লো, তাতে সে ভয়ানক কাতর হয়ে পড়লো। আরোগ্য হতে তার পুরো একটা সপ্তাহ লেগেছিল।

কয়েক মাস পর এর চেয়ে কিছু ভাল একটা কাজ জুটে গেল। আইলওয়ার্থে মিঃ জোন্সের ধর্ম-বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা কাজ পেল সে। মিঃ জোন্স এক বিস্তৃত ধর্মায়তনের যাজক ছিলেন। ভিনসেণ্টকে প্রথমে তিনি শিক্ষক হিসেবেই নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু শীঘ্রই তিনি তাকে গ্রাম্য পাদরীর সহকারী করে নিলেন।

ভিনসেণ্ট যে-সব চিত্র মনে মনে অঙ্কিত করেছিল, আবার তা পরিবর্তন করতে হল। এখন আর উরসুলাকে সে মানব-মুক্তির বাণী-দাতা ধর্মযাজকের পত্নী হিসেবে বস্তির গরীবদের মধ্যে সেবারতা নারীরূপে কল্পনা করতে পারছে না। এখন উরসুলা বরং নিম্ন পদের গ্রাম্য পাদরীর স্ত্রী; মহল্লায় গিয়ে যাজকের কাজে স্বামীকে সাহায্য করছে—যেমন সাহায্য করছেন ভিনসেণ্টের বাবাকে তার মা। উরসুলা সম্মতিসূচক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে তার দিকে। ভিনসেণ্ট যে তুচ্ছ ছবি-বেচা জীবন ছেড়ে দিয়ে এখন মানবতার কাজে আত্মনিয়োগ করেছে, তা দেখে উরসুলা খুব খুশি হয়েছে; এ সমস্ত সে যেন চোখের উপর দেখতে পেল।

উরসুলার বিবাহের দিন যে ক্রমেই এগিয়ে আসছে, ক্রমেই তার কুমারী জীবন যে সংকীর্ণতর হয়ে আসছে, ভিনসেণ্ট আপনাকে তা কোনোক্রমেই বুঝতে দিত না। তার ও উরসুলার মাঝখানে যে তৃতীয় ব্যক্তিটি—তার বাস্তব সত্তাকে ভিনসেণ্ট কখনো হৃদয়ে স্থান দিত না। সে নেই, সে থাকতে পারে না। সে মায়া মাত্র; সে সত্য নয়—এইটেই সে সত্য বলে ভাবতে চেষ্টা করত। সে আরো ভাবত, তার মধ্যে এমন একটা কিছু গলদ হয়ত দেখেছে যার জন্যে উরসুলা তাকে বিয়ে করতে রাজী হচ্ছে না—সে-গলদ সে যে-করেই হোক পূরণ করে নেবেই। তা ছাড়া, ঈশ্বরের সেবা করা—সেইতো সব কাজের সেরা কাজ। এর চেয়ে বড়ো কাজ আর কি হতে পারে?

মিঃ জোন্সের ছাত্রেরা গরীব। তারা লণ্ডন থেকে পড়তে আসত। স্কুলের পরিচালক মশাই তাদের পিতামাতার ঠিকানা লিখে দিয়ে ভিনসেণ্টকে সেখানে মাইনে আদায়ের জন্য পাঠাতেন। তাদের বসতি ছিল হোয়াইট চ্যাপেলের মাঝামাঝি জায়গাতে। সেখানে রাস্তাগুলি দুর্গন্ধময়। বড় বড় পরিবার-গুলি এক সঙ্গে ঘেঁষাঘেঁষি করে বাস করে, ঠাণ্ডা স্যাঁতসেতে জায়গাতে। আসবাবহীন ঘরগুলি দৈন্যের প্রতিমূর্তি। লোকগুলি ক্ষুধায় ও রোগে কাতর—প্রত্যেকের চোখে-মুখে এই কাতরতার সুস্পষ্ট ছাপ। ছাত্রের অভিভাবকেরা অনেকে ব্যাধিগ্রস্ত পশুমাংসের ব্যবসা করত। গবর্ণমেণ্ট আইন করে প্রকাশ্য বাজারে সে-ব্যবসা বন্ধ করে দিয়েছেন। ভিনসেণ্ট এই সব পরিবারের যার বাড়িতেই গিয়েছে সেখানেই তাদের অতি নীচুধরণের জীবনযাত্রার পরিচয় পেয়েছে। শীত নিবারণের উপযুক্ত উপকরণের অভাবে কম্বল মাত্র গায়ে জড়িয়ে তারা শীতে কাঁপছে। বাসি খাবার খাচ্ছে, আধপচা মাংস উনুনে চড়িয়ে তাই গলাধঃকরণ করছে। তাদের দুঃখদুর্গতির কাহিনী শুনতে শুনতে কোথা দিয়ে যে বেলা ফুরিয়ে যায়, কখন যে রাত হয়ে আসে, ভিনসেণ্ট তা বুঝতেই পারে না।

এইভাবে লণ্ডন যাতায়াতের কাজটা সে সানন্দচিত্তে গ্রহণ করেছিল। এতে তার বিরক্তি আসত না, কেন না, ফেরবার পথে উরসুলার বাড়ির কাছ দিয়ে আসার সুযোগ তার রোজই ঘটে যেত। কিন্তু হোয়াইট চ্যাপেলের বস্তি-জীবনের দুঃখ-দুর্দশা দেখতে দেখতে, উরসুলার জন্য তার মনে যে হাহাকার ছিল সেটা কমে আসতে লাগল। উরসুলা তার মনের সবখানি স্থান জুড়ে ছিল; সেখান থেকে সে এখন অন্তর্হিত হল। এমনকি, ভিনসেণ্ট

বাড়ি ফেরার পথে ক্ল্যাফামের পথ ধরে আসার কথা ভুলেই গেল। সে শূন্য হস্তে আইলওয়ার্থে ফিরে আসত; মিঃ জোন্সের হাতে একটি কপর্দকও এনে দিতে পারত না।

একদিন বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় যখন উপাসনা চলছে, ধর্মশিক্ষক জোন্স তখন শ্রান্ত পদে তাঁর সহকারীর নিকটে এগিয়ে এলেন। ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছেন তিনি। বললেন, "ভিনসেণ্ট, আজ আমার শরীর ভয়ানক খারাপ। এত দুর্বল লাগছে যে, ভয় হচ্ছে হয়ত পড়ে যাব। তুমিতো ধর্মোপদেশগুলি আগাগোড়া লিখে রাখ, তাই না? তার থেকেই আজ একটা পড় তুমি, আমরা শুনব। তোমার ধর্মব্যাখ্যা কেমন—কোন্ ধরণের ধর্মশিক্ষক হবে তুমি—তাই আমি দেখতে চাই আজ।"

ভিনসেণ্ট কম্পিতদেহে বেদিকায় আরোহণ করল। মুখ চোখ লাল হয়ে এলো তার। হাতদুটি দিয়ে কি করতে হবে তা সে ভুলেই গেল। তার কণ্ঠস্বর কর্কশ শোনালো—তাও আবার থেমে থেমে বেরুচ্ছে। কেমন সুন্দর অর্থপূর্ণ বাক্যাংশগুলি সে কাগজে লিখেছিল। স্মৃতির দুয়ার বৃথাই হাতড়ালো সে। সে-সব মর্মস্পর্শী বাক্যের একটিও তার মনে পড়ল না। কিন্তু অনুভব করল, ভাঙা ভাঙা শব্দ আর অস্পষ্ট অনমনীয় অঙ্গভঙ্গীর মধ্যে দিয়েও নিজস্ব একটা তেজের সান্নিধ্য সে পাচ্ছে।

মিঃ জোন্স বললেন, "বেশ সুন্দর হয়েছে। সামনের সপ্তাহে তোমাকে আমি রিচ্‌মণ্ড পাঠাব।"

শরৎকাল। পরিষ্কার কাচ-স্বচ্ছ দিন। টেমস নদীর তীরে তীরে পথ। সে পথ আইলওয়ার্থ থেকে রিচমণ্ড যাবার। সুনীল আকাশ, হলদে পাতার ঝাকড়া মাথায় বড়ো বড়ো বাদাম গাছ টেমস নদীর বুকের আরশিতে প্রতিফলিত। রিচমণ্ডের অধিবাসীরা মিঃ জোন্সকে লিখে জানালেন, এই তরুণ ডাচ্ প্রচারকটিকে তাদের ভালই লেগেছে। চিঠি পড়ে মিঃ জোন্সের সহৃদয়তা জাগল। তিনি মনে করলেন ভিনসেণ্টকে একটা সুযোগ দেওয়া ভাল। মিঃ জোন্সের টার্নহাম গ্রীণের গীর্জাটি খুব বড়ো। জনসমাগম খুব হয়। তারা ধর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করে। ভিনসেণ্ট যদি সেখানে ধর্মব্যাখ্যায় কৃতকার্য হয়, তবে যে-কোন গীর্জার বেদীতে উঠে বক্তৃতা দিতে তার আটকাবে না। তার যোগ্যতাও সর্বত্র স্বীকৃত হবে।

ভিনসেণ্ট তার বক্তব্যের বস্তু হিসেবে বাইবেলের ১১৯ঃ১৯নং সংগীতটি নির্বাচিত করলঃ "এ জগতে আমি নতুন এসেছি; তোমার বাণী আমার কাছে গোপন রেখো না।" সহজ স্বতঃস্ফূর্ত উদ্দীপনার সঙ্গে সে বলে চলল। তার যৌবন, তার তেজ, তার দৃঢ় বাহুর বল, প্রশস্ত মস্তক, এবং সুতীক্ষ্ম সুগভীর দৃষ্টি সব কিছু মিলিয়ে শ্রোতাদের মধ্যে একটা প্রচণ্ড প্রভাব সৃষ্টি হল।

জনতার অনেকেই তার বাণীর জন্য তাকে ধন্যবাদ জানাতে এগিয়ে এলো। সে তাদের সঙ্গে করমর্দন করল, এবং বিভ্রান্ত দুর্জ্ঞেয় দৃষ্টিতে তাকিয়ে মৃদু হাস্য করল। লোকজন বেরিয়ে যেতেই সে কালবিলম্ব না করে গীর্জার পশ্চাতের দরজা দিয়ে বেরিয়ে লণ্ডনের পথে পা চালিয়ে দিল।

তখন ঝড় উঠেছে। টুপি ও ওভারকোট সঙ্গে আনতে তার ভুল হয়ে গিয়েছে। টেমস নদীর জল হরিদ্রাভ হয়ে উঠেছে—বিশেষ করে তীরের কাছ দিয়ে। দূর চক্রবালে আলোর বিচ্ছুরণ, ওপরে কালো পিঙ্গলবর্ণের মেঘের মাতামাতি। কিছুক্ষণের মধ্যেই খরধারে বৃষ্টি নামল। শুধু তার পোষাক নয়, গায়ের চামড়া পর্যন্ত ভিজে জবজবে হয়ে উঠেছে। তবু সে রুদ্ধনিশ্বাসে ছুটে চলল।"

অবশেষে কৃতকার্য হয়েছে সে। আপনাকে খুঁজে পেয়েছে। সে বিজয়ী হয়েছে। আপনার এই সাফল্যকে, জয়কে, সে উরসুলার পদমূলে লুটিয়ে দেবে। তার বিজয়ের অংশভাগিনী করবে উরসুলাকে।

বৃষ্টির ধারা সংকীর্ণ শুভ্র পথের ধুলো-বালিকে কাদা করে ভাসিয়ে নিল; হর্দন গাছের ঝোপগুলিকে মাটির সঙ্গে শুইয়ে দিল। দূরে লণ্ডন নগরীকে দেখাচ্ছে দুরারে-এর খোদাই ছবির মতো—তার উচ্চ সৌধ-চূড়া, কলের চিমনি, স্লেট-পাথরের ছাদ আর গথিক ধাঁচে প্রস্তুত বাড়ী-ঘর নিয়ে চোখের সম্মুখে জেগে উঠেছে।

সেই লণ্ডন-নগরীতে ঢুকতে তাকে সারা পথ ঝড়ের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়েছে। অবিশ্রান্ত বৃষ্টধারায় তার মাথা ও মুখ প্লাবিত হয়েছে। অবিরাম জলে তার পায়ের বুট ভিজতে ভিজতে নরম ও ভারী হয়ে উঠেছে। লয়ার-ভবনে যখন উপস্থিত হল, তখন অপরাহ্ন অতিক্রান্ত। সন্ধ্যা নামল। পাংশু বর্ণের ঘন প্রদোষান্ধকার এলো ঘনিয়ে। কিছুটা দূর থেকে সংগীতের ধ্বনি ভেসে আসছে। ভায়োলিন বাজছে সেই সংগীতের তালে তালে। সে কান পেতে শুনলো। কিন্তু কিসের সংগীত সেটা, বুঝতে পারল না। বাড়িটির প্রত্যেক কক্ষে—প্রদীপালোকের প্রস্রবণ। বাইরে, বৃষ্টির জল যে আটকা পড়েছে, তারই এখানে-সেখানে অনেক গাড়ি দাঁড়ানো। ভিনসেণ্ট দেখতে পেলো, বৈঠকখানা ঘরে নৃত্যও চলেছে। একটা গাড়িতে এক বৃদ্ধ গাড়োয়ান বিরাট এক ছাতা মাথায় দিয়ে গুটিসুটি হয়ে বক্সের উপর বসেছিল।

ভিনসেণ্ট তাকে জিজ্ঞেস করল, "কি হচ্ছে এ বাড়িতে?"

"বিয়ে বলেই তো মালুম হচ্ছে।"

ভিনসেণ্ট গাড়িখানাতে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল। তার রক্তাভ অলকদামে সঞ্চিত বৃষ্টিবারি গাল বেয়ে মুখ বেয়ে ঝরে ঝরে পড়ছে তখনো। কিছুক্ষণ পর সম্মুখের দরজা খোলা হল। উরসুলা ও তার সঙ্গে একজন দীর্ঘায়ত ছিমছাম পুরুষের মূর্তি দ্বারপথে সহসা যেন বিকশিত হয়ে উঠল। বৈঠকখানার জনতা নৃত্য ভেঙে প্রাঙ্গণে নেমে পড়েছে। তাদের উচ্চ হাসি ও চীৎকারে মুখর হয়ে উঠেছে প্রাঙ্গণ। কখনো আবার চাল ছড়ানো হচ্ছে। যেখানটায় গাড়ির ছায়া পড়েছে, ধরা পড়ে যাবার ভয়ে ভিনসেণ্ট সেইখানে সরে গিয়ে দাঁড়াল। গাড়োয়ান তার ঘোড়া দুটির উপর চাবুক আস্ফালন করল, তারা ধীরে ধীরে চলতে শুরু করল। ভিনসেণ্ট কয়েক পা এগিয়ে এলো। গাড়ির জানালা বেয়ে বৃষ্টির জল গড়িয়ে পড়ছে। তাতে মুখখানা ঠেকিয়ে নীরবে দাঁড়ালো গিয়ে। উরসুলা তখন পুরুষটির বাহুবন্ধনে নিবিড়ভাবে আবদ্ধ। তার মুখ পূর্ণভাবে ওরই মুখের সঙ্গে বিন্যস্ত। গাড়িখানা দ্রুতবেগে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ভিনসেণ্টের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম ভাব চকিতে খেলে গেল। অতি পরিচ্ছন্ন ও পরিষ্কার সে-ভাব। সূত্র আজ পরিচ্ছিন্ন। কিন্তু সেটা এত শীঘ্রই যে ছিন্ন হয়ে যাবে তা সে ভাবতে পারে নি।

খরধার বৃষ্টির মধ্যেই সে আইলওয়ার্থে ফিরে এলো। তারপর জিনিসপত্র বেঁধেছেঁদে চিরদিনের জন্য লণ্ডন ত্যাগ করল। (ক্রমশঃ)

## ব্রহ্মের অবস্থা

ব্রহ্মের রাজনৈতিক ও রণনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমশঃই যেন জটিল থেকে জটিলতর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কারেন-কম্যুনিস্ট-পি ভি ও বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সরকারী অভিযানের তীব্রতা যে পরিমাণে বেড়েছে সে পরিমাণে সরকারী বাহিনী যে সাফল্যলাভ করতে পারে নি—সে বিষয়ে কোন সংশয় নেই। পক্ষাধিককাল পূর্বে থাকিন নু বিদ্রোহীদের উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণের চরম নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে, তারা যদি ৩১শে মার্চের মধ্যে অস্ত্রশস্ত্রাদি সহ আত্মসমর্পণ করে, তবে তাদের ক্ষমা করা হবে। কিন্তু বিদ্রোহীরা তাঁর নির্দেশে কর্ণপাত করে নি। বর্তমানে ব্রহ্মের প্রকৃত অবস্থা কি বাইরে থেকে সেটা স্পষ্ট করে বোঝার উপায় নেই। কার্যত থাকিন নু গভর্নমেণ্টের অস্তিত্ব বৃহত্তর রেঙ্গুন এলাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ কিনা তাও নিশ্চয় করে বলা যায় না। বিদ্রোহীদের অধিকৃত শহরগুলিতে সরকারী বিমানবহরের গুরুতর বোমাবর্ষণ সত্ত্বেও বিদ্রোহীরা যখন ভয় পেয়ে আত্মসমর্পণ করে নি—তখন স্পষ্টই বোঝা যায় যে, তারা এখনও দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তারা থাকিন নু গভর্নমেণ্টের চরম পত্রের উপর ততটা গুরুত্ব আরোপ করছে না। নরম ও গরম দুই পথ পরীক্ষা করেই থাকিন নু ব্যর্থ হয়েছেন বলা চলে। কারেনদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবী তিনি মেনে নিয়েছেন—তাতেও তাদের দিক থেকে সাড়া পাওয়া যায় নি। একটা বিশেষ সময়ের মধ্যে আত্মসমর্পণ করলে বিদ্রোহীদের ক্ষমা করা হবে—এঘোষণাতেও কোন কাজ হয় নি। সর্বশেষে থাকিন নু গভর্নমেণ্ট বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সমর প্রয়াসে আত্মনিয়োগ করেও বিশেষ সাফল্যলাভ করতে পারেন নি। আর একদিকে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা দ্বারাও থাকিন নু বিদ্রোহীদের দলে ভাঙন ধরানোর চেষ্টা করছেন। সেটা হল বিদ্রোহী হোয়াইট ব্যাণ্ড পি ভি ওদের সঙ্গে স্বতন্ত্র আপোষরফা করার প্রয়াস। এ আপোষ-প্রয়াস আজকের নয়—বহুদিনের। কিন্তু আজও পর্যন্ত উভয়পক্ষের মধ্যবর্তী ব্যবধান কমেছে বলে মনে হয় না।

হোয়াইট ব্যাণ্ড পি ভি ওদের সঙ্গে আপোষের আশা থাকিন নু অবশ্য এখনও ত্যাগ করেন নি। কমিউনিস্টদের সঙ্গে আপোষের প্রশ্নই ওঠে না, আর কারেনদের সঙ্গে আপোষ-প্রয়াসও ব্যর্থ হয়ে গেছে। থাকিন থান্ টুনের কমিউনিস্ট দল একক হাতে দীর্ঘ এক বৎসরকাল গভর্নমেণ্ট বিরোধী সংগ্রাম চালিয়ে কিছুই করে উঠতে পারে নি। তাদের আন্দোলন
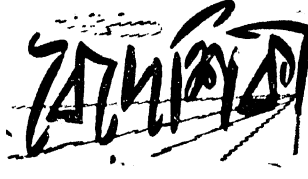
প্রায় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে চলেছিল। এর মধ্যে দেখা দিল কারেন বিদ্রোহ। সেই সুযোগে কমিউনিস্টরা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। এমন খবরও পাওয়া গেছে যে, কারেনরা যুদ্ধ করে একটা শহর দখল করেছে, আর সে শহর শাসন করছে কমিউনিস্টরা। উদাহরণস্বরূপ মান্দালয়ের কথাই বলা চলে। ব্রহ্ম রণাঙ্গনের সবচেয়ে বড় দুঃসংবাদ এই যে, বিদ্রোহীরা প্রোমে স্বতন্ত্র গভর্নমেণ্ট গঠনের উদ্যোগ করছে। প্রোম রেঙ্গুনের ১৬০ মাইল উত্তরে। প্রোমের ৪০ মাইল উত্তরস্থিত থায়েট্‌মিও শহরটিও বিদ্রোহীদের হাতে পড়েছে বলে প্রকাশ। এদিকে হোয়াইট ব্যাণ্ড পি ভি ও রাও রেঙ্গুনের ৮০ মাইল উত্তর-পশ্চিমস্থিত হেনজাদার নিকটবর্তী লেমিয়েৎনা শহরটি দখল করে নিয়েছে। বিদ্রোহীরা যদি সত্যই স্বতন্ত্র গভর্নমেণ্ট গঠন করে থাকে, তবে থাকিন নুর পক্ষে বিদ্রোহ দমন করা আরও কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। যে বিদ্রোহী দল প্রোমে রাজধানী স্থাপন করার চেষ্টা করছে, তাদের অধিনায়কত্ব করছেন বো কুন্ জ নামে ব্রহ্ম পার্লামেণ্টের একজন ভূতপূর্ব সদস্য। তাঁর দলে কমিউনিস্ট, হোয়াইট ব্যাণ্ড পি ভি ও এবং বার্মা রাইফেলের বিদ্রোহী সৈন্যরা আছে। প্রকাশ যে, বিদ্রোহীরা প্রোম জেলার সকল সরকারী কর্মচারীকে মাইনেপত্র না দিয়েই বরখাস্ত করে দিয়েছে। বিদ্রোহীদের পিছনে এতদিন কোন সুপরিকল্পিত কর্মপ্রয়াস ছিল না বলা চলে। এইবার তারা যদি সত্যই গভর্নমেণ্ট স্থাপন করে থাকে, তবে তাদের কর্মপ্রয়াস আরও সুসংহত ও সুপরিকল্পিত হবে এবং তার ফলে বিদ্রোহ দমনে থাকিন নু-কে বেশী বেগ পেতে হবে।

২রা এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ যে, থাকিন নু গভর্নমেণ্টের ৬ জন মন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন এবং থাকিন নু তাঁদের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছেন। পদত্যাগী মন্ত্রীদের নাম উপপ্রধান মন্ত্রী ও পররাষ্ট্রসচিব উ কিয় নিইন্, কৃষি ও বন বিভাগের মন্ত্রী থাকিন টিন্, শিল্প ও খনি বিভাগের মন্ত্রী উ কিয় মিণ্ট্, শিক্ষামন্ত্রী উ উইন্, স্বাস্থ্যসচিব বো হ্লা এ এবং দপ্তর-বিহীন মন্ত্রী বো সেইন মান। পদত্যাগী মন্ত্রীদের মধ্যে ৪ জন সোস্যালিস্ট ও বাকী দুজন পি ভি ও দলের। এই পদত্যাগের ফলে থাকিন নু মন্ত্রিসভার সদস্য-সংখ্যা ১৭ জন থেকে ১১ জন হয়ে দাঁড়াল। রেঙ্গুন বেতার থেকে বক্তৃতা প্রসঙ্গে থাকিন নু ঘোষণা করেছেন যে, উত্তর ব্রহ্মে বিদ্রোহের অবস্থা সরকারী আয়ত্তে এসেছে এবং মান্দালয় পুনরধিকারের সকল আয়োজন সমাপ্ত হয়েছে। তাঁর এ উক্তি সত্য হলে সুখের কথা সন্দেহ নেই। কিন্তু এ পর্যন্ত ব্যাপার যা দেখা যাচ্ছে, তাতে আশার কারণ খুঁজে পাওয়া মুশকিল। উত্তর ব্রহ্মের একটি অনামী রাজনৈতিক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রধান মন্ত্রী থাকিন নু এ অভিযোগও এনেছেন যে, তারা পিছন থেকে ছুরিকাঘাত করার চেষ্টায় আছে। এই দলটিই নাকি তাঁর মান্দালয় অভিযান প্রয়াসকে বিলম্বিত করে দিয়েছে। থাকিন নু মন্ত্রিসভার থেকে পদত্যাগ সম্বন্ধে রেঙ্গুনের রাজনৈতিক ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা এই যে, মন্ত্রিসভায় হোয়াইট ব্যাণ্ড পি ভি ও প্রতিনিধিদের প্রবেশের সুবিধার জন্যেই এ ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১লা এপ্রিল তারিখে মিট্‌কিনা থেকে ফিরে এসে থাকিন নু হোয়াইট ব্যাণ্ড পি ভি ও দলের নেতা বো পো কুনের সঙ্গে আপোষ-আলোচনা আরম্ভ করেছেন বলে সংবাদ পাওয়া গেছে। হোয়াইট ব্যাণ্ড পিভি ওদের সঙ্গে ব্রহ্ম গভর্নমেণ্টের একটা বোঝাপড়া হয়ে গেলেই ব্রহ্মে বিদ্রোহের অবসান হবে, এরূপ আশা করা অবশ্য বৃথা। এই বিদ্রোহ উপলক্ষে দেখা গেছে যে, ব্রহ্মের সরকারী সেনাবাহিনী ও কর্মচারীদের মধ্যে মনোবলের অত্যন্ত অভাব। নূতন মনোবল ও দেশরক্ষার ব্রতে এদের উদ্বুদ্ধ করে তুলতে না পারলে কোন কাজই হবে না। সে কাজ থাকিন নু কতটা পারবেন না পারবেন, তার উপরেই তার সকল প্রয়াসের সার্থকতা নির্ভর করবে।

## সিরিয়ায় সশস্ত্র বিদ্রোহ

আরব লীগের অন্তর্ভুক্ত অন্যতম আরব রাষ্ট্র সিরিয়া থেকে গুরুতর বিদ্রোহের সংবাদ এসেছে। এ বিদ্রোহ ঠিক গণ-অভ্যুত্থান নয়—রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সামরিক বিদ্রোহ। ৩০শে মার্চের সংবাদে প্রকাশ যে, সিরিয়ার সেনাবাহিনী বিদ্রোহী হ'য়ে সরকারী শাসনযন্ত্র দখল করেছে এবং প্রধান সেনাপতি কর্নেল হুস্নি জৈম্ সামরিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন। শাসন ক্ষমতা গ্রহণের অব্যবহিত পরে দামাস্কাস বেতার থেকে কর্নেল জৈম্ তিন দফা নির্দেশ জারী করেছেন। প্রথম দফার নির্দেশে জাতিকে বলা হয়েছে যে, দেশের অবস্থা যেরূপ দ্রুত অবনতির পথে চলেছিল, তাতে তথাকথিত জাতীয়তাবাদীদের হাত থেকে সিরিয়াকে মুক্ত

করা প্রয়োজন ছিল। কর্নেল হুসনি জৈম্ সেই কাজই করেছেন এবং সিরিয়ায় প্রকৃত গণতান্ত্রিক গভর্নমেণ্ট গঠিত না হওয়া পর্যন্ত জনসাধারণের উচিত সর্বান্তঃকরণে তাঁকে সাহায্য করা। দ্বিতীয় দফার ঘোষণায় পুনর্বিজ্ঞপ্তি না দেওয়া পর্যন্ত সিরিয়ার সর্বত্র সামরিক আইন জারী করা হয়েছে এবং সমস্ত গ্রাম ও শহরে সান্ধ্য আইন জারী করা হয়েছে। তৃতীয় দফার ঘোষণায় বলা হয়েছে যে, আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে কেউ যদি চলাফেরা করে, তবে তার মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে। কর্নেল জৈম্ আরও ঘোষণা করেছেন যে, সিরিয়ার প্রেসিডেণ্ট সুক্রি এল কোআট্‌লি ও পদচ্যুত প্রধান মন্ত্রী খালিদ এল আজিমকে সিরিয়ার রাজনৈতিক জীবন থেকে নির্বাসিত করা হবে। মাত্র ৪ মাস পূর্বে গত ডিসেম্বরে সিরিয়া এক রাজনৈতিক সংকট কাটিয়ে উঠেছে। তখন প্যালেস্টাইনে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার দাবীতে জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল এবং সমগ্র সিরিয়ায় তিনদিনব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট হয়েছিল। ফলে জমিল মাদাম বে'র মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করেছিলেন এবং সিরিয়া দুই সপ্তাহকাল মন্ত্রিবিহীন ছিল। তারপরেই খালিদ এল আজিমের মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছিল।

সিরিয়ার এই সশস্ত্র বিদ্রোহের সম্বন্ধে মজার কথা এই যে, সেনাবাহিনীকে সামান্য একটি গুলীও ছুড়তে হয়নি তারা একই সঙ্গে বিনা বাধায় দেশের সর্বত্র সরকারী কর্মকেন্দ্রগুলি দখল করে নিয়েছে। এ ধরণের রক্তপাতহীন বিপ্লবের দৃশ্য বড় একটা দেখা যায় না। এই সামরিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে কর্নেল জৈম্ বলেছেন যে, গভর্নমেণ্টের কার্যকলাপের ফলে সেনাবাহিনী লোকচক্ষে হেয় হ'য়ে উঠছিল এবং তার প্রতিকারের জন্যেই এ বিদ্রোহের প্রয়োজন ছিল। কথাটা অবশ্য তিনি খুলে বলেন নি। খোলাখুলিভাবে বিচার করলে দেখা যায় যে, এই সামরিক অভ্যুত্থান হ'ল আরব রাষ্ট্রগুলির প্যালেস্টাইনে যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়ার ফল। ক্ষুদ্র ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাইলের হাতে আরব লীগের অন্তর্ভুক্ত আরব রাষ্ট্রগুলি যে চরম আঘাত খেয়েছে তার ফলে আরব জগতের প্রায় সর্বত্রই অসন্তোষ ও বিক্ষোভের সূত্রপাত হয়েছে। নিজেদের সামরিক শক্তি সম্বন্ধে তারা আরব জনসাধারণের মনে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করেছিল। ইসরাইলের হাতে সামরিক বিপর্যয়ের ফলে সে ধারণা জনমানস থেকে সমূলে উৎপাটিত হয়েছে। শুধু তাই নয়—মিসর ও লেবানন ইতিমধ্যেই ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাইলের সঙ্গে শান্তিচুক্তি সম্পাদিত করেছে। ট্রান্সজর্ডানের সঙ্গেও শান্তিচুক্তির খসড়া তৈরী হয়ে গেছে এবং উভয় পক্ষ সে খসড়া গ্রহণ করেছে। এখন শুধু স্বাক্ষর দিলেই হয়। সিরিয়াও স্বতন্ত্রভাবে ইসরাইলের সঙ্গে শান্তি আলোচনা করতে রাজী হয়েছে। সিরিয়ার পদচ্যুত গভর্নমেণ্ট এই শান্তি আলোচনায় স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন কর্নেল হুসনি জৈমের একনায়কত্বমূলক গভর্নমেণ্ট সে পূর্ব-স্বীকৃতির মর্যাদা রাখবেন কি না, তা স্পষ্ট ক'রে জানা যায়নি। প্যালেস্টাইনে রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠানের মধ্যস্থ ডাঃ বাঞ্চে বলেছেন যে, সিরিয়া ও ইসরাইলের শান্তি আলোচনার পথে কোন বাধা হবে না। তবে অদূর ভবিষ্যতে এরূপ আলোচনার অনুষ্ঠান হবে বলে মনে হয় না। তার কারণ কর্নেল হুসনি জৈম বর্তমানে ঘর গোছানো নিয়ে ব্যস্ত। অদূর ভবিষ্যতে সিরিয়ায় কোন নতুন নিয়মতান্ত্রিক গভর্নমেণ্ট গঠনের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। সাফল্যপূর্ণভাবে শাসনক্ষমতা দখলের পরেই কর্নেল জৈম সিরিয়ার ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী, বর্তমানে সিরিয়ার প্রতিনিধি পরিষদের সভাপতি ফারিস্ এল খুরির সঙ্গে নিয়মতান্ত্রিক গভর্নমেণ্ট গঠনের সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেন। তখন জানা গিয়েছিল যে, প্রতিনিধি পরিষদের মোট ১৩৬ জন সদস্যের মধ্যে ৭৬ জনের সমর্থন তিনি পেয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই তখন আশা করা গিয়েছিল যে, বর্তমান প্রতিনিধি পরিষদ না ভেঙে দিয়েই হয়তো নতুন গণতান্ত্রিক গভর্নমেণ্ট গঠন করা হবে। কিন্তু সর্বশেষ সংবাদে দেখা গেল যে, কর্নেল জৈম্ বর্তমান প্রতিনিধি পরিষদ ভেঙে দিয়েছেন এবং নতুন শাসনতন্ত্র ও নতুন প্রতিনিধি পরিষদ গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন। এ অনেকটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার এবং এর ফলে সিরিয়ার বুকে কিছুদিনের জন্যে সামরিক একনায়কত্ব কায়েম হ'ল বলে মনে হয়। সিরিয়ার এই অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিক রাজনৈতিক রদবদল দেখে আরব জগতের অন্যান্য দেশেও দুশ্চিন্তা দেখা দিয়েছে—বিশেষ করে শাসক মহলে। অবিলম্বে প্যালেস্টাইনে পূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠিত না হ'লে এবং আরব জগতের থেকে পাশ্চাত্যের স্বার্থবাদী কূটনীতির অবসান না ঘটলে অন্য একাধিক আরব রাষ্ট্রেও সিরিয়ার মত সশস্ত্র সামরিক অভ্যুত্থান হওয়া অসম্ভব নয়।

৩—৪—৪৯

**স**প্তর্ষি আলয় থেকে যজ্ঞের নিমন্ত্রণ এসেছে, আশ্রম কুটীরের দ্বার বন্ধ করে অগ্নি যাত্রা করলেন।

নবোষার আলোক মাত্র স্ফুরিত হয়েছে পূর্বদিগ্বধূর রমণীয় ভ্রূবিলাসের মত, তারই লাস্যে সুরঞ্জিত হয়ে উঠেছে গগন-কপোল। সেই প্রথমজাগ্রত প্রহরের স্নিগ্ধ বাতাসে মনের আনন্দে একাকী পথ ধরে চলেছিলেন অগ্নি। শ্যাম বনভূমির উপান্ত পার হয়ে এসে থামলেন এক স্রোতস্বতীর কাছে, গন্ধপাষাণের ওপর দিয়ে ক্ষুদ্র জলধারা সলজ্জ-কলহর্ষে পুন্নাগকেশরের পুঞ্জ পুঞ্জ উপহার ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। এই জলধারার ওপারেই চৈত্ররথ কানন, তারপর শিলাজতু ও স্ফটিকে আকীর্ণ এক কৃষ্ণশৈলস্থলী, তারই সুউচ্চ শীর্ষে নভোপুরীর মত সপ্তর্ষির আলয়।

স্রোতস্বতীর কাছে দাঁড়িয়ে দূর সপ্তর্ষি-ভবনের দিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন অগ্নি। কিন্তু নিকটেই যে বনচ্ছায়ার সঙ্গে মেঘবর্ণ প্রস্তরে রচিত একটি ভবনের শান্ত প্রতিচ্ছবি নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার কথা একবারও মনে পড়ে না।

এই মেঘবর্ণ ভবনের অভ্যন্তরে মণিময় দীপিকার মত রূপরম্যা যে কুমারী তরুণীর হৃদয় অনুরাগের আলোকে ভরে রয়েছে, কিসের জন্য এবং কার জন্য, সেকথা জানেন অগ্নি। এই পথেই তো কতবার সে দেখা দিয়েছে, পদ্মপত্রে লেখা তার লিপিকা এই পথেই কতবার কুড়িয়ে পেয়েছেন অগ্নি। মৃদু তৃণে আস্তীর্ণ এই সুকোমল পথতলে কতবার সে এসে অগ্নির পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে, তার আবেদন অশ্রুসজল হয়ে উঠেছে কতবার। ঐ মেঘবর্ণ দক্ষভবনের মেয়ে স্বাহা ভালবেসেছে অগ্নিকে।

ভালবাসতে পারেনি অগ্নি। স্বাহা যেন অগ্নির অবাধ পথচলার জীবনকে স্তব্ধ করে দিতে চায়; অগ্নির জীবনকে এই বৃহৎ জগতের সহস্র আনন্দবৈচিত্র্য থেকে বঞ্চিত করে যেন ঊর্ণতন্তু দিয়ে ঘেরা একটি ক্ষুদ্র বৃত্তের মধ্যে বন্দী করে রাখতে চায় স্বাহা, অগ্নি তাই মনে করেন। স্বাহার আহ্বানকে শুধু পিছন ডাকের মত একটা বাধা বলেই মনে হয়েছে অগ্নির। তাই আজও এত নিকটে দাঁড়িয়েও মেঘবর্ণ ভবনের দিকে একবার চোখ তুলে তাকাতেও ভুলে যান অগ্নি।

গন্ধপাষাণে প্রবাহিত ক্ষুদ্র জলধারা পার হবার জন্য এগিয়ে যাচ্ছিলেন অগ্নি, কিন্তু কার মৃদুসঞ্চারিত পদধ্বনির ছন্দে তৃণময় পথতল যেন স্পন্দিত হয়ে উঠেছে, প্রভাতী নীরবতার মধ্যে অগ্নি সচকিত হয়ে ওঠেন। চৈত্ররথ কাননের মৃগ নয়, মেঘবর্ণ ভবনের অন্তর্লোক থেকে সেই মৃগনয়নী যেন এক দুঃস্বপ্ন দেখে হঠাৎ জাগ্রত হয়ে এই পথে ছুটে চলে এসেছে। অপ্রসন্ন হয়েই অগ্নি দাঁড়িয়ে থাকেন। দক্ষের মেয়ে স্বাহা এসে অগ্নির পথরোধ করে দাঁড়ায়।

শুধু কপালের ওপর একটি কস্তুরী-তিলক, শেষ রাতের তারার মতই শয়নঘোরে যেন অস্পষ্ট হয়ে গেছে, একেবারে মুছে যায়নি। এ ছাড়া আর কোন প্রসাধন ও আভরণ নেই স্বাহার। ভালবাসার বিনিময়ে যে ভালবাসা পেল না, তার আর প্রসাধনে প্রয়োজন কি? তারও অন্তর যে বৈধব্যের বেদনায় ভরে আছে। মিথ্যা তার কনককেয়ূর, বৃথা তার মঞ্জু মঞ্জীর, আর ক্বণৎকাঞ্চীদাম। এই পথেরই এক পত্রচ্ছদ তরুতলে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ প্রতীক্ষার কতগুলি ব্যাকুল মুহূর্তের মধ্যে স্বাহা একদিন বুঝতে পেরেছিল—অগ্নিকে সে ভালবেসে ফেলেছে। সেই অনুরাগের স্বাক্ষর এই কস্তুরী-তিলক। এই আশ্রমচারী সুন্দর পাবকের প্রেমে সেই দিন তার জীবনের সকল কামনাকে উৎসর্গ করে দিয়েছিল স্বাহা। তারপর, আর একটি সায়াহ্নে এই পথ থেকেই ব্যর্থ আবেদনের বেদনা নিয়ে ফিরে গেছে স্বাহা, জেনে গেছে অগ্নি তাকে ভালবাসে না। বুঝেছিল স্বাহা, তার সীমন্তে আর সিন্দূর-বিন্দু কোনদিন দেখা দেবে না। তবে আর কাজ কি এই কেয়ূরে, মঞ্জীরে আর কাঞ্চীদামে?

তবু আজও আবার ছুটে এসেছে স্বাহা। বৈধব্যের চেয়ে বুঝি বেশী জ্বালা আছে ভালবাসার অপমানে। প্রেমিকের মৃত্যুর চেয়ে বুঝি বেশি দুঃসহ প্রেমের মৃত্যু, প্রেমিকার কাছে।

স্বাহা বলে—এমনি করেই কি চলে যেতে হয়?

স্বাহার প্রশ্নের উত্তর দেন না অগ্নি। শুধু বিস্মিত হয়ে স্বাহার এই নিরাভরণ মূর্তির দিকে তাকিয়ে থাকেন, যেন স্বেচ্ছায় বনবাস ব্রত গ্রহণ করে ভূভিয়েখাতব্বী এই রূপমতী কুমারী অকারণে তপস্বিনীর মূর্তি ধরেছে।

অগ্নি প্রশ্ন করেন—এ তোমার কি বেশ স্বাহা?

স্বাহা—এই তো আমার যোগ্য বেশ।

অগ্নি—কেন?

স্বাহা—বুঝতে পার না?

সুবোধ ঘোষ

অগ্নি—না। তোমার মত মেয়ে কেন এত প্রসাধনবিহীন, এত নিরাভরণ, এত......।

স্বাহা—ব্যর্থ অনুরাগের জ্বালা অঙ্গরাগের প্রলেপে শান্ত হয় না অগ্নি। যার জীবনের নয়নানন্দ এমনি করে সম্মুখ পথ দিয়েই অদৃশ্য হয়ে যায়, তার নয়নে কৃষ্ণাঞ্জন শোভা পায় না। যার কণ্ঠে প্রিয়তমজনের বরমাল্য শোভা পেল না, মণিহার তার গলায় সাজে না।

অগ্নি বিচলিত হন না। প্রতিবাদ করেই বলেন—এ তোমারই ভুল স্বাহা, আমাকে এর জন্য দায়ী করো না।

স্বাহা—কিসের ভুল?

অগ্নি—আমাকে ভালবাস কেন? তুমি তো ইচ্ছে করলেই অন্য......।

স্বাহা—তা হয় না অগ্নি, ভালবাসা মধুপের ফুলবিলাস নয়। এক হতে অন্য জনা, নিত্য নব অভিসার আর বল্লভ সন্ধান, নারীপ্রেমের রীতি নয়, নারীর ধর্মও নয়।

অগ্নি—নারীধর্ম কি?

স্বাহা—এক প্রেম ও এক পতি।

অগ্নি—যদি সম্ভব না হয়, তবে?

স্বাহা—তবে বৈধব্য।

অপ্রসন্ন হয়ে ওঠেন অগ্নি। কী হিংস্র এক ধর্মতত্ত্বের কথা এত শান্তভাবে বলে চলেছে স্বাহা। এক নারী এক পুরুষের জীবনকে কারাগারের পাষাণ-প্রাচীরের মত চারদিক থেকে শুধু রুদ্ধ করে রাখবে, তারই নাম নারীপ্রেম?

স্বাহা বলে—শুধু নারীর ধর্ম কেন, পুরুষের ধর্মও যে তাই অগ্নি।

অগ্নি বিরক্ত হয়েই প্রশ্ন করেন—কি?

স্বাহা—একনারীব্রত।

অগ্নি—এ ধর্মতত্ত্ব তুমিই স্মরণ করে রাখ স্বাহা। আমাকে বুঝতে বলো না।

স্বাহা—কেন?

অগ্নি—জীবনে কোন নারীকে ভালবাসার প্রয়োজন নেই আমার।

স্বাহা—সেও পুরুষধর্ম নয় অগ্নি।

অগ্নি উষ্মা বোধ করেন—আমার ধর্ম আমি জানি।

স্বাহা—তোমার ধর্ম কি স্বতন্ত্র?

অগ্নি—হ্যাঁ।

চুপ করে থাকে স্বাহা, হয়তো তাই সত্য। ভাস্বরতনু এই পাবকের ক্ষুধা তৃষ্ণা ও আনন্দ হয়তো সাধারণের মত নয়। তাই ব্যর্থ হয়ে গেছে স্বাহার আহ্বান। অন্তরে যার অনলশিখার আকুলতা, মণিময় দীপিকার প্রেম তার কাছে ক্ষীণদ্যুতি বলে মনে হবে বৈকি। চক্ষে যার দাহিকার তৃষ্ণা, প্রেমিকা স্বাহার কমু নয়নশ্রী তার কাছে মূল্যহীন বলেই তো মনে হবে। বক্ষে যার বেদনা নেই, তার কাছে আবেদনের কি অর্থ আছে?

অগ্নি বলেন—আমি যাই এবার।

স্বাহা—কোথায়?

অগ্নি—সপ্তর্ষি ভবনে যজ্ঞের নিমন্ত্রণ আছে।

স্বাহা চমকে উঠে যেন বেদনার্তভাবে বলে—যেও না।

অগ্নি—কেন?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না স্বাহা। তবু স্বাহার মন চমকে উঠেছে। মনে হয়, অনলশিখার আকুলতা অন্তরে বহন করে অগ্নি যেন চিরকালের মত তার চক্ষের বাইরে চলে যাচ্ছে, আর ফিরবে না। কেন এই শঙ্কা, তার অর্থ স্পষ্ট করে বুঝতে পারে না স্বাহা।

স্বাহার উত্তর শোনার জন্য আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করেন না অগ্নি। গন্ধপাষাণে প্রবাহিত ক্ষুদ্র জলধারা পার হয়ে চৈত্ররথ কাননের পথে অদৃশ্য হয়ে যান।

* * * * *

সপ্তর্ষির সমাদরে ও সপ্তঋষি পত্নীর অভ্যর্থনায় যজ্ঞে ও উৎসবে কয়েকটি দিন আনন্দের মধ্যেই শেষ করে দিলেন অগ্নি। এবার তাঁকে চলে যেতে হবে। কিন্তু বুঝতে পারেন অগ্নি, চলে যেতে মন চাইছে না।

সপ্তর্ষি ভবনের যজ্ঞশালায় ধূমসৌরভ আর ছিল না, উৎসবের প্রদীপও নিভে গেছে অনেকদিন আগে। জীবনে এই প্রথম বেদনা বোধ করেন অগ্নি, এই প্রথম অনুভব করেন, সপ্তর্ষি ভবনে কিসের এক মায়া তাঁকে পিছন থেকে ডাকছে। মনে হয় পথ ফুরিয়ে গেছে, চিরজীবন এই ভবনের অন্তর্লোক সন্ধান করে সেই মায়ার রহস্যকে উদ্ধার করতে চান অগ্নি।

কিন্তু সে যে নিতান্ত অনধিকার, অতিথি অগ্নির পক্ষে আর এক মুহূর্তও সপ্তর্ষিভবনে থাকবার কোন প্রয়োজন নেই। বিদায় অভ্যর্থনা জানিয়ে গেছেন সপ্তঋষি, মরীচি ও অত্রি, অঙ্গিরা ও পুলস্ত্য, পুলহ ও ক্রতু, আর বশিষ্ঠ। বিদায় প্রণাম নিবেদন করে গেছে সপ্তঋষি পত্নী—সম্ভূতি ও অনসূয়া, শ্রদ্ধা ও প্রীতি, গতি ও সন্নীতি এবং অরুন্ধতী। সপ্ত সহচরী সেবিত সপ্তর্ষির এই প্রেমপূরিত নভোপুরীর অভ্যন্তরে চন্দ্রতারায় অবকীর্ণ স্নিগ্ধ আলোকের সংসারে নিতান্ত অবান্তর হয়েও কিসের আশায় পড়ে থাকতে চান অগ্নি?

নিজেকে প্রশ্ন করেও কোন উত্তর পেলেন না অগ্নি। অশান্ত মনের তাড়না থেকে যেন পালিয়ে যাবার জন্যই দ্রুতপদে সপ্তর্ষি ভবনের অঙ্গিনা পার হয়ে চলে যান। নিস্তব্ধ যজ্ঞশালার দুয়ার পর্যন্ত পৌঁছে কিছুক্ষণের মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। পরমুহূর্তে যেন এক স্বপ্নলোক থেকে উৎসারিত কলহাস্যের শব্দ শুনে চমকে ওঠেন।

যজ্ঞশালার পাশে এক লতাগৃহে বসে মাল্য রচনা করছিল সপ্তঋষি পত্নী। নিষ্পলক চক্ষে তাকিয়ে থাকেন অগ্নি এতক্ষণে বুঝতে পারেন, এই স্বপ্নলোকেরই রূপামৃত পান করবার জন্য তাঁর অন্তরের অনল তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠেছে। সাতটি লীলায়িত অঙ্গশোভা, শিথিলনিচোল, বিগলিত বেণী, চঞ্চল সমীরকৌতুকে উদ্বেলিত অংশুক বসন। সপ্ততন্বীর পুলকাঞ্চিত দেহ যেন সাতটি শিখা, যার বিচ্ছুরিত প্রভা প্রবল দাহিকা হয়ে অগ্নির প্রতি শোণিতকণিকায় সঞ্চারিত হয়ে গেছে। তারই বেদনায় অস্থির হয়ে যজ্ঞশালার দুয়ার পার হয়ে ছুটে চলে যান অগ্নি।

সেই দিন থেকে চৈত্ররথ কাননের অভ্যন্তরে এক অনলের তৃষ্ণা ঘুরে বেড়ায়। দূরে নভোপুরীর অঙ্গনে এক লতাগৃহের নিভৃতে সে অনলের দাহিকা বন্দী হয়ে আছে। তারই ধ্যানে জীবনযৌবন সঁপে দিয়ে চৈত্ররথ কাননের নিভৃতে নিজেকে নির্বাসিত করে রেখেছেন অগ্নি। এক অসম্ভবের আশায়, অপ্রাপ্যের তপস্যায়, অনন্ত প্রতীক্ষার সংকল্প নিয়ে এইখানে বসে থাকবেন অগ্নি। এই প্রতীক্ষায় যদি জীবন ফুরিয়ে যায়, ক্ষতি কি?

কি ক্ষতি, কেমন করে বুঝবেন অগ্নি? কি ক্ষতি, সে বুঝবে কি করে যে স্নিগ্ধদ্যুতি স্বাহার আহ্বানকে জীবনের বাধা মনে করেছে? বুঝবার মত হৃদয় কোথায় তার, সপ্তঋষিবধূকে অভিসারিকারূপে দেখবার আশায় চৈত্ররথ কাননের নিভৃতে যার সত্তা এক ভয়ঙ্কর প্রতীক্ষার তপস্যায় বসে আছে? নারীকে প্রেমিকারূপে নয়, শুধু দাহিকারূপে লাভ করার জন্য যে পুরুষের তৃষ্ণা আকুল হয়ে রয়েছে, সে বুঝবে কি করে, ক্ষতি কোথায়?

জীবনে সবচেয়ে বড় ক্ষতি হয়ে গেছে যার, সেই একদিন শুনতে পায়, চৈত্ররথ কাননের নিভৃতে নিজেকে নির্বাসিত করে রেখেছে অগ্নি। দূরে নভোপুরীর দিকে তাকিয়ে এক ভয়ঙ্কর প্রতীক্ষার তপস্যায় সে সুন্দর পাবকের দিনযামিনীর মুহূর্ত কেটে যায়, দুঃসহ তৃষ্ণায়। স্বাহা বুঝতে পারে, তার আশঙ্কাই এতদিনে সত্য হয়েছে। মেঘবর্ণ প্রস্তরে রচিত ভবনের নিভৃতে কুমারী স্বাহার মন বেদনায় ভেঙে পড়ে।

পুরুষধর্ম বোঝে না, নারী প্রেমের রীতিও বোঝে না, এমন মানুষের জীবনে বনবাসের অভিশাপ লাগবে, তাতে আশ্চর্য কি? মমতায় অসাধারণ নয়, প্রীতিতে অসাধারণ নয়, শুধু অনলভরা ক্ষুধা-তৃষ্ণা কামনায় অসাধারণ, এমন মানুষকে সাধারণের সংসার সহ্য করতে পারে না, কোনদিন পারবেও না। সমাজ-ধর্মের এই সহজ সত্যটুকু উপলব্ধি করবার মত হৃদয় নেই অগ্নির।

অনুরাগিণী স্বাহার কস্তুরীতিলক যার কাছে কোন মর্যাদা পেল না, একনিষ্ঠার সুন্দর আবেদনকে লাঞ্ছিত করে যে চলে গেছে, তার জীবনের মাদকতা আজ [illegible]

রূপে চরম হয়েই দেখা দিয়েছে। এ পৌরুষ পৌরুষ নয়, এই পরদারকামনা কামনা নয়, এ প্রতীক্ষা প্রণয়ীর প্রতীক্ষা নয়, এ শুধু নিজের অনলে নিজেকে ভস্মীভূত করা। আত্মহত্যার এই ভয়ানক আয়োজন থেকে কে নিবৃত্ত করতে পারে অগ্নিকে?

কেউ নয়, অগ্নিকে এই অভিশপ্ত নির্বাসন থেকে উদ্ধার করবার জন্য এ পৃথিবীর কোন হৃদয়ে কোন উদ্বেগ, কৌতূহল ও আগ্রহ নেই, শুধু একটি হৃদয় ছাড়া। সেই হৃদয় আজ থেকে থেকে এক মেঘবর্ণ ভবনের নিভৃতে বেদনায় ভেঙে পড়ে, অসিতনয়নশোভা অশ্রুজলে মেদুরতায় ভরে ওঠে। এ ক্ষতি শুধু স্বাহারই ক্ষতি, আর কারও নয়। এতদিনে যেন সত্যি করে তার বৈধব্যের রিক্ততা চরম হতে চলেছে।

কে উদ্ধার করবে অগ্নিকে? সুন্দর পাবকের জীবনের শুচিতাকে এই ভয়ানক কলুষের আক্রমণ থেকে কেমন করে রক্ষা করা যায়? অগ্নিপ্রেমিকা স্বাহা সারাক্ষণ তার ভাবনার অন্ধকারে যেন ছটফট করতে থাকে। —ক্ষমা কর অদৃষ্টের দেবতা, শক্তি দাও হে সকলকালপুরুষে। হরণ কর সকল ভয় হে ভয়হরণ! কর নিঃসংকোচ, কর নির্লজ্জ, প্রেমিকা স্বাহার জীবনে দাও পরম দুঃসাহসের অভিসার। চৈত্ররথ কাননের কারাগার থেকে সকল অভিশাপের প্রাচীর চূর্ণ করে স্বাহার জীবনবাঞ্ছিতকে উদ্ধার করে আনতে হবে, সে উদ্ধারের মন্ত্রটুকু বলে দাও এই প্রণয়ভীরু কুমারী স্বাহার কানে কানে, হে পরম দৈব!

প্রতি মুহূর্তে স্বাহার অন্তরে এই আকুল প্রার্থনা যেন নীরবে ধ্বনিত হতে থাকে। সেই অসহায় ভ্রান্তকে উদ্ধার করতেই হবে, সংকল্পে অটল হয়ে ওঠে স্বাহার মন। কিন্তু মনের নাগালে কোন পথ খুঁজে পায় না। মেঘবর্ণ ভবনের চূড়ায় সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনতর হয়ে দেখা দেয়।

তার মনেরই পথহীন অন্ধকারের মত বাইরের এই চরাচরব্যাপ্ত অন্ধকারের দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে ছিল স্বাহা। তার জীবনের স্নিগ্ধজ্যোতি প্রেম যেন এই বিরাট অন্ধকারের চাপে চিরকালের মত নিভে যেতে চলেছে। প্রেমিকা হয়ে যে সুন্দর পাবককে ভালবেসেছে, পতিরূপে যাকে পেয়ে জীবন ধন্য করতে চেয়েছে, তাকে উদ্ধার করে আনবার মত শক্তি নেই স্বাহার। এই ভীরু প্রেমের দুর্বলতাকে ধিক্কার দেয় স্বাহা।

জ্বালাময় আলোকের মত অদ্ভুত এক রক্তিম আভায় ভরে ওঠে স্বাহার মুখ। এই অন্ধকারের সমুদ্রে বহুদূরে যেন বাড়ববহ্নি জ্বলছে, তারই প্রতিচ্ছায়া পড়েছে স্বাহার মুখে। নিষ্পলক চক্ষে দূরে বনগিরিশিরে এক দাবানলের জ্বালালীলা দেখছিল স্বাহা। কোন্ এক প্রেমিকার ব্যর্থ আবেদনের বেদনা যেন দাহিকা হয়ে তার দয়িতের মিলন-তৃষ্ণায় জগতের এই অন্ধকারে পথ সন্ধান করে ফিরছে, সকল লাজ, ভয়, বাধা পুড়িয়ে দিয়ে।

প্রস্তুত হয় স্বাহা।

* * * * *

সফল হয়েছে অনলের তৃষ্ণা, চৈত্ররথ কাননের পথে শুরু হয়েছে দাহিকার অভিসার। সপ্তর্ষি ভবনের নভোপুরী থেকে যেন এক একটি রূপের শিখা এসে অগ্নির আলিঙ্গনে আত্মসমর্পণ করছে। অনলশিখ অগ্নির ভয়ংকর প্রতীক্ষার তপস্যা, বনপথে আগত মৃদুমঞ্জরীর নিক্কণে নিত্য চমকিত হয়ে ওঠে। স্নিগ্ধবেণী, কজ্জলিত আঁখি, রঞ্জিত অধর, কেয়ূর কিঙ্কিনী কাঞ্চীভূষিত মূর্তি মনোহরা, স্বচ্ছ অংশুকচ্ছদে পরিবৃত মদালসমন্থর এক একটি অঙ্গশোভা ঋষিবধূর মূর্তি ধরে চৈত্ররথ কাননের নিভৃতে প্রতি রজনীতে রভসাকুল উৎসব সৃষ্টি করে। অন্ধ ভৃঙ্গের মত সেই নারী দেহপুষ্পের মধু পান করেন অগ্নি। শুধু দেখতে পান না, সে মূর্তির সকল ছদ্মসজ্জা ছাপিয়ে কপালের ওপর একটি কস্তুরীতিলক স্পষ্ট হয়ে আছে।

পরদার কামনার অশুচিতা হতে প্রেমাস্পদের জীবনকে রক্ষা করার জন্য বিচিত্র এক কপট অভিসার শুরু হয়েছে স্বাহার জীবনে। ঋষিবধূর ছদ্মমূর্তি ধরে প্রতি রজনীতে চৈত্ররথ কাননের নিভৃতে যেন দাহিকার উপঢৌকন নিয়ে যায় স্বাহা।

কোথায় ভুল হলো, ভাবতে পারে না স্বাহা। সকল লজ্জা কুণ্ঠা ভয় মন থেকে মুছে ফেলে এক কপট অভিসারের নায়িকা হয়ে ওঠে স্বাহা। হোক্ কপট, হোক্ কৃত্রিম, জীবনে যার বক্ষোস্পর্শ চিরন্তন করে রাখতে চেয়েছিল স্বাহা, ছদ্মবেশে চৈত্ররথবনের এক মোহ-কুহেলিকার আড়ালে মুখ ঢেকে তারই আলিঙ্গন বরণ করতে কোন অশুচিতা বোধ করে না স্বাহা।

জীবনের এক ব্যর্থপ্রেমের বেদনায় ভরা মহানাট্যে যেন নায়িকার মত অভিনয় করে চলেছে স্বাহা। এই নাট্যলোকের বনপথে যে অকৃত্রিম অন্ধকার ছড়িয়ে রয়েছে তার চেয়ে বাস্তব সত্য আর কিছু নেই, কিন্তু তারই মধ্যে যে ঋষিবধূ সম্ভূতির মূর্তি অভিসারে চলেছে, তার চেয়ে মিথ্যা আর কিছু নেই। এইভাবেই এই নাট্যলোকে দেখা দিয়েছে ঋষিবধূ অনসূয়া, শ্রদ্ধা, প্রীতি, গতি ও সন্নীতি। সব মিথ্যা, সব অলীক, সব কপট। এই ছদ্ম-প্রতিমূর্তির মধ্যে শুধু স্বাহা নামে প্রচ্ছন্ন এক মিলনের আকুলতাই সত্য।

চৈত্ররথ কাননের রাত্রি শিশিরবাষ্পে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। স্বাহার যাত্রালগ্ন এগিয়ে এসেছে, বশিষ্ঠপ্রিয়া অরুন্ধতীর রূপে ছদ্মসজ্জা করে স্বাহা। যাত্রা সুরু হয়।

চলতে গিয়েই যেন বাধা পায় স্বাহা। যা কোনদিন হয়নি, মনের গহনে কে যেন প্রতিবাদ করে ওঠে—ভুল করছো স্বাহা।

এগিয়ে যায় স্বাহা। মঞ্জীর বাজে না, গতি ছন্দ হারায়। কানে কানে কে যেন বলে দিয়ে পালিয়ে যায়—অন্যায় করছো স্বাহা।

চৈত্ররথ বনে প্রবেশ করে স্বাহা। পথের কণ্টকগুল্ম যেন পেছন থেকে স্বাহার নীলাঞ্চল টেনে ধরে—অপমান করো না স্বাহা।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে স্বাহা। কার অপমান? কিসের অন্যায়? কোথায় ভুল? স্বাহার সমস্ত মন ভয়ে শিউরে ওঠে। ভুল করে এক ভয়ানক নির্লজ্জতা দিয়ে যেন জগতের নারীধর্মকে সে অপমান করছে।

তার দেহমন এক অশুচিতার স্পর্শে কলুষিত হয়ে উঠেছে, আজ প্রথম অনুভব করে স্বাহা। বনপথের ওপরে সেইখানেই অসহায় ভাবে লুটিয়ে পড়ে স্বাহা। আর পারবে না স্বাহা, আর শক্তি নেই, পতিপ্রাণা বশিষ্ঠপ্রিয়া অরুন্ধতীকে অপমান করতে পারবে না স্বাহা। লোক পূজ্যা সেই সতী নারীর নকল মূর্তিকে অভিনয়ের ছলেও পরপুরুষের হাতে তুলে দিতে পারবে না।

এমন করে কোনদিন কাঁদেনি স্বাহা। এত স্পষ্ট করে নিজের ভুল আর ক্ষতকে কোনদিন বুঝতে পারেনি। তার প্রেমাস্পদ সুন্দর পাবকের জীবনকে শুচিময় এক প্রেমের দীক্ষা দিতে পারেনি স্বাহা, বরং ভুল করে বহু ছদ্ম-রূপে সঙ্গ দান করে তার পৌরুষ কলুষিত করে এসেছে। এ নারীপ্রেমের রীতি নয়, প্রেমাস্পদের প্রতি প্রেমিকার কর্তব্য নয়।

চৈত্ররথ কাননে বনপথের একান্তে এক কৃত্রিম অরুন্ধতীর অন্তরে যেন অনুতাপে পুড়তে থাকে। একনিষ্ঠ প্রেমের প্রতিমা, বশিষ্ঠপ্রিয়া অরুন্ধতীর মূর্তি নকল করে এই রূপসজ্জা যেন আকস্মিক আঘাত দিয়ে বদলে দিয়েছে স্বাহার অন্তরের রূপ, ভেঙে দিয়েছে ভুল, স্মরণ করিয়ে দিয়েছে নারীধর্মের রীতি। অভিনয়ের কাছেই আজ হেরে গেছে স্বাহা।

চুপ করে বসেছিল স্বাহা। চৈত্ররথ বনের এই অন্ধকার যেন তার সারাজীবনের পথ ভুল করে দিয়েছে। মেঘবর্ণ দক্ষভবনের স্নেহনীড়ে আর ফিরে যাবারও পথ নেই। এক শিশু প্রাণের সঞ্চার এসে গেছে স্বাহার অন্তর্লোকে, এই নিভৃত বক্ষোবেদনার প্রতি স্পন্দনে তারই সাড়া আজ স্পষ্ট করে শুনতে পায় কুমারী স্বাহা। সকল দিক দিয়ে ক্ষতি ও অখ্যাতি আজ পূর্ণ করে তুলেছে স্বাহার জীবন।

মধ্যরজনীর ক্ষীণ চন্দ্রলেখা চৈত্ররথ বনের পুষ্পগুল্ম লতায় চূর্ণ জ্যোৎস্না ছড়িয়ে আলো-ছায়ার মায়া সৃষ্টি করে। স্বাহা মুখ তুলে তাকায়, যেন পালিয়ে যাবার পথ খোঁজে। রক্ষা করতে পারেনি অগ্নিকে, রক্ষা করতে পারেনি

নিজেকে, কিন্তু সব ক্ষতি ও অপমানের অভিশাপ থেকে একটি শিশুজীবনকে মাতার স্নেহ দিয়ে রক্ষা করার জন্য আজ তাকে আরও দূরান্তে সবাকার অগোচর এক নিবিড় বনবাসে চলে যেতে হবে। তারই জন্য যেন পথ খোঁজে স্বাহা।

চমকে ওঠে স্বাহা। কার পদশব্দ? বনের মৃগ নয়, মঞ্জীরধ্বনি শুনতে না পেয়ে একটি উৎকর্ণ আকুলতা যেন সারা বনপথ কাউকে সন্ধান করে ফিরছে। সে অস্থির পদশব্দ এগিয়ে আসে, স্বাহার সম্মুখে এসে ক্ষণিকের মত শান্ত হয়ে দাঁড়ায়। তারপর আগ্রহভরে প্রশ্ন করে—কে তুমি?

—আমি অরুন্ধতী।

—অরুন্ধতী! আমি অগ্নি।

—তুমি অভিশাপ। তুমি অশুচি, হীন-পৌরুষ, প্রেমহীন পারদারিক তুমি। আমার সম্মুখ হতে দূরে সরে যাও।

অগ্নি প্রখর দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে থাকেন, বুঝতে চেষ্টা করেন, চৈত্ররথ বনের আলোছায়ার রহস্যের মধ্যে এ কোন্ নতুন ছলনা এসে প্রবেশ করেছে?

বুঝতে পেরেছেন অগ্নি, কপট অভিসারে ছলিত হয়েছে চৈত্ররথ কানন, ছলিত হয়েছে তাঁর প্রতীক্ষার তপস্যা, ছলিত হয়েছে তাঁর অনল তৃষ্ণা মিথ্যা উপহারে। সুচারুভূষিতা এই নারীর কপালে অঙ্কিত ঐ কস্তুরীতিলক স্পষ্ট করেই দেখতে পেয়েছেন অগ্নি।

—স্বাহা!

অগ্নির ক্রুদ্ধ আহ্বানে উঠে দাঁড়ায় স্বাহা।

—এত বড় ছলনা দিয়ে আমাকে অপমান করলে কেন স্বাহা?

—জানি না কেন করেছি। ভুল করেছি। ক্ষমা কর।

—ক্ষমা হয় না স্বাহা।

—দাও অভিশাপ। শুধু একটি আশীর্বাদ করো......।

বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে থাকেন অগ্নি। স্বাহা অগ্নিকে প্রণাম করে—শুধু একটি আশীর্বাদ করো, তোমার সন্তানকে যেন সকল ক্ষতি ও অখ্যাতি থেকে রক্ষা করতে পারি।

চৈত্ররথ কাননের আলোছায়া যেন দুর্বোধ্য এক স্বপ্নলোকের রূপ নিয়ে আরও রহস্যময় হয়ে উঠেছে। তারই মধ্যে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন অগ্নি, যেন তাঁর জীবনের সকল অনল তৃষ্ণা স্তব্ধ হয়ে গেছে। তাঁর পথভ্রান্ত পৌরুষের জীবনকে অশুচিতার পাপ হতে রক্ষা করার জন্য কুমারী হয়েও নিজ দেহ হতে অগ্নিকে দাহিকার উপহার দিয়ে সকল জ্বালা সহ্য করেছে যে, তাঁরই সন্তানের মাতা হতে চলেছে যে, তারই কপালে চিরন্তন হয়ে আছে একটি প্রেমের কস্তুরীতিলক।

কিন্তু স্বাহা ছিল না, অগ্নিকে প্রণাম করেই এই আলোছায়ার রহস্যের মধ্যে সে অদৃশ্য হয়ে গেছে। অসহায় ভাবে বেদনাপীড়িত কণ্ঠস্বরে বনময় প্রতিধ্বনি তুলে অগ্নি ডাকেন—স্বাহা! স্বাহা।

* * * *

চৈত্ররথ কাননে বৎসরের পর বৎসর শীত গ্রীষ্ম আর বর্ষা বসন্তের খেলা শেষ হয়। তারই মধ্যে অহরহ একটি আকুল প্রতিধ্বনি শুধু আলো অন্ধকার ও বাতাস বেদনার্ত করে ছুটাছুটি করে বেড়ায়—স্বাহা! স্বাহা!

সত্যি ক'রে এক অনন্ত প্রতীক্ষার তপস্যা সুরু করেছেন অগ্নি। কপালে কস্তুরীতিলক, স্নিগ্ধদ্যুতিরূপিণী এক নারী এই পথে ফিরে এসে দেখা দেবে কবে? স্বাহা! স্বাহা! আগ্নেয়জননী স্বাহা! পিতৃহৃদয়ের শূন্যতা, শুদ্ধপৌরুষ পতিহৃদয়ের শূন্যতা দূর করার জন্য যেন এক বাঞ্ছিতার উদ্দেশ্যে সাগ্রহ আহ্বান মন্দ্র চৈত্ররথ কাননের বাতাসে নিরন্তর মন্দ্রিত হয়। আশ্রমগেহিণী রূপে, গার্হপত্যের একমাত্র শিখা রূপে, সেই একপ্রেমের পুণ্যকেই অনন্তকাল আহ্বান করবেন অগ্নি—স্বাহা! স্বাহা!

## রহস

### পরিমল দত্ত

যোজন-বিথার অনেক নদীর পার
বনময় দেশ সাঁওতাল পরগণা,
আকাশের ঘট উপুড় যেথায় নীলে
শালের সবুজ স্বপ্নের জালে বোনা।

মহুয়া-মদির জ্যোৎস্না উজল রাতি
হৃদয়ে কাহার ছায়াপথ জানি আঁকে
এলফিনদের নিভৃত নাচের সাথী
রূপালি সে নদী হলুদ বেলার বাঁকে।

অনেক যোজন অনেক যোজন দূরে
রহস্য-ঘন মধুচন্দ্রিকা-দেশ
বেসেছিনু ভাল উপকথা ভূমিকায়
একটি সে মেয়ে, দীঘল যাহার কেশ
মেঘল-বরনী, কর্ণে মহুয়া ফুল,
ভুলিনি তাহারে কখনো হবে না ভুল।

## আপেক্ষিক

### আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

শীত আর ম্লান বর্ষা নেমে আসে ধীরে
কুণ্ঠাভরে পদক্ষেপ বিক্ষুব্ধ যৌবন,
হৃদি-তন্ত্র আর যেন বাজে নাকো মীড়ে
জীবন আনন্দহীন, সংকুচিত মন।

বিগত দিনের স্মৃতি : বহ্নিশিখা নারী।
অভিমন্যু-শরক্ষেপ, চতুরতা-ভরা,
উজ্জ্বল আকাশে দীপ্ত নক্ষত্রের সারি
মন্দ্রিত-মুখর ছিলো বিপুলা এ ধরা।

মালবিকা স্বপ্ন-লীনা—অবন্তীর পথ
আকস্মিক রুদ্ধগতি, নির্দেশ-নামায়
নিশ্চল নিস্পন্দ রয় বসন্তের রথ,
প্রাচুর্যবিহীন প্রাণে, তমসা ঘনায়!

এ জীবন-অন্বেষণ! রূঢ় মরীচিকা
যদি নাহি রহে পার্শ্বে দীপ্ত মালবিকা।

সত্যব্রত, মীরা সরকার, সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়, অমিতা বসু, শান্তা প্রভৃতি। মতিমহল থিয়েটার্সের পরিবেশনে ১৯শে মার্চ থেকে মিনার-বিজলী-ছবিঘরে দেখানো হচ্ছে।

বাঙলা ছবির বাজার সম্পর্কে দিন দিন হতাশা বেড়েই চলেছে, কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে যে, গুণের দিক থেকে বাঙলা ছবির মর্যাদা আবার ফিরে আসছে। সেই রকম মর্যাদা বাড়িয়ে যাবার মতো ছবি হচ্ছে "সন্দীপন পাঠশালা।" বিষয়বস্তুর দিক থেকে ছবিখানি একটি স্মরণীয় অবদান।

খুঁটিয়ে বিচার করলে সিনেমার চারিত্রিক দোষত্রুটি অনেক দিকেই লক্ষ্যে পড়ে। বিন্যাসে সাধারণ কৃতিত্বও অনেক স্থলে পাওয়া যায়নি, কলাকৌশলের ত্রুটিও কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি করেছে; কিন্তু তা সত্ত্বেও বিষয়বস্তুর আবেদনে ছবিখানি বরণীয় হ'য়ে উঠতে পেরেছে।

একটি মানুষের শিক্ষালাভের ও বিতরণের মানুষ হওয়া ও মানুষ করে তোলার উদগ্র স্পৃহা এবং তার জন্যে পদে পদে দুর্ভোগ—আমাদের দেশের শিক্ষা বিস্তারের পিছনে যে করুণ কাহিনী পরিব্যাপ্ত হ'য়ে আছে "সন্দীপন পাঠশালা"তে তাই রূপায়িত হয়েছে। সীতারামের চৌদ্দপুরুষ চাষা—কিন্তু লাঙলের দিকে তার মন গেলো না। ছেলে বয়সে শান্তিনিকেতনে একবার গিয়ে সেখানকার পাঠশালা দেখে নিজেও বড় হ'য়ে ঐ রকম একটা পাঠশালা খোলার স্বপ্ন দেখতে থাকে। অবস্থার জন্যে ম্যাট্রিকের শেষে তার পক্ষে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হলো না। পিতার আগ্রহে তাকে জমিদারী সেরেস্তায় কাজ নিতে হ'লো। কিন্তু পাঠশালা খোলার ইচ্ছা সে ছাড়লে না। প্রতিবেশী শুঁড়ির সহায়তায় পাঠশালার জন্যে একখানা ঘর পেলে। কিন্তু ছোটজাত হ'য়ে পণ্ডিতী করতে যাওয়া বড়জাতেদের বরদাস্ত হ'লো না। তারা উদ্বোধন দিনের সমস্ত আয়োজন পণ্ড ক'রে দিলে। সীতারাম নিদারুণ আঘাত পেলো; কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে তাকে সাহায্যের জন্যে এগিয়ে এলো জমিদারতনয় ধীরাবাবু আর রাণীমা। এদের সহায়তায় পাঠশালা আরম্ভ হ'য়ে গেলো, ছাত্র এলো পল্লীরই ছোটজাতের ছেলেমেয়েরা। সীতারামের আদর্শ পুরুষ হলেন ধীরাবাবু। বাধাবিপত্তি অনটনের মধ্যে সীতারাম তার পাঠশালাকে আস্তে আস্তে গড়ে তুলতে থাকে। তাকে উৎসাহিত করতে থাকেন স্কুল-ইন্সপেক্টর রজনীবাবু। সীতারাম এগিয়ে চলে। ওদিকে পারিবারিক জীবনে বিরোধ গড়ে ওঠে। বাবা রমানাথ ছেলের পণ্ডিতী সখকে প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করতে পারে না। স্ত্রী মনোরমার অশিক্ষিত মনোবৃত্তি বারে বারে তাকে আঘাত করে। সেই সময়ে তার সামনে নতুন দীপশিখারূপে আবির্ভূত হ'লো নতুন শিক্ষয়িত্রী নীলিমা। নীলিমা ধীরানন্দেরই স্ত্রী। কায়স্থ ব'লে রাণীমা তাকে বধূরূপে বরণ করতে পারলেন না, নীলিমাকে গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হলো। তারপর বিপর্যয় এলো নতুন রূপ নিয়ে। ধীরানন্দ স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় তাকে ক'লকাতায় গ্রেপ্তার করা হয়। সে খবরে সীতারাম তার পাঠশালার ছুটি দিয়ে দেয়। পাঠশালার ওপর রাজরোষ পড়লো—পাঠশালা বন্ধ হলো। কিন্তু তাকে আবার উৎসাহ দিলে তারই পড়ুয়া ছেলেরা। নতুন উদ্যমে সীতারাম আবার তার পাঠশালা পত্তন করলে গাছতলাতে। আবার সীতারাম এগিয়ে চলতে থাকে। দেশের হাওয়া ততদিনে বদলে যেতে আরম্ভ করেছে। ধীরানন্দ ফিরে এসে সীতারামকে নতুন মর্যাদায় ভূষিত করলে। পল্লীর বড়জাতেরাও আজ সীতারামকে শ্রদ্ধা করতে শিখেছে, তার জ্ঞানব্রত উদ্‌যাপনে তারাও সহায়ক হয়েছে। সীতারামের জীবন পরিক্রমাও

## পাকিস্থানে কর আদায়ের ফন্দী

প্রায় বছরখানেক হ'লো পাকিস্তানে মোদ কর বৃদ্ধি নিয়ে আন্দোলন হয়ে যার লে পাকিস্তান গভর্নমেণ্ট চাপে পড়ে কর মিয়ে দিতে বাধ্য হয়। সরকারিভাবে সাফল্য ভ না ক'রতে পেরে পাকিস্তান বেসরকারী পায় খাটিয়ে সিনেমা থেকে টাকা তোলার এক ন্দী আবিষ্কার ক'রেছে। খবর পওয়া গেলো য, রাজসাহীর সিনেমাগুলিতে আনসার ও াকিস্তান জাতীয় রক্ষী বাহিনীর নাম ক'রে নয়মিতভাবে চাঁদা তোলার এক বধ্যতামূলক ্যবস্থা প্রবর্তন করা হ'য়েছে। প্রত্যেক র্শককে টিকিট কেনার সময় চার আনা পর্যন্ত টকিট পিছু এক আনা এবং তার ওপরের টকিট পিছু দু আনা ক'রে উক্ত ফাণ্ডের জন্যে াঁদা দিতেই হয়। চাঁদার আলাদা হিসেব রাখা য় এবং প্রতিদিনই সরকারি কর্মচারি এসে টকিট দেখে হিসেব পরীক্ষা ক'রে যায়।

## প্রমোদ কর বৃদ্ধির জের

মধ্যভারত ও বেরারে প্রমোদ কর বাড়িয়ে তকরা পঞ্চাশ ক'রে দেওয়ার প্রতিবাদে াগপুর ও অন্যান্য স্থানের সমস্ত চিত্রগৃহ ১লা এপ্রিল থেকে ৭ই এপ্রিল পর্যন্ত বন্ধ ক'রে রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ফল দাঁড়ালো এই যে, ও-প্রদেশে যে ঘাটতিটুকু পূরণ করার জন্যে কর বাড়ানো হ'লো ঐ এক সপ্তাহের বন্ধেতে তা প্রায় অসম্ভব হ'য়ে উঠলো।

পশ্চিমবঙ্গেতে ওরকম কোন উপায় চিত্র ব্যবসায়ীরা অবলম্বন করেনি। তবে জনসাধারণ এই কর বৃদ্ধি কিভাবে গ্রহণ করেছে, সেটা জানা যাবে কয়েক সপ্তাহের বিক্রী দেখলেই। টিকেটের হার বেঁধে দেওয়া নিয়ে যে বৈষম্য আশংকা করা গিয়েছিলো তাই ঘটেছে। উত্তর ও দক্ষিণ ক'লকাতার চিত্রগৃহগুলিও নিজেদের মধ্যে একটা মিল আনতে অপারগ হয়েছে। বাঙলা চিত্রগৃহগুলিত সর্বনিম্ন টিকিট হয়েছে সাড়ে ছ' আনা, আর হিন্দী চিত্রগৃহগুলিতে সর্বনিম্ন দশ আনা। হিন্দী ছবির বাজার এতে দমে যাবে কি না, কয়েক সপ্তাহ গেলেই বুঝতে পারা যাবে।

## নূতন ছবির পরিচয়

**সন্দীপন পাঠশালা** (ন্যাশনাল সাউণ্ড ষ্টুডিও)—কাহিনী: তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিচালনা: অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়, আলোকচিত্র: প্রবোধ দাস ও রামানন্দ সেন, শব্দযোজনা: সত্যেন চট্টোপাধ্যায়, সুরযোজনা: হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। ভূমিকায়: সাধন সরকার, প্রদীপ বটব্যাল, সিধু গাঙ্গুলী, ভূপেন চক্রবর্তী, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, কুমার মিত্র, জীবন মুখোপাধ্যায়, মণি শ্রীমানি, দেবেন বসু, সুনীল দাশগুপ্ত, লক্ষ্মী, নিরঞ্জন,


মহাভারতী লিঃএর প্রথম চিত্র নিবেদন

প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত ও পরিচালিত

শ্রেষ্ঠাংশে — শিপ্রা ও ধীরাজ

অন্যান্য বিশিষ্ট চরিত্রে রূপ দেবেন—ছায়া দেবী, কমলা, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্রগোপাল মিত্র, নবদ্বীপ হালদার, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, বাণীবাবু, শশাঙ্ক সোম প্রভৃতি।

দ্রুত সমাপ্তির পথে

মহাভারতীর পরবর্তী নিবেদন—

প্রেমেন্দ্র মিত্রের

"আবার কালোছায়া"

সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরণের রোমাঞ্চকর রহস্য চিত্র।

**গত ২৪শে মার্চ হলিউডের একাডেমি থিয়েটারে এই অভিনেতা-অভিনেত্রীদের পুরস্কৃত করা হয়। বাম হইতে দক্ষিণেঃ ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কস (জুনিয়র); স্যর লরেন্স অলিভিয়ার (১৯৪৮ সালের শ্রেষ্ঠ অভিনেতারূপে পুরস্কৃত); ক্লেয়ার ট্রেভর (শ্রেষ্ঠ অভিনেতারূপে); জেরি ওয়াল্‌ড্‌ (আর্ভিং হলিবার্গ পুরস্কার প্রাপ্ত); জেন ওয়াই-ম্যান (বৎসরের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীরূপে; ওয়ালটার হাস্টন (শ্রেষ্ঠ সহঃ অভিনেতারূপে)।**

শেষ হ'য়ে আসতে থাকে। পিতা মারা গিয়েছেন, একটিমাত্র মেয়ে রেখে স্ত্রীও পরলোকযাত্রা করেছে। মেয়েও বিধবা। সীতারাম বার্ধক্যের কোঠায় পা দিয়েছে, একদিন তার চোখের জ্যোতিও নিভে গেল। জীবনের শেষ নিঃশ্বাস-টুকু পর্যন্ত সীতারামের একমাত্র ধ্যান জ্ঞান হ'য়ে রইলো তার পাঠশালা আর তার ছাত্রেরা।

'সন্দীপন পাঠশালা'কে বাঙলা ছবির সমগ্র ইতিহাসের মধ্যে বিষয়বস্তুর দিক থেকে আদর্শ-স্থানীয় একখানি অবদান বলে অভিহিত করা যায় এবং একথা বলা যায় যে, যারা বিষয়-বস্তুটুকুতেই মশগুল হয়ে উঠতে পারেন, কলা-কৌশল বা পরিচালনার উৎকর্ষের দিকে গ্রাহ্য করেন না তাদের কাছে ছবিখানি অনন্যসাধারণ বলেও প্রতিভাত হতে পারে, নয়তো একথা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না যে, যে পরিমাণ গুরুত্বপূর্ণ কাহিনী সে তুলনায়, বিন্যাস অনেক এলোমেলো হয়েছে, নাটকীয় বাঁধুনী হয়েছে অনেক আলগা আর কলাকৌশলের দিক হয়েছে অনেক খেলো। পরিচালক ও কুশলীদের মধ্যে যত্ন ও নিষ্ঠার বেশ অভাব দেখা দিয়েছে নয়তো ছবিখানি তোলার সময়ে আগাগোড়া পরিচালক ও কুশলীদের খুবই প্রতিবন্ধক সহ্য করতে হয়েছে যে কারণে সমস্ত দিক থেকে অসাধারণ হবার সুযোগ থাকাতেও তা হয়নি। নিয়মিত ছবি দেখিয়েদের চোখেতে তাই অনেক ভুলত্রুটি জ্বলজ্বল করে ওঠে; অনেকখানি জায়গা তাদের কাছে বেশ নীরস লাগে; নাটকীয় প্রতিঘাত-গুলো মনে হয় অত্যন্ত দুর্বল।

কাহিনীর প্রাণ সীতারাম পণ্ডিত। চরিত্রটিকে প্রাণ সঞ্চার করেছেন সাধন সরকার এবং তিনি যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তা তাকে বাঙলার সেরা শিল্পীদের সঙ্গে আসন করে দেবে। নিরঞ্জন, সত্যব্রত, লক্ষ্মী প্রভৃতি বাচ্চা ছেলেদের দল ছবিখানিতে সম্পদ যোগ করেছে। অন্যান্য ভূমিকায় মীরা সরকার অচল, প্রদীপ বটব্যাল তেমন ছাপ দিতে পারেননি—অবশ্য সাধন সরকারের অভিনয়ের সামনে কারুর পক্ষেই দৃষ্টি আকর্ষণ করা অসম্ভব হয়ে উঠেছিলো।

গান মোট তিনখানি। দুখানি রবীন্দ্র-নাথের 'জাগো আলস শয়ন বিলগ্ন' আর 'একলা চলরে'। দুখানি গানই গাওয়া হয়েছে খুবই ভালো, কিন্তু তেমন সিচুয়েশনে ফেলতে না পারায় জমেনি। তৃতীয় গান ছেলেদের পাঠশালায় খেলার গান। রচনা, সুর ও গাওয়ার কৃতিত্ব আছে খুবই, কিন্তু এটারও প্রকৃত আবহাওয়া সৃষ্টি হতে পারেনি।

খুঁটিয়ে সমালোচনা করলে বহু ত্রুটিই পাওয়া যাবে। কিন্তু সত্যিকারের শিক্ষনীয় বিষয় নিয়ে যাতে দেশের ও দশের উপকার হতে পারে তেমন ছবি তোলার প্রশংসনীয় প্রচেষ্টাটাই সব ত্রুটিকে ঢাকা দিয়ে দেয়। 'সন্দীপন পাঠশালার' মতো ছবি বাঙলা সিনেমাকে গৌরবের আসন এনে দেবে।

**কামনা** (কীর্তি পিকচার্স—ইন্দ্রপুরী)—কাহিনী ও সংলাপঃ ব্যোমকেশ হালদার, চিত্রনাট্য ও পরিচালনাঃ নবেন্দুসুন্দর, আলোক-চিত্রঃ মুরারী ঘোষ, শব্দগ্রহণঃ সত্যেন ঘোষ, সুর যোজনায়ঃ দ্বিজেন চৌধুরী, শিল্প নির্দেশেঃ মণি মজুমদার। ভূমিকায়ঃ জহর গাঙ্গুলী, উত্তম চ্যাটার্জি, ফনী রায়, আশু বসু, তুলসি চক্রবর্তী, অমর চৌধুরী, প্রীতি মজুমদার, ছবি রায়, রাজলক্ষ্মী, উমা গোয়েঙ্কা, ইরা ঘোষ, যমুনা সিংহ প্রভৃতি।

'কামনা' বাঙলা চিত্রশিল্পের আর একটি দুষ্কৃতি। বাঙলা ছবির বাজারকে ধ্বসিয়ে দেবার জন্যে যে ধরণের সব ছবির আজকাল উৎপাৎ দেখা দিয়েছে 'কামনা' তাদেরই অন্যতম, তাদেরই মত অন্তঃসারশূন্য একেবারেই নীরেট বাজে ছবি। শুধু তাই নয়, একেবারে কিছু হয়নি জানতে পেরেই যেন ছবির মালিক লোককে ভুলিয়ে আকর্ষণ করবার জন্যে ঢাক পিটিয়েছেন অত্যন্ত প্রচণ্ডভাবে। শোনা গেলো এটা নাকি কর্তৃপক্ষের পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনা। খুব নামমাত্র পয়সায় যত বাজেই হোক ছবিখানিকে শেষ ক'রে তারপরে ধূম ক'রে প্রচার মারফৎ লোক জড়ো করে ছবিখানিকে চালিয়ে দেওয়াই ছিলো এদের উদ্দেশ্য ছবিও তাই হয়েছে তেমনিই—এমন সবদিক থেকেই বাজে ছবি বড় একটা চোখে পড়ে না। ছবিখানির কোন একটি বিষয়ও আলোচনার যোগ্য বলে মনে করা গেলো না। যারা ছবিখানি তুলেছেন—কাহিনী-কার, পরিচালক, অভিনয়-শিল্পীর, কলাকুশলী সকলেই যেনো একজোট হয়ে একখানা বাজে ছবি তুলবেন পণ করেই কাজ করে গিয়েছেন। ছবিখানি প্রদর্শনের অযোগ্য প্রাচী আলেয়া প্রভৃতি অভিজাত চিত্রগৃহের উচিত ছিলো না এদের প্রশ্রয় দেওয়া।

'কামনা'র মতো ছবি তোলায় যারা ব্রতী হয়েছেন তাদের কাছে আমরা একটা অনুরোধ জানাতে চাই—বাঙলার চিত্রশিল্প যে অত্যন্ত দুরবস্থায় পৌঁছেছে তা তারা জানেন, এবং এটাও তারা জানেন যে, অবস্থা ভালো করার অন্যতম উপায় ছবির স্ট্যান্ডার্ড উঁচু করা। সুতরাং তারা যদি বাঙলা চিত্রশিল্পকে কয়েক বছরের জন্যে রেহাই দেন তো বাঙলা চিত্রশিল্প এবং চিত্রামোদী উভয় পক্ষই তাদের অশেষ ধন্যবাদ জানাবেন।

কি

বেটন কাপ ভারতের শ্রেষ্ঠ হকি প্রতিযোগিতা সোবেই গণ্য ছিল। এই জন্য এই প্রতিযোগিতায় ারতের সকল অঞ্চলের বিশিষ্ট হকি দল যোগদান রিত। প্রতিযোগিতায় উচ্চাঙ্গের নৈপুণ্যেও দর্শিত হইত। কিন্তু কি কারণে জানা যায় না ঠাৎ এক বৎসর দেখা গেল বেটন প্রতিযোগিতায় াঙলার বাহিরের কোন দলই যোগদান করিতে ম্মুক নহে। পরিচালকগণ স্থানীয় জনসাধারণের নর্ষ্ঠানটির জন্য প্রতিযোগিতার তালিকায় কয়েকটি াহিরের দলের নাম ভর্তি করিয়া রাখিয়াছিলেন। নুষ্ঠান শেষ হইলে দেখা গেল ঐ সকল দল যাগদান করিল না। ইহার পর হইতে প্রতি-যাগিতাটি সম্পূর্ণভাবে স্থানীয় দলসমূহের উপর নর্ভর করিয়া চালাইতে হইল। দীর্ঘকাল পরে এই ৎসর পুনরায় প্রতিযোগিতায় অনেক বাহিরের লকে যোগদান করিতে দেখা যাইতেছে। সমস্ত লগুলিই যদি কলিকাতায় আসে খেলাগুলি দর্শন-যাগ্যও হইবে। তবে সকল দল যে আসিবে না স বিষয় আমরা নিঃসন্দেহ। বাঙলার হকি পরিচালনার ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা সকলেই জানে। সইজন্যই অনেক দল শেষ পর্যন্ত প্রতিযোগিতায় যাগদানও করিবে না। পরিচালকগণের দূরদৃষ্টিও প্রখর। তাঁহারাও প্রতিযোগিতার ক্ষতিসাধন যাহাতে া হয় তাহার জন্য বাহিরের দলগুলিকে তৃতীয় াউণ্ডে ফেলিয়া রাখিয়াছেন।

বাঙলার হকি খেলার স্ট্যাণ্ডার্ড চরমে নামিয়াছে পরিচালকদের নির্বুদ্ধিতার জন্য। বাহিরে বাঙলার যেটুকু মান-সম্মান ছিল তাহাও নষ্ট হইতে চলিয়াছে। ইহার পরও কিরূপে যে হকি পরি-চালকগণের অপ্রতিহত গতি থাকিতে পারে আমরা কল্পনাই করিতে পারি না।

## ফুটবল

ফুটবল মরসুম শীঘ্রই আরম্ভ হইবে। অধিকাংশ বিশিষ্ট দলের পরিচালকগণ দল গঠনের ত প্রকার উপায় অবলম্বন করা সম্ভব ছিল তাহা শেষ করিয়াছেন। তবে আমদানীর প্রচেষ্টা বন্ধ য় নাই। শিক্ষার ব্যবস্থার মধ্য দিয়া খেলোয়াড় তৈয়ারী করিবার নীতি পরিচালকগণ কোনদিনই গ্রহণ করেন নাই সুতরাং এইবারেও করেন নাই এবং ভবিষ্যতে করিবেনও না। আমরা কেবল আশ্চর্য হই এই কথা চিন্তা করিয়া যে, উৎসাহী ফুটবল খেলোয়াড়গণ কি করিয়া বৎসরের পর বৎসর এই অবিচার ও অত্যাচার সহ্য করিয়া চলিয়াছেন। তাঁহাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ এই-ভাবে রুদ্ধ হওয়ায় একবারও কি মনে জাগে না াহার প্রতিবাদ করিতে? প্রকাশ্যে জনসাধারণের মাঝে প্রতিবাদসূচক কথা বলিবার জন্য তাহাদের প্রাণ কি কোন সময়েই অস্থির হয় না? কোন

সময়েই কি তাহাদের মনে জাগে না যে সুযোগ-সুবিধা না দেওয়ার জন্যই উন্নততর স্তরে পৌঁছিতে সক্ষম হইতেছে না? জড়পদার্থ ব্যতীত সকল জীবেরই প্রতিবাদ করিবার ক্ষমতা আছে আমরা শুনিয়া আসিতেছি। বাঙলার উৎসাহী ফুটবল খেলোয়াড়গণ কোন্ শ্রেণীর জীব বা পদার্থ তাহা বিশ্লেষণ করা আমাদের পক্ষে কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

১৯৩৪ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া এত দীর্ঘ কাল আমরা প্রতিবৎসর খেলোয়াড় আমদানীর বিরুদ্ধে বলিয়াছি কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় কোন কার্যকরী ফলই এই পর্যন্ত আমরা দেখিতে পাই নাই। আমদানীর সংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে। বাঙলা দেশে যখন প্রথম শ্রেণীর ফুটবল খেলিবার লোকেরই এত অভাব তখন এই খেলা বন্ধ করিয়া দিলেই ভাল হয়। খেলাধুলার প্রকৃত উদ্দেশ্য স্বাস্থ্যলাভ করিয়া ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্তুত হওয়া। কিন্তু কলিকাতার মাঠে যাঁহারা বিভিন্ন ক্লাবের পাণ্ডা হইয়া বসিয়া আছেন তাঁহাদের উদ্দেশ্য অন্যরূপ। তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য ছলেবলে, প্রয়োজন হইলে বহু অর্থ ব্যয়ে দলকে বিভিন্ন খেলায় জয়ী করা। এই সকল জ্ঞানহীন, দায়িত্বহীন লোক যতদিন খেলার মাঠে প্রাধান্য-লাভের সুযোগ পাইবে, ততদিন কোন খেলায় বাঙালী খেলোয়াড়গণকে অভাবনীয় উন্নতি করিতে দেখা যাইবে না।

### মুষ্টিযুদ্ধ

দীর্ঘকাল পরে নোর্টে বেঙ্গল এমেচার বক্সিং ফেডারেশন প্রাদেশিক চ্যাম্পিয়নসিপ মুষ্টি-যুদ্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। এক সপ্তাহ ধরিয়া প্রতিযোগিতা চলিবার পর সকল বিভাগের শেষ নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়। অধিকাংশ দিনই বিভিন্ন লড়াইতে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিলক্ষিত হয়। প্রতিদিন দর্শক সমাগমও বেশ ভাল হইত। মুষ্টিযুদ্ধ বিষয়টির জনপ্রিয়তা কমিয়া গিয়াছে বলিয়া যাহা আশঙ্কা করা হইত তাহা যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে। আরও সুখের বিষয়, এই প্রতিযোগিতায় লক্ষ্য করা গেল যে, দুই এক বৎসরের মধ্যেই মুষ্টিযুদ্ধের প্রত্যেকটি বিভাগের চ্যাম্পিয়ন হইবে বাঙালী। এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান অথবা ইউরোপীয়ানগণ শত চেষ্টা করিয়াও ইহার গতি রোধ করিতে পারিবেন না।

বাঙালী মুষ্টিযোদ্ধাদের এই অগ্রগতিতে সাহায্য করিয়াছে বেঙ্গলী বক্সিং এসোসিয়েশনের একনিষ্ঠ কর্মিগণ, ইহাও সকলকেই স্বীকার করিতে হইয়াছে। তবে একটি খুব দুঃখের কারণ হইয়াছে গুরুভারের বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার মুষ্টিযোদ্ধা কেহই ছিল না। আশা হয়, আগামী বৎসরে ঐ অভাব আর থাকিবে না। নিম্নে চ্যাম্পিয়নসিপের ফাইনালের ফলাফল প্রদত্ত হইল:—

**ফ্লাই ওয়েট**

সি মিটসন (লরেন্স ক্যাম্প) পয়েণ্টে ডি চক্রবর্তীকে (জিমন্যাসিয়াম) পরাজিত করেন।

**ব্যাণ্টম ওয়েট**

বাবুলাল (জি জি) পয়েণ্টে সিড প্যারীকে (লরেন্স ক্যাম্প) পরাজিত করেন।

**ফেদার ওয়েট**

ফণী সুর (বেঙ্গলী বক্সিং এসোঃ) টেক্নি-ক্যাল নক আউটে এন গণ্টলেটকে (জি জি) পরাজিত করেন।

**লাইট ওয়েট**

হিমাংশু পাল (বেঙ্গলী বক্সিং এসোঃ) পয়েণ্টে ডি জেকবকে (জি জি) পরাজিত করেন।

**ওয়েল্টার ওয়েট**

আর কানস্টন (জি জি) পয়েণ্টে ই লার্ডনারকে (জিমন্যাসিয়াম) পরাজিত করেন।

**মিডল ওয়েট**

আর লেহানী (জি জি) পয়েণ্টে ভি রড্রিকস্‌কে (জি জি) পরাজিত করেন।

### আন্তর্মন্ত্রিসভা টেনিস প্রতিযোগিতা

বর্তমান বৎসরের কোন এক সময়ে দিল্লীতে আন্তর্মন্ত্রিসভা টেনিস প্রতিযোগিতার খেলা অনুষ্ঠিত হইবে। বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে, দিল্লী লন টেনিস এসোসিয়েশন ইতিমধ্যেই খেলাটি অনুমোদন করিয়াছেন। খেলাটি জনসাধারণের মধ্যে যে বিশেষ কৌতূহল ও উত্তেজনার সৃষ্টি করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

খেলার তারিখ এখনও চূড়ান্তভাবে কিছুই ঠিক করা হয় নাই। এই প্রতিযোগিতার আহ্বায়কগণকে সর্বপ্রথমে ডি-এল-টি-এর মঞ্জুরী গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যথা, অনেক রেজিস্টার্ড খেলোয়াড়েরই বাতিল হওয়ার আশঙ্কা থাকিবে।

ডাক ও তার বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল মিঃ কৃষ্ণপ্রসাদ উক্ত প্রতিযোগিতার সেক্রেটারীর কাজ করিবেন। তিনি টেনিস কাপ বিজয়ী প্রাক্তন খেলোয়াড়। এই প্রতিযোগিতায় পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুও সম্ভবত যোগদান করিবেন।
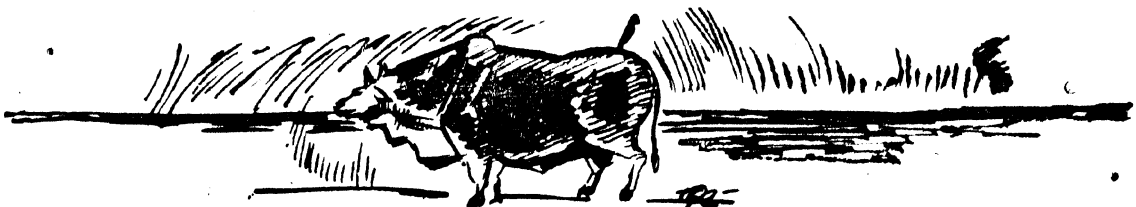
## দেশী সংবাদ

২৮শে মার্চ—ভারতীয় পার্লামেণ্টে শ্রীহরিবিষ্ণু কামাথের এক প্রশ্নের উত্তরে সহকারী পররাষ্ট্রসচিব ডাঃ কেশকার বলেন, গভর্নমেণ্টের সংবাদ এই যে, আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতা নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু জীবিত নাই।

গতকল্য রাত্রি ২টা ৫১ মিনিটের সময় ই বি রেলওয়ের ময়মনসিংহ-বাহাদুরাবাদ সেকসনে পিয়ারপুর স্টেশনের নিকট দুইখানি যাত্রীবাহী ট্রেণের মধ্যে সামনাসামনি সংঘর্ষের ফলে ৫ ব্যক্তি নিহত এবং অপর ১৫ জন আহত হইয়াছে।

নয়াদিল্লীর সংবাদে প্রকাশ ভারত সরকার শীঘ্রই ভূপাল রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিবেন। ভূপালের নবাবের সহিত ভারত সরকারের দেশীয় রাজ্য দপ্তরের উপদেষ্টা শ্রীযুত ভি পি মেননের আলাপ আলোচনার ফলে এই সম্পর্কে ভূপালে উভয়ের মধ্যে এক চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে শ্রমমন্ত্রী শ্রীযুত কালীপদ মুখার্জি শ্রম বাজেট উত্থাপন করিয়া এইরূপ দাবী করেন যে, প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টের প্রগতিশীল শ্রমনীতির ফলে সুফল লাভ হইয়াছে এবং উহা মালিক ও শ্রমিকের পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নতি সাধনে ফলবতী হইয়াছে।

আসাম ব্যবস্থা পরিষদে আসাম জমিদারী উচ্ছেদ বিলটি (১৯৪৮) গৃহীত হইয়াছে।

২৯শে মার্চ—আগামী মাসে লণ্ডনে কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রীদের যে সম্মেলন হইবে, অদ্য ভারতীয় পার্লামেণ্টে সে সম্পর্কে এক বিবৃতি দান প্রসঙ্গে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বলেন যে, কমনওয়েলথ সম্পর্কিত কয়েকটি নিয়মতান্ত্রিক প্রশ্নই উক্ত সম্মেলনের প্রধান আলোচ্য বিষয় হইবে।

পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের অদ্যকার অধিবেশনে বাজেটের ৯টি খাতে ব্যয়-বরাদ্দ মঞ্জুর করা হইলে পরিষদে প্রাদেশিক সরকারের ১৯৪৯—৫০ সালের সমগ্র বাজেটের ব্যয়-বরাদ্দের আলোচনা পরিসমাপ্ত হয়।

ভারতের সহকারী প্রধান মন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল অদ্য বিমানযোগে জয়পুরে পেঁৗছেন। ইঞ্জিনের গোলমালের দরুণ বিমানখানা জয়পুর হইতে ৩০ মাইল দূরবর্তী এক স্থানে অবতরণ করিতে বাধ্য হয়। সর্দার প্যাটেল কোনরূপ আঘাত পান নাই।

আগামী ২রা মে পূর্ব পাঞ্জাব হাইকোর্টে মহাত্মা গান্ধী হত্যা মামলার আপীলের শুনানী আরম্ভ হইবে।

৩০শে মার্চ—ভারতের সহকারী প্রধান মন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বৃহত্তর রাজস্থান ইউনিয়নের উদ্বোধন করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, রাজস্থানকে সম্মিলিত করিবার জন্য রাণা প্রতাপ যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, অদ্য তাহা পূর্ণ হইল। জয়পুর দরবার কক্ষের প্রাঙ্গণে উদ্বোধন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

১৯৪১ সালের বঙ্গীয় রাজস্ব (বিক্রয় কর) আইন সংশোধন করিয়া একটি বিল পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে গৃহীত হয় এবং গভর্নর ইহা অনুমোদন করিয়াছেন। সংশোধিত আইনটি অদ্য কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে এবং প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইহা বলবৎ হইয়াছে। বিক্রয় কর বহির্ভূত দ্রব্যের তালিকা হইতে সরিষার তৈল, দিয়াশলাই, কয়লা, সংবাদপত্র প্রভৃতি কয়েকটি দ্রব্য বাদ দেওয়া হইয়াছে।

ভারতীয় পার্লামেণ্টে সিলেক্ট কমিটি কর্তৃক বিবেচিত রাজস্ব বিল দুইটি পরিবর্তনের পর গৃহীত হয়। যে সমস্ত হিন্দু যৌথ পরিবারে অন্ততঃপক্ষে ২ জন বয়স্ক ব্যক্তি থাকিবেন, তাঁহাদের উপর ট্যাক্স নির্ধারণ জন্য আয়ের সীমা ৩০০০৲ টাকা হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৫০০০৲ টাকা করা হয় এবং সিলেক্ট কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত বিমান ডাকের উপর প্রতি তোলায় ২ পয়সা অতিরিক্ত কর নির্ধারণের প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়।

৩১শে মার্চ—মাদ্রাজের প্রধান মন্ত্রী শ্রী ও পি রামস্বামী রেড্ডিয়ার গভর্নরের নিকট তাঁহার মন্ত্রিসভার পদত্যাগপত্র দাখিল করিয়াছেন। গভর্নর অদ্য প্রাতে মাদ্রাজ কংগ্রেস পরিষদ দলের নব নির্বাচিত নেতা শ্রীকুমারস্বামী রাজাকে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আহ্বান করেন এবং নূতন মন্ত্রিসভা কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত সময়ের জন্য শ্রীরামস্বামী রেড্ডিয়ার ও তাঁহার মন্ত্রিসভার সদস্যগণকে কাজ চালাইয়া যাইতে অনুরোধ করেন। শ্রীযুত রেড্ডিয়ার উহাতে সম্মত হইয়াছেন।

ভারত সরকারের পররাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারী জেনারেল স্যার গিরিজাশঙ্কর বাজপেয়ী ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে কাশ্মীরে যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাবের ব্যাখ্যা লইয়া কাশ্মীর কমিশনের সদস্যদের সহিত আলোচনা করেন। ওয়াকিবহাল মহলের খবরে প্রকাশ, পাকিস্থান যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাই চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হইয়া উঠিয়াছে।

সুরাটের এক সংবাদে প্রকাশ, গত ১৫ দিন যাবৎ এক বিস্তীর্ণ এলাকায় দাবাগ্নি প্রজ্বলিত হওয়ায় সুরাটের সন্নিহিত বনাঞ্চলের দুইশত গ্রামের অধিবাসীরা গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

১লা এপ্রিল—আম্বালায় অনাড়ম্বর অথচ গাম্ভীর্যপূর্ণ প্রতিবেশের মধ্যে ভারতীয় বিমান বাহিনীর ষোড়শ বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের রাষ্ট্রপাল, পূর্ব পাঞ্জাবের গভর্নর এবং ভারতীয় সৈন্য বাহিনী, নৌ বাহিনী এবং বিমান বাহিনীর বহু অফিসার এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

ভারতের রাষ্ট্রপাল শ্রীযুত রাজাগোপালাচারী আম্বালায় এক সম্বর্ধনার উত্তরে বক্তৃতা প্রসঙ্গে এইরূপ মন্তব্য করেন যে, বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানী করা আমাদের দেশ জননীর পক্ষে চরমতম লজ্জার বিষয়। তিনি প্রত্যেক ভারতবাসীকে যে কোন উপায়ে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট হইতে আবেদন জানান।

অদ্য ভারতীয় পার্লামেণ্টে হিন্দু সংহিতা বিল সম্বন্ধে পুনরায় আলোচনা আরম্ভ হয়। সদস্যগণকে পূর্বে বিজ্ঞপ্তি না দিয়া যেভাবে বিলটি উত্থাপিত হইয়াছে, প্রথমেই কয়েকজন সদস্য তাহাতে আপত্তি জানান। জনাব নাজিরুদ্দীন আমেদ বিলের আলোচনার বিরোধিতা করিয়া গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী যে সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন, অদ্য সে সম্বন্ধে তিনি বক্তৃতা করেন। তাঁহার সংশোধন প্রস্তাব এই যে, আরও জনমত সংগ্রহের জন্য বিলটি পুনরায় প্রচার করা হউক। জনাব আমেদের বক্তৃতা শেষ হইবার পূর্বেই পরিষদের অধিবেশন মুলতুবী থাকে।

পাটনায় প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, সমাজতন্ত্রী নেতা শ্রীযুত জয়প্রকাশ নারায়ণ অদ্য এক ভীষণ মোটর দুর্ঘটনায় পতিত হন। প্রকাশ, তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং তাঁহার পত্নী শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দেবীও আহত হইয়াছেন।

২রা এপ্রিল—অদ্য মজঃফরপুরে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্য বাবু ব্রজবিহারী প্রসাদ ক্ষুদিরাম স্মৃতি-স্তম্ভের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করিয়াছেন। ১৯ বৎসর বয়স্ক বাঙালী যুবক ক্ষুদিরাম বসু যেখানে ১৯০৮ সালে বৈপ্লবিক আন্দোলনের প্রথম বোমা নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই স্থানে এই স্মৃতি-স্তম্ভ নির্মিত হইবে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর এই স্মৃতি-স্তম্ভের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করার কথা ছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে জানান হইয়াছে যে, পণ্ডিতজী নীতিগতভাবে এইরূপ অনুষ্ঠানের সহিত নিজেকে যুক্ত করার বিরোধী।

মজঃফরপুরে বিহার প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মেলনের সপ্তম বার্ষিক অধিবেশন আরম্ভ হয়। বিহারের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ শ্রীকৃষ্ণ সিংহ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে কংগ্রেস কর্মীদিগকে গান্ধীজীর রামরাজ্যের আদর্শ পূর্ণ করার জন্য কাজ করিয়া যাইতে অনুরোধ করেন।

ভারত সরকারের দেশীয় রাজ্য দপ্তরের এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, যত শীঘ্র সম্ভব ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিনকে লইয়া একটি যুক্তরাজ্য গঠন করার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে শীঘ্রই দুইটি রাজ্যের শাসনকর্তাদের সহিত আলোচনা আরম্ভ করা হইবে।

নয়াদিল্লীতে পররাষ্ট্র দপ্তরে অর্থনৈতিক বিষয়গুলি আলোচনার জন্য ভারত-পাকিস্তান সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হয়।

৩রা এপ্রিল—লক্ষ্ণৌয়ে কংগ্রেস পরিষদ সদস্য ও কংগ্রেস কর্মীদের এক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ঘোষণা করেন যে, শীঘ্রই ভারতবর্ষকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্ররূপে ঘোষণা করা হইবে।

## বিদেশী সংবাদ

৩১শে মার্চ—চীনে কম্যুনিষ্টরা ব্যাপক আক্রমণ সুরু করায় সরকারী বাহিনী আনকিং শহরের উপকণ্ঠে পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হয়।

মস্কোর সংবাদে প্রকাশ, শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত আগামীকল্য রুশিয়া ত্যাগ করিবেন। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে তিনি গত দেড় বৎসরকাল ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের পদে অধিষ্ঠিতা ছিলেন।

প্রতি সংখ্যা—চারি আনা    বার্ষিক মূল্য—১৩৲    ষাণ্মাসিক—৬৷৷৹

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক :—আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

> ভাবের প্রবাহ সময়ে সময়ে এর‌ূপ খরস্রোতে চলিতে থাকে, তখন সমাজের ন‌ূতন জীবনলাভ হয়, সমাজ তখন ন‌ূতন ম‌ূর্ত্তি গ্রহণ করে, যাহাকে এতদিন ম‌ৃতকল্প বলিয়া বোধ হইত, সে এখন জীবনের স্রোতে তরঙ্গ উঠাইয়া কলকলনাদে ছ‌ুটিতে থাকে। সমাজের মধ্যে যাঁহারা জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ, সমাজের মধ্যে যাঁহারা উচ্চ পদবীতে সমাসীন, সমাজের যাঁহারা নেতা, তাঁহারা এই ভাবের স্রোতের স‌ৃষ্টি করিয়া দেন, আবার সমগ্র সমাজ, যাহা এতদিন জড়ভাব, নিশ্চেষ্ট ভাব অবলম্বন করিয়াছিল, সমগ্র সমাজ যখন সেই দ‌ুর্দম প্রবাহে নীয়মান হয়, জ্ঞানিগণ ও নেতৃগণও তখন সেই স্রোতের ম‌ুখে ভাসিয়া চলেন। আমাদের জাতীয় জীবনের যে স্রোত এখন অল্পবেগে চলিয়াছে, সেই স্রোতে বেগ-উৎপাদনের জন্য এইর‌ূপ ভাবের উদ্দীপনা প্রয়োজন। আমার বিশ্বাস, স্বজাতিপ্রেম ও স্বদেশবাৎসল্য সেই উদ্দীপনা প্রদানে সমর্থ। —রামেন্দ্রস‌ুন্দর ত্রিবেদী

সম্পাদক ঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহ সম্পাদক ঃ শ্রীসাগরময় ঘোষ

ষোড়শ বর্ষ] শনিবার, ৩রা বৈশাখ, ১৩৫৬ সাল। Saturday 16th April, 1949. [২৪শ সংখ্যা

STATE LIB...

## সাময়িক প্রসঙ্গ

### বাঙালীর নববর্ষ

বর্ষচক্র ঘ‌ুরিয়া গেল। ১৩৫৫ সাল অতিক্রম করিয়া আমরা ১৩৫৬ সালের কাল-সীমায় পদার্পণ করিলাম। স‌ুখের দিন সহজেই কাটিয়া যায়; কিন্তু দ‌ুঃখের দিন কাটিতে চাহে না। দ‌ুঃখকে ঠেলিয়া ফেলিয়া আমরা স‌ুখের দিনের প্রতীক্ষায় আকুল হইয়া উঠি। বাঙলা দেশ সত্যই বড় দ‌ুঃখের দিন যাইতেছে। প্রকৃতপক্ষ ঐতিহাসিক কালের মধ্যে বোধ হয় এত দ‌ুঃখ-দ‌ুর্দশার দিন বাঙালীর কাছে আর আসে নাই। বাঙলার সভ্যতা, সংস্কৃতি, সংস্থিতি এবং সঙ্গতি সবই আজ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ন‌ূতন বৎসর আসিল; কিন্তু দ‌ুঃখের সেদিন কি আমরা পিছনে ফেলিয়া আসিতে পারিয়াছি? ন‌ূতন বৎসরকে আমরা কি নির্বিঘ্নতর সঙ্গে বরণ করিয়া লইতে সমর্থ হইতেছি? এ প্রশ্ন থাকিয়াই যাইতেছে। বস্তুত বৈশাখের স‌ূর্যের প্রখর আলোতেও আমাদের অন্তরে প‌ুঞ্জীভূত নৈরাশ্যের আঁধার কাটিতেছে না। সমস্যার আমাদের শেষ নাই। অন্ন সমস্যা, বস্ত্র সমস্যা, কোন সমস্যারই সমাধান হয় নাই। নেতাদের নির্দেশ এবং সাধ‌ুদের উপদেশ সমস্তই অগ্রাহ্য করিয়া ম‌ুনাফাখোর আর চোরাবাজারী দলের সমাজদ্রোহী অনাচারের স্রোত উদ্দামগতিতে বহিয়া চলিয়াছে। নীতির দোহাই, বিবেকের দোহাই কোন কিছ‌ুই কাজে আসিতেছে না। ইহার উপরে রহিয়াছে উদ্বাস্তুদের সমস্যা। শত শত নরনারী নিরাশ্রয় অবস্থায় পথে পথে ঘ‌ুরিতেছে। ইহাদের মাথা গুঁজিবার স্থান নাই, জীবিকার সংস্থানের অভাব। এতদিন পর্যন্ত প‌ূর্ববঙ্গ হইতে আগত এই সব উদ্বাস্তুদের সাহায্য এবং প‌ুনর্বসতি বিধানের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার স‌ুনির্দিষ্ট কোন কর্মপন্থাই অবলম্বন করেন নাই। তাঁহারা অর্থ ব্যয় না করিয়াছেন এমন নয়, কিন্তু স্থায়ীভাবে ফলপ্রস‌ূ হইতে পারে, এমনভাবে তাঁহাদের অর্থ ব্যয়িত হয় নাই। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ সম্বন্ধে স‌ুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা অবলম্বন করিয়া কাজ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন এবং ভারত সরকারের দ‌ৃষ্টিও এতদিন পরে প‌ূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের সাহায্য-বিধানে সমধিক আকৃষ্ট হইয়াছে। তাঁহারা প‌ূর্বে উদ্বাস্তুদের প‌ুনর্বসতি বিধানের কার্যের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে পাঁচ কোটি টাকা মঞ্জ‌ুর করিয়াছিলেন। বলা বাহ‌ুল্য, প্রয়োজনের অন‌ুপাতে এই সাহায্য অত্যন্তই সামান্য। সেদিন ভারত সরকারের নিকট হইতে এই আশ্বাস পাওয়া গিয়াছে যে, ছয় মাস পরে তাঁহারা এজন্য আরও টাকার ব্যবস্থা করা সম্বন্ধে বিবেচনা করিবেন। উদ্বাস্তুদের সমস্যার গ‌ুর‌ুত্ব আমরাও স্বীকার করি। বস্তুত স‌ুপ্রতিষ্ঠিত কোন গভর্নমেণ্টের পক্ষেও এত বড় একটা সমস্যার সহজে সমাধান করা সম্ভব নয়। ফলত সদ্য-স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ভারতের সম্ম‌ুখে ভারত বিভাগ স্বর‌ূপ বিপর্যয়ের ফলে যেমন বিরাট সমস্যা দেখা দিয়াছে, জগতের কোন গভর্নমেণ্টকে এত বড় সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব লইতে হয় নাই। স‌ুতরাং অধৈর্য হইলে চলিবে না। প্রকৃতপক্ষে প‌ূর্ববঙ্গ সরকারের সংখ্যালঘ‌ু সম্প্রদায়ের সম্পর্কে অবলম্বিত নীতি এবং তাহাদের নিরাপত্তা, আশ্বস্তি ও রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে নিশ্চয়তার উপরই এই সমস্যার সম্যক্ সমাধান নির্ভর করিতেছে।

### প‌ূর্ববঙ্গের বর্তমান অবস্থা

ভারত এবং পাকিস্থানের মধ্যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের ভাব প‌ূর্বাপেক্ষা অনেকটা বাড়িয়াছে, একথা আমরাও স্বীকার করি; কিন্তু প‌ূর্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ একদল লোকের সংখ্যালঘ‌ু সম্প্রদায়ের পক্ষে উদ্বেগ স‌ৃষ্টির বাতিক এখনও সেখানে অনর্থ পাকাইয়া তুলিতেছে। সাম্প্রদায়িক প্রভুত্বের মনোভাব হইতে ম‌ুক্ত হইয়া প‌ূর্ববঙ্গের শাসন-নীতি সর্বজনীন উদার আদর্শকে একান্তভাবে গ্রহণ করিবার মত মনস্বিতা অবলম্বন করিতে পারিতেছে না। বাঙলা অক্ষরের বদলে প‌ূর্ববঙ্গে উর্দ‌ু হরফ চালাইবার উদ্যম এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাঙলা ভাষাকে প‌ূর্ব-পাকিস্থানে রাষ্ট্রভাষাস্বর‌ূপে গ্রহণ করিবার সম্বন্ধে প‌ূর্বে যে প্রতিশ্র‌ুতি দেওয়া হইয়াছিল, এইভাবে তাহা নস্যাৎ করিয়া উর্দ‌ুকে আনিয়া বাঙালীর ঘাড়ে চাপাইবার চেষ্টা হইতেছে। পাকিস্থানের নোটে এবং ম‌ুদ্রায় বাঙলা ভাষা ব্যবহার করা হইবে, এই প্রতিশ্র‌ুতিও রক্ষিত হয় নাই। প‌ূর্ব-পাকিস্থানের নোটের গায়ে বাঙলা অঙ্ক বসাইয়া সে কাজ উদ্ধার করা হইয়াছে। পাকিস্থানী নোটে বাঙলা ভাষার স্থান হয় নাই। ইহার উপর সেখানকার অন্ন সমস্যার জটিলতারই বা বিশেষ সমাধান হইতেছে কোথায়? প‌ূর্ববঙ্গের কৃষি-সচিব ডাক্তার মালেক সেদিন খাদ্য সম্পর্কিত একটি বিতর্কের উত্তরে এই আশ্বাস দিয়াছেন যে, চাউলের অভাবের জন্য চিন্তা কি? শাক-সব্জী, মাছ, মাংস, দ‌ুধ, ঘি, মধ‌ু, ফল প্রভৃতির সাহায্যেই আমরা সে অভাব মিটাইতে পারি। মালেক সাহেবের উক্তি হইতে মনে হয়, প‌ূর্ববঙ্গে ব‌ুঝি দ‌ুধ ঘি মধ‌ুর বন্যা বহিয়া চলিয়াছে। যেখানে লোকের আয় মাসিক পনের

টাকার বেশি নয়, দুধ ঘি তাহাদের কয়জনের ভাগ্যে জুটিতে পারে, কর্তারা ইহা তলাইয়া দেখেন না, ইহাই বিচিত্র। পূর্ববঙ্গে অনেক স্থানেই চাউলের মূল্য এখনও মণকরা ৪০, টাকার কম নয়। এই অবস্থার প্রতিকার করিতে হইবে এবং তাহা সম্ভব হইলে উদ্বাস্তুদের সমস্যা অনেকটা হ্রাস পাইবে বলিয়াই আমরা মনে করি। কারণ শুধু যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরাই পশ্চিমবঙ্গে আসিতেছে এমন নয়, আর্থিক সমস্যার চাপে পড়িয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের লোকও পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তভাগে আশ্রয় লইতেছে বলিয়া আমরা শুনিতে পাইতেছি। খাদ্য-সমস্যার এই গুরুত্ব শুধু পূর্ববঙ্গের নয়, পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা আরও জটিল; কারণ পশ্চিমবঙ্গ খাদ্য সম্পর্কে বর্তমানে ঘাটতি রাষ্ট্র। ভারত গভর্নমেণ্ট কিছুদিন পূর্বে এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ১৯৫১ সালের পর তাঁহারা বিদেশ হইতে আর খাদ্যশস্য আমদানী করিবেন না। খাদ্য সম্পর্কে ভারতীয় রাষ্ট্রকে স্বপ্রতিষ্ঠ করিবার কার্যক্রম অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ সরকার উন্নত ধরণের বীজ এবং সারের প্রয়োগ দ্বারা এবং সেচ-ব্যবস্থার সংস্থানে দুই বৎসরের মধ্যে যাহাতে এই প্রদেশ খাদ্য সম্বন্ধে আত্মনির্ভর হইতে পারে, তেমন ব্যবস্থা করিতেছেন বলিয়া শোনা যাইতেছে। এসব প্রস্তাব ও প্রস্তাবনা যদি কার্যে পরিণত হয়, তবে বর্তমান নিদারুণ নৈরাশ্যের মধ্যেও আমাদের মনে কিছু আশার কারণ ঘটে; কিন্তু আমাদের নৈতিক প্রতিবেশের যদি উন্নতি না হয়, তবে সদিচ্ছাপূর্ণ কোন পরিকল্পনাই কাজে আসিবে না বলিয়া আমরা মনে করি। নববর্ষে আমাদের রাষ্ট্র এবং সমাজ-জীবনে সেই নৈতিক বিশুদ্ধি সম্পাদনে সমর্থ হোক, ইহাই প্রার্থনা।

### মানভূমে সত্যাগ্রহ

মানভূমকে কেন্দ্র করিয়া বর্তমানে যে সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা আর অধিক দূরে অগ্রসর হইবে না, অন্তত লোকসেবক সঙ্ঘের নেতা শ্রীযুত অতুলচন্দ্র ঘোষ এবং তাঁহার সতীর্থ দল সত্যাগ্রহের সঙ্কল্প ঘোষণা করিবার পরে বিহার গভর্নমেণ্ট এবং তাঁহারা উদাসীন থাকিলেও ভারত গভর্নমেণ্ট এই সমস্যা সমাধানের জন্য অগ্রসর হইবেন, আমরা ইহাই আশা করিয়াছিলাম; কিন্তু আমাদের সে আশা ব্যর্থ হইয়াছে। সেদিন নয়াদিল্লীতে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভবনে পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী এবং বিহারের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে এই সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা হয় বলিয়া প্রকাশ; কিন্তু সে আলোচনার ফল কি হইয়াছে, জানা যায় নাই। প্রকৃতপক্ষে বাঙালী সমাজের অভাব-অভিযোগকে উপেক্ষা করিবার একটা মনোবৃত্তি বিভিন্ন প্রদেশের শাসকবর্গ এবং কংগ্রেসের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মধ্যে কিছুদিন হইতে বিশেষভাবে দেখা দিয়াছে। মানভূমের সম্বন্ধেও তাহাই সত্য হইতে চলিয়াছে। সত্যাগ্রহীদের পক্ষ হইতে তাঁহাদের অভাব-অভিযোগ এবং তৎপ্রতিকারে তাঁহাদের সত্যাগ্রহ অবলম্বনের সঙ্কল্পের কথা বিহার গভর্নমেণ্টকে পূর্বাহ্নেই জানানো হইয়াছিল। ভারত গভর্নমেণ্টেরও তাহা অবিদিত ছিল না। কিন্তু বিহারের শাসকবর্গ কিংবা আমাদের জাতীয় রাষ্ট্রের অধিনায়কগণ পর্যন্ত সেদিকে কর্ণপাত করা প্রয়োজন বোধ করেন নাই। গত ৬ই এপ্রিল হইতে মানভূমের বিভিন্ন স্থানে সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইয়াছে। এই ক[illegible]ক দিনের ব্যাপার হইতে আমরা ইহাই বুঝিয়াছি যে, বিহার সরকার এই সত্যাগ্রহ সম্পর্কে কর্তব্যপালনের সব দায়িত্ব স্থানীয় রাজকর্মচারীদের উপর ছাড়িয়া দিয়াছেন। বিরোধী একদল গুণ্ডা শ্রেণীর লোক রাজকর্মচারীদের সেই কর্তব্য সম্পাদনে সাহায্য করিতে আগাইয়া আসিয়াছে। বিরোধী এই গুণ্ডার দল সত্যাগ্রহীদের উপর ইতরভাবে আক্রমণ চালাইতেছে। সত্যাগ্রহীদের গায়ে আলকাতরা মাখাইয়া তাহাদের উপর লঙ্কার গুঁড়া দিয়াছে, মোটর লরীর উপর নিরীহ সত্যাগ্রহীকে টানিয়া তুলিয়া পরে তাহাকে ফেলিয়া দিয়াছে। পুলিশ নিরপেক্ষ দর্শকস্বরূপে এই দৃশ্য উপভোগ করিয়াছে। দুই-একটি জায়গায় পুলিশেরাও সত্যাগ্রহীদের নির্যাতনে সাক্ষাৎ-সম্পর্কে অংশ গ্রহণ করিয়াছে। আমরা জানি, মানভূমের সত্যাগ্রহের যাঁহারা নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা অনেকেই ত্যাগী কর্মী এবং অহিংস নীতিতে একান্ত নিষ্ঠাবান। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে দুঃখ-কষ্ট বরণের ভিতর দিয়া তাঁহাদের সে নিষ্ঠা-বুদ্ধি বহু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। বিহারের কর্তৃপক্ষ যদি মনে করিয়া থাকেন যে, কিছুদিন এইভাবে উপদ্রুত হইলেই তাঁহাদের সঙ্কল্প শিথিল হইয়া পড়িবে, তবে তাঁহারা ভুল বুঝিয়াছেন। সত্যাগ্রহের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন নাই, শাসকদের মনোভাব যদি ইহাই হয়; তাহা হইলেও সত্যাগ্রহীদের উপর যাহারা উপদ্রব করিতেছে, তাহাদিগকে সংযত করা তহাদের কর্তব্য। তাঁহাদের অন্তত এটুকু বোঝা উচিত যে, সত্যাগ্রহীরা যেরূপ আদর্শনিষ্ঠ এবং নীতিবোধসম্পন্ন, যাহারা তাঁহাদের উপর অত্যাচার করিতেছে, তাহারা সে প্রকৃতির লোক নয়। এই সব উপদ্রবকারীদের পিছনে থাকিয়া একদল লোক কাজ করিতেছে। তাহাদের দুষ্প্রবৃত্তি যদি প্রশ্রয় পায়, তবে ইহারা যে কোন মুহূর্তে বড় রকমের অনর্থ পাকাইয়া তুলিবে। তাহার ফল কতদূর গড়াইতে পারে, বিহার গভর্নমেণ্টকে আমরা তাহাই ভাবিয়া দেখিতে বলিতেছি। প্রকৃতপক্ষে মানভূমের সত্যাগ্রহকে শাসনবিভাগীয় স্থানী ঘটনাস্বরূপে দেখা ভুল; কারণ ইহার সঙ্গে গণতান্ত্রিক অধিকারগত একটি মৌলিক প্রশ্ন জড়িত রহিয়াছে। বিহারের বাঙলা ভাষাভাষী সমাজের ন্যায্য অধিকার রক্ষার দায়িত্ব বিহার গভর্নমেণ্টের রহিয়াছে, তাঁহারা তাহা উপেক্ষা করিতে পারেন না। শুধু বিহার গভর্নমেণ্টই নহেন, ভারত গভর্নমেণ্টের এ সম্বন্ধে দায়িত্ব আছে। ভাষাগতভাবে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ন্যায্য সে অধিকার ভারত গভর্নমেণ্ট নিজেদের নীতিতে গ্রহণ করিয়া লইয়াছেন, কোন প্রদেশের শাসন-বিভাগীয় ব্যবস্থার ফলে যদি তাহা লঙ্ঘিত হয়, তাহা হইলে সেক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করিবার দায়িত্ব ভারত সরকারের উপরই বর্তায়। কিন্তু বিহার সরকার কিংবা ভারত সরকার ইঁহাদের কাহারও দায়িত্ব প্রতিপালনের জন্য কোন রকমের আন্তরিক আগ্রহেরই আমরা পরিচয় পাইতেছি না। বিহারের কোন মন্ত্রী কিংবা কোন কংগ্রেসকর্মী জননায়ক এ পর্যন্ত মানভূমে গিয়া প্রকৃত অবস্থা কি, দেখা দরকার বোধ করেন নাই। পুলিশ সত্যাগ্রহীদের উপর নির্যাতনের তামাসা দেখিতেছে এবং মন্ত্রীরা বাঙলা ভাষাকে বিহার হইতে উৎখাত করিবার সঙ্কল্পে নীতির পর নীতির পাকচক্র আঁটিতেছেন। ভারত সরকার ভ্রূক্ষেপশূন্য, নিজেদের বিঘোষিত নীতির মর্যাদা রক্ষা সম্বন্ধে উদাসীন। অবস্থা ক্রমে এইভাবে উদ্বেগজনক হইয়া উঠিতেছে। মানভূমের সত্যাগ্রহীদের আদর্শনিষ্ঠার প্রখরতায়, তাঁহাদের দুঃখ-কষ্টের দহন-জ্বালায় অসত্যকে প্রতিষ্ঠা করিবার অভিসন্ধিজাল দগ্ধ হইবে এবং তাঁহাদের প্রাণপূর্ণ সাধনায় বিহারের শাসন-চক্র হইতে প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতার দুর্বুদ্ধির প্রভাব বিদূরিত হইবে, আমরা ইহাই আশা করি।

### ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন

ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের প্রশ্ন সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্য গণপরিষদের সভাপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদের সভাপতিত্বে দার কমিটি গঠিত হয়। সেই কমিটি বর্তমান অবস্থায় ভাষাগত প্রদেশ গঠনের উদ্যোগ স্থগিত রাখিবার পরামর্শ দেন। দার কমিটির সুপারিশ প্রকাশিত হইলে নূতন প্রদেশ গঠনের পক্ষপাতীদের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দেয়। ইহার ফলে বিষয়টির সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনা করিবার জন্য কংগ্রেসের রাষ্ট্রপতি, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ও পণ্ডিত জওহরলালকে লইয়া একটি নূতন কমিটি গঠিত হয়। কিছুদিন হইল এই কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়, পরে উহা কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে। দার কমিটি এবং নেহরু কমিটি এই দুইয়ের আলোচনা করিলে দেখা যায়, উভয়ের মধ্যে বস্তুগত বিভেদ কিছুই নাই, বিভেদ যাহা কিছু আছে শুধু মাত্র ভাষার। দার কমিটির অনুসরণ করিয়া এই কমিটিও

অন্ধ্র, কর্ণাটক, কেরল ও মহারাষ্ট্র এই চারিটি প্রদেশের বিষয়ই কেবল বিবেচনা করিয়াছেন। কমিটি অন্ধ্র প্রদেশের সম্বন্ধে কিছু অনুকূল মত প্রকাশ করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের দাবীকে ইঁহারা কার্যত আমলই দেন নাই। কমিটির মতে "ভাষাগত বিচারে উত্তর ভারতে প্রাদেশিক সীমার সংশোধনের প্রশ্ন বর্তমানে উত্থাপন করাই উচিত নহে, সে দাবীর পক্ষে যতই যুক্তি-প্রমাণ থাকুক।" উত্তর ভারতের প্রসঙ্গে কমিটি যে পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহারের সীমানা সম্পর্কিত প্রশ্নেরই ইঙ্গিত করিয়াছেন, ইহা বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না। প্রকৃত প্রস্তাবে পশ্চিমবঙ্গের দাবীর যৌক্তিকতাকেও তাঁহারা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তাঁহাদের মতে "বর্তমানে এইরূপ দাবী অগ্রাহ্য করা হইল বলিয়াই ইহার দ্বারা একথা কেহ যেন মনে না করেন যে, এইরূপ প্রাদেশিক সীমা সংশোধনের দাবী অসঙ্গত বা যুক্তিবিরুদ্ধ।" দাবী যুক্তিবিরুদ্ধ নয়, তবে সে প্রশ্ন উত্থাপন করাই অনুচিত কেন? ইহার একমাত্র উত্তর এই যে, কমিটির মতে পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহারের সীমানা সম্পর্কিত ব্যাপার নিতান্তই সামান্য। এখানে স্বভাবতঃই এই প্রশ্ন উঠে যে, নূতন প্রদেশ গঠনের ব্যাপার অনেকটা বৃহৎ। শাসন-বিভাগীয় নানা বিষয়ের বিবেচনা, বিশেষত আর্থিক প্রশ্ন সে সম্পর্কে নানা জটিলতা সৃষ্টি করে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের দাবী অপেক্ষাকৃত সামান্য, এক্ষেত্রে সেসব জটিলতা কিছুই নাই। কারণ, উভয় প্রদেশের কয়েকটি অঞ্চল অপর প্রদেশের প্রতিষ্ঠিত শাসন-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করিলেই গোল চুকিয়া যায়। তবে কমিটি সে নির্দেশ কেন দিলেন না? বস্তুত পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের মধ্যে ভাষাগত সীমা নির্ধারণের যে সমস্যা, তাহা সামান্যই ছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে আমরা যতদিন পরাধীন ছিলাম, ততদিন পর্যন্ত ইহা কোন সমস্যাই ছিল না। বিহার এবং বাঙলার উভয় প্রদেশের নেতারাই সীমানার পুনর্গঠন সম্বন্ধে একমত ছিলেন। বিহারের একজন কংগ্রেস নেতাও তখন মানভূম প্রভৃতি বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলগুলিকে বাঙলার অন্তর্ভুক্ত করার বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই; পক্ষান্তরে সকলেই তাহা সমর্থন করিয়াছেন। ভারত স্বাধীন হইবার পরই ইহা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিহারের নেতৃবৃন্দের প্রতিকূলতা এবং এই সম্বন্ধে সহজভাবে মীমাংসা করিতে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের অনিচ্ছা ইহাকে সমস্যায় পরিণত করিয়াছে। বিহার গভর্নমেণ্টের আচরণ এই সামান্য ব্যাপারকে সত্যই গুরুতর করিয়া তুলিয়াছে। মানভূমের দিকে চাহিলেই বুঝা যাইবে যে, সামান্য ব্যাপার আর সামান্য নাই। কংগ্রেসের প্রধানগণ কোনমতেই এ সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতে পারিবেন না।

**সমস্যার জটিলতা**

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক ভাষাগত প্রদেশ কমিটি অর্থাৎ নেহরু কমিটির রিপোর্ট গৃহীত হইবার পর এক বিচিত্র অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। রাষ্ট্রপতি ডক্টর সীতারামিয়া গত ৭ই এপ্রিল বোম্বাই শহরে সাংবাদিকদের এক বৈঠকে বলিয়াছেন যে, কমিটি ভাষাগত প্রদেশ গঠনের দাবী অগ্রাহ্য বা স্থগিত রাখেন নাই; পরন্তু কতকগুলি সর্তে তাহা মানিয়াই লইয়াছেন। রাষ্ট্রপতির এই ব্যাখ্যা পাঠ করিয়া আমরা অনেকটা হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছি। কারণ রিপোর্টে আমরা স্পষ্টই পড়িতেছি—কমিটি লিখিয়াছেন—"আমরা যাহাতে বিশেষ প্রয়োজনীয় অন্যান্য প্রশ্নের সমাধানে সকল শক্তি কেন্দ্রীভূত করিতে পারি এবং এই প্রশ্নের গোলের মধ্যে আমাদের শক্তি বিচ্ছিন্ন হইয়া না পড়ে, সেজন্য নূতন প্রদেশ গঠনের প্রশ্ন কয়েক বৎসরের জন্য স্থগিত রাখাই শ্রেয় মনে করি।" অবশ্য রাষ্ট্রপতির নিজের প্রদেশ অন্ধ্রকে লইয়া এক বৎসরের মধ্যে নূতন প্রদেশ গঠিত হইতেছে। কিন্তু অন্ধ্রের সম্বন্ধে এই বিশেষ বিবেচনার জন্য মোটামুটিভাবে কমিটির সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কোন সংশয়ের অবকাশ থাকে না। সর্দার প্যাটেলের সভাপতিত্বে সম্প্রতি দিল্লীতে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক প্রধান মন্ত্রী সম্মেলনের সিদ্ধান্তে বিষয়টি আরও জলের মত পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। প্রধান মন্ত্রীদের মতে —"ভাষাগত প্রদেশ কমিটি বর্তমান প্রাদেশিক সীমার কোনরূপ পরিবর্তন করার বিরুদ্ধে মত দিয়াছেন এবং কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটিও সেই মত গ্রহণ করিয়াছেন।" প্রধান মন্ত্রীরা তদনুযায়ী এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বর্তমানে প্রাদেশিক সীমা পরিবর্তনের জন্য আন্দোলন করা উচিত হইবে না। আদিবাসীদের অধ্যুষিত অঞ্চলগুলির সীমানা সম্পর্কেই প্রধানমন্ত্রীরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন, অন্য ক্ষেত্র সম্পর্কে নয়, সংবাদটি পাঠ করিলে কাহারো কাহারো ইহা মনে হইতে পারে, কিন্তু তাহাও যুক্তিতে টিকে না; কারণ পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনের সিদ্ধান্তে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে আছেন। বলা বাহুল্য, পশ্চিমবঙ্গে আদিবাসীদের লইয়া কোন সমস্যা নাই। সুতরাং বুঝিতে হয়, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা এবং আসামের প্রধানমন্ত্রীদের সঙ্গে যোগ দিয়া পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী নেহরু কমিটির নির্দেশমত ভাষাগত ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন স্থগিত রাখার পক্ষেই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে উত্তর ভারতে প্রাদেশিক সীমা নির্ধারণের কোন সমস্যা আছে বলিয়াই যখন স্বীকৃত হয় নাই, তখন আসাম, পশ্চিম বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যার প্রধানমন্ত্রীদের এ বিষয়ে অভিমত নিতান্তই অবান্তর বলিয়া মনে হয়। উত্তর ভারতে প্রাদেশিক সীমা নির্ধারণের যে সমস্যা আছে, কমিটি তাহাকে অতি সামান্য ব্যাপার বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। পশ্চিম বাঙলার কোন দাবী কিংবা বাঙলা-ভাষাভাষীদের দাবী সম্বন্ধে কমিটির রিপোর্টে কোন উল্লেখই দৃষ্ট হয় না। এরূপ অবস্থায় "বর্তমানে প্রাদেশিক সীমা পুনর্নির্ধারণের কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা উচিত নহে,"—পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রীর এমন স্বীকৃতি-পত্রে সহি দিবার কি সার্থকতা থাকিতে পারে, সত্যই আমরা বুঝি না। অথচ ইহার ফল দাঁড়াইবে এই যে সামান্য ব্যাপার বলিয়া কমিটি যাহা চাপা দিতে চাহিয়াছিলেন, পশ্চিম বাঙলার প্রধানমন্ত্রী এইভাবে যৌথ বিবৃতিতে জড়িত হওয়াতে তাহাই ভাল করিয়া চাপা পড়িবে। এইখানে আমাদের আশঙ্কা। বস্তুত রাষ্ট্রপতির মতানুসারেই দক্ষিণ ভারতের ভাষাগত প্রদেশ গঠনের অপেক্ষাকৃত জটিল প্রশ্নগত দাবীই যদি ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্তে অনুমোদিত হইয়া থাকে; এ বৎসরের মধ্যে যদি অন্ধ্রকে নূতন প্রদেশে গঠিত করা যায়, তাহা হইলে উত্তর ভারতের অর্থাৎ পশ্চিম বাঙলার এই সামান্য দাবীটুকুও অগ্রাহ্য করা উচিত নহে। আমাদের এ অনুরোধ। বাঙলা বিভক্ত হইবার পর পশ্চিমবঙ্গের সম্মুখে যেসব সমস্যা দেখা দিয়াছে, কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ তাহা উপেক্ষা করিতে পারেন না, ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক স্বার্থে বৃহত্তর প্রয়োজনের দিক হইতে ভারত সরকারেরও এ সম্বন্ধে অবিলম্বে বিবেচনা করা উচিত। আসাম, বিহার, উড়িষ্যা বা মধ্যপ্রদেশ এ সম্বন্ধে উদাসীন হইতে পারে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কোনমতেই উদাসীন থাকিতে পারে না।

শিল্পী: শ্রীনন্দলাল বসু
[শ্রীসুজাতা মিত্র সৌজন্যে]
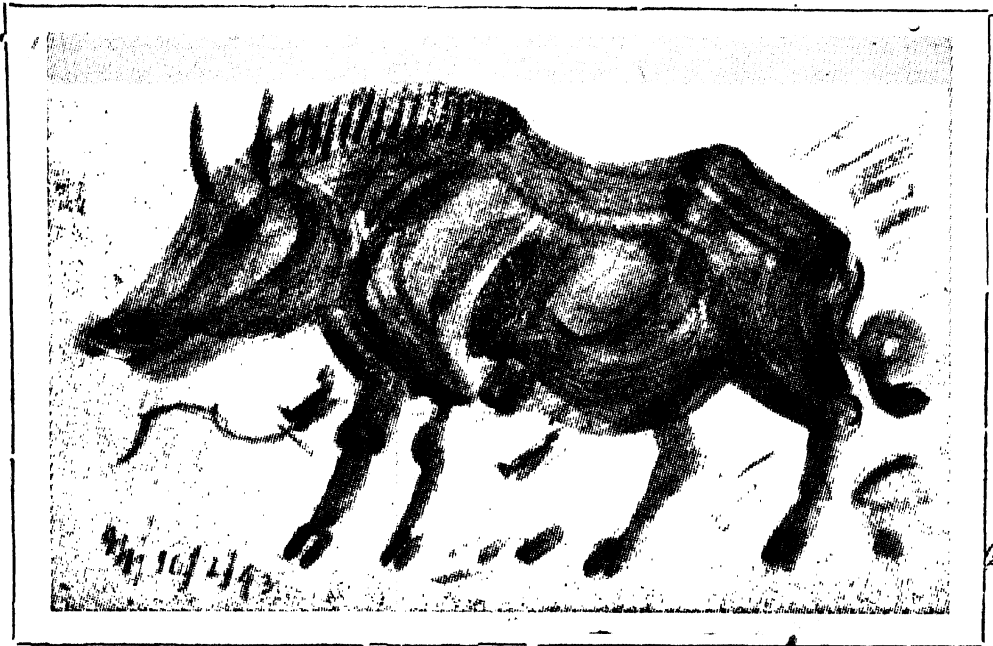
# যৌবনের সূর্যাস্ত

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

যৌবনের সূর্যাস্ত আজ তোমার অঙ্গে।
ঘনতর বনচ্ছায়া
বিলুণ্ঠিত তোমার কেশে,
দূর দিগন্তের কালো আভা
চোখের কোলে কোলে দুলছে,
আর ওই ভুরুর খিলানের তল দিয়ে
নীড়-ফেরা হাঁসের দল এখনি উড়ে চলে' গিয়েছে,
তাদের পক্ষ বিধূননে
এখনো চোখের পক্ষ্মগুলি কম্পিত।
যৌবনের সূর্যাস্ত আজ তোমার অঙ্গে॥

এখনো অধর তার মাধুরী হারায়নি,
এখনো গালের গোলাপ দুটি প্রগল্‌ভ,
ললাটের নিষ্কল দর্পণ এখনো
মনোরথের মুকুর,
চিবুক সুকুমার,
তবু, রজনীগন্ধার গ্রীবাতে নেমেছে
সন্ধ্যার কোমলতা।
যৌবনের সূর্যাস্ত আজ তোমার অঙ্গে॥

কৈশোরে যখন তোমার লাবণ্য
দিনে দিনে উন্মীলিত হচ্ছিল
তখন আমি ছিলাম না।
কোথায় ছিলাম?
তুমি ছিলে তবু আমি ছিলাম না
এ রহস্যের অন্ত না পাই।
তবু তো তোমার লাবণ্য-মুকুল মঞ্জরিত হচ্ছিল।

তারপরে এলো যৌবন।
কনককিরণদ্রব মধুমাধুর্যভারাবনত
দীপ্ত দ্বিপ্রহরের মতো
তোমার দুঃসহ যৌবন
ফেটে পড়বার মুখে,
বিশ্বের নিষ্পেষণ যেন অনুভব করছে
তোমার উদ্বেল বক্ষ,
আকাশের চুম্বন যেন অনুভব করছে
শুক্তিপাণ্ডু তোমার দুটি কপোল,
ইন্দ্রাণীর নীলাম্বরের প্রান্ত দুলে দুলে উঠছে
তোমার কুন্তলে,

তোমার নিপুণ অঙ্গুলির লঘু চাতুর্যের দিকে
তাকিয়ে রয়েছে বীণাহারা উর্বশী,
আর,
কুন্দ-সুকুমার চরণ দুটির ধ্যান-রসে
মেনকা আজ নৃত্যভোলা।
তোমারি বঙ্কিম অধরচিহ্ন ওই চন্দ্রে,
ছায়াপথে তোমারি ওড়না লুণ্ঠিত,
তোমার সৌন্দর্যের তাপে তপ্ত হ'য়ে উঠেছে
পঞ্চশরের শরগুলি,
ধূর্জটির ধ্যানে লাগছে উদ্‌ভ্রান্তি,
তোমার যৌবনের প্রচণ্ড বাণাঘাতে
বিশ্বের ভোগবতী স্পৃহাকে তুমি উচ্ছ্বসিত ক'রে
দিয়েছিলে—
সেদিন ছিল তোমার যৌবন।
সেই যৌবনের সূর্যাস্ত আজ তোমার অঙ্গে॥

এখনো চন্দ্রোদয় বাকি।
তপস্বিনী মহাশ্বেতার মতো চতুর্থীর চন্দ্রকলা
কৃষ্ণ কমণ্ডলু থেকে ঢেলে দেবে
স্বর্গীয় কিরণ তোমার ললাটে,
সেই হবে তোমার অভিষেক,
অসমাপ্ত যৌবনের অপার্থিব উপসংহার,
অপরিতৃপ্ত বেদনার দিব্য সমবেদনা,
তৃষ্ণার তিরোধান,
নিষ্ফল দ্রাক্ষাগুচ্ছের নির্যাসিত সুরায়
সুরসভার উৎসব হবে সম্পন্ন।
তারপরে আছে কবি।

যৌবনের সূর্যাস্ত আজ তোমার অঙ্গে।
এমন সুন্দর তোমাকে আগে কখনো দেখিনি,
দিবস রাত্রির সম্মিলিত নিপুণতায়
আজ এ কি তোমার বধূসজ্জা?
অস্তোদয়োন্মুখ চন্দ্র-সূর্য
বহন করছে তোমার চতুর্দোলা,
সীমন্তে তোমার গোধূলির চেলি,
চোখে তোমার প্রশান্ত বিষাদ,
এ যদি সৌন্দর্য নয়,
তবে সৌন্দর্য আর কা'কে বলে?
অক্ষয় হোক এই সূর্যাস্তের মাধুরী,
যৌবনের সূর্যাস্ত আজ তোমার অঙ্গে॥

**রামস্বামীর** স্থানে কুমারস্বামী মান্দ্রাজের প্রধান মন্ত্রী নির্বাচিত হইয়াছেন। সেখানকার মহিলা বাস কণ্ডাক্টারদের মত মন্ত্রী নির্বাচনেও মুখশ্রীকে বিশেষ গুণরূপে বিবেচনা

করা হইয়াছে কি না সে সংবাদ এখনও প্রকাশিত হয় নাই।

* * * * *

**রাজস্থান** সংগঠনে রাণা প্রতাপের স্বপ্ন সফল হইয়াছে বলিয়া অনেকেই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।—"প্রজাস্থানের জন্যে অবশ্যি এখনো অনেকেই দেয়ালা কচ্ছেন"—এ অভিমত প্রকাশ করিলেন বিশুখুড়ো।

* * *

শ্রী must feed nation." চাষীরা **যুক্ত** পাতিল বলিয়াছেন—"Farmers নিশ্চয়ই বুদ্ধিমানে খায় আর বোকারা খাওয়ায় প্রবাদের সঙ্গে পরিচিত নয়, থাকলে হয়ত একটা জবাব দিতে পারিত"—মন্তব্য করিলেন খুড়ো।

* * * * *

ডাঃ কুমারাপ্পা পতিত জমি চাষের জন্য ট্রাক্টারের বদলে হাতী দিয়া চাষের সুপারিশ করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে চাষের সুবিধা হইবে কি না জিজ্ঞাসা করায় বিশুখুড়ো বলিলেন—"তা না হলেও "মারি তো হাতী" আদর্শবাদ তো বজায় থাকবে।"

**একটি** সংবাদে জানা গেল পৃথিবীর মধ্যে নাকি চল্লিশ হাজার রকম মাছ আছে। "কিন্তু মাছ না পাওয়ার বিভিন্ন যুক্তির সংখ্যা চল্লিশ হাজারের অনেক বেশী"—এই মন্তব্যও বিশুখুড়োই করিলেন।

* * *

**অন্য** এক সংবাদে শুনিলাম পৃথিবীর মধ্যে ফরাসী রসুইর চাহিদাই নাকি সবচেয়ে বেশী। পৃথিবীর সর্বত্র খাদ্যাভাব এ সংবাদও আমরা শুনিতেছি, তবে রসুইরা রাঁধেন কি?—শ্যামলাল বলিল—"কেন, ভেরেণ্ডার ফরাসী কাবাব!"

* * *

**জনৈক** ইটালো-আর্জেণ্টানিয়ান নাকি প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে "Garden of Eden" নামক একটি স্থান ক্রয় করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। "বস্ত্র সমস্যা সমাধানের জন্যে কিনা, তা অবশ্যি সংবাদে বলা হয় নি"—মন্তব্য করিলেন আমাদের এক সহযাত্রী।

* * *

**একটি** সংবাদে শুনিলাম—সিংহ বনের রাজা কেন সে সম্বন্ধে নাকি গবেষণা চলিতেছে।—"এর মধ্যে গবেষণার কি আর আছে, Quit Jungle শ্লোগান বলার কেউ নেই বলেই সিংহ এখনো বনের রাজা"—বলা বাহুল্য এ মন্তব্য বিশুখুড়োর।

* * * * * *

**রাষ্ট্রপাল** রাজাজীর এক নির্দেশ—Grow some thing that can be eaten by man or domestic animal.

রাজাজী ঠিক নির্দেশই দিয়াছেন,—এই দুইয়ের খাদ্যবস্তুর সীমারেখা আজ প্রায় বিলুপ্ত।

**রাজাজীর** একটি মন্তব্য—"মন্ত্রীরা হচ্ছেন শ্রীগণেশ"। খুড়ো বলিলেন—সেই জন্যেই তো ভয়, পাছে কখন উল্টে যান।

* * * * *

"Times of India" জানাইতেছেন—এড্‌মিরাল নিমিৎস্ নাকি সমুদ্রপীড়ায় ভয়ানক কাবু হইয়া পড়েন। একজন এড্‌মিরালের পক্ষে নিশ্চয়ই এটা গৌরবের কথা নয়। যা হোক আমরা আশা করিয়া আছি—"পর্বত পীড়ায়" তিনি কাবু হইবেন না;—কাশ্মীর সমুদ্রের অনেক ঊর্ধ্বে।

* * * * *

**মিঃ চার্চিল** বলিয়াছেন—ক্রেমলিনে চৌদ্দজন শয়তান আছে।—"লণ্ডনে শয়তানের

সংখ্যা কত তা স্টালিনের মুখে শুনবার জন্যে আমরা উদগ্রীব হয়ে আছি"—বলিলেন খুড়ো।

* * * *

**দিল্লী** এবং বোম্বাইতে নাকি অলিম্পিক স্টেডিয়াম তৈরীর প্রস্তাব হইতেছে। একটি অসমর্থিত সংবাদে প্রকাশ বাঙলা সরকার নাকি গড়ের মাঠে আরও বৃক্ষ বৃদ্ধির পরিকল্পনা করিতেছেন।

* * * *

**সহযোগী** "স্টেট্‌স্‌ম্যান" রবিবাসরীয় পত্রে ছোটদের প্রতিযোগিতার জন্য একটি ছবি ছাপিয়াছেন। কতকগুলি cross line-এর মধ্যে চারটি মেয়ে-পুরুষ একসঙ্গে টেলিফোনে কথা বলিতেছেন। কে কাহার সঙ্গে কথা বলিতেছেন তাহা বলিয়া দেওয়াই প্রতিযোগিতার বিষয়। খুড়োকে একথা বলিয়া ছবিখানি দেখাইলাম। তিনি বলিলেন—"বাচ্চারা কেন, স্বয়ং মিঃ ভৈস্‌ও বলতে পারবেন না, কে কার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলছে।"
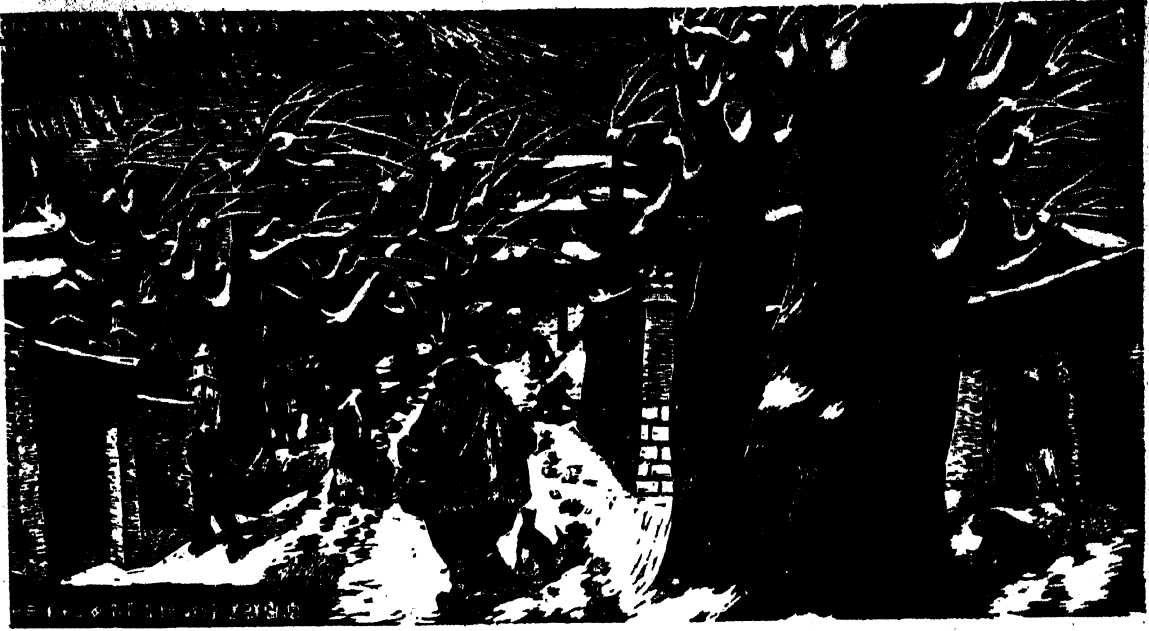
# চীন শিল্পকলার বিবর্তন

চীনের রাষ্ট্রিক কাঠামো আজ রাজনৈতিক বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত। কিন্তু এই বিষম দুর্যোগের দিনেও তার সুমহৎ আত্মিক সত্তাকে ভুললে চলবে না, কেন না, সভ্যতা সংস্কৃতি ধর্ম ও মানবতা এ-সব দিক থেকে এই জ্ঞান-বৃদ্ধ সুপ্রাচীন দেশটি এককালে এশিয়ার নমস্য ছিল বললে অত্যুক্তি হবে না এবং এর আজকের বিপদ সারা এশিয়ার আকাশে কালো-ছায়ার পক্ষ বিস্তার করেছে।

সুখের বিষয় দীর্ঘকালের বিভিন্ন বিপর্যয়ের মধ্যেও তার সংস্কৃতি মরে যায় নি; তমসারাতের ঝড়ঝাপ্টাতেও সে তার সুকুমারকলার দীপশিখাটিকে উত্তরীয়প্রান্তে সন্তর্পণে বাঁচিয়ে রেখেছে।

তার বর্তমান যুগের শিল্পকলা কোন্ পথে চলেছে, এ প্রবন্ধে আমরা তারই অনুসন্ধান করব।

সারা উনিশ শতক জুড়ে চীনের মধ্যে কারিগরী বিদ্যা শিখবার এবং বিজ্ঞানকে কাজে লাগাবার একটা অনির্বাণ আকাঙ্ক্ষা দেখা গিয়েছে। এবং তার গৃহযুদ্ধের বছরগুলিতে রাজনৈতিক চেতনার ধারা উৎসারিত হয়েছে। কিন্তু তার বোধ বুদ্ধি এবং জীবনের বিকাশ তখন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল; সেটা এক সময়ে সহসা আলোকে মুখরিত হয়ে উঠল।

হু শী এবং তাঁর অনুসারীরা ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে এক নতুন আন্দোলনের গোড়াপত্তন করলেন। সেটা সাহিত্যিক নবজাগরণের আন্দোলন। চীনের প্রাচীন লিখন-রীতি যে অতিশয় জটিল এবং দুরায়ত্ত তা সকলেই জানেন। তাঁরা সে-রীতি ত্যাগ করতে বললেন। "পাই হুয়া" অর্থাৎ "সোজা ভাষা"কে চীনের শিক্ষিতসমাজ ব্রাত্যভাষা বলে পতিত করে রেখেছিলেন। হু শী'র দল লেখা-পড়ার সব কাজে সেই ব্রাত্যভাষাকেই গ্রহণের আন্দোলন চালালেন। এর আগে এ-ভাষা কেবল নীচু স্তরের লিখনে, অর্থাৎ জনরঞ্জক নাটক নভেলে ব্যবহার হত।

এ আন্দোলনের ফল শীঘ্রই ফলল। চীনের বুদ্ধি-জীবনে এর আশ্চর্য রকম প্রতিক্রিয়া হল। সারা চীনের বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষার্থীরা দেখল, তাদের কাঁধ থেকে এক গুরুভার বোঝা যেন নেমে গিয়েছে। সহজ ভাষা গ্রাহ্য হওয়ার ফলে চীনা সাহিত্যের মরা গাঙে বান ডাকল: এই নতুন প্রকাশভঙ্গীকে অবলম্বন করে রাশি রাশি কবিতা উপন্যাস ছোটগল্প প্রবন্ধ লেখা হতে লাগল। চীন যেন তার 'হুস-উয়ো' অর্থাৎ আত্মসত্তা ফিরে পেল। গ্রন্থরচনা ছাড়াও পিপিং সাংহাই প্রভৃতি শহরে শত শত সাময়িক পত্রের প্রকাশ দ্বারা সে-সত্তার বিকাশ হতে লাগল।

১৯১২ ও ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে সাংহাই শহরে কয়েকটি ছোট ছোট স্টুডিও খোলা হয়েছিল। এর সঙ্গে সঙ্গে "নতুন স্রোত" নামে শিল্প-বিষয়ক একখানি সাময়িকপত্র বের হয়। এই প্রচেষ্টা থেকে চৈনিক শিল্পকলার যে বিবর্তন শুরু হয় তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চীনের নব্যকলার গোড়াপত্তন এইখানে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে কয়েকটি চীনা যুবক জাপানে গিয়ে শিল্পকলা শিক্ষা করেন। জাপশিল্পে ইতিপূর্বেই ইউরোপীয় ধারা এসে গিয়েছে। ইউরোপের যুদ্ধ শেষ হলে তাঁরা শিল্পচর্চার জন্য ফ্রান্সে যান। পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্ট, বিখ্যাত পণ্ডিত ও শিক্ষাবিদ্ ডাঃ ৎসাই ইউয়ান-ফেই এবিষয়ে তাঁদের বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছিলেন। তিনি এতদূর শিল্পোৎসাহী ছিলেন যে, চীনে ধর্মের পদবীতে একদিন শিল্পকলাই একচ্ছত্র অধিপতি হবে, এ তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি আর্ট সোসাইটি স্থাপন করেছিলেন। এই সোসাইটি ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে বর্ধিত হয়ে পিকিংয়ের ন্যাশনাল একাডেমিতে রূপান্তরিত হয়। এর পরবর্তী কয় বৎসরে তাঁর উৎসাহে উৎসাহিত অনেকেই শিল্পচর্চার জন্য ফ্রান্সে ও বেলজিয়ামে গিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে শুজু পিও, লিউ হাইশো, লিঙ্ ফাঙ্-মিঙ্ বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী কয় বৎসরের মধ্যে চীনে শিল্পচর্চার উদ্দীপনা চরমে উঠেছিল। নতুন নতুন ধারার পরীক্ষা ও

ধাবমান অশ্ব ] [শিল্পী—শুজ্ পিওঁ জলপ্রপাত ] [ শিল্পী হোয়ান্ চুন্-পি

প্রবর্তন, এবং সঙ্গে সঙ্গে চিরাচরিত পদ্ধতির বন্ধন থেকে শিল্পের মুক্তিবিধানের চেষ্টা এই সময়ে পূর্ণোদ্যমে চলেছিল। ১৯২৭ খৃস্টাব্দে কুমিন্টাঙ কর্তৃক রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত এই উদ্যম অব্যাহত ছিল। ১৯২৩ খৃস্টাব্দে শুচৌ-এ, ১৯২৫-২৭ খৃস্টাব্দে সাংহাইএ, ১৯২৭ খৃস্টাব্দে নান্‌কিঙ্ ও চেঙতুতে এবং অন্যান্য কেন্দ্রে শিল্প-বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। এই সকল বিদ্যালয়ে, বিশেষ করে হ্যাংচৌ ও সাংহাই-এ শিল্প বিদ্যালয়গুলিতে শিল্পে বিশেষ প্রগতিশীল ধারা অনুসৃত হয়েছিল। ড্রইং ও পেণ্টিংএ নগ্নমূর্তিচিত্রণও উপেক্ষিত হত না। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এসকল শিল্পীকে নগ্নমূর্তি অঙ্কন অনুমোদিত করার জন্য জেনারেল সুন্ চুয়ান্‌ফাঙ্‌এর সঙ্গে যেমন সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হয়েছিল, তেমনি সাংহাই-এর মধ্যবিত্ত জীবনের বদ্ধমূল সংস্কারের সঙ্গেও তাদের সংঘাত বেধেছিল। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত তাঁরা শিল্পে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী প্রবর্তনে সফল হন।

এই সকল বিদ্যালয়ের কোনো কোনোটিতে অঙ্কনের যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হত তা প্রণিধানযোগ্য। অঙ্কনের অন্যান্য ধারার মতো, পুরোণো পদ্ধতিতে তুলির কাজ শেখাবারও ব্যবস্থা থাকত। প্রথম বৎসর ড্রইংএর কাজ শেখাবার পর ছাত্রগণকে দুটি বিভিন্ন ধারার কোনো একটিকে গ্রহণ করতে বলা হত। তার একটি ধারা হল পরম্পরাগত পদ্ধতিতে ফুল পাখি ও প্রাকৃতিক দৃশ্যাদির চিত্রণ। আর, দ্বিতীয় ধারা হচ্ছে ঐ চিরাচরিত রীতি ত্যাগ করে বিদেশী ভাব গ্রহণ। শিক্ষার্থীকে এ দুটির যে-কোনো একটিকে অনুসরণ করতে হত।

পাশ্চাত্য প্রভাবিত আধুনিক চীনা শিল্পের প্রথম স্তরকে যাঁরা রূপদান করেছেন, শিল্পী হিসাবে তাঁরা ছিলেন অ্যাকাডেমিক পদ্ধতির ভক্ত, দৃশ্য রূপের যথাযথ অনুকৃতিতেই তাদের প্রবৃত্তি, ইম্‌প্রেসনিজম্‌এর প্রভাব অল্প। আধুনিক চীনা শিল্পের দ্বিতীয় স্তর যাঁরা সৃষ্টি করেছেন তাঁরা ফ্রান্সের শিল্প আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছেন। ১৯২৭—৩৫ খৃষ্টাব্দ মধ্যে তাঁরা পারি শহরে থাকাকালীন আধুনিক নানা শিল্পধারা ও শিল্পদর্শন আত্মস্থ করতে যত্ন করেন এবং দেশে ফিরে এসে সাংহাই শহরে নতুন শিল্পীগোষ্ঠী গঠন করেন। চীনের চিরাচরিত পদ্ধতি ও নব্য ভাবধারার মধ্যে সমন্বয় সাধনে এই শিল্পী-গোষ্ঠীর দান অসামান্য। চারদিকের বিরোধী আবহাওয়ার মধ্যেও এই দল আধুনিক শিল্পে ভাবব্যঞ্জনার সংহত রূপ বিকাশ করতে সাধনা করেছেন। ফলে চীন শিল্পে কিউবিসম্, সুররিয়েলিসম্ প্রভৃতি ধারার প্রবর্তন হয়। তবে একথা ঠিক, সাংহাই ও ক্যাণ্টন শহরের মুষ্টিমেয় শিল্পরসিক ছাড়া বিশাল জন-সমাজের কাছে এসব নব্য পদ্ধতি সার্থক বা বাণীময় হয়ে ওঠেনি।

বাম দিকে, উপরে
"সৈনিক"—শিল্পী শিয়া ও তিং
বাম দিকে, মধ্যে
"মিয়াও কৃষক রমণী—শিল্পী ফাং শিউন কিন্
ডান দিকে, উপরে
"প্রকৃতির রূপ"—শিল্পী শুজু পিওঁ
নীচে
"য়ু-কুং কর্তৃক পর্বত ছেদন"—একটি পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে অঙ্কিত।
শিল্পী শুজু পিওঁ

শিল্পাচার্য শুজু পিঙঁ (তুলি হস্তে); পাশে অন্য একজন চীনা শিল্পী। শুজু পিঙঁ এখন পিকিংএ ন্যাশনাল একাডেমির ডিরেক্টর।

কৃষক (প্ল্যান্টার)] [শিল্পী—হোয়া তিয়েন্-ইউ

কাজেই, এই স্তরেও শীঘ্রই ভাঙন ধরল। নব্য চীনের খ্যাতনামা লেখক লু হ্‌সুন্ ১৯২৮ খৃস্টাব্দে চীনে রাশিয়ান উড্‌কাট বা কাঠখোদাইয়ের প্রবর্তন করলেন। এর বলিষ্ঠতায় ও ব্যঞ্জনায় শিল্পরসিকরা চমৎকৃত হলেন। এবং এর প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 'চায়নীজ উড্‌কাট স্টাডি অ্যাসোসিয়েশন' নামে একটি শিল্পী সংস্থা গঠিত হল। চীনা শিল্পক্ষেত্রে এ'রা শক্তিশালী বামপন্থীর ভূমিকা গ্রহণ করলেন। ক্রমে শিল্প ছাড়া সমাজজীবনের ক্ষেত্রেও এ'রা বামপন্থীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। কমিউনিষ্ট এবং কুমিন্টাঙ দলের দ্বন্দ্বে দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া তখন খুবই দুর্যোগময়। কাজেই যে বামপন্থী শিল্পীদের উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের অনেককেই শেষ পর্যন্ত কারাগারে যেতে হল। যারা বাইরে ছিল তারা ইয়েনানে কমিউনিস্টদের দলে যোগ দিল। এই

শিল্পী—ফাং শিউন কিন্ : পশ্চিম চীনের আদিবাসীদের জীবনযাত্রা নিয়ে ইনি অনেক ছবি এঁকেছেন।

উডকাট বা কাঠখোদাই শিল্প নিরক্ষর লোকদের মধ্যে ভাবধারা সম্প্রসারণের বিশেষ উপযোগী। এর মাধ্যমে অল্প খরচে, অল্প পরিশ্রমে নতুন ভাব প্রচারে অধিক মাত্রায় সাফল্যলাভ সম্ভব হয়েছিল।

ইতিমধ্যে 'স্টর্ম সোসাইটি' নামে এক সাংঘাতিক ধরণের শিল্পীগোষ্ঠীর আবির্ভাব বা প্রাদুর্ভাব হয়ে চীনশিল্পে একটা আলোড়নের সৃষ্টি করে। এ'রা সাংহাই-এ প্রতি বৎসর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতেন। ১৯৩৫ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত এই প্রদর্শনী নিয়মিতভবে চলেছিল। (এই সময়ে চীনকে ধ্বংস করার জন্য জাপানীদের প্রথম প্রচেষ্টা পর্যুদস্ত হয়। কাজেই চীনের গণজীবনে তখন উত্তেজনা ও উদ্দীপনার অন্ত ছিল না।) কিন্তু শীঘ্রই এই শিল্পীদলে মতবিরোধ দেখা দিল। তাদের কেউ কেউ বললেন, শিল্পে আরো বাস্তবতা আনতে হবে, একে একেবারে সর্বহারার শিল্পে পরিণত করতে হবে। আবার কেউ কেউ মনে করলেন, শিল্পে পূর্বেকার শান্ত সমাহিত ভাবকে অব্যাহত রেখে চলাই ঠিক হবে। এই দুই মতের টানাটানির দরুণ এই দলটি শীঘ্রই ভেঙে যায়।

১৯৩৭ খৃস্টাব্দে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রাক্কালেই শিল্পের নব্য প্রচেষ্টাগুলি দেশের চিত্তকে অধিকার করেছিল। এই সময়ে যদিও অধিকাংশ শিল্পীই বাম বা দক্ষিণ কোন্ পথে পা দেবেন তা নিয়ে ভাবনায় পড়েছিলেন, তবু সাধারণভাবে বলা যায়, গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আশায় তাঁরা কমিউনিস্টদের দলে ভিড়তে অসম্মত ছিলেন। তবে, কুমিন্টাঙ-এর একদলীয় শাসনকেও তাঁরা মেনে নিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। ফলে যে অনিশ্চয়তা তাঁদের মনে বদ্ধমূল হয়ে যায় তা আর অপসারিত হয় নি। যা হো সাংহাই হ্যাংচো ক্যান্টন প্রভৃতি স্থা যে-সকল শিল্প বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল সেগুলিতে সদ্য ইউরোপ প্রত্যাগত চীন যুবকদের খুবই ভীড় হতে থাকে। বড় বড় শহ রীতিমতো চিত্র প্রদর্শনী খোলা হচ্ছে; তা কোনো একজন শিল্পীর কিংবা কোনে একদল শিল্পীর আঁকা ছবি সাজানো হচ্ছে এই সময়ের শিল্পীদের মধ্যে ফাং শিউনকিন ৎসো শুজেন, লু স'পাই, লি ইউ শিং এব লিউ থাইছু এই ক'জনের নাম বিশেষভা উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত শিল্পী একজন ভাস্কর এ'রা প্রায় প্রত্যেকেই ফ্রান্স ও বেলজিয়ামে ভাব ধারার সঙ্গে যোগ রেখে শিল্প সাধন করে চলেছিলেন।

তারপর যুদ্ধ এলো। একটির পর একা বড় বড় উপকূল-শহর জাপানীদের হা যেতে লাগল। লক্ষ লক্ষ আশ্রয়প্রার্থী পূ থেকে পশ্চিমে পালিয়ে আসতে লাগল

তুষারপাত] [শিল্পী চ্যাং অ্যান-চি শুজু পিঙঁর ছাত্র

পদ্মফুল ] [শিল্পী—চ্যাং তা চিয়েন

সবশেষে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে জাপানীরা চুংকংএর নীচে ইয়াংশী নদীতে পার্বত্য বাঁধের কাছ পর্যন্ত এগিয়ে এলো। এই সব এলাকায় যত শিল্পবিদ্যালয় ছিল, সবই বন্ধ হয়ে গেল। কতকগুলি আবার নূতন করে চুংকিং, চেংটু, কুনমিং এবং কুয়েইলিন্ শহরে স্থাপন করা হল। এগুলি মুক্ত চীনের সংস্কৃতি-কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হল। জাপ আক্রমণের ফলে চীনা শিল্পীদের সংহতি নষ্ট হয়ে গেল, তার ফল সুদূরপ্রসারী। তা ছাড়া, অল্প মজুরী ও অধিক পরিশ্রম শিল্পী-জীবনকে পর্যুদস্ত করে হয় তাঁদের কারিগরের শ্রেণীতে নয় তো প্রচারকের পর্যায়ে এনে ফেলল।

এই বিপর্যয়ের একটা কল্যাণকর দিকও যে নেই তা নয়। যারা ছিল স্বভাবতঃই কল্পনাচারী, তাদেরও বাস্তব জীবনের দিকে এবং প্রত্যক্ষ প্রকৃতির রূপে মন আকৃষ্ট হল। পশ্চিম চীনে সরে আসার পর তথাকার আরণ্য সৌন্দর্য শিল্পীদের যে অভিভূত করেছিল তারই ফলে, একটি সম্পূর্ণ নিজস্ব নূতন ভাবধারা তাঁদের অঙ্কনের মধ্যে ধরা দিয়েছিল। বিদেশী প্রভাব থেকে মুক্ত এই ভাবধারায় তারা যেন সত্য ও শাশ্বত চীনকে খুঁজে পেলেন। তিব্বতের সীমান্ত অঞ্চল ও উচ্চভূমি, মঙ্গোলিয়ার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, মিয়াওনোস্নো ও চিয়াং জাতীয় লোকদের বর্ণপ্রিয়তা এই প্রথমবার শিল্পীর ছবি আঁকার বিষয়বস্তুরূপে পরিগণিত হল। চীন শিল্পের এই বিবর্তন যে বিশেষ আশাপ্রদ ও সম্ভাবনাময়, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

তুন্ হুয়াং একটি প্রচীন শহর। এখানে পার্বত্য গুহা ও মন্দিরাদির কারুকার্য প্রসিদ্ধ। ভারতীয় বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ এই নগরী অতিক্রম করেই চীনে যাতায়াত করেছিলেন। চীনের শিক্ষা বিভাগ এখানকার বিখ্যাত ভিত্তি চিত্রাবলী পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে একটি গবেষণাগার স্থাপন করেন। সমসাময়িক চীনা শিল্পীদের অনেকেই এখানকার ভিত্তি চিত্রাদির সম্বন্ধে চাক্ষুষ জ্ঞান লাভের জন্য এখানে যাতয়াত করেন। এখানে যাঁরা কাজ করেছেন—তাঁদের মধ্যে চ্যাং তা' চিয়েন, কুয়ান্ শান্ ইয়ে, উ ৎসো শুজেন্, ইয়ে ছিয়েন ইউ এই ক'জনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বড়ো আর একটি শিল্পীগোষ্ঠী তিব্বত ও সীমান্ত অঞ্চল পর্যটন করে শিল্পের উপাদান সংগ্রহ করেন। এই দলের ফাং শিউন্ কিন চীনের কারু ও নক্সার ইতিহাস সম্বন্ধে ইতিপূর্বে বহু বৎসর গবেষণা করেছেন। উ ৎসা শুজেন, ইয়ে ছিয়েন ইউ এবং শিয়াও তিং এ'রাও উক্ত দলের মধ্যে ছিলেন। এই শেষোক্ত শিল্পীরা ব্যঙ্গচিত্রকর রূপে জীবন আরম্ভ করেন, কিন্তু পরে উচ্চ ভাবের আলেখ্য রচনায় পারদর্শিতা দেখিয়েছেন।

এবার চীনের শিল্পাচার্য শুজু পিও সম্বন্ধে কিছু বলে প্রবন্ধ শেষ করব। চীন শিল্পের নব্য ভাবধারা তরুণ অবস্থাকে যাঁরা লালন করে বাঁচিয়ে তুলেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে শুজু পিও'র নাম করতে হয়। শিল্প শিক্ষাদান তাঁর অন্যতম ব্রত। তিনি অক্লান্ত-কর্মা। তাঁর প্রতিভাও বহুমুখী। বহুবিধ অঙ্কন-পদ্ধতি, বহু বিচিত্র ভাবের ব্যঞ্জনা তাঁর শিল্পে বিশেষ বলিষ্ঠভাবে রূপায়িত হয়েছে। চীনের শিল্প বিবর্তনের একটির পর একটি স্তর তাঁর শিল্পে সুস্পষ্টভাবে অঙ্কিত। তাঁর শিল্প প্রচেষ্টার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে লোক-শিল্পের বিকাশ। ইতিহাসকে ও গাথা-জাতীয় কাহিনীকে চিত্রে রূপ দেওয়া তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। চিত্রে কখনো তিনি তৈল রং ব্যবহার করেন কখনো বা খাঁটি চীনা পদ্ধতিতেই ছবি আঁকেন। তবে রূপ-কল্পনায় পাশ্চাত্য বস্তুনিষ্ঠা বা অনুকৃতিপ্রবণতা লক্ষিত হয়।

যাঁরা ঐতিহ্যের আশ্রয় গ্রহণ করেননি, বরং 'আধুনিক' থাকতে চেয়েছেন,—যেমন উ ৎসা শুজেন এবং লিউ স'পাই—যুদ্ধের সময়ে তাঁদের শিল্পচর্চায় একেবারে ভাটা পড়ে গিয়েছিল। অন্যদিকে, ফাং শিউন কিন্ প্রমুখ শিল্পিগণ তাদের ফরাসীতে প্রাপ্ত শিক্ষার সঙ্গে যুক্তিসঙ্গতভাবে চীনে অতীত অঙ্কন পদ্ধতিকে মেলাবার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারার এবং অঙ্কন পদ্ধতির সার্থক সমন্বয় সাধনের এই চেষ্টা যদি সফল হয়, তাহলে চীনা শিল্পের সুপ্রাচীন অতীত ইতিহাস যেমন মহিমময়, তার ভবিষ্যৎও যে তেমনি বা ততোধিক উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, এরূপ প্রত্যাশা অনুচিত বলা চলে না।

প্রকৃতির শোভা ] [ শিল্পী কুয়ান শান-ইয়ে

[ পূর্বানুবৃত্তি ]

ফ্যালনার ঘরে কিন্তু এত রাত অবধি আলো জ্বলে না। সন্ধ্যাটি হ'তে রান্নাটি শেষ ক'রে খেয়ে ফেলে ফ্যালনা।

রাত জেগে করবে কি। চাটাইয়ের ওপর শুয়ে চিন্তা করে সে। শহর অঞ্চলে জায়গা। রাস্তায় বেরোনো মানে পয়সা খরচ। গাঁয়ের ছেলে শহরের বিস্কুটের কারখানায় খেটে খেটে এসেছে। ঘরে বুড়ো বাপ আছে, বোন আছে বিয়ের বাকি। এসব চিন্তা ক'রে মুখ বুজে খাটে আর মাইনের টাকার অর্ধেকটা মনিঅর্ডার ক'রে পাঠিয়ে দেয়। ফ্যালনা জানে আমোদ ফুর্তি। কিন্তু তার রসদ যোগাতে কড়ি জুটবে কোত্থেকে। তাই চুপ ক'রে থাকে সে।

রাসু হাসে। 'কড়ি জুগাইব ভূতে, কড়ি জোটায় শয়তান, বুঝলি ফুর্তি করবার মেজাজ অইলে আপনা থেহে জোটে।'

ফ্যাল্না ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে থাকে। রাসুর মুখ দেখে না। অন্ধকার ঘর। রাসুর গলা শোনে। আর দেখে ফটাস্ ক'রে দেশলাইর কাঠিটা জ্বলে উঠে একটা বিড়ির মুখ লাল ক'রে দিয়ে আবার নিভে গেছে। বোঝা গেল, রাসু চাটাই বিছিয়ে শোবার উদ্যোগ করছে।

'কডা বাজে, রাসু ভাই?'

'বারোটা বাজাইছে ঘড়ি শুনছস না।'

ফ্যালনা কান পেতে শোনে। জেলখানার পেটা-ঘড়ির শব্দ এখান অবধি ভেসে আসে। চ্যাটাইয়ের ওপর গা মেলে দিয়ে রাসু ফের ফিক্ ফিকিয়ে হাসে। যেন বাইরে সারাদিন যত আমোদ ফুর্তি ক'রে এসেছে সেগুলি এখন পেটের ভিতর গুন্ গুন্ করছে। হাসির ধমকে রাসুর হাতের বিড়ি কাঁপে। দেখে অন্ধকারে ফ্যালনা একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে।

'বুঝলি বেড়াল আইজ আবার বেড়ার ধারে আইছিল।' রাসু বলল। ফ্যালনা চুপ করে রইল।

'আইজ আমি যতবার তাকাইছি আমারে দেখছে।' রাসু আবার বলল। ফ্যালনা চুপ।

'চলা ফিরা দেখলে বোঝা যায় কেমনতর মাইয়্যা।' যেন নিজের মনে রাসু এবার হাসল একটু।

'তোমার কি পাপের ডর নাই, রাসু ভাই।'

'পাপটা কোন্হানে দেখলি তুই, পাপ কেম্নে জিগাই।' রাসু মুখের একটা শব্দ করে।

'মাগীপট্টি গিয়্যা শরীল তোমার পচা ধরছিল্। ডাক্তারের ইঞ্জেশনে ভাল অইলা। অখন ওর মাইয়্যার সব্বনাশ ভাবছ বুঝি।'

রাসু চুপ করে থাকে।

ফ্যালনা বলে, 'ভাল না এডা। এম্নে কাজ করবা না।'

'আমার দোষ কি। মাইয়্যা যদি আমারে দেইখ্যা বেড়ার কাছে আইয়ে আমি করমু কি।'

ফ্যালনা আবার তখন চুপ করে থাকে। কা'র দোষ ভাবে। রেলের মালগুদামে কাজ করার সময় রাসুর এক পা কাটা গেছে। তখন থেকে খোঁড়া। একটা চোখ গেছে খারাপ রোগে। চিরকালইতো ও কুচরিত্র। দুজন, মানে ফ্যালনা আর রাসু যখন গাঁ ছেড়ে শহরে এল রোজগারের ধান্ধায় সেদিন থেকে রাসুর বদ্ দিশা। ফ্যালান দেখছে। কিন্তু সাহস পায় না সে কিছু বলতে। কারণ ফ্যালনার চেয়ে রাসু রোজগার করে বেশি, অনেক বেশি। তাই রাসুর প্রতাপ অধিক, হাঁক বড়। 'তুই কি বুঝবি। তোর ক্ষেমতা আছে মাগীপট্টি যাইবার?' যখনই বেশ্যাবাড়ি যেতে রাসুকে মানা করেছে ফ্যালনা রাসু মুখ ঝামটা মেরেছে। 'পয়সা নাই তাই বগা অইয়্যা আছিস।' ফ্যালান চুপ। রাসু বলে, 'বয়সকালে মাগী চায় না, মাইয়্যালোকের সনে ঘুম পাড়তে মন কয় না,—এমন মানুষ দেহা না একটা।'

কথাটা ঠিক। ফ্যালান ভাবে।

ফ্যাল্নার বয়স চব্বিশ, রাসুর তেইশ।

ফ্যাল্না [illegible] বিস্কুটের কারখানায় কুড়ি টাকার চাক্রি। ঘরে বুড়ো বাপ আছে, বোন আছে বিয়ের বাকি। ক্ষেত-খামার নেই। এই কুড়ি টাকা এখন সম্বল। অবশ্য রাসুর কথা অন্যরকম। শহরে পা না দিতে ও হুট্ ক'রে মালগাড়ির চাক্রি জোটায়। তারপর 'অটো-দিল-বাহার' বিড়ির কারখানায় কাজ জোটে। চুক্তির কাজে পয়সা বেশি। ফ্যালনা মাথা কুটে পারল না এমন একটা কাজ বাগাতে। ফ্যালনার চেয়ে রাসুর বুদ্ধি বেশি, চতুর বেশি। অবশ্য বিয়ের কথা তুললে রাসু বলে, 'কাজ কি মরা গলায় বাঁইধ্যা। বিয়া করা মাইয়্যার ঝকট বেশি, লটখড়ি, বুঝলি এর নাম শহর। এহানে পয়সা দিলে অই দব্য জোটে।' ফ্যালনা আর কিছু বলে না। কেননা, রাসুর যে রোজগার বেশি বড় গলা ক'রে ও যখন এটা জাহির করে তখন আর ফ্যালনার কিছু বলার থাকে না। তবু, ফ্যাল্না মনে মনে জানে, রাসুর শহুরে মেয়ে ছাড়া এখন অন্য মেয়ে পছন্দ হবে না। ওর চোখের দিশা ঘুরে গেছে গাঁ ছাড়বার পর থেকে। কোনখানে কাজল, মাথায় সুগন্ধতেল, পায়ে আল্তা, খুঁজছে কেবল এইসব। বলে, 'তোর বোন কুসুম তো ওই মেয়েডার সমান।' একদিন বাজারের পিছনে গিরিবেশ্যার মেয়ে চপলকে দেখিয়ে রাসু বল্ছিল, 'তোর বোন কুসুমের থন ময়লা রঙ নাকটা থ্যাব্ড়া বেশি। সাজের গুণে কেমন চমৎকার লাগ্ছে দ্যাখ্। ছাঁদছিরি কত অন রকম।' চপল চুল ছেড়ে দিয়ে গলির মুখে দাঁড়িয়ে ছিল। ফ্যালনারও ভাল লাগছিল দেখে। পায়ে আলতা,—চটি-পরা পা। বুকের মাঝখানে একটা ফিতের বাঁধন ছাড়া আর ঢাকনা নেই। আস্ত একটা সিগারেট টানছিল চপল দুই চোখে লম্বা ক'রে টানা কাজল। কানে ঢলঢলে মাকড়ি। বুকের আঁচলটাও ঢল্ঢলে হয়ে পিছনে পড়ছিল কোমর বেয়ে। ফ্যালনা কতক্ষণ কথা বলতে পারেনি। বাজারের গলি পার হয়ে রাসুকে বলছিল, 'তবু তো নষ্ট মেয়েমানুষ' 'থুইয়া দে নষ্ট আর ভাল। তার লাইগ্যা তো বোন কুসমরে বিয়্যা করমু নাহি। পেত্নীর মত থাহে।'

ফ্যালনা আর কিছু বলত না। কেনন বোন নিয়ে রাসু ঠাট্টা আরম্ভ ক'লে ফ্যালনা চুপ ক'রে যেত। রাসুর বোন [illegible] না বলে অন্যের ওপর এই সুবিধা নি[illegible]। তাই কি কিন্তু রাসুর পরিবর্তনটা তো সে চোখের ওপর দেখছে। ক'দিন হ'ল আর গাঁ ছেড়েছে আসলে রাসু বাবুঘেঁসা হয়ে গেছে—ভয়ানক বাবুঘেঁসা। সেলুনে ঘাড় চাঁছে। চা খায় দিনে আটবার। বিড়ির কারখানায় পোষায় না তা এখন সিনেমার টিকিট কিনে রাস্তায় ঘুরে চড়া দামে বিক্রী করছে। কিছু বললে যে

চি শহরে পয়স্যা রোজগার করতে, সোজা নে বেশি পয়স্যা যেহানে ঢু মারমু সেহানে। র মত সরকার শালার কারখানার পচা গোবর য়া বিস্কুট বানামু নাহি ভাব্‌ছিস।'

এর পর ফ্যাল্‌না আরো চুপ ক'রে যায়। ল্‌না যে সরকার কোম্পানীর বিস্কুটের খানার কাজ ছাড়া আর কোনো কাজই গাড় করতে পারে নি এই তিন বছরে রাসু ন্যে ওকে ধিক্কার দেয়। 'তুই আহাম্মক, বুক, গাঁয়ে যাইয়া মাটি কাট, শহরের যুক্ত না।'

'বুঝলি, মগজ থাকলে পয়স্যা আইয়ে, আর স্যা যহন আইয়ে তখন মেজাজও হয় অন্য-ম।' রাসু বোঝাচ্ছিল, 'এক পয়স্যার বাপ, তুই রসের বুঝবি কি।' অর্থাৎ পের কথায় রাসু আজ আবার রেগে ল্‌নাকে যা-তা বলছে। অনেক রাত পর্যন্ত বে ও। টের পেয়ে চুপ ক'রে, যেন ঘুমিয়ে ড়ছে, এমন ভাণ ক'রে রইল ফ্যাল্‌না নকক্ষণ।

অন্ধকারে রাসুর মুখে খৈ ফুটছিল। নিফের হোটেলে মুর্গি খাইছি তো পাপ ইল, চপলের বাড়ি গিছি তো পাপ করলাম, নেমার টিকিট বেচায় পাপ,—তোর শালা নিয়ার বেবাক কামই পাপ। পয়স্যা খরচের মতা নাই যার তার মনে পাপের ডর ছাড়া র কিছু আছে নাহি।'

ফ্যাল্‌না আর শব্দ করে না। রাসু ঘুমন্ত ল্‌নাকে শুনিয়ে শুনিয়ে রসের কথা বলে, ইল আইছিল্ বেড়ালনী সিঁড়ির মাথায়, ইজ আইছিল্ একবারে বেড়ার গা ঘেঁইস্যা। বার বিড়ি ধরাইছি মাথার চুলে হাত কাইছিল্ মাইয়া। এ হগল লক্ষণ কি আর ঝবার বাকি আছে। চুল্‌বুল্ করছে শরীল! স বাড়ছে না?'

কিন্তু ফ্যাল্‌না ভাবছিল কাণা খোঁড়ার কে তাকায় আর বিড়ির আগুন দেখে খোঁপায় ত বুলায় এমন মেয়ে কেমন মেয়ে। 'বয়স ড়ছে চুল্‌বুল্ করছে শরীল।' রাসুর কথায় ট্ ক'রে আর একটা কথা মনে পড়ে ্যাল্‌নার। তখন তার মন আরো বেশি খারাপ য়। কুসুম এই ষোলয় পা দিয়েছে, এখন র্যন্ত ফ্যাল্‌না ওর বিয়ের কোনো ব্যবস্থাই রতে পারছে না। রাসুর কথায় আর ওর মন াকে না। েন নিজের মনে রাসু বলছিল, া,—কি পাছা, কেমন রং, পামু; মাইয়ার যখন ওলমতি হাত বাড়াতে দেরী অইব না।'

যেন হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গেছে ফ্যাল্‌নার। উঠে রজার ঝাপ তুলে বাইরে প্রস্রাব করতে যায়। ন্দমগাছের মগডালে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ ঝুলছে। াদুড় ঝট্‌পট্ শব্দ করছে থেকে থেকে মাথার পর। রাত নিশুতি। চারদিক নিঝুম। সনেমাঘরের উঁচু গম্বুজটার দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইল ফ্যাল্‌না। র বকর্ থামলে ও ঘরে গিয়ে শুতে পাচ্ছে। মতলব। নেই যা

সিনেমাহলের পিছনের একটা পর্ট। হ্যাঁ, এটা। চারদিকে ভাঙ্গা ইঁট আর পাশের সারা-মিলের অনেকগুলো মরচে ধরা ফুটো টুসিধে, কানাস্তারা জড়ো ক'রে রাখা হয়েছে। 'রাইস মিলের মালিক সনাতন পোদ্দারকে বলে কয়ে রাসু এই চালাটা জোগাড় করেছে দু'জনের থাকবার জন্যে। চার টাকা ভাড়া। তা হলেও সুবিধা আছে। শহরের মধ্যজায়গা এটা। সকালে উঠে ফ্যাল্‌নার বিস্কুটের কারখানায় যেতে দু'মিনিটের বেশি সময় লাগে না এখান থেকে, আর সিনেমাহল সামনে, একেবারে ঘরের গা ঘেঁসে আছে বলে রাসুর সুবিধা আরও অনেক বেশি ফ্যাল্‌না বোঝে। কিন্তু সে সব তো আর ভাবছিল না সে এখন, ভাবছে সুন্দরী-তলার শনক্ষেতের আড়ালকরা একটা মেটে ঘরের কথা। ঘরের পিছনে তালের জঙ্গল। বুড়ো বাপ কাশছে। কুসুম পিদিম জেবলে ওষুধ বাটছে শিয়রে বসে। বাপের সেবা করছে না কি, অতবড় মেয়ে, না নিজের ভাবনা ভাবছে।

যেন কিছু ঠিক করতে পারে না ফ্যাল্‌না এক এক সময়। দূরে থাকলে বাড়ির ভাবনা বেশি আসে মনে, ফ্যাল্‌না আজ তিন বছর লক্ষ্য করছে। যেন কুসুম না থাকলে ভাবনাটা একটু কম হ'ত। তা-ও সময় সময় মনে হয় তার। 'আ,—কি রং, কেমন মাইয়্যার পাছা।' রাসুর কথাবার্তার ঢং এত খারাপ যে, এসব শুনে ফ্যাল্‌নার দুশ্চিন্তা আরো বেড়ে যায়। তাই সে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে।

পোদ্দারের রাইসমিলের চালার দিকে চোখ রেখে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল ফ্যাল্‌না। হঠাৎ চমকে উঠল। চমকে উঠবার কথা বটে। ফট্‌ফট্ করছে জ্যোছনা। সাদা ধব্‌ধবে কি একটা মিলের গুদামঘরের চালা থেকে লাফিয়ে নিচে কানাস্তারার গাদায় এসে পড়ল। অথচ শব্দ হ'ল না এক ফোঁটা। চোখ বড় ক'রে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর ফ্যালনা বুঝল, কি এটা। ইঁটের গাদার পাশে মোটা ল্যাজটা ওপরের দিকে তুলে দিয়ে লাল বাদামি চোখ মেলে কট্‌মট্ করে তাকিয়ে আছে ফ্যালনার দিকে। যেন ফ্যাল্‌নার ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়বে। কেন, রাগ, কিসের রাগ বেড়ালনীর, ফ্যাল্‌না বুঝল না, বুঝতে চেষ্টাও করল না, কেননা, অবাক হয়ে সে কেবল ভাবছিল তখন এমন শব্দ না করে ওরা চলাফিরা করে কি ক'রে। রাসুর বেড়াল বেড়ার ধারে যখন এসে দাঁড়ায় পায়ের শব্দ হয় না কি একটু।

ফ্যাল্‌না ফের যখন ঘরে গিয়ে ঢোকে, রাসু কিত্‌কিত ক'রে হাসে। বোঝা গেল রাসু তখনো জেগে। কি এক কুমতলব এসেছে মাথায়।

...কের ন্যাকামি হচ্ছে? সুখসিন্ধু এবার দিলো, বললো, আমার বাসায়। তিন মাইল, আমার বাড়ি আধ ...লে ব্রীজের গায়েই। কোন্‌টা অম্লশূল... অজীর্ণ, পে... ডিওডিন্যাল ...হয়ে বললাম, আধ মাইলটাই। ডিসপেপসিয়া, ...ম দুজন। যাদের সম্পর্কটা রোগ যকৃতসংক্রান্ত... কাঁচকলায় তারাই এক নিমেষে পাকি। বহু... অন্তরঙ্গ সুহৃদ। বহুদিন দেশ-...র বিস্তৃত... ...টুর স্বাদ বড় মিষ্টি লাগতে যায় রাসুর... অথবা ই বন্ধুকে পেয়েই হয়ত।

টের পেয়ে ... ছিলাম জোরে ...ড়িতে টান দিয়ে মাতব্বরের মত ... বিড়বিড় করে। 'অভাব অভাব কইর‍্যা প্যান্ প্যান্ করছ, ইডা করলে দোষের কি অইব শুনি, না মাইয়াছেলে ইহানে কিছু কম চাক্‌রি করছে।'

ফ্যাল্‌না নীরব।

'শহর-বন্দর জায়গা। বইনেরে ইহানে রাখলে চালাকচতুর অইত।' রাসু বলল, 'রাজী থাকিস ত আমি তোর বইনের চাক্‌রি খুঁজি।'

অরুণা স্থির হয়ে শুনল। অরুণা শুনছে এখানে এসেছে পর থেকে।

টেবিলের ওপর দুই হাত রেখে ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলে সুশী বলল, 'তারপর শোন অরুণাদি—'

বয়সে সমান দু'জন, কি হেডমিসট্রেস সুশীলার চেয়ে দু' এক বছরের ছোটও হ'তে পারে, তথাপি পদমর্যাদা বজায় রাখবার জন্যেই যেন অরুণাকে সুশী 'অরুণাদি' ডাকে। বলল, 'আমাদের প্রেমের কৈশোর তখন, আমায় ও প্রেজেণ্ট করেছিল এত বড় একটা আরশী, বলেছিল, যতবার এই আরশীতে মুখ দেখবে আমার কথা মনে পড়বে তোমার, কেননা তোমার মুখ আমার মনের আয়নায় রাতদিন ভেসে আছে, ভেসে থাকবে, সুশী।'

একটুক্ষণ চুপ থেকে আজ অরুণা প্রথম প্রশ্ন করল, 'কিন্তু বিয়ে করতে গেছলে কেন, বিয়েতে রাজী হওয়া তোমার উচিত হয়েছিল কি?'

'ও বিয়ে করবে না যেদিন শুনল আমার মা' সুশী ক্ষীণ হাসল, অরুণার চোখে চোখে চেয়ে অল্প মাথা নেড়ে বলল, 'জানই তো, বাংলাদেশ, মেয়ে বড় হয়েছে মা কি আর চুপ ক'রে বসে থাকতে পারে। বিধিমত বিয়ের চেষ্টা চলল পাত্র ঠিক হ'ল—'

'আর ওমনি তুমিও রাজী হয়ে গেলে?'

'আমার মতামতের দাম কি। সতেরো বছরের মেয়ের ইচ্ছা অনিচ্ছার মূল্য কে দেয় এই সমাজে?'

অরুণা চুপ।

# সূর্যমি

...সলিং-এর ...গলা— 'তুমি ... আসনি অরুণাদি, ...শুড়ী একদিন এসেছিলেন এখানে ছোট দেওরকে সঙ্গে নিয়ে।'

'তোমায় দেখতে?'

'আমায় ফিরিয়ে নিতে।' অরুণার মুখের ওপর চোখ রাখল সুশী। 'আমার কথা শুনে তুমি অবাক হচ্ছ, আমায় ওরা আদর করত, আমায় রাখত ওদের আপনজন ক'রে তবু কেন চলে এলাম? কেন মন বসল না একান্নবর্তী বিশাল গৃহস্থপরিবারের শুদ্ধাচারিণী পতিব্রতা বিধবা সেজে থাকতে। আমার মনেও এ প্রশ্ন জেগেছিল, কেন এলাম।' সুশী চুপ করল। অরুণা নীরব।

'ভালবাসা?' সুশী হঠাৎ প্রশ্ন করল যেন, তারপর আস্তে মাথা দুলিয়ে নিজের মনে হাসল। 'বিয়ের আগে শহরের একটি মেয়ে একটি ছেলেকে ভালবেসেছিল এদিনে এ দৃষ্টান্তের অভাব নেই, তুমি জান অরুণাদি।'

অরুণা ঘরের দেয়ালের ওপর চোখ রাখল।

'তা নয়। এখন বুঝছি সেজন্য আমি সবাইকে ছেড়ে চলে আসিনি। সত্যি আমার উচিত ছিল, অরুণাদি, ওদের ভালবাসা, এমন স্বামী হয় না, ও'র ভাই, ও'র বাপ, মা,— অতুলনীয়, এমন মানুষ এ জন্মে আর পাব না ঠিক। তা নয়।' আবেশাচ্ছন্ন গলায় সুশীলা বলল, 'এক এক সময় মনে হয়, আমার শিক্ষায় ত্রুটি ছিল, আমার বড় হওয়ার, সতেরো বছর অবধি বেড়ে ওঠার মধ্যে গলদ ছিল নিশ্চয়। বড় ভাশুর বলেছিলেন ঘরে পড়াশোনা কর। দরকার হয় টিউটর রেখে দিই। অর্থাৎ—' স্বচ্ছতর হয়ে এল সুশীলার গলা, 'আর দশটি রুচিবান অভিভাবকের মত তিনি প্রথম শুনে বিশ্বাসই করতে পারেননি আমি বাড়ি ছেড়ে এসে একটা মেয়ে-স্কুলে মাস্টারী করব। যখন কিছুতেই আমায় রাজী করানো গেল না, —ঘরের বাইরে পা বাড়াবই, রাগ ক'রে এক ননদ বলেছিল, শিক্ষয়িত্রীর মেয়ে, শেষ পর্যন্ত অই হবে আমরা কি জানতাম না।'

সুশীলার মুখের করুণ হাসি অরুণাকে আঘাত করল। 'না, হাসির কথা নয়, ঠিকই বলেছিল ননদ মনোরমা। আ, স্বামী সন্তান নিয়ে কী সুখে আছে মনোদি, দেখলে ঈর্ষা

শেষ করে সুশীলা চোখ বুজলো। ...রে আস্তে আস্তে চোখ মেলে ...থায় যেন ফাঁক ছিল, ফাঁকি ছিল শহুরে-জীবনে, শৈশব আর সবটা ...দ আমার এখানে না কাটত।'

...টা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অরুণা কি বলতে ...ল, সুশীলা বলল, 'আমি কি জানতাম ..., অর্ধেক আলো অর্ধেক অন্ধকার নিয়ে গড়ে উঠছিল আমার প্রথম যৌবন। আধখানা গাঁয়ের মন আর আধখানা নতুন জেগে-ওঠা শহরের দৃষ্টি নিয়ে মা আমাকে মানুষ করছিল। নিশীথ যখনই এবাড়ি এসেছে মা আমাকে অবাধে মিশতে দিয়েছে।'

'তারপর?' অরুণা উৎকর্ণ হয়ে আছে।

'তখন সবে আমি 'দেবদাস' পড়ে শেষ করেছি, ও দেখছিল টার্জন এন্ড হার মেট। এ শহরে তখন সিনেমা এসে গেছে কিনা।' অপরূপ ভ্রূভঙ্গি করল সুশীলা। 'নতুন সভা-সমিতি হচ্ছে। মহিলাদেরও ডাক পড়ত। মহিলাদের মধ্যে সভায় যোগ দিতে দেখতাম কেবল আমার মা আর লিলির মা মানে মোহিনী-বাবুর স্ত্রীকে, আর কাউকে তখন পর্যন্ত দেখিনি।

'তারপর?' সুন্দর কাহিনী শুনবার জন্যে অরুণা সোজা হয়ে বসল।

'মা বসে বসে ঘামত, গলা কাঁপত, গা কাঁপত দেখতাম পুরুষদের সভায় উঠে দাঁড়িয়ে যখন কথা কইত। তবু সারারাত জেগে লেখা 'নারী-প্রগতি' প্রবন্ধ শেষ পর্যন্ত মা পড়ে শেষ করত। অনেকবার করেছিল।'

অরুণা চুপ।

সুশীলা বলল, 'শেষ পর্যন্ত সেই সাহস রাখতে পারেনি, তোমায় আগেই বলেছি, বিয়ের বয়েস হ'তে আমায় পাত্রস্থ করতে মা প্রায় মাথা গরম ক'রে ফেলেছিল।'

'ততটা অগ্রসর হননি তাঁরা তখনও', অস্ফুটে অরুণা বলল।

'আর আমরা রাতারাতি তখন অনেকদূর এগিয়ে গেছি।' উত্তেজিত শোনাল সুশীলার গলা। 'না, অরুণাদি মিথ্যা বলেছি। আমার মতামতের মূল্য দেয়নি মা, তাই বিয়ে হয়েছিল মেয়ের,—বিয়ের ষোল-আনা কারণ বুঝি তা ছিল না। মতামতগুলো নিজের মধ্যে গোল পাকিয়ে তুলেছিল। না-এর চেয়ে হ্যাঁ-এর শব্দই বেশি শুনলাম শরীরের মধ্যে রাত্রে শুতে গিয়ে যখন আয়নার সামনে দাঁড়ালাম। শরীর সম্পর্কে অতিরিক্ত সচেতন ক'রে তুলেছিল আমাদের ভালবাসা। এ যুগের ভালবাসার ধর্মই এই,— জানি না, কাউকে তুমি ভালবেসেছ কি না, অরুণাদি।' উত্তেজনার মধ্যেও সুশীলা ঠোঁট বাঁকা করে ঈষৎ হাসল। 'শরীর সর্বস্ব হয়ে গেছি আমি তখন, সেই সতেরো বছর বয়সে; তাই বিয়ে ও ভালবাসার মধ্যে বিয়ের জয় হ'ল।

তবু দ্বিধা সংশয় দুঃখ বা বিচ্ছেদ-বেদনা, যা-ই তোমরা আখ্যা দাও, মনের আনাচে-কানাচে যে-টুকু লেগে ছিল, সন্ধ্যার পর নিশীথের কথা শুনে তা একেবারে দূর হ'ল। —'আমি ত আছিই তার ওপর একটা স্বামী জুটল,' কানে কানে বলল ও 'তোমারই লাভ হল বেশি, সুশী। তুমি সুখী।'

সুশী চুপ করল।

অরুণা তেমনি নীরব।

সুশী বলল, 'তাই স্বামীর কাছে যেতে দুঃখ তো হ'লই না এবং শ্বশুরবাড়ি থেকেও যতবার এখানে এসেছি আমার সুখের তার সমানভাবে বাঁধা আছে দেখলাম। বুঝলে অরুণাদি, শ্বশুরবাড়ি যাওয়াতে মা যেমন খুশি হয়েছিল, এখানে ফিরে এসেও সন্ধ্যার পর সন্ধ্যা যখন নিশীথের সঙ্গে কাটত মাকে একদিন অখুশি হতে দেখিনি, এমন।'

সুশীর চোখে চোখে তাকাল অরুণা।

সুশী চোখ না নামিয়ে বলল, 'শরীরধর্মী ভালবাসা অবসরের অপেক্ষা রাখে কম। একবার শ্বশুরবাড়ি থেকে ফিরতে দেরী হয়েছিল বেশ কিছুদিন। এসে দেখলাম, অবশ্য এমন আশঙ্কা বুকের মধ্যে জেগেছিল আমার বিয়ের রাত থেকেই, নিশির পাশে আর একটি মেয়ে, লিলি।'

'লিলি নন্দী, যে আজ বিকেলে দলবল নিয়ে মহিলা-সমিতির চাঁদা তুলতে এসেছিল?'

'হ্যাঁ, চেয়ারম্যান মোহিনীবাবুর মেয়ে।' একটু থেমে সুশীলা বলল, 'না, লিলি ভুলে গেছে, জীর্ণ পত্রের মত উড়িয়ে দিয়েছে সব স্মৃতি, ওর শক্তি আছে তাই। আমি পারি না, আমি পারিনি, দুর্বল, তাই কি। শরীরের স্বাদ—'

অরুণা চোখ নামাল।

'হ্যাঁ, লিলি একটি সন্তান পর্যন্ত ধারণ করেছিল। আমি জানি। আমার কাছেই এসে কেঁদেছিল। প্রেমিক তখন শহর ছেড়ে পালিয়েছে।'

'তারপর?'

ঠিক চমকায় না অরুণা। বড় বড় চোখে তাকায়।

'এত কথা তোমায় আজ বলতাম না, অরুণাদি।' সুশীলা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'লিলি নন্দী ফুরফুরে প্রজাপতি সেজে চাঁদা তুলছে, বা ফিরে এসে নিশীথ দিব্যি গাড়ি চড়ে নিরঞ্জন রায়ের স্ত্রীকে নিয়ে হাওয়া খাচ্ছে, সে সব আমার বক্তব্য নয়, আমার কথা আমাকে নিয়ে, আমি কেন নিঃশেষ হয়ে গেলাম।' করুণ চোখে তাকায় সুশীলা। 'অগ্রসর হতে এক জায়গায় এসে কি আমি থেমে যাইনি?'

'কি রকম?'

'থাক আজ আর নয়।' হঠাৎ উঠে দাঁড়াল সুশীলা।

'অই দেখ রাত বারোটা বাজে।' আঙুল [দিয়ে] অরুণার টেবিলের টাইমপীস দেখিয়ে [সুশী]লা বলল, 'তোমায় ডিসটার্ব করলাম। [অনে]কা সময় নষ্ট আর কি। আসল কথা কি, [আমা]র কোল্ড-ক্রীম ফুরিয়েছে তোমার একটু নিতে এলাম, ভাই। ঠাণ্ডায় ঘুরে এসে মুখ চর্‌চর করছে।'

'হ্যাঁ, তা নাও, নেবেই তো।' হাত বাড়িয়ে [অরু]ণা ক্রিমের কৌটো এগিয়ে দেয়।

'সতেরো বছর বয়স থেকেই এই শরীরের [দিকে] ঝোঁক পড়েছিল কি না, তাই শরীরে [একটু]ও একটু ফাটল ধরলেও চিন্তা হয়।'

সুশীলার কথায় অরুণা হাসল।

'চিঠি লিখছিলে নাকি?' টেবিলে ঝুঁকে [পড়ল] সুশীলা।

'হ্যাঁ, বোনঝিকে।' অপাঙ্গে অরুণা টেবিলের [ওপ]র নিজের লেখা অর্ধসমাপ্ত চিঠিটা একবার [দেখ]ল।

সুশী সোজা হয়ে দাঁড়াল 'একটা প্রশ্ন [কিন্]তু তোমায় আজও করা হয়নি, অরুণাদি।'

'কি, প্রেম, কাউকে ভালবেসেছি কি না?'

আঙুলের ডগায় ক্রীম তুলে গালে ঘসতে [ঘস]তে হঠাৎ স্থির হয়ে গেল সুশীলা।

'ভালবাসতে কি না।' সুশীলা হাসল। [যা]র যে বাসছে সে কোন্ দুঃখে শিক্ষয়িত্রী-[গির]ী করতে আসবে?'

'অর্থাৎ শিক্ষয়িত্রীর শূন্য ধূসর জীবনে [প্রে]মের অবকাশ নেই এই তুমি বলতে চাও?'

'এদেশের শিক্ষয়িত্রীদের দেখলে কি তাই [মনে] হয় না, অরুণা?'

'হবে, হতে পারে।' অরুণা দেয়ালের [এ]ক চোখ রাখল। সুশীলা আস্তে আস্তে [ঘর] থেকে বেরিয়ে গেল।

অরুণা আরো কতক্ষণ তেমনি চুপ করে [বসে] রইল। সুশীর কথাগুলো ঘুরে ফিরে [তা]র মনে হচ্ছিল। সুশীর সঙ্গে এক সঙ্গে [কথা]গুলো কথা অরুণার আর হয়নি এখানে [আসা] অবধি। কথায় কথায় শনিবারের বিকেল [ওরা] দুজন আজ বেড়াতে বেরিয়েছিল। [রে]স্টুরেন্টে স্কুল-কমিটির সদস্যদের সঙ্গে বসে [খা]ওয়া, গল্প করা এবং ডাক্তারবাবুর দুজনকে [এ]কেবারে মুড়ীর দরজা পর্যন্ত পৌঁছে [দে]ওয়ার প্রত্যে[ক]টি দৃশ্য অরুণার মনে পড়ল। [মনে] পড়ল মহিলা-সমিতির অগ্রণী লিলি [ন]দীকে, স্টুডিবেকারের স্টীয়ারিং হুইল ধরে [ব]থা নিশীনাথকে, নিশানাথের ঘাড়ের কাছে [মু]খ এনে ধরা পশ্চাদ্বর্তিনী রূপসীকে, আর [পাষা]ণের মত স্থির,—গাড়ির পিছনের সীটে [উপ]বিষ্ট নির্জীব ধনাঢ্য এক নিরঞ্জন [রায়]কে। তিনটা আধুনিক শহর ঘুরে অরুণা [এখ]ানে এসেছে, এই ছোট শহরে। আধুনিকতার [ছি]টেখাটো সুন্দর কাঠামোটি এখানে গড়ে উঠেছে অরুণা চোখের ওপর দেখতে পাচ্ছে। অসংলগ্নতা বা আশ্চর্যের কিছুই নেই যা স্বাভাবিক,—অন্য শহরে যেমন আছে। হ্যাঁ, থার্ড ক্লাশে জিওগ্রাফী পড়ায় যে মেয়েটি, সারাদিন এমনি প্রায় চুপ করে থাকে, সাদাসিধে, সেই সুশীর প্রেম, বিবাহ, ব্যর্থতা আর তারপর ব্যর্থ দিনাতিবাহনের রংহীন কাহিনী কিছুই নতুন ঠেকল না অরুণার কাছে,—বা শোবার আগে সুশীর একটু ক্রিম গালে ঘসার লোভ, কি ডাক্তারবাবুর এতরাত্রে টিচার্স-কোয়ার্টারের চৌকাঠ পর্যন্ত আসা বা শিশুর মত অবিমিশ্র হাসি। স্বাভাবিক, সবই স্বাভাবিক। সাড়ে বারোটায় ঘরে এসে যখন ঘড়ির কাঁটা টিক্‌টিক্ করছে অরুণা কলম তুলে চিঠি শেষ করতে বসল। শোবার আগে তার মনে পড়ল সুশীলার সুন্দর কথাটি, 'অগ্রসর হতে হতে একজায়গায় এসে যেন থেমে গেছি। আমি কি দুর্বল?'

প্রতিপদের চাঁদের মত পরিচ্ছন্ন মার্জিত এক চিলতে হাসি অরুণার ঠোঁটে উঁকি দেয়। চিঠি লেখা শেষ ক'রে আলো নিভিয়ে সে শুয়ে পড়ে। সুশীর ঘরের আলো নিভেছে অনেকক্ষণ।

কিন্তু ঘরের আলো নিভলেই তো আর চোখে ঘুম নামে না। সুশী ঘুমোয়নি, শুয়ে শুয়ে ভাবছে, অরুণা অনুমান করল।

সবচেয়ে বেশী রাত অবধি আলো জ্বলে পপি-লজে, নিরঞ্জন রায়ের বাংলোয়।

দিনের বেলায় বাংলোটি দেখতে ছবির মত সুন্দর। লাল সুড়কি ঢালা, সবুজ দুর্বা ছোপানো, জিনিয়া ডালিয়া ম্যাগনোলিয়া ছড়ানো পরিচ্ছন্ন লন, সিমেণ্ট ও অ্যাসবেস্টাসে তৈরী কাগজের মত শাদা ঘর। সবুজ জানালা। জানালার পর্দা আকাশের মত নীল।

শহরের এটা শেষ প্রান্ত। তার পরে মাঠ, তারপর নদী। নদীর যেখানে শুরু সেখান থেকে গ্রাম। ধান ক্ষেত, শর্ষে ক্ষেত, বাঁধ, ইঁটের পাঁজা চোখে পড়ে।

(ক্রমশ)


[...]কেন ন্যাকামি হচ্ছে? সুখসিন্ধু এবার [...] দিলো, বললো, আমার বাসায় [...] তিন মাইল, আমার বাড়ি আধ [...]লে ব্রীজের গায়েই। কোন্‌টা
অম্ল[...]
অজীর্ণ, পে[...]
ডিওডিন্যাল [...] হয়ে বললাম, আধ মাইলটাই।
ডিসপেপসিয়া, [...]ম দুজন। যাদের সম্পর্কটা
রোগ যন্ত্রণা[...]চকলায় তারাই এক নিমেষে
থাকি। বহু [...]তরঙ্গ সুহৃদ্। বহুদিন দেশ-
রোগের বিস্তৃত [...] ঔষধ পাঠান [...] স্বাদ বড় মিষ্টি লাগতে
জলপাইগুড়ি অথবা [...] বন্ধুকে পেয়েই হয়ত।
ব্যাকরণতীর্থ, আয়ুর্বেদ[...]লে আমরা ছিলাম
স্ট্রীট, কলিকাতা ৬। ফোন—[...]রাস্তা দিয়ে হাটতে
[...] আসছিল।
[...] তার

ধবল ও কুষ্ঠ

প্রায় ত্রিশ বছর আগের কথা — কাশীধামে কোনও ত্রিকালজ্ঞ ঋষির নিকট হইতে আমরা এই পাপজ ব্যাধির অমোঘ ঔষধ ও একটি অব্যর্থ ফলপ্রদ তাবিজ পাইয়াছিলাম। ধবল, অসাড়, গলিত অথবা যে কোনও প্রকার কঠিন কুষ্ঠ রোগ হোক— রোগের বিবরণ ও রোগীর জন্মবার সহ পত্র দিলে আমি সকলকেই এই ঔষধ ও কবচ প্রস্তুত করিয়া দিয়া থাকি। ইহা সহস্র সহস্র রোগীতে পরীক্ষিত ও সুফলপ্রাপ্ত ধবল ও কুষ্ঠরোগের অমোঘ চিকিৎসা।

শ্রীঅমিয় বালা দেবী
৩০/৩বি, ডাক্তার লেন, কলিকাতা।

# চমক

সুশীল রায়

চৌমাথায় এসে বাস ধরতে হয়। সদরঘাট থেকে শিবপুর আঠাশ মাইল রাস্তা। এই রাস্তায় দিনে চার বার বাস্ যাতায়াত করে। চৌরাস্তায় বাস্-এর একটা ছোট স্টেশন আছে।

তিলিপুকুর থেকে এই চৌমাথা মাইল তিনেক পথ। হাতে সুটকেস আর বগলে বেডিং নিয়ে ছুটতে ছুটতে আসছিলাম। এ বাস্‌টা ফস্কানো চলবে না। তার ওপর আকাশ ভরে মেঘও করে এসেছে। মাথা তুলে আকাশের দিকে তাকাবার ফুরসৎ ছিলো না, চোখ সিধে সামনে রেখে হন হন করে হাঁটছি। ঘড়ি দেখবো, তারও কোনো উপায় নেই—বাঁ হাত আটকা। পাঁচটায় এসে সোয়া পাঁচটায় বাস্ ছেড়ে যায়। যখন কাউনিয়ার সাঁকোয় উঠি, তখন বেডিং নামিয়ে ঘড়িটা দেখেছিলাম—পাঁচটা।

একটা মোক্ষম হোঁচট খেয়ে তাল সামলাবার সঙ্গে সঙ্গে ঝমঝম শব্দে বৃষ্টি নেমে এলো। বৃষ্টির এক-একটা ধারা ধারালো তীরের মতো চোখে মুখে বিঁধতে লাগলো। চশমায় জল পড়ে পথঘাট ঝাপসা হয়ে গেলো। দুর্যোগের সঙ্গে দুর্ভোগটা এভাবে আসবে জানা ছিল না। মাথা নুইয়ে বৃষ্টিকে মাথা দিয়ে আটকাতে আটকাতে এগোতে লাগলাম। পথ আর বেশি বাকি নেই। মাথা তুলে তাকালে এখান থেকে চৌমাথা দেখা যায়।

ডাবের দোকানের ঝাঁপের নীচে মাথা গুঁজবার একটু জায়গা পাওয়া গেল। দোকানটা রাস্তার এ পাশে। ও-পাশে বাস্-এর শেড। ঝাঁপের নীচে আমার পায়ের কাছে দুটো ছাগল দাঁড়িয়ে কান ঝাড়ছে। বোঝা নামিয়ে আমি কোঁচা দিয়ে মুখ মুছে নিলাম। চশমা খুলে রাস্তার ওপারের শেডের দিকে তাকিয়ে দেখলাম ছিমছাম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে। ভদ্রলোককে দেখে আশা হলো—বাস্ তবে আসেনি। ঘড়ি দেখলাম—সাড়ে পাঁচটা বাজে।

বৃষ্টি একটু বাদেই ধরে এলো বটে, কিন্তু বাস্ তবুও এলো না দেখে ভদ্রলোকটির দিকে আমি এমনভাবে তাকালাম—যেন কিছু জিজ্ঞাসা করছি। দেখলাম, তিনিও আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি-মুচকি হাসছেন যেন। তারপর স্পষ্ট দেখলাম, আমাকে যেন ইসারায় ডাকছেন। আমাকে, না, আর কাউকে? এদিক ওদিক তাকালাম। দোকানীকে দেখা যাচ্ছে না, ছাগল দুটো ঝিমুচ্ছে। বেডিং আর সুটকেস্ তুলে আমিই হাঁটা দিলাম। রাস্তা পার হয়ে তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, ডাকছিলেন নাকি?

ভদ্রলোক অমায়িকভাবে হেসে বললেন, হ্যাঁ রে।

চমকে উঠলাম। তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আকাশ পাতাল খুঁজতে লাগলাম।

—চিনতে পারিস্? তুই ভূপতি না?

অবাক হয়ে আবার তাকালাম। এবার চট করে চিনে ফেললাম এক নিমেষে, বলল কে তুই, সুধাসিন্ধু?

—প্রায় ধরেছিস, তবে সুধাসিন্ধু নয় সুখসিন্ধু।

বললাম, হ্যাঁ, আমাকে এমন দেখেই চিন কী করে? তোকে চিনতে তো আমার রী মতো বেগ—

বাধা দিয়ে সুখসিন্ধু বললো, তুই তেমনটিই আছিস, কিন্তু আমি যে একেবা কেমনটি হয়ে গেছি!

সত্যি, একেবারে বদলে গেছে সুখসিং নামটাও তার প্রকাণ্ড—সুখসিন্ধু প্রচ সরস্বতী। কিন্তু এই নামের জন্যেই তার খ্যা নয়। তার খ্যাতির কারণ অন্য। তার আপা মস্তক তাকিয়ে তাকিয়ে তাই দেখছিলাম, ত ঠকঠক করে কাঁপছিলাম।

—একেবারে ভিজে গেছিস। বেডি খোল্ না।

—খুলে লাভ নেই, ওটাও একেবারে ভি গেছে।

—তবে সুটকেস্—

—ওতে জামা-কাপড় নেই।

সুখসিন্ধু হাসলো। ওর বুক-পকে রুমালের একটা কোণ দেখা যাচ্ছে, নানার

র কাজ করা। রুমালটা টেনে বার করে ও মুখ মুছে আবার সেটা পকেটে গুছিয়ে না।

জিজ্ঞাসা করলাম, বাস্ কটায় আসবে?

—যাবি কোথায়?

—সদরঘাটে। স্টিমারটা ধরা চাই।

উৎকট আওয়াজ করে হেসে উঠলো সুখ-, বললো, সে বাস কখন ছেড়ে চলে গেছে। কার সার্ভিসের এই একটা বড় দোষ— পাংচুয়াল।

দশ বারো বছর বাদে সুখসিন্ধুর সঙ্গে। দশ বারো বছরেও আমার কোনো বদল শুনে মনে মনে খুশি হয়েছি, তাকে আজ দেখে যৎপরোনাস্তি সুখী হয়েছি, চিনতে পেরে উল্লসিত হয়ে উঠেছি, সবই। কিন্তু এই বাস্ দুর্ঘটনার কথা শুনে বারেই যেন দমে গেলাম। উল্লাস আনন্দ াদ এক নিমেষে জল হয়ে গেলো।

সুখসিন্ধু বললো, এখন উপায়?

বললাম, নেক্সট্ বাস ক'টায়?

—কাল সকাল আটটা।

উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, আর র?

—সেই কাল রাত্রে। দিনে একবারই তো

চব্বিশটা ঘণ্টা মাটি। তিলিপুকুরেই ফিরে হবে তাহলে। এই শেডের নীচে বসে তো কাটানো চলবে না! বৃষ্টিটা আর একটু এলেই রওনা হতে হবে। হাড়ে হাড়ে শীত গেছে, চোয়াল টনটন করছে। জলে ভিজে ংটা লোহার মতো ভারী হয়ে গেছে। ওটাকে মাথায় চাপাতে হবে—তা না হলে যাবে না। নিজের এই দুর্ভোগের কথা ছিলাম, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে সুখসিন্ধুর ও মনে হচ্ছিল। ওর পাশে বসতে ঘেন্না তা আমাদের, আজ তার বাবুগিরির অন্ত। আশ্চর্য বদল হয়েছে বটে।

আড়-চোখে তাকালাম ওর দিকে। পুরনো কে পেয়ে তার সঙ্গে অনর্গল কথা বলা ত ছিলো। কিন্তু কথা বলার উৎসাহ চ্ছলাম না। ওর জবাবগুলো কেমন-যেন -কাটা, ছাড়া-ছাড়া। আমাকে আবিষ্কার ই ওর কাজ যেন ফুরিয়ে গেছে—অন্তরঙ্গতা র আর বেনো গরজই তার যেন নেই। না থাক অন্যায় নয়। এতোদিন বাদে যাগ পেয়ে আ ও প্রতিশোধ নিচ্ছে হয়ত। রা ওকে এককালে কম অবজ্ঞা করিনি। ন্ বাই ছিলো সুখসিন্ধুর। সারাটা বছর একটা কোট গায়ে দিয়ে কাটিয়ে দিতো। কোট সেটা—যেমন মোটা তেমনি ভারি, তার চেয়েও বড়। মাথায় কোঁকড়া কোঁকড়া চুলের ফাঁকে ফাঁকে ঘা। দুহাত দিয়ে লের মতো মাথা চুলকাতো সুখসিন্ধু। কানের পাশ দিয়ে কস গড়াতো। ধীরে ধীরে দুটো কানও ঘায়ে ভরে যায়। পড়া না পারলে আমরা কানমলা খেতাম। সুখসিন্ধুর কানে কেউ হাত দিতো না। ওর পকেট ভর্তি থাকতো হাজারো রকমের জিনিস। হাতের কাছে যা ও পেতো, তার কিছুই ফেলে দিতো না—পকেটে পুরতো। পেরেক, কাগজের টুকরো, বাদামী কাগজের ঠোঙা, মরচে পড়া ব্লেড, পেনসিল, ভোঁতা নিব্, চ্যাপ্টা হয়ে যাওয়া সেফটিপিন, ইরেজার, এমন কি ফুটবলের ব্লাডারও। মাথায় ঘায়ের অছিলায় একদিনও স্নান করতো না। ওর এই অদ্ভুত রুচিই ছিল ওর খ্যাতির কারণ। এই খ্যাতিটা ছিল বলেই সবাই ওর নাম জানতো। খ্যাতির জন্যেই ওর নাম, নামের জন্যে খ্যাতি নয়। কিন্তু তবু আমি ওর নামটাও আজ ভুল করে ফেলেছিলাম।

এবার সোজাসুজি ওর দিকে তাকালাম। মাথায় দিব্যি সিঁথি। রুমাল বার করে আবার ও মুখ মুছলো, আবার তেমনি পরিপাটি করে গুছিয়ে রাখলো পকেটে।

বৃষ্টি অনেকটা কমে গেছে। এর মধ্যে রওনা হওয়া চলে। সন্ধ্যেও হয়ে আসছে। আর দেরি করা ঠিক না। তিন মাইল পথ তিলি-পুকুর।

বললাম, চলি রে তবে। বহুদিন বাদে দেখা হলো।

সুখসিন্ধু অন্য দিকে চোখ রেখে বললো, বছর পনর হবে নির্ঘাৎ।

তর্ক না করে বললাম, তা হবে।

—যাচ্ছিস্ কোথায়?

—ফিরে যাই।

এক চোখ একটু ছোট করে কুৎসিতভাবে হাসলো সুখসিন্ধু, বললো, মুখরোচক কেউ আছে নাকি—যাবো সঙ্গে?

বিরক্ত হয়ে বললাম, পিসিমার অসুখ শুনে এসেছিলাম।

সুখসিন্ধু বললো, বলতে হয়। কেমন আছেন?

—ভাল।

—তবে আর ফিরে যাবি কেন?

—তা না হলে থাকবো কোথায়?

মুখ বিকৃত করে সুখসিন্ধু বললো, থাকবো কোথায়? ন্যাকা!

ন্যাকামি করিনি। পরিষ্কার কথাই বলে-ছিলাম। আমাকে যেমন ও ঘা দিলো, আমিও তেমনি, চিমটি কেটে জবাব দিলাম, ভোল বদলে ফেলেছিস্ যে একেবারে। তোর সে সখের কোটটা গেলো কোথায়?

এতটুকু রাগ করলে না সুখসিন্ধু, বললো, জলাঞ্জলি দিয়েছি। সে অনেক কথা। চ' আমার সঙ্গে।

—কোথায়?

—ফের ন্যাকামি হচ্ছে? সুখসিন্ধু এবার যেন ধমক দিলো, বললো, আমার বাসায়। তিলিপুকুর তিন মাইল, আমার বাড়ি আধ মাইল—ঝলমলে ব্রীজের গায়েই। কোনটা সুবিধে?

উৎসাহিত হয়ে বললাম, আধ মাইলটাই।

হাঁটা দিলাম দুজন। যাদের সম্পর্কটা ছিলো আদায়-কাঁচকলায় তারাই এক নিমেষে হয়ে উঠলাম অন্তরঙ্গ সুহৃদ্। বহুদিন দেশ-ছাড়া, দেশের মাটির স্বাদ বড় মিষ্টি লাগতে লাগলো। দেশী এই বন্ধুকে পেয়েই হয়ত। সদরঘাটের হাই ইস্কুলে আমরা ছিলাম সহপাঠী, আজ এই সদর রাস্তা দিয়ে হাটতে হাটতে সেই সব স্মৃতি মনে আসছিল। ঝলমলের সাঁকো দেখিনি বহুকাল। তার নীচেই ঝিলমিলে নদী ছিল, নাম কাঁকন। কাঁকন এখন শুকিয়ে নাকি কাঠ হয়ে গেছে, কিন্তু ব্রীজটা আছেই।

সুখসিন্ধু তার কাকার জোত-জমির নাকি মালিক হয়েছে। মালিক হয়েই সে বিয়ে করে। তার নাম, মুচকি হেসে সুখসিন্ধু বললো, শুনে হাসবি নিশ্চয়, ডাক নাম চুমকি, ভালো নাম কী রাখা যায় বল্ তো?

ওর কোমরে একটা গুতো দিয়ে হেসে বললাম, অন্নপ্রাশন হয়ে গেছে তো?

—তার মানে? থমকে দাঁড়িয়ে গেল সে।

—না, মানে কিছু নেই। নামকরণটা এখনো বুঝি হয়নি?

কোনো জবাব না দিয়ে আবার হাঁটতে লাগলো। আধ মাইল পথ এখনি ফুরিয়ে যাবে। আমার হাত থেকে এতক্ষণে ও সুটকেসটা নিলো। এতক্ষণে হয়ত খেয়াল হলো ওর। সৌজন্যবোধও হয়েছে তাহলে। ওর বউকে গিয়ে নালিশ করতে হবে ওর নামে। অনেকক্ষণ আমাকে দিয়ে ও দুটো মাল বইয়ে নিয়েছে।

সুখসিন্ধু বললো, ইংরেজি জানিনে ভাই। কাকাও মরে গেলেন, পড়াশুনাও ছেড়ে দিলাম। কিন্তু মেয়েটি যেমন মাইল্ড তেমনি সুইট। গরীবের মেয়ে—পছন্দ করে বিয়ে করেছি। গেঁয়ো মেয়ে বলতে যা বুঝিস্ ও কিন্তু তা নয়, টেস্টও আছে খুব। ছিমছাম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন—যাকে বলে নীট-ক্লীন—ও ভারি ভালবাসে।

আবছা অন্ধকারে ওর বুক পকেটের দিকে তাকালাম। রুমালের কোণ ওর হাঁটার তালে তালে দুলছিলো। নিজের পোষাক-আষাকের দিকে আর তাকিয়ে লাভ নেই, ভিজে গায়ের সঙ্গে এঁটে গিয়েছিলো, এখন হাওয়া পেয়ে একটু আলগা হয়েছে। বন্ধুপত্নীর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের যে উৎসাহ এতক্ষণ আমাকে বেগে হাঁটাচ্ছিলো, সে বেগ অজানিতেই ঢিমিয়ে এলো।

সুখসিন্ধু বললো, পিছিয়ে পড়ছিস কেন?

বললাম, বেডিংটো বেজায় ভারি।

দূরে ওই ঝলমলের সাঁকো। রাস্তা ওখানে অনেকটা উঁচু হয়ে গেছে। আকাশের গায়ে ব্রীজের রেলিং-এর ছবি ফুটে উঠেছে। মনে হচ্ছে চোখের সামনে যেন কাঠ-কয়লা দিয়ে কে ছবি এঁকে দিয়েছে। ডানদিকে ঢালুপথে আমাদের নেমে পড়তে হলো।

চমৎকার বাড়ি। সুখসিন্ধুর কাকা কবরেজি করে তাহলে বেশ দু'পয়সা কামিয়েছেন। সুখসিন্ধুর অদৃষ্টের সঙ্গে নিজের অদৃষ্টের তুলনা চট্ করে মনে পড়ে গেলো। অক্লেশে এত বড় একটা সম্পত্তির মালিক হয়ে গেছে। তার ওপর আছে চুমকি। বারান্দায় দুটো মোড়া নিয়ে পাশাপাশি বসলাম।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললাম, তারপর?

লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো সুখসিন্ধু, বললো, তারপর কাপড় জামা ছেড়ে নাও। আরাম করে বসে তারপর কথাবার্তা বলি দুটো। কদ্দিন বাদে দেখা। বছর কুড়ি তো হবেই?

এবার প্রতিবাদ করলাম, বললাম, পনর বছরও নয় কুড়ি বছরও নয়, বছর বারো হবে। হিসেব করে দ্যাখ্ না।

—যাক্ গে। আর অঙ্ক কষে দরকার নেই। বাপী, বাপী—

ভাবলাম, এটা বুঝি চুমকির আদুরে নাম। একটু বাদেই একটা বুড়ো চাকর এলো। সুখসিন্ধু বললো, খেয়াল নেই কেন তোমাদের? আমার বন্ধু এসেছে দেখছোনা? দেয়ালগিরিটা বাড়িয়ে দাও, খাবার ব্যবস্থা করো, আর ইয়ে—একটা জামা আর একটা কাপড় নিয়ে এসো। জল্দি চটপট।

আমার দিকে ফিরে বললো, কী আনন্দ যে আমার হয়েছে বুঝবি নে। এই গণ্ডগ্রামে একা একা পড়ে আছি। সঙ্গী নেই, আড্ডা নেই, মজলিস নেই। জীবনটা জমবে কেন? থেকে যা না ক'টা দিন।

ওর উচ্ছ্বাসকে কোনো রকমে প্রশ্রয় না দিয়ে বললাম, সন্ধ্যে হবার সঙ্গে সঙ্গে চারদিক একেবারে বোবা হয়ে গেছে। একটু সাড়া-শব্দ নেই কোথাও। মাঝে মাঝে বাইরে থেকে ঘুরে এলোও তো পারিস্। আয় না একবার আমাদের ওদিকে।

—বিয়ে করেছিস্?

—তা করেছি একটা।

হো হো করে হেসে উঠলো সুখসিন্ধু, একটা? একটা ছাড়া দুটো বিয়ে আবার হয় নাকি। মাইরি, হাসালি। বউ-এর নাম কি?

—কেন রে, নাম জেনে কী হবে?

—কিসসু না। এমনি। চুমকি খুব মোলায়েম নামের পক্ষপাতি। আমার নামটি কী ভয়ংকর—সুখসিন্ধু প্রচণ্ড সরস্বতী।

সুখসিন্ধু আবার হেসে উঠতে গিয়েছিল, এমন সময় বাপী কাপড়-জামা নিয়ে এলো। ঘরের মধ্যে গিয়ে বদলে নিলাম। একটু অস্বস্তিই ঠেকছিলো, চুমকি কোথায় দাঁড়িয়ে আছে কে জানে? একটু বাদে খাওয়া-দাওয়াও সেরে নিলাম। রাতও বাড়তে লাগলো, গল্পও জমে উঠতে লাগলো ধীরে ধীরে। কিন্তু সুখসিন্ধুর বউকে দেখা হলো না। গ্রামে থাকে, আলো হয়তো এখনো পায়নি ভালো করে। গ্রাম্য সংস্কারটা ছাড়াতে পারেনি। বন্ধুর সামনে বউকে এনে দাঁড় করাতেই হবে—এর অবশ্য কোনো মানে নেই।

সুখসিন্ধু বললো, না, আমার ওটা নেই। স্বামীর বন্ধুর সামনে বউ আসবে, এতে আপত্তির কী থাকতে পারে বুঝিনে ভাই। অনেকে এ রকম আড়াল-আবডাল পছন্দ করে বটে। কিন্তু আমি ও-সব মানিনে।

বললাম, এই নিরিবিলি জীবন ভাল লাগে তোর? সময় কাটাস্ কী করে?

—পাখি স্বীকার করি। ম্যাজিক শিখেছি। ভেনট্রিলোকুইজম জানি। একা একাই বক-বক করি। তাসের খেলা জানি, পাখির ডাক ডাকতে পারি, বেড়ালের ঝগড়া, কুকুরের চীৎকার, মশার ভনভনানি—সব রকম শব্দ করতে পারি। শুধু প্র্যাকটিস্, শুধু অভ্যাস। শুনবি?

একঘেয়ে ঠেকছিলো, তাই বাধা দিলাম না। সুখসিন্ধু উঠে দাঁড়ালো। ঘর থেকে একটা গেলাস নিয়ে এসে বললো, ভূতের গলা শোন্। আমার এক বন্ধু মরে ভূত হয়ে গেছে—তাকে ডাকছি। হ্যালো ডারলিং, ডারলিং। ডারলিং ভিন্ন গলায় জবাব দিলো, কে সুখসিন্ধু? সুখ-সিন্ধু বললো, কতদূরে তুমি? বহুদূর থেকে জবাব এলো, পরলোকে। সুখসিন্ধু বললো, আমার এই গেলাসে এসো।

তারপর ভৌতিক সেই গলা ধীরে ধীরে কাছে এলো, গেলাসে ঢুকলো। ঢোকা মাত্র হাত দিয়ে গেলাসের মুখ চেপে ধরলো সুখসিন্ধু। গেলাসের মধ্যে থেকে দম-আটকানো গলায় তার বন্ধু হাজারো রকম অনুনয় বিনয় করতে লাগলো। সুখসিন্ধু তাকে ছেড়ে দিয়ে মোড়ায় এসে বসলো, বললো, কেমন?

বললাম, বেশ তো পারিস। বউ শুনে কী বলে?

—কী আর বলবে? হাসে। ভেরী মাইল্ড আর সুইট মেয়েটি।

বলতে পারলাম না, গুণ তো শুনছি, রূপ তো দেখলাম না। একবার শুধু ভেতরের দরজার দিকে তাকালাম। বলা যায় না, দরজার আড়ালে এসে কেউ দাঁড়াতেও পারে। কিন্তু সেখানে কেউ নেই।

সুখসিন্ধু বললো, তোর ওই কথাটায় বেজায় মজা লেগেছে আমার।

—কোন্ কথাটা?

সুখসিন্ধু হো হো করে হেসে উঠে বললে ওই যে, তা করেছি একটা। বিয়ে তো মানু একটাই করে রে।

এই কথাটায় হাসির মশলা এমন কী আ বুঝতে পারলাম না। ওর দিকে একদৃষ্টে চে রইলাম।

—আমার মুখ দেখে লাভ আছে? চ শুবি চল্। অনেক রাত হয়ে গেছে।

আমার শোবার ব্যবস্থা করে দিয়ে সু সিন্ধু অদৃশ্য হয়ে গেলো। ঘরে মিটমিট ক দেয়ালগিরি জ্বলছে। দূরে শেয়াল ডাকছে ঝলমলে ব্রীজের ওপর দিয়ে গোরুর গাড়ি চ গেলো বুঝি একটা। অচেনা জায়গায় ঘু হচ্ছিলো না। শুয়ে শুয়ে এই সব শ শুনছিলাম। তারপর সব শব্দ ছাপিয়ে, মধু গুঞ্জন কানে ভেসে এলো। সুখসিন্ধুরা গল্প করছে। চুমকির গলা সত্যিই বড় মিষ্টি অনর্গল কথা বলছে দু'জন। কথা বলার ধর শুনেই বোঝা যাচ্ছে, দুজনের বড় ভাব। তারপ আলোচনা শুরু হলো আমার সম্বন্ধে। কা খাড়া করে শুনতে লাগলাম। সুখসিন্ধু আমা অজস্র প্রশংসা করছে, আর চুমকি খিলখি করে হাসছে। হাসি থামার পর সুখসিন্ বললো, আমাকে তুমি ঘেন্না করতে, সইতে পারতে না। এখন আমি কেমন পরিষ্কা হয়েছি। মাথার বিখাজ কেমন শুকিয়ে গেছে হাত দিয়ে দ্যাখো।—চুমকি হাত দিয়ে হয় দেখছে এখন। কোনো সাড়া-শব্দ নেই। চো বুজে সুখসিন্ধু নিশ্চয় আদর উপভোগ করে এখন। সুখসিন্ধু আবার কথা বললো, বললে কোটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি কাঁকনের জলে কাকার ওষুধে যে ঘা শুকোয়নি, তোমার হাতে ছোঁয়ায় ম্যাজিকের মতো তা মিলিয়ে গেলো চুমকি বললো, যাবেই তো, যাবেই তো। সু সিন্ধু বললো, অধৈর্য তো হয়েছিলে খুব চুমকি বললো, দূর পাগল।

এই কথার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ ভীষণ ঝগড় লেগে গেল, দু'জনের। সুখসিন্ধু চীৎকা করছে, চুমকি শাসাচ্ছে। চারদিকের নিস্তব্ধত ভেদ করে দুজনের গলা সমান চড়ায় উঠতে লাগলো ধীরে ধীরে। এই ঝগড়ার একটা কথা বোঝা গেল না। অজস্র গালিগালাজের মধ্যে শুধু সুখসিন্ধুর একটা কথা শোনা যাচ্ছিলে আমায় পাগল বললে, আমায় পাগল বললে —চুমকি এবার বোঝাতে লাগলো ওকে সত্যিকার পাগল সে বলেনি, আদর করে পাগল বলতে নেই। সুখসিন্ধু হয়ত বুঝলো তারপর আর কোনো কথা শোনা গেল ন দু'জনের। সারা রাত জেগে থেকেও আ কোন সাড়া পেলাম না।

সকালে বাপী এসে বললো, রাতে ঘুমুতে পেরেছিলেন তো?

—কেন?

—এমনি। বাবু চেঁচামেচি করছিলেন া। মাথার অসুখটা আবার বেড়েছে।

উঠে বসে বললাম, মাথার অসুখটা মানে, ? বিথাজ?

বাপী বললো, মা-ঠাকরুন পালাবার পরই ঘা শুকিয়ে গেছে, কিন্তু পাগল হয়ে গেছেন ন।

বুঝতে পারলাম না। বললাম, মা-ঠাকরুন কি বললে?

—তিনি তো আজ বছর ছয় নিরুদ্দেশ। তার পর থেকেই বাবুর মাথার ঠিক নেই। জানেন না বুঝি আপনি? কখনো বাড়ে, কখনো কমে। কাল রাতে খুব বাড়াবাড়ি গেছে। সারারাত আবোল-তাবোল বকেছেন।

নিমেষে সব যেন কেমন ভৌতিক আর ভুয়ো বলে মনে হলো। সারারাতের এত কথাবার্তা তবে কি সব মিথ্যা! ভয় পেয়ে গেলাম বললাম, তোমার নাম তো বাপী? একটা কাজ করতে হবে তোমাকে, আমার মাল মোড়ে পেঁছে দিতে হবে। আটটার বাস্ ধরা চাইই আমার।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে তৈরী হয়ে সেখান থেকে চম্পট দিলাম।

# ইন্দ্রের বিধান

**ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়**

[ "গে-নেক্" বা "করী দি এলিফ্যাণ্ট" বা াস্ট এণ্ড আউটকাস্ট"এর স্রষ্টা ধনগোপালের রচয় দান বোধ হয় বাহুল্য। আপন প্রতিভা অধ্যবসায় তাঁকে বিশ্বসাহিত্যে স্মরণীয় ক'রে খেছে। এটি তাঁর "দ্য জজ্‌মেণ্ট অব্ দ্র" নামক একাঙ্কিকার অনুবাদ ]

*

স্থান : হিমালয়মূলে একটি আশ্রম

কাল : পঞ্চদশ শতাব্দী

সামনেই আশ্রমের মণ্ডপ। তার মাঝখানে ণ্যেতরু। বাঁপাশে গিরিচূড়া — পাথরের ি়ড়ি তার বুকের ওপর দিয়ে নেমে এসেছে। ানপাশে মন্দিরের সিঁড়ি ও আশ্রমের ভিতরে াবার দরজা। দূরে অরণ্য পর্বত, হিমালয়ের ষারমুকুট সন্ধ্যার আলোয় ভাস্বর।

দূরাগত বজ্রধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যপট ঠল।

শান্ত। (পুণ্যতরুর কাছে প্রাচীন তাল-াতার পুঁথি পড়তে পড়তে আকাশের দিকে ুখ তুলে চায়) ঘোর দুঃসময়ের আভাস াচ্ছি।

(হঠাৎ মন্দির দ্বার খুলে যায়। আচার্য ুক্র দ্বারপাশে দাঁড়িয়ে। শান্তকে একা দেখে ুক্র সোপান দিয়ে নেমে আসেন তার কাছে)

শুক্র। বুঝতে পারছ কিছু?

শান্ত। হ্যাঁ, গুরুদেব।

শুক্র। কণাদ কই?

শান্ত। এখনি আসবে। শুনুন গুরু-দেব : এতে লিখছে : "সত্যের সঙ্গে অসত্যের প্রভেদ চুলমাত্র। যে কর্ম, মনঃ, কি বাক্য দ্বারা এ দুয়ের মধ্যে সংযোগ ঘটাবে, তার ওপরে নামবে ইন্দ্রদেবের অমোঘ দণ্ড।

শুক্র। ইন্দ্রের বজ্র চিরন্যায়পরায়ণ। ভ্রান্তকে, দুষ্কৃতকে তার আঘাত পেতেই হবে —যেখানেই সে লুকোক না কেন! ঘন অরণ্যের আড়ালেই হোক, আর তপোবনের নিভৃত শান্তির মধ্যেই হোক; ইন্দ্রের শাস্তি নামবেই তার শিরে। যে ভ্রান্ত নিজের ত্রুটি জানে না, তাকেও ইন্দ্রদেব আঘাত হেনে সংশোধন করবেন। (দূরে বজ্রগর্জন)

শান্ত। প্রভু, আপনি যখন বলেন, শুধু হৃদয়ই উদ্বোধিত ক'রে তোলেন না, আমাদের মনীষাও পূর্ণ ক'রে তোলেন সত্যের মহিমায়।

শুক্র। প্রশংসা ভালো। কিন্তু আমায় কেন প্রশংসা করছ—এখনও যে আমি ঈশ্বরকে লাভ করিনি; আর—(বিষাদভরে মাথা নাড়েন)।

শান্ত। পাবেন, নিশ্চয় আপনি অবিলম্বেই পাবেন। আপনার পাবার সময় এসেছে।

শুক্র। তাই যেন সত্য হয়!

শান্ত। প্রভু, আমি কি আপনার কিছু ক'রে দিতে পারি? যদি আপনার ভার আমি একটুও কমিয়ে দিতে পারি—

শুক্র। তা তুমি দিয়েছ। আশ্রমের সকল সেবার ভার তুমি আমার কাছ থেকে নিয়েছ। কৃতজ্ঞতার যে বাঁধনে তুমি আমাকে বেঁধেছ, তা ছিন্ন করা যায় না।

(কণাদের প্রবেশ)

এসো কণাদ, আজ কুশল তো?

কণাদ। (বাইশ বছরের যুবা) আপনার প্রসাদে আমি সুস্থ ও শান্তই আছি। আপনার ধ্যান হ'য়ে গেছে?

শুক্র। (বিষাদভরে) নয় দণ্ড ধরে ধ্যান করলাম, কিন্তু—যাই, মন্ত্রপাঠ করি গিয়ে। (মন্দির বুকে দরজা বন্ধ ক'রে দিলেন)।

কণাদ। আজ উনি যেন নিজের মতো নেই।

শান্ত। বহুক্ষণ ধ্যান করলে উনি অন্য রকম হ'য়ে যান।

কণাদ। চোখে ওঁর কিসের বেদনা?

শান্ত। বেদনা কী ক'রে হবে? উনি যে সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, ঘৃণা-প্রেমের ঊর্ধ্বে উঠেছেন!

কণাদ। প্রেমেরও ঊর্ধ্বে?

শান্ত। হাঁ; ঘৃণা প্রেম এরা বিপরীত, তাই এরা মায়া, অলীক মোহ।

কণাদ। তবু তো পৃথিবীকে আমাদের ভালোবাসতে হবে!

শান্ত। হাঁ, যাতে পৃথিবীকে আমরা সাহায্য করতে পারি।

কণাদ। ঐ গ্রামবাসীরা তো পার্থিব জীবন যাপন করে—তবু তো প্রভু ওদের সঙ্গে স্নেহ-ময় ব্যবহার করেন।

শান্ত। আমরা ব্রহ্মচারী। পৃথিবীর সকল বন্ধন—সংসারের বন্ধন আমরা ছিন্ন করেছি, যাতে আমাদের মন, স্নেহ, যত্ন আমরা ঈশ্বরের সন্তানদের 'পরে অর্পণ করতে পারি। আমাদের প্রেম সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। (দূরে বজ্রধ্বনি)

কণাদ। সত্য বটে। তবু মনে হয় গুরু-দেব যেন অন্য সবার চেয়ে তোমাকেই বেশী ভালোবাসেন।

শান্ত। না, ভাই! উনি কাউকে কারও চেয়ে বেশী ভালোবাসেন না। দশ বছর আমি ওঁর সঙ্গে আছি। তাই আমার 'পরে একটু বেশী নির্ভর করেন। কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য হচ্ছে যে, উনি কাউকেই বেশী ভালোবাসেন না; কারণ সবার প্রতিই ওঁর সমান স্নেহ। ইন্দ্রদেব সাক্ষী : গুরুদেব কাউকে কারও চেয়ে বেশী ভালোবাসেন না।

কণাদ। গুরু আমাদের সুমহান! তবু আমার ভাবতে আনন্দ হয় যে, তোমার প্রতি তাঁর স্নেহই সবচেয়ে বেশী।

শান্ত। প্রতিটি জীবেই তাঁর প্রেম। পার্থিবমনা মানষের মত উনি—একে বেশী একে কম—এ রকম তুলনা ক'রে ভালোবাসেন না। কাল রাতে বৃষ্টির ধারা যখন আর্তনারীর মত কেঁদে কেঁদে ফিরছিল, তখন ওঁর উদাত্ত কণ্ঠ কেমন আলোর গান, প্রেমের গানে উদ্বেল হ'য়ে উঠেছিল। উনি ঈশ্বরের পূজারী, সার্থক বন্দনাকার দেবমহিমার।

কণাদ। এখনও সে স্বর আমার কানে লেগে আছে।

শান্ত। প্রতিটি কথায় ওঁর কী আনন্দ উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছিল—কখনও ভুলব না।

সকল বন্ধন যিনি ছিন্ন করেছেন, তিনিই শুধু এমন গভীর, এমন অমেয় প্রেম নিয়ে বলতে পারেন। কোন আশঙ্কাই—

কণাদ। সেই কথাই তোমায় জানাতে এসেছি। গুরুদেবের মুখে কি তুমি বিষাদ ও শঙ্কার আভাস দেখতে পাচ্ছ না?

শান্ত। উনি গভীর চিন্তায় মগ্ন—আর কিছু নয়।

কণাদ। সেই সংবাদটি আসার পর থেকে ওঁর মনে বেদনা জেগেছে। ওর মধ্যে কোনও শোকের বার্তা আছে।

শান্ত। না, ও সংবাদের সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই।

[বজ্র গর্জায়। মন্দির দ্বার খুলে শুক্র বেরোলেন]

শুক্র। কণাদ!

কণাদ। হাঁ, প্রভু! [শুক্রের কাছে যান। শুক্র কী সব নির্দেশ দেন। কণাদের প্রস্থান। শুক্র আকাশের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন]

শান্ত। ওঁকে আশ্চর্য সুন্দর দেখাচ্ছে! নবীন কোনও দেবতার মত উনি দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে রয়েছেন—পুণ্যবানদের স্বর্গরাজ্যে নিয়ে যাবার জন্য যেন উনি অবতীর্ণ হয়েছেন। প্রভু, আপনাকে গুরুরূপে পেয়েছি, এ আমার পরম ভাগ্য! আপনাকে পেয়েছি, এজন্য ব্রহ্মকে আমার নমস্কার!

[কণাদের প্রবেশ। শুক্র শান্তের কাছে আসেন, পিছনে আসে কণাদ]

কণাদ। প্রভু, সব প্রস্তুত।

শুক্র। গ্রামে যাও; সেখানে জিজ্ঞাসা করো, সর্ববিধ কুশল কি না। স্বর্গ যখন অকরুণ—হায়, আর একটি দিন বৃষ্টি হ'লে সমস্ত শস্য নষ্ট হবে! তখন কী ক'রে ওরা বাঁচবে? না, না, তা অসম্ভব! তোমরা দুজনেই তাদের কাছে গিয়ে আমার শুভাশিস্ জানাও। ব'লো, আজ রাতে ইন্দ্রদেবের কাছে আর একবার আমরা পুজো দেব। আর বৃষ্টি হ'লে চলবে না।

শান্ত। ভিক্ষাপাত্র নিয়ে এসো, কণাদ।

কণাদ। মশালও আনব কি?

শুক্র। চাঁদ মেঘে ঢাকা পড়তে পারে; হাঁ, মশালও (কণাদের প্রস্থান) হাঁ। (বজ্রগর্জন) ঝড়ের আভাস বেড়েই চলল। দুর্যোগ সুরু হবার আগেই তোমরা আশ্রয় পাবে, এই প্রার্থনা করি। (ক্ষণেক নীরব) প্রতিদিনই এ পৃথিবী আঁধার হ'য়ে আসছে। ক্রূর সর্পের মত অধর্ম আর পাপ তাকে বেষ্টন করছে। একমাত্র আমরা—ব্রহ্মচারীরাই তাকে বাঁচাতে পারি। শান্ত, অবিচল থেকো—আমায় শক্তি দিও। পৃথিবীতে আলো নিয়ে আসতে আমার সহায় হয়ো। তুমি শুধু আমার শিষ্য নও, তুমি আমার বন্ধু, আমার ভাই! (শান্তকে আলিঙ্গন ক'রে) সংসারের থেকে আমায় বাঁচাও।

কণাদ। (প্রবেশ ক'রে) এই যে—(বিস্ময়ে থমকে যায়)

শুক্র। (শান্তকে ছেড়ে) এসো কণাদ। (কণাদ আসে। তার কণ্ঠ বেষ্টন ক'রে) ভাই আমার—

কণাদ। (প্রদীপ্ত মুখে) গুরুদেব—

শুক্র। সাহস ধরো; মুক্ত হও—মুক্ত হও পৃথিবীর সব মোহ থেকে, সংসার থেকে! গ্রামে যাও; আমাদের শুভাশিস্ নিয়ে যাও সেখানে। হরি তাদের রক্ষা করুন! তোমরা নিরাপদে ফিরে এসো। (বজ্রবিদ্যুৎ) হা ইন্দ্রদেব!—দেখো ওদিকে বৃষ্টি ঝরছে। ত্বরায় যাও।

শান্ত। (কণাদের হাত থেকে মশাল ও ভিক্ষাপাত্র নিয়ে) এসো।

শুক্র। (তাদের মাথায় হাত দিয়ে) তোমাদের দুজনকেই আশীর্বাদ করি। ইন্দ্র তোমাদের রক্ষা করুন—(বাকী কথা বজ্রবিদ্যুতে ঢাকা পড়ে গেল)।

(শিষ্যদ্বয় মন্ত্রোচ্চারণ করে—ওঁ শান্তি ওঁ। তারপরে সিঁড়ি বেয়ে নেমে যায়)।

শুক্র। এ দুর্যোগ কেটে যাক। শিব তোমায় রক্ষা করুন, শান্ত আমার! দশ বছর ও আমার সঙ্গে ফিরেছে—সেই সজীব সত্যের সন্ধানে আমার সহায়তা করেছে।। আজ আমি ঈশ্বরের অতি নিকটে—সম্বোধির দ্বারপ্রান্তে। অনুভব করছি, অল্প পরেই এই আবরণ দূর হবে, আর সেই পরম রহস্যের হৃদয়ে আমার হৃদয় মুক্ত করব। কে আসে? (একমনে শোনেন) এত তাড়াতাড়ি তো ওরা ফিরে আসতে পারে না। হায়! আবার মোহ! অধুনা কত মোহ যে আমায় ঘিরেছে! ঊষার পূর্বেই অন্ধকার গাঢ়তম—তাই এরা হয়তো অন্বেষণের শেষই নির্দেশ করছে। হাঁ, এর পর আসবে আলো; আমি দেখতে পাব ঈশ্বরকে।

(পদধ্বনি। মন দিয়ে শোনেন)। ওরা কি এখনই ফিরে আসছে? শান্ত!

(এগিয়ে এসে নীচে তাকান।) ভীম বজ্রগর্জন। সেদিকে কর্ণপাত করেন না।

সহসা অস্বস্তিভরে পিছিয়ে যান। যা দেখছেন তা সত্য কিনা, তাই স্থির করতে শুক্র চোখ মোছেন। কয়েক পা এগিয়ে আসেন। একটি বৃদ্ধের মাথা সিঁড়ির ওপর দেখা যায়। শুক্র বিমূঢ়। পিছিয়ে যান। তাঁর পিঠ পুণ্যতরুকে স্পর্শ করে। নিশ্চল হয়ে থাকেন। বৃদ্ধ শেষ সিঁড়ি অতিক্রম করেন। শুক্রকে দেখতে পান না। পিছনে হিমালয়ের দিকে চান। তারপর মন্দিরপ্রাচীর অনুসরণ করে দৃষ্টি তাঁর শুক্রের ওপর পড়ে।)

শুক্র। কী চাই?

বৃদ্ধ (সন্তর্পণে শুক্রকে নিরীক্ষণ করে) হায় শুক্র, তুমি কি তোমার বৃদ্ধ পিতাকে চিনতে পারছ না?

শুক্র। আমার পিতা নেই।

বৃদ্ধ। সেকি! আমি সত্যই তোর পিতা। আমার দূত কি সেদিন আসেনি? (স্তব্ধতা) সে কি তবে মিথ্যা বলেছে? তুমি কি জানোনা, যে তোমার মা—

শুক্র। আপনার দূত এসেছিল।

বৃদ্ধ। তবে এখনই গৃহে চলো। আর সময় নেই। এসো বৎস, তোমার জননী পৃথিবী ছেড়ে যাবার আগে দেখা দিয়ে যাও।

শুক্র। আমি যেতে পারব না।

বৃদ্ধ। পারবে না? ওরে তুই কি জানিস না, তোর মা মৃত্যুশয্যায়!

শুক্র। পৃথিবীকে আমি ত্যাগ করেছি। দ্বাদশ বছর ধরে আমি পিতৃহীন, মাতৃহীন।

বৃদ্ধ। তুই আমাদের ছেড়ে এসেছিলি, কিন্তু আমরা তো তোকে ত্যাগ করিনি! এখন তোর আসা উচিত।

শুক্র। আপনার দূতকে আমি বলেছিলাম, আমার পিতামাতা নেই—আমি যেতে পারব না।

বৃদ্ধ। আমি সব শুনেছি। আমাদের থেকেই তোর জন্ম, তোর হৃদয় তো একেবারে পাষাণ হয়ে যেতে পারে না। চল বাছাঃ আমি তোর পিতা, তোকে মিনতি জানাচ্ছি।

শুক্র। না, না। শুধু ঈশ্বরই আমার পিতা।

বৃদ্ধ। শাস্ত্রে কি বলে না, যে জনক-জননীই তোর দেবতা! পিতৃ-আজ্ঞা পালনীয়।

শুক্র। এ কথা যে বলেছিল, সে আলোককে, সত্যকে দেখেনি।

বৃদ্ধ তবে শাস্ত্রের নামে আমি তোকে আদেশ করছি।

শুক্র। একমাত্র ভগবানই আমায় আদেশ করতে পারেন।

বৃদ্ধ। বিষ্ণু আমায় রক্ষা করুন। তুই কি স্বপ্ন দেখছিস, পুত্র আমার? ঐখানে তোর মা প'ড়ে মরণের সঙ্গে যুঝছে,—

শুক্র। আমি সব শুনেছি।

বৃদ্ধ। তবু তুই যাবি না?

শুক্র। না বাবা, আমি যেতে পারব না। যেদিন সন্ন্যাস গ্রহণ করেছি, সেদিন থেকেই আমি ছিন্ন করেছি আপনাদের সঙ্গে আমার বন্ধন। সকল বেষ্টন থেকে মুক্তি আমার চাই। ঈশ্বরের জন্যে সকলকে আমায় ভালোবাসতে হবে, তাই নিজের জন্য আমার কাউকে ভালোবাসা চলবে না। ভগবান যেখানে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সেখানেই আমায় থাকতে হবে, যতদিন না তিনি আমায় অন্যত্র আহ্বান করেন।

বৃদ্ধ। কিন্তু তোর মা যে তোকে ডাকছে—প্রতিটি নিশ্বাসের জন্য তাকে সংগ্রাম করতে হচ্ছে। সে যে তোকে দেখতে চায়!

শুক্র। আমি যেতে পারব না।

বৃদ্ধ। যেতে যে তোকে হবেই!

শুক্র। সম্ভব হ'লে আমি যেতাম। কিন্তু আমার জীবন ভগবানের হাতে।

বৃদ্ধ। ভগবান্! তোর জীবন ভগবানের হাতে? কে তোকে এ জীবন দিয়েছিল? ভগবান্, না যে দুঃখিনী ঐ মৃত্যুশয্যায় প'ড়ে আছে? কী কৃতঘ্নতা! সত্যই এ যুগ অন্ধকার! পুত্র তার পিতার বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছে —জননীকে হত্যা করছে!

শুক্র (শান্তভাবে)। কোনও একজনকে অন্যের চেয়ে বেশি ভালোবাসা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার চরণ আমার হৃদয়েরই মত ঈশ্বরনির্দিষ্ট পথ ছাড়া চলতে পারে না।

বৃদ্ধ। এ তুই সত্য বলছিস?

শুক্র। কাউকে যদি আমি অপরের চেয়ে বেশি ভালোবেসে থাকি, তবে ইন্দ্র স্বয়ং যেন আমায় শাস্তি দেন। ইন্দ্রদেব, শ্রবণ করুন! (বজ্র গর্জন)

বৃদ্ধ। চল্ বৎস, তোর ভগবানেরই নামে তোকে মিনতি জানাচ্ছি, তোর মায়ের কাছে চল্। তোর পায়ে প'ড়ে আমি অনুগ্রহ ভিক্ষা করছি! (নতজানু হন)

(শুক্র তাঁকে তুলে ধ'রে নিজের মাথা পিতার পায়ে রাখেন।)

বৃদ্ধ। তবে তুই যাবি?

শুক্র (দ্বিধান্বিত)। শাস্ত্রে আছে, যে প্রতি দ্বাদশ বৎসরান্তে সাধুরা একবার তাঁদের জন্মস্থান দর্শন করতে পারেন।

বৃদ্ধ। আর তুই চ'লে আসবার পরে ঠিক বারো বছরই কেটেছে। শাস্ত্র ধন্য হ'ক!

শুক্র। কিন্তু পিতা, আমি যদি যাই, তবে তো শাস্ত্রবাক্য অনুসারে যাব না, মাকে দেখবার বাসনা সবার ওপরে রয়েছে বলেই যাব। এতক্ষণ শাস্ত্র উদ্ধৃত করবার স্বপ্নও আমার মনে জাগেনি, আর এখন শাস্ত্রমত কাজ করবার জন্য ব্যগ্র হ'য়ে উঠেছি। কী পরিহাস! আমাদের ধর্মাধর্ম কি শাস্ত্রবাক্য থেকে প্রতিপন্ন হবে না, হবে আমাদের মনোগত ভাব থেকে! আর এখন যদি যাই, তবে শাস্ত্রের বিরুদ্ধাচরণ করা হবে।

বৃদ্ধ। বিরুদ্ধাচরণ!

শুক্র। আমাদের চিন্তাই আমাদের দোষ-গুণের পরিচায়ক। অসৎ চিন্তা যার মনে আছে, সত্যিই সে অসৎ লোক। না, না। শাস্ত্রবাক্য ব'লে আমায় প্রলোভন দেখাবেন না। এখানেই আমাকে থাকতে হবে। প্রতিজ্ঞা আমাকে রাখতেই হবে।

(আ[কা]শের দিকে তাকান। মেঘমেদুর হ'য়ে উঠে আকাশ।)

বৃদ্ধ। [শা]স্ত্র তো আকাশে লেখা নেই। সে খোদিত রয়েছে মানুষের অন্তরে। হৃদয়ে যা বলে, তাই শোনে।

শুক্র। শুধু ঈশ্বরের বাণীই পালনীয়। তাঁর আদেশ আমি অমান্য করতে পারি না। আমি সন্ন্যাসী—মাকে দেখবার প্রলোভনের কাছে কখনও ধরা দেব না। না! ঈশ্বর—

বৃদ্ধ। মুমূর্ষু জননীকে যে সন্তান থেকে বঞ্চিত করে, সে কেমন ঈশ্বর? হিন্দুর ধর্মে এমন ঈশ্বরের কথা কেউ জানে না। এমন ঈশ্বরের কোনও অস্তিত্ব নেই।

শুক্র। ভ্রান্ত প্রাণ, তোমার স্রষ্টাকে নিন্দা করো না। আমার দেবতা সত্যের দেবতা, প্রেমের দেবতা।

বৃদ্ধ। প্রেমের দেবতা! কেমন ক'রে সে প্রেমের দেবতা হবে? সে যে তোর প্রেমের ধারা শুষ্ক করে দিয়েছে; মেঘ যেমন সূর্যের দৃষ্টি অন্ধ করে দেয়, তেমনি ক'রে তোর বুদ্ধিকে সে অন্ধ ক'রে দিয়েছে। তুই মিথ্যা বলছিস! এ প্রেমের দেবতা নয়, এ তোর উন্মত্ত আত্মার দেবতা—স্বার্থপ্রেম, যা তোর মাকে তার শেষ সুখ হ'তে বঞ্চিত করছে। আমি—হাঁ, আমি তোর জন্যে তোর ভগবানের কাছে উত্তর দেব। যদি তোর জননীকে দেখতে গিয়ে তুই পাপ করিস, সে পাপের দণ্ড যেন আমার শিরে পড়ে। আয়, তোর পিতার আজ্ঞা শোন্, যদি পাপ হয়, তার ভার আমি বহন করব।

শুক্র। না, পুণ্যপাপ দুয়েরই ফল আপনাকেই ভোগ করতে হয়। অন্যের পাপ কেউ ক্ষালন করতে পারে না। হা ঈশ্বর! অভিশপ্ত হ'ক্ আমার জন্মমুহূর্ত!

বৃদ্ধ (সরোষে)। তোর জন্মকে তুই অভিশাপ দিলি?

শুক্র। হাঁ, এই গ্লানিময় পৃথিবীতে জন্মান অভিশাপেরই যোগ্য!

বৃদ্ধ। তবে অভিশাপ দে তোর ক্লিন্ন মন আর রিক্ত অন্তরাত্মাকে! বলিস না—

শুক্র। না, যে মুহূর্ত আমায় এই মোহ-ময়, মায়াময় জগতে জন্ম নিতে দেখেছিল, আমি শাপ দিই তাকে।

বৃদ্ধ। তোর জন্মমুহূর্তকে শাপ দিস্, এত স্পর্ধা তোর! পাপিষ্ঠ! তোর মা মৃত্যু-শয্যায় আর তুই তোর জন্মলগ্নকে অভিশাপ দিলি! ঈশ্বর সাক্ষী! ও নিজে ওর পিতৃরোষ জাগিয়েছে! এখন—কোনও ঈশ্বরই তোকে রক্ষা করতে পারবে না।

শুক্র। না, না—

বৃদ্ধ। শুক্র, আমি তোর পিতা, ইহ-জীবনে আমিই তোর আরাধ্য দেবতা, আমি তোকে অভিশাপ দিচ্ছি। তুই তোর মায়ের কাছ থেকে তার সন্তানকে কেড়ে নিয়েছিস, অন্তিমকালে তাকে শান্তি থেকে বঞ্চিত করেছিস। কুলদেবতার রোষ জ্বালিয়ে তুলে-ছিস তুই।

শুক্র। (চীৎকার ক'রে)। এমন করে নয়; এমন ক'রে নয়। (বজ্রবিদ্যুৎ, সারা আকাশ আঁধার হ'য়ে উঠল।)

বৃদ্ধ। এমন ক'রে নয়? এমন করেই হবে। অহর্নিশ আমার অভিশাপ তোর 'পরে বর্ষিত হক! সমগ্র বংশ অভিশপ্ত হক্।

শুক্র (পিতার পায়ে প'ড়ে)। আমার মিনতি—

বৃদ্ধ (স'রে গিয়ে)। স্পর্শ করিস না আমায়। জীবনেমরণে সর্বদা তুই অভিশপ্ত হ'য়ে রইলি।

শুক্র—পিতা—

বৃদ্ধ। আমাকে তোর পিতা ব'লে ডেকে আমায় কলুষিত করিস না। ইন্দ্রের শাস্তি নামুক তোর শিরে।

(রাগে দুঃখে কাঁপতে কাঁপতে বৃদ্ধ চ'লে গেলেন।)

শুক্র। পিতা, শুনুন—

(মুষলধারে বৃষ্টি নামল, সঙ্গে বজ্র-বিদ্যুৎ। অবিরাম বৃষ্টিতে আদিগন্ত ঝাপ্‌সা হ'য়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে আকাশ পরিষ্কার হ'ল। ক্ষীণ জ্যোৎস্নায় দেখা গেল, পুণ্য-তরুমূলে শুক্র ব'সে আছেন—সিক্ত, বিধ্বস্ত। অবসন্ন দেহে তিনি ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। নীচে কণ্ঠ-স্বর শোনা যায়।)

শুক্র। শেষ হ'য়ে গেল কি? ইন্দ্র কি তবে বিচার ক'রে আমায় নির্দোষ দেখলেন? হাঁ, ভুল করে থাকলে তো তাঁর বজ্র এসে আমায় আঘাত হানত। বৃষ্টিধারায় অন্ধ হ'য়ে আমি মৃত্যুর প্রতীক্ষায় ছিলাম। তবু তো কিছু হ'ল না! ইন্দ্র বিচার করেছেন। ওরে ছায়ার পৃথিবী, অবশেষে আজ আমি তোর বন্ধনমুক্ত হ'লাম। পৃথিবীর কিছুর সঙ্গেই আজ আমার যোগ নেই, এমন কি (স্তব্ধতা) —এমন কি শান্ত-র সঙ্গেও নয়।

(নীচে পদশব্দ, কণ্ঠস্বর ও মশালের আলো গোচর হয়) কে ও?

(কয়েক পা এগিয়ে যান, মশাল হাতে কণাদের প্রবেশ)

কণাদ। গুরুদেব, প্রভু!

শুক্র। কণাদ, তুমি! (ক্ষণিক, কিন্তু সুতীব্র নীরবতা) শান্ত, শান্ত কোথায়?

কণাদ। শান্ত—

শুক্র (নীচে আরও মশাল দেখে) ঝুলো! কে আসে?

কণাদ। ওরা মৃতদেহ বহন ক'রে আনছে।

শুক্র। কে মৃত? (ধীরে ধীরে) শান্ত কোথায়?

কণাদ। পাহাড়ের পাদমূলে বজ্র তাকে আঘাত হেনেছে।

শুক্র। শান্ত, আমার শান্ত!

(দুজনে মশাল হাতে কী যেন ব'য়ে নিয়ে এল। নীরবতা।)

শুক্র (ধীরে)। শান্ত! চ'লে গেছে! (একটু থেমে, তারাভরা আকাশের দিকে চেয়ে) ইন্দ্রের বিধান!

[ যবনিকা ]

অনুবাদক: শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়

## ইতিহাস

**আর্যপুত্র সুপ্রিয়**

এই অকালের বিকেল আমার 'হেরিটেজ'
আমার কাজল-মাখানো শৈশব-মিতালীর স্মৃতিপট!
এখন নেমেছে এরোড্রোম আঁধার করে।

সিঁদুরে রঙের বিকেল ছিল কতকাল আগে,
আকাশের গায়ে—
টালীগঞ্জের যে মেয়েরা,
বিন্তি খেলতে আসতো আমাদের বাড়ি,
কাক-ডাকা দুপুরে বেলায় রাস্তা পেরিয়ে
তাদের ছাদে টাঙানো থাকত
এই সিঁদুরে বিকেল—

পাঁজর-বেরোনো বাই-প্লেনের দিন,
ফুরিয়ে গেছে কি!
প্রথম মার্লিন,
ইঞ্জিনের শব্দগুলো শোনা যেত
আর রাড়ারের আকারে
নার্ভাস—নাক উঁচু বোকার মতন—
সংকোচ-কুণ্ঠ আলপনা—নম্রনীল পটভূমিকায়।
দুপুরের ঘড়িতে বাজত দুটো,

আর হলদে ট্র্যাম অনেকদূরে চলে যেত,
ছোট হয়ে হয়ে।
বাই-প্লেনের দিন যে কেমন করে ফুরিয়ে গেল,
আর কবে!

এই পঁচিশ বছর কি দাগ কেটে বসে গেছে
তোমার পদ্মপত্রের হিসাব লিপিতে—
শোনোঃ
তোমার হিসেবে লুকোনো থাক
এই পঁচিশ বছরের ফাঁকিঃ
ফিরিয়ে দাও টালীগঞ্জের প্রথম গন্ধ
প্রথম শরতের শিশির-ভেজা ঘাসের
[আর ভোর রাতের অম্বুরী-তামাকের]

এখন,
জ্বরের অনুকম্পন চেতনার কিনারায়
ছুঁচের মত 'হারিকেন' ওড়ে
কলকাতার আকাশে—
[এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান বর্ষীয়সী চায় আকাশে]
বাইপ্লেনের যুগ গেল শেষ হয়ে,
এমনি করেই!

## বনবাস

**শ্রীগিরিজা গঙ্গোপাধ্যায়**

আজ-ও যেন মাঝে মাঝে শুনি কোলাহল
কৈশোরের তীর হতে; যে দিবসগুলি
পশ্চাতে চলিয়া গেছে আকাশ আকুলি'
মিছিলে, নিশানে, রঙে। তাহাদের দল
আজ-ও যেন ডাক দেয় যে পথে এখন
গম্ভীর দিবসগুলি চলে যায় ধীরে
বাঁকা-চোরা ঢালু পথে পাঁকের গভীরে,
যে পথে নিশ্বাস বন্ধ, অন্ধ দুনয়ন।

তখন পৃথিবী ছিল প্রবালের দ্বীপ
দিন ছিল গজমোতি, রাত ছিল নীলা;
স্বপন সে ফুল-ঝুরি, দুরাশার লীলা
স্ফটিকের ঝাড়ে ঝাড়ে সাত-রঙা দীপ।
সে-সব হয়েছে শেষ, ফিরিবে না আর
রাম সে যুবক আজ—বনবাস তার।

## বিবর্ত্তন

**সাধনা ঘোষ**

দুস্তর মরুর মাঝে মৃগতৃষ্ণিকার
লেলিহান রসনার ক্ষুধিত বিস্তার
ছলনার জালে বাঁধি উদ্ভ্রান্ত পথিকে
মৃত্যুর অনল ঢালে চকিত নিমিখে।

ধরণীর অন্ধকার গর্ভকোষ ভেদি',
তৃণাঙ্কুর তোলে শির বন্ধডোর ছেদি'
মৃত্তিকার রসসিক্ত প্রাণের প্রবাহে
উদ্দীপিত জীবনের জয়গান গাহে।

ঊষর মরুভূ আর শ্যামল তৃণের,
সুস্নিগ্ধ রজনী আর প্রখর দিনের
মাঝে বসে হেরি আমি বিস্ময় বিলীন
সৃষ্টির বিবর্ত-ছন্দ—আদি অন্তহীন॥

# হিউএন্ চ্যাঙ্-এর ভারতভ্রমণ

## —শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু—

### ভূমিকা

খৃষ্টাব্দের প্রথম শতাব্দীতে বা তার আগেই বৌদ্ধধর্ম চীনে পেঁাছেছিল। সেই থেকে বহু ভারতীয় বৌদ্ধ সন্ন্যাসী দুর্গম পথ অতিক্রম কোরে চীনে ধর্ম প্রচার করতে যেতেন। আর অনেক চৈনিক ভক্ত বৌদ্ধও তাঁদের ধর্মের প্রধান প্রধান তীর্থস্থানগুলি দেখবার জন্যে আর মূল শাস্ত্রগুলির অনুসন্ধানে ভারতবর্ষে আসতেন।

তাঁদের মধ্যে একজন, "শাক্যপুত্র ফা হিয়ান" ৪০০ খৃষ্টাব্দে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ভারতে প্রবেশ কোরে উত্তর ভারতে ১৩।১৪ বছর যাপন কোরে তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকে সমুদ্রপথে চীনদেশে প্রত্যাগমন করেন।

৪৫৩ খৃষ্টাব্দে তৎকালীন চীনসম্রাট ঠো-পা-সুঙ্ বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করেন আর সেই থেকে চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম ও লাওৎসে এবং কনফুসীয়াসের প্রবর্তিত ধর্মের সঙ্গে অন্ততঃ সমান সমাদর পেয়ে আসছে।

৬২৯ খৃষ্টাব্দে হিউএনচাঙ্ নামক চীনদেশের একজন মহাপণ্ডিত ভক্ত বৌদ্ধ-ভিক্ষু স্থলপথে ভারতবর্ষে আসেন আর সমস্ত ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ কোরে ৬৪৫ খৃষ্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। তিনি চীনদেশের সেই সময়কার সীমানার বাইরে যে সব দেশ দেখেছিলেন, চীন সম্রাটের অনুরোধে সে সব দেশের তিনি একটা বিবরণ লেখেন। এ বইখানা চীনভাষার একখানা উৎকৃষ্ট সাহিত্যগ্রন্থ বোলে গণ্য হয়। তাছাড়া তাঁর শিষ্য হুই-লি-কে তিনি তাঁর নিজের ভ্রমণকাহিনী কিছু কিছু বলেছিলেন। হুই-লি সেই সমস্ত কথা 'হিউএনচাঙের জীবনী' নামক এক পুস্তকে লিখেছেন।

মুসলমান আক্রমণের আগে ভারতবর্ষের অবস্থার বিবরণ খুব বেশী পাওয়া যায় না। সেই জন্যে একজন বুদ্ধিমান বিজ্ঞ বিদেশী প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ হিসাবে এই দুইখানা গ্রন্থ অমূল্য।

হিউএনচাঙ্ ছিলেন অল্পবয়সে সংসারত্যাগী, বৌদ্ধ ভিক্ষু। সংসারের সাধারণ দৈনন্দিন ব্যাপার সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ কৌতূহল ছিল না। তাঁর ভারতে আসার এক প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বৌদ্ধ তীর্থস্থানগুলি দর্শন করা। সমগ্র ভারতে সে সময়ে অসংখ্য বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম, স্তূপ ইত্যাদি ছিল। স্তূপগুলির কতক ছিল বুদ্ধের বা তাঁর প্রধান শিষ্যদের দেহাবশেষ বা ব্যবহৃত সামগ্রীর উপর। বেশীর ভাগই ছিল কোনও না কোনও বৌদ্ধ পৌরাণিক ঘটনার স্মৃতিচিহ্ন।

হিউএনচাঙের গ্রন্থ ও তাঁর শিষ্য হুই-লির লিখিত জীবনচরিত এ সমস্ত স্তূপ সংক্রান্ত কাহিনীগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণে ভরা। এগুলির প্রত্যেকটি, ভক্ত বৌদ্ধের কাছে মনোরম হোলেও, সাধারণ পাঠকের চিত্ত বিনোদন করতে অক্ষম।

তাছাড়া বারোশো' বছর আগে হিউএনচাঙ্ যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিতর দিয়ে পর্যটন করেছিলেন, তা মনে রাখলে, তাঁর ভ্রমণের কতকটা স্পষ্ট ছবি কল্পনা করা সম্ভব হয়।

বর্তমান গ্রন্থে, সাধারণের পাঠোপযোগী কোরে, হিউএনচাঙের ভ্রমণকাহিনী ও তাঁর দৃষ্ট দেশগুলির সমসাময়িক রাষ্ট্রীয় ও সাংস্কৃতিক অবস্থা, যতদূর জানা গিয়েছে, সংক্ষেপে দেওয়ার চেষ্টা করা গেল।

প্রধানতঃ যে গ্রন্থগুলি অবলম্বন কোরে এই বই লেখা হোল, সেগুলির নাম—

Buddhist Records of the Western world (Translated from the Chinese by S. Beal—2 Vols. 1906 (Trubner's Oriental Series).
The Life of Hiuen-Tsiang by the Shaman Hwui-Li—Translated by S. Beal 1911 (Trubner's Oriental Series).
On Yuang Chwang's Travels in India,—2 Vols.—by Thomas Watters (London : Royal Asiatic Society) 1904.
"In the Footsteps of the Buddha" by Rene Grousset (Translated from the French by Mariette Leon) (Routledge 1932).

এ ছাড়া আরও কোনও কোনও ভ্রমণকাহিনী বা সাধারণ ঐতিহাসিক গ্রন্থ থেকেও কিছু কিছু তথ্য সংগৃহীত হয়েছে।
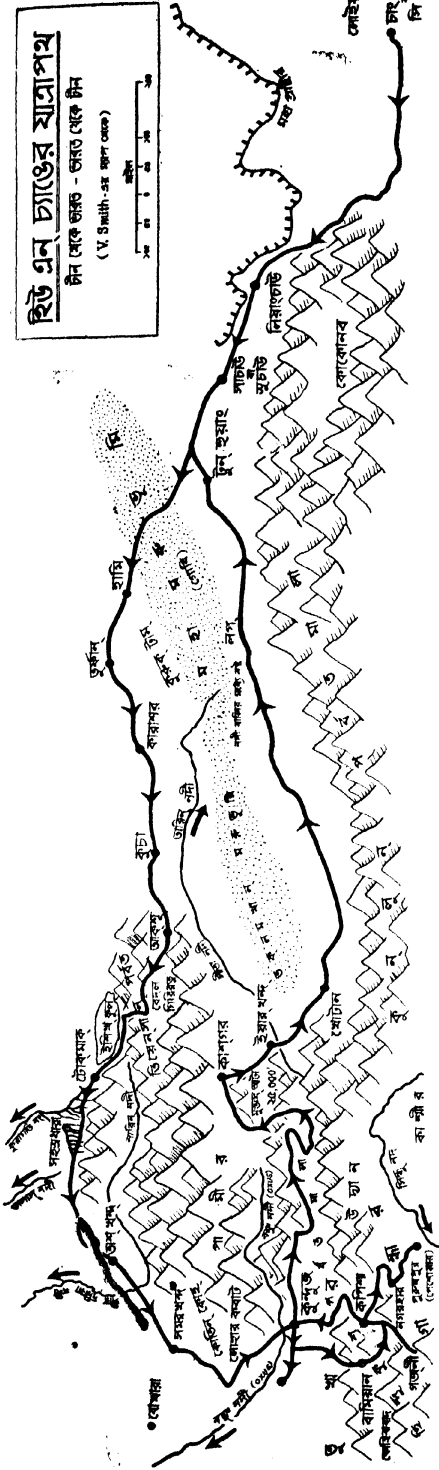
**প্রথম জীবন—চীন থেকে ভারত অভিমুখে যাত্রা**

৬০১ খৃষ্টাব্দে হোনান্ প্রদেশে, লো-ইয়াঙ্ (বর্তমান হোনান্ ফু) নগরে এক সম্ভ্রান্ত কনফুসীয় পরিবারে হিউএনচাঙের জন্ম হয়। এ'র পিতামহ বিদ্বান ছিলেন। তিনি পিকিনের সরকারী মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। পিতা হুই-এর কার্যকুশলতার, সংযত ও মার্জিত আচার ব্যবহারের খ্যাতি ছিল। সম্মানলাভের আকাঙ্ক্ষার চেয়ে জ্ঞানানুশীলনেই তাঁর অনুরাগ বেশী থাকায় আর সুই রাজবংশের যে পতন আসন্ন তা বুঝতে পেরে তিনি কোন সরকারী কাজ গ্রহণ করেন নি, আর সব লোকেরই শ্রদ্ধাভাজন হয়েছিলেন। তিনি দেখতে দীর্ঘাকৃতি সুপুরুষ ছিলেন।

হিউএনচাঙ্ পিতার সর্বকনিষ্ঠ চতুর্থ পুত্র ছিলেন। আট বছর বয়স থেকেই এ'র ভব্যতা, গুরুজনদের প্রতি কনফুসীয় শাস্ত্রানুযায়ী সম্মান প্রদর্শন দেখে এর বাবা অবাক হন। তাঁর স্মরণশক্তি তীক্ষ্ণ ছিল আর ছোটবেলায় সমবয়স্ক ছেলেদের সঙ্গে খেলাধুলা না কোরে তিনি বিরলে লেখাপড়া নিয়ে থাকতেই ভালবাসতেন। এ'র দ্বিতীয় ভ্রাতা বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

ছোট ভাইয়ের ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়নে স্পৃহা দেখে তিনি তাঁকে সঙ্ঘারামে নিজের সঙ্গে অনেক সময়ে রাখতেন। আর সেই থেকে হিউএন-চাঙেরও ভবিষ্যৎ জীবনের ধারা একরকম স্থির হোয়ে গেল।

হিউএনচাঙের বয়স যখন মাত্র ১২ বছর তখন অপ্রত্যাশিতভাবে এক রাজাজ্ঞা আসে যে, লোইয়াঙের মঠে ১৪ জন ভিক্ষু সরকারী খরচে প্রতিপালিত হবেন। শত শত আবেদনকারী উপস্থিত হলেন। হিউএনচাঙের বয়স নির্দিষ্ট বয়স অপেক্ষা কম হওয়ায় তিনি প্রার্থী হতে পারেন নি। তবু তিনি ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। রাজকর্মচারী তাঁকে দেখতে পেয়ে বললেন—"তুমি কে ভাই?" "আমি অমুক।" "তুমি কি শ্রামণের হোতে চাও?" "অবশ্য। কিন্তু নির্দিষ্ট বয়সের চেয়ে আমার বয়স কম।" "কী উদ্দেশ্যে তুমি শ্রামণের হোতে চাও?" "তথাগতের (বুদ্ধের) ধর্ম দেশে বিদেশে প্রচার করাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য।"

রাজকর্মচারী তাঁর প্রতিভাব্যঞ্জক আকৃতি ও কথাবার্তা দেখে শুনে এতই আশ্চর্য হলেন যে, ঐ অল্পবয়সেই তাঁকে মঠের ব্রহ্মচারী (শ্রামণের) হবার অধিকার দিলেন। এমন কি, এই সময়েই তাঁর বুদ্ধি এত তীক্ষ্ণ ছিল যে, মঠের সন্ন্যাসীরা তাঁকে মধ্যে মধ্যে অধ্যাপনা করতে বলতেন। হিউএনচাঙ্ ভারতীয় দর্শন অধ্যয়ন করতে আরম্ভ করলেন। বৌদ্ধধর্মে, মহাযান ও হীনযান নামক যে দুই শাখা আছে তার মধ্যে মহাযানের দিকেই তিনি প্রথম থেকে আকৃষ্ট হন। "নির্বাণসূত্রের" শূন্যবাদ "মহাযান সম্পরিগ্রহ সূত্রের" বিজ্ঞানবাদ তাঁর এত চিত্তাকর্ষক হোল যে, তিনি আহার নিদ্রা ত্যাগ কোরে এরই অনুশীলন করতে থাকলেন।

এই সময়ে চীনদেশে মহা যুদ্ধবিপ্লব আরম্ভ হোল। চীনের সুই রাজবংশের পতন হোল আর সিংহাসনের নানা দাবীদারদের মধ্যে সংঘর্ষ আরম্ভ হোল। এই সুযোগে তুরস্করাও দলে দলে চীনদেশ আক্রমণ করল। ঠাঙ্‌বংশের নতুন সম্রাট ৬১৮ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন আরোহণ করলেন। কিন্তু তুরস্কদের আক্রমণ থেকে উদ্ধার কোরে সে সিংহাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করতে তাঁর পুত্র ঠাই-চুঙ্‌কে আরও কয়েক বছর যুদ্ধ করতে হয়েছিল। ৬২৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাট ঠাইচুঙ্ নিজে চীনের সিংহাসন আরোহণ করেন। ক্রমশ তাঁর সাম্রাজ্য পশ্চিমে কাস্পীয়ান সাগর পর্যন্ত পে'ছৈছিল আর তাঁর সময়ে চীন এক মহা-সমৃদ্ধিশালী সাম্রাজ্য হোয়ে ওঠে।

কিন্তু ৬১৪।৬১৫ খৃষ্টাব্দে হিউএনচাঙ্ যে সময়ে লো-ইয়াঙে শাস্ত্রানুশীলন করছিলেন, তখন যুদ্ধের হিড়িকে লো-ইয়াঙ্ প্রদেশ ধ্যান-ধারণার মোটেই উপযুক্ত স্থান ছিল না। অরাজকতা এতদূর বেড়ে গেল যে, প্রাদেশিক রাজধানী দস্যুদের আড্ডা হয়ে উঠল। "হোনান্ প্রদেশ হিংস্র পশুর আবাসে পরিণত হোল। লো-ইয়াঙের পথে ঘাটে মৃতদেহ দেখা যেতে লাগল। বিচারকরা হত হলেন। পলায়ন ছাড়া বৌদ্ধ ভিক্ষুর জীবনরক্ষার অন্য কোন পথ রইলো না।"

কিন্তু কোথায় পালাবেন? হিউএনচাঙের মত নিরীহ সাধু সন্ন্যাসীদের পক্ষে এ সময়টাই ভয়াবহ ছিল। সব লোকই যুদ্ধ বিগ্রহ নিয়ে ব্যস্ত। হিউএনচাঙ্ আর তাঁর দাদা সুসুচুয়ান প্রদেশের পর্বতে আশ্রয় নিতে গেলেন। কেবল এইখানেই কতকটা শান্তি ছিল। (আধুনিক-কালেও চীন সরকার এই প্রদেশেরই চুঙ্‌কিঙ্ শহরে আশ্রয় নিয়েছেন।)

সুসুচুয়ানের রাজধানী চেংটু শহরে আরও অনেক পলাতক সন্ন্যাসী ও পণ্ডিতদের সঙ্গে তাঁদের দেখা হোল। কুঙ্‌হুইস্যুর মঠে এ'দের সঙ্গে হিউএনচাঙ্ নানা বৌদ্ধশাস্ত্র পাঠ কোরে ২।৩ বছর কাটালেন। যে কোন বিষয় একবার পড়লেই তিনি অধিগত করতে পারতেন। তাঁর অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞান ও বিচারশক্তির খ্যাতি দেশময় রাষ্ট্র হোল। যদিও তিনি এ সময়ে মহাযান সূত্রগুলির দিকেই বেশী আকৃষ্ট ছিলেন তবু হীনযানের "অভিধর্মকোষশাস্ত্র" ইত্যাদিও অধ্যয়ন করেন। এইজন্যেই মধ্য এশিয়া আর ভারতবর্ষ পর্যটনের সময়ে তিনি নানা মতাবলম্বী পণ্ডিতদের সঙ্গে যে অসংখ্য বিচার করেন সে সব বিচারে সকল বৌদ্ধ-শাস্ত্রেরই বচন উদ্ধার করবার শক্তি থাকায় অসাধারণ পাণ্ডিত্যের আর বিচারশক্তির পরিচয় দিতে সক্ষম হন।

২০ বৎসর বয়সে হিউএনচাঙ্ সম্পূর্ণরূপে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এই সময় থেকে তিনি "ধর্মগুরু" নামে পরিচিত হন। সুসুচুয়ান ত্যাগ কোরে এখন তিনি নতুন রাজবংশের রাজধানী চাং-আনে আসেন। এর পাঁচশত বৎসর আগে কাশগর ও ভারতের বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা এখানে মঠ স্থাপন কোরে মহাযান ও হীনযানের অসংখ্য ধর্মগ্রন্থ সংস্কৃত থেকে চীন ভাষায় অনূদিত করতে আরম্ভ করেছিলেন। হিউএনচাঙের সময়েও এখানে বৌদ্ধশাস্ত্রের অনেক উপদেষ্টা ছিলেন কিন্তু এ'রা সকলে এক মতাবলম্বী ছিলেন না। প্রত্যেকেই একটা আলাদা মতের অনুসরণ করতেন। হিউএন-চাঙের জীবনীলেখক বলেন—"ধর্মগুরু বুঝতে পারলেন যে, এই সব পণ্ডিতদের প্রত্যেকেই বিশিষ্ট জ্ঞানী ছিলেন। কিন্তু তিনি যখন শাস্ত্রের সঙ্গে এ'দের মতবাদ মিলিয়ে দেখতে চেষ্টা করলেন তখন দেখলেন যে, নানা শাস্ত্রের নানা মত। কোন্‌টা খাঁটি তা বোঝা অসম্ভব হোল। তখন তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন যে, তিনি পশ্চিমদেশে (ভারতবর্ষ) পর্যটন কোরে, সেখানকার জ্ঞানীদের সঙ্গে বিচার কোরে নিজের সন্দেহ ভঞ্জন করবেন।"

এই স্থির কোরে, আরও কয়েকজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে হিউএনচাঙ্ সম্রাট ঠাই-চুঙের কাছে আবেদন করলেন যে, তাঁদের চীনদেশ ত্যাগ কোরে যেতে অনুমতি দেওয়া হোক্। ঠাই-চুঙের সাম্রাজ্য তখনও ভাল কোরে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। তিনি ঐ বিপদসংকুল পথে যাত্রা করতে অনুমতি দিলেন না। হিউএনচাঙ্‌ও পথের বিপদের কথা ভাল কোরেই জানতেন। কিন্তু তবু নিজের মন পরীক্ষা কোরে বিবেচনা করলেন যে, তাঁর মত সংসারমুক্ত পুরুষের পক্ষে নির্ভীকভাবে সমস্ত বিপদের সম্মুখীন হওয়াই উচিত হবে। সম্রাটের আদেশ অমান্য কোরে সীমানা ত্যাগ করাতে বিপদের সম্ভাবনা ছিল। সঙ্গীরাও তাঁকে ত্যাগ করেছিল। কিন্তু তাতে কী? তিনি ফা-হি-আন্ প্রমুখ পুরাতন মহাত্মা পর্যটকদের অনুসরণ করতে ইচ্ছা করলেন। মানুষের সাহায্য তুচ্ছ জ্ঞান কোরে তিনি মনে মনে বোধিসত্ত্বদের কাছে গোপনে দেশত্যাগ করবার সঙ্কল্প নিবেদন করলেন, আর তাঁদের কাছে প্রার্থনা করলেন যে, তাঁরা যেন তাঁকে এই যাত্রার সব সময়েই অদৃশ্য-ভাবে রক্ষা করেন।

৬২৯ খৃষ্টাব্দে তিনি একটি স্বপ্ন দেখেন আর তাতেই তাঁর মন আরও দৃঢ়তর হয়। স্বপ্নে সমুদ্রের মধ্যে বিচিত্র সুমেরু পর্বত দেখতে পেলেন। পর্বতের চূড়ায় উঠবার জন্যে তিনি যেন তরঙ্গসংকুল সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন। সেই সময়ে এক মানস পদ্ম যেন তাঁর পায়ের তলায় আবির্ভূত হোয়ে তাঁকে পর্বতের পাদদেশে পেঁছে দিল। তবু পর্বত

দুরারোহ হওয়ায় তাঁর পর্বত শিখরে উঠা সম্ভব হল না। কিন্তু এই সময়ে হঠাৎ একটা অদ্ভুত ঘূর্ণীবাতাস তাকে তুলে নিয়ে পর্বত চূড়ায় উপস্থাপিত করল। সেখান থেকে তিনি চারিদিকে দিগন্তরাল পর্যন্ত নানা দেশ পরিষ্কারভাবে দেখতে পেলেন। যে সব দেশ তিনি পর্যটন করতে যাচ্ছেন, সেই সবেরই যেন প্রতিচ্ছায়া দেখলেন। আনন্দের আতিশয্যে তিনি জেগে উঠলেন আর এর কয়েকদিন পরেই পর্যটনে বার হলেন।

ধর্মগুরু হিউএনচাঙ যখন যাত্রা করেন তখন তাঁর বয়স ছিল ২৮ বৎসর। তিনি সুশ্রী, দীর্ঘকায় ছিলেন। তাঁর চোখ উজ্জ্বল, চলন ধীর গম্ভীর, মুখশ্রী মনোহর ও বুদ্ধি-মণ্ডিত ছিল। তাঁর স্বভাবে যে পৌরুষ ও নম্রতার সমাবেশ ছিল তা তাঁর পর্যটনের নানা ঘটনা থেকে প্রকাশ পায়। তাঁর কণ্ঠস্বর পরিষ্কার ও বহুদূর প্রসারী ছিল, কথা-বার্তাও মহিমাব্যঞ্জক ও মধুর; সুতরাং শ্রোতাদের চিত্তাকর্ষক ছিল। পাতলা সুতার ঢিলা পোষাক ও কোমরে চওড়া কটিবন্ধ ধারণ করায় তাঁকে পণ্ডিতের মতই দেখাতো। কনফুসীয়সুলভ সাধারণ বুদ্ধি, বিজ্ঞতা, প্রাত্যহিক জীবনের উপযোগী সাবধানতা ও স্থির মতির সঙ্গে বৌদ্ধ সদয় ভাবের সংমিশ্রণ তাঁর স্বভাবে ছিল। যার তার সঙ্গে বন্ধুতা করতেন না, কিন্তু বন্ধুতা রক্ষা করবার জন্যে যে সাবধানতা প্রয়োজন তা তাঁর যথেষ্ট ছিল। স্থৈর্য, মানসিক সাম্যভাব আর করুণা তাঁর স্বভাবে প্রকাশ পেতো। ক্রমশঃ তিনি চীনের পর্বতসংকুল পশ্চিমপ্রান্তে (আধুনিক কানসু প্রদেশে) লি আং চাউ সহরে উপনীত হোলেন।

এখান থেকে পথ বিশেষ দুর্গম ছিল। চারদিকেই খড় বা ঘাসের দেশ—উত্তর দিকে গোবির মরুভূমি, দক্ষিণে কোকোনরের বন্য মালভূমি। তার উপরে এই সীমান্ত শহর থেকে বেরোতে হোলে সম্রাটের পরোআনা দরকার হোত। হিউ এন চাঙ্ গোপনে এই শহর ত্যাগ করে উত্তর-পশ্চিম দিকে গেলেন। দিনে সাবধানে লুকিয়ে থাকতেন, রাত্রে পথ চলতেন, কিন্তু এত সাবধানে থেকেও তিনি জানতে পারলেন যে, সীমান্ত রক্ষীদল তাঁর বিনা আদেশে যাত্রার কথা জানতে পেরেছে। আর তাঁকে গ্রেপ্তার করতে লোক নিযুক্ত হয়েছে। আরও শুনলেন যে, পশ্চিম সীমান্ত ছেড়ে যাবার পথে কুড়ি মাইল অন্তর অন্তর পাঁচটি পাহারা স্তম্ভ আছে। বিপদের উপর বিপদ, এই সময়ে তাঁর ঘোড়াটাও মরে গেল। সৌভাগ্যক্রমে এজেলার শাসনকর্তা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী থাকায় তাঁকে আর গ্রেপ্তার হতে হল না। কিন্তু তাঁর যে দুজন চেলা সঙ্গী ছিল তারা এখানেই তাঁকে ত্যাগ করল। ধর্মগুরু এখন একেবারে নিঃসঙ্গ হলেন। তিনি একটা নতুন ঘোড়া কিনলেন আর মন্দিরে গিয়ে বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়র কাছে প্রার্থনা করলেন যে, শেষ সীমান্ত রক্ষীর দল এড়িয়ে যাবার জন্যে তিনি যেন একজন পথ-প্রদর্শক পান। শীঘ্রই একজন বৌদ্ধ বিদেশী যুবা নিজেই এসে পথ-প্রদর্শক হোতে চাইল। হিউ এন চাঙ্ আনন্দের সহিত তাকে নিযুক্ত করলেন। এই সময়ে এক বৃদ্ধ তাঁকে বললেন, "পশ্চিমের পথ দুর্গম আর বিপদসংকুল। কোথাও চোরাবালি, কোথাও ভূত, প্রেত, কোথাও বা তপ্ত ঝড়। এই সব সহ্য করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। বড় বড় যাত্রীর দল পথ ভুলে মারা যায়। এ অবস্থায় আপনার পক্ষে একা এ পথ অতিক্রম করা দুঃসাধ্য। সাবধান! জীবন বিপন্ন করবেন না।" হিউ এন চাঙ্ তথাপি যাবার জন্যে বদ্ধপরিকর হওয়াতে বৃদ্ধ তাকে একটা বুড়ো অস্থিচর্মসার লাল ঘোড়া দিয়ে বলল যে, এটাই রাস্তা চেনে আর ওর সঙ্গে আপনার ছোট ঘোড়াটা বদল করুন। হিউ এন চাঙ্ এতে রাজী হলেন কারণ চাংআনে থাকতে এক দৈবজ্ঞের কাছে শুনেছিলেন যে এই রকমই হবে।

অল্প কিছুদিন পরে পথ-প্রদর্শক যুবাও বিপদসংকুল পথে যেতে রাজী না হয়ে তাঁকে ছেড়ে চলে গেল। তারপর হিউ এন চাঙ্ পেইশান আর কুরুকটাঘের নুনমাটি আর পাথরের মধ্যে দিয়ে গোবি মরুভূমিতে প্রবেশ করলেন। এই ভয়ঙ্কর মরুভূমিতে তাঁর পথ-প্রদর্শক ছিল শুধু মৃত যাত্রীদের অস্থি (!) আর উটের মল। আস্তে আস্তে এই পথ পরিচারণ করতে করতে তিনি একদিন দেখলেন যেন দিকচক্রবাল শত শত অস্ত্রধারী যোদ্ধায় পূর্ণ, কখনও তারা কুচকাওয়াজ কোরে যাচ্ছে, কখনও বা স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যেকের পরিধানে চামড়ার পরিচ্ছদ। একদিকে উট আর সুসজ্জিত ঘোড়া অন্যদিকে ঝকঝকে নিশান আর বর্শা। মুহূর্তে মুহূর্তে এই দৃশ্যের নানা রকম পরিবর্তন হচ্ছিল। পরিব্রাজক স্থির করলেন যে, এসব নিশ্চয় দৈত্য-দানব ভূতপ্রেতের কারসাজি। * আবার শূন্য থেকে যেন অশরীরী বাণী উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠল—"ভয় নেই! ভয় নেই!"

এরপর একদিন তিনি চীনের পশ্চিম সীমান্তের কাছে রক্ষীদের প্রথম পাহারা স্তম্ভের কাছে গিয়ে পড়লেন। এর কাছেই জল ছিল। কিন্তু রক্ষীদের ভয়ে তিনি দিনের বেলা জলের কাছে না গিয়ে বালির মধ্যে একটা গর্তে লুকিয়ে থাকলেন। রাত্রে ঝরণার কাছে গিয়ে জলপান করছিলেন আর জলপাত্র পূর্ণ করছিলেন, এমন সময় হঠাৎ একটার পর একটা তীর এসে তাঁর হাঁটু ঘেঁসে মাটিতে পড়ল।

* মরুভূমিতে নৈসর্গিক কারণে মরীচিকা হবার দরুণ সর্বত্রই মরুপর্যটকদের মধ্যে এরকম কাহিনী প্রচলিত আছে।

তিনি বুঝতে পারলেন যে, রক্ষীরা তাঁকে দেখে ফেলেছে। যতদূর শক্তি তিনি চীৎকার করে বোলে উঠলেন, "তীর মেরো না; আমি রাজধানী থেকে আগত সন্ন্যাসী।" এই বলে দুর্গের নিকটে গেলেন। দুর্গাধ্যক্ষ বৌদ্ধ ছিল। সেও তাঁকে পথের বিপদের কথা বলে যাত্রা করতে বারণ করল। বলল,—"টুন্-হুয়াঙে * একজন ধর্মগুরু আছেন। তিনি আপনাকে দেখে খুশী হবেন। আপনি তাঁর কাছে গিয়ে থাকুন না?" হিউ এন চাঙ্ উত্তর দিলেন,—"অল্প বয়স থেকেই আমি বৌদ্ধধর্মে একান্ত-ভাবে অনুরাগী। চাঙ্ আন আর লো ইয়াঙ, এই দুই রাজধানীতেই যেসব মুখ্য সন্ন্যাসীরা বৌদ্ধধর্মের চর্চা করে থাকেন, তারা সর্বদাই আমার কাছে আসতেন, বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা করতে, ধর্ম সম্বন্ধে গভীর ভাবে চিন্তা করতে আর ধার্মিক জীবনের ফললাভ করতে। আমি তাঁদের সঙ্গে কথা বলেছি, ধর্মের উপদেশ দিয়েছি, বিচার করেছি। যদিও এ কথা বলতে আমি সংকোচ বোধ করছি, তবুও এ সত্য যে, আজকালকার মধ্যে কোনও সন্ন্যাসীরই আমার চেয়ে বেশী খ্যাতি নেই। আমি যদি ধর্মের আরও অনুশীলন করতে চাই, আমার খ্যাতি আরও বাড়াতে চাই, আপনি কি মনে করেন আমি টুন্ হুয়াঙের সন্ন্যাসীদের শিষ্যত্ব করব?"

এক অখ্যাত সীমান্তের দুর্গরক্ষীকে এই কঠিন তিরস্কার করবার পর আবার তাকে এই ভাবে বোঝালেন—"ধর্মশাস্ত্রগুলি আর তার ভাষ্যগুলির অসম্পূর্ণ অবস্থা আমার গভীর দুঃখের কারণ হয়েছে। নিজের ক্ষতির আশঙ্কা, বিপদ-আপদ তুচ্ছ করে আমি পণ করেছি যে, বুদ্ধদেব যে ধর্মশিক্ষা মানুষকে দান কোরে গিয়েছেন, ভারতবর্ষে গিয়ে সেই ধর্ম অন্বেষণ করব। কিন্তু আপনি দয়ালু লোক হওয়া সত্ত্বেও আমার এই আগ্রহে উৎসাহ না দিয়ে আমাকে নিবৃত্ত হোতে বলছেন! এরপর কি আপনি এ কথা বোলতে সাহসী হবেন যে, আমার মতন আপনিও সংসারের প্রাণীদের দুঃখে দুঃখী বা আমার মতন আপনিও জীবের মুক্তি ইচ্ছা করেন? আপনি যদি আমার যাত্রায় বাধা দেন, তা হোলে আপনার কাছে আমার প্রাণ বলি দেব, তবু হিউ এন চাঙ চীন দেশের অভিমুখে একপাও বাড়াবে না।"

রক্ষী বোধ হয় জীবনে এ রকম বাগ্মীতা কখনও শোনেনি। এই বক্তৃতায় অভিভূত হোয়ে আর বোধ হয় ধর্মভাবেও একটু বিচলিত হোয়ে সে পথিককে সাহায্য করতে রাজী হল। তার কাছ থেকে কিছু খাদ্য-সামগ্রী নিয়ে এখান থেকে সোজা তিনি চতুর্থ পাহারা স্তম্ভে পেঁছলেন। সেই স্তম্ভের রক্ষীও ধার্মিক আর প্রথম স্তম্ভের রক্ষীর আত্মীয় ছিল। সে বলল, সীমান্তের যে পঞ্চম (শেষ) দুর্গ আছে, তার

* চীন সীমান্তের কাছে একটা জেলার সদর।

কাছে যেন তিনি না যান, কারণ সে দুর্গের রক্ষী বৌদ্ধধর্ম বিদ্বেষী।

এই শেষ দুর্গ পরিহার করবার জন্য হিউ এন চাঙকে বাধ্য হোয়ে কামুল বা হামিতে যাবার যেটা সাধারণ যাত্রীদের পথ ছিল, সেটায় না গিয়ে, উত্তর-পশ্চিমের আর এক পথ যেটা গাশুন গোবির মরুভূমির পথ, যাকে চৈনিকরা বালির নদী বলে সেই পথে যাবার চেষ্টা করতে হল। তাঁর জীবনী লেখক বলেন—

> "এই পথে পশু-পক্ষী, জল বা পশুর খাদ্য ঘাস কিছুই ছিল না। পথিক তাঁর নিজের ছায়া দেখে সময় নির্ণয় করতেন, আর প্রজ্ঞা-পারমিতা অধ্যয়ন করতে করতে পথ চলতেন।"

পাঠক কল্পনা নেত্রে এই মরুভূমি দেখুন, আর দেখুন একজন যাত্রী সম্পূর্ণ একাকী, অজানা, অচেনা দূর এক ভারতবর্ষের অভিমুখে বিপদসংকুল মরুভূমির পথে চলেছেন—তাঁর পথপ্রদর্শক কেবল মৃত যাত্রীদের অস্থি, সংগী একমাত্র তাঁর নিজের দেহের ছায়া তাঁর সান্ত্বনার একমাত্র সামগ্রী ধর্মশাস্ত্রের বাক্যাবলী আর তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ভারতে গিয়ে নানা ধর্মমতের তুলনা করা আর ধর্মশাস্ত্রের পাঠোদ্ধার।

তিনি শুনেছিলেন "বন্য অশ্বের প্রস্রবণ" নামে একটি প্রস্রবণ আছে। কিন্তু সে প্রস্রবণ তিনি খুঁজে পেলেন না। জলের কমণ্ডলু তুলে জলপান করতে গেলেন। ভারী কমণ্ডলু তাঁর হাত থেকে পড়ে গেল। সব জলই নষ্ট হোল। তারপর পথেরও গোলমাল হয়ে গেল। ঠিক পথ আর বুঝতে পারলেন না। হতাশ হোয়ে আবার ৪র্থ প্রেক্ষাস্তম্ভের দিকে ফিরলেন। কেবল এই একবার মাত্র প্রতিজ্ঞা থেকে তিনি বিচলিত হয়েছিলেন। কিন্তু চার ক্রোশ গিয়ে তিনি আবার ফিরলেন। "প্রথম থেকেই আমি পণ করেছি যে, ভারতবর্ষে না পেঁাছতে পারলে, চীনের দিকে আমি এক পা-ও ফিরাব না। পূর্বদেশে ফিরে গিয়ে বাস করার চাইতে বরং পশ্চিমদিকে মুখ ফিরিয়ে মৃত্যু হোক্—সেও ভালো।" এই বোলে তিনি তাঁর ঘোড়ার মুখ ফিরালেন আর বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরকে মনে মনে স্মরণ করে আবার উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হলেন।

সতীশ কবিরাজের
শ্বাসারি
হাঁপানি ও ব্রঙ্কাইটীসে
বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ
নিরাময়কারী মহৌষধ
সর্বত্র বড় বড় দোকানে
পাওয়া যায়।
কবিরাজ
এস, সি, শর্ম্মা এণ্ড সন্স
সাহাপুর · বেহালা · দক্ষিণ কলিকাতা

।দিকে অনন্তস্পর্শী সমতল ছাড়া জনপ্রাণীও থতে পেলেন না। রাত্রে অপচ্ছায়ারা রদিকে আলো জবালাতো। দিনে ভীষণ ড় মরুভূমির বালির বৃষ্টি হোত। এই স্ত বিপদ তিনি নির্ভীকভাবে পথ চলতেন। ন্তু অসহ্য তৃষ্ণার কষ্টে তাঁর চলা অসম্ভব ল। পাঁচদিন, চার রাত এক ফোঁটা জলও নি পান করতে পারলেন না। অসহ্য তৃষ্ণায় টের নাড়িভুঁড়ি পর্যন্ত যেন জবলে যেতে গল। দুর্বল হয়ে তিনি মরুভূমিতে শুয়ে ড়লেন, কিন্তু অবলোকিতেশ্বরের নাম গ্রহণ তে বিরত হোলেন না। প্রার্থনা করলেন, ামার এই যাত্রায় আমি ধন, মান, যশ কিছুই আকাঙ্ক্ষা করি না। আমার একমাত্র উদ্দেশ্য সম্যক জ্ঞান আর সত্য ধর্মশাস্ত্রের অন্বেষণ। হে বোধিসত্ত্ব! সংসারের দুঃখ থেকে জীবকে উদ্ধার করবার জন্যে আপনার হৃদয় সর্বদাই ব্যগ্র। আমার দুঃখ কি আপনি দেখছেন না?"

পঞ্চম রাত্রি পর্যন্ত তিনি এইভাবে প্রার্থনা করবার পর অর্ধেক রাত্রে হঠাৎ একটা সুমধুর বাতাস যেন তাঁর সমস্ত অবয়বের ভিতর দিয়ে বোয়ে গেল। মনে হোল যেন কোনও শীতল প্রস্রবণে তিনি স্নাত হয়েছেন। তৎক্ষণাৎ তাঁর অন্ধ চোখ আবার দৃষ্টিশক্তি লাভ করল। এমন কি, অশ্বও বল পেয়ে উঠে দাঁড়ালো। এইভাবে পুনর্জীবন লাভ করে তাঁর একটু সুনিদ্রাও হোল। ঘুমিয়ে স্বপন দেখলেন একজন বৃহদাকার দানব একটা মস্ত বর্শা আর নিশান হাতে কোরে ভীষণ শব্দে তাঁকে বলছে—"নিষ্ঠার সঙ্গে অগ্রসর না হোয়ে এখন ঘুমোচ্ছেন কেন?"

চমকে জেগে উঠে ধর্মগুরু আবার অগ্রসর হলেন। চার মাইল অতিক্রম করবার পর হঠাৎ তাঁর ঘোড়া জোর কোরে তাঁকে একদিকে নিয়ে গেল। সেখানে তিনি একটা মরুদ্যান পেলেন। পরিষ্কার জল আর ভালো ঘাস পেয়ে যাত্রী আর অশ্ব জীবনীশক্তি পেলেন। দুদিন পর তিনি ই—উ (আধুনিক হামি)তে পেশছলেন।

(ক্রমশঃ)

জনসন যেমন বলিয়াছিলেন,—

Survey mankind from China to
eru.

তেমনই সেচের ব্যবস্থা হইতে জন্মনিয়ন্ত্রণ ন্ত সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়া পশ্চিম ঙ্গর বেসামরিক সরবরাহ সচিব বলিয়াছেন, াপাতত অন্তত ৫ বৎসর পশ্চিম বঙ্গের অন-ট দূর হইতে পারে না। শুনা যায়, কতদিনে র্মানী পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হইবে তাহা জিজ্ঞাসা রিলে, একজন জার্মান উত্তর দিয়াছিল—৫৪ সরে—৫০ বৎসর জার্মানীকে বিজেতৃদিগের য়ন্ত্রণাধীন রাখা হইবে–নিয়ন্ত্রণমুক্ত হইলে র্মানীর পূর্বাবস্থা প্রাপ্তির জন্য মাত্র ৪ সর প্রয়োজন হইবে। ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধে র্মানীর দ্বারা শোষিত ফ্রান্স আশাতীতরূপে তভাবে তাহার পূর্বাবস্থার্জন করিয়াছিল। । সকল কথা– শিল্পপ্রধান দেশের; কৃষিপ্রধান শের দুর্দশা ২ বৎসরে দূর করা সম্ভব। সে ষয়ে বিজ্ঞান যে আমাদিগের সহায় হইতে রে, তাহা বলা বাহুল্য। কৃত্রিম সারের দ্বারা মির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি, উৎকৃষ্ট বীজের ারা ফসলের ফলন বৃদ্ধি, পাম্পের দ্বারা চের ব্যবস্থা করা—এ সকল কথনও উপেক্ষাও রা যায় না।

সরকারের হিসাবে দেখা যায় জিলা ২৪ রগণায় আবাদী জমির পরিমাণ ১৬ লক্ষ ৫১ জার ৯ শত একর; আর আবাদযোগ্য তিত জমির পরিমাণ ১ লক্ষ ৬৩ হাজার ৩ ত একর। এই যে, দেড় লক্ষ একর জমি াবাদযোগ্য হইয়াও অনাবাদী রহিয়াছে, হার কারণ কি, ইহার জন্য কে দায়ী এবং হাতে আবাদ করিবার জন্য কি চেষ্টা ইতেছে? ভারতবর্ষ বিভক্ত হইয়া স্বায়ত্তশাসন াভের পরে প্রায় ২ বৎসর অতিবাহিত হইল। ই সময়ের মধ্যে পশ্চিম বঙ্গে খাদ্যোপকরণ র্ধিত করিবার কি চেষ্টা হইয়াছে? ২৪ পরগণা লিকাতাকে বেষ্টন করিয়া আছে; সেই জিলায় । দেড় শত একর জমি পতিত আছে, তাহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই; কারণ আমরা দেখিতে পাই কলিকাতার উপকণ্ঠে কলিকাতা ও ব্যারাকপুরের মধ্যবর্তী স্থানে যেমন, কলিকাতা হইতে বারুইপুরের মধ্যবর্তী স্থানেও তেমনই অনেক জমি "পতিত" আছে—আগাছায় পূর্ণ।

আমরা সারের সম্বন্ধে দেখিতে পাই, সরকারের কৃষি বিভাগের অমৃতধারা কৃষককে সার প্রয়োগ সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে উদ্যোগী নন। সরকার যে সার বিক্রয় করেন, তাহাতে অনেক অসার দ্রব্য মিশ্রিত পাওয়া যায়, সে অভিযোগ সরকার নিশ্চয়ই জানেন;—যে সার বিক্রয় করা হয়, তাহার শক্তি পরীক্ষা করিয়া বিক্রয় করা হয় না। আমরা শুনিতেছি, পূর্বে কৃষকগণ সার (সরকারী দোকান হইতে) কিনিলে যে মূল্য হ্রাস পাইত, এবার তাহা তারা পাইবে না। কিন্তু মূল্য হ্রাসের মাত্রা বৃদ্ধি করাই বাঞ্ছনীয়। কারণ, তাহা হইলে কৃষকগণ সার ব্যবহারে আরও আগ্রহসম্পন্ন হইবে।

ইহার পরে আমরা বীজের কথা বলিব। শাকসব্জী বিবিধ—দেশী ও বিদেশী। বিদেশী শাকসব্জীর মধ্যে কপি, বীট, গাজর, সালগম, টোম্যাটো, লেটুস প্রভৃতির প্রচলন অধিক। বিদেশী শাকসব্জীর বীজ এদেশে দুইটি স্থানে ভাল হয়—কোয়েটায় ও কাশ্মীরে। কোয়েটা এখন পাকিস্তানে; তথা হইতে বীজ রপ্তানি করিতে দেওয়া না দেওয়া পাকিস্তান সরকারের অভিপ্রায়ের উপর নির্ভর করে—রপ্তানির জন্য চড়া শুল্ক ধার্য হইতে পারে। কাশ্মীরে এখনও অশান্তির অবসান হয় নাই। তাহার পর—আমেরিকা প্রভৃতি বিদেশে রোগ-শূন্য শাকসব্জীর গাছ উৎপন্ন করিবার জন্য যেরূপ পরীক্ষা ও গবেষণা হইয়াছে ও হইতেছে—কোয়েটায় ও কাশ্মীরে তাহা হয় নাই। ভারত সরকার এই অবস্থায়ও বিদেশ হইতে বীজ আমদানীর অনুমতি দিতে অসম্মত। আমরা জানি গত বৎসর কোন কোন কৃষক ও বীজ ব্যবসায়ী বিদেশ হইতে উন্নত শ্রেণীর বীজ আনিবার অনুমতি চাহিয়া সে অনুমতি লাভ করেন নাই। আমেরিকায় ফুল-কপির পীতরোগশূন্য করিবার চেষ্টা ফলবতী হইয়াছে। কাজেই আমেরিকা হইতে পীতরোগ-শূন্য কপির বীজ আমদানী করিলে অনেক উপকার হইত। এদেশে সরকার সেরূপ পরীক্ষা করেন নাই বা করিলে সাফল্য লাভ করেন নাই।

বাঁধাকপি সম্বন্ধে বলা যায় ডেনমার্কে নিম্নলিখিত বিবিধ কপির বীজের ফলন অধিক হয়—(১) গ্লোরী অব এনখুইজেন, (২) লেট ফ্ল্যাট ডল, (৩) কোপেনহেগেন মার্কেট। ভারত সরকার যদি আবেদন করিলে এইরূপ বীজ আনিবার অনুমতি ও সুবিধা দেন অথবা যদি আপনারা আমদানী করিয়া সরবরাহ করেন, তাহা হইলে আগামী শীত-কালেই কপির ফলন অধিক হইতে পারে।

ইহার পরে সেচের কথা। কবে দামোদরের ও ময়ূরাক্ষীর প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত হইবে, তাহা গণৎকারও বোধ হয় বলিতে সাহস করিবেন না। টেনেসী ভ্যালী ব্যবস্থার অন্ধ অনুকরণ ব্যর্থ হইতেও পারে—দেশের উপযোগী ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিন্তু বাঁধ ও পুষ্করিণীগুলির আবশ্যক সংস্কার সাধন করিলে যে অনেক জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা যায় এবং পাম্প ব্যবহার করিলে সহজে সেচ দেওয়া যায়, তাহা বলা বাহুল্য। এই প্রসঙ্গে আমরা বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের ও ২৪ পরগণার কথাই আজ উল্লেখ করিব। বিষ্ণুপুরের বাঁধের ব্যবস্থা দেখিয়া অনেকেই বলিয়াছেন—পৃথিবীর লোককে বাঁধের ও পুষ্করিণীর জলে সেচ ব্যবহার করিবার জন্য

বিষ্ণুপুরে আসিতে হইবে। সেই বিষ্ণুপুরে বাঁধগুলি কিভাবে নষ্ট হইতেছে, তাহা দেখিলে দুঃখিত হইতে হয়। পশ্চিম বঙ্গে বিশেষভাবে পুষ্করিণী হইতে দ্রোণীর সাহায্যে সেচ অতি পুরাতন ব্যবস্থা। ২৪ পরগণায়—কলিকাতার উপকণ্ঠে বোড়াল গ্রামে "সেন দীঘী" নামক যে বিরাট দীঘী গল্মে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে, তাহার বর্ণনা রাজনারায়ণ বসু মহাশয় দিয়া গিয়াছেন। উহার সংস্কার হইলে যে অনেক জমিতে সেচের ব্যবস্থা হয়, তাহাও কৃষি বিভাগের কর্মচারীরা হিসাব করিয়া সরকারকে জানাইয়াছেন। কৃষি বিভাগ যখন মৎস্য বিভাগের সহিত সংযুক্ত ছিল, সেই সময় কৃষি সচিব শ্রীহেমচন্দ্র নস্কর ঐ দীঘী পরিদর্শনও করিয়াছেন। সরকার কি ঐ দীঘী ও অন্যান্য স্থানে ঐরূপ দীঘী সাধারণের হিতার্থে অধিকার করিয়া সে সকলে সেচের ও মৎস্যের চাষের ব্যবস্থা করিতে পারেন না? পাঁচ বৎসর পরে হইবে বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকা অসংগত এবং অক্ষমতার ছদ্মবেশ।

কি উপায়ে আয়ার্লণ্ডের সমবায় প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে তথায় হাঁস মুর্গীর উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, তাহার বিবরণ আমরা পশ্চিম বঙ্গের কৃষি বিভাগের কর্মচারীদিগের অবশ্য পাঠ্য বলিয়া মনে করি। ইউরোপে আজ যে মুর্গী "ব্রামা" নামে পরিচিত ও আদৃত তাহা এদেশ হইতে "কোচিন" মুর্গীরই মত বিলাতে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। "ব্রামা"—চট্টগ্রামের দেশী মুর্গী—ব্রহ্মপুত্রের নাম হইতে তাহার নামকরণ; "ব্রামা" বিকৃতি। এমন দৃষ্টান্ত অন্যদিকেও আছে। যথা—অলক্তের বর্ণ কৃমিজ বলিয়া রক্তবর্ণ ইংরেজীতে শেষে "ক্রিমজনে" পরিণত হইয়াছে, সংস্কৃত "শর্করা" হইতে ইংরেজী "সুগারের" উৎপত্তি। কোচিন হইতে নীত মুর্গীই বর্তমানে "ব্রাহ্ম কোচিনের" পূর্বপুরুষ। এ অবস্থায় যদি "রাডস রেড" বা "লেগহর্ন" লইয়া পশ্চিম বঙ্গে মুর্গীর উন্নতি সাধন চেষ্টা না করিয়া চট্টগ্রামের মুর্গী লইয়া তাহা করা হয়, তবে সহজে ফললাভ হইতে পারে।

পশ্চিম বঙ্গে দুগ্ধাভাব দূর করিবার জন্য সর্বাগ্রে কলিকাতায় যে সকল উৎকৃষ্ট গাভী ও বৎস নীত হয়, সে সকল যাহাতে নষ্ট না হয়, তাহার ব্যবস্থা করা। সরকারী রিপোর্টেই প্রকাশ, প্রতি বৎসর বহু দুগ্ধবতী গাভী কলিকাতায় আমদানী করা হয় এবং দুগ্ধদান কাল শেষ হইলেই কশাইকে দেওয়া হয়। আর গোবরের ও পশুখাদ্য উৎপাদনের ত কথাই নাই।

মৎস্যের চাষেও যে কোন সুপরিকল্পিত উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, এমন কথা বলা যায় না। কি উপায়ে—যেনতেন প্রকারে সমুদ্র হইতে ডোবা পর্যন্ত হইতে মাছ আমদানী করিয়া কলিকাতাবাসীর জন্য মাছের দাম কম করিয়া তাহাদিগের মুখ বন্ধ করা যায়, সরকার যেন সেই চেষ্টাতেই ব্যস্ত। কিন্তু কলিকাতাই বঙ্গদেশ নহে এবং কলিকাতার বাহিরে বাঙলায় সংবাদপত্র না থাকিলেও বাঙ্গালীর বাস আছে। আর যাহাকে সাধারণত "পোনা" মাছ বলা হয় —খাদ্য হিসাবে তাহাই একমাত্র মাছ নহে। রোহিত, কাতলা, মৃগেল—বড় বড় মাছ। তাহার আদর অধিক। কিন্তু ইউরোপে কোন কোন দেশে যে খাল, বিল, বাঁওড়, জলা ছোট ছোট মাছের ডিমে ও বাচ্চায় ভরিয়া দিয়া মাছের উৎপত্তি বৃদ্ধি করা হয়, তাহা সর্বজনবিদিত। পার্শে, চাঁদা, বেলে, ট্যাংরা, পুঁটি সরপুঁটি ফে'সা এইরূপ অনেক ছোট মাছ অতি অল্প যত্নে বাড়িতে থাকে। সেদিকে মনোযোগ না করার কারণ কি?

আগামী ৫ বৎসরে পশ্চিম বঙ্গে খাদ্যাভাব ঘুচিবে না, তাহা মানিয়া লইতে লোক বাধ্য নহে। আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস, পশ্চিম বঙ্গের কৃষি ও মৎস্য বিভাগ যদি আন্তরিক চেষ্টা করেন, তবে ২ বৎসরের মধ্যেই তাঁহারা সরবরাহ সচিবের মতের অসারতা প্রতিপন্ন করিতে পারেন। সরবরাহ বিভাগের নিয়ন্ত্রণে পশ্চিম বঙ্গ সরকার কি প্রতি বিভাগের জন্য একটি করিয়া পরামর্শদান সমিতি গঠন করিয়া দেশের লোককে বিনামূল্যে তাঁহাদিগের অমূল্য অভিজ্ঞতা জাতির কল্যাণ জন্য দিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতে পারেন না? অভিজ্ঞতা ও আন্তরিকতা দপ্তরখানায় বেতনভুক্ কর্মচারীদিগের মধ্যেই যে আবদ্ধ নহে, তাহা অনায়াসে বলা যায়।

কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের জন্য নিযুক্ত কমিটির নির্ধারণ গ্রহণ করিয়াছেন —নহে, নহে, নহে—এখন ওসকল কথা উঠিতেই পারে না। এই কমিটির সদস্যত্রয়ের নাম—কংগ্রেসের সভাপতি ডক্টর পট্টভী সীতারামিয়া, ভারত রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু এবং সহকারী প্রধান মন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। কমিটির নির্দেশে অন্ধ্রকে স্বতন্ত্র প্রদেশ করিবার দাবী সর্বাগ্রে বিবেচিত হইবে। বলা হইয়াছে, যদি লোকমত প্রবল হয়, তবে গণতন্ত্রানুমোদিত প্রথায় সে বিষয়ে অবহিত হওয়া কর্তব্য হইলেও—এক্ষেত্রে তাহা হইবে না—কেন না, সমগ্র ভারতের কল্যাণই প্রধান লক্ষ্য। কাজেই এখন কিছুকালের জন্য ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের প্রস্তাব বাতিল ও নামঞ্জুর করিয়া অত্যাবশ্যক বিষয়-সমূহে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করাই প্রয়োজন। ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন যে-খণ্ডিত ভারতে অত্যাবশ্যক বিষয় সমূহের তালিকাভুক্ত হইতে পারে, তাহা কি কল্পনাতীত?

কমিটি যে সকল যুক্তি উপস্থাপিত করিয়া কংগ্রেসের নীতি ও প্রতিশ্রুতি অবজ্ঞা করিতে চাহিয়াছেন, সে সকলের ভিত্তিহীনতা অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। আমরা কমিটির সকল যুক্তির আলোচনা করিতে চাহি না—সে স্থান আমাদিগের নাই। আমরা কেবল পশ্চিম বঙ্গের জন্যই বলিব। যে সময়ের মধ্যে কমিটির নির্ধারণ অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ আর বিহারের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চল দাবী করিতে পারিবে না, সেই সময়ের সুযোগ লইয়া বিহার ছলে বলে কৌশলে ঐ সকল অঞ্চলকে হিন্দী ভাষাভাষী প্রতিপন্ন করিবার ব্যবস্থা করিবে। বিহার সরকার বিহারের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গভুক্ত করিবার জন্য আন্দোলনকারী ও সেই আন্দোলনের সহিত সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে "সাসপেক্ট" মনে করিয়া ব্যবহারের জন্য পুলিশকে যে নির্দেশ দিয়াছেন, তাহা নিশ্চয়ই পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু দেখিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে বলি—তিনি বাঙলার সম্বন্ধে তাঁহার সাধারণ মত ক্ষণেকের জন্য বর্জন করিয়া —কি স্বীকার করিবেন না, বিহার সরকারের সেই নির্দেশ—ইংরেজের আমলে ভার[ত] সরকারের হ্যালেট সার্কুলারেরই ম[ত] নিন্দনীয়? আমাদিগের বিশ্বাস, কমিটির নির্ধারণ, বাঙালীর অসন্তোষের অগ্নিতে ইন্ধন যোগ করিবে, তাহার ক্ষতে ক্ষারক্ষেপ করিবে। Hope deferred maketh the heart sic[k]. কংগ্রেসের নীতি ও প্রতিশ্রুতি কখনই নির্ভরের অযোগ্য হইতে পারে না, এই বিশ্বাসে বাঙালীরা এতদিন এই আন্দোলন প্রদীপ্ত করিতে নিরস্ত ছিল। কিন্তু আজ যখন কংগ্রেস সরকার—স্বায়ত্তশাসনশীল দেশে—তাহাদিগের কংগ্রেসের নীতিতে ও প্রতিশ্রুতিতে সে অবিচলিত বিশ্বাস বিলম্বিত করিলেন, তখন তাহার অসন্তোষ যে রাষ্ট্রের শক্তি বৃদ্ধি করিয়া দৌর্বল্য বর্ধিত করিতে পারে, তাহা যেন আজ যাঁহারা ক্ষমতাশালী তাঁহারা মনে রাখেন।

বিহারে বাঙালীদিগের প্রতি যে ব্যবহার করা হইতেছে, তাহার পরিণতি মানভূমের সত্যাগ্রহে। এবার দোলযাত্রার সময় সরকারের কোন কোন লোকও যে রং লইয়া হোলি খেলিয়াছিল, তাহার পরে, অহিংসায় যাঁহারা অবিচলিত তাঁহাদিগের পক্ষে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করা ব্যতীত অন্য উপায় ছিল না। কারণ যাঁহাদিগের নিকট দুর্নীতি প্রতীকারের আশা করা যায়—তাঁহারাই দুর্নীতির পরোক্ষভাবে সমর্থক। গত ৬ই এপ্রিল—ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভ প্রচেষ্টার ইতিহাসের পবিত্র দিনে মানভূমে সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইয়াছে। যাঁহারা সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই বাঙালী—পুরুষ ও নারী। সত্যাগ্রহে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে ২রা এপ্রিল পুরুলিয়ার লোকসেবক সঙ্ঘের পরিচালক শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ —তাঁহার বহু সহকর্মীতে গঠিত বিহার সচিব সঙ্ঘকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার একাংশ

করিলেই সত্যাগ্রহীদিগের উদ্দেশ্য বুঝা

আজ আমাদিগকে আপনাদিগের কৃত য়ের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে হইতেছে। আপনারা আপনাদিগের কার্য বিশ্লেষণ বন, তখন যে আপনারা ঐ সকল য়ের জন্য পরিতপ্ত হইবেন, তাহাতে সন্দেহ সেইসকল অন্যায় হইতে অব্যাহতি নাই—কল আমাদিগের জাতীয় জীবনের একটি য় মসিমলিন করিবে। আজ বেদনার্ত য় আমাদিগকে এই কথা বলিতে হইতেছে না বলিয়া উপায় নাই। আমরা আপনা-র প্রতি ভালবাসা ও সহানুভূতি সহকারে কথা বলিতেছি। আমাদিগের ইহা বলিবার শ্য—আপনাদিগকে আপনাদিগের বর্তমানে ষ্ঠিত কাজের স্বরূপ উপলব্ধি করান এবং ট প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের সদস্যরূপে আপনা-র নিকট লোক কিরূপ ব্যবহার লাভের । করিয়াছে, তাহা বুঝান। স্নেহবশে বা হানির ভয়ে আমরা অপ্রীতিকর অবস্থা ন করিতে পারি না।......আমরা কর্তব্য-ধবশে জনগণের পক্ষাবলম্বন এবং ষ্ঠানের ও তাহার ঐক্যের জন্য কাজ তে বাধ্য।"

সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্বে সেবক সঙ্ঘের সম্পাদক শ্রীবিভূতি দাশ যে বিবৃতি প্রচার করেন, তাহাতে তিনি কে স্মরণ রাখিতে বলেন—এই সত্যাগ্রহ রীদিগের বিরুদ্ধে নহে—ইহার সহিত দশিকতার কোন সম্বন্ধ নাই। প্রাদেশিকতা গ্রেসের আদর্শবিরোধী। বিহার সরকার শিকতার প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া মানভূমের বাসীদিগের প্রতি যে অন্যায় করিতেছেন, র প্রতিকার করিয়া মনুষ্যমাত্রেরই জন্য । ও অধিকার প্রতিষ্ঠা এই সত্যাগ্রহের দেশ্য।

তিনি বাঙলার লোকের নিকট সনির্বন্ধ রোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন, তাঁহারা যেন রে সত্যাগ্রহের সহিত সহানুভূতিহেতু কাতায় এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য স্থানে রী-বিরোধী প্রচারকার্য না করেন। কারণ, তে এই সত্যাগ্রহের উদ্দেশ্য বিকৃত করা বে। কোন দায়িত্বজ্ঞানহীন লোকও যেন প প্রচারকার্যে প্রবৃত্ত না হন।

তিনি বিহারীদিগকেও অনুরোধ করিয়াছেন, তাঁহারা যেন সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত এই সত্যাগ্রহের সহিত সহানুভূতি-সম্পন্ন হন।

এই সকল পত্র ও বিবৃতি হইতে বুঝা যায়—কোন্ পক্ষ হইতে সত্যাগ্রহের নীতি-বিরুদ্ধ কাজের আশঙ্কা করা যায়। যাঁহারা বিহারে এই সত্যাগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারা সত্যাগ্রহের পুরাতন সৈনিক। তাঁহা-দিগের দিক হইতে কোন আশঙ্কা নাই। আশঙ্কা কোন্ পক্ষ হইতে হইতে পারে, তাহার পরিচয় সত্যাগ্রহ আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া গিয়াছে।

বিহার সরকার বিহারে ত্যাগ্রহের জন্য সশস্ত্র পুলিশ প্রেরণ করিয়াছেন। কখন কি হয় তাহা বলা দুষ্কর। কিন্তু আমাদিগের বিশ্বাস, গান্ধীজীর নির্দিষ্ট পথে যাঁহারা দৃঢ়পদে অগ্রসর হইতে কৃতসঙ্কল্প, তাঁহাদিগের সত্যাগ্রহ সাফল্যলাভ করিবে।

"Truth forever on the scaffold, wrong
forever on the throne—
Yet that scaffold sways the future, and
behind the dim unknown
Standeth God within the shadow,
keeping watch above His own."

সত্যাগ্রহে বাধাদানকারীরা লোকের চশমা প্রভৃতি কাড়িয়া লইয়াছে—সাংবাদিকদিগের উপর বিষাক্ত ভেষজরস নিক্ষেপ করিয়াছে এবং তাহাদিগের নিক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ডের আঘাতে অতুলবাবুর দেহ হইতে রক্তপাত হইয়াছে। এই রক্তেই হয়ত সত্যাগ্রহের জয়তিলক অঙ্কিত হইবে।

পশ্চিমবঙ্গে এই সত্যাগ্রহের প্রতিক্রিয়া না হওয়া অবশ্যই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু বিহার সত্যাগ্রহ বলে দলিত করিবার চেষ্টা হইলে ফল কি হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিহারের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলে এই সত্যাগ্রহের অভিযান মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করিয়া কর্তব্য বিষয়ে সচেতন হইয়াছেন কি না আমরা বলিতে পারি না। এই সত্যাগ্রহের ফল যে সমগ্র ভারত রাষ্ট্রে অনুভূত হইবে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না।

যখন পূর্ববঙ্গ ত্যাগে বাধ্য হিন্দুদিগের কতকাংশকে আন্দামানে পাঠাইবার প্রস্তাব হয়, তখনই আমরা বলিয়াছিলাম, যাহাদিগকে পাঠান হইবে, তাহাদিগকে "দ্বীপান্তর করা"ই হইবে। কারণ, পশ্চিমবঙ্গের সহিত তাহাদিগের কোন যোগ থাকিবে না। যদি আন্দামান পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শাসনাধীন করা হইত—আন্দামান-বাসীদিগের পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে প্রতি-নিধি প্রেরণের অধিকার স্বীকার করা হইত এবং পশ্চিমবঙ্গের সহিত আন্দামানের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ করা হইত—তবেই আন্দামানে প্রেরিত বাঙালীরা স্বস্তি অনুভব করিতে পারিত।

স্বর্গ হইতেও বড় জননী জন্মভূমি ত্যাগ যে কেহ সহজে করিতে চাহে না, তাহা বলা বাহুল্য। কিরূপ কারণে পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুরা পৈতৃক বাস ত্যাগ করিতেছেন, তাহা "আনন্দবাজার পত্রিকা"র নিজস্ব সংবাদদাতার গত ৫ই এপ্রিল খুলনা হইতে প্রেরিত পত্রে বুঝিতে পারা যায়—

"প্রকাশ, গত ১৯।৩।৪৯ তারিখে রাত্রি অনুমান ১-৩০ মিনিটের সময় ১২।১৪ জন দুর্বৃত্ত মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া কচুয়া থানার অন্তর্গত বাগাল গ্রামের শ্রীসুরেন্দ্র-নাথ সাহার বাড়িতে হানা দিয়া ধান, চাউল, বাসন, কাপড় ইত্যাদি এবং নগদ ২০০ টাকা লইয়া যায়। তাহাদের মধ্যে ৩ জন দুর্বৃত্ত সুরেন সাহার স্ত্রী ও ভ্রাতৃবধূর উপর পাশবিক অত্যাচার করে, ফলে তাহারা উভয়েই সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়ে এবং রক্তস্রাব হইতে থাকে। তাহা-দিগকে বাগেরহাট হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। দুর্বৃত্তগণ যাইবার সময় তাহাদের হাতের চুড়ি ও কানের ফুল লইয়া যায়। দুর্বৃত্তগণ গৃহ-স্বামীর প্রতিবেশী এবং ঐ তিনজনকে চিনিতে পারা গিয়াছে। পুলিশ তিনজনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। তন্মধ্যে একজনকে জামীনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। সে এখন ইহাদের ও অন্যান্য হিন্দুদিগকে শাসাইতেছে বলিয়া প্রকাশ। স্থানীয় হিন্দুগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িয়া-ছেন। উক্ত গ্রামে মাত্র ১৪ ঘর হিন্দু বাস করেন।"

যে সময় উভয় রাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীরা শিষ্টাচারের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া শান্তির ও প্রীতির কথা বলিতেছেন, সেই সময় পূর্ব পাকিস্থানে এইরূপ ঘটনা ঘটিতেছে। এই সকল দুর্ব্যবহারের সংবাদ কি পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভিত্তিহীন মনে করিতে বা উপেক্ষা করিতে পারেন?

## জাপানী নয় ফরাসী!

ছবিখানি দেখে মনে হবে বুঝিবা জাপানে কোনো জাপানী নাটক অভিনীত হচ্ছে, কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই তা নয়। ফরাসী ছাত্রদের একটি দল, যারা জাপানের সংস্কৃতি ও কৃষ্টি পছন্দ করে তারা প্যারিস নগরীতে একটি জাপানী নাটক অভিনয় করেছিল। ছবিখানি সেই নাটক অভিনয়েরই একটি দৃশ্য। নাটকের নাম "উজুমে"—জাপানের একটি প্রাচীন উপাখ্যান, আলো ও নাট্যশিল্পের জন্মকথা অবলম্বনে উজুমে নৃত্যনাট্য রচিত হয়েছে। যুদ্ধের পর ইয়োরোপে এই প্রথম জাপানী নাটক অভিনীত হ'ল। "উজুমে নৃত্যনাট্য" জাপানে শতাব্দীর পর শতাব্দী অভিনীত হয়ে আসছে, তবে কেবলমাত্র নতুন কোনো রাজার অভিষেক উৎসবেই এই নাটক অভিনীত হয়।

প্যারিসে অভিনীত হচ্ছে প্রাচীন জাপানী নৃত্য নাট্য

## যত পার কুকুর ধরো

কাশীর রাস্তার ধর্মের ষাঁড়ের মতো বার্লিনের রাস্তায় নাকি কুকুরের উৎপাত ভয়ানক বেড়ে গেছে। হয়ত যাদের পোষা কুকুর ছিল, তারা কুকুরদের আর খেতে দিতে না পেরে ছেড়ে দিচ্ছে। নিজেদের পেট চলাই আজকাল দায় হয়ে উঠেছে। বার্লিন শহরে এই সব হ্যাংলা অথবা ন্যাংলা কুকুরদের ধরবার জন্য সরকারী ব্যবস্থা করা হয়েছে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে দেওয়ালের আড়ালে হাতে রুটি নিয়ে স্ত্রীলোকটি কুকুরের অপেক্ষা করছে। কুকুর এলেই তাকে রুটি খেতে দেওয়া হবে ও সেই সুযোগে স্ত্রীলোকটি তার হাতের দড়ি দিয়ে কুকুরটিকে বেঁধে ফেলে তাদের জন্য নির্দিষ্ট "জেলখানায়" নিয়ে যাবে। কে জানে বার্লিনে হয়ত কুকুরদেরও স্বাধীন থাকবার উপায় নেই।

## জিবই রাখবোনা

গ্রীসের জন পলিটিস এথেন্সের কাছে বাস করে। তার কাষ হল গরিলা বাহিনীকে এক স্থান থেকে অপর স্থানে চালান দেওয়া। পলিটিস কিছুদিন আগে ধরা পড়ে যায়, পুলিসকে ফাঁকি দেবার চেষ্টায় একটি লরীর নীচে লাফিয়ে পড়ে, কিন্তু তার আত্মহত্যার চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং পা দুটি তার ভেঙ্গে যায়। শেষ পর্যন্ত তাকে সারিয়ে তোলা হয়। পুলিসের কাছে যখন তাকে প্রশ্নোত্তরের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়, তখন সে কোন প্রশ্নেরই উত্তর দিতে অস্বীকার করে আর উত্তর দেবেই বা কি করে? ইতিমধ্যে সে তার জিবটি দাঁত দিয়ে কেটে বাদ দিয়ে দিয়েছে। পাছে পুলিসকে কোন কথা বলতে বাধ্য হতে হয়।

## আমাদের দাবী মানতে হবে

ওদিকে টোকিয়ো শহরের ইম্পিরিয়াল প্লাজাতে টেলিফোন গার্লরা ধর্মঘট করে মিটিং করেছে। কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ হ'ল যে, একদিকে তোমরা লোক ছাঁটাই করছ, আর অপরদিকে আমাদের কাজ বাড়াচ্ছ, ওসব চলবে না। মিটিংএ তারা দাবী করছে যে, "আরও হাত বাড়াতে হবে, আমাদের দাবী মানতে হবে।" তাদের এই দাবী টেলিফোনের সংগে একটি মুষ্টিবদ্ধ হাত যোগ করে চিত্র দ্বারা জানানো হচ্ছে। মিটিংএ এই ছবিটি অনেক ছবির মধ্যে খুবই আকর্ষণীয় হয়েছিল।

বাসের কনডাক্টার নয়, কুকুর শিকারী!

"আমাদের দাবী মানতে হবে"

# বিপ্রমুখের কথা

অক্ষয়-স্বর্গ-কামনয়া'—শ্রাদ্ধমন্ত্রের এই অংশটি বারে বারে মনে পড়ছে। ‌কবারই শ্রাদ্ধকৃত্য করতে হয়েছে। তাই গুলো একরকম কণ্ঠস্থ হয়ে গেছে। সেই মন্ত্রের মধ্যে স্বর্গ-কামনাটি পরিস্ফুট। বেশি যে মনে হয়, সত্যি বোধ হয় স্বর্গ কোনও বাস্তব পদার্থ আছে। পরম-গত সম্রাট প্রিয়দর্শীও তাঁর প্রজাবর্গকে চরণে প্রবন্ধ করেছিলেন স্বর্গের মনোরম দেখিয়ে—হস্তী, বিমান আর জ্যোতি দর্শন য়ে। খৃষ্টান যাজকের দলও ধর্ম প্রচারের য় স্বর্গরাজ্যের বিস্তারিত উল্লেখ করেন। ‌ঙ্ই আমাদের শাস্ত্রে ও সংস্কারে যে '-কামনা শিকড় চালিয়ে বসে আছে, সেটা । কিছু বিচিত্র নয়। পারত্রিক মঙ্গল আর ‌-ত্রাণের জন্যই যত কিছু ক্রিয়াকলাপ। এর এও এক রকম ঘুষ। অহরহ যে ‌ভয় মানুষের মনকে ঘিরে আছে, তার হাত ক ছাড়ান পাওয়ার উদ্দেশ্যেই আমরা 'বাসের কল্পনাকে আঁকড়ে আছি। উপায় বিপদটা বাস্তব ও চাক্ষুষ এসে দাঁড়ালে তা অতি বড় কাপুরুষও মরিয়া হয়ে বীরের । আচরণ করে। কিন্তু কাল্পনিক এবং য়ত্ত বলেই মৃত্যু-চিন্তা এত মারাত্মক। া দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

আমার এক আত্মীয় ছিলেন—যিনি ‌কগ্রস্ত মানুষ। শরীরের প্রতি তাঁর ‌ভব মমতা ছিল। মানে, রোগের ভয় আর ‌র ভয় তাঁকে এতই কাবু করে ফেলেছিল কোনমতেই তিনি 'রিস্‌ক্' নিতেন না। ‌বীর অদৃশ্য বীজাণুর সঙ্গে লড়াই করা না। তাই অধিকাংশ সময়েই রাস্তায় ‌লে তিনি নিঃশ্বাস বন্ধ করে প্রাণায়াম ‌তন। অর্থাৎ তীব্র ঘ্রাণশক্তির সাহায্যে ন অনুমান করতে পারতেন, নিকটেই ‌ও আবর্জনা আছে কিনা এবং সময়মত ‌গ থেকেই দম বন্ধ করে চলতেন। শুধু নয়। সর্ব বিষয়েই তাঁর একমাত্র চিন্তা ‌, কখন কিভাবে মৃত্যু এসে শিয়রে ‌বে! চীনাবাদাম খেতেন না, কার একবার ‌টর অসুখ করেছিল। আমের গায়ে ফুটো, ‌পের গায়ে দাগ—এগুলো তাঁর শক্তিশালী ‌ার খুব [illegible]কটে ধরে' তন্ন তন্ন করে খুঁটিয়ে ‌তেন। [illegible], তাল, নোনা, পেয়ারা, ‌জ এবং ইলিশ মাছ তিনি ছুঁতেন না। ‌লো 'কলেরা ফ্রুট'। বৎসরে দু-বার স্নান ‌তেন। একবার পয়লা বৈশাখ আর একবার ‌া আশ্বিন। স্নানের উপকারিতায় তাঁর ‌মাত্র আস্থা ছিল না। বলতেনঃ 'কুয়োর বেশিদিন চলে, না আল্‌নার দড়ি বেশিদিন ‌ক?' তাঁর গায়ে কেউ হাত দিতে পারত যেহেতু মৃদুতম ঘর্ষণে যদি একটিমাত্র লোম উৎপাটিত হয়, তাহলে কার্বঙ্কলজনিত মৃত্যু অনিবার্য। অসহ্য দাঁতের যন্ত্রণায় কাতর হয়ে চুপ করে থাকতেন। কিন্তু ডেণ্টিস্টের ত্রিসীমানায় যেতেন না, কারণ দাঁত তুলতে গিয়ে একজনের চোয়ালের হাড়ে নেক্রসিস হয়েছিল। পায়ে হুঁচোট লেগেছিল বলে তিনি 'সীরাম্' ইনজেকশ্যান নিয়েও সেই স্থানে এত টিঞ্চার আয়োডিন, তুঁতে প্রভৃতি শোধক দ্রব্য ঘষেছিলেন যে, সেখানকার ক্ষত শুকোতে মাসাবধিকাল লেগেছিল। তিনি ছিলেন এ্যাগ্‌নস্টিক এবং অবিবাহিত। স্ত্রীলোকের মজ্জাগত কপটতা এবং অসাধুতা বিশ্লেষণ করে' তিনি সংসারের অশান্তি এবং জগতের অনিত্যতা উপলব্ধি করেন এবং সেই সূত্রেই তিনি ব্রহ্মের সন্দেহজনক অস্তিত্বে উপস্থিত হন। তীব্র ও তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে কোনও সাধারণ মন্তব্যে পেঁছানো এবং স্ত্রীলোক সম্পর্কে এমন মনোভাব পোষণ করা অত্যন্ত অযৌক্তিক একথা কেউই তাঁকে বোঝাতে পারে নি। সবচেয়ে মজা এই, তিনি এম-এ পরীক্ষায় লজিক পেপারে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। তিনি স্বপ্ন দেখতেন, অধিকাংশই দুঃস্বপ্ন। যেগুলিকে বিচার-বিশ্লেষণ করা চলত না, সেগুলিকে তিনি প্রিমনিশ্যান অথবা পূর্বাভাস বলে অভিহিত করতেন। এই সব স্বপ্নের মধ্যে কয়েকটি তাঁর জীবনে আশ্চর্য রকম মিলে গিয়েছিল এবং তার মধ্যে একটি হ'ল তাঁর নিজের মৃত্যু সম্পর্কে। তিনি একবার অর্ধ-জাগ্রত কিংবা তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় তাঁরই কোনও এক বিশিষ্ট বন্ধুর ছায়ামূর্তি দেখেন। এ ঘটনার কিছুদিন আগেই সে বন্ধুর মৃত্যু ঘটেছিল।

তন্দ্রার ঘোরে দেখা হলেও, এতদিন বাদে বন্ধুর সঙ্গে চাক্ষুষ (?) মিলন-কালে তিনি কুশল প্রশ্ন না করে সরাসরি জিজ্ঞাসা করে বসলেন, তিনি নিজে কবে মারা যাবেন। উত্তর পেলেন, সাতচল্লিশ বছর বয়সে। পরপারে কি আছে না আছে, অথবা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে তিনি কোনও প্রশ্ন করেন নি। কেননা এ বিষয়ে তাঁর নিজস্ব ধারণা খুবই দৃঢ় ছিল। মৃত্যুভয় যথেষ্ট থাকলেও তিনি মনে করতেন, মৃত্যুর আসল কষ্ট বা বিভীষিকা সাময়িক। একবার মরতে [illegible] চিন্তার কোনও কারণ নেই। যেখানেই হোক্, থাকার একটা ব্যবস্থা হবেই। শূন্যেই হোক্ আর জলস্থলপূর্ণ একটা নির্দিষ্ট স্থানেই হোক্, সেখানে দুর্গন্ধ বা আবর্জনাকুণ্ড নেই—এটা আশা করা যেতে পারে। তবে বন্ধু অদৃশ্য হবার পূর্বে তিনি আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেন। সেটা স্ত্রীলোক সম্পর্কে। উত্তরে বন্ধু বলেন, "ও সব কিছু ভাবিস নি......ওদের আত্মা নেই। ওরা এখানে আসতে পারে না........."

এর পর থেকে তাঁর মৃত্যুভয় অনেক পরিমাণে কমে গেল। অর্থাৎ জীবনের স্বাভাবিক মমত্ববোধ কিংবা রোগভীতি অথবা কয়েকটা বাতিক ছাড়া আর বিশেষ কিছু দুশ্চিন্তার কারণ রইল না। সাতচল্লিশ বছরে পড়বার আগেই তাঁর আসন্ন প্রয়াণ সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট সচেতন হয়ে এ সংসারের বাকি কর্তব্য এবং কয়েকটি পারিবারিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে নিলেন। হঠাৎ ধূমপান নেশাটা খুব প্রবল হয়ে উঠেছিল, এইটুকু পরিবর্তন মাত্র লক্ষ্য করেছিলুম। নইলে মরণভয় নিয়ে আর মাথা ঘামাতেন না। অতিরিক্ত ধূমপান নিয়ে যখন অনুযোগ করেছি, তখন তিনি বলতেন, সবই তো ধোঁয়া! ঐ তো একমাত্র সত্য। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বলতেন, নেতিমূলক বিচারে একটা কোনও জায়গায় এসে থামতে হয়। সেটা ঈশ্বরও হতে পারেন, প্রকৃতিও হতে পারে। মনে হয়, ব্রহ্ম থাকলেও থাক্‌তে পারেন। বিজ্ঞান আরও অগ্রসর হলে অদৃশ্য তড়িৎশক্তির সাহায্যে কোনও পরীক্ষা যদি সফল হয়, তবেই বলা যাবে—কিছু আছে কি না। এ বিষয়ে মন খুব খোলা এবং নির্বিকার রাখাই উচিত। তা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার সময়ে ঈশ্বরের অধ্যায়টি বাদ দিয়েছিলুম, ও থেকে বিশেষ প্রশ্ন আসে না........."

সে যাই হোক্, তিনি তৈরি হতে লাগলেন প্রফুল্লচিত্তে এবং নজর করে দেখলুম তাঁর শীর্ণ দেহে একটু একটু মেদ সঞ্চার হয়েছে। তবে তাঁর একটা ধারণা জন্মালো, কলেরায় তাঁর প্রাণবিয়োগ হবে। আমরা আমাদের কর্তব্য করবো, যথাবিহিত তাঁর চিকিৎসা করাবো, কিন্তু তাঁকে বাঁচানো যাবে না। ব্যাপারটা দাঁড়ালো তাই। সাতচল্লিশ বছর পূর্ণ হবার কয়েকদিন আগে নিতান্তই অসময়ে তাঁকে কলেরায় ধরল। সে সময়ে এ রোগ কোথাও হচ্ছিল না। কিন্তু তাঁর পূর্ব ধারণা অনুযায়ী তাঁকে যথাসময়ে এবং নির্দিষ্ট রোগেই যেতে হ'ল। তাঁকে এতটুকু ম্লান অথবা ভীত ও কাতর দেখি নি। সময় থাকতে তিনি তৈরি হয়েছিলেন এবং বহুদিন সঞ্চিত মৃত্যুভয় জয় করে বেশ প্রশান্ত মনেই তিনি গত হলেন।

* * * *

দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটি হল একজন আত্মীয়ার। তিনি ছিলেন পুত্রহীনা বিধবা। বাল্যকাল

থেকে তাঁর কাছে শুনে এসেছি, জীবনে তাঁর কোনও প্রয়োজন নেই। দেবতা অথবা সংসারের কোনও কাজেই তাঁর আবশ্যকতা নেই। এমন মূল্যহীন দগ্ধ জীবন থাকার চেয়ে যাওয়াই ভালো। একবার তাঁকে কোনও এক নামকরা জ্যোতিষী তাঁর হাত দেখে বলেছিলেন, তাঁর পরমায়ু ফুরিয়ে এসেছে। বছরখানেক বাদে মাঘ মাস পর্যন্ত তাঁর মেয়াদ। তবে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করালে মারক গ্রহের অশুভ দৃষ্টি কেটে যেতে পারে। বিধবা স্ত্রীলোক সে কথা হেসে উড়িয়ে দেন।

কিন্তু এই কথা শোনার পর থেকে তিনি শুকিয়ে যেতে লাগলেন। তাঁর স্বাভাবিক প্রফুল্লতা, হাসি-খুশি মেজাজ লুপ্ত হল। বয়স্থা হলেও তাঁর সৌন্দর্য এবং শরীরের বাঁধুনি ছিল দেখবার মতন। কিন্তু জ্যোতিষীর গণনা-ফল শোনার পর থেকেই তাঁর বর্ণ ও স্বাস্থ্য অত্যন্ত মলিন হতে লাগল। তাঁর এই অহেতুক মৃত্যুভয় নিয়ে কত ঠাট্টা-তামাসা করেছি। জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী যে বিশুদ্ধ বুজরুকি, স্বস্ত্যয়ন বাবদ কিছু অর্থ আদায়ের ফন্দি যে তাঁর নিশ্চয়ই ছিল, এ কথাও তাঁকে বহুবার বুঝিয়েছি। কিন্তু কোনও ফল হ[illegible] নি। যিনি এতদিন ছিলেন সাহসী এব[illegible] আপনার দেহ সম্বন্ধে অত্যন্ত উদাসীন, তি[illegible] হঠাৎ অন্য মানুষ হয়ে গেলেন। দেহ আ[illegible] জীবনের প্রতি তাঁর মায়া অসম্ভব বেড়ে গে[illegible] এবং অবশেষে বিনা রোগে ভয়পীড়িত এ[illegible] মহিলা একদিন শয্যাগ্রহণ করলেন এবং বিশে[illegible] কোনও উপসর্গ না জুটতেই প্রাণত্যাগ করলেন তাঁর কি রোগ হয়েছে, প্রতিবেশিনীরা প্রশ্ন করলে তিনি সত্য কথাই বলতেন—মৃত্যু-ভয়।

## বিজ্ঞানের কথা

# মৌমাছির জীবন কথা

### শ্রীতেজেশচন্দ্র সেন

কোথাও নতুন ফুল ফুটলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে খবর মৌমাছিদের কাছে কী ক'রে পৌঁছায়? সে সব ফুল চাকের নিকটে নাও থাকতে পারে। ভোর হ'তে না হ'তেই প্রথমে একটি দুটি তারপরে আসতে থাকে দলে দলে। এ কী ক'রে সম্ভব হয়? এর উত্তর পাওয়া গেছে জার্মেন বিজ্ঞানী কার্ল ফন্ ফ্রিশ্ সাহেবের কাছ থেকে। পূর্বে "দেশ" পত্রিকায় এ সম্বন্ধে একবার আলোচনা করা হয়েছে। মৌমাছি নিয়ে এইরূপ পরীক্ষা কার্যে তারি প্রদর্শিত পথ অনুসরণ ক'রে তারি শিষ্য রোয়েশ্ সাহেব জন্ম হ'তে মৃত্যু পর্যন্ত মৌমাছিদের জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও যেভাবে ওরা জীবনযাত্রা নির্বাহ করে সে সম্বন্ধে যে সব তথ্য আবিষ্কার করেছেন তা যেমন অভিনব তেমনি কৌতূহলোদ্দীপক।

চাকে মৌমাছির ভিড়ের মধ্যে পরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণের জন্য কোন একটি বিশেষ মৌমাছিকে আলাদা ক'রে নজরবন্দী ক'রে রাখা খুবই শক্ত। রোয়েশ সাহেব তার "প্রতিপালিত" চাকের প্রত্যেকটি মৌমাছিকে আলাদা রঙে রঞ্জিত ক'রে আলাদা আলাদা সংখ্যায় নামকরণ করেছিলেন। সেইরূপে একটি মৌমাছিরই জীবন কাহিনী এ স্থানে বর্ণনা করে হবে। সংখ্যার পরিবর্তে তার একটি নামকরণ করা যাক। মনে করা যাক মৌমাছিটির নাম মধুশ্রী।

মধুশ্রীরও জন্ম হয়েছিলো চাকের অন্যান্য মৌমাছির ন্যায় ডিম হ'তে। চাকের যে-খোপটি তার জন্য নির্দিষ্ট হয়েছিলো, সেই খোপটিতে ডিম ফুটে বের হ'য়ে পর পর লার্ভা ও পুপার অবস্থা অতিক্রম ক'রে একদিন সে সর্বাঙ্গপূর্ণ একটি মৌমাছি হ'য়ে বের হ'য়ে এলো।

জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তার অদৃষ্টলিপিতে নির্ধারিত হয়ে গেলো সে হবে চিরবন্ধ্যা। চির-বন্ধ্যা স্ত্রীজাতীয় মৌমাছি চাকে সে একাই নয়, একমাত্র রাণী ও কয়েকটি পুরুষ জাতীয় মৌমাছি ভিন্ন চাকের অন্যান্য সকল মৌমাছিই মধুশ্রীর ন্যায় চিরবন্ধ্যা স্ত্রী জাতীয় মৌমাছি। চিরবন্ধ্যা হ'য়ে সন্তানের জননী না হ'তে পারলেও মধুশ্রীর জন্য দুঃখিত হবার কারণ নেই। কারণ এই অক্ষমতার দরুণই মৌমাছি জীবনের যত-কিছু বৈচিত্র্য, যত-কিছু অভিজ্ঞতা উপভোগ করবার সুযোগ বা সৌভাগ্য তার জীবনে ঘটবার সম্ভাবনা হয়েছিলো। রাণীর ন্যায় সারা জীবন ধরে কেবল-মাত্র চাকের খোপে খোপে ডিম পেড়ে পেড়েই তার জীবন অতিবাহিত হয়নি। বহু সন্তানের জননী রাণীর একঘেয়ে জীবনের তুলনায় তার কর্মবহুল বন্ধ্যা জীবনের অভিজ্ঞতা অনেক বেশি। অনেক বেশি উদ্দীপনাময়। অন্ততঃ-পক্ষে জীবনে একদিন তাকে এমন একটি অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল যার জন্য তার জীবন ধারণ করা সার্থক হয়েছে ব'লে মনে হবে।

জন্ম লাভের পরেই তার দেহ ধৌত বা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা প্রয়োজন। কারণ তখনো তার গায়ে তার পূর্ব[illegible] জীবনের কিছু কিছু চিহ্ন থেকে যায়। [illegible] চিহ্ন বা পুপার গায়ের ছিন্ন [illegible] টুকরো সূক্ষ্ম পর্দাগুলিকে গা হ'তে সরাতে সে ব্যস্ত হ'য়ে ওঠে। প্রথম পরিষ্কার করে সে তার চোখ ও মাথাটি। তারপর একে একে ডানা, বুক, পিঠ ও মুখের শুঁড় দুটি। অবশ্য এ সব কা[illegible] তাকে নিজেকেই করতে হয়। এ সব মাজা ঘষার কাজ করতে করতে তার ক্ষুধাও পে[illegible] আসে। এ সময় ক্ষুধা নিবারণের জন্য তাকে নির্ভর করতে হয় চাকের বয়স্ক মৌমাছিদে[illegible] উপর। শুধু মধুশ্রীই নয়, চাকের যাবতী[illegible] বয়ঃকনিষ্ঠ মৌমাছিদের প্রথম অবস্থায় বয়ো-জ্যেষ্ঠ মৌমাছিরাই খাওয়ায়।

গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ডানা, শুঁড় ও পাগুলিকে শক্ত ক'রে নিয়েই সে কাজে লেগে যায়। প্রথম কাজ হয় তার চাকের ভিতরে[illegible] শিশু সদনটির শূন্য খোপগুলির ভিতর। সেগুলিকে পরিষ্কার করা হয় তার প্রথম কাজ। একটির পর একটি ক'রে সে শূন্য খোপগুলি ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকে। কোনটির ভিতর ঢুকেই সে বের হয়ে আসে, কোনটার ভিতরে একবার একটু দৃষ্টি ফেলেই পাশ কেটে চলে যায়, কোনটার ভিতরে ঢুকে তার বের হ'য়ে আসতে বেশ একটু সময় লাগে। রোয়েশ্ সাহেব সঙ্গে সঙ্গে খোপ-গুলিকে চিহ্নিত ক'রে দেখেছেন মধুশ্রীর পরিদর্শনের পর কিছুক্ষণের মধ্যেই রাণী[illegible] লাগে। রোয়েশ্ সাহেব সঙ্গে সঙ্গে খোপ-গুলিতে সে একটি ক'রে ডিম পেড়ে রেখে চলে যায়। কিন্তু সব শূন্য খোপেই যে রাণী ডিম পাড়ে তা নয়, খোপের ভিতরে মুখ ঢুকিয়েই রাণী বুঝতে পারে, কোন খোপটি পরিষ্কার কোন খোপটি পরিষ্কার নয়। যে-টি পরিষ্কার নয় তার ভিতরে রাণী একবার মুখ ঢুকিয়েই মুখ বের করে নেয় এবং সেই খোপে ডিম না পেড়েই অন্য খোপে চলে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যে বয়কনিষ্ঠ একটি ঝাড়ুদার

মাছি এসে সেই খোপটি পরিষ্কার ক'রে । রাণী ঘ্রতে ঘ্রতে পাশ দিয়ে যাবার য় আর একবার সেই শ্ন্য খোপটির ভিতরে থ ঢ্কিয়ে দেখে নেয়। যদি ব্ঝতে পারে পটি যথেষ্ট পরিষ্কার হয়েছে, ডিম-পাড়া ন তাহ'লে অমনি সে খোপের ভিতরে ঢ্কে ম পেড়ে রেখে আসবে। রাণী বা বয়-নষ্ঠ ঝাড়্দার মৌমাছির দল কী ক'রে ঝতে পারে কোন খোপটি পরিষ্কার আর ন খোপটি পরিষ্কার নয়? চাকের ভিতরের ধকারের মধ্যে চোখের দ্ষ্টি যে এ বিষয়ে দের বিশেষ সাহায্য করতে পারে, তা মনে না। খ্ব সম্ভব ঘ্রাণেন্দ্রিয় এ বিষয়ে দর সাহায্য করে।

শিশ্-সদনের শ্ন্য খোপগ্লি পরিষ্কার-রিচ্ছন্ন করা হয়ে গেলে মধ্শ্রীর সে স্থানে র কোন কাজ থাকে না, অন্ততঃ দেখে তাই ন হয়। তারি কাছাকাছি একট্ নিরিবিলি গা খ্জে নিয়ে সেই স্থানে সে চ্প করে স থাকে। একি শ্ধ্ তার বিশ্রাম না ড়েমি করেই সময় কাটানো? পরীক্ষায় খা গেছে শিশ্-সদনের খোপগ্লির উত্তাপের া কমিয়ে দিতে না দিতেই অমনি চারদিক তে মৌমাছির দল ভিড় করে আসে দিকে। ওরা নিজেদের দেহের উত্তাপ দিয়ে ই স্থানের তাপ ব্দ্ধির চেষ্টা করে। শিশ্ নের তাপ রক্ষা করাও বয়ঃকনিষ্ঠ মৌমাছি-র একটি কাজ। মধ্শ্রীর বিশ্রামও সেইর্পে কটি কাজ—নিতান্ত কুঁড়েমি করে সময় টানো নয়।

জন্মের পর মধ্শ্রীর দ্দিন কেটে গেছে। তীয় দিবস হতে তার চালচলন, চলাফেরা লে গেল। এখন থেকে চাকের যেস্থানে পগ্লিতে মধ্ ও রেণ্ সঞ্চিত হয়, সে সব পেই সে বেশী ঘ্রে বেড়ায়। কখনো খোপ কে একট্ রেণ্ বা একট্ মধ্ চুষে নেয়। মনি আবার ফিরে আসে শিশ্ সদনটিতে। বারও সে খোপে ঘ্রে বেড়ায়। কিন্তু এবার র প্রয়োজন অন্যর্প। এবার সে খোঁজে র্ভা (Larva) জাতীয় ছানাদের। এখন থেকে র কাজ হলো শিশ্সদনের লার্ভাগ্লিকে ওয়ান। ওদের খাদ্য শ্ধ্ রেণ্ও নয়, শ্ধ্ ধ্ও নয়, এই উভয় খাদ্যের সঙ্গে আর একটি শেষ খাদ্য মিশ্রিত হয়ে ওদের খাদ্য তৈরি । সেই বিশেষ খাদ্যটি জেলি * নামে পরিচিত। র্ভাদের জন্মের চতুর্থ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা-ত বয়স্ক—সাধারণতঃ ৬ দিন হতে ১৩ দিনের—মৌমাছিরা ওদের জেলি জাতীয় পদার্থ খাওয়ায়। তারপর সেই জেলির সঙ্গে যোগ হয় মধ্শ্রী তার সমবয়স্ক মৌমাছিদের দ্বারা মধ্ ও রেণ্র ভান্ডার হতে আনীত রেণ্ ও মধ্। এ স্থানে সহজেই এ প্রশ্ন জাগতে পারে বয়স্ক ও বয়ঃকনিষ্ঠ এই উভয় দল মৌমাছিই খাদ্য বিতরণের সময় তাদের পোষ্য লার্ভাগ্লির বয়স কী করে ওরা ঠিক করে নেয়। এ প্রশ্নের উত্তর এখনো পাওয়া যায়নি।

উপরোক্ত কর্তব্য সম্পাদন করতে করতেই মধ্শ্রীর জীবনে আসে আর একটি অদ্ভুত পরিবর্তন। তখন সে কেবলই চাকময় ঘ্রে বেড়ায়। মনে হয় চাকের কোথায় কি আছে তা দেখাই যেন তার এই পরিভ্রমণের উদ্দেশ্য। কিন্তু তাও খ্ব বেশী সময়ের জন্য নয়। মনে হয় সব যেন তার দেখা হয়ে গেছে। থেকে থেকে চলতে চলতে সে হঠাৎ এক এক জায়গায় দাঁড়িয়ে যায় বা বসে পড়ে। প্র্বে বয়স্ক মৌমাছিদের সামনে দেখতে পেলেই সে যেন ভয় পেতো, ছ্টে পালিয়ে যেতো অন্যদিকে। অনেক সময় প্র্বে বয়স্কদের গায়ের ধাক্কায় তাকে স্থানচ্যুত হতেও দেখা গেছে। এখন হতে যেসব মৌমাছি ফ্ল হতে মধ্ সংগ্রহের পর চাকে প্রবেশ করে ব্যস্তব্যস্ত ভাবে যখন প্রচার ন্ত্য * (information dance) আরম্ভ করে দেয়, তখন দেখা গেল মধ্শ্রী স্থির দ্ষ্টিতে তাদের দেখছে। প্র্বের ভয় যেন তার কেটে গেছে। কখনো একবার দ্বার বয়স্ক কর্মীদের কাছ থেকে তাকে খাদ্য চেয়ে নিতেও দেখা যায়। নতুন নতুন আবিষ্কারের নেশায় সে উত্তেজিত হয়ে ঘ্রতে ঘ্রতে এক সময়ে একেবারে চাকে প্রবেশের ছিদ্রপথের ম্খটিতে এসে উপস্থিত হলো। সেখানে দলে দলে মৌমাছি মধ্ ও রেণ্ নিয়ে বার হতে ছ্টে আসছে ভিতরে, দলে দলে মৌমাছি ভিতর হতে বের হচ্ছে বাইরে। সেই ভিড়ের ভিতরে পড়ে এক রকম দিশেহারা হয়েই যেন একদল বহির্যাত্রী মৌমাছির সঙ্গে সেও বের হয়ে পড়লো। এতদিনের পরিচিত ঘর স্খ, আরাম সব রইলো তার পিছনে পড়ে।

সে চলল উড়ে। মান্ষও কি একদিন ব্হৎ জগতের সন্ধানে চির-পরিচিত ঘর, স্খ, স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম সব ত্যাগ করে এমনি এক অজানা অনিশ্চিতের উদ্দেশে পথে বের হয়ে পড়ে না? অনেকে মনে করতে পারেন, মধ্শ্রীর চাক হতে বের হবার জন্য মনের এই আবেগ কোন অজানা অনিশ্চিত পথের উদ্দেশে যাত্রার জন্য নয়—সে যায় অন্যান্য সকলের ন্যায় মধ্ আহরণ করতে।

এই স্থানে রোয়েশ্ সাহেব আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন মধ্শ্রীর চাক ছেড়ে প্রথম বাইরে আসার উদ্দেশ্য ফ্ল হতে ঠিক মধ্ আহরণ করা নয়। চিনি-গোলা জল বা মধ্র পাত্র তাদের সামনে রেখে দেখা গেছে খাবার দিকে তাদের বিশেষ মন নেই—কেউ হয়তো পাত্রের খাবার একট্ চুষে নেয়, আবার কেউ কেউ—তাদের সংখ্যাই বেশী—সেদিকে দ্কপাত মাত্র না করে সোজা উড়ে চলে যায়। বরং দেখতে পাওয়া গেছে বাইরে থেকে ঘ্রে চাকে ফিরে এসেই ওরা খাবার চেয়ে নেয় অন্য মৌমাছিদের কাছ থেকে। রোয়েশ্ সাহেবের সিদ্ধান্ত চাক হতে বের হয়ে মধ্শ্রীর প্রথম ওড়বার উদ্দেশ্য দিক নির্ণয় করা। কেননা, দেখা গেছে মধ্শ্রী চাক হতে উড়ে বের হয়েই প্নরায় চাকের দিকে ম্খ ঘ্রিয়ে সেই স্থানটিকে কেন্দ্র করে চক্রাকারে ঘ্রে ঘ্রে উড়তে থাকে। এতদিন সে চাকের ভিতরেই ছিলো, চাকের বাইরে কোথায় কি আছে, তা তার কিছ্ই জানা নেই। চাক হতে বাইরে এসে প্রথমেই সে চাকের পারি-পার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে পরিচিত হতে চেষ্টা করে। ভবিষ্যতে তাকে এরই ভিতর দিয়ে পথ করে যেতে হবে দ্র-দ্রান্তরে মধ্ আহরণের জন্য। পথ চিনে চাকে আনাগোনা করতে হলে মনের স্মৃতির পটে এর একটি স্স্পষ্ট ছাপ থাকা প্রয়োজন। নতুবা দ্র হতে মধ্ আহরণ করে পথ চিনে চাকে ফিরবার সময় তার বিভ্রান্ত হবার সম্ভাবনাই বেশী। পরীক্ষায়ও দেখা গেছে, চাক হতে ধরে নিয়ে দ্রে ছেড়ে দিলে সেই সব বয়ঃকনিষ্ঠ মৌমাছিই পথ চিনে চাকে ফিরে আসতে পারে যারা চাক হতে একবার বের হয়ে প্নরায় চাকে ফিরে এসেছে। কিন্তু যেসব বয়ঃকনিষ্ঠ মৌমাছি কখনো চাক হতে বের হয়নি, তাদের দ্রে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিলে ওরা পথ চিনে চাকে ফিরে আসতে পারে না।

প্রথম ভ্রমণ-যাত্রার পর মধ্শ্রী আরো কয়েক-বার ভ্রমণে বার হয়। চাকে ফিরে এসে সে তার প্রতিদিনের নির্ধারিত কাজে সে নিয্ক্ত হয়। চাকে লার্ভার সংখ্যা ব্দ্ধি পেলে তাকে আরো কিছ্কাল ওদের শ্শ্রূষার কাজে নিয্ক্ত থাকতে হয়।

বহির্জগতের সহিত সংস্পর্শে আসায় বা অন্য যে-কোন কারণেই হক মধ্শ্রীর মনের গতি যেন বদলে গেল। চাকের মধ্যে সে তার

---

* 'জেলি' মৌমাছির গা হতে নিস্ত রস। নেকটা স্তন্যপায়ী জন্তুর ব্কের দ্ধের মতো নিস। লার্ভাগ্লি প্রথম অবস্থায় শ্ধ্ মধ্ শ্ধ্ রেণ্ খেয়ে হজম করতে পারে না। তখন রা সেই রস বা দ্ধ খায়।

* মৌমাছিরা নতুন আবিষ্কৃত ফ্লের সংবাদটাকে প্রচার করে ন্ত্যের দ্বারা।

**ডাক্তার পালের পদ্ম মধ্**
ব্যবহারে চক্ষ্র ছানি, গ্লকোমা, চক্ষ্ লাল হওয়া, জল পড়া, কর্ কর্ করা ইত্যাদি সর্বপ্রকার চক্ষ্রোগ সম্পূর্ণ স্থায়ীভাবে আরোগ্য হয়। ১ ড্রাম—২, দ্ই ড্রাম শিশি—৩,। **পাল ফারমেসী**, ৩০০নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। **যম্নাদাস এন্ড কোং**, চাঁদনী চক, দিল্লী। **কিং মেডিকেল হল**, ২৫নং আমিনাবাদ পার্ক, লক্ষ্ণৌ।

নির্ধারিত কাজে নিযুক্ত থাকলেও এখন হতে দেখা গেলো বাইরে বের হবার দিকেই যেন তার ঝোঁক বেশী। কিন্তু তখনো বয়ঃজ্যেষ্ঠ মৌমাছিদের ন্যায় বাইরে বেরহয়ে ফুল হতে মধু আহরণ করবার অধিকার তার জন্মায় নি। তখনো তাকে কিছুকাল চাকের নানা কাজে লিপ্ত থাকতে হয়। যেমন যেসব মৌমাছি ফুল হতে মধু ও রেণু আহরণ করে চাকে নিয়ে আসে তাদের ভার মোচন করে সেই সব মধু ও রেণু ভাঁড়ারে যথাস্থানে তুলে রাখা, চাকের মৃত দেহগুলিকে সরানো, কোথাও আবর্জনা জমলে তা পরিষ্কার করা, খোপের মুখের পর্দা কেটে বয়ঃপ্রাপ্ত ছানাদের বাইরে আসতে সাহায্য করা, সর্বশেষে তাকে নিযুক্ত হতে হয় দ্বার রক্ষার কাজে।

এই দ্বারপালের কাজ থেকেই চাকের মৌমাছিদের বিশেষভাবে বয়ঃকনিষ্ঠদের দায়িত্ব-বোধের সম্যক পরিচয় লাভ করা যায়।

চাকের দ্বারপথে একদল মৌমাছি সর্বদাই পাহারায় নিযুক্ত থাকে। রোয়েশ্ সাহেব লিখেছেন, একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাওয়া যায়, বিশেষ কোন শ্রেণীর মৌমাছি নয়, চাকের প্রায় সর্বশ্রেণীর মৌমাছিই চাকের দ্বার পাহারা দেয়। উহারা দ্বারের মুখে বা দ্বারের নিকটেই অপেক্ষা করে থাকে। খুব সকালে মৌমাছিরা চাক হতে বের হবার আগেই ওরা দ্বারের ছিদ্র পথের মুখটিতে এসে সমবেত হয়। সকাল হতে সন্ধ্যা অবধি ওরা সেই স্থান ত্যাগ করে কোথাও বড় একটা যায় না। সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি তাদের দ্বার পথটির দিকে। যেমনি কোন মৌমাছি দ্বারপথের কাঠের ফলকটি* উপর এসে বসে, অমনি দ্বারপথের দল মুখের দুধারের শুঁড় উঁচিয়ে, ডানা নাড়তে নাড়তে ছুটে এসে ওকে ঘিরে ফেলে। তারপর চলে অনুসন্ধান। গায়ে শুঁড় বুলিয়ে, ঘ্রাণ নিয়ে, গা চেটে নানা উপায়ে পরীক্ষা করে যখন বুঝতে পারে মৌমাছিটি শত্রুপক্ষীয় নয়, তখনই ওরা তাকে পথ ছেড়ে দেয়। এরূপ সতর্কতা শুধু একটি দুটি মৌমাছি সম্বন্ধেই নয়, চাকে যত মৌমাছি প্রবেশ করবে তাদের সকলের সম্বন্ধেই প্রহরীদের এইরূপ সতর্কতা। তাদের এই সতর্কতার কারণ হচ্ছে, সুযোগ পেলেই প্রতি চাকেই শত্রুপক্ষীয় মৌমাছি, বোলতা বা অন্য জাতীয় পতঙ্গ ঢুকে চাকের মধু লুঠ করবার চেষ্টা করে। সেইরূপ শত্রুপক্ষীয় মৌমাছি সামনে পড়লেই দুদলে বেধে যায় লড়াই। শত্রু যদি একক বা সংখ্যায় কম হয়, লড়াইয়ের নিষ্পত্তি হয় অতি সহজে। প্রথমতঃ মুখের দাড়া দিয়ে চারদিক থেকে প্রহরীর দল ওকে চেপে ধরে তারপর আরম্ভ করে হুল ফুটাতে। সংখ্যায় বেশী হলেও শেষ পর্যন্ত শত্রুদলকেই হার মানতে হয়।

আমাদের মধ্যে অনেকেরই বিশ্বাস এমন কি যারা মৌমাছি নিয়ে আলোচনা করেন তারাও মনে করেন যারা দ্বারপাল বা প্রহরীর কাজ করে ওরা চাকের বিশেষ এক শ্রেণীর মৌমাছি। কিন্তু রোয়েশ্ সাহেব তাঁর চিহ্নিত মৌমাছি-গুলির দিকে বিশেষ দৃষ্টি রেখে দেখেছেন, বিশেষ একটা বয়সে চাকের প্রায় সব মৌমাছিকেই একবার করে এই দ্বারপালের কাজ করতে হয়।

এই দ্বাররক্ষার কাজে সকল মৌমাছির উৎসাহই যে এক রকম তা নয়। কোন কোন মৌমাছি প্রায় সর্বক্ষণই দ্বারের কাছটিতে পড়ে থাকে। অল্প সময়ের জন্য কখনো কখনো খেতে যায়। দু'একবার চাক হতে বের হয়ে চারদিকটা ঘুরে দেখেও আসে, কিন্তু দ্বারপথে লড়াইয়ের সূচনা দেখবামাত্র এমন তাড়াহুড়ো করে ছুটে আসে যে, অনেক সময় তার পা ও ডানার নীচে অন্য মৌমাছিরা চাপাও পড়ে যায়। চাকে এমন মৌমাছিও দেখতে পাওয়া যায় প্রহরীর কাজে নিযুক্ত থাকলেও লড়াই এড়িয়ে চলতেই যেন ওরা ভালবাসে। দ্বারপথে লড়াই হতে দেখলে সেদিকে না ঘেঁষে অন্যদিকে অন্য কাজে চলে যায়।

এর পরেই মধুশ্রীর কর্মজীবনের শেষ অধ্যায়ের আরম্ভ। এবার তাকে বের হতে হবে রেণু অথবা মধু আহরণের কাজে। কার আদেশ বা কিসের প্রেরণায় সে প্রথম ফুলে মধু বা রেণু খুঁজতে বের হয়? রেণু বা মধুর মধ্যে সে কোনটি আহরণ করবে তা সে কিরূপে স্থির করে? (একই মৌমাছি কখনো মধু ও রেণু উভয়ই সংগ্রহ করে না।) এ রহস্য এখনো উদ্ঘাটিত হয়নি। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, সে মধু বা রেণু সংগ্রহ করতে যায় একা—অন্য কোন অভিজ্ঞ মৌমাছিকে সে অনুসরণ করে না। একা একা নতুন ফুল আবিষ্কারের গৌরব যেন সে একাই ভোগ করতে চায়। তার এই স্বাধীনভাবে নতুন নতুন ফুল আবিষ্কারের দ্বারা চাকের যথেষ্ট উপকার হয়। কারণ যেসব নতুন নতুন বয়ঃকনিষ্ঠ মৌমাছি প্রতিদিন একটির পর একটি মধুর খোঁজে চাক হতে বের হয়, তাদের সংখ্যা নিতান্ত সামান্য নয়। সুতরাং চাকের কাছাকাছি এমন কোন নতুন ফুল ফুটতে পারে না, যা চাকের মৌমাছিদের সন্ধানে না আসে।

এর পরেই মধুশ্রীর জীবনের চরম মুহূর্ত। তার কর্মবহুল জীবনের অবসান চার থেকে ছয় সপ্তাহের মধ্যেই ঘটে যায়। খুব বেশী যে বাঁচে সে আট সপ্তাহ। যদি কোন মৌমাছি গ্রীষ্ম ঋতুর শেষ ভাগে জন্মায়, তবে সৌভাগ্য-বশতঃ রাণীর সঙ্গে তার শীত-নিদ্রা ঘটতেও পারে এবং রাণীর সঙ্গে তার জীবনও অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী হয়।

অনেকে মনে করতে পারেন, বেচারী মধু-শ্রী চাকের জন্য খেটে খেটেই যেন প্রাণ দিলো। রোয়েশ্ সাহেবও বলেন,—"হাঁ, মধু-শ্রী খেটে খেটেই প্রাণ দিয়েছে। কিন্তু চাকের সকল মৌমাছিই যে এভাবে প্রাণ দেয় তা নয়। চাকে কর্মবিমুখ অলস মৌমাছির সংখ্যাও নিতান্ত সামান্য নয়। মানুষের ন্যায় এ সম্বন্ধে মৌমাছিদেরও ব্যক্তিগত রুচির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য দেখতে পাওয়া যায়।"

* ছোট ছোট কাঠের বাক্সের ভিতরে মৌমাছি পোষা হয়। বাক্সের ভিতরে প্রবেশের জন্য একটি ছিদ্র থাকে। সেইটিই প্রবেশের দ্বার। তার সামনেই থাকে এই কাঠের ফলকটি।

## ...কূটনীতির খেলা

...ম্যুনিস্ট অধিকৃত পিপিং শহরে কুওমিনটাঙ গভর্নমেণ্ট ও চীনের ...নিস্ট প্রতিনিধিদলের মধ্যে যে শান্তি ...াচনা আরম্ভ হয়েছে তার তির্যক গতি চীনের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ...ঙ্কিত হয়ে ওঠার কারণ আছে। ইংরেজী ...র্ষের গোড়া থেকে আমরা শান্তি-...াচনার কথা শুনে আসছি। কিন্তু সেই ...াচনা আরম্ভ হল এপ্রিল মাসের প্রথমে। ...ত আলোচনার প্রথম বলি হিসাবে চীনের ...ধিনায়ক চিয়াং কাইশেককে সাময়িকভাবে ...ও নানকিং-এর রাজনৈতিক রংগমঞ্চ থেকে দাঁড়াতে হল, দ্বিতীয় বলি হিসাবে চীনের ...ন মন্ত্রী ডাঃ সুন-ফো-কে করতে হল ...্যাগ। এত উদ্যোগ আয়োজনের পরে যদি ...াম যে শান্তি আলোচনা আশানুরূপভাবে ...য়ে চলেছে, তবু খানিকটা স্বস্তির নিশ্বাস ...বার কারণ থাকত। দীর্ঘদিনের যুদ্ধদীর্ণ ...নর জাতীয় জীবনে আজ যে শান্তির ...াজনই সর্বাধিক—আশা করি একথাটা কেউ ...ীকার করতে পারবেন না। কিন্তু পিপিং-শান্তি-আলোচনা যেভাবে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ...ছে তাতে তার থেকে কোন স্থায়ী শান্তির ...াশা করা যায় না। কম্যুনিস্টরা একদিকে ...ন্তর আলোচনা যেমন চালাচ্ছে, তেমনি ...রদিকে ইয়াংসি নদী অতিক্রম করে নানকিং-দিকে ধাওয়া করারও চেষ্টা করছে; ...ুনিস্ট বেতার থেকে প্রতিনিয়ত বিনাসর্তে ...তীয়তাবাদী চীনের আত্মসমর্পণ দাবী করে ...ুকি দেওয়া হচ্ছে। আর এদিকে জাতীয়তা-...ী চীনের বিনাসর্তে আত্মসমর্পণের কোন ...ভপ্রায় যে নেই সেকথা চীনের প্রধান মন্ত্রী ...নারেল হো ইং চিন্ স্পষ্ট করেই বলে ...য়েছেন। ফলে পিপিং-এর শান্তি আলোচনায় ...পাতত অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ...য়কদিন পূর্বে শান্তি আলোচনা আরম্ভ ...ার মুখে যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হবার সংবাদে আশার সঞ্চার হয়েছিল, কয়েকদিন যেতে যেতেই সে আশার বিলুপ্তি ঘটেছে।

কম্যুনিস্টরা যুদ্ধবিজয়ী; সুতরাং তারা জয়ীর মত কড়া সুরেই কথা বলছে। তারা শান্তি চায় সে বিষয়ে সংশয় নেই—তবে ...রা শান্তি চায় নিজেদের সর্তে। যেখানে ...ই পক্ষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের প্রশ্ন সেখানে ...দ পরস্পরের প্রতি বিবেচনা না থাকে, তবে ...কৃত শান্তি স্থাপন অসম্ভব। চীনে সেই ...বস্থারই উদ্ভব হয়েছে। জাতীয়তাবাদী ...না চাইছে বিনাযুদ্ধে নিজেদের যতটা অধিকার ...খা যায় তাই বজায় রাখতে। যুদ্ধবিজয়ী
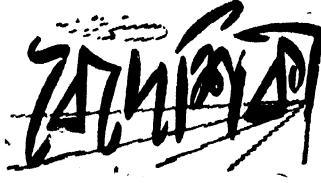
কম্যুনিস্টদের সংগে সম্মুখ সংগ্রামে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখা যে কষ্টকর—সে সত্য জাতীয়তাবাদী চীন জানে। তাই নরম সুরে কথা বলা ছাড়া তাদের উপায় নেই। কিন্তু তাদের সুর যতই নরম হোক, কম্যুনিস্টদের চড়া সুর একটুও নামছে না। ফলে শান্তির জন্যে কুওমিনটাঙ দল যতটা এগিয়েছিল, এখন তারা ভাবছে ততটা এগুনো তাদের উচিত হয়েছে কিনা। উভয়পক্ষে এই যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে তার মূলে আছে—পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাস। কম্যুনিস্টরা ভাবছে যে চীনের জাতীয় গভর্নমেণ্টে যতটা রদবদলই হয়ে থাকুক, গভর্নমেণ্টের উপর থেকে পদত্যাগী চিয়াং কাইশেকের প্রভাব নিঃশেষে মুছে যায় নি। সরকারী শান্তি প্রতিনিধি-দলের নায়ক জেনারেল চ্যাং চি চুং পিপিং-এ আসার পূর্বে চিয়াং কাইশেকের সংগে দেখা করেছিলেন—এই অপরাধে শান্তি আলোচনা সুরুতেই ভেঙে যাবার লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। চীনের বর্তমান প্রধান মন্ত্রী জেনারেল হো ইং চিন্ দীর্ঘকাল চিয়াং কাইশেকের আস্থাভাজন যুদ্ধ-মন্ত্রী ছিলেন—এ খবরও কম্যুনিস্টদের অজানা নয়। এ অবস্থায় তারা সরকারী শান্তি প্রয়াসের উপর পূর্ণ আস্থা স্থাপন করতে পারছে না। অপরপক্ষে জাতীয়তাবাদী চীনের অবস্থাও অনুরূপ। তারাও কম্যুনিস্ট-দের পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছে না। দুই পক্ষের সমরসজ্জাই অব্যাহত রয়ে গেছে। শান্তি আলোচনার আড়ালে থেকে ইয়াংসির দক্ষিণাঞ্চলে জাতীয়তাবাদী চীন যাতে কম্যুনিস্টবিরোধী যুদ্ধায়োজনকে আরও বাড়িয়ে তুলতে না পারে তার জন্যে কম্যুনিস্টরা ইয়াংসি অতিক্রম করে রাজধানী নানকিং দখল করতে উৎসুক। গত দুই চারদিনের মধ্যে তারা ইয়াংসির তীরবর্তী ২।৪টি গুরুত্বপূর্ণ সরকারী ঘাঁটিও দখল করে নিয়েছে। নানকিং কম্যুনিস্টদের হাতে ছেড়ে দিলে জাতীয়তাবাদী চীনের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে বাধ্য। ক্যাণ্টন থেকে যুদ্ধ পরিচালনার যত পরিকল্পনাই সরকার পক্ষের ...ক, নানকিং হস্তচ্যুত হলে সরকারপক্ষের ভাঙা মনোবল আরও ভেঙে যাবে। তাই জাতীয়তাবাদী চীন অনেকটা বেঁকে বসেছে। প্রধান মন্ত্রী জেনারেল হো ইং চিন্ ক্যাণ্টন থেকে নানকিং-এ আসার পূর্বে বলে এসেছেন যে, কুওমিনটাঙ কোন-ক্রমেই বিনাসর্তে আত্মসমর্পণ করবে না। চীন গভর্নমেণ্টের কোন কোন দপ্তর ইতিমধ্যেই ক্যাণ্টনে স্থানান্তরিত হয়েছে। সামরিক পরিস্থিতি আরও শোচনীয় হয়ে উঠলে অবশিষ্ট সরকারী দপ্তরগুলিও যে নানকিং থেকে ক্যাণ্টনে স্থানান্তরিত করা হতে পারে জেনারেল হো সে ইঙ্গিতও দিয়েছেন। কুওমিনটাঙের দক্ষিণপন্থী কোন কোন নেতা এমন কথাও বলেছেন যে, পিপিং আলোচনা ব্যর্থ হলে জেনারেলিসিমো চিয়াং কাইশেক আবার জাতীয় নেতারূপে ফিরে আসতে পারেন। সেরূপ একটা সম্ভাবনা যে আছে সাম্প্রতিক আর একটি ঘটনা থেকেও তার আভাস পাওয়া যায়। গত বৎসর চীনকে সাহায্য করার জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে ৭ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার বরাদ্দ করেছিল তার মধ্যে মাত্র দুই কোটি দশ লক্ষ ডলার চীনকে দেওয়ার পরেই চীনে সামরিক বিপর্যয় দেখা দেয়। বাকী ৫ কোটি ৪০ লক্ষ ডলার সাহায্য দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। সম্প্রতি মার্কিন সেনেট এই বাকী ডলার সাহায্য চীনকে দেবার পরিপূর্ণ অধিকার দিয়েছে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানকে—তবে এই সর্ত আরোপ করা হয়েছে যে, এই অর্থসাহায্যের একাংশও যেন কম্যুনিস্ট চীনের জন্যে ব্যয়িত না হয়। এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, জাতীয়তাবাদী চীনের সম্বন্ধে মার্কিন আস্থা আবার ফিরে এসেছে।

পিপিং-এ যে শান্তি আলোচনা চলছে শেষ পর্যন্ত তা ব্যর্থ হবে বলে আশঙ্কা করার যথেষ্ট কারণ আছে। তার একমাত্র কারণ হল প্রকৃত শান্তি প্রয়াসের চেয়ে রাজনৈতিক কূটনীতিই এখানে হয়ে দাঁড়িয়েছে বড়। এক দমে ইয়াংসি পর্যন্ত এসে কম্যুনিস্ট সেনা-বাহিনীর প্রয়োজন ছিল বিশ্রামের। শান্তি-আলোচনার বনামে সেই বিশ্রামই তারা নিচ্ছে। তা ছাড়া যদি আপোষে তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় অর্থাৎ সমগ্র চীনে কম্যুনিস্ট প্রভাব প্রসারিত হয়, তাহলেই বা মন্দ কি। আর সরকারপক্ষ চেষ্টা করছে আপোষের পথে নিজেদের অধিকার যথাসম্ভব বজায় রাখিতে। স্পষ্টতই উভয়পক্ষের আদর্শ ও উদ্দেশ্য পরস্পরবিরোধী। শান্তি আলোচনা যদি শেষ পর্যন্ত ব্যর্থই হয়, তবে কম্যুনিস্টরাও তাদের সমর্থকদের বলতে পারবে যে, আপোষে শান্তির জন্যে তারা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে—কিন্তু কুওমিনটাঙের বিরোধের জন্যে শান্তি স্থাপন সম্ভব হল না—আর কুওমিনটাঙও তাদের সমর্থক জনসমাজকে বলতে পারবে যে, তাদের

তরফ থেকে শান্তি প্রয়াসের ত্রুটি ছিল না—কিন্তু কম্যুনিস্টদের জেদের জন্যে তা সম্ভব হয়ে উঠল না। কম্যুনিস্ট শাসিত চীনই হোক আর কুওমিনটাঙ শাসিত চীনই হোক—চীনের সাধারণ জনগণ যে শান্তিকামনায় উদগ্র হয়ে উঠেছে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। পিপিং-এর শান্তি আলোচনার দ্বারা শান্তিকামী জনগণকে ভাঁওতা দেওয়া সহজ হবে—তার দ্বারা বৃহত্তর কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না বলেই মনে করি।

## রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের সাধারণ অধিবেশন

৫ই এপ্রিল রাত্রিতে আমেরিকার ফ্লাসিং মেডোজে সম্মিলিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের স্থগিত প্যারী অধিবেশনের পুনর্মিলন হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্র সচিব ডাঃ হার্বার্ট ইভাটের সভাপতিত্বেই এ অধিবেশন আরম্ভ হয়েছে। অধিবেশনের উদ্বোধন উপলক্ষে ডাঃ ইভাট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে আমাদের অনেক আশার কথাই শুনিয়েছেন। এরূপ আশার কথা আমরা প্যারী অধিবেশনের প্রারম্ভে শুনেছিলাম। কিন্তু প্যারী অধিবেশনের ফলে বিশ্বশান্তির সম্ভাবনা যে নিকটতর হয়নি—একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। বিশ্বশান্তির উদ্দেশ্যেই এ প্রতিষ্ঠানটির সৃষ্টি হয়েছিল এবং বিশ্বশান্তি স্থাপনের কাজে এ প্রতিষ্ঠানটি কতটা সাহায্য করছে না করছে তাই দিয়েই আমরা এর কৃতিত্ব অকৃতিত্বের বিচার করব। নিছক ভাববিলাস বা আদর্শবাদের আশ্রয় নিয়ে কোন লাভ নেই। একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক ঘটনার পটভূমিকাতে এবার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের সাধারণ অধিবেশন আরম্ভ হয়েছে। ৫ই এপ্রিল রাত্রে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের অধিবেশন আরম্ভ হয়েছে আর ঠিক তার একদিন পূর্বেই ৪ঠা এপ্রিল রাত্রে ইউরোপের ১১টি রাজ্য ও আমেরিকা মিলে ওয়াশিংটনে অতলান্তিক চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। অতলান্তিক চুক্তি যারা স্বাক্ষর করেছে তারা প্রত্যেকেই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের সদস্য। রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের কর্মক্ষমতায় তারা পরিপূর্ণ আস্থা রাখতে পারেনি বলেই যে তারা আজ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের বাইরে একটি নূতন সংগঠনের মধ্যে একত্রিত হয়েছে সে বিষয়ে সংশয় নেই। চুক্তি স্বাক্ষরকারী ১২টি দেশ হল বেলজিয়াম, বৃটেন, কানাডা, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, আইসল্যান্ড, ইটালী, লুক্সেমবুর্গ, নেদারল্যান্ডস, নরওয়ে, পর্টুগাল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এদের অতলান্তিক চুক্তি স্বাক্ষরের একমাত্র উদ্দেশ্য হল ভাবী কোন আক্রমণের বিরুদ্ধে সম্মিলিত ভাবে আত্মরক্ষা করা। কোন দিক থেকে যে আক্রমণের আশংকা করা হচ্ছে, তাও আজ অজানা নেই। উৎসাহী সাংবাদিকরা হিসেব নিকেশ করে দেখিয়েছেন যে, চুক্তি স্বাক্ষরকারী দেশগুলির সামগ্রিক লোকসংখ্যা রাশিয়ার নেতৃত্বাধীন সমগ্র পূর্ব ইউরোপের লোকসংখ্যার চেয়ে শতকরা ১৫ জন বেশী। পরস্পর-বিরোধী দুটি পক্ষের সামরিক শক্তি বর্তমানে প্রায় একই রূপ। আর্থিক শক্তি কার কত তারও একটা তুলনামূলক হিসাব-নিকাশ করা হয়েছে। এ ধরণের হিসাব-নিকাশ জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধ বাধার পূর্বেও আমরা করতে দেখেছিলাম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ৪ বৎসর যেতে না যেতেই নূতন যুদ্ধোদ্যোগের কথা শুনে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে খুব বেশী আশান্বিত হওয়া যায় কি?

রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠান টিঁকে আছে এবং আরও কিছুদিন টিঁকেও হয়তো থাকবে। কিন্তু ক্রমশ তার অবস্থা যে ১৯৩০ সালের পরবর্তী জেনেভার জাতি সঙ্ঘের মত হয়ে উঠছে—সে বিষয়ে সংশয় নেই। রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠান যদি ক্রমশ নিবীর্য ও নিষ্ক্রিয় প্রতিষ্ঠান হয়ে না উঠত—তবে আজ অতলান্তিক চুক্তি, ভূমধ্যসাগরীয় চুক্তি, প্রশান্ত মহাসাগরীয় চুক্তি বা সোভিয়েট রাশিয়া প্রভাবিত পূর্ব ইউরোপের পারস্পরিক সাহায্য পরিষদের প্রয়োজন হবে কেন? অতলান্তিক চুক্তি পরিষদের প্রয়োজন হবে কেন? অতলান্তিক চুক্তি স্বাক্ষরকারী দেশের প্রতিনিধিরা যাই বলুন আর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের বর্তমান সভাপতি ডাঃ ইভাট যাই ভাবুন—অতলান্তিক চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠান যে অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়বে সে বিষয়ে সংশয় পোষণ করা উচিত নয়। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষী প্রধানমন্ত্রী ডাঃ মালান তো অতলান্তিক চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে সম্মিলিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের মৃত্যুই দেখতে পেয়েছেন। রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হলে তাঁর মত খুশী বোধ হয় কেউ হবে না। তাই তিনি অতলান্তিক চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্যে নিজের মনোগত অভিপ্রায়কেই প্রতিফলিত দেখতে পেয়েছেন। আমরা তাঁর মত অতটা নৈরাশ্যবাদী না হলেও এই ধরণের ঘটনায় আমরা আশান্বিত হবার কারণ দেখছি না। অতলান্তিক চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে রণসজ্জা করে যারা ভাবী আক্রমণের গতিরোধের প্রয়াস করছে, আত্মরক্ষার অধিকার তাদের নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু আত্মরক্ষার প্রশ্ন উঠলেই ভাবী যুদ্ধের অস্তিত্ব ধরে রাখতে হয়। যুদ্ধের অস্তিত্ব যেখানে স্বীকৃত সত্য সেখানে বিশ্বশান্তির কথা বলা মায়া-মরীচিকা মাত্র নয় কি?

লণ্ডনে আসন্ন কমনওয়েলথ সম্মেলনের নামে আর এক দফা ভেল্কিবাজি অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এবারের ভেল্কিবাজির মূল লক্ষ্য নাকি ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষকে সম্মোহিত করে কিভাবে কমনওয়েলথে রাখা যায়, তার উপায় নির্ধারণ এবারের কমনওয়েলথ প্রধ[illegible]ী সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য বলে প্রক[illegible] হয়েছে। আগামী ২০শে থেকে ২৩শে এপ্রিলের মধ্যে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে একথা ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু ও বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী মিঃ এটলী একই যোগে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ ও বৃটিশ পার্লামেণ্টে ঘোষণা করেছেন। সম্মেলনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি দেশের প্রধানমন্ত্রীরই এ সম্মেলনে যোগ দেবার কথা আছে। গত অক্টোবর মাসে লণ্ডনে একটি কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলন হয়ে গেছে। কোন একটি জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব না হলে মাত্র এই কয়মাসের ব্যবধানে যে নতুন একটি সম্মেলনের প্রয়োজন হত না সে কথা সহজেই বোঝা যায়। বিশেষ করে এই সম্মেলন ডাকার পূর্বে বৃটেনের তরফ থেকে প্রত্যেক সংশ্লিষ্ট দেশে একজন করে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীকে পাঠানো হয়েছিল। এই উদ্যোগ আয়োজন দেখে সাংবাদিকদের রসনাও উদ্যত হয়ে উঠেছিল এবং সম্মেলনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁরা নানা রকম গুজব গবেষণায় মেতে উঠেছিলেন। তার মধ্যে একটি গুজব ছিল এই যে, অতলান্তিক চুক্তির অনুরূপ ভিত্তিতে ভারত, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি কমনওয়েলথের দেশগুলির সাহায্যে বৃটেন একটি প্রশান্ত মহাসাগরীয় চুক্তি গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। পণ্ডিত নেহরু সুস্পষ্ট ঘোষণার দ্বারা এই ধরণের গুজবের অবসান ঘটিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ স্বাধীন রিপাব্লিক হয়েও কিভাবে কমনওয়েলথের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রেখে চলতে পারে, সেইটেই হবে আলোচ্য কমনওয়েলথ সম্মেলনের মূল বিবেচ্য। তাঁর মতে প্রশান্ত মহাসাগরীয় চুক্তি সম্পাদনের কথা উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা-প্রসূত।

যতদূর শোনা যাচ্ছে তাতে আগামী মে মাসের গণপরিষদের অধিবেশনেই রিপাব্লিক-রূপী ভারতের শাসনতন্ত্র গৃহীত হয়ে যাবে এবং আগামী আগস্ট মাসের মধ্যে ভারতে নতুন শাসনতন্ত্র চালু হয়ে যাবে। তা জানতে পেরেই বৃটেন কিঞ্চিৎ শঙ্কিত হয়ে উঠেছে। ব্রহ্ম কিম্বা আয়র্ল্যান্ডকে বৃটেন যত সহজে কমনওয়েলথের বাইরে চলে যেতে দিয়েছে, ভারতকে তত সহজে যেতে দিতে সে চায় না। ভারতকে কমনওয়েলথের মধ্যে ধরে রাখার জন্যে কমনওয়েলথের গঠনতন্ত্রে যদি পরিবর্তন সাধন করতে হয়, তা হলেও বৃটেনের নাকি আপত্তি নেই। অপর পক্ষে এ সম্বন্ধে বৃটিশ ডোমিনিয়নগুলির মতামত সুস্পষ্ট। শ্বেতাঙ্গ বৃটিশ ডোমিনিয়নগুলি মনে করে যে কমনওয়েলথে কোন রিপাব্লিকের স্থান হতে পারে না। ফিল্ড মার্শাল স্মাটস এই মনোভাব প্রকাশ করে যে, কমনওয়েলথের যোগাযোগের ভিত্তি হল বৃটিশ রাজশক্তির প্রতি আনুগত্য। রিপাব্লিকের পক্ষে যখন রাজশক্তি মানা সম্ভব নয়, তখন কমনওয়েলথে রিপাব্লিকের স্থান হতে পারে না। তবু অ্যাটলী গভর্নমেণ্ট যে অসাধ্য সাধনের চেষ্টা করছেন তার ফলাফল আমরা সাগ্রহে লক্ষ্য করব। ১০।৪।৪৯

# জীবন-তৃষা

## আর্ভিঙ্ স্টোন

অনুবাদক—অদ্বৈত মল্ল বর্মন

[ পূর্বানুবৃত্তি ]

### প্রথম পর্ব

#### 'বরিনেজ'

ভাইস-এডমিরাল জোহানস্ ভ্যান গোঘ্ ডাচ নৌবাহিনীর সবচেয়ে বড়ো ...ারী। ডকের পাশেই তাঁর কক্ষবহুল ...। সরকারী বাড়ি—ভাড়া লাগে না।

তিনি বাড়ির সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে। তাঁর ...পুত্র আসছে, তারই সম্মানার্থে তিনি পদমর্যাদা অনুযায়ী পোষাক পরেছেন। স্কন্ধে কারুকার্যখচিত সুবর্ণের 'ব্যাজ' জ্বল জ্বল করছে। ভ্যান গোঘ্ বংশের ...লরই চিবুক প্রশস্ত। তাঁর সেই প্রশস্ত ...কের উপরে দৃঢ় সরলোন্নত নাসিকা—তার ...াংশ উন্নত ললাট পর্যন্ত বিনাস্ত।

তিনি বললেন, "তুমি এসেছ ভিন্সেণ্ট, ...র বড়ো আনন্দ হচ্ছে। আমার বাড়িটা বড়ো ...রাবিলি, সন্তানদের বিয়ে হয়ে ...ছে, তারা কেউ আর এ বাড়িতে নেই।"

অনেকগুলো প্রশস্ত, কোনাকুনি সিঁড়ি ভেঙে ...। উপরে উঠে গেলেন। জ্যান-খুড়ো একটি ...। উন্মুক্ত করলেন। ভিনসেণ্ট ঘরটিতে প্রবেশ ... হাত থেকে তার ব্যাগটা নামিয়ে রাখল। ...র দিকে মুখ করে একটি বড়ো জানালা। ...ন-খুড়ো শয্যার এক প্রান্তে বসলেন। তাঁর ...নালী অলকগুচ্ছের মর্যাদা রক্ষা করে যতদূর ...ব হৃদ্যতার ভাব দেখাবার চেষ্টা করলেন ...ন।

"তুমি ধর্মযাজকের কাজ করবে বলে পড়া-...না করতে মনস্থ করেছ, এ শুনে আমি খুব ...শ হয়েছি। ভ্যানগোঘ বংশের কেউ না কেউ ...বানের কাজে আত্মনিয়োগ করেই থাকে—...কালই এরূপ হয়ে আসছে।

ভিন্সেণ্ট পাইপ হাতে নিয়ে, তাতে সযত্নে ...াক পুরতে লাগল। এটা তার একটা ভঙ্গী-...শেষ। কোনো কিছু ভাবতে সময় নেবার ...কার হলেই সে ধীরে সুস্থে পাইপে তামাক ...র। বলল সে, "আমি ধর্মপ্রচারক হতে এবং তার অধিকার পেতে চেয়েছিলাম, আপনি তা জানেন।"

"প্রচারক হয়ে তোমার কাজ নেই ভিনসেণ্ট। তারা তো অশিক্ষিত লোক। ভগবান জানে কি ভুয়ো ধর্মতত্ত্বই না তারা লোককে শেখায়। না বাবা, তোমার এ কাজ নয়। ভ্যান গোঘ্ বংশের যারা যারা ধর্মশিক্ষক হয়েছে, তারা সবাই বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট হয়েছে। যাক এসব কথা। তুমি এখন কাপড়চোপড় বদলাও। আটটায় ডিনার।"

ভাইস্ এড্মিরালের প্রশস্ত পিঠখানা যেই দরজার পথে অদৃশ্য হয়েছে অমনি ভিন্সেণ্টের মধ্যে একটি মৃদু বিষাদের ভাব নেমে এলো। চারদিকে সে তাকিয়ে দেখল। শয্যাটি প্রশস্ত ও সুকোমল। লেখবার ডেস্কখানা বেশ বড়ো। খাটো, মসৃণ পড়ার টেবিলখানা তাকে যেন আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। কিন্তু এত সব আরামের উপকরণ দেখে সে অস্বস্তি বোধ করল। অপরিচিত লোকের সান্নিধ্যে সে যেরকম অস্বস্তি বোধ করে থাকে, সেইরূপ। টুপিটা একটানে খুলে রেখে, দ্রুত বেরিয়ে বাঁধের দিকে বেড়াতে চলে গেলো। সেখানে এক ইহুদি পুস্তক বিক্রেতার সঙ্গে তার দেখা হল। বিক্রেতা একটা খোলা তাক থেকে কতকগুলি ছবির সুন্দর প্রিণ্ট বার করে দেখালে, ভিনসেণ্ট্ অনেক খুঁজে পেতে তার থেকে তেরোখানা প্রিণ্ট বেছে নিয়ে বগলে করে ফিরে চলল। আলকাতরার কড়া গন্ধে নিঃশ্বাস ভারী হয়ে আসে। তার মধ্য দিয়েই জলের ধার ধরে সে বাড়িতে পেঁছাল।

ছবিগুলি দেওয়ালে টাঙাতে গিয়ে, দেওয়ালের চটের কোনো ক্ষতি না হয় এজন্য খুব আস্তে পিন মারতে লাগল। এমন সময়ে দরজার কড়া [illegible] উঠল। রেভারেন্ড স্ট্রিকার ঘরে ঢুকলেন। [illegible]ও সম্পর্কে ভিনসেণ্টের কাকা হন। কিন্তু তিনি ভ্যান গোঘ্ বংশের লোক নন। তাঁর পত্নী ও ভিনসেণ্টের মা পরস্পর সহোদরা ভগিনী। তিনি আমস্টার্ডামের প্রখ্যাতনামা ধর্মযাজক। তাঁর বিচক্ষণতা সকলে একবাক্যে স্বীকার করে থাকে।

পরস্পর কুশল প্রশ্নাদির পর রেভারেণ্ড বললেন, "তোমাকে ল্যাটিন ও গ্রীক শেখাবার জন্যে আমি মেণ্ডিস ডা কোস্টাকে পেয়েছি। ক্ল্যাসিক্যাল ভাষায় তাঁর মতো অত বড়ো পণ্ডিত এখানে আর নেই। ইহুদী পাড়ায় তাঁর বাড়ি। প্রথম পাঠ নেবার জন্যে তোমাকে সোমবার তিনটায় সেখানে যেতে হবে। যাক, যে-জন্যে আমি এসেছিঃ কালকের রবিবারের 'ডিনারে' তোমার নিমন্ত্রণ রইল। তোমার মাসি উইলহেল-মিনা আর মাসতুতো বোন'কে' তোমাকে দেখবার জন্য উদ্গ্রীব।"

"আমি নিশ্চয়ই যাব কাকা। কোন্ সময়ে আমায় যেতে হবে?"

"আমরা দুপুরে খাই সকাল বেলাকার গীর্জার কাজ সেরে।"

রেভারেণ্ড স্ট্রিকার তাঁর কালো হ্যাট ও দস্তনা তুলে দাঁড়ালেন। ভিন্সেণ্ট তাঁকে বলল, "বাড়ির সবাইকে আমার সম্ভাষণ জানাবেন।"

খুড়ো বললেন, "আচ্ছা, আজকের মতো চলি।"

স্ট্রিকার পরিবার কাইজারগ্রাখে বাস করতেন। সমগ্র আমস্টারডামে এইটি সবচেয়ে বেশি অভিজাত স্থান। এটি চতুর্থ 'হর্স-সু বুলেভার্ড'; পোতাশ্রয়ের দক্ষিণ পার্শ থেকে শুরু হয়ে একটি খাল মাঝখানটুকু ঘুরে ভিতর দিক দিয়ে আবার পোতাশ্রয়েই গিয়ে পড়েছে; এইভাবে স্থানটি ঠিক অশ্বখুরের আকৃতি পেয়েছে। খালটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। খালটি আরো উল্লেখযোগ্য এইজন্য যে, এটি 'ক্রুস' নামক শৈবালদামে আবৃত নয়। এই রহস্যময় সবুজ শৈবাল দরিদ্র এলাকার খাল-গুলিকে শত শত বৎসর ধরে পুরু গালিচার মত আবৃত করে রেখেছে।

এই কাইজার্সগ্রাখ স্ট্রীটের সারিবন্ধ বাড়ি-গুলো সম্পূর্ণ ফ্লেমিশ ধরণের। অর্থাৎ ফ্ল্যাণ্ডার্সের অনুকরণে তৈরী। সংকীর্ণ, সুনির্মিত, পরস্পর দৃঢ়সংবদ্ধ—যেন এক সারি সুসজ্জিত 'পিউরিটান' সৈনিক—অ্যাটেনশন অবস্থায় দণ্ডায়মান।

পরের দিন। খুড়ো স্ট্রিকারের ধর্মসভায় যোগদানের পর ভিন্সেণ্ট তাঁর গৃহাভিমুখে রওয়ানা হন। আকাশে ধূসরবর্ণের মেঘ করে ছিল। এই মেঘ হল্যাণ্ডের আকাশকে অনাদি-কাল থেকে আবৃত করে আসছে। আজকের তীব্র সূর্যালোকে সে-মেঘ অপসারিত হয়েছে। ভিন্সেণ্ট একটু সকাল সকাল এসে পড়েছে। আত্মগতভাবে, ধ্যানস্থের মতো খানিকক্ষণ পায়চারি করল। এবং খালের নৌকাগুলো স্রোত ঠেলে কেমন উজানের দিকে এগুচ্ছে—লক্ষ্য করে দেখল।

নৌকাগুলি অধিকাংশই বালি-বোঝাই। চৌ-কোনা নৌকা—কেবল দুই প্রান্ত সঁচালো। রং কালো, কিন্তু জলে-জলে সে-রং ফিকে হয়ে গিয়েছে। মাঝখানটা অত্যধিক স্থূল; সেখানে মাল বোঝাই করা হয়। নৌকার পিছনের গলুই থেকে সামনের 'গলুই' পর্যন্ত দুই পাশে দাঁড় ঝোলানো; তাতে এই জলবিহারী পরিবার তাদের কাপড়চোপড় শুকোবার জন্য টাঙিয়ে রাখে। পরিবারের কর্তা-ব্যক্তি নৌকার খুঁটি কাদায় ডুবিয়ে কাঁধ ঠেকিয়ে জোর দিয়ে বসায়। বসাতে বসাতে এক একবার খুঁটিটাকে আকড়ে ধরে লাফ দেয়। ঝাঁকুনি খেয়ে পায়ের তলা থেকে নৌকা আলগা হয়ে যায়। গৃহিণী স্থূলাঙ্গী, রক্তিমবর্ণা, খোশ-মেজাজী। পেছনের গলুইয়ে তার স্থায়ী আসন। সেখানে বসে বসে সে কাঠের বৈঠা ঠিক করছে। ছেলেপিলেরা কুকুরছানা নিয়ে খেলা করছে এবং কিছুক্ষণ পর পরই ভিতরের খুপরিতে চলে যাচ্ছে। সেটাই তাদের থাকবার জায়গা।

রেভারেণ্ড স্ট্রিকারের বাসভবনটি খাঁটি ফ্লেমিশ ভাস্কর্যের নিদর্শন। সরু, ত্রিতল, শীর্ষে চতুষ্কোণ গম্বুজ; সেটি আবার গ্রীক-ধরণের গবাক্ষ-সজ্জিত এবং আরবীয় ভঙ্গীতে ঢেউ তুলে তুলে তাতে কারুকার্য করা হয়েছে।

উইলহেলমিনা-মাসি ভিন্‌সেণ্টকে সম্ভাষণ করে ভোজন-কক্ষে নিয়ে গেলেন। আরি শেফারের অঙ্কিত একখানা কেলভিনের পোর্ট্রেট দেওয়ালে ঝোলানো; 'সাইডবোর্ডে' রক্ষিত রূপোর বাসনগুলি চিক্‌চিক্ করছে। কক্ষের চারিটি দেওয়াল কালো দারু-শিল্পে খচিত।

কক্ষটি রীতি অনুযায়ী অনুজ্জ্বল-করা। ভিন্‌সেণ্টের চোখে এই অনুজ্জ্বলতার ঘোর কেটে যাওয়ার পূর্বেই একটি দীর্ঘাঙ্গী নমনীয়া তরুণী-মূর্তি, যেন ছায়া ভেদ করে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠে, তাকে উচ্ছ্বসিতভাবে সম্ভাষণ করল।

সুললিত মধুরকণ্ঠে বলল সে, "তুমি অবিশ্যি আমাকে চেন না। আমি তোমার মাসতুতো বোন কে।"

তার বিলম্বিত হাতখানাকে ভিন্‌সেণ্ট নিজের হাতে গ্রহণ করল। একজন তরুণীর কোমল, উষ্ণ দেহমাংসের স্পর্শ বহুদিন পরে আজ প্রথম সে অনুভব করল।

সেই হৃদ্যতার কণ্ঠেই তরুণী আবার বলল, "আমাদের এর আগে আর কখনো দেখা হয় নি। আশ্চর্যের কথা। অথচ আমি ছাব্বিশ বছরে পৌঁছুলাম, আর তুমি—তুমিও বোধ হয়—"

ভিন্‌সেণ্ট নীরবে তার দিকে তাকাল। একটা-কিছু উত্তর দেওয়া যে প্রয়োজন, কয়েক মিনিট কেটে যাওয়ার আগে একথা তার বুদ্ধিতেই এলো না। এই নির্বুদ্ধিতার ক্ষতিপূরণ করার জন্য সে উচ্চ, কর্কশ কণ্ঠে আচমকা বলে উঠল, "আমার চব্বিশ। তোমার চেয়ে কম।"

"হাঁ। তা হোক গে। এটা কোনো কৌতূহলের কথা নয়। কৌতূহলের কথা হচ্ছে, তুমিও কখনো আমস্টারডামে আসোনি, আর আমিও কখনো ব্রাবাণ্টে যাইনি। আরে একি, তুমি যে দাঁড়িয়েই আছ, বস। আর আমিই বা কি রকম, খেয়াল-ছাড়া মানুষ। বস তুমি।"

একটা শক্ত চেয়ারের কিনারায় বসল সে। অমার্জিত গ্রাম্য পরিবেশ থেকে সে মার্জিত ভদ্র সমাজে এসেছে। গেঁয়ো শুয়ারের মতো ব্যবহার তার সাজে না। এখানে তাকে কেতা-দুরস্ত হতে হবে। এ সম্বন্ধে তার মনে নানা জল্পনা খেলছিল—তারই খেই ধরে সে বলল, "মা তো সব সময়েই চান তুমি মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে বেড়িয়ে আস। ব্রাবাণ্ট জায়গাটিও তোমার মন্দ লাগবে না, কেন না, পল্লী-অঞ্চলের নিরিবিলিতে মনে বেশ শান্তি পাওয়া যায়।"

"আমি তা জানি। অ্যানা-মাসি চিঠি লিখে কয়েকবার আমাকে নিমন্ত্রণও করেছেন। শীগ্গিরই ওখানে যাব একবার।"

"হাঁ, অবশ্যই যেয়ো।" ভিন্‌সেণ্ট উত্তর দিল।

তার মনের একটি ক্ষুদ্রাংশমাত্র তরুণীর সঙ্গে আলাপ-রত ছিল, বাকি দেহ-মন সমগ্রটাই ছিল তার রূপ-আস্বাদনে বিভোর। বহুদিনের পিপাসার্ত সে, উদগ্র তৃষ্ণা নিয়ে সে তার উচ্ছ্বসিত রূপমাধুরী পান করতে লাগল। পূর্বে কে'র দেহাবয়বে ডাচ্ রমণীসুলভ বলিষ্ঠতা ছিল, তার স্থলে এখন সর্ব-অঙ্গে মসৃণ কমণীয়তা ও গঠন-সামঞ্জস্য এসে গিয়েছে। তার মাথার চুলগুলি মসৃণ স্বর্ণাভ বাদামি বর্ণও ধারণ করে নি, আবার পল্লীবালার ন্যায় অমসৃণ রক্তাভও নয়। চুলগুলিতে তার উভয় ভাবের সংমিশ্রণ ঘটেছে; অর্থাৎ পল্লী-ভাবের উগ্রতা যেন ভদ্র-ভাবের স্নিগ্ধতায় মিলিত হয়ে এক অপূর্ব ঔজ্জ্বল্যের সৃষ্টি করেছে তার চুলে। রৌদ্র ও হাওয়া তার গাত্রবর্ণকে বিবর্ণ করে দিতে পারে নি। চিবুকের শুভ্রতা তার গণ্ডের রক্তাভার সঙ্গে মিলিত হয়ে তার মুখ-খানিকে ডাচ শিল্পীদের একখানা নিখুঁত শিল্পকর্মে পরিণত করেছে। তার চোখদুটিতে গভীর নীলিমা; জীবনের এক আনন্দময় নৃত্যছন্দ যেন তাতে লীলায়িত। পূর্ণ ওষ্ঠ-শোভিত মুখবিবর কিঞ্চিৎ বিমুক্ত, যেন কিছু বলার জন্য প্রতীক্ষমান।

সে ভিন্‌সেণ্টের নীরবতা লক্ষ্য করে বলল, "কি ভাবছ তুমি বলতো? মনে হচ্ছে, আগে থেকে কোনো চিন্তা তোমার মন অধিকার করে রেখেছে।"

"আমি ভাবছিলাম কি জানো? ভাবছিলাম, শিল্পী রেমব্রাণ্ট তোমার ছবি আঁকতে পেলে ধন্য হয়ে যেতেন।"

'কে' কণ্ঠস্বরে অপূর্ব মাধুর্য মাখিয়ে মৃদুভাবে হাসল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, "রেমব্রাণ্ট তো কেবল কদাকার বুড়ীদের ছবি এঁকেই ধন্য হয়েছেন, তাই না?"

"না। তিনি চিত্রিত করেছেন রূপবতী বর্ষীয়সী রমণীদের। যে-সব রমণী দরিদ্রা, কিংবা কোনো দিক থেকে সুখবঞ্চিতা, অথচ দুঃখের মধ্য দিয়েই আত্মার সান্নিধ্য পেয়েছে তিনি এঁকেছেন সেই সব নারীদের।"

এই প্রথমবার কে ভিন্‌সেণ্টের প্রতি সত্যিকারভাবে দৃষ্টিপাত করল। ভিন্‌সেণ্ট এখানে আসা অবধি তার দিকে কে শুধু মাঝে-মাঝে ভাসা-ভাসাভাবে তাকিয়েছে এবং তার তামাটে-লাল চুল ও ভারী মুখমণ্ডলটাই কেবল সে-দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। এখন সে দেখতে পেল ভিন্‌সেণ্টের সুপূর্ণ মুখবিবর, সুগভীর আদল, প্রোজ্জ্বল চক্ষুদুটি, এবং উচ্চ সুসমঞ্জস ললাট; আকৃতির এই বিশেষত্ব-গুলি ভ্যান্ গোঘ্ বংশের বৈশিষ্ট্য।

কে অনুচ্চ কণ্ঠে বলল, "কথাটা বড়ো আনাড়ীর মতো বলে ফেলেছি। এর জন্য ক্ষমা চাইছি। তুমি রেম্‌ব্রাণ্টের সম্বন্ধে যা বলতে চেয়েছ, আমি তা বুঝতে পেরেছি। বয়স যাদের মধ্যে ছাপ এনে দিয়েছে, দুঃখ যন্ত্রণায় যাদের মুখে বলিরেখা দেখা দিয়েছে এবং পরাজয় যাদের মুখে সুগভীর রেখাপাত করেছে, তাদেরই ছবি যখন তিনি আঁকতেন, তখন তিনি এদেরই মধ্যে সত্যিকারের সৌন্দর্যের সন্ধান পেতেন তাই না?"

"এত মন দিয়ে তোরা কি বিষয়ে আলোচনা করছিস রে?" বলতে বলতে রেভারেণ্ড স্ট্রিকার ঘরে ঢুকলেন।

কে উত্তর দিল, "আমরা পরিচয় করে নিচ্ছি বাবা। আমার এত সুন্দর একটি মাসতুতো-ভাই রয়েছে এ কথা তো কোনোদিন তুমি আমায় বলোনি বাবা!"

আরো একজন এসে ঘরে ঢুকলো। একটি কোমলাঙ্গ যুবক। তার মুখে স্বতঃস্ফূর্ত হাসি, চলনে সুমধুর লালিত্য। কে আসন ছেড়ে উঠে, আগ্রহভরে তাকে চুম্বন করল। বলল, "'কাজিন' ভিন্‌সেণ্ট, ইনি আমার স্বামী মিনহিয়ার ভোস।"

সে বেরিয়ে গিয়ে কয়েক মিনিট পরেই দুমাসের একটি শিশুকে নিয়ে ঘরে ঢুকল। শিশু হাসিখুসি, প্রাণচঞ্চল; মুখে স্বপ্নময় আবেশ। নীলাভ চোখ দুটি ঠিক তার মার চোখের মতো। কে নত হয়ে ছেলেটিকে তুলে ধরল। ভোস মাতাপুত্র দুজনার মাঝ-খান দিয়ে বাহু বাড়িয়ে শিশুটিকে ধরল।

মাসি উইলহেলমিনা জিজ্ঞাসা করলেন, ন্সেণ্ট, তুমি আমার সঙ্গে টেবিলের এ টাতে বস, কেমন?"

কে বসল ভোসকে সঙ্গে নিয়ে ভিন্-টের উল্টো দিকে। তার স্বামী বাড়ি ফিরে এসেছে বলে, ভিন্সেণ্টকে বেমালমে ভুলেই গিয়েছে। তার স্থল রক্তরাগে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। সময়ে তার স্বামী নিম্নস্বরে আর-কেউ না তে পায় এমনিভাবে, বেশ সক্ষ্ম কি একটা বলে ফেলেছে। তাতে কে মহর্তমধ্যে কত হয়ে উঠল এবং মখ বাড়িয়ে তাকে ন করল।

তাদের প্রেম-প্রণয়ের এই ঢেউগলি ন্সেণ্টের বকের বেলাভূমিতে এসে আছড়ে ছে। তাকে বিদীর্ণ করে দিচ্ছে। সেই বার রাত্রির মর্মবিদারক স্মৃতি। পর অনেক দিন উরসলাকে ভুলে ছিল সে। থেকে আজ এই প্রথম উরসলার জন্য রানো বেদনা তার মনের কোনো রহস্যময় থেকে সরু হয়ে ক্রমে সে-বেদনা তার সারা মন মস্তিষ্ককে প্লাবিত করল। তার খে উপবিষ্ট ক্ষুদ্র পরিবারটি—এর অচ্ছেদ্য ন. এর আনন্দঘন স্নেহ-বন্ধন সব কিছু লয়ে তার মধ্যে একটিমাত্র প্রগাঢ় উপলব্ধি গিয়ে দিল, সেটি এই যে, সে ক্ষুধার্ত; লোবাসার জন্য সে বভুক্ষিত; এরই মধ্য দিয়ে নির্তবিলীন মাসগলি সে কাটিয়ে এসেছে। বভুক্ষা তার মধ্যে অহর্নিশ মাথা কুটে মরছে, সহজে নিবৃত্ত হবার নয়।

৩

ভিন্সেণ্ট বাইবেল পড়বার জন্য প্রতিদিন র্যোদয়ের পর্বেই শয্যাত্যাগ করত। পাঁচটার য় সর্য দেখা দিলে সে জানালায় গিয়ে ড়াল। এখান থেকে অনতিদরেই ডকের ঙ্গণ। গেটের মধ্য দিয়ে দলে দলে মজররা ঙ্গণে ঢকছে। সে দেখল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েঃ র্ঘ অসমান সারিতে বদ্ধ জীবগলো—চ্ছাদনে আবৃত। "জইডার জী"-তে ছোট ট স্টীমার ইতস্তত যাতায়াত করছে। দরে, দীর কাছাকাছি দেখা যাচ্ছে বাদামি পাল তুলে দের দ্রুত সঞ্চরণ।

ধীরে ধীরে সর্য পর্ণাবয়ব নিয়ে উদিত লেন। তক্তার স্তপগলিতে কুয়াশা করেছিল, দ্রে তা অপসারিত হয়ে গেল। ভিন্সেণ্ট খন জানালা থেকে ফিরে এলো; এক খণ্ড কনো রটি ও এক গ্লাস বিয়ার দিয়ে প্রাতরাস প্ন করল। তারপর পরো সাত ঘণ্টার জন্য ্যাটিন ও গ্রীক পড়তে বসে গেল।

একটানা চার পাঁচ ঘণ্টা পাঠে মনোনিবেশ রে থাকার পর তার মাথা ভার বোধ হতে াগল। মাঝে মাঝে রগগলি টন্‌টন্ করতে লাগল এবং চিন্তার গোলমাল হতে লাগল। এত জোর চিন্তা ও উদ্বেগ-আবেগের মধ্যে দিয়ে এক বৎসর কাটাবার পর নিয়মবদ্ধ পাঠের অধ্যবসায় কি করে সে চালিয়ে যাবে ভেবে পেলো না। পড়া ছেড়ে এসব চিন্তা করতেই সময় কেটে গেল। সর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ল। এখন মেণ্ডিস ডা কোস্টার কাছে যাবার সময় হয়েছে। তাঁর কাছে পাঠ নিতে হবে। সেখানে যাওয়ার পথ 'বটেনকাণ্টের' মধ্য দিয়ে, 'ওডেজিড্‌স্ চ্যাপেল' এবং পরাতন গীর্জা ও দক্ষিণ গীর্জার পাশ দিয়ে; অতঃপর কতকগলো আঁকাবাঁকা গলি অতিক্রম করতে হয়। এ সব গলি কামারের দোকান, হাতা-বালতির দোকান আর লিথোগ্রাফ ছবির দোকানে ভরতি। ভিন্সেণ্ট পায়ে হেঁটে এ সমস্ত অতিক্রম করে গন্তব্যস্থলে উপস্থিত হলো।

মেণ্ডিস ছবির প্রসঙ্গে ভিনসেণ্টের নিকট রইপারেজের অঙ্কিত 'ইমিটেশান অব জেসাস ক্রাইস্ট' ছবিখানার কথা তুললেন। এই শিল্পী ছিলেন ইহদী জাতির এক ক্লসিক্যাল টাইপ। তাঁর চোখ দটি ছিল সপ্রসস্ত ও সগভীর। মখখানা ছিল বেশ পাতলা গাল বসা, কিন্তু সারা মখে ঐশ্বরিক ভাব সকোমল সঁচালো শ্মশ্রুতে প্রাচীন ইহদি পরোহিতের ছাপ।

এই ইহদী-পাড়াতে দপরটায় ভয়ানক গরম। তার উপর লোকজনের বসতিও এত ঘন যে, দম বন্ধ হয়ে আসে। ভিন্সেণ্ট পরো সাত ঘণ্টা গরপাক গ্রীক ও ল্যাটিন পড়ার পর আরো কয়েক ঘণ্টা ডাচ ইতিহাস ও ব্যাকরণ পাঠ শেষ করে মেণ্ডিসের সঙ্গে লিথোগ্রাফ সম্বন্ধে আলোচনা করত। মারিস-এর অঙ্কিত 'এ ব্যাপ্টিজম' বা দীক্ষা শীর্ষক ছবির থেকে ভিনসেণ্ট যে স্কেচ করেছে, একদিন সেখানা নিয়ে এসে তার শিক্ষকের হাতে দিল।

মেণ্ডিস তাঁর হাড়সর্বস্ব সর আঙলগলির দ্বারা "দীক্ষা" ছবিটি গ্রহণ করলেন এবং এমন-ভাবে তুলে ধরলেন যাতে উঁচু জানালা-পথে কড়া, ধলিধসর যে রৌদ্র আসছে, তা ছবির ওপর পড়তে পারে।

তিনি গলায় জোর দিয়ে ইহদীসলভ ধ্বনি তুলে বললেন, "খব ভাল ছবি এটা। বিশ্বধর্মের এক সার্বজনীন ভাব ছবিটিতে ফটে উঠেছে।"

ভিন্সেণ্টের যাবতীয় ক্লান্তিবিরক্তি সেই মহর্তেই কেটে গেল। সে অতি উৎসাহের সঙ্গে মারিসের আর্টের বর্ণনা দিতে প্রবৃত্ত হল। মেণ্ডিস মাথা নেড়ে মদ আপত্তি জানালেন। ভিন্সেণ্টকে ল্যাটিন ও গ্রীক শেখাবার জন্য রেভারেণ্ড স্ট্রিকার তাঁকে উচ্চবেতনে নিযক্ত করেছেন।

তিনি ধীরকণ্ঠে বললেন, "ভিন্সেণ্ট, শোনো। মারিসের আর্ট খবই সন্দর। কিন্তু সময় বড় অল্প। এখন এসব ছেড়ে পাঠে মন দেওয়াই ভাল। তাই দাও।"

ভিন্সেণ্ট তা বঝল। দ-ঘণ্টার পাঠ সেরে ফিরবার পথে, যে সব বাড়িতে করাতের কাজ, ছতোর মিস্ত্রীর কাজ হয় কিংবা জাহাজে খাদ্য পানীয় সরবরাহকারীরা কার্যরত থাকে, ভিন্সেণ্ট যে সব বাড়ির দরজায় থেমে দাঁড়াত, যেখান থেকে ভেতরটা দেখা যায়। সেখানে দেখতে পেতো, খব বড় মদের পিপে। তার ধারেকাছের দরজাগলো সবই খোলা রাখা হয়েছে। ভিতরে মশাল হাতে লোকজন ছটোছটি করেছে।

জ্যান-কাকা সাতদিনের জন্য 'হেলবর্টে' গিয়েছেন। ডক-প্রাঙ্গণের পিছনের অত বড়ো বাড়ি। ভিন্সেণ্ট এখানে খবই নিঃসঙ্গ বোধ করছে বঝতে পেরে একদিন বিকেলের পর কে ও ভোস তাকে 'ডিনারে' ডেকে নিতে এলো।

কে তাকে বলল, "তোমার জ্যান-কাকা যতদিন ফিরে না আসেন, তুমি প্রতি রাত্রে আমাদের কাছেই যেয়ো। মা জিজ্ঞেস করছিলেন, উপাসনার পর রবিবারের 'ডিনার' তুমি প্রতি সপ্তাহে আমাদের সঙ্গেই খাবে কি না।"

খাওয়ার পর তারা তাস খেলতে বসল। কিন্তু ভিন্সেণ্ট তাস খেলা জানে না বলে, ঘরের এক নিরিবিলি কোণে অগস্ট গ্রাসনের লেখা ক্রসেডের ইতিহাসখানা নিয়ে পড়তে বসল। যেখানে বসেছে, সেখান থেকে কের মখখানা, তার চকিত চঞ্চল হাসিটকু স্পষ্ট দেখা যায়। কে তাসের টেবিল ছেড়ে তার কাছে এলো, কাছ ঘেঁসে বসল।

"তুমি কি বই পড়ছ, ভিন্সেণ্ট ভাই?" কে জিজ্ঞাসা করল।

ভিন্সেণ্ট বইটার নাম করল। তারপর বলল, 'বইটা খবই সন্দর। থাইস মারিস যে ভাব নিয়ে ছবি আঁকেন, এ বইটি সেই ভাব নিয়ে লেখা, এ আমি বলে দিতে পারি।"

কে একট হাসল। শিল্প-সাহিত্য নিয়ে হামেশাই ভিন্সেণ্ট এমন সব মজার ধাঁধা লাগিয়ে দেয়। কে জানতে চায়, "আচ্ছা, এত শিল্পী থাকতে লেখক থাইস মারিসকেই অনসরণ করবে কেন?"

"বইটা আগে পড়, তারপর মারিসের একটা ক্যানভাসের কথা মনে করিয়ে দেয় কি না দেখ। লেখক যেখানে পাহাড়ের উপর এক পরোণো দর্গের বর্ণনা দিয়েছেন—প্রদোষের আধো-ছায়ায় শরৎকালের বন সেখানে মায়ালোকের সৃষ্টি করেছে; নীচে কালো জমি ও একজন চাষী, শাদা ঘোড়া নিয়ে জমি চষছে। পড়ো আগে সেই পাতাগলি।"

কে যখন পড়তে শর করল, ভিন্সেণ্ট তাকে একখানা চেয়ার এনে দিল। কে তার দিকে তাকালো। চিন্তামণ্ডিত ভাবের ব্যঞ্জনায় তার সেই নীলিম নেত্র দটি ঈষৎ কালো হয়ে এলো।

"সে বলল, "হ্যাঁ, দেখলাম; ঠিক মারিসের মতই লেখা হয়েছে। লেখক ও শিল্পী দুজনে একই চিন্তাকে দুই বিভিন্ন উপায়ে প্রকাশ করেছেন।"

ভিনসেন্ট বইটি তুলে নিয়ে আগ্রহভরে পাতার মধ্যে আঙুল চালাতে চালাতে বলল, "এই যে লাইনটা দেখছো মাইকেলেট বা কার্লাইলের লেখা থেকে এই লাইনটি সোজা তুলে নেওয়া হয়েছে।"

"ভিনসেন্ট ভাই, বিদ্যালয়ের সঙ্গে এত কম সম্পর্ক তোমার, তবু তুমি এত শিখেছ যে, আশ্চর্য লাগে। তুমি এখনো অনেক বই পড়ো, তাই না?"

"না। পড়তে চাই খুবই। কিন্তু হয়ে ওঠে না। আর এখন তো, সত্যি বলতে কি, পড়ার আগ্রহকে লালন করার আমার আর প্রয়োজন নেই, কেন না জানবার মতো, চাওয়ার মতো যা কিছু সবই খৃষ্টের বাণীতেই রয়েছে। অন্য যে কোন বই অপেক্ষা অধিক সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সে সব আমি খৃষ্টের ভাষণে পেতে পারি।"

কে সটান দাঁড়িয়ে বিস্ময়াহত কণ্ঠে বলে উঠল, "ও ভিনসেন্ট, তোমার মুখে এসব কি শুনছি। তোমাতে এসব মোটে মানায় না।"

ভিনসেন্ট তার দিকে অবাক হয়ে তাকাল।

"বাবা বলেন, তোমার কেবল পড়াতেই নিবিষ্টমনা হওয়া উচিত, পড়া ছাড়া আর কিছুতে মন দেওয়া উচিত নয়—তবু যতক্ষণ তুমি ক্রুসেডের ইতিহাসের পাতায় থাইস মারিসের ছাপ দেখছিলে তোমাকে তখন কতো সুন্দর দেখাচ্ছিল। আর এখন, গ্রাম্য পাদরীদের মতো এসব কি কথা বলছো?"

ভোস ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে বলল, "কে, তোমার তাস বেঁটে দেওয়া হয়েছে, চলো।"

ভিনসেন্টের ভুরুর নীচে জীবন্ত জ্বলমান দুটি চোখ—কে মুহূর্তকাল তাতে নিজের চোখ মেলে ধরল, তারপর স্বামীর হাত ধরে গিয়ে তাস খেলায় যোগ দিল।

(ক্রমশ)

**কিরূপে রোগী দেখিতে হয়** (৪র্থ সংস্করণ)—ডাঃ জি রায় প্রণীত। প্রকাশক—দি ভারত পাবলিশিং হাউস, ২৭।২নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ সিকা।

ইহা একখানি হোমিওপ্যাথি পুস্তক। ইহা আমেরিকার প্রতিভাশালী বহুদর্শী বিখ্যাত ডাক্তার ন্যাশ লিখিত "হাউ টু টেক দি কেস্ এন্ড ফাইন্ড দি সিমিলিমাম্" (How to take the case and find the similimum) নামক পুস্তকের বঙ্গানুবাদ। অনুবাদক ডাক্তার জি রায়। ইহা শুধু অনুবাদ নয়, ইহার স্থানে স্থানে "নোট" দিয়া এবং হোমিওপ্যাথি মতে "রোক কি" রোগী কে ও "কিসের চিকিৎসা করিতে হইবে" প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা করিয়া পুস্তকের বিষয়টিকে বিশদ করা হইয়াছে। ইহাতে আরও অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় লিখিত আছে। যাঁহারা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার পক্ষপাতী অথচ ইংরাজী পুস্তক পাঠে অসমর্থ তাঁহারা এই পুস্তক পাঠ করিলে বিশেষ উপকৃত হইবেন। পুস্তকের ভাষা সরল এবং ছাপা ও কাগজ ভাল।

৫৮।৪৯

**শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা**—শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ, বি-এ, সম্পাদিত। প্রকাশক—শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম এ, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ৬৪, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা অথবা প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, বাঙলাবাজার, ঢাকা। মূল্য চারি টাকা চারি আনা।

জগদীশবাবুর গীতা দীর্ঘকাল যাবৎ বাঙলাদেশে পঠিত হইয়া আসিতেছে কাজেই উহার নূতন পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। এদেশে বাঙলা ভাষায় যে কয়খানা বিস্তৃত আলোচনাপূর্ণ গীতার সংস্করণ প্রচলিত আছে, জগদীশবাবুর গীতা তন্মধ্যে' একটি। অধুনা বিস্তৃত আকারে উহার পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত। প্রায় সাড়ে সাত শত পৃষ্ঠাব্যাপী এই গ্রন্থ মধ্যে মূল শ্লোক, প্রতি শ্লোকের শব্দার্থসহ অন্বয়, বঙ্গানুবাদ এবং টীকা টীপ্পনী ইত্যাদি দেওয়া হইয়াছে। সাধারণ পাঠকদের বুঝিবার উপযোগী ব্যাখ্যা যেমন দেওয়া হইয়াছে তেমনি বিজ্ঞতর পাঠকদের জন্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য গীতা ব্যাখ্যাকারীদের মত ও আলোচনাসহ গীতার্থ দীপিকা নামে একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতে গীতাখানা সর্বশ্রেণীর পাঠকের নিত্য পাঠযোগ্য হইয়াছে। গ্রন্থারম্ভে হইয়াছে, উহাতে সর্বধর্মশাস্ত্রে গীতার প্রভাব, সর্বধর্ম সমন্বয়ে গীতা গ্রন্থের প্রচেষ্টা, গীতার শিক্ষা, গীতার টীকাকারগণের পরিচয় প্রভৃতি বহু গীতা সম্পর্কিত জ্ঞাতব্য তথ্য স্থান পাইয়াছে।

গীতা সর্বযুগের যোগ গ্রন্থ—কেবল গ্রন্থ নহে, উহা মানবের অভ্যাস। এই অভ্যাসকে জীবনের সঙ্গে যুক্ত করিয়া নেওয়াই গীতাপাঠের সার্থকতা। উহা কেবল হিন্দু ধর্মের গ্রন্থ নহে, সর্বমানবের ধর্মগ্রন্থ। তাই প্রাচ্য পাশ্চাত্য সর্বদেশে এবং সর্বকালে উহা বন্দিত। সনাতন ঋষিকণ্ঠনিঃসৃত এই অনুপম বস্তুকে আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছি।

বাজারে গীতা গ্রন্থের নানা সংস্করণ প্রচলিত আছে। তবে উহাদের অধিকাংশই সংক্ষিপ্ত। এই সকল হইতে গীতার মর্ম সম্যক উপলব্ধি হওয়া ক্লেশকর। পূর্বে নানাস্থানে গীতা পাঠ শ্রবণাদির রেওয়াজ ছিল। যে কারণেই হউক উহা হ্রাস পাইয়াছে। এখন বিস্তৃত ব্যাখ্যা সমন্বিত গীতা সাধারণ পাঠকদের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়। এইজন্য জগদীশবাবুর গীতাখানাকে আমরা অসংকোচে অনুমোদন করিতেছি। সুখের বিষয় তিনি নিছক পাণ্ডিত্য দেখাইবার জন্য কিংবা কোনো নিজস্ব মত খাড়া করিবার জন্য গীতা ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হন নাই। সকলকে সহজভাবে গীতার মূলবস্তু বুঝাইয়া দিবার উদ্দেশ্যেই তিনি এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার গীতা সমাদৃত হইয়াছে। বর্তমানে ৫ম সংস্করণে আলোচনা বিস্তৃততর হওয়ায় গীতাধ্যায়ীদের নিকট বইখানা অপরিহার্য বলিয়াই আমরা মনে করি।

২৩।৪৯

**শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম**—শ্রীজ[illegible]শচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীঅনিলচন্দ্র [illegible] এম এ, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ৬৪নং কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা অথবা বাঙলাবাজার, ঢাকা। মূল্য চারি টাকা আট আনা।

শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যেরূপ বিস্তৃতভাবে নাই। তিনি জ্ঞানীর দৃষ্টিতে পুরাতাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে এবং সমালোচকের দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাকে ভক্ত ও ভাবুকের দৃষ্টিতে দেখাইবার চেষ্টা সম্ভবত তিনি করেন নাই। ভাগবত গ্রন্থে ভগবান কৃষ্ণকে যে দৃষ্টিতে দেখা হইয়াছে, তাহা ঐতিহাসিক তথা সমালোকদের দৃষ্টিতে ধরা পড়িবার বস্তু নহে। কেবল প্রেমের দৃষ্টিতেই সেই সত্য ও সুন্দরের স্বরূপ ধরা পড়িতে পারে। ভাগবতকার পুন পুন একথার উল্লেখ করিয়াছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রেমময়রূপে ভক্তি ও ভাবুকের দৃষ্টিতে বুঝাইবার চেষ্টা বৈষ্ণবগণের নিকট সর্বযুগে বন্দনীয়। তাঁহাকে অন্যভাবে বুঝাইবার প্রচেষ্টা জ্ঞানান্বেষীর নিকট আদরণীয় হইলেও ভক্তিকামীর নিকট বেদনাদায়ক। শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে এই বিস্তৃত আলোচনা গ্রন্থ অধুনা প্রকাশিত হইয়াছে। জগদীশবাবু লব্ধপ্রতিষ্ঠ গীতা ব্যাখ্যাতা তাঁহার এই গ্রন্থে তিনি ভক্তির দৃষ্টিতে, প্রেমের দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। গ্রন্থখানা সুবিস্তৃত। স্থানাভাবে উহার সম্যক পরিচয় দেওয়া সম্ভব নহে। এই গ্রন্থ আশা করি শীঘ্রই রসিক ও ভক্ত সমাজে অবিচলিত আসন লাভ করিবে। আমরা শুধু সংক্ষেপে এইমাত্র বলিয়াই ক্ষান্ত হইব যে, গ্রন্থকার বেদ, উপনিষদ, পুরাণাদি প্রাচীন ঋষিশাস্ত্র এবং পরবর্তী সময়ের বৈষ্ণব গ্রন্থাদি বিশেষভাবে পর্যালোচনা করিয়া এই অনুপম গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্মের স্বরূপ প্রতিপাদক শত শত শ্লোক, বৈষ্ণব কবিতার বহু উধৃত এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। গ্রন্থখানা মধুর রসের আকর। বৈষ্ণব অবৈষ্ণব সকলকেই আমরা গ্রন্থখানা পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

২৪।৪৯

**ডিটেক্‌টিভ** (১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা)—সম্পাদক—শ্রীদীনেশ সরকার। কার্যালয়—১৪, বলরাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা—৪। বার্ষিক মূল্য সডাক ছয় টাকা ছয় আনা। প্রতি সংখ্যা আট আনা।

এখানা ডিটেক্‌টিভ গল্পের মাসিক পত্র। কয়েকটি সুনির্বাচিত গোয়েন্দা কাহিনী আলোচ্য সংখ্যাটিতে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছাপা এবং রঙীন কভার সহজেই পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমরা পত্রখানার দীর্ঘজীবন ও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

৪।৪৯

**নেতাজী সুভাষচন্দ্র**—শ্রীদীপ্তিরঞ্জন বসু। প্রকাশক—এ মুখার্জি এণ্ড কোং, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য দুই আনা।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বিপ্লবী জীবনের রূপ পুস্তিকাখানাতে সংক্ষেপে ফুটাইয়া তোলা হয়েছে। এই সুন্দর সুমুদ্রিত পুস্তকটি পড়িয়া পাঠকেরা বিশেষ প্রীতিলাভ করিবে।

**প্রবাহ** (মাসিক পত্র)—সম্পাদক—শ্রীমনোরঞ্জন ...। কার্যালয়—৬৪নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। মূল্য বার্ষিক সডাক সাড়ে চার টাকা। প্রতি সংখ্যা ছয় আনা।

"প্রবাহ" প্রগতিশীল মাসিক পত্র। আমরা ইহার প্রথম সংখ্যা সমালোচনার্থ পাইয়া প্রীত হইলাম। নানা চিত্তাকর্ষক রচনা সম্ভারে পত্রিকাখানি সমৃদ্ধ। ২৯।৪৯

**Bengal Library Association Bulletin—Vol. VII, 1948.**

আমরা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পত্রিকার ৭ম খণ্ড (১৯৪৮) সমালোচনার্থ পাইয়া প্রীতিলাভ করিয়াছি। ইহাতে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারসমূহ এবং দেশ বিদেশের নানা পাঠাগার সম্পর্কে নানা তথ্য, সংবাদ ও কার্য বিবরণাদি স্থান পাইয়াছে। ৩৪।৪৯

**রাম চরিত**—বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স্ লিঃ (আশুতোষ লাইব্রেরী) মূল্য ৸০।

বাঙলা হরফে ছাপা সরল ও সরস হিন্দী ভাষায় লেখা রামায়ণের আখ্যানভাগ লইয়া রচিত এই বইখানি হিন্দীভাষা শিক্ষার্থী বাঙালীর পক্ষে উপকারে লাগিবে। ভারতের রাষ্ট্রপাল চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী মহাশয়ের উপদেশ অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা বিভাগ বাঙলা হরফে একখানা হিন্দী রামায়ণ মুদ্রণ ও প্রকাশ করা সম্ভব কিনা জানিতে চাওয়ায় প্রকাশক আশুতোষ লাইব্রেরী এই কল্পনা বাস্তবে পরিণত করিয়াছেন। বইখানির কাগজ ও ছাপা চমৎকার। পরিশিষ্টে দেবনাগরী অক্ষরে পরিচয়, হিন্দী ভাষা উচ্চারণের নিয়ম ও হিন্দী ব্যাকরণের সাধারণ নিয়মগুলি দেওয়া হইয়াছে। এই বই হিন্দী শিক্ষার্থী বাঙালীর ও বাঙালী ছেলেমেয়েদের আকর্ষণের বস্তু হইয়াছে এবং ইহা দ্বারা জনগণের মধ্যে হিন্দীভাষা প্রচারের সহায়তাও হইবে।

**ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রেমিসেস রেণ্ট কণ্ট্রোল এ্যাক্ট**—সুশান্তকুমার সেন। প্রকাশক—এস সি সরকার এণ্ড সন্স লিঃ; মূল্য—ছয় টাকা।

বাঙলা দেশে বাড়ী ভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৪৮ সালের ১লা ডিসেম্বর হইতে কার্যকরী হইয়াছে। বাড়ী ভাড়ার দুর্নীতি আজ সর্বজন-বিদিত। সেই দুর্নীতি দমনের জন্য এই আইন অনুমোদিত হইয়াছে। কিন্তু এই এ্যাক্টের ধারাগুলি বহু জায়গায় স্বতঃবিরোধী এবং এই সকল পরস্পর বিরোধী ধারাগুলির সরকার কিংবা হাইকোর্ট কর্তৃক সুস্পষ্টরূপে সামঞ্জস্য না হওয়া পর্যন্ত ভাড়াটিয়াদের দুর্গতির সত্যিকার লাঘব হইবে না। ১১নং এবং ১২নং ধারায় যেখানে সাব-টেনাণ্টদের অধিকার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, ধারার ধারাগুলি আরও পরিষ্কার হওয়া উচিত ছিল। আইনতঃ সাব-টেনাণ্টদের যে অধিকার দেওয়া হইয়াছে, কার্যতঃ তাহা থাকিবে না। যদি কোন টেনাণ্ট ভাড়ার চুক্তি-বিরোধীভাবে কোন সাব-টেনাণ্ট রাখে এবং পরে তাহার উচ্ছেদ হয়, সেই সঙ্গে সাব-টেন্যাণ্টেরও উচ্ছেদ হইবে। কোন ক্ষেত্রে চুক্তি-সঙ্গত এবং কোন ক্ষেত্রে চুক্তি-বিরোধী তাহা সাব-টেনাণ্টদের বাড়ীওয়ালার কাছ হইতে জানিয়া লইতে হইবে, তাহা না হইলে বিনাদোষে যে কোন সময়ে টেনাণ্টের দোষে সাব-টেনাণ্টকে গৃহহারা হইতে হইবে। গ্রন্থকার এই সকল দোষগুলির সামঞ্জস্য করার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে হাইকোর্টের নির্দেশ না থাকায়, তিনি অসুবিধা বোধ করিয়াছেন। যে সকল ধারাগুলি নূতন এবং যাহাদের সম্বন্ধে হাইকোর্টের কোন সিদ্ধান্ত নেই, সেই সকল ধারা সম্বন্ধে গ্রন্থকারের ব্যাখ্যাগুলি অনেক জায়গায় কোন সঠিক ইঙ্গিত দেয় নাই। এ দোষ গ্রন্থকারের নয়, যাঁরা আইনের ক্ষমতা রচনা করিয়াছেন তাঁহাদের। এই পুস্তকটি আইনজীবিদের যথেষ্ট কার্যে আসিবে।

**অন্ ইনফ্লেশন (On Inflation)**:—লেখক—শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার। আতাওয়ার রহমান কর্তৃক পি-১৩, গণেশচন্দ্র এভেন্যু হইতে প্রকাশিত। মূল্য ॥৵০ আনা মাত্র।

মুদ্রাস্ফীতি ও তাহার প্রতিকার সম্পর্কে খ্যাতনামা অর্থনীতিক শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার রচিত দুইটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লইয়া এই পুস্তকখানি প্রকাশিত হইয়াছে। কার্যকরী অর্থনীতি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সরকারের মতামত ভারতের সর্বত্র যেরূপ আগ্রহ সহকারে বিবেচিত হইয়া থাকে, তাহাতে আমাদের আশা আছে এই পুস্তকখানি সুধীসমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করিবে। ভারতের বর্তমান মুদ্রাস্ফীতির কারণ এবং এই মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসের উদ্দেশে কি কি উপায় গ্রহণ করা যাইতে পারে শ্রীযুক্ত সরকার বাস্তব অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহার আলোচনা করিয়াছেন। সরকারী বিশেষজ্ঞগণ এবং ব্যবসায়ী মহলও এই গ্রন্থখানি পাঠে উপকৃত হইবেন বলিয়া মনে করি।


**যৌগিক ও তান্ত্রিক চিকিৎসা**—বিশ্ববিশ্রুত বৈদান্তিক যোগী, স্বামী প্রেমানন্দজীর প্রবর্তিত— মানসিক রোগে, হিষ্টিরিয়া, উন্মাদ, বাত ইত্যাদিতে বিংশতি বৎসরের অনুশীলন ও সাধনার অভিজ্ঞতা। বহু প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রের ও ব্যক্তিগত উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। বিবরণের জন্য রিপ্লাই কার্ডে ইংরাজিতে লিখুন। প্রোফেসার এস্ এন্ বসু, পোঃ—দত্ত-পুকুর, ২৪ পরগণা। (সি ১২০০)

## কলিকাতার দরে বই কিনুন

আমাদের প্রকাশিত Guide to Bengali Books (Catalogue) এ নানাবিধ পুস্তকের বিস্তৃত সন্ধান পাইবেন। প্রত্যেক শিক্ষিত গৃহের ও লাইব্রেরীর অপরিহার্য। ডাকব্যয় সহ মূল্য ।৵০ অগ্রিম M. O.তে প্রেরিতব্য। এতদ্ব্যতীত মফঃস্বলবাসীদের যাবতীয় পুস্তক মূল্যের অর্ধাংশ দিলেই ভিঃ পিঃতে সরবরাহ করা হয়। ডাকব্যয় স্বতন্ত্র। কৃষ্টি পাব্লিসিটি সোসাইটি অব্ ইণ্ডিয়া, ১৪৬, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা—৯।

গভর্ণমেণ্ট রেজিষ্টার্ড একমাত্র বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠান

**(মধ্যপ্রদেশ ও বেরারে হিন্দীতে প্রাচীনতম)**

সর্বসাধারণের সুবিধার জন্য ন্যূনতম প্রবেশমূল্যে

## ১২,০০০৲ টাকা প্রাপ্তির সুবর্ণ সুযোগ।

গভঃ রেজিঃ নং ২১৭ প্রতিযোগিতা নং সি/৯/ডি

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ, জব্বলপুরে সুরক্ষিত আমাদের শীলমোহর করা সমাধানের সহিত যে সকল সমাধানকারীর সমাধান মিলিয়া যাইবে তাঁহাদিগকে প্রথম পুরস্কার ৮৪০০৲ টাকা; যাঁহাদের মধ্য সমকোণ (Cross Row) কর্তন পংক্তি (Line) মিলিয়া যাইবে তাঁহাদিগকে দ্বিতীয় পুরস্কার ২৪০০ টাকা; এবং যিনি প্রতিযোগিতায় সবচেয়ে বেশী সংখ্যায় প্রবেশপত্র পাঠাইবেন, তাঁহাকে তৃতীয় পুরস্কার ১২০০৲ টাকা দেওয়া হইবে। সমাধান আমাদের অফিসে বন্ধ হইবার সময় ৭-৫-৪৯, সমাধানের ফল ১৪-৫-৪৯ তারিখে "দেশ" পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।
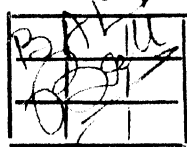
**সমাধান করিবার রীতিঃ**—প্রদত্ত চতুষ্কোণে ৯ হইতে ৩৩ পর্যন্ত সংখ্যাগুলির মধ্যে যে কোন সংখ্যা ইচ্ছামত এরূপভাবে সাজাইতে হইবে, যাহাতে প্রত্যেকটি খাড়া (Row) পংক্তি, আড়া (Column) পংক্তি এবং কোণাকোণি যোগফল ৬৩ হইবে। কোন সংখ্যাই একবারের বেশী ব্যবহার করা যাইবে না।

**প্রবেশমূল্যঃ**—একটি সমাধানের জন্য বার আনা এবং তাহার সহিত এক নামে দেওয়া বাকী সমাধানগুলির প্রত্যেকটির জন্য আট আনা মাত্র।

**নিয়মাবলীঃ**—সাদা কাগজে লিখিয়া প্রতিযোগিতার নম্বরযুক্ত যতগুলি সমাধান ইচ্ছা ততগুলি উপরোক্ত হারে মনিঅর্ডারের রসিদসহ পাঠাইতে হইবে। প্রবেশমূল্য মনিঅর্ডারযোগে অথবা আমাদের অফিসে নগদ গৃহীত হইবে। একত্রীকৃত টাকার পরিমাণ কম হইলে পুরস্কারের হারের তারতম্য হইবে। প্রতিযোগিতায় ম্যানেজারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত ও আইনসঙ্গত বলিয়া গণ্য করা হইবে। উপযুক্ত টিকিট পাঠাইলে পুরস্কৃত সমাধানকারীর নাম এবং ন্যায্য বিষয়ে চিঠিপত্রের উত্তর দেওয়া হইবে। আপনার নাম, ঠিকানা ও সমাধানের সংখ্যাগুলি বাংলা, হিন্দী অথবা ইংরাজীতে লিখিবেন। নিম্নঠিকানায় প্রবেশমূল্য ও সমাধান পাঠাইবেন।

সি/৮/ডি সমাধানের ফল

৪৯

| ১৭ | ১৮ | ৭ |
|---|---|---|
| ৪ | ১৪ | ২৪ |
| ২১ | ১০ | ১১ |

এম্, সি, বোনাফিট্ ব্যুরো (ইণ্ডিয়া)

আম্বেরদেউ (মসজিদের পাশের গলি)।

জব্বলপুর, সি, পি।

# মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র

### শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন শাস্ত্রী

বাঙ্গালার মঙ্গল কাব্যে "চণ্ডীমঙ্গল-রচয়িতা কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম এবং অন্নদামঙ্গল"-রচয়িতা গুণাকর ভারতচন্দ্রের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি খুব বেশী। সে কালের চন্দ্রসমাজে চণ্ডীমঙ্গল এবং রসিক সমাজে অন্নদামঙ্গল, বিশেষতঃ বিদ্যাসুন্দরের স্থান খুব উচ্চে ছিল। ফোর্ট উইলিয়মের সিভিলিয়ানরা কিছুদিন ভারতচন্দ্র পড়িয়াছে—বাঙ্গালীর বিদ্যালয়ে উহা চলে নাই। গত পঞ্চাশ বৎসর ইংরাজী শিক্ষার সুরুচিগ্রস্ত বাঙ্গালীর নিকট উহারা একপ্রকার অস্পৃশ্য হইয়াই পড়িয়াছিল, সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়া ইহাদের মর্যাদা আবার হঠাৎ বাড়িয়া গিয়াছে।

বাঙ্গালার মনীষীরা কিন্তু কখনও ইঁহাদের বিষয় অনবহিত ছিলেন না। বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশ-চন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র—সকলেই চণ্ডীমঙ্গলের অশেষ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। ভারতচন্দ্র ইঁহাদের নিকট আদরের, তবে কবি ও কাব্য হিসাবে মুকুন্দরাম ও "চণ্ডীমঙ্গলের" স্থানই ঊর্ধ্বে। পঞ্চমে সুর ধরিতে পারেন নাই বলিয়া, কেবল সেই অপরাধেই ভারতচন্দ্রের নিকট মুকুন্দরাম হারিয়া গিয়াছেন, এই মন্তব্যও করিতে বঙ্কিমচন্দ্র ছাড়েন নাই। সত্যই বিচারে যে মুকুন্দরামই বড়, তাঁহার কাব্য যে বাঙ্গালার মহাকাব্য এবং তিনি মহাকবি, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। চরিত্র-চিত্রণে তিনি যে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন, তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যে সুলভ নহে। মহত্ত্বে বেহুলা ও চাঁদ সওদাগরের চরিত্র অতিশয় উচ্চাঙ্গের হইলেও ফুল্লরা ও ভাড়ু-দত্তের মত জীবন্ত চরিত্র বাঙলার প্রাচীন সাহিত্যে আর নাই—অবশ্য "পূর্ববঙ্গ গীতিকা" বা "ময়মনসিংহ গীতিকা"র বহু চরিত্রও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। কালকেতুর চরিত্র এবং খুল্লনা, লহনা ও শ্রীপতির চিত্র ইহার পরের স্তরের। অনেক সময় মনে হয়, ফুল্লরা ও ভাড়ুদত্ত কবির পরিচিত, কবি তাহাদিগকে সৃষ্টি করেন নাই, বিধাতার সৃষ্টি হইতে বাছিয়া লইয়াছেন। কালকেতু কবির আধা জানা, আধা অজানা। বাকিগুলি জীবন্ত চরিত্র নহে, জীবন্ত চিত্র মাত্র। ভারতচন্দ্রের কাব্য আগাগোড়াই এই জীবন্ত চিত্র মাত্র, দুই একটি ক্ষুদ্র চরিত্র বাদে তাহার মধ্যে চরিত্রের বালাই নাই। চিত্রের জন্যও তিনি মুকুন্দরামের নিকট ঋণী। অবশ্য পরের নিকট ঋণ গ্রহণ করা সাহিত্য ক্ষেত্রে কৌলিন্যের হানিকর নহে, তাহা হইলে স্বয়ং সেক্সপীয়র ও কালিদাসও অপাংক্তেয় হইয়া যাইতেন। মৌলিকতা মাত্রই প্রশংসার নহে। অযোগ্য রচনায় মৌলিকতার সাহিত্যের কোন উৎকর্ষই সাধিত হয় না। মৌলিকতা না থাকিলে ভারতচন্দ্র একজন শ্রেষ্ঠ কবি এবং উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গ সাহিত্যে তিনি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। স্বীকার করিতেই হইবে যে, সংস্কৃতের শব্দ সামগ্রীর ভাণ্ডার লুণ্ঠন না করিলে এবং দুচারখানা অলঙ্কার সংস্কৃতের নিকট চাহিয়া না পাইলে বাঙলা সাহিত্যের আজ যে ঐশ্বর্য দেখিতেছি, তাহা সম্ভব হইত না। ঈশ্বর গুপ্ত হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত হিসাব করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে বঙ্গবাণীর মন্দির আমরা বিদেশী প্রচুর আসবাবপত্রে সাজাইয়াছি বটে, কিন্তু তাহার ইমারত প্রধানতঃ সংস্কৃতের মসলা দিয়াই প্রস্তুত। চণ্ডীদাসের প্রাচীন পুঁথিতে যে বানান ও ভাষা দেখা যায়, তাহা অবলম্বন করিয়া সাহিত্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে, সেই গুণেই যে সকলে চণ্ডীদাসের কৃতিত্ব অর্জন করিতে পারিতেন, তাহা নহে। সংস্কৃতের শব্দ, অলঙ্কার ছন্দ—দুহাতে লুঠ করিয়া ভারতচন্দ্র বঙ্গবাণীর ভাণ্ডারে রাখিয়াছেন। শতাব্দী পরে রামমোহন, মৃত্যুঞ্জয়, বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার গদ্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে ভারতচন্দ্রের পদ্ধতিই অবলম্বন করিয়াছেন, মধুসূদন একটু বেশী দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। আহৃত ঐশ্বর্যে বঙ্কিমচন্দ্রও বঙ্গ সাহিত্যের সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন।

কবিকঙ্কনের চণ্ডীমঙ্গলে ব্যাধের আলয়ে নাগরিকদের টানিয়া আনিয়াছেন, ভারতচন্দ্রের অন্নদা, হরি হোড়ের পল্লীনিলয় ছাড়িয়া নগরে রাজপ্রাসাদে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ভারতের ভারতীও অন্নদার সহিত পল্লী ছাড়িয়া নগরে আসিয়াছেন। বঙ্গভারতীকে ভারতচন্দ্রই প্রথম নাগরিকা করিয়া তুলিয়াছেন। ইহার কারণও ছিল,—মুকুন্দরামও অবশ্য আড়রার ভূস্বামী রঘুনাথ রায়ের আশ্রিত ছিলেন, কিন্তু তাহা পণ্ডিত মণ্ডিত নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দরবার নহে। মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রের শ্রোতা এক ছিল না। মুকুন্দরাম সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত সুপরিচিত পণ্ডিত বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু বিদ্যাপতি ও ভারতচন্দ্রের মত তাহার পাণ্ডিত্যের পাকা দলিল নাই। আমরা বিদ্যাপতি ও ভারতচন্দ্রের সংস্কৃত রচনা পাইয়াছি, মুকুন্দ-রাম বা চণ্ডীদাসের পাই নাই। ফলতঃ বৈষ্ণব গীতি কাব্যে চণ্ডীদাসের যে স্থান, মঙ্গল কাব্যে মুকুন্দরাম সেই [illegible] অধিকারী, গীতি কাব্যকার বিদ্যাপতির পার্শ্বে মঙ্গল-কাব্যকার ভারতচন্দ্রের স্থান। ভারতচন্দ্রের আর একটা দান স্মরণীয়। সংস্কৃত দশরূপক প্রভৃতি গ্রন্থে নায়ক-নায়িকাদের এবং [illegible] নানা জাতীয় পুরুষ ও রমণীর লক্ষণ আছে,—এই সকল সাহিত্য শাস্ত্রের অঙ্গ। ভানু ভট্ট প্রণীত সংস্কৃত রসমঞ্জরীর অনুকরণে রসমঞ্জরী রচনা করিয়া ভারতচন্দ্র বাঙলা ভাষায় সাহিত্য শাস্ত্রে আলোচনার সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন। শব্দসম্পদে সমৃদ্ধ উজ্জ্বল চিত্রশোভিত মসৃণ রচনায় ভারতচন্দ্রের তুলনা নাই, বঙ্গ সাহিত্যের ভাণ্ডারে তাহার দানও অসাধারণ।

মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে আর একটা কথা প্রায় শুনিতে পাওয়া যায়—মুকুন্দরাম বাঙলার সেক্সপীয়র ও ভারতচন্দ্র বাঙলার পোপ। ভারতচন্দ্র বাঙলার পোপ সন্দেহ নাই, ইংরাজীতে পোপের ও বাঙলায় ভারতচন্দ্রের রচনা হইতে যত বিশিষ্ট বাক্যের সৃষ্টি হইয়া শিষ্ট-সমাজে প্রচলিত হইয়াছে, এমন আর কাহারও নহে। এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প আছে, ভারত-চন্দ্রের জনৈক ভক্ত সকল মজলিশে সকল প্রসঙ্গে ভারতচন্দ্রের কাব্য হইতে এমন সুন্দর সুন্দর কথা তুলিয়া বলিতেন এবং প্রসঙ্গের সহিত তাহা এত সংলগ্ন হইত যে লোকে বিস্ময় বোধ করিত। ভদ্রলোকের বিদ্যা ছিল এই ভারতচন্দ্র পর্যন্ত। একদিন কয়েকজন লোক তাহাকে জব্দ করিবার জন্য দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ, ইহাদের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ তাহা নিয়া আলোচনা আরম্ভ করিলেন। ভারতের ভক্ত হার মানিলেন না, তিনি বলিয়া উঠিলেন, "এক ভস্ম ছাই আর, দোষ-গুণ কই কার, আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল।" অর্থাৎ দ্বৈতবাদ বা অদ্বৈতবাদ কোনটাই কিছু না, আমিত্বের অবসান না হইলে মুক্তির সম্ভাবনা নাই। বলা বাহুল্য, ভারতচন্দ্রের ভক্তই দার্শনিক বিচারের এক কথায় মীমাংসা করিয়া দিলেন। ভারতচন্দ্রের এমনই একটা প্রতিপত্তি এককালে ছিল।

চরিত্র সৃষ্টির নৈপুণ্যের দিক দিয়া সেক্সপীয়রের সহিত মুকুন্দরামের তুলনা করিলে তাহার বিরুদ্ধে বলিবার বিশেষ কিছুই নাই, তথাপি সত্যের অনুরোধে বলিতে হয়, মুকুন্দরামের কাব্যে তত চরিত্রই বা কোথায়, তেমন বৈচিত্র্যই বা কোথায়? দ্বিতীয় মুকুন্দ-রামের ন্যায় সেক্সপীয়র সম্বন্ধে মনে হয়—তাঁহার নাটকের অনেক উজ্জ্বল চরিত্র নিজের সৃষ্টি নহে, বিধাতার সৃষ্টি হইতে বাছাই করিয়া লওয়া। ফুল্লরা মুকুন্দরামের বিয়াত্রিচে কিনা, তাহাও নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। কিন্তু সেক্সপীয়রের সহিত মুকুন্দরামের তুলনার মধ্যে একটু বাড়াবাড়ি আছে। মুকুন্দরামের কতগুলি রচনা কথকদের কথার ন্যায় ছাঁচে ঢালা—বন-বর্ণনা, বন্যা বর্ণনা প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত। সন্ধ্যা, রাত্রি, প্রভাত, রাজসভা, বন, শ্মশান মানব [illegible] ইত্যাদির বর্ণনার জন্য [illegible]

ল বাঁধা গৎ থাকিত, যখনই প্রয়োজন তখনই সেগুলি আওড়াইয়া যাইতেন। না করিতে গেলেই প্রায় একসংগেই র সকল ঋতুর সকল প্রকারের ফুল-ফল ত পাওয়া যায়। অথচ মুকুন্দরামের ভারতচন্দ্রের কৈলাসও নহে, কালিদাসের নাক অলকাও নহে। বন-বর্ণনায় একটা শরভও চাই। শরভ পুরান প্রসিদ্ধ দবিশিষ্ট জন্তু, তাহা সিংহকেও বধ করে। একেন্দ্রনাথ ঘোষ তাঁহার "বৈদিক ত্য প্রাণীর কথা" নামক বিস্তৃত প্রবন্ধে ং একপ্রকার কাল্পনিক প্রাণী বলিয়াছেন। তই যদি ঐরূপ কোন প্রাণী স্বীকার ত হয়, তাহা হইলে ইহা একপ্রকার বিষাক্ত সা ছাড়া কিছু নহে। মুকুন্দরাম কোন্‌ ল কিরূপ শরভ দেখিয়াছিলেন, বলিবার নাই। তবে যেহেতু মহাভারত প্রভৃতিতে উল্লেখ আছে, অতএব বন-বর্ণনায় একটা অবশ্য চাই। কবির কালকেতু ব্যাধপুত্র, তাহার বিবাহের সময় "ব্রাহ্মণ বসিয়া , বেদমন্ত্র পড়ি ঘটে, গণেশ করিল হন"—বস্তুত কালকেতুর বিবাহে বৈদিক পাঠ ও বৈদিক আচারের এত বেশি বর যে, ধনপতি সওদাগরের বিবাহেও হয় নাই। লহনা খুল্লনাকে "না যাই-হ র নিকটে" বলিয়া যেভাবে উপদেশ হে, তাহা পড়িলে লহনার প্রতি করুণার র হয়। ইহা অপেক্ষা ভবানন্দের পদ্মমুখী ন্দ্রমুখী অনেক স্পষ্ট, অনেক স্বাভাবিক। য ভারতচন্দ্রের নায়িকারা উভয়েই রূঢ়-না, প্রৌঢ়া। মুকুন্দরামের একটি নায়িকা -যৌবনা, অন্যটি প্রৌঢ়া। এইরূপ বহু হরণ দিয়াই বুঝান যায় যে, মুকুন্দরাম ন বিষয়ে সাবধান নহেন, সেক্সপীয়র বা নদাসের সহিত তাঁহার তুলনা বিড়ম্বনা মাত্র। তচন্দ্র নকলনবীশ হইতে পারেন, তবে ন্দরাম অপেক্ষা সাবধান।

মুকুন্দরাম সংস্কৃত সাহিত্য হইতে ঋণ ন নাই, তাহা নহে। বহু উদাহরণের াজন নাই, একটিমাত্র দৃষ্টান্ত দিতেছি। দ দেবীর বর্ণনায় তিনি লিখিয়াছেন:

"গালে সিন্দুর বিন্দু, নব-অরবিন্দ বন্ধু
তার কোলে চন্দনের বিন্দু।
য়া তিমির মেলা, ধরিয়া কুন্তল ছলা
ব-ী করিল রবি-ইন্দু॥"

সুন্দর বর্ণনা। এখন শংকরাচার্যের "আনন্দ-রী" হইতে ইহার অনুরূপ অথবা আদর্শ াকটি উদ্ধৃত করিতেছি:

"হন্তী সিন্দুরং প্রবল কবরী ভার তিমির
দ্বিষাং বৃন্দৈর্বন্দীকৃতমিব নবীনার্ক কিরণম্‌।
তনোতু ক্ষেমং নস্তব বদন সৌন্দর্য লহরী
পরিবাহস্রোতঃ সরণিরিব সীমন্ত সরণিঃ॥"

ভাব এই—তোমার সীমন্তে নবোদ্ভিন্ন র্ষকিরণের ন্যায় উজ্জ্বল সিন্দুরবিন্দু, কুন্তলভার রূপ প্রবল শত্রুসমূহ দুইপার্শ্বে থাকিয়া যেন সেই নবোদিত সূর্যকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে। মনে হইতেছে তোমার মুখে সৌন্দর্য উচ্ছ্বসিত ও তরঙ্গিত হইয়া উঠিয়াছে, মুখে আর তাহা ধরিতেছে না—সীমন্তরূপ সঙ্কীর্ণ পথে তাহা ঝরিয়া পড়িতেছে।

ভাবে, ভাষায়, সৌন্দর্যে গাম্ভীর্যে এক উদার অলৌকিকরূপে শঙ্কর দেবীমূর্তি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন,—মুকুন্দরামের লেখনী-স্পর্শে সেই দেবী সুন্দরী মানবীতে পরিণত হইয়াছেন। কৃত্রিমতাদুষ্ট হইলেও ভারতচন্দ্রের বাণী কারুনৈপুণ্যমার্জিত লেখনী সমধিক শক্তি-সম্পন্ন।

মুকুন্দরাম সম্বন্ধে আর একটি প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া বক্তব্যের উপসংহার করিব। মুকুন্দরামের উপাস্য দেবতা কে? কেহ বলেন তিনি পঞ্চোপাসক। হিন্দুমাত্রকেই তো পঞ্চো-পাসক বলা যাইতে পারে। হিন্দু তীর্থ আবাহন করিবার সময়ে যেমন গঙ্গা-যমুনা-গোদাবরী-সরস্বতী-নর্মদা-সিন্ধু-কাবেরীকে আবাহন করেন, অধিকাংশ পূজার সময়েই তেমনই ভারতের বিভিন্ন অংশে অবস্থিত গাণপত্য সৌর শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতার উদ্দেশ্যে সগন্ধ কুসুম নিবেদন করেন। তীর্থ-আবাহনের মত ইহাও নিখিল ভারতের একটা ঐক্যসূত্র। কেহ বলেন, মুকুন্দরাম বৈষ্ণব, কাহারও মতে তিনি শাক্ত। মনে হয়, সকল মতই কিছু সত্য কিছু মিথ্যা। মুকুন্দরাম যত গ্রামে, যত পীঠস্থানে যত দেবদেবী আছেন, সকলেরই বন্দনা করিয়াছেন। তাঁহার বন্দনা দেখিয়া মনে হয়, পাছে কেহ বাদ পড়িয়া রাগ করেন, এ আশঙ্কায় তিনি সন্ত্রস্ত। বৌদ্ধ-দের দেবতা ধর্মঠাকুর, আদিদেব নিরঞ্জনও বাদ যান নাই। তবে তিনি কাহার উপাসক? এই রহস্যমন্দির উদ্ঘাটনের একটা কৌশল আছে। চণ্ডীর নিকট প্রার্থনায় তাঁহার স্বরূপ সম্বন্ধে কবি বলিয়াছেন:—

"অমর কুলের দর্পে, দেবকী অষ্টম গর্ভে
হৈলা প্রভু ক্ষিতিভার নাশে।
হরিতে হরির ভীতি, যোগনিদ্রা ভগবতী,
থুইলা যশোদা গর্ভবাসে।
ভোজরাজ মহাতঙ্কে, শ্রীহরি করিয়া অঙ্কে
বসুদেব গেলা নন্দাগার
অগাধ যমুনাতল, করি মায়া কৈল স্থল,
শিবারূপে নন্দী হৈলা পার।
হরিতে অবনীভার, কৃপাময় অবতার,
যদু কুলে হৈলা নারায়ণ।
হইলা নন্দের সুতা, কি কব সে সব কথা,
চক্রবর্তী শ্রীকবিকঙ্কণ॥"

কৌতূহলী পাঠক আগাগোড়া চণ্ডীমঙ্গল পড়িয়া দেখিতে —সুন্‌, কবি অন্যূন ৫০।৬০ বার নানা প্রসংগে চণ্ডীর কথা বলিয়াছেন, কিন্তু এমন একটি স্থানও নাই যেখানে চণ্ডীর কথা বলিতে গিয়া নন্দগৃহে অবতীর্ণা এই যোগমায়ার কথা বলা না হইয়াছে। এই যোগমায়ার সম্বন্ধে হরিবংশে বলা হইয়াছে:—

"বিদ্ধি চৈনা মথোৎপন্নামংশাদ্দেবীং প্রজাপতেঃ।
একানংশাং যোগকন্যাং রক্ষার্থং কেশবস্য তু॥"
বিষ্ণু পর্ব, ৪।৪৭

ইঁহাকে কেশবের রক্ষার্থ প্রজাপতির অংশে উৎপন্না একানংশা-যোগ্যকন্যা বলিয়া জানিবে।'

নীলকণ্ঠ ইহার টীকায় বলিয়াছেন, "একা-চাসো অনংশেতি, একানংশা, ভগবতা একা সতী অবিভক্তা"। এই দেবী একা অথচ অনংশা, ভগবান্‌ বিষ্ণুর সহিত ইনি এক অন্বয়ভাবে মিলিতা। এই দেবীর সম্বন্ধে প্রতিমা-লক্ষণে বরাহমিহির বলিয়াছেন:—

"একানংশা কার্যা দেবী বলদেব কৃষ্ণয়োর্মধ্যে
কটি সংস্থিত বাম করা সরোজমিতরেণ
চোদ্বহন্তী॥"
—বৃহৎ সংহিতা ৫৮।৩৭

অর্থাৎ বলরাম ও কৃষ্ণের মধ্যে একানংশার প্রতিমা নির্মাণ করিবে। ইহার বামহস্ত কটি-দেশে সংস্থিত ও ডান হাতে একটি পদ্ম।

পুরীধামের সুভদ্রাই যে এই একানংশা, ইহা সহজে বুঝিতে পারা গেল। মুকুন্দরাম এই একানংশার উপাসক তান্ত্রিক, একাধারে শাক্ত ও বৈষ্ণব। ইনি বাসুলীর উপাসক চণ্ডীদাসেরই সগোত্র। মুকুন্দরামের গৃহে বিষ্ণুবিগ্রহ বা শক্তিবিগ্রহ যাহাই পূজিত হউন না কেন, তিনি বিষ্ণু নামে বৈষ্ণব শাস্ত্রে, অথবা চণ্ডী নামে শাক্ত শাস্ত্রে—যাহাতেই আসক্তি দেখান না কেন, তাহাতে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। তান্ত্রিকের আচার সম্বন্ধে তন্ত্রসারে কুলচূড়ামণি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে:—

"উদারচিত্তঃ সর্বত্র বৈষ্ণবাচারতৎপরঃ।
পরানিন্দাসহিষ্ণুঃ স্যাদুপকাররতঃ সদা।"

অর্থাৎ তান্ত্রিক উদারচিত্ত ও বৈষ্ণবাচার-সম্পন্ন হইবেন। তিনি পরনিন্দা সহ্য করিবেন ও পরের উপকারে রত থাকিবেন।

গোতমীয় তন্ত্রে তান্ত্রিকের ধারণা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে:—

"দিক্‌কালাদ্যনবচ্ছিন্নে কৃষ্ণে চেতো বিধায় চ।
তন্ময়ো ভবতি ক্ষিপ্রং জীবব্রহ্মৈক্য যোজনাৎ॥"

অর্থাৎ দিক্‌ ও কাল প্রভৃতি দ্বারা অনবচ্ছিন্ন শ্রীকৃষ্ণে চিত্ত স্থির করিয়া, জীব ও ব্রহ্মের যোগসাধন করিয়া সাধক শীঘ্র তন্ময়তা লাভ করেন।

ইহার পর মুকুন্দরামের তান্ত্রিকতা সম্বন্ধে ভুল হইবার কারণ নাই। আরও একটা কথা মনে রাখা উচিত,—শৈব তীর্থ কাশীর তীর্থাধিপতি আদিকেশব, বৈষ্ণব তীর্থ বৃন্দাবনের তীর্থাধি-পতি শিব। ভারতচন্দ্রও হরি ও হরের অভিন্নতা কীর্তন করিয়া গিয়াছেন। অন্নদার ভক্ত যে শিব ও বিষ্ণুর ভক্তও হইতে পারেন তাহাও তিনি মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন। মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি কাব্যের মধ্যে ধর্মের সমন্বয়ও ঘোষণা করিয়াছেন, ইহা বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে।

### দর্শকদের বয়স সমস্যা

গত ৯ই এপ্রিল ভারতীয় পার্লামেণ্টে ভারতীয় চলচ্চিত্র আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন প্রস্তাব পাশ হয়েছে। এ আইনে অতঃপর ১৮ বছরের নিম্ন বয়স্কদের ছবি দেখা নিয়ন্ত্রিত হয়ে যাবে। সব ছবি সকলের জন্যে নয় কিন্তু বাছবিচার না করেই ছেলেরা সবরকম ছবি দেখে যাওয়ায় তারা অকালপক্ক হয়ে উঠছে এবং তাদের মধ্যে নানা রকম দুর্নীতিরও প্রসার লাভ করছে। কিন্তু ভারতীয় আইনের এমন কোন ক্ষমতা এতদিন ছিল না যার বলেতে ছেলেদের সব ছবি দেখা থেকে নিবৃত্ত করা যেতো। এখন এই সংশোধন আইনের পর বড়দের দেখার উপযোগী এবং ছোটদের দেখার উপযোগী বিচারে সেন্সর হবার সময় প্রত্যেক ছবিতে যথাক্রমে এ ও ইউ মার্কা করে দেওয়া হবে। এ মার্কা ছবিতে ছোটদের ঢুকতে দেওয়া হবে না আর ইউ মার্কা ছবি হবে সর্বজনের জন্যে।

একথা স্বীকার করতে হবে যে এরকম একটা আইনের প্রয়োজন ছিলো খুবই। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে বয়স নির্ধারণ নিয়ে—সে ভারটা থাকবে কার ওপরে আর তার ফয়েসলাই বা হবে কি উপায়ে? এ নিয়ে সিনেমা ম্যানেজারদের প্রতি প্রদর্শনীতেই যে কি পরিমাণ ঝামেলার সামনে পড়তে হবে তা সহজেই অনুমেয়—তর্ক বিতর্ক যে প্রতিদিনই দাঙ্গার সৃষ্টি করতে পারে এ সম্ভাবনাকেও অস্বীকার করা যায় না। এ বিষয়ে কোন্ উপায় অবলম্বন করলে শান্তি বজায় রাখা সম্ভব হতে পারে?

বৃটেনে যে নিয়ম আছে তাতে নাবালকরা কোন পরিণত বয়স্ক অভিভাবক সংগে থাকলে এ মার্কা ছবি দেখবার ছাড়পত্র পায়। ওখানকার ছেলেরা তাই একা অবস্থায় কোন এ মার্কা ছবি দেখার ইচ্ছে করলে সিনেমার সামনে ঘোরাফেরা করে এবং কোন পরিণত বয়স্ককে জপিয়ে তার সংগে সিনেমায় ঢুকে পড়ে—এ খবরও পাওয়া যায়। আমাদের এখানে সে ভয়টা আদপেই নেই; কারণ আমাদের নিয়মে অভিভাবক সংগে থাক আর নাই থাক ৩ বছর থেকে ১৮ বছর বয়স হলেই এ ছবিতে তার আর প্রবেশ করবার কোন উপায় নেই। আরও একটা সমস্যা রয়েছে। ৮।১০ বছর থেকে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত অপ্রাপ্তবয়স্কদের আইনমত এ মার্কা ছবি থেকে নিবৃত্ত করা, ধরা যাক, হয়তো সম্ভব হলো। বাপ-মারাও ওদের ফেলে রেখে ছবি দেখতে যেতে পারেন। কিন্তু ৩ থেকে ৮ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদেরও কি ফেলে যাওয়া চলবে? বাপ-মা বা অভিভাবকদের অনুপস্থিতিকালে ওরা যাবেই বা কোথায় আর থাকবেই বা কার কাছে? বড় পরিবার হলে হয়তো তা সম্ভব, কিন্তু একক পরিবারগুলি কি করবে? —স্বামী-স্ত্রী এবং একটি বা দুটি নাবালক নিয়ে যাদের পরিবার সেই স্বামী বা স্ত্রীকে সিনেমা দেখা তো তা'হলে একেবারেই বন্ধ করে দিতে হয়। শিশুকে ঘুম পাড়িয়ে ফ্ল্যাটে চাবি দিয়ে সিনেমা দেখে আসার পর শিশুকে দুর্ঘটনার মধ্যে পেয়েছে এমন অনেক ঘটনা ওদেশ থেকে পাওয়া যায়। ছেলেমেয়েদের একা ফেলে যাওয়ার জন্যে তারা কুসংসর্গ ও উচ্ছৃংখলতার শীকার হয়ে পড়ে এ নজীরও ওদেশ থেকে বড় কম পাওয়া যায় না।

সর্বদিক তাহলে বাঁচিয়ে চলা যায় কি করে? সকলে অথবা বেশীর ভাগ প্রযোজকই ইউ শ্রেণীর ছবি তুলবে সেটা আশা করা যায় না। তাছাড়া যদিইবা প্রযোজকরা কেবল মাত্র ইউ শ্রেণীর ছবি তোলার দিকেই ঝোঁক দেয় কিন্তু তাদের তোলা ছবি সেন্সরের বিচারে যে ইউ মার্কা পাবার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেই তারই বা কোনো নিশ্চিত নির্দেশ কোথায়? হয়তো একথার সংগে আপনি প্রাক্‌নির্মাণ গল্প পরীক্ষার কথা এসে পড়বে। সেও কী কম ঝামেলার কথা, না ও ব্যবস্থাতে ছবি তোলা সম্ভব হতে পারে?

মোট কথা, ছবিকে মার্কা করে দেবার আইন সর্বদিক মিলিয়ে একটা বিশ্রী জটিল অবস্থার আমদানী করে ফেলেছে। উদ্ধার পাবার কোন রাস্তা পাওয়া যায় তো ভালই, নয়তো শেষ-পর্যন্ত কিসের সামনে গিয়ে যে দাঁড়াতে হবে বলা শক্ত।

### পাকিস্তানে ভারতীয় পতাকা ছাড়পত্র পাবে কি?

এলোমেলো বাতাস থেকে কুড়নো একটা খবর থেকে শোনা গেলো যে, গত সপ্তাহে পণ্ডিত নেহরু কর্তৃক ভারতীয় পার্লামেণ্টে এক বিতর্কের সময় পূর্ব পাকিস্তানের সেন্সর বোর্ড কর্তৃক ছবিতে ভারতীয় পতাকায় আপত্তির কথা উল্লেখ করার পর করাচীর বড়-কর্তারা নাকি পূর্ব পাকিস্তানের কর্তাদের ধমকে দিয়েছেন এবং নির্দেশ দিয়েছেন যেন তারা ভবিষ্যতে আর এরকম ছেলেমানুষী না করেন। খবরটা সত্যি হলে আনন্দের কথা এবং পূর্ব পাকিস্তান আর এক স্টেটের জাতীয় পতাকার প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করে আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করার যে অপরাধ করে যাচ্ছিলো তা রোধ হবে। শুধু তাই নয়, এর দ্বারা দুই বাঙলার সৌহার্দ্যও বাড়বে অনেক পরিমাণে। জনশ্রুতি [illegible] ভারতীয় ছবি থেকে ভারতীয় পতাকা বা জাত[illegible] ধ্বনি, অথবা বাঙলা ছবি থেকে [illegible]চন্দ্রের মতো মনীষীদের প্রতিকৃতি বাদ দেওয়ার পিছনে পূর্ব পাকিস্তানের কোন নির্ধারিত নীতি বা আদর্শের দোহাই নেই। ওটা নাকি সম্পূর্ণরূপে কর্তাব্যক্তিদের মধ্যে সমঝোতার অভাবের ফল। শোনা যায় পূর্ব পাকিস্তানে এমন কজন আছেন যারা সেন্সর বোর্ডের সভ্য হবার দাবী করেন এবং সেন্সর বোর্ডের নির্দেশকে বাতিল করারও ক্ষমতা তাদের আছে। তাই সভ্য হবার তাদের দাবী না পূরণ হওয়ায় তারা তাদের ওপর কর্তামির জোরে সেন্সর বোর্ডের ধার না ঘেষে নিজেরাই নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছেন। কোন খবরটাই অবশ্য সঠিকভাবে জানা যায়নি। তবে অপ্রীতিকর প্রতিবন্ধক যতই দূর হয় দু'রাষ্ট্রের পক্ষে ততই মংগল।

### টিকিটের জন্য সারি দেওয়ার অপরাধ

সিনেমার টিকিট কিনতে সারি দেওয়াটা এখন চালু ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে—ভিড়েতে টিকিট পেতে এ ছাড়া উপায়ও নেই। প্রায় সব সিনেমার ক্ষেত্রেই সারিটা অবশ্যই গাঁথা হয় সিনেমার বাইরে ফুটপাতের ওপরে, নয়তো কোন সিনেমারই অন্তর্গত এমন জয়গা থাকে না যাতে কয়েকশত লোকের বিরাট সারি সংকুলান হতে পারে। বাধ্য হয়েই সারি দেওয়া হয় সরকারী রাস্তায় এবং তার জন্যে রাস্তার চলাচল ব্যাহত হয় খুবই। রাস্তা আটকানো আইনবিরুদ্ধ কিন্তু এসব ক্ষেত্রে উপায়ই বা কি? তাছাড়া, এই সারি দেওয়ার রেওয়াজ আরম্ভ হয় ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বরে গুণ্ডাদের কাছে ভিতর থেকে টিকিট বিক্রী করা হয় এই অপবাদ দিয়ে জনসাধারণ ক্ষিপ্ত হয়ে যখন কতকগুলি চিত্রগৃহে আগুন লাগিয়ে দেয় এবং প্রভূত ক্ষতি সাধন করে যার ফলে চিত্রগৃহগুলি তার প্রতিবাদে একজোটে দীর্ঘদিন বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়। তারপর সহরের পুলিশ কমিশনারের পরামর্শ মতই তারা চিত্রগৃহের দরজা আবার খোলে এবং তখন থেকেই নীচু শ্রেণীর টিকিট প্রতি প্রদর্শনী আরম্ভ হবার মাত্র আধঘণ্টা আগে থেকে বিক্রী করার নিয়ম করে দেওয়াতেই সারি দেওয়া বাধ্য হয়েই শুরু হয়ে যায়। এই নতুন ব্যবস্থার জন্য চিত্রগৃহগুলিকে টিকিট বিক্রীর জন্যে লোক বাড়াতে হয়, তাছাড়া সারি দেবার রেলিং, আলাদা টিকিট ঘর ইত্যাদি বাবদও কিছু খরচ করতে হয়। পুলিশ কমিশনার কয়েকটি চিত্রগৃহে নিজে ঘুরে এসে নতুন ব্যবস্থার অনুমোদনও করেন। তারপর থেকেই নিয়মিতভাবে প্রত্যেক চিত্রগৃহের সামনেই সারি দেওয়া চলে আসছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় সম্প্রতি উত্তর কলিকাতায় একটি চিত্রগৃহের সামনে সারি দাঁড়িয়ে পথের চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করার অপরাধে উক্ত চিত্রগৃহের ম্যানেজারের নামে পুলিশ থেকে আদালতে এক মামলা রুজু করা হয়। ম্যাজিস্ট্রেট অবশ্য ব্যাপারটা নিতান্তই হাস্যকর বলে প্রত্রপাঠ মামলা ডিসমিস করে ম্যানেজারকে রেহাই দেন। বিস্ময়ের বিষয় হচ্ছে সারি তো দাঁড়ায় কলকাতায় ছেষট্টিটা চিত্রগৃহের সামনের রাস্তাতেই, কিন্তু তার জন্যে পুলিশ বেছে বেছে

কলিকাতায় একটি বিশেষ চিত্রগৃহের জারকেই বা অপরাধী সাব্যস্ত করলে কেন? পছনে আর কোন রহস্য নিশ্চয়ই আছে।

**নিউ এম্পায়ারে নৃত্য-গীতাভিনয়**

গত ১০ই মার্চ নিউ এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে ন্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা পুনরায় ার রায়ের "হ য ব র ল" অভিনয় করেন। সেই অভিনয়ের আরম্ভে রবীন্দ্রনাথের ঙ্গদা" নৃত্যনাট্যের একটি দৃশ্য, আসাম শ লোকনৃত্যগীত ও রবীন্দ্রনাথের টি গানও একটি গানের সঙ্গে নাচ উপলক্ষে দেখানো হয়। গতবারের কার্য-র কিছু পরিবর্তন ঘটেছে দেখলাম। ব র ল" পূর্বের ন্যায় দর্শককে আনন্দ ছে এবং প্রত্যেক অভিনেতা এই নাটকে তাঁদের অভিনয় যথাসম্ভব ভাল করবার চেষ্টা করেছেন। লক্ষণীয় বিষয় হোলো এ'দের বাচনভঙ্গী। রঙ্গমঞ্চে কিভাবে প্রত্যেক কথার উপর জোর দিয়ে, কথার ভাবের সঙ্গে মিলিয়ে, সুউচ্চ কণ্ঠে কথা বলে যেতে হয় এ'দের অভিনয়ের সেই গুণটি আমাদের বিশেষ ভাল লেগেছে। যাত্রা বা আগের দিনের থিয়েটারের অভিনয়ের মত অনাবশ্যক অর্থহীন চীৎকার নয়।

প্রথম অর্ধের কার্যসূচীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো "চিত্রাঙ্গদা" নত্যনাট্যের অংশটি। এতে শ্রীমতী সেবা মিত্র চিত্রাঙ্গদার অংশ গ্রহণ করেন। ভাবে, দেহছন্দের স্বাভাবিক লালিত্যে ও ভঙ্গীর বৈচিত্র্যে তিনি চিত্রাঙ্গদার অভিনয়কে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। তারই সঙ্গে অর্জুনের ভূমিকায় ছিলেন—কেলুদ্-নায়ার। তিনি সুদক্ষ নৃত্যবিদ্—নৃত্যকৌশল তাঁর বিশেষ আয়ত্ত থাকা সত্ত্বেও এই ধরণের নৃত্যনাট্যের অভিনয়ের দিক্ থেকে তাকে তেমন মানায়নি। তিনি গানের কথাকে আর একটু গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে হয়তো তাঁর নৃত্যাভিনয় সর্বাঙ্গসুন্দর হোতো। নৃত্যাভিনয়ে গান ও নাচের সঙ্গে খুবই খাপ খেয়েছিল।

আসাম প্রদেশের লোকনৃত্যের অংশ গ্রহণ করেছিলেন দুটি মেয়ে। দোতারার সুর-ঝঙ্কারে ও আসামী লোক গীতের সঙ্গে এক সহজ ছন্দে নাচলেও—সব মিলিয়ে যে রস-সৃষ্টি করেছিল সেইটিই হোলো লোকনৃত্য-গীতের মর্মকথা।

ই

পৃথিবীর ক্রীড়া ইতিহাসে জাতীয় দলের য়ক শাস্তিমূলক ব্যবস্থাধীনে পড়িয়াছেন কখনই শুনিতে বা দেখিতে পাওয়া যায় সুতরাং ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল ভারতীয় দলের অধিনায়ক লালা াথের উপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন পৃথিবীর ক্রীড়া ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় হইল। ইহা খুব গৌরবের বিষয় নহে। শাস্তিমূলক ব্যবস্থা কেবল যে অমরনাথের ত জীবনের উপর গভীর কালীমা লেপন তাহা নহে, ইহা জাতীয় জীবনকেও ত করিল। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল র সভ্যগণ এই সকল গুরুত্বপূর্ণ কথা স্মরণ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন কি না এই আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। জাতীয় যে সিদ্ধান্তের সহিত জড়িত তাহা কার্যকরী ার পূর্বে বহু বিষয় চিন্তা ও অনুসন্ধান প্রয়োজন আছে। তবে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস কন্ট্রোল বোর্ডের সিদ্ধান্তের পরিসমাপ্তি নেই হইবে না ইহা লইয়া বহু আলাপ-াচনা হইবে।

**বোর্ডের অভিযোগ**

অধিনায়ক অমরনাথের উপর শাস্তিমূলক া অবলম্বনের সময় বোর্ডে যে সকল বিষয় াচনা হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় (১) নাথ নাকি ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ভ্রমণের সময় বার অসদাচরণ করিয়াছেন, (২) এমন কি শৃঙ্খলাভঙ্গকারী কার্যকলাপ করিয়াছেন, লক্ষ্মৌতে সংবাদপত্রের প্রতিনিধির নিকট র কার্যকলাপ সম্পর্কে বিবৃতি প্রদান াছেন।

উক্ত সকল অভিযোগের সমর্থনে বোর্ডের সম্মুখে তি মহাশয় কি কি বিষয়ে উপস্থিত করিয়া- কি কি ঘটনা তিনি উল্লেখ করিয়াছিলেন, বোর্ডের পক্ষ হইতে বিশদভাবে কিছুই করা হয় নাই। কেবল অধিনায়ক অমরনাথ তর কোন প্রতিনিধিমূলক খেলায় অথবা প্রাদেশিক দলের পক্ষে খেলিতে পারিবেন না সিদ্ধান্ত বোর্ডের সভায় গৃহীত হইয়াছে া প্রকাশ করা হইয়াছে। সেই সঙ্গে বলা ছে যে, উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণ অমরনাথ ট ইণ্ডিজ দলের ভ্রমণের সময় ক্রমাগত ব্যবহার ও শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী কার্য করিয়াছেন।

**অমনাথের লক্ষ্মৌর বিবৃতি**

ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের কার্যকলাপ সম্পর্কে অমরনাথ লক্ষ্মৌতে সংবাদপত্র প্রতিনিধির নিকট যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া বোর্ডের সভায় বলা হইয়াছে তাহা পাঠ করিলে দেখা যায় অমরনাথ "ন্যাশনাল হেরাল্ড" পত্রিকার প্রতিনিধির সহিত কাণপুরে দেখা হইলে বলেন—(১) "বোর্ড সামঞ্জস্যহীন নীতি অনুসরণ করিয়া যথেষ্ট ক্ষতি করিতেছে।

(২) "সর্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয় যে, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও অস্ট্রেলিয়ার মত শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে ভারতীয় খেলোয়াড়গণ দলগত শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া যেরূপ খেলিয়াছেন তাহা বহু কষ্টে অর্জিত হইয়াছে, কিন্তু কতকগুলি বিশিষ্ট পরিচালক নিজ নিজ স্বার্থের জন্য তাহার মধ্যেও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিতেছেন।

(৩) এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "পরে কি ঘটিবে তাহার নিদর্শন আমি পাইয়াছি। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বিরুদ্ধে বোম্বাইতে দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচ খেলিবার ঠিক পূর্ব দিন নেট প্রাকটিশের সময় আমার পায়ে আঘাত লাগে। পরের দিন টেস্ট ম্যাচ খেলা হইবার ঠিক পূর্বে কন্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি মিঃ ডিমেলো আমার ঘরে ঢুকিয়া কেন আমার আহত হইবার সংবাদ ঠিক সময় জানান হয় নাই বলিয়া কটূক্তি করিলেন। আমি ভারতীয় দলের ম্যানেজারকে ঠিক সময় সংবাদ দিয়াছি, উক্ত ম্যানেজার ডাক্তার আনিয়া ঔষধ পত্রের ব্যবস্থা করিয়াছেন এই সকল কথা বলা সত্ত্বেও মিঃ ডিমেলো কোন যুক্তিতেই কাণ দিলেন না। ফলে ভারতীয় খেলোয়াড়দের সম্মুখেই মিঃ ডিমেলোর সহিত আমার [illegible] কিছু বচসা হইয়া গেল। আমি বিরক্ত হই[illegible]াম, কিন্তু তখন চুপচাপ করিয়া থাকা ছাড়া উপায় ছিল না। টেস্ট ম্যাচের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলার সময় আমার পায়ের অবস্থা ভাল হওয়ায় আমি দলের সম্মান রক্ষার জন্য প্রাণপণ খেলি। কিন্তু ঐ সময় হইতেই মিঃ ডিমেলোর সহিত আমার সদ্ভাব থাকে না।"

(৪) অমরনাথ আরও বলেন, "আমি জানিতে পারিয়াছি, পর্দার আড়ালে কি চলিয়াছে। আগামী কমনওয়েলথ ক্রিকেট দলের ভ্রমণের সময় যাহাতে আমি অধিনায়ক না হইতে পারি তাহার চেষ্টা চলিয়াছে।

(৫) এই প্রসঙ্গে অমরনাথ বলেন, "ইতিমধ্যেই তিনজনের নাম অধিনায়কের জন্য উঠিয়াছে। বোম্বাই কে সি ইব্রাহিমের নাম তুলিয়াছেন। মিঃ ডিমেলোর ইচ্ছা বিজয় হাজারে অধিনায়ক হন। তৃতীয় নাম উঠিয়াছে পি ই পালিয়ার। খুব সম্ভব এই অধিনায়কের নাম আগামী আগস্ট মাসে প্রকাশ করা হইবে।"

(৬) অমরনাথ আরও বলেন, "বোর্ডের সভাপতি পদ লইয়া এবার তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইবে। পশ্চিম বাঙলার মিঃ মুখার্জি ও হোলকারের লেঃ কর্ণেল সি কে নাইডু ইহারা দুইজনেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবেন। যদি পশ্চিম বাঙলা ও হোলকার একত্র হন মিঃ ডি মেলোর অবস্থা সঙ্গীন হইবে।"

(৭) ন্যাশনাল হেরাল্ডের প্রতিনিধি জানিতে চান, "মিঃ ডিমেলোর নাম সকল ষড়যন্ত্রের মাঝে কেন উঠে?" ইহার উত্তরে অমরনাথ বলেন, "কর্ণেল সি কে নাইডু ও অধ্যাপক দেওধরকে জিজ্ঞাসা করিলে প্রশ্নের জবাব পাইবেন। তাঁহারা বলিতে পারেন কিভাবে তাঁহাদের বোর্ড হইতে অপসারিত করা হইয়াছে।"

অমরনাথ লক্ষ্মৌতে সংবাদপত্রের প্রতিনিধির নিকট যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা নিছক ব্যক্তিগত ধারণার অভিব্যক্তি। যদি বোর্ডের এই সম্পর্কে কোন অভিযোগ থাকে তাহারা অনায়াসে একটি নিরপেক্ষ অনুসন্ধান কমিটি নিযুক্ত করিতে পারেন। আর এইরূপ কমিটি ইতিপূর্বেও অমরনাথের আচরণ লইয়া ১৯৩৭ সালে বোম্বাইতে গঠিত হয়। ঐ কমিটির সভাপতি ছিলেন স্যার জন বোমণ্ট। ঐ কমিটির তদন্ত রিপোর্টে স্পষ্টই লেখা আছে, "অমরনাথকে দেশে ফেরৎ পাঠান ঠিক হয় নাই। একপক্ষকালের জন্য খেলিতে না দিলেই যথেষ্ট হইত। মহারাজকুমার লঘু দোষে গুরুদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইংলণ্ডে ভারতীয় ক্রিকেট দলের কালিমা লেপন করা হইয়াছে ও ভারতীয়গণকে বৈদেশিক চক্ষে হীন প্রতিপন্ন করা হইয়াছে......ইত্যাদি।

এই ক্ষেত্রেও মনে হয় বোর্ড হঠাৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিয়া নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটির উপর সকল কিছুর ভার দিলে ভাল করিতেন।

## দেশী সংবাদ

৪ঠা এপ্রিল—অদ্য ভারতীয় পার্লামেণ্টে হিন্দু, শিখ, জৈন ও অন্যান্য জাতি বা শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ সংক্রান্ত একটি বে-সরকারী বিল গৃহীত হয়। বিলে বিভিন্ন জাতি বা শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ বৈধ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুত এস কে পাতিল বোম্বাইয়ের মেয়র নির্বাচিত হইয়াছেন।

৫ই এপ্রিল—নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন কমিটির রিপোর্ট গৃহীত হয়। উক্ত রিপোর্টে কয়েক বৎসর ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন স্থগিত রাখিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। কমিটি মনে করেন যে, অন্যান্য প্রদেশ সম্পর্কে বিবেচনার পূর্বে অন্ধ্র প্রদেশের কথা সর্বাগ্রে বিবেচনা করিতে হইবে।

পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের সংক্ষিপ্ত অধিবেশনে প্রাদেশিক ভূমি রাজস্ব বিক্রয় (সংশোধন) বিলটিকে সিলেক্ট কমিটির নিকট প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে পরিষদের বর্তমান বাজেট অধিবেশন পরিসমাপ্ত হয়।

৬ই এপ্রিল—মানভূম লোকসেবক সঙ্ঘের পরিচালক শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ অদ্য পুরুলিয়া হইতে ২৩ মাইল দূরবর্তী মাগুরো নামক এক গ্রামে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিয়াছেন। স্থানীয় অধিবাসীদের মাতৃভাষার উচ্ছেদ সাধনের এবং বাঙলা ভাষাভাষী জনগণের উপর জোর করিয়া হিন্দী ভাষা চাপাইয়া দিবার সরকারী প্রয়াসের বিরুদ্ধেই এই সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইয়াছে।

শ্রী এইচ পি মোদী যুক্তপ্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি বর্তমান মাসের শেষভাগে অথবা মে মাসের প্রথম ভাগে কার্যভার গ্রহণ করিবেন।

সুইজারল্যাণ্ডের হিমালয় অভিযাত্রী দলের ৫ জন সদস্য অদ্য বিমানযোগে কলিকাতায় আগমন করিয়াছেন। অভিযাত্রী দল কয়েকদিন কলিকাতায় অবস্থান করিয়া দার্জিলিং গমন করিবেন এবং সেখান হইতেই অভিযান আরম্ভ হইবে।

অদ্য পূর্বে পাঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ গোপীচাঁদ ভার্গব এবং তাঁহার মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যগণ পদত্যাগ করেন। পূর্ব পাঞ্জাব কংগ্রেস পরিষদ দলের সভায় লালা ভীমসেন সাচার দলপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। গভর্নর লালা ভীমসেন সাচারকে নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করার জন্য আহ্বান করিয়াছেন।

অদ্য মাদ্রাজের নবনিযুক্ত প্রধান মন্ত্রী শ্রীকুমার স্বামী রাজা ও মন্ত্রিসভার অপর ৯ জন সদস্যের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

৭ই এপ্রিল—বিভিন্ন দেশীয় রাজ্য ইউনিয়নের রাজপ্রমুখ এবং প্রধান মন্ত্রিগণ অদ্য নয়াদিল্লীতে ভারত সরকারের দেশীয় রাজ্য দপ্তরের প্রতিনিধিদের সহিত একটি সম্মেলনে মিলিত হন। এই সম্মেলনে দেশীয় রাজ্য ইউনিয়নগুলির শাসনতন্ত্র ভারতের নূতন শাসনতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে পরিণত করার যৌক্তিকতা এবং বিভিন্ন ইউনিয়নের গণপরিষদে এই শাসনতন্ত্র গৃহীত হইবার প্রণালী সম্পর্কে আলোচনা হয়।

ভারতীয় পার্লামেণ্টে অর্থ সচিব কর্তৃক উত্থাপিত কোম্পানীর ডিভিডেণ্ড সংক্রান্ত বিলটি গৃহীত হয়। উহাতে বলা হইয়াছে যে, কোম্পানীসমূহ আদায়ীকৃত মূলধন অথবা ১৯৪৬ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৪৮ সালের ৩১শে মার্চের মধ্যে গড়পড়তা বার্ষিক লভ্যাংশের শতকরা ৬ ভাগ (যাহা বেশী) ডিভিডেণ্ড হিসাবে দিতে পারিবে।

৮ই এপ্রিল—কংগ্রেস সভাপতি ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া বোম্বাইয়ে এক সাংবাদিক বৈঠকে ঘোষণা করেন যে, ১৯৪৯ সালের আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি শাসনতন্ত্র চূড়ান্তভাবে গৃহীত হইলে নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী প্রথম সাধারণ নির্বাচন ১৯৫১ সালের ফেব্রুয়ারীতে অনুষ্ঠিত হইবে।

৯ই এপ্রিল—নয়াদিল্লীতে গণপরিষদ ভবনের পরিষদ কক্ষে প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু রাষ্ট্র সঙ্ঘের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত সহযোগিতা করিবার জন্য গঠিত ভারতীয় জাতীয় কমিশনের প্রথম সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। শিক্ষাসচিব মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন।

অদ্য মধ্য রাত্রে বিশিষ্ট উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ ও লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের ডীন ডাঃ বীরবল সাহানী লক্ষ্ণৌয়ে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৮ বৎসর হইয়াছিল।

মানভূম লোক সেবক সঙ্ঘ ৬ই এপ্রিল হইতে যে সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে এ পর্যন্ত ৭২ জন সত্যাগ্রহী ১৯টি গ্রামে সত্যাগ্রহ করিয়াছেন। সত্যাগ্রহীদের মধ্যে দুইজন মহিলা আছেন। অদ্য সত্যাগ্রহের চতুর্থ দিবস। এ পর্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

**১০ই এপ্রিল**—শনিবার রাত্রি ৩-১৫ মিনিটের সময় বারাণসী ক্যাণ্টনমেণ্ট ষ্টেশন হইতে দুই মাইল দূরে বরুণা পুল অতিক্রম করিবার পর পাঞ্জাব এক্সপ্রেস লাইনচ্যুত হইবার ফলে ১০ জন নিহত ও ৪০ জন আহত হইয়াছে। আহতদের মধ্যে ৭ জনের আঘাত গুরুতর। বারাণসীর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ এই দুর্ঘটনার কারণ বলিয়া সন্দেহ হইতেছে।

নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন হয়। অদ্যকার অধিবেশনে একটি মস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে আলোচনা হয়। প্রজাতন্ত্রে পরিণত হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। উক্ত ঘোষণার সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া কমনওয়েলথের সহিত ভারতবর্ষের কিরূপ সম্বন্ধ থাকা আবশ্যক অদ্যকার অধিবেশনে কেবল এই বিষয়টিই আলোচিত হয়।

## বিদেশী সংবাদ

৩রা এপ্রিল—ব্রহ্মের সরকারী সেনাদল মান্দালয় পুনরায় দখল করিয়াছে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

৪ঠা এপ্রিল—ওয়াশিংটনে ১২টি পাশ্চাত্য রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র সচিবগণ আনুষ্ঠানিকভাবে আটলাণ্টিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়াছেন। এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানে চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্রসমূহ তাহাদের একের উপর আক্রমণকে চুক্তিবদ্ধ সকল রাষ্ট্রের উপর আক্রমণ বলিয়া গণ্য করিবে। দীর্ঘ নয় মাসকাল পারস্পরিক রক্ষাব্যবস্থার জন্য আলাপ-আলোচনার পর এই চুক্তি সম্পাদিত হইল।

নানকিং-এর এক সংবাদে প্রকাশ, চীনা কমিউনিস্টগণ জাতীয়তাবাদীদের প্রস্তাব অনুযায়ী আগামীকল্য যুদ্ধ বিরতির নির্দেশ প্রদান করিতে সম্মত হইয়াছেন।

৫ই এপ্রিল—রেঙ্গুনের সংবাদে প্রকাশ, কারেন বিদ্রোহিগণ বিনাসর্তে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব করার পর অদ্য রেঙ্গুনের দশ মাইল উত্তরে অবস্থিত ইনসিনে যুদ্ধ বিরতির নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। কারেন জাতীয় ইউনিয়নের সভাপতি স বা উ গি আত্মসমর্পণের প্রস্তাব করিয়াছেন।

৬ই এপ্রিল—রেঙ্গুনের সংবাদে প্রকাশ, ব্রহ্মের সরকারী বাহিনী মান্দালয়ের ৪০ মাইল উত্তরে মেমিও পুনরায় অধিকার করিয়াছে।

নানকিংএর সংবাদে প্রকাশ, নানকিং-এর ৩০ মাইল পূর্বে ইচেং-এ ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছে। কমিউনিস্ট কর্তৃপক্ষ যুদ্ধবিরতির নির্দেশ দিবে বলিয়া যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, সে সম্পর্কে আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। গতকল্য পিপিং-এ শান্তি আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে।

৮ই এপ্রিল—রেঙ্গুনের সংবাদে প্রকাশ, আত্মসমর্পণ সম্পর্কে ইনসিনে কারেন নেতাদের মধ্যে মত-বিরোধ হইয়াছে।

নানকিং-এর সংবাদে প্রকাশ, চীনা কম্যুনিস্ট ইয়াংসী নদীর উত্তরতটে সরকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে নূতন করিয়া ব্যাপক আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে।

রেঙ্গুনে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, অদ্য রাত্রি রেঙ্গুনের উত্তরে অবস্থিত ইনসিনে কারেন বিদ্রোহী ও সরকারী বাহিনীর মধ্যে প্রবল সংগ্রাম চলিতেছে। ইনসিনে কারেন বিদ্রোহী ও ব্রহ্ম গভর্নমেণ্টের শান্তি আলোচনা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।


প্রতি সংখ্যা—চারি আনা　　বার্ষিক ১২৷৷—১৩.　　ষাণ্মাসিক—৬৷৷৹

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক :—আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সম্পাদক ঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহ সম্পাদক ঃ শ্রীসাগরময় ঘোষ

> দাঁড়িপাল্লার যে দিক্ ভারী হয়, সেই দিক ঝুঁকে পড়ে, আর যে দিক্ হাল্কা হয়, সেই দিক্ ওপরে উঠে যায়। মানুষের মন দাঁড়িপাল্লার ন্যায়, তার এক দিকে সংসার, আর এক দিকে ভগবান। যার সংসার, মান, সম্ভ্রম ইত্যাদির ভার বেশী হয়, তার মন ভগবান থেকে উঠে গিয়ে সংসারের দিকে ঝুঁকে পড়ে; আর যার বিবেক-বৈরাগ্য ও ভগবদ্ভক্তির ভার বেশী হয়, তার মন সংসার থেকে উঠে গিয়ে ভগবানের দিকে ঝুঁকে পড়ে।
>
> —শ্রীরামকৃষ্ণ

ষোড়শ বর্ষ ] শনিবার, ১০ই বৈশাখ, ১৩৫৬ সাল। Saturday, 23rd April, 1949. [২৫শ সংখ্যা

### স্মৃতি-পূজা

গত ৩০শে চৈত্র বুধবার কলিকাতায় 'আনন্দবাজার', 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড' ও 'দেশ' পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা প্রফুল্লকুমার সরকারের পঞ্চ বার্ষিকী স্মৃতি দিবস প্রতিপালিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে বাঙলার শীর্ষস্থানীয় সাহিত্যিক এবং সাংবাদিকগণ তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন। প্রফুল্লকুমার আমাদের পরিচালক ছিলেন। তিনি আমাদের গুরু, উপদেষ্টা এবং সুহৃৎ ছিলেন। তাঁহার ন্যায় একটি মহৎ জীবনের নীরব, নিরহঙ্কৃত কর্মসাধনার সংস্পর্শ আমরা লাভ করিয়াছি, এজন্য নিজদিগকে ধন্য মনে করি। সমুন্নত সংস্কৃতির একটি সুসংযত সৌষ্ঠব প্রফুল্লকুমারের সমগ্র জীবনকে সুমধুর করিয়া তুলিয়াছিল, এমন জীবন সত্যই বিরল। বস্তুতঃ গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের উপসংহারভাগে আদর্শ জীবনের যে সব লক্ষণ নির্দেশিত হইয়াছে প্রফুল্লকুমারের মধ্যে আমরা সেইসব লক্ষণের বিকাশ দেখিতে পাইয়াছি। স্বদেশের স্বাধীনতা প্রফুল্লকুমারের সব সাধনার লক্ষ্য ছিল। সমাজের সর্বাঙ্গীন নৈতিক উন্নতির পথেই আমাদের সেই স্বাধীনতা সত্য হইয়া উঠিবে, তাঁহার এই বিশ্বাস ছিল। তাঁহার নিকট রাজনীতি সমাজ-নীতি হইতে বিচ্ছিন্ন বস্তু ছিল না; এজন্য স্বাধীনতার জন্য রাজনীতিক শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিবার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক দুর্নীতিসমূহ যাহাতে দূর হয়, প্রফুল্লকুমার সেজন্য অনলসভাবে কাজ করিয়া গিয়াছেন। সাংবাদিক, সাহিত্যিক এবং ভক্ত বৈষ্ণব স্বরূপে তাঁহার সে সাধনা লোকসেবার পথে বিভিন্ন মুখে বিকশিত হইয়া উঠে। স্বাধীনতা আমরা পাইয়াছি; কিন্তু সমাজ-জীবনের গ্লানি হইতে আমরা এখনও মুক্ত হইতে পারি নাই। দেশব্যাপী দুর্নীতি। সংকট আমাদের সকল দিকে। প্রফুল্লকুমার যদি জীবিত থাকিতেন, তবে বাঙলাদেশের সাহিত্য এবং সংবাদ-সাধনা তাঁহার অনহঙ্কৃত জীবনের আদর্শে বর্তমান সংকট কাটাইতে বিশেষ অনুপ্রেরণা লাভ করিত। আমরা কাজের মূলে জীবন্ত আদর্শের আশ্রয় পাইতাম। আত্মার অমরতায় আমরা বিশ্বাসী। যদিও প্রফুল্লকুমার প্রত্যক্ষশরীরে আমাদের মধ্যে বর্তমান নাই, তথাপি তাঁহার সান্নিধ্য আমরা অন্তরে নিবিড়ভাবে অনুভব করি। মর্ত্যজীবনের অতীত অমৃতলোক হইতে তাঁহার আশীর্বাদ আমাদের কর্তব্য উদযাপনে শক্তি দান করুক ইহাই একান্তমনে প্রার্থনা করিতেছি।

### মানভূম সত্যাগ্রহ

মানভূম সত্যাগ্রহের অবস্থা উত্তরোত্তর উদ্বেগজনক আকার ধারণ করিতেছে। ভাড়াটিয়া গুণ্ডার দল নির্বিবাদে নিরীহ সত্যাগ্রহীদিগকে লাঠিপেটা করিতেছে। তাহাদিগকে বলপূর্বক ধরিয়া লইয়া প্রহারের দ্বারা অজ্ঞান করিয়া ফেলিয়া রাখিয়া যাইতেছে। গুণ্ডারা বাঙালীদের দোকান লুঠ করিতেছে, এবং পরে বিহারের পুলিশের সপ্রশংস দৃষ্টিতে আপ্যায়িত হইয়া রামধুন গাহিতে গাহিতে বিজয়গর্বে গৃহে ফিরিতেছে। মানভূম সত্যাগ্রহের নেতা শ্রীযুত অতুলচন্দ্র ঘোষের সহধর্মিণী শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা পর্যন্ত গুণ্ডাদের হাতে প্রহৃত হইয়াছেন। ঘোষ মহাশয়ের পুত্র শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ বিহার পরিষদের সদস্য শ্রীসাগর মাহাতো এবং বিহার গভর্নমেণ্টের ভূতপূর্ব পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী শ্রীযুত জীমূতবাহন সেনকেও গুণ্ডারা রেহাই দেয় নাই। এইসব গুণ্ডা বাহির হইতে আমদানী করা হইতেছে। ইহারা লাঠি, সড়কী, টাঙ্গী তলোয়ার, কেহ কেহ বন্দুক এবং পিস্তল পর্যন্ত সঙ্গে লইয়া মহোৎসাহে দৌরাত্ম্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে। কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির কিছুদিন পূর্বে নয়াদিল্লীতে যে অধিবেশন হইয়া গেল, তাহাতে মানভূমে সত্যাগ্রহের প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়। কমিটি এই সিদ্ধান্ত করেন যে, বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন রহিয়াছে, এরূপ অবস্থায় সত্যাগ্রহ বন্ধ করিবার জন্য কংগ্রেস-সভাপতি সংশিলষ্ট পক্ষগুলির নিকট পত্র লিখিবেন। ওয়ার্কিং কমিটি সংশিলষ্ট পক্ষ বলিতে কাহাদিগকে বুঝিয়াছেন আমরা জানি না এবং এই সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণও কিছু পাওয়া যায় নাই। তবে ইহাই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও অবস্থার কোন উন্নতি সাধিত হয় নাই। মানভূমের বাঙালী সমাজের মধ্যে আশার ভাব কিছু জাগে নাই, গুণ্ডারদলও নিরুৎসাহিত হয় নাই; অধিকন্তু বিহার গভর্নমেণ্ট সমভাবেই নীরব রহিয়াছেন এবং গুণ্ডার দলের বিরুদ্ধে অঙ্গুলী উত্তোলন করা পর্যন্ত প্রয়োজন বোধ করিতেছেন না। বস্তুতঃ ওয়ার্কিং কমিটি সাক্ষাৎ-সম্পর্কে মানভূমের ব্যাপারটি নিজেরা হাতে লন নাই। তাঁহারা ভারত সরকারের উপরই এ সম্বন্ধে বিবেচনার ভার দিয়া নিরস্ত হইয়াছেন বলিয়াই মনে হইতেছে। ইহার ফলে মানভূমে বাঙালীদের অভিযোগসমূহ ধামাচাপা পড়িবে অনেকে এই আশঙ্কা করিতেছেন। কারণ কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি এই সম্পর্কে বিহার গভর্নমেণ্টের

দায়িত্বের প্রশ্নটি তোলেন নাই; কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে বিহার গভর্নমেণ্টের আচরণ এবং নীতি প্রত্যক্ষভাবে ইহার মূলে রহিয়াছে। মানভূমের বাঙালী অধিবাসীদের উপর স্থানীয় গভর্ন-মেণ্টের নানাবিধ অত্যাচার ও অবিচারের অভি-যোগ সত্য কিনা, অথবা কতটা সত্য, ওয়ার্কিং কমিটি তাঁহার নিরপেক্ষ তদন্তের সুপারিশ করিবেন, আমরা ইহাই আশা করিয়াছিলাম। বিহারের নেতারা আজ তাহাদের কথা ঘুরাইয়া লইতেছেন; কিন্তু তাহাতেই মানভূমের সংস্কৃতি বদলাইয়া যায় নাই। রাতারাতি জোর করিয়া তাহা বদলানো যায়ও না। কার্যতঃ মানভূম বাঙলা ভাষাভাষীরই জেলা, ইহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। কিন্তু ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ পুনর্গঠনের দাবীর ফলে মানভূম পাছে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত হইয়া যায়, এই বিপত্তি এড়াইবার জন্য শাসন-শক্তির সাহায্যে মানভূমকে 'হিন্দী করণের' উৎকট জুলুমবাজীর অবতারণা করা হইয়াছে। শাসকবর্গ তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যেভাবে তাহাদের শক্তি অপপ্রয়োগে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ব্রিটিশের স্বৈরাচারও ততখানি অগ্রসর হইতে সংকোচ বোধ করিত। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সব অধিকার হইতে সেখানকার বাঙালীরা বঞ্চিত হইয়াছেন। তাঁহাদের সম্বন্ধে সেখানকার গভর্নমেণ্টের যেন কোন দায়িত্বই নাই। মানভূমের সত্যাগ্রহ বন্ধ হোক, আমরাও ইহাই চাই; কিন্তু তৎপূর্বে যাহারা প্রকাশ্যভাবে কংগ্রেসের নীতিকে লঙ্ঘন করিতেছে, মানভূমের বাঙালীদের প্রাথমিক অধি-কারের উপর নিতান্ত নির্লজ্জভাবে হস্তক্ষেপ করিয়া উদ্দাম স্বেচ্ছাচারিতায় প্রবৃত্ত হইয়াছে, সমগ্র ভারতের কল্যাণের দিকে তাকাইয়া এবং কংগ্রেসের আদর্শের মর্যাদার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাহাদিগকে সংযত করা কর্তব্য। প্রকৃতপক্ষে মানভূমে আজ যে সমস্যা দেখা দিয়াছে, তাহা কংগ্রেসের মৌলিক নীতি, মানুষের মৌলিক অধিকার এবং গণতান্ত্রিকতার মূল সূত্রের সঙ্গে বিজড়িত রহিয়াছে। সেদিক হইতে বিষয়টির বিচার না করিয়া যদি প্রাদেশিক মনোবৃত্তির বশে ইহাকে এখনও ধামাচাপা দিবার চেষ্টা করা হয়, তবে সমস্যার জটিলতা আরও বৃদ্ধি পাইবে বলিয়াই আমরা আশঙ্কা করি।

**দায়িত্ব কাহাদের**

নিখিল ভারত হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি শেঠ গোবিন্দদাস সম্প্রতি কলিকাতায় আগমন করেন। সাংবাদিকদের এক সম্মেলনে শেঠজী মানভূমের ব্যাপারের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন, মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের প্রাথমিক অধিকারকে সংকোচ করিয়া জোর করিয়া হিন্দী প্রচলন করা তিনি কোন মতেই সমর্থন করেন না। তিনি হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনের অভিমত উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, ভারতের যে কোন স্থানে যদি অন্য প্রদেশের কোন সমাজের লোক অধিক সংখ্যায় থাকে, তবে তাহাদিগকে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করাই স্থানীয় গভর্নমেণ্টের নীতি হইবে। দেখা যাইতেছে, বিহার গভর্নমেণ্টের হিন্দী ভাষানুরাগী কর্তৃপক্ষ নিখিল ভারত হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনের অভিমত অগ্রাহ্য করিতেছেন। শুধু তাহাই নয়, তাঁহারা বঙ্গ-ভাষাভাষীদের উপর হিন্দী জোর করিয়া চাপাইবার যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন তাহা যেমন নির্লজ্জ, তেমনই নিন্দনীয়। প্রকৃতপক্ষে মানভূমের নিরীহ সত্যাগ্রহীদের উপর, যে অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছে, তাহার ষোলআনা দায়িত্ব তাঁহাদেরই। সাক্ষাৎ সম্পর্কে তাঁহারা এই ব্যাপারে নির্লিপ্ত আছেন, এইরূপ দেখাইবার ভান করিতেছেন কিন্তু ইহা সুস্পষ্ট যে, তাঁহাদের অবলম্বিত নীতিই গুণ্ডাশ্রেণীর লোকদিগকে উস্কাইয়া তুলিয়াছে। বস্তুতঃ গুণ্ডারা ভাড়াটিয়া মাত্র। বিহার সরকারের শাসন-নীতির যাহারা নিয়ামক তাঁহাদের প্রশ্রয় না পাইলে জনমান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের উপর হস্ত উত্তোলন করিতে কিছুতেই সাহসী হইত না। প্রাদেশিকতার সংস্কার-বুদ্ধিতে বিহারের নেতাদের দৃষ্টি সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। তাঁহাদের এই ধরণের কাজের পরিণাম কতটা ভয়াবহ হইয়া উঠিতে পারে তাঁহারা এখনও তাহা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতেছেন না। বাঙলা আজ নানাভাবে বিপন্ন। বাঙালীরা বর্তমানে সর্বভারতীয় প্রভাবাবিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন নেতৃত্বের অভাবে অসহায় সুতরাং তাঁহাদের উপর যাহা খুসী করা চলিবে, বিহারী নেতারা যদি এইরূপ মনে করিয়া থাকেন, তবে ভুল বুঝিয়াছেন। কারণ, তাঁহাদের অনাচারের প্রতিক্রিয়া তাঁহাদিগকেই একদিন আঘাত করিবে। আজ বাঙালী সমাজকে দাবাইয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে গুণ্ডা শ্রেণীকে তাঁহারা লেলাইয়া দিতেছেন; কিন্তু এই গুণ্ডারা অবাধ দুষ্প্রবৃত্তির একবার আস্বাদ পাইলে, তাঁহাদের ঘাড়ে চাপিয়াও তাহা আদায় করিতে চাহিবে। বিহারী বলিয়া কসুর করিবে না। মানভূমের বাঙালীরা অখণ্ড ভারতের চেতনাভ্রষ্ট হইয়া প্রাদেশিকতাকে আশ্রয় করিয়াছে, ইহা সত্য প্রমাণিত হইলে আমরা সর্বাগ্রে, মানভূমের বাঙালীদের নিন্দা করিতাম; কিন্তু সত্যাগ্রহের উদ্যোক্তাগণের দাবী ও আচরণের মধ্যে সংকীর্ণ প্রাদেশিকতার বিন্দুমাত্র স্থান নাই এবং কংগ্রেস গভর্নমেণ্টকে কোনপ্রকারে বিব্রত করিবার প্রয়াসও নাই। তাঁহারা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও যেরূপ সংযম এবং নিষ্ঠার দ্বা[illegible] সত্যাগ্রহের আদর্শ উদ্দীপ্ত [illegible]য়াছেন, তাহা সত্যই প্রশংসার বিষয়। তাঁহাদের এই আদর্শ-নিষ্ঠা এবং সংযম জয়যুক্ত হইবেই, আমাদের ইহাই দৃঢ় বিশ্বাস। মহদাদর্শের সাধনার জন্য ত্যাগ ও তপস্যা পশুবলের উপর জয়লাভ করে ইহা চিরন্তন সত্য। মানভূমের সত্যাগ্রহীদের রক্তপাতে এই সত্যই প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে।

**বন্দীশালার বাণী**

খান আবদুল গফ্‌ফর খান ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম অগ্রণী। এ দেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে তিনি সীমান্ত-গান্ধী এই আখ্যা লাভ করিয়াছেন। এই বর্ষীয়ান্ জন-নায়ক বর্তমানে পাকিস্থান সরকার কর্তৃক কারারুদ্ধ আছেন। সম্প্রতি কারা-প্রাচীরের অন্তরাল হইতে প্রেরিত তাঁহার একটি বিবৃতি নয়াদিল্লীর 'পিপল' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। সীমান্ত-নেতা এই বিবৃতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "পাঠানদের ত্যাগেই পাকিস্থান ও হিন্দুস্থান স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে এবং এদেশে ব্রিটিশের আধিপত্যের সমাধি হইয়াছে। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে পাঠানদের দান অতুলনীয় না হইলেও তুচ্ছ নহে। এইজন্যই ফিরিঙ্গীরা পাঠানদিগকে শ্রেষ্ঠ দুষমণ বলিয়া মনে করে এবং তাহাদিগকে সমূলে ধ্বংস করিবার মতলবেই তাহারা পাঠানের বাসভূমিকে পাকি-স্থানের খোয়াড়ে ঢুকাইয়া দিয়াছে।" পাকি-স্থানের রাষ্ট্রনীতির কর্ণধারগণ খান আবদুল গফফর খানের এই উক্তিকে প্রীতির চোখে দেখিবেন না, আমরা জানি; কিন্তু তাহাতেই সত্য কখনো মিথ্যা হইয়া যায় না। বস্তুতঃ একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, পাকি-স্থান আন্দোলনের সংগঠক এবং প্ররোচক দলের পাণ্ডারা যত গর্বই করুন না কেন, ব্রিটিশ-প্রভুত্ব ভারত হইতে অপসারিত করিবার মূলে তাঁহাদের কোন কৃতিত্বই নাই। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষান্ধ মধ্যযুগীয় বর্বরতার মূলে কোন মহত্ত্ব থাকিতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেস এবং কংগ্রেসের আদর্শে অনুপ্রাণিত জনগণের আত্মোৎসর্গের প্রভাবেই ভারতের ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হইয়াছে এবং ভারত ও পাকিস্থান উভয় রাষ্ট্রের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পাকিস্থান রাষ্ট্রের নিয়ামকগণ স্বার্থ-সংকীর্ণ কূটনীতির দায়ে তাঁহাদের স্বাধীনতা লাভের অবদানের ক্ষেত্রে কংগ্রেসের এই সাধনার কথা স্বীকার করিতে স্বভাবতই কুণ্ঠিত হন। তাঁহাদের স্বাধীনতা লাভের মূলে খান আবদুল গফফর খানের [illegible]নুগামীদের অবদানের কথা উত্থাপন করাও তাঁহারা উক্ত একই কারণে অসমীচীন মনে করেন। সাম্প্রদায়িকতায় অন্ধ হইয়া যাঁহারা প্রতিবেশীর রক্তে ধরণী কলঙ্কিত করিয়াছিল তাঁহাদের মতে তাহারাই পাকিস্থান প্রতিষ্ঠা করিয়াছে; সুতরাং তাহারাই বড় বীর। পক্ষান্তরে কংগ্রেসের আদর্শ-নিষ্ঠ খান আবদুল গফফর খান পাকিস্থানের শত্রু বলিয়া বিবেচিত হইয়া আজ বন্দীভূত। কিন্তু

সত্যেরই জয় হয়, মিথ্যা স্থায়ী হইতে পারে না। স্বাধীনতা সংগ্রামের উদার আদর্শ, কংগ্রেসের সাধনাকে প্রাণবন্ত করিয়াছিল এবং সীমান্ত পাঠান-নেতাদের আত্মোৎসর্গের ফলে তাহা মহনীয় হইয়াছিল। পাকিস্থানকে যদি উন্নত রাষ্ট্রের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়, তবে সে আদর্শের মর্যাদা দিতেই হইবে। চালাকীর দ্বারা কোন মহৎ কার্য সিদ্ধ হয় না। পাকিস্থানে খান আবদুল গফ্ফর খানের ন্যায় ত্যাগী নেতার নিগ্রহ এবং তাঁহার জীবনাদর্শের অবমাননা এই দিক হইতে পাকিস্থানী রাষ্ট্রনীতির মানবতার মহত্ববর্জিত নীতিহীনতাকেই উন্মুক্ত করিতেছে।

### শিক্ষকদের দাবী

এদেশের শতকরা ৮৬ জন লোক এখনও নিরক্ষর। অজ্ঞানতার যবনিকা অপসারিত করিবার জন্য স্বাধীন ভারতের কর্তব্য কতখানি এবং সে কর্তব্য প্রতিপালনে ভারত সরকার বিশেষভাবে পশ্চিমবঙ্গের সরকার কি করিতেছেন কলিকাতা শহরে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সম্মেলনে সে সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা হইয়া গিয়াছে। সম্মেলনের উদ্বোধনকর্তা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীযুত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি প্রিন্সিপ্যাল অমিয়কুমার সেন এবং সভাপতি প্রিন্সিপ্যাল সোমেশ্বর মুখোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গের এই তিনজন শীর্ষস্থানীয় শিক্ষাব্রতী তাঁহাদের বক্তৃতায়, এ বিষয়ে সরকার সম্যক সচেতন নহেন, এই একই অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছেন। বস্তুতঃ ইঁহাদের ন্যায় বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরও অভিযোগের যৌক্তিকতা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। শিক্ষার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থব্যয়ের হিসাব দেখিলেই বিষয়টা সুস্পষ্ট হইয়া পড়ে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশ এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে আগাইয়া চলিয়াছে। বোম্বাই শিক্ষার জন্য তাহার আয়ের শতকরা ১৮৲ টাকা, মাদ্রাজ ২২৲ টাকা খরচ করে; কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের এই ব্যয়ের পরিমাণ মাত্র ৯৲ টাকা। হিসাব খতাইতে গেলে দেখা যায়, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই প্রদেশের প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ের শিক্ষার বাবদ বার্ষিক ৮ আনা ব্যয় করিয়া থাকেন। এই বরাদ্দে চলিলে পশ্চিমবঙ্গে নিরক্ষরতা দূর হইতে সম্ভবতঃ যুগান্তর ঘটিয়া যাইবে। তারপর, প্রদেশের শিক্ষাদানে যাহারা ব্রতী, তাহাদের সম্বন্ধে সরকারের দৃষ্টির কথা না তোলাই বোধ হয় ভাল। সরকারের সকল বিভাগের মধ্যে শিক্ষা বিভাগই বোধ হয়, সব চেয়ে বেশী উপেক্ষিত এবং জাতির জ্ঞান বিতরণের ভার যাঁহাদের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে, তাঁহাদের আর্থিক দুর্দশাই সব চেয়ে বেশী। যাঁহারা শিক্ষাদানের পবিত্র ব্রতে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহারা টাকা পয়সার দিকে চাহিবেন না এবং অকিঞ্চনের জীবনের আদর্শ গ্রহণ করাই তাঁহাদের উচিত, এই সব সদুপদেশ আমরা কর্তাদের মুখে মাঝে মাঝে শুনিতে পাই। প্রাচীন গুরুদের আদর্শের কথা এক্ষেত্রে উত্থাপন করিতেও কর্তৃপক্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের অনেকের বিবেকে বাধে না। এমন সব যুক্তিতে দরিদ্র শিক্ষকের অদৃষ্ট লইয়া পরিহাস করা হয় বলিয়াই আমরা মনে করি। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই ধরণের ব্যয়কুণ্ঠা এবং শিক্ষকদের দুঃখ-দুর্দশার প্রতীকার সাধনে এই ধরণের উপেক্ষা বা দীর্ঘসূত্রতা এ দেশের সমাজ জীবনকে সংকটের দিকে লইয়া চলিয়াছে। দেশ স্বাধীন হইবার পরও যদি শিক্ষার মূল্য সর্বাগ্রে স্বীকৃত না হয় এবং শিক্ষকদের জীবনধারণের উপযোগী ব্যবস্থাটা অন্ততঃ করা সম্ভব না হয় তবে জাতির অধোগতি অনিবার্য। এ সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অবিলম্বে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। শান্তি ও আইন রক্ষার প্রয়োজন অবশ্যই আছে, কিন্তু জাতিকে মানুষ করিবার প্রয়োজন তাহার অপেক্ষা কম নয়।

### মাতৃভূমি রক্ষার জন্য আহ্বান

ভারতের সেনানির্বাচন সম্পর্কিত বিভাগের ডিরেক্টর ব্রিগেডিয়ার বিলিমোরিয়া সেদিন কলিকাতায় একটি বক্তৃতা প্রসঙ্গে দেশের তরুণদিগকে দলে দলে সেনা বিভাগে যোগদানের জন্য আহ্বান করিয়াছেন। ইংলণ্ডের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, তথাকার রাজপরিবারের পুত্রদিগকে স্থল, নৌ এবং বিমান এই তিন বাহিনীতে ভর্তি করিবার রীতি আছে। এদেশের বড় বড় ব্যবসায়ী এবং শাসন বিভাগের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ যদি তাঁহাদের ছেলেদের দেশরক্ষা বাহিনীতে ভর্তি করেন তাহা হইলে খুব একটা বড় কাজ হয়। ভারতবর্ষ বিশাল দেশ। মাতৃভূমিকে রক্ষা করিবার জন্য এদেশের প্রত্যেক পরিবার হইতে একটি করিয়া ছেলে দেশরক্ষা বাহিনীতে ভর্তি করা উচিত। ভারতীয় সমর বিভাগের অতীতের ত্রুটির কথা পর্যালোচনা করিয়া ব্রিগেডিয়ার বিলিমোরিয়া বলেন, যুদ্ধের সময়ও এদিকে জনসাধারণের বিশেষ সাড়া পাওয়া যায় নাই। ইহার একটা কারণও অবশ্য ছিল। সেই সময়ে জনসাধারণের মনে এরূপ একটা দ্বিধা ছিল যে, সেনাবাহিনীতে জাতিগত বৈষম্য আছে, সুতরাং ভারতীয়দের সেখানে শুধু জল টানা এবং কাঠ বহনের কাজই করিতে হইবে। যোগ্যতা থাকিলেও সাদায় কালায় পার্থক্য বোধের জন্য ভারতবাসীরা সৈনা বিভাগের উচ্চ পদ পাইবে না। ইংরেজেরা তাহাদিগকে অবিশ্বাসের চোখে দেখে। সেনা বিভাগে যোগ না দিবার পক্ষে আর একটি দ্বিধার কারণ এই ছিল যে, তখনকার দিনের যুদ্ধে ভারতের কোন স্বার্থ ছিল না। ইংলণ্ডের সাম্রাজ্য স্বার্থ সিদ্ধ করিবার জন্যই ভারতীয় সেনাদিগকে কামানের গোলাস্বরূপে ব্যবহার করা হইত। বলা বাহুল্য, ব্রিগেডিয়ার বিলিমোরিয়া যে কথাগুলি বলিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য এবং প্রধানতঃ উক্ত কারণগুলির জন্য তৎকালে বাঙালী তরুণদের মধ্যে সেনা বিভাগে যোগদানের জন্য তেমন আগ্রহ দেখা যায় নাই; শুধু তাহাই নয়, যাহারা সেনা বিভাগে যোগ দিয়াছে, জনসাধারণ তাহাদিগকে শ্রদ্ধার চোখেও দেখিতে পারে নাই। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের ক্রীতদাসেরই সামিল করিয়াছে। কিন্তু ভারত স্বাধীনতালাভ করিবার পর এখন আর সে অবস্থা নাই। বর্তমান সেনা-বিভাগের দ্বার সকলের জন্যই উন্মুক্ত এবং যোগ্যতানুযায়ী উচ্চ পদ লাভে অধিকারও সকলেরই আছে। সামরিক এবং অসামরিক জাতি এই হিসাবে বিদেশী শাসকের নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে সেনা বিভাগে লোক সংগ্রহে যে কৃত্রিম ভেদ ও ব্যবধান গড়িয়া তুলিয়াছিল, সে বালাই এখন চুকিয়া গিয়াছে। আমরা এদেশের তরুণদিগকে অবস্থার এই গুরুত্ব এবং তাহাদের দায়িত্ব উপলব্ধি করিতে বলি। সুখের বিষয় এই যে, দেশরক্ষার ক্ষেত্রে এই দায়িত্ববোধ বাঙলার তরুণ সমাজে ক্রমেই পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে এবং সমর শিক্ষার সুযোগ গ্রহণের জন্য তাহাদের মধ্যে আগ্রহ জাগিতেছে। বঙ্গীয় রক্ষিদল এ সম্বন্ধে আমাদের মনে আশার সঞ্চার করিয়াছে। বৎসরকাল পূর্বে এই বাহিনী গঠিত হয়। এই সময়ের মধ্যে ১৯ শত যুবক ইহাতে যোগদান করিয়াছে। বাঙলার প্রধান মন্ত্রী সেদিন ব্যাঙ্গালোরের একটি বক্তৃতায় এই আশা প্রকাশ করিয়াছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত অঞ্চলের নিরাপত্তা বিধানের উদ্দেশ্যে গঠিত এই বাহিনীতে অল্পদিনের মধ্যে আর ১৪ হাজার যুবক যোগদান করিবে। সেদিন কাঁচড়াপাড়ায় বঙ্গীয় এই রক্ষিদলের প্রথম বার্ষিকী অনুষ্ঠানে ভারতের প্রধান সেনাপতি জেনারেল কারিয়াপ্পা এই দলের তরুণদের কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করিয়া বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি জানাইয়াছেন যে, এই রক্ষিদল স্থায়ী রেজিমেণ্টের সহিত যুক্ত হইয়া ট্রেণিং লাভ করিবে। এইভাবে ইহারা ভবিষ্যতে সামরিক সৈনিকরূপে আরও বেশীসংখ্যক বাঙালী যুবককে শিক্ষাদান করিতে পারিবে। দেশপ্রেমের আবেগ এবং উদ্দীপনা বাঙলার তরুণ সমাজে স্বাভাবিকভাবেই আছে। তাহারা পশুর মত মরিতে চায় না; কিন্তু মানুষের মত মরিতে জানে। মাতৃভূমির মর্যাদা রক্ষায় অস্ত্রধারণের শিক্ষালাভের আহ্বানে পশ্চিমবঙ্গের তরুণ সমাজ আগ্রহের সঙ্গেই আগাইয়া আসিবে, এ বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নাই।

# সাপ

## সুশীল রায়

ফুলে বিষ আছে, পুরোনো জনশ্রুতি—
সাগরেও নাকি অনেক রত্ন আছে।
বিষ খোঁজা থেকে রত্ন খোঁজাই ভালো,
উপদেশ শুনি বহু ডুবারীর কাছে।

সাগর যতই মন্থন ক'রে ফিরি—
বিষ ওঠে খালি, রত্ন কি তবে মিছা?
ডুবারীর সাজ দূরে ছুঁড়ে ফেলে তাই
উঠান ভরিয়া রচেছি ফুল-বাগিচা।

বেশ সুখে আছি। গন্ধ ভালোই লাগে—
প্রাণ মন এতে সত্যিই হয় মাৎ।
যাদের সঙ্গে দেখা হওয়া দুর্ঘট
তারাও স্বয়ং এসে করে সাক্ষাৎ।

মেঘ দেখে ভয় অনেকেই করে শুনি
আমার আদপে সে বালাই মোটে নাই।
দুর্দিনে যার নাই তোয়াক্কা কোনো
মেঘের হুমকি তার কাছে মিথ্যাই।

খোঁপাবাঁধা মেঘ এলোচুল মেঘ বহু
কত উড়ে যায় আমার আকাশ দিয়ে
বজ্রের কোনো বার্তা যদি-বা থাকে
গুরু গর্জনে হয়ত যায় শুনিয়ে।

কে করে কেয়ার! যা বলার বলে ওরা
যা শোনার শুনি, হয়ত শুনিনে মোটে—
বর্ষণে যদি প্লাবন আনিতে চায়,
দেখি সে-ধারায় ফুল শুধু ফুটে ওঠে।

ওদিকে ও কাঁদে এদিকে এ হাসে, আমি
দুয়ের মধ্যে ক্ষীণ নির্জীব সেতু
একমনে ব'সে ভাবি গালে হাত দিয়ে
আকাশ-মাটির কাঁদার-হাসার হেতু।

প্রবল বর্ষা আসে না তো প্রত্যহ
ফুলের বন্যা সেও তো এক বেলার—
সকাল দুপুর বিকালের মৌতাত
তাই ব্যাস্ততা তাড়াতাড়ি সারবার।

ফুল ছেঁড়া পাপ, মালা গাঁথা তার চেয়ে
দ্বিগুণ পাতক; আঘাত মোটে না ক'রে
আঘ্রাণ নেওয়া ফুলের আসল পুজো—
এ নাকি সত্য অক্ষরে অক্ষরে।

সত্যমিথ্যা পরখ করার হেতু
সেদিন ফুলেতে সহসা দিলেম হাত—
অমনি কী যেন কিলবিল ক'রে উঠে
দারুণ ছোবল দিল যে অকস্মাৎ।

ইতিপূর্বেও একদা অমনি ক'রে
ঘ'টেছিল ঠিক অনুরূপ অঘটন।
বিপর্যয়ের মাঝখানে প'ড়ে গিয়ে
ভুল না করার করেছি হাজার পণ।

দু'বার আমাকে সাপে কামড়ালো, তবু
আজও বেঁচে আছি নেহাৎ মরিনি ব'লে—
পহেলা কামড়ে প্রাণ যদি নিতে, প্রভু,
দ্বিতীয় অভিজ্ঞতা কি পাই তা হ'লে?

মেঘে আজও ভয় হয়নি তবুও বটে,
কিন্তু জীবনে দুইদিনকার ভুলে
কী যে আতঙ্ক ঢুকে গেছে হাড়ে হাড়ে
ভারি ভয় পাই চুলে আর এই ফুলে।

আমার বাগানে ফুলগুলি সেই থেকে
ফুল নয় আর, তারা সব পরিতাপ।
কুন্তলে আর দেখিনে মেঘ-পাহাড়
চুলের মধ্যে দেখি বিষধর সাপ।

বেণীতে ফণীতে ভেদাভেদ গেছে চুকে
আতঙ্কে তাই হয়ে আছি [illegible] বাংশুল।
তদবধি তাই সতর্ক হুঁশিয়ার—
হয় না তো কভু ভুল আর এক চুল।

## সোভিয়েট 'ভেটো'

স্বস্তি পরিষদে সোভিয়েট রাশিয়ার 'ভেটো' প্রয়োগের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ করার একটা প্রয়াস গত বৎসরাধিক কাল থেকেই করা হচ্ছে। এই 'ভেটো' প্রয়োগের ক্ষেত্র সংকোচ করায় প্রধান উদ্যোগী হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও চীন। এই রাষ্ট্র কয়টি নিজেরাও সোভিয়েট রাশিয়ার মত 'ভেটো' প্রয়োগের অধিকারী। তবু যখন তারা 'ভেটো' প্রয়োগের উপর বাধা-নিষেধ আরোপ করতে চায়, তখন বিষয়টি একটু তলিয়ে বোঝা প্রয়োজন। এই প্রয়াসের পিছনে উল্লিখিত রাষ্ট্র কয়টির প্রধান যুক্তি হল এই যে, সোভিয়েট রাশিয়া আজকাল কথায় কথায় 'ভেটো' প্রয়োগ করতে আরম্ভ ক'রে স্বস্তি-পরিষদ ও রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠানের কাজে অচল অবস্থার সৃষ্টি করেছে। এ পর্যন্ত গত তিন বৎসরে একা সোভিয়েট রাশিয়াই কম পক্ষে ৩০ বার 'ভেটো' প্রয়োগ করেছে। ভেটো প্রয়োগের ক্ষেত্র সংকোচের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, বৃটেন ও চীন যে প্রস্তাবটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের সাধারণ অধিবেশনে উপস্থাপিত করেছিল সেটি ৪৩—৬ ভোটে গৃহীত হয়ে গেছে। যে ৬টি রাষ্ট্র প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছে তার মধ্যে আছে সোভিয়েট রাশিয়া ও তার অনুবর্তী পূর্ব ইউরোপের রাজ্য কয়টি। এত অধিক সংখ্যক ভোটে ইংগ মার্কিন পক্ষের প্রস্তাব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানে গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও সোভিয়েট রাশিয়ার 'ভেটো' প্রয়োগের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হবে কি না—সেটা সন্দেহের বিষয়। 'ভেটো' বস্তুটি বিশ্ব সনদের একটি মূল অংগ বিশেষ। এই বিশ্বসনদের উপর ভিত্তি স্থাপিত আছে বলেই বিশ্বরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠান বর্তমান রূপে এখনও বিদ্যমান আছে। বিশ্ব-সনদ পরিবর্তিত না করে 'ভেটো' বস্তুটিকে নিষ্ক্রিয় করার কিংবা তার ক্রিয়াশীলতাকে সীমাবদ্ধ করার কোনই উপায় নেই। আর বিশ্বসদন পরিবর্তিত করার অর্থই হল বর্তমান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানকে ভেটো দেওয়া। বর্তমানে বিশ্ব রাজনীতির গতি যে পথ ধরে চলেছে তাতে হয়তো অদূর ভবিষ্যতে একদিন এইভাবেই সম্মিলিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের অপমৃত্যু ঘটবে। কিন্তু এখনও সেদিন আসেনি এবং আসেনি বলেই ইংগ-মার্কিন পক্ষ এভাবে অবনত মস্তকে সোভিয়েট 'ভেটো'কে মেনে চলতে বাধ্য হচ্ছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে এবং বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে তেহরাণ, ইয়াল্টা ও পটসড্যামে সোভিয়েট রাষ্ট্রের সঙ্গে মার্কিন রাষ্ট্রনায়কদের পশ্চিমী শক্তিপুঞ্জের আলোচনার ফলে সম্মিলিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের যে সনদ গড়ে উঠেছিল তার মূল কথা ছিল বৃহৎ

পঞ্চশক্তির মতৈক্য। সেদিন সোভিয়েট রাশিয়ার সংগে পশ্চিমী শক্তিপুঞ্জের ছিল গলায় গলায় ভাব। রাষ্ট্রাধিনায়কেরা সেদিন বুঝেছিলেন যে বৃহৎ পঞ্চশক্তির মধ্যে বিশ্ব সমস্যাগুলি সম্বন্ধে মতৈক্য সৃষ্টি না হলে কোন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানই টিঁকে থাকতে পারবে না কিংবা তার দ্বারা বিশ্ব শান্তিরও কোন সহায়তা হবে না। সর্বধ্বংসী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর ২।৩ বৎসর যেতে না যেতেই একদিকে সোভিয়েট রাশিয়া এবং অপরদিকে ইংগ-মার্কিন রাষ্ট্রদ্বয়ের মধ্যে তীব্র মতবিরোধ দেখা দেবে—এমন কথা কেউ সেদিন স্বপ্নেও ভাবে নি। কিন্তু কখনও কখনও স্বপ্নের অকল্পিত বিষয়ও যে সত্য হয়ে দাঁড়ায় আজকের দিনে পূর্ব-পশ্চিমের ক্রমবর্ধমান বিরোধ তার প্রমাণ। সেই জন্যেই আজ সোভিয়েট রাশিয়ার হাতে 'ভেটো'র মারণাস্ত্র ডেমোক্রাটিক ভেটোর ভক্ত পাশ্চাত্য শক্তিপুঞ্জের কাছে এত ভয়াবহ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু নিছক ভোটাধিক্যের জোরে বিশ্বরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠান চলবে—এরকম কোন অভিপ্রায় যে প্রতিষ্ঠাতা বৃহৎ পঞ্চ শক্তির মনে ছিল না তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ হল বিশ্বসনদে এই 'ভেটো'র অস্তিত্ব। পাশ্চাত্য কূটনীতির তুলনায় সোভিয়েট কূটনীতি বড় কম যায় না। স্টালিন প্রমুখ সোভিয়েট রাষ্ট্রনায়করা সেদিন বুঝেছিলেন যে যুদ্ধকালীন বিশ্বরাজনীতির চাপে পড়ে আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি পাশ্চাত্য শক্তিপুঞ্জ সোভিয়েট রাশিয়ার সহযোগিতায় বিশ্বরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলায় উৎসাহী হলেও, একদিন না একদিন উভয় পক্ষের মধ্যবর্তী বিরাট আদর্শগত ব্যবধান বড় হয়ে উঠবেই এবং সেদিন পশ্চিমী শক্তিপুঞ্জ ভোটের জোরেই সোভিয়েট রাশিয়াকে কোণঠাসা করে রাখার চেষ্টা করবে। তাই তাঁরা দাবী করেছিলেন যে এমন একটা ব্যবস্থা করতে হবে যাতে বৃহৎ পঞ্চশক্তি একমত না হলে কোন সমস্যার সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে না। এর থেকেই জন্ম হয়েছিল 'ভেটো'র। ভেটোর সম্বন্ধে বিশ্বসনদে নির্দেশ [illegible]ছে যে এই ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন করতে হলে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের মোট সদস্য সংখ্যার তিন-চতুর্থাংশ সদস্যের অনুমোদনই যে শুধু পেতে হবে তা নয়—তার পিছনে বৃহৎ পঞ্চশক্তিরও অনুমোদন থাকা চাই। বৃহৎ পঞ্চশক্তির মধ্যে একটিও যদি বেঁকে বসে, তবে ভেটোর কোন রদ-বদল করা সম্ভব হবে না।

সোভিয়েট 'ভেটো' প্রয়োগের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ করার জন্যে আনীত যে ইংগ-মার্কিন পক্ষীয় প্রস্তাব তিন-চতুর্থাংশের অধিক ভোটে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানে গৃহীত হয়েছে 'ভেটো'র অধিকারী সোভিয়েট রাশিয়া ভোট দিয়েছে তার বিরুদ্ধে। এর অর্থই হল এ প্রস্তাব সোভিয়েট অনুমোদন পায় নি। সুতরাং সোভিয়েট 'ভেটো'র জোরেই ভেটো সংকোচের প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত ঘায়েল হয়ে যাবে। রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের বর্তমান রূপ ও গঠনতন্ত্র আমূল পরিবর্তিত না করে 'ভেটো'র সংকুচন বা বিলুপ্তি সাধন যে সম্ভব নয়—এ কথা ইংগ-মার্কিন পক্ষেরও অবিদিত নয়। তাই তারা অন্য উপায়েও স্বস্তি পরিষদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করার চেষ্টা করে আসছে। 'লিট্ল অ্যাসেম্বলী'র প্রতিষ্ঠা এমনই প্রয়াস-সঞ্জাত। স্বস্তি-পরিষদের হাত থেকে ক্ষমতা নিয়ে এই 'লিট্ল অ্যাসেম্বলী'র হাতে তুলে দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু সোভিয়েট বিরোধিতার ফলে এ প্রয়াসও বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হয় নি। 'ভেটো' নিয়ে ইংগ-মার্কিন পক্ষ থেকে যে হৈ চৈ করা হয় তা নেহাতই প্রচারকার্য বলে মনে করার কারণ আছে। 'ভেটো' বিনষ্ট করার ক্ষমতা যখন তাদের নেই —তখন এ নিয়ে হৈ চৈ করে লাভ নেই। বর্তমান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠান যতদিন টিঁকে থাকবে ততদিন ইংগ-মার্কিন পক্ষ যেমন ভোটের জোরে সোভিয়েট রাশিয়াকে কাত্ করার চেষ্টা করবে, তেমনই সোভিয়েট রাশিয়াও 'ভেটো'র মারণাস্ত্র প্রয়োগ করে চাইবে আত্মরক্ষা করতে। এর ফলে হবে এই যে রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠান নিষ্ক্রিয় ও অচল হয়ে পড়বে। বর্তমানে সে দুর্লক্ষণ দেখা দিয়েছে। এ দুর্দৈবের হাত থেকে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানকে বাঁচাতে পারে শুধু বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, বৃটেন ও সোভিয়েট রাশিয়ার মতৈক্য। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় সে প্রত্যাশা করা মূঢ়তারই নামান্তর।

## ইন্দোনেশিয়া

২৩শে মার্চ তারিখে স্বস্তি পরিষদে গৃহীত ক্যানাডার প্রস্তাবক্রমে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের সদিচ্ছা কমিশনের মধ্যস্থতায় ব্যাটাভিয়ায় ডাচ প্রতিনিধি দল ও ইন্দোনেশীয় রিপাব্লিকান দলের প্রতিনিধিদের মধ্যে পুনরায় আপোষ-আলোচনা আরম্ভ হয়েছে। ডাচ প্রতিনিধি দলের অধিনায়ক হয়ে এসেছেন ডাঃ ভ্যান্ রোয়েন এবং ইন্দোনেশীয় রিপাব্লিকান দলের নেতা হয়ে এসেছেন ডাঃ রোয়েম্। ডাঃ সুকর্ণ, ডাঃ মহম্মদ হাতা প্রমুখ রিপাব্লিকের রাষ্ট্র-নায়করা আজও ডাচদের হাতে বাঁকা দ্বীপে বন্দী। স্বস্তি পরিষদে ডাচ প্রতিনিধি দলের

অধিনায়করূপে ডাঃ ভ্যান্ রোয়েনের যে প্রতিক্রিয়াশীল স্বরূপ আমরা দেখেছি তাতে তাঁর উপর আমাদের কোন আস্থা নেই। অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে তিনি প্রগতিশীল মতবাদের পোষক হলেও বিশেষ কিছু এসে যেত না। আপোষ-আলোচনার গতি নিয়ন্ত্রিত হবে একমাত্র ডাচ গবর্ণমেণ্টের অনুসৃত নীতির দ্বারা। সে নীতির একমাত্র উদ্দেশ্য হলো জোর করে স্বাধীনতাকামী ইন্দোনেশীয়দের ঘাড়ে সাম্রাজ্যবাদ মার্কা স্বাধীনতা চাপিয়ে দেওয়া—যে স্বাধীনতার সমস্ত কলকাঠি থাকবে ডাচদের হাতে আর ইন্দোনেশীয়রা পাবে ভুয়া রাষ্ট্রাধিকার। এই ধরনের অদ্ভুত প্রস্তাবে ইন্দোনেশীয়রা সম্মত হচ্ছে না বলেই বার বার আপোষ-আলোচনা হচ্ছে, চুক্তি হচ্ছে আবার চুক্তিভংগও হচ্ছে। এই পরিস্থিতির জন্যে দায়ী হল একমাত্র ডাচ গবর্নমেণ্ট। স্বস্তি-পরিষদের থেকে ডাচ গবর্ণমেণ্টের উপর যে চাপ দেওয়া উচিত ছিল, তা আংশিকভাবেও দেওয়া হচ্ছে না—বরং ডাচদের অন্যায় জেদ মেনে বার বার করে স্বস্তি পরিষদের প্রস্তাব বদলানো হচ্ছে। গত ২৮শে জানুয়ারী তারিখে স্বস্তি পরিষদে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল আপোষরফার পক্ষে সে প্রস্তাব আশানুরূপ না হলেও তার মধ্যে যেটুকু সুস্পষ্ট নির্দেশ ছিল তাও ডাচরা মানতে রাজী হয়নি। ফলে আবার ক্যানাডার প্রস্তাব গ্রহণ করতে হয়েছে। এ প্রস্তাব দুর্বল, অনির্দিষ্ট ও অস্পষ্ট। এর মূল বক্তব্য দুটি—যোগাযোগার্তায় রিপাব্লিক রাষ্ট্রের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রাথমিক আলোচনা ও হেগে স্থায়ী আপোষ-মীমাংসার জন্যে গোলটেবিল বৈঠকের ব্যবস্থা করা। বর্তমানে এই প্রথম পর্ব নিয়েই আলোচনা চলছে। রিপাব্লিকের পুনঃ প্রতিষ্ঠা নিয়ে প্রথমেই আলোচনা ভেঙে যাবার উপক্রম হয়েছিল। ডাচরা দাবী তুলেছে যে, রিপাব্লিকের পুনঃ প্রতিষ্ঠা, যুদ্ধবিরতি ও হেগের গোলটেবিল বৈঠকের অনুষ্ঠান সম্বন্ধে একই যোগে আলোচনা করা প্রয়োজন। অপরপক্ষে রিপাব্লিকের প্রতিনিধিদল দাবী করেছেন যে, রিপাব্লিকের পুনঃ প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত অপর দুটি প্রশ্নের আলোচনা নিরর্থক। শেষ পর্যন্ত সদিচ্ছা কমিশনের চেয়ারম্যান যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি মিঃ কোক্রানের প্রস্তাবক্রমে ডাচরা প্রথমেই রিপাব্লিক রাষ্ট্রের পুনঃ প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন আলোচনা করতে সম্মত হয়েছে। বর্তমানে সে আলোচনাই চলেছে।

আমরা এর মধ্যে নতুন কোন আশার আলোকই দেখতে পাচ্ছি না। যারা স্বস্তি পরিষদের সুস্পষ্ট বিরোধিতা করে লিংগাদ্-জাতি চুক্তি ও রেনভিল্ চুক্তি ভংগ করতে পেরেছে, যারা আন্তর্জাতিক বিধি ভংগ করে ফ্যাসিস্ট পন্থায় রিপাব্লিকের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে দিয়েছে তাদের দ্বারা যে কোন প্রকারের দুষ্কার্যের অনুষ্ঠান সম্ভব। তবু যদি স্বস্তি পরিষদ কিংবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তরফ থেকে কিছুটা চাপ পড়ত—তাহলে ভাল ফল হবার সম্ভাবনা থাকত। কিন্তু স্বার্থবাদী কূটনীতি প্রভাবিত স্বস্তি পরিষদের কাছ থেকে সেরূপ প্রত্যাশা করা বৃথা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও যে হল্যাণ্ডের উপর বাড়তি কোন চাপ দেবে না—এটাও অবধারিত। হল্যাণ্ড উত্তর অতলান্তিক চুক্তি স্বাক্ষরকারী অন্যতম রাষ্ট্র। তার জীয়ন মরণের কাঠি বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি বলে যে, হল্যাণ্ড ইন্দোনেশীয়ার সংগে সম্মানজনক আপোষরফা না করলে তাকে মার্শাল সাহায্য দেওয়া হবে না—তবে মুহূর্তের মধ্যেই ইন্দোনেশীয় সমস্যার সমাধান হয়ে যেতে পারে। কিন্তু তা সে বলেও নি এবং বলবেও না। হল্যাণ্ডের মূল শক্তিস্তম্ভ হল ইন্দোনেশিয়ার সাম্রাজ্য। সেটা তার হাত ছাড়া হয়ে গেলে হল্যাণ্ড দুর্বল হয়ে পড়বে। কম্যুনিস্টবিরোধী এবং সংগ্রামের অংশীদার হল্যাণ্ডকে দুর্বল করে তোলা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিপ্রেত হতে পারে না। তাই সেও চাইছে একটা গোঁজামিল-দেওয়া আপোষরফা ঘটাতে। এই জন্যেই ইন্দোনেশিয়ার সমস্যা যথাপূর্বই থেকে যাচ্ছে। ইউরোপের জন্যে অতিরিক্ত মার্শাল সাহায্য মঞ্জুর করা প্রসংগে এই সেদিনও মার্কিন সেনেটে প্রশ্ন উঠেছিল হল্যাণ্ড ইন্দোনেশিয়ার সংগে আপোষ না করলে তাকে সাহায্য করা হবে না—এরূপ একটা সর্তারোপ করা হবে কি না। শেষ পর্যন্ত সেরূপ কোন সর্তই আরোপিত হয় নি। এখন একমাত্র ভরসা হল এ বিষয়ে এশিয়ার জাতিপুঞ্জের চাপ। জানুয়ারী মাসে এ বিষয়ে আলোচনার জন্যে পণ্ডিত নেহরু যে এশিয়া সম্মেলন আহবান করেছিলেন তার একটি প্রস্তাবও স্বস্তি পরিষদ গ্রহণ করেন নি। কিছুদিন পূর্বে পুনরালোচনার জন্যে কয়েক দিন পূর্বে দিল্লীতে এশিয়াবাসী ১১টি দেশের কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের একটি সম্মেলন হয়ে গেছে। এই সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় নি। অবিলম্বে ডাচদের উপর যদি বড় ধরণের চাপ না দেওয়া যায়, তবে তারা আপোষ-আলোচনার বনামে নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী অভিপ্রায়ই পূর্ণ করে চলবে। বর্তমান আপোষ-আলোচনার আড়ালেও তাদের দুরভিসন্ধি যে আছে তার একটি প্রমাণ সম্প্রতি মিলেছে। একটি সংবাদে দেখা গেল যে এখনও ইন্দোনেশিয়ায় নতুন ডাচ সৈন্য আমদানীর চেষ্টা চলেছে এবং তার বিরুদ্ধে প্রায় তিন হাজার শান্তিকামী ডাচ নরনারী বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। পুলিশের সাহায্যে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভংগ করতে হয়েছিল। আপোষে ইন্দোনেশীয়াকে স্বাধীনতা দানই যদি ডাচদের অভিপ্রায় হবে—তবে স্বদেশ থেকে এই নতুন সৈন্য আমদানীর চেষ্টা চলেছে কেন এ প্রশ্ন সহজেই করা যায়। বিশেষ করে এই মুহূর্তে যখন উত্তর অতলান্তিক চুক্তির মাধ্যমে ইউরোপ রক্ষার আয়োজন চলেছে এবং এজন্যে স্বদেশেই ডাচদের অধিক সৈন্যের প্রয়োজন। এসব দেখে স্পষ্টই মনে হয় যে স্বস্তি পরিষদের মাধ্যমে ইন্দোনেশীয় সমস্যার কোন সমাধানই হবে না। তাই আজ ভারত ও এশিয়ার জাতিপুঞ্জের উচিত একদিকে ডাচদের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য সকল প্রকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা এবং অপরদিকে ম্রিয়মান ইন্দোনেশীয় রিপাব্লিককে পুনরুজ্জীবিত করে তোলার চেষ্টা করা। এ ছাড়া ইন্দোনেশীয় সমস্যা সমাধানের দ্বিতীয় কোন পথ আর চোখে পড়ছে না। ১৭-৪-৪৯
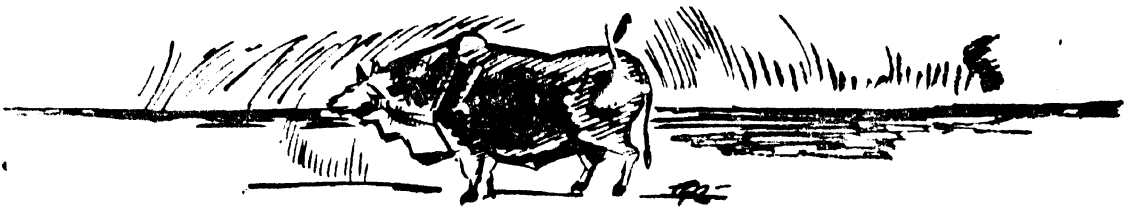
[ পূর্বানুবৃত্তি ]

শহরের এই শেষ সীমানায় মাটির রাস্তা দিয়ে ইতিপূর্বে যারা আসা-যাওয়া করতো, আজও তারা যাওয়া আসা করে। গাঁয়ের চাষারা চাল নিয়ে আসে এই পথে শহরের বাজারে, আনাজ, দুধ, ডিম। মোকদ্দমা করতে আসে কেউ, কারুর দরকার রেভিনিউ স্ট্যাম্প কেনার। এই রাস্তা ধরে হলধর হরকরা, ডাকের ব্যাগ কাঁধে নিয়ে হুর্হুর্ ক'রে চলে যায় গাঁয়ের দিকে। পিতম মুচি যায় সস্তায় গরুর চামড়া কিনতে চেনা গাঁয়ে।

চিরদিন তারা ভাবছিল এখানে আর যা-ই হোক, কেউ ঘর বাঁধতে আসবে না বাস করতে। কিন্তু বাবুরা এখানে অবধি শহরকে এগিয়ে নিয়ে এল। এখানে আছে পাদ্রী। সকলের আগে মিশন হাউস হয়েছিল এই অঞ্চলে।

হ্যাঁ, তারপর তৈরী হয় সরকারী কৃষিশালা। হাসপাতাল, লাসকাটা ঘর।

তারপর আসে পুলিশ সাহেবের বাংলো। তারপর আসেন মহকুমা হাকিম। তার থেকে একটু দূরে ঘর বেধেছে নিরঞ্জন রায়। দালান উঠতে দেরি বলে লাসকাটা ঘর থেকে একশ গজ দূরে কৃষ্ণচূড়া গাছ কালো ক'রে যেখানে বাদুড় ঝুলে থাকে সেই অদ্ভুত থমথমে জায়গা রাতারাতি ভরাট হ'য়ে কেমন সুন্দর ঝকঝকে বাংলো তৈরী হল।

না, পিতম মুচির গা ছম্‌ছম করত রাত্রে লাসকাটা ঘরের পাশ দিয়ে যেতে, গরুর ছাল মাথায় ক'রে যখন ও গাঁ থেকে ফিরত।

আর আজ সেই লাসকাটা ঘরের পাশে বাবুর বাংলোয় রাত বারোটার পরও জোর হেজাক্ জ্বলছে। বাবুদের সখ আলাদা। পর্দা-গুটানো জানলার কাঁচ বেয়ে চাঁদের আলোর মত আলো ঝরে পড়ছে অঝোরে।

গাঁ থেকে ফিরবার সময় হলধর হরকরার চোখে পড়ল। পিতম দেখল।

সিনেমার টিকিট বিক্রী করা শেষ ক'রে একদিন বাবুর বাংলোর আলো দেখবে ব'লে ফ্যালনা ও রাসু এসে দেখে যায়। দেখবার মত ছবি। ফ্যালনাকে ধরে নিয়ে আসে কীর্তিমান রাসু। তারপর চোখে পড়ে শহরের দুটি প্রবীণের, চেয়ারম্যান ও সাবরেজিস্ট্রারের। মুরারী বাবুর ও মোহিনী বাবুর। খাওয়া দাওয়ার পর একদিন পান চিবোতে চিবোতে দুজন বেড়াতে আসেন একটা রিক্সা নিয়ে এদিকে।

দুই বন্ধু এই ভেবে গর্ব অনুভব করেন শহরটা কত দ্রুত বাড়ল। কত রাত অবধি এর আলো জ্বলছে আজকাল। গির্জা অবধি এর সম্প্রসারণ।

এ'রা কারা। কার বাংলো ওটা?

বনগাঁর নিরঞ্জন রায়। তাঁর স্ত্রী।

ব্যাংক, ব্যবসা নিয়ে অনেক টাকা ভদ্রলোকের। হ্যাঁ এই শহরে নতুন এসেছে। ব্যবসা করবে, বসবাস করবে। ওটি কে? গাড়ি থেকে নামল স্বামী স্ত্রী দুজনকে দুদিকে রেখে? উকিল অটল বাবুর ছেলে।

তাই বলো। আমাদের নিশানাথ। এই শহরের একটি ছেলে ধনীর সুন্দরী স্ত্রীকে হাতে ধরে গাড়ি থেকে নামায়। সাবরেজিস্ট্রার ও চেয়ারম্যান বলাবলি করেন, নিশ্চয়। খাঁটি ব্রিটিশ আমলে এরা মানুষ,—আমাদের ছেলে-মেয়েরা। সংসারের বাস্তব দিকটাকে উপেক্ষা করবার মত মন ও মেজাজ এদের থাকতেই পারে না। এই স্বাভাবিক। একটি সাধারণ মধ্যবিত্ত, বি এ ফেল্ করা ছেলে যদি এভাবেও অগ্রসর হয় তাতে অভিভাবক হিসাবে আমাদেরও উল্লসিত হবার কারণ আছে বৈকি।

'Efficiency যুগটাই হ'ল এগিয়ে যাবার।' মোহিনীবাবু বলেন, এই শহরের প্রসন্ন ন্যায়রত্নে একটি জল ছেলে, যাকে বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের "সোনার চাঁদ" পচাত্তর টাকা মাইনেয় সন্দীপ না হাতিয়ার কোন চরে স্কুলের মাস্টারি করছে। কি হ'ল তাতে,—ছেলেটির অত ভালত্ব শেষ পর্যন্ত কি কাজে লাগল।' সাবরেজিস্ট্রার হাসলেন।

এ ছেলে ওস্তাদ, করিতকর্মা। মিথ্যা বলেছি? চেয়ারম্যান মাথা নাড়েন। বন্ধুর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস্‌ফিসিয়ে বলেন, নীতি নীতি করে আমরা নিজেরা যেমন চাপা পড়ে গেছি, তেমনি চেপে রেখেছি সন্তানদের। আরে বাবা, হোক না ছেলেটা খানিকটা বখাটে, ডানপিটে। শেষ অবধি ও কি হয়ে ওঠে তাই দিয়ে সব বিচার করাব—আজকের ছেলের কৃতিত্ব তো পুঁথি-পড়া পাণ্ডিত্যে নয়, কি ধুমপাননিবারণী সভার সভ্য হওয়ায়। ছেলে কি করছে, ক'টা টাকা ঘরে আনলো শেষ অবধি তাই তো আমরা দেখি—আমরা সাধারণ মানুষ, যাদের খেটে খেতে হয়, দু'পয়সা আয় বাড়লে রাত্রে সুনিদ্রা হয়।' সাব-রেজিস্ট্রার মাথা নাড়লেন। 'আর নীতিটা কোথায় আছে এদিনে, কোনখানে তুমি দেখছো? চেয়ারম্যান চোখ টিপলেন। 'গান্ধী রামকৃষ্ণ দিয়ে তো তোমার আমার বিচার হবে না। পয়সা, অর্থ। Bare fact এ কেউ আমরা অস্বীকার করতে পারছি? অমুকবাবু দেশের একজন কেউ কেটা হয়ে গেছে, খোঁজ নিয়ে দেখলাম সারাজীবন ব্ল্যাক-মার্কেট চালিয়ে এসেছেন বেমালুম। দুর্নীতি? কই একথা তো কেউ বলছে না। বরং রোজ কাগজে তার প্রশস্তি বেরোচ্ছে, কেননা, তিনি অমুক বন্যায় অত হাজার টাকা দান করেছেন, অমুক জায়গায় ইস্কুল খুলেছেন। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত টাকা দিয়ে, তাঁর ক্ষমতার ও কর্মের বিচার করি আমরা।' সাব-রেজিস্ট্রার চুপ।

'ডলারের যুগ। টাকাকড়ি দিয়ে তোমার নামধাম, প্রতিপত্তি, যশ।' মোহিনীবাবু ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলেন। 'টু-পাইস যার নেই তার কিছুই নেই।'

'টু-পাইস আছে বলেই তো আমাদের মোহিনী নন্দী মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হয়েছে।'

'টু-পাইস আছে বলেই তো টিমটিমে উকিল শশধর আজ মন্ত্রী হয়েছে।' টিপ্পনির পর মোহিনীবাবু হাসলেন।

'পয়সা এবং মেধা, দুইটি থাকা চাই—শুধু পয়সা তো এখানকার নিধু শীলেরও আছে।'

'একটাই আরেকটাকে টেনে আনছে ব্রাদার।' সাব-রেজিস্ট্রার মন্তব্য করলেন, 'নিধু শীলের পয়সা হয়েছে, তাই ওর মাথায় এসেছে স্বগ্রামে নিজের নামে মেয়েদের ইস্কুল করা। তুমি খবর রাখ না। কেন টাকাটা তো ও রিলিফ-ফণ্ডে দিতে পারত।'

সাব-রেজিস্ট্রার হঠাৎ হাসলেন। 'দুর্গতির নেশা থেকে শীল-নন্দনও অব্যাহতি পায়নি।'

'এটা কি খারাপ?' চেয়ারম্যান উত্তেজিত হন। 'বলছি তো হেল্দি সাইন।' সাব-রেজিস্ট্রার বললেন, 'বলে প্রগতি। ওর ছেলে যে মাইনিং শিখে এলো ধানবাদ থেকে। ওর মেয়ে নাচ শিখছে। স্টেটসম্যানে তো সেদিন ফটো বেরোলো। তুমি কি আজকাল স্টেটস-ম্যান রাখ না নন্দী।' হাজরা পাকা ভুরু বাঁকা করে সুপিরিয়রিটির ভাব নিয়ে হরিতকী গাছের গুঁড়িতে দাঁড়িয়ে হেজাক্ জ্বালানো বাংলোর ছবি দেখেন।

যেন এই প্রসঙ্গ চাপা দেবার জন্য চেয়ার-ম্যান সাব-রেজিস্ট্রারের কানে ফিসফিসিয়ে ওঠেন। 'কাপ্তান ছেলে জানে সে যুগের সেনাপতিরা রাজাদের তুষ্ট রাখবার জন্যে রাণীদের তোষামোদ করত বেশি।'

কফাশ্রিত গলা গম্ভীর ক'রে বুড়ো মুরারী হাজরা মন্তব্য করলেন, 'অটলের বৈঠকখানার ওপাশটায় নতুন ইট সিমেন্ট দেখলাম।'

'ছেলে পাঠাচ্ছে। বাজারের ওদিকটায় ব্যাঙ্কের দালান উঠছে নতুন।' বলে চেয়ারম্যান হাসেন। অন্যায় অথচ ভাল এই রকম একটা জিজ্ঞাসা সাবরেজিস্ট্রারের ভুরুতে উঁকি দিতে দিতে আবার মিলিয়ে গেল।

'দেবীকে তোষামোদ করা হচ্ছে, কিন্তু দেবতা যে ভিতরে ভিতরে গোমরাচ্ছে না তাই বা কে জানে?'

ফেরার পথে সাবরেজিস্ট্রার মন্তব্য করেন।

'আমার মনে কি আর তা স্ট্রাইক করেনি।' রিকসার গদীর ওপর স্থূল দেহ এলিয়ে দিয়ে মোহিনী হাসেন। 'টেবিলের একধারে কেমন মুখ ভার করে বসে একটার পর একটা সিগারেট টানছে দেখলে তো।'

'খাওয়া দাওয়ার আয়োজন হচ্ছে মনে হল।'

'কাপ্তান ছেলে পাখী স্বীকার করে এনেছে শুনলাম।' চেয়ারম্যান প্যাকেট থেকে সিগারেট বার করলেন।

'আমার মনে হয়।' গলাটাকে যথাসম্ভব সূক্ষ্ম করলেন সাবরেজিস্ট্রার, 'নিরঞ্জন রায় ড্রিঙ্ক করে,—তোমার কি মনে হয়? কেমন অ্যাল্কোহলিক ফ্যাট আছে শরীরে, দেখে যেন তাই অনুমান হয়।'

'আরে রাম। বলে কি না ড্রিঙ্ক করে। ডুবে থাকে হে ডুবে থাকে।' চাপা গলায় নয়, উঁচু গলায় চেয়ারম্যান কথা বলেন। 'ইমাম-বক্সকে বাবুর বাংলোর মালী ঠিক করা হয়েছে, হ্যাঁ আমাদের ইমামবক্স, মাংস ফেরি করতো যে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে। বলল সেদিন, বাক্স ভর্তি হুইস্কি আর বীয়ারের বোতল আছে রায়ের ঘরে। নিজের চোখে ও দেখেছে।'

সাবরেজিস্ট্রার চুপ ক'রে গেলেন।

'অঢেল পয়সা থাকলে—বুঝলে না?' যেন নিজের মনে মোহিনীবাবু পরে বিড়বিড় করেন। বস্তুতঃ পয়সা এ শহরে অনেকেরই আছে। কিন্তু ড্রিঙ্ক করার প্রচলন বা এ নিয়ে আলোচনা আগে এ শহরে বিশেষ ছিল না। সম্প্রতি কে এক নীহার বাগচি কণ্ট্রাক্টারি করে হঠাৎ অনেক পয়সার মালিক হয়ে এই শহরে এসে দিনকতক বসবাস করছিলেন। উদ্দেশ্য এখান থেকে,—এখানকার নদী ছেঁকে সব মাছ ধরে অন্য বড় বড় শহরে চালান দেওয়া এবং এই উদ্দেশ্যে এখানকার রেলওয়ে ও পুলিশ সার্কেল থেকে আরম্ভ করে ডাক-সাইটে ব্যবসায়ীদের হাত করবার জন্যে বাড়িতে তিনি প্রায়ই বড় রকমের নৈশভোজের আয়োজন করতেন। আর টেবিলের ওপর এনে জড়ো করতেন নানা সাইজের নানা রঙের বোতল। সেই থেকে বাবুরা তো নিশ্চয়ই, বাসার চাকর-বাকর পর্যন্ত ফ্যালনা, রাসু, ইমামবক্স জেনে ফেলেছে, শিখে রেখেছে কোনটা বীয়ার, কোনটার নাম হুইস্কি, কোন্ বোতলে ব্রাণ্ডি থাকে। ফ্যাল্নাকে কুলি খাটিয়ে ফ্যাল্নার মনিবের দোকান থেকে চতুর রাসু দিনকতক সেই নৈশভোজের কেক্ পাউরুটি যোগান দিয়েছিল আর ইমামবক্স সরবরাহ করত মুর্গি পাঁঠা।

'আগে নিশানাথের খুব আনাগোনা ছিল না তোমার বাড়িতে?' সাবরেজিস্ট্রার হঠাৎ প্রশ্ন করলেন।

'আনাগোনা মানে?' চেয়ারম্যান সোজা হয়ে বসলেন। 'সারাদিন তো থাকত আমার ওখানে। লিলি মিলিদের সঙ্গে—' বলতে বলতে চেয়ারম্যান মাঝপথে থেমে যান।

হসপিট্যাল রোডের বাঁক ঘুরে বাদাম গাছের সার। ঠুন্ ঠুন্ এগিয়ে চলে রিক্সা।

'বৈশাখ শেষ হতে চলল, শহরে কিন্তু এবার এখনো পটল আমদানী হল না, সাব-রেজিস্ট্রার।'

'হুঁ' একটু চুপ থেকে সাবরেজিস্ট্রার বললেন, 'যা-ই বল, তোমার বড় মেয়ে লিলিকে আমার বেশ লাগে। ভারি bold। কথায় চলায় এমন একটা তেজ রেখে চলে যা শহরের আর দশটি মেয়ের—'

'হিস্।' মোহিনীবাবু হঠাৎ মুরারীবাবুর হাতে চাপ দেন। সাবরেজিস্ট্রার থেমে যান! যেন সাবরেজিস্ট্রারকে থামাবার জন্যে মোহিনী এমন করেন। সাঁ করে একটা মোটরগাড়ি রিক্সার পাশ কেটে দূরের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

'পুলিশ সাহেব রাউণ্ডে বেরিয়েছে।' আস্তে আস্তে বললেন চেয়ারম্যান। যেন সাবরেজিস্ট্রারের হাতে চাপ দেও[illegible] এই কারণ। কোনো মন্তব্য না করে সাবরেজিস্ট্রার তাড়া দেন রিক্সাওলাকে। 'একটু টেনে চল্ বাবা, অনেক রাত হয়ে গেল যে।

'খুব bold।' গর্বের সুরে চেয়ারম্যান হঠাৎ আবার আরম্ভ করেন, 'মহিলা-সমিতির পাণ্ডা হয়েছে মেয়ে, রাতদিন এখন অই নিয়ে আছে।'

'ভাল ভাল।' সাবরেজিস্ট্রার মেরুদাঁড়া টান করে বসেন। 'শহরে যে এমন একটা জিনিস গড়ে উঠছে সেটাই সব চেয়ে বড় আশার কথা। আমি ভয়ঙ্কর support করি এসব। তুমি?'

মোহিনী নিঃশব্দে মাথা নাড়েন।

একটা থ্রিল। গভীর রাত্রে পায়ে হেঁটে শহরে বেড়ানো নেশার মত হয়ে গেছে ডাক্তারের। আধুনিক জীবন।

না, পাইন দেবদারুর জঙ্গলে এ সুযোগ ছিল না। সঙ্গে থাকতো গুলিভরা রিভলবার, কিন্তু সন্ধ্যার পর কোনোদিন কি ডাক্তার সাহস পেয়েছে বাইরে বেরোবার? কি বিশ্রী উপদ্রব বাঘের!

এখানে পিঞ্জর-মুক্ত বিহঙ্গের মত ডাক্তার মনের আনন্দে ঘুরছে পথে পথে।

এই মাত্র পৌঁছে দিয়ে এসেছে শিক্ষয়িত্রী দুজনকে তাঁদের কোয়ার্টারে। নির্বিকার।

ফুরফুরে রাতের হাওয়ায় বেড়াতে বেড়াতে এসেছে লাসকাটা ঘর অবধি। শহরের শেষ প্রান্তে।

দূরে কাঁচের জানালা আগুনের ফুল হয়ে জ্বলছে। ডাক্তার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ দেখল। এই সেই নিরঞ্জন রায়ের বাংলো।

অনেক রাত অবধি ওখানে খানাপিনা চলে।

গার্ডেনের কথা মনে পড়ল ডাক্তারের।

সেখানে এক কার্টারের বাংলো ছাড়া অধিক রাত্রে আলো জেলে খানাপিনার রেওয়াজ ছিল না।

একটা থ্রিল। বাংলাদেশে বাঙালী সমাজে উত্তেজনা এসেছে, জীবন-জোয়ার। এই উত্তেজনা ভাল কি মন্দ তা দেখল না ডাক্তার, দেখল এর স্পোর্টস।

বেশ অগ্রসর হচ্ছে শহর।

এখানেও স্বামী, স্ত্রী এবং স্বামীর নবীন কর্মচারী কি স্ত্রীর নবীন কোনো বন্ধুকে নিয়ে গভীর রাত করে এক টেবিলে বসে শিকার করা পাখীর রান্না-মাংস খাওয়ার সাহেবী কায়দা-কানুন ঢুকেছে।

অর্থাৎ বাঙালী পরিচ্ছন্ন হয়েছে, সামাজিক মার্জিত।

এক ঘরকুনো অটলবাবু ছাড়া এ শহরে আর কেউ মুখ গমরা করে বসে নেই।

যোগীন ডাক্তার দেহে-মনে জীবনের স্পন্দন অনুভব করল।

হ্যাঁ, মেলা-মেশা, জনপ্রিয়তা, পপুলারিটি। আধুনিকতার সবচেয়ে বড় গুণ।

ডাক্তার জনপ্রিয় হতে চায়।

দেহে-মনে সুস্থ থাকার এর চেয়ে বড় বৈজ্ঞানিক কোনো পন্থাও যে পৃথিবীতে আবিষ্কৃত হয়নি।

মানুষের সংসর্গই মানুষকে এগিয়ে দেয়। বিকাশের পথে, বিস্তৃতির দিকে। মানুষ মানুষকে বড় করে।

ডাক্তারের বেশ লাগল গৃহস্বামীর এই উদারতা। ব্যাঙ্কের ম্যানেজার, তার অর্থ নিরঞ্জনের বেতনভোগী কর্মচারী। কিন্তু নিরঞ্জন তো নিশানাথকে আর কর্মচারীর মতো দেখল না, বা রাখল না ওকে দূরে সরিয়ে, বা দরজার বাইরে দাঁড় করিয়ে।

সুযোগ-সুবিধা ও প্রশ্রয় পেয়েছে বলেই অটলবাবুর ছেলে দেখতে দেখতে এতটা কর্মঠ, যোগ্য ও কৃতী হতে পেরেছে সন্দেহ কি।

বাপের মত এই ছেলে যদি অসামাজিক, মুখচোরা, লাজুক হত তো এমনটি হত না।

বাংলোর জানালায় শেষবার চোখ বুলিয়ে ডাক্তার যখন ফের হসপিটাল রোডে উঠে এল ঢং করে একটা বাজে ট্রেজারির পেটা-ঘড়িতে।

একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া, হাসি-ফূর্তি। Be master merry, while you may.

শিস দিতে দিতে, হেলে-দুলে বাড়ির দিকে হাঁটে ডাক্তার, ভাবতে ভাবতে।

কার্টার সাহেবের বাংলোয় আসতো ছোকরা হিগিন্স। পাহাড়ী পথে ঘোড়া ছুটিয়ে দূরের আর এক বাগান থেকে। তখনো কার্টার-পত্নী জীবিত। সন্ধ্যার পর চলতো খানাপিনা। রোজ।

বলত কার্টার এদিকে, যখন বুড়ো হয়েছে, আর কার্টার-পত্নী পরলোকে, আমি সর্বদা জুড়ির স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করতাম, ডাক্তার, তাই ছোকরাকে ডাকতাম বাংলোয়। মানুষের সংসর্গ ছাড়া মানুষ সুখী হতে পারে না। এই জঙ্গলে আর এসোসিয়েশন কই, তাই বুঝলে না,—কয়েকটা ঘণ্টা জুড়ির ফূর্তিতে কাটতো। যেন এই ক'ঘণ্টা ও বেশী বাঁচতো। হ্যাঁ, Cupid নাক ঢুকিয়েছিল, ঢোকাতে আরম্ভ করেছিল বৈকি, আমি বেশ দেখতে পেতাম। কিন্তু জান কি, ডাক্তার Love মার খাচ্ছে Money-র কাছে, অনেক দেখলাম, অনেক দেখেছি, বিশেষ করে আমাদের এই ইউরোপীয় সমাজে। জুড়ি সম্পর্কে আমি অতিমাত্রায় নিশ্চিন্ত ছিলাম, কেননা হিগিন্স আদ্ধেক টাকা রোজগার করত আমার রোজগারের অনুপাতে—সেই জন্যেই হাঁ—হাঁ—কার্টার জোরে জোরে হাসতো। তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলত জুড়িকে মনে পড়ে।

এখানে অবশ্য সে রকম প্রশ্ন নয়। ওখানে ছিল বন্ধু, এখানে কর্মচারী।

তবু, মাংস ভক্ষণরত গৃহস্বামী, হাস্যচপল গৃহিণী এবং টেবিলে উপস্থিত সুঠাম উন্নত দেহ অভ্যাগত যুবককে দেখে সাহেবের কুঠির সেই নৈশ উৎসবের কথাই মনে পড়ল ডাক্তারের।

আর বুড়ো কার্টারের উক্তি। Love মার খাচ্ছে Money-র কাছে। আমাদের ইউরোপীয় সমাজের এই রীতি।

শুধু তোমাদের সমাজের জন্যে আজ একথা নয়, সবার, সর্বত্র এই সত্য। মনে মনে বলল ডাক্তার। মোহিনীবাবুর কথাটা মনে পড়েছে তার তখন। কাল সকালে পার্কে বেড়াতে বেড়াতে কথা হচ্ছিল। "আমি প্রশংসা করি, প্রশংসা করছি অটলবাবুর ছেলের। Ambition রাখে।"

"না লিলিকে ও তখন বিয়ে করেনি বলে আমার একটুও দুঃখ হয়নি।" ডাক্তারের কাঁধে হাত রেখে, স্বীয় কন্যা ও নিশানাথের মধ্যে এককালে হৃদ্যতা ছিল তা উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করতে করতে মোহিনী বলছিলেন, "আগে আমায় এস্টাব্লিশড্ হতে দিন, তারপর বিয়ে, তারপর সব। —কোলকাতা যাবার আগের দিন যখন ও আমায় বলল, সত্যি, বলতে কি, আমার চোখে জল এসেছিল আশায়, আনন্দে। ফুটো চালার নীচে বসে শুধু ডালভাত খেয়ে সংসার জমবে না, প্রেম শুকিয়ে যাবে, কাকাবাবু। সারারাত শুয়ে শুয়ে নিশীথের কথাগুলো মনে হয়েছিল, ডাক্তার, তাই লিলির কান্নাকে সেদিন আমি আর কান্নার মধ্যেই গণ্য করিনি।"

"আজকালকার ছেলে।" মন্তব্য করছিলেন সঙ্গী পোস্ট মাস্টার।

এবং মেয়ে। আমার মেয়েও শেষটায় শক্ত হল। পরদিন যেতে চেয়েছিল স্টেশনে নিশীথকে তুলে দিতে। একটু সর্দিজ্বর হওয়ার দরুণ আমি বারণ করি"

"এখন, এখন তা হলে—" প্রস্তাবটা তুলেছিলেন সঙ্গী সারদাবাবু। নাজীর সারদা রাহা।

"এখন অন্য রকম সমস্যা।" রাহার মুখের দিকে তাকিয়ে মোহিনী হাসছিলেন। "প্রজাপতি কানমলা খাচ্ছে ওর কাজের কাছে। যত বলছি এইবার বিয়ে টিয়ে করে ফেল, মেয়ে তার উত্তরে বলে বিয়ে, বিয়ের কথা আপাতত আমি ভাবতেই পারছি না বাবা, সমিতি নিয়ে এখন এমন ব্যস্ত। এত কাজ—"

"তাই নাকি? ওর মহিলা সমিতি।" সপ্রশংসচোখে নাজীরবাবু পোস্টমাস্টার বাবু চেয়ারম্যানের মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। আজকালকার মেয়ে।"

"তাই। ঊর্ধ্বে দৃষ্টি রেখে মোহিনীবাবু মন্তব্য করছিলেন, "আমিও বিশেষ জোর দিচ্ছি না। মেয়ে বড় হয়েছে, ওর Freedom হল এখন সবচেয়ে বড় কথা,—এ যুগে—"

পার্কে বেড়াতে বেড়াতে মোহিনীবাবুর মুখে শোনা [illegible] উক্তি।

এই শহরের একটি মেয়ে।

ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেলল ডাক্তার চেরীর মার কথা ভেবে। আধখানা শহর ও আধখানা পাহাড়ের মন নিয়ে ইজিচেয়ারে শুয়ে ছটফট করছে নীহার। আমি সভা-সমিতিতেও নাম লেখাব, আবার উনিশে পা দিয়েছে মেয়ে বিয়ের চিন্তায় চোখে ঘুম আসবে না, সত্যি এ বড় অদ্ভুত, ডাক্তার মনে মনে হাসল।

লিলির চেয়ে চেরী কত ছোট।

এবং শহরে এত সব মেয়ে সভা-সমিতি নানা কাজকর্ম স্কুল-কলেজে ছড়িয়ে আছে দেখে অটলবাবুর কাছে হুট করে আজ নিজের মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব তুলতেও ডাক্তারের কেমন সঙ্কোচ বোধ হচ্ছিল।

অথচ নীহার জিজ্ঞেস করবে, রাত জেগে থাকবে, ডাক্তার আজ কোনো কথা নিয়ে এল কি।

"কে?"

অটলবাবুর বৈঠকখানার দরজা পার হবার পর ডাক্তার টের পায় কে একজন পিছনে আসছে।

যোগীন ডাক্তার ঘুরে দাঁড়ায়।

"কি বলছিস?"

কালো কুচকুচে গায়ের রং, ইলেকট্রিক আলোতেও বোঝা গেল ছেলেটার রং বেজায় কালো। চোখ দুটো শেয়ালের চোখের মতন জ্বলছে। শেয়ালের মতন শুকনো, কদাকার। বিশ্রী নোংরা একফালি দাঁত বার করে হাসল।

'কি চাইছিস?' শুধুই হাসি দেখে ডাক্তার ধমক দিল।

'চা খামু।' বলল হেলেটা।

'তার মানে পয়সা।' ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে সুরু করল ডাক্তার। 'রাস্তাঘাটে আমি ভিক্ষে দিই না।'

একটা নিশ্বাসের শব্দ শোনা গেল, তারপর উত্তর। 'আপনি খয়রাত করবেন বইল্যা এহানে আর আমি আপীস পামু কোথায়।'

ভিক্ষুক ছেলের হিউমার-বোধ। এ শহরের সাধারণ ভিক্ষুকটি পর্যন্ত চতুর হয়ে গেছে।

ডাক্তার হাসি সম্বরণ করতে পারল না। ফের ঘুরে দাঁড়াল। 'তোর নাম কি?'

'রাসু। রাসমোহন কর্মকার।'

'কাজকর্ম কিছু করিস? মজার কথা বলতে শিখেছিস যে।'

রাসু মুখ নামাল।

'ফুরণে কামকাজ করি।'

'কেন চাকরিতে দোষ কি?' ডাক্তার একটু অবাক।

'আড়াই শ খাস্তা বিস্কুট ভাইজ্যা ফ্যালুনা কামায় ছ' আনা। আড়াইটা টিকিড বেইচ্যা আমার আহে সাড়ে বারো আনা, চাকরি করমু ক্যান্।'

'ভাল। কিসের টিকিট?'

'ছিনেমার।'

ডাক্তার শব্দ করে হাসল।

'চমৎকার ব্যবসা বেছে নিয়েছিস, ভিক্ষে কেন।'

'ন্যা, এই, এমনি।' রাসু কান চুলকায়। 'বাবুর যদি দয়া অয়, চারছ' পইস্যা, চা খামু।'

অর্থাৎ এটা উপরি রোজগার, বুঝল ডাক্তার। একটা আনি পকেট থেকে তুলে ছেলেটার হাতে ফেলে দিল।

ডাক্তার হাঁটে।

ছেলেটা আবার পিছন পিছন আসে।

'ডাক্তারবাবু—'

'আবার কি চাস্?' ডাক্তার ধমক দেয়।

'আপনার মেহেদীর জংগল।' রাসু নোংরা দাঁতে হাসে।

বাড়ির সামনে বেড়ার ধারে এসে ডাক্তার থমকে দাঁড়ায়।

'কি হ'ল মেহেদীর বেড়ার?' হ্যাঁ একটু জংগল হয়েছে বৈকি। হেসে ডাক্তার বলল, 'ছেটে দিবি মেহেদীর গাছগুলো? ফুরনে কাজ করিস তো।'

মেহেদীর বাড়তি মাথাগুলোর দিকে চোখ রেখে, রাসু মিটি মিটি হাসে।

'সেই কথাই বাবুকে জিগাইছি। কাইল দেহি অতবড় শিয়াল ঢুকছে বেড়ার মদ্যে।'

আশ্চর্যের কিছুই নেই। ভাবল ডাক্তার। হার্ট-অব-দি টাউন। হ'লে হবে কি। জংগল থাকলে সাপ শেয়াল বাসা করবেই।

শেয়ালের মতন জ্বলজ্বলে চোখে রাসু মেহেদীর বেড়া দেখছে।

'পারমু, পারমু না ক্যান্। তিন রোজে বেবাক সাফ্ কইর‍্যা ফেলমু।'

'তাই করিস।' ঘাড় নেড়ে যোগীন ডাক্তার গেট্ পার হ'য়ে ভিতরে ঢোকে। খুশি হয়ে রাসু চলে যায়।

(ক্রমশঃ)

# তিন প্রশ্ন

লিও টলস্টয়

কোনো-এক দেশের রাজা একদিন রাজকার্যের অবসরে বসে বসে ভাবছিলেন, 'যদি জানা যেত, কোনো একটা কাজ সুসম্পন্ন করতে হলে ঠিক কোন্ সময়ে সেটি আরম্ভ করা উচিত; কী রকম লোকের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া, অর্থাৎ একটা বিশেষ সময়ে কোন্ লোকটির সংগে অবস্থান করা অত্যাবশ্যক এবং কোন্ কাজটা মানুষের অবশ্য কর্তব্য এবং অবিলম্বে করণীয়; তাহলে যখন যে কাজেই হাত দেওয়া যাক-না কেন, সবই হয়তো বেশ সহজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যেতে পারত।'

অনেকক্ষণ ধরে তিনি ভাবলেন, এই প্রশ্নগুলোর ঠিক ঠিক উত্তর কী হতে পারে। এক একটি প্রশ্নের নানা রকমের উত্তর তাঁর মাথায় আসতে লাগল। একটা যথার্থ উত্তর তিনি কিছুতেই স্থির করে উঠতে পারলেন না। ভেবে ভেবে কোনো কূলকিনারা না পেয়ে তিনি সর্বত্র ঘোষণা করে দিলেন, যে এই জটিল প্রশ্ন তিনটির যথার্থ উত্তর বলে দিতে পারবে, তাকে প্রচুর পারিতোষিক দেওয়া হবে।

পুরস্কারের লোভে কত দেশ-দেশান্তর থেকে কতশত পণ্ডিত রাজ দরবারে এসে হাজির হতে লাগলেন, কিন্তু কেউই সঠিক সোজাসুজি জবাব দিতে পারলেন না। এক একজন এক একরকম মত প্রকাশ করলেন।

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে কেউ কেউ বললেন, কোনো কাজ আরম্ভ করার যথার্থ কাল নির্ধারণ করতে হলে আগে থাকতে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি ঘণ্টা প্রতিটি দিনের হিসাব কষে একটা সুনির্দিষ্ট নিখুঁত কর্মতালিকা তৈরি করতে হবে এবং খুব কঠোর ও নিয়মিতভাবে সেই কর্মতালিকা অনুসরণ করে কাজকর্ম করে যেতে হবে। তাঁদের মতে, একমাত্র এইভাবে চললেই ঠিক কাজটি ঠিক সময়ে নিষ্পন্ন করা যাবে এবং যথার্থ কখন কাজটি আরম্ভ করা উচিত তা পূর্বাহ্ণে জানা যেতে পারবে। কেউবা বললেন, কোনো কাজ আরম্ভ করবার যথার্থ সময় আগে থাকতে নির্ধারণ করা অসম্ভব। তবে কোনো বিষয়ে অলসভাবে সময়ক্ষেপ না করে, চতুর্দিকের ঘটনাপ্রবাহের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখে, উপস্থিত যে কাজ সবচেয়ে বেশী জরুরী মনে হচ্ছে, সেইটে প্রথমে করে ফেলতে পারলেই কাজকর্ম যথাসময়ে করা যেতে পারবে। আবার কেউবা এই মতের প্রতিবাদ করে বলে উঠলেন, চতুর্দিকের ঘটনাপ্রবাহের প্রতি বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি যত সতর্ক দৃষ্টিই রাখা যাক না কেন, সামান্য একজন মানুষের পক্ষে সমুদয় কাজের প্রকৃতি বিচার করে কোন্‌টি সবচেয়ে দরকারী এবং আশুকর্তব্য তা স্থির করা একেবারেই অসম্ভব। অতএব এইসব দিকে দৃষ্টি রাখতে হলে রাজার পক্ষে একটা উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা দরকার। এই পরিষদের সদস্যরা কাজকর্মের প্রকৃতি ও গুরুত্ব বিচারে রাজাকে সাহায্য করবেন। কিন্তু এর পরে কেউ কেউ আবার বললেন, এমন অনেক কাজ আছে যা পরিষদের সমক্ষে উপস্থিত করবার সময় থাকে না, কেননা, সেসব কাজে হয়তো তখন-তখনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার [illegible]। অথচ কোনো কাজের সিদ্ধান্ত করতে হলে তার পরিমাণ পূর্বাহ্ণেই অনুমান করে নেওয়ার দরকার, আর এই কাজ শুধু যাদুকর বা ভবিষ্যদ্দ্রষ্টারাই করতে পারেন। অতএব কোনো কাজ করবার যথার্থ কাল নির্ণয় করতে হলে যাদুকর বা ভবিষ্যদ্দ্রষ্টার সংগে পরামর্শ করার একান্ত প্রয়োজন।

ঠিক একই ভাবে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরেও নানা মুনি নানা মত প্রকাশ করলেন। কেউ কেউ বললেন, রাজকার্যের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্যে চাই যথাযোগ্য সুপরামর্শ, আর তার জন্যে প্রয়োজন সুচতুর, কুশলী এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধি দূরদর্শী মন্ত্রীর। কেউবা বললেন, ধর্মই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন এবং এই ধর্মরক্ষার্থেই বিধাতা নৃপতিকে প্রেরণ করতেন। অতএব রাজার পক্ষে ধর্ম তথা ধর্মপ্রচারক যাজকের সংগই অপরিহার্যরূপে রক্ষণীয়। আবার কেউবা বললেন, রাজার স্কন্ধে বিপুল কর্মভার ন্যস্ত। এই সমস্ত কর্ম সুসম্পন্ন করতে হলে চাই দীর্ঘায়ু। কিন্তু রোগ দুর্ঘটনা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ নানাপ্রকারে চেষ্টা করে অপরিণত অবস্থাতেই মানুষের জীবনকে ছিনিয়ে নিতে। কাজে কাজেই রোগ-ব্যাধিকে পরাভূত করে, এইসব দুর্যোগকে অতিক্রম করে, দীর্ঘজীবন লাভ করতে হলে চাই কৃতবিদ্য চিকিৎসকের একান্ত আন্তরিক সহযোগিতা। অতএব চিকিৎসকই রাজার পরম মিত্র এবং অবশ্য প্রয়োজনীয়। আবার কেউ কেউ বললেন, রাজার কীর্তি প্রধানতঃ নির্ভর করে তাঁর বাহুবলের উপরে। যিনি অধিকতর শক্তিশালী এবং দিগ্বিজয়ী বীর তিনিই বেশী প্রথিতযশা হন। কিন্তু রাজার বাহুবল বা শক্তির মূল উৎস তাঁর বিপুল সুশৃংখল সৈন্যবাহিনী। কাজে কাজেই সৈন্যবাহিনীই রাজার পক্ষে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজনীয়।

তৃতীয় প্রশ্নটির উত্তরে, কোন্ কাজটা সবচেয়ে জরুরী এবং আশুকর্তব্য, সে সম্পর্কে কেউ কেউ বললেন, বর্তমান সভ্যতার যুগে বিজ্ঞানই পৃথিবীর যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিষয়ের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। অতএব বিজ্ঞানের সাধনাই সর্বপ্রধান ও সর্বপ্রথম কর্তব্য। কেউ কেউ বললেন, রাজার পক্ষে তাঁর অধিকার ও সম্পদ রক্ষা করতে হলে বিজ্ঞান-সাধনার চেয়েও আগে দরকার যুদ্ধের কৌশল শিক্ষা করা। রাজ্যের অন্যান্য বিপদ-আপদ দূর এবং প্রজার ধন-প্রাণ রক্ষা করতে হলে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা অপরিহার্য। আবার কেউবা বললেন, মানুষের জীবন ক্ষণস্থায়ী এবং জীবনাবসানে প্রত্যেককেই ঈশ্বরের দরবারে গিয়ে তার কৃত-কর্মের জন্যে জবাবদিহি করতে হবে। কাজে কাজেই যত শীঘ্র সম্ভব কাম, ক্রোধ দূর করে, সংসারের মোহ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে, ঈশ্বরের চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে তাঁর পাদপদ্মে একান্তভাবে আত্মনিবেদন করাই সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বপ্রধান কর্তব্য।

কারও উত্তরের সঙ্গে কারও উত্তর মেলে না। প্রত্যেকেই আপন আপন বিদ্যা, বুদ্ধি ও জ্ঞান অনুসারে বিচার করে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করতে লাগল, তাই কারও উত্তরকেই রাজা চূড়ান্ত ও যথার্থ বলে গ্রহণ করতে পারলেন না এবং পুরস্কারও কেউই পেলেন না। কিন্তু এইখানেই রাজা হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিলেন না। প্রশ্ন তিনটির যথার্থ উত্তর জানতেই হবে, এই তাঁর সঙ্কল্প। কাজে কাজেই শেষ পর্যন্ত তিনি দেশবিখ্যাত মহাজ্ঞানী এক সাধুর শরণাপন্ন হতে মনস্থ করলেন।

এই সন্ন্যাসী বনের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র কুটীরে বাস করতেন এবং ধ্যান-ধারণা ও শাস্ত্রাধ্যয়নে কালাতিপাত করতেন। কুটীরটি ছেড়ে তিনি কখনও কোথাও যেতেন না। এবং সাধারণ গৃহস্থ ছাড়া সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তির সঙ্গে তিনি দেখা-সাক্ষাৎও করতেন না। সেইজন্য রাজা খুব সাদাসিধে পোষাক পরলেন এবং কয়েকজন ছদ্মবেশী দেহরক্ষী নিয়ে অশ্বারোহণে বেরিয়ে পড়লেন সেই তপোবনের উদ্দেশে। নগর-গ্রাম পেরিয়ে বনের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে সহসা কুটীরটি দূর থেকে তাঁদের নজরে পড়ল। তখন রাজা ঘোড়া থেকে নেমে তাঁর দেহরক্ষীদের আশেপাশে লুকিয়ে অপেক্ষা করতে বলে, পদব্রজে কুটীরের সম্মুখে গিয়ে হাজির হলেন।

সন্ন্যাসী তখন তাঁর তপোবনের এক অংশে একটি গর্ত খুঁড়ছিলেন। হঠাৎ চোখ তুলে তিনি তাঁর কুটীরের দিকে একটি লোককে আসতে দেখে তাকে অভ্যর্থনা জানালেন এবং কুশলপ্রশ্ন করলেন। তারপরে তিনি আবার তাঁর নিজের কাজে মগ্ন হলেন। বহুক্ষণ ধরে এই শ্রমসাধ্য কাজ করার দরুণ তিনি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত ও দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। এক একটি কোপে যেমন তিনি খানিকটা করে মাটি কাটছিলেন, এক একটি গভীর বন্ধ নিশ্বাস তাঁর বুক ঠেলে বেরিয়ে আসছিল। বস্তুতঃ তিনি রীতিমতো হাঁপাচ্ছিলেন।

রাজা খানিকটা ইতস্ততঃ করে সন্ন্যাসীর কাছে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন এবং শান্ত গম্ভীর স্বরে বললেন, "হে জ্ঞানবৃদ্ধ ঋষি, আমি অত্যন্ত জটিল সমস্যায় পড়ে আপনার কাছে তিনটি প্রশ্নের উত্তর জানতে এসেছি। ঠিক কাজটি ঠিক সময়ে করবার জ্ঞান কী করে লাভ করা যায়? একটি বিশেষ অবস্থায় এবং বিশেষ সময়ে কোন্ ব্যক্তির সঙ্গ মানুষের পক্ষে সবচেয়ে মূল্যবান এবং অপরিহার্য? কোন্ কাজ সবচেয়ে জরুরী এবং অবিলম্বে করণীয়?"

সন্ন্যাসী রাজার কথাগুলো নীরবে শুনলেন, কিন্তু কোনো উত্তর দিলেন না। হাতে খানিকটা থুথু মেখে হাতটা ভিজিয়ে নিয়ে আবার মাটি কোপাতে লাগলেন।

কঠোর পরিশ্রমে বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর নুয়ে-পড়া দেহটার দিকে তাকিয়ে রাজার মনে অনুকম্পা হল, তিনি গদগদস্বরে বললেন, "আপনি খুবই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। কোদালটা আমার হাতে দিন, আমি খানিকটা গর্ত খুঁড়ে দিচ্ছি।"

"ধন্যবাদ!" বলে সন্ন্যাসী কোদালটি রাজার হাতে দিলেন এবং মাটিতে বসে পড়লেন। খানিকক্ষণ কাজ করার পর রাজা আবার প্রশ্নগুলো করলেন। কিন্তু এবারও সন্ন্যাসী কোনো উত্তর করলেন না। উঠে দাঁড়িয়ে কোদালখানি নেবার জন্যে হাতদুটো বাড়িয়ে দিয়ে তিনি বললেন, "এখন তুমি একটু বিশ্রাম করো, আমি খানিকটা কাজ করি।"

কিন্তু সন্ন্যাসীকে আরও কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতে বলে রাজা নিজেই গর্ত খুঁড়তে লাগলেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল। অস্তমান সূর্য গাছের আড়ালে হেলে পড়ল। অবশেষে কোদালটা একপাশে রেখে তিনি বলে উঠলেন, "হে মহর্ষি, আমি আপনার কাছে আমার প্রশ্নগুলোর উত্তর জানতে এসেছি। যদি আপনি উত্তর দিতে অসমর্থ হন, তাহলে বলুন, আমি গৃহে প্রত্যাগমন করি।"

"তাই তো! কে যেন এই দিকে দৌড়ে আসছে। চলো তো দেখা যাক।" তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে সন্ন্যাসী বললেন।

রাজা পিছন ফিরে দেখলেন, দীর্ঘশ্মশ্রু-ধারী একটি লোক বনের মধ্যে থেকে দৌড়ে আসছে, দুহাত দিয়ে সে তার পেটটা চেপে ধরে আছে, [illegible]লের ফাঁক দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে তাজা রক্ত পড়ছে টস টস করে। কুটীরটার কাছে পৌঁছতে না পৌঁছতে লোকটা জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল এবং অস্ফুট ক্ষীণ স্বরে গোঙাতে লাগল।

সন্ন্যাসী এবং রাজা উভয়ে মিলে তাড়া-তাড়ি লোকটার পোষাক-পরিচ্ছদ খুলে ফেললেন। তাঁর পেটে একটি গভীর ক্ষত। রাজা স্বয়ং সাধ্যমতো যত্নে ক্ষতস্থানটা ধুয়ে দিলেন এবং নিজের রুমাল দিয়ে বেশ করে বেঁধে দিলেন। কিন্তু রক্তপাত আর কিছুতেই বন্ধ হয় না। কাজেই রক্তে ভেজা ব্যাণ্ডেজটি খুলে বার বার তিনি ক্ষতটা ধুয়ে দিয়ে নতুন করে বেঁধে দিতে লাগলেন। এইভাবে বহুক্ষণ শুশ্রূষার পর রক্তপাত বন্ধ হল এবং লোকটা ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে পেতে লাগল। জ্ঞান হবার পর চোখ মেলে তাকিয়ে প্রথমেই লোকটা জল খেতে চাইল। রাজা তৎক্ষণাৎ খানিকটা জল এনে তাকে খাইয়ে দিলেন। এদিকে ইতি-মধ্যে সূর্য ডুবে গেছে, সন্ধ্যার অন্ধকার একটা আবছায়া পর্দার মতো সমস্ত আকাশ-বাতাসকে ঢেকে ফেলছে। কাজেই সন্ন্যাসী এবং রাজা উভয়ে মিলে ধরাধরি করে লোকটাকে কুটীরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ভালো করে শুইয়ে দিলেন। বিছানায় পড়েই লোকটা চোখ বুজল এবং ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ল।

দীর্ঘ পথ ভ্রমণ এবং কঠোর শারীরিক পরিশ্রমের ফলে রাজাও এত বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, মাটিতে বসে, বেড়ার গায়ে হেলান দিয়ে, মুড়িসুড়ি হয়ে তিনিও অনতি-বিলম্বে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন—স্থান কাল বিবেচনা করবার শক্তি আর তাঁর ছিল না। গরমের দিনের ছোটো রাত—এক ঘুমে একেবারে কাবার হয়ে গেল। সকালে যখন ঘুম ভাঙল, প্রথমটা তিনি মোটেই স্মরণ করতে পারলেন না, কোথায় তিনি এসেছেন। তাঁর মনে সন্দেহ জাগল, সত্যি সত্যিই তিনি দেশের রাজা কিনা; আর সম্মুখের বিছানা থেকে শ্মশ্রুধারী যে লোকটা তাঁর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে সেই বা কে?

রাজাকে জেগে উঠতে দেখে এবং তার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে লোকটি অর্ধস্ফুট ক্ষীণ কাতর স্বরে বলল, "মহারাজ, আমায় ক্ষমা করুন।"

"তোমার সঙ্গে আমার পূর্ব পরিচয় নেই আর তোমাকে আমি জানিও নে। এ অবস্থায় হঠাৎ আমার কাছে ক্ষমা চাইবার কী তাৎপর্য তা তো বুঝতে পারছি না।" রাজা বিস্মিতভাবে বললেন।

"আপনি আমাকে জানেন না বটে, কিন্তু আমি আপনাকে জানি। আপনি আমার ভাইকে প্রাণদণ্ড দিয়েছেন এবং তার সমুদয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছেন। সেই বিচারের দিন থেকে আমি আপনার মহাশত্রু এবং আপনাকে হত্যা করে এর সমুচিত প্রতিশোধ নেব এই ছিল আমার প্রতিজ্ঞা। আমি সংবাদ পাই, আপনি একা সন্ন্যাসীর কুটীরে এসেছেন। তাই ফেরবার পথে আপনাকে হত্যা করবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আমি বনের মধ্যে গা-ঢাকা দিয়ে

বসে ছিলাম। কিন্তু সারাটা দিন কেটে গেল, আপনার ফেরার কোন লক্ষণ দেখতে পেলাম না। উদ্বিগ্ন হয়ে আপনার সন্ধানে লুকোনো জায়গা থেকে বেরিয়ে এলাম। কিন্তু বেরিয়ে আসতেই পড়লাম আপনার দেহরক্ষীদের মুখোমুখি। তারা আমাকে বেশ ভালোভাবেই জানে, তাই দেখবামাত্র একজন তার তরবারিখানা ঝনাৎ করে খাপ থেকে খুলেই বসিয়ে দিলে আমার পেটে আমূল। সন্ন্যাসীর আশ্রমে পৌঁছতে পারলে এদের হাত থেকে বাঁচলেও বাঁচতে পারি, এই আশায় মুমূর্ষু অবস্থায় কোন রকমে তাদের কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করেই সেই দিকে ছুটতে আরম্ভ করি। তার পরের ঘটনা আপনার অজানা নেই' আপনি ছিলেন, তাই আপনার শুশ্রূষায় আমার প্রাণরক্ষা হল, নইলে রক্তপাত হতে হতেই আমার জীবন শেষ হয়ে যেত। আমি আপনাকে হত্যা করতে এসে-ছিলাম, আর আপনিই কিনা আমার জীবন-দান করলেন। এখন আমার একান্ত প্রার্থনা, যদি সত্যই আমি নিরাময় হয়ে উঠি এবং যদি আপনি অনুমতি করেন, তাহলে আজ থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি আপনার একান্ত বিশ্বস্ত ও অনুগত হয়ে থাকব। আমার অপরাধ মার্জনা করুন।"

এত সহজে মহাশত্রুর সঙ্গে সখ্য স্থাপিত হওয়ায় রাজা খুব খুশি হলেন। তিনি যে কেবল তাকে ক্ষমা করলেন তা নয়, তার সেবা-শুশ্রূষার জন্যে নিজ ভৃত্য ও চিকিৎসককে পাঠিয়ে দেবেন বললেন এবং তাদের বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি আবার ফিরিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

আহত লোকটির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাজা কুটীর থেকে বেরিয়ে সন্ন্যাসীকে খুঁজতে লাগলেন। তাঁর ইচ্ছা, ফিরে যাবার আগে শেষ-বারের মতো আর একবার সন্ন্যাসীকে তাঁর প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে অনুরোধ করেন।

কিছু দূরে, আগের দিন যেখানে গর্ত খোঁড়া হয়েছিল সেখানে হাঁটু গেড়ে বসে সন্ন্যাসী সেই গর্তের মধ্যে একটা একটা করে বীজ পুঁতছিলেন। রাজা ধীর পদক্ষেপে তাঁর দিকে এগিয়ে গিয়ে সংকোচভরে বললেন, "হে জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ, শেষবারের মতো আমি আপনার কাছে আমার প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রার্থনা করছি।"

সন্ন্যাসী মাথাটা তুলে রাজার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে মৃদুহাস্যে বললেন, "উত্তর তো তোমাকে দেওয়া হয়ে গেছে।"

"উত্তর দেওয়া হয়েছে! কোথায়। কখন বললেন? আপনি কী বলছেন, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না," বিস্মিত রাজা ইতস্তত করে বললেন।

সন্ন্যাসী বললেন, "তুমি কি বুঝতে পারছ না, গত কাল আমার পরিশ্রম ও ক্লেশ দেখে যদি তুমি সহানুভূতিপরায়ণ না হতে, যদি এই গর্তগুলো খুঁড়ে না দিয়ে তুমি তোমার ইচ্ছা মতো চলে যেতে, তাহলে ঐ লোকটি নির্ঘাৎ তোমাকে আক্রমণ করত এবং হত্যা করত আর তোমাকেও নিশ্চয়ই এই বলে আফশোষ করতে হত, 'হায় হায়, কেন আমি সন্ন্যাসীর কুটীরে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম না!' কাজে কাজেই বেশ দেখা যাচ্ছে, তুমি যখন আমার হাত থেকে কোদালখানা নিয়ে মাটি কোপাতে শুরু করলে সেইটিই ছিল ঐ কাজের একেবারে যথার্থ সময় এবং সেই সময়টায় আমার সঙ্গই ছিল তোমার পক্ষে সর্বাধিক কাম্য ও মূল্যবান। আর আমার কাজ বা কল্যাণ করাই ছিল তখনকার মতো তোমার পক্ষে সবচেয়ে জরুরী ও গুরুতর কাজ। তার পরে ঐ লোকটি যখন দৌড়ে আমাদের কাছে এসে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল এবং তুমি করুণাপরবশ হয়ে ওর শুশ্রূষায় মন দিলে, সেইটেই ছিল ঐ কাজের যোগ্যতম সময়, কেননা তখন-তখনই যদি তুমি লোকটার ক্ষতস্থান ধুয়ে ভালোভাবে বেঁধে না দিতে তাহলে রক্ত-পাতের ফলে নিশ্চয়ই ওর মৃত্যু হত এবং তোমার সঙ্গে ওর মিটমাট ও মৈত্রীও হত না, এ-জীবনের মতো একটা বৈরীভাব থেকেই যেত। আবার সেই সময়ে ঐ লোকটিই ছিল তোমার পক্ষে অত্যাবশ্যক; আর তুমি যেরকম আন্তরিকভাবে মুমূর্ষু লোকটার সেবা-শুশ্রূষা করলে সেই কাজটাই ছিল তোমার পক্ষে সবচেয়ে জরুরী তথা অবশ্য কর্তব্য। কাজে কাজেই প্রথম প্রশ্নের উত্তরে মনেরেখো, যখন যে-কাজই আসুক না কেন, তা সম্পাদন করবার সবচেয়ে উপযুক্ত সময় আছে একটিই এবং সেটি হচ্ছে—'এখন!' একমাত্র এই 'এখনটা'ই সবচেয়ে উত্তম এবং উপযুক্ত কাল। কেননা শুধু এই সময়েই মানুষের কর্মশক্তি এবং প্রীতি পূর্ণমাত্রায় বর্তমান থাকে—ভবিষ্যৎ তো মানুষের অজ্ঞাত, নিয়তির ঘনান্ধকার গহ্বরে আবৃত; কাজেই ভবিষ্যতের ভরসা করা কোনক্রমেই সুবুদ্ধির পরিচায়ক নয়। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে আমি বলব, সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ব্যক্তি তিনিই যাঁর সঙ্গে তুমি অবস্থান করছ, কেননা কেউই বলতে পারে না, ইহজীবনে দ্বিতীয় আর কোন ব্যক্তির সাক্ষাৎলাভের সৌভাগ্য তোমার হবে কিনা। আর তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে জেনে রেখো, সবচেয়ে জরুরী এবং অবশ্যকর্তব্য কাজ হচ্ছে, তুমি যার সঙ্গে অবস্থান করছ, তার কল্যাণ করা; কেননা একমাত্র সেই উদ্দেশ্যেই মানুষ পৃথিবীতে জন্মলাভ করেছে।"

অনুবাদক ঃ জগদিন্দ্র ভৌমিক

# হিউএন্ চ্যাঙ্-এর ভারতভ্রমণ

## —শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু—

(পূর্বানুবৃত্তি)

### হামি-তুরফান-কুচা

হামি থেকে হিন্দুকুশ পর্যন্ত সমস্ত দেশ এ সময়ে পশ্চিম তুরস্ক সম্রাটের অধীনে কতকগুলি রাজ্যে বিভক্ত ছিল।

আধুনিককালে এ প্রদেশ বস্তুতঃ মৃতই বলা চলে কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে ইয়ুরোপীয় প্রত্ন-তাত্ত্বিকদের (বিশেষতঃ Vonle Coq. ও Grünwedel-এর) গবেষণার ফলে এদেশের পুরাকালের সভ্যতার ইতিহাস প্রকাশ হোয়ে পড়ছে। মরুভূমি ক্রমশঃ বিস্তারলাভ কোরে এসব দেশের বহু নগর গ্রাম ইত্যাদি গ্রাস কোরে ধ্বংস করেছে। কিন্তু মরুভূমির শুষ্কতার জন্যেই প্রায়, দেড়হাজার বছরের পুরোনো অনেক শিল্পের নিদর্শন, এমনকি বহুগ্রন্থ, কাগজপত্র বালির মধ্যে থেকে এখনো পাওয়া যায়। এসব থেকে বোঝা যায় যে ষষ্ঠ, সপ্তম শতাব্দীতে এ দেশ বেশ সমৃদ্ধিশালী ছিল আর এদের সাংস্কৃতিক বিশিষ্টতা ছিল।

মধ্য এশিয়ার অন্যান্য জাতির মত, এ সময়ে এরাও বৌদ্ধ ছিল। শিক্ষিতরা সংস্কৃত ভাষায় অনুপ্রাণিত ছিলেন। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এদের লিপি, ভাষা আর আকৃতি।

মৌর্যযুগে ভারতের অধিকাংশ প্রদেশে যে লিপি ব্যবহৃত হত, তার নাম ব্রাহ্মীলিপি। কিন্তু গান্ধার ও উত্তর-পশ্চিম প্রত্যন্ত দেশের শিলালেখ গুলিতে অশোক খরোষ্ঠী লিপি ব্যবহার করেছিলেন, যার সঙ্গে ব্রাহ্মী লিপির চেয়ে পুরাতন ইরাণীয় লিপির সাদৃশ্যই বেশী। এ কিছু আশ্চর্যের বিষয় নয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে যে হিউএনচাঙের সময়ে ব্রাহ্মী-লিপিই তুরফান ও কুচায় ব্যবহৃত হোত। তিনি নিজেই বলেছেন—"এদের লিখবার ধরণ ভারতীয়দেরই মতন, যদিও কিছু কিছু প্রভেদ আছে।"

এঁরা যে ভাষা ব্যবহার করতেন, যে ভাষায় শত শত সংস্কৃত গ্রন্থ এঁরা অনুবাদ করেছেন—সে ভাষা এখন মৃত (আধুনিক পণ্ডিতরা তার নাম দিয়েছেন তুষারীয় বা তুখারীয়)। ভাষা-বিদ্‌রা যদিও এ ভাষা এখনো ভাল কোরে বুঝতে পরেন নি, তবুও যতটুকু বুঝতে পেরেছেন, তাতে মনে হয় যে, প্রাচীন ভারতীয় বা ইরাণীয় কোন ভাষারই সঙ্গে এর তত মিল নেই, যত মিল আছে পুরাতন ইটালিয়ান ও কেল্টিক ভাষার সঙ্গে।

তৃতীয় আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে যে, এদের একদিকে চীন অন্যদিকে আল্টাইয়ে তুরস্ক হোলেও এরা নিজেরা চীনাও ছিল না, তুরস্কও ছিল না।

দেওয়াল পট ইত্যাদিতে অঙ্কিত মূর্তি থেকে বোঝা যায় যে, এরা আর্যজাতীয়ই ছিল—আর ইটালীয়ান ও কেল্টিক জাতির সঙ্গেই এদের আকৃতির বেশী সাদৃশ্য ছিল। এমন কি, সপ্তম শতাব্দীতে এঁরা যে পরিচ্ছদ, আসবাব ব্যবহার করতেন, তার সঙ্গে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ফ্রান্স ও জার্মাণীর সাজসজ্জা, জীবনযাত্রার অদ্ভুত মিল দেখা যায়।

হামির মরূদ্যানে হিউএনচাঙ্ একটি সঙ্ঘা-রামে কিছুদিন যাপন করেন। এই সঙ্ঘারামে তাঁর নিজগ্রামের এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসীকে দেখে ধর্মগুরু আনন্দাশ্রু ত্যাগ করেন।

পশ্চিমদিকের নিকটতম মরূদ্যান ছিল কাও চাঙ্ (আধুনিক তুরফান)। তুরফান, আধুনিক লিংকিআং প্রদেশে বারকুলের দক্ষিণে, মরুভূমির মধ্যে অবস্থিত। এর উত্তরে আর দক্ষিণে পর্বতমালা। রাজধানী ছিল আধুনিক তুরফানের ২৫ মাইল পূবে কারাখোজায়।

হিউএনচাঙের সময়ে এদেশের যিনি রাজা ছিলেন, তিনি চীন দেশীয়। তাঁর নাম ছিল কু-ওএন্-তাই (রাজ্যকাল ৬২০—৬৪০)। ঠাইচুং চীনের সম্রাট হওয়ার অল্প সময়ের ভিতর ইনি সম্রাটের সঙ্গে উপহার আদান প্রদান দ্বারা সখ্য সূত্রে আবদ্ধ হন। এঁর স্বভাব অনেকটা রাজসিক প্রকৃতির ছিল। হিউএনচাঙ হামিতে আছেন শুনে ইনি পঞ্চাশ ষাট জন কর্ম-চারীকে সুসজ্জিত ঘোড়ায় চড়িয়ে হিউএনচাঙকে নিমন্ত্রণ করতে পাঠালেন। হিউএনচাঙের যদিও অন্যপথে যাবার ইচ্ছা ছিল তবু তাঁকে একরকম জোর কোরেই তুরফানে আনা হোল। ছ' দিনের পথ অতিক্রম কোরে তিনি তুরফানে পেঁছিলেন। রাজার প্রেরিত অনুচররা তাঁকে সন্ধ্যার সময়ে পথে বিশ্রাম কোরতে না দিয়ে রাত দুপুরে তুরফানে পেঁ[illegible]দিল। রাজাও সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা না কোরে তখনই মশালের আলোতে পরিব্রাজককে অভ্যর্থনা কোরে এক মহামূল্য আচ্ছাদনে সজ্জিত জমকালো তাঁবুতে স্থাপন করলেন। এই বোলে অভ্যর্থনা করলেন—"গুরুদেব! আপনার এ শিষ্য আপনার আগমন বার্তা শুনে আহ্লাদে আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছে। কোন্ পথে আসছেন শুনে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, আজ রাত্রেই আপনি পেঁছাবেন। তাই আমার স্ত্রী, সন্তানরা আর আমি সকলেই জেগে থেকে ধর্মগ্রন্থ পাঠ করতে করতে আপনার অপেক্ষা করছি। একটু পরেই মহারাণী জন পঞ্চাশেক দাসীর সঙ্গে এসে পড়লেন। রাত্রি যখন প্রভাত হোয়ে এলো, তখন হিউএনচাঙ আর সহ্য করতে না পেরে একটু বিশ্রামের অবকাশ প্রার্থনা করলেন।

হিউএনচাঙের প্রতি রাজার আচরণ এই নমুনামাফিকই চলল। একদিকে যেমন রাজা ধর্মগুরুর চরণে উপহার আর সম্মানের স্রোত নিবেদন করতে থাকলেন আর রাজ্যের মহা মহা ভিক্ষু সন্ন্যাসীদের ধর্মগুরুর আদেশানুবর্তী কোরে রেখে দিলেন, তেমনি আবার এতবড় পণ্ডিতকে হাতে পেয়ে তাঁকে নিজ পারিবারিক গুরু আর তুরফানের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অগ্রণী কোরে এখানেই রেখে দেবার মতলব করলেন। ধর্মগুরু বৃথাই অনুযোগ করলেন "আমি সম্মানলাভ করবার জন্যে এই যাত্রা আরম্ভ করিনি। আমাদের দেশে শাস্ত্রগুলি অসম্পূর্ণ দেখে আমার দুঃখ হয় আর সেই জন্যেই শাস্ত্রোদ্ধার করবার জন্যে আমি মৃত্যুভয় তুচ্ছ-জ্ঞান কোরে, অজ্ঞাত ধর্মমতগুলি জানবার জন্যে পশ্চিমদেশের অভিমুখে যাত্রা করেছি। আমার ইচ্ছা দৈব অমৃতবাণীর ধারা কেবল ভারতবর্ষেই সিঞ্চিত না হোয়ে চীনেরও সর্বত্র সিঞ্চিত হোক্। হে রাজন্ আপনার সঙ্কল্প ত্যাগ করুন আর আমাকে এত বেশী বন্ধুতার সম্মানদানে বিরত থাকুন।"

রাজা এ কথায় কর্ণপাত করলেন না। "আপনার শিষ্যের আপনার প্রতি ভক্তি অসীম। আপনাকে পূজা নিবেদন কোরতে আমি বদ্ধ-পরিকর আর পামিরের পর্বতটলানো বরং সহজ কিন্তু আমার সঙ্কল্প টলানো যাবে না।"

হিউএনচাঙ্ দেখলেন মহা বিপদ। কিন্তু তাঁর সঙ্কল্পও কম অটল ছিল না। তিনিও কিছুতেই রাজি হন না। "তখন রাজা ক্রোধে রক্তবর্ণ হোয়ে উঠলেন আর সম্মুখে হস্ত প্রসারিত কোরে দিয়ে, আস্তানা গুটিয়ে তর্জন কোরে বললেন—"তা হোলে আপনার শিষ্য আপনার সঙ্গে অন্যরকম ব্যবহার করবে। দেখা যাক্ আপনি কেমন কোরে এখান থেকে যান্! আমি জোর কোরে আপনাকে এখানে রেখে দেব আর না হয়তো আপনাকে চীনেই ফেরৎ পাঠাব। ভালো কোরে ভেবে দেখুন! আমার কথাই শোনা ভালো!" হিউএনচাঙ্ সাহসে ভর কোরে বললেন—"আমি ধর্মের জন্যে চলেছি। রাজা আমার হাড় কয়খানা রেখে দিতে পারবেন্। মন বা সঙ্কল্পের উপর তাঁর কোন ক্ষমতা নেই।"

রাজাও ছাড়েন না। এদিকে ভক্তি ও সম্মানের মাত্রা এত বেড়ে গেল যে, রাজা ধর্মগুরুকে নিজের আহার পরিবেশন করতে লাগলেন। অবস্থা বেগতিক্ দেখে হিউএনচাঙ্ প্রায়োপবেশন করবার ভয় দেখালেন। "তিনি সোজা নিশ্চলভাবে অবস্থান করলেন; তিনদিন একফোঁটা জলও মুখে দিলেন না। চতুর্থদিনে রাজা দেখলেন যে, ধর্মগুরুর নিঃশ্বাস অতি ক্ষীণভাবে বইছে। নিজের হঠকারিতায়, লজ্জিত, ভীত হোয়ে তিনি ধর্মগুরুকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত কোরে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।" বুদ্ধদেবের মূর্তির সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করলেন যে, তিনি অতিথিকে যেতে দেবেন। শুধু অনুরোধ করলেন যে, ফিরবার পথে যেন তিন বছর তিনি তাঁর রাজ্যে কাটিয়ে যান। "আর ভবিষ্যতে কোনও কল্পে যদি আপনি বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন, তা হলে প্রসেনজিত বা বিম্বিসারের মত আমি যেন আপনার সেবা করতে পাই।"

রাজার অনুরোধে হিউএনচাঙ্ আর এক-মাস তুরফানে থেকে রাজসভায় ও প্রজাদের ধর্মোপদেশ দিতে রাজী হলেন। রাজা এক চাঁদোয়া টাঙালেন যার তলায় ৩০০ লোক বসতে পারে। মহারাণী, রাজা স্বয়ং, দেশের সমস্ত মঠের অধ্যক্ষরা আর প্রধান প্রধান রাজকর্মচারীরা ভিন্ন ভিন্ন দলে বসে সশ্রদ্ধভাবে তাঁর উপদেশ গ্রহণ করতো। প্রত্যহ উপদেশের সময় হোলে, স্বয়ং রাজা একটা গন্ধদ্রব্যের পাত্র হাতে নিয়ে আসতেন আর সেইখানে একটা পাদপীঠ স্থাপন করতেন। তার উপরে পা দিয়ে হিউএন-চাঙকে প্রত্যহ বেদীতে বসতে হোত।

হিউএনচাঙের যাওয়া যখন স্থিরই হোল, তখন রাজা কু-ওয়েন-তাই তাঁর স্বভাবসিদ্ধ প্রচণ্ডভাবে যাত্রার আয়োজন কোরে দিলেন। তিয়েন-শান্ ও পামির অতিক্রম করবার জন্যে যা যা দরকার, ঐ একমাসের মধ্যে সমস্ত তৈয়ারী হোল। পোষাক, পরিচ্ছদ, সোনা, রূপা, সাটিন; রেশম ইত্যাদি জোগাড় হোল। তিরিশটা ঘোড়া আর ২৪ জন চাকর নিযুক্ত হোল। আর পশ্চিম তুরস্কদের সম্রাটের সভায় ধর্মগুরুকে নিয়ে যাবার জন্যে একজন কর্মচারীও নিযুক্ত হোল। এইটাই হোল তাঁর সবচেয়ে মূল্যবান সাহায্য। কারণ তুরস্করাই এ সময়ে এ দেশে সবচেয়ে প্রবল ছিল। দুইখানা যান, ৫০০ প্রস্থ সাটিন-বস্ত্রে পূর্ণ কোরে তিনি তুরস্ক সম্রাটকে এই সঙ্গে উপঢৌকন পাঠালেন আর তার সঙ্গে একখানা চিঠি দিলেন—"ধর্মগুরু আপনার নফরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি বৌদ্ধধর্মের মূল-গ্রন্থগুলির অন্বেষণে ব্রাহ্মণদের দেশে যাচ্ছেন। আমার নিবেদন যে এই প্রণামপত্রের লেখক নফরকে সম্রাট যে দয়ার চোখে দেখেন ধর্ম-গুরুকে- সেই দয়ার চোখে দেখুন।"

রাজাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, প্রশংসা আর আশীর্বাদসূচক এক লম্বা বক্তৃতা কোরে ধর্ম-গুরু বিদায় নিলেন।

এখান থেকে হিউএনচাঙের পথযাত্রার ধারা বদলে গেল। এতদিন, তিনি চীনসম্রাটের আদেশের বিরুদ্ধে গোপনে রাজকর্মচারীদের ভয়ে ভয়ে অগ্রসর হচ্ছিলেন। কারো কাছে সাহায্য পাবার দাবী ছিল না। তুরফানরাজার আশ্রয় ও সুপারিশপত্র পাওয়ায় তাঁর এই লাভ হোল যে তিনি শক্তিশালী পশ্চিম তুরস্কদের আশ্রয় পাবার অধিকার পেলেন। আর তুরফান থেকে হিন্দুকুশ পর্বত পর্যন্ত সমস্ত প্রদেশের শাসনকর্তা ছিলেন তুরস্ক সম্রাটের ছেলে যিনি
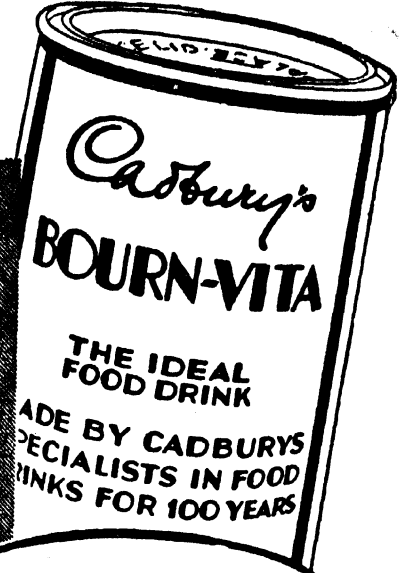

ক্যালসিয়ম ও ভিটামিন আছে বলে
বোর্নভিটা বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের হাড় পেশী পুষ্ট করে।
বোর্নভিটা খেলে বড়োদেরও ভালো ঘুম হয় এবং অফুরন্ত
কর্মোৎসাহ আসে।

আবার তুরফান রাজার জামাতা ছিলেন। কাজেই পথে রাজকর্মচারীদের. ভয় আর রইল না।

যাত্রা করবার দিন তুরফানরাজ, তাঁর সমস্ত সভাসদ, সব ভিক্ষুরা আর নগরের অধিকাংশ লোক নগরের বাইরে পর্যন্ত ধর্মগুরুর সঙ্গে গিয়ে বিদায় গ্রহণ করলেন। তুরফানরাজ সজল-চোখে ধর্মগুরুর কাছে বিদায় নিলেন। ধর্ম-গুরুও ফিরবার পথে তুরফানরাজের সঙ্গে ৩ বছর কাটিয়ে যাবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। হিউয়েনচাঙ যখন ১৪ বছর পরে ভারতবর্ষ থেকে ফেরেন তখন এই প্রতিশ্রুতি পালন করবার কথা তাঁর স্মরণ ছিল, কিন্তু ইতিমধ্যে তুরফানরাজের মৃত্যু হওয়ায় সেটা আর সম্ভব হয় নি।

হিউএনচাঙ তুরফান থেকে "ও-কি-নি" বা অগ্নি (বর্তমান কারাসর) নগরে এলেন। কারা-সরের রাজাও বৌদ্ধ ছিলেন। ধর্মগুরুর সম্মান রক্ষার জন্যে তিনি মন্ত্রীবর্গ সহ সহরের বাইরে এসে ধর্মগুরুকে অভ্যর্থনা কোরে নিয়ে এলেন আর সাদরে রাজপ্রাসাদে বাসস্থান দিলেন কিন্তু প্রতিবাসী তুরফান রাজার সঙ্গে তাঁর সদ্ভাব না থাকায় তুরফানরাজার অনুচরদের তিনি বাস-স্থানও দিলেন না আর ঘোড়া বদল করতেও দিলেন না। কাজেই হিউএনচাঙ এখানে মাত্র একরাত্রি বাস কোরে তারপর একটা নদী আর পর্বত অতিক্রম ক'রে "কুচা" সহরে এলেন।

কুচা সহর (সংস্কৃত কুচী) এ সময়ের মধ্যে এসিয়ার সবচেয়ে প্রধান সহর ছিল। হিউএনচাঙ এখানকার ঐশ্বর্য আর সংস্কৃতি দেখে বিস্মিত হন। "এ রাজ্য পূব থেকে পশ্চিমে এক হাজার লি বিস্তৃত। (৫ লি=১ মাইল) সহরের পরিধি ১৭।১৮ লি। মাটি লাল, জোয়ার আর গমের উপযুক্ত। এখানে চাল, আঙুর, বেদানা, আর প্রচুর পরিমাণে আলুবোখরা, নাসপাতি, পীচ, আড়ু উৎপন্ন হয়। সোনা, লোহা, তামা, সিসা আর রাঙের খনি আছে। আবহাওয়া সুখদ। অধিবাসীরা সুচরিত্র। এদের লিপি ভারতীয়দের লিপির মতন (ব্রাহ্মী)। এখানকার বাদ্যকরদের বাঁশী আর সেতারে অসাধারণ দক্ষতা।" অন্য চৈনিক বিবরণে আর আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায়ও এই সাক্ষ্য পাওয়া যায়। বিস্তৃত গোবি মরুভূমির মধ্যে এই মরূদ্যানের সমৃদ্ধি ও আমোদ প্রমোদের খ্যাতি ছিল। ইরাণ থেকে আনা প্রসাধন সামগ্রী এখানে বিক্রয় হোত। এখানকার স্ত্রীলোকদের রমণীয়তার প্রসিদ্ধি ছিল।

আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার দ্বারা এই প্রদেশ থেকে, বহুকালের শিল্পসামগ্রী, পোড়া ইঁটের ও পলস্তরার তৈয়ারী (Terracotta and stucco) মূর্তি ও অন্যান্য ভাস্কর্য, দেওয়ালপট ইত্যাদি পাওয়া গিয়েছে। (তার বেশীর ভাগই এখন জার্মানীর যাদুঘরে)। এর থেকে দেখা যায় যে, ৩য়, ৪র্থ, শতাব্দীতে এখানকার শিল্পে গ্রীক (গান্ধারীয়) প্রভাব আর ভারতের গুপ্তযুগের প্রভাব যথেষ্ট ছিল। কিন্তু হিউএনচাঙের সমসাময়িক নিদর্শন-গুলিতে ইরাণের প্রভাবই বেশী দেখা যায়। এ সব পট থেকে জানা যায় এই সময়ে কুচা-প্রদেশের জীবনযাত্রা কেমন ছিল, কুচাবাসীরা কিভাবে যুদ্ধযাত্রায় যেতেন, কিভাবে বৌদ্ধ মন্দিরে পূজা দিতেন। তাঁদের পূজার ও যুদ্ধের পোষাক পরিচ্ছদ, অস্ত্রশস্ত্র, যুবক-যুবতীদের রকম সকম, আকৃতি প্রকৃতি সমস্তই কিরকম সমৃদ্ধ ছিল তা এইসব ছবি থেকে বোঝা যায়। এর থেকে বোঝা যায় যে, এদের আকৃতি ছিল অনেকটা আধুনিক ইটালিয়ানদের মত, আচার-ব্যবহার ছিল ইরাণীদের মত আর ধর্মাচরণ সম্পূর্ণ বৌদ্ধ ছিল।

কুচাতে অসংখ্য বৌদ্ধশাস্ত্র সংস্কৃত থেকে অনুবাদ হোত। বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত কুমার-জীব খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে এক ভারতীয়ের বংশে কুচায় জন্মগ্রহণ করেন। অল্পবয়সে কাশ্মীরে গিয়ে ইনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন আর বেদ থেকে আরম্ভ কোরে বৌদ্ধ হীনযান পর্যন্ত সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন কোরে কুড়ি বছর বয়সের আগেই কুচায় ফিরে আসেন। ৩৮৩ খৃষ্টাব্দে চীনের এক অভিযান যখন কুচা আক্রমণ করে, তখন চীন সেনাদল এঁকে উত্তর চীনে নিয়ে যায়। কুচায় ও চীনে ইনি বহু বৌদ্ধগ্রন্থ বিশেষতঃ—সদ্ধর্ম পুণ্ডরিক, "সুত্রালঙ্কার" আর মাধ্যমিক মতবাদের নানা গ্রন্থ অনুবাদ করেন।

হিউএনচাঙ কুচায় ১০০ সঙ্ঘারাম ও পাঁচ-হাজারের বেশী হীনযানী ভিক্ষু দেখেন। তিনি বলেন—"সব সঙ্ঘারামগুলিতেই চমৎকার কারুকার্যময় বুদ্ধমূর্তি আছে। এগুলি বহু-মূল্য রত্নখচিত আর রেশমী বস্ত্রে মণ্ডিত। পর্বের দিনে এসমস্ত মূর্তি রথে চড়িয়ে শোভাযাত্রা করা হয়।" একটা সঙ্ঘারামে তিনি এমন চমৎকার একটা বুদ্ধমূর্তি দেখেছিলেন যে, তিনি বলেন, এটা দেবতার তৈরী।

হিউএনচাঙের সময়ে যিনি কুচার রাজা ছিলেন, তার নাম তুখারীয় ভাষায় স্বর্ণটেপ (সংস্কৃত—স্বর্ণদেব)। এর পিতার নাম ছিল "স্বর্ণপুষ্প"। স্বর্ণদেব খুব ধার্মিক বৌদ্ধ ছিলেন। তাঁর প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন মোক্ষ-গুপ্ত আর মোক্ষগুপ্তের অধীনে ৫০০ ভিক্ষু রাজা দ্বারা প্রতিপালিত হতেন। হিউএনচাঙের আগমনবার্তা পেয়ে রাজা প্রধান প্রধান রাজ-কর্মচারী আর ভিক্ষুদের সঙ্গে কোরে বাদ্য-যন্ত্রসহকরে তাঁকে অভ্যর্থনা কোরে নিয়ে এলেন। নগরে প্রবেশ করবার পর একজন ভিক্ষু তাঁকে এক ঝুড়ি সদ্য ফোটা ফুল দিলেন। সেই সব নিয়ে হিউএনচাঙ নগরের ১০।১২টি বৌদ্ধ মন্দিরে পূজা দিলেন। প্রত্যেক মঠে বুদ্ধের প্রতিমা পূজা করবার জন্যে তাঁকে ফুল ও মদ দেওয়া হোল।

কুমারজীব নিজে যদিও মহাযানী ছিলেন, তবু তাঁর উপদেশ কুচায় বেশী কার্যকরী হয় নি। এখানে হীনযানেরই আধিপত্য ছিল। হীনযানের ক্রমিক মতানুসারে তিনরকম মাংস বৌদ্ধরা আহার করতে পারেন।* কাজেই নিমন্ত্রণ সত্ত্বেও হিউএনচাঙ রাজার সঙ্গে আহার করতে পারলেন না। এদিকে রাজার ধর্মোপ-দেষ্টার সঙ্গে হিউএনচাঙের মতবিরোধ হোল। মোক্ষগুপ্ত "বিভাষা শাস্ত্র" আর "অভিধর্ম-কোশ শাস্ত্রের" দোহাই দিয়ে হীনযান সমর্থন করতে চাইলেন। হিউএনচাঙ জবাব দিলেন—"চীনেও আমাদের এই দুই শাস্ত্র আছে কিন্তু দুঃখের সঙ্গে আমাকে বলতে হবে যে, এগুলি নিতান্ত বাজে আর ভাসাভাসা কথায় পূর্ণ। আমি মহাযান শাস্ত্র বিশেষতঃ যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন করবার জন্যেই দেশত্যাগ করেছি।" মোক্ষগুপ্ত বললেন যে—"মহাযান তো বুদ্ধের বাণী নয়। মহাযান মত তো একটা নতুন মত, বুদ্ধের মতের উপর জোর কোরে বসানো হয়েছে। যে শাস্ত্রে ভুল মত শিক্ষা দেওয়া হয়, সে শাস্ত্র অধ্যয়ন কোরে লাভ কী? বুদ্ধের প্রকৃত শিষ্যরা এসব পাঠ করেন না।" এ কথায় এক মুহূর্তের জন্যে হিউএনচাঙের ধৈর্য্য লোপ হোল। "যোগশাস্ত্র যিনি শিক্ষা দিয়েছেন তিনি মৈত্রেয় বুদ্ধের পূর্ণাবতার ছিলেন। এ শাস্ত্র ভুল বোলে, অনন্ত রসাতলে ডুববার আপনার ভয় হয় না কি?" তর্ক ক্রমশই তীব্র হোয়ে উঠছিল।

যা হোক মতে অমিল হোলেও, হিউএন-চাঙ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন যে, কুচার ভিক্ষুদের অন্ততঃ হীনযান শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান ছিল আর তাঁদের জীবনযাত্রা সাধুজনোচিত ছিল। অপর পক্ষে মোক্ষগুপ্ত হিউএনচাঙের তীব্র ভাষা সত্ত্বেও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বিরত হন নি।

এই অবস্থাটা কতক পরিমাণে অপ্রীতিকর হোলেও এর নিরসনের উপায় ছিল না। কারণ তিএন্‌শান্‌ পর্বত গভীর তুষারাবৃত থাকায় ধর্মগুরু আরও দুমাস কুচায় থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন। আর এসব তর্কের ফলে যে মনে বিরাগ উৎপন্ন হয় নি, তার প্রমাণ এই যে শীতের তীব্রতা কমলে হিউএনচাঙ যেদিন কুচা ত্যাগ করলেন, রাজা স্বর্ণদেব সেদিন তাঁকে বহু ভৃত্য, উট, ঘোড়া ইত্যাদি দিয়ে, নিজে, ভিক্ষু আর গৃহস্থ ভক্তদের সঙ্গে কোরে নগরের বাইরে বহুদূর পর্যন্ত অনুগমন কোরে তাঁকে বিদায় দিয়েছিলেন।

(ক্রমশঃ)

* (১) যে পশু ভিক্ষুর জন্যেই হত হয়েছে বোলে জানা নেই বা সন্দেহ করা যায় না। (২) শিকারী পাখী বা জন্তু দ্বারা হত পশু। (৩) প্রাকৃতিক কারণে মৃত পশু (মানুষের বধ করা নয়)।

স্বাস্থ্য প্রসঙ্গ

# ঘুমন্ত রোগ

**অমরেন্দ্রকুমার সেন**

কোনো কোনো বৈজ্ঞানিক মনে করেন যে, পৃথিবীতে এমন একদিন আসবে যেদিন মানুষের আধিপত্য আর থাকবে না, পোকা মাকড়রাই সেদিন পৃথিবীতে রাজত্ব করবে। তাঁদের অনুমান যদি কোনোদিন সম্ভব হয় তাহলে বোধ হয় সমস্ত মধ্য আফ্রিকার বিরাট স্থান জুড়ে এক মাছির রাজত্ব স্থাপিত হ'বে, যদি না ইতিমধ্যে মানুষ মাছিদের হারিয়ে দিতে পারে। এই মাছির নাম হ'ল "সেট্‌সি", আকারে ছোট, রং বাদামী। এই মাছি মধ্য আফ্রিকায় ক্রমশঃ প্রাধান্য লাভ করছে। উগাণ্ডা, টাঙ্গানাইকা, বেলজিয়ান কঙ্গো, নাইজিরিয়া প্রভৃতি দেশের বহু অঞ্চল মনুষ্য বাসের অযোগ্য করে তুলেছে এই মাছি।

মশা যেমন ম্যালেরিয়া রোগ ছড়িয়ে বেড়ায় সেট্‌সি মাছি সেই রকম 'ঘুমন্ত রোগ' ছড়িয়ে বেড়ায়। অ্যানোফিলিস নামে মশা ম্যালেরিয়া-গ্রস্থ রোগীকে দংশন করে অপর এক সুস্থ ব্যক্তিকে দংশন করলে তার ম্যালেরিয়া রোগ হয়, সেট্‌সি মাছিও সেই রকম ঘুমন্ত রোগ-গ্রস্থ ব্যক্তিকে প্রথমে দংশন করে সুস্থ ব্যক্তিকে দংশন করে তাকেও ঘুমন্ত রোগী করে দেয়। মানুষের ঘুমন্ত রোগকে বলা হয় "স্লিপিং সিকনেস্" আর গৃহপালিত জন্তুদের ঘুমন্ত রোগকে বলা হয় "নাগানা।" গৃহপালিত জন্তু বলা হ'ল এই জন্য যে, বন্য জন্তুদের এই রোগ হয় না। তারা সম্ভবতঃ এই রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শক্তি অর্জন করেছে। ১৯০১ সাল
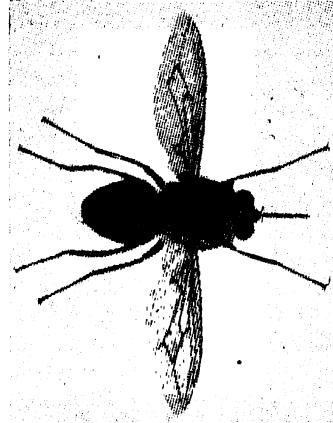
ঘুমন্ত রোগের জীবাণুর বাহক সেট্‌সি মাছি

থেকে ১৯০৫ সালের মধ্যে এক উগাণ্ডাতে ঘুমন্ত রোগে মারা গেছে তিন লক্ষ আফ্রিকা-বাসী। আজ উগাণ্ডার পাঁচ ভাগের মধ্যে চার ভাগ অংশ মনুষ্য বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য হয়েছে।

ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণুর নাম হল প্ল্যাসমোডিয়াম। অনুবীক্ষণ যন্ত্রে ম্যালেরিয়া রোগীর রক্ত পরীক্ষা করলে প্ল্যাসমোডিয়াম জীবাণু দেখা যায়। সেই রকম ঘুমন্ত রোগের জীবাণুর নাম ট্রাইপ্যানোসোম। ঘুমন্ত রোগীর রক্ত পরীক্ষা করলে ঐ ট্রাইপ্যানোসোম জীবাণুর দেখা পাওয়া যাবে। অ্যানোফিলিস নামক মশার মতো সেট্‌সি মাছি একজন মানুষের দেহ থেকে অপর একজনের দেহে ঘুমন্ত রোগের জীবাণু সংক্রমিত করে। অ্যানোফিলিস মশার যেমন রক্ত পান করবার একটি সরু লম্বা ও ধারালো শুঁড় আছে সেট্‌সি মাছিরও সেই রকম সরু লম্বা ও ধারালো শুঁড় আছে, রক্তপান করবার জন্য।

সেট্‌সি মাছি কামড়াবার পর কোনো কোনো ব্যক্তি দু' তিন সপ্তাহের মধ্যে আবার কোনো ব্যক্তি কয়েক মাস পরে রোগগ্রস্ত হয়। যে জায়গাটিতে মাছি কামড়ায় সেই জায়গাটি পরে লাল হয়, তখন থেকেই রোগের লক্ষণগুলি ফুটে ওঠে। প্রথমে জ্বর হয়, সকাল অপেক্ষা সন্ধ্যায় উত্তাপ বেশী ওঠে। প্রথম কয়েক সপ্তাহ জ্বর আসে আবার ছেড়ে যায়, তারপর প্রায় স্থায়ী হয়ে যায়। ইতিমধ্যে রোগী হয়ে যায় ভীষণ দুর্বল, ভোগে রক্তাল্পতায়, শরীরের নানাস্থানের গ্রন্থগুলি স্ফীত হয়ে ওঠে সমস্ত গায়ে কালসিটে পড়ার মতো চাকা চাকা দাগ হয়। চামড়া শুকনো হয়ে যায় কিংবা দেহের বহু স্থানের ত্বক শক্ত হয়ে যায়। কিন্তু প্রধান লক্ষণ হল রোগী ক্রমশঃ সব কিছুতেই অমনোযোগী হয়ে পড়ে, গতি শ্লথ হয় আর সদাসর্বদা সে যেন ঘুমুতে থাকে। তার জিহ্বা ও হাত যেন কাঁপতে থাকতে, যে সময়ে জ্ঞান থাকে সে সময়ে সে একটা চাপা মাথা ধরার ভোগে। খাবার ইচ্ছা মোটেই থাকে না, মুখের

ঘুমন্ত রোগের ভয়ে কাফ্রিরা দলে দলে গ্রাম ত্যাগ করে' চলে যাচ্ছে

ঘুমন্ত রোগের কবলে পড়ে' কাফ্রি পল্লী শ্রী হীন হয়েছে

সামনে খাবার তুলে ধরলে হয়ত খায়, নিজের হাতে খাদ্য গ্রহণ করবার স্পৃহা তার থাকে না। ক্রমশঃ রোগা হ'তে হ'তে দেহ হয়ে যায় কংকালসার এবং আসল রোগ অপেক্ষা উপবাস ও অবসন্দ তার মৃত্যুর কারণ হয়।

সেট্‌সি মাছি আকারে সাধারণ মাছি অপেক্ষা বড় নয় তবে সাধারণ মাছি যেমন সর্বত্র দেখা যায় সেট্‌সিকে তেমন সর্বত্র দেখা যায় না। তারা ছায়া বেশী পছন্দ করে। রোদ পেলেই তারা মরে যায়। গৃহপালিত জন্তু অপেক্ষা বন্য জন্তুর আশ্রয়ে তারা থাকতে বেশী পছন্দ করে। বন্যজন্তুরা বনের ছায়ায় থাকে, রোদ লাগে না, এই জন্যই তারা বন্যজন্তুর আশ্রয় আরও বেশী পছন্দ করে তাও আবার পেটের নীচে থাকে। রোদ ছাড়া এদের ভয় করবার আরও একটি জিনিস আছে তা হ'ল জল। জল খেলেই এরা মরে যায়। সেট্‌সি মাছির একটি

কুসংস্কারগ্রস্ত কোনো কোনো ব্যক্তি রোগীকে কাঠের সংগে বেঁধে রাখে, রোগ তাড়াবার জন্য

বিশেষত্ব আছে। তারা স্থির কোনো জন্তুকে আক্রমণ করে না। বনে কোনো মানুষ যদি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তাকে সেট্‌সি আক্রমণ করে না, কিন্তু চলন্ত লরীর ওপর তারা দলে দলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সেট্‌সি মাছির এই বিশেষত্বের সুযোগ নিয়ে তৈরী করা হয়েছে "হ্যারিস ট্র্যাপ" নামে ফাঁদ। ফাঁদটি আর কিছুই নয়, কাঠের তৈরী জন্তু যাকে যান্ত্রিক কৌশলে নাড়ানো হয়, সেট্‌সি মাছি জন্তু ভ্রমে তাকে আক্রমণ করে। জন্তুর গায়ে সম্ভবতঃ আঠা লাগানো থাকে তাইতে মাছিগুলি আটকে যায়। এইরূপে অনেক সেট্‌সি মাছি মেরে ফেলা হয়।

সেট্‌সি মাছিকে একস্থানে আবদ্ধ করে রাখবার জন্য আর একপ্রকার কৌশল অবলম্বন
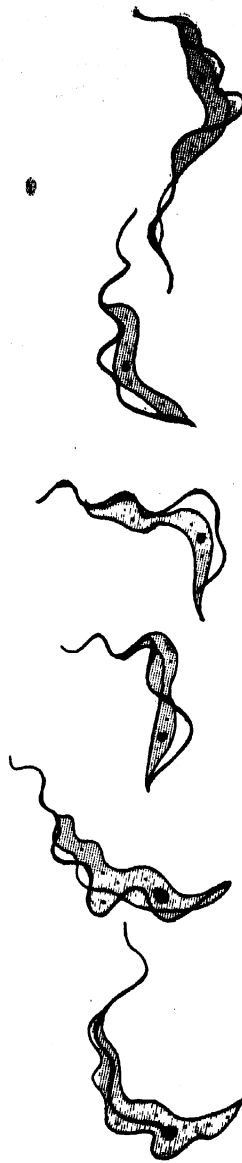
ঘুমন্ত রোগের জীবাণু ট্রাইপ্যানোসোমা

করা হয়। যে অঞ্চলে বন্য জন্তুদের মধ্যে সেট্‌সি মাছি আছে বলে জানা যায় সেই অঞ্চলের জন্তুরা যাতে অন্য অঞ্চলে যেতে না পারে তার জন্য গভীর পরিখা খনন করে দেওয়া হয় অথবা বেড়া দিয়ে দেওয়া হয়, কিন্তু দেখা গেছে যে, দুটির কোনোটিরই কার্যকরী হয় না। বর্ষাকালে পরিখাগুলি ধ্বসে যায় এবং মশার উৎপাত বেড়ে যায়। বেড়াগুলি হাতির দল ভেংগে দেয়।

তবে অরণ্য পরিষ্কার করে কিংবা বন্য জন্তুদের দলে দলে মেরে দেখা গেছে যে সেট্‌সি মাছি মরে এবং ঘুমন্ত রোগের উপদ্রবও কমে যায়। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমান একটা অঞ্চলের সমস্ত অরণ্য সাফ করা যায় না অথবা সমস্ত জন্তু মেরে ফেলা যায় না। বন সাফ করে ফেললে কিংবা বন্য জন্তুদের মেরে ফেললে অন্য প্রকার আত্মঘাতী ক্ষতি হবার সম্ভাবনা আছে। তথাপি গত কুড়ি বছরে একমাত্র দক্ষিণ রোডেসিয়াতে হরিণ, বাঁদর, গণ্ডার, বেবুন, জেব্রা, মহিষ, বন্য শূকর এবং অপরাপর জন্তু মিলিয়ে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ জন্তু মেরে ফেলা হয়েছে।

আর এক উপায় আছে তা হ'লো সেট্‌সি অধ্যুষিত অঞ্চলে বিমান থেকে ডি-ডি-টি ছড়িয়ে

চিকিৎসা কেন্দ্রে আফ্রিকাবাসীরাও কাজ করে

দেওয়া। কিন্তু আফ্রিকা অরণ্যে ছড়াবার মতো অত ডি-ডি-টি কোথায়? তবুও জুলুল্যাণ্ডে কিছু ডি-ডি-টি ছড়ানো হয়েছে, কি ফল হয়েছে এখনও জানানো হয়নি। মানুষকে আক্রমণ করা ব্যতীত সেট্‌সি মাছি গৃহপালিত জন্তুকে আক্রমণ করে। বন্য জন্তুরা ঘুমন্ত রোগে না মরলেও গৃহপালিত জন্তুরা মরে দলে দলে। সেট্‌সি মাছি দিনের রোদে উড়তে পারে না, কিন্তু রাত্রে তারা বেরিয়ে পড়ে দলে দলে, ঝাঁকে ঝাঁকে, হাজারে হাজারে, ঝাঁপিয়ে পড়ে নরনারী শিশু গরু ছাগলের ওপর তারপর তাদের চিরনিদ্রার কোলে তুলে দেয়।

কিন্তু কিছু হাতীর দাঁত আর হীরে অপেক্ষাও আফ্রিকার অন্য সম্ভাবনা আছে। এই যে বিরাট অঞ্চল যেখানে মানুষ বাঁচতে পারে না, চাষবাস যেখানে অসম্ভব সে অঞ্চল কি নিষ্কর্মা হয়ে পড়ে থাকবে? বিজ্ঞান কি সামান্য মাছির কাছে পরাভব স্বীকার করবে? অথচ

পৃথিবীর বহু অঞ্চলে যখন স্থানাভাব ও খাদ্যাভাব তখন এই অঞ্চলে যদি কিছু লোকের বসতি স্থাপন করানো যায় কিংবা চাষবাস করা যায় তবে অনেক সমস্যার সমাধান হয়।

তবে আশার আলো দেখা দিয়েছে। দু'টি নতুন ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে, যার ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে।

প্রথম ওষুধটির নাম হ'ল অ্যানট্রাইসাইড। ঘুমন্ত রোগের জীবাণু ট্রাইপ্যানোসোমকে ধ্বংস করবার জন্য চারজন ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিক গবেষণা আরম্ভ করেন। এই দলের নেতা ছিলেন ডক্টর এফ এইচ এস কার্ড, যিনি ডক্টর ডেভি ও ডক্টর রোজের সহযোগীতায় প্যালুড্রিন আবিষ্কার করেছেন। ডক্টর ডেভিও এই দলে ছিলেন। তবে অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, ওষুধটি আবিষ্কৃত হওয়ার অল্পদিন পরেই ইংলণ্ডের চেসায়ারে এক রেল দুর্ঘটনায় ডক্টর কার্ড মাত্র ৩৯ বৎসর বয়সে মারা যান। ওষুধ আবিষ্কৃত হওয়ার পর খার্টুম, নাইরোবি এবং উগান্ডার এন্টেবি নামক স্থানে ডক্টর ডেভির অধীনে কয়েকটি পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপিত হয়। এই সকল পরীক্ষা কেন্দ্রে অ্যানট্রাইসাইড নিয়ে নানাভাবে পরীক্ষা করে বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসকগণ সন্তুষ্ট হয়েছেন। নতুন ওষুধটি দেখতে অনেকটা সাদা চিনির দানার মতো, মানুষ ও জন্তুর দেহে ইঞ্জেকসানরূপে অথবা অন্যভাবে প্রয়োগ করা যায়। এই কাজ চিকিৎসক ব্যতীত অপর কোনো ব্যক্তিও সম্পন্ন করতে পারে। নতুন ওষুধের রোগ প্রতিরোধ করবার এবং আরোগ্য করবার উভয় ক্ষমতাই আছে। অ্যানট্রাইসাইড এখন পাইকারী হারে প্রস্তুত করা হচ্ছে। উপযুক্ত পরিমাণে পাওয়া গেলেই এটি ঘুমন্ত রোগ অধ্যুষিত অঞ্চলে পাঠানো হবে।

অপর ওষুধটির নাম হ'ল ফেনান-প্রাইডিয়াম। এটিও ডক্টর এল পি ওয়ালস নামে জনৈক ইংরাজ বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কার। এই ওষুধটি জীবজন্তুর ঘুমন্ত রোগ নাগানা আরোগ্য করতে পারে। কেনিয়া, টাংগানাইকা ও উগান্ডাতে এই নতুন ওষুধ ব্যবহৃত হয়েছিল, ফলাফল বিশেষ আশাপ্রদ। ওষুধটির মস্ত সুবিধা এই যে, এর মাত্রা খুব সামান্য।

সদ্য ঘুমন্ত রোগগ্রস্থ ব্যক্তিকে প্রতিষেধক ইঞ্জেকসান দেওয়া হচ্ছে।

ঘুমন্ত রোগের জটিলতা সম্বন্ধে গবেষণা চালাবার জন্য ফ্রেঞ্চ ইকোয়েটোরিয়াল আফ্রিকার ব্রাজাভিল নামক স্থানে পাস্তুর ইনস্টিটিউটের একটি শাখা খোলা হয়েছে।

ইংরাজ চিকিৎসক রোণাল্ড রস ও ইটালীয় চিকিৎসক ব্যাতিস্তা গ্রাসসি আবিষ্কার করেন যে, অ্যানোফিলিস নামে মশা মানুষের দেহে ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু প্রবেশ করিয়ে দেয়; মার্কিন চিকিৎসক ওআল্টার রীড আবিষ্কার করেন যে, স্টেগোমায়া ফ্যাসিয়েটা নামে মশা পীতজ্বর-সংক্রমণের জন্য দায়ী; ডেভিড ব্রুস নামে ইংরাজ চিকিৎসক গত শতাব্দীর শেষ ভাগে আবিষ্কার করেন যে, সেট্‌সি মাছি ঘুমন্ত রোগের জীবাণু ট্রাই-প্যানোসোমের বাহক এবং এই মাছি যার স্থানীয় নাম হ'ল "কিভু", ঘুমন্ত রোগ ও নাগানা সংক্রমণের জন্য দায়ী। মজা হ'ল এই যে, ডেভিড ব্রুস সৈন্য বিভাগে যোগদান করে-ছিলেন দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ না হয়ে অথবা পৃথিবীকে দেখবার জন্যও নয়, বিবাহ করবার জন্য! এই চাকরী গ্রহণ করবার পূর্বে তাঁর এক পয়সাও সম্বল ছিল না। তবে উপযুক্ত স্ত্রী পেয়েছিলেন ডেভিড ব্রুস, স্বামীর সঙ্গে সুদূর আফ্রিকার দুর্গম অঞ্চলে তিনি ভ্রমণ করেছেন, স্বামীর সব কাজে সব সময়েই পাশে পাশে থেকে সব রকম কাজই করেছেন; রান্না করা থেকে আরম্ভ করে সেট্‌সি মাছি ধরা কিংবা মাইক্রোস্কোপের স্লাইড ঠিক করে দেওয়া। ডেভিড ব্রুস মাল্টা ফিভার নামক রোগের জীবাণু আবিষ্কার করেন, সেই সময় নাটাল ও জুলুল্যাণ্ডের শাসনকর্তা তাঁকে আফ্রিকায় নিয়ে যান ঘুমন্ত রোগ সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধানের জন্য। ডেভিড ব্রুস শেষ পর্যন্ত কৃতকার্য হয়েছিলেন। মধ্যে ডেভিড ব্রুসকে অন্যত্র বদলি করা হয়, সেই সময় একদল বৈজ্ঞানিক কাজ করছিলেন। থুইলিয়ার যেমন মিশরে কলেরা রোগের তথ্যানুসন্ধান করতে যেয়ে কলেরায় মারা গেলেন, জেস্ ল্যাজিয়ার পীতজ্বরের গবেষণায় নিজের প্রাণ দিলেন সেই রকম টুলক নামে একজন বৈজ্ঞানিক সেট্‌সি মাছির দংশনে ঘুমন্ত রোগের কবলে প্রাণ দিলেন।

# কাঁচের বাড়ি আর প্ল্যাষ্টিকের লেন্‌স

গত ১৯৪৮এর গ্রীষ্মকালে অলিম্পিক খেলা দেখার জন্য লণ্ডনে বহু দর্শক আসেন বিদেশ থেকে। শহর দেখতে বেরিয়ে
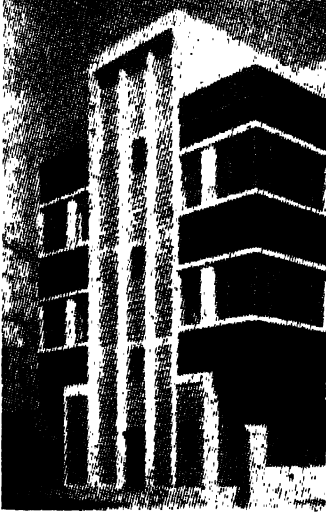
একতলায় দেয়ালে এবং পাশে কাঁচের ইট লাগান রয়েছে। ফলে সিঁড়িতে এবং নীচ তলায় আলোর অভাব হচ্ছে না। বাইরেকার দেয়ালগুলো কালো, মসৃণ ভিট্রোলাইট কাঁচের তৈরী।

তাদের মধ্যে অনেকেই সংবাদপত্রের জন্য প্রসিদ্ধ ফ্লীট স্ট্রীটে যান। সেখানে কোন একটি সংবাদ-পত্রের অফিস বিশেষ করে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই অফিস ভবনের সমস্ত সামনাটাই ছিল কাল কাঁচের তৈরী।

অধুনা স্থাপত্যে কাঁচ ব্যবহারের একটি চমৎকার উদাহরণ হচ্ছে এই সমস্ত বাড়ীটি। এতে যে কাঁচ ব্যবহার করা হয়, তার নাম ভিট্রোলাইট। একপ্রকার ঘষা কাঁচ। দোকান, অফিস, ল্যাবরেটরী, বাথরুম ইত্যাদির বাইরে ও ভিতর দেয়ালের জন্য এর ব্যবহার আজকাল খুবই নজরে পড়ে। কাঁচের ইঁট (!) দিয়ে বাড়ি তোলা আজকাল ফ্যাসানের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে। সুবিধে এই যে, এর ভিতর দিয়ে আলো প্রবেশ করে। অথচ বাইরের গরম ভিতরে আসে না। তা ছাড়া কাঁচের ইঁট শব্দরোধীও বটে। শিল্পীর হাত ও রঙের ব্যবহারে এর সাজ-সজ্জার দিকেও সম্ভাবনা রয়েছে যথেষ্ট।

সম্পূর্ণরূপে বায়ু-নিরুদ্ধ পাত্রে কাঁচ গালিয়ে এ ধরণের কাজ করা হয়ে থাকে।

গৃহাদি নির্মাণ কার্যে ব্যবহৃত পেষক ও পালিশকারক যমজ যন্ত্রের আবিষ্কার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর দ্বারা আধুনিক উন্নত ধরণের এমন সুমসৃণ কাঁচের পাত তৈরী হয় যা নিখুঁত ভাবে জোড়া লাগে। সাধারণত অতিকায় চুল্লীর ভিতর কাঁচ গলান ও পরিশুদ্ধ হয়। এর পর জলে ঠাণ্ডা করা দুটি রোলারের মধ্যে দিয়ে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়। ফলে অবিচ্ছিন্ন ডোরা কাটা কতগুলো দাগ পড়ে কাঁচের গায়ে। অতঃপর এর আয়ুষ্কাল বাড়াবার জন্য আরো কয়েকটি উত্তাপ প্রক্রিয়ার প্রয়োগ করা হয়। এবং সবশেষে পেষক ও পালিশকারক যন্ত্র দুটির মধ্যে দিয়ে যাবার পর কাঁচ একই সংগে উভয় দিকে মসৃণতা লাভ করে। এ ধরণে পালিশ করা কাঁচ অন্য যে-কোন ধরণের কাঁচের চেয়ে অধিকতর মসৃণ। এর ভিতর দিয়ে দৃষ্টিশক্তির গতিবিধি থাকে অবাধ ও অবিকৃত।

আলোকের জন্য বিভিন্ন রকমের যে সমস্ত কাঁচ ব্যবহৃত হয়, তা উচ্চ তাপ সহ্য করতে পারে। পারদ বা সোডিয়াম বাষ্পের ক্ষয়কারী অত্যাচারও এদের অসহ্য নয়। উন্নত ধরণের কাঁচ উৎপাদনের ফলেই আজ দোকানে, অফিস ঘরে, কারখানায় ফ্লোরোসেণ্ট আলোর এত ছড়াছড়ি। বৃটেনে রাস্তার জন্য ফ্লোরোসেণ্ট আলোর ব্যবস্থা হচ্ছে।

### রঙিন কাঁচ

মধ্য যুগে রঙিন কাঁচ উৎপাদনে ইটালীর দক্ষতাই ছিল সব চাইতে বেশী। গত উনবিংশ শতকে বৃটেনে এই শিল্পের পুনরুজ্জীবন
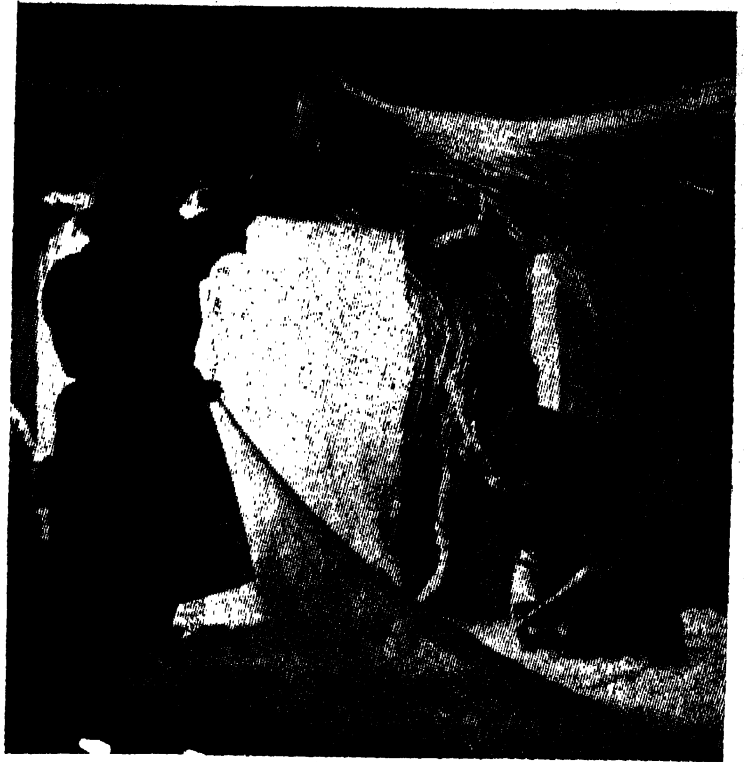
মেয়েরা শিগ্গীরই কাঁচের কাপড় পড়তে পারবেন। ইতিমধ্যেই কাঁচের বিয়ের পোষাকে জনৈকা মহিলার বিবাহ হয়েছে। এ কাপড়ের পাঁচটি কি ছয়টি সুতো একত্র করলে চুলের মত মোটা হবে।

মধ্যযুগীয় রঙিন কাঁচের মত সুদৃশ্য রঙিন কাঁচ উৎপাদন বর্তমানে সম্ভব হয়েছে। ছবিতে একটি গবাক্ষের চিত্র ও চিত্রটির মূল অঙ্কন দেখা যাচ্ছে।

ঘটে। এই কাজের জন্য রসেটি, ফোর্ড ম্যাডক্স ব্রাউন, বার্ন-জোন্স এবং উইলিয়াম মরিসের সঙ্গে লণ্ডনের কোন একটি প্রতিষ্ঠানের উৎসাহপূর্ণ সহযোগিতা বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। এরা কাঁচ গলাবার এমন একটি পন্থা বের করলেন, যার ফলে মধ্যযুগীয় রঙিন কাঁচের অপূর্ব বর্ণসুষমার সমস্ত রহস্য ধরা পড়ে গেল। এই কাজে বিশেষ ব্যুৎপত্তির জন্য জেমস হোগান আন্তর্জাতিক খ্যাতিলাভ করেছেন। বৃটেনে বহু গীর্জার জানালায়, যুক্তরাষ্ট্রে ও অন্যান্য দেশে রঙিন কাঁচ শিল্পের প্রশংসনীয় নিদর্শন রয়েছে। লিভারপুলের নতুন 'ক্যাথিড্রল'টির জানালায় যে রঙিন কাঁচ লাগান রয়েছে তা মধ্যযুগীয় ইটালীয় রঙিন কাঁচের চাইতে নিকৃষ্ট নয়।

এই শিল্পের সর্বশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে রঙিন কাঁচ থেকে বোতাম, মালা ও নানা রকম গয়না তৈরী করা। গত যুদ্ধের সময় ও পরে এই ব্যবসা বিশেষ উন্নতি লাভ করে। অবশ্য ইউরোপ থেকে যে সমস্ত আশ্রয়প্রার্থী বৃটেনে আসেন এই ব্যবসায় কৃতিত্বে তাদেরও হাত রয়েছে যথেষ্ট। আজকাল লেন্স এবং বৈদ্যুতিক ও মোটর শিল্পের জন্য তিনপলা প্রতিফলক কাঁচ উৎপাদনও বেশ সমাদর লাভ করেছে।

কাঁচ শিল্পের আর একটি বিশেষ উৎপাদন হচ্ছে সীসক স্বচ্ছ কাঁচ। ১৬৭৭এ জর্জ র‍্যাভেন্স ক্রফটের এক আবিষ্কার থেকেই এর উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে। বিজ্ঞানের কাজে ব্যবহৃত ও চোখে দেখার জন্য বিভিন্ন রকমের প্রচুর পরিমাণ কাঁচ ছাড়াও কেবলমাত্র বৃটেনে বৎসরে তিনশত কোটি কাঁচের পাত্র ও বোতল তৈর হয়। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, ছ তোলার জন্য আজকাল হলিউডে সব চাই ভাল যে সমস্ত লেন্স ব্যবহার করা হয়, ত সবই বৃটেনের তৈরী। সত্যিই কাঁচ উৎপাদ গত যুদ্ধের পর অন্যান্যের তুলনায় বৃ অনেকখানি এগিয়ে গেছে।

কিন্তু বৃটেনে উক্ত শিল্পের এই অগ্রগতি কারণ অনুধাবন করাও শক্ত নয়। শেফি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঁচ শিল্প শাখার গবেষণা অনুশীলনীই এর উন্নতির মূল কারণ। গ ১৯১৫তে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এই শাখা উদ্বোধন করেন। এবং কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের প থেকে কাঁচ শিল্পে গবেষণার জন্য ঐটিই ছি প্রথম প্রচেষ্টা।

### প্লাস্টিকের লেন্স

লেন্স বলতে আমরা এতদিন ব এসেছি বাঁকা একখণ্ড কাঁচ যা দিয়ে লক্ষ্যব বড় করে দেখা যায়, আলোক-রশ্মিকে ফোকাস করে। অর্থাৎ তথাকথিত কাঁচের লেন বলতে যা বোঝায় আমাদের ধারণা ছিল তা কিন্তু বর্তমানে প্ল্যাস্টিকের লেন্স ব্যবহ সবাইকেই অবাক করেছে।

প্ল্যাস্টিকের লেন্স সমান এক টুক প্ল্যাস্টিকের পাত মাত্র। প্ল্যাস্টিক লেন্ ক্ষমতার রকম ফের করা চলে। অথচ যে তেমন করে আপনি এ জিনিস ব্যবহার কর পারেন। চির খাওয়ার বা ভাঙবার বি সম্ভাবনা নেই। যদিও আপনার বাড়িতেই কাঁচি রয়েছে (নিশ্চয়ই সাধারণ) তাই দি এ কাটা চলবে।

প্ল্যাস্টিক লেন্সের আকারের উপপাত্তিক কোন বাধানিষেধ নেই। কা লেন্সের ঘনত্ব ও আকার ইত্যাদির যে সম

প্ল্যাস্টিক লেন্সটিকে ইচ্ছেমত মাপে কেটে নেওয়া যায়।

আলোক প্রবেশক কাঁচ লাগান দর্জি-বিভাগ

প্রতিফলনের কাজে আস্ত বাঁকা কাঁচের লেন্সের চাইতে এর দক্ষতা কিছুই কম নয়।

অবশ্য একথা সত্যি যে, ক্যামেরাতে বা টেলিস্কোপে যে কাঁচের লেন্স ব্যবহার করা হয়, প্ল্যাস্টিক লেন্স তার মত সূক্ষ্ম কাজ দেয় না। কিন্তু আলোক রশ্মিকে একত্রিত করা বা রশ্মির শক্তি বৃদ্ধি করার কাজে প্ল্যাস্টিক লেন্সের ক্ষমতাই অধিক। টেলিভিসন টিউবের মুখে যদি প্ল্যাস্টিক লেন্স বসান যায়, তবে প্রতিচ্ছবিটি দ্বিগুণ বড় দেখা যাবে। অথবা অধুনা বড় করে দেখার জন্য যন্ত্রচালিত যে সমস্ত উপায় আছে, প্ল্যাস্টিক লেন্স তারই সমান কাজ দেবে। ক্যামেরাতে ফোকাসের জন্য যে গ্রাউন্ড গ্লাস হয়েছে তার সংগে একটি প্ল্যাস্টিক লেন্স জুড়ে দিলে প্রতিচ্ছবিটি আড়াই থেকে দশ গুণ পর্যন্ত অধিক উজ্জ্বল দেখাবে। ফলে খুব অস্পষ্ট আলোকেও লক্ষ্য বস্তুর উপর ফোকাস করা চলবে এবং সেই অনুযায়ী ছবির পরিবেষ্টনী ঠিক করা যাবে।

জটিলতা রয়েছে সে সমস্ত হাংগামাও নেই এর মধ্যে। ছত্রিশ ইঞ্চি ব্যাস নিয়ে বিরাটাকারের প্ল্যাস্টিক লেন্স তৈরী করাও খুব কষ্টসাধ্য নয়। অথচ সমান আকারের কাঁচের লেন্সের চাইতে প্ল্যাস্টিক লেন্সের দাম পড়বে অনেক কম।

নিউইয়র্কের রোকেস্টারের ইস্টম্যান কোডাক কোম্পানী যে নতুন প্ল্যাস্টিক লেন্স তৈরী করতে পেরেছেন তা হচ্ছে দৃষ্টিশক্তির খুব সহজ অথচ কৌশলপূর্ণ কতকগুলো বৈজ্ঞানিক তথ্যের দ্বারা। প্রচলিত কাঁচের লেন্সে পৃষ্ঠভাগটি থাকে বাঁকা। এবং তার জোরেই আলোক রশ্মিগুলো ফোকাস করার অবস্থায় আসে। কিন্তু খালি চোখে প্ল্যাস্টিক লেন্স যথার্থই সমান মনে হয়। যদিও এর পৃষ্ঠভাগটি ছোট ছোট অংশে ভাগ করা এবং ফলে লেন্সের গায় গ্রামোফোন রেকর্ডের মত দাগ কাটা থাকে। অথচ আলোকরশ্মি
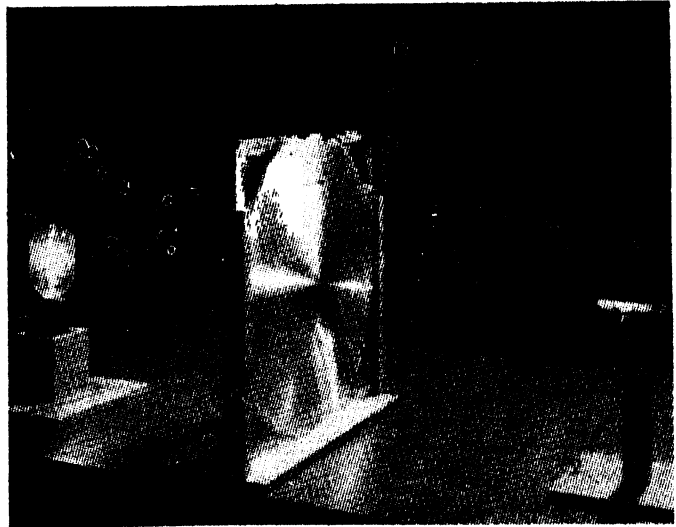
দুটি প্ল্যাস্টিক লেন্সের একত্রিত ফোকাসের দ্বারা সিগারেট ধরান হচ্ছে।

## একই যন্ত্রে চারটি আনন্দ-ব্যবস্থা!

এপ্রিল মাসের পয়লা তারিখে প্যারিস সহরের সিনেমা ও ফটো সালোঁতে অভিনব একটি যন্ত্র প্রদর্শিত হয়েছে। যন্ত্রটি দেখলে সত্যিই অবাক হয়ে যেতে হয়। এটি দেখতে অনেকটা রেডিও সেটের মতই বটে; কিন্তু এই

চারটি আনন্দ এই যন্ত্রে

যন্ত্রটি ভিন্ন ভিন্ন চারটি আনন্দের ব্যবস্থা করে দিতে পারে। প্রথম এটি রেডিও সেটের কাজ করে। দ্বিতীয়তঃ এর ভেতরে রেকর্ড দিয়ে গ্রামোফোনের মত বাজানোও যায়, তৃতীয়তঃ এটিতে এমন ব্যবস্থা আছে যাতে করে সিনেমার ১৬ মিলিমিটার মাপের ফিল্ম চালিয়ে নির্বাক এবং সবাক দু' রকমের ছবিই দেখা বা দেখানো চলতে পারে। সঙ্গের ছবি দেখলেই দেখতে পাবেন যন্ত্রটির ডানদিকে রেকর্ড ঘোরাবার ব্যবস্থা ও যন্ত্রটির বাঁ দিকে ফিল্ম দেখানোর কল-কব্জা লাগানো রয়েছে। এমন একটি যন্ত্র কেনবার জন্য সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। কিন্তু এখনও এ যন্ত্রটি বাজারে ছাড়া হয়নি। আর কয়েকটা দিন সবুর করুন।

## সত্যি কথা প্রকাশ করার দাওয়াই!

অর্থাৎ যারা নানাভাবে সত্যটাকে গোপন করেন, তাঁদের পেট থেকে আসল কথাটা বার করে আনার চেষ্টায় সম্প্রতি এক সমাধান আবিষ্কৃত হয়েছে এবং সমাধানটি হচ্ছে ঘুম পাড়িয়ে সত্যিকথা বার করে নেওয়া। এবং এই ঘুম পাড়াবার জন্য কতকগুলি বিশেষ ধরণের ঔষধও আবিষ্কার করেছেন তাঁরাই। এবং সেই ঔষধগুলির তাই বিশেষ নামকরণও করা হয়েছে Truth Drugs এই ঔষধগুলির মধ্যে কয়েকটিকে ডাক্তারেরা ছোট খাটো অপারেশন বা অস্ত্রোপচার ব্যাপারে কাজে লাগান বলে জানা গেছে। অর্থাৎ সত্যি কথা যার কাছ থেকে আদায় করতে হবে তাকে এই ওষুধ খাওয়ালে তার মধ্যে একটা মাতলামী ও জড়তার ভাব আসে—মনটাও এলিয়ে পড়ে, তাই ওষুধের প্রক্রিয়ায় সে তখন ইচ্ছামত সাজিয়ে গুছিয়ে কথা বলতে পারে না, ফলে বেশীর ভাগ সময়েই বলে ফেলে সহজ ও সত্যি কথাগুলি। পেন্টোথাল, সোডিয়াম, এমাইটাল প্রভৃতি 'সত্য সন্ধানী ঔষধ' এই আখ্যা পেয়েছে। মদের ঝোঁকে যেমন অনেকের পেটের কথা বেরিয়ে আসে—এ ব্যাপারটাও অনেকটা তাই।

## বিয়ের বয়স—একশো পাঁচ!

আমেরিকার অণ্টারিও প্রদেশের ব্রাউন হিল বলে জায়গাটির অধিবাসিনী শ্রীমতী এলিজাবেথ আলেকজাণ্ডারের বয়স সম্প্রতি একশো পাঁচ বছর হয়েছে। তিনি আজীবন কুমারী। এই উপলক্ষে সাংবাদিকেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি বিয়ে করেননি কেন? তার জবাবে কুমারী এলিজাবেথ জানান যে, সাত পনের বছর আগেও তিনি বিবাহের প্রস্তাব পেয়েছিলেন কিন্তু পছন্দমত না হওয়ায় তখনও তিনি সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন; তবে, এখন যদি তেমন উপযুক্ত পাত্রের কাছ থেকে প্রস্তাব পাওয়া যায়, তাহলে হয়তো তিনি বিয়ে করতে পারেন। কথাটা শুনে সাংবাদিকরা আর কি বলবেন! ফিরে এসে ফলাও করে এই খবরটি কাগজে ছেপে দিয়েছেন। যদি পাত্র পাওয়া যায়।

## যন্ত্র করবে সেক্রেটারীর কাজ!

সম্প্রতি ম্যানহাট্টানের মোহক বিজনেস মেশিন কর্পোরেশন 'টেলি ম্যাগনেট' নামে এক নূতন ধরণের টেলিফোন যন্ত্র প্রদর্শন করেছেন—ঐ প্রতিষ্ঠানের সভাপতি জর্জ রায়ান বলেছেন—যন্ত্রটি অনেকগুলি কাজ একসঙ্গে করবে। যখন বাড়িতে কেউ থাকবে না তখন আপনার হয়ে এই যন্ত্রটিই জবাব দেবে যে কেউ বাড়িতে নেই! এটা কি করে সম্ভব হবে জানেন? যেমনি টেলিফোনটা বেজে উঠবে অমনি যন্ত্রটির কলকব্জার সাহায্যে টেলিফোনের রিসিভারটি সরে গিয়ে দাঁড়াবে একটি গ্রামোফোনের রেকর্ডের চাকতির উপরে। গ্রামোফোনের চাকতিটা ঘুরে উঠলেই যন্ত্রের মালিকের নিজের গলার স্বরে বা অন্য কারুর স্বরে জানানো হ

টেলি-ম্যাগনেট বা যন্ত্র-সেক্রেটারী

'বাড়িতে কেউ নেই—আপনার কি বক্তব্য আ তা বলুন।' তখন অপর দিক থেকে যিনি ক করছিলেন তিনি যা বলবেন—অমনি এই যন্ত্র ধাতব ফিতায় তা রেকর্ড করা হয়ে য তারপর বাড়ির মালিক যখন বাড়িতে ফির —তখন তিনি ঐ যন্ত্রের একটি মিটার দে বুঝতে পারেন কজন তাঁকে ফোনে ডেকেছি তারপর সেই রেকর্ড করা ফিতে ঘুরিয়ে শুনে নেন, টেলিফোনে তাঁকে কে কি বলেছে অর্থাৎ এই যন্ত্রটি কার্যতঃ একজন সেক্রেটা কাজ করে দেয়, এটা অনায়াসেই বলা চলে।

# ঋতু

**প্রভাত দেবসরকার**

শোভনা বুঝতেই পারেনি হঠাৎ কখন তার রোগ-পাণ্ডুর জানালার বাইরেটা অমন আশ্চর্য রকমে বদলে গেল—দৃষ্টির শূন্যতায় অভূতপূর্ব রমনীয়তা ধরা পড়ছে আজ। সামনের মাঠটা পেরিয়ে হাসপাতালের কম্পাউণ্ড ছাড়িয়ে উধাও দৃষ্টির আশে পাশে কত না-বোঝা ভাল লাগা ভিড় করছে। মাঠের ধূসর প্রফুল্লতা হাসপাতাল সীমানার দেবদারু গাছগুলোর ডালে ডালে নাড়া দিচ্ছে—আশ্চর্য, এত অজস্র কাঁচপাতাই বা গাছগুলোয় এল কখন? ঝরা পাতার মর্মরে এত খুশী কেন? মাঝে মাঝে পাতা ঝরান ধুলো ওড়ান দমকা বাতাসে মাঠটা কেমন যেন ঘুলিয়ে উঠছে—হাসপাতালের জমাদারটি কম্পাউণ্ড সীমানায় ঝাড়ু হাতে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে।

পায়ের ঢাকাটা অনেকক্ষণ পায়ের তলায় নেমে এসেছে। গা শির-শির করা শীতোষ্ণতায় দেহটা যেন হঠাৎ বড় লঘু হ'য়ে উঠেছে—শিথিল অবসাদের আমেজটা এখন বড় আরামদায়ক। [illegible] শোভনার মনে হয়, তার রোগ সেরে গেল নাকি? নিরবচ্ছিন্ন অবসাদের গ্লানি কেটে গিয়ে হঠাৎ প্রফুল্লতায় মন ভরে উঠেছে! উৎসুক চোখের পাতায় ভ্রমর গুঞ্জনের মত একটা লঘু চেতনা জেগে আছে—মনের কোন ভার নেই, ধার নেই, দায় নেই। বড় ভাল লাগছে। এখন বললে, শোভনা যেন মনের ভাল লাগাটাকে সম্পূর্ণ ব্যক্ত করতে পারবে না। যেভাবে শুয়ে আছে ঠিক সেইভাবে শুয়ে না থাকলে যেন আর এমন ভাল লাগবে না। কতদিন যে এমনি ভাল লাগেনি শোভনা মনে করতে পারে না।

পাশ না ফিরেই সন্তর্পণে শোভনা ডান হাতটা আলগোছা তুলে মাথার ওপর রাখলে—করপল্লবে কপালের স্বেদবিন্দুর স্পর্শ লাগল। বার বার শোভনা ঘর্মসিক্ত আঙুলগুলো নিয়ে চোখের ওপর ধরতে লাগল—একি আশ্চর্য, একি বিস্ময়! শীতের দিন ফুরিয়ে কখন তাপের দিন এল? শোভনার এই শরীরেও ঘাম ছুটছে? সত্যি কি গরম পড়েছে আজ?

ভোরের দিকে শীত পাওয়ার কথা মনে পড়ে যায় শোভনার—বড্ড যেন শীত করেছিল, হাত দুটোকে জড় করে বুকের মধ্যে চেপে ধরেও যেন শীত যায়নি, স্তন দুটোর কোন উত্তাপই তখন শীতার্ত দেহে সঞ্চারিত হয়নি, কম্বলের তলায় নিজের দেহের স্পর্শে নিজেই শোভনা বড় কাতর হ'য়ে উঠেছিল, সারাদেহের কঙ্কাল স্পর্শ তাকে বার বার সঙ্কুচিত করে দিয়েছিল—যা উত্তাপ ছিল বুকে, তাও যেন তখন বড় কৃপণতা করেছিল—বড় অপর্যাপ্ত হৃদয়তাপ রুগ্না শোভনার।

আজ সকালেও টেম্পারেচার ছিল। জিভের তলায় থার্মমিটার দিতে বিরক্তিতে শোভনার কামড়ে দিতে ইচ্ছে করেছিল—ভাল লাগে না রোজ রোজ এমন করে ভাল হওয়ার নামে মৃত্যু-প্রবঞ্চনা ক'রে।

চোখের ওপর তাপ পরীক্ষার যন্ত্রটা নার্স নাড়াচাড়া করতে বড় অস্বস্তি লেগেছিল শোভনার। হাত তুলে নার্সের হাতটা সরিয়ে দিতে চেয়েছিল সে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারেনি—নিশ্চেষ্ট হয়ে আর পাঁচদিনের মত বিছানায় পড়ে রইল, পূর্ণিমায় পক্ষকালের শেষ সময় চাঁদ।

কর্তব্যপরায়ণা নার্স বললে, মুখটা একটু—

বিনা প্রতিবাদে শোভনা আর সব দিনের মত জিভটা বাড়িয়ে হাঁ করে রইল, নার্সের নির্দেশের সবটুকু ব্যক্ত হবার আগেই। কতক্ষণইবা, কিন্তু তবুও শোভনার মনে হ'য়েছিল আজকে অনেকক্ষণ তাপ পরীক্ষার যন্ত্রটা তার জিহ্বাগ্রে গ্রথিত ছিল। একটা স্বাদহীন আস্বাদে মুখটা অনেকক্ষণ বিস্বাদ হ'য়েছিল।

যাবার সময় নার্স বললে, এক্স-রে রিপোর্ট এসে গেছে—আজ থেকেই আপনার এ-পি হ'বে।

যেন কথাগুলো অবান্তর, অর্থহীন, অপর কাউকে বলা হ'চ্ছে—শোভনা শুধু নিষ্পলক চোখে নার্সের দিকে চেয়েছিল। শোভনার আগ্রহহীনতায় নার্সই শেষে অপ্রস্তুত হ'য়ে গিয়েছিল, শুভ সংবাদ বহনের সুস্মিত ভাবটা কখন মুছে গেল। নার্স ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই যেন শোভনার খেয়াল হলো, নার্সের কথা তার বুঝতে না পারার কোন মানে হয় না, তার ভাল হবার জন্যে ভাল ব্যবস্থা হ'চ্ছে অতঃপর। ঠোঁটের কোণে একটু ম্লান হাসিও যেন ফুটে উঠেছিল। তখনো নার্সের সশব্দ পদক্ষেপ শোনা যাচ্ছিল, খুট-খুট-খুট! বড়

নিশ্চিন্ত মনে হ'য়েছিল শোভনার সে শব্দটা। এ-পি হ'লে সে ভাল হ'য়ে যাবে এ বিশ্বাসের আর যেন সায় পাওয়া যায় না মনে। অথচ এই এক্স-রে রিপোর্টের জন্যে কতদিন না শোভনা নার্সকে উদ্ব্যস্ত করেছে—তার রোগের সঠিক ব্যাখ্যার জন্যে মনে মনে কত না ভাঙা-গড়া করেছে! সভয়ে সশংকায় ভেবেছে, না, রোগ তার কঠিন দুরারোগ্য নয়—যত ভয় পেয়েছে, অত ভয় পাবার কারণ সেই—অশুভ বক্ষস্পন্দনে শুভ, নির্ভয় সংবাদের সেকি প্রত্যাশা! কেন বাঁচতে ইচ্ছে নেই কি শোভনার? কে জানে কেন, সত্যি আর তত আগ্রহ নেই শোভনার। হঠাৎ যেন ভাবতে পারে না, এ-পি করলে সে সেরে উঠবে, কিন্তু তারপর? ক্ষতি কি, না সেরে তিলে তিলে ক্ষয় হ'য়ে গেলে? শুধু নিজের জন্যে মানুষ এর চেয়ে কি আর ভাল করে বাঁচতে পারে? রোগ সেরে গেলে তো সে নিজেকে ভুলে যাবে!

তবু শোভনার বার বার মনে হয়েছিল, তাকে সেরে উঠতেই হ'বে। তার জন্যে আর একজন নিজেকে ভুলে যায় কেন। প্রায় প্রতিদিনই সে এসে দেখা করে যায়—সে সবার মুখের দিকে তাকান যায় না, দিন দিন ভাবনায় মানুষটা কাঁটা হ'য়ে যাচ্ছে—রোগ যেন তারই হয়েছে। তাকে দেখে শোভনা রোগ শয্যায় শুয়ে কতদিন সান্ত্বনা পেতে গিয়ে কেঁদেই ফেলেছে। সুরেশ কিন্তু অন্য মানে করে নিয়েছে : ছি, কাঁদবো কেন? শিগ্গীরই তুমি সেরে উঠবে—রোগ হয়েছে তার কি! এর চেয়ে কত শক্ত রোগ আজকাল লোকের হ'চ্ছে। ডাক্তার ভাদুড়ী বললেন, তোমার ও কিছু না, দুদিনেই সেরে যাবে, ছি কাঁদতে আছে!

সেদিন অশ্রু সংবরণ করতে গিয়ে কত অশ্রু যে ঝরেছিল শোভনার মনে নেই। সে বলতে চেয়েছিল, নিজের দিকে একবার দেখ দেখি—কাঁদি কি সাধে। রোগ হ'লো আমার আর তুমি দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছো। কিন্তু মুখ ফুটে কোন কথা বেরোয়নি। সুরেশ তার জন্যে ভেবে সারা হ'চ্ছে এর জন্যেও মনের কোথায় যেন একটা সান্ত্বনা আছে শোভনার। সুরেশ বলেছিল, এ-পি করার সঙ্গে সঙ্গে সেরে উঠবে। এই তো সেদিন আমার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হ'লো, তারও অমনি—

এ রোগেও ভাল হয়ে ওঠার ঐ একটি মাত্র দৃষ্টান্ত সুরেশের মুখে শোভনা অন্তত একশবার শুনেছে—কেমন করে সে বন্ধুটির রোগ হ'লো, কেমন করেই বা সেরে গেল। শোভনার ভয় পাবার কিছু নেই, মিথ্যে ভয়!

শুনে শুনে শোভনার মুখস্থ হ'য়ে গিয়েছিল—সুরেশের অবর্তমানে রোগ মুক্তির কাহিনীটা সময় সময় বানান মনে হ'তো। অন্ধকার কেবিনের মধ্যে এক ঘেয়ে রোগ ভোগের অনুভূতিতে যে ভাব জাগতো সে কি পুনর্জীবনের বাসনা, না মৃত্যুর বিস্মৃতির অতল গহ্বরে তলিয়ে যাওয়ার নিরুপায় স্বীকৃতি? ভাবতে ভাবতে কতবার শোভনা থমকে উঠেছে—লোহার খাটটাও যেন সঙ্গে সঙ্গে শব্দ করেছে। আশ্চর্য এই জাগরণ, মৃত্যু যন্ত্রণার চেয়েও হয়তো মর্মান্তিক, শোভনার মনে হয়েছে এমনি হয়তো তার দম বন্ধ হ'য়ে যাবে, কাল সকালে সুরেশ এসে হয়তো আর তাকে সান্ত্বনা দিতে পারবে না। পাশ ফিরে শোভনা নিজেকে সামলে নিয়েছে, কিন্তু মনটা যেন কেমন উদাস হ'য়ে গেছে—কোন মানে হয় না বাঁচবার আশায় রোজ রোজ এমনি করে মরে যাওয়ার। কাল সকাল হ'তে এখনো কত দেরী কে জানে, জানালার বাইরে মাঠটার উপর অন্ধকারে একটা কি যেন ঘোরাফেরা করছে, অস্পষ্ট একটা ছায়া তারই জানালার কাছে এগিয়ে আসছে যেন। ভয়ে শোভনার বুকের ভেতরটা শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে উঠেছে, বাকশক্তি রোধ হয়ে গেছে—চোখ বন্ধ করেও সে বিভীষিকার হাত থেকে রেহাই পায়নি, অশরীরী প্রেতটা যেন জানালার নীচে চোখ ফেলে অপেক্ষা করছে। কিন্তু বেশীক্ষণ শোভনা চোখ বুজিয়ে থাকতে পারেনি, ভয়ের মধ্যে নির্ভয় হ'তে মাঝে মাঝে অন্ধকারে চোখ চেয়ে দেখেছে। সারারাত শোভনা ঘুমবার অবকাশ পায়নি। রাত-জাগা আতঙ্কে থেকে থেকে দূরাগত শহর চেতনা ফুটে উঠেছে : যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতাল থেকে ভবানীপুর বকুল বাগান আর কতদূর—খাট থেকে কোন রকমে নেমে স্লিপার জোড়াটা পায়ে গলিয়ে চাদরটা গায়ে জড়িয়ে মাঠটা পেরলেই সে এখন বকুল বাগানে পেঁছিতে পারবে! ঐ তো সেখানের সুস্থ জীবনের কলরোল এখন স্পষ্ট কানে বাজছে! মৃত্যু-পথযাত্রীর পক্ষে একি ভীষণ ভাবনা! আর যদি সে কোনদিন নাই ফেরে কেউ কি জানবে শোভনার বাঁচার ইচ্ছেটা দিনে দিনে ভয়ে ভাবনায় কত তীব্র হয়ে উঠেছিল?

সুরেশকে একদিন শোভনা বলেছিল, দিনের বেলাটা বেশ থাকি, কিন্তু রাত্তির হ'লে বড্ড ভয় করে। মনে হয়—

সুরেশ তাড়াতাড়ি প্রশ্নটা চাপা দিতে বলেছিল, ভয়ের কি আছে? আশে পাশে তোমার মত কত লোক আছে—আগে জায়গাটা তত সুবিধের ছিল না বটে, এখন তো আশে-পাশে অনেক বাড়িঘর উঠছে—আর কিছু-দিনের মধ্যে শহর হ'য়ে যাবে। ভাল বাড়িতেই আছ।

শোভনা আর কিছু বলেনি—তার ভয়টা ব্যাখ্যা করে বলবার মত নির্বোধ সে নয়। সুরেশ যদি না বুঝে থাকে তাকে বোঝাবার শক্তিও শোভনার নেই। তাই তো এতে ভয়ের কি আছে!

সুরেশের হাতটা বুকের মধ্যে টেনে চেপে ধরতে ইচ্ছে করেছিল শোভনার—প্রতিদিন রাতের ভয়ের রেশ হয়তো এখনো তার বুকের মধ্যে আছে। সুরেশ নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে। কিন্তু সুরেশ আজকাল যেন একটু দূরত্ব রেখে বসে—অনেকটা ব্যবধান, তার বিছানা থেকে সুরেশের চেয়ার হাত বাড়িয়ে ছোঁয়া যায় না। আর হাত বাড়ালেও হয়তো সুরেশ চেয়ার টেনে কাছে সরে আসবে না। হাতটা হঠাৎ যেন বড় পঙ্গু হ'য়ে গেল শোভনার।

সুরেশ উঠে যেতে শোভনা বিছনার ওপর উঠে বসেছিল। হাত ঘুরিয়ে আলুলায়িত রুক্ষ কেশ বেঁধে নিয়েছিল—জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে চুপ করে বসেছিল খানিক্ষণ গোধূলি ছায়ায় মাঠটা হঠাৎ কেমন বোবা হ'য়ে গেছে, শহরতলীর সঙ্গীহীন একাকীত্বের আসন্ন বিরহ যেন আলো আঁধারে স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে-চোখের ওপর আলো মরে গেল, ছায়া নেমে এল।

মাঠটা আর দেখতে না পেলেও অদূরে অনেকগুলো নতুন ইমারতের ছায়ামূর্তি শোভনার চোখের ওপর আবছা ভেসে রইল আশ্চর্য এর মধ্যে এত বাড়িঘর তৈরী হ'য়ে কখন! গত দেড় বছরে এ জায়গাটার [illegible] পরিবর্তনই না হ'য়ে গেছে! লোকে এ[illegible] বলছে যাদবপুর কলোনি—শোভনাদের [illegible] পাবার কি আছে? শেয়ালের ডাকে মৃত্যু ইঙ্গিত নেই, বাস্তুহারার প্রতিবাদ আছে। [illegible] না, ও শোভনার মনের ভুল! নিশ্চয়ই সে ভ[illegible] হ'য়ে যাবে, আবার বাড়ি ফিরে যাবে ভয় [illegible]

সামনেটা আর দেখা গেল না। [illegible] দুচোখ বেয়ে অশ্রু যেন শেষ হয় না। [illegible] দুটো কোলের ওপর রেখে স্থির হ'য়ে শো[illegible] নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল—কিছুতেই নিজে[illegible] সামলাতে পারলে না। যত ভাবে কেন কাঁদছে ততই যেন কান্নার বেগটা বেড়ে যা[illegible] ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে অশ্রু উদ্বেল হ'য়ে [illegible] আজ এমন কি হ'লো যে, অবনত মুখী সন[illegible] সঙ্গে শোভনার চোখে অশ্রু ঘনাল?

অনেক রাতে ঘুমের ঘোরে গায়ের ঢা[illegible] ঠিক করতে করতে বুকের ওপর হাত [illegible] শোভনার ঘুম ভেঙে গেল। সভয়ে [illegible] হ'লো, তার বক্ষস্পন্দন অতি ক্ষীণ, স্তন [illegible] দৃঢ়তা শিথিল—পীনোন্নত বক্ষঃস্থল স[illegible] অনেকক্ষণ শোভনা রুদ্ধশ্বাসে প্রহর গুনে আর কাঁদতে পারলে না, কেমন কাঠ [illegible] বিছানায় পড়ে রইল। যাদবপুর স্টেশ[illegible] ওপারে কটা শেয়াল তখন ডেকে উঠ[illegible] যক্ষ্মা হাসপাতালের উচ্ছিষ্টভোজী কু[illegible] সাড়া দিলে হৈ হৈ করে। আজকের তি[illegible] আকাশে এখনো চাঁদ থাকবার কথা নয়। কুকুরটার হেংলা চেহারা মনে পড়ে শো[illegible] গায়ের ভেতরটা শিরশির করে উঠলো। [illegible] মত ওটাও একদিন মরবে ঐ শেয়ালগুলোই একদিন টেনে নিয়ে যাবে।

সুরেশ উঠে গেলে রোজ একটা নিশ্চেষ্ট অবসাদ আসে শোভনার সারাদিনের উন্মুখতা কেমন যেন মিইয়ে যায়। এ আসন্ন রাতের ভয়ের জন্যে নয়, রোগের একান্ত উপলব্ধির জন্যেও নয়—আবার অসহায় নির্জীবতার নিমিত্তও নয়। এর সঠিক কারণ শোভনার জানা নেই। রোগের প্রথম দিকে সুরেশকে না দেখলে একদিনও আর বাঁচবে না মনে করেছিল শোভনা, কিন্তু যতদিন যাচ্ছে সে ধারণারও কেমন যেন মানে নেই আর। আজকাল সুরেশ রোজ আসে না, শোভনা তো বেঁচে আছে! শোভনার মন মেনে নিয়েছে, রোজ এসে তার রোগ শয্যার পাশে বসার মত অবসর সুরেশের নাও থাকতে পারে। কিন্তু এই নিয়ে প্রথম প্রথম শোভনা অভিমান করতে ছাড়তো না—জিগ্যেস করতো ঃ কাল এলে না যে? কাজ ছিল?

সুরেশ যেন কত অপরাধ করেছে এমনি-ভাবে অন্যমনস্ক হ'য়ে প্রশ্নটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করতো। অভিমানেও শোভনার ভারী ভাল লাগতো সুরেশের এই অপরাধ স্বীকার করার ভাবটা। শেষে সুরেশ একটা কাজের অজুহাত দেখাতো। একদিনের অদর্শন কত দুঃসহ মনে হ'তো—কত ভালমন্দ শোভনা ভেবে নিতো, কত ভাঙা-গড়া! সুরেশ চলে গেলে বেশী করে মনে হতো সুরেশের না আসার কথাটা—কেন আসেনি; কি এমন কাজ? মাসের মধ্যে হয়তো একদিন, তবু যেন কতদিন পরে পরে সুরেশ তার খোঁজ নিতে আসছে! কেন? কেন? তার রোগের জন্যে কি সুরেশ বিরক্ত হ'য়ে উঠেছে আজকাল? কৈফিয়ৎ চাইবার বদলে শোভনা অনেকদিন চুপ করে গুম হ'য়ে বিছানায় পড়ে থাকতো ঃ যেন সুরেশের আসা-যাওয়ায় আর তার কিছু আসে যায় না। সুরেশ কপালে হাত রেখে তাপ পরীক্ষা করতো—শোভনা পাছে চোখাচোখি হ'য়ে হেসে ফেলে জোর করে চোখ বুজিয়ে থাকতো। কপালে হাত রেখে সুরেশ জিগ্যেস করে, আজ কেমন আছ?

শোভনার কোন সাড়া নেই—যেন রোগের ঘোরে বেহুশ হ'য়ে আছে। সুরেশও হাত ওঠাতো না—শোভনাও সাড়া না করে পড়ে থাকতো। শেষে সুরেশের হাতের স্পর্শটা গভীর হ'লে, নিজের হাতটা আপনা হ'তে উঠে এলে দুটি হাতের গভীর স্পর্শানুভূতিতে বোঝাপড়া হয়ে গেলে, শোভনা চোখ খুলে ম্লান হেসে সুরেশের মুখের ওপর ঠায় চেয়ে থাকতো। সে হাসির অর্থটা এত স্পষ্ট যে, সুরেশ বেশীক্ষণ চোখে চোখে চাইতে পারতো না। মনে হতো এখনি শোভনা এমন একটা কাণ্ড করে বসবে যার জন্যে সুরেশ মোটেই প্রস্তুত নয়। অনেকক্ষণ শোভনা হাত ছাড়তো না। বাইরে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার কথা সুরেশ একাই টের পেত, বেচারা শোভনার খেয়াল থাকতো না, ওদিকে দেখা করার সময় কখন উৎরে গেছে। ছি, কাকে সে সন্দেহ করছে মিছিমিছি? সুরেশ তাকে যত ভালবাসে দুনিয়ার আর কেউ বোধহয় তাকে তত ভালবাসে না—সুরেশের ভালবাসার সম্রাজ্ঞী সে। আর তার চেয়ে সুরেশ নিশ্চয়ই আর কাউকে বেশী ভালবাসে না—না না, বেশী কেন আদৌ ভালবাসে না। তাকে ছাড়া সুরেশ আর কাউকে ভালবাসতে যাবেই বা কেন? একেবারে অসম্ভব! তবুও অভিমান—সন্দেহ-ভরে ইদানীং মনের মধ্যে শোভনার কি যেন একটা হয়—যে-দিনই সুরেশ না আসে সেদিনই দিনের দীর্ঘতা রাতের অপ্রসন্নতা রোগ-ভোগের নিরবচ্ছিন্ন অস্বস্তিকর উপলব্ধির যেন শেষ হয় না। হঠাৎ ঘুম ভেঙে শোভনা মনে করতে পারে না, সে কে—আপন সত্তায় পূর্বাপরের বিস্মৃতি আসে। আশে পাশে এখানে ওখানে খুঁজে দেখলে কাউকে দেখা যায় না—সে নেই, কেউ নেই। কখনো কখনো বুক চাপা কান্নার উদ্বেলতা নিঃসঙ্গ সমুদ্রের হাহাকারের মত শূন্যাশ্রয়ী স্তব্ধতাকে ভেঙে ফেলতে চায়।

অন্যমনস্ক হয়ে এক সময় চোখের ওপর ধরা হাতটা বুকের ওপর পড়ে গেল। হঠাৎ নিজের স্পর্শে নিজেই শোভনা চমকে উঠলো। যেন হাতটা আর কারো গায়ের ওপর পড়েছে—আশ্চর্য শিহরণ! বুকের কাপড়টা কখন সরে গিয়েছিল শোভনা টের পায়নি—জামার বোতাম গুলোও সে কখন খুলে ফেলেছিল। অন্য দিনের তুলনায় আজ কেবিনের ভেতরটা গরম যেন বেশী, অসহ্য নয়—অভূতপূর্ব মনোরম।

স্খলিত হাতটা শোভনা সরিয়ে নিলে না—আবরণচ্যুত বুকে ইচ্ছে করেই চেপে ধরলে। চোখের কোল দুটো হঠাৎ আবেশে ভার হয়ে উঠলো—শিহরণ-পুলকে শিথিল বক্ষঃস্থল উন্নত, পীনোন্নত। দিবানিদ্রার পর শরীরটা এখন বেশ ঝরঝরে লঘু মনে হচ্ছে। যেন সব রোগ সেরে গেছে। অনির্বচনীয় খুশীতে রোগদুষ্ট দেহটা উপছে উঠেছে। উঠে বসে দাঁড়িয়ে ছুটে রোগমুক্তির সংবাদটা যদি এখন জানান যেত!

দুটো হাতই আড়াআড়িভাবে শোভনা বুকের মধ্যে চেপে ধরে থাকে। বাইরের খুশীটা অন্তর্মুখী করার একটা অদম্য বাসনা বুকের ভেতরটা তোলপাড় করে ফেলে। শোভনা চোখ দুটো বুজে থাকে।

সুরেশের সঙ্গে তার পরিচয়টা বড় অদ্ভুত। সেটা বর্ষাকাল—প্রায়ই কাক ভেজা হয়ে শোভনা অফিস যাতায়াত করে। ট্রামবাস থেকে নেমে কোথাও গাড়ীবারান্দার নীচে দাঁড়াবার আগেই সে প্রায়ই ভিজে যায়। যুদ্ধের বাজারে ছাতার দুষ্প্রাপ্যতার সুযোগে কলকাতার বর্ষাও এবার বেশ পিছে লেগেছে। বিরক্ত হয়ে একদিন শোভনা বৃষ্টি থামার জন্যে অপেক্ষা না করে ভিজে ভিজে বাড়ি ফিরছিল। পিছনে একজন ছাতি মাথায় আসছিল। শোভনা দৃকপাত না করেই এগিয়ে চলেছে। হঠাৎ পিছনের ছাতিটা যেন মাথার ওপর বৃষ্টিটা আড়াল করে দিলে—শোভনা থমকে দাঁড়িয়ে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে, পা থেকে মাথা পর্যন্ত একটা সলজ্জ লাজুকতা যেন শিউরে উঠলো। লোকটিকে শোভনা চিনলে।

ছাতার অধিকারী তখন পাশে এসে নিজের পায়ের ভিজে জুতোর দিকে দৃষ্টি রেখে বললে, মানে, বৃষ্টিটা বড্ড জোরে এল কিনা! বড্ড ভিজে যাচ্ছিলেন, তাই—

শোভনা দুপা এগিয়ে ছাতার বাইরে গিয়ে বললে, দরকার হবে না, ধন্যবাদ!

ছাতার অধিকারী অপ্রস্তুত হয়ে বললে, মাপ করবেন—মানে, কিছু খারাপ ভেবে—দেখুন!

আর দেখবার প্রয়োজন শোভনার হয়তো ছিল না। লোকটিকে ইতিপূর্বে সে অনেকবার দেখেছে। আর কে বলছে সে অন্যায় করেছে। তবে বৃষ্টিঝরা দিনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কৈফিয়ৎ শোনবার মেজাজ তার নেই।

ছত্রপতি পিছন থেকে বললে, যদি কিছু অপরাধ হয়ে থাকে ক্ষমা করবেন।

শোভনা ফের থমকে দাঁড়িয়ে গেল বৃষ্টির মধ্যেই। পিছনের লোকটি কিন্তু ছাতা নিয়ে আর এগিয়ে আসতে পারলে না। মাঝখান থেকে বৃষ্টিটা আরো জোরে এসে শোভনাকে একেবারে নাইয়ে দিলে। বাড়িতে এসে চুল মুছতে মুছতে শোভনা মনে মনে হেসে ফেললে। কেন হাসলে নিজেই বুঝতে পারলে না। লোকটার ব্যবহারে না নিজের আচরণে? ছাতার মধ্যে এলে তার কি এমন ক্ষতি হতো? এটা ঠিক তা হলে এমনি করে ভর সন্ধ্যে বেলায় চুল শুকোবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়তে হতো না। এক ছাতার মধ্যে অপরিচিত একটা লোকের পাশাপাশি হাঁটতে তার আপত্তি কেন হলো? কোন মানে হয়না—তা হলে এক ট্রামে বাসে ট্রেনে একসঙ্গে চলা-ফেরা করে কি করে? অপরিচিত কেউ আসন ছেড়ে দিয়ে পাশে দাঁড়ালে নির্লজ্জের মত বসে কি করে? ঠোঁটের কোণে সকৌতুক হাসির সঙ্গে শোভনার কথাগুলো মনে হতে লাগল। সে যাই মনে করুক, লোকটা তার সম্বন্ধে কি মনে করলে কে জানে। এতটা বাড়াবাড়ি, না করলেই যেন শোভনা আজ ভাল করতো। ছি, ছি। ভিজে চুল শুকোবার অছিলায় শোভনা সে-রাত্রে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঘুমুতে পারেনি

সুরেশ কিন্তু ছাড়বার পাত্র নয়। সেই বর্ষার মধ্যেই একদিন শোভনাকে নিজের উন্মুক্ত ছাতার মধ্যে আনতে সমর্থ হয়েছিল। তার পরের ইতিহাস আজ বড় বেদনার সঙ্গে শোভনার মনে পড়ছে। কিছুতেই মনকে সে-সব দিনের চিন্তা থেকে ফেরাতে পারছে না। আশ্চর্য!

চোখ চাইতে জানালার বাইরে দৃষ্টিটা উদাস হ'য়ে উঠলো। সামনের মাঠে অনেকটা ছায়া নেমে এসেছে। একটা শুকনো পাতা খোলা জানালা দিয়ে ছুটে এসে তার বিছানায় পড়ল। বুকের

ওপর থেকে শীর্ণ হাতটা তুলে পাতাটা কুড়িয়ে নিয়ে এমনি নাড়াচাড়া ক'রতে লাগল। মরা-ঝরা পাতার বিশুষ্ক শিরগুলো কি বীভৎস! শোভনা সভয়ে দেখলে তার হাতের শিরগুলো দাগড়া দাগড়া হ'য়ে ফুলে উঠেছে। তাতের ওপরটা কি বিশ্রী দেখচ্ছে!

আজ নিয়ে সুরেশ তিনদিন তাকে দেখতে আসেনি। আজ আর আসবার সময় আছে কি না কে জানে। আত্মীয় বন্ধুদের যারা দেখতে এসেছিল তারা এখন ফিরে যাচ্ছে—মাঠের ওপর দিয়েই তারা হাসপাতালের সীমা অতিক্রম করছে। আজো সুরেশ আসবে না হয়তো এলেও কখন আর আসবে? বাইরে দিনের আলো অনেকটা নিভে এসেছে।

তবুও চোখ দুটোর ঔৎসুক্য নেভে না। ওদের মধ্যে সুরেশকে কিছুতে শোভনা খুঁজে পায় না। কেন সুরেশ আজো এল না? নিজেকে অসহায় অনাত্মীয় ভেবেও শোভনা আজ কাঁদতে ভুলে যায়। তার রোগ হওয়া থেকে আজ পর্যন্ত সুরেশ তার জন্যে যা করেছে, না করলেই যেন ভাল করতো। কোন দরকার ছিল না। দয়া সে কারো চায় না। সে মরে গেলেই বা কার কি? —কি আসে যাবে? একদৃষ্টে চেয়ে থাকায় চোখদুটো বড় করকর করে ওঠে, বড় জ্বালা করে। শুধু শুধু কেন যে সে চেয়ে আছে!

হঠাৎ শোভনা দম বন্ধ করে' জ্বালাময়ী চোখদুটি বিস্ফারিত করে রাখে। হাসপাতালের কম্পাউন্ডের ওধারে নতুন বাড়িটার খোলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে তারি বয়েসী একটি মেয়ে অনেকক্ষণ ধরে কেশচর্চা করছে—মাঝে মাঝে সচকিত হয়ে রেলিং-এ ভর দিয়ে রাস্তার দিকে ঝুকে পড়ে কি যেন দেখছে। শোভনা অনেকক্ষণ লক্ষ্য করেছে। কিন্তু এ কি! মেয়েটি হঠাৎ অত নিশ্চল স্থির হ'য়ে গেল কেন? আর একটি মূর্তি দেখা গেল মেয়েটির ঠিক মুখোমুখি। শোভনা প্রাণপণে আপন ক্ষীণ দৃষ্টিটা উজ্জ্বল করতে চেষ্টা করলে। কিন্তু তারপর? ওরা ওখানে ঐ উন্মুক্ত বারান্দায় দাঁড়িয়ে উতলা প্রকৃতির আলো-আঁধারে পরস্পরকে পরস্পর এত কি প্রশ্ন করছে? ঐ কেশপ্রসাধিকার সামনে দাঁড়িয়ে কে ঐ পুরুষ?

টলতে টলতে জানলার কাছ পর্যন্ত শোভনা উঠে আসে। গরাদ ধরে কিছুক্ষণ নতুন বাড়িটার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থেকে আবার টলতে টলতে বিছানায় এসে মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে। চোখের আশা হয়তো মেটে। বাইরেটা ইতিমধ্যে অন্ধকার হয়ে গেছে।

চাদরের ভেতর থেকে মুখ বার করে' পাশ ফিরতে দেয়ালের গায়ে টাঙানো জ্বরের গ্রাফ চার্টটার ওপর চোখ দুটো আটকে গেল। সেই-দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে শোভনার হঠাৎ মনে হ'লো, দেয়ালটার ওপর একটা বন্ধুর পথ কোথায় যেন নিরুদ্দেশ হ'য়ে গেছে। পথটায় চাদরটা তুলে মাথার ওপর টেনে দিলে—না, কোথাও চেয়ে থাকবার মত চিত্তাকর্ষক কিছু নেই। শুধু শুধু চোখকে পীড়া দেওয়া। ঘুম না আসা পর্যন্ত সে আর চেয়ে দেখবে না।

কিন্তু নতুন বাড়ির বারান্দায় মেয়েটির সামনে গোধূলি বেলায় যে লোকটি এসে দাঁড়াল তাকে শোভনা চেনে না কি? অনেকদিন নিজের রুক্ষচুলে চিরুণী দেওয়া হয়নি, শোভনার মনে পড়ে। অযত্নে তার চাঁচর কেশে অনেক জট পড়ে গেছে।

টেম্পারেচার নর্ম্যাল না হওয়া পর্যন্ত শোভনার ফুসফুসে এ-পি করা আপাততঃ বন্ধ আছে। নার্সকে বলে শোভনা জানালায় একটা পর্দা করিয়ে নিয়েছে।

# বিজ্ঞমুখের কথা

দেহত্যাগের পূর্বে মানুষ প্রস্তুত হয়ে নেয়। সমাজও এই প্রস্তুতির অনুমোদন করে। অজ্ঞাত জগতে প্রবেশ করবার আগে ইহলোকের বন্ধন কাটানো প্রয়োজন। যিনি সংযত ও শুদ্ধসত্ত্ব অথবা স্থিরপ্রজ্ঞ, তিনি প্রত্যাসন্ন প্রয়াণের আভাস টের পান। সেই মত আপনার মনকে তৈরি করে নেন। কিন্তু সাধারণ লোকের অতখানি আত্মস্থ ভাব নাও থাকতে পারে। তাই আত্মীয়-স্বজন, হিতৈষী প্রতিবেশী—এক কথায় সমাজ, কতগুলি ক্রিয়াকলাপের আয়োজন করেছে। বহুদিন রোগভোগে জীর্ণ মৃত্যুপথযাত্রীর মঙ্গলকামনায়, অঙ্গ ও চিত্তশুদ্ধির জন্য প্রায়শ্চিত্ত, বৈতরণী প্রভৃতির ব্যবস্থা শাস্ত্রে অনুমোদিত আছে। কালক্রমে এগুলি অন্তঃসারশূন্য অনুষ্ঠানে পরিণত হয়ে আসে। অনেক ক্ষেত্রেই এসব সংস্কার বর্তমানে পরিত্যক্ত হয়েছে। কিন্তু যেটুকু আজও টি'কে আছে, সেটুকুও নিতান্তই অর্থহীন মনে হয়—যদিও ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের কাছে সেটা খুবই অর্থপূর্ণ। যাঁরা উদাসীন ও নির্বিকার, মৃত্যুর পরে আত্মার অস্তিত্ব আছে কি না এবং পরলোকের জীবনাবস্থা নিয়ে মাথা ঘামান না, তাঁদের কাছে, অবশ্য সমাজপতি অথবা ধর্মধ্বজ ব্যক্তিরা ঘেঁসতে পান না। কিন্তু তার মধ্যে যে সব লোকের এখনও পাঁজি-পুঁথিতে বিশ্বাস আছে, পরলোকের ভয় কিংবা মৃত্যুর পর আত্মার ক্ষুধা-তৃষ্ণা, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি ব্যাপারে আস্থা আছে, তারা সময় থাকতে বৈতরণী, প্রায়শ্চিত্ত বিধির ব্যবস্থা করে

এই প্রসঙ্গে একটি সত্য ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। আমাদেরই প্রতিবেশী এক ভদ্রলোক ছিলেন। তাঁর সঙ্গে কুটুম্বিতার সম্পর্ক ছিল। সেই সূত্রে তাঁর কাছে মধ্যে মধ্যে যাওয়া-আসা চলত। মানুষটি সত্যিই ভালো ছিলেন। অর্থাৎ নিরীহ, নির্বিবাদ। সরকারী চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করে তিনি তখন একাদিক্রমে বিশ বছরেরও ওপর পেনসান ভোগ করছিলেন। স্বাস্থ্য তাঁর ভালই ছিল। মানে, খারাপ হবার উপায় ছিল না। আশির কাছাকাছি বয়স হলেও মোটামুটি তাঁর কার্যক্ষমতা অটুট ছিল। নিয়মিত স্নান, আহার, ঘড়ির কাঁটা ধরে বেড়াতে যাওয়া এবং বাড়ী ফিরে আসা, চাকরের সাহায্যে তৈল-মর্দন, সামান্যতম সর্দির আভাসে ঔষধ-সেবন, দিবা-নিদ্রার বদলে চশমা লাগিয়ে (ধর্মগ্রন্থে অরুচির ফলে) ডিকেন্সের উপন্যাস-পাঠ, প্রত্যহ মধু-ক্ষার-কটু-অম্ল প্রভৃতি নব রস সেবন ইত্যাদি নানা প্রকারের স্বাস্থ্য-রক্ষার প্রক্রিয়া অবলম্বন করার ফলে জরা তাঁকে আক্রমণ করতে পারে নি। জীবনে তাঁকে নিয়মের অতিরিক্ত ভোজন করতে দেখি নি। তবে ঠান্ডার ভয়ে তিনি একটু কাতর হয়ে পড়তেন। প্রতি বৎসর তাঁর বাড়ীতে ধুমধাম করে সরস্বতী পুজো হত। সে সময়ে শীতটা কমে এলেও তিনি মাথা-ঢাকা টুপি পরে বসে থাকতেন। বলতেন—৫-৫২ মিঃ সময়ে সূর্যাস্ত, তারপরেই হিম পড়তে শুরু করে। সাড়ে ছ'টায় অতিথিদের পঙক্তি-ভোজন আরম্ভ হত। আটটায় সব শেষ। সাড়ে আটটা থেকে ন'টার সময়ে কোনও লোক সেই রাস্তা দিয়ে গেলে বুঝতেই পারত না যে এ বাড়ীতে কিছুক্ষণ আগে অনেক নিমন্ত্রিত-অভ্যাগতের দল এসেছিলেন। সাড়ে সাতটা বেজে গেলেই আমরা অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে পড়তুম এবং শত কাজ ফেলেও তাঁর বাড়ীর দিকে ছুটতুম—পাছে গিয়ে দেখি ফটক বন্ধ হয়ে গেছে। অথচ না গেলেও নয়। তিনি অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হতেন। সকাল-সকাল অতিথিদের খাইয়ে অর্থাৎ এক একটি ব্যাচ্ বিশ মিনিটের মধ্যে সেরে আটটায় শেষ করতে হত। তাই দই-মিষ্টি পাতে পড়ছে, ওদিকে বাঁ হাতে আমাদের পান নিতে হত। ভদ্রলোক সাড়ে আটটায় শেষ ছিলিমটুকু খেয়ে নটায় শয্যা গ্রহণ করতেন। এ হেন নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে এতটুকু ফাঁক ছিল না যে যমরাজ উঁকি দেন।

কিন্তু হঠাৎ একদিন বেড়াতে গিয়ে দেখি তাঁর হাতে গীতা। একটু বিস্মিত হলুম, ভাবলুম বোধ হয় কৌতূহলের বশে ধর্মগ্রন্থ একটু আধটু উলটে দেখছেন। কিন্তু তার কিছুদিন পরেই কি একটা পুণ্যতিথি উপলক্ষ্যে তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রিত হয়ে পেলাম একখানি পকেট গীতা এবং একটি রুপোর সিকি। সে সব সত্যযুগের কথা—একটি সিকিতে তখন এক প্যাকেট গোল্ড ফ্লেক, একটি দেশলাই আর এক দোনা মিঠে পান পাওয়া যেত। তবু গীতার বিতরণ দেখে ভাবিত হলুম। পরে সন্ধান নিয়ে জানলুম যে তাঁর স্বাস্থ্য ভালো যাচ্ছে না, ভাঙন ধরেছে। মধ্যে মধ্যে বেড়াতে না বেরিয়ে বাড়ীতেই সদালাপ চলেছে এবং তার চেয়ে যেটি বড় সমস্যা একজন যাজক ব্রাহ্মণ পিছু নিয়েছে। তারপর থেকেই ভদ্রলোকের স্বাস্থ্য আরও ভাঙতে লাগল এবং সেই অনুপাতে পুণ্যাহ [illegible] ব্রাহ্মণদের দান-দক্ষিণা ইত্যাদি বাড়তে লাগল। অবশেষে কয়েক মাস শয্যাশায়ী হয়ে রইলেন। ইতাবসরে উইল তৈরি হ'ল। প্রাপ্তির আশায় সেই ধর্মোপদেষ্টা পুরোহিতটি তখনও সঙ্গ ছাড়েন নি। শেষ মোকায় যদি আরও কিছু মেলে, এই চিন্তায় তাঁর যাতায়াত আরও বেড়ে গেল। শয্যার পাশে বসেই তিনি ধর্মগ্রন্থ পাঠ, অধ্যাত্ম-চর্চা, পরপারের কড়ি-সঞ্চয় প্রভৃতি প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্যগুলি কখনো প্রাঞ্জল ভাষায়, কখনো নাটকীয় ভঙ্গীতে বেশ বিশদ ভাবেই বোঝাতে লাগলেন। এসব কাজের জন্য, ডাক্তারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরও চার টাকা দৈনিক ফি ধার্য্য হল। ঘরের আত্মীয়-স্বজন ইতিমধ্যে এই পুরোহিতের অত্যাচারে উত্যক্ত হয়ে উঠলেন।

অবশেষে শেষ মুহূর্ত একদিন ঘনিয়ে এল। সে সময়টা আমি ছিলুম। অতএব যা দেখেছি, তাই লিখছি। যখন ডাক্তার জবাব দিয়ে গেলেন যে আশা নেই, এখন কেবল শেষ সময়ের প্রতীক্ষা, তখন মুমূর্ষু বৃদ্ধ হলেও পুত্র কন্যারা বিমর্ষ হলেন। কিন্তু পুরোহিত দমবার পাত্র নন। সময়টা ছিল সন্ধ্যা। তিনি আসছি বলেই চট্ করে বেরিয়ে গেলেন, বোধ হয় খেয়েদেয়ে এসে কাজে লাগবেন বলে বলসঞ্চয় করতে গেলেন। যাবার সময়ে তাঁর সহকর্মী ভাইপোটিকে নজর রাখবার জন্য বাইরের ঘরে বসিয়ে রেখে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি ফিরে এসে বাড়ীর বড় ছেলেকে ডেকে বললেন, কর্তার ইচ্ছা ছিল, প্রায়শ্চিত্ত-বৈতরণী করা হয়। বহু দিন শয্যাশায়ী হয়ে রোগভোগ করলে প্রায়শ্চিত্ত করাই যুক্তিসঙ্গত। তা ছাড়া, কৃতী পুরুষ, যশস্বী ব্যক্তির মৃত্যুকালে যদি উপার্জনশীল পুত্রেরা এই সামান্য কর্তব্যটুকু দেখান, তাহলে কলি পূর্ণ হয়েছে বলতে হবে......।" কেউই রাজি হলেন না। কিন্তু পুরোহিত যখন বললেন, 'কর্তার এখনও একটু জ্ঞান আছে। আমি একবার তাঁর কাছে যাবো, দেখি তাঁর কি ইচ্ছা, তখন সকলে সন্ত্রস্ত হয়ে নিতান্ত অনিচ্ছায় সম্মতি দান করলেন। আমি বাইরের উঠানে ছিলুম। দেখলুম পুরোহিত নেমে এসে ভাইপোকে ইঙ্গিত করবা মাত্রই দুজনেই শশব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে গেলেন। এবং আশ্চর্যের বিষয় অল্পক্ষণের মধ্যেই যাবতীয় উপকরণ নিয়ে হাজির হলেন। শয্যার পাশেই দাঁড়িয়ে, কখনো বা বসে ক্রিয়া চলতে লাগল। রোগী তখন অসাড়। কিন্তু কাজের কোনও ব্যাঘাত হল না। পুরোহিতের অদম্য উৎসাহ ঘনায়মান মৃত্যুশোককে যেন নিমেষে বাক্যবাণের সাহায্যে দূর করে দিল। এর পর বৈতরণীর পালা। পুরোহিত বললেন, গাভী তো নেই। অতএব গাভীর বিনিময়ে দক্ষিণা দিলেই চলবে। দক্ষিণার পরিমাণ শুনে সকলেই হতভম্ব। এমন সময় কর্তার ছোট ছেলে বলে উঠলেন,

"শাস্ত্রীয় মতে যখন কাজ হচ্ছে তখন কোনও ত্রুটি হতে দেব না। যদি গাভী না মেলে, বাছুর কিনে আনছি।" তিনি আমার দিকে তির্যক্ দৃষ্টিপাত করতেই আমিও তাঁর সংগে বেরিয়ে এলুম। তারপর দুজনে পরামর্শ এ'টে নিকটেই গলির মধ্যে এক গোয়ালার কাছ থেকে একটি বাছুর সংগ্রহ করে নিয়ে এলুম। পুরোহিতকে খবর দেওয়া হল। তিনি আসন ত্যাগ করে তাড়াতাড়ি নেমে এসে বাছুরটিকে দেখে বড় প্রীত হলেন। মনে-মনে ততক্ষণ তিনি বাছুরটিকে বিক্রি করলে কত দর পাওয়া যাবে তার একটা হিসাব-নিকাশ করে ফেলেছেন।

এখন মহা-সমস্যার সৃষ্টি হল—বাছুরটিকে দোতলায় কর্তার পাশে কি করে নিয়ে যাওয়া যায়। এত লোকজনের মধ্যে বাছুরটি অত্যন্ত ভীত-চকিত হয়ে পড়েছে। অনেক চেষ্টা করে তাকে নাড়ানো গেল না। বাছুরটি নিতান্ত কচি নয় যে পাঁজাকোলা করে তোলা যাবে। তখন পুরোহিতেরই গামছা গলায় বে'ধে তাকে টানতে হল। সি'ড়ির কাছে এসে কিন্তু 'পাদমেকং ন গচ্ছামি' অবস্থা। অগত্যা পুরোহিত তার কান দুটো মর্দন করতে লাগলেন। কর্তার ছোট ছেলে গামছা ধরে টানতে লাগলেন আর আমি পশ্চাতে দাঁড়িয়ে লেজ মোচড়াতে লাগলুম। প্রথমে ভয়ের চোটে বাছুরটি সি'ড়িটা নোংরা করে ফেলল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আধ ঘণ্টা ধস্তাধস্তির ফলে তাকে ওপরে নিয়ে যাওয়া গেল। ইতিমধ্যে আমাদের অধ্যবসায়ের ফল কি দাঁড়ায় তা দেখবার জন্য সমবেত স্ত্রী-পুরুষ মুমূর্ষু বৃদ্ধকে ছেড়ে সি'ড়ির কাছে জমায়েৎ হয়েছেন।

সে যাই হোক্। আমাদের কাজ উদ্ধার হল। অচৈতন্য বৃদ্ধের অবশ হাতখানিতে কোনও প্রকারে গরুর লেজে ঠেকান হল এবং সংক্ষেপে মন্ত্র পাঠ শেষ হল। এবং আশ্চর্যের বিষয়—তার একটু পরেই বৃদ্ধের প্রাণবায়ু নির্গত হল। যেন গরুর লেজ ধরে বৈতরণী পার হবার প্রতীক্ষাতেই তাঁর শেষ নিঃশ্বাস আটকে ছিল। কিন্তু তারপরেই পুরোহিত বুঝতে পারলেন যে তিনি ঠকে গেছেন। ওটি পুরুষ বাছুর। স্ত্রী-বৎস হলে লাভের আশা ছিল। জিনিস-পত্র-সমেত বাছুরটিকে নামিয়ে অগত্যা বাড়ী রওনা হলেন। কিন্তু হঠাৎ গামছাশুদ্ধ বাছুর চার পা তুলে দৌড়ে পাশের গলিতে তার মনিব গোয়ালার চালা ঘরে গিয়ে ঢুক্‌ল। আমাদের বৈতরণী-পালাও সাঙ্গ হল।

পাকিস্থানে ভারত সরকারের চীফ কমিশনার স্যার শ্রীরাম পূর্ব পাকিস্থানে সফরের পথে কলিকাতায় উপনীত হইয়াই পূর্ব পাকিস্থানের হিন্দুদিগের কর্তব্য সম্বন্ধে নিজ মত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছিলেন। তিনি বলেন—

"আমি পূর্ব পাকিস্থানের মুসলমানাতিরিক্তদিগকে ভয়ে গৃহ গ্রাম ত্যাগ করিয়া পলায়ন না করিয়া দৃঢ় ও সবল দেখিতে চাহি। তাঁহারা পাকিস্থানের প্রজা এবং পাকিস্থানের প্রজারূপেই তাঁহাদিগকে যাহা পারেন করিতে হইবে। তথায় মুসলমানাতিরিক্তগণ নিজ নিজ বাসস্থানে থাকিয়া বিপদ ঘটিলে আপনাদিগের গৃহ ও মন্দির রক্ষা করুন। তাঁহাদিগকে তাঁহাদিগের মুসলমান ভ্রাতৃগণের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সহযোগিতা করিতে হইবে। আমার মনে হয়, ভয়ের কোন কারণ নাই। তবে আমি বলিব—সমাজের উচ্চ স্তরের লোকরা যেন গৃহ ত্যাগ না করেন। জনগণের কোন ত্রুটি নাই; কিন্তু উচ্চ স্তরের লোকরা চলিয়া আসিলে তাহারা পরিত্যক্ত হইবে। তাহা অভিপ্রেত নহে। শিক্ষিত ও উচ্চস্তরের লোকরা জনসাধারণের সহিত একযোগে কাজ করিবেন। ভারত রাষ্ট্র ও পাকিস্থান আদর্শ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত করিতে আগ্রহসম্পন্ন। উভয়ে অতীতের কথা বিস্মৃত হইয়া সৌহার্দ প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন।"

স্যার শ্রীরাম বলিয়াছেন—ইহাই ভারত সরকারের অবলম্বিত নীতি। তিনি যদি ভারত সরকারের বশংবদ কর্মচারী হিসাবে কথা বলেন, তবে আমরা বলিব, তাঁহার পূর্ব পাকিস্থান সফরে পূর্ব পাকিস্থানের হিন্দুরা কোনরূপ উপকারের আশা করিতে পারেন না। কিন্তু যদি তাহা না হয়, তবে আমরা অবশ্যই বলিব, তিনি পূর্ব পাকিস্থান সফরে তথায় ত্যক্ত হিন্দুদিগের অবস্থা অধ্যয়ন করিয়া পরে মত প্রকাশ করিলে ভাল করিতেন। তিনি যে বহু নিন্দিত ইংরেজ সরকারের ও সেই সরকারের আমলাদিগের মত পূর্ব পাকিস্থানে হিন্দুদিগকে—হিন্দু না বলিয়া "মুসলমানাতিরিক্ত" বলিয়াছেন, তাহা কি ভারত সরকারের ব্রিটিশ সরকারের নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত নীতিসম্মত? আমরা লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি, পশ্চিমবঙ্গের প্রধান সচিবও পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘিষ্ঠদিগকে হিন্দু বলিতে অসম্মত! কলিকাতায় আসিয়া প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু অত্যন্ত সরলভাবে বলিয়াছিলেন, পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা পাকিস্থানে ফিরিয়া না যাইলে আশ্রয়প্রার্থি-সমস্যার সমাধান হইবে না; কারণ তাহা ব্যতীত ঐ সমস্যার সমাধান করিতে ভারত সরকার অক্ষম। স্যার শ্রীরাম যেন প্রধান মন্ত্রীর উক্তির বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, পূর্ব পাকিস্থানের হিন্দুরা পাকিস্থানের প্রজা—কাজেই পাকিস্থানেই তাহাদিগের ভাগ্যে যাহা ঘটে ঘটিবে। তিনি বলিয়াছেন, ভয়ের কোন কারণ নাই। কিন্তু যেদিন তিনি উদ্ধৃত উক্তি করিয়াছেন, তাহার পরদিন 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র প্রতিনিধি বর্ধমান হইতে সংবাদ দিয়াছেন—

খুলনা জেলার শালপুর গ্রামের শিবনাথ শিকদারের স্ত্রী শ্রীমতী কৌশল্যা দাসীকে কতিপয় মুসলমান পাকিস্থান হইতে অপহরণ করিয়া বর্ধমান শহরে আটক রাখিয়াছে বলিয়া বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভা হইতে সংবাদ পাইয়া বর্ধমান জেলা হিন্দু মহাসভা সম্পাদক শ্রীশ্রীকুমার মিত্র, স্থানীয় পুলিশে সহায়তায় গতকল্য (যেদিন স্যার শ্রীরা কলিকাতায় উদ্ধৃত উক্তি করেন সেইদিন জনৈক মুসলমানের বাড়ি হইতে তাহা উদ্ধার করিয়াছেন। প্রকাশ, স্বামী অনুপস্থিতিতে দুর্বৃত্তগণ তাহাকে হরণ ক এবং সোলপুরে একটি খালি বাড়িতে তাহ উপর পর পর দুই দিন পাশবিক অত্যাচার ক এবং তাহার পর তাহাকে বর্ধমানে লইয়া আসে আবদুল মজিদ নামক এক ব্যক্তির নিব তাহাকে রাখা হইয়াছিল। এখানে তাহা বিভিন্ন স্থানে এমন কি জনৈক অবসরপ্রা সরকারী কর্মচারীর গৃহে রাখা হইয়াছিল পুলিশ আবদুল মজিদ, আবদুল লতিফ এ রাবিয়া বেগম নামক একটি স্ত্রীলোক গ্রেপ্তার করিয়াছে। অন্য আসামীরা পূর্বে পাকিস্থানে চলিয়া গিয়াছে।

এক্ষেত্রে জিজ্ঞাস্য পাকিস্থান সরকার কি অভিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে বিচারের জন্য পশ্চি বঙ্গে পাঠাইয়া দিবেন? কলিকাতায় হ্যারিস রোডের মামলায় আদালতে যাহাদিগ বিচারার্থ চাহিয়াছিলেন, বলা হইয়াছিল তাহারা পাকিস্থানে গিয়াছে। পাকিস্থান স কার যে তাহাদিগকে পাঠাইয়া দিয়াছেন এ সংবাদ আমরা পাই নাই। ঐ ব্যাপা পাকিস্থানের মুসলমান দুর্বৃত্তদিগের সহি হিন্দুস্থানের মুসলমান দুর্বৃত্তদিগের ঘনি যোগের ও সহযোগের পরিচয় রহিয়াছে।

ইহার পরেও কি স্যার শ্রীরাম বলিবেন ভয়ের কোন কারণ নাই; ভারত সরক পাঞ্জাবে হিন্দুদিগকে ঐরূপ সদুপদেশ বিত করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। আজ ব হইয়াছে, ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান প্রতিনি প্রতিষ্ঠানের সম্মতিতে ভারতবর্ষ বিভ

কারের প্রজা হইবার সুযোগ নাই! একথা কি পূর্ব পাকিস্থানের হিন্দুরা মানিয়া লইবেন? পাকিস্থান অকুণ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছে, তাহা ইসলাম রাষ্ট্র। তথায় অমুসলমানরা কিরূপ ব্যবহার আশা করিতে পারেন?

তিনি বলিয়াছেন, ভারত রাষ্ট্র ও পাকিস্থান পূর্ব কথা বিস্মৃত হইয়া পরস্পরের মধ্যে আদর্শ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত করিতেই আগ্রহশীল। তিনি হিন্দুস্থান সরকারের কর্মচারী—ভারত সরকারের মনের কথা জানিতে পারেন, কিন্তু তিনি কিরূপে পাকিস্থান সরকারের মনের কথা ব্যক্ত করিতে পারেন? নোয়াখালি, ত্রিপুরা প্রভৃতি স্থানে মুসলমানদিগের যে মনোভাবের পরিচয় পাইয়া গান্ধীজী বলিয়াছিলেন, তিনি অন্ধকারে আলোক-সন্ধান পাইতেছেন না, পাকিস্থানে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় কি সেই মনোভাব ছিন্ন কন্থার মত ত্যাগ করিয়াছে?

স্যার শ্রীরাম বলিয়াছেন, তিনি পূর্ববঙ্গের অবস্থাদি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। যদি তাহাও হয়, তবে কি তিনি সে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া অবস্থা বিবেচনা করিয়া অভিমত প্রকাশ করিলেও তাহা মূল্যবান হইত না। আদর্শে ও বাস্তবে যে অনেক প্রভেদ হয়, তাহা আশা করি, তিনি স্বীকার করিবেন। তিনি পূর্ববঙ্গে যাইয়া গ্রামে হিন্দুদিগের অবস্থা দেখিয়া ও তাঁহাদিগের সহিত সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়া আসিয়া মত পরিবর্তন করেন কিনা, তাহা জানিবার জন্য আমরা যে উৎসুক হইয়া থাকিব, তাহা বলা বাহুল্য। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল একবার বলিয়াছিলেন, পাকিস্থান যদি পূর্ববঙ্গের হিন্দুদিগকে আত্মসম্মান আক্ষুণ্ণ রাখিয়া বাসের সুযোগ প্রদান না করে, তবে তাহাদিগের জন্য আবশ্যক ভূমি পাকিস্থানের নিকট দাবী করা হইবে—ভারত সরকার তাহাদিগের দুঃখ দুর্দশা দেখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন না। স্যার শ্রীরামের উক্তির সহিত সে উক্তির সামঞ্জস্য নাই। স্যার শ্রীরাম বলিতেছেন, যে সকল হিন্দু পাকিস্থানে রহিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা যখন পাকিস্থানের প্রজা তখন তাঁহাদিগকে সেইভাবেই কাজ করিতে হইবে। আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, যদি কোন কারণে উভয় রাষ্ট্রে বিরোধিতার উদ্ভব হয়, তবে তিনি এই সতর্ক হিন্দুর নিকট কিরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা করিবেন? আমাদিগের মনে হয়, স্যার শ্রীরাম পূর্বে পাকিস্থানে হিন্দুদিগের অবস্থা দেখিতে আসিয়া তাহা না দেখিয়াই এইরূপ মত প্রকাশ করিয়া যে অবিমৃষ্যকারিতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা তাঁহার মত পদস্থ ব্যক্তির উপযুক্ত নহে।

মানভূম সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে ২টি বিষয় বিশেষ লক্ষ্য করিতে হয়—

(১) যাঁহারা গান্ধী প্রচারিত প্রকৃত সত্যাগ্রহের মনোভাব লইয়া সত্যাগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহারা বাঙালী।

(২) সত্যাগ্রহীরা প্রকৃত সত্যাগ্রহীর ভাবে ভাবিত হইয়া কাজ করিলেও সত্যাগ্রহ প্রতিরোধকারীরা যে কাজ করিয়াছে, তাহা নিন্দনীয়—ঘৃণ্য এবং তাহারা সরকারের স্বারা-প্ররোচিত বা প্রযুক্ত তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকিলেও বিহার সরকারের কর্মচারীরা দাঁড়াইয়া অকারণ সত্যাগ্রহীদিগের উপর অত্যাচার, তাঁহাদিগকে প্রহার, তাঁহাদিগকে ধরিয়া কোন অনির্দিষ্ট স্থানে লইয়া যাওয়া, তাঁহাদিগের চক্ষুতে লঙ্কাচূর্ণ নিক্ষেপ প্রভৃতি উপভোগ করিয়াছে। প্রতিকার করে নাই।

যাহারা সত্যাগ্রহে বাধা দিতে আসিয়াছিল, সত্যাগ্রহ তাহাদিগের কোন ন্যায়সঙ্গত স্বার্থের বিরোধী নহে। কেবল যাহারা চোরাবাজারী, যাহারা দুর্নীতি দ্যোতক কার্যে লিপ্ত তাহাদিগের স্বার্থই সত্যাগ্রহের দ্বারা ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা। আমাদের মনে হয়, সত্যাগ্রহবিরোধীরা যে কোন কোন সত্যাগ্রহীর মুখে আলকাতরা ও চূণ মাখাইয়া জয়োল্লাসে উৎফুল্ল হইয়াছে—চূণ কালি তাহাদিগের মুখেই লিপ্ত হইয়াছে। বাবু মুরলীমনোহর প্রসাদের মত ব্যক্তিরাও তাহা হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন কি না তাহা বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন—এ আশা আমরা করিতে পারি; কারণ যে হিন্দী প্রচার সমিতিকে তিনি বিহারের বঙ্গ ভাষাভাষী অঞ্চল হিন্দী ভাষাভাষী না করায় তিরস্কার করিয়াছিলেন, সেই সমিতির উৎসাহী ব্যক্তিদিগকেও সত্যাগ্রহ-বিরোধিতা পরিচালিত করিতে দেখা গিয়াছিল।

যাঁহারা সত্যাগ্রহ আরম্ভ করেন, তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য—

(১) বিহার নির্বিঘ্নতা রক্ষা আইনের অপব্যবহারের প্রতিবাদ;

(২) মানভূমের বঙ্গভাষাভাষীদিগকে হিন্দী ভাষা ব্যবহারে বাধ্য করার প্রতিবাদ;

(৩) সরকারের কার্যে ও কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতির উচ্ছেদ সাধন।

যাঁহারা সত্যাগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের দৃঢ়তা পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর বা বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের অজ্ঞাত নহে। তাঁহাদিগের সাফল্য-পরিচয় মানভূমে সত্যাগ্রহের বিস্তারে ও ক্রমে পাওয়া গিয়াছে। কংগ্রেস বা কেন্দ্রী সরকার সত্যাগ্রহ আসন্ন জানিয়াও কোন ব্যবস্থা করেন নাই, তাহাতে মনে হয়, তাঁহারা ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। গান্ধীজী যখন লবণ সত্যাগ্রহের সঙ্কল্প লইয়া ডাণ্ডী অভিযান আরম্ভ করেন, তখন অনেকে তাঁহার প্রচেষ্টায় হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন নাই—যে বৃটিশ সরকারের শাসনব্যবস্থা বর্তমান ভারত সরকার উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত করিয়াছেন—সেই সরকারও তখন তাহার গুরুত্ব স্বীকার করেন নাই বটে, কিন্তু শেষে সত্যাগ্রহের দাবী স্বীকার করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন—সম্ভ্রম রক্ষা করিতে পারেন নাই।

গত ৬ই এপ্রিল মানভূমে সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইবার পরে—বোধ হয় অবস্থা লক্ষ্য করিয়া—১১ই এপ্রিল কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি ঐ বিষয় আলোচনা করিয়া স্থির করেন—বিষয়টি কেন্দ্রী সরকারের বিচারাধীন; সুতরাং সভাপতি সকল পক্ষকে সত্যাগ্রহ বন্ধ করিতে অনুরোধ করুন।

কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির এই নির্দেশে আমরা কয়টি বিষয় লক্ষ্য করিবার বলিয়া মনে করি—(১) তাঁহারা 'সকল পক্ষ' বলিতে কি মনে করেন। সত্যাগ্রহে দুই পক্ষ থাকে বটে, যাঁহারা সত্যাগ্রহ করেন এবং যাঁহাদিগের কার্যের প্রতিবাদ করা হয়; কিন্তু এক্ষেত্রে কি বিহার সরকার ও বিহারের কংগ্রেস দুর্নীতি বর্জন করিবেন এবং মানভূমের বঙ্গভাষাভাষীদিগকে হিন্দী ভাষাভাষী করিবার প্রচেষ্টায় বিরত হইবেন? আর বিহারের নির্বিঘ্নতা রক্ষা আইনের অপপ্রয়োগ কি বন্ধ হইবে? যদি তাহা না হয়, তবে অপর পক্ষ অর্থাৎ সত্যাগ্রহকারীদিগকে নিবৃত্ত হইতে বলা কি একদেশদর্শিতার পরিচায়ক বলিয়া বিবেচিত হইবে না? বিহার সরকার যদি সঙ্গে সঙ্গে বিহারের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলসমূহে বঙ্গভাষাভাষীদিগকে হিন্দী ব্যবহারে বাধ্য করার ব্যবস্থা বর্জন করেন—বিদ্যালয়সমূহে প্রেরিত সার্কুলার বাতিল করেন এবং সত্যাগ্রহীদিগের অন্যান্য দাবী মানিয়া লন, তবেই সত্যাগ্রহীদিগকে নিরস্ত হইতে বলা সঙ্গত—নইলে নহে।

(২) কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি কি কেন্দ্রী সরকারের অঙ্গ? কেন্দ্রী সরকার কুত্রাপি এমন কথা বলেন নাই যে, তাঁহারা মানভূমে সত্যাগ্রহের বিষয় বিবেচনা করিতেছেন। তাঁহারা এমন কথা বলেন নাই যে, বিহার সরকার বঙ্গভাষাভাষীদিগকে হিন্দী ব্যবহারে বাধ্য করিয়া অসঙ্গত কাজ করিতেছেন এবং সে কাজ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনানুসারে বিহার সরকার করিতে পারিলেও তাহার প্রতিক্রিয়া যখন সমগ্র রাষ্ট্রে হইতে পারে, তখন কেন্দ্রী সরকার সে বিষয় বিচার করিবেন। পরন্তু আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, কেন্দ্রী সরকারের অ-কংগ্রেসী মন্ত্রীদিগের অন্যতম—বাঙালী মন্ত্রী—ইংরেজিতে যাহাকে "thin end of the wedge" বলে, সেইরূপে বাঙলা পুস্তক দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত করিবার পরামর্শও দিয়াছেন। এই অবস্থায় মানভূমের সত্যাগ্রহ যে কেন্দ্রী সরকারের বিবেচনাধীন, তাহা কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি কিরূপে জানিতে ও জানিয়া ঘোষণা করিতে পারেন? বিহার সরকার যদি সত্যাগ্রহের কারণ দূর করিতে বাধ্য না হন, তবে সত্যাগ্রহীরা মধ্যপথে সত্যাগ্রহ বন্ধ করিলেও তাহা পুনরায়

অবলম্বন প্রয়োজন হইতে পারে। কেন্দ্রী সরকার তাহা করিবেন কি?

বিহারের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলে বাঙালী-দিগকে হিন্দী ব্যবহারে বাধ্য করিবার মূলে যে কথা রহিয়াছে, তাহা উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করা যায় না। তাহা কংগ্রেসের নীতি ও প্রতিশ্রুতির মর্যাদা রক্ষা করিয়া বিহারের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলগুলি পশ্চিমবঙ্গকে প্রদান করা। কেন্দ্রী সরকার সে বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছেন, তাহা যেমন কংগ্রেসের নীতির ও প্রতিশ্রুতির বিরোধী, তেমনই বাঙালীর প্রতি অবিচার। সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যে সত্যাগ্রহ বাঙলায় ও বিহারে হইতে পারে, তাহা কি কেন্দ্রী সরকার কল্পনা করিতে পারেন না?

কলিকাতায় হাইকোর্টের ব্যবহারজীবীরা ও অন্য অনেকে মানভূমে সত্যাগ্রহীদিগের কার্য সমর্থন করিয়াছেন। দিল্লীর সংবাদে প্রকাশ, বিহারে বাঙলা পঠন-পাঠনের বিষয় তথায় বিহারের প্রধানসচিব ও পশ্চিমবঙ্গের প্রধান সচিব ও কয়জন সচিব আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীজগজীবন রামও আলোচনায় যোগ দিয়াছিলেন। এই দুইজন কাহাদিগের প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহা প্রকাশ নাই। এই আলোচনায় ভারত সরকারের যোগদানের কোন কারণ যে ঘটিয়াছে, তাহা জানা যায় নাই; বাঙালীরাও কাহাকেও প্রতিনিধি করেন নাই। প্রকাশ, বিহার সরকার জানাইয়াছেন—

(১) পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত বাঙালী ছাত্র-ছাত্রীরা বাঙলায় শিক্ষালাভের অধিকার পাইবে;

(২) ষষ্ঠ শ্রেণী হইতে প্রাথমিক পরীক্ষা পর্যন্ত বাঙলায়ও শিক্ষা ও পরীক্ষা হইতে পারিবে। কোন বিদ্যালয়ে বাঙলা শিক্ষার বাহন হইবে, সেজন্য তাহার সরকারী সাহায্য প্রাপ্তিতে বাধা হইবে না।

(৩) অন্যান্য বিদ্যালয়ে সরল হিন্দীতে শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিলেও বাঙালী ছাত্ররা বাঙলা ব্যবহার করিতে পারিবে।

(৪) সরকারী বিদ্যালয়ে বাঙালীদিগের জন্য পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত বাঙলায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকিবে—যে সকল সরকারী বিদ্যালয়ে বহু বাঙালী ছাত্রছাত্রী থাকিবে, সে সকলের কি ব্যবস্থা হইবে, তাহা বিবেচনা করা হইবে।

বিহার সরকারের ভূতপূর্ব পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী ও মানভূমের কংগ্রেস-নেতা শ্রীজীমূতবাহন সেন মানভূমে সত্যাগ্রহের কারণ নির্ধারণের জন্য একটি বিচার বিভাগীয় কমিশন ও মানভূমের অবস্থা জ্ঞাপন জন্য একজন কর্মচারী নিয়োগের দাবী ভারত সরকারকে জানাইয়াছেন। শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বিহারী সচিবদিগের সহিত আলোচনা করিতেছেন এই সংবাদ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, শিক্ষার মাধ্যম পূর্ববৎ করিলেই মানভূমের সমস্যার সমাধান হইবে মনে করিলে ভুল হইবে। কংগ্রেসের নীতি অনুসারে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ-সীমা নির্ধারিত হইলে মানভূম বাঙলার অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে, এই আশংকায় বিহার সরকার মানভূমে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালীদিগের সম্বন্ধে যে দমন-নীতি পরিচালিত করিতেছেন, তাহার সমালোচনা করিয়া সেন মহাশয় বলিয়াছেন—

"বর্তমান অবস্থায় আমাদিগের প্রথম দাবী, ভারত সরকারকে ঘোষণা করিতে হইবে যে, বিহার একটি দুই ভাষাভাষী (বাঙলা ও হিন্দী) প্রদেশ এবং মানভূম বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চল—তথায় অধিকাংশ অধিবাসীই বাঙালী এবং বাঙলার ভাষা ও সংস্কৃতিই তাঁহাদিগের ভাষা ও সংস্কৃতি।"

আমরা আশা করি, বিহারের ও পশ্চিম বঙ্গের বাঙালীদিগকে কেবল ভাষা সম্বন্ধে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা হইবে না। রোগের নিদান নির্ণয় করিয়া উপযুক্ত বিধান করিতে হইবে।

ক্রুসেন্ চিকিৎসায় আবার সক্ষম

বাতের দরুণ রামলালের প্রত্যেকটি ইনিংস নষ্ট হইতেছিল। তীক্ষ্ন যন্ত্রণা তাহার সমস্ত গাঁট ও মাংসপেশীসমূহ আক্রমণ করিয়াছিল। ব্যাট ধরিতেও কষ্ট বোধ হইতেছিল। তাই খেলা অসমাপ্ত রাখিয়া অবসর নিতে হইয়াছিল—এবং ভাবিয়াছিল যে, তার ক্রিকেট জীবনের পরিসমাপ্তি বোধ হয় এখানেই। দলের নেতা তাহাকে সদুপদেশ দিলেন "প্রাতরাশের পূর্বে প্রত্যহ ক্রুসেন সেবন করুন।"

রা[illegible]লাল তাহাই পালন করিল। তিন সপ্তা[illegible] পরে বড় একটি ট্রফি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সে [illegible] রাণ করিল। তাহার খেলা পূর্বাপে[illegible] উন্নত হইয়াছে—ক্রুসেন্‌কে ধন্যবাদ। [illegible]টে ও মাংসপেশীতে ইউরিক অ্যাসিডের [illegible]ধিক্যই যে কোনরূপ বাতে ভোগার একমাত্র কারণ এবং মূত্রাশয়কে ধুইয়া পরিষ্কার করাই ইউরিক অ্যাসিড দূরীভূত করার একমাত্র উপায়। দ্বিবিধ সাফল্যের ইহাই গোপন রহস্য।

ইহা মূত্রালয় ও অন্ত্রের উপর একই সময়ে কাজ করে। শরীরের যে কোনভাগের জমা ইউরিক অ্যাসিড পরিষ্কার করিয়া পুনরায় জমা প্রতিরোধ করে।

আজই ক্রুসেন্ কিনুন। সর্বত্র কেমিষ্ট ও মনোহারী দোকানে পাওয়া যায়; দাম—১।৷৵০ আনা হলদে মোড়কে

KRUSCHEN SALTS

ক্রুসেন সেবনে আপনিও ঐ ভাবে আনন্দ পাইতে পারেন

কিছুদিন হইতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোন কোন সচিব লোককে বহু উদ্দেশ্যসাধক সমবায় সমিতি গঠন করিতে সদুপদেশ দিতেছেন। লর্ড কার্জনের উদ্যোগে যখন সমবায় সমিতি সম্বন্ধীয় আইন প্রবর্তিত হয়, তখন হইতে এ পর্যন্ত বাঙলায় সমবায় বিভাগের কাজ যে লজ্জার বিষয়, তাহা অনায়াসে বলা যায়। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে বৃটেনের রাজা ভারত-বর্ষে আসিয়া বলিয়াছিলেন—

"If the system of Co-operation can be introduced and utilised to the full, I presee a great and glorious future for the agricultural interests of the country."

কার্যত সরকার-শাসিত সমবায় বিভাগের দ্বারা বহু লোকের সর্বনাশ সাধিত হইয়াছে—বিভাগ দুনীতিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। সেই অভিজ্ঞতা লইয়া এবার গঠনের কাজ করিতে হইবে। আমরা ২৪ পরগণার বাঁশদ্রোণী ইউনিয়নের সহিত সরকারের যে পত্র ব্যবহার হইয়াছে, তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। ঐ ইউনিয়নে বহু উদ্দেশ্যসাধন সমবায় সমিতি গঠন করিয়া তাহা যথারীতি রেজেস্টারী করিয়া—কেরোসিন তেল ও খাদ্যশস্যের জন্য লাইসেন্সের প্রার্থনা করেন। তাঁহারা বলেন—ঐ ইউনিয়ন 'রেশন' ও 'কর্ডনড' অঞ্চলের মধ্যবর্তী হওয়ায় উহাতে চাউল তখনই ২৬ টাকা মণ দরে বিক্রয় হইতেছে। সেইজন্য সমিতি জয়নগর, মথুরাপুর, কাকদ্বীপ ও কুল্পী হইতে চাউল আমদানীর অনুমতি চাহিলে আলিপুরের কণ্ট্রোলার অব প্রোকিওরমেণ্টের অফিস হইতে গত ৩১শে জানুয়ারী জানান হয়—তাঁহারা যেন লাইসেন্স লইয়া পরে আবেদন করেন। তাঁহারা লাইসেন্স লইয়া পুনরায় আবেদন করিলে জানান হয়—,কর্ডনড' অঞ্চল হইতে চাউল কিনিবার অনুমতি দেওয়া হইবে না। এই উত্তর পাঠ করিয়া মনে হয়, অকারণ বিলম্ব করিবার অভিপ্রায়ে প্রথম পত্রে বলা হইয়াছিল, সমিতি যেন লাইসেন্স লইয়া পরে আবেদন করেন। যখন সরকার প্রকৃত সাহায্য প্রদান করিতে অসম্মত, তখন লোককে বহু উদ্দেশ্যসাধক সমবায় সমিতি গঠন করিতে সদুপদেশ দেওয়া যে ব্যঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, তাহা মনে করা সংগত।

আমরা জানি, রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী যখন শিক্ষাবিভাগের কার্যভার গ্রহণ করেন, তখন তিনি দেখেন, পশ্চিমবঙ্গের সরকার শিক্ষাবিভাগের প্রয়োজনের অনুপাতে অর্থ প্রদান না করিয়াও কয় লক্ষ টাকা ব্যয় হয় নাই বলিয়া বাজেয়াপ্ত করিয়া বাজেটে আয়ের দিক ভারী করিতেছেন। তিনি তাহার বিশেষ প্রতিবাদ করিয়া ঐ টাকা আদায় করেন এবং তাহার পরে শিক্ষকদিগের মধ্যে কিছু টাকা বণ্টন করা সম্ভব হয়। সেইজন্য আমরা শুনিয়া বিস্মিত হইলাম, গত বৎসর যে টাকা শিক্ষাবিভাগের জন্য বরাদ্দ হইয়াছিল—ডিরেক্টর অব পাবলিক ইন্সট্রাকশন তাহার সম্পূর্ণ ব্যয়-ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। আমরা আশা করি, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ হইতে এই জনরব সত্য কিনা, তাহা যেমন লোককে জানাইয়া দিবেন, তেমনই ইহা সত্য হইলে যাঁহার ত্রুটিতে ইহা হইয়াছে, তাঁহাকে অযোগ্যতার ফল ভোগ করিতে হইবে। যেভাবে অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে, সে বিষয়েও অনেক বলিবার আছে। যে স্থানে 'বাসের' কোন প্রয়োজন ছিল না, তথায় যে 'বাস' দিয়া শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানকে অকারণ ভারগ্রস্ত করা হইয়াছে—এমন অভিযোগও আমরা পাইয়াছি।

আমরা ইতঃপূর্বে বলিয়াছিলাম, পশ্চিমবঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষার পরিবর্তন সাধনে আগ্রহশীল হইয়া সংস্কৃত এসোসিয়েশন গঠন জন্য চতুষ্পাঠীসমূহের অধ্যাপকদিগের যে তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা ভ্রমপূর্ণ। আমরা জানিয়া প্রীত হইলাম, সরকার সেই অভিযোগ সংগত বিবেচনা করিয়া তালিকা সংশোধনের অভিপ্রায়ে ভোটারদিগের নাম প্রেরণের দিন ২৫শে এপ্রিল পর্যন্ত ধার্য করিয়াছেন।

আমরা পূর্বে যাহা বলিয়াছি, তাহাই আবার বলিব, যে রিপোর্টের ভিত্তিতে এই নির্বাচন-ব্যবস্থা হইতেছে, তাহা এখনও লোককে দেখিতে দেওয়া হয় নাই। সেই গুপ্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে নির্বাচন আপত্তিকর। রিপোর্ট প্রকাশ করিয়া তাহার সম্বন্ধে লোকমত জানিয়া তবে সে বিষয়ে কোন ব্যবস্থা করাই গণতন্ত্রানুগ। পশ্চিমবঙ্গের বাঙলা, সংস্কৃত ও ইংরেজি শিক্ষার পদ্ধতিতে পরিবর্তন করা প্রয়োজন মনে হইলে আর সকল বর্জন করিয়া সংস্কৃত শিক্ষা সম্বন্ধে পরিবর্তনের সার্থকতা ও প্রয়োজন কি? এখন পরিবর্তন ও নির্বাচন স্থগিত রাখা হউক।

বিমানে পত্রাদি প্রেরণের ব্যব... করা হইবে বলিয়া ভারত সরকার ডাকমাশুল বাড়াইয়াছেন। তাহাতে দরিদ্র ও মধ্যবিত্তের বিশেষ অসুবিধা হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে—অনেক স্থলে ইহা 'গুণ হৈয়া দোষ হৈল বিদ্যার বিদ্যায়'। পাটনা হইতে যে পত্র বর্ধমানে আসিবে, তাহা পাটনা হইতে বিমানে কলিকাতায় আনিয়া কলিকাতা হইতে রেলে বর্ধমানে প্রেরণ করা হয়; ফলে পত্রপ্রাপ্তিতে একদিন বিলম্ব ঘটে। বিমান ডাকের ব্যবস্থা স্বতন্ত্র রাখিয়া তাহার জন্য অতিরিক্ত মাশুলের ব্যবস্থা পূর্ববৎ রাখিলেই হইত। তাহাতে দরিদ্রদের অসুবিধা ঘটিত না। আর এক কথা। ডাক বিভাগের অনবগত থাকিবার কারণ নাই যে, পল্লীগ্রামে কোন কোন স্থানে সপ্তাহে একদিন—অথবা দুইদিন ডাক বিলি হয়। প্রথমে সেই ব্যবস্থার পরিবর্তন ও বিলির উন্নতি সাধন প্রয়োজন। সেদিকে যে ডাক বিভাগের দৃষ্টি আছে, এমন মনে হয় না। কেবল বড় বড় শহরের সুবিধার জন্য কাজ করিলে তাহা 'তৈলাক্ত মাত্রকে তৈল প্রয়োগ' ব্যতীত আর কিছুই হয় না। পল্লী-গ্রামের দুরবস্থা সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গের গবর্ণর যাহা বলিয়াছেন, সে সম্বন্ধে কি পশ্চিমবঙ্গ সরকার অবহিত হইয়া—বাঙলার পল্লীগ্রামে ডাক বিলির, ডাকঘর প্রতিষ্ঠার ও টেলিগ্রামের ব্যবস্থার বিষয় ভারত সরকারকে জানাইবেন?

গত ২৭শে চৈত্র অপরাহ্নে ঔপন্যাসিক শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় যখন হাওড়ায় এক সভা হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন, তখন কয়জন লোক পথে তাঁহার মোটর থামাইয়া তাঁহাকে প্রহার করে। তাঁহার গল্প 'সন্দীপন পাঠশালা' ছায়াচিত্রে দেখান হইতেছে। তাহাতে কোন কোন উক্তিতে—মাহিষ্যদিগের অসম্ভ্রমব্যঞ্জক কথা আছে বলিয়া ঐ সম্প্রদায়ের কোন কোন লোক পূর্বে আপত্তি করিয়াছিলেন। তাহা লইয়া সংবাদপত্রে আলোচনাও হইয়াছিল। অনেকের বিশ্বাস, ঐ সম্প্রদায়ের কয়জন লোকই ঐদিন তাঁহাকে প্রহার করে। তারাশঙ্করবাবু তাঁহার রচনায় যে সকল অংশ আপত্তিকর বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, সে সকল বর্জন করিতে সম্মত হইয়াছেন। আমাদিগের মনে হয়, আক্রমণকারীদিগের কাজই যে কেবল নিন্দনীয় তাহা নহে—তাহার উদ্ভব যাহাকে Inferiority Complex বলে তাহা হইতে। এক্ষেত্রে যে সম্প্রদায়বিশেষকে হেয় করা লেখকের অভিপ্রেত নহে, তাহা তিনিও বলিয়াছেন—সাহিত্যিকরাও তাহাই মনে করেন।

# জীবন-তৃষা

## আর্ভিঙ্ স্টোন

অনুবাদক—অদ্বৈত মল্ল বর্মন

[ পূর্বানুবৃত্তি ]

৪

মেণ্ডিস ডা কোস্টা জানতেন, জীবনের আরো সাধারণ খুটিনাটি নিয়ে আলোচনা করতে ভিনসেণ্টের অপরিসীম আগ্রহ। সপ্তাহে কয়েকবার করে তিনি কোনো অছিলায় পড়ার শেষে শহর অবধি তার সংগে চলে আসতেন।

একদিন তিনি ভিনসেণ্টকে শহরের এমন এক অঞ্চলে নিয়ে এলেন যেখানে সবই নূতন এবং চিত্তাকর্ষক মনে হল। স্থানটি ডাচ রেলওয়ে স্টেশনের দিকে ভোণ্ডেল পার্কের কাছে। এর একদিক 'লেডশে পুর্টে' পর্যন্ত প্রসারিত। রাশি রাশি করাত-কল চলছে সেখানে; ছোট ছোট বাগান-ঘেরা শ্রমিকদের কুটীর শ্রেণী। জনবসতি অত্যন্ত নিবিড়। ছোট ছোট অনেকগুলি খাল স্থানটিকে বহু অংশে খণ্ডিত করেছে।

ভিনসেণ্ট বলল, "এরূপ একটি বস্তিতে প্রচারকের কাজ করা যেত তাহলে বেশ হত।"

মেণ্ডিস পাইপে তামাক ভরে, তামাকের কৌটোটা ভিনসেণ্টের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, "তুমি ঠিকই বলেছ। মাঝ শহরে আমাদের যে বন্ধুরা বাস করে, তাদের চাইতে এ সমস্ত লোকেরই তো ধর্মের প্রয়োজন, ভগবানের প্রয়োজন বেশী।"

তারা একটি ছোট কাঠের পুল অতিক্রম করছিল। পুলটি জাপানী পুলের মতো ছোট। ভিনসেণ্ট থেমে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "কি বলছেন আপনি, মাস্টার মশাই!"

"বলছি এ সব মজুরদের কথা।" মেণ্ডিস হাতখানা আস্তে ঘুরিয়ে নিয়ে বলতে লাগলেন, "এরা বড়ো কষ্টে জীবন কাটায়। যখন রোগ হয়, ডাক্তার ডাকবার পয়সা জোটাতে পারে না। কালকে যা খাবে তার পয়সা আজকে জোটাতে হয়। এমনি অবস্থা তাদের। তাও আজ শক্ত খাটুনি খাটলে তবেই কালকে খাওয়ার দুটো পয়সা জোটাতে পারবে। যে সব ঘরে তারা বাস করে, তা তো চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছ। কত ছোট আর দৈন্যভরা এই ঘরগুলো। থাকার ঘর, পায়খানার জায়গা সবই কত কাছা-কাছি। জীবন কাটানো নিয়ে এরা সত্যি বড়ো বিব্রত। এই নিরতিশয় দুঃখ দৈন্যের মধ্যে একটু সান্ত্বনা পাওয়ার জন্য ঈশ্বর চিন্তার প্রয়োজন তো এদেরই।"

ভিনসেণ্ট পাইপ ধরিয়ে দেশলাইয়ের জ্বলন্ত কাঠিটা খালের জলে ছুঁড়ে ফেলে বলল, "মাঝ-শহরের লোকদের কথা যা বলছিলেন—ওদের কি এর দরকার নেই?"

"তারা ভালো খেতে পায়, ভালো পরতে পায়। তাদের অবস্থা ভাল। স্থায়ী চাকরী-ও ব্যবসা রয়েছে। ভবিষ্যতের বিপদ-আপদের জন্য জমানো টাকাকড়ি রয়েছে। তারা যখন ভগবানের চিন্তা করবে, সে ভগবান দুঃখীর ভগবান নয়। তাদের যিনি ভগবান, তাঁকে একজন বিত্তশালী প্রবীণ ভদ্রলোক বলতে পার তুমিঃ তাঁর সংসারে যে পুলকের ছন্দে দিন যায় রাত্রি যায়, তিনি বরং সেই পুলকেই আপনি মশগুল হয়ে আছেন, এর বাইরে তাকাবার অবসর তাঁর নেই।"

ভিনসেণ্ট বলল, "সংক্ষেপে বলা যায়, ওরা, মানে শহরের বড় লোকেরা, নিরেট!"

"কি আশ্চর্য! তা তো আমি বলছি না!" বলে উঠলেন মেণ্ডিস।

"আপনি বলছেন না, কিন্তু আমি বলছি।"

সেই রাত্রে ভিনসেণ্ট তার গ্রীক বইগুলি বার করে ইতস্তত ছড়িয়ে দিল। তার পর সামনের দেওয়ালের দিকে চোখ মেলে চেয়ে রইল অনেকক্ষণ পর্যন্ত। লণ্ডনের বস্তিগুলির কথা, সেখানকার লোকের অবর্ণনীয় দুঃখদৈন্যের কথা, সব তার মনে পড়ল। ধর্মগুরু হওয়ার জন্য এবং ঐসব লোককে সাহায্য করার জন্য তার মনে যে বাসনা জেগেছিল, সেসবও মনে পড়ল। তার মনে ছায়ার মতো একবার খুড়ো স্ট্রিকারের গীর্জাটি ভেসে উঠল। সেখানে যারা সমবেত হয় তারা বিত্তশালী। তারা সুশিক্ষিত। তাদের প্রবণতা জীবন-সুখ উপভোগের দিকে। সে সুখের সর্ব-উপকরণ আহরণে তারা সমর্থ। খুড়ো স্ট্রিকার যে-সব ধর্মবাণী দিয়ে থাকেন, সেগুলি সুন্দর সেগুলিতে সান্ত্বনার সুর অনুরণিত হয় কিন্তু যারা সমবেত হয়, তাদের কারো কি এ সান্ত্বনার প্রয়োজন আছে? তাদের নিকট এর কী মূল্য আছে?

তার প্রথম আমস্টারডামে আসার পর থেকে ধীরে ধীরে ছয় মাস কেটে গিয়েছে। অবশেষে এখন সে বুঝতে আরম্ভ করলো যে, প্রকৃতিগত যোগ্যতাকে কঠোর শ্রম দ্বারা পূরণ করা যায় না। সে ভাষাতত্ত্বের গ্রন্থগুলি একপাশে ঠেলে ঠেলে সরিয়ে দিল, তারপর তার বীজগণিতের বই খুলল। মাঝ রাত্রিতে জ্যান-কাকা ঘরে ঢুকলেন।

তিনি বললেন, "ভিনসেণ্ট, তোমার দরজার নীচ দিয়ে আলো বেরুচ্ছে দেখলাম, তা এলাম।" তা ছাড়া, প্রহরী আমায় বললে, সে নাকি তোমায় ভোর চারটেতেও ডকের প্রাঙ্গণে পায়চারি করতে দেখেছে। রোজ ক'ঘণ্টা করে পড় তুমি?"

"ঠিক নেই। তবে আঠারো ঘণ্টা থেকে কুড়ি ঘণ্টার মধ্যে।"

"কুড়ি ঘণ্টা?" জ্যান্ কাকা মস্ত আন্দোলিত করে বললেন। তাঁর মুখে সন্দেহের ছাপ আরো সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। ভ্যানগো পরিবারের কারো জীবন ব্যর্থ হয়ে যা[illegible] এ চিন্তার সংগে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া ভাই[illegible] এডমিরালের পক্ষে সহজ নয়। তিনি বললে[illegible] "তোমার অত ঘণ্টা পড়বার দরকার নেই।"

"কিন্তু কাকা, আমার কাজ তো [illegible] করতে হবে।"

কাকার পুরু ভ্রু দুটি কুঞ্চিত হল। তি[illegible] বললেন, "কাজ তোমার যেভাবে হয় হতে দা[illegible] আমি তোমার বাপ-মার কাছে ভালো ব[illegible] তোমার দেখাশোনার জন্য প্রতিশ্রুত আ[illegible] কাজেই দয়া করে তুমি এখন শুয়ে পড়, [illegible] ভবিষ্যতে কখনো এত রাত থাকতে উঠে প[illegible] বসো না।"

ভিনসেণ্ট অঙ্ককষার খাতাগুলি ঠে[illegible] সরিয়ে রাখল। তার ঘুমোবার দরকার নেই। [illegible] ভালোবাসা, সহানুভূতি, আনন্দ এসবে[illegible] দরকার নেই। তার দরকার কেবল ল্যাটিন [illegible] গ্রীক শেখবার, বীজগণিত আর ব্যাকরণ শেখ[illegible] —যাতে সে পরীক্ষা পাশ করতে পারে, বি[illegible] বিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে পারে, ধর্মগুরু [illegible] পৃথিবীতে ভগবানের সত্যিকার কাজ তার [illegible] সম্পন্ন হতে পারে।

৫

মে মাস ঘুরে এসেছে। এক বছর আগে আরেক মে মাসে ভিনসেণ্ট আমস্টারডামে এসেছিল। নিয়মের আটঘাটে বাঁধা যে শিক্ষা, তা লাভ করার যোগ্যতা তার নেই এবং তার এই অযোগ্যতাই শেষ পর্যন্ত তাকে কাবু করে ফেলেছে এটা এই মে মাস থেকে তার কেবলই মনে হতে লাগল। এই বোধটা, সত্যি যা ঘটছে তার বিকৃতি মাত্রই নয়, সে যে পরাজিত হয়ে চলেছে তারই স্বীকারোক্তি। এক নিদারুণ অন্তর্দ্বন্দ্বে সে ক্ষতবিক্ষত হতে লাগল। তার মস্তিষ্কের একটা দিক তাকে যতবারই জোর করে বোঝাচ্ছে, তুমি পরাজিত, ততবারই সে বাকি মনটাকে চাবুক মেরে এই পরাজয় স্বীকৃতিটাকে ভুলিয়ে দিয়েছে। আবার জয়ী হওয়ার জন্য সে প্রচণ্ড পরিশ্রমকে অবলম্বন করেছে।

কিন্তু সমস্যা তো কেবল পরিশ্রম নিয়ে নয়। তা যদি হত তাহলে সে দেহে মনে এতখানি বিব্রত হয়ে পড়ত না। যে প্রশ্নটা তাকে রাতদিন ঘা দিচ্ছে সেটা এই : 'সে কি চায়? সে কি তার কাকা স্ট্রিকারের মতো একজন বিচক্ষণ ভদ্রলোক ধর্মযাজক হতে চায়? তার জন্য আরো পাঁচ বছর তাকে পড়তে হবে? এই অনাগত পাঁচটি বছর যদি সে ব্যাকরণের সূত্র আর বীজগণিতের ফরমুলা নিয়ে ভাবতে ভাবতেই কাটিয়ে দেয়, তা হলে, দরিদ্র পীড়িত নির্যাতিতদের সেবা করার যে আদর্শ সে নিজের মধ্যে লালন করে এসেছে তার কি উপায় হবে?

মে মাসের শেষ দিকে একদিন অপরাহ্ণে পাঠ সমাধা করার পর ভিনসেণ্ট বলল, "মঁসিয়ে ডা কোস্টা, আমার সঙ্গে একটু বেরোবার সময় হবে কি আপনার?"

ভিনসেণ্টের মধ্যে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব নিয়ত বেড়ে চলেছে, সেটা মেণ্ডিসের মনে বিরক্তি ধরিয়ে দিয়েছিল। তিনি দিব্যচক্ষে দেখতে পেয়েছিলেন, এই চপলমতি যুবকের মানসিক অবস্থা এমন এক জায়গাতে গিয়ে ঠেকেছে, অনতিবিলম্বে একটা সুরাহা না করে দিলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা।

"হাঁ। একটু বেরোব বলে আমিও ঠিক করে রেখেছি। বৃষ্টি ধরে গিয়ে এখন হাওয়া খুব পরিষ্কার হয়ে এসেছে। আমি সানন্দচিত্তে তোমার সঙ্গে বেরোব।" একটি পশমী স্কার্ফ নিয়ে তিনি গলার চারদিক ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে জড়িয়ে নিলেন আর উঁচু কলারওয়ালা কালো রঙের একটা কোট গায়ে দিলেন। তারপর দুজনের পথ পরিক্রমা শুরু হল। তারা 'সিনাগোগ' বা ইহুদি-ধর্মসভা ভবনের পাশ দিয়ে চললেন। এই 'সিনগোগে'ই তিন শ বছর আগে বারুচ ও স্পিনোজার গীর্জার সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্যুতি অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছিল। তারপর কয়েকটি বাড়ি ছাড়িয়ে যেতে তারা 'জীস্ট্যাটে' রেমব্রাণ্টের পুরোনো গৃহের কাছে এসে গেল। তারই পাশ দিয়ে তারা চলল।

চলতে চলতে এক সময় মেণ্ডিস আবেগ-হীন কণ্ঠে বললেন, "দারিদ্র আর অপমানের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।"

ভিনসেণ্ট তৎক্ষণাৎ তাঁর দিকে চোখ তুলে তাকাল। কোনো বিষয়ে রেখে ঢেকে কথা বলবার অভ্যাস মেণ্ডিসের ছিল না। তাঁর অভ্যাস ছিল, কোনো সমস্যা উঠলে, সঙ্গের লোক সেটার উল্লেখ মাত্র না করলেই তিনি নিজেই সেটার অন্তস্তল পর্যন্ত চিরে দেখাতেন। গ্রন্থে জড়িয়ে জট পাকিয়ে কিছুই তিনি বলতেন না বা ভাবতেন না। সব কিছুর জটিলতা খুলে দিয়ে চলাই তাঁর অভ্যাস ছিল। এইজন্য যে বিষয়ে একবার তিনি কথা বলতেন, তা যেন ভাবনার সীমাহীন গভীরতায় ডুবে যেত। জ্যান কাকা ও খুড়ো স্ট্রিকার ঠিক অন্য ধরণের। তাঁরা এমনি সংক্ষেপে ও সুসংবদ্ধভাবে কথা বলেন যে, তাঁদের কাছে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা 'হাঁ' কিংবা 'না' ধ্বনি করেই বক্তব্য চুকিয়ে দেন। কিন্তু মেণ্ডিস কারো জবাব দেবার আগে জিজ্ঞাসু-ব্যক্তির চিন্তাকে তাঁর সুগম্য জ্ঞানের গভীরে অবগাহন করিয়ে নেন।

ভিনসেণ্ট বলল, "তা হলেও, তিনি অসুখী মন নিয়ে মরেন নি।"

মেনডিস উত্তর দিলেন, "না। আপনাকে তিনি সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করে গিয়েছেন; আর যা তিনি করে গিয়েছেন তার মূল্য যে কি, তাও তাঁর অজানা ছিল না। অবশ্য তাঁর সময়ে তা আর কেউ জানত না, কেবল তিনিই জানতেন।"

"মানলাম, তিনি জানতেন। কিন্তু তাঁর জানাটাই কি তাঁর মূল্য সম্বন্ধে বড়ো কথা হল? তাঁর জানাটা ভুলও তো হতে পারত? তা হলে, বিশ্বের লোক তাঁকে উপেক্ষা দেখিয়ে ঠিক কাজ করেছে—এটাই কি গ্রাহ্য হয়ে যেত না?"

"বিশ্বের লোক তাঁকে কিভাবে নেবে না-নেবে, রেমব্রাণ্টের তাতে কিছু যেত-আসত না। তাঁর কাজ ছবি আঁকা; ছবিই তিনি এঁকেছেন। সে-ছবি ভাল হয়েছে কি মন্দ হয়েছে, তা ভাববার অবসর তাঁর ছিল না। তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, শিরা-উপশিরা, দেহ মনের প্রতি রন্ধ্র প্রতি কোষ ব্যেপে ছিল কেবল অঙ্কনের তাগিদ। অঙ্কনই ছিল একমাত্র উপাদান যা একত্রিত করে তাঁর নশ্বর-দেহের সর্ব অবয়ব গঠিত। অঙ্কনই তাঁকে শরীরী জীবরূপে খাড়া করে রেখেছিল। শোনো ভিনসেণ্ট বস্তু হিসেবে শিল্প তার শিল্পীকে ব[illegible]ানি ব্যঞ্জন দিতে পারল, সেইটে নিয়েই হবে শিল্পের মূল্য বিচার। রেমব্রাণ্ট যাকে জীবনের লক্ষ্য বলে জেনেছিলেন, তাকেই চরিতার্থ করে গিয়েছেন এবং সেইটেই তাঁর ঠিক হয়েছে। তাঁর শিল্প যদি ব্যর্থও হয়ে যেত, সে-ব্যর্থতাকে আমরা তার কল্পনা-ব্যভিচারী হয়ে আমস্টারডামের মহাবিত্তশালী সওদাগর হওয়া অপেক্ষাও হাজার গুণ বেশি কৃতকার্যতা বলে মেনে নিতাম।"

"তাইতো দেখছি।"

সে-কথায় কাণ না দিয়ে নিজের চিন্তার সূত্র ধরেই মেনডিস বলে চললেন, "রেমব্রাণ্টের শিল্পসৃষ্টি সমগ্র জগতের লোককে যে আজও আনন্দ দিচ্ছে, সেটা জগতের লোকের সম্পূর্ণ উপরি পাওনা। যখন তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন, তখনই তাঁর জীবন সাফল্য ও চরিতার্থতায় কানায়-কানায় পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। তাঁর সুন্দর সুঠাম জীবন-গ্রন্থখানা তখনই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তাঁর অধ্যবসায় এবং আত্মনিষ্ঠার উৎকর্ষটাই বড়ো কথা—তাঁর কাজের উৎকর্ষটা বড়ো কথা নয়।"

তীরের কাছে লোকে ঠেলাগাড়িতে বালি বোঝাই করছে। দেখবার জন্য তারা কিছুক্ষণ থামল। তারপর আইভি ফুলে-ভরা বাগান দেখতে দেখতে অনেক সরু গলি অতিক্রম করে চলল।

"আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি, মঁসিয়ে। কোনো যুবকের পক্ষে তার ঠিক পথটা বেছে নেওয়া কিভাবে সম্ভব হতে পারে বলুন তো। যেমন ধরুন সে ভাবল এই কাজটা বিশেষ করে তার করণীয়; একেই জীবন-পণে আঁকড়ে ধরতে হবে তার। কিন্তু পরে দেখা গেল, কাজটা তার পক্ষে একেবারেই বে-মানান। ভাবুন দেখি তখন কি হবে।"

মেনডিসের চিবুক কোটের কলারে ঢাকা ছিল। সেটা তিনি খুলে দিলেন। তাঁর চোখের ঘন কৃষ্ণ তারা দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন, "ভিনসেণ্ট, চেয়ে দেখ, অস্তমান সূর্য ধূসর মেঘের উপর কেমন আবির ছড়াচ্ছে!"

তারা কথাবার্তায় মশগুল ছিল। বুঝতে পারেনি কখন পোতাশ্রয়ের কাছে এসে পড়েছে। পশ্চিমাকাশে রঙের বিচ্ছুরণ। তাকেই সামনে করে নদীপারে দাঁড়িয়ে আছে জাহাজের অনেক মাস্তুল, পুরোনো বাড়ি ও গাছের সারি জী-বার্গ অবধি এগিয়ে যাই। সেখানে ইহুদী-প্রতিফলিত হয়েছে। মেনডিস পাইপে তামাক ভরলেন। কাগজের থলেটা ভিনসেণ্টের দিকে এগিয়ে ধরলেন।

"আমি আগেই পাইপ ধরিয়েছি, মঁসিয়ে।" বলল ভিনসেণ্ট।

"ও, হাঁ, তাই ত বটে। চল না, তীর ধরে জী-বার্গ অবধি এগিয়ে যাই। সেখানে ইহুদী-গীর্জার পাশে মুক্ত সমাধি প্রাঙ্গণ; সেখানে আমাদেরই লোকেরা সমাহিত রয়েছে। তাদের পাশে দু' দণ্ড বসবে চল।"

প্রশান্ত নীরবতার মধ্যে দুজনে পথ চলেছেন। পাইপের ধোঁয়া হাওয়ায় দুজনার কাঁধের উপর দিয়ে বয়ে চলেছে। "কোনো

নিয়মে নিয়েই তুমি সব সময়ের জন্য একটা নির্দিশ্চত ধারণা করে রাখতে পার না ভিন্‌সেণ্ট", বলে চললেন, মেন্‌ডিস, "যা ঠিক বলে জেনেছ, সাহস করে সেটা করে যাওয়াই হবে তোমার কর্তব্য, তুমি কেবল তাই করতে পার। পরে সেটা ভুল বলেও প্রতিপন্ন হতে পারে, কিন্তু কাজ তোমার অন্তত সম্পন্ন করে রাখা চাই—আর এই করাটাই বড়ো কথা। বিবেক থেকে যে-সব নির্দেশ আমরা পেয়ে থাকি, তার মধ্যে সর্বোত্তম নির্দেশগুলিকে মেনে চলা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। কাজের ফল শেষে কি দাঁড়াবে তার বিচারের ভার ছেড়ে দাও ভগবানের হাতে। যে-কোনো ভাবে সৃষ্টিকর্তার সেবা করার কামনা যদি এই মুহূর্তে নিশ্চিত-ভাবে তোমার মনে জেগে থাকে তো ঐ বিশ্বাসটাকেই আঁকড়ে ধরো,—ঐটেই হোক তোমার ভবিষ্যতের একমাত্র পথপ্রদর্শক। ঐটেতে নির্ভর করতে, ঐটেতে আত্মবিশ্বাসকে ন্যস্ত করতে ভয় পেয়ো না তুমি।"

"মনে করুন, আমি যদি যোগ্যতা অর্জন করতে পারি?"

"যোগ্যতা কিসের—ভগবৎ সেবার?" মেন্‌ডিস তার দিকে তাকালেন, মুখে প্রচ্ছন্ন হাসি।

"না। যোগ্যতা বলতে আমি বোঝাতে চাই কেতাবি বিদ্যা শিখে পাশ করে উপাধিযুক্ত ধর্মযাজক হওয়া। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যেমন পরীক্ষা পাশ করে ধর্মযাজক হয়ে বেরোয়।"

ভিন্‌সেণ্টের চিন্তা সমস্যার এক গণ্ডির মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। সমস্যার একটা গণ্ডি-বদ্ধ দিক নিয়ে আলোচনা করার ইচ্ছা মেন্‌ডিসের ছিল না; তিনি কেবল চেয়েছেন এর আরো ব্যাপক, আরো সাধারণ স্তরটি নিয়ে আলোচনা করতে এবং যুবকটিকে এর থেকে নিজের যুক্তি খাড়া করবার জন্য সাহায্য করতে। ততক্ষণে তাঁরা ইহুদি সমাধিক্ষেত্রে এসে পড়েছেন। সমাধিক্ষেত্রটি খুবই অনাড়ম্বর। হিব্রুভাষায় উৎকীর্ণ করা পুরোনো প্রস্তরলিপি আর এলডারবেরির বুক্ষে স্থানটি সমাচ্ছন্ন। যত্রতত্র উচ্চ, ঘন-সবুজ তৃণের আচ্ছাদন। ডা কোস্টা পরিবারের জন্য এক খণ্ড জমি সংরক্ষিত আছে। তার কাছে একখানি পাথরের বেঞ্চি পাতা। দুজনে এখানে বসে পড়লেন। ভিন্‌সেণ্ট পাইপ নিভিয়ে ফেলল। এখন স্বায়ংকাল। এই সময়ে সমাধি প্রাঙ্গণ একেবারে নির্জন ও নিস্তব্ধ। কোথাও কোনো সাড়াশব্দ থাকে না।

মেন্‌ডিসের বাবা ও মা ঠিক পাশাপাশি দুটি কবরে শুয়ে আছেন। দুটি কবরের দিকে চেয়ে থেকে মেন্‌ডিস বললেন, "শোনো ভিন্‌সেণ্ট। প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে একটা স্বয়ং-সম্পূর্ণতা, একটা চরিত্রবৈশিষ্ট্য রয়েছে। সে যদি সেটা পালন করে চলতে পারে তা হলে যা-ই সে করুক না কেন, সবশেষে সেটাই সবচেয়ে ভালো হয়ে দাঁড়ায়। তুমি যদি কেবল ছবি-বিক্রেতাই থেকে যেতে, যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা তোমাকে স্বকীয় ধারায় মানুষ করে তুলছে, সেটা তোমাকে উত্তম ছবি-বিক্রেতাই করে তুলত। তোমার শিক্ষা সম্বন্ধেও এ নীতিই খাটে। একদিন তুমি আপনাকে পরিপূর্ণ করে প্রকাশ করবেই করবে; তা যে পথেই তুমি ধরো না কেন; বিকাশের মাধ্যমটা বড়ো কথা নয়, বিকাশটাই হল বড়ো কথা।"

"বেতনভুক্ পুরোহিত হবার জন্য আমস্টারডামে যদি আমি পড়ে না থাকি? যদি আমস্টারডাম ছেড়ে চলে যাই?"

"তাতে কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি হবে না। ধর্ম-শিক্ষক হয়ে তুমি লণ্ডনে ফিরে যাবে; নয় তো কোনো দোকানে কাজ করবে; আর না হয় তো ব্রাবাণ্টে চাষের কাজ শুরু করে দেবে। যে-কাজই তুমি করবে, উত্তমরূপে করবে। যে-উপাদানে তুমি মানুষ, তার গুণাগুণ আমি বেশ টের পাচ্ছি। তা যে ভাল উপাদান তাও আমার বহু আগেই জানা হয়ে গিয়েছে। জীবনে বহুবার তোমার মনে হবে তুমি ভুল করছ, তোমার জীবন ব্যর্থ হয়ে চলেছে, কিন্তু সর্বশেষে তুমি আপনাকে প্রকাশ করে তুলবে, তখন ঐ প্রকাশটাই তোমার জীবনের মূল্য হয়ে দাঁড়াবে।"

"ধন্যবাদ মঁসিয়ে ডা কোস্টা। আপনি যা বললেন, তাতে আমার খুব সাহায্য হবে।"

মেন্‌ডিসের শরীরটা একটু কেঁপে উঠল। যে-বেঞ্চিতে বসেছিলেন, সেটা ঠাণ্ডা হয়ে উঠেছে; আর পশ্চাতে সমুদ্রগর্ভে সূর্য অস্ত গিয়েছে। তিনি উঠে পড়লেন। বললেন, "ভিন্‌সেণ্ট, চল এবার যাওয়া যাক।"

৬

পরের দিন। সন্ধ্যার ছায়া নেমেছে। ভিন্‌সেণ্ট ডক-প্রাঙ্গণের দিকে দৃষ্টি মেলে জানলাতে দাঁড়িয়ে ছিল। ছোট এভিনিউয়ে সারি বেঁধে পপ্‌লার গাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে। গাছগুলি যেমন কৃশ, তাদের শাখাগুলিও তেমনি ক্ষীণ। সন্ধ্যার ধূসর আকাশের সামনে তারা হালকাভাবে দাঁড়ালে।

ভিন্‌সেণ্ট আপনমনে বলে চলল, "আমি নিয়মে-বাঁধা পড়াশোনায় তেমন ভালো নই; কিন্তু তার মানে কি এই যে, আমার দ্বারা সংসারে কোনো কাজই হবে না? মানুষকে ভালবাসা... আমার যে সংকল্প রয়েছে, তার সঙ্গে ল্যাটিন আর গ্রীকের কি সম্পর্ক?"

জ্যান-কাকা নীচে পায়চারি করছেন। দূরে ডকের মধ্যে জাহাজ ভাসছে, তাদের মাস্তুলগুলি ভিন্‌সেণ্ট এখান থেকেও দেখতে পাচ্ছে। কালো, লাল ও ধূসর বর্ণের উপকূল-রক্ষী মনিটর জাহাজগুলি ঘিরে রেখেছে ডকটিকে।

"সারাজীবন ধরে আমি যে কামনা করে এসেছি, তা কি কেবল এই ত্রিকোণ আর বৃত্ত এঁকে যাওয়া? তা নয়। ভগবানের সত্যিকার কাজ করে যাব, এইটেই আমি জন্মভর চেয়ে এসেছি। বড়ো গীর্জায় মার্জিত ভাষায় ধর্ম-বার্তা প্রচার করা—তাও আমি কখনো চাই নি। যারা পতিত ও লাঞ্ছিত, দুঃখ বেদনা যাদের নিত্যসাথী, আমিও তো তাদেরই একজন।"

ঠিক এই সময়ে ঘণ্টা বেজে উঠল। মজুর-দের জনতার স্রোত সবটা এক সঙ্গে দরজার দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়তে লাগল। বাতিওয়ালা এলো ডক-প্রাঙ্গণের লণ্ঠন জেলে দেবার জন্য। ভিন্‌সেণ্ট জানলা থেকে সরে এলো।

তার বাবা, তার জ্যান-কাকা ও খুড়ো স্ট্রিকার গত বছর তার জন্য অনেক অর্থ ঢেলেছেন ও অনেক সময় ব্যয় করেছেন। সে-সবই সে বুঝতে পারছে। সে যদি এখন হাল ছেড়ে দেয় তবে তাঁরা ভাববেন সেগুলো জলে ঢালা হয়েছে।

যা হোক্ সে তো চেষ্টার কোনো ত্রুটিই রাখে নি। দিনে কুড়ি ঘণ্টা কাজ করছে; তার বেশি আর কি করবে সে। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে ছাত্রজীবনের পক্ষে সে এখন সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত পড়াশোনা সে অনেক দেরি করে শুরু করেছে। আচ্ছা, কালকেই যদি সে ধর্মপ্রচারক হয়ে বেরিয়ে পড়ে ঐ-সব হরিজনদের মধ্যে কাজ শুরু করে দেয়, এটা ও কি তা হলে তার পড়াশোনার মতোই বিলম্বিত ও ব্যর্থ হয়ে যাবে? যদি সে রোগীকে আরোগ্য করে, ব্যথিতকে আরাম দেয়, পাপীদের সান্ত্বনা দেয়, এবং অবিশ্বাসীদের দীক্ষাদান করে, তবে তাও কি ব্যর্থই হবে?

আত্মীয়েরা হয়তঃ বলবেন, হাঁ, তাও ব্যর্থই হবে। তাঁরা আরো বলবেন, তুমি যে কাজেই হাত দেবে, সে-কাজই ভণ্ডুল হবে। কখনো তুমি সফলকাম হবে না। তুমি অকর্মা তুমি অকৃতজ্ঞ তুমি ভ্যান গোঘ-বংশের কলঙ্ক।

কিন্তু, "যা-ই তুমি করো না কেন, উত্তমরূপে করে যাবে। অবশেষে আপনাকে তুমি প্রকাশ করবে; সেই প্রকাশ করাটাই হবে তোমার জীবনের সার্থকতা।" একথা মেনডিস তাকে বলেছেন।

আর 'কে'। সবজান্তা সে। ভিনসেণ্টের মধ্যে এক সঙ্কীর্ণমনা ধর্মযাজকদের অঙ্কুর দেখতে পেয়ে আগে থেকেই অবাক হয়ে আছে। তবে হাঁ, আমস্টারডামে থাকলে সে এর চেয়ে ভালো কিছু হতে পারবে না, একথা নিঃসন্দেহ কেননা, সত্যভাষণ এখানে দিন দিন ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে যায়। পৃথিবীর কোন্‌খানে তার যোগ্য স্থান হবে, তার জানা আছে। মেনডিস তাকে সেখানেই যাবার জন্যে সাহস ও বল যুগিয়েছেন। আত্মীয়েরা ভর্ৎসনা করবে কিন্তু সে ভর্ৎসনা বেশিদিন তার গায়ে লাগবে না তার নিজের বলতে যা আছে, তা এত তুচ্ছ যে ঈশ্বরের জন্য অনায়াসে ত্যাগ করা চলে।

ব্যাগে জিনিসপত্র গুটিয়ে নিয়ে, কাউকে কিছু না বলেই সে তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল।

(ক্রমশঃ

# ভারতে তন্তু সমস্যা

**শ্রীকালীচরণ ঘোষ**

ভারতবর্ষ হইতে পাকিস্থান একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হওয়ায় রাজনৈতিক বা শাসনতান্ত্রিক লাভ যাহা হইয়াছে, তাহা রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌গণের বিচার্য বিষয়, কিন্তু অর্থনৈতিক ব্যাপারে ভারতের (অর্থাৎ ভারতীয় ইউনিয়নের) যে সর্বনাশ সাধিত হইয়াছে, তাহা যতই দিন যাইতেছে, ততই পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। কল্পনায় যে বিভাগের সীমা রেখা বর্তমান, সমুদ্র নয়, পর্বত নয় এমনকি একটি নদীও যেখানে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের সীমা নির্দেশ করে না. যেখানে গ্রামে গ্রামে জড়াইয়া আজও দুইটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের সীমা উহ্য হইয়া বর্তমান, সেখানে অর্থনৈতিক বিষয় আলোচনা করিতে গেলে দেখা যায়, বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হইয়াছে। আর এই দুই পৃথক সত্তা ভারতকে যেভাবে আঘাত করিয়াছে, তাহাতে ভারতীয় রাষ্ট্রপরিচালকগণ বিমূঢ় ও শিল্পপতিগণ বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছেন।

### ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা

বিভাগের পূর্বে ভারতের অহঙ্কার ছিল, জগতে কাঁচা মালের রপ্তানীর বাজারে তাহার একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান আছে। ভারতবর্ষ বিদেশী শাসনের চাপে পড়িয়া বিদেশী স্বার্থের খাতিরে যে সকল বস্তু রপ্তানী করে, ভারত স্বাধীন হইলে একদিন তাহাই শিল্প সাহায্যে রূপান্তরিত করিয়া বিদেশ হইতে অধিকতর ধন আহরণ করিয়া আনিবে, দেশে শিল্প প্রসারলাভ করিয়া অধিক লোককে ধন দান করিবে, দেশ সমৃদ্ধ হইবে। জগতের বাজারে ভারতবর্ষ যাহা দেয়, তাহার অনেকই ভারতের প্রায় একচেটিয়া সম্পত্তি, অন্ততঃ তত গুরুতর প্রতিদ্বন্দ্বিতা অপরের সঙ্গে নাই। ভারতের পাট, চা, লাক্ষা, তৈলবীজ বিশেষতঃ চীনা বাদাম, তিসি ও রেড়ী, কাজু বাদাম প্রভৃতি পণ্য সম্বন্ধে ভারতের একটি বিশিষ্ট স্থান নির্দিষ্ট ছিল। ভারতীয় তুলা অপরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক'রয়াও অপরাপর দেশের সহিত তুলনায় দাম অপেক্ষাকৃত কম থাকায় ১৯২৫-২৬ সালে ৭,৪৭,৩৩৩ টন তুলা ৯৫ কোটি ২৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকায় রপ্তানী হইয়াছে। এই সকল দ্রব্য বিক্রয় করিয়া আমরা বিদেশ হইতে আনীত প্রস্তুত মালের দাম দিয়াছি। বিদেশী মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া আমাদের অপরাপর দায় মিটাইয়াছি। আজ এক আঁচড়ে ভারত বিভাগের ফলে আমরা নূতন বিপদের সম্মুখীন হইয়া পড়িয়াছি।

### বিভাগের প্রত্যক্ষ কুফল

আর যাহাই হউক. যে কয়টি বিষয়ে আমাদের প্রধান বাণিজ্য ছিল, ভারত বিভাগে তাহার শ্রেষ্ঠস্থানীয় কয়টি বস্তু বিষয়ে আমরা অত্যন্ত হীন হইয়া পড়িয়াছি। কেবল বাণিজ্যে ক্ষতি হইলে যাহা হইত, তাহা অপেক্ষা বিপদের গুরুত্ব বহু গুণ বেশী হইয়া পড়িয়াছে। কারণ যাহা আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজন, তাহাও হারাইতে বসিয়াছি। ভারতবর্ষ যখন খাদ্য তণ্ডুল রপ্তানী করিত, সে দিনের কথা স্মরণ করিয়া লাভ নাই। কারণ আজ ভারতবর্ষ অন্নের জন্য পরমুখাপেক্ষী। কিন্তু ভারত বিভাগের ফলে, আমাদের অভাবের পরিমাণ বহু গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। যে সকল অঞ্চলে সেচ প্রভৃতির উন্নতির দ্বারা কম জমিতে বেশী ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, তাহা আজ পাকিস্থানের কুক্ষিগত। সিন্ধু এবং পশ্চিম পঞ্চনদ দুইটি অঞ্চলই ধান, গম প্রভৃতি খাদ্যশস্য বিষয়ে উদ্বৃত্ত অঞ্চল, সুতরাং অন্ন সম্বন্ধে আমাদের পরনির্ভরতা অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়াছে।

### পাটের কথা

কিন্তু তাহা অপেক্ষা অধিক বিপদ হইয়াছে, তন্তু লইয়া। পাট ভারতের একচেটিয়া সম্পত্তি এবং তাহার প্রকৃতিগত জন্মস্থান পূর্ববঙ্গে। বিদেশে পাট এবং পাটজাত দ্রব্যাদি রপ্তানী করিয়া আমাদের দেশ বহু অর্থ আহরণ করিয়া আনিত। ১৯২৫-২৬ সালে বিদেশে প্রেরিত পাটের দাম ৩৭ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা ছিল। আর সেই সঙ্গে পাট জাত দ্রব্যের মূল্য ৫৮ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা । কমবেশী এই অনুপাতে আমরা পাট হইতে বৎসরে একশত কোটি বা ততোধিক টাকা পাইতাম। পাটের সংশিলষ্ট কাজ কর্মে রপ্তানী শুল্ক প্রভৃতি লইয়া লোকের শ্রমের ক্ষেত্রে এবং অপরাপর নানা প্রকার আয় ছিল।

কিন্তু আজ বিপদ নূতনতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কাঁচা পাট উৎপাদনে পশ্চিম বাঙ্গালার জেলার মধ্যে ২৪ পরগণার দশম স্থান ছিল। উপরের নয়টি যথা—ময়মনসিংহ, ঢাকা, রঙ্গপুর, ত্রিপুরা, ফরিদপুর, রাজসাহী বগুড়া, পাটনা এবং যশোহর আজ পাকিস্থানে। সুতরাং ২৪ পরগণা পাট উৎপাদনে ভারতে প্রথম স্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা হইতেই ভারতবর্ষের অবস্থা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। পাটের জমি হিসাবে শতকরা ৭৩·৫ ভাগ পাকিস্থানের সম্পত্তি। বেশী করিয়া ধরিয়াও ভারতের ভাগ্যে সাড়ে সাত লক্ষ একর জমি ও ২০ লক্ষ গাঁট পাট হইতেছে না। সেখানে পাকিস্থান হইতে প্রাপ্ত হিসাবে দেখা যায়, তাহাদের জমি ছিল (১৯৪৭-৪৮) ২০ লক্ষ একর এবং পাটের পরিমাণ ৬৮ লক্ষ গাঁট। এবারে চাষের অসুবিধা হেতু (১৯৪৮-৪৯ পূর্বাভাষ) ১৮ লক্ষ ৭৭ হাজার একর ও ৫৪ লক্ষ ৭৯ হাজার গাঁট পাট ধরা হইয়াছে।

বিপদ এইখানেই শেষ নয়। প্রায় শতাধিক পাটকল সমস্ত ভারতের অংশে পড়িয়াছে এবং সেখানে বৎসরে ৭০ হইতে ৭৫ লক্ষ গাঁট পাট প্রয়োজন। পাকিস্থান বৎসরে ৫০ লক্ষ গাঁট পাট দিতে সম্মত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে পাট কলগুলির অবস্থা শোচনীয় দাঁড়াইয়াছে। তাহার উপর পাকিস্থান কেবল যে পাটের দাম চড়াইয়া দিতেছে তাহা নয়, পাটের উপর রপ্তানী শুল্ক চাপাইয়া দিতেছে। সুতরাং পাকিস্থান হইতে পাট লইয়া কারবার করার অসুবিধা ক্রমেই ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে। ভারতের পাট কলগুলির সমস্যা গুরুতর। এত বড় বিরাট শিল্পে কিছু মাল মজুদ না থাকিলে চলে না। কিন্তু পাটের অসঙ্গতি হেতু ভাণ্ডার হইতে খরচ করিয়া চালাইতে হইতেছে। পাটজাত দ্রব্যাদি রপ্তানী করিয়া বর্তমানে যে ১২৭ কোটি টাকা পাওয়া গিয়াছে, তাহা পাকিস্থান নিয়ন্ত্রণ করিবে।

সর্বাপেক্ষা সহজ হিসাবে বলা যায়, পাট কিনিতে পাকিস্থানকে বৎসরে অন্ততঃ একশত কোটি টাকা দিতে হইবে। পাকিস্থান পাটজাত দ্রব্য কিছু কিনিবে, কিন্তু তাহার পরিমাণ কোনও ক্রমেই ১০ হইতে ১৫ কোটি টাকার অধিক হইবে না। এই সকল হিসাবে বুঝিতে পারা যায়, পাটের অধিকাংশই পাকিস্থানে গিয়া সমস্যা কত গুরুতর দাঁড়াইয়াছে।

### তুলার কথা

ভারতীয় শিল্পের অপর এক অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তন্তু তুলা লইয়া চিন্তার যথেষ্ট কারণ দাঁড়াইয়াছে। পরিমাণ হিসাবে তুলার অবস্থা পাটের মত নয় বটে, কিন্তু দীর্ঘতন্তু তুলার অধিকাংশই পাকিস্থানে পড়িয়াছে এবং পাকিস্থানের মিল হিসাবে তাহার বিস্তর তুলা উদ্বৃত্ত হইতে চলিয়াছে।

ইদানীং ভারতীয় তুলার পরিমাণ যথেষ্ট হইলেও লোকের রুচির পরিবর্তনে এবং উত্তরোত্তর সূক্ষ্ম সুতা কাটার উপযুক্ত যন্ত্রাদি বসাইবার দরুণ বিদেশ হইতে আমদানীর পরিমাণ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল; কিন্তু

বর্তমানে ইহা যে কি অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে, তাহা লোকের ধারণা নাই। ১৯৪৮-৪৯ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত দশ মাসে এই আমদানীর মূল্য ৪৮ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা হইয়াছে। আশা করা যায়, এ বৎসর আমদানী ৫০ কোটি টাকা ছাড়াইয়া যাইবে।

বর্তমানে ভারতে প্রায় ১ কোটি একর জমিতে চাষ হইয়া কমবেশী ২১ লক্ষ গাঁট তুলা পাওয়া যাইবে। সে স্থলে পাকিস্থানে ২৯ লক্ষ একর জমি এবং আন্দাজ ১৩ লক্ষ গাঁট তুলা হইতেছে অর্থাৎ সারা ভারতবর্ষের শতকরা ৩৯ ভাগ। কিন্তু মিল হিসাবে আমাদের সংখ্যা ৩৮০ এবং পাকিস্থানে ১৫টি। ভারতীয় মিলে প্রতি বৎসর লাগে ভারতীয় তুলা প্রায় ৩০ লক্ষ গাঁট; তাহা ছাড়া বিদেশী তুলাও প্রায় ৭ লক্ষ গাঁট। পাকিস্থানের তুলা না পাইলে বিদেশী তুলা লইতে হইবে এবং তাহার যে কি অবস্থা তাহা পূর্বে বলিয়াছি।

বর্তমানে ভারতীয় রপ্তানীর মধ্যে ক্রমেই তুলার কাপড়ের স্থান মূল্য হিসাবে উপরে উঠিতেছে। ১৯৪৮-৪৯ জানুয়ারী পর্যন্ত দশ মাসে ৩৪ কোটি টাকা আর কাঁচা তুলা মাত্র ১৬ কোটি টাকা। আমাদের নিজেদের চাহিদা মিটাইতে পারা যায় না; উপরন্তু দেশের অর্থ-নৈতিক অবস্থার সমতা রক্ষা করিতে হইলে রপ্তানীর প্রয়োজন আছে। পাকিস্থানের সহিত সুবন্দোবস্ত হয় নাই, উপরন্তু পাকিস্থান হইতে আমদানী তুলার সকল দায় মিটাইয়া তুলা লওয়ার বিড়ম্বনা বাড়িয়া চলিতেছে। ভারতের বহু মিল কাজ বন্ধ করিতে বাধ্য হইবে। বিদেশ হইতে এত দামে তুলা আনিয়া দেশের মিল চালাইতে যে ভীষণ ক্ষতি হইবে, তাহা বুঝিতে

যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে, তাহাতে ভারতের অর্থ-নৈতিক সমস্যার গুরুত্বই বৃদ্ধি পাইবে। তুলা রপ্তানী বন্ধ করিবার প্রস্তাব হইয়াছে, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় সে পরিমাণ কিছুই নয়। বেশী তুলা আমদানী করিতে হইবে, সে কারণে আমাদের বিক্রেতাদিগের দেশের মুদ্রা সংগ্রহ করা প্রয়োজন। তাহা ছাড়া কতদিনে ভারতের তুলার অভাব মিটিবে, তাহা বলা যায় না।

**পশমের কথা**

পাট ও তুলার পর তন্তু জগতে পশমের স্থান এবং এবিষয়ে ভারতবর্ষের অবস্থা নিতান্ত হীন ছিল না। ভারতে যেমন সূক্ষ্ম ও দীর্ঘ তন্তু তুলা কম জন্মে, পশম সম্বন্ধে ভারতবর্ষে উৎকৃষ্ট পশম পাওয়া যাইত না। সারা ভারতে প্রায় নয় কোটি পাউন্ড তুলা সংগৃহীত হইত। যেমন আমরা বয়নের উপযোগী উৎকৃষ্ট পশমের আমাদের কাঁচা মাল রপ্তানী করিয়া সে অর্থ দ্বারা ঐ প্রস্তুত দ্রব্যাদি আমদানী করিতাম, পাওয়া যাইত। ১৯১৮-১৯ সালে ৫ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা (৪ কোটি ৭৪ লক্ষ পাউন্ড ওজন) মূল্যের অসংস্কৃত পশম রপ্তানী হইয়াছিল। এখন ভারতীয় ইউনিয়নের পশমের মোট পরিমাণ কিঞ্চিদধিক ৫ কোটি পাউন্ড। পশম, তাহার মধ্যে অপেক্ষাকৃত ভাল পশমের প্রায় অর্দ্ধেক পাকিস্থান পাইয়াছে; আরও পাইয়াছে পশ্চিম পঞ্চনদের প্রায় সমস্ত পশমের শিল্প-কেন্দ্রগুলি। কাহারও কাহারও মতে পাকিস্থান সমস্ত ভারতের শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ পশম পাইয়াছে। মনে হয়, ইহা সামান্য অতিরঞ্জন দোষে দুষ্ট। ভারতের কয়েকটি বড় পশমের কারখানা বিদেশী পশম বহু পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় পশম সম্পর্কেও আমাদের পরনির্ভরতা বাড়িয়া চলিতেছে।

**অর্থনৈতিক বিপর্যয়**

কেবল তন্তুর কথা সমালোচনা করিলেই দেখা যায়, প্রতি বৎসর দুইশত কোটি না হইলেও প্রায় পৌনে দুইশত কোটি টাকা আমাদের বিদেশীকে দিতে হইবে তন্তুর অভাব মিটাইবার জন্য। তাহার সহিত যদি অন্নশস্য আমদানীর জন্য একশত কোটি টাকা ধরা যায়, তাহা হইলে অবস্থার গুরুত্ব সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে। অবশ্য তন্তু আমদানী করিয়া আমরা প্রস্তুত দ্রব্যাদি রপ্তানী দ্বারা কিছু অর্থ বিদেশীদের নিকট পাইতে পারি, কিন্তু অন্ন সমস্যায় আমরা প্রায় দিগ্বিদিক জ্ঞানহীন হইতে বসিয়াছি।

তন্তুতে খাদ্যশস্য এমন জট পাকাইয়াছে যে, তাহার সুমীমাংসা হওয়া কঠিন। খাদ্যমন্ত্রী এবং তাঁহার সহকর্মী মন্ত্রিবর্গ বলিতেছেন, আগামী দুই বৎসরে খাদ্য সম্বন্ধে আমাদের পরনির্ভরতা ঘুচিবে। কাজের নমুনা দেখিয়া অতীতের অভিজ্ঞতা আলোচনা করিয়া ইহাতে আস্থা স্থাপন করিতে ইচ্ছা করে না। নূতন
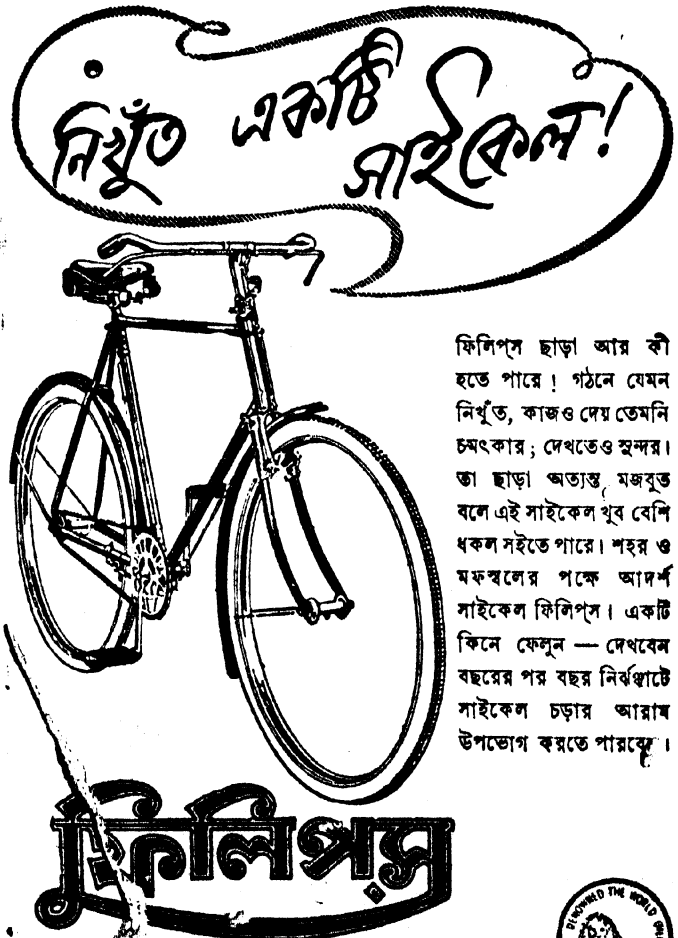
জমি চাষে আসিলে মন্দ কথা নয়, কিন্তু তন্তু বৃদ্ধি করিতে শস্যের ক্ষেত এবং শস্যের ক্ষেত করিতে তন্তুর ক্ষেতের উপর চাপ পড়িবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। সুতরাং এ দিকটা ভাবিয়া দেখা দরকার।

সর্বাপেক্ষা গুরুতর সমস্যা যুদ্ধ বাধিলেই দেখা দিবে। ভাত কাপড় ব্যাপারে পরনির্ভরতা অত্যন্ত বিপদের কথা। অথচ শান্তির সময় সমস্ত অর্থ বিদেশে দিতে হইতেছে এবং পরস্পরে বিরোধ বাঁধিলে যে কি হইবে, তাহা ভাবিয়া ঠিক করা যায় না। যুদ্ধের আশঙ্কায় সকল দেশ যতদূর সম্ভব স্বাবলম্বী হইবার চেষ্টা করিতেছে। আর আমাদের যাত্রার প্রারম্ভেই নানা দিক হইতে অসুবিধা আসিয়া দেখা দিতেছে।

আমাদের রাষ্ট্রপরিচালকগণ এই সমস্যার সমাধান করিতে পারিলে তাঁহাদের যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যাইবে।
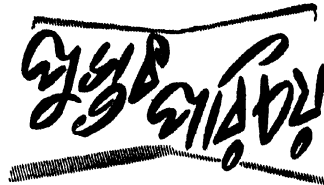
**খেলাধুলো (মাসিক পত্র)** শ্রীশম্ভুনাথ মল্লিক সম্পাদিত। কার্যালয়—২৭ বলরাম দে স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য প্রতি সংখ্যা আট আনা।

'খেলাধুলো' মাসিক পত্রের প্রথম সংখ্যাখানি উপহার পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। যতদূর মনে হয়, খেলাধুলো সম্বন্ধে এমন পূর্ণাঙ্গ মাসিক পত্র এর আগে বাহির হয় নাই। ক্রীড়াকৌতুক ও ব্যায়ামচর্চাদি সম্পর্কে বহু প্রবন্ধ চিত্রাদযোগে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি সুলিখিত এবং খেলাধুলোর প্রতি অনুরাগবৃদ্ধির উপযোগী। পত্রখানা বাঙলার তরুণ সমাজে বিশেষভাবে প্রচারিত হওয়া প্রয়োজন। আমরা পত্রখানার সাফল্য ও দীর্ঘজীবন কামনা করি।

**হারিয়ে যারে জগত কাঁদে**—শ্রীশিবদাস চক্রবর্তী। স্ট্যান্ডার্ড বুক কোম্পানী, ২১৬, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। পৃঃ ১৮৮, মূল্য তিন টাকা।

মহাত্মা গান্ধীর জীবন-কথা। বিবিধ গ্রন্থ হইতে তথ্যাদি সংকলন করিয়া পূর্ণ জীবনালেখ্য অংকন করিবার জন্য লেখক যে প্রচেষ্টা করিয়াছেন তাহা প্রশংসার্হ। কিন্তু উচ্ছ্বাস ও আবেগে আসল বক্তব্যই অনেক স্থলে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। গ্রন্থে কয়েকটি চিত্র সংযোজিত হইয়াছে। চিত্রগুলি পুরাতন, মুদ্রণও আশানুরূপ নয়।

**জাগ রে সকল দেশ**—মৃগনাভি। সুধাংশু সাহিত্য মন্দির, ২০৬, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। পৃঃ ২২৬। মূল্য চার টাকা।

উনিশ-শ বেয়াল্লিশের পটভূমিকায় লেখা এক দীর্ঘ আখ্যায়িকা। গান্ধীজীর করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে আহ্বান দিয়া কাহিনী শুরু। এবং নায়িকা উমার আত্মত্যাগের কাহিনী দিয়া কাহিনী শেষ। লেখক যে-সব কবিতার উদ্ধৃতি দিয়াছেন, তাহা ভুল হইয়াছে। রচনার হাত কাঁচা। রুদ্ররূপ ভক্তদাস ইত্যাদি চরিত্র তেমন ফুটিয়া উঠিবার অবকাশ পায় নাই। এই কাহিনী পাকা হাতে পড়িলে উৎরাইতে পারিত।

কাহিনী আপাতত শেষ এখানে। কিন্তু এই-খানেই পূর্ণচ্ছেদ নয়। কেন না, আলোচ্য গ্রন্থটি প্রথম খণ্ড মাত্র।

**লাল মাকড়সা**—মণিলাল অধিকারী। বাণী-তীর্থ, ২৪৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, বালিগঞ্জ, কলিকাতা—১৯। পৃঃ ৯৬। মূল্য এক টা[illegible]

ডিটেকটিভ কাহিনী। লাল মাকড়সা [illegible] প্রবাসী উচ্চ শিক্ষিত বাঙালী যুবক, সে একজন বড়ঘরের ছেলে। ধনরত্ন লুঠ করিয়া সে টাকা জোগাড় করে আর সেই ধনরত্ন বিলাইয়া দেয় গরীব দুঃখীদের মধ্যে। তাই গরীব দুঃখীরা তাহাকে [illegible] ভক্তিশ্রদ্ধা করে।—এমনি একটা আদর্শ পুরুষরূপে লাল মাকড়সাকে দাঁড় করাইয়া তার দস্যুপনার কাহিনী ছোটদের জন্যে লেখা। শিশু সাহিত্যের দিকে সুলেখকদের দৃষ্টি না পড়িলে সে-সাহিত্য লইয়া এইভাবে ছেলেখেলা বন্ধ হইবার আশা দেখি না।

**পূজারিণী চন্দ্রাবতী**:—শ্রীনীলাপদ ভট্টাচার্য প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—প্রবর্তক পাবলিশার্স, ৬১নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

চন্দ্রাবতী ময়মনসিংহ জেলার মনসার পাঁচালী রচয়িতা বংশীদাসের কন্যা ছিলেন। সংস্কৃতাদি পঠন পাঠনে তাঁহার প্রবল অনুরাগ ছিল। পিতার ছাত্র জয়ানন্দের সহিত কৈশোরে তিনি প্রণয়াবদ্ধ হন। কিন্তু জয়ানন্দ জনৈক যবন কুমারীর পাণি-গ্রহণ করায় পিতার নির্দেশে তিনি শাস্ত্রাদি চর্চায় প্রবৃত্ত হন এবং কৌমার্য ব্রত গ্রহণ করেন। তাঁহার রচিত রামায়ণ কথা ও অসংখ্য মেয়েলী সঙ্গীত পূর্ববঙ্গের পল্লীতে এখনও গীত হইয়া থাকে। আলোচ্য পুস্তিকায় সরল পয়ার ছন্দে চন্দ্রাবতীর জীবন-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। ২২।২

**বাঁশের কেল্লা**:—শ্রীমনোজ বসু প্রণীত। প্রকাশক—বেঙ্গল পাবলিশার্স; ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য দুই টাকা চারি আনা।

"বাঁশের কেল্লা" উপন্যাসটিতে সুদক্ষ লেখক সম্পূর্ণ এক নূতন জগতের দ্বার পাঠকদের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। নীলকুঠীর আমল হইতে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত বন্ধন-নিপীড়িত মানুষ কি ভাবে বারে বারে মাথা তুলিয়া রুখিয়া দাঁড়াইয়াছে, বাঁশের কেল্লা'র মতই বিদেশী কুঠীয়াল হইতে শুরু করিয়া প্রবলপ্রতাপ বিদেশী শাসনের অত্যাচারের দুর্গ কি ভাবে ধসিয়া পড়িয়াছে, উপন্যাসটির পৃষ্ঠাগুলির মধ্যে লেখক এক অভিনব ভঙ্গীতে তাহারই মর্মকথা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। কন্যাদায়গ্রস্ত পীতাম্বরের অসহায়ত্ব, কেশবের নষ্টামি, দুর্গার দুর্গত আত্মার অন্তিম বিদ্রোহ পড়িতে পড়িতে পাঠক মুগ্ধ হইবেন। বইটির ছাপা ও বাঁধাই উত্তম।

**বিপর্যয়**—শ্রীমনোজ বসু প্রণীত। প্রকাশক—বেঙ্গল পাবলিশার্স; ১৪, বঙ্কিম চাটুর্জ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

"বিপর্যয়" একখানি রসমধুর নাটক। সম্পূর্ণ আধুনিক টেকনিকে লেখা [illegible] চারিটি অঙ্কে ভাগ করা। লেখক পাকা কথা-[illegible]পী। তাঁহার এই নাটক [illegible] পাঠ করিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। রঙমহল থিয়েটারে ইহা সাফল্যের সহিত অভিনীত হইয়াছিল। সাধারণ [illegible] অভিনয়ের উপযোগী করিয়া লেখক উহাকে পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন সাধারণ অ[illegible]চ্ছেদগণের দৃষ্টি আশা করি নাটকখানির প্রতি আ[illegible]ষ্ট হইবে। ২১।৪৯

**ব্লু এঞ্জেল**:—শ্রীশৈলবিহারী ঘোষ অনূদিত। প্রকাশক—বুকস্ট্যান্ড, ১।১।১এ [illegible]ঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

জার্মান সাহিত্যিক হাইনরিখ্ ম্যানের বিখ্যাত উপন্যাসের বঙ্গানুবাদ। 'ব্লু এঞ্জেল' বিশ্বের কথা-সাহিত্যের একখানি স্মরণীয় গ্রন্থ। এক অধ্যাপকের কোনো এক নটীর প্রেমে পতনের অপ্রসিদ্ধ মর্মস্পর্শী কাহিনী উপন্যাসটিতে অনুপম ভঙ্গীতে বিবৃত হইয়াছে। শ্রীযুত শৈলবিহারী ঘোষ এই অনুপম গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়া বাঙলা সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করিলেন। ২।৪৯

**ম্যাজারিক**—ত্রিলোচন দাশ এম-এ। কিশোর সংঘ, চন্দননগর। দাম তিন আনা।

আধুনিক চেকোস্লোভাকিয়ার নির্মাতারূপে ম্যাজারিকের নাম স্মরণীয় হয়ে থাকবে। যদিও সে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তবুও ম্যাজারিকের আত্মা আজও সেখানে বিরাজ করিতেছে। লেখক তাঁহারই কথা স্মরণ করিয়া এই পুস্তিকা প্রণয়ন করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি নেতাজী সুভাষের কথাও বহু স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, পণ্ডিত নেহেরুও নাকি ম্যাজারিককে চিনিতে পারেন নাই। কিন্তু আমাদের বক্তব্য এই যে, গ্রন্থকার ম্যাজারিককে হয়ত-বা চিনিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার স্বদেশের অধিনায়ককে আদপেই চিনিতে পারেন নাই।

স্বামী বিবেকানন্দের সমাজ-দর্শন সম্বন্ধে লেখক যাহা বুঝিয়াছেন, তাহাই তিনি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, স্বামী বিবেকানন্দ আধুনিক যুগের শিবাজী। শিবাজীর সহিত স্বামীজীর তুলনা কিভাবে করা হইল বুঝা গেল না। গ্রন্থশেষে লেখক স্বামী জগদীশ্বরানন্দের নিকট লিখিত তাঁহার চিঠি মুদ্রিত করিয়াছেন—ইহা দ্বারা তিনি তাঁহার স্বকীয় দর্শন বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া মনে হইল। কিন্তু স্পষ্ট করিয়া কিছুই বুঝা গেল না।

**ল্যালেগ্রো ও এল্ পেন্সারসো**:—শ্রীরামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—"বিদ্যারত্ন মন্দির", ৩নং দর্জিপাড়া বাই লেন (বিডন রো), কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

মিলটনের "ল্যালেগ্রো" ও "এল্ পেন্সারসো" কবিতা দুইটির মূল এবং পদ্যে বঙ্গানুবাদ এই পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। ৩৩/৪৯

**আমার ভাব-মঞ্জুষা**—শ্রীবামাচরণ দাস চৌধুরী প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীবিমলকৃষ্ণ দাস চৌধুরী বি-এ, বি-এল; ৭।১বি, পাল স্ট্রীট, শ্যামবাজার, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

কবিতার বই। ৩৬ পৃষ্ঠার মধ্যে মোট ২৮টি কবিতার সমষ্টি। কবিতাগুলি অতি সাধারণ স্তরের। ২৬।৪৯

**সামবেদীয় সন্ধ্যা—বন্দনা**:—শ্রীরামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—"বিদ্যারত্ন মন্দির", ৩নং দর্জিপাড়া বাই লেন (বিডন রো), কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

সন্ধ্যা-উপাসনার রীতিনীতি ও মন্ত্রাদি এই পুস্তকে সঙ্কলন করা হইয়াছে। ৩২।৪৯

# শেষপ্রশ্ন ঃ শরৎ বাবুর তর্কনিষ্ঠা

**শ্রীক্ষেত্রলাল সাহা**

শরৎবাবুর শেষপ্রশ্ন নামক পুস্তকখানি সম্বন্ধে আমরা যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি। প্রস্তাবিত লেখাটির শিরোনামার তাৎপর্য বুঝিতে কাহারো কোনো কষ্ট হইবে না। শেষপ্রশ্ন সম্বন্ধে আমাদের প্রথম প্রশ্ন এই—ইহা কি উপন্যাস? প্রশ্নের উত্তর এই—ইহাতে উপন্যাসের কোনো কিছু নাই। ইহা উপন্যাস নহে। তবে ইহা কি? এক কথায় ইহা তর্কমাত্র। একটি বিষয় তাহার অপরিসীম তর্কপ্রবাহ। ঘুরিয়া ফিরিয়া রহিয়া রহিয়া পুনঃ পুনঃ অবিচলিত, অপরিবর্তিত প্রণালীতে ঐ একই কথা! কথাটি কি? নীতিধর্মপরায়ণ, শাস্ত্র বিশ্বাসী বেদপুরাণপন্থী হিন্দুগণ ভ্রান্ত, অজ্ঞ, মূর্খ। অভ্রান্ত বিজ্ঞ বিচক্ষণ কারা একথা শরৎবাবু স্পষ্ট করিয়া আমাদিগকে জানান নাই। তবে একটি কথা তর্কপথেই আমরা পাই। যাহারা নীতিধর্ম, পুরাতন আচার ব্যবহার, বেদ-পুরাণ-স্মৃতি মানেন না, তাহারাই জ্ঞান-বান। আর একটি কথার আভাস তিনি যাহা দিয়াছেন তাহা এই—জগতে ও জীবনে সুখই সত্য। সুখের অনুসন্ধানই বুদ্ধিমানের পরিচয়। এই সুখের কোনো সংজ্ঞাও তিনি দেন নাই। তবে পুস্তক পড়িয়া——ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি মার্গে যে সুখ আমরা পাই, তদতিরিক্ত অন্য কোনো সুখের আভাস আমাদের বুদ্ধিতে ধরা পড়ে না। যাই হোক, আলোচ্য পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয়ের দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কিছু আছে কি না আমরা দেখিব।

শরৎবাবুর শেষপ্রশ্ন সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য তাহা দুর্ভাগ্যবশতঃ বিশেষরূপে নকারাত্মকই হইবে। কারণ গ্রন্থে যাহা আছে তাহা অতি অল্প। আর যাহা নাই, অর্থাৎ উপন্যাস-পাঠকের চিত্তে যে সমস্ত আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থাকিয়া যায়, তাহা প্রকান্ড, অপরিমেয়। অর্থাৎ উপন্যাস পাঠের কোনো আশাই ইহাতে মেটে না। সুতরাং অনেকটা নেতি-নেতি-নীতি-পথেই আমাদিগকে অনেক কথা বলিতে হইবে। বেদান্ত দর্শনের একটি সূত্র আছে—তর্কা-প্রতিষ্ঠানাৎ। অর্থাৎ তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই—এই হেতু। এই পুস্তক পড়িয়া মনে হয়, শরৎ-বাবুর দর্শনানুসারে সূত্রটি হইবে তর্ক-প্রতিষ্ঠানাৎ। অর্থাৎ তর্কই প্রতিষ্ঠার হেতু। শেষপ্রশ্ন সম্বন্ধে ইহাই প্রথম সিদ্ধান্ত।

সাহিত্যিকের নীতিধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্র-বিষয়ক মতামত এবং ব্যক্তিগত জীবন যাহাই হোক, তাহার লিখিত সাহিত্যের বিচারে আমরা ঐ সকল টানিয়া আনিয়া সমালোচনা মজাইয়া পচাইব না। সাহিত্যের উপাদান মানবজীবন। সমগ্র জীবন। মানুষের জীবনে যাহা কিছু ঘটে সমস্তই সাহিত্যের বিষয়। পাপপুণ্য, ধর্মাধর্ম, ন্যায় অন্যায়, বিচার বিজ্ঞতা, অনাচার অত্যাচার উন্মত্ততা সমস্ত সাহিত্যে আসিবে। পরার্থে আত্মোৎসর্গ হইতে পিতৃহত্যা পর্যন্ত। সাহিত্য সমালোচনার বিচার ও মান-পরিমাণের বিষয় দুইটি। একটি রস-সামগ্রীর নির্বাচন। দ্বিতীয় সেই দ্রব্য সামগ্রীর পরস্পর সমনুসন্ধান, বিবিধ বিষয়সজ্জা ও ভাবসমাধান। যাহার নাম সাহিত্য-কলা বা আর্ট।

কবিতার কথা পৃথক। কিন্তু নাটক-নভেলে বিষয় সামগ্রী মানেই রসসামগ্রী। রস, লাইফ এবং আর্ট এই কথা তিনটির ভিতর পরস্পর নিবিড় সমন্বয় বিদ্যমান। জীবনের গতিশীলতা লইয়াই রসের সঞ্চার। আর্টের প্রয়োগবিজ্ঞান প্রবর্তিত হয় রসসঞ্চার লইয়াই। আমরা যদি বলি শেষ প্রশ্নে না আছে আর্ট—না আছে রস, পাঠক চমকিয়া উঠিবেন। কিন্তু কথাটি সত্য। একটু ধৈর্যধারণ করিয়া বুঝিতে হইবে। উপন্যাসখানি যেখানে আরম্ভ সেইখানেই শেষ। একেবারে অচলায়তন, স্থিতিমান। Static। উপন্যাসের ছায়াময় ফ্রেমে বাঁধা কোনো কাল্পনিক ডিবেটিং সোসাইটির ধারাবাহিক কতকগুলি অধিবেশনের লিপিবদ্ধ বিষয় বিচার বিবরণ অর্থাৎ 'প্রসিডিংস্' লইয়াই শেষ-প্রশ্ন। এমন ঘটনাবিহীন উপন্যাস কখন কেহ লিখিয়াছে বলিয়া জানি না। এক অধিবেশন ভাঙ্গিয়া অপর অধিবেশনের আয়োজন। ইহা পুনঃ পুনঃ আটাশটি অধ্যায় ব্যাপিয়া এই একই ব্যাপার। তর্কের তথা আলাপ-আলোচনার বিষয়ের কোনো বৈচিত্র্য নাই। একই কথা শতবার করিয়া—একই ভাবে, একই ভঙ্গীতে, একই ভাষায়। আলোচনার অন্তর্গত ভাব ভাবনা ধারণা কল্পনার কোথাও কোনো গতি নাই। প্রতিদিন একখানে আরম্ভ, একস্থানে শেষ। লেখকের ধৈর্যের বাহাদুরী আছে। আর পাঠকের? যে বইখানি পড়িলাম তাহা সপ্তম সংস্করণ! আশ্চর্য! ভাবিলে চমৎকার [illegible]

এই অপূর্ব উপন্যাস—যিনি শ্রীকান্ত—প্রথম খণ্ড, পল্লীসমাজ ও পণ্ডিতমশাই প্রভৃতি লিখিয়াছিলেন তাঁহারই এই লেখা মনে করা অসম্ভব—এই অপূর্ব উপন্যাসে আর্টের কারিগরীর স্পর্শ কি কিছুই থাকিতে পারে? যাহা আছে তাহা দেখা যাক। ঠিক যেন একটি ঘূর্ণমান যন্ত্রচক্র, একটি দৃঢ়ীকৃত স্থিরীকৃত আইডিয়ার কাষ্ঠদণ্ডের উপর অবিরত পাক খাইয়া ঘুরিয়া যাইতেছে আর আসিতেছে। দারু স্তম্ভটির মাথার উপর, স্তম্ভটির জীবন্ত প্রতিচ্ছবিরূপে বসিয়া আছে একটি রূপসী রমণী। নাম কমল। ওরফে শিবানী। ইনিই নিষ্ক্রিয় নাটকের নায়িকা। ইহার চরিত্র সংসারের রঙ্গমঞ্চে গ্রন্থকার যাহা ফুটাইয়াছেন অর্থাৎ প্রত্যক্ষ কর্মপ্রণালীতে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা নাম মাত্র। অন্যান্য নিষ্ক্রিয় প্রায় চরিত্র-মুখনির্গত নিন্দা প্রশংসার বিশেষত প্রশংসার দ্বারাই কমল চরিত্রের চিত্রণ যাহা কিছু, তাহা হইয়াছে। কমলই সঙ্গীতের মূলতান। যন্ত্রের অর-নাভি বা pivot। আর সকলেই ঐ সঙ্গীতের সহযোগী বা প্রতিযোগী সুরভেদ ঐ যন্ত্রের আংশিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।

কমল গ্রন্থকারের ভাব-শক্তি ও বাক্-শক্তি ইহা মনে করিতে আমরা বাধ্য। সে অন্য যাহা তাহা বলিব।

মেয়েটির অন্য গুণ যেমন-তেমন, তিনি তর্কে এবং বক্তৃতায় অপ্রতিদ্বন্দ্বিনী।

গ্রন্থকার গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন তর্কের জন্যই। হিন্দুর ধর্মকর্ম রীতিনীতি আচার নিয়ম জ্ঞান বিশ্বাস সমস্তই কুসংস্কার সমস্তই মানব জীবনের উন্নতির একান্ত অন্তরায়। ঐ সমস্ত ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ধ্বংস করিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য স্থাপন করিতে হইবে। এ উদ্দেশ্যে যে সুমহান তর্কাভিযানের সমারম্ভ লেখক করিয়াছেন—কমল তাহার সেনানায়িকা। ইহাতে আমাদের কোনো আপত্তি নাই। কিন্তু নায়িকা অবিরাম চোখা চোখা কথা বলিয়াই চলিয়াছেন। ঝরঝরে ঝলমলে বাক্যগুলি শুনিতে ভাল। যিনি শোনেন তিনিই তারিফ করেন। মুগ্ধ হন তাহার তর্কশরাঘাতে সকলেই জর্জরিত—অথচ হর্ষিত। মজা এই একটি ফুৎকারে কমলের অনেকগুলি করিয়া বাক্যবাণ উড়িয়া যাইতে পারে। কিন্তু সেই ফুৎকার দিবার বুদ্ধিবল সম্বলিত একটি চরিত্রও শরৎবাবু সৃষ্টি করেন নাই। শরৎবাবু মনে করিয়াছেন কমল যাহা বলে, অর্থাৎ শরৎবাবু যাহা ভাবেন তাহাই সত্য সমস্যার শেষ কথা। কাহারো সাধ্য নাই ইহার প্রতিবাদ করে। দুই একটি উদাহরণ দেই। কমল বলিতেছে কোনো দেশের কোনো বৈশিষ্ট্যের জন্যেই মানুষ নয়। মানুষের জন্যই তার আদর।' বৈশিষ্ট্যহীন মানুষ—অর্থাৎ যে মানুষ শুধুই মানুষ, আর কিছুই নহে, যে

মানুষ কেমন? কোথায় থাকে, কেহ জানে কি? পাশ্চাত্য নৈয়ায়িকের 'নমিনেলিজম্', 'কনসেপ্-চুয়্যালিজম্' এবং 'রিয়্যালিজম্'-এর বিচার-বুদ্ধিও কমলের তর্কযুদ্ধের নিকট পরাজিত। আবার বলিতেছে, 'মানুষের চেয়ে মানুষের বিশেষত্বটা বড় নয়। আর তাই যখন ভুলি, বিশেষত্ব যায়, মানুষকেও হারাই।' কথাগুলি অর্থহীন। অর্থাৎ ননসেন্স। এইপ্রকার তর্ক সর্বত্র। কিন্তু ইহাই শুনিয়া—'আশুবাবু যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন।' আশুবাবু গ্রন্থের সর্বশ্রেষ্ঠ চরিত্র। অন্যদিকে যেমন কমল সর্বোত্তমা। (১১১ পৃষ্ঠা)।

কমল আবার বলিয়াছে—'মত এবং কর্ম দুই-ই বাইরের জিনিস; মনটাই সত্য।' 'মত' যদি মনের না হয়, মনের পরিচায়ক না হয়, তবে কি? 'কর্ম' যদি মনের প্রেরণায় নির্দেশিত না হয়—তবে তাহা কি? ইহা কি প্রলাপ নহে। (২০২ পৃষ্ঠা)।

আর একটি উদাহরণ দেই—যাহাতে একাধারে সংগতি ও সংগীত, লজিক ও পয়োট্রি দুই-ই পাইব। 'যখন যেটুকু পাই তাকেই যেন সত্যি বলে মেনে নিতে পারি। দুঃখের দাহ যেন আমার বিগত সুখের শিশিরবিন্দু-গুলিকে শুষে ফেলতে না পারে।' সুন্দর কথা! অর্থাৎ যাহা পাই—তাহাই সত্য। দুঃখও সত্য। সুখও সত্য। পরস্পর বিরুদ্ধ নহে। ক্ষণিক সুখ, ক্ষণিক দুঃখ, সবই সত্য। সুখদুঃখ দুইই চেষ্টার ফল কর্মসঞ্জাত। স্থাবরের সুখদুঃখ নাই। তাহা হইলে মানবজীবনে মিথ্যা কিছু নাই, দুষ্কর্ম এবং দুঃখ, সৎকর্ম এবং সুখ অথবা তদ্বিপরীতক্রমে সমস্তই সত্য। সুতরাং সমস্তই সুন্দর ও পুণ্যময়! মানবজীবন সমস্যার সমাধান এমন আর কখনো হয় নাই। সব সত্য হইয়া গেল। আবার পরক্ষণেই উক্ত হইয়াছে—'জীবনের সুখদুঃখ কোনোটাই সত্য নয়। সত্যি শুধু তার চঞ্চল মুহূর্তগুলি। সত্যি শুধু তার চলে যাওয়ার ছন্দটুকু।' অতি সুরম্য ভাবখানি। কিন্তু আগের কথাগুলি কাটা গেল। সত্যটা মিথ্যা হইয়া গেল। তা যাক। উচ্চতর সত্যে আরোহণ করা গেল। কিন্তু সুখ-দুঃখ মিথ্যা বলিয়া উপলব্ধি করে [illegible] দুঃখের ভাবছন্দটিকে সত্য বলিয়া হৃদয়ে [illegible] করে—তেমন মানুষ শরৎবাবু কয়জন দেখিয়াছেন? শরৎবাবুর প্রাণময়ী কমল কয়জন দেখিয়াছে। যাহারা সুখ দুঃখ মিথ্যা মনে করিয়া —আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ —সুখদুঃখে বিতৃষ্ণ হইয়া, সুখ-দুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ—যাহারা চির-সুন্দরের গতিসুষমার সাধনা করে—যে তে পাদন্যাস বিলাসলক্ষ্ম্যাঃ—তাহাদের প্রতি ত শরৎবাবুর অসীম অবহেলা—অনন্ত অবজ্ঞা। যাহারা সুখদুঃখের দ্বন্দ্বাতীত ভূমিতে আরোহণ করিবার জন্য সাধনা করেন তাহাদিগকে দগ্ধ করিয়া উড়াইয়া দিবার জন্যই না শরৎবাবু এই শেষপ্রশ্নের 'আর্টিলারী' সাজাইয়াছেন! (৭৮ পৃষ্ঠা)। সর্বত্রই এইপ্রকার ভাববিরোধিতা।

উপরোক্ত কথা দুটি যে শুধু কথামাত্র, অর্থহীন তাহার প্রমাণ আমরা অচিরাৎ পাইব। তপঃ সংযম ব্রহ্মচর্যাদির সাধনার দ্বারা দেশের কল্যাণকামী সতীশ বেচারার কমলের কঠোর হস্তে দুর্দশার অন্ত নাই। ধাক্কা ধমকের ধারাটা এইপ্রকার—'বলুন সংসার ত্যাগ ও বৈরাগ্য সাধনা আমাদের নয়। আমাদের সাধনা পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্য, সমস্ত সৌন্দর্য, সমস্ত প্রাণ নিয়ে বেঁচে থাকা।' ত্যাগ বৈরাগ্য ও ব্রহ্মচর্যাদির ব্যঙ্গবিদ্রূপ করিতেই শরৎবাবু এই গ্রন্থে অনেক শক্তির অপব্যয় করিয়াছেন।—'যারা অনেক পেয়েছে, তারা সহজেই দিয়েছে। অকিঞ্চন-তার ইস্কুল খুলে তাদের ত্যাগের গ্র্যাজুয়েট তৈরী করতে হয়নি। অর্থাৎ তোমরা সুখে স্বচ্ছন্দে আরামে আবেসে থাক তাহা হইলেই অনেক পাইবে। তখন অনেককে অনেক দিও। বৈরাগ্যের দ্বারা কেহ কখনো কিছু পায় না। শরৎবাবুর উপদেশের ইহাই ধারা। অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে আর ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানশুঃ ইত্যাদি যাঁহারা লিখিয়াছেন তাহাদের স্থান কোথায়?

শরৎবাবু শেষপ্রশ্নে যে অন্তহীন তর্ক-শৃঙ্খল গাঁথিয়া গাঁথিয়া রাজ্যজোড়া জাল বিস্তার করিয়াছেন—তাহার পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করা বৃথা। কারণ পাতায় পাতায় উহা পরিব্যাপ্ত। যথা—'লৌকিক আচার অনুষ্ঠানই হোক, বা পারলৌকিক ধর্মকর্মই হোক, কেবল-মাত্র দেশের বাহু আঁকড়ে থাকায় স্বদেশ প্রীতির বাহবা পাওয়া যায়। কিন্তু স্বদেশের কল্যাণের দেবতাকে খুশি করা যায় না।' * * 'আশুবাবু অবাক হইয়া শুধু কহিলেন, তুমি বল কি কমল!' কমলের কথায় সকলেই অবাক হইয়া যান। কাহারো মুখে নাই উত্তর দেন। অথচ সাদাসিদা উত্তর প্রত্যেক কথারি অনায়াসেই দেওয়া যায়। ভারতবর্ষে যাহারা যৎকিঞ্চিৎ বিদ্যাবুদ্ধিরও অধিকারী তাহারাও শুধু দেশের বলিয়াই কোনো বিষয়ের গৌরব করেন না। বাস্তবিক গৌরবযুক্ত বলিয়াই, কল্যাণকর বলিয়াই সম্মান করেন। ভারতের যা কিছু সবই সুন্দর, সবই উত্তম, সবই গরীয়ান এই প্রকার ভ্রান্ত ধারণাবিশিষ্ট লোক তুমি কয়জন দেখিয়াছ? আমরা দেখি নাই। এই প্রকার [illegible] এরাজ্যে কেহ বলিতে পারে না। কমল বলিল। লুপ্ত বস্তুর পুনরুদ্ধার মাত্রই যে ভাল তার [illegible] নাই। মোহের ঘোরে মন্দ বস্তুর পুনঃ প্রতিষ্ঠা সংসারে ঘটতে দেখা যায়।' 'আশুবাবু [illegible] খুঁজিয়া পাইলেন না।' বিলাতফেরৎ সুশিক্ষিত সুপ্রবীণ আশু-বাবুর বুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারি না। আমরা তাহা জানি। আমরা অত নির্বোধ নই—এবম্বিধ কিছু বলিবার শক্তিটুকুও শরৎ-সাহিত্যের রাজ্যে কাহারো নাই।

কমল বলিল, 'গতিশীল মানবচিত্তের পদে পদে যে সত্য নিত্য নূতনরূপে দেখা দেয়, সবাই তাকে চিনতে পারে না।' অর্থাৎ সংকল্প বিকল্পময় পরিবর্তনই যে মানবমনের স্বভাব, এবং যে মন অনুক্ষণ বিকারপ্রাপ্ত হইতেছে, চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্-দৃঢ়ং—ইত্যাদি যে মনের সর্ববাদিসম্মত বর্ণনা, সর্বদা কামক্রোধ লোভাদির অত্যাচার যে মনের উপর চলিতেছে, সেই মনের পদে পদে অর্থাৎ প্রতি বিকারে বিকারে সত্য নিত্য নূতন হইয়া দেখা দিতেছে—এই উৎকট মনস্তত্ত্ববিদ্যা শরৎ-বাবু কোথায় পাইলেন? সত্য কি আষাঢ় মাসের পিটুলী গাছের গোটাগুলির মত অথবা আশ্বিন মাসের চুনোপুটি মাছগুলির মত হাত বাড়াইলেই পাওয়া যায়? আশুবাবু বলিলেন, দেশের ধর্ম, দেশের আচার অনুষ্ঠান ত্যাগ করে বাইরে থেকে ভিক্ষে নিতে থাকলে * * জগতে মানুষ বলে দাবী জানাতে যাব কোন পরিচয়ে? কমল বলিল, দাবী আপনি এসে ঘরে পৌঁছবে, পরিচয়ের প্রয়োজন হবে না। বিশ্বজগৎ বিনা পরিচয়েই চিনতে পারবে। আশুবাবু যাহা বলিলেন, তাহার অর্থ হয়। কমলের কথা নিরর্থক—nonsense। পাতঞ্জল দর্শনের — শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ। যাহা শুনিতে সুন্দর, বুঝিতে শূন্য, সেই বিকল্প শরৎবাবুর লজিকে সর্বত্র। (১৮৯-১৯০ পৃ)।

কমল উপন্যাসের একজন পাত্রী। তাহারি কথাই যে শরৎবাবুর কথা ইহা মনে করিবার কি কারণ আছে—এই প্রশ্ন কেহ তুলিতে পারেন। ইহা মনে করিবার কারণ নিশ্চয়ই আছে। উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস অর্থাৎ পুনঃ পুনরুক্তি, অপূর্বতা বা অভিনবত্ব। ফল অর্থাৎ প্রতিফলিত অর্থ এবং সর্বতোভাবে তাৎপর্য্য বিনির্যাস—এইরূপে সর্বপ্রকারেই আমরা কমলের উক্তিপ্রাধান্য, ভাবপ্রাধান্য এবং সাহিত্যিকপদপ্রাধান্য পাইতেছি। এই গ্রন্থমন্ত্রের কমলই ঋষি, কমলই দেবতা, কমলই ছন্দ। কমলকে যাহারা বিদ্বেষ করে তাহারা অশ্রদ্ধেয়, হাস্যাস্পদ। যেমন অক্ষয়। শেষ পর্যন্ত অক্ষয়ও কমলের অনুগত হইয়া গেল। কমলকে শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে যাহারা তাহারাই লেখকের প্রীতির পাত্র, ভক্তির পাত্র, প্রশংসার পাত্র। আদরে অনাদরে, ভালবাসায় ঘৃণায়। রাগদ্বেষে, সর্বভাবে সর্বদিক হইতে কমলের আহ্বান। কমলের আকর্ষণ। কমল যেখানে যায় সেখানেই আলো। যেখানে যায় না সেই-খানেই আঁধার। কমলের কথাই, কমলের বাণীই শেষ প্রশ্নে বেদবাণী। যে মানে সেই ধন্য। যে মানে না সে অধম।

ভারতের দর্শনবিজ্ঞান, বেদ-উপনিষদ পুরাণ, সাধনা আরাধনা, যোগ তপস্যা, ত্যাগ বৈরাগ্য, ভারতবাসী যাহা কিছু লইয়া আত্ম-গৌরব অনুভব করে, কমল সমস্তই তুচ্ছ জ্ঞান করে। সমস্তই ভ্রান্ত, সমস্ত কুসংস্কার, সমস্তই জ্ঞানাভিমানী নির্বোধগণের অপরিসীম অন্ধবিশ্বাসের ভিত্তিভূমি। মানুষ নিত্য নূতন নূতন পথে অগ্রসর হইয়া যাইবে। নূতন নূতন সত্য আবিষ্কার করিবে। প্রাণে মনে অনুভবে উপলব্ধিতে সুখে-দুঃখে সম্ভোগে-দুর্ভোগে যাহা কিছু অভিজ্ঞতা আমরা লাভ করি সমস্তই সত্য। কাম ক্রোধ হিংসা দ্বেষ কলহ দ্বন্দ্ব সবই সত্য। মানবচিত্ত স্বতন্ত্র। স্বচ্ছন্দ। মানবমন স্বাধীন। দুর্নিবার অগ্রগতিই তাহার সার্থকতা। উদ্দাম উচ্ছল গতিপথই-ত সত্য পথ। সকলে উচ্ছৃঙ্খল মনোরথে সত্য আবিষ্কার করিতে নিষ্ক্রান্ত হও। বিধি-নিষেধের নিগড় ভাঙিয়া ফেল। শাস্ত্রশাসনের আনুগত্য মূর্খতা। নীতিরীতি দুর্বলতা।

যে ধর্মশাস্ত্র ও নীতিবিজ্ঞান প্রচারের জন্য শেষপ্রশ্ন লেখা তাহার তাৎপর্য ইহা ছাড়া আর কিছু নহে। কমল এই নবধর্মের ঋষিকন্যা। পরদেবতা। অম্ভৃণস্য মহর্ষেঃ দুহিতা বাঙনাম্নী ব্রহ্মবিদুষী স্বাত্মানমস্তৌৎ —অমভৃণ ঋষির কন্যা। নাম ছিল তার বাক্। তিনি ছিলেন ব্রহ্মবিদুষী। তিনি আত্মার মহিমা কীর্তন করিয়া ছিলেন। শরৎ বাবুর কমল একান্ত বাঙ্ময়ী। বাক্যবিদুষী। নির্বিবাদ মনের স্বতন্ত্র প্রগতিতেই তিনি ব্রহ্মদর্শন করেন। বিবাহ বিধিবন্ধন সম্বন্ধে কমলের যাহা মতবাদ বা তত্ত্বপ্রবন্ধ তাহার কিঞ্চিৎ উদাহরণ দিব। কমল বলিতেছে— 'কোনো আনন্দেরি স্থায়িত্ব নাই। আছে শুধু তার ক্ষণস্থায়ী দিনগুলি। সেই-ত মানব-জীবনের চরম সঞ্চয়। তাকে বাঁধতে গেলেই সে মরে। তাই তো বিবাহের স্থায়িত্ব আছে। নাই তার আনন্দ। দুঃসহ স্থায়িত্বের মোটা দড়ি গলায় বেঁধে সে আত্মহত্যা করে মরে।' বিবাহ সম্পর্কে যার যা ইচ্ছা তিনি সে মত প্রচার করুন। আমরা মারামারি করিতে চাহি না। কিন্তু লিখিত বা উচ্চারিত বাক্যে ত একটি অর্থসমন্বয়, একটা লজিক বা Sense থাকা উচিত। উৎকট অর্থহীন বাক্য জ্ঞানের গলায় গুঁজে দেওয়া কি সম্ভব? কিন্তু আমাদের নবযুবকগণের জ্ঞানের দেবতা এই সমস্ত বাক্য পরমানন্দে উপভোগ করিতেছে। 'কোনো আনন্দেরি স্থায়িত্ব নাই।' বেশ কথা। এর চেয়ে পুরাতন কথা পৃথিবীতে আর নাই। এই কথার পর 'আছে শুধু তার ক্ষণস্থায়ী দিনগুলি।' অর্থাৎ—ক্ষণস্থায়ী দিনগুলি কিন্তু চিরস্থায়ী! বিপরীত বাক্য যোজনা অর্থাৎ Balancing of two Sentences-এর ইহাই অর্থ। ইহা পাগলের বুলি নয় কি?

তারপর 'সেইতো মানবজীবনের চরম সঞ্চয়।' তার মানে? ক্ষণস্থায়ী যাহা তাহার আবার সঞ্চয় কি? 'তাকে বাঁধতে গেলেই সে মরে।' যাহা ক্ষণস্থায়ী তাহার আবার বাঁচন-মরণ কি? আর বাঁধনই বা কি? 'তাই ত বিবাহের স্থায়িত্ব আছে। নাই তার আনন্দ!' দুটো কথাই মিথ্যা। Nonsense! জীবনেরই স্থায়িত্ব নাই। বিবাহের স্থায়িত্ব কোথায়? বিবাহে আনন্দ নাই—একথাও মিথ্যা। বিবাহে আনন্দই আছে। ইহাও মিথ্যা। লেখকের বক্তব্য—বিবাহটা ইচ্ছানুসারে ভাঙা-গড়া চলে না ইহা ভয়ানক অনুতাপের বিষয়। বিবাহ হইবে আনন্দের উত্তেজনায়। বিবাহ ভাঙিয়া যাইবে আনন্দের অবসানে। আবার বিবাহ! আবার ভঙ্গ। ইহাই সুন্দর। ইহাই পরানন্দের প্রতিষ্ঠা! —বেশ কথা। একথার উপর আমরা কলহ কোলাহল তুলিব না। লেখক সেই কথাটা লিখিলে ল্যাঠা চুকিয়া যাইত। প্রলাপ বকার আবশ্যক ছিল না। আমাদের সবুজের দল কিন্তু এই সমস্ত প্রলাপ মনে করেন না। ইহা তাহাদের পরীরাণীর রসের রাজ্যের গদ্য-কবিতা!

আরো কবিত্বে, আরো গভীরতায় এই কথারই সম্প্রসারণ হইয়াছে একটু পরেই। কমল বলিল। আমার উঠানের ধারে যে ফুল ফোটে তার জীবন এক বেলার বেশী নয়। তার চেয়ে ওই মশলা-পেশা নোড়াটা ঢের টেকসহি। ঢের দীর্ঘস্থায়ী—ইত্যাদি। এ বাঙ্গাত্মক রসোৎসারে আমাদের ধন্য হওয়া উচিত। শ্রবণেন্দ্রিয় ইহাতে আপ্যায়িত। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের অনুগ্রাহক বুদ্ধি-নামক একটি দুষ্ট-দেবতা আছে। সে কিন্তু রসভঙ্গের যম। তার কার্য—দ্রব্যস্ফুরণ বিজ্ঞান-মিন্দ্রিয়াণামনুগ্রহঃ। অর্থস্ফুরণ বিজ্ঞান জিনিষটাকে গলা টিপিয়া মারা যায় না। বাহির হইতে উপমান দুটির ঝলক আমরা দেখিলাম। কিন্তু উপমেয় কোথায়? ফুল আমরা জানি। নোড়া আমরা জানি। কিন্তু বর্তমান প্রকরণে অর্থাৎ Contextএ ফুল কি[illegible]সের জন্য ফুটিল। এ নোড়া কিসের জন্য নড়ি[illegible] Context হইল নরনারীর মিলন ব্যাপার। [illegible]হা বিবাহে ঘটে। আর ব্যভিচারে ঘটে। ব্যভিচার [illegible]থাটি বড় বিশ্রী। আমরা বলিব—বৈধ প্রণয় আর অবৈধ প্রণয় অথবা স্বচ্ছন্দ প্রেম। বিব[illegible] ব্যাপারটি নরনারীর জীবনব্যাপী ব্যাপ[illegible]। সুতরাং একটু দীর্ঘ স্বচ্ছন্দ বা অবৈধ যোগাযোগ স্বভাবত [illegible] স্থায়ী। গ্রন্থকারের দার্শনিক অভিমত এই। বিবাহ স্থুল। [illegible] শ্রীহীন অপ্রিয়। কারণ ববাহে প্রেম ন[illegible] অবৈধ মিলন সুক্ষ্ম। [illegible]মল [illegible]চারু। [illegible]রণ তাহাতে প্রেম আছে। অবৈধ মিলন সুতরাং ফুলের মতন সুমনোরম' বিবাহ [illegible]ৎসিত কঠিন নোড়াটীর মত। এই বিচার যদি বিজ্ঞান হইত তবে আমরা মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতাম। ইহা কদর্য মিথ্যা। পৃথিবীতে কেহই কোনো দিনও ইহা গ্রহণ করে নাই। করিবে না। ইহাদ্বারা অজ্ঞ অপক্ব যুবকগণের মাথা নষ্ট না হয় আমরা ইহাই কামনা করি। (২৭৭।২৭৮ পৃষ্ঠা)।

শেষপ্রশ্নে আমরা এই ব্যাপারের পরি-সমাপ্তি দেখিয়া এই আলোচনা সমাপ্ত করিব। উপন্যাসের আখ্যানবস্তু এই পুস্তকে কিছুই নাই বলিলেই হয়। অন্যান্য নামগুলিরও যেমন একটা স্থান পুস্তকে আছে, অজিতের তেমনি একটা স্থান আছে। ইনি বিলাত ফেরৎ। উচ্চ-শিক্ষিত। সম্পত্তিশালী। কমলের অনুগ্রহে ব্যর্থ প্রণয়ে সার্থকতা আসিয়াছে। পরস্পর পরস্পরের মিলনকামী। অজিত যথাসর্বস্ব সমর্পণ করিয়াও কমলকে বিবাহ করিতে চায়। অর্থাৎ বিবাহ-বন্ধনে বাঁধিতে চায়। কমল অজিতকে চায়। কিন্তু বিবাহ চায় না। স্বাধীন প্রণয় পথে মিলনসৌভাগ্য লাভ করিতে চায়। কমল বলিল, 'তোমার দুর্বলতা দিয়েই আমাকে বেঁধে রাখ। তোমার মত মানুষকে সংসারে ভাসিয়ে দিয়ে যাব, অত নিষ্ঠুর আমি নই।' নীলিমার দুই চক্ষে জল আসিয়া পড়িল। আশুবাবু বাষ্পাকুল চক্ষু মুছিলেন। ইতি। শরৎবাবুর যৌনমিলন বিজ্ঞানের উপসংহার এবং উদাহরণ এই।

এই যৌনমিলন ব্যাপারটি যদি লেখক চরিত্রবিবর্তপথে—সদসৎ যেমনি চরিত্র হোক—চরিত্র পরিস্ফুটন পথে, চেষ্টা ও কার্য সংযোজন দ্বারে, পরিবর্তনময়ী পরিস্থিতি ও ঘটনাবলীর সহমিলনে—অসাধারণ ঔপন্যাসিক প্রণালীতে প্রকাশ করিয়া আনিতেন তবে না হয় আমরা উপভোগ করিতাম। কিন্তু তাহা তিনি করেন নাই এই উপন্যাসে। প্লটের বালাই নাই। আছে শুধু কথা কাটাকাটি, আর তর্কসূত্রের দীর্ঘজাল আদ্যন্তমধ্যব্যাপী। শরৎবাবু যে শিক্ষা বাঙালীকে দিয়াছেন ও দিতে চাহিয়াছেন এই উপন্যাস সেই। শিক্ষা প্রচারের বক্তৃতাবলী কমল উপন্যাসের নায়িকা নহে। শরৎবাবুর সামাজিক ও [illegible]তিক মতবাদের ঘোষণাধ্বনিযন্ত্র মূর্তিমতী – Broadcasting Machine Personified. কমলের রূপ আছে। যৌব[illegible] আছে। জ্ঞা[illegible] বিদ্যাবুদ্ধি আ[illegible] বিদ্যাবুদ্ধি[illegible] পরিচয় [illegible]ঞ্চিৎ দে[illegible] হইল। এইবার তাহা[illegible] জন্ম [illegible] পরিচয়—যাহা তাহাকে তাহা[illegible] স[illegible]কর্তা শরৎবাবু মনে হয় সগৌরবে দা[illegible] [illegible]রয়াছে। কমল নিজে একান্ত অসংকুচি[illegible] চিত্তেই তাহার প্রিয়জন অজিতবাবুকে আ[illegible] পরিচয় দিয়াছে। পিতামাতা বিবাহ স্বা[illegible] ইত্যাদি।

প্রথমতঃ আমরা দেখিলাম কমল শিবনাথে[illegible] গৃহিণী। প্রেয়সী কিন্তু পত্নী নহে। পরিণী[illegible] নহে। কিন্তু উপপত্নী নহে—গ্রন্থকার আম[illegible] দিগকে সেই অসদ্বিচার হইতে রক্ষা করিয়াছে[illegible] পত্নীও নহে। উপপত্নীও নহে। প্রীতি মিল[illegible] মিলিতা সঙ্গিনী। বিবাহ সম্বন্ধ হইতেও [illegible] সম্বন্ধ শ্রেষ্ঠ। পুণ্যতর। অচিরাৎ সম্ব[illegible]

ভাঙিয়া গেল। কমলের মহদন্তঃকরণে বাধা লাগিল না। সে দুঃখ করিল না। শেষ করিল না। মুক্ত চিত্তে অন্য কোনো যোগ্য প্রণয়ীর জন্য তিনি কৃপাপ্রমুখী হইয়া থাকিলেন। জটিল অজিতবাবু। পূর্বপ্রেমভঙ্গব্যথায় ব্যথিত। একদিন কথাপ্রসঙ্গে অজিত জিজ্ঞাসা করিল কমল আহারে কৃচ্ছ্র অবলম্বন করিয়াছ কবে থেকে। কমল বলিল—আমার প্রথম স্বামীর মরবার পর থেকেই। এই পরিচয়ের আরম্ভ। কমলের প্রথম স্বামী ছিলেন একজন ক্রীশ্চান। তার মৃত্যুর পরই কমলের পিতার মৃত্যু হইল ঘোড়া থেকে পড়ে। মাতা শিবনাথের গৃহিণী-হীন খুড়ার গৃহিণী হইয়া আশ্রয় লাভ করিলেন। কন্যা ভ্রাতুষ্পুত্র শিবনাথের প্রীতি-পথে পত্নীপদে আরোহণ করিলেন। কিন্তু পরিণয় অনাবশ্যক মনে করিলেন। কমলের মাতার রূপ ছিল। রুচি ছিল না। ইহা কমলের কথা। 'বিয়ের পরে একটা দুর্নাম রটায় তাঁর স্বামী তাঁকে নিয়ে আসামের চা-বাগানে পালিয়ে যান। কমলের মাতার এই স্বামী কমলের পিতা নহে। 'তিনি কয়েক মাসের জ্বরে মারা গেলেন। বছর তিনেক পরে আমার জন্ম হ'ল বাগানের বড় সাহেবের ঘরে।' ইহা কমলের উক্তি। অর্থাৎ একজন ইংরেজের বাঙালী বিধবা রক্ষিতার গর্ভে কমলের জন্ম। কমল ইহাতে গৌরবই বোধ করে। কমল নিজের জীবনেও সে গৌরবের অমর্যাদা করে নাই। শরৎবাবু এ কমলচরিত্র সৃষ্টি করিয়া তাহাকে এই পিতৃমাতৃসম্পদ্ প্রদান করিয়া এবং তাহাকে অপরাপর ভাবসাধনার উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া নিশ্চয়ই গৌরব বোধ করিয়াছিলেন।

ভালমন্দের কথা নয়। কিন্তু নায়িকার জন্য, যে নায়িকার মুখে তিনি আপনার জ্ঞান-তন্ত্র জগতে প্রচার করিবেন, সেই নায়িকার জন্য, এমন উৎকট জন্মবিবরণ কি করিয়া তিনি কল্পনা করিলেন তাহা আমাদের চিন্তার অতীত। আর্টের দিক হইতে ইহা শোচনীয় অধঃপতন। হিন্দুধর্ম, হিন্দুসমাজ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান অনুষ্ঠান প্রভৃতির প্রতি দুরন্ত দুষ্ট বিদ্বেষ প্রকাশই যখন শরৎবাবুর উদ্দেশ্য ছিল, তখন তজ্জন্য উপযুক্ত ... নির্বাচন করিলে তাহার হিংসার সমুচিত প্রভা ফুটিয়া উঠিত। কমলকে সমুচ্চ বংশমর্যাদা দান করা উচিত ছিল। দিব্য হিন্দুধর্মপরিস্থিতির মধ্য হইতে নায়িকাকে বাহির করিয়া আনিয়া ধর্ম-বিদ্রোহিনীর সুদৃঢ় ভূমিতে তাহাকে স্থাপন করা উচিত ছিল। শরৎবাবু নায়িকাকে যে জন্ম ও চরিত্র দান করিয়াছেন তাহাতে তাহার অসদুদ্দেশ্য নিষ্ফল হইয়াছে। বিশেষত কমল আদ্যোপান্ত কথা বলিয়া বক্তৃতা করিয়া কুতর্ক এবং অনর্থ তর্ক করিয়াই চলিল—কাজ কিছুই করিল না। সম্পাদন কিছুই করিলনা। শরৎ-বাবুর সৃজনীশক্তি, তাহার creative art কোনোদিনও সমুন্নত শক্তিশালী ছিল না। তবু কিছুকিঞ্চিৎ ছিল। কিন্তু শেষপ্রশ্নে উহা চূড়ান্ত অক্ষমতার পরিচয় দিয়াছে।

পূর্বে বলিয়াছি শেষপ্রশ্নে প্লটের বালাই নাই। কারণ Action কিছুই নাই। রাগ-দ্বেষাদি চিত্তবেগবিকার, নানা ব্যক্তির নানা উদ্দেশ্য, নানা চেষ্টা প্রচেষ্টা এবং তৎতৎ প্রতি-ক্রিয়া। নব নব ঘটনা পরম্পরাপথে নব নব পরিস্থিতির পরিস্ফুটন—নব নব চিন্তা চেষ্টাদি সংঘর্ষ। নব নব রসস্ফূর্তি, নব নব উদ্দীপনা—যে সমস্ত ব্যাপার লইয়া উপন্যাস হয়। শেষপ্রশ্নে তাহার কিছুই নাই। এই সকল ঔপন্যাসিক রসসামগ্রী শরৎবাবুর লেখায় কোথায় কোথায় কি পরিমাণে কি ভাবে আসিয়াছে তাহার বিচার এখনো হয় নাই। শরৎবাবুর উপন্যাস লইয়া বাঙলাদেশ আবৃত-চক্ষু স্তুতিগানে মুখরিত। বিচার বিবেচনা কিছুই আরম্ভ হয় নাই। ইহা খুবই দুঃখের বিষয়।

শেষ প্রশ্নের আখ্যানাংশ নামমাত্র। চরিত্র অনেক। কিন্তু সম্বন্ধ সংযোগ তাহাদের কিছুই নাই বলিলেই চলে। সকলেই ভিন্ন ভিন্ন দৈনন্দিন বৈঠকের সরিক তাহারা। members of parlours meetings এইমাত্র সম্বন্ধ। একটি সুসংযোজিত কর্ম বৃক্ষের শাখাপ্রশাখা তাহারা নয়। একটি বৃহৎ ভাবমণ্ডলের অন্তরঙ্গ অংশকলা তাহারা নয়। আগ্রায় আগন্তুক আশুবাবুর বাসাবাটীতে এবং কদাচিৎ কোনো অকর্মণ্য অধ্যাপকের আশ্রমে অথবা কোনো অজ্ঞাতচরিত ম্যাজিস্ট্রেটের কুঠীতে যে সখের মজলিশ বসে, তাহাতে যোগ দিয়া বৈচিত্র্যহীন আলাপ আলাচনা করিয়া যাহারা মজলিস মশগুল করেন, তাহারাই তৎসম্পর্কেই এই উপন্যাসের চরিত্রসমূহ। প্রথম আশুতোষ গুপ্ত। খুব সজ্জন। সদাশয়। কিছু করেন না। বড়মানুষ। বাতে ভোগেন। স্বর্গীয়া পত্নীকে ভুলিতে পারেন নাই। রূপসী বিদুষী যুবতী অনূঢ়া কন্যার পিতা। এই পর্যন্ত। কার্যত বাতগ্রস্ত আশু-বাবু। কিন্তু ... বাতগ্রস্ত সবগুলি চরিত্র। রাজেনকে বাদ দেওয়া যায়। সকলেই প্রায় ক্রিয়াহীন। কথা বলেন বেশ। কমলের পক্ষে। অথবা বিপক্ষে।

প্রফেসর অবিনাশ মুখুয্যে। বিপত্নীক। বন্ধুসঙ্গে আনন্দ প্রসঙ্গে কালযাপন করেন। একটি ছোট ছেলে। গৃহে বিধবা, যুবতী, রূপবতী শালিকা। উভয়ের মধ্যে খুব ভাব। আদর করিয়া ছোট গিন্নী বলিয়া ডাকেন। অক্ষয়বাবুও অধ্যাপক। পুরাতনপন্থী। অসহিষ্ণু নীতিবাদী। ... তর্কপটু। রণপ্রবণ। চরিত্রের স্খলনপতন ... করেন না। শাসন-পরায়ণ। কমলকে প্রীতির চক্ষে দেখেন না। লেখক অক্ষয়কে প্রীতির চক্ষে দেখেন নাই। তিনি অক্ষয়ের নীতিনিষ্ঠ চরিত্রের ... অশ্রদ্ধেয়তা দেখাইয়াছেন। হরেন্দ্র অবিনাশের আত্মীয়। বিবাহ করেন নাই। অধ্যাপক। অবস্থা ভাল। অনেক দরিদ্র ছাত্রের শিক্ষা ব্যয়ভার বহন করেন। বাসাটী তাহার প্রায় একটি ব্রহ্মচর্যাশ্রম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সতীশ ও রাজেন তাহার বন্ধু। সৎকার্যে সহকর্মী। শেষ প্রশ্নের চরিত্র-রেজেষ্টারীতে এই সমস্ত নাম আছে এবং সকলেরি গুণদোষের তালিকা আছে। আলাপ-আলোচনায় উল্লেখ আছে। কিন্তু সকলেই যার যার তার তার। উপন্যাসের—যদি উপন্যাস বলিয়া কিছু থাকে—তাহার এরা কেউ কিছু নয়। আশুবাবু নামক যে অশ্বত্থ বৃক্ষটী, এই বিহঙ্গগুলি মাঝে মাঝে উড়িয়া আসিয়া তাহারি শাখায় বা ছায়ায় বসিয়া কলকূজন করেন। আর কমল নাম্নী যে মধুমালতীর লতাটি, কতক ভ্রমরের মত তাহাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া গুঞ্জন করেন, আর কতক উহাকেই বিষবল্লী মনে করিয়া দূরে সরিয়া যান—অথবা উন্মূলিত করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু সকলেই ছায়ামাত্র। রক্তে মাংসে মনেপ্রাণে কেহই মানুষ হইয়া উঠে নাই।

বাকি থাকিল শিবনাথ আর অজিত। কায়া কেহ নয়। ছায়াই। উভয়েই পর পর আশুবাবুর মেয়ের প্রণয়প্রার্থী এবং প্রণয়ভোগী। শিবনাথ কি—বলা যায় না। তবে চমৎকার। পাপচরিত্র চিত্রণের কলাকৌশল শরৎবাবু জানিতেন না। পুণ্যচরিত্র সংরচনাই কি জানিতেন? বোধ হয় না। বিষয়টি অন্য প্রবন্ধে বুঝাইব। বিরাজবৌ, বিন্দুর ছেলে, পণ্ডিতমশাই প্রভৃতির সমালোচনায় শরৎবাবুর চরিত্রাঙ্কণ পদ্ধতির রহস্য উদঘাটন করিতে চেষ্টা করিব। শিবনাথ কমলের রূপযৌবন দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া রোগশয্যাশায়িনী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া দার্শনিক ও নৈতিক বিচারবিবেচনাপূর্বক কমলকে পত্নী নয় উপপত্নী নয়, পরাৎপরা পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন। ব্যাপারটি গ্রন্থকারের সহানুভূতির আলোক হইতে বঞ্চিত বলিয়া একেবারেই মনে হয় না। কারণ কমলের মুখে এই মিলন-পর্বটির সমর্থনাত্মিকা অনেক ভাববাণী তিনি প্রস্ফুরিত করিয়াছেন। আশুবাবুর কন্যার রূপজ্যোৎস্নায় অভিষিক্ত ব্যাকুলচিত্ত শিবনাথ অমন প্রেম-কমলের প্রেমের গ্রন্থি অকাতরে ছিন্ন করিল। সংগীত সন্ধানে আশুবাবুর কন্যা মনোরমার সহিত শিবনাথের পরিচয়, প্রীতি ও পরিণয় সংকল্প। শিবনাথের স্ত্রী পরিত্যাগ এবং কমলের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ জানিয়া মনোরমার ভাবভঙ্গি ও অভিমান। ইতিমধ্যে অজিতের আগমন। অজিতের সঙ্গে পূর্ব হইতেই মনোরমার গভীর প্রণয়সম্বন্ধ এবং বিবাহ প্রস্তাবাদি হইয়াছিল। এখন সে বিলাত প্রত্যাগত। শিবনাথকে দেখিয়া মনোরমার পূর্ব প্রণয় ধ্বসিয়া গেল। নবীন প্রেম উপজিল। আবার শিবনাথের শিবানীকে দেখিয়া মনোরমার সে নবীন প্রেমও খসিয়া পড়িল। মনোরমারও ভাগ্য, অজিতেরও

সৌভাগ্য। যথাসময়ে অর্থাৎ ঐ ফাঁকটিতে, ঐ Inter-regnumএ, অজিত আসিয়া উপস্থিত হইল। তবু রক্ষা হ'ল না। অজিতের প্রায় চোখের সামনেই কতকটা, এবং কতকটা আঁধারে-আলোকে কুঞ্জছায়াতলে মনোরমা শিবনাথের সহিত চাওয়া-চাওয়ি কানাকাণি লুকোলুকি আরম্ভ করিল। অজিত দেখিয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল। শিবনাথ কমলকে ছাড়িয়া নিশ্চিন্তে মনোরমার পদানুসরণ করিল। অজিত মনোরমাকে ছাড়িয়া কমল-কাননে আশ্রয় গ্রহণ করিল। মনোরমা শিবনাথকে চায়। বিবাহ করিতে চায়। কমল অজিতকে চায়। বিবাহ চায় না। এর মধ্যে সাহিত্য কোথায়? শোভা সুষমা কোথায়। রসসৌন্দর্য কোথায়? ভাবসৌষ্ঠব কোথায়? সাহিত্যে পাপও সুন্দর হয়। পুণ্যও সুন্দর হয়। বীর করুণ রৌদ্র হাস—এমন কি বীভৎস পর্যন্ত রস আছে। কিন্তু এই সকল কোন রসে পড়িবে! আগাগোড়া অপ্রীতিকর। আগাগোড়া কুৎসিত। সমস্ত কদর্য। পাপপুণ্যে চুলোয় যাক্। একটা শোভনতাও তো চাই। সপ্তদশ শতকে ইংলণ্ডে ভ্যানব্রু, কংগ্রীব, উইবারলী প্রভৃতি অতি নিন্দনীয় লজ্জাজনক বিষয় লইয়া কত সুন্দর সুন্দর নাটক লিখিয়াছিল। আর এ কি? এত সব বিশ্রী কাণ্ড যে এ বিষয়ে কোনো কথা বলিয়া কথার অপব্যবহার করিতে ইচ্ছা করে না। এসব জিনিস সমালোচনার যোগ্য নয়। এই পুস্তকের সাতটি সংস্করণ হইয়াছে। এর চেয়ে আশ্চর্য সাহিত্যের রাজ্যে আর কিছু কখনো ঘটে নাই। শ্রীকান্তের প্রথম পর্বের সপ্তম সংস্করণ হইয়াছে। সপ্তবিংশ সংস্করণ হইলেও অন্যায় হইত না। পরিণীতার পঞ্চবিংশ সংস্করণ হইয়াছে—জানিলে আনন্দ হয়। পণ্ডিক মশাইর মাত্র পাঁচটা সংস্করণ হইয়াছে। পঁচিশটা হওয়া উচিত ছিল। গৃহদাহ একমাত্র সংস্করণ—খুব স্বাভাবিক। বাঙালী পাঠকের কাণ্ডজ্ঞানআছে বোঝা যায়। সাহিত্যবোধ আছে মনে করা যায়। কিন্তু শেষ প্রশ্নের সপ্তম সংস্করণ। তার চেয়ে মরণ ভাল। নৈতিক যেমন তেমন, কিন্তু সাহিত্য-বোধের, সাহিত্যরসাস্বাদনের কি ভয়ানক অধঃপতনের পরিচয়।

শরৎবাবুর মনস্তত্ত্ব বিদ্যার আলোচনা আমরা যথাসময়ে করিব। একটা অধ্যয়নের বিষয়। আপাতত একটি কথা বলিব। শরৎবাবুর সাহিত্যে পাঁচটা যুগপ্রভাব দেখা যায়। কাল-পর্যায়ে হয়ত মিলিবে না। কিন্তু ভাবপর্যায়টা স্পষ্ট। প্রথম সত্য যুগ। বিরাজ বৌ, বিন্দুর ছেলে, রামের সুমতি প্রভৃতি। তারপর ত্রেতা যুগ। শ্রীকান্ত প্রথম পর্ব। পরিণীতা। পণ্ডিত মশাই প্রভৃতি। অনন্তর দ্বাপর যুগ চরিত্রহীন, দেবদাস প্রভৃতি। তদনন্তর কলিযুগ। গৃহদাহ। সর্বশেষে অন্ধকার যুগ। শেষ প্রশ্ন। সত্যে যৌনভাব নাই। ত্রেতায় যৌনভাব আসিয়াছে। কিন্তু সুরম্য। সুশোভন। দ্বাপরে নর-নারী সম্বন্ধের ভ্রংশ এবং বিকৃতি আরম্ভ হইয়াছে। তবু প্রাণের জোরে মাধুর্য সুরক্ষিত হইতেছে। কলিতে যৌনভাব কুৎসিত রূপ ধারণ করিয়াছে। প্রচ্ছন্নকামুকতার কদর্য আকার গ্রহণ করিয়াছে। শেষ প্রশ্নের অন্ধকারে সর্বতো পতন ঘটিয়াছে। বিকৃত বাদানুবাদের গহন আবর্জনাতে আখ্যাংশের শেষ লেশ পর্যন্ত ডুবিয়া গিয়াছে। অন্ধকারে শোভা সৌন্দর্য কোথায়? অস্বচ্ছ ছায়ায় প্রেতছায়ার আনাগোনা আর কানাকানি।

শরৎবাবুর উপন্যাস রচনা কলাকৌশলের বিকট বিকার ও অধঃপতনের আর একটি উদাহরণ দিয়া প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব। আর্টের অগণিত অবান্তর বিকৃতি ও কদাকৃতি যাহা যাহা আছে তাহার বিবরণ লিখিয়া সময়ের অপব্যবহার করিব না। অবিনাশ মুখুয্যের শালী নীলিমা দেবী। অবিনাশের ছোট গিন্নী। অবশ্য বিধবা। পিতৃ সংসারে ভ্রাতৃ সম্পর্কে থাকেন না। থাকেন বিপত্নীক ভগিনীপতির গৃহে গৃহিণী হইয়া। প্রীতির প্রকৃতির যাহাই হোক, উভয়ের মধ্যে একটা গভীর প্রীতি। মেয়েটি খুব সেবাপরায়ণ এবং নানা গুণবতী। যৎকিঞ্চিৎ বাজে ঘটনার উপলক্ষে তিনি ভগিনী-পতির সংসার ছাড়িয়া আশুবাবুর বাসায় আসিয়া স্থান লইলেন। ব্রাহ্মণের মেয়ে বিধবা। জাতিতে বৈদ্য, বাতব্যাধি বিকলা[illegible]গ আশুবাবুর সেবা করেন। আশুবাবু অথচ শ[illegible]রে আগন্তুক। যাই হোক মানিয়া লইলাম। অ[illegible]াভাবিক কিছু নয়। আশুবাবুর বয়স ষাটের ক[illegible]ছাকাছি। শরৎ-বাবুর ভাষায় বিরাটদেহধারী। [illegible]াবার সেই দেহ বাতে অচলতাগতপ্রায়। ২৬[illegible]৭ বৎসর বয়স্কা কন্যার পিতা। এই একদিক। [illegible]ন্যদিকে নীলিমা দেবী। ভগিনীপতি অবিনাশে[illegible] সঙ্গে মধুর-ভাবস[illegible]ন্ধবতী। ভগিনীপতির [illegible]সংসার—নিজের সংসার [illegible]ড়িয়া আশুবাবুর ব[illegible]ায় বসবাস করিতে [illegible]সিলেন, তা বসুন। কিন্তু কি সর্বনাশ! মদনের অসাধ্য[illegible] সাধন! অবিনাশের [illegible] ভালবাসা কোথা[illegible] ভাসিয়া গেল! রূপ[illegible] যুবতী গুণবতী নী[illegible]লিমা [illegible] পিতৃতুল্য বৃদ্ধ[illegible]য় বাতবিকল, [illegible] দেহ আশুবাবুর জন্য প্রেমপা[illegible]লিনী। [illegible]বাবু কন্যার দুর্ব্যবহারে কি[illegible]ত যাই[illegible]বেন জানিয়া নীলিমা চেয়ারে বসিয়াই মূর্চ্ছিতা হইলেন। চেতনা পাইয়া 'শশব্যস্তে উঠে বসল। একবার, সমস্ত দেহটা তার কেঁপে উঠল। তারপর উপুড় হয়ে আমার (আশুবাবুর) কোলের উপর মুখ চেপে হুহু করে কেঁদে উঠল। সে কি কান্না! মনে হ'ল বুঝি তার বুক ফেটে যায় বা। * কমল জিজ্ঞাসা করিল, একি আপনি আগে বুঝতে পারেন নি? আশুবাবু বলিলেন, না। স্বপ্নেও ভাবিনি।' —ইত্যাদি

অভূতপূর্ব রসাভাসের এমন হাস্যাস্পদ উদাহরণ পৃথিবীতে সমস্ত সাহিত্যসমাজে কোথাও মিলিবে না। শরৎবাবুর সাহিত্যজীবনে শেষপ্রশ্ন প্রকৃতির প্রতিশোধ। অতি ভয়ানক প্রতিশোধ। শেষপ্রশ্ন অবশ্য শরৎবাবু উপন্যাস লিখিতে বসিয়া ছিলেন না। তিনি মনে মনে মহর্ষির আসনে বসিয়াছিলেন। বাঙলাদেশ তথা ভারতবর্ষকে শিক্ষা দিয়া উন্নত করিবার জন্য। ধর্ম, অধ্যাত্ম ও নীতির আবর্জনায় আগুন দিয়া স্বেচ্ছাচারিতার নব-ধর্ম প্রচার করিবার জন্য। বাঙালী পাঠকের তাঁহার প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রীতির মঞ্চের উপর তিনি আসন পাতিয়া ছিলেন। ভাবিয়াছিলেন তিনি যাহা বলিবেন তাহাই বেদবাক্য হইবে। বাঙালী যুবক সম্প্রদায়ের নাড়ীনক্ষত্র তিনি বুঝিয়া ছিলেন। যাই হোক কোন্ বা ঋষির অভিশাপে তিনি শেষপ্রশ্ন এই দুর্দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। আমরা দুঃখিত। তাঁহার অনেকগুলি লেখা সোনার অক্ষরে মুদ্রিত হওয়া উচিত। আর কতকগুলি সাবধানে পরিহার করা উচিত নূতন সংস্করণের আয়োজন করা উচিত নহে। আর সেই ভাল লেখাগুলিও ভাল করিয়া বিচার করিয়া বোঝা উচিত।

শেষ প্রশ্নের চারিশত পৃষ্ঠার প্রায় প্রতি পৃষ্ঠায়ই অতিমঞ্জু[illegible] অতি মনোহর কথা আছে। কিন্তু তাহার [illegible]নচতুর্থাংশই বাহ্য ঝলকদার শব্দজ্ঞানানুপাত। বস্তুশূন্যে বিকল্পঃ সত্যচ্যুত। [illegible]্যায়ভ্রষ্ট। কুতর্কনিষ্ঠ[illegible] একটু খানিক অ[illegible]ক্ষাপূর্বক, এক[illegible] [illegible]utinisingly দৃষ্টি ক[illegible] [illegible] ধরা পড়ে। শরৎবাবুরের [illegible] বেদবাক্যও নির্বোধের মত গ্রহণ কর[illegible] উচিত নয়। শ্রদ্ধাপূর্বক গ্রহণ করিয়া [illegible]রে ধীরে বিচার করা উচিত। বেদের উপদেশ আছে—আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যে মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্য ইতি। (বৃহদারণ্যকে [illegible]যদি সত্য দর্শন করিতে চাও, তবে প্রথম শোনো, তারপর বোঝ, তারপর হৃদয়ঙ্গম কর সর্বশেষে দর্শন লাভ কর।

## নূতন ছবির পরিচয়

অনন্যা—(শ্রীমতী পিকচার্স—কালি ফিল্মস্)—
কাহিনী : কল্যাণী মুখোপাধ্যায়, চিত্রনাট্য ও সংলাপ : বিনয় চট্টোপাধ্যায়, পরিচালনা : সব্যসাচী, আলোক-চিত্র : অজয় কর, শব্দযোজনা : যতীন দত্ত ও সন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিল্পনির্দেশ : বীরেন নাগ, সুরযোজনা : উমাপতি শীল। ভূমিকায় : বিপিন গুপ্ত, কমল মিত্র, পূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়, বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, ফণী রায়, সন্তোষ দাস, হরিধন মুখোপাধ্যায়, কানন দেবী, অনুভা গুপ্তা, রেবা বসু প্রভৃতি।

ছবিখানি প্রাইমা ফিল্মসের পরিবেশনায় ৮ই এপ্রিল থেকে রূপবাণী, ছায়া ও ইন্দিরাতে দেখানো হ'চ্ছে।

ধনী শিল্পী সমরেন্দ্রনাথ বিপত্নীক হ'য়ে তার দুটি সন্তানকে মানুষ ক'রে তুলতে থাকেন। দেবকুমার আর সীতা। দেবকুমার বড় হ'য়ে অন্যপথ ধরলে—সে হ'লো ইঞ্জিনীয়ার। আর সীতা শিক্ষা নিলে তার বাবার কাছে থেকে —ছবি আঁকা আর গান-বাজনায় সে দক্ষতা অর্জন ক'রলে আর সেই সঙ্গে সে নিজের মধ্যে একটা স্বাতন্ত্র্যবোধও গড়ে তুললে।

দেবকুমার উচ্চতর শিক্ষার জন্য বিলেত যাত্রার দিনই সমরেন্দ্রনাথ কঠিন অসুখে পড়লেন। দিবারাত্র সেবা ও চিকিৎসায় তাকে বাঁচিয়ে তুললেন ডাঃ রাঘব ঘোষাল। সুস্থ হবার পর সমরেন্দ্রনাথ সীতার বিবাহ দিতে চাইলেন এবং এও জানালেন যে তিনি তার সম্পত্তির অর্ধেক সীতাকে দিয়ে যাবেন। রাঘব ঘোষাল তখন জানালেন যে তার এক ভাই আছে, যদি আপত্তি না থাকে তো তিনি সীতাকে ভ্রাতৃবধূরূপে গ্রহণ ক'রতে রাজী আছেন। সমরেন্দ্রনাথ ডাঃ রাঘবের কাছে কৃতজ্ঞ ছিলেন সুতরাং বিবাহ হ'তে দেরী হ'লো না। বিবাহের পর সীতা এক বিপরীত আবহাওয়ার মধ্যে গিয়ে পড়'লো। জানতে পারলে যে, স্বামী কমল এক অদ্ভুত জীব, প্রচণ্ড নির্বোধ, নিজের সব সত্তাটা তার দাদা রাঘবের দখলে ছেড়ে দিয়ে রেখেছে। বড়জা মুখরা এবং নীচমনা। সীতার ঐশ্বর্য তার কাছে চক্ষুশূল। তার সম্পত্তির লোভে যে তাকে এ বাড়ীতে আনা হ'য়েছে একদিন তাও প্রকাশ হ'য়ে গেলো। এ বাড়ীতে সীতার শিল্পচর্চাও ঘুচে গেলো। এরা যে কত নীচ তা জানা গেলো যেদিন সীতা তার ভাসুরের আলমারীতে তার মায়ের দেওয়া হারছড়াটা আবিষ্কার ক'রলে। এদের আর প্রশ্রয় দেওয়া সীতার পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে উঠলো। সে পিতার কাছে গিয়ে অনুনয় ক'রে নতুন উইল করিয়ে তার নাম সম্পত্তির অংশীদার থেকে বাদ দিয়ে দিলে। এরপর সীতার একটি কন্যা-সন্তান হ'লো। সীতা তাকে নিজের ইচ্ছা মতো বড় ক'রে তুলতে লাগলো, ভাসুর বা জায়ের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধাচরণ ক'রেও। ইতিমধ্যে সমরেন্দ্রনাথ মারা গেলেন। ডাঃ রাঘব এতদিনে জানতে পারলেন যে তার আশা ব্যর্থ হ'য়েছে। সীতার ওপর উৎপীড়ন বেড়ে গেলো। সীতা সমস্ত কিছু সহ্য ক'রেও তার উমাকে বড় ক'রে তুললো। উমা কলেজে পড়ে, মার মতই সে স্বাধীনচেতা হ'য়ে উঠেছে। উমা ভালবাসে কলেজের তরুণ অধ্যাপক সুকান্ত দাসকে—মাকে যা সে চিনেছিলো তাতে জানতো যে এতে তার অমত হবে না। কিন্তু যখন বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে সে মার কাছে গেলো তখন শুদ্র বলে সীতা সহজে এ বিবাহ মেনে নিতে


## নতুন উপায়ে শ্যামদেশীয় চালের ভাত রান্না করুন

এই চালের ভাত ঠিকভাবে রান্না ক'রতে সম্ভবতঃ আপনার অসুবিধা হয়। সচরাচর যেভাবে ভাত রান্না করা হয়, সেভাবে রান্না ক'রলে এই চালের ভাতের সমস্তটা গলে গিয়ে আঠালো একটা দলা বেঁধে যায় অভিযোগ শোনা গেছে।

কেন্দ্রীয় খাদ্যশস্য পরীক্ষাগারে দেখা গেছে যে, নিম্নলিখিত উপায়ে এই চালের বেশ ভাল ভাত রান্না করা যায়। আপনিও এই নিয়মে এই চালের ভাত রান্না ক'রে দেখতে পারেন:—

(ক) **সাধারণ নিয়ম:** ধরুণ, আপনাকে আড়াই ছটাক চালের ভাত রান্না ক'রতে হবে। তাহলে প্রথমতঃ আড়াই ছটাক জল ফুটিয়ে নিন। এই জলে ঐ পরিমাণ চাল মিশিয়ে মৃদু আগুনে সিদ্ধ হতে দিন। চাল যখন আধাসিদ্ধ হবে, তখন তাতে আর কিছুটা জল (ধরুণ, এক ছটাক) মিশিয়ে নাড়তে থাকুন। মনে রাখবেন যে, বেশী জোর না দিয়ে ধীরে ধীরে নাড়তে হবে। বেশীক্ষণ ধরে নাড়াও ঠিক নয়। যখন দেখবেন যে, পাত্রের ভিতর আর জল নেই আর চাল সিদ্ধ হয়ে গেছে, তখন উনুনের ওপর থেকে পাত্রটি নামিয়ে রাখুন। এভাবে রান্না ক'রলে এ চালের ভাত গলে গিয়ে দলা বেধে যাবে না। ভাতের এক-একটি দানা আর একটি দানা থেকে মোটামুটি পৃথকই থাকবে আর তা খেতেও ভাল লাগবে।

(খ) **চাল ভিজিয়ে রান্না করার প্রণালী:** আড়াই ছটাক চাল আড়াই ছটাক জলে প্রায় ১৫ ঘণ্টাকাল ভিজিয়ে রাখুন। তারপর ঐ জলসুদ্ধ চাল মৃদু আগুনে সিদ্ধ ক'রতে থাকুন আর দু'একবার ধীরে ধীরে চালগুলো নেড়ে দিন। এতে আর জল মেশাবার প্রয়োজন নেই। এভাবে রান্না ক'রলে এ চালের ভাত [illegible] বেধে যাবে না।

(গ) **ভেজে রান্না করার প্রণালী:** দুই তোলা ঘিয়ে আড়াই ছটাক চাল মৃদু আগুনে ভাজুন। যখন দেখবেন যে, চালের সাদা রং একটু একটু লাল হয়ে উঠেছে, তখন তাতে আড়াই ছটাক পরিমিত জল মিশিয়ে দিন। চাল আধাসিদ্ধ হ'লে তাতে আর ছটাকখানেক জল দিন। এভাবে রান্না ক'রলে ভাত দলা বেধে যাবে না, সে ভাত খেতে ভাল লাগবে, আর ভাতের দানাগুলি উল্লিখিত দু'টি প্রণালীতে রান্না-করা ভাতের দানার চেয়েও আল্‌গা আল্‌গা থাকবে।

(ঘ) **ভাপে সিদ্ধ ক'রে রান্না করার প্রণালী:** আড়াই ছটাক চালে সম পরিমাণ জল মিশিয়ে স্টীম কুকারে সিদ্ধ হ'তে দিন। এই উপায়ে রান্না ক'রলে ভাত দলা বেধে যাবে না আর [illegible] তেও সুস্বাদু হবে। ভাতের দানাগুলি অন্য তিনটি প্রণালীতে রান্না-করা ভাতের দানাগুলির চেয়ে আরো একটু পৃথক পৃথক [illegible]।

শ্যামদেশে কিছু পরিমাণ এই ধরণের চাল উৎপন্ন হয় এবং যাঁরা শ্যামদেশের চাল নিয়ে থাকেন, তাঁদের বরাদ্দ চালের মধ্যে এই রকম কিছুটা চাল গ্রহণ করা একান্ত উচিত। যদি আমরা এই ধরণের চাল না নিই, তা'হলে সেই সঙ্গে শ্যামদেশের যে পরিমাণ চাল আমাদের জন্য বরাদ্দ করা আছে, তার সমস্তটাই আমাদের হারাতে হয়। সরবরাহের বর্তমান অবস্থায় খাদ্যের বরাদ্দ এভাবে নষ্ট হ'তে দেওয়া চলে না। এই চাল স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর নয়।

সামনের বার, আপনাকে যখন আপনার সাপ্তাহিক বরাদ্দের অংশ হিসেবে কিছুটা এই ধরণের চাল দেওয়া হবে, তখন আপনি উল্লিখিত যে-কোন উপায়ে এ চালের ভাত রান্না ক'রে দেখবেন।

**পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনসংভরণ বিভাগ থেকে প্রচারিত**

পারলেন না। তবুও মেয়ের সুখের কথা চিন্তা করে সীতা নিজে গেলো সুকান্তকে দেখতে এবং সুকান্তের গুণের পরিচয় পেয়ে উমাকে তিনি মত দিতে আর দ্বিধা ক'রলেন না। বাড়ীতে এনিয়ে তুমুল কাণ্ড বেধে গেলো। ডাঃ রাঘবের পক্ষে এদের আর সহ্য করা অসম্ভব হ'য়ে উঠলো। তাই সীতা আর উমাকে বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসতে হ'লো। উমাকে নিয়ে সুকান্ত রেঙ্গুণে চলে যাবার পর সীতা প্রথমে গেলো তার দাদার কাছে। ডাঃ রাঘব ঘোষাল গিয়েছিলেন সীতাকে ফিরিয়ে আনার জন্যে, অবশ্য সেটা সমাজে নিজের মান রাখবার জন্যে, কিন্তু ব্যর্থ হ'য়ে তাকে ফিরে আসতে হয়। সীতা সেখান থেকে এক গ্রামে গিয়ে শিক্ষয়িত্রীর পদ গ্রহণ করে। সেখানে একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে স্বামী কমলের সঙ্গে মিলন হ'লো।

কাহিনীটি অভিনবত্বের দিক থেকে ছবির ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট অবদান বলা যায়। একটা দীপ্ত দৃষ্টিভঙ্গীরও পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও অনন্যসাধারণ একটা কিছু হ'য়ে উঠতে পারেনি, সেটা সম্ভবতঃ বিন্যাসের দোষেই। সবকিছুর মধ্যে একটা কৃত্রিমতা পরিব্যাপ্ত দেখা যায়। ঘটনাগুলোকে স্বাভাবিক স্রোতের মুখে ছেড়ে দেওয়ার চেয়ে ছক কেটে তার রাস্তা নির্দিষ্ট ক'রে দেওয়ার আভাসটা অত্যন্ত স্পষ্ট। আর তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এগিয়ে এসেও একটা কোন নাটকীয় পরিস্থিতি পুষ্ট ক'রে তুলতে পারেনি—কাহিনীতে আছে সবই ঐ একটি বস্তু ছাড়া। ছবি হ'য়েছে বেশ ঝরঝরে কিন্তু গতি অত্যন্ত শ্লথ। তবুও বসে থেকে দেখবার আগ্রহ গোড়া থেকে শেষ পর্যন্তই সজাগ রেখে দেবার মত অনেক গুণেই ছবিখানির মধ্যে পরিস্ফুট হ'তে পেরেছে।

অভিনয়ে অনন্যসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন যাঁদারাম স্বামী কমলের ভূমিকায় পূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়—সত্যিকারে প্রতিভাবান শিল্পী আর একজনকে পেয়ে আমরা অভিবাদন জানাচ্ছি। চলনে বলনে অভিব্যক্তিতে একটা অত্যন্ত কষ্টকল্পিত কৃত্রিম চরিত্রকেও তিনি সহানুভূতিপূর্ণ ক'রে তুলতে পেরেছেন। বিপিন গুপ্তের সমরেন্দ্রনাথের মধ্যে আবেগের উচ্ছ্বাসটাই হ'য়েছে প্রবল, নয়তো তার অভিনয় ক্ষমতাকে স্বীকার করার মতো যথেষ্ট দক্ষতা পাওয়া যায়। সুকান্তের ভূমিকায় বিকাশ রায় ছোট ভূমিকাতেও ছাপ দিতে পেরেছেন, অবশ্য অসাধারণ কিছু নয়। ডাঃ রাঘব ঘোষালকে কমল মিত্র তার দীর্ঘ বেহায়া আর বাজখাই গলায় সামনে তুলে ধ'রে রাখতে পেরেছেন—এই পর্যন্তই। সীতার চরিত্রটি এখনকার দিনে বাস্তব স্বাভাবিক হ'লেও ওর মধ্যে কোথাও কোথাও এমন কৃত্রিমতা প্রবিষ্ট করিয়ে দেওয়া হ'য়েছে যাতে মর্মের ধার পর্যন্ত যায় কিন্তু স্পর্শ ক'রতে পারে না। শ্রীমতী কাননও চরিত্রটিকে আর বেশী প্রাণবন্ত ক'রতে পারেনি। অনুভা গুপ্তার উমা চলে যাবার মত ছাড়া কিছু নয়।

পাঁচখানি গানের মধ্যে চারখানি হচ্ছে রবীন্দ্র সঙ্গীত আর একখানি শৈলেন রায়ের রচনা। গানগুলি গাওয়া হ'য়েছে ভালই, কিন্তু সুসংগত হয়নি—বাজনার জোর গানকে দাবিয়ে রেখে দিয়েছে; আর শব্দের মধ্যেও একটু কর্কশতা কাণে লাগলো।

কলাকুশলের দিক মোটামুটি। শিল্প-নির্দেশ ছবির সৌষ্ঠব বাড়িয়েছে ব'লে স্বীকার করা যায়।

ডিষ্ট্রিবিউটর্স: মেসার্স দি এসিয়াটিক মার্কেন্টাইল কর্পোরেশন লিঃ
১, ক্লাইভ রো, কলিকাতা। ফোন—বি, বি, ১৬০২

## হকি

বেংগল হকি এসোসিয়েশন পরিচালিত হকি লীগ প্রতিযোগিতার সকল খেলা শেষ হইয়াছে। পোর্ট কমিশনার্স দল পুনরায় প্রথম ডিভিসনের চ্যাম্পিয়ান হইয়াছে। পোর্ট কমিশনার্স দল এইবার লইয়া পঞ্চমবার লীগ চ্যাম্পিয়ান হইল। ইতিপূর্বে পোর্ট কমিশনার্স দল ১৯৪২, ১৯৪৪, ১৯৪৬ ও ১৯৪৮ সালে লীগ চ্যাম্পিয়ানশিপের গৌরব অর্জন করে। ১৯৪৭ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার জন্য কোন খেলা হয় না। নতুবা ঐ বৎসরে পোর্ট কমিশনার্স দল চ্যাম্পিয়ান হইতে পারিত। হকি লীগ প্রতিযোগিতায় পোর্ট কমিশনার্স দলের এই কৃতিত্ব সত্যই প্রশংসনীয়। তবে এই বৎসরে পোর্ট কমিশনার্স দল একরূপ সৌভাগ্য বলেই চ্যাম্পিয়ানশিপের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছে বলিলে কোনরূপ অত্যুক্তি করা হইবে না। কারণ প্রতিযোগিতার মীমাংসার শেষ খেলায় পোর্ট কমিশনার্স দল সৌভাগ্যক্রমেই একটিমাত্র গোলে মোহনবাগান দলকে পরাজিত করে। খেলার সূচনায় পোর্ট কমিশনার্স দল গোল করিয়া শেষ পর্যন্ত আত্মরক্ষায় ব্যস্ত থাকিতে বাধ্য হয়। মোহনবাগান দলের আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়গণ আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও গোল পরিশোধ করিতে পারে নাই। মোহনবাগান দল এই খেলায় পরাজিত হইয়া রানার্স আপ হইয়াছে।

রাজস্থান ক্লাব দ্বিতীয় ডিভিসন ও বাটা স্পোর্টস ক্লাব তৃতীয় ডিভিসনের চ্যাম্পিয়ান হইয়াছে। লীগ প্রতিযোগিতায় উঠানামা প্রবর্তিত হওয়ায় রাজস্থান আগামী বৎসরে প্রথম ডিভিসনে ও বাটা স্পোর্টস দ্বিতীয় ডিভিসনে খেলিবার সৌভাগ্য লাভ করিল।

দীর্ঘ দুই মাস ধরিয়া হকি লীগ প্রতিযোগিতা পরিচালিত হওয়ায় বিভিন্ন দলের ও বিভিন্ন খেলোয়াড়ের বহু খেলা দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অতি দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে বাঙলার হকি স্ট্যান্ডার্ড পূর্ব বৎসর অপেক্ষাও নিম্নস্তরের হইয়াছে। এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য বাঙলার হকি পরিচালকগণ কি করিতেছেন বা করিবেন জানিতে ইচ্ছা হয়।

### বেটন হকি কাপ

বেটন হকি কাপ প্রতিযোগিতার খেলা আরম্ভ হইয়াছে। বাহিরের দলসমূহ একে একে আসিয়া কলিকাতায় পেঁৗছিতেছেন দেখিয়া আনন্দ হইল। তবে ইহা আমরা একেবারে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে, যোগদানকারী দলসমূহ শেষ পর্যন্ত প্রতিযোগিতায় যোগদান করিবে না। কলিকাতার প্লেগ, কলেরা প্রভৃতি রোগের প্রাদুর্ভাবের সংবাদ যেভাবে প্রতিদিন প্রকাশিত [illegible] তাহাতে বাহিরের অনেক দলের পরিচালকের মনে ভীতি সঞ্চার করিয়াছে।

## ফুটবল

আই এফ এর নূতন গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নির্বাচনের মধ্যে বহু কিছু যে গলদ [illegible] বিভিন্ন স্থানের আলোচনা প্রসংগেই আমরা শুনিতে পাইয়া থাকি। ঐসব আলোচনা বা উক্তি যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন নহে তাহার প্রমাণ দিয়াছে সম্প্রতি প্রকাশিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যাথলেটিক ক্লাবের সম্পাদকের আই এফ এর পরিচালকমণ্ডলীর নিকট লিখিত পত্রখানি। ঐ পত্রে অভিযোগ করা হইয়াছে যে, (১) আই এফ এ সরাসরি বিভিন্ন কলেজকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে হেয় প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে উহা সমর্থন করা সম্ভব নহে। (২) ১৯৩৯ সালে আই এফ এর পরিচালকমণ্ডলীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য দুইটি স্থান সংরক্ষিত হইবে বলিয়া যে সিদ্ধান্ত হইয়াছিল তাহা ভঙ্গ করা হইয়াছে, (৩) নূতন গঠনতন্ত্রে কেবলমাত্র অন্তর্ভুক্ত কলেজসমূহের জন্য একটি স্থান রাখা হইয়াছে এই পরিবর্তন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত আলোচনা করিয়া করা হয় নাই। এইরূপ অবস্থায় আই এফ এর নূতন গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নির্বাচন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে সমর্থন করে না তাহা জানাইয়া দিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাথলেটিক ক্লাব বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত সকল স্কুল ও কলেজকে আই এফ এর সম্পর্ক ত্যাগ করিতে নির্দেশ দিয়াছে। আই এফ এর নূতন গঠনতন্ত্র যতক্ষণ পরিবর্তন না করা হইতেছে ততক্ষণ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ কোন কলেজ বা স্কুল আই এফ এর পরিচালিত কোন প্রতিযোগিতায় যোগদান করিবে না। সম্পাদকের এই কড়া চিঠি আই এফ এ'কে বেশ একটু চঞ্চল করিয়াছে বলিয়া জানা গেল। ইতিমধ্যেই আই এফ এর কোন বিশিষ্ট পরিচালক বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত মিটমাট করিতে গিয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়াছেন বলিয়া শোনা গেল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যাথলেটিক ক্লাবের সম্পাদক যে অভিযোগ করিয়াছেন তাহা খুবই গুরুতর। ইতিপূর্বে স্কুল প্রতিনিধি নির্বাচন যেভাবে ধামা চাপা দেওয়া হইয়াছে, এই ক্ষেত্রে তাহা সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না।

### ভারতীয় ফুটবল দলের সিংহল ভ্রমণ

নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশন সিংহল স্পোর্টস এসোসিয়েশনের অনুরোধে একটি ফুটবল দল প্রেরণ করিয়াছেন। এই দল নির্বাচনের সময় পক্ষপাতিত্বের যে অভাব হয় নাই ইহা নিঃসন্দেহেই বলা চলে। এমন কয়েকজন খেলোয়াড়কে নির্বাচন করা হইয়াছে যাহারা ভারতীয় দলে দূরের কথা বাঙলার বাছাই দলে স্থান পাইতে পারেন না। সিংহলের ফুটবল স্ট্যান্ডার্ড খুব উন্নততর নহে, সুতরাং যে দল প্রেরিত হইয়াছে তাহা অনায়াসেই সকল খেলায় জয়ী হইবে; কিন্তু তাহা বলিয়া দল নির্বাচনের সময় নির্বাচকগণ পক্ষপাতদুষ্ট রোগ হইতে মুক্ত থাকেন, ইহা সকলেই কামনা করেন। মোহনবাগানের অনিল দে দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি যাইতে না পারায় শেষ পর্যন্ত এস মান্নাকে অধিনায়ক মনোনীত করা হইয়াছে। যে সকল খেলোয়াড়গণ ভারতীয় ফুটবল দলের প্রতিনিধিত্ব করিতে গিয়াছেন তাঁহাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ এস মান্না (অধিনায়ক), তাজমহম্মদ (বাঙলা), [illegible] ব্যানার্জি (বাঙলা), রবি দাস (বাঙলা), অভয় [illegible] (বাঙলা), মহাবীর (বাঙলা), [illegible]জ (বাঙলা), বজ্রভেলু (মহীশূর), এণ্টনী (মহীশূর), [illegible]বাজ (মহীশূর), রমন (মহীশূর), আবিদ হোসেন (যুক্তপ্রদেশ), হনুমন্ত রাও (মাদ্রাজ), সম্মুগম (মহীশূর), বাসির (মহীশূর) ও আমেদ (মহীশূর)।

কে পি ট্যাণ্ডন দলের ম্যানেজার হিসাবে গিয়াছেন। ভারতীয় ফুটবল দল দুইটি টেস্ট ম্যাচ ও তিনটি সাধারণ খেলায় যোগদান করিবে।

## ক্রিকেট

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের অমরনাথের উপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের জের অনেক দূর যে গড়াইবে তাহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছিলাম, ফলত তাহাই হইয়াছে। দিল্লী ক্রিকেট এসোসিয়েশন ইতিমধ্যেই বোর্ডের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিয়াছে। বাঙলা, মহারাষ্ট্র, হোলকার, বিহার, যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি প্রাদেশিক ক্রিকেট এসোসিয়েশনের পরিচালকগণ অনুরূপ প্রতিবাদ জানাইবেন বলিয়া শোনা যাইতেছে। এইদিকে অমরনাথ বোর্ডের সিদ্ধান্তের সংবাদ শ্রবণ করিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, অভিযোগ সম্পর্কে কিছুই জানেন না। তিনি সংবাদপত্রের প্রতিনিধির নিকট বোর্ডকে হীনপ্রতিপন্ন করিয়া বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন বলিয়া যে অভিযোগ করা হইয়াছে তাহাও ভিত্তিহীন। তিনি কোন প্রতিনিধির নিকট কোন বিবৃতি প্রদান করেন নাই বলিয়া জোর করিয়া প্রচার করিয়াছেন। অমরনাথ দাবী করিয়াছেন বোর্ডের নিকট তাঁহার অভিযোগ সংক্রান্ত সকল কিছু সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচার করিতে। অমরনাথের এই উক্তির উত্তরে বোর্ডের সভাপতি মিঃ ডি মেলো বলিয়াছেন, "অমরনাথের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে। সভা অমরনাথের নিকট হইতে কিছু শুনিবার বা অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন অনুভব করে নাই। সভার সম্মুখে প্রচুর প্রমাণ ছিল ঐ সকল সম্পর্কে সন্দেহ করিবারও কোন কারণ ছিল না।" এই প্রসংগে তিনি ১৯৩৬ সালে অমরনাথের বিরুদ্ধে যে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়, তাহা দূর করিতে তাঁহাকে কি পরিমাণ বন্ধুবান্ধবের হস্তে নিগৃহীত হইতে হয় তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন। আগামী জুলাই মাসে বোর্ডের যে সভা হইবে তাহাতে অমরনাথের অভিযোগ সম্পর্কে পুনরায় আলোচনা হইবে বলিয়াও সভাপতি মিঃ ডি মেলো উল্লেখ করিয়াছেন।

মিঃ ডি মেলোর উক্তি পাঠে অনেকেই বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, ইহা যেন ঠিক "ঠাকুর ঘরে কে?" "আমি কলা খাই নাই"র মতন।


রাজবৈদ্য শ্রীপ্রভাকর চট্টোপাধ্যায় এম-এ আবিষ্কৃত

যক্ষ্মারি সেবনে বহু রোগী আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। বিস্তৃত বিবরণ পুস্তিকার জন্য পত্র লিখুন বা সাক্ষাৎ করুন। ১৭২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ফোন—৪০৩৯ বি বি।

পেটেরপীড়া তীব্র অম্ল, পেটে বায়ু, গ্যাসট্রিক আলসার, কলিক পেইন প্রভৃতি ১ দিনেই বন্ধ করিয়া "দীপন" স্থায়ী আরোগ্য করে। মূল্য ৩্, মাঃ ৸৵০। কবিরাজ—আর এন চক্রবর্তী। ২৪, দেবেন্দ্র ঘোষ রোড, ভবানীপুর, কলিঃ—২৫। ফোন সাউথ—৩০৮।

## দেশী সংবাদ

১১ই এপ্রিল—নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে মানভূম সত্যাগ্রহ সম্পর্কে আলোচনা হয়। বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন থাকায় স্থির হইয়াছে যে, সত্যাগ্রহ বন্ধ করার জন্য কংগ্রেস সভাপতি সংশ্লিষ্ট দলগুলির নিকট পত্র লিখিবেন।

পুরুলিয়া লোক সেবক সংঘে এই মর্মে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, পুরুলিয়া হইতে ১৬ মাইল দূরবর্তী চাকলতায় সত্যাগ্রহ করিতে গিয়া ১০।১২ জন লোক আহত হইয়াছে। আহতদের মধ্যে মানভূম লোক সেবক সংঘের পরিচালক শ্রীঅতুল ঘোষের পুত্র শ্রীঅরুণ ঘোষ অন্যতম।

১২ই এপ্রিল—নয়াদিল্লীর সংবাদে প্রকাশ, দেশীয় রাজ্যসমূহের বিভিন্ন ইউনিয়ন গঠন সংক্রান্ত চুক্তিপত্র সংশোধন করা হইবে। জানা গিয়াছে যে, ইহার ফলে এই সব ইউনিয়নের শাসন পরিচালন ব্যবস্থা ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশাধীন হইবে।

বিন্ধ্য প্রদেশের শিল্প ও সংভরণ সচিব শ্রীশিববাহাদুর সিংকে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

রায়গড়ে (মহাকোশল) মহাকোশল প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মেলনের অধিবেশনে কংগ্রেসকে শক্তিশালী করিবার এবং দেশের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নের নিমিত্ত গান্ধীজীর গঠনমূলক পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করার জন্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের নিকট আবেদন করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

১৩ই এপ্রিল—ইন্দোনেশিয়ার পরিস্থিতি আলোচনার উদ্দেশ্যে অদ্য নয়াদিল্লীতে ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে এক ঘরোয়া বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ব্রহ্মের প্রধান মন্ত্রী থাকিন নু এবং আফগানিস্থান, অস্ট্রেলিয়া, চীন, সিংহল প্রভৃতি দেশের কূটনৈতিক প্রতিনিধিরা আলোচনায় যোগদান করেন।

পুরুলিয়ার সংবাদে প্রকাশ, গতকল্য মানভূম জেলায় যে ৪টি গ্রামে সত্যাগ্রহ হয় তৎসম্পর্কে জানা গিয়াছে যে, বাঘাট শ্যামপুর (কালীপুর) ও চৌলিয়ামায় (চাস্তিল) বিক্ষোভকারীগণ সত্যাগ্রহীগণের উপর মারপিট করে। জনৈক সত্যাগ্রহীকে হাণ্টার দ্বারা প্রহার করা হয়।

১৪ই এপ্রিল—ত্রিবাঙ্কুরের তামিল ভাষাভাষী তালুকসমূহ মাদ্রাজ প্রদেশের অন্তর্ভুক্তির দাবী করিয়া গতকল্য ত্রিবাঙ্কুর-তামিলনাদ কংগ্রেস ত্রিবান্দ্রম হইতে ৪২ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত নাগেরকইলে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিয়াছে। এই সম্পর্কে ত্রিবাঙ্কুর-তামিলনাদ কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীনাথানিয়েল এবং অপর কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

নয়াদিল্লীর সংবাদে প্রকাশ, পাকিস্থান কর্তৃক কাশ্মীরে যুদ্ধ বিরতির চুক্তি প্রতিনিয়ত ভঙ্গ করায় ভারত সরকার কাশ্মীর কমিশনের নিকট প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিবেন। যুদ্ধ বিরতির চুক্তি সম্পাদিত হইবার পর পাকিস্থানী সৈন্যদল কাশ্মীর রণাঙ্গনের গুরেজ, উরি ও টিথোয়াল অঞ্চলের বহু স্থান দখল করিয়াছে।

কাঁচড়াপাড়ায় বঙ্গীয় রক্ষিদলের শিক্ষা কেন্দ্রে উক্ত দলের প্রথম বার্ষিকী উৎসবের অনুষ্ঠান হয় এবং উহাতে বক্তৃতা প্রসঙ্গে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর প্রধান সেনাপতি জেনারেল কে এম কারিয়াপ্পা ঘোষণা করেন যে, তিনি দেশের এতদঞ্চল হইতে অন্ততঃপক্ষে ২০০ লোক লইয়া একটি সেনাদল (কোম্পানী) গঠনের জন্য আদেশ জারী করিয়াছেন।

পূর্ব পাঞ্জাবের নবনির্বাচিত প্রধান মন্ত্রী শ্রীভীমসেন সাচার ও তাঁহার মন্ত্রিসভার অপর চারিজন সদস্য বাবু বচন সিং, সর্দার উজ্জ্বল সিং, সর্দার যোগীন্দ্র সিং ও চৌধুরী লাহরী সিং অদ্য শপথ গ্রহণ করেন।

১৫ই এপ্রিল—জম্মু হইতে এই মর্মে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, গত ১লা জানুয়ারীর পরে একমাত্র জম্মু প্রদেশেই প্রায় ৪০টি ক্ষেত্রে পাকিস্থানী সৈন্য যুদ্ধ বিরতির চুক্তি ভঙ্গ করিয়াছে এবং ইহা রাষ্ট্রসংঘের সামরিক পর্যবেক্ষকদের গোচরীভূত করা হইয়াছে।

ভারত সরকার বিন্ধ্য প্রদেশ দেশীয় রাজ্য ইউনিয়নের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

পুরুলিয়ার সংবাদে প্রকাশ, বুধবার মাঝিহিরা গ্রামে বিক্ষোভকারিগণ সত্যাগ্রহীদের মারপিট করে। শ্রীবৈদ্যনাথ দত্তের দুইটি দাঁত ভাঙ্গিয়া যায়। শ্রীজীমূতমোহন সেনের মাথা ফাটিয়া যায়। স্বর্গীয় নিবারণ দাশগুপ্তের পুত্র শ্রীবিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত এবং অন্যান্য অনেকে পাল্টা বিক্ষোভকারিগণ কর্তৃক প্রহৃত হন।

১৬ই এপ্রিল—নয়াদিল্লীতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, কাশ্মীরে যুদ্ধবিরতি চুক্তি ভঙ্গ করিয়া পাকিস্থানী বাহিনী ভারতীয় সৈনাদের উপর গুলী বর্ষণ করে। ভারতীয় বাহিনী প্রত্যুত্তরে কোনরূপ গুলী বর্ষণ করে নাই। ঐ দিন পাকিস্থানী বাহিনী ভারতীয় সীমানার অন্তর্বর্তী এ[illegible]টি গ্রাম অধিকার করিয়াছে।

নয়াদিল্লীতে সর্দার বল্লভভা[illegible] প্যাটেলের বাসভবনে মহাত্মা গান্ধী স্মৃতি ভা[illegible]ডারের শিল্পপতি কমিটির এক বৈঠক হয় এবং [illegible] কমিটি গান্ধী জাতীয় স্মৃতি ভাণ্ডারের চে[illegible]ম্যান ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদকে মোট ৫ কোটি ৭ [illegible] ৫১ হাজার ১৫১ টাকার কয়েকখানি চেক দেন।

আর্মি হেড কোয়ার্টার্সে[illegible] সেনা নির্বাচন সম্পর্কীয় ডিরেক্টর এন ডি [illegible]লমোরিয়া অদ্য কলিকাতায় সরকারী দপ্তরখানায় [illegible]ক্তৃতা প্রসঙ্গে দেশের যুবকগণকে অধিক সংখ্যায় সৈন্যদলে ভর্তি হইতে বিশেষভাবে আহ্বান করেন।

বরোদার প্রধান মন্ত্রী ডাঃ জী[illegible]রাজ মেহতা আমেদাবাদে [illegible]বিমান ঘাঁটিতে সাংবাদিকদের নিক[illegible] বলেন যে, বরো[illegible]র অন্তর্ভুক্তির প্র[illegible]ন সম্প[illegible] আলোচনার জন্য তিনি দিল্লী গিয়াছি[illegible]ন। তিনি আরও বলেন যে, [illegible]লা মে বরোদা [illegible] সহিত যুক্ত হইবে এবং [illegible] সম্পর্কে [illegible] প্রস্তুতি চলিতেছে।

নয়াদিল্লীতে খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রী শ্রীজয়রামদাস দৌলতরামের সভাপতিত্বে প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যসমূহের কৃষি কর্মচারিগণের এক সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছে।

১৭ই এপ্রিল—নয়াদিল্লীতে প্রাদেশিক ও দেশীয় রাজ্য গভর্নমেণ্ট সমূহের কৃষি বিভাগীয় সেক্রেটারী ও ডিরেক্টরগণের সম্মেলনে ভারতকে ১৯৫১ সালের মধ্যে খাদ্যে স্বাবলম্বী করার পরিকল্পনা সম্পর্কিত যাবতীয় কয়েকটি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

গতকল্য আনন্দবাজার পত্রিকা ও হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড কার্যালয়ে শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র মজুমদারের সহিত আলোচনা প্রসঙ্গে সর্দার জীবন সিং বলেন যে, সতীশবাবুর নেতৃত্বে গান্ধী শিবিরের যে সকল কর্মী নোয়াখালিতে গান্ধীজীর আরব্ধ শান্তি স্থাপন প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইতেছেন, তাঁহার তাঁহাদের কাজকে মূলত মানব কল্যাণের আদর্শে অনুপ্রাণিত বিশ্ব-শান্তি আন্দোলনের অঙ্গীভূত বলিয়াই মনে করিতেছেন।

কলিকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত গো-সেবা সম্মেলনে (পূর্বাঞ্চল শাখা) বক্তৃতা প্রসঙ্গে বিভিন্ন বক্তা অবিলম্বে গো-হত্যা বন্ধ করিয়া জাতির এই অমূল্য সম্পদ রক্ষার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন। সম্মেলনে এই মর্মে এক প্রস্তাবও গৃহীত হয়।

## বিদেশী সংবাদ

১১ই এপ্রিল—অদ্য মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদে ব্যয় বরাদ্দ কমিটি আণবিক অস্ত্রোৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় অনুমোদন করিয়াছেন।

১২ই এপ্রিল—রেঙ্গুনের সংবাদে প্রকাশ ব্রহ্মের সরকারী বাহিনী মান্দালয় পুনরধিকার করিয়াছে।

১৪ই এপ্রিল—ইন্দোনেশিয়া সমস্যার সমাধানকল্পে অদ্য বাটাভিয়ায় ওলন্দাজ ও সাধারণতন্ত্র প্রতিনিধিমণ্ডলীর মধ্যে আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে।

নুরেমবার্গে নাৎসী যুদ্ধাপরাধীদের শেষ [illegible] ১৩শ বিচারপর্ব সমাপ্ত হইয়াছে। একটি মার্কি[illegible] ট্রাইবুনালের বিচারে ১৯ জন প্রাক্তন নাৎসী শাসনকর্তা ও কূটনৈতিকের বিভিন্ন মেয়াদে ২৫ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড হইয়াছে।

১৭ই এপ্রিল—অদ্য রাত্রিতে কম্যুনিস্ট বেতারে ঘোষিত হই[illegible]ছে যে, চীন সরকারকে ২০[illegible] এপ্রিলের মধ্যে [illegible]শান্তি প্রস্তাব সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ [illegible]রিতে হইবে। গতকল্য সরকারী প্রতিনিধি দলে[illegible] অন্যতম সদস্য হুয়াং সাও সিং এ[illegible] শান্তি প্রস্তা[illegible]বের খসড়া সহ রাজধানী[illegible] নানকিং[illegible] প্রত্যাবর্তন [illegible]রেন।

গত [illegible]নুয়ারী [illegible] ডারবানে অনুষ্ঠি[illegible] দাঙ্গাহা[illegible] [illegible]র্কে তদন্তের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা গভর্ন[illegible] কর্তৃক নিযুক্ত কমিশনের রিপোর্ট অদ্য প্র[illegible]শিত হইয়াছে। রিপোর্টে কমিশন এই মর্মে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে, প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে আফ্রিকাবাসীদের পুনরায় দাঙ্গাহাঙ্গামা শুরু করিবার প্রভূত আশঙ্কা বিদ্যমান। কমিশন ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে, কিছু সংখ্যক ইউরো[illegible] [illegible] ভারতীয়দের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক নীতি গ্রহণে আফ্রিকাবাসীদের কার্যকরভাবে প্ররোচনা দিয়াছিল।

প্রতি সংখ্যা—চারি আনা বা[illegible]ক মূল্য—১৩, ষাণ্মাসিক—৬॥০

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক ঃ—আনন্দবাজার প[illegible] লিমিটেড, ১নং বর্মণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সম্পাদক ঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহ সম্পাদক ঃ শ্রীসাগরময় ঘোষ

বাহুবল অপেক্ষা বাক্যবল সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ। এ পর্যন্ত বাহুবলে পৃথিবীর কেবল অবনতিই সাধন করিয়াছে—যাহা কিছু উন্নতি ঘটিয়াছে, তাহা বাক্যবলে। সভ্যতার যাহা কিছু উন্নতি ঘটিয়াছে, তাহা বাক্যবলে। সমাজনীতি, রাজনীতি, ধর্মনীতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, যাহারই উন্নতি ঘটিয়াছে, তাহা বাক্যবলে। যিনি বক্তা, যিনি কবি, যিনি লেখক —দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, নীতিবেত্তা, ধর্মবেত্তা, ব্যবস্থা-বেত্তা, সকলেই বাক্যবলেই বলী।

— বঙ্কিমচন্দ্র

ষোড়শ বর্ষ ] শনিবার, ১৭ই বৈশাখ, ১৩৫৬ সাল। Saturday, 30th April, 1949. [ ২৬শ সংখ্যা

## সাময়িক প্রসঙ্গ

### মানভূম সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির নির্দেশ

গত ২১শে মানভূমে সত্যাগ্রহের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়। ঠিক ঐ সময়ে সত্যাগ্রহ আন্দোলন বন্ধ করিবার জন্য রাষ্ট্রপতি ডক্টর পট্টভি সীতারামিয়ার নিকট হইতে মানভূম লোকসেবক সঙ্ঘের পরিচালক শ্রীযুত অতুল-চন্দ্র ঘোষের নির্দেশ আসে। রাষ্ট্রপতি তাঁহার নির্দেশে বলেন,—"কয়েকটি অভিযোগের প্রতিকারের জন্য মানভূম জেলার আপনারা যে সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন, তৎসম্পর্কে আমি বলিতে চাই যে, বিষয়টি ওয়ার্কিং কমিটির গোচরে আনা হইয়াছে এবং আপনাদিগকে সত্যাগ্রহ [illegible]ত্যাহার করিতে বলিবার জন্য আমাকে নির্দেশ [illegible]ওয়া হইয়াছে। প্রধানতঃ যে কারণে আপনারা স[illegible]াগ্রহ আরম্ভ করিয়াছেন তাহা সমস্ত দ্বিভা[illegible]ী অঞ্চলে বর্তমান রহিয়া[illegible] এবং বিষয়টি অন[illegible] বিলম্বেই গণপরিষদের উপদে[illegible] [illegible]তি এব[illegible] ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক বিবেচিত হইবে। শু[illegible] আমি আশা করি যে, আপনারা আন্দোলন [illegible] করিবেন।" রাষ্ট্রপতির এই নির্দেশে একটা বিষয় সুস্পষ্ট হইয়াছে, ইহাতে প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও অন্ততঃ পরোক্ষভাবে সত্যাগ্রহীদের দাবীর যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। লোকসেবক সঙ্ঘ যে কারণে সত্যাগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন সে সব অভিযোগের প্রতিকার করিবার জন্য কংগ্রেসের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করিবেন। রাষ্ট্রপতির ঐ বিবৃতিতে বিহারের কর্তৃপক্ষের এতৎসম্পর্কিত দায়িত্ব জড়িত হইয়াছে। কংগ্রেসের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এতদিন পর্যন্ত মানভূমের বাঙগালী সমাজের দাবীকে আমলই দিতে চাহেন নাই। পক্ষান্তরে তাহাকে সামান্য ব্যাপার বলিয়া উ[illegible]ইয়া [illegible]তে চেষ্টা [illegible] মানভূমের সত্যা[illegible]দের [illegible] লাঞ্ছনা বরণ করিয়া লইয়া [illegible] এই অবজ্ঞাপূর্ণ উদাসীনতা ভঙ্গ করিতে সমর্থ হইয়াছেন; সুতরাং তাঁহাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই, একথা বলা চলে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, রাষ্ট্রপতি এই [illegible]দেশে সোজাসুজি বাস্তব অবস্থাকে স্বীকা[illegible] করিয়া লওয়া হয় নাই। ইহাতে অনেকটা দ্বি[illegible]া, অনেকখানি সঙ্কোচ বিজড়িত রহিয়াছে[illegible] মানভূমের সত্যাগ্রহীদের অভিযোগের প্রতি[illegible]র সাধন করা হইবে, রাষ্ট্র-পতি এমন আশ্[illegible]স দিতে পারেন নাই। তিনি অস্পষ্ট ভাষায় [illegible]ধু ভবিষ্যতের ভরসা দিয়াছেন মাত্র। অথচ স[illegible]্যাগ্রহীরা যে অভিযোগের জন্য সত্যাগ্রহ [illegible]লম্বন করিয়াছেন, তাহার [illegible]তিকারের [illegible]ন্য সঙ্গে সঙ্গে কার্যকর ব্যবস্থা অব[illegible]বন [illegible]রাই তাঁহার পক্ষে উচিত ছিল। বলা ব[illegible] — রাষ্ট্রপতির নির্দেশের এই দিক হইতে [illegible]তা এবং অসমীচীনতা সকলেরই চোখে পড়িবে। রাষ্ট্রপ[illegible] পত্রে বলা হইয়াছে যে, প্রধানত যে কারণে স[illegible] [illegible]হ আরম্ভ হইয়াছে, তাহা সমস্ত দ্বিভাষী অঞ্চলেই বর্তমান রহিয়াছে। ফলত[illegible] [illegible]তে মানভূমের সমস্যাটিকে একটা ব্যাপক এবং সাধারণ রূপ দেওয়া হইয়াছে। এইভাবে সমস্যাটিতে স্থানীয় বিশেষত্ব যে সব কারণে সৃষ্ট হইয়াছে, সেগুলিকে চাপা দিবার একটা অভিপ্রায় রাষ্ট্র-পতির পত্রে আছে, লোকের ইহা মনে হইতে পারে। কিন্তু যেখানের অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৮০ জন বাঙলা ভাষাভাষী সত্যই কি তাহাকে দ্বিভাষী অঞ্চল বলা যায়? এই যুক্তি ধার্য করিলে ভারতের সব অঞ্চলকেই তো দ্বিভাষী অঞ্চল বলিতে হয়। রাষ্ট্রপতির নিজের প্রদেশ অন্ধ্রই কি এক-ভাষাভাষী অঞ্চল? কেরল, কর্ণাটক কোনটিই তাহা নয়। বস্তুত ভাষাগত-বিভেদ কম বেশি পরিমাণে ভারতের অনেক প্রদেশেই আছে। কিন্তু আর কোন অঞ্চলেই সংখ্যাগরিষ্ঠ-ভাষাভাষী সম্প্র-দায়কে সংখ্যালঘিষ্ঠে পরিণত করিবার জন্য গোটা শাসন-শক্তি তাহাদের বল-বাহন লইয়া সব ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করিবার জন্য উদ্যত হইয়া উঠে নাই। একটা সংস্কৃতিকে ধ্বংস করিবার জন্য ভারতের অন্য কোন প্রদেশের কর্তৃপক্ষ প্রকাশ্যে এবং গোপনে নির্লজ্জভাবে মানুষের মৌলিক অধিকার পদদলিত করিতে প্রবৃত্ত হয় নাই। বিহারের কর্তৃপক্ষের এই সব অনাচারের সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতির পত্রে কোন উল্লেখই নাই। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সত্যাগ্রহ বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির নিকট পত্র লিখিবার ভার রাষ্ট্রপতির উপর অর্পণ করেন; কিন্তু মানভূমের এই ব্যাপার লইয়া বিহার গবর্ণমেণ্টের নিকট কোন পত্র লিখিত হইয়াছে কিনা, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। প্রকৃতপক্ষে মানভূমের সত্যাগ্রহের জন্য তাঁহারাই দায়ী। তাঁহাদের উপর কোন নির্দেশ না দিয়া শুধু সত্যাগ্রহীদের উপর একতরফা সত্যাগ্রহ বন্ধ করিবার নির্দেশ জারী করাতে সমস্যার জটিলতা বৃদ্ধির কারণই সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। রাষ্ট্রপতির নির্দেশকে মর্যাদা দিয়া শ্রীযুত অতুলচন্দ্র ঘোষ সত্যাগ্রহ

স্থগিত রাখিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার আদর্শ-নিষ্ঠা আরও উজ্জ্বল হইয়াছে। এতৎসম্বন্ধীয় সব দায়িত্ব অতঃপর কংগ্রেসের উপর পড়িল এবং কংগ্রেসের নিরপেক্ষ ন্যায়বিচারের মর্যাদার সংগে প্রশ্নটি সাক্ষাৎ সম্পর্কে বিজড়িত হইল। রাষ্ট্রপতি এবার অভিযোগের কারণ দূর করিবেন আমরা এই আশা করি। প্রকৃতপক্ষে বিহার গবর্ণমেণ্ট মানুষের মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করিয়া যে অন্যায় এবং অনাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, মানভূমের সমস্যার সমাধান করিতে হইলে আগে তাহারই প্রতিকার করা উচিত। সে পথে না গিয়া অন্য পথ অবলম্বন করিতে গেলে সমস্যার কিছুতেই সমাধান হইবে না। আমরা আশা করি, রাষ্ট্রপতি এ সম্বন্ধে গুরুত্ব উপলব্ধি করিবেন।

### উৎকট মনোবৃত্তি

বিহারের কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ এতদিন পর্যন্ত মানভূমের বাঙালীদের অভিযোগ সম্বন্ধে বাক্-নিষ্পত্তি করা প্রয়োজন বোধ করেন নাই। বিহার সরকার সে কাজটা ঠিকমত গোছাইয়া লইতে-ছেন, সম্ভবত ইহা স্থির বুঝিয়া তাঁহারা আশ্বস্তি সহকারে বাঙালীদের দাবীর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছিলেন। দেখিতেছি, এতদিন পরে তাঁহাদের সে নীরবতা ভঙ্গ হইয়াছে। বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী শ্রীবৈদ্যনাথ প্রসাদ চৌধুরী স্বয়ং একটি বিবৃতি লইয়া আসরে অবতীর্ণ হইয়া-ছেন। এই বিবৃতিতে আমরা তাহার বাক্-বিভূতির পরিচয় পাইয়াছি। অখণ্ড দেশ ও জাতির আদর্শ আমাদের ন্যায় অন্ধ জনের নিকট তিনি উপস্থিত করিয়াছেন এবং আমাদের জ্ঞাননেত্র উন্মীলনের জন্য অজস্র উপদেশামৃত বর্ষণ করিয়াছেন। সংগে সংগে বিহার গবর্ণ-মেণ্টেরও তিনি ঢালা সাফাই গাহিয়াছেন, কিন্তু সত্যাগ্রহীদের উপর গুণ্ডাদলের বর্বরসুলভ আক্রমণের নিন্দা করার বিন্দুমাত্র প্রয়োজন-বোধ তাঁহার অহিংস-নীতি-বিশুদ্ধ বিবেকে সাড়া দেয় নাই। মানভূমের বাঙলাভাষাভাষী সমাজকে হিন্দী বোল ধরাইবার জন্য বিহারের শাসন-বিভাগের নীতি নিয়ন্ত্রণে যে প্রয়োগ-নৈপুণ্য প্রকটিত হইতেছে, সেক্রেটারী মহাশয়ের চক্ষু সেদিকে সুবিধাজনকভাবেই নিমীলিত রহিয়া গিয়াছে। সত্যাগ্রহী লোকসেবক সঙ্ঘের কাহাকেও বিহার গবর্ণমেণ্ট গ্রেপ্তার করেন নাই বলিয়া তিনি গবর্ণমেণ্টের অপরিসীম সহিষ্ণুতার মহিমা কীর্তন করিতে সংকোচ বোধ করেন নাই। তাঁহারা দোষের অতীত। সত্যা-গ্রহীরা যত দোষে দোষী। তাঁহার মতে বিভেদ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করাই মানভূমের সত্যাগ্রহী-দের উদ্দেশ্য। শ্রীযুত অতুলচন্দ্র ঘোষের ন্যায় আদর্শনিষ্ঠ ত্যাগী এবং কর্মীর অন্তরে যে বিদ্বেষ-বুদ্ধি স্থান পাইতে পারে না, চৌধুরী মহাশয় নিজেও ইহা জানেন; কিন্তু জানিয়াও অস্বীকার করিতে চাহিয়াছেন। বিহারের কংগ্রেস-সাধনাকে যাঁহারা বুকের রক্ত ঢালিয়া দিয়া বলিষ্ঠ করিয়াছেন, প্রাদেশিকতায় অন্ধ হইয়া তিনি তাঁহাদের উপর অনুচিত আক্রমণ করিয়াছেন। তাঁহাদের বিরুদ্ধে কংগ্রেস হইতে কোনরূপ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়, এমন অশোভন মনোবৃত্তির আগ্রহের ইঙ্গিতও তাঁহার বিবৃতির মধ্যে আছে। কলিকাতার সংবাদপত্রের উপর চৌধুরী মহাশয়ের উষ্মা অত্যধিক। ই'হারা সত্যাগ্রহীদের ছবি ছাপায়, ইহাতে তিনি চিত্তের স্থৈর্য হারাইয়াছেন। তিনি ইহা তলাইয়া দেখেন নাই যে, ফটো মিথ্যা করিয়া ছাপানো যায় না। সত্যাগ্রহীদের উপর নির্যাতনের ফটো প্রকাশিত হওয়াটা তিনি অবাঞ্ছিত মনে করিতে পারেন; কিন্তু গুণ্ডামিকে তিনি যে অবাঞ্ছিত মনে করেন কিম্বা তাহাতে তাঁহার আপত্তি বা অরুচি, এমন কোন কথাই তাঁহার বিবৃতিতে পাওয়া যায় না। তিনি যদি গুণ্ডামিকে অবাঞ্ছিত মনে করিতেন, তবে অবশ্য গুণ্ডাদলের অত্যাচারের নিন্দা করিতেও তাঁহার পক্ষে ভাষার অভাব ঘটিত না। সুতরাং এ সম্বন্ধে তাঁহার নীরবতা স্বতঃপরত বলিয়াই বুঝিতে হয়। এরূপ অবস্থায় জন-সাধারণ যদি মনে করে যে, বিহারের কর্তৃপক্ষ এবং বিহার গবর্নমেণ্ট গুণ্ডাদলের পিছনে রহিয়াছেন, তবে দোষ দেওয়া যায় কি?

### পূর্ববঙ্গে ছাড়পত্র বিধান

সম্প্রতি ঢাকা শহরে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রীদের সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। গত ডিসেম্বর মাসে দিল্লীতে যে আন্তঃ-ডোমিনিয়ন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, তদনুযায়ী কিরূপ কাজ চলিতেছে, সেই সম্বন্ধে আলোচনা এবং কর্তব্য নির্ধারণ করাই এই বৈঠকের উদ্দেশ্য ছিল। পূর্ববঙ্গ হইতে অ[illegible] প্রদেশে আগমনেচ্ছু ব্যক্তিদের জন্য কিছুদি[illegible] হইল পূর্ববঙ্গ গবর্নমেণ্ট আয়কর সা[illegible]ফিকেট দাখিল করিবার আদেশ জারী করিয়া[illegible]ছেন। পূর্ববঙ্গ গবর্নমেণ্টের দেয় আয়কর ফাঁকি দিয়া কেহ অন্যত্র চলিয়া না যাইতে পারে, সেইজন্য এই ব্যবস্থা। কিন্তু এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে উভয় বঙ্গের মধ্যে একটা ব্যাপক সমস্যা সৃষ্টি হইতে বসিয়াছে। পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে আর্থিক [illegible]রবারিক সম্পর্ক এখনও নিবিড়, প্রত্যহ শ[illegible]ত নরনারী উভয় বঙ্গের মধ্যে [illegible]তায়াত [illegible]রিয়া থাকেন। ই'হাদের মধ্যে আ[illegible]র প্রদান যোগ্য লোকের সংখ্যা মুষ্টিমেয় [illegible]। অথচ এই মুষ্টিমেয় লোককে আয়কর প্রদানে [illegible] করিবার জন্য পূর্ববঙ্গ গবর্নমেণ্ট যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে শত শত লোকের অশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে। পূর্ব ও পশ্চিম-বঙ্গের মধ্যে যাতায়াতকারীদের সংখ্যা ইহার মধ্যেই অনেক হ্রাস পাইয়াছে। আয়কর খালাসী এই সার্টিফিকেট বাহির করাও সহজ ব্যাপা[র] নয়; অথচ পূর্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে আসিতে হইলে জলপথে, স্থলপথে বা শূ[ন্য] মার্গে সর্বত্র সকলকে এই সার্টিফিকে[ট] দেখাইতে হইবে, নহিলে বাহির হইবার উপা[য়] নাই। এমন ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে আর্থি[ক] বিপর্যয় আসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তাহা ছা[ড়া] আর্থিক এবং পারিবারিক সম্পর্কের জন্য যাঁহ[ারা] দিগকে উভয় বঙ্গের মধ্যে যাতায়াত করি[তে] হয়, তাঁহাদের মধ্যে দস্তুরমত একটা আতঙ্ক সৃষ্টি হইয়াছে। অধিকন্তু এই সার্টি[]ফিকেট বিধানের ব্যবস্থাগুলিও সুস্প[ষ্ট] নয়। সেগুলির জন্য জনসাধারণই শু[ধু] বিব্রত হইয়া পড়ে নাই, রেল, স্টীম[ার] এবং বিমান পথের কর্তৃপক্ষও এগুলি[র] জন্য মুশকিলের মধ্যে পড়িয়া গিয়া[] ছেন। ইতিমধ্যেই নিরীহ যাত্রীদের উপ[র] উৎপীড়ন চালাইয়া গুণ্ডা শ্রেণীর লোকে[রা] অর্থ আদায়ের ব্যবসা আরম্ভ করিয়া দিয়া[ছে]। সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলির মধ্যে দুর্নীতির প[থ] ইহাতে আরও পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে বলা বাহুল্য, ইহার ফলে পাকিস্থানের অ[] প্রয়োজন সিদ্ধ হওয়ার চেয়ে অনর্থই [] বাড়িবে। ঢাকার সাম্প্রতিক প্রধান ম[ন্ত্রী] সম্মেলনে এ সম্বন্ধেও আলোচনা হয়। [] বিধানের মধ্যে যে প্রচুর অস্পষ্টতা রহিয়া[ছে] উভয় প্রধান মন্ত্রীই ইহা স্বীকারও ক[রে]ন কিন্তু কেন্দ্রীয় পাকিস্থান সরকারের এই বিধা[ন] এইজন্য পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের জনসাধার[ণের] মধ্যে যে ব্যাপক সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে, ত[াহা] দূর করিবার জন্য সাময়িকভাবে ইহার প্রয়[োগ] স্থগিত রাখিতেও পূর্ববঙ্গের প্রধান ম[ন্ত্রী] সম্মত হইতে সমর্থ হন নাই। এ[রূপ] অবস্থায় এই বিধানের প্রয়োগ হইতে পূ[র্ব] বঙ্গকে মুক্ত করিবার জন্য তিনি কেন্দ্রীয় পা[কি]স্থান সরকারের উপর চাপ দিবেন, আমাদের [] অনুরোধ। বস্তুতঃ আন্তঃ-ডোমিনিয়ন চু[ক্তি]র ফলে [illegible] মধ্যে অনেক সমস্যার স[মা]ধান [illegible] চলিয়াছিল, এই বিধান কার্য[করী হই]লে সে সব ব্যর্থ হইবে এবং পূর্ববঙ্গে[র] আর্থিক বিপর্যয় গুরুতর হইয়া উঠি[বে] বলিয়াই আমরা মনে করি। পূর্ববঙ্গে[র] স্বার্থের দিকে তাকাইয়াও এমন অবিবেচিত [] [illegible]কর ব্যবস্থা অবিলম্বে রহিত করা প্র[য়ো]জন। আমরা কিছুদিন হইতে লক্ষ্য করিতে[ছি] পশ্চিম পাকিস্থান ও পূর্ববঙ্গের সামাজিক এবং আর্থিক সঙ্গতি এবং সংস্কৃতি যে এক [] কেন্দ্রীয় পাকিস্থান সরকার সে সম্বন্ধে বিবে[চনা]ভাবে বিবেচনা করিতেছেন না। খাজা না[জি]মুদ্দিন পাকিস্থানের গভর্নর-জেনারেল থ[াকা] সত্ত্বেও পূর্ববঙ্গের পক্ষে বিপর্যয় সৃষ্টি[কর] এমন বিধান প্রবর্তিত হয়, ইহাই আরও দুঃ[খের] বিষয়।

**কমনওয়েলথ সম্মেলন**

বিপুল আড়ম্বরের মধ্যে গত ২২শে এপ্রিল লণ্ডনে কমনওয়েলথ সম্মেলন আরম্ভ হয়। ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর দিকে সকলের দৃষ্টি বিশেষভাবে নিবদ্ধ ছিল। ভারত এখন স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। স্বাধীন ভারত ব্রিটিশ রাষ্ট্র সমবায়ের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, না তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে, ব্রিটিশ রাষ্ট্রনীতিক এবং ব্রিটিশ রাষ্ট্র-সমবায়ের রাজনীতিকগণের সকলেরই এজন্য আগ্রহ পরিলক্ষিত হইয়াছে। আয়ার ব্রিটিশ সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন করিবার পর এই প্রশ্নটি স্বভাবতঃই বড় হইয়া দেখা দিয়াছে। বলা বাহুল্য, এ সম্বন্ধে ভারতের সিদ্ধান্ত সুস্পষ্ট। প্রথমতঃ ভারত স্বাধীন এবং সার্বভৌম রাষ্ট্র। ইংলণ্ডেশ্বরের আনুগত্য স্বীকার করিয়া লইতে সে কিছুতেই প্রস্তুত নহে। প্রকৃতপক্ষে ইংলণ্ডেশ্বরের আনুগত্য স্বীকার না করিয়া এবং নিজেদের সার্বভৌম ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ না করিয়া যদি পারস্পরিক কল্যাণ সাধনের সূত্রে ব্রিটিশ রাষ্ট্র সমবায়ের মধ্যে অবস্থান করা ভারতের পক্ষে সম্ভব হয়, তবে তাহাতে সে অপাত্তি করিবে না। সম্প্রতি বিশ্বের শক্তিসমূহ পরস্পরবিরোধী দুইটি ব্লকে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। পণ্ডিত জওহরলাল একথা স্পষ্ট করিয়াই জানাইয়া দিয়াছেন যে, ভারত এই দুই ব্লকের কোন একটির সঙ্গে যুক্ত হইতে অক্ষম। এই সব সর্ত বজায় রাখিয়া ভারতের পক্ষে ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত থাকা সম্ভব হইবে কি? বলা বাহুল্য এ সম্পর্কে দায়িত্ব ভারতের নয়। ব্রিটিশ কমনওয়েলথের সংহতি বজায় রাখিবার জন্য যাঁহারা ব্যস্ত, তাঁহাদেরই সে দায়িত্ব। [illegible]টের উপর, ভারতকে যদি কমনওয়েলথের ম[illegible] রাখিতে হয়, তবে ইংলণ্ডেশ্বরের আনুগত্যকে [illegible]শ্রয় করিয়া যে সাম্রাজ্য-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠি[illegible]ছে, তাহাকে বিদায় [illegible]রিয়া দিয়া সম্পূর্ণ ন[illegible]ন কোন পথ আবিষ্কার [illegible] হইবে, আন্তর্জা[illegible]তিক নীতির ক্ষেত্রেও ভারতকে [illegible]রাষ্ট্র গো[illegible]ীর স্বার্থসিদ্ধির ক্ষেত্রে আর টানিয়া [illegible] [illegible]বে না। স্বাধীন ও সার্বভৌম সাধারণত[illegible]রূপে ভারত নিজের শত্রু এবং মিত্র ঠিক করি[illegible] সে নিজের স্বার্থ ও কল্যাণের জন্য নিজের পররাষ্ট্র নীতি নিয়ন্ত্রণ করিবে। পশুবলের কোন জোটের কাছে [illegible]স মাথা হেট করিবে না। ব্রিটিশ রাষ্ট্র গোষ্ঠীর মহিমা যতই থাকুক, সঙ্কীর্ণ স্বার্থের দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং বর্বরোচিত বর্ণ-বৈষম্যের কূটনীতি[illegible] পাকের মধ্যে ভারত জড়াইয়া থাকিতে প্রস্তুত নয়। ভারত বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের সখ্য কামনা করে; কিন্তু মানবতার বিরোধী ফ্যাসিস্ট বা সাম্রাজ্যবাদীদের পশুবলের প্রভাব সে কোনক্রমেই স্বীকার করিয়া লইবে না।

**পূর্ববঙ্গে প্রাচীর-বেষ্টনী**

গত ২২শে এপ্রিল পূর্ববঙ্গ সরকার কলিকাতার 'আনন্দবাজার পত্রিকা', 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড', 'ইত্তেহাদ' এবং 'নেশন' এই চারখানা সংবাদপত্রের পূর্ববঙ্গে প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়াছেন। 'অমৃতবাজার পত্রিকা', 'যুগান্তর' এবং 'বসুমতী'র উপর নিষেধ-বিধি পূর্বে হইতেই প্রযুক্ত আছে। সুতরাং কলিকাতা হইতে প্রকাশিত সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সুপ্রচারিত সব কয়েকখানা সংবাদপত্রেরই অতঃপর পূর্ববঙ্গে প্রবেশ নিষিদ্ধ হইল। ইহার ফলে পূর্ববঙ্গের বিপুল জনসাধারণ সংবাদপত্র পাঠের সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইল। কোন্ অপরাধে পূর্ববঙ্গ সরকার ভারতীয় সংবাদপত্রগুলির সম্বন্ধে এমন কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন, এতৎসম্পর্কিত সংবাদে তাহা কিছুই জানা যায় নাই এবং আমাদের পক্ষে তাহা ধারণা করিয়া ওঠাও সম্ভব নয়; কারণ এই সংবাদপত্রগুলি আন্তঃডোমিনিয়ন চুক্তির ধারা বিশেষভাবে প্রতিপালন করিতেছিলেন এবং কোথায়ও তাহার ব্যত্যয় ঘটিয়াছে বলিয়া আমরা জানি না। প্রকৃতপক্ষে পূর্ববঙ্গ সরকারের এই আদেশ আমরা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারমূলক এবং গণতন্ত্রবিরোধী বলিয়া মনে করি। বর্তমান যুগে জনমতানুসারে শাসনতন্ত্র পরিচালিত হইয়া থাকে। স্বেচ্ছাচারতন্ত্রই সমালোচনা সহ্য করিতে পারে না; কিন্তু গণতন্ত্রের নীতি সমালোচনা-সংযত শক্তির পরিচালনার উপরই নির্ভর করে। পূর্ববঙ্গ গভর্নমেণ্ট [illegible]নমতানুযায়ী গণতান্ত্রিকতার উপর প্রতিষ্ঠি[illegible], আমরা সেখানকার শাসকদের মুখে প্র[illegible]তনিয়তই এমন কথা শুনিতে পাই; সুতরা[illegible] সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে [illegible]রংবার তাঁহাদের অসমীচীন এবং অবিবেচ[illegible] চিত্ত বিক্ষোভ এবং উৎকট—এই [illegible]র আগ্রহ ও উষ্মা আমাদিগকে স্বভাবত[illegible]ই বিস্মিত করে। দোষ সব গভর্নমেণ্টেরই [illegible]াকে এবং সেগুলির প্রতি শাসকদের দৃষ্টি [illegible]কর্ষণ করা অপরাধজনক কিছু নয়, বরং শা[illegible]কদের তাহাতে সাহায্য হয়। পূর্ববঙ্গ সরক[illegible] গণতান্ত্রিকতার এই সাধারণ সত্যটি উপ[illegible]ব্ধি করিতে পারেন না, ইহা মনে [illegible] আ[illegible]দের পক্ষে কঠিন। সমালোচনা সম[illegible]র্কে [illegible]এতটা স্পর্শ-কাতর বা অসহিষ্ণু [illegible] [illegible]তন্ত্রানুযায়ী শাসনকার্য চলে না। পক্ষান্তরে [illegible]মন মনো[illegible]ত্তিতে স্বেচ্ছাচারই পুষ্ট হইয়া উঠে এবং জ[illegible]কে দলন করিবার প্রবৃত্তিই [illegible]দিক হই[illegible] প্রশ্রয় পায়। সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ[illegible]র ফলে রাষ্ট্রের চারিদিকে যবনিকার সৃষ্টি হয়; সেই যবনিকার আড়ালে শাসকেরাই যথেষ্টভাবে নিজেদের শক্তির অপপ্রয়োগের সুবিধা লাভ করেন। পূর্ববঙ্গ সরকার কি ইহাই কামনা করেন? যদি নিজেদের রাষ্ট্রে তেমন প্রতিবেশ গড়িয়া তোলাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য হইয়া থাকে, তবে আন্তঃডোমিনিয়ন চুক্তি প্রভৃতির কি সার্থকতা আছে আমরা বুঝি না। বর্তমানে আন্তঃ-ডোমিনিয়ন চুক্তি অনুযায়ী উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে সৌহার্দ্য এবং সদ্ভাব সম্প্রসারিত করিবার উদ্দেশ্যে চেষ্টা হইতেছে। উভয় রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী ও শাসকবর্গের মধ্যে আজকাল ঘন ঘন আলোচনা চলিতেছে। ইহার ফলে জনসাধারণের মধ্যে একটা আশ্বস্তির ভাবও ক্রমশ দৃঢ় হইয়া উঠিতেছে; কিন্তু পূর্ববঙ্গ গভর্নমেণ্টের এই সব স্বৈরাচারমূলক বিধানে সে ভাব নষ্ট হইবে এবং উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে বৈষম্যবোধই বাড়িবে। ইহা সত্যই দুঃখের বিষয়। আমরা আশা করি, পূর্ববঙ্গ সরকার এখনও তাঁহাদের ভুল বুঝিতে পারিবেন এবং কলিকাতা হইতে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলির উপর হইতে নিষেধ-বিধি অবিলম্বে প্রত্যাহৃত হইবে।

**কলিকাতায় প্লেগের প্রকোপ**

কলিকাতায় প্লেগের প্রকোপ ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। ব্যাধির আক্রমণ এখনও ব্যাপক কিম্বা আতঙ্ককর আকার ধারণ না করিলেও ইহা ক্রমাগত শহর এবং শহরতলীতে ছড়াইয়া পড়িতেছে। কলিকাতার প্লেগে একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার এই যে, ইহা কোন বিশেষ অঞ্চল হইতে ক্রমিকভাবে চারিদিকে সম্প্রসারিত হইতেছে না। প্লেগ সাধারণত সেইভাবেই ছড়ায়। কিন্তু কলিকাতার প্লেগ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত—কখনও কুমারটুলী, কখনও একেবারে কামারহাটী। বিশেষ অঞ্চলে ইহা গণ্ডীবদ্ধ নয়। বসন্তের টীকা, প্লেগের টীকা, টাইফয়েডের টীকা প্রস্থে প্রস্থে এই টীকা-পর্বের পাকে পড়িয়া শহরবাসীদের জীবনযাত্রা সত্যই দুর্বহ হইয়া উঠিতেছে। বস্তুত টীকার ব্যবস্থা ছাড়াও শহর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিবার চেষ্টা করা সর্বাগ্রে দরকার। শহরবাসীদের মধ্যে এ কাজে শৈথিল্য রহিয়াছে, আমরা জানি কারণ শিক্ষার অভাব। এ অভাব উপযুক্ত এবং সুপরিচালিত প্রচারকার্যের সাহায্যে দূর করিতে হইবে। শহরের বিভিন্ন অঞ্চলের তরুণেরা এ কাজে সমধিক আগ্রহসম্পন্ন হইবেন এবং পৌর-কর্তৃপক্ষও তাঁহাদের শৈথিল্য পরিত্যাগ করিবেন আমরা ইহাই আশা করি। প্রকৃতপক্ষে শহরের পথ, ঘাট এবং বাজারগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবার দিকে যদি পৌর কর্তৃপক্ষ দৃষ্টি দান করেন এবং শহরবাসীরা তাঁহাদের ঘরবাড়ি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবার পৌর-দায়িত্ব সম্বন্ধে সমধিক সচেতন হন, তবে কলিকাতা বিভিন্ন মহামারীর প্রকোপ হইতে এখনও মুক্ত হইতে পারে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

# তবু

**গোবিন্দ চক্রবর্তী**

হাত দিয়ে হাত ছুঁই ঃ
মুখ দিয়ে মুখ—
তবু তাতে ভরে কতটুকু!
দুজনেই সাগর-ঝিনুক
বুক তাই শিশিরে সাগর।

হাজার ঢেউয়ের পর
তবু সহস্রেক;
মেঘের পিছনে মেঘ—
আবেগের পাঁজরে আবেগ।
উত্তাপ-তাড়িত বাষ্প ঃ
বাষ্প-গলা জল—
তবু সেই আদিগন্ত অতলান্ত তল
কিছুতেই যায় না ত' ছোঁয়া!

কিছুতে ভরে না তবু মন।
যত পুষ্প-আচ্ছাদিত
প্রাণের অঙ্গন;
পিছে তার ছায়া ফেলে ডাকে তেপান্তর ঃ
ব্যবধান বাড়ে শুধু দুরূহ দুস্তর।

এ সীমানা কোনদিনই হবে না কি পার!
রাত্রিশেষে দেখিব না জ্যোতির উৎসার॥

# গ্রীষ্মের প্রার্থনা

**নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী**

এই যে অসুস্থ রাত্রি, এই
মুমূর্ষু কামনা, বৈশাখের
সূর্যের প্রহার, মৃত্যু—এর
বিবর্ণ মনকে ভালোবেসে
তৃপ্তি নেই, কিছু তৃপ্তি নেই।
গ্রীষ্মের হৃদয় থেকে স্তব
ওঠে ঊর্ধ্বে তাই, যার শেষে
আছে শ্যাম-বর্ষার উৎসব।

হে আষাঢ় এসো দগ্ধ মনের
শিয়রে, আবেগ আনো
এই বিবর্ণ প্রাণে; হে আষাঢ়
আশার নিবিড় মোহে
ঢালো প্রাণবারি, উজ্জীবনের
গভীর আবেশে হানো
প্রাণের শিকড়ে বৃষ্টি, ভাসাও
সবুজের সমারোহে।

মৃতের পিঙ্গল স্তব্ধ মনে
সংগীতের ঢেউ। বৈশাখের
ওষ্ঠ নড়ে, মজ্জার মাংসের
ভার ঝরে প্রশান্ত প্রগাঢ়
প্রার্থনার মন্ত্র উচ্চারণে,
—'বর্ষার সম্ভার করো জয়।'
ঊর্ধ্বে ওঠে, আরো ঊর্ধ্বে—আরো,
গ্রীষ্মের হৃদয়, এ-হৃদয়।

# সুজাতা

**জয়শ্রী চৌধুরী**

দূরে শতাব্দীর ওপার থেকে
তোমার কণ্ঠ আজও শুনি সুজাতা—
তুমি বরাননা, জীবনের অমৃত বার্তা তোমার হাতে—
মৃত্যুকে তুমি করেছ মহিমাময়।

ইতিহাসের পাতায় পাতায়
অহিংসার বাণী আছে
কিন্তু তার অন্তরালে
তোমার মধুহস্তের দান
আজও আছে অক্ষয় হয়ে— ।

দীর্ঘ তপস্যার শেষে
শীর্ণ তথাগতের হাতে
তোমার পায়েসান্ন করেছিল জীবনদান
অনন্ত পথ যাত্রীর পায়ে
নিঃশব্দ অর্ঘ্য তোমার ব্যর্থ হয়নি।

আজকের পৃথিবীতে
নতুন করে তপস্যা হয়েছে শুরু
অরণ্য আর গুহার প্রাণ [illegible]গে উঠেছে আবার
হিংস্র ভয়াল [illegible]হানিতে
প্র[illegible] [illegible]ান্তি।

তথাগতের তপ[illegible] শেষ হয় না বুঝি
'[illegible]রের' স্বপ্ন বুঝি বা হয় সফল
দৈন্য আর ক্লিন্নতার পাঁকে
স্নান করেছে ধরণী
[illegible] প্রহর
শুনছে তোমার পদধ্বনি।

তুমি কি আসবে না সুজাতা
ক্ষুধার্ত তপঃক্লিষ্টের হাতে
তুলে দেবে না কি পায়েসান্নের পাত্র
নবজীবনের বুদ্বুদ আর কি ভেসে উঠবে না
তোমার পাত্রের কানায় কানায়?

## আয়ার

১৮ই এপ্রিল ইস্টার মনডের দিন আয়ারের জাতীয় জীবনে একটি ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে গেছে। ঐ দিন স্বাধীন আয়ার আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেকে রিপাব্লিকরূপে ঘোষণা করেছে। স্বাধীন আয়ারের সঙ্গে বৃটিশ রাজ শক্তির যে শেষ যোগসূত্রটুকু ছিল, এই দিন তাও গেছে বিচ্ছিন্ন হয়ে। আয়ারের রিপাব্লিক্যান শাসনতন্ত্র আইরিশ পার্লামেন্ট ডেইলে গৃহীত হয়েছিল, দুই মাসেরও অধিক পূর্বে। কিন্তু আইরিশ জাতীয় নেতারা ইচ্ছা করেই অপেক্ষা করেছিলেন, এই ইস্টার মনডেটির জন্যে। এই দিনটি আইরিশ জাতীয় জীবনে একটা বিরাট বিপ্লবের স্মারক ও গভীর হৃদয়ানুভূতিব্যঞ্জক। ৩৩ বৎসর পূর্বে ঠিক এমনই একটি দিনে জাতীয়তাবাদী আইরিশ নেতারা বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক অভিযান চালিয়ে ডাবলিনের জেনারেল পোষ্ট অফিস দখল করে নিয়েছিলেন এবং তার শীর্ষদেশে ত্রিবর্ণ রঞ্জিত আইরিশ জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছিলেন। তদবধি আইরিশ জাতীয় ইতিহাসে এই দিনটি পবিত্র ও স্মরণীয় হয়ে আছে। ৩৩ বৎসর পরে তাই এই ইস্টার মনডের দিনটিকেই আইরিশ জাতীয় নেতারা বেছে নিয়েছেন আয়ারের নব-জীবনের শুভারম্ভের প্রথম দিনরূপে। ৩৩ বৎসর ধরে স্বাধীনতাকামী আইরিশ জনগণ যে স্বপ্ন দেখে আসছিল, আজ তাই পরিপূর্ণ হল বাস্তবে এসে। আয়ারকে রিপাব্লিকরূপে ঘোষণা করার যে উৎসব সেটাও অনুষ্ঠিত হয়েছে, ডাবলিনের সেই ঐতিহাসিক জেনারেল পোষ্ট অফিসের গৃহে। এ উপলক্ষে আইরিশ জনগণের মনে অভূতপূর্ব আনন্দ-চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। হবারই কথা। এই দিনটির জন্যেই কি তারা সুদীর্ঘ কাল ধরে সাধনা করে আসে নি?

আয়র্ল্যান্ডকে স্বাধীন রিপাব্লিকে পরিণত করাই ছিল আইরিশ জাতীয়তাবাদীদের আজীবনের [illegible]। কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী কূটনীতির চাপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে আয়র্ল্যান্ডকে গ্রহণ করতে হয়েছিল বৃটিশ ডোমিনিয়নী পদমর্যাদা। শুধু তাই নয়, সেই ডোমিনিয়নী স্বাধীনতা দেবার পূর্বে বৃটিশ [illegible] আয়র্ল্যান্ডকে করেছিল দ্বিধা বিভক্ত এবং তার উত্তরাঞ্চলে আলস্টার নামে নিজেদের তাঁবেদার একটি নতুন রাষ্ট্র স্থাপন করেছিল। [illegible] আলস্টার সরাসরি বৃটিশ তাঁবেদার রাষ্ট্ররূপেই বর্তমান আছে। এ হল ১৯২২ সালের ঘটনা। তারপরেও দেখতে দেখতে সুদীর্ঘ ২৭।৮ বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে আয়ারের বুকের উপর দিয়ে। তার মধ্যে আয়ারের রাজনীতির অনেক হের-ফেরই আমরা দেখেছি। কিন্তু আয়ারবাসীরা দুটি কথা ভুলতে পারেনি—একটি হল স্বাধীন সার্বভৌম আয়ার রিপাব্লিকের প্রতিষ্ঠা ও অপরটি হল আয়ার এবং আলস্টারের পুনর্মিলন। নামে না হলেও কার্যত ডি ভ্যালেরার হাতে পড়ে আয়ার বহু পূর্বেই রিপাব্লিকে পরিণত হয়েছিল। আয়ারের শাসনভার হাতে পাবার পরেই ডি ভ্যালেরা ডোমিনিয়নী স্বাধীনতার প্রতীক গবর্নর জেনারেলের পদ দিয়েছিলেন বিলুপ্ত করে; তার পরিবর্তে সৃষ্টি করেছিলেন প্রেসিডেন্টের পদ। বৃটিশ রাজার সঙ্গে আয়ারের যে যোগ তা দিয়েছিলেন তিনি যথাসম্ভব কমিয়ে। অভ্যন্তরীণ সকল ব্যাপারেই প্রেসিডেন্ট এবং প্রধান মন্ত্রীই ছিলেন সর্বেসর্বা। শুধু বৈদেশিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রদূতাদি নিয়োগ ব্যাপারে লৌকিকভাবে বৃটিশ রাজার অনুমোদন নেওয়া হত মাত্র। আয়ারের সার্বভৌম স্বাধীনতার চরম প্রমাণ দিয়েছিলেন ডি ভ্যালেরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন যুদ্ধরত বৃটেন আয়ারের সন্নিকটবর্তী রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও আয়ার তাকে কোনরূপ সুযোগ দিতে চায় নি। আয়ারকে হাত করতে পারলে জার্মানবিরোধী সংগ্রামে ইংরেজদের বিশেষ সুবিধা যে হত সে কথা স্বীকার না করার উপায় নেই। কিন্তু ডি ভ্যালেরার নেতৃত্বে পরিচালিত আয়ার বৃটেনকে সে সুযোগ দেয় নি। যুদ্ধের প্রথম থেকেই ডি ভ্যালেরা আয়ারকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ রাষ্ট্ররূপে ঘোষণা করেছিলেন এবং যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত তিনি আয়ারের এই দলনিরপেক্ষ স্বাতন্ত্র্য পুরোপুরি বজায় রেখেছিলেন। কার্যতঃ ডি ভ্যালেরা এতকাল যা করে আসছিলেন এবার তা আইনত স্বীকৃতি পেল—এই হল তফাৎ।

আয়ারের জাতীয় জীবনের এই সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য উৎসবে ডি ভ্যালেরা অংশগ্রহণ করেন নি। এর চেয়ে গভীরতর পরিতাপের বিষয় আর কিছু হতে পারে না। বিগত সাধারণ নির্বাচনে ডি ভ্যালেরার ফিয়ানা ফেল দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারে নি বলে সংখ্যাগরিষ্ঠ বিরোধী দলের নেতা মিঃ কস্টেলো বর্তমানে আয়ারের প্রধান মন্ত্রী। ডি ভ্যালেরার এই জাতীয় উৎসব বর্জন কিন্তু রাজনৈতিক নেতৃত্বের দলীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফল নয়। এর কারণ [illegible] সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। ভারতের স্বাধীনতালাভ মহাত্মা গান্ধীকে কম আনন্দিত করে নি। কিন্তু স্বাধীনতা উৎসবের দিন তাঁর হৃদয়ই হয়তো [illegible] সর্বাধিক পরিমাণে ব্যথাচ্ছন্ন। [illegible] ভারত অখণ্ড ভারতের উপাসক গান্ধীজীকে যে পুরোপুরি সন্তুষ্ট করতে পারে নি—তা সহজেই বোঝা যায়। রিপাব্লিকরূপে আয়ারের আত্মপ্রতিষ্ঠার দিন ডি ভ্যালেরাও হৃদয়ে অনুরূপ ব্যথাই পেয়েছিলেন। আয়ার সার্বভৌম স্বাধীন রিপাব্লিক হল কিন্তু যে অখণ্ড আয়ারের স্বপ্ন তিনি চিরদিন দেখে এসেছেন তা সার্থক হয়ে উঠল না। এই ব্যথাই ডি ভ্যালেরার হৃদয়ে সব চেয়ে বেশী করে বেজেছে এবং তাই তিনি উৎসবাদি বর্জন করেছিলেন। আলস্টারের মত দুষ্ট ক্ষত যতদিন পর্যন্ত থাকবে ততদিন ডি ভ্যালেরার মত স্বদেশপ্রেমিকের হৃদয় কিছুতেই শান্ত হতে পারবে না।

নবজীবনের যাত্রাপথে রিপাব্লিকরূপী আয়ারকে আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আর কিছুদিনের মধ্যে ভারতও নিজেকে স্বাধীন সার্বভৌম রিপাব্লিকরূপে ঘোষণা করতে চলেছে। রিপাব্লিকান ভারত ও রিপাব্লিকান আয়ারের মধ্যে প্রীতির যোগসূত্র উত্তরোত্তর ঘনিষ্ঠ হয়েই উঠবে—এ আশা আমরা সহজেই করতে পারি। আয়ারের সঙ্গে ভারতের আধ্যাত্মিক ভাবগত যোগাযোগ দীর্ঘদিনের। স্বাধীনতার জন্যে আইরিশ বীরদের সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের কাহিনী পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে জুগিয়েছে মরণজয়ী দুঃসাহস। সে কথা ভারতবর্ষ কোনদিনই ভুলবে না। ভারত এখনও বৃটিশ কমনওয়েলথে আছে বলে আয়ার রিপাব্লিক হলে ভারতের সঙ্গে তার সম্বন্ধের কোন রদবদল হবে কিনা—এরূপ একটি প্রশ্নের জবাবে কিছুদিন পূর্বেও ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে পণ্ডিত নেহরু ঘোষণা করেছিলেন যে, সেরূপ কোন পরিবর্তনই হবে না—ভারতের সঙ্গে আয়ারের যে সম্পর্ক তা সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণই শুধু থাকবে না—উত্তরোত্তর সে সম্পর্ক হয়ে উঠবে আরও ঘনীভূত। আমরাও সেই কামনাই করি।

## চীনে পুনরায় সংগ্রাম

কম্যুনিস্টদের সঙ্গে শান্তি আলোচনার বনামে কিছুকাল ধরে চীনের রণাঙ্গনে যে যুদ্ধবিরতির লক্ষণ দেখা দিয়েছিল আপাতত পুনরায় তার ছন্দ ভঙ্গ হয়েছে। ২০শে এপ্রিল থেকে ইয়াংসি নদীর উভয় তীরে আবার বেজে উঠেছে রণ-দামামা। নতুন অভিযান আরম্ভ করেছে কম্যুনিস্টরাই ইয়াংসির উত্তর তীর থেকে দক্ষিণ তীরের দিকে। ইতিমধ্যে ইয়াংসি নদী অতিক্রম করে কম্যুনিস্ট বাহিনী প্রবেশ করেছে চীনের রাজধানী নানকিং-এ। দুই চার দিনের মধ্যেই নানকিং যে পুরোপুরি কম্যুনিস্টদের হাতে পড়বে সে বিষয়ে কোন সংশয় নেই। অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট লি সুং জেন জেনারেলিসিমো চিয়াং কাইশেকের সঙ্গে দেখা করে নানকিং-এ ফিরে এসেছেন সত্য—কিন্তু তাঁর গভর্নমেণ্টের দপ্তরগুলি বিমানযোগে অতি দ্রুত ৭০০ মাইল দূরবর্তী দক্ষিণ চীনের ক্যাণ্টনে স্থানান্তরিত হয়েছে। এই ক্যাণ্টনই কুওমিণ্টাঙ দলের নতুন রাজধানী হবে নানকিং-এর রক্ষাব্যূহ ভেদ করতে কম্যুনিস্ট-

দের আদৌ কোন বেগ পেতে হয় নি। ইয়াংসি রণক্ষেত্রে কম্যুনিস্টরা বর্তমানে ৩ লক্ষ সৈন্য সমাবেশ করেছে বলে প্রকাশ। যুদ্ধ বিজয়ী কম্যুনিস্টদের সংগে বিনা সর্তে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া কুওমিণ্টাঙের কোন সম্মানজনক আপোষ-রফা হওয়া যে সম্ভব নয় এরূপ একটা আশঙ্কা আমরা পূর্বাপরই প্রকাশ করে এসেছি। আমাদের সেই আশঙ্কাই সত্য প্রমাণিত হতে চলেছে।

পিপিং-এ উভয় পক্ষের ১২।১৪ দিনব্যাপী শান্তি আলোচনা ভেঙে যাবার প্রধান কারণ হল কম্যুনিস্টদের ইয়াংসি নদী বিনা বাধায় অতিক্রমের দাবী। প্রধানত এই প্রশ্নটি নিয়েই শেষ পর্যন্ত উভয় পক্ষের মধ্যে বিরোধ বাধে এবং উভয় পক্ষের মনঃপূত কোন সমাধান আবিষ্কার করতে না পারার ফলেই যুদ্ধ পুনরারম্ভ হয়েছে। আলোচনার গোড়া থেকেই দেখা যাচ্ছিল যে, শান্তি সম্বন্ধে উভয় পক্ষের ধারণা ও মতবাদ পরস্পরবিরোধী। কম্যুনিস্টরা চাইছিল শান্তির পথে সমগ্র চীনের উপর নিজেদের কর্তৃত্বকে অপ্রতিহত করে তুলতে আর কুওমিণ্টাঙ চাইছিল শান্তির পথে নিজেদের দলীয় গভর্নমেণ্টের অস্তিত্ব যথা-সম্ভব বজায় রাখতে। দক্ষিণ চীনে কুওমিণ্টাঙ গভর্নমেণ্ট ও সেনাবাহিনীর প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকতে দিয়ে কম্যুনিস্টরা যদি কোন শান্তি স্থাপন করত তবে সে শান্তি দীর্ঘস্থায়ী হত না এ তারা জানে। তাই তারা বরাবর জোর দিয়ে আসছিল ইয়াংসি নদী অতিক্রমের উপর। ইয়াংসির অপর পারে কুওমিণ্টাঙ কি করে না করে তার উপর নজর রাখাই ছিল কম্যুনিস্টদের এই সর্তারোপের একমাত্র উদ্দেশ্য। শান্তি আলোচনা আরম্ভ হবার বহু পূর্বেই কম্যুনিস্ট অধিনায়ক মাও সে তুঙ যে ৮ দফা শান্তি সর্ত প্রচার করেছিলেন তা পুরোপুরি মেনে নিয়ে শান্তি স্থাপন করতে হলে কার্যত কুওমিণ্টাঙ গভর্নমেণ্টের আত্মহত্যা করাই হত। এই আটটি সর্তের মধ্যে প্রয়োজনানুরূপ কিছু কিছু রদবদল করা সম্ভব হবে—এই আশাতেই তাঁরা শান্তি প্রতিনিধিদল পাঠিয়েছিলেন পিপিং-এ। কিন্তু গোড়া থেকেই দেখা গেল যে, বিজয়ী কম্যুনিস্টদের মনোভাব কঠিন ও অনমনীয়। তার উপর ১৭ই এপ্রিল তারিখে মাও সে-তুঙের নির্দেশে কম্যুনিস্ট পক্ষ থেকে যখন ২৪ দফার একটি নতুন শান্তি পরিকল্পনা সরকারী প্রতিনিধিদের হাতে পেশ করা হল, তখনই বোঝা গেল যে, শান্তি আলোচনা ভেঙে যেতে বাধ্য। এই শান্তি পরিকল্পনা গ্রহণ বা বর্জনের জন্যে কুওমিণ্টাঙকে সময় দেওয়া হল ২০শে এপ্রিল পর্যন্ত। সরকারী শান্তি প্রতিনিধিদলের অন্যতম সদস্য হুয়াং সাও-সিয়েং এই ২৪ দফা সর্ত নিয়ে এলেন নানকিং-এ। প্রেসিডেণ্ট লি সুং-জেনের গভর্নমেণ্ট কম্যুনিস্ট পক্ষের এই দাবী মেনে নিতে পারেন নি বলেই নতুন করে যুদ্ধারম্ভ হয়েছে। চিয়াং কাইশেকের সংগে পরামর্শ করে এসে প্রেসিডেণ্ট লি ঘোষণা করেছেন যে, কুওমিণ্টাঙ পক্ষ শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন। কম্যুনিস্টদের অতিরিক্ত চাপের ফলে কুওমিণ্টাঙ দলে আবার কম্যুনিস্টবিরোধী রক্ষণশীলদের প্রাধান্যই যে বেড়ে চলেছে—প্রেসিডেণ্ট লি-র এই ঘোষণা তারই প্রতীক।

চীনের জাতীয় জীবনে গৃহযুদ্ধের দুর্গ্রহ অবসানের যে ক্ষীণ সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল আপাতত তা বিলুপ্ত হল। নানকিং দখলের পর কম্যুনিস্টদের অন্যতম লক্ষ্য হবে অদূরবর্তী সাংহাই দখল করা। এই উদ্দেশ্যে কম্যুনিস্ট বাহিনী ইতিমধ্যেই সাংহাইকে বিচ্ছিন্ন করে তোলার চেষ্টায় আছে। এই অবস্থায় দক্ষিণ চীনের সর্বত্র কম্যুনিস্ট গেরিলা দলের তৎপরতাও বেড়ে উঠেছে। দক্ষিণ চীনে এখনও চিয়াং কাইশেকের অপ্রতিহত প্রভাব আছে একথা স্বীকার করে নিলেও চিয়াং গভর্নমেণ্টের পক্ষে কম্যুনিস্ট বিজয়াভিযানকে বাধা দেওয়া এক কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। গত জানুয়ারী মাস থেকে চীনের জাতীয় গভর্নমেণ্ট যে মধ্যপথ নিয়ে চলেছে কম্যুনিস্ট অগ্রাভিযানের ফলে সেই মধ্যপথ তাকে বর্জন করতে হবে। হয় জেনারেলিসিমো চিয়াং কাইশেককে পুনরায় রাষ্ট্রনায়কত্ব গ্রহণ করে প্রাণপণে কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে সকল জাতীয় শক্তি সংহত করে চলতে হবে—নয়তো একেবারে গভর্নমেণ্ট থেকে সরে দাঁড়িয়ে শান্তিকামীদের স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকার দিতে হবে। যবনিকার আড়ালে থেকে কলকাঠি নাড়ার যে নীতি চিয়াং কাইশেক গ্রহণ করেছেন—তাঁর সে নীতি একেবারে ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে।

## ইটালীর ভূতপূর্ব উপনিবেশ

আফ্রিকাস্থিত ইটালীর ভূতপূর্ব উপনিবেশ সাইরেনেইকা, সোমালিল্যাণ্ড, লিবিয়া প্রভৃতির ভাবী শাসন ব্যবস্থা কি হবে, তা নিয়ে রাষ্ট্রসংঘের বৃহৎ শক্তি কয়টির মতভেদের অন্ত নেই। ফলে এ সমস্যাটির কোন সুষ্ঠু সমাধান আজও হয় নি। রাষ্ট্রসংঘের বর্তমান অধিবেশনেও এই প্রশ্নটি বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। ইটালীর উপনিবেশগুলির সংগে বৃহৎ শক্তি কয়টির রাজনৈতিক স্বার্থ বিজড়িত আছে বলে তারা কোনপ্রকারেই এ সম্বন্ধে একমত হতে পারছে না। ইটালীর বিগত সাধারণ নির্বাচনে কম্যুনিস্টদের পরাজয়ের পূর্বে রাশিয়ার ধারণা ছিল যে, ইটালীতে কম্যুনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। তাই তখন রাশিয়া প্রস্তাব করেছিল যে, আফ্রিকার উপনিবেশগুলি ইটালীকে ফিরিয়ে দিতে হবে। রাশিয়ার উদ্দেশ্য ছিল ভূমধ্যসাগর তীরবর্তী কম্যুনিস্ট ইটালীর শক্তি বাড়িয়ে তোলা। সেদিন বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি এর তীব্র বিরোধিতা করেছিল। আজ ইটালীতে দক্ষিণপন্থী সিনর ডি গ্যাস্-পেরীর গভর্নমেণ্ট গঠিত হওয়ায় রাশিয়া আবার ইটালীকে তার উপনিবেশ ফিরিয়ে দেবার বিরোধী হয়ে উঠেছে। অপরপক্ষে ইটালী অতলান্তিক চুক্তি স্বাক্ষরকারী অন্যতম রাষ্ট্র বলে তার শক্তি বাড়িয়ে তোলা আজ বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অত্যন্ত প্রয়োজন। তাই পুরোপুরি না হলে ইটালীর উপনিবেশের একটা বড় অংশ আজ তারা ইটালীর হাতে তুলে দিতে চায়। বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা রাশিয়া—কোন দেশই উপনিবেশের পরাধীন জনগণের স্বার্থের দিকে তাকিয়ে কথা বলছে না—সকলেই পরিচালিত হচ্ছে নিজেদের স্বার্থবাদী কর্মনীতির দ্বারা।

এই পরস্পর বিরোধী বিতর্কের মধ্যে ভারতের প্রতিনিধি দলের নেতা শ্রী এম সি শীতলবাদ ইটালীর ঔপনিবেশিক সমস্যা সমাধানে একটি নতুন চালের ইঙ্গিত দিয়েছেন। গত ১৮ই এপ্রিল তিনি রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠানের সাধারণ অধিবেশনে এ সম্বন্ধে একটি ৮ দফার পরিকল্পনা পেশ করেছেন। পরিকল্পনাটির মূল কথা হল ইটালীর ভূতপূর্ব উপনিবেশগুলিকে রাষ্ট্রসংঘের অছির শাসনাধীনে ছেড়ে দিতে হবে এবং নিম্নোক্ত উপায়ে শাসনকার্য চলবে: (১) প্রত্যেকটি অঞ্চলের জন্যে পৃথিবীর ছোট দেশগুলির মধ্য থেকে একজন গবর্নর নিযুক্ত করতে হবে; (২) শাসন পরিচালনার জন্যে একটি আন্তর্জাতিক কর্মচারীসংঘ সৃষ্টি করতে হবে; (৩) রাষ্ট্রসংঘ শাসনভার গ্রহণ করার পূর্ব পর্যন্ত বর্তমান শাসনব্যবস্থাই চলবে; (৪) স্থানীয় জনগণ ও রাষ্ট্রসংঘের সদস্য দেশগুলির লোক নিয়ে একটি পুলিশ বাহিনী গড়ে তুলতে হবে; (৫) বর্তমান শাসন পরিচালকদের সংগে পরামর্শ করে শাসনব্যবস্থার খুঁটিনাটি নির্ধারিত করা হবে এবং বর্তমান শাসন পরিচালকরা প্রয়োজনীয় সকল তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য থাকবেন; (৬) প্রত্যেক অঞ্চলে স্থানীয় অধিবাসীদের প্রতিনিধি নিয়ে উপদেষ্টা পরিষদ গড়ে তোলা হবে এবং এই পরিষদ শাসন পরিচালনায় সহায়তা করবেন; (৭) রাষ্ট্রসংঘের অছি পরিষদ মাঝে মাঝে পরিদর্শক মণ্ডলী পাঠিয়ে যোগাযোগ রক্ষা করবেন এবং (৮) ১০ থেকে ২০ বৎসরের মধ্যে প্রত্যেক অঞ্চলে গণভোট গ্রহণ করা হবে এবং সে গণভোটে স্থানীয় অধিবাসীরাই স্থির করবে তারা স্বাধীন হতে চায়, না অন্য কোন সংলগ্ন দেশে মিশে যেতে চায়। ভারতের এই পরিকল্পনা যে সর্বাংশে ইটালীয় উপনিবেশের অধিবাসীদের স্বার্থরক্ষার অনুকূল হবে—সে বিষয়ে আমাদের কোন সংশয় নেই। ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মত্ত বৃহৎ শক্তিপুঞ্জ ভারতের এই পরিকল্পনা গ্রহণ করবে কিনা জানি না—তবে এ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলে আন্তর্জাতিক শান্তির পক্ষে তা যে কল্যাণকর হবে—সে বিষয়ে আমরা নিঃসংশয়। ২৪।৪।৪৯

**অসময়েই** কয়েকদিন ধরিয়া বর্ষাবাদল গেল। আজ আকাশ সম্পূর্ণরূপে মেঘমুক্ত হইয়াছে। ক্রিয়া কর্মের পর মাজা ঘষা বাসনের মতনই আকাশ এবং গাছের লতাপাতাগুলি প্রভাতী আলোয় ঝক্ ঝক্ করিতেছে।

একপাল হনুমান আসিয়া পাড়ার বুড়ো বকুল গাছের ডালে ডালে বসিয়া গেল। হনুমানগুলির আনন্দের সীমা নাই—কয়েকদিন বৃষ্টির পর আজ রৌদ্র উঠিয়াছে, [illegible]গাছের বৃষ্টিধৌত পাতাগুলি নির্ভাবনায় চিবাই[illegible] থাকে—পাতার গায়ে একটুকুও ধুলাবালির [illegible] নাই।

বিশ হইতে তিরিশটা হনু[illegible] লইয়া এই দলটি গা[illegible]। একমাত্র পালে[illegible] গোদাটি পুরুষ, অন্য [illegible] স্ত্রীজা[illegible]—ইহাদের সমাজে ইহাই নিয়ম। উই[illegible] পূর্ব পুরুষ হইলেও কস্মিনকালেও [illegible]দের 'মানুষ' হইবার সম্ভাবনা নাই কা[illegible] ব্যবস্থাপক সভায় কোন সহৃদয় পুরুষ কিম্বা স্ত্রী-সমাজের কোন প্রগতিশীল নারীর দ্বারা এই অবিচারের প্রতিকারকল্পে কোন আইন বা প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিবার সুযোগ পাইবে [illegible] সে যাহাই হউক মোটামুটি ইহারা বেশ শান্তিতেই আছে—কাহারও মনে কোন খেদ নাই।

**পালের গোদাটির নাম জম্বু।**

**জম্বু সেদিন বকুল গাছের মগডালে বসিয়া** পাড়ার পারিপার্শ্বিক অবস্থাটা অত্যন্ত **মনোযোগের সহিত পর্যবেক্ষণ করিতেছিল— বকুল গাছের কষটে পাতা খাইবার মতন প্রবৃত্তি** তাহার নাই—বিশেষ করিয়া সে যখন পালের গোদা যাহা কিছু ভাল এবং উপাদেয় সমস্তই খুঁজিয়া বাহির করা স্ত্রী হনুমানগুলির কার্য। সাপি নামক স্ত্রী হনুমানটির এ বিষয়ে বিশেষ পারদর্শিতা আছে। সবসময়ে জম্বুর আহার্য অন্বেষণ করাই যেন তাহার কাজ। ইহার অবশ্য এ[illegible]টা কারণ আছে—সাপি তিন-চারটি সন্তানের মাতা কিন্তু দুর্ভাগ্য! প্রতিবারই প্রসব করি[illegible]াছে পুরুষ হনুমান। পালের গোদা কিছুতেই পুরুষ হনুমান বাঁচিতে দেয় না, ভবিষ্যৎ প্র[illegible]দ্বন্দ্বিতার ভয়ে! সাপির বাচ্চাগুলি দুইমা[illegible] হইলেই জম্বু টের পাইয়া সাপির কোল হ[illegible]তে ছিনাইয়া লইয়া নিষ্ঠুরভাবে মারিয়া ফে[illegible]লয়াছে। প্রতিবারই বাচ্চাগুলি বাঁচাইবার জন্য কত চেষ্টা করিয়াছে সাপি—দল ছাড়িয়া একা[illegible] জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়া বাস করিয়াছে, [illegible]দলে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছে কি[illegible]তু হিসাবের পারদর্শিতায় জম্বু [illegible]গাণনিককেও হার মানায়—ঠিক টের পাইয়া গিয়া[illegible]ছে সাপির অনুপস্থিতি! খুঁজিয়া বাহির করিয়া[illegible] সাপিকে, নির্মমভাবে বাচ্চাটিকে তাহার ব[illegible] হইতে ছিনাইয়া লইয়া কাঁচ মুণ্ডুটা ধড়-ছাড়া করিয়া[illegible] তবে নিশ্চিন্ত! সে কি মূর্তি জম্বুর! আজও [illegible]র সে মূর্তি চিন্তা করিলে সাপির গা[illegible] খাড়া হইয়া উঠে। ভগবান যদি মেয়ে-বাচ্চা দেন তাহা হইলে বড়ই সুখের হয়। গোদার আর কোন আপত্তি নাই— **ভয় নাই তাহার ভবিষ্যৎ প্রতিদ্বন্দ্বিতার।** সাপি আগামী মাসে সন্তান **প্রসব করিবে তাই** সর্বদাই জম্বুর মনোরঞ্জনের **জন্য কারণে** অকারণে উকুন বাছিয়া দেয়—গৃহস্থের **শশাটা** কলাটা নিজে না খাইয়া **জম্বুর দৃষ্টি আকর্ষণ** করিয়া দেয়—উদ্দেশ্য যদি এবার **তাহার** বাচ্চাটাকে না মারিয়া ফেলে।

জম্বু একবার নিজের দলের দিকে দৃষ্টি দিতেই নজর পড়িল কিমার উপর। **কিমা তন্বী** কিশোরী। কি সুন্দর **ভঙ্গীতে বসিয়া আছে।** জম্বু অপলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকে কিমার দিকে। সাপি যে কতক্ষণ ধরিয়া পরম ধৈর্যের সহিত উকুণ বাছিয়া চলিয়াছে সেদিকে খেয়াল নাই জম্বুর। সাপি একবার কটমট করিয়া ভাবী সপত্নীর দিকে দৃষ্টি হানিয়া দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে—

"লো......লো......হৈ—" পাড়ার ছোঁড়াগুলি পিছু লাগিয়াছে—জম্বুর কানের পাশ দিয়া একটি মাটির গুলতি সাঁই করিয়া চলিয়া গেল।

"থ্যাঁক্ থ্যাঁক্ থ্যাঁকোর থ্যাঁক্—" জম্বু সাদা ধপধপে দাঁতগুলি বিকটভাবে উন্মোচন করিয়া তাড়াইয়া নামিয়া আসে ছেলেগুলির দিকে—ছেলেগুলি ভয় পাইয়া নিমেষের মধ্যে উধাও হইয়া গেল।

জম্বু রাজকীয় ভঙ্গীতে আবার ফিরিয়া গেল নিজের জায়গায়। একটু শান্তিতে বসিতে দেয় না মানুষের ঐ বাচ্চাগুলি। যত কদাকার জীব। গায়ে না আছে পাটল রঙের লোম। না আছে একটি সুদীর্ঘ সৌষ্ঠবপূর্ণ লাঙ্গুল। ভগবান উহাদিগকে হনুমান বানাইতে বানাইতে

অসম্পূর্ণভাবেই মানুষ করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন।

"উঃ—" জম্বু ব্যথা পাইয়া চমকাইয়া উঠে।

অসাবধানতাবশত সাপি উকুণ বাছিতে গিয়া পিটের একটি কাঁচা লোম তুলিয়া ফেলিয়াছে। জম্বু পিছু ফিরিয়া খ্যাঁকাইয়া উঠে—"খ্যাঁক্—খ্যাঁকোর।"

সাপি তড়াক্ করিয়া লাফ দিয়া অন্যডালে চলিয়া গেল—জম্বুর আর যেন কোন মোহ নাই সাপির উপরে! অথচ এই কয়েক মাস আগে—

কয়েকদিন ধরিয়া বৃষ্টির পর গায়ের উপর রৌদ্রটা ভারি চমৎকার লাগিতেছে। ঘুমের অলস স্পর্শে জম্বুর চোখের পাতা বন্ধ হইয়া আসে। গৃহিণীরা সব পেটের ধান্ধায় ব্যস্ত। মানুষদের নাকি উল্টা ব্যবস্থা—পুরুষদেরই অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করিয়া দিতে হয়। মনোরঞ্জনের জন্য পরিশ্রম করিতে হয়—খোসামদি করিতে হয়। জম্বু ভাগ্যিস মানুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করে নাই।

জম্বুর চোখের পাতা বন্ধ হইয়া আসিলেও অদূরে টিনের বাড়িটার অন্দরের দিকে মধ্যে মধ্যে তাকাইয়া দেখিতেছিল। একটি স্ত্রীলোক ছড়ি হাতে রৌদ্রে দেওয়া বড়ি আগলাইতেছে। জম্বু একবার মনে মনে হাসিয়া লয়। বাড়ির পুরুষ মানুষটি বাহির হইয়া যাইবামাত্র জম্বু নিশব্দগতিতে রাস্তা দিয়া লাফাইয়া লাফাইয়া আগাইয়া চলে বড়ির লোভে।

"ঘেউ—ঘেউ—" পাড়ার খেঁকি কুকুরটা ধাওয়া করিল জম্বুর পিছনে, জম্বু অবলীলাক্রমে উঠিয়া পড়িল নিকটবর্তী প্রাচীরের উপরে। হনুমানদের কি যে অপরাধ জম্বু বুঝিতে পারে না অথচ কুকুরগুলি দুই চক্ষে হনুমানদের দেখিতে পারে না। চীৎকার করিয়া তাড়া করিয়া অনর্থক একটা অশান্তির সৃষ্টি করা উহাদের চাইই।

জম্বু ঝুপ করিয়া রৌদ্রে দেওয়া বড়ির কাছে নামিয়া পড়িয়া দুই হাতে বড়িগুলি মুখের মধ্যে পুরিতে থাকে—স্ত্রীলোকটি একবার সভয়ে পিছাইয়া গিয়া চীৎকার করিয়া উঠে—"লো—লো—। ও সুধা। ও শান্তি। হনুতে বড়িগুলো খেলো রে—"

জম্বুর ভ্রুক্ষেপ নাই। দশ বিশটি স্ত্রীলোক আসিলেও জম্বু গ্রাহ্য করে না। পিঠের উপর কয়েক ঘা বিনা আপত্তিতেই সহ্য করে তাহার পর একবার মাত্র দাঁত বাহির করিতেই স্ত্রীলোকটি পালাইয়া যায়। এদিকে বড়িও একরকম নিঃশেষ। ভারি উপাদেয় জিনিস এই বড়ি। বড়ির পরিবর্তে স্ত্রীলোকের হাতে কয়েক ঘা প্রহার জম্বু হাসিমুখে খাইতে রাজি আছে প্রতিদিনই।

"হ্যাঁ হ্যাঁ লো—লো—" একটি ষণ্ডা মতন পুরুষ মানুষ উঠানে দাঁড়াইতেই জম্বু তিনলাফে টিনের কোটার মটকায় এবং পরক্ষণেই পাড়ার সেই বৃদ্ধ বকুলগাছের মগডালে।

বকুলগাছের উপর হইতেই জম্বু স্ত্রীলোকটির গজরানি শুনিতে পায়—সম্ভবতঃ গালাগালি দিতেছে। আচ্ছা মূর্খ এই মানুষগুলি। জম্বু নিজেত আর বড়ি তৈয়ার করিতে পারে না কাজেই মানুষের দেওয়া বড়ি জম্বুত খাইবেই। ইহাতে মনুষের কি আপত্তি থাকিতে পারে জম্বু বহু গবেষণা করিয়াও ঠিক ধরিতে পারে না।

তন্বী কিশোরী কিমা সুড়সুড় করিয়া আসিয়া জম্বুর গা ঘেঁসিয়া বসিয়া পড়িল। জম্বুর গণ্ডস্থলির মধ্যে তখনও দুতিন গণ্ডা বড়ি লুকান ছিল—হনুমানসুলভ ঘ্রাণশক্তির জোরে কিমা টের পাইয়া গিয়াছে।

গুটিচারেক বড়ি জম্বু মুখ হইতে বাহির করিয়া কিমাকে উপহার দিল—অন্য কেহ হইলে জম্বু কিছুতেই একটি বড়িও হস্তান্তর করিত না—কিন্তু কিমার কথা স্বতন্ত্র। এখন হইতে কিমার মনোরঞ্জন না করিলে কিমা কোনদিন হয়ত বাট্রু সর্দারের দলে ভিড়িয়া পড়িবে। বাট্রুর বয়স অল্প হইলে কি হয় বেশ কৃতিত্বের সহিতই আর একটি দলের সর্দারী করিতেছে। বাট্রুর পরিপুষ্ট দেহের গঠন, প্রকৃতিটিও ভীষণ রুক্ষ। কিছুদিন পূর্বে এই গ্রামের দক্ষিণে দীঘির ধারে জাম গাছটার দখল লইয়া বাট্রু ও জম্বুর মধ্যে লড়াই বাধিবার উপক্রম হইয়াছিল কিন্তু জম্বুর বিকট চীৎকার ও হুঙ্কার শুনিয়া বাট্রু সেদিন আর আগাইয়া আসে নাই তবে বাট্রু যে বিশেষ ভয়ও পাইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না—কেমন যেন দাম্ভিক ও অগ্রাহ্যপূর্ণ হাবভাব! জম্বুর গায়ের জোর থাক না থাক গলার জোর আছে বিলক্ষণ এবং এই গলার জোরেই এখন পর্যন্ত বেশ নির্বিবাদে দল চালাইয়া আসিতেছে।

হ্যাঁ, সেদিন লক্ষ্য [illegible]রয়াছিল কিমার চোখে প্রশংসামাখা দৃষ্টি অবাক বিস্ময়ে তাকাইয়াছিল বাট্রুর দিকে। বাট্রুর চোখেও ছিল লুব্ধ দৃষ্টি। জম্বু ঠিক সময়ে না আসিয়া পড়িলে কিমা হয়ত সেইদিনই বাট্রুর দলে চলিয়া যাইত। বাট্রুর তুলনায় [illegible]বুকে বৃদ্ধ বলিলেও চলে। বৃদ্ধই ত। সেদিন কাঁচা বেল খাইতে গিয়া সম্মুখের দাঁতটা একটু নড়িয়া গিয়াছে।

জম্বু একবার অকারণেই [illegible] ছাড়ে—"হুপ্ হুপ্—খ্যাঁকার খ্যাঁ[illegible]." তাহার পর বকুল গাছের ডাল[illegible]রিয়া ঝাঁকাইয়া বেড়াইল ভীষণ বেগে। অকার[illegible] হয়ত ঠিক নয়। মনের কোণে এইমাত্র যে বৃ[illegible] ছায়া পড়িয়াছিল তাহাই জোর করিয়া দূর করিবার জন্য বাহ্যিক আস্ফালন।

জম্বুর পুলক আলোড়নের স্পর্শে অন্যান্য হনুমানগুলিও ক্যাচর ম্যাচর করিয়া গাছ সরগরম করিয়া তোলে—বাচ্চাগুলি টিনের কোঠার উপর ইচ্ছা করিয়াই শব্দ করে পদাঘাতে।

কিছুক্ষণের মধ্যে আলোড়ন থামিয়া গেল। অকারণে পুলক প্রকাশের বিপদও আছে—গৃহস্থেরা হনুমানগুলির শুভাগমন জানিতে পারিয়া রীতিমত সাবধান হইয়া যায়—বড়িটা কলাটা আর তেমন অপহরণ করা যায় না।

পুলক প্রকাশ করিয়া জম্বু হাঁপাইয়া উঠে। মোটা ডালের গায়ে ঠেস দিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিতেই জম্বুর চোখ বুজিয়া আসে আপনা হইতেই। কিন্তু নিরিবিলি শান্তি মরকট জীবনে ভগবান লেখেন নাই—মগডালের আড়ালে কাকে যে বাসা বাঁধিয়াছে তাহা নীচ হইতে মোটেই টের পাওয়া যায় না—জম্বুর বিশ্রামস্থলটা সন্দেহজনকভাবে বাসার সান্নিধ্যে হওয়ায় কাকটা আচমকা ঠোক্‌রাইয়া দিল জম্বুর মাথার চাঁদিতে—উঃ যেন লোহার ডাণ্ডসের ঘা।

কাকটা যে এখানে বাসা বাঁধিয়াছে তাহা যদি জম্বু ঘুণাক্ষরে জানিতে পারিত তাহা হইলে কি আর এখানে বসিত। জম্বু দ্বিরুক্তি না করিয়া ডালের কয়েক ধাপ নীচের দিকে নামিয়া গেল। কিন্তু তাহাতেও রক্ষা নাই কাকটা চীৎকার করিয়া ইতিমধ্যে অনেকগুলি স্বজাতি জুটাইয়া ফেলিয়াছে এবং যতক্ষণ না এ পাড়া ছাড়িয়া চলিয়া যায় ততক্ষণ ক্ষান্ত হইবার নয়। ঐ একটি জীব যাহার বিরুদ্ধে কিছুই করিতে পারে না জম্বু—চারিদিক হইতে এমন করিয়া চীৎকার করিতে ও ঠোকরাইতে থাকে যে কাহার সাধ্য একদণ্ড তিষ্ঠায়। আর এমন হাতসাফাই ঠোকর। কিছুতেই ধরিতে পারা যায় না উহাদিগকে—অন্ততঃ জম্বু জীবনে কখনও পারে নাই।

নাঃ, চলিয়াই যাইতে হইল এ পাড়া হইতে তাহা ছাড়া গৃহস্থেরা সাবধান হইয়া পড়িয়াছে এখানে আর তেমন জুৎ হইবে না। জম্বু বকুল গাছ হইতে [illegible]মগাছে এবং নিমগাছ হইতে পা[illegible] মহাশয়ের [illegible]কা প্রাচীরের উপর [illegible]দিয়া ছুটিয়া চলিয়া গে[illegible]। চলিয়া [illegible] যাইতে একবার পিছু [illegible]খিল যে গৃহিণীরা তাহার পিছ[illegible]রয়াছে কি না। এখন আস্তানা গাড়িবে [illegible]রতন বাবুর পেঁয়াজ ও বেগুনের ক্ষেতের চারপাশে। জম্বুর একটা বাঁধাধরা পরিক্রমা তালিকা আছে—আজ যে ফসলটা এখানে নিঃশেষ করিয়া গেল, তাহার পুনর্বিকাশের [illegible]র্বটা জম্বুর মানসচিত্রে দিব্য মুদ্রিত থাকে।

জম্বু শিবরতন বাবুর গোয়ালঘরের চালের মাথায় বসিয়া তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকাইয়া দেখিল। ঐত বেগুনের ক্ষেত। আগলদার অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া তামাক টানিতেছে আপন খেয়াল মতন—চুপি চুপি দুই চারিটা বেগুন খাইয়া আসিলে হয়। জম্বু চাল বাহিয়া নামিতে যাইতেছিল কিন্তু ওটার মধ্যে কি আছে? ঐ ডালাটার মধ্যে পাকা ঘরের বারান্দায়

বেগুনের ক্ষেতের দিকে আর যাওয়া হইল না —জম্বু অতি সন্তর্পণে বারান্দায় নামিয়া গেল।

হা ভগবান! আজ জম্বু যে কাহার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিল। ডালার মধ্যে আছে খইল। এই কিছু আগে খাইয়াছে বড়ি এখন পাইল খইল। জম্বু একবার সন্ত্রস্তভাবে চারিদিকে তাকাইয়া লইল, কি জানি, সাঁই করিয়া একটা আধপোয়া ওজনের মাটির গুলতি পিঠে পড়িতে পারে। জম্বু অবশ্য ধূর্ত বটে কিন্তু মানুষগুলিও কম ধূর্ত নয়। জম্বু আর দেরী না করিয়া দুই থাবা ও মুখ ভর্তি করিয়া খইল লইয়া পুনরায় চালের মাথায় গিয়া বসিল—সাবধানের মার নাই। আঃ, অপূর্ব আস্বাদ এই খইল জিনিসটার। জম্বু চিরজীবন মানুষের গোলামী করিতে রাজী আছে যদি তাহারা শুধু খইল খাওয়াইয়া জম্বুকে পুষিতে পারে।

ওদিক হইতে গৃহিণীদের কলকণ্ঠ শোনা যাইতেছে। এই বেলায় আরও দুইতিন থাবা খইল খাইয়া আসিলে হয়। গোলমাল শুনিয়া মানুষগুলি খইলের ডালা সরাইয়া ফেলিতে পারে। জম্বু বারান্দার দিকে নজর দিল কিন্তু আশ্চর্য। খইলের ডালাটা ওখানে নাই। তবে দুই চারিটা খইলের টুকরা ছড়ান আছে বারান্দার উপর। জম্বু আবার নামিয়া গেল বারান্দায় —নিকটে জনমনুষ্য নাই। জম্বু সন্ত্রস্তভাবে খইলের টুকরাগুলি মুখের মধ্যে পুরিতে লাগিল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বারান্দার ছড়ান খইল শেষ হইয়া গেল সত্য—কিন্তু সম্মুখের খালি ঘরটার ভিতর পর্যন্ত খইল পড়িয়া আছে। শুধু খইল? ঘরের একদিকে বালির উপর আলু রাখা আছে বিস্তর। কোন দুরভিসন্ধি নাইত? দরজার এক পা[illegible] বন্ধই বা কেন? চিন্তার কথা। জম্বু পাঁজরের কাছটা চুলকাইয়া লইল। কি সুন্দর আস্বাদ এই খইলটার। মুখের মধ্যে আস্বাদটা এখনও লাগিয়া আছে। আর আলু যে[illegible] খায় নাই জম্বু।

এদিক ওদিক তাকাইয়া[illegible] পর্যন্ত ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল আলু[illegible] খইলের লোভে এবং যেমন ঘরের মধ্যে প্রবেশ অমনি অম্বর পাটি দরজাটা সশব্দে বন্ধ হইয়া গেল। একপাটি দরজা পূর্ব হইতেই বন্ধ ছিল অপর পাটির শিকলে দড়ি বাঁধিয়া শিবরতন বাবুর পুত্র থামের আড়ালে অপেক্ষা ক[illegible] এই সুযোগটার জন্যই।

জম্বু দরজা ধরিয়া হেঁচকা টান মারিয়া খুলিবার চেষ্টা করে কিন্তু ছোকরাটি তাহার পূর্বেই শিকল তুলিয়া দিয়াছে।

জম্বুর আস্ফালন ও চীৎকার শুনিয়া তাহার গৃহিণীরা বাড়ির ছাত ও চালময় বসিয়া গেল, প্রতিবাদ ও সমবেদনা জানাইবার ত্রুটি হইল না। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। নীচে নামিয়া আসিবার সাহস কাহারও কুলাইল না।

ছোকরাটি জানালার নিকটে দাঁড়াইয়া দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে থাকে। রাগে জম্বুর আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠে—"খ্যাঁকোর—খ্যাঁক্!" জম্বু দাঁত দেখায়। ছোকরা মনুষ্য-ভাষায় কি যেন শাসাইয়া একটু দূরে সরিয়া গিয়া কাহার উদ্দেশ্যে চেঁচাইতে থাকে—"আয় ভুলুয়া—আ—তু উ উ—"

জম্বু জানালা হইতেই দেখিতে পাইল যে, কালো মিস্‌মিসে যমদূতের মতন একটা কুকুর ছুটিয়া আসিল ছোকরার নিকটে—ছোকরা জানালার ভিতর দিয়া জম্বুকে দেখাইয়া উস্কাইয়া দেয়—"লেঃ স্ স্ স্—" ঘরে ঢুকিবার রাস্তা নাই কিন্তু কুকুরটার কি আস্ফালন। পায়ত জম্বুকে টুকরা টুকরা করিয়া ফেলে।

"উঁপ্ খ্যাঁকোর খ্যাঁক—" জম্বু কুকুরটিকে সাবধান করিয়া দেয়। ফল হইল বিপরীত! কুকুরটা আরও ক্ষেপিয়া উঠে। শেষ পর্যন্ত ছোকরা দরজার শিকল আল্‌গা করিয়া কুকুরটিকে জম্বুর ঘরের মধ্যে ঢুকাইয়া দিয়া আবার শিকল তুলিয়া দিল এবং পর মুহূর্তে ঘরের মধ্যে সুরু হইয়া গেল কুরুক্ষেত্র কাণ্ড। দুইজনের হুটোপুটিতে উৎক্ষিপ্ত আলু ও বালির আঁধিয়াতে ঘরের ভিতরটা অন্ধকার হইয়া গেল। বাহির হইতে কেবলমাত্র শুনিতে পাওয়া যায় দুইটি জীবের বিশেষ বিশেষ চীৎকার—"খ্যাঁক্ খ্যাঁক্" আর "ঘেউ ঘেউ"।

মিনিট দশ পরে সব চুপচাপ হইয়া গেল—তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে যুদ্ধ বিরতি ঘটিল কি করিয়া? ছোকরা জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া দেখে যে জম্বু দেওয়াল আলমারির সর্বোচ্চ তাকে গুঁড়ি হইয়া হাঁপাইতেছে আর ভুলুয়া দরজার নিকট সতৃষ্ণ নয়নে দাঁড়াইয়া আছে—যুদ্ধে আর দরকার নাই। এখন ঘরের বাহির হইতে পারিলে যেন দুজনেই বাঁচে।

দরজা খুলি[illegible] দিতেই ভুলুয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে এক দিক দিয়া পলাইয়া গেল। সম্মুখের পা হইতে রক্ত ঝরিয়া পড়িতেছে। জম্বুও তি[illegible] পায়ে লাফাইতে লাফাইতে অন্যদিক দিয়া [illegible]লিয়া গেল। তাহার একটা কান ছিঁড়িয়া [illegible]য়াছে। রক্ত গড়াইয়া পড়িতেছে ঘাড় বাহিয়া।

জম্বু[illegible] মুক্তিলাভে জম্বুর গৃহিণীরা স্তোৎ[illegible]ত্য ও কলরব করিয়া রীতিমতন অভিনন্দ[illegible] জ্ঞাপন করিল। জম্বু কিন্তু তাহা মোটেই গ্রাহ্য করিল [illegible] সোজা গিয়া বসিল অশ্বত্থ গাছের মাথায়।

এদিকে দরজা [illegible] ছোকরার চক্ষুস্থির! ঘরময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে আলু ও বালি আর দুইটি যুধ্যমান ভীত ও সন্ত্রস্ত জীবের পরিত্যক্ত মলমূত্র।

সূর্য পশ্চিমদিকে ডুবিতে চলিয়াছে। জম্বুর গৃহিণীরা মহানন্দে এডাল ওডাল করিয়া বেড়াইতেছে। এতবড় যে মানহানিকর কাণ্ড হইয়া গেল তাহা যেন কিছুই নয়। লজ্জায় ও অপমানে জম্বুর যেন মাথা কাটা যাইতেছে। উঃ! এতগুলি গৃহিণীর সম্মুখে জম্বুকে ঠকাইল একটা মানুষের বাচ্চা—আর ভুলুয়ার হাতে পাইতে হইল লাঞ্ছনা। অথচ মানুষের এই ফাঁদে যাহাতে কোন অপরিণামদর্শী হনুমান বাচ্চা না পড়ে তাহার জন্য কত উপদেশ কত সাবধান করিয়া দিয়াছে জম্বু। নাঃ! এ মুখ আর কাহাকেও দেখাইবার নহে। সম্মান থাকিতে থাকিতে এই বেলায় সন্ন্যাসীর দলে নাম লেখানই ভাল।

সাপি জম্বুর কান হইতে নিসৃত রক্তের ধারা হাতে করিয়া মুছিয়া লইয়া চাটিয়া দেখিল —কেমন যেন নূতন স্বাদ। জম্বু সাপিকে খেঁকাইয়া সরাইয়া দিল দূরে, তাহার পর ডালে ঠেস দিয়া শুইয়া পড়িল। ক' ফোঁটা চোখের জল গালের রোমের মধ্যে মিলাইয়া গেল। 'সন্ন্যাসী' দলটি এদিকে আসিলে হয়। জম্বু বিনা যুদ্ধে ও বিনা সর্তে এই দলের শাসনভার উহাদের একজনের হাতে তুলিয়া দিবে। যে গোদা এইরূপভাবে লাঞ্ছিত হয় তাহার আর সর্দারী করা মানায় না!

ক্রমে অন্ধকার হইয়া গেল, হনুমানগুলি ডালে ডালে চুপ-চাপ বসিয়া গেল রাত্রি কাটাইবার জন্য। জম্বুর কিন্তু অনেকটা রাত্রি পর্যন্ত ঘুম আসে না। সন্ন্যাসী দলই ভাল। কোন ভাবনা চিন্তা নাই। প্রতিদিন গৃহিণীদের গুণতি করিয়া হিসাব রাখিতে হয় না। কারণ, সন্ন্যাসী দলের সকলেই পুরুষ। একটিও স্ত্রী নাই। জম্বু প্রথম জীবনটা এই সন্ন্যাসী দলেই কাটাইয়াছে। তাহার পূর্বের কথাও অল্প অল্প মনে পড়ে। জম্বুর মা তাহার দলপতির দৃষ্টি এড়াইয়া দুই মাসের শিশু জম্বুকে সন্ন্যাসী দলের মধ্যে ছাড়িয়া দিয়া গিয়াছিল। সেই দলপতি অর্থাৎ জম্বুর পিতা টেরও পাইয়া গিয়াছিল ঠিক সময়ে কিন্তু কয়েক মুহূর্তের ব্যবধানের সুযোগে আজও জম্বু বাঁচিয়া আছে নচেৎ সেই দিনই জম্বুর কচি মুণ্ডুটা ধড় ছাড়া হইয়া যাইত যদি জম্বুর পিতা জম্বুকে ছোঁ মারিয়া তুলিয়া লইয়া যাইতে পারিত। উঃ! সে কি বীভৎস চেহারা দলপতির। কিন্তু ভগবান রক্ষা করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসী দলের সদার ঠিক সেই সময়ে আবির্ভূত হইয়া জম্বুকে আগলাইয়া এমন হুঙ্কার ও দন্তঘর্ষণ করিয়াছিল যে জম্বুর পিতা আর কালবিলম্ব না করিয়া পালাইয়া গিয়াছিল। এমনি করিয়াই 'সন্ন্যাসী' দলের সৃষ্টি। যত পরিত্যক্ত পুরুষ শিশুগুলিকে 'সন্ন্যাসী' দলের প্রত্যেক সভ্য পরম যত্নে লালন-পালন করিয়া থাকে। তাহারপর একদিন হয়ত গৃহী ও সন্ন্যাসী দলের সর্দারের মধ্যে লাগিয়া যায় যুদ্ধ—গৃহী দলের সর্দার যদি পরাজিত হয় তাহা হইলে সন্ন্যাসী দলের সর্দার কিম্বা তাহার অনু-

মোদিত কোন সন্ন্যাসী সভ্য তখন হয় গৃহী দলের সর্দার আর পরাজিত গৃহী দলের সর্দার নাম লেখায় সন্ন্যাসী দলে অতি সাধারণ সভ্য হিসাবে। এমনি করিয়া এই দুই রাজ্যহীন রাজার মধ্যে চলে যুদ্ধবিগ্রহ ও স্থান বিনিময়—আজ যে 'রাজা' কাল সে হয়ত 'সন্ন্যাসী'!

সময়ে সময়ে জম্বুর মনে হয় দল রাখিতে গিয়া কাজ কি আছে এই হিংসাবৃত্তিতে? কিন্তু পুরুষ হনুমান দেখিলেই জম্বুর রক্ত গরম হইয়া উঠে নিজেরই অলক্ষ্যে। ভবিষ্যৎ প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী হনুমানেও চাহে না। জম্বু এই দলটির প্রথম অধিপতি হয় বছর সাতেক আগে। ও পাড়ার নেড়া বেলগাছটার মাথার উপর বসিয়াছিল এই দলের তদানীন্তন সর্দার। জম্বুকে একাকী নিকটে পাইয়া তাড়া করিয়া আসিয়াছিল দলপতিটি, ভয়ে জম্বু কয়েক পদ পিছাইয়াও গিয়াছিল। তাহার পর জম্বু এক দুর্দমনীয় আক্রোশে জাপটাইয়া ধরিয়াছিল সর্দারকে—ধস্তাধস্তি ও নখ-দন্তের নির্মম ব্যবহার চলিয়াছিল তিন ঘণ্টা যাবৎ। ভীতা চকিতা স্ত্রীহনুমানগুলি কোথায় যে লুকাইয়াছিল তাহাদের সেই যুদ্ধ দেখিয়া। শেষ পর্যন্ত সর্দারের পরাজয় ঘটে এবং তখন হইতে জম্বু আজও এই দলের অধিপতি।

*  *  *  *

এমনি করিয়া এক বৎসর চলিয়া গেল। সাপি সন্তান প্রসব করিয়াই কোথায় যে পলাইয়া গিয়াছে জম্বু বহু অনুসন্ধান করিয়াও তাহার খোঁজ পায় নাই। সম্ভবত বাট্টুর দলে ঢুকিয়া পড়িয়াছে, কিম্বা সাঁওতালের তীর খাইয়া মারা গিয়াছে।

এদিকে কিমা হইয়া উঠিয়াছে অসম্ভব রকম সুন্দরী। সাপির জন্য জম্বুর কোন খেদ নাই, কিন্তু দুর্ভাবনা হইয়াছে কিমাকে লইয়া। এমন নিখুঁত সুন্দরী হনুমান জম্বু কোন দিন কোন দলে দেখে নাই; তাহার উপর, কিমার যেন কেমন দলছাড়া ভাব! জম্বুকে যে তাহার মনে ধরিয়াছে এমন তো মনে হয় না। কি কুক্ষণে কিমা সেদিন বাট্টু সর্দারকে দেখিয়াছিল। জম্বুর দেহের সমস্ত রক্তকণিকা এক মুহূর্তে মাথায় চড়িয়া যায়। যদি কখনও বাট্টু সর্দারের সহিত জম্বুর সাক্ষাৎ হয় ত জম্বু দেখাইয়া দিবে যে প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা মানেই প্রাণ দেওয়া।

কিমা তখন ননীবালা বৈষ্ণবীর আখড়ার কদলীবৃক্ষ হইতে চুপি চুপি কদলী চুরি করিয়া খাইতেছিল। জম্বু আজকাল কিমাকে চোখের আড়াল করিতে চাহে না—আর বিশ্বাস নাই কিমাকে। জম্বু কিমার দিকে চাহিয়া উৎকটভাবে হুঙ্কার ছাড়ে—"হুপ্—য়্যাঃ—খ্যাঁকোর খ্যাঁক্—!"

কিমা কিন্তু জম্বুর হুঙ্কারের দাপে মোটেই চমৎকৃত হইল না—এমন কি গ্রাহ্যই করিল না। একবার মাত্র পিছু ফিরিয়া জম্বুকে তাচ্ছিল্যভরে দেখিয়াই নিজের কাজে রত হইয়া গেল।

ঠিক কদলীবৃক্ষের পিছনে আখড়া বাড়ির ছাত হইতে সমানে জবাব আসে—"হুপ—খ্যাঁকোর—খ্যাঁক—!"

ঐত বাট্টু সর্দারের হুঙ্কার। জম্বু তড়িৎ-পৃষ্টের মতন চার পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া গেল এই জন্যই কিমার অমন তাচ্ছিল্যপূর্ণ মনোভাব। আর বাট্টুরও কম আস্পর্ধা নয় যে জম্বুর দলের সীমানার মধ্যে আসে প্রণয় জ্ঞাপন করিতে।

ইহার পর জম্বু কি করিতেছে না করিতেছে আর মনে পড়ে না—সুরু হইয়া গেল বাট্টু ও জম্বুর মারাত্মক যুদ্ধ। উহাদের আস্ফালন ও হুড়াহুড়িতে কন্টকটা কলাগাছ ও পেঁপে গাছ ধরাশায়ী হইয়া গেল; আখড়া-বাড়ির রান্নাঘরের জীর্ণ খড়ের চালাটা সশব্দে ভাঙিয়া পড়িল। উহাদের লড়াই দেখিয়া গৃহস্থেরা ছেলেপিলে লইয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। পাড়ার খেঁকি কুকুরগুলি সুরু করিয়া দিল ছুটাছুটি ও চেঁচামেচি। কিন্তু সেদিকে বাট্টুর বা জম্বুর কোন খেয়াল নাই। এখন শুধু যুদ্ধ আর যুদ্ধ। শেষ পর্যন্ত তাহারা সরকারী ডাক বাংলোর টিনের চালের উপর হাজির হইল, মরা-বাঁচার জ্ঞান নাই—ভ্রুক্ষেপ নাই মানুষজনকে—যে-মানুষের সাড়া পাইলে দশ হাত সরিয়া যায়।

"ঘরে ঢুকুন হুজুর, হনুদের মার লেগেছে—" ডাক-বাংলোর মালী এস ডি ও সাহেবকে সাবধান করিয়া দেয়।

হনুমান দুইটির তাণ্ডব যুদ্ধনৃত্যে ডাক-বাংলোর টিনের চাল ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম। কিমার সাহস আছে বলিতে হইবে—দুই সর্দারের যুদ্ধ দেখিয়া অন্যান্য হনুমানগুলি কে কোন্ দিকে পালাইয়া গিয়াছে—কিমা কিন্তু ছুটিয়া আসিয়া সর্দার দুইটির প্রাণ-ঘাতী যুদ্ধ থামাইবার জন্য বৃথা মধ্যস্থতা করিতে যায়। কিন্তু কে মানে তাহার এ মধ্যস্থতার। আগে যুদ্ধ জয় তবে না সুন্দরী!

"হরিবল্!" এস ডি ও সাহেবের বিরক্তি-পূর্ণ উক্তি শোনা গেল। পরমুহূর্তে সাহেবের দুইনলা বন্দুক হইতে দুইটি বজ্র নির্ঘোষ হইয়া গেল উপরি উপরি।

বন্দুকের ধোঁয়া পরিষ্কার হইলে দেখা গেল বাট্টু সর্দার ও কিমার রক্তাক্ত দেহ টিনের চালের উপর লুটাইয়া পড়িয়া আছে। জম্বু খুব বাঁচিয়া গিয়াছে—তবে একটা হাত জখম হইয়াছে বন্দুকের ছর্‌রা লাগিয়া। জম্বু ভাঙ্গা হাত লইয়া কোন দিকে পলাইয়া গেল।

লোক জমিয়া গেল বিস্তর। ননীবালা বৈষ্ণবী সাহেবের অনুমতি লইয়া রামের অনুচর অনুচরী বাট্টু ও কিমার সমাধির ব্যবস্থা করিয়া দিল আখড়া বাড়ির ছায়াস্নিগ্ধ নিমগাছের তলায়।

জম্বু ভাঙ্গা হাতেই আজও এই দলের সর্দারী করিতেছে। চৈত্রের খর মধ্যাহ্নের অলসক্ষণে জম্বু আখড়া বাড়ির সোঁদাগন্ধ নিমফল ভক্ষণ করিতে করিতে কিমা ও বাট্টুর মৃত্যুশয্যার দিকে তাকাইয়া আপন খেয়াল মতন হুঙ্কার ছাড়ে "হুপ্—খ্যাঁকোর-খ্যাক—"। [illegible]হিণীরা কিচির মিচির করিয়া উ[illegible] আগের ম[illegible]—জম্বু [illegible] সগর্বে তাকাই[illegible] দেখে গ[illegible] সকলেই ত আছে কিন্[illegible] কিমা [illegible]

**[ পূর্বানুবৃত্তি ]**

উৎসবান্তের অবসাদ।

বাইরে যেমন ঝিঁঝি পোকার ডাক, তেমনি ঘরে, হেজাক্ লণ্ঠনের সোঁ সোঁ শব্দে রাতকে আরো বেশি গভীর মনে হয়।

টেবিলের ওপর বসানো ঝক্‌মকে লণ্ঠন। মিউনিসিপ্যাল মার্কেট থেকে পপি নিজে কিনে ছিল। নিশানাথ সঙ্গে ছিল।

এঘরের টুকিটাকি সব আসবাব, যেমন সুন্দর একটা আখরোট কাঠের টেবিল, হাল্কা দুখানা চেয়ার, দুটো ফোল্ডিং খাট, ছোট্ট ড্রেসিং টেবিল যাবতীয় পপির নিজের হাতে কেনা। কেবল তাই?

পাহাড় থেকে নেমে ওরা কোলকাতা হয়ে এখানে এলো। আর আসবার প্রস্তুতি-স্বরূপ, এই শহরে বাসা বাঁধবার সরঞ্জাম হিসেবে হেন বস্তু নেই ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে সারা কোলকাতা ঘুরে পপি না কিনেছে। অফুরন্ত উৎসাহ এখানে ও[illegible]বার।

এলো।

শেষ পর্যন্ত খাওয়া-দাওয়া[illegible] হ'ল। এক সঙ্গে ব'[illegible] রাত একটা অবধি।

এই নিয়ে [illegible]।

পাখি শীকার ক'রে [illegible] নিশানাথের যত না, পপির উৎসাহ শতগুণ বেশি।

অবিশ্যি পাকে-প্রকারে শেষ পর্যন্ত সমস্ত দোষটাই নিরঞ্জনের ঘাড়ে এসে পড়ে, আর সেজন্যে তাকে শাস্তিও ভোগ করতে হয় খুব।

মানে শীকারের মাংসের বেশির ভাগটাই উদরসাৎ করতে হয় নিরঞ্জনকে চুপ থেকে।

আর ওরা টেবিলে ব'সে শুধু গল্প করে।

'লোভী তুমি।' কথা বলতে বলতে হঠাৎ যখন পপি থেমে যায়, তখন ওর সুগোল, সুশ্রী বিশাল চোখ থেকে এই ঠাট্টাই ঝরে পড়ে এই হাসি। নিরঞ্জনের পাতের ওপর, পপির নিজের হাতে কেনা পোরসেলিন ডিশের ওপর, মাংসের রসে অভিষিক্ত পাঁচটি রোমশ, পুরু, মোটা আঙ্গুলের ওপর। আঙ্গুলের ডায়মণ্ড-বসানো আঙ্গটিটি পর্যন্ত ঝোলে রসে স্নান ক'রে উঠেছে। পপি এক মুহূর্তের জন্যে তাকিয়ে দেখে।

হ্যাঁ খুব বেশি লোভ বলেই তো নিরঞ্জন চর্বণ ও চোষণের কাজ বন্ধ রেখে একটিবারও কথা বলতে পারে না। মুখ তুলতে।

এর জন্যে দায়ী, সে নিজে পপি নয়।

দুই চোখে একটিবার ভোজনরত স্বামীকে দেখে পপি পুনরায় গল্পে মেতে ওঠে।

আহারান্তে দীর্ঘ ইজিচেয়ারে শরীর ঢেলে নিরঞ্জন সিগারেট ধরায়।

অধিক ভোজনের পর অবসাদ তো আসবেই।

সিগারেট টানতে টানতে নিরঞ্জন চুপ ক'রে ভাবে। আর ভুক্ত বস্তুর চাপে ক্ষণে ক্ষণে চোখ বোজে।

অদূরে টেবিলে সোঁ সোঁ শব্দে হেজাগ জ্বলছে।

খাওয়ার শেষে দুজন উঠে যায়, বাইরে, বারান্দায়।

গ্রীষ্মের রাতে নদীর জলো-হাওয়া কত স্বাস্থ্যপ্রদ আরামদায়ক। পপিকে বোঝাচ্ছিল নিশানাথ।

'জলো-হাওয়া মানুষকে মোটা ক'রে দেয়।' পপির গলা।

'আপন[illegible] বেলায় সে-নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটছে'। নিশানাথ।

'বা-রে[illegible] এক মাস তো এলাম মোটে।' উচ্চকিত উচ্ছ্বসিত পপি। 'দেখুন না আমি মোট[illegible] না।'

ক্যানভাসের পিঠে চুপচাপ মাথাটা এলিয়ে দিয়ে নিরঞ্জন সিগারেটে টান দিল।

'আমার তো মনে হয় মোটা হওয়া না হওয়াটা মনের [illegible] নির্ভর করে বেশি।' পপি।

'কি রকম?' মৃদু গম্ভীর হাসি শোনা গেল যুবকের। 'আমি তো জানি খাদ্য ও জল-বায়ুটার প্রাধান্যই বেশি ঘটে শরীরের ওপর।'

'সে কতক্ষণের ক'জনের জন্যে?'

চাপা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ ভেসে এল ঘরের ভিতর।

'কেন?'

'পৃথিবীতে এমন ক'জন আছে, এতটা সুখী, যে, মোটা হ'ব ইচ্ছা করেছে ব'লেই এক আবহাওয়া থেকে আর এক জায়গার হাওয়ায় এসে সেখানকার ভাল ভাল জিনিসগুলি খাওয়ামাত্র মোটা হয়ে গেছে? এ-দিনে এমন সুখী ক'জন?'

নিশানাথ চুপ ক'রে রইল।

'এক যার সব আছে সে অথবা সন্ন্যাসী।' পপি বলল। 'আমরা মনের চাপেই যে সব মানুষ মরে যাচ্ছি, মরে গেলাম।'

একটুক্ষণ দুজন চুপ।

আবার পপির গলাঃ 'আমরা অতিরিক্ত সভ্য হ'তে হ'তে অতিরিক্তরকম দাস বনে গেছি মনের কাছে। আর মনের ধর্ম জীবনে অশান্তি ডেকে আনা সে তো জানেনই, অসন্তোষ।'

'কি রকম? নিশানাথ হাসে।

'অই রকম।' পরিচ্ছন্ন পপির গলাঃ 'একটা পাবেন তো আর একটা পাবেন না, সব পাবেন একটির অভাব থেকে যাবে। চিত্তের এক জায়গায় না আর এক জায়গা ছিদ্র ক'রে বেড়াবে। আপনাকে কোনো অবস্থাতেই 'শান্তি পেয়েছি' বলতে দেবে না।'

'সত্যি, মানসিক অশান্তি বড়ো খারাপ।' যুবক মন্তব্য করল।

'থাক্ ওসব মনটন নিয়ে আলোচনা ক'রে লাভ নেই, তাতে মন আরো বেশি খারাপ হয়। বলুন তো কাল বৃষ্টি হবে কিনা।' যেন পপি বারান্দার ওধারে গিয়ে হঠাৎ আকাশ দেখে।

আলনার পাশে নতুন কেনা ঝক্‌ঝকে কাবার্ডের ওপর চোখ রেখে নিরঞ্জন লম্বা টান দিল সিগারেটে।

দুজন সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামছে। টের পেল নিরঞ্জন। নিরঞ্জন উঠে কাবার্ড থেকে বার ক'রে নিয়ে এল, হ্যাঁ ইমামবক্স বর্ণিত বোতল ডিকেণ্টার।

হ্যাঁ, এ-ব্যাপারেও নিশানাথ নিরঞ্জনের সাহায্যকারী, বন্ধু। বস্তুত, যে সব বিষয়ে সকল দিক থেকে সাহায্য করে সেই-তো বন্ধু। প্রকৃত বন্ধু। একজন কর্মচারীও তোমার জীবনে বন্ধু হ'তে পারে, আশ্চর্য কি।

নিশ্চয়, নিরঞ্জন নিশানাথের কাছে কৃতজ্ঞ। নিশানাথ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সতেরোটা স্কচ হুইস্কি আর চব্বিশ বোতল ল্যাগার বীয়র জোগাড় করেছিল কি ক'রে নিরঞ্জন ভেবে পায় না।

তুখোড় ছেলে।

Smart বললে বিশেষণ সম্পূর্ণ হয় না। অনেক ক্ষেত্রে দুঃসাহসীও। আর বেশ ধূর্ত।

বুদ্ধিমান তো বটেই। কর্মঠ।

তার ওপর বিশেষ গুণ, গায়ে যথেষ্ট শক্তি রাখে। বয়সে নবীন।

অতীতের কোনো হিরো, মধ্যযুগের এক নাইট এসেছে নিরঞ্জনের ঘরে, তার সংসারে। ঠোঁট থেকে ডিকেণ্টার আলগা ক'রে টেবিলে নামিয়ে রাখতে রাখতে ভাবল নিরঞ্জন।

ওরা আবার সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠেছে। নিরঞ্জন চুপচাপ ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়ল।

'আমি ভাবতেই পারি না লাশকাটা ঘরে এত ভয় কেন আপনার।' যুবকের হাসির শব্দ। 'কি ভয় ওখানটায়?'

'বা-রে! ঐ ঘরে লাশ কাটা হয় ভাবলে কার না ভয় করে, বেশ বোঝাচ্ছেন যা হোক।' অনুযোগের সুর পাপির।

'বেশ তো, এখন তো আর কাটা চেরা হচ্ছে না কারোর লাশ, এখন ঐ ঘর ঘরই।' গম্ভীর গলায় নিশানাথ বলল। আমায় বলুন, ও-ঘরে একলা শুয়ে রাত কাটিয়ে আসি।'

'যতদিন রক্ত গরম থাকে ততদিন মানুষ ভয় কম করে। আপনার রক্ত গরম কিনা তাই এই দুঃসাহস।'

'কি রকম?' যুবক আবার হাসল।

'অই রকম।' চাপা গভীর দীর্ঘশ্বাস পাপির। কিছুক্ষণ দুজনই চুপ।

ক্যানভাসের ওপর নিরঞ্জন মাথাটা নামিয়ে আনল।

'আপনার কথায় মনে হয় যেন আপনি কত বুড়ো হয়ে গেছেন।' নিশানাথ বলছে একটু পরে।

'বললাম তো, মন। অশান্তি। মানুষকে অসহায়, কাপুরুষ ক'রে দেয়, ভীরু দুর্বল। নিজের তারুণ্যে আস্থা হারাতে পারে মনের এ-অবস্থা হওয়াও বিচিত্র নয়। হ্যাঁ, এক এক সময়, সত্যি বলতে কি, আমার মনে হয় আমি বুড়িয়ে গেছি।'

'আশ্চর্য আপনার একখানা মন।' যেন প্রসঙ্গ হাল্কা করবার জন্যে নিশানাথ সুন্দর ক'রে হাসল। 'চলুন ঘরে, রাত হয়েছে, মিঃ রায় বুঝি ঘুমিয়ে পড়লেন।'

'সংসারে নিশ্চিন্ত যারা তাদের চট্ ক'রে ঘুম আসে।' কথার শেষে, বেশ শব্দ ক'রে পাপি এবার হাসল।

নিশানাথকে তার উত্তরে কিছু বলতে শুনল না নিরঞ্জন।

কাল খুব ভোরে নিশানাথকে বেরোতে হচ্ছে ব্যাঙ্কের কাজে। যেতে হবে দূরের একটা গাঁয়ে।

বেশ বড় রকমের মক্কেলের খোঁজ পাওয়া গেছে। কে এক মহিম নন্দী অনেক টাকা এনে জড়ো করছে নিরঞ্জন রায়ের ব্যাঙ্কে এবং স্থির হয়েছে, এত দূরের রাস্তা, রায়ের গাড়ি নিয়ে বেরোবে নিশানাথ। নিরঞ্জন নিজে এ প্রস্তাব দিয়েছে।

কিন্তু তা-ই তো যথেষ্ট নয়।

সম্পর্কে মনিব যতটা চিন্তা করেন মনিব-পত্নীর দৃষ্টি তার চেয়েও বেশি যায়। চিরদিনই গেছে।

পাপি প্রস্তাব দিয়েছে রাতটা নিশানাথ বাংলোয় থেকে যাবে। এত রাত্রে ঘরে ফেরা আবার রাত থাকতে এখানে ছুটে আসা সে অনেক হাঙ্গামা। 'নিশ্চয়।' নিরঞ্জন খুশি হয়ে প্রস্তাব সমর্থন করেছে।

না, নিরঞ্জন খুশি। রাত একটার পরও পাপির চোখে ঘুমের জড়িমা নেই, বা এত রাত অবধি বাগানে বারান্দায় ঘোরাঘুরি ক'রে ঠান্ডায় গলা ব'সে যাওয়ার লক্ষণ। বরং যত রাত হচ্ছে নিটোল, স্বচ্ছ, আলোর রেখার মতন তীব্র ও পরিচ্ছন্ন শোনাচ্ছিল পাপির এক এক ঝলক হাসি, প্রত্যেকটি কথা।

যেন আজ আর নিরঞ্জন মনে করতে পারছে না, বিয়ের পর থেকে সন্ধ্যাবাতির সঙ্গে সঙ্গে কতকাল পাপির গলায় সেই সবুজ মাফলারটা জড়ানো ছিল।

একটু পর পাপি এসে এ ঘরে ঢুকল ড্রয়িংরুমের চাবি নিতে।

নিরঞ্জন ঘুমিয়ে আছে কি ঘুমের ভাণ ক'রে আছে। পাপি ডাকল না। পাপিও যদি এভাবে ঘুমিয়ে পড়ত কি ঘুমের ভাণ ক'রে শুয়ে থাকত নিরঞ্জন ডাকত কি?

এই হচ্ছে আজকাল।

এটা আরম্ভ হয়েছে শিলং-এ থাকতে। একজন যদি চুপ ক'রে থাকে আর একজন কথা বলে না।

চাবি নিয়ে পাপি নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

* * * * * *

'এরকম বেণী কবে থেকে শুরু করলেন?'

'কেন, এই বেণী আর কোনোদিন চোখে পড়েনি আপনার?' পাপি বেণীর ওপর বাঁ-হাতের পিঠ রাখল, [illegible]রপর প্রশ্নকর্তার দিকে নয়, তাকাল নেপালী [illegible]াকরটার দিকে।

চাকর নিশানাথের শয্যা তৈরী করছিল গৃহিণীর নির্দেশমত। ক্যাম্প-খাটের ওপর সুজনি ধব্‌ধবে ধোয়া শাদা [illegible]দর, মনোরম ঢাকনি দেয়া বালিশ।

'বাহাদুর টুম্‌কো কাম হো[illegible]য়া?'

'হুঁ মাঈজী!'

ইঁদুরের মত ছোট ছোট চে[illegible]খ। [illegible]কে-লেশহীন ডিমের মত পালিশ মু[illegible] [illegible] রাত্তি একটা ছেলে পাহাড় থেকে ধরে [illegible] আসা।

'আভি টুম্ [illegible]স্পার যাও।' অল্প হেসে পাপি ঘাড় কাৎ করল 'আভি টোমারা ছুট্টি।'

[illegible]ুশি হয়ে ঘ[illegible] [illegible]ড় বাচ্চা বাহাদুর মাঈজী ও মেন্‌জারবাবুকে কু[illegible]শ ক'রে তিড়িং ক'রে লাফিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এই চাকরটাকেও গৃহস্থের আর অত্যাবশ্যক জিনিসের মত নিশানাথ রায় পরিবারকে জুটিয়ে [illegible]

বস্তুত শিলং-এ শেষের দিকে মিঃ রায় যেন কেমন হয়ে গেছলেন।

সামান্য একটা কাজ, চাকরবাকর জোগাড় করা তো দূরের কথা, একটা খাম টাইপ করতেও রায় নিশানাথকে ডাকতো। অথচ এই নিরঞ্জন রায়কেই নিশানাথ দেখেছে, ক'দিনের কথা আর, ক'দ্দিন সে এ-পরিবারের সংশ্লিষ্ট, অসুরের মত রাত দিন খাটতে। মফঃস্বলে বেরিয়েও জরুরী সব চিঠি ড্রাফ্‌ট রাত দেড়টা দুটো পর্যন্ত নিজের হাতে টাইপ্ করতে।

দেখতে দেখতে সেই অসুর লোহার মত শক্ত, কঠিন কর্মবীর পুরুষ হঠাৎ এই একটা বছরেই এমন এলোমেলো ঢিলেঢালা ছন্নখান হ'য়ে পড়ল কি ক'রে নিশানাথ ভাবছে।

এবং সর্বকাজে তার ডাক। ঘরে বাইরে। দিবা রাত্র। নিশানাথ ওটা বাকি রইল ক'রে দিও, ওটা করেছো তো।

হেসে নিশানাথ মাথা নাড়ছে।

কেননা, সে জানে মনিবকে যত বেশি তুষ্ট রাখা যায় এদিনে তত বেশি উন্নতি।

এবং প্রভুর কাজের চেয়েও প্রভুপত্নীর আব্দার বেশি।

নিশীথবাবু এটা করবেন ওটা করবেন।

হেসে নিশানাথ মাথা নাড়ছে।

এবং এখনও, ঘর থেকে চাকর বেরিয়ে যেতে, ঈষৎ হেসে প্রভুপত্নীর মুখের দিকে তাকিয়ে নিশীথই আগে প্রশ্ন করল। 'হ্যাঁ, কি যেন বলছিলেন বেণীর কথা?'

'বলছিলাম এরকম বেণী করতে আমায় আর দেখেন নি?'

'একটু চুপ থেকে দেয়ালের দিকে চোখ রেখে নিশীথ বলল, 'ঠিক মনে পড়ছে না।'

'কি ক'রে আ[illegible] পড়বে মনে, রাতদিন তো হিজ মাস্টারের [illegible]ছন পিছন আছেন।'

'এই অভি[illegible]যোগ আপনার মিথ্যা মিসেস রায়।' নিশ[illegible]াথ বলল, 'আপনার সঙ্গে আমাকে ক[illegible]ক্ষণ কাটাতে হয় না[illegible]খানে অবসর সময়টা, ব[illegible] সেরেও স[illegible] এ-বাড়িতে থাকি।

'ত[illegible] বুঝুন কাজ করতে শুধু [illegible]বাড়ি আসেন কি থাকেন, কেবলই কাজ কথাটা যে রোজ বলছি মিথ্যা কি।'

'খানিকটা সত্য।' হাসতে গিয়ে নিশী কিছুক্ষণ পাপির চোখে চোখ রাখল।

'এধরণের বেণীতে আপনাকে সত্যি ভা[illegible] অদ্ভুত দেখাচ্ছে।'

'কেমন অদ্ভুত, কি আবার অদ্ভুত হল পাপি হাল্‌কা হেসে উঠল। 'মেয়েদের বেণী দিকে তাকাবার সময় হয় কি আপনার?'

'ইচ্ছা করে সময় সময় তাকাবার, কাজে চাপে—'

'কাজ আর কাজ, টাকা আর কড়ি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পাপি দেওয়ালের ওপ

...জের চরকায় তেল দিতে দিতে শেষটায় কি ...ভ হয় জানেন?'

'কি হয় শুনি?' হাসতে গিয়ে গলার দু শব্দ করল নিশানাথ।

'কি আর হবে, চোখের ওপর তো দেখতে ...চ্ছেন।' দেওয়াল থেকে চোখ না সরিয়ে যেন ...জের মনে বলল পপি, 'সেই চোখ সেই ...খার দৃষ্টি আপনা থেকে মরে যায়, তারপর ...ষ্টা করেও চুলের বেণী চোখের কাজলের ...ধ্যে দৃষ্টি রেখে অন্তত কিছুক্ষণের জন্যেও ...রুষটি আত্মসমাহিত হতে পারে না। রূপ-...র্চা করবার আগে সে মনে মনে স্বাস্থ্যচর্চা ...রে, নয়তো রূপের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান ...য়ে তাড়াতাড়ি ক্যাটালগ খুলে বসে। ...মেয়েদের কম্প্লেকশনের জন্যে, চুলের জন্যে ...আর কোনো ভাল স্নো পাউডার ক্রিম শ্যাম্পু ...বেরোলো কিনা বাজারে, বা শরীরে রক্তের ...লালিমা ফুটিয়ে তুলতে আরো আধুনিক বা ...অভিনব কোনো ওষুধ—কথাটা মিথ্যে ...বলছি?' তেরছা চোখে পপি নিশানাথকে দেখল, 'কথা বলছেন না যে?'

'মানে অর্কিডের দিকে তাকাতে গিয়ে গাছের প্রয়োজনীয় সারের কথা চিন্তা করা।' সোনার তার পেঁচানো দাঁতের ঝিলিক তুলে নিশানাথ ঠিক হাসল না, হাসির একটু আভাষ এনে বলল, 'গাছের গুঁড়িতে কতটা জল-মাটির দরকার ফুল দেখতে দেখতে তাই শুধু চিন্তা করা, কেমন?'

একটুক্ষণ কথা বলল না পপি।

'টায়ার্ড, সত্যি আমি টায়ার্ড।' কেমন অস্থির হয়ে দাঁত দিয়ে ঠোঁটের একটা কোণা চেপে ধরে পপি ভুরু কুঁচকোলো। তারপরই অবশ্য দেখতে দেখতে সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে যায়। ভুরু টান করে হেসে পপি একটু শিস দিতে দিতে ডান হাঁটুটা ঈষৎ আন্দোলিত করে বলল, 'বলতে কি ও আমার স্বাস্থ্য ও শরীর নিয়ে যত কম আলোচনা করে যত কম তাকায় আমার দিকে—আমি যেন তত বেশি ভাল বোধ করি আজকাল।'

নিশীথ কতক্ষণ চুপ থেকে পরে হাত-ঘড়ি দেখল। 'দুটো বাজে, আপনি শুতে যান মিসেস রায়, বিছানা করা হয়ে গেছে, জল রাখা হয়েছে টেবিলে। টর্চটাও শয্যার পাশে সুন্দর করে শুইয়ে রেখে গেছে আমার দিল্-বাহাদুর। আর কিছু দরকার পড়বে না?'

'কিছুরই না?' অপাঙ্গে যুবকের চোখে চোখে তাকাল পপি। হাঁটুর ঈষৎ আন্দোলন তখনও থেমে যায়নি মনিব-পত্নীর।

'আপাতত দেখছি না।' নিশীথ কি ভেবে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে হাসল, আর দাঁতে দাঁত চাপল।

'ভাল।' দীর্ঘশ্বাসের ঢেউ তুলে ক্ষুদ্রকায়া মনিবপত্নী চৌকাঠ পার হয়ে টুপ করে অন্ধকার বারান্দায় নেমে যায়।

নিশানাথ চৌকাঠ পর্যন্ত পা বাড়িয়েও পরে পা সরিয়ে নিলে। ঘরে গিয়ে বিছানার পাশে দাঁড়াল। তারপর জানালার পাশে গিয়ে চুপ করে বাইরের দিকে চেয়ে রইল। বিরাট ইমারৎ তৈরী হচ্ছে নিরঞ্জন রায়ের। কংক্রীটের গাঁথুনি আর স্টীল ফ্রেমে কণ্টকিত আকাশের ওপারে তামাটে রঙের পুরানো এক ফালি চাঁদ ঝুলছে। হঠাৎ কি একটা ঠাট্টার সুড়সুড়ির মত সমস্ত মগজে ও মনে একটা সুড়সুড়ি অনুভব করে নিশানাথ অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে হাসল।

পুরানো চাঁদ, পুরানো আকাশ। এই শহরে নিশানাথ বড় হয়েছে।

পাঁচ বছর পর হঠাৎ ফিরে এসে কেমন নতুন ঠেকেছে এখানকার সব কিছু চোখে। এই শহরের বাড়ি-ঘর, রাস্তা মানুষ সব, সবাই।

ভয়ংকর প্র্যাকটিক্যাল লোক মোহিনী নন্দী। তিনবার ফেল করার পর চতুর্থবার মোক্তারি পরীক্ষা দিয়ে তিনি পাশ করেন। কিন্তু প্র্যাকটিস জমাতে তাঁর তিন বছর লাগেনি। পঞ্চাশোর্ধে এসেছেন।

এখনো নিটোল গোলগাল ক্লিনশেভ্ড সমর্থ চেহারা। দেখলেই বোঝা যায় ভদ্রলোক চতুর, রুচিবান ও বিলাসী।

মোক্তার হয়েও তিনি পুরোনো অঞ্চল মানে বকুলবাগানের সব কটি বাসিন্দার চেয়ে স্বচ্ছল তো বটেই, সপ্রতিভ, চতুর এবং ফন্দিবাজ।

শহরে নতুন অফিসার কেউ এলে হ্যাঁ, তিনিই সকলের আগে ছুটে যান বাড়িতে দেখা করতে, বন্ধুত্ব জমাতে। সব সময় উঁচুর দিকে দৃষ্টি।

বড় হওয়ার এই স্পৃহাই মোহিনীকে বড় করে দিয়েছে, সমসাময়িক বন্ধুরা মন্তব্য করেন কোনো কোনো সময়।

বস্তুত মাত্র কএক বছরেই মোহিনী নন্দীর অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে।

অবশ্য কেউ কেউ কানাকানি করে, বাইরে যতটা দেখা যায় ভিতরে ততটা নয়। ঠাটটাই বেশি, সে তুলনায় পয়সা জমেনি।

না জমু, মোহিনীবাবুর বাড়ির মত এমন সাজানোগোছানো ঝকঝকে বাড়ি এ অঞ্চলে আর কার আছে। এমন সুন্দর বাগান, বাড়ির সামনে অত বড় লন্।

যখন তিনি বাড়ি থেকে বেরোন দেখা যায় বেশ দোরদুরস্ত তাঁর জামাকাপড়।

হ্যাঁ, ফ্যাশানের ব্লাউজ গায়ে দিতে ও শাড়ি পরতে সকলের আগে ওঁর বাড়ির মেয়েদেরই দেখা যায়। সবচেয়ে বেশি ফিট্‌ফাট থাকে মোহিনীবাবুর মেয়েরা।

চেয়ারম্যান বিপত্নীক। চারিটি মেয়ে। লিলি মিলি ইরা মীরা। প্রায় কাঁধ মেলানো বয়েস বোনেদের। সবাই ফর্সা।

লিলির বিয়ে হয়নি কাজেই বাকি তিনটিও অনূঢ়া।

দেবু ওরফে দেবব্রত মোহিনীবাবুর এক ছেলে এবং সেটি জ্যেষ্ঠ সন্তান। বি এ পরীক্ষা দিলে এবার। পরীক্ষার ফল বেরোতে এখনো পুরো দু'মাস বাকি। প্রচুর অবসর। অনন্য-চিত্ত হয়ে দেবু এখন সাহিত্য করছে সাহিত্য পড়ছে।

সম্প্রতি কলেজ ম্যাগাজিনে ওর একটি মৌলিক ছোট গল্প বেরিয়েছে। সবাই প্রশংসা করেছে লেখার। বোনদের তুলনায় ও স্বল্প-ভাষী ও লাজুক। আর বেজায় ঘরকুনো।

রোববারের সকাল। দশটা বাজে। ইরা ও মীরা এই মাত্র গানের ক্লাস শেষ করে ঘরে ফিরেছে। এই শহরে একটি সংগীত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় মেয়েদের গান শেখার বিশেষ সুবিধা হয়েছে। বাড়ি ফেরার পরও নতুন শেখা গানের একটা দুটো কলি থেকে থেকে ইরা মীরার গলায় বিচিত্র গমকে বিবিধ ঢংয়ে খেলে বেড়াচ্ছিল। পাশের ঘরে বসে দেবব্রত একটু আগে টুর্গেনিভ পড়ছিল। হঠাৎ বোনেদের গলা শুনে বই পড়া বন্ধ করে এখন খোলা জানালার ওপারে লিচু গাছটার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। চেয়ারম্যান বৈঠকখানায় বসে স্থানীয় দুচারজন ভদ্রলোকের সঙ্গে সারা সকাল লোক্যাল পলিটিক্স আলোচনা করেছেন। এইমাত্র ভদ্রলোকেরা উঠে বেরিয়ে গেলেন। মোহিনীবাবু ভিতরে যাবার জন্যে উঠি উঠি করছেন। বাড়ির ভিতরে দ্বিতীয় মেয়ে মিলি চা তৈরী করে রাখছে বাবার জন্যে। মোহিনীবাবু এসময়ে আর একবার চা খান। বস্তুত ঘরের কাজকর্ম বেশির ভাগ মিলিকেই দেখাশোনা করতে হয়। ইরা মীরা পড়াশোনা ও গানবাজনার চর্চা করে, সংসারের কাজে হাত ঠেকাবার বড় একটা সময় পায় না। বড় মেয়ে লিলি সংসারের কাজকর্ম দেখা দূরে থাক, ভাত খেতেও ওর সময় নেই। সারাদিনই থাকতে হচ্ছে বাইরে। ঘোরাঘুরি করছে সমিতির কাজে। চাঁদা তোলা, সমিতি অর্গানাইজ করা, আসছে জেনারেল মিটিংএর প্রেসিডেন্ট নির্বাচন, একজিকিউটিভ কমিটির মিটিং ইত্যাদি নানা ব্যাপার। ছুটোছুটি করতে হচ্ছে ওকে হরদম।

এর জন্যে মোহিনীবাবু ভিতরে ভিতরে বেশ গর্বিত। ইরা মীরাও দিদিকে এর জন্যে শ্রদ্ধা করে, দিদির ব্যক্তিত্ব, আশ্চর্য সংগঠনী-শক্তি ও পরিশ্রম করার ক্ষমতার কথা চিন্তা করে তারা এক এক সময় মুগ্ধ হয়।

লিলি সম্পর্কে মিলির মনোভাবের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না, কেননা, ভাই দেবুর মত সেও স্বভাব-গম্ভীরা। চাপা। দিদির কাজের নিন্দা বা প্রশংসা কোনোটাই ওর চোখে-মুখে লেখা থাকে না।

আর সব দিক থেকে নির্বিকার দেবব্রত। কলেজ এবং কলেজ সমাপনান্তে সাহিত্য ছাড়া

ওর চেহারায় আর কিছু থাকতে পারে পরম শত্রুও ওকে এ অভিযোগ দেবে না।

মোহিনীবাবু উঠি উঠি করেও চেয়ারে বসে রইলেন। লিলি বাড়িতে ঢুকছে।

মেয়ের সঙ্গে কথা বলবার জন্যে তিনি এখনো এখানে বসে আছেন। মেয়েকে মোহিনীবাবু একটু নিভৃতে চান।

লিলি আজ বেশি রকম শ্রান্ত।

রৌদ্রে ঘুরে ঘুরে গাল টুকটুকে লাল হয়েছে। খোঁপার সামনের দুটো চুল এলোমেলো দেখাচ্ছে। মেয়ের দিকে চোখ পড়তে মোহিনীবাবু চোখ ফেরাতে পারলেন না।

চার মেয়ের মধ্যে লিলিই তাঁর চোখে সুন্দর। রূপের দিক থেকে লিলিকেই তিনি সকলের ওপরে স্থান দেন।

বস্তুত লিলি জীবনে একটা ঘোরতর অপরাধ করেছিল, মোহিনীবাবু ভুলতেন না যদি না ওর চোখ জোড়া মোহিনীবাবুকে এত বিমুগ্ধ করত। মোহিনীবাবুর সমস্ত শরীর জুড়িয়ে যায় মেয়ের চোখের দিকে তাকালে। তাই তিনি সেই পাপকে পাপ বলে আর মনে স্থান দেন না এখন। একটা ভুল হয়েছিল শুধু।

মানুষ ভুল করে।

ফুলের বুকে কীট বাসা বাঁধে। কীটকেই তুমি ধ্বংস করতে পার। ফুল নয়। চিন্তা করেন মোহিনীবাবু কথাটা।

অত্যন্ত বিচলিত হতে গিয়েও পরে তিনি সামলে উঠেছিলেন।

অবশ্য এ ব্যাপারে লিলিও যথেষ্ট শক্ত মনের পরিচয় দিয়েছিল।

সন্ধ্যাবেলা অটলবাবুর বৈঠকখানা থেকে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে এসে লিলির কথা শুনে মোহিনীবাবু ভারি চমকে উঠেছিলেন।

ও-পক্ষে ছেলে যেমন বাপকে বোঝাচ্ছিল এখানেও লিলি বাবাকে বোঝাল।

মোহিনীবাবু আর শব্দ করলেন না।

মিহিজামে মাসিমা আছেন। দিনকতক ওখানে থেকে এলেই হবে। তুমি চিঠি লিখে দাও।' বেশ জোর দিয়া কথাটা লিলি উত্থাপন করেছিল।

মোহিনীবাবু বিস্মিত হয়েছিলেন। মেয়ের মনের পরিচয় মোহিনীবাবু এর আগে পাননি। হ্যাঁ এটাই তো সবচেয়ে ভাল প্রস্তাব।

তিনি ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন মিসেস দত্ত মানে আপন শালী বিজনপ্রভাকে।

যুদ্ধফেরৎ ডাক্তার রণদা দত্ত। বাড়ির ধরণধারণ চালচলতি আলাদা। প্রথমে স্বাস্থ্য তারপরে সব।

মাসীমা কানে কানে বলে দিয়েছিলেন খুকীকে (লিলির স্বর্গতা মার মত বিজনপ্রভাও লিলিকে খুকী বলে ডাকেন, এখনও।) যত বেশি বাইরে বাইরে ঘোরাফেরা করবি আর রোদ হওয়া লাগাবি শরীরের চামড়া তত বেশি সুন্দর হবে। (ক্রমশ)

## বদ্ধ ঘরে

### ধীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

চুপচাপ আছি বদ্ধঘরে।
এখানে আলোর সাড়া জাগে না মর্মরে।
দেয়ালের ইটে আঁকা মৃত্যু-পাণ্ডুরতা
ঘিরে থাকে শব্দহীন অরণ্য স্তব্ধতা।
সঙ্কীর্ণ আকাশ
ঘুলঘুলি-পথে শুধু আনাগোনা করে—
লেখে না রক্তিম ইতিহাস।

অগাধ জীবন আছে
বদ্ধঘর পরিধির শেষে,
নতুন হলুদে-চাঁদ আবেগে-আশ্লেষে
যে-পৃথিবীর মাটিকে জড়ায়,
উষ্ণতা ছড়িয়ে রাখে দক্ষিণ হাওয়ায়,—
সেইখানে মুক্তখোলা মাঠে
শূন্যে মন শুধু যেতে চায়।
হয়ত সেখানে ফুল মেলে আছে সৌরভ হৃদয়,
একেকটি ঊর্ণ খুলে উজ্জীবিত বৃন্তের বিস্ময়
অরণ্যে ও মাঠে।
কিছুই আভাস তার জানবার নয়—
এখানে মুহূর্তগুলি ম্রিয়মান কাটে।
স্বেদবিন্দু জমে থাকে শরীরে ললাটে।
কুজ্ঝটিকাময়
বদ্ধঘরখানি এই—তার পরিচয়।

দিন যায় শূন্য বদ্ধঘরে।
শিস দিয়ে যায় পাখি উন্মুক্ত প্রান্তরে।

## তোমাকে

### নৃপেন্দ্র সান্যাল

এখানে রৌদ্রঘন দিন, বাঁকা পথ, সম্মুখে একি ঝাউ মাঠ?
সুমনা এ গ্রামের নাম কিছু জানো? মনের কপাট
খুলে দাও। বল দুপুরের রৌদ্র সোনা ফুলে
কি বলতে চাও। তারপর যেও চলে,
যদি যেতে চাও।
আমার প্রাণের প্রান্তে একটু দাঁড়াও।

আমি জানি না ত', অসংখ্য মুহূর্ত হয়ে
যে জীবন মিশে যায় সমুদ্র সময়ে,—
তাকে তুমি এত ঘৃণা কর।
যে প্রাণে উদ্বেগ নেই ঢেউ থরো থ[illegible]
তাকে তুমি এত ঘৃণা কর?
(আহা বৃষ্টি, হাওয়া, ঝড়ে—
তোমাকে ত' কাছে পাই। তারপরে
তপ্ত বালুচরে সূর্য মুখরিত দিন সোনা[illegible] [illegible] কেটে যায়।
সেই ফুল আলো হয়ে ঝাউ মাঠে আমাকে থামায়।)

[illegible]নি, সুমনা আমি ঠিক জানি। এ প্রাণের তীর
তোমাকে ত' ছুঁয়ে যায়নি। মুহূর্ত ঢেউয়ে ভেঙে [illegible] চৌচির
এ প্রাণের তীর।
এ প্রাণের বালুচরে,—প্রান্তে পেঁৗছিলাম।
স[illegible] মুদ্র—ঢেউ এঁকে বেঁকে লিখে গেল নাম।
([illegible] এ সময়, শুধু কি সময়?
পৃথিবীর ক্ষয় সে ত আনে নিশ্চয়।)

তবুও সুমনা, হয়ো না কৃপণ তুমি আজ। এই প্রাণে
সূর্য সোনা ফুল বুনে দাও। ভরে দাও চৈত্রের দুপুরের গানে।

বিজ্ঞানের কথা

# উদ্ভিদের খাদ্য সংগ্রহ

ডক্টর অভীশ্বর সেন

বাতাসের ভিতর অঙ্গারক বাষ্প থাকে প্রতি দশ হাজারের মধ্যে মাত্র তিন ...রি ভাগ, তবু এই অঙ্গারক বাষ্পের সামান্য ...ঙ্গারটুকু লইয়াই উদ্ভিদ শরীর গঠিত হয়। ...ঙ্গারক বাষ্পকে গ্রহণ করিবার জন্য উদ্ভিদ-...ত্রের যে প্রবেশপথ থাকে তাহার সংখ্যা ...ক কোটি কুড়ি লক্ষ। একটি মানুষ একদিনে ...তখানি অঙ্গারকবাষ্প উদ্গীরণ করে

**ছোলার শিকড়**

(প্রায় এক সের) তাহার ব্যবহার করিবার জন্য প্রায় সাত শত বর্গফুট আয়তনের বৃক্ষপত্রের প্রয়োজন হয়।

সজীব উদ্ভিদের শত করা প্রায় কুড়ি ভাগ থাকে অঙ্গার বাকীটুকুর অধিকাংশই জল। কিন্তু শুধু অঙ্গার ও জল লইয়াই উদ্ভিদ-শরীর গঠিত নয়, উদ্ভিদ দেহে আরও বহু পদার্থ থাকে। কোন শুষ্ক উদ্ভিদকে পোড়াইলে যে ভস্ম পড়িয়া থাকে তাহার মধ্যে এই পদার্থ-গুলির সন্ধান পাওয়া যায়। যাহা পাওয়া যায় না তাহা হইল নাইট্রোজেন।

দেখা গিয়াছে যদিও এই সকল খনিজ পদার্থগুলির পরিমাণ অত্যন্ত কম তবু ইহাদের না হইলে উদ্ভিদদেহ সুগঠিত হয়না। একত্রে ইহাদের কতকগুলির অভাব হইলে উদ্ভিদের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিতে পারে। এই পদার্থগুলির মধ্যে যাহারা সমধিক উল্লেখযোগ্য তাহারা হইতেছে নাইট্রোজেন, ফস্ফরাস ও পটাসিয়ম।

নিম্ন শ্রেণীর উদ্ভিদেরা সমস্ত শরীর দিয়া জলে দ্রবীভূত এই সকল পদার্থ গ্রহণ করে। অপেক্ষাকৃত উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদের মধ্যে এই প্রকৃতি শুধু মূলের (শিকড়ের) মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সাধারণ উদ্ভিদ এই সকল খনিজ পদার্থ মাটি হইতে জলের সহিত গ্রহণ করে।

কতকগুলি সাধারণ খাদ্যশস্য মাটি হইতে যতখানি করিয়া নাইট্রোজেন ফস্ফরিক এসিড ও পটাশ গ্রহণ করে তাহার একটা সাধারণ হিসাব নীচে দেওয়া গেল :—

**বৎসরে একরপিছু আন্দাজ যত পাউন্ড করিয়া নিম্নলিখিত পদার্থগুলি মাটি হইতে উদ্ভিদ্ গ্রহণ করে**

| শস্য উদ্ভিদ | নাইট্রোজেন | ফস্ফরিক এসিড | পটাস |
|---|---|---|---|
| ধান | ৫০ | ২০ | ৭৫ |
| গম | ৬০ | ৩০ | ৫০ |
| যব | ৫০ | ২৫ | ৫০ |
| ভুট্টা | ৯৫ | ৪৫ | ১২০ |
| আখ | ৮৫ | ৬০ | ১৯০ |
| আলু | ৯০ | ৪০ | ১৯০ |
| রাঙা আলু | ৭০ | ২০ | ১০০ |
| বিট | ১১০ | ৪০ | ১৫৫ |
| তামাক | ৮০ | ২৫ | ৭৫ |
| বিলাতী বেগুন | ১০৫ | ৩০ | ১৪৫ |
| শশা | ৫০ | ৪০ | ৮০ |
| গাঁজর | ১৪০ | ৬০ | ২৮০ |
| পিঁয়াজ | ৮০ | ৩৫ | ১১০ |
| বাঁধাকপি | ১৭৫ | ৬৫ | ১৯০ |
| ফুলকপি | ২০০ | ৮০ | ১৫০ |
| শাক | ৭৫ | ৩৫ | ১০৫ |
| মটরশুটি | ১২০ | ৩০ | ৪০ |
| চিনে বাদাম | ৯০ | ২৫ | ৬০ |
| কার্পাস | ১৫০ | ১০০ | ১৬০ |
| আনারস | ১৫৫ | ৫০ | ৩২৫ |
| কলা | ২৫ | ২০ | ১৩৫ |
| কমলা লেবু | ৪০ | ২০ | ৪৫ |
| কাগজি লেবু | [illegible] | ১৫ | ৬০ |
| নারিকেল | ৯০ | ৪০ | ১০০ |
| কফি | ৫৫ | ১০ | ৭০ |
| কোকো | ২৫ | ১০ | ৫৫ |
| চা | ৩৫ | ৫ | ১৫ |

নাইট্রোজেন, ফস্ফরিক এসিড ও পটাসের মধ্যে মাটি হইতে নাইট্রোজেনেরই সকলকার অপেক্ষা অধিক অপচয় হয়। প্রতি বৎসর বৃষ্টি অথবা জলসেচের জলের সঙ্গে দ্রবীভূত সকল পদার্থই জলের সহিত মাটি হইতে চলিয়া যায়। এইরূপে নাইট্রোজেন ও পটাশই অধিক নষ্ট হয়, ফস্ফরিক এসিড তত নষ্ট হয় না। পটাশকে ধরিয়া রাখিবার ক্ষমতাও মাটির আছে। নাইট্রোজেন এত সহজে ধরা দেয় না। সুতরাং বৃষ্টির জলে পটাশের অপচয়, নাইট্রোজেনের মত অধিক নহে। মাটির ভিতর নাইট্রোজেন-ঘটিত পদার্থগুলির জলে সহজে দ্রবীভূত হওয়াই এই অপচয়ের প্রধান কারণ। তদ্ব্যতীত মাটির ভিতরকার বহু ক্ষার জাতীয় পদার্থের সহিত রাসায়নিক সংযোগ বিয়োগের ফলে নাইট্রোজেন এমোনিয়া অথবা মুক্ত নাইট্রোজেন বাষ্পের আকারে বাতাসে মিশিয়া যায়। দেখা গিয়াছে, এই হিসাবে মাটি হইতে বাৎসরিক নাইট্রোজেন ব্যয়ের পরিমাণ একর পিছু প্রায় একশত পাউন্ড করিয়া। যে মাটিতে শস্য বা উদ্ভিদ জন্মে না, সেখানে ইহার প্রায় সবটুকুই বৃষ্টির জলে ধুইয়া নষ্ট হইয়া যায়।

সুতরাং উদ্ভিদখাদ্য হিসাবে নাইট্রোজেন বহুমূল্য। জীবজগৎ উদ্ভিদদেহের নাইট্রোজেন লইয়া বাঁচিয়া আছে, মাটির নাইট্রোজেন না হইলে উদ্ভিদদের চলে না। পটাশ ও ফসফরাস সংগ্রহ করিবার জন্য উদ্ভিদদের বিশেষ কোন বাহ্যিক পরিবর্তন লক্ষিত হয় না, বোধ হয় তাহার প্রয়োজনও হয় না। কিন্তু নাইট্রোজেন সংগ্রহের জন্য উদ্ভিদের বহু পরিবর্তন মানুষের চোখে ধরা পড়িয়াছে।

কৃষিরসায়নের জন্মদাতা বিখ্যাত জার্মান বৈজ্ঞানিক লিবিগ বিশ্বাস করিতেন না বাতাস হইতে উদ্ভিদেরা যেমন অঙ্গারক বাষ্প গ্রহণ করে তেমনি নাইট্রোজেনও তাহারা নাইট্রোজেন বাতাস হইতে সংগ্রহ করে। তাঁহার পর বহু পরীক্ষার ফলাফল উদ্ভিদের বাতাস হইতে নাইট্রোজেন গ্রহণের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু বর্তমানে, ইহা যে সত্য হইতে পারে তাহারও প্রমাণের অভাব নাই। শ্যাওলা জাতীয় বহু উদ্ভিদ সূর্যালোকে বাতাস হইতে নাইট্রোজেন গ্রহণ করিতে পারে। যে জলে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বেশী থাকে, সেখানে শৈবালের বাতাস হইতে নাইট্রোজেন সংগ্রহের প্রয়োজন হয় না। যখন জলে নাইট্রোজেনের

পরিমাণ বেশী থাকে না, তাহারা তখন বাতাস হইতে নাইট্রোজেন গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে।

ধান বা গম জাতীয় উদ্ভিদ বেশী বৃদ্ধি পায় না; তাই তাহাদের নাইট্রোজেনের প্রয়োজন বেশী হয় না। বট অথবা অশ্বত্থের শিকড় মাটির ভিতর বহুদূর বিস্তৃতি লাভ করে, প্রয়োজনমত নাইট্রোজেন সংগ্রহে তাহাদের কোন

গমের শিকড়

কষ্ট হয় না। কিন্তু সয়াবীন বা শণ খুব তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পায়। তাহার জন্য অন্যান্য যৌগিক পদার্থ ও নাইট্রোজেনের প্রভূত পরিমাণে প্রয়োজন হয়। অথচ ইহাদের শিকড় এত বিস্তৃত নয় যে, মাটি হইতে খুঁটিয়া খুঁটিয়া প্রয়োজনমত নাইট্রোজেন সংগ্রহ করিতে পারে। তাই এই সকল উদ্ভিদ এক অদ্ভুত পন্থা অবলম্বন করে। এই সকল উদ্ভিদের শিকড়ের মধ্যে বহু গুটি জন্মায়। মাটির মধ্য হইতে তাহার মধ্যে আসে একপ্রকার জীবাণু। তাহাদের বাতাস হইতে নাইট্রোজেন গ্রহণের ক্ষমতা আছে। উদ্ভিদ এই নাইট্রোজেন নিজেদের প্রয়োজনমত ব্যবহার করে, নাইট্রোজেন খাদ্যের বিনিময়ে জীবাণুদের ইহারা দেয় অন্যান্য খাদ্য ও নিশ্চিত আশ্রয়। যে সমস্ত মাটিতে নাইট্রোজেন বেশী থাকে না সেখানেই এই সকল গুটি বহুলভাবে জন্মায়। যে স্থানের মাটিতে, নাইট্রোজেন বেশী থাকে, সেখানে এই সকল গুটি উদ্ভিদের মূলে জন্মে না। নাইট্রোজেনবাহী এই সকল উদ্ভিদ বাতাস হইতে নাইট্রোজেন সংগ্রহের জন্য পরিশ্রম করা অপেক্ষা মাটির ভিতরকার অনায়াসলব্ধ প্রচুর নাইট্রোজেনের ব্যবহার করা পছন্দ করে।

বাধ্য হইলে যে সকল উদ্ভিদ সাধারণতঃ নাইট্রোজেনবাহী নয়, তাহারাও নাইট্রোজেন বাতাস হইতে সংগ্রহ করিতে বাধ্য হয়। কেমন করিয়া তাহা ঘটে আজও জানা যায় নাই। বীজে যে পরিমাণ নাইট্রোজেন থাকে, তাহা অপেক্ষা বেশী পাওয়া যায়, নাইট্রোজেনহীন কোন জলে বা বালুতে সেই বীজ রোপণ করিয়া যে উদ্ভিদ জন্মে তাহাতে। কোথা হইতে এই নাইট্রোজেন আসে তাহার খবর আজও পাওয়া যায় নাই। বাতাস ভিন্ন এই নাইট্রোজেন আপাততঃ আসিতে পারে না। উদ্ভিদ নাইট্রোজেনহীন জল বা বালুতে বর্ধিত হইতে হইতে, বাতাস হইতে প্রাণপণে কোনপ্রকারে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে। এই সকল উদ্ভিদ অবশ্য দীর্ঘজীবী ও সুস্থ বা সবল হয় না। সুবিধাজনক পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে থাকিয়া অধিকাংশ উদ্ভিদের নাইট্রোজেন সংগ্রহকারী শক্তির উন্নতিলাভ হয় নাই। নাইট্রোজেনবাহী সিম বা সয়াবীন প্রতিকূল অবস্থায় বাধ্য হইয়া জীবাণু সাহায্যে নাইট্রোজেন সংগ্রহশক্তি লাভ করিয়াছে।

যখন এই সকল চেষ্টাতেও উদ্ভিদ নাইট্রোজেন সংগ্রহ করিতে পারে না, মাটির ভিতরকার নাইট্রোজেন খুব কম অথবা উদ্ভিদের গ্রহণযোগ্য অবস্থায় থাকে না, অথবা উদ্ভিদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা নাইট্রোজেন সংগ্রহকারী জীবাণুদের প্রতিকূল হইয়া উঠে তখন এই সকল উদ্ভিদের প্রকৃতি হিংস্র হইয়া উঠে। তাহারা তখন নানা কৌশলে ক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গ গ্রাস করিয়া নিজেদের নাইট্রোজেনের প্রয়োজন পরিপূরণ করে। দেখা গিয়াছে, স্বাভাবিক অবস্থায় এই সকল উদ্ভিদের শিকড় বেশী হয় না। নাইট্রোজেনঘটিত নানা যৌগিক পদার্থ দিয়া তাহাদের শিকড় বৃদ্ধি হইতে দেখা গিয়াছে। এই অবস্থায় কীট পতঙ্গ না ধরিলেও তাহাদের বৃদ্ধির কোন ক্ষতি হয় না। বহুদিন ধরিয়া নাইট্রোজেনঘটিত রাসায়নিক উদ্ভিজ খাদ্যে বর্ধিত করিলে ইহাদের কীটপতঙ্গ ধরিবার শক্তি হ্রাস পায়, তাহার প্রয়োজনও বড় একটা থাকে না।

পতঙ্গভুক উদ্ভিদ

প্রকৃতির প্রবৃত্তি একই—.াঁচিয়া থাকি জন্য প্রচণ্ড স্বাভাবিক উদ্যম, ব্যক্তিগত প্র পরস্পর সামাজিক সহযোগিতা, তাহারও অ হিংসা ও লুণ্ঠন;—মানব ও উদ্ভিদ জ সমভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে;—কোথাও ত বিভিন্নতা নাই।

# প্রত্নোদ্ভিদ্ ও বীরবল সাহনী

**অমরেন্দ্রকুমার সেন**

**জ**নগণে, বৃক্ষলতায়, নদনদীতে পরিপূর্ণ আমাদের এই পৃথিবী একদিনেই সৃষ্টি হয়নি, বাষ্পদেহে সূর্য থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর থেকে আজকের এই অবস্থায় উপনীত হতে পৃথিবীর লেগেছে বহু কোটি বৎসর। এই দীর্ঘ সময়ের ভিতর পৃথিবীতে কখন কি ঘটেছে, সৌভাগ্যক্রমে তার প্রমাণ থেকে গেছে। পৃথিবীতে প্রাণের সর্বপ্রথম চিহ্নের ছাপ আজও দেখা যায়। সে ছাপ হল অল্‌গা নামক শ্যাওলার, পাথরের চাপে পড়ে বন্দী হয়ে আছে অতীতের সাক্ষী-স্বরূপ।

**বীরবল সাহনী**
**পৃথিবীর প্রথম পেলিওবট্যানিক্যাল ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা**

নানা শক্তির প্রভাবে ও প্রাকৃতিক বহু পরিবর্তনের ফলে অনেক বস্তু পদার্থ পৃথিবীর ওপর স্তরে স্তরে জমা হয়েছে। এই স্তরের গভীরতা দেখে ভূ-তাত্ত্বিকেরা পৃথিবীর বয়সের একটা হিসাব করেছেন। এই-রূপে এক ফুট স্তর জমা হতে সময় লেগেছে নয় শত বৎসর, জানা গেছে যে, এই স্তরের গভীরতা মোটামুটি ৭০ মাইল। এক ফুট স্তর জমা হতে যদি সময় লেগে থাকে ৯০০ বৎসর তাহলে ৭০ ফিট স্তর জমা হতে সময় লেগেছে ৩৩ কোটি বৎসর। এই ৩৩ কোট বৎসরের আগেও আছে পাহাড় সমুদ্র ও পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠ গঠনের শতাধিক কোটি বৎসরের রহস্যময় ইতিহাস। মোটামুটি ধরে নেওয়া যায়, পৃথিবীর বয়স দুশো কোটি বছর।

পৃথিবীর সৃষ্টির আরম্ভ থেকে যদি একটা চলচ্চিত্র তৈরী করা যায়, যাতে দেখানো হয়েছে পৃথিবীর ধারাবাহিক ইতিহাস এবং সেই চলচ্চিত্র দেখাতে যদি সময় লাগে চব্বিশ ঘণ্টা তাহলে পৃথিবীতে কত দিন মানুষ সৃষ্টি হয়েছে, আর কতদিন প্রাগৈতিহাসিক জন্তুরা রাজত্ব করে গেছে, কিভাবে ধীরে ধীরে প্রাণের প্রকাশ হ'ল ইত্যাদির একটা তুলনা-মূলক সময়ের আন্দাজ পাওয়া যাবে। মনে করুন সেই চলচ্চিত্র দেখানো হচ্ছে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে প্রথম বারো ঘণ্টা যা দেখানো হবে তা আমাদের কাছে অজ্ঞাত। পরের আট ঘণ্টায় দেখতে পাবো কি করে প্রাণের প্রকাশ হ'ল এক অদৃশ্য জীবকোষকে কেন্দ্র করে আর কত না বৈচিত্রের মধ্য দিয়ে সে মৃত্যুকে পরা-ভব করে এগিয়ে চলল। কুড়ি ঘণ্টা মানে প্রায় পৌণে দুশো কোটি বছর এখানেই কেটে গেল। এর পর তিন ঘণ্টা পনেরো মিনিট দেখা যাবে অতিকায় দীর্ঘদেহী সব জীবজন্তু, তাদের দেহের তুলনায় মাথা ছিল ক্ষুদ্র, তাই তারা জীবন সংগ্রামে হেরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হল। আর বাকি থাকে ৪৫ মিনিট এর মধ্যে ৪৪ মিনিট ৫৫ সেকেণ্ড সময় দেখতে পাবো পৃথিবীতে স্তন্যপায়ী জীবের ক্রমবিকাশ, আর বাকি ৫ সেকেণ্ড মাত্র মানুষের ইতিহাস

অগ্নিজ, রূপান্তরিত ও স্তরীভূত পাথর দ্বারা পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠ গঠিত। স্তরীভূত পাহাড়ের গায়ে পাথরে অঙ্কিত প্রাণীর দেহা-বশিষ্ট থেকে জীব সৃষ্টির ইতিহাস পাওয়া যায়। খুব পুরাতন পাহাড়কে বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, "আ্যাজয়েক রক" অর্থাৎ অজৈবিক পাহাড়। এই সকল পাহাড়ের বয়স আশি কোটি বছরেরও বেশী এবং তাদের মধ্যে কোনো জীবাশ্ম বা ফসিল পাওয়া যায়নি। এদের চেয়ে যে সকল পাথরের বয়স কম তাদের বলা হয়, "লোয়ার পেলিওজয়েক" অর্থাৎ প্রথম জৈবিক পাহাড়। এই সকল পাহাড়ে জীব সৃষ্টির স্পষ্ট চিহ্ন পাওয়া যায়। আগে যে শ্যাওলার কথা বলা হয়েছে তার ফসিল পাওয়া যায় এই যুগের পাহাড়ে অথবা পাথরে। অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন এই শ্যাওলাই হ'ল পৃথিবীর প্রথম প্রাণ-স্পন্দন। এর পর পাওয়া যায় কিছু পোকা ও সামুদ্রিক মাছের চিহ্ন। এরা সম্ভবতঃ ৪০।৫০ কোটি বৎসর পূর্বে পৃথিবীতে এসেছিল। তারপর জলবায়ুর কত পরিবর্তন হ'ল সেই সঙ্গে পরিবর্তন হল ভূপৃষ্ঠেরও। ভূপৃষ্ঠ ও পাহাড়ের গা থেকে বৃষ্টি ধারার সঙ্গে মাটি ধুয়ে জলাশয়ে জমা হ'তে লাগল। জলাশয়গুলি অগভীর হ'তে লাগল। অনেক মাছ বা কোনো কোনো জলজ প্রাণী মাটির ওপর উঠে এসে বাস করতে শিখল। এই সময় থেকেই মাটিতে উদ্ভিদের সৃষ্টি হ'তে লাগল। এই যুগের উদ্ভিদ এবং এর পরবর্তী যুগে সৃষ্ট বহু উদ্ভিদ আজ আর পৃথিবীতে নেই কিন্তু তাদের নিদর্শন তারা রেখে গেছে সেই সব প্রাচীন যুগের পাথরের গায়ে যাদের আমরা বলি ফসিল। ফসিলরা অতীত পৃথিবীর মৌন সাক্ষী।

**ক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক শ্যাওলার প্রাচীনতম ফসিলের নিদর্শন**

গত ৩রা এপ্রিল লক্ষ্ণৌ শহরে এক ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেছে। ঐ দিন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু পৃথিবীতে প্রথম পেলিও-বটানিক্যাল ইনস্টিটিউটের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছেন। পেলিওবটানি অর্থাৎ প্রত্নোদ্ভিদ্ হল উদ্ভিদ বিদ্যার সেই শাখা যার অনুশীলন দ্বারা পৃথিবীর প্রাচীন সেই সব গাছের কথা জানা যায় যারা আজ বিলুপ্ত হয়েছে এবং যাদের কেবলমাত্র ফসিল অবস্থাতেই পাওয়া যায়। এই সকল ফসিলের অনুশীলন দ্বারা কেবলমাত্র যে পৃথিবীর বয়স জানা যায় তাই নয়, কয়লা ও পেট্রোলের

অস্তিত্বের নির্দেশও এই বিজ্ঞানের অনুশীলন দ্বারা জানা যায়। ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করবার সময় সেই সঙ্গে পৃথিবীর নানা স্থান থেকে এবং মহেঞ্জোদড়োতে সংগৃহীত কয়েকটি ফসিল পুঁতে দেওয়া হয়। যে কর্ণিক দ্বারা পণ্ডিতজী ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন তার হাতলটি একটি প্রস্তরীভূত গাছের ডাল দ্বারা তৈরী করা হয়েছে।

যে বৈজ্ঞানিকের দীর্ঘ দিনের ঐকান্তিক চেষ্টা, আগ্রহ, নিষ্ঠা ও ত্যাগের জন্য এই প্রত্নোদ্ভিদ্ মন্দির প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে তাঁর নাম বীরবল সাহনী। তাঁর এই কার্যে সহযোগিতা করেছেন তাঁর উপযুক্ত অর্ধাঙ্গিনী শ্রীমতী সাবিত্রী। এজন্য তাঁরা তাদের সমুদয় সম্পত্তি ও আজীবন সংগৃহীত বহু ফসিলও দান করেছেন। কিন্তু বীরবল সাহনী তাঁর আরব্ধ কার্যকে সম্পূর্ণ করে

ফার্ণ গাছের ফসিলের সুন্দর নমুনা

যেতে পারলেন না, ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যেই মৃত্যু তাঁকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল।

ঠিক কুড়ি বৎসর পূর্বে ১৯২৯ খৃস্টাব্দে পেলিও বটানিক্যাল ইনস্টিটিউটের অঙ্কুরোদ্গম হয়। তখন আশা করা গিয়েছিল যে, সরকারী সাহায্যে এই অঙ্কুর ধীরে ধীরে বৃক্ষে পরিণত হবে, কিন্তু সরকার পক্ষ থেকে কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। তখন ঠিক হয় যে, এক বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবেই এই ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হোক্ তা সে যত ছোটই হোক্। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারতের প্রত্নোদ্ভিজ্জেরা মিলে এক কমিটি গঠন করেন, কিন্তু যুদ্ধ বেধে ওঠায় কাজের অসুবিধা ঘটতে থাকে।

১৯৪৬ সালের ১৪ই মে কমিটির আটজন সভ্য মিলে পুনরায় ঠিক করেন যে, ... বার সময় উপস্থিত হয়েছে। এজন্য আর বিলম্ব করা উচিত নয়। সরকারী কোনো প্রকার সাহায্য ব্যতিরেকে ৩রা জুন তারিখে সোসাইটির পত্তন হ'ল। সোসাইটি পত্তন করা সম্ভব করলেন ডক্টর বীরবল সাহনী ও তদীয় পত্নী। তাঁরা তাঁদের ফসিলের সংগ্রহ, গ্রন্থাগার এবং কিছু আসবাবপত্র দিয়ে সোসাইটির সূত্রপাত করলেন। কেউ কেউ কিছু অর্থও দান করলেন। ঠিক হ'ল যে, এই সোসাইটি যত শীঘ্র সম্ভব একটি গবেষণাগার স্থাপন করবেন যেখানে পৃথিবীর যে কোনো দেশের বিজ্ঞানী এসে গবেষণা করতে পারবেন। তাছাড়া গবেষণাগারের নিজস্ব একটি বাড়ি থাকা চাই, যেখানে একটি গ্রন্থাগার ও মিউজিয়াম থাকবে। একটি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করা হবে যাতে প্রত্নোদ্ভিদ্ সংক্রান্ত মৌলিক প্রবন্ধ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের খবরাখবর থাকবে। অর্থ সম্বন্ধে ইনস্টিটিউট স্বাবলম্বী হলে বিদেশে ছাত্র প্রেরণ করা হবে এবং বিদেশের পণ্ডিতদের আমন্ত্রণ করে আনা হবে। এই সকল উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৪৬ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে ভারতের পেলিওবটানিক ইনস্টিটিউট স্থাপিত হ'ল এবং তার অবৈতনিক অধ্যক্ষ নিযুক্ত হলেন ডক্টর বীরবল সাহনী।

এই পেলিওবট্যানিকেল ইনস্টিটিউট স্থাপিত হবার পর থেকে কিছু কিছু অর্থসাহায্যও আসতে লাগল। বাড়ি তৈরী করতে ব্যয় হবে নয় থেকে দশ লক্ষ টাকা। কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই আড়াই লক্ষ টাকা দিয়েছেন। ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে ইউনিভার্সিটি রোডের একটি বাড়িতে ইনস্টিটিউট আপাততঃ স্থানান্তরিত করা হয়েছে। বাড়িটি যুক্তপ্রদেশের সরকার সোসাইটিকে দান করেছেন।

এই ইনস্টিটিউটের যিনি কিউরেটর তিনি একজন চৈনিক। বর্তমানে ফসিল সংগ্রহের জন্য তিনি চীন দেশে আছেন। ন্যাশনাল পিকিং ইউনিভার্সিটির তিনি একজন অধ্যাপক। তাছাড়া ইতমধ্যেই ইনস্টিটিউটের কয়েকজন কর্মীকে কয়েকটি বিখ্যাত রাসায়নিক ও পেট্রল কোম্পানী বৃত্তি দিয়ে গবেষণায় নিযুক্ত করেছেন।

পৃথিবীর বহু পণ্ডিত ব্যক্তি ও নানা প্রতিষ্ঠানের শুভেচ্ছা নিয়ে প্রত্নোদ্ভিদ্ মন্দির স্থাপিত হয়েছে কিন্তু ঠিক সময়ে তার প্রতিষ্ঠাতার প্রয়োজন বেশী, সেই সময়েই হল তাঁর মৃত্যু।

বীরবল সাহ[illegible]র জীবন কেটেছে বিজ্ঞানের অনুশীলনে, তাঁর [illegible] সম্ভব হয়েছে এবং শোনা যায়, মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর পত্নীকে বলে গেছেন, অবশিষ্ট জীবন প্রত্নোদ্ভিদ্ মন্দিরের কল্যাণের জন্য অতিবাহিত করতে। সত্যকারের বিজ্ঞানী সাধবী স্ত্রীকে যোগ্য ...

পাঞ্জাবের ভেড়া নামক স্থানে ১৮৯[illegible] সালের ১৪ই নবেম্বর রুচিরাম সাহনী নাম[illegible] জনৈক রসায়নের অধ্যাপকের তৃতীয় পুত্র[illegible] জন্ম হয়। নবজাতকের নাম রাখা হয় বীরবল[illegible] বালক বীরবল অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলে[illegible] এবং পিতাও তাঁকে শিক্ষা দিতে অবহে[illegible] করেননি। পিতার সৎশিক্ষার গুণেই বীরব[illegible] উত্তর জীবনে একজন প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানি[illegible] হতে পেরেছিলেন। লাহোর গভর্নমে[illegible] কলেজের তিনি যখন ছাত্র ছিলেন, ত[illegible] উদ্ভিদ বিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন পাঞ্জা[illegible] স্বনামধন্য বৈজ্ঞানিক শিবরাম কাশ্যপ। উপয[illegible] অধ্যাপক উপযুক্ত ছাত্র পেয়েছিলেন। এখা[illegible]

একটি গাছের গুঁড়ি প্রস্তরীভূত হয়ে গে[illegible]

বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে অধ্যা[illegible] সাহনীর মতো অধ্যাপক কাশ্যপেরও [illegible] মৃত্যু হয়েছিল হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে।

বীরবল ১৯১৫ খৃস্টাব্দে কেম্ব্রিজে [illegible] কেম্ব্রিজে বীরবল কয়েকটি বিশেষ বৃত্তি [illegible] অধ্যাপক এ সি সিউয়ার্ড বীরবলকে [illegible] করেন, অধ্যাপক সিউয়ার্ডও বীরবলকে [illegible] ভাবে বিশেষ যত্ন নিয়ে শিক্ষা দিতে থা[illegible] তিনি উদ্ভিদের অঙ্গসংস্থান বিদ্যায় পার[illegible] হন এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি এস[illegible] হয়ে ১৯১৯ সালে দেশে ফিরে আসেন। প্র[illegible] তিনি কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক [illegible]

বিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯২১ সালে তিনি লক্ষ্মৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদ বিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং আজীবন এই পদেই তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন। অধ্যাপক হিসেবে তিনি ছিলেন আদর্শ। অধ্যাপনা করেই তিনি ক্ষান্ত থাকতেন না, নানাপ্রকার মৌলিক গবেষণায় নিজে তো নিযুক্ত থাকতেনই উপরন্তু সহকারী ও ছাত্রদের সব সময়েই বিজ্ঞান অনুশীলন করতে উৎসাহ দিতেন। ১৯২৯ সালে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'ডক্টর অব সায়েন্স' উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন। অধ্যাপক সাহনীই প্রথম ভারতীয় যাঁকে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় এইরূপে সম্মানিত করলেন।

ক্রমে ভারতের সীমা ছাড়িয়ে অধ্যাপক সাহনীর নাম ছড়িয়ে পড়ল। ১৯৩৬ সালে তিনি লণ্ডনের রয়েল সোসাইটির সভ্য মনোনীত হলেন এবং তিনি হলেন ষষ্ঠ ভারতীয় সভ্য। সেই বৎসরেই অধ্যাপক সাহনীকে এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল "বার্কলে পদক" দ্বারা ভূষিত করেন। অধ্যাপক সাহনী ইণ্ডিয়ান বট্যানিক্যাল সোসাইটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং স্বদেশ ও বিদেশের বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। ১৯৪০ সালে তিনি সায়েন্স কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করেন, ইতিপূর্বে একবার উদ্ভিদবিদ্যা এবং আর একবার ভূতত্ত্ব শাখার সভাপতিত্ব করেন। ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সের তিনি
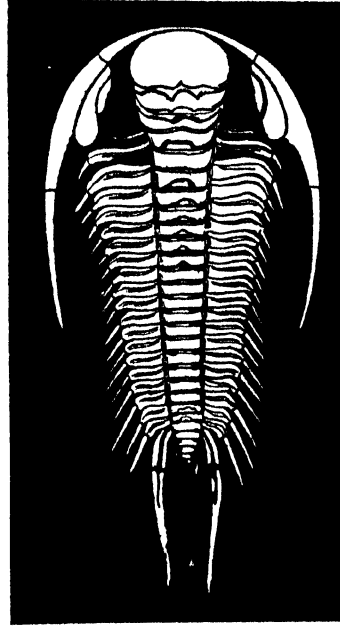
আদিমতম প্রাণীর ফসিল

দুবার সভাপতি ছিলেন। ইণ্ডিয়ান বট্যানিক্যাল সোসাইটি এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব সায়েন্সেরও তিনি সভাপতি ছিলেন। ১৯৩৫ খৃস্টাব্দে অ্যামস্টার্ডামে ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক উদ্ভিদ বিজ্ঞানের যে অধিবেশন হয়েছিল, তাতে প্রত্নোদ্ভিদ্ শাখার তিনি সভাপতি ছিলেন এবং সেই বৎসর প্যারিস ন্যাচারাল হিস্টরি মিউজিয়মের শতবার্ষিকী উৎসবে তিনি ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। ইতিপূর্বে ১৯৩০ সালে তিনি কেম্ব্রিজে পঞ্চম আন্তর্জাতিক উদ্ভিদ বিজ্ঞান অধিবেশনে প্রত্নোদ্ভিদ্ শাখার সহ-সভাপতিত্ব করেছিলেন। স্টকহোমে আগামী সপ্তম আন্তর্জাতিক উদ্ভিদ বিজ্ঞান অধিবেশনের তিনি মূল সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন।

ফসিল সংগ্রহের জন্য অধ্যাপক সাহনী বহুস্থানে ভ্রমণ করেছেন। এই কাজে তাঁর স্ত্রী তাঁর সঙ্গে যেতেন সহকারীরূপে। রাজমহল পাহাড়ে আবৃতবীজ বৃক্ষের তিনি যে ফসিল সংগ্রহ করেন, তা সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই ফসিল একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। তাঁর লিখিত মৌলিক প্রবন্ধগুলি বিজ্ঞান জগতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।

৩রা এপ্রিল পেলিও বট্যানিক্যাল ইনস্টিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় আর ৯ই এপ্রিল রাত্রে তিনি গুরুতর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন; ছয় ঘণ্টা পরে তাঁর মৃত্যু হয়।

প্রত্নোদ্ভিদ্ মন্দিরের মধ্যে বীরবল সাহনীর স্মৃতি জাগরূক হয়ে থাকবে।

# মিল ও মিলন

বাণীবিনোদ সেনগুপ্ত

কাকডাকা দ্বিপ্রহরে
বসিয়া আপন ঘরে
কলম লইয়া করে
কবি কোনো জনা,
পাখার তলায় বসি
কাগজে লাগায় মসী
সযতনে মাজি ঘষি
করিছে রচনা।

হেন কালে আলিসায়
চটক চটিকা হায়
কলরবে মুখরায়
প্রেম কিচিমিচি,

বসন্তের আগমন
পুলকিত শিহরণ
ধমনীতে আলোড়ন
কেন মিছেমিছি।

কবিবর ভাবে মনে
কেন বসি এক কোণে
কড়িকাঠ মরে গোণে
বৃথা এ প্রয়াস,
দুয়ে মেলা কবিতার
বসি দেখে ছবি তার
চটক ও চটিকার
প্রণয় বিলাস।

# ইন্দ্র দুগারের চিত্র প্রদর্শনী

**শিবজেন্দ্র মৈত্র**

কোনো একজন মাত্র শিল্পীর একক শিল্প-প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান কলকাতা শহরে দুর্লভ। এখানে আমরা যে-সব চিত্র-প্রদর্শনীর সংগে পরিচিত, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা বিভিন্ন শিল্পীর কাছ থেকে সংগৃহীত অথবা আহরিত চিত্রের সম্মিলিত প্রদর্শনী। সাধারণতঃ এ-ধরণের প্রদর্শনী দর্শককেও আকৃষ্ট করে বেশি। কিছুটা বৈচিত্র্যের উন্মাদনা ও কিছুটা প্রতিযোগিতার উত্তেজনা সহজেই দর্শকের মনকে উদ্দীপ্ত করে।

কিন্তু কোনো একজন মাত্র শিল্পীর রচনার মূল্য নির্ণয়, তাঁর ক্রমবিকাশ, দৃষ্টিকোণ, আঙ্গিকের ব্যবহার, উৎকর্ষের পরিধি ও দুর্বলতাকে শিল্প-বিচারের দিক থেকে লক্ষ্য করতে হলে সেই শিল্পীর একক প্রদর্শনীর সার্থকতা অনস্বীকার্য।

মাত্র কিছুদিন পূর্বে কুমার সিং হলে শিল্পী ইন্দ্র দুগারের যে একক শিল্প-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হ'ল, কয়েকটি কারণে তা উল্লেখ-যোগ্য। প্রদর্শনীর যারা অনুষ্ঠাতা, তাঁদের উৎসাহ ও দুঃসাহসিকতা ব্যতীত যে এই প্রদর্শনী অসম্ভব ছিল, তা সহজেই অনুমেয়। যে-দেশে সাধারণতঃ বয়সের প্রবীণতা হচ্ছে প্রাজ্ঞতার মাপকাঠি সেখানে নবীন শিল্পী ইন্দ্র দুগারের একক প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান দুঃসাহসিক ঘটনা বলে প্রতীয়মান হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু এই দুঃসাহসিকতা শিল্পীকে কোথাও মোহগ্রস্ত করে নি। কারণ অধিকাংশ সময়েই তথাকথিত "আধুনিক" শিল্পের অভিজ্ঞতা আমার কাছে আতঙ্কজনক। অসুস্থ মনো-বিকারের বিবর্ণ ছায়া আজ "আধুনিক" শিল্পকে কেবলমাত্র শিল্পীর নিজস্ব গোষ্ঠীর উপলব্ধির বস্তু করে তুলেছে। শিল্পী দুগার যে কোথাও আমাদের চমকে দেবার প্রচেষ্টা করেন নি, এর জন্যে তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

অথচ, শিল্পী তো নিঃসংকোচেই আধুনিক। তাঁর আঁকা রেখাচিত্র, নিসর্গ-চিত্র প্রভৃতি থেকে সহজেই অনুভব করা যাবে—তিনি চোখ খুলে আঁকেন নি, মনও খোলা রেখেছেন। তথাকথিত ভারতীয় চিত্রপদ্ধতির স্তন্যরসে তিনি মানুষ হলেও, বিদেশী আঙ্গিকও তাঁর কলমের মুখে প্রকাশের তাগিদে আশ্চর্য নিজস্বতায় ব্যক্ত হয়েছে। এই প্রদর্শনী সম্বন্ধে সাধারণতঃ বলতে শুনেছি, নিসর্গ-চিত্রগুলি মূলতঃ ইম্প্রেসনিস্ট-পন্থী। কথাটি [illegible] দর্শন নয়, বর্ণ-ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে আলোর প্রতিফলনকে প্রকাশ করার পদ্ধতিই হচ্ছে ইম্প্রেসনিস্ট পন্থা। সাধারণভাবে শিল্পী দুগারের সমষ্টিগত দৃষ্টি এই সব চিত্রের মধ্যে দিয়ে প্রাথমিকভাবে প্রকাশ পাওয়াতে এই ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। অথচ একটু মনো-যোগের সঙ্গে লক্ষ্য করলে ধরা পড়বে—শিল্পী চিত্রবস্তুকে নিকট দৃষ্টির আস্বাদনীয় ক'রে তুলতে স্থানে স্থানে রেখা-ব্যবহারের সাহায্য গ্রহণ করেছেন। যেমন, শোন-ভাণ্ডার (৪), প্রথম ও পঞ্চম পর্বত-মালা (১, ২), গ্রাম-প্রান্ত (১৫), প্রভৃতি চিত্র দর্শনীয়।

অবশ্য, শিল্প-পদ্ধতির এই যৌগিক-পন্থা শিল্প রসাস্বাদনে কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি করে কি-না, তা এই স্থলে অবশ্য বিচার্য। শিল্পীর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপলব্ধিই এই নিসর্গ-চিত্রগুলির মূল প্রেরণা—তা সহজেই অনুমেয়। প্রকৃতির মধ্যে যে অংশটুকু সামঞ্জস্যপূর্ণ, সামগ্রিক পরিবেশ থেকে তুলে নিয়ে তাকে চিত্রান্তর্গত

রাজপ্ত রমণী

পরিব্রাজকের আস্তানা

স্বকীয় স্বরূপটি যতোটা না পরিস্ফুট, তার চেয়েও বেশি প্রকাশ পেয়েছে শিল্পীর মন—এবং সে মানসিকতাও অধিকাংশ স্থলে রোমাণ্টিক রসে পরিপ্লুত। শিল্পী দুগারের হাতে নিসর্গের আপন স্বরূপটি উদ্‌ঘাটিত হতে দেখা গেল—যা শিল্পীর মানসিক দৃষ্টির ছায়ায় কোথাও ঝাপ্‌সা হয়ে যায় নি।

এই প্রদর্শনীর 'বসন্ত' (১ ও ২) এই দু'টি চিত্র চীনা-প্রভাবিত এই রকম আলোচনা শুনতে পাওয়া গেল। সিল্কের ওপর অঙ্কিত হবার দরুণ হয়তো কোনো কোনো দর্শকের মনে এই ধারণা জন্মেছে। চীনা ক্যালিগ্রাফির যে পদ্ধতি তা এই চিত্র দু'টিতে কোথাও অনুসৃত হয় নি। Space বা অবকাশের দ্বারা ভারসাম্য (Balance) সৃষ্টির যে-প্রচেষ্টা চীনা-শিল্পে থাকে, সে প্রচেষ্টাও এখানে কোথাও নেই। এখানেও রেখা রচনা ও বর্ণ প্রয়োগে শিল্পী দুগারের যে মৌলিকত দেখা গিয়াছে, তা কোনো ক্রমেই চীনা শিল্প প্রভাবিত নয়।

এই প্রদর্শনীর অন্যতম আকর্ষণ ছিল পোস্ট কার্ডের ওপর রেখা রচনাগুলি। শিল্পীর ডেকোরেটিভ ধারণা, বর্ণজ্ঞান, অতি সুন্দরভাবে এগুলির মধ্যে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। শিল্পী ও শিল্প রসিকদের কাছে এগুলি অমূল্য তো বটেই, ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতির সাংস্কৃতিক মূল্য বিচার যাঁরা করেন, সেই সব সমাজ-বিজ্ঞানীর কাছেও এগুলি ডক্যুমেণ্ট বলে ভবিষ্যৎকালে প্রতীয়মান হবে।

করাই শিল্পীর প্রাথমিক উদ্দেশ্য। এই কারণেই মনে হয়, একটা প্রবল বাস্তবিকতা-বোধ ও বাস্তব-দৃষ্টিই শিল্পীর মৌল দৃষ্টি। সেই মূল দৃষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যখনই শিল্পী কল্পনার সাহায্য নিতে গিয়েছেন, সেইখানেই সামগ্রিক রচনার স্থানে স্থানে শিথিলতা আশ্রয় নিয়েছে। কারণ, শিল্পী যে রীতি বা পদ্ধতিকে আশ্রয় করেই শিল্প-রচনা করুনা না কেন, মূল দৃষ্টির অবিচ্ছেদী সম্পূর্ণতার মধ্যেই শিল্পীর শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই প্রদর্শনীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্র "গ্রাম্য কুটির" চিত্রটি উল্লেখ করি। পশ্চাদপটের সুবিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র ও কুটিরের মধ্যে দিয়ে massive quality প্রকাশ পেয়েছে, কুটিরের পশ্চাদ্‌ভাগে তালবৃক্ষে ও সম্মুখভাগে ধান্যক্ষেত্রে কুটির ও তালবৃক্ষের মাঝখানের অবকাশ-ক্ষেত্রে পুষ্পবিতানে রেখাময়তায় বিপরীত রসের উদ্ভব করেছে। অন্যত্রও "পল্লীপ্রান্তে" চিত্রের উপরিভাগ যে-পরিমাণে বাস্তবিকতায় সুসম্পূর্ণ, নিম্ন-ভাগের মূর্তি-রচনা ও শুষ্ক বিশীর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আগাছায় রেখা প্রয়োগ এই বিপরীত রসের উদ্ভব করেছে। এই পারস্পরিক বিরোধী দৃষ্টিকোণ শিল্পীর বহু নিসর্গচিত্রকে প্রথম শ্রেণীর উৎকর্ষতায় উত্তীর্ণ হবার পক্ষে বাধার সৃষ্টি করেছে।

তবুও শিল্পী ইন্দ্র দুগার বাংলা দেশের শিল্পে যে নিসর্গ-চিত্রের প্রবর্তনা করলেন, তার মধ্যে বৈশিষ্ট্য অনস্বীকার্য। নিসর্গ চিত্র কোনদিনই আমাদের শিল্পীদের আকৃষ্ট করে নি। বিভিন্ন শিল্পীর হাতে তার প্রকাশ আমরা যতটুকু দেখেছি, তার মধ্যে নিসর্গের

যাত্রী

# হিউএন্ চ্যাঙ্-এর ভারতভ্রমণ

—শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু—

(পূর্বানুবৃত্তি)

### তিএনশান—সমরখন্দ—তুখার

কুচা ছেড়ে হিউএনচাঙ্ কিজিল ও আকশু হোয়ে উত্তরে তিএন্শান্ পর্বতের দিকে চল্লেন। এ দেশ পশ্চিম তুরুষ্কদের সাম্রাজ্যের ভিতরে ছিল বটে তবে এ সীমান্তে শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা এ সময়ে ভালো ছিল না। এমন কি হিউএনচাঙ্ কুচা ছাড়বার পরই ২০০০ অশ্বারোহী তুরুষ্ক দস্যুদের সাক্ষাৎ পান। এরা একটা মস্ত যাত্রী প্রবাহ (Caravan) লুট করে লুটের সামগ্রীর ভাগ নিয়ে ঝগড়া করছিল।

হিউএনচাঙ্ বেদাল গিরিপথ দিয়ে তিএন্শানের উত্তরে চলে গেলেন। অর্থাৎ তারিম অববাহিকা থেকে সীর দরিয়ার অববাহিকাতে গেলেন। তিএন্শানের এই উত্তরদিকটা তুষার নদে পূর্ণ। হিউএনচাঙ্ এইভাবে তুষার নদের বর্ণনা দিয়েছেন—"এই তুষার পর্বত পামিরের উত্তর কোনে অবস্থিত। এটা ভীষণ বিপদ সংকুল, আকাশস্পর্শী পর্বত। সৃষ্টির প্রথম থেকে এখানে বরফ জমেছে আর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বরফের নদী হয়েছে—যা কোন সময়েই গলে না। শক্ত ঝকঝকে সাদা বরফের চাংড়া ভেঙে গড়িয়ে পড়ছে আর মেঘের মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। একদৃষ্টে চেয়ে থাকলে চোখ ঝল্সে যায়। পথের উপর বরফের পাহাড় ভেঙে ভেঙে পড়ে; কোনও কোনওটা ১০০ ফুট উঁচু, কোনও কোনওটা ৩০।৪০ ফুট চওড়া। এসব পাহাড় অতিক্রম করা কষ্টসাধ্য আর বিপদসংকুল। এর উপর, বাতাসের আর তুষারের ঝড় আর ঘূর্ণীবাতাস সব সময়েই বইছে। চামড়ার লাইনিং দেওয়া পোষাক, জুতা সত্ত্বেও শীতে কাঁপতে হয়। খাওয়া বা ঘুমানোর জন্যে শুক্নো জায়গা পাওয়া যায় না। কোনও জিনিসের সাহায্যে কড়াইটা উঁচু কোরে ধরে রান্না করতে হয় আর তুষারের উপরেই মাদুর বিছানো ছাড়া উপায় নেই।" এই পর্বত অতিক্রম করতে সাত দিন লেগেছিল আর হিউএনচাঙের সঙ্গীদের মধ্যে ১৩।১৪ জন মানুষ আর বহু গরুঘোড়া এখানে মারা যায়।

তিএন্শানের উত্তর পাশ দিয়ে নেমে হিউএনচাঙ্ "ঈশিক্ স্কুল" বা গরম হ্রদের দক্ষিণ-তীরে এলেন। এর জল কখনো জমে না সেইজন্যে একে গরম হ্রদ বলা হয়। "এই হ্রদের পরিধি আন্দাজ ১০০০ লি। এটা পূব পশ্চিমে লম্বা। এর চারিদিকেই পর্বত। জলের রঙ্ সবুজ কালো আর স্বাদ নোন্তা তেতো। অনেক সময়েই এতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঢেউ হয়।"

পশ্চিম তুরুষ্ক সম্রাট ইয়ার গু টুঙ্ এ সময়ে এখানে শীকারে এসেছিলেন। হ্রদের উত্তর-পশ্চিম কূলে আধুনিক চৌক্মাক্ সহরের কাছে হিউএনচাঙের সঙ্গে এঁর সাক্ষাৎ হয়। তখন ৬৩০ খৃষ্টাব্দের প্রথম। পশ্চিম তুরুষ্কদের সাম্রাজ্য এই সময়ে চরম বিস্তৃতি লাভ করেছিল। আল্টাই থেকে হিন্দুকুশ পর্বত, ইরাণ থেকে চীনের সীমান্ত পর্য্যন্ত এদের রাজত্ব ছিল। তুরুষ্করা তাতারদেরই একটা শাখা যদিও এদের যাযাবর অসভ্য জাতিই বলা যায় তবু সভ্যতার সংস্পর্শ যে এদের একেবারে ছিল না তা নয়। হিউএনচাঙ এদের যে বিবরণ দিয়েছেন তার থেকে হূন্ আটিলা বা ভবিষ্যৎ তাতার সম্রাট চেংগিস্ খানের কথা মনে পড়ে—"এই অসভ্যদের প্রচুর ঘোড়া। সম্রাটের পরিধানে সবুজ সাটিনের কোট ছিল। মাথার চুল সবই দেখা যাচ্ছিল, তবে কপালে একটা দশ ফুট লম্বা রেশমের কাপড় দিয়ে বাঁধা ছিল। এঁর চারিপাশে শ' দুই যোদ্ধা ছিল। তাদের সবারই বেণী বাঁধা আর পরিধানে ব্রোকেডের কোট। অন্য সৈন্যরা সকলেই উষ্ট্রারোহী বা অশ্বারোহী। তাদের পরণে লোমের বা ভাল পশমের পরিচ্ছদ; আর হাতে লম্বা বর্শা, নিশান আর সরল ধনুক। যতদূর দৃষ্টি চলে, সমস্ত জায়গাই সৈন্যদলে ভরা ছিল......।"

এই অসভ্য হিংস্র যোদ্ধাদলের কিন্তু ধর্মে কিছু কিছু মতি ছিল। হিউএনচাঙের মতে এরা একরকম অগ্নি উপাসক ছিল। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মের উপরও এদের শ্রদ্ধা ছিল। ৫৮০ খৃষ্টাব্দে এদের সেই সময়কার সম্রাট টো-পো গান্ধারের ভিক্ষু জিন গুপ্তের প্রভাবে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন। হিউএনচাঙের সময় সম্রাট
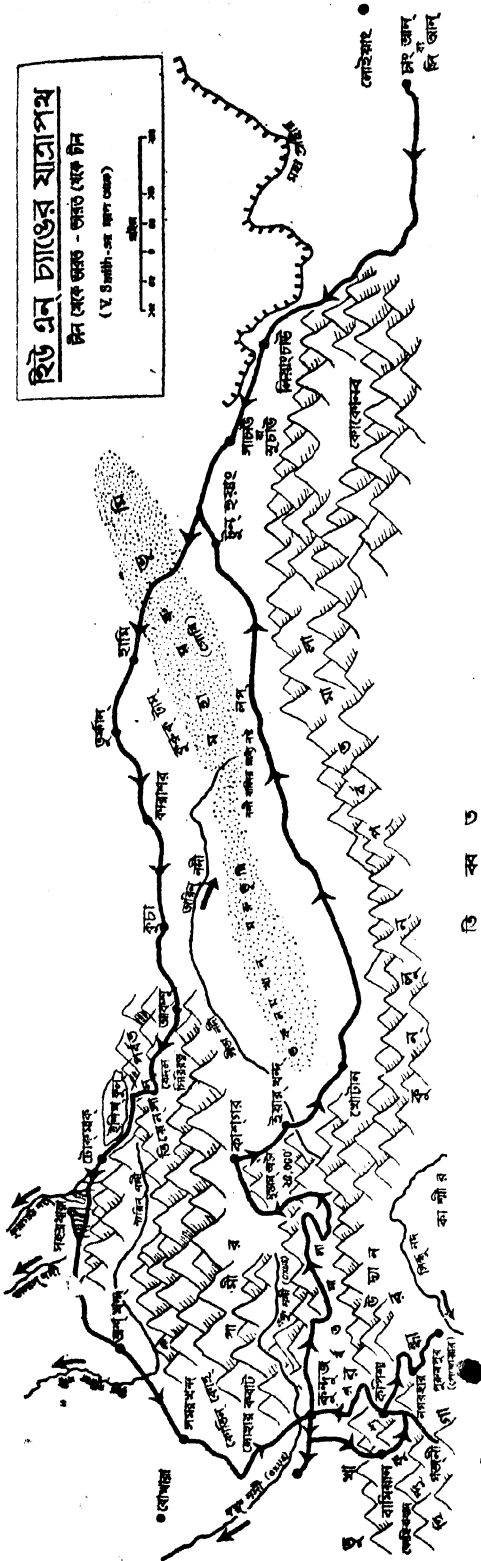
...। ইনি বিচক্ষণ ...চাঙের সঙ্গে ... প্রভাকর মিত্র ...ন সহচরের সঙ্গে ...ম্রাট তাঁর উপর এত ...৬ খৃষ্টাব্দে যখন চীন- ...যান, তখন অত্যন্ত ...কে ছেড়ে দেন।

...ক দেখে সম্রাট খুশী হোয়ে ...কতক এখানে থাকুন, ২।৩ দিন ...ফিরে আস্ছি।" এই বোলে একটা ...তাঁর থাকবার বন্দোবস্ত কোরে দিয়ে ...য়ে গেলেন। শীকার শেষ হোলে, সম্রাট ...উএনচাঙ্‌কে ডেকে পাঠালেন। সম্রাট বাস ...রতেন একটা প্রকাণ্ড তাঁবুতে। "তাতে ...সানালী ফুলের এমন কাজ করা যে চোখ ...ঝলসে যায়। তুরুষ্কেরা অগ্নির উপাসক, কাঠে ...সূক্ষ্মভাবে অগ্নি আছে মনে কোরে এ'রা ...কাঠের আসনে বসেন না। রাজকর্মচারীরা ...লম্বা লম্বা মাদুর পেতে তার উপরে বসে- ...ছিলেন, প্রত্যেকেরই পরিধানে ব্রোকেডের জম- ...কালো পরিচ্ছদ। যদিও ইনি যাযাবর জাতির ...রাজা বই নন, চামড়ার তাঁবুতে বাস, তবু তাঁর ...দিকে চাইলে বিস্ময় ও শ্রদ্ধার উদ্রেক হোতেই ...য়।"

হিউএনচাঙের ঐ জায়গায় অবস্থানের ...সময়েই, সম্রাট একবার বিদেশী দূতদের ...অভ্যর্থনা করেন। হিউএনচাঙ্‌ তার এই বিবরণ ...দেন—"অসভ্য সম্রাট দূতদের বস্‌তে বললেন। ...এই সময়ে বাজনদারদের বাদ্য আরম্ভ হোল ...আর পানীয় আনবার হুকুম হোল। বিদেশী ...দূতদের সঙ্গে সম্রাট মদ্যপান করলেন। ...অতিথিদের ক্রমশঃই স্ফূর্তি বাড়তে লাগল। ...তারা পরস্পরের পানপাত্র ঠোকাঠুকি কোরে ...মদ খাবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে লাগল। এই ...সময়ে চারিদিক থেকে বাজনা বেজে উঠল। ...সুরগুলি অর্ধঅসভ্য হোলেও কানে মন্দ ...লাগছিল না। ভালই লাগছিল। কিছু পরেই ...নতুন পাত্র এলো। অতিথিদের সামনে স্তূপা- ...কারে ভেড়ার আর গোবৎসের সিদ্ধ মাংস রাখা ...হোল......।"

তুরুষ্ক সম্রাট এই ভোজের সময়ে হিউএন- ...চাঙের প্রতি যে রকম দৃষ্টি রেখেছিলেন তাতে ...তাঁর ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাই প্রকাশ পায়। তুরুষ্কেরা ...গদির উপর মাদুর পেতে বসেছিলেন, ধর্ম- ...গুরুকে বসবার জন্যে একখানা লোহার চেয়ার ...দেওয়া হয়। তাঁর জন্যে বিশেষ করে পবিত্র ...খাদ্যের ব্যবস্থা হয়—চালের তৈরী পিঠা, ...দুধের সর, চিনি, মধু, মনাক্কা আর মনাক্কার ...মদ। আর ভোজের পর সম্রাট তাঁকে বৌদ্ধ ধর্মের ...উপদেশ দিতে অনুরোধ করলেন। অতএব ...সৈন্যদলের প্রধানদের সম্মুখে ধর্মগুরু তাঁর ...ধর্মের প্রধান প্রধান কথাগুলি ব্যাখ্যা করলেন। ...দশশীল, অহিংসা, পারমিতা ও মোক্ষলাভের উপায় সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। উপদেশের শেষে সম্রাট "দু-হাত তুলে সাষ্টাঙ্গে নত হলেন আর আনন্দের সঙ্গে উপদেশ গ্রহণ করলেন।"

হিউএনচাঙকে তাঁর পছন্দ হয়ে গেল আর তুরফা...রাজার মত ইনিও তাঁকে নিরস্ত করবার চেষ্টা করলেন; "গুরুদেব! ভারতবর্ষে যাবেন না। সেখানে এত গরম যে, গ্রীষ্মকাল শীত-কালে কোনও তফাৎ নেই। আমার ভয় হচ্ছে যে, সে কষ্ট আপনার সহ্য হবে না। সেখানকার মানুষ সব নগ্ন কালো, ভব্যতা জানে না, আর আপনার সাক্ষাতের উপযুক্ত তারা নয়।" হিউএনচাঙ্‌ জবাব দিলেন—"যাই বলুন, বুদ্ধের প্রকৃত ধর্মের অনুসন্ধানে যাবার জন্যে আমার মন সর্বদাই অতিশয় ব্যগ্র হয়ে রয়েছে। সেখানে পবিত্র তীর্থস্থানগুলি দেখব আর তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করবো এই আমার প্রাণের ইচ্ছা।

সম্রাটকে রাজি হোতেই হোল। তিনি এক দোভাষীকে দিয়ে কপিশার রাজার নিকট সুপারিশ পত্র লিখিয়ে দিলেন। আর দোভাষীকে হুকুম দিলেন যে, সে স্বয়ং ধর্মগুরুর সঙ্গে কাবুল উপত্যকায় কপিশা পর্যন্ত ঐ চিঠিগুলো নিয়ে যায়। হিউএন-চাঙকে শিরোপা দিয়ে নিজে তাঁকে পথে খানিকদূর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এলেন।

এই ক্ষমতাশালী তুরুষ্ক সম্রাটের সহায়তা না পেলে হিউএনচাঙের পক্ষে পামির আর তুখারদেশ পার হওয়া সহজ হোত না। আশ্চর্যের বিষয়, এই বৎসরের শেষভাগেই এই সম্রাট হত্যাকারীর হাতে মৃত হন আর তারপর থেকেই পশ্চিম তুরুষ্ক সাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হয়।

হিউএনচাঙ্‌ আবার পশ্চিমদিকে অগ্রসর হোলেন। যে সমতলে চু নদীর দশ শাখা আর কুরাগতি নদীর নয় প্রশাখা প্রবাহিত সে সমতল পার হোলেন। তখনও আর আজও তার নাম "সহস্রধারা" (মিভবুলাক)। "এই দেশ লম্বায় চওড়ায় ২০০ লি, (৫ লি=১ মাইল)। দক্ষিণে পর্বত, অন্য তিনদিকে সমতল। প্রচুর জল আর উ'চু উ'চু বিশাল অরণ্য। বসন্তকালে শত সহস্র ফুল সমতলে ফুটে ওঠে। প্রচুর জলাশয় থাকায় এ স্থানের নাম সহস্রধারা। সম্রাট প্রত্যেক বছর গরমের সময় এখানে আসেন। দলে দলে হরিণ ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের গলায় ঘণ্টা আর আংটি বাঁধা। সম্রাট হুকুম দিয়েছেন যে, এই হরিণ কেউ মারলে তার মৃত্যুদণ্ড হবে। তাই এরা মানুষ দেখে ভয় পায় না আর মৃত্যু পর্যন্ত শান্তিতে থাকতে পারে।"

এরপর যাত্রী তালাস্‌ নদী (আধুনিক আউলিয়াটা) পার হয়ে টাস্‌খেন্টে গেলেন। সেখান থেকে লালবালির মরুভূমি কিজিল কুমের পূব পাশ পার হোয়ে সমরখন্দে এলেন।

সমরখন্দ এ সময়ে বাণিজ্য সম্পদে খুব সমৃদ্ধ ছিল। ৬৩০ খৃষ্টাব্দে হিউএনচাঙ্‌ যখন এখানে আসেন তখন এটা একটা ছোট তুরুষ্ক পারস্য রাজ্যের রাজধানী ছিল। এর সংস্কৃতি সম্পূর্ণভাবে পারশীক ছিল। হিউএনচাঙ্‌ বলেন,—"অধিবাসীদের সংখ্যা খুব বেশী। রাজা প্রজা সবাই খুব বীর আর সাহসী। রাজা বা প্রজা কারোই বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাস নেই। এরা অগ্নির উপাসক।" আসলে কোন বিশেষ ধর্মেই এদের গোঁড়ামী ছিল না। হিউএনচাঙ্‌ আরও বলেন যে, প্রথমে রাজা তাঁর সমাদর করেননি। কিন্তু পরদিন তাঁর কাছে মোক্ষধর্মের উপদেশ পাওয়ার পর রাজার ধর্মে বিশ্বাস হয়। রাজ্যের অধিবাসীরা হিউএন-চাঙের অনুচরদের পোড়াবার জন্যে মশাল নিয়ে তাদের তাড়া করে। রাজা ঐ দুর্বৃত্তদের ধরে তাদের হাত পা কেটে দিতে হুকুম দিয়ে-ছিলেন, কিন্তু ধর্মগুরু তাঁকে নিরস্ত করায়, রাজা তাদের শুধু লাঠির প্রহার দিয়ে নগর থেকে তাড়িয়ে দেন। হিউএনচাঙ্‌ বলেন যে, এরপর সব শ্রেণীর লোকেরাই দলে দলে ধর্মোপদেশ নেবার জন্যে তাঁর কাছে আসতে লাগল।

সমরখন্দ ছেড়ে পরিব্রাজক পশ্চিম-দক্ষিণে যাত্রা করলেন আর কেশ পার হোয়ে পামিরের এক ছিন্ন অংশ কোটিন্‌ কোহর পর্বতে এলেন। "এই পর্বতের পথ খুব খাড়াই আর বিপদ্‌জনক। এতে পা দেবার পর জল বা ঘাস কিছুই দেখা যায় না।" এই পর্বতের উপর দিয়ে ৩০০ লি যাবার পর 'লোহার কবাটে' আসা যায়।" এই বিখ্যাত গিরিসঙ্কট দিয়ে আজও সমরখন্দ আর বক্ষুনদীর যাত্রী-প্রবাহগুলি যাতায়াত করে। হিউএনচাঙ্‌ বলেন—"দুটি সমান্তরাল পর্বতশ্রেণী দুই দিকে খুব খাড়াভাবে উঠেছে মধ্যে কেবল একটা সরু পথ। প্রবেশ মুখে কাঠের দুটো জোড়া কবাট রাখা আছে আর তার উপরে অনেক ছোট ছোট লোহার ঘণ্টা। কবাটের উপর অনেক লোহা মারা আছে। এই পথে সহজে শত্রু আসতে পারে না বলে একে লোহার কবাট বলা হয়।

লোহার কবাট থেকে হিন্দুকুশ পর্বত পর্যন্ত প্রদেশ তুখার (তুষার) নামে পরিচিত ছিল। বক্ষু (oxus) নদী এই দেশের ভিতরে পূব থেকে পশ্চিমে প্রবাহিত।

আগেই বলেছি, তুরফান থেকে তুখার পর্যন্ত সমস্ত দেশের জন্যে পশ্চিম তুরুষ্ক সম্রাটের একজন শাসনকর্তা ছিলেন। এই শাসনকর্তার প্রধান আবাস ছিল বক্ষু নদীর দক্ষিণে, কুন্দুজে। হিউএনচাঙ্‌ ৬৩০ খৃষ্টাব্দে যখন বক্ষুনদী পার হোয়ে কুন্দুজে পৌঁছান, তখন শাসনকর্তা ছিলেন তুরুষ্ক সম্রাটের একছেলে টারডুশাড্‌। ইনি আবার হিউএন-

দেশের পরিচিত তুরফান রাজের জামাতা কিম্বা ভগ্নীপতি ছিলেন।

হিউএনচাঙ্ টারডুশাডের কাছে উপস্থিত হলেন তাঁর বাপের সংবাদ আর তুরফানরাজের সুপারিশ পত্র নিয়ে। টারডুশাড হিউএনচাঙকে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন আর তাঁর সঙ্গে নিজেও ভারতবর্ষে যাবেন স্থির করেছিলেন, কিন্তু তা হোতে পারল না।

ধর্মগুরু যখন উপস্থিত হন, তার অল্প কিছুকাল আগেই তুরফানরাজকন্যার মৃত্যু হয়। টারডুশাড্ শীঘ্রই আবার তাঁর শ্যালীকে বিবাহ করলেন। কিন্তু নতুন রাণী আগেকার রাণীর ছেলের প্রণয়িনী হোয়ে টারডুশাড্‌কে হত্যা করে তার প্রণয়ীকে রাজা করল। যা হোক্ নতুন রাজাও হিউএনচাঙের আশ্রয় দাতা হলেন আর তাঁকে পরামর্শ দিলেন যে, সোজা গান্ধারের দিকে না গিয়ে তিনি যেন বাল্‌খ্ (বাহ্লীক) হোয়ে যান। বললেন—"বাল্‌খ্ আপনার এ শিষ্যের রাজত্বের মধ্যেই একটা নগর। এখানে এত পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন আছে যে, লোকে একে ছোটরাজগৃহ বলে। আমার ইচ্ছা ধর্মগুরু সেখানে গিয়ে পবিত্রস্থানগুলিতে পূজা দেন।"

আধুনিক কালে বাল্‌খ্ দেশটা একরকম মৃতই বলা যায়। কিন্তু হিউএনচাঙের সময়ে এখানকার অবস্থা বেশ ভালোই ছিল। হিউএনচাঙ্ এখানে ৩০০০ ভিক্ষু আর এক-শত সংঘারাম দেখতে পান। অনেক সংঘারামে বুদ্ধের নিদর্শন ছিল। অর্হৎ ও ভিক্ষুদের স্মারকস্তূপ তো শত শত ছিল। "নগরের বাইরে নবসংঘারাম নামে অদ্ভুত কারুকার্যময় একটা প্রকাণ্ড সংঘারাম আছে। এর ভিতর বুদ্ধমন্দিরে বুদ্ধের একটা জলের পাত্র, একটা দাঁত আর একটা ঝাঁটা রাখা আছে। এই সংঘা-রামের উত্তরে একটা ২০০ ফুট উঁচু স্তূপ আছে।"

এখানকার ভিক্ষুরা হীনযানী হোলেও তাঁরা বেশ জ্ঞানী ছিলেন আর ধর্মগুরুর সঙ্গে তাদের বেশ বনিবনাও হোল। এমন কি, হিউএনচাঙ্ বলেন যে, এখানে প্রজ্ঞাকর নামে এক পণ্ডিতের মুখে কাত্যায়নের 'অভি ধর্ম' আর 'বিভাষাসূত্রের' কঠিন জায়গার ব্যাখ্যা শুনে তিনি খুব উপকৃত হন। তিনি একমাস এখানে বাস কোরে বিভাষা শাস্ত্র অধ্যয়ন করলেন।

বাহ্লীকের পর ধর্মগুরু হিন্দুকুশের ভিতর প্রবেশ করলেন। এই পর্বত অতিক্রম করা তাঁর খুব কষ্টকর হয়েছিল। তিনি বলেন—এইপথ তুষারনদ আর মরুভূমির পথ থেকে দ্বিগুণ কঠিন। সর্বত্র সবসময়েই তুষারের ঘূর্ণী ঝড় বইছে। পর্বতের দৈত্য দানব, দস্যুরা লোককে খুব কষ্ট দেয়।"

অবশেষে হিউএনচাঙ হিন্দুকুশ পর্বত-শ্রেণীর এক উপত্যকায়, বামিয়ানে উপস্থিত হলেন। এখানেও রাজা ও ভিক্ষুরা শহরের বাইরে এসে তাঁকে অভ্যর্থনা কোরে নিয়ে গেলেন।

হিউএনচাঙ বামিয়ানের যে বর্ণনা দিয়েছেন, আধুনিক ভ্রমণকারীরাও তার যথার্থতার সাক্ষ্য দেন। হিউএনচাঙ বলেন—"বামিয়ান যেন পর্বতের গায়ে লেগে আছে আর সেখান থেকে নেমে উপত্যকায়ও বিস্তার করেছে। এর উত্তর দিকে উঁচু দেওয়ালের মত খাড়াই পর্বত। এখানে বহু ঘোড়া ভেড়া চরে। খুব শীতের দেশ। লোকগুলি অর্ধ অসভ্য আর কর্কশ কিন্তু ধর্মে বিশ্বাসী।" আধুনিক আফগানদের পূর্বপুরুষ। তিনি এখানে দশটি সংঘারাম আর বহু হীনযানী বৌদ্ধ দেখেন। উত্তর দিকের দেওয়ালের মতন খাড়া পর্বত খনন কোরে যে অনেক ভিক্ষুদের থাকবার বিহার তৈয়ারী হয়েছিল আর এই দেওয়ালের গায়ে যে দুটি প্রকাণ্ড বুদ্ধমূর্তি গঠিত আছে—যা আজও পথিকদের বিস্ময় উৎপাদন করে, হিউএনচাঙ্ তার কথাও বলেছেন। তিনি মনে করেছিলেন এই দুইটি মূর্তি একটা ১৫০ ফুট আর একটা ১০০ ফুট উঁচু। আসলে মেপে দেখা গিয়েছে যে, এরা আরও বড়—একটা ১৭০ ফুট উঁচু আর একটা ১১৭ ফুট উঁচু। তিনি এখানে একটা ১০০০ ফুট(?) লম্বা শয়ান মহানির্বাণমূর্তি দেখেন।

উল্লিখিত দুই মূর্তির পেছনে যে দেওয়াল-পট আঁকা আছে, তাও তিনি নিশ্চয়ই দেখে-ছিলেন যদিও তার উল্লেখ করেন নি।

বামিয়ান ছেড়ে ৯০০০ ফুট উঁচু পথে কোহিবাবা পার হোয়ে হিউএনচাঙ্ গান্ধারের সুন্দর সমতলে এসে পৌঁছলেন।

এইবার তিনি ভারতবর্ষের সীমানার মধ্যে প্রবেশ করলেন। প্রাচীনকালে হিন্দুকুশই 'হিন্দুদেশের' বা 'ব্রাহ্মণদের' দেশের সীমানা বোলে গণ্য হোত। (ক্রমশঃ)

# হিরন্ময় বাণী

সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত

কি কথা জানাতে চায়
অজস্র সে বুদ্বুদ-শিশুরা?
এলো মেলো ভাষা ফোটে
না জেগে মিলায়।

চটুল চপল যেন জলের ভাষারা
মুছে যায় জলের জোয়ারে।
বলে তবু: ভাষা দাও—
কী-আশ্বাসে দাঁড়াব না হলে?

আছে বেশ প্রচলিত অভ্যস্ত পৃথিবী,
ভাল তারে মনে হয় অনেক সময়ে—
ইতস্তত চলা এই জীর্ণ রোমন্থনে,
পরম সহজ যেন ধ্রুব নিত্যকালে।

তবু-ও টংকার বাজে প্রাণের ধনুতে,
অস্ফুট হিমানীপুঞ্জে লাগে এসে আলোকের তীর—
চেতনা-শোণিত গলে, যেন একবার
ঝরে কিছু প্রদীপ্ত উত্তাপ।

অব্যক্ত বেদনা জাগে প্রাণপঞ্জস্তূপে,
আবর্জনা শৈল চিরি বাহিরায় প্রাণের কোরক—
পরিব্যাপ্ত চেতনার ক্ষণিক ঝলকে—
আচ্ছন্ন হৃদয়ে এক দীপ্ত ভাষা জাগে।

ন্যুব্জদেহ সেইক্ষণে জানে ঋজুতারে—
খঞ্জ পায় চলার আবেগ।
অন্ধ দেখে হিরণ্ময় আলো,
মৃত্যুহীন হিরণ্ময় বাণী।

মানভূম সত্যাগ্রহের প্রথম পর্ব সত্যাগ্রহীদিগের জয়ে এবং সত্যাগ্রহের বিরোধীদিগের ও বিহার সরকারের চেষ্টার ব্যর্থতায় শেষ হইয়াছে। আমাদিগের বিশ্বাস সমগ্র ভারতবর্ষ এই সত্যাগ্রহের পরিণতি সাগ্রহে লক্ষ্য করিয়াছে এবং ইহার ফল কি হইবে তাহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে। সত্যাগ্রহীদিগের উপর যে হিংসাদ্যোতক অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, সত্যাগ্রহকারী পুত্রের পীড়নের সংবাদে তাঁহার মাতার মৃত্যু হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের নানা স্থান ও বিহারের কোন কোন অংশ হইতে বাঙালীরা এই সত্যাগ্রহের সমর্থন করিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। সত্যাগ্রহীরা বাঙলায় কোনরূপ আন্দোলন করিতে নিষেধ করায় বাঙলা হইতে সত্যাগ্রহীরা মানভূমে গমন করেন নাই এবং বাঙলার বহু তরুণের আগ্রহ সংযত রাখিতে বাধ্য হইয়াছে। সুখের বিষয় বিহারীদিগের কোন কোন সম্প্রদায়ের অত্যাচারের প্রতিক্রিয়ায় পশ্চিমবঙ্গে বিহারীদিগের প্রতি .কোনরূপ অনাচারে লোকের ব্যবহার কলঙ্কিত হয় নাই। যে পশ্চিমবঙ্গ গান্ধীজীর অভিপ্রায়ের প্রতি শ্রদ্ধাহেতু 'প্রত্যক্ষ সংগ্রামের' প্রবর্তক শহিদ সুরাবর্দীকেও কোনরূপ অপমানজনক ব্যবহারভাজন করে নাই, সেই পশ্চিমবঙ্গ এবারও প্রকৃত সত্যাগ্রহীর মনোভাবের পূর্ব পরিচয় প্রকট করিয়াছে।

বিহারে বাঙালী সত্যাগ্রহীরা তাঁহাদিগের অনুষ্ঠানে অন্য কাহারও কোনরূপ সাহায্য বা হস্তক্ষেপবিরতি চাহিলেও কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ হইতে শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায় মানভূম গিয়াছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও যাত্রার সংকল্প ঘোষণা করিয়া তাহা প্রত্যাহার করিয়া বলিয়াছেন—যদি বিহারের প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি তাঁহার সহগামী হন, তবেই তিনি মানভূমে যাইবেন। বলা বাহুল্য বিহারের কংগ্রেস কমিটির সভাপতি তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন এবং সুরেশবাবুরও যাওয়া হয় নাই।

এই প্রসঙ্গে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের ব্যবহার যে বিবেচ্য, তাহা অস্বীকার করা সংগত হইবে না। কানপুরে তিনি বলিয়াছেন, সত্যাগ্রহ করা অতুলবাবু প্রমুখ ব্যক্তিদিগের পক্ষে সংগত হয় নাই। তাঁহার উক্তির উত্তরে অতুলবাবু যে বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, যে সকল কারণে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করা হইয়াছে, সে সকল এবং সত্যাগ্রহ করিবার সিদ্ধান্ত সবই রাজেন্দ্রবাবুকে জানান হইয়াছিল: কিন্তু তিনি সে সম্বন্ধে কিছুই না

বিহার সরকার যে বিহারের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করিবার পক্ষপাতীদিগের প্রতি খর দৃষ্টি রাখিবার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দিয়াছেন, তাহাও রাজেন্দ্রপ্রসাদ বাবু অবগত আছেন।

মানভূমে সত্যাগ্রহবিরোধীরা যে ব্যবহার করিয়াছে—তাহা অহিংস বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। পশ্চিমবঙ্গের লোক জিজ্ঞাসা করিতেছে, বিহার সরকার সেই ব্যবহারের প্রতীকার না করায় অনেকেরই দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দিগের সম্বন্ধে মালান সরকারের ব্যবহার মনে পড়িতেছে। দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারত রাষ্ট্র উভয়ই যেমন বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত—তেমনই পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার উভয় প্রদেশই ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত। বৃটিশ সরকার যেমন দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় নির্যাতনে নির্বিকার ভারত সরকার তেমনই বিহারে বাঙালী নির্যাতনে নির্বিকার।

বিহারে সত্যাগ্রহের জয় হইয়াছে। চৌরীচৌরায় লোক অহিংসায় অবিচলিত না থাকায় গান্ধীজী স্বাধীনতা সংগ্রামের আদেশ প্রত্যাহার করিয়াছিলেন। বিহারে বিহারীরা হিংসাপরবশ হওয়ায় বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও বিহার সরকার কি করিবেন, তাহা দেখিবার জন্য ভারত রাষ্ট্রে সর্বত্র বাঙালীরা যে উদগ্রীব হইয়া আছেন, তাহা বলা বাহুল্য। ইহার শেষ কোথায়?

পাকিস্থানে ভারত রাষ্ট্রের হাই কমিশনার ডক্টর সীতারাম কার্যভার গ্রহণ করিবার পরে প্রথম পূর্ব পাকিস্থান পরিদর্শনে যাইবার পথে কলিকাতায় যে মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহার আলোচনা আমরা পূর্বে করিয়াছি। সেই মত ভারত সরকারের মত—তাহাই পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর মত এবং ভারত সরকারের মন্ত্রীত্ব লাভের পূর্বে যে শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পূর্ববঙ্গের হিন্দুদিগকে পশ্চিমবঙ্গে "হোমল্যাণ্ড" [illegible]বার আশা ও প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তিনিও এখন সেই মতই গ্রহণ করিয়াছেন। পূর্ব পাকিস্থান হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে [illegible] ডক্টর [illegible]তারাম মত পরিবর্তন করিতেন, তবে তাহাতে আমরা বিস্ময়ানুভব করিতাম না। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে বৃটেনের মন্ত্রী পিট বলিয়াছিলেন—

"All opinions must inevitably be subservient to times and circumstances and**ly because he holds the same** opinion **for ten or fifteen years,** when the **circumstances under which it was** formed **are totally changed, is instance** to the **most idle vanity."**

কিন্তু আমরা দেখিতেছি, তিনি মতে পরিবর্তন করেন নাই। অবশ্য তিনি স্বীকা করিয়াছেন, পূর্ববঙ্গে হিন্দুদিগের দুর্দশ যে অল্প তাহা তিনি মনে করেন না। তিনি তা দেখিয়াছেন এবং তিনি অত্যন্ত বেদনানুভ করিয়াছেন। কিন্তু গণতন্ত্রের যে ফ অবশ্যম্ভাবী তাহাই হইয়াছে এবং তাহা অত্যা তিক্ত হইলেও তাহা গলাধঃকরণ করা ব্যতী উপায় নাই।

কিন্তু তিনি মনে করেন, সরকারের অধ বাঙলার হিন্দু কর্মচারীরা যে সকলেই পশ্চি বঙ্গে চাকরী লইয়াছেন, তাহার যথেষ্ট কা ছিল না! আর প্রায় ১৫ লক্ষ হিন্দু নরনা যে সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া পূর্ববঙ্গ হই চলিয়া আসিয়াছেন, তাহারও কোন কা নাই! আমাদিগের বিশ্বাস, তিনি বাঙল মোসলেম লীগের শাসনকালীন ইতিহাস ম যোগ সহকারে পাঠ করেন নাই—করিলে তি উহা মনে করিতে পারিতেন না। ডক্টর সীতার কি ভাবিয়া দেখিবেন, কেন—পূর্ববঙ্গের হিন্দ দিগকে আজ তিনি ও ভারত সরকার যা বলিতেছেন, পশ্চিম পাঞ্জাবের স্থানত্যা হিন্দু ও শিখদিগকে কেন তাহা বলা সম্ হয় নাই? আজ যে হরিদ্বারের মত স্থানে পুরাতন দেবালয় প্রভৃতি পশ্চিম পাঞ্জাব হই আগত আশ্রয়প্রার্থীতে পূর্ণ হইয়াছে, আজ কুরুক্ষেত্র আশ্রয়প্রার্থী নগরে পরিণত হইয়া তাহার কারণ কি তিনি বিবেচনা করি দেখিয়াছেন? পূর্ববঙ্গে যে অত্যাচার পৈশাচিক অত্যাচার নোয়াখালী ত্রিপুরা প্রভৃ মুসলমান প্রধান স্থানে হইয়া গিয়াছে, তা বিবেচনা করিয়া—এখনও যে পূর্ব পাকিস্থা হিন্দুর মান সম্ভ্রম—নারীর সতীত্ব নিরা নহে তাহা বিবেচনা করিয়া তিনি কি ম করেন, তথা হইতে আগমনে হিন্দুদি আগ্রহের কারণ নাই এবং তাঁহাদের পক্ষে হিন্দ দিগকে দাসভাবে তথায় বাস করাই গণত একমাত্র লাভ? এসব যদি সত্য হয়, তবে তিনি পূর্ববঙ্গে হিন্দুদিগের স্বধর্মত্যাগে অনিবার্যতার বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিবে পাকিস্থান কখন অস্বীকার করে নাই যে, তা ইসলাম রাষ্ট্র। ইসলাম রাষ্ট্রে ইসলামাতিরি দিগের বাস কিরূপ ভয়াবহ, তাহার প্র মিশরে ও ইরাণে পাওয়া গিয়াছে—ঐ সব দেশের সকল অধিবাসী বাধ্য হইয়া মুসলম হইয়াছে।

ডক্টর সীতারাম বলিয়াছেন—পাকিস্থ

সরকারী চাকরীতে হিন্দু নিয়োগ করিবেন। তিনি স্বীকার করিয়াছেন—তাহা অবিলম্বে হইবে না। তাহা কখন হইবে কি না, সে বিষয়ে আমরা যদি মুসলীম লীগের শাসনকালে বাঙলার অবস্থা স্মরণ করিয়া, সন্দেহ পোষণ করি, তবে কি ডক্টর সীতারাম আমাদিগকে দোষ দিবেন? আর যতদিন সেই অবস্থা না হয়, তত দিনে কি হিন্দুরা পূর্ব পাকিস্থানে হীন জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইবেন না? তাহা কি তিনি অভিপ্রেত বলিয়া বিবেচনা করেন?

গণতন্ত্রের যে রূপ তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা যে ভুল হইতে পারে, তাহা বিবেচনা করা তাঁহার কর্তব্য। গণতন্ত্রের কোন্ নিয়মে সংখ্যালঘিষ্ঠগণ ধর্মাচরণের স্বাধীনতায়ও বঞ্চিত হয়, তাহা কি তিনি বলিয়া দিবেন? হিন্দুর উপর অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইলে যে পাকিস্থানে পুলিসও তাহার প্রতীকার করে না—যশোহরে হিন্দুর গৃহ অধিকৃত হইলে সে সম্বন্ধে খাজা নাজিমুদ্দীনের নির্দেশও যে পালিত হয় না—এ সকল কি কোন নীতির প্ররোচনায় হয় না?

যদি গণতন্ত্রের নীতিই ডক্টর সীতারাম একমাত্র নীতি বলিয়া মনে করেন, তবে তিনি আবার পূর্ব পাকিস্থানের হিন্দুদিগের সম্বন্ধে শিরঃপীড়ানুভব করেন কেন? যদি তাহাদিগের দুর্দশার প্রতীকার করা অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে স্পষ্ট করিয়া বলাই ভাল, গণতন্ত্রের নিয়মে যখন তাঁহারা পাকিস্থানের প্রজা—ভারতবর্ষের বিভাগের কালে যখন তাহাদিগকে পাকিস্থানে রাখা হইয়াছে, তখন তাহাদিগকে পাকিস্থানেই—"রাখিলে রাখিতে পার, মারিলে কে করে মানা?" পাকিস্থানে ত্যক্ত হিন্দুরা ভারত রাষ্ট্রের কাছে প্রতীকার ও আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছেন—তাহা তাহাদের অধিকার বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন। যদি ভারত রাষ্ট্র তাহা অধিকার বলিয়া স্বীকার না করেন, তবে তাঁহাদিগকে সদুপদেশ দিবার অধিকার কি ভারত রাষ্ট্রের আছে বা থাকিতে পারে?

ডক্টর সীতারাম পূর্ব পাকিস্থানের হিন্দুদিগকে বলিয়াছেন, তাঁহারা পাকিস্থানের প্রজা—পাকিস্থানে থাকিয়া আন্দোলন করুন। পাকিস্থানের হিন্দুরা বাঙালী—তাঁহারা আন্দোলনের উপযোগিতা অবগত আছেন—কারণ, বাঙালীরাই ভারতবাসীকে অধিকারের জন্য আন্দোলন করিতে শিখাইয়াছিলেন। কিন্তু ইসলাম রাষ্ট্রে কাফেরের পক্ষে আন্দোলন করা কিরূপ বিপজ্জনক, তাহাও বিবেচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন। পাকিস্থান সরকার মুসলমানাতিরিক্ত অধিবাসিগণের আন্দোলন যে রাষ্ট্রদ্রোহিতা বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহার পরিচয়ের অভাব নাই।

আমরা ডক্টর সীতারামকে ও ভারত সরকারকে এই সকল বিবেচনা করিয়া পূর্ব পাকিস্থানে হিন্দুদিগের সম্বন্ধে কর্তব্য নির্ধারণ করিয়া সেই কর্তব্য পালন করিতে অগ্রসর হইতে অনুরোধ করিতেছি। তাঁহারা কি সেই কর্তব্য পালন করিতে অবহিত হইবেন? তাহাই জিজ্ঞাস্য।

পূর্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয়প্রার্থী কয়টি হিন্দু পরিবারকে আন্দামানে প্রেরণ করা হইয়াছে। তাঁহাদিগকে প্রেরণের পূর্বে ও পরে আন্দামানে লোকের বাসের ও অর্থার্জনের সুবিধা সম্বন্ধে অনেক প্রচারকার্য সরকার পরিচালিত করিয়াছেন। তাঁহাদিগের যাত্রার সময় পশ্চিমবঙ্গের প্রধান-সচিব তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন—তাঁহারা বিদেশে যাইতেছেন না—কলিকাতা হইতে শিলং যাত্রার মত ভারত রাষ্ট্রের এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতেছেন। আমরা তখনই বলিয়াছিলাম, আন্দামান যদি পশ্চিমবঙ্গের অংশ করা হয় এবং তথায় অধিবাসীরা পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে সদস্য নির্বাচনের অধিকার লাভ করেন, তাহা হইলেই তথায় বাঙালীরা মনে করিতে পারিবেন—তাঁহারা বিদেশে গমন করেন নাই। সে যাহাই হউক, তাঁহারা তথায় উপনীত হইবার পরে অভিযোগ পাওয়া যাইতেছে, তাঁহাদিগকে যে সকল সুবিধা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল, তাঁহারা তথায় যাইয়া দেখিতেছেন, তাঁহাদিগকে সে সকল প্রদান করা হইতেছে না। তাঁহারা এখন আর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রজা নহেন, সুতরাং তাঁহাদিগের সম্বন্ধে আর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোন দায়িত্ব নাই—একথা অবশ্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার বলিতে পারেন। কিন্তু দায়িত্ব যদি না থাকে, তথাপি কর্তব্য যে নাই, তাহা বলা যায় না। কারণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারই—পশ্চিমবঙ্গে তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিতে না পারিয়া এবং বিহারের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলও না পাইয়া তাঁহাদিগকে আন্দামানে যাইতে পরামর্শ ও প্ররোচনা দিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, যাঁহাদিগের সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে, তাঁহারা বাঙালী—কংগ্রেসের দ্বারা গৃহীত বঙ্গবিভাগের ফলে বাধ্য হইয়া পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গে স্থানের এবং সেইজন্য খাদ্যোপকরণের অভাবই পূর্ববঙ্গ হইতে আগত ব্যক্তিদিগকে স্থানদানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রধান আপত্তি। এই আপত্তির কারণ কিন্তু সর্বতোভাবে স্বীকার্য নহে। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দ হইতে ভারত সরকার আর বিদেশ হইতে খাদ্যোপকরণ আমদানী করিবেন না স্থির করিয়াছেন। তাঁহারা সেইজন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ঐ সময়ের মধ্যে উৎপন্ন খাদ্যশস্যের পরিমাণ ৪ লক্ষ টন বাড়াইবার ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গে এখন যে প্রায় ৩২ লক্ষ টন খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়, তাহার উপর ৩৪ লক্ষ টন বাড়িলে পশ্চিমবঙ্গ খাদ্যদ্রব্য সম্বন্ধে স্বাবলম্বী হইতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার নাকি স্থির করিয়াছেন—১৯৪৯-৫০ খৃষ্টাব্দেই তাঁহারা খাদ্যশস্যের পরিমাণ একলক্ষ ৩৩ হাজার টন বাড়াইবেন এবং পরবৎসর আরও ২ লক্ষ ৬৭ হাজার টন উৎপাদন করিবেন। পশ্চিমবঙ্গের সমধিক উর্বরতাসম্পন্ন অংশে উৎকৃষ্ট বীজ ও সার প্রদানের ব্যবস্থা হইবে; কতকগুলি ছোট ছোট সেচের খালও খনিত হইবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে খাদ্যশস্যোৎপাদনের জন্য যে প্রায় কোটি টাকা পাইবার আশা করেন—তাহাতেই ঐ সকল খাল খনিত হইবে। তদ্ভিন্ন অনেক 'পতিত' জমী 'উঠিত' করিবার ব্যবস্থা করা হইবে। এই পরিকল্পনা যদি কার্যে পরিণত হয়, তবে ভালই। কিন্তু ইহা যদি সম্ভব হয়, তবে এতদিন কেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেদিকে মনোযোগ দেন নাই, তাহা বিস্ময়ের বিষয়।

কলিকাতায় 'ছেলে ধরার ভয়' দেখা দিয়াছে। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে একবার এইরূপ 'ভয় দেখা গিয়াছিল। সেবারও স্থানে স্থানে হাঙ্গামায় নিরপরাধ লোক সন্দেহে প্রহৃত হয়। সেই সময়—পূজার পূর্বে শহরে স্বেচ্ছাসেবক দল বিদেশী পণ্য ক্রয়ে লোককে বিরত করিতেছিল। সেই সময় 'স্টেটস্‌ম্যান' কতকগুলি জনরব প্রকাশ করেন। সে সকলের একটি এই যে,—য়ুরোপীয় বণিক সভা ও সরকার এই গুজব রটাইতেছেন—উদ্দেশ্য, লোক উত্তেজিত হইয়া হাঙ্গামা করিবে এবং সেই ছল ধরিয়া সরকার পুলিশের বহর বাড়াইয়া স্বেচ্ছাসেবকদিগকে শাসন করিবেন—ফলে বিদেশী পণ্য বিক্রীত হইবে। এবার সেরূপ কোন জনরব নাই। কোন কোন ক্ষেত্রে চোর ধরাও পড়িয়াছে। তাহারা কি কি উদ্দেশ্যে ছেলেমেয়ে চুরি করে, তাহা কিন্তু জানা যায় নাই। কলিকাতায় এখন বহু লোকসমাগম হইয়াছে—বালকবালিকাদিগের পথ হারানও অধিক হইয়াছে। সেবার কিন্তু সন্দেহে লোক প্রহৃত হইয়াছিল—নিহত হয় নাই এবার তাহাও হইয়াছে ও হইতেছে। বড় বড় যুদ্ধের পরে সমাজে নিষ্ঠুরতা বৃদ্ধি পায়। "ত্রিশ বৎসরের যুদ্ধে" য়ুরোপীয় সমাজ মানুষের দুঃখকষ্টে কিরূপ উদাসীন হইয়াছিল, তাহার পরিচয় ইতিহাসে আছে। হয়ত বাঙলায় যুদ্ধ—মোসলেম লীগের শাসনকালীন অত্যাচার ও অনাচার প্রভৃতি মানুষকে নির্মম করিয়াছে এবং অন্নাভাব তাহাতে সহায় হইয়াছে। সমাজের শিক্ষিত স্তরকেও যে দুর্নীতির সঙ্গে সঙ্গে শৃঙ্খলা সম্বন্ধে অমনোযোগী করিয়াছে তাহার প্রমাণাভাব নাই। ছাত্রদিগের পরীক্ষাকালে অসদুপায় অবলম্বন ভয়াবহ ব্যাপকতা লাভ করিয়াছে এবং তাহাতে বাধা দিয়া পর্যবেক্ষকের ছাত্রদিগের দ্বারা প্রহারে জর্জরিত হওয়াও যেন আর অস্বাভাবিক ব্যাপার নহে। সমাজের পক্ষে এই অবস্থা ভয়াবহ। পশ্চিমবঙ্গ সরকার লোককে এই

সম্পর্কে যথেচ্ছা লোকের প্রতি অত্যাচার করিতে নিষেধ করিয়া যে বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন, সকলেই তাহার সমর্থন করিবেন।

নিম্নলিখিত সংবাদে আমরা যারপর নাই বিস্মিত হইয়াছি—

"পশ্চিমবঙ্গের কৃষি-বিভাগ নাকি হরিণ-ঘাটায় গোশালা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রথম কিস্তিতে ৫০০ দুগ্ধবতী গাভী ক্রয় করিবেন, স্থির করিয়াছেন। এই ৫ শত গাভী ক্রয় করিবার জন্য কৃষি বিভাগের কয়জন চাকরীয়া শীঘ্রই পূর্ব পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে গমন করিবেন। বর্ষার পূর্বেই সরকার নিয়মিতভাবে দুগ্ধ সরবরাহ করিতে পারিবেন, আশা করেন। সরকারের হিসাবে যে দুগ্ধ পাওয়া যাইবে, তাহার কতকাংশ কাঁচড়াপাড়া যক্ষ্মা হাসপাতালে দেওয়া হইবে এবং অবশিষ্ট অংশ কলিকাতায় ও শহরতলীতে বিক্রয় করা হইবে।

অন্যান্য প্রদেশ হইতে গরু কিনিলে অনেক টাকা হাতফের হয় বটে, কিন্তু সে ক্রীত গাভী বাঙলার উপযোগী হইবে বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই। যে সকল কারণে পাঞ্জাব, কাশী প্রভৃতি স্থান হইতে আনীত গাভী কলিকাতায় আসিলে আবার গর্ভবতী হয় না—বাঙলার জলবায়ুর প্রভাব সে সকলের অন্যতম। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে মেজর ভন ও মেজর মিস্ত্রগার এদেশে গোশালা সম্বন্ধে যে প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এবং সরকারই যাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে বলা হইয়াছিল, বৎসর বৎসর বাহির হইতে কলিকাতায় যে সকল গাভী আনীত হয়, সে সকল যে সকল কারণে দুগ্ধ বন্ধ করিলেই কশাইদিগকে দেওয়া হয়—সে সকলের অন্যতম—

"From the effects of climate they fail to hold when put to the bull."

আমাদিগের বিশ্বাস পশ্চিমবঙ্গের কৃষি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ুর পরিবর্তন সাধন করিতে পারিবেন না। তাঁহারা যদি ব্ল্যাকউডের রিপোর্ট পাঠ করেন, তবে জানিতে পারিবেন—বাঙলার গরু বিহার ও যুক্তপ্রদেশের গরু হইতে ভিন্নজাতীয় নহে—জলবায়ুর প্রভাবে পারিপার্শ্বিক অবস্থায় ক্ষুদ্রকায় হইয়াছে—দুগ্ধও কম দেয়। কাজেই মনে করা অসংগত নহে যে, যে ৫ শত গাভী আনা হইবে —সেগুলিকে শেষে হত্যা করা হইবে। ফলে ঐ সকল দেশেও গাভীর মূল্য বর্ধিত হইবে। সে কথাও পূর্বোক্ত পুস্তকে লিখিত হইয়াছিল—

"This rapid exhaustion of stock ends in scarcity of supply and consequent exhaustion of stock in the breeding districts".

পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব বুঝিতে হইলে মনে রাখা প্রয়োজন—বিহারে যে 'টোলারস' ব্রীড' গরু উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা বিহারে দৈনিক ১০।১২ সের দুধ দিলেও বাঙলায় ৮ সেরের অধিক দেয় না।

পাঞ্জাবের যে গরু 'মণ্টগমারী' জাতীয় বলিয়া পরিচিত, তাহা পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে অনুপযোগী। এ বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মত কি গৃহীত হইয়াছে? সানিয়াল গাভী বাঙলার উপযোগী না হইলেও সানিয়াল ষণ্ড ব্যবহার করিয়া বাঙলার গরুর উন্নতি সাধন সম্ভব হইয়াছে।

আমরা মনে করি, যদি বাঙলার উৎকৃষ্ট গাভী ও উপযুক্ত (সানিয়াল বা নেলোর বা হিসার বা রোটাক) ষণ্ড লইয়া পরীক্ষা করা হয়, তবে যে বাঙলার গাভী তৃতীয় পর্যায়ে দৈনিক ১০ সের পর্যন্ত দুধ দিতে পারে, তাহা দিঘাপাতিয়ার পরলোকগত কুমার শরৎকুমার রায় দেখাইয়া গিয়াছেন।

## কুয়োয় পড়া খুকুর উদ্ধার

এ মাসের ৮ই তারিখে ক্যালিফোর্ণিয়ার স্যান মারিনো বলে যায়গাটিতে একটি খুকুকে নিয়ে বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। ব্যাপারটা হচ্ছে ঐদিন সন্ধ্যায় সাড়ে তিন বছরের খুকু ক্যাথি ফিসকাস্ তার ছোট্ট দিদি আর বোনদের সঙ্গে খেলতে খেলতে হঠাৎ পড়ে যায় ৯৪ ফুট গভীর এক মুখ খোলা জনহীন সরু নালী বা কূপের মধ্যে। এই খবর জানা যেতেই সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় তাকে উদ্ধারের চেষ্টা। তার উদ্ধারের চেষ্টায় তিন দিন ধরে নানারকম যন্ত্রপাতির সাহায্যে মাটি কেটে কেটে নালাটা যেখানে বেঁকেছে সেখানে পৌঁছাবার চেষ্টা চলে—ও মেয়েটি যাতে বেঁচে থাকে সেজন্য নলের মধ্যে অনবরত অক্সিজেন গ্যাস দেওয়া চলতে থাকে। কয়েকদিন ধরে শত শত লোক তার উদ্ধার চেষ্টা করছে ও হাজার হাজার লোক গভীর উৎকণ্ঠা নিয়ে ভীড় করছে বলে জানা গেছে। তবে খুকুটিকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে কি না, এখনও সে খবরটা এসে পৌঁছয় নি। তবে যাঁরা এই উদ্ধার কার্য চালাচ্ছেন—তাঁরা এই আশাই প্রকাশ করেছেন যে মেয়েটিকে খুব সম্ভব জীবিতই উদ্ধার করা যাবে, কারণ নালার মধ্যে অনবরত অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে। ছোট্ট সাড়ে তিন বছরের একটি খুকুকে এই বিপদের মুখ থেকে উদ্ধার করে আনার জন্য সারা স্যানফ্রান্সিসকো শহরে যে কতখানি চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে তা সঙ্গের উদ্ধার কার্যক্ষেত্রের ছবিটি দেখলেই বুঝতে পারবেন। আর একটি ছবিতে দেখানো হয়েছে ক্যাথি ফিসকাসের আসল চেহারাটি ও পাশের নলকূপটির আকার এবং মাটি কেটে কেটে অত নীচে কিভাবে যাওয়া হচ্ছে—তারই একটা নক্সা। বেচারা ক্যাথি জীবিত অবস্থায় উদ্ধার লাভ করুক—এই প্রার্থনাটুকু আমরা তো করছিই, আর আপনারাও এই প্রার্থনা করবেন।

কুয়োয়-পড়া খুকু ও তাকে উদ্ধারের আয়োজন

খুকুকে উদ্ধারের জন্য কুয়ো কাটা হচ্ছে

## অবসরের সংগী সাপ

অস্ট্রিয়ার এক সার্কাসের খেলোয়াড় পরিবারভুক্ত রুডলফ রেবারনিগ্-এর অবসর-সময়ের সংগী হচ্ছে একটি পাইথন সাপ। তিনি যখন বাড়ীতে বসে চিঠিপত্তর লেখেন বা হিসেবের খাতাপত্তর দেখেন, তখন সাপটি তার ঘাড়, গলা, দেহটি বেড় দিয়ে দিয়ে ঘুরে বেড়ায়—অথচ কোনও ক্ষতি করে না। রেবারনিগ সাহেবের এই সাপটিকে ধার নিয়েই মরিক্কা রোয়েক্ নৃত্যশিল্পী সর্পনৃত্য দেখান।

গায়ের গহনা নয় সাপ

## লেজ ধরেই বাঘ মারা

সম্প্রতি পূর্ণিয়ায় ফরবেশগঞ্জ থেকে শ্রীযুত অমল কুণ্ডু আমাদের জানিয়েছেন যে সেখানকার ফরবেশগঞ্জ টাউনে অভিনবভাবে বাঘ শিকার করা হয়েছে। ব্যাপারটা হচ্ছে গত ১৩ই এপ্রিল বেলা ৯টা ১০টার সময় ৬০ বছরের বৃদ্ধ এক ব্যবসায়ী দেখেন তাঁর গুদামের মাটির টালির দেওয়ালের কোণের একটি ছোট ফাঁকের মধ্য দিয়ে যেন একটা

বাঘের ল্যাজ বেরিয়ে রয়েছে। তিনি টুঁ শব্দটি না করে চট্ করে বাঘের ল্যাজটি শক্ত করে চেপে ধরেন এবং প্রাণপণ শক্তিতে সেটিকে টানার সঙ্গে সঙ্গেই চীৎকার শুরু করেন, তাঁর চীৎকারে আরও কয়েকজন এসে পড়েন তখন চার পাঁচ জনে মিলে বাঘটির ল্যাজ ধরে টানতে থাকে, এবং কয়েকজন সড়কী বল্লম প্রভৃতি নিয়ে বাঘটিকে খোঁচা মারতে আরম্ভ করেন। বাঘটিও প্রাণপণে গর্জন শুরু করে। পাঁচ সাত মিনিট এমনি-ভাবে টানাটানি চলার পর বাঘের গর্জন থেমে যায়, তখন বন্দুক এনে ঐ ফাটলের ফাঁক দিয়ে দুবার গুলী করা হয়। পরে বাঘটিকে বার করে আনা হয়, অনেকে মনে করেন যে গুলী খাওয়ার আগেই বাঘটি পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়। এই ব্যাপারে সারা শহরে নাকি একটা সাড়া পড়ে গেছে। তাতো যাবার কথাই কি বলেন!

### কাগজের বালিশ!

বালিশ ত' তুলোরই হয়, বড় জোর হাওয়ায় ভর্তি; কিন্তু আজকাল আবার কাগজেরও বালিশ তৈরী হচ্ছে। ইংলণ্ডে যাঁরা রাত্রে রেলে ভ্রমণ করেন তাঁদের জন্য রেল কর্তৃপক্ষ এই বালিশের ব্যবস্থা করছেন। বালিসগুলির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ উভয় দিকেই ১৫ ইঞ্চি, ধবধবে সাদা ভাল কাগজের তৈরী, পাতলা কাগজের কুঁচি দিয়ে ভর্তি করা থাকে। সমস্ত বালিসটি সেলোফোন মোড়া থাকে। মাথায় দিলে কোনোই অসুবিধা হয় না। দাম, প্রত্যেকটি বালিসের এক শিলিং মাত্র; স্টেশনে ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর কাছে কিনতে পাওয়া যায়। দামটা কিছু কম করলে আমাদের দেশেও ভালই বিক্রি হবে মনে হয়।

শিম্পাজীর সাহেবিয়ানা

কাগজের বালিশ

### শিম্পাঞ্জীর ঔষধ অনুরাগ

সম্প্রতি খবর পাওয়া গেছে, লণ্ডনে চিড়িয়াখানায় স্যালি, সো-সো, কোস্পো আ সুসান নামে যে চারিটি শিম্পাজী আছে—তা নাকি ভারী বুদ্ধি রাখে, যা কিছু তাদে শেখানো যায়, তাই তারা চটপট্ শিখে নেয় টেবিলে বসে ছুরি কাঁটা নিয়ে তারা এখ খানা খেতে শিখছে, শোনা যাচ্ছে জনসাধার খুব শিগ্‌গিরী তাদের খানা খাওয়ার কায় দেখতে পাবেন। তখন নিশ্চয় চারধারে ভী জমে যাবে। কিন্তু ইদানীং আরও এক ব্যাপারে—শিম্পাঞ্জীগুলি সকলের দৃ আকর্ষণ করেছে। সেটা হচ্ছে রোজ সকা তাদের চামচে করে ওষুধ খাওয়া। সক হলেই তারা যে যার ওষুধ খাওয়ার চামচ নিয়ে অপেক্ষা করে থাকে, কখন তাদে রক্ষক—মিঃ এল জি স্মিথ এসে ওষুধ দে দেবেন। যতক্ষণ না মিঃ স্মিথ এসে তাদে চারজনকে ওষুধ খাওয়ান—ততক্ষণ তারা না রীতিমত অস্বস্তি বোধ করে। অর্থাৎ বে বোঝা যাচ্ছে শিম্পাজী চতুষ্টয়কে ওষ খাওয়ার বাতিকে পেয়েছে।

অনুবাদ সাহিত্য

# যদি ফিরে আসে

**আঁদ্রে মরুয়া**

আগস্ট ১৯৪৫। ফরাসী যুদ্ধবন্দীরা ফিরছে জার্মেনী থেকে। রাত্রির অন্ধকার ভেদ ক'রে একটানা গতিতে ছুটেছে মিলিটারী স্পেশাল। তারই এক কামরায় আমাদের কাহিনীর শুরু। কাহিনী বললে ভুল হবে; ঘটনাটি সত্য।

গাড়ি সীমান্ত পার হয়ে এসেছে। পাঁচ বৎসর পর সৈনিকরা ফিরে এল আপন দেশে। ক্লান্ত হ'লেও তারা উৎফুল্ল। বাড়িঘরের কত কথাই না মনে পড়ছে। সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে একখানা হাসি মুখ—কারো প্রিয়ার, কারো বা প্রণয়িনীর। পাঁচ বৎসর—দুই একটি দিন নয়। এত দিন কি করে কেটেছে তার? আজও কি সে তেমনি তাকে ভালবাসবে? আবার কি পুরানো দিনের মত সংসারী হয়ে বসা যাবে? এমনি সব কথা বার বার মনে আসছে। কেউ-বা বেশ আশান্বিত—হাসি-খুশি। কাউকে বা দেখাচ্ছে কিছুটা উদ্বিগ্ন।

ট্রেনের যে কামরার কথা বলছিলুম তার এক কোণের দিকে বসেছে রেনো লিমারি। পেরিগর্দের একটি ছোট শহর সার্ডিলে তার বাড়ি। বেশ লম্বা, কিছুটা রোগাটে চেহারা কিন্তু চোখ দুটি ভা-রি উজ্জ্বল, মুখখানাও খুব সতেজ। পাশের লোকটির সাথে সে কথা বলছিল।

"স্যাতুনিন, তুমি কি বিয়ে করেছ?"

"কেন? নিশ্চয়ই বিয়ে করেছি। যুদ্ধের দু বছর আগে হবে।"

ছোট হাসিখুশি লোকটি পকেট থেকে বের করলে একখানা তেলের দাগ লাগা ছেঁড়া ফটো। বললে—

"এই দেখো আমার মার্থা"।

"বেশ সুন্দরী। আচ্ছা ভাই, এই যে ফিরে চলেছ তোমার মনে কোন দুর্ভাবনা আসছে না?"

"দুর্ভাবনা! বা রে! দুর্ভাবনা কেন?"

"দুর্ভাবনা—কারণ অমন সুন্দরী মেয়ে; কারণ এতদিন সে একা ছিল; কারণ আরও কত লোক আছে।"

"না! হাসালে ভাই। আমি আর মার্থা—এর মাঝে আবার অন্যলোক? অসম্ভব। দুটি বছর কি সুখেই না কেটেছে। তারপর যুদ্ধ বাধলো; আমারও চলে আসতে হলো। কিন্তু এই পাঁচ বছর ধরে কত চিঠিই না সে লিখেছে। তা যদি দেখতে—।"

"ওঃ চিঠি—চিঠিতে কিছু বোঝা যায় না। আমি যে সব চিঠি পেয়েছি তাও—। কিন্তু তবুও—।"

"কেন? তুমি কি তাকে বিশ্বাস কর না?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই বিশ্বাস করি। অন্ততঃ অন্য কারও চেয়ে কম করি না। আর বিয়ের পর ছ বছর কেটেছে কোন দিন এতটুকু অসন্তোষ ছিল না।"

"তবে?"

"তবে কিনা আমার নিজের উপরই বিশ্বাস নেই। নিজের সৌভাগ্যকে আমি বোধ হয় সৌভাগ্য বলে মনে করতে পারি না। আমার কেবলই মনে হয় এত সুখ আমার মত হতভাগার কপালে টিকতে পারে না। হেলেনের মত সুন্দরী, বুদ্ধিমতী, লেখাপড়া জানা মেয়ে—আমি তার যোগ্যই নই। তাইতো ভাবছি—যুদ্ধের হিড়িকে কত লোক এসেছে। তাদের অনেকে হয়তো আমার চেয়ে কত ভাল। গাঁয়ের সব চেয়ে ভাল মেয়েটি কি তাদের চোখ এড়িয়েছে?"

"বেশ তো। হল কি তাতে? সে যদি তোমাকে ভালবাসে—।"

"নিশ্চয়ই সে ভালবাসে। আর ভালবাসা বলতে? কিন্তু ভেবে দেখো—পাঁচ পাঁচটি বছর কেটে গেছে। সারডিলে তার আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই। সম্পূর্ণ একাই তাকে কাটাতে হয়েছে। এমন অবস্থায়—।"

"না ভাই, তুমি ভুল করছ। আমি জোর করে বলতে পারি তুমি ভুল করছ। আর কিছু যদি হয়েই থাকে তাতেই বা কি? এই ধর, কেউ যদি আমায় বলে যে মার্থা—। আমি তক্ষুণি তাকে থামিয়ে দেব। বলব, দেখ—মার্থা আমার স্ত্রী। যুদ্ধের সময় বেচারি একা থাকত। এখন আবার শান্তি ফিরে এসেছে; আমরাও ফিরে যাব আমাদের পুরানো জীবনে।"

"আমি কিন্তু তা পারব না। গিয়ে যদি শুনি যে—"

"কি করবে তা হ'লে? ওকে খুন করবে?"

"না। খুন করব কেন? একটা মন্দ কথাও বলব না। আমি শুধু দূরে চলে যাব। আমার টাকা, পয়সা, বাড়ী, [illegible] সব ওকে দিয়ে দেব। ব্যবসা কিছু জানি। তাই সম্বল করে অনেক দূরে কোথাও চলে যাব। নামটা বদলে দিলে কেউ আর আমার খোঁজ পাবে না। একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে চলে যাব।"

গাড়ীর একটানা গতির দোলায় সবার চোখে ঘুম নেমে এল। বাহিরে নিঝুম নিবিড় রাত্রি। কামরার ভেতর শুধু একা জেগে রইল রেনো।

এদিকে সরকারী দপ্তর থেকে যখন সারডিলের মেয়রকে সংবাদ দেওয়া হল যে, রেনো লিমারি ২০শে আগস্ট এসে পেঁাছবে, তিনি নিজেই গেলেন রেনোর বাড়ী। মাদাম বাগানেই কাজ করছিলেন। মেয়র যেয়ে বললেন—

"একান্ত সুসংবাদ, মাদাম। আপনার স্বামী বাড়ী ফিরছেন ২০শে তারিখ। অবশ্য জানি কি অভাবেই আপনাকে দিন কাটাতে হচ্ছে। আর আমাদের সবারইতো ঐ এক অবস্থা। তবু এমন দিনে একটু কিছু বিশেষ আয়োজন—।"

"হাঁ, নিশ্চয়ই। রেনো ফিরে আসছে এমন দিনে—। আপনি ২০শে বল্লেন না? আচ্ছা, কখন এসে পেঁাছবে বলতে পারেন?"

"তা দুপুরতো হবেই।"

"ধন্যবাদ! শত ধন্যবাদ! কী বলে [illegible] আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাব!"

২০শে আগস্ট ভোর না হতেই উঠে পড়[illegible] হেলেন। রাত্রিতে চোখে ঘুমই আসেনি। আ[illegible] রেনো ফিরে আসবে। কালকের দিনটা কেটে[illegible] ঘর দরজা পরিষ্কার করতে। মেজেটা ভাল করে ধুয়েছে, জানালার পর্দায় পরিয়েছে নতুন ফিতে, খাবার টেবিলটাকে ঘসে মেজে একেবারে তক্‌তকে করেছে। কিছুটা সময় গেছে একটি পরবার মত জামা খুঁজতে। নীচে অবশ্য সিল্কই পরা ভাল। কিন্তু—। রেনো সব চেয়ে পছন্দ করত—সেই নীল জংলা ছিটের জামাটি। পুরানো জামা। পরে দেখলে কোমরটা বড় বেশি ঢিলে হয়ে গেছে। শরীরটাই শুকিয়ে গেছে কিনা। শেষে ঠিক হলো যে তার নিজের হাতের তৈরী কালো জামাটিই পরবে। একটা রঙীন কলার ও রঙীন বেল্ট হলেই বেশ মানাবে। জামার পর্ব শেষ করে তাকে যেতে হয়েছিল নাপিতের দোকানে। রেনো যে কোঁকড়ানো চুল ভালবাসে। রাত্রিতে একটা জাল পরে নিয়েছিল যাতে চুলটা আবার না নষ্ট হয়ে যায়।

খাবারগুলোও হওয়া চাই ঠিক রেনোর পছন্দ মত। অবশ্য যুদ্ধের ফলে বাজারে অনেক কিছুই দুর্ঘট। ডিম ঘরেই আছে। বাড়ীর

মুর্গীর টাট্কা ডিম আর রেনো ত তার তৈয়ারী অমলেটের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আলু ও মাংস। আগের দিনই একটা মুর্গী সাঁতলে রাখা হয়েছে।" কিন্তু চকোলেট? না, চকোলেট না হলেই চলবে না। ওটাই তো রেনো সব চেয়ে বেশি পছন্দ করে। সেদিন তার এক বন্ধু বলেছিল বটে যে পাশের গাঁয়ে একটা দোকানে লুকিয়ে চকোলেট বিক্রী হয়। সেখানেই যেতে হবে। আটটায় বের হলে সাইকেল করে নটায় ফেরা যাবে নিশ্চয়। থাকবে শুধু রান্নার যা বাকী। এখন জিনিসপত্র সব সাজিয়ে-গুছিয়ে রেখে গেলে এসে চট্ করে রান্নাটা সেরে নেওয়া যাবে।

টেবিলটাই সাজানো যাক্। সাদা ও লালে কাজ করা টেবিল ক্লথ—সেই যেখানা বিয়ের পর প্রথম তারা ব্যবহার করেছিল। সেই ছবি আঁকা বেগুনে রঙের প্লেটগুলো—যা দেখে রেনো হাসিতে ফেটে পড়তো। আর কিছু ফুল। হাঁ ফুল সে বড় বেশি ভালবাসে আর অমন করে ফুল সাজাতেও নাকি কেউ জানে না। তোড়াটি হলো তিন রঙের—সাদা ডেইজি, লাল পপি আর সবুজ কর্ণফ্লাওয়ার।

এখন বেরোতে হয়। সাইকেল নিয়ে বাইরে থেকে জানালা দিয়ে হেলেন একবার ঘরটি দেখে নিলে। হাঁ, ঠিক হয়েছে। এতকাল পর বাড়ী ফিরছে বেচারা। এসে দেখবে সবই আগেকার মত আছে। এতটুকু কিছু বদলায়নি—সব কিছু তার মনের মত সাজানো। জানালার কাছে আসতেই ঘরের আয়নায় ফুটে উঠলো তার ছবি। একটু রোগা অবশ্য সে হয়েছে। কিন্তু এখনও তাকে সুন্দরী তরুণীই বলতে হবে বই কি?

আটটা বাজল। আর দেরী নয়। খুশি মনে একটা গান গাইতে গাইতে হেলেন সাইকেল ছুটিয়ে দিলে পাশের গাঁয়ের পথে।

সারডিল শহরটি ছোট। তারও একেবারে শেষ সীমায় লিমারিদের বাড়ী। তাই ওপথে লোকজনের যাতায়াত প্রায় নেই। তখন সাড়ে আটটার মত হবে। ওপাড়ার একজন দেখল যে রেনো ধীরে ধীরে বাড়ীর দিকে চলেছে।

বাগানে ঢুকেই রেনো নীচু গলায় ডাকল—"হেলেন।" কেউ সাড়া দিল না। এবার সে বেশ চেঁচিয়ে উঠল—"হেলেন"—"হেলেন"—"হেলেন"!

কোন সাড়া এল না। রেনোর কেমন ভয় হল। আর একটু এগিয়ে গেল। সেখান থেকে জানালা দিয়ে ঘরের ভেতরটা দেখা যায়। রেনো দেখল—খাওয়ার টেবিল সাজানো—দুজনের মত। মাথাটা যেন দুলে উঠল। দেয়াল ধরে সে সামলে নিল নিজেকে। "ওঃ সত্যি সাথী জুটিয়ে নিয়েছে তা হ'লে।"

একটু পরেই ফিরে এল হেলেন। ওপাড়ার সে লোকটি তাকে বলল—"ওগো [illegible]

রেনোকে দেখলুম তাড়াহুড়ো করে চলেছে। কত ডাকলুম, সাড়াই দিল না—ছুটে বেরিয়ে গেল।"

হেলেন কিছু বুঝতে পারল না; জিগ্যেস করল—"ছুটে বেরিয়ে গেল? কোন দিকে গেল বলতো।"

"অই তো ওদিক পানে—থিবিয়ার্সের দিকে হবে।"

হেলেন ছুটল মেয়রের আফিসে। বলল তাঁকে—"রেনোর মন ভা-রি খুঁতখুঁতে। সে দেখেছে দুজনের মতো করে খাওয়ার টেবিল সাজানো। অমনি তার মনে সন্দেহ হয়েছে। সে তো জানে না তারই জন্য এ আয়োজন। বড় একগুঁয়ে লোক। কী করে বসে কে জানে। যে করেই হোক রেনোকে খুঁজে ফিরিয়ে আনতেই হবে।" কিন্তু মেয়র কিছুই জানে না। তিনি থিবিয়ার্সে লোক পাঠালেন। সেখানেও রেনোকে পাওয়া গেল না। পুলিশে খবর দেওয়া হলো। তারাও কোন খোঁজ পেল না।

সারা রাত জেগে হেলেন একা বসে রইল সেই সাজানো টেবিলের পাশে। ভোরের ফুল শুকিয়ে ঝরে পড়ল রাত্রির গরমে।

তিন বৎসর কেটে যায়। আজও হেলেন প্রতীক্ষায় আছে যদি সে ফিরে আসে।

অনুবাদক—শ্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী


## পালনীয়

এখনই প্লেগের টিকা নিন।
আপনার ঘরবাড়ী, উঠান, বাগান ও গুদাম পরিষ্কার করুন। তরল ডি-ডি-টি, ব্লিচিং পাউডার বা চূণ ছড়িয়ে আপনার ঘরদোর জীবাণুমুক্ত করুন।
ইঁদুর থেকেই প্লেগের উৎপত্তি। ইঁদুরের গর্তগুলো বুজিয়ে ফেলুন; কল বা ফাঁদ পেতে ইঁদুর মারুন। মৃত বা মৃতপ্রায় ইঁদুর ন্যাকড়া বা কাগজ দিয়ে ঢেকে রাখুন এবং কেরোসিন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলুন।

যদি দেখেন বা শুনতে পান যে, আপনার এলাকায় একসঙ্গে অনেকগুলো ইঁদুর মরছে কিংবা কোন লোক প্লেগে আক্রান্ত হয়েছে, তাহ'লে আপনার ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন এবং নিকটবর্তী টিকা দেওয়ার কেন্দ্রে অবিলম্বে খবর দিন।

আপনার বাড়ীর ময়লা, উচ্ছিষ্ট প্রভৃতি টিন বা বালতীতে ঢেকে রাখুন এবং কর্পোরেশনের লোক ময়লা সরাতে আসার আগেই কর্পোরেশনের ডাস্টবিনে সেই টিনের ময়লা ফেলুন।

# প্লেগ
## নিবারণে আপনার কর্তব্য

আতঙ্কিত হবেন না। মিথ্যা গুজব রটাবেন না।

আপনার ঘরদোর অপরিষ্কৃত অবস্থায় রাখবেন না। কারণ ময়লা ও আবর্জনা-পূর্ণ স্থানেই ইঁদুর থাকে।

খাবার জিনিষ যেখানে সেখানে ফেলবেন না; এতে ইঁদুর আকৃষ্ট হয়।

যে-বাড়ীতে এ-রোগ দেখা দিয়েছে, সেখানে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন না ক'রে যাবেন না। সেখানে যেতে হ'লে

## বর্জনীয়

আপনার পায়ে হাঁটু পর্যন্ত কেরোসিন বা তরল ডি-ডি-টি মেখে নেবেন।
মৃত বা মৃতপ্রায় ইঁদুর ছোঁবেন না; যথাসম্ভব সেগুলি পুড়িয়ে ফেলুন।
কোন লোক প্লেগে আক্রান্ত হয়েছে বলে সন্দেহ হ'লে বা কোথাও ইঁদুর মরছে বলে জানতে পারলে আপনার ডিস্ট্রিক্ট হেল্থ অফিসারকে খবর দিতে ভুলবেন না।

**কোন রকম অসুবিধা হ'লে সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর (পি কে ৩৬[illegible] –এক্সটেনশন্ ১৫৮) বা ক'লকাতা কর্পোরেশনের হেল্থ্ অফিসার (বি বি ৩৮৫, বি বি ৫৬৫, বি বি ৫৬৭) খবর দিন।**

জনস্বাস্থ্যের খাতিরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগ থেকে প্রচারিত

# জীবন-তৃষা

## আর্ভিঙ্ স্টোন

**অনুবাদক—অদ্বৈত মল্ল বর্মন**

**[ পূর্বানুবৃত্তি ]**

৭

রেভাঃ ভ্যান ডেন ব্রিংক, রেভাঃ ডি জোঙ্ ও রেভাঃ পিটারসেন এই তিনজন মিলে বেলজিয়ান ধর্মপ্রচার সমিতি নামে একটি দল গঠন করেছিলেন। এঁরা ব্রাসেলসে একটি স্কুল বিদ্যালয় খুলেছিলেন। সেখানে ছাত্রদের বিনাব্যয়ে শিক্ষা দিতেন এবং থাকা ও খাওয়া-খরচের জন্য ছাত্রদের কাছ থেকে অতি সামান্য অর্থ গ্রহণ করতেন। ভিনসেণ্ট সমিতির সদস্যদের সংগে দেখা করে ছাত্র হয়ে গেল।

রেভাঃ পিটারসেন তাকে বললেন, "তিন মাস শিক্ষা দেবার পর আমরা তোমাকে বেলজিয়মের কোনো একটা জায়গাতে একটা কাজ দিয়ে দেব।"

"তবে কাজ দেবার আগে দেখতে হবে, সে কাজের যোগ্য হয়েছে কি না।" রেভাঃ ডি জোঙ রেভাঃ পিটারসেনের দিকে ফিরে ভারিক্কিভাবে বললেন। যৌবনকালে যন্ত্রপাতির কাজ করার সময়ে রেভাঃ ডি জোঙের বুড়ো আংগুলটি গোড়া থেকে কেটে গিয়েছিল। এর পরেই তিনি সে-কাজ ছেড়ে দিয়ে ধর্মব্রত গ্রহণ করেন।

এবার রেভাঃ ভ্যান ডেন ব্রিংক বললেন, "মসিয়ে ভ্যান গোঘ্, ধর্মপ্রচারের কাজে কোন্ জিনিসটা সবচেয়ে বড়ো দরকারী, তোমাকে বলে রাখি। জনতার সামনে বক্তৃতা দিতে হবে। সে বক্তৃতা তাদের সহজবোধ্য হওয়া চাই; তাদের ভালো লাগা চাই এবং তাতে তাদের আকৃষ্ট করা চাই। বক্তৃতা দেবার এই ক্ষমতাটাই সবচেয়ে বড়ো দরকারী।"

গীর্জা ঘরেই তাঁদের সংগে সাক্ষাৎকার হয়েছিল। রেভাঃ পিটারসেন ভিনসেণ্টকে নিয়ে বাইরে এলেন। ব্রাসেলসের আকাশ আজ রৌদ্রময়। সেই উজ্জ্বল সূর্যালোকে পা ফেলতে ফেলতে ভিনসেণ্টের হাতদুটি ধরে রেভাঃ পিটারসেন বললেন, "তোমাকে দলে পেয়ে আমার অত্যন্ত আনন্দ হচ্ছে। বেলজিয়ামে আমাদের অনেক কিছু করবার মত কাজ পড়ে রয়েছে, সেগুলো সম্পন্ন করতে হবে। তোমার যা উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখছি তার থেকে বলতে পারি, একাজে তুমি অসীম যোগ্যতা দেখাতে পারবে।"

তাঁর কাছ থেকে আশাতীত দাক্ষিণ্য পেয়ে ভিনসেণ্ট আনন্দে নির্বাক হয়ে গেল। তাঁর কথাগুলি উজ্জ্বল রৌদ্রালোকের চেয়েও উষ্ণ ও প্রীতিপদ বোধ হল।

খাড়া ছয়তলা পাথরের বাড়িগুলি দু'পাশে রেখে পথ চলে গিয়েছে। সে পথে চলতে চলতে ভিনসেণ্ট কথাগুলোর উত্তর দেবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল। এমন সময় রেভাঃ পিটারসেন থামলেন।

বললেন, "এবার আমায় ফিরতে হবে। এই নাও আমার কার্ড। বিকেলে যেদিনই সময় পাবে আমার কাছে চলে আসবে। দুজনে মিলে বেশ আলাপ-আলোচনা করা যাবে।"

রেভারেণ্ডদের এই বিদ্যালয়ে ছাত্র পাওয়া গেল ভিনসেণ্টকে নিয়ে সর্বসাকুল্যে মাত্র তিনজন। ছাত্রদের তত্ত্বাবধান করতেন মাস্টার বোকমা। তাঁর শরীর খাটো ও কৃশ, গালদুটি গর্তে বসা। সে গর্তের দুটি পার নাকের দুপাশ দিয়ে ভুরু থেকে নীচের দিকে সটান লম্বমান।

ভিনসেণ্টের সহপাঠী দুজন উনিশ বছরের গ্রাম্য তরুণ। সেই দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব অবিলম্বে পাকা হয়ে উঠল। হৃদ্যতা গাঢ়তর করবার জন্যেই তারা দুজনেই ভিনসেণ্টের প্রতি বিদ্রূপ বর্ষণ করতে লাগল।

গোড়ার দিকে একদিন এক অসতর্ক মুহূর্তে তাদের একজনকে ভিনসেণ্ট বলেছিল, "আমার লক্ষ্য হচ্ছে আপনাকে তৃণের সংগে মিশিয়ে দেওয়া—mourir a moi-même (অন্তরে অন্তরে মরে যাচ্ছি আমি)।" যখনই তারা দেখতে পেতো সে প্রাণপণে ফরসী ভাষায় বক্তৃতা মুখস্থ করছে কিংবা কোনো পাঠ্য-পুস্তক নিয়ে গলদঘর্ম হচ্ছে, তারা বিদ্রূপের ভঙ্গীতে বলত, "কি করছ ভ্যান গোঘ্? অন্তরে অন্তরে মরে যাচ্ছো নাকি?"

এসব বিদ্রূপবাণ সহ্য করা হয়ত অসম্ভব হত না। কিন্তু মাস্টার বোকমার সংগে তাল রাখা একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়ত। তাঁর কাছে গেলে সে মহা দুর্ভাবনায় পড়ে যেত। ছাত্রদের শিখিয়ে পড়িয়ে ভালো বক্তা করে তুলবেন—এইটেই ছিল মাস্টার বোকমার ইচ্ছে। প্রতিদিন রাত্রিতে বাড়িতে বসে তাদের একটা করে বক্তৃতা তৈরী করতে হত; পরের দিন ক্লাসে এসে সেটা বলতে হত। অপর দুজন ছাত্র বাইবেলের সহজ ও প্রাঞ্জল বাণীগুলোকে জোড়াতাড়া দিয়ে সুন্দর সুন্দর বক্তৃতা তৈরী করে আনত; ক্লাসে এসে সে সব অনর্গল আবৃত্তি করে যেত। ভিনসেণ্ট ধীরেসুস্থে ধর্মোপদেশ প্রস্তুত করতে থাকত; প্রতিটি ছত্রে সমস্ত হৃদয়মন ঢেলে দিয়ে রচনা করত তার বক্তৃতা। যা বলতে হবে সেটা সে নিজের মধ্যে গভীরভাবে উপলব্ধি করত; কিন্তু ক্লাসে এসে বলবার জন্য উঠে দাঁড়ালেই সে অন্য রকম হয়ে যেত; বলবার কথাগুলো সে হাজার চেষ্টায়ও সহজে প্রকাশ করতে পারত না।

বোকমা নির্মম হয়ে উঠতেন: "তোমার ধর্মপ্রচারক হবার কোনো আশা নেই, ভিনসেণ্ট। তুমি দেখছি কথাই কইতে পার না। কে শুনবে তোমার এমন বক্তৃতা।"

এরপর একদিন বোকমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। ভিনসেণ্ট সরাসরি জানিয়ে দিয়েছে আগে থেকে প্রস্তুত না হয়ে সে কোনও বক্তৃতা দিতে পারবে না। একথা শুনে মাস্টার বোকমা কিছুতেই রাগ সামলাতে পারলেন না। ভিনসেণ্ট সারা রাত জেগে রচনা লিখল। রচনাটিকে অর্থসমৃদ্ধ করার জন্য এর প্রতিটি শব্দ চোস্ত ফরাসি থেকে বেছে বেছে প্রয়োগ করল। পরের দিন ক্লাসে অন্য দুজন ছাত্র কাগজের দিকে দুএকবার মাত্র তাকিয়েই যীশুখৃস্ট ও মানব-মুক্তি সম্বন্ধে স্বচ্ছন্দে বক্তৃতা দিয়ে ফেলেল; বক্তৃতার মাঝে মাঝে মাস্টার বোকমাও সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লেন। এর পর এলো ভিনসেণ্টের পালা। সে বক্তৃতা-লেখা কাগজ সামনে ধরে পড়তে শুরু করল। এতে বোকমার রাগ বেড়ে গেল। তিনি এ বক্তৃতা শুনবেন না। বললেন:

"আমস্টার্ডামে তোমার শিক্ষকেরা তোমাকে বুঝি এইভাবেই শিখিয়েছে? দেখো ভ্যান গোঘ, আমার ক্লাসে যারা যারা শিখেছে, তারা দু' সেকেণ্ড আগে জানালেই বক্তৃতা দিতে পারে এবং শ্রোতাদের মুগ্ধ করতে পারে। এটুকুন যোগ্যতা যার নেই, এমন কাউকেই আমি পড়াইনি।"

ভিনসেণ্ট কাগজ না দেখে বলতে চেষ্টা করল। কিন্তু আগের রাতে যা যা লিখেছে

সেগুলি কিছুতেই ঠিক ঠিক মনে আনতে পারল না। যতবার বলতে চেষ্টা করছে, ততবার ঠেকে যাচ্ছে। সহপাঠীদের মুখে বিদ্রূপের হাসি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। মাস্টার বোকমাও সে হাসিতে যোগ দিলেন।

আমস্টারডামে থাকার সময় থেকেই তার স্নায়ুতে জ্বালা ধরে আছে। এখন সে জ্বলুনি অসহ্য হয়ে উঠল।

"মাস্টার বোকমা, আমার বক্তৃতা আমি যেভাবে পারব সেইভাবেই দেব। আমি জানি আমার কাজ নির্দোষ। আপনার অপমান আমি কিছুতেই মাথা পেতে নেব না।"

বোকমার রাগ সপ্তমে চড়ে গেল। চীৎকার করে বললেন, "আমার কথা মেনে তোমাকে চলতেই হবে। যদি না চল, ক্লাস থেকে তোমায় বের করে দেব।"

এই ঘটনায় দুজনের মধ্যে একটা প্রকাশ্য বিরোধের সৃষ্টি হয়ে রইল। রাত্রিতে ভিনসেন্টের ঘুম আসত না; বিছানায় শোওয়া তার কাছে অর্থহীন। সে সারারাত পরিশ্রম করত এবং যতগুলি বক্তৃতা তৈরী করে আনতে তাকে বলা হত সে তার চারগুণ তৈরী করে নিয়ে আসত। অনিদ্রায় ক্রমে তার ক্ষুধা একেবারেই কমে গেল। সে কৃশ হতে লাগল এবং তার মেজাজ রুক্ষ হয়ে উঠল।

নভেম্বর মাসে তাকে সমিতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য ও চাকুরী নেবার জন্য গীর্জা-ঘরে ডেকে পাঠানো হল। অবশেষে সব বাধা বুঝি তার পথ থেকে অপসারিত হয়েছে। একটা শ্রান্ত আত্মতুষ্টির ভাবে তার চিত্ত আজ প্রসন্ন। এসে দেখল সহপাঠী দুজন আগে থেকেই সেখানে বসে আছে। সে ঘরে ঢুকল, রেভারেণ্ড পিটারসেন তার দিকে ফিরেও তাকালেন না; কিন্তু বোকমা তাকালেন; তাঁর চোখে বিদ্রূপের দ্যুতি।

রেভারেণ্ড ডি জোঙ ছাত্রদুটির কাজের খুব তারিফ করলেন, তাদের সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানালেন এবং নিয়োগপত্র দিলেন। 'হুগ স্ট্রাটেন' ও 'এটিহোভে' গিয়ে তাদের কাজ করতে হবে। তারা দুজন হাত ধরাধরি করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রেভারেণ্ড ডি জোঙ এবার ভিনসেণ্টের দিকে ফিরে বললেন, "মসিঁয়ে ভ্যান গোঘ, তুমি লোককে ঈশ্বরের বাণী শোনাবার উপযুক্ত হয়েছ বলে সমিতি স্বীকার করে নিতে পারছেন না। আমাকে দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, তোমাকে আমরা চাকুরী দিতে অক্ষম।"

ভিনসেণ্ট অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। পরে বলল, "আমি কী দোষ করেছি বলুন তো।"

"তুমি উদ্ধত। কর্তৃপক্ষের আদেশ মানতে তুমি প্রস্তুত নও। বাধ্যতা হচ্ছে আমাদের গীর্জার প্রথম নীতি। তার উপর বক্তৃতা দেওয়া তুমি শিখে উঠতে পারনি। তোমার শিক্ষক মনে করেন, তুমি ধর্মপ্রচারের যোগ্য হওনি।"

রেভারেণ্ড পিটারসেনের দিকে ভিনসেণ্ট চোখ তুলে তাকান। রেভারেণ্ড তখন জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছেন। ভিনসেণ্ট কাউকে উদ্দেশ না করে আত্মগতভাবে বলল, "তা হলে আমি এখন কি করব?"

"আবার ছয় মাসের জন্য তুমি বিদ্যালয়ে ফিরে যেতে পার। অবশ্য যদি তোমার অভিরুচি হয়," উত্তর দিলেন ভ্যান ডেন ব্রিঙ্ক, বললেন, "ঐ ছ' মাসের পর সম্ভবত তোমাকে........"

ভিনসেণ্ট মাথা নীচু করে তার অমসৃণ মোটা বুটজুতার দিকে তাকাল; দেখতে পেল, জুতোর চামড়া ছিঁড়তে শুরু করেছে। তারপর, উত্তর দেবার কোনো ভাষা না পেয়ে, নীরবে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল।

নগরীর বড়ো বড়ো রাস্তাগুলো দ্রুতপদে অতিক্রম করল। তারপর 'লাকেনে' এসে উপস্থিত হল। অন্য মনস্কভাবে হেঁটে চলেছে সে। সরু পায়েচলা গলি, দু'পাশে কর্মচঞ্চল শব্দমুখরিত কারখানা-বাড়ি। সেই গলি ছাড়িয়ে একটি খোলা জমি। সেখানে একটি কৃশ, জরাজীর্ণ শাদা ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। সে জন্মভর খাটুনির পর জীবনের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। স্থানটি নির্জন ও নিস্তব্ধ। ভূমিতলে একটি মড়ার মাথার খুলি পড়ে আছে। অল্প দূরে একটি কুটির। সেখানে যে লোকটি বাস করে, ঘোড়ার চামড়া ছাড়ানো তার পেশা। কুটিরের পাশেই শুকনো একটি ঘোড়ার কঙ্কাল শায়িত। অসহায় বোবা জীবদের প্রতি অনুকম্পায় তার মর্মস্থল ব্যথিয়ে উঠল। সে শূন্য, ভারাক্রান্ত মনে পাইপ মুখে তুলে নিল। তামাকে আগুন ধরিয়ে টানতে লাগল। কিন্তু কি ভয়ানক তেতো। তামাকের ধোঁয়া আজকের মত এ বিস্বাদ আর কোনোদিন লাগেনি সে একটা কাঠের গুঁড়ির উপর ব পড়ল। শাদা ঘোড়াটি তার কা এগিয়ে এসে পিঠে নাক ঘসা লাগল। ভিনসেণ্ট ফিরে প্রাণীটার বিক্ গলদেশে হাত বুলিয়ে দিল। এভাবে কিছুক্ষ গেলে, তার মন ভগবানের চিন্তায় ভরে উঠল অন্তে কিছুটা সান্ত্বনা পেল সে। আপনা মনে বলে উঠল, "যীশুকে ঝড়ঝঞ্ঝাও বিচালি করতে পারে নি। আমি একলা নই; কেনন ভগবান আমাকে ছেড়ে যান নি। কোনো কোনোদিন কোনো না কোনোভাবে তাঁকে সে করার উপায় আমার একটা জুটবেই।"

ঘরে ফিরে এসে দেখল, রেভারেণ পিটারসেন তারই প্রতীক্ষায় বসে আছেন তিনি বললেন, "ভিনসেণ্ট, আজ তুমি আমা বাড়িতে খাবে। তোমায় বলতে এসেছি।"

রাস্তা জন-মুখর। শ্রমিকেরা বিকেলে খাবার খেতে ত্রস্তপদে চলেছে। তাদের ভী ঠেলে দু'জন পথ চলতে লাগলেন। পিটারসে নানা গল্পগুজব করে চললেন। যেন তাঁদের মধ্যে কিছুই হয় নি, এমনি ভাব। তাঁর প্রত্যেক কথা গভীরভাবে ভিনসেণ্টের মনের পরদা আঘাত করছে। পিটারসেন তাকে সামনে ঘরে নিয়ে বসালেন। ঘরের দেওয়ালে কয়ে খানি জল-রঙের ছবি টাঙানো। এক কো একটি 'ইজেল'। ঘরখানা রীতিমতো এক স্টুডিও হয়ে উঠেছে।

ভিনসেণ্ট আশ্চর্য হয়ে বলল, "আপনি ছ আঁকেন? আমি তো জানতাম না!"

পিটারসেন বিব্রত হয়ে পড়লেন। উ দিলেন, "আরে না না, ও কিছু নয়। আ


## ক্যালকেমিকোর সতর্কীকরণ!

আমাদের জনপ্রিয় প্রসাধন সামগ্রীগুলির বিশেষ ক'রে **মার্গো সোপ, কান্তা, ক্যাস্টরল, ভৃঙ্গল** প্রভৃতির বহু প্রকার নকল বাজারে বেরিয়েছে। যাঁরা এই প্রকার নকল মাল তৈরী ক'রে হীন প্রবঞ্চকের কারবার করছেন এবং আমাদের পৃষ্ঠপোষকদের ও দোকানদারদের প্রতারণা করছেন, তাঁদের সতর্ক ক'রে দেওয়া হচ্ছে যে, তাঁরা এবং যে সকল দোকানদার এঁদের সঙ্গে কোন প্রকারে জড়িত ব'লে জানা যাবে, তাঁরাও এই অন্যায় কুকার্য থেকে যদি অবিলম্বে বিরত না হন, তবে তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুমোদিত অতি কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে।

**দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ**

**কলিকাতা—২৯**

কেবল অভ্যাস করছি। অবসর সময়ে, চিত্ত-বিনোদনের জন্য একটু আধটু আঁকি মাত্র। ও আবার তোমার চোখে পড়েছে। আমি হলে তো এড়িয়েই যেতুম। বলবার মতো ও কিছু নয়।"

তাঁরা খেতে বসলেন। পিটারসেনের কন্যাটি ক্রীড়াবনতা, মুখচোরা, পঞ্চদশী মেয়ে। খাবারের থালা থেকে লজ্জায় সে একবারও মুখ তুলে চায় নি। সারাক্ষণ সে মাথা নীচু করেই খেল। পিটারসেন খেতে খেতে অনেক অসংলগ্ন কথা বলতে লাগলেন। এদিকে ভিনসেণ্ট ভদ্রতার খাতিরে কিছু কিছু গলাধঃকরণের চেষ্টা করল। হঠাৎ এক সময়ে তার মন পিটারসেনের কথাগুলোর প্রতি আকৃষ্ট হল। রেভারেণ্ড একটা কাজের কথা বলছেন। কিন্তু ভিনসেণ্ট তাঁর আগের কথাগুলোর খেই ধরতে পারে নি।

রেভারেণ্ড বলছেন, "'বরিনেজ' একটা কয়লাখনি অঞ্চল। সত্যি বলতে কি, সেখানে সারা জেলায় তুমি এমন একটি প্রাণী খুঁজে পাবে না যে খনিতে নেমে কাজ না করেছে। হাজার বিপদ মাথায় করে তারা খনির ভিতরে কাজ করে। কিন্তু মাইনে যা পায়, নিতান্ত প্রাণ ধারণের পক্ষেও তা অপ্রচুর। পায়রার খোপের মতো ঘর। তাও ধসে পড়া। তারই মধ্যে এই সব খনিমজুরের স্ত্রীপুত্রেরা দিন কাটায়। বছরের অধিকাংশ সময়ই তারা শীতে কাঁপে, জ্বরে ভোগে আর উপোসে কষ্ট পায়।"

ভিনসেণ্ট ভেবে পেলো না এ-সব কথা তাকে কেন শোনানো হচ্ছে। সে জিজ্ঞাসা করল, "কোথায় সে 'বরিনেজ'?"

বেলজিয়ামের দক্ষিণে; মন্‌স্‌-এর কাছে। সম্প্রতি সেখানে আমি কিছুদিন ছিলাম। ভিনসেণ্ট, সত্যিকার কাজ যদি করতে হয় তো তার উপযুক্ত জায়গা হচ্ছে বরিনেজ। ব্যথিতকে সান্ত্বনা দেবার যদি প্রয়োজন থাকে, তাদের বেদনাদগ্ধ চিত্তে পুণ্যের আলো জ্বালিয়ে দেবার যদি প্রয়োজন থাকে, সে-প্রয়োজন মেটাবার এমন জায়গা আর নেই। এইজন্য বরিনেজ-বাসীদের একজন প্রচারকের দরকার সব চেয়ে বেশি। এমন দুঃখীর জায়গা, এমন ব্যথিতের জায়গা আর পাবে না।"

শুনতে শুনতে ভিনসেণ্টের গলায় খাবার আটকে গেল। কিছুতেই গিলতে পারল না। কাঁটাচামচগুলো ঠেলে সরিয়ে দিল সে। পিটার-সন কেন তাকে এভাবে যন্ত্রণা দিচ্ছেন, ঘুরে ফিরে এই প্রশ্নই তার মনে জাগতে লাগল।

রেভারেণ্ড বললেন, "ভিনসেণ্ট, তুমি 'বরিনেজ' যাও। সেই কয়লাখনি এলাকায় গিয়ে তোমার শক্তি দিয়ে উৎসাহ দিয়ে অনেক কিছু করতে পারবে তুমি।"

"কিন্তু, কি করে আমি যাব? সমিতি......

"হাঁ, তা জানি। তোমার বাবাকে সেদিন আমি সব কথা বুঝিয়ে পত্র লিখেছিলাম। আজ দুপুরের ডাকে সে-পত্রের উত্তর পেয়েছি। তিনি জানিয়েছেন, যতদিন তোমার বাঁধা চাকুরী না হয়, ততদিন তুমি 'বরিনেজে' থাকতে পার; তিনি তোমায় সাহায্য করবেন।"

আনন্দে, উত্তেজনায় ভিনসেণ্ট আর বসে থাকতে পারল না। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আপনি তা হলে আমাকে কাজ দিয়ে সেখানেই পাঠিয়ে দিন।"

"তাই দেব। কিন্তু আমাকে কিছুদিন সময় দিতে হবে। তুমি যখন ভালো কাজ দেখাতে পারবে, সমিতি তা দেখে নরম না হয়ে পারবে না, তোমার কাজের তারিফ করবেই। আর তা না হলেও ভাবনার কারণ নেই। ডি জোঙ ও ভ্যান ডেন রিংক এর মধ্যে একদিন আমার কাছে আসবেন। উদ্দেশ্য, কোনো একটা বিষয়ে আমার খাতির পাওয়া। সেই খাতিরের বদলে আমিও একটা খাতির চাইব। ঐ এলাকার দীনহীনদের জন্যে তোমার মতো লোকেরই দরকার। আমার কাজের বিচারভার ভগবানের হাতে। যে-কোনো উপায়ে তোমাকে আমি তাদের কাছে পাঠাতে চাই। এতে ভগবানও নিশ্চয় সায় দেবেন।"

রেলগাড়ি দক্ষিণ মুলুকে এগিয়ে চলেছে।

দিক্‌চক্রবালে ধীরে ধীরে দেখা দিয়েছে একসারি পাহাড়। ফ্লান্‌ডার্সের সমতল প্রদেশের বৈচিত্র্যহীন পরিবেশ এতদিন ভিনসেণ্টের মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। পাহাড়ের দৃশ্য দেখে তার মন খুশিতে ভরে উঠল। মাত্র কিছুক্ষণ দেখেই বুঝতে পারল পাহাড়গুলি দেখবার মতো বটে। সচরাচর এমন পাহাড় চোখে পড়ে না। প্রতিটি পাহাড় সমতল ভূমি থেকে সিধে খাড়া হয়ে উঠেছে; কোনোটার সঙ্গে কোনোটার যোগ নেই। যেন আচমকা মাটি ফুঁড়ে দাঁড়িয়ে গেছে।

এর এক একটাকে মিসরের পিরামিড বলে স্বচ্ছন্দে কল্পনা করা যায়। জানালার ভেতর দিয়ে দৃষ্টি গলিয়ে দেখতে দেখতে সে আত্মগত-ভাবে বলল, "যেন কালো মিসর!" পাশে বসে ছিল যে লোকটি, তার দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল, "পাহাড়গুলো কি করে অমন খাড়া দাঁড়িয়ে গেল বলতে পারেন?"

সহযাত্রী উত্তর দিল, "পারি। মাটির নীচু থেকে কয়লার সঙ্গে যেসব খাদ ওপরে ওঠে, সেগুলো জমে স্তূপ হয়ে আছে। এগুলো সেই স্তূপ। ঐ যে দেখছ ছোটো একখানা গাড়ি পাহাড়ের চূড়োয় গিয়ে ঠেকেছে—দেখতে পাচ্ছ তো? এক পলক ওর দেখ ভাল করে।"

সহযাত্রীর কথা শেষ হতে না হতেই দেখা গেল, ছোটো গাড়িখানা ঘুরে কাত হয়ে গিয়েছে। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা কালো মেঘ যেন সেখান থেকে নীচের দিকে উড়ে নামতে শুরু করেছে। সহযাত্রী বলে উঠল, "এই দেখো। এর থেকেই বুঝতে পারবে কিভাবে এরা বেড়ে উঠেছে। রোজ রোজ এক আঙুল আধ আঙুল করে এরা বেড়ে উঠছে। গত পঞ্চাশ বছর ধরে আমি দেখে আসছি।"

রেলগাড়ি 'ওয়াসমেস'এ থামলে ভিনসেণ্ট তাড়াতাড়ি নেমে পড়ল। গর্তের মতো নীচু এক খণ্ড রুক্ষ, উষর জমির ওপর এই শহরটি অবস্থিত। পাণ্ডুবর্ণ সূর্যের ঝাপসা আলো আড়াআড়িভাবে এসে স্থানটিকে কিছু আলোকিত করেছে, কিন্তু কয়লার ধোঁয়ার একটা পুরু স্তর আকাশের অনেকখানিই আড়াল করে রেখেছে। 'ওয়াসমেসে' পাহাড়ের পাশাপাশি দু সারি উঁচু ইটের বাড়ি তোলবার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু বাড়ির শেষ ধাপ পর্যন্ত তৈরী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইটগুলো আলগা হয়ে ধসে পড়ে গিয়েছিল। এর পর এখানে 'পেটিটি ওয়াসমেস' বা 'ছোটো ওয়াসমেস' নামক পল্লীর গোড়া পত্তন হয়।

ভিনসেণ্ট লম্বা টিলার পথ ধরে হেঁটে চলল। পাড়াটা একেবারে নির্জন। দেখে তার ভারি আশ্চর্য লাগল। এর কোনোখানে একটা জনপ্রাণীর চিহ্নও নেই। দু-একটা বাড়ির দরজায় দেখা গেল এক একটি স্ত্রীলোক ম্লানমুখে জড়ের মতো দাঁড়িয়ে আছে।

'পেটিটি ওয়াসমেস' কয়লা-খনির মজুরদের গ্রাম। সারাটি গ্রামে ইটের বাড়ি মাত্র একটি। সেটা রুটিবিস্কুটওয়ালা জীন-ব্যাপ্টিস্ট ডেনিসের বাড়ি। টিলার একেবারে মাথায় দাঁড়ানো। ভিনসেণ্ট সেই বাড়িতেই থাকবে। রেভারেণ্ড পিটারসেনকে এই বাড়িরই গৃহকর্তা চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন, তাঁদের শহরে পরের বার যাঁকে ধর্মপ্রচারক করে পাঠানো হবে, তাঁকে তিনি নিজের বাড়িতে থাকবার জায়গা করে দেবেন।

মাদাম ডেনিস ভিনসেণ্টকে সাদরে গ্রহণ করলেন। তাঁর রান্নাঘর তাজা রুটির গন্ধে ভরপুর। তারই মধ্য দিয়ে ভিন-সেণ্টকে নিয়ে গিয়ে তার জন্য যে ঘরখানি রাখা হয়েছে, সেঘর দেখালেন। বাড়তি ছাদের তলাকার একটুখানি জায়গা। সেটিই তার ঘর। একটি মাত্র জানালা, বিষাদমলিন 'পেটিটি ওয়াসমেসে'র দিকে মুখ করে আছে। বাড়তি কড়িকাঠের মুখগুলি নীচের দিকে বাঁকানো। জায়গাটি মাদাম ডেনিসের কর্মনিপুণ হস্তে উজ্জ্বল করে নিকানো। দেখা মাত্রই ভিনসেণ্ট জায়গাটিকে পছন্দ করে ফেলল। উৎসাহচাঞ্চল্য তার এমনি বেড়ে গেল যে, নিজের জিনিসপত্রগুলি খুলবারও অবসর পেল না। মোটা কাঠের সিঁড়ি ক'খানা ভেঙে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে রান্না ঘরে মাদাম ডেনিসকে বলতে এলো সে বাইরে বেরুচ্ছে।

মাদাম ডেনিস তাকে বললেন, "খাওয়ার সময় চলে আসতে যেন ভুল করো না। পাঁচটায় আমাদের খাওয়া হয়।"

মাদাম ডেনিসকে ভিনসেণ্টের খুব ভাল লাগল। তিনি সহজ মানুষ। কোনো বিষয় ভেবে ভেবে জটিল করা তাঁর ধাতে নেই। সব কিছু সহজে বুঝবার প্রবৃত্তি তাঁর প্রকৃতিগত। ভিনসেণ্ট তা বুঝতে পারল। সে উত্তর দিল; "আমি ঠিক সময়ে ফিরে আসব মাদাম। আমি কেবল জায়গাটা একটু দেখতে বেরুচ্ছি।"

"আজ রাতে আমাদের এক বন্ধু আসবেন। তাঁর সঙ্গে তোমার দেখা হওয়া ভাল। মার্কাসিতে তিনি ফোরম্যানের কাজ করেন। তিনি তোমাকে অনেক কিছু বলে দিতে পারবেন যা তোমার জেনে রাখা খুবই দরকার।"

বাইরে বরফ পড়তে সুরু করেছে। রাস্তায় চলতে চলতে ভিনসেণ্ট লক্ষ্য করল, বাগানের ও ক্ষেতের বেড়াগুলি কয়লা খনির চিমনির ধোঁয়ায় কেমন কালো হয়ে গিয়েছে। ডেনিসদের বাড়ির পুব পাশে একটি লম্বা গভীর খাদের মতো জায়গা। বেশির ভাগ খনি মজুরের কুটির সেখানে। অপর পাশে বিস্তীর্ণ খোলা জমিতে একটা কালো পাহাড়ের ঢিবি, আর কতকগুলি চিমনি। এটাই মার্কাসি কয়লা খনি। পেটিট ওয়াসমেস গ্রামের প্রায় সব মজুরই এই খনির ভেতর কাজ করতে নেমেছে। জমির মাঝখান দিয়ে কাঁটাঝিনের উপর একটি পথ, নানা রকম কোঁকড়ানো গাছের শিকড়ে সেপথ মাঝে মাঝে ছিন্ন।

'কারনেবজেস্ বেল্‌জিক পরিচালিত সারিবন্ধ সাতটি কয়লা খনির মধ্যে মার্কাসি খনি অন্যতম। সারা 'বরিনেজ' অঞ্চলে এই খনিটি সবচেয়ে পুরোনো এবং এর মধ্যে কাজ করাও সবচেয়ে বেশি বিপজ্জনক। এর ভিতর বহু লোকক্ষয় হয়েছে বলে এর দুর্নাম আছে। এই খনিগর্ভে নামতে বা উঠতে যেমন অনেকে প্রাণ হারিয়েছে, তেমনি বিষাক্ত গ্যাসে, বিস্ফোরণে, জলোচ্ছ্বাসে কিংবা ওপরের ছাদ ধ্বসে পড়ার জন্যে বহু লোক ধ্বংস হয়েছে। খনির উপরের জমিতে দুখানি নীচু ধরণের ইটের ঘর। কয়লা তোলার কলকাঠি এর ভিতরেই চালানো হয় এবং মজুত কয়লা এখানে গাড়িতে বোঝাই করা হয়। উঁচু চিমনিগুলি এক সময়ে হলদে রঙের ছিল, এখন কালো হয়ে গিয়েছে। সেগুলি প্রায় গায় গায় লাগানো। দিনে রাতে চব্বিশ ঘণ্টা এই চিমনি থেকে কালো ধোঁয়া বেরোয় এবং চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে। মার্কাসি খনির চারপাশে দরিদ্র খনিমজুরদের কুটিরশ্রেণী। কুটিরের সঙ্গে দু-একটা মরা গাছ ধোঁয়ায় কালি বর্ণ। কাঁটা গাছের বেড়া, ময়লার স্তূপ, ছাইয়ের গাদা আর স্তূপাকার অব্যবহার্য কয়লা কুটিরগুলির মলিনতা আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু সব কিছুকে আড়াল করে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে সেই কালো পাহাড়ের 'পিরামিড'! স্থানটি মালিন্য ও বিষাদে আচ্ছন্ন। প্রথম দৃষ্টিতেই এখানকার সবকিছু ভিনসেণ্টের কাছে মলিন ও নিষ্প্রাণ বোধ হল। সে মনে মনে বলল, "লোকে এটাকে কালো দেশ বলে, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এমন জায়গাকে তো কালো বলবেই।"

কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকার পর দেখল, খনিমজুরের দল গেট দিয়ে বেরোতে শুরু করেছে। পরনে মোটা কাপড়ের ছেঁড়া পোষাক, মাথায় চামড়ার টুপি, পুরুষ ও স্ত্রী সকলের একই পোষাক। সকলেই কালো হয়ে গিয়েছে। চিমনির রংয়ের মতো ঘোরতর কালো। কয়লার কালিমাখা মুখের ওপর চোখের সাদা অংশটুকু যেন আলগাভাবে লাগানো রয়েছে—এ যেন এক অদ্ভুত ব্যতিক্রম। লোকে যে তাদের কালা নিগ্রো প্রবাহ বলে তা অযৌক্তিক নয়। সেই কোন্ ঊষা কালে ঢুকে সারাদিন খনিগর্ভের অন্ধকারে কাজ করে, বেরিয়ে এসেছে। এই জন্য বিকেলের ম্লান রোদের আভাও তাদের চোখে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে। আধ-বোজা চোখে তারা খোঁড়াতে খোঁড়াতে নিজেদের মধ্যে দুটি একটি অশ্লীল, চুটকি কথা বলতে বলতে গেট পেরিয়ে বেরিয়ে আসছে। লোকগুলি দেখতে খাটো, সরু, কুঁজো কাঁধ, দেহ পেশিবহুল।

সেদিন অপরাহ্নে গ্রামটিতে নির্জন মনে হয়েছিল কেন, ভিনসেণ্ট এখন তা বুঝতে পারল। খাদের ওপর ঐ যে কুটিরশ্রেণী রয়েছে, সত্যিকার পেটিট ওয়াসমেস গ্রাম সেটি নয়; আসল পেটিট ওয়াসমেস হচ্ছে সাত হাজার নিটার নীচেকার এই ভূগর্ভ নগরী। গ্রামের সমস্ত বাসিন্দা তারই মধ্যে সারাদিন কাটিয়ে, ওখানে যায় কেবল রাতে ঘুমোবার জন্য।

(ক্রমশ)

# ছোঁয়াচ

## জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়

একটানা পথ কাটি, আর চোখে কতো কি যে দেখি—
রোদ জল ঘাস পাতা ঘুরে ফিরে তারা সবই মেকিঃ
এই পথ ধুলো-মাখা, তবু তাও ভারী ঠেকে পায়েঃ
আকাশ? অনেক উঁচু—হয় না কাছের কোনোপায়ে?
ভারি ফাঁকা ভারি বাঁকা রোজকার দেখা এইসব,
সাগরের জল দিয়ে আকাশের রঙে-আঁকা বৃথা উৎসব।

বহুদূরে গাছপালা সাগরের ঢেউ আর 'কেউ' আরো দূরে—
তারা সব কাঁচা-হাতে-আঁকা কোন ছবির মতোনই ভঙ্গুর।

তবে যেন মনে হয়, যদি কেউ ঢলঢলে চোখে
আমার আগেই দেখে সব কিছু বিচিত্র আলোকে,
আর যদি হাঁটে এই ধুলো-ভেজা পথে বরাবর
দুখানি পায়ের চাপে আর যদি করে তোলে সে-পথ মুখর;
আর যদি আকাশের মতো বড় হৃদয়ের ঝাঁপি খুলে হাসে
খামখেয়ালের বশে প্রাণভরে একবারো শুধু ভালোবাসে,
দূর দূর গাছপালা সাগরের ঢেউ ছিঁড়ে যদি সেই 'কেউ' হতে পারে,
হয়তো পায়ের মাটি আর চোখে সব কিছু পৌঁছাবে সহজের দ্বারে।

# বাংলা সাহিত্যের নরনারী

প্র-না-বি.....

## নব বাবু

যে মাইকেল্ মধুসূদন মেঘনাদ বধ কাব্য ও বীরাঙ্গনা কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তিনিই কি-ভাবে আবার একেই কি বলে সভ্যতা এবং বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ রচনা করিলেন—অনেকে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া থাকেন। অনেককেই এ বিস্ময় প্রকাশ করিতে শুনিয়াছি। তৎকালীন কোন কোন লোককেও এই অসংগতি চমকাইয়া দিয়াছিল। রাজেন্দ্রলাল মিত্র একটি পত্রে সেই কালে রাজনারায়ণ বসুকে লিখিয়াছিলেন—
"It is a wonder to me how the author could paint so humorous a picture with one hand, while the other was busy with depicting the Miltonic grandeur of Tilottama."
প্রহসন দু'খানির রচনাকাল ১৮৫৯—ঐ সময় তিলোত্তমা রচনারও কাল বটে।

মাইকেলের বাঙলা গদ্যের কলম জড়তাগ্রস্ত ছিল। তাঁহার একখানি বাঙলা পত্র পাওয়া গিয়াছে—তাহার ভাষা যেমন জড়, তাহার শোক প্রকাশের ভাবও তেমনি কৃত্রিম। কৃষ্ণকুমারীর গদ্য নিতান্ত কৃত্রিম, হেক্টর বধের ভাষা কিম্ভূত। অথচ প্রহসন দু'খানির ভাষা স্বচ্ছ, অনায়াস; সংলাপ নাটকীয়; হাস্য ও শ্লেষ সমুজ্জ্বল—আর নরনারীগণ সকলেই বাস্তব জীবনের সহচর। না তাহারা পৌরাণিক, না ঐতিহাসিক, না ছায়া প্রায়। তাহারা এমনি সজীব যে, পায়ে কাঁটা ফুটিলে রক্তক্ষরিত হইবার আশঙ্কা। বাস্তবিক তাঁহার অন্যান্য রচনার সঙ্গে প্রহসন দুটির এমন শ্রেণীগত পার্থক্য যে, বিস্মিত হইবার কথাই বটে।

কিন্তু বিস্মিত হইলে তো কাজ চলিবে না, বিস্ময়ের অন্তর্নিহিত ঐক্য আবিষ্কার না করা অবধি সমালোচকের ছুটি নাই। আমার একটি ধারণা যে, কোন লোকের মুখের বা কোন লেখকের দুটি কথায় বা দুটি রচনায় আপাতঃ প্রভেদ যতই দুস্তর হোক না কেন, কোথাও নিশ্চয় একটা নিগূঢ় ঐক্য থাকিবেই—নহিলে সংসারটাই পাগলামি হইত। অনেকে বলিবেন, পাগলামি বই কি! পাগলের কথায় সঙ্গতি কোথায়? পাগলের কথা যে আমাদের অসঙ্গত বোধ হয়, তার একমাত্র কারণ পাগলের মনের গতিবিধি ও ইতিহাস আমাদের সম্পূর্ণ পরিচিত নয়। পূর্ণ পরিচয় পাইলে দেখিতাম উন্মাদের প্রলাপও গোপন যুক্তি জালের দ্বারা সুবিন্যস্ত। এমন ক্ষেত্রে মেঘনাদ বধ কাব্য ও প্রহসন দুটি যে সত্যই অসংগত, তাহা বোধ হয় না। দূর পরিপ্রেক্ষিতে দেখিয়া ইহাই আমার প্রত্যয় হইয়াছে যে, মেঘনাদ বধ কাব্য ও প্রহসন দুটি একই সামাজিক পরিবেশের সৃষ্টি—তাহাদের রূপ ভিন্ন হইলেও স্বরূপ এক। তৎকালীন সমাজ মনের Positive দিকের বিকাশ মেঘনাদ বধ কাব্যে—আর Negative দিকের বিকাশ প্রহসন দু'খানিতে। চাঁদের এক পিঠ চিরজ্যোতির্ময়—অপর এক পিঠ চিরান্ধকার—তবুতো তাহা একই উপগ্রহের এ পিঠ—ও পিঠ। মধুসূদনের গ্রহ, প্রতিভার এ পিঠ ও পিঠ মহাকাব্য আর প্রহসন, আলো অন্ধকারের উপমা ব্যবহার করিতে চাই না—তাই একটাকে Positive approach বা ইতি বুদ্ধি অপরটাকে Negative approach বা নেতি বুদ্ধি সঞ্জাত শিল্প সৃষ্টি বলিলাম।

২

যে সমাজ মনের আদর্শরূপে মেঘনাদ বধ কাব্য, তাহারই বাস্তবরূপে একেই কি বলে সভ্যতা এবং বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ। অন্যত্র এক প্রসঙ্গে মাইকেলকে আমি কাব্য সাধনার সব্যসাচী বলিয়াছি, তাহা এই কারণেই—তাহার এক বাহু আদর্শ সত্যের দিকে, আর অপর বাহু বাস্তব সত্যের দিকে প্রসারিত। দুটি রূপই মাইকেলের মনকে সমান নাড়া দিয়াছিল, নাড়া খাওয়া মনের ভিতর হইতে যুগল প্রবাহ নিঃসৃত হইয়া পড়িয়াছে। কবির নিজের কথাই ধরা যাক। মাইকেল মধুসূদন শব্দ দুটির মধ্যে তৎকালীন সামাজিক ইতিহাস যেমন সংক্ষেপে, যেমন স্পষ্টভাবে লিখিত, এমন আর কোথায়? সেকালের ইংরাজি শিক্ষিত রিচার্ডসন ডিরোজিওর ছাত্ররা মদ খাইত, গোলদীঘির রেলিঙের শিক টপকাইয়া গিয়া শিক কাবাব খাইত, বাহাদুরি দেখাইবার আশায় ধর্ম ও সমাজ ত্যাগ করিত। পৃথিবী বানান লিখিতে পয় খকলা না রকলা জিজ্ঞাসা করিয়া গৌরব বোধ করিত, এ সমস্তই নির্যাসিত আকারে কি মাইকেল শব্দটির মধ্যে নিহিত নাই? আবার তাহারাই তো ইংরাজি সাহিত্যের স্রোতে গা-ভাসান দিয়া মুক্তির মোহানার দিকে যাত্রা করিয়াছিল—আজ আমরা যা কিছু সুফল ভোগ করিতেছি, তাহার গোড়া পত্তন করিতেছিল, ইংরাজি সভ্যতার প্রথম ধাক্কাটা সামলাইয়া লইয়া তাহাকে আমাদের [illegible] শোধন করিয়া শোভন করিয়া রাখিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল—সেই তাহাদের প্রতিনিধি বলিয়া কি মধুসূদনকে লওয়া যায় না? ঐ [illegible] লোকটির মধ্যে দুটি ব্যক্তি ও দুটি ব্যক্তিত্ব বিরাজমান [illegible]। একজন 'নব' মাতাল, দেশীয় সভ্যতা ও ঐতিহ্যের নিন্দুক, কুসংস্কার ছিন্ন করিবার নামে নূতন সংস্কারের প্রবর্তক; আর একজন নূতন সূর্যের চাতক, নূতন বন্দরের নাবিক, বিদেশী সভ্যতার নীলকণ্ঠ—একজনের মনের কথা—'রাম ও তাহার অনুচরদের আমি ঘৃণা করি'—আর একজন বলিয়াছে—'মেঘনাদের চিন্তায় আমার কল্পনা উদ্দীপিত হইয়া ওঠে', সে বলে, 'রাবণ একজন মহামহিম পুরুষ'—আরও সংক্ষেপে বলা চলে যে, একজন রাবণ—আর একজন নববাবু। একজন তৎকালীন অবস্থার আদর্শ রূপ—আর একজন বাস্তব রূপ। এই কথাগুলি মনে রাখিলে প্রহসন দু'খানির পরিপ্রেক্ষিত পাওয়া যাইবে—বুঝিতে পারা যাইবে, তাহারা আকস্মিক নয়—যথাযথ কার্যকারণ সম্ভূত। মাইকেলের কলমে ইহাদের সৃষ্টি দেখিয়া বিস্মিত হইবার কিছুই নাই।

একেই কি বলে সভ্যতার নায়ক নববাবু—একটা শ্রেণীরূপের প্রতিনিধি। এমন কি নববাবু কোন ব্যক্তির যে নাম নয়—ইংরাজি পড়া নূতন নববাবুর দল বা ইয়ং বেঙ্গল—তাহা তৎকালীন লোকেরাও বুঝিয়াছিলেন। "ইয়ং বেঙ্গল অভিধেয় নববাবুদিগের দোষোদ্ঘোষণই বর্তমান প্রহসনের একমাত্র উদ্দেশ্য; এবং তাহা যে অবিকল হইয়াছে, ইহার প্রমাণার্থে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে, ইহাতে যে সকল ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে, প্রায় তৎসমুদায়ই আমাদিগের জানিত কোন না কোন নববাবু দ্বারা আচরিত হইয়াছে।" আবার আর একজন বলিয়াছেন যে—"ইহা দ্বারা কলিকাতাবাসী অনেক নববাবুর চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে।" তৎকালীন লোকে প্রহসন দু'খানির বাস্তব ইঙ্গিত সম্বন্ধে সজাগ ছিল—তাই পাইকপাড়ার রাজাদের অনুরোধে লিখিত হইয়াও নাটক দুটি তাঁহাদের রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইতে পারে নাই। নববাবুগণ এবং পুরাতন ভক্তগণ অনেক তদ্বির-তদারক করিয়া অভিনয় বন্ধ রাখিতে বাধ্য করিয়াছিল।

এবারে বুঝিতে পারা যাইবে যে, মাইকেলের গদ্যের কলম স্বভাবতঃ এমন জড়তাগ্রস্ত, এ দু'খানিতে তাহা এমন সচল, লঘু, সুনিপুণ হইল কেন? এক্ষেত্রে যে মাইকেলের প্রতিভার স্বক্ষেত্র। কৃষ্ণকুমারী, শর্মিষ্ঠা তাহার প্রতিভার স্বক্ষেত্র নয়—তিনি যেন পরের জমিতে চাষ করিতেছিলেন—ও কাজ বেগার। কিন্তু প্রহসন দুটি মেঘনাদ বধ বা বীরাঙ্গনার মতোই তাঁহার নিজস্ব অভিজ্ঞতার ভূমি—সে অভিজ্ঞতা এতই ঘনিষ্ঠ যে, নববাবুর অনুরূপ নিমচাঁদ চরিত্রে কেহ কেহ মাইকেল চরিত্রের আভাস দেখিতে পাইয়াছেন!

৩

প্রহসন দু'খানি বিশেষ একেই কি বলে সভ্যতা বাঙলা প্রহসনের আদর্শ হইয়া আছে, যেমন পরবর্তী শিক্ষিত মাতাল চরিত্রের আদর্শ নববাবু। আর ইহার সংলাপের চটক, শ্লেষ প্রভৃতিও আজ পর্যন্ত অনুকরণযোগ্য, কিন্তু

অননুকরণীয় হইয়া বিরাজ করিতেছে। মস্ত নববাবুকে দেখিয়া কর্তা গৃহিনীকে বলিতেছেন—"ওকে যখন প্রসব করেছিলে, তখন নুন খাইয়ে মেরে ফেলতে পারনি?

নব। হিয়র, হিয়র, হুরে।"

তখনকার অনেক নববাবুই নিশ্চয় নিজেদের অবস্থা স্মরণ করিয়া মনে মনে কর্তার প্রস্তাব সমর্থন করিত। গিরীশচন্দ্র উদ্ধৃত অংশটুকু পড়িয়া বিস্ময়ে নাকি বলিয়াছিলেন—মধু কি খাইয়া ইহা লিখিয়াছিল? মধু যে কি খাইয়া লিখিয়াছিল, তাহা অনুমান করা কঠিন নয় এবং নববাবু কি খাইয়া ইহা বলিয়াছিল, তাহা তো দেখাই যাইতেছে। কিন্তু ইহার Irony অত্যন্ত নিদারুণ। ইহা wit-এর স্তর হইতে humour-এর স্তরে উন্নীত হইয়াছে। আর নববাবুর বন্ধু কর্তার কাছে নিজের পরিচয় দিবার উদ্দেশ্যে কি বলিবে, তাহা ভাবিতেছে। সে বলিতেছে—"তোমাদের কর্তাকে কি বলবো যে আমি বিএরের—মুখটি—স্বকৃতভঙ্গ—" এ pun-এর তুলনা বাঙলা সাহিত্যে নাই—এ বোধ করি, কেবল পানশীল ব্যক্তির কল্পনাতেই আসিতে পারিত।*

* একেই কি বলে সভ্যতা।

# বিজ্ঞমুখের কথা

আমাদের যেমন বৈতরণী পার হতে হয় গরুর লেজ ধরে, গ্রীক পুরাণেও তেমনি নৌকায় পার হতে হয় যম রাজার দুয়ারে পেঁছুতে হলে। ওদেরও আছে Styx আর Lethe নদী, খেয়ার মাঝি Charon আর প্লুটোর রাজপুরীর ভীষণ রক্ষক Cerberus কুকুর।

পরলোক আর স্বর্গ অথবা পাতাল সম্বন্ধে ধারণা মোটামুটি সব প্রাচীন জাতেরই এক ধাঁচের। মিশর, ব্যাবিলন, ঈজিয়ন, গ্রীক, চীন অথবা ভারতীয় সকল প্রাচীন সভ্যতাই মৃত্যুর পর অজানা জগৎ নিয়ে চিন্তা করেছে; ভূতপ্রেত কিংবা পরলোকের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে একটা কাল্পনিক শৃঙ্খলা খাড়া করেছে। কেবল স্থানীয় প্রথা অনুসারে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সংস্কার এবং অনুষ্ঠান। কিন্তু মোটামুটি সব জাতেরই মধ্যে অশরীরী আত্মা ও পারত্রিক অবস্থা নিয়ে যথেষ্ট পরিমাণে জল্পনা আছে আর আছে ভৌতিক জগতে বিশ্বাস। এ বিশ্বাস অতি প্রাচীন সংস্কার। সভ্যতার বিবর্তনে আজ আমরা অনেক এগিয়ে এসেছি। কিন্তু মনে-প্রাণে আজও সেই আদিম সংস্কারের অতি-স্বাভাবিক আতঙ্কের শিহরণ লেগে আছে। দৃশ্য জগতের অর্থাৎ প্রাকৃতিক জগতের কোনও একটি বস্তুকে কেন্দ্র করে,—একটা পুরানো গাছ, নির্জন পাহাড়ী উপত্যকায় হয়তো কোনও এক প্রাচীন প্রস্তরখণ্ড অথবা লোকালয়ের মধ্যস্থলেই একটা জীর্ণ কিংবা পরিত্যক্ত বাড়ি নিয়ে এমন একটা আধিভৌতিক মণ্ডলের সৃষ্টি হয়েছে যেটা অবিশ্বাস করলেও মন থেকে ঝেড়ে ফেলা শক্ত। মানুষ যেমন দৈবে বিশ্বাস করে, জ্যোতিষ গণনা কিংবা ভবিষ্যদ্ বাণীতে পূর্ণ আস্থা না রেখেও হাত দেখায়, তেমনি ভূত অথবা আত্মায় বিশ্বাসী না হয়েও একেবারে এ অদৃশ্য বস্তু-গুলোকে উড়িয়ে দিতে পারে না। মানুষের মজ্জায় ও রক্তের মধ্যে রয়েছে এই কায়াহীন ছায়ার রহস্যময় প্রীতি-আকর্ষণ। তাই সাহিত্যে আর জীবনে এত ভূতের গল্পের ছড়াছড়ি। যেটা অজ্ঞাত, যেটা অ-দৃষ্ট, সেই জিনিসটাই মনকে টানে। বিশ্বাস করি আর না করি, ভূতের গল্প পড়তে ভাল লাগে, খাঁটি বিলেতি ভূত। কেননা, এটা ঠিক যে ইংরেজ ও আমেরিকান লেখক ভৌতিক আবহাওয়া যেমন নিপুণভাবে সৃষ্টি করেছেন অন্য কোনও দেশের লেখক তেমনটি পারেন নি। ওদের দেশে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকরা সকলেই অল্পবিস্তর ভূত নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন। মধ্যযুগে নোম্, স্প্রুক, গবলিন অথবা শয়তানের দল তো ছিলই। বর্তমান জীবনের জটিল অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে বিদেশী ভূতরাও আধুনিক সাজে রূপান্তরিত হয়েছে। শেকসপীয়রের যুগ চলে গেছে। কিন্তু রেনেসাঁ, রীফরমেশ্যান ও অনেক কিছু কর্ম এবং ভাব জগতের বিপ্লব কাটিয়ে ভৌতিক আকর্ষণ আজও টিঁকে আছে। এডগার অ্যালানপো থেকে আধুনিক মার্কিন লেখক জেম্স্ থার্বর, স্টীভেনসন থেকে এম-আর-জেমস পর্যন্ত যত ইংরেজ আর আমেরিক্যান সাহিত্যিক এই অদৃশ্য জগতের নাগপাশ কাটিয়ে উঠতে পারেননি। ব্ল্যাকউড-এর 'দী উইলোজ', ডীলা মেয়রের সীটনস্ আন্ট' কিংবা জেমস-এর 'দী মেজোটিণ্ট' নামক অপূর্ব রহস্য গল্পের গা-ছমছম্যানির পাশে দেশী ভূতের গল্প একেবারেই জোলো মনে হয়। কায়াহীন আত্মা নিয়ে নিরবয়ব রহস্যমণ্ডল রচনা করতে জানতেন একা রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু মাত্র দু চারটি গল্পই তিনি লিখে গেছেন।

ফ্যানটাসি লেখা অর্থাৎ বিশুদ্ধ ও বলিষ্ঠ কল্পনার সাহায্যে সার্থক কাহিনী রচনা করা সত্যিই শক্ত কাজ। পূর্বাপর সঙ্গতি রেখে, প্রকাশে আর ইঙ্গিতে খাঁটি আবহাওয়া সৃষ্টি করতে হলে চাই উঁচুদরের শিল্পীর হাত। ফ্যানটাসির অর্থ নয় অসংলগ্ন কয়েকটা রোমাঞ্চের শিথিল গ্রন্থি। ফ্যানটাসি কিংবা ভূতের গল্পের প্রাণবস্তু হল অ্যাট্‌মস্‌ফিয়র অর্থাৎ একটি যথার্থ প্রি[illegible]। তাতে আতিশয্য থাকবে না তথ্যের। কিন্তু থাকবে সারবস্তু, মূল কথা—যেটি ভাষার লীলায়িত অথচ সংযত গুণে যথাসময়ে যথাযথভাবে ফুটে উঠবে, পাঠকের মনকে অযথা উত্তেজিত না করে অত্যন্ত স্বাভাবিক গতিতে সার্থক পরিণতির গভীর গহ্বর মুখে এনে ছেড়ে দেবে। এ ধরণের গল্প লিখতে গেলে চাই অসঙ্গতির জগতে শুদ্ধ কল্পনার ধারিণী শক্তি। অস্পৃশ্য এবং অদৃশ্য মণ্ডলের সঙ্গে থাকবে সূক্ষ্ম সংস্পর্শ; থাকবে বাস্তব ও জড় জগতের নিত্য এবং বোধ-গম্য স্পর্শ-সঙ্গতি।

ভূতের গল্পের মধ্যে জাতের তফাৎও আছে। শুধু একটা ভয় ভয়, গা-শিউরে ওঠা ভাব, নিশুতে রাতের আলো-ছায়ার কারসাজি কিংবা অমাবস্যার অন্ধকারে মুমূর্ষু রোগীর কোটরগত চক্ষু, শ্মশানঘাটের নির্জনতা অথবা পোড়ো বাড়িতে কালো বেড়ালের আনাগোনা নিয়ে গল্প বলা বা লেখা যায় বটে। কিন্তু বেশিক্ষণ সে গল্পের দাগ থাকে না মনে। সান্ধ্য মজলিস কিংবা বর্ষার আসর-জমানো গল্প এক ধরণের আর ভৌতিক কথাসাহিত্য অন্য ধরণের সৃষ্টি। অজানা অচেনা ও অদেখা জিনিস কিংবা মনোভাব নিয়ে কারবার করতে হলে চাই হুঁসিয়ার কলম। চাই সহজ আভিজাত্য-বোধ।

আশ্চর্য লাগে ভাবতে—এই ভূতের গল্প মানুষকে কিভাবে বরাবর মুগ্ধ, আকৃষ্ট করেছে। মানুষের মন এক বিচিত্র, স্বতন্ত্র জগৎ—যে জগৎ দৃশ্য আর অদৃশ্য পদার্থের মধ্যে এক ধূম্র সেতু বন্ধন করে রেখেছে। তার এ চিরন্তন দুর্বলতা। অশরীরী ছায়ারাজ্য, দুর্জ্ঞেয় এবং অনুপলব্ধ রহস্যের প্রতি তার এই স্বাভাবিক এবং অচ্ছেদ্য আসক্তি। আদিম যুগ থেকে চলে আসছে এই ম্যানড্রেক শিকড়ের রূপক কাহিনী। ইতিহাসের প্রাচীন পাতায় ভূর্জপত্রে, রক্ত লেখায়, কাজল অক্ষরে আর পাথরের কুঁদোয় কতো অলিখিত গল্প, কতো পুরাতন জনশ্রুতি, বিশ্বাস ও সংস্কার ছড়িয়ে আছে। সেই অর্ধবিস্মৃত অন্ধকার পরিবেশে আমাদের উজ্জ্বল আধুনিক মনও অসহায়-ভাবে পথ সন্ধান করে ফেরে। রূপকথা হল কথাসাহিত্যের প্রাচীন বিকাশ। কিন্তু তারও আগে আছে অজানার ভয়, মোহ এবং দুর্নিবার আকর্ষণ। মাটির নীচে আর শূন্য হাওয়ায় তার শিকড় চলে গেছে। অচেতন এবং অবচেতন মনের গভীরে প্রবেশ করে আছে ভৌতিক গল্পের ঐতিহাসিক মূল।

আমি নিজে ভূতের গল্প পড়তে ও শুনতে অত্যন্ত ভালোবাসি। তাই বোধ হয় এখনও ভূত ছাড়াতে পারছি না। ভূতের গল্পের যতই ইন্টেলেকচুয়াল ব্যাখ্যা করি না কেন, আসলে মন আমার ভয়-প্রবণ। এই ভয়-প্রবণতা আছে বলেই ভূতের গল্প আমার কাছে এত প্রিয়। যে জিনিসটা ভয়ের কারণ, সেই জিনিসটাই অদ্ভুত মোহজালে মনকে জড়ায়। শিশু যখন মায়ের কোলে শুয়ে নিরাপদ দেহে আর আশ্বস্ত মনে ভয়ের গল্প শোনে, তার সেই মনের দোলা থামে না। বড় বয়সে নিশ্চিন্ত মনে লেপ গায়ে দিয়ে শীতের রাত্রে ভূতের গল্প পড়বার সময়ে সেই পুরাতন শিশুমনের কিছুটা উত্তেজনা আর অধীর আগ্রহ এসে আবার তার ভয়-প্রবণতা জাগিয়ে দেয়, মুগ্ধ করে তার সাময়িক সত্তাকে, বিশ্বাস করায় অশরীরী মূর্তির নিঃশব্দ অস্তিত্বে। পড়তে পড়তে চোখের পাতা জড়িয়ে যায়,-অপাঙ্গ দৃষ্টির পলকে মনে হয় কে যেন অশ্রুতে পদ-সঞ্চার করে গেল। গায়ে একটু কাঁটা দিয়ে ওঠে। তবু ভালো লাগে। আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েও ঘুম আসে না। মৃত ব্যক্তিদের কথা, কতদিনের আগেকার শোনা গল্প মনের দরজায় এসে ভিড় করে দাঁড়ায়। আলোটা আবার জ্বালাতে হয়, শয্যা থেকে উঠে চোখে মুখে জল দিয়ে আর একটা সিগারেট ধরাতে হয়। মানুষের মন দূরযানী, দৃষ্টিও অদৃশ্য-সন্ধানী।

পরলোক আর প্রেততত্ত্বের চর্চা তাই সকল সভ্য দেশেই অল্পাবিস্তর হয়েছে এবং এখনও চলছে। মৃত্যুভয় থেকে আসে এই সব চিন্তা, জানবার আগ্রহ। বিশিষ্ট আত্মীয়-বিয়োগে মন যখন কাতর অথবা অপর পারে কি হচ্ছে এবং সে কেমন আছে, এই সব জানবার জন্য মন যখন ব্যগ্র ও অধীর হয়ে ওঠে, মানুষ তখন থিওজফিস্ট হয়। সীয়াঁস আর টেবল-টিলটিং মারফৎ পরলোকের বার্তা পাবার জন্য সে তখন উন্মুখ হয়ে ওঠে। উত্তর-প্রত্যুত্তরের সাহায্যে যদি কিছু মিলে যায় অথবা কোনও সত্য ঘটনার বিবৃতি প্রকাশিত হয়ে পড়ে—যা অনেক ক্ষেত্রে হয়েছে, তাহলে হাজার শিক্ষিত হলেও মন পরলোক এবং আত্মার নিঃসংশয় সংবাদে আস্থাবান হয়ে পড়ে। কত শিক্ষিত ব্যক্তি থিওজফি-চর্চায় প্রতারকের পাল্লায় পড়ে অর্থ ও স্বাস্থ্য নষ্ট করেছেন। সে খবর অনেকেই জানেন। ও জিনিসের এমনি মোহ যে ঠকেও আবার ঠকতে হয়।

## সাহিত্য-সংবাদ

### মিলন সঙ্ঘ—মালা

**রচনা প্রতিযোগিতার ফল**

২৬শে মার্চ সংখ্যার 'দেশ' পত্রিকায় যে প্রবন্ধ আবৃত্তি ও বিতর্ক প্রতিযোগিতার আহ্বান করা হইয়াছিল, তাহার ফলাফল নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ-

১। **প্রবন্ধঃ** (১) শ্রীহরিপদ শাসমল (ডায়মণ্ড-হারবার), (২) শ্রীপরেশনাথ সাফুই (ভাদুড়া); ২। **আবৃত্তিঃ** (ক) পৃথিবী—(১) শ্রীজ্যোতির্ময় দেব-সরকার (মালা); (খ) ওরা কাজ করে—(১) শ্রীমতী গোপা দত্ত (ডায়মণ্ডহারবার), (২) শ্রীঅরবিন্দ সরকার (বেলসিংহ); (গ) বীরপুরুষ ও মনে পড়া—(১) শ্রীসুভাষ হালদার (হরিণডাঙ্গা), (২) রৌশেন আলি (মালা); (৩) সবিতারাণী দেব-সরকার (মালা) (৪) দীপালী দেবসরকার (মালা); (ঘ) আবোল-তাবোল—(১) শ্রীনবনীকুমার মণ্ডল (মালা), (২) শোভারাণী মণ্ডল (মালা), (৩) শমিতা দেবসরকার (মালা); ৩। বিতর্কের জন্য কোন প্রতিযোগী পাওয়া যায় নাই।



# নূতন উপায়ে শ্যামদেশীয় চালের ভাত রান্না করুন

এই চালের ভাত ঠিকভাবে রান্না ক'রতে সম্ভবতঃ আপনার অসুবিধা হয়। সচরাচর যেভাবে ভাত রান্না করা হয়, সেভাবে রান্না ক'রলে এই চালের ভাতের সমস্তটা গলে গিয়ে আঠালো একটা দলা বেঁধে যায় অভিযোগ শোনা গেছে। কেন্দ্রীয় খাদ্যশস্য পরীক্ষাগারে দেখা গেছে যে, নিম্নলিখিত উপায়ে এই চালের বেশ ভাল ভাত রান্না করা যায়। আপনিও এই নিয়মে এই চালের ভাত রান্না ক'রে দেখতে পারেন ঃ—

(ক) **সাধারণ নিয়মঃ** ধরুন, আপনাকে আড়াই ছটাক চালের ভাত রান্না ক'রতে হবে। তাহলে প্রথমতঃ আড়াই ছটাক জল ফুটিয়ে নিন। এই জলে ঐ পরিমাণ চাল মিশিয়ে মৃদু আগুনে সিদ্ধ হ'তে দিন। চাল যখন আধাসিদ্ধ হবে, তখন তাতে আর কিছুটা জল (ধরুন, এক ছটাক) মিশিয়ে নাড়তে থাকুন। মনে রাখবেন যে, বেশী জোর না দিয়ে ধীরে ধীরে নাড়তে হবে। বেশীক্ষণ ধরে নাড়াও ঠিক নয়। যখন দেখবেন যে, পাত্রের ভিতর আর জল নেই আর চাল সিদ্ধ হয়ে গেছে, তখন উনুনের ওপর থেকে পাত্রটি নামিয়ে রাখুন। এভাবে রান্না ক'রলে এ চালের ভাত গলে গিয়ে দলা বেঁধে যাবে না। ভাতের এক-একটি দানা আর একটি দানা থেকে মোটামুটি পৃথকই থাকবে আর তা খেতেও ভাল লাগবে।

(খ) **চাল ভিজিয়ে রান্না করার প্রণালীঃ** আড়াই ছটাক চাল আড়াই ছটাক জলে প্রায় ১৫ ঘণ্টাকাল ভিজিয়ে রাখুন। তারপর ঐ জলসুদ্ধ চাল মৃদু আগুনে সিদ্ধ ক'রতে থাকুন আর দু'একবার ধীরে ধীরে চালগুলো নেড়ে দিন। এতে আর জল মেশাবার প্রয়োজন নেই। এভাবে রান্না ক'রলে এ চালের ভাত দলা বেঁধে যাবে না।

(গ) **ভেজে রান্না করার প্রণালীঃ** দুই তোলা ঘিতে আড়াই ছটাক চাল মৃদু আগুনে ভাজুন। যখন দেখবেন যে, চালের সাদা রং একটু একটু লাল হয়ে উঠেছে, তখন তাতে আড়াই ছটাক পরিমিত জল মিশিয়ে দিন। চাল আধাসিদ্ধ হ'লে তাতে আর ছটাকখানেক জল দিন। এভাবে রান্না ক'রলে ভাত দলা বেঁধে যাবে না, সে ভাত খেতে ভাল লাগবে, আর ভাতের দানাগুলি উল্লিখিত দু'টি প্রণালীতে রান্না-করা ভাতের দানার চেয়েও আলগা আলগা থাকবে।

(ঘ) **ভাপে সিদ্ধ ক'রে রান্না করার প্রণালীঃ** আড়াই ছটাক চালে সমপরিমাণ জল মিশিয়ে স্টীম কুকারে সিদ্ধ হ'তে দিন। এই উপায়ে রান্না ক'রলে ভাত দলা বেঁধে যাবে না আর তা খেতেও সুস্বাদু হবে। ভাতের দানাগুলি অন্য তিনটি প্রণালীতে রান্না-করা ভাতের দানাগুলির চেয়ে আরো একটু পৃথক পৃথকভাবে থাকবে।

শ্যামদেশে কিছু পরিমাণ এই ধরণের চাল উৎপন্ন হয় এবং যাঁরা শ্যামদেশের চাল নিয়ে থাকেন, তাঁদের বরাদ্দ চালের মধ্যে এই রকম কিছুটা চাল গ্রহণ করা একান্ত উচিত। যদি আমরা এই ধরণের চাল না নিই, তাহলে সেই সঙ্গে শ্যামদেশের যে পরিমাণ চাল আমাদের জন্য বরাদ্দ করা আছে, তার সমস্তটাই আমাদের হারাতে হয়। সরবরাহের বর্তমান অবস্থায় খাদ্যের বরাদ্দ এভাবে নষ্ট হ'তে দেওয়া চলে না। এই চাল স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর নয়।

সামনের বার, আপনাকে যখন আপনার সাপ্তাহিক বরাদ্দের অংশ হিসেবে কিছুটা এই ধরণের চাল দেওয়া হবে, তখন আপনি উল্লিখিত যে-কোন উপায়ে এ চালের ভাত রান্না ক'রে দেখবেন।

**পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনসংভরণ বিভাগ থেকে প্রচারিত**

**শুভ** নববর্ষে ব্যবসায়ীদের হালখাতা উৎসব সুসম্পন্ন হইয়া গেল। আয়কর বিভাগ ব্যবসায়ীদের হালে প্রবর্তিত দ্বিতীয় নম্বর খাতাটির সন্ধান করিতেছেন। কিন্তু তাঁরা বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছেন যে, ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে এই হালের খাতাটির 'হাল-খাতার' প্রয়োজন হয় না।

*   *   *   *   *

**আমাদের** রাষ্ট্রপাল শ্রীযুক্ত রাজাজী বলিয়াছেন যে, ভারতের কুটীরশিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয় করিয়াই আমরা অধিক পরিমাণ ডলার উপার্জনে সক্ষম হইব। বিশু খুড়ো বলিলেন—"অতঃপর তালপাতার ভেঁপুর উৎপাদন নিশ্চয়ই আরো অধিক পরিমাণে বেড়ে যাবে।"

*   *   *   *   *

**ছেলে** এবং মেয়েদের বিবাহের নিম্নতম বয়স নির্ধারিত হইয়া গিয়াছে। ঊর্ধ্বতম বয়সের সীমারেখা এখনও নির্ধারিত হয় নাই, সুতরাং মাভৈঃ।

*   *   *   *   *

**কর্তৃপক্ষ** নাকি ঠিক করিয়াছেন যে, তাঁরা অতঃপর দিল্লীর হোটেলের খাদ্যতালিকা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। "অর্থাৎ খাড়া-বড়ি-থোড় কখন থোড়-বড়ি-খাড়া হয়-না-হয়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন"—মন্তব্য করিলেন বিশু খুড়ো।

*   *   *   *   *

"IT was in the forest that our great poets sang of the truths they discovered"—বলিয়াছেন আমাদের খাদ্য মন্ত্রী শ্রীযুক্ত জয়রামদাস দৌলতরাম। বিশু খুড়ো বলিলেন—"সত্যি কথা যে লোকালয়ে বলার বিপদ আছে, তা তাঁরা জানতেন।"

**সংবাদদাতা** জানাইতেছেন, পণ্ডিত জওহরলাল নাকি বিলাত যাত্রার প্রাক্কালে জুহুতে অনেকক্ষণ সাঁতার কাটিয়াছেন। —"তাহলে ডুবে মরার আশংকা আমাদের নেই"—মন্তব্য করিল আমাদের শ্যামলাল।

*   *   *   *   *

**কলিকাতার** রাস্তার স্তিমিত আলোর জন্য কর্পোরেশনই দায়ী, একথা বলা হইয়াছে গ্যাস কোম্পানীর তরফ হইতে। খুড়ো বলিলেন—"আহা, ষাট, ওকথা বলবেন না, এর জন্যে দায়ী আমরাই। আমরা চোখের মাথা খেয়েছি বলেই তো চোখে কিছু দেখতে পাইনে।"

*   *   *   *   *

**বাজারে গুজব** কলিকাতায় নাকি সম্প্রতি ছেলেধরার দল আসিয়াছে। আমরা কথাটা বিশ্বাস করি না, তবু সতর্কবাণী উচ্চারণ করিতেছি—রাজনৈতিক চোংড়ার দল সাবধান হউন।

*   *   *   *   *

**কলিকাতায়** সম্প্রতি Keep to the pavement আন্দোলন চলিতেছে। বলা বাহুল্য, ইহা ফুটপাথ ধরিয়া পথ চলারই আন্দোলন এবং নাগরিক মাত্রেরই এই আন্দোলনে সাড়া দেওয়া উচিত। "এটাকে কেউ যেন ফুটপাথে বসবাসের আন্দোলন মনে না করেন"—টীকা করিলেন বিশু খুড়ো।

*   *   *   *   *

**আফ্রিকার** সংগে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন হইলেও এই দুই দেশের মধ্যে পশু বিনিময় এখনও চলিতেছে। —"Essential goods-এর মর্যাদা দিতে হবে বৈকি"—বলিলেন বিশু খুড়ো।

**আমাদের** প্রদেশপাল ডাঃ কাটজু তাঁর এ[...] সাম্প্রতিক ভাষণে বলিয়াছেন—"Stan[d] on your own legs." "ট্রামে-বাসে চলা[র] সময় কিন্তু সেটা সব সময় সম্ভব হয় না, বা[ধ্য] হয়েই তখন অন্যের পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে হয়"—মন্তব্য করিলেন ট্রামে-বাসে[র] এক যাত্রী।

*   *   *   *   *

**স্বামী** নিখিলানন্দজী বলিয়াছেন—"Don't run after name" বিশু খুড়ো আবার বলিলেন—"কিন্তু স্বামীজী কি জানেন না যে, কলিতে নামৈ[ব] কেবলম্?"

*   *   *   *   *

**লালা** অমরনাথ বলিয়াছেন—"I expect Board will play cricket with me." মিঃ ডি' মেলো নাকি একবার ডন ব্র্যাডম্যানকে আউট করিয়াছিলেন। আশা করি তিনি লালাজীর অনুরোধ রক্ষা করিতে পশ্চাৎপদ হইবেন না। আমাদের শুধু অনুরোধ—তিনি যেন Body line-এর আশ্রয় গ্রহণ না করেন।

*   *   *   *   *

**নতুন** চমকপ্রদ ভ্রমণের ব্যবস্থা করুন"—একটি বিজ্ঞাপন। বিশু খুড়ো বলিলেন—"আমরা যে ভ্রমণ-ব্যবস্থায় দশটা-পাঁচটা অফিস করি, তা দেখে যে-কোন দেশের যে-কোন জাতের পিলে পর্যন্ত চমকে যাওয়ার কথা; এর চেয়ে আর কী চমকপ্রদ ব্যবস্থা হবে?"
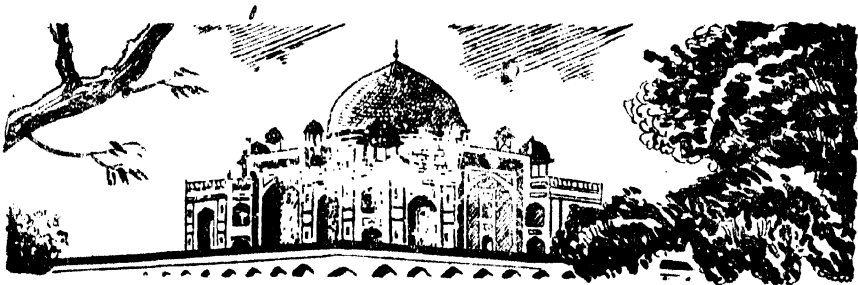
নতুন বর্ধিত হারে প্রমোদ-কর বহাল হওয়ার প্রথম মাস অতিক্রান্ত হলো। এই মাত্র তিরিশটা দিনের হিসেব থেকেই কলকাতার চিত্রগৃহগুলিতে দেখা যাচ্ছে যে, লোকসমাগম প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কমে গিয়েছে। চিত্র-ব্যবসায়ী মহলের আক্ষেপ ছিলো যে, কর বাড়িয়ে দেওয়ার জন্যে জনসাধারণের কাছ থেকে কোন প্রতিবাদ পাওয়া যায় নি। এখন দেখা যাচ্ছে যে, তাদের সে ধারণা একেবারেই ভুল—চিত্রগৃহে আসা আগের চেয়ে কম করাই তো জনসাধারণের প্রচণ্ডতম প্রতিবাদ। এখানে একটা কথা অবশ্য বলে রাখা ভালো যে, জনসাধারণ যে ছবি দেখা কম ক'রে দিচ্ছে, সেটা কর না দেবার মতলবে নয়—এখনকার হারে কর দিয়ে আগের মত ছবি দেখা বজায় রেখে যাওয়া আর তাদের সাধ্যে কুলচ্ছে না বলেই সখটা তাদের একটু কমিয়ে ফেলতে হ'য়েছে। হিসেব থেকে দেখা যাচ্ছে যে, জনসমাগম কম হলেও গভর্নমেণ্টের এখনও কোন লোকসান যাচ্ছে না। বরং কর বাড়িয়ে গভর্নমেণ্টের আয় কিছু বেড়েছে। কিন্তু তাতে চিত্রশিল্পের লোকসান বাঁচানো যাচ্ছে না। যেহেতু ইতিপূর্বেই আমরা আলোচনা প্রসঙ্গে দেখিয়েছি পুরেণো হারে একশো টাকার বিক্রীতে যেখানে এখুনে প্রায় তিরিশ টাকা কর দিতে হ'তো, নতুন হারে সে জায়গায় দিতে হচ্ছে এখুনে প্রায় পঞ্চাশ টাকা। অর্থাৎ এখন কর বাড়বার দরুণ বিক্রী কমে গিয়ে যদি ছেষট্টি টাকাতেও দাঁড়ায়, তাহলেও গভর্নমেণ্টের ভাগে পড়ছে তেত্রিশ টাকারও বেশী। তার মানে পুরেণো কম হারের করের থেকে যা আমদানী হ'তো, তার চেয়ে প্রায় তিন টাকা বেশীই আয় হচ্ছে এবং সেটা হচ্ছে মোট বিক্রী কম হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও। এ থেকে আরও দেখা যাচ্ছে যে, করের পুরেনো হারে গভর্নমেণ্টের ভাগ বাদ দিয়ে চিত্র-ব্যবসায়ীর হাতে একশো টাকার মধ্যে প্রায় সাতষট্টি টাকা থেকে যাচ্ছিল, যার মধ্যে গোটা পঁয়ত্রিশ টাকা যাচ্ছিলো পরিবেশকের ভাগে, আর ঐ পঁয়ত্রিশ থেকে অন্তত পনেরো-বিশ টাকাও তবু চিত্রশিল্প অর্থাৎ নির্মাতার হাতে পৌঁছবার সম্ভাবনা ছিলো। এখন ছেষট্টি টাকা থেকে তেত্রিশ টাকা গভর্নমেণ্টকে দেবার পর ব্যবসায়ীর হাতের বাকি তেত্রিশের মাত্র গোটা ষোল যাচ্ছে পরিবেশকের হাতে, আর তা থেকে নির্মাতার হাতে যা পৌঁচচ্ছে এবং সেই টাকায় নির্মাতার অবস্থা কি দাঁড়াচ্ছে, তা কথার চেয়ে অনুভব করে নেওয়া অনেক সহজ।

তবুও কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, এই এপ্রিল মাসেতেই কলকাতার প্রায় সব স্টুডিওগুলি মিলিয়ে প্রায় দু'ডজন নতুন ছবির মহরৎ সুসম্পন্ন হচ্ছে, যার মধ্যে প্রায় কুড়িখানিই হচ্ছে বাঙলা ছবি। এক পয়লা বৈশাখেই মহরতের সংখ্যা এগারোতে দাঁড়িয়েছিলো। জানি না, এর মধ্যে শেষ হবে কতগুলি ছবি, কিন্তু ছবি তোলার এই অস্বাভাবিক হিড়িকের মধ্যে একটা কোন [illegible] আছেই, নয়তো অতগুলো চিত্র-নির্মাতা সব জেনেশুনেও ঝাঁপিয়ে পড়বে, সেটা যেন কেমনতরো ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কোন দিক থেকে কিসের আশ্বাস এই সব চিত্র-নির্মাতারা যে পাচ্ছে, তা আমাদের বুদ্ধির বাইরে। কিন্তু বাঙলা চিত্রনির্মাতারা কোন অবস্থাতেই যে দমে যায় না, এটা চিত্রশিল্পের পক্ষে একটা আশার কথাও বটে এবং হয়তো তাদের এই দুর্দমনীয় প্রচেষ্টাই বাঙলা ছবিকে বাঁচিয়ে তুলবে আবার।

**নৃত্যশিল্পী মৃণালিনী**

ভারতের দক্ষিনী নৃত্যশিল্পী মৃণালিনী সারাভাই ও তাঁর নৃত্যসম্প্রদায় সম্প্রতি লণ্ডনে মার্টিনস্ থিয়েটারে নৃত্যকলা প্রদর্শন ক'রে প্রশংসা অর্জন করেন। মৃণালিনী কিছুকাল শান্তিনিকেতনে কলাভবনের ছাত্রী ছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে কলকাতায় 'শ্যামা', 'চণ্ডালিকা' প্রভৃতি নৃত্যনাট্যাভিনয়ে প্রধান অংশ গ্রহণ করেন। মৃণালিনী মালাবারের অম্মু স্বামীনাথমের কন্যা ও ক্যাপ্টেন লক্ষ্মীর বোন। আমেদাবাদের বিখ্যাত মিল মালিক আম্বালাল সরাভাইয়ের ইনি পুত্রবধূ।

## ভারতে কাঁচা ফিল্ম তৈরী

কিছুদিন পূর্বে ভারতীয় পার্লামেণ্টে এক তর্কের সময়ে শিল্পমন্ত্রী জানান যে, কলকাতায় কোন একটি প্রতিষ্ঠান ভারতে কাঁচা ফিল্ম তৈরীর কাজে উদ্যোগী হ'য়েছে এবং ভারত সরকার এবিষয়ে তাঁদের সহযোগিতা দিচ্ছেন। খবরটি প্রকাশিত হবার পর এ বিষয়ে আর কিছুই জানা যায়নি। সম্প্রতি জানা গিয়েছে যে, ইণ্ডিয়া ফটো-প্লেট পেপার এণ্ড ফিল্ম ম্যানুফেকচারিং লিমিটেড নামে একটি প্রতিষ্ঠান তাদের কালিমপঙের কারখানায় এবিষয়ে সাতাই অনেকখানি অগ্রসর হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানটি শ্রীপ্রকাশচন্দ্র চ্যাটার্জীর উদ্যোগে ১৯৩৪ সালে স্থাপিত হয় এবং ফিল্ম তৈরী বিষয়ে তারা অনেক দূরে অগ্রসর হন। কিন্তু যুদ্ধের দরুণ প্রতিষ্ঠানের জার্মান বিশেষজ্ঞ ডাঃ এডাম ট্রুমকে চলে যেতে হওয়ায় সমস্ত কাজ বন্ধ

**আলী খান ও রিটা হেওয়ার্থ**

হলিউডের বিখ্যাত সুন্দরী চিত্রাভিনেত্রী রিটা হেওয়ার্থ আগা খাঁর একমাত্র পুত্র আলী খাঁর পাণিগ্রহণ করছেন এই সংবাদে আমেরিকায় খুব সোরগোল পড়ে গিয়েছিল শীঘ্রই তাঁরা পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হবেন এ সংবাদ ঘোষিত হয়েছে। প্যারিসের ঘোড়দৌড়ের মাঠে দুজনকে এক [illegible] দেখা যাচ্ছে।

থাকতে বাধ্য হয়। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিকে নতুনভাবে গঠন করা হ'য়েছে এবং পরিচালক-মণ্ডলীর সভাপতিরূপে খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং সহঃ সভাপতিরূপে ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষকে গ্রহণ করা হ'য়েছে। ডাঃ ঘোষকে পুনরায় বহাল করার জন্য এবং জার্মানী যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য থেকে যন্ত্রপাতি আনার জন্যে ভারত সরকারের সংগে কথা বলেছে। উদ্যোক্তারা আশা করেন যে, ১৯৫২ সালের মধ্যে তাদের তৈরী কাঁচা ফিল্ম বাজারে চালু হ'তে পারবে।

### দক্ষিণী

আগামী ২৫শে বৈশাখ দক্ষিণী কৃষ্টি কেন্দ্রের প্রথম বার্ষিকী সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হবে। এই উপলক্ষে রবীন্দ্র-সংগীতের একটি জলসার আয়োজন করা হয়েছে, যাতে 'দক্ষিণী'র রবীন্দ্র-সংগীত শিক্ষালয়ে ও নৃত্যকলা কেন্দ্রের সভ্যরা ছাড়া শান্তিনিকেতন থেকেও অনেকেই যোগদান করবেন।

রূপায়ন চিত্র-প্রতিষ্ঠানের "দেবী চৌধুরাণী" চিত্রে প্রদীপকুমার ও স্বাগতা

দক্ষিণ কলকাতার কয়েকজন যুবকের উৎসাহে দক্ষিণীর প্রতিষ্ঠা হয় মাত্র এক বছর পূর্বে, কিন্তু ইতিমধ্যেই তারা জনসাধারণের মধ্যে আদরণীয় হয়ে উঠতে পেরেছে। গত বৎসর জুন মাসে এদের উদ্যোগে একটি চারদিন-ব্যাপী অনবদ্য অনুষ্ঠান হয়, যার মোট পাঁচটি অধিবেশনে ২০টি বিভিন্ন শ্রেণীর রবীন্দ্র-সংগীতের জলসা হয়, যাতে বাঙলার প্রায় সমস্ত সংগীতজ্ঞরাই যোগদান করেন। তা'ছাড়া 'দক্ষিণী' নিয়মিতভাবে অভিজ্ঞ শিক্ষকদের পরিচালনায় জনসাধারণের মধ্যে রবীন্দ্র-সংগীত প্রচার ও শিক্ষার ব্যবস্থা ক'রে আসছে। এ ছাড়া শান্তিনিকেতনী ঢঙে নৃত্য-শিক্ষারও একটি কেন্দ্র এদের দ্বারা পরিচালিত হয়। এই কৃষ্টি কেন্দ্রটির উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

নিউথিয়েটার্সের "অভিমান" চিত্রে শ্রীমতী সন্ধ্যারাণী

### নতুন মহরৎ

১লা বৈশাখ—ক্যালকাটা মুভীটোনে কলালক্ষ্মী চিত্রের 'স্বামী', পরিচালক পশুপতি চট্টোপাধ্যায়; খগেন রায়ের পরিচালনা ও প্রযোজনায় একখানি ছবি। ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে মায়াপুরী পিকচার্সের 'ছায়ানট' ও 'বিজলিকা', দুখানিরই পরিচালক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়; মানু সেনের পরিচালনায় 'বৈকুণ্ঠের উইল'; স্বাগত পিকচার্সের 'উপেক্ষিতা'। ন্যাশনাল সাউণ্ড স্টুডিওতে এ মপি প্রোডাকসন্সের একখানি ছবি, অগ্রদূতের পরিচালনায়।

১৩ই বৈশাখ—কালি ফিল্মস স্টুডিওতে দেশ পিকচার্সের 'রাত নিরালী' (হিন্দী ও 'লীলা কমল' (বাঙলা), দুখানি ছবিরই পরিচালক সুনীল মজুমদার।

### ভারতের প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য কার্টুন ছবি

কলকাতার কার্টুনাইজেশন নামক একটি প্রতিষ্ঠান ৪ই বছর পরিশ্রম করে 'সাবাস' নামে হিন্দী ও বাঙলা ভাষায় একখানি পূর্ণদৈর্ঘ্য কার্টুন ছবি তোলা সমাপ্ত ক'রেছে বলে খবর পাওয়া গেল। কার্টুনটিতে সর্বসমেত পনেরোটি বিভিন্ন চরিত্র সন্নিবিষ্ট হ'য়েছে এবং তার প্রদর্শনকাল হ'চ্ছে আশী মিনিট। ছবিখানি পরিকল্পনা ও পরিচালনা ক'রেছেন শ্রীপ্রকাশ মল্লিক।

### নিউ থিয়েটার্সের নতুন বাঙলা ছবি

নির্বাক ও সবাক যুগের গোড়ার আমলের জনপ্রিয় ইংরিজি ছবি 'ওভার দি হিল' অবলম্বনে পরিচালক বিমল রায় তাঁর পরবর্তী বাঙলা ছবির চিত্রনাট্য রচনায় ব্যস্ত আছেন। ছবিখানি তোলার অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই সম্পূর্ণ করে ফেলার জন্য প্রাথমিক কাজ দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

### গীতবিতান কর্তৃক "বসন্ত" অভিনয়

আগামী ১লা ও ২রা মে তারিখে "নিউ এম্পায়ার" মঞ্চে গীত-বিতান কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের 'বসন্ত' অভিনীত হইবে। রবীন্দ্রনাথের ঋতু উৎসবগুলির মধ্যে এই সংগীত-মুখর 'বসন্ত' নাটিকার একটি বিশেষ স্থান আছে। কবি গানের অর্ঘ্যে ঋতুরাজের আবাহন রচনা করিয়াছেন। শীতের রিক্ত প্রাঙ্গণে বসন্ত যে রসের প্লাবন উৎসারিত করিয়া তোলে, সুরের ভাষাতেই কবি তার নাট্যরূপ দিয়াছেন। নৃত্যব্যঞ্জনার সহযোগে সেই রূপ আরও পরিস্ফুট ও চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাট্যাভিনয়ে বিশেষ একটি ধারার প্রবর্তন করিয়াছেন :

গীতবিতান
কর্তৃক
গীত-বিতানের সাহায্যার্থে
রবীন্দ্রনাথের
"বসন্ত"
নৃত্যাভিনয়
নিউ এম্পায়ার
রবিবার, ১লা মে সকাল ১০টা
সোমবার, ২রা মে সন্ধ্যা ৬টা
প্রবেশমূল্য—২০, ১০, ৫, ৩, ও ২,
প্রাপ্তিস্থান : গীতবিতান, ১৫৫ রসা রোড ও ১ ভুবন সরকার লেন (শনি ও বুধবার বিকাল ও রবিবার সকালে) মেলোডি, ৮২এ রাসবিহারী এভিনিউ।

## ক্রিকেট

লালা অমরনাথের উপর ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের হঠাৎ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন ব্যাপারটি সহজে মিটিবে না, অনেকদূর গড়াইবে, ইহা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি সুতরাং বর্তমানে একের পর এক বিভিন্ন প্রাদেশিক ক্রিকেট এসোসিয়েশনের প্রতিবাদসূচক অভিমত প্রকাশিত হইতে দেখিয়া কোনরূপ আশ্চর্য হই নাই। তবে বাঙলা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের কার্যকরী সমিতির সভায় যেরূপ ধরণের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন সেইরূপ কঠোর সুতীক্ষ্ম বাক্যবাণ আমরা আশা করি নাই। বোর্ড অমরনাথকে তাঁহার অভিযোগ সম্বন্ধে কোন কিছু বলিবার সুযোগ না দিয়া চুপি চুপি কাজ সারিয়া অত্যন্ত অন্যায়, নীতিবিরুদ্ধ ও স্বেচ্ছাচারিতার পরিচয় দিয়াছেন বলিয়া বাঙলা ক্রিকেট এসোসিয়েশন প্রস্তাবের মধ্যে উল্লেখ করায় সত্যই আশ্চর্যান্বিত হইয়াছি। বাঙলার ক্রিকেট পরিচালকগণের সুদৃঢ় মনোভাবের অভিব্যক্তি সত্যই প্রশংসনীয়। যাহা অন্যায় যাহা নীতিবিরুদ্ধ তাহা কখনই নীরবে সহ্য করা উচিত নহে। স্পষ্ট ভাষায় তাহার প্রতিবাদ করা প্রত্যেক দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন লোকেরই কর্তব্য। বাঙলার ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সমতুল্য প্রতিবাদ আর কোন প্রাদেশিক এসোসিয়েশন করে নাই। একটি প্রাদেশিক এসোসিয়েশনের সম্পাদক যেভাবে এই অন্যায়ের প্রতিবাদ জানাইয়াছেন তাহা না করিলেই বোধ হয় ভাল করিতেন। ঐ প্রদেশের কার্যকারী সমিতি কি করিতেছেন? জাতির সম্মান হানিকর ঘটনা কি একেবারেই নীরবে তাঁহারা মানিয়া লইবেন? দিল্লী এসোসিয়েশনের পরিচালকমন্ডলীর প্রস্তাব গ্রহণের মধ্যে প্রকৃত মনোভাবের পরিচয় পরিস্ফুট না হইলেও কণ্ট্রোল বোর্ডের সভাপতিকে সভায় উপস্থিত রাখিয়া যে প্রতিবাদসূচক প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন ইহাতে বাহাদুরি আছে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। বোম্বাই ও হোলকার ক্রিকেট এসোসিয়েশনের নীরবতা সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন। বোর্ডের যে সভায় অমরনাথের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক প্রস্তাব গৃহীত হয় ঐ সভায় উক্ত দুইটি এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি উপস্থিত থাকিয়া ঠিক বর্তমানের ন্যায় কোনরূপ কথা বলেন নাই। ইহাতে অনেকেই সন্দেহ করিতেছেন অমরনাথকে ভারতীয় ক্রিকেট হইতে বিতাড়নের পশ্চাতে ইহারাও আছেন। এতবড় অপবাদ আমরা সমর্থন করি না, তবে নীরবতা সমীচীন নহে ইহা না বলিয়া পারা যায় না। শীঘ্রই ইহাদের অভিমত জানিতে পারা যাইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

## হকি

বেঙ্গল হকি এসোসিয়েশন বিশ্বজয়ী ভারতীয় অলিম্পিক হকি দলের সহিত বেটন প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী বিভিন্ন দলের খেলোয়াড়দের লইয়া গঠিত অবশিষ্ট দলের এক প্রদর্শনী খেলার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই খেলা যে উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা সাফল্যমণ্ডিত হইলেও খেলা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারা যায় নাই। অলিম্পিক দল খ্যাতি অনুযায়ী ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। ব্যক্তিগতভাবে কয়েকজন খেলোয়াড় ভাল খেলিলেও দলগতভাবের খেলা মোটেই উচ্চাঙ্গের হয় নাই। ভারতীয় হকি স্ট্যান্ডার্ডের পতনের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব হকি স্টান্ডার্ডও যে নিম্নস্তরের হইয়াছে ইহা স্পষ্টই এই খেলায় প্রতীয়মান হইয়াছে। ভারতের হকি স্ট্যান্ডার্ড উন্নততর না করিলে বিশ্ববিজয়ী সম্মান অক্ষুন্ন থাকিবে না ইহা আশঙ্কা করিবার মত যথেষ্ট কারণ আছে। সৌভাগ্যের বিষয় যে, ১৯৫২ সালের বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠানের কর্মসূচী হইতে হকি খেলা বাদ দিবার চেষ্টা চলিয়াছে। ভারতের অনেক ক্রীড়ামোদী আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সিদ্ধান্ত পাঠে চঞ্চল হইয়াছেন কিন্তু আমরা বলিব ভারতীয় হকি দল পর পর তিনবার বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠানে হকি খেলায় বিজয়ী হইয়া যে খ্যাতি ও সুনাম অর্জন করিয়াছে তাহা যাহাতে ভবিষ্যতে রক্ষা পায় সেইদিকেই সকলের দৃষ্টি দেওয়া উচিত। অনুষ্ঠানের জন্য ব্যস্ত হইবার কোনই কারণ নাই। পরবর্তী অনুষ্ঠানের কর্মসূচীতে যখন হকি খেলা স্থান পাইবে তখন যেন ভারতীয় হকি দল খুবই উচ্চাঙ্গের ক্রীড়াকৌশল প্রদর্শন করিতে পারে তাহার জন্যই উঠিয়া পড়িয়া চেষ্টা করা উচিত। বিশ্বজয়ী হইবার সুযোগ গেল সুতরাং আর কিছুই করিবার নাই, নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকা কখনই যুক্তিসঙ্গত হইবে না।

কার্যকরী সমিতির সিদ্ধান্ত রোমের সাধারণ সভায় গৃহীত হইবে ইহা কে জোর করিয়া বলিতে পারে? বিশেষ করিয়া ভারতীয় প্রতিনিধি মিঃ জি ডি সোন্ধী যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন তাহা কার্যকরী হইবে না আশঙ্কা করিবারও কোন কারণ ঘটে নাই। তিনি নিশ্চয় না জানিয়া শুনিয়া বিবৃতি প্রকাশ করেন নাই। ইহা ছাড়া আমেরিকার অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সভাপতির উক্তিও উপেক্ষা করা চলে না। তিনি ১৯৫২ সালের বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন "ইহারা সকলে ঘরবাড়ি ছাড়িয়া জঙ্গলে বাস করিয়া বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের থাকিবার স্থান করিয়া দিতে পারে।" এতবড় ত্যাগ স্বীকার ইতিপূর্বে কোন দেশের পরিচালকগণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন বলিয়া আমরা শুনি নাই। সুতরাং হকি খেলা অনুষ্ঠান কর্মসূচী হইতে বাদ পড়িবেই ইহা এখন হইতেই ধারণা করা আমাদের অন্যায় হইবে।

## ফুটবল

খেলোয়াড় আমদানী করিয়া দল পুষ্ট করার নীতি আমরা কোন দিনই সমর্থন করি নাই। সুতরাং বর্তমানে বাঙলার কয়েকটি বিশিষ্ট ক্লাবের পরিচালকদের বাঙলার বাহিরের খেলোয়াড় আনিয়া দলের শক্তি বৃদ্ধির জন্য ছুটাছুটি করিতে দেখিয়া সত্যই মর্মাহত হইয়াছি। ইহারা বাঙলার উৎসাহী ফুটবল খেলোয়াড়দের সকল উৎসাহ ও উদ্যমের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছেন ইহা বলিতে আমাদের কোন দ্বিধা বোধ হইতেছে না। খেলোয়াড় সৃষ্টি করিবার যাহাদের শক্তি নাই তাহাদের ক্লাব পরিচালনা করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করাই অন্যায়। দেশের পরাধীনতা উৎসাহী ফুটবল খেলোয়াড়দের এতদিন প্রতিবাদের ক্ষমতা হরণ করিয়া ছিল কিন্তু বর্তমানে দেশ স্বাধীন। এই সময় অনিষ্টকারী নীতি খেলোয়াড়গণ নীরবে সহ্য করিবে ইহা পরিচালকগণ কিরূপে ধারণা করিলেন বুঝিতে পারি না। বহু অর্থের বিনিময়ে যে এই সকল বাহিরের খেলোয়াড় কলিকাতায় খেলিতে আসিতেছেন ইহা আগে বলিলে কেহ বিশ্বাস করিত না কিন্তু এখন সকলেই জানে। টাকার আদান প্রদান প্রকাশ্যে না হইলেও কিভাবে সকল ব্যবস্থা হইয়া থাকে তাহা জানিতে কাহারও বাকী নাই। গ্রেট ব্রিটেনের ন্যায় পেশাদারী ব্যবস্থা ফুটবল খেলায় প্রবর্তন করিলে কাহারও কিছু বলিবার থাকিবে না। কিন্তু যতক্ষণ তাহা না হইতেছে ততক্ষণ বাঙলার প্রত্যেক উৎসাহী খেলোয়াড়ের অধিকার আছে বাঙলার বিশিষ্ট দলসমূহে খেলিবার ও উন্নততর নৈপুণ্যে অধিকারী হইবার। ন্যায়সঙ্গত দাবী হইতে তাঁহাদের বঞ্চিত করিলে তাহারা কখনও তাহা সহ্য করিবে না।

অলিম্পিক দলের সঙ্গে অবশিষ্ট দলের হকি খেলা প্রদর্শনীর একটি দৃশ্য

## দেশী সংবাদ

১৯শে এপ্রিল—ইংলণ্ড যাত্রার প্রাক্কালে জওহরলাল নেহরু অদ্য দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্দিরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।

গ্রেট বৃটেনস্থ ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রী ভি কে কৃষ্ণ মেনন আয়ারল্যাণ্ডে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হইয়াছেন। শ্রীযুত মেনন হাই কমিশনারের কার্য ব্যতীতও ঐ কাজ চালাইবেন।

অস্ট্রেলিয়ার প্রধান মন্ত্রী মিঃ জোসেফ চিফলী ও নিউজিল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ পিটার ফ্রেজার লণ্ডন যাওয়ার পথে অদ্য বিমানযোগে কলিকাতায় পৌঁছিয়াছেন।

১৯শে এপ্রিল—ইংলণ্ড যাত্রার প্রাক্কালে বোম্বাইয়ে এক সাংবাদিক বৈঠকে ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বলেন যে, কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির সহিত ভারতের ভবিষ্যৎ সম্পর্ক কিরূপ হইবে, ইহা নির্ধারণ করাই আমার এইবার ইংলণ্ড গমনের মুখ্য উদ্দেশ্য। ভারতের পররাষ্ট্র নীতি বিশ্লেষণ করিয়া পণ্ডিত নেহরু বলেন যে, পরস্পর শত্রু ভাবাপন্ন ব্লকগুলির সহিত আমরা যুক্ত হইতে পারি না। কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রী সম্মেলনে যোগদানের জন্য পণ্ডিত নেহরু অদ্য রাত্রিতে বোম্বাই বিমান ঘাঁটি হইতে লণ্ডন যাত্রা করেন।

কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের পক্ষ হইতে ভারতবর্ষের পাকিস্থানস্থিত হাই কমিশনার স্যার সীতারামকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। উহাতে ভাষণ প্রসঙ্গে তিনি এইরূপ প্রতিশ্রুতি দেন যে, পূর্ব পাকিস্থানে সম্প্রতি আয়কর আইনের কয়েকটি ধারা বলবৎ করার ফলে পূর্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে আগমনকারী ব্যক্তিগণকে সরকারী সার্টিফিকেট প্রদর্শন সম্পর্কে যে সকল অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে, তাহার বিষয় তিনি ভারত সরকারের গোচরীভূত করিবেন।

অদ্য অতি প্রত্যুষ হইতে কলিকাতায় শ্যামবাজার অঞ্চলে ছেলে-চুরির এক গুজব রটিয়া যায়। ইহার পরিণতি স্বরূপ রাত্রি প্রায় ৮ ঘটিকার সময় শ্যামবাজারের মোড়ে সাধুর বেশধারী ৪৫ বৎসর বয়স্ক এক ব্যক্তিকে এক ক্ষিপ্র জনতা পাথর ছুড়িয়া নিহত করে।

২০শে এপ্রিল—ঢাকার সংবাদে প্রকাশ, অদ্য পুলিশ প্রায় ৫ শত ছাত্রের এক শোভাযাত্রার উপর লাঠি চালাইয়া ও কাঁদুনে গ্যাস প্রয়োগ করিয়া তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিয়াছে। কতিপয় ছাত্রকে চিকিৎসার্থ হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে।

কলিকাতায় শিশু নিরুদ্দেশের ব্যাপারে আতঙ্কের সঞ্চার হয় এবং উহার ফলে গত মঙ্গলবার ও বুধবার কয়েকটি বিশ্রী ঘটনা ঘটে। এইসব ঘটনায় ক্রুদ্ধ জনতা ছেলেধরা সন্দেহে কয়েকজনকে নির্মমভাবে মারপিট করে; ফলে দুই ব্যক্তি নিহত ও কয়েকজন আহত হইয়াছে।

ঢাকায় পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রিদ্বয়ের এক সম্মেলন হয়।

নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত ভারতীয় যক্ষ্মা নিবারণী সমিতির ১১শ বাৎসরিক সাধারণ সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ প্রসঙ্গে ভারতের স্বাস্থ্য

মন্ত্রী রাজকুমারী অমৃত কুমারী বলেন যে, ভারতে প্রতি মিনিটে একজন লোক যক্ষ্মার মারা যায়।

"আনন্দবাজার পত্রিকা", "হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড" ও "দেশ" পত্রিকার ডিরেক্টরগণের পক্ষ হইতে অদ্য মধ্যাহ্নে ভারত সরকারের সংবাদ ও বেতার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীযুত আর আর দিবাকরকে গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে এক প্রীতি ভোজে আপ্যায়িত করা হয়।

২১শে এপ্রিল—পাকিস্থানী সৈন্যরা কাশ্মীরের বিভিন্ন অঞ্চলে যুদ্ধবিরতি চুক্তি ভঙ্গ করায় ভারত সরকার গতকল্য রাওলপিণ্ডিতে কাশ্মীর কমিশনের নিকট সরকারীভাবে প্রতিবাদপত্র প্রেরণ করিয়াছেন।

পুরুলিয়ার সংবাদে প্রকাশ, অদ্য চাণ্ডিল থানার অন্তর্গত নিমডি এবং বড়বাজার থানার অন্তর্গত লাকা ও আদাবনীতে মানভূম সত্যাগ্রহের দ্বিতীয় পর্যায় আরম্ভ হইয়াছে।

আগরতলার সংবাদে প্রকাশ, কমলপুর হইতে এই মর্মে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, ত্রিপুরা রাজ্য ও পাকিস্থানের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মধ্যে এক সংঘর্ষ হইয়াছে।

পূর্ব পাঞ্জাবে সাচার মন্ত্রিসভা পুনর্গঠিত হইয়াছে। ডাঃ গোপীচাঁদ ভার্গব, শ্রীপৃথ্বী সিং, আজাদ এবং সর্দার গুরুবচন সিংকে নবগঠিত মন্ত্রিসভায় লওয়া হয়। পূর্ব পাঞ্জাবের গভর্নর নূতন তিনজন মন্ত্রীকে শপথ গ্রহণ করান।

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় অদ্য কলিকাতায় আপার সার্কুলার রোডস্থ বিজ্ঞান কলেজের প্রাঙ্গণে রেডিও ফিজিক্স ও ইলেকট্রনিকস্ ইনস্টিটিউটের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।

২২শে এপ্রিল—পূর্ববঙ্গ সরকার ২২শে এপ্রিল হইতে পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত কলিকাতায় প্রকাশিত 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' 'আনন্দবাজার পত্রিকা', 'ইত্তেহাদ' ও 'নেশন'—এই চারিখানি দৈনিক সংবাদপত্রের পূর্ববঙ্গে প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

২৩শে এপ্রিল—লোকসেবক সঙ্ঘের পরিচালক ও মানভূম সত্যাগ্রহের নেতা শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ অদ্য সত্যাগ্রহ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়াছেন। প্রকাশ, নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্পাদকের নিকট হইতে একখানি তার ও পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি [illegible] ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়ার একখানা পত্র পাওয়ার পর [illegible] এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

[illegible] বোম্বাই গভর্নমেন্টের জনৈক মুখপাত্র অদ্য [illegible] ইতিপূর্বে কোলাপুর [illegible] রাট ও দা[illegible] শাসনভার প্রদেশ [illegible] আইন অনুযায়ী বোম্বাই সরকার গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদের সব কয়টিই আগামী ১৫ই মে সম্পূর্ণরূপে বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

কুড়িগ্রামের এক সংবাদে প্রকাশ, গত ৩রা বৈশাখ কুড়িগ্রাম মহকুমার অন্তর্গত মাদাইখালে পুলিশ এক জনতা কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া গুলীবর্ষণ করার ফলে ১০ জন লোক নিহত এবং ৫ জন গুরুতর আহত হইয়াছে।

২৪শে এপ্রিল—নয়াদিল্লীর সংবাদে প্রকাশ, ১৯৫১ সালের পর ভারতে আর বিদেশী খাদ্য আমদানী করা হইবে না বলিয়া ভারত গভর্ণমেণ্ট যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা ভারতের সকল প্রদেশ ও উপরাষ্ট্র সমর্থন করিয়াছেন। তিন বৎসরের মধ্যেই ভারত সরকার খাদ্য সম্পর্কে স্বয়ং-সম্পূর্ণ হইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

বোম্বাইয়ের সংবাদে প্রকাশ, ১৯৪৮ সালের জুলাই মাস হইতে ১৯৪৯ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার মজুত স্টার্লিং-এর পরিমাণ ছয় শত কোটি স্টার্লিং হ্রাস পাইয়াছে।

হায়দরাবাদের সামরিক গভর্নর মেজর জেনারেল জে এন চৌধুরী ঘোষণা করেন যে, শাসনকার্যে জনমত গ্রহণের জন্য হায়দরাবাদের সামরিক গভর্নমেণ্ট জননায়কগণের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে তিন সপ্তাহের মধ্যেই জননেতাগণকে লইয়া কয়েকটি উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হইবে।

## বিদেশী সংবাদ

১৮ই এপ্রিল—অদ্য আয়ারল্যাণ্ড একটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্ররূপে জগতে প্রতিষ্ঠিত হইল। মধ্যরাত্রিতে ২১ বার তোপধ্বনির পর নূতন প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করা হয়।

১৯শে এপ্রিল—ব্রহ্মের সরকারী সৈন্যরা মেমিও পুনরধিকার করিয়াছে।

২১শে এপ্রিল—নানকিং-এর সংবাদে প্রকাশ, অদ্য তিন হাজার কম্যুনিষ্ট সৈন্য ইয়াংসী নদী অতিক্রম করিয়াছে।

ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু গতকল্য রাত্রিতে বিমানযোগে লণ্ডনে পৌঁছেন।

২২শে এপ্রিল—বৃটিশ কমনওয়েলথের সহিত সাধারণতন্ত্রী ভারতের ভবিষ্যৎ সম্পর্ক সম্বন্ধে কোন একটি পরিকল্পনার সূত্র আবিষ্কারের জন্য অদ্য লণ্ডনে বৃটিশ কমনওয়েলথ নেতৃবর্গের গোপন পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন আরম্ভ হয়। বৃটেন, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত, পাকিস্থান ও সিংহলের রাজনীতিকগণ এই সম্মেলনে যোগদান করেন।

চীনের কম্যুনিষ্ট বেতারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, উ হু এবং নানকিং-এর মধ্যে তিন লক্ষ কম্যুনিষ্ট সৈন্য ইয়াংসী নদী অতিক্রম করিয়াছে।

২৩শে এপ্রিল—নানকিং-এর সংবাদে প্রকাশ, অদ্য প্রত্যুষে কম্যুনিষ্ট বাহিনী চীনের রাজধানী নানকিং-এ প্রবেশ করিয়াছে। চীন গভর্নমেণ্টের সমস্ত বিশিষ্ট কর্মচারী শহর ত্যাগ করিয়াছে বলিয়া জানা যায়। সংবাদে আরও প্রকাশ, ইয়াংসী নদী বরাবর জাতীয় গভর্নমেণ্টের রক্ষাব্যূহ সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হইয়াছে।

২৪শে এপ্রিল—সাংহাই-এর সংবাদে প্রকাশ, কম্যুনিস্ট বাহিনী চীনের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সমৃদ্ধশালী সহর সাংহাইকে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য ত্রিমুখী অভিযান আরম্ভ করিয়াছে। কম্যুনিস্টদের অগ্রগতির ফলে সাংহাই নগরী বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

ব্রহ্মের সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, বর্মী সরকারী সৈন্যরা ইনসিনে কারেনদের অন্যতম ঘাঁটি সেমিনারী হিল দখল করিয়াছে।

প্রতি সংখ্যা—চারি আনা বার্ষিক মূল্য—১৩৲ ষাণ্মাসিক—৬৷৷৹
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক:—আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মন স্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

# বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

(১৪শ সংখ্যা হইতে ২৬শ সংখ্যা পর্যন্ত)

# পঁচিশে বৈশাখ

২৫শে বৈশাখ জগতের মহাপুণ্যময় তিথি। —এই দিবস বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর বুকে পদার্পণ করেন। রবীন্দ্রনাথ ক্ষণজন্মা পুরুষ। তাঁহার ন্যায় মহামানবের জন্মলগ্ন সহজে আসে না। বিশ্ব-জগৎকে সেজন্য অন্তরের আকুতি লইয়া দাঁড়াইতে হয়, বিশ্ব-প্রকৃতিকে নরলোকে দুর্লভ তেমন মানব-দেবতাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার জন্য দীর্ঘ দিনে প্রস্তুত হইতে হয়। ১২৬৮ সালের ২৪শে বৈশাখের রাত্রির শেষযামে এমন একটি শুভ লগ্ন আসিয়াছিল -বঙ্গজননী বিশ্ব-কবিকে কোলে পাইয়া ধন্য হইয়াছিলেন। দেবগণ সে শুভলগ্নে পুষ্প বৃষ্টি করিয়াছিলেন, দিগঙ্গনাগণ শুভ শঙ্খ বাজাইয়াছিলেন।

২৫শে বৈশাখের সেই ঊষায় সূর্যের তরুণ কিরণে নূতন হাসি ফোটে, প্রজাপতির কণ্ঠে নূতন ঋক্ ধ্বনিত হয়। ভারতীর বীণায় অভিনব ঝঙ্কার বাজিতে থাকে। প্রজাপতি-কণ্ঠের সে বেদধ্বনিতে বাণীর বীণার সে ঝঙ্কার ভারতের বুকে নূতন যুগের এক অপূর্ব রহস্য উন্মুক্ত হইবার সাড়া জাগায়। রবীন্দ্রনাথের মুখে ভারত তাহার শাশ্বত জীবন-সাধনার বাণী নূতন করিয়া শুনিতে পায়। সুপ্ত জাতির অন্তর অমৃতত্বের জন্য তপস্যা উদ্দীপনা লাভ করে। রবীন্দ্রনাথের মর্তলীলার অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে সে তপস্যার বিমলজ্যোতিঃ বৈশাখের সূর্যের মতই প্রাণময় ভাস্বর প্রভায় ছড়াইয়া পড়ে। বহুদিন পরে ভারত আপনার আত্মার সন্ধান পায়। তাহার দীর্ঘ দিবসের দৈন্য ঘুচিয়া যায়।

বাঙলার পরম সৌভাগ্য: •রবীন্দ্র-নাথের ন্যায় মহামানবকে বাঙলা দেশ তাহার সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং সঙ্গীতের মধ্যে একান্ত আপন করিয়া পাইয়াছিল। এ দেশের বেদনা এবং সাধনাকে কেন্দ্র করিয়াই বিশ্ব-কবির হিরন্ময় দীপ্ত-ছবি দূরদিগন্তে মহিমা বিস্তার করে। বাঙলার মর্মদেশ আলোড়িত করিয়া প্রচণ্ড তাঁহার প্রাণের বৈভব নব-সৃষ্টির বিচিত্র গৌরবে সমগ্র ভারতের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করে; সমগ্র জগৎকে নব-জীবনের পথ দেখায়। এত বড় মনোময়, প্রাণময় এবং বিজ্ঞান-ময় আশ্রয় বাঙলা দেশ আর কোনদিন পায় নাই। বাঙলার সাহিত্য, বাঙলার শিল্পকলা কবির বিচিত্র মধুর বীণার ঝঙ্কারে শতদলের মত বিকশিত হইয়া উঠে। কবির বীণার রুদ্র ছন্দে পশুবল স্তব্ধ হইয়া যায়। রাক্ষস এবং অসুরের দল চমকিয়া উঠে: সত্যের গৌরবে দৃপ্ত রবীন্দ্রনাথের ভাষার কঠোর আঘাতে অত্যাচারীর মর্মমূলে কম্প উপস্থিত হয়। তাহাদের অন্তরের ভীরুতা পদে পদে উন্মুক্ত হইয়া পড়ে এবং বাহিরের দাপট ফাঁকা হইতে থাকে। রবীন্দ্রনাথের অবদান এমনই অগ্নিময়। কবির কণ্ঠের অভয়-মন্ত্রে বাঙলার দুর্গম পথযাত্রী সাধকের দল মৃত্যুকে বরণ করিবার পথে অমৃতত্বের সাধনায় আত্মোৎসর্গের অনুপ্রেরণা লাভ করে। বাঙলার সঙ্গে সমগ্র ভারতের প্রাণের বাঁধন নিবিড় হয়। রবীন্দ্রনাথের অবদান এইভাবে ভারতের স্বাধীনতা-প্রতিষ্ঠার মূলে শক্তি সঞ্চার করিয়াছে। বস্তুতঃ এক্ষেত্রে রাজনীতির গতি এবং প্রকৃতি একান্ত বাহ্য। অন্তরের আশ্রয় যদি না পায়, তবে রাজনীতির শুধু বাহিরের চটক অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হয় না। প্রবলের প্রথম আঘাতেই ভাঙ্গিয়া পড়ে।

রবীন্দ্রনাথ বাঙলার, রবীন্দ্রনাথ ভারতের: কিন্তু সেই কথাই বড় কথা নয়, রবীন্দ্রনাথ সমগ্র জগতের। ভারতের সাধনায় যে সনাতন সত্য প্রকটিত হইয়াছিল, তাহা বিশ্বকে কোনদিন পৃথক করিয়া দেখে নাই। এদেশের সংস্কৃতি বিশ্বকে যুগে যুগে আপনার করিয়া লইয়াছে। ভেদ-দৃষ্টিতে দেখা, নানারূপে দেখা, মৃত্যুরই পথ; ভারতের সাধনা অব্যয় অমৃতের সন্ধান পাইয়া এই মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের সাধনায় ভারতীয় সনাতন সংস্কৃতির সেই মর্মবাণী মৈত্রীর সেই মহিমা প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। সূর্যের প্রকাশ যেমন অনাময় এবং অখণ্ডিত, রবীন্দ্রনাথের জীবনের দীপ্তি এবং দ্যুতি তেমনই বিশ্বের সর্বত্র আলো করিয়াছে। একদিন ২৫শে বৈশাখে রাত্রির আঁধার আলো করিয়া বাঙলার অঙ্গনে যে সূর্য জাগিয়াছিল, বিশ্বতেজা সে বিভাবসু পূর্ণের দান, পূর্ণ গরিমায় বিশ্ব-জগতে মানবত্বের অপরিম্লান গৌরব বিস্তার করিয়াছে।

২৫শে বৈশাখের পুণ্যময় প্রভাতে পূর্ণ দানের পূর্ণ মহিমায়, পূর্ণ জীবনে প্রতিষ্ঠিত সেই রবিকে আমরা বন্দনা করি। তাঁহার হিরণ্ময় জ্যোতিঃ আমাদিগকে সব দৈন্য এবং কার্পণ্য হইতে রক্ষা করুক। তাঁহার অভয় হাস্যে দৈত্য-দানবের বিভীষিকা বিদূরিত হোক প্রেত এবং পিশাচের দল দূরে পলায়ন করুক সব ক্ষুদ্রতা সব সঙ্কীর্ণতা হইতে তি তাঁহার মন্ত্রবীর্যে আমাদিগকে সমুন্নত করিয় তুলুন। রবীন্দ্রনাথের জীবন চিন্ময়। এম জীবন দেশ কাল এবং পাত্রের কোন ব্যবচ্ছে খণ্ডিত হয় না। চিন্ময় দেবতার অপরিচ্ছি সৎ-মূর্তি অনুধ্যানের পথে নিত্য অভি সৌন্দর্য এবং মাধুর্যে বিকশিত হইয়া উ ২৫শে বৈশাখের পুণ্য প্রভাতে আমাদের অন্ত লোকে জ্যোতির্ময় রবির নিত্য আবির্ভ উপলব্ধি করিয়া আমরা যেন অবীর্য হই উদ্ধার পাই এবং মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত থাকি পারি। বিশ্বের গুরু, জাতির গুরু এবং জ এবং আমাদের সকলের গুরু রবীন্দ্রনাথ আমরা বন্দনা করি।

# রবীন্দ্র-জন্মোৎসব

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত

রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসবে এই কথাই বলতে ভালো লাগে যে, তিনি কবি। আমাদের দেশের আলঙ্কারিকের কথায় পৃথিবীর দুই-তিন-পাঁচজন মহাকবির একজন, যাঁরা বিশেষ দেশে এবং বিশেষ কালে আবির্ভূত হয়ে সে দেশ এবং কালের সীমা ছাড়িয়ে সমস্ত দেশ এবং সমস্ত কালের জন্য সৃষ্টি করেছেন।

কিন্তু আজ পৃথিবীতে এবং আমাদের দেশে যে সঙ্কট উপস্থিত হয়েছে তার ফলে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা এবং কর্মধারার কথাই বিশেষ করে মনে পড়ছে। আজ জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ, স্বার্থ নিয়ে হানাহানি এবং প্রত্যেক জাতির হাতেই নূতন নূতন মারণাস্ত্র। এই অত্যন্ত প্রকট সাময়িক ব্যাপারের ভয়াবহতা প্রত্যেকের কাছেই সুস্পষ্ট।

কিন্তু এ ছাড়াও অন্য আর একটি সঙ্কট দেখা দিয়েছে। এই জন্য সঙ্কটটি মঙ্গলের আকার নিয়ে আমাদের কাছে আসছে। পৃথিবীর আদিযুগ থেকে বেশীর ভাগ লোক নিজেদের ন্যূনতম প্রয়োজন থেকে বঞ্চিত, অনাহার এবং অভাব থেকে এরা কোনোকালেই মুক্তি পায়নি। এদের এর থেকে রক্ষা করা মঙ্গলময় চেষ্টা। কিন্তু এর মধ্যেও সর্বনাশের বীজ নিহিত আছে।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারার একমাত্র কাজ তাকে মানুষের কাজে খাটানো—আজ এই কথা সমস্ত পৃথিবীর লোক ঘোষণা করছে। কাজের পরিমাপ করেই বিজ্ঞানের জয়ধ্বনি উঠছে। এটম বোমার আবিষ্কারের পেছনের জ্ঞান কতো বড়ো পরম আশ্চর্য! কিন্তু তার কথা বিশেষ শোনা যাচ্ছে না। শুধু শুনছি, একে ধ্বংসের কাজে না লাগিয়ে মানুষের মঙ্গলে লাগান হোক। কিন্তু বিজ্ঞানের বড়ো অংশ জ্ঞানের, কাজে লাগানোর অংশটা সামান্য। বিজ্ঞানের যে অংশটা জ্ঞানের, আমাদের বিস্ময়ের আনন্দের তার কথা আমরা ভুলে যাচ্ছি।

শরীরের বাইরে যে মানুষ তাকে আমরা ভুলে গেছি, তাই বিজ্ঞানের মধ্যে মনের এবং আনন্দের অংশ আমাদের মনে আর সাড়া জাগাচ্ছে না। হিটলারের Strength through Joy এর নীতি আজ প্রধান হয়ে উঠছে। আনন্দের নিজস্ব মূল্য নেই, শক্তি জাগায় ব'লেই তার দাম। রবীন্দ্রনাথের জীবন ও কর্মধারা এর প্রচণ্ড প্রতিবাদ। মানুষের প্রয়োজনে বিজ্ঞানের প্রয়োগে তিনি উৎসাহী ছিলেন কিন্তু প্রয়োগসর্বস্ব বিজ্ঞানের তিনি ছিলেন বিরোধী। মানুষের শরীর যে তার কতো বড়ো অংশ সে কথা বুঝতে কবির ভুল হয়নি কিন্তু এ কথাও তিনি ভোলেননি যে, মানুষের জ্ঞান ও আনন্দলোকই তার চরম সার্থকতা, চরম পরিণতি। সাংসারিক কাজের জন্য যে সাধারণ জ্ঞানের প্রয়োজন তা থেকে আমাদের জনসাধারণ বঞ্চিত। কিন্তু একথা আমরা যেন না ভুলি যে, শরীরের আকাঙ্ক্ষা মেটালেই বঞ্চিত জনসাধারণের সমস্ত বঞ্চনা দূর হয় না। আমরা নিজেদের সম্বন্ধে যদি একথা মনে না করি তবে তাদের সম্বন্ধেই বা কেন একথা মনে করব।

একথা ভালো করে বোঝবার জন্যই আজ রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করতে হবে। এই জ্ঞান ভারতবর্ষের অন্য সব প্রদেশে এত স্পষ্ট নয়। বাঙালি কাজের জাত নয় এ রকম একটা অভিযোগ প্রচলিত। কিন্তু এই অভিযোগের কারণটিই বাঙালিকে একটি সঙ্কট থেকে রক্ষা করেছে। শরীরের বাইরের মানুষটির সম্বন্ধে বাঙালির জ্ঞান অনেক স্পষ্ট।

রবীন্দ্রনাথের এই বাণী সমস্ত ভারতবর্ষে এবং পৃথিবীতে প্রচারের দায়িত্ব বিশ্বভারতীর, বিশ্বভারতী এবং বাঙালিকে এই দায় বহন করতে হবে। তা যদি না করি তবে বাঙালির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ব্যর্থ হবে, বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা সার্থক হবে না। জীবন, কর্ম এবং সাধনা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে শিক্ষা দিয়ে গেছেন, বাঙালি এবং বিশ্বভারতীকে তার উত্তরাধিকার বহন করতে হবে।

যে কবির জীবনে এই জ্ঞান ও সাধনা পুঞ্জীভূত হয়েছিল, তাঁর আবির্ভাব দিবসের উৎসবে তাঁকে প্রণাম করি এবং আমাকে এখানে আহ্বান করার জন্য আপনাদের নমস্কার জানাই।

[১ বৈশাখ ১৩৫৬ শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র-জন্মোৎসবে ভাষণ]

# ভারতের আত্মপ্রতিষ্ঠা

## শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

**রবীন্দ্রনাথ মহাকবি, কিন্তু সেই মহাকাব্যেই তাঁর পরিচয় ও কর্মক্ষেত্র সীমাবদ্ধ নয়। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে কাব্যের অতিরিক্ত কোনো বাণীই তাঁহার নিকট হইতে আমরা পাইতাম না। তিনি রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি সম্বন্ধেও গভীরভাবে চিন্তা করিয়াছেন। শহুরে সভ্যতায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না, দেশের নাড়ীর সহিত তাঁর আত্মার যোগ ছিল। মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি তাঁর ঐকান্তিক অনুরক্তির কথাও সর্বজনবিদিত। এই নিবন্ধে উক্ত বিষয়াবলী সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।**

পঁচিশে বৈশাখ কবিগুরুর আবির্ভাবোৎসব দেশের সর্বত্র সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইবে। এই অনুষ্ঠানটির সর্বব্যাপিতা দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় যে, মহাকবির বাণী আমাদের চিত্তে গিয়া সাড়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছে। ইহা আশার কথা, আনন্দের বিষয়। আজ পঁচিশে বৈশাখ উপলক্ষ্যে কবির বাণীকে একবার স্মরণ করা যাইতে পারে।

যে ব্যক্তি কবিমাত্র বা সাহিত্যিকমাত্র তাহার অধিক কিছু নয়, তাহার কাব্যকে, সাহিত্যিকতা বাদ দিলে স্মরণীয় আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু মহাকবির মহাকাব্যকে বাদ দিলেও স্মরণীয় অংশ কিছু থাকিয়া যায়—সেই স্মরণীয় অংশই তাঁহার বাণী। সেই বাণীরূপে তাঁহার কাব্যকীর্তিকে অতিক্রম করিয়া বিরাজ করে। ভাষাজ্ঞানের অভাব বশতঃ যাহার পক্ষে রবীন্দ্রনাথের কাব্য পাঠ করা সম্ভব হয় নাই, সেই ব্যক্তিও তাঁহার বাণীকে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, কারণ কাব্যের মতো বাণী ভাষার উপরে নির্ভর করে না, যে ভাষাতেই তাহাকে রূপান্তরিত করা যাক না কেন তাহার দীপ্তি সমান উজ্জ্বল থাকে। রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট বাণী কি? বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে তিনি নূতন কিছু বলিয়াছেন, আবার স্বদেশবাসীর উদ্দেশ্যেও কিছু বলিয়াছেন। আমরা শেষোক্ত বাণীকেই স্মরণ করিব।

মহাকবি গেটে একস্থানে বলিয়াছেন যে, যাহা কিছু জ্ঞানের কথা তাহা পূর্বেই চিন্তিত হইয়া গিয়াছে। তিনি বলিতেছেন আমাদের কাজ সে সমস্তকে পুনরায় চিন্তা করা। পুনরায় চিন্তা করা বলিতে বোঝায় যে পুরাতন সত্যগুলিকে আমরা জীবনের অদ্যতনে প্রয়োগ করি। ইহাকেই ম্যাথু আর্নল্ড বলিয়াছেন, "Application of Ideas to life." একথাগুলি স্মরণ করাইয়া দিবার তাৎপর্য এই যে কবিগুরুর বাণী নূতন নয়, নূতনত্ব তাহার প্রয়োগে। ভারতের প্রাচীন ঋষিগণ যে সব সত্যকে নৈর্ব্যক্তিকভাবে উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন রবীন্দ্রনাথের বাস্তবনিষ্ঠ প্রতিভা তাহাদের বিশেষ ক্ষেত্রে, বিশেষ উপলক্ষে প্রয়োগ করিয়াছে। গেটের ভাষায় জ্ঞানের কথাকে নূতন করিয়া কবি চিন্তা করিয়াছেন।

আত্মানং বিদ্ধি একটি প্রাচীন মন্ত্র। কিন্তু বহু ব্যবহার ও বহু শ্রুতির ফলে মন্ত্রটির গুরুত্ব যেন আমাদের মনে কমিয়া গিয়াছে। সংসারে এমনই হইয়া থাকে, পুরাতন মুদ্রার জৌলুষ কমিয়া আসে, কিন্তু তাই বলিয়া তাহার মূল্য কমে কি? রবীন্দ্রনাথের সংস্কারভেদী দৃষ্টি অনায়াসে সঞ্চিত আবর্জনারাশি অতিক্রম করিয়া এই অভয় বাণীর মর্মস্থলে প্রবেশ করিতে সক্ষম হইয়াছে এবং তাহাকে আমাদের জীবন পরিবেশের মধ্যে নূতনভাবে প্রয়োগ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক ও সামাজিক রচনাবলী ও মতামতের সহিত যাহাদের কিছু মাত্র পরিচয় আছে তাহারাই বলিবেন যে, কবির রাজনীতি ও সমাজনীতি প্রধানতঃ আত্মমুখী। যে কালে দেশের নেতাগণের নেতৃত্ব মর্যাদা ইংরাজি উচ্চারণের বিশুদ্ধতার উপরে নির্ভর করিত, এখনকার আন্দোলন বিলাতে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করিলে সমস্ত ব্যর্থ বলিয়া মনে হইত, সে কালে উপহসিত হইবার আশঙ্কা সত্ত্বেও কবিকে বলিতে হইয়াছিল বিদেশে মন পড়িয়া থাকিলে দেশের কোন কাজ হইবে না, বাহির হইতে চিত্তকে জড়াইয়া আনিয়া ঘরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। তিনি বলিয়াছিলেন যে, স্বাধীনতা লাভ মানে নিজে বড় হওয়া অপরকে ছোট করিয়া দেওয়া নয়। তিনি সকলকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন যে, আমাদের দুর্বলতার উপরেই শত্রুর শাসনের ভিত্তি। নিজেরা সবল হইতে পারিলে বিদেশী শাসনের ভিত্তিটাই ধ্বসিয়া পড়িবে। নিজেকে দেখো, নিজের দেশকে দেখো, নিজের অন্তরের কথা শোনো, দেখিয়া জানিয়া শুনিয়া শক্তিমান হইয়া ওঠো। ইহাই তাঁহার রাজনীতি ও সমাজনীতির মূলগত সত্য। বস্তুতঃ ইহা প্রাচীন 'আত্মানং বিদ্ধি' মন্ত্রের নবতম প্রয়োগ ভিন্ন আর কিছুই নয়।

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সমাজের পরিকল্পনা, তাঁহার দেশনায়ক বরণের প্রস্তাব ওই একই মন্ত্রের নূতন ব্যবহার। তিনিই প্রথমে দেশের গোটা কয়েক শহরের দিক হইতে চিন্তাশীলগণের দৃষ্টি গ্রামে গাঁথা এই দেশের দিকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তিনিই প্রথমে বলিয়াছিলেন, যে, শহরের উন্নতি দেশের উন্নতি নয়। কবির বাণী এই যে, ভারতবর্ষের প্রাণপুরুষ তাহার গ্রামগুলিতে বিরাজ করিতেছে সেখানেই আমাদের প্রকৃত স্বদেশী সমাজ। শিক্ষার ক্ষেত্রেও দেখিতে পাইব যে, মাতৃভাষাকে স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিতে তাঁহার চেষ্টার ও উক্তির ত্রুটি নাই। এই সমস্ত প্রচেষ্টাই একটি সাধারণ সত্যে পর্যবসিত হইতে পারে, সেই সাধারণ সত্যটি ভারতের প্রাচীন মন্ত্র 'আত্মানং বিদ্ধি'। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে রবীন্দ্রনাথ বিলাতি বস্ত্রের বয়কট সমর্থন করিয়াছিলেন কিন্তু অন্যান্য নেতাদের সমর্থনের সহিত তাহার একটা মৌলিক ভেদ ছিল। অন্যান্য নেতারা বলিতেন যে, ইংরাজকে জব্দ করিবার জন্যই বিলাতি কাপড় পরা ছাড়িব। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন তাহা হইবে না। ইংরাজকে জব্দ করা উদ্দেশ্য হইলে মনটা ইংরাজের দরজাতেই পড়িয়া থাকিবে, তাহার ফলে ইংরাজ জব্দ হইলেও আমরাও কম জব্দ হইব না, যাহার মন স্বায়ত্ত নয়, তাহার চেয়ে দুর্বল, অসহায় আর কে? তিনি বলিলেন যে, নিজের তৈরি কাপড় পরা উচিত বলিয়াই পরিব। বাহ্য ফলের বিচারে এই দুই দৃষ্টিতে বিশেষ ভেদ নাই কিন্তু আসল ভেদটা গোড়ায়। একজনের দৃষ্টি বাহিরে পড়িয়া আছে, রবীন্দ্রনাথ তাহাকে ভিতরে ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা করিতেছেন অর্থাৎ তিনি ভাষান্তরে 'আত্মানং বিদ্ধি' এই মন্ত্রই উচ্চারণ করিতেছেন। এই প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের আর এক মহাপুরুষের উল্লেখ করা যাইতে পারে। অহিংসা ও করুণার বাণী নূতন নয়। নূতন ক্ষেত্রে, নূতন ব্যবহারে তাহাদের সার্থক প্রয়োগেই মহাত্মাজীর প্রতিভা ও বাস্তববুদ্ধি প্রকাশ পাইয়াছে। মহাত্মাজী যাহাকে 'change of heart' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—বস্তুতঃ তাহাও রূপান্তরে 'আত্মানং বিদ্ধি' ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ হৃদয়ের পরিবর্তন করিতে হইলে আত্মস্থ হইতে হয়, আত্মাকে জানিতে হয়। ফল কথা, গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথ দুইজনেই ইউরোপের দিকে বিক্ষিপ্ত আমাদের চিত্তকে ঘরের মধ্যে ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং এইভাবে আত্মস্থ হইবার সুযোগ আমাদের দিয়াছেন। সে সুযোগ আমরা লইব কি না বা কতখানি লইব তাহা সম্পূর্ণরূপে আমাদের উপরেই নির্ভর করিতেছে।

এখন দেশ স্বাধীন হইয়াছে। স্বাধীনতার দায়িত্বের অজুহাতে আত্মস্থ হইবার গুরুত্ব

বাড়িয়া গিয়াছে। পঁচিশে বৈশাখের ঋষি পথ-নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন—এখন আমরা কি করিব, কিভাবে চলিব সে দায়িত্ব আমাদের। কিন্তু বড়ই আশঙ্কার কথা এই যে, কবিগুরুর বাণীর প্রতি আমাদের আশানুরূপ দৃষ্টি যেন নাই। রাজনীতি ক্ষেত্রে, শিক্ষায়, সমাজে সর্বত্র ব্যক্তিগত ও দলগত বিরোধ বৃহত্তর বিরোধের ভূমিকা রচনায় ব্যস্ত। একদল অপর দলকে শত্রু ভাবিতেছে আর সেই কারণেই মনটা গিয়া শত্রুর দরজায় পড়িয়া আছে। নিজের মন আর আমাদের নিজের অধীন নয়, আয়ত্ত নয়। জানিব কি? জানিব কাহাকে? গান্ধী-পূর্ব কংগ্রেসের যুগে দেশের নেতাদের মন যেমন বিলাতমুখী ছিল, স্বাধীনতা লাভের পর দেশের নেতাদের, রাজনৈতিক কর্মীদের মন আজ তেমনি পরদল-মুখী। পরদলের সতর্ক দৃষ্টি এড়াইয়া স্ব-জনের পুষ্টি সাধনই যেন আজ আমাদের রাজনৈতিক কৃতিত্বের পরাকাষ্ঠা হইয়া উঠিয়াছে। 'আত্মানাং বিদ্ধি' মন্ত্র আজ নিরর্থক ধ্বনি মাত্র।

অনেকের বিশ্বাস এই যে, রবীন্দ্রনাথের বাণীতে রাজনীতিক ও বাস্তব কর্মীদের তেমন প্রয়োজন নাই, তাঁহাদের বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র-সাহিত্য একপ্রকার সূক্ষ্ম বিলাস মাত্র। কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি রাজনীতি ক্ষেত্রের ব্যক্তিদের পক্ষে রবীন্দ্র বাণী আজ যেমন অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে—এমন আর কাহারো পক্ষে নয়। ভারতবর্ষের রাজনীতি আজ 'আত্মানাং বিদ্ধি' বাণী ভুলিতে বসিয়াছে। এই বাণীতে আজ তাহার বড়ই আবশ্যক। আমাদের রাজনীতিকগণ বিনম্রচিত্তে, নত মস্তকে কবিগুরুর নির্দেশ গ্রহণ করিবার আশায় তাঁহার বাণী-প্রাঙ্গণে সমবেত হইয়াছেন—ইহাই আজ আমরা দেখিতে চাই। কবির বাণীকে শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণে, নিষ্ঠার সহিত পালনে পঁচিশে বৈশাখের যথার্থ সার্থকতা—নতুবা "মিছে তব সহকার শাখা, মিছে তব মঙ্গল কলস।"

# আলোকতীর্থের কবি

শ্রীসরলাবালা সরকার

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আমরা প্রথমেই অনুভব করি ছন্দের ঝঙ্কার, যেন নৃত্যনিপুণা নটীর তালে তালে নৃত্য। তাহার পর আমাদের প্রাণে আসিয়া স্পর্শ করে এক অমৃতময় সুর—যে সুর শ্যামের বাঁশীতে বাজিয়া যমুনাকে উজানে বহাইয়াছিল, যে সুর তাপসের হৃদয়ে স্বর্গীয় ধ্বনিরূপে ঝঙ্কৃত হয়, গানের যে সুর দুঃখ-সুখ বাসনা-কামনার পরপারে এক অপার্থিব আনন্দের অনুভূতিতে জীবন ভরপুর করিয়া দেয়। তাহার পর আমরা অনুভব করি এক গতিপ্রবাহ, যাহা নব নব আবর্তনের মধ্য দিয়া নিত্য নূতনরূপে বিকশিত হইয়া ওঠে।

রবীন্দ্রনাথের ছন্দের ঝঙ্কারে কখনও বা রুদ্রতাল কখনও বা মৃদুতাল কখনও বিলম্বিত কখনও দ্রুত। তাঁহার ছেলেবেলার কবিতাগুলিতেও যেমন,—

'তরল জলদে বিমল চাঁদিমা
সুধার ঝরণা দিতেছে ঢালি,
মলয় ঢলিয়া কুসুমের কোলে
নীরবে লইছে সুরভি ডালি।'

অথবা :—

'থাকিয়া থাকিয়া বিজনে পাপিয়া
কানন ছাপিয়া তুলেছে তান।'

আবার শিশু বয়সের কবিতায়,

'আমসত্ত্ব দুধে ফেলি তাহাতে কদলী দলি
সন্দেশ মাখিয়া দিয়া তাতে,
হাপুস হুপুস শব্দ চারিদিক নিস্তব্ধ
পিঁপিড়া কাঁদিয়া যায় পাতে।'

কোন খানেই ছন্দের তাল কাটে নাই। এই তালে তালে জগতের বিকাশের পথে অগ্রগতির কথা তাঁহার প্রায় সকল রচনাতেই পাওয়া যায়।

"ছন্দে উঁদিছে চন্দ্রমা,
ছন্দে কনক রবি উদিছে"

ছন্দের তালে তালে নৃত্য করিয়া ঋতুর পর ঋতুর আবর্তনের ছবি আঁকিয়াছেন তিনি, আর সেই ছবির ভিতর দিয়াই আমরা পাই মৃত্যুহীন চিরনবীনের সাক্ষাৎ।

তাঁহার নটরাজ নৃত্যের তালে তালে তিনি পৃথিবীর যত জড়তা যত বাধা ও বন্ধন দলিত করিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার উত্তরবায়ু একতারার তারে তীব্র নিখাদে ঝঙ্কার দিয়া শিথিলবৃন্ত পত্রাবলীকে ঝরাইয়া দিয়া যায়। শীত ঋতুর অবসানে নব বসন্তে কিশলয়দলের শাখায় শাখায় বিকশিত হইবার চাঞ্চল্য তাঁহার ছন্দের তালে তালে ঝঙ্কৃত হইতেছে।

"কিশলয় দল হল চঞ্চল,
উতলা প্রাণের কলকোলাহল
শাখায় শাখায় উঠে।"

কবির এই তাল তাঁহার গানের সঙ্গে যেন এক হইয়া মিলিয়া মিশিয়া রহিয়াছে, সে যেন নদীর কলগুঞ্জনে তরঙ্গের তাল। এই গানের সুর কবি অতি শৈশব হইতেই স্বপ্নচৈতন্যের ভিতর দিয়া নিজের প্রাণের ভিতর আয়ত্ত করিয়াছেন এক অনুভূতিময় জগতে। নানা বর্ণে চিত্রিত বিচিত্রিতের নর্মবাঁশি তিনি জীবনের যাত্রার প্রারম্ভেই যেন কুড়াইয়া পাইয়াছেন। সেই প্রাপ্তির স্বরূপ যে কী, কবির বর্ণনায় তাহা আমরা এই ভাবে পাই—

"মহামৌন পারাবারে—
প্রভাতের বাণীবন্যা চঞ্চলি মিলিল শতধারে
" দিয়া হিল্লোল দোল।"

এই যে বহুবিচিত্র রূপের ভিতর এক শত রূপে অপরূপা বিচিত্রা বিরাজিতা রহিয়াছেন কবির সহিত অতি শৈশবেই তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল।

"ছিলাম যবে মায়ের কোলে,
বাঁশী বাজানো শিখাবে বলে
চোরাই করে এনেছ মোরে তুমি,
বিচিত্রা হে, বিচিত্রা,
যেখানে তব রঙ্গের রঙ্গভূমি।
আকাশতলে এলায়ে কেশ
বাজালে বাঁশী চুপে,
সে মায়া সুরে স্বপ্নছবি
জাগিল কত রূপে;
লক্ষ্যহারা মিলিল তারা
রূপ কথার বাটে,
পারায়ে গেল ধূলির সীমা
তেপান্তরী মাঠে।
নারিকেলের ডালের আগে
দুপুর বেলা কাঁপন লাগে,
ইশারা তারি লাগিল মোর প্রাণে
বিচিত্রা হে বিচিত্রা!
কি বলে তারা কে বলো তাহা জানে।
অর্থহারা সুরের দেশে
ফিরালে দিনে দিনে,
ঝলিত মনে অবাক বাণী
শিশির যেন তৃণে।"

এই যে বিচিত্রার বাঁশীর সুর, এ সুর বাক্‌যন্ত্র উচ্চারিত সুর নয়, এ এক 'অবাক বাণী'। কবির মনে সেই সুর ঝঙ্কৃত হইয়াছে তৃণের প্রান্তে শিশির-বিন্দু যেমন ঝলকিত হয়।

যে বাঁশী জীবনের যাত্রাপথে কবি কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন তাহাতে তিনি প্রাণের নিঃশ্বাস ভরিয়া দিয়াছেন—

'আমি শুধু বাঁশরীতে ভরিয়াছি
প্রাণের নিঃশ্বাস।
বিচিত্রের সুরগুলি গ্রন্থিবারে করেছি প্রয়াস
আপনার বীণার তন্তুতে। ফুল ফোটাবার আগে
ফালগুনে তরুর মর্মে বেদনার যে স্পন্দন জাগে,
আমন্ত্রণ করেছিনু তারে মোর মুগ্ধ রাগিণীতে
উৎকণ্ঠা কম্পিত মূর্চ্ছনায়।
ছিন্ন পত্র মোর গীতে—
ফেলে গেছে শেষ দীর্ঘশ্বাস।
ধরনীর অন্তঃপুরে—

# গঠন-কার্যে রবীন্দ্রনাথ

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

কবিতায় অতুলনীয়, গল্পে অপরাজেয়, সাহিত্য-সৃষ্টিতে সিদ্ধহস্ত, শিক্ষাবিস্তারে বিস্থিত রবীন্দ্রনাথের শব্দের ঝঙ্কারে, ছন্দের ঙ্কারে, উপমার অলঙ্কারে আজ অনেকেই তাঁহার গঠনকার্যে অনুরাগের কথা ভুলিয়া যাইতেছেন বা সে অনুরাগ লোকের দৃষ্টি অতিক্রম করিতেছে। সেইজন্য আজ সে কথা স্মরণ করা প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। তিনি সাহিত্যের সাহায্যেই তাঁহার কাজ করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তিনি যে "কেবলই স্বপন করেছি বপন বাতাসে", তাহা নহে। শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার পরিকল্পনা 'বিশ্বভারতীতে' মূর্তি গ্রহণ করিয়াছিল। গঠনকার্যে তাঁহার অনুরাগও সমাজে অল্প প্রভাব বিস্তার করে নাই। তাঁহার গঠনকার্যের পরিকল্পনা লক্ষ্য করিলে তাঁহার প্রতিভার বৈশিষ্ট্য সপ্রকাশ হয় —যে সমাজে তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার সকল স্তর সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি বুঝিতে পারা যায়।

তাঁহার পূর্ববর্তীরা ভগীরথের মত সাধনা করিয়া জাতীয় ভাবের মন্দাকিনী ধারা এদেশে আনিয়াছিলেন। কিন্তু মন্দাকিনী যখন ধরাতলে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন, তখন মহাদেব স্বীয় মস্তকে তাঁহাকে ধারণ করিলে—তাঁহার জটাজাল মধ্যে বহুদিন পথসন্ধানে সংযতবেগ হইয়া তবে ধরাতলে সগর সন্তানগণের উদ্ধার সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তেমনই সেই ভাব দীর্ঘদিন নানা সভা-সমিতি-সম্মেলনের মধ্য দিয়া স্বদেশী আন্দোলনে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। হিন্দু মেলা সেই সকল অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের অন্যতম। স্বদেশী আন্দোলন—লবণ ও শর্করার আন্দোলন নহে—তাহা ভাবের আন্দোলন, অভাবের অনুভূতিতে তাহার উদ্ভব। তাহা দেখিয়া লোক বিস্ময়ে ও ভক্তিতে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—

"আজি বাঙলা দেশের হৃদয় হতে কবে আপনি—
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী!"

জননীর মন্দিরের রুদ্ধ দ্বার যেন ভক্তের ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে মুক্ত হইয়াছিল—ভক্ত মার অপরূপ রূপ প্রত্যক্ষ করিল—

"ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে
বাঁ হাত করে শঙ্কা হরণ;
দুই নয়নে স্নেহের হাসি
ললাট নেত্র আগুন বরণ!"

"আবেদন আর নিবেদনের থালা বহে বহে নতশির" ভারতীয় মা'র নূতন রূপ দেখিল। সে সেই—

"সপ্ত কোটি কণ্ঠ কলকলনিনাদ করালে,
দ্বিসপ্তকোটিভুজৈ ধৃত খরকরবালে।"

সেই জন্যই অরবিন্দ লিখিয়াছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের জননী জন্মভূমি ত্রিধারিণী নহেন—তাঁহার বরহস্তে ভিক্ষাপাত্র নাই—আছে খরকরবাল।

সেই জননীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া রবীন্দ্রনাথের বন্ধু উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ইংরেজের আদালতে অভিযুক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন—

"I do not want to take any part in this trial because I do not believe that in carrying out my humble share of the God-appointed mission of Swaraj, I am in any way accountable to the alien people who happen to rule over us and whose interest is and must necessarily be in the way of our true national development."

১৯০৬ খৃষ্টাব্দের পূর্বে কংগ্রেসেও স্বাবলম্বনের কথা উঠে নাই। কিন্তু তাহার বহু পূর্বে রবীন্দ্রনাথ যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত "হিন্দু মেলায়" স্বাবলম্বনের গুণ কীর্তিত হইয়াছিল। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইবার ১৬ বৎসর পূর্বে এই মেলার উদ্দেশ্য বিবৃতিতে ছিল—

"দেশীয় লোক মধ্যে সদ্ভাব সংস্থাপন এবং দেশীয় লোক দ্বারা স্বদেশীয় সৎকার্য সাধন করাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য।"

উদ্দেশ্য-বিবৃতি প্রসঙ্গে সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছিলেন, ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য—আত্মনির্ভর। তিনি বলেন—

"আপনার চেষ্টায় মহৎ কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া এবং তাহা সফল করাকেই আত্মনির্ভর কহে। ভারতবর্ষের এই একটি প্রধান অভাব, আমাদের সকল কার্যেই আমরা রাজপুরুষগণের সাহায্য যাচ্ঞা করি, ইহা কি সাধারণ লজ্জার বিষয়? কেন আমরা কি মনুষ্য নহি? মানব জন্ম গ্রহণ করিয়া চিরকাল পরের সাহায্যের উপর নির্ভর করা অপেক্ষা লজ্জার বিষয় আর কি আছে? অতএব যাহাতে এই আত্মনির্ভর ভারতবর্ষে স্থাপিত হয়—ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হয়, তাহা এই মেলার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য। স্বদেশের হিতসাধনের জন্য পরের সাহায্য না চাহিয়া যাহাতে আমরা আপনারাই তাহা সাধন করিতে পারি, এই ইহার প্রকৃত ও প্রধান উদ্দেশ্য।"

মেলায় বক্তা মনোমোহন বসু এই বিষয় আরও স্পষ্ট করিয়া বলেন—

আমরা সারল্যের বিনিময়ে "ঐক্যনামা মহাবীজ ক্রয় করিতে আসিয়াছি। সেই বীজ স্বদেশ ক্ষেত্রে রোপিত হইয়া সমুচিত যত্নবারি এবং উপযুক্ত উৎসাহতাপ প্রাপ্ত হইলেই একটি মনোহর বৃক্ষ উৎপাদন করিবেক। এত মনোহর হইবে যে, যখন জাতিগৌরবরূপ তাহার নব পত্রাবলীর মধ্যে অতি শুভ্র সৌভাগ্য-পুষ্প বিকশিত হইবে, তখন তাহার শোভা ও সৌরভে ভারতভূমি আমোদিত হইতে থাকিবে। তাহার ফলের নাম করিতে এখন সাহস হয় না, অপর দেশের লোকেরা তাহাকে 'স্বাধীনতা' নাম দিয়া তাহার অমৃতাস্বাদ ভোগ করিয়া থাকে। আমরা সে ফল কখন দেখি নাই, কেবল জনশ্রুতিতে তাহার অনুপম গুণগ্রামের কণামাত্র শ্রবণ করিয়াছি। কিন্তু আমাদিগের অবিচলিত অধ্যবসায় থাকিলে অন্তত 'স্বাবলম্বন' নামা মধুর ফলের আস্বাদনেও বঞ্চিত হইব না।"

স্বাধীনতা আমাদিগের কাম্য, একথা বলা তখন নিষিদ্ধ ছিল; এমন কি, স্বদেশী আন্দোলনের সময়েও "স্বরাজ" আমাদিগের কাম্য, ইহা বলার 'অপরাধে' ইংরেজ সরকার লোককে অভিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু হাইকোর্টের বাঙালী বিচারকের নির্দেশে 'স্বরাজ' নির্দোষ বলিয়া বিবেচিত হয়।

তাহার বহু দিন পূর্বে রবীন্দ্রনাথ ভিক্ষা-নীতির নিন্দা করিয়া সেই ভাবই প্রকাশ করিয়াছিলেন—

সর্বং পরবশং দুঃখম্
সর্বং আত্মবশং সুখম্। —

"(মিছে) কথার বাঁধুনী কাঁদুনীর পালা
চোখে নাহি কারো নীর,
আবেদন আর নিবেদনের থালা
ব'হে ব'হে নতশির;
কাঁদিয়ে সোহাগ। ছি-ছি একি লাজ,
জগতের মাঝে ভিখারীর সাজ,
আপনি করিবে আপনার কাজ
(করি) পরের পরে অভিমান!
(ছি-ছি) পরের কাছে অভিমান!

* * * * *

দাও দাও বলে পরের পিছু পিছু
কাঁদিয়া বেড়ালে মেলে নাত কিছু;
যদি মান পেতে চাও প্রাণ পেতে দাও
প্রাণ আগে কর দান।"

বঙ্কিমচন্দ্র তখন ভারতবাসীর র[illegible]নী চর্চাকে ব্যঙ্গ করিয়া [illegible]লিয়াছিলেন—"হে রাধেকৃষ্ণ! ভিক্ষা দাও গো। —ইহাহ

## রবীন্দ্রনাথের ছবি
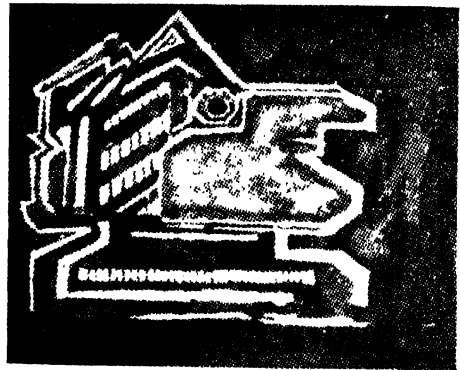
# জন্মদিন

## নির্মাল্য বসু

পড়ছিলেম কাব্যগ্রন্থ।
বহু যুগ আগের এক কবির লেখা।
চোদ্দ-শ সালের নতুন তরুণ আমি—
চোখে আমার নতুন আলোর ছায়া;
মুখে আমার নতুনতর ভাষা;
আর বুকে আমার নানা রঙের সাগর জলের ঢেউ।
পড়ছিলেম শতবর্ষ আগের কবির কাব্য
নেহাৎই কৌতূহলে।
খস্‌খসে পুরোণো জরাজীর্ণ গ্রন্থাবলী—
মলাট গেছে খসে,
কীটদষ্ট ক্ষয়িত পৃষ্ঠায় বার্ধক্যের দৈন্য;
ধুলোভরা—ঝুললাগা।
কিন্তু আখরগুলো কী উজ্জ্বল!
বর্ষণ-ক্ষান্ত দিগন্তে যেন
নানান্ রঙের বিচিত্রতায় সজল রামধনু।
পড়ে চলেছি একমনে—একটানা—অনেকক্ষণ।
হঠাৎ বসন্তের চকিত চমক লাগে মনে—
দূর উপবনের চ্যুত মুকুলের সৌগন্ধ্য মাতাল হয়ে এলো নাকি!
বাজে কোথায় মিঠেসুরের মেঠো বাঁশী?
ঝরা পাতায় কুড়িয়ে পেলেম যেন
কোন বিরহীর ভূর্জ পাতার লিপি।
হঠাৎ কার পরশ যেন লাগে;
আমার বীণার তারে তারে বেজে ওঠে আনন্দ-ভৈরবী।
আর আমার স্তব্ধ অনুভূতিতে
কে যেন চলে যায়
আমারি মনের বলা, না-বলা সব বাণী
আনন্দ আর বেদন ব্যঞ্জনায়।

চমকে উঠি—
তাই তো!
কে? স্বপ্ন! তন্দ্রা!
তাকিয়ে দেখি খোলা বইয়ের অনেকগুলো পৃষ্ঠা গেছে ভিজে।
আমার চোখে জল;
আমার মনে আনন্দ;
হাওয়ায় উড়ছে কাব্যগ্রন্থের খোলা পাতা—
উড়ছে আমার অনাদি হৃদয়ের গোটা ইতিহাস।
দেয়ালে টাঙানো ছবিটার দিকে চোখ পড়ে;
উইয়ে খাওয়া ফ্রেম আর ভাঙা কাঁচে আঁটা
সস্তা নিউজ প্রিন্টে ছাপানো ছবি।
নীচে লেখা—জন্ম পঁচিশে বৈশাখ ১২৬৭ সাল।
আশ্চর্য!
কিন্তু একশো বছর আগে তো জন্মাই নি আমি;
আমার সুখ দুঃখ—হাসি কান্না
আর চাওয়া পাওয়ার কথা তুমি জানলে কেমন করে
ওগো আমার চিরকালের চির নতুন কবি?
অন্তরের অলক্ষ্য মণি-কোঠায় বসে
নানা রঙের তুলি বুলিয়ে চলেছো তুমি।
তার কোনটি হাসির—
কোনটি বা অশ্রুর;
আর তারি জালে নতুন করে বাঁধছো চির-আমিকে
জীবনের পরম-পূর্ণতায়।
একশো বছর আগেও তাই ছিলে—
একশো বছর পরে আজো তুমি আছো;
আর একশো বছর পরেও তুমি থাকবে
চির নবীনের অক্ষয় জন্মদিনের পটে॥

# পঁচিশে বৈশাখ

## শ্রীপরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

ইতিহাস কই রাখে না ঠিকানা, প্রাক্ ইতিহাস অংকে
লুকানো রয়েছে কত উজ্জ্বল দিন,
আর্যাবর্তে কবির কণ্ঠে নিনাদিত কত শঙ্খে—
কত না কবিতা জাহ্নবী জলে হারা!
বাল্মীকি আর ব্যাসের বিষাণ কোটি ভারতীয় কণ্ঠে
হর্ষ বিষাদে কেঁপে ওঠে হৃদি বীণ্,
কালিদাস গেছে বাজিয়ে যে বীণা সুললিত কত ছন্দে—
কবিতার সুধা অমরা অমিয়া পারা!
প্রতি ধূলিকণা সজীব হেথায়—হিমালয় পদপ্রান্তে—
গানে প্রাণে, যেন—মৌন দার্শনিক,
এ মাটির বুকে পেয়েছে জীবন কবি ও তাঁহার কাব্য
যুগে যুগে কত! লেখা নেই তার কথা!
হাজার পীড়ন লাঞ্ছনা আর বিদেশীর রথচক্রে
শান্ত প্রকৃতি কেঁপে ওঠে চৌদিক!—
গংগা যমুনা গোদাবরী তীরে গান শুনে যত শত্রু
মিশে গিয়ে হেথা নেমে আসে নীরবতা!
বাঙলার তাজা কিশলয় বুকে নেমে আসে মহা-শীর্বাদ—
পঁচিশে বোশেখ নিদাঘতপ্ত দিবা,
আঁধার কাটি নি সুনীল গগনে কিরণেতে সমাকীর্ণ
হিমালয় বুকে প্রাচী-র গগণে রবি

জেগে ওঠে আর, পৃথ্বীটা দেখে বিস্ময়ভরা চক্ষে
আগ্রহে সবে তুলে দেখে নিজ গ্রীবা!—
কোন্ মহাকবি এলো আজ হেথা পুণ্য ধূলির এ তীর্থে
অতীতের মহাকবিদের স্নেহ লভি!
পঁচিশে বোশেখ—নির্মোক নীল—অভ্রেরা অবলুপ্ত,—
আলো আর গানে ভরপুর চারিদিক,
নিনাদিত বীণা ভারতের বুকে ভারতীর কর স্পর্শে!—
নত করে মাথা প্রণাম জানাই তাঁরে।
ধন্য এ ভূমি বিশ্বকবির বাণী বন্দনা ছন্দে,
জগৎ চিনিল তাঁহারে আকস্মিক,
পরায়ে তাহারা দিল সেরা মালা তাঁহার কবির কণ্ঠে,—
অর্থের ফুল ফুটে ওঠে চারিধারে!
পঁচিশে বোশেখ, ভুলিতে পারি না এ লগন মহাপুণ্য,
ধূপদীপ আর প্রদীপ জ্বালায়ে রাখি—
নবজাতকের আবাহন লাগি, আসন যে আজ শূন্য!—
নূতন গানও কবিতায় যাক ভরে—
স্বার্থ দ্বন্দ্ব তামসী নিশার অবসানে নব শ
দেখিতে জনতা রহে অপলক আঁখি—
ভারত গগণে জ্বলিয়া উঠুক উজ্জ্বল নব সূর্য—
সোনালী আলোক পড়ুক এ ভূমে ঝরে।

# রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য

## শান্তিদেব ঘোষ

### প্রাচীন ভারতের গীতিনাট্য

আমাদের দেশে গীতনাট্য নামে কয়েক-প্রকার নাটকের প্রচলন অনেককাল থেকেই চলে আসছে। যে নাটকে পাত্রপাত্রীর কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে প্রচুর গান থাকে সেগুলো এক রকমের গীতনাট্য। এর নমুনা আমরা পাই অনেকগুলি প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের মধ্যে, দক্ষিণ ভারতে কর্ণাট প্রদেশে প্রচলিত একপ্রকার নৃত্যাভিনয়ে, বাঙলাদেশে প্রচলিত যাত্রাভিনয়ে এবং গুরুদেবের রচিত শারদোৎসব, ফাল্গুনী, অচলায়তন, তাসের দেশ প্রভৃতি গীতনাট্যের মধ্যে। এই নাটকের [illegible] শুনে বেশ বোঝা যায় যে, নাটকে কেবল রসমাধুর্য বিস্তারের জন্যে গানগুলি বসানো হয়নি, নাটকের সাধারণ ভাষায় যে ভাব প্রকাশ করা গেল না, গান দিয়েই যেন তাকে পূরণ করা হচ্ছে।

আর এক রকমের গীতনাট্য হল, যাতে পাত্রপাত্রী সাধারণ ভাষায় কথা বলে না। কোন সূত্রধার কথার ভাষায় নাটকের ঘটনা ও বিষয়বস্তুকে দর্শকের সামনে খুলে ধরে। কেবল গানের অংশ অভিনেতারা অভিনয় করে থাকে। অনেক সময় দেখা গেছে সূত্রধারই একাধারে নাচে, গানে, বক্তৃতায় প্রধান অংশ গ্রহণ করেছে, অন্যান্য অভিনেতারা উপলক্ষ্য মাত্র। এ ধরণের গীতনাট্যের সঙ্গে আসামের বৈষ্ণবদের "অঙ্কীয়া নাট" নাটকে, বাঙলার "কালীদমন" নামে প্রাচীন যাত্রাগানে, দক্ষিণ ভারতের অন্ধ্র-দেশে প্রচলিত প্রাচীন নৃত্যাভিনয়ে এবং গুরুদেবের 'শাপমোচন' ও 'শীশুতীর্থ' প্রভৃতি গীতিনাট্যে তার মিল পাওয়া যায়।

গুরুদেবের রচিত 'বসন্ত', 'শ্রাবণ-গাথা,' 'ঋতুরঙ্গ' কিন্তু এ ধরণের গীতনাট্য নয়। এগুলি দেখে মনে হবে যেন গানের জন্যেই নাটকের পরিবেশ তৈরী করা হয়েছে। গান-গুলিকে একটি মূল ভাবসূত্রে গেঁথে দর্শকদের কাছে ধরবার ইচ্ছা থেকেই এই সব নাটকীয় আয়োজন।

### অপেরা ও নৃত্যনাট্য

এক ধরণের গীতনাট্য আছে, যার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত কথাবার্তা সুরে রচিত। ইয়োরোপে এই নাটকের প্রভাব খুব। তাদের ভাষায় একে বলে 'অপেরা'। আমাদের দেশে পূর্ণাঙ্গ গীতনাট্য দক্ষিণ ভারতের কেরল প্রদেশে ও তামিলনাদের মধ্যে আজও প্রচলিত। গুরুদেব স্বয়ং এই ধরণের গীতনাট্য রচনা করেছিলেন ছয়টি। সে কটির নাম হল বাল্মীকি-প্রতিভা, কালমৃগয়া, মায়ার খেলা, চিত্রাঙ্গদা, শ্যামা ও চণ্ডালিকা।

আমাদের দেশের প্রচলিত ধারা অনুসারে সব রকমের গীতনাট্যে নাচ বা নাচের অভিনয় ছিল অতি আবশ্যক। নাচ ছাড়া গীতনাট্য অভিনীত হতে পারে, এ যেন আমাদের পূর্বপুরুষরা ভাবতেই পারতেন না। সেই কারণেই আমাদের দেশের প্রাচীন সব রকমের গীতনাট্যের গান মাত্রেই নাচে অভিনয় হ'ত এবং আজও হয়। বোধ হয় প্রাচীন পণ্ডিতেরা এই জন্যেই সংগীতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে, একাধারে নাচ গান ও বাজনা যাতে মিশেছে তাকেই বলা হবে সংগীত।

প্রাচীন ভারতে গান ও নাচকে গীত-নাট্যে এত বড় স্থান দিল কেন, তা ভাববার বিষয়। হৃদয়াবেগকে আমরা সাধারণ কথায়

প্রথম গীতনাট্য বাল্মীকি প্রতিভা অভিনয়ে বাল্মীকির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ

মত না সুন্দর করে ফোটাতে পারি, তার চেয়ে বেশী সুন্দর হয়ে ওঠে কবিতার ছন্দে। আরো মর্মস্পর্শী হয়ে রাগিনীতে মিশে সে যখন গানে রূপ নেয়। নাটককে সাধারণ কথার অভিনয় ভাল লাগে বটে, কিন্তু তার চেয়েও ভাল লাগে তাকে সুরের ভিতর দিয়ে যখন আমরা পাই। সবচেয়ে বেশী মন আকর্ষণ করে যখন দেহছন্দের নৃত্যভঙ্গীতে তা রূপ নেয়।

এই কথা ভেবেই বোধ হয় আমাদের পূর্বপুরুষেরা গানে ও নাচে নাটককে পূর্ণ করে নানা প্রকারের গীতিনাট্যে তাকে রূপান্তরিত করতেন। ভারতীয় আদর্শে গান ছাড়া নাটক নেই, আবার গান যেখানে আছে সেখানে নাচ থাকবেই।

গুরুদেবের জীবনের প্রথমদিকে রচিত কয়েকটি পূর্ণাঙ্গ গীতিনাটক বাল্মীকি-প্রতিভা, কাল-মৃগয়া ও মায়ার খেলা ছাড়া আর সবগুলিতেই নাচের চেষ্টা করা হয়েছিল। সেগুলি সবই নাচের ভঙ্গিতে অভিনয় করবার। শারদোৎসব থেকে শুরু করে চণ্ডালিকা পর্যন্ত জীবনের শেষার্ধের সবকটি গীতিনাট্যের অভিনয়কালে গানগুলিকে কোন না কোনভাবে নাচের ভাষায় অভিনয় করা হয়েছিল। নাচের ভাষাকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে চিত্রাঙ্গদা, শ্যামা ও চণ্ডালিকার অভিনয় হয়েছিল বলেই তিনি আলাদা নামকরণ "নৃত্যনাট্য"।

ইয়োরোপের গীতিনাট্য অপেরাকে নৃত্যনাট্য বলা চলে না। কারণ অপেরা কেবল গানে অভিনয় করবার জন্যেই রচিত। নাচের জন্যে নয়। সুগায়কের গানের উপরেই অপেরার ভালমন্দ নির্ভর করে। নৃত্যপটু নটনটীর জন্যে এ নয়। সেদিক থেকে গুরুদেবের প্রথম জীবনের বাল্মীকি-প্রতিভা, কাল-মৃগয়া ও মায়ার খেলার সঙ্গে বিদেশী অপেরার মিল বিশেষ লক্ষ্য করি। এর গানগুলি এমনভাবে রচিত যে, মনে হয় সাধারণভাবে অভিনয় করবার পক্ষেই তা উপযুক্ত।

### নবজাগরণের যুগ

এই গীতিনাট্য কটির সঙ্গে পাশ্চাত্য প্রথার মিল পাবার কারণটা কি তার উত্তর পেতে হলে আমাদের বাঙলা দেশের সংগীত ইতিহাসের দিকে একটু নজর দিতে হবে। সেই সঙ্গে সংগীতে গুরুদেবের জন্মকালকে ও তার পারিপার্শ্বিক আবহাওয়াকেও ভালভাবে জানা দরকার।

তাঁর জন্ম কলিকাতা শহরে ইংরাজী ১৮৬১ খৃস্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের কয়েক বৎসর পরে। এই যুগটি বাঙলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের একটি স্মরণীয় যুগ। যে কারণে গুরুদেব এই সময়টিকে স্মরণ করে বলেছেন বর্তমান আধুনিক যুগের আরম্ভ।

উনিশ শতকের গোড়া থেকে সিপাহী বিদ্রোহের সময় পর্যন্ত বাঙলা দেশে বিদেশী সভ্যতার প্রভাবে দেশের শিক্ষা, সমাজ, ধর্ম ও রাজনীতিতে যে আন্দোলন চলেছিল তার মধ্যে ছিল বিলিতি সভ্যতার প্রতি অনুকরণের ঝোঁক। সে সভ্যতার ভালোটিকে গ্রহণ করবার প্রতি যেমন একটি আন্দোলন দেশে ছিল, তেমনি সেদেশ থেকে পাওয়া ব্যক্তিস্বাধীনতা ও চিন্তা-স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারের দিকেও দেশের একদল শিক্ষিতদের মন বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। প্রথম দলে ছিলেন রামমোহন, মহর্ষী দেবেন্দ্রনাথ, ঈশ্বরচন্দ্র, অক্ষয় দত্ত, রাজনারায়ণ বসু ইত্যাদি। দ্বিতীয় দলে ছিলেন হিন্দু কলেজের মেধাবী একদল ছাত্রবৃন্দ। হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে ধারণা হয়েছিল যে, যা কিছু ভারতীয় তাই বর্জনীয়, আর ইয়োরোপের সব কিছুই গ্রহণীয়। রামমোহন ও তাঁর পরবর্তীদের আন্দোলনের মধ্যে দেখা গেল ইয়োরোপের যা ভালো তাকে নিজের দেশী সাজে সাজানোর ও যাতে দেশের আবহাওয়ায় তা খাপ খায় তার চেষ্টা। এর একটি বড় উদাহরণ হোলো ব্রাহ্ম সমাজ—তার চিন্তা ও কর্ম আন্দোলন। এই সমাজের প্রচলিত সামাজিক বহু রকমের করণীয় প্রথার মধ্যে ইয়োরোপের সমাজের রীতিনীতির প্রভাব বেশ বোঝা যায়। এইভাবে কি শিক্ষায়, জ্ঞানে, ধর্মে, সাহিত্যে, সমাজ ও রাজনীতিতে ইয়োরোপ উভয় পথেই অনুকরণের বিষয় হয়ে ওঠে। সিপাহী বিদ্রোহে[র] পরই এই অনুকরণের মনোভাবে[র] মধ্যে একটা বড় রকমের পরিবর্ত[ন] আসে। এখন থেকেই দেখা গেল নিজে[র] স্বভাবের সঙ্গে মিলিয়ে এই প্রভাবকে গ্র[হণ] দেবার চেষ্টা। পূর্বে দুই ভিন্নমুখী প্রভা[ব] সমাজে যে সংঘর্ষ দেখা দিয়েছিল এতদিনে [তা] শান্ত হয়ে সুন্দর একটি সমন্বয়ের সৃ[ষ্টি] করেছে এবং দেশী ও বিলিতি উভয় সভ্যতা[র] ভালমন্দের একটা যাচাই হয়ে গিয়ে যা গ্রহণ[ীয়] তাকে যেন এইবার স্বীকার করা হোলো।

দেশের সংগীত এবং অভিনয়কলাও এ[ই] আন্দোলনের মধ্যে নির্লিপ্ত থাকতে পারে[নি]।

গীতিনাট্যের প্রথম সুরকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

তাতেও পরিবর্তন দেখা গে[ল]। প্রথম যুগের এই সংগীত আন্দোলনে অনুকরণের ইচ্ছাটাই প্রক[াশ] পেয়েছে কলকাতাবাসী এক[দল] সংগীতানুরাগীদের ম[ধ্যে]। কিন্তু নিজের দেশের ... শ্রেণীর সংগীতকে একেব[ারে] বর্জন করার কথা ... ভাবেনি। ভাবেনি বিলি[তি] সংগীতই একমাত্র সংগী[ত] ... নিজের দেশেরটি কিছুই ন[য়]।

### বিদেশী সংগীতের প্রভাব

আজকাল আমরা ... গ্রামে যে যাত্রাভিনয় দেখি এ[র] সূচনা হয়েছিল বি[দেশী] সভ্যতাকে গ্রহণ করবার প্র[থম] যুগে। ১৮ শতকের শেষ ... ১৯ শতকের প্রথম দিক প[র্যন্ত] কলিকাতায় ইংরাজি নাট[কের] অভিনয় খুব হোতো। ... নাটকের অভিনয় দেখা তখন শিক্ষিত সমাজের মধ্যে বি[শেষ] প্রচলিত ছিল। তখনকার হি[ন্দু] কলেজের ও অন্যান্য ছাত্র ম[হলে] বিলিতি নাটকের অভিনয় ... ও সেই আদর্শে বিদ্যা[লয়ে] ইংরেজি ভাষায় অভি[নয়] ও আবৃত্তি করা শিক্ষার একটা বি[শেষ] অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই আবহাওয়ায় ... বাঙলা ভাষায় বিলিতি অনুকরণে একপ্র[কার] যাত্রার উদয় হোলো, কলিকাতার ধনী[দের] উৎসাহে ও অর্থ সাহায্যে। তাকে নাম ... সখের যাত্রা। তাতে করে প্রা[চীন] প্রচলিত গীতিনাট্যের প্রতি ... ধীরে ধীরে কমতে লাগল। নতুন যাত্রার গঠনভঙ্গী হল থিয়েটারের ... সাধারণ কথা প্রাধান্য পেল। সিপাহী বিদ্রো[হের] পরে যখন পুরো বিলিতি আদর্শে বা[ঙলা] ভাষায় নাটক রচনার একটা ব্যাপক আন্দো[লন] দেখা দিল—যাকে বলা চলে এ যু[গের] থিয়েটারের আরম্ভ—তখন সেই থিয়েটা[রের]

...কের দেখাদেখি দেশী যাত্রায় আর একবার ...রবর্তন ঘটল। সেই পরিবর্তিত যাত্রার নমুনা ...ও আমরা দেখছি। ১৯ শতকের গোড়ায় ... সখের যাত্রার উদ্ভব হলেও সিপাহী ...দ্রোহের আগ-পর্যন্ত প্রাচীন পদ্ধতির ...ভিনয়ের প্রভাব তখনও যথেষ্ট দেখা গেছে। ...তু এ যুগে থিয়েটারী যাত্রার প্রসারের সঙ্গে ...গে তার আদর কমতে থাকে। এখন আর সেই ...চীন যাত্রা দেখাই যায় না। আমরা আজ তার ...া ভুলে গেছি। কিন্তু এই নতুন যাত্রা বিলিতি ...য়েটারের আদর্শে পরিচালিত হয়েও গানকে ...দ দিতে পারেনি। যাত্রায় কথা ও গানকে প্রায় ...মান স্থান দিতে হয়েছে। প্রাচীন যাত্রায় গানের ...গে যে নাচের চলন ছিল এই নতুন যাত্রা তাকে ... পরিমাণে রাখতে বাধ্য হলো। এমনকি ...য়েটারেও গান ও নাচের প্রভাব দেখলাম। ...বে দেশী থিয়েটারে প্রচলিত নাচের ঢং ...লিতি নাটক থেকে এসেছিল কি না এ সংবাদ ...ঠিক দেওয়া সম্ভব নয়। তবে এটুকু বলা চলে ... সে নাচের ভঙ্গী ছিল দেশী, তাকে বিলিতি ...টারী আদর্শে সাজানো হোতো। বিগত প্রথম ...মহাযুদ্ধের শেষেও ঐ জাতীয় দেশী বিদেশী ...শ্রিত থিয়েটারী নাচের প্রভাব রঙ্গালয়ে খুবই ...ছিল। আজও তার কিছু কিছু নমুনা ...ওয়া যায়।

আমাদের দেশে মুসলমান যুগ থেকে আরম্ভ ...রে উৎসবে নহবতের বাজনা বাজত। নানারূপ ...জো এবং শোভাযাত্রায় বিচিত্র আকারের ঢাক-...ঢোল শিঙ্গা, কাশি ইত্যাদি তালযন্ত্রের বাজনার ...এরা অনুষ্ঠানকে বাজনার শব্দে মাতিয়ে ...তো। ১৯ শতকের গোড়া থেকেই শুরু ...নে ধনীদের উৎসাহে সমাজে দেশী বাজনা ...গে করে বিলিতি ব্যান্ড বাজনা। তারা ...বাহে, ভোজে—এই বাজনাকে উৎসাহিত ...রতে লাগলেন। এই সময় মফঃস্বলের ধনী ...মিদারদের মধ্যে বিশেষ করে কৃষ্ণনগরের রাজ-...রিবার কলকাতা থেকে লোক নিয়ে দেশী ...জিয়েদের দিয়ে বিলিতি ব্যান্ডের দল তৈরী ...রেন। আজও আমরা ধনীদের বিবাহের ...শোভাযাত্রায়, বড় বড় উৎসবে, পূজার আমোদে, ...জাতীয় উৎসব দিনে, খেলার প্রাঙ্গণে ঐপ্রকার ...ব্যান্ড বাজনার নমুনা দেখি। এখনকার শিক্ষিত ...যুবক মহলে এই বাজনা এতদূর প্রভাব বিস্তার ...করেছে যে, বিলিতি বাজিয়েদের সাজপোষাকে ...ও সেই ঢংএ ব্যান্ডের বাজনায় তারা দেশের ...স্মরণীয় নেতাদের জন্মোৎসব করে, স্বাধীনতা ...দিবস উদ্যাপন করে, সরস্বতী পূজার প্রতিমা ...ভাসাতে যায় অনেকে। নিজের দেশের ঢাক, ...ঢোল, কাড়া নাকাড়া, শিঙ্গা কাশি ইত্যাদি ...বাজাতে বা সেই বাজনা শিখতে তাদের উৎসাহ ...হয় না, উপরন্তু লজ্জা বোধ করে।

বাঙলার প্রাচীন গীতনাট্য ইত্যাদিতে সাধারণত বাজতো ঢোলক, তম্বুরা, মোচঙ্গ, মন্দিরায় "সাজবাজনা" অথবা বহু জোড়া খোল ও করতালের একসঙ্গে সঙ্গত। ১৯ শতকের আরম্ভ থেকে, তবলা ও বেহালা এর মধ্যে স্থান পায়। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের পরে যখন বিলিতি থিয়েটারের আদর্শে অভিনয়ের আরম্ভে ও নানা দৃশ্যের মাঝে মাঝে দেশী ঐক্যতান বাজনার সৃষ্টি হল, তারও প্রভাব দেশী যাত্রা বা গীতনাট্য এড়াতে পারল না। পুরোণো প্রথাকে তুলে দিয়ে নতুন প্রথাকে গ্রহণ করতে দ্বিধা করলো না। সেই প্রভাবের বিসদৃশ নমুনা হোলো আজকালকার যাত্রার কনসার্ট বাজনা। কিছুদিন আগেও গ্রামের যাত্রায় বেহালা বাজতে শুনেছি, আজ সেই বাজনাটিও সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়েছে। আজকাল যাত্রায় বিকট শব্দের কয়েকটি বিলিতি যন্ত্রেরই একমাত্র স্থান হয়েছে। সঙ্গে থাকে ঢোল, তবলা ও করতাল।

### ভারতীয় সংগীতের রূপান্তর

বিলিতি সংগীতের অনুসরণে নিজের দেশের সংগীতকে অবজ্ঞা বা অবহেলা না ক'রে দুই দেশের সংগীতের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে, নতুন পথে দেশের সংগীত ও অভিনয়কে পরিচালিত করবার প্রথম দায়িত্ব নিয়েছিলেন সে যুগের বিখ্যাত ধনী শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও তাঁর দাদা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর। শৌরীন্দ্রমোহন উচ্চশ্রেণীর ভারতীয় সংগীতের উন্নতি ও প্রসারে যে রকম চেষ্টা করেছিলেন তা ভারতীয় সংগীতের ইতিহাসে চিরদিনের মত স্বীকৃত হয়ে গেছে। কিন্তু বিলিতি সংগীতে তাঁর কি রকম আগ্রহ এবং উৎসাহ ছিল সেদিকটিও আমাদের জানা দরকার।

ইনি ইয়োরোপীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে ভারতীয় সংগীতকে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখতে শিখেছিলেন। ভারতীয় সংগীতকে বুদ্ধিবিচারের দ্বারা বোঝবার ও বোঝাবার চেষ্টা ইনি সেই যুগে প্রথম চালু করেন। সংস্কৃত পুঁথির সাহায্যে প্রাচীন সংগীত বিষয়ে আলোচনার আগ্রহে তিনি তাঁর দরবারে অনেক পণ্ডিত নিযুক্ত করেন। এই উৎসাহের ফলেই তাঁর নামে বাঙলা ও ইংরাজী ভাষায় আলোচনার বই আজও আমরা দেখতে পাই। ইয়োরোপের সংগীতের জন্যে জার্মান দেশীয় একজন সংগীতজ্ঞকে শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করেছিলেন। এ'দেরই বাড়ির বড় ছেলে প্রমোদকুমার ছিলেন পাকা ইয়োরোপীয়ান মিউজিশিয়ান। দৌহিত্র গুরুদাসও ছিলেন ভালো পিয়ানো বাজিয়ে। এ'রা দুজনে বিদেশী আদর্শে দেশী [illegible]তকে "হার্মনাইজ" করবার চেষ্টা করেছিলেন। শৌরীন্দ্রমোহনের দাদা যতীন্দ্রমোহন, বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর সাহায্যে ১৮৫৮ খৃঃ দেশী রাগ-রাগিনীর গৎ দিয়ে বিলিতি থিয়েটারের আদর্শে, বাঙলা থিয়েটারের জন্যে প্রথম দেশী যন্ত্রের ঐক্যতান সংগীতের চলন করেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এ'রা আরো কতকগুলি নাটকের জন্যে একই প্রথায় ঐক্যতান সংগীত রচনা করিয়েছিলেন। এই সময়টা কলিকাতা শহরে সখের থিয়েটারের যুগ। এ'দের দেখাদেখি সব থিয়েটারেই নূতন পদ্ধতির ঐক্যতান সংগীত বাজানোর একটা রেওয়াজ দাঁড়িয়ে গেল। ১৮৬৬ খৃঃ কাছাকাছি এ'রা সংগীতের আলোচনার্থ সম্মিলনীর আয়োজন করেছিলেন। ইচ্ছা ছিল ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের খ্যাতনামা গায়কদের মধ্যে সংগীতে যে মতভেদ আছে, এখানে তার একটা মীমাংসা করবেন। বিলিতি সংগীতের স্বরলিপি প্রথার উপকারিতা লক্ষ্য করে ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ১৮৫৮ খৃঃ ঐক্যতান সংগীত বাজানোর সুবিধার্থে গতের লিখন প্রণালীর উদ্ভাবন করেন। বাজনার দল সেই লিখিত খাতা দেখেই গত বাজাতো। এই গত-লিখন পদ্ধতিই পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ পায় "সংগীতসার", (১৮৬৮ খৃঃ) ও "ঐক্যতানিক স্বরলিপি" (১২৭৪ ফাঃ) পুস্তকে। ১৮৬৭ খৃঃ এ'দেরই নাটকের দলের কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় "বঙ্গৈকতান" নামে একখানি স্বরলিপি পুস্তক প্রকাশ করেন কিন্তু সেই স্বরলিপি পদ্ধতি ছিল বিলিতি। তবে তাঁর দাবী এই ছিল যে, ঐ বইটিতেই "হিন্দু সংগীতের প্রথম স্বরলিপি" প্রকাশিত হল। এই সময়েই (১৮৬৮) "Hindusthani Air arranged for Pianoforte" ও "ইংরাজি স্বরলিপি পদ্ধতি" (১৮৬৮) নামে দুখানি বই প্রকাশিত হয় শৌরীন্দ্রমোহন ও ক্ষেত্রমোহনের উৎসাহে ও প্রেরণায় তাঁদেরই এক গুণী শিষ্যের দ্বারা। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দ থেকেই অর্কেস্ট্রা বা ঐক্যতান সংগীত বাজনার জন্যে দেশী বাজিয়েরা বিলিতি যন্ত্র বাজাবার জন্যে গুরুতর পরিশ্রম করছে। তখন থেকেই বাঙালী পিওনো, হারমোনিয়ম, কনসার্টিনা, সিকলেফ্লুট ও ফ্লাটফ্লুট ইত্যাদি নানাপ্রকার বিদেশী যন্ত্র বাজাতে শুরু করে দিয়েছে। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে কোন কোন থিয়েটারের ঐক্যতানে বিলিতি গত বাজানোর চেষ্টা হচ্ছে। থিয়েটারে বাজানোর জন্যে ঐক্যতান ও গতের রচনার সঙ্গে সঙ্গে স্বরলিপি প্রথার প্রবর্তনার মূলে বিলিতি সংগীতের প্রভাব সুস্পষ্ট।

সংগীত বিষয়ে জনসভায় বক্তৃতার প্রথম প্রচলন করেন শৌরীন্দ্রমোহন ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে, হিন্দুমেলার উৎসবে। তিনি দাবী করেন, বাঙলা ভাষায় এই বিষয়ে তিনিই পথপ্রদর্শক। বক্তৃতার ছাপা পুস্তিকায় তিনি বলেছেন—"ইহা আমার প্রথম উদ্যম। এই ভার[illegible]র্ষে সংগীতের বিষয়ে বঙ্গভাষায় [illegible]হ এরূপ ব[illegible]তা প্রকাশ্য সভায় করিয়াছে [illegible]কনা সন্দেহ।" তাঁর এই পুস্তিকাটি ও অ[illegible]ন্যান্য সংগীত বিষয়ের বইগুলি পড়লে বেশ [illegible] যায় যে,

তিনি বিলাতি সংগীতে নানাদিক থেকে গভীর জ্ঞানলাভ করেছেন এবং কি করে সংগীতকে আলোচনার বস্তু করে তুলতে হয় তাও জেনেছেন ঐ সংগীতের আলোচনা কালে। এছাড়া তখনকার শিক্ষিত সংগীতজ্ঞ মহলে বিলাতি সংগীতের আলোচনা কতখানি গভীর ও ব্যাপক হয়েছিল, কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বই "গীতসূত্রসার" (১৮৮৫) তার একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। বিলাতি সংগীতের গভীর জ্ঞান ছাড়া ঐ ধরণের বই লেখা কখনো সম্ভব হোতো না। বিলাতি শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন এঁরা। কিন্তু ওস্তাদী গায়ক মহলেও এই আন্দোলন বেশ ভাবিয়ে তুলেছিল। তাই বরোদানিবাসী বিখ্যাত ওস্তাদ মৌলা বক্স ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে হিন্দুমেলার উৎসবে বলেছিলেন, "তিনি ইরাজদের ন্যায় পঞ্চাশ হাজার লোককে এক সঙ্গে গান করাইতে পারেন। ইংরাজদের রীতি এবং আমাদের দেশের রীতি একত্র করিয়া সংগীত শাস্ত্র প্রস্তুত করিলে ঐকতান গান অনায়াসে প্রচলিত হইতে পারে।" এই যুগেই, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে, শৌরীন্দ্রমোহন ও ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী জনসাধারণের সুবিধার্থে একটি সংগীত বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয় সেদিনের বহু সংগীত পিপাসুদের বিশেষ কাজে লেগেছিল। এই বিদ্যালয়ের ছাত্র দক্ষিণাচরণ সেন "Blue Ribbon Orchestra" নামে একটি দল তৈরী করে বিখ্যাত হন। তিনি ঐ বিদ্যালয়ে শৌরীন্দ্রমোহনের পুত্র প্রমোদকুমারের কাছে ও পুস্তক পাঠে বিলাতি হারমনি সংগীতের চর্চা করেছিলেন। ১৮৮৯ খৃঃ কেবল বেহালা যন্ত্রের সাহায্যেই ইয়োরোপীয় প্রথায় বাঙলা দেশে সর্বপ্রথম ঐকতান সংগীত রচনা করেন। তখনকার দিনের "কহিনুর" ও "ষ্টার" থিয়েটারে ঐ বাজনা বাজাতেন। প্রমোদকুমার ঠাকুর এই দলের জন্যে বিলাতি প্রথায় ঐকতান রচনা করে দিতেন। তাঁর রচিত "Lady Dufferin Valse" নামে একটি নাচের বাজনা বিশেষ পরিচিত ছিল। ১৯১২ সাল পর্যন্ত এই দলের কার্যকলাপের পরিচয় পাই। ইংলণ্ডেশ্বরের এদেশে আগমন উপলক্ষে বিলাতি প্রথায় দেশী যন্ত্রের ঐকতান বাজনায় এই দল প্রশংসা অর্জন করে।

এই কটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার ভিতর দিয়েও ঐ যুগের শিক্ষিতদের মধ্যে বিলাতি সংগীতের আন্দোলন কি রকম জেগেছিল তার একটি ভাল পরিচয় পাই। বেশ বোঝা যায় যে, বাঙলাদেশ চালচলনে, ধর্মে, রাজনীতিতে, শিল্পে, সাহিত্যে ও কাব্যের বেলাই কেবল বিলাতি আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়নি সংগীত ও নাটকেও তার প্র[illegible] যথেষ্ট পড়েছিল। আজ "জাতীয় সংগীত"-এর [illegible] আদর আমরা করতে শিখেছি সেও হল ঐ [illegible]গের পাশ্চাত্য আদর্শের দান। [illegible]ইভাবে [illegible]দেশী চিন্তায় অনুপ্রাণিত হয়ে, থিয়েটার, গান, ঐক্যতান, স্বরলিপি, সংগীত-বিদ্যালয়, সংগীত-পুস্তক, সংগীতসভা, ব্যাণ্ড ইত্যাদি যখন হতে পারে তখন "অপেরা" জাতীয় গীতনাটকই বা বাদ যাবে কেন। এই উৎসাহেই তখন কিছু অপেরাও রচিত হয়। তারই প্রথমটির নাম হোলো "শকুন্তলা" (১৮৬৫), তাকে বলা হয়েছে,—"This is the first opera in Bengalee." এর পরে আরো কিছু অপেরা বা গীতিনাট্যের সংবাদ আমরা পাই। এই যুগে বিলাতি পেশাদারী থিয়েটারের দল কলিকাতায় এসে মাসের পর মাস অভিনয় বা Pantomime দেখতো। কলিকাতাবাসী শিক্ষিতেরা সেই অভিনয় বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে দেখেছে এবং সেই অনুকরণেই কলিকাতায় পেশাদারী থিয়েটার স্থাপনের সূচনা হয়। এমন কি বিলাতি থিয়েটারের দৃশ্যশয্যা ও অভিনয় পদ্ধতি পর্যন্ত অনুকরণযোগ্য বলে তখনকার দিনের উৎসাহী যুবকরা মনে করেছিলেন।

**রবীন্দ্রনাথের পরিবারে সংগীতচর্চা**

সংগীত ও অভিনয়ের এই আন্দোলনের ঢেউ গুরুদেবের পরিবারেও এসে লেগেছিল এবং তা কার্যকরী হয়েছিল। সে যুগের ধনী মাত্রেরই ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রতি টান ছিল। সামর্থ না থাকলেও তাঁরা ওস্তাদ রেখে তাদের গান বাজনা শুনতে যে রকম ভালবাসতেন তেমনি তার চর্চাও করতেন। অন্তত তখনকার ধনীরা বড় বড় গাইয়ে বা বাজিয়ে পালন করা সামাজিক পদমর্যাদার অঙ্গ হিসাবে দেখতেন। গুরুদেবের পরিবারেও এই রকমের একটা ভারতীয় সংগীতের নিবিড় আবহাওয়া ছিল। আবার সেই সঙ্গে এই পরিবারে বিলাতি সংগীতকে জানবার ও শেখবার আগ্রহও দেখা গিয়েছিল খুব। কার্যকলাপে দেখি তাঁরা সে যুগের বিলাতি সংগীতের আন্দোলনের সম্পূর্ণ সমর্থন করতেন। এদের বাড়ির উপাসনার গানে পুরাতন সরেংগীওয়ালার বাজনা বন্ধ হয়ে গিয়ে শুরু হোলো Organএর সংগত। প্রথম বাজাতে শুরু করলেন সত্যেন্দ্রনাথ, পরে দ্বিজেন্দ্রনাথ এবং শেষকালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। সে সময়কার নতুন সখের থিয়েটারের ঝোঁক এঁদের পরিবারেও দেখা গেল। যার ফলে (১৮৬৭) খৃষ্টাব্দে "নবনাটক" বিখ্যাত হয়ে ওঠে ও পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অন্যান্য ঐতিহাসিক নাটকগুলির দেখা পেলাম। নবনাটে সেই যুগের প্রচলিত প্রথায় ঐকতান সংগীত বাজানো হয়েছিল, যার গৎ রচনা করতেন খ্যাতনামা গায়ক ও [illegible] বনারের গীত শিক্ষক "বিষ্ণু"। এই বাজনার দলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ হারমোনিয়ম বাজাতেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ বিলাতি বাঁশীতে ইয়োরোপীয় বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কৃত সুর বিজ্ঞান বিষয়ে পরীক্ষা করতেন। সংগীতবিজ্ঞানের আলোচনাও তাঁদের মধ্যে যথেষ্ট ছিল। এঁদেরই উৎসাহে ১৮৭৫ সালে আদি ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে সংগীত-বিদ্যালয় শুরু হয়। বিখ্যাত সঙ্গীতবিৎ যদুনাথ ভট্ট এই বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিযুক্ত হন। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী যে বৎসর 'সঙ্গীতসার' বই প্রকাশ করেন, সেই বৎসরেই দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় নূতন পদ্ধতিতে লেখা একটি স্বরলিপি প্রথা প্রকাশ করেন কয়েকটি গান সহ। সেই স্বরলিপিপদ্ধতিই কয়েকবার সংশোধিত ও পরিবর্তিত হয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কৃত আকার মাত্রিক স্বরলিপিতে রূপ নিয়ে আজ বাঙলাদেশে সুপরিচিত। এই বাড়িতে বিলাতি সংগীতের কি রকমের চর্চা হোতো শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবীর মধ্যে আজও তার পরিচয় পাই। ইনি একাধারে কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীত, উভয়েরই চর্চা করেছিলেন। তাঁর দাদা সুরেন্দ্র নাথ ঠাকুর অল্প বয়সে বিলাতি সংগীতের যে চর্চা করেছিলেন তার পরিচয় আমরা পাই 'রাগ ও মেলডি' শীর্ষক তাঁর একটি সংগীত বিষয়ের প্রবন্ধ পড়ে।

স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁর কন্যা সরলা দেবীকে পিওনো শেখাবার জন্যে যে একটি মেম শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করেছিলেন ও রোজ এক ঘণ্টা করে মেয়েকে সেই বাজনা অভ্যাস করাতেন একথা সরলা দেবী তাঁর আত্মকথায়ও বলে গেছেন। পিওনো বাজনায় পারদর্শী এই বাড়ির ছেলেমেয়েদের গুরুদেব একবার তাঁর লেখা 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটিকে বাজনায় ফুটিয়ে তুলতে বলেছিলেন। সরলা দেবী সেই রচনায় হাত দিয়েছিলেন। অল্পবয়সে গুরুদেবের অন্যান্য গানে বিলাতিমতে কর্ড দেওয়া বা হার্মনি করার চেষ্টা করতেন। 'সকাতরে ঐ কাঁদিছে' ও 'আমি চিনি গো চিনি' গানের হার্মনি যুক্ত সুর ইন্দিরা দেবী ও তিনি এক সঙ্গে রচনা করেন। এরকমে আরো কিছু গানকে রূপান্তরিত করেছিলেন বলে শোনা যায়। গুরুদেবের ভ্রাতুষ্পুত্রী অভিজ্ঞা দেবী ও প্রতিভা দেবী ভারতীয় সংগীতের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী সংগীতের এতদূর অভ্যাস করেছিলেন যে, পিয়ানোয় ওস্তাদী বিলাতি বাজনা অনায়াসে বাজাতে পারতেন। "Funeral March" 'Moonlight 'Sonata' জাতীয় কম্পোজিশন পিয়ানো বাজনায় আয়ত্ত করেছিলেন। পিয়ানোর সঙ্গে বাজিয়ে গান গাওয়ার অভ্যাসও তাঁর বিশেষ ছিল। এঁদের বাড়ির প্রায় প্রত্যেক ছেলেমেয়েই এইভাবে দিশি সংগীতের সঙ্গে কিছু পরিমাণে বিলেতি সংগীতের চর্চা করেছেন। জ্যোতিবাবু পিয়ানো যন্ত্রের সাহায্যে কিভাবে গুরুদেবকে সুরের ঝংকারে অনুপ্রাণিত করতেন জীবনস্মৃতি পুস্তকে তার বর্ণনা আপনারা নিশ্চয় পড়েছেন। তা ছাড়া গুরুদেব নিজেও প্রথমবা[illegible]

বিদেশে বাসের সময় কিছু বিলাতি গান কণ্ঠে আয়ত্তও করেছিলেন।

এ'দের পরিবারে বিদেশী সংগীতের অনুকরণটাই বড় হয়ে দেখা দিল না। দেশী ও বিলিতি সুরের সংমিশ্রণের ফলে নতুন জিনিস পেলাম যা বাঙলা সংগীতে সৃষ্টির পর্যায়ে পড়ে। সে পথে গুরুদেবের ক্ষমতাই বিশেষ কার্যকরী হয়েছিল। তাঁর দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন গুরুদেবের পথ প্রদর্শক।

এই রকম দিশী ও বিদেশী সংগীতের আবহাওয়ার মধ্যে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে প্রথম গীতিনাট্য পেলাম 'বাল্মীকি-প্রতিভা' এবং তার পরবৎসরে 'কালমৃগয়া', এবং আরো কয়েক বৎসর পরে 'মায়ার খেলা।'

**রবীন্দ্রনাথের প্রথম গীতনাটক**

বাল্মীকি-প্রতিভা গুরুদেবের রচিত প্রথম গীতিনাটক এবং প্রথম অভিনীতও বটে। এই নাটক রচনায় যে কী আনন্দ ও প্রেরণা ছিল, অল্প দুটি কথায় তিনি তা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন। সেই দিনটিকে স্মরণ করে বলেছেন, "বাল্মীকি-প্রতিভা ও কাল মৃগয়া যে উৎসাহে লিখিয়াছিলাম সে উৎসাহে আর কিছু রচনা করি নাই। ওই দুটি গ্রন্থে আমাদের সেই সময়কার একটা সংগীতের উত্তেজনা প্রকাশ পাইয়াছে।"

তৎকালে প্রচলিত অনুরূপ দেশী বা বিদেশী কোনো গীতিনাট্য থেকে এই 'বাল্মীকি-প্রতিভা' রচনার কল্পনা মনে এসেছিল কিনা, সে কথা নিশ্চিত করে বলার মতো কোনো তথ্য আমাদের সামনে নেই। কিন্তু আমরা জানি, ঐ নাটক রচনার পূর্বে গুরুদেবের বাড়িতে বিদ্বজ্জন সমাগম উৎসব উপলক্ষ্যে 'মানময়ী' নামে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রচিত একখানি পূর্ণাঙ্গ গীতিনাটক অভিনীত হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিজে, গুরুদেব ও পরিবারের আরো অনেকেই এই অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। অভিনয়ের সঠিক তারিখ জানা নেই, কিন্তু ছোট পুস্তিকা আকারে বইটির ছাপা তারিখ হোলো ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ। গুরুদেব বিলেত থেকে ফিরে আসার পরেই এই নাটকে অংশ গ্রহণ করেন এবং সর্বশেষ গানটি তাঁর রচনা। এই শেষ গানটি হোলো 'আয় তবে সহচরী, হাতে হাত ধরি ধরি'। স্বর্গের ইন্দ্র, উর্বশী, মদন-রতি ইত্যাদি দেবদেবীর মধ্যে প্রেমের ঘটনা নিয়ে একটি হাল্কাধরণের হাসির নাটক। এর গানও সুরে-তালে গীত হয়েছিল বলে জানা যায়।

'মানময়ী' রচনার আগে তাঁদের পরিবারে আরো একটি পূর্ণ গীতনাটকের খবর পাই। নাটকটির নাম 'বসন্ত উৎসব'। রচয়িতা গুরুদেবের দিদি স্বর্ণকুমারী দেবী। পুস্তকাকারে প্রকাশিত এই নাটকের তারিখ হল ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ, অর্থাৎ গুরুদেব যখন বিদেশে। কিন্তু ঠিক কবে কোথায় কাদের নিয়ে অভিনীত হয়েছিল বা কারা এই নাটকের পিছনে ছিলেন তার কোন খোঁজ ঐতিহাসিকরা দেননি। এই নাটকটি অবিকল 'বাল্মীকি প্রতিভা' বা 'মায়ার খেলা' জাতীয় গীতনাট্যের মত প্রত্যেক গানটি রাগরাগিনী ও তালে বাধা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে গীতনাটকের সাহায্যে অভিনয় করার চল গুরুদেবের পরিবারে বাল্মীকি প্রতিভা রচনার অনেক আগেই সুরু হয়ে গেছে। সব তথ্য না জানা থাকায়, এই নাটকটির সৃষ্টি কার উৎসাহে হয়েছিল বলা কঠিন, কিন্তু বিদ্বজ্জনসমাগমের বিষয় বলে অনুমান করি। এবং এই নাটব রচনায় জ্যোতিবাবুর হাত ছিল।

বিদ্বজ্জন সমাগমের একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন জ্যোতিবাবু এবং তাকে এই সভার অনেক কিছু করতে হত এবং ভাবতে হত। সমাগত অতিথিবৃন্দের মনোরঞ্জনের জন্য জ্যোতিবাবু অনেক কিছু পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টার আজ আমরা কোন পরিচয়ই পেতাম না যদি না গুরুদেব তাঁর সঙ্গীরূপে পাশে থাকতেন। বাল্মীকি প্রতিভা রচনা পর্যন্ত সংগীতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের মনে গান রচনার যে পথ ও আদর্শ নির্দেশ করেছিলেন পরবর্তী জীবনে তা গুরুদেবের বিশেষ কাজে লেগেছিল।

**ভারতীয় ও ইয়োরোপীয় সংগীতের পার্থক্য**

আমাদের সংগীত সাধারণত একটিমাত্র সংক্ষিপ্ত স্থায়ীভাব অবলম্বন করে আত্মপ্রকাশ করে। এ সংগীত প্রকাণ্ড নির্জন প্রকৃতির অনির্দিষ্ট অনির্বচনীয় বিষাদগম্ভীর সংগীত। বড়ো বড়ো রাগিণীর মধ্যে যে গাম্ভীর্য এবং কাতরতা আছে সে যেন কোন ব্যক্তিবিশেষের

**মায়ার খেলা গীত নাট্যের একটি দৃশ্য**

এই সময় গানে, অভিনয়ে তিনি প্রত্যেকবারেই নতুন কিছু দেখাবার জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা করতেন। এবং বাড়ির সকলকে সেই পথে চালিত করবারও তাঁর বিশেষ ক্ষমতা ছিল। বসন্ত উৎসব ও মানময়ীর মত গীতিনাটক রচনার কথা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মনে উদয় হবার কারণ এইটিই অনুমান করা যায় যে, তিনি তখনকার দিনের কোন অপেরা হয়তো দেখেছিলেন। কিম্বা ঐপ্রকার কোন গীতিনাটিকার কথা স্মরণ করে স্বর্ণকুমারী দেবীর দ্বারা 'বসন্ত উৎসব' লিখিয়েছিলেন। বাল্মীকি প্রতিভা ও কালমৃগয়া গুরুদেব জ্যোতিবাবুর উৎসাহেই রচনা করেছিলেন। এই সময় পর্যন্ত গুরুদেব তাঁরই ইচ্ছাতে চালিত হতেন। গান রচনার ক্ষেত্রে জ্যোতি[illegible]র মধ্যে উঁচুদরের শিল্প প্রতিভার পরিচয় যে কোটেনি একথা বোধহয় সকলেই স্বীকার করবেন। বাঙলা গানের ক্ষেত্রে তাঁর সেই অভাবটা গুরুদেবের মধ্যে তিনি পূরণ করেছেন। গানের ক্ষেত্রে নয় সে যেন অকূলে অসীমের প্রান্তবর্তী এই সঙ্গীহীন বিশ্বজগতের। এ সংগীত আমাদের সুখ দুঃখকে অতিক্রম করে চলে যায়। ডাক দেয় একলার দিকে। এ একের গান, একলার গমন, কিন্তু তা কোণের এক নয় তা বিশ্বব্যাপী এক। সেইজন্যেই আমাদের কালোয়াতি গানটা ঠিক যেন মানুষের গান নয়, সে যেন সমস্ত জগতের। তার বৈরাগ্য, তার শান্তি, তার গাম্ভীর্য সমস্ত সংকীর্ণ উত্তেজনাকে নষ্ট করে দেবার জন্যেই।

আর ইয়োরোপের সংগীত যেন মানুষের বাস্তব জীবনের সঙ্গে বিচিত্রভাবে জড়িত। এ সংগীত মানবজীবনের বিচিত্রতাকে গানের সুরে অনুবাদ করে প্রকাশ করছে। এ সংগীত প্রবল ও প্রকাণ্ড। সেইজন্যেই দেখি এমন বিষয় নেই যাকে নিয়ে ইয়োরোপ গান রচনা না করেছে। বিষয় বৈচিত্র্যে ইয়োরোপ অনেকখানি অগ্রসর।

আমাদের সংগীতের অভাব ছিল মানবিক বৈচিত্র্যের। ইয়োরোপীয় সভ্যতার সংস্রবে

**আমাদের** মনোজগতের পরিবর্তন হল, আমরা **একটি** মাত্র স্থায়ী ভাবের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে **চাইলাম** না। আমরা সংগীতের ভিতর দিয়ে **ব্যক্তিগত** ছোটো খাটো সুখ দুঃখ আনন্দের **বিষয়কেও** গানে ফোটাবার চেষ্টা করতে **লাগলাম**। তারই ফলস্বরূপ আরো এগিয়ে গিয়ে **আমরা** বাঙলা গানে জাতীয় সংগীত, উত্তেজক **সংগীত**, যুদ্ধ সংগীত, হাসির গান, মৃত্যুর গান, **বিয়ের** গান, অভ্যর্থনার গান, জন্মদিনের গান, **নানা** উৎসবের গান, চাষ করার গান, ধানকাটার **গান**, নলকূপের গান, চায়ের গান, চলার গান, **খেলার** গান, ইত্যাদি আরো কত কি পেলাম। **এইরূপ** বিষয় বৈচিত্র্যে গুরুদেবের গান দেশের **মধ্যে** শ্রেষ্ঠ একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। **এইটিই** তোলো ইয়োরোপের আর একটি বিশেষ **দান**।

সংগীতকে মানুষের বৈচিত্র্যময় বাইরের **জীবনের** সঙ্গে জড়িয়ে নেবার, যে মূল উপায়-গুলি ইয়োরোপের জ্ঞানীরা আবিষ্কার করে-ছিলেন; সেগুলি গুরুদেবও জেনেছিলেন।

ইয়োরোপের এই চিন্তাধারার সঙ্গে তিনি পরিচিত হন, Herbert Spencer-এর লেখা পড়ে। Spencer তখনকার দিনের শিক্ষিত **বাঙালী**দের মধ্যে ইয়োরোপের একজন উচ্চ-**শ্রেণীর** চিন্তাশীল **জ্ঞানী**রূপে পরিচিত **ছিলেন**। এ'র লেখা তখনকার চিন্তাশীল **বাঙালীমাত্রই** পড়তেন। শোনা যায়, স্বামী **বিবেকানন্দও** সন্ন্যাস জীবনের পূর্বে এ'র **লেখার** ভক্ত ছিলেন।

সংগীত বিষয়ে এ'র মতামত সেই সময়ে **গুরুদেবের** চিন্তাকে খুব নাড়া দিয়েছিল, **তা** হলো,—

Music is but an idealization of the **natural** language of emotion; and that consequently, music must be **good** or bad according as it conforms to the laws of this natural language. The various inflections of voice which accompany feeling of different **kinds** and intensities, are the germs **out** of which music is developed. It **is** demonstrable that these inflections **and** cadences are not accidental or **arbitrary**; but that they are deter-**mined** by certain general principles **of** vital actions; and their expres-**siveness** depends on this, whence it **follows** that musical phrases and **the** melodies built of them, can be **effective** only when they are in hermony with these genaral prin-ciple....the swarms of worthless ballads that infest drawingrooms, **as** compositions which science would **forbid**. The sin against science by **setting** to music ideas that are not **emotional** enough to prompt musical **expression**; and **they** also sin against **science by** setting by using musical **phrases that** have no natural relations **to** the ideas expressed: even where **these** are emotional. They are bad **because** they are untrue. And to say **they** are untrue, is to say they are **unscientific**.

এই বৈজ্ঞানিক উপায়গুলি যে কি, তারই কয়েকটি উদাহরণ Spencerএর লেখা থেকে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। তিনি লিখছেন,—

The staccato, appropriate to energetic passages to passages expressive of exhilaration, of resolution, of confidence.

Slurred intervals are **expressive** of gentler and less active feelings;.... ....The difference of effect resulting from difference of time in music is also attributable to the same law.

Move frequent changes of pitch ordinarily result from Passion, are imitated and developed in song;

The slowest movements, largo and adugio, are used where such depressing emotions as grief, or such unexciting emotions as reverence, are to be portrayed, while the move rapid movements, presto, represent successively increasing degrees of mental vivacity.

স্পেন্সারের লেখা পড়ে **ইয়োরোপীয়** সংগীতের বৈশিষ্টকে সমর্থন ক'রে গুরুদেবের কতগুলি উক্তি বাল্মীকি-প্রতিভা রচনার যুগের একটি প্রবন্ধ থেকে তুলে দিচ্ছি। তিনি লিখছেন,—

"আমরা যখন রোদন করি তখন দুইটি পাশাপাশি সুরের মধ্যে ব্যবধান অতি অল্পই থাকে, রোদনে স্বর প্রত্যেক কোমল সুরের উপর দিয়া গড়াইয়া যায়, সুর অত্যন্ত টানা হয়। আমরা যখন হাসি—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, কোমল সুর একটিও লাগে না, টানা সুর একটিও নাই, পাশাপাশি সুরের মধ্যে দূর ব্যবধান, আর তালের ঝোঁকে ঝোঁকে সুর লাগে। দুঃখের রাগিনী দুঃখের রজনীর ন্যায় অতি ধীরে ধীরে চলে, তাহাকে প্রতি কোমল সুরের উপর দিয়া যাইতে হয়। আর সুখের রাগিনী সুখের দিবসের ন্যায়, অতি দ্রুত-পদক্ষেপে চলে, দুই তিনটা করিয়া সুর ডিঙ্গাইয়া যায়। উচ্ছ্বাসময় উল্লাসের সুরই অত্যন্ত সহসা ওঠে। আমরা সহসা হাসিয়া উঠি, কোথা হইতে আরম্ভ করি কোথায় শেষ করি তাহার ঠিকানা নাই, রোদনের ন্যায় তাহা ক্রমশ মিলাইয়া আসে না।

দ্রুত তাল সুখের ভাব প্রকাশের একটা অঙ্গ বটে। ভাবের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তালও দ্রুত ও বিলম্বিত করা আবশ্যক—সর্বত্রই যে তাল সমান রাখিতেই হইবে তাহা নয়।

গীতি নাট্যে, যাহা আদ্যোপান্ত সুরে অভিনয় করিতে হয় তাহাতে স্থান বিশেষে তাল না থাকা বিশেষ আবশ্যক। নহিলে অভিনয়ের স্ফূর্তি হওয়া অসম্ভব।"

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই রকমের এক আদর্শ সামনে রেখে, বাল্মীকি-প্রতিভা রচনার যুগে,—ভারতীয় রাগরাগিণী নিয়ে নানাভাবে পরীক্ষা করতেন। পিয়ানো যন্ত্রে জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের এই পরীক্ষার বিষয়ে গুরুদেব বলেছেন, "জ্যোতিদাদা তখন প্রত্যহই প্রায় সমস্ত দিন ওস্তাদি গানগুলোকে পিয়ানো যন্ত্রের মধ্যে ফেলিয়া তাহাদিগকে **যথেচ্ছা মন্থন** করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন।—যে সকল সুর বাঁধা নিয়মের মধ্যে মন্দগতিতে দস্তুর রাখিয়া চলে তাহাদিগকে প্রথাবিরুদ্ধ বিপর্যস্তভাবে দৌড় করাইবামাত্র সেই বিপ্লবে তাহাদের প্রকৃতিতে নূতন নূতন অভাবনীয় শক্তি দেখা দিত এবং তাহাতে আমাদের চিত্তকে সর্বদা বিচলিত করিয়া তুলিত। সুরগুলো যেন নানাপ্রকার কথা কহিতেছে এইরূপ আমরা স্পষ্ট শুনিতে পাইতাম।"

### বাল্মীকি-প্রতিভা গীতনাট্যের বিশেষত্ব

বাল্মীকি-প্রতিভা রচনাকালে স্পেনসারএর যে মতবাদ কাজে লেগেছিল একথা স্বীকার করে গুরুদেব বলেছিলেন,—

"স্পেন্সরের এই কথাটি মনে লাগিয়াছিল। ভাবিয়াছিলাম এই মত অনুসারে আগাগোড়া সুর করিয়া নানা ভাবকে গানের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়া অভিনয় করিয়া গেলে চলিবে না কেন।"

কিন্তু এই নাটকের অধিকাংশ সুরই দেশী রাগ-রাগিণীর অবলম্বনে।

"কিন্তু এই গীতনাট্যে তাহাকে তাহার বৈঠকি মর্যাদা হইতে অন্যক্ষেত্রে বাহির করিয়া আনা হইয়াছে; উড়িয়া চলা যাহার ব্যবসায় তাহাকে মাটিতে দৌড় করাইবার কাজে লাগানো গিয়াছে।......সংগীতকে এইরূপ নাট্যকার্যে নিযুক্ত করাটা অসংগত বা নিষ্ফল হয় নাই। বাল্মীকি-প্রতিভা গীতনাট্যের ইহাই বিশেষত্ব। সংগীতের এইরূপ বন্ধনমোচন ও তাহাকে নিঃসঙ্কোচে সকল প্রকার ব্যবহারে লাগাইবার আনন্দ আমার মনকে বিশেষভাবে অধিকার করিয়াছিল।"

গুরুদেব বলেছেন—"এ নাটকটি অপেরা নয়—'সুরে নাটিকা', অর্থাৎ সংগীতই ইহার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে নাই, ইহার নাট্য বিষয়টাকে সুর করিয়া অভিনয় করা হয় মাত্র—স্বতন্ত্র সংগীতের মাধুর্য ইহার অতি অল্প-স্থলেই আছে।" একথাগুলি নিয়ে একটু ভাববার আছে।

ইউরোপে অপেরা ছিল সুর প্রধান নাটক; রচয়িতারা অপেরার কথা বা নাটকীয় বিষয়-বস্তুর দিকে বিশেষ নজর দিতো না। **এই** প্রথার পরিবর্তন আনেন জার্মান দেশীয় বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ কবি ওয়াগনার, **উনবিংশ** শতাব্দীর মধ্য ভাগে। গানে বা অপেরায় **সুর** যোজনা বিষয়ে তিনি কতগুলি বিশেষ **আদর্শ** মেনে চলতেন। এবং তাতে করেই **ইয়ো-রোপের** অপেরা জগতে তিনি যুগান্তর আনতে পেরেছিলেন বলে আজো তিনি সম্মানিত। **ইয়োরোপের কোন সমালোচক তাই বলছেন,—**

**"He did give the world a new and perfect form of musical drama. He broke completely with older Conceptions according to which an opera**

had been merely an opportunity for a few strong-lunged singers to show how they could juggle their high C's while paying absolutely no attention to the text."

এই জন্যেই এই বিশেষ পদ্ধতির অপেরাকে সে দেশীয় সমালোচকরা নূতন নামকরণ করে বলেছেন, "Music Drama." ওয়াগনারের Music Drama-য় সুর যোজনার মূল তত্ত্ব কটি এখানে সে দেশের সংগীত বিশেষজ্ঞদের ভাষা থেকে তুলে দিচ্ছি। এবং তাতে দেখা যাবে যে, Herbert Spencer যে মতবাদ প্রচার করেছিলেন তা ওয়াগনারের মতবাদের সঙ্গে প্রায় এক।

1. The abolition of a set form (that is ending as one began), and the use of any shape that the poem suggested.
2. Absolute unity of the entire work, no division into songs, duets, choruses, with applause between and some times even encores, Continuity from begining to end.
3. The music is always to interpret the poetry. Its entire character is to be dictated by words;...."In the wedding of the arts poetry is the man, Music the women;" "Poetry must lead, music must follow;" "Music is the handmaid of poetry;" are a few of Wagner's apothegms.
4. Abolition of mere tune and substitution of a melodic recitative, called the "melos".
5. Excellence of libretto. No book is fit to be used for the text of an opera unless it would make a successful drama by itself.
6. He apparently made music express everything of which it is capable, when united with poetical and dramatical literature.

গুরুদেব যাকে সুরে নাটক বলেছেন ওয়াগনারের "Music Drama" বলতে ঠিক তাই বোঝায়। 'কাল মৃগয়া'ও ঠিক এই পদ্ধতির রচনা। 'মায়ার খেলা'র বিষয়ে তিনি বলেছেন যে, তাতে নাট্য মুখ্য নয়, গীতই মুখ্য। মায়ার খেলা তেমনি নাট্যের সূত্রে গানের মালা। বলেছেন......"মায়ার খেলা যখন লিখিয়াছিলাম তখন গানের রসেই সমস্ত মন অভিষিক্ত হইয়া ছিল।" এই গীত-নাটিকাকে বরঞ্চ ইয়োরোপের আগের দিনের অপেরার মত বলা যেতে পারে। শুনলেই বোঝা যায়, সুরে ও কথার দিকেই দৃষ্টি ছিল বেশী। বাল্মীকি প্রতিভা ও কাল মৃগয়ার গান নানা জাতীয়, নানা ঢং-এর ও নানা রসের অন্য গানের সুর নিয়ে রচিত কিন্তু সেই রাগ-রাগিণীগুলি অভিনয়ে ছন্দে লয়ে, ভঙ্গীতে গাওয়ার দরুণ বাংলা গীত নাটকের দিক থেকে আশ্চর্য রকমের এক আদর্শ খাড়া করেছে। মায়ার খেলার গানে এতটা অভিনয়ের স্বাধীনতা ফোটে না।

## সংগীতে কথা ও সুরের সমন্বয়

উপরেই বলেছি, স্পেন্সর ও ওয়াগনারের মত হল, গান রচনায় কবিতা যা করতে বলবে সুর যেন তা মেনে চলে। গুরুদেবও এই মতের সমর্থনে প্রথম জীবনে বলেছিলেন,—"গানের কথাকেই গানের সুরের দ্বারা পরিস্ফুট করিয়া তোলা সংগীতের মুখ্য উদ্দেশ্য।"

"আমি গানের কথাগুলিকে সুরের উপর দাঁড় করাইতে চাই। আমি সুর বসাইয়া যাই কথা বাহির করিবার জন্য।"

পাশ্চাত্য সংগীত রচয়িতাদের সঙ্গে গুরুদেবের এক জায়গায় বিশেষ তফাৎ দেখি। গুরুদেব পেয়েছিলেন আমাদের দেশের নানা রাগ-রাগিণী ও তার গায়কী ঢং, এবং তাকেই গীত-নাট্যের ভাবানুযায়ী ব্যবহার করেছেন। বিলিতি সংগীতে আজকাল রাগরাগিণী জাতীয় কোন সংগীত পদ্ধতির চলন নেই। তারা কেবল স্বরগুলিকে নানারূপে ও নানা ছন্দে সাজিয়ে তার থেকে বিভিন্ন ভাব প্রকাশের চেষ্টা করে।

ভারতীয় সংগীতের রাগরাগিণীর জগৎ ও তার নানা প্রকার গীত প্রকরণ, নানা রস প্রকাশের দিক থেকে বিশেষ মূল্যবান সম্পদ। নানা রাগিণী নানা ঢং-এ গাইবার সময় যে বিচিত্র রসের সৃষ্টি করে, সেটি গান রচনার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। আমাদের রাগ-রাগিণী সংগীত মনের এমন এক স্তরের প্রকাশ যে তাকে বাহ্যিক জগতের কাজে লাগানো সম্ভব নয় বলেই মনে হোতো। এ সংগীত যে শান্ত রসের সাধনা করে তা বড় গভীর অনুভূতি সাপেক্ষ রসের সাধনা। ইয়োরোপ এ ধরণের সাধনার পক্ষপাতী কিনা তা আমার জানা নেই, তবে এটুকু জানি যে, তারা তাদের দৈনন্দিন জীবনের সুখ দুঃখ রাগ দ্বেষ পূর্ণ ক্ষণিক রসের মধ্যেই আনন্দ দেয়। অন্তত মনে হয় এইটিই হোলো সে দেশের সংগীতের মূল বক্তব্য। গুরুদেব আমাদের সংগীতকে এই পথেই আনতে চেয়েছিলেন বলেই স্পেন্সরের মতকেই গ্রহণীয় মনে করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর ঐ ভুল ভাঙে। ভারতীয় সংগীতকে পাশ্চাত্য আদর্শে চালনা করা যে ঠিক নয় তা বুঝতে পারেন, মধ্য জীবনে যখন ভারতীয় সংগীতের ভিতরকার রসের সন্ধান পেতে লাগলেন। সেদিক থেকে আমি বলব বাল্মীকি প্রতিভার যুগ তার শিক্ষানবিশীর যুগ, রসানুভূতির যুগে তিনি তখনো পৌঁছুতে পারেন নি। তাই ১৯।২০ বৎসর বয়স পর্যন্ত কাজে, লেখায়, যে মতবাদকে সমর্থন করেছিলেন, ৫০ বৎসরের কাছাকাছি সময়ে রসানুভূতির জগতে এসে বললেন,—"যে মতটিকে তখন এত স্পর্ধার সঙ্গে ব্যক্ত করিয়া ছিলাম সে মতটি যে সত্য নয় সে কথা আজ স্বীকার করিব।"

চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্যের একটি দৃশ্যে মা ও মেয়ে

কিন্তু সুর যোজনার এই বিলিতি আদর্শ তাঁর লিরিক ধর্মী কবিতায় তিনি আর একভাবে গ্রহণ করেছিলেন বলেই সুর ও কথায় মিলনের মাধুর্য আমরা এক বাক্যে স্বীকার করি। ভারতীয় রাগরাগিণী সংগীতকে লিরিক ধর্মী হৃদয়াবেগের বাহন হিসেবেই আমরা দেখি। গুরুদেব বলেন, কবিতা যেমন ভাবের ভাষা সংগীতও তেমনি ভাবের ভাষা। সুতরাং লিরিক ধর্মী ভাব প্রকাশের এই দুইটি ভাবকে যদি এক সঙ্গে মেলাতে পারি তাহলে গানের মাধুর্য

অনেক বাড়ে। কেবল পাঠ করে মনে যে আনন্দ পাই সুরে মিলে সে আনন্দ আরো গভীরভাবে মন আকর্ষণ করে। কারণ সুরের আবেদন কথা ও ছন্দের আবেদনের চেয়ে জোরালো। এই পথে গানকে চালনা করার দরুণ কথা সুরের উপর রাজত্ব করবে ও সুর থাকবে অনুচরের মত; এ ধরণের কোন প্রশ্নই ওঠে না, বরং দুটিতে এক হয়ে গিয়ে সমগ্রভাবে যে রসের সন্ধান দেয় তার তুলনা নেই।

### নৃত্যনাট্যের বৈশিষ্ট্য

আরম্ভে গুরুদেবের আরো অন্য রকমের গীতিনাট্যের নাম উল্লেখ করেছিলাম। কিন্তু সে নাটকের গানগুলি নিয়ে বাল্মীকি প্রতিভার গানের মত আলোচনা করবার কিছুই নেই। সেখানে গানগুলিকে অনায়াসে নাটক থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েও তার রস উপভোগ করা যায়। এই সব গানের সুর নিয়ে আলোচনা অন্যান্য গানের মতই হওয়া উচিত। তাতেই তার প্রকৃত রূপ প্রকাশ পাবে।

কিন্তু শেষ জীবনের চিত্রাঙ্গদা, শ্যামা, চণ্ডালিকা, গীতিনাট্য কটি এই দলে পড়বে না। এগুলি বাল্মীকি প্রতিভার মত পূর্ণাঙ্গ গীতিনাট্য বটে, কিন্তু এর রচনা পদ্ধতিতে যে পার্থক্য ঘটেছে সেটি আলোচনার যোগ্য। বাল্মীকি প্রতিভার মত সুরে নাটিকা বা মায়ার খেলার মত কেবল গীতিমুখ্য নাটিকাও নয়। এগুলো হলো নৃত্যনাট্য। নাচের কথা চিন্তা করে লেখা। নাচের দরুণ এই নাটকের গানে বাঁধা ছন্দের দোলার দিকে নজর রাখতে হয়েছে। অর্থাৎ বেশীর ভাগ অংশেই বাঁধা ছন্দে গানগুলিকে গাইতে হয়। সাধারণ কথাবার্তার অংশগুলিও এই বাঁধা ছন্দের বাঁধনে পড়ে গেছে। এর মধ্যেও তিনি যে বৈচিত্র এনেছেন তা হলো এই যে, নাটকের পাত্রপাত্রীর সম্পূর্ণ এক একটি বক্তব্যের ভিতর দিয়ে যে ভাব প্রকাশ পাচ্ছে, একটি রাগিণী ও একটি তালের গতি তাকেই লক্ষ্য করে চলেছে। বাঁধা ছন্দ হলেও ছন্দের গতি কথার অনুকূল করার চেষ্টা করেছেন। চণ্ডালিকা গীতিনাট্যে মা ও মেয়ে যেখানে কথা কইছে, সেই অংশগুলি গানের সুরে একবার শুনলে আমার বক্তব্য অনেকটা স্পষ্ট হবে।

এই কটি গীতিনাট্যের মধ্যে চিত্রাঙ্গদার যে অংশগুলি গানের সুরহীন আবৃত্তির সঙ্গে নৃত্যভঙ্গিতে অভিনয় করতে হয় সে অংশগুলিও উল্লেখযোগ্য। আবৃত্তির ছন্দ আর গানের ছন্দ যে এক নিয়মে চলে না তা সকলেই জানেন, কিন্তু আবৃত্তির ছন্দে অভিনয় করা যে ভালো নাচিয়েদের পক্ষে সম্ভব এ আমরা নিশ্চয়ই করে বলতে পারি। ইয়োরোপে এ চেষ্টা নাচিয়েরা করেছেন। গুরুদেবের "ঝুলন" কবিতার আবৃত্তির সঙ্গে নৃত্যাভিনয় ভারতীয় নৃত্যে জগতের একটি উল্লেখযোগ্য নূতন পরীক্ষা। আবৃত্তি পদ্ধতি বা বাল্মীকি প্রতিভার গায়কী পদ্ধতি মূলত এক। কিন্তু চিত্রাঙ্গদার আবৃত্তি অংশে সুর রইল না নাচ হোলো, বাল্মীকি প্রতিভায় সুরে আবৃত্তি হোলো নাচ ছিল না। কিন্তু আবৃত্তির ছন্দে-নাচে অভিনয় করা সম্ভব দেখে কয়েক বৎসর পূর্বে আমরা বাল্মীকি প্রতিভাকে নৃত্যাভিনয়ে রূপ দিতে চেষ্টা করেছিলাম এবং এই নাটিকার গায়কী না বদলেও যে তার সঙ্গে নাচে অভিনয় করা যায় সে পরীক্ষাতে আমরা কৃতকার্য যে হয়েছি একথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি।

আমার বিশ্বাস, বাল্মীকি প্রতিভা, কাল-মৃগয়া গীতিনাট্যকে যদি নাচের সাহায্যে সম্পূর্ণ অভিনয়যোগ্য করে তোলা যায়, তবে ভারতীয় নৃত্য জগতের একটি নূতন দিক খুলে যাবে। এর ভিতর দিয়ে নৃত্যনাট্য বা গীতিনাট্যের যে রূপ প্রকাশ পাবে সেইটাই হবে পূর্ব ও পশ্চিমের প্রকৃত মিলনের রূপ, প্রকৃত নূতন সৃষ্টি। এর প্রারম্ভিক কাজ গুরুদেব শুরু করেছিলেন, তিনি আমাদের মধ্যে কাজের ধারা ধরিয়ে দিয়ে গেছেন। ভারতীয় গীতিনাট্য বা নৃত্যনাট্যের জগতে যুগোপযোগী সৃষ্টি করতে হলে গুরুদেবের নির্দেশিত পন্থা অবলম্বন করেই আমাদের অগ্রসর হতে হবে—এই পথেই ভারতীয় নৃত্যের নব নব বিকাশের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে।

নটীর পূজা — শিল্পীঃ শ্রীনন্দলাল বসু

# রবীন্দ্রনাথের আর্ট কি

**শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়**

রবীন্দ্রনাথ কবি ও শিল্পী, ভাবুক ও কর্মী; তাই প্রথমেই তিনি মানুষের ব্যক্তি-স্বরূপের আদিমতম প্রকাশ-মাধ্যম 'আর্ট' সম্বন্ধে আলোচনা উত্থাপন করিয়াছেন। কারণ 'আর্ট' হইতেছে ভাবের রূপমূর্তি; ভাবনার এক রূপ হইতেছে সাহিত্য ও কলা—তাহার অন্য রূপ হইতেছে বস্তুসৃষ্টি, কবির ভাষায় বলি—

> মানুষের লক্ষ লক্ষ অলক্ষ্য ভাবনা
> অসংখ্য কামনা,
> রূপে মত্ত বস্তুর আহ্বানে উঠে মাতি
> তাদের খেলায় হতে সাথী।
> স্বপ্ন যত অব্যক্ত আকুল
> খুঁজে মরে কূল.........
> চিত্তের কঠিন চেষ্টা বস্তুরূপে
> স্তূপে স্তূপে
> উঠিতেছে ভরি,
> সেই তো নগরী। (রূপ-বলাকা)

সমস্ত জগৎ ছিল জনবিরল মরুসদৃশ,—মানুষের অদৃশ্য ভাবনা, অশেষ কামনারাজি গণনাতীত বৈচিত্র্যের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়া চলিয়াছে—'অস্ফুট ভাবনা যত......দেয় পাড়ি ব্যগ্র ঊর্ধ্বশ্বাসে আকারের অসহ্য পিয়াসে'। এই দৃশ্য ও অদৃশ্য জগৎ বা রূপ ও অরূপ বিশ্বের সেতু হইতেছে আমার অহংবোধ,

রবীন্দ্রনাথের 'ন্যাশনালিজম্' ও "পার্সোন্যালিটি" দুইটি গ্রন্থের প্রবন্ধাবলী প্রায় একই পর্বে রচিত এবং জাপান ও আমেরিকার বক্তৃতায় ব্যবহৃত হয়। পার্সোন্যালিটি ও ন্যাশনালিজম্ পরস্পরের পরিপূরক গ্রন্থ।

১৯১২-১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ আমেরিকায় ও ইংলণ্ডে যে বক্তৃতা দেন, Sadhana নামে তাহা প্রকাশিত হয় ১৯১৪ সালের গোড়ার দিকে। সেই প্রবন্ধগুলিতে কবি তাঁহার 'শান্তিনিকেতনে'র উপদেশমালার মূল কথাগুলি তথা ভারতীয় হিন্দু সাধনার কথা বা আরও স্পষ্ট করিয়া বলিলে—ব্রাহ্মধর্মের আদর্শের কথাই বলিয়াছিলেন।

কিন্তু তাঁহার Personalityর বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথের নিজ ধর্মবোধের কথা—অর্থাৎ তাঁহার ব্যক্তিস্বরূপ প্রকাশ পাইয়াছে। মানুষ তাহার অখণ্ড ব্যক্তিত্ববোধের মধ্যে যখন সংশ্লিষ্ট সত্যের সন্ধান পায়, তখন সে বস্তু ও অবস্তু, বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে যথাযথ সম্বন্ধ আবিষ্কার করিতে সক্ষম হয়। আদর্শতা ও ব্যবহারিকতার মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য ভেদের মধ্যে সেতু রচনা করিয়া, সে তাহার খণ্ডিত দ্বৈত জীবনকে অদ্বৈতরূপে দেখে। 'পার্সোন্যালিটি'র প্রবন্ধগুলি সেই ভাবরাজি ব্যাখ্যা করিয়াছে। অনেকের মতে রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি গদ্য প্রবন্ধসংগ্রহের মধ্যে এইখানিই হইতেছে শ্রেষ্ঠ। প্রবন্ধগুলির নাম দেখিয়া হঠাৎ তাহাদের মধ্যে অখণ্ড যোগসূত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, কিন্তু গভীরভাবে অধ্যয়ন ও প্রণিধান করিলে তাহাদের মধ্যে একটি সমন্বিত দার্শনিকতার সন্ধান পাওয়া যায়।

পার্সোন্যালিটি গ্রন্থের আলোচিত প্রবন্ধের নাম—

1. What is Art. 2. The world of Personality. 3. The Second Birth. 4. My School. 5. Meditation. 6. Woman.

আমার ব্যক্তিস্বরূপ বা পার্সোন্যালিটি। এই ব্যক্তিস্বরূপের প্রধানতম ক্ষেত্র হইতেছে 'আর্ট'। অহংবোধের যে স্বরূপটি আর্টের মধ্যে মুক্তিলাভ করিয়াছে, তাহার দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা হইয়াছে "পার্সোন্যালিটি" গ্রন্থের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পঞ্চম প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধগুলির মূল "শান্তিনিকেতন" ও বিশেষভাবে 'সঞ্চয়' ও 'পরিচয়' গ্রন্থের মধ্যেই পাওয়া যায়। এই অহংবোধের উদ্বোধনের ক্ষেত্র শিক্ষা ও বিকাশের ক্ষেত্র সমাজ—তাই কবি আলোচনা করিয়াছেন, My school * ও Woman প্রবন্ধদ্বয়ে। ব্রহ্মচর্যে যাহার সূত্রপাত, সংসারধর্মে তাহার পরিণতি, তাই 'নারী' সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে সর্বশেষে—মানুষ সামাজিক জীব এবং সেই সমাজ-জীবনের কেন্দ্রে আছে নারী বিচিত্ররূপিণী।

"পার্সোন্যালিটি" গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ What is Art নানাদিক হইতে বিশেষভাবে বিচারণীয়। রবীন্দ্রনাথ "আর্ট" সম্বন্ধে টুকরা টুকরা আলোচনা নানা স্থানে করিয়াছেন। কিন্তু এ পর্যন্ত ঐ বিষয়ে কোনো বিশেষ প্রবন্ধ লিখিয়া তাহা ব্যক্ত করেন নাই। তবে জাপান যাত্রার পূর্বে 'ছবির অংগ' (সবুজ পত্র ১৩২২ বৈশাখ) শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখেন। তাহাকে ঠিক আর্টের আলোচনা বলা যায় না, কারণ চিত্রবিদ্যা হইতে আর্ট বা কলা বিস্তৃততর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য—ইংরেজিতে আর্টের অর্থও বহু ব্যাপক। জাপান যাইবার পূর্বে কলিকাতার জোড়াসাঁকো বাড়িতে 'বিচিত্রা' বিদ্যালয়ে যেসব বিদ্যাদানের ব্যবস্থা হয়, তাহার মধ্যে চিত্রবিদ্যার স্থান ছিল খুব বড়। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যিক হইলেও শিল্পকলার একজন বড় রকম সমঝদার ছিলেন ও শেষ জীবনে চিত্রকলায় যে কী আনন্দ পাইতেন, তাহার কথা রবীন্দ্রজীবনীর সাধারণ পাঠকগণের নিকটও সুবিদিত। সুর সৃষ্টিতে তাঁহার যেমন আনন্দ, রূপ-সৃষ্টিতে তাঁহার আনন্দ উহা হইতে কিছুমাত্র কম ছিল না। জার্মান সাহিত্যিক লেসিং (Lessing) তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ Laocoon-এর আরম্ভে অপ্রমাণ ও প্রতিবাদ করিবার জন্য যে মত দিয়াছিলেন, তাহা আর কাহারও সম্বন্ধে প্রযোজ্য কি না জানি না, তবে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে নিঃসংকোচেই বলা যাইতে পারে যে, তিনি লেসিং-এর বিশ্লেষণকে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিলেন। লেসিং বলিয়াছিলেন,—

"The first person who compared painting and poetry with each other was a man of fine feeling, who perceived that both these arts produced upon him a similar effect."

রবীন্দ্রনাথের বিরাট গদ্যসাহিত্য ও পত্রধারা হইতে কলা ও সৌন্দর্যতত্ত্ব সম্বন্ধে বহু উৎকৃষ্ট বাণী উদ্ধৃত করিবার একখানি সুখপাঠ্য নিবন্ধ প্রণয়ন করা যাইতে পারে। কিন্তু সুসংগতভাবে আলোচিত আর্টের কথা কোনো একটি প্রবন্ধে বা গ্রন্থে পাওয়া যায় না। বহু বৎসর পূর্বে জাতীয় শিক্ষা পরিষদে কবি যে কয়টি বক্তৃতা করেন, তাহাতে সৌন্দর্যতত্ত্ব (aesthetics) সম্বন্ধে আলোচনা পাই। কিন্তু এস্‌থেটিক্‌স ত' আর্টের অংশমাত্র।

সৌন্দর্য চিরদিনই সাহিত্যিক-কবিদের বোধের ও সৌন্দর্যতত্ত্ব চিরকালই দার্শনিকদের বুদ্ধি-বিচারের বিষয় হইয়া আসিয়াছে। পাশ্চাত্য দেশে কবিদের মধ্যে শেলি, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, গেটে, শিলার, লেসিং প্রভৃতি অনেকেই এবং দার্শনিকদের মধ্যে প্লাতোন (Plato) প্রমুখ প্রায় সকলেই ইহার আলোচনায় যোগদান করিয়াছেন; তবে দার্শনিক কান্ট যথার্থ ভাবে সৌন্দর্যতত্ত্বকে দর্শনশাস্ত্রোপযোগী করিয়া বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করিলেন। রবীন্দ্রনাথও তাঁহার What is Art প্রবন্ধে এই তত্ত্বেরই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কবির 'জগতে'র সর্বাপেক্ষা বড়ো কথা হইতেছে যে, জীবন আর্ট ও আর্টই জীবন (life is art, and art life)—রবীন্দ্রনাথ জীবন-শিল্পী।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি, 'বিচিত্রা' ভবন স্থাপনের পর্ব হইতে আর্ট সম্বন্ধে বিচিত্র ভাবনা রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের মনের মধ্যে আন্দোলিত হইতেছিল। তা ছাড়া, এই সময়ে বাঙলা দেশের সাময়িক পত্রিকায় আর্ট আদর্শপন্থী হইবে না বাস্তবপন্থী হইবে তাহার জোর আলোচনা চলিতেছিল। আর্টের প্রয়োজন কি, আর্ট সর্বভৌমিক (Universal) না জাতীয় (National), লোকশিক্ষায় আর্টের স্থান কি ইত্যাদি নানা প্রশ্ন তুলিয়া একদল লেখক সাময়িক পত্রে পত্রে তুফান তুলিয়াছিলেন; লেখকদের মধ্যে শিল্পী, শিল্পশাস্ত্রী বা দার্শনিক বড় কেহ ছিলেন না অধিকাংশই ছিলেন সাংবাদিক, সমাজতত্ত্ববিদ, ঐতিহাসিক অথবা রাজনীতিক; ফলে আলোচনা জমিয়াছিল বেশ গরম আবহাওয়ার মধ্যে। এইসব রচনার লক্ষ্যস্থল ছিল রবীন্দ্রনাথের কাব্যদৃষ্টি, ও অবনীন্দ্রনাথ প্রমুখ শিল্পীদের চিত্রসৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথ এইসব আলোচনা ও আক্রমণের উত্তর দেন 'বাস্তব' প্রবন্ধে (সবুজপত্র, ১৩২১, শ্রাবণ), আর 'ফাল্গুনী' প্রকাশের পর লেখেন 'কবির কৈফিয়ৎ' (স-প, ১৩২২, জ্যৈষ্ঠ)।

রবীন্দ্রনাথের শিল্প চেতনা বিশেষভাবে পুষ্টিলাভ করিল আমেরিকার পথে জাপান বাসকালে; সেখানে কবি প্রায় চারিমাস কাল বাস করেন। জাপানে আর্ট দেখিবার সুযোগ ও বুঝিবার অবকাশ পান প্রচুর। কিন্তু পত্রধারা ছাড়া আর কোথায়ও সে সম্বন্ধে তাঁহার মতামত প্রকাশ করিতে দেখি না। আমেরিকার জন্য বক্তৃতা লিখিতে গিয়া আর্ট সম্বন্ধে তাঁহার ভাবনারাজি নির্গলিতভাবে রূপ লইল What is Art-এ।

রবীন্দ্রনাথের প্রশ্ন আর্ট কি। এই প্রশ্ন বহু পুরাতন। টলস্টয় এই প্রশ্নই করিয়াছিলেন; ক্রোচে এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া বক্তৃতা করেন।*

আর্টের সংজ্ঞাদান চেষ্টা কেহ করে নাই; কারণ life is art and art life, জীবনের সংজ্ঞা দান করা যেমন অসাধ্য, আর্টের সংজ্ঞা দেওয়া তেমনি কঠিন। তাই ক্রোচে বলিলেন—"the question as to what is art,—I will say at once, in the simplest manner, that art is vision or intuition."

বলা বাহুল্য ইহা definition নহে। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন আর্ট জীবনের ন্যায় আপনার বেগে গড়িয়া উঠিয়াছে, মানুষ আর্টে আনন্দ পাইয়াছে, অথচ সে জানে না উহা কি।

Art, like life itself, has grown by its own impulse, and man has taken his pleasure in it without definitely knowing of it" ..... "I shall not define Art." (Personality p. 5, 7)

কবি আর্টের সংজ্ঞা দান করিবেন না; কারণ যে মুহূর্তে তাহাকে ভাষার সূত্রের মধ্যে গাঁথিবার চেষ্টা হইবে—তখনই আসিয়া পড়িবে conscious purpose, তখন উহা আর vision বা intuition থাকিবে না। conscious purpose হইলেই রচনা উদ্দেশ্যমূলক হইবে, এবং যে-মুহূর্তে রচনার মধ্যে উদ্দেশ্য প্রবেশ করিবে—তখনই উহাকে স্পষ্ট, বাস্তব করিবার দিকে লেখকের বা শিল্পীর মন উগ্র হইয়া উঠিবে—নদী চলে আপন প্রেরণায়, আপন বেগে—খাল কাটা হয় মানুষের প্রয়োজনের তাগিদে।

স্পষ্ট করিয়া সংজ্ঞাদান করাই সত্য প্রকাশের একমাত্র ভঙ্গী নহে

Clearness is not necessarily the only or the most important aspect of a truth. (Personality p. 6).

কবির এই উক্তি বহু ভাবুকের দ্বারা স্বীকৃত; এডমন্ড বার্ক বলিয়াছেন,

a clear idea is therefore another name for a little idea' (quoted from Carritt, Philosophy of Beauty p. 90).

বিখ্যাত বৃটিশ শিল্পী ও ভাবুক রেনলডস বলেন,

---

* বাহিরের জন্য রবীন্দ্রনাথ বোধহয় এই সবপ্রথম যখন তাঁহার বিদ্যালয় সম্বন্ধে কিছু বলেন; তবে এই প্রবন্ধকে বিদ্যালয়ের আলোচনামাত্র না বলিয়া শিক্ষাতত্ত্বের সমালোচনা বলিলে ভাল হয়। অজিতকুমার চক্রবর্তী 'ব্রহ্ম বিদ্যালয়' লেখেন ১৯১১ ...; ১৯১৪ আগস্টের মডার্ন রিভিউ-এ তিনি 'Santiniketan, Bolpur' শীর্ষক এক প্রবন্ধ লেখেন। ইংরেজিতে উহাই বোধহয় সবপ্রথম আলোচনা।

* ১৯১২ সালে আমেরিকার Rice Institute-এ তিনি যে বক্তৃতাগুলি দেন তাহার নাম The Essence of Aesthetics; ইহার প্রথম বক্তৃতা What is Art।

bscurity—is one sort of the sublime' 'arritt p. 97).
তরাং আর্ট রাহস্যিক হইবেই যেমন জীবন স্যময়। এই obscurityই ক্রমে mysticm ও symbolism-এর মধ্যে শিল্প ও হিত্যকে লইয়া যায়। রূপ রূপকে পরিণত লেই প্রকাশের চরমতা—এ মত নূতনও যেমন রাতনও তেমনি।

আর্টের সংজ্ঞা যেমন নিরূপণ করা গেল না, র্টের স্রষ্টা মানুষের সংজ্ঞা দান করাও তেমনি ঠিন; Humanity, Personality শব্দেরও নো সুসংগত সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। নুষকে জানা যায় তাহার বিচিত্র ভাবনা কর্মের মধ্য দিয়া; এই সৃষ্টিকার্য নানাবে রূপায়িত হইয়াছে,—ভাষা, সাহিত্য, শল্প, ইতিহাস, বিজ্ঞানের মধ্য দিয়া ার্সোন্যালিটি বা ব্যক্তিস্বরূপের প্রকাশ লিতেছে।

"Language, art, myth, religion are o isolated, random creations. They are eld together by a common bond." Cassirer, An Essay on Man. P. 68). ই মিলন সত্তাকে কবি পার্সোন্যালিটি আখ্যা ান করিয়াছেন।

আর্টের সংজ্ঞা নিরূপণ করা গেল না, যাক্তিস্বরও অভিধা স্পষ্ট হইল না। কিন্তু আর্টের উদ্দেশ্য কি সে-সম্বন্ধে প্রশ্ন করা াইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন 'expression of personality' (p. 19), অর্থাৎ বাক্তিস্বরূপের আত্মপ্রকাশ—সমগ্র সত্তার প্রকাশ। এই সমগ্র সত্তাবোধ কি তাহা রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বহুভাষণে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। জগতকে অবচ্ছিন্নভাবে (abstraction) দেখাও যেমন ব্যর্থ, জগতকে বিশ্লিষ্টভাবে দেখার চেষ্টাও তেমনি নিষ্ফল। একদল দার্শনিকের অবচ্ছিন্ন দৃষ্টি যেমন মানুষকে শূন্যতার মরুভূমিতে লইয়া গিয়া দিশাহারা করিয়া দেয়, তেমনই বিজ্ঞানীরও বস্তুবিশ্লেষণের শেষ কোথায়ও হয় না; পূর্ণতার দৃষ্টি কেহই মানুষের চোখে দিতে পারে না; সে পারে আর্ট। দর্শন ও বিজ্ঞানের সেতু হইতেছে আর্ট; ছন্দে সুরে রূপে,—ব্যক্ত ও অব্যক্তে মিশিয়া ও মিশাইয়া আপনাকে প্রকাশ করার অর্থ হইতেছে আর্ট—expression of personality।

প্রাচীন কাল হইতে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত য়ুরোপে আর্টের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সৌন্দর্যসৃষ্টি। আমাদের দেশেও চিত্র স্থপতি এমন কি সাহিত্যের নায়ক-নায়িকারা পর্যন্ত বিশেষ বিশেষ ছাঁচে ঢালিয়া রচিত হইত। য়ুরোপে রুশো আর্টের সনাতন রীতির বিরুদ্ধে প্রথম যুদ্ধ ঘোষণা করেন—classical artএর স্থানে characteristic art আসিল। তখন হইতে সৌন্দর্য-প্রকাশই যে আর্টের উদ্দেশ্য এই ধারণা দূর হইয়া আর্টের নবজন্ম হইল। রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন,

This has led to a confusion in our thought that the object of art is the production of beauty: whereas beauty in art has been the main instrument and ultimate significance. (Personality p. 19).

গ্যেটে বলিয়াছিলেন এই কথাই অন্য ভাষায়—
They try to make you believe that the fine arts arose from our supposed inclination to beautify the world around us. That is not true."

দার্শনিক Cassirer বলিতেছেন,
"the whole theory of beauty had to assume a new shape. Beauty in the traditional sense of the term is by no means the only aim of art, it is in fact but a secondary and derivative feature." (Ernst Cassirer, An Essay on Man p. 140).

সুতরাং সৌন্দর্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা জগতের অনেক মনীষীর চিন্তা-পদ্ধতির সহিত এক পথাশ্রয়ী।*

আর্টের উদ্দেশ্য সৌন্দর্য সৃষ্টি না হইতে পারে, কিন্তু আর্টের উদ্ভব আদৌ কেন হইল, সে প্রশ্নের উত্তর তো চাই। রবীন্দ্রনাথের মতে মানুষের তহবিলে আছে a fund of emotional energy এই অতিরিক্ত (surplus) seeks its outlet in the creation of Art. for man's civilization is built upon his surplus. (p. 11)
মানুষের এই ভাববন্যা আত্মপ্রকাশের জন্য ব্যথিত। এই বেদনা অহেতুকী—ইহাকে বলিতে পারা যায় আধ্যাত্মিক। নানা অভিঘাতসঞ্জাত এই বেদনা আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্য আকুলিত। সৃষ্টির মধ্যে আপনার মুক্তি হইবামাত্র প্রয়োজনের তাগিদের কথা আর আমাদের মনে থাকে না; ব্যবহারিকতার মিতাচার আমরা বিস্মৃত হই; তখন আমাদের সমস্ত সত্তা সুরে ধ্বনিয়া উঠে, মন্দিরের চূড়া আকাশকে স্পর্শ করিবার জন্য ঊর্ধ্বগামী হয় (Personality p 17)। এই কথা কবি অন্যত্র বলিয়াছেন,—
Life is perpetually creative because it contains in itself that surplus which overflows the boundaries of immediate time and space, restlessly pursuing its adventures of expression in the varied forms of self-realisation." (The Meaning of Art—Dacca University Lecture 1926).

প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রাচুর্যেই আর্টের জন্ম—এই তত্ত্ব সর্বদেশের কলাশাস্ত্রী ও দার্শনিকের দ্বারা স্বীকৃত হইলেও ইহার বিরোধী দলে বড় বড় দার্শনিক আছেন। তাঁহারা বলেন, প্রয়োজনের চাহিদা পূরণ করিতে না পারিলে আর্ট নিরর্থক—উহা বিলাস-বাসনের বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। দার্শনিক প্লাতোন ত' বহু শতাব্দী পূর্বে বলিয়াছিলেন, the useful is the art, যা কাজের তাই আর্ট। ঠিক উল্টা কথা বলিলেন, আধুনিক যুগের আর্ট-সর্বস্ববাদী অসকার ওয়াইল্ডে—all art is useless। বিপরীতবাদীরা বলেন, মরুভূমি ত' নিরর্থক; কিন্তু যে মুহূর্তে সেখানে গাছপালা জন্মিয়া ফলের বাগান হইল—তখন সে জায়গাটিতে কেবল প্রয়োজন সিদ্ধ হইল না, সবুজে শ্যামলের যোগে সমস্তটি সুন্দর হইয়া উঠিল। সুতরাং সৌন্দর্যের সহিত প্রয়োজনের যোগ আছে। আবার আর একজন, বার্ক, বলেন, অনেক জিনিস খুবই সুন্দর—কিন্তু তাহার প্রয়োজনীয়তার অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; ফুল ফুটিলে আমাদের কি প্রয়োজন সিদ্ধ হয়? কিন্তু ইহার জবাব আছে—কেবল ব্যবহারিকতার প্রয়োজনসিদ্ধি মানুষের একমাত্র কাম্য হয় নাই; সে আনন্দ চায়, তাহার ইন্দ্রিয়-মন তৃপ্তি চায়। তথাকথিত অপ্রয়োজনীয় পুষ্পরাশি তাহার মনে যে অনির্বচনীয় রস সৃষ্টি করে, তাহার মূল্য কি কম? রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এই বর্গান্তর্গত। সেই জন্য তিনি বলিলেন, মানুষের এমন একটি emotional energy আছে, যাহা কেবলমাত্র আত্মরক্ষা ও আত্মপোষণেই নিঃশেষিত হয় না। এই উদ্বৃত্ত আবেগ হইতে আর্টের জন্ম। ওয়ার্ডসওয়ার্থ ইহাকে বলিয়াছেন,—the spontaneous overflow of powerful feelings—রবীন্দ্রনাথের ভাষায় emotional forces (p 13)।

অহেতুকী, প্রয়োজনাতিরিক্ত সৃষ্টিকে art for art's sake বলা যাইতে পারে। এ সম্বন্ধে একটু পরেই আমরা আলোচনা করিব। রবীন্দ্রনাথের মতে আর্টের উদ্ভবক্ষেত্র হইতেছে
The region where both our faculties of creation and enjoyment have been spontaneous and half-conscious". (Personality p. 5).
Croce-র মতে ইহাই intuition.

ক্রোচে ত' স্পষ্টই বলেন, আর্ট যেমন physical act হইতে পারে না, তেমনি উহা utilitarian actও হইতে পারে না; কারণ, প্রয়োজনমুখী শিল্পকলা স্রষ্টার সুখ-দুঃখের সহিত জড়িত, তাহা কখনও বিশুদ্ধ আর্ট হইতে পারে না। এই জন্যই আর্ট কখনো moral act হইতে পারে না; কারণ আর্ট কখনো ইচ্ছার দ্বারা সৃষ্ট হয় না। ক্রোচে বলেন, art does not arise as an act of the will; goodwill, which constitutes the honest man, does not constitute the artist." (Essence of Aesthetics p. 14).
সুতরাং যথার্থ শিল্পীর সৃষ্টি ক্রোচের মতে

---

* ভারতবর্ষে ভাস্কর্য শিল্পে যে সব অদ্ভুত, কিম্ভূত, বীভৎস মূর্তি খোদাই দেখা যায়, তাহা শিল্পশাস্ত্রের অতিনিয়মিতার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া কিনা—তাহা বিচার্য। জগতের সর্বত্রই অতি-পেলব শিল্পের বিরুদ্ধে বস্তুতান্ত্রিক শিল্প সৃষ্টির যে আবেগ দৃষ্ট হয়, ভারতের শিল্প ইতিহাসে তাহার সন্ধান নিরর্থক হইবে না। মানবের শিল্পমানস ছককাটা ঐতিহ্য রীতিনীতিকে অতিক্রম করিয়া অসুন্দরকেও আর্টের আঙ্গিক করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের চিত্রকে এই দৃষ্টিভঙ্গীতেও দেখা যায়।

is neither morally praiseworthy, nor blameworthy'

যেসব সমালোচক মনে করেন যে, শিল্পীর কর্তব্য হইতেছে মানবের উপকার করা, তাহাদের মতকে রবীন্দ্রনাথ 'বাস্তব' প্রবন্ধে ও অন্যান্য রচনার মধ্যে সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "লোক-শিক্ষার কী হবে? সে কথার জবাবদিহি সাহিত্যের নয়। সাহিত্য লোককে শিক্ষা দেবার জন্য কোনো চিন্তাই করে না। কোনো দেশেই সাহিত্য স্কুল মাস্টারির ভার নেয়নি।" (সাহিত্যের পথে পৃঃ ১১৮)। ইহার সঙ্গে ক্রোচের মত তুলনীয়। দার্শনিক শিল্পশাস্ত্রী বলিতেছেন,—

The end attributed to art, of directing the good and inspiring horror of evil, of correcting and ameliorating customs, is a derivation of the moralistic doctrine, and so in the demand addressed to artists to collaborate in the education of the lower classes, in the strengthening of the national or bellicose spirit of a people, in the diffusion of the ideals of a modest and laborious life; and so on. These are all things that art cannot do ...... and one does not see why art should do either. (p. 14—15).

কারণ যে শিল্পী বা স্রষ্টা তাহার আনন্দ সৃষ্টিতে, আত্মপ্রকাশে—সে neither believes nor disbelieves in his image; he produces it (p. 18).

ইহাই হইতেছে সৃষ্টির মূলের কথা—আনন্দে যাহার উদ্ভব—উদ্দেশ্যহীন সৃষ্টি লীলা মাত্র।

রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন, "অন্তরের অহেতুক আনন্দকে বাহিরে প্রত্যক্ষ গোচর করার দ্বারা তাকে পর্যাপ্তি দান করবার যে চেষ্টা, তাকে খেলা না বলে লীলা বলা যেতে পারে। সে হচ্ছে আমাদের রূপ সৃষ্টি করবার বৃত্তি; প্রয়োজন সাধনের বৃত্তি নয়। (তথ্য ও সত্য—সাহিত্যের পথে পৃঃ ১৪) ইহাই হইতেছে আর্ট সৃষ্টির লীলাবাদ।

'The world as an art is the play of the Supreme Person revelling in image-making' (Dacca Lecture).

য়ুরোপে অনেকে এই মতবাদকে মনের খেলা বলিয়াছেন; রবীন্দ্রনাথ ইহাকে লীলাময়ের লীলানন্দ বলিয়াছেন।

কোনোপ্রকার প্রয়োজনসিদ্ধি যদি আর্টের জনক না হয়, তবে art for art's sake মতবাদ স্বীকার করিতে দোষ কি? য়ুরোপে গোচিয়ের-এর এই বাক্যটি অবলম্বন করিয়া উনবিংশ শতকে এক শ্রেণীর সাহিত্যিক ও শিল্পী যে স্বৈরাচার ও অসংযমকে পোষণ করিয়াছিলেন, তাহাই এই বাক্যটিকে সুধী-সমাজে অপাংক্তেয় করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার যৌবনে এই মতবাদকে নানা ভাবে সমর্থন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি ঐ বাক্যের লৌকিক অর্থকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যান। কি ভাবে তাঁহার সাহিত্য সাধনা সত্যম্, শিবম্ ও সুন্দরম্‌কে মিলাইয়া নবতর অনুভূতিলোকে উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল তাহার আলোচনা অন্যত্র করা হইয়াছে—সংক্ষেপত বলিতে পারি জাতীয় শিক্ষা পরিষদের বক্তৃতা-গুলি তাহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। আমাদের আলোচ্য What is art প্রবন্ধে কবি বহুনিন্দিত art for art's sake মতবাদের নবতম ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। আধুনিক লেখকদের মধ্যে টলস্টয় এই মতবাদের তীব্র প্রতিবাদী—তাঁহার what is art গ্রন্থের অনেকখানিই এই মত-বাদের ধ্বংস কার্যে নিযুক্ত। রবীন্দ্রনাথ টলস্টয় প্রমুখ সমালোচকদের মতের সমালোচনা করিয়া বলিলেন যে, য়ুরোপে Puritanic যুগের শুচিতাবাদের আদর্শ নূতন ভাবে এ যুগের সাহিত্য ও শিল্পে দেখা দিয়াছে (recurrence of the ascetic ideal of the puritanic age).

কবির মতে এই শুচিতাবাদ হইতেছে প্রকৃতির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া। মানুষ যখন জীবনের সহিত সহজ সংযোগ হারায়, তখনই সে ভালো-মন্দ লইয়া খুঁৎখুঁতানি করিতে শুরু করে; তখন সে কৃচ্ছ্রতাকে বৃহৎ করিয়া দেখে ও সুখ এবং আনন্দকে মায়ার ফাঁদ বলিয়া নিন্দা করে।*

টলস্টয় আর্টকে যে নৈতিকতা বা Moralistic দিক হইতে দেখিয়াছিলেন, তাহা প্রায় অবচ্ছিন্ন বা Abstraction হইয়া দাঁড়াইয়াছে; টলস্টয়ের আর্ট বিশ্ব-জনীনতা, ধর্মীয়তা ও নৈতিকতার সংযোগে এমন একটি তুরীয় আদর্শতার মধ্যে গিয়া পড়িয়াছে যে, সেক্ষেত্রে ভাবনার পক্ষে রূপ গ্রহণ করাই দুঃসাধ্য।

রবীন্দ্রনাথ আর্টের অহেতুকী আনন্দ-প্রেরণাকে স্বীকার করিয়া যে ধর্ম ও নীতিকে পোষণ করিয়াছেন, তাহা কোনো বিশেষ ধর্মের ধর্মীয়তা নহে, তাহা কোনো বিশেষ সভ্যতার পরম্পরাগত নৈতিকতা নহে, সর্বমানবে যে ধর্ম, যে নীতি অনুসরণ করিতে পারে,—তাহারই আদর্শে উহা রচিত।

ক্রোচের সহিত টলস্টয়ের আর্ট সম্বন্ধে মতের মিলের অপেক্ষা অমিলই বেশি; কিন্তু আর্ট-সর্বস্ববাদীদিগকে ক্রোচে প্রচুর নিন্দা করিয়া অবশেষে বলিলেন। যেহেতু

the basis of all poetry is human personality, and since human personality finds its completion in morality, the basis of all poetry is the moral consciousness." (Aesthetics—En. Br. 14 Ed.)

ক্রোচের এই moral consciousness হইতেছে রবীন্দ্রনাথের সত্য-শিব-সুন্দরের সমন্বিত অধ্যাত্ম আদর্শ।

এইজন্যই রবীন্দ্রনাথ আর্টিস্ট বা স্রষ্টার নিকট হইতে বড় কঠোরতার দাবী করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, "যদি সৌন্দর্যভোগ করিতে চাও, তবে ভোগবিলাসকে দমন করিয়া শুচি হইয়া শান্ত হও।" 'প্রবৃত্তির ঘূর্ণি-নৃত্যের প্রলয়োৎসবে' য়ুরোপের সাহিত্য ও কলার কী দুর্গতি হইয়াছে, তাহা টলস্টয় তাঁহার আর্ট বিষয়ক গ্রন্থে অকুণ্ঠ লেখনীতে ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার মতে যে আর্ট ধর্মকে লাঞ্ছিত করে, সে আর্ট কখনো সত্য আর্ট বলিয়া স্বীকৃত হইবে না। রবীন্দ্রনাথও বলিতেছেন, 'উত্তেজনাকে, আনন্দ ও বিকৃতিকে সৌন্দর্য বলিয়া' ভুল করা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক; "সৌন্দর্যবোধকে পূর্ণভাবে লাভ করিতে হইলে চিত্তে শান্তি চাই", শুধু শান্তি নহে, মনের শুচিতাও চাই। (সাহিত্য পৃঃ ৩৪)।

রবীন্দ্রনাথ বহু স্থানে বলিয়াছেন যে, আর্টিস্টরা জীবনের স্বাভাবিকতাকে অস্বীকার করিয়া আপনাদিগকে আর্টের একটি অলীক জগতের জীব মনে করে, তাহা আদৌ সমর্থন-যোগ্য নহে;

'I believe in a spiritual world—not as anything separate from this world—but as its innermost truth' (Personality p. 126)

রবীন্দ্রনাথ জগৎকে পাশ কাটাইয়া জীবনকে অবচ্ছিন্ন সৌন্দর্যলোকের তুরীয়তার মধ্যে অতিবাহিত হইতে দেন নাই।

আর্টের সৃষ্টি বা আত্মপ্রকাশের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত আছে মনের চারিদিকের শান্ত পরিবেশ। সুর ও রূপের রস সৃষ্টির জন্য একটি বস্তুবাহুল্যবিরল রিক্ততার প্রয়োজন, অর্থাৎ সৃষ্টির চারিদিকে যদি অবকাশ না থাকে, তাহা হইলে সম্পূর্ণ মূর্তিতে তাহাকে দেখা যায় না। "আজকালকার দিনে সেই অবকাশ নেই; তাই এখনকার লোকে সাহিত্য বা কলা-সৃষ্টির সম্পূর্ণতা থেকে বঞ্চিত। তারা রস চায় না, মদ চায়; আনন্দ চায় না, আমোদ চায়। চিত্তের জাগরণটা তার কাছে শূন্য, তারা চায় চমক লাগা।" (যাত্রী পৃ ৫৫)। সরলতা স্বচ্ছতা যে আর্টের আভরণ, তা লোকে প্রায় ভুলিতে বসিয়াছে; তাই আর্ট চমক লাগাইবার কাজে (Stunt) মত্ত, কসরৎ দেখাইবার প্রলোভনে মজিয়াছে। আর্ট সৃষ্টির মধ্যে কোলাহল নাই, "তার গভীরতম পরিচয় হচ্চে তার আত্মসংবরণে।" (যাত্রী পৃ ৫৬)।

এখন আর্টের সৃষ্টি বা আত্মপ্রকাশের অর্থ কি, তাহার বিচার করা যাক।

বাহিরের রূপ হইতেছে আর্টের জগৎ; কিন্তু আসলে আমাদের নয়নসমক্ষে যে রূপের জগৎ প্রতিভাত হয়, তাহা যতক্ষণ আমার ব্যক্তিগত অনুভূতির মধ্যে থাকে, ততক্ষণ তাহা আর্ট নহে। প্রকাশেই আর্টের জন্ম; নীরব কবির অস্তিত্ব নাই। কবি লিখিয়াছেন, "আমি আমার সৌন্দর্য-উজ্জ্বল আনন্দের মুহূর্তে

---

* When enjoyment loses its direct touch with life, growing fastidious and fantastic in the world of elaborate conventions, then comes the call for renunciation which rejects happiness itself as a snare—Personality.

কবি এ সম্বন্ধে "যাত্রীর ডায়েরী"তে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

...লিকে ভাষার দ্বারা বারম্বার স্থায়িভাবে ...র্তিমান করাতেই ক্রমশ আমার অন্তর্জীবনের ...থ সংগম হয়ে এসেছে।" এই আত্মপ্রকাশের ...র্ণতাতেই মুক্তি।

সাহিত্য ও কলার সাধনায় "মানুষের চিত্ত আপনাকে বাহিরে রূপ দিয়া সেই রূপের ভিতর হইতে পুনশ্চ আপনাকেই ফিরিয়া দেখিতেছে।" (রূপ ও অরূপ—সঞ্চয় পৃঃ ১২)। সেই জন্য কবি বলিয়াছেন,

In art, man reveals himself and not his objects' (Personality p. 12).

"সৃষ্টি মোর সৃষ্টি সাথে মেলে যেথা
সেথা পাই ছাড়া,
মুক্তি যে আমারে তাই
সংগীতের মাঝে দেয় সাড়া।"
(মুক্তি—পূরবী)

এখন বাহিরের এই বিচিত্র জগৎ মানুষের ইন্দ্রিয়-দ্বার দিয়া মনের মধ্যে নিরন্তর আছড়াইয়া পড়িতেছে; এই অগণিত বস্তু-রাশির মধ্য হইতে যাহা গ্রাহ্য, মন তাহাকে গ্রহণ করে, ও আপনার মতন করিয়া নূতন-ভাবে গড়িয়া লয়—যাহা বর্জনীয়, তাহা ত্যাগ করে; আবার বিস্মৃতির তলে কত শত ডুবিয়া মরে। সুতরাং মানুষের ভাবাবেগে (emotional forces) গ্রহণ-বর্জন করিতে এই সৃষ্টি কার্যকে আগাইয়া লইয়া চলিয়াছে; তাহার রূপ তাহাকে অচল বাঁধনে বাঁধিতে পারে না।

ইন্দ্রিয় যখন নির্বিচারে বহির্জগতের সমস্তকেই মনের দ্বারে আনিয়া স্তূপ করিতে থাকে, তখন মন যে বাছাবাছি করে, তাহারই নাম দেওয়া হইয়াছে 'রুচি' বা taste। এই taste বা রুচির শাস্ত্রকে বলে 'রসশাস্ত্র'। একটি বাক্য কেন ভালো লাগিল, একটি দৃশ্য কেন চক্ষুকে তৃপ্তি দিল, এ প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়া কঠিন, তৎসত্ত্বেও শাস্ত্রকারগণ বহু আড়ম্বরে এই বিশ্লেষণে বারে বারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই বিচার এখনো শেষ হয় নাই, পৃথিবীর সর্বত্র পণ্ডিতেরা ইহার আলোচনা এখনো করিতেছেন—কেন ভালো লাগে, কাহাকে ভালো লাগে, কি ভালো লাগে ইত্যাদি অসংখ্য প্রশ্ন ইহার পরস্পরের সহিত জড়িত।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য যাঁহারা ধীরভাবে অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই লক্ষ্য করিয়াছেন যে, কবি আর্টকে জীবন হইতে পৃথক করিয়া দেখেন নাই এবং তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবন-দর্শনের সহিত তাঁহার আর্টতত্ত্ব অংগাংগীভাবে যুক্ত। 'শান্তি-নিকেতনে'র উপদেশমালা আলোচনাকালে আমরা দেখাইয়াছি, কবি কিভাবে সত্য-শিব-সুন্দরকে ধর্মসাধনায় গ্রথিয়া আলোচনা করিয়াছেন। যদিও আসলে সেইটি শান্তম্ শিবমদ্বৈতমের সাধনা। (দ্রঃ যাত্রী—রবীন্দ্র-রচনাবলী, পৃঃ ৪৪৯)। সত্য-শিব-সুন্দরবাদ রবীন্দ্রনাথের পূর্বেই আমাদের দেশে ধর্মসাহিত্যে য়ুরোপ হইতে প্রচারিত হইয়াছিল। রাষ্ট্র ও সমাজ-জীবনের আদর্শ প্রতিষ্ঠাকল্পে ব্রাহ্মসমাজ যেমন এদেশে ফরাসী বিপ্লবের বাণীমন্ত্র—সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা—প্রবর্তন করেন; তেমনি অধ্যাত্ম-জীবনের আদর্শ প্রতিষ্ঠা-ক্ষেত্রে তাঁহারা এদেশে ভিক্টর কুঁজ্যা প্রবর্তিত সত্য-শিব-সুন্দরের দর্শনতত্ত্ব প্রচার করেন। রবীন্দ্রনাথ এই ত্রিতত্ত্বকে অধ্যাত্ম-জীবনের সাধনার অংগরূপে শান্তম্ শিবমদ্বৈতমের সহিত অখণ্ডভাবেই গ্রহণ করিয়াছিলেন; গানে তিনি লেখেন 'সত্যমংগল প্রেমময়', অন্যেরা লেখেন 'সত্যং শিব সুন্দর দেব-চরাচরে' 'সত্যং শিব সুন্দর রূপ ভাতি', অথবা 'চিরনবীন শিব সুন্দর হে' ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথের কাছে 'Life is art and art life'

আর্ট অবচ্ছিন্ন বিষয় নহে, তাহা সমগ্র জীবনের সাধনলব্ধ সত্য; অহেতুকী তাহার প্রেরণা; অনুভূতিতে তাহার উদ্ভব; বুদ্ধির অগম্য—কিন্তু বোধের মধ্যে পূর্ণ; সংক্ষেপে মানুষের চরম আত্মপ্রকাশ হইতেছে আর্টে।

রবীন্দ্রনাথ এক স্থানে বলিয়াছেন—"বিশ্বের যেখানে প্রকাশের ধারা, প্রকাশের লীলা, সেখানে যদি মনটাকে সম্পূর্ণ করে ধরা দিতে পার, তাহলেই অন্তরের মধ্যে প্রকাশের বেগ সঞ্চারিত হয়—আলো থেকেই আলো জ্বলে। দেখতে পাওয়া মানে হচ্ছে প্রকাশকে পাওয়া। ......বিশ্বের প্রকাশকে মন দিয়ে গ্রহণ করাই হচ্ছে আর্টিস্টের সাধনা।" (যাত্রী)।

# স্মরণীয় একটি দিন

## বাণী সেনগুপ্ত

শুভ বৈশাখ মাসে আগের দিনে ছোট মেয়েরা করিত পুণ্য-পুকুর ব্রত, বড়রা করিতেন অক্ষয়-তৃতীয়ায় পূর্বপুরুষদের জল দানের উৎসব। আজ যখন আমরা আবাহন করি নববর্ষকে, বলি "এসো এসো নববর্ষ", "তখন সমস্ত হৃদয় দিয়া স্বাগত করি পঁচিশে বৈশাখকে। পঁচিশে বৈশাখে লীন হয় ছোটদের পুণ্য পুকুর, বড়দের অক্ষয়-তৃতীয়া সার্থক হয় এই দিনে। পঁচিশে বৈশাখে গুরুদেবের জন্মদিন, মৃত্যুহীন মহামানবের স্মরণে ধন্য হই আমরা।

আমার শিশু-কল-কাকলীতে মুখরিত জীবনে আসে পঁচিশে বৈশাখ বার বার। আসে পরম শুচিতায় সরল, অনাড়ম্বরে, শুভ্র সুন্দর আলিংগনে, ধূপে, দীপে, বেলা, বকুলে, আমার প্রিয়তমা কন্যাদের সুরচিত পরিবেশে। কনক-কিরণ ঢালা বিমল উষায় এ দিনে প্রথম প্রণাম করি তরুণ অরুণকে, যিনি চির পুরাতন হইয়াও চির নূতন। সদ্যোজাত শিশু রবিকে এক পঁচিশে বৈশাখ যে আলোর অঞ্জলি তিনি উপহার দিয়াছিলেন, আজও এই নির্মল উষায় সেই স্বর্ণ রেণু মুঠা মুঠা ছড়াইয়া দেন তিনি অকৃপণ হাতে, রাঙাইয়া দেন আমার সমস্ত মনের ঔৎসুক্য। এ রঙ শুধুই নানা রঙে রং করা পঁচিশে বৈশাখের "রবি"র।

আজ অনেক জনের অনেক আয়োজন, ঘরে বাহিরে যে যার পূজার অর্ঘ নিয়া প্রস্তুত। মন আমার সেই ফেলিয়া আসা পঁচিশ বৎসর পূর্বের একটি দিনের সৌরভে পরিপূর্ণ।

তখন অসহযোগ আন্দোলনের তুমুল বন্যার পরের অবস্থা, দেশের জনতা-তরংগ ভাদ্রের ভরা নদীর মত অন্তরে উদ্বেল, বাহিরে শান্ত। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের মাতৃভূমি পূর্ববঙ্গ যখন তাঁদের ব্যাকুল আহ্বানে সাড়া দিয়া অহিংস সংগ্রামে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া বিপন্ন, বিপর্যস্ত, সে দিনে একবার রবীন্দ্রনাথ গেলেন পূর্ববঙ্গের শ্রেষ্ঠ নগরী ঢাকা শহরে। আজ যেখানে পূর্ব পাকিস্থানের রাজধানী। শস্য শ্যামলা বাঙলার নদী-মেখলা রূপ [illegible] দেখে নূর, সে কি বুঝিবে সেই অনুপম শ্যাম মঞ্জরী! কূলে কূলে ভরা বুড়ী গংগার বুকে পান্সী ভাসাইয়া অবস্থান করিলেন রবীন্দ্রনাথ। শিলাইদহের পদ্মাকে তাঁর মনে পড়িল কি!

অতি সাধারণ একটি বাঙলার মেয়ে আমি, থাকি পূর্ববঙ্গের মহকুমা শহরে, মহানগরী কলিকাতার সংগে কোন যোগাযোগ নাই। শান্তিনিকেতনে কবিগুরুর দর্শন লাভ, সে তো আমার পক্ষে আকাশ কুসুমের মতই অলীক স্বপ্ন। এবার রবীন্দ্রনাথ কাছে আসিয়াছেন, সংকল্প করিলাম, তাঁকে দর্শন করা চাই-ই। তিনি অবশ্যই জনতাকে দর্শন দান করেন, করেন হয়তো হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা কিন্তু সে সবে যোগ দিতেও তো সুযোগ সুবিধা চাই। তরুণী বধূ অনভিজ্ঞা জননী ছোট ছোট কচিদের নিয়া সর্বত্র যাওয়া চলে না, যাওয়াও নিজের হাতে, নিজের ইচ্ছায় হয় না। উৎসাহে, উৎকণ্ঠায় দিন যায়, বাড়ির বড়দের আগ্রহের সংগে নিজের আকাঙ্ক্ষা মিশাইয়া আশা করিয়া থাকি। মনোরঞ্জন চৌধুরী এবং তাঁর স্ত্রী শ্রীযুক্তা ইন্দুলেখা দেবী রবীন্দ্রনাথের প্রিয়তম ছাত্রছাত্রী। এঁরা আমাদের পরিবারের একান্ত আপনার জন, আমার স্বামীর বিশেষ বন্ধু। মনোরঞ্জনবাবুর ভাই সরোজবাবুকে বলিয়া আমার দেবর কবি-দর্শনের ব্যবস্থা করিলেন। ভোরবেলা নির্জন পান্সীতে তাঁর দেখা পাওয়া যাইবে। আমাদের পরিবারের যারা যাইবে শুধু তারাই সেখানে থাকিবে, আর কেউ থাকিবে না, দেখা করিবার এমন সুন্দর সুযোগ সাধারণের ভাগ্যে হয় না। আনন্দে পূর্ব রাত্রি নিদ্রাহীন অবস্থায় কাটাইয়া ভোরে আমরা বুড়ী গংগার ঘাটে উপস্থিত হইলাম। আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণী, তাঁর দুই বধূ ও এক মেয়েকে নিয়া গেলেন, সংগে আমার দেবর। সরোজবাবু আমাদের কবি-গুরুর

১৩৪৭ সালের পঁচিশে বৈশাখে রবীন্দ্রনাথ

গ পরিচয় করাইয়া দিলেন। সে কি ন্তে, পবিত্র অনন্যসাধারণ দীপ্ত সৌন্দর্য, প বেনে বজরা আলো করিয়া আছেন। পূর্ব গন্তে নবারুণের প্রকাশ, তারই সোণার লো জলে স্থলে বিশ্বচরাচরে খেলা রতেছে। খেলা করিতেছে বিশ্ববরেণ্য কবির মোর্মাণ্ডিত আননে, শুভ্র শ্মশ্রু জালে, শুভ্র শ্রাশিতে খেলা করিতেছে তাঁর স্বর্ণ বর্ণের জানুলম্বিত অঙ্গাবরণে। চির পরিচিত ঙ্গতে সেই আরাম কেদারায় কোলের উপর ড়া হাত রাখিয়া পূর্ব দিকে প্রসন্ন উদার ষ্ট মেলিয়া বসিয়া আছেন তিনি। আমরা র পদধূলি লইয়া কাছে দাঁড়াইলাম। যেন নমগ্ন মহাতাপসের ধ্যান ভাঙিল, মৃদু মধুর ণ্ঠে তিনি বাক্যালাপ করিলেন আমার শাশুড়ী কুরাণীর সঙ্গে। আমি সমস্ত জগৎ ভুলিয়া ই মহামানবকে দর্শন করিয়া ধন্য হইয়া লাম। সার্থকতার আনন্দে হৃদয় ভরপুর। বীরবে গেলাম নীরবে ফিরিয়া আসিলাম। সেই কদিনের দেখার স্মৃতি পরশ পাথরের মত রা জীবনকে যে সোণার রং ধরাইয়া দিল, চিশে বৈশাখ শ্রদ্ধানত হৃদয়ে সেই কথাই রণ করি।

বাঙালীর গড়পড়তা ২৫ বৎসরের আয়ু। বজ্ঞানীরা অনেক হিসাব কষিয়া বাহির করিয়া-ছেন, নির্ভুল সে পরিমাপ। জীবনের ৪৫ ৎসর বহু সুখে দুঃখে কাটিয়া গিয়াছে, তাই প্রতিক্ষণ মনে করি অনেক হইয়াছে, এবার আসি, যাত্রার ইতি করি। ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিক শক্তির বলে বলীয়ান। এ দেশের মানুষ চির-দিন ইহলোকের চাইতে পরলোকের ভাবনাই বেশী ভাবে। কোন রকমে এপারের গোণা দিন কটা কৃচ্ছ্রসাধনে কাটাইয়া ওপারে যাওয়ার উপায়কেই জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ মনে করে। এই-রূপে রস ভরা ধরণীকে স্নেহ প্রীতিময় সংসারকে এরা বলে নরক, কামিনী কাঞ্চন এদের কাছে অস্পৃশ্য। আমাদের কাছে কিন্তু এরাই প্রকৃত মানুষ, এরাই আদর্শ, এরাই নমস্য। সাধন ভজন যে করি না এজন্য সর্বদাই নিজকে অপরাধী ভাবি। মানুষকে চিরদিনই সংগ্রাম করিতে হয়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচার অপমান, অসাম্যের বিরুদ্ধে তার সংগ্রামের শেষ নাই। মানুষ নিজেকে যত ভাল মনে করে, শিক্ষিত, সংস্কৃত, মহানুভব মনে করে সত্যই তো সে তা নয়; তাই লোভের বশে, হিংসার মত্ততায় শক্তির অপব্যবহারেও তার অন্যায় সংগ্রামের শেষ নাই। দয়া, মায়া, করুণা প্রভৃতি দুর্বলের ভাব বিলাস, সুস্থ মানুষের ধর্ম নয় এ কথাও মানুষেই মনে করে এবং সেই মানুষের সংখ্যাই তো পৃথিবীতে বেশী। ভারতের শান্ত পরিবেশে তার শান্তিকামী অধিবাসী হয়তো বড় বেশী শান্তি কামনা করে তাই তার অহিংসাই পরম ধর্ম, ক্ষমাই শাশ্বত বাণী। এই নিয়াই ভারতবাসী পৃথিবীর মধ্যে তার শ্রেষ্ঠতা নিষ্পন্ন করে।

গুরুবাদ আজও ভারতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে। এ দেশে নানা ধর্ম সম্প্রদায়ে নানা গুরুর অভাব নাই, গুরুর সাহায্য ব্যতিরেকে আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করা অসাধ্য এ বিষয়ে প্রায় সকল ভারতবাসীই এক-মত। আমাদের সকল সাধারণ বাঙালী হিন্দু পরিবারে সকলেরই কুল গুরু আছেন, তিনি শুভদিন দেখিয়া কানে মন্ত্র দান করেন, মনের গোপনে তাকে রক্ষা করিতে হয়, প্রতিদিন সেই মন্ত্র জপ না করিয়া জল গ্রহণ করিবে না ইহাই নিয়ম। ইষ্ট পূজার সঙ্গে গুরু পূজার বিধি আছে, ফুলে, ফলে জলে গুরুদেবের পদপল্লবে অর্ঘ দান করাও পরমার্থ লাভের উপায় বলিয়া বিবেচিত।

আমি বিংশ শতাব্দীর একটি অতি সাধারণ বাঙলার মেয়ে, পাশ্চাত্য ভাবধারার প্লাবনে প্লাবিত দেশে নদী তটভূমিতে ক্লেদমণ্ডিত তৃণরাজির মতই ম্লান, তেমনই অগণিত, অবাঞ্ছিতের মধ্যেই আমার স্থান। বিজ্ঞানের জয়গান মুখরিত যুগেও বিজ্ঞানের নামেই অজ্ঞান হই, কায়ক্লেশে দিন যাপন, বহু সন্তান প্রসবের দুঃখ বহন করিয়াই দিন যায়। বাহিরের বিশাল বিশ্বের সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচাইয়া নিজকে শামুকের খোলার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া বসিয়া থাকিয়া মনে করি সমস্ত বিপদ, দুর্যোগ এড়াইলাম, কিন্তু অন্তরীক্ষে মহাকাল অট্টহাসি হাসেন, তাঁর প্রলয় নৃত্যের ঠেলা সামলাইতে হয় বিশেষ করিয়া আমাদেরই। সর্বরকমে রিক্ত করিয়া ছাড়েন তিনি আমাদের। আসে যুদ্ধ বিগ্রহ, বিপ্লব, আসে পঞ্চাশের মন্বন্তর, দাঙ্গাহাঙ্গামার রক্তস্নাত দুর্দিন। পায়ের নীচের মাটি যেন সরিয়া যায়, নিরুপায় হৃদয় প্রতিক্ষণ আর্তনাদ করে 'ঠাকুর রক্ষা কর, রক্ষা কর'। নির্দোষ, নির্মল সন্তানদের শত-বাহু মেলিয়া ঢাকিয়া রাখিতে চায়। মনে শান্তি নাই, উদ্বেগের অন্ত নাই, এদের কল্যাণ চিন্তা ছাড়া কোন চিন্তা নাই আমার। এই বণিকের ধা...কের যুগে অর্থনৈতিক চাপে ক্লিষ্ট এক মধ্যবিত্ত জননী আমি, আমার ক্ষমতাবিহীন ভাবনার নিরর্থকতা পরিজনকে বিব্রতই করে। মা বলেন, 'বয়স হইয়াছে এখন মন্ত্র নাও, শান্তি পাইবে।' ছেলেরা সবে বড় হইয়াছে যৌবনমদে তারা মনে করে নিজেদের বিজ্ঞ, সুসম্পূর্ণ, সক্ষম; দুর্গম পথকে ভয় করে না। মৃত্যুকে অমৃত জ্ঞান করে তারা। মাকে মনে করে অনভিজ্ঞ কচি মেয়ে, সান্ত্বনার ছলে হাসিয়া বলে 'আমি আছি ভয় কর কেন মা?' বলে, 'এবার আমরা বড় হইয়াছি, আর কেন মা আমাদের ভাবনা ভাব, এখন ধর্মে কর্মে মন দাও, শান্ত হইবে, শান্তি পাইবে।' জানি না গীতা ভাগ-বতের পাঠ, বেদ উপনিষদের কোন খবর রাখি নাই এতদিন, আজীবন সংসারকে স্বামীকে সন্তানকে ধ্যান জ্ঞান মনে করিয়াই জীবন কাটাইয়াছি, মনে ভাবিয়াছি 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়'। আজ জীবনের সন্ধ্যা-বেলা কোথা যাইব গুরু খুঁজিতে, কে আমার কানে শান্ত হইবার মন্ত্র দিবে?

বাহিরের শত আলোড়নে যোগ দিয়া যতই কেন না কোলাহল করি, অন্তর আমার পূর্ণ, পূর্ণ এক মহামন্ত্রে। কেউ জানে না, কিন্তু আমারও গুরুদেব আছেন, একদিন এক সোনার ঊষায় নির্জন নদীর উপরে আমি আমার গুরু-দেবের দর্শন লাভ করিয়াছিলাম। তাঁর সঙ্গে আমার কোন কথা হয় নাই, নাই বা হইল, দেন নাই আমার কানে কোন মন্ত্র, নাই বা দিলেন, কিন্তু আমার চক্ষে মায়ার অঞ্জন পরাইয়া দিয়া-ছিলেন, যার প্রভাবে এ জীবন ভূমার সান্নিধ্য লাভ করিয়াছে। সুন্দরের পূজায় নিবেদনের থালা সাজাইতেছে।

সত্যই তো বয়স হইল, মনে ভাবি এবার ধর্মে মন দিব, অন্তত ধর্মগ্রন্থ তো পড়িবই। মনে করিয়া তাকের দিকে আগাইয়া যাই, যেখানে ধূলি মলিন গীতা, ভাগবত সাজান রহিয়াছে। দেখি, ছোটদের লোভের হাত বাঁচাইয়া বড়রা আমার 'সঞ্চয়িতা'কে তুলিয়া রাখিয়াছেন গীতা ভাগবতের উপরেই, হয় না আমার ধর্ম কর্ম, হয় না গৃহকাজ। মন ডুবিয়া যায় সেই 'জীবন বেদে', দেখি কোথায় শিশু-কালের শিশু। কোথায় কথা কাহিনী, সোনার তরীতে মন অকূলে পাড়ি জমায়। গীতাঞ্জলির গানের ডানা কোন অপরিচিত আকাশে নিমন্ত্রণ করে। দিনের আলো ফুরাইয়া যায়, সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসে, আমি পড়ি মহুয়া, পড়ি সবলা 'নারীরে আপনভাগ্য জয় করিবার কেন নাহি দিবে অধিকার, হে বিধাতা।'

# ৪৫ বছর আগেকার শান্তিনিকেতন

## সুধীরঞ্জন দাশ

সে আজ প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর আগেকার কথা। শান্তশিষ্ট ছেলে বলে সুনাম আমার ছিল না। একদিন বড়দি (অমলা দাস) বল্লেন : রবি কাকাকে বলেছি তোকে বোলপুর পাঠিয়ে দেব। রবিকাকা যে কে তা জানতাম না—আর বোলপুর যে কোথায় তাও আগে শুনিনি কখনো। মনের মধ্যে নানা দুর্ভাবনা শুরু হোলো। তার উপরে যখন আমার এক পিসতুত দাদা বল্লেন যে, বোলপুরে বেয়াড়া ছেলেদের তুলোধুনো করে সায়েস্তা করবার ব্যবস্থা আছে তখন মনের যে কি অবস্থা হোলো তা বলে বোঝান শক্ত। অথচ ভয় পেয়ে মুসড়ে পড়াটাও অপমানকর ঠেকল। একটু জোর গলায় উত্তর দিলাম—সেই ভাল; এখানে তোমাদের সর্দারী থেকে ত বাঁচব।

বোলপুরে থাকার ব্যবস্থা শুরু হোলো। একটি ছোট বাক্স এলো, তার মধ্যে দেওয়া হলো পাঁচ কি ছ'খানা ধুতি, চারটে গেঞ্জি, চারটে পাঞ্জাবী কি সার্ট তা মনে নেই। সবচেয়ে মজার লাগল—একটি গাড়ু, একখানা চেলির কাপড় এবং একটি ছুতোরের যন্ত্রের বাক্স। তার মধ্যে ছিল হাতুড়ী, বাটালী, করাত ইত্যাদি। শুনলাম, ভোরে স্নানের পর চেলির কাপড় পড়তে হয় সেখানে। এইসব জিনিষপত্র নাড়াচাড়া করতে করতে ভয়টা একটু নরম হয়ে এলো। হাতুড়ী, বাটালী ও করাতখানা মনে কিছু ভরসা এনে দিলে। আর যাই হোক, ওগুলি নিয়ে সেখানে ত' দিন কাটান যাবে।

দিনক্ষণ দেখে ভোলাদাদার সঙ্গে রওনা হওয়া গেল। বিদায়ক্ষণে মায়ের মুখখানা দেখে মনটা যে একটু দমে গিয়েছিল ত অস্বীকার করিনে। মা বল্লেন—লক্ষ্মী ছে হয়ে থেকো—ছুটি হলেই বাড়ী আসবে—কো ভয় নেই। দুষ্টু ছেলেদের দিকে মায়ের এক বিশেষ টান থাকে—এখন তা যে-রকম বু তেমন তখন বুঝিনি। কিন্তু মায়ের মুখখা তখন করুণায় ভরে উঠেছিল—তার ছবি এখ মনে আছে।

এর আগে রেলে বড় একটা চড়িনি তাই রেলগাড়ীটা মন্দ লাগল না। জানাল দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দূর দিগন্তের দিকে চে রইলাম। দূরের গাছপালাগুলিও রেলের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে মনে হলো। বর্ধমান স্টেশনে গাড় থামল। কি হৈ-চৈ পড়ে গেল। ভোলাদাদা প্যাটি মিহিদানা ইত্যাদি সম্বন্ধে একট দুর্বলতা ছিল—কাজেই জলযোগটা মন্দ হোল না।

বর্ধমান থেকে বোলপুরের মাঝের স্টেশনগুলি পরে যেমন মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল তখন তা ছিল না। কাজেই প্রত্যেক স্টেশনে যাত্রীদের ওঠানামা দেখতে দেখতে বোলপুর যে আগতপ্রায় তা জানা ছিল না। কিছুক্ষণ পরে একটা স্টেশনের দূরের সিগনেল পার হতে না

'আমরা সোজা রাস্তা ধরে একটা প্রকাণ্ড মাঠের মধ্যে পড়লাম'

ভোরেই ভোলাদাদা উঠে আমার ব্যাগ আর বিছানাটা কাছে টেনে আনলেন আর বল্লেন—এবার নাবতে হবে। হঠাৎ যেন একটা ধাক্কা খেয়ে সজাগ হয়ে উঠলাম। তুলোধোনার রাজ্যের কাছে এসে পড়েছি মনটা খুব প্রসন্ন হয়ে উঠল না নামবার কথা শুনে। গাড়ী নানা শব্দ করে স্টেশনে থামল। আমরা নেমে পড়লাম। এমন সময় বেঁটে, কালো এবং খুব ষণ্ডামার্কা একটা লোক "ভোলা", "ভোলা" বলে ডাক ছেড়ে এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করছে দেখলাম। ভোলাদাদা তাকে ডাকলেন। ভোলাদাদাকে একটু ভয় এবং সমীহ করতাম। এই লোকটা যে "ভোলা", "ভোলা" করে নাম ধরে দাদাকে ডেকে আস্পর্ধা দেখালো, তাতে মনে হলো বোলপুর জায়গাটা খুব বড় সুবিধে নয়। ভোলা যে তাকে কখনো দেখেনি এবং সে-ও যে ভোলাকে কস্মিনকালে চেনে না, সুতরাং নাম ধরে ডাক পাড়া ছাড়া তার উপায় ছিল না, সেটা বোধগম্য হবার মত সুবুদ্ধি তখনো হয়নি। লোকটির নাম পরে জানলাম "খোদো"। সে আমাদের স্নানের জল ইন্দারা থেকে তুলে দিত।

স্টেশন থেকে বের হয়ে একটি গরুর গাড়ীর মধ্যে জিনিসপত্র তুলে আমরা উঠলাম। সেটা সাধারণ গরুর গাড়ী নয়। তার মধ্যে অনেক জায়গা—দুদিকে বেঞ্চ—মাথার উপর কাঠের ছাদ—জানালা ছিল দুপাশে। আজ-কালকার দিনের ছোট বাস বল্লেই হয়। গরু দুটি প্রকাণ্ড বড় আর চলছিলও বেশ জোরে। গাড়োয়ানটি মাঝবয়স পেরিয়ে যাওয়া একটি মুসলমান। পরে তার সঙ্গে ভাব হয়েছিল—কিন্তু নামটা ঠিক মনে নেই। লাল মাটির রাস্তায় ধুলো উড়িয়ে, দুপাশের তামাকের দোকানের গন্ধ কাটিয়ে, বাঁয়ে সুরুলের রাস্তা ও দাতব্য চিকিৎসালয়ের ছোট একতলা কুঠরী ছাড়িয়ে ছোট গির্জাটি ডাইনে ফেলে আমরা সোজা রাস্তা ধরে একটা প্রকাণ্ড মাঠের মধ্যে পড়লাম। ডান দিকে দূরে উঁচু ঢিবির পাহাড় ও তার উপর একটা তাল গাছ দেখা যাচ্ছিল। তারপর ভুবনডাঙ্গা ও মস্ত বড় একটা বাঁধ—যার ভাল নাম পরে শুনলাম তালদীঘি—তা বাঁয়ে রেখে একটু এগোলেই গাড়োয়ান একটি গাছপালা ঢাকা ছোট বাড়ী দেখিয়ে পরিচয় করালে—নীচু বাংলা। তারপর রাঙ্গা মাটির পথ বেয়ে বাঁয়ে মোড় ঘুরে একটা খোলা গেটের ভিতরে ঢুকে দুপাশের আমালকী বীথির মধ্যে দিয়ে এক বড় দোতলা বাড়ীর সামনে এসে গাড়ী থামালো। একটি চাকর এসে আমাদের বাড়ীর দোতালায় নিয়ে গেল। সিঁড়ি দিয়ে উঠে একটা ঘেরা বারান্দার ভিতর দিয়ে বাঁ দিকের বড় হল কামরা পেরিয়ে দক্ষিণের বারান্দায় গিয়ে পেঁছিলাম। গৌরবর্ণ, দাড়ি-ওয়ালা, স্প্রিংএর চশমা নাকে, পাঞ্জাবী গায়ে একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক পাশের একটা ঘর থেকে বের হয়ে এসে বল্লেন—"ভোলা, এলি, এই ছেলেটি আমার কাছে থাকবে? বেশ!" দাদা পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন। আমি করেছিলাম কিনা মনে নেই। তারপর ও'দের কি কথাবার্তা হল ভুলে গেছি। কিছুক্ষণ পরে ভদ্রলোক চাকরটিকে ডেকে বল্লেন—এই ছেলেটিকে আর ওর জিনিষপত্র নিয়ে ভূপেন-বাবুর কাছে নিয়ে যাও। এই আমার প্রথম পরিচয় হলো গুরুদেবের সঙ্গে। তাঁকে দেখে দুষ্ট ছেলেকে তুলোধোনা করা মানুষ বলে মনে হোলো না। চাকরটির নাম ছিল বোধ হয় উমাচরণ।

ভূপেনবাবু বেঁটে খাটো উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ মানুষ। চাকরটির মুখে বার্তা শুনে বল্লেন—"এস বাবা।" তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন ছেলেদের ঘরে। লম্বা টালির দোচালা ঘর, দুদিকে অপরিসর দুটি বারান্দা। এই ঘরটির নাম এখন হয়েছে প্রাক্‌কুটীর। ঘরে পাশাপাশি তক্তপোষ পাতা—দুতিন হাত অন্তর। তক্তপোষে বিছানা বেশ পরিপাটি গোলাকৃতি করে গোটান। তক্তপোষের মাথার দিকে একটি করে ডেস্ক। পায়ের দিকে একটি সরু গলির মত রাস্তা। যতদূর মনে পড়ে, তখন ১৫টি কি ১৬টি ছেলে ছিল বিদ্যালয়ে। আমারও একটি তক্তপোষ বরাদ্দ হোলো। বাক্সটা তার নীচে ঠেলে, বিছানাটা তক্তপোষে বিছিয়ে বারান্দায় গেলাম। বারান্দার সামনে লাল কাঁকরের রাস্তা, তারপর এক শ্রেণী শাল গাছ আর তারপর অবারিত মাঠ। ওখানে তখন ঐ টালির ঘরের পশ্চিমে একতলা একখানা বাড়ি ছিল। সেখানে ছিল লাইব্রেরী ও ল্যাবরেটরী। তার পশ্চিমে ছিল রান্নাঘর। তারপর আবার খোলা মাঠ—যতদূর চোখ যায়। টালিঘরের উত্তরে ছিল বড় ইন্দারা ও তার পাশে বড় বড় লম্বাটে চৌবাচ্চা। তারও উত্তরে ছিল একটি খড়ের ঘর। সেখানে থাকতেন হরিবাবু। সৌভাগ্যক্রমে ভূপেনবাবু এবং হরিবাবু দুজনেই জীবিত রয়েছেন।

তখনো সন্ধ্যার অন্ধকার নামেনি। বারান্দা থেকে লাল কাঁকরের রাস্তায় নামলাম। শালের বীথির পর একটা ডোবা ছিল। সেখানে দেখলাম একটি ছেলে—বেশ গৌরবর্ণ রং, পরণে লুঙ্গি। খানিকটা অজানা রকমের ছেলে মনে হোলো। নাম শুনলাম—নারায়ণ কাশীনাথ দেবল। সে আমার যাবার কয়েকদিন আগে এসেছিল। সে নিবিষ্ট মনে ডোবায় একটি নৌকা ভাসিয়ে খেলছিল। তার সঙ্গে আলাপ করে ফেলা গেল। ছেলেরা যেখানে নৌকা ভাসিয়ে খেলতে পায়, সে জায়গাটাকে খুব ভয়াবহ বলে ঠেকল না। পিসতুত দাদার কোন বর্ণনা-ই এ পর্যন্ত ঠিক মিলল না। মনটা একটু হাল্কা হোলো।

সন্ধ্যার সময় ঘণ্টা পড়ল। ছেলেরা হাত-মুখ ধুয়ে চেলির কাপড় পরে নিজের নিজের কম্বলের আসনু মাঠের মধ্যে এখানে-ওখানে বিছিয়ে বসে পড়ল। কেউ নড়েও না, কথাও বলে না।
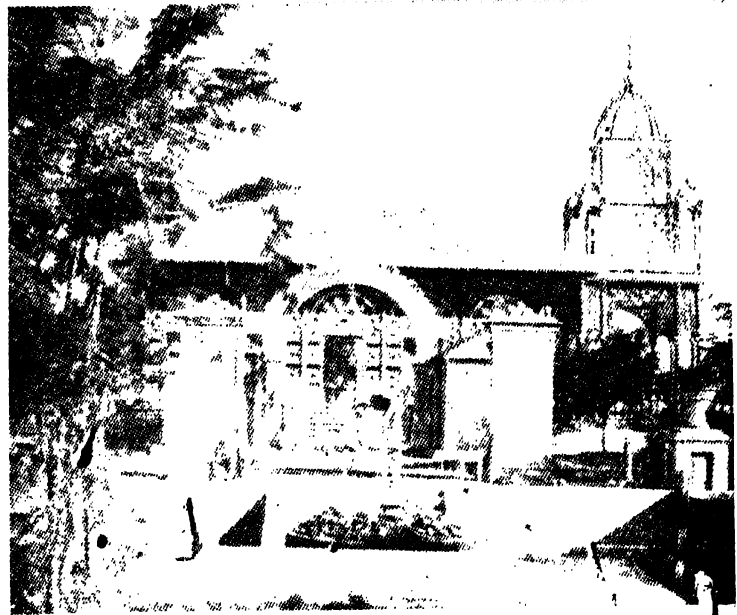
উপাসনার মন্দির

ছাতিমতলা

আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে চেয়ে রইলাম বোধ হয় দশ মিনিট পরে আবার ঘণ্টা পড়ল—ছেলেরা উঠে এলো। চেলির কাপড় সবাই ছেড়ে সবাই তখন প্রস্তুত হোলো গান ও গল্পের ক্লাশে যাবার জন্যে। তখনকার দিনে সন্ধ্যার পর ছেলেদের পড়ার বালাই ছিল না। গানের ক্লাশ, গল্পের ক্লাশ—এই সবই ছিল। দীনুবাবুকে দেখলাম প্রথম গানের ক্লাশে। অজিত চক্রবর্তী মশায়ও গানের ক্লাশে গান শেখাতেন। ছেলেরা শিখত নৈবেদ্যর গানগুলি। একটি গান এখনো মনে আছে, "আমার এ ঘরে আপনার করে গৃহ দীপখানি জ্বালো হে।"

গল্পের ক্লাশ ছিল ছেলেদের খুব প্রিয়। এক একজন মাস্টার মশায় এক একদিন গল্প বলতেন। সেদিন বোধ হয় জগদানন্দবাবুর গল্প বলবার দিন ছিল। তিনি ছিলেন শ্যামবর্ণ—কালো বল্লেও ভুল হবে না। গরমের সময় প্রায় খালি গায়েই থাকতেন। পরণের কাপড়ে কোঁচা না দিয়ে কাপড়টিকে ঘাড়ের উপর দিয়ে ঘুরিয়ে আনতেন। পায়ের পাতার অর্ধেকটা থাকত চটি জুতার বাইরে। গল্প বলতে বলতে যখন হাসতেন তখন মুখ দিয়ে শব্দ বড় বের হতো না—কেবল তাঁর কলসীর মত ভুঁড়ি নড়ত। জগদানন্দবাবুর গল্পের তুলনা ছিল না। পৃথিবী থেকে একটা পেল্লায় কামান দাগা একটা প্রকাণ্ড গোলার মধ্যে বসে চারজন বন্ধুর মঙ্গলগ্রহে যাবার বর্ণনাটা মনে করলে এখনো গা শিউরে উঠে।

সেদিন রাত্রিতে খাওয়াটা তেমন সুবিধে হোল না। একে অচেনা জায়গা—তার উপর নিরামিষ আহার—তারপরে আবার নিজের থালা গ্লাস ও বাটি মেজে ধুয়ে নিয়ে আসা। ব্যাপারটার নূতনত্বটাই মনে রয়ে গেছে।

তখন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন মোহিতবাবু। মাস্টার মশায়দের মধ্যে ছিলেন জগদানন্দবাবু, হরিবাবু, অজিতবাবু, সত্যবাবু (গুরুদেবের জামাতা) ও ভুপেনবাবু। নগেন আইচ মশায় বোধ হয় কিছুদিন পরে আসেন। বিধুশেখর শাস্ত্রী মশায় আরও কিছুকাল পরে আসেন।

পরদিন সকালে ঘণ্টার আওয়াজে ও ছেলেদের কথাবার্তার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। প্রাতঃকৃত্য সমাধা করে স্নানের পালা। কোদো কেরোসিনের টিনে জল তুলে ঢেলে দিচ্ছে। ভুপেনবাবু দাঁড়িয়ে দেখছেন—ছেলে ভাল করে স্নান করছে কি না। যার খোস হয়েছে তাকে কার্বলিক সাবান মেখে দেওয়া—কাউকে গামছা দিয়ে গা মুছিয়ে দে[illegible] এই ছিল তাঁর আনন্দ। ভুপেনবাবুর কাছে শেখা "লোকেশ চৈতন্যময়াধিদেব" স্তোত্রটি যা ঘুম থেকে উঠেই আবৃত্তি করতে শিখেছিলাম, তা এই বয়সে এখনো ভুলিনি। জানিনে আজকের দিনের শান্তিনিকেতনে ভুপেনবাবু, জগদানন্দবাবু ও হরিবাবুর মত স্নেহশীল মাস্টার মশায় আছেন কি না।

সেদিন সকালে পট্টবস্ত্র পরিধান করে আসন বিছিয়ে প্রথম যে উপাসনায় বসেছিলাম তা এখনো মনে রয়ে গিয়েছে। বসে যে কি বলতে বা করতে হবে, মনে মনে বা কি ভাবতে হবে—কেউ বলে দেননি। এইটুকু খালি শুনেছিলাম যে, উপাসনায় বসতে হবে। উপাসনার কোন মানেই জানা ছিল না তখন—কিন্তু এই যে একটি অভ্যাস হোলো এর মূল্য কিছুই নেই একথা আজকের দিনে মনে হয় না। সব ছেলেরা উঠে যখন লাইন দিয়ে দাঁড়াল, আমিও গিয়ে দাঁড়ালাম। ঠিক সেই সময়ে দেখা গেল গুরুদেবও আস্তে আস্তে এসে চটিজুতাটি ছেড়ে লাইনের সামনে দাঁড়ালেন। তারপর হাতজোড় করে সুললিত উচ্চ কণ্ঠে সুরু করলেন, "ওঁ পিতানোসি"। ছেলেরাও সুর মিলিয়ে স্তোত্র পাঠে যোগ দিল। সমবেত উপাসনার এই চিত্রটি সেদিন মনের মধ্যে যে রেখাপাত করেছিল, আজও তা বোধ হয় মুছে যায়নি। সেদিন আমার জানা ছিল না স্তোত্রটির বাক্যগুলি কিন্তু দু তিন দিনেই মুখস্থ হয়ে গেল। স্তোত্রটির অর্থ যে আজ পর্যন্ত সত্যি করে বুঝেছি তা বলছিনে—কিন্তু এই না বুঝে শেখা ঋষিবাক্য যে জীবনের কোনো কাজেই আসেনি তাও স্বীকার করিনে। উপাসনান্তে ছেলেরা একে একে গুরুদেবকে প্রণাম করল—আমিও প্রণাম করলাম। গুরুদেব মুদিত নয়নে হাতজোড় করে প্রত্যেককে প্রতি নমস্কার করলেন। তাঁর সেই সৌম্য প্রশান্ত মুখের নীরব আশীর্বাদ নিয়ে কিশোর বয়সে গুরুগৃহে আমার আশ্রমবাস সুরু হোলো।

গুরুদেব ছোটদের ইংরেজী ক্লাশ নিতেন। সে পড়ার ক্লাশ না খেলার ক্লাশ বলা শক্ত। মুখে মুখে শেখান ছিল রেওয়াজ। "রান" বল্লেই যখন দৌড়তে হোতো তখন "রান" শব্দের মানে যে দৌড়ন তা বুঝতে কষ্ট হোতো না। ছোটদের পড়বার জন্যে গুরুদেব রচনা করেছিলেন ইংরেজী সোপান। সংস্কৃত পড়াতেন হরিবাবু। তিনি লিখেছিলেন সংস্কৃত প্রবেশ। অমরকোষের অনেকগুলি শ্লোক আমরা তখন শিখেছিলাম। "হিমাংশুশ্চন্দ্রমাচন্দ্র" শ্লোকে চাঁদের নানা নাম এবং "সুরসূর্যমাদিত্য" শ্লোকে সূর্যের বহু নাম হয়েছিল মুখস্থ। সে সব বই এখনো পড়ান হয় কিনা জানিনে। অংক ও বিজ্ঞান পড়াতেন জগদানন্দবাবু। ল্যাবরেটরীর মধ্যে নানা রকমের যন্ত্রপাতিও ছিল। রামধনুর সাতটা রং মিশে গেলে যে সাদা দেখায় তা চাক্ষুষ প্রমাণ সাতরঙা একটা চাকতি সজোরে ঘোরালেই দেখা যেত। ইলেকট্রিক রেলগাড়িও ছিল আমাদের ল্যাবরেটরীতে। সত্যবাবুর ফিজিয়লজির ক্লাশে ছিল নরকঙ্কাল ও বড় বড় মানুষের ছবি।

ধ্যা বেলায় লাইব্রেরীর সামনে হোতো ানন্দবাবুর গ্রহ-নক্ষত্রের আলোচনা। নকগুলি চার্ট ছিল। যে মাসে যে সব -নক্ষত্র দেখা যায় তা ঐ চার্ট দেখে সনাক্ত তে কষ্ট হোতো না। সপ্তর্ষিমণ্ডলের ইরের নক্ষত্র দুটিকে একটি লাইন দিয়ে জুড়ে ই লাইনটা টেনে নিয়ে গেলে যে একেবারে ব তারায় পেঁছান যায় এ আমরা দুদিনেই নে নিয়েছিলাম। তারাগুলি মিটি মিটি লে আর নেভে আর গ্রহগুলি অপলক চোখে য়ে থাকে সেত চোখে দেখেই বোঝা গেল। পুরাধিপতির দেওয়া প্রকাণ্ড দূরবীণে লির ধূমকেতু—যা কিছুদিন পরে উঠেছিল—কে দেখা গিয়েছিল বড় করে। গুরুদেব ঝে মাঝে সেন্স ট্রেনিং ক্লাশ নিতেন। "এই দখ এক ফুট লম্বা কাঠিটা কত বড়—এখন লত ঐ টেবিলটা লম্বায় কত ফুট হবে?" টেবিলটার দিকে একমনে তাকিয়ে কেউ বল্লে—র, কেউ বা বল্লে—পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চি। মাপা হালো টেবিল গজ-কাঠি দিয়ে। যার উত্তর হালো সত্যিকারের মাপের কাছাকাছি, সেই জতল। এই রকম মুখে মুখে এবং কিছুটা ই পড়ে আমাদের পড়াশুনা চলত। ক্লাশ তো ঘরের বাইরে গাছের ছায়ায়। এই পড়ায় ক্লান্তি ছিল না, আনন্দ ছিল প্রচুর। ঐ সময়কার ছেলেদের মধ্যে মনে পড়ে সুজিত চক্রবর্তী (অজিতবাবুর ভাই), অরবিন্দ বোস (আনন্দ-মোহন বোসের কনিষ্ঠ ছেলে), অরুণ সেন (দীনেশ সেন মহাশয়ের পুত্র), গৌরগোপাল ঘোষ (যার নামে খেলার মাঠকে বলা হয় গৌর প্রাঙ্গণ), দেবল এবং নরেন খাঁ।

সে সময় একটি জাপানী ছুতোর আমাদের কাঠের কাজ শেখাত। নিজের হাতে করাত দিয়ে কাঠ চিরে ছোট ডেস্ক, আলনা তৈরী করা সহজসাধ্য হয়ে পড়েছিল দিন কতকের মধ্যে। সেই জাপানী মিস্ত্রিটি পর পর দুটি কাঠের নৌকা করেছিল—একটি ছোট, তার খোলটি জাহাজের মত, আর একটি বড়, তার তলাটা চেপ্টা। ছোট নৌকার নামকরণ হয়েছিল "সোনার তরী" আর বড়টির নাম ছিল "চিত্রা"। সে দুটিকে ভাসান হোলো তালদীঘিতে অর্থাৎ ভুবনডাঙগার বড় বাঁধটায়। যতদূর মনে পড়ে সে সময় রুশ-জাপানের যুদ্ধ চলছিল। জাপানী মিস্ত্রিটির সঙ্গে সঙ্গে আমরাও চঞ্চল হয়ে উঠতাম যুদ্ধের খবর শুনে। দীনুবাবু কবিতা লিখলেন—তার একটা ছত্র মনে আছে, "া পান করিয়া ছুটিল জাপান রুশিয়ার সনে রুষিয়া।" যেদিন পোর্ট আর্থার জাপানীরা দখল করলে, সেদিন জাপানী ছুতোরকে আর পায় কে। যেদিন রুশিয়ার বল্টিক নৌ-বাহিনীকে এ্যাডমিরাল টোগো সমুদ্র সমাধি করালেন, সেদিন বিদ্যালয়ের সব ক'টি ছাত্র ও জাপানী মিস্ত্রি মিলে দীনুবাবু রচিত "জয় জয় জয় হে জাপান" গান গেয়ে বোলপুর পর্যন্ত ঘুরে এলাম।

সেই সময়ে গুরুদেব প্রায়ই রান্না ঘরে ছেলেদের সঙ্গে খেতে বসতেন। তাঁর জন্যে কয়েকখানা মোটা আটার রুটি ও নিরামিষ তরকারী আসত এবং রান্নাঘরের ছেলেদের জন্যে যা রান্না হোত তাও তিনি নিতেন—বোধ হয় রাঁধুনী বামুনকে সজাগ রাখবার জন্যে। তাঁর নির্দিষ্ট কোন জায়গা ছিল না—এক-একদিন এক এক জায়গায় বসে পড়তেন, যে-দুটি ছেলের পাশে তিনি বসতেন নিজের রুটি থেকে একে একখানা ওকে একখানা দিতেন। আমরা সকলেই চাইতাম যেন গুরুদেব আজকে আমার পাশে বসেন। ঘি মাখান মোটা মোটা আটার রুটির লোভই যে আমাদের এই আকাঙ্ক্ষার একমাত্র কারণ ছিল তা মোটেই নয়। আমরা সকলে তাঁর সান্নিধ্য কামনা করতাম এবং পেতামও।

একটি লোককে বেশ মনে আছে, তাকে সবাই সর্দার বলে ডাকত। তার সম্বন্ধে নানা রকমের গল্প শুনেছি। সে না-কি ছিল সেই সব ডাকাতদের সর্দার যারা ছাতিমতলায় ধ্যান-নিবিষ্ট মহর্ষি দেবেকে ঘেরাও করেছিল। কার কাছে শুনেছি মনে নেই—কিন্তু শুনেছি, সে না-কি রণপায়ে চড়ে বোলপুর থেকে বর্ধমান গিয়ে কাকে খুন করে সেই দিনই ফিরে আসে। তাকে জিজ্ঞাসা করলে সে শুধু হাসত। লম্বা ছিপছিপে তার চেহারা—কোমরে কাপড়ের উপর একটা বেল্ট বাঁধা থাকত। সে হয়েছিল শেষ পর্যন্ত আমাদের ডাক হরকরা, বোলপুর থেকে চিঠিপত্র নিয়ে আসাই ছিল কাজ। ছেলেরা বেশী করে ধরে পড়লে মাথার উপর লাঠি ঘুরিয়ে লাফ মেরে "হারে রে রে রে রে" ডাক ছাড়ত। আমরা মুগ্ধ হয়ে দেখতাম তার দিকে। একটু পরে সে থামত, বলত সে কি আজকের কথা। পুরানোকালের কথাটা যে কি, কেউ-ই তা জানতাম না—কেবল কল্পনা করে নিতাম কত লোমহর্ষণ ডাকাতির কাহিনী।

নীচু বাঙলাটা ছোট বয়সে অনেক দূরে বলে মনে হত। সেখানে থাকতেন দ্বিজেন্দ্রনাথ—গুরুদেবের বড় দাদা এবং তাঁর পুত্রবধূ হেমলতা দেবী যাঁকে আমরা ডাকতাম বড়মা বলে। বড় দাদার এলাকার মধ্যে যেতে সাহস হত না, পাছে তাঁর পড়াশুনার ব্যাঘাত ঘটে; কিন্তু তাঁর টেবিলে, চেয়ারের উপরে যে সব কাঠবিড়ালী ও শালিখ ছাতু খাবার লোভে আসত, তাদের দেখবার কৌতূহল ছিল আমাদের বিস্তর। দূর থেকে দেখে চলে আসতাম। নীচু বাঙলার অন্য টানটি ছিল বড়মা। একটু আদরযত্ন, দুটো মিষ্টি কথার উপরে কিছু জলযোগও পাওয়া যেত। ছেলেদের দেয়া 'বড়মা' নামটি আজও তাঁর রয়ে গেছে।

বুধবারে মন্দিরে উপাসনা হত। ছেলেরা লাইন করে মন্দিরে যেত। মন্দিরের ফটকের উপর তখন একটি ঘণ্টা ছিল। গুরুদেব নিজে সেটিকে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড় টেনে বাজাতেন। তারপর সকলে সমবেত হলে গুরুদেব উপাসনা করতেন; উপনিষদের শ্লোকগুলি আবৃত্তি করে ব্যাখ্যা করতেন। সে সব বুঝবার বয়স তখন হয়নি আমাদের। মন যে ঠিক দিতে পারতাম উপাসনায় তা নয়। কখনো যে ঘুমে ঢুলে পড়িনি তাও বলতে পারিনে। কিন্তু, তাঁর মধুর কণ্ঠস্বরে ও বিশুদ্ধ উচ্চারণে উপনিষদের শ্লোকগুলি গানের মত শোনাত। "যো দেবো যো অগ্নৌ যো অপ্সু" থেকে আরম্ভ করে অনেকগুলি স্তোত্র আমাদের শুনে শুনে মুখস্থ যে হয়ে গিয়েছিল, আজও তা ভুলিনি। এই না বুঝে শেখা স্তোত্রগুলি আমাদের কিশোর মনে যে কোন রেখাপাত করেনি তা কে বলবে। গুরুদেবের উপদেশ-গুলি "শান্তিনিকেতন" নামে ছাপা হয়েছিল পরে।

বুধবারে ধোপা আসত তার গাধার পিঠে কাপড়ের পুঁটলিগুলি নিয়ে—নাম ছিল তার সাবু। নাপিত ছিল আব্বাস। তাকে বললে সে অনর্গল ইংরেজি বলত যার মধ্যে কেবল বোঝা যেত "হোরি" কথাটা। সেটা যে ইংরেজী শব্দ তা অভিধানে বলে না; কিন্তু তার ইংরেজী বুলির মধ্যে হোরি শব্দটার ছটা কিছু বেশী ছিল বলে তার নাম হয়েছিল হোরি আব্বাস। আমাদের মধ্যে অনেকের ধারণা ছিল যে, সাবু মানেই ধোপা কেন না সাবু মারা যাবার পর একদিন একজন মাষ্টার মশায়কে জিজ্ঞাসা করেছিল, নতুন সাবু কবে আসবে।

আমাদের তখন নিজেদের সব কাজ নিজেদের করতে হোতো। রুটিন করে ঘর ঝাঁট দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। সপ্তাহে সপ্তাহে এক-একটি দলের ক্যাপ্টেন এক-একজন ছেলে নির্বাচিত হোতো। ক্যাপ্টেনের ক্ষমতা ছিল বিস্তর, তাকে না মানবার যো ছিল না। ব্যতিক্রম কিছু ঘটলেই বিচার সভায় কৈফিয়ৎ দিতে হোতো। কৈফিয়ৎ মঞ্জুর না হলে এক-দিনের জল-খাবার বন্ধ হতে পারত।

ছেলেদের সে সময়ে বাগান করবার রেওয়াজ ছিল। প্রত্যেক ছেলেকে একটি একটি ছোট প্লট দেওয়া হোতো। কেউ তাতে লাগাত অরহর ডাল, কেউবা চীনা বাদাম আর কেউবা ভুট্টা। কিন্তু যে-ছেলের বাগানে আগাছা হোতো বা জলের অভাবে ফসল মরে যাবার উপক্রম হোতো, তার ক্ষেত কেড়ে নেওয়ার আইন ছিল। সেটাকে আমরা মস্তবড় অপমান বলে মনে করতাম।

জুতো পরবার রেওয়াজ ছিল না। সবাইকে আলখাল্লা পরতে হোতো। হাতে থাকত নিজের মাথা পর্যন্ত লম্বা লাঠি। ছেলেরা তখন সবাই দণ্ডী। এটা তপোবনের

বালখিল্য মুনি বালকদের কি বৌদ্ধ ভিক্ষুদের নমুনায় গ্রহণ করা হয়েছিল, তা বলতে পারি না। এক ধরণের গেরুয়া আলখাল্লা ও লাঠিতে একটা সংঘবদ্ধতার ভাব এনে দিত মনে। এগুলি ব্রহ্মচর্যাশ্রম জীবনের সঙ্গে খুব খাপ খেত।

শান্তিনিকেতনে বর্ষার দিনগুলি খুব উপভোগ্য ছিল। বৃষ্টি এলেই ক্লাশ ছুটি আর ছেলেরা ও মাস্টার মশায়রা বের হয়ে যেতেন বৃষ্টিতে ভিজতে। "মেঘৈর্মেদুরমম্বরং" যেমন দেখেছি শান্তিনিকেতনে, তেমন বোধ হয় কোথাও দেখিনি। দেখতে দেখতে সুরুলের আমবাগানটা বৃষ্টির ধারায় ঝাপসা হয়ে লুপ্ত হয়ে যেত আর বৃষ্টিটা যেন হেঁটে হেঁটে ধান ক্ষেত ও মাঠ পেরিয়ে এসে পড়ত আমাদের শান্তিনিকেতন শাল-বীথির উপর। ঝোড়ো হাওয়ায় ও জলের ঝাপটায় শালগাছগুলির ডালপালাগুলি যেন হাততালি দিয়ে নেচে উঠত।

"শালের বনে থেকে থেকে
ঝড় দোলা দেয় হেঁকে হেঁকে"

এই গান আমরা চাক্ষুষ উপলব্ধি করেছি। উত্তরে খোয়াইতে জল চলতে শুরু করত। খোয়াই পার হয়ে গোয়ালপাড়ার কাছে কোপাই নদী, যার উপর দিয়ে গরুর গাড়ী অনায়াসে চলে যেত, সে শীর্ণ নদী দেখতে দেখতে ভরে উঠত। সে বানের কি স্ফীত স্রোত! ঝাঁপিয়ে পড়া যেত তার মধ্যে। তারপর স্রোতে গা ঢেলে কত কেয়াফুলের গাছের পাশ দিয়ে চলে যেতাম। সে ফুলের গন্ধ এখনো যেন নাকে আসে। অনেকটা ভেসে যাবার পর দূরে একটা রেলের সেতু দেখা যেত। আমাদের বলা ছিল যে, সে সেতুতে পৌঁছবার আগেই ওপারে গিয়ে উঠতে হবে—কেননা সেতুর তলায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের মধ্যে পড়লে বিপদের সম্ভাবনা। পারে যখন ওঠা গেল তখন বৃষ্টি হয়ত থেমে গেছে। তারপর রেল লাইন ধরে ফিরে আসার পালা। দু'একটা তাল গাছে পাকা তাল দেখতে পেলে তাকে পাথর ছুঁড়ে পাড়বার ব্যবস্থাও করা হোতো—তারপর আঁটি নিয়ে কাড়াকাড়ি। এই রকম করে ভিজে কাপড় গায়ে-ই শুকিয়ে যেত। আশ্রমে ফিরে গরম আদার চায়ের ব্যবস্থা থাকত।

এই রকম করে গল্পে-গানে আকাশ বাতাস ও আলোর সঙ্গে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আবহাওয়া আমাদের কিশোর-জীবনে মিশে গেল। প্রায় দু' বছর এই রকম আবহাওয়ার মধ্যে বাস করবার পর একবার ছুটীতে কলকাতার বাড়ীতে ফিরে এসে অসুখে পড়লাম। ছুটীর শেষে আমার আশ্রমে ফেরা হোলো না। কলকাতার স্কুলে ভর্তি হতে হোলো। কিন্তু শান্তিনিকেতনের মায়া পেছুটানের মত রয়েই গেল। পিসতুত দাদা অবাক হলেন আমার বিদ্যালয়ে ফিরে যাবার আগ্রহ দেখে ও তুলো-ধোনার ভয় না থাকায়। প্রায় বছরখানেক পরে আবার ফিরে গেলাম আশ্রমে। সে সব অনেক কথা, পরে বলবার চেষ্টা করবো। কিন্তু আজকের দিনের বলার কথাটি হচ্ছে এই যে, সেদিনকার শান্তিনিকেতনের যে-টান আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে গেল, সে-টান যে আজ পর্যন্ত জীবনে রয়ে গেছে। এ কিসের টান তা কে বলবে।

# পঁচিশে বৈশাখ

**দেবদাস পাঠক**

যখন হৃদয় ক্লান্ত, ক্লান্ত দিন রাত্রির প্রহর,
দুঃসহ গ্লানির ভারে নিপীড়িত জীবন-যৌবন,
স্বপ্নের আশ্বাস নেই—নেই মিঠে মৃদু অবসর,
এখানে হারাল দিশা অরণ্য বিলাসী এক মন।

পিপাসার্ত এ-হৃদয়; তবু কই এতটুকু আলো
কোনখানে নেই বুঝি; আকাশে উৎসুক দুই চোখ
বৃথাই সান্ত্বনা খোঁজে; সে আশ্বাস কোথায় হারাল
হে আকাশ, হে পৃথিবী, হে আলোর উৎস সৌরলোক!

মেঘ-স্বপ্ন আর নেই। জীবন এ-কী-এ ব্যথা হানে,
এ কোন সূর্য আসে বেদনার ভারে ম্রিয়মান।
প্রান্তরের দগ্ধ হাওয়া তবুও বলেছে কানে কানে
পঁচিশে বৈশাখ আছে—আছে তাই এ-জীবনে গান।

[ পূর্বানুবৃত্তি ]

কতদিন বোনঝিকে সংগোপনে ডেকে আদর ক'রে বিজনপ্রভা বিচিত্র নুড্‌রে ছবি দেখিয়েছিল। নীল সফেন উদ্বেলিত সমুদ্র পায়ের নিচে রেখে উত্তপ্ত বালু-বেলায় উদার আকাশের তলায় বিবসনা সুন্দরীদের আকণ্ঠ রৌদ্র-পানের দৃশ্য।

'শরীর, শরীরের জন্যে ওরা না করে কি! এই এটি ইটালীয়ান, ওটি কানাডার মেয়ে, এটি হাঙ্গেরিয়ান,—দেখ, কী অদ্ভুত উরু, আশ্চর্য নিটোল স্তন, সুঠাম বাহু।' ছবির ওপর আঙুল রেখে মাসীমা লিলিকে বুঝিয়েছিল, 'ওরা ত্রিশ বছর বয়সেও আঠারো বছরের মেয়ের সৌন্দর্য, স্বাস্থ্য, শক্তি, ক্ষমতা, উচ্ছলতা, আবেগ শরীর ভরে, মন ভরে ধরে রাখে বেঁধে রাখে, আমরা ভাবতে পারি না—'

কথার শেষে বিজনপ্রভা ছোট্ট নিশ্বাস ফেলেছিল এবং বলতে কি, ছবিতে রৌদ্ররাঙা বালুর ওপর ছড়িয়ে দেওয়া মেলে ধরা সুন্দর শরীর দেখে লিলি যে পরিমাণ অবাক ও আশ্চর্য হয়েছিল, চোখের সামনে ত্রিশ অতিক্রান্তা মাসীমাকে দেখেও সে কম মুগ্ধ বিস্মিত হয় নি!

নিটোল আঁটসাট গড়ন।

গোলাপের মত গায়ের রঙ, আপেলের মত মসৃণ গাল।

একটা কাঁচা টমেটো চুষতে চুষতে, লিলির মনে আছে, প্রথমদিনই বেড়াতে বেড়াতে বিজনপ্রভা বলছিল, 'বোল্ড হতে হয়, আমাদের দেশের মেয়েরা একটু একটু বোল্ড হচ্ছে এটা আশার কথা সন্দেহ নেই। তুই যে ভেঙে না প'ড়ে এখানে ছুটে এলি সেজন্যে আমি তোকে ব্র্যাভো দিচ্ছি।' বিজনপ্রভা হাসছিল কুন্দশুভ্র দাঁত বার ক'রে।

মিহিজামে মাসীমা যতগুলি কথা, কথা নয় উপদেশ দিয়েছিল, লিলি সব মনে রেখেছে, মেনে চলছে এখনও।

রাত্রে শোবার আগে ঠাণ্ডা জলে নেবুর রস খাওয়া, সকালে খোলা হাওয়ায় বেড়ানোর অভ্যাস তার চিরকালের হয়ে গেছে। সংক্ষিপ্ত সজ্জা, স্বল্প গহনা।

'স্মার্ট, খুব স্মার্ট হতে হয় এদিনে।' বলত মাসীমা কতদিন। 'একটা ছেলের চেয়ে আমি কম কিসে, মনের এই জোর রাখবি, এতটা দোড়।'

আশ্চর্য, এখানে যেটা পর্বতপ্রমাণ ভয় ছিল, লিলি এক এক সময় ভাবে, হাসে মনে মনে, যেটা হয়ে উঠেছিল সাংঘাতিক দুঃস্বপ্নের মত, সেখানে গিয়ে সামান্য জ্বরের অসুখের মত যেন হয়ে গেল সবটা ব্যাপার।

এমন চোখে দেখেছিল মাসীমা মেসোমশায়।

আর লিলির, কেন জানি মাঝে মাঝে মনে পড়ে, মিহিজামে হাওয়া-বদল করতে আসা মেসোমশায়ের বন্ধু ধূসর নীল চক্ষু লম্বা সেই আমেরিকান ডাক্তার ডিককে। কী চওড়া হাত, অসম্ভব শক্ত পুরু লম্বা আঙুল ছিল সাহেবের।

বোম্বাই-আখের গিঁঠের মতন আঙুলের এক একটা গিঁঠ, যত শক্ত হোক, অদ্ভুত কোমল ছিল ডিকের হাতের এবং আঙুলের রং। সকালবেলার রোদে একটু লাল হয়ে আসা স্থলপদ্মের পাপড়ির মতন মসৃণ চামড়ায় মোড়া ঝকঝকে পরিচ্ছন্ন হাত। মাঝের দুটো আঙুলে গাঢ় তামাটে রঙের প্রলেপ, লিলি প্রথম বুঝতে পারে নি, পরে মাসীমা বুঝিয়ে বলেছিল, অবিশ্রাম সিগারেট টেনে আঙুলের এই দশা হয়েছে।

ও হ্যাঁ, ডিককে লিলির আরো বেশি মনে থাকার সবচেয়ে বড় কারণ সকালবেলা মেসোমশায়ের বারান্দায় চা খেতে বসে লিলিকে দেখেই মিষ্টি হেসে প্রথম দিন ও বলে উঠেছিল, "You naughty girl." মধুর মৃদু ভর্ৎসনা। অর্থাৎ একটু আগে মেসোমশায় লিলির বিয়ের সম্বন্ধে বলছিল, লিলি তা টের পেল। লিলিকে দেখা শেষ করে ডিক মেসোমশায়ের দিকে মুখ ফিরিয়ে হাসতে হাসতে কোন্ এক ড্রুসিলা সম্বন্ধে কি বলছিল।

তড়বড়ে ইংরেজি কথাগুলো লিলি তখন ভাল বুঝতে পারে নি। পরে রাত্রে খাবার টেবিলে বসে মেসোমশায় বুঝিয়ে দেয় সাহেবের এক বোন আছে দেশে। ড্রুসিলা। হিগিন্স যুদ্ধে যোগ দেবার ঠিক আগের মুহূর্তে বোনটি এমন কাণ্ড বাধিয়েছিল এবং বোনের কেস নিজের হাতে সেরে তবে ডিক যুদ্ধে আসে। লিলির বয়সের মেয়ে ড্রুসিলা।

লিলির অপারেসনের সময় বলতে কি ডিক উপস্থিত ছিল বলে লিলির আগে তবু যে ভয়টুকু ছিল, পরে তা-ও আর থাকে নি। এমন তো সাহেবের বোনেরও হয়েছিল, যেন ভাবত সে।

মিহিজামের অদ্ভুত দিনগুলো লিলি ভুলবে না।

বিশেষ করে মাসীমা ও মেসোমশায়ের যত্ন ও আদর। এখনও মাঝে মাঝে মোহিনীবাবু বলেন, রণধীরের সঙ্গে অনেক দেশ ঘুরে অনেক জায়গা দেখেশুনে বিজনপ্রভার মনের প্রসারতা বেড়ে গেছে। আউট্‌লুক এমন সুন্দর বদলেছে। এগুলো হয় জায়গার গুণে, বৃহত্তর সমাজে মেলামেশা করার ফলে—' চার মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে মোহিনীবাবু পরিতৃপ্তির হাসি হাসেন। বলেন, 'না হলে ওই বিজন, তোমাদের মায়েরই তো বোন, কুসুমপুরের মেয়ে,—বুঝলে না?'

লিলি চুপ করে মাথা নাড়ে। ইরা মীরা মুচকি হেসে দিদির দিকে তাকায় এবং মিহিজামের গল্প শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে মিলি আর দাঁড়িয়ে না থেকে ঘরে কাজকর্ম দেখাশোনা করতে আস্তে আস্তে সরে পড়ে।

স্ত্রী বেঁচে থাকলে কি অবস্থা হ'ত, একটুক্ষণের জন্যে সে কথা মনে নাড়াচাড়া করলেও মোহিনীবাবু তা আর অবশ্য ভাবেন না। বরং কৃতজ্ঞতায় তাঁর মন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে শ্যালিকা বিজনের ওপর।

বলতে কি, মিহিজাম থেকে লিলির ফিরে আসার পর সমস্ত শুনে মোহিনীবাবু মেয়ের ওপর খুশি হয়ে উঠেছিলেন, বিশেষ করে আরো এই জন্যে। যেন এটা তাঁর প্রবাসী আত্মীয় রণধীর দত্ত, শালী বিজনপ্রভা ও উদারহৃদয় হাস্যোচ্ছল বিদেশী বন্ধু ডিকের প্রতি কৃতজ্ঞতা তো বটেই, সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রকাশেরই একটা রূপ।

মাসীমার উপদেশ লিলি অক্ষরে অক্ষরে পালন করছিল সভা-সমিতি সামাজিকতায় নিজেকে বিক্ষিপ্ত ব্যাপৃত রেখে। মনের প্রসারতা তো বটেই, শারীরিক সুষমার সঙ্গে চিত্তের দার্ঢ্য, কোমল লীলার ওপর কঠিন দীপ্তির প্রলেপ, এই নিয়ে আধুনিক মেয়ে এক কথায় তোমায় হীরের মত শক্ত হ'তে হবে হীরের মত উজ্জ্বল অপরূপ।

ইদানীং কথাগুলো আরো সুন্দরভাবে দানা বেঁধেছে লিলির মনে। আর পরিচ্ছন্ন হয়েছে বুদ্ধি, মার্জিত হয়েছে রূপ।

মোহিনীবাবু মেয়ের মুখের দিকে একটুক্ষণ চেয়ে থেকে চোখ নামালেন। হলুদে সুরমা

গোল্ড-ফ্লেকের টিন থেকে একটা সিগারেট তুলে মুখে গুঁজলেন।

'কদ্দুর গেছলে?' সিগারেট ধরিয়ে চেয়ারম্যান প্রশ্ন করলেন।

'পুলিশ সাহেবের কুঠি।' লিলি হাতের ব্যাগ বাবার টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল। 'মিসেস রাজী হয়েছেন।'

'হবেন-ই তো, আমি বলিনি তোমায়?' মোহিনীবাবু অর্ধমুদ্রিত চোখে মেয়ের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। 'এতবড় একটা কাজ করতে যাচ্ছ তোমরা, প্রত্যেক অফিসার-পত্নীর কো-অপারেশন পাবে। আর? আর কার কাছে গেছলে?'

মোহিনীবাবু মেয়ের চোখে চোখে তাকালেন।

লিলি চোখ নামাল।

মোহিনীবাবুর মুখের হাসি আস্তে আস্তে নিভে এল। দুই ভুরুর মাঝখানে সূক্ষ্ম জিজ্ঞাসা-চিহ্ন। গম্ভীর হয়ে যায় চেহারা।

'আমার তো মনে হয়, উচিত তোমাদের, আসছে অ্যানিভার্সারীতে মিসেস রায়কেই প্রেসিডেন্ট করা?'

'মোটা চাঁদা পাওয়া যাবে?' লিলি বাবার মুখের দিকে চেয়ে অল্প হাসল।

'নিশ্চয়।' চেয়ারম্যান উত্তেজনায় চোখ বড় করলেন। 'সমিতি সমিতি করছ তোমরা, সর্বদা মনে রেখো পেছনে অর্থের জোর না থাকলে ও-সব বাঁচানো যায় না, কোনদিনই কেউ পারেনি।' হাসলেন মোহিনীবাবু। 'টাকা, টাকা, বুঝেছ মা, সংসারটাই টাকার চারধারে চড়কির মত ঘুরছে। বুদ্ধি করে সকলের আগে এ্যাদ্দিনে তোমাদের পাপি-লজেই তো যাওয়া উচিত ছিল।' একটু থেমে মোহিনী-বাবু বললেন, 'আমি ভয়ানক প্র্যাকটিক্যাল লোক, মা। খুঁটির জোর, পায়াভারি না থাকলে সমিতি বলো এসোসিয়েশন বলো কিছুই এক রাতের বেশি টিকবে না। দেদার টাকার মালিক ওরা। হ্যাঁ, রায়-গিন্নীকে টেনে নাও, সমিতি রাতারাতি ফেঁপে উঠবে।'

মাথা নেড়ে হৃষ্ট-মনে লিলি ভিতরে চলে যাচ্ছিল, মোহিনীবাবু আবার ডাকলেন, 'শোন।'

মেয়ে ঘুরে দাঁড়াল।

'ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল?' নিভৃত গলায় চেয়ারম্যান প্রশ্ন করলেন।

মেঝের ওপর চোখ রেখে লিলি মাথা নাড়ল।

'অবশ্য, আমার যা আইডিয়া, এদিনে সেন্টিমেন্ট জিনিসটাকে যত কম আমল দেওয়া যায় তত ভাল। কেন, এক আধদিন দেখা করলে দোষ ছিল কি?'

লিলি চুপ।

'যা হবার হয়েছে, ওসব আমরাও মনে রাখিনি ও-ও হয়ত ভুলে গেছে।' দেয়ালের দিকে চোখ রেখে চেয়ারম্যান যেন নিজের মনে বিড়বিড় করছিলেন। 'শুনেছি নিশীথ নিজের জন্য গাড়ি কিনবে। প্রমিজিং ছেলে, আমার তো বেশ পছন্দ হয়।'

অনেকদিন পর লিলির দুই কান আবার লাল হয়ে গেছে।

মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে মোহিনীবাবু মৃদু মৃদু হাসেন।

'বাবা তোমার চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল।'

'আঃ, আমাদের কি একটু কথা বলতে দিবিনে?' রুষ্ট হয়ে লিলি মিলির দিকে তাকাল। মিলি দাঁড়িয়েছিল ভিতরের দিকের দরজায়। স্ক্রীন ঘেঁসে। লিলি যখন বাবার সঙ্গে কথা বলে তখন ভাই বা বোনদের কেউ এঘরে ঢুকলে লিলি বিরক্ত হয়, বিশেষ করে আজকাল। কতরকম কাজের কথা থাকে ওর বাবার সঙ্গে। 'যাচ্ছি, তুমি যাও।' মোহিনী-বাবু দরজার দিকে মুখ ফেরালেন। মিলি সরে যেতে চেয়ারম্যান বড় মেয়ের মুখের দিকে চোখ তুলে নিচু গলায় বললেন, 'তা ছাড়া, যত আধুনিকাই হও তোমরা, বিয়ে জিনিসটা তো আর অ্যাভয়েড করতে পারছ না? ইউরোপ বা অ্যামেরিকার মেয়েরাও এক বয়সে বিয়ে থা করে সংসারী হয়। ওটা যে দরকার।' কথার শেষে চেয়ারম্যান টেনে টেনে হাসেন।

'এখন আমি কিছু উত্তর দিতে পারব না বাবা। রোদে ঘুরে আমার মাথা ঝিমঝিম করছে।'

'না না।' মোহিনীবাবু ব্রস্ত হয়ে হাত নাড়েন। 'তুমি চিন্তা কর। তোমার ইচ্ছার ওপরই আমি সব ছেড়ে দিয়েছি।'

(ক্রমশঃ)


# জরুরী ঘোষণা

**এতদ্দ্বারা সর্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, ১৩৫৬ সালের ১লা বৈশাখ হইতে**

## লক্ষ্মীবিলাস তৈলের

বোতল ও শিশিতে

**এই সঙ্গে দেওয়া নমুনা মত স্পেসাল গ্রীণ রংএর**

## ক্যাপস্থল

**লাগান হইতেছে।**

কিনিবার সময় বোতল বা শিশিতে উহা আছে কি না ভাল করিয়া দেখিয়া লইবেন এবং কোনরূপ ছেড়া, ফাটা হইলে উহা নিতে অস্বীকার করিবেন। ব্যবহারের পূর্বে অনুগ্রহপূর্বক ক্যাপসুলটী ছিঁড়িয়া ফেলিবেন—যাহাতে নকলকারীরা উহা পুনরায় ব্যবহার করিতে না পারে।

## এম, এল, বসু এণ্ড কোং লিঃ

**লক্ষ্মীবিলাস হাউস, ১৪নং জগন্নাথ দত্ত লেন, কলিকাতা।**

# বিজ্ঞমুখের কথা

মৃত্যু থেকে রোগের কথা আসাই স্বাভাবিক। রোগের ভয় অত্যন্ত স্বাভাবিক একটা প্রবৃত্তি, যার সঙ্গে মৃত্যুভয়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু মনের ভিতরে এই রোগভীতি যেভাবে কাজ করে চলে যে ওটাকে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দ্বারা নতুন অর্থ দেওয়া হয়। যে ব্যক্তি মৃত্যুভয়গ্রস্ত তাকে আমরা দুর্বল অসহায় ভেবে কৃপার চক্ষে দেখি, মনে মনে শ্রদ্ধা করি না। কিন্তু যে মানুষ সমস্তক্ষণ রোগচিন্তায় তন্ময়, তাকে বাতিকগ্রস্ত বলে ভাবলেও তেমন অবজ্ঞার পাত্র হিসেবে দেখি না। যার রোগভয় আছে, তার খানিকটা সাধারণ বৈজ্ঞানিক বোধ আছে এবং রোগের স্বরূপ ও লক্ষণ নির্ণয় করবার ক্ষমতা আছে। সর্বদা রোগ-চর্চা করে করে তার কিছুটা আধা-ডাক্তারি হাব-ভাব এসে যায়। এবং সে ব্যক্তি যখন স্বাস্থ্যরক্ষার খাতিরে সতর্ক থাকে এবং গায়ে পড়ে পরকেও সাবধান হতে উপদেশ দেয়, তখন শ্রোতা একটু বিচলিত না হয়ে পারে না। তা ছাড়া আত্মরক্ষা অতি আদিম প্রচেষ্টা। কাজেই রোগচিন্তায় মগ্ন মানুষকে নিয়ে আমরা যথেষ্ট ঠাট্টা-তামাসা করি বটে। কিন্তু তার কার্যকলাপগুলো সযত্নে ও কৌতূহলী চিত্তে অনুধাবন করে থাকি। মনে-মনে ভাবি, হবেও বা! এই মানুষটা অনেক ভেবেছে, পড়েছে ও দেখেছে। তারপর ক্রমশ তার আচরণ আর রোগের প্রতিষেধক প্রক্রিয়াগুলি আমাদের তেমন আর বিস্মিত করে না। বরঞ্চ একটু একটু করে আমাদের জীবন ও চিন্তাকে সংক্রামিত করে। অতএব মৃত্যুভয় এর উৎপত্তি হলেও, রোগভয় জিনিসটার অর্থ বদলেছে এবং আসল চেহারাটাও বর্ণচোরা। স্বাস্থ্যরক্ষা, আত্মরক্ষা এবং পৌর কর্তব্য দায়িত্বের অছিলায় রোগভয় সূক্ষ্মভাবে, বৈজ্ঞানিক পোষাক পরে আমাদের ব্যবহারিক জীবনে একটা স্থায়ী আশ্রয় নিয়েছে।

কয়েকটি দৃষ্টান্ত না দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে না। আপনারা অকারণে সন্ত্রস্ত হবেন না। যুদ্ধোত্তর যুগে এমনিই তো মরে রয়েছি। আধপেটা খেয়ে, ভেজাল বস্তু গলাধঃকরণ করে, এক কামরায় ছ'জন শুয়ে বর্তমানে নাগরিক জীবন তো মূষিক-সমাজে রূপান্তরিত হয়েছে। তারপর সেই ঝির্নঝিনিয়া থেকে সুরু করে প্লেগ, কলেরা, বসন্ত, টাইফয়েড এবং অবশেষে ছেলেধরা প্রভৃতি সত্য এবং মিথ্যা হুজুগে প্রাণ তো জেরবার হয়ে গেল। এ অবস্থায়, বিশেষ করে দুর্ভিক্ষ আর দাঙ্গার পর থেকে আমরা যেভাবে বাস করছি এবং বঙ্গ-বিচ্ছেদের ফলে যে হারে জনসংখ্যার চাপ পড়েছে এ শহরের স্বাস্থ্যের ওপর, তাতে পরমাত্মা যদি এই কদর্য এবং জীর্ণ পুরাতন খাঁচা ছেড়ে চলে যেতে চায়, তা হলে বিশেষ কিছু বলবার থাকে না। ব্যক্তিগতভাবে বলতে পারি, আধিভৌতিক দেহান্তে আমি যুক্ত ভারত রাষ্ট্র অথবা পাকিস্থান কোথাও থাকতে চাই না। সেখানে আছে ব্যাধি, আছে অর্থনৈতিক জীবন সমস্যার উৎকট সমাধান, আছে পোলিটিক্যাল স্বর্গ-নরকের কল্পান্তব্যাপী বিরোধ। এ বিষয়ে আমার যদি কোনও স্বাধীনতা থাকে, তাহলে আমার প্রাণ-পক্ষী যেন অ্যালুশিয়ন দ্বীপমালায় অথবা দক্ষিণ মেরুর নিঃসঙ্গ তুষার-প্রান্তরে নব-আবিষ্কৃত নির্জন হ্রদের তীরে বিচরণ করে।

কিন্তু সে কথা থাক্। রোগ-সম্পর্কে বেশি কৌতূহল না থাকাই ভালো। ম্যালেরিয়া প্রভৃতি সাধারণ রোগ আমাদের খুবই পরিচিত এবং এর মোটামুটি লক্ষণগুলো আমরা সবাই জানি। কিন্তু ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া কিংবা কোনও বড় রকমের অসুখ সম্পর্কে বেশি জ্ঞানার্জন করবার স্পৃহা থাকলে মুশকিলে পড়তে হয় বৈ কি। ধরুন, আপনার জ্বর হয়েছে এবং সেই সঙ্গে মাথার যন্ত্রণাও শুরু হয়েছে। হঠাৎ মধ্য রাত্রে যদি সেই বেদনা ক্রমশ মুখের দিকে নেমে এসে আপনার চোয়াল আক্রমণ করে অর্থাৎ ব্যথায় হাঁ করতে না পারেন, তখন যদি আপনার জানা থাকে যে মেনিন-জাইটিসের কয়েকটি লক্ষণের সঙ্গে আপনার উপসর্গগুলোর আশ্চর্য রকমের সাদৃশ্য আছে, তখন মনের অবস্থা কেমন হয়? লিভারের দোষে যদি কারুর ঘুসঘুসে জ্বর ও কাসি হয়, তাহলে অসুস্থ ব্যক্তি যদি ক্রমাগতই ফুসফুসের মারাত্মক ব্যাধি-চিন্তায় মগ্ন থাকেন, তাহলে কিছুদিনের মধ্যে তাঁকে স্নায়ুর পীড়ায় শয্যাগ্রহণ করতে হবে।

এই কথাটা উল্লেখ করছি এই কারণে যে বেশির ভাগ মানুষ রোগের নাম-ধাম না জেনে ভালোই থাকে। আর শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান রোগী হলে নিজে ভেবে-ভেবে, ডাক্তারকে জেরা করে অথবা পরোপকারী আত্মীয়-বন্ধুর পরামর্শে নিজের স্বাস্থ্য আরও নষ্ট করেন এবং আরও পাঁচজনকে উত্যক্ত করে তোলেন। একজন ভদ্রলোককে দেখেছি যাঁর রক্তচাপ অত্যধিক ছিল। কিন্তু তিনি মোটে রোগের কথা নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। অত্যাচারও করতেন না। স্নানাহার নিয়মিত করে ডাক্তারের উপদেশ মত চলতেন এবং তাতে তাঁর পরমায়ু দীর্ঘই হয়ে-ছিল। অপর একজন ভদ্রলোক ছিলেন গুণী ও জ্ঞানী ব্যক্তি। তিনি ঐ রোগ-সংক্রান্ত সমস্ত মেডিক্যাল লিটরেচার পড়ে ফেলে সপ্তাহে দু'বার করে ডাক্তার বাড়ী ছুটতেন এবং রক্তচাপ পরীক্ষা করাতেন। ফলে তিন বছরের মধ্যে এই রোগের যেটা স্বাভাবিক লক্ষণ এবং সব চেয়ে ক্ষতিকর উপসর্গ, অর্থাৎ মানসিক অশান্তির ফলে শয্যাশায়ী হলেন এবং মারা গেলেন। দুটো চারটে উদাহরণ থেকে একটা সাধারণ মন্তব্যে পৌঁছানো যুক্তিসংগত নয়, মানি। কিন্তু দেখে শুনে মনে হয় রোগ সম্পর্কে বেশি কৌতূহল অথবা পাণ্ডিত্য না থাকাই ভালো। রোগ বরাবরই আছে এবং থাকবেও। কেবল বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে তাদের রূপ ও লক্ষণ ভালোভাবে জানা গেছে, তাদের নতুন নামকরণ হয়েছে এবং প্রতিষেধক চিকিৎসার ব্যবস্থাও আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু এ সব চিন্তা বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসকের মাথাতেই থাকুক। আপনার আমার মাথা তাই নিয়ে যদি অযথা উত্তেজিত হতে থাকে, তা হলে পরমায়ু আপনিই কমে আসবে। স্বাস্থ্য ও রোগ সম্পর্কে বিশেষ করে কয়েকটা সাধারণ ও সংক্রামক ব্যাধি সম্পর্কে কিছুটা সাধারণ জ্ঞান এবং পৌর দায়িত্ববোধ থাকা নিশ্চয়ই উচিত। কিন্তু তাই নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে আমাদের মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠে। যারা যত বেশি রোগ-চিন্তা করে, তারা তত অসুস্থ হয়ে পড়ে এ কথাটা মিথ্যা নয়। আর যারা কম চিন্তা কাতর, তাদের দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ততই ভালো। আমার নিজস্ব ধারণা যে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষক অধ্যাপক আইনজীবীর দলই রোগ সম্পর্কে অতি মাত্রায় সচেতন। যদি সকলের আন্তরিক স্বীকারোক্তি প্রকাশ করা সম্ভব হয়, তাহলে দেখা যাবে নিউরটিক বা হাইপোকন্ড্রিয়াকের সংখ্যা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই বেশি। রোগ, রোগের লক্ষণ ও তার পরিণতি সম্বন্ধে এ'দের চিন্তা এবং কল্পনা বহু দূরে প্রসারী। শুধু তাই নয়, বিজ্ঞাপন থেকে চিকিৎসা শাস্ত্রের নবতম মন্তব্য এ'দের জানা আছে। ফলে এ'দের চিকিৎসা করা মুশকিল।

আর একটি কথা। পরোপকারী পরামর্শ-দাতা তথাকথিত হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুদের কাছ থেকে দূরে থাকাই সমীচীন। এক ধরণের লোক আছেন যাঁদের ভয় দেখিয়েই আনন্দ। আপনি হয়তো স্নান করেননি, সারাদিন কাজকর্মে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরছেন। রাস্তায় দেখা হল এই ধরণের আপনার এক পরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে। তিনি আপনাকে দেখা মাত্রই বলে উঠলেন, "কি হয়েছে? শরীরটা যে ক্রমশ খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তুমি মোটেই যত্ন নিচ্ছ না স্বাস্থ্যের......স্বাস্থ্যকে অত অবহেলা করলে একদিন ঠকতে হবে আমার ভগ্নীপতির মতন......অত পয়সার চিন্তায় ব্যস্ত থাকলে শরীর কি টেঁকে, বাবা? আর এই সময়ে ধুতি-পাঞ্জাবী পরে সারা শহর কি ঘুরে বেড়ানো উচিত! গাম্-বুট না হয় নাই পরলে। কিন্তু মোজা-পাৎলুন থাকলে অনেকটা নিরাপদ। আজকাল শুধু বিউবনিক নয়, নিউমনিক এবং সেপ্টিসিমিক! ক্লান্ত শরীরে আক্রমণটাও আকস্মিক। না, না ভয় পেয়ো না। তবে অতটা বেপরোয়া ঘুরে বেড়িয়ে দেহের জখম কোরো না। কি জানো—যেতে হবে সকলকেই ......কিন্তু অসময়ে বেঘোরে যাওয়াটা কি ভালো......?"

পঁচিশে বৈশাখ। এই দিনের অপরিম্লান সূর্যোদয়টি আমরা বিনম্র কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করিতেছি আর লোকান্তরিত মহামানবকে নিবেদন করিতেছি আমাদের ভূমিষ্ঠ প্রণাম। সব দেশে যিনি নিজের ঘর খুঁজিয়াছিলেন তাঁকে কোন ভৌগোলিক গণ্ডীতে আবদ্ধ রাখা যায় না। তবু রবীন্দ্রনাথ যে আমাদের ঘরেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এই আত্মগৌরব গোপন করার প্রয়াস আমাদের পক্ষে বৃথা।—

* * * * °

কাব্যটা বিশু খুড়োর বড় একটা আসে না। কিন্তু তবু আজ রবীন্দ্র জন্ম-বার্ষিকীর প্রসংগে খুড়ো একেবারে তন্ময় হইয়া উঠিলেন। তাঁর মন্তব্যগুলি আজ রবীন্দ্র-আবৃত্তি-উদ্ধৃতির মধ্য দিয়া মহাকবির স্মরণ-খানিকে আমাদের কাছে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিল।

* * * * °

একটি সংবাদে প্রকাশ, পাকিস্তান নাকি কাশ্মীরে প্রায় আশীটি স্থানে যুদ্ধ-বিরতি সীমানা লংঘন করিয়াছে। খুড়ো বলিলেন—কিন্তু তাঁরা তাঁদের আদর্শের সীমানা লংঘন করেননি—সীমার মাঝে অসীম তুমির প্রতি তাঁদের আনুগত্য চিরকালের।

* * * * °

শহীদ সুরাবর্দী অতঃপর স্থায়ীভাবে পাকিস্তানে বসবাস করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। খুড়ো বলিলেন—"মনে না করে উপায় নেই—মালা ছিল তার ফুলগুলি গেছে, রয়েছে ডোর।"

* * * * *

রামধুন গাহিতে গাহিতে সত্যাগ্রহীদের উপর গুণ্ডাদের আক্রমণ—মানভূমের এক খবর। বিশু খুড়ো বলিলেন—"অনুমান করতে বেগ পেতে হয়না তারা হয়ত রাম-ধুনের সংগে বাপুজীকেও স্মরণ করেছেন এবং মনে মনে বলেছেন তোমায়—পিতা বলে শুধু জানি, তোমায়— নত হয়ে যেন না মানি" !!

* * * * °

রেডিওতে রবীন্দ্র সংগীতের অশুদ্ধ সুর সম্বন্ধে আমরা অনেকদিন হইতেই নানা রকম অভিযোগ শুনিয়া আসিতেছি। অভিযোগটা কোন কোন রবীন্দ্র সংগীতের গায়ক-গায়িকা সম্বন্ধে একেবারে মিথ্যা নয়। খুড়ো এই প্রসংগে বেতারকেন্দ্র সম্বন্ধে মন্তব্য করিলেন—"যে-গান কানে যায় না শোনা, সে-গান সেথা নিত্য বাজে"।

* * * * °

সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, প্রজাতন্ত্রী-ভারত রাজানুগত্যের দায় হইতে মুক্ত। কিন্তু পাকিস্তানের কথা জিজ্ঞাসা করিলে—খুড়ো বলিলেন—"লিয়াকৎ আলি সাহেব গানে নিবেদন জানিয়েছেন—বেঁধেছিনু, রাখী পরাণে তোমার, সে রাখী খুলো না ভুলো না।"

* * * * °

বিলাতে মন্ত্রি-সম্মেলন, রাজপ্রাসাদে ভোজ, মহা আড়ম্বরের মধ্যে সমরসিংহ মিঃ চার্চিলের কোন উল্লেখ দেখিতে পাইলাম না। খুড়ো বলিলেন—"তিনি ঘরে বসে নিশ্চয়ই Liquidation এর কথা ভেবেছেন এবং সেই পুরানো গানই গেয়েছেন—রাজপুরীতে বাজায় বাঁশী বেলা শেষের গান !!

* * * °

দিল্লীতে ছেলেরা পরীক্ষা স্থগিতের জন্য ধর্মঘট করিয়াছেন। —"তাই তো, খোকা আমার সে খোকা আর নাইতো"—বাধ্য হইয়াই খুড়োকে টিপ্পনী কাটিতে হয়।

* * * * °

NO fees should be recovered from a paying patient if he dies on the day of his admission to a Government or State aided hospital—

বোম্বাই সরকারের একটি বিজ্ঞপ্তি। একটি অসমর্থিত বিজ্ঞপ্তির কথা উল্লেখ করিয়া খুড়ো বলিলেন—হাসপাতালের কর্মচারীরা রোগীর মৃত্যুর ঠিক পূর্বে মুহূর্তে তার কানে কানে বলে দেবেন—মনে রেখো এক বিন্দু দিলাম শিশির।

* * *

সরকারী বিবৃতি এবং সতর্কবাণী সত্ত্বেও কালোবাজার এখনও পুরাদমে চলিতেছে এবং এই বাজারে ট্রামে-বাসের যাত্রী-শ্রেণীর সাধারণ ক্রেতারাই খাইতেছেন। প্রসংগটা উত্থাপন করি বিশু খুড়ো মন্তব্য করিলেন—"অমন তোমরা বলো না, কালো বাজার কোথায় কালো তারে বলে গাঁয়ের লোক।"

* * * * °

কলিকাতায় সম্প্রতি একটি চিতা বাঘের বাচ্চার আবির্ভাব লইয়া অনেক আলোচনা গবেষণা হইয়া গিয়াছে কিন্তু তাহার আকস্মিক আগমনের হেতু কেহই নির্ণয় করিতে পারেন নাই। বিশু খুড়ো বলিলেন—"অনেক ব্যাপারে কোলকাতা মাটি অঞ্চল হলেও বাণী-বিবৃতির অভাব এখানে নেই; সুতরাং শুনে তোমার মুখের বাণী আসবে ছুটে বনের প্রাণী—এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

* * * * *

আজ কয়েক বৎসর কলিকাতার বাজারে ইলিশ মাছ দুর্লভ হইয়াছে বলিয়া জনৈক সহযোগী আক্ষেপ করিয়াছেন। রসিক বাঙ্গালীর সান্ত্বনাটার ইংগিত সহযোগী যা দিয়াছেন—খুড়োর মুখে আমরা তাহাই কাব্যরূপ পাইলাম—"গন্ধ তাহার ভেসে বেড়ায় উদাস করিয়া।"

* * * * *

কলিকাতায় ভাড়াটে বাড়ীর সমস্যারও কোন দিক হইতে কোন মীমাংসা এখনও হইল না। খুড়ো বলিলেন—"তার হবেও না, এ বস্তুটি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছে পর্যন্ত দুর্লভ ছিল, তিনিও আক্ষেপ করে গেছেন—ধন নয়, মান নয়, এতটুকু বাসা।"

* * * *

ত্রিকেন্দ্রাম্‌ জেলখানায় বন্দী কমিউনিস্টরা নাকি সরকারী খরচায় সিগারেট খাওয়ার দাবী জানাইয়াছেন। —"ভাগ্য ভালো, তারা যে দাবী জানান নি—একটি ছটাক সোডার জলে বাকী তিন পো হুইস্কি"—মন্তব্য করিল আমাদের শ্যামলাল। আজ শ্যামও রবীন্দ্রনাথ আওড়ায়—ওয়া গুরুজী কী ফতে!

# হিউএন্ চ্যাঙ্-এর ভারতভ্রমণ

## —শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু—

(পূর্বানুবৃত্তি)

### ভারতবর্ষের সাধারণ বর্ণনা
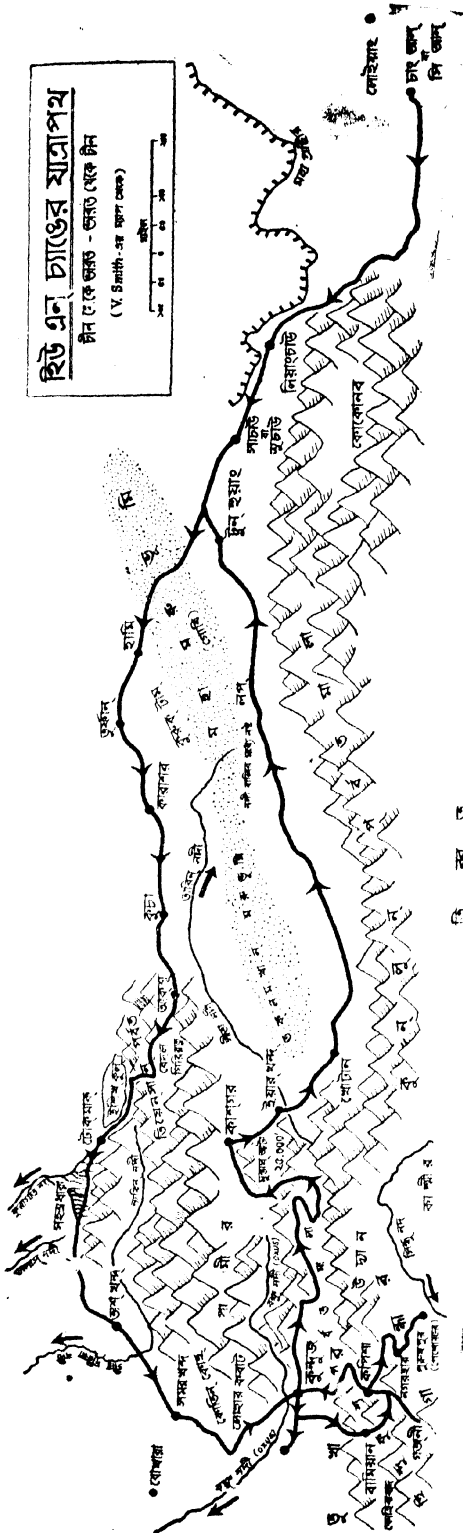
হি **উএনচাঙ** তাঁর গ্রন্থে সমগ্র ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একটা সাধারণ বর্ণনা দিয়েছেন। এই বর্ণনার মুখ্য অংশগুলি নীচে সংকলিত হোল।

**নাম।** ভারতবর্ষের অধিবাসীরা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন নাম ব্যবহার করেন। কিন্তু সমস্ত দেশের কোন একটা নাম ব্যবহার করেন না। পুরাকালে কেউ একে 'সিনতু' বলেছেন, কেউ বা 'হিএনতাই' বলেছেন। আমার মতে 'ইনতু' নির্ভুল আর ভালো। আমাদের ভাষায় 'ইনতু' মানে চন্দ্র। আর সূর্যাস্তের পর যখন পৃথিবী অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে, তখন চন্দ্রালোকই যেমন সমস্ত জীবলোকের সব চেয়ে আনন্দকর সহায় হয়, তেমনি অজ্ঞানান্ধকারে মগ্ন সংসার-চক্রে ঘূর্ণমান প্রাণীদের জন্যে এই দেশের সাধু ও জ্ঞানী ব্যক্তিরাই যুগে যুগে আলো বিকিরণ কোরে তাদের পথ দেখিয়েছেন।

এদেশের পরিবারগুলি যে সব জাতিতে বিভক্ত, তার মধ্যে ব্রাহ্মণরাই পবিত্রতা ও মহত্ত্বের জন্যে বিশিষ্ট। এই জন্যে সাধারণ লোকে এদেশকে ব্রাহ্মণের দেশও বলে থাকে।

**দেশের পরিমাণ ইত্যাদি।** সমগ্র ভারতবর্ষকে সাধারণত পঞ্চ ভারত বলা হয়।*

এর পরিধি আন্দাজ ১৮০০০ হাজার মাইল। তিন দিকে সমুদ্র, উত্তরে হিমালয়। উত্তর দিকটা চওড়া, দক্ষিণটা সরু। আকারে অর্ধচন্দ্রের মতো। দেশটা গরম। উত্তর ভাগে পর্বত। পূবে সুজলা উপত্যকা আর সমতল; প্রচুর শস্য ও ফল হয়। দক্ষিণ দেশ অরণ্য সংকুল। পশ্চিম প্রস্তরাকীর্ণ অনুর্বর।

**নগর গৃহ ইত্যাদি।** নগর ও গ্রামে চতুর্দিকের দেওয়াল উঁচু ও চওড়া। রাস্তা-পথ সবই আঁকা-বাঁকা। রাস্তা অপরিস্কার। দুদিকের দোকানগুলিতে পরিচায়ক চিহ্ন আছে। মাটি নরম হওয়ায় শহরের দেওয়ালগুলি ইঁটের বা টালির তৈয়ারী; গৃহগুলিতে নীচের ও উপরের তলায় বারান্দা চাতাল থাকে। এগুলি কাঠের তৈয়ারী; কাঠের উপর চূণ বালি লেপা। ছাদ, টালির। গৃহগুলির আকার চীনদেশেরই মতো। চারিদিকে ফুল ছড়িয়ে দেবার প্রথা আছে। কসাই, জেলে, নর্তক, জহ্লাদ আর মেথরেরা শহরের বাইরে ছোট ছোট দেওয়াল ঘেরা ঘরে বাস করে। এরা শহরের আসবার বা শহর থেকে যাবার সময় রাস্তার বাঁ দিক ঘেঁসে যায়।

সঙ্ঘারামগুলি আশ্চর্য নিপুণভাবে তৈয়ারী। চার কোণে তেতলা স্তম্ভ থাকে। কড়িকাঠগুলির বাইরের অংশ কারুকার্যময়। দরজা জানলায় খুব রং করা থাকে। ভিক্ষুদের ঘরগুলি কেবল ভেতর দিকে কারুকার্য করা।

উঁচু চওড়া হলটি বাড়ির ঠিক মধ্যখানে। বাড়িগুলি অনেক তলা হতে পারে। স্তম্ভগুলির উচ্চতা ও আকার নানা রকম, এর কোন স্থির নিয়ম নেই। দরজাগুলি পূবের দিকে খোলা। রাজসিংহাসনও পূবের দিকে মুখ করা।

**আসন, পরিচ্ছদ।** এরা মাদুরের উপর বিশ্রাম করে। রাজপরিবার ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মাদুর নানা রকমভাবে অলংকৃত কিন্তু আকারে সবই এক। রাজার সিংহাসন

---

* **পঞ্চ-ভারত** (আধুনিক নাম অনুসারে)—

(১) **উত্তর-ভারত**—পাঞ্জাব, কাশ্মীর, আফগানিস্থান।

(২) **পশ্চিম-ভারত**—সিন্ধু, পশ্চিম রাজপুতানা, কচ্ছ, গুজরাট, নর্মদার দক্ষিণ অংশ (সমুদ্রতীর পর্যন্ত)।

(৩) **মধ্যভারত**—গাঙ্গেয় প্রদেশগুলি (থানেশ্বর থেকে ভাগীরথীর উত্তর পর্যন্ত। দক্ষিণে নর্মদা পর্যন্ত)।

(৪) **পূর্ব-ভারত**—বাঙলাদেশ, আসাম, সম্বলপুর, উড়িষ্যা, গঞ্জাম।

(৫) **দক্ষিণ-ভারত**—বাকি দক্ষিণ অংশ। (Cunningham)

খুব উঁচু আর বড়, নানা রত্নে খচিত আর সূক্ষ্ম বস্ত্রে ঢাকা। পাদানিও রত্নখচিত। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা রুচি অনুসারে চমৎকার রঙীন আর দামী আসন ব্যবহার করেন।

এরা কাটা কাপড় ব্যবহার করে না। সাদা পরিচ্ছদই পছন্দ করে। পুরুষেরা কাপড়টা কোমরে আর বগল পর্যন্ত জড়িয়ে দেয়। আর ডান কাঁধ খোলা থাকে। মেয়েদের কাপড় মাটি পর্যন্ত পড়ে; আর গা সম্পূর্ণ ঢাকা থাকে। মাথার উপরে একগোছা চুল বাঁধা থাকে আর অবশিষ্ট চুল ছাড়াই থাকে। পুরুষদের কারো কারো গোঁফ কামানো বা অন্য কোন অদ্ভুত অদ্ভুত প্রথা আছে। মাথায় ফুলের মালা, গলায় রত্নহার থাকে। পরিচ্ছদ রেশম বা সুতীর। আর এক রকম তিসির কাপড় আছে, তাকে ক্ষৌম বলে। ছাগলের লোমেও পোষাক হয়।

উত্তর ভারতে শীত হয় আর লোকে আঁট, খাটো পোষাক পরে। বিধর্মীদের (হিন্দু, জৈন, সন্ন্যাসী ইত্যাদি) পরিচ্ছদ ও প্রসাধন হরেক রকমের। কেউ ময়ূরের পালক পরে, কেউবা মাথার খুলির মালা পরে, কেউ সম্পূর্ণ নগ্ন, কেউ পাতা বা ছাল পরে, কেউ কেশোৎপাটন করে, কেউ গোঁফ ছাটে, কেউবা জটাধারী; কেউ লাল, কেউ সাদা কাপড় পরে।

শ্রমণদের কেবল তিন পরিচ্ছদ (সংঘটি, সংকক্ষিকা, নিবাসন)। আকারে সম্প্রদায় অনুসারে অল্প প্রভেদ হয়। হলুদে লাল দু রঙেরই আছে। সাধারণ ক্ষত্রিয় আর ব্রাহ্মণরা পরিচ্ছন্ন সভ্য পরিচ্ছদ পরেন আর সাদাসিদে ও মিতব্যয়ীভাবে থাকেন। রাজা আর মহামন্ত্রীরা হাতে গলায় অলংকার পরেন। রত্নখচিত মুকুট পরেন, মাথায় ফুলের মালা পরেন।

স্বর্ণালংকার ব্যবসায়ী ও অন্য ধনী বণিকরা বেশীর ভাগ নগ্ন পদেই থাকেন। কম লোকেই পাদুকা ব্যবহার করেন। এঁদের দাঁতে কালো বা লাল রঙ করা (পান?)। এঁরা চুল বাঁধেন আর কর্ণবেধ করেন, নাকে গহনা পরেন। এদের বড় বড় চোখ।

এঁরা শারীরিক পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে খুব মনোযোগী। খাবার আগে সকলেই স্নান করেন। ভুক্তাবশেষ খান না। অপরের খাওয়া খাদ্য খান না। মাটি বা কাঠের বাসনে খেলে সেগুলি ভাঙতেই হয়। খাবার পর এরা দাঁতন করে, হাত, মুখ ধোয়।

এঁটো হাতে কারোকে ছোঁয় না। শৌচের পর শরীর ধুয়ে চন্দন কাঠ বা হলুদের গন্ধ মাখা হয়।

রাজা যখন স্নান করেন, বাদ্য সহকারে স্তোত্র পাঠ হয়। সকলেই পূজার আগে স্নান করেন।

### লিপি, ভাষা, বিদ্যা, গ্রন্থ

ভারতের অক্ষরগুলি ব্রহ্মাদেব সৃষ্টি করেন (ব্রাহ্মী)। কালক্রমে নানা প্রদেশে এই লিপি ক্রমশ একটু একটু ভিন্ন হয়ে গিয়েছে। কিন্তু খুব বেশী বদল হয়নি। মধ্য ভারতের (গঙ্গাতীরের) ভাষাই অবিকৃত অবস্থায় আছে; এখানে উচ্চারণ শ্রুতিসুখকর, পরিষ্কার, দেবতাদের মতন আর সমস্ত মানুষের অনুকরণীয়।

প্রত্যেক প্রদেশে একজন কর্মচারী আছেন যার কাজ ঘটনাগুলি লিপিবদ্ধ করা। এই বিবরণগুলির নাম নীলপিট।

বালকদের নানা বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়: প্রথমে সিদ্ধিরস্তু * তারপর শব্দবিদ্যা (ব্যাকরণ) শিল্পস্থান বিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা হেতুবিদ্যা, অধ্যাত্মবিদ্যা। ব্রাহ্মণরা চতুর্বেদ পড়েন। সমস্তবিদ্যা খুব গভীরভাবে শেষ পর্যন্ত না জানলে কেউ শিক্ষক হোতে পারে

---

* একশত বৎসর আগেও বাঙলা দেশে বর্ণপরিচয়ের নাম ছিল "সিদ্ধিরস্তু"। মন্মথকুমার বসু—স্মৃতিকথা ৮ পৃঃ।


## নূতন উপায়ে শ্যামদেশীয় চালের ভাত রান্না করুন

এই চালের ভাত ঠিকভাবে রান্না ক'রতে সম্ভবতঃ আপনার অসুবিধা হয়। সচরাচর যেভাবে ভাত রান্না করা হয়, সেভাবে রান্না ক'রলে এই চালের ভাতের সমস্তটা গলে গিয়ে আঠালো একটা দলা বেধে যায় অভিযোগ শোনা গেছে।

কেন্দ্রীয় খাদ্যশস্য পরীক্ষাগারে দেখা গেছে যে, নিম্নলিখিত উপায়ে এই চালের বেশ ভাল ভাত রান্না করা যায়। আপনিও এই নিয়মে এই চালের ভাত রান্না ক'রে দেখতে পারেন:—

(ক) **সাধারণ নিয়ম:** ধরুণ, আপনাকে আড়াই ছটাক চালের ভাত রান্না ক'রতে হবে। তাহলে প্রথমতঃ আড়াই ছটাক জল ফুটিয়ে নিন। এই জলে ঐ পরিমাণ চাল মিশিয়ে মৃদু আগুনে সিদ্ধ হ'তে দিন। চাল যখন আধাসিদ্ধ হবে, তখন তাতে আর কিছুটা জল (ধরুণ, এক ছটাক) মিশিয়ে নাড়তে থাকুন। মনে রাখবেন যে, বেশী জোর না দিয়ে ধীরে ধীরে নাড়তে হবে। বেশীক্ষণ ধরে নাড়াও ঠিক নয়। যখন দেখবেন যে, পাত্রের ভিতর আর জল নেই আর চাল সিদ্ধ হয়ে গেছে, তখন উনুনের ওপর থেকে পাত্রটি নামিয়ে রাখুন। এভাবে রান্না ক'রলে এ চালের ভাত গলে গিয়ে দলা বেধে যাবে না। ভাতের এক-একটি দানা আর একটি দানা থেকে মোটামুটি পৃথকই থাকবে আর তা খেতেও ভাল লাগবে।

(খ) **চাল ভিজিয়ে রান্না করার প্রণালী:** আড়াই ছটাক চাল আড়াই ছটাক জলে প্রায় ১৫ ঘণ্টাকাল ভিজিয়ে রাখুন। তারপর ঐ জলসুদ্ধ চাল মৃদু আগুনে সিদ্ধ ক'রতে থাকুন আর দু'একবার ধীরে ধীরে চালগুলো নেড়ে দিন। এতে আর জল মেশাবার প্রয়োজন নেই। এভাবে রান্না ক'রলে এ চালের ভাত দলা বেধে যাবে না।

(গ) **ভেজে রান্না করার প্রণালী:** দুই তোলা ঘিতে আড়াই ছটাক চাল মৃদু আগুনে ভাজুন। যখন দেখবেন যে, চালের সাদা রং একটু একটু লাল হয়ে উঠেছে, তখন তাতে আড়াই ছটাক পরিমিত জল মিশিয়ে দিন। চাল আধাসিদ্ধ হ'লে তাতে আর ছটাকখানেক জল দিন। এভাবে রান্না ক'রলে ভাত দলা বেধে যাবে না, সে ভাত খেতে ভাল লাগবে, আর ভাতের দানাগুলি উল্লিখিত দু'টি প্রণালীতে রান্না-করা ভাতের দানার চেয়েও আলগা আলগা থাকবে।

(ঘ) **ভাপে সিদ্ধ ক'রে রান্না করার প্রণালী:** আড়াই ছটাক চা লে সমপরিমাণ জল মিশিয়ে স্টীম কুকারে সিদ্ধ হ'তে দিন। এই উপায়ে রান্না ক'রলে ভাত দলা বেধে যাবে না আর তা' খেতেও সুস্বাদু হবে। ভাতের দানাগুলি অন্য তিনটি প্রণালীতে রান্না-করা ভাতের দানাগুলির চেয়ে আরো একটু পৃথক পৃথকভাবে থাকবে।

শ্যামদেশে কিছু পরিমাণ এই ধরণের চাল উৎপন্ন হয় এবং যাঁরা শ্যামদেশের চাল নিয়ে থাকেন, তাঁদের বরাদ্দ চালের মধ্যে এই রকম কিছুটা চাল গ্রহণ করা একান্ত উচিত। যদি আমরা এই ধরণের চাল না নিই, তা'হলে সেই সঙ্গে শ্যামদেশের যে পরিমাণ চাল আমাদের জন্য বরাদ্দ করা আছে, তার সমস্তটাই আমাদের হারাতে হয়। সরবরাহের বর্তমান অবস্থায় খাদ্যের বরাদ্দ এভাবে নষ্ট হ'তে দেওয়া চলে না। এই চাল স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর নয়।

সামনের বার, আপনাকে যখন আপনার সাপ্তাহিক বরাদ্দের হিসেবে কিছুটা এই ধরণের চাল দেওয়া হবে, তখন আপনি উল্লিখিত যে-কোন উপায়ে এ চালের ভাত রান্না ক'রে দেখবেন।

**পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনসংভরণ বিভাগ থেকে প্রচারিত**

া। এ'রা প্রথমে বিষয়টি সাধারণভাবে বুঝিয়ে দেন। তারপর কঠিন কঠিন শব্দগুলি বুঝান। বিধানে নিপুণভাবে ছাত্রদের অগ্রসর করান। নির্বোধদের বুদ্ধি তীক্ষ্ম করেন। ভীরুদের উৎসাহ দেন। যারা অল্প বিদ্যায় সন্তুষ্ট হোয়ে চলে যেতে চায়, তাদের অধ্যাবসায় দৃঢ় করতে চেষ্টা করেন। ৩০ বছর বয়সে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়ে চরিত্র গঠিত হয়। তখন এরা কোনও কাজে নিযুক্ত হোয়ে শিক্ষকদের পুরস্কৃত করে।

কেহ কেহ আছেন যাঁরা শাস্ত্রে গভীর জ্ঞানী, সংসার ত্যাগী, সরল চিত্ত, অর্থে ও সাংসারিক নিন্দা স্তুতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত। রাজারা ও দেশের প্রধান ব্যক্তিরা এ'দের খুব সম্মান করেন কিন্তু রাজসভায় তাঁরা আকৃষ্ট হন না। সম্মানে বা অর্থে নিস্পৃহ হোয়ে নিজেদের সামান্য সম্বলের উপরেই নির্ভর কোরে উৎসাহের সঙ্গে তাঁরা বিদ্যা ও জ্ঞানের অন্বেষণে ব্যাপৃত থাকেন। নিজেদের যথেষ্ট ধন থাকলেও এ'রা নানাস্থানে ঘুরে বেড়িয়ে ভিক্ষায়ে জীবনধারণ করেন। সত্যান্বেষণেই এ'দের সম্মান; দারিদ্র্যে এ'দের লজ্জা নেই। আবার এ রকম লোকও আছেন যাঁরা বিদ্যার মূল্য ভালো কোরেই জানেন, তবু নির্লজ্জভাবে কর্তব্যে অবহেলা কোরে, নিজেদের সুখের জন্যে ইতস্তত ঘুরে বেড়িয়ে অর্থ নষ্ট করেন। মহার্ঘ খাদ্য আর পোষাকেই তাঁরা সর্বস্ব ব্যয় করেন। এদের অখ্যাতি বহুদূর পর্যন্ত রটে।

**সামাজিক প্রথা।** হিউএনচাঙ সাধারণভাবে জাতিভেদ বর্ণনা করেছেন। এর খুঁটিনাটির গোলক-ধাঁধাঁর মধ্যে প্রবেশ কোরে সময় নষ্ট করেন নি। তিনি বলেছেন—নিকট আত্মীয়ের মধ্যে বিবাহ হয় না। স্ত্রীলোকদের একবারের বেশী বিবাহ হয় না। বিধবার বিবাহ হয় না।

**আচার ব্যবহার।** সাধারণ লোক আমুদে কিন্তু খাঁটি। টাকা পয়সা সম্বন্ধে, ব্যবহারে, বিচার কাজে সাধু ও সৎ, জুয়োচোর বা ঠক বা বিশ্বাসঘাতক নয়। পরলোকের ভয় করে। আচার-ব্যবহার নম্র আর সুমিষ্ট। চোর ডাকাতের সংখ্যা কম। আইনভঙ্গকারীর বেশ সূক্ষ্মভাবে বিচার হয় আর অপরাধীদের কয়েদ করা হয়; বিশ্বাসঘাতকতা করলে বা পিতা-মাতাকে কষ্ট দিলে অপরাধীর হাত পা বা নাক কান কেটে লোকালয় থেকে দূর করে দেওয়া হয়। অন্য অপরাধে অর্থদণ্ড হয়। অপরাধ অন্বেষণের সময়ে আসামীকে কষ্ট দেওয়া হয় না। বিচারক যদি মনে করেন যে, অপরাধ প্রমাণ হয়েছে আর তবু আসামী অপরাধ স্বীকার না করে তা হোলে সন্দেহ স্থলে, জল বা আগুন বা ওজন বা বিষ দ্বারা পরীক্ষা করা হয়। *

ভব্যতা প্রকাশ নয় রকমে হয়—(১) মিষ্ট সম্ভাষণ, (২) মাথা নুইয়ে সম্মান প্রদর্শন, (৩) দুই হাত উঁচু কোরে মাথা নোয়ানো, (৪) দুই হাত একত্র কোরে মস্তক নত করা, (৫) এক হাঁটু বেঁকানো, (৬) দুই হাঁটু গেড়ে বসা, (৭) হাত আর হাঁটু মাটিতে রাখা, (৮) পঞ্চ-চক্র (দুই হাঁটু, দুই কনুই আর কপাল) দ্বারা প্রণাম, (৯) সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত।

সবচেয়ে বেশী ভক্তি প্রদর্শন হচ্ছে একবার ভূমিতে প্রণত হোয়ে তারপর হাঁটু গেড়ে বসে স্তুতি করা। দূরে থাকলে মাটিতে প্রণাম করলেই চলে; কাছে থাকলে পদচুম্বন করে, গোড়ালিতে হাত দেওয়া রীতি।

উপরিস্থনের কাছে আজ্ঞা পেলে পরিচ্ছদ মাটির থেকে তুলে প্রণাম করতে হয়। যাকে প্রণাম করা হোলো তাঁর কর্তব্য মিষ্ট কথা বলে প্রণতের মাথা ছোঁয়া বা পিঠে হাত বুলানো আর সস্নেহে আদেশ বা উপদেশ দেওয়া।

ভক্তি প্রদর্শন করার জন্যে প্রণাম ছাড়া অনেক সময়ে একবার বা তিনবার প্রদক্ষিণ করা হয় বা অন্য রকমে বিশেষ ভক্তি দেখানো হয়।

কারো অসুখ কোরলে সে প্রথমে সাত দিন উপবাস করে। তাতেও না সারলে ঔষধ খায়।

কেউ মরলে আত্মীয়রা উচ্চস্বরে বিলাপ করে।

শোকসূচক কোনও পরিচ্ছদ পরিধানের রীতি নেই। ভিক্ষুদের পক্ষে মৃতের জন্যে বিলাপ করা বারণ। হিউএনচাঙ অন্তর্জলির প্রথারও বিবরণ দিয়েছেন।

**শাসন, রাজস্ব, ইত্যাদি।** শাসনকার্য ন্যায়-সঙ্গত বোলে সরকারী দাবীর সংখ্যা কম। পরি-বারগুলির নামের ফর্দ নেই। কাউকে জোর কোরে খাটিয়ে নেওয়া হয় না। রাজ-কর স্বল্প। প্রত্যেকেই নিজ নিজ সম্পত্তি শান্তিতে ভোগ করে। যারা রাজার জমি চাষ করে তারা উৎপন্নের ষষ্ঠ ভাগ রাজস্ব দেয়। বণিকরা নির্বিঘ্নে যাতায়াত করে। নদীতে ও রাজপথে স্থানে স্থানে অল্প শুল্ক দিতে হয়। পারি-শ্রমিক আগে ধার্য কোরে তারপর লোক প্রকাশ্যে নিযুক্ত করা হয় (গোপনে নয়)।

**গাছপালা ইত্যাদি।** বিভিন্ন স্থানের জমির গুণ অনুসারে বিভিন্ন গাছপালা উৎপন্ন হয়। যথা অম্ল (তেঁতুল), আম্ল (আম্র?), মধুক, কুল, কপিত্থ, অমলা (আমলকী?), তিন্দুক, উদুম্বর, মোচা, নারিকেল, পনস। খেজুর, Chestnut, ফি (লকেট ফল), থি পাওয়া যায় না। নাসপাতি, আলুবোখারা, পীচ, আড়ু, কাশ্মীর থেকে পশ্চিমে পাওয়া যায়। কমলা-লেবু ডালিম সব জায়গায়ই হয়।

চাষের মধ্যে চাল, গম প্রচুর, আদা, সর্ষে, তরমুজ, কুমড়ো ইত্যাদি। পিয়াজ রসুন বেশী লোকে খায় না। কেউ খেলে তাকে শহরের বাইরে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। সাধারণ খাদ্য হচ্ছে দুধ, মাখন, সর, ভুরা চিনি, মিছরি, পিঠা, চিড়া, সর্ষের তেল। মাছ, ভেড়া, ছাগলের মাংস, মৃগ মাংস সাধারণত তাজা, কখনো বা নুন দেওয়া খাওয়া হয়। ষাঁড়, গাধা, হাতি, ঘোড়া, শুকর, কুকুর, নেকড়ে, সিংহ, বাঁদর আর লোমওয়ালা সব জন্তুর মাংস নিষিদ্ধ। এসব যারা খায় তাদের সকলে ঘৃণা করে; তারা শহরের বাইরে থাকে।

মদ অনেক রকমের। ক্ষত্রিয়রা আঙুর আর আঁখের রসের মদ পান করে, বৈশ্যরা জোরালো মদ পান করে। শ্রমণরা আর ব্রাহ্মণরা আঙুর আর আঁখের এক রকম রস পান করে, কিন্তু এ রস গাঁজিয়ে তোলা (Fermented) নয়।

বাসন সব রকমই আছে। বেশীর ভাগ মাটির। লাল তামার বাসন কদাচিৎ ব্যবহার হয়। এক থালায় সব খাদ্য মেখে নিয়ে হাত দিয়ে খাওয়া হয়। সাধারণত চামচ বা বাটি ব্যবহার হয় না আর কোনও রকম খাবার কাঠি (Chopsticks) নেই। তবে অসুস্থ হলে এরা তামার চামচ ব্যবহার করে।

সোনা, রূপা, কাঁসা, স্ফটিক, মুক্তা এদেশে প্রচুর উৎপন্ন হয়। তা ছাড়া দ্বীপপুঞ্জ থেকে জহরৎ জিনিসের বিনিময়ে সংগ্রহ করা হয়। দেশের মধ্যে বেচাকেনায় সোণা বা রূপার মুদ্রা, কড়ি আর ছোট ছোট মুক্তো ব্যবহার হয়।
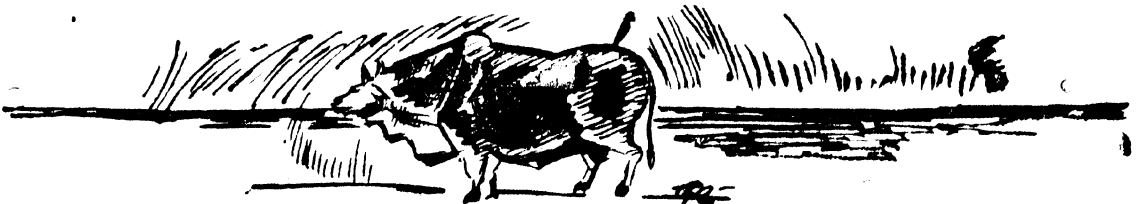
(ক্রমশ)

* "চারু দত্ত। বিষসলিলতুলাগ্নি প্রার্থিতে মে বিচারে ক্রকচমিহ শরীরে বীক্ষ্য দাতব্যমদ্য" ইত্যাদি। মৃচ্ছকটিক। নবমঃ অঙ্কঃ।

# জীবন-তৃষা

## আর্ভিঙ্ স্টোন

**অনুবাদক—অদ্বৈত মল্ল বর্মন**

[ পূর্বানুবৃত্তি ]

৯

খেতে বসে মাদাম ডেনিস ভিনসেণ্টকে বললেন, "জেকস্ ভার্ণি একজন কৃতী পুরুষ; তাঁর যা কিছু উন্নতি, নিজের চেষ্টাতেই করেছেন। কিন্তু তা হলেও তিনি খনিমজুরদের সংগে বন্ধুভাব বজায় রেখেছেন।"

"তার মানে, যারা পদোন্নতি করে তাদের সবাই কি মজুরদের সংগে বন্ধুভাব বজায় রাখে না?"

"না মসিয়ে ভিনসেণ্ট, রাখে না। যে মুহূর্তে তারা 'পেটিট ওয়াসমেস' থেকে প্রমোশন পেয়ে 'ওয়াসমেসে' আসে, সেই মুহূর্তেই তাদের দৃষ্টিভঙ্গী বদলে যায়; তারা মজুরদের সংগে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম ব্যবহার করতে শুরু করে। টাকার খাতিরে তারা মালিকের হয়ে মজুরদের উৎপীড়ন করতে ছাড়ে না; তাদের হালচাল সবই তখন মালিকের মতো হয়ে পড়ে। এককালে খনির মধ্যে ক্রীতদাসের মতো খেটেছে একথা তারা ভুলে যায়। কিন্তু জেকস্ বদলান নি। তিনি সৎ এবং বিশ্বাসী। আমরা যখন ধর্মঘট করি, তিনি থাকেন পুরোভাগে। খনিমজুরদের মধ্যে তার যেরূপ প্রভাব প্রতিপত্তি তেমন আর কারো নেই। তাঁর কথা ছাড়া মজুররা আর কারো কথা গ্রাহ্য করে না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি বেশি দিন বেঁচে থাকবেন না।"

"কেন, তাঁর কি হয়েছে?" ভিনসেণ্ট জিজ্ঞাসা করে।

"যা হয়ে থাকে। ফুসফুসের ব্যাধি। খনিতে যারা কাজ করে, এ রোগ তাদের সকলেরই হয়। সামনের শীতকাল পর্যন্ত তিনি বাঁচবেন কি না সন্দেহ।"

কিছুক্ষণ পরে জেকস্ ভার্ণি এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর শরীর খাটো। কাঁধ ঝুঁকে পড়েছে। বিষণ্ণ চোখ দুটি গর্তে ঢুকে গিয়েছে। নাকের গর্ত থেকে, ভুরুর কোণ থেকে এবং কাণের পাতা থেকে শুঁয়ার মতো বড়ো বড়ো লোম বেরিয়েছে তাঁর। মাথায় পড়েছে টাক। ভিনসেণ্ট ধর্মপ্রচারের ব্রত নিয়ে মজুরদের ভাগ্যোন্নতি করতে এসেছে, একথা শুনে তিনি একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন। বললেন, "হায় মসিয়ে! আমাদের ভালো করার চেষ্টা অনেক লোকে করেছে, কিন্তু তবু কিছু হয় নি। আমরা আগে যা ছিলাম এখনো ঠিক তাই আছি।"

"আপনি কি মনে করেন, 'বরিনেজে' লোকের অবস্থা খুবই খারাপ?" ভিনসেণ্ট জিজ্ঞাসা করল।

জেকস্ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "আমার নিজের কথা যদি বলি তো বলব, খারাপ নয়। আমার মা আমাকে কিছু কিছু পড়তে শিখিয়েছিলেন, সেজন্যই আমি "ফোরম্যান" হতে পেরেছি। ওয়াসমেসের দিকে যে রাস্তা গিয়েছে, তার উপর আমার ছোটো একখানি ইঁটের বাড়ি আছে। আমাদের খাওয়াপরারও কোনো কষ্ট নেই। কাজেই আমার দিক থেকে অবস্থা খারাপের কথা ওঠে না......"

তিনি আর বলতে পারলেন না। কাশির প্রচণ্ড ধাক্কায় থামতে বাধ্য হলেন। ভিনসেণ্টের মনে হল, তাঁর প্রশস্ত বুকখানা কাশির ধাক্কায় বুঝিবা বিদীর্ণ হয়ে যায়। দরজার বাইরে কিছুক্ষণ পায়চারি করার পর এবং রাস্তার উপরে কয়েকবার থুথু ফেলার পর জেক্স্ আবার এসে রান্নাঘরের গরমে বসলেন। বসে বসে নাকের, ভুরুর ও কাণের লোমগুলি টানতে লাগলেন।

"দেখুন মসিয়ে, আমি যখন 'ফোরম্যান' হই, আমার বয়স তখন ঊনত্রিশ ব[illegible] পেরিয়ে গেছে। সেই থেকে ফুসফুস জোড়াটাও গিয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও জীবন আমি একরকম ভালই কাটিয়েছি। কিন্তু মজুররা......" তিনি মাদাম ডেনিসের দিকে তাকালেন, বললেন, "আপনি কি বলেন? একে একবার হেনরি ডেক্রুকের কাছে নিয়ে যাব নাকি?"

"যান। সত্যি সত্যি যা হয়েছে তাই তিনি নিজের কানে শুনে আসবেন; এতে তাঁর কোনো ক্ষতি হবে না।"

জেক্স্ ভার্ণি ভিনসেণ্টের দিকে ফিরে, ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গীতে বললেন, "মসিয়ে, আর যাই হোক, আমি একজন ফোরম্যান। আমি তো 'ওদের' অবাধ্য হতে পারিনে! কিন্তু হেনরি—হ্যাঁ, হেনরি আপনাকে সব দেখিয়ে দিতে পারবে।"

সেই ঠাণ্ডা হিমের রাতে জেক্সের সংগে ভিনসেণ্ট বেরিয়ে পড়ল। শীঘ্রই দুজনে খনি মজুরদের খাদে ঢুকে পড়ল। মজুরদের ঘরগুলি এক একটা কাঠের কুঠরী বিশেষ। কোনো নক্সা অনুসারে এগুলি তৈরী নয়; পাহাড়ের নীচে ঢালু জায়গায় এলোমেলো-ভাবে এগুলিকে খাড়া করে রাখা হয়েছে। মধ্যে দিয়ে একটি মাত্র পথ গিয়েছে—তার থেকে বেরিয়েছে ঘরে ঢোকার আবর্জনাপূর্ণ ছোট-ছোট রাস্তা। পথ এমনি আঁকাবাঁকা গোল-মেলে যে, সর্বদা যারা চলাফেরা করে তারা ছাড়া অন্যের পক্ষে সে-পথ দিয়ে ঠিক জায়গাতে পৌঁছানো কিছুতেই সম্ভব নয়। জেক্সের পিছু পিছু যেতে যেতে ভিনসেণ্ট কয়লার স্তূপ, কাঠের গুঁড়ি আর আবর্জনার গাদায় বার বার আছাড় খেতে লাগল। প্রায় অনেক রাস্তা নেমে আসবার পর তারা ডেক্রুকের কুঠরী দেখতে পেল। পিছনের ছোটো জানলা দিয়ে মিটমিট করে একটা আলো জ্বলতে দেখা গেল। কড়া নাড়তে মাদাম ডেক্রুক্ এসে দরজা খুলে দিলেন।

ডেক্রুকের ঘরখানা এই খাদের আর সব মজুরদের ঘরের চাইতে একটুও আলাদা নয়। এরও মাটির কাঁচা মেজে, শেওলা ধরা ছাদ; মাঝে মাঝে চট আর মোটা ক্যানভাস আট্‌কিয়ে হাওয়া বেরোবার পথ করে দেওয়া হয়েছে। ঘরের পিছনের দুই কোণে দুটি বিছানা পাতা। এর একটিতে তিনটি শিশু জড়াজড়ি করে ঘুমুচ্ছে। ঘরের আসবাবপত্রের মধ্যে একটি স্টোভ, একখানি কাঠের টেবিল, একটি চেয়ার আর দেয়ালের সংগে পেরেক দিয়ে আঁটা একটি কাঠের বাক্স—তার মধ্যে কয়েকটি থালাবাসন রাখা হয়েছে। বরিনেজের আর-সব বাসিন্দাদের মতো এই ডেক্রুক-পরিবারেও একটি ছাগল ও কয়েকটি খরগোস আছে। এতে সময় সময় তাদের মাংস খাওয়া চলে। ছাগলটি শিশুদের খাটের তলায় ঘুমুচ্ছে। আর খরগোসগুলি স্টোভের পিছনে কিছু খড়কুটা আশ্রয় করে পড়ে আছে।

কারা এসেছে দেখবার জন্য মাদাম ডেক্রুক্ প্রথমে দরজার খানিকটা মাত্র খুললেন। তারপর তিনি আগন্তুক দুজনকে ঘরের ভেতর আসতে বললেন। বিয়ের বহু বৎসর আগে থেকেই তিনি

আসছেন। খনির ভিতরে গাড়ি তে ঠেলতে আর কয়লা কাটতে কাটতে জীবনের যা কিছু রস নিংড়ে বেরিয়ে ছে: একেবারে ছিবড়ের মতো হয়ে রয়েছেন তিনি। এখনো তাঁর ছাব্বিশ বছর হয়নি—এরই মধ্যে জরা এসে তাকে শীর্ণ ও মলিন করে দিয়েছে।

ডেকরুক্ স্টোভের পাশে চেয়ারে গা লয়ে দিয়ে পড়েছিলেন। জেক্‌স্‌কে দেখতে য়ে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন। উচ্ছ্বাসের বলে উঠলেন, "আরে, তুমি যে! কতদিন র আজ তুমি আমার ঘরে এসেছ। বড় সি হলাম তোমাকে পেয়ে। তোমার বন্ধুকেও নয়ে আহ্বান করছি।"

সারা 'বরিনেজে' ডেকরুকই ছিল এক মাত্র কে, কয়লার খনি যাকে মেরে ফেলতে রেনি। এটা তার গর্বের বিষয়। তিনি ই বলতেন, "আমি এমনিতে মরব না। খন বুড়ো হব, বিছানায় পড়ে মরব আমি। রা আমাকে মেরে ফেলতে পারবে না; তাদের মি দেব না আমায় মেরে ফেলতে।"

তার মাথার ডান পাশে একটি বড়ো লাল 'আব'—চুলের ফাঁকে ফাঁকে লনার মতো সেটা উজ্জ্বল হয়ে জেগে ছে। এর উৎপত্তির সঙ্গে এক দিনের একটা দুঃখ স্মৃতি জড়িত আছে। সেদিন করে তারা খনির নীচে নামছিল, টি দড়ি খুলে গিয়ে একশো মিটার নীচে পড়ে গিয়েছিল। তাতে ঊনত্রিশ জন মজুর মারা য়। মরেন নি কেবল ডেকরুক। তাঁর একখানা পা চার জায়গাতে ভেঙে গিয়েছিল। এর জন্যে তাকে পাঁচদিন শয্যাশায়ী থাকতে য়। আজও তাকে হাঁটবার সময়ে সেই পাখানা টেনে টেনে চলতে হয়। তার ডান পাশের লের নীচে গায়ের মোটা কালো সার্টটা উঁচু হয়ে থাকে—তারও এক ইতিহাস আছে। খনির মধ্যে একদিন একটি বাষ্পাধার ফেটে গিয়েছিল। তার ফলে ডেকরুক্ একটি কয়লার গাড়িতে ছিটকে পড়েছিলেন। তাতে তার পাঁজরের তিন জায়গা ভেঙে যায়। সেগুলি আর জোড়া লাগেনি। কিন্তু তিনি সংগ্রামী। লড়ায়ে মোরগের মতো যোদ্ধা তিনি। তাকে কোনো কিছুতে দমাতে পারে নি। কোম্পানীর বিরুদ্ধে সব সময়ে তীব্র ভাষায় মন্তব্য করেন বলে, তাকে সবচেয়ে খারাপ 'সীমে' কাজ করতে দেওয়া হয়েছে। তাতে কয়লা বের করা যেমন আত্মক, তেমনি কাজের নিয়মও অত্যন্ত ক্লেশ জনক। দিনের পর দিন তিনি যেমন ক্লেশ বহন করে চলেছেন, তেমনি তাঁর শাণিত জিহ্বা দিনের পর দিন অনল বর্ষণ করে চলেছে—"তাঁদের" বিরুদ্ধে—যাঁরা জানার বাইরে, দেখার বাইরে—অথচ শত্রুরূপে যাঁদের অপচ্ছায়া খনির সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। ডেকরুকের উঁচু থুতনির ঠিক মাঝখানে একটা টোল—কথা বলবার সময় মুখখানা দুদিকে বেঁকে যায়।

তিনি বললেন, "মসিয়ে ভ্যান গোঘ, আপনি ঠিক জায়গাতেই এসে পড়েছেন। এই বরিনেজে আমরা যারা আছি—আমাদের সঙ্গে ক্রীতদাসেরও তুলনা হয় না। আমরা তাদেরও নীচে। এখানে আমরা পশু হয়ে গিয়েছি। শেষ-রাত তিন-টায় উঠে আমরা মার্কাসি খনিতে নামতে যাই। খাওয়ার জন্য আমরা মাত্র পনেরো মিনিটের বিশ্রাম পাই। তারপর অবিশ্রাম খাটুনি চলতে থাকে বিকেল চারটে পর্যন্ত। যেখানে আমরা কাজ করি, সে মশাই এক অদ্ভুত জায়গা। সেখানে সবকিছুই ঘোরতর কালো আর গরম। আমরা সেখানে খালি গায়ে কাজ করি। বাতাস সেখানে কয়লার গুঁড়ো আর বিষাক্ত বাষ্পে ভারী হয়ে থাকে। আমরা নিঃশ্বাস নিতে পারি না। 'সীম' থেকে যখন কয়লা তুলি, সেখানে দাঁড়াবার জায়গাটুকু পর্যন্ত থাকে না। তখন হামাগুড়ি দিয়ে কাজ করতে হয়। এক-জনের স্থানটুকুতে দুজনে ঘেঁষাঘেঁষি করে কাজ করতে হয়। আট ন বছর বয়স হতে না হতেই আমরা কাজে যাই। ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নেমে সেই কালো আঁধারের মধ্যে ডুবে থাকি। আমাদের বয়স যখন হয় কুড়ি বছর তখনই জ্বর আর ফুসফুসের রোগ এসে আমাদের কাবু করে ফেলে। যদি বিষাক্ত বাষ্পে দম আটকে না যায়, কিংবা কুঠরী ধসে গিয়ে আমরা মাথা ভেঙে মারা না যাই (এই সময়ে তিনি মাথার লাল আবটাতে হাত বুলিয়ে নিলেন) তা হলে চল্লিশ বছর পর্যন্ত বেঁচে যেতে পারি। তারপরে অবশ্য না খেয়ে মরতে হয়। কি বল ভার্নি, আমার কথা ঠিক তো?"

ডেকরুক অতিশয় উত্তেজিত হয়েছিলেন। তাঁর কথায় দেশজ শব্দ এত বেশি এসে পড়ছিল যে, ভিনসেণ্ট সব কথার অর্থই বুঝতে পারছিল না। তাঁর চোখ দুটি রাগে কালো হয়ে এসেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও চিবুকের টোলটির জন্য মুখ-খানাকে বেশ হাসি-হাসি দেখাচ্ছিল।

জেক্‌স্ বললেন, "হাঁ ডেকরুক, তুমি যা বললে, সব সত্যি।"

দূরে ঘরের কোণে বিছানা। মাদাম ডেকরুক সেখানে বসেছিলেন। কেরোসিন লণ্ঠনের অস্বচ্ছ আলোয় তাকে ছায়ার মতো দেখাচ্ছে। স্বামীর মুখে তিনি হাজারবার এসব কথা শুনেছেন। তবু আজও তিনি কথাগুলি কান পেতে শুনলেন। বহু বৎসর ধরে তিনি কয়লার গাড়ি ঠেলেছেন, [illegible] তানকে পর পর গর্ভে ধরেছেন। তার উপর ক্যানভাসের বেড়া দেওয়া ঘরে বছরের পর বছর তীব্র শীতে ভুগেছেন—আজ তার মধ্যে বিদ্রোহের লেশমাত্রও আর অবশিষ্ট নেই। ডেকরুক


# কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
## কর্তৃক
## প্রকাশিত

**কয়েকখানি বিশিষ্ট গ্রন্থ**

বেদান্তদর্শন অদ্বৈতবাদ—ডাঃ শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী। ৫০০ শত পৃষ্ঠা। চার টাকা।

বাঙ্গলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ—শ্রীমন্মথনাথ বসু। সাত টাকা (৩০০ শত পৃষ্ঠা)।

গিরিশচন্দ্র—শ্রীকুমুদবন্ধু সেন। ২৪২ পৃষ্ঠা। দুই টাকা।

গিরিশচন্দ্র—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। ২৫০ পৃষ্ঠা। দুই টাকা চারি আনা।

গিরিশচন্দ্র—দেবেন্দ্রনাথ বসু। ১০০ পৃষ্ঠা। মূল্য এক টাকা।

গিরিশচন্দ্র—মন ও শিল্প—মহেন্দ্রনাথ দত্ত। ১৮৭ পৃষ্ঠা। দেড় টাকা।

বাঙ্গলা সাহিত্যের কথা (৫ম সং)—ডাঃ শ্রীসুকুমার সেনগুপ্ত। আড়াই টাকা।

বাঙ্গলা ছন্দের মূলসূত্র (৪র্থ সং)—শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়। চার টাকা।

বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা—শ্রীঅজয়চন্দ্র সরকার। দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্য চরিতের উপাদান—ডাঃ শ্রীবিমান-বিহারী মজুমদার। ৮১০ পৃষ্ঠা। সাড়ে সাত টাকা।

বৃহৎ বঙ্গ—ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন। ১২৯১ পৃষ্ঠায় দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ। বার টাকা।

বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়—ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন। দুই খণ্ডে সমাপ্ত। ২০৮৭ পৃষ্ঠা। ষোল টাকা বার আনা।

সাঙ্গীতিকী—শ্রীদিলীপকুমার রায়। ২৯২ পৃষ্ঠা। দুই টাকা।

ধর্ম সাধনা—স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের "The Hindu view of Life" প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ। ১২৪ পৃষ্ঠা। এক টাকা।

সকল সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়

তার খোঁড়া পা জেকস-এর দিক থেকে টেনে ভিনসেণ্টের দিকে ঘুরোলেন।

"কিন্তু এত কষ্ট করেও আমরা কি পাচ্ছি, মসিঁয়ে? মাথা গুঁজবার একটা কুঠরী আর জীবনটা চালাবার জন্য যতটুকু খাদ্যের দরকার ঠিক ততটুকুই খাদ্য—এই তো পাচ্ছি। কি খাই আমরা? রুটি, টক পনীর, আর কালো কফি। আর হয়ত সারা বছরে একবার কি দুবার মাংস খেতে পাই। 'তারা' যদি আমাদের মাইনে থেকে রোজ পঞ্চাশ 'সেণ্টাইমস' কেটে নেয় তা হলে আমরা উপোস করে মরে যাব; তা হলে আমাদের দিয়ে তাদের কয়লাখনি চালানো অসম্ভব হয়ে পড়বে। আমাদের মজুরী তারা যে আরো কমাচ্ছে না, তার কারণ এই। আমরা মশাই একেবারে মরণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি। জীবনের প্রতিটি দিন আমাদের মৃত্যুর সীমায় ঠেলে নিয়ে চলেছে। যখন একটা কিছু অসুখবিসুখ করে, একটা কানাকড়িও তখন আমাদের দেওয়া হয় না। তখন আমরা মারা পড়ি। কুকুর যেভাবে মরে তেমনিভাবে আমরা মরে যাই। আমাদের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা তখন প্রতিবেশীদের দেওয়া খাদ্যে জীবনধারণ করে। আট থেকে চল্লিশ—মোট এই বত্রিশ বছর আমরা কালো আঁধার গর্তে কাল কাটাই। তার পর ঐ পাহাড়ে উঠতে যে পথ দেখছেন, তারই পরে একটা গর্তের ভেতর গিয়ে ঢুকি। সেখানে শুয়ে আমরা সব জ্বালা জুড়াই।"

(ক্রমশঃ)


# বিশেষ কনসেসন

**এসিড প্রুভড 22Kt. মেট্রো রোল্ডগোল্ড গহনা**

**—গ্যারাণ্টি ২০ বৎসর—**

চুড়ি—বড় ৮ গাছা ৩০, স্থলে ১৬, ছোট—২৫, স্থলে ১৩, নেকলেস অথবা মফচেইন—২৫, স্থলে ১৩, নেকচেইন ১৮" একছড়া—১০, স্থলে ৬, আংটী ১টি ৮, স্থলে ৪, বোতাম এক সেট ৪, স্থলে ২, কানপাশা, কানবালা ও ইয়ারিং প্রতি জোড়া ৯, স্থলে ৬,। আর্মলেট অথবা অনন্ত এক জোড়া ২৮, স্থলে ১৪,। ডাক মাশুল ৸৵০, একত্রে ৫০, অলঙ্কার লইলে মাশুল লাগিবে না।

**নিউ ইণ্ডিয়ান রোল্ড এণ্ড ক্যারেট গোল্ড কোং**

**১নং কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা।**

**"অর্দ্ধমূল্যে বিরাট কন্‌সেসন"**

**গ্যারাণ্টি ২০ বৎসর**

চুরি বড় ৮ গাছা ৩০, টাকা স্থলে ১৫,; ঐ ছোট ৮ গাছা ১৩ টাকা, নেক্‌লেস মফচেইন ও ফাঁসিহার প্রত্যেকটি ১২,, নেক-চেইন ১টি ৬,; আংটি ১টি ৪, বোতাম ১ সেট ২, ঐ চেইন সহ ১ সেট ২৸০, কাণপাশা, কাণবালা, ইয়ারিং প্রতি জোড়া ৪, আর্মলেট অথবা অনন্ত ১৪, প্রতি জোড়া, বিছাপদক ১টি ৮,, রুলী ও তারের বালা প্রতি জোড়া ৭,, মাকড়ী অথবা ইয়ার টপ প্রতি জোড়া ৫,, ঘড়ির ব্যাণ্ড ১টি ৫,, ছাতার বোতাম ১ সেট ২,, কঙ্কন প্রতি জোড়া ২০, ডাক মাশুল ৸৵০ আনা মাত্র। **ওরিয়েণ্টাল রোল্ড এণ্ড ক্যারেট গোল্ড ট্রেডিং কোং**

**১১নং কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা।**

বাঙলার তথা ভারতের জাতীয় আন্দোলনে বিশ্বকবির কর্ম, প্রেরণা ও চিন্তার সুনিপুণ আলোচনায় অনবদ্য একখানি গ্রন্থ——

**প্রফুল্লকুমার সরকার প্রণীত**

# জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ

২য় সংস্করণ—মূল্য দুই টাকা।

(ডাকমাশুল ও বিক্রয়কর স্বতন্ত্র)

**বিশেষ কনসেশান ঃ** বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ৮৯তম জন্মোৎসব উপলক্ষে ১৫ই মে, ১৯৪৯ পর্যন্ত প্রত্যেক ক্রেতাকে শতকরা ১০, টাকা এবং প্রত্যেক পুস্তকবিক্রেতাকে শতকরা ২৫, টাকা হিসাবে কমিশন দেওয়া হইবে।

[ আমাদের অন্যান্য পুস্তক-এর তালিকা সংগ্রহ করুন ]

**প্রাপ্তিস্থান**

# শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস

৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা—৯

# উত্তর

## "বনফুল"

সিনেমা সম্বন্ধে যে সব প্রশ্ন আপনি আমাকে করেছেন, তা আমাকে না করে' কোনও সিনেমা ব্যবসায়ীকে করলে পারতেন। কারণ সিনেমার সঙ্গে ব্যবসায়ের সম্পর্কটাই মুখ্য, সাহিত্যের সম্পর্ক নিতান্তই গৌণ, এত গৌণ যে, উৎকৃষ্ট সাহিত্য বলতে রসিকসমাজ যা বোঝেন, তাকে বাদ দিয়েও সিনেমা ব্যবসা চলে এবং আমাদের দেশে ভালই চলে বোধ হয়। সকল দেশেই সাহিত্য-রসিকের সংখ্যা কম, আমাদের দেশে আরও কম, কারণ আমাদের দেশে শিক্ষিত লোকের সংখ্যাই কম। যে রসিকের সংখ্যা কোটিকে গোটিক তাদের উপর নির্ভর করে' এদেশের সিনেমা ব্যবসায়ীদের খাঁটি কাব্য-বিলাস করবার তাগদ নেই। সুতরাং অনন্যোপায় হয়ে খাঁটি জিনিসে খিড়কি-পথে তাঁরা ভেজাল মেশাচ্ছেন। মোড়ের দোকানে যে মুদিটা ঘিয়ে সাপের চর্বি অথবা দালদা মেশায়, তার সঙ্গে ব্যবসায় নীতির দিক দিয়ে হোমরা-চোমরা সিনেমাওলাদের খুব যে বেশী তফাৎ আছে তা নয়। আপাতদৃষ্টিতে ওই ঘি যেমন মনে, এই সব ছবিও তেমনি সাহিত্য এবং শিল্প। যে সব জিনিস ভেজাল দিয়ে সিনেমার ছবি তৈরি হয়, তার ফর্দ অনেক লম্বা। সংক্ষেপে দু'চার কথা বলছি। একটা কথা কিন্তু আগে বলে নিই। দালদা এবং সাপের চর্বিরও যেমন রসায়ন-জগতে স্থান আছে, সিনেমার এই ভেজালগুলোরও তেমনি কাব্য-জগতে স্থান আছে। ওগুলোও কাব্যের উপকরণ, সুপ্রযুক্ত হলে ওরাই অপরূপ রস সৃষ্টি করতে পারে।

যৌন-আবেদনটাই সিনেমা-ভেজালের প্রধান উপকরণ। নানা ছলে-ছুতোয় মানুষের এই পশু-প্রবৃত্তিটাকে উত্তেজিত করাই যেন এদের লক্ষ্য। আইন বাঁচিয়ে যিনি যতটা তা করতে পারছেন, তিনিই যেন ততটা কৃতার্থ। ভেজালের দ্বিতীয় উপকরণ সুতরাং—প্রেম। সব রকম প্রেম। পিতৃপ্রেম, মাতৃপ্রেম, ভ্রাতৃপ্রেম, বন্ধু-প্রেম, শিশুপ্রেম, পশুপ্রেম, দেব-দেবীপ্রেম, দেশ-প্রেম, জাতিপ্রেম—ইত্যাদি নানারকম প্রেমের রকমফেরের সঙ্গে যুবক-যুবতীর স্বর্গীয় প্রেমও থাকা চাই। প্রেম মানুষের শ্রেষ্ঠতম বৃত্তি। এর আবেদন অব্যর্থ। এটাকে ভেজাল বলছি কারণ অধিকাংশ সময়েই এটা সুপ্রযুক্ত নয়। সন্দেশে কামড় দিয়ে যদি কড়াং ক'রে দাঁতে কাঁকর লাগে এবং সে কাঁকর যদি বহুমূল্য হীরের টুকরো বা খাঁটি সোনার দানাও হয়, তাহলেও সন্দেশের বেলায় সেটা ভেজাল। কোনও সন্দেশ-রসিক তা বরদাস্ত করবেন না। প্রেম থাকতেই হবে, অতএব যখন তখন যেখানে সেখানে প্রেম আমদানী কর, কবি যদি তা করতে রাজী না হয়, মাইনে-করা কেরাণীকে দিয়েও প্রেমের দৃশ্য লেখাও এইটেই হল বেরসিক বণিক মনোবৃত্তি। বণিককে দোষ দেওয়া যায় না, কারণ চাহিদা অনুসারেই তাকে মাল সরবরাহ করতে হবে। ভেজালের তৃতীয় উপকরণ হচ্ছে প্রচলিত জনপ্রিয় ধুয়ো। অর্থাৎ শ্লোগান। সমাজের সর্বক্ষেত্রেই (আর্থিক, পারিবারিক, রাজনৈতিক, সাহিত্যিক প্রভৃতি) একদল থাকে অত্যাচারী, আর একদল থাকে অত্যাচারিত। দ্বিতীয় দলই সংখ্যায় বেশী। এই দ্বিতীয় দলের স্বপক্ষে এবং প্রথম দলের বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে যে সব ধুয়ো ওঠে, সিনেমার বিফায় হিসাবে প্রায়ই সেগুলি জনপ্রিয়। এতে অত্যাচারীদের আঁকা হয় আলকাতরা দিয়ে, আর অত্যাচারিতেরা হয় সব নিষ্কলঙ্ক। তা না আঁকলে সিনেমায় চলবে না। ভাল কাব্যেও অত্যাচারীরা নিন্দিত। কিন্তু একটু তফাৎ আছে। প্রথম তফাৎ জীবনদ্রষ্টা কবি নানাদিক দিয়ে বিচার করবার প্রয়াস পান কে প্রকৃত অত্যাচারী। তাঁর বিচারের অভিনবত্বে তিনি পুরাতন ধারণার মূল্য বদলে দেন অনেক সময়ে। স্নেহময়ী জননীই হয়তো নিষ্ঠুরা অত্যাচারিণীরূপে প্রতিভাত হতে পারেন কবি-দৃষ্টিতে। দ্বিতীয় তফাৎ, কবির কাব্যে অত্যাচারী বা অত্যাচারিত কেউ একরঙা নয়। শক্তিতে দুর্বলতায় ভালোয় মন্দে তারা প্রত্যেকেই বহুবর্ণসমন্বিত সার্থক সৃষ্টি, জনপ্রিয় মতবাদের প্রতিধ্বনি মাত্র নয়। তৃতীয় তফাৎ, কাব্যের বিচার অমোঘ। কবি অত্যাচারীর জয়গান করে না কখনও। কিন্তু ব্যবসায়ীকে তা করলে চলবে না। সংখ্যাধিক্যের মন রাখতে হবে তাদের। যদি কোনও কারণে অত্যাচারীদের সংখ্যাধিক্য ঘটে, তাহলে তাদেরই জয়ধ্বনি করতে হবে। তা না করলে ছবি চলবে না।

ভেজালের চতুর্থ উপকরণ হচ্ছে গান। কারণে-অকারণে যেখানে সেখানে গান ঢোকানো হয়, গায়ক-গায়িকা বা সঙ্গীত-রচয়িতার সুনামের সুবিধা নেবার জন্য। 'অমুকের গান আছে, অতএব চল যাই'—মনোভাবের সুযোগ নেন সিনেমা বণিকরা। সে গান যে অনেক সময় রসভঙ্গ করে, তা তাঁরা দেখতে পান না, কিম্বা দেখতে চান না, কারণ তাঁদের লক্ষ্য শিল্পের দিকে নয়, বক্স অফিসের দিকে। নামজাদা লেখকদের বইও তাঁরা নেন লেখকের খাতির খাতিরে, সাহিত্যবুদ্ধিপ্রণোদিত হয়ে নয়। কিন্তু আগেই বলেছি উঁচুদরের সাহিত্য-সৃষ্টিকে ছবিতে রূপ দেবার ক্ষমতা এঁদের নেই, (রূপ দিতে হলে যে পরিমাণ অর্থব্যয় অনিবার্য, যে ধরণের অভিনেতা-অভিনেত্রী প্রয়োজন, তা প্রায়ই দুর্লভ এদেশে)—তাই নামের খাতিরে নামজাদা কাব্য নিয়ে এঁরা
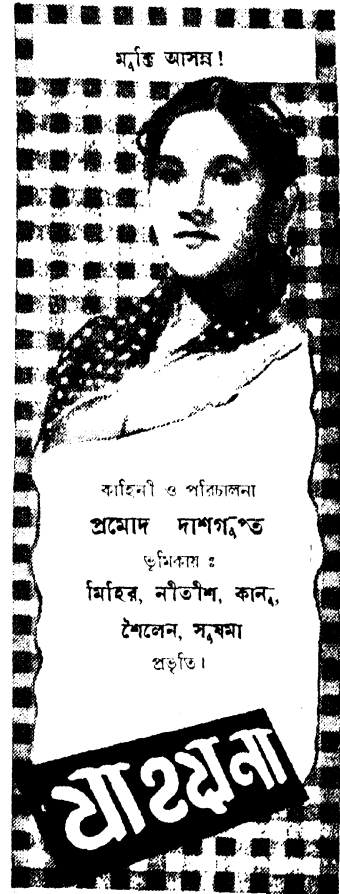
পূর্ণশ্রী ও বিশিষ্ট চিত্রগৃহে
একমাত্র পরিবেষক :
অগ্রণী : ৬৩, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

নিজেরাও বিব্রত হয়ে পড়েন, রসিকসমাজও পীড়িত হয়।

ভেজালের পঞ্চম উপকরণ হচ্ছে—মহাপুরুষ চরিত। গান্ধীজী, নেতাজী, চৈতন্য, বিবেকানন্দ প্রভৃতির নামে কে না বিচলিত হয়? এ'রা প্রত্যেকেই যুগস্রষ্টা। এ'দের প্রত্যেকের জীবনই মহাকাব্যের বিষয়। এ'দের মহজ্জীবনকে সম্পূর্ণ মর্যাদা দিতে পারে, তেমন নৈপুণ্য এদেশের সিনেমা-শিল্পের হয়েছে কি না সন্দেহ। তাই যে ছবি আমাদের উদ্দীপ্ত ক'রত তা প্রায়ই বিরক্ত করে' তোলে। যা সুখাদ্য রন্ধনের দোষে তাই অখাদ্য ভেজালে পরিণত হয়। সুতরাং বুঝতেই পারছেন যে, যদিও সিনেমার সঙ্গে 'সাহিত্য' এবং 'শিল্প' কথা দুটি প্রায়ই জড়িত থাকতে দেখা যায়, প্রকৃত সাহিত্য এবং শিল্পের সঙ্গে ওর সম্পর্ক কত কম।

যে ব্যবসায়ের দিকটা এর মুখ্য অংশ, সে দিকটাও ক্রমশ হতাশাজনক হয়ে আসছে না কি বাঙালীর ভাগ্যে? ভালগারিটির প্রতিযোগিতাতেও বাঙালী না কি হেরে যাচ্ছে অন্য প্রদেশবাসীর কাছে। খেলো জিনিসের প্রতি জুগুপ্সাই এর কারণ হ'লে একটা আধ্যাত্মিক তৃপ্তি পেতাম। বাঙলাদেশের ছবির পরদায় হিন্দী ছবির এত ভীড়ের কারণ রাষ্ট্রভাষা শেখবার আগ্রহ নয়, অন্য প্রদেশবাসীদের প্রতি স্নেহও নয়। এর কারণ লোভ এবং কাম। এই দুটি রিপুর পাল্লায় পড়লে আমরা ভুলে যাই যে, কখন কোন বক্তৃতায়, কখন কোন কবিতায়, কখন কোন প্রবন্ধে বা তর্কসভায় আমরা স্বাজাত্য-প্রীতির উচ্ছ্বাসে টগবগ করে ফুটে উঠেছিলাম বাকী আর চারটে রিপুর প্ররোচনায়। ওই দুটি রিপুর কবলে পড়লে আমাদের জ্ঞান থাকে না যে, দৈনন্দিন জীবনে আমরা যে পয়সা ব্যয় করি, তার মধ্যে ক'টা পয়সা বাঙালীর পকেটে যায়।

সাহিত্যিকদের সঙ্গে সিনেমার কি সম্পর্ক হওয়া উচিত, আপনি জানতে চেয়েছেন। সম্পর্কটা একটা বিশেষ ধরণের হবে, একথা আপনি ভাবছেন কেন? দর্শক, প্রযোজক, অভিনেতা, অভিনেত্রী, ক্যামেরাম্যান প্রভৃতি বহু লোকের সিনেমার সঙ্গে যে সম্পর্ক, সাহিত্যিকের সঙ্গেও সিনেমার সেই সম্পর্ক হওয়া সম্ভব—অর্থাৎ টাকার সম্পর্ক। কারণ একথাটা তো সুবিদিত যে, সাহিত্যিকেরাও মানুষ, তাঁদেরও বাঁচতে হবে। প্রাচীনযুগে সাহিত্যিকেরা রাজানুগ্রহে সাহিত্য-চর্চা করতেন। মাঝে মাঝে অবশ্য রাজার মহিমা-কীর্তন করতে হ'ত তাঁদের। রোগা লোককেও শালপ্রাংশুমহাভুজ বলে' বা ছোট জমিদারকেও সমুদ্র-মেখলা-ক্ষিতি-পতি আখ্যা দিয়ে তুষ্ট রাখতেন তাঁরা। এখন জনগণই রাজা। সুতরাং জনপ্রিয় শ্লোগান কীর্তন করে এখনও অধিকাংশ সাহিত্যিককে বাঁচতে হবে। সিনেমা যদি সেই ধুয়ার বাহন হয় অর্থ এবং স্বাচ্ছন্দ্যের বিনিময়ে কবি নিশ্চয়ই সুর দেবেন তাতে। এতে যে তাঁদের সাহিত্য-ধর্মচ্যুতি ঘটবেই, এমনও কোন কথা নেই। বরং পরমার্থিক সাহিত্য-চর্চা করতে গেলে যে আর্থিক সচ্ছলতা প্রয়োজন, তা হওয়াতে এ'রা ভাল সাহিত্য সৃষ্টি করবার অবসর পাবেন। তবে অর্থের বিনিময়ে কোনও প্রকৃত সাহিত্যিক কোনওকালে যে আত্মবিক্রয় করবেন, তা মনে হয় না। কারণ কবিরা পাখীর জাত, খাঁচাকে তাঁরা বড় ভয় করেন।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের
সদ্য প্রকাশিত ও সব চেয়ে নতুন ঢঙের উপন্যাস

**একটি গ্রাম্য প্রেমের কাহিনী**

মধুর নিবিড় সরস করুণ কাহিনী। মর্মস্পর্শী, অবিস্মরণীয়।
দাম—তিন টাকা

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের
**ইরাবতী**
বর্মার মুক্তি সংগ্রামের পটভূমিকায় বৃহৎ উপন্যাস। আনন্দবাজার বলেন: "বাঙালী পাঠকের অপরিচিত জীবনখণ্ডকে আঁকিবার চেষ্টায় লেখক যে সাফল্য লাভ করিয়াছেন, এ এক দুরূহ কৃতিত্ব।"
দাম—চার টাকা

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের
**সারেঙ**
বঞ্চিত ও দরিদ্র মুসলমান চাষী মাঝি মাস্টারের আশা-আকাঙ্ক্ষার নিখুঁত আলেখ্য। আনন্দবাজার, হিন্দুস্থান স্টাণ্ডার্ড, ইত্তেহাদ, মোহাম্মদী, দেশ, পূর্বাশা প্রভৃতি পত্রে উচ্চপ্রশংসিত।
দাম—দু'টাকা বারো আনা।

**ইনি আর উনি**
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত রচিত ও শৈল চক্রবর্তী বিচিত্রিত।
হাসি ও বিদ্রূপে, চরিত্র-চিত্রে ও ছবির রেখায় অতুলনীয় উপভোগ।
স্টেটসম্যান প্রমুখ সকল পত্রে উচ্চ প্রশংসিত।
দাম—তিন টাকা

**দিগন্ত পাবলিশার্স**
২০২, রাসবিহারী এভিনিউ
কলিকাতা—২৯

## র্লিনে আশার আলোক

আপাতদৃষ্টিতে যা অসম্ভব পৃথিবীতে ও মাঝে মাঝে সম্ভব হয়ে ওঠে। গত ৮ সকাল বার্লিনের অবরোধ এমনই একটি াধানের অতীত এবং অসম্ভব ঘটনা বলেই শ্বাসীদের চোখে প্রতিভাত হয়ে এসেছে। র্ঘদিন পরে এই দীর্ঘস্থায়ী সমস্যার একটা ষ্ঠু সমাধান হতে চলেছে—এরূপ আশা াষণ করার কারণ ইতিমধ্যেই দেখা দিয়েছে। র্কিন রাষ্ট্রদপ্তর ঘোষণা করেছেন যে, বার্লিন বরোধ অবসানের পথ বর্তমানে স্পষ্ট বলে নে হয়। অবরোধের অবসান না হওয়া র্যন্ত অবশ্য এ সম্বন্ধে জোর করে কিছু বলা ক্ত। ইতিপূর্বে এবিষয়ে একাধিক বারের আপোষ-আলোচনা সাফল্যের মুখে এসে ব্যর্থ য়ে যেতে আমরা দেখেছি। তবু দীর্ঘ দিন পরে দুটি পরস্পর বিরোধী পক্ষ বার্লিন নিয়ে আপোষ আলোচনার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে দেখলে নে আশার সঞ্চার হয় বৈকি!

আপাতদৃষ্টিতে এবারের আপোষ-আলোচনার প্রথম উদ্যোগী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হলেও এর মূল সূত্র নিহিত আছে প্রাথমিক সোভিয়েট উদ্যমের মধ্যেই। মস্কোতে স্টালিন ও মলোটভের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্সের বিশেষ দূতত্রয়ের আপোষ-আলোচনা ব্যর্থ হয়ে যাবার পর পশ্চিমী শক্তি-ত্রয় বার্লিন সমস্যাকে তুলে দিয়েছিল সম্মিলিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের প্যারী অধিবেশনের হাতে। সোভিয়েট রাশিয়া 'ভেটো' ক্ষমতার অধিকারী বলে স্বস্তি পরিষদ স্বাভাবিকভাবেই এ সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট কিছু করে উঠতে পারেন নি। কিন্তু যে দ্বৈত মুদ্রানীতি বার্লিন অবরোধের মূল কারণ বলে অভিহিত সে সম্বন্ধে একটা বোঝাপড়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল ব্রামুগুলিয়ার পরিকল্পনায়। এই পরিকল্পনা অনুসারে বার্লিনের মুদ্রানীতি সম্বন্ধে তথ্যালোচনার জন্যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের অধীনে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের কথা হয়েছিল এবং সে কমিটিতে পরস্পর বিরোধী চতুঃশক্তির প্রতিনিধিরাও যোগ দিতে সম্মত হয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অন্যান্য অনেক পরিকল্পনার মত এটিও স্থাছে ফেঁসে। তদবধি বার্লিন অবরোধ প্রসঙ্গ চাপা পড়েই ছিল। অতঃপর এ সম্বন্ধে সর্বপ্রথম মুখ খোলেন রুশ রাষ্ট্রাধিনায়ক জেনারেলিসিমো স্টালিন গত ২৭শে জানুয়ারী তারিখে। মার্কিন সাংবাদিক মিঃ কিংসবেরি স্মিথের কয়েকটি প্রশ্নের যে জবাব তিনি দেন তার থেকে বোঝা যায় যে, বার্লিন সম্বন্ধে সোভিয়েট রাশিয়ার সুর অনেকটা নরম হয়ে এসেছে। এতদিন পর্যন্ত বার্লিন অবরোধ অবসানের ব্যাপারে সোভিয়েট রাশিয়ার প্রধান সর্ত ছিল বার্লিন মুদ্রানীতির সংস্কার ও
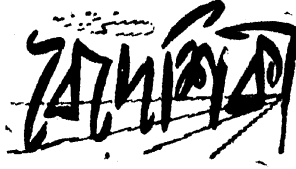
বার্লিনে সোভিয়েট রাশিয়ার মুদ্রা চালু করা। স্টালিনের আলোচ্য বিবৃতিতে এই অপরিহার্য সর্তটি ছিল না তাতে শুধু ছিল যে পশ্চিমী শক্তিত্রয় যদি পশ্চিম জার্মানীতে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের প্রশ্নটি স্থগিত রাখে এবং পশ্চিমাঞ্চলে চালু বাধা নিষেধ তুলে নেয়—তবে সোভিয়েট রাশিয়াও তার অধিকৃত এলাকা থেকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও যোগাযোগবিষয়ক বাধানিষেধ তুলে নিতে রাজী আছে। এ সম্বন্ধে রুশ ব্যাখ্যা জানার জন্যে গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানে মার্কিন প্রতিনিধি ডাঃ জেসাপ, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানে রুশ প্রতিনিধি এম মালিকের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন। এইখানেই হল এবারের আপোষ-আলোচনার প্রথম সূত্রপাত। ২৬শে এপ্রিল তারিখে সোভিয়েট সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান 'টাস' এই সংবাদটি পরি-বেশন করেন। পর্দার অন্তরালে অনুষ্ঠিত এই দুতরফা আপোষ-আলোচনার কথা প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার জল্পনা-কল্পনার অবকাশ সৃষ্টি হয়েছে। এম মালিক এবং ডাঃ জেসাপের মধ্যে এখনও নিউ ইয়র্কে ঘন ঘন সাক্ষাৎ ও আলোচনা চলছে। ডাঃ জেসাফ একাই ইংগ-মার্কিন-ফরাসী পক্ষের প্রতিনিধিত্ব করছেন বলে শোনা যায়। একথা অবশ্যই অনস্বীকার্য যে সোভিয়েট রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটা স্পষ্ট বোঝা পড়া হলে বৃটেন ও ফ্রান্সকে আপোষ-মীমাংসায় রাজী করাতে কষ্ট হবে না। আলোচ্য আপোষ-আলোচনা একটা নির্দিষ্ট স্তর পেরুলেই চতুঃশক্তির বৈঠক বসবে বলে আশা করা যায়।

এবারের আপোষ-আলোচনার মূল বৈশিষ্ট্য দুটিঃ একযোগে সোভিয়েট রাশিয়ার অধিকৃত বার্লিনে ও পশ্চিমী শক্তিত্রয়ের অধিকৃত এলাকায় অবরোধের অবসান এবং জার্মানীর প্রশ্ন বিবেচনার জন্যে চতুঃশক্তির বৈদেশিক সচিবদের একটি বৈঠক আহ্বান। এই শেষোক্ত সর্তের উপরও সোভিয়েট পক্ষ এবার বেশী জোর দেয়নি। চতুঃশক্তির পররাষ্ট্র সচিবদের বৈঠক আহ্বানের একটি সুনির্দিষ্ট তারিখ ঠিক হলেই সোভিয়েট রাশিয়া অবরোধের অবসান ঘটাতে রাজী আছে। অনমনীয় সোভিয়েট রাশিয়ার এই আকস্মিক নমনীয় মনোভাব দেখে পশ্চিমী শক্তিপুঞ্জের মনে স্বাভাবিকভাবেই সন্দেহ জাগার কথা। তারা একে বার্লিনের কূটনীতির খেলায় সোভিয়েট রাশিয়ার হেরে যাবার লক্ষণ বলেই ধরে নিয়েছে আর ধরে নিয়েছে একে একটা রাজনৈতিক চালবাজি বলে। দীর্ঘ আট মাসের প্রচেষ্টায় পশ্চিমী শক্তিপুঞ্জ আজ পশ্চিম জার্মানীকে ফেডারেল রাষ্ট্ররূপে সংগঠিত করার মুখে, সোভিয়েট রাশিয়া তাদের এই সমাপ্তপ্রায় ব্রত উদ্‌যাপনে বাধা দেবার জন্যে এই রাজনৈতিক চালের অবতারণা করেছে। এই চাল সার্থক হলে মে মাসের শেষ দিকেই চতুঃশক্তির পররাষ্ট্র সচিবদের বৈঠক আহূত হতে পারে। অন্যদিকে আগামী জুলাই মাসের আগে পশ্চিম জার্মানীর নূতন শাসন-তন্ত্র প্রবর্তিত হবার কোন সম্ভাবনাই নেই। ফলে ২।৩ মাসের এই ব্যবধানে অনেক কিছু ঘটে যেতে পারে। পররাষ্ট্র সচিবদের বৈঠকে সোভিয়েট রাশিয়া যদি অখণ্ড ঐক্যবন্ধ জার্মান রাষ্ট্র পত্তনে স্বীকৃত হয়ে যায়, তবে ফেডারেল পশ্চিম জার্মানী সংগঠনের স্বপ্ন স্বপ্ন হয়েই থাকবে।

যাই হোক, এই নতুন আপোষ-প্রচেষ্টায় শুধু স্টালিনের কূটনৈতিক চালের পরিচয় পেয়ে চুপ করে থাকলেই চলবে না। এই নতুন আপোষ প্রচেষ্টায় উভয় পক্ষের সদিচ্ছা ও সহানুভূতি থাকা বাঞ্ছনীয়। প্রায় এক বৎসরের মত হল বার্লিনে অচল অবস্থার উদ্ভব হয়েছে। প্রথম প্রথম অবরোধের ফলে ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষের যে গুরুতর অসুবিধা হয়েছিল আজ অবশ্য সেটা তারা কাটিয়ে উঠেছে। তবে বার্লিন রক্ষা করতে গিয়ে তাদের মূল্য দিতে হয় নি কম। বিমানযোগে লক্ষ লক্ষ লোকের দৈনন্দিন খাদ্য ও জ্বালানীর সংস্থান করা যে কি বিরাট ও ব্যয়বহুল ব্যাপার তা একটু চিন্ত করলেই সহজে বোঝা যায়। অসুবিধা শুধ ইংগ-মার্কিন পক্ষেরই হয়নি; তাদের অধিকৃ বার্লিনে ও পশ্চিম জার্মানীতে সোভিয়ে রাশিয়ার বিরুদ্ধে তারাও অবরোধ নীতি গ্রহ করেছে প্রতিশোধাত্মক ব্যবস্থা হিসাবে। ফ পোল্যাণ্ডের অধিবাসীদের চলাচল ব্যবস্ যেমন বিচ্ছিন্ন হয়েছে, তেমনি জার্মান সোভিয়েট অধিকৃত অঞ্চলের অর্থনীতি হয়েছে ব্যাহত। সুতরাং নিজের স্বার্থে খাতিরেও রাশিয়া আজ আপোষ-প্রয়াসের চে করতে পারে। একে নিছক কূটনৈতিক চ বললে ভুল করা হবে। বার্লিন সমস্যার সমাধ হলেই যে অন্যান্য বিশ্বসমস্যার সমাধান হ যাবে এরূপ কোন দুরাশা বোধ হয় আজকে পৃথিবীতে কারও মনে নেই। তবে বার্ সমস্যা আজ বিশ্বসমস্যার প্রতীক হ দাঁড়িয়েছে। উভয় পক্ষ সন্তুষ্ট হতে প বার্লিন সমস্যার এরূপ কোন সমাধান যদি তবে তার ফলে পৃথিবীর অন্যান্য সম সম্বন্ধেও বৃহৎ শক্তিপুঞ্জের মনোভাব ও দৃ ভঙ্গী পালটাতে পারে। সামগ্রিকভাবে বি শান্তির পক্ষে সেটা কল্যাণকরই হবে।

## সিংহলে ভারতীয় সমস্যা

সম্প্রতি সিংহলের রাজধানী কলম্বোতে সরোজিনী নগরে সিংহল জাতীয় কংগ্রেসের নবম বার্ষিক অধিবেশন হয়ে গেছে। সিংহল পার্লামেণ্টের ভারতীয় সদস্য কে রাজলিঙগম এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর শুভেচ্ছা বহন করে সিংহলস্থ ভারতীয় হাই-কমিশনার শ্রী ভি ভি গিরি এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। তা ছাড়া, ভারতবর্ষ থেকে গেছিলেন ভূতপূর্ব কংগ্রেস সভাপতি আচার্য কৃপালনী ও তামিলনাদ কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেণ্ট শ্রীকামরাজ নাদার। সিংহল জাতীয় কংগ্রেসের এই অধিবেশনে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এবং এই সিদ্ধান্তগুলি কার্যে পরিণত হলে সিংহলের রাজনীতিতে নতুন ঝড়ের আবির্ভাব হওয়াও অসম্ভব নয়। কিছু-দিন পূর্বে সিংহলে নাগরিক অধিকার সম্বন্ধে পার্লামেণ্টে দুটি আইন পাশ হয়ে গেছে। এই আইন দুটি নিয়ে পার্লামেণ্টের ভেতরে ও বাইরে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল। কিন্তু তাকে উপেক্ষা করেই মিঃ সেনানায়কের গভর্নমেণ্ট আইন দুটিকে পাশ করিয়ে নিয়েছেন। লণ্ডনে কমনওয়েলথ সম্মেলনে যোগ দেবার জন্যে সিংহল ত্যাগের মুখে মিঃ সেনানায়ক বলে গেছেন যে, আলোচ্য আইনের দ্বারা সিংহলে ভারতীয়দের প্রশ্নের চূড়ান্ত সমাধান হয়ে গেছে। কিন্তু মিঃ সেনানায়ক যাকে চূড়ান্ত ব্যবস্থা বলে মনে করেন ভারতীয়রা যে তাকে চূড়ান্ত ব্যবস্থা বলে মনে করেন না—তার প্রমাণ দিয়েছে সিংহল জাতীয় কংগ্রেসের এই অধিবেশন। সিংহল প্রবাসী ভারতীয়রা মিঃ সেনানায়ক ও তাঁর সহকর্মীদের গড়া এই অন্যায় আইন মেনে নিতে রাজী হয়নি।

ভারতবর্ষ সিংহলকে কোনদিন ভিন্ন দেশ বলে মনে করেনি। কিন্তু বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী কূটনীতি আজ এই দুটি দেশকে স্বতন্ত্র করেই শুধু দেয়নি—তাদের কোন কোন ব্যাপারে পরস্পর বিরোধীও করে তুলেছে। সিংহল জাতীয় কংগ্রেসে বক্তৃতা দান প্রসঙ্গে আচার্য কৃপালনী একথাটা স্পষ্ট করেই বলেছেন। তিনি বলেছেনঃ "আমি কোনদিনই ভারতবাসী ও সিংহলবাসীদের দুটি স্বতন্ত্র জাতি বলে মনে করিনি। আমি সর্বদাই মনে করেছি যে, জাতি-গত ও সংস্কৃতিগত দিক থেকে আমরা এক। রাজনৈতিক দিক থেকে ভারতবর্ষ বহুবার একাধিক রাজ্যে বিভক্ত হয়েছে; কিন্তু তার ফলে ভারতের মূলগত ঐক্য কোনদিন ব্যাহত হয়নি। ভারত ও সিংহল দুটি স্বাধীন দেশ বলেই তারা ভিন্ন হবে এমন কোন কথা নেই। ......দাসত্বে আমরা এক ছিলাম আর স্বাধীনতায় আমরা বিভক্ত এ দৃশ্য সত্যই অদ্ভুত।" সিংহলে যাঁরা শাসন ক্ষমতার আসনে বসে আছেন তাদের কানে আচার্য কৃপালনীর এ বাণী পৌঁছুবে কিনা জানি না—যদি পৌঁছয় তবে সেটা সমগ্র সিংহলের পক্ষেই হবে কল্যাণকর। কেমন করে জানি না সিংহলের কায়েমী স্বার্থের ধারক একদল লোকের মনে ধারণা জন্মেছে যে, সিংহল প্রবাসী ভারতীয়রা সিংহলের আদিবাসীদের স্বার্থের পথে বাধাস্বরূপ। এই অসত্য যারা প্রচার করে তারা হল সিংহলের জাতীয় জীবনে কায়েমী স্বার্থের ধারক ও পোষক। নিজেদের কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখার জন্যেই তারা এ

প্রসত্য প্রচার করে। শ্রী কে রাজলিংগম তাঁর সভাপতির অভিভাষণে একথাটি স্পষ্ট করেই বলেছেন। তিনি বলেছেন যে ভারতীয় শ্রমিক কান্ডির কৃষকদের আর্থিক দুর্দশার জন্যে দায়ী নয়—দায়ী যদি কেউ হয়, তবে সে হল সিংহলের মধ্যযুগীয় জমিদারী প্রথা। তবু স্বার্থবাদীরা ভয় পায় ভারতীয়দের এবং নানাবিধ অপপ্রচারের দ্বারা ভারতীয়দের লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা চলে। স্বাধীন সিংহলে ভারতীয়দের পূর্ণ নাগরিক অধিকার দিতে এত দ্বিধা দ্বন্দ্বের একমাত্র কারণ হল জনগণকে অবাধে শাসন শোষণ করার অধিকার সম্পূর্ণরূপে নিজেদের হাতে রাখা। ভারতীয় সমাজের মধ্যে গণচেতনা বেশী এবং সিংহলে গণজাগরণ এনেছে তারাই। সেই গণচেতনার প্রত্যক্ষ ফলরূপে স্বাধীনতার অধিকার দিতে এত দ্বিধাদ্বন্দ্বের একমাত্র সিংহলবাসীরা আজ ভারতীয়দেরই নাগরিক ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টায় আছে।

ভারতীয়দের দাবী বিশেষ কিছু নয়। তারা অন্যান্য সিংহলবাসীর সংগে সমান নাগরিক অধিকার দাবী করে। সিংহলের মোট অধিবাসীর শতকরা প্রায় ২০ জন ভারতীয় এবং তাদের অধিকাংশই সিংহলের স্থায়ী বাসিন্দা। তাদের অনেকেরই দুই তিন পুরুষ ধরে স্বদেশের সংগে কোন যোগাযোগ নেই। যে সব ভারতীয় সিংহলে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে চায় তাদের পূর্ণ নাগরিক অধিকার দিতে হবে—এই হল সিংহল প্রবাসী ভারতীয়দের দাবী। ভারতীয়রা সিংহলে উড়ে গিয়ে জুড়ে বসেছে এরূপ মনে করা হলে ভুল করা হবে। সিংহলের আহবানেই তারা এই দ্বীপটির প্রাণ স্বরূপ রবার ও চা-এর চাষের শ্রীবৃদ্ধি করতে গিয়েছে। সিংহলের রবার ও চা বাগানে কম করে ৭ লক্ষ ভারতীয় কাজ করে। চা এবং রবার এস্টেটের ম্যানেজারের অপ্রতিহত প্রভাবে এদের অধিকাংশকেই কুলি ব্যারাকে যে দুঃসহ জীবন যাপন করতে হয় তা বলে বোঝানো কঠিন। সিংহলে ভারত ও পাকিস্থানবাসীদের জন্যে যে নতুন নাগরিক অধিকারের বিধি গৃহীত হয়েছে তা কার্যকরী হলে এদের প্রায় সকলকেই নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হবে। এই বিধির বলে এদের অস্থায়ী বাসিন্দারূপে ধরা হবে। কিন্তু কার্যত এরা কুলি ব্যারাকেই যুগের পর যুগ, বংশের পর বংশ বাস করে আসছে। ভারতীয়রা যাতে সমান নাগরিকাধিকার পায় তার জন্যে ভারতের তরফ থেকে প্রধান মন্ত্রী পন্ডিত নেহরু কম চেষ্টা করেননি। এ বিষয়ে সিংহলের প্রধান মন্ত্রীর সংগে ভারতের প্রধান মন্ত্রীর প্রচুর পত্র বিনিময় হয়েছে কিন্তু তাতে কাজ হয়নি কিছুই। কার্যতঃ সিংহলে বর্তমানে দুই দফার নাগরিক অধিকার চালানোর চেষ্টা চলছে। প্রথম দফায় পূর্ণ নাগরিক অধিকার দেওয়া হচ্ছে তাদেরই যারা সিংহলের স্থায়ী বাসিন্দাদের বংশধর। দ্বিতীয় দফার নাগরিক অধিকার দেওয়া হচ্ছে নাম রেজিস্টারী করে তার মধ্যে আবেদনকারীদের বাছাই করে। অধিকাংশ ভারতবাসী এই দ্বিতীয় দফায় পড়ে। দুই শ্রেণীর নাগরিকদের মধ্যে অধিকারের ক্ষেত্রে আবার বিভিন্নতাও আছে প্রচুর। নাগরিক হিসাবে গণ্য করেও ভোটাধিকার না দেবার ব্যবস্থাও আছে। ভারতবাসীদের ক্ষেত্রে এই সর্তারোপ শুধু বৈষম্যমূলক ও অপমানজনকই নয়—সমাজবিরোধী এবং হাস্যকরও। তাই সিংহল জাতীয় কংগ্রেস এ ব্যবস্থা মেনে নিতে রাজী হয়নি। সরোজিনী নগরের সম্মেলনে প্রস্তাব গ্রহণ করে ভারতীয়দের নাম রেজিস্টারী করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং এই সমাজবিরোধী বিধি বর্জন করতে বলা হয়েছে। প্রয়োজন হলে সিংহল প্রবাসী ভারতীয়রা মহাত্মা গান্ধীর প্রদর্শিত পথে অহিংস সত্যাগ্রহ করবে—এ ইংগিতও সিংহল জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন থেকে পাওয়া গেছে।

সিংহলের আকাশে এই কৃষ্ণ মেঘের সঞ্চার আমরা অশুভ বলেই মনে করি। সিংহল ও ভারতবর্ষ অংগাংগীভাবে জড়িত। সিংহলে তথাকথিত জাতি বিদ্বেষের ঝড় উঠলে ভারতবর্ষও তার হস্ত থেকে রেহাই পাবে না। তা ছাড়া, সিংহলে ভারতীয় স্বার্থ বিপন্ন হলে সিংহল ও ভারতের প্রীতির সম্পর্কও ক্ষুন্ন হতে বাধ্য। সেনানায়ক গভর্নমেণ্টের কাছে আমাদের অনুরোধ তাঁরা যেন দক্ষিণ আফ্রিকার জাতি-বিদ্বেষী মালান গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে প্রথম পাঠ না নিয়ে অবিলম্বে ভারতীয়দের ন্যায়-সংগত দাবী মেটান। সিংহলের জাতীয় স্বার্থের পক্ষেই সেটা কল্যাণকর হবে।

১-৫-৪৯
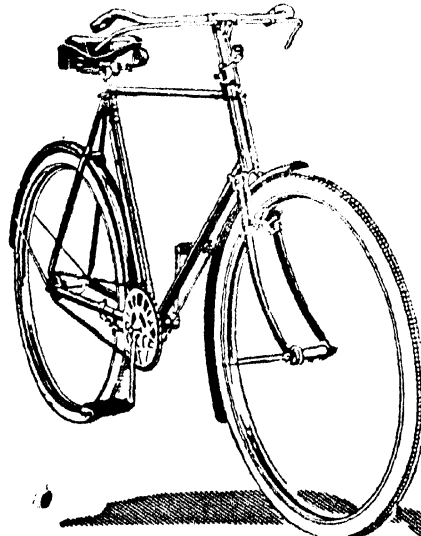
## আড়াই হাজার বছরের পুরানো শবাধার

সম্প্রতি মিশরের এক খবরে জানা গেছে, প্রাচীন মিশরের সমাধি-ভূমি সাক্কারায় মিশরের রাজা জোনারের কবরের ওপর যে পিরামিড আছে, তার সিঁড়িগুলির প্রায় একশো ফুট নীচে থেকে গত ২৯শে মার্চ দুটি কবর আবিষ্কৃত হয়েছে। ঐই কবর দুটির সন্ধান প্রথম আবিষ্কার করেন মিশরের পিরামিড সংরক্ষণ বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ আবিদ এসালাম বলে এক স্থপতিবিদ্. কিন্তু কবর দুটি খোলা হয়েছে গত ২৯শে মার্চ, মিশরের প্রাচীন সংস্কৃতি সংরক্ষণ বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল ডক্টর ইতিয়েন ড্রিয়োতনের উপস্থিতিতে। কবর দুটি খুঁড়ে যে দুটি শবাধার পাওয়া গেছে, তার মধ্যে একটি শবাধারকে আড়াই হাজার বছর পূর্বের মেম্‌ফিস্ নগরীর প্রাচীন 'তাহ' (Path) দেবীর মন্দিরের কেরানী 'কানুকেইয়ের' (Kanukeir) শবাধার বলে চিনতে পারা গেছে। অপরটি হচ্ছে প্রাচীন মিশরের বিখ্যাত রাজ-নীতিজ্ঞ স্থপতিবিদ্ "ইম্‌হোতেপ"এর শবাধার। শবাধার দুটি মিশরের 'মমী' সংরক্ষণ ব্যবস্থা অনুযায়ী সেই মত কাঠ-খোদাই করেই তৈরি, কিন্তু আড়াই হাজার বছর আগেকার এই কাঠের তৈরি শবাধার দুটি এখনও বেশ মজবুত আছে। কাজেই ব্যাপারটা খুবই তাজ্জব যে তা মানতেই হবে।

আড়াই হাজার বছর আগের শবাধার

## প্রবন্ধ নিয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধ

ফ্রান্সের প্যারী শহরে সম্প্রতি এক প্রবন্ধ নিয়ে প্রবন্ধকার ও যাঁর সম্বন্ধে প্রবন্ধটি লেখা হয়েছে, তাঁদের দুজনের মধ্যে তলোয়ারের পাল্লায় রীতিমত একটি দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয়ে গেছে। প্রবন্ধকার হচ্ছেন সাংবাদিক পিয়ারে-মোরিনডন, তিনি তাঁর প্রবন্ধে 'বোনাপার্তি আরমাঁদ কাবুরে' বলে একটি ব্যক্তিকে বিশেষভাবে আক্রমণ করেন, ফলে কাবুরে মেরিনডলকে অসি-যুদ্ধের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করেন মেরিনডলও সে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান স্বীকার করেন। যথারীতি প্যারীর কাছাকাছি সেনার্টের জঙ্গলে এই অসিযুদ্ধের ব্যবস্থা হয় এবং এই দ্বন্দ্বের বিচারকরূপে হাজির থাকেন 'এ্যালেন সোরী' নামে আর একজন সাংবাদিক। এখন থেকে সাংবাদিকদের মসীযুদ্ধে জয়ী হওয়ার জন্য অসিযুদ্ধেও পারদর্শী হতে হবে, এ আশঙ্কায় খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছি।

## যা কিছু সম্পদ সবই স্ত্রীর মাথায়!

মানুষের সব সেরা সম্পদ বুদ্ধি, অবশ্য মানুষের নিজের মাথাতেই থাকে; কিন্তু সারা জীবনের পার্থিব সম্পদ সম্পত্তিকে মণিরত্ন আর সোনা, রূপায় পরিণত করে স্ত্রীর মাথায় চাপিয়ে দিতে পারলেই সবচেয়ে বেশি খুশি হয় যে এমন লোকের সন্ধানও পাওয়া গেছে এক বিদেশী সাংবাদিকের খবরে। খবরটা হচ্ছে, সম্প্রতি তিব্বতের সিংঘাই প্রদেশের পাঞ্চেন লামা আশ্রমের কাছাকাছি কুমবুম গ্রামের এর অধিবাসী এক অবস্থাপন্ন তিব্বতী—তাঁর সমস্ত পার্থিব সম্পত্তিকে সোনা-দানা, মণি-মাণিক্যে রূপান্তরিত করে বেশ ভারী একটি মুকুট তৈরি করিয়ে তাঁর স্ত্রীর মাথায় সেটি পরিয়ে দিয়েছেন তিব্বতীদের বড় উৎসব 'মাঘন-উৎসব'এর পুণ্য দিনে। তাঁর স্ত্রীও স্বামীর সম্পদের ভারী বোঝাটি মাথা পেতে নিয়েছেন। গহনা ও সোনা-দানা অনুরাগী স্ত্রীরা এ খবরে নিশ্চয়ই উল্লসিত হবেন!

ক

বোম্বাইয়ের **টাটা স্পোর্টস ক্লাব** বেটন হকি কাপ বিজয়ীর **সম্মানলাভ করিয়াছে।** বোম্বাইয়ের দ্বিতীয় হকি **দল হিসাবে টাটা স্পোর্টস ক্লাব** এই গৌরব অর্জন **করিল।** ইতিপূর্বে ১৯৩৬ সালে বোম্বাই কাষ্টমস দল এই প্রতিযোগিতায় জয়লাভে সক্ষম হয়। **প্রকৃত যোগ্য দলই** প্রতিযোগিতায় সফলালাভ **করিয়াছে।** প্রতিযোগিতার প্রত্যেকটি খেলায় **বোম্বাইয়ের** টাটা স্পোর্টস ক্লাবের খেলোয়াড়গণ **উন্নততর নৈপুণ্য** ও যথেষ্ট বুদ্ধি-মত্তার পরিচয় দিয়াছেন। সেমি ফাইনালে কলিকাতার **হকি** লীগ চ্যাম্পিয়ানও এরূপে গত বৎসরের বেটন কাপ বিজয়ী পোর্ট কমিশনার্স দলকে যেভাবে ৩—০ গোলে পরাজিত করে তাহার পর কাহারও সন্দেহ থাকে না যে, টাটা স্পোর্টস ক্লাব ফাইনালে স্থানীয় পাঞ্জাব স্পোর্টস দলকে পরাজিত করিতে পারিবে। তবে এই কথা অস্বীকার করা চলে না যে, টাটা স্পোর্টস ক্লাব অপর সকল খেলায় যেরূপ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছিল ফাইনালে সেইরূপ পারে নাই। ফলে পাঞ্জাব স্পোর্টস ক্লাব খেলার সূচনায় এক গোলে অগ্রগামী হইতে সক্ষম হয়। পরে এই অবস্থার পরিবর্তন করিতে বোম্বাইয়ের দলকে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই।

গত কয়েক বৎসর হইতে বোম্বাই কি খেলা ধূলা, কি সন্তরণ, কি এ্যাথলেটিকস্ সকল বিষয়েই ভারতের সকল গৌরবের অধিকারী হইতেছে। ইহাতে স্পষ্টই অনুভব করা যায় যে, এই প্রদেশের খেলোয়াড়, সাঁতারু ও এ্যাথলেটরা সকলেই গৌরব অর্জনের জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করিতেছেন এবং পরিচালকগণও ইহাদের আন্তরিক-ভাবেই সাহায্য করিতেছেন। বাংলা দেশের খেলোয়াড়গণ, সাঁতারুগণ, এ্যাথলেটগণ এমন কি পরিচালকগণ বোম্বাইর আদর্শ অনুসরণ করিলে আমরা বিশেষ আনন্দিত হইব।

**ফাইনাল খেলা**

বেটন কাপ ফাইনাল খেলায় এই বৎসরে অন্যান্য বৎসরের তুলনায় যথেষ্ট দর্শক সমাগম হয়। কারণ খেলা দেখিবার টিকিট বিক্রয় হইতে বেঙ্গল হকি এসোসিয়েশন সাত হাজার আটশত টাকা সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। খেলার প্রথম মিনিটেই পাঞ্জাব স্পোর্টস ক্লাবের সারোয়ান সিং গোল করেন। তবে আট মিনিট পরে টাটা স্পোর্টস দলের জি ডিমেলো গোলটি পরিশোধ করেন। ২১ মিনিটের সময় বোম্বাইর ব্রাগাঞ্জা বিজয়সূচক গোলটি করেন। দ্বিতীয়ার্ধে খেলা খুবই নিরুৎসাহপূর্ণ হয়। প্রথমার্ধের ফলাফলেই খেলা **শেষ হয়।**

টাটা স্পোর্টস **ক্লাবঃ**—এন পিণ্টো; এইচ কার্ভেলো ও আর এস জেণ্টল; পেরুমল, জি পেরেরা ও পি ফেরার্ড; এফ **কুটিনো**, জে ডিমেলো, এল **ডিসুজা, এ ব্রাগাঞ্জা ও এন ফার্নাণ্ডিজ।**

পাঞ্জাব স্পোর্টসঃ—কে সিং; মদন ও সারোয়ান সিং; গুরুদয়াল সিং, **প্রকাশ ও ইন্দরজিৎ সিং;** হরজিন্দার সিং, যশোবন্ত সিং, সারিয়া সিং, জে শেঠি **ও জগদীশ।**

**ফুটবল**

**সিংহল ভ্রমণকারী ভারতীয় ফুটবল দল প্রত্যেকটি খেলাতেই বিজয়ী হইতে পারিয়াছে। এইরূপ ফলাফলের সহিত ভারতীয় দল দেশে প্রত্যাবর্তন করিতে পারিবে ইহা আমরা পূর্বেই জানিতাম; সুতরাং ইহাতে কোনরূপ বিস্ময় বা উল্লসিত হইবার কারণ খুঁজিয়া পাই না। ঠিক কি জন্যই যে দল প্রেরিত হইল সেই সংবাদ আমরা** এখনও সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। উদ্দেশ্য-বিহীন এক ভ্রমণ-ব্যবস্থা **কখনই** হইতে পারে না। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য হইতে হয় যখনই মনে পড়ে এই ভ্রমণ-ব্যবস্থা ফুটবল মরসুমের পূর্বেই হইয়াছে। নিম্নে ভারতীয় ফুটবল দলের সিংহল ভ্রমণের **ফলাফল** প্রদত্ত হইলঃ—

(১) ভারতীয় দল ৩—১ গোলে মাদ্রাজ একাদশকে পরাজিত করে। এই খেলা মাদ্রাজে **হয়।**

(২) ভারতীয় দল ৩—১ গোলে সিংহলের ইউনাইটেড সার্ভিসেস দলকে পরাজিত করে।

(৩) ভারতীয় দল ৩—০ গোলে সিংহল সিটি লীগ একাদশকে পরাজিত করে।
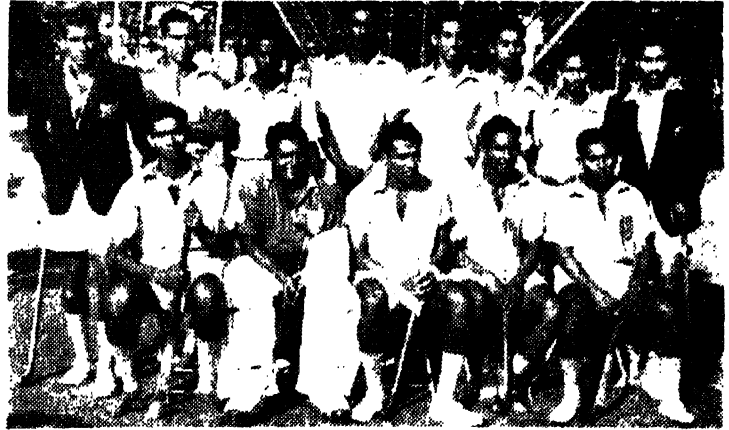
বেটন কাপ বিজয়ী বোম্বাইয়ের টাটা স্পোর্টস ক্লাবের খেলোয়াড়গণ

(৪) ভারতীয় দল প্রথম টেস্ট খেলায় ১—০ গোলে সিংহল দলকে পরাজিত করে।

(৫) ভারতীয় দল দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় ৬—১ গোলে সিংহল দলকে পরাজিত করে।

(৬) ভারতীয় দল সিংহলের শেষ খেলায় সিটি লীগ দলকে ১—০ গোলে পরাজিত করে।

**কলিকাতা ফুটবল লীগ**

ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশন পরিচালিত কলিকাতা ফুটবল লীগের বিভিন্ন ডিভিসনের খেলা সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে। ধীরে ধীরে বিভিন্ন খেলা দেখিবার জন্য দর্শক সমাগমও বৃদ্ধি পাইতেছে। বিশিষ্ট দলসমূহের খেলোয়াড় আমদানীর পালা এখনও শেষ হয় নাই। শোনা যাইতেছে, আরও কতকগুলি খেলোয়াড় বাঙলার বাহির হইতে আসিতেছে। সকল দলের পরিচালকই যে অবাঙালী খেলোয়াড়দের উপর বিশেষভাবে দৃষ্টি দিয়াছেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। বাঙলার উৎসাহী খেলোয়াড়গণ শেষ পর্যন্ত এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিবেন কি না তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। তবে আমাদের যতদূর ধারণা, **জনসাধারণের পক্ষ হইতে এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন শীঘ্রই আরম্ভ হইবে। বাঙলার মাঠে** বাঙালী খেলোয়াড়গণের **সকল উন্নতির পথ রুদ্ধ হইবে ইহা** তাহারা সহ্য করিবেন **না। ফুটবল মরসুমে** শান্তি ও শৃঙ্খলার মধ্যে **অতিবাহিত হয় ইহা সকলেরই** কাম্য। কিন্তু **যাহা বাঙলার ভবিষ্যৎ** খেলোয়াড়গণের পক্ষে অনিষ্টকারী তাহা **চিরকাল** নীরবে মানিয়া লওয়াও অন্যায় **ইহা একরূপ সকলেই** উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন।

কেবল প্রতিবাদ করিলেই চলিবে না। **উৎসাহী** খেলোয়াড়গণ উন্নততর নৈপুণ্যের অধিকারী **হইতে** পারেন তাহার সুনির্দিষ্ট কর্মসূচীও রচিত **হওয়া** প্রয়োজন। বাঙলার ফুটবল পরিচালকগণেরই **ইহা** করা কর্তব্য। ইঁহারা কি করিবেন ইহাই আমাদের **জিজ্ঞাস্য?**

**সন্তরণ**

পশ্চিমবঙ্গ শারীরিক শিক্ষক সমিতি বাঙলার সন্তরণ স্ট্যাণ্ডার্ডের উন্নতিকল্পে উৎসাহী **হইয়াছে** দেখিয়া পরম পরিতোষ লাভ করা গেল। **ইঁহারা** কেবল শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াই সন্তুষ্ট হইবেন না সন্তরণের প্রত্যেকটি বিষয়ের প্রাথমিক ব্যবস্থা হইতে ক্রমোন্নতির পথ নির্দেশক **পুস্তিকা** প্রকাশেরও ব্যবস্থা করিয়াছেন। এমন কি, **সন্তরণ** সম্পর্কীয় চলচ্চিত্রসমূহও সাঁতারুগণ **যাহাতে** নিয়মিতভাবে দেখিতে পারে তাহারও **আয়োজন** করিয়াছেন। ইঁহাদের প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত **হউক** ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।


**আবশ্যক**

**আমাদের উচ্চশ্রেণীর লেডিজ পার্স, পুরুষ ও মহিলাগণের জুতা ও চপ্পল বিক্রয়ার্থ প্রত্যেক সহরে এজেণ্ট ও ষ্টকিষ্ট চাই।**

নমুনা এবং এজেন্সীর সর্তাদির জন্য লিখুনঃ—

**এম এইচ এলেন শু এণ্ড চপ্পল কোং,**

১২।৪৫৮, সোতারগঞ্জ, কাণপুর।

## দেশী সংবাদ

২৫শে এপ্রিল—পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলে কিছুসংখ্যক নিরাপত্তা বন্দী, তাঁহাদের কতকগুলি দাবী পূরণ করা হয় নাই এই অভিযোগে অনশন আরম্ভ করিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেণ্টের রাজস্ব ও পূর্ত মন্ত্রী শ্রীযুত বিমল চন্দ্র সিংহ এক বিবৃতিতে বলেন যে, গভর্নমেণ্ট নগদ টাকায় ক্ষতিপূরণ দিয়া জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ পরিকল্পনা প্রবর্তন করা যায় কিনা, তাহা বিবেচনা করিতেছেন। গভর্নমেণ্ট প্রথমে সুন্দরবন অঞ্চলে এই পরিকল্পনা কার্যকরী করিবেন।

২৬শে এপ্রিল—মানভূম লোকসেবক সঙ্ঘের পরিচালক শ্রীযুত অতুলচন্দ্র ঘোষ এক বিবৃতিতে বলেন যে, মানভূমের সত্যাগ্রহ বিনাসর্তে প্রত্যাহার করা হয় নাই।

কলিকাতায় সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ মন্দিরে অনুষ্ঠিত শিক্ষাব্রতী, ছাত্র অভিভাবকগণের এক সম্মেলনে পরীক্ষাক্ষেত্রে ছাত্রগণের মধ্যে দুর্নীতির প্রশ্রয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

২৭শে এপ্রিল—কলিকাতায় বহুবাজার স্ট্রীট অঞ্চলে এক শোচনীয় হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে নারী আত্মরক্ষা সমিতি নামে একটি মহিলা সভায় অনশনব্রতী নিরাপত্তা বন্দিগণের দাবীর প্রতি পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেণ্টের মনোভাবের নিন্দা করিয়া বক্তৃতা দেওয়া হয়। সভাশেষে ১৪৪ ধারা অমান্য করিয়া একটি শোভাযাত্রা করিতে চেষ্টা করিলে কয়েকটি ঘটনা হয়। এই ঘটনায় পুলিশ কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহার করে এবং গুলী চালায়। হাঙ্গামা কালে কয়েকটি বোমাও নিক্ষিপ্ত হয়। হাঙ্গামার সময় চারিজন মহিলা এবং একজন কনস্টেবল সহ মোট সাতজন নিহত এবং ৫।৬ জন আহত হয়।

কলিকাতা শহরে ভূগর্ভস্থ রেলপথ নির্মাণের সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেণ্ট ফরাসী ইঞ্জিনীয়ারগণের এক দলকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। অদ্য ৬ জন সদস্য লইয়া গঠিত সেই ফরাসী ইঞ্জিনীয়ার দল কলিকাতা পৌঁছিয়াছেন।

ভারত সরকারের পুনর্বসতি সচিব শ্রীযুত মোহনলাল শকসেনা এক বিবৃতিতে বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুদের পুনর্বসতির জন্য ভারত গভর্নমেণ্ট ৫ কোটি টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

২৮শে এপ্রিল—কলিকাতায় ১৪৪ ধারা অমান্য করিয়া অদ্য একটি শোভাযাত্রা বাহির হইলে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের নিকট পুলিশের সহিত উহার সংঘর্ষের ফলে বিশেষ হাঙ্গামার সৃষ্টি হয়। এই হাঙ্গামার সময় কয়েকজন লোক আহত হয়, তন্মধ্যে ৫ জন বন্দুকের গুলীতে আহত হয়।

রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠান ভারত-পাকিস্থান কমিশন অদ্য কাশ্মীরে যুদ্ধবিরতি চুক্তিকে কার্যে রূপদানের চূড়ান্ত সর্ত ভারত ও পাকিস্থান গভর্নমেণ্টের নিকট পেশ করিয়াছেন। এক সপ্তাহের মধ্যে এ সকল প্রস্তাবের জবাব দিতে উভয় গভর্নমেণ্টকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

নয়াদিল্লীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল কমনওয়েলথ সম্পর্কে লণ্ডনে গৃহীত সিদ্ধান্তকে "গুরুত্বপূর্ণ ও দূঢ়তাব্যঞ্জক" বলিয়া বর্ণনা করেন।

২৯শে এপ্রিল—ভারতের রাষ্ট্রপাল এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীশিবপ্রসাদ সিংহকে বিচার বিভাগীয় দুর্নীতির অভিযোগে বিচারকের পদ হইতে অপসারিত করিয়া এক আদেশ দিয়াছেন।

মাদ্রাজের দুইটি গ্রামে কম্যুনিস্টদের সশস্ত্র অক্রমণের ফলে পাঁচজন নিহত ও কয়েকজন আহত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

কলিকাতায় লাটপ্রাসাদে নিখিল ভারত কারিগরী শিক্ষা পরিষদের চতুর্থ অধিবেশন আরম্ভ হয়। পশ্চিমবঙ্গের গভর্নর ডাঃ কে এন কাটজু তাঁহার উদ্বোধন বক্তৃতায় বলেন যে, আমাদের সর্বশক্তি প্রয়োগে ভারতে কারিগরী শিক্ষার উন্নতিবিধান করিতে হইবে।

৩০শে এপ্রিল—পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলে নিরাপত্তা বন্দিগণের যে অনশন ধর্মঘট চলিতেছিল, অদ্য তাহা প্রত্যাহৃত হইয়াছে।

ভারতীয় গণপরিষদের প্রেসিডেণ্ট ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ হিন্দু সংহিতা বিলের আলোচনা স্থগিত রাখার সুপারিশ করিয়াছেন।

১লা মে—বরোদা রাজ্য বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। অদ্য হইতে বরোদা আইনের পরিবর্তে বোম্বাই গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত বরোদা শাসন আইন বলবৎ হইল। রাত্রি বারোটার পর বরোদায় সরকারী ভবনগুলিতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা উড্ডীন করা হয়। বোম্বাইয়ের প্রধান মন্ত্রী শ্রী বি জি খের বরোদা রাজ্যের বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্ভুক্তি অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন।

১৯৪৯-৫০ সালের খরিপ শস্য এবং তুলার মূল্য নির্ধারণ না করিয়াই নয়াদিল্লীতে প্রাদেশিক ও দেশীয় রাজ্যের খাদ্য ও কৃষি সচিবদের সম্মেলন সমাপ্ত হইয়াছে। সম্মেলন গভর্নমেণ্টের নিকট এই সুপারিশ করিয়াছেন যে, শস্যের অবস্থা জানার পর খরিপ শস্য ও তুলার মূল্য স্থির করা হইবে।

## বিদেশী সংবাদ

২৫শে এপ্রিল—চীনা কম্যুনিস্টরা বেতার মারফৎ এই দাবী জানাইয়াছে যে, গত সপ্তাহে ইয়াংসী নদীতে যে ব্যাপার ঘটিয়াছে, তজ্জন্য "বৃটিশ সরকারকে অবশ্যই ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে।" ইয়াংসী নদীর ঘটনায় ৪ খানা বৃটিশ জাহাজ জড়িত ছিল। কম্যুনিস্টরা এই বলিয়া অভিযোগ করিয়াছে যে, বৃটেন চীনের গৃহযুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিয়াছে।

২৬শে এপ্রিল—ওয়াশিংটনের সংবাদে প্রকাশ, চীনা কম্যুনিস্টরা মার্কিন দূতের বাসগৃহে বে-আইনী প্রবেশ করায় কম্যুনিস্ট সামরিক কর্তৃপক্ষের নিকট তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতে নানকিংস্থিত মার্কিন সামরিক প্রতিনিধিকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

২৭শে এপ্রিল—পাঁচদিন আলোচনার পর লণ্ডন ডোমিনিয়ন প্রধান মন্ত্রীদের সম্মেলনে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, ভারতে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবার পরও ভারত কমনওয়েলথের পূর্ণ ও তুল্য মর্যাদাসম্পন্ন সদস্য থাকিবে। বর্তমানে কমনওয়েলথের প্রধান রাজাকে ভারত কমনওয়েলথের অপরাপর সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে যোগসূত্রের প্রতীক হিসাবে গণ্য করিবে। অপরাপর রাষ্ট্র রাজানুগত্য স্বীকার করিয়া লইবে; কিন্তু প্রজাতন্ত্রী ভারত রাজানুগত্য স্বীকার না করিলেও কমনওয়েলথের তুল্য মর্যাদাসম্পন্ন সদস্য বলিয়া গণ্য হইবে।

রেঙ্গুনের সংবাদে প্রকাশ, গণ-স্বেচ্ছাসেবী সঙ্ঘের বিদ্রোহী সদস্য, কম্যুনিস্ট ও সেনাবাহিনী ত্যাগকারী সৈন্যগণ গণতান্ত্রিক বাহিনী নামে নিজেদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া একটি ১৬ দফা ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়াছে। প্রথম দফায় থাকিন নু'র গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম চালাইয়া যাইবার সঙ্কল্প প্রকাশ করা হইয়াছে।

কম্যুনিস্ট অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়ার জন্য চীনাদের উদ্দেশে এক বেতার ঘোষণা দ্বারা জেনারেলিসিমো চিয়াং কাইশেক অদ্য নাটকীয়ভাবে তাঁহার তিন মাসের অবসর জীবন শেষ করিয়াছেন।

২৯শে এপ্রিল—সাংহাই-এর সংবাদে প্রকাশ, অদ্য কম্যুনিস্ট বাহিনী সাময়িকভাবে সাংহাই-এর পাশ কাটাইয়া দক্ষিণ চীনের প্রধান সরকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করিয়াছে। কম্যুনিস্ট বাহিনী সরকারী সৈন্যদলের ৫০০ মাইলব্যাপী রক্ষাব্যূহের প্রধান ঘাঁটি হ্যাংচাও-এর ২৫ মাইল উত্তরে উপস্থিত হইয়াছে।

১লা মে—চীনের সরকারী সৈন্যদল ৫০০ মাইলব্যাপী নূতন আত্মরক্ষা কেন্দ্রের প্রধান কেন্দ্র হ্যাংচাও সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করিয়াছে এবং নূতন অবস্থান ঘাঁটিতে সরিয়া আসিয়াছে। একটি কম্যুনিস্ট বর্শাফলক এই নূতন রক্ষাব্যূহ ছাড়াইয়া ৪০ মাইল অগ্রসর হইয়াছে।

রেঙ্গুনের সংবাদে প্রকাশ, ব্রহ্মের সরকারী সৈন্যরা মধ্য ব্রহ্মের কারেন ঘাঁটি টাঙ্গুতে প্রবেশ করিয়াছে।

সম্পাদক : শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন
সহ সম্পাদক : শ্রীসাগরময় ঘোষ
প্রতি সংখ্যা—চারি আনা বার্ষিক মূল্য—১৩৲ ষাণ্মাসিক—৬৷৷৹
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক:—আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মন স্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদক ঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন
সহ সম্পাদক ঃ শ্রীসাগরময় ঘোষ

যে-নদী হারায়ে স্রোত চলিতে না পারে,
সহস্র শৈবালদাম বাঁধে আসি তারে;
যে-জাতি জীবনহারা অচল অসাড়
পদে পদে বাঁধে তা'রে জীর্ণ লোকাচার।
সর্বজন সর্বক্ষণ চলে যেই পথে,
তৃণগুল্ম সেথা নাহি জন্মে কোনো মতে—
যে-জাতি চলে না কভু তারি পথপরে
তন্ত্র মন্ত্র সংহিতায় চরণ না সরে।

—রবীন্দ্রনাথ

ষোড়শ বর্ষ ] শনিবার, ৩১শে বৈশাখ, ১৩৫৬ সাল। Saturday, 14th May, 1949. [ ২৮শ সংখ্যা

### গণপতির ফাঁসি

ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহের্ ব্রিটিশ রাষ্ট্র-সমবায় সম্মেলনের কাজ শেষ করিয়া গত ৬ই মে ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। রাষ্ট্র-সম্মেলন ব্রিটিশ রাষ্ট্র সমবায়ের সনাতন নীতির মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়াও ভারতের সার্বভৌম গণতান্ত্রিক অধিকার স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন। পক্ষান্তরে ভারত তাঁহার রাষ্ট্রীয় আদর্শকে একটুও ক্ষুণ্ণ করে নাই। স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের পরিপূর্ণ মর্যাদার সঙ্গে তাহার জন্য ব্রিটিশ রাষ্ট্র-সমবায়ে সখ্যতার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করা হইয়াছে। রাষ্ট্র সমবায়ের নিয়ামকদের এমন সুবুদ্ধি এবং বাস্তব অবস্থা বিবেচনায় তাঁহাদের এই দূরদর্শিতার জন্য বিশ্ব-পরিব্যাপ্ত প্রশস্তিবাদও ইতিমধ্যেই একটি ঘটনায় ফাঁকা হইয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। গত ৪ঠা মে প্যান মালয়ান শ্রমিক সঙ্ঘের ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট গণপতিকে ভারতের সব প্রতিবাদকে অগ্রাহ্য করিয়া কুয়ালালামপুরে জেলে ফাঁসি দেওয়া হয়, ইহাতে সমগ্র ভারতে বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে। চতুর্বিংশতি বৎসর বয়স্ক এই তামিল যুবকের শুধু এইটুকু অপরাধ প্রতিপন্ন হয় যে, তাঁহার নিকট একটি রিভলবার ছিল। মালয়ে প্রবর্তিত জরুরী বিধানে অস্ত্রশস্ত্র রাখা প্রাণদণ্ডার্হ অপরাধের মধ্যে গণ্য। গণপতি মালয়স্থ ভারতীয় প্রতিনিধি মিঃ থিভির নিকট বলেন, তিনি ৫ মাস কাল অসুস্থ অবস্থায় জঙ্গলের মধ্যে লুকাইয়া ছিলেন। এজন্য জরুরী বিধানের কথা তিনি জানিতেন না। পরে জানিতে পারিয়া নিকটবর্তী থানায় রিভলবারটি সমর্পণ করিবার জন্য তিনি যাইতেছিলেন। আত্মরক্ষার প্রয়োজনের জন্যই তিনি জঙ্গলের মধ্যে রিভলবারটি লইয়া যান। একটি গাছের তলায় তিনি বিশ্রাম করিতেছিলেন, এই অবস্থায় তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়; তিনি বাধা দিবার কোন চেষ্টা করেন নাই। বস্তুতঃ রিভলবারটি গণপতির কাছে ছিল, ইহা ছাড়া, তিনি যে অন্য কোন অপরাধমূলক কাজ করিয়াছিলেন ইহা প্রতিপন্ন হয় নাই। কিন্তু ফাঁসি তাঁহাকে দেওয়া চাই, শুধু এই জিদের বশে পনেরো দিনের মধ্যে তাড়াতাড়ি করিয়া গণপতিকে ফাঁসি দেওয়া হইয়াছে। গণপতির প্রাণদণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে ভারত গভর্নমেণ্ট লণ্ডনস্থ ভারতীয় হাইকমিশনারের মারফৎ আবেদন করেন এবং দণ্ডাদেশ সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করিবার জন্য প্রাণদণ্ড স্থগিত রাখিতে অনুরোধ জানান। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট তাহাতে সম্মতও হন; কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের সে প্রতিশ্রুতি পালিত হইবার পূর্বেই গণপতিকে ফাঁসি দেওয়া হয়। মালয়ের ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের নিকট ভারত গভর্নমেণ্টের পক্ষ হইতে সব চেষ্টা তো ব্যর্থ হয়ই; খোদ ব্রিটিশ সরকারের প্রতিশ্রুতিও মালয়ের ব্রিটিশ প্রভুরা পরোয়া করেন নাই কিংবা সে প্রয়োজন বোধ করেন নাই। আমরা জানি, সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে নীতির কোন মূল্য নাই। তাহারা ভীতির জোরে নিজেদের স্বৈরাচার বজায় রাখিতে চায়। ভীতির এই ভাব জাগাইয়া তুলিবার জন্য নজীর সৃষ্টি করিতে তাহারা রক্তপিপাসু উন্মর্দনায় প্রমত্ত হইয়া উঠে। নির্দোষকে হত্যা করিতেও তাহাদের বিবেকে বাধে না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী দলের এমন পৈশাচিক প্রবৃত্তির পরিচয় ভারতের ইতিহাসে অসংখ্য রহিয়াছে। কার্যতঃ দেখা যাইতেছে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আজ এলাইয়া পড়িলেও সাম্রাজ্যবাদীদের সে প্রবৃত্তি যায় নাই। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের নখদন্ত বিগলিত হইলেও আঁচড়কামড়ের প্রবৃত্তি ক্ষুণ্ণ হয় নাই। এই অবস্থা উপলব্ধি করিয়াই রাষ্ট্রপতি ডক্টর সীতারামিয়া সেদিন বলিয়াছেন, "রাষ্ট্র সমবায়ের উপর আমাদের বিশেষ বিশ্বাস রাখা চলে না।" প্রকৃতপক্ষে, রাষ্ট্র সমবায়ের সখ্য ও সৌহার্দ্যের নজীর যদি এইরূপ হয়, এবং ভারতের কোন কথা ব্রিটিশ প্রভুদের কাছে এইভাবেই উপেক্ষিত হইতে থাকে তাহা হইলে রাষ্ট্র-সম্মেলনে স্বাধীন ভারতের মর্যাদার কোন মূল্যই থাকে না। মালয়ে ব্রিটিশ প্রভুরা ভারতের কথা রাখেন নাই; তাঁহারা সাক্ষাৎ সম্পর্কে ভারতের অবমাননা করিয়াছেন। ভারত গভর্নমেণ্ট লণ্ডনস্থ ভারতীয় হাই কমিশনারের মারফৎ গণপতির প্রাণদণ্ডের প্রতিবাদ করিয়াছেন। গণপতির পরলোকগত আত্মা ইহাতে তৃপ্ত হইবে কি না আমরা জানি না; কিন্তু স্বাধীন ভারতের, মনের জ্বালা নিশ্চয়ই তাহাতে মিটিবে না। ভারতের আত্মমর্যাদার উপর এই আঘাত, মানবতার এমন অবমাননাকে সে শুধু সদিচ্ছামূলক মামুলী প্রতিশ্রুতিতে স্বীকার করিয়া লইবে না। ব্রিটিশ প্রভুদের এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। ভারতের প্রতি এমন ব্যবহারের জন্য তাহাদিগকে নতি স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহারা যদি তাহাতে রাজী না থাকেন ইজ্জতের মোহ যদি এখনও তাহাদের দূর না হয়, তবে রাষ্ট্র সমবায়ের অশেষ মহিমা সত্ত্বেও জাগ্রত ভারত নিজের পথ দেখিয়া লইতে দ্বিধা করিবে না।

### পাকিস্থানী নীতির বৈশিষ্ট্য

সর্ব জগতের দৃষ্টি বর্তমানে পণ্ডিত জওহরলালের দিকে আকৃষ্ট; কিন্তু পাকিস্থানের রাষ্ট্রনীতিকদের তেমন আদরআপ্যায়ন নাই। পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী জনাব লিয়াকত আলীর এজন্য চিত্ত বিক্ষোভ ঘটে এবং লণ্ডনে একটি বিবৃতিতে তিনি এজন্য কিঞ্চিৎ উষ্মাও প্রকাশ করেন। কিন্তু তজ্জন্য ভারতের অপরাধ কি? বিশ্বের মর্যাদা প্রধানতঃ উন্নত আদর্শনিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব এবং মানবতামূলক সাধনার উপর নির্ভর করে। ফলতঃ পাকিস্থানী রাজনীতিকেরা শুধু কথার জোরে এ মর্যাদা আদায় করিতে পারেন না। ইতিহাসের বিচারে সত্যেরই সমাদর ঘটে, অসত্যের আড়ম্বর এবং পরিস্ফীতি দীর্ঘ দিন মানব-সংস্কৃতিকে বিড়ম্বিত করিতে সমর্থ হয় না। পাকিস্থানী রাজনীতিকেরা যদি সত্যই বিশ্ব রাষ্ট্র-সমাজে নিজেদের মর্যাদা লাভ করিতে চাহেন, তবে মধ্যযুগীয় মনোভাবের ঊর্ধ্বে উঠিয়া তাঁহাদের রাষ্ট্রীয় আদর্শে উদার মানব-সংস্কৃতিকে প্রতিষ্ঠা করাই তাঁহাদের পক্ষে সর্বাগ্রে প্রয়োজন; কিন্তু সে পথে না গিয়া ভারতকে খাটো করিয়াই তাঁহারা বড় হইতে চাহেন। জনাব লিয়াকত আলী পাকিস্থানী রাজনীতির সেই বিশিষ্ট ধারা অবলম্বন করিয়াই নিজেদের ঢাক নিজে পিটাইয়াছেন। লণ্ডনের ইসলামিক তমদ্দুন কেন্দ্রের সম্বর্ধনা সভায় পাক-প্রধানমন্ত্রী ভারতের বিরুদ্ধে প্রচার কার্য চালাইয়া আসিয়াছেন। তাঁহার মন্তব্য এই যে, ভারত বিভাগের পর যে সব আশ্রয়প্রার্থী পাকিস্থানে আসিয়াছিল, তাহারা তাহাদের সমস্যা সমাধান করিয়া ফেলিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে একজনও ভারতের মত বাড়ীঘর ছাড়া অবস্থায় নাই। ইহা ব্যতীত ভারতে মুদ্রাস্ফীতি ঘটিয়াছে; কিন্তু পাকিস্থানে কোনরূপ মুদ্রাস্ফীতি ঘটে নাই। পাকিস্থানে অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদির মূল্য অথবা জীবিকা নির্বাহের ব্যয় কোনটিই বৃদ্ধি পায় নাই। পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রীর এই আত্মশ্লাঘায় অবশ্য আমাদের উদ্বিগ্ন না হইলেও চলিত; কিন্তু ভারতের উপর আক্রমণ চালাইতে না গেলেই তিনি ভাল করিতেন। প্রকৃতপক্ষে যেমন জবরদস্তির জোরে তাহারা আশ্রয়প্রার্থীদের সমস্যার সমাধান করিয়াছেন, সকলেই জানে এবং এক্ষেত্রে তাহাদের গৌরব করিবার কিছুই নাই। তাহাদের বৈষম্যমূলক নীতির প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ চাপে পড়িয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের লোকেরা দলে দলে বাস্তুভিটা ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছে। পাকিস্থানী কর্তারা পূর্ববঙ্গেও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এই সব ভিটামাটি জব্দ করিয়া লইয়া বিহারী এবং পাঞ্জাবী মুসলমানদিগকে বসাইয়াছেন, তাহা ছাড়া সংখ্যালঘুদের মধ্যে যাঁহারা এখনও পাকিস্থানের বাসিন্দা আছেন, নির্বিচারে তাহাদিগকে বাড়ীঘর হইতে বাহির করিয়া দিয়া আশ্রয়প্রার্থীদের বাসস্থানের বিধান করিতেও তাঁহারা কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। ভারত রাষ্ট্র পাকিস্থানী এমন জবরদখলের নীতি অনুসরণ করিতে পারে নাই। এখানে আশ্রয়প্রার্থীদের বসতি বিধানের জন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে বাড়ী ঘর হইতে বাহির করিয়া দিবার বর্বর নীতি অবলম্বিত হয় নাই। ভারত যদি সে নীতি অবলম্বন করিত তবে, এখানে আশ্রয়প্রার্থী সমস্যার সমাধানে তাহাকেও বিশেষ বেগ পাইতে হইত না; কিন্তু ভারতের রাষ্ট্রীয় আদর্শে তাহা বাধে। ইহা ছাড়া ভারতীয় রাষ্ট্রের নীতি স্বার্থ-সংস্কারমূলক নয়; এজন্য সংখ্যালঘুদের পক্ষে তাহা উদ্বেগকর হয় নাই। তাহাদের আশ্বস্তি শিথিল হয় নাই, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পক্ষে ভারতের বাস্তুভিটা ছাড়িয়া যাইবার প্রশ্ন গুরুতরভাবে দেখা দেয় নাই; পক্ষান্তরে পাকিস্থান হইতে যাহারা মুসলমান তাহারাও অনেকে ভারতে আসিয়াছে এবং এখনও আসিতেছে, এজন্য আশ্রয়প্রার্থীদের সমস্যা পাকিস্থানের পক্ষে ভারতের ন্যায় গুরুতর আকার ধারণ করে নাই। বস্তুতঃ পাকিস্থানে আশ্রয়প্রার্থীদের সমস্যা সমাধান হওয়ার মূলে পাকিস্থানী শাসকদের গৌরব করিবার কিছুই নাই বরং সে গৌরব অনেকখানি ভারতেরই প্রাপ্য। ভারতের সর্বজনীন অধিকারসম্মত শাসন-নীতির জন্যই পাকিস্থানের ভার লঘু হইয়াছে, প্রকৃত সত্য ইহাই। পাকিস্থানে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে নাই এবং অত্যাবশ্যক দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পায় নাই বলিয়া জনাব লিয়াকৎ আলী যে গর্ব করিয়াছেন তাহা লোকে পরিহাস বলিয়াই মনে করিবে। পাকিস্থান কায়েম হইবার পর পাকিস্থানের অন্যতম বৃহৎ প্রদেশ পূর্ববঙ্গে অত্যাবশ্যক দ্রব্যসমূহের মূল্য যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, পূর্ববঙ্গের ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে কিছুদিন আগেও চাউলের দর ৫০৲।৬০৲ টাকা পর্যন্ত উঠিয়াছিল। বর্তমানেও দর ৩০৲।৪০৲ টাকার কম নয়। নদীবহুল পূর্ববঙ্গে যে মাছের দর প্রতি সের চার আনা মাত্র ছিল, আজ তাহাই আড়াই টাকা তিন টাকায় গিয়া উঠিয়াছে। যে দুধ কয়েক বৎসর আগেও প্রতি সের দুই আনায় মিলিত আজ তাহার মূল্য হইয়াছে কম পক্ষে বার আনা। পাকিস্থানে কাপড় দীর্ঘকাল দুষ্প্রাপ্য ছিল সম্প্রতি যাহা পাওয়া যাইতেছে তাহার মূল্যও স্বাভাবিকের তুলনায় আট গুণ। বাঙালীর নিত্য প্রয়োজনীয় সরিষা তেলের দরও সের করা ৩৲।৩৷৷৹ টাকার কম নয়। পাকিস্থানে দ্রব্যমূল্যের এই পটভূমিতেই পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী বিলাতে গিয়া বিশ্ববাসীকে জানাইতেছেন যে, পাকিস্থানে প্রয়োজন দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি পায় নাই। পাকিস্থানী নীতির ইহাই বৈচিত্র্য!

### পাকিস্থানের অর্থনীতি

ভারত এবং পকিস্থানের মধ্যে গতিবিধি এবং ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে বিনিময় যাহাতে স্বাভাবিক হয়, এই উদ্দেশ্যে পর পর কয়েকটি আন্তঃডোমিনিয়ন সম্মেলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বলা বাহুল্য, ইহাতে ভারত এবং পাকিস্থান উভয়েরই সুবিধা। ভারত গভর্নমেণ্ট তাঁহাদের নীতি এতদুপযোগীভাবেই নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, পাকিস্থানের কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে অনুকূল সাড়া পাওয়া যাইতেছে না। পক্ষান্তরে উভয় রাষ্ট্রের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং গতিবিধির স্বাভাবিক ধারা বিপর্যস্ত হয়, এমন সব নূতন নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তনে তাহাদের উৎসাহ যেন জিদের সঙ্গে বাড়িয়া চলিয়াছে। তাঁহারা আয় কর খালাসী ছাড়পত্রের ব্যবস্থা জারী করিয়াছেন। ইহার ফলে ভারত এবং পাকিস্থানের মধ্যে যাতায়াতের সমস্যা জটিল হইয়া উঠিয়াছে। পাকিস্থানী এবং ভারত রাষ্ট্রের অধিবাসী সকলেরই নিদারুণ অসুবিধা সৃষ্টি হইয়াছে। তাহার পর তাঁহারা এই বিধান জারী করিয়াছেন যে, পাকিস্থান হইতে কেহ ৫০ টাকার বেশী লইয়া বাহিরে যাইতে পারিবে না। ইহার ফলে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য একেবারে বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। ভারত বিভাগ হইবার অনেক পূর্বে পূর্ব বঙ্গ এবং পশ্চিম বঙ্গের মধ্যে দুইখানি পার্শেল ট্রেন যাতায়াত করিত, এখন একখানি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। পূর্ব বঙ্গ হইতে আগত মালপত্র রাখিবার জন্য শিয়ালদহ স্টেশনের যে সব মাল-গুদাম আছে, আগে সেগুলিতে জায়গা হইত না, আজকাল সেগুলি খালি পড়িয়া থাকে। পূর্ব বঙ্গ এবং পশ্চিম বঙ্গের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পর্ক এইভাবে ক্ষুণ্ণ হওয়াতে শুধু যে পশ্চিম বঙ্গের ক্ষতি হইবে এমন নয়, পূর্ব বঙ্গের আর্থিক বিপর্যয় আরও বেশী উৎকট হইয়া পড়িবে এবং ইতিমধ্যেই তাহা গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। আর্থিক কষ্টের চাপে পড়িয়া পূর্ব বঙ্গ হইতে দলে দলে মুসলমান আসামে যাইতে আরম্ভ করিয়াছে। আসাম পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়া শ্রীযুত মোহনলাল শকসেনা সেদিনও আমাদিগকে একথা বলিয়াছেন। পাকিস্থানী রাষ্ট্র-নিয়ামকদের ভেদবৈষম্যমূলক নীতি তাহাদিগকে কোন দিকে লইয়া চলিয়াছে, এখনও তাহারা লক্ষ্য করিতেছেন না, ইহাই আশ্চর্য।

### ভূমের ব্যাপার

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি ত্রার সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিহার গ্রেসের সভাপতি পণ্ডিত প্রজাপতি মিশ্র প্রতি মানভূমের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিবার দ্দেশ্যে পুরুলিয়া পরিভ্রমণ করেন। পুরুলিয়া রভ্রমণের পর পণ্ডিত প্রজাপতি মিশ্রের ভিমত বিহার কংগ্রেসের প্রচার বিভাগ বিশেষ ৎপরতার সঙ্গে প্রচার করিয়াছেন। এতৎ-পৰ্কিত বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, রুলিয়া পরিভ্রমণের ফলে ইহাই প্রতিপন্ন ইয়াছে যে, সেখানকার অধিবাসীরা সকলে হারেই থাকিতে চায় এবং হিন্দী ভাষা হাদের জোর করিয়া চাপানো হয় নাই। রুলিয়ার অধিবাসীরা নিজেরা ইচ্ছা করিয়াও হিন্দী শিক্ষা করিতে চায়। মিশ্র মহাশয় এই সম্পর্কে তাহাদের আগ্রহ দেখিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, বিহার প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির পুরুলিয়া পরিভ্রমণ সম্পর্কে য অভিমত বিহার রাষ্ট্রীয় সমিতি কর্তৃক প্রচারিত হইয়াছে, তাহাতে মানভূমের সত্যাগ্রহীদের উপরই ষোল আনা দোষ চাপানো হইয়াছে। সত্যাগ্রহী দলের নেতা শ্রীযুত অতুলচন্দ্র ঘোষ সম্প্রতি উহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। অতুলবাবু বলেন, লোকসেবক সঙ্ঘের কর্মীদের উপর যে নির্যাতন চালানো হইয়াছে, গ্রামে যাইয়া তদন্ত না করিলে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে না। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, পণ্ডিত মিশ্র তাহা করেন নাই; অধিকন্তু বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কেও তিনি গ্রাম পরিদর্শন হইতে নিবৃত্ত করিয়াছেন। গভর্নমেণ্টের লোক লইয়া গঠিত কয়েকটি প্রতিনিধিদলের সঙ্গেই তাহাদের দেখা-সাক্ষাৎ হয়। ইহাদের মনোভাব কিরূপ হইবে বলাই বাহুল্য; কারণ, মানভূম জেলার হাঙ্গামার জন্য ইহারাই প্রত্যক্ষভাবে দায়ী। মানভূম জেলার চারিদিকে সরকারী পরিবেষ্টন কেমন পাকাপাকি হইয়াছে এবং বিহারের কংগ্রেস নেতারা কিরূপ মনোভাব লইয়া চলিতেছেন, বিহার কংগ্রেসের প্রচার-কার্যে তাহার আর একটা পরিচয় পাওয়া গেল। সমস্ত বাঙালীসমাজ এ সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতির নির্দেশের প্রতীক্ষা করিতেছে। প্রকৃতপক্ষে ইহার সঙ্গে কংগ্রেসের আদর্শনিষ্ঠার প্রশ্ন জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। রাষ্ট্রপতির নির্দেশে এবং তাঁহার অবলম্বিত ব্যবস্থায় কংগ্রেসের সে মর্যাদা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে, আমরা এখনও এই আশাই করিতেছি। বলা বাহুল্য, মানভূমের সত্যাগ্রহ স্থগিত রাখা হইয়াছে, তাহা পরিত্যক্ত হয় নাই। বাঙালী সত্যের জন্য, ন্যায়ের জন্য, দেশ এবং জাতির বৃহত্তর স্বার্থের জন্য দুঃখকষ্ট বরণ করিতে ভীত নয়। কংগ্রেসের মর্যাদা এবং মানুষের মৌলিক অধিকারের জন্য মানভূমে যদি প্রয়োজন হয়, তবে দুঃখ-কষ্ট বরণ করিবার পথেই বাঙালী সত্যের প্রতিষ্ঠা করিতে অগ্রসর হইবে।

### শ্রীঅরবিন্দের তপস্যা

আলিপুরের জজ আদালতের যে প্রকোষ্ঠে ৪০ বৎসর পূর্বে মাণিকতলা বোমার মামলা সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দের বিচার হয়, ২৩শে বৈশাখ শুক্রবার সেই কক্ষে শ্রীঅরবিন্দের তৎকালীন একখানি প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। রবীন্দ্রনাথ শ্রীঅরবিন্দকে ভারতের বাণীমূর্তি বলিয়া বন্দনা করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে শ্রীঅরবিন্দের সাধনা হইতেই বাঙলা দেশে অগ্নিযুগের উদ্বোধন ঘটে এবং পরে সমগ্র ভারতের বিপ্লবের বহ্নি-শিখা বিস্তৃত হয়। দেশের স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য সত্যানিষ্ঠ সেই বলিষ্ঠ সাধনা অতঃপর ভারতের রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে বিচিত্ররূপে এবং বিভিন্ন পথে বিকাশ লাভ করে। কিন্তু মূলে প্রাণশক্তি একই ছিল; ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের মূলে এই প্রাণশক্তি সঞ্চার করাই অরবিন্দের সাধনার বিশেষ অবদান। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—"ভিক্ষাতরে বাড়াওনি আতুর অঞ্জলী," "আছ জাগি সদা পরিপূর্ণতার তরে"। ভারত আজ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে কিন্তু অরবিন্দের তপস্যা এখনও চলিতেছে। স্বাধীন ভারতের অখণ্ড অভ্যুদয়ের অনাময় জ্যোতির আলোকে জগতের অজ্ঞান অন্ধকার যাহাতে দূর হয়—এজন্য শ্রীঅরবিন্দ যোগ-সাধনায় নিমগ্ন রহিয়াছেন। পশুত্বের গ্লানি হইতে মানুষকে দেবত্বে উন্নীত করিবার উদ্দেশ্যে তিনি দিবারাত্র তপোমগ্ন। অখণ্ডের বাণী তিনি শুনিয়াছেন, পরিপূর্ণ সত্তার মহিমা তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন। ভারতের আত্মধর্মে তিনি অধিগত হইয়াছেন। এ দেশের অনাময় সংস্কৃতিতে সমুজ্জ্বল তাঁহার সেই উপলব্ধির দিব্য প্রভাবে ভারতের স্বাধীনতা বিশ্বমানবের বর্তমান জীবনের দৈন্য এবং দুর্বলতা দূর করিবার জন্য বলিষ্ঠ হইয়া উঠুক, ইহাই প্রার্থনা।

### রাষ্ট্র-সমবায়ে ভারত

কথায় আছে, নেকড়ে বাঘ তাহার গায়ের রং বদলায় না। ব্রিটিশ জাতিও সেইরূপ নিজেদের ইজ্জতের মোহ ছাড়িতে পারে না। ব্রিটিশের এই ইজ্জতের মোহ শ্বেতাঙ্গ জাতিগত বর্ণবৈষম্যের সঙ্গে জড়িত হইয়া তাহাদের সাম্রাজ্য-নীতিকে উৎকট করিয়া তুলিয়াছে। রাষ্ট্র-সম্মেলনের সিদ্ধান্তে ভারতের সার্বভৌম স্বাতন্ত্র্য মর্যাদা স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু এই স্বীকৃতিকে সার্থক করিতে হইলে ব্রিটিশ রাষ্ট্র সমবায়ের এতাবৎকাল প্রদর্শিত আদর্শেরও পরিবর্তন করিতে হইবে। শ্বেতাঙ্গ জাতির প্রভুত্বগত যে সংস্কার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে এতদিন প্রভাবিত করিয়াছে, তাহাকে উৎখাত করিতে হইবে। নহিলে ভারতের সখ্য, মৈত্র বা সহযোগিতা রাষ্ট্র সম্মেলনের সংহতিকে সুদৃঢ় রাখিবার বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিবে না। স্বাধীন রাষ্ট্রস্বরূপে ভারতের সখ্য এবং সহযোগিতা সত্যই যদি রাষ্ট্র সমবায়ের শক্তিনিচয়ের কাম্য হইয়া থাকে, তবে ভারতের আদর্শকেও তাঁহাদের মর্যাদা দিতে হইবে। ভারতের রাষ্ট্রীয় আদর্শের তাঁহারা পদে পদে অবমাননা করিবেন, অথচ ভারত তাঁহাদের স্বার্থ-সেবায় প্রবৃত্ত থাকিবে, এমন দুরাশা তাঁহাদের পরিত্যাগ করা উচিত। লণ্ডন ত্যাগের পূর্বে ইণ্ডিয়া লীগের উদ্যোগে আহূত সভায় পণ্ডিত জওহরলাল এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। দক্ষিণ আফ্রিকার সমস্যার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, দক্ষিণ আফ্রিকায় এসিয়াবাসীদের সম্পর্কে যে সমস্যা দেখা দিয়াছে, সমগ্র জগতের শান্তি তাহার ফলে বিপর্যস্ত হইবে, এমন আশঙ্কার কারণ আছে। সেদিন ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টেও দক্ষিণ আফ্রিকার জাতি বৈষম্যমূলক বিধি-ব্যবস্থার কথা উঠে। কয়েকজন সদস্য তাহার তীব্র প্রতিবাদও করেন। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধান মন্ত্রী ডক্টর মালান রাষ্ট্র সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি এ সম্বন্ধে তাঁহার মত পরিবর্তন করিয়াছেন বলিয়া তো মনে হয় না। অস্ট্রেলিয়ায় কৃষ্ণাঙ্গ জাতির প্রবেশ নিষিদ্ধ রহিয়াছে। সে অবস্থারও কোন পরিবর্তন ঘটিবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। এরূপ অবস্থায় ভারতকে রাষ্ট্র সমবায়ের মধ্যে রাখিবার চেষ্টা কতটা সার্থক হইবে, এ সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্টই সন্দেহ আছে। অবশ্য, ভারত পৃথিবীর সব রাষ্ট্রের সখ্য এবং সহযোগিতাই কামনা করে; শুধু তাহাই নয়, অতীতের যত তিক্ত অভিজ্ঞতা সেগুলিও জগতের শান্তি এবং কল্যাণকামনায় নবীন ভারত বিস্মৃত হইতে প্রস্তুত আছে। কিন্তু শ্বেতাঙ্গ জাতিসুলভ বৈষম্যের সংস্কার রাষ্ট্র-সমবায়ের সদস্য শক্তিবর্গ পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছেন কি? যদি এ সম্বন্ধে মনের কোণে তাহাদের কোন সঙ্কোচ থাকে, তবে শুধু বৈঠকে মিলিত হইয়াই ভারতের মৈত্রী তাঁহারা লাভ করিতে পারিবেন না। বস্তুতঃ তেলে জলে কখনও মিশ খায় না। নির্যাতিত মানবতার সংবেদনা লইয়া ভারত জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহার এই প্রাণধর্মের কাছে রাজনীতিক স্বার্থসঙ্কীর্ণ কোন প্রবঞ্চনা টিকিতে পারিবে না। এসিয়ার আত্মা আজ ভারতকে আশ্রয় করিয়া জাগিতেছে। শ্বেতাঙ্গ প্রভুত্বের বৈষম্যমূলক নীতির সব অভিসন্ধি ছিন্ন করিয়া ভারতের অন্তরে মানবতামূলক সেই সংবেদন সত্য হইয়া উঠিবেই।

# রবীন্দ্র জন্মোৎসব

ভারতের আত্মার বাণীমূর্তি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের উননবতিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে গত পঁচিশে বৈশাখ রবিবার কলিকাতা মহানগরী ও তাহার উপকণ্ঠের অধিবাসিবৃন্দ বিভিন্ন মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে সমবেত হইয়া তাঁহার পুণ্যস্মৃতির প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

সেইদিন প্রাতে রবীন্দ্রনাথের জন্মস্থান ও শৈশবের লীলাভূমি জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ির 'বিচিত্রা ভবনে' বিশ্বভারতী সম্মিলনীর উদ্যোগে এক ধ্যানগম্ভীর অনুষ্ঠানে তাঁহার শুভ জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। মহামানবের উননবতিতম আবির্ভাব তিথি স্মরণে ৮৯টি ঘৃতের প্রদীপ প্রজ্বলিত করা হয়।

এইদিন অপরাহ্নে নিখিল ভারত রবীন্দ্র স্মৃতি-রক্ষা সমিতির উদ্যোগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলে বক্তৃতা গান পাঠ ও আবৃত্তি সহযোগে কবিগুরুর জন্মদিবস অত্যন্ত নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সহিত উদযাপিত হয়। সিনেট হলের ভিতরে বাহিরে বারান্দায় রাস্তায় ও পার্ক পর্যন্ত লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছিল।

নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলনের উদ্যোগে এইদিন প্রভাতে ও সায়াহ্নে 'মহাজাতি সদনে' মহাকবির জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করিয়া মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীতে রবীন্দ্রনাথের প্রেম ও মৈত্রীর বাণীর মর্ম বিশ্লেষণ করেন এবং শ্রীযুক্তা সরলাবালা সরকার নবজাগ্রত ভারতের যাত্রাপথে কবিগুরুর শুভাশীষ প্রার্থনা করেন। সায়াহ্নিক অনুষ্ঠানে পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী তাঁহার সভাপতির ভাষণে বলেন যে, শুধু বক্তৃতা করিয়াই আমরা মহাকবির জন্মদিবস পালন করিতে পারিব না তাঁহার আদর্শ পালন করিলেই তাঁহার জন্মদিন উদ্‌যাপন সার্থক হইবে।

নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলন 'মহাজাতি সদনে' আগামী ১৫ই মে পর্যন্ত সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়াছেন। বাঙলার বিশিষ্ট মনীষী ও রবীন্দ্র-সংগীতবিদ্‌গণ রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার আলোচনার দ্বারা এবং বক্তৃতায় নৃত্যে ও গানে কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিবেদন করেন।
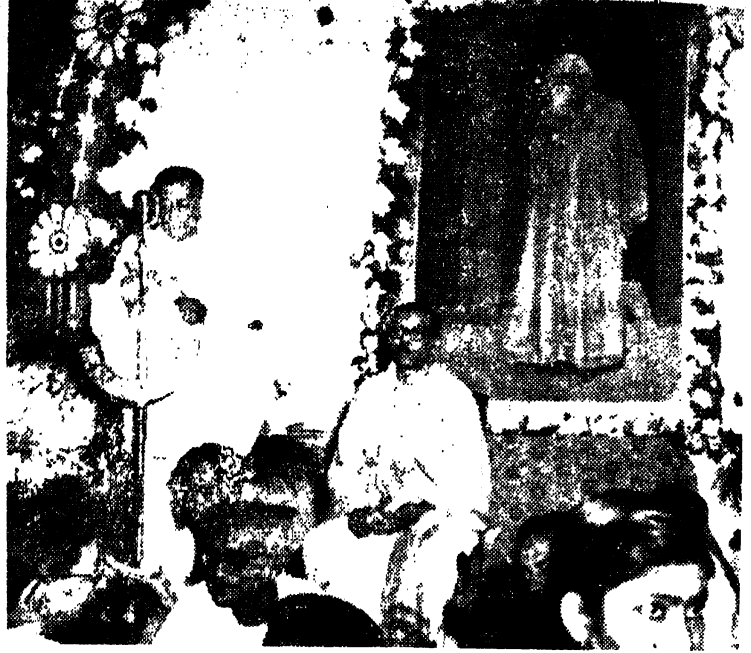
রবিবার সিনেট হলে রবীন্দ্র জন্মোৎসব অনুষ্ঠানের সভাপতি ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা তাঁহার ভাষণ পাঠ করিতেছেন, পার্শ্বে উপবিষ্ট নিখিল ভারত রবীন্দ্র স্মৃতিরক্ষা সমিতির সম্পাদক শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র মজুমদার

সিনেট হলের অনুষ্ঠানে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী স্বস্তি পাঠ করিতেছেন

## ইংরেজের চৈনিক নীতি

**ই**য়াংসি নদীতে কম্যুনিস্টদের হাতে বৃটিশ ক্রুজার "এ্যামেথিস্ট"এর নাকাল হবার পর থেকে ইংরেজের চৈনিক নীতিতে একটা নতুন আলোড়ন দেখা যাচ্ছে। কম্যুনিস্ট-দের অগ্রগতিতে ইংরেজরা বিশেষ উদ্বিঘ্ন, এমন কোন লক্ষণ এতদিন দেখা যায় নি। বরঞ্চ কোমিনটাং ও চিয়াং কাইশেকের দুর্দশায় বহুতর ইংরেজ সাংবাদিক ও প্রচারকের লেখার মধ্যে একটা চাপা খুশির ভাব অনুভব করা যেত। এটা কেবল "বামপন্থীদের" সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। হংকংএর ঝানু বৃটিশ বণিকদেরও অনুরূপ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া গেছে। এরা কোন দিনই চিয়াং কাইশেক বা কোমিনটাংএর উপর সন্তুষ্ট ছিল না। তারপর যখন দেখা গেল যে কোমিনটাং কম্যুনিস্টদের ঠেকিয়ে রাখতে পারবে সে ভরসা নেই এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আশা হোল যে, কম্যুনিস্টদের রাজত্বেও পুরোদমে ব্যবসা করার সুযোগ মিলবে তখন বৃটিশ ব্যবসায়ীদের পক্ষে চীনের গৃহ-যুদ্ধ ও কোমিনটাং-এর যুগপৎ অবসান কামনা করা কিছু আশ্চর্য ব্যাপার নয়।

জাপানী যুদ্ধ শেষ হবার পরে হংকংএর ভবিষ্যতের কথা যখন ওঠে তখন স্পষ্টই বোঝা গিয়েছিল যে, বৃটিশ অধিকার থেকে হংকং ফিরে পাওয়ার বাসনা চিয়াং কাইশেক ও কোমিনটাং-এর মনেও যথেষ্ট প্রবল, কেবল সুযোগের অপেক্ষা। সুতরাং কড়া জাতীয়তা-বাদী কোমিনটাংএর প্রতি বৃটিশদের কোন বিশেষ দরদ থাকার কারণ নেই। কম্যুনিস্টদের ও পরোক্ষে রুশ-শক্তির প্রতিরোধক হিসাবে কোমিনটাং-এর বল বৃদ্ধি করার দায়িত্ব গোড়া থেকেই বড় তরফ অর্থাৎ আমেরিকা নিয়েছে। সে দায়িত্বের ভাগ নেয়ার সামর্থ্য ইংরেজের ছিলও না। তা ছাড়া, ইংরেজ বহু পুরোনো খেলোয়াড়, হয়ত বা মনে মনে বুঝেছিল ভস্মে ঘি ঢালা হচ্ছে। কোমিনটাংকে সাহায্য করার জন্যে কম্যুনিস্টদের কাছে আমেরিকানরা অধিক-তর অপ্রিয় হবে, সুতরাং কম্যুনিস্টরা যদি জেতে তবে নিরপেক্ষ থাকার পুরস্কার হিসাবে আমেরিকানদের তুলনায় ইংরেজরা ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কম্যুনিস্ট কর্তৃপক্ষদের কাছ থেকে বেশি সুযোগ-সুবিধা পাবে—এ আশাও তাদের নিশ্চয়ই ছিল। চীনা কম্যুনিস্টরা কর্তৃত্ব পেলে বর্তমান শিল্প ও আর্থিক প্রতি-ষ্ঠানগুলিকে নষ্ট বা গ্রাস না করে সেগুলিকে একরকম পূর্বের অবস্থায় রেখেই তাদের সাহায্যে দেশ পুনর্গঠন করতে চেষ্টা করবে—এই ধারণাও কম্যুনিস্ট-অধিকৃত মাঞ্চুরিয়া এবং উত্তর চীনে কম্যুনিস্ট কর্তৃপক্ষের আচরণ দেখে অনেকের মনে ক্রমশঃ বদ্ধমূল হচ্ছিল। এ পর্যন্ত দেখা গেছে যে চীনা কম্যুনিস্টরা কৃষির জমির নতুন বণ্টনব্যবস্থা করতেই তৎপর, শিল্প ও নাগরিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে তারা এখনও হাত দিতে চায় না। কম্যুনিস্ট দখলের পরে অনেক জায়গায় শিল্প ও ব্যাঙ্ক প্রভৃতি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিশেষ করে অভয় দেওয়া হয়েছে, বিদেশী ব্যবসায়ীদেরও নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়ে নির্ভয়ে কাজ চালিয়ে যেতে বলা হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বিখ্যাত বৃটিশ প্রতিষ্ঠান "হংকং এণ্ড সাংহাই ব্যাঙ্কিং করপোরেশন" এবং আরও কয়েকটি ব্যাঙ্ককে উত্তর চীনে কম্যুনিস্ট কর্তৃপক্ষ এজেন্ট নিযুক্ত করেছেন। এইসব দেখেশুনে অনেকেরই ধারণা হয়েছে যে কম্যুনিস্ট অধিকৃত চীনেও ব্যবসার সুযোগ থাকবে। তারা মনে করছে যে, যুদ্ধে জয়ী হওয়ার পরে কম্যুনিস্টদের এতরকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে ও হবে যে তারা কাজের সুবিধার জন্যে বর্তমান শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে আপোষ করে চলতে চাইবে। দ্বিতীয়তঃ, চীনে শিল্পের উন্নতি ও প্রসার বাইরের সাহায্য ছাড়া হওয়া সম্ভব নয়, সে সাহায্য কম্যুনিস্টরা রাশিয়ার কাছ থেকে অতি সামান্যই আশা করতে পারে, কারণ রাশিয়ার পক্ষে চীনে বেশি পরিমাণ মূলধন ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা সম্ভব নয়। সুতরাং চীনা কম্যুনিস্টরা যদি চীনকে শিল্পসমৃদ্ধ করতে চায় তবে তাদের বৃটিশ ও এমনকি আমেরিকান ব্যবসায়ীদের সঙ্গেই কারবার করতে হবে। চীনা কম্যুনিস্টদের সম্বন্ধে এরা আরও একটা আশা পোষণ করতে শুরু করেছে, সেটা হোল এই যে, চীনা কম্যুনিস্টদের বর্তমান দল-পতিরা মস্কোর তাঁবেদারি কখনই করবে না। য়ুরোপে টিটোর সঙ্গে মস্কোর আজ যে সম্বন্ধ, এশিয়ায় মাও-সে-তুংএর সঙ্গে ভবিষ্যতে মস্কোর সম্বন্ধ অনুরূপ হয়ে উঠবে বলে এদের আশা। আশাটা সম্পূর্ণ অমূলক নাও হতে পারে।

কিন্তু এতদিন বৃটিশ ব্যবসায়ীরা চীনে কম্যুনিস্ট জোয়ারের সঙ্গে সঙ্গে যেমন সচ্ছন্দে নৌকা বেয়ে চলছিল তাতে একটা বাধা পড়ল "এ্যামেথিস্ট"এর ঘটনায়। বৃটিশ পার্লামেন্টে এই নিয়ে তুমুল বিতর্ক হয়ে গেছে। বৃটিশের ধনে, প্রাণে বা মানে আঘাত দিলে ভবিষ্যতে তা সহ্য করা হবে না, চীনা কম্যুনিস্টদের এইটে বুঝিয়ে দেবার জন্যে যে ব্যবস্থার দরকার বৃটিশ গভর্নমেণ্ট তার জন্যে তৎপর হয়ে উঠেছেন। কোন কারণেই ইংরেজ হংকং ছাড়বে না, এইটে জোর করে ঘোষণা করা হচ্ছে। চীনের কাছাকাছি যে বৃটিশ নৌবহর থাকে তাকে আরো জোরালো করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই সিঙ্গাপুর থেকে নৌবহরের কয়েকজন কর্তা হংকংএ পরামর্শ করতে গেছেন। হংকংএ সামরিক বিমানের কোন ঘাঁটি ছিল না, মালয় থেকে সামরিক বিমান যাতে হংকংএ গিয়ে নামতে পারে তার জন্যে হংকংএ বিমানঘাঁটি তৈরী করার কাজ শুরু হচ্ছে। সম্ভবতঃ একখানা বিমানবাহী জাহাজ অর্থাৎ এয়ার-ক্রাফ্ট-ক্যারিয়ার হংকংএর কাছাকাছি রাখার ব্যবস্থাও হয়েছে। এগুলি বোধহয় বৃটিশ জাতির আহত অভিমানের উপর প্রলেপের ব্যবস্থা মাত্র। আসলে বৃটিশ ব্যবসায়ীদের স্বার্থের খাতিরেই বৃটিশ গভর্ন-মেণ্ট পারতপক্ষে এখন চীনা কম্যুনিস্টদের সঙ্গে লাগতে যাবেন না।

## গণপতির ফাঁসি

নিখিল-মালয় ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের সভাপতি ভারতীয় যুবক গণপতির ফাঁসি হয়ে গেছে। গণপতির সম্বন্ধে বিস্তারিত সংবাদ পূর্বেই কাগজে বেরিয়ে গেছে, এখানে তার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এ ঘটনা ভারত-বাসী সহজে ভুলবে না। ভারত সরকারের মালয়-স্থিত প্রতিনিধিরা গণপতির ফাঁসি ঠেকাতে, অন্ততঃ স্থগিত করাতে চেষ্টা করেছিলেন, ভারতীয় হাইকমিশনার বিলাতে বৃটিশ গভর্নমেণ্টের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন, মালয় ভ্রমণকালে পররাষ্ট্র বিভাগের উপমন্ত্রী ডক্টর কেসকারও মালয়ের বৃটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে গণপতির প্রাণরক্ষার জন্য তদ্বির করে-ছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হোল না। গণপতির ফাঁসি হয়েছে বাহ্যতঃ সেলাংগরের দেশীয় সুলতানের গভর্নমেণ্টের আদেশে। আসলে কিন্তু মালয়ে রাজশক্তি সম্পূর্ণভাবে বৃটিশের করতলগত, দেশীয় সুলতানরা বৃটিশের ক্রীড়নক মাত্র। সুতরাং এক্ষেত্রে গণ-পতির প্রাণবধের এবং ভারত সরকারের অব-মাননার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে বৃটিশের—খাস বৃটিশ গভর্নমেণ্টের, কারণ মালয় "ডোমিনিয়ন" নয়, মালয়ের ঔপনিবেশিক শাসন সোজা লণ্ডন থেকে নিয়ন্ত্রিত হয়। অতএব দিল্লীকে

বোঝাপড়া করতে হবে লণ্ডনের সঙ্গে। জাপানীর ঠেঙ্গানী এবং সুভাষ-গঠিত আই এন এ'র স্মৃতি অস্পষ্ট হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে মালয়ের শ্বেতাঙ্গগণ আবার বোধহয় ভারতীয়দের 'কুলির জাত' বলে ভাবতে শুরু করেছে। ১৫ই আগস্টের প্রভাব তাদের ওপর পড়েনি মনে হচ্ছে। একটা কালা কুলির সর্দারকে ঝুলিয়ে দেবে—তার জন্যে আবার এত ঝামেলা কিসের?

কমনওয়েলথ কনফারেন্সের অব্যবহিত পরেই গণপতির ব্যাপারটা বড় তিতো লাগবে সন্দেহ নেই, কিন্তু বিষয়টি পণ্ডিত নেহরুর নিজ দপ্তরের অন্তর্গত, সুতরাং তিনি ভুলে থাকতে পারবেন না, দেশের লোকও ভুলে থাকতে দেবে না। ৪ঠা মে কুয়ালালামপুরের জেলে গণপতির ফাঁসি হয়। গণপতির জায়গায় বীরসেনম নামে যে ব্যক্তি ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের সভাপতি হয়েছিলেন তিনিও গণপতির ফাঁসির পরের দিনই এক টহলদারী গুর্খা সৈনিকের হাতে গুলি খেয়ে মারা যান। এ'র সম্বন্ধে কেবল এই সংবাদটুকু এসেছে যে নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে গেরিলাদের একটা আস্তানা থেকে চীনাদের সঙ্গে পালাবার সময়ে তাঁকে গুলি করা হয়। নাম দেখে মনে হয় ইনিও ভারতীয়। সুতরাং এ'র সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ এবং প্রকাশ করার দায়িত্বও মালয়স্থিত ভারত গভর্নমেণ্টের প্রতিনিধিদের ওপর এসে পড়েছে। প্রকাশিত সংবাদের ধরণ থেকে মনে হতে পারে যে, গণপতি ও বীরসেনম্ উভয়েরই কম্যুনিস্টদের সঙ্গে কিছু সম্পর্ক ছিল, কিন্তু সে কথা গৌণ, আসল প্রশ্ন হোল এই যে, গণপতি ও বীরসেনম এমন কোন অপরাধ করেছিলেন কিনা যার জন্যে তাঁরা বধযোগ্য বিবেচিত হতে পারেন, না কালা আদমী বলে ন্যায় বিচারের চেয়ে শিক্ষা দেওয়াই শ্বেতাঙ্গ কর্তৃপক্ষের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল?

## বিপন্ন ব্রহ্ম গভর্নমেণ্ট

শেষপর্যন্ত ঠিক হয়েছে যে, ভারতবর্ষ, পাকিস্থান ও বৃটিশ গভর্নমেণ্ট একযোগে ব্রহ্ম গভর্নমেণ্টকে সাহায্যদান করবে। মোটামুটি কথা বোধহয় লণ্ডনে কমনওয়েলথ কনফারেন্সের সময়েই হয়ে গিয়েছে। পণ্ডিত নেহরু ও মিঃ লিয়াকৎ আলি খানের লণ্ডন যাত্রার প্রাক্কালে ব্রহ্মের প্রধান মন্ত্রী থাকিন নু এসে এ'দের সঙ্গে আলাপ করে যান। রেঙ্গুন থেকে যা খবর আসছে তাতে জানা যায় যে, ব্রহ্ম গভর্নমেণ্টকে টাকা ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করা হবে। এ ব্যাপারের খুঁটিনাটি ব্যবস্থাগুলি সম্বন্ধে ব্রহ্ম গভর্নমেণ্টের সঙ্গে রেঙ্গুনে অবস্থিত অন্য তিন গভর্নমেণ্টের দূতদের আলোচনা চলছে। ফলাফল বোধহয় সত্বরই প্রকাশিত হবে। এরকম শোনা যাচ্ছে যে, সাহায্যদানকারী তিন গভর্নমেণ্টের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটা কমিটি বা কাউন্সিল মতন থাকবে। তার কাজ বোধহয় হবে, যে সাহায্য দেওয়া হবে সেটার সদ্ব্যবহার হচ্ছে কিনা দেখা। চীনে আমেরিকা-প্রদত্ত সাহায্যের পরিণাম দেখে ভবিষ্যতের রাজনৈতিক দাতারা নিশ্চয়ই একটু সবাধান হয়ে চলবেন।

## পথ খোলা—মন খোলা নয়

বর্তমান প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার আগেই ইঙ্গ-মার্কিন-ফরাসী অধিকৃত পশ্চিম জার্মানী থেকে বার্লিনে যাতায়াতের স্থলপথ অবরোধ মুক্ত হবে। রাশিয়া পথ খুলে দিতে এগিয়ে এল কেন, এই নিয়ে অনেক জল্পনা কল্পনা চলছে। তবে কোন পক্ষের মনের ভাবই যে অপরের সম্বন্ধে এতটুকু বদলেছে তা মনে হচ্ছে না। ২৩-এ মে তারিখে রুশ, বৃটিশ, ফরাসী ও মার্কিন এই চার গভর্নমেণ্টের পররাষ্ট্র-সচিবদের আবার বৈঠক বসবে। মুখে অবশ্য সকলেই নিষ্পত্তির জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করছে কিন্তু উভয়পক্ষের আচরণ দেখলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে নিষ্পত্তির আশায় কোন পক্ষই নিজের কাজে ঢিল দিচ্ছে না। ইংরেজ ও মার্কিন কর্তাদের কথায় বার্তায় একটা চাপা উল্লাসের আভাষ পাওয়া যাচ্ছে—রাশিয়াকে খানিকটা কায়দা করা গেছে, এই রকম ভাব। কিন্তু তার সঙ্গে সন্দেহ এবং একটু ভয়ও মিশ্রিত আছে। কি জানি আবার কাছে ঘেঁষে এসে কি গণ্ডগোল বাধায়। অনেক কষ্টে আতলান্তিক চুক্তিটা সই হয়েছে, যেমন-তেমন করে একটা 'কাউন্সিল অব য়ুরোপ'ও খাড়া করা গেছে, পশ্চিম জার্মানীতেও মোটামুটি নিজেদের ইচ্ছানুরূপ একটা ফেডারেল গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত করতে অ-কম্যুনিস্ট জার্মান দলগুলিকে রাজী করানো গেছে। এ পক্ষের ভালোরকম সামরিক তোড়জোড় না দেখলে যে রাশিয়ার কিছুতেই সুবুদ্ধির উদয় হবে না, এই প্রচারও বেশ জমে উঠেছে—ঠিক এই সময়ে রাশিয়া আপোষ করার ভাণ দেখিয়ে লোকের মন আবার বিগড়ে না দেয়!

৮-৫-৪৯

# সময়

**শ্রীঅর্চনাপ্রসাদ দাশগুপ্ত**

স্তব্ধ পাতার আড়ালে লুকালো ক্ষীয়মান চাঁদ পাণ্ডুর ম্লান মুখ,
টেনে নিয়ে গেল ঝরোকাতে ঝরা বসন-প্রান্ত জ্যোৎস্না চীনাংশুক,
মুঠোয় মুঠোয় তারকার ধূলি ছড়ানো যা ছিল আকাশের আঙিনায়
সহসা তাহারা জ্বলিয়া উঠিল, উজ্জ্বল চোখে ঝলকিত কৌতুক।

জানালার পথে হাত বাড়ালাম, ঊর্দ্ধ আকাশে পুণ্যের পরপারে
সময়ের নদী সূক্ষ্ম প্রবাহে আঙুলের ফাঁকে মিলালো অন্ধকারে,
গেল বহুকাল, তারাগুলি সব হেলিয়া পড়িল একে একে দেখিলাম,
আকাশের ঘড়ি তারার কাঁটাতে মূক সংকেতে কী জানালো
বারে বারে!

তোমরা সকলে ঘুমোতে লাগিলে, আমার দু'চোখে ঘুম ঘুচে
গেল বুঝি,
দ্রুত ধাবমান রাতের চরণে জীবনের চোখে তাকালাম সোজাসুজিঃ
দেখিলাম চেয়ে প্রতি নিঃশ্বাসে আয়ু তহবিলে ঘাটতি চ'লেছে বেড়ে,
রাতের আঁধার তোলপাড় ক'রে কোন সান্ত্বনা মিলিল না কোথা খুঁজি!
'অন্ত কি নেই বর্তমানের?' শুধানু, 'সময় সে-ও তো আপেক্ষিক?'
জবাব এলো না, গাহিল সহসা পূর্ব তোরণে আলোক বৈতালিক॥

শৈ**লেশ্বরের** বিলেত-যাত্রার কাহিনীটা একটু বিচিত্র। অনুভাকে কেন্দ্র ক'রেই তার এই পর্যটনের সূত্রপাত। শহরের অভিজাত ব্যারিস্টার তীর্থপতি চৌধুরীর অভিজাত কন্যা অনুভা। একই বছরে একসাথে এম এ পাশ ক'রে বেরোয় দু'জনে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ে এমন ছাত্র-ছাত্রীর নাম তো আরও কতই আছে রেজিস্ট্রি খাতায়। কিন্তু সেই নির্বিশেষের মধ্যে একটু বিশেষতমই বৈ কি শৈলেশ্বর আর অনুভা। দু'জনেই পেলো সেকেণ্ড ক্লাশ ঃ শৈলেশ্বর হ'লো সেকেণ্ড, অনুভা থার্ড। ফার্স্ট ক্লাশে কারুর নাম ওঠেনি এবছর বিশ্ববিদ্যালয়ে।

শৈলেশ্বর ব'ল্‌লো, 'এতবড় অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত্‌ নয় অনুভা। এগ্‌-জামিনারের নেগ্‌লিজেন্সেই এই বিপদ ঘ'টেছে। খাতা রি-এগ্‌জামিন করাবার জন্য আমি জোর ক'রবো।'

অনুভা বল্‌লো, 'করো, ক্ষতি নেই, কিন্তু শুধু তোমার নিজের খাতা, এই যেন মনে থাকে।'

অর্থাৎ—অনুভার ভয়, পাছে নতুন ক'রে খাতা পরীক্ষা হ'লে থার্ড থেকে একেবারে টুয়েল্‌ভ্‌থে নেমে যায় সে। পরীক্ষা দিয়ে অবধি এগ্‌জামিনারদের বাড়ীবাড়ী গিয়ে ঘুরে এসেছে সে কম নয়। কাজটা এত গোপনে যে, শৈলেশ্বরের দৃষ্টিতে পর্যন্ত তা আড়াল প'ড়ে গেছে। অথচ পড়াশুনোয় ফাঁকি দেবার মেয়ে নয় অনুভা। সারা বছর বাড়ীতে রীতিমত প্রফেসার রেখে প'ড়েছে সে। কিন্তু হ'লে কি হবে, পরীক্ষার হলে ব'স্‌লেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন কেমন ঘুরপাক খেতে থাকে মাথায়। জানা জানা বিষয়গুলো কেমন যেন বীভৎস প্রেতের মতো অনবরত ভয় দেখায় তাকে। কথাটা ব'লে তাই অনেকক্ষণ ধ'রে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সে শৈলেশ্বরের মুখের দিকে।

মুখ টিপে একবার হাস্‌তে চেষ্টা ক'রলো শৈলেশ্বর।—'বেশ, তোমার প্রয়োজন না থাকে, আমার নিজের সম্বন্ধেই হেড্‌-এগ্‌জামিনারকে ব'লবো।'

—'তিনি যদি রি-এগ্‌জামিনের ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত টেক্‌আপ্‌ না করেন!' ইতস্ততঃ-কণ্ঠে অনুভা ব'ললো, 'শুনেছি, ফার্স্ট্‌ ক্লাশ পাবার মতো মেরিট নাকি এগ্‌জামিনাররা খুঁজে পাননি এবারে।'

—'এ্যাব্‌সার্ড্‌!' কণ্ঠের উপর একটা বিশেষ রকম জোর দিয়ে শৈলেশ্বর ব'ল্‌লো 'আমি বিশ্বাস করি না একথা।'

অর্থাৎ—নিজেকে সেকেণ্ড ক্লাশের মতো ডি-মেরিটেড্‌ ব'লে স্বীকার ক'রে নিতে রাজি নয় শৈলেশ্বর। তার এই পৌরুষকে ভালোবাসে অনুভা, শ্রদ্ধা করে মনে মনে। তার নিজের মনের দীনতা দিয়ে মাপ্‌তে যায় না সে শৈলেশ্বরকে। কলেজে থার্ড ইয়ার থেকে তাকে চেনে অনুভা। মনে মনে এই শ্রদ্ধা সে পরিচয়ের প্রথম দিন থেকেই নিবেদন ক'রে এসেছে শৈলেশ্বরকে। ডিবেটিং ক্লাশে লক্ষ্য ক'রেছে—কী অসাধারণ যুক্তি নিয়ে সে হারিয়ে দিয়েছে প্রফেসার আর ছাত্রদের। কোচিং ক্লাশে কোনো দিন শৈলেশ্বরের পিছনে বিন্দুমাত্র সময় ব্যয় ক'রতে হয়নি প্রফেসারকে। কথাটা ব'লে নিজের মনে সংশয় বোধ ক'রলেও সেই পুরোনো শ্রদ্ধাকে আর একবার নতুন ক'রে অনুভা মনে মনে জানিয়ে নিল' শৈলেশ্বরকে, তারপর শৈলেশ্বরের কণ্ঠের সঙ্গে সমান তাল রেখে ব'ললো, 'আমিও বিশ্বাস করি না।'

কিন্তু অনুভার কথাটাই শেষ পর্যন্ত সত্যি হ'লো। হেড এগ্‌জামিনার থেকে শুরু ক'রে বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিটি পর্যন্ত চক্রাকারে ঘুরে এলো শৈলেশ্বর, কিন্তু ঐ সেকেণ্ড ক্লাশ সেকেণ্ডই। একটি নম্বরও আর নতুন ক'রে তার খাতায় উঠলো না।

শুনে পাইপমুখে একবার বাঁকা হাসি হাসলেন তীর্থপতিঃ 'আমি জানতুম, এর বেশী তুমি উঠ্‌তে পারবে না।'

অনেক কষ্টে নিজের মধ্যে ক্রোধ দমন ক'রে নিল' শৈলেশ্বর ঃ 'কিছুই তবে জানেন না আপনি।'

মুখের পাইপটাকে কেন্দ্র ক'রে চোখ দুটোকে একবার অর্ধগোলাকৃতভাবে ঘুরিয়ে নিলেন তীর্থপতিঃ 'হয়ত হবে!' —থেমে ব'ল্‌লেন, 'তবে অনুভা সম্পর্কে আমি খুব আপ্‌সেট্‌ হ'য়ে প'ড়েছি। ওর কোচিং প্রফেসার পর্যন্ত বলেছিল—ফার্স্টক্লাশ ওর অবধারিত বাট্‌ লাক্‌।'

মুখ থেকে পাইপটা নামিয়ে একটা ভারী নিশ্বাস ত্যাগ ক'রলেন তীর্থপতি চৌধুরী।

—'অনুভার ওপিনিয়ান কিন্তু তা নয়' ভালো ক'রে একবার চোখ তুলে তাকাতে চেষ্টা ক'রলো শৈলেশ্বর।

'ওপিনিয়ান গ্রো ক'রবার মতো ওর বয়স হ'য়েছে ব'লেই আমি বিশ্বাস করি না।'

অর্থাৎ—এখনও যেন কচি খুকিটি অনুভা মেয়ে সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন হ'য়েও অনেকখানিই নির্বিকল্প তীর্থপতি চৌধুরী। এটা তাঁর মতো আইনজীবীর পক্ষে শোভা পায় না, ছেলেমানুষী ব'লে হাসি পায়।

কিন্তু সেটুকু নিজের মধ্যে সম্বরণ ক'রে নিল শৈলেশ্বর। স্থান ত্যাগ ক'রে উঠতে উঠতে ব'ললো, 'অনুভার কাছ থেকে ওর বয়সটা এক সময় জিজ্ঞেস ক'রে নেবেন তা হ'লে।'

পাইপের মুখে কেস থেকে নতুন ক'রে তামাক ভ'রতে ভ'রতে হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে গেলেন তীর্থপতি চৌধুরী।

সদর গেটের দিকে এগিয়ে আসতেই হঠাৎ পিছন থেকে গলা শোনা গেল অনুভার, নিজের ঘরের জানলায় মুখ বাড়িয়ে চাপা গলায় ডাকছে অনুভা।

দু'পা পিছিয়ে এসে শার্সিতে হাত রেখে মুখ উঁচালো শৈলেশ্বর : 'কি বলো?'

—'এই মাত্র বাবার মুখের উপর তুমি যে কথা ব'লে গেলে, তা আমার কানে এসেছে।' অনুভা ব'ললো, 'কিন্তু কথাটা ওভাবে না ব'লে অন্যভাবেও ব'ল্‌লে পারতে! কলেজের দোর পেরোতে পেরোতেই কি আর্ট ভুলে গেলে!'

—'আর কিছু ব'ল্‌বে?' বাঁ হাতে জামার কলারটাকে ঘাড়ের দিকে আরও কিছুটা উঁচিয়ে নিতে চেষ্টা ক'রলো শৈলেশ্বর।

—'সম্ভবতঃ তুমি ঝগড়া ক'রবে ব'লে মনে হ'চ্ছে।' একবার ঢোক চিপে নিল' অনুভা। —'সত্যিই কি বাবা আমার বয়স জানেন না? কথাটা একটু বিশ্রী শোনাচ্ছে না-কি? অন্য কিছু ব'লে বাবাকে তোমার খুশী ক'রে আসা উচিৎ ছিল।'

—'কেন আমি তোমার বাবার মুহুরি নাকি যে, চাকুরি যাবার ভয় থাক্‌বে!' একটু রূঢ় ভাবেই কথাটা বেরিয়ে এলো শৈলেশ্বরের মুখ থেকে। —'তিনি আমার পার্সোনালিটিকে আঘাত ক'রেছেন। অতটা সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্স থাকা ভাল নয়; দুনিয়া সম্বন্ধে অজ্ঞ থেকে যেতে হয় তাতে। এটা বুঝিয়ে দিও তোমার বাবাকে।'

শার্সি থেকে হাত নামিয়ে নিয়ে সাম্‌নের পথে পা বাড়ালো শৈলেশ্বর। কিন্তু খানিকটা পথ এগিয়ে আসতেই নিজের কাছেই নিজেকে বড় বিশ্রী ব'লে মনে হ'লো তার। অতটা বাড়িয়ে বলা ঠিক হয়নি অনুভাকে। হয়ত অনুভা দুঃখ পেলো মনে; আর হয়ত গিয়ে সহজভাবে তবে দাঁড়ানো সম্ভব হবে না ওর সাম্‌নে। কিন্তু তার মনকে সত্যিই আঘাত দিয়ে কথা ব'লেছেন তীর্থপতি চৌধুরী। খচ্‌খচ্‌ ক'রে কথাটা বিঁধতে লাগলো শৈলেশ্বরের মনে : 'আমি জানতুম, এর বেশী তুমি উঠতে পারবে না।' মানুষের সম্বন্ধে এত ছোট ক'রে জেনে ব'সে থাকা ভালো নয়, ওতে দম্ভ বেড়ে যায়, বিশ্বচরাচর সম্পর্কে ঘৃণা আসে। —নিজের মতবাদ সম্পর্কে নিজের মধ্যে আরও কিছুটা দৃঢ় হ'য়ে নিল' শৈলেশ্বর, তারপর আরও কিছুটা দ্রুত পা চালালো বাড়ীর দিকে।

ঘরে ঢুকে জামা ছেড়ে ব'সতেই মা এলেন একবাটি গরম দুধ আর গোটা দুই কাঁচা সন্দেশ নিয়ে। ব'ললেন, 'কেবল বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াস্‌, কাছে তো আর পাই না! নে, ধর, দুধটুকু আগে খেয়ে নে।'

—'এ তোমার বড্ড বাড়াবাড়ি মা।' কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ ক'রলো শৈলেশ্বর। —'জানো যে, দুধ আমি ভালোবাসিনা, তবু বাটি ভ'রে এনে সাজিয়ে ধ'রবে!'

—'এটুকু না খেলে শরীর রাখ্‌বি কি ক'রে? একেই তো পরীক্ষার পড়া প'ড়ে শুকিয়ে গেছিস বাবা। লক্ষ্মী তো, নে, ধর, কথা শোন।' স্নেহ যেন মুক্তো হ'য়ে ঝ'রে পড়তে থাকে মার মুখ থেকে।

বাটিতে চুমুক দিয়ে ঢক্‌ ঢক্‌ ক'রে এক নিশ্বাসে গিলে নেয় দুধটুকু শৈলেশ্বর, তারপর এক সময় গিয়ে খুলে বসে নিজের দপ্তর।

রাশি রাশি কাগজের টুক্‌রো, রাশি রাশি রচনার ভিড়। এম-এর কোর্স নিয়ে যত নোট ক'রেছে সে এপর্যন্ত ঠিক ক'রলো শৈলেশ্বর, ওগুলোকে গুছিয়ে কিছুটা বাড়িয়ে কমিয়ে থিসিস্‌ সাবমিট ক'রবে ডক্টরেটের জন্য। অনুভার বাবাকে অন্ততঃ দেখিয়ে দিতে হবে, তার সম্বন্ধে তিনি যা মনে করেন, সে ঠিক ততটা ছোট নয়। —এপাশ থেকে ওপাশ থেকে পর-পর অনেকগুলো কাগজ টেনে বার ক'রলো শৈলেশ্বর। হঠাৎ একখানি খামে মোড়া চিঠি উঠে এলো হাতে। ছাপার হরফে গোট্‌-গোট্‌ ক'রে উপরে শৈলেশ্বরের নাম লেখা।

অনুভারই হস্তাক্ষর। বি এ পাশ ক'রে চিঠিটা লিখেছিল অনুভা। নিতান্ত সেই তথাকথিত মামুলী প্রেমপত্র নয়, অথচ হৃদয়কে কোথাও লুকিয়ে রাখতে পারেনি চিঠিটার কোথাও। বহুবার প'ড়েছে চিঠিটা শৈলেশ্বর, আবারও প'ড়লো :

...'জানি তুমি এ লেখা প'ড়ে হাসবে, কিন্তু চিঠি লিখ্‌বার জন্য মনটা আসলে তৈরীই নেই এখন। আকাশে খুব মেঘ জ'মে হাওয়া দিচ্ছে বাইরে; মাসটা তো ভালো নয়, ভরা ভাদ্র ('এ ভরা বাদর মাহ ভাদর'...) এখুনি হয়ত বৃষ্টির ধারা নাম্‌বে। তার আগে আগে গিয়ে যাতে চিঠিটা পৌঁছায় তোমার হাতে, তাই লেখা। পারো তো এক্ষুনি চ'লে এসো। নতুন রেকর্ড এনেছি বাড়ীতে, রবীন্দ্রনাথের বর্ষাসংগীত; সময় নিষ্ঠার দিক দিয়ে খিচুরীর চাইতে একেবারে কম উপভোগ্য হবে না তা। এসো কিন্তু!...'

চিঠিটা হাতে ক'রে এনেছিল অনুভাদের বাচ্চা চাকর বৈজুনাথ। —যন্ত্রচালিতের মতো যথাসময়ে গিয়ে সেদিন উপস্থিত হ'য়েছিল শৈলেশ্বর। একটু পরেই সত্যি সত্যি বৃষ্টিটা এলো এবং খুব জোরেই এলো। ঠিক মনে আছে। এখনো, রবীন্দ্রসংগীতের নতুন রেকর্ড একখানিও বাজেনি সেদিন, বেজেছিল শুধু দু'জনের কণ্ঠ। রাগিণী না থাক্‌, রাগ ছিল না সেদিন; কেমন একটা মুগ্ধ অনুরাগে শুধু ভ'রে উঠেছিল সমস্ত ঘরখানি। তারপর অনেকগুলো দিন কেটেছিল সেদিনের সেই স্মৃতি নিয়ে।

প্রসংগতঃ একবার মনে প'ড়লো পরিচয়ের প্রথম দিনটাকে। ক্লাসে প্রথম মেয়েদের সংখ্যা ছিল চার, হঠাৎ একদিন সংখ্যাটি পাঁচে উঠ্‌লো। দামী একখানি জর্জেট প'রে ক্লাসে এসে ঢুক্‌লো নতুন সংখ্যাটি। রেজিস্ট্রি খাতা দেখে নাম ডাক্‌লেন প্রফেসর : অনুভা চৌধুরী? —'প্রেজেণ্ট স্যার' ব'লে উঠে দাঁড়াবার ভংগীতে সামান্য একটু ন'ড়ে ব'স্‌লো মাত্র মেয়েটি। দু'একটা দিন যেতে-না-যেতেই ক্লাসের ছেলেরা পিছু নিতে শুরু ক'রলো অনুভার। ক্লাস ভ'রে গান রচনা আরম্ভ হ'য়ে গেল ওকে নিয়ে; জর্জেটের বিরুদ্ধে সম্মিলিত বিক্ষোভ ঝ'রে প'ড়তে লাগ্‌লো কথা আর সুরে। অতিষ্ঠ হ'য়ে অনুভা একদিন নালিশ জানালো প্রফেসারকে। শুনে প্রফেসার নিজেই লজ্জিত হ'লেন। ইতিমধ্যে একদিন ডিবেট ব'সলো কমন রুমে, বিষয়— 'জাতীয় শিল্প-প্রসারে খদ্দরের স্থান।' পুরো পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধ'রে বক্তৃতা দিল শৈলেশ্বর। বক্তব্যটা শেষ ক'রলো এইভাবে যে, দেশের স্বাধীনতা প্রচেষ্টায় যখন হাজার হাজার স্ত্রী-পুরুষ জেল খাটছে, এমন দিনেও যারা দেশের খদ্দর ফেলে ফ্যাশান দুরস্ত সজ্জা পরিধান করে, তারা সমস্ত জাতির নিন্দার্হ। ইঙ্গিতটুকু প্রকাশ্যে গিয়েই অনুভাকে বিঁধলো। ঠিক তার পরদিনই খদ্দর প'রে এসে ক্লাসে ঢুক্‌লো অনুভা। ছুটি হ'লে শৈলেশ্বরকে সাম্‌নে পেয়ে ব'ললো, 'কালকের বক্তৃতায় আপনি আমার চিরকালের মস্ত একটা মোহকে ভেঙে দিয়েছেন। তার জন্য আমি এতটুকুও দুঃখিত নই, বরং উপকৃত। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আপনাকে।'

সেই কৃতজ্ঞতা ক্রমে দুই করপুটে প্রীতির পুষ্পস্তবক হ'য়ে ফুটে উঠেছে।...

অমুনিতর একটা বর্ষণমুখরিত মুহূর্তে একদিন শৈলেশ্বর ব'লেছিল, 'তোমাকে কিন্তু কম জ্বালাতনটা সহ্য ক'রতে হয়নি, যাই বলো। আজ আর একবার পরো না তোমার সেই পুরনো জর্জেটখানিকে নামিয়ে, দেখিনা কেমন দেখায়!'

অপেক্ষাকৃত মুখ গম্ভীর ক'রে উত্তর দিয়েছিল অনুভা : 'থামো, পাগলামি রাখো।'

ব্যস্‌, ঐ পর্যন্তই। তারপর থেকে ধীরে ধীরে দিনগুলো কেটে এসেছে এম্‌নি ক'রে; কেটে এসেছে সমুদ্রের জলের মতো, স্টীমারের বয়লারের মতো, মেঘের বিদ্যুৎ আর পাহাড়ের ফোয়ারার মতো।

চিঠিখানি যথাস্থানে গ‌ুঁজে রেখে এক সময় নিজের দপ্তর ছেড়ে উঠে প'ড়লো শৈলেশ্বর।

এর ঠিক দ‌ু'দিন বাদেই হঠাৎ অন‌ুভার একখানি স্মারকলিপি এলো তার হাতে। জন্মদিনের নিমন্ত্রণ জানিয়ে অন‌ুভা লিখেছে ঃ

...'পরীক্ষায় পাশটাও বাবা জড়িছেন এর সাথে। আমার কিন্তু খ‌ুব লজ্জা ক'রছে। কিন্তু বাবার ঐ এক খেয়াল। যে য‌ুগে বার্ণার্ড'শ'র মতো ব্যক্তি তাঁর জন্মদিনে লোক সমাজ থেকে পালিয়ে বেড়ান, সেখানে আমার মতো তিত্‌পু'ঁটিকে নিয়ে সংসারের এই রাজসিকতায় সত্যিই মনের দিক থেকে সাড়া পাচ্ছি না। অথচ বাবাকে বারণ ক'রবার মতো সাহসও পাচ্ছি না বড় একটা। তা যাক্‌গে, তুমি এসো কিন্তু।'...

গিয়ে উপস্থিত হ'লো শৈলেশ্বর, হাতে এক ঝাড় রজনীগন্ধা। উপহারের ব্যাপারে এ হয়ত শৈলেশ্বরের কাছে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর নয়, খ‌ুশী হ'লো অন‌ুভাও, কিন্তু ম‌ুখ ফিরিয়ে একটা চুর‌ুট ধরালেন তীর্থপতি চৌধ‌ুরী। তাঁর এ্যারিস্টোক্র্যাসির দরজা গলিয়ে আরও হয়ত অধিক দামী উপহার এসে পেঁ'ছেচে অন‌ুভার হাতে। কিন্তু তার জন্যে নিজেকে বিন্দ‌ুমাত্র খাটো মনে করেনি শৈলেশ্বর। এক ট‌ুক্‌রো কার্ড লিখে ঝ‌ুলিয়ে দিয়েছে সে রজনীগন্ধার গায়ে ঃ 'এ ফ‌ুল সত্য হ'য়ে থাক্‌ তোমার জীবনে অন‌ুভা।'

অতিথি অভ্যাগতেরা বিদায় নিয়ে গেলে নির্জনে এক সময় অন‌ুভা ব'ল্‌লো, 'পড়েছ তো শেষের কবিতা? ঐ যেখানে নিস্তরঙ্গ জলের ব‌ুকে একটা ঢিল ছ‌ু'ড়ে মেরে অমিট্‌ রে ব'ল্‌লো ঃ অনন্তকালের মধ্যে জলের এই স্পন্দনট‌ুক‌ু কম সত্য নয়। ভাব্‌চি—তোমার এই রজনীগন্ধার পরিবর্তে এর ডাঁটিটাই একদিন তেম্‌নি ক'রে সত্য না হয় আমার জীবনে!' ব'লে খিল্‌খিল্‌ করে কিছ‌ুক্ষণ হাসলো অন‌ুভা।

বেশ দেখালো কিন্তু ওর হাসিটা আজকে। পরীক্ষার সময়টা মনে হ'য়েছিল, আজকাল ও অনেকটা ব‌ুড়িয়ে গেছে। কিন্তু পরিপ‌ূর্ণ যৌবনের দ‌ূতী ব'লে যেন আজ কেবলই তাকিয়ে থাক্‌তে ইচ্ছে ক'রছে অন‌ুভার চোখের দিকে। মেয়েদের প্রসাধন স্বপ্নের স‌ূর্য রচনা করে প‌ুর‌ুষ-চিত্তে। নীরবে আর একবার ভালো ক'রে দেখে নিল' শৈলেশ্বর অন‌ুভাকে, তারপর হঠাৎ এক সময় মনের নির‌ুদ্ধ লজ্জাকে একেবারে বিসর্জন দিয়ে ব'স্‌লো ঃ 'প্রস্তাব্‌টা পাড়ি তা হ'লে তোমার বাবার কাছে?'

শ‌ুনে আঁৎকে উঠ্‌লো না অন‌ুভা বরং কিছ‌ুটা অভিভ‌ূত হ'তে দেখা গেল তাকে।

—'লজ্জা এসে বাধা দেবে না?'

—'কেন, লজ্জা কিসে, চ‌ুরি ক'রতে তো আর যাচ্ছিনে!'

—'এও একরকম চ‌ুরি বৈ কি?'

—'যথা?'

—'ধরো আমাকেই।'

'তার জন্যে অভিভাবকের অন‌ুমোদনই তো চাওয়া হ'চ্ছে!'

আর কথা কাট্‌তে পারলো না অন‌ুভা। মনে মনে শ‌ুধ‌ু ব'ল্‌লো ঃ 'গিয়ে ব'ল্‌লেই তো পারো!'

পরদিন সোজা সরলভাবে প্রস্তাবটা পেড়ে ব'সলো শৈলেশ্বর তীর্থপতির কাছে। ইজি-চেয়ারে শ‌ুয়ে কি একখানি ইংরেজি ডিকেট্‌টিভ্‌ প'ড়ছিলেন তীর্থপতি; প্রথমটা ভালো ক'রে কান দিলেন না কথাটায়।

আরও খানিকটা কাছে এগিয়ে দাঁড়ালো শৈলেশ্বর ঃ 'অন‌ুভাকে আমি বিয়ে ক'রতে চাই। অন‌ুভার মত পেয়েছি আমি।'

বই ব‌ুজিয়ে খানিকটা সোজা হ'য়ে উঠে ব'সলেন তীর্থপতি ঃ 'মোস্ট্‌ আন্‌-এক্সপেক্টেড এ্যাপ্রোচ।'

শৈলেশ্বরের ম‌ুখের দিকে একবার চোখ তুলে তাকালেন তীর্থপতি। —'ড‌ু ইউ থিঙ্ক্‌ ইওরসেল্‌ফ্‌ ফিট ফর মাই গার্ল? নিজেকে এতটা উপয‌ুক্ত মনে করো তুমি?'

—'ইয়েস, হোয়াই নট, কেন নয়!' দ‌ৃঢ়-দ‌ৃষ্টিতে আরও কিছ‌ুটা দ‌ৃঢ় হ'য়ে দাঁড়াতে চেষ্টা ক'রলো শৈলেশ্বর।

—'বাট আই ডোণ্ট।' শ‌ুয়ে পড়ে আর একবার বইয়ের প‌ৃষ্ঠায় চোখ ব‌ুলোতে চেষ্টা করলেন তীর্থপতি।

এবারে খানিকটা নরম কণ্ঠ শোনা গেল শৈলেশ্বরের ঃ 'কেন নয় বল‌ুন?'

—'এই জন্যে যে, অন‌ুভার একটা ব্রাইট ফিউচার আছে।' থেমে বইয়ের প‌ৃষ্ঠার দিকেই দ‌ৃষ্টি রেখে তীর্থপতি বললেন, 'তোমার যথেষ্ট বয়স হয়েছে; অন‌ুভার মত থাকলেও তার ওপিনিয়নের স‌ুযোগ নিয়ে তোমার ছেলেমান‌ুষী করা সাজে না। ট্রাই ট‌ু গেট ফাদার'র সাকসেস।'

—'এই তবে আপনার শেষ কথা?'

—'সো ফার রানস মাই কনসান্স।'

—'আপনার মেয়ের হ‌ৃদয়ের দিকে একবারও তাকিয়ে দেখেছেন?'

—'প্রয়োজন পড়ে না।' আর একবার বই বন্ধ করে সোজা হয়ে উঠে বসতে চেষ্টা করলেন তীর্থপতি।

কিন্তু বিন্দ‌ুমাত্রও আর অপেক্ষা করলো না শৈলেশ্বর। অবস্থা তার তীর্থপতির মতো না হলেও তার বাবা যা ব্যাঙ্কে রেখে গিয়েছেন, প্রয়োজন হলে তা ভাঙিয়ে শহরের উপর মোটর হাঁকিয়ে ...া কয়েক বছর দিব্যি গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়াতে পারে শৈলেশ্বর। কিন্তু সে-পথ তার আদর্শের পথ নয়।

কিছ‌ুদিন বেশ চ‌ুপচাপ কাটলো। একদিন ঘরে বসে সে চিঠি দিল অন‌ুভাকে ঃ

'ভালোবাসাকে যখন প্রাণের ম‌ূল্যে সম্মানিত করা যেতো, তখন দেখলাম—তার চাইতেও সম্মানিত ব্যক্তি আমাদের গ‌ুর‌ুজনেরা। —তোমার বাবার দম্ভ বড় কম নয়। তোমাকে দিয়ে তিনি সম্ভবত কোন রাজা-বাদশার স্বপ্ন দেখছেন। কিন্তু মান‌ুষের ভবিষ্যৎ বলা যায় কি! আজকের এই ফকির আমিটা একদিন তেমন কিছ‌ুও তো হতে পারি! এই প্রতিশ্র‌ুতি নিয়েই বিলেত যাচ্ছি।......'

চিঠি পড়ে একটা বড় নিঃশ্বাস চেপে নিল মাত্র নিজের মধ্যে অন‌ুভা। তীর্থপতিও কিছ‌ু একটা প্রশ্ন তোলেন নি তার কাছে, সেও কিছ‌ু একটা উ'চ‌ু ম‌ুখ নিয়ে গিয়ে দাঁড়াতে পারেনি সহজ মনে।

কয়েক সপ্তাহ পর একদিন অন‌ুভা হঠাৎ একটা অদ্ভ‌ুত কথার অবতারণা নিয়ে দাঁড়ালো বাবার সামনে ঃ 'বাসন্তী ইনস্টিটিউটের জন্য হেড মিস্ট্রেস চেয়ে কর্তৃপক্ষ আবেদন করেছেন। আমি এ্যাপ্লাই করতে চাই বাবা।'

শ‌ুনে যেন হঠাৎ আকাশ থেকে পড়লেন তীর্থপতি চৌধ‌ুরী। —'তীর্থপতির মেয়ে করবে স্কুল-মাস্টারী? তুই হাসালি মা।'

—'কেন, মাস্টারী করাকে তুমি ছোট কাজ বলে মনে করছো?'

—'ছোট কাজ না হলেও তোর অভাব কি, বল তো মা?' —গলার স্বরটাকে অনেকখানি কোমল করতে চেষ্টা করলেন তীর্থপতি।

—'ধনপ্রাচ‌ুর্য আর সম্পদই তো জীবনের সবটা নয় বাবা! স্কুলের কানেকশনে আমার জানবার শিখবার স‌ুযোগ হবে অনেকখানি। এমন করে বিনে কাজে একা-একা ঘরে বসে থাকতে ভালো লাগে না।'

মাথা নীচ‌ু করে কি একখানি ম্যাগাজিনের পাতায় দ‌ৃষ্টি নিবদ্ধ করলো অন‌ুভা।

চত‌ুর আইনজীবী তীর্থপতি। কথাটা ধরে নিতে তাঁর বিশেষ বেগ পেতে হলো না। বললেন, 'ইউনিভার্সিটির রিসার্চে তোকে নেবার জন্যে প্রফেসার গ‌ুপ্তকে ধরেছি; হলে ওস‌ুন অব কাল্‌চারের মধ্যে গিয়ে পড়তে পারবি।'

মনে হয়েছিল, কথাটা শ‌ুনে খ‌ুশী হবে অন‌ুভা, কিন্তু বিন্দ‌ুমাত্রও তেমন কোন লক্ষণ দেখা গেল না তার মধ্যে। কিছ‌ুক্ষণ একই অবস্থায় ম্যাগাজিনের মধ্যে ম‌ুখ ঠেসে বসে থেকে নীরবে এক সময় নিজের ঘরে এসে শ‌ুয়ে পড়লো সে।

শেষ পর্যন্ত তার ইচ্ছাটাই জয়ী হলো। প্রফেসার গ‌ুপ্ত একদিন জানিয়ে দিলেন—এবছর কিছ‌ু করতে পারা গেল না, এজন্য তিনি আন্তরিক দ‌ুঃখিত।

শ‌ুনে অলক্ষ্যে একটা ভারী নিঃশ্বাস ফেললেন তীর্থপতি, বললেন, 'আমার মেয়ের ওয়ার্থ এজন্য কমে যাবে না।'

বাসন্তি ইনস্টিটিউটেই চাকরী নি[ল] অন‌ুভা। সারাদিন ছাত্রীদের নিয়ে মে[তে]

থাকে, অবসর সময়টা নিভৃতে বসে সাহিত্য পড়ে আর মনে মনে কল্পনা করে শৈলেশ্বরের বিলেতী জীবনটাকে। সাথে সাথে ধিক্কারও আসে একবার নিজের উপর। বাবা ইচ্ছে করলে তাকেও কি পাঠাতে পারতেন না বিলেত! কিন্তু তারপর? নিজের মধ্যেই আবার প্রশ্নাতুর হয়ে ওঠে অনুভা: বিলেত থেকে ঘুরে এলেই বা এমন কি একটা হাতী ঘোড়া হয়ে যেতো সে এখানে? বিলেত ফেরতা এমন মেয়ে কতই তো আছে এদেশে! তাদের কজনের নাম জানে খবরের কাগজের পাঠক? ধীরে ধীরে এক সময় দু হাতের মুঠোর মধ্যে খুলে বসে সে 'সঞ্চয়িতা'র পাতা: একটি 'সাধারণ মেয়ে' শরৎবাবুকে অনুরোধ করে বলছে—

'...পায়ে পড়ি তোমার, একটা গল্প লেখ তুমি
শরৎবাবু,—
নিতান্ত সাধারণ মেয়ের গল্প,—
যে দুর্ভাগিনীকে দূরের থেকে পাল্লা দিতে হয়
অন্ততঃ পাঁচ সাত জন অসামান্যার সঙ্গে,
অর্থাৎ সপ্তরথিনীর মার।
বুঝে নিয়েছি, আমার কপাল ভেঙেছে,
হার হয়েছে আমার।
কিন্তু তুমি যার কথা লিখবে,
তাকে জিতিয়ে দিয়ো আমার হয়ে—
প'ড়তে প'ড়তে বুক যেন ওঠে ফুলে।
ফুল চন্দন পড়ুক তোমার কলমের মুখে...'

মেয়েটির জীবনের সঙ্গে যেন নিজের অনেকটা মিল খুঁজে পায় অনুভা। অনেকটা এক হ'তে হ'তে খানিকটা যেন ছাড়া-ছাড়া। কিন্তু তক্ষুনি সমস্ত মনটা কেমন যেন বড় ছিঃ ছিঃ ক'রে ওঠে। খানিকটা আত্মসচেতন হয়ে ওঠে অনুভা। কি সব ভাবছে সে ছেলে-মানুষের মতো!

এমনি করেই বছর ঘুরে আসে।

তীর্থপতি এক সময় কাছে ডেকে বসালেন মেয়েকে: 'এখন তো তোর বয়স হয়েছে মা, দেখে শুনে একটি পাত্র দেখি এবারে, কি বলিস?'

অর্থাৎ অনুভার কিছু একটা বলবার উপরই যেন এত বড় কাজটা নির্ভর করে আছে: আর মেয়ের বয়সটাও এত দিনে ওঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে বাবার! অতি দুঃখে মনে মনে একবার হাসি পেলো অনুভার।

স্বপ্ন থেকে পুনরায় স্বর তুললেন তীর্থপতি: 'আমি জানি, এতে তোর অমত থাকতে পারে না।'

করেছেই কি অমত কোনোকালে অনুভা? খানিকটা লজ্জা ত্যাগ করতে চেষ্টা করলো সে বাবার কাছে: 'শৈলেশ্বরকে তুমি আঘাত দিয়েছ বাবা।'

ঘটনাটা পুরনো, কাহিনীটা আরও পুরনো। তীর্থপতি তাই মনে রাখতে চাননি বিষয়টা। কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে থেকে ধীরে ধীরে স্বর তুললেন তিনি: 'তীর্থপতি চৌধুরীর মেয়ে তুই মা, তোর আসন হবে এমনিতরই যথাযোগ্য কোনো ঘরে, ছেলে-মানুষী মোহকে কখনো প্রশ্রয় দিতে নেই মনে।'

নিজের মধ্যে একবার চমকে উঠলো অনুভা। পাগলের মতো এ কি বলছেন বাবা? ভালবাসাকে বলছেন মোহ? সংসারে সব কিছুই তবে মোহ, ভালবাসা বলে কিছু নেই? অত্যন্ত বেশী আধুনিক হয়েও মাঝে মাঝে এত বেশী রক্ষণশীলতা প্রকাশ করে বসেন বাবা যে, অনেক সময় শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলতে হয়।

কিছু একটা বলবে বলে একবার মুখ উঁচালো অনুভা, কিন্তু তক্ষুনি মাথা নিচু হয়ে এলো।

বিষয়টা বুঝলেন তীর্থপতি। কিন্তু যা তিনি নিজে উপযুক্ত বলে স্বীকার করেন না, তা সাধন করতেও রাজি নন তিনি। কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে নীরবে এক সময় অন্যত্র উঠে গেলেন তীর্থপতি।

এমনি করেই প্রতিদিন আকাশে সূর্য ওঠে, সূর্য ডোবে, আসে পূর্ণিমা, আসে অমাবস্যা, ঋতু পরিবর্তনের রূপ ফুটে ওঠে আকাশের নীলে, গাছের পাতায় আর মাটির সবুজ ঘাসে। আবার বছর ঘুরে আসে।

হঠাৎ একদিন প্রসন্ন প্রভাতে বিলেত থেকে ঘরে ফিরলো শৈলেশ্বর। শুধু ফিরলো বললেই সবটা বলা হবে না। বাংলার মাটি ছেড়ে যাবার পর থেকে একদিকে আরও যেমন বেশী করে আকর্ষণ করেছে তাকে ঠিক মায়ের মতো করেই বাংলা দেশ, তেমনি বহুতর রুচির পরিবর্তনও এনে দিয়েছে তাকে প্রতীচ্যের আবহাওয়া। অনুভাকে ভুলতে পারা সহজ ছিল না তার পক্ষে, কিন্তু ভুলিয়ে রেখেছে তাকে তার কর্মক্লান্তি, ভুলিয়ে রেখেছে তাকে তার বৃহত্তর স্পর্শানুভূতি। এই-ই বুঝি হয়, এই-ই বুঝি হয়ে থাকে। অনুভাকে কেন্দ্র করে এক-দিন জগৎটা ছিল ছোট; আজ সে জগতে সমুদ্রের গর্জন শোনা যায়, শোনা যায় 'ট্যাঙ্ক' আর 'মাইনে'র আওয়াজ, জাহাজের বাঁশী। পৃথিবীটা ইলেকট্রিকের মতো বেড়ে গেছে শৈলেশ্বরের চোখে।

সন্ধ্যার দিকে এক সময় প্রসাধন সেরে উঠতে উঠতে হঠাৎ একখানি চিঠি উড়ে এলো অনুভার হাতে। ছাপানো প্যাডের কাগজে লেখা। ছাপানো নামটার দিকে উপর্যুপরি কয়েকবার লক্ষ্য করলো সে: এস চক্রবর্তী, আই সি এস, ডি এইচ পি সি আই (লণ্ডন)। দু এক কথায় চিঠিটা শেষ করেছে শৈলেশ্বর:

'বিলেত থেকে খেতাব কুড়িয়ে নিয়ে আবার ঘরে ফিরলাম। দেখলাম—দুনিয়ার মানুষগুলো কিছু নয়, তাদের খেতাবটাই বড়। এবারে একেবারে নীলকণ্ঠ হয়ে বসবো, ভাবছি। তুমি আমার চিরকালের মানসী হয়ে থেকো।'

আনন্দে ফুলে উঠলো অনুভা। শৈলেশ্বর আই সি এস হয়ে ফিরে এলো, এবারে হয়ত তবে বাবাদের হাকিম হয়ে বসবে সে। শৈলে-শ্বরের প্রতিভার সত্যিই তুলনা নেই। যেমন ক'রে প্রথম থার্ড ইয়ার ক্লাশে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকতো সে শৈলেশ্বরের দিকে, আজও ঠিক তেমনি করেই তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে হয়। সত্যিই জিনিয়াস শৈলেশ্বর। কিন্তু এতদিন মনে মনে রাগও হয়েছে অনুভার কম নয়। ইচ্ছে করেই বিলেত থেকে একটাও চিঠি দেয় নি তাকে শৈলেশ্বর। কেন, কি অপরাধ করেছিল সে তার কাছে? কিন্তু আজ আর এতটুকুও ইচ্ছে করলো না রাগ করে বসে থাকতে। ইচ্ছে হলো—এক্ষুনি ছুটে গিয়ে এক ছড়া মালা তাকে গলায় দুলিয়ে অভিনন্দন জানিয়ে আসে।

আর একবার চিঠিটা পড়ে শেষ করলো অনুভা: 'তুমি আমার চিরকালের মানসী হয়ে থেকো।' গলার লকেটটা কেমন যেন একবার বুকের মধ্যে হঠাৎ সামান্য বিঁধতেই ব্যথা বোধ করলো সে। উঠতে যাবে, এমন সময় সামনে এসে দাঁড়ালেন তীর্থপতি। তিনিও পেয়েছেন শৈলেশ্বরের খবরটা। সেই থেকে তিনিও আশ্চর্য বোধ করছেন মনে মনে।

অনুভা বললো, 'সম্ভবতঃ কোথাও তুমি বেরোচ্ছ বলে মনে হচ্ছে বাবা?'

—হ্যাঁ, বেরোচ্ছি বৈ কি, শৈলেশ্বরকে গিয়ে কনগ্রাচুলেট করে আসতে হবে যে।' মৃদু একবার হাসির রেখা ফুটে উঠে ধীরে ধীরে আবার দুই ঠোঁটের মধ্যে মিলিয়ে গেল তীর্থ-পতির।

অনুভা বললো, 'নেমন্তন্ন করবে না বাড়িতে?'

—'হ্যাঁ, তাও করবো বৈ কি!'

ধীরে ধীরে চৌকাঠ পেরিয়ে বাইরের পথে নেমে এলেন তীর্থপতি।

বসে বসে একটা এ্যাটাচি কেসে কী কতক-গুলো গোছাচ্ছিল শৈলেশ্বর।

'তোমাকে আজ কনগ্রাচুলেশন জানাতে এসেছি শৈলেশ্বর।' বলতে বলতে ঘরে ঢুকে নিজেই একখানি চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন তীর্থপতি। 'তুমি আমার ধারণাকে উল্টে দিয়েছ। ইউ আর জিনিয়াস নো ডাউট।'

হাত জোড় করে নমস্কার জানিয়ে শৈলে-শ্বর বললো, সামান্য একটা পাশের ব্যাপারে কনগ্রাচুলেশনের কিছু আছে কি?'

'আছে বৈ কি, অনেকখানিই আছে।' থেমে তীর্থপতি বললেন, 'ওবেলা তুমি কিন্তু আমাদের ওখানে খাবে।'

এ্যাটাচি কেসের ডালাটা বন্ধ করে আর একবার হাত জোড় করে দাঁড়ালো শৈলেশ্বর:

...প করবেন, বিশেষ কাজে আমাকে ওয়ার্ধা ...তে হচ্ছে। ফিরি কবে ঠিক নেই।'

—'কিন্তু'—কিছুটা ইতস্তত করলেন তীর্থপতি ঃ 'কিন্তু তোমার সাথে যে আমার কটা বিশেষ কনফিডেন্সিয়াল টক্ আছে!'

—বলুন। ঘরে আপাতত কোনো তৃতীয় ব্যক্তি নেই। মোস্ট্ স্যুদিং এ্যান্ড সলিটারী। বলুন কি কথা আছে।' স্থির হয়ে দাঁড়ালো কিছুক্ষণ শৈলেশ্বর।

বিন্দুমাত্র সময়ক্ষেপ করলেন না তীর্থপতি। বললেন, 'আজ আমার অনুরোধ, তুমি অনুভাকে বিয়ে করো।'

শুনে হো-হো করে হেসে উঠলো শৈলেশ্বর। এত জোরে সম্ভবত সে গত চার বছরের মধ্যে হাসে নি।

'হাসির কথা নয়; এ তোমার কাছে আজ আমার আর্নেস্ট রিকোয়েস্ট।' প্রার্থনার দৃষ্টি ফেটে পড়তে চাইল যেন তীর্থপতির দুচোখ থেকে।

—'বাট্, ডু ইউ থিঙ্ক দ্যাট্ ইওর ডটার ইজ ফিট টু মাই পজিশন?'—চোখ দুটোকে একবার দৃঢ় করতে চেষ্টা করলো শৈলেশ্বর।

একথার অর্থ জানেন তীর্থপতি চৌধুরী, তাই নিজের মধ্যে ঠিক উপযুক্ত জবাবটা তক্ষুনি খুঁজে পেলেন না। পরে বললেন, 'একদিন ছিল, সেই দিনটির কথা অন্তত মনে করো আজ।'

—'রিমেম্‌ব্রেন্স ইজ অলওয়েজ রিমেমব্রেন্স, এন্ড ইট ইজ আউট অব কোশ্চেন নাউ।'—কথাটা বলতে এতটুকুও গলা কাঁপলো না শৈলেশ্বরের। এ্যাটাচি কেসটাকে টেবলের একপাশে শুইয়ে রাখতে রাখতে বললো, 'আপনাকে সুখী করতে না পেরে আমি আন্তরিক দুঃখিত।'

মাটি দু' ভাগ হয়ে গেলে সম্ভবতঃ এই মুহূর্তে তার মধ্যে প্রবেশ করতে এতটুকুও দ্বিধা করতেন না তীর্থপতি। লজ্জায় দুঃখে আর অপমানে তিনি এতটুকু হয়ে গেলেন নিজের মধ্যে। আর বসে থাকা চলে না, চেয়ারটা কেমন যেন বড় বিঁধছে পিঠে।

উঠে দাঁড়ালেন তীর্থপতি চৌধুরী।—'এই তবে তোমার ফাইনাল ডিসিশন?'

—'সো আই থিঙ্ক্।'

আর একবার হাত উঁচিয়ে কপালে স্পর্শ করতে গেল শৈলেশ্বর। কিন্তু ততক্ষণে তীর্থপতির ছায়া বারান্দা ছেড়ে আরও অনেকটা পেরিয়ে গেছে।

শিক্ষা প্রসঙ্গ

# ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগার

**শ্রীমনকুমার সেন**

অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত প্রাচীন পাণ্ডুলিপি ও পুঁথিপত্রের আলোচনা করতে হলে ভারতীয় সুধীসমাজকে ব্রিটিশ মিউজিয়মের সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। যে সমস্ত বই ভারতে দুষ্প্রাপ্য সেগুলি প্রায়শ ব্রিটিশ মিউজিয়মের গ্রন্থাগারগুলিতে পাওয়া যায়। এর অনেকগুলি কারণ আছে বলে মনে হয়, তবে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে এই যে, বিদেশী শাসকগণ ভারতের প্রয়োজনীয় নথিপত্র ও বইপুস্তকগুলি রক্ষা করবার কোন গরজ বোধ করেননি। এঁদের এই দায়িত্বহীন ও অমার্জনীয় উদাসীনতার একটা বড় প্রমাণ—বিলাতের 'ইণ্ডিয়া হাউসে' রক্ষিত ১৮৫৮ সালে রাণী ভিক্টোরিয়া কর্তৃক নিজহস্তে ভারত শাসনের দায়িত্ব গ্রহণের সময়কার বহু মূল্যবান নথীপত্র ও পুস্তকের বিনাশ সাধন। বহুমূল্য পাণ্ডুলিপি ও পুস্তকের অন্যূন তিনশত টন ওজনদরে বিক্রয় করা হয়েছিল একটি কাগজপ্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানকে! শুধু বিলেতেই এহেন কাণ্ডকারখানা ঘটেছে তা নয়, ভারতেও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বড়কর্তাগণ ঘর খালি করবার জন্যে অবলীলাক্রমে আপিসের বইপত্রগুলি ধ্বংস করে ফেলবার আদেশ দিতেন! জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত জাতীয়তাবাদী দৈনিক পত্রিকাগুলির কীটদষ্ট ও ছিন্নাঙ্গ শোচনীয় অবস্থা দেখলে আমরা কোন সভ্যজগতের মানুষ বলে বিশ্বাস হতে চায় না। ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের কর্মকর্তাগণ এর জন্যে দায়ী এবং তাঁরা যে ১৯০০ সালের কাছাকাছিও এ ধরণের অপকর্ম করেছেন তার প্রমাণ আছে! যাই হোক, সরকারী কর্মচারীদের দায়িত্বজ্ঞানের অভাব হলেও জনসাধারণের মধ্যে প্রাচীন পুঁথি, পাণ্ডুলিপি ও প্রয়োজনীয় দলিলদস্তাবেজ রক্ষা করবার একটা ঐকান্তিক আগ্রহ প্রকাশ পায়। এই উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতীয় ও ইউরোপীয় বিদ্যানুরাগী ব্যক্তিগণ সংঘবদ্ধ হন ও বিভিন্ন অঞ্চলে গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা করেন। জনসাধারণের এই আন্তরিক প্রয়াসের একটি সুফল হচ্ছে ১৮৩৫ সালে প্রতিষ্ঠিত 'কলিকাতা সাধারণ গ্রন্থাগার' বা ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরী। সাধারণের প্রদত্ত চাঁদা ও স্বল্পায়ু ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রদত্ত পুস্তকগুলি নিয়ে এই গ্রন্থাগারের জীবনযাত্রা শুরু হয়। কয়েক বৎসর যাবৎ এসপ্ল্যানেড রো-এর ডাঃ স্ট্রং-এর গৃহের নীচতলায় ছিল এই সাধারণ গ্রন্থাগারের কার্যালয়। সেখানকার অবস্থা সন্তোষজনক ছিল না বলে অনেকগুলি বই অকালে নষ্ট হয়ে যায়। ভারতের বহু মূল্যবান পাণ্ডুলিপি পুস্তক ইত্যাদি রক্ষা করেছেন বলে 'কলিকাতা সাধারণ গ্রন্থাগারের' পরিচালক সংঘের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ; তাহলেও তাঁদের উপযুক্ত যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থার অভাবে আরো অনেক দুর্লভ গ্রন্থরত্ন আমরা চিরতরে হারিয়েছি সেকথাটিও উপেক্ষা করতে পারা যায় না। ভারতের প্রথম সংবাদপত্র হিকি সাহেবের 'বেঙ্গল গেজেট' (Hicky's Bengal Gazette) সাধারণ গ্রন্থাগারে সযত্নে রক্ষা করা হয়নি। কর্তিত কীটদষ্ট 'বেঙ্গল গেজেটের' এই কপিটি দেখলে যে কোন সুধীব্যক্তি মর্মপীড়া বোধ করে থাকেন। আবার এর মধ্যে থেকে সর্বাধিক কৌতূহলজনক ফ্রান্সিস্ ও হেস্টিংস-এর দ্বন্দ্বমূলক বিবরণটি কোন সাহিত্যিক-তস্কর গায়েব করেছেন! এই পত্রিকাটিরই অপর এক কপি রয়েছে ব্রিটিশ মিউজিয়মে—অক্ষত ও অক্ষুণ্ণ অবস্থায়।

১৮৪১ সালের জুলাই মাসে এই গ্রন্থাগা[র] লায়নস্ রেঞ্জে অবস্থিত ফোর্ট উইলি[য়ম] কলেজ ভবনে স্থানান্তরিত করা হ[য়]। ইতিমধ্যে স্যার চার্লস্ মেটকাফ-এর ভার[ত] সেবার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নিদর্শনস্বর[ূপ] 'মেটকাফ হল' নির্মাণকল্পে এই গ্রন্থাগা[রের] তরফ থেকে ছয়হাজার টাকা চাঁদা দেওয়া হ[য়]। এর তিনবৎসর পরে, অর্থাৎ ১৮৪৪ সা[লে]

জুন মাসে, 'মেটকাফ হল' ভবনের এক অংশে গ্রন্থাগারটি পুনরায় স্থানান্তরিত করা হয়। এ সময় থেকেই গ্রন্থাগারের সমৃদ্ধিলাভের পথ উন্মুক্ত হয় বলা যেতে পারে। প্রশস্ত স্থান পেয়ে গ্রন্থাগারের কার্যকলাপেরও খুব সুবিধা হয় একথা বলাই বাহুল্য। একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে এই যে, বাংলা উপন্যাসের জনক 'প্যারীচাঁদ মিত্র সূচনা থেকেই এই গ্রন্থাগারটির সঙ্গে সহযোগী গ্রন্থাগারিক রূপে যুক্ত ছিলেন। তারপর গ্রন্থাগারিকের পদে নিযুক্ত থাকাকালীন ১৮৮৩ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। মেটকাফ হলে এই নূতন ভবনে প্যারীচাঁদ মহানগরীর সুধী, সমাজসংস্কারক, সাহিত্যসেবী ও জননেতাদের মধ্যে তাঁর অগণিত বন্ধুদের অভ্যর্থনা জানাবার বৃহত্তর সুযোগ পেয়েছিলেন। প্রতি সন্ধ্যায় বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর এই সমাবেশে বিভিন্ন বিষয়ের প্রাণবন্ত আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক গ্রন্থাগারটিকে মুখরিত করে তুলত। বাস্তবিকপক্ষে এসময়ে গ্রন্থাগারটি শুধু গ্রন্থ রক্ষণাবেক্ষণের গৃহই ছিল না, এটিকে বিদ্যোৎসাহী সমাজ সাধনা ও শিক্ষার অন্যতম পীঠস্থান বলেই মনে করত। এবং এর সর্বজনপ্রিয় পুরোধা ছিলেন প্যারীচাঁদ। প্যারীচাঁদের মৃত্যুতে এই প্রতিষ্ঠানের যে ক্ষতি হয় তা কোনদিন পূরণ হয়নি।

প্রথম সাধারণ গ্রন্থাগার হিসেবে স্বভাবতঃই এই গ্রন্থাগারটির এক অসামান্য প্রতিষ্ঠা ছিল। কিন্তু সহরের বিভিন্ন স্থানে আরো কয়েকটি সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এর প্রতিষ্ঠাও ক্ষুণ্ণ হতে থাকে এবং ১৮৯৯ সালে এমন শোচনীয় অবস্থায় এসে দাঁড়ায় যে, লর্ড কার্জন গ্রন্থাগারটি পরিদর্শন করতে গিয়ে অত্যন্ত হতাশমনে ফিরে আসেন। 'ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরীর' উদ্বোধন করতে গিয়ে লর্ড কার্জন এই প্রসঙ্গে খেদোক্তি করে বলেন, "অতঃপর আমি উপরতলায় কলিকাতা সাধারণ গ্রন্থাগারে আসি। বিভিন্ন কক্ষে ছিন্নভিন্ন বহু পুস্তক ইতস্তত ছড়ানো অবস্থায় ছিল। জনকয়েক পাঠক সংবাদপত্র ও সাধারণ শ্রেণীর উপন্যাস প্রভৃতি নেড়েচেড়ে দেখছিলেন। বিবদমান কবুতরদলকে দেখে মনে হল তারা তাদের স্থায়ী আবাসের মালিকানা নিয়ে বিব্রত রয়েছে! এসব দেখে আমার মন অস্বস্তিতে ভরে ওঠে।"

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর পত্তন হয় ১৮৯১ সালে। সরকারী বিভাগগুলির কতিপয় গ্রন্থাগার একত্রিত করে এর সৃষ্টি এবং ভারত সরকারে দলিলদস্তাবেজ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ছিলেন এর প্রধান কর্তা। উল্লিখিত গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে স্বরাষ্ট্র বিভাগের গ্রন্থাগারটিই ছিল সর্বাধিক সমৃদ্ধ ও আকর্ষণীয়। এই গ্রন্থাগারটিতে ফোর্ট উইলিয়ামের ইস্ট ইণ্ডিয়া কলেজ এবং লণ্ডনের ইস্ট ইণ্ডিয়া বোর্ডের লাইব্রেরীর বহু পুস্তক সংরক্ষিত ছিল।

এসময়ে কেবলমাত্র স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণেরই ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর পুস্তকাদি ব্যবহারের অধিকার ছিল। ভারত সরকারের কোন বিভাগীয় কর্মকর্তার অনুমতি নিয়ে বে-সরকারী ব্যক্তিগণ বইপুস্তক আনতে পারতো। লর্ড কার্জনই সর্বপ্রথম এই গ্রন্থাগারের দ্বার সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করার পরিকল্পনা করেন। কলিকাতা সাধারণ গ্রন্থাগারের পত্রিকা-পুস্তকাদি রক্ষার চিন্তাও তাঁকে বিব্রত করে রেখেছিল। এই গ্রন্থাগারটিকে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর সঙ্গে যুক্ত করার পরিকল্পনায়ও তিনি সফল হয়েছিলেন। যে তিনটি সর্তে এই গ্রন্থাগারদুইটির একত্রীকরণ সম্পন্ন হয় তা হল, (১) প্রতিটি শেয়ারের মূল্য পাঁচশত টাকা হিসাবে সমস্ত টাকা জমা দেওয়া হবে কলিকাতা সাধারণ গ্রন্থাগারের কার্যনির্বাহক পরিষদ বা কাউন্সিলের তহবিলে এবং কাউন্সিল সে টাকা যথানিয়মে শেয়ারহোল্ডার বা অংশীদার অথবা তাঁদের আইনসম্মত উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে বণ্টন করবেন, (২) কলিকাতা সাধারণ গ্রন্থাগারের সকল অংশীদার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী ব্যবহারের সর্ববিধ সুযোগ পাবেন এবং (৩) কলিকাতা সাধারণ গ্রন্থাগারের যে সমস্ত বই পুস্তক ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর প্রয়োজন হবে না সেগুলি উক্ত কাউন্সিলের হস্তে অর্পণ করা হবে। ১৯০৩ সালের ৩০শে জানুয়ারী লর্ড কার্জন সর্বসাধারণের জন্য ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী উন্মুক্ত ঘোষণা করেন। এই উপলক্ষ্যে তিনি যে ভাষণ দেন তা খুবই তথ্যপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীকে তিনি একটি Robust as well as a learned Child-রূপে পরিচয় করিয়ে দিয়ে তার পরিপূর্ণতা ও সমৃদ্ধির জন্যে কলিকাতার জনসাধারণের সহযোগিতা কামনা করেন। লর্ড কার্জনের বিবৃতিতে দেখা যায়, এসময়ে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর পুস্তকের সংখ্যা ছিল প্রায় একলক্ষ। জনপ্রিয় বিভিন্ন ভাষায় লিখিত সমস্ত প্রয়োজনীয় বই এবং উচ্চশ্রেণীর পুস্তকাদি সংগ্রহ করে লাইব্রেরীটিকে পূর্ণাঙ্গ করে তোলার উদ্দেশ্যও লর্ড কার্জন ব্যক্ত করেন।

ব্রিটিশ মিউজিয়ামের সহকারী গ্রন্থাগারিক মিঃ জে ম্যাকফারলেন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর প্রথম গ্রন্থাগারিকরূপে নিযুক্ত হয়ে আসেন। এবং স্বভাবতই ব্রিটিশ মিউজিয়ামের আদর্শেই ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীটিকেও গঠনের প্রচেষ্টা চলতে থাকে।

নিত্য নূতন বই পুস্তক সংগ্রহের ফলে গ্রন্থাগারের দেহ স্ফীত হয় বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার উপযুক্ত স্থান সংকুলান করাটা একটা মস্ত সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে আমাদের মত দেশে যেখানে গ্রন্থাগার আন্দোলন এখনও শৈশব উত্তীর্ণ হয়নি সেখানে এই সমস্যা অধিকতর কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। পর্যাপ্ত স্থানের অভাবে অধিকাংশ গ্রন্থাগারগুলিতেই বহু-সংখ্যক পুস্তক অযত্নে ও অবহেলায় নষ্ট হতে দেখা যায়। মাত্র কুড়ি বৎসরের মধ্যে স্তূপীকৃত বই পুস্তকে মেটকাফ হলে আর তিলধারণের স্থান না থাকায় ১৯২৩ সালে এস্প্লানেডের পুরাতন সেক্রেটারিয়েট ভবনে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী স্থানান্তরিত করা হয়।

বর্তমান মেটকাফ হলে জনসাধারণের প্রবেশাধিকার নেই এবং তাঁদের অনেকেই হয়তো এর অস্তিত্বও অবগত নন। কিন্তু কলিকাতার ইতিহাসে মেটকাফ হল একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। ভারতের প্রথম গ্রন্থাগারশিশুটি ভূমিষ্ঠ হয়েছিল এই মেটকাফ হলে একথা বিস্মৃত হওয়ার উপায় নেই। এই মেটকাফ হলেই বাংলা উপন্যাসের জনক প্যারীচাঁদ মিত্র দীর্ঘ চল্লিশ বৎসরকাল নিরলস কর্মসাধনায় ব্যাপৃত ছিলেন। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর প্রথম ভারতীয় গ্রন্থাগারিকরূপে ১৯০৭-১১ সাল পর্যন্ত স্বনামধন্য হরিনাথ দে'র সাধনক্ষেত্রও ছিল এইখানে। বঙ্গভঙ্গের ষড়যন্ত্রকারী লর্ড কার্জন বাঙালীর বহু অভিশাপ কুড়িয়েছেন, আবার গ্রন্থাগারের সহায়তায় জনসাধারণের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ব্যাপকতর সুযোগ এনে দিয়ে বাঙালী তথা ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতাও তিনি লাভ করেছেন সন্দেহ নাই।

১৯২৩ সালে এস্প্লানেড ভবনটিই লাইব্রেরীর পক্ষে বেশ প্রশস্ত মনে হয়েছিল, কিন্তু বর্তমানে ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন মিটানোর পক্ষে এইস্থানও অত্যন্ত অপর্যাপ্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হবার পর জবাকুসুম হাউসে লাইব্রেরীটি স্থানান্তরিত করা হয় বটে, কিন্তু সেটিও প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত অপর্যাপ্ত বলেই প্রমাণিত হয়।

বর্তমানে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী "ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল লাইব্রেরী" বা ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগাররূপে অভিহিত। এস্প্লানেড থেকে এই গ্রন্থাগার বেলভিডিয়ারে স্থানান্তরের প্রস্তাবে অনুকূল ও প্রতিকূল দু'রকম সমালোচনাই প্রচুর চলেছে। ভারত সরকার স্থানান্তরের সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেছেন। গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠায় যে নীতিটি সর্বাগ্রে বিবেচনা করা প্রয়োজন সেটি হচ্ছে ভবিষ্যতে প্রয়োজনমাফিক গ্রন্থাগারের সম্প্রসারণের সুবিধা রাখা। এই নীতির দিক থেকে জাতীয় গ্রন্থাগারের বেলভিডিয়ারে স্থানান্তরিতকরণের সিদ্ধান্ত সমর্থনযোগ্য। ভবিষ্যতে গ্রন্থাগারটির সম্প্রসারণের বিলক্ষণ সুবিধা রয়েছে বেলভিডিয়ারে।

বেলভিডিয়ারের পরিবেশে একটা রোমাঞ্চকর আবহাওয়া অনুভব করা যায়।

বহু দূরের অতীতে কার হাতে এর পত্তন হয়েছিল সেটা অনেকটা রহস্যময় কল্পনার বিষয়মাত্র। কেহ কেহ বলেন, বেলভিডিয়ার ছিল মিরজাফরের সম্পত্তি। ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৬৩ সালে মিরজাফরকে নবাবের গদীতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং মিরজাফর কৃতজ্ঞতা-স্বরূপ তার এই আলীপুরস্থ সম্পত্তি হেস্টিংসকে অর্পণ করেন।

সরকারী দলিলপত্রে বেলভিডিয়ারের সহিত হেস্টিংসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৭৭০ সালে বেলভিডিয়ার ফোর্ট উইলিয়মের গভর্নর কার্টিয়ারের সাময়িক বাস-ভবন ছিল এরূপ নিশ্চিত প্রমাণ রয়েছে। খুব সম্ভবতঃ কার্টিয়ার হেস্টিংসের কাছ থেকে বেলভিডিয়ার ভাড়া নিয়েছিলেন। দুই বৎসর পরে হেস্টিংস ফোর্ট উইলিয়মের গভর্নর পদে নিযুক্ত হন। তিনি প্রায়শ তাঁর আলীপুরস্থ উদ্যানটিতে যেতেন বলে জানা যায়। বেলভিডিয়ার ভবনের ঠিক বাইরেই একটি ক্ষুদ্র গৃহ ছিল। এই গৃহে হেস্টিংসের পুত্র জুলিয়াস ইমহফ্ তাঁর মুসলিম স্ত্রী সহ বাস করতেন। আলীপুরে হেস্টিংসের ইহাও ছিল অন্যতম আকর্ষণ। ১৭৮০ সালে বেলভিডিয়ার ভবন মেজর টলির নিকট বিক্রয় করা হয়। টলির মৃত্যুর পর ১৭৮৪ সালে উহা মিঃ ব্রুকস নামীয় জনৈক ব্যক্তির নিকট বার্ষিক ৩৫০ পাউন্ড হারে ইজারা দেওয়া হয়। ১৮২২ থেকে ১৮২৫ সাল পর্যন্ত ভারতের প্রধান সেনাপতি এডওয়ার্ড প্যাগেট বেল-ভিডিয়ারে অবস্থান করেছিলেন। ১৮৩৮ সালে এ্যাডজুটেন্ট জেনারেল চার্লস্ প্রিন্সেপ এই সম্পত্তি ক্রয় করেন। প্রিন্সেপের কাছ থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ক্রয় করে নেয় ১৮৫৪ সালে ৮০ হাজার টাকায়। তখন থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত বেলভিডিয়ার ভবন ছিল বাঙলার লেফ্টেন্যাণ্ট গভর্নরের সরকারী আবাস। ভারতের রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত হওয়ার পর এটিকে ভাইসরয়ের কলিকাতা বাসভবনে পরিণত করা হয়।

বেলভিডিয়ারের প্রধান প্রবেশপথ উত্তর দিকে জীরত পুলের (Zerut Bridge) বিপরীতমুখী। গৃহের চারিদিকে বহু বৃক্ষ-সমন্বিত বিস্তীর্ণ তৃণাচ্ছাদিত ভূমি। ১৮০২ সালে টলির এ্যাটর্নি কলিকাতা গেজেটে বেলভিডিয়ার বিক্রয়ের একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেছিলেন, তাতে বেলভিডিয়ারের আয়তন ঘোষণা করা হয়েছিল ৭২ বিঘা, ৮ কাঠা, ৪ ছটাক। বেলভিডিয়ার ভবনের সিঁড়িগুলি দুই সারি সুউচ্চ থামের মধ্যে সুদৃশ্য দেখায়। ১৮৫৪ সাল থেকে বেলভিডিয়ার ভবনটির অনেক পরিবর্তন ও সংযোজন হয়েছে। স্যার স্টুয়ার্ট ব্যালে এবং স্যার চার্লস্ এলিয়টের চেষ্টায় প্রাতরাশের কক্ষটি ও পশ্চিম খণ্ডের উপরতলা নির্মিত হয়। নাচঘর ও নৈশভোজনের ঘর নির্মিত হয় স্যার এনড্রু ফ্রেজারের উদ্যোগে। স্যার আলেকজাণ্ডার ম্যাকেন্জী যখন গভর্নর তখন বেলভিডিয়ার ভবনে বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এই সুপ্রাচীন ভবনটি ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রথম অধ্যায়ের কত অখ্যাত ছোটখাট ঘটনার সাক্ষ্য বহন করছে তার ইয়ত্তা নেই। কোম্পানীর অতিথিরূপে মুর্শিদাবাদের নবাব যখন কলকাতায় আসতেন তখন তিনি অবস্থান করতেন এই বেলভিডিয়ারে। কোম্পানী নবাবদের দৈনিক ভাতা বাবদ এক সহস্র টাকা মঞ্জুর করতেন। আরো কত সীমাহীন ব্যয়-বিলাসের মৌন প্রহরী এই বেলভিডিয়ার।

বেঙ্গল গেজেটে প্রকাশিত হেস্টিংস ও ফ্রান্সিসের দ্বৈত সংগ্রামের কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। ফ্রান্সিস ছিলেন হেস্টিংসের একজন পরিষদ সদস্য। উভয়ের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিণতি ঘটে ১৭৮০ সালের আগস্ট মাসে এক দ্বন্দ্বযুদ্ধে। বেলভিডিয়ার ভবনের ঠিক বহিঃ সীমানায় এই সাহেবী লড়াই হয়। লড়াইয়ে ফ্রান্সিস পরাজিত হন ও আহত অবস্থায় বেলভিডিয়ার ভবনে শুশ্রূষার্থ নীত হন। শুধু এই দ্বৈত-সংগ্রামই নয়, গুপ্ত প্রণয়লীলার রোমাঞ্চকর কাহিনীও বেলভিডিয়ারের সঙ্গে জড়িত রয়েছে। এবং এই কাহিনীর নায়কছিলেন ফ্রান্সিস। বেলভিডিয়ারের অদূরেই একটি লাল রঙের উদ্যানবাটীতে বাস করতেন মিসেস গ্রাণ্ড নাম্নী অপরূপ রূপলাবণ্যময়ী জনৈকা ইউরোপীয় মহিলা। মিসেস গ্রাণ্ডের রূপের খ্যাতি শুধু কলকাতায় নয় সমগ্র ভারতের দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে পড়ে অভিজাত সমাজের মনোবেদনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফ্রান্সিস ও মিসেস গ্রাণ্ডের মধ্যে গুপ্ত-প্রণয়ের সূত্রপাত হয় এবং পত্রালাপ ও গোপন দেখা-সাক্ষাতের মধ্য দিয়ে তা পরিণতি লাভ করতে থাকে। একদিন সন্ধ্যায় মিঃ গ্রাণ্ড তাঁর এক বন্ধুর বাড়ীতে নৈশভোজনের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়েছেন, এমনি সময় তাঁর চাকর-বাকরদের কয়েকজন ফ্রান্সিসকে মিসেস গ্রাণ্ডের কক্ষে হাতেনাতে ধরে ফেলে। এনিয়ে একটা তুমুল হট্টগোল ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এবং মিঃ গ্রাণ্ড তাঁর স্ত্রীর সম্মান রক্ষার্থ মধ্যযুগীয় কায়দায় ফ্রান্সিসকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করেন। বলা বাহুল্য, ফ্রান্সিস এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণে সাহসী হলেন না। অগত্যা মিঃ গ্র্যাণ্ড সুপ্রীম কোর্টে নালিশ করেন। কোর্ট ফ্রান্সিসকে দোষী সাব্যস্ত করে তাঁর পঞ্চাশ সহস্র টাকা জরিমানা করেন। জরিমানার টাকা ক্ষতিপূরণস্বরূপ মিঃ গ্র্যাণ্ডকে প্রত্যর্পণের নির্দেশ দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে মিসেস গ্র্যাণ্ড যখন ফ্রান্স পরিদর্শনে যান সেখানেও তাঁর রূপরশ্মি বহু লোকের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটিয়েছিল এবং তাদের মধ্যে ফ্রান্সের পররাষ্ট্রসচিব মঁসিয়ে তেলেরা মিসেস গ্র্যাণ্ডের পাণিগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন।

বেলভিডিয়ারের অনতিদূরে হেস্টিংস ভবন—ওয়ারেন হেস্টিংসের অন্যতম বাসগৃহ। আলীপুরের বহুজনজ্ঞাত একটি ভৌতিক কাহিনী হেস্টিংস ভবনের সহিত জড়িত। প্রতিদিন সন্ধ্যায় নিয়মিতভাবে হেস্টিংস চারটি অশ্ব চালিত এক শকটে আরোহণ করে এই গৃহে আসতেন। গৃহে প্রবেশ করে' তাঁকে কোন দুর্লভ বস্তু নিবিষ্টমনে অন্বেষণ করতে দেখা যেত। কিছুকাল পরে কলিকাতা গেজেটে হেস্টিংস দুটি ক্ষুদ্র চিত্র ও কতক-গুলি ব্যক্তিগত কাগজপত্র হারিয়েছে বলে একটি বিজ্ঞাপন দেন। পূর্বোক্ত ঘটনার সঙ্গে এই বিজ্ঞাপন সম্পর্করহিত নয় বলেই অনেকে মনে করেন।

বেলভিডিয়ারের পূর্বদিকে ছিল ফ্রান্সিসের বাসভবন 'লজ'। উত্তরকালে এটিকে ২৪ পরগণা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সরকারী বাসভবনে পরিণত করা হয়। ইংরেজ উপন্যাসিক উইলিয়ম মেকপিস্ থ্যাকারে তার পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত 'লজে' লালিতপালিত হয়েছিলেন। ২৪ পরগণার কালেক্টররূপে উইলিয়মের পিতা ১৮১২ সালে এই গৃহের বাসিন্দা ছিলেন। বেলভিডিয়ার ভবনের উদ্যানে উইলিয়ম অন্তত দু চারবার আসা-যাওয়া করেছেন, এরূপ অনুমান করা চলে।

বর্তমান বেলভিডিয়ার রোডের তৎকালে নাম ছিল 'লভ লেন' (Love Lane)! কথিত আছে, প্রেম করে বিবাহ করেছিলেন ২৪ পরগণার এমন একজন কালেক্টরের অনুরোধ-ক্রমেই রাস্তাটির নামকরণ করা হয় 'লভ লেন' - অর্থাৎ 'ভালবাসার গলি'!

বেলভিডিয়ার ও তার পারিপার্শ্বিকের এই সব বিচিত্র ঘটনাবলীর সঙ্গে কলিকাতার ভারতীয় বাসিন্দাগণের কোনরূপ যোগাযোগ বা সহানুভূতি ছিল না। এই ভবনে ভারতীয়গণের প্রবেশাধিকার ছিল না এবং এর আড়ম্বর ও বিলাস-ব্যসন ভারতীয়গণের চক্ষুপীড়ারই কারণ ছিল। বেলভিডিয়ার ও কলিকাতার জনসমাজের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগসূত্রের একটিমাত্র দৃষ্টান্ত আমরা পাই। এটিও অবশ্য জনমানসে বিস্মৃতির অতলে ডুবে আছে, তবে জাতীয় গ্রন্থাগারের একটি পাণ্ডুলিপি বিবরণী পুস্তকে (manuscript proceedings book) এর উল্লেখ দেখা যায়।

এক সময়ে কতিপয় ইউরোপীয় ও ভারতীয় শিক্ষাব্রতী ভারতে শিক্ষাবিস্তারকল্পে লঘু সাহিত্য রচনার প্রয়োজন অনুভব করে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠার সংকল্প করেন। এই সংগঠনের নাম রাখা হয় 'ভারত-সেবা সাহিত্য

সমাজ' ("Society for the diffusion of useful literature in India")। এই সমাজের উদ্যোগে ইংরেজি ও বাঙলায় সহজ-পাঠ্য ও শিক্ষামূলক গ্রন্থাবলী প্রকাশের সিদ্ধান্ত করা হয়। ১৮৯০ সালের ৩১শে জানুয়ারী বেলভিডিয়ারে স্যার স্টুয়ার্ট ব্যালের সভাপতিত্বে এই সাহিত্য-সমাজের উদ্বোধন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। ভারতীয়গণের মধ্যে স্বনামধন্য স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার রাসবিহারী ঘোষ, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ মনীষিগণ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। পরে বঙ্কিম-চন্দ্রও এই সমাজে যোগদান করেন।

বিদেশী শাসন থেকে অব্যাহতি লাভ করে স্বাধীন ভারত আজ নতুন করে তার শিক্ষা ও সংস্কৃতির সৌধ গড়ে তুলছে। জাতীয় শিক্ষা-প্রগতিতে বেলভিডিয়ারের জাতীয় গ্রন্থাগারের দান ও দায়িত্ব হবে অসামান্য। সর্বসাধারণের এই বিদ্যামন্দির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ও জনপ্রিয়তা লাভ করতে থাকবে, ইহাই আমরা আশা করি।

৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯৪৯ তারিখের হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডে প্রকাশিত শ্রী সি আর ব্যানার্জির প্রবন্ধ অনুসরণে।

# মাটির খাবার

শ্রীদীনেশ সেন

মাটির খাবার দরকার, তা কি কি, এ সব আমাদের পূর্বে পুরুষেরা বৈজ্ঞানিক-ভাবে জানতেন না। এটা না জানলেও তাঁরা মাটিতে যে সব জিনিস সময়মত দিতেন, মাটির খাবার বা সার হিসাবে প্রত্যেকটির দরকার ছিল আর সেগুলি প্রয়োগের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও আছে। তাঁরা নিজেরা ঠিক ঠিক বৈজ্ঞানিক ছিলেন না, তাঁদের না ছিল ল্যাবরেটরী, না টেস্টটিউব বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেতাবী বিদ্যে।

বৈজ্ঞানিকদের একটা গুণ থাকা দরকার যেটাকে বলে 'বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার ক্ষমতা' একটা কিছু জিনিস হল, তাঁরা দেখলেন, তার থেকে ধরে নিতেন, অনুরূপ অবস্থাতে সেই জিনিসটা হবে। কে প্রথমে লক্ষ্য করেছিলেন তা জানা যায়নি, একটা হাড় পড়ে থাকলে তার ধারের ঘাসগুলো হয় জোরালো। পরে গাছের গোড়ায় হাড় বা হাড়ের গুঁড়ো দিয়ে দেখা গেল গাছটির খুব জোর বাড়ে। চাষের ক্ষেতে দিয়ে দেখলেন ফসল হয় ভালো। তাঁদের এই ক্ষমতাটা ছিল।

ঐ ক্ষমতার বলে মাটিতে ছাই, গোবর, খইল হাড়ের গুঁড়ো দেওয়া দরকার তা তাঁরা জেনেছিলেন আর মাটিতে তা দিতেন। এসব তাঁরা দেখে ঠেকে শিখেছিলেন। তাঁরা জমিতে বিরিকলাই জাতীয় ডালের গাছ লাগাতেন মাঝে মাঝে পরের বছর সেই জমিতে অন্য ফসল হতো ভালো। এতে হতো বিরিকলাই জাতীয় গাছের শিকড়ের 'নাইট্রোজেন বন্দীকারী' বা 'নাইট্রিফাইং ব্যাকটিরিয়ার' সাহায্যে জমির নাইট্রোজেন ক্ষতিপূরণ। এই 'ব্যাকটিরিয়াম' কথা তাঁরা নিশ্চয়ই জানতেন না, এখন তা জানা হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ক্লোরিন মাটিতে নাইট্রোজেন ক্ষতিপূরণের একটি পদ্ধতি এটি।

এখন আরও জানা গেছে ছাইতে 'পটাশ', গোবরে নাইট্রোজেন আর ফসফেটস, হাড়েতে ফসফেটাস ইত্যাদি আছে। প্রত্যেক ফসল মাটি থেকে ঐসব জিনিস কিছু কিছু টেনে নেয়। পরে একই জমিতে ভালো ফসল করতে হলে মাটিতে ঐসব জিনিসের ক্ষতিপূরণ করার দরকার। এক টন উৎপাদিত গমের দরকার ৪৭ পাউণ্ড নাইট্রোজেন, ১৮ পাঃ ফসফরিক এসিড আর ১২ পাউণ্ড পটাশ। এগুলির পরিপূরণ দরকার। কারণ ওরা মাটি থেকে ওটা নেয়।

কখন কি করতে হবে তা আমাদের দেশে কৃষকদের জন্য ছড়াতে খনার বচনে বলে দেওয়া আছে এই বৈজ্ঞানিক যুগের কত আগে থেকে। ইংরেজীতেও ওদেশের কৃষকদের জন্য ওদেশের মনীষীদের রচিত ছড়াতে উপদেশ অনেক আছে। যে সব দ্রব্য উদ্ভিদ দেহে লাগে আর মাটির থেকেই নেয়, সে সব দ্রব্যগুলি মাটির খাবার।

পরে বিজ্ঞানের উন্নতির সংগে সংগে জানা গেল, মাটির থেকে আরও অনেক জিনিস উদ্ভিদ দেহে লাগে। অভাবই আবিষ্কারের জননী। বর্ধিত লোক সংখ্যার জন্য জমি পিছু বেশী খাদ্য উৎপাদন প্রয়োজন হয়ে পড়ল। মাটি থেকে কি করে খাদ্য বেশী উৎপাদন করা যায়, তার চেষ্টা চলল দেশে দেশে, পশ্চিমের দেশগুলিতে। ধীমান বৈজ্ঞানিকরা চেষ্টা করতে গিয়ে প্রথমে হলেন বিফল, পরে তাঁরা মাটির খাবারের রহস্য আবিষ্কার করলেন। অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানা গেল, নাইট্রোজেন পটাশিয়াম আর ফসফরাস ছাড়া আর অনেক মৌলিক দ্রব্যের লবণ দরকার উদ্ভিদের উপযুক্ত পরিপুষ্টির জন্য। সবগুলি হচ্ছে মোটামুটি আঠারোটা। হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ক্লোরিন তামা, দস্তা, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম লোহ ম্যাগনেসিয়াম বোরণ বেরিয়াম, স্ট্রোনশিয়াম, আয়োডিন, গন্ধক ফসফরাস আর কার্বন। এদের মাত্রার অল্পাধিক্যতর আছে। কতকগুলি 'ট্রেস এলিমেণ্টর' মতন ভাগে থাকে। 'বর্ণ বিশ্লেষণ' যন্ত্র ছাড়া এদের উপস্থিতি জানা কষ্টকর।

কার্বন হাইড্রোজেন অক্সিজেনের ভাগের পরিমাণ খুব বেশী, নাইট্রোজেন, পটাশিয়াম ইত্যাদি কিছু কম পরিমাণ; অন্যান্যের মাত্রা আরও কম।

এদের কতকগুলি বায়বীয়, কতকগুলি মৌলিক ধাতু কতকগুলি অন্য কঠিন পদার্থ। উদ্ভিদ দেহে এগুলি প্রবেশ করে, শিকড়ের 'রুট হেয়ারের কোষগুলির সাহায্যে, মাটির থেকে জলে গোলা এদের লবণ হিসাবে। কতকগুলি প্রবেশ করে, গাছের সবুজ পাতার 'ক্লোরোফিল সাহায্যে, গ্যাস হিসাবে, যেমন 'কার্বন ডাই অক্সাইড'।

সাধারণ মাটিতে নাইট্রোজেন, ফসফরাস আর পটাশিয়াম ছাড়া (এগুলি মাটিতে এদের লবণ হিসাবে থাকে) অন্য পদার্থগুলি বেশ বেশী মাত্রায় থাকে, এগুলির সাধারণতঃ ক্ষতিপূরণের প্রয়োজন হয় না। অবশ্য উদ্ভিদ দেহের উপযুক্ত পরিপুষ্টির জন্য দরকার প্রত্যেক পদার্থটি নির্দিষ্ট মাত্রায়।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ভন লিবিগ নামে একজন জর্মন রসায়নজ্ঞ রাসায়নিক সারের সাহায্যে উৎপাদন বাড়ানোর সম্ভাবনার কথা জানান। প্রথম দৃষ্টিতে কাজটি সোজা মনে হয়েছিল, ফসল তৈরি করবার আগে ও পরে মাটির রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে নিয়ে ঘাটতি পড়া রাসায়নিক দ্রব্যগুলি মাটিতে মিশিয়ে দিলেই মাটির খাবার দেওয়া হলো—পরের ফসল ভালো হবে।

কিন্তু তা হয়নি। প্রথম দৃষ্টিতে কাজটা ঐ রকমই সোজা বলে মনে হয়েছিল। রাসায়নিক-দের কথা শুনে তাঁরা জমিতে নাইট্রেট ও পটাশ মিশিয়ে দেখলেন সব সময় তাতে কাজ চলে না। লিবিগ কথাটি বানান করে লিখলে হয়

লিট-বিগ। **উল্টিয়ে লিখলে হয় বিগ-লাই,** যার অর্থ একটা বিরাট মিথ্যা কথা। তাঁরা লিবিগকে **ওই বলে ঠাট্টা করতে শুরু** করলেন।

এতে রাসায়নিকরা দমে গেলেন না, মাটিটা নিয়ে আরও মনোনিবেশ সহকারে দেখতে আরম্ভ করলেন। দেখলেন মাটি একটা সম্পূর্ণ পৃথক জগৎ। এতে আছে, নিম্ন প্রাণী জগতের লক্ষ লক্ষ 'ব্যাকটিরিয়া', জল জলীয় বাষ্প, চটচটে আঠালো পদার্থ, ভিন্ন ভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ, এদের কঠিন, অর্ধতরল ও বায়বীয় বিভিন্ন অবস্থা। মাটির উপযুক্ত শস্য উৎপাদন ক্ষমতার বৃদ্ধির জন্য এই সবগুলির অনুশীলন করা উচিত। এর জন্য দরকার উপযুক্ত পদার্থবিদ্যাবিদ রাসায়নিক এবং প্রাণিতত্ত্ববিদদের একত্র সহযোগিতা।

পশ্চিমের বৈজ্ঞানিকবৃন্দ মাটির রহস্য ভেদ করবার জন্য একনিষ্ঠভাবে কাজ শুরু করে দিলেন। তখন থেকে বিরামহীন গবেষণা চলেছে, গবেষণার ফলে মাটি তার স্বরূপ খুলে দিয়েছে। মাটি আজ আর অবহেলিত বস্তু নয়। বৈজ্ঞানিকগণ এখন সসম্মান দৃষ্টিতে দেখে থাকেন, জমির শস্য উৎপাদন ক্ষমতা বেড়ে গেছে, আজকালকার বর্ধিত লোক সংখ্যার খাদ্য সমস্যারও সমাধান হয়েছে খানিক।

উদ্ভিদদেহের কোন অংশ মাটিতে পড়লে কি অবস্থা প্রাপ্ত হয়, গবেষণা দ্বারা তা জানা গেছে। ফসলের পরে বাহিরের বাতাস, বৃষ্টির জল, সৌরকিরণ আর মাটির উদ্বৃত্ত সার থেকে শস্য উৎপাদন কেমন করে হয় তাও জানা গেছে। শস্যের উপযুক্ত বৃদ্ধি ও প্রসারের জন্য ক্ষয়িত নাইট্রেট ফসফেট ও পটাশের পরিপূরণ করা দরকার তাও জানা হয়েছে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা এ সব জানতেন না, না জেনেই উপযুক্ত নাইট্রেট ফসফেট ও পটাশের অভাব পূরণের জন্য গোবর, হাড়ের গুঁড়ো আর ছাইর ব্যবস্থা করতেন।

উদ্ভিদ দেহের কোন অংশ মাটিতে পড়ে থাকলে, লক্ষ লক্ষ ব্যাকটিরিয়া তাকে আক্রমণ করে সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকটিরিয়ার ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন হয়, আঠালো, কালো, 'হিউমিক' এসিড। উদ্ভিদদেহের 'প্রোটাড'গুলির নাইট্রোজেনকে বন্দী হতে হয় 'এমোনিয়া' বা 'এমোনিয়া জাতীয়' দ্রব্যে। এর পরে দ্বিতীয় একদল ব্যাকটিরিয়া এদের আক্রমণ করে। তারা 'এমোনিয়া' থেকে 'নাইট্রাইট' পর্যন্ত করে ছেড়ে দেয়। তৃতীয় দলের কাজ তখন হয় শুরু; এরা এদের করে 'নাইট্রেট'।

এই ব্যাকটিরিয়াগুলির কাজ সুষ্ঠুভাবে হতে হলে এদের উপযুক্ত অবস্থায় বর্তমান থাকা দরকার। জমির 'ক্ষারত্ব বা উপযুক্ত অম্লত্ব', জমিতে কতকগুলি রাসায়নিক দ্রব্যের উপযুক্ত পরিমাণে অবস্থিতি। মাটির উপর হাওয়া-চলাচলের সুবিধা-অসুবিধাও এদের কার্যক্ষমতা ঠিক করে। এরা মানুষের চাইতে ঢের তাড়াতাড়ি আর দক্ষভাবে 'প্রোটাড'এর নাইট্রোজেন থেকে 'নাইট্রেট' করে।

গাছপালার পতিত অংশ থেকে মাটি এই-রকমভাবে তার খানিকটা ক্ষয়িত নাইট্রোজেন পুনঃপ্রাপ্ত হয়।

পূর্বপুরুষদের ব্যবহৃত গোবর পশু-পক্ষীর বিষ্ঠা হাড়ের গুঁড়ো ছাই, ক্রমবর্ধমান কর্ষিত ভূমি ক্ষেত্রের পক্ষে যথেষ্ট নয়। এর জন্য অন্য সূত্রে অনুসন্ধান করতে গিয়ে, আবিষ্কার করা হয় 'পেরু' দেশের উপকূলের দ্বীপপুঞ্জে সামুদ্রিক 'পেঙ্গুইন আর 'পেলিকান' পাখীদের যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত বিষ্ঠারাশি। এটা উত্তম সার হিসাবে কিছুদিন ব্যবহার চলে। পরে অল্পদিনেই এটা নিঃশেষ হয়ে যায়।

পশ্চিমদেশে পেঙ্গুইন বিষ্ঠা শেষ হয়ে যাবার পরে 'নাইট্রেটের' জন্য ফের অন্য অনুসন্ধান চলতে থাকে। একজন জার্মান আবিষ্কৃত চিলি দেশের 'নাইট্রেট ডিপজিটের উপর সবার নজর পড়ে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত 'নাইট্রেট' পাবার কেন্দ্রস্থল ছিল এই নাইট্রেট ডিপজিটগুলি।

উদ্ভিদদেহের প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন মাটির সঙ্গে বিভিন্ন নাইট্রেট মিশিয়ে দেওয়া যায় সুন্দরভাবে। প্রথম মহাযুদ্ধে ইংরেজ যখন জার্মান বন্দরগুলি অবরোধ করেন, তখন জার্মনরা বাতাসের নাইট্রোজেন থেকে নাইট্রিক এসিড তৈরী করতে শুরু করেন, বৈদ্যুৎ-চুল্লীর উগ্রতাপে। তার থেকে নাইট্রোজেন বন্দী করবার পদ্ধতি মানুষের আবিষ্কৃত পদ্ধতি হতে শুরু করল। আগে এ কাজ করত নাইট্রিফাইং ব্যাকটিরিয়া।'

যুদ্ধের সময় অন্য 'নাইট্রেটের সঙ্গে নাইট্রিক এসিড প্রচুর দরকার। নাইট্রো-সেলুলোজ, নাইট্রোগ্লিসারিন, টি এন টি, এ সব উগ্র বিস্ফোরক তৈরী করবার কাজে। আগে চিলির 'নাইট্রেটের' উপর সালফিউরিক এসিড'এর ক্রিয়ার ফলে নাইট্রিক এসিড তৈরী হতো। যুদ্ধের খাবারও নাইট্রোজেন, মাটিরও নাইট্রোজেন একটি অন্যতম খাবার। কৃত্রিম উপায়ে বাতাসের নাইট্রোজেন থেকে নাইট্রিক এসিড তৈরী করে, জার্মানরা 'নাইট্রোজেন শিল্পে' যুগান্তর এনে দিয়েছেন।

অনেকখানি 'নাইট্রোজেন' এমোনিয়াম সালফেটস হিসাবে কোক ওভেন থেকে পাওয়া যায়। 'কোক ওভেন'গুলি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কাঁচা পাথুরে কয়লা পোড়াবার চুল্লী। উদ্দেশ্য কাঁচা কয়লার উদ্বায়বীয় অংশগুলিকে (যা কাঁচা কয়লায় অনেকখানি থাকে) ধরা এবং কাজে লাগানো। এমোনিয়াম সালফেট তৈরী হয় পাথুরে কয়লার গ্যাসের এমোনিয়ার সহিত সালফিউরিক এসিডের ক্রিয়ার ফলে। এমোনিয়াম সালফেট নাইট্রোজেন ক্ষতিপূরণকারী হিসাবে মাটির অন্য খাবার। কৃত্রিম উপায়ে উৎপাদিত এমোনিয়ার সঙ্গে সালফিউরিক এসিডের ক্রিয়ার ফলেও এমোনিয়াম সালফেটস তৈরী করা যায়।

দ্বিতীয় খাদ্য "পটাশ"। খানিকটা পটাশ উনুনের ছাইতে আছে। পড়ে থাকা গাছের অংশ থেকেও খানিকটা পটাশ মাটিতে পায়। উনুনের ছাই দিয়েও কাজ চলে। এতে জমির ক্ষারত্ব বা অম্লত্বের উপর ক্রিয়া আছে। জর্মনীতে আছে পটাশের স্তর। এই খনিজ পটাশ দেওয়া দরকার মাটিতে উপযুক্ত পটাশ ক্ষতিপূরণের জন্য। পটাশের ব্যবসাতে জর্মনীর একাধিপত্য। কারণ এগুলি সস্তা। অন্য পদার্থের সংমিশ্রণে এগুলি, কার্নালাইট, কাইনাইট ও সিলভানাইট নামে পরিচিত। বীট-চিনি শিল্পের চিটে গুড় ও সামুদ্রিক আগাছাতে 'পটাশ' পাওয়া যায়।

তৃতীয় খাদ্য "ফসফেটস"। হাড়ের গুঁড়োতে সারের উপযুক্ত 'ফসফেটস' আছে। হাড়ের গুঁড়োর উৎপাদন প্রয়োজনের তুলনায় ঢের কম। খনিজ ফসফেটস্ বা ফসফেটসম্পন্ন খনিজ পদার্থ থেকে মাটির দরকার 'ফসফেটস' তৈরী করা হয়।

চতুর্থ খাদ্য, উপযুক্ত মাত্রায় জল। অতিরিক্ত জল বা জলের অনটন দুটাই খারাপ। জল দরকার লবণগুলিকে মাটিতে 'রুট হেয়ারের কোষগুলির সাহায্যে শোষণ উপযুক্ত করবার জন্য।

কৃষিকার্যের গোড়ার কথা—উপযুক্ত পরিমাণ সেচের জল, সার, উপরোক্ত রাসায়নিক দ্রব্য বা মাটির খাবারের উৎপাদন ও ব্যবহার। আমাদের দেশের মাটি বছরের পর বছর শস্য উৎপাদন করে গেছে, কিন্তু সব ক্ষেত্রে ক্ষয়িত রাসায়নিক দ্রব্যগুলি পরিপূরণ করা হয় নি। তার জন্য নির্ভর করি, সাগরপারের মিল-মালিকদের উপর, সেচের জলের জন্য ভাগ্যের। দারিদ্র্যের জন্য আমাদের একমাত্র সহজপ্রাপ্য মাটির খাবার গোবর, জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করি। রাসায়নিক সার কেনবার মত অর্থও নাই। অনেকদিন ধরে মাটিকে উপযুক্ত পরিমাণ খাবার দেওয়া হয় নি বলে আমাদেরও আজ খাদ্যাভাব ঘটেছে। খাদ্যাভাবের একটা কারণ লোকসংখ্যা বৃদ্ধি। বিশেষজ্ঞরাই বলতে পারেন কোনটা বেশী, জমির উৎপাদন শক্তি হ্রাস না জনবৃদ্ধি।

# সাহিত্যিকের দায়িত্ব

**শ্রীঅবনীনাথ রায়**

এক সাহিত্য সভায় প্রবন্ধ পড়ার পর জনৈক শ্রোতা আমাকে সখের সাহিত্যিক বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। আমি রাগ করি নাই। কথাটার মধ্যে সত্য আছে। বাস্তবিক যেরূপ হইলে সত্যিকারের সাহিত্যিক হয় সেরূপ ত আমরা নহি। চব্বিশ ঘণ্টার অধিকাংশ সময় আমাদের সাহিত্যসাধনায় নিয়োজিত হয় না। আমরা সাহিত্য চর্চা করিয়া থাকি বাকে ভদ্রে, নিজের খুশী এবং সুযোগ মত। সুতরাং সাহিত্য আমাদের নিকট তপস্যা নহে—সময় কাটাইবার ব্যসন বা বিলাস মাত্র। এই ভাবে সাহিত্য লইয়া ব্যাপৃত থাকিলে বৃহৎ সত্যের সাক্ষাৎ পাইবার সম্ভাবনা নাই—যাহা মিলিতে পারে, তাহা সত্যের ছিটে-ফোঁটা মাত্র। এই কারণেই বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের পর আমাদের দেশে এখনও আর কোন সত্যিকারের সাহিত্যিকের সাক্ষাৎ পাওয়া যাইতেছে না। সাহিত্যকে ব্যবসায় হিসাবে গ্রহণ করিলে জীবিকা নির্বাহ হইতে পারে—হয়ত মোটরেও চড়া যায় বন্ধুবান্ধবের স্তুতি এবং গোড়ভক্তের সাধুবাদও মিলিতে পারে, কিন্তু যে সত্য তপস্যালব্ধ তাহার নাগাল পাওয়া যায় না।

বলা বাহুল্য এইখানে সাহিত্যকে একটা বৃহত্তর পটভূমিকার মধ্যে দেখা হইতেছে—যে পটভূমিকায় সাহিত্যিক এবং দ্রষ্টা (Seer) এক হইয়া গিয়াছেন। এই পটভূমিকায় মহাত্মা গান্ধী, শ্রীঅরবিন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি মনীষিগণের নাম সাহিত্যিকের বা দ্রষ্টার পর্যায়ে করা যাইতে পারে, যাঁহারা ভারতের সনাতন চিত্তক্ষেত্রকে ঊষর হইয়া যাইতে দেন নাই—নতুন ভাবধারা এবং নির্মল চিন্তাস্রোত দিয়া জাতির মনঃশক্তি এবং প্রাণশক্তিকে সঞ্জীবিত এবং সতেজ করিয়া রাখিয়াছেন।

আজ ভারতবর্ষ স্বাধীন হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যিকের দায়িত্ব বাড়িয়াছে। আজ আর সাহিত্য লইয়া খেলা করিলে চলিবে না। সাহিত্যিককে এখন মানুষ গড়িবার ভার গ্রহণ করিতে হইবে। এই মনুষ্য গঠন সাহিত্যের মাধ্যমে হওয়াই সম্ভব, কারণ সাহিত্যই সমস্ত চিন্তা রসসমৃদ্ধ করিয়া পরিবেষণ করিতে পারে যা আপামর সাধারণ সকলের গ্রহণীয় হয়। তত্ত্বকথা এবং ধর্মশাস্ত্র সাধারণ মানুষ এড়াইয়া চলিতে চায়, কিন্তু রসোত্তীর্ণ তত্ত্বকথাও সে পরিপাক করিতে পারে। মনুষ্য আইডিয়া এবং আদর্শের মধ্য দিয়াই বাঁচে, আহার এবং পানীয় দ্বারা যাহাকে বাঁচাইতে হয় সেটা মানুষের শরীর—প্রাণ বা আত্মা নহে। স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি মনে করিয়া যদি নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাই—মানুষ হইতে চেষ্টা না করি, তবে যে স্বাধীনতা পাইয়াছি তাহাকে রক্ষা করিতে পারা যাইবে না। মনে রাখিতে হইবে স্বাধীনতা লাভ সম্ভব হইয়াছে আমাদের চেষ্টা দ্বারা নহে, যাহারা এখন এই লইয়া গৌরব বোধ করিতেছি। স্বাধীনতা লাভ সম্ভব হইয়াছে ভারতের একদল উত্তর-সাধকের তপস্যায় যাঁহারা নিজেদের ত্যাগ এবং আত্মোৎসর্গের দ্বারা স্বাধীনতা যজ্ঞের সমিধ সরবরাহ করিয়া চলিয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায় হইতে আরম্ভ করিয়া মহাত্মা গান্ধী পর্যন্ত এই যজ্ঞ সমানে চলিয়াছে। এখনকার যুগের লোকের দায়িত্ব যজ্ঞের এই অগ্নিকে নির্বাপিত হইতে না দেওয়া। সেটা সম্ভব হইবে যদি দেশের জন-সাধারণ মানুষ হইয়া উঠিবার সাধনা গ্রহণ করে এবং দেশের সাহিত্য যদি প্রকৃত জ্ঞান, রস এবং আনন্দ পরিবেষণ করিয়া ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য এবং আদর্শকে সর্বদা দেশের লোকের চোখের সামনে ধরিয়া রাখিতে সাহায্য করে।

যাঁহারা শুধু কর্মকেই দেখেন তাঁহারা কর্মের আদিতে যে ভাব বা আইডিয়া ছিল, তাহাকে দেখিতে পান না। বাস্তবিক পক্ষে কর্ম মননেরই ফল মাত্র—আগে যেটা আমার মনে ইচ্ছা বা আইডিয়ারূপে উদিত হয় সেইটিই পরে কর্মরূপে প্রকাশিত হয়। এই ভাব বা আইডিয়া সরবরাহ করিবার কাজ সাহিত্যের। দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথ আগে আইডিয়া ভারতবর্ষের আকাশে বাতাসে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন, মহাত্মা গান্ধী পরে তাহাকে কর্মধারায় রূপায়িত করিয়া তুলিয়াছেন। যে দেশের সাহিত্য বৃহৎ আদর্শ এবং বৃহৎ জীবনের সন্ধান দিতে না পারে, সে দেশের জাতি উন্নতিশীল, বীর্যবান এবং মৃত্যুঞ্জয় হইতে পারে না।

বিগত একদশক কিংবা তার কিছু বেশি দিন হইতে বাঙলা সাহিত্যে আদর্শের একটা ভ্রষ্টাচার লক্ষিত হইয়াছিল। হঠাৎ দেহকেই বড় বলিয়া স্বীকার করি যৌনলীলার ছবি সাহিত্যের মুকুরে প্রতিফলিত হইয়া উঠিয়াছিল। এখনো যে সে ঘোর একেবারে কাটিয়াছে এমন মনে হয় না—তবে সে যে নিশ্চিতরূপে কমের দিকে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই লই বাদানুবাদেরও অবধি ছিল না। কিন্তু যাঁরা তত্ত্বজ্ঞ, ভারতের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের যোগসূত্র যাঁদের পরিচিত তাঁহারা এই স্বৈরাচারে বিচলিত হন নাই। তাঁহারা জানিতেন এ একটা আকস্মিক ঢেউএর মত পাশ্চাত্য সাহিত্যের রঙীন পাতা হইতে উড়িয়া আসিয়া আমাদের দেশের দুর্বল মস্তিষ্কে বাসা বাঁধিয়াছে। ইহার গতি মানুষের দেহ অবধি—আত্মাকে ইহা স্পর্শ করিতে পারিবে না। সুতরাং ইহার অল্পকালস্থায়ী আক্রমণকে ভয় করিবার কিছু নাই।

হইলও তাহাই। জোয়ারের জলের মত এ ভাববন্যা পশ্চিম হইতে যেমন আসিয়াছিল ভাঁটার টানে আবার তেমনি সরিয়া যাইতেছে। ভারত তাহার আদর্শে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। এই যুগসন্ধিক্ষণে ভারতবর্ষে স্বাধীনতার আবির্ভাব। ভারতবর্ষের সাহিত্যিককে এইবার জাতিকে লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার ভার গ্রহণ করিতে হইবে।

এই কারণে গত ডিসেম্বর মাসে যখন ভারতের নগরে নগরে কনফারেন্স এবং সম্মেলনের ধুম লাগিয়া গেল—যখন নিখিল সর্বভারতীয় অর্থনৈতিক সম্মেলন, দার্শনিক সম্মেলন, বিজ্ঞানের কংগ্রেস, শিক্ষা সম্মেলন, চিকিৎসা শাস্ত্র সম্মেলন—এমন কি আইনজীবী দের সম্মেলনও হইয়া গেল, তখন দুঃখের সঙ্গে মনে হইয়াছিল যে, এই মাহেন্দ্রক্ষণে সাহিত্য সম্মেলনের সংবাদ নাই কেন? ভারতবর্ষকে নতুন করিয়া গড়িয়া তুলিবার যজ্ঞে কেবল কি সাহিত্যিকেরই কিছু দিবার নাই?

কিন্তু সাহিত্যিক যদি তার নিজের মিশন খুঁজিয়া না পায়, ভারতবর্ষের আত্মাকে যদি সে আবিষ্কার করিতে না পারে, তবে তাহার প্রতি দেশের যে অনাদর দেখা গিয়াছে, তাহার সে যোগ্যই হইবে। তাহার মিশন যে ক্ষুদ্র নয়, সে মানুষ গড়িয়া না দিলে সদ্যলব্ধ স্বাধীনতা যে মরীচিকার মত শূন্যে মিলাইয়া যায় ইহার প্রমাণ তাহাকে দিতে হইবে।

ভারতের কল্যাণ কিসে, তার লক্ষ্য কি এবং তার প্রাণশক্তি কোথায় পুঞ্জিত হইয়া আছে ইহা সর্বাগ্রে উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতে হইবে। ভারতের বাণী সকলের গ্রহণযোগ্য করিয়া 'চারণায়িত' (inter-pret) করিয়া দিবার ভার সাহিত্যিকের।

ভারতবর্ষ একটি বিশিষ্ট দেশ—বিচিত্র ইহার সভ্যতা, ইহা জগতের অন্যান্য দেশের সমপর্যায়ভুক্ত নহে। ইহা হিমালয় এবং সমুদ্র দ্বারা রক্ষিত। এখানে যে জাতি বাস করে, তার সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য অন্য জাতির তুলনায় স্বতন্ত্র।*

এখানকার অধিবাসী স্মরণাতীত কাল হইতে এক পরমপুরুষকে ধ্যান করিয়াছে—জাগতিক লাভ ক্ষতিকে একমাত্র করিয়া দেখে নাই। সেই কারণে ভারতবর্ষকে তপোভূমি আখ্যা দেওয়া হয়—জীবনের আদি এবং অন্ত ও তার রহস্য উপলব্ধি করিয়া দেখিবার জন্য এই দেশের অধিবাসী কঠিন তপস্যা করিয়াছে। এই তপস্যার ফলে ভারতবর্ষে যে সভ্যতা এবং সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা ভগবৎকেন্দ্রিক—মনুষ্যকেন্দ্রিক নহে। সেই কারণে অন্য দেশের লোক ভারতীয় সভ্যতার মর্মগ্রহণ করিতে পারে না। ইহা তাহাদের অপরাধ নহে—আদর্শের রূপে বিভিন্নতাই এই না বুঝিতে পারিবার কারণ। নানারূপে এবং নানাভাবে ভগবানকে উপলব্ধি করিবার এমন অপূর্ব সাধনা অপর কোন জাতির ইতিহাসে লক্ষ্য করা যায় না। এইখানেই ভারতবর্ষের শক্তি এবং বৈশিষ্ট্য নিহিত একথা আমাদের মনে রাখিতে হইবে।

নিজের জন্মভূমি বলিয়া গৌরব বোধ করিবার অছিলায় এই প্রসঙ্গের অবতারণা করি নাই। বৃথা অতিরঞ্জন কোন দেশকেই বড় করিয়া তুলিতে পারে না। কিন্তু পূর্বপুরুষের তপস্যা দ্বারা অর্জিত যে পরম সম্পদ আমরা বিনা আয়াসে লাভ করিয়াছি, কেবলমাত্র ভারতের অধিবাসী বলিয়াই যে দৈবী বিত্ত আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে দাবী করিতে পারি, তাহার প্রকৃত মূল্য সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। তাহা না থাকিলে এই বিত্ত না আমাদের কোন কাজে লাগিবে, না অপরকে তাহা দিতে পারিব। মূল্যজ্ঞানের অভাবে ইহার মূল্যও আমাদের কাছে কম হইয়া যাইবে বলিয়াই এই কথা সর্বপ্রথম স্মরণীয়।

ভারতের সাহিত্য ভারতের সভ্যতার অনুগামী হওয়া প্রয়োজন। ভারতের সভ্যতার অন্তরের কথা নিবৃত্তি-প্রবৃত্তি বা ভোগ এখানে আদর্শ হিসাবে কোন দিন পূজা পায় নাই। মানুষের জীবন এক অনন্ত গতিপথে বিস্তৃত—ইহার অতীতও যেমন অসীম, ইহার ভবিষ্যৎও তেমন অনন্ত। আমরা নিজেদের আজ যে অবস্থায় দেখিতে পাইতেছি, তাহা জীবনের যাত্রাপথের একটা মাধ্যমিক পরিস্থিতি মাত্র। ইহার এখানেই শেষ নহে। আগেও বহু পথ অতিক্রম করিয়া আসা হইয়াছে—সম্মুখে এখনো অনেক পথ অনতিক্রান্ত পড়িয়া আছে। কোন মানুষ বা কোন জাতি যদি এই রকম মনোভাবাপন্ন হয়, তবে সে নিজের এবং অপরের ঐশ্বর্য সম্বন্ধে লুব্ধ হইয়া উঠিতে পারে না। কারণ সে জানে যে, যে ঐশ্বর্য তাহাকে অমৃতত্বের পথে অগ্রসর করাইয়া দিবে না, সে-ঐশ্বর্য শুধু তুচ্ছই নয় সে অমৃত-লাভের পথে বাধাস্বরূপ। এই কারণেই মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিয়াছিলেন, "আমি উপ-করণবতাং (উপকরণযুক্ত) জীবন লইয়া কি করিব ? তাহাতে যদি অমৃতত্ব লাভ করা যায়, তবে সে ভাল কথা নচেৎ সেই উপকরণে আমার কোন প্রয়োজন নাই।

মৈত্রেয়ীর এই উক্তির মধ্যেই ভারতবর্ষের আদর্শের কথা ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে—ভারতের সাহিত্যিককে এই আদর্শ গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে সমাজজীবনে অণুপ্রবিষ্ট করাইয়া দিবার জন্য চারণ-ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে। মানব-জীবনে এই আদর্শ স্বীকৃত হইলে প্রাচ্যে তথা পাশ্চাত্যে শান্তি আসিবে। নচেৎ কেবলমাত্র U. N. O.-এর সাহায্যে বিশ্বে মৈত্রী এবং শান্তি স্থাপিত হইতে পারে না। মানুষের মনে যদি লোলুপতার বীজ সমান-ভাবে উপ্ত থাকে, তবে সে সুযোগ পাইলে পরস্বাপহরণের চেষ্টা করিবেই—U. N. O.-এর মহাসভায় গৃহীত শান্তি প্রস্তাবের কোন মূল্যই সে দিতে পারিবে না। ইহার প্রমাণ আমরা ইন্দোনেশিয়া বা নূতন ভারতের ক্ষেত্রে দেখিতে পাইতেছি। ওলন্দাজেরা U. N. O.-র সভায় গৃহীত যুদ্ধ বন্ধ করিবার প্রস্তাব পাশ হওয়া সত্ত্বেও তাহা গ্রাহ্যের মধ্যে আনিতেছে না। ইহাই মানুষের স্বভাব। যতক্ষণ তাহার নিজের স্বার্থে আঘাত না লাগে, ততক্ষণ সে বড় বড় কথা বলে। যে মুহূর্তে তার নিজের স্বার্থহানি হয় বা তার সম্ভাবনা মাত্র দেখা দেয়, সেই মুহূর্তেই সে আত্মরক্ষার জন্য রুখিয়া ওঠে তখন আর তার নীতিজ্ঞান থাকে না। ওলন্দাজেরা ইন্দোনেশিয়ার স্বপ্ন-সাধ্যসাধ লইয়া ধরা পড়িয়াছে মাত্র—নচেৎ সমস্ত পাশ্চাত্য জাতিরই মনের কথা ঐ এক। তারা সর্বদাই সজাগ হইয়া আছে—পার্শ্ববর্তী কোন শক্তিকে বড় হইতে দিবে না। এইরূপে তাহারা শক্তির সাম্য বা Balance of Power রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। ইহারই নাম পাশ্চাত্য দেশের ভাষায় ডিপ্লোম্যাসি বা রাজনীতি। কিন্তু এই নীতির অভ্যন্তরীণ কথা হইল পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস। এই নীতি অনুসরণ করিলে চিরজীবন শক্তির সাম্য রক্ষা করিয়াই চলিতে হইবে—কোনদিন শান্তি আসিবে না। ভারত-বর্ষ এই অবিশ্বাসের নীতি গ্রহণ করে নাই। স্বামী বিবেকানন্দ যেদিন চিকাগো শহরে গত শতাব্দীর শেষভাগে বলিয়াছিলেন যে, বিস্তারেই জীবন, সংকোচনে মৃত্যু * সেদিন আমেরিকায় ধন্য ধন্য পড়িয়া গিয়াছিল। তার কারণ ইতিপূর্বে তাহারা এমন কথা শোনে নাই—আজও সে দেশের কেহ এমন কথা বলিতে পারে না। তাহারা এই নীতি-বাক্যে বিশ্বাস করে না—তাই মানেও না। তাহাদের ঐতিহ্য এই কথা বিশ্বাস করিবার মত করিয়া তাহাদের গড়িয়া তোলে নাই। কিন্তু অবিশ্বাসের মূলোচ্ছেদ করিবার নীতি যদি কিছু থাকে, তবে সে এইখানে। অন্য মানুষকে যদি নিজেরই আত্মার বিস্তৃতি বা বিস্তৃততর আত্মা বলিয়া মনে করিতে পারি, অন্য জাতিকে যদি নিজের জাতিরই বিস্তৃততর রূপে বলিয়া ধারণা করিতে পারি, তবে অন্য ভূখণ্ডকে নিজের দেশেরই ব্যাপকতর ছবি বলিয়া পরিকল্পনা করা সম্ভব হইবে। এই বাক্যের অন্তর্নিহিত সত্য হইল এই যে, সেই এক সর্বশক্তিমান ভগবানই মানুষ হইতে মানুষে, এক জাতি হইতে অন্য জাতিতে এবং এক দেশ হইতে অপর দেশে বিস্তৃত হইয়া আছেন বা ভাষান্তরে বলা যায়, তিনিই সমস্ত হইয়া রহিয়াছেন। এইভাবে আবিষ্ট হইতে পারিলে মানুষে মানুষের প্রতি কিম্বা এক জাতি অপর জাতির প্রতি হিংসা বা দ্বেষ করে না—কারণ নিজের বিরুদ্ধে নিজের কোন হিংসা নাই—নিজেকে সকলে বিনা কারণেই ভালবাসে।

ভারতবর্ষের মনকে এই আদর্শে পরিপূর্ণ করিতে হইবে—তার সাহিত্যে এই ঐতিহ্যেরই অনুরণন থাকিবে। পাশ্চাত্য দেশের ব পাশ্চাত্য সাহিত্যের আদর্শ আমাদের পক্ষে গ্রহণীয় নয়। এই কথা বলিলেই সকলের মনে একটা ধাঁধা লাগিয়া যায়। সকলে বলেন পাশ্চাত্য সভ্যতার কি সবটাই মন্দ কিম্ব পাশ্চাত্য সভ্যতার বৈজ্ঞানিক দানকে অবহেল করিয়া পুনরায় কি হিন্দু ধর্মের কুসংস্কারে যুগে ফিরিয়া যাইব? রেল গাড়ি, মোটরকা হাওয়াই জাহাজ প্রভৃতি পরিহার করি পুনরায় কি গরুর গাড়িতে চড়িতে হইবে বলা বাহুল্য কোন সভ্যতারই সব মন্দ কিম্ব নিজেদের সভ্যতার সবই ভাল, একথা ব আমার উদ্দেশ্য নয়। কালক্রমে হিন্দু ধর্মে এবং হিন্দু সভ্যতার মধ্যেও আবর্জ জন্মিয়াছে, কিন্তু তবু তাহার বনেদ ঠি আছে। তাহার প্রমাণ তাহার লোকের চা এবং তাহার সামাজিক গঠন। রামায়ণ-মহ ভারতের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া এই বি শতাব্দী পর্যন্ত ভারতবর্ষে নিবৃত্তি ত্যাগেরই অনুশীলন হইয়াছে দেখিতে পা শ্রীরামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, শ্রীকৃষ্ণ হইতে আর করিয়া বর্তমান যুগে মহাত্মা গান্ধী পর্য

* India shut into a separate existence by the Himalayas and the ocean, has always been the home of a peculiar people with characteristics of its own recognisably distinct from all others, with its own distinct civilization, way of life, way of the spirit, a separate culture, arts, building of society."—Sri Aurobindo.

* Expansion is life, contraction is dea

মহামানবেরাই অকুণ্ঠ পূজা পাইয়াছেন। অহিংসার বেদীমূলে নিজেকে উৎসর্গ করিয়া মহাত্মাজী হিন্দু-মুসলমানের বিদ্বেষ-বহ্নি চির নির্বাপিত করিতে চাহিয়াছেন। অন্য কোন দেশে এত বড় আদর্শ অনুসৃত হয় নাই। পশ্চিমে মহামানব যীশুখৃষ্টে বৃহৎ সত্যের ঘোষণা করিয়াছেন দেখিতে পাই—নিজের জীবন বলি দিয়া তিনি তাহা পালনও করিয়াছেন, কিন্তু জাতির জীবনে তাহা প্রকাশিত হয় নাই। দক্ষিণ গণ্ডে চপেটাঘাত করিলে বাম গণ্ড ফিরাইয়া দিতে হইবে, এই নীতিতে ও দেশের লোক যদি বিশ্বাস করিত, তবে এই মহাযুদ্ধের পর মহাযুদ্ধ ঘটিতে পারিত না। এই বাক্যকে ও দেশের লোক কার্যত পাগলের প্রলাপ বলিয়াই মনে করে।

কিন্তু ভারতবর্ষে সমাজ-জীবনের কাঠামো এবং জীবনযাত্রা প্রণালীর ভিতর দিয়া এই আদর্শকে সঞ্চারিত করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে—কারণ একদিনে এই আদর্শ জাতীয় জীবনে সংক্রামিত হওয়ার বস্তু নয়। সেই কারণে এদেশের সমাজে আদরণীয় ধনী নয়—জ্ঞানী; ভোগী নয়—ত্যাগী। বীর্য থাকা সত্ত্বেও ক্ষত্রিয় এবং বিত্ত থাকা সত্ত্বেও বৈশ্য—এই সমাজে ব্রহ্ম বীর্য এবং ব্রহ্ম বিত্তের পদানত। উচ্চ স্তর হইতে নিম্ন পর্যন্ত এই সমাজে একটা প্রীতির এবং সৌহার্দ্যের ভাব বিনিময় হইবার ব্যবস্থা ছিল। সর্বদা প্রবহমান এই প্রীতির স্রোতের আদান প্রদানের ফলে এখানে বিদ্বেষ এবং বিরোধ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিবার সুযোগ পায় নাই।

মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা এবং আনুগত্য এই জীবনের মূলমন্ত্র। বাক্যে এবং কর্মে সংযম এবং বিনয় এখানে মনুষ্যত্বের মাপকাঠি। অহঙ্কার, অসংযম এবং ডিসিপ্লিনের অভাব এখানে সর্বথা পরিত্যাজ্য।

পাশ্চাত্য সভ্যতার একটা গৌরব হইল এই যে, তাঁহারা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে এবং গবেষণায় ভারতবর্ষকে পরাভূত করিয়া বহুদূরে অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে এই জগৎকে শক্তির তরঙ্গ (waves of energy) বলিয়া প্রতীতি হয়। বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে কোন ভুল নাই, কিন্তু প্রশ্ন হইল এই যে, শক্তিটা কাহার? মানুষ যতদিন এই শক্তিকে নিজের শক্তি বলিয়া মনে করে, ইহাকে নিজের স্বার্থ সিদ্ধ করিবার কার্যে ব্যবহার করে, ততদিন এই শক্তি তাহার পক্ষে মারাত্মক। সেই জন্যই বিজ্ঞানের উন্নতি এবং আবিষ্ক্রিয়ার ফলে মানুষ মারণাস্ত্রের পর মারণাস্ত্র জড় করিয়া তুলিতেছে, মানুষের বিরুদ্ধে তাহার অবিশ্বাস এবং বিদ্বেষের অন্ত নাই—মানুষের ধন-প্রাণ নির্ভয় হইবার পরিবর্তে মানুষ অধিকতর শঙ্কাতুর হইয়া উঠিয়াছে। আজ ইরানের বাদশাহের জীবন নাশ করিবার চেষ্টা, কাল ব্রহ্মদেশে মন্ত্রীদিগকে হত্যা, গত যুদ্ধে হিটলারের বিলোপ, মুসোলিনীর নিধন—এই সব ঘটনাগুলিকে বিজ্ঞানের কীর্তি বলিব কিম্বা পরাজয় বলিব বুঝিয়া উঠিতে পারি না। আমাদের দেশে এবং বিদেশে সর্বত্র অসন্তোষ এবং বিদ্বেষ মানুষের প্রীতির সম্বন্ধকে জর্জরিত করিয়া তুলিয়াছে। হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্মঘট প্রভৃতি ঘটনা সেই অসন্তোষেরই বহিঃপ্রকাশ। এইরূপ হওয়াই অনিবার্য। যতদিন মানুষের চরিত্রে লোলুপতা এবং গৃধ্নুতা থাকিবে, ততদিন সে শান্তির পথে যাইতে পারিবে না। লোভের নিয়মই এই যে, সে যাহা চায়, তাহা পাইলে পুনরায় আরো চাহে—তাহার লোভ পাওয়ার দ্বারা কোনদিন নিবৃত্ত হয় না। সুতরাং পাশ্চাত্য সভ্যতার কাছে হাত পাতিয়া বিশ্ব-শান্তি পাওয়া যাইবে না। সেজন্য প্রতীচ্য সভ্যতারই দ্বারস্থ হইতে হইবে।

বিজ্ঞানের দ্বারা পৃথিবী যে সুপথে চালিত হইতেছে না, সে দুঃখ সেদিন প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল বিজ্ঞান কংগ্রেস উদ্বোধন করা উপলক্ষে তাঁর অভিভাষণে বলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, বিজ্ঞানের মহৎ কীর্তি সত্ত্বেও পৃথিবী যেন ঠিকমত চলিতেছে না—ইহার মধ্যে যেন একটা কি বড় রকমের গলদ রহিয়াছে। আমাদের মধ্যে অনেক মনীষী আছেন, এমনকি, প্রতিভাশালী ব্যক্তিও আছেন, যাঁদের সদিচ্ছা সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ, কিন্তু তবু পৃথিবী ক্রমাগত ভুল পথেই যাইতেছে কেন?*

সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিই এই বিষয়ে একমত হইবেন। বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্ক্রিয়া সত্ত্বেও মানুষের অবস্থা ফিরিতেছে না কেন? মানুষের মধ্যেকার প্রীতির, সহযোগিতার, আন্তরিকতার সম্বন্ধ গাঢ়তর হইতেছে না কেন? আণবিক বোমার ভয়ে সকলে তটস্থ কেন? যাহার আণবিক বোমা আছে, তাহার উপর সকলের ক্রুর দৃষ্টি কেন? ইহার একমাত্র উত্তর, যে শক্তি মানুষের নিজস্ব নয়, সেই শক্তিকে মানুষ নিজের শক্তি বলিয়া মনে করিতেছে। এই শক্তি যে ঈশ্বরীয় শক্তি, এই সত্য যে মুহূর্তে স্বীকৃত হইবে, সেই মুহূর্তে এই শক্তি মানুষের হাতে অমৃত হইয়া উঠিবে—তখন আর সেই শক্তি মানুষকে নিধন করিবে না, তাহাকে রক্ষা করিবে। ভারতীয় সভ্যতা এই সত্য প্রথম হইতেই স্বীকার করিয়া আসিয়াছে।

---

* In spite of its very great scientific achievement today, the world is obviously in a bad way and there is something very wrong about it. There are plenty of men of ability and talent and even genius, plenty of good-will, yet the world goes wrong progressively.

# এ বৈশাখে

**জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়**

যে সব মেয়ে চুলের রঙে মেঘের বাতি ঘষে
নদীর চরে কবিতা হয়ে গুচ্ছাকারে দাঁড়ায়
এবারে হাওয়া অনেক দূরে তাদেরই চুলে ছড়ায়,
আমরা যারা অভাগা জন, কেবলই দূরে থাকি।

দুপুরে আজো পুরানো ঢঙে অনেকানেক গ্রামে
খবর আনে শালিখ-ডাকা অবিবাহিত পথে
যেখানে থামে সে সব মেয়ে যাদের খোলা চুলে
এবারে হাওয়া নিরুদ্দেশে ঠিকানা লিখে রাখে,
আমরা শুধু অভাগা জন দূরে দূরেই থাকি।

দুপুর আজো তেমনি করে সকালে ফাঁকি দিয়ে
করুণ ঘন বিষাদ মেঘে বিকেল ডেকে আনে
যখনই শুধু পুকুর পাড়ে বিরহী ছায়া গাছে
অনেক মেয়ে স্নানের শেষে কতো না কথা ভাবে!
এবারে হাওয়া আকাশ পথে তাদেরই কাছে কাছে।

আমরা যারা অভাগা জন কেবলই দূরে থাকি
এ বৈশাখে অনেক চিঠি ছিটিয়ে দেবো হাওয়ায়॥

# স্ত্রীস্বাধীনতার অন্তর্দ্বন্দ্ব

সুস্মিতা আনোয়ার

বিগত কয়েক বৎসরের ধারাবাহিক নারী আন্দোলনের ফলে বর্তমান স্ত্রী-স্বাধীনতা যে এদেশের সামাজিক জীবনের উপর কিছু পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে, সে বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ নাই; কিন্তু স্বাধীন দেশের মাপকাঠি (Standard) অনুযায়ী আমাদের দেশের স্ত্রী-স্বাধীনতা এখনও তার প্রথম অবস্থা অতিক্রম করতে পারেনি। সুতরাং বর্তমানকালের এই খণ্ডিত স্ত্রী-স্বাধীনতাকে তার সম্পূর্ণতার পথে পৌঁছিয়ে দেওয়া আমাদের একান্ত প্রয়োজন ও নিতান্ত কাম্য; এবং আশা আছে যে, স্বাধীন ভারতের নতুন রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা এ বিষয়ে আমাদের যথাযথ সাহায্য প্রদানে কার্পণ্য করবে না।

এখন প্রশ্ন ওঠে যে, সুশৃঙ্খল সামাজিক জীবনযাপনের প্রয়োজনে আমাদের মেয়েদের কতখানি স্বাধীতার যথার্থ প্রয়োজন, আর কতটুকুইবা তার বাহুল্য।

অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে এড়িয়ে গিয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভবপর নয় এবং অনেকের মতে বর্তমান স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রধানতঃ এই কারণেই খণ্ডিত হয়ে রয়েছে। তাই, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মেয়েদের স্বাধীনতার দাবীই বর্তমান নারী-আন্দোলনের এক প্রধান এবং প্রত্যক্ষ লক্ষ্য বলে প্রতীয়মান হয়। প্রায়ই মাসিক পত্রে, দৈনিক খবরের কাগজে, সর্বত্রই মেয়েদের অর্থনৈতিক পরাধীনতার সমস্যা নিয়ে তুমুল আন্দোলন তোলা হচ্ছে এবং মেয়েদের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক রুচি ও শিক্ষাসম্পন্ন বহু পুরুষেরও এই বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহ থাকায় তাঁরা মেয়েদের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে তাঁদের অর্থনৈতিক পরাধীনতার অন্যতম অন্তরায় স্ত্রী-শিক্ষার অভাব দূর করবার জন্য যেভাবে সমগ্র ভারতের (বিশেষ করে বাংলা দেশের) নারী সম্প্রদায়ের ভিতর জনশিক্ষার (Mass education) প্রচার করার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছেন, তাতে সত্যিই আনন্দ হয় এবং আশা হয় এই ভাবে মেয়েদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার প্রচার হয়ে গেলে পরে সামান্য চেষ্টা ও আগ্রহ থাকলে উপার্জনক্ষম হবার উপযোগী শিক্ষায় নিজেদের শিক্ষিত করে তুলতে তাঁদের বিশেষ বেগ পেতে হবে না।

এখন আমাদের বিচার করে দেখতে হবে যে, নারী উপার্জনক্ষম হলেই কি তার ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের সকল দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে, না তার জীবনে নূতন কোন সমস্যা দেখা দিয়ে তার স্বাধীনতা সমস্যার মীমাংসা আরও জটিল করে তোলে?

সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার করলেই দেখা যায় যে, মেয়েদের স্বাধীন জীবনযাত্রার পথে প্রধান অন্তরায় তাদের মাতৃত্ব। প্রগতি যতই প্রসারলাভ করুক না কেন, আমরা আশা করি যে, সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে সৃষ্টিকে বাধা দেওয়া মেয়েদের পক্ষে সহজ অথবা সম্ভবপর নয়—এবং কোন জাতির পক্ষেই সেটা কাম্য হতে পারে না। তাই মনে হয় যে, সামাজিক ব্যবস্থার অল্প-বিস্তর রদ-বদলে যদিই বা পুরুষের অধীনতা পাশ থেকে মুক্তি-লাভ করা মেয়েদের পক্ষে সম্ভব হয়, তথাপি প্রকৃতির শৃঙ্খলে চিরকালের জন্য তাঁরা বাঁধা পড়েছেন। ফলে মাতৃত্বের দায়িত্ব ও সন্তানের দাবী মিটাতে গিয়ে দেশ-কাল নির্বিশেষে শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিচারে যুগে যুগে মেয়েদের সম্পূর্ণভাবে না হোক, আংশিকভাবেও পুরুষের উপর নির্ভর করতে বাধ্য হতে হয়েছে এবং তার ফলে অন্ততঃ সাময়িক ভাবেও তাঁদের স্বাধীনতা কিছু পরিমাণে ব্যাহত হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে।

অনেকে দাবী করেন যে, আধুনিক উপার্জনক্ষম মহিলার পক্ষে নিছক সন্তান পালনের কারণে পুরুষের আশ্রয়ের কোন প্রয়োজন নাই, কারণ তিনি সহজেই চাকুরী করে নিজের ও সন্তানের ভরণ-পোষণ করতে পারেন; কিন্তু সন্তানের প্রতি মায়ের কর্তব্য কেবলমাত্র ভরণপোষণের ভিতরেই সীমাবদ্ধ নয়,—সন্তানের প্রতি মায়ের দায়িত্ব আরও অনেক গভীর অনেক ব্যাপক এবং অধিকাংশ সময় বাইরের কাজে আত্মনিয়োগ করার পর মায়ের পক্ষে সেই দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এই বিষয়ে আরও গভীরভাবে দেখলে দেখা যায় যে, দীর্ঘদিনের পরিশ্রমের পর মায়ের কর্মক্লান্ত দেহ-মন স্বভাবতঃই বিশ্রাম চায় এবং বিশ্রামের শেষে দৈনন্দিন জীবনের শত প্রয়োজন সহস্রবার তাঁকে উদ্ব্যস্ত করে তোলে; তার উপরে আছে সামাজিক জীবনের আহ্বান, আমোদ-প্রমোদ ও সবার উপরে আছে শিক্ষিত মনের স্বাভাবিক দাবী। কর্মক্লান্ত দেহ যেমন ক্ষুধার্ত হয়ে ওঠে—দীর্ঘ শ্রমের একঘেঁয়েমীতে হাঁপিয়ে পড়া মনও তেমনি কিছু মানসিক খোরাক চায়, ফলে সাহিত্য চর্চা অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর বিশ্রাম করে, সংসারের খুঁটিনাটি প্রয়োজন মিটিয়ে লোক-লৌকিকতা বজায় রেখে, শিল্প-সাহিত্যের অল্পবিস্তর চর্চা রেখে ও সিনেমা থিয়েটার দেখে সন্তান পালনের উপযুক্ত অবসর ঘটান তাঁর পক্ষে সহজ হয়ে ওঠে না। সুতরাং তখন তিনি বাধ্য হয়ে গভর্নেস অথবা শিক্ষিতা নার্সের সাহায্য খোঁজেন।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চাকুরিজীবী মেয়েদের আর্থিক অবস্থা বিশেষ উন্নত হয় না বলে তাঁদের পক্ষে ২।৩টি ছেলেমেয়ের জন্য পৃথক গভর্নেস রেখে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা বিশেষ সহজ হয় না। ফলে তাঁদের সন্তান পালন এক দুরূহ সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

অন্যান্য সুসভ্য দেশে, যেখানে চাকুরিজীবী মায়েদের সংখ্যার হার অনুপাতে অনেক বেশী সেখানে সরকার বহুল পরিমাণে স্টেট নার্সারী ক্লাশ প্রভৃতির প্রচলনের দ্বারা তাঁদের সন্তান পালনের ব্যয়-ভার ও দায়িত্ব অনেকাংশে লাঘব করে এনেছেন এবং সেই সব দেশে মায়েরাও তাঁদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা ও প্রতিপালন সম্বন্ধে কিছুটা নিশ্চিন্ত হতে পেরেছেন। বর্তমানে আমাদের স্বাধীন ভারতীয় সরকারেরও যদি এ বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহ থেকে থাকে, তাহলে আশা করা যায়, শীঘ্রই এদেশেও পল্লীতে পল্লীতে যথেষ্ট সংখ্যক সরকারী শিশু শিক্ষা-সদন খোলার ব্যবস্থা হবে। তখন আমাদের দেশের কর্মী মায়েরাও অন্যান্য সুসভ্য দেশের চাকুরিজীবী মায়েদের মতন তাঁদের ছেলে-মেয়েদের সম্বন্ধে কতকটা নিশ্চিন্ত হয়ে কাজে মনোনিবেশ করতে পারবেন।

এখন আমাদের ভেবে দেখতে হবে যে, নার্সারীতে প্রতিপালিত করলেই সন্তানের সম্বন্ধে মায়ের দায়িত্বের অবসান হয় কিনা এবং মাতৃক্রোড় থেকে দূরে প্রতিপালিত হওয়ায় সন্তানের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে কোন প্রকার তারতম্য ঘটে কিনা।

যদি নার্সারীসমূহ দায়িত্বশীল গভর্নমেন্ট কর্তৃক পরিচালিত হয় এবং তার বিধি-ব্যবস্থার উপর কর্তৃপক্ষের যদি যথাযথভাবে দৃষ্টি থাকে, তাহলে আশা করা যায় যে, অনেক দায়িত্বহীন পিতামাতার সন্তান, বাড়ীর চাইতে নার্সারীতেই সহজে সুশিক্ষা লাভ করবে। নার্সারীর রুটিন-বাঁধা নিয়ম তাকে নিয়মানুবর্তী হতে শেখাবে। নিয়মিত ব্যায়াম, আহার ইত্যাদি তার শরীরকে সুস্থ ও সবল করে তোলে এবং

শিশু-শিক্ষায় বিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞ শিক্ষয়িত্রীর তত্ত্বাবধানে শিক্ষা লাভ করায় ধীরে ধীরে তার চিত্তের বিকাশ হয়। এই সব সুবিধা সত্ত্বেও নার্সারীর শিক্ষার ভিতর অনেক ত্রুটি আছে যার ফলে নার্সারীর শিক্ষাকে আদর্শ বলে মেনে নেওয়া যায় না।

নার্সারীর প্রধান ত্রুটি সেখানকার সমষ্টিগত শিক্ষাপদ্ধতি। বহু পরিবারের বিভিন্ন প্রকৃতির ছেলেমেয়ে সেখানে একসঙ্গে প্রতিপালিত হয় এবং প্রত্যেক শিশু-চরিত্রেই তার স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য থাকায় কোন শিক্ষয়িত্রীর পক্ষেই শিক্ষালয়ের গতানুগতিক পাইকারী শিক্ষা দেওয়া ছাড়া শিশুর মানসিক বৃত্তির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হয় না। প্রত্যেকটি শিশুর চরিত্রের দোষ-ত্রুটির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রেখে তার চিত্তের উন্মেষ ঘটানোর মতন ধৈর্য এবং সস্নেহ তৎপরতা একমাত্র মায়ের পক্ষেই থাকা সম্ভব। স্বগৃহে থেকে মা-বাবার স্নেহের শাসনে যে শিক্ষা হয়, সে শিক্ষা হৃদয়বৃত্তির শিক্ষা। পারিবারিক জীবনের স্নেহ-বন্ধনের মাঝে প্রতিপালিত হওয়ায় মায়া-মমতা, দয়া-দাক্ষিণ্য প্রভৃতি হৃদয়বৃত্তির অনুভূতি শিশু-মনকে প্রভাবান্বিত করে তুলে সহজেই তার চিত্তের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়বৃত্তির বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে। ফলে পারিবারিক জীবন তার পক্ষে মধুর হয়ে ওঠে ও নিজেকে তার পরিবারের একজন বলে ভাবতে শিখে আপনা থেকেই সে নিজের পরিবারের প্রতি দায়িত্ববান হয়ে ওঠে। অপর পক্ষে মা-বাবা ও পরিবারের অন্য সকলের কাছ থেকে দূরে নার্সারীতে প্রতিপালিত হওয়ায় পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে শিশুর কোন ধারণা থাকে না। সেইজন্য মা-বাবা ও পরিবারের অন্যান্য সকলের প্রতি শিশুর যতখানি আকর্ষণ থাকা স্বাভাবিক, ঠিক ততখানি আকর্ষণ রাখা তার পক্ষে সহজ হয়ে ওঠে না। ফলে ধীরে ধীরে সে নিজের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এই ভাবে ধীরে ধীরে পারিবারিক জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। স্বাধীন দেশের সুস্থ সামাজিক জীবনের পক্ষে এ একটা সামান্য ক্ষতি নয়. পারিবারিক জীবনের আকর্ষণ থেকে ধীরে ধীরে শিশু-মন মানবতার প্রতি আকৃষ্ট হয় ও ক্রমে সমগ্র দেশের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠে একদিন উপলব্ধি করে যে, দেশ শুধুই মৃত্তিকাময় নয়—তারও প্রাণ আছে, সে চিন্ময়। তখন এই সব অনুভূতি সেই চিন্ময়ী দেশ-মাতৃকার উদ্দেশ্যে নিজেকে উৎসর্গ করার জন্য প্রতিনিয়ত তার মনকে তাগাদা দিয়ে অধীর করে তুলবে।

অনেকে এই প্রসঙ্গে দৃষ্টান্তস্বরূপে রাশিয়ার সমাজ-ব্যবস্থার উল্লেখ করতে পারেন—কিন্তু সে ক্ষেত্রে বলে রাখা প্রয়োজন যে, প্রথমতঃ সেখানে অধিকাংশ মেয়েরা এখনও ঘরে থেকে সন্তান পালন ও নানাবিধ গৃহকর্মের তত্ত্বাবধান করে সময় কাটান। দ্বিতীয়তঃ যাঁরা কারখানা অথবা আপিসে কাজ করেন, তাঁদের পারিবারিক জীবনে ভাঙনের একটা অপ্রত্যক্ষ ঝোঁক দেখা দিচ্ছে তাই বর্তমানে সেখানেও এনিয়ে সমস্যা উপস্থিত হয়েছে।

এতক্ষণ শুধু সন্তানের সুবিধা-অসুবিধার কথাই আলোচনা করা হলো—নিজের স্নেহাঞ্চল থেকে দূরে রেখে সন্তান পালন করায় মাও কিছু কম ক্ষতিগ্রস্ত হন না। নিজের হাতে সন্তান পালন করার মধ্যে দিয়ে মায়ের ব্যক্তিত্বের প্রকাশ যতখানি সহজ ও সম্পূর্ণ হয় এমন আর অন্য কোন ভাবেই সম্ভব হয় না। শুধুই ব্যক্তিত্বের প্রকাশ নয়, মাতৃত্বের মধ্যে দিয়ে নারী-চরিত্র তার শ্রেষ্ঠ পরিণতি লাভ করে. মাতৃক্রোড় থেকে দূরে প্রতিপালিত হওয়ার জন্য সন্তানের শিক্ষা যেমন অসম্পূর্ণ থেকে যায় তেমনি মা হওয়া সত্ত্বেও সন্তানের কাছ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার ফলে মাও ক্রমে নারী-চরিত্রের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে এক অসম্পূর্ণ জীবনযাপন করতে বাধ্য হন।

অতএব মোটামুটিভাবে দেখা গেল যে, সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পাওয়ায় মেয়েদের দৈনন্দিন জীবনের সর্বপ্রকার দ্বন্দ্বের মীমাংসা তো হয়ই না বরং সন্তান পালনের সমস্যা আরও জটিল হয়ে ওঠে এবং তার ফলে সমাজও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এখন দেখা যাক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মেয়েদের পুরুষের উপর নির্ভরশীল রেখেই বা সমাজ কতখানি লাভবান হ'তে পারে। অর্থনৈতিক-ক্ষেত্রে পুরুষের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে মেয়েরা যদি গৃহকর্মে মন দেন, তাহ'লে প্রত্যেক সংসার যে সুনিপুণ শৃঙ্খলার সঙ্গে চলে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না—কিন্তু অর্থনৈতিক পরাধীনতা মেনে নেওয়ায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মেয়েদের পুরুষের দ্বারা পরিচালিত হতে হয় বলে তাঁদের স্বাধীন সত্তাবোধের বড় একটা অবকাশ থাকে না—ফলে কালক্রমে তাঁদের মধ্যে একটা হীনতাবোধের অনুভূতি দেখা যায়, তবে মেয়েদের এই আত্মবলির বিনিময়ে সহজেই এক সুস্থ সামাজিক জীবন গড়ে উঠে দেশকে নানাভাবে লাভবান করে তোলে। যে দেশের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা রয়েছে সে দেশের উন্নতির বড় একটা অবকাশ থাকে না। কিন্তু এই অজুহাতে চিরকালই মেয়েরা যে নীরবে পুরুষের অন্যায় অবিচার সহ্য করে যাবে তাওতো সম্ভব না। তাই অনেক ক্ষেত্রে চাকরী করা মেয়েদের অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায় এবং তার ফল সমাজের পক্ষে যে কতখানি ক্ষতিকর তা আগেই আলোচনা করে দেখানো হয়েছে।

সুতরাং এখন দেখা যাচ্ছে যে, যে সমাজ-ব্যবস্থা মেয়েদের সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দানের পক্ষপাতী মেয়েরা তারা যদি পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করলেও পারিবারিক জীবন বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং যে সমাজ-ব্যবস্থায় মেয়েদের পুরুষের উপর নির্ভর করে চলতে হচ্ছে সে সমাজ-ব্যবস্থায় মেয়েদের ব্যক্তিত্ব বার বার খর্ব হচ্ছে—অথচ সমাজ সে বিষয়ে নির্বিকার।

নারীর দাবী ও সন্তানের দাবীর পুনঃ পুনঃ সংঘাতের আবর্তে স্ত্রী-স্বাধীনতার যে অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হ'য়েছে তার ফলে স্ত্রী-স্বাধীনতার সমস্যা আরও বেশী জটিল হয়ে দেখা দিয়েছে। অথচ যখন স্বাধীন ভারতে সুস্থ সামাজিক জীবন গঠনের প্রয়োজনে মেয়েদের সাহায্য ও সহানুভূতির মূল্য নিতান্ত কম নয়, তখন সাধারণভাবে সম্ভব না হ'লে আইনের সাহায্য নিয়েও মেয়েদের [illegible] অক্ষুণ্ণ রাখার একটা সুবন্দোবস্ত করা বাঞ্ছনীয়।

পুরুষের মতো আইনগতভাবে মেয়েদের যদি পূর্ণ নাগরিক অধিকার ভোগে সমান সুযোগের ব্যবস্থা করা হয় এবং চিরাচরিত বিবাহ আইনের অল্পবিস্তর সংশোধনের দ্বারা প্রয়োজন অনুযায়ী তাঁদের বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার দেওয়া হয়, তা হ'লে আশা করা যায় যে, স্ত্রী-স্বাধীনতা সমস্যার সমাধানের গুরুভার অনেকাংশে লাঘব হয়।

এ ছাড়া আজকের দিনে স্ত্রী-স্বাধীনতার অন্তর্দ্বন্দ্ব অবসানের আর সহজ উপায় কি?
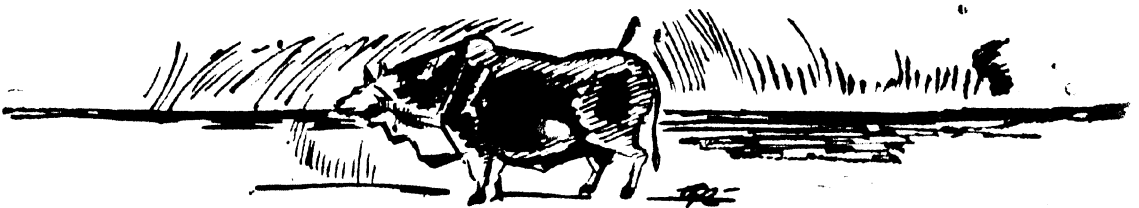
দিল্লীশ্বরী (২য় সং)—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

এই গ্রন্থে "রজিয়ৎ (সাধারণতঃ রিজিয়া নামে পরিচিতা)" ও "নূরজাহান"—ভারত ইতিহাসের মোসলেম যুগের এই দুইটি প্রসিদ্ধা নারীর বিচিত্র জীবনকথা আলোচিত হইয়াছে। দিল্লীর সুলতান ইলতুৎমিশের (সাধারণত আলতামাশ নামে পরিচিত) কন্যা রজিয়ৎ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া সত্যসত্যই 'দিল্লীশ্বরী' হইয়াছিলেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের পত্নী নূরজহান আইনত না হইলেও কার্যত দিল্লীশ্বরীই ছিলেন। কারণ জাহাঙ্গীর নামে মাত্র সম্রাট থাকিলেও রাজ্যের সর্বাংশে সম্রাজ্ঞী নূরজহানই পরিচালিত করিতেন। কাজেই সেদিক দিয়া গ্রন্থখানির 'দিল্লীশ্বরী' নাম সার্থক হইয়াছে।

ব্রজেন্দ্রবাবু ঐতিহাসিক উপাদানগুলির বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বিচার করিয়া এই দুই ইতিহাসপ্রসিদ্ধা মহিলার জীবন ও চরিত্রের যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহাতে একদিকে যেমন ঐতিহাসিক হিসাবে তাঁহার শ্রম ও কৃতিত্বের নিদর্শন রহিয়াছে তেমনি পাওয়া গিয়াছে তাঁহার ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠার পরিচয়। কিন্তু ঐতিহাসিক গবেষণায় ও সত্যনিষ্ঠায়ই যে তিনি শুধু কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাহা নহে, তাঁহার রচনাশৈলীর গুণে এই দুইটি জীবনীচিত্র উপন্যাসের মত চিত্তাকর্ষক ও সুখপাঠ্য হইয়া উঠিয়াছে। ঐতিহাসিক সত্য রক্ষা করিয়া ঐতিহাসিক চিত্রকে সর্বজনহৃদয়গ্রাহী করিয়া তোলা কম কৃতিত্বের পরিচায়ক নহে। গ্রন্থকারের প্রচেষ্টা সেদিক দিয়া সার্থক হইয়াছে। পুস্তকটির সর্বত্র প্রচার বাঞ্ছনীয়। কারণ তাহাতে জনসাধারণের ইতিহাস পাঠের স্পৃহা বর্ধিত হইবে বলিয়া আমরা মনে করি।

বইএর প্রচ্ছদপট মনোরম। ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর।

**WHY PROHIBITION?—Dr. H. C. Mookerjee, M.A., Ph.D., Vice-President, Constituent Assembly of India. Published by The Book House, 15, College Square, Calcutta. Pp 221, Price Rs. 4 only.**

মাদকদ্রব্য বর্জনের কর্মতালিকা কংগ্রেস বহুদিন হইতে লইয়াছে এবং কোন কোন প্রাদেশিক সরকার এ বিষয়ে কাজ শুরু করিয়াছেন। আশা করা যায়, কয়েক বৎসরের মধ্যেই মদ্যপান বা বিক্রয় আইনতঃ নিষিদ্ধ হইবে। কিন্তু এই বিস্তৃত সামাজিক ব্যাধি শুধু আইনে একেবারে দেশ হইতে উঠিয়া যাইবে না। প্রথমত, কর্মক্লান্ত দিবসের শেষে শোচনীয় দারিদ্র্য ও দুঃখের অবসাদ ভুলিতে শ্রমিকেরা সুস্থ জীবনধারণের ব্যবস্থা ও উপকরণ যত দিন না পান, তত দিন গোপনে প্রস্তুত সাংঘাতিক বিষ পান করিতে থাকিবেন। সেজন্যই মহাত্মাজী বলিয়াছিলেন যে, একদিনের জন্য ভারতবর্ষের ডিক্টেটর হইলে তিনি মাদকদ্রব্যের ব্যবহার বন্ধ করিয়া দিবেন, তালগাছগুলি কাটিয়া দিবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মিলমালিকদের বাধ্য করিবেন, যাহাতে শ্রমিকের জন্য স্বাস্থ্যকর বাসের ও নির্মল আনন্দ উপভোগের ব্যবস্থা হয়। দ্বিতীয়ত, দেখা গিয়াছে যে, আইন করিয়া মদ্যপান বন্ধ করিলেও দেশের লোক অবৈধ উপায়ে অতি নিকৃষ্ট মদ্য প্রস্তুত করিয়া পান করে। সুতরাং যত দিন দেশের লোকদের মাদক দ্রব্য ব্যবহারের বিষময় ফল সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন না করিতে পারা যায়, ততদিন সরকারী প্রচেষ্টা সফল হইবে না। ডাঃ মুখার্জি দেশবাসীকে সেই শিক্ষা দিবার অভিলাষেই এই পুস্তক লিখিয়াছেন।

বইখানি লিখিবার উৎসাহ গ্রন্থকার প্রথমে স্বর্গত মহাদেব দেশাইএর নিকট পাইয়াছিলেন। ১৯৪১ সালে আহমদাবাদে এক সপ্তাহ মহাদেব দেশাইএর সঙ্গে থাকাকালীন তিনি মদ্যপানের অপকারিতা সম্পর্কে শ্রমিক ও ছাত্রের বিরাট সমাবেশে বক্তৃতা দেন। সেই সময় মহাদেবজীর সঙ্গে কথাবার্তায় বইখানি লিখিতে তিনি উৎসাহ পান। য়ুরোপে মদ্যপানের বিষময় ফল লইয়া বহু সুধী ও সমাজসেবক গবেষণা করিয়াছেন এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে মদ্যপানের অপকারিতা বুঝাইয়াছেন। গ্রন্থকার শিক্ষাগুরু ও বিশিষ্ট খৃষ্টান হইলেও শুধু নৈতিক প্রশ্ন লইয়া আলোচনা করেন নাই। বস্তুত তিনি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পথ ধরিয়াছেন। মদ্যপানের মাত্রাধিক্য করিয়া নিজের সর্বনাশ হয়, মাদকদ্রব্য বর্জনের এই যুক্তির উপর তিনি জোর দেন নাই। মদ্য প্রস্তুত প্রণালী হইতে আরম্ভ করিয়া মদ্যপানে স্বাস্থ্য, মন ও আয়ুর উপর কি কি প্রতিক্রিয়া হয়, তাহাদের বিশদ বিবরণ তিনি দিয়াছেন। পুস্তকের নানা স্থানে তিনি পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের গবেষণা ও সিদ্ধান্ত উল্লেখ করিয়াছেন।

অনেকের ধারণা আছে যে, বিদেশী বীয়ার বা দেশী পচাই মদে শতকরা ৫ হইতে ১০ ভাগ মাদকদ্রব্য (অ্যালকোহল) থাকাতে নেশা হয় না বা শরীরের ক্ষতি করে না। কিন্তু বস্তুত যতটা বীয়ার বা পচাই খাওয়া হয়, তাহাতে হুইস্কীর সমান কাজ করে। অল্প বীয়ার বা পচাইতেও স্বাস্থ্যের হানি হয়। দেশী তাড়ি ভারতবর্ষের বহু স্থানে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত হয়, কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ধুতুরা বীজ গুঁড়া করিয়া রসে মেশান হয়। ধুতুরা কি সাংঘাতিক বিষ, ভারতবর্ষের সকলেই জানেন। আধুনিক পদ্ধতিতে যে মদ প্রস্তুত হয়, তাহাতে ফলের রস প্রায় থাকেই না; মদ তৈয়ারীর বহু দেশ ফ্রান্স ও জার্মানিতে ইহা দেখা গিয়াছে। অনেকে ভাবেন, কোন কোন মাদকদ্রব্য ঔষধের কাজ করে! বিশেষত অল্প পান করিলে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়। লণ্ডনের টাইমস্ পত্রিকার মতে মাদকদ্রব্য স্বাস্থ্যের সহায় -- এই বিশ্বাস বৈজ্ঞানিক তুলাদণ্ডে ডাইনী দিয়ে অসুখ সারাবার মত অসম্ভব। লিভারপুল য়ুনিভার্সিটির অধ্যাপক ডাঃ ডন ও বিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ রিচার্ড ক্যাবটের মতে, কোন মাদকদ্রব্যে শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়ার (হার্ট) উপকার হয় না। মাদকদ্রব্যে খাদ্য হজম করিতেও কোন সাহায্য করে না; উপরন্তু হজমশক্তি নষ্ট করে।

মাদকদ্রব্য স্নায়ুমণ্ডলী হইতে আরম্ভ করিয়া শরীরের রক্তকোষ ও প্রধান যন্ত্রগুলিতে আঘাত করে ও ভাঙন ধরায়। ইহার প্রতিক্রিয়া মেরুদণ্ডের উপর এমন প্রবল হয় যে, ডাঃ সি সি উইকসের মতে অনেক ক্ষয়কারক অসুখ মাদকদ্রব্য ব্যবহারে মেরুদণ্ডের উপর প্রভাব হওয়ার জন্য হয়। অনিদ্রা, পক্ষাঘাত, মানসিক বিকার প্রভৃতি রোগ এই মদ্যপান হইতে জন্মে। ক্ষয়রোগের (টিউবারকিউলোসিস) ইহা একটি বড় ক্ষেত্র। ফ্রান্সে ডাঃ ব্রুয়ারদের মতে, মাদকদ্রব্য ক্ষয়রোগ আক্রমণের বড় সহায়। অধিক মদ্যপায়ী ক্ষয়রোগের বিষকে রুখিতে পারে না। ক্ষয়রোগে আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে মদ্যপায়িগণের মৃত্যুহার শতকরা ২১·৮ এবং মদ্যবিরোধীদের মৃত্যুহার শতকরা ৯·৯। যাহারা সুস্থ হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মদ্যপায়ীদের সংখ্যা শতকরা ২৯·৫ এবং অন্যান্যের সংখ্যা শতকরা ৪৯·২। ক্ষয়রোগ সম্পর্কে আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে ১৯০৫ সালে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় যে, ক্ষয়রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইলে মদ্যপানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আগে চালাইতে হইবে। অধিক মদ্যপায়ীদের সন্তানদের মধ্যে ক্ষয়রোগের বীজাণু সহজে বাসা বাঁধে। ক্যানসার রোগ কিরূপে মাদকদ্রব্যে বাড়িতে পারে, তাহার গবেষণায় দেখা গিয়াছে যে, যে-লোক রোজ বীয়ার পান করেন, তাঁহাকে ক্যানসার সহজে ধরিতে পারে। স্যার পিয়ার্স গোল্ড বলেন, মাদকদ্রব্যে শরীরের এত হানি হয় যে, ক্ষয় হইতে হইতে ক্যানসার সহজে আক্রমণ করিতে পারে। অধ্যাপক জে বি এস হ্যালডেন অনেক অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন যে, মাদকদ্রব্য বিক্রয়কারীদের মধ্যে (সরাইওয়ালা, মদের ভাঁটি ও মদ চোলাইএ কর্মী ও হোটেলে মদ বিক্রয়কারীদের মধ্যে) মুখে গলায়, তালুতে ক্যানসার হইয়া বহু লোক মারা গিয়াছেন এবং ৬৫ বৎসরের নীচে মৃত্যুহারের সংখ্যা অন্যান্যের দ্বিগুণ।

মদ্যপানে বুদ্ধির জড়তা আসে, এ বিষয় অধিক তর্কের বোধ হয় প্রয়োজন নাই। ইতালীতে ছেলে-বুড়ো অনেকেই মদ্যপান করেন। সেখানে দেখা গিয়াছে, মদ্যপায়ী ছাত্রেরা শতকরা ৩০ জন পড়া-শোনায় খারাপ এবং মদ্যবিরোধীদের মধ্যে শতকরা ৩ জন ভাল ফললাভ করে নাই।

আয়ুর উপর ইহার কি প্রতিক্রিয়া দেখা যাক। ত্রিশ বছর পার হইবার পর মদ্য ব্যবসায়ের কর্মীরা অন্যান্য ক্ষেত্রে কর্মীদের অপেক্ষা ১৫ বছর কম বাঁচেন। জীবনবীমার প্রস্তাব গ্রহণ সম্পর্কে স্যার ক্লিফোর্ড আলবার্ট এম ডি, এম আর সি পি এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, মদ্য ব্যবসায়ে রত ব্যক্তিরও স্বাস্থ্য সাধারণ পরীক্ষায় খুব ভাল হইলেও বীমার হার শতকরা ৫০ ভাগ বাড়াইয়া দেওয়া উচিত এবং কোম্পানী যদি আরও সাবধান হইতে চায়, তাহা হইলে জীবনবীমার প্রস্তাব সরাসরি অগ্রাহ্য করা উচিত।

গ্রন্থকার সব দৃষ্টান্তগুলি য়ুরোপ হইতে লইয়াছেন। ভারতবর্ষে সাধারণত স্বাস্থ্য ও আয়ু এত স্বল্প যে, মদ্যপানের বিষময় ফল আরও অধিক হইবে, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই।

মদ্যপায়ীরা কত অর্থ ব্যয় করে, তাহার হিসাবে দেখা যায়, ইংলণ্ডে ১৯৩৮ সালে ২৫ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড এবং ১৯৪৫ সালে ৬৮ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় করিয়াছে এবং আমেরিকার লোকেরা ১৯৩৪ সালে দুই শত কোটি ত্রিশ লক্ষ ডলার এবং ১৯৪৬ সালে আট শত সাতাত্তর কোটি

উজার ব্যয় করে। ভারতবর্ষে ১৯০০ সালে মাত্র ৬ কোটি টাকা মাদকদ্রব্যে সরকারের আয় হয় এবং ১৯৩৪ সালে তাহা বাড়িয়া ১০০ কোটি টাকা হয়। ভারতবর্ষে মাদকদ্রব্য বিক্রয় মারফৎ গবর্ণমেণ্টের আয় বৃদ্ধির এক ষড়যন্ত্র বহুদিন হইতে চলিয়া আসিয়াছে। ইহার ফলে আজ মাদকদ্রব্যের কর শতকরা ৭৫ হইতে ৮০ ভাগ পচাই ও তাড়ি-পায়ীরা দেয়। তাহারা নিজেরা ভাল করিয়া খাইতে পারিতে পায় না; অথচ অযথা অর্থ নষ্ট করে; জীবনের হানি করে।

মাদকদ্রব্য বর্জনের বিরোধিতা সাধারণত ধনিক শ্রেণীর লোকেরা করে। রাষ্ট্রের কর পচাই ও তাড়ি বন্ধ হইলে তাহাদের উপর পড়িবে। সুতরাং বাঙলা দেশের এসেম্বলীতে হিন্দু-মুসলমান ধনী, য়ুরোপীয় ও এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানরা মাদকদ্রব্য বর্জনের বিরোধিতা করেন। সাধারণ লোক মাদকদ্রব্য বর্জনের জন্য আগ্রহশীল। চট্টগ্রামের পার্বত্য অধিবাসীরা মাদকদ্রব্য বর্জনের জন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট দরখাস্ত করিয়াছিলেন, বীরভূমের সাঁওতালগণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। পাঞ্জাবে কাসুর গ্রামের ৮,৮১৮ জনের মধ্যে দুইজন বিরোধিতা করিয়াছিলেন; আর সকলেই বর্জনের পক্ষে ছিলেন। তৎকালীন বাঙলা বা পাঞ্জাব কংগ্রেসের প্রভাবাধীনে ছিল না।

ভারতে মদ্যপান বর্জনের ফলাফল হিসাব করিয়া জানা যায় সর্বত্র গৃহিণী ও শিশুরা আনন্দিত হইয়াছে। বিহারে ছাপরা জিলায়, মাদ্রাজে সালেজ ও চিত্তুরের ম্যাজিস্ট্রেটগণ এবং যুক্তপ্রদেশের এটা ও মৈনপুরীর কর্তারা বলেন ঘরে ঘরে বিবাদ মারপিট বন্ধ হইয়া শান্তি আসিয়াছে এবং সাধারণ লোকের জীবনযাত্রা উন্নত হইয়াছে।

মাদকদ্রব্য হইতে কর আদায় বিষ বিক্রয় ও খাওয়াইয়া কর আদায়ের মত পাপ। সুতরাং করের প্রশ্ন না তোলাই ভাল। আর আইন করিয়া মাদকদ্রব্য একেবারে বর্জন হইবে না সত্য। কিন্তু চুরি ডাকাতি হয় বলিয়া চুরি ডাকাতির অপরাধ আইনে শাস্তিদায়ক হইবে না, ইহা নিশ্চয়ই কেহ বলিবেন না। আমেরিকায় মাদকদ্রব্য বর্জন আইন করিয়া বন্ধ করিয়া শতকরা ৬০ ভাগ ফল পাওয়া গিয়াছিল এবং সামাজিক জীবনযাত্রা আরও সুস্থ হইয়াছিল। ভারতবর্ষের কৃষ্টি ও ঐতিহ্যে ইহা নিশ্চয়ই আরও বেশী সাফল্য লাভ করিবে এবং দেশবাসী ইহার কুফল জানিতে পারিলে অবৈধ ব্যবসায় বড় লোকদের ক্ষমা করিবে না।

কংগ্রেসী সরকার দেশ হইতে মাদকদ্রব্য বর্জনের জন্য যতটা সক্রিয় হওয়া প্রয়োজন এখনও ততটা সক্রিয় হয় নাই। কিন্তু ইহা শুধু গভর্নমেণ্টের কাজ নয়। সমাজসেবীদেরও কর্তব্য আছে। ডাঃ মুখার্জির এই পুস্তকখানি নানা তথ্য ও যুক্তিতে পূর্ণ হইয়া সমাজসেবী ও দেশের হিতাকাঙ্ক্ষী প্রত্যেক কর্মীর নিকট খুব মূল্যবান হইবে। যাঁহারা মদ্য স্পর্শ করেন না তাঁহারাও ইহা পড়িয়া মদ্যপানের বিষময় ফল সম্বন্ধে দেশবাসীদের শিক্ষা দিতে পারিবেন। গভর্নমেণ্ট এই পুস্তিকার সাহায্যে প্রচারকার্যে বহু সহায়তা পাইবেন। এজন্য পুস্তকখানির বহুল প্রচার আবশ্যক। ইহার অনুবাদ অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় হওয়া প্রয়োজন।

দাম হিসাবে পুস্তকখানির ছাপা, বাঁধাই ও মলাট আরও সুন্দর হওয়া উচিত। ইহার একটি সুলভ সংস্করণ প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

—গুণদা মজুমদার।

**তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ সংগ্রাম**—শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। মূল্য—১৷৷০। প্রকাশক—শ্রীসমর লাহিড়ী, ১৬৯, রসা রোড, কলিকাতা।

পনেরোই আগস্ট ১৯৪৭ সালের পর হইতে জাতীয় আন্দোলনমূলক পুস্তিকা প্রচুর প্রকাশিত হইয়াছে। বাধা-নিষেধের গণ্ডী ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় এই ধরণের পুস্তিকা অবরুদ্ধ স্রোতের মতন ফেনিল উচ্ছ্বাসে ও সগর্জনে সমতলভূমিতে নানা ধারায় নামিয়া আসিয়াছে। কতকগুলি পুস্তিকা দেশের বিপ্লবাত্মক কার্যধারার সহিত জনগণের পরিচয় ঘটাইবার ছদ্মবেশে অনেকক্ষেত্রেই ব্যক্তিবিশেষ বা দলবিশেষের আত্মপ্রচার কাহিনীতে পর্যবসিত হইতেছে। সুখের বিষয়, কয়েকটি পুস্তিকা এই দলগত ও ব্যক্তিগত অপপ্রচারকে অতিক্রম করিয়া যথার্থ প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে স্থায়ী আসন লাভে সমর্থ হইয়াছে। ব্যক্তি বা দলকে উহ্য রাখিয়া প্রকৃত ঘটনাকে প্রাধান্য দিয়া যে কয়খানি পুস্তিকা রচিত হইয়াছে, নরেনবাবুর 'তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ সংগ্রাম' তাহাদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে, ইহা সুনিশ্চিত। তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ তদানীন্তন অত্যাচারী মোহন্তের উচ্ছৃঙ্খলতার বিরুদ্ধে বাঙলার বিপ্লবী যুবকগণের প্রথম অহিংস সংগ্রাম। দেশবন্ধুর অনুরোধে বিপ্লবী যুবকেরা এই অনাচারের উচ্ছেদ সাধনে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছিলেন, এই সত্যাগ্রহের ইহাই ছিলো বিশেষত্ব। সত্যাগ্রহের কাহিনীটি নরেনবাবু অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

প্রামাণ্য ঘটনা সম্বলিত ও বিপ্লবী নেতা ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় ও হেমচন্দ্র ঘোষ লিখিত দুইটি ভূমিকাযুক্ত এই পুস্তিকাটির বহুল প্রচার কামনা করি।

**চট্টগ্রামের ইতিহাস**—নবাবী আমলঃ—প্রণেতা মাহবুবউল আলম। ওরিয়েণ্ট পাবলিশার্স, ১৩, স্টেশন রোড, ঢাকা। বোর্ডে বাঁধাই। মূল্য বারো আনা।

**চট্টগ্রামের ইতিহাস**—ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলঃ—প্রণেতা মাহবুবউল আলম। তাজ লাইব্রেরী, ৪৫।২, লোয়ার রেঞ্জ, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

**মফিজন্**—প্রণেতা মাহবুবউল আলম। ওরিয়েণ্ট পাবলিশার্স, ১৩, স্টেশন রোড, ঢাকা। মূল্য আট আনা।

জনাব মাহবুবউল আলম মুসলমান সাহিত্যিকগণের অগ্রগণ্য। তিনি মোমেনের জবানবন্দী প্রভৃতি বই লিখিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। তাঁহার ভাষা যেমন স্বচ্ছ ও জোরালো, তেমনি চাপা হাস্যরসে সমুজ্জ্বল। তাঁহার রচনার পরিমাণ অল্প হইলেও যাহা কিছু তিনি লিখিয়াছেন তাহা সারবান হইয়া উঠিয়াছে। এইজন্য সার্থকনামা সাহিত্যিকগণের মধ্যে তাঁহাকে অনায়াসে স্থান দেওয়া যাইতে পারে। তাঁহার রচিত উল্লিখিত তিনখানা বই আমরা আনন্দ ও কৌতূহলের সঙ্গে পাঠ করিয়াছি। প্রথমোক্ত দুইখানা গ্রন্থে চট্টগ্রামের নবাবী আমলের এবং কোম্পানীর আমলের ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে। বই দুটির উপাদান লেখকের নিজস্ব শ্রম ও গবেষণা লব্ধ। এই ঐতিহাসিক তথ্যগুলি অন্যান্য ইতিহাসে পাওয়া যাইবে না। এইজন্য এই দুটি বই আকারে ক্ষুদ্র হইলেও ইতিহাসের সম্পদ বৃদ্ধি করিবে।

'মফিজন্' একটি গল্প পুস্তিকা। মুসলিম পরিবারের একটি চিত্তাকর্ষক কাহিনী গল্পটিতে চিত্রিত হইয়াছে। ৬৫—৬০—৬১।৪৯

**সন্দীপন পাঠশালা**—শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য চারি টাকা।

একজন শিক্ষাব্রতীর ত্যাগ ও আদর্শকে পটভূমিকা করিয়া এই উপন্যাসটি রচিত হইয়াছে। উপন্যাসের নায়ক চাষীর ছেলে হইয়াও নানা বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়া শিক্ষালাভ করে এবং শিক্ষাদানকে জীবনের ব্রতরূপে অবলম্বন করে। পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতা নানাভাবে বারবার তাহার আশার স্বপ্নকে পর্যুদস্ত করিয়া দেয়; কিন্তু সে কাহারও নিকট পরাজয় না মানিয়া স্বীয় লক্ষ্য পথে অটল থাকে। তাহার এই অশ্রুসিক্ত কাহিনীটি পাঠক মাত্রেরই মর্ম স্পর্শ করিবে।

**আগস্ট—১৯৪২**—শ্রীমনোজ বসু প্রণীত। বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা। দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য চারি টাকা।

শ্রীমনোজ বসু প্রবীণ কথাসাহিত্যিক। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের পটভূমিকায় লেখা তাঁহার কয়েকখানি উপন্যাস পাঠকদের নিকট সমাদৃত হইয়াছে। আলোচ্য উপন্যাসটি আগস্ট আন্দোলন অবলম্বন করিয়া লিখিত। বইটি রাজনৈতিক ভিত্তিতে রচিত। কাজেই উহার পাত্র-পাত্রিগণও রাজনৈতিক, বিশেষ করিয়া আগস্ট—৪২ এর প্রলয়ঙ্কর বৈপ্লবিক ভাবধারা ও কার্যকলাপের মধ্য দিয়া রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে। লেখকের জোরালো গল্প বলার ক্ষমতা বইটিতে সর্বত্র সুস্পষ্ট। তাঁহার অন্যান্য রাজনৈতিক উপন্যাসের ন্যায় এইটিও যথাযোগ্য সমাদর লাভ করিবে সন্দেহ নাই।

**শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা**—শ্রীঅসিতকুমার হালদার কর্তৃক পদ্যছন্দে অনুবাদিত। প্রকাশক—দি ইম্পিরিয়াল আর্ট কটেজ, ১-এ, টেগোর ক্যাসেল স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

শিল্পী শ্রীযুত অসিতকুমার হালদার অনূদিত গীতার কাব্যানুবাদ পাঠ করিয়া প্রীত হইলাম। মূলের সঙ্গে যথাযথ মিল রাখিয়া প্রাঞ্জল ভাষায় তিনি সমগ্র গীতার অনুবাদ করিয়াছেন। গ্রন্থের শেষাংশে সমগ্র গীতার মূল শ্লোকগুলি দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থ পকেট আকারের হওয়ায় সর্বদা কাছে রাখার সুবিধা হইবে।

**চতুরঙ্গ** (কার্তিক—পৌষ, ১৩৫৫) **সম্পাদকঃ** হুমায়ুন কবীর। প্রতি সংখ্যা ১৲ টাকা।

ত্রৈমাসিক চতুরঙ্গ পত্রিকার আলোচ্য সংখ্যাটি গল্প, প্রবন্ধ, কবিতায় সমৃদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রেমেন্দ্র মিত্রর ধারাবাহিক উপন্যাস, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন-কাহিনী, সৈয়দ মুজতবা আলীর কবিতা এবং নরেন্দ্রনাথ মিত্রর গল্প এই সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ। যুদ্ধকালীন ও তৎপরবর্তী বার্লিন শহরের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় লইয়া পল্ ম্যাটকের 'বার্লিন' শীর্ষক রচনার অনুবাদ পাঠকদের চিন্তার খোরাক দিবে।

**প্রাথমিক কৃষিপাঠ**—ডক্টর যামিনীরঞ্জন মজুমদার। প্রবর্তক পাবলিশার্স, ৬১, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। তৃতীয় সংস্করণ; পৃঃ ৬৮। দাম দশ আনা।

মাটির কথা, বিভিন্ন মাটির গুণ, গাছের কথা, সারের কথা, বিভিন্ন শস্যের বিবরণ ও ফলন প্রণালী ইত্যাদি বহু অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এরূপ গ্রন্থ গৃহস্থদের বিশেষ উপকারে লাগিবে বলিয়া মনে হয়।

স্বাস্থ্য প্রসঙ্গ

# নব আবিষ্কৃত আহার্য

মানুষের পক্ষে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে প্রধানত যে তিনটি জিনিস দরকার, তাহা হইতেছে আহার, বাসস্থান ও বস্ত্র। কিন্তু যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে এই তিনটি দ্রব্যই দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ইহার মধ্যে আহার্যবস্তুই মানুষের সর্বাধিক প্রয়োজন। কারণ, রৌদ্র-বৃষ্টিতে ঘাটে-মাঠে পড়িয়া থাকা চলে, বস্ত্রের অভাবে প্রকৃতির শিশু হইয়া বাঁচিয়া থাকা চলে, কিন্তু শূন্য উদর নিয়া বাঁচা চলে না। তাই জগত জুড়িয়া আজ আহারের জন্য এত হাহাকার।

সাধারণত মানুষকে সুস্থ ও কার্যক্ষম থাকিতে হইলে গড়পড়তা দৈনিক ২,২৫০ ক্যালরি খাদ্য প্রয়োজন। মানুষের ইঞ্জিনটাকে চালু রাখিবার জন্য ইহাই হইতেছে সর্বনিম্ন জ্বালানি। কিন্তু কার্যত ২২৫০ ক্যালরি তো দূরের কথা, জগতের জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশী যা খায়, তা খাওয়া বলা চলে না। এশিয়া, আমেরিকা ও আফ্রিকা এবং কেন্দ্রীয় আমেরিকার জনসাধারণ দৈনিক যা খায়, তার উত্তাপ ২,২৫০ ক্যালরির কম। জগতের অন্য পঞ্চমাংশে লোক দৈনিক ২,২৫০ হইতে ২৭৫০ ক্যালরি খাদ্য গ্রহণ করে এবং জীবিত ব্যক্তিদের এক-তৃতীয়াংশ দৈনিক ২৭৫০ কালরির অধিক খাদ্য গ্রহণ করিতে পারে।

কিন্তু ইহাই সব নহে। জনসংখ্যার যে ভাগ ক্যালরির মূল্যে খাদ্য গ্রহণ করিতে পারে, তাহাদের আহার্যেও পুষ্টিকর দ্রব্যের অভাব থাকে অত্যন্ত বেশী। জগতের সামান্যসংখ্যক লোকই পূর্ণ ক্যালরির আহার্য গ্রহণ করিতে পায়, আর পায় দুধ, চর্বি এবং স্বাস্থ্যরক্ষামূলক ভিটামিন। সুতরাং অন্য অংশের যে অবস্থা, তা সহজেই অনুমেয়।

মানুষের প্রধান খাদ্যশস্যের সবটাই উৎপন্ন হয় প্রায় জমি হইতে। জগতের সমস্ত জনসংখ্যাকে ভালভাবে খাওয়াইতে হইলে বর্তমানে জমি হইতে যা উৎপন্ন হয়, তার দ্বিগুণ উৎপন্ন করিতে হইবে। কিন্তু ক্ষুধার্ত কোটি কোটি জনসংখ্যাকে আহার্য জোগাইতে পারে বিশ্বে তেমনি উর্বর জমির আজ একান্ত অভাব। অনাগত বংশধরদের কথা তো ওঠেই না। অন্নাভাবে তাহাদের মৃত্যু রাত্রির পর দিনের মতই সুনিশ্চিত। কারণ, বিশ্বের বর্তমান জনসংখ্যার যদি সমান আহার্য গ্রহণের অধিকার থাকিত, তবে প্রত্যেকের চাহিদা মিটাইবার মত জনপ্রতি মাত্র তিন বিঘা আধ কাঠার চেয়েও কম উর্বর জমি পাওয়া যাইত। ইহাও সম্ভব হয় নাই। জমির উপর যে চাপ পড়িতেছে, তাহাতে জমির উর্বরা শক্তি দ্রুত হ্রাস পাইতেছে। সুতরাং জনসংখ্যা বৃদ্ধির সহিত ভূমির উর্বরা-শক্তি তাল রাখিয়া চলিতে পারিবে কিনা, তাহা খুবই সন্দেহজনক।

খাদ্যসংকট কত শোচনীয় হইয়াছে, জাপান ও ভারতের খাদ্যাবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করিলে তাহা পরিস্ফুট হইবে। ক্ষুদ্র জাপানের জনসংখ্যা হইতেছে ৮ কোটি। জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক ১৫০ লক্ষ একর জমি চাষ করে। জমি হইতে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহাতে জাপানের জনসংখ্যার পাঁচভাগের ৪ ভাগের মাত্র ক্ষুন্নিবৃত্তি হইতে পারে।

ভারতের অবস্থা আরও শোচনীয়। এখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে আশংকাজনকরূপে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সঙ্গে পা ফেলিয়া চলিতে পারে কৃষিজাত উৎপাদনের দিক হইতে তাহার কোন সম্ভাবনা নাই। অথচ ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সহিত কৃষিজাত দ্রব্যের সমতা স্থাপিত না হইলে জীবনের মান উন্নততর হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। কৃষিবিদদের মতে আগামী ৫০ বৎসরে ভারতের জমি হইতে উৎপাদনের হার আরও শতকরা পঞ্চাশভাগ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, কিন্তু এই সময়ের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি যে দ্রুততর হইবে, এ সংবাদ উহাদের অজানা নয়।

ইহাই যদি অবস্থা হয়, তবে কি হইবে? পৃথিবীর কোন দেশ কি বুভুক্ষু মানুষকে খাওয়াইবার জন্য অঢেল খাদ্যশস্য রপ্তানি করিতে পারিবে? অসম্ভব। কোন দেশই, সে যত উদ্বৃত্ত দেশই হোক না কেন, ঘাটতি দেশে অফুরন্ত খাদ্যশস্য চালান করিতে পারে না। কারণ, তারও ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য খাদ্য মজুত রাখিতে হইবে। তবে কি হইবে?

এক সময় ধারণা করা গিয়াছিল এবং আশাও করা গিয়াছিল যে, কতকগুলি প্রাণহীন রসায়নের সংযোগে খাদ্য-বটিকা প্রস্তুত করা যাইবে, যাহা খাইলে আমাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি হইবে। কিন্তু তাহা কার্যকরী হয় নাই। টমেটো, বীন প্রভৃতি ভূমিজাত আনাজকে রসায়ন-মিশ্রিত জলে উৎপন্ন করার চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু উৎপাদন ব্যয় অধিক হওয়ায় ঐ প্রচেষ্টা বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সমুদ্র হইতে নানাজাতীয় খাদ্যদ্রব্য আরও আহরণ করা যায় কিনা তাহারও চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু তাহাও ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। অথচ খাদ্য-সমস্যা ক্রমেই তীব্রতর হইয়া উঠিতেছে।

এই দারুণ সমস্যা সমাধানে আগাইয়া আসিয়াছে বিজ্ঞান। খাদ্য উৎপাদন ব্যাপারে এমন কিছু বৈপ্লবিক তথ্য সে আবিষ্কার করিয়াছে, যাহার ফলে পৃথিবী হইতে বুভুক্ষাকে চিরতরে বিদায় দিবার কল্পনা আর অলীক বলিয়া মনে হইবে না। চিরদুর্ভিক্ষ-পীড়িত ভারতবর্ষে এই মনুষ্য-খাদ্য-উৎপাদন ব্যবস্থা দেবতার আশীর্বাদস্বরূপ হইবে।

ডাঃ রিচার্ড এল মেয়ার নামক জনৈক নবীন রসায়নবিৎ বিজ্ঞান কিভাবে খাদ্য-সমস্যা সমাধান করিতে পারে, সে সম্পর্কে তথ্য-সংগ্রহ করিতেছিলেন। বৈজ্ঞানিক উপায়ে যে খাদ্য উৎপাদন সম্ভব, সে সম্পর্কে বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়া তিনি একটি রিপোর্ট প্রস্তুত করিয়াছেন। ঐ রিপোর্টে তিনি বলিয়াছেন যে, এতদিন খাদ্য সম্পর্কে জমির উপর একান্তভাবে নির্ভর করিতে হইত। বিজ্ঞান আমাদের এই বন্ধন হইতে মুক্তিদান করিয়াছে। জমির সাহায্য ছাড়াও ফ্যাক্টরীতে যে পাইকারীভাবে খাদ্য উৎপাদন করা চলে, বিজ্ঞানীরা হাতে-কলমে তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। কোন কোন দেশে সত্যি সত্যি অভূমিজ খাদ্য প্রস্তুত হইয়াছে। খাদ্য-প্রস্তুতের অভিনব পন্থার আবিষ্কারের ফলে যে ভোগ্যবস্তু প্রস্তুত হইবে, তাহাতে বিশ্বের বর্তমান জনসংখ্যার আরও অর্ধগুণ অধিবাসীকে আহার্য সরবরাহ করা সহজতর হইবে। স্বল্পব্যয়ে খাদ্য প্রস্তুত ও সরবরাহ করা যাইবে। অর্ধভুক্ত কোটি কোটি জনসংখ্যার জন্য সুপুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ সম্ভবপর হইবে। ফ্যাক্টরীতে উৎপন্ন খাদ্যের স্বাদ আমাদের বর্তমান আহার্যের মতই হইবে। তা'ছাড়া রোদ-ঝড়-জল বৃষ্টিতে যে লক্ষ লক্ষ লোক পরিশ্রম করে, তাহাদের পরিশ্রম লাঘব করা সম্ভবপর হইবে।

এখন প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক যে, যে-খাদ্য আমাদের এতদিনের দুশ্চিন্তার অবসান করিয়া লক্ষ লক্ষ নিরন্ন অধিবাসীকে আসন্ন মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিবার আশা দিতেছে, তাহা কি এবং কি ভাবেই বা তাহা প্রস্তুত হইতেছে।

এই সম্পর্কে ডাঃ মেয়ারের রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, খাদ্য-প্রস্তুতের জন্য বৈজ্ঞানিকগণ এতদিন এককোষ গুল্ম লইয়া যে গবেষণা চালাইতেছিলেন, তাহার ফলেই খাদ্য উৎপাদনের এই যুগান্তকারী পন্থা আবিষ্কার সম্ভব হইয়াছে। ঐ গুল্ম অতি ক্ষুদ্র। একমাত্র অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া তাহা দেখা যায় না। ঐ গুল্মের ('এলজে' জাতীয় শৈবাল) উপর যে গাঁজলা ওঠে, তাই হইতেছে নূতন 'খাদ্যশস্য'। বৈজ্ঞানিকরা পরীক্ষার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, সূর্যালোক, বাতাস, জল আর অতি সাধারণ কয়েকটি রসায়নের সংযোগে ইহাকে অতি উৎকৃষ্ট খাদ্যে পরিণত করা যাইতে পারে।

দশ বৎসর ধরিয়া জলের সেওলা বা ঐ জাতীয় গুল্ম হইতে মনুষ্যের উপযোগী খাদ্য প্রস্তুত সম্ভবপর কিনা তাহা লইয়া গবেষণা চলিতেছিল। কিন্তু বর্তমান গুল্মটি এত ক্ষুদ্র যে এতদিন পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয় নাই। কিন্তু পরে জলজ গুল্মাদিকে মনুষ্য খাদ্যরূপে ব্যবহার করা সম্ভবপর কিনা তাহা লইয়া গবেষণা করিতে করিতে ঐ অতি ক্ষুদ্র সমুদ্র শৈবালের প্রতি বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। অতি ক্ষুদ্র বৈদ্যুতিক কণা যেমন মহাশক্তিশালী 'আণবিক বোমার' জন্মদাতা ঐ শৈবালও তেমনি। তবে পার্থক্য হইতেছে একটি মানুষের ধ্বংসের জন্য সৃষ্ট অপরটি মানুষকে আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষার জন্য আবিষ্কৃত।

পূর্বেই বলিয়াছি, ঐ সবুজ গুল্ম জলে জন্মায়। উহারা দেখিতে অনেকটা স্যাওলার মত কিন্তু গোলাকৃতি। এগুলিকে বলে 'এলজা' বা শৈবাল। এইসব গুল্মের উপর যে গাঁজলা বা ফেনা ওঠে তাহাকেই কিছু রাসায়নিক সংযোগে মনুষ্য-খাদ্যের উপযোগী করা যায়। ইহাকে 'ইস্টের' সহিতও তুলনা করা যাইতে পারে। ইহাতে প্রচুর পরিমাণ থিয়ামিন, রিবোফ্লাভিন প্রভৃতি ভিটামিন আছে। মাত্র এক আউন্স ইস্টের মধ্য যে পরিমাণ প্রোটিন আছে তাহা পাইতে হইলে ৫ আউন্স ডিম, তিন আউন্স ভেড়ার মাংস, ষোল আউন্স দুধ ও চার আউন্স গম খাইতে হইবে।

এই নূতন খাদ্যদ্রব্যটি ইতিমধ্যেই বাজারে বিক্রীত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। জামাইকাতে যে ফ্যাক্টরী আছে তাহাতে এই খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন হইতেছে। পোর্টোরিকো, ভেনিজুয়েলা, আফ্রিকা এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জেও ঐ ধরণের ফ্যাক্টরী স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে। খাদ্যাভাবের দিনে ঐসব ফ্যাক্টরী যে দ্রুত উন্নতি হইবে তাহা একপ্রকার সুনিশ্চিত।

বর্তমানে বীট শর্করা ছাড়াও মাতগুড়, বার্লি, ভুট্টা, গম প্রভৃতি শ্বেতসার পদার্থ এবং ক্যালসিয়াম সুপারফসফেট, এমোনিয়াম সালফেট, এমোনিয়া ও সালফিউরিক এসিড প্রভৃতি রাসায়নিক ইস্ট প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হয়। অদূর ভবিষ্যতে ব্যাপকভাবে শৈবালের গাঁজলা হইতে ইস্ট প্রস্তুত হইবে। ইহার দাম হইবে অত্যন্ত শস্তা কিন্তু প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন ইত্যাদি থাকায় উপকারিতা হইবে সহস্রগুণ বেশী।

---

# অপহৃতা

**শ্রীঅমিয়জীবন মুখোপাধ্যায়**

আমারো সোনার প্রেম আমারো এ ভাঙা বুকে আছে
আমারে একটি ঘর দাও--
সে ঘরের খেলা নিয়ে রব আমি তোমারি তো কাছে
প্রিয়তম, মোরে তুমি নাও।
আজো তো অনেক ভাবি সেদিনের রাত--
কেন যে আমার বুকে ওরা এসে হানিল আঘাত!
আমি কিবা জানি তার বলো--
চোখে শুধু জল ছিলো--ওদের দেখি নি আমি চেয়ে!
সহসা কী জানি কী যে হ'লো--
অনেক আগুনে ওরা আমারে যে ফেলেছিল ছেয়ে!

চারিদিকে ছিলো হানাহানি--
শুনেছি রক্তের স্রোতে ধুয়ে ধুয়ে গিয়েছিল পথ
শুনেছি ধূলার পরে সব হাসি, সব গান ফেলেছিল টানি,'
শুনেছি ওদের রবে কেঁপেছিল নদী-পর্বত!
শুধু ঘৃণা, হিংসা ও দ্বেষ--
ওরা যে মানুষ ছিলো--সে মানুষ সহসা তো হ'ল নিঃশেষ--
অন্ধে, আগুনে আর মন-ভরা ক্রোধে
ওরা তো সহসা হ'ল কালো--
গলিত লাভার স্রোত--ধ্বংসেরে কেবা বলো রোধে--
মানুষ কি কোনও দিন মানুষেরে বেসেছিল ভালো--?

আগুন আমারো চারিপাশে--
হিংস্র-হাওয়ার বুকে আমি অসহায়,
আগুনের চোখে চেয়ে মোরে ঘিরে ওরা শুধু খল-খল হাসে--
রাতের আঁধার ঠেলে কোন্‌খানে নিয়ে চ'লে যায়!
কী যে ওরা ক'রেছিলো আমি কিবা জানি বলো তার--?
কোনো কথা শোনে নি তো, অনুনয় রাখে নি আমার--,
চাঁদ-তারা নিভেছিলো শুধু আকাশের
মেঘেরা থমকে ছিল লাজে,
জানি না তো কিছু বেশি এর--
তারপরে দেখিলাম আপনারে শুধু চির-রিক্তার সাজে!

এ বুক ভেঙেছে প্রিয়, তবু তো মরে নি ভালবাসা--
তবু তো সহসা লাগে ভালো--
তোমার সবল বাহু--তোমার মমতা-ভরা ভাষা
ওই তব মুখ-ভরা আলো!
জীবন ঘুমায়ে ছিল সেদিনের ব্যথা, অপমানে
আবার জাগার পাখী কিছু যেন বলে গানে গানে--
আমার নয়ন-ভ'রে স্বপ্নেরা আজো ফেলে ছায়া,
আমারে বাঁধিতে দাও ঘর--
একটু মধুর আশা--আমারে একটু দাও মায়া--
একটু ঘুমের ঘোরে তুমি আজ এসো মনোহর!

# প্রাদেশিকতার প্রতিকার

**শ্রীপ্রমথনাথ বিশী**

ভারত রাষ্ট্রের সম্মুখে আজ অন্যতম গুরুতর সমস্যা প্রাদেশিকতা। প্রাদেশিকতার বিষে সমস্ত রাষ্ট্রদেহ আজ জর্জরিত হইয়াছে, বোধ করি কোন প্রদেশই এই বিষাক্ত আবহাওয়ার অতীত নয়। বিশেষ যে সমস্ত প্রদেশ পাশাপাশি অবস্থিত, তাহাদের অনেকেরই মধ্যে প্রাদেশিক বিদ্বেষ সংকটকর আকার লাভ করিয়াছে। বিহার, আসাম ও বাঙলাদেশের (বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের কথাই বলিতেছি) দৃষ্টান্ত লওয়া যাইতে পারে। এ সত্য আর অবিদিত নাই যে, এই তিন প্রদেশের মধ্যে প্রাদেশিক রেষারেষি একটা আশু সংকটের মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আসাম ও বিহারের পক্ষ হইতে বাঙলা ভাষার উপরে নানাপ্রকার সূক্ষ্ম ও স্থূল, গোপন ও প্রকাশ্য আক্রমণ চলিতেছে। উক্ত প্রদেশদ্বয় ভাষাকে লক্ষ্য করিয়াই আক্রমণ চালাইতেছে, বাঙালীকে লক্ষ্য করিয়া নয়। ইহা এক নূতন পন্থা। কিন্তু নূতন হইলেও ইহাতে বিশেষ অভিনবত্ব আছে। যেহেতু তাহারা জানে, সকলেই জানে যে, বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি বাঙালী মাত্রেরই একটা আন্তরিক দরদ আছে। তাহারা জানে যে, বাঙালীর পক্ষে বাঙলা ভাষা পরিত্যাগ করা সহজ নহে, বাঙলাভাষী বলিয়া গৌরব বর্জন করা আরও কঠিন। যে সমস্ত বাঙালী পুরুষানুক্রমে অন্য প্রদেশে বাস করিতেছেন, তাঁহারা আজও বাঙলা ভাষা পরিত্যাগ করেন নাই, বাস্তবক্ষেত্রে প্রবাস প্রদেশের ভাষা শিখিয়া লইলেও বাঙলাই এখন পর্যন্ত তাঁহাদের মাতৃভাষা, পারিবারিক প্রয়োজনে এবং প্রবাসী বাঙালী সমাজে—এখনও তাঁহারা বাঙলাই ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহার কারণ অনুধাবন এ প্রবন্ধের বিষয় নয়—তথাপি সংক্ষেপে ইহার কারণের উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথমত বর্তমান ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা বলিয়া, সাহিত্যিক সম্পদে সমৃদ্ধতম ভাষা বলিয়া বাঙালী একটা গৌরব অনুভব করে। দ্বিতীয়ত—হিন্দী-ভাষাভাষী বৃহৎ ভূখণ্ডের ভাষায় একটা আঞ্চলিক প্রভেদ থাকিলেও এক অঞ্চলের ভাষা হইতে ভাষান্তরে গমন বা ভাষান্তর গ্রহণ কঠিন নয়, অনেক সময়েই তাহা অজ্ঞাতসারে সিদ্ধ হয়—বাঙলা ভাষাভাষীর পক্ষে হিন্দী গ্রহণ বা হিন্দীর আঞ্চলিক রূপকে গ্রহণ তেমন সহজ নয়—অনেক সময়েই তাহা শিক্ষাসাধ্য ব্যাপার। এখন, প্রথম ও দ্বিতীয় কারণ দুইটি মিলিত হইয়া প্রবাসী বাঙালীর পক্ষে বাঙলার স্থলে সর্বতোভাবে হিন্দী গ্রহণ কঠিন করিয়া তুলিয়াছে। প্রয়োজনের খাতিরে তাঁহারা হিন্দী শিখিলেও বাঙলাকে ভুলিয়া যান নাই—আর এই বাঙলা ভাষাকে আশ্রয় করিয়াই তাঁহারা একপ্রকার নিজস্বতা এ পর্যন্ত রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। ভিন্ন প্রদেশে বাস করিয়াও এই নিজস্ব রক্ষাকে সে প্রদেশবাসীরা প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারিতেছে না। তাহাদের হয়তো সন্দেহ এই যে, কোন অদূরকালে প্রদেশের সীমা নির্ণয়ের প্রশ্ন উঠিলে প্রবাসী বাঙালী সমাজ বাঙলা দেশের অন্তর্ভুক্ত হইবার দাবী তুলিবেন। আসাম ও বিহারের বাঙালী সমাজ যদি সর্বতোভাবে হিন্দীভাষাকে গ্রহণ করিতেন, ঘরে এবং বাইরে, আপন ও পরের মধ্যে হিন্দী ভাষা ব্যবহার করিতেন, তবে তাঁহাদের বিরুদ্ধে এ সন্দেহ হয়তো দূরীভূত হইত। কিন্তু কার্যত তাহা ঘটে নাই, কেননা, প্রবাসী বাঙালী সমাজ অন্তত এ দুই প্রদেশের প্রবাসী বাঙালী সমাজ বাঙলা ভাষার গৌরব ত্যাগ করিতে অসম্মত। ইহা অস্বাভাবিক নহে। প্রবাসী বাঙালীরা আপনকার মধ্যে বাঙলা ভাষা বলিয়াই ক্ষান্ত নহেন, নিজেদের সন্তান সন্ততিগণকেও বাঙলা ভাষা শিক্ষা দিতে উদ্যত। আসামের সর্বত্র এবং বিহারের অনেক স্থলেই বাঙালী বিদ্যালয় আছে। এ সব বিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যম বাঙলা—এবং ইহাদের অনেকগুলিই মূলতঃ বাঙালী-গণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। এইসব বিদ্যালয়গুলিকে একদল বিহারী ও আসামবাসী সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিতেছেন—তাঁহাদের বোধ করি ধারণা যে—বাঙালীর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিবার এইগুলিই আসল যন্ত্র—আর বাঙালীত্ব লোপ না পাইলে নিজ নিজ প্রদেশের বর্তমান সীমা সম্বন্ধে তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছেন না—কাজেই এই বিদ্যালয়গুলি অর্থাৎ বিদ্যালয়ের বাঙলা ভাষার মাধ্যম একটা জটিল তর্কের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। আর আগেই বলিয়াছি বর্তমানে প্রাদেশিকতার বিষ ভাষাকে আশ্রয় করিয়াই আপন মূর্তি প্রকাশ করিতেছে।

এমন যে হইল তাহার হেতু উপলব্ধি কঠিন নয়। মানুষে মানুষে যতগুলি সংযোগের সূত্র আছে—তন্মধ্যে ভাষার সূত্রই সবচেয়ে দৃঢ়। সমান রক্ত ও সমান ধর্মও মানুষের যোগসূত্র—এক সময়ে এই যোগেই সমাজ বিধৃত হইত। ধর্ম যখন সমাজের প্রধান সক্রিয় শক্তি ছিল—তখন অর্থাৎ ইউরোপের মধ্যযুগে ক্যাথলিক ইউরোপ ধর্মের সূত্রেই আবদ্ধ ছিল। হোলি রোম্যান সাম্রাজ্য—এই সূত্রের বাস্তব মূর্তি। তখন সম্রাট ও পোপ উভয়ে মিলিয়া রাষ্ট্রদেহের দুই বাহুর মতো সমাজকে রক্ষা ও চালনা করিত। অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর জাতিরা রক্তের যোগটাকেই সবচেয়ে বড় মনে করে—এখনো করে, আগেও করিত—এবং যেসব জাতি এখন সভ্য, অনগ্রসরতার আমলে তাহারাও বড় মনে করিত। সুলভ ব্যতিক্রমগুলি ছাড়িয়া দিলে দেখা যাইবে মানুষের সভ্যতা সমরক্ত বোধ, সমধর্মবোধ ও সমভাষাবোধের ধাপে ধাপে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। নৃতত্ত্ব বিজ্ঞানের গবেষণায় সমরক্তবোধের থিওরি বিনষ্টপ্রায়—অন্ততঃ তাহা এমন সক্রিয় ও ব্যাপক নহে যে তাহাকে অবলম্বন করিয়া সমাজ সংহতি সাধিত হইতে পারে। হিটলারের 'Nordic Race'-এর থিওরী নাৎসী সমাজের বহির্ভূত কোন মনীষী বিশ্বাস করিত না। আবার অন্যদিকে বর্তমান মানব সমাজ সমগ্রভাবে ধর্মের আনুষ্ঠানিক দিকের প্রতি সন্দেহপরায়ণ। এদেশে ও অন্য-দেশে মধ্যযুগের আমলে আনুষ্ঠানিক ধর্মের উপরে মানুষ যে গুরুত্ব আরোপ করিত এখন আর তাহা করে না। ধর্ম এখন ব্যক্তিগত ব্যাপার—আগের ন্যায় আর সামাজিক ব্যাপার নহে। ধর্মের দ্বারা এখন মানুষ ভগবানের সহিত যোগসূত্র রক্ষা করিতে পারে—কিন্তু মানুষে মানুষে ধর্মের দ্বারা এখন আর যোগরক্ষা সম্ভব নহে। কিন্তু সেই প্রয়োজনে একটা যোগসূত্র তো চাই—নহিলে চলে কিভাবে? সাধারণভাবে মানবসমাজ এখন সম-সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী। তাহার বিশ্বাস সম-সংস্কৃতিই মানুষে মানুষে যোগ রক্ষা করিতে সক্ষম। সংস্কৃতির বাহন ভাষা—অতএব ভাষাই মানুষে মানুষে যোগ রক্ষা করিতে সক্ষম—তাই আজকার দিনে ভাষার যে অপরিসীম গুরুত্ব—এমন আর কখনো ছিল? যেকালে প্রায় সব জাতিই অল্প বিস্ত স্বতন্ত্রভাবে বাস করিত, তখন ভাষার এ গুরুত্বটি তখনকার দিনে ভাষা ছি প্রয়োজনের বাহন, সাহিত্যের বাহন—তদধি কিছু নয়। আজকার দিনে ভাষা একটি প্রচ রাজনৈতিক অস্ত্র। ইহার নূতন গুরুত্ব উপ লব্ধি করিলে ইহাকে Sherman Tanl মার্কিন Super fortress বিমান মনে ক যাইতে পারে এবং কালক্রমে ইহার গুরুত্ব যথ আরও বাড়িবে—তখন ইহাই হইয়া দাঁড়াই —পলিটিক্যাল এটম বোম। মোটের উপরে ব চলে যে, ভাষার বিস্ফোরণ ক্ষমতা অসীম-ইহাকে সংযত করিতে না পারিলে, ইহা প্রয়োজনের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র করিয়া না রাখি পারিলে ভাষাদ্বন্দ্বে নিরত প্রদেশগুলির অব হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে পরিণত ক ফেলিতে পারে।

অবশ্য একটা কথা বলিয়া রাখি—সমধর্মে ও সমরক্তের দ্বারা মানব সংহতি ঘটাইবার থিওরিতে মানুষে এখন যেমন আর বিশ্বাস করে না, তেমনি হয় তো কোন এক অনাগত-কালে সম-সংস্কৃতির গুরুত্বের উপরেও সে বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিবে। তখন আবার কোন্ সূত্রকে সে গ্রহণ করিবে, সেদিন কত দূরবর্তী, কোন্ কোন্ কার্যকারণের ফলে সমসংস্কৃতির উপরে বিশ্বাস তাহার দৃঢ় হইবে—এসব বিষয়ের আলোচনা চিত্তাকর্ষক হইলেও বর্তমান প্রবন্ধ তাহার ক্ষেত্র নয়। সংস্কৃতির বাহন স্বরূপ ভাষার উপরে নবারোপিত রাজনৈতিক প্রচণ্ড গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। আর সেই ভাষাকে অবলম্বন করিয়া যে প্রাদেশিকতার সূত্রপাত তাহার ভয়াবহ পরিণামের দিকেও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ ইহার অপর এক উদ্দেশ্য। তথাকথিত স্বৈজাত্য নীতির আঘাতে ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ড হইয়া পাকিস্থান ও ভারত রাষ্ট্রের সৃষ্টি করিয়াছে। আর এখন হইতে সতর্ক না হইলে ভাষাশ্রয়ী দ্বন্দ্বের আঘাতে ভারতরাষ্ট্র এমন দশ বিশ খণ্ড হইয়া যাইবার আশঙ্কা। যেমন করিয়াই হোক—এই বিষের ক্রিয়া বন্ধ করিতেই হইবে। অতীতের নজীর তুলিয়া বলিয়া লাভ নাই যে, ভারতবর্ষ কখনো ভাষার ভিত্তিতে বিভক্ত ছিল না। হয় তো ছিল, হয় তো ছিল না, সর্বত্র নিশ্চয়ই ছিল না—কিন্তু আগেই বলিয়াছি তখনকার দিনে ভাষার বর্তমান গুরুত্ব ছিল না। ভাষার রাজনৈতিক গুরুত্ব নিতান্তই অর্বাচীনকালের ব্যাপার। প্রাচীনকালে সমাজ সমধর্মের যোগ-সূত্রে বিশ্বাসী ছিল বলিয়া কোন্ অঞ্চলের লোকে কোন্ ভাষা বলে তাহার সন্ধান কেহ করিত না। এখনকার দিনে যেমন আমরা বলিয়া থাকি ধর্মের সহিত রাষ্ট্রের যোগ নাই—ধর্ম নিতান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার—তখনকার দিনে ভাষার প্রতি মানুষের অনেকটা সেইরূপ ভাব ছিল আর কি।

২

এখন ভাষাশ্রয়ী প্রাদেশিকতার প্রতিকারের উপায় কি? একমাত্র উপায়, অন্ততঃ আমার চোখে একমাত্র উপায়—ভাষাকে অবলম্বন করিয়া প্রাদেশিকতার প্রশ্রয়ের পথ বন্ধ করিয়া দেওয়া। কিন্তু তাহার উপায় কি? সমভাষী প্রদেশ সৃষ্টি করাই তাহার একমাত্র উপায়। অন্য উপায় নাই কিম্বা থাকিলেও আমার চোখে এখন তাহা পড়িতেছে না। স্বীকার করাই ভালো, যে সম-ভাষী প্রদেশ গঠনের স্বপক্ষে এক সময়ে আমি ছিলাম না—ভাবিতাম ভারত রাষ্ট্রের সংহতি ক্ষুন্ন হইবে। কিন্তু ঘটনার বাস্তব ধারা যে পথে চলিয়াছে—মিশ্রভাষী প্রদেশ থাকিবার ফলে যে নিরন্তর দ্বৈরদ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইতেছে—বুঝিতেছি তাহাতেই রাষ্ট্রের ঐক্য ক্ষুন্ন হইবার আশংকা। আমি যে কারণে একদিন একটি মত পোষণ করিতাম—ঠিক সেই কারণেই এখন বিরুদ্ধ মত অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছি। মানুষের বিদ্যাবুদ্ধি যতই হোক, আমার তো সামান্য, অনেক সময়েই বাস্তবের সঙ্গে ঘোড়-দৌড়ে তাহা পারিয়া ওঠে না। তখন বাস্তবকে সুযুক্তির দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা না করিয়া বুদ্ধিকে বাস্তবের সংগত করিয়া লওয়াই বিচক্ষণতার পরিচয়। এখন আমার ধারণা জন্মিয়াছে যে, অচিরে ভাষাশ্রয়ী প্রাদেশিকতা দূর করিবার উদ্দেশ্যে সর্বত্র, বিশেষভাবে বাঙলায় ও বিহারে সমভাষী প্রদেশ গঠন না করিলে এই দুই প্রদেশের ঘর্ষণে যে দাবানল জ্বলিবার আশংকা তাহার পরিণাম শুভ নহে। আর এমন দাবানলের কারণ ভারত রাষ্ট্রের অনেক স্থলেই উত্তরে ও দক্ষিণে পুঞ্জীভূত হইয়া আছে।

পশ্চিমবঙ্গের একটি অংশ ১৯১১ সালের পর হইতে বিহারের অন্তর্গত হইয়া আছে। ঐ অংশটি পশ্চিমবঙ্গের ফিরিয়া পাওয়া উচিত। কি ভাষার বিচারে, কি লোকসংখ্যার বিচারে—যে দিক দিয়াই বিচার করা যাক না কেন—উহা পশ্চিমবঙ্গেরই স্বাভাবিক অংশ। এ বিষয়ে গত এক বৎসরকালের অধিক ধরিয়া সংবাদ পত্রাদিতে বিস্তর আলোচনা হইয়াছে—অতএব নূতন করিয়া সে আলোচনায় প্রবেশ করা বাহুল্য পশ্চিমবঙ্গের পক্ষ হইতে পশ্চিম-বঙ্গ সরকার এই দাবী উত্থাপন করিয়াছেন। তাহা ছাড়া নববঙ্গ সমিতি, বঙ্গভাষা প্রচার সমিতি প্রভৃতি প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতেও উক্ত দাবী উত্থাপিত হইয়াছে—কিন্তু বিহার সরকার একেবারেই নিরুত্তর। শুধু তাই নয়, বিহারভুক্ত উক্ত অংশের বাঙলা ভাষাকে অপাংক্তেয় করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে, বাঙলা ভাষার পরিবর্তে হিন্দী চালাইবার উদ্দেশ্যে—এবং এই উপায়ে উক্ত অঞ্চলের প্রধান ভাষা বলিয়া হিন্দীকে প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে নানাপ্রকার গোপন ও প্রকাশ্য ষড়যন্ত্র চলিতেছে। এ বিষয়েও ইদানীংকালে সংবাদপত্রাদিতে বিস্তর সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে এবং পশ্চিম-বঙ্গের ও বিহারের অনেক বিশিষ্ট বাঙালী ও বাঙালী প্রতিষ্ঠান ইহার প্রতিবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। নববঙ্গ সমিতি, বঙ্গভাষা প্রচার সমিতির সভাপতি ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিহার বেঙ্গলী এসোসিয়েশনের প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রক্ষিত, পুরুলিয়ার বিশিষ্ট নাগরিক শ্রীযুক্ত জীমূতবাহন সেন প্রভৃতি বিহার সরকারের উক্ত নীতির বিরুদ্ধে বিবৃতি যোগে প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। শেষে অবস্থা এমন সঙ্কটজনক হইয়াছে যে, পুরুলিয়ার লোকসেবক সংঘকে বাধ্য হইয়া সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করিতে হইয়াছে। এ সমস্তই পরিজ্ঞাত। এ হইল একদিকের কথা। অন্যদিকে রাষ্ট্রপতি ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া সমভাষী প্রদেশ গঠনের নীতি স্বীকার করিয়া লইয়া জানাইয়াছেন যে, সমভাষী প্রদেশ গঠনের সংকল্প প্রাদেশিকতা নহে। উক্ত নীতি অনুসারে অন্ধ্রকে নূতন প্রদেশে পরিণত করিবার প্রস্তাবও গৃহীত হইয়াছে। আবার ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ নাগপুর হইতে এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে কংগ্রেস কর্তৃক নিযুক্ত কমিটি নীতিগতভাবে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন স্বীকার করিয়া লইয়াছেন—তিনি এই নীতি সমর্থন করিয়াছেন। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, বিহারভুক্ত পশ্চিমবঙ্গের অংশ বিষয়ক মামলাটির দোতরফা শুনানী হইয়া গিয়াছে—নীতি হিসাবে ইহা গৃহীত। এখন কেবল নীতিকে কার্যে পরিণত করা বাকি। অতঃপর ভারত সরকারকে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে। ভারত সরকার দেশ হইতে সাম্প্রদায়িকতা দূর করিতে কৃতসংকল্প। সাম্প্রদায়িকতারই নূতন রূপ প্রাদেশিকতা, প্রাদেশিক বিদ্বেষের অন্যতম কারণ মিশ্রভাষী প্রদেশের অস্তিত্ব—বর্তমান ক্ষেত্রে, বিহারভুক্ত পশ্চিমবঙ্গের অংশ। কাজেই ভারত সরকারের উচিত অবিলম্বে এই বিদ্বেষের কারণ দূর করা—এবং তাহার উপায় স্বভাবতঃ যাহা পশ্চিম-বঙ্গের অংশ পশ্চিমবঙ্গকে তাহা ফিরাইয়া দেওয়া। আমাদের এই প্রস্তাব প্রাদেশিক মনোভাবসম্ভূত নহে, বরঞ্চ প্রাদেশিক রেষা-রেষির মূলে উৎখাত করিয়া ফেলিবার উদ্দেশ্যেই আমরা ইহা বলিতেছি।

৩

বর্তমান সময় নূতনভাবে প্রদেশ সাজাইবার বিশেষ উপযোগী। দেশীয়রাজ্যগুলিকে দেশের অন্যান্য প্রদেশের অন্তর্গত করিয়া দিবার নীতি অনুসারে ইতিমধ্যেই বড়োদা রাজ্যকে বোম্বাই প্রদেশভুক্ত করিয়া ফেলা হইয়াছে। যে স্থলে সম্ভব অনেকগুলি দেশীয় রাজ্যকে একত্র করিয়া নূতন প্রদেশের সৃষ্টি হইবে, যেখানে তাহা সম্ভব নয়—দেশীয় রাজ্যগুলিকে নিকটবর্তী প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেওয়া হইবে। প্রকাশ যে, বানারস, রামপুর প্রভৃতি দেশীয় রাজ্য যুক্তপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হইবে। ইহাতে যুক্তপ্রদেশের আয়তন বাড়িবে। যুক্তপ্রদেশের পূর্বতম জেলা বালিয়ার উপরে বিহার অনেক দিন হইল দাবী করিতেছে। বিহারের দাবী শাসনকার্য পরিচালনার সুবিধা এবং সম-ভাষিতার উপরে প্রতিষ্ঠিত। বিহারকে বালিয়া জেলা দেওয়া যাইতে পারে। ইহাতে বিহারের আয়তন বাড়িবে। আর বিহারের পূর্বতন অংশে পশ্চিমবঙ্গের যে খণ্ডটি আছে—তাহা পশ্চিম-বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে যুক্তপ্রদেশ ও বিহার কাহারো আয়তন বিশেষ কমিবে না এবং সমভাষী প্রদেশরূপে তাহাদের সংহতি বাড়িবে। আর মানভূম এবং সিংভূম, সাঁওতাল পরগণা প্রভৃতির খণ্ডাংশ বাঙলা দেশ ফিরিয়া পাইলে কেবল যে

তাহার সংহতি বৃদ্ধি পাইবে তাহাই নয়—বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে বিদ্বেষের কারণও দূরীভূত হইবে। বিহার যে যুক্তির বলে বালিয়া জেলা দাবী করিতেছে, পশ্চিমবঙ্গও সেই যুক্তির বলেই মানভূম প্রভৃতি অংশ দাবী করিতে পারে। বিহার তাহার পশ্চিমাঞ্চলে যে নীতি উত্থাপন করিবে পূর্বাঞ্চলে তাহা অস্বীকার করিবে এমন হইতেই পারে না। আর আমরা যে বিহার বিদ্বেষী বা প্রাদেশিক নই তাহার প্রমাণ বালিয়া জেলার উপরে বিহারের দাবী আমরা অস্বীকার করিতেছি না। আমাদের প্রস্তাবিত উপায়ে যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্র ঢালিয়া সাজিলে সমভাষী প্রদেশরূপে প্রত্যেক প্রদেশেরই সংহতি বাড়িবে এবং পরস্পরের মধ্যে যে বিদ্বেষ আছে তাহা দূরীভূত হইয়া প্রত্যেকে এবং ভারত রাষ্ট্র এক নূতন শক্তি লাভ করিবে। এবিষয়ে ভারত সরকার কতদূর সচেতন জানি না—কিন্তু সচেতন হইবার সময় আসিয়াছে—কারণ প্রাদেশিকতা আর বাড়িবার সুযোগ পাইলে—এ সমস্যা সাম্প্রদায়িক সমস্যার চেয়েও ব্যাপকতর ও ভীষণতর হইয়া পড়িবে।

আমার এই প্রবন্ধ কাহার চোখে পড়িবে জানি না। পূর্বোক্ত তিনটি প্রদেশের মানচিত্রকে নূতন করিয়া সাজাইবার যে প্রস্তাব করিলাম তাহা যদি সমীচীন বোধ হয়, তাহা যদি ভারত রাষ্ট্রের স্বার্থ ও প্রদেশগুলির স্বার্থ বিরোধী না হয়—তবে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং বিহারের প্রতিনিধিমূলক বাঙালী প্রতিষ্ঠান সমূহ একবার এ বিষয়ে চিন্তা করিয়া দেখিলে বিশেষ উপকৃত হইব। এই উপায়ের তিনটি বৈশিষ্ট্য—(১) বিহার ও যুক্তপ্রদেশের কাহারো আয়তন ক্ষুন্ন হইবে না, বিহারে গচ্ছিতাংশ ফিরিয়া পাইয়া পশ্চিমবঙ্গ স্বাভাবিক আয়তন প্রাপ্ত হইবে, (২) সমভাবী প্রদেশরূপে তিনটিরই সংহতি বাড়িবে আর (৩)প্রাদেশিক বিদ্বেষের কারণ দূরীভূত হইবার ফলে ভারত রাষ্ট্র অধিকতর শক্তিশালী হইয়া উঠিবে।

পাকিস্থানে ভারতরাষ্ট্রের হাই কমিশনার ডক্টর সীতারাম পূর্ব পাকিস্থান পরিভ্রমণ করিয়া কিরূপ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রকাশ নাই। তিনি বলিয়াছেন, পূর্ব পাকিস্থান দেখিয়া তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দে মাতরম" মন্ত্রের প্রকৃত অর্থ বুঝিয়াছেন, "ফুল্ল কুসুমিত দ্রুমদলশোভিণীম্" মা'র রূপ তিনি তথায় প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সেই জননীর স্নেহে বঞ্চিত হওয়া বাঙালীর পক্ষে কত বেদনাদায়ক, তাহা যদি তিনি উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন, তবেই তিনি দেশ বিভাগে বাঙালীর ক্ষতির পরিমাণ পরিমাপ করিতে পারিবেন। কেবল আর্থিক ক্ষতিই ক্ষতি নহে; কারণ "sentiment rules the world—not reason"—ইহাও অস্বীকার করা যায় না। তিনি কলিকাতায় বলিয়া গিয়াছেন, তিনি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহা প্রধান মন্ত্রীকে নিবেদন করিবেন। তাহাতে প্রধান মন্ত্রীর পূর্বেই গঠিত মতের পরিবর্তন সম্ভব কি না, তাহা আমরা জানি না। যদি তাহা সম্ভব হয়, তাহা হইলেও তিনি যখন ভারত রাষ্ট্রের সহিত বৃটিশ রাষ্ট্রের সম্বন্ধ নির্ধারণে ব্যস্ত তখন তাহা বিবেচনা করিবার সময় তিনি পাইয়াছেন কি না, বলিতে পারি না। কারণ—

"While the eagle of Thought rides
the tempest in scorn;
Who cares if the lightning is burning
the corn?

তিনি পূর্ব পাকিস্থানে সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দুদিগের অবস্থা দেখিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার পরে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান সচিব বিধানচন্দ্র রায় পূর্ব পাকিস্থানে যাইয়া প্রধান সচিবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছেন—অবশ্য অনেক সমস্যার আলোচনা হইয়াছিল। কোন্ কোন্ বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল, তাহা অবশ্য প্রকাশ নাই। সে সকল সমস্যা যাহাদিগকে পীড়িত করিতেছে, তাহারা যে আলোচনাফল জানিবার জন্য আগ্রহ অনুভব করিতেও পারে, তাহা যদি স্বীকৃত না হয়, তবে তাহাতে সেই স্বৈরাচারী শাসকের কথাই মনে পড়িবে—"জনগণ! তাহারা কেবল আইন মানিয়া কাজ করিবে।"

ভারত রাষ্ট্রের হাই কমিশনার ও পশ্চিম বঙ্গের প্রধান সচিব উভয়ের পূর্ব পাকিস্থান হইতে নিরাপদে প্রত্যাবর্তনের পরেই ২টি ব্যবস্থা পূর্ব পাকিস্থান সরকার করিয়াছেন:—

(১) পূর্ব পাকিস্থান হইতে আসিতে হইলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছাড়ের প্রয়োজন হইবে।

(২) পূর্ব পাকিস্থানে 'আনন্দবাজার', 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড', 'ইত্তেহাদ' ও 'নেশান' সংবাদপত্রকয়খানির প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়াছে। পূর্বেই 'অমৃতবাজার পত্রিকা' প্রভৃতি কয়খানির প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়াছিল।

পূর্ব পাকিস্থান হইতে ভারত রাষ্ট্রে আসিতে ছাড় প্রয়োজন হইবে, এই ব্যবস্থা কিছুদিন হইতেই বিবেচিত হইয়াছিল। এবার তাহা বহাল করিবার সময় কারণ দর্শান হইয়াছে—পাছে আয়কর ফাঁকি দেওয়া হয়।

কিন্তু এই ব্যবস্থায় লোকের যে অসুবিধা অনিবার্য তাহা কি বিবেচিত হইয়াছে? পূর্ব-পাকিস্থানের ব্যবসায়ীদিগকে 'লোহার বাসরে' লক্ষীন্দরের মত রাখিবার উদ্দেশ্যেই কি এই নিয়ম করা হইয়াছে?

কয়খানি সংবাদপত্রের প্রবেশ নিষেধেও কি সেই অনুমান দৃঢ় হয় না?

এই প্রসঙ্গে 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' বলিয়াছেন—উভয় রাষ্ট্রে সংবাদ ও মত প্রচার সম্বন্ধে যে সকল ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, তাঁহারা কুত্রাপি সে সকল লঙ্ঘন করেন নাই—তথাপি এই আদেশ জারী করা হইয়াছে। আমরা 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' প্রভৃতিকে বিশপের উপকথার নেকড়ে বাঘ ও মেষশাবকের গল্প স্মরণ করিতে বলিব। ব্যবস্থা ভঙ্গ করা বা ত্রুটি যে সকল সময় কার্যের কারণ হয়, এমন নহে। আমরা আশা করি, পশ্চিমবঙ্গের সংবাদপত্রসমূহ বলিবেন—

"We suffer no dictation from any quarter, in the discharge of our journalistic duty."

আমরা ডক্টর সীতারামকেও জিজ্ঞাসা করি, এই সকল ব্যবস্থার পরেও কি তাঁহারা মনে করেন, পূর্বপাকিস্থানের হিন্দুদিগের সে স্থান ত্যাগের বিশেষ কারণ নাই? অবশ্য আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না যে, ভারত রাষ্ট্রের হাই কমিশনার ও পশ্চিমবঙ্গের প্রধান-সচিব উভয়ের সম্মতি লইয়া এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পূর্ববঙ্গের হিন্দুদিগের পক্ষে পশ্চিমবঙ্গের লোকমতের এ সংবাদের বাহন সংবাদপত্রে বঞ্চিত থাকা কিরূপ কণ্টকর তাহাও যেমন বিবেচ্য—এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ স্বৈর-শাসনেই সম্ভব কি না তাহাও তেমনই বিবেচ্য। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংবাদপত্র পাঠের ব্যবস্থা আছে তাহা স্বরাষ্ট্র বিভাগেই হইয়া থাকে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রধান সচিবের অধীন স্বরাষ্ট্র বিভাগ কি পূর্ব পাকিস্থান সরকারের এই ব্যবস্থা সমর্থন করিতে পারেন? যদি না পারেন, তবে কি তাঁহারা ইহার প্রতিবাদ করিবেন? প্রতিবাদ যদি প্রতিশোধাত্মক কার্যে পরিণত হয়, তাহাও হইতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কি মনে করেন না—এই সকল সংবাদ-পত্র যাহা করিতেছেন, তাহা না করিলে তাঁহারা কর্তব্যভ্রষ্ট হইবেন?

সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিতে হয় যে, পূর্ব-পাকিস্থানে উল্লেখযোগ্য সংবাদপত্রের বিশেষ অভাব আছে। কাজেই পূর্ববঙ্গের হিন্দুদিগকে পৃথিবীর সংবাদে ও লোকমতে বঞ্চিত রাখা ব্যতীত পূর্বপাকিস্থান সরকারের অন্য কোন

উদ্দেশ্য এই নিষেধাজ্ঞায় সপ্রকাশ হয় না।

পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ সংবাদপত্রই শিশু-রাষ্ট্রকে ও তাহার পরিচালকদিগকে বিব্রত করিতে অনিচ্ছা হেতু সংযমের ও সতর্কতার আধিক্যই অনুশীলন করিয়াছেন। ভারত সরকারও যে 'মিটমাটের' মনোভাবই প্রশংসনীয় মনে করিয়াছেন, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু—

**"The temperament of compromise and conciliation makes for peace and pleasantness; but it fails in the hour of crisis."**

পশ্চিমবঙ্গের সংবাদসমূহ কি আজ পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ও ভারত সরকারকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন না—এই সকল ব্যবহার ও ব্যবস্থা কি পূর্বপাকিস্থানের সম্প্রীতির মনোভাবের পরিচায়ক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে?

এই সকল ব্যবহারের পরেও কি ভারত রাষ্ট্র নায়কগণ মনে করেন—বাঙালীকে দ্বিধা বিভক্ত করাই ইসলাম রাষ্ট্র পূর্বপাকিস্থানের উদ্দেশ্য নহে? ইসলাম রাষ্ট্রে হিন্দুরা যে ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকার দাবী করিতে পারেন না—পশ্চিমবঙ্গের সংবাদপত্র নিষিদ্ধ করায় তাহাই প্রকাশ পায়।

আমাদিগের বিশ্বাস, পশ্চিমবঙ্গের শক্তিশালী সংবাদপত্রের দ্বারাই সর্বত্র বাঙালীর অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা হইবে। আজ বাঙালীর দুর্দিনে তাঁহারা কখনই আপনাদিগের কর্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ হইবেন না। অত্যাচার অনাচার কারাগার—কিছুতেই তাঁহারা কর্তব্যভ্রষ্ট হন নাই। তাঁহারা মনে করিয়াছেন—তাঁহাদিগের কার্যের দ্বারা জাতির অধিকার রক্ষিত হইবে—দেশের উন্নতি সাধিত হইবে। সেইজন্যই পূর্ব-পাকিস্থান সরকার পশ্চিমবঙ্গের পত্রগুলির পাকিস্থানে প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা মনে করি, সংবাদপত্রের শক্তি যথাযথরূপে প্রযুক্ত হইলে—স্বৈরশাসন বিশ্বাসী সরকারকে তাহার নিকট মস্তক নত করিতেই হইবে। পশ্চিমবঙ্গের সরকারকে ও ভারত সরকারকে পুনঃ সে কথা স্মরণ করিতে ও সংবাদপত্রের অধিকার রক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর হইতে হইবে।

বিঘ্নসঙ্কুল কণ্টকিত পথ অবিচলিত গতিতে অতিক্রম করিয়া মানভূম সত্যাগ্রহ প্রথম পর্বে সাফল্য লাভ করিবার পরে—দ্বিতীয় পর্বে তাহা স্থগিত রাখা হইয়াছে। সত্যাগ্রহীরা কংগ্রেসের নীতি ও প্রতিশ্রুতির মর্যাদা রক্ষা করিতে সর্বদাই প্রস্তুত: সেই জন্য কংগ্রেসের সভাপতির নির্দেশে তাঁহারা সত্যাগ্রহ স্থগিত রাখিয়াছেন—ত্যাগ করেন নাই। গত ১১ই এপ্রিল কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি বলেন—বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের বিচারাধীন; সুতরাং সভাপতি সকল পক্ষকে সত্যাগ্রহ বন্ধ করিতে অনুরোধ করুন। সভাপতির পত্র ২২শে এপ্রিলের পূর্বে লোকসেবক সঙ্ঘের হস্তগত হয় নাই। এই বিলম্বের অন্যতম কারণ—কংগ্রেসের দপ্তর মানভূমের সত্যাগ্রহী নেতা শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষকে ভুলিয়া—পশ্চিমবঙ্গের প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীঅতুল্য ঘোষকে পত্র পাঠাইয়াছিলেন! কংগ্রেসের সভাপতির পত্র এইরূপঃ—

আপনি কতকগুলি অভিযোগের প্রতিকার জন্য মানভূম জিলায় যে সত্যাগ্রহ অনুষ্ঠান করিয়াছেন, সে সম্পর্কে আমাকে বলিতে হইতেছে—বিষয়টি কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির নিকট উপস্থাপিত করা হইয়াছে এবং আপনাকে সত্যাগ্রহে বিরত থাকিবার জন্য লিখিতে আমি অনুরুদ্ধ হইয়াছি; কারণ, প্রধানতঃ যে কারণে খাপছাড়া রকমে সত্যাগ্রহ করা হইতেছে তাহা দ্বিভাষাভাষী সকল স্থানের সমস্যা—সুতরাং উহা একদিন গণপরিষদের পরামর্শ সমিতির ও কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির বিবেচ্য হইবে। সেই কারণে আমি আশা করি, আপনি সত্যাগ্রহ বন্ধ করিবেন।"

পত্রখানি পাঠ করিলে মনে হয়, কংগ্রেসের সভাপতি "রোগী যথা নিম খায় মুদিয়া নয়ন" —সেইভাবে পত্র লিখিয়াছেন। তিনি কার্যকরী সমিতির অনুরোধ পালন করিয়াছেন। কবে—কতদিনে এই সমস্যা গণপরিষদের পরামর্শ সমিতি ও কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি কর্তৃক-বিবেচিত হইবে, তাহা তিনি জানেন না।

কার্যকরী সমিতির প্রস্তাবে ছিল—বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের বিচারাধীন। পত্রে সেরূপ কোন কথা নাই। কার্যকরী সমিতি বলিয়াছিলেন—সকল পক্ষকে সত্যাগ্রহ বন্ধ রাখিতে বলা হউক। কিন্তু কংগ্রেসের সভাপতি আর কোন্ পক্ষকে নির্দেশ দিয়াছেন? যে সকল অনাচারের প্রতীকারকল্পে সত্যাগ্রহ হইয়াছে বিহার সরকারকে সে সকলের অনুষ্ঠানে বিরত থাকিতে কি বলা হইয়াছে? যদি তাহা না করা হইয়া থাকে, তবে কি সত্যাগ্রহীদিগকে সত্যাগ্রহ বিরতির অনুরোধ জ্ঞাপন একদেশদর্শিতার পরিচয় বলিয়া নিন্দনীয় হয় নাই। কোন কালে সমস্যা বিবেচিত হইবে বলিয়া অতুলবাবু ও তাহার নির্যাতন পিষ্ট সহসত্যাগ্রহীদিগকে আশ্বাস দিবার সঙ্গে সঙ্গে কি বিহার সরকারকে নির্দেশদানের প্রয়োজন ছিল না? ইহা কি বিহার সরকারের নৈতিক পরাজয় অনিবার্য দেখিয়া তাহাকে আরও অনাচারের দ্বারা ভবিষ্যতে জয়লাভের সুযোগ দান বলিয়া বিবেচিত হইবে না?

বিহারেও সত্যাগ্রহের সহিত সহানুভূতির অভাব হয় নাই। কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতিও যখন অনায়াসে পদদলিত হইতেছে, তখন কংগ্রেসের সভাপতির এই আশ্বাসের মূল্য কি, তাহা সত্যাগ্রহীরা এবং তাঁহাদিগের সহিত যাঁহারা সহানুভূতিসম্পন্ন তাঁহারা অবশ্যই বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। বিহার সরকার প্রত্যক্ষভাবে যাহাই কেন করুন না, তাঁহাদিগের কার্যে যে পরোক্ষভাবে হিংসাদ্যোতক কার্যের দ্বারা সত্যাগ্রহে বাধাদান ঘটিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সত্যাগ্রহকারীদিগকে প্রহার করা হইয়াছে—তাঁহাদিগের চক্ষুতে লঙ্কাচূর্ণ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে—তাঁহাদিগের প্রতি যে সকল ব্যবহার হইয়াছে সে সকল হইতে দেওয়া যে কোন সরকারের পক্ষে কলঙ্কের কথা। সত্যাগ্রহীদিগের উপর অত্যাচার কোন কোন স্থলে বিহার সরকারের কর্মচারিদিগের উপস্থিতিতে হওয়ায় লোকে সরকারের সম্বন্ধে কি বিবেচনা করিতেছে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কার্য যে বিশেষ নিন্দার্হ তাহা বলা বাহুল্য। সেই কমিটির সম্পাদক শ্রীবৈদ্যনাথপ্রসাদ চৌধুরী যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহা বিদ্বেষবিষদুষ্ট এবং আপনাদিগের দোষ অপরের প্রতি আরোপ চেষ্টায় কলঙ্কিত। তিনি বলিয়াছেন—মানভূম জিলার তথাকথিত সত্যাগ্রহে যে কুশ্রী অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, তাহা তাঁহারা উদ্বেগসহকারে লক্ষ্য করিতেছেন। বিহারে বিহার সরকারের কার্যে ও বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সমর্থনে যে কুশ্রী—সমাজদ্রোহী অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, তাহার প্রতিকার চেষ্টায় সত্যাগ্রহ অনুষ্ঠিত হইতেছে। ইহা 'তথাকথিত' সত্যাগ্রহ নহে—প্রকৃত সত্যাগ্রহ এবং ক্ষমতা হস্তগত করিয়া আজ কংগ্রেসীরাও অনেকে তাহার স্বরূপ ভুলিয়াছেন। লোকসেবক সঙ্ঘের সম্বন্ধে অভিযোগ করা হইয়াছে, তাহার সদস্যগণ পুরাতন কংগ্রেসসেবক হইয়াও সত্যাগ্রহে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে মানভূম কংগ্রেস কমিটির সহিত পরামর্শ করেন নাই। কিন্তু অতুলবাবু প্রভৃতি অনন্যোপায় হইয়া অহিংসায় অবিচলিত বলিয়া —সত্যাগ্রহে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে অনাচারের প্রাবল্য প্রকাশ করিয়াছেন এবং যে বাবু রাজেন্দ্র-প্রসাদের অঙ্গুলী হেলনে বিহার কংগ্রেস ও বিহার সরকার পরিচালিত—যিনি ক্ষমতা লাভের পরে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন সম্বন্ধে কংগ্রেসের নীতি ও প্রতিশ্রুতি অনায়াসে অবজ্ঞা করিয়াছেন, তাঁহাকেও জানাইয়াছিলেন। বিবৃতিতে ব্যক্ত উক্তির দ্বারা বৈদ্যনাথপ্রসাদ লোকের চক্ষুতে ধূলিনিক্ষেপ করিতে পারিবেন না।

বৈদ্যনাথপ্রসাদ এই কথা বলিয়া মনকে প্রবোধ দিয়াছেন যে, মানভূমের সত্যাগ্রহ ক্ষুদ্র ব্যাপার। গান্ধীজী যখন লবণ সত্যাগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার কয়জন সঙ্গী ছিলেন? বৈদ্যনাথবাবু তখন কি করিতে-ছিলেন? প্রকৃত কথা তিনি গোপন করিতে পারেন নাই, সেইজন্য বলিয়াছেন—মানভূমে ও অন্যত্র যে সংগ্রাম চলিতেছে, তাহার উদ্দেশ্য—

বিভাগ ও বিচ্ছেদ। অর্থাৎ যদি বিহারের বঙ্গ-ভাষাভাষী অঞ্চল—কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতি অনুসারে পশ্চিমবঙ্গকে দিতে হয়, তবে তাহাতে বাধা দিবার জন্য যে কোন উপায় সমর্থনীয়।

তাহার পরে বৈদ্যনাথপ্রসাদ কলিকাতার সংবাদপত্রকে আক্রমণ করিয়াছেন। লক্ষ্য করিবার বিষয়, বাবু মুরলীমনোহর প্রসাদের হিংসাসমর্থক হীন আক্রমণে ইনি কোন কথা বলা প্রয়োজন মনে করেন নাই। বিহারে—বিহারীদিগের দ্বারা—অন্য প্রদেশের বণিকের সাহায্য গ্রহণ করিয়াও বাঙলার সংবাদ-পত্রের মত উচ্চাঙ্গের সংবাদপত্র প্রবর্তন বা পরিচালন সম্ভব হয় নাই। ইহার জন্য বাঙলা দায়ী নহে। বৈদ্যনাথপ্রসাদ অনায়াসে বলিয়াছেন, কলিকাতায় প্রভাবশালী সংবাদপত্রে বিহার সরকারকে এমনভাবে চিত্রিত করা হইতেছে যে, সে সরকার যেন পশুবলে মান-ভূমে বাঙালীদিগের ভাষার ও সংস্কৃতির উচ্ছেদ সাধনে তৎপর; প্রতিদিন অত্যাচারের বিবরণ ও চিত্র প্রস্তুত করিয়া প্রকাশিত হইতেছে।

আমরা বৈদ্যনাথপ্রসাদকে বলিতে পারি, বিহারে বিহারী সরকারের বাঙালীদিগের 'ভাষা ও সংস্কৃতির' উচ্ছেদ সাধনের বিবরণ কল্পনা করিয়া রচনা করিবার কোনই প্রয়োজন হয় না—সে বিষয়ে বিহার সরকারের চেষ্টা সর্বদাই সপ্রকাশ—তাহা অকৃতজ্ঞতার বিকাশ। জিজ্ঞাসা করি, প্রতিদিন কলিকাতার শক্তিশালী সংবাদ-পত্রে বিহারে বাঙালীদিগের উপর অত্যাচারের বিবরণ ও চিত্র প্রকাশ করা হয়—এই উক্তি যদি মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়, তবে কি কংগ্রেসের সভা-পতি ডক্টর পট্টভী সীতারামিয়া তাঁহাকে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক পদের অযোগ্য স্বীকার করিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার নির্দেশ দিবেন এবং বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁহার পক্ষ সমর্থনে বিরত থাকিবেন? বৈদ্যনাথ প্রসাদ জানিয়া রাখুন, তাঁহার ভিত্তিহীন উক্তির দ্বারা তিনি কলিকাতার সংবাদপত্রের শক্তি ক্ষুণ্ণ করিতে পারিবেন না—সে ক্ষমতা তাঁহার নাই এবং মিথ্যার দ্বারা কখন কোন সাধু উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না—তাহাতে কেবল অনৃতবিলাসীর স্বভাবের পরিচয় প্রকট হয়।

এদিকে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন সম্বন্ধে মত প্রকাশে বিরত থাকেন নাই। বিমানে বাঙালোর যাত্রার প্রাক্কালে নাগ-পুরে তিনি বলিয়াছেন, ভারতবর্ষের অর্থাৎ ভারত রাষ্ট্রের এই সংকটকালে দেশের নির্বিঘ্নতা ঐক্য ও আর্থিক উন্নতির দিকে মনোযোগ দান এবং বিচ্ছিন্নকারী ভাব বর্জনই দেশবাসীর কর্তব্য। কিন্তু তিনি কি অস্বীকার করিতে পারেন যে, বিহারের যে ব্যবহার তাঁহার দ্বারা কেবল সমর্থিতই হয় নাই, পরন্তু প্রবর্তিতও হইয়াছে, তাহা রাষ্ট্রের ঐক্যের বিরোধী। তিনি বলিয়াছেন—ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের বিষয় বিবেচনার জন্য গঠিত কমিটির নির্ধারণই তিনি সমর্থন করেন। ভারত রাষ্ট্রের রাজনীতিক ক্ষমতা লাভের ফলে বিষয়টি নূতন আলোকে দেখিতে হইতেছে। এই নূতন আলোকে কি কংগ্রেসের নীতি বিবৃত করিবার জন্যই ব্যবহৃত হইতেছে? অবশ্য বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ অন্ধের ও মহারাষ্ট্রের উল্লেখ করিলেও পশ্চিমবঙ্গের দাবীর কথার উল্লেখও করেন নাই। তাহার কারণ কি এই যে, বিহারের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চল যে পশ্চিমবঙ্গকে দেওয়া হইবে না, তাহা তিনি ও তাঁহার বন্ধুরা পূর্বেই স্থির করিয়াছেন এবং সে বিষয়ে তাঁহাদিগের সংকল্প কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতির মত পরিবর্তিত হইবে না? তাঁহা-দিগের ইচ্ছায় যদি বিহারে সত্যাগ্রহ বন্ধ হয়, তথাপি যে বিহারের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলগুলি হিন্দী ভাষাভাষী করিবার চেষ্টা চলিতে থাকিবে—তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

লক্ষ্য করিবার বিষয়, বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক যে বিবৃতি দিয়াছেন—কমিটির সভাপতি বলিয়াছেন, তাহার সহিত কমিটির কোন সম্বন্ধ নাই! যদি তাহাই হয়, তবে কি সম্পাদক বৈদ্যনাথপ্রসাদ চৌধুরীকে শৃঙ্খলাভঙ্গের জন্য দণ্ডিত করা হইবে?

অতুলবাবু ঘোষণা করিয়াছেন, কংগ্রেসের সভাপতির নির্দেশে সত্যাগ্রহ স্থগিত রাখা হইয়াছে—তাহা ত্যক্ত হয় নাই।

---

# একটি অনন্ত প্রশ্ন

**বেণু দত্ত রায়**

মনে পড়ে—
থেকে থেকে আজ মনে পড়ে—
কোনো এক বসন্তের রৌদ্রমতী স্নিগ্ধ নীল ভোরে—
তোমার চোখের পরে রেখে মোর চোখ
মনে হয়েছিলো বুঝি
পৃথিবীকে কোনো স্বর্গলোক।
(সেখানে কি পেয়েছিনু অন্য কোনো রাঙা সূর্যালোক?)
সে-আলোর ছোঁয়া লেগে মনে—
সে-আলোর ছায়া লেগে, মৃদু-শিহরণে—
ভুলে গিয়ে পৃথিবীর পুরোণো সীমানা,
আর কোনো রাঙামাটি দেশে গিয়ে দিয়েছিনু হানা?
নানারঙা মেঘেদের দেশে—
চাঁপা-রঙা আঁচলের অনুরাগে মেশে—
এ-হৃদয় হয়েছিলো আবেগে উধাও:
দু'টি প্রাণ এক হয়ে একখানি ভাটিয়ালী নাও!

আজো যদি কোনো রাতে ভুল করে যেয়ে—
তোমাকেই আর বার বুকে ফিরে চেয়ে—
তোমার দু'চোখে যদি দু'টি চোখে ছায়া ফেলে চাই,
সেদিনের তোমাকে কি আর বার সেইখানে আমি ফিরে পাই?

# বিপ্রমুখের কথা

জগতে রোগভয় আর মৃত্যুভয় যেমন আছে, তার দাওয়াইয়ের ব্যবস্থাও তেমনি আছে। অর্থাৎ একদিকে ইনকুলেশন আর বীজাণুনাশক লোশ্যনের ব্যবহার, অপরদিকে হতাশ্বাস এবং ভয়প্রবণ ব্যক্তিকে হিতৈষী আত্মীয়-প্রতিবেশীর অভয়-প্রলেপ। ওষুধে আর প্রতিষেধক সাবধানতায় যে ফল পাওয়া যায়, তার সমর্থন পাওয়া যায় আধুনিক চিকিৎসা-শাস্ত্রের গবেষণায় এবং আবিষ্কারে। আর শুভার্থী স্বজন-বান্ধবের অযাচিত হিতোপদেশ কতখানি কার্যকরী হয়, তার হিসাব-নিকাশ করতে গেলে হয়তো দেখা যাবে—শুভের চেয়ে অশুভই ঘটে বেশী।

কিন্তু তবু আমরা পরের কাজে অথবা কথায় কথা না বলে থাকতে পারি না। ওটা অধিকাংশ মানুষেরই মজ্জাগত স্বভাব। আমাদের অবচেতন মনে নিঃস্বার্থ পরোপকারের স্পৃহা সুপ্ত হয়ে আছে। সময় ও সুযোগ পেলেই সেই পরোপকারের প্রবৃত্তিটা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। আমরা হুমড়ি খেয়ে পড়ি, এগিয়ে যাই কাজে সাহায্য করতে, নিদেন পক্ষে মূল্যবান উপদেশ দিতে। যিনি দুশ্চিন্তায় পীড়িত, ভয়কাতর অথবা বিপদগ্রস্ত, তিনি কি আর মুখ ফুটে সাহায্য প্রার্থনা করবেন? তাই আমাদের মাথা ব্যথা স্বাভাবিক। প্রশ্ন করে খুঁচিয়ে বার করি গলদটা কোথায়। তারপর তার সবিস্তার আলোচনায় নিজস্ব মতামত প্রকাশ করি। হয়তো বাস্তবিক সাহায্য করি, নয় তো পরামর্শ দিই। তাতে কাজ হোক্ বা না হোক্—প্রতিবেশিত্ব অথবা আত্মীয়তার দাবি তো উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

মনে করুন, আপনার মেয়ের বিয়ে—যে মেয়েটি কালো এবং স্বাস্থ্যহীন বলে এতদিন ধরে বিয়ে হচ্ছিল না। হয়তো বা বিয়ের কথায় আশ-পাশের বাড়ী থেকে যথেষ্ট পরিমাণে ভাংচি দেওয়া হয়েছিল এবং কোনও সম্বন্ধ পাকবার আগেই ভেঙে যাচ্ছিল। শুধু মেয়ে অপছন্দ বলে নয়—অন্য কোনও কারণে, যেটা পাত্রপক্ষ পরিষ্কার জানিয়ে দেন না। শুধু একটি ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করেন—ঠিকুজির মিল হল না। ঐ এক কথাতেই কাজ উদ্ধার হয়ে যায়। এ সম্বন্ধ প্রথমতঃ ঝুলিয়ে রেখে ও ভেঙে দিয়ে অতঃপর শাঁসালো এবং বেশি পাওনার আশা-যুক্ত অন্য কোনও পক্ষ অবলম্বন করা চলে। মনে মনে হয়তো আপনার ঘনায়মান সন্দেহ যে, পটলা ভটচাজই এ কাজ করেছে এবং বেনামী উড়ো চিঠি দিয়ে পাত্রপক্ষকে ভাগিয়েছে। তবু মেয়ের বিয়ে যখন স্থির হল, তখন তাকে নিমন্ত্রণও করতে হয় এবং পটলার পরোপকার-ব্রত এমনি শুদ্ধ ও নিঃস্বার্থ যে, বিয়ের রাত্রে বুক দিয়ে পড়ে কাজ আপনার উদ্ধার করে দেয়। আত্মীয়স্বজন, পাড়া-পড়শীর ভিতর এমন অনেক লোক পাবেন, যাঁরা আপনার আমন্ত্রণের অপেক্ষা করেন না। অনর্গল বাক্য আর মন-ভোলানো টিপ্পনীতে আপনার হৃদয়-পথের উন্মুক্ত দরজার ভিতর দিয়ে মিষ্টি অথবা মাছের ভাঁড়ারের দরজায় গিয়ে উপস্থিত হন এবং চাবিটি পর্যন্ত হস্তগত করেন। এই সব মানুষের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য হল এই যে, আড়ালে তাঁরা যাই ভাবুন না কেন আপনার সম্বন্ধে, সম্মুখে তাঁরাই আপনার প্রকৃত হিতৈষী।

কিন্তু ধূর্ত পল্লীসমাজী লোকেদের কথা বাদ দিলেও আর এক ধরণের মানুষ আপনারা দেখতে পাবেন মধ্যে মধ্যে, যাঁরা স্বার্থের হানি করেও অপরের মঙ্গল কামনা করেন—এমনকি, গাঁটের পয়সা খরচ করে অন্য লোকের সত্য অথবা কাল্পনিক দুঃখমোচনে অগ্রসর হন। এ'রা ঠকেন হরদম। কিন্তু প্রতারিত হয়েও আবার পরহিত সাধনে উন্মুখ হয়ে ওঠেন। এ'রাই হলেন বিশুদ্ধ 'আলট্রুয়িস্ট।' মানুষকে চট করে খারাপ ভাবতে কিম্বা অবিশ্বাস করতে এ'রা পারেন না। তারপর পরের ভাল করতে গিয়ে যখন সত্যিই বিপদে পড়েন কিম্বা ক্ষতিগ্রস্ত হন, তখন সেই অন্যায় দুর্দৈব এবং মানুষের অকৃতজ্ঞতা নিয়ে অনুশোচনা করেন মাত্র। সত্যিকারের শিক্ষা ও চৈতন্যোদয় এ'দের হয় না।

এমনি এক ভদ্রলোককে জানি—যিনি আজও অদম্য উৎসাহে পরোপকার করে চলেছেন। কাছে পয়সা না থাকলে ধার করে তৃতীয় পক্ষের ঘরে প্রার্থিত অর্থ পৌঁছে দেন। যত অসম্ভব পরিকল্পনা, যত উগ্র অতিরঞ্জিত মিথ্যা, ততই তিনি মুগ্ধ। যত সূক্ষ্ম এবং মারাত্মক চাটুকারিতা, ততই তিনি বিগলিত। অথচ শিক্ষিত এবং সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। হিতৈষী যদি সাবধান করে দেন তাঁকে, তিনি অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন। একবার জাহাজ ভাড়া করে তিনি রেঙ্গুনে ঠকতে গিয়েছিলেন এক পুরানো বন্ধুর কাছে। বলেছিলুম, 'জমি বিক্রীর ব্যবসা একটি প্রকান্ড ভাঁওতা। মাঝখান থেকে শুধু শুধু অনেক পয়সা বরবাদ হয়ে যাবে।' তিনি তো কথা শুনলেনই না। যে-টাকা সংগে নিয়ে গিয়েছিলেন, সেগুলো নষ্ট করে এলেন। অপর এক ব্যক্তিকে বুঝিয়ে-পড়িয়ে আরও কিছু টাকা দিইয়ে দিলেন এবং পরিশেষে তৃতীয় এক দূরসম্পর্কিত আত্মীয়ের কাছে টাকা ধার করে কলকাতায় ফিরে এলেন। মনে মনে বুঝেছিলেন সব ব্যাপারটা। তারপর যখন হাতে-নাতে এবং আদালতে প্রমাণ হয়ে গেল পুরানো বন্ধুটি এক ঝানু ব্যবসাদার, বহু লোককেই ফাঁসিয়েছে, তখন তিনি শুধু মন্তব্য করলেন, 'আমারও কিছু গেছে। তবে মানুষটা খারাপ নয়। বিদেশে ব্যবসা পেতেছে, টাকার অভাবেই তার স্বভাব নষ্ট হয়েছে। অবশ্য, অবস্থা ভালো হলেই আমাকে সব ফেরত দেবে বলেছে।'

এই ভদ্রলোকের স্বভাবের মজা হল এই যে, কোন খারাপ জিনিস কিম্বা কোন মন্দ মানুষকে সমর্থন করা। এটা অবিশ্যি মনস্তত্ত্বের এলাকায় পড়ে। কিন্তু কয়েকটা ব্যাপারে তিনি এখনও অপরিণত রয়ে গেছেন। বাস্তবকে দেখেন ও জানেন। কিছু যে বোঝেন না, তা নয়। তবু সেই বাস্তবকে পুরোপুরি গ্রহণ করতে এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার ফলে নিজস্ব মতামত এবং আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে তিনি নারাজ। আপনারা হয়তো বলবেন, এ ধরণের মানুষ হল নির্বোধ আদর্শবাদী। এ'রা শুধু প্রতারিতই হয় না, প্রতারিত হওয়ার মধ্যে একটা বিশেষ ধরণের আত্মতৃপ্তি অনুভব করে। সাহিত্যে এই টাইপের চরিত্র অনেক পাওয়া যাবে। কথাটা হয়তো ঠিক। তবু এদের প্রতি আমাদের সহানুভূতি আসে। জীবনেই বলুন, আর সাহিত্যের মারফতই বলুন, যখনই আমরা একটি সরল বিশ্বাসী আদর্শনিষ্ঠ মানুষের সাক্ষাৎ পাই, তখনই তার প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে পারিনে। কোথায় যেন একটা আন্তরিক মমত্ব-বোধ সঞ্চিত হতে থাকে। তার বঞ্চনায় আর লাঞ্ছনায় একটু ব্যথিত হই। বাস্তব তথ্যের কাছে আদর্শের পরাজয়ে ভাবি মনুষ্যত্বেরই অবমাননা।

এটা হল এক ধরণের পরার্থপরতা এই সব মানুষ খুব কমই আত্মকেন্দ্রিক হয়ে থাকে। পরোপকার এ'দের স্বধর্ম, মনের মুখোশ নয়। আর এক ধরণের মানুষ আছে—যারা ধূর্ত প্রবঞ্চক নয়, আবার আদর্শ বাতিকগ্রস্তও নয়। তারা এ দুয়ের মাঝামাঝি—মার্ট্যর।


## বিনা অস্ত্রে চক্ষু ছানি

ডিজন্স "আই-কিওর" (রেজিঃ) চক্ষু ছানি এবং সর্বপ্রকার চক্ষুরোগের একমাত্র অব্যর্থ মহৌষধ। বিনা অস্ত্রে ঘরে বসিয়া নিরাময় সুবর্ণ সুযোগ। গ্যারান্টী দিয়া আরোগ্য করা হয়। নিশ্চিত ও নির্ভরযোগ্য বলিয়া পৃথিবীর সর্বত্র আদরণীয়। মূল্য প্রতি শিশি ৩্ টাকা, মাশুল ৸০ আনা।

**কমলা ওয়ার্কস্ (দ) পাঁচপোতা, বেঙ্গল।**

# জীবন-তৃষ্ণা

## আর্ভিঙ্ স্টোন

**অনুবাদক—অদ্বৈত মল্ল বর্মন**

[ পূর্বানুবৃত্তি ]

### ১০

খনি মজুরদের অবস্থা বুঝতে ভিনসেণ্টের বিলম্ব হয় নি। তারা অজ্ঞ এবং অশিক্ষিত। তাদের প্রায় সকলেই একেবারে নিরক্ষর। কিন্তু তবু তারা নির্বোধ নয়। তাদের কাজ কষ্টসাধ্য হলেও, তারা কাজে খুব চটপটে। তারা সাহসী, প্রাণখোলা এবং অতিমাত্রায় ভাবপ্রবণ। জ্বরে ভুগে ভুগে শীর্ণ ও ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছে। ক্লান্তিতে একেবারে ভেঙে পড়েছে তারা। কেবল রবিবার ছাড়া সপ্তাহের ছ'টা দিন সূর্যালোকের সংস্পর্শে না থাকার দরুণ তাদের চামড়াতে ধোঁয়াটে বাদামি রঙ ধরেছে— কালো কালো অজস্র দাগ বসে গিয়েছে। কোটরে-ঢোকা চোখে বিষাদের কালিমা। সে চোখের মূক চাহনিতে যেন এই ভাষা লেখা রয়েছেঃ দেখ, আমরা মার খাই, কিন্তু মার দিতে পারি না; আমরা অত্যাচারিত।

লোকগুলিকে ভিনসেণ্টের খুব ভাল লাগল। জুণ্ডার্ট ও ইটেনের 'ব্রাবাণ্ট'দের মতই তারা সরল ও শান্ত। জায়গাটাতে মানুষ নেই বলে তার মনে যে ধারণা শিকড় গেড়েছিল, এরপর আর তা রইল না। বুঝতে পারল, মানুষ বলতে যা বোঝায় এখানে তার কমতি নেই।

জায়গাটা কয়েকদিন দেখাশোনার পর ভিনসেণ্ট ধর্মসভার ব্যবস্থা করল। ডেনিসদের রুটি বানাবার ঘরের পেছনে উঁচুনীচু খোলা জায়গাতে প্রথম সভার আয়োজন হলো। জায়গাটা সে নিজ হাতে পরিষ্কার করল। লোকের বসবার জন্য নিজে বয়ে এনে বেঞ্চি জড়ো করল। বিকেল পাঁচটার সময়ে খনি-মজুররা নিজ নিজ পরিবার নিয়ে সভায় এসে জমা হল। ঠাণ্ডা বাঁচানোর জন্য গলায় স্কার্ফ ও মাথায় ছোট টুপি। ভিনসেণ্ট এক বাড়ি থেকে একটি কেরোসিনের ল্যাম্প চেয়ে এনেছিল। সভাস্থলে একমাত্র সেইটাই আলোর কাজ করল। খনি-মজুররা আঁধারে বেঞ্চির উপরে বসেছে। ভিনসেণ্ট বাইবেলের ওপর কেমন ঝুঁকে পড়েছে তারা তাই চেয়ে চেয়ে দেখছে আর শীত বাঁচাবার জন্য দু'হাত বগলে পুরে মন দিয়ে তার কথাগুলি শুনছে।

বক্তৃতার জন্য বাইবেলের কোন্ বাণীটা এখানে সবচাইতে মানানসই হবে—ভিনসেণ্ট বাইবেল তোলপাড় করে সেটা খুঁজতে লাগল। শেষে গ্রন্থের 'এ্যাক্টস্' অর্থাৎ 'কর্মযোগ' শীর্ষক খণ্ডের ১৬-এ পরিচ্ছেদটি নির্বাচন করল, "রাত্রিতে পলের কাছে কেমন একটা ছায়ামূর্তির আবির্ভাব হল; ম্যাসিডোনিয়ার একটি লোক সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে, অনুনয় করে বলছে : 'আপনি ম্যাসিডোনিয়াতে আসুন, এসে আমাদের সাহায্য করুন।'"

তারপর ভিনসেণ্ট বলতে লাগল, "বন্ধুগণ, এই ম্যাসিডোনিয়ার এক-একটি লোককে একএক জন মজুর বলে মনে করতে হবে। যার মুখে পড়েছে দুঃখ ও যন্ত্রণার ছাপ—এমনি ধরণের মজুর। মনে করবেন না যে, তার চিত্তে ঐশ্বর্য নেই, কেননা, তার মধ্যে অবিনশ্বর আত্মা বর্তমান রয়েছে। সে যাতে ধ্বংস হতে না পারে তার জন্য চাই তার মনের খোরাক—ভগবানের বাণী। মানুষ খৃষ্টের অনুসরণ করুক, সহজ অনাড়ম্বর জীবন যাপন করুক, বড়ো বড়ো উচ্চাশা ছেড়ে দিয়ে সাধারণভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করুক—ভগবান এই তো চান। ভগবানের বাণী থেকে লোক যেন নম্র ও সরলমনা হতে শেখে,—তা হলেই সে ঈশ্বরনির্দিষ্ট দিনে স্বর্গরাজ্যে গিয়ে শান্তিলাভ করতে পারবে।"

গ্রামে অনেক রোগী ছিল। ভিনসেণ্ট চিকিৎসকের মতো প্রতিদিন তাদের বাড়ি বাড়ি ঘুরত। যখনই সুবিধা হত, একটু দুধ, দু একটা রুটি, গরম মোজা বা বিছানার চাদর রোগীদের বাড়ি দিয়ে আসত। পল্লীতে টাইফয়েড এবং একরকম সান্নিপাতিক জ্বরের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল। খনিমজুরেরা এর নাম দিয়েছিল 'la sott fievre'. এই জ্বর হলে রোগী দুঃস্বপ্ন দেখে চীৎকার করে উঠত আর সারাক্ষণ প্রলাপ বকত। এই জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মজুররা বিছানায় পড়ে ক্রমশ দুর্বল, জীর্ণশীর্ণ ও কঙ্কালসার হয়ে যেত। রোগীর সংখ্যাও দিন দিন বেড়ে চলত।

পেটিট ওয়াস্মেস গ্রামের সব লোক তাকে আদর করে 'মসিয়ে' ভিনসেণ্ট বলে ডাকত। তাদের এই ডাকে প্রীতির ভাব যেমন ছিল, তেমনি ছিল সম্ভ্রমের ভাব। গ্রামের প্রত্যেকটি কুটিরে সে সাধ্যমত খাদ্য দান করত এবং সান্ত্বনার বাণী শুনাতো; রোগীর শুশ্রূষা করত এবং সর্বহারাদের সঙ্গে গিয়ে প্রার্থনায় বসত—তাদের বেদনাদগ্ধ প্রাণে বইয়ে দিত ভগবৎ-আলোকের মন্দাকিনীধারা। বস্তুত সারা পল্লীতে এমন একটি কুটির ছিল না যেখানে তার সেবাযত্নের কল্যাণস্পর্শ না লেগেছিল। খৃস্টমাস উৎসবের কয়েকদিন আগে মার্কাসির কাছে একটা পরিত্যক্ত আস্তাবল পাওয়া গেল। স্থানটা বেশ প্রশস্ত—শতাধিক লোক অক্লেশে বসতে পারবে। স্থানটি এমনি অনুর্বর যে একটি দূর্বাঘাস পর্যন্ত গজায় না; উপরন্তু জায়গাটা অত্যন্ত ঠাণ্ডা। সেখানে মানুষের বসতি নেই। এসব সত্ত্বেও সেদিন পেটিট ওয়াসমেসের এত লোক সেখানে সমবেত হয়েছিল যে, তিল ধারণের জায়গা পর্যন্ত ছিল না। ভিনসেণ্টের কাছ থেকে সেদিন তারা বেথলেমের গল্প শুনল—পৃথিবীতে কি করে শান্তি নেমে এসেছিল তার কাহিনী শুনল। মাত্র দু' সপ্তাহ হল ভিনসেণ্ট 'বরিনেজে' এসেছে। এরই মধ্যে সে লক্ষ্য করেছে যে, দিনের পর দিন লোকের অবস্থা এখানে কেবল খারাপের দিকেই চলেছে—লোকের দুঃখ দুর্দশা নিরবচ্ছিন্নভাবে বেড়ে চলেছে। কিন্তু তবু সাধারণ একটি আস্তাবলের ভেতর, কয়েকটা ছোট কেরোসিন ল্যাম্পের ধোঁয়াটে আলোয় এইসব দুঃখস্নাত মানবসন্ততির মাঝে ভিনসেণ্ট যেন যীশু খৃস্টকে স্বর্গলোক থেকে নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে—সে যেন লোকগুলির অন্তরলোককে ধরাতলে স্বর্গরাজ্য নেমে আসার আশ্বাসে উদ্দীপিত করতে পেরেছে।

একটিমাত্র কাঁটা তাঁর জীবন-পথে আজও অবশিষ্ট রয়েছে। সেটা তাকে অনবরতই খোঁচা দেয় : এখনও তাকে পিতাই ভরণ-পোষণ করে চলেছেন। প্রত্যেক রাত্রে প্রার্থনা করে সে, ভগবানের পায়ে মাথা খুঁড়ে জানায়, ভগবান, এমন দিন আমার কবে আসবে যেদিন আমি দুটো খাওয়া-পরার জন্য সামান্য

কয়েকটা ফ্রাঙ্ক রোজগার করতে পারব। আমার প্রয়োজন অতি অল্প। এই প্রয়োজন মেটাবার জন্য কবে তুমি আমাকে অন্যের গলগ্রহ হওয়ার দায় থেকে মুক্ত করবে।

আবহাওয়া বড়ই খারাপ। রাশি রাশি কালো মেঘ সমস্ত আকাশটাকে ঢেকে দিয়েছে। জোরে জোরে বৃষ্টি হচ্ছে। পথঘাট জলে কাদায় অত্যন্ত কদর্য হয়ে উঠেছে। মজুরদের বস্তির মেটে মেঝেগুলি একেবারে কাদা কাদা হয়ে গিয়েছে। বছরের নতুন দিনে জিন্-ব্যাপটিস্ট ডেনিস ওয়াসমেসে গিয়ে ভিনসেণ্টের একখানি চিঠি নিয়ে এসেছেন। খামের বাম দিকের ওপরের কোণে রেভারেণ্ড পিটারসনে নাম। উত্তেজনায় ভিনসেণ্টের দেহ কাঁপছে। চিঠিখানা হাতে করে প্রায় দৌড়ে গিয়ে সে ঘরে ঢুকল। বৃষ্টিতে ঘরের খানিকটা জায়গা ক্ষয়ে গিয়েছে। কিন্তু সেদিকে সে ভ্রূক্ষেপ করল না। এলোমেলো আঙুল চালিয়ে খামখানা ছিঁড়ল। তারপর এক নিশ্বাসে পত্রখানা পড়ে ফেলল:

প্রিয় ভিনসেণ্ট,

তোমার কাজ খুব চমৎকার হচ্ছে। ধর্মপ্রচার সমিতি তোমার কাজের কথা শুনেছেন। তাঁরা তোমাকে নতুন বৎসরের প্রথম দিন থেকে ছয় মাসের জন্য সাময়িকভাবে কাজে বহাল করছেন।

জুন মাসটা যদি ভালয় ভালয় কেটে যায় তা হলে তোমার চাকুরী স্থায়ী হয়ে যাবে। এখন থেকে তোমাকে মাসে পঞ্চাশ ফ্রাঙ্ক করে মাইনে দেওয়া হবে।

মাঝে মাঝে আমাকে চিঠি লিখো। সর্বদা ঈশ্বরে বিশ্বাস রেখে চলবে।

প্রীতার্থী—পিটারসেন

পত্রখানা হাতের মুঠোয় চেপে সে আনন্দের আতিশয্যে বিছানায় পড়ে গড়াগড়ি দিতে লাগল। অবশেষে তারও জীবনে সাফল্য এসেছে। জীবন নিয়ে যে-কাজ সে করতে চেয়েছিল, আজ সে-কাজ তার করতলগত হয়েছে। ওইটুকুই সে সারাক্ষণ কামনা করে এসেছিল। এতদিন তা সে সোজাসুজি চাইতে পারে নি। চাওয়ার ক্ষমতা ও সাহস হয় নি বলে। আজ থেকে সে মাসে পঞ্চাশ ফ্রাঙ্ক করে মাইনে পাবে। থাকা খাওয়ার খরচ হিসেবে ওই টাকাই যথেষ্ট। এখন থেকে তাকে আর কারো গলগ্রহ হয়ে থাকতে হবে না।

সে টেবিলে গিয়ে বসল। উল্লাসের সঙ্গে বিজয়গর্বে তার পিতাকে একটি চিঠি লিখলো। তাঁকে জানিয়ে দিল তাঁর আর তাকে সাহায্য করতে হবে না এবং তার দরুণ এতদিন যে টাকা খরচ হয়েছে সেটা বেঁচে গিয়ে পরিবারের আয় বৃদ্ধি হবে। লেখা যখন শেষ হল, বাইরে তখন সন্ধ্যার ছায়া নেমেছে। দূরে, মার্কাসি খনির ওদিকটায় ঘন ঘন বাজ পড়ছে ও বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। সে রান্নাঘর পেরিয়ে নীচে নেমে বৃষ্টির মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বাইরের বৃষ্টির মতোই তার মনের আনন্দও উদ্দাম হয়ে উঠেছে।

মাদাম ডেনিস তার পিছু পিছু দৌড়ে এসে ডাকলেন, "মঁসিয়ে ভিনসেণ্ট, কোথা যাচ্ছ তুমি। কোট না নিয়ে টুপি না নিয়ে এমন-ভাবে বেরুচ্ছ কোথায়?"

ভিনসেণ্ট শুনলই না, কোনো উত্তরও দিল না। ছুটতে ছুটতে সে একটা টিলার ওপর উঠল। সেখান থেকে বরিনেজের অনেকটা জায়গা সে দেখতে পেল। খনির বড় বড় চিমনি, কয়লার বড় বড় স্তূপ, মজুরদের ছোট ছোট কুঁড়ে সব কিছুই তার চোখে পড়ল। আরো দেখতে পেল, কালো একটা বাসার ভেতর থেকে পিঁপড়েরা যেমন বেরোয়--কালো পাতাল থেকে তেমনিভাবে পিল পিল করে বেরোচ্ছে ওরা। এইমাত্র ওদের ছুটি হয়েছে। দূরে দেখা যাচ্ছে কালো পাইন-বন, ছোট ছোট কুটিরগুলিকে যেন তারই গায়ে এঁটে দিয়েছে। আরো দূরে একটা গীর্জার লম্বা চূড়া আর একটা পুরোনো মিল চোখে পড়ছে। সমস্ত দৃশ্যটাই যেন একটা ঝাপসা আবরণে মোড়া। মেঘের ছায়া থেকে একটা আলো-আঁধারি মায়া যেন জেগে জেগে মিলিয়ে যাচ্ছে। এই দৃশ্য তাকে মাইকেলের ও রাইসডেলের ছবির কথা মনে করিয়ে দিল। বরিনেজে আসার পর ছবির কথা আজ এই প্রথম তার মনে পড়ল।

১১

সমিতির অনুমোদন পেয়ে ভিনসেণ্টের ধর্মপ্রচারকের পদ এখন পাকা হয়েছে। এখন তার প্রতিদিন সভা করার জন্য একটা স্থায়ী জায়গা দরকার। অনেক খুঁজে পেতে খাদের একেবারে নীচের দিকে, পাইনবনের মধ্যে দিয়ে যে ছোট পথ গিয়েছে তারই উপরে বেশ বড়ো একটা ঘর পাওয়া গেল। ঘরটার নাম ছিল 'সেলোন দু বোবি', এখানে পাড়ার ছেলে-মেয়েদের সপ্তাহে একদিন নাচ শেখানো হত। ভিনসেণ্ট দুপুরের পর পাড়ার চার থেকে আট বছরের ছেলেমেয়েদের এখানে জড়ো করত। তাদের সে বর্ণপরিচয় শেখাত আর বাইবেলের ছোট ছোট গল্প শোনাত। এসব ছেলেমেয়ের অনেকেই এর আগে কখনো লেখাপড়ার সংস্রবে আসে নি। ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশও তাদের জীবনে এই প্রথম।

ভিনসেণ্ট ঘরখানা প্রধানত জেকস্ ভার্নির সাহায্যেই জোগাড় করতে পেরেছিল। একদিন জেকস্ ভার্নিকে সে বলল, "ঘরখানা গরম রাখা দরকার। তার জন্য কয়লা চাই। কয়লা কোথায় পাই বলুন ত? ছেলেদের তো গরমের মধ্যে রাখতে হবে। তা ছাড়া, স্টোভ জ্বালিয়ে রাখতে পারলে রাত্রির সভাও একটু বেশিক্ষণ ধরে চালানো যেতে পারে।"

জেকস্ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কি ভাবলেন। তারপর বললেন, "কাল দুপুরে এখানে আসবেন। আমি বলে দেব।"

পরের দিন 'সেলোনে' এসে ভিনসেণ্ট দেখতে পেল, একদল স্ত্রীলোক সেখানে তারই অপেক্ষায় বসে আছে। তারা খনিমজুরদের স্ত্রী ও কন্যা। পরনে কালো ব্লাউজ এবং লম্বা কালো স্কার্ট; মাথায় নীল রুমাল বাঁধা। তারা সকলেই এক একটা থলে নিয়ে এসেছে।

ভার্নির ছোট মেয়েটি বলল, "মঁসিয়ে ভিনসেণ্ট, দেখুন আমি আপনার জন্যও একটা থলে এনেছি, এতে আপনাকেও কিন্তু কয়লা ভরতে হবে।"

মজুরদের কুঁড়েঘরের কানাচ দিয়ে আঁকা-বাঁকা পথ। সেই সব পথ দিয়ে তারা ওপরে উঠতে লাগল। টিলার উপরে ডেনিস পরিবারের রুটির কারখানা অতিক্রম করল। যে মাঠের মাঝখানে মার্কাসি খনি রয়েছে, সেই মাঠে পা দিল। তারপর কারখানা ঘরগুলির প্রাচীর ঘেঁসে হাঁটতে হাঁটতে অবশেষে একেবারে পিছনের সেই কালো পিরামিড স্তূপের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। দল ভেঙে দিয়ে তারা পৃথক্ পৃথক্ হয়ে গেল। তারপর এক একজন এক এক দিক থেকে স্তূপে আক্রমণ করল। ছোট ছোট পোকা মড়া কাঠের গুঁড়িকে যেভাবে ছেয়ে ফেলে, তারাও তেমনিভাবে স্তূপটাকে দখল করে নিল। থলে হাতে করে প্রত্যেকেই চার দিক দিয়ে উপরে উঠতে লাগল।

মাদমোয়াজেল ভার্নি বললে, "মঁসিয়ে ভিনসেণ্ট, আপনাকে একেবারে ওপরে যেতে হবে; এর আগে আপনি কয়লা পাবেন না, কেননা, বছরের পর বছর আমরা নীচে থেকে কয়লা কুড়িয়ে নিয়ে খালি করে দিয়েছি। চলে আসুন আপনি ওপরে। এর মধ্যে কয়লা কোনটা দেখিয়ে দিচ্ছি।"

সে ছাগলছানার মতো লাফিয়ে লাফিয়ে ওপরে উঠতে লাগল। কিন্তু ভিনসেণ্টকে বেশির ভাগ উঠতে হল হামাগুড়ি দিয়ে। কারণ, তার পায়ের তলার মাটি সরে যাওয়ার দরুণ সে খাড়া থাকতে পারছিল না।

মাদমোয়াজেল ভার্নি আগে আগে চলেছে মাঝে মাঝে হাঁটু গেড়ে বসে দলাবাঁধা কাদার মতো কি তুলছে। হাতে নিয়ে সেটা পরীক্ষা করছে। তারপর ভিনসেণ্টের দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছে। বেশ চটপটে চালাক চতুর মেয়ে দেখতে বেশ সুন্দরী। ভার্নি যখন 'ফোরম্যান' হয়, মেয়েটি তখন সাত বছরের। সে কখনো খনিতে যায়নি, কাজেই খনির ভিতরের হাল অবস্থা সে কখনো চোখে দেখেনি।

সে চীৎকার করে ডাকল, "ম'সিয়ে ভিনসেণ্ট, উপরে উঠে আসুন। উপরে না এলে ভালো কয়লা পাবেন না। সবারই থলে ভরা হয়ে যাচ্ছে। আপনি পিছিয়ে পড়ছেন। উপরে উঠে আসুন।" তার কয়লা কুড়ানো একটা খেলা মাত্র; প্রয়োজন নয়। কেননা ভার্নি খুব কম দামে কোম্পানি থেকে কয়লা কিনতে পায়।

একেবারে উপরে যাওয়া তাদের হয়ে উঠল না। কেননা, খনি থেকে ছোট ছোট গাড়ি ভর্তি করে এনে ওপরে থেকে আবর্জনা ঢালা হচ্ছে। আগে এক পাশে ঢালা হয়ে গেলে, তারপর আর এক পাশে ঢালছে—রোজ যেমন ঢালা হয়। এই অত্যুচ্চ পিরামিড থেকে কয়লা বেছে বের করা, কাজটা বড়ো সহজ নয়। মাদমোয়াজেল ভার্নি তাকে দেখিয়ে দিল, এই-ভাবে এক একটা দলা হাতে নিয়ে আঙ্গুল ফাঁক করে হাতখানা ছড়িয়ে ধরতে হবে, তাতে কাদা, পাথরের কুচি, মাটি—সব বাজে জিনিস আঙুলের ফাঁক দিয়ে পড়ে যাবে। হাতে কেবল কয়লা থেকে যাবে। এখানে আবর্জনার সঙ্গে কোম্পানীর যে কয়লা নষ্ট হয় তা অতি সামান্য। তা আবার ঠিক কয়লাও নয়। মজুরদের বউ ঝিরা এখানে যা কুড়োয়, তা একরকমের দলাবাঁধা পাথরের কুচি। কয়লার বাজারে এ জিনিস কেউ কেনে না। বৃষ্টি ও বরফ পড়ে টিলার সর্বাঙ্গ ভিজে গিয়েছে। ভিন-সেণ্টের হাতদুটি এরই মধ্যে কেটে আঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছে। কয়লা মনে করে নানা পদার্থ দিয়ে থলের সিকি অংশ মাত্র সে ভরতে পারল। মেয়েরা কিন্তু ততক্ষণে তাদের থলে প্রায় পুরো করে এনেছে।

মেয়েরা যার যার থলে 'সেলানো' রেখে তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে গেল। সংসারের কাজ করতে হবে। কিন্তু যাবার আগে তারা প্রতি-শ্রুতি দিয়ে গেল রাতে লোকজন নিয়ে তারা ধর্মসভাতে অবিশ্যি যোগ দেবে। মাদমোয়াজেল ভার্নি তাদের বাড়িতে খাবার জন্য ভিনসেণ্টকে নিমন্ত্রণ করলে ভিনসেণ্ট তা সানন্দে গ্রহণ করল। ভার্নির বাড়িতে ঘর দুখানা। একখানাতে স্টোভ, রান্নার জিনিসপত্র ইত্যাদি। অন্য ঘরখানা তাদের শোবার ঘর। ভার্নির অবস্থা ভাল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার ঘরে একখানা সাবান নেই। এর কারণ, ভিনসেণ্ট শুনেছে, বরিনেজের বাসিন্দাদের পক্ষে সাবান ব্যবহার একটা অসম্ভব বিলাসিতা। যেদিন থেকে এখানে বালকেরা কয়লার খনিতে নামে এবং বালিকারা টিলার কয়লা কুড়োতে যায় সেদিন থেকে শুরু হয়ে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত বরিনেজ-বাসীদের হাতে মুখে কয়লা। এ কয়লা থেকে তারা সারা জীবনে কখনো মুক্ত হতে পারে না।

মাদমোয়াজেল ভার্নি ভিনসেণ্টের জন্য এক কড়া ঠাণ্ডা জল এনে রাস্তার পাশে রেখে দিল। ভিনসেণ্ট প্রাণপণে সারা দেহ রগড়াতে লাগল। তাতে কয়লার কালি কতখানি উঠেছে জানতে পারেনি। কিন্তু, যখন মেয়েটির সামনে গিয়ে বসল এবং দেখল, তার মুখে এখনো কালো কালো দাগ লেগে রয়েছে—ধোঁয়ার কালিমা এখনো মুখ থেকে যায়নি, তখন সে বুঝতে পারল তার নিজের মুখখানাও নিশ্চয় ওই রকমই দেখাচ্ছে। খেতে বসে মাদমোয়াজেল ভার্নি অনেক রকম গল্প করল।

জেক্‌স বলল, "ম'সিয়ে ভিনসেণ্ট, আপনি পেটিট ওয়াসমেসে এসেছেন আজ দুমাস তবু এখনো আপনি বরিনেজকে ঠিক ঠিক জানতে পারেন নি।"

ভিনসেণ্ট বিনীতভাবে উত্তর দিল, "হ্যাঁ ম'সিয়ে ভার্নি, একথা ঠিক। তবে আমার মনে হয়, এখানকার লোকদের সম্বন্ধে অল্পে অল্পে আমার ধারণা স্পষ্ট হচ্ছে। আমি তাদের কিছু কিছু করে বুঝতে পারছি।"

জেক্‌স নাকের ভিতর থেকে লম্বা একটি লোম টেনে বের করে মনোযোগের সঙ্গে সেটা দেখতে দেখতে বলল, "আমি তা বলছি না। আমি বলছি, আপনি কেবল আমাদের মাটির ওপরের যে জীবনযাত্রা, সেটাই দেখেছেন। কিন্তু সেটা মোটেই আমাদের জীবন নয়। মাটির ওপরে আমরা কেবল ঘুমোতে আসি। আমাদের জীবনটা আসলে কি, তা যদি জানতে চান, আপনাকে খনিতে নামতে হবে। নেমে দেখতে হবে, ভোর থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত আমরা কিভাবে সেখানে কাজ করি।"

ভিনসেণ্ট বলল, "খনিতে নামতে আমারও খুব ইচ্ছে। কিন্তু কোম্পানী আমাকে অনুমতি দেবে কি?"

জেক্‌স একখামচা চিনি মুখে পুরে তার সঙ্গে সঙ্গে কালো তেতো কফি ঢেলে ঢোক গিলতে গিলতে বলল, "আপনার জন্য আমি অনুমতি চেয়ে পাঠিয়েছি। খনি নিরাপদ আছে কিনা, দেখবার জন্য কাল আমি মার্কাসি খনিতে নামব। ভোরে আপনি ডেনিসদের বাড়ির সামনে তিনটা বাজতে পনেরো মিনিট আগে দাঁড়িয়ে থাকবেন। আপনাকে তুলে নিয়ে যাব।"

(ক্রমশ)

---

# অবচেতন

**উপেন্দ্রকুমার মালাকার**

ঘুমিয়ে অনেক দিন,
অনেক দিনের যাযাবরী জীবন,
আজ জাগিলাম
এই মৃত্যু নদীর কিনারে।
সুপ্ত কামনা যতো
হঠাৎ সাপের ফণার মতো মাথা তুলে জাগে;
অনেক ক্ষুধা,
অনেক তৃষ্ণা এখনো রয়েছে বাকি—
এ ভগ্ন দেহ দেউলে।
অবাক আমি!
জানতুম না এমনি করে' নিজের নগ্ন পরিচয়,
জানতুম না এমনি করে' গজিয়েছে কখন—
আমিও যে কামনা করেছি—
আর সবার মতোঃ
একটি নারী,
একটি নীড়,
আর তারি ছায়া শীতল প্রাঙ্গণে—
খেলারত উজ্জ্বল, বলিষ্ঠ
দু'একটি শিশু।
আশ্চর্য!
এতদিন ধরে' এই কামনা করেছি আমি?
আজ কিন্তু অবাক।

# হিউএন্ চ্যাঙ্-এর ভারতভ্রমণ

—শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু—

(পূর্বানুবৃত্তি)

## গান্ধার-উদ্যান-তক্ষশীলা

প্রাচীন কালে হিন্দুকুশ থেকে সিন্ধুনদ পর্যন্ত শুভ বস্তু (আধুনিক শ্বাট্) নদী আর সিন্ধুনদের অববাহিকার দক্ষিণ অংশের নাম ছিল গান্ধার। এই প্রদেশে কতকগুলি বিখ্যাত নগর ছিল, যথা—কপিশা (আধুনিক কাবুলের উত্তরে কাবুল নদীর তীরে), নগরহার (আধুনিক জালালাবাদ), পুরুষপুর (আধুনিক পেশাওয়ার), পুস্কলাবতী (আধুনিক চার সাড্ডা)।

গান্ধারের উত্তরে রমণীয় উদ্যানের মত শুভবস্তু আর পান্জ্কোরা নদীর তীরবর্তী (আধুনিক চিত্রল ও তার পূবের আর দক্ষিণের) অংশের নাম ছিল উদ্যান।

সিন্ধুনদ থেকে বিতস্তা (ঝিলম) পর্যন্ত সমতলের নাম ছিল তক্ষশীলা (এর প্রধান নগরও ছিল তক্ষশীলা)। এর উত্তরের পার্বত্য প্রদেশের নাম ছিল উরসা (আধুনিক হাজারা)।

আলেকজান্দারের আগে সিন্ধুনদ পর্যন্ত ইরাণের হকামনিষিয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আলেকজান্দার এ সমস্ত জয় করেন। কিন্তু তার অব্যবহিত পরেই মৌর্য সম্রাটরা হিন্দুকুশ পর্যন্ত সমস্ত দেশ তাঁদের সাম্রাজ্যভুক্ত কোরে নেন। তাঁদের প্রাদেশিক রাজধানী ছিল তক্ষশীলায় (আধুনিক হাসান্ আবদাল্) আর তাঁরা এই প্রদেশের নামও দেন তক্ষশীলা। অশোক যুবরাজ অবস্থায় রাজ-প্রতিনিধিরূপে এখানকার শাসনকর্তা ছিলেন। তারপর তিনি যখন সম্রাট হোয়ে সোৎসাহে ধর্মপ্রচার করছিলেন, তখন তাঁর পুত্র কুনাল তক্ষশীলায় রাজপ্রতিনিধি ছিলেন। আর পিতার আদেশে অসংখ্য সঙ্ঘারাম, স্তূপ, বিহার ইত্যাদি নির্মাণ করেন। অশোক যখন বুদ্ধের অস্থির নানা অংশ সমস্ত দেশে বিতরণ করেন, তখন এদেশেও কিছু কিছু বিতরণ কোরে তার উপর স্তূপ নির্মাণ করেছিলেন।

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর গ্রীকরা এ সমস্ত দেশ আবার জয় কোরে ছোট ছোট গ্রীক রাজ্য স্থাপন করে আর তুখার থেকে তক্ষশীলা পর্যন্ত প্রদেশের নাম দেয় বাক্ট্রিয়া। এখানকার গ্রীকরাও ক্রমশ বৌদ্ধ (কেহ কেহ বৈষ্ণব, শৈব ইত্যাদি) হোয়ে যায়। এরপর ক্রমান্বয়ে শক্, পহ্লব, কুষানরা গ্রীকদের থেকে এ প্রদেশ অধিকার করে। তাতার কুষানরা ক্রমশ বৌদ্ধ হোয়ে যায়। সম্ভবত কুষানদের রাজত্বকালে খৃষ্টাব্দের প্রথম শতাব্দীতে চীনদেশে বৌদ্ধ ধর্ম প্রথম প্রচারিত হোতে আরম্ভ হয়। কিন্তু মৌর্যদের বৌদ্ধধর্ম থেকে কুষানদের বৌদ্ধ-ধর্মে অনেক প্রভেদ ছিল। কারণ এই সময়েই মহাযানের প্রচার আরম্ভ হয়। কেহ কেহ বলেন, বিখ্যাত মহাযানী নাগার্জুন কুষানরাজ কনিষ্কের সভায়ই মহাযান মতের প্রচার করেন। কুষানরা এই অঞ্চলে বহু সঙ্ঘারাম, বিহার, স্তূপ ইত্যাদি নির্মাণ করেছিলেন। মহাযানী বৌদ্ধের কাছে কনিষ্ক রাজাও অশোকরাজার মতই শ্রদ্ধার পাত্র।

হিউএনচাঙের ভারত আগমনের দুই শত বছর আগে একদল তাতার হূনরা ভারত আক্রমণ করে। এরা ভীষণ নৃশংস, বর্বর ছিল। উত্তর-পশ্চিম থেকে সমস্ত দেশে লুঠ ও হত্যা করতে করতে নগর, মন্দির, স্তূপ, সঙ্ঘারাম, ভাস্কর্য ইত্যাদি ধ্বংস করতে করতে এরা অগ্রসর হোল। কুষানরা উদ্যান ও কাশ্মীরে পালিয়ে গেলেন। গুপ্ত সাম্রাজ্য ধ্বংস হোয়ে গেল। বর্বরদের মধ্যেও সবচেয়ে নৃশংস ছিল তোরমানের পুত্র মিহির গুল। সৌভাগ্যক্রমে মালবরাজ যশোবর্মণ, মগধের শেষ গুপ্ত সম্রাট বালাদিত্যের সঙ্গে মিলিত হোয়ে ৫২৮ খৃষ্টাব্দে হূণ সৈন্যদল পরাজিত কোরে মিহির গুলকে বন্দী করেন। কিন্তু (হিউএনচাঙ্ বলেন, বালাদিত্যের মাতার সুপারিশে) তাকে হত্যা না কোরে নির্বাসন দিলেন। মিহির গুল কাশ্মীরে আশ্রয় নিল। কিন্তু ষড়যন্ত্র কোরে আশ্রয়দাতার সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়ে দিল আর কাশ্মীররাজকে হারিয়ে কাশ্মীর আর গান্ধারের অধিবাসীদের হত্যা করতে লাগল। যা হোক্ এর বছর খানেক পরে তার

**ভারতবর্ষ**
**(সপ্তম খৃষ্টাব্দী)**

মৃত্যু হয়। আর সেইথেকে হূণদের অত্যাচার ভারতে বন্ধ হয়। উত্তর-পশ্চিমে আর মালবে হূণদের ছোট ছোট রাজ্য টিকে ছিল বটে, কিন্তু ক্রমশ এরাও ভারতীয়ই হোয়ে যায়।

হিউএনচাঙের সময়ে গান্ধারের রাজা যদিও সম্ভবত বর্বর হূণবংশীয়ই ছিলেন, তবু একশত বছর সুভ্য জাতির সংস্পর্শে এসে এদের অনেকটা উন্নতি হয়েছিল। রাজা স্বয়ং উৎসাহী বৌদ্ধ ছিলেন। তাঁর রাজধানী ছিল বর্তমান কাবুলের উত্তরে কপিশায়।

হিউএনচাঙ্ কপিশাতেই প্রথমে নগ্ন শৈব আর গায়ে ছাইমাখা, হাড়ের মালা গলায়, শৈব সন্ন্যাসীর দেখা পান। কিন্তু তখনো এ প্রদেশের বেশীর ভাগ লোকই বৌদ্ধ ছিল। হীনযান, মহাযান, দুই যানের ভিক্ষুরাই হিউএনচাঙকে নিমন্ত্রণ করলেন, কিন্তু হীনযানী প্রজ্ঞাকার (কুচা থেকে) হিউএনচাঙের পথের সঙ্গী থাকায় তাঁর খাতিরে হিউএনচাঙ একটা হীনযানী সঙ্ঘারামেই আশ্রয় নিলেন। পনজ্‌শির নদীর তীরে এই সঙ্ঘারামের ভগ্নাবশেষ আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিকরা সনাক্ত করেছেন। হিউএনচাঙ বলেন, কনিষ্ক রাজা অনেক রাজাদের যুদ্ধে হারিয়ে রাজপুত্রদের বন্দী কোরে জামীনস্বরূপ এই অট্টালিকায় রেখেছিলেন। সেই অট্টালিকায়ই এই সঙ্ঘারাম হয়েছে। রাজপুত্রেরা মাটির তলায় ধনরত্ন প্রোথিত কোরে রেখেছিলেন। হিউএনচাঙ এখানে থাকবার সময়ে সেই গুপ্তধন আবিষ্কার করবার সহায়তা করেছিলেন।

এ পর্যন্ত হিউএনচাঙ হীনযানীদের দেশের ভিতর দিয়ে আসছিলেন। এখানে মহাযানীদের সাহায্য পেয়ে আনন্দ বোধ করলেন। স্বয়ং রাজা ছিলেন উৎসাহী মহাযানী। এই সময়ে তিনি নানা মতের পণ্ডিতদের এক বিচারসভা আহবান করেছিলেন। সে সভা ৫ দিন চলেছিল। হিউএনচাঙ আর প্রজ্ঞাকারকে রাজা এ সভায় যোগ দিতে অনুরোধ করেছিলেন। সভার পর রাজা সকলকেই দক্ষিণা দিয়েছিলেন।

প্রজ্ঞাকার এখান থেকে ফিরে গেলেন। হিউএনচাঙ গ্রীষ্মকালটা ঐ সঙ্ঘারামে কাটিয়ে আবার পূর্ব দিকে চললেন। কাবুল নদীর দক্ষিণ তীর ধরে নগরহারে (জালালাবাদ) এলেন। এদেশ সম্বন্ধে তিনি বলেন, এখানে প্রচুর শস্য, ফুল ফল হয়। আবহাওয়া আর্দ্র, গরম। লোকগুলি সৎ, সরল, সাহসী, বিদ্যার আদর করে, ধনের আদর করে না। বহু সঙ্ঘারাম আছে, কিন্তু ভিক্ষুর সংখ্যা কম। স্তূপগুলির ভগ্নাবস্থা। পাঁচটি দেবমন্দির আর আন্দাজ একশ বিধর্মী (অ-বৌদ্ধ) আছে। নগরের চারিদিকেই হূণদের দ্বারা ধ্বংস করা বহু সঙ্ঘারাম দেখা গেল। অশোকনির্মিত একটি প্রকাণ্ড স্তূপ ছিল। এইখানেই বুদ্ধ এক পূর্বজন্মে সে সময়কার বুদ্ধ দীপঙ্করের সাক্ষাৎ ও আশীর্বাদ লাভ করেন। নগরহারের কাছে হিড্ডা নগরে বুদ্ধের মাথার খুলি একটি স্তূপে রাখা ছিল।

নগরহার থেকে ৪।৫ মাইল দূরে একটা গুহা ছিল, যেখানে বুদ্ধ নাগরাজ গোপালকে পরাজয় কোরে নিজের ছায়া রেখে গিয়েছিলেন। ধর্মগুরু এটা দেখবার ইচ্ছা করলেন। (প্রত্নতাত্ত্বিক "ফুশে" "চাহার বাগ" গ্রামের কাছে এই গুহা সনাক্ত করেন)। এই গুহায় যাওয়া বিপজ্জনক ছিল। পথে নৃশংস দস্যুর হাতে প্রাণহানির ভয় ছিল। সঙ্গীরা বৃথাই হিউএনচাঙকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করলেন। তিনি বললেন—"লক্ষ কল্পেও একবার বুদ্ধের ছায়া দর্শন দুর্লভ। এতদূরে এসে এ না দেখে কি আমি থাকতে পারি? আপনারা আস্তে আস্তে অগ্রসর হোন। আমি শীঘ্রই ফিরে আসছি।"

পথে কেবল এক বৃদ্ধ তাঁর পথ প্রদর্শক হোতে রাজী হয়। অল্প কিছু দূরে যাবার পর পাঁচজন দস্যু খড়্গ হস্তে পথরোধ করলো। ধর্মগুরু মাথার টুপি খুলে তাঁর তীর্থযাত্রীর পরিচ্ছদ দেখালেন। একজন দস্যু বললে—"গুরুদেব! আপনি কোথায় যেতে চান?" ধর্মগুরু উত্তর দিলেন—"আমি বুদ্ধের ছায়া দর্শন আর পূজো করতে যেতে চাই। দস্যু বলল—শোনেননি কি যে এদিকে দস্যুভয় আছে?" সাধু জবাব দিলেন—"দস্যুরাও তো মানুষই। আমি বুদ্ধের আরাধনা করতে যাচ্ছি। পথে যদি হিংস্র পশুও থাকে, তবু আমি নির্ভয়ে যাব। তোমাদের তো কথাই নেই। তোমাদের মনে তো দয়ার বৃত্তি আছে।" হিউ এন চাঙের

জীবনীকার বলেন,—"একথা শুনে দস্যুদের মনে দয়া হোল, তাদেরও ধর্মে মতি হোল।"

তারপর হিউ এন চাঙ গুহায় প্রবেশ করলেন। গুহাটি ছিল পশ্চিমমুখী। প্রথমে অন্ধকারে কিছুই দেখতে পেলেন না। বৃদ্ধ পথ-প্রদর্শক বোলল,—"গুরুদেব! ভিতরে চোলে যান। পূবের দেওয়ালটা পর্যন্ত যখন পৌছবেন, তখন পঞ্চাশ পা পিছিয়ে এসে পূবের দিকে চেয়ে দেখবেন। ঐখানেই ছায়া আছে।"

ধর্মগুরু একাই গুহায় ঢুকে ঐ কথামত পূবের দেয়াল থেকে পঞ্চাশ পা পিছিয়ে পূব দিকে চেয়ে স্থির হয়ে রইলেন। তারপর গভীর বিশ্বাসভরে একশো বার নমস্কার করলেন। কিছুই দেখতে পেলেন না। তখন নিজেকে মহাপাপী জ্ঞান কোরে নিজেকে ভৎর্সনা করতে করতে গভীর দুঃখে ক্রন্দন করতে লাগলেন। আবার সরল মনে নমস্কার করতে করতে গাথা আর সূত্র আবৃত্তি করতে লাগলেন।

তখন অলৌকিক ঘটনা ঘটল। এই ভাবে শতবার প্রণত হবার পর পূবের দেওয়ালে, ভিক্ষুর ভিক্ষাপাত্রের আকারের একটা আলোর আভা মুহূর্তের জন্যে দেখতে পেলেন। দুঃখে, আনন্দে আবার আরাধনা করতে লাগলেন—আবার ক্ষণিকের জন্যে তার চেয়েও একটা বড় আভা দেখতে পেলেন। প্রেম ও উৎসাহে পূর্ণ হোয়ে তিনি শপথ করলেন যে, পবিত্র ছায়া না দেখে তিনি কিছুতেই যাবেন না। এই ভাবে আরাধনা করতে করতে হঠাৎ সমস্ত গুহাটা একটা প্রভায় সমুজ্জ্বল হোয়ে উঠল আর হঠাৎ মেঘ কেটে গিয়ে যেমন স্বর্ণ পর্বতের আশ্চর্য দৃশ্য দেখা যায়, তেমনি পূর্বে দেওয়ালে উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণে তথাগতের মহিমাময় ছায়া প্রকাশ হোল। তাঁর দৈব আনন অত্যুজ্জ্বল প্রভাময়! হিউ এন চাঙ গভীর আনন্দে পূর্ণ হোয়ে তাঁর মহিমান্বিত অনুপম আরাধ্যকে দেখতে লাগলেন। বুদ্ধের শরীর আর সন্ন্যাস বস্ত্র গৈরিক বর্ণের ছিল। হাঁটুর উপরের সমস্ত শরীরের শোভা সমুজ্জ্বল ছিল। কিন্তু নীচের কমলাসন কতকটা ঝাপসা ছিল। তাঁর ডাইনে, বামে, পিছনে বোধিসত্ত্বদের আর পূণ্যাত্মা ভিক্ষুদের ছায়া দেখা যাচ্ছিল।

এই অলৌকিক দৃশ্য দেখবার পর ধর্মগুরু দেখলেন, ছয়টি লোক বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। ধর্মগুরু তাদের ধূপধূনা আর আগুন আনতে বললেন। আগুন ভিতরে আনতেই বুদ্ধের ছায়া অদৃশ্য হোল। তখনই তিনি আগুন নিভিয়ে ফেললেন আর ছায়া আবার আভির্ভূত হোল। ঐ ছয় ব্যক্তির মধ্যে পাঁচজন ছায়া দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু একজন কিছুই দেখতে পারেনি। এও কেবল মুহূর্ত মাত্র থেকে আবার মিলিয়ে গেল। হিউ এন চাঙ ভক্তিভরে প্রণত হোয়ে বুদ্ধের আরাধনা করতে করতে ফুল আর পূজা নিবেদন করলেন। তারপর সেখান থেকে বিদায় নিলেন।

নগরহার ছেড়ে হিউ এন চাঙ খাইবার পাশের ভিতর দিয়ে এসে গান্ধারের প্রধান নগর পুরুষপুর (পেশাওয়ার) এলেন। এইখানেই কুষাণ সম্রাট কণিষ্কের শীতকালের রাজধানী ছিল। (গ্রীষ্মকালে তিনি কপিশাতে থাকতেন)। হিউ এন চাঙ মহাযানের যে শাখার অনুগামী ছিলেন, তার স্থাপয়িতা দার্শনিক ভ্রাতৃদ্বয় অসঙ্গ ও বসুবন্ধু, হিউ এন চাঙের দুইশত বর্ষ আগে পুরুষপুরেই জন্মগ্রহণ করেন। এখানে এসে তিনি একথা সানন্দে স্মরণ করলেন।

দুঃখের বিষয় হিউ এন চাঙ ৬৩০ খৃস্টাব্দে যখন পুরুষপুরে আসেন তার ২০০ বছর আগে বর্বর মিহিরগুল এদেশ ধ্বংস করেছিল। তিনি বলেছেন,—"নগর, গ্রাম সবই প্রায় জনশূন্য। পুরুষপুরের এক কোণে কেবল হাজার খানেক পরিবার বাস করে। লক্ষ লক্ষ বৌদ্ধ মঠের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। এগুলির উপর গাছ জন্মাচ্ছে। বেশীর ভাগ স্তূপ ধ্বংস হয়েছে। পুরুষপুরে রক্ষিত বুদ্ধের ভিক্ষাপাত্র পর্যন্ত বর্বররা লুঠ কোরে নিয়ে গিয়েছিল।

হিউ এন চাঙের পূর্ববর্তী চৈনিক পরিব্রাজকরা পুরুষপুরে, কণিষ্ক নির্মিত একটা প্রকান্ড স্তূপের উল্লেখ করেছেন। এত প্রকান্ড স্তূপ জম্বুদ্বীপে আর দ্বিতীয় ছিল না। একজন দর্শক এর এই বিবরণ দিয়েছেন—৩০ ফুট উঁচু ভিতের উপর, চমৎকার পালিশ করা কারুকার্যময়, পাথরের একটা পাঁচতলা উঁচু অট্টালিকা। তার উপরে ১২০ ফুট উঁচু খোদাই কাজ করা কাঠের বাড়ী। তার উপর ৩০০ ফুট উঁচু একটা লৌহস্তম্ভ। এতে পর পর ১৫টা সোনালী ছাতা। সমস্তটা কেউ কেউ বলেন ৭০০ ফুট উঁচু ছিল, অন্যেরা বলেন ১০০০ ফুট। হিউ এন চাঙ এর ভগ্নাবশেষ দেখেছিলেন। তখনও এর প্রধান অট্টালিকাটা ৪০০ ফুট উঁচু ছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, স্পুনার (D. B. Spooner) এই ভগ্নাবশেষ খনন কোরে কণিষ্কের মূর্তি অঙ্কিত একটা আধারে রক্ষিত বুদ্ধাস্থি পান। এই বুদ্ধাস্থি ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধদের দেওয়া হয়। আধারটা পেশাওয়ারের মিউজিয়ামে রাখা আছে।

কণিষ্কের স্তূপের পশ্চিমে হিউ এন চাঙ কণিষ্ক নির্মিত একটা অতি সুন্দর বিহারের ভগ্ন্যবশেষও দেখেছিলেন।

হিউ এন চাঙ পুরুষপুরে প্রচুর আঁখ আর গুড় তৈরী হোতে দেখেছিলেন। এ সময়ে চীন দেশের লোকে জানতো না যে আঁখ থেকে গুড় তৈরী হয়। হিউ এন চাঙ ও অন্যান্য ভ্রমণকারীদের বর্ণনা শুনে চীন সম্রাট ঠাই চুঙ আঁখের গুড় তৈরী করা শিখতে ভারতবর্ষে লোক পাঠিয়েছিলেন। আবার এর কয়েক শত বছর পর থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত চীন দেশ থেকে প্রচুর চিনি ভারতবর্ষে আমদানী করা হোত। 'চিনি'—এ নামও তারি জন্যেই।

পুরুষপুর ছেড়ে আবার কাবুল নদী পার হোয়ে হিউ এন চাঙ কাবুল নদী আর শুভবস্তু (শ্বাট) নদীর সঙ্গমস্থলে পুস্কলাবতী এলেন। এখানে পুরাকালে গ্রীকদের এক রাজধানী ছিল। এখানে হিউ এন চাঙ সম্রাট অশোক নির্মিত একটা স্তূপ দেখেন। বুদ্ধ এক পূর্ব জন্মে যেখানে তাঁর দুটি চোখ দান করেছিলেন, এ স্তূপ সেখানে নির্মিত।

পুস্কলাবতী থেকে হিউ এন চাঙ আবার উত্তরে পার্বত্য প্রদেশে প্রবেশ কোরে হারিতী স্তূপ, একশৃঙ্গ স্তূপ, বেস্সান্তর স্তূপ দর্শন করেন। এসব বুদ্ধের পূর্ব জন্মের ঘটনাস্থল। সর্বত্রই অশোক রাজা নির্মিত বহু স্তূপ ও সঙ্ঘারাম ছিল—বেশীর ভাগই হূণদের অত্যাচারে প্রায় জনশূন্য। আধুনিক সাবাজগাড়ির কাছে 'বিধর্মী' (হিন্দু)দের দেবতা ভীমা দেবীর মূর্তি নীল পাথরের গায়ে খোদিত ছিল। 'ইনি ঈশ্বরের পত্নী। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলেই বিশ্বাস করে যে, এই মূর্তির অলৌকিক ক্ষমতা আছে। আর ভারতের সর্বত্র থেকে লোকে এখানে পূজো দিতে আসে। যারা দেবতার আকার দেখতে চায়, এ রকম বিশ্বাসী লোক সাতদিন উপোষের পর দেবতাকে দেখতে পায় আর বেশীর ভাগ সময়েই তাদের ইচ্ছা পূর্ণ হয়ও। এই পর্বতের পাদদেশে ভীমাদেবীর পতি মহেশ্বরদেবের একটা মন্দির আছে। ছাইমাখা বিধর্মীরা এখানে পূজো দিতে আসে।"

উদ্যান ও উরশার প্রধান প্রধান স্তূপগুলি দেখে হিউ এন চাঙ আবার দক্ষিণে এলেন আর ব্যাকরণকার পাণিনির জন্মস্থান শলাতুরের কাছে উদভাণ্ড নগরে (বর্তমান উনড্) সিন্ধুনদ পার হলেন। তিনি বলেন, এ সময়েও শলাতুরের ব্রাহ্মণদের বিদ্যাবুদ্ধি ও স্মরণশক্তির খ্যাতি ছিল।

তক্ষশীলায় এসেও দেখলেন, সেই একই অবস্থা সর্বত্র কেবল হূণদের অত্যাচারের চিহ্ন। "অনেক সঙ্ঘারাম আছে, কিন্তু সবই দুর্দশাগ্রস্ত।"

সঙ্ঘারাম আর স্তূপের ধ্বংসাবশেষ দেখতে দেখতে, কয়েকটি গিরিবর্ত্ম আর লোহার পুল অতিক্রম কোরে হিউ এন চাঙ কাশ্মীরে পৌছলেন।

(পূর্বানুবৃত্তি)

বকুলবাগানের দক্ষিণে মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তা ঘেঁষে এক চিলতে সবুজ জমি। মাঝখান দিয়ে লাল সুরকি-ঢালা ঝাউ ছায়ায় মোড়া সরু আঁকাবাঁকা পথ।

যেন শহরের সবচেয়ে মার্জিত অঞ্চল এটা।

নিশ্চয়ই, এটা কালচারের কেন্দ্র। প্রফেসার পাড়া।

লাল টালি-ছাওয়া মাধবীবিতান ঘেরা সুন্দর কয়েকখানা ঘর। সবগুলো প্রায় এক-রকম দেখতে। স্থানীয় কলেজের ন'জন অধ্যাপকের আস্তানা। সেদিন বেলা দশটার সময় দেখা গেল একটি ঘরের বারান্দায় চুপচাপ বসে আছে এক যুবক। হাতে সেদিনের খবরকাগজ। এঁর নাম বিদ্যুৎবিকাশ। রোগা ছিপছিপে নিরীহ চেহারা। হ্যাঁ, ইনি ইউনিভার্সিটির একজন নামকরা ছাত্র। ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। কিছু বেশি টাকা মাইনে পেয়ে মফঃস্বল কলেজে চলে এসেছেন অধ্যাপনা করতে। সস্ত্রীক আছেন এখানে।

সম্প্রতি এ শহরে এসেছেন।

স্টেটস্‌ম্যানের আদ্যোপান্ত পড়া শেষ করে বিকাশবাবু (এই নামেই তিনি এখানে বেশি পরিচিত) হাই তুললেন ঘড়ি দেখলেন।

ঘড়ির কাঁটা দশটার দাগ পার হ'তে চলল। ভুরুতে অশান্তি নিয়ে, দেখা গেল বিদ্যুৎ-বিকাশ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

পাইচারী করলেন বারাণ্ডাটা দু'বার। ভাবছিলেন চেয়ারম্যানের মেয়ে লিলি আজ কেন এখন পর্যন্ত এল না। হ্যাঁ, কথা ছিল ওর আসার।

কথা হ'য়েছিল কাল বিকেলে ওপাড়ার একটা রেস্টুরেন্টে। মেয়েরা সেখানে জড়ো হয়েছিল আর কি ক'রে, বিদ্যুৎবিকাশও হঠাৎ সেখানে গিয়ে পড়েছিলেন।

'মেয়েদের সমিতির অ্যানিভার্সারিতে পড়া চলে এমন একটি প্রবন্ধ লিখে রাখবেন বিকাশবাবু।' বলছিল সবাই।

কাল অর্ধেক রাত জেগে বিদ্যুৎবিকাশ প্রবন্ধটি রচনা করে রেখেছেন বেশ বাছা বাছা শব্দ যুগিয়ে, অথচ এখন পর্যন্ত ওরা কেউ এলই না।

সকালের রোদ তেতে আগুন হয়ে গেছে। চায়ের পেয়ালা শুকিয়ে খটখটে, মাছি উড়ছে পাত্রের মুখের ধারে। স্টেটসম্যানের পাতাগুলো খসে খসে পড়ল টেবিল থেকে মেঝেয়, এলোমেলো, এধারে ওধারে। বিদ্যুৎবিকাশ পায়ে পায়ে ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে নিয়ে চললেন আর সহস্রবার তাকালেন রাস্তায়, বাইরে, সামনের মৌসুমী ফুল-ছিটোনো সবুজ লনের দিকে।

হঠাৎ যদি শাদা জুতো দেখা যায়।

হলুদ বাঘ ডোরা শাড়ির চমক।

সময় সম্পর্কে বিদ্যুৎবিকাশবাবুর এত সচেতন থাকার কারণ স্ত্রী মিনতি এইবেলা ঘরে ফিরবে।

না, মিনতিকে বিদ্যুৎবিকাশ ভয় করেন বললে ভুল হবে, মিনতির ওপর তিনি বিরক্ত এবং কোনো কোনো বিষয়ে খুব বেশি বিরক্ত।

আশ্চর্য দুজনের রুচি, রুচির বৈষম্য।

বিদ্যুৎবিকাশ, মাঝে মাঝে কেন, এখন, ক'দিন ধ'রে সমানেই ভাবছেন।

আশ্চর্য পরিবর্তন দেখা যায় মেয়েদের চরিত্রের। বিশেষ, বিয়ের পর। বিয়ের আগে বিকাশবাবু মিনতির মধ্যে যে রূপ দেখে-ছিলেন, বিয়ের পর পুরো একটি বছরও তা রইল না। Love Marriage. বন্ধুরা অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানিয়েছিল। এমন কি এই এক বছর পরও দূর থেকে কোনো কোনো বন্ধু চিঠি দিয়ে খবর নিচ্ছে, জানতে চাচ্ছে কেমন কাটছে দু'জনের। কেমন কাটাচ্ছে ওরা।

বিদ্যুৎবিকাশের দূরের বন্ধুরা জানতে পারছে না, এই মাত্র আজ সকালেও ঝগড়ার ঝড়ো ঝাপ্‌টা হাওয়া বয়ে গেছে এই ঘরে।

তুলনাটা ঠিক হ'লো না।

শিক্ষিত আধুনিক নব দম্পতীর গৃহের নিঃশব্দ ক্ষুরধার-চকিত কলহ। ধার ও মসৃণতা সমপরিমাণে আছে। উচ্চবাচ্য, লম্ফ-ঝম্প নেই, তাই বাইরে থেকে বোঝা যায় না।

বিদ্যুৎবিকাশ, ভাবছিলেন, কি করে রাতারাতি এলিয়টের কবিতা মিনতির এত খারাপ ঠেকতে পারে। এত ভ্রুকুটি কাব্যালোচনায়।

অবশ্য মসৃণভাবেই মিনতি বলেছে, ব্রজ-মাধববাবু, স্থানীয় কলেজের অঙ্কের গুরু ব্রজমাধব রক্ষিত নদীর ওপারে ইট পোড়াচ্ছে। না, এখনই দালান তুলবে ব'লে নয়, ইট বিক্রী করছে ভদ্রলোক টাকার জন্যে। অধ্যাপক মানুষ ইটের কারবার দিয়েছে নিছক অতিরিক্ত আয়ের জন্যে। ইটের গায়ে পরিষ্কার ছাপ আছে বি এম আর।

সবাই আয় বাড়াচ্ছে এদিনে।

চলতি বাজারদরের অনুপাতে আয় না বাড়লে মানুষকে বিপন্ন হতে দেরি হয় না।

এই সেদিন দর্শনের অধ্যাপক কামাখ্যা চন্দ কয়লার দোকান খুলেছেন চোখমুখ বুজে। কেন খুলবে না, মাস্টারি ক'রে কত আর এক একজনের রোজগার।

বোটানির প্রিয়নাথ নন্দী বাজারে নেমে ব্যবসা আরম্ভ করেছে। বছরে দু'খানা ক'রে স্কুলের পাঠ্যবই ছাড়ছে। একটা কিছু করছে সবাই।

করছে না, করল না শুধু সোনার মেডেল পাওয়া বিদ্যুৎবিকাশ। সব সময় মুখে না বললেও, মিনতি সর্বদাই জানাতে চাইছে, যে-ব্যক্তি অবসর সময় এলিয়ট নিয়ে কাটায়, ছেলেদের মিটিংএ মেয়েদের সভায় প্রবন্ধ পড়ার ঘন ঘন ডাক যার তার ভবিষ্যৎ তমসাবৃত।

ধরতে গেলে বিয়ের প্রায় পরদিন থেকেই বলছে মিনতি 'বিয়ের আগে কাব্য ঢের শোনা গেছে। এখন সংসারী হয়েছ পয়সাকড়ির দিকে মন দাও।' অদ্ভুত দক্ষতার সঙ্গে বলছিল ও।

বিয়ের আগে আনন্দবাবুর বৈঠকখানায় মিনতির পড়ার ঘরে বিদ্যুৎবিকাশ মিনতিকে কবিতা পড়ে শোনাতেন এখন মনে হলে তাঁর লজ্জা হয়।

স্ত্রীকে কবিতা পড়ে শোনানো বিদ্যুৎ-বিকাশ অনেকদিন বন্ধ করে দিয়েছেন।

এখানে আসবার পর থেকেই বিকাশবাবু অন্যান্য অধ্যাপকের বৈষয়িক অবস্থা, তাঁদের অবস্থা পরিবর্তনের উদাম ও আয় বাড়ানোর নানাবিধ কাহিনী শুনছেন মিনতির মুখে। রোজ।

আশ্চর্য, বিদ্যুৎবিকাশ কি কিছুই করবেন না।

● মিনতি পরিষ্কার জিজ্ঞেস করেছে আজ সকালে। না হলে তাকেই নামতে হচ্ছে, নিতে হচ্ছে একটা কিছু অতিরিক্ত রোজগারের অবলম্বনস্বরূপে। মিনতি বেরিয়ে গেছে সকাল বেলা। দূর সম্পর্কের এক জ্যেঠামশাই এসেছে ওর এখানে। একটা মোটা বীমা কোম্পানীর অর্গানাইজার। যদি বোঝে, যদি সম্ভব হয় মিনতি জ্যেঠাবাবুর কাছ থেকে একটা এজেন্সি চেয়ে রাখবে।

বিদ্যুৎবিকাশ না করুক।

মিনতি করবে। নিজে ঘুরে ঘুরে ইন্সিওর করাবে লোকের জীবন। আর যা-ই হোক দারিদ্র সয়ে ও বাঁচতে রাজী নয়।

দু'এক অক্ষর সে ও যখন লেখাপড়া শিখেছে। খামোকা কষ্টভোগ কেন। 'একটা চাকর নেই বিয়ের পর থেকে।' প্রত্যেকটি কথার পর মিনতি এটা বলে।

বিদ্যুৎবিকাশ বোকার মতন তাকিয়ে ছিলেন স্ত্রীর দিকে। তাঁরই পরিচিত মুখ। মিনতি রায়। ছাত্রী মিনতি সেন। 'আমিই চাকরি করব।' বলছে ও এখন।

'ভাবতেই পারি না তুমি কি ক'রে ওসব ছাইমুণ্ড রাত জেগে লিখতে পার।' কাল রাত্রে বিদ্যুৎবিকাশ যখন প্রবন্ধটা লিখছিলেন মিনতি শোয়া থেকে বলছিল, 'মানুষ পয়সা পয়সা করে পাগল হয়ে যাচ্ছে, আর তুমি, যা ভাল বোঝ কর।'

মিনতি চুপ করে ছিল।

বিদ্যুৎবিকাশ হাসির ভাণ নিয়েই অবশ্য আলো নিভিয়েছিলেন।

'হাঁ, পয়সাওলা বাপের মেয়ে লিলি, পুলিশ সাহেবের স্ত্রী, এস ডি ও'র স্ত্রী, মিসেস রায়, পুলিন কণ্ট্রাক্টরের বোন রেবা সুমিতাকে নিয়ে ওই সমিতি, ওখানে নাক ঢুকিয়ে কি সুবিধা হবে।' [illegible] ঘুমের ঘোরে কি জেগে থেকে মিনতি বিড়বিড় করে বলছিল শয্যার এক পাশে কাৎ হয়ে শুয়ে, বিদ্যুৎবিকাশ ঠিক ঠাহর করতে পারেন নি। বিছানায় তিনি চুপ করে শুয়ে ছিলেন।

সকালে উঠে চা না খেয়ে দুপদাপ করে শ্রীমতী বেরিয়ে গেল বীমা কোম্পানীর জ্যেঠাবাবুর কাছে।

বিদ্যুৎবিকাশ বারান্দায় পায়চারী করতে করতে ভাবছিলেন ইতিমধ্যে লিলি ওরা কেউ এসে লেখাটা নিয়ে গেলে কি ভাল হত না? ভবিষ্যতে তিনি আর এমনে হয়ত রাজী হবেন না।

যেন লিলিদের জন্যে রাত জেগে লেখাটা তৈরী করার দরুণই আরো বেশি জিদ্ করে মিনতি বেরিয়েছে অর্থাগমের উপায় খুঁজতে।

অপরাধ বৈকি।

তরুণ অধ্যাপকের এত দীপ্ত মেধা রাশি রাশি বিদ্যা সভা-সমিতিতে প্রবন্ধ কবিতা পড়ে ক্ষয়িত ব্যয়িত হচ্ছে আধুনিক স্ত্রী তা পছন্দ করবে কেন। কে-ই বা করে।

বিদ্যুৎবিকাশের ঠোঁটের প্রান্তে কি একটা জিজ্ঞাসা উঁকি দিয়ে আবার নিভে গেল।

আলাদা ক'রে বারান্দার টবে ছোট্ট একটা মল্লিকার চারা পুঁতেছিলেন তিনি যত্ন করে। ফুল আর ফুটবে না। চারাটা আস্তে আস্তে হলদে রং ধরে কেমন স্তিমিত ম্রিয়মাণ হয়ে গেছে। একটা বিদ্ঘুটে ছাই রঙের পোকা ডাঁটের একটা অংশ দিনের পর দিন কামড়ে ধরে একভাবে চুপচাপ শুয়ে আছে।

বিদ্যুৎবিকাশ স'রে আসছিলেন টবের ধার থেকে। জুতোর খট্‌খটে আওয়াজে চমকে চোখ ফেরালেন সিঁড়ির দিকে।

লিলি নয়, স্ত্রী মিনতিও না।

আর, এক জোড়া জুতোর শব্দ নয়, ছোট ছোট অনেকগুলো আওয়াজ।

শিশির-ধোয়া শিউলীর মত ফুটফুটে সাতটি মুখ রেলিঙের ওপারে আস্তে আস্তে উঁকি দেয়। অধ্যাপক-পাড়ার ছোট ছোট মেয়ের একটি দল।

'কোথায় গিছলে সব?' বিদ্যুৎবিকাশ হাসলেন। সমস্ত সকালে এই বোধ হয় প্রথম হাসি।

'আমাদের 'ডাক-ঘরের' রিহার্সাল হচ্ছে, দাদাবাবু।'

'কোথায়?' বিদ্যুৎবিকাশ যেন বেশ একটু অবাক হন। 'কে শেখাচ্ছে?'

'অরুণাদি।' নবছরের ডলি সবচেয়ে সপ্রতিভ। নতুন হেডমিস্ট্রেসের নাম বলল সকলের আগে।

'আমাদের নতুন হেড মিসট্রেসকে দেখেন নি দাদাবাবু?' ডলির পর বাকি সব কলকলিয়ে উঠল। খুব সুন্দর, অত্যন্ত বুদ্ধিমতী।' বলল ওরা ছোট ছোট গলা বাড়িয়ে।

'হেঁ, বিয়ে করেনি, একলা আছেন, সারাদিন কবিতার বই পড়েন তোমার মতন।' বলতে বলতে সিঁড়ির পিছন থেকে মিনতি রায় এসে সামনে দাঁড়ালো।

বিদ্যুৎবিকাশ চোখ নামালেন।

'আশ্চর্য, কতদিন আমি তোমায় বারণ করেছি, অত ছোট মেয়েদের সঙ্গে বেশি কথা বলো না, বেশি কথা কয়ে কাজ কি?' অপ্রসন্ন চোখে মিনতি প্রথমে স্বামীর দিকে তাকালো। তারপর রূঢ় কটাক্ষ হানল অধ্যাপক নন্দিনীদের দিকে। 'তোমরা যে যার ঘরে যাও। যাও বলছি।' তর্জনী দেখাল মিনতি। ভয়ে ফুলের পাপড়ির মত টুপ্ টাপ্ সব খসে পড়ল। ডলি, বীণা, ঝুমুক্কো কাবেরী, তাপ্তী, ইরা, কুঙ্কুম। এদিক ওদিক।

'বেশ বড় হয়েছে সব মেয়ে, এগারো বারো বছর বয়েস কম কি।' মিনতি বিদ্যুৎবিকাশের দিকে চোখ ফেরাল। 'হুট্ ক'রে কে কি মন্তব্য করে, বোঝ না?'

'ওরা এসেছিল, আমি—'

'আসবেই, এ পাড়ায় তোমার মতন এমন আর কে অবসর নিয়ে ব'সে আছে। শিক্ষয়িত্রীর কাছে সারা সকাল নাটকের মহড়া দিয়ে ওরা এখন তা তোমায় শোনাতে এসেছিল, 'তুমি একজন কাব্যরসিক কিনা, ছোট মেয়েরাও তা জেনে গেছে।' মিনতি বাইরের দিকে চোখ রেখে একটুক্ষণ চুপ ক'রে রইল।

'জ্যেঠাবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল?' যেন প্রসঙ্গ পরিবর্তন করার জন্যে বিদ্যুৎবিকাশ আস্তে আস্তে প্রশ্ন করেন।

'হয়েছিল।' মিনতি গলা পরিষ্কার ক'রে স্বামীর মুখের দিকে তাকাল। 'তোমার খুব সুখ্যাতি করলেন, সব শুনে জ্যেঠাবাবু কি বললে জান?'

বিদ্যুৎবিকাশ স্ত্রীর চোখে চোখে তাকাতে গিয়েও ফের মাটির দিকে তাকালেন।

'তোমার এলিয়ট সাহেব ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ছিলেন, কবিতা লিখতে গিয়েও ভদ্রলোক টাকা কড়ি জিনিসটা ভুলতেন না।' একটু থেমে মিনতি বেশ ধীরে কঠিন গলায় বলতে লাগল, 'ওপর ছাড়, কবিতা স্বপ্ন,—কিছুই কিছু না এদিনে যদি না তোমার ট্যাঁক ভারি থাকে। হ্যাঁ, আমি এজেন্সী নিলাম।' জুতোর শব্দ তুলে হাতের ব্যাগ দোলাতে দোলাতে স্ত্রী গিয়ে ঘরে ঢুকল। অধ্যাপক একটা নিশ্বাস ফেললেন। হলদে ডাঁটের গায়ে ধূসর পোকাটা একবার একটুখানি যেন নড়ে উঠেছিল।

কিন্তু ঘরে গিয়েও মিনতি ক্ষান্ত হয়নি। 'অমন ফড়িং ফড়িং ভাব থাকবে না। সমিতি তো কত হচ্ছে চোখের ওপর দেখতে পাচ্ছি। এস ডি ও'র বাংলোয় সেকেণ্ড অফিসারের বাড়িতে, পুলিসসাহেবের দরজায়—সারাদিন তো শুনি এই হচ্ছে। বাপ্ কী ঘোরাঘুরি না করতে পারে মেয়ে।'

লিলি সম্পর্কে স্ত্রীর মন্তব্য।

ছোট্ট একটা নিশ্বাস ফেলে হাত বাড়িয়ে একটা কাঠি নিয়ে বিদ্যুৎবিকাশ পোকাটাকে তুলতে চেষ্টা করেন। (ক্রমশ

(হস্তি দন্ত ভস্ম মিশ্রিত)

টাকনাশক, কেশ বৃদ্ধিকারক কেশ পতন মরা মাস প্রভৃতি যে কোনও প্রকার কোন রোগ নিবারক। মূল্য ২৷৷০, বড় ৯, মাঃ ৮৵০ আনা। ভারতী ঔষধালয়, ১২৬।২, হাজরা রোড, কালীঘাট, কলিকাতা—২৬। ষ্টকিষ্ট—এ কে ষ্টোরস, ৭৩, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

# অনুবাদ

আহ্সান হাবীব

বারোটা একটা দুটো তিনটেও বাজে
রাত হোল কত, ঘুমের তাগাদা বাড়ে,
ঘুম নেই তবু। টেলিপ্রিন্টার চলে!

গেলাসের মুখে গরম চায়ের ধোঁয়া
পতিগতপ্রাণা রমণীর মত আহা
সান্ত্বনা দেয়।
অনুবাদ করি আমি।

অনুবাদ করি দেশবিদেশের কথা,
খবরাখবর। খবরের নেই শেষ।

ভোঁতা ভাঙা নিবে কথা কয়ে ওঠে চীন,
মাঝে মাঝে এসে গর্জায় আমেরিকা,
বক্তৃতা দেয় বৃটেন কখনো এসে—
কখনো বা তার ফাঁকে ফাঁকে দেয় দেখা
রক্তরঙিন আশ্বাসবাণী কোনো।

অনুবাদ করি
খবরের নেই শেষ—
কোথাও তরুণ যাত্রীর পায়ে পায়ে
অজানা দেশের অদ্ভুত পরিচয়;
ইতিহাস নাকি লিখবে নতুন করে।

খবর এসেছে।
অনুবাদ করি তাই—
নৈশক্লাবের নীলচোখো মেয়েদের
গুরুনিতম্ব প্রতিযোগিতার ফল
বেরিয়েছে কাল। খবর এসেছে তারো।

খবর এসেছে অনুবাদ করি আমি।
ব্যাঙ্কে ডাকাতি, অজ্ঞাতনামা দান,
নারীহরণের খবর রয়েছে দুটো।
শুভপরিণয়?
তাও দু'একটা আছে।

কে কিনেছে কাল হাম্বার গাড়ি, আর
কে খেয়েছে বিষ,
শেষ চিঠি পড়ে তার
কথা না বলেই মূর্ছিত কোন মেয়ে—
টেলিপ্রিণ্টারে খবরের জাল বোনা।

খবর এসেছে দাঙ্গা হয়েছে দুটো।
খবর এসেছে সাতাশ তোপের মুখে
রাজকুমারীর সন্তান প্রসবের,
বি-এন-আর এ নাকি এগারোটা বগি শেষ।

খবরের পর খবর আসছে শুধু
তবু মনে হয় খবর আসেনি আজো।

অনুবাদ করা বানানো খবর নয়—
মৌলিকতার মহনীয়তায় ভরা
খবর আসুক সব খবরের সেরা;
অনুবাদ ছাড়া ছাপাতে দেবার মত।

মান্দ্রাজের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুত কুমারস্বামী রাজা এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলিয়াছেন—আমরা আজ যে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি, তাহা অর্জনের কৃতিত্বের বৃহদংশ সাংবাদিকরা অবশ্যই দাবী করিতে পারেন। বিশু খুড়ো বলিলেন—"মন্ত্রিত্বের গদির কতটা অংশ সাংবাদিকরা দাবী করতে পারেন, সে প্রশ্নটা কিন্তু মন্ত্রিবর ইচ্ছে করেই এড়িয়ে গেলেন।"

* * * * *

মান্দ্রাজের অন্য এক সংবাদে প্রকাশ, সেখানকার সরকার নাকি কয়েকটি বিবাহের ব্যাপারে ঘটকালি করিতেছেন। খুড়ো বলিলেন—"তাতে অন্য প্রদেশের উৎসাহিত হওয়ার কারণ নেই; এ বিয়ে Mad রাশি ছাড়া সম্ভব নয়।"

* * * * *

বিলাতে একটি ভারতীয় সম্মেলনে পণ্ডিত জওহরলাল বলিয়াছেন—সিভিল এবং মিলিটারী সার্ভিসে উপযুক্ত অফিসার পাওয়া দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছে। —"আরজি সব কটাই আসছে হয়ত মন্ত্রীর পদের জন্যে"—মন্তব্য করিলেন বিশু খুড়ো।

* * * * *

Outsiders win six events in Delhi races—একটি সংবাদ। জওহরলাল সরকার এখন থেকে Doping সম্বন্ধে সতর্ক না হলে Outsider-রা হয়ত ছোট-বড় সব কটা বাজি-ই মেরে দেবে"—মন্তব্য করিলেন জনৈক রেস-রসিক সহযাত্রী।

* * * * *

ডাঃ মালান পণ্ডিত জওহরলালের সঙ্গে খানা খাইয়াছেন। এক অসমর্থিত সংবাদে প্রকাশ, পণ্ডিতজী আফ্রিকার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু ডাঃ মালান তা শুনিয়াও শুনেন নাই। খুড়ো বলিলেন—"আশ্চর্য কিছু নয়, তিনি হলেন Dr. Deaf (D. F.) Malan !

British Industries Fair সম্বন্ধে সংবাদ দিতে গিয়া সংবাদদাতা লিখিতেছেন—

"Apart from the manufactures of Britain, the London section of the fair includes special Commonwealth exhibits".

—"আমরা শুনলাম, কমনওয়েলথ মানপত্রের খদ্দের নাকি তেমন জুটছে না"—মন্তব্য করিলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * * * *

"সিন্ধুনদের পাকিস্তান ত্যাগের উদ্যোগ" একটি সংবাদের শিরোনামা। আমাদের শ্যামলাল বলিল—"অতঃপর পদ্মা-বুড়ীগঙ্গা কি করেন, তা দেখবার জন্যে আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে রইলাম।"

* * * * *

জাপানে ট্রাক্ ড্রাইভাররা যানবাহন চলাচলের নিয়ম লঙ্ঘন করিলে কর্তৃপক্ষ অপরাধীকে যানবাহন চলাচলের নিয়ম সম্বন্ধে লেকচার দিতে বাধ্য করেন—ইহাই নাকি এই অপরাধের যোগ্য শাস্তি। আমাদের দেশে ট্রাক ড্রাইভাররা অপরাধ করিয়াও লেকচার দেন, তবে সেটা শাস্তি হিসাবে নয়—Birth right হিসাবে !

* * * * *

বিগত সপ্তাহের বড় খবর কলিকাতায় ফুটবল শুরু হইয়া গিয়াছে। ভিন্ন প্রদেশ হইতে খেলোয়াড় আমদানীর আভাস যা পাইলাম, তাতে মনে না করিয়া উপায় নাই—"বড় বাজার তো ডুবেই গেছে, এবারে মাঠ ভেসে যায় রে"। ......"ফুটবলের সঙ্গে আন্তর্জাতিক খেলাও শুরু হয়েছে, অর্থাৎ প্রথম দিনেই রেফারীকে তাড়া করার খেলার খবরও পেলাম"—মন্তব্য করিতে করিতে বিশু খুড়ো ট্রাম হইতে নামিয়া পড়িলেন।

একটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে জানা গেল পৃথিবী নাকি প্রতি শতাব্দীতে তি সেকেণ্ড করিয়া আস্তে ঘুরিতেছে এবং তা ফলে ঘড়িও ঠিক সময় দিতেছে না। বিশু খুড়ো বলিলেন—"এটা জানবার জন্যে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রয়োজন হয় না। অফিস ছুটির আগের আধ ঘণ্টা বাজতে যে প্রায় দেড় ঘণ্টা লেগে যায়, সে কথা কে না জানে ?

* * * *

রাশিয়া নাকি অচিরেই এমন এক ছায়াচিত্র তুলিবেন যে—তার প্রত্যেকটি দৃশ্যে দৃশ্যানুরূপ গন্ধও দর্শক পাইবেন; যেমন ফুল বাগানের দৃশ্যে ফুলের গন্ধ, মাঠের দৃশ্যে ঘাসের আঘ্রাণ। —"কিন্তু এখানে কোলকাতার বস্তির দৃশ্য দেখতে দেখতে যে কী অবস্থা হবে, তা ভাবতে এখন থেকেই গা গুলিয়ে উঠছে"—মন্তব্য করিলেন জনৈক সিনেমা-ফ্যান।

* * * *

নিউ ইয়র্কে শীতকালে রাস্তা গরম রাখার জন্য এক প্রকার বিশেষ ধরণের পাইপের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। —"আমরা রাস্তা গরমের জন্যে অন্য রকম ব্যবস্থা করে থাকি—হয় বক্তৃতা, নয় ইনকিলাব জিন্দাবাদ, আর তাতেও যদি না শানায়, তবে ট্রামে-বাসে আগুন।" —মন্তব্য বলা বাহুল্য খুড়োর।

* * * *

শুনিলাম এক প্রকার নূতন দাবা খেলা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাঁর নাম দেওয়া হইয়াছে আণবিক দাবা। চলতি দাবা খেলার বড়ে-গজ-ঘোড়ার উপরও "ট্যাঙ্ক ও এরোপ্লেন" নামে দুইটি ঘুঁটির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। —"এ-খেলায় হারাকে বাজিমাৎ না বলে কি হিরোশিমাৎ বলা হবে"—প্রশ্ন করেন বিশু খুড়ো।

## ...জন্মের কথা মনে আছে গাঁথা

এক খবরে জানা গেছে যে, জব্বলপুরের ...র্গত গারোলী গ্রামের এক আহিরের পাঁচ ...র একটি ছেলে তার বিগত জন্মের বহু ... ও কথা বলতে শুরু করায় একটি ...ল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ছেলেটি বলেছে, ...র জন্মে সে আগর নামে এক ...র এক মহাজন ছিল—এবং দুটি ... রেখে তিনি মারা যান। ছেলেটির ...মত তাকে ঐ গ্রামে নিয়ে যাওয়া ... সেখানে পৌঁছেই ছেলেটি নিজেই পথ ... সোজা গিয়ে এক মহাজনের বাড়ীতে ...ক। এবং ঐ বাড়ির পরিবারবর্গের সামনে ... কতকগুলি গোপনীয় কথা বলে যা ঐ ...বারের দু' একজন ছাড়া কেউ জানতো না। ... বছরের ছোট্ট শিশুটির কথাবার্তায় সবাই ...ই অবাক হয়ে যায়—ছেলেটিকে দেখার জন্য ... তার কথা শোনার জন্য খুব ভীড় হচ্ছে।

## ...জকন্যার মুচির কাজ

ইংলণ্ডেশ্বরী কুইন ভিক্টোরিয়ার নাতনীর ...নী জার্মানীর স্যাক্সনী কোবার্গগাথা ...শর প্রিন্সেস ক্যারোলিন ম্যাথল্ডি—সম্প্রতি

রাজকন্যা জুতো মেরামতের কাজে!

...র্মানীতে আছেন এবং সেখানে তিনি তাঁর ও ...জের ছয়টি সন্তানের জীবিকা অর্জনের জন্য ...মুচির পেশা অবলম্বন করেছেন। জুতো ...রামত ও তৈরী করাই এখন রাজকন্যার কাজ ...য়েছে। যুদ্ধের আগে এই রাজকন্যা ...াথল্ডি রাজবংশের গণ্ডী ডিঙিয়ে পিটার ...পফিং নামে একটি সাধারণ বিমান চালককে ...য়ে করেন। এই বিমান চালকটি ...৯৪৪ সালে বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান, ...বং রাজকন্যা ছ'টি ছেলেমেয়ে নিয়ে বিধবা হন। তারপর থেকেই তিনি বহুকষ্টে দিন কাটাচ্ছেন এবং তাঁর পূর্বপুরুষদের ধ্বংসপ্রাপ্ত রাজবাড়ির কাছাকাছি একটি অতি সাধারণ বাসা বাড়িতে তার বোন প্রিন্সেস জোসেফ ও আর পাঁচজনের সঙ্গে বাস করছেন। যে রাজকন্যা ম্যাথাল্ডির একদিন খেয়াল বা 'হবি' (Hobby) ছিল রকমারী জুতা সংগ্রহ, জুতা তৈরী— আজ তাঁকেই সেটিকে কাজে লাগিয়ে সাধারণের জুতো মেরামত করে জীবিকা অর্জন করতে হচ্ছে—একেই বলে ভাগ্যের পরিহাস।

## রাখাল যোগীর আবির্ভাব

আর একটি খবরে প্রকাশ—মাদ্রাজ প্রদেশের গোদাবরী জেলার একটি গ্রামের তেরো বছর বয়সের এক রাখাল ১৯৪৬ সালে ২২শে অক্টোবর হঠাৎ সমাধিস্থ হয়ে পড়ে, এবং এই সমাধি অবস্থায় প্রায় আড়াইটি বছর থাকার পর গত ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে সে মুখ খোলে এবং যে দুচারটি কথা বলে—তাও আবার উচ্চাঙ্গের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব কথা। আড়াই বছর ধ'রে সমাধি অবস্থায় থাকার ফলে—সে খায়নি বা কোনও পানীয় গ্রহণ করেনি—এমন কি মল-মূত্র পর্যন্ত ত্যাগ করেনি এবং আরও বিস্ময়ের কথা এই যে—ছেলেটির গায়ের রঙ বদলে একেবারে কাঁচাসোনার রঙ দেখা দিয়েছে। এই তরুণ যোগী যৌগিক আসনে অধিকাংশ সময়ই সমাধি অবস্থায় থাকেন। তাঁকে দর্শন করার জন্য প্রতিদিনই আশপাশের গ্রাম থেকে বহু স্ত্রীপুরুষ গ্রামে ভীড় করছে।

রাখাল যোগীর আবির্ভাবটা এযুগে অভাবনীয় ব্যাপার বলে মনে হলেও— অবিশ্বাসের কিছু নেই। আধ্যাত্মিকতার ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ একমাত্র ভারতবর্ষেই এমন ঘটনা ঘটা সম্ভব।

## বাসের ভীড় এড়াবার নূতন ফন্দি

বাসে ট্রামে চলাফেরা শুধু যে এদেশেই বিড়ম্বনা—তা ভাববেন না, আরও নানা দেশে এই দুর্ভোগ ভোগ করতে হচ্ছে অল্পবিস্তর সবাইকেই। বাসে ওঠবার জন্য বিলেতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা 'কিউ' দিয়ে দাঁড়াতে হয় অনেক সময়—কারণ সেখানে এদেশের মত ঠেলেঠুলে —এর তার পা মাড়িয়ে বাসে ওঠবার উপায় নেই। অথচ সবাইকার তো মোটর বা ট্যাক্সী চড়ার মত সঙ্গতিও নেই। তাই সম্প্রতি মিঃ ও মিসেস্ চার্লস জ্যাস্প্যার বাসে চড়ার আশা ত্যাগ করে —বুদ্ধি খাটিয়ে দুজনে মিলে নিজেরাই নতুন একটা ব্যবস্থা করে নিয়েছেন। ব্যবস্থাটা হচ্ছে একটি 'ট্যাণ্ডেম' ধরণের সাইকেল কিনে তার সঙ্গে একটা আলগা বাক্সগাড়ি লাগিয়ে নিয়ে তাঁদের দুটি ছেলেমেয়ে সহ সপরিবারে এখানে ওখানে যাওয়ার উপযোগী একটি গাড়ি তৈরী করে নিয়েছেন। একটু পরিশ্রম করায় ও বুদ্ধি খাটানোর ফলে তাঁদের বাসে চড়ার দুর্ভোগ অনেকখানি কমে গেছে। তাঁদের এই গাড়ীর নমুনা দেখে—ছোট ছোট আরও দু' একটি পরিবার এই ধরণের গাড়ি তৈরী করবার কাজে হাত দিয়েছেন। ছবিতে দেখুন—জ্যাস্প্যার দম্পতি তাঁদের ছেলেমেয়েকে নিয়ে কী স্ফূর্তিতেই না গাড়ি চালাচ্ছেন!

জ্যাস্পার দম্পতী—নূতন বাহনে

**নিউ এম্পায়ারে বিচিত্রানুষ্ঠান**

গত রবিবার কবিগুরুর জন্মোৎসব উপলক্ষে ইম্প্রেসারিও শ্রীবিমল চৌধুরীর ব্যবস্থাপনায় নিউ এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে, সংগীত, নৃত্য ও কৌতুক অভিনয়ের একটি বিশেষ উপভোগ্য জলসার আয়োজন হয়েছিল। তিমিরবরণ, রবীন মজুমদার, ধীরেন মিত্র, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সুপ্রভা সরকার, উৎপলা সেন, বীরেন ভদ্র, বালকৃষ্ণ মেনন, যোগীন্দ্রসুন্দর, গোপাল চ্যাটার্জি, দীপ্তি ঘোষ, সুধা, ছান্দু, অজিত চ্যাটার্জি, জহর রায় প্রভৃতি বিশিষ্ট জনপ্রিয় শিল্পীদের সমন্বয়ে জলসাটি সেদিন শহরের একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল এবং অত্যন্ত দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যেও প্রেক্ষাগৃহে প্রচুর জনসমাগম হয়েছিল। প্রত্যেক শিল্পীই নিজ নিজ বৈশিষ্ট অনুসারে দর্শকদের তৃপ্তি দিয়াছেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষ করে ধীরেন মিত্র, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও উৎপলা সেনের গান, বীরেন ভদ্র'র রবীন্দ্রনাথের "শেষ শিক্ষা" কবিতার আবৃত্তি, বালকৃষ্ণ মেননের "গড়ুর নৃত্য" ও গোপাল ও সুধার দ্বৈত-নৃত্য "কৃষক-দম্পতী" দর্শকদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করে।

**রবীন্দ্রনাথের গীতিনাটিকা 'বসন্ত'**

গত ১লা ও ২রা মে রবিবার ও সোমবার নিউ এম্পায়ারে গীত বিতানের ছাত্রছাত্রীরা রবীন্দ্রনাথের গীতি-নাটিকা 'বসন্ত' পূর্ণপ্রেক্ষাগৃহে সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেছেন। শান্তিনিকেতনের আদর্শে রবীন্দ্র-সংগীত ও নৃত্যাভিনয় শিক্ষা দেবার জন্য গীতবিতান প্রতিষ্ঠানটি কলকাতায় গত কয়েক বছর ধরে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে এসেছে; গত রবিবারের নৃত্য-গীতাভিনয়ের মধ্যে দিয়ে তাদের এই প্রচেষ্টার আংশিক সাফল্য দেখে আমরা মুগ্ধ হয়েছি। রবীন্দ্রনাথের 'বসন্ত' সংগীত-বহুল একটি নাটিকা। রাজা ও সভাকবির কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে গানগুলিকে একটি ভাবধারার সূত্রে গ্রথিত হয়েছে। সাধারণ দর্শকদের কাছে বইটির রসগ্রহণ সহজলভ্য নয়—কিন্তু গীত-বিতানের ছাত্রছাত্রীরা নাচে গানে অভিনয়ে এবং অঙ্গাভরণ ও মঞ্চসজ্জায় বসন্তের যে রঙীন আবেশ সেদিন ফুটিয়ে তুলেছিলেন তার আবেদন দর্শকদের কাছে ব্যর্থ হয় নি। একক ও সমস্বর গানগুলি যন্ত্রসংগীতের সমাবেশে যেমন জমে উঠেছিল নাচ সেদিক দিয়ে তত-খানি সাড়া জাগাতে পারে নি। তবে শেষের গানের সঙ্গে সমবেত নৃত্যটি ছন্দ-হিল্লোলে এবং বর্ণবৈচিত্র্যে স্থায়ী রেশ রেখে দিতে পেরেছিল। গানের দিকে গীতবিতানের পরি-চালকরা শিক্ষকতার যেমন নিখুঁত পরিচয় দিতে পেরেছেন নাচের দিকে ততটা পারেন নি। শান্তিনিকেতনের নৃত্য-পদ্ধতি ও তার আদর্শটি অনুকরণের চেষ্টা হয়েছে মাত্র, কিন্তু সুযোগ্য পরিচালনার অভাবে তা খাপছাড়া হয়েছে। আশা করি পরিচালকমণ্ডলী ভবিষ্যতে নৃত্য-পরিচালনার দিকে আরেকটু দৃষ্টি দেবেন। এই রবিবার সকালে নিউ এম্পায়ারে 'বসন্ত' পুনরভিনয় হবে।

## কলিকাতা সংগীত সম্মিলনী

**ষষ্ঠ-বার্ষিক সংগীত প্রতিযোগিতা—১৯৪৯**

আগামী ২১শে মে হইতে ২৫শে মে ১৯৪৯ পর্যন্ত উক্ত সম্মিলনীর ষষ্ঠ-বার্ষিক সংগীত ও নৃত্য এবং যন্ত্র সংগীত প্রতিযোগিতা হইবে। স্থান—শ্যামবাজার এ ভি স্কুল, ১২৬নং শ্যামবাজার স্ট্রীট্। প্রবেশিকা এক টাকা। আগামী ২০শে মে ১৯৪৯ গতবারের কৃতী ছাত্রছাত্রীদের পদক দেওয়া হইবে। বিচারক থাকিবেনঃ—প্রঃ মনোরঞ্জন সেন, প্রঃ সুরেশ চক্রবর্তী, প্রঃ রমেশ-চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রঃ নন্দগোপাল, প্রঃ ওঙ্কার-নাথ রায়চৌধুরী, ওস্তাদ আলী আহম্মদ, দক্ষিণামোহন ঠাকুর, হেমন্তকুমার মুখো-পাধ্যায়, প্রঃ কে এল মুখার্জি, মনীশংকর, কিরীট্ রায়, দুর্গা সেন ইত্যাদি। প্রত্যহ বেলা ২টা হইতে ৬টা পর্যন্ত নিম্ন ঠিকানায় নাম লওয়া হইতেছেঃ—(১) শ্যামবাজার এ ভি স্কুল। ১২৬নং শ্যামবাজার স্ট্রীট্। (২) শ্রীধীরেন মুখোপাধ্যায় (যুগ্ম-সম্পাদক) ৭৮নং কাশীপুর রোড্, কলিকাতা।

---

## আবৃত্তি ও রচনা প্রতিযোগিতা

'আমরা ও আমাদের কথা', পাক্ষিক কিশোর পত্রিকার পরিচালনাধীনে ১৮ বা তন্নিম্ন বয়স্ক বালক বালিকাদের জন্য কালিদাস স্মৃতি আবৃত্তি ও উপেন্দ্র স্মৃতি রচনা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইবে। আবৃত্তি প্রতিযোগীদের আগামী ১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৬-এর মধ্যে নাম, ঠিকানা ও বয়স এবং রচনা প্রতিযোগীদের রচনা সহ নাম, ঠিকানা ও বয়স 'আমরা ও আমাদের কথা'র কার্যালয়ে (১৮নং জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন লেন, নারিকেলডাঙ্গা, কলিকাতা) পাঠাইতে হইবে।

আবৃত্তির বিষয়-**রবীন্দ্রনাথের 'আবির্ভাব'**।

রচনার বিষয়-'**তোমার জীবনের সবচেয়ে বড় বেকুবী (নির্বুদ্ধিতা)**'।


গভর্ণমেণ্ট রেজিষ্টার্ড একমাত্র বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠান

**(মধ্যপ্রদেশ ও বেরারে হিন্দীতে প্রাচীনতম)**

সর্বসাধারণের সুবিধার জন্য ন্যূনতম প্রবেশমূল্যে

# ১২.০০০৲ টাকা প্রাপ্তির সুবর্ণ সুযোগ।

গভ রেজিঃ নং ২১৭ প্রতিযোগিতা নং সি/১০/ডি

**কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ**, জব্বলপুরে সুরক্ষিত আমাদের শীলমোহর করা সমাধানের সহিত যে সকল সমাধানকারীর সমাধান মিলিয়া যাইবে তাঁহাদিগকে প্রথম পুরস্কার ৮৪০০৲ টাকা; যাঁহাদের মধ্য সমকোণ (Cross Row) কর্তন পংক্তি (Line) মিলিয়া যাইবে তাঁহাদিগকে দ্বিতীয় পুরস্কার ২৪০০ টাকা; এবং যিনি প্রতিযোগিতায় সবচেয়ে বেশী সংখ্যায় প্রবেশপত্র পাঠাইবেন, তাঁহাকে তৃতীয় পুরস্কার ১২০০৲ টাকা দেওয়া হইবে। সমাধান আমাদের অফিসে গ্রহণ করিবার শেষ তারিখ ৮-৬-৪৯, সমাধানের ফল ১৮-৬-৪৯ তারিখে **"দেশ"** পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

৫৭

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

**সমাধান করিবার রীতি** —প্রদত্ত চতুষ্কোণে ৫ হইতে ৩৫ পর্যন্ত সংখ্যাগুলির মধ্যে যে কোন সংখ্যা ইচ্ছামত এরূপভাবে সাজাইতে হইবে যাহাতে প্রত্যেকটি খাড়া (Row) পংক্তি, আড়া (Column) পংক্তি এবং কোণাকোণি যোগফল ৫৭ হইবে। কোন সংখ্যাই একবারের বেশী ব্যবহার করা যাইবে না।

**প্রবেশমূল্যঃ**—একটি সমাধানের জন্য বার আনা এবং তাহার সহিত এক নামে দেওয়া বাকী সমাধানগুলির প্রত্যেকটির জন্য আট আনা মাত্র।

**নিয়মাবলীঃ**—সাদা কাগজে লিখিয়া প্রতিযোগিতায় নম্বরযুক্ত যতগুলি সমাধান ইচ্ছা ততগুলি উপরোক্ত হারে মনিঅর্ডারের রসিদসহ পাঠাইতে হইবে। প্রবেশমূল্য মনিঅর্ডারযোগে অথবা আমাদের অফিসে নগদ গৃহীত হইবে। একত্রীকৃত টাকার পরিমাণ কম হইলে পুরস্কারের হারের তারতম্য হইবে। প্রতিযোগিতায় ম্যানেজারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত ও আইনসংগত বলিয়া গণ্য করা হইবে। উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠাইলে পুরস্কৃত সমাধানকারীর নাম এবং ন্যায্য বিষয়ে চিঠিপত্রের উত্তর দেওয়া হইবে। আপনার নাম, ঠিকানা ও সমাধানের সংখ্যাগুলি বাংলা, হিন্দী অথবা ইংরাজীতে লিখিবেন। নিম্নঠিকানায় প্রবেশমূল্য ও সমাধান পাঠাইবেন।

সি/৯/ডি সমাধানের ফল

৬৩

| | | |
|---|---|---|
| ১৩ | ২৭ | ২৩ |
| ৩১ | ২১ | ১১ |
| ১৯ | ১৫ | ২৯ |

এম্, সি, বেনিফিট্ বুরো (ইণ্ডিয়া)

আন্ধেরদেউ (মসজিদের পাশের গলি)।

জব্বলপুর, সি, পি।

# খেলাধূলা

## ক্রিকেট

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি ; এ এস ডিমেলো বহু আকাঙ্খিত অধিনায়ক রনাথের অভিযোগ সম্পর্কে ২৩ দফার এক দীর্ঘ রিস্তি সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য দান করিয়া-ন। এই দীর্ঘ অভিযোগ তালিকা পাঠ করিয়া গের মনে কিরূপ ধারণা হইয়াছে বলা কঠিন, ব আমরা এক কথায় বলিতে পারি, ইহা "পর্বতের যিক প্রসবের" সামিল। এত হৈ চৈ, এত জল্পনা-পনা করিয়া শেষ পর্যন্ত এই ধরণের অভিযোগ লিকা প্রকাশ করিবেন ইহা আমাদের একেবারেই রণাতীত ছিল। আমাদের মনে হইয়াছিল অনেক রুত্বপূর্ণ নীতিলঙ্ঘনকারী, অশিষ্ট আচরণের শদ বিবরণ তিনি প্রকাশ করিবেন। ব্যক্তিগত দ্বেষ ও ঈর্ষার বশবর্তী হইয়া তিনি যে ভিযোগ সমূহের তালিকা গঠন করিয়াছেন ইহা রূপ স্পষ্টই ধরা পড়িয়া গিয়াছে। বাঙলা দেশের বোর্ডের সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ াহার অন্তরে শেলের মত বিদ্ধ হইয়াছে। তাই নি তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া নানাভাবে মরনাথের অভিযোগের মধ্যে বাঙলাকে হীন তপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বাঙলার দীয়মান তরুণ খেলোয়াড় পি সেন নিজ ক্রীড়া-শলেই ভারতীয় দলে স্থান লাভ করিয়াছে, কিন্তু ঃ ডিমেলো তাহাতে অর্থের বিনিময় হইয়াছে লয়া প্রমাণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। ইতি-র্বের বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অমরনাথকে ঙলা প্রদেশ পাঁচ সহস্র মুদ্রা দান করেন, কিন্তু ভিযোগে বলা হইয়াছে উহা অমরনাথ বোর্ডের না অনুমতিতে গ্রহণ করিয়াছেন। অমরনাথের স্ত অভিযোগের মধ্যে এই অভিযোগটাই খুব শী বড় করিয়া তিনি ধরিয়াছেন এবং বার বার নি অভিযোগের বিভিন্ন ধারায় তাহার উল্লেখ রিয়াছেন। অমরনাথ এই সম্পর্কে অথবা অভি-যোগের সম্পূর্ণ তালিকার এখনও কোন প্রত্যুত্তর ন করেন নাই, কিন্তু বাঙলা হইতে বিভিন্ন বৃতির মধ্য দিয়া ইহার অসারত্ব প্রমাণিত ইয়াছে। লক্ষ্ণৌর পত্রিকার বিবৃতি মিঃ ডিমেলোর ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ। অমরনাথ ইতি-র্বেই এইরূপ বিবৃতি করেন নাই বলিয়া সংবাদ-ত্র মারফৎ অস্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং এই অভিযোগও যে অমরনাথকে দোষী প্রমাণিত রিতে পারিবে সেই বিষয়ও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। পর যে সকল অভিযোগ তিনি উল্লেখ করিয়াছেন াহা একরূপ ব্যক্তিগত, সুতরাং ঐ বিষয় আলোচনা ও অনুসন্ধান করিবার জন্য নিরপেক্ষ দন্ত কমিটি গঠনের কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম, এখনও করি। ইহা ছাড়া এই বিষয়টির মীমাংসা ওয়া একেবারেই অসম্ভব। এই প্রসঙ্গে কোন সাংবাদিক ডাঃ রাধাবিনোদ পালের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ডাঃ পাল যদি সত্যই ইহার ভার গ্রহণ করেন, খুবই সুখের বিষয় হইবে।

### কমনওয়েলথ ক্রিকেট দল

কমনওয়েলথ ক্রিকেট দলের ভারত ভ্রমণ ব্যবস্থা একরূপ পাকাপাকি হইয়াছে। অস্ট্রেলিয়া, ইংলণ্ড, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রভৃতি কমনওয়েলথের বিভিন্ন দেশের বহু বিশিষ্ট খেলোয়াড় ঐ দলে আসিবেন বলিয়া কন্ট্রোল বোর্ড হইতে প্রচারিত হইয়াছে। এই দলের খেলোয়াড়দের তালিকাও প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ তালিকায় কেবল কম্পটন ও হাটন বাদ পড়িয়াছেন। সর্বাপেক্ষা সমস্যা হইয়াছে কে এই দলের অধিনায়ক হইবেন। কন্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি মিঃ ডিমেলো এই প্রসঙ্গে ব্রায়েন ভ্যালেণ্টাইন ও আর্থার সেলার্সের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি শীঘ্রই নাকি এই সকল বিষয় আলোচনা করিতে লণ্ডনে যাইবেন। কমনওয়েলথ দল বেশ শক্তিশালী করিবার চেষ্টা চলিয়াছে, দেখা যাক কতদূর ইহা দাঁড়ায়। যে সকল খেলোয়াড়ের এই দলের হইয়া আসিবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া বোর্ডের সভাপতি জানাইয়াছেন তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ—

কিথ মিলার ও সিড বার্নেস (অস্ট্রেলিয়া), ফ্রাঙ্ক ওয়েল ও ইভার্টন উইকস্ (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ), জি পোপ ও সি বার্নেট (ইংলণ্ড), ই টোসাক, জি ট্রাইব, বি ডুল্যাণ্ড, জে পোর্টফোর্ড, সি পেপার, কে মিউলম্যান ডি জ্যাকসন এবং এল লিভিংস্টন (অস্ট্রেলিয়া)।

## ফুটবল

১৯৫০ সালের বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার এশিয়া অঞ্চলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য মাত্র তিনটি দল নাম প্রেরণ করে। সম্প্রতি প্রকাশিত সংবাদে প্রকাশ যে, ঐ তিনটি দলের মধ্যে ফিলি-পাইন্স প্রতিযোগিতা হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছে। অপর দল বর্মাও অবসর গ্রহণের পথে। তবে তাহারা এখনও পর্যন্ত শেষ সিদ্ধান্ত পরি-চালকদের নিকট জ্ঞাপন করে নাই। কেবলমাত্র জানাইয়াছে যে, যুদ্ধের জন্য দল গঠন করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। সকল খেলোয়াড়কেই নাকি সামরিক বিভাগ তলব করিয়া লইয়া গিয়াছেন। এইরূপ অবস্থায় এই অঞ্চলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য কেবল পড়িয়া রহিল ভারত। বর্মা না যোগদান করিলে ফাঁকা মাঠে পা "চালাচালি" করিয়া পরবর্তী রাউণ্ডে খেলিবার যোগ্যতা অর্জন করিবেন। ভারতীয় ফুটবল পরিচালকগণ, এমন কি খেলোয়াড়গণের পক্ষে ইহা খুবই সুখকর সন্দেহ নাই।

## মুষ্টিযুদ্ধ

বাঙলার মুষ্টিযুদ্ধের সব কিছুই বেঙ্গলী বক্সিং এসোসিয়েশন ইহা আমরা বহুবার বহু প্রবন্ধের মধ্য দিয়াই উল্লেখ করিয়াছি। সুতরাং এই এসোসিয়েশনের দুইজন মুষ্টিযোদ্ধা হিমাংশু পাল ও ফণি সুরকে যথাক্রমে লাইট ওয়েট ও ফেদার ওয়েটে বাঙলার চ্যাম্পিয়ান হইতে দেখিয়া আমরা কোনরূপ আশ্চর্য হই নাই। আগামী বৎসরে এই এসোসিয়েশনের আরও কতকগুলি মুষ্টিযোদ্ধাকে বিভিন্ন ওয়েটের চ্যাম্পিয়ান হইতে দেখিব ইহা জোর করিয়াই বলিতে পারি। কারণ বর্ষাকালের আগমন এই এসোসিয়েশনের শিক্ষাকেন্দ্রের কোনই ক্ষতি করিতে পারে নাই। নিয়মিতভাবেই উৎসাহী মুষ্টিযোদ্ধাগণ শ্রীযুত পি এল রায়, শ্রীযুত ফণি মিত্র ও শ্রীযুত সন্তোষ দের অধীনে শিক্ষা গ্রহণ করিতেছেন।

দুইজন চ্যাম্পিয়ান বাঙালী মুষ্টিযোদ্ধা হিমাংশু পাল ও ফণি সুর সহ শিক্ষক সন্তোষ দে

# দেশী সংবাদ

২রা মে—সিমলায় পূর্ব পাঞ্জাব হাইকোর্টের ফুল বেঞ্চে মহাত্মা গান্ধী হত্যা মামলার আপীলের শুনানী আরম্ভ হইয়াছে। এই দিন আসামী আপ্তে ও মদনলালের পক্ষের কৌঁসুলী শ্রী বি ব্যানার্জি সওয়াল আরম্ভ করেন।

ভূপালের নবাব ভূপালের শাসনভার ভারত গবর্ণমেণ্টের হস্তে অর্পণ করিতে সম্মত হইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। নবাব প্রয়োজনীয় কাগজপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন।

ভারত গভর্নমেণ্টের পুনর্বসতি মন্ত্রী শ্রীমোহনলাল শকসেনা এক বিবৃতিতে বলেন যে, ১৯৪৯ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বরের পর ভারত গবর্ণমেণ্ট আর উদ্বাস্তুদের সম্বন্ধে সাহায্যদান সংক্রান্ত কোন ব্যয়-বরাদ্দ বহন করিবেন না। ভারত গভর্নমেণ্ট সেই জন্য প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টসমূহকে এই পরামর্শ দিয়াছেন যে, তাঁহারা যেন সাহায্য শিবিরগুলিকে আগামী ৬ মাসের মধ্যে কর্মকেন্দ্রে পরিণত করিয়া আত্মনির্ভরশীল করিয়া তোলেন।

বিশ্বভারতী সংসদের এক বিশেষ সভায় ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সর্বসম্মতিক্রমে বিশ্বভারতীর আচার্য নির্বাচিত হইয়াছেন।

৩রা মে—কংগ্রেস সভাপতি ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া এই মর্মে এক রুলিং দিয়াছেন যে, শ্রীপুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন যুক্তপ্রদেশের ব্যবস্থা পরিষদের স্পীকার ও প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি একসঙ্গে এই উভয় পদ অধিকার করিয়া থাকিতে পারেন না।

পাটনার এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভারত সরকারের পুনর্বসতি সচিব শ্রীমোহনলাল শকসেনা বলেন যে, এ পর্যন্ত পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্থান হইতে ৮০ লক্ষের মত উদ্বাস্তু ভারতে আসিয়াছে। পশ্চিম পাকিস্থান হইতে আগত প্রায় ৫৫ লক্ষ উদ্বাস্তুর মধ্যে অনুমান ৩৫ লক্ষের পুনর্বসতির ব্যবস্থা হইয়াছে।

রাষ্ট্রপতি ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া বাঙ্গালোরে কংগ্রেস কর্মীদের সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, এক ভাষাভাষী প্রদেশের দাবী প্রাদেশিকতা নহে।

৪ঠা মে—ভারত গভর্নমেণ্টের সহকারী প্রধান মন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল অদ্য ঘোষণা করেন যে, ১৯৪৯ সালের ১লা জুন হইতে ভারত সরকার ভূপালের শাসনভার গ্রহণ করিবেন।

নয়াদিল্লীর এক সরকারী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, গত ডিসেম্বর মাসে দাম্বিতে (সুমাত্রা) ওলন্দাজ প্যারা সৈন্যগণ তিনজন ভারতীয়কে গুলীতে নিহত করায় ইন্দোনেশিয়ার ওলন্দাজ গভর্নমেন্ট ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন।

৫ই মে—ভারত সরকারের পররাষ্ট্র দপ্তর হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, প্যান-মালয়ান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের ভূতপূর্ব ভারতীয় প্রেসিডেণ্ট মিঃ এস আর গণপতিকে মালয় কর্তৃপক্ষ গতকল্য ফাঁসি দেওয়ায় বৃটিশ সরকারের নিকট তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতে লণ্ডনস্থ ভারতীয় হাই কমিশনারকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ভারত সরকারের দৃঢ় অভিমত এই যে, মিঃ গণপতিকে ঘটনার গুরুত্বের তুলনায় অত্যন্ত কঠোর শাস্তি দেওয়া হইয়াছে।

কাশ্মীরের লাডাক উপত্যকার এক বৌদ্ধ প্রতিনিধিমণ্ডলী অদ্য দিল্লী হইতে বিমানযোগে কলিকাতা পৌঁছেন। এক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে প্রতিনিধিমণ্ডলীর নেতা মিঃ ক্লোন ছিয়াং রিগজিন দৃঢ়তার সহিত এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, লাডাকের বৌদ্ধ সম্প্রদায় ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত থাকারই পক্ষপাতী।

৬ই মে—ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু লণ্ডনে ডোমিনিয়ন প্রধান মন্ত্রী সম্মেলনে যোগদানের পর বিমানযোগে ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। তিনি ১৫ দিন বিদেশে অবস্থান করেন।

ইন্দোরে ভারতীয় জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে ভারতের সহকারী প্রধান মন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বলেন যে, শ্রমিকদের শান্তি ও সমৃদ্ধির উপরই বিশ্বশান্তি নির্ভর করিতেছে। একমাত্র মহাত্মা গান্ধীর প্রদর্শিত সত্য ও অহিংসার পথেই শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব। তিনি আরও বলেন যে, কম্যুনিষ্টরাই শ্রমিক শ্রেণীর সর্বাপেক্ষা বড় শত্রু।

আগামী ২১শে ও ২২শে মে দেরাদুনে নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতির যে অধিবেশন হইবে, তাহার ব্যাপক তোড়জোড় চলিতেছে। গণ-পরিষদের সদস্য শ্রীমহাবীর ত্যাগীর সভাপতিত্বে অভ্যর্থনা সমিতি ২০টি সাব কমিটি মনোনীত করিয়াছেন।

আলীপুর জজ আদালতের যে বিচার প্রকোষ্ঠে ৪০ বৎসর পূর্বে মাণিকতলা বোমার মামলা সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দের বিচার হইয়াছিল, অদ্য সায়াহ্নে উক্ত কক্ষে শ্রীঅরবিন্দের তৎকালীন একখানি প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

৭ই মে—অদ্য কলিকাতায় বেথুন বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে উক্ত বিদ্যালয়ের শতবর্ষ পুরণোপলক্ষে একটি অশোক ও দুইটি বকুল বৃক্ষ রোপণের এক চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠান হয়। আচার্য শ্রীক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন।

ভারতের সহকারী প্রধান মন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ইন্দোরে এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে দেশীয় রাজ্য ইউনিয়ন সমূহের কংগ্রেস রাজনীতিকগণকে এই মর্মে সতর্ক করিয়া দেন যে, ক্ষমতা লাভের জন্য তাঁহারা ঝগড়া বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহার অবসান ঘটাইয়া দেশের যথার্থ সেবায় যদি তাঁহারা আত্মনিয়োগ না করেন, তবে তিনি মন্ত্রিসভাগুলি ভাঙ্গিয়া দিয়া দেশীয় রাজ্য ইউনিয়নগুলিকে কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনের অধীনে আনয়ন করিবেন।

৮ই মে—কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উননবতিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে নিখিল ভারত রবীন্দ্র স্মৃতিরক্ষা সমিতির উদ্যোগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলে এক বিরাট জনসভায় দেশবাসী তাঁহার পুণ্যস্মৃতির প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিবেদন করেন। কলিকাতার শেরিফ ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

নয়াদিল্লীতে বড়লাট প্রাসাদে রাষ্ট্রপাল শ্রী চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারীর সভাপতিত্বে প্রদেশপালগণের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে খাদ্যাবস্থা, উদ্বাস্তু সমস্যা ও দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা ব্যবস্থা আলোচিত হয়।

ইন্দোরে ভারতীয় জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের তিনদিনব্যাপী অধিবেশন শেষ হয়। অদ্যকার অধিবেশনে ১৭টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। তন্মধ্যে ভারতীয় জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের উদ্দেশ্য সম্পর্কিত একটি প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, গান্ধীজীর আদর্শে ভারতে নূতন সমাজ গড়িয়া তোলাই এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য।

# বিদেশী সংবাদ

২রা মে—লণ্ডনে ভারতীয় ছাত্রদের সম্মুখে বক্তৃতা প্রসঙ্গে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বলেন যে, ভারত গোপনে অতলান্তিক চুক্তিতে অংশ গ্রহণে রাজী হইয়াছে বলিয়া যে অভিযোগ করা হইয়াছে, তাহা সত্য নহে।

৩রা মে—লণ্ডনের সংবাদে প্রকাশ, গত সপ্তাহে লণ্ডনে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী কর্তৃক আহূত কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রীদের এক বৈঠকে ব্রহ্মদেশে আইন ও শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে থাকিন নুর গভর্নমেণ্টকে সহায়তা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। প্রকাশ, অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করিয়া এবং ঋণ মঞ্জুর করিয়া ব্রহ্মদেশকে সাহায্য করা হইবে।

৪ঠা মে—মালয় ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের ভূতপূর্ব প্রেসিডেণ্ট এস আর গণপতিকে আজ সকালে কুয়ালালামপুরে ফাঁসি দেওয়া হইয়াছে। মালয় প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম জরুরী বিধানানুযায়ী মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন।

৫ই মে—ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বার্ণ-এ সাংবাদিকদের এক বৈঠকে ঘোষণা করেন যে, আগামী চার, পাঁচ বা ছয় মাসের মধ্যে ভারতে সম্পূর্ণ স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে।

সিঙ্গাপুরের সংবাদে প্রকাশ, ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন নেতা মিঃ গণপতির স্থলাভিষিক্ত মিঃ পি বীরসেনান নামক জনৈক ভারতীয় গত মঙ্গলবার গেরিলা ছাউনি হইতে পলায়নের সময় গুর্খাদের গুলীতে নিহত হইয়াছেন।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূত শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত অদ্য বিমানযোগে নিউইয়র্কে পৌঁছিয়াছেন।

৬ই মে—জগৎপ্রসিদ্ধ নাট্যকার "বেলজিয়ামের সেক্সপিয়ার" কাউণ্ট মরিস মেটারলিঙ্ক পরলোকগমন করিয়াছেন। সাহিত্যের জন্য তাঁহাকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হইয়াছিল।

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক:—আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কাজ না করিয়া অনেকে সময় নষ্ট করে সন্দেহ নাই—কিন্তু কাজ করিয়া যাহারা সময় নষ্ট করে, তাহারা কাজও নষ্ট করে, সময়ও নষ্ট করে। তাহাদের পদভারে পৃথিবী কম্পান্বিত এবং তাহাদেরই সচেষ্টতার হাত হইতে অসহায় সংসারকে রক্ষা করিবার জন্য ভগবান বলিয়াছেন—"সম্ভবামি যুগে যুগে।"

—রবীন্দ্রনাথ


ম্পাদক ঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

হ সম্পাদক ঃ শ্রীসাগরময় ঘোষ

ষোড়শ বর্ষ ] শনিবার, ৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৬ সাল। Saturday, 21st May, 1949. [ ২৯শ সংখ্যা


## ষ্যতের ইঙ্গিত

দক্ষিণ আফ্রিকা সম্পর্কে জাতিসংঘ পরিষদে নৈতিক কমিটিতে ভারতের পক্ষ হইতে এই একটি প্রস্তাব উত্থাপিত হয় যে, সেখানে তীয়দের প্রতি কর্তৃপক্ষের আচরণের ফলে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, সে সম্বন্ধে সন্ধান র জন্য জাতিসংঘ হইতে তিনজন প্রতিনিধি য়া একটি কমিশন নিযুক্ত করা হউক। বলা ল্যে জাতিসংঘে এই প্রস্তাব গৃহীত হওয়াতে তের যে বিশেষ কিছু জয়লাভ হইয়াছিল া আমাদের আনন্দ উল্লাসের তেমন কোন ণ ছিল, আমরা তাহা মনে করি না; ন্তরে এই ব্যাপারে জাতিসংঘের অন্তঃ- তির যে পরিচয় উন্মুক্ত হইয়াছে তাহাতে ষ্যতের সম্বন্ধে আমাদিগকে যথেষ্টই দহান করিয়া তুলিয়াছে। এই প্রস্তাবের ক্ষ ২১ এবং বিপক্ষে ১৭টি ভোট হয়, ১২টি স্ত্রর প্রতিনিধি নিরপেক্ষ ছিলেন। সুতরাং কয়েকটি ভোটের জোরেই প্রস্তাবটি টিকিয়া । এরূপ অবস্থায় সঙ্ঘ-পরিষদের সাধারণ ধবেশনে গ্রহণযোগ্যভাবে প্রস্তাবটি সমর্থিত বার কোন সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া ভারতীয় তনিধি প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছেন ং অবশেষে দক্ষিণ আফ্রিকা, প্যাকিস্থান এবং রতের প্রতিনিধিদের মধ্যে একটি গোলটেবিল কের প্রস্তাব মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন। ন্স ও মেক্সিকো কর্তৃক উত্থাপিত শেষোক্ত তাবে ভারতীয়দের প্রতি আচরণ সম্পর্কে ক্ষণ আফ্রিকার গভর্নমেণ্টের উপর দোষস্পর্শ ই। এ প্রস্তাবে সমস্যা যেমন তেমনই থাকিল, থচ এ সম্পর্কে জাতিসংঘের কর্তব্য কিছুই হল না। সুতরাং ভারতের উদ্দেশ্য সোজা- জি ইহাতে সিদ্ধ হয় নাই বলা চলে। এক্ষেত্রে ক্য করিবার বিষয় এই যে, গ্রেট ব্রিটেন, র্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং অস্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধিগণ মূল প্রস্তাবে ভারতের বিরুদ্ধতা করেন। ভারত ব্রিটিশ রাষ্ট্র-সমবায়ের সখ্য ও সৌহার্দ্য স্বীকার করিয়া লইয়াছে। অথচ এই সেদিন লণ্ডনে প্রধান মন্ত্রী সম্মেলনে সমবেত হইয়া রাষ্ট্র সমবায়ের অন্তর্ভুক্ত থাকিবার সিদ্ধান্ত করাতে যাঁহারা ভারতের রাজনীতিক দূর- দর্শিতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়াছিলেন, দেখা যাইতেছে, লণ্ডনের চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরের কলমের কালি শুকাইয়া যাইতে না যাইতে তাঁহারাই আগে ভারতের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিলেন। সে কাজে ইঁহাদের বিবেকে বাধে নাই। ইঁহারা যদি ভারতের প্রস্তাব সম্পর্কে নিরপেক্ষ থাকিতেন, তবুও ইঁহাদের চক্ষুলজ্জার একটু পরিচয় আমরা পাইতাম; কিন্তু এ বেলা চোখের পর্দায় তাঁহাদের একটুও আটকায় নাই। তাঁহারা সোজাসুজি ভারতের প্রস্তাবের বিরুদ্ধতা করিয়াছেন, অর্থাৎ দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের প্রতি বর্ণ বৈষম্যের ভিত্তিতে যে নির্লজ্জ বর্বর আচরণ চলিতেছে ইঁহারা তাহারই সমর্থন করিয়াছেন। সুতরাং শ্বেতাঙ্গ জাতির প্রভুত্ব এবং প্রাধান্যের যে সংস্কার এতকাল পর্যন্ত ব্রিটিশ জাতির এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নীতিকে নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে, দেখা যাইতেছে, আজও তাঁহাদের সে দিকে সমান নিষ্ঠাবুদ্ধি বজায় রহিয়াছে। ভারতের প্রতি সখ্যসূত্রের দায়েও যে তাঁহাদের অন্তরের কৃষ্ণাঙ্গ বিদ্বেষবুদ্ধি টলিবার বস্তু নয়, এই ব্যাপারে ইহা পরিষ্কার হইয়া গেল। বর্বর এমন বর্ণ- বৈষম্য যাহাদিগকে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে, তাঁহারা ভারতের প্রতি স্বাধীন জাতিসুলভ সৌহার্দ্যের মর্যাদা মানিয়া চলিবে এতটা আশা এখনও করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। লণ্ডনের সম্মেলন সম্পর্কে সেখানকার একখানা সংবাদ- পত্রে সম্প্রতি একখানা ছবি প্রকাশিত হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার মালান, ভারতের প্রধান মন্ত্রীর সহিত একত্র বসিয়া চা-পান করিতেছেন, ছবিতে ইহা প্রদর্শিত হইয়াছিল। এই ফটোখানা দেখিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার জনৈক শ্বেতাঙ্গনন্দন উত্তেজিত হইয়া উক্ত পত্রে একটি প্রতিবাদ ছাপাইয়াছেন। তিনি অভিযোগ করিয়াছেন যে, ছবিখানা নিশ্চয়ই কৃত্রিম; কারণ, দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধান মন্ত্রী কিছুতেই ভারতের একজন কৃষ্ণাঙ্গ প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে একত্র বসিয়া চা খাইতে পারেন না। অবশ্য ব্রিটিশ রাষ্ট্র-সমবায়ের প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিরা সকলেই যে দক্ষিণ আফ্রিকা উক্ত অজ্ঞাত- কুলশীল শ্বেতাঙ্গনন্দনের ন্যায় অসভ্য মনো- বৃত্তি সম্পন্ন হইবেন, আমরা এ কথা বলিতেছি না; কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে তাঁহাদের মধ্যে যিনি যতই সংস্কৃতিসম্পন্ন কিংবা উদার হউন, নীতি- গতভাবে ব্রিটিশ রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্র-সমবায়ের মনোভাব যে বর্ণবৈষম্যের বর্বর কুসংস্কারেই প্রভাবিত, জাতিসংঘের ভোটেই তাহা প্রতিপন্ন হইল। রাষ্ট্র-সঙ্ঘাতের গতিও এক্ষেত্রে লক্ষ্যের মধ্যে পড়িবে। এরূপ অবস্থায় ভারতের পক্ষে রাষ্ট্র সমবায়ে সখ্য- সূত্রে আবদ্ধ থাকা সম্ভব হইয়া উঠিবে কি? জগতে শ্বেতাঙ্গ প্রভুত্ব অব্যাহত রাখাই যদি রাষ্ট্র-সমবায়ের মুখ্য লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায় এবং উদার মানবতার ক্ষেত্রে ভারতের মর্যাদার উপর তাঁহারা আঘাত করিতে দ্বিধাবোধ না করেন, তবে রাষ্ট্র সমবায় হইতে ভারতের বিদায়কালীন পদাঘাত লাভ করিবার জন্য শ্বেতাঙ্গ প্রভুত্ব- বাদীদিগকে আমরা প্রস্তুত হইতে বলি।

**বর্বরতার জন্য বড়াই**

স্বাধীনতা লাভ করিবার পর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের গুরুত্ব অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম প্রত্যক্ষভাবে মানবতামূলক ছিল; এজন্য স্বাধীন ভারত নির্যাতিত মানব সমাজের, বিশেষভাবে এশিয়ার শ্বেতাঙ্গ সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা শোষিত এবং নিগৃহীত জাতিনিচয়ের ইতিমধ্যেই নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছে। মানব-সমুন্নতির ক্ষেত্রের এই কর্তব্য ভারত উপেক্ষা করিতে পারে না। জাগ্রত ভারতের আত্মা তেমন মিথ্যাচার কাহারও প্রভুত্বমূলক নির্দেশে স্বীকার করিতে সমর্থ হইবে না। সে চেষ্টা করিতে গেলে বিক্ষোভ বিপ্লব অনিবার্য হইয়া উঠিবে। প্রকৃত-পক্ষে ব্রিটিশ রাষ্ট্র-সমবায়ে ভারতের স্বাধীনতাকে পূর্ণ মর্যাদা দান করার অর্থই হইল মানবতার এই উদার আদর্শকে স্বীকার করিয়া লওয়া। ভারতের কোন কথা শুনিব না, অথচ রাষ্ট্র-সমবায়ের অন্তর্ভুক্ত জাতিগুলির নীতি যতই মানবতা-বিরোধী হউক, রাষ্ট্র সমবায়ের গুণ গান এবং তাহাদের শীর্ষস্থানীয় প্রতীককে মহিমান্বিত করিয়াই ভারত তৃপ্ত ও তুষ্ট থাকিবে, আমাদের মতে, এমন কল্পনার কোন মূল্যই নাই; বস্তুতঃ তাহা মূর্খতারই পরিচায়ক। আমরা দেখিতেছি, মানবতা-বিরোধী বর্বরতার জন্য গর্ববোধ ব্রিটিশ রাষ্ট্র সমবায়ের নীতিকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধান মন্ত্রী সেদিন তথাকার ব্যবস্থা-পরিষদে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ ভারতীয়দের দাবী-দাওয়া মঞ্জুরের ব্যাপারে ভারতীয়দের অনুরোধ রক্ষার দ্বারা যদি সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা হয়, তবে এখানকার সমস্যার সমাধান করা হইবে না; সোজা কথায়, ডাক্তার মালান ইহাই বলিয়াছেন যে, তাঁহারা ভারতীয়দের কোন দাবী দাওয়া মানিবেন না। সেই সঙ্গে ডাক্তার মালান ইহাও বলেন যে, এই ব্যাপারে দক্ষিণ আফ্রিকার সমগ্র জাতি একমত এবং কোন সরকার যদি উক্ত দাবী মানিয়া লয়, তবে সেই সরকার ১৫ দিনও টিকিবে না। মালয়ের ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের মতিগতিও ভারতের প্রতি সমভাবেই উপেক্ষা-মূলক। শ্রমিক নেতা গণপতির প্রাণদণ্ড বিধানে ভারতের সর্বত্র যে বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে, তাহাতে মালয়ের ব্রিটিশ প্রভুরা চটিয়া উঠিয়াছেন। মালয় ফেডারেশনের চীফ সেক্রেটারী স্যার আলেকজান্ডার নিউবল্ট সম্প্রতি এই সম্পর্কে একটি বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। স্যার আলেকজেন্ডারের অভিমত এই যে, গণপতির প্রাণদণ্ডের ব্যাপার সম্পূর্ণরূপেই মালয়ের ঘরোয়া ব্যাপার, সুতরাং এই সম্পর্কে অপর কোন গভর্নমেন্টের সঙ্গে তাঁহাদের কোন বাধ্য-বাধকতা নাই। এ কথার অর্থ এই কি সাক্ষাৎ সম্পর্কে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের কর্তৃত্বাধীন মালয় বা অন্যত্র ভারতীয় কালা-আদমীর সম্বন্ধে সেখানকার কর্তব্য যাহা খুশি করিতে থাকিবেন, সে সম্বন্ধে ভারতের কোন কিছু করিবার ক্ষমতা নাই, এমন কি, সে ক্ষেত্রে ভারত সরকার মানবতার প্রাথমিক অধিকার পালনের কথা উত্থাপন করিলেও শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের খৃষ্টপ্রেমপ্লাবিত চক্ষু আরক্ত হইয়া উঠিবে। রাষ্ট্র-সমবায়ের এমন মহিমা নিশ্চয়ই ভারতকে প্রলুব্ধ করিবে না এবং এমন সঙ্গীদের সাহায্য লাভের দায়ে আত্মমর্যাদা বিকাইয়া দিতে তাহার বিবেক-বুদ্ধি বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিবে। মানবতা-বিরোধী বর্বরতা লইয়া যাহারা এইভাবে গর্ববোধ করে, ভারত তাহাদের সম্পর্ক বর্জন করাই শ্রেয় মনে করিবে—ইহা সুনিশ্চিত।

**সাম্প্রদায়িকতার কুফল**

মোশ্লেম লীগের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। পাকিস্থান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু লীগ সাম্প্রদায়িকতার যে আগুন জ্বালাইয়া তুলিয়াছিল, তাহা আজও নিভে নাই। বস্তুত দুষ্টপ্রবৃত্তি সংক্রামক ব্যাধির মতই ছড়াইয়া পড়ে এবং মানব-সংস্কৃতিকে কলুষিত করে। পাকিস্থানের জন্য সংগ্রাম মানব-সংস্কৃতির মূলে কোন বৃহৎ আদর্শের প্রেরণা সঞ্চার করিতে পারে নাই; পক্ষান্তরে শিক্ষিত এবং সংস্কৃতিসম্পন্ন সমাজের মধ্যেও তাহা ঘৃণা ও বিদ্বেষের বিষ ছড়াইয়াছে। সম্প্রতি ঢাকা বার লাইব্রেরীর সাধারণ বার্ষিক সভার নির্বাচন উপলক্ষে এ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। এই সভায় আগামী বর্ষের জন্য সভাপতি এবং সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হইবার পর সম্পাদকের পদের জন্য দুইটি নাম প্রস্তাবিত হয়। শ্রীযুত সতীশচন্দ্র মজুমদার ৫৭ ভোট পাইয়া সম্পাদক নির্বাচিত হন, তাঁহার মুসলমান প্রতিদ্বন্দ্বী ৩৯ ভোট পান। গণতন্ত্র পন্থায় সম্পাদক নির্বাচিত হইলেও বার লাইব্রেরীর মুসলমান সদস্যগণ ইহাতে মনঃক্ষুন্ন হন। একজন মুসলমান সদস্য এই উপলক্ষে বক্তৃতা করিবার আবদার উপস্থিত করেন; কিন্তু সভাপতি অনাবশ্যকবোধে সে অনুমতি দেন না। ইহাতে মুসলমান সদস্যগণ প্রতিবাদস্বরূপে সভাস্থল ত্যাগ করিয়া যান। তাঁহারা যাইবার সময় উত্তেজনার সঙ্গে কেহ কেহ বলেন, "হিন্দুদিগকে সমঝাইয়া দেওয়া হইবে—ইহা পাকিস্থান।" অবশ্য ইহা সমঝাইয়া দেওয়ার প্রয়োজন নাই, কারণ পূর্ব-বঙ্গের সমুন্নত সংস্কৃতিসম্পন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তাহা হাড়ে হাড়েই বুঝিয়া লইয়াছেন। ঢাকার বার লাইব্রেরীতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নেতাদিগকে সভা করিতে না দিয়া সেখানকার মুসলমান উকীলেরা পরে ইহা আরও বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। পূর্ব-সমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠান বার লাইব্রেরীর মুসলমান সদস্যদের মতিগতিই যদি এইরূপ হয়, তবে গ্রামে গ্রামে মোল্লা-মৌলবীর দলের মনোভাব হিন্দুদের সম্বন্ধে কিরূপ হইতে পারে, সহজেই বোঝা যায়। পাকিস্থানে আর্থিক কষ্ট আছে, অভাব আছে, অভিযোগ আছে, কিন্তু সেগুলিকেও আমরা কোন গুরুত্ব দিতে চাহি না; কারণ ন্যূনাধিক পরিমাণে অন্যান্য রাষ্ট্রেও সেসব সমস্যা রহিয়াছে, কিন্তু মানুষের মর্যাদার উপর আঘাত; বিশেষভাবে রাষ্ট্র জীবনের উপেক্ষা এবং অসহায়ত্ব উচ্চ সংস্কৃতিসম্মত সমাজকে সবচেয়ে বেশী পীড়িত করে। সেই দুর্দৈব পূর্ব পাকিস্থানের আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। সর্বজনীন মর্যাদা যত দিন সেখানে প্রতিষ্ঠিত না হইবে, ততদিন পর্যন্ত আধুনিক উন্নত রাষ্ট্রস্বরূপে পাকিস্থান গড়িয়া উঠিবে না।

**রাষ্ট্রে সর্বজনীন অধিকার**

ভারতীয় গণ-পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। এই অধিবেশনে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কাজ শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে এবং আগামী ১৫ই আগস্ট ভারতের সাধারণতন্ত্র ঘোষিত হইবে এমন কথাও শোনা যাইতেছে। গণ-পরিষদের উপদেষ্টা কমিটি সম্প্রতি একটি বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। এই বিবৃতিতে দেখা যায়, ধর্মসম্প্রদায় হিসাবে আইনসভায় পৃথক আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা কমিটি পরিত্যাগ করিয়াছেন; পূর্ব সিদ্ধান্তে মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতির জন্য সাময়িকভাবে পৃথক আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা স্বীকৃত হইয়াছিল, সম্প্রতি যেগুলি সব বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে, কেবলমাত্র তপশীলী সম্প্রদায়ের জন্য ব্যবস্থাটি বজায় রাখা হইয়াছে। ইহার ফলে আইনসভায় প্রতিনিধি-নির্বাচনে ধর্মসম্প্রদায়ের নাম করিয়া এবং সাম্প্রদায়িক বুদ্ধিকে উস্কাইয়া কেহ যে বিশেষ সুবিধা করিয়া লইবে, সে উপায় আর থাকিল না। ধর্ম-সম্প্রদায়নির্বিশেষে সকল প্রার্থীকে সমান স্তরে দাঁড়াইতে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইবে এবং অনেককে রাষ্ট্রের সব সম্প্রদায়ের ভোটের উপর নির্ভর করিতে হইবে। বলা বাহুল্য, উন্নত রাষ্ট্রের ইহাই আদর্শ। কিন্তু তপশীলী তালিকা বলিয়া এতদিন পৃথক নির্বাচনে যে ধারাটি চলিয়া আসিতেছিল আমাদের মতে তাহারও পরিবর্তন করা প্রয়োজন। আমরা মনে করি, জাতিগত বিভাগ না করিয়া সমাজে বা শিক্ষায় 'অনগ্রসর' শ্রেণীসমূহকেই এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত করিয়া—তাঁহাদের উন্নতিলাভের দিকে রাষ্ট্রের নীতিকে কেন্দ্রীভূত করা দরকার। বলা বাহুল্য, অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য সাময়িকভাবেই এই ব্যবস্থা, ইহাও যাহাতে যথাসম্ভব রহিত করা যায়, সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। উপদেষ্টা কমিটির সিদ্ধান্ত সর্বত্র অনুমোদিত ও

রিকল্পনায় যে অসম্পূর্ণতা ছিল, এবারকার প্রস্তাবে তাহা প্রায় সংশোধিত হইয়াছে, যেটুকু অসম্পূর্ণতা এখনও রহিল, তাহাও সাময়িকভাবেই গৃহীত হইয়াছে, সুতরাং অবস্থার অগ্রগতির সহিত ইহাও সংশোধিত হইতে বিলম্ব ঘটিবে না।

**বাঙলার সংকট**

ভারত বিভক্ত হইবার ফলে বাঙলা দেশের উপর সবচেয়ে বড় আঘাত আসিয়া পড়িয়াছে। প্রকৃতপক্ষে বাঙলার মত পাঞ্জাবও বিভক্ত হইয়াছে; কিন্তু বাঙলার মত সংকট পাঞ্জাবের পক্ষেও ঘটে নাই। পাঞ্জাব তাহার বলিষ্ঠ সংস্কৃতিকে সংহত করিবার সুবিধা পাইয়াছে; কিন্তু বাঙলার সমগ্র সংস্কৃতি আজ বিপন্ন। চারিদিক হইতে বাঙলার সংস্কৃতিকে বিপর্যস্ত করিয়া ফেলিবার অশুভ উদ্যম চলিতেছে। বাঙলার ঐতিহ্য ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে তাহার অকুণ্ঠ অবদান এবং আত্মোৎসর্গের কোন স্বীকৃতি নাই। পক্ষান্তরে বাঙালীকে পিষ্ট করিয়া ফেলিবার জন্য বিজাতীয় একটা হিংসা এবং ঘৃণার ভাব প্রতিবেশী প্রদেশগুলির মধ্যে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইতেছে। বিহার, উড়িষ্যা, আসাম সর্বত্র এই মনোভাব। মানভূমের ব্যাপারের মীমাংসা করিবার কোন ব্যবস্থা এখনও হয় নাই। সত্যাগ্রহিগণ রাষ্ট্রপতির নির্দেশকে মর্যাদা দিয়াছেন। তাঁহারা সত্যাগ্রহ স্থগিত রাখিয়াছেন; কিন্তু অপর পক্ষ অর্থাৎ বিহার সরকার তাঁহাদের কর্মতৎপরতা বন্ধ রাখেন নাই। সত্যাগ্রহ স্থগিত রাখার সুযোগ তাঁহারা ষোল আনা গ্রহণ করিতেছেন। সত্যাগ্রহকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য সরকারী কর্মচারীরা গ্রামে গ্রামে প্রচারকার্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই সঙ্গে বিহারী নেতারাও আছেন। সভা-সমিতির সাহায্যে বাঙালীদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচার করা হইতেছে এবং বাঙলার বৈষ্ণব সংস্কৃতিসম্পন্ন মাহাতো শ্রেণীর বিরুদ্ধে একটা বিদ্বেষ জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা হইতেছে। বিগত হোলির সময়ের হাঙ্গামা সম্পর্কে পুলিশের বিরুদ্ধে কতকগুলি মামলা আনা হইয়াছিল, পাল্টা হিসাবে পুলিশও পনেরজন বিশিষ্ট বাঙালী ভদ্রলোকের বিরুদ্ধে মামলা আনে। এই পনেরোজন ভদ্রলোকের মধ্যে চৌদ্দজনকে হাজতে আটক করা হয়। ইঁহাদের জামিনের আবেদন অগ্রাহ্য হইয়া যায়। পুলিশের বিরুদ্ধে আনীত মামলার সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া জেলা ম্যাজিস্ট্রেট একজন কনেস্টবলের নামে শমন জারী করিতে বলেন। কিন্তু মহকুমা হাকিম জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সুপারিশ না মানিয়া মামলা নাকচ করিয়া দিয়াছেন। অবস্থা কি দাঁড়াইয়াছে, ইহাতেই বোঝা যায়। মানভূমের যাঁহারা বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্মী, বিহারের খুদে কর্তারা তাঁহাদিগকে জামিনে খালাস পর্যন্ত দিতে নারাজ, অথচ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সুপারিশ সত্ত্বেও কনেস্টবলের বিরুদ্ধে আনীত মামলা সরাসরি নাকচ করিয়া দিতে তাঁহাদের কলমে বাধে নাই। মানভূমের এই অনাচার এবং উপদ্রবের সঙ্গে কুচবিহারের কথাও উল্লেখযোগ্য। কুচবিহার চিরকালই বাঙলা দেশের অংশস্বরূপে বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। কুচবিহারের সহিত বাঙলার সংস্কৃতিগত, ভাষাগত ও রাষ্ট্রগত অভিন্নতা বিদ্যমান। কুচবিহারের জনসাধারণ বাঙলা ভাষায় কথা বলে, অন্য কোন ভাষা তাঁহারা বুঝেই না। এতদিন পরে এই কুচবিহার আসামের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য সেখানকার প্রতিক্রিয়াশীলপন্থীদের মধ্যে এক উৎকট বাতিক দেখা দিয়াছে। আসামের প্রাদেশিক মনোভাবসম্পন্ন নেতারা কিছুদিন হইতেই এই অভিসন্ধিতে ইন্ধন যোগাইয়া আসিতেছেন। স্যার আকবর হায়দরী যখন আসামের রাষ্ট্রপাল ছিলেন, তখন হইতেই ইঁহারা এই মতলব আঁটিতে আরম্ভ করিয়াছেন। শুনিতেছি, আসাম প্রাদেশিক কিষাণ কংগ্রেসের পক্ষ হইতে কুচবিহারে একটি সদিচ্ছা মিশন আসিতেছে। কুচবিহারের সঙ্গে আসামের সাংস্কৃতিক সৌহার্দ্য পুনরুজ্জীবিত করাই নাকি এই মিশনের উদ্দেশ্য। কুচবিহারের সঙ্গে আসামের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক কোন্ অতীত যুগে ছিল, ইতিহাসের গবেষণার বিষয়; কিন্তু এতদিন পরে সেই সম্পর্ক পুনরুজ্জীবিত করিবার গরজ কেন দেখা দিয়াছে, বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না। বস্তুত কুচবিহারকে বাঙলা হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্যই এই সব চেষ্টা। বাঙলার বিরুদ্ধে এইভাবে চারিদিকে চক্রান্ত চলিতেছে। বাঙালী কি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে? কথায় কথায় প্রাদেশিকতার ধুয়া তুলিয়া বাঙালীর মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইতেছে; কিন্তু বাঙলা ভাষা, বাঙলার সংস্কৃতি, বাঙলার অধিকার ক্ষুণ্ণ করিবার জন্য যাহারা নানারূপে অসঙ্গত উপায় স্পষ্টভাবে অবলম্বন করিতেছে, তাহাদের প্রাদেশিকতা নিন্দনীয় হয় না, ইহা আশ্চর্য। বলা বাহুল্য, বাঙালী এই সব জবরদস্তি নীরবে বরদাস্ত করিবে না। তাহার সম্বন্ধে অবিচার যথেষ্ট হইয়াছে এবং তাহার মাত্রা শেষ পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে। যদি এখনও তাহার পরিসমাপ্তি না ঘটে, তবে বিক্ষোভ অনিবার্যভাবে দেখা দিবে। বাঙলা দেশ এখন খুব দুর্দশার মধ্যে পড়িয়াছে, আমরা জানি। বাঙলায় সম্প্রতি নেতৃত্বের এমন অভাব বাঙলা দেশে দীর্ঘদিনের মধ্যে দেখা দেয় নাই এবং [illegible] বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের পীড়ন ও পেষণের মধ্যেও এতটা মানসিক দৈন্য এবং অসহায়ত্ব বাঙালী কোনদিন বোধ করে নাই। তথাপি বাঙালী মরে নাই। সব সংকীর্ণতা, অন্যায় এবং অবিচারের বিরুদ্ধে প্রাণপাতী সাধনার একান্ত প্রেরণা বাঙালীর অন্তরে এখনও রহিয়াছে। ভারতের ঐক্য, সংহতি এবং কংগ্রেসের আদর্শের মর্যাদা রক্ষার জন্য সে প্রেরণা প্রাণময় রূপ পরিগ্রহ করিবে। বাঙালীকে পিষ্ট করা চলিবে না।

**ভগবান বুদ্ধের সাধনা**

বিগত ১২ই মে ফল্গু নদীর তীরে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বুদ্ধগয়ায় বিপুল আড়ম্বরের সঙ্গে ভগবান বুদ্ধের স্মৃতিপূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বৈশাখী পূর্ণিমার এই পবিত্র তিথিতে ভগবান বুদ্ধের জন্ম হয়, তিনি বুদ্ধত্বলাভ করেন এবং নির্বাণের অধিকারী হন। বুদ্ধগয়ায় এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে এবার ২ লক্ষের অধিক তীর্থযাত্রীর সমাগম ঘটে। জগতের বিভিন্ন দেশ হইতে বৌদ্ধ যাত্রিকগণ সমবেত হন। বুদ্ধগয়ার মন্দির পরিচালনার ব্যাপারে বৌদ্ধরা এখন হইতে অধিকারলাভ করিয়াছেন, বহুদিন পর্যন্ত এই অধিকার তাঁহাদের ছিল না। ভগবান বুদ্ধের উদার সার্বভৌম মানবতার বাণী স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনে সার্থক হইয়া উঠুক আমরা ইহাই কামনা করি। প্রকৃতপক্ষে ভগবান বুদ্ধ ভারতীয় সভ্যতার মর্মকথাই ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহাকে বাদ দিলে ভারতের সভ্যতা এবং সাধনার সত্যকার প্রাণবস্তু কিছুই থাকে না। ভারত ভগবান বুদ্ধকে ভুলে নাই, ভুলিতে পারেও না। প্রকৃতপক্ষে ভারতের বর্তমান সভ্যতা এবং সংস্কৃতি ভগবান বুদ্ধের অবদানকে অবলম্বন করিয়াই বাঁচিয়া আছে। ভগবান তথাগতের সত্য, প্রেম এবং অহিংসার আদর্শ এদেশের মনীষাকে সঞ্জীবিত করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে। এ দেশের সাধকগণ তাঁহাদের অন্তরের একান্ত অনুভূতির আলোকে ভগবান তথাগতেরই আরতি করিয়াছেন। স্বাধীন ভারতে ভারতীয় সাধনা এবং সংস্কৃতির সেই অন্তরতম সত্য যুগাগত সংস্কার এবং লোকাচারের আবর্জনা হইতে উন্মুক্ত হইয়া ফুটিয়া উঠুক, বিশ্বের বিরোধ-বৈষম্যজনিত অজ্ঞানতা তাহাতে বিদূরিত হোক, মানুষ মানুষ হিসাবে মর্যাদালাভ করুক, ইহাই প্রার্থনা।

আফ্রফং গ্রীসে দুইপক্ষের মধ্যে একটা আপোষ-নিষ্পত্তি হয় কিনা, তার একটা রব উঠেছিল। শেষ যাই হোক গ্রীসের উত্তর সীমান্ত আর্টকাতে না পারলে গ্রীক গভর্নমেণ্টকে সব রকম সাহায্য দিয়েও যে বিদ্রোহীদের পরাস্ত করানো সহজ হবে না, সেকথা আজ অনেকেই মনে করছে। বর্মার ক্ষেত্রেও উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রক্ষার প্রশ্ন অগোণে বড় হয়ে উঠতে পারে। বর্মী বিদ্রোহীরা যদি চীন থেকে সাহায্য পাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারে, তবে বাইরে থেকে কেবল অস্ত্রশস্ত্র জুগিয়ে বর্মায় বিদ্রোহ বা ঘরোয়া যুদ্ধের সম্পূর্ণ অবসান ঘটানো সহজ হবে না। চীনের কম্যুনিস্টদের সঙ্গে বর্মার বিদ্রোহীরা যোগাযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হবে কিনা, তার ওপর ভবিষ্যৎ অনেকটা নির্ভর করছে। যদি বাইরের সাহায্য পেয়ে বর্মা গভর্নমেণ্ট তাড়াতাড়ি কিছু করে ফেলতে পারেন, তবেই সাহায্যের সার্থকতা হবে, তা না হলে যত দেরী হবে, ততই সমস্যা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হবে বলে আশংকা হয়। ফল যাই হোক বৃটেনের লেজুড় হয়ে বর্মার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করায় ভারতের মর্যাদা বৃদ্ধির কোন আশা দেখা যায় না, বরঞ্চ মর্যাদাহানির সম্ভাবনা আছে। আশা করি, ভারতীয় কর্তৃপক্ষ সতর্ক থাকবেন।

**নাম ও রূপ**

সিয়ামের নাম আবার থাইল্যাণ্ড হোল। জাপানী যুদ্ধের সময়ে সিয়ামের নাম থাইল্যাণ্ড হয়েছিল। জাপানের সঙ্গে থাইল্যাণ্ডের সেই সময়কার সহযোগিতার কথা আবার এই নাম-করণে "মিত্র" শক্তিগুলির মনে পড়বে, কিন্তু থাইল্যাণ্ডের কর্তা বিপুল-সংগ্রাম বুদ্ধিমান লোক। তিনি জানেন যে, এই নিয়ে রাগারাগি করতে এখন আর কারো উৎসাহ হবে না। জাপানের পরাজয়ের পরে "মিত্র" শক্তিদের মন রাখবার জন্যে থাইল্যাণ্ড সিয়াম হয়েছিল। তারপর অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে, এখন আবার থাইল্যাণ্ড হতে কোন বাধা নেই। নতুন কনস্টিট্যুশনেও দেশের নাম থাইল্যাণ্ড।

জাপানী যুদ্ধের সময়ে দুটি নাম পরিবর্তন খুব বিখ্যাত হয়েছিল। একটা হোল—নিজেদের ভাষায় যে নামে থাইরা পরিচিত, সেই নামানুসারে দেশের নাম সিয়ামের বদলে থাইল্যাণ্ড করা। আর দ্বিতীয়টি হোল—জাপানীদের দ্বারা সিঙ্গাপুরের নতুন নামকরণ—শোনান। সিয়াম আবার থাইল্যাণ্ড হোল। সিঙ্গাপুর আবার কোনো দিন শোনান হবে, এ কল্পনা কোনো জাপানীর মনে উদয় হয় কিনা জানি না, তবে মনে এলেও মুখে নিশ্চয়ই কেউ প্রকাশ করে না।

জাপানীরা কেবল বুদ্ধিমান জাত নয়, মুখ বুজে অনিবার্য দুঃখকে সহ্য করার শক্তিও অসীম। কিন্তু জাপানীদের পক্ষে সেটা দুর্ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পণ নয়, দুর্ভাগ্যের ওপর জয়ী হবার কৌশলের অঙ্গ। সেই জন্যে এক এক সময়ে মনে হয় যে, জেনারেল ম্যাক-আর্থার জাপানীদের যতটা পোষমানাতে পেরেছেন, তার চেয়ে জাপানীরা বোধ হয় তাঁকে বেশী পোষ মানিয়েছে। যুদ্ধের ক্ষতি-পূরণ হিসেবে জাপান থেকে ২১ লক্ষ টন ওজনের কল-কারখানা তুলে নেওয়া স্থির হয়েছিল। এর মধ্যে এ পর্যন্ত মাত্র ৫০ হাজার টন ওজনের কল-কারখানা জাপানের বাইরে গেছে। সম্প্রতি ওয়াশিংটন থেকে খবর এসেছে যে, জাপান থেকে আর কল-কারখানা সরিয়ে নেওয়া হবে না বলে মার্কিণ কর্তৃপক্ষ আদেশ দিয়েছেন। কারণ জাপানকে খেয়ে বাঁচতে হলে জাপানী শিল্পের উৎপাদন নাকি পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখা দরকার। অবশ্য রাশিয়ার দিকে নজর রেখেই আমেরিকা জাপানকে বাঁচাতে চাচ্ছে। তাহলেও একথা ভুললে চলবে না যে, জাপানীদের জাতীয় শক্তি দেখেই আমেরিকা জাপানের ওপর নির্ভর করতে সাহস করছে।

অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী মিঃ জোসেফ চিফলে সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ার লেবার পার্টির কর্মপরিষদের এক সভায় বলেছেন যে, আপাততঃ যুদ্ধের সম্ভাবনা কমেছে। এই অবসরে অস্ট্রেলিয়ার লোকসংখ্যা বাড়াবার জন্যে যত পারা যায় "সবচেয়ে ভালো" লোক বৃদ্ধি করা উচিত। চিফলে সাহেবের ভয় যে, বর্তমান সুযোগ হারালে পরে অস্ট্রেলিয়ার মুশকিল হবে। কারণ এশিয়ার অন্যান্য দেশে লোক-সংখ্যার চাপ বাড়ছে এবং তারা অস্ট্রেলিয়ার ফাঁকা জায়গাগুলির দিকে নজর দেবেই। মিঃ চিফলে চান বৃটিশ জাতের লোক দিয়ে অস্ট্রেলিয়া ভরাতে না পেলে বৃটিশ প্রভাবান্বিত অন্য ইউরোপীয় জাতের লোকও কিছু কিছু নেওয়া চলতে পারে। মোট কথা, অস্ট্রেলিয়াকে 'সাদা' বলতেই হবে। হয়ত আরও কিছুকাল এই আখ্যা বহাল রাখা যাবেও। কিন্তু চিরকাল অস্ট্রেলিয়ার দেশ এশিয়াবাসীদের কাছে বন্ধ করে রাখার শক্তি কি কারো হবে?

১৫.৫.৪৯

# অনেক অনেক পথ অতিক্রম করি

**আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত**

দিবস শর্বরী,
অনেক অনেক পথ অতিক্রম করি ঃ
কোথা শীর্ণ রেখা নদী কোথা বা পাহাড়—
কোথা ঘন বনানীর কালো অন্ধকার।
কভু বা উজ্জ্বল আশা, কভু শ্রান্তি মনে
কভু নামে বর্ষাধারা শ্রাবণ গর্জনে।
নামে আলো, নামে ছায়া
তবু গান গাই—
বন্ধুর হোক্ না পথ বিশ্রাম যে নাই।
লোভাতুর হাতছানি, আঘাতের ব্যথা
প্রতি পদক্ষেপে জমে নিত্য কতো কথা
প্রচুর কাহিনী জমা—নানান্ সুরের
গন্ধময় গন্ধহীন রঙীন ফুলের;
কাঁদি, হাসি গান গাই
দিবস শর্বরী
অনেক অনেক পথ অতিক্রম করি।

# রবীন্দ্রনাথ

## শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

বীন্দ্রনাথ আজ বেঁচে থাকলে ৮৮ বৎসর অতিক্রম করতেন। জর্জ বার্নার্ড শ কে ৯৩ বছর বয়সে তাঁহার পরিহাস চটুল চিন্তাধারার পরিচয় দিচ্ছেন। মানুষ সুস্থ হয়ে জীবন ধারণ করবে—এইটিই সেভাবে আকাঙ্ক্ষিত, আর রবীন্দ্রনাথের লোকোত্তর মানুষের পক্ষে সুস্থ সবল নিয়ে এই সকলের কাম্য দীর্ঘায়ু হয়ে বেঁচে জাতির পক্ষে সৌভাগ্যের কথা হ'ত। যাঁরা জীবনে রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য আর স্নেহ পেয়ে ধন্য হয়েছি—তাদের কাছে একটা বিশেষ ক্ষোভের কথা যে রবীন্দ্রনাথ স্বাধীনতা দেখে যেতে পারলেন না। দেশের উপস্থিত অবস্থায় বেঁচে থাকা পক্ষে কষ্টকর হ'ত, কিন্তু তাঁর উদার দৃষ্টি উপদেশ থেকে আমরা জাতীয় জীবনে না কিছু পথ্য আর পাথেয় সংগ্রহ করতে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সর্বপল্লী যে উক্তি করেছিলেন তাঁর জীবৎকালে শেষ জন্মদিনে সেই উক্তির নিহিত সত্য, আমরা মর্মে মর্মে অনুভব

is he is still with us shows that has not yet forsaken us.

রবীন্দ্রনাথের মতো বিরাট পুরুষের কিছু বলতে গেলেই তিনটি বিষয়ের বর্ণনা করতে হয়—(১) তিনি ব্যাপকভাবে সমগ্র জাতির জন্য কি করেছেন বা কি গিয়েছেন, (২) তিনি সংকীর্ণভাবে তাঁর ভাষীদের জন্য কি করেছেন—আর ব্যক্তিগতভাবে আমরা তাঁর কাছে কি জন্য । শেষোক্ত বিষয়টি সম্বন্ধে বিচার আলোচনা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার হ'তে পারে। কিন্তু আর দুটি বৃহত্তর ব্যাপক দিক্ থেকে আমাদের যে হবে সেটা অনেকটা বস্তুতান্ত্রিক হবে—একেবারে নিছক আত্মকেন্দ্রী নয়। আমরা সমগ্রভাবে ভারতীয় জাতির জন্য রবীন্দ্রনাথ কি দিয়ে গিয়েছেন সেটার একটু করে দেখি—আর তা থেকেই নিখিল তের জনগণ রবীন্দ্রনাথে কাছে কতটা থাকবে তার একটা দিগদর্শন আমরা পারবো।

আর একটা কথা আছে। আমাদের ব্যক্তি- প্রদেশগত বা সমগ্র দেশ বা জাতিগত সত্তার বা জীবনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সংযোগের কথা অতিক্রম করে বিশ্বমানবের সঙ্গে তাঁর যোগের কথাও বিচার্য। তবে সে সম্বন্ধে স্পষ্ট অভিমত দেবেন—ভারতের বাইরের লোকেরা—আমাদের মুখে তারা ঝাল খাবেন না। তবে তাঁরা কিভাবে রবীন্দ্রনাথকে দেখেছেন ও দেখছেন—তার ধারণা আমরা বিদেশে গিয়ে বা বিদেশীদের সঙ্গে মিশে বা বিদেশীদের লেখা পড়ে করতে পারি।

আমেরিকার সুপরিচিত লেখক Will Durant রবীন্দ্রনাথকে তাঁর লেখা একখানি বই পাঠিয়ে দেন এই বইতে তিনি এইভাবে রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন—You are the reason why India should be free. একজন নিরপেক্ষ বিদেশীর কাছে এইরকম কথা শুনে বুঝতে পারা যায় যে, বাইরের লোকেদের কাছে ভারতবর্ষের মর্যাদা এই একটিমাত্র মানুষ কত বাড়িয়ে দিয়েছেন। বাস্তবিক আমাদের সংস্কৃততে যে কথা আছে যে সৎ পুত্রের দ্বারা "কুলং পবিত্রং জননী চ কৃতার্থা" হ'য়ে থাকে, তা এই রকম ঘটনা বা অবস্থা থেকে বোঝা যায়। এখন থেকে ২৬।২৭ বছর পূর্বেকার কথা, রবীন্দ্রনাথ তাঁর ১০।১১ বৎসর পূর্বে নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন, কিন্তু ইউরোপের সব দেশেই তাঁর লোকপ্রিয়তা ক্রমবর্ধমান দেখে প্যারিসে ছাত্ররূপে আমাদের অবস্থানের সময়ে মহারাষ্ট্র দেশ থেকে আগত একজন সতীর্থ আমায় বলেছিলেন—রবীন্দ্রনাথ is the greatest ambassador who can be sent out by any country to the world. কথাটা অতি সত্য। রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবে সাধারণ ভারতবাসীই বিদেশের সহৃদয় শিক্ষিত জনগণের কাছে যে মর্যাদা পেয়েছেন, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যে সব জাতির লোক পৃথিবীতে অগ্রণী—তাদের প্রাপ্য মর্যাদার চাইতে তা কোন অংশে কম নয়। এটা ভারতের বাইরে নানা দেশে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা। খালি মর্যাদা নয়—তার সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের গৌরবের জন্য তাঁর বিশ্বমানবিকতার জন্য আরও একটা জিনিস বিদেশীদের কাছে থেকে পেয়েছি—সেটা হচ্ছে হৃদ্যতা বা মিত্রতা, যেটা ইংলণ্ড আর আমেরিকার মতো দোর্দণ্ডপ্রতাপ জাতির মানুষও সর্বত্র সেভাবে পায় না। এই সব অভিজ্ঞতার কথা—এর আগে বলেছি, এখন আর পুনরুক্তি করবো না। কাজেই আধুনিক ভারতবাসীর পক্ষে বিশেষ ক'রে ইংরেজের অধীন ভারতবাসীর পক্ষে রবীন্দ্রনাথের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবার এই একটা মস্ত বড় কারণ। রবীন্দ্রনাথ বাইরের লোককে কোন কিছুর চটকে কোন কিছু sensational বা রোমাঞ্চকর ব্যাপার দেখিয়ে মুগ্ধ করেন নি—আর এই-খানেই তাঁর গৌরব—আর ভারতেরও গৌরব। তিনি সহজভাবে নিতান্ত আপনার জনের মতো নানা জাতির বিদেশী লোকের মনে একটা ভালোবাসার আসন পেয়েছিলেন। একটি ছোট ঘটনার কথা আমার মনে হচ্ছে—এটি বন্ধুবর শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগের অভিজ্ঞতা। একবার প্যারিসে রবীন্দ্রনাথ কিছুকাল অবস্থান করেন। কালিদাসবাবু তখন তাঁর সঙ্গে ছিলেন। প্যারিসের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে একটা বক্তৃতা দিতে রবীন্দ্রনাথকে যেতে হবে। লম্বা পাড়ি। ট্যাক্সি আনা হ'ল। রবীন্দ্র-নাথের হোটেলের দরজায় ট্যাক্সি হাজির—উনি সিঁড়ি দিয়ে নামছেন। গাড়ি পর্যন্ত প্রত্যুদ্-গমনের জন্য কতকগুলি লোক সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ, সৌম্য আকৃতি আর সর্বোপরি তাঁর প্রশান্ত স্নিগ্ধ দৃষ্টি আর ঋষি জনোচিত মুখমণ্ডল, যা দেখে সকলেরই শ্রদ্ধা বা সম্ভ্রম জাগতো, ট্যাক্সিচালকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। কালিদাসবাবু নেমে রবীন্দ্রনাথের জন্য ট্যাক্সির দরজা খুলতে আসছেন ট্যাক্সিচালক নিজে গাড়ি থেকে বেরিয়ে এলে এসেই চুপি চুপি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো মশাই ইনি কে? কালিদাসবাবু বললেন, ইনি হিন্দু বা ভারতীয় কবি রবীন্দ্রনাথ তাগোর শুনেই লোকটি সসম্ভ্রমে তাঁর দিকে তাকালে আর সঙ্গে সঙ্গে মাথার টুপি খুলে হাতে নিলে, আর নিজে এগিয়ে এসে রবীন্দ্রনাথের জন্য গাড়ির দরজা খুলে দাঁড়িয়ে রইল। রবীন্দ্রনাথ গাড়িতে চড়লেন,—যথাস্থানে ট্যাক্সি এসে পৌঁছলো, সেখানে তাঁর জন্যে অপেক্ষমান লোকেরা—তাঁকে স্বাগত ক'রে ভিতরে নিয়ে যাচ্ছে, কালিদাসবাবু এলেন, ট্যাক্সির মিটার দেখতে, ভাড়া কত দিতে হবে। বেশ একটা মোটা অঙ্ক উঠেছিল, কিন্তু ট্যাক্সিওয়ালা কল ঘুরিয়ে দিলে আর বললে, আমি ভাড়া নেবোনা—আমি ওঁর বই পড়েছি। কালিদাসবাবুর কৌতূহল হ'ল—তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কি কি বই পড়েছ—আর কোন্ বইটা তোমার সব চাইতে ভালো লেগেছে? ফরাসীতে ৩।৪ খানা বই যা বেরিয়েছে, সব পড়েছি, তবে সব চেয়ে ভালো লেগেছে "সাধনা"। বলেই বেশি বাক্যব্যয় না করে খালি ট্যাক্সি নিয়ে সে চুকে

গেল। এ থেকে এ কথা বলবো না যে, Paris-এ প্রত্যেক বা বেশির ভাগ ট্যাক্সিওয়ালা রবীন্দ্রনাথের বই পড়ে থাকে। তবে একটা জিনিস বুঝতে পারা যায় কি রকম ভাবে সাধারণ লোকের কাছে তাঁর বাণী পেণছৈছে—আর তাঁর কাছ থেকে তারা কিছু অন্তত পেয়েছে মনে ক'রে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা—এমন কি ভালোবাসার ভাব পোষণ করেছে। আর রবীন্দ্রনাথ কবি হিসাবে এই ভালোবাসাটুকুনই কামনা ক'রে গিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতি এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসীর প্রতি এই আকর্ষণ আর শ্রদ্ধার মূলে কোন রাজনৈতিক কারণ নেই, আছে এক সাধারণ মানবধর্ম যেটা সংকীর্ণ জাতীয়তা অথবা দলগত ভাবুকতা বা স্বার্থের বহু ঊর্ধ্বে অবস্থিত।

এইখানেই রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানবের চিত্তজয়ের মূল কারণ নিহিত। তিনি মানুষকে ভালোবেসেছিলেন আর বিশ্বমানবের প্রতি প্রেম তাঁর জীবনে এ যুগে যে মহনীয়ভাবে প্রকাশ পেয়েছিল সে রকমটি আর কোথাও দেখা যায়নি। রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে কে যেন বলেছেন, তিনি ছিলেন most stupendous mind of modern times—এটা যেমন সত্য কথা, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে এটাও সমানভাবে সত্যি কথা যে, তাকে "The greatest lovers of man"-এর দলে প্রথম শ্রেণীতে স্থান দিতে হয়। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা এত নানামুখী যে, তার বর্ণনা করে অসংখ্য বিরুদ বা বর্ণনামূলক উপাধি তাঁর সম্বন্ধে তৈরি করে প্রয়োগ করতে পারা যায়, আর তাতেও তাঁর গুণের পার আমরা পাবো না। উড়িষ্যার কবি সদানন্দ চৈতন্যদেবকে নাকি 'হরিনাম মূর্তি' এই আখ্যা দিয়েছিলেন—চৈতন্যদেবের নামধর্ম প্রচারের কথা মনে করলে এই বিষয়টিকে তাঁর সম্বন্ধে সার্থক বলা যায়। তেমনি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অন্যতম বিরুদ বা আখ্যা হতে পারে—'মানব প্রেম মূর্তি' বা 'মানবিকতা বিগ্রহ।'

বিশ্বমানবের কাছে এই সম্মান আর বিশ্বমানবের মনে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা—এই দুটি জিনিস বহু স্থলে অঙ্গাঙ্গীভাবে গ্রথিত দেখেছি। রবীন্দ্রনাথ যেমন ওদিকে বিশ্বজগতে আমাদের মর্যাদা বাড়িয়েছেন, তেমনি তিনি আমাদের ঘরের মানুষই রয়ে গিয়েছেন। এই দুটি জিনিসের একত্র অবস্থান—বড়ই অপূর্ব, এক অদ্ভুত রহস্য। ওয়ার্ডসওয়ার্থ যে বলেছেন, স্কাইলার্ক পাখী একদিকে গগনবিহারী, আকাশ আপনার সঙ্গীতে সে ভরিয়ে দেয়—আর এক দিকে সে মাটির উপরে তার বাসা ভোলে না। ওদিকে ফিনল্যান্ডের অনুরাগী ভক্ত রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সংস্কৃতে কবিতা লিখছেন—

ন কর্হিচিৎ কিল প্রাচী প্রতীচ্যা সংগমিষ্যতি।
পুরস্তাদ্ বৈ রবিস্তূদয়ন্ প্রতীচীমপ্যরোচয়ৎ॥
দক্ষিণামপ্যুদীচীং চ ব্যভাসয়দ্ উরুক্রমঃ।
তৎ পূজ্যসে, রবীন্দ্র! ত্বম্ উত্তরস্যাং বিশেষতঃ॥

বাঙলায় যার অর্থ হচ্ছে—

"পূর্বদেশ পশ্চিমের সঙ্গে কখনো মিলিত হবে না, কিন্তু পূর্বদেশে উদিত হয়ে রবি পশ্চিমকেও আলোকিত করেন—উরুক্রম অর্থাৎ বিষ্ণুর মতো দূরগামী হয়ে দক্ষিণ আর উত্তর দিককেও রবি উদ্ভাসিত করেছেন; সেইজন্য হে রবীন্দ্র! তুমি বিশেষ করে আমাদের উত্তরদেশেও পূজিত হও।"

আবার যবদ্বীপের ভাবুক রবীন্দ্রনাথের কবিতার তিন হাত ঘুরে-আসা অনুবাদ "বাঙলা থেকে ইংরাজি, ইংরাজি থেকে ডাচ, ডাচ থেকে যবদ্বীপীয় ভাষা" পড়ে ভাবাবেগে প্রকাশ্য সভায় কেঁদে ফেলেছিলেন—আর লেবাননের আরব কবি শান্তিনিকেতনে এসে রবীন্দ্রনাথকে দর্শন করে নিজেকে কৃতার্থ মনে করে যাচ্ছেন, তেমনি এদিকে বাঙলা দেশের মেয়েরা সভা করে রবীন্দ্রনাথকে আহ্বান করে এনে তাঁকে জানাচ্ছেন—আপনি আমাদের ঘরের কবি, আমাদের গৃহকর্মের ভিতরে, আমাদের রান্নাঘরের ভিতরেও আপনাকে পেয়েছি। কথাটা যে বলা হয়েছে—অতি সার্থক কথা—"He alone is truly international who is most intensely national".—সেক্সপীয়র সম্বন্ধেও বলা হয়েছে যে, একদিকে যেমন ইংলন্ডের জাতীয় কবি, তেমনি তিনি সমগ্র জগতের কবি।

আধুনিককালের ভারতীয় চিন্তানেতাদের কারো কারো বাণী বা শিক্ষা বা চরিতকথা ভারতের বাইরে মানুষদের মধ্যে দিয়ে পেণছেছে। কিন্তু এঁদের সকলের সব কথা কিম্বা চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য যে বাইরের লোক ঠিকমতো ধরতে পেরেছে, তা মনে হয় না, আর ধরতে পারাও সম্ভব নয়। স্বামী বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্বের মহিমা কিছু কিছু তাঁর বাইরের শিষ্যেরা তাঁর সঙ্গে এসে বা তাঁর লেখা পড়ে বুঝতে পেরেছিলেন, ভগিনী নিবেদিতার মতো দুচারজন, তিনি যেভাবে বেদান্তকে আধুনিক জীবনে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন, তারও ধারণা করতে পেরেছেন, কিন্তু সাধারণ শিক্ষিত অ-ভারতীয়ের কাছে, ভারতীয় সভ্যতারই মতো দুর্বোধ্য প্রহেলিকা হয়ে থাকতেন, যদি না রোমা রোঁলার মতো অনুভবী ও দরদী চিন্তানেতা তাঁর স্বরূপ পাশ্চাত্যের সামনে সার্থকভাবে প্রকাশ করে দিতে সমর্থ হতেন। গান্ধীজীর অহিংসা আর সত্যাগ্রহ তাঁর আদর্শ আর কার্যক্রম ইউরোপে আর আমেরিকায় সাধারণ লোকে তো বুঝতেই পারে না। অ-সাধারণ লোকের মাথাতেও ঢোকে না, কিন্তু তিনি যে ইংরাজকে বিব্রত করেছিলেন, এটা তারা বুঝেছিল। আর ইংরাজের প্রতি প্রীতির আধিক্য আর তাঁর স[ঙ্গে] সঙ্গে ভারতের যোগী ফকির সন্ন্যাসী বিভূতি সম্বন্ধে একটা আবছা আবছা ভীতি-মিশ্র বিস্ময়ের ভাব—এই দুইয়ে জনসাধারণের মনে একটা অস্পষ্ট ধারণা এনেছিল—যদিও একথা স্বীকার করতে হবে যে, সত্যকার উচ্চ মনোভাবের মনীষীদের অনেকে মহাত্মাজীর অহিংসার বাণীর আবশ্যকতা বেশ প্রণিধান করেই মেনে নিয়েছিলেন—কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আলাদ কথা। তাঁকে লোকে পেয়েছিল কবিরূপে। যাঁর লেখায় তারা তাদের নিজের মনের মধ্যে নিহিত আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ, নীতি-আদর্শ প্রভৃতির প্রতিধ্বনি পেয়েছিল—

One touch of Nature maketh the whole world keen.

এই touch of Nature রবীন্দ্রনাথকে সকল দেশের মানুষের আত্মীয় করে তুলেছে।

রবীন্দ্রনাথ সমগ্রভাবে ভারতবর্ষের আ[র] ভারতবাসীদের মর্যাদা বাড়িয়েছেন—কিন্তু তাঁ[র] সমভাষাভাষী আমরা বাঙালী—আমাদের জ[ন্য] বিশেষভাবে, তিনি যা দিয়ে গিয়েছেন তা[র] মূল্য আমরা ঠিকমতো হয়তো বুঝি না, আ[র] মূল্য দিতেও হয়তো আমরা পারবো না। যে[মন] হাওয়া, জলের মতো এমন অনেক জিনি[স] আছে, আমাদের ভাবজগতে আর সামাজি[ক] জীবনে যা না হলে আমাদের একদণ্ড চলে [না] —আর যার কথা আমরা সাধারণত মনেই রা[খি] না। আমাদের এই যে বাঙলা ভাষা, যে[টা] উপস্থিতকালে বাঙালীর প্রতিষ্ঠার একটি প্রধ[ান] অবলম্বন বলে আমরা মেনে নিয়েছি, রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে সেই বাঙলা ভাষায় গ[র্ব] করার আর যা থাকে, তা কতটা কি[ছু] সাহিত্যের কোঠায় পেণছৈ (আমাদের বাঙলা আর ভারতের জীবনে তার সার্থকতা যাই থা[ক] না কেন), সেটা বিবেচনা করবার কি[ছু]। ইংরেজ কবি আর লেখক গোল্ডস্মিথ সম্ব[ন্ধে] অতি উচ্চ প্রশংসা করে ডাঃ জনসন যে ক[থা] বলেছিলেন, সেকথা রবীন্দ্রনাথের মতো মনীষ[ী] সম্বন্ধেই প্রযোজ্য—"He touched noth[ing] which he did not adorn." রবীন্দ্রনাথের মতো এমন সার্বভৌম সাহিত্য-সম্রাট জগতের বাঙ্ময় ইতিহাসে আর কোথায় দেখা গিয়েছে। এ সম্বন্ধে মাতৃভাষার সাহিত্যের সঙ্গে স্বল্প পরিচয়ও যার আছে—এমন বাঙালীকে কিছু বলবার আবশ্যকতা নেই। কেবল কি সাহিত্যে-সোফোক্লিস্ সম্বন্ধে যে বলা হয়েছে, যে তিনি যে 'Saw life steadily and saw it whole', রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সে কথা তো বলতে পারা যায়ই উপরন্তু তিনি কেবল জীবন-নাট্যের spectator বা দর্শক মাত্র ছিলেন না। তাঁর মধ্যে zest of life, জীবন-রস সম্বন্ধে সচেতনতা আর আগ্রহ এত ছিল যে, তিনি নিজে তাতে পুরোপুরি অংশ নিতে দ্বিধা করেননি। এই জন্যে সাহিত্যের বাইরে অথচ প্রত্যক্ষ ব[া]

ক সাহিত্যের সঙ্গে সংযুক্ত অভিনয় সজ্জা, রূপকলা অবং সুকুমার শিল্প তাঁর ার অধীনেই ছিল। আবার ওদিকে রাষ্ট্র নর সঙ্গেও তাঁর সংযোগ যে কত ঘনিষ্ঠ সেকথা আধুনিক ভারতের ইতিহাসের পৃষ্ঠা জুড়ে আছে। বাঙালীকে ূর্ণ ভারতীয় আর পরিপূর্ণ মানুষ হতে নাথের দান যে কতখানি তা অল্প কথায় বলবার নয়। ভগবানের আশীর্বাদ- এ যুগে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব না হলে ক সংস্কৃতিতে, আত্মসম্মানে, জাতীয়তার বাঙালী কতটুকু দাঁড়িয়ে থাকতে সে বিষয়ে আমরা প্রশ্ন করতে পারি। রকম ঋণ নিয়ে মানুষ পৃথিবীতে জন্মায়, ঋণ, পিতৃ ঋণ আর ঋষি ঋণ। আর ের জীবন আর জীবনের সাধনা এই তিন পরিশোধ চেষ্টাতেই হয়ে থাকে। রবীন্দ্র- লেখার সঙ্গে পরিচয় সংস্থাপন এবং সীর মধ্যে তাঁর বাণীর প্রচার আমাদের নর অন্যতম ঋষি ঋণ পরিশোধ বলে ধরতে পারি। এইজন্যই প্রত্যেক সহৃদয় ক সংস্কৃতিকামী বাঙালীর এদিকে একটা আর দায়িত্ব আছে। রবীন্দ্রনাথের বাণী জ মারফৎ প্রধানতঃ ভারতের অন্য প্রদেশে হচ্ছে, সম্প্রতি দেবনাগরী অক্ষরে রবীন্দ্র- মূল বাঙলা রচনা প্রকাশিত করবার যে বিশ্বভারতী কার্যে পরিণত করবার করছেন, সেটি একটি বিশেষ সময়োপ- যোগী কাজ হবে—এর দ্বারা রবীন্দ্রনাথের আর সঙ্গে সঙ্গে বাঙলা সাহিত্যের আদর নিখিল ভারতে আরও বাড়বে, এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। এই কাজে রবীন্দ্র ভারতীরও অংশ গ্রহণ করা কর্তব্য বলে মনে করি।

এখন বিশ্বমানব, ভারতবর্ষ আর বাঙালী সমাজের কথা ছেড়ে নিজের ব্যক্তিগত কথায় বলতে পারা যায়, আমার নিজের ব্যক্তিত্বের স্ফুরণে রবীন্দ্রনাথ যতটা স্থান নিয়ে আছেন, তারই পটভূমিকার সামনে ব্যাপকতর পরিধির মধ্যেই তাঁর প্রভাবের কথা আমি বিচার করতে পারি। এ বিষয়ে ব্যক্তিগত কথা সব বলবার নয়, বলতে পারাও যায় না, তবে আমার জীবনে যে সমস্ত বস্তু আমাকে আমার পরিপূর্ণ মানসিক আর আধ্যাত্মিক সার্থকতার পথে পরিচালিত করেছে তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য আর তাঁর ভাবধারার সঙ্গে স্বল্পাদপি স্বল্প পরিচয়, একটি প্রধান। স্কুলে পড়বার সময় ১৪ বৎসর বয়সে রবীন্দ্র রচনার সঙ্গে প্রথম পরিচয় ঘটে— 'চিত্রার' আর 'কথা ও কাহিনীর' কতকগুলি কবিতার মাধ্যমে তার লোকোত্তর প্রতিভার একটি ঝলক চোখের সামনে আসে—অনির্বচনীয় এক সৌন্দর্য- ময় স্বপ্নরাজ্যের দ্বার যেন আমার জন্য উন্মুক্ত হয়ে যায়। যার পাত্র যতটুকু সে ততটুকুই নিতে পারে—আমার মতো সাহিত্যিক রসবোধ-বর্জিত নীরস ভাষা- তত্ত্বের আলোচকের মন যতটা আপ্লুত হবার তা হয়েছে, জীবনে এক নতুন অমৃত রসের আস্বাদ রবীন্দ্র রচনা আমার কাছে এনে দিয়েছে। ভাষাতত্ত্বের আলোচক হিসাবে আমার পক্ষে একটা বিশেষ আত্ম- প্রসাদের কথা এই যে, রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের একটা দিক আমাদেরই পর্যায়ে পড়ে— ব্যাকরনিয়া রবীন্দ্রনাথকে আমাদের আলোচ্য বিদ্যার একজন পথিকৃৎ বলে আমরা মেনে নিতে পারি। রবীন্দ্রনাথের সাহচর্য, সেটা জীবনে এক অপূর্ব সৌভাগ্যরূপে আমি পেয়েছি। তাঁর সঙ্গে কথা কওয়াটাই ছিল এক শ্রেষ্ঠ মানসিক রসায়ন। তাঁর স্নেহ পেয়েও ধন্য হয়েছি। তাঁর স্নেহ আমার মতো অনেকেই পেয়েছেন, কিন্তু মহাপুরুষদের সঙ্গে যাঁদের সংযোগ বা সাহচর্য ঘটে, তাঁদের প্রত্যেকেরই বৈশিষ্ট্যের আধারের মধ্যে এই সংযোগের সূত্র মিলবে। তানসেন তাঁর এক ধ্রুপদের বাণীতে তাঁর আরাধ্য দেবতার সম্বন্ধে বলেছেন যে, তুমি বহুবল্লভ কিন্তু তানসেনের কাছে তুমি একবল্লভ। রবীন্দ্রনাথের বহুমুখ ব্যক্তিত্বের মধ্যে আমি এমন একটা দিক পেয়েছি, যেখানে কেবল তিনি আছেন আর আমি আছি—আর কারো স্থান সেখানে নেই। একথা আমার মতো আরও অনেকে নিশ্চয়ই বলতে পারবেন। মহা- পুরুষের সর্বশ্বরত্বের এই একটা প্রমাণ। ব্যক্তিগত কথা এসে পড়লে মূক হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। আর এই কথা বলেই আমি আমার বক্তব্যের উপসংহার করছি— "The highest tribute is tribute of Silence."

# সমীক্ষা

## শ্রীরণজিৎকুমার সেন

মাঝে মাঝে এ নিরুদ্ধ বেদনার পারে
খুঁজে পাই আর এক জীবনঃ
রোগমুক্ত শোকমুক্ত উজ্জ্বলন্ত এক
নিবিড় নীলিম নীল জীবন-সায়র।

প্রচুর আনন্দ-রসে স্নান ক'রে উঠিঃ
সূর্যস্নানঃ
স্নান ক'রে উঠি এক চকিত আলোয়।

মনে হয় এ পৃথিবী এ বসুধা যেন
ছেয়ে গেছে সুরে সুরে...
কথা আর গানে আর নূপুরে নূপুরে।

সেখানে উর্বশী-নৃত্যঃ
সেখানে নক্ষত্রাকাশঃ
সেখানে গোলাপ-দামে যৌবন মূর্ছিতঃ
মহারাজ ইন্দ্র আমি সৌর-সভায়।
এ মুহূর্তে ভুলে যাই—
মর্তের বজ্রাহত আমি ব্যর্থ বটঃ
ভূমিকম্পে টলোটল সহস্র শিকড়।
আকাশ এখান থেকে উঁচুতে অনেক,
অনেক উঁচুতে আরও তারকার দেশঃ
যেখানে মঙ্গলগ্রহে আর এক পৃথিবী
চকিতে দুরন্ত রচে সহস্র যোজন।

# হিউএন্ চ্যাঙ্-এর ভারতভ্রমণ

## —শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু—

( পূর্বানুবৃত্তি )

### কাশ্মীর থেকে কান্যকুব্জ

হিউ এন চাঙ পশ্চিমের গিরিবর্ত্ম দিয়ে সম্ভবত বরাহমূলপুরায় (বা বরামূলায়), কাশ্মীর রাজ্যে প্রবেশ করলেন। তাঁর বিদ্যাবত্তার ও সাধুত্বের খ্যাতি আগেই কাশ্মীরে পৌঁছেছিল। তিনি কাশ্মীরের সীমানায় পৌঁচেছেন শুনে কাশ্মীর রাজ দুর্লভ বর্দ্ধন প্রজ্ঞাদিত্য তাঁর মাতুলকে হিউ এন চাঙের জন্যে গাড়ি-ঘোড়াসহ পাঠিয়ে দিলেন। দিন কতক পরে তাঁরা যখন রাজধানী প্রবরপুরে (আধুনিক শ্রীনগরে) প্রবেশ করলেন, তখন কাশ্মীর রাজ মহাসমারোহে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন। স্বয়ং রাজা, তাঁর সমস্ত সভাসদ আর রাজধানীতে যত ভিক্ষু ছিলেন সকলে (প্রায় এক সহস্র লোক) নগর থেকে ১ লি এগিয়ে গিয়ে ধর্ম-গুরুকে প্রণাম কোরে তাঁর সম্মুখে অসংখ্য ফুল ছড়িয়ে দিলেন। তারপর তাঁকে একটা মস্ত হাতীতে চড়িয়ে নিয়ে আসা হোল। সমস্ত পথ পতাকা, চামর, ফুল গন্ধদ্রব্য দিয়ে সজ্জিত ছিল। সে রাত্রে তাঁকে 'জয়েন্দ্র' নামক এক বিহারে থাকতে দেওয়া হোল। পরদিন রাজার অনুরোধে তিনি রাজপ্রাসাদে এলেন, আর তারপর বিশিষ্ট পণ্ডিতদের সঙ্গে একত্র ভোজ উৎসব হবার পর রাজা তাঁকে শাস্ত্রের কঠিন কঠিন স্থান ব্যাখ্যা করতে আমন্ত্রণ করলেন।

শাস্ত্রের অনুসন্ধানেই তিনি এসেছেন শুনে রাজা শাস্ত্রের আর সূত্রের অনুলিপি করবার জন্যে কুড়িজন লোক নিযুক্ত করলেন। আর হিউ এন চাঙের পরিচর্যার জন্যেও পাঁচজন ভৃত্য নিযুক্ত হোল।

হিউ এন চাঙ এখানে ৭০ বছর বয়স্ক একজন শ্রদ্ধেয় গুরুর সাহচর্য পান। এই দুই-জন পণ্ডিত পরস্পরকে মনের মতন পেয়ে দুজনেই যে খুব খুশি হয়েছিলেন, তা হিউ এন চাঙের জীবনীকারের লেখা থেকে বেশ বোঝা যায়। গুরু পবিত্র ব্রহ্মচারী ব্রতধারী ছিলেন। বয়সের জন্যে তাঁর কিছু শারীরিক দুর্বলতা হয়েছিল বটে, কিন্তু উপযুক্ত ছাত্র পেয়ে তিনি সোৎসাহে শিক্ষা দিতে লাগলেন। তাঁর বুদ্ধি অসাধারণ সূক্ষ্ম ছিল আর জ্ঞান গভীর ছিল। গুণে, বিদ্যায় তিনি প্রায় দেবতার মতন ছিলেন আর তাঁর করুণ হৃদয় পণ্ডিত-দের প্রতি প্রেমে আর বিদ্বানদের প্রতি শ্রদ্ধায় পূর্ণ ছিল। কঠিন কঠিন বিষয় বুঝিয়ে দেবার তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। হিউ এন চাঙ অসঙ্কোচে তাঁকে প্রশ্ন করতেন আর দিবারাত্র অবিশ্রাম আগ্রহে তাঁর কাছে শিক্ষা করতেন। সকালে "কোষশাস্ত্র" পাঠ হোত। অপরাহ্নে "ন্যায় অনুসার" শাস্ত্র, আবার রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে "হেতুবাদ" শাস্ত্র পড়া হোত। হিউ এন চাঙ এখানে আরও অনেক বিশিষ্ট পণ্ডিতের সাক্ষাৎ পান। ভারতীয় পণ্ডিতদের বিদ্যাবত্তায় তিনি চমৎকৃত হন। এইভাবে তিনি কাশ্মীরে পুরা দুই বছর (৬৩১ খৃষ্টাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাস থেকে ৬৩৩ খৃষ্টাব্দের বৈশাখ মাস পর্যন্ত) কাটিয়ে ছিলেন। এইখানেই তাঁর দার্শনিক শিক্ষা অনেক অগ্রসর হয়।

কাশ্মীর সম্বন্ধে তিনি বলেন "এখানে প্রচুর ফুল, ফল, ফসল জন্মে। তাছাড়া পাহাড়ী ঘোড়া, জাফরান, নানা ওষধি আর স্ফটিক উৎপন্ন হয়। শীতকালে খুব তুষারপাত হয়। লোকগুলি সুশ্রী, কিন্তু অসৎ আর ধূর্ত। এদের বিদ্যায় অনুরাগ আছে। বৌদ্ধ, বিধর্মী দুই-ই আছে।

"তথাগতের পরিনির্বাণের চারশত বছর পরে গান্ধারের রাজা কণিষ্ক পাঁচশত বাছা বাছা সাধু মহাত্মাদের একটি সংগীতি (সমিতি) এখানে আহ্বান করেছিলেন। তাঁরা ত্রিপিটকের যা নিগূঢ় তাৎপর্য, তাই সহস্র সহস্র শ্লোকে করেন। আর সেই পাতাগুলি একটা পাথরের সিন্দুকে রেখে তার উপর একটি স্তূপ নির্মাণ করা হয়।" কোনও ভাগ্যবান প্রত্নতাত্ত্বিক হয়তো এক সময়ে এই তামার পাতগুলি আবিষ্কার করতে পারবেন।

কাশ্মীর ছেড়ে হিউ এন চাঙ গঙ্গাতীরের দিকে অগ্রসর হলেন।

প্রথমে এলেন শাকলে (বর্তমান শিয়াল-কোট)। হিউএন চাঙের পাঁচ শত বছর আগে এখানে গ্রীকদের একটা ছোট রাজ্য ছিল। সেই রাজ্যের রাজাদের মধ্যে একজন মেনানডের (বৌদ্ধনাম মিলিন্দ) বৌদ্ধ শাস্ত্রে বিখ্যাত। তাঁর সঙ্গে বৌদ্ধ ভিক্ষু নাগসেনের বিচার হয়। সেই বিচারের বিবরণ "মিলিন্দ পঞ্হো" (মিলিন্দ প্রশ্ন) বৌদ্ধশাস্ত্রের একখানা মূল্য-বান গ্রন্থ। হিউএন চাঙের সময়ে শাকলে, মিলিন্দের কোনও স্মৃতি বোধ হয় ছিল না। থাকলে তিনি নিশ্চয়ই তার উল্লেখ করতেন। কিন্তু মহাযানের একজন বিশিষ্ট দার্শনিক বসুবন্ধু, হিউএন চাঙের দুই শত বছর ... এখানেই হীনযান ত্যাগ কোরে মহাযানী বোলে প্রসিদ্ধ ছিল।

বর্বর হূনদের নৃশংস রাজা মি... গুলের প্রধান আড্ডা ছিল শাকলে। গান্ধা... রাজ পরিবারকে হত্যা কোরে, সমস্ত সঙ্ঘা... গুলি যতগুলি পেরেছিল স্তূপ গুলি ধ... কোরে সে সমস্ত দেশের ধনরত্ন লুঠ করে আর অধিবাসীদের দলে দলে বন্দী ক... এনে সিন্ধু নদীর তীরে হত্যা করেছি... আধুনিক "সভ্য জাতিদের" নৃশংস... তুলনায় অবশ্য এ কিছুই নয়।

হিউএন চাঙ্ বলেন, "শাকল থেকে পূ... সর্বত্র পথে বহু "পুণ্যশালা" আছে। সে... অনাথ আতুরদের বিনামূল্যে ভোজ্য ও ... বিতরণ করা হয়। পথিকদের কোনও ... হয় না।" কিন্তু শাকল ত্যাগ করার ... হিউএন চাঙ আর তাঁর সঙ্গীরা এক প... বনের মধ্যে দস্যু দল কর্তৃক আক্রান্ত ... দস্যুরা তাঁদের বস্ত্রাদি যথাসর্বস্ব কেড়ে ... তরবারী হস্তে তাঁদের তাড়া করল। ... ছুটতে ছুটতে এক জঙ্গলাকীর্ণ ... বিলের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। দস্যুরা ... আর দেখতে না পেয়ে চলে গেল। ... হিউএন চাঙ্ আর সঙ্গী শ্রামণেরা ... ছুটতে গিয়ে দেখলেন এক গ্রামের কাছে ... জন ব্রাহ্মণ চাষ করছেন। তাঁকে এই ... দেওয়ায় তিনি লাঙ্গল ছেড়ে শঙ্খ ... বাজিয়ে লোক জড়ো করলেন আর ... লোক সংগ্রহ কোরে দস্যুদের ধরতে ... কিন্তু তাদের আর উদ্দেশ পেলেন না। ... লোকরা তাদের যা কাপড়চোপড় ছিল ... দের পরতে দিল।

"সঙ্গীরা সর্বস্ব হারিয়ে হা ... করতে লাগলেন, কিন্তু হিউএন চাঙকে ... বদনে থাকতে দেখে তাঁরা আশ্চর্য হোলেন। তাতে তিনি বললেন, "জীবন তো ... বেঁচে তো রয়েছি। গোটা কতক পোষাক ... জিনিসপত্র যাক বা থাক তাতে কী এমন ... যায়?" তখন সঙ্গীরা বুঝলেন যে হিউএন চাঙের হৃদয় ছিল নদীর গভীর জলের মত ... নদীর উপরে ঢেউ হোতে পারে কিন্তু ... জল বিচলিত হয় না।"

পরদিন তাঁরা ইরাবতী (রাভি) নদীর ... এক নগরে (লাহোর?) পৌঁছলেন। সেখানকার লোক, অধিকাংশই বিধর্মী হোলেও ... গুরুর আর তাঁর সঙ্গীদের জন্যে প্রচুর ... পরিচ্ছদ ইত্যাদি সংগ্রহ কোরে দিল।

ধর্মগুরু এই নগরের কাছে এক ... কুঞ্জে সাত শো বছর বয়স্ক এক বৃদ্ধের সাক্ষাৎ পান। তিনি আবার মাধ্যমিক শাস্ত্রে ... পণ্ডিত ছিলেন। হিউএন চাঙ্ এক ...

**ভারতবর্ষ**
**(সপ্তম খৃষ্টাব্দী)**
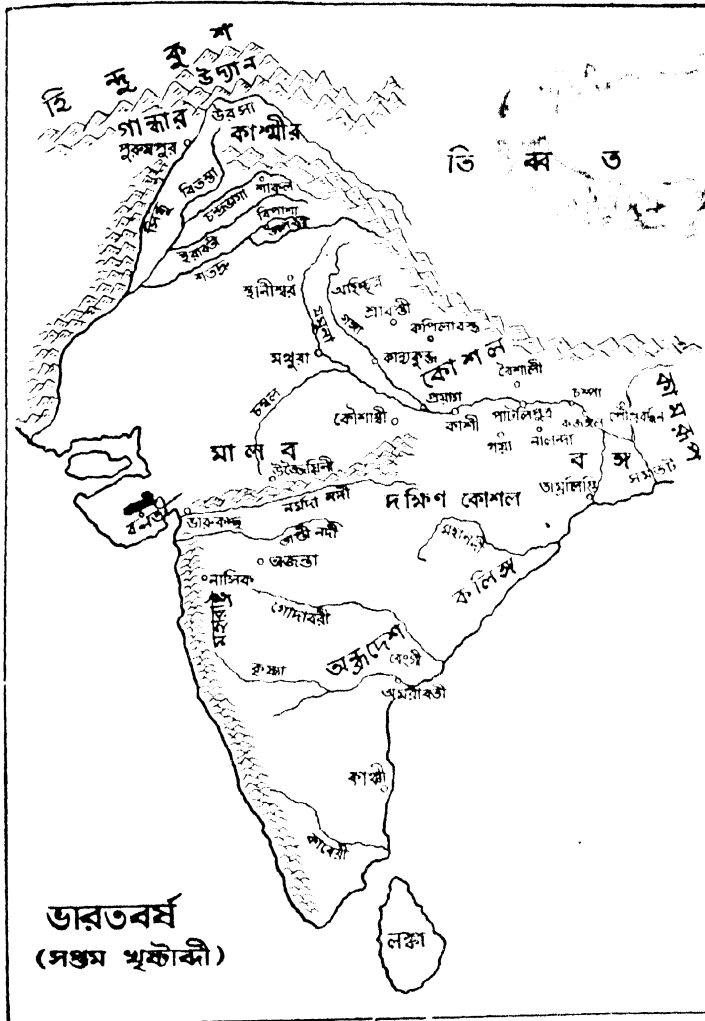
এখানে থেকে তাঁর কাছে শাস্ত্র পাঠ করলেন।

এখান থেকে তিনি দক্ষিণ-পূবে অগ্রসর হোয়ে বিপাশা (বিআস্) নদীর তীরে চীন-ভুক্তি নামক এক স্থানে এলেন। বিনীত প্রভ নামক একজন বিখ্যাত পণ্ডিতকে এখানে পেয়ে তিনি চোদ্দ মাস এখানে থেকে তাঁর কাছে অনেক হীনযানী শাস্ত্র অধ্যয়ন করলেন। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের নিয়ম আছে বর্ষকালটা কোনও সংঘারামে থেকে 'বর্ষাবাস' করা। ৬৩৪ খৃষ্টাব্দের বর্ষকালটা হিউএন চাঙ্ জালন্ধরে এক ভিক্ষুর কাছে থেকে শাস্ত্রপাঠ করেন। তারপর উত্তরে বর্তমান সিমলার কাছে কুলু পর্বতে (সংস্কৃত "কুলুট") কিছু-দিন থেকে আবার দক্ষিণে এসে মথুরায় উপস্থিত হলেন।

মথুরা যেমন বৈষ্ণবদের, তেমনি বৌদ্ধ-দেরও তীর্থস্থান ছিল। বুদ্ধ শিষ্য সারি-পুত্র, মৌদ্গল্যায়ন, উপালি, আনন্দ ও রাহুলের স্মারক স্তূপ এখানে ছিল। অভি-ধর্মের ছাত্ররা সারিপুত্রের যোগশিক্ষার্থীরা মৌদ্গল্যায়নে বিনয়ের ছাত্ররা উপালীর ভিক্ষু-নীরা আনন্দের আর শ্রামণেরা রাহুলের পূজা দিত। (রাহুল বুদ্ধের পুত্র। ইনি অমর।) মহাযানীরা বোধিসত্ত্বদের পূজা করতো। অশোকের গুরু মহাস্থবির উপগুপ্ত মথুরার লোক ছিলেন। মথুরার কাছে তাঁর প্রতিষ্ঠিত একটি সংঘারামে তাঁর নখ আর কেশের অংশ রাখা ছিল। "এখানকার লোকে অরণ্যের মত অজস্র আমলকীর গাছ রোপণ করতে ভালবাসে।"

মথুরা ছেড়ে হিউএন চাঙ্ যমুনা নদীর উজানে স্থানীশ্বরে (আধুনিক থানেশ্বর) গেলেন। এ সময়ে যিনি উত্তর ভারতের সম্রাট ছিলেন, সেই হর্ষবর্ধনের পিতা প্রভাকর-বর্ধনের রাজধানী এখানেই ছিল। "এখান-কার আবহাওয়া গরম হোলেও সুখদ। এ স্থান খুব সমৃদ্ধিশালী। এখানে অনেক ধনী আর বিলাসী লোকের বাস। তারা অসরল কিন্তু গুণের আদর করতে জানে। এখানকার বৌদ্ধরা হীনযানী। বিধর্মীদের বহু দেব-মন্দির আছে। এর চারিদিকে দুশো লি (৪০ মাইল) পর্যন্ত স্থানকে "ধর্মক্ষেত্র" (কুরু-ক্ষেত্র) বলে। সেখানে পূর্বকালে দুই রাজায় এক যুদ্ধ হয়েছিল, ইত্যাদি।"

স্থানীশ্বর থেকে উত্তরে গিয়ে হিউএন চাঙ্, সম্ভবত হৃষিকেশের কাছে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হলেন। গঙ্গার তিনি এই বিবরণ দিয়েছেন—"উৎপত্তির কাছে এ নদী ৩ লি চওড়া। মোহনার কাছে ১০ লি চওড়া। জলের রঙ নীলাভ কিন্তু অনেক সময়ে রঙের বদল হয় আর ঢেউগুলি বিশাল। এর জলে অনেক আঁশওয়ালা রাক্ষস বাস করে, কিন্তু তারা মানুষের অনিষ্ট করে না। জলের স্বাদ মিষ্ট, সুস্বাদু; তাতে এক রকম খুব ছোট ছোট বালি আছে। ভারতীয় গ্রন্থে একে পবিত্র নদী বলা হয়েছে আর এতে স্নান করলে নাকি সব পাপ ধুয়ে যায়। যারা এ জল পান করে, এমন কি কুলকুচাও করে, তাদেরও সব বিপদ দূর হোয়ে যায়—আর মৃত্যুর পর তারা সুখে স্বর্গে বাস করে। কিন্তু এ সব বিধর্মীদের বিশ্বাস। বোধিসত্ত্ব আর্যদেব দেখিয়েছেন যে, এ বিশ্বাস ভুল। আর সেই থেকে এ বিশ্বাস লোপ পাচ্ছে।" মন্তব্যগুলি কতকটা ইয়ুরোপীয় মিশনারিদের মতন হোল। পরের ধর্মবিশ্বাসের প্রতি [illegible] দৃষ্টি, নিজেদের বেলা যাই হোক্ না কেন! কয়েক মাস তিনি এই অঞ্চলে—আধুনিক দেরাদুন, হরিদ্বার, গাড়োয়াল ইত্যাদি স্থানে কাটান। তারপর প[illegible] রোহিলখণ্ডে, মতিপুর, অহিচ্ছত্র (ব[illegible] রামনগর) ইত্যাদি স্থানে ৪।৫ মাস [illegible] বৌদ্ধ প্রথামত "বর্ষাবাস" যাপন করেন ও স্থানীয় পণ্ডিতদের সঙ্গে নানা শাস্ত্র পাঠ করেন। তারপর দক্ষিণ-পূবে এসে গঙ্গাপার হোয়ে আধুনিক ইটা জেলায় এলেন। এ প্রদেশে সে সময়ে 'বীরাসন' নামে একটি নগর ছিল আর তার কাছেই ছিল 'কপিত্থ' বা সংকাশ্য।

• বুদ্ধ একবার দেবতাদের আর তাঁর স্বর্গ-গতা মাতা মায়া দেবীকে ধর্মোপদেশ না দেবার জন্যে "ত্রয়স্ত্রিংসৎ স্বর্গে" তিন মাসের জন্যে গিয়েছিলেন। জম্বুদ্বীপে ফিরবার সময়ে দেবরাজ শক্র তাঁর জন্যে স্বর্গ থেকে এই সংকাশ্য পর্যন্ত ৩টা সিঁড়ি তৈরি কোরে

ন্মেছিলেন। মধ্যের সিঁড়িটা দিয়ে স্বয়ং দ্ধ তাঁর ডানদিকের সিঁড়ি দিয়ে শ্বেতচামর স্তে ব্রহ্মা আর বাঁ দিকের সিঁড়ি দিয়ে ছত্র স্তে শক্রদেব নেমেছিলেন। "কয়েক শত ছর আগে এ তিনটা সিঁড়ি মাটির ধ্য অদৃশ্য হোয়ে যায়। সেজন্যে কাছাকাছি রাজারা ছিলেন, তাঁরা রত্নখচিত তিনটা টের সিঁড়ি যথাস্থানে তৈরি কোরে দিয়ে-ন। এগুলি আন্দাজ ৭০ ফুট উঁচু।"

এই সিঁড়িগুলিতে পূজা দিয়ে হিউএন ঙ্ গঙ্গাতীর ধরে দক্ষিণ-পূবে এসে কান্য-ব্জ উপনীত হলেন। তখন ৬৩৬ ষ্টাব্দে।

এ সময়ে কান্যকুব্জ সমস্ত উত্তর রতের সম্রাট মহারাজাধিরাজ হর্ষবর্ধন শীলা-ত্যের রাজধানী ছিল। ৬০৬ খৃষ্টাব্দে াল্দ বছর বয়সে তিনি সিংহাসনে অধিরোহণ রেন। সম্ভবত ৬৩৬ বা ৬৩৭ খৃষ্টাব্দে র বংশের প্রবল শত্রু বঙ্গাধীপ মহারাজা শাঙ্কের মৃত্যু হয়। তারপর কাশ্মীর থেকে মরূপ পর্যন্ত উত্তর ভারতে এমন কোনও জা থাকলেন না যিনি হর্ষবর্ধনের ভয়ে পমান না হতেন। দক্ষিণে তাঁর ক্ষমতার মা ছিল নর্মদা নদী। নর্মদা থেকে কাবেরী র্যন্ত সমস্ত দাক্ষিণাত্যের সম্রাট ছিলেন লুক্য বংশীয় দ্বিতীয় পুলকেশিন্।

হর্ষবর্ধন যে কেবল পরাক্রমশীল নৃপতি লেন তাই নয়। তিনি নিজে বিদ্বান, গুণী সংস্কৃতিবান ছিলেন। তাঁর রচিত তিন-না উপাদেয় নাটক 'রত্নাবলী', 'নাগানন্দ' ও প্রিয়দর্শিকা' আজও আছে। তামার ফলকে র স্বহস্ত লিখিত যে স্বাক্ষর পাওয়া ছে তাতে দেখা যায় তাঁর হস্তলিপি কী কার ছিল। নানা ধর্ম মতের বিচারে তাঁর তাঁর ভগ্নী রাজশ্রীর আগ্রহ ছিল একথা ত্যক্ষদর্শী হিউএন চাঙের বিবরণেই জানা । তিনি গুণী ব্যক্তিদের তাঁর সভায় মন্ত্রণ করতে ভালবাসতেন। হিউএন চাঙ্ কাদম্বরী' ও 'হর্ষ-চরিত' প্রণেতা বাণ- এই দুই প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থাকায় র্ষবর্ধন সম্বন্ধে অনেক কথাই আমরা জানতে ারি। অবশ্য, এই দুইজনই হর্ষের পরম ত্র, আশ্রিত ও অনুগ্রহ ভাজন হওয়ায় কোনও গনও বিষয়ে এঁদের বিবরণ (যথা হর্ষের ত্রু শশাঙ্ক সম্বন্ধে কিম্বদন্তীগুলি) কিছু ক্ষপাতদুষ্ট হওয়া অসম্ভব নয়।

কান্যকুব্জ নগর সম্বন্ধে হিউএন চাঙ্ বলেন—নগর লম্বায় ২০ লি, চওড়ায় ৪।৫ লি। নগরের চতুর্দিকে একটা শুকনো পরিখা আছে। স্থানে স্থানে সুদৃঢ় ও উচ্চ স্তম্ভ। সর্বত্র আয়নার মত উজ্জ্বল, স্বচ্ছ পুষ্করিণী, ফুলের বাগান, উপবন। এখানে পণ্যদ্রব্য প্রচুর। অধিবাসীরা ধনী ও সুখী। দেশটা শস্য ফুল ফলে পূর্ণ। আবহাওয়া আরামজনক। লোকগুলি সাধু, সরল, আকৃতি মহত্ত্ব ও দাক্ষিণ্য ব্যঞ্জক। পরিচ্ছদ উজ্জ্বল ও মহার্ঘ। এরা খুব বিদ্যাচর্চা করে। এদের ভাষার সংস্কৃতি প্রসিদ্ধ। বৌদ্ধ ও বিধর্মীদের সংখ্যা প্রায় সমান। মহাযান ও হীনযান দুই সম্প্রদায় মিলিয়ে দশ হাজার ভিক্ষু আছেন আর একশত সংঘারাম আছে। দেবমন্দিরও দুই শত আর দেবভক্ত হাজার হাজার।

বর্তমান রাজা বৈশ্য জাতীয়। তাঁর নাম হর্ষবর্ধন। রাজকর্মচারীদের এক সভা দেশ শাসন করে। রাজার বাবার নাম ছিল প্রভা-করবর্ধন। বড় ভাইয়ের নাম রাজ্যবর্ধন। রাজ্য-বর্ধন সাধুভাবে রাজ্য শাসন করতেন। এই সময়ে কর্ণ সুবর্ণের রাজা শশাঙ্ক প্রায়ই তাঁর মন্ত্রীদের বলতেন—"যে রাজ্যের সীমান্তে ধার্মিক রাজা থাকে, সে রাজা অসুখী।" তখন তারা (মন্ত্রীরা) রাজ্যবর্ধনকে এক সভায় আহ্বান কোরে হত্যা করল।

"তখন প্রধান মন্ত্রী ভাণ্ডী ও অন্যান্য রাজকর্মচারীরা হর্ষবর্ধনকে সর্বগুণে মণ্ডিত দেখে তাঁকেই রাজা হোতে আমন্ত্রণ করলেন। হর্ষবর্ধন প্রথমে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, পরে সকলের অনুরোধে "কুমার শীলাদিত্য" নাম নিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করলেন। তার-পর বহু সৈন্যদল সংগ্রহ কোরে ৩০ বছরে পূবে ও পশ্চিমে সমস্ত দেশ জয় করেন। গত ৬ বছর তাঁর আর যুদ্ধ করতে হয় নি। তখন থেকে তিনি শান্তিতে রাজত্ব করছেন। * তিনি নিজে সংযমী। আহার নিদ্রা ত্যাগ কোরে পুণ্যের বৃক্ষ রোপণ করতে আগ্রহান্বিত। তাঁর সমস্ত রাজ্যে জীবহত্যা বারণ। গঙ্গাতীরে তিনি সহস্র সহস্র ১০০ ফুট উঁচু স্তূপ-নির্মাণ করেছেন। সে সব জায়গায় পান্থ ও দরিদ্র অধিবাসীদের জন্যে চিকিৎসক, ঔষধ ও আহার্য রাখা আছে।

"প্রতি পাঁচ বছরে তিনি এক মহামোক্ষ পরিষদ আহ্বান করেন। এ সময়ে কেবল সৈন্যদের খরচ হাতে রেখে রাজকোষের অন্য সমস্ত অর্থ দান করেন। প্রতি বৎসর তিনি সমস্ত দেশের শ্রমণদের আহ্বান কোরে চতুর্থ ও সপ্তম দিনে তাদের চার রকম দান (আহার্য, পানীয়, ঔষধ ও বস্ত্র) বিতরণ করেন। তারপর বেদী সজ্জিত কোরে ভিক্ষুদের শাস্ত্র বিচার করতে বলেন আর নিজেই তর্কের ফল বিচার করেন। তিনি সাধুদের পুরস্কৃত করেন, অসাধুদের শাস্তি দেন, নির্গুণকে অবনত করান, গুণীকে উন্নত করেন। সাধু ও জ্ঞানী ভিক্ষুদের সিংহাসনে বসিয়ে নিজে উপদেশ গ্রহণ করেন। সাধু জ্ঞানী না হোলেও ভক্তির পাত্র হন, কিন্তু পূজিত হন না। ভিক্ষু অসাধু হোলে নির্বাসিত হন।......তাঁর দূতেরা রাজকার্যে সর্বদাই যাতায়াত করে। লোকের স্বভাব পরীক্ষা করবার জন্যে তিনি লোকের সঙ্গে মেশেন। রাজধানী ছেড়ে যেখানেই যান, একটি সদ্যপ্রস্তুত আবাসে থাকেন। বর্ষার তিন মাস সফরে যান না। সফরের প্রাসাদে সর্বদাই সব ধর্মাবলম্বীকেই ভোজ্য দেন। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা হয়তো সংখ্যায় এক হাজার হলেন, ব্রাহ্মণরা পাঁচ শত। প্রত্যেক দিনমান তিনি তিন ভাগ করেন। প্রথম ভাগে রাজকার্য করেন। দ্বিতীয় ভাগে নিরবচ্ছিন্নভাবে পুণ্য কাজে লিপ্ত থাকেন।"

হর্ষবর্ধন নিজেকে শৈব বোলে পরিচয় দিয়েছেন। তিনি ৬০৬ খৃষ্টাব্দ থেকে ৬৪৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। হয়তো জীবনের শেষভাগে তিনি বৌদ্ধ বা বৌদ্ধ-ভাবাপন্ন হোয়েছিলেন, কিন্তু হিউএন চাঙের কথায়ই বোঝা যায় যে, কোনও ধর্মেই তাঁর বিদ্বেষ ছিল না।

এইবারে কান্যকুব্জে হিউএন চাঙ সম্রাটের সাক্ষাৎ পান নি। হয়তো তিনি রাজধানীতে ছিলেন না। যাহোক্ ৬৩৬ খৃষ্টাব্দে তিন মাস হিউএন চাঙ এখানে "ভদ্র-বিহার" মঠে থেকে আচার্য বীর্যসেনের কাছে ত্রিপিটক গ্রন্থগুলির ভাষ্য আবার পাঠ করেন।

(ক্রমশ)

* ইংরাজ ঐতিহাসিকরা বলেন হিউএন চাঙ ভুল করে ত্রিশের জায়গায় ছয় আর ছয়ের জায়গায় ত্রিশ বলেছেন। কিন্তু হিউএন চাঙের কথাই সত্য বলে মনে হয়। রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত "বাঙলা দেশের ইতিহাস" ২৭।২৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

# বাংলা সাহিত্যের নরনারী

**প্র-না-বি.....**

## বিনোদিনী

বিনোদিনীর মতো নারী-চরিত্র রবীন্দ্র-সাহিত্যে বিরল; বিরল এই জন্যে যে, দেবযানী, রুক্মিণী (বৌঠাকুরাণীর হাট) ও বাঁশরী সরকার বিনোদিনীর সগোত্র হইলেও এই শ্রেণীর নারী চরিত্র অঙ্কন কবির স্বভাব-সঙ্গত নয়। বিনোদিনীকে দেখিয়া মনে হয়, সে যেন শরৎচন্দ্রের কোন অলিখিত উপন্যাসের নায়িকা। কিম্বা বলা উচিত যে, যেহেতু চোখের বালির আগে শরৎচন্দ্রের কোন উপন্যাস লিখিত হয় নাই—শরৎচন্দ্রের অনেক নারী চরিত্রই বিনোদিনীর ধাতুতে গঠিত। বিধবা বিনোদিনী হঠাৎ মহেন্দ্রের ভরা সংসারে আসিয়া উপস্থিত হইল। বিনোদিনী রূপবতী, যুবতী, নানা গুণময়ী, তার উপরে এক সময়ে মহেন্দ্রের সঙ্গে তাহার বিবাহের একটা প্রস্তাব উঠিয়াছিল। বিলুপ্ত সেই বিস্মৃত-প্রায় সূত্র যেন এই সংসারের উপরে মহেন্দ্রের উপরে তাহার এক প্রকার দাবী প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিল। যে-সিংহাসনে একদা সে বসিলে বসিতে পারিত, তাহাকে সবলে আঘাত করিল, মহেন্দ্র ও আশালতার সংসার গড়িয়া উঠিল। এখানে আর একটা নূতন সূত্র যুক্ত হইয়া বিনোদিনীর মনস্তত্ত্বকে জটিলতর করিয়া তুলিয়াছে। সে মহেন্দ্রের বন্ধু বিহারী। বিহারী মহেন্দ্রের আসক্তি হইতে মুক্ত—সে বিনোদিনীকে দূরে রাখিতে কৃতসংকল্প, আর দূরে রাখিবার উদ্দেশ্যেই তাহার সহিত স্বাভাবিক ব্যবহারের ঘনিষ্ঠতা করিয়া চলিয়াছে। বস্তুতঃ মহেন্দ্র, বিনোদিনী ও বিহারীকে লইয়াই আকর্ষণ বিকর্ষণ ও প্রত্যাকর্ষণের ত্রিভুজ গঠিত—আশালতা একেবারেই অবান্তর। ত্রিভুজের স্বভাবই এই যে সে ক্রমাগত চরখির মতো পাক খাইতে থাকে—অন্তত একটা ভুজ খসিয়া না পড়া অবধি তাহার শান্তি নাই। শেষ পর্যন্ত মহেন্দ্ররূপ ভুজটি খসিয়া পড়িয়াছে—তখনই বিনোদিনীর সঙ্গে মহেন্দ্র, বিহারী ও অন্যান্য সকলের সম্বন্ধ পুনরায় সংসারের স্বভাবে ফিরিয়া আসিয়াছে। অসামাজিক কামনার স্থান সংসারে নাই সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া মানুষের মনেও থাকিবে না এমন নয়। যাহা মনে আছে কোন সময়ে তাহা বাহির হইয়া পড়িবেই—তখন তাহাকে সামলাইবার উপায় কি? সে উপায় ঐ মনের হাতেই আছে। বিনোদিনী যখন জানিল যে, বিহারী তাহাকে ভালবাসে, তাহাকে বিবাহ করিতে সম্মত, তখনই তাহার ক্ষুব্ধ আত্ম-সম্মান শান্ত হইল এবং মনের দিক হইতে যাহা মিলিল তাহাকে হাতে পাইবার উদ্দেশ্যে আর আকুলতা প্রকাশ করিল না। এখানেই বিনোদিনীর ও লেখকের কৃতিত্ব। কিন্তু অনেক পাঠক ইহাতে সন্তুষ্ট নহেন। বিনোদিনীর সঙ্গে বিহারীর বিবাহ হইয়া গেলেই বোধ করি তাঁহারা খুশী হইতেন। সংসারে এমন হইলেও শিল্পে কদাচিৎ এমন ঘটে—ইহাতেই বাস্তবের সঙ্গে শিল্পের পার্থক্য।

বিনোদিনীর উত্তপ্ত যৌবন জ্বালাময় প্রকৃতির গূঢ় মর্মস্থলে একটি সজল কোমল পূজানিবেদিত নারী প্রকৃতি ছিল। সমস্ত উপন্যাসের গতি সেই নারী প্রকৃতিকে মুক্তি দানের দিকে যাত্রা করিয়াছে। কবি বলিতেছেন—

"বিনোদিনী তাহার ছেলেবেলাকার কথা বলিতে লাগিল, তাহার বাপ-মায়ের কথা, তাহার বাল্য সাথীর কথা। বলিতে বলিতে তাহার মাথা হইতে কাপড়টুকু খসিয়া পড়িল। বিনোদিনীর মুখে খর যৌবনের যে একটি দীপ্তি সর্বদাই বিরাজ করিত, বাল্য স্মৃতির ছায়া আসিয়া তাহাকে স্নিগ্ধ করিয়া দিল। বিনোদিনীর চক্ষে যে কৌতুকতীব্র কটাক্ষ দেখিয়া তীক্ষ্ন দৃষ্টি বিহারীর মনে এ পর্যন্ত নানা প্রকার সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল, সেই উজ্জ্বল কৃষ্ণ জ্যোতি যখন একটি শান্ত সজল রেখায় ম্লান হইয়া আসিল, তখন বিহারী যেন আর একটি মানুষ দেখিতে পাইল। এই দীপ্তি মণ্ডলের কেন্দ্রস্থলে কোমল হৃদয়টুকু এখনো সুধা ধারায় সরস হইয়া আছে, অপরিতৃপ্ত রঙ্গরস কৌতুক বিলাসের দহন জ্বালায় এখনো নারী প্রকৃতি শুষ্ক হইয়া যায় নাই। বিনোদিনী সলজ্জ সতী স্ত্রী ভাবে একান্ত ভক্তিভরে পতি সেবা করিতেছে, কল্যাণ পরিপূর্ণ। জননীর মতো সন্তানকে কোলে ধরিয়া আছে, এ ছবি ইতিপূর্বে মুহূর্তের জন্যও বিহারীর মনে উদিত হয় নাই—আজ যেন রঙ্গমঞ্চের পটখানা ক্ষণকালের জন্য উড়িয়া গিয়া ঘরের ভিতরকার একটি মঙ্গল দৃশ্য তাহার চোখে পড়িল। বিহারী ভাবিল, বিনোদিনী বাহিরে বিলাসিনী যুবতী বটে, কিন্তু তাহার অন্তরে একটি পূজারতা নারী নিরশনে তপস্যা করিতেছে। বিহারী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে কহিল, প্রকৃত আপনাকে মানুষ আপনিও জানিতে পারে না, অন্তর্যামীই জানেন, অবস্থাবিপাকে যেটা বাহিরে গড়িয়া উঠে, সংসারের কাছে সেইটেই সত্য।"

চোখের বালি উপন্যাসের, যুবতী বিনোদিনীর মর্মকথা উদ্ধৃত অংশে কবি আপনিই প্রকাশ করিয়াছেন। মদনের পঞ্চশর বিনোদিনীর হৃদয়ে যে অগ্নি জ্বালিয়াছিল, যে অগ্নিতে মহেন্দ্রর সংসার ভস্ম হইতে পারিত সেই অগ্নিকে কবি শান্ত করিয়া, সংযত করিয়া গৃহের মঙ্গল দীপে পরিণত করিয়াছেন। বাস্তবতার নামে স্বভাবের আগুনকে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিয়া দাবানল বাধাইয়া বসা রবীন্দ্রনাথের শিল্পধর্মসঙ্গত নয়—এটাই বোধ হয় আধুনিকেরা পছন্দ করেন না। তাঁহারা বলেন যে, রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত যাইতে রাজি নহেন। কিন্তু শেষের পরেও তো আর একটা শেষ আছে। দাবানল যত প্রচণ্ডই হোক এক সময়ে তাহারও অবসান ঘটে—তখন কি তাহার ভস্মস্তূপ বৈরাগ্যের বাণী বহন করে না? রবীন্দ্রনাথ যদি সেই বৈরাগ্যের ইঙ্গিত করিয়া থাকেন তবে তাঁহাকে দোষ দেওয়া উচিত নয় যে, তিনি শেষ পর্যন্ত যাইতে রাজী নহেন। বাস্তববাদিগণের পরিকল্পিত শেষের পরে যে আর একটা অতি শেষ আছে রবীন্দ্রনাথ ততদূর যাইতে সম্মত। বাস্তববাদীরা পথকেই গৃহ ভাবিয়া মনে করে যে, চঞ্চলতাই তাহার ধর্ম। কিন্তু যে ব্যক্তি পরবর্তী স্তরকে দেখিয়াছে সে জানে পথের পরে গৃহ, চঞ্চলতার পরে বিরাম। বাস্তববাদী অর্ধদর্শী সমগ্রদর্শী ব্যক্তিকে Idealist বলি, Superrealist বা বাস্তবোত্তরবাদী বলিতেও বাধা নাই।

রবীন্দ্রনাথের মহুয়া কাব্যগ্রন্থে 'নাম্নী' নামে একটি উপকাব্য আছে। এই কাব্যটিতে নারীর বিশ্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। মনস্তত্ত্ব অনুসারে নারীর সতেরোটি রূপ ইহাতে প্রদর্শিত। রবীন্দ্রনাথ-চিত্রিত নারীসমাজের কতখানি এই সব বর্ণনার সঙ্গে মেলে তাহা একটা কৌতূহলজনক আলোচনার বিষয়। বিনোদিনী চরিত্র কবি কল্পিত 'নাগরী' পর্যায়ের সঙ্গে অনেক দূর পর্যন্ত মেলে—এই প্রসঙ্গে তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে। কবি বলিতেছেন—

> সে যেন তুফান
> যাহারে চঞ্চল করে সে তরীকে করে খান্ খান্
> অট্টহাস্যে আঘাতিয়া এপাশে ও
>
> * * * *
>
> অদৃশ্য আগুনে
> কুঞ্জ তার বেড়িয়াছে;
> যারা আসে কাছে
> সব থেকে তারা দূরে রয়;
> মোহ মন্ত্রে যে-হৃদয়
> করে জয়
> তারি পরে অবজ্ঞায় দারুণ নির্দয়।

মহেন্দ্রর সঙ্গে বিনোদিনীর কথা স্মরণ করিলে এই বর্ণনার যাথার্থ্য উপলব্ধি হইবে। মহেন্দ্রকে সে লুব্ধ করিয়াছিল সন্দেহ নাই, তাহাকে পুষ্প সৌরভে উতলা করিয়া দিয়াছিল নিশ্চয়—কিন্তু অদৃশ্য আগুনে কুঞ্জ তার পরিবেষ্টিত ছিল—মহেন্দ্র প্রবেশের পথ পায় নাই—এবং মোহমন্ত্রে তাহার হৃদয় বিজিত হইলেও বিনোদিনীর নির্দয় অবজ্ঞা ব্যতীত

আর কিছুই তাহার ভাগ্যে জোটে নাই। ইহার সহিত তুলনায় নির্বিকার কল্প বিহারীর প্রতি বিনোদিনীর আচরণ ও মনোভাব কত পৃথক! কবি বলিতেছেন—

আপন তপস্যা ল'য়ে যে পুরুষ নিশ্চল সদাই
যে উহারে ফিরে চাহে নাই,
জানি সেই উদাসীন
একদিন
জিনিয়াছে ওরে,
জ্বালাময়ী তারি পায়ে দীপ্ত দীপ দিল অর্ঘ্য ভ'রে।

বিহারীর পায়েই এই নাগরী আপন চিত্ত সমর্পণ করিয়াছে।

বিনোদিনী—।
প্রসাধন-সাধনে চতুরা,
জানে সে ঢালিতে সুরা
ভূষণ-ভঙ্গীতে,
অলক্তের আরক্ত ইঙ্গিতে।

বিধবা বিনোদিনীর সাজসজ্জা, স্বল্প প্রসাধনের সুনিপুণ দক্ষতা এবং বিরল ভূষণের সংকেতময় ভঙ্গীতে উপরের কাব্যাংশের সার্থকতা বুঝাইয়া দেয়। আর—

যাদুকরী বচনে চলনে;
গোপন সে নাহি করে আপন ছলনে;
অকপট মিথ্যারে সে নানা রসে করিয়া মধুর
নিন্দা তার করি দেয় দূর;
জ্যোৎস্নার মতন
গোপনেও নহে সে গোপন।

মহেন্দ্রর সহিত তাহার ব্যবহার স্মরণ করিলে উদ্ধৃত কাব্য সত্যকে কোন ক্রমেই অস্বীকার করা যায় না।

তবু উদ্ধৃত অংশগুলি হইতে বিনোদিনীর পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যাইবে না, ইহাই তাহার সম্পূর্ণরূপ হইলে চোখের বালির উপসংহার অন্য রকম হইত। বিনোদিনীর প্রকৃতির গভীরে একটি সেবা প্রয়াসী সলজ্জ মাতা ও পত্নী স্তিমিত ছিল। ঘটনাচক্রে তাহার অতৃপ্ত প্রণয় পিপাসা জাগিয়া উঠিয়াছিল বটে, কিন্তু ঘটনাচক্রই শেষ পর্যন্ত তাহার স্তিমিত প্রকৃতিকে গৃহ দীপের মতো অচঞ্চল স্নিগ্ধ শিখায় পরিণতি দান করিয়াছে। নাম্নী উপকাব্যের শ্যামলী কবিতাটি হইতে বিনোদিনী চরিত্রের উপসংহারের বর্ণনা পাওয়া যায়—

গৃহ কোণে ছোট দীপ জ্বালায় নেবায়,
দিন কাটে সহজ সেবায়।
স্নান সাঙ্গ করি এলোচুলে
অপরাজিতার ফুলে
প্রভাতে নীরব নিবেদনে
স্তব করে একমনে।

অনুকূল অবস্থায় পড়িলে স্বভাবতঃই বিনোদিনী যাহা হইতে পারিত, ঔপন্যাসিক যাহার আভাস দিয়াছেন—কবির কলমে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। *

* রবীন্দ্রনাথের "চোখের বালি"।


## বিনা অস্ত্রে চক্ষু ছানি

ডিজন্স "আই-কিওর" (রেজিঃ) চক্ষু ছানি এবং সর্বপ্রকার চক্ষুরোগের একমাত্র অব্যর্থ মহৌষধ। বিনা অস্ত্রে ঘরে বসিয়া নিরাময় সুবর্ণ সুযোগ। গ্যারাণ্টী দিয়া আরোগ্য করা হয়। নিশ্চিত ও নির্ভরযোগ্য বলিয়া পৃথিবীর সর্বত্র আদরণীয়। মূল্য প্রতি শিশি ৩, টাকা, মাশুল ৸০ আনা।

**কমলা ওয়ার্কস** (দ) পাঁচপোতা, বেঙ্গল।
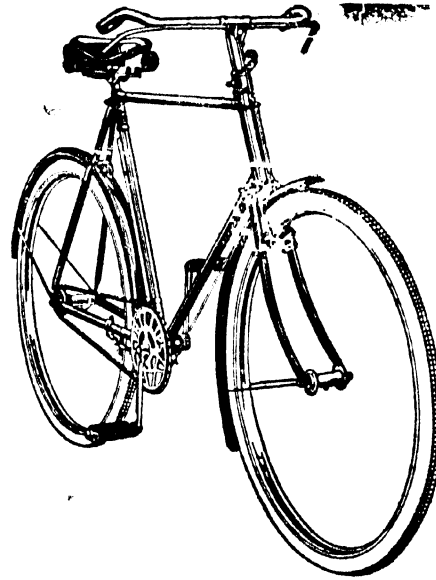

ফিলিপ্স সাইকেল অত্যন্ত টেকসই। খারাপ রাস্তার সব রকম ধকল এই সাইকেল সইতে পারে, তাই বছরের পর বছর ধরে আপনি সম্পূর্ণ নির্ঝঞ্ঝাটে ফিলিপ্স ব্যবহার করতে পারবেন। পঞ্চাশ বছরের ওপরে সাইকেল তৈরির কাজে অভিজ্ঞ একটি আধুনিক কারখানায় এই সাইকেল তৈরি হয়। সাইকেল চড়ায় সত্যিকার আরাম ও আনন্দ পেতে হলে ফিলিপ্সই কিনুন—সব দিক দিয়ে বিচার করলে এর চেয়ে ভালো সাইকেল আর পাবেন না।


টেলিফোন: বড়বাজার ৮৩৮

# মুখার্জী ষ্টুডিয়ো

ফটোগ্রাফার ও আর্টিষ্ট
১৮৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

(পূর্বানুবৃত্তি)

ঘ রে এসে মিনতি ক্লান্ত। একটু চা খাবে —তার আয়োজন চলছে, টুং টাং শব্দ য়ালা পিরিচ কেট্‌লির। অধ্যাপকের নে এলো।

'এই আর এক ফ্যাশান। বিয়ে টিয়ে লাম না। একলা বিদেশে আছি, চাক্‌রি ছি—তা-ও তো মেয়ে স্কুলের টিচারি। তেই এমন অহংকার—শুনছি গরবিনী নাকি রো সঙ্গে কথাই বলতে চান না। শুধু বিধা পেলে অমুকবাবু তমুকবাবুদের নিয়ে স্টুরেণ্টে মাঝে মাঝে চা খান। গা জ্বালা র, কী সব হচ্ছে এক একটা মেয়ে আজ।'

এটা নতুন হেডমিস্ট্রেস্‌ সম্পর্কে।

যেহেতু একটু আগে ছোট মেয়েরা বিদ্যুৎ-কাশের কাছে এসে হেড্‌মিস্ট্রেস্‌ মিস্ ের প্রশংসা করছিল।

বিদ্যুৎবিকাশ শুকনো ডাঁটের গা থেকে াকাটাকে ছাড়িয়ে এনে চোখের সামনে তুলে রলেন।

'কি করে যে মানুষ এত টাকা করতে রে বুঝি না। কেমনে সম্ভব। এক রঞ্জন রায়কে দিয়ে জ্যোঠাবাবু বিশহাজার কার পলিসি করিয়েছেন।......তাই ভাবি, ী থাকে লোকের অদৃষ্টে। কি হ'ল, কি করল ত টাকা ক'রে—স্ত্রীরত্নটি রাতদিন ঘুরছেন মান্ এক উকিলের ছেলের সঙ্গে। ভাল।'

এসব বাইরের মহলের খবর। মিনতি যা ড়িয়ে বাড়িয়ে আনে। শহরের এর ওর সংবাদ।

কাঠিশুদ্ধ পোকাটা রেলিঙ গলিয়ে বাইরে ফেলে দেন বিদ্যুৎবিকাশ।

বিদ্যুৎবিকাশের কানে আসছিল এবার এই মহলের সংবাদ। অধ্যাপক পাড়ার ইনি উনি সম্পর্কিত প্রাত্যাহিক খবর। কাবেরীর মা নতুন রেডিওসেট্ কিনল, ঝর্ণার মা ছ'গাছ রে ইলেক্‌ট্রিক চুড়ী গড়িয়েছে কাল, মুকোর মা-বাবা এবার পুজোর ছুটিতে নীলগিরি পাহাড়ে বেড়াতে যাচ্ছে। প্রিয়নাথ াবু এটা করতে পারছেন পাঠ্য-বই বিক্রীর টাকায়। তাপতীর মা মেয়ের জন্যে এবং নিজের জন্যে আলাদা এক সেট্ করে গয়না গড়াচ্ছে আগামী মাসে। ইঁট বিক্রীর টাকায়। রেডিও আসছে কয়লায়।

বিদ্যুৎবিকাশ পায়চারী করতে করতে চলে গেলেন বারান্দার ওমাথায়।

বিদ্যুৎবিকাশের মনে পড়েছে, এমন এক ছুটির দিনে, এপ্রিলের নীল আকাশ ঝলসানো রোদের দিকে চেয়ে পদ্মপুকুর রোডে আনন্দ বাবুর বৈঠকখানার পাশে মিনতির পড়ার ঘরে বসে তিনি আবৃত্তি করেছিলেন।

Miss Nancy Ellicott smoked
And danced all the modern dances;
And her aunts were not quite sure
how they felt about it.

আর, আকাশের মত ঝক্‌ঝকে নীল চোখ মেলে পরিচ্ছন্ন কুমারী মেয়ে পড়েছিল:

In the room the women come and go
Talking of Michangel.

ঘড়ির কাটায় তখন বেলা দশটা।

মিনতির সেবার বি এ ফাইন্যাল দেবার বছর। এই সেদিন। গেলবার।

এক বছর এখনো পার হয়নি।

তরুণ অধ্যাপক পায়চারী করতে করতে ফিরে আসেন বারান্দার এমাথায়।

আধুনিক শহরে রোববারের দুপুরটা শান লাগানো ক্ষুরের মত চকচক করে, ঝক্‌ঝকে।

কে বলবে সাব রেজিস্টার কলেজের ছোকরা ন'ন। না আর গাছতলার নাপিত নয়, সেলুন, সোজা সেখান থেকে ক্ষৌরকর্ম সেরে এসেছেন। চেপ্টা দন্তহীন মুখের দু' পাশে চোয়ালের দুটো দিকে সাবানের ফেনার শুকনো দাগ নিয়ে তিনি এখন বাড়ি ফিরছেন না। পরিস্কার, পাউডারের পাফ-চাপড়ানো নিখুঁত কেতা দুরস্ত চেহারা।

পরিমিত বিত্ত কিন্তু পরিশীলিত মন।

অন্ততঃ নিজের সম্পর্কে সাব রেজিস্টারের এই ধারণা, তাঁর ছেলেও নেই মেয়েও নেই। তিনি মোহিনীর মত একই সঙ্গে সন্ততির ভবিষ্যৎ ও পলিটিকস নিয়ে মাথা ঘামান না। ছুটির সকালে তিনি মোহিনীর মত বৈঠকখানায় আটক না থেকে বরং শহর ভ্রমণে বেরোন। বেরিয়েছেন।

হাত ঘড়ি আছে, পাকা-চুলে একটু টেরী আছে, কালো চিক্‌টিকে রুমাল-পাড় ধুতি পাম্প সু, সুদৃশ্য নস্যর কৌটো। এই বয়সেও বেশ তরুণ হবার মত গন্ধ-ঢালা রুমাল আছে পকেটে।

বেড়াতে বেড়াতে হাঁটতে হাঁটতে বুঝি বা শিস দিতে দিতেই সুন্দর বাঁধানো হসপিট্যাল রোড ধরে সাব রেজিস্টার টিচার্স কোয়ার্টারের দিকে অগ্রসর হন। একলা। এমনি।

রাস্তার মাঝখানে মুরারী একবার দাঁড়ান। শহরে চীনা ডেণ্টিস্ট আবার কবে এলো। সস্তায় এমন সুন্দর দাঁত বাঁধাতে পৃথিবীতে এদের জুড়ি নেই।

বার বার সাব রেজিস্টার সাইন-বোর্ডখানা পড়লেন, চিং লু ফিন।

সমর্থ চীনা মহিলা হলদে খোলা-বুকে হয়ে ঘরের এক পাশে বসে সন্তানকে স্তন্য দিচ্ছে অন্য পাশে টিংটিঙে, লম্বা, খড়ম পায়ে কালো চশমা পরা চীনা পুরুষ। পেঁয়াজের খোসা ছাড়াচ্ছে দরজায় দাঁড়িয়ে, এখনো রুগী আসেনি, এলেই ডাক্তার পেঁয়াজ ফেলে দিয়ে সাঁড়াশী তুলে নেবে। আর মেয়েটা কালের ছেলেকে চট করে নামিয়ে রেখে উঠে উনুনে গরম জলের কেটলি চাপাবে, পটাশ মেশানো লাল জলের গ্লাশ নিয়ে ছুটে আসবে রুগীর পাশে মুখ ধোয়াতে। দাঁত বসাতে গিয়ে বিদেশীনীর হাতের সেবা-যত্ন। যেন ছবিটা কল্পনা করতে করতে মুরারীবাবু হুট ক'রে এক সময়ে ঢুকে পড়লেন দোকানে নতুন নকল দাঁত পরতে, আজ তাঁর বাহান্ন বছর বয়েস পূর্ণ হবে। দৃশ্যটা চোখে পড়ল অটলবাবুর।

অটলবাবু দেখলেন, হাসলেন না।

কাঠের চেয়ারে চুপ চাপ বসে থেকে সকাল থেকে দেখছেন একটার পর একটা দৃশ্য আর দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন।

চাকর কানাই লণ্ড্রী থেকে ধোপদুরস্ত জামা কাপড় নিয়ে এল একটু আগে। অটলবাবুর নিজের জামা-কাপড় কখানা? প্রায় সবই মেজোবাবুর। নিশানাথের। কানাইর কাপড় জামাও আছে। নিশানাথকে বড়বাবু বা একমাত্র বাবু না ডেকে চাকরটা মেজবাবু ডাকছে কেন। নিশানাথের চেয়ে আর বড় কে আছে বিলাসী-বাবু এ বাড়িতে, যেন পিতা হয়েও অটলবাবু তা মাঝে মাঝে ভাবেন।

হ্যাঁ বাড়ির ঘর দরজা মেঝের চেহারাই বদলে গেছে ক'দিনে। কানাই রাতদিন মেজোবাবুর ফাই-ফরমাস খেটে, বখশীস টখশীস পেয়ে

টেরী মাথায় সিনেমা কার্নিভ্যাল দেখে বেশ ফুরফুরে বাবুটি হয়ে আছে।

বলতে কি অটলবাবু এ জীবনে লণ্ড্রীতেও কাপড় কাচাননি আবার লণ্ড্রীর জামা-কাপড় গায়ে চড়িয়ে বাড়ির চাকরকেও সিনেমার শো দেখতে তিনি ছুটতে দেখেননি। অটলবাবু চাকরই দেখেননি।

তাই চুপ ক'রে রাস্তার নিম গাছটার দিকে চেয়ে থাকেন।

মুন্সেফ শশাঙ্ক আঢ্য। হাঁটছেন। বেড়াচ্ছেন। সঙ্গে স্ত্রী।

একটা কুকুর। চাকর। কুকুরের শিকল ধ'রে চাকরটা কখনো মুন্সেফ মুন্সেফানীর কখনো সকলের পিছনে। ঠেলাগাড়িতে নবজাতক।

পেরাম্বুলেটারের হাতল ধরে আয়া স্বরূপিণী মুন্সেফ-শ্যালিকা, নাম যেন কি ও হ্যাঁ, ডায়না। নামটা কানে লাগল অটলবাবুর।

মুন্সেফবাবু ক্ষণে ক্ষণে ঘাড় ফিরিয়ে সহাস্য কলরবে পত্নীর অনুজাকে সম্বোধন করছেন। ডায়না দেবী কপট ক্রোধে মুখ রক্তিম ক'রে মাথা নাড়ছে, আমায় আবার কেন, আমি এসে করব কি, বেশ তো হাঁটছেন দু'জন।'

'বুঝলে,' মুন্সেফ পত্নীর মন্থর কণ্ঠস্বর। 'আরো দুটো শেয়ার কিনে রাখা ভাল, আমি বলছি এই বেলা তুমি নিয়ে নাও।'

'হুঁ, দেখছি। মুন্সেফবাবু শ্যালিকাকে ছেড়ে স্ত্রীর চোখে চোখে তাকান। ঘন ঘন শির সঞ্চালন করেন। অর্থাৎ, তোমার যুক্তি সর্বাগ্রে বিবেচ্য, তবে এখন বেড়াতে বেরিয়ে......

'ওকি, রাগ ক'রে দাঁড়িয়ে পড়লে।'

ঠেলা গাড়ী সহ ডায়না দেবী আর এক পা অগ্রসর হচ্ছে না। আঢ্য মশায় ছুটে এসে শ্যালিকার সঙ্গে মিলিত হন, হাতে হাত রাখেন, হাসেন।

কুকুর আনন্দে ল্যাজ নাড়ে। ডায়নার অধরে হাসি ফোটে। আবার পেরাম্বুলেটারের চাকা ঘুরল।

আস্তে আস্তে ক্যারাভান অদৃশ্য হয়ে গেল দরজার সামনে থেকে। অটলবাবু নিস্তেজ নিশ্বাস ফেললেন।

ঝুর ঝুর করে এক মুঠো পাকা হলদে নিমপাতা ঝরে পড়ে এলোমেলো হাওয়ায়। ঘরের সামনে। একটা শুকনো পাতা উড়ে এসে অটলবাবুর টেবিলে পড়ে, কোলে।

'গুডমর্নিং'।

'সুপ্রভাত'। অটলবাবু ক্ষীণ হেসে সোজা হয়ে বসেন।

'বেরোলেন না?'

'নাঃ।'

'শরীর খারাপ?' চোখ থেকে কালো ঠুলিটা ডাক্তার সরিয়ে নেয়। 'বলুন।' যেন পকেট থেকে এখুনি স্টেথস্কোপ তুলে অটলবাবুর বুকে চেপে ধরবে।

ডাক্তার হাসল।

'স্বাস্থ্যের সাধারণ নিয়মগুলো পর্যন্ত আমরা অবহেলা করি, এর চেয়ে পরিতাপের বিষয় আর কি হ'তে পারে। সত্যি কি তা নয়?'

অটলবাবু গম্ভীর।

'এমন ফাইন ওয়েদার, পার্কে দুটো চক্কর দিয়ে আসতে পারতেন, মাঠে যেয়ে—'

যোগীন ডাক্তারের কথা মাঝখানে থেমে গেল।

যেন অটলবাবু আজ এই প্রথম মুখ খুললেন।

'কথা হচ্ছে কি, ডাক্তার।' অটলবাবুর শুকনো স্তিমিত চোখে প্রতিবাদ, কিন্তু মুখে বিনয়ের হাসি। 'আমার মনে হয়, কেমন জানি ভয় হয়, সত্যি আমি পিছিয়ে গেছি, কারো সঙ্গে মেশার অনুপযুক্ত, বাইরে যাওয়া আমার পক্ষে অযৌক্তিক।'

'কেন, এটা কিসে থেকে হ'ল।' যোগীন ভুরু কুঁচকে অটলবাবুর মুখের দিকে তাকায়। 'এই melancholy তো ভাল নয়।'

টেবিলের ওপর দুই চোখ নিবিষ্ট রেখে অটলবাবু কি যেন ভাবেন।

ডাক্তার জুতোর গোড়ালীটা মেঝের ওপর একটু ঠুকল। একবার বাইরের দিকে তাকাল।

'রাত্রে আপনার ভাল ঘুম হয়?'

'তা একরকম—' অটলবাবু দুর্বল ভঙ্গীতে হাসেন।

'দেখি—'

'ওকি, ব্লাডপ্রেশার দেখছেন নাকি?' অটলবাবু এবার শব্দ ক'রে হাসলেন তারপর গম্ভীর হয়ে গেলেন। 'ও সব মোটামুটি ঠিক আছে যোগীনবাবু, বললাম তো আসল অসুখটা মনের, যার কোনো—'

ওষুধ নেই,' বেশ অপ্রসন্ন চোখে যোগীন ডাক্তার হাত গুটিয়ে নিলে। একটু গম্ভীর থেকে পরে বলল, যদি ইচ্ছা ক'রে সারাক্ষণ আমি মন খারাপ ক'রে ঘরে ব'সে থাকি, সত্যি এর কোনো ওষুধ নেই। আজকের দিনে মানুষ—'

যোগীন হঠাৎ থেমে যায়।

অটলবাবু আস্তে আস্তে বলেন, 'এটাও ঠিক—মানুষ দিন দিন যত বেশী সভ্য হচ্ছে মনের রোগ কিন্তু তত বেশী বাড়ছে, আর বেশ জটিল আকারে তা দেখা দিচ্ছে, মিথ্যা বললাম কি?' অটলবাবু চৌকাঠের বাইরে চোখ রাখতে গিয়েও ডাক্তারের দিকে তাকান।

'তা হতে পারে, আপনারা পণ্ডিত মানুষ, ভাবেন বেশী।' যেন কথায় বিশেষ সুবিধা করতে না পেরে যোগীন শেষ পর্যন্ত উঠে দাঁড়াল। প্রসঙ্গ পরিবর্তনের অভিপ্রায়ে জানালার বাইরে তাকিয়ে বলল, 'নিশানাথ বুঝি বাড়ি নেই।'

'না আর্দালীকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছে মফঃস্বল যাচ্ছে,—এখানকারই কোন্ গাঁয়ে।'

'ব্যাঙ্কের কাজে।' যেন ডাক্তার নিজের মনে বলল।

অটলবাবু চুপ থেকে মাথা নাড়লেন।

'খুব খাটছে ব্যাঙ্কটার জন্যে।'

অটলবাবু নীরব।

'চললাম।' ডাক্তার ঘুরে দাঁড়াল।

'কদ্দুর যাওয়া হবে? আজ রোববার।'

না আজ আর দূরে যাওয়া হবে না, টিচার্স কোয়ার্টারে একবার উঁকি দিয়ে বাড়ি।'

'চলি।' বিলাতী কায়দায় মাথা নেড়ে ডাক্তার লাফিয়ে চৌকাঠের বাইরে নেমে গেল।

শাদা সার্টস, শোলার টুপী মাথায়। গগলস। বর্মা চুরুট। শাদা জুতো।

যতদূর দেখা যায়, অটলবাবু চুপ করে দরজার বাইরে তাকিয়ে রইলেন। দেখলেন। চড়ুকির মতন এ বাড়ির দরজায় ও বাড়ির বৈঠকখানায় উঁকি দিয়ে কথা কয়ে হেসে গল্প ক'রে ডাক্তার দেবদারু গাছের আড়ালে অদৃশ্য হ'ল। অর্থাৎ সেখান থেকে রাস্তার বাঁক। আর দেখা যায় না।

একটা গোলাপ ঝুলছিল সার্টের বোতামের ওপর। অল্প অল্প গন্ধ বেরোচ্ছিল।

চলে যাবার পরও ডাক্তারের মূর্তিটা চোখের ওপর ভাসছিল অটলবাবুর।

দৃশ্য পরিবর্তিত হয়।

ছুটির সকালে বেশ সেজেগুজে বেড়াতে বেরিয়েছেন পঙ্কজ গুপ্ত, হীরেন্দ্র পালিত। এই শহরের বিশিষ্ট লোক এ'রাও।

ঘাড়ে গলায় অল্প অল্প পাউডারের ছোপ। চোখে সুদৃশ্য চশমা। আদ্দির তলায় নেটের গেঞ্জি উঁকি দিচ্ছিল একজনের। ত্রিশোর্দ্ধ দু'জনের বয়েস।

সিগারেটের ধোঁয়ায় হাস্যালাপে এবং গম্ভীর কথোপকথনে ছুটির সকালের হাওয়া চঞ্চল করে দিয়ে দু'জন চলল হসপিটাল রোডের দিকে। দেবদারু গাছের বাঁক এ'দেরও নিশানা।

অটলবাবু চুপ ক'রে রইলেন।

অল্প পরে মাটির একটা পাকা নিমফলে ঠোকর দিতে একটা শালিক নেমে এল।

গরুর গাড়ী গেল একটা রাস্তার পিলার ঘেঁষে, একটু পরে একটা রিক্সা। শালিকটা নড়ল না।

অনড় পাথরের মত অটলবাবু বসে রইলেন এর পর কে যায় রাস্তায় দেখতে। রোদের হলদে রং শাদা হয়ে গেছে ইতিমধ্যে।

ক্রমশঃ

# আণবিক শক্তির [illegible]

চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত এম, এস-সি

১৯৪৫ সালের ৬ই আগস্ট পৃথিবীর ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন, কারণ ঐ দিন হিরোসিমা এবং নাগাসাকির উপর আণবিক বোমা ফেলা হয় এবং ঐ ঘটনার দিন থেকেই আণবিক যুগের সূচনা হোয়েছে বলা যেতে পারে। তখন থেকেই বৈজ্ঞানিক মহলে জল্পনা-কল্পনা শুরু হোয়ে যায় যে, কি কোরে পরমাণুর বুকে লুকোনো এই অপরিমিত শক্তিকে মানুষের দৈনন্দিন কাজে লাগান যেতে পারে। হিরোসিমা ও নাগাসাকির ধ্বংসলীলা দেখে বৈজ্ঞানিক-জগতের বাইরে সাধারণ লোকেরও এই শক্তি সম্বন্ধে কৌতূহল জাগবে এটা খুবই স্বাভাবিক। কাজেই সকলের মুখে আজকাল আণবিক বোমার কথা শুনতে পাওয়া যায়—বিশেষ করে বর্তমান ঘোরাল আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সকলেই এ সম্বন্ধে সচেতন হোয়েছেন। এই রহস্যময় আণবিক শক্তি সম্বন্ধে আলোচনা কোরবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা।

এই বিষয় ভালভাবে জানতে গেলে পরমাণুর গঠন-প্রণালী সম্বন্ধে কিছুটা ওয়াকিবহাল হওয়া প্রয়োজন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে জন ডালটন নামে এক প্রসিদ্ধ রসায়নবিদ সর্বপ্রথম পদার্থের গঠনতত্ত্ব ও পরমাণুর সম্বন্ধে আমাদের কিছু আভাস দেন। তিনি বলেন যে, পদার্থের ক্ষুদ্রতম অবস্থার নাম 'পরমাণু' এবং এই পরমাণু স্বাভাবিক অবস্থায় থাকতে পারে এবং সকল প্রকার রাসায়নিক ক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ কোরতে পারে। পরে ডালটনের এই মতবাদকে পরিবর্তন কোরে এ্যাভোগাড্রো বলেন যে, পদার্থের ক্ষুদ্রতম অবস্থা 'পরমাণু' সন্দেহ নেই; কিন্তু এই পরমাণু স্বাভাবিক অবস্থায় থাকতে পারে না। স্বাভাবিক অবস্থায় থাকতে হোলে কয়েকটি পরমাণুকে সংঘবদ্ধ হোয়ে থাকতে হবে, যাদের নাম তিনি দিলেন 'অণু' (Molecule)। উদাহরণস্বরূপ তিনি বোললেন যে, জলের একটি 'অণু' দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণু এবং একটি অক্সিজেন পরমাণু দ্বারা গঠিত। যদি কিছু জল নিয়ে ক্রমাগত ভাগ কোরতে কোরতে যাই তাহলে সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম অবস্থায় পৌঁছালে তাকে জলের একটি 'অণু' বোলব। এই অণুকে আরো ক্ষুদ্র কোরলে সে আর জল থাকবে না—ভেঙ্গে দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু এবং একটি অক্সিজেন পরমাণুতে পরিণত হবে। কাজেই স্বাভাবিক অবস্থায় থাকাকালীন পদার্থের ক্ষুদ্রতম অবস্থাকে আমরা বলি অণু এবং একটি অণু দুই বা ততোধিক পরমাণু দ্বারা গঠিত। এ্যাভোগাড্রো আরো বোললেন যে, কোন মৌলিক পদার্থের সব পরমাণুরাই সর্ববিষয়ে একরকম। খুব অল্প দিন আগে পর্যন্ত এই বিশ্বাস অটুট ছিল যে, এই অভঙ্গুর, অবিনাশী পরমাণু দ্বারাই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড গঠিত। বিংশ শতাব্দীর পদার্থ বিজ্ঞান এই অভঙ্গুর পরমাণুবাদ বদলে দিয়েছে।

গত শতাব্দীর শেষভাগে ক্রুকস্, লেনার্ড এবং বিশেষ করে সার জে জে টমসন পরমাণু ভেঙ্গে ছোট কোরতে পারা যায় কিনা এই পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁরা এই পরীক্ষায় সাফল্যলাভ কোরে দেখালেন যে, যে-কোন পরমাণুই হোক না কেন, তাদের ভেঙ্গে যে ক্ষুদ্র কণিকা পাওয়া গেল তারা ওজনে সবাই সমান এবং তারা সমপরিমাণ ঋণতড়িৎবাহী। এরা ঋণতড়িৎযুক্ত বলেই এদের নাম দেওয়া হোল 'ইলেকট্রন'। কিন্তু একটি পরমাণু শুধু ইলেকট্রন দ্বারা তৈরী হোতে পারে না কারণ যেহেতু ইলেকট্রন ঋণতড়িৎবাহী সেহেতু শুধু ইলেকট্রন দ্বারা তৈরী পরমাণুটিও নিশ্চয়ই ঋণতড়িৎবাহী হবে। কিন্তু খুব ভালরূপ পরীক্ষা কোরে দেখা গেছে যে, একটি গোটা পরমাণু কোন তড়িৎই বহন করে না। কাজেই পরমাণুর ভিতর নিশ্চয়ই কোথাও এমন পরিমাণ বিপরীতধর্মী ধনতড়িৎ লুকোনো আছে যা সমস্ত ইলেকট্রনের ঋণতড়িতের সমান। তাহলেই সমগ্র পরমাণুটি নিস্তড়িৎ হবে। তখন বৈজ্ঞানিক মহলে খোঁজ খোঁজ পড়ে গেল। বহু পরীক্ষার পরে এই ধনতড়িতের সন্ধান পাওয়া গেল এবং দেখা গেল যে, এই ধনতড়িৎ একটি অতি ক্ষুদ্র জায়গায় আবদ্ধ যার পরিমাণ হোচ্ছে এক ইঞ্চির লক্ষ লক্ষ ভাগের এক ভাগ। এইভাবে ১৯১১ সালে লর্ড রাদারফোর্ড পরমাণু গঠন প্রণালীর একটি ছবি খাড়া কোরলেন এবং এই ছবি অনুসারে পরমাণুর কেন্দ্রস্থলে খুব সামান্য স্থান দখল কোরে ধনতড়িৎ বর্তমান এবং তারি চতুর্দিকে পরিভ্রমণ কোরছে ঋণতড়িৎবাহী ইলেকট্রন। কেন্দ্রস্থলের ধনতড়িতের নাম 'কেন্দ্রিক' (Nucleus)। ইলেকট্রনগুলি কেন্দ্রিকের চতুষ্পার্শে এমন গতিতে পরিভ্রমণ কোরছে যাতে তারা বিপরীত তড়িৎযুক্ত কেন্দ্রিকের উপর না গিয়ে পড়ে—ঠিক যেমন পৃথিবী সূর্যের চতুর্দিকে এমন এক গতি নিয়ে ছুটছে যাতে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে পৃথিবী সূর্যের উপর না গিয়ে পড়ে। এক কথায়, রাদারফোর্ড পরমাণবিক গঠনপ্রণালীকে সৌর জগতের গঠন প্রণালীর সঙ্গে তুলনা কোরলেন —কেন্দ্রিক সূর্যের ভূমিকা এবং ইলেকট্রনগুলি বিভিন্ন গ্রহের ভূমিকা অভিনয় কোরছে।

তাহলে, আমরা দেখছি যে, প্রত্যেক পরমাণুতে আছে একটি কেন্দ্রিক ও পরিভ্রামামাণ ইলেকট্রন। কিন্তু প্রশ্ন হোচ্ছে কোন পরমাণুতে কটা ইলেকট্রন থাকবে? সবরকম পরমাণুতে কি একই সংখ্যার ইলেকট্রন থাকবে না বিভিন্ন সংখ্যার ইলেকট্রন থাকবে? এর উত্তর বহু পূর্বে রুশীয় বৈজ্ঞানিক মেণ্ডেলীফ দিয়েছেন। মেণ্ডেলীফ সমস্ত মৌলিকপদার্থকে তাদের পরমাণবিক ওজন অনুসারে একটি ছকে সাজিয়েছেন। এই ছকের নাম 'পিরিয়ডিক টেবল'। এই পিরিয়ডিক টেবলে যে মৌলিক পদার্থ যে স্থান অধিকার কোরেছে সেটাকে তার পরমাণবিক সংখ্যা বলা হয় এবং প্রত্যেক মৌলিক পদার্থের ইলেকট্রন সংখ্যা তার পরমাণবিক সংখ্যার সমান। যেমন, হাইড্রোজেন পিরিয়ডিক টেবলে সর্বপ্রথম স্থান অধিকার করাতে এর পরমাণবিক সংখ্যা ১ এবং সেহেতু এর পরমাণুতে একটি ইলেকট্রন আছে। ২ (দুই) পরমাণবিক সংখ্যার মৌলিক পদার্থ হিলিয়ামে দুটি ইলেকট্রন এবং ৩ পরমাণবিক সংখ্যার পদার্থ লিথিয়ামে তিনটি ইলেকট্রন কেন্দ্রিকের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ কোরছে। এই ভাবে পিরিয়ডিক টেবল অনুসরণ কোরলে সর্ব শেষে পৃথিবীর সবচাইতে ভারী মৌলিক পদার্থ 'ইউরেনিয়াম' পাওয়া যাবে। ইউরেনিয়ামের পরমাণবিক সংখ্যা ৯২—কাজেই এর কেন্দ্রিকের চতুর্দিকে ৯২টি ইলেকট্রন পরিভ্রমণ কোরছে। আণবিক শক্তি আলোচনায় এই ইউরেনিয়াম অতি প্রয়োজনীয় স্থান অধিকার কোরেছে।

যে কোন মৌলিক পদার্থের যথা পারদ অথবা ক্লোরিনের পরমাণবিক সংখ্যা এবং পরমাণবিক ওজন এক এরূপ একটা ধারণা বহুদিন বলবৎ ছিল। কিন্তু পরে দেখা গেল যে, মৌলিক পদার্থের পরমাণুরা বিভিন্ন ওজনের হোতে পারে এবং এদের বলা হোল 'আইসোটোপস্'। এই 'আইসোটোপস' আবিষ্কারে আসটনের ভরলিপি যন্ত্র (Mass-Spectrograph) অভূতপূর্ব সাফল্য দেখিয়েছে। যখন আইসোটোপসের অস্তিত্ব স্বীকৃত ও প্রমাণিত হোল তখন দেখা গেল যে, পরমাণুর পরমাণবিক

ওজন পূর্ণ সংখ্যার খুব কাছাকাছি হোয়েছে। অধুনা প্রায় সব মৌলিক পদার্থের এমন কি সর্বাপেক্ষা সরল হাইড্রোজেনেরও আইসো-টোপস পাওয়া গেছে।

পরমাণুর পরমাণবিক সংখ্যা পূর্ণসংখ্যা হবে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই কারণ পরমাণুর বহির্গঠনে পূর্ণসংখ্যার ইলেকট্রন বিদ্যমান। আইসোটোপসের আবিষ্কারের পর যখন পরমাণবিক ওজনও পূর্ণসংখ্যায় প্রকাশিত হোল তখন সকলেই মনে কোরলেন আভ্যন্তরীণ বস্তুতেও—অর্থাৎ ওজনাবিশিষ্ট কেন্দ্রিকেও—পূর্ণসংখ্যার বস্তু বর্তমান। এই অনুমান যদি সত্য হয় তাহলে ঐ বস্তু হাইড্রোজেন কেন্দ্রিক ছাড়া আর কিছুই না এবং এর নাম দেওয়া হোয়েছে 'প্রোটোন'। কিন্তু এই অনুমানেও গোল আছে। হাইড্রোজেনের পরমাণবিক সংখ্যা এক। কাজেই এতে একটি ইলেকট্রন ঘুরছে যার তড়িৎ পরিমাণ কেন্দ্রিকে অবস্থিত একটি প্রোটোন থেকে বিপরীত ও সমান এবং হাইড্রোজেনের পরমাণবিক ওজনও এক। কাজেই হাইড্রোজেন পরমাণু বিশ্লেষণে আর কোন গোল রইল না। কিন্তু মুশকিল হবে পরবর্তী পদার্থ হিলিয়াম এর বেলাতে। হিলিয়ামের পরমাণবিক সংখ্যা দুই—কাজেই এতে দুটি ইলেকট্রন আছে এবং পরমাণুটি নিস্তড়িৎ হোতে গেলে কেন্দ্রিকে দুটি প্রোটন থাকা উচিত। কিন্তু এর পরমাণবিক ওজন চার—কাজেই এর কেন্দ্রিকে দুটি প্রোটনের বদলে চারিটি প্রোটন আছে। তাহলে তড়িৎ সামঞ্জস্য থাকে কি করে? এই সামঞ্জস্য আসতে পারে যদি এমন একটি কণিকা খুঁজে পাওয়া যায় যার ভর প্রোটনের ভরের সমান; কিন্তু সম্পূর্ণ নিস্তড়িৎ। আবার বৈজ্ঞানিক মহলে খোঁজ খোঁজ পড়ল। অবশেষে ঠিক যেমনটি চাওয়া হোয়েছিল ঠিক তেমন একটি কণার সন্ধান পাওয়া গেল। তার নাম দেওয়া হোল 'নিউট্রন'। প্রত্যেক পরমাণুর কেন্দ্রিকে ঠিক ততটি প্রোটন থাকবে যা দরকার হবে মোট ইলেকট্রনের ঋণতড়িতের সমান ও বিপরীত হোতে এবং পরমাণুর বাকী ওজনের ঘাটতি পূরণ কোরবে নিস্তড়িৎ 'নিউট্রন'।

১৮৯৬ সালে হেনরী ব্যাকারেলের এক অভিনব আবিষ্কার পরমাণবিক শক্তি সম্বন্ধে নতুন আলোকসম্পাত কোরল এবং পরমাণবিক গঠন প্রণালী সম্বন্ধে নতুনভাবে পর্যালোচনা শুরু হোল। ব্যাকারেল দেখতে পেলেন যে সবচেয়ে ভারী পদার্থ ইউরেনিয়াম সংযুক্ত যে কোন জিনিস আপনা থেকেই ফটোগ্রাফী প্লেটকে সক্রিয় কোরে তুলছে। এর কিছু পরে বিখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক পিয়ের কুরী ও তাঁর স্ত্রী মাদাম কুরী এই ব্যাপারটি আরো বিশেষভাবে লক্ষ্য কোরলেন 'রেডিয়াম' বলে এক দুষ্প্রাপ্য পদার্থে। তখন থেকে এই ব্যাপারকে পদার্থের 'তেজস্ক্রিয়া' (Radio-activity) বলে অভিহিত করা হয়। তেজস্ক্রিয়া সম্বন্ধে বহু গবেষণা কোরে রাদারফোর্ড ও সডি বোললেন যে, তেজস্ক্রিয়া পদার্থের কেন্দ্রিক-গুলি এত ভঙ্গুর ও ক্ষণস্থায়ী যে কালক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে এগুলি আপনাথেকে ভেঙ্গে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে এর থেকে প্রচুর শক্তির নির্গম হয়—আলফা, বীটা ও গামারশ্মি নামক তিন রকম রশ্মির আকারে। পরমাণু কেন্দ্রিকের ভঙ্গুরতা ও সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর শক্তির নির্গমের কথা বিজ্ঞানীরা প্রথম জানলেন। ১৯১৯ সালে রাদারফোর্ড কর্তৃক কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়া আবিষ্কারের ফলে বৈজ্ঞানিকগণ এদিকে আরো অগ্রসর হোলেন। তখুনি তাঁরা চিন্তা কোরতে আরম্ভ কোরলেন কি করে এই কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়া ঠিক পথে পরিচালিত কোরে তা থেকে নির্গত অমিতশক্তিকে কাজে লাগান যাবে।

আমরা আগে দেখেছি যে সব আইসোটোপস কেন্দ্রিকের ভর পূর্ণসংখ্যা। কিন্তু এটা ঠিক নয়। প্রোটনের ভর ঠিক ১ নয়—১·০০৮১। হিলিয়াম কেন্দ্রিকের ভর ৪.০০৩৯ কিন্তু হিলিয়াম কেন্দ্রিক দুটি প্রোটন ও দুটি নিউট্রন দিয়ে তৈরী এবং সেই অনুসারে এর ভর হওয়া উচিত ৪.০৩৪০। বাকী ভর কোথায় গেল? 'ভরের অবিনশ্বরত্ব' (Conservation of Mass) প্রতিপাদ্য অনুসারে এই বাকী ভর বিনাশ পেতে পারে না। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আলবার্ট আইনস্টাইন এই গণ্ডগোলের মীমাংসা কোরলেন তাঁর বিখ্যাত "ভর ও শক্তির তুল্য-মূল্যতা" (Equivalence of Mass and Energy) নামক প্রতিপাদ্য দ্বারা। এই প্রতিপাদ্য অনুসারে আইনস্টাইন বোললেন বাকী ভর শক্তিতে পরিণত হোয়েছে—যে শক্তি কেন্দ্রিকের বিভিন্ন উপাদানগুলিকে যথা প্রোটন ও নিউটন প্রভৃতিকে এক সঙ্গে বেঁধে রেখেছে এবং এইজনাই এই শক্তিকে বলা হয় "বন্ধনশক্তি"। তখন বৈজ্ঞানিকেরা বোললেন যে, কেন্দ্রিকের এই উপাদানগুলিকে যদি বিচ্ছিন্ন কোরতে পারা যায় তাহলে এই শক্তি মুক্ত হবে এবং আমরা প্রচুর শক্তি আয়ত্তে আনতে পারব। এইখানেই হোচ্ছে পরমাণুর অমিতশক্তির উৎস।

ব্যাকারেলের সময় থেকেই দেখতে পাওয়া গিয়েছিল যে ইউরেনিয়াম কেন্দ্রিক অতি ক্ষণস্থায়ী। এমন কি মন্দগতি নিউট্রন দ্বারা আহত হোলেও এর কেন্দ্রিক দুভাগে বিভক্ত হোয়ে যায়। বাস্তবিক পক্ষে এ ব্যাপারে দ্রুতগতি নিউট্রনের চাইতে মন্দগতি নিউট্রন বিশেষ কার্যকরী। তাহলে এটা বেশ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে কেন্দ্রিকের এই ভাঙ্গন (fission of Nuclei)-এর জন্য বিশেষ কোন বলপ্রয়োগের প্রয়োজন নেই—এটা অনেকটা বারুদে সামান্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সংযোগের মত। পরমাণবিক শক্তির উৎস হিসাবে ইউরেনিয়ামের কার্যকারিতার আর একটি কারণ হোচ্ছে যে ইউরেনিয়ামে পারস্পরিক প্রক্রিয়া অতি সুষ্ঠুভাবে ঘটে। ব্যাপারটা এই রকমঃ—প্রথমে ইউরেনিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রিক নিউট্রন দ্বারা আহত হোয়ে ভেঙ্গে দুভাগ হোয়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর শক্তির নির্গম হয় এবং কেন্দ্রিকের ভিতর থেকে কয়েকটি নিউ-ট্রন ছুটে বেরিয়ে যায়। এই নিউট্রনগুলি আবার কাছাকাছি কেন্দ্রিকের ভাঙ্গন ঘটায় এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর শক্তি ও কয়েকটি নিউট্রনের নির্গম হয়। এই নিউট্রনগুলি আবার অন্য কতগুলি কেন্দ্রিককে আঘাত করে এবং এই ভাবে পারস্পরিক প্রক্রিয়া চালু থাকে। ফলে অতি অল্প সময়ের ভিতর এত বেশী শক্তি জমায়েত হয় যে, তা থেকে হঠাৎ ভীষণ বিস্ফোরণের সৃষ্টি হয়।

কেন্দ্রিক ভাঙ্গনের ব্যাপারে ইউরেনিয়াম ২৩৮এর চাইতে তার একটি আইসোটোপ ইউরেনিয়াম ২৩৫ আরো বেশী সফলতা অর্জন কোরতে দেখা গেছে। কিন্তু যে পারস্পরিক প্রক্রিয়া উপরে বলা হোল সেটা যেমন গোলমেলে তেমনি কঠিন। তদুপরি ইউরেনিয়াম ২৩৫ অতি দুষ্প্রাপ্য—১৪০ ভাগ ইউরেনিয়াম ২৩৮এ মাত্র ১ ভাগ ইউরেনিয়াম ২৩৫ আছে এবং এই স্বল্প পরিমাণ আইসোটোপকে আসল ধাতু থেকে বিচ্ছিন্ন করাও ভয়ানক জটিল ও দুরূহ। কাজেই এই জটিল ও দুরূহ ব্যাপারকে এড়িয়ে যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হোয়েছে তা হোচ্ছে এইঃ—যখন সাধারণ গতিসম্পন্ন নিউট্রনকে ইউরেনিয়াম ২৩৮এর কেন্দ্রিকের দিকে ছুঁড়ে দেওয়া হয়, তখন ঐ কেন্দ্রিক এই নিউট্রনটিকে বেমালুম নিজের ভিতর আত্মসাৎ কোরে নেয় এবং একটি বিটাকণা বার করে দিয়ে নিজে অতি ক্ষণস্থায়ী নেপচুনিয়াম নামে নতুন একটি পদার্থের কেন্দ্রিকে পরিণত হয়। এই নেপচুনিয়াম কেন্দ্রিক এত ক্ষণস্থায়ী যে শীঘ্রই এর থেকে আর একটি বিটাকণা বেরিয়ে আসে এবং নেপচুনিয়াম কেন্দ্রিক 'প্লুটোনিয়াম' নামে আর একটি নতুন পদার্থের কেন্দ্রিকে পরিণত হয়। প্লুটোনিয়াম কেন্দ্রিক ততটা ক্ষণস্থায়ী নয় এবং ইউরেনিয়াম ২৩৫এর মত মন্দগতি নিউট্রন দ্বারা আহত হোলে অতি সহজেই দুভাগে ভেঙ্গে যায়। এই কারণেই পরমাণবিক শক্তি আহরণের জন্য প্লুটোনিয়াম সবচাইতে সুবিধাজনক বলে প্রমাণিত হোয়েছে।

ইউরেনিয়াম কেন্দ্রিকের ভাঙ্গনের ফলে যে প্রচণ্ড শক্তির উদ্ভব হোল—যার পরিমাণ প্রায় দুশ' মিলিয়ন ইলেকট্রন-ভোল্ট তা দেখে বৈজ্ঞানিক মহল হতবাক্ হোয়ে গেলেন। হিসাব করে দেখা গেছে যে, কেন্দ্রিক ভাঙ্গনের ফলে এই যে শক্তির সৃষ্টি হয়—যা ঘটতে কয়েক মাইক্রোসেকেণ্ডের মাত্র প্রয়োজন—সেই শক্তি কয়েক মিলিয়ন ডিগ্রী তাপ ও কয়েক মিলিয়ন এ্যাটমোসফিয়ার (atmosphere) চাপ সৃষ্টি করে। এই প্রচণ্ড তাপ ও চাপের ফল কি

ণ তা হিরোসিমা ও নাগাসাকির ধ্বংস-া থেকে সহজেই বুঝতে পারা যায়। যে ন্ত শক্তি এর পূর্বে বৈজ্ঞানিকদের জানা, আণবিক শক্তির প্রচণ্ডতার কাছে সে সব প্রভ হোয়ে গেছে।

এই শক্তির প্রচণ্ডতা লক্ষ্য কোরে প্রথম কেই বৈজ্ঞানিকগণ মাথা ঘামাতে আরম্ভ রলেন কি কোরে একে মানুষের দৈনন্দিন জে লাগান যেতে পারে। এই শক্তিকে যখন সত্যই সাধারণ ব্যবহারের উপযোগী করা , তখন পৃথিবীর অর্থনৈতিক জগতে যে টা মহা আলোড়ন আসবে তাতে কোন দহ নেই। একটা ঘটনার উল্লেখ কোরলেই পারটা পরিষ্কার হবে। ১৯৩৮ সালে ণ্ডের সমস্ত কল-কারখানা চালু রাখতে প্রায় ৩০,০০০ মিলিয়ন ইউনিট বৈদ্যুতিক শক্তির প্রয়োজন হোয়েছিল। এই শক্তিকে পেতে প্রায় ২০ মিলিয়ন টন কয়লা পোড়াতে হয়। কিন্তু আণবিক যুগে আমরা এক বর্গগজ আয়তনের একটি ছোট ইউরেনিয়াম অক্সাইড খণ্ডকে বিধ্বস্ত কোরে এই শক্তি পেতে পারি! যুদ্ধের আগে যখন প্রথম ইউরেনিয়াম কেন্দ্রিকের ভাঙ্গন আবিষ্কৃত হয়, তখন অনেকে বলেছিলেন যে, ভবিষ্যতে মোটরগাড়ী, এরোপ্লেন, ট্রেণ প্রভৃতি চালাতে পেট্রোল, কয়লা ও নানারকম যন্ত্রপাতির আর কোন প্রয়োজন হবে না। বাড়ীতে আলো জ্বালাতে বা মেশিন চালাতে বৈদ্যুতিক শক্তিরও কোন প্রয়োজন থাকবে না। এরা বলেছিলেন যে, এমন সব পাওয়ার পিল' বা আণবিক শক্তিপূর্ণ ছোট ছোট কাল বাক্স আবিষ্কৃত হবে যা মোটরকারে বা ট্রেনে জুড়ে দিলেই গাড়ীগুলি অনায়াসে হাজার হাজার মাইল একসঙ্গে চলতে পারব। কিন্তু সত্যি কথা বোলতে গেলে এখনি এতটা আশা করা ঠিক না। এ সম্বন্ধে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রাইস যা বোলেছেন সেটা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বোলেছেন,—

"The development of atomic energy for large scale constructive purposes is a very long business. The atomic age, if it ever comes, is certainly not here yet and is likely to be a half-century off and even when it does come it may have unpleasant features about it, even from the technologists' point of view."

# আমি আর আমার বাড়ীওয়ালা

স্টিফেন লীকক্

আমি যে আমার বাড়িওয়ালাকে খুন করেছি সে কথা আর চাপা নেই। কেন করলাম, তার একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া দরকার।

সকলেই বলছেন এ-কৈফিয়তের কোনও প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমার নিজেরও তো বিবেক বলে একটা পদার্থ আছে। সেই বিবেক-বুদ্ধের তাড়া খেয়েই একদিন আমি সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বলবার জন্য পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছে গিয়ে হাজির হলাম। অথচ তিনিও বললেন দরকার নেই কৈফিয়তের। এ সমস্ত কৈফিয়ৎ-টৌফিয়ৎ কেউ দেয় না, দেওয়াটা খুব বাঞ্ছনীয়ও নয়।

বললেন, "আপনি বলছেন আপনার বাড়ি-ওয়ালাকে আপনি খুন করেছেন। তা বেশ তো, করতে হয়েছে কি?" এটা আইনের আওতায় পড়ে কিনা জিজ্ঞাসা করতে তিনি বললেন, "কি ভাবে পড়ে আপনি বলুন।"

আমি তাঁকে বুঝিয়ে বললাম, ব্যাপারটা নিয়ে আমি খানিকটা বিব্রত হয়ে পড়েছি। বাড়িওয়ালা-খুনের ব্যাপারে বন্ধু-বান্ধব, এমন কি অপরিচিত সব ভদ্রলোকরাও আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে পাঠাচ্ছেন। অথচ আসল ব্যাপারটা বিবেচনা করে দেখলে স্বীকার করতেই হয় যে, এ অভিনন্দন কোনক্রমেই আমার প্রাপ্য নয়। মোট কথা ঘটনাটা সকলের জানা দরকার।

—"বেশ তো, ভালো কথা" পুলিশ সুপার বললেন, "খুশী হলে আপনি এই ফর্মটা পূরণ করে দিয়ে যেতে পারেন।" বলে তিনি তাঁর কাগজপত্র হাতড়াতে লাগলেন।

—"বাড়িওয়ালাকে আপনি খুন করেছেন বলছিলেন না? না কি এখনো করেননি, পরে করবেন?"

গলায় বেশ অনেকটা জোর দিয়ে বললাম, "আজ্ঞে না, তাঁকে আমি খুনই করেছি।"

পুলিশ সুপার বললেন, "খুব ভালো কথা। ও ব্যাপারে আবার আলাদা ফর্মের ব্যবস্থা রয়েছে কিনা, তাই।" বড় একখানা ছাপানো কাগজ তিনি আমার হাতে গছিয়ে দিলেন। তাতে আমার বয়স, পেশা, হত্যার কারণ (যদি অবশ্য থাকে) ইত্যাদি সব লিখে দিতে হবে।

"এই যে হত্যার কারণ লিখতে বলা হয়েছে, এখানটায় কি লেখা যায় বলুন তো?"

"আমার মনে হয়," তিনি বললেন, "কোনও কারণ নেই' লিখে দেয়াই ভালো। আর নয়তো লিখে দিন 'কারণ অতি স্বাভাবিক।'"

এই বলে তিনি আমাকে নমস্কার করে দরজা দেখিয়ে দিলেন। চলে আসবার সময় এ কথাও বলে দিলেন যে, লাশটাকে যেন আমি দয়া করে একটা কবর দেবার ব্যবস্থা করি, সেটাকে যেন আবার রাস্তার ওপর ফেলে রাখা না হয়।

ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলে আমি খুব খুশী হতে পারলাম না। বেশ বুঝলাম যে, আইনের বাঁধাধরা গণ্ডী ছেড়ে তিনি এক পাও বাইরে আসিতে রাজী নন। আর সত্যিই তো সমস্ত খুনোখুনি নিয়েই যদি তদন্ত-তল্লাস করতে হয়, তাহলে তো এ বেচারার জীবন দুর্বহ হয়ে উঠবে।

বাড়িওয়ালাকে মানুষে খুন করে কেন? ভাড়া বাড়ালে তবেই। এতো খুব সাদা কথা। বাড়িওয়ালা এসে বলে, "এ মাস থেকে আমি দশ ডলার করে ভাড়া বাড়িয়ে দিলাম।" উত্তরে তার ভাড়াটে বলে, "বেশ, আমিও তোমাকে গুলী করে মারবো।" তা সে মারেও মাঝে মাঝে আবার মাঝেসাঝে ভুলেও যায়।

তবে কিনা আমার ব্যাপারটা একটু আলাদা। 'জাতীয় ভাড়াটে সম্মেলন' প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন যে, এই সৎ কাজের জন্য আগামী শনিবার আমাকে একটা মেডেল উপহার দেওয়া হবে। অথচ আসল রহস্য কেউই জানেন না। সুতরাং সব কথা খুলে লিখতে আমি বাধ্য হলাম।

আমি আর আমার স্ত্রী এই ফ্ল্যাটে এসে উঠেছি তা প্রায় বছর পাঁচেক হবে। বাড়িওয়ালা নিজে এসে আমাকে খুঁটিনাটি সব দেখিয়ে-শুনিয়ে দিলেন। এবং এ কথা বলতে আমার কিছুমাত্রও বাধা নেই যে, তার আচার-ব্যবহারে তখন আমি অস্বাভাবিক কিছুই খুঁজে পাইনি। পেলেও সে খুব সামান্য।

শুধু একটা ব্যাপারে আমি একটু চমকে গিয়েছিলাম। আমার কাবার্ডটা একটু ছোট। কিন্তু তার জন্যেই ভদ্রলোক কিনা, অবাক কাণ্ড, আমার কাছে ক্ষমা চেয়ে বসলেন।

তিনি বলেছিলেন, "কিছু মনে করবেন না, এ ফ্ল্যাটে ঐ এক অসুবিধে।"

তাঁর কথার ধরণে আমি একটু অস্বস্তি বোধ করেছিলাম সেদিন; বলেছিলাম, "তা হোক না, ভাঁড়ার ঘরটা আবার তেমনি বড় আছে। হাওয়া-বাতাসও বেশ খেলে এখানে। আড়ে-পাশে এটা ফুট চারেক করে তো হবেই।"

ভদ্রলোক তাঁর গোঁ ছাড়লেন না। বললেন, "ভাঁড়ার ঘরটা বড় হতে পারে, কিন্তু কাবার্ডটা যে ছোট এ তো আর অস্বীকার করা যায় না। দাঁড়ান শীগগীরই এর একটা বিহিত করে দিচ্ছি।"

এর মাস দুয়েক বাদেই তিনি নতুন কাবার্ড তৈরী করে দিলেন। ব্যাপারটায় আমি একটু চমকে গিয়েছিলাম। আরো চমকে গেলাম যখন দেখলাম এর জন্যে তিনি ভাড়া বাড়ালেন না। অগত্যা আমি নিজেই গিয়ে একদিন তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, "নতুন কাবার্ডের ব্যবস্থা ক'রে দিলেন, ভাড়া বাড়াবেন না তার জন্যে?" তিনি বললেন, "না, মাত্র পঞ্চাশ ডলার খরচা হয়েছে আমার। ওর জন্যে আবার একটা ভাড়া বাড়াবো কি।" বললাম, "তাও কি হয়। ওটা কি কম হলো? পঞ্চাশ ডলার ধার দিলেও তো বছরে ষাট ডলার সুদ পাওয়া যায়।"

ভদ্রলোক আমার কথা স্বীকার করলেন, কিন্তু সেইসঙ্গে একথাও জানিয়ে দিলেন যে, ভাড়া তিনি বাড়াবেন না।

কথাবার্তা শুনে মনে হলো ভদ্রলোকের মাথায় একটু গোলমাল আছে। তখন পর্যন্ত আমি তাঁকে খুন করবার কথা ভাবিনি। সেটা তার আগে কিছু দিন পরের ব্যাপার।

পরের বছর বসন্তকাল পর্যন্ত আর কোনও গোলমাল হলো না। হঠাৎ একদিন খুব একচোট ক্ষমাটমা চেয়ে নিয়ে (এ-সব ব্যাপার এমনিতেই একটু গোলমেলে) তিনি আমাকে জানালেন যে, পুরো ফ্ল্যাটটাকে তিনি নতুন করে কাগজ দিয়ে মুড়ে দিতে চান। বৃথাই তাঁকে আমি বাধা দেবার চেষ্টা করলাম। বললাম, "মাত্র দশবছর আগেই তো আপনি এ কাগজ লাগিয়েছেন, এরই মধ্যে আবার কেন?" তিনি বললেন, "তার পর কাগজের দামও দ্বিগুণ বেড়েছে।" বললাম, "তাহলেই দেখুন, এরই মধ্যে আবার কাগজ লাগাবার কি দরকার। আর যদি লাগাতেই হয় তাহলে ভাড়াও মশাই আমার কুড়ি ডলার করে বাড়িয়ে দিন।" তার উত্তরে তিনি জানিয়ে দিলেন যে বাড়ি-ভাড়া এক পয়সাও বাড়ানো হবে না। বলতে কি, এর পর থেকে তার সঙ্গে আমার এক তিক্ত সম্পর্কের সৃষ্টি হলো।

তার পরের ব্যাপার আরও মারাত্মক। যে সময়ের কথা বলছি বাড়ি তৈরীর মালমশলার দাম তখন অত্যন্ত বেড়ে যায়। ফলে, অনেকেরই মনে থাকতে পারে, বাড়িভাড়াও তখন বেশ বেড়ে গিয়েছিল। অথচ আমার বাড়িওয়ালা যে কেমনতরো মানুষ, বাড়িভাড়া তিনি এক পয়সাও বাড়ালেন না।

আমি শুধু একবার বলেছিলাম, 'বাড়ি তৈরীর খরচা এখন দ্বিগুণ হয়ে গেছে।' উত্তরে তিনি বললেন, "তা হোকগে, আমি তো আর নতুন বাড়ি তৈরী করতে যাচ্ছি না। ভাড়াটে বসিয়ে এতদিন পর্যন্ত আমি শতকরা দশ ডলার মুনাফা পাচ্ছিলাম। এখনও তা-ই পাচ্ছি।"

বললাম, "নিজের কথা না-হয় নাই ভাবলেন, অন্ততঃ স্ত্রীর কথাটা ভাবুন।"

—"দরকার হবে না।" তাঁর সংক্ষিপ্ত উত্তর।

কিন্তু আমিও এত সহজে ছাড়বার পাত্র নই। বললাম, "ভাড়া বাড়ানোটা আপনার কর্তব্যই এইতো কালকের কাগজেই এক বাড়ি-ওয়ালার চিঠি বেরিয়েছে। চমৎকার চিঠি। তাতে তিনি বলেছেন যে, বাড়ি তৈরীর খরচ বেড়ে যাওয়ায় বাধ্য হয়েই তাঁকে এখন তাঁর স্ত্রী-পুত্রের কথা চিন্তা করতে হচ্ছে। কী করুণ চিঠি!"

বাড়িওয়ালা তাতে বললেন, "স্ত্রীর ভাবনা আমার নেই, আমি অবিবাহিত।"

"বিয়ে করেননি? তাই বলুন।" এই সময়েই সর্বপ্রথম আমার মনে এই চিন্তা উঁকি মেরে গেল যে, লোকটাকে তো তাহলে সহজেই সরিয়ে দেয়া যায়।

নবেম্বর মাসে আর একদফা কথা কাটা-কাটি হয়ে গেল তার সঙ্গে। যুদ্ধবিরতির দিবস উপলক্ষে বাড়িভাড়া সেবার দেড়গুণ বাড়িয়ে দেয়া হয়। পাঠকদেরও সে কথা মনে থাকতে পারে। অথচ আমার বাড়িওয়ালা আমাকে জানিয়ে দিলেন তিনি ভাড়া বাড়াবেন না।

লোকটার মধ্যে কি দেশপ্রেমেরও বালাই নেই। এর কিছুদিন বাদেই মার্শাল ফকের সফর উপলক্ষে আর একবার ভাড়া বেড়ে যায়। এবারে বেড়েছিল শতকরা পঁচিশ ডলার। প্রাক্তন সৈনিকদের সম্মানার্থে নাকি এই ব্যবস্থা।

ভাড়া বাড়ানোর মূলে ছিল দেশপ্রেম। আগেভাগে চিন্তা না করেই সকলে তখন ভাড়া বাড়িয়ে চলেছে। সৈন্যদেরও বলাবলি করতে শুনেছি এই অপরূপ অভ্যর্থনার কথা তারা জীবনে ভুলবে না।

এর পর আরো একবার ভাড়া বাড়লো। যুবরাজের সফর উপলক্ষে। ভাড়া বাড়ানো ছাড়া আর কীভাবেই বা তাঁকে সম্মান জানানো যেত।

অথচ, আমার বাড়িওয়ালা যে কী মানুষ, তিনি এর ধারেকাছেও ঘেঁষলেন না। একটি পয়সা ভাড়া বাড়ালেন না তিনি। বললেন, "শতকরা দশ ডলার মুনাফা পাচ্ছি, তা-ই আমার যথেষ্ট।"

ভদ্রলোকের বুদ্ধিশুদ্ধি যে লোপ পেয়ে গিয়েছিল সে-বিষয়ে আজ আর আমার মনে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। কী বিহিত করা যায়, তখন থেকেই আমার সেই এক চিন্তা।

বিপর্যয় ঘটলো গত মাসে। রাতারাতি জার্মান মার্ক-এর দাম পড়ে যাওয়ায় বাড়ি ভাড়া বাড়িয়ে সেই সংকটকে ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়। এ-যে বুদ্ধিমানেরই ব্যবস্থা সে কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

মার্ক-এর দাম পড়ে যাওয়ায় যে সংকট সৃষ্টি হলো এইভাবে তাকে ঠেকিয়ে না রাখলে আমাদের বিনাশ অনিবার্য হয়ে উঠত। মার্ক সস্তা হ'য়ে গেছে, অনায়াসে জার্মানরা যে তখন বাড়িঘর দখল করে বসতে পারতো তাতে আর সন্দেহ নেই।

ঝাড়া তিনদিন বসে রইলাম। রোজই ভাবতাম বাড়িওয়ালা আজ নির্ঘাত ভাড়া বাড়াবার নোটিশ নিয়ে এসে হাজির হবে।

তা যখন হলোনা তখন আমি নিজেই তাঁর অফিসে গিয়ে হাজির হলাম। হাতিয়ার সঙ্গে নিতে ভুলিনি, সে কথা বলাই ভালো। আর না নিয়েই বা উপায় কি। যার কাছে যাচ্ছি সে তো একটি আস্ত অমানুষ। তার মাথার ঘিলু যে জমাট বেঁধে গেছে।

এবং সেখানে গিয়ে আর আমি খুব বাক্য-ব্যয় করিনি। সরাসরি প্রশ্ন করলাম, "জার্মান মার্কের দাম পড়ে গেছে, খবর রাখেন তার?"

—"রাখি, তা তাতে হয়েছে কি?"

—"আপনি আমার ভাড়া বাড়িয়ে দেবেন কিনা বলুন?"

—"এক আধলাও না।"

অতঃপর রিভলবার তুলে নিয়ে আমি তার ঘোড়া টিপে দিলাম। আমার দিকে কাৎ হয়ে বসেছিলেন তিনি। সবশুদ্ধ চারবার গুলী চালাতে হলো আমাকে। ধোঁয়ার মধ্য দিয়ে নজর চালিয়ে দেখলাম প্রথম গুলীটি তাঁর ওয়েস্ট-কোটের ভিতরে গিয়ে বিদ্ধ হলো, দ্বিতীয়টি তাঁর কলার উড়িয়ে নিয়ে গেল, বেমালুম। তৎ-ক্ষণে তৃতীয় আর চতুর্থ গুলীও তাঁর পিঠে গিয়ে বিঁধেছে। বুঝলাম, হয়ে এসেছে তাঁর। রাস্তা পর্যন্ত গিয়ে আর তাঁকে পৌঁছতে হবে না, পৌঁছলেও আর তাঁর হাটবার ক্ষমতা নেই।

এই অবস্থায় তাঁকে ফেলে রেখে সোজা পুলিশের কাছে চলে গেলাম আমি। সেখানে গিয়ে সব কথা খুলে বললাম। আগেই তার উল্লেখ করেছি।

'ভাড়াটে লীগ' আমাকে মেডেল উপহার দেবার প্রস্তাব করেছেন। সব কথা খুলে বললাম আমি। এর পরেও যদি তাঁদের সে ইচ্ছে থাকে, বেশতো, আমার কোনও আপত্তি নেই।

**অনুবাদ : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী**

# এযুগের হিন্দী কবিতা

বিজয় ব্যানার্জি

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের অবসান পর্যন্ত হিন্দী কাব্য-সাহিত্যে তিনটি ...ট ধারা প্রবহমান দেখতে পাওয়া যায়। তিনটি ধারাকে যথাক্রমে বৈষ্ণববাদ (ভক্তি-সংমিশ্রিত), জীবন-রহস্যবাদ (mysti-...) ও জাতীয়তাবাদ বলে অভিহিত করা ... পারে। বৈষ্ণববাদ ও মিস্টিসিজম ...লাভ করেছিল চতুর্দশ শতাব্দী ... শুরু করে ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি ... পর্যন্ত। আরো পূর্ববর্তী যুগে সৃষ্ট ... রাজারাজড়ার গৌরবকাহিনীর প্রাচুর্য ... এই বীর-উপাসনার ভাব বর্তমান কালেরও ...ী কবিদের কারো কারো মধ্যে প্রবল ...তে পাওয়া যায়। এছাড়া বহু আগে ...ই যৌন-আবেদনমূলক আদিরসাত্মক ... হিন্দী সাহিত্যে স্থান পেয়েছে এবং ...ন পাচ্ছে আজকালও বেশ প্রচুরভাবেই।

বৈষ্ণব ও ভক্ত কবিদের মধ্যে রামানন্দ ...র্ভূত হয়েছিলেন চতুর্দশ শতাব্দীতে। ...র অবতার রাম ছিলেন তাঁর উপাস্য ...। তাঁর ভক্তি ও প্রেমের দর্শনে জাতি-...র বালাই ছিল না কোন। এঁরই শিষ্য-... ছিলেন কবির, রায়দাস, সেন, সদন ...তি ভক্ত কবিগণ। এঁরা ছিলেন যথাক্রমে ...লা, মুচি, নাপিত ও কশাই—তথাকথিত ...শ্রেণীর লোক সব।

এর পর তুলসীদাস ও মীরা বাঈয়ের ...নে সে-যুগের বৈষ্ণব ও ভক্তি-সাহিত্য ...র চরম শিখরে ওঠে। মীরার ভজনাবলী ... তুলসীদাসের 'রামচরিতমানস' অপরূপ ...সৃষ্টি।

সে যুগের ভক্তিবাদের সঙ্গে জীবন-...স্যবাদ (মিস্টিসিজম) বিমিশ্রিত ছিল। ...নত কবিরের রচনাতেই সে-যুগের জীবন-...স্য-বাদ নূতন ভঙ্গীতে ব্যক্ত হতে থাকে।

বৈষ্ণব কবিদের কাছে ভগবান যেখানে ...ক্তিতে রূপায়িত এবং যেখানে বৈষ্ণববাদীরা ...মেশ্বরের কাছে আত্মসমর্পিত, সেখানে ...র্বৈক্তিক, দুরধিগম্য ও অনুভূতিতে ...কৃত এবং ব্যক্তি-আত্মা ও পরমাত্মায় ব্যবধান ...হৈত অসীম একত্ববিশিষ্ট সত্তার কল্পনা ...রেছেন মিস্টিক কবিরা।

কবিরের রচনায় উপনিষদ ও সুফি ...দর্শের প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। এর পর ষোড়শ শতাব্দীতে মালিক মহম্মদ জয়াসী ...স্পষ্টভাবে সুফি রহস্যবাদের আমদানী ...রেন হিন্দী সাহিত্যে।

হিন্দী সাহিত্যে জাতীয়তাবাদের সূচনা দেখতে পাই প্রাচীন 'বীরগাথায়', অতীতকালের রাজা-রাণীদের বীরত্ব, আত্মত্যাগ ও প্রেমের কাহিনীর এই ছন্দোময় বর্ণনার মধ্যে জাতীয়তাবোধের ইঙ্গিত পাওয়া যেত।

খুমান, পৃথ্বীরাজ, বিশালদেব, হামির ইত্যাদি সে-যুগের বীর যোদ্ধারা হলেন এই সব কাব্য-সাহিত্যের নায়ক।

এর পর আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ও পরে মুঘল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে শিখগুরু গোবিন্দ সিংহ ও শিবাজীকে কেন্দ্র করে যে রাজনৈতিক-ধর্মনৈতিক অভ্যুদয় ঘটে, সম-সাময়িক কোন কোন হিন্দী কবি তা লিপিবদ্ধ করেন সুললিত কবিতার ভাষায়। শিবাজীর সভাকবি ভুষণ তাঁদের অন্যতম। তাঁর শিব-রাজা ভুষণ ও শিভবানী নামক গ্রন্থ দুটি পূর্ববর্তী কালের শ্রেষ্ঠ জাতীয় সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করেছে।

বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শেষ পর্যন্ত হিন্দী সাহিত্যের পশ্চাদভূমিতে উপরোক্ত তিনটি ধারা সুস্পষ্টভাবে প্রবাহিত ছিল দেখতে পাই। তৃতীয় দশক হতে এই ত্রিধারা পরস্পরের সাথে মিশে গিয়ে মোটামুটি ভাবে একটা রোমান্টিক প্রবাহ সৃষ্টি করে তুলেছে। বর্তমান হিন্দী কাব্য-সাহিত্যকে এক কথায় রোমান্টিক বলে বর্ণনা করা চলে।

উপরোক্ত ত্রিধারার পথে এ-যুগের প্রথম শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কবি হলেন ভারতেন্দু (হরিশ্চন্দ্র-বাবু) (১৮৫০-১৮৮৫) অতীতের ভাব-ধারায় তাঁর ভক্তি ও প্রেমবিষয়ক গান ও কবিতাগুলি রচিত হলেও মীরা বাঈয়ের সেই গভীর আকুতি ও সুতীব্র অনুভূতির পরিচয় তাঁর লেখায় পাওয়া যায় না। মীরার মত ভাবমধুর, অত বেদনাপ্লুত করে লিখতে পারেন নি ভারতেন্দু ভক্তের ও প্রেমিকের আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রত্যাশা, ব্যর্থতা ও চরিতার্থতার কথা। রাধাকৃষ্ণ ও গোপীদের প্রেমলীলামূলক দেড় হাজার কবিতা ও গান লিখেছেন ভারতেন্দু। তাঁর এই জাতীয় গীতি কাব্যগ্রন্থগুলির অধিকাংশের নামও প্রেম দিয়ে। যথা—প্রেমসর্বস্ব (১৮৭০), প্রেমাশ্রু বর্ষণ (১৮৭৩), প্রেমমালিকা (১৮৭১), প্রেম-মাধুরী (১৮৭৫), প্রেম প্রলাপ (১৮৭৯), প্রেমতরঙ্গ (১৮৭৭), প্রেম ফুলওয়ারী (১৮৮৩)'। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে তিনি আর এক-খানি প্রেমমূলক গীতি গ্রন্থ 'গীত গোবিন্দ' প্রকাশ করেন।

এসব গ্রন্থের বিষয়বস্তু প্রায় এক হলেও ভাববস্তু সর্বত্র এক নয়। 'প্রেম-মাধুরীতে' কবি ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পিত; 'প্রেম প্রলাপের' মধ্য দিয়ে প্রেম যে চিত্তশুদ্ধি করে, একথা তিনি বলতে চেয়েছেন। 'প্রেম প্রলাপ' ব্যর্থ-প্রেমের বেদনামুখরিত। 'প্রেমতরঙ্গে' দেখা যায়, পৃথিবীর প্রেমের প্রতি কবির মনোযোগ আকর্ষিত হয়েছে।

ভারতেন্দুর আবির্ভাব হয়েছিল বর্তমান হিন্দু সাহিত্যের প্রাথমিক কাল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে। এর পর বর্তমান হিন্দু সাহিত্যের মধ্যযুগে অযোধ্যাপ্রসাদ উপাধ্যায়ের (১৮৬৫—) 'প্রিয় প্রবাস' (১৯০৯—১৯১৩) প্রকাশিত হয় বৈষ্ণব সাহিত্যে শেষ সুস্পষ্ট অবদান হিসাবে। প্রধানত শ্রীকৃষ্ণের মথুরা যাত্রা কাহিনী এই কাব্য গ্রন্থের বিষয়বস্তু। ভাব-মাধুর্যে ও নূতন আঙ্গিকে এই বইখানা ভারতেন্দুর যে কোন গ্রন্থ হতে উন্নত। যদিও সমগ্রভাবে ভারতেন্দু এযুগের শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কবি। এই বইখানা লেখা হয়েছে 'সারি বুলি' ভাষায়। এই 'সারি বুলি' ভাষাতেই বর্তমান হিন্দী গদ্য ও পদ্য রচিত হয়ে চলেছে বেশির ভাগ। এই কাব্য গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণকে মানুষ হিসাবে দেখানো হয়েছে, অলৌকিক করে নয়। মাতা যশোদার দুঃখকে, রাধার বিরহকে বড় সকরুণ করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এই গ্রন্থে।

এর পর থেকে হিন্দী সাহিত্যে প্রকাশিত প্রেম ও ভক্তিমূলক কবিতা বা সঙ্গীত রাধাকৃষ্ণবিষয়ক না হয়ে ব্যক্তিগত অনুভূতিকে ব্যক্ত করেছে এবং এর কতগুলি গভীরতা দিক থেকে মিস্টিক পরিণতি লাভ করেছে এদিকে পুরাতন মিস্টিসিজমের বেদান্তবাদ সুফি রহস্যবাদ বর্তমান কালের কোন কো কবিকে অনুপ্রাণিত করলেও সাধারণভা মিস্টিসিজম অতিক্রান্তিকতায় (Transcen-dentalism) ও 'পলায়নপরতায়' (escapism) পর্যবসিত হয়েছে।

এ-যুগের মিস্টিক কবিদের অগ্রদূ হলেন জয়শঙ্কর প্রসাদ (১৮৮৯—১৯৩৭) তাঁর কানন কুসুম (১৯১২) নামক কবি গ্রন্থে প্রকৃতিপ্রিয়তা প্রাধান্য লাভ করলে তবে বিশেষ গভীরতার পরিচয় পাওয়া যায় ঐ লেখায়। জীবনের ক্ষেত্রে ঝঞ্ঝাহত ব প্রকৃতির মধ্যে আরো গভীরভাবে আ খুঁজেছেন। প্রকৃতির মধ্য দিয়ে মুক্তির সন্ধ করেছেন 'করুণালয় (১৯১৩), ঝর্ণা, আ প্রভৃতি কবিতা গ্রন্থে। তাঁর কাব্য-জীব জীবন-রহস্যবাদের সূচনা এইখানে। এর

তাঁর পরবর্তী কবিতা-গ্রন্থে আমরা পূর্ণাঙ্গ মিস্টিসিজমের পরিচয় পাই। 'লহর' (১৯১৫) নামক গ্রন্থে কবি তাঁর পার্থিব পরিবেশকে গ্রহণ করলেও তাঁর অতিক্রান্তিক মন এখানে সীমাবদ্ধ থাকে নাই। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য-গ্রন্থ 'কামায়নী' প্রকাশিত হয় ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে। বর্তমান হিন্দী সাহিত্যে একটি বিশেষ অবদান হিসাবে গৃহীত এই গ্রন্থখানি। কবি যেন তাঁর আত্ম ও জীবন-জিজ্ঞাসার চরম উত্তর খুঁজে পেয়েছেন এইবার। তিনি এবার পারি-পার্শ্বিক জীবনকে, মানুষের এই সহজ জীবনকে স্বীকার করে নিয়েছেন। তৃপ্তি পেয়েছেন এইখানে, নিকটের মধ্যে তিনি অনুভব করেছেন সুদূরকে। এই কাব্য-কাহিনী গল্পাকারে গ্রথিত।

সুমিত্রানন্দন পন্থের (১৯০১-) কবিতায় নিগূঢ় মিস্টিসিজমের পরিচয় পাওয়া যায়। মিস্টিসিজম যেন তাঁর প্রকৃতির সাথে মিশে আছে—নিছক অন্তর্প্রকৃতি। তাঁর কবিতার উৎসও তাই মূলত তাঁর অন্তর। তাঁর অধিকাংশ কবিতা দৃশ্যত প্রেমমূলক। কিন্তু এ-প্রেমে প্যাশনের অভাব থাকাতে এবং তাঁর প্রেমের কবিতাগুলি মস্তিষ্কপ্রসূত হওয়াতে বিশেষ ঝাঁঝ ও আবেগ নাই তাঁর লেখায়। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে 'বীণা' নামক কবিতা-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ছন্দ ও শব্দ-মাধুর্যের জন্য এই গ্রন্থ জনপ্রিয় হয়, কিন্তু জনতার কবি ইনি নন। ইনি আসলে ইনটেলেকচুয়াল কবি। তাই এঁর সত্যিকারের আবেদন ইনটেলেকচুয়াল মনের কাছে। তিনি তাঁর কবিতার আঙ্গিকের দিকে বিশেষ নজর দেন এবং কবিতায় শব্দ-প্রয়োগ সম্বন্ধে কয়েকটি নিবন্ধও রচনা করেন। তাঁর প্রিয় শব্দগুলির কয়েকটি হল 'বীণা, ফুল, ঊষা, সঙ্গীত, তার, বাদল ও কিরণ।' ভাষার প্রয়োগ ক্ষেত্রেও তাঁর বিশেষত্ব আছে। তিনি হিন্দুস্থানী ব্যবহার করেছেন অনেক জায়গায়। 'সারি বুলির'ও ব্যবহার করেছেন প্রচুর। তাঁর অন্য কয়েকটি কবিতা-গ্রন্থের নাম 'পল্লব, গুঞ্জন ও গ্রন্থি'। 'গ্রন্থি' প্রকাশিত হয় ১৯২০ খৃষ্টাব্দে।

হিন্দী সাহিত্যের পরিমণ্ডলের বাইরে কবি নিরালার (১৮৯৬) নাম সুপরিচিত। এঁর আসল নাম সূর্যকান্ত ত্রিপাঠি। ইনিও প্রধানত মিস্টিক কবি। হিন্দুদর্শন নিয়ে ইনি বহু পড়াশুনা করেছেন। এঁর কবিতায় উপ-নিষদের প্রভাব সুস্পষ্ট। সাধু সন্ত ফকির দরবেশ প্রভৃতির সহজ আত্মদর্শনও তাঁকে প্রভাবান্বিত করেছে। এঁর কবিতার প্রধান বক্তব্য হল, যা কিছু পরিদৃশ্যমান, তা সেই মূল সত্তারই বিকাশ—বেদান্তেরই কথা। এঁর কবিতার মধ্যে এমন একটা ছন্দ-মাধুর্য ও কোমলতা আছে যে, তা প্রায় সব রকমের কাব্য-পাঠকের মনকে ছুঁইয়ে দেয়। প্রেমের কবিতাও তিনি লিখেছেন বিস্তর। দেহকে অবলম্বন করে দেহাতীত প্রেমেরই বন্দনা গান তিনি গেয়েছেন বেশির ভাগ ক্ষেত্রে। প্রেমমূলক কবিতার দেহ-অতিক্রান্তিকতা, কিন্তু বৈদান্তিক আধ্যাত্মিকতায় পর্যবসিত হয় নাই। এর পরিণতি এসেছে সৌন্দর্যানুভূতির পথে। জুঁই কলি নিয়ে লেখা তাঁর একটি প্রতীক ধর্মী প্রেমের কবিতা খুবই জনপ্রিয়।

নিরালা গান লিখেছেন অনেক। তাঁর এই গানগুলির সঞ্চয়ন করা হয়েছে গীতিকা নামক একটি গ্রন্থে। 'অনামিকা ও পরিমালা' তাঁ কবিতা গ্রন্থগুলির অন্তর্ভুক্ত। 'অপ্সরা ও অলকা' নামে দুখানা উপন্যাসও তি লিখেছেন। মহাদেবী বর্মার (১৯০৭– কবিতায় যদিও মিস্টিসিজমের গন্ধ পাওয়া যায় তবু তিনি খাঁটি অর্থে মিস্টিক নন; ব্যক্তি পরিবেশকে অতিক্রম করে তাঁর কবিতা আদর্শ শেষ পর্যন্ত ঊর্ধ্বগামী হওয়াতে তা রচনাকে অতিক্রান্তিক বা Transcendanta বলে উল্লেখ করা ভাল। তাঁর প্রাথমিক কবিত
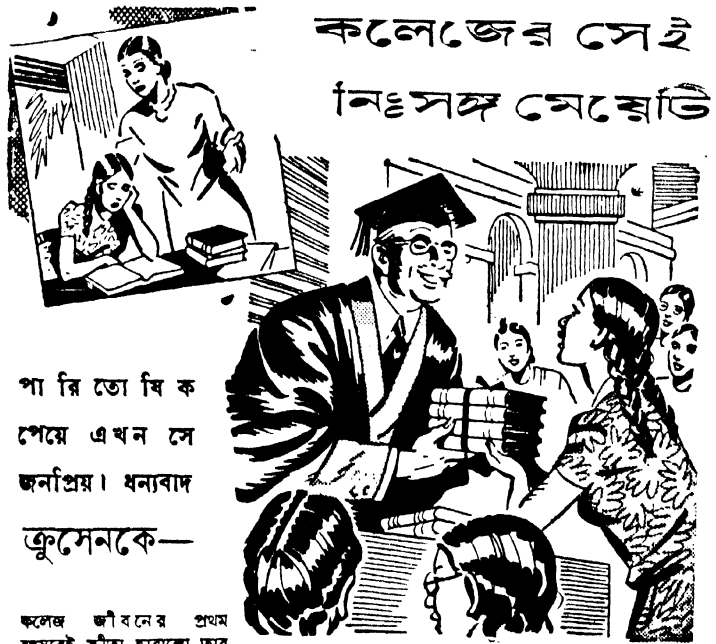

কলেজ জীবনের প্রথম বৎসরেই সীতা হারালো তার শরীরের ঔজ্জ্বল্য আর সেই সঙ্গে তার বান্ধবীদের। সে যেন কেমন অমনোযোগী আর ক্লান্ত হ'য়ে পড়ল, মেজাজও হ'ল খিট্‌খিটে আর হ'ল যেন বুদ্ধিহীন। তার দেহের চামড়াও কি সব দাগে ভর্তি হ'য়ে গেল। সে ঠিক ক'রল কলেজ ছেড়ে দেবে। এই কথা সে তার মাকে বলতে তিনি তাকে সুপরামর্শ দিলেন—"প্রত্যহ সকালে প্রাতরাশের আগেই ক্রুশেন খেও।"

এক বৎসর পরে। সীতা ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় পুরস্কার পেল। বন্ধুরা বলতে লাগল, রূপ ও প্রতিভা একই সঙ্গে পাওয়া ভাগ্যের কথা। সীতা খুশী হ'ল। মনে পড়ল তার মায়ের সৎপরামর্শ।

খোঁজ নিলে দেখা যাবে যে, মানুষের অর্ধেকের ওপর রোগের মূল কারণ হ'ল তার অভ্যন্তরীণ জড়তা। শরীরকে সহজ ও সরল রাখবার একমাত্র উপায় প্রত্যহ ক্রুসেন সেবন করা। ক্রুসেনের উপাদান ছয়টি খনিজ লবণ, যেগুলি আপনার অভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলিকে চালু ও কার্যক্ষম রাখে এবং সেই সঙ্গে রক্তকে বিশুদ্ধ রাখে। ক্রুসেন আপনাকে কার্যক্ষম রাখবে।

আজই ক্রুসেন কিনুন। সকল ডাক্তার-খানা ও মনোহারী দোকানে পাওয়া যায়।

মূল্য—হলদে রংয়ের বাক্স ১॥৶০

আপনিও ক্রুসেন ব্যবহারে আনন্দ পাইতে পারেন

ল ব্যক্তিগত বেদনার সহজ অভিব্যক্তি ধ্যেই প্রকাশ পেয়েছিল। পরিশেষে তিনি বেদনার পারিপার্শ্বিকতার থেকেই মুক্তি য়েছিলেন। তাঁর প্রথম দিককার কবিতার নীহারে (১৯৩০) তাঁর অসহায় নিঃসংগতার অঙ্কিত, তাঁর শূন্য জীবনের দুঃসহ ভজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ। সাধারণত প্রেমের তার মধ্য দিয়ে সেদিনের কবির রিক্ত মনের চয় উদ্ঘাটিত হয়েছিল। তবে হ্যাঁ, ক্ষীণ শার দীপশিখা তিনি প্রথম থেকেই জ্বালিয়ে খছিলেন। পরবর্তী কবিতাগুলিতে সে লো উজ্জ্বলতর হয়ে জ্বলে উঠতে থাকে, রের গোপনতার অন্ধকার একেবারে শোষিত হয় না তবু। তাঁর রশ্মিতে (১৯৩২) আলোকচ্ছটা কেন্দ্র-বিচ্ছুরিত বহু সরল ায় ছড়িয়ে পড়েছে হতাশার কালো পট-মকায়। তাঁর আশায় বেদনার সমুদ্র জলে গে উঠেছে আলোকোজ্জ্বল বুদ্বুদ-নিলতা, ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত কবির রজা' নামক কবিতা-গ্রন্থে কবির মনের কাশ উষার আলোকে উদ্ভাসিত দেখতে ই বেদনার হোমানলে জ্বলে জ্বলে অন্তর র খাঁটি সোনায় পরিণত হয়েছে। নূতন ঘাতে তখন হতাশা জাগে না, জেগে ওঠে ানুভূতির আনন্দ। তবু মনে হয়, বেদনাকে পূর্ণ অতিক্রম করতে চাননি বোধ হয় তিনি। খের মধ্য দিয়েই আনন্দ'—বলেছেন টাফেন। মহাদেবী এইরূপ আনন্দেরই সন্ধান রেছেন।

অতিক্রান্তিক কবিদের অন্যতম হলেন হনলাল মাহাতো (১৯০১—)। তিনি ঠিক স্টিক নন, বৈষ্ণব। তাঁর কবিতার দার্শনিক রণতি এসেছে পরমাত্মা বা পরম সত্তাকে আত্মসমর্পণের ভংগীতে স্বীকার করে নিয়ে। ৎকে তিনি দেখেছেন মায়া-প্রবঞ্চনাময়, কৃষ্ণ ই পরম সত্তা। রাধা হলো মানুষ আত্মানু-তির প্রতীক। তাঁর কবিতা বইয়ের নাম র্মালা (১৯২৫) ও একতারা (১৯২৭)। এই ম ও ধর্মমূলক কবিতা গ্রন্থ দুটিতে যতটা বির দার্শনিক চিত্তের পরিচয় পাওয়া যায়, টা পাওয়া যায় না কবিচিত্তের। ভাষা তাঁর লীল নয়, পুরানো ধরণের।

ঠিক মিস্টিক্ নন, কিন্তু বেদনাক্লিষ্ট—টি বিধুর চিত্তের পরিচয় দিয়েছেন নারী বি তারা পান্ডে ও চকোরী (রামেশ্বরী বী)। তারা পান্ডে তাঁর 'স্বীকার' নামক থে ব্যক্ত করেছেন তাঁর নিজস্ব সুখ-দুঃখেরই । চকোরীর কবিতায় ফুটে উঠেছে প্রতীক্ষা চরম ব্যর্থতার সকরুণ মধুর বর্ণনা। আলেয়া ে ভুলিয়েছে কবির। মরীচিকা তৃষ্ণার্ত টিতে জলভ্রম ঘটিয়েছে। সমগ্রভাবে জীবন েন দিয়েছে ব্যর্থতা। পরিশেষে ক্লান্ত কবি খেছেন 'শ্রান্তা' নামক কবিতা—লিখেছেন আশার শেষ রশ্মি মুছে যাওয়ার কথা, বিচূর্ণিত প্রত্যাশার কথা।

অন্যতম দুঃখবাদী কবি হলেন হৃদয়েশ। এ'র হতাশা দুরারোগ্যে বিষণ্ণতায় পরিণত হয়েছে। প্রতিক্রিয়াস্বরূপ তিনি কবিতা লিখেছেন সুরার বন্দনা গান গেয়ে। দুঃখকে তিনি ভুলতে চেয়েছেন সুরায়, কিন্তু দুঃখ জয় করবার সবলতার পরিচয় তিনি দেননি। অবশেষে সুরার পাত্র তিনি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন হতাশায়।

হিন্দী সাহিত্যে এই রোমান্টিক ধারায় অন্যান্য বহু কবি কবিতা, সংগীতাদিও লিখেছেন। এমনকি মহাকাব্য বা এপিকও রচনা করতে প্রয়াস পেয়েছেন। পুস্তকাকারে ও সাময়িকপত্রে লেখা—রচনা হিসাবে এইরূপ বহু কবিতাই প্রকাশিত হয়েছে। তার প্রায় সব-গুলিই বিশেষত্ববর্জিত বলে তার উল্লেখ এখানে করলাম না। এযুগের জাতীয়তাবাদী বা স্বদেশী কবিতা রচনা শুরু হয় ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের সমসাময়িক কালে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার সময় থেকে। হিন্দী সাহিত্যের নব-যুগের প্রবর্তক ভারতেন্দু (হরিশ্চন্দ্র) জাতীয়তাবাদের প্রথম প্রধান কবি। তাঁর সময় থেকে আজ পর্যন্ত আরো অনেক কবি স্বদেশী কবিতা লিখে হিন্দী পাঠকদের কাছে সমাদৃত হয়েছেন। বদ্রিনারায়ণ, লক্ষ্মীনারায়ণ মিশ্র, মহাবীর প্রসাদ, শ্রীধর পাঠক, মৈথিলীপ্রসাদ গুপ্ত ইত্যাদি খ্যাতনামা কবিদের নাম এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে মহাত্মাজীর অসহযোগ আন্দোলনের সময় স্বদেশী কবিতা লিখে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিলেন মাখনলাল চতুর্বেদী, জ্ঞানশঙ্কর বিদ্যার্থী, রামনরিশা ত্রিপাঠি প্রভৃতি কবিগণ। কিন্তু এই সব স্বদেশী কবিতার কাব্যমূল্য সামান্যই। ভাবের গভীরতা, ভাষার মাধুর্য, আদর্শের উৎকর্ষতা—সবকিছুরই অভাব আছে এইগুলিতে। তবে আছে বাগাড়ম্বর, স্বদেশী বুলি—'দেশজননী, গান্ধীজীকি জয়, তোড়ো' বন্ধন' প্রভৃতি জাতীয় শব্দের প্রয়োগ।

বলা বাহুল্য যে, বর্তমান হিন্দী কাব্য-সাহিত্যের একটা মোটামুটি পরিচায়ক হিসাবে এই নিবন্ধের অবতারণা। ঐতিহাসিক বিচার ও পান্ডিত্যপূর্ণ আলোচনার দিক থেকে বর্তমান হিন্দী কাব্য-সাহিত্য সম্বন্ধে বিরাট থিসিস রচনা করা যেতে পারে, কিন্তু এযুগের বিশ্ব-সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে গেলে সমগ্রভাবেই বর্তমান কালের হিন্দী কবিতা অনুল্লেখযোগ্য। যে হিসাবে রবীন্দ্রনাথ, ইকবাল ও নগুচি বিশ্ব-সাহিত্যের কবি, সে হিসাবে বর্তমান কালের হিন্দী ভাষার কবিদের কারো নামোল্লেখ করা যায় না। তবে ভারতীয় শিক্ষিত মহলে ভারতেন্দু, প্রসাদ, নিরালা, মহাদেবীবর্মা, চকোরী ও পন্থের নাম অনেকটা পরিচিত।

স্বদেশী বা নেহাৎ দেহাত্মক কবিতায় দৃশ্যত বাস্তবতার কথা থাকলেও কবিদের আবেগ-প্রাচুর্য প্রায় সব ক্ষেত্রেই বাস্তবতার গণ্ডি অতিক্রম করেছে। হিন্দী কাব্য-সাহিত্যে নিছক বাস্তব কবির উল্লেখযোগ্য আবির্ভাব হয়নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, কম্যুনিজম ও বর্তমান আর্থিক সংকট সংমিশ্রিতভাবে সাময়িক পত্রের কোন কোন কবিকে প্রলেটারিয়ান ধাঁচে কবিতা লেখার অনুপ্রেরণা দিয়েছে বটে কিন্তু সেসব রচনা কাব্যরসহীন হওয়ায় জমাট বাঁধতে পারেনি। এছাড়াও নূতন ধাঁচে নূতন আংগিকে কবিতা লেখার প্রচেষ্টা চলেছে।

রোমান্টিক লেখকদের মধ্যে ভারতেন্দুর লেখার ধরণ তো রীতিমত সে-যুগের। প্রসাদ, পন্থ, নিরালা প্রভৃতি লেখকগণ তাঁদের লেখায় সাবলীলতা ও ছন্দবৈচিত্র্য, এমনকি মুক্ত ছন্দও এনেছেন বটে কিন্তু তাদের লেখাও পুরান ধরণের। চকোরী, তারা, পান্ডে প্রভৃতি লেখিকার লেখায় নারীসুলভ কমনীয়তা আছে বটে, কিন্তু এ'রাও গতানুগতিক ধাঁচ এড়াতে পারেন নি।

যে ভাষার কাব্য-সাহিত্য একদা তুলসীদাস, কবীর, মীরাবাঈ প্রভৃতির অবদানে সমৃদ্ধ হয়েছিল, যে ভাষায় এযুগে প্রেমচন্দের মত পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছোট গল্প লেখকের গল্পের জন্য অপরিসীম গৌরবের অধিকারী, সে ভাষাকে আগামী দিনে কোন শ্রেষ্ঠ হিন্দী কবি অপরূপ কাব্য-সুষমায় ভূষিত করবেন, এটা আমরা আশা করব নিশ্চয়।


রাজবৈদ্য শ্রীপ্রভাকর চট্টোপাধ্যায় এম-এ আবিষ্কৃত

যক্ষ্মারি সেবনে বহু রোগী আরোগ্য-লাভ করিয়াছেন। বিস্তৃত বিবরণ পুস্তিকার জন্য পত্র লিখুন বা সাক্ষাৎ করুন। ১৭২নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা, ফোন—৪০৩১ বি বি।

# ঝড়

বিশ্বনাথ চৌধুরী
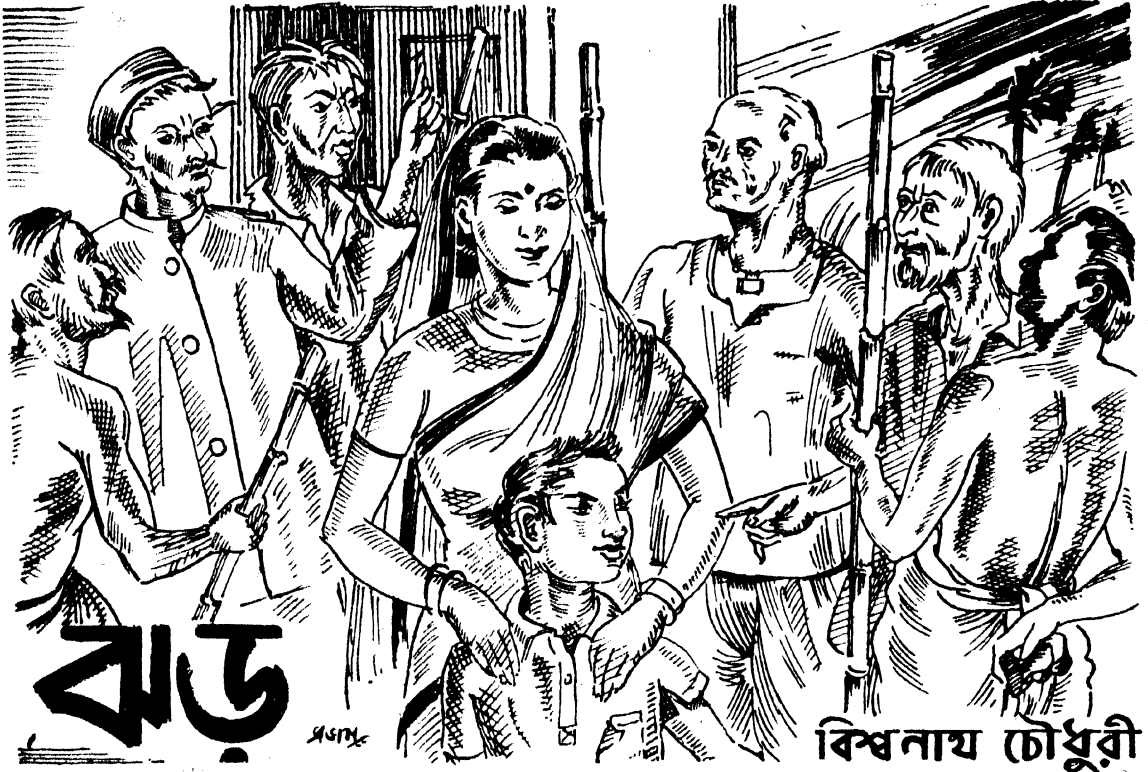
অনেক দিনের পুরোণো জামাটা চাকরের হাত থেকে নিয়ে রমলা আবার গুছিয়ে রাখলে। পুরোণো বলতে যা কিছু সবই তো গেছে ওই জামাটায় আর হাত দিয়ে লাভ কি?

দিন আর ফিরে আসবে না তবু একটা স্মারক চিহ্ন। ঐ জামাটার দিকে তাকালে তার অনেক কথা মনে পড়ে,—অনেক দিনের ফেলে আসা স্বপ্ন চোখের ওপর ভেসে ওঠে। বারো বছর আগে নিজের হাতের তৈরী জামা—রমলা সংকুচিতভাবে বলেছিলঃ ছাই হয়েছে এটা, আমি কি আর সেলাই জানি? এ তুমি পড়তে পারবে না।

—তোমার হাতের জিনিস আমার গায়ে উঠবে না ঐ অপবাদ দিয়ে তুমি আর লজ্জা দিয়ো না রমলা।

পার্থসারথি সেদিন খুশিতে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠেছিল—উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিল রমলার।

টানাটানির সংসারে অর্থের স্বাচ্ছন্দ্য না থাকলেও অকারণ উল্লাস ছিল,—আর পার্থসারথি প্রাণশক্তির প্রাচুর্যে ঝলমল করতো—অভাবের পঙ্কিলতা আর গ্লানি ধুয়ে মুছে নিতো, দুরন্ত আবেগে ভাসিয়ে নিতো সব জঞ্জাল। প্রতিকূল আবহাওয়াকে প্রাণপণে ঠেকিয়ে রাখতো—নুয়ে পড়তো না—ভেঙে পড়তো না কোনমতে। দৃঢ় বলিষ্ঠ বাহু দিয়ে সমস্ত বিপদকে সে আটকে রাখতো।

ভীরু পাখীর মত ঝড়ের ঝাপটা থেকে সেদিন যেমন রমলা আশ্রয় পেয়েছে—আজও তেমনি—।

তবে সেদিন সে জীবনধারণের সমস্ত উপকরণের মধ্যে নিজেকে নিঃশেষে মিশিয়ে দিতো, বিলিয়ে দিতো একরকম,—কিন্তু আজ আর তার প্রয়োজন নেই। লোকজন বেড়েছে। চাকর, খানসামা, ড্রাইভার, মালি—এদেরই সোরগোল চলছে সারাক্ষণ।

কচুর বই আর ঢেঁকির শাকের দিন চলে গেছে। ডাক রোস্ট আর ফাউল কারিরই কেরামতি এখন।—রমলাও তাই আজ অনাবশ্যক হয়ে পড়ছে ক্রমশ। পার্থসারথির আর তাকে তেমন দরকার নেই। সে আছে এইমাত্র।

পুরোণো বাড়ি ভেঙে নতুন হয়েছে,—নতুন সোফা সেট, নতুন রেডিও, গাড়ীও নতুন ক'খানা। শুধু সেই একমাত্র পুরোণো মন নিয়ে পুরোণো দিনের স্মৃতি আঁকড়ে ব'সে আছে।

পার্থসারথি তাকে আর বদলাতে পারেনি, তবু তাকে নতুন করে সংস্কার করতে বিন্দুমাত্র চেষ্টার ত্রুটি করেনি,— গভর্নেস এসেছে,—ওস্তাদ তায়েব খাঁকে ইন্দোর থেকে আমদানী করা হয়েছে—তবু রমলা এসব কিছু বুঝতে চায় না—শিখতে চায়নি নতুন কিছু, আভিজাত্যের পালিস লাগাতে চায়নি মনে, তাই খুঁত থেকে গিয়েছে অনেক—ফাঁকও ক্রমশঃ বেড়ে উঠছে।

খানসামাদের রসুইঘরের সুবাস রমলা তাই ঠাকুরঘরে বসে সহ্য করতে পারে না। এয়ার কনডিশনড্ ঘরে সর্দি লেগে যায়। পেট্রল আর মবিল অয়েলের গন্ধে গা বমি করে।

ব্রোঞ্জের চুড়ি থেকে সোনা খসিয়ে মাত্র ৩৭ টাকা পাওয়া গিয়েছে। লাল সুতো জ[illegible] নিরাভরণ হাতে রমলা যেদিন পার্থসারথির মঙ্গল কামনায় নিজেকে নিঃস্ব রিক্ত করে দিতে চেয়েছিল,—ভাগ্য অন্বেষণের মাত্র ৩৭ টাকা মূলধন—হাত পেতে নিতে পার্থসারথির পৌরুষও সেদিন ক্ষুণ্ণ হয়েছিল হয়ত।

মোটর মিস্ত্রীর কাজ করতো সে—বাড়ি বাড়ি ঘুরে খুচরো কাজ আদায় করতো—আয়ও তাই ছিল সামান্য।

ক্লান্ত ঘর্মাক্ত দেহে, কালিমাখা হাতে যখন সে বাড়ি ঢুকতো—গাছের ছায়া বড় হয়ে বেলা তখন প্রায় শেষ প্রান্তে এসে ঠেকেছে।

রমলা তখনও রান্নাঘরের টুকিটাকি নিয়ে ব্যস্ত। উন্মুখ আগ্রহে সে মনের পাপড়িগুলো

...রেছে, একনিষ্ঠ সেবায় বিলিয়ে দিতে ...ছে নিজেকে—একাগ্র তন্ময় হয়ে ভেবেছে ...সারথির কথা। আর পার্থসারথি দৈনন্দিন ...নের অতি প্রয়োজনীয় জিনিস র‍্যাশন আর ...র কথা ভাবতে ভাবতে এসেছে। দিনের ... দিয়ে দিনের খরচ মেটানো যায় না, অথচ ...র বরাদ্দ বলতে তো তার কিছু নেই। ... পার্থসারথি স্রোতের মুখে গা ঢেলে দিয়ে ... আছে—নিজেকে ক্লান্ত মনে করেনি ...দিন।

রমলার স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য ক'রে মনে ...ছে—এইবার তার একটু বিশ্রাম দরকার। ...খের কোনে কালি পড়েছে, ঠোঁট দু'টি ...ন নিষ্প্রভ,—কেমন যেন শিথিলভাবে ভেঙ্গে ...ড়ছে রমলা, তবু নিজেকে জোর করে দাঁড় ...রয়ে রাখছে কোনমতে। পরিচ্ছন্ন হাতে পরি-...টিভাবে সে সংসারের শৃঙ্খলা বজায় রাখছে। ...ন্তু আর কতদিন? পার্থসারথি ভেবে ঠিক ...তে পারে না এর ওপর আর একটি শিশুর ...ভ সে কি করে কুলিয়ে উঠবে? ভেবে কূল ...য় না বলে ভাবতেও চায় না পার্থসারথি।

পুরোণো ঝরঝরে মোটরে শব্দ করতে করতে ...সারথি বাড়ির দরজার সামনে থামলো। ...ক্ষাকাতর রমলা উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তার ... থেকে মুক্তি পেয়ে একটু খুশি হলো ...য়। হাসতে হাসতে বললেঃ গাড়ী হলো ...এইবার বাড়ি—কি বলো?

ঃ ঠাট্টা নয় একটা চল্‌তি গ্যারেজের ...নার হলাম। আজ থেকে পুরো ছ' আনার ...শীদার।

ঃ তোমার অংশে বুঝি ভাঙ্গা গাড়ীখানা ...ড়েছে? কৌতুক করে বললে রমলা। পার্থ-...রথি একটুও দমে গেল না, গম্ভীর গলায় ...ব দিলেঃ কালকেই ওর চেহারা বদলে যাবে ...খে নিও—ঝক্‌ঝকে পালিসে আনকোরা নতুন ...র ইঞ্জিন পর্যন্ত। চেষ্টা ক'রেও তুমি আর ...ন্‌তে পারবে না।

সত্যি রমলা চিনতে পারেনি। দিনের পর ...ন পার্থসারথির কারখানার চেহারা বদ্‌লেছে ...সঙ্গে সঙ্গে পার্থসারথিও।

যুদ্ধের বাজারে প্রচুর লাভ করেছে পার্থ-...রথি। সচ্ছলতার সঙ্গে স্বাচ্ছন্দ্য বেড়েছে—...একটা বড় ব্যবসার গা ঘেঁষে আরও দুটো ...শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।

অক্লান্ত চেষ্টা এবং পরিশ্রমে সে ধাপে ...ধাপে এগিয়ে গেছে, ব্যবসায়ী মহলে তার প্রতিষ্ঠা অনেকের মনে ঈর্ষা জাগায় এখন।

এই বাড়িরই একতলার একটা ঘরে রমলা প্রথমে ভাড়াটে হিসেবে এসেছিল,—পার্থ-...সারথি এর মালিকানা স্বত্ব এখন কিনে নিয়েছে। পুরোণো নোনাধরা দেয়াল ভেঙ্গে নতুন প্রাসাদ তৈরী হয়েছে।

সেদিনের কথা মনে পড়ছে তার। তাদের প্রথম সন্তান, তুল্‌তুলে নরম একমুঠো তুলোর মত লাগতো বলে আদর করে নাম রেখেছিল—তুল্‌তুল। বয়সের সঙ্গে ব্যবহারে বিবর্ণ হ'য়ে তারই অপভ্রংশ দাঁড়িয়েছে টুটুল।

টুটুল ছেলেবেলায় খুব দুষ্টু ছিল—কিছুতেই ঘুম আসতো না তার। তাকে দোলা দিতে দিতে সন্ধ্যার আবছায়ায় রমলা যে ঘরে বসে গুন্ গুন্ ক'রে গান করতো, আজ সেটা বাবুর্চিখানায় পরিণত হয়েছে। পুরোণো বলতে আর কিছু নেই। শুধু প্রাচীরের পাশে কৃষ্ণচূড়ার গাছটা আজও তেমনি দাঁড়িয়ে। আর আছে বস্তিটা তবে তার আয়ুও বেশীদিন নয়। পার্থসারথি জমিদারের কাছ থেকে বস্তীটা কিনে নিয়েছে এবার। নতুন কারখানার প্ল্যান সব ঠিক হ'য়েছে। টয় (Toy) তৈরী হবে এখানে—জাপান থেকে টেক্‌নিশিয়ানও এসেছে একজন।

নোটিশ দেওয়া হয়েছে বস্তীর সবাইকে। নোটিশের মেয়াদও ফুরিয়ে এসেছে। দলে দলে বস্তীর লোক যে যার পথ দেখ্‌ছে। কোথায় যাবে এরা? আবার কোন সহরতলীর মাটি অশ্রুজলে সিক্ত করবে এরা—কে জানে?

টুটুল আর বস্তীর ছেলে পালোয়ান—প্রায় সমবয়সী। ছেলেবেলায় এরা একসঙ্গে মেলামেশা করেছে—খেলাধুলো করেছে—নিজেদের মধ্যে কোন ব্যবধান রাখেনি। পার্থ-সারথি দূরে থেকে লক্ষ্য করেছে কোনদিন বাধা দেবার কথা মনে হয়নি তার। বড় হ'বার সঙ্গে সঙ্গে মত বদলেছে তার। পালোয়ানেরও শিশু মনে ধাক্কা লেগেছে, দূরে থেকে টুটুলের কাছে আনতে চেয়েছে কিন্তু সাহসে কুলোয়নি।

রমলাও সাহস হারিয়ে ফেলেছে ক্রমশঃ পার্থসারথির মুখোমুখি হলে সেই কেমন থতমত খায় আজকাল,—কেমন যেন দুর্বল মনে করে নিজেকে,—অজানা অচেনা, লোকের চোখের সামনে পড়লে যেমন হয়।

দূরে সরে গিয়েছে পার্থসারথি,—দুর্ভেদ্য আভিজাত্যের আড়াল রচনা করেছে চারদিকে।

সারাদিনের অবিশ্রান্ত খাটুনির পর রাত্রে পার্থসারথি যখন ঘুমিয়ে থাকে—রমলা দূরে থেকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। হাহাকার আর দীর্ঘশ্বাস বুকে নিয়ে চোখের তৃষ্ণা তার মিটতে চায় না,—পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকে আলগোছে হয়ত চাদরটা টেনে দেয়।

ঘুমের মধ্যেও পার্থসারথি কি বিড়বিড় ক'রে বলে যায়—রমলা বুঝতে পারে না, বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর সন্তর্পণে আবার চলে আসে।

মাসের মধ্যে ক'দিনই বা বাড়িতে আসে পার্থসারথি? দিনরাত কাজের চাকায় সে নিজেকে পিষে ফেলছে। সোনার স্বাদ সে পেয়েছে তাই স্বর্ণমৃগের পিছনে ছোটাছুটি আজও তার শেষ হয়নি।

রাত্রিবাস বাড়িতে হ'লে, ভোর বেলায় বেরোবার আগে রমলাকে একবার জিগ্‌গেস করে পার্থসারথিঃ কি চাই তোমার?

রমলা জবাব দেয় না। চাইবার আর তার কি আছে? রমলা জানে, যা সে চায় চিরদিনের মত তা তার নাগালের বাইরে।

বছরের পর বছর এমনি মুখ বুজে সহ্য করে রমলা। সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলো ক্রমশঃ যেন মরে যাচ্ছে, বোবা অর্থহীন দৃষ্টিতে আর শিহরণ নেই। যা ইচ্ছে হোক্ কোন কিছুতেই বাধা দেবার উৎসাহ নেই তার।

আজই হঠাৎ কিজানি কেন চাকরের হাত থেকে সে জামাটা টেনে নিয়ে আলনায় গুছিয়ে রাখ্‌লে।

হঠাৎ যেন পুরোণো দিন আবার তাকে পেয়ে বসলো। ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হলো রমলা। কৃষ্ণচূড়ার গাছটা এখনও তেমনি আছে।

ধূলো উড়িয়ে ঝড় উঠেছে আকাশে। বাতাসে শোঁ শোঁ শব্দ। অন্ধকারে কেঁপে উঠ্‌লো রমলা। কই টুটুল? টুটুলতো এখনও আসেনি। অস্থিরতায় চঞ্চল হ'লো রমলা—জরুরী ডাক পড়লো চাকর খানসামার। চতুর্দিকে লোক খুঁজ্‌তে বের হলো। শুধু গেল না হরু খানসামা। আলমারী থেকে ধুতি পাঞ্জাবী বের করে একটার পর একটা সে সুটকেশে গুছিয়ে রাখ্‌ছিল। আজ দার্জিলিং মেলে পার্থ-সারথির বাইরে যাবার কথা।

তুফানের স্রোতে ফুলে ফুলে উঠ্‌ছে জল, —গঙ্গার ওপর বাড়িখানাও যেন দুলে দুলে উঠছে। ঝড়ের বাতাসে দু'একখানা সার্সির কাঁচ টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে ভেঙ্গে পড়লো। রমলা জানালার ধারে একদৃষ্টে রাস্তার দিকে তাকিয়ে—চোখেমুখে বৃষ্টির ছাট লাগছে তার। উদ্বিগ্নকাতর নিষ্পলক দৃষ্টি—চোখের জল বৃষ্টির জলের সঙ্গে মিশেছে—অন্ধকারে তাই বোঝা যায় না।

পার্থসারথি কখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, সে টের পায়নি। অশ্রুসজল উদাস দৃষ্টি, মুখের ভাষাও তার বোবা হয়ে গেছে। হাত ধরে কাছে টেনে নিলে পার্থসারথি।

ঃ টুটুল এসেছে, ফিরে দেখো।

আত্মহারা হ'য়ে বুকের ওপর লুটিয়ে পড়লো রমলা। দুর্বলতায় ভেঙ্গে পড়লো বোধ হয়।

অনেকক্ষণ পরে চোখ মেললো টুটুল। পালোয়ান দূরে দাঁড়িয়ে।

পার্থসারথি গম্ভীর গলায় বললেঃ সত্যি করে বলো—তুমি টুটুলকে মোটরবোট থেকে ঠেলে জলে ফেলে দিয়েছিলে? —সত্যি কথা বললে কোন ভয় নেই—জবাব দাও।

পালোয়ানের গলা শুকিয়ে এসেছে—তবুও চেষ্টা করে দৃঢ়কণ্ঠে বললেঃ হ্যাঁ।

সোজা দাঁড়িয়ে আছে পালোয়ান, একটুও ভেঙ্গে পড়েনি।

ঃ কারণ জানতে পারি কি?

ঃ আমায় ছোটলোক বলেছিল।—বলেছিল তোরা মিস্ত্রীর কাজ করিস—তোদের হাতে আমরা জল খাই না।

ঃ ভারী অন্যায় করেছিল। উদ্ধত ভঙ্গীতে প্রবল হেসে উঠলো পার্থসারথি।

ঃ মিস্ত্রীর কাজ করলেই ছোটলোক হয় না—আপনিওতো মোটর মিস্ত্রী ছিলেন।

ঃ Shut up. কোণ থেকে হাণ্টার নিয়ে এক ঘা বসিয়ে দিলে পার্থসারথি—রমলা ছুটে এসে পালোয়ানকে আড়াল করে দাঁড়ালো।

চাবুকের আঘাতে পিঠের চামড়া ফেটে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে, কিন্তু একটুও দমেনি পালোয়ান, তেমনি দৃঢ় দীপ্ত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে। অন্যায়ের প্রতিবাদে সমস্ত আঘাত সে বুক পেতে সহ্য করবে। কিন্তু কিছুতেই ছোট হতে পারবে না।

উত্তেজনায় সমস্ত ঘর পায়চারী করছে পার্থসারথি। বস্তী সরকার মনিবের মেজাজ রুক্ষ দেখে মুখ নীচু করে সন্ত্রস্তভাবে দাঁড়িয়ে।

ঃ এরা কত নম্বর ঘরে থাকে? ঝাঁজিয়ে উঠলো পার্থসারথি।

ঃ আজ্ঞে তেইশ নম্বর।

ঃ এখুনি এদের জিনিসপত্র রাস্তায় বের করে দিন। আজই তোমরা বস্তী ছেড়ে চলে যাবে বুঝলে? পালোয়ানের দিকে অগ্নি-দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে হুকুম দিলে পার্থসারথি।

কিন্তু কোথায় যাবে পালোয়ান? একমাস হ'লো তার মা জ্বর আর কাশিতে বিছানা নিয়েছে, নড়ে বসতে পারে না। কিন্তু তবু পালোয়ান প্রতিবাদের একটা কথাও মুখ ফুটে বলতে পারলো না।

বস্তী সরকার চলে যাচ্ছিল, পার্থসারথি পিছন থেকে বললেঃ দাঁড়ান—নোটিশের মেয়াদ তো ফুরিয়ে গেছে, কিন্তু এখনও বস্তী খালি হচ্ছে না কেন?

—জানেন আমার এতে কত লোকসান হচ্ছে, নতুন কারখানার কতগুলো লোকের বসে বসে মাইনে গুণতে হচ্ছে।

ঃ আজ্ঞে ওরা আরও কিছু সময় চায়।

ঃ না না আর একদিনও নয়—চব্বিশঘণ্টার মধ্যে সবাইকে উঠে যেতে হবে—আপনি একা না পারলে সঙ্গে শক্ত দেখে দারোয়ান নেবেন।

ঃ যে আজ্ঞে, সরকারের সঙ্গে পালোয়ানও চলে যাচ্ছিল। রমলা তাকে কাছে টানলে। —ক্ষতস্থানে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো—আলমারী থেকে ওষুদ আনলো একটা। পালোয়ান এতক্ষণ শক্ত কঠিন ছিল এইবার যেন ভেঙ্গে পড়লো মনে হ'লো—কান্নায় সমস্ত শরীর তার ফুলে ফুলে উঠছে।

হঠাৎ হৈ চৈ অশান্ত কোলাহলে রমলার চমক ভাঙ্গলো। এ কি! এত লোক বাড়ির মধ্যে লোকগুলোও ক্ষেপে গিয়েছে নাকি? জানালার দরজার সার্সি টুকরো টুকরো হয়ে ছিটকে পড়ছে।

—সোফাসেট ফরাস বিছানা কার্পেট সব তচনচ করে ফেলেছে, কোন দারোয়ানই তাদের আটকাতে পারছে না—এরা কারা?

একটা খানসামা ছুটে এসে বললেঃ বস্তীর লোক ক্ষেপে গিয়েছে হুজুর।

ঃ আচ্ছা দাঁড়াও। বন্দুক নিয়ে পার্থ-সারথি ছুটে বেরোতে চাইছিল, রমলা পথ আটকালো। পার্থসারথি কি ভেবে টেলি-ফোনের কাছে সরে এলো।

ঃ ও কি করছো? পুলিশে খবর দেবে? —না—না ও ভুল তুমি করো না। হাত ধরে অনুনয় করলো রমলা। তারপরে নিজের শাড়ীটাকে গুছিয়ে নিয়ে সেই ক্ষিপ্ত জনতার কাছে এগিয়ে গেল রমলা।

সিঁড়ি দিয়ে যারা ওপরে উঠতে যাচ্ছিল রমলাকে দেখে তারা পিছিয়ে এলো।

ঃ কি চাই আপনাদের? রমলার গলায় কোন জড়তা নেই। এই সোজা প্রশ্নের কেউ যেন জবাব দিতে পারছে না, এ ওকে ঠেলাঠেলি করতে লাগলো। ওরই মধ্যে একটি ছেলে এগিয়ে এসে বললেঃ আমরা বিচার চাই। আমাদের অন্যায়ভাবে বস্তী থেকে তুলে দেওয়া হচ্ছে—আমরা তার নালিশ জানাতে এসেছি। এখন যেন সবাই কথা বলার সাহস ফিরে পেয়েছে, নফর কুণ্ডু এগিয়ে এসে বললেঃ আমাদের বস্তীর ছেলে পালোয়ানকে অন্যায়-ভাবে মারা হয়েছে—তাকে আটকে রাখা হয়েছে —আমরা তার প্রতিবিধান চাই।

ঃ কেউ আমাকে মারেনি। কেউ আমাকে আটকায়নি—তোমরা ভুল শুনেছ। রমলা চমকে পিছনে ফিরে দেখলে পালোয়ান তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

রমলা বললেঃ আমি কথা দিচ্ছি আপনাদের এখন বস্তী ছেড়ে চলে যেতে হবে না। আপনারা আমার প্রতিবেশী, এমনভাবে বাড়ি ঢুকে উপদ্রব করা ঠিক হয়নি।

সকলের উত্তেজনা যেন এক মুহূর্তে জল হ'য়ে গেল। তারা যেন যথেষ্ট লজ্জিত হয়েছে, এমনিভাবে যে, যার ঘরে চলে গেল।

আর পালোয়ান? তাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে রমলা ওপরে উঠে এলো।

পার্থসারথি চুপ ক'রে মাথায় হাত দিয়ে বসে—রমলা এগিয়ে এসে বললেঃ তুমি আমার ওপর রাগ করেছ?

ঃ না। তুমি আমায় অপমানের হাত থেকে বাঁচিয়েছ—তোমারই জয় হলো রমলা।

ঃ আমি নয় পালোয়ান—তুমি ওকে কাছে ডাকো। টুটুল আর পালোয়ান, দু'জনকে কাছে টেনে নিলে পার্থসারথি। পালোয়ানের কথাটা পার্থসারথির যেন নতুনভাবে মনে পড়লো—সত্যি সেওতো একদিন মিস্ত্রীই ছিল।

একটু থেমে রমলা বললেঃ আমি ওদের কথা দিয়েছি, তুমিতো আর ওদের বস্তী থেকে তুলে দেবে না। তোমার অনেক টাকা, কার-খানার জন্যে অন্য জায়গা দেখে নিও। আহা! বেচারাদের তুলে দিলে পথে পথে কোথায় ঘুরে বেড়াবে বলো ত?

ঃ আমি কোনদিন কিছু চাইনি, আমার এ আবদার তোমাকে রাখতে হবে।

ঃ আবদার নয় অধিকার। তোমার কথা দেওয়া আর আমার কথা দেওয়াতো একই রমলা। আমি কি তোমার অসম্মান করতে পারি?

খুশিতে রমলার চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল গড়িয়ে পড়লো।

গান্ধী চরিত—ঋষি দাস প্রণীত। ওরিয়েন্ট কোম্পানী, ৯নং শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা তু প্রকাশিত। দাম সাড়ে চার টাকা। ডবল াই সাইজ। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৯৮।

আলোচ্য গ্রন্থের ভূমিকায় গ্রন্থকার এই গ্রন্থ ন সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য উপস্থিত করিয়াছেন। ন বলেন, বর্তমানে ভারতে প্রধানত দুই দল রে আছেন, যাঁদের এক দল গান্ধী বলতে ান, আর এক দল যাঁরা চিমটে দিয়েও ধীজীকে ছোঁবেন না। এঁদের কোন দলের রে নই আমি। গ্রন্থকার ইতঃপূর্বে রোঁম্যা লাঁ রচিত 'মহাত্মা গান্ধী' নামক গ্রন্থখানার লা অনুবাদ করেন। গ্রন্থকার বলেন, "বইখানির মিক মূল্য ছিল প্রচুর। কিন্তু একথাও তখন ন হয়েছিল, বাঙালী পাঠকের হাতে আজ যা ল দিলাম, এর সবটুকুই বিচারসহ নয়, এর নকখানাই ফিরিয়ে নেওয়া দরকার। তাই আমার এই ন রচনা।" আমাদের মনে হয়, আলোচ্য থখানি গ্রন্থকারের অন্তত সে উদ্দেশ্য অনেকটা দ্ধ করিয়াছে। গ্রন্থকার সমাজতন্ত্র বিশেষভাবে র্কস-এংগেলের অনুরাগী। এই মতবাদীদের টি বিশেষ দৃষ্টিভংগীর পরিচয় পাওয়া যায়। হারা নিজেদের মতবাদের কাঠামোর ফ্রেমের মধ্যে রিয়া মানুষের বিচার করিতে চাহেন, যেখানে হা কিছু সেই হিসাবে মিলে না, তাহা ইঁহাদের হে নস্যাৎ হইয়া যায় এবং নিন্দিত হইয়া পড়ে। নুষকে গোটা হিসাবে দেখিবার সামর্থ্য ইঁহাদের কে না এবং মানব সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি সমগ্র বনের সাধনা এবং অবদানের স্থায়ী মূল্যও হারা স্বীকার করেন না। আলোচ্য গ্রন্থখানিতেও ই বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যাইবে। গ্রন্থখানি মনই বড় তেমনই আলোচনাও বিস্তৃত; কিন্তু সে আলোচনা গোটা মানুষ হিসাবে গান্ধীজীকে ফুটাইয়া তোলে না। গান্ধীজীর দার্শনিক মতবাদের অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিতে এবং তাহা খণ্ডিত করিতেই প্রধানত প্রযুক্ত হইয়াছে। গান্ধীজীর প্রশস্তি এ আলোচনায় প্রচুর আছে, একথা আমরাও স্বীকার করি, কিন্তু গান্ধীজীর সম্বন্ধে গ্রন্থকারের মনে আগাগোড়া এই ধারণা কাজ করিয়াছে যে, "গান্ধীজী ব্যক্তিগতভাবে স্বার্থত্যাগী; কিন্তু সমাজগত ভূমিকায় তিনি লালসার এবং স্বার্থবুদ্ধির অভিব্যক্তি"। গ্রন্থকারের আলোচনায় তাঁহার ধারণাগত গান্ধী-জীবনের সমাজগত স্বরূপটিই বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বস্তুত গান্ধীজীর ন্যায় মহামানবের মর্যাদা ইহাতে সম্যকভাবে রক্ষিত হয় নাই। পান্ডিত্যের দিক হইতে গ্রন্থকারের আলোচনার মূল্য থাকিতে পারে; কিন্তু পান্ডিত্যই জীবনী-লেখকের একমাত্র যোগ্যতার পরিচায়ক নয়। মানব সমাজ এবং তাহার নৈতিক আদর্শ ও সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্রভাবে মানব চরিত্রের অভিব্যক্তি দান করিতেই জীবনী-লেখকের সার্থকতা। বিশেষ মতবাদের সংস্কার বলে সে দিকে গ্রন্থকারের উদ্যম যে সফল হইয়াছে, আমরা একথা বলিতে পারিলাম না। ১১।৪৯

**যক্ষ্মা চিকিৎসা** (১ম ও দ্বিতীয় খণ্ড):—রাজবৈদ্য কবিরাজ প্রাণাচার্য শ্রীপ্রভাকর চট্টোপাধ্যায় এম এ রসসিন্ধু প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—রাজবৈদ্য আয়ুর্বেদ ভবন, ১৭২নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা। দুই খণ্ডে প্রায় সাড়ে চারিশত পৃষ্ঠা। মূল্য ১ম খণ্ড আড়াই টাকা, দ্বিতীয় খণ্ড পাঁচ টাকা।

অধুনা যক্ষ্মা রোগের দ্রুত প্রসার শহরের একটি বিষম সমস্যায় পরিণত হইয়াছে। শুধু শহরে নয়, সুদূর পল্লীতেও ইহার বিস্তার ভয়াবহরূপ ধারণ করিতেছে। ইহার চিকিৎসা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ডাক্তারী মতেই হইয়া থাকে, যদিও সব ক্ষেত্রে উপযুক্ত ফল পাওয়া সম্ভবপর হয় না। আলোচ্য গ্রন্থের লেখক একজন কবিরাজ। তিনি কবিরাজী মতে যক্ষ্মা চিকিৎসার যাবতীয় তথ্য এই গ্রন্থে পরিবেশন করিয়াছেন। রোগ হওয়ার পর চিকিৎসা করা অপেক্ষা রোগ যাহাতে হইতে না পারে, তজ্জন্য জনসাধারণের পক্ষে এই রোগোৎপত্তির কারণাদি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকা বাঞ্ছনীয়। কত সামান্য ব্যাপার হইতে এই কালব্যাধির উদ্ভব হইতে পারে এবং আহার-বিহারে নিয়ম ও শৃংখলা রক্ষা করিয়া চলিলে কত সহজে এই রোগের হাত এড়ানো যাইতে পারে, আলোচ্য গ্রন্থে তাহা বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। এই গ্রন্থ পাঠে চিকিৎসকগণ যেমন লাভবান হইবেন, তেমনি সাধারণ পাঠকগণও যক্ষ্মা ও উহার চিকিৎসা সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় জ্ঞানলাভে সক্ষম হইবেন। গ্রন্থকার কেবল কবিরাজী মতে নহে, আধুনিক মতেও রোগটিকে বুঝিবার ও বোঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই জন্য সকলেরই ইহা কাজে আসিবে বলিয়া বিশ্বাস। জনসাধারণের মধ্যে এইরূপ গ্রন্থের প্রচার হওয়া উচিত। কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ডের মূল্য নির্ধারণ অসংগত বিবেচিত হওয়ায়, জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতা দৃষ্টে গ্রন্থকারকে উহার মূল্য হ্রাস করিতে অনুরোধ জানাই। ৫৫—৫৬।৪৯

**কৃষ্ণ সাগরের নাবিক**—শ্রীযজ্ঞেশ্বর রায়। ওরিয়েন্টাল পাব্লিশিং কোং, ১১ডি, আরপুলি লেন, কলিকাতা—১২। পৃঃ ১২১। দাম দেড় টাকা।

'ব্ল্যাক সী সেলার' নামক রুশ গ্রন্থের প্রথমার্ধের অনুবাদ। অনুবাদ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। সুতরাং একটানা পড়িয়া যাওয়া কষ্টকর নয়। ৮৪।৪৯

**গুচ্ছ**—প্রণেতা বাণীকুমার স্বর্গীয় মহাদেব মুখোপাধ্যায়। প্রাপ্তিস্থান—ইকড়া চতুষ্পাঠী, পোঃ ইকড়া, জিলা বর্ধমান। মূল্য দেড় টাকা।

কবিতার বই। প্রেম, উদ্দীপনা, প্রীতি, আশা, আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি নানা ভাবের কবিতা বইটিতে সংকলিত। মাঝে মাঝে ছন্দ ও মিলের কিছু ত্রুটি আছে, কিন্তু ভাব স্বচ্ছ। অধিকাংশ কবিতাই পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করিবে। গ্রন্থারম্ভে একটি প্রবন্ধে গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী দেওয়া হইয়াছে। ৮৮।৪৯

**শ্যানবন্ধু**—বিমল নস্কর প্রণীত। প্রকাশক—ডি এম লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ সিকা।

কবিতার বই। মোট ২৯টি কবিতার সমষ্টি। তার অনেকগুলি রচনাই পাঠকের মনে দোলা দিবে। কবিতাগুলি ... ছন্দে ও জোরালো ভাষায় রচিত। ৭২।৪৯

**দত্তা-পরিচিতি**—শ্রীসচ্চিদানন্দ পাঠক প্রণীত। ইউনিভার্সাল পাবলিশার্স, ২২১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য এক টাকা।

শরৎচন্দ্রের 'দত্তা' উপন্যাসটিকে আলোচ্য পুস্তকে বিশেষভাবে সমালোচনা করা হইয়াছে এবং উপন্যাসটির প্রধান প্রধান চরিত্রগুলিকে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। ৫৪।৪৯

**ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন**—শ্রীঅরবিন্দ ঘোষাল। প্রাপ্তিস্থান—সুভাষ স্কুল অব পলিটিক্স, হাওড়া। মূল্য ছয় আনা।

ট্রেড ইউনিয়ন গঠন সম্পর্কে জ্ঞাতব্য তথ্যাদি-পূর্ণ পুস্তিকা। ৯৩।৪৯

**নীর পরিবার**—কাজী আবদুল ওদুদ প্রণীত। ওরিয়েণ্ট পাবলিশার্স, ১৩, স্টেশন রোড, ঢাকা। মূল্য দুই টাকা।

**আজাদ**—কাজী আবদুল ওদুদ প্রণীত। ওরিয়েণ্ট পাবলিশার্স, ১৩, স্টেশন রোড, ঢাকা। মূল্য দুই টাকা।

**তরুণ**—কাজী আবদুল ওদুদ প্রণীত। ওরিয়েণ্ট পাবলিশার্স, ১৩, স্টেশন রোড, ঢাকা। মূল্য এক টাকা।

কাজী আবদুল ওদুদ সাহেব প্রবীণ সাহিত্যিক। কথাশিল্প ও প্রবন্ধশিল্প—সাহিত্যের এই উভয় বিভাগেই তিনি সমান কৃতী। সাহিত্যসেবাকে যাঁহারা জীবনের প্রধান ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং সাহিত্যের মধ্য দিয়া ভ্রাতৃত্ব ও প্রীতির বিকাশকে যাঁহারা অগ্রে স্থান দিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে জনাব কাজী আবদুল ওদুদ সাহেব অন্যতম। তাঁহার কথাসাহিত্যের সর্বত্র একটি বলিষ্ঠ ও সুস্থ মনের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই সংপ্রচেষ্টা বরণীয় হইলেও সাহিত্যের 'বাজারে' বোধ হয় বরণীয় নয়; প্রমাণ তাঁহার 'নীর পরিবার' নামক গল্প বইটি। ১৯১৮ সালে উহার প্রথম সংস্করণ এবং ১৯৪৮ সালে দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছে। ইহা সাহিত্যের দুর্ভাগ বলিতে হইবে।

'আজাদ' একখানি উপন্যাস। লেখক ভূমিকায় জানাইয়াছেন'আজাদ' উপন্যাসটি "একটি বৃ পরিকল্পনার আদি স্তর। এই পরিকল্পনার মূলে প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছিল মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন, আর বিশেষ করিয়া রোমাঁ রোলাঁর 'জন ক্রিস্টোফার' বইখানি।"

লেখকের এই মহৎ পরিকল্পনা কার্যে পরিণ হইলে বাঙলার কথাসাহিত্য সমধিক লাভবা হইবে সন্দেহ নাই। এই পরিকল্পনার প্রথম গ্র 'আজাদ' পড়িয়া মুগ্ধ হইলাম। লেখকের পরিণ মন ও বুদ্ধি এবং পাকা হাতের ছাপ বইটির সর্ব সুস্পষ্ট। স্বচ্ছ ভাষায় ও বলিষ্ঠ বর্ণনায় বইটি পাঠকমাত্রেরই চিত্তস্পর্শ করিবে।

'তরুণ' চারিটি গল্পের সমষ্টি। চারি গল্পই ইতিপূর্বে বিভিন্ন সাময়িকপত্রে বাহি হইয়াছিল। ৬৩—৬২—৬৪।৪:

**আলোকলতা**—আবুল ফজল প্রণীত। ওরি য়েণ্ট পাবলিশার্স, ১৩, স্টেশন রোড, ঢাকা মূল্য এক টাকা।

**প্রগতি**—আবুল ফজল প্রণীত। ওরিয়ে পাবলিশার্স, ১৩, স্টেশন রোড, ঢাকা। মূ এক টাকা।

**কায়েদে আজম**—আবুল ফজল প্রণীত। তা

লাইব্রেরী, ৪৫।২, লোয়ার রেঞ্জ, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ সিকা।

বাঙলা সাহিত্যের প্রথম যুগকে যে সকল জেলার সাহিত্যিক সমৃদ্ধ করিয়াছেন, চট্টগ্রামের স্থান উঁহাদের কারো পশ্চাতে নয়। এই জেলাতে কবি আলাওল যে পুঁথিসাহিত্য রচনা করেন, তাহা বহুদিন সাহিত্যরসপিপাসুদিগকে তৃপ্তি ও আনন্দদান করিবে। জনাব আবুল ফজল সেই চট্টগ্রামের লোক। 'চৌচির' প্রভৃতি গল্প উপন্যাস লিখিয়া ইনি সাহিত্যক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। তাঁহার লেখা 'আলোকলতা' পাঁচটি একাঙ্ক নাটিকার সমষ্টি। 'প্রগতি' বইখানি তিন অঙ্কের নাটিকা। কথাশিল্পী আবুল ফজল নাটক রচনাতেও যে মুনশিয়ানার পরিচয় দিয়াছেন।

'কায়েদে আজম' একখানি তিন অঙ্কের নাটক। কায়েদে আজম জিন্নার কর্মময় জীবনের রূপ যে সরস করিয়া নাটকটিতে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে।

৬৮—৬৭—৬৬।৪


আয়নার সামনে যেতে ভয় পান?

অনেক মেয়েই আয়নায় নিজের চেহারা দেখতে ভয় পান। কেন জানেন? শত চেষ্টা করলেও তাঁদের চুল নাকি পরিপাটি থাকে না, বাগ মানে না। অথচ এর একটা অতি সহজ প্রতিকার রয়েছে এটা অনেকেই জানেন না। গত একাত্তর বছর ধরে জবাকুসুম লক্ষ লক্ষ মেয়ের চুলের স্বাস্থ্য ও শ্রী বৃদ্ধি করে এসেছে। আপনিও জবাকুসুম মাখুন।

সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লিঃ, জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা ১২। শাখা:—২৯ কলুটোলা স্ট্রীট

CIX 2

॥' ট্যরডম' কথাটির যথার্থ বাঙলা প্রতি-শব্দ নেই। কিন্তু মানব-চরিত্রের এই ত্তি অথবা প্রকাশটুকু সার্বজনীন।

প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই এই ভাবটি আছে, তন অথবা সুপ্ত অবস্থায়। আত্মোৎসর্গ রা আপনার মানসিক ও শারীরিক ক্লেশ-শ বরণ করে অপরের প্রীতিসাধন করার য় যে বিশেষ ধরণের আনন্দ, গৌরব এবং প্রসাদ আছে, সেটা সকলেই জানেন। স্তাত্ত্বিকরা বলবেন—ওটা অবদমিত ডিজম। আত্মপীড়ন-প্রবৃত্তির নিরুদ্ধ প্রতি-য়া। কিন্তু সে যাই হোক্, এই মানসের কাশ অনেক চরিত্রে প্রতিফলিত হতে দেখতে ই। যে মানুষ সমাজে আপনার প্রাপ্য প্রতিষ্ঠা লে না, পরিবারে যার মর্যাদা কম, সংসার কে আমল দেয় না, তার মধ্যে আত্মদানের ভাবিক ঝুঁকতিটা বেশি। যাকে নিয়ে আমরা দ্রুপ করি, যাকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিই না, গে অনাদর করি, সে যে কালক্রমে মার্টার হয়ে ঠবে—এটা বিচিত্র নয়। সে যখন দেখে থিবী বড় শক্ত জায়গা, বাস্তব জগতে প্রতিষ্ঠা র্জন করতে হলে চাই আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং রিত্রের দৃঢ়তা—যে দৃঢ়তা তার স্বভাবে নেই, খন কোনঠাসা হয়ে সে একটি নিজস্ব দৃষ্টি-ঙ্গী অর্জন করে। সেটা হল আত্মদুঃখের াত্মপীড়নের। মনটা তখন সেই বিশিষ্ট কোণ থকে জগৎকে বিচার ও গ্রহণ করতে শেখে, াপনার কার্যকলাপ সেই অনুসারে পরিচালিত রে থাকে। প্রাচীনকালে ও মধ্যযুগের তিহাস বিশ্রুত যে সব মহামানব আত্মোৎসর্গ রে গেছেন, তাঁদের মনোভাব কি ছিল তার চার-ক্ষেত্র এটা নয়। কোন্ নিরুদ্ধ মনের বেশে তাঁরা এই পথ অবলম্বন করেছিলেন, আলোচনা করবেন মনস্তত্ত্ববিদ্। তবে নবপ্রীতি অসাধারণ না হলে আন্তরিক মানব-প্রেমিক এবং মার্টার হওয়া যায় না। আর একটি থা, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যেমন সক্রেটিস্, শু কিংবা মহাত্মাজী মার্টার হয়েছেন মৃত্যুর রে। তাঁদের চরিত্রে যে দৃঢ়তা, অটল সত্য-ষ্ঠা এবং প্রচন্ড জিদ, তারই ফলে আদর্শ-তি তাঁদের স্বপ্নেরও অগম্য। সেই আদর্শ-ষ্ঠার জন্যেই তাঁরা মৃত্যু বরণ করেছেন। কেউ উ বা জীবিত থেকেই মানব-প্রেমিক আখ্যা য়েছেন, পৃথিবীর সঙ্গে বিরোধ ঘটেনি বলেই দের মৃত্যুদন্ড জোটেনি। কিন্তু সারা জীবন রে অজস্রভাবে আপনাকে বিলিয়ে দিয়েছেন রহিত-সাধনায়। এ'রা 'ক্যাননাইজড্' য়েছেন জীবন্দশায়।

কিন্তু ধর্ম ও সমাজের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনায় যাঁদের দেহদান করতে হয়েছে, তাঁদের কথা আমার আলোচ্য নয়। যে সব সাধারণ মানুষ নিয়ে আমরা বাস করি, ঘরকন্না করি, আত্মীয় সম্পর্কে জড়িত থাকি, তাদের কথাই বলছি। এদের মধ্যে অনেকেরই চরিত্রে এই আত্মদানের সুর পরিস্ফুট অথবা অর্ধপরিস্ফুট অবস্থায় রয়েছে। নিজেকে পীড়িত করে অপরের সুখ বিধান করার মধ্যে দুটি দিক আছে—একটি সাচ্চা আর একটি ঝুটা। কখনো কখনো কোনও চরিত্রে এ দুয়ের সংমিশ্রণও ঘটে থাকে।

আপনারা সকলেই স্বীকার করবেন যে, কতকগুলি প্রবৃত্তির বিকাশ অথবা বিবর্তন একান্তভাবেই পরিবেশ-নির্ভর। যে মানুষ যে পরিবেশে বাস করে, যে গন্ডীর মধ্যে তার দৃষ্টি আবদ্ধ, সংসারের কাছে যে ব্যবহার সে পেয়ে থাকে, সে অনেকটা সেই মত গড়ে ওঠে। কাজেই কারুর বেলায় আলট্রুয়িজম খাঁটি জিনিস, কারুর ক্ষেত্রে 'পোজ'-বিশেষ। কারুর চরিত্রে বিশুদ্ধ মার্টারডমের সম্ভাবনা, কারুর বা কৃত্রিম ভঙ্গিমা। তা ছাড়া, একই মানুষের মধ্যে বিভিন্ন সত্তার প্রকাশ হতে পারে, পুরুষোচিত এবং স্ত্রীজনোচিত প্রবৃত্তির মিশ্রণ অথবা স্ফুরণ হতে পারে। কোনও কোনও পুরুষ আছেন, যাঁরা নিজের বলতে কিছুই চান না, রাখেন না, দাবী করেন না। অপরকে দিয়েই তাঁদের তৃপ্তি ও শান্তি। নিজে জীর্ণ ও মলিন বেশে থাকেন, নিজের ঘর অপরিষ্কার; নিজস্ব অর্থ নেই বললেই চলে—হয়তো ভবিষ্যতের সংস্থান করতেও নারাজ। যে পোষাকটা পরিত্যক্ত এবং অব্যবহার্য সেইটেই তিনি তুলে নেন। যে আহার্যটা মন্দ এবং অখাদ্য, সেইটে তিনি তৃপ্তি সহকারে ভোজন করেন। যে ঘরটা সবচেয়ে অসংস্কৃত এবং অস্বাস্থ্যকর, সেই ঘরে বাস করেই তাঁর আনন্দ। দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্যের যে উপকরণগুলো নইলে মানুষের জীবনধারণ কষ্টকর হয়ে ওঠে, সেগুলোর প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র আশক্তি নেই। ফরসা এবং ভালো জামাকাপড় কেউ দিলে হয় তিনি দিয়ে দেন, নয়তো তুলে রাখেন। আর এইসব কাজ করে তিনি মনে মনে তৃপ্ত এবং গর্বিত। চরিত্রের মজ্জাগত দুর্বলতার জন্যে তিনি তাঁর ন্যায্য মর্যাদা থেকে বঞ্চিত থাকেন। হোটেল বা দোকানের বিল্ অনেক সময়ে তাঁরই ঘাড়ে চাপানো হয়ে থাকে। 'পারবো না, দেবো না, এ কী অন্যায়!' বলেন অথচ প্রতিবারই সে পাওনা শোধ করেন। তাঁর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে, একটু আধটু খোসামোদ করে পরস্মৈপদী মানুষ তাঁকে শোষণ করেন। তিনি জানেন ও বোঝেন। কিন্তু দৃঢ় প্রতিবাদ বা অস্বীকার করবার মতন তাঁর মনের জোর নেই। আবার জগতের নিমকহারামির সম্বন্ধে অনুযোগ অভিযোগও করে থাকেন। এই সব মানুষের ক্ষতির অংকটাই আমরা দেখতে ও শুনতে পাই, কেন না লোকসান দিয়ে তিনি দুঃখ করেন, লোকের কাছে সহানুভূতি প্রত্যাশা করেন। এমন মানুষও আছেন যাঁর বিয়ের ইচ্ছা ষোল আনা, সংসারধর্মেও স্বাভাবিক আসক্তি ও নৈপুণ্য আছে। অথচ সংসারী হতে পারলেন না পরাশ্রয়ী আত্মীয় প্রতিপালনের চাপে। মুখে বলেন—সংসার বড় খারাপ জিনিস। ও পথ মাড়ানো উচিত নয়। অথচ কেউ যদি তাঁকে সংসারী ও স্থিতিশীল করে দেয়, তিনি যে অখুশী হবেন, তা মনে হয় না। আসলে ইনি দুর্বল এবং নিজে থেকে জঞ্জাল ঝেড়ে ফেলে একটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দ্বৈত-আশ্রম প্রতিষ্ঠায় অপারগ।

মহিলাদের মধ্যেও এমন 'টাইপ' পাওয়া যাবে। সত্যি কথা বলতে গেলে মহিলাদের মধ্যে এমন ধরণের মার্টারের সংখ্যাই বেশী। কারণটা অবশ্য স্বাভাবিক। সংসারের যে পরিবেশে তাঁরা বাস করেন, যে নিপীড়ন চলে থাকে তাঁদের মনের ও দেহের ওপর, তাতে আত্মদানের প্রবৃত্তিটা শাণিত হয়ে ওঠে। তবে বেশি মাত্রায় অর্থাৎ বাড়াবাড়ি হলে, তাঁদের নিয়ে বাস করা কঠিন হয়ে পড়ে। এই সব মহিলাদের মন খারাপ হল ক্রনিক ব্যাধি। বিবর্ণ মুখ আর মলিন বেশে সারাদিন পরিশ্রম করে অপরের তৃপ্তি বিধান করা আর আপনাকে সর্বসুখে বঞ্চিত করে রাখাই যেন তাঁদের স্বধর্ম। নিতান্তই প্রাণধারণের জন্যে যেটুকু প্রয়োজন, সেইটুকুই তাঁরা আহার করেন। ভালো-মন্দ জিনিস স্বামী-পুত্রের পাতে তুলে তো দেনই, এমন কি জা-ননদের জন্যে সরিয়ে রাখেন। হয়তো তিনিই সংসারের কর্ত্রী, ভাঁড়ারের চাবি তাঁরই হাতে। কিন্তু তাঁর আসন-বসন, আহার-নিদ্রা পরিচারিকার মতন। গোপন ঈর্ষায় অথবা, স্বার্থপরতায় এ'দের মেজাজ স্বভাবতই তিক্ত হয়ে থাকে। একটুতেই ফেটে পড়েন, নয়ত ছুতো-নাতায় অপর পক্ষকে আপনার আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্তগুলিকে উজ্জ্বল ভাষায় শুনিয়ে দেন। "আমার কিছুই চাই না......" এইটেই হল তাঁদের মুখের বুলি। অথচ ভোগের স্পৃহা যে এ'রা জয় করেছেন, তা নয়। দগ্ধ ললাট নিয়ে দুঃখও করেন।

এই ধরণের পরার্থপরতা, বিজ্ঞাপিত আত্মদানের দৃষ্টান্ত অনেকেই দেখেছেন। এটা ঠিক্ মনোবিকার না হলেও এক বিশেষ রকমের মানসিক অবদমন। এ নিয়ে অদৃষ্টকে ধিক্কার দেওয়া চলে, বিধাতা কিংবা সংসারের অবিচার নিয়ে অভিযোগ করা চলে কিংবা সাহিত্যের খোরাক হওয়া যায়। কিন্তু স্বেচ্ছায় যাঁরা দুঃখ-দহে ডুবে থাকতে ভালোবাসেন, তাঁদের অবুঝ আত্মপ্রীতির সঙ্গে নিত্য সংস্পর্শে থাকা সত্যিই এক কঠিন পরীক্ষা।

সাড়ে বারো মণ ওজনের বিষ্ণুমূর্তি

## একটি দুঃখের সংবাদ

সম্প্রতি গত ১লা বৈশাখ তারিখে দক্ষিণ কলিকাতায় অদ্ভুত এক ঘটনায় শ্রীযুক্ত অসিত মৈত্রের সাড়ে তিন বছরের ছেলে শ্রীমান আলোক মারা গেছে। ঘটনার দিন দুপুরবেলা ঐ পরিবারে নববর্ষ উপলক্ষে নারায়ণ পুজো হচ্ছিল, তখন ঐ শিশুটি তার বাবার পাশে বসে পুজো দেখছিল। ইতিমধ্যে শিশুটির মামাতো ভাই সুধীর নামে আর একটি আট বছরের ছেলে ঐ বাড়ীতে এসে হাজির হয়, এবং পুজোর ঘর থেকে আলোককে ডেকে নিয়ে নীচের ঘরে খেলা করতে যায়। নীচের সেই ঘরের কোণে পাথরের তৈরী একটি বিষ্ণুর মূর্তি রাখা ছিল। 'আলোক' অন্যান্য দিনের মত খেলার ছলে ঐ মূর্তির আড়ালে দাঁড়িয়ে চোখ বুজে পুজোর ভঙ্গীতে দাঁড়ায়। তখন সুধীর ও আর একটি ছেলে 'স্বপন' মূর্তিটির অপর দিক থেকে ঝুঁকে পড়ে তার ভঙ্গী দেখে বিশেষ কৌতুক বোধ করছিল। এমন সময় তাদের দুজনের ভার লেগে পাথরের মূর্তিটি সশব্দে আলোকের গায়ে গিয়ে পড়ে—আলোক চাপা পড়ে যায়। ঐ শব্দে উপরের পুজোর ঘর থেকে পরিবারের অন্যান্য লোক ছেলেটির পিতামাতা ছুটে এসে দেখেন, আলোক চাপা পড়ে গেছে। তখনই মূর্তিটি সরিয়ে ফেলা হয়, দেখা যায়, পুজোরী ভক্ত শিশু আলোকের দেহে প্রাণ নেই! পাথরের

ঐ বিগ্রহটির ওজন ১২॥ মণ ও ৪॥ ফুট উঁচু। অনেক দুর্ঘটনা ঘটে—কিন্তু ভক্ত শিশুটিকে গ্রহণে বিগ্রহের এই আগ্রহের অর্থ বোঝা দায়। শোকসন্তপ্ত মৈত্র পরিবারকে সকলেই সমবেদনা জানাবেন। আমিও জানাচ্ছি।

তিন বছরের শিশু আলোক

## চ্যান্সেলার স্বামীর হাত থেকে উপাধি লাভ !

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি ও পুরস্কার অনেকেই পান, পেয়েছেনও, কিন্তু সম্প্রতি ইংলণ্ডের রাজার বড় মেয়ে প্রিন্সেস্ এলিজাবেথ ওয়েলসের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মান-জনক "ডক্টর অব্ মিউজিক" উপাধি লাভ করেছেন এবং এই উপাধির সনদটি তাঁর হাতে তুলে দিয়েছেন ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার রূপে রাজকন্যার স্বামী ডিউক অব্ এডিনবার্গ

স্বামী উপাধির সনদটি স্ত্রীর হাতে তুলে দিচ্ছেন

নিজেই। ডিউক অব্ এডিনবার্গ ওয়েলস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলারের পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর সব প্রথম উপাধি ও সনদ প্রদান করেছেন তাঁর স্ত্রী প্রিন্সেস এলিজাবেথকেই। এ ছাড়া ঐ একই দিনে তাঁর কাছ থেকে উপাধি ও সনদ লাভ করেছেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলিও ছিলেন বলে জানা গেছে। যোগ্য চ্যান্সেলার যোগ্যা প্রার্থিনীকেই উপাধি দান করেছেন—এতে কারুর কিছু বলার নেই, কি বলেন!

## নাকের সাহায্যে পড়া

গত যুদ্ধের ফলে যে সব শিশু অন্ধ হয়ে গেছে, সম্প্রতি তাদের শিক্ষা দিয়ে মানুষ করে তোলার জন্য রোম শহরে একটি 'অন্ধাবাস' তৈরী হয়েছে। এই অন্ধাবাসে—ইতালো রেনজিত্তি বলে একটি এগারো বছর বয়সের অন্ধ ছেলে অদ্ভুত উপায়ে লেখা পড়া শিখছে।

এগারো বছরের অন্ধ ছেলের উদ্যম

ব্রেল প্রণালীতে ছাপা—উঁচু উঁচু ফুটকীর অক্ষরের উপর নাক বুলিয়ে বুলিয়ে সে পড়ে। কারণ তার অন্যান্য অন্ধ সহপাঠীদের মত ব্রেল অক্ষরে হাত বুলিয়ে পড়বার উপায় নেই। একেতো অন্ধ, তার উপর বোমার আঘাতে হাত দুটি জখম হওয়ায় সে দুটিও কেটে বাদ দিতে হয়েছে। দুখানি হাত এবং দুটো চোখ হারিয়েও 'ইতালো' মনের আশা আকাঙ্ক্ষা একটুও হারায়নি। তার বিশ্বাস, সে ঐভাবে লেখাপড়া শিখেই মস্ত বড় লোক হবে।

# পাশ্চাত্য শিল্পীর প্রাচ্য সাধনা

শিক্ষা, সংস্কৃতি ও শিল্পকলায় 'ওরিয়েণ্ট' কথাটির একটি নিজস্ব ভাব ও ব্যঞ্জনা ছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নিয়ে অনেক দ্বন্দ্ব য় গিয়েছে। কোনো কবি বলেছেন, এ দুয়ের ধ্য কোনো দিন মিল হবে না; কিন্তু শাবাদীরা জানেন, জ্ঞানবিজ্ঞানের সবরকম বধারার মধ্য দিয়ে দুটোই দুটোকে কাছে নছে।

তবু 'ওরিয়েণ্ট' বা 'প্রাচ্য' কথাটার নিজস্ব কটা চমক, একটা সম্ভ্রমপূর্ণ আকর্ষণ আছে। আকর্ষণে পাশ্চাত্য এসে বার বার আপনা কে ধরা দিয়েছে, ইতিহাসে এর নজীরের ভাব নেই।

বিশেষ করে প্রাচ্য শিল্পকলার নামে শ্চাত্যের চোখে যে বিভ্রম জাগে, এই শিল্পের য়া তাদের চোখে যে মোহ জন্মায় তাতে রা সময় সময় আত্মহারা হয়েছে, ইতিহাসে রও নজীর আছে। বিশেষ করে রোমাণ্টিক ত্রকলায় 'ওরিয়েণ্ট' কথাটা শিল্পরসিকদের নে মন্ত্রের মতো কাজ করে।

বিশ্বের শিল্পে সাহিত্যে ও অন্যান্য ভাব-রায় রোমাণ্টিক যুগ কবে থেকে শুরু হল, নর কি তার পরিণতি, তা নিয়ে আলোচনা রা আমাদের অভিপ্রায় নয়, রোমাণ্টিক রিবেশের মধ্যে একজন পাশ্চাত্য শিল্পী ক করে প্রাচ্য শিল্পের সাধনায় বড় হয়েছিলেন এবং এ অ-সম সাধনায় কি করে তাঁর তিভা স্ফুরণ হয়েছিল এ প্রবন্ধে আমরা ক্ষেপে এইটুকুই বর্ণনা করব।

নেপোলিয়ানকে ফ্রান্সের সম্রাট বা ডক্টেটর দুই-ই বলা চলে। কিন্তু তার চেয়েও তো পরিচয়, তিনি ছিলেন সে-যুগের লিটিক্যাল রোমাণ্টিক। প্রধানতঃ তাঁরই জনৈতিক অভীপ্সার মধ্য দিয়ে একবার প্রাচ্য শিল্পের রোমান্স পাশ্চাত্য চেতনার স্রোতে এসে মিশেছিল।

## ২

আলজিয়ার্স-এর 'বে' হুসেন ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে ফরাসী রাজদূতকে বিতাড়িত করেন। এ নিয়ে যে সংঘাতের সৃষ্টি হয়েছিল তার ফলে ফ্রান্স থেকে একটি অভিযাত্রী দলকে সেখায় পাঠানো হয়েছিল। এই দলটি অল্প-কালের মধ্যেই আলজিয়ার্সে তুর্ক-শাসনের অবসান ঘটাতে সক্ষম হয়। কিন্তু দেশটিকে তখন পুরাপুরি দখল করা সম্ভব হয় নি। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে, আবদুল কাদিরকে পরাজিত করার পরই দেশটিকে চূড়ান্তভাবে অধিকার করা সম্ভব হয়। এই মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে মরক্কোর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার বিশেষ প্রয়োজন হয়েছিল। মরক্কোর অধিবাসীদের হাতে রাখা ও আলজিয়ার্স থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন রাখাই ছিল ফরাসীদের এই যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্য। যা হোক, ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ফরাসী থেকে মরক্কোর সম্রাটের দরবারে দৌত্যকার্যের জন্য এক বিশেষ প্রতিনিধি দল পাঠানো হয়। মরক্কোর সম্রাট মুলে আবদুল রহমানের জন্ম হয় ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে। তিনি ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে তাঁর খুড়া মুলে সোলিমানের সিংহাসনে বসেন। তাঁর রাজত্বের প্রথম দিকে স্থানীয় আদিবাসীদের মধ্যে ভয়ানক বিদ্রোহ বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল। আবার মৃত্যুর
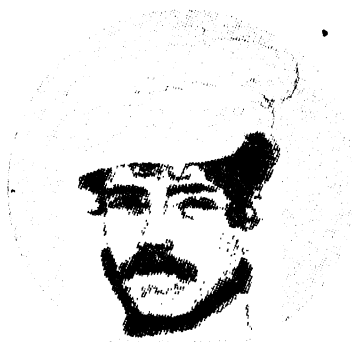
শিল্পী দেলাক্রো

কিছু আগে থেকে তাঁকে ফ্রান্স ও স্পেনের সঙ্গে নানা গোলমালে জড়িয়ে পড়তে হয়। এসব সত্ত্বেও মরক্কো তখনো ছিল দুর্ভেদ্য দেশ। তার নিজস্ব আইন-কানুন ও স্বকীয় ভাবধারণা নিয়ে তখনো সে অনেকটা নিরুপদ্রবেই দিন যাপন করছিল।

যা হোক, ফ্রান্সের লুই ফিলিপ গভর্নমেণ্ট মরক্কোয় যে প্রতিনিধি দল পাঠান, তার মুখপাত্র ছিলেন কূটনীতিবিশারদ কোঁতে দ্য মরনে। তাঁর সূক্ষ্ম রুচিবোধ ছিল এবং শিল্পকলায় ছিল গাঢ় অনুরাগ। বিখ্যাত চিত্র-সংগ্রাহক প্রিন্স দেমিদভের তিনি বন্ধু ছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে যে জায়গাতে প্রতিনিধিদল পাঠানো হত, তাদের সঙ্গে দু একজন করে শিল্পীও দেওয়া হত। কোঁতে দ্য মরনেও তাই করলেন; একজন শিল্পীকে সঙ্গে নেবেন স্থির করলেন, মরক্কোর লোক-জনের ও তাদের আচার অনুষ্ঠানাদির চিত্র আঁকবার জন্য। সরকারী কাজে এসকল চিত্র বিশেষ সাহায্য করবে বলেই তাঁর বিশ্বাস ছিল। তা ছাড়া তাঁদের দৌত্যকার্যের ঐতিহাসিক রেকর্ড ইত্যাদি চিত্রিত করে রাখা ইতিহাসের দিক থেকেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। একাজে কাকে লাগানো যায় স্থির করতে না পেরে ফ্রান্সের একজন বিখ্যাত অপেরা-ডিরেক্টরকে নির্বাচনের ভার দেওয়া হল। অপেরা-ডিরেক্টর সুদক্ষ চিত্রশিল্পী ইউজিন দেলাক্রোর নাম প্রস্তাব করলে, তাকেই নেওয়া স্থির হল।

দেলাক্রো তখন বত্রিশ বছরের যুবক। শিল্পী হিসাবে দেলাক্রোর নাম তখন ছড়াতে শুরু হয়েছে। তাঁর মধ্যে লোকে তখন ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার আভাস দেখতে পাচ্ছে। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে দেলাক্রো একটি প্রদর্শনীতে "দান্তে ও ভার্জিল" নামে নিজের আঁকা একখানি ছবি পাঠান। তার থেকেই ফরাসী শিল্পজগতে তাঁর যশ একটু একটু করে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এর দু বছর পর তাঁর "খিওস'এর হত্যাকাণ্ড" নামে আর একখানা ছবি বেরোয়। এই ছবিতে গ্রীক খৃষ্টানদের প্রতি তুর্কীদের উৎপীড়ন চিত্রিত ছিল। এই চিত্রের থেকেই তাঁর মনে নির্মম হিংসাকার্যের দৃশ্য জমকালো করে আঁকার প্রবৃত্তি দেখা দেয়। প্রাচ্যের বিষয়বস্তু নিয়ে ছবি আঁকার কথা এর আগে তিনি কল্পনায়ও ভাবেন নি। বিশেষতঃ 'ওরিয়েণ্টে'র সঙ্গে শিল্পগত ভাবে কোনো যোগাযোগ তাঁর ছিল না। ইউরোপের বাইরের চিত্র জগতের সঙ্গে তাঁর একবার মাত্র সাক্ষাৎ হয়েছিল ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে—তিনি তখন ফ্রান্সের পারসিক দূত হাসান খাঁর একখানা লিথোগ্রাফ করেছিলেন।

দেলাক্রোর প্রকৃতি ছিল তাঁর শিল্প-বস্তুর ঠিক উল্টো ধরণের। তিনি যখন ছবি আঁকতেন তার সর্বত্র রেখায় রেখায় ছড়িয়ে দিতেন বিক্ষোভ, অশান্তি আর ভয়াবহতা। কিন্তু তিনি নিজে ছিলেন অত্যন্ত শান্ত স্বভাবের, অত্যন্ত লাজুক প্রকৃতির। শিল্পীর নিজের স্বভাবের সঙ্গে তাঁর শিল্পবস্তুর প্রকৃতির এমন অদ্ভুত পার্থক্য খুব কম শিল্পীর ক্ষেত্রেই দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা যেমন ছিল অদ্ভুত তেমনি বিশ্লেষণ ক্ষমতাও ছিল অসাধারণ। তিনি ভালো লিখতেও পারতেন। লেখার মধ্য দিয়েও অত্যন্ত প্রাঞ্জল অথচ সুস্পষ্টভাবে নিজেকে প্রকাশ করার ক্ষমতা তাঁর ছিল। শিল্পবিদ্যা ছাড়াও নানা বিষয়ে তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। সঙ্গীতবিদ্যা থেকে ফটোগ্রাফী পর্যন্ত অনেক কিছুই তাঁর জানা ছিল। কাজেই মরক্কো-যাত্রী প্রতিনিধিদলে সর্বাধিক যোগ
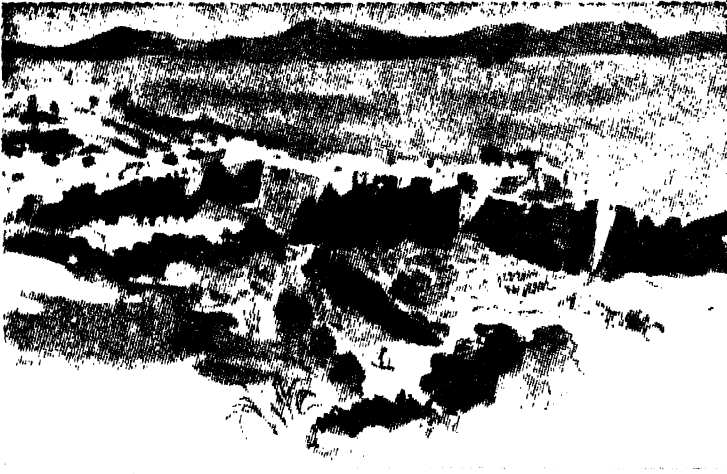
তান্‌জিয়ারের দৃশ্য : জলরঙ। লুভার চিত্রশালায় রক্ষিত নোটবইয়ের প্রথমপাতার ছবি

ব্যক্তি রূপে তাঁকেই গ্রহণ করা হল। ১৮২২ খৃষ্টাব্দ থেকে তিনি একটা 'স্মৃতিলিপি' (Journal) রাখতে শুরু করেন; মৃত্যুর কয়েক মাস আগে পর্যন্তও তিনি তাতে লিখেছেন। এই স্মৃতিলিপি'টি শিল্পকলার ইতিহাসের একটি প্রামাণ্য দলিল হিসেবে রক্ষিত আছে। স্মৃতিলিপিটিতে ১৮২৪ থেকে ১৮৪৭ পর্যন্ত একটা সুদীর্ঘ বিরতি চোখে পড়বে। এই সমস্তটাই মরক্কো থেকে ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ রেকর্ড ও তথ্যাদি সংগ্রহ করে আনার কাজে তাঁকে পাঠানো হয়েছিল।

প্রতিনিধিদলের সংগে মরক্কো থাকা কালে দেলাক্রো নানারকম 'স্কেচ্' এঁকে সাতখানা নোটবই পূর্ণ করেছিলেন। তাতে পেন্সিল, কালি ও জলরঙের নানারকম স্কেচ্ ছিল। তার থেকে চারখানি নোটবই হারিয়ে গিয়েছে। বাকি তিনখানি এখন লুভার চিত্রশালায়, মিউজি কঁদে চিত্রশালায় এবং প্যারিস বিশ্ব-বিদ্যালয়ের চিত্রসংগ্রহ বিভাগে রক্ষিত আছে। এর মধ্যে তাঁর আঠারোখানি বিশেষ ধরণের জলরঙ ছবি আছে। তাঁর জাহাজ যে সময়ে তুলোঁ বন্দরে আটক রাখা হয়েছিল, এই ছবিগুলি সেই সময়ের আঁকা। এই ছবিগুলিতে বলিষ্ঠতার যেমন সুস্পষ্ট ছাপ পড়েছে তেমনি শিল্পী তার মনের তৎকালীন উপলব্ধিকে অকপটে এবং সাহসের সংগে চিত্রিত করেছেন।

৩

দেলাক্রো ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ২১শে ডিসেম্বর প্যারিস থেকে যাত্রা করেন। স্থল-পথে তুলোঁ পর্যন্ত এসে তিনি 'লা পার্ল' নামক রণতরীতে উঠে সাগর পাড়ি দেন। সে সময়ে ঝড়ঝাটিকায় তাঁর যাত্রাপথ অত্যন্ত বিঘ্নসংকুল হয়ে উঠেছিল। তার ওপর, যেখানে তাঁরা যাচ্ছেন, সেখানে খুব কলেরা লেগেছে বলে গুজব প্রচারিত হওয়ায় জাহাজের নাবিকদের মধ্যে তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এসব কারণে দেলাক্রোর এই সমুদ্রযাত্রা বড়ো নিরানন্দময় হয়ে পড়েছিল।

'লা পার্ল' ২৪শে জানুয়ারী তান্‌জিয়ারে উপনীত হয়। স্থানটি দেখে দেলাক্রোর কৌতূহল ও মানসিক উত্তেজনা দুর্বার হয়ে ওঠে। নিজের মধ্যে তিনি একটা দুর্বার উন্মাদনা অনুভব করতে থাকেন। যা কিছু দেখছেন সবই তাঁর কাছে নতুন ঠেকছে বলেই যে তাঁর এই উদ্দীপনা, তা নয়। এখানকার সব কিছুর মধ্যে তাঁর নিজের আদর্শের বিশ্লেষণ দেখতে পেয়েই তিনি এতোটা প্রাণ-চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন। এখানে একটা অদৃশ্য জগৎ তাঁর চোখের সামনে নিজেকে মেলে ধরেছিল। অদ্ভুত এ জগৎ। এখানে বৃদ্ধা ধরিত্রীর আদি কালের মানুষগুলিই যেন এখনো বিচরণ করছে। মানুষগুলির বেশে ভূষণে চাল-চলনে সর্বত্র আদিমতার সুস্পষ্ট ছাপ। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখানে বর্ণমাধুরী ও গতিছন্দের অপূর্ব সমন্বয় শিল্পীর চোখকে অতি সহজেই আবিষ্ট করে তুলল। তাদের জীবনের বর্ণময় চাঞ্চল্য শিল্পীর চোখের সামনে এঁকে দিল সাতরঙা রামধনু। তিনি সেই রঙকে দুহাতে লুট করতে লাগলেন, প্রাণ ঢেলে আঁকতে লাগলেন ছবির পর ছবি।

৪

ছবি আঁকতে গিয়ে দেলাক্রোকে খুব বড়ো একটা অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল। 'মুর'দের মধ্যে একটা কুসংস্কার আছে,

মরক্কোর অধিবাসীদের নানা রকম 'টাইপ'। কয়েকজন আরব ও একটি নিগ্রো রমণীর ছবি এখানে আঁকা হয়েছে
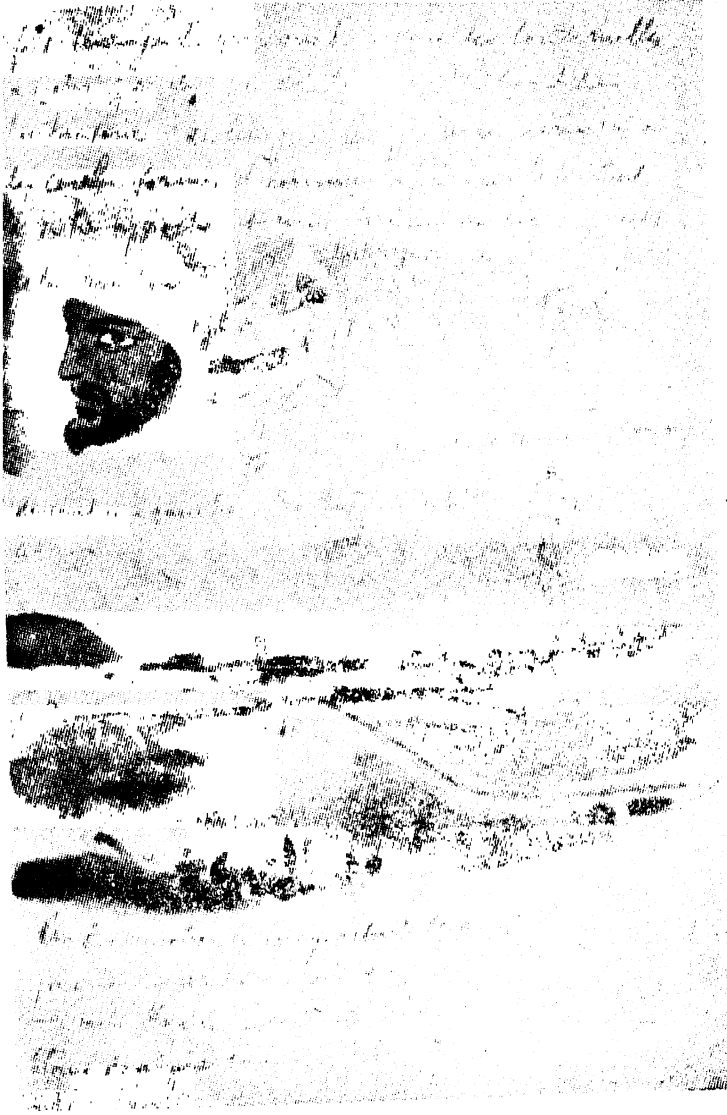
দেলাক্রোর নোটবইয়ের একটি পৃষ্ঠা। চিত্রের উপরিভাগে কয়েকজন আরব সংগীতজ্ঞের ছবি আঁকা হয়েছে। ফরাসি প্রতিনিধিদলসহ মেকনিসে যাওয়ার পথে এ'রা তাদের সংগী হয়েছিলেন। মেকনিস শহরটিকে শিল্পী প্রথম দৃষ্টিতে যেমনটি দেখেছিলেন, ছবির নিম্নভাগে তা চিত্রিত করেছেন

মানুষের ছবি আঁকা পাপ। এজন্য তাদের পোর্ট্রেট আঁকা বা তাদের জীবনযাত্রা নিয়ে ছবি আঁকা কিংবা ড্রইং করা সময় সময় অসম্ভব হয়ে উঠত। দেলাক্রো যতদিন মরক্কোতে ছিলেন সব সময়েই তাকে এই অসুবিধাটি ভোগ করতে হয়েছে। তাদের নিয়ে ছবি আঁকতে তাঁকে সারাক্ষণ বেগ পেতে হত।

মুরদের এই সংস্কার আদিম যুগ থেকেই বদ্ধমূল ছিল। তার ওপর মুসলমানদের প্রাণীচিত্রাংকনে ধর্মীয় অনুশাসন তাদের সে সংস্কারকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল। দেলাক্রো অনেক সময় পয়সা দিয়ে পুরুষদের রাজি করতেন তার পাশে বসতে যাতে তাদের 'টাইপ' তিনি তুলির লিখনে রূপায়িত করতে পারেন। কিন্তু এ কাজে স্ত্রীলোকদের পাওয়া কিছুতেই সম্ভব হত না। অনেক লুকিয়ে চুরিয়ে, অনেক সাধ্যসাধনা করে তাঁকে একাজ করতে হত। 'মুর'-রমণীদের ছবি আঁকতে গিয়ে একাধিকবার তাঁকে জীবন পর্যন্ত বিপন্ন করতে হয়েছে।

দেলাক্রোর নোটবইতে তাদের যে-সব স্কেচ আঁকা রয়েছে, তার থেকে সহজেই জানা যায় মরক্কোর অধিবাসীদের মধ্যে নানা জাতি ও বর্ণধারার সমাবেশ ঘটেছিল। তাদের চেহারার বিভিন্নতা ও স্বভাবের বৈচিত্র্য স্কেচগুলিতে রেখায় রেখায় ফুটে উঠেছে।

তানজিয়ারে থাকা কালে দেলাক্রো তথাকার সংখ্যাবহুল ইহুদী সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে আসতে পেরেছিলেন। ইহুদীরা ছিল বিশেষ অতিথিপরায়ণ। তারা ধর্মসংক্রান্ত কুসংস্কারে জড়িত না থাকায় তিনি অতি সহজেই তাদের সংগে মিশতে ও তাদের নিয়ে ছবি আঁকতে পেরেছিলেন। সাধারণত তারা ফরাসী ভাষায় কথা বলত, তাদের মেয়েরাও ছিল পরমাসুন্দরী। তাদের নিয়ে আঁকা দেলাক্রোর কয়েকখানি ছবি শিল্পজগতে প্রখ্যাত হয়ে আছে।

প্রাচীন স্পেনের ভাষা ও ঐতিহ্যের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা থাকা সত্ত্বেও তানজিয়ারের ইহুদি সম্প্রদায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে ভাব ও আচারগত একটা সমন্বয়ের রূপ নিয়ে দেলাক্রোর চোখে ধরা দিয়েছিল। ২১ ফেব্রুয়ারী দেলাক্রো ইহুদিদের একটা বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত "ম্যাগাসিন পিত্রেক্স" পত্রে অনুষ্ঠানটির বর্ণনা দিয়ে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তার আগের বছরের প্রদর্শনীতে তিনি এ নিয়ে একটা ছবি এ'কে দিয়েছিলেন। শিল্পীর যে নোটবইগুলি চিত্রশালায় রক্ষিত আছে তার একটিতে একটা পৃষ্ঠায় ঐ বিয়ের কনের একটা ড্রইং আঁকা আছে; ড্রইংটিতে কনের নিজ হাতে তার নাম লেখা আছে; জমিলা বুজাগলো নামটি হিব্রু অক্ষরে লেখা। আরবীর সংগে অক্ষরগুলির কোনো মিল নেই। অক্ষরগুলি সবই স্বরবর্ণ; কেবল ইংরাজি 'এইচ'এর মত একটা চিহ্ন এর একমাত্র ব্যতিক্রম।

বিয়ের অনুষ্ঠানটি সারাদিন ধরে চলেছিল। ইহুদি, স্পেনীয়, মুর, নিগ্রো ও ফরাসি সকলে এতে যোগ দিয়েছিল। সারাদিন ধরে আমোদ আহ্লাদ, গান বাজনা খানা পিনা চলেছিল। এখানে বিয়ের একটু বর্ণনা দেওয়া গেল। সকালবেলা কনে সখীপরিবৃতা হয়ে ঘরে মেঝের ওপর বসল। তার পরণে পশমে তৈরী ঢিলে পোষাক। সে সারাক্ষণ চোখ বুজে বসে থাকল। ঘরের মধ্যে বর্ষীয়সী বরাঙ্গনা তম্বুরা বাজিয়ে গান গাইছে। কনের

**দেলাক্রোর নোটবইয়ে নানা ভংগীতে পঞ্চাশটিরও বেশি উটের ছবি আঁকা আছে। জন্তুর ছবি আঁকায় তাঁর খুব অনুরাগ ছিল**

মেলতে মানা, সে সেই যে চোখ বুজেছে আর খোলে নি। বিয়ের সত্যিকার অনুষ্ঠান যখন চলতে থাকে তখনো তাকে চোখ বুজেই থাকতে হয়। রীতি আছে: রঙ্গিনী সখীরা তাকে চোখ মেলাবার জন্য অনেক চেষ্টা করবে, তাকে খোঁচাবে, চিমটি কাটবে, তার গায়ে সূঁচ ফুড়বে, তার কানের কাছে গলা ছেড়ে চীৎকার করবে--কনে তবু চোখ খুলতে পারবে না।

শেষে এক সময়ে তাকে কোনো দর্শনীয় মূর্তির মতো মাথায় একটা রঙচঙে ওড়না পরিয়ে পিতৃগৃহ থেকে বহন করে নিয়ে যাওয়া হয়, সংগে সংগে সংগীত ও নৃত্য অবিরাম চলতে থাকে। গীটার এবং 'দোতারা' (দুই তারবিশিষ্ট একরকম মুরিশ ভায়োলিন) এদের প্রধান বাদ্যযন্ত্র। যে-সকল নাচ হয় তার মধ্যে 'উদর-নৃত্য' নামে একপ্রকার কষ্টসাধ্য নাচ আছে। এ নাচ কেবল মেয়েরাই নাচে। কনের শোভাযাত্রা সম্বন্ধে দেলাক্রো লিখেছেন, "রাস্তার দুপাশে স্পেনীয়ার্ডরা জানলা থেকে মুখ বাড়িয়ে শোভাযাত্রা দেখছে; মুর রমণীরা ছাদে দাঁড়িয়ে দেখছে, বুড়োরা দেখছে রাস্তার পাশে বড়ো বড়ো পাথরের উপর দাঁড়িয়ে। লণ্ঠন জ্বলছে। একটি ইহুদি তরুণ দুটি মশাল হাতে করে আগে আগে চলেছে, আগুনের শিখা এক এক বার তার মুখে গিয়ে লাগছে।"

৫

সম্রাট মুলে আবদুল রহমান তখন মেক্‌নিসে বাস করতেন। মার্চের ৫ তারিখে প্রতিনিধিদল সেখানে যাত্রা করল। এই দলে ফরাসি রাজদূত, তাঁর সহকারী, দোভাষী—এঁরা ছিলেন। শিল্পী দেলাক্রোর সংগে শীঘ্রই এদের বন্ধুত্ব হয়ে যায় এবং এঁরা শিল্পীকে শিল্পের মালমসলা সংগ্রহে বিশেষভাবে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেন। মুরদের রীতিনীতি আচার ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁকে তথ্যাদি পরিবেশনেও তাঁরা প্রতিশ্রুত হন। যাত্রীদের পথপ্রদর্শক দলের নায়ক ছিলেন কায়েদ বেন আবু। দেলাক্রো এঁর একখানি সুন্দর জল-রঙ পোর্ট্রেট এঁকেছিলেন। যাত্রীদের মেক্‌নিসে রাজসমীপে যেতে দশ দিন লেগেছিল। রাস্তায় প্রত্যেক শহর থেকে শাসনকর্তারা গার্ড পাঠাতে লাগলেন। তাতে যাত্রীদলের সংখ্যা বেড়ে তাদের 'কাফেলা' একটা বিরাট শোভাযাত্রায় পরিণত হয়েছিল। 'সেবো' নদীর তীরে পৌঁছলে, তাদের নৌকো করে নদী পার করানো হয়। নদীতে পুল তৈরী হয়নি কেন জিজ্ঞাসা করলে জানানো হয় যে, শুল্ক আদায়ের জন্য দস্যু-তস্করদের ধরবার জন্য এবং বিদ্রোহীদের দমন করবার সুবিধার জনাই পুল তৈরী থেকে তাঁরা বিরত আছেন।

যখনি বিদেশ থেকে কোনো প্রতিনিধি দল দৌত্যকার্যে মেক্‌নিসে এসেছে তখনি সেখানে তুমুল হাংগামার সৃষ্টি হয়েছে। এর আগে একবার অস্ট্রিয়া থেকে একটা দল এসেছিল। তাদের নিয়ে যে হাংগামা হয় তাতে বারোটি লোক আর চোদ্দটি ঘোড়া মারা যায়। দেলাক্রোর দলটি আসাতেও প্রথমে কিছুটা সন্দেহের সৃষ্টি যে না হয়েছিল তা নয়। সম্রাটের সংগে দেখা হওয়ার আগে পর্যন্ত তাদেরকে নিজেদের কোয়ার্টারের বাইরে যেতে দেওয়া হয়নি। ২২ মার্চ তাঁরা সম্রাটের সংগে সাক্ষাৎকারের সুযোগ পান।

এই সাক্ষাৎকারের ঘটনাটি দেলাক্রোর শিল্পী মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। তিনি এর একটা বিবরণ লিখে গিয়েছেন। তিনি ফরাসি সম্রাট লুই-ফিলিপের সংগে এই মরক্কো সম্রাটের হুবহু সাদৃশ্য দেখতে পেয়েছিলেন। খুব বড়ো একটি গেট দিয়ে প্রাসাদে ঢুকতে হয়। 'গেটে' পেরেক দিয়ে আটকানো বড়ো বড়ো লোহার 'প্লেট'। গেট পার হয়ে প্রাংগণের ওপর দিয়ে তাঁরা একটি 'স্কোয়ারে' গিয়ে উপস্থিত হলেন। সম্রাট সেইখানেই তাঁদের অভ্যর্থনা করার ব্যবস্থা করেছিলেন।

**মরক্কোতে এসে তথাকার ঘোড়াগুলি দেখে দেলাক্রো বিশেষ মুগ্ধ হন। এই চিত্রে দুটি ঘোড়া ও একজন ঘোড়সওয়ার চিত্রিত হয়েছে**

...ন্‌জিয়ারে একটি ইহুদি বিবাহ। ইহুদি ও নিগ্রোরা একসঙ্গে মিলে নৃত্যগীতে মত্ত হয়ে উঠেছে

...সেই "আম্মার সেইডুনা!" অর্থাৎ আমাদের ... দীর্ঘজীবী হউন' এই বলে একটা গম্ভীর ...ধ্বনি উঠল। তারপর একটি গেট ... নিগ্রো সৈন্যেরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে ...য়ে এলো। তাদের মাথার টুপিগুলো ... এবং অগ্রভাগ সূচালো। এরপর বেরিয়ে ... বর্শা হাতে দুটি লোক। লোক দুটির ...নে এলেন সম্রাট মুলে আবদুল রহমান ... সাদা ঘোড়ায় চড়ে। একটি ক্রীতদাস ... মাথার ওপর কাঠের হাতলওয়ালা একটি ... ধরে রেখেছে। ছাতার শীর্ষভাগে একটি ...র গোলক। ছাতার ভাঁজে ভাঁজে লাল ও ... রঙের কারুকার্য। তাঁর দু'পাশে ...রি লোক লম্বা শাদা কাপড় দুলিয়ে তাঁকে ... করছে। তাঁর পিছনে সবুজ কাপড়ে ... একটি গাড়ি। তার চাকাগুলি সোনার ... দিয়ে মোড়া। ফরাসি-রাজের পত্র গ্রহণ ...র পর সম্রাট আদেশ দিলেন, প্রতিনিধি-...কে প্রাসাদের কতকগুলি কামরা দেখতে ...ো হোক। শিল্পী দেলাক্রো এখানে ...জোচিত বিপুল এবং অপরিমেয় জাঁক-...ক দেখবেন বলেই আশা করেছিলেন। কিন্তু ... পরিবর্তে দেখলেন, দৈন্য এসে যেন ...নকার সব আড়ম্বর গ্রাস করে ফেলছে। ...জা ও জানালা থেকে রঙ উঠে গিয়েছে; ... কিছুতেই যেন একটা রঙ-চটা মালিন্য। ...ডোরে ছেলেমেয়েরা দাঁড়িয়েছে। তারাও ...রা দেখতে। তাদের কাপড়-চোপড় সবই ...লা।

প্রতিনিধিদল সম্রাটকে জরির কাজ করা ...খানি কিংখাবের আসন দান করলেন। সম্রাট তার পরিবর্তে লুই-ফিলিপকে উপহার দিলেন অনেকগুলি জানোয়ার—এর মধ্যে বাঘ, সিংহ, হরিণ ও উটপাখী প্রভৃতি ছিল। একটি কৌতূহলের ব্যাপার এই ঘটেছিল যে, সম্রাট যখন লুই ফিলিপের পত্রের উত্তর দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তিনি লেখবার কাগজ চেয়ে নিলেন ফরাসিদের কাছ থেকে।

দলের অল্প কজন লোককে মেক্‌নিসের রাস্তায় ঘুরে বেড়াবার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল। শিল্পী দেলাক্রো তাদের সঙ্গে এই স্বাধীনতা পেয়েছিলেন। তিনি তথাকার পথঘাট ও বাড়িঘরের কতকগুলি জলরঙ ছবি এঁকে নিয়েছিলেন এবং তার থেকে খুব বড়ো একখানি তৈল-চিত্র প্রস্তুত করেছিলেন। চিত্রখানি ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের প্রদর্শনীতে দেখানো হয়। এই বিদেশী লোকদের প্রতি স্থানীয় লোকদের মনোভাব তেমন ভাল ছিল না। কিছু কিছু অবাঞ্ছনীয় ব্যাপারও ঘটতে লাগল। এর পর শিল্পীকে রাস্তায় বেরোতে হলে নিরাপত্তার জন্য 'গার্ড' নিয়ে বেরোতে হত।

প্রতিনিধিদল ৫ই এপ্রিল মেক্‌নিস ত্যাগ করেন। যে পথ ধরে গিয়েছিলেন, সেই পথ দিয়েই তারা ১২ই এপ্রিল তানজিয়ারে এসে পৌঁছেন। এখানে তাদের কিছুদিন থাকতে হয়।

জুন মাসে ফ্রান্সে ফিরে আসার আগে দেলাক্রো ব্যক্তিগতভাবে স্পেনে গিয়েছিলেন এবং দৌত্যপ্রতিনিধিরা সরকারীভাবে গিয়েছিলেন আলজিয়ার্স পরিদর্শনে।

৬

দেশে ফিরে এসে দেলাক্রো তাঁর বাকি জীবনে কেবল একটি মাত্র কাজই করে গিয়েছেন। মরক্কো থেকে যে সমস্ত দৃশ্য ও কল্পনা সঙ্গে করে এনেছিলেন তার থেকে ছবি আঁকতে আঁকতে তাঁর বাকি জীবন কেটে গিয়েছিল। ডেভিড যেমন প্রাচীন রোমের পদক

আলজিয়ার্সের পুরনারী। দেলাক্রোর মরক্কো সফরের একখানি মূল্যবান নিদর্শন। এর আগে আর কোনো ইউরোপীয় শিল্পী হারেমের ছবি আঁকেন নি।

আর 'বাস-রিলিফে'র মধ্যে শিল্পের আদর্শ খ্‌জে পেয়ে তাকেই তাঁর আর্টের ভিত্তি করে নিয়েছিলেন, তেমনি দেলাক্রোও মরক্কোতে তাঁর শিল্পবস্তুকে বিকাশ করার জন্য রূপের সন্ধান পেয়েছিলেন। দেশটি তাঁর মনে কতখানি দাগ কেটে রেখেছিল তা তাঁর নিজের কথায় বলছি। তিনি লিখেছেন: "দেশটির রূপ আমার নয়নপথে সর্বদা জেগে থাকবে। এই মহাজাতির নরনারীরা আমার মৃত্যু পর্যন্ত স্মৃতিপথ আলো করে দাঁড়িয়ে থাকবে। তাদেরই মধ্যে আমি পেয়েছি প্রাচীন জগতের সুবিপুল সৌন্দর্যের সন্ধান।"

দেলাক্রোর ছবিগুলো শিল্পীদের মনে একটা কৌতূহলের সৃষ্টি করে রেখেছে। এখানে সেটুকু বলেই আমরা প্রবন্ধ শেষ করব। তাঁর নোটবইগুলি দেখে সবাই মেনে নেবেন যে, আফ্রিকা সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান নিখুঁত এবং উপলব্ধি তীক্ষ্ণ। কিন্তু, যখন তিনি বড়ো বড়ো তৈলচিত্রে তা প্রকাশ করেছেন, তখন তাতে রঙের দিক থেকে বাস্তবতার কিঞ্চিৎ অভাব ঘটেছে। তিনি প্রয়োগ করেছেন 'ভেরোনীয়' আলো—গাঢ় নীল আকাশ আর অত্যন্ত রঙচঙে 'ছায়া'। কিন্তু আসলে আফ্রিকার প্রখর সূর্যালোক এমন 'ছায়া' ফেলে না। সে-সূর্যালোকের ছায়া হবে কালো আর ঘন—সে ছায়ার রঙে কোনো ঘনত্ব থাকবে না, থাকবে এক রকমের দ্যুতিময় চমক। মরক্কোর ছোট ছোট দালান আর তাদের বিধ্বস্ত কক্ষগুলির ভিতরের স্থির ছায়ার ঘনত্ব অঙ্কনে তিনি অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। মধ্যযুগের একটি মূর রাজ্যের সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে একজন ফরাসী শিল্পী ভাবে ও চিত্ত-সংবেদনে কতখানি প্রাণময় হয়ে উঠেছিলেন, বিভিন্ন চিত্রশালায় রক্ষিত তাঁর নোটবইগুলি তারই পরিচয় বহন করে আসছে।

# জীবন-তৃষা

## আর্ভিঙ্ স্টোন

অনুবাদক—অদ্বৈত মল্ল বর্মন

[ পূর্বানুবৃত্তি ]

ডেকস্ পরিবারের সবাই সেদিন ভিনসেণ্টের সঙ্গে 'সেলোনে' গেল। কিন্তু যে ডেকস্‌কে তার গৃহের উষ্ণতায় এত প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল তাকেই রাস্তায় আসার সঙ্গে সঙ্গেই কাসির ধাক্কায় এলিয়ে পড়তে দেখা গেল। তাকে মাঝ রাস্তা থেকেই বাড়ি ফিরে যেতে হল। ভিনসেণ্ট 'সেলোনে' এসে দেখল, হেনরি ডেকরূকে খোঁড়া পা টেনে টেনে আগে থেকেই হাজির। সে তখন স্টোভ জ্বালবার চেষ্টা করছে।

ভিনসেণ্টকে দেখে তার বিস্ফারিত মুখ থেকে হাসি ছড়িয়ে পড়ল। চীৎকার করে বলল, "আসুন মঁসিয়ে ভিনসেণ্ট। এই স্টোভটা আমি ছাড়া সারা ওয়াসমেসে আর কেউ ধরাতে পারে না। আমি এর নাড়ী-নক্ষত্র জানি। আগেকার দিনে এখানে আমরা যখন পার্টি দিতাম, সেই থেকে এর সঙ্গে আমার পরিচয়। স্টোভটা বেয়াড়া; কিন্তু আমার হাতে এর নিস্তার নেই। এর অন্ধিসন্ধি সব আমার জানা।"

মেয়েরা থলেয় করে যা দিয়ে গিয়েছে, তা জবজবে ভিজে—তার মধ্যে কয়লার পরিমাণ অতি কম। কিন্তু ডেকরূক তাই দিয়েই স্টোভটা গরম করে ফেলল। স্টোভ ধরিয়ে সে যখন খোঁড়া পা নিয়ে উত্তেজিতভাবে পায়চারি করছিল, তার মাথার আবে তখন রক্ত জমে তার শাদা চামড়া লাল করে তুলছিল।

ভিনসেণ্টের এই নতুন গীর্জার প্রথম বক্তৃতা শুনবার জন্য সে-রাতে পেটিট ওয়াসমেসে প্রতিটি মজুর পরিবার এসে 'সেলোনে' জমা হয়েছিল। বেঞ্চিগুলি ভরে গেলে পর কাছাকাছি যাদের বাড়ি, তারা বাড়ি থেকে বাক্স ও চেয়ার বয়ে নিয়ে এসে তার উপরে বসল। তিনশ'র ওপর লোক সেদিন ভীড় করেছিল। ভিনসেণ্টের মন সেদিন কতকগুলি কারণে আনন্দে একেবারে কানায় কানায় ভরা ছিল। মজুরদের বউ-ঝিরা সেদিন আপনা থেকে সহৃদয়তা দেখিয়ে গিয়েছে; অযাচিতভাবে তাকে কয়লা কুড়িয়ে সাহায্য করেছে; তারপর সে আজ তার নিজের মন্দিরে দাঁড়িয়ে প্রাণ খুলে মনের কথা বলতে পারবে; তাতে বরিনেজবাসীদের মুখ থেকে বিষাদের মালিন্য দূর হয়ে সে-মুখ আশায় আনন্দে ও আশ্বাসে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে।

শ্রোতাদের সম্বোধন করে ভিনসেণ্ট বলতে লাগল, "একটা পুরোনো বিশ্বাস আমাদের মধ্যে চলে আসছে; তা এই ঃ সংসারে আমরা অপরিচিতরূপে জন্ম নিই। তবু আমরা নিঃসঙ্গ নই। কেননা, পিতা আমাদের সঙ্গে আছেন। আমরা তীর্থযাত্রী। আমাদের জীবন একটি সুদীর্ঘ যাত্রাপথ—সে-পথ পৃথিবী থেকে স্বর্গ পর্যন্ত প্রসারিত।

"আনন্দের চেয়ে দুঃখ ভালো; আর পুলকের প্রাচুর্যের মধ্যেও হৃদয় থাকে বিষাদমগ্ন। উৎসবের ঘরে যাওয়ার চেয়ে শোকের ঘরে যাওয়া অনেক ভাল; কারণ বিষাদের স্পর্শে হৃদয় নির্মল ও উন্নত হয়।

"যীশুকে যারা বিশ্বাস করে, দুঃখের মধ্যেও তারা নিরাশ হয় না। তাদের সকল বেদনাকে ধন্য করে আশার আলো ফুটে ওঠে। তারা যতবার দুঃখের দহনে জ্বলবে, ততবার তারা অন্ধকার থেকে আলোকের পথে ধাপে ধাপে অগ্রসর হবে।

"পিতা, আমাদের অসত্যের কাছ থেকে দূরে রাখ, তোমার কাছে এই প্রার্থনা। তোমার কাছে আমরা দারিদ্র্যও চাই না, ধনও চাই না; জীবনযাপনের উপযোগী অন্নবস্ত্র পেলেই আমরা সন্তুষ্ট থাকব।"

সকলের আগে মাদাম ডেকরূক তার পাশে এসে দাঁড়ালো। তার চোখে আবেশ; মুখের একটা কোণ বার বার কাঁপছে। সে বলল, "মঁসিয়ে ভিনসেণ্ট, জীবনে দুঃখের বোঝা বইতে বইতে আমি ভগবানে বিশ্বাস হারিয়ে বসেছিলাম। আপনার দ্বারা সেই হারানো বিশ্বাস ফিরে পেলাম। এজন্য আপনাকে প্রাণ খুলে ধন্যবাদ জানাই।"

সকলে চলে যাবার পর ভিনসেণ্ট 'সেলোনের' ঘরের দরজায় তালা লাগিয়ে নানা কথা ভাবতে ভাবতে ডেনিসের বাড়ির দিকে চলতে লাগল। তার প্রতি লোকের আজ যে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে, তাতে অনায়াসে ধরে নেওয়া যেতে পারে, 'বরিনেজ'বাসীরা তাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করেছে এবং ঈশ্বরের বাণীপ্রচারকরূপে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করেছে। তাদের এ পরিবর্তন কিসে হল? সে এখানে নতুন একটা গীর্জা করেছে বলে? তা নয়; খনি-মজুরদের কাছে গীর্জা হওয়া-না-হওয়া সমান। সমিতি যে তাকে প্রচারকের নিয়োগপত্র দিয়েছে তা তারা জানে না, কেননা তাকে যে নিয়োগ-পত্র না দিয়েই পাঠানো হয়েছিল, একথা তো সে গোড়ায় তাদের কাছে বলেনি। তার আজকের বক্তৃতা খুবই হৃদয়গ্রাহী হয়েছে সন্দেহ নেই: কিন্তু এ কয়দিন সে ভাঙা কুঁড়ে বা খালি আস্তাবলে যেসব বক্তৃতা দিয়েছে, সেগুলিও তো কম মর্মস্পর্শী হয়নি।

ডেনিসরা সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। বেকারির পাশেই তাদের শোবার ঘর। বেকারি থেকে রুটির তাজা মিষ্টি গন্ধ বেরুচ্ছে। রান্নাঘরের কাছ ঘেঁষে একটি ছোট কুয়ো। ভিনসেণ্ট তার থেকে এক বালতি জল তুলে ওপরে এসে সাবান ও আয়না নিয়ে বসল। আয়নাটা দেয়ালে কাত করে লাগিয়ে নিজের মুখ দেখল। তার অনুমান ঠিক। ভার্নিদের বাড়িতে ধুয়ে-মুছেও মুখ থেকে কয়লার দাগ তুলতে পারেনি। তার চোখের পাতা, চোয়াল এখনো কালো হয়ে আছে। সারা মুখে কালির ছোপ নিয়েই সে আজ নতুন মন্দিরে উপাসনা করে এসেছে। একথা ভেবে তার হাসি পেল। তার বাপ ও খুড়ো স্ট্রিকার তাকে আজ এ অবস্থায় দেখলে কেমন আশ্চর্য হয়ে যেতেন।

সে ঠাণ্ডা জলে হাত ডুবিয়ে সাবান ঘসে ফেণা বের করে মুখে মাখতে যাবে, এমন সময় তার কি একটা কথা মনে পড়ে গেল, ভিজে হাত মাঝপথে থেমে রইল তার। আবার সে আয়নার মধ্যে তাকালো। দেখল, স্তূপের সেই কালো কয়লার গুড়ো তার কপালের রেখায় রেখায়, চোখের পাতাগুলিতে, দুটি গালের নীচে, আর গোল চিবুকের সবটাতে দাগ বসিয়ে দিয়েছে।

সে জোরে বলে উঠল, "এতক্ষণে বুঝলাম তারা কেন আমাকে আপন মনে করেছে। শেষকালে সত্যি আমি তাদেরই একজন হয়ে গিয়েছি।"

হাত দুটি জলে চুবিয়ে মুছে ফেলল, সে হাত আর মুখে লাগাল না। এর পর থেকে যতদিন সে 'বরিনেজ' ছিল, প্রতিদিন মুখে কয়লার গুড়া ঘষত, যাতে আর দশজনের থেকে সে আলাদা না হয়ে যায়; তাকে যে লোকে নিজেদের সঙ্গে এক করে নিতে পারে

১২

পর দিন শেষরাতে ভিনসেণ্ট আড়াইটার সময় ঘুম থেকে উঠে ডেনিসদের রান্নাঘরে বসে একটুকরো শুকনো রুটি খেয়ে বেরুল, তারপর দরজাতে যখন জেকস্-এর সঙ্গে তার দেখা হল, তখন পৌণে তিনটে বাজে। রাতে খুব বরফ পড়েছে। মার্কাসি যাওয়ার পথ বরফে ঢাকা পড়ে গিয়েছে। দুজনে ময়দানে নেমে খনির কালো চিমনি ও স্তূপে লক্ষ্য করে চলতে লাগল। ভিনসেণ্ট দূর থেকেই দেখতে পেল খনি-মজুররা বরফের উপর দিয়ে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে চলেছে। অসংখ্য জীব। যেমনি কালো তেমনি ছোট দেখাচ্ছে। একই বাসায় ঢোকবার জন্যে চারদিকে তাড়াহুড়ো করে এগিয়ে আসছে। ভয়ানক ঠাণ্ডা। মজুররা গায়ের পাতলা কালো কোট চিবুক পর্যন্ত টেনে দিয়েছে। গরমের আশায় দুটি কাঁধ ভিতরের দিকে কুঁচকানো।

জেক্স তাকে প্রথমে একটা ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে তাকের উপর অনেকগুলি কেরোসিনের বাতি ঝোলানো। এক একটা নম্বরের নীচে এক একটা বাতি ঝুলছে। জেকস বলল, এখান থেকে এক একটা বাতি নিয়ে মজুরদল নীচে নামে। নীচে যখন কোন দুর্ঘটনা হয়, এখানকার নম্বর দেখে আমরা বলতে পারি কারা বিপদে পড়েছে।"

মজুররা ক্ষিপ্র হাতে বাতি তুলে নিয়ে, বরফ-ঢাকা প্রাঙ্গণ পেরিয়ে একটা ইঁটের ঘরে গিয়ে ঢুকল। সেখান থেকে নীচে নামতে হয়। ভিনসেণ্ট ও জেকস্ মজুরদের দলে ভিড়ে গেল। যে 'খাঁচায়' করে নীচে নামতে হয়, তাতে উপরি উপরি ছ'টা কুঠরী। প্রত্যেক কুঠরীতে একটা করে কয়লার 'ট্রাক' খনি থেকে উপরে তোলা যায়। একটা কুঠরীতে হাঁটু ভেঙে বসলেও মাত্র দুজন মজুর বসতে পারে। কিন্তু সে জায়গাতে পাঁচজনে বসে এক গাদা কয়লার মতোই ঠেসাঠেসি করে তারা নীচে নামতে থাকে।

জেকস্ একজন ফোরম্যান বলে, সে, ভিনসেণ্ট ও একজন সহকারী—মাত্র এই তিনজনে ওপরের কুঠরীটা দখল করল। হাঁটু ভেঙে উবু হয়ে বসল তারা। দু'পায়ের আঙুলে দুপাশ থেকে চাপ পড়ছে। উপরে তারের ঘের দেওয়া। মাথা ঠেকে আছে সেখানে।

জেকস্ বলল, "মসিয়ে ভিনসেণ্ট, হাত দুটি সোজা করে সামনের দিকে রাখবেন। হাত যেন দেওয়ালে না লাগে। লাগলে তক্ষুনি সে হাত চিরদিনের জন্য হারাতে হবে।"

একটি সংকেত হওয়া মাত্রই "খাঁচা"টা দুখানা ইস্পাতের ঠেকনায় ভর করে তীরের বেগে নীচে নামতে লাগল। যে পথ দিয়ে 'খাঁচা' নামছে, তার পরিসর খাঁচার আয়তন থেকে আধ ইঞ্চির বেশি বড় নয়। আধ মাইল নীচে এক পাতাল-পুরী। কালি-ঢালা আঁধারে ঢাকা তার পথ। কিছু একটা যদি ঘটে যায়, তাহলে মৃত্যু নিশ্চিত। এই কথা ভেবে ভিনসেণ্ট ভয়ে কেঁপে উঠল। এই কালো গর্তের মধ্যে দিয়ে এক অজানা, অচেনা অতল আঁধারের বুকে ছুটে চলেছে। তার মনে এক অজানা আতঙ্ক। তাতে তার আপাদমস্তক কেঁপে উঠল। তবে সে বুঝতে পারল ভয়ের তেমন কারণ নেই, কেননা এই নামার পথে গত দু'মাস থেকে কোন দুর্ঘটনা ঘটে নি। তাই তেমন ভয় নেই। কিন্তু ভিতরের কেরোসিনের বাতিটা কাঁপছে। তার দিকে তাকালে মনে হয়, তেমন ভরসাও নেই।

তার ভয়ের কথা জেকস্‌কে জানালো। জেকস্ কেবল সহানুভূতির ভংগীতে একটু হাসল। বলল, "এমন ভয় প্রত্যেক মজুরেরই হয়ে থাকে।

"কিন্তু তারা রোজ রোজ নীচে নামে। এ ভয় তাদের গা-সহা হয়ে গিয়েছে।"

"না, হয় নি। এক দুর্জয় আতঙ্কের ভাব সব সময়ে তাদের আচ্ছন্ন করে রাখে। এই 'খাঁচা'র ভয় তাদের মরণের দিন পর্যন্ত ছায়ার মতো অনুসরণ করে।"

"আচ্ছা মশাই, আপনার নি: কেমন লাগছে বলুন তো?"

"আপনি যেমন ভিতরে ভিতরে কাঁপছেন, তেমনি আমিও কাঁপছি। আমি তেত্রিশ বছর ধরে খনিতে নেমে আসছি। তবু কাঁপছি।"

সাড়ে তিনশ' মিটার বা অর্ধেক রাস্তা যাওয়ার পর 'খাঁচা' এক মুহূর্ত থামল। তারপর একটা ঝাঁকুনি খেয়ে আবার নীচে নামতে লাগল। গর্তের চারপাশ থেকে স্রোতের মতো জল বেরুচ্ছে। দেখে ভিনসেণ্ট আবার ভয়ে কেঁপে উঠল। উপরের দিকে তাকিয়ে এককণা দিনের আলো দেখতে পেল— আকাশের একটা তারা দেখতে যতটুকু, ঠিক ততটুকু। সাড়ে ছ'শ মিটার যাওয়ার পর তারা বেরুলো। কিন্তু মজুররা বেরুলো না। তারা আরো নেমে চলল। ভিনসেণ্টরা যেখানে নামল, সেটা একদিক খোলা একটা প্রশস্ত গহ্বর। কয়লার পাথর আর কাদামাটি কেটে কেটে পথ করা হয়েছে। ভিনসেণ্ট ভেবেছিল একটা গরম নরককুণ্ডে বুঝি সে ডুবে যাবে। কিন্তু না, তার অনুমান ঠিক নয়। ঢুকবার রাস্তাটা খুবই ঠাণ্ডা।

তার খুশি উপচে উঠল: "ও মশাই ভার্নি, এ তো খুব ভালো জায়গা। খারাপ কিসে শুনি?

'না, খরাপ নয়। কিন্তু এই স্তরে মজুররা কাজ করে না তো। এই স্তরের কয়লা অনেক আগেই নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। এখানে আমরা উপর থেকে হাওয়া পাচ্ছি। মজুরর কাজ করে নীচে। এ হাওয়া তাদের কোন কাজে আসে না।"

গহ্বরের ভিতর দিয়ে তারা হেঁটে চলল। প্রায় সিকি মাইল যাওয়ার পর জেকস্ মো ঘুরল। বলল, "আমার পিছু পিছু আসুন মসিয়ে' ভিনসেণ্ট। জানেন, বিপদ এখানে হাত ধরাধরি করে চলে; আপনি যদি পা ফস্‌কে পড়ে যান, তাতে কেবল আপনিই মারা যাবেন না, আমরাও মারা যাব।"

ভিনসেণ্টের চোখের সামনেই জেকস্ অদৃশ্য হয়ে গেল। ভিনসেণ্ট পা টিপে টিপে সামনে এগুতে গিয়ে মাটিতে একটা গর্তের মতো পথ পেয়ে গেল। তারপর হাতড়াতে হাতড়াতে ধরবার মই পেল। গর্তটা যে রকম প্রশস্ত, তাতে একটা কৃশ লোক অনায়াসে তার মধ্যে দিয়ে হেঁটে যেতে পারে। প্রথম পাঁচ মিটার যেতে তেমন কষ্ট হয় নি। কিন্তু অর্ধেক রাস্তার পর যে চিহ্ন দেওয়া আছে, তার ওপারে পা দিয়েই হঠাৎ পিছন দিকে ঘুরতে হল। এখান থেকে উল্টো দিক দিয়ে নামতে হবে। পাথর চুঁইয়ে ঝির ঝির করে জল পড়তে শুরু করেছে। মইয়ের জোড়াগুলি কাদায় ঢাকা পড়ে গিয়েছে। ওপর থেকে চোঁয়ানো জল ভিনসেণ্টের গায়ের উপরেও পড়ছে।

(ক্রমশঃ)

শ্চিম বঙ্গের বহু সমস্যার মধ্যে তাহার অন্ন সমস্যাদি যে সর্বাপেক্ষা রুক, তাহা বলা বাহুল্য। গত ১৩ই মাঘ অর্থাৎ প্রায় ১৬ মাস পশ্চিম বঙ্গের প্রধান সচিবের লাভের পরেই ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এই : গুরুত্ব উপলব্ধি ও স্বীকার করিয়া ছিলেন—

মানার মত এই যে, বর্তমানে লোক যে ৮ আউন্স মাত্র খাদ্যোপকরণ পাইতেছে, স্থানে প্রত্যেকের ১৬ আউন্স পাওয়া না।"

থাৎ রেশনে সরকার যে খাদ্যোপকরণ করিয়াছেন, তাহার দ্বিগুণ না পাইলে স্বাস্থ্য রক্ষা করা সম্ভব নহে। প্রয়োজন অল্প খাদ্যে লোকের স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ রোগ বৃদ্ধি পায়—জাতি ধ্বংসের পথে হয়। কিন্তু গত ১৬ মাসে—এত ফসল পাইলেও সরকার রেশনে ঐ ১৬ আউন্স করণ দিতে পারেন নাই। কাজেই র মনে বরাবরই প্রশ্ন উদিত হয়—বহু রেশনিং ব্যবস্থা রাখিবার কি কোন আছে। গান্ধীজী যে ঐ ব্যবস্থার করিয়া ফল দেখিতে বলিয়াছিলেন, গণ তাহাও করেন নাই। অথচ কি , তাহা কয় দিনের ব্যবধানে ২টি বিচারকদের মন্তব্যে প্রকাশ ছে :—

১) শেখ ঈশাক ডায়মণ্ডহারবার হইতে ১০ সের চাউল আনিবার অপরাধে হয়। সে ২৪শে এপ্রিলের ঘটনা। ৪ দিন হাজতে রাখিবার পরে ২৮শে তাহার মামলা হইলে বিচারক—জেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীবিজয় মুখোপাধ্যায় ৪ পয়সা জরিমানা করিয়া মন্তব্য :—

ক) "আমি যতই এই শ্রেণীর মামলা ছি, ততই আমার মনে হইতেছে, যে সকল স্ত্রীলোক ও পুরুষ কলিকাতার অধি-গের উপকার করিতেছে—তাহাদিগকেই তে হইতেছে।"

"আমরা (সরকারের ব্যবস্থায়) যে কিনিতে বাধ্য হই, তাহার নিকৃষ্টতার ছাড়িয়া দিলেও বলিতে হয়, তাহাতে সপ্তাহকাল আহার চলে না।...... ব্যক্তির মত লোক যদি এইভাবে চাউল বিক্রয় না করিত, তবে কলিকাতাবাসী কেই সপ্তাহে ২ দিন অন্নাভাব ভোগ হইত।"

তনি যে ঈশাককে তাহার চাউল ফিরাইয়া আদেশ করিয়াছিলেন, তাহার কারণ কাহারও বিলম্ব হইবে না।

২) বিনা ছাড়ে ২০ সের চাউল রাখায় পুরের স্পেশ্যাল ম্যাজিস্ট্রেট শ্রী এন সি গঙ্গোপাধ্যায় গত ২০শে বৈশাখ কলিকাতার কোন অধ্যাপকের পাচক হরিহর মিশ্রকে এক টাকা জরিমানা করিয়াছেন। সংক্ষেপে প্রকাশ, গত ২০শে এপ্রিল পূর্ববঙ্গ হইতে ১৫ জন লোক অধ্যাপকের গৃহে উপনীত হয়; সেইজন্য অধ্যাপক মিশ্রকে বাদলপুরে চাউল কিনিতে পাঠাইয়াছিলেন। চাউল লইয়া ফিরিবার সময় সে গ্রেপ্তার হয়। রায়ে, বিচারক মন্তব্য করেন —চোরাকারবার বন্ধ করা ও প্রকৃত অপরাধী-দিগকে দণ্ডদান করাই নিয়ন্ত্রণ আদেশের উদ্দেশ্য।......অনিবার্য কারণে, একান্ত প্রয়োজনে সেই আদেশ লঙ্ঘন দয়াদ্যোতক দণ্ডের উপযুক্ত।" অপরাধ তুচ্ছ বলিয়া বিচারক মিশ্রকে এক টাকা জরিমানা করেন। তিনিও সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ দেন চাউল বা চাউলের বিক্রয়লব্ধ অর্থ মিশ্রকে দিতে হইবে।

এই ঘটনায় অনেকেরই ফরাসী লেখক পল ... "এক বাটি দুধের জন্য" গল্পটি মনে পড়িবে। স্ত্রীর পথ্যের জন্য যে দরিদ্র অনন্যোপায় হইয়া এক বাটি দুধ দুগ্ধ বিক্রেতার পাত্র হইতে "চুরি" করিয়াছিল, সে কাঠগড়ায় দণ্ডিত হইয়া আত্মহত্যা করিবার সময় মানুষের নির্দয় বিচারের প্রতিবাদ করিয়াছিল আর তাহার রুগ্ন পত্নীও ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছিল।

বিধানবাবু বলিয়াছিলেন — সরকারের ব্যবস্থায় লোক যে খাদ্যোপকরণ পায়, তাহার স্বাস্থ্যের জন্য তাহার দ্বিগুণ প্রয়োজন। আর প্রথম মোকদ্দমায় বিচারক বলিয়াছেন—আইনের দৃষ্টিতে চুরি করিয়া আনা চাউল না পাইলে কলিকাতায় অনেককেই সপ্তাহে ২ দিন অনাহারে থাকিতে হয়। এই উভয় উক্তি হইতে অবস্থার ভয়াবহতা বুঝিতে পারা যায়। বিচারক বলিয়াছেন—যাহারা আইনের মতে চুরি করিয়া কলিকাতায় চাউল আনিয়া বিক্রয় করে, তাহারা কলিকাতাবাসীর উপকারই করিতেছে।

এই উক্তির উত্তরে বলিবার কি আছে বা থাকিতে পারে?

এখন অবস্থা এইরূপ তখন কি রেশনিং ব্যবস্থার বিষয় পুনরায় বিবেচনা করা সঙ্গত নহে?

পশ্চিম বঙ্গ সরকার যে খাদ্যোপকরণ বৃদ্ধির কোন উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই, তাহা তাঁহারাও অস্বীকার করেন না। যদি পশ্চিম বঙ্গে পতিত জমি না থাকিত, যদি পশ্চিম বঙ্গ মরুভূমি পর্যায়ভুক্ত হইত এবং তাহাতে অধিবাসীদিগের আহার্যের জন্য বিদেশের উপর নির্ভর করিতেই হইত, তবে আমরা সরকারের কাজের সমালোচনা অনাবশ্যক বাহুল্য বলিয়া বিবেচনা করিতাম। কিন্তু অবস্থা অন্যরূপ। জমির অভাব নাই, উৎপাদন বৃদ্ধিরও উপায় যে নাই, তাহা নহে। অভাব—ব্যবস্থার। আমাদিগের আশঙ্কা হয়, যেভাবে কাজ হইতেছে তাহাতে পশ্চিম বঙ্গের অন্নাভাব কোনদিন দূর হইবে না—জন-সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বর্ধিতই হইবে। আমরা আজ ২টি উদাহরণ দিব—একটি কলিকাতার উপকণ্ঠের, একটি জলপাইগুড়ীর।

(১) কলিকাতায় পূর্ববঙ্গাগত হিন্দু-দিগের সংখ্যা বৃদ্ধি কতকগুলি ব্যবসায়ীর লাভের লোভ ... বাড়াইয়াছে। যে কেহ ২৪ পরগণা জিলায়—টালিগঞ্জ হইতে ৪।৫ মাইলের মধ্যে গড়িয়া হইতে বোড়াল রোডে অগ্রসর হইলে দেখিতে পাইবেন কলিকাতার নিকটে—চাষের জমি ভরাট করিয়া তাহাতে বাসের "কলোনী" রচনা করিয়া লাভবান হইবার জন্য ঐ স্থান হইতে প্রতিদিন শতাধিক লরীতে মাটি আনিয়া ফেলা হইতেছে। ইহাতে কলি-কাতা-সংলগ্ন চাষের জমি বাসের জমিতে পরিণত করিয়া কতকগুলি ধনীর লাভ হইতেছে বটে, কিন্তু চাষের জমির পরিমাণ হ্রাস হইতেছে। কেবল তাহাই নহে। যে স্থান হইতে চাষের জমি নষ্ট করিয়া গর্ত খনন করিয়া মাটি আনা হইতেছে সে স্থানেও চাষের জমি কমিয়া যাইতেছে—গর্ত খননের ফলে অস্বাস্থ্যকর অবস্থার উদ্ভব হইতেছে।

(২) গত ৪ঠা মে জলপাইগুড়ী হইতে পরিবেশিত সংবাদে প্রকাশ, জিলার চা-বাগান অঞ্চলে আবাদযোগ্য "পতিত" জমির পরিমাপ জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২৪ দল কর্মচারী পাঠাইয়াছেন। প্রত্যেক দলে একজন কানুনগো ও ২ জন জরিপকারী থাকিবেন। কিন্তু জলপাইগুড়ী শহর হইতে ৮।১০ মাইলের মধ্যে যে বাসের জন্য সরকার অনেক চাষের জমি লইতেছেন, তাহার কারণ কি? সেই জমিতে বোরো ধানের ফলন খুব ভাল হয় এবং সেই কারণে বহু কৃষক তথায় মাচার উপর কুটীর নির্মাণ করিয়া বাস করে। পশ্চিম বঙ্গ সরকার যদি নিরপেক্ষভাবে অনুসন্ধান করেন, তাহা হইলে এই জমি গ্রহণের রহস্য অতি সহজেই ভেদ করিতে পারিবেন। আমরা যে সংবাদ পাইয়াছি তাহাতে গান্ধীজীর প্রিয় শিষ্য নির্মল বসু মহাশয়ও জিজ্ঞাসা করিলে এই রহস্য ভেদে সহায় করিতে পারেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার বঙ্গলার বাহির হইতে গরু আনিয়া কলিকাতায় কিছু দুগ্ধ সরবরাহ করিবার যে পরিকল্পনা করিয়াছেন, তাহার আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখাইয়াছি, এই কার্যে যে অর্থ ব্যয় হইবে তাহা অপব্যয়ে পরিণত হইবার সম্ভাবনাই অত্যন্ত অধিক। কারণ

**তাহাতে পশ্চিমবঙ্গের কোন উল্লেখযোগ্য উপকার হইবে না—কলিকাতায় দুগ্ধ সরবরাহও উল্লেখযোগ্য হইবে এমন নহে। নিখিল ভারত গো-**সেবা সমাজের সভাপতি শেঠ গোবিন্দ দাস কিছুদিন পূর্বে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। গত ৬ই মে তিনি দিল্লী হইতে যে বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে তিনি আমাদের মতেরই সমর্থন করিয়াছেনঃ—

(১) বাঙলার বাহির হইতে যে সকল গবী দুগ্ধের জন্য প্রতি বৎসর কলিকাতায় নীত হয়, সেগুলি প্রায়ই ৬।৭ মাস পরে (অর্থাৎ তাহাদিগের দুগ্ধ কমিলেই) 'কষাইদিগকে' বিক্রয় করা হয়। যাহাতে দেশের এই ভয়াবহ অর্থনীতির ক্ষতি নিবারিত হয়, অবিলম্বে তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

(২) বাঙলার বাহির হইতে গবী আমদানী বন্ধ করা কর্তব্য। কেননা, বাঙলার জলবায়ুতে সে সকলের অধিকাংশ উক্তের রোগে অকর্মণ্য হইয়া যায়। সুতরাং বাঙলার গরু বাছাই করিয়া বা অন্যান্য জাতীয় ষণ্ডের দ্বারা বাঙলার গরুর উন্নতি সাধন করা প্রয়োজন। গান্ধীজীর নির্দেশে ওয়ার্ধায় যে পরীক্ষা হইয়াছে, তাহার ফলে স্থানীয় গরুর বিশেষ উন্নতি সাধন সম্ভব হইয়াছে—দুগ্ধের পরিমাণ দৈনিক এক সের হইতে ৭ সেরও হইয়াছে। বাঙলার পরলোকগত কুমার শরৎকুমার রায় এইরূপ পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। কলিকাতায় শ্রীবিজয়কৃষ্ণ মজুমদার কৃত্রিম উপায়ে প্রজনন দ্বারা দেশীয় গবীর শাবকের বিশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছেন। শ্রীরাজেন্দ্রকৃষ্ণ দত্তের কাজ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(৩) নানা প্রদেশে সরকার গোশালাসমূহের জমি সংগ্রহে সাহায্য করিয়াছেন। আর পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলিকাতা পিঁজরাপোল সোসাইটীর গোবর আপনারা লইতেছেন।

(৪) হরিণঘাটায় পশ্চিম বঙ্গ সরকার ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন — এক ছটাক দুগ্ধ পাওয়া যায় নাই। তাঁহারা যদি আবার ৫ শত হরিয়ানা, সাহিওয়াল ও থারপারকার গরু তথায় আমদানী করেন, তবে আরও কয় লক্ষ টাকার অপব্যয় মাত্র হইবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কি এ বিষয়ে অবহিত হইবেন?

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগ এক বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন যে, ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে নানা কারণে ডাকঘরে সরকারী কুইনাইন বিক্রয়ের যে ব্যবস্থা বাতিল করা হইয়াছিল, তাহা আবার প্রবর্তিত করা হইয়াছে। প্রচার বিভাগ যদি কাজের অভাবে অত্যন্ত পুরাতন সংবাদ এইভাবে নূতন করিয়া প্রচার করেন, তবে তাহাতে সরকারের প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। এক মাসের অধিককাল পূর্বেই **ডাকঘরে সরকারী কুইনাইন বিক্রয়ের ব্যবস্থা আরম্ভ হইয়াছে এবং পল্লীগ্রামের লোকের সে সংবাদ পাইতে বিলম্ব হয় নাই। প্রচার বিভাগ** পশ্চিমবঙ্গের লোকের অনেক উপকার করিতে পারেন; কিন্তু যদি বিভাগের বিবৃতির সহিত প্রধান-সচিবের বিবৃতির সামঞ্জস্য না থাকে, তবে তাহা কি পরিতাপের বিষয়ই হয় না?

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান সচিব ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় আপনার চক্ষুর চিকিৎসার জন্য বিদেশে যাইতেছেন। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে কে প্রধান সচিবের কার্যভার বহন করিবেন, তাহা এখনও জানা যায় নাই। কিরণশঙ্কর রায়ের মৃত্যুর পরে স্বরাষ্ট্র বিভাগের যে অংশের কাজ তিনি করিতেন সে অংশের জন্য কোন সচিব নিযুক্ত করা হয় নাই। তাহা হ্যামলেটের যুক্তির জন্য কিনা, বলা যায় না—

"Thrift, thrift, Horatio!" যদি সচিবসংখ্যা হ্রাসে কাজের ক্ষতি না হয়, তবে হ্রাসই কি সমর্থনযোগ্য নহে?

পশ্চিমবঙ্গে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে দলাদলি শেষে যেভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহা দুঃখের বিষয়। গত ৬ই মে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির একশত ৭ জন সদস্য গত আগষ্ট মাসে নির্বাচিত কার্যকরী সমিতির ও কর্মকর্তাদিগের অপসারণ বিষয় বিবেচনা করিয়া নূতন সমিতি ও কর্মকর্তা নির্বাচনের জন্য সভা আহ্বান করিতে বলিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন—

সংগঠন ও সেবাকার্যের উন্নতি সাধনের জন্য কার্যকরী সমিতির পরিবর্তন প্রয়োজন।

ঐ পত্রে স্বাক্ষরকারীদিগের পক্ষে শ্রীঅমরকৃষ্ণ ঘোষ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদককে লিখিয়াছেন, স্বাক্ষরকারী একশত ৭ জন ব্যতীত কমিটির আরও একশত ২০ জন সদস্য ঐ পত্রের উদ্দেশ্য সমর্থন করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হইবে; সেইজন্য স্বাক্ষরকারীরা ও তাঁহাদিগের সমর্থনকারীরা ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন যে, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনের পরেই (৩১শে মে হইলেই ভাল হয়) যেন কলিকাতায় কোন নিরপেক্ষ স্থানে যেন প্রস্তাবিত সভার অধিবেশনের ব্যবস্থা করা হয়।

এই পত্রের নকল নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সম্পাদকের নিকটেও প্রেরণ করা হইয়াছে। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি বা কংগ্রেসের পরিচালকগণ কোনরূপ মীমাংসা করিবার চেষ্টা হয়ত করিবেন। কিন্তু যখন মতভেদ ও অসন্তোষ প্রবল হয়, তখন তাহা বৃক্ষের কোটরস্থ বহ্নির ন্যায় শেষে সমগ্র বন দগ্ধ করিতেও পারে।

পশ্চিমবঙ্গে ইহার মধ্যেই একবার সচিব-**সঙ্ঘ পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে** এবং সকলে **জানেন, তাহার পরে যে** সচিবসঙ্ঘ **হইয়াছেন, তাহার পতন ঘটাইবার** জন্য ২ চেষ্টা হইয়া গিয়াছে—এবার তৃতীয় উপক্রম কিনা কে বলিবে?

বার বার সচিবসঙ্ঘ পরিবর্তন কোন কোন সময়েও অভিপ্রেত নহে; যে দেশে শাসন প্রবর্তিত হয়, সে দেশে তাহা কারণ। কারণ সে দেশে সচিবদিগকে অর্জন করিতে হয়। তাঁহাদিগের অনেক অজ্ঞতাসঞ্জাত। কিন্তু অজ্ঞতার সঙ্গে ঔদ্ধত্য ও ক্ষমতাপ্রিয়তা মিশ্রিত হয়, তখন দুর্নীতির আকর হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা থাকে। কংগ্রেসের মধ্যে যে ক্ষমতাপ্রিয়তা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, তাহা কংগ্রেসের পরিচালকগণই দিনের পর দিন স্বীকার করিতেছেন এবং সেজন্য শঙ্কা প্রকাশ করিতেছেন। ত্যাগে—বহু সাধনায় জাতি যে অধিকার অর্জন করিয়াছে, তাহার প্রতিনিধিদিগের ত্রুটিতে তাহা মরীচিকায় পর্যবসিত হয়, তবে সে দুঃখ রাখিবার স্থান আর থাকিবে না।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্মচারীদিগকে বিষয়ে সতর্ক করিয়া এক পত্র প্রচার করিয়াছেন। তাহাতে বলা হইয়াছে, যদিও সরকার কর্মচারীদিগের ব্যক্তিগত অভ্যাসে হস্তক্ষেপ করিতে চাহেন না, তথাপি তাঁহাদিগকে সতর্ক করা প্রয়োজন মনে করিতেছেন। তাঁহারা যেন ব্যবহারে ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন না করেন সরকার আশা করেন, "সরকারী চাকরীয়া মদ্যপানে মত্ত অবস্থায় জনগণের নিকট উপস্থিত হইবেন না; তাঁহাদিগের অনুষ্ঠিত সরকারী বা আধা সরকারী অনুষ্ঠানে মদ্য দিবেন না; হোটেল প্রভৃতি সকল স্থানে লোক আহারাদির জন্য সমবেত হয় সে সকল স্থানে প্রকাশ্যভাবে মদ্য পান করিবেন না।" দ্বিতীয় দফা এই যে, সরকার জানিয়াছেন, কোন কোন সরকারী কর্মচারী যেভাবে যান ব্যবহার করেন, তাহা অসঙ্গত। তাঁহারা যেন ভাড়া না দিয়া কোন সাধারণ ব্যবহার্য যানে গতায়াত না করেন। খাদ্যদ্রব্যের জন্য যেন উপযুক্ত মূল্য ও কাজের জন্য পারিশ্রমিক প্রদান করেন—বিনামূল্যে খাদ্যদ্রব্য বা কাজ গ্রহণ না করেন। কতদূর প্রবল ও ব্যাপ্ত হইলে সরকার এইরূপ ঘোষণা করিতে হয়, তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায়। আমরা শুনিয়াছি, ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ পশ্চিমবঙ্গের প্রধান সচিব ছিলেন, সেই সময় তিনি টেলিফোনে সংবাদ পাইয়াছিলেন, সার্কুলার রোডে কোন চক্ষু গৃহে কলিকাতার পুলিশের কোন কোন কর্মচারী মদ্যপানের আড্ডা জমাইয়াছেন। কোন সরকারী কর্মচারী যদি ব্যবহারে ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন করেন, তবে কি তাঁহাকে অপসারিত করাই সঙ্গত নহে?

**ম**দ্রাবাদ বিতর্কের প্রয়োজন আর নাই একথা ঘোষণা করিয়াছেন স্বয়ং নিজাম র। কিন্তু মায়ের চেয়ে যিনি বেশী সেন তিনি অর্থাৎ জনাব জাফরুল্লা স্থির করিয়াছেন যে, উনোতে এই প্রসঙ্গ করিবেন। খুড়ো বলিলেন,—"আশা নয় নাই তর্কের অভ্যাস।"

*　　*　　*

নাব লিয়াকৎ আলি বিলাতে প্রচার করিয়া আসিয়াছেন—Pakistan is ...ially sounder than India. ...মন্তব্য করিল, "দেনা শোধের টাল- ...তাহলে নেহাৎই মহাজনকে ফাঁকি ...র মতলব ছাড়া কিছু নয়।"

*　　*　　*

**পা**কিস্থান গণপরিষদের সদস্য মৌলানা ...বির আমেদ বলিয়াছেন,—আমরা ...শের তল্পিবাহী হইয়া পড়িয়াছি। "আমরা ... সম্বন্ধে নতুন কিছু শুনবো বলে ...করেছিলাম"—বলিলেন জনৈক সহযাত্রী।

*　　*　　*

**সর্দার** প্যাটেল বলিয়াছেন,—কংগ্রেস-কর্মীরা মধুলুব্ধ মৌমাছির মত ...রের লোভে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। বিশু-...রা বলিলেন,—"কিন্তু মন্ত্রীই যদি না হওয়া ...তবে মিছে জেলে যাওয়া ভাই, মিছে ...পোষাকী-খদ্দর!"

*　　*　　*

**পশ্চিমবঙ্গ** সরকারের হরিণঘাটার দুগ্ধ প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে শেঠ গোবিন্দদাস ...য়াছেন,—সেখানে এ পর্যন্ত পঞ্চাশ ...ধিক টাকা ব্যয় করা হইয়াছে, কিন্তু এখনো ...কোটা দুধের সংস্থান হয় নাই। "কিন্তু ...ঠজী বোধ হয় জানেন না আমাদের নীতি ...আদা। দুধ না খাই গৌ ভি আচ্ছা, কিন্তু ...তে হলে কামধেনুর। আর কামধেনু সংগ্রহে একটু বিলম্ব বা ব্যয়বাহুল্য এমন হয়েই থাকে"—বলিলেন এক সহযাত্রী।

*　　*　　*

**নিলাম** পশ্চিমবঙ্গ সরকার চুরি, ডাকাতি, হত্যা প্রভৃতির অপরাধীদের ধরিবার জন্য একটি আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ক্রয় করিয়াছেন। কিন্তু মুনাফা শিকারীরা এই যন্ত্রে ধরা পড়িবে কি না তা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না।

*　　*　　*

**সরকারী** দুর্নীতি দমন বিভাগ প্রায় শতাধিক অপরাধী কর্মচারীর নামের তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন। জনৈক সহযাত্রী এই প্রসঙ্গে আমাদিগকে পূর্ববঙ্গের একটি প্রবাদ বাক্য শুনাইলেন—"হাটের মাঝে ঢিল পড়ে, অভাগারাই শুধু মরে!"

*　　*　　*

**অন্য** এক সংবাদে প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার সরকারী কর্মচারীদিগকে প্রকাশ্যে মদ্যপান করিতে নিষেধ করিয়াছেন। "অপ্রকাশ্যে মদ্যপান নিষিদ্ধ হয়নি বলে কর্মচারীরা নিশ্চয়ই সরকারের সুখ্যাতি করছেন"—বলা বাহুল্য, মন্তব্যটি খুড়োর।

*　　*　　*

**বিশু**খুড়োকে হিন্দু মহাসভার সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত রাজনীতিতে যোগদানের সংবাদ পাঠ করিয়া শুনাইলাম। খুড়ো চোখ বুজিয়া বলিলেন,—"সংবাদটা আবার পড়তো শুনি, মনে হচ্ছে যেন ছাপার ভুল আছে, ওটা রাজনীতি না হয়ে হয়ত মন্দিরনীতি হবে!"

*　　*　　*

**খাদ্যমন্ত্রী** শ্রীযুক্ত জয়রামদাস দৌলতরাম বলিয়াছেন যে, ভারত আগামী ১৯৫১ সাল হইতে খাদ্য ব্যাপারে স্বাবলম্বী হইবে। "সেই জন্যই সরকার বুঝি উঠে-পড়ে পাকা হতুকী চাষে লেগে গিয়েছেন"—মন্তব্য বলা বাহুল্য খুড়োর, কিন্তু সরকারের পাকা হরিতকী চাষের খবর তিনি কোথায় সংগ্রহ করিয়াছেন তা একমাত্র তিনিই জানেন।

*　　*　　*

**প্রসংগত** একটি সংবাদ মনে পড়িয়া গেল। বিগত মহাযুদ্ধের সময় একদল সৈন্য নিজেদের শিবির হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। তাদের প্রতি সামরিক কর্তৃপক্ষের একটি নির্দেশ ছিল—Anything the monkeys eat will be safe for you. বিশুখুড়ো বলিলেন,—"সংসার যুদ্ধে যারা সহজ জীবন-যাত্রার পথ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে তাদের প্রতিও কর্তৃপক্ষের নির্দেশ প্রায় অনুরূপ—"Anything the goats eat will be safe for you."

*　　*　　*

**রুমানিয়ার** এক সংবাদে প্রকাশ, সেখানকার কোন এক গ্রামের প্রায় দুইশত অধিবাসী নাকি জনৈক পাদ্রীর সাহায্যে স্বর্গে বসিবার আসন বুক করিয়া রাখিয়াছেন। "ট্রামে-বাসের আসন অগ্রিম বুক করার ব্যবস্থা থাকলে আমরা স্বর্গের আগে এই আসনটাই বুক করতাম"—বাসের পা-দানে ঝুলিতে ঝুলিতে মন্তব্য করিলেন জনৈক যাত্রী।

*　　*　　*

**কোন** এক ব্যক্তির সম্বন্ধে বিদ্রূপাত্মক সমালোচনা করায় ফরাসী দেশের জনৈক সাংবাদিককে নাকি "ডুয়েল" লড়িতে হইয়াছে। বিশুখুড়োকে এই সংবাদ শুনাইলে তিনি গম্ভীর হইয়া বলিলেন,—"আমাদের দেশে সংবাদ সেন্সারের ব্যবস্থা বড়ই ত্রুটিপূর্ণ; ধর যদি"... ...তিনি কথাটা শেষ করিতে পারিলেন না, কিন্তু শান্তিপ্রিয় খুড়োর মনের কথা বুঝিতে বেগ পাইতে হইল না।

## • মহাজাতি সদনে 'শ্যামা' অভিনয়

নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলনের উদ্যোগে 'মহাজাতি সদনে' সপ্তাহব্যাপী যে অধিবেশন হয়ে গেল, তারই সপ্তম দিবসের অনুষ্ঠান ছিল গত রবিবার সন্ধ্যায় নৃত্যনাট্য 'শ্যামা' অভিনয়।

'শ্যামা' নৃত্যনাট্যে বজ্রসেন ও শ্যামার ভূমিকায় প্রীতিধারা ও মেনন

রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনে রচিত যে কয়খানি নৃত্যনাট্য আছে তার মধ্যে শ্যামাই হচ্ছে সর্বাধিক জনপ্রিয়। ব্যর্থ প্রেমের অন্তর্দ্বন্দ্ব নিয়ে এই কাহিনী, যার পরিসমাপ্তি হচ্ছে বিয়োগ-বেদনার একটি করুণ দৃশ্যে। প্রেমের জন্য জীবনের শ্রেষ্ঠ মূল্য নিবেদন করেছিল সুন্দরী শ্যামা। কিন্তু তার সেই ভালবাসার মধ্যে যে কাঁটা ছিল সেই কাঁটা সে গোপন রাখতে পারেনি বলেই ধিক্কারের মধ্যে তার প্রেমাস্পদ একদিন তাকে পরিত্যাগ করে চলে গেল। গানের কথা ও সুরের মাধুর্যের মধ্য দিয়ে কাহিনীর যে আবেদন গভীরভাবে দর্শকদের অন্তরে প্রবেশ করে, নৃত্যাভিনয়ের সহযোগে সে আবেদন কাব্যমণ্ডিত রূপে নিয়ে দর্শকদের অভিভূত করে দেয়। তাই বলা হয় 'শ্যামা' হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের সর্বাধিক জনপ্রিয় রচনা আর নৃত্যনাট্যের টেক্‌নিকের দিক দিয়ে 'চণ্ডালিকা' হচ্ছে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা।

'মহাজাতি সদনে' 'শ্যামা'র যে অভিনয় হয়ে গেল তা বিশ্বভারতীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত না হলেও এর অধিকাংশ শিল্পীই শান্তি-নিকেতনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। শান্তি-নিকেতনের প্রাক্তন নৃত্য শিক্ষক [illegible] ও শান্তিনিকেতন সংগীত ভবনের [illegible] অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুগ্ম [illegible] কলকাতা ও শান্তিনিকেতনের কয়েকজন [illegible] সমাবেশে 'শ্যামা' সুষ্ঠুভাবেই অভিনীত [illegible] তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব [illegible] মহাজাতি সদনে বাঙলার বহু গুণী [illegible] তাঁদের বক্তৃতায় গানে রবীন্দ্রনাথের প্রতি [illegible] শ্রদ্ধা জানিয়ে গেছেন; শ্যামা [illegible] শিল্পীরাও পরম নিষ্ঠার সঙ্গে অন্তরের [illegible] নিয়ে সেদিন মহাজাতি সদনে অভি[illegible] ছিলেন বলেই তা দর্শকদের [illegible] পেরেছিল। মহাজাতি সদনে সেদিন [illegible] জনসমাগম হয়েছিল, বিরাট হলে তিল [illegible] স্থান নেই। ভিতরে প্রচণ্ড গরম, [illegible] বাকি থেকে অতিসাধারণ কেরাণী [illegible] গা ঘেঁষাঘেঁষি করে একই ঢালা [illegible] বসে গেছেন, নম্র হয়ে নীরব হয়ে [illegible] দু ঘণ্টাব্যাপী অভিনয় দেখে গেলেন। [illegible] গোলমাল নেই, হৈ চৈ নেই, জায়গা [illegible] ঠেলাঠেলি নেই, মারামারি নেই। [illegible] অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রী [illegible] ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী উপস্থিত [illegible] প্রধান অতিথিরূপে, আর উপস্থিত [illegible] রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী ও [illegible] মীরা দেবী।

সেদিনের অভিনয়ে বজ্র সেনের ভূমি[illegible] বালকৃষ্ণ মেনন তাঁর পূর্ব খ্যাতি অক্ষুণ্ণ [illegible] ছিলেন। আর শ্যামার ভূমিকায় প্রী[illegible] কলকাতার পেশাদারী শিল্পী [illegible]

সখী সহ সুন্দরী শ্যামা

'শ্যামা' নৃত্যনাট্যের শিল্পিবৃন্দ

[illegible] মেননের শিক্ষকতায় ও পরিচালনায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। শ্যামা চরিত্রে প্রেমের অন্তর্দ্বন্দ্বের যে দুটি রূপ তা হচ্ছে একদিকে দয়িতকে পাবার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় যেমন আকুল, আরেক দিকে তাকে না পাবার ব্যর্থতায় তেমনি ম্রিয়মান। প্রীতিধারা শ্যামা চরিত্রের এই দ্বন্দ্ব যোগ্যতার সঙ্গেই রূপ দিতে পেরেছিলেন। তাঁর নৃত্যভঙ্গিমার মধ্যে যে অতিরঞ্জন দোষটুকু মাঝে মাঝে বিসদৃশ লাগছিল তা হচ্ছে তাঁর দীর্ঘদিনের কলকাতার পেশাদারী নৃত্যশিক্ষার দোষ—তাকে কাটিয়ে উঠতে কিছুকাল সময় লাগবে। ব্যর্থ-প্রেমিক উত্তীয়র ভূমিকায় সুদর্শন ছেলেটির নৃত্যাভিনয় স্বাভাবিক হয়েছিল, প্রহরীর ভূমিকায় সিংহলী নৃত্যশিল্পী মাকুলুলুর অভিনয় প্রশংসা পাবার যোগ্য। সখীদের ভূমিকায় যে তিনটি মেয়ে অভিনয় করেছেন তাঁরাও কলকাতারই শিল্পী, কিন্তু শান্তিনিকেতনের নৃত্যপদ্ধতি অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে আয়ত্ত করে নিতে পেরেছিলেন বলেই এই অভিনয়ে তাঁরা সুন্দর মানিয়ে গিয়েছিলেন।

শ্যামার ও সখীদের গানগুলি বেলা রায়, চিত্রা মজুমদার, আরতি বসু ও কমলা বসুর কণ্ঠে শ্রুতিমধুর হয়েছিল এবং বজ্র সেন, উত্তীয় ও প্রহরীর গানগুলি অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় সংগীত হয়েছিল। কিন্তু গান গাওয়ার মধ্যে বলিষ্ঠতার অভাব থেকে গিয়েছিল প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। যেমন উল্লেখ করা যেতে পারে 'কাঁদিতে হবে রে পাপিষ্ঠা' প্রভৃতি অংশের নৃত্যাভিনয়ে যে পৌরুষব্যঞ্জক বলিষ্ঠতা রয়েছে গানে সে বলিষ্ঠতার অভাব থেকে যাওয়ায় অভিনয়কে অধিকতর প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে সহায়তা করেনি। গানে মীড় শ্রুতি আশ ইত্যাদি লাগিয়ে শুদ্ধভাবে গেয়ে যাওয়া এক কথা আর সে গানে প্রাণ-সঞ্চার করা আরেক কথা। এই দুটি যখন এক-সঙ্গে হবে তখনই গান শ্রোতাদের মনে সাড়া জাগাতে পারবে। এর জন্যে সেদিনের অভিনয়ে গায়কদের দোষ দিই না—এ দোষ আজকালকার যুগের 'মাইক ভয়েস' গায়কদের কাছ থেকে সংক্রামকরূপে সর্বত্র ছড়াচ্ছে। এদিকে গায়করা এখন থেকেই সচেতন না হলে ভবিষ্যতে পুরুষের কণ্ঠে মেয়েলী গানে দেশ ছেয়ে যাবে।

শ্যামা নৃত্যাভিনয়ে কয়েকজন নতুন শিল্পীর পরিচয় পাওয়া গেল যাঁরা শান্তি-নিকেতনে থেকে নৃত্যশিক্ষার সুযোগ না পেয়েও শান্তিনিকেতনের নৃত্যপদ্ধতির ধারা অনুশীলনের দ্বারা রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য অভিনয় করার উপযোগী করে নিজেদের তৈরী করে নিতে পেরেছেন। এটা কম কৃতিত্বের কথা নয়।

পরিশেষে নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের এই বলে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই যে রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য সমগ্র সপ্তাহব্যাপী ঐকান্তিক নিষ্ঠা, অপরিসীম উদ্যম এবং অক্লান্ত পরিশ্রম করে তাঁরা যে আয়োজন করেছিলেন তা দেশের পক্ষে এবং জাতির পক্ষে গৌরবের বিষয়। তাঁরা ক্ষুদ্র আকারে যে অনুষ্ঠানের সূত্রপাত করলেন অদূর ভবিষ্যতে এইটিই সমগ্র দেশব্যাপী বিরাট উৎসবে পরিণত হবে। কারণ রবীন্দ্র জন্মোৎসব জাতীয় উৎসব হোক এইটিই আজ আমরা মনে-প্রাণে কামনা করছি এবং তারি গোড়াপত্তন করে দিয়ে গেলেন নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলনের উদ্যোক্তারা।

### সেবাব্রতী সমাজ সেবক সংঘ

দক্ষিণ কলিকাতা ব্রতী বালক সংঘ নাগরিক জীবনের দোষত্রুটি জনসাধারণের কাছে তুলে ধরবার জন্য কলকাতার বিশিষ্ট শিল্পীদের সহযোগিতায় একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। একদিকে তারা যেমন নাগরিক জীবনের ছোট ছোট অভদ্রজনোচিত ব্যবহার চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাবেন, অন্যদিকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে দুষ্টু ছেলেদের সুস্থ করবার প্রণালী ও তাদের সহযোগিতায় কিভাবে বহু সামাজিক কদভ্যাসের পরিসমাপ্তি ঘটে তারই নিদর্শন দেবেন। এদের প্রথম নিবেদন 'চলতি পথের ভেরী' আগামী ১২ই জুন নিউ এম্পায়ারে প্রদর্শিত হবে। যোগদান করবেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, শম্ভো গুহঠাকুরতা, সুনীল রায়, সুনীতি মিত্র, দক্ষিণা ঠাকুর প্রভৃতি।

# কলিকাতায় কলেরা

## মনে রাখবার সাতটি

১। কলেরা রোগীকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিন কিংবা তাকে আলাদা ঘরে রাখুন।

২। কলেরা রোগীর ব্যবহৃত কাপড়চোপড় পুড়িয়ে ফেলুন।

৩। কোন লোক কলেরায় আক্রান্ত হলে হেলথ্ অফিসারকে খবর দিন।

৪। পানীয় জল সিদ্ধ করে নিন্ এবং ঠাণ্ডা হবার পর পান করুন।

৫। বাজারে তৈরি সব রকম খাদ্য ও পানীয় পরিহার করুন।

৬। খাবার জিনিষ ঢেকে রাখুন,—তাতে যেন মাছি না বসতে পারে।

৭। ছ' মাস অন্তর কলেরার টিকা নিয়ে এ রোগ থেকে আত্মরক্ষা করুন।

---

নিম্নলিখিত যে-কোন টিকা কেন্দ্রে গিয়ে নিখরচায়

## *কলেরার টিকা নিন*

---

**হেলথ্ ডিরেক্টরেটের অধীনে কলিকাতাস্থ টিকা কেন্দ্রগুলির তালিকা**

### রেশন অফিস ঃ

১। শ্যামপুকুর আর্/ও ... ১২৮/১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট।
২। মাণিকতলা ,, ... ২৪৪, আপার সার্কুলার রোড।
৩। বড়তলা ,, ... ২৪৩/১, ঐ
৪। আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ,, ... ১৯, কেশব সেন ষ্ট্রীট।
৫। জোড়াবাগান ,, ... ২৪বি, নিমতলাঘাট ষ্ট্রীট।
৬। বড়বাজার ,, ... ৩৯, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ষ্ট্রীট।
৭। হেয়ার ষ্ট্রীট ,, ... ৭, রাধাবাজার লেন।
৮। বৌবাজার ,, ... ৯৫, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ।
৯। জোড়াসাঁকো ,, ... ১২৬, ঐ
১০। মুচীপাড়া ,, ... ১১৭, ধর্মতলা ষ্ট্রীট।
১১। তালতলা ,, ... ৪এ, হগ্ ষ্ট্রীট।
১২। ইণ্টালী ,, ... ২২, ডাঃ সুরেশ সরকার রোড।
১৩। পার্ক ষ্ট্রীট ,, ... ৫৫ ও ৫৫এ, ফ্রী স্কুল ষ্ট্রীট।
১৪। বেণিয়াপুকুর ,, ... ৩, সারোয়ার্দী এভেনিউ।
১৫। ভবানীপুর ,, এলগিন রোড।
১৬। আলীপুর ,, ... ৩নং গোবিন্দ আঢ্য রোড।
১৭। ওয়াটগঞ্জ ,, ... ২৬, পাইপ রোড।
১৮। গার্ডেন রীচ ,, ... পাহাড়পুর রোড (নুটবিহারী দাস এইচ ই স্কুল)
১৯। টালীগঞ্জ ,, ... ১০০, রসা রোড।
২০। বালিগঞ্জ ,, ... ১১৬, রাসবিহারী এভেনিউ।
২১। বেলেঘাটা আর/ও ... ১৩২, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড।
২২। কাশীপুর ,, ... ৩৭এ, কাশীপুর রোড।
২৩। চীৎপুর ,, ... ৬, বি টি রোড।
২৪। হওড়া সাব-এরিয়া আর্/ও ওয়ার্ড ১ ও ২ ... ৩ ও ৪, হরগঞ্জ রোড।
২৫। হাওড়া সাব-এরিয়া আর্/ও ওয়ার্ড ৩ ও ৪ ... ১১, কিঙ্স্ রোড।
২৬। হাওড়া সাব-এরিয়া আর/ও ওয়ার্ড ৫ ও ৭ ... ৪, নিত্যধন মুখার্জি রোড।
২৭। হাওড়া সাব-এরিয়া আর্/ও ওয়ার্ড ৬ ... ১২, ধর্মতলা লেন।
২৮। হাওড়া সাব-এরিয়া আর্/ও ওয়ার্ড ৮ ও ৯ ... ১৮৬, জি টি রোড।

### ষ্টেশন

২৯। **শিয়ালদহ ষ্টেশন** (মেন, নর্থ ও সাউথ)
৩০। **হাওড়া ষ্টেশন**
৩১। বালিগঞ্জ ষ্টেশন।

### অন্যান্য স্থান ঃ

৩২। এস্প্ল্যানেড।

## বাজার

৩৩। অর্ফানগঞ্জ, ৩৪। গড়িয়াহাটা, ৩৫। শ্যামবাজার, ৩৬। রাজাবাজার, ৩৭। হাতীবাগান, ৩৮। শোভাবাজার, ৩৯। বৈঠকখানা, ৪০। নূতনবাজার, ৪১। বাগবাজার, ৪২। মাণিকতলা, ৪৩। কোলে, ৪৪। কলেজ ষ্ট্রীট, ৪৫। ল্যান্স-ডাউন, ৪৬। বৌবাজার, ৪৭। খিদিরপুর, ৪৮। কালীঘাট, ৪৯। চারু মার্কেট (টালীগঞ্জ), ৫০। পার্ক সার্কাস, ৫১। তালতলা, ৫২। টেরিটিবাজার, ৫৩। শ্রীমানী, ৫৪। রাণী রাসমণি, ৫৫। ছাতুবাবু, ৫৬। পাথুরিয়াঘাটা, ৫৭। আলু পোস্তা, ৫৮। মল্লিক বাজার, ৫৯। চাঁদনী, ৬০। হগ্, ৬১। বড়বাজার, ৬২। ইণ্টালী, ৬৩। চেতলা, ৬৪। যদুবাবু, ৬৫। সাদার্ণ, ৬৬। বেনিয়াপুকুর, ৬৭। মেছুয়াবাজার, ৬৮। ঢাকুরিয়া।

## হাসপাতাল

৬৯। মেয়ো হাসপাতাল, ৭০। চাঁদনী ডিসপেন্সারী, ৭১। প্রেসিডেন্সী জেনারেল হাসপাতাল, ৭২। লেক মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, ৭৩। নর্থ সুবার্বণ হাসপাতাল, ৭৪। রাইটার্স বিল্ডিংস্ (ভিজিটরস্ রুম)।

## স্বেচ্ছা প্রতিষ্ঠান

(৩৩)ঃ—১। (১) রবীন্দ্র এ্যাম্বুঃ ডিভিসন, (২) জোড়াসাঁকো এ্যাম্বুঃ ডিভিসন, (৩) শ্রীঅরবিন্দ এ্যাম্বুঃ ডিভিসন, (৪) ইণ্টালী এ্যাম্বুঃ ডিভিসন, (৫) পরিতোষ মুখার্জি—পোষ্ট এণ্ড টেলিঃ একাউণ্টস অফিস, (৬) সিকদারবাগান এ্যাম্বুঃ ডিভিসন, (৭) আশুতোষ কলেজ এ্যাম্বুঃ ডিভিসন, (৮) কসবা এ্যাম্বুঃ ডিভিসন, (৯) সালকিয়া এ্যাম্বুঃ ডিভিসন, (১০) ডিষ্ট্রিক্ট অফিসার—২ডি, বাওয়ালী মণ্ডল রোড, টালীগঞ্জ, (১১) ইয়ং ইণ্ডিয়া এ্যাম্বুঃ ডিভিসন, (১২) দীনবন্ধু মেডিক্যাল হল—১৯০, জি টি রোড, (১৩) চ্যাটার্জি ফার্মেসী ৪, শ্রীরাম ঢ্যাং রোড। ২। **কাশী-বিশ্বনাথ সমিতি**—(১) ৭, চীৎপুর স্পার, (২) ৫০, বড়তলা ষ্ট্রীট, (৩) ১, মল্লিক ষ্ট্রীট। ৩। মারোয়াড়ী রিলিফ সোসাইটি—(১) ৩৯১, আপার চীৎপুর রোড, ৪। বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী দাতব্য ঔষধালয়—(১) ৩৭, বড়তলা ষ্ট্রীট, ৫। মহম্মদ আলী হাসপাতাল—৭, আমড়াতলা লেন, ৬। ক্যালকাটা ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন—(১) ১৭৬, হ্যারিসন রোড, ৭। রিলিফ ওয়েলফেয়ার এ্যাম্বুলেন্স কোর—আশুতোষ বিল্ডিং, ৮। মিলন চক্র—২২, যোগেশ মিত্র রোড, ৯। হিউম্যানিটি এসোসিয়েশন—হাওড়া, ১০। ইণ্ডিয়ান রেড ক্রস সোসাইটি—**সাব এরিয়া**—(১) জোড়াসাঁকো—৮, গড়পার বাই লেন, (২) আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট—১০বি, পাটোয়ার বাগান লেন, (৩) ইণ্টালী—৬, পামারবাজার রোড, (৪) মুচীপাড়া, ১৬, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, (৫) ভবানীপুর—৮, মোহিনীমোহন রোড, (৬) ওয়াটগঞ্জ—৩৮এ, রামকমল ষ্ট্রীট, (৭) **টালীগঞ্জ**—পি ৯১, লেক রোড, (৮) তালতলা—২৮, নিয়োগীপুকুর রোড, (৯) ওয়াটগঞ্জ—মুখার্জী ফার্মেসী—১০৬, ডায়মণ্ড-হারবার রোড, (১০) ওয়াটগঞ্জ—২৯, সার্কুলার গার্ডেনরীচ।

## কর্পোরেশন কেন্দ্র

১। গোখানা ডিস্পেন্সারী নং ১—৭২/১, গ্রে ষ্ট্রীট, ২। গোখানা ডিস্পেন্সারী নং ২—৯২, বৈঠকখানা রোড, ৩। ইউনানী ডিস্পেন্সারী, ৪নং কানাই শীল ষ্ট্রীট, ৪। নারিকেলডাঙ্গা ডিস্পেন্সারী, ১০৯, নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড, ৫। উল্টাডাঙ্গা ডিস্পেন্সারী—১২৩, উল্টাডাঙ্গা মেন রোড, ৬। গোবরা ডিস্পেন্সারী—৫৮, ক্রিষ্টোফার রোড, ৭। বালীগঞ্জ ডিস্পেন্সারী—২৩, রুস্তমজী ষ্ট্রীট, ৮। ভবানীপুর ডিস্পেন্সারী—৫৬, হরিশ মুখার্জি রোড, ৯। খিদিরপুর ডিস্পেন্সারী—৫৬, পাইপ রোড, ১০। মনসাতলা হাসপাতাল—৬, মনসাতলা লেন, ১১। কালীঘাট ডিস্পেন্সারী—২৪০, কালীঘাট রোড, ১২। চেতলা ডিস্পেন্সারী—২৯/৫, চেতলা সেণ্ট্রাল রোড, ১৩। গোখানা ডিস্পেন্সারী—৪-৪২, জাজেস কোর্ট রোড, ১৪। তালতলা ডিস্পেন্সারী—৫৮, লোয়ার সার্কুলার রোড, ১৫। চীৎপুর ডিস্পেন্সারী—৩, গোপাল মুখার্জি রোড, ১৬। ট্যাংরা ডিস্পেন্সারী—চিংড়িঘাটা রোড, ১৭। টালা পাম্পিং ষ্টেশন ডিস্পেন্সারী—৬৯, বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড (কেবলমাত্র টালা পাম্পিং ষ্টেশনের কর্মচারীদের জন্য), ১৮। ১নং ডিষ্ট্রিক্ট অফিস ভ্যাকসিনেশন ষ্টেশন—৭৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, ১৯। এলেন মার্কেট ভ্যাকসিনেশন ষ্টেশন—১৯৯, আপার চীৎপুর রোড, ২০। সুকিয়া ষ্ট্রীট ভ্যাকসিনেশন ষ্টেশন, ২১। সিকদারপাড়া ভ্যাকসিনেশন ষ্টেশন, ২২। ২নং ডিষ্ট্রিক্ট হেলথ অফিস—২২, মীর্জাপুর ষ্ট্রীট, ২৩। বাগলা মারোয়াড়ী হাসপাতাল—১২৮ এবং ১৩০, হ্যারিসন রোড, ২৪। মেডিক্যাল কলেজ ভ্যাকসিনেশন ষ্টেশন, ২৫। ওয়েলিংটন স্কোয়ার ভ্যাকসি-নেশন ষ্টেশন, ২৬। সেণ্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস ভ্যাকসিনেশন ষ্টেশন—৫, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড, ২৭। ক্যাম্বেল হাসপাতাল ভ্যাকসিনেশন ষ্টেশন, ২৮। পটারী রোড ভ্যাকসিনেশন ষ্টেশন—১৫, পটারী রোড, ২৯। লিণ্টন ষ্ট্রীট ভ্যাকসিনেশন ষ্টেশন—৮৩, লিণ্টন ষ্ট্রীট, ৩০। বালীগঞ্জ এ্যানিমাল ভ্যাকসিন ডিপো ভ্যাকসিনেশন ষ্টেশন—৩৬, বালীগঞ্জ সার্কুলার রোড, ৩১। শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতাল ভ্যাকসিনেশন ষ্টেশন, ৩২। হাজরা রোড ভ্যাকসিনেশন ষ্টেশন—১১৪, হাজরা রোড, ৩৩। ৪নং ডিষ্ট্রিক্ট অফিস ভ্যাকসিনেশন ষ্টেশন—১১, বেলভেডিয়ার রোড, ৩৪। পাইপ রোড ভ্যাকসিনেশন ষ্টেশন—৬৯, পাইপ রোড, ৩৫। ট্রাঙ্গুলার পার্ক ভ্যাকসিনেশন ষ্টেশন—রাসবিহারী এভেনিউ, ৩৬। মাণিকতলা মিউনিসিপ্যাল অফিস ভ্যাকসিনেশন ষ্টেশন—১০৯, নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড, ৩৭। বেলিয়াঘাটা মেন রোড ভ্যাকসিনেশন ষ্টেশন—১৬০, বেলিয়াঘাটা মেন রোড, ৩৮। কাশীপুর মিউনিসি-প্যাল অফিস ভ্যাকসিনেশন ষ্টেশন—১০ ও ১১, বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, ৩৯। কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ ভ্যাকসিনেশন ষ্টেশন—১, বেলগাছিয়া রোড, ৪০। চীৎপুর রোড ও কলুটোলা ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলস্থিত কেন্দ্র, ৪১। ৫, হরিণবাড়ী লেন, ৪২। ২৮।এ, পোলক ষ্ট্রীট—পোলক হাউস, দ্বিতল (পেছনের ব্লক), ৪৩। ১৯, জ্যাকেরিয়া ষ্ট্রীট—দ্বিতল (কেবলমাত্র মহিলাদের জন্য)—সকাল ৯টা হইতে ১১টা এবং বিকাল ৩টা হইতে ৫টা।

**প শ্চি ম ব ঙ্গ স র কা রে র জ ন স্বা স্থ্য বি ভা গ থে কে প্র চা রি ত**

## দেশী সংবাদ

৯ই মে—ইন্দোরে ভারতীয় জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সাধারণ পরিষদে আগামী বৎসরের জন্য কর্মকর্তা নির্বাচন সম্পন্ন হয়। শ্রীখান্দুভাই দেশাই সভাপতি ও শ্রীহরিহরনাথ শাস্ত্রী সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছেন।

নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার ওয়ার্কিং কমিটি পুনরায় "রাজনীতি"তে যোগ দিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

লণ্ডনে কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রী সম্মেলনে যে অভাবনীয় সাফল্য অর্জিত হইয়াছে, তজ্জন্য পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে অভিনন্দিত করিয়া বিহার ব্যবস্থা পরিষদে একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে।

১০ই মে—ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু অদ্য রাত্রে দেশবাসীর উদ্দেশে প্রচারিত এক বেতার বক্তৃতায় বলেন যে, লণ্ডন চুক্তির ফলে ভারতের সম্মান বা মর্যাদা মোটেই ক্ষুণ্ণ হয় নাই—বরং বিশ্বসভায় ভারতের মর্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, সার্বভৌম অধিকার এবং স্বরাষ্ট্র বা পররাষ্ট্র নীতি ক্ষুণ্ণ করিয়া ভারত কোন গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ হয় নাই।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের হিসাবে প্রকাশ, গত ১লা জানুয়ারী হইতে ৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত প্রদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে অনুমান ১৫৯ জনকে প্লেগ রোগাক্রান্ত সন্দেহে কলিকাতার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। উক্ত সময়ের মধ্যে প্লেগ রোগে অনুমান ২৯ জনের মৃত্যু হয়।

জোড়হাটের কয়েক মাইল দূরে এক শোচনীয় মোটর দুর্ঘটনার ফলে এক বরযাত্রী দলের ১৫ জন নিহত হইয়াছে।

১১ই মে—নয়াদিল্লীতে সহকারী প্রধান মন্ত্রী সর্দার প্যাটেলের সভাপতিত্বে গণপরিষদ উপদেষ্টা বোর্ডের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, স্বাধীন ভারতের বর্তমান অবস্থায় মুসলমান, খৃষ্টান, শিখ অথবা সংখ্যালঘু অপর কোন ধর্ম সম্প্রদায়ের জন্য আইন পরিষদগুলিতে আসন সংরক্ষণ নীতি যুক্তিযুক্ত হইবে না।

ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু নয়াদিল্লীতে এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন যে, কমনওয়েলথ সম্পর্কে লণ্ডন সিদ্ধান্তের ফলে ভারত শিল্প বাণিজ্য ইত্যাদিতে সহযোগিতার একটা সাময়িক সুবিধা এবং বিশ্বশান্তির ক্ষেত্রে একটা মনস্তাত্ত্বিক সুবিধা পাইয়াছে।

গান্ধী স্মারকনিধির ট্রাস্টী বোর্ডের চেয়ারম্যান ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ সংবাদপত্রে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে গান্ধী জাতীয় স্মৃতি ভাণ্ডারে অর্থ সংগ্রহ বন্ধ করা হইল বলিয়া ঘোষণা করেন।

কলিকাতায় পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কার্যনির্বাহক পরিষদের এক সভায় গৃহীত প্রস্তাবে কোচবিহার রাজ্যকে অবিলম্বে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্তির দাবী জানান হয় এবং মালয়ের ভারতীয় শ্রমিক নেতা শ্রীগণপতির প্রাণদণ্ডের প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

গান্ধী হত্যা মামলার প্রধান আসামী নাথুরাম গড়সে পূর্ব পাঞ্জাব হাইকোর্টের ফুল বেঞ্চে পুনরায় তাহার সওয়াল আরম্ভ করিয়া মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকাণ্ডকে তাঁহার একার কাজ বলিয়া উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, ইহার জন্য অপর আসামীগণকে কোনরূপেই দায়ী করা যায় না।

১২ই মে—নয়াদিল্লীর এক সংবাদে প্রকাশ, ভারত সরকার আগামী ৩১শে অক্টোবরের পর উদ্বাস্তুদের খয়রাতি সাহায্য দান বন্ধ করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। উহার পরিবর্তে তাহাদিগকে মজুরীর কাজ দেওয়া হইবে।

ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু আগামী অক্টোবর মাসে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র পরিদর্শনের জন্য প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন।

১৩ই মে—কলিকাতা পুলিশে বাঙালী যুবকগণকে সার্জেণ্টের পদে নিয়োগ করা হইয়াছে। পূর্বে এই পদগুলি ইউরোপীয় ও এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের একচেটিয়া ছিল।

বোম্বাইয়ে ভারতের বাণিজ্যসচিব শ্রী কে সি নিয়োগীর সভাপতিত্বে স্থায়ী বাণিজ্য উপদেষ্টা কমিটির এক বৈঠক হয়। বেলগ্রেড, আনকারা, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্য প্রতিনিধি নিয়োগের প্রস্তাব কমিটি অনুমোদন করেন।

মাদ্রাজ শহর ব্যতীত প্রদেশের অন্যান্য স্থানের চিত্রগৃহে এবং রঙ্গমঞ্চে ধূমপান নিষিদ্ধ করিয়া মাদ্রাজ সরকার এক আদেশ জারী করিয়াছেন।

১৪ই মে—কলিকাতা পুলিশ বাহিনীর নব গঠিত মহিলা শাখায় অদ্য ৭জন মহিলা সাব-ইন্সপেক্টর এবং ১৭জন এসিস্ট্যাণ্ট সাব ইন্সপেক্টর নিযুক্ত করা হয়। নারী অপরাধীদের বিষয়ে নারী পুলিশ নিয়োগ করার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

নয়াদিল্লীর সংবাদে প্রকাশ, মহাত্মা গান্ধীর ভস্মাবশেষ ও তাঁহার সম্পর্কিত পুস্তকাদি রক্ষার জন্য ভারতে শীঘ্রই একটি স্থায়ী যাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হইবে।

১৫ই মে—নয়াদিল্লীতে ভারতীয় গণ পরিষদের কংগ্রেস দলের এক বৈঠকে প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু লণ্ডন সিদ্ধান্ত সম্পর্কে ৪৫ মিনিট বক্তৃতা করেন। ইহার পর কংগ্রেস দল কর্তৃক উক্ত সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হয়। কংগ্রেস সভাপতি ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন।

## বিদেশী সংবাদ

৮ই মে—অদ্য রাত্রিতে বনের গণপরিষদে পশ্চিম জার্মাণ সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। এই যুক্তরাষ্ট্রীয় সাধারণতন্ত্র পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিলেও জার্মাণ মাত্রের জন্যই উন্মুক্ত থাকিবে।

১০ই মে—সিঙ্গাপুরের সংবাদে প্রকাশ, শাম্ব-শিবম্ নামক আর একজন ভারতীয়ের প্রতি অস্ত্রশস্ত্র রাখার অভিযোগে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেওয়া হইয়াছে। প্রকাশ, লণ্ডনস্থ ভারতীয় হাই কমিশনার শাম্বশিবমের পক্ষ হইয়া ঔপনিবেশিক সচিবের নিকট এই সম্পর্কে প্রবল প্রতিবাদ জানাইয়াছেন।

১২ই মে—দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ভারতের অভিযোগের বিষয়টি একান্তভাবে দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাপার বলিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিনিধি রাষ্ট্র সঙ্ঘের রাজনৈতিক কমিটিতে যে প্রস্তাব আনয়ন করেন, তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের প্রতি আচরণ সম্পর্কে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, সে সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য কমিটি তিনজন সদস্য লইয়া একটি কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত করেন।

অদ্য রাত্রি ১২টা এক মিনিটের সময় একটি মার্কিণ জীপ বার্লিন ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে বার্লিন অবরোধ ব্যবস্থার অবসান হয়।

পশ্চিম জার্মাণ গণপরিষদ কর্তৃক বন সহর পশ্চিম জার্মাণ যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী নির্বাচিত হইয়াছে। বন শহর কলোন হইতে ১৫ মাইল দূরে রাইন নদীর তীরে অবস্থিত।

ওলন্দাজ সরকার ঘোষণা করিয়াছেন যে, ইন্দোনেশিয়ায় প্রেরিত ওলন্দাজ প্রতিনিধি দল ও গণতন্ত্রী নেতৃবৃন্দের মধ্যে বাটাভিয়ায় যে চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে, ওলন্দাজ সরকার তাহা সম্পূর্ণভাবে অনুমোদন করিয়াছেন।

১৩ই মে—চীনের প্রধানতম বাণিজ্যকেন্দ্র সাংহাই-এর চতুর্দিকে সরকারী ফৌজ অর্ধবৃত্তাকারে যে রক্ষাব্যূহ রচনা করিয়াছে, উহার [illegible] স্থানগুলিতে চীনা কম্যুনিস্টরা অদ্য প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। সাংহাই-এর ১৯ মাইল [illegible] পশ্চিমে অবস্থিত লিউহো হইতে সরকারী [illegible] সরিয়া গিয়াছে বলিয়া অদ্য ঘোষণা করা হইয়াছে।

রেঙ্গুণের ২২০ মাইল উত্তর-পূর্বে [illegible] পাহাড় অঞ্চলে অর্ধ স্বায়ত্তশাসনসম্পন্ন [illegible] রাজ্যের রাজধানী লৈলাও কারেন বিদ্রোহীদের কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছে।

ক্যাণ্টনে চীনা জাতীয় দলের [illegible] সভায় জেনারেল চিয়াং কাইশেককে ক্যাণ্টনে আসিয়া পুনরায় জাতীয় নেতৃত্ব গ্রহণের আহ্বান জানাইবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

১৪ই মে—রেঙ্গুণের ১০ মাইল উত্তরে অবস্থিত ইনসিনের চারিদিকে প্রচণ্ড সংগ্রাম চলিতেছে। সংগ্রামরত সরকারী বাহিনী কারেন বিদ্রোহীদের এই ঘাঁটির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

অদ্য রাষ্ট্র সঙ্ঘের সাধারণ পরিষদে ভারত-আফ্রিকা বিরোধের চূড়ান্ত আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর হইতে জানান হইয়াছে যে, তৃতীয় মহাযুদ্ধের সমস্ত আশঙ্কা তিরোহিত না হওয়া পর্যন্ত পশ্চিম ইউরোপকে আমেরিকা কর্তৃক সামরিক সাহায্য দানের পরিকল্পনা অব্যাহত থাকিবে।

১৫ই মে—রাষ্ট্র সঙ্ঘের সাধারণ পরিষদ অদ্য রাত্রিতে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা বিরোধ সম্পর্কে আলোচনার জন্য ভারত, পাকিস্থান ও দক্ষিণ আফ্রিকাকে এক সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। প্রস্তাবের বিরুদ্ধে একমাত্র দক্ষিণ আফ্রিকাই ভোট দেয়।

ত্রিপলিতানিয়াকে ইংরাজদের কর্তৃত্ব হইতে ১৯৫১ সালে ইতালীয় অছি ব্যবস্থার অধীনে লইয়া যাইবার যে পরিকল্পনা বৃটেন রচনা করিয়াছে, উহার ফলে আরবরা বিক্ষুব্ধ হইয়াছে। বিক্ষুব্ধ আরব জাতিকে ছত্রভঙ্গ করার উদ্দেশ্যে পুলিশ গুলী চালনা করে। ফলে একজন নিহত ও কয়েকজন আহত হইয়াছে।

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক:—আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মন স্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
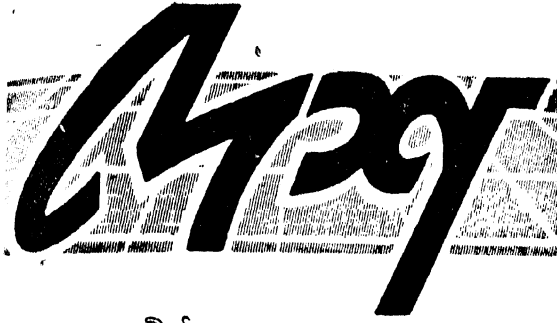
মহামহিমময় হয় যদি স্থান, দারুণ উত্তাপে জ্বলে যায় প্রাণ,
তবুও সে দেশ স্বদেশ যার।
তাহার নয়নে তেমন সুন্দর, মনোহর স্থান পৃথিবী সাগর,
নাহিক ভূতলে কোথাও আর॥
কে আছে এমন মানব সমাজে, হৃদি-তন্ত্রী যার আনন্দে না বাজে,
বহুদিন পরে হেরি স্বদেশ।
না বলে উল্লাসে প্রফুল্ল অন্তরে, প্রেমভক্তি মোহ অনুরাগ ভরে,
এই জন্মভূমি আমার দেশ॥
—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক ঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন
সহ সম্পাদক ঃ শ্রীসাগরময় ঘোষ

ষোড়শ বর্ষ ] শনিবার, ১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৬ সাল। Saturday, 28th May, 1949. [৩০শ সংখ্যা

**লণ্ডন সিদ্ধান্তে ভারত**

ভারতের ব্রিটিশ-রাষ্ট্র-সমবায়ের অন্তর্ভুক্ত থাকার সিদ্ধান্ত ভারতীয় গণপরিষদের অনুমোদন লাভ করিবার পর নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতিরও সমর্থনলাভ করিয়াছে। [illegible] যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্যসচিব মিঃ আনিউরিন বেভান ভারতের এই সিদ্ধান্তকে ভারত-ব্রিটিশ সমস্যা সমাধানে বর্তমান শতাব্দীর সর্বাপেক্ষা [illegible] ঘটনা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের নিজেদের কথা বলিতে গেলে আমরা এই সিদ্ধান্তে যেমন উল্লসিত হই নাই, তেমনই এজন্য দুঃখিতও নহি। রাজনীতিতে কোন ব্যবস্থাই অপরিবর্তনীয় বলিয়া গৃহীত হয় না, রাষ্ট্রের মূল উদ্দেশ্য এবং প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই এতৎসম্পর্কিত সব ব্যবস্থা নির্ণীত হইয়া থাকে। লণ্ডন সম্মেলনের সিদ্ধান্তকে আমরা সেইরূপ অপরিবর্তনীয় বলিয়া মনে করি না। ভারত জগতের সকলের শান্তির সখ্য এবং সৌহার্দ্য কামনা করে, উপযাচক হইয়া সে অপর কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক নীতি অবলম্বন করিতে চায় না, কিংবা তাহারা সখ্যের জন্য আগাইয়া আসিলে ভারত তাহাদের অতীত কার্যের [illegible]নিকাশ করিতেও বসিবে না, ভবিষ্যৎকেই সে বড় করিয়া দেখে। ব্রিটিশ জাতি কিংবা ব্রিটিশ রাষ্ট্র সমবায় ভারতের সখ্য কামনা করিয়াছে। এক্ষেত্রে ভারত বন্ধুর হাত বাড়াইয়া দিয়াছে, ভবিষ্যতের জন্য তাহাদের কাছে কোন দাসখৎ লিখিয়া দেয় নাই। তাহাদের সঙ্গে সখ্যতার সূত্রে সংযুক্ত থাকিতে ভারতের এই সম্মতিতে সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে তাহার অধিকারও কোন অংশে ক্ষুণ্ণ হয় নাই। স্বাধীন এবং সার্বভৌম অধিকারসম্পন্ন রাষ্ট্র হিসাবে ভারতের মর্যাদাকে স্বীকার করিয়া লইয়া রাষ্ট্র সমবায়ের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি ভারতের সখ্য এবং সৌহার্দ্য প্রার্থী-স্বরূপে দাঁড়াইয়াছে। তাহারা মাথা হেঁট করিয়াই আসিয়াছে। স্বাধীন রাষ্ট্রস্বরূপে সৌহার্দ্যের ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করা ভারত নিজের কর্তব্য বলিয়াই মনে করে। সে সেই কর্তব্য এবং দায়িত্ব প্রতিপালনের পথেই অগ্রসর হইয়াছে। ভারত জানে, এই কর্তব্য প্রতিপালনের পথ সহজ নয়। জগতের জাতিসমূহের মধ্যে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ, হিংসা এবং স্বার্থদুষ্টিজনিত সংকীর্ণতা যথেষ্টই আছে। সেগুলি নিজের শক্তি বলে কাটাইয়াই ভারতকে অগ্রসর হইতে হইবে। সুতরাং পথের এই সব বাধা বিদ্যমান থাকিতে ভারতের পক্ষে উল্লাসের কোন কারণ ঘটে নাই। পক্ষান্তরে এই সিদ্ধান্তের জন্য ভারত দুঃখিতও নয়। কারণ, ভবিষ্যতের পথ তাহার পক্ষে খোলাই আছে। ব্রিটিশ জাতি কিংবা ব্রিটিশ রাষ্ট্র সমবায়ের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি যদি ভারতের আদর্শ ও নীতির অনুকূলে প্রতিবেশ সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত না হয় এবং সেজন্য তাহাদের অতীতের সংস্কার সংশোধন না করে তবে ভারত তাহাদের সহিত সম্পর্ক ছেদন করিতে ইতস্ততঃ করিবে না। বস্তুত ভারত নিজেদের শক্তিতেই পরিপূর্ণরূপে বিশ্বাসী, পরস্পরের মুখের দিকে সে তাকাইয়া নাই এবং নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সে দুর্বলতাজনিত কোন অনিশ্চয়তা অন্তরে পোষণ করে না। জুজুর ভয়ে সে ভীত নয়। ব্রিটিশ জাতি এবং রাষ্ট্র সমবায় ভারতের সখ্যতাপ্রার্থী হইয়াছে, ভারত নিজের উদার রাষ্ট্রীয় আদর্শ এবং সংস্কৃতিসম্মতভাবেই তাহাদের সে আহ্বানে সাড়া দিয়াছে। ভারতের সখ্যতাকামী রাষ্ট্রনিচয় যদি এতৎসম্পর্কিত তাহাদের কর্তব্য পালনে আন্তরিকতার সঙ্গে অগ্রসর না হয়, কিংবা নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থ সিদ্ধ করিবার অতীত সংস্কারবশে কূটনীতির কারসাজী খাটাইতে উদ্যত হয়, জাগ্রত ভারতকে প্রবঞ্চিত করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইবে না। তাহারা যাহাতে সমুচিত শিক্ষালাভ করে, ভারতের নীতিও তদনুযায়ী সম্প্রসারিত হইবে। বস্তুত রাষ্ট্রনীতি-নিয়ন্ত্রণে দূরদর্শিতার ক্ষেত্রে ভারতের দৈন্য ঘটিবে না। যাহারা শক্তিশালী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদিগকে বিতাড়িত করিয়া নিজেদের সার্বভৌম স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, বিলীয়মান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিভীষিকায় কম্পিত হইবার মত কোন প্রশ্ন নিশ্চয়ই তাহাদের কাছে উপস্থিত হয় নাই। বিশ্বে শান্তি এবং মানবতাকে প্রতিষ্ঠা করাই ভারতের লক্ষ্য, কোন দুর্বলতায় ভারত সেই লক্ষ্য হইতে বিচলিত হইবে না।

**রাষ্ট্রীয় সমিতির আলোচনা**

লণ্ডন চুক্তি সম্বন্ধে নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির আলোচনায় বিশেষ উৎসাহ এবং উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয় নাই। ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ মূল প্রস্তাবটি উপস্থিত করেন। তাঁহার বক্তৃতাও তেমন জমিয়া উঠিয়াছিল বলা যায় না। বর্তমান অবস্থায় ভারতের স্বার্থের দিক হইতে এই চুক্তির প্রয়োজন সম্বন্ধে তিনি প্রধানত যুক্তি উপস্থিত করেন। বাস্তবিক কথাও তাহাই। রাষ্ট্র সমবায়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়া

অসহায়ের সহায় পাইয়াছি, এই ধারণায় যেমন আমাদের উল্লাস করিবার কিছু নাই, সেইরূপ আমাদের সর্বনাশ সমুপস্থিত বলিয়া আর্তনাদ উপস্থিত করাও নিষ্প্রয়োজন। আলোচনায় এই ভাব দেখা গিয়াছে। লণ্ডন চুক্তির প্রস্তাবটি পরিষদে প্রথমে উপস্থিত না করিয়া নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতিতে প্রথমে উপস্থিত করা উচিত ছিল, কয়েকজন বিতর্কে এই কথা তোলেন। পণ্ডিত জওহরলাল তাঁহাদের উক্তির যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। মোটের উপর, এত বড় একটা গুরুতর ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আলোচনা যতখানি জমিয়া উঠা উচিত ছিল, সমিতির আলোচনায় তদুপযোগী আগ্রহের অভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। সিদ্ধান্ত যখন করা হইয়াছে, তখন তাহা মানিয়া লওয়া উচিত, পরে দেখা যাইবে। অধিকাংশ সদস্যেরই এই মনোভাব ছিল। নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির অন্যান্য আলোচনাও বিশেষ সন্তোষজনক হইয়াছে বলা চলে না। কংগ্রেস এবং মন্ত্রিমণ্ডলের সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনার প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়; কিন্তু আলোচনাটি পর্দার আড়ালে নিষ্পন্ন হওয়াতে সে আগ্রহ তৃপ্ত হইবার পক্ষে বিশেষ অসুবিধা ঘটে। জাতীয় সঙ্গীত এবং রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত এখনও হয় নাই। মানভূমের সমস্যার তদন্ত করিবার জন্য এবং মীমাংসার উপায় নির্দেশের জন্য শ্রীযুক্তা সুচেতা কৃপালনী ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, বিহার প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি শ্রীপ্রজাপতি মিশ্র এবং ভারত সরকারের শ্রমসচিব শ্রীজগজীবন রামকে লইয়া একটি কমিটি নিযুক্ত করা হইয়াছে। কমিটির সদস্যদের সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য কিছুই নাই। কিন্তু এই ব্যবস্থার ফলে বিষয়টি এখনও বিলম্বিত হইতে চলিল বলিয়াই আমাদের মনে হইতেছে। অথচ মানভূমকে কেন্দ্র করিয়া বর্তমানে যে সমস্যা দেখা দিয়াছে, অবিলম্বে তাহার মীমাংসা হওয়াই প্রয়োজন।

### শিক্ষার ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতা

পাকিস্থান ইসলাম রাষ্ট্র। মুসলমান ব্যতীত অপর কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের সংস্কৃতির মর্যাদা সেখানে থাকিতে পারে না, পাকিস্থানের রাষ্ট্রনীতিকদের বিবেকবুদ্ধি বস্তুত এই সংস্কারবশেই যে কাজ করিতেছে, ক্রমেই সে তত্ত্ব স্পষ্ট হইয়া পড়িতেছে। পূর্ব-বঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থা হইতে অপর সম্প্রদায়ের সংস্কৃতিকে উৎখাত করিয়া তাহাকে ইসলামী করিয়া ফেলিবার জন্য উৎকট আগ্রহের সঙ্গে সেখানকার কর্তারা অভিযান আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিক্ষাব্রতীগণ ইহাতে আতঙ্কিত হইয়াছেন এবং তাঁহারা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভেদ নীতির এমন দৌরাত্ম্যে প্রতিবাদ উত্থাপন করিয়াছেন। আমরা পূর্ববঙ্গের সরকারী উপদেষ্টা-দের এই ধরণের অশোভন উদ্যমের পরিচয় কিছুদিন হইতেই পাইতে-ছিলাম। গত বৎসরে সেখানকার উচ্চ বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকে অশোকের কয়েকটি অনুশাসন এবং মহাত্মা গান্ধীর প্রার্থনার কিছু অংশ ছিল। কর্তাদের বিবেকে ইহা বরদাস্ত হয় নাই। তাঁহারা এবার ঐ সব অংশ বাদ দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের 'অপমান' শীর্ষক কবিতাটিও পৌত্তলিকতাগন্ধী বলিয়া পাঠ্য পুস্তক হইতে বর্জন করা হইয়াছে। পাঠ্য পুস্তকাদির অধিকাংশ রচনা যে কেবল মুসলমান লেখকগণ কর্তৃক লিখিত ইহাই নয়, পরন্তু অধিকাংশ লেখাই ইসলাম সংস্কৃতি এবং সভ্যতাবিষয়ক। কতকগুলি লেখা হিন্দু-দের সংস্কৃতিতে বিশেষভাবে আঘাত করিবার উদ্দেশ্যেই শিক্ষাক্ষেত্রে স্থান দেওয়া হইয়াছে। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের নির্মল জীবনের আদর্শকে বিমলিন করিয়া উপস্থিত করা হইয়াছে এবং তাঁহাকে ইসলাম ধর্মের প্রধান শত্রুরূপে চিত্রিত করা হইয়াছে। ইতিহাস গ্রন্থ হইতে হিন্দু রাজত্বের অংশকে যতদূর সম্ভব সঙ্কুচিত করিয়া মুসলিম রাজত্বের অংশকে অনুচিত রকমে প্রাধান্য প্রদান করা হইয়াছে। বস্তুত ভারত নামটিই পূর্ব-পাকিস্থানের কর্তৃপক্ষের বিবদৃষ্টির বিষয়ীভূত হইয়াছে। দেখা যায়, তথাকার পাঠ্য তালিকা হইতে ভারত নামটি সযত্নে বাদ দেওয়া হইতেছে, তৎপরিবর্তে পাক-ভারত নামটি পত্তন করা হইয়াছে। এই সব ব্যাপারে বোঝা যায়, সংস্কৃতির উদার ক্ষেত্রে সাম্প্র-দায়িকতাকে প্রশ্রয় দিলে কি অনিষ্ট ঘটে, পূর্ববঙ্গের কর্তৃপক্ষ স্পষ্টভাবে ইহা উপলব্ধি করিতেছেন না। কিন্তু ইহা সত্য যে, শিক্ষাব্যবস্থা যদি ধর্ম-নিরপেক্ষ এবং উদার মনোভাবসম্পন্ন না হয়, তবে পাকিস্থানের সমাজ এবং রাষ্ট্র জীবনের পক্ষেই তাহা ক্ষতিকর হইয়া উঠিবে। ভারতের তাহাতে কোন অনিষ্ট হইবে না। পূর্ববঙ্গের কর্তৃপক্ষ সেখানকার হিন্দু সমাজের সংস্কৃতিকে লঘু করিতে চেষ্টা করিয়া বস্তুত নিজেদের রাষ্ট্রকে মধ্যযুগীয় প্রগতি-বিরোধী অনুন্নত অবস্থার মধ্যে লইয়া চলিয়াছেন। কিন্তু এত বড় একটা সহজ সত্যও বুঝাইবার মত উপদেষ্টারও তাহাদের অভাব ঘটিয়াছে। ইসলামের 'সংস্কৃতির মর্যাদা কেহই অস্বীকার করিতেছে না; কিন্তু হিন্দু সংস্কৃতির উপযুক্ত মর্যাদা দানের অনুদার মনোবৃত্তির উৎকটতার মধ্যে নিশ্চয়ই ইসলামের সংস্কৃতির মর্যাদা নিহিত নহে। পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি একটা সামান্য বস্তু নয়। বলিষ্ঠ মানব ধর্মের উপর তাহা প্রতিষ্ঠিত এবং অপরিম্লান ঐতিহ্যের গৌরবেও তাহা উজ্জ্বল। সে সংস্কৃতির মর্যাদায় পাকিস্থানেরই মর্যাদা বাড়ে এবং তাহার অবমাননায় মানবতার মর্যাদার উপরই আঘাত পড়ে। কিন্তু এ সব কথা বলিয়া বিশেষ কিছু লাভ আছে, এমন মনে হয় না। আমাদের শুধু বক্তব্য এই যে, পূর্ব-বঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ইসলামীকরণই যদি সেখানকার সরকারের নীতি হয়, তবে হিন্দু সমাজের জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করাই কর্তৃপক্ষের কর্তব্য। দেখিতেছি পূর্ববঙ্গের শিক্ষা-ব্যবস্থায় তাঁহারা সুস্পষ্ট-ভাবে বৈষম্যমূলক নীতি অবলম্বনে অগ্রসর হইয়াছেন। ইহার ফলে হিন্দু সমাজ হইতে স্বতন্ত্র শিক্ষা-ব্যবস্থার দাবী উঠিয়াছে। পাকিস্থানের সংখ্যা-লঘু সম্প্রদায়সমূহের সংস্কৃতির সম্মান রক্ষার জন্য পাকিস্থানের রাষ্ট্রনীতির কর্ণধারগণ বারংবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন এখন সে সব প্রতিশ্রুতিকে মর্যাদা দান করিবার কর্তব্য তাঁহাদের উপর আপতিত হইয়াছে।

### বন্ধু নীতির স্বরূপ

দীর্ঘ দিনের পর স্বৈরশাসনের উপদ্রবের অবসানে হায়দরাবাদ রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। লুটেরার দল সেখান হইতে বিদায় লইতে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু হায়দরাবাদের এই শান্তি পাকিস্থানের পররাষ্ট্র সচিবের বুকের পাঁজরে গিয়া বিঁধিয়াছে। তাঁহার অশ্রু নিরোধ মানিতেছে না। জাতিসঙ্ঘের দুয়ারে তিনি এখনও ধর্ণা দিয়া পড়িয়া আছেন এবং নিষ্ফল আক্রোশে আর্তনাদ করিতেছেন। কিন্তু অকারণ এই অশ্রু বর্ষণ কেন? হায়দরাবাদের সঙ্গে পাকিস্থানের কি সম্পর্ক আছে? বস্তুত সিডনি কটনের মামলায় স্পষ্টভাবেই প্রতিপন্ন হইয়া গিয়াছে যে, হায়দরাবাদের ব্যাপারে দুরভিসন্ধিমূলকভাবে হস্তক্ষেপ করিয়া পাকিস্থান সেখানে ভারতের বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। লণ্ডনের আদালতে সিডনি কটনের জরিমানা হইয়াছে। এই মামলায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, কটনকে বেআইনীভাবে হায়দরাবাদ রাজ্যে অস্ত্রশস্ত্র আমদানী করিবার জন্য পাকিস্থানের কর্তৃপক্ষ করাচীর বিমান-ঘাঁটি ব্যবহার করিতে দিয়াছিলেন। পাকিস্থানের উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের দ্বারা হায়দরাবাদের রাজকর্মচারী ও সিডনি কটনের মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল। এই মামলা সম্পর্কে আরও দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে শমন জারী করা হয়। ইঁহারা পাকিস্থানেরই কর্মচারী। পাকিস্থান গভর্নমেণ্টের দেশরক্ষা বিভাগের সেক্রেটারী ইঁহাদের সম্বন্ধে এই সার্টিফিকেট দাখিল করেন যে, একটি ল্যাঙকাস্টার শ্রেণীর

মেন অস্ত্রশস্ত্র বহন করিবার জন্য পাকিস্থান ভর্নমেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিল; সুতরাং হাদের কোন অপরাধ নাই। প্রকৃতপক্ষে শ্মীর আক্রমণের সকল দায়িত্ব হানাদারদের পর দিয়া পাকিস্থানের কর্তৃপক্ষ যেমন নিজেরা দোষ সাজিবার চেষ্টা করেন, পরে কাশ্মীরে হাদের সাক্ষাৎ-সম্পর্কে সেনা প্রেরণের কথা ক্ত হইয়া পড়ে, হায়দরাবাদের বেলাতেও তাহাই তিপন্ন হইয়াছে। সিডনি কটনের মামলার বরণ প্রকাশ হইবার পরও পাকিস্থানের রাষ্ট্র সচিব জাতিসঙ্ঘের সভায় দাঁড়াইয়া দরাবাদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে লজ্জা নুভব করেন নাই, ইহাই আশ্চর্য। ফলত থ্যার আশ্রয় লইয়া অকারণে এবং ষড়যন্ত্র-লক পন্থায় ভারতের শত্রুতা করিবার একটা ভ্যাস পাকিস্থানের রাষ্ট্রনীতিকদের সংস্কারে কা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ অবস্থায় দুই ষ্ট্রের মধ্যে সম্প্রীতি কিরূপে স্থায়ী হইবে, রা ভাবিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু এইভাবে রতের বিরোধিতায় প্রবৃত্ত থাকাতে পাকি-নের কল্যাণ কিছুই নাই; পরন্তু সঙ্কটই ড়িবে, আমরা শুধু ইহাই বলিয়া রাখি।

**ন্দননগরের গণভোট**

সাম্রাজ্যবাদের পিপাসা সহজে নিবৃত্ত বার নয়। ইহা তীব্র বাঘের রক্তের পিপাসার ই হিংস্র। চন্দননগরে ফরাসী কর্তাদের ও সাজ রব পড়িয়া গিয়াছে। গত মাসে খানকার পৌর-পরিষদ একটি বিশেষ ধিবেশনে গণভোট ব্যতীতই চন্দননগরকে রতীয় রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে স্থা অবলম্বনের জন্য ফরাসী এবং ভারত রকারকে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। কিন্তু ম্রাজ্যবাদী ফরাসীরা এত সহজে জনগণের বী মানিয়া লইবার পাত্র নয়। সাম্রাজ্যবাদী-র প্রধান সম্বল মিথ্যা এবং ছল-চাতুরির লা শেষ পর্যন্ত খেলিয়া দেখিয়া তবে হারা নিরস্ত হইবে, এজন্য প্রস্তুত হইতেছে। রাসীরা পৌর-পরিষদের দাবী গ্রাহ্য না করিয়া গামী ১৯শে জুন গণভোট গৃহীত হইবে র করিয়াছে। কিন্তু মাত্র ২৩শে মে এই দ্ধান্তের কথা ভারত সরকারকে জানানো য়াছে। ওদিকে চন্দননগরে ফরাসীদের জের ঘাঁটি বজায় রাখিবার জন্য নানারূপ পন কারসাজী চলিতেছে। প্রকাশ্য-বেও জনমতকে চাপা দিবার ব্যবস্থা দ্রুততার ঙ্গে অবলম্বন করা হইতেছে। চন্দননগরের লিশ বিভাগের কর্তৃত্ব এতদিন পর্যন্ত পৌর-রিষদের হাতে ছিল, ফরাসী শাসনকর্তা সে মতা কাড়িয়া এখন নিজের হাতে লইয়াছেন। হার উপর সৈন্য আমদানী করা হইয়াছে। রতের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন শাসন-ভাগীয় কর্মচারীদিগের কয়েকজনকে ইতি-ধ্যেই বরখাস্ত করা হইয়াছে। অন্যান্য অনেককে শাসানো হইতেছে। ভোটদাতাদের তালিকায় সব ভোটদাতার নাম উঠানো হয় নাই। সুতরাং আগামী গণভোট যে যথোচিতভাবে হইবে না, এমন আশঙ্কার বিশেষ কারণ দেখা দিয়াছে। চন্দননগর পশ্চিমবঙ্গের মধ্যস্থানে অবস্থিত এবং সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনীতিক সকল দিকে এই নগর পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত না হইয়া ফরাসী হামবড়া শাসকদের গোলামি করিতে ইচ্ছুক এমন বিশ্বাসঘাতক দেশদ্রোহী সংস্কৃতিসম্পন্ন চন্দননগরবাসীদের মধ্যে কেহ যে আছে, আমাদের ইহা বিশ্বাস হয় না। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে চন্দননগরের অধিবাসীরা আন্তরিকতার সঙ্গে সহযোগিতা করিয়াছেন। ভারতের বীর সন্তানেরা দেশের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা-ব্রতে চন্দন-নগরের মাটিতে প্রাণ দিয়াছে। চন্দননগরের এসব ঐতিহ্য ফরাসীদের অজানা নয়; তথাপি তাহারা পৌর-পরিষদের দাবী মানিয়া না লইয়া গণ-ভোটের খেলায় যখন নামিতে সাহসী হইয়াছে, তখন মিথ্যাচার এবং জুলুমবাজীর অবতারণা করিতেও যে তাঁহারা ইতস্তত করিবে না, ইহা বেশই বুঝা যায়। কিন্তু চন্দননগরবাসীদের সঙ্কল্প তাহাতে ক্ষুণ্ণ হইবে না। নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিতে তাহারা জানে। সেখানকার যুবশক্তি জাগ্রত, অন্যায় তাহারা বরদাস্ত করিবে না। তথাপি চন্দননগরের গণভোট যাহাতে সাম্রাজ্যবাদীদের প্রচ্ছন্ন কূটনীতিতে প্রভাবিত না হয়, সেজন্য ভারত সরকারের এখন হইতে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা কর্তব্য। পণ্ডিচেরী এবং মাহের ব্যাপারে এ সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা যথেষ্ট রহিয়াছে। গণ-ভোট পরিচালনার উপর দৃষ্টি রাখিবার উদ্দেশ্যে সেখানে ভারতের প্রতিনিধি রাখা আবশ্যক। বস্তুত চন্দননগরে এই গণভোটের ব্যাপার হইতে ফরাসীদিগকে ভাল রকমে বুঝাইয়া দেওয়া প্রয়োজন যে, ভারতে তাঁহাদের আর স্থান হইবে না। এখন ভদ্রভাবে এদেশ ছাড়িয়া যাওয়াই তাঁহাদের পক্ষে মঙ্গলজনক।

**কংগ্রেসের আদর্শ ও নীতি**

সম্প্রতি দিল্লীতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেস কমিটিসমূহের সভাপতি ও সম্পাদক-দের সম্মেলন শেষ হইয়াছে। শুনিতেছি, কংগ্রেসের কাজ যাহাতে অপেক্ষাকৃত সুষ্ঠু ভাবে পরিচালিত হয়, তৎসম্পর্কে এই বৈঠকে একটি কার্যক্রম নির্ধারিত হইয়াছে। কংগ্রেসের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা বজায় রাখা এবং কংগ্রেসের অধীনে যুবক, মহিলা, কৃষাণ ও শ্রমিকদিগকে সংহত করিবার উদ্দেশ্যে সমধিক কর্মতৎপরতা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। দেশের বর্তমান অবস্থায় কংগ্রেসের কাজে একটা নূতন এবং আন্তরিকতাসম্পন্ন বলিষ্ঠ প্রেরণা সঞ্চার করা যে একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে, একথা সকলেই স্বীকার করিবেন। ভারত স্বাধীনতা লাভ করিবার পর দেশের জনসাধারণ যেন কংগ্রেসের কাজের সঙ্গে প্রাণের যোগসূত্রের সাড়া পাইতেছে না। স্বাধীনতা লাভ করিবার জন্য কংগ্রেস জনগণের মনে যে অগ্নিময় প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছিল, স্বাধীনতা লাভ করিবার পর দেশের গঠনমূলক কাজে তাহাকে সার্থক করিয়া তোলা সম্ভব হইতেছে না। বস্তুত ত্যাগ ও সেবাময় কর্ম-সাধনার আদর্শই জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত করে। বিদেশীর সঙ্গে বিরুদ্ধতার পরিপ্রেক্ষার অভাবে সে আদর্শ যেন অনেকটা স্তিমিত হইয়া পড়িয়াছে এবং নানা মতবাদের সাময়িক উত্তেজনার মধ্যে জনগণের চিত্ত বিভ্রান্ত হইতে চলিতেছে। বাস্তবিকপক্ষে এই অবস্থা দেশের পক্ষে বড়ই বিপজ্জনক। আদর্শ যদি সুস্পষ্ট থাকে, তবে উত্তেজনা, তাহা যতই সাময়িক এবং অবিবেচিত হোক না, তাহাতে বিশেষ কোন অনিষ্ট ঘটে না, পরন্তু লক্ষ্যহীন, আদর্শহীন উত্তেজনা জাতিকে হিংস্র পশুত্বের দিকেই লইয়া যায় এবং তেমন উত্তেজনার আবর্তে জাতির স্বচ্ছভাবে মননের শক্তি নষ্ট হয়। লক্ষ্যহীন, আদর্শহীন তেমন উত্তেজনাজনিত অনর্থ বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র এবং সমাজ-জীবনকে বিপর্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। মানুষ মনুষ্যত্ব ভুলিয়া আত্মধ্বংসী পশুত্বে প্রমত্ত হইয়া উঠিয়াছে। ইহার ফলে সমাজ-জীবনের সংস্থিতি বিচূর্ণ হইতেছে, জাতি তাহার যুগাগত সংস্কৃতির সম্বল হইতে বঞ্চিত হইয়া ভয়াবহ পরাধীনতার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিতেছে। আমাদিগকে আজ এ সম্বন্ধে সতর্ক হইতে হইবে এবং আমাদের রাষ্ট্রীয় সাধনার মূলীভূত ত্যাগ ও সেবার আদর্শকে প্রোজ্জ্বল করিয়া তুলিতে হইবে; এক আদর্শে জাতিকে সংহত করিতে হইবে। একমাত্র কংগ্রেসের দ্বারাই এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে; বস্তুত জাতিকে এক লক্ষ্যে সংহত করিবার মত অন্য কোন প্রতিষ্ঠানই নাই। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দোষ-ত্রুটি যদি কোথায়ও কিছু কিছু দেখা দিয়াও থাকে, তথাপি সমগ্রভাবে কংগ্রেসের এই বিশিষ্টতা ক্ষুণ্ণ হয় নাই। সুতরাং কংগ্রেসকে ভিত্তি করিয়া স্বাধীন ভারতকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। এজন্য কংগ্রেসকর্মীদের আদর্শনিষ্ঠ সাধনায় প্রবৃত্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। পদ, মান এবং প্রতিষ্ঠার মোহ পরিত্যাগ করিয়া জাতির গঠনমূলক কর্মসাধনায় তাঁহাদিগকে প্রবৃত্ত হইতে হইবে; নিঃস্বার্থ সেবার মধ্যে যে অনাবিল আনন্দের উৎস রহিয়াছে, সেই আনন্দকে সম্বল করিয়া তাঁহাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং তজ্জনিত উপদলীয় যত সব চক্রান্ত কংগ্রেসের বিভিন্ন কেন্দ্রে বর্তমানে দেখা দিয়াছে, ত্যাগ ও সেবার সঞ্জীবনী ধারায় সে কলঙ্ক ধৌত করিয়া মনুষ্যত্বের বীর্য জাগাইয়া তুলিতে হইবে

# ভাঙা পেয়ালা

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

আমি নিশ্চয় জানি তুমি এ বাড়িতে নেই,
তবু সংশয় যায় না,
আশার টুকরো ভেসে ভেসে ওঠে
নদীর কালো জলে তারার আলোর মতো,
পরিপূর্ণ নিশ্চয়ের উপরে
অনিশ্চয়ের আশ্বাস,
পূর্ণিমার চন্দ্রমণ্ডলে চকোরের কলঙ্ক।

হঠাৎ মনে হ'ল ওই চৌকাঠের ফ্রেমে
এখনি সম্মুখ হবে তোমার মূর্তি
পূর্বাশার পটে রহস্যময়ী ঊষা।
মনে হ'ল এখনি তোমার স্বপ্ন-নাড়া-দেওয়া কণ্ঠস্বর
ধ্বনিত হবে—হ'ল না
মনে হ'ল জন্মান্তরের সৌহৃদ্য-জাগানো তোমার আঁচলের সুগন্ধ
প্রবাহিত হবে—হ'ল না,
মনে হ'ল কোন্ দৈব মৃগয়ায়
বিভ্রান্ত কুরঙ্গী চন্দ্রকলার মতো
হঠাৎ প্রবেশ করবে তুমি পূর্বেকার মতো আমার মনের গহন অরণ্যে
মনে হ'ল—কিন্তু বৃথা মনে হওয়ার
তালিকা বাড়িয়ে লাভ নেই,
তুমি ছিলে না,
তাই এলে না।
থাক্‌লে আসতে
যেমন এসেছ আগে হাজারবার।
ঘোমটা মাথায় টেনে
আঁচলটা সামলে নিয়ে,
দর্পণকে সাক্ষী ক'রে
মুখের উপরে একবার দ্রুত হাত বুলিয়ে নিয়ে,
তারপরে আরম্ভ হ'ত তুচ্ছ কথার গীতাপাঠ।

চায়ের সময় হ'লে পেয়ালা-চামচে টুং টাং
শব্দ তুলে চা ঢালতে,
দুধে আর চায়ে কেমন মিশতো,
যেন দৈবী ঊষার আবির্ভাব।
রঙের সংগে রঙের জোড় লাগ্‌তো আকাশে,
পর্দায় পর্দায় ঘটত মেলবন্ধন,
কাকলির কলধ্বনি উঠ্‌ত চামচে আর পেয়ালায়।
লোক যতই থাক্ না,
আমার ভাগ্যে পড়তো ভাঙা পেয়ালাটা!
ভাঙা পেয়ালার ভাগ্য নিয়েই এসেছি সংসারে,
আস্ত পেয়ালা আর জুট্‌ল না।
নাই জুট্‌ল—দুঃখ নাই।

ভাঙা পেয়ালায় যে চাক-ভাঙা মধু পেয়েছি
তা কয়জনে পায়?
ভাঙা পেয়ালায় পেয়েছি তোমার বিশ্বাস,
ভাঙা পেয়ালা তোমার পরাজয়ের ভগ্নদূত,
ওতেই স্বীকার ক'রে ফেলেছ
ভাঙা পেয়ালার অপমানে লোকটা পালাবে না;
ওই ভাঙা পেয়ালাতেই আমি চিহ্নিত,
আমি বিশিষ্ট
তোমার আপনার ব'লে।

চিরন্তন হ'য়ে থাক্ আমার ভাঙা পেয়ালা,
আস্তর দাবী আমি রাখবো না।
কিন্তু আজ তুমি নেই।
থাক্‌লে আসতে
আর ভাঙা পেয়ালাটা এগিয়ে দিতে আমার দিকে
অষ্টমী শশীর ভাঙা পেয়ালায়
রজনী যেমন বিশ্বকে দেয় সুধা।

# মেটারলিঙ্ক

শ্রীরবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

যখন মেটারলিঙ্ক সবে সাহিত্য-সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। একজন বড় ফরাসী লেখক তাঁকে "বেলজিয়ামের সেক্সপীয়র" বলে অভিহিত করেছেন। এই সময়ে তাঁর এক ভক্ত তাঁকে ভোজে নিমন্ত্রণ করতে এলে তিনি বললেন—কোন অনুষ্ঠান বা ঘটা করবেন না, আমাকে একজন সামান্য কৃষক বলে মনে করবেন। এ দাম্ভিকের বিনয় বা কোন লৌকিক নম্রতা প্রদর্শন নয়। মেটারলিঙ্ক ছিলেন সত্যিই মহৎ, সরল খোলাপ্রাণ। মিল্টন বলেছেন, বড় কবির জীবনই একখানা বড় কাব্য। মেটারলিঙ্কের কথাবার্তায় আচরণে থাকত একটি সুন্দর কবিচিত্তের আভাস। বন্ধুরা বললেন—তুমি আধুনিক ফরাসী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি। মেটারলিঙ্ক উত্তর করলেন—আমাকে কবি বলবেন না, আমি কবি নই; গদ্য নাটকে আমার ভাব ও কল্পনা প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছি মাত্র।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ২৯শে আগস্ট ঘেণ্ট্ শহরে মেটারলিঙ্কের জন্ম। জেস্যুইট্ ধর্ম-সম্প্রদায়ের এক কলেজে লেখাপড়া করে তিনি ঘেণ্ট্ বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন অধ্যয়ন করেন। কিন্তু আইন ব্যবসা তাঁর ভাল লাগল না। হাতে প্রথম দু'তিনটি মামলায় হেরে তিনি আদালত ছাড়লেন। এ ইসময় থেকেই শুরু হল তাঁর সাহিত্য-জীবন।

মেটারলিঙ্ককে আমরা জানি স্বপ্নের কবি বলে, মিস্টিক্ বলে। তাঁর নাটকে আছে এক গভীর হৃদয়ানুভূতি ও বিস্ময়ের প্রকাশ। তিনি যেন সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতিকে দেখেছেন পৃথিবীর প্রথম মানুষের বিস্ময়মুগ্ধ চোখ দিয়ে। সংক্ষুব্ধ মহাসাগরের তরঙ্গমালা, নক্ষত্রালোকে সমুজ্জ্বল অসীম আকাশ, বন, নদী, পর্বত, আলো, অন্ধকার সব কিছুর মধ্যেই তিনি অনুভব করেছেন এক অজানা শক্তির, এক অদেখা সৌন্দর্যের সংকেত। তাঁর প্রথম যুগের নাটকে দেখতে পাই এই বিস্ময়ের সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে ভয় ও আশঙ্কা। মানুষের সুখ-শান্তি বিনষ্ট করছে এক হৃদয়হীন ক্রূর শক্তি। যে শিশুটির সরল হাসি সমস্ত ঘরে ঢেলে দিয়েছে এত আলো, এত সুর, মৃত্যু নেয় তাকে চোখের পলকে আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে। মেটারলিঙ্কের প্রথমদিককার কয়েকখানি নাটকে আছে এক হতাশা। নিবিড় সৌন্দর্যানুভূতি আর মানুষের প্রতি মমত্ব বোধ থেকেই আসে এই আশঙ্কা। জীবনের আস্বাদই আনে মৃত্যুর ভয়। কিন্তু মেটারলিঙ্কের মন বেশীদিন এরূপ নৈরাশ্যে আচ্ছন্ন ছিল না। তাঁর ১৯০০ খৃষ্টাব্দের পরে লেখা নাটকে আমরা সন্ধান পাই এক নতুন আলোকের, এক নতুন বিশ্বাসের। হতাশা ও আশঙ্কার পারগেটরীর পার হয়ে যেন তিনি উপনীত হলেন এক আনন্দের স্বর্গে। তখন পেলেন তিনি সত্য ও সুন্দরের পরিচয়। বুঝলেন প্রেম ও প্রীতিই সৃষ্টির মূলে। সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে তিনি অনুভব করলেন এক সুন্দর ছন্দ। প্রভাতের আলো, শিশুর হাসি, দিগন্তের নীলিমা, পৃথিবীতে যা কিছু সুন্দর সবি যেন এক সুরে বাঁধা, একই মহাসত্যের প্রকাশ। মৃত্যু আছে, বেদনা আছে; কিন্তু তা জগতের প্রাণধর্মকে নষ্ট করতে পারে না। মেটারলিঙ্কের শ্রেষ্ঠ নাটক "নীল-পাখী" (ব্লু-বার্ড) এই বিস্ময়মুগ্ধ আনন্দময় অনুভূতির প্রকাশ। তিলতিল-মিতিলের স্বপ্নরাজ্যে অন্ধকার আছে, ভয় ও বিপদ আছে। কিন্তু তাদের স্বপ্নপথের যাত্রার শেষ আলোকে, শান্ত স্নেহপূর্ণ কুটীর-জীবনের নির্মল দীপ্তিতে। নানা বাধা-বিঘ্নের ভেতর দিয়ে, নানা শঙ্কা নিরাশার ভেতর দিয়ে
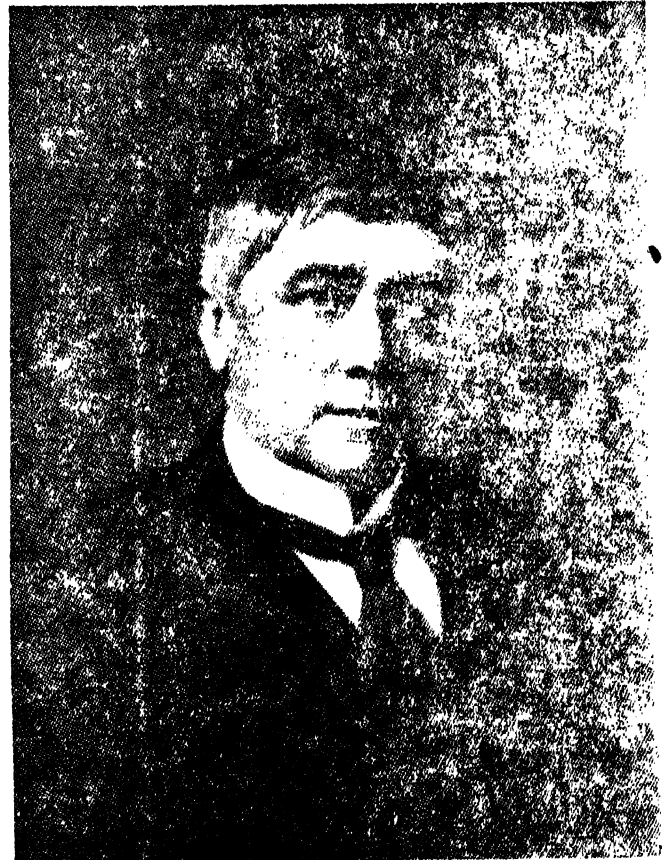
এই শিশু দুটি পথ হেঁটেছে নীল-পাখীর সন্ধানে। তাই বুঝি তাদের যাত্রা মাত্র স্বপ্নের যাত্রা নয়—তা কঠিন বাস্তবজীবনের এক গভীর রহস্যাবৃত রূপ। এ ভাবহীন অলসের রঙিন স্বপ্ন নয়, রংচঙা কাঁচের ভেতর দিয়ে দুনিয়াকে দেখা নয়। নিছক কল্পনা-বিলাস থেকে 'নীল-পাখীর' মত কাব্যের সৃষ্টি হতে পারে না। এ নাটকের মধ্যে রূপায়িত হয়েছে এক রসানুভূতি—এক নতুন আলোক ও আনন্দময় জীবনের আশা। তিলতিলমিতিলের সেই সোনার প্রভাত যেন এক নতুন বিশ্বের নতুন প্রভাত। এ নাটকের প্রত্যেকটি ঘটনাকে রূপক বলে বিচার করলে, এর প্রত্যেক চরিত্রে তত্ত্বের খোঁজ করলে এর মূল ভাবব্যঞ্জনা আমরা ধরতে পারব না। 'নীল-পাখীর' তত্ত্ব রহস্যে মিলিয়ে গেছে। সূক্ষ্ম তত্ত্ববিচার করে এর অর্থ ধরা যাবে না। কারণ এর দ্যোতনা শিশুর হাসির মত সরল ও রহস্যময় "নীল-পাখীর" রাজ্য যেমন অনন্ত বিশ্বে বিস্তৃত তেমন আবার এক মজুরের কুটিরে সীমাবদ্ধ। সেই কুটিরের জানালা দিয়ে ঘরে আসছে নির্মল আলো—সমস্ত বিশ্বের প্রেম ও আনন্দের বার্তা। "নীল-পাখী" নিবিল ভোরের কাব্য। তিলতিল-মিতিলের ঘুম ভাঙলে তারা তাদের নীল-পাখী দিয়ে দিল তাদের এক প্রতিবেশীর শিশুকে—কারণ সে নীল-পাখী চেয়েছে। সেদিন বড়দিন। তিলতিলমিতিলের এই দিয়ে দেয়ার মধ্যে যেন শুনতে পাই বাইবেলের সেই কথা—For of such is the kingdom of God—স্বর্গরাজ্য এই শিশুদের জন্যেই।

"নীল-পাখীর কবি প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, সাহিত্যিকের শ্রেষ্ঠ সম্মান নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। তবু প্রশ্ন ওঠে—আমাদের যুগ নীল-পাখীর যুগ কিনা। বাস্তবিকই মেটারলিঙ্কের কাব্য বিশ্বসাহিত্যে কতদিন বেঁচে থাকবে বলা কঠিন। আধুনিক সাহিত্য বিস্ময় ও রহস্যের পথ ছেড়ে নিছক বুদ্ধির পথ ধরেছে। এর আলো অপারেসন থিয়েটারের তীব্র ইলেকট্রিকের আলো। এতে সমাজদেহের ও মানবমনের সমস্ত সূক্ষ্ম ক্ষত, সমস্ত নিয়ত জীবাণু ধরা পড়ে। চাঁদের আলো বা প্রদীপের আলোতে একাজ হয় না। এই বোধ হয় সাহিত্য বিবর্তনের স্বাভাবিক পরিণতি। প্রাচীন মানুষের সেই বিস্ময়, সেই রহস্যবোধ, রসঘন ভাবাবেগ বোধ হয় কালধর্মে আমাদের মন থেকে বিদায় নিয়েছে। কিন্তু তা কি চিরকালের জন্যে বিদায় নিয়েছে? প্লেটো বলেছিলেন বিস্ময়ই জ্ঞানের দুয়ার। যদি বিস্ময়কে বাদ দেই, তবে সেই জ্ঞানের দুয়ার কি বন্ধ হয়ে যাবে না? বিজ্ঞানে কত নতুন নতুন আবিষ্কার হয়েছে—সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে টেপ দিয়ে মাপা হয়েছে। সব কিছুই যেন আমাদের আয়ত্তের মধ্যে এসেছে, আমাদের বুদ্ধির খপ্পরে পড়ে গেছে। কিন্তু তবু ত সৃষ্টি যেন মানুষের কাছে এক বিরাট প্রহেলিকা। এক আধুনিক বৈজ্ঞানিক নাকি বলেছেন—

"The wave-mechanics theory reduces the last building-stones of the universe to something like a spiritual throb".

এই স্পন্দন কি বা কিসের তা বিজ্ঞান ধরতে পারবে কিনা বলা যায় না। তবে কবি হৃদয় দিয়ে অনুভব করে এই স্পন্দন। তার চোখে ধরা দেয় সারা বিশ্বের পুলক-শিহরণ। তৃণে-পুলকিত মাটির ধরা লুটায় আমার সামনে। নিশার আকাশ যেন কেমন করে তার পানে তাকায়। লক্ষ যোজন দূরের তারকা যেন কি ভাষায় তাকে ডাকে। সেই প্রাণের আলোড়নে সে পায় এক ঐক্যের সন্ধান সব কিছুর মধ্যে দেখে এক সুর ও রঙের একাকার। সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে হয় তার এক নিবিড় আত্মীয়তা।

ধুলারেও মানি আপনা ছোট-বড় হীন সবার মাঝারে করি চিত্তের স্থাপনা। মিস্টিক মেটারলিঙ্কের ছিল এই ঐক্যবোধ, বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে এই আত্মবোধ।

সামাজিক বা ব্যক্তি-জীবনের ছোট-বড় সমস্যা তাঁর অজানা ছিল না। দুই-একখানা নাটকে তিনি তার অবতারণাও করেছেন। তার মোনা-ভানা নাটক ঠিক ইবসেনের ডলস্ হাউস-এর ছাঁচে লেখা। এই নাটকের সমস্যা পুরুষ যেমন দেশের জন্য সব বিসর্জন দিতে পারে, নারী তার স্বদেশ রক্ষার জন্য তার সম্মান বিসর্জন দিতে পারে কিনা।

"মোনা-ভানা" খাঁটি সমস্যা নাটকও নয়, ঠিক ট্রাজেডিও নয়। নায়িকার বলিষ্ঠ প্রাণ-ধর্ম তার সমস্যার জটিল গ্রন্থি আলগা করে দিয়ে দিল তাকে সার্থক জীবনের খোঁজ।

"নীল-পাখী"ই মেটারলিঙ্কের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। এ নাটকে রূপ পেয়েছে তার সবচেয়ে গভীর রহস্যময় অনুভূতির। এ নাটকের শেষে এক আনন্দময় পরিপূর্ণতায়। সব ক্ষতি মিথ্যা করি • অনন্তের আনন্দ বিরাজে। নীল-পাখী সম্বন্ধে এক রুশ নাট্যপরিচালক বলেছেন—

"Let the Blue Bird in our theatre thrill the grand children and arouse serious thoughts and deep feelings in their grand-parents. Let the grand-children on coming home from the theatre feel the joy of existence with which Tyltyl and Mytyl are possessed in the last act of the play. At the same time let these grand-fathers and grand-mother's once more before their impending death become inspired with the natural desire of men: to enjoy God's world and be glad that it is beautiful."

"নীল-পাখী"র মর্ম এই। মনে হয় যেন সৃষ্টির সব কিছুই দেখলাম এক নতুন চোখ নিয়ে। এক নতুন সুর যেন বেজে ওঠে আমাদের চিত্তে—

বাজালে যে সুরে প্রভাত-আলোরে সেই
সুরে মোরে বাজাও।
যে সুর ভরিলে ভাষা-ভোলা গীতে
শিশুর নবীন জীবন-বাঁশীতে
জননীর মুখ-তাকানো হাসিতে—সেই সুরে
মোরে বাজাও।

মিস্টিক মেটারলিঙ্ক খুঁজতেন এই সুর। তাঁর সুন্দর প্রবন্ধগুলিতেও আছে এক সুরের ব্যঞ্জনা। বিস্ময়বোধের প্রেরণায় তিনি আগ্রহ নিয়ে পড়তেন সব প্রাচীন দেশের সাহিত্য ও ইতিহাস। ঋগ্‌বেদ পড়ে তিনি অনুভব করলেন প্রাচীন মনের সঙ্গে তার মনের সংযোগ। "ভারতবর্ষ" প্রবন্ধে তিনি লিখলেন ঋগ্‌বেদ সম্বন্ধে।

Is it possible to find in our human annals, words more majestic, more august in tone, more divine.

ভারতীয় মনের সঙ্গে তাঁর মনের এই ঐক্য তিনি আবার বুঝলেন রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি পড়ে। তিনি বলতেন—"গীতাঞ্জলির মধ্যে এমন সব কবিতা পড়েছি, যার থেকে গভীর হৃদয়স্পর্শী কবিতা আর কিছু কোথাও নেই। "নীল-পাখী"র কবির সঙ্গে আছে আমাদের এক বিশেষ আত্মীয়তা। "নীল-পাখী"র আলো এসে পড়েছে আমাদের প্রাঙ্গণে।

# কবি-ফৌজদার প্রেমেন্দ্র মিত্র—

## শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৯৩২ সাল। ক্লাস করি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যের, মন কিন্তু সর্বক্ষণ পড়ে থাকে কলেজ স্কোয়ারের উত্তরে ছোট্ট একটা বই এর দোকানে। তারি অন্দরের ঘুপ্‌সি ঘর দিনকয়েক আগে বই কিনতে ঢুকে হাতে পড়েছিল কবিতার এক বই-এর সদ্য-ছাপা আলগা একটি ফর্মা। দোকানের মালিক আপত্তি করলেন না পড়তে দিতে, একটু অবাকই হলাম। কালি তখনো শুকোয় নি, প্রেসের তাজা গন্ধ যেন লেগে রয়েছে তাতে,—পড়ে দেখি কবিতাগুলিও তাজা। রসের ভিয়ান, সে রসের উচ্ছ্বসিত উৎসারণ, তাজা প্রাণের উৎস থেকে। রবীন্দ্রনাথের 'শিশু' কাব্যের "পাখির পালক" কবিতাটি মনে পড়ে কি? রঙীন একটি পালক হঠাৎ ধুলোয় কুড়িয়ে পেয়ে ছোট্ট মেয়েটির মনের যে অবস্থা হয়েছিল, আমারও সেদিন অনেকটা সেই দশা—

> সোনালী রঙের পাখির পালক
> ধোয়া সে সোনার স্রোতে
> খসে এল যেন তরুণ আলোক
> অরুণের পাখা হতে।
> *   *   *   *
> ছোটোখাটো নীড় শাবকের ভিড়
> কতো মতো কলরব,
> প্রভাতের সুখ, উড়িবার আশা
> মনে পড়ে যেন সব।

নামহীন কয়েকটি মাত্র কবিতায় বাস্তবিকই বলরবের অন্ত ছিল না। নূতন সূর্যোদয়, নূতন আকাশ, নূতন আশা-আকাঙ্ক্ষার কত বিচিত্র রাগরাগিণীর গান। সূর্যসচেতন সুদূরে কোন্ বনবিহঙ্গের উধাও উন্মুক্ত ডানার ঝাপট সেদিন যেন অনেকক্ষণ ধরে ধ্বনিত হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য-ক্লাসের শেকল-বাঁধা আমার তরুণচিত্তের গভীরে।

সেই থেকে প্রত্যহ ক্লাস ফাঁকি দিয়ে জুটতে শুরু করলাম নগণ্য সেই ছোট্ট দোকান-ঘরটিতে কবিতার বইখানির পরবর্তী নতুন নতুন ফর্মাগুলির সন্ধানে। ক্লাস-পালিয়ে বইএর দোকানে বসে টাটকা-ছাপা ফর্মা থেকে কবিতা পড়ার মধ্যে এমনিতেই বোধ করি বেশ একটু রোমান্টিক আকর্ষণ ছিল। তার ওপরে বিস্ময় বড়ো কম ছিল না আরম্ভের কয়েকটি কাব্য-পংক্তিতেও, বিশেষ ক'রে আমাদের ওই কাঁচা বয়সের পক্ষে—

> এ মাটির ঢেলা কবে কে ছুড়িল সূর্যের পানে ভাই
> পৃথিবী যাহার নাম।
> লক্ষ্যভ্রষ্ট চিরদিন সে যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফেরে
> সূর্যেরে অবিরাম।

অথবা—

> আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির আর,
> ছুতোরের,
> মুটে মজুরের,
> আমি কবি যত ইতরের।

পৃথিবীর মতো স্থির ধ্রুবগতিশীল আস্ত সৌর-গ্রহটিকে বালকের হাতের তুচ্ছ মাটির ঢেলার মতো আচমকা সূর্যের অগ্নিকক্ষের দিকে ছুড়ে মারার কল্পনা ও-বয়সে খুবই চমক লাগায়। নিঃসঙ্কোচে উচ্চকণ্ঠে যে-লেখক নিজেকে ইতরজনার কবি বলে ঘোষণা ক'রে বসে হাটের মাঝখানে, তার প্রতি অহৈতুক একটা টান না জেগেও পারে না। কবির নাম তখনো জানি না; শুধু জানলাম, এই তাঁর প্রথম কবিতার বই—নামেও বইটি তাই 'প্রথমা,' ভাষায় ও ছন্দে অনবদ্য পাকাহাতের কারিগরি। মনের দিগন্তে ফর্মার পর ফর্মা গেঁথে তিলে তিলে যেন গড়ে উঠছিল কাব্যের এক ইন্দ্রজাল-জড়িত প্রবাল দ্বীপ, অর্ধোদ্যত অগ্নিগিরির পুঞ্জিত বেদনাভাসও যেন থেকে থেকে অনুভব করা যায় তার অন্তরালে।

বলা বোধ করি বাহুল্য যে, বইখানি বাজারে বেরোবা-মাত্রই কিনেছিলাম। নিতান্ত যদি সর্বপ্রথম নাও হই, 'প্রথমা' কাব্যের অন্যতম প্রথম ক্রেতা আমি নিঃসন্দেহে। হস্টেলের একা-ঘরে আর একবার রসিয়ে পড়া শুরু হল কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতা; অন্তরঙ্গ রসিক সুহৃদদের চেঁচিয়ে পড়ে শোনাতেও সেদিন কসুর করিনি। 'মাটির ঢেলা' 'জীবন-শিয়রে বসি স্বপ্ন দেয় দোল', 'মৃত্যুরে কে মনে রাখে', 'জীবনমহাদেবের নৃত্য' প্রভৃতি কবিতা, একের পর এক। আমার সে নবীন উৎসাহের কথা আজো তাঁদের অনেকে মনে রেখেছেন দেখে বিশেষ তৃপ্তি বোধ করে থাকি।

প্রেমেন্দ্রের 'প্রথমা'র প্রথম কবিতাতেই পড়লাম—

> পথভ্রান্ত দেবতা মোদের, নয়নে অমৃত-ভাতি
> হিংস্র নখর হাতে;
> জানি তার বাণী সর্বনাশিনী তবুও চলিতে হবে
> তারি মূক ইশারাতে।

রবীন্দ্র-কাব্যে আবাল্যকাল আমরা মানুষ; হয়তো সেই কারণে আমার কল্পনায় রবীন্দ্রনাথের নিত্যকৌতুকময়ী জীবনদেবতাই—কবি যাঁকে, 'আমার প্রেয়সী' আমার দেবতা, আমার বিশ্বরূপী, বলেও তৃপ্তি পান নি—কী এক যেন নূতন রূপে প্রকাশ পেলেন, বিশেষ ক'রে ওই 'পথভ্রান্ত' শব্দটির অব্যর্থ অর্থব্যঞ্জনায়। মনে হল, হোক্ 'পথভ্রান্ত', হোক্ তার হাতে 'হিংস্র নখর,' নয়নে যখন 'অমৃতভাতি' নিভে

নেভেনি 'সর্বনাশ' তার ভাগ্যালিপি হবে কেমন ক'রে?

বাস্তবিক, তদ্‌গত হয়ে কবিতা পাঠ করবার সে ছিল এক আশ্চর্য বয়স! প্রত্যহ সাগ্রহে পড়ি ললিতে-কঠোরে মেশানো এই নতুন কাব্যটির কবিতা। তার কোনো ছন্দ-নিটোল পংক্তিতে সহসা হয়তো—

জীবনের যাত্রা হেরি মহাকাশ ব্যেপে,
'তারায় তারায় তার জয়ধ্বনি উঠে কে'পে কে'পে।

আবার কোথাও বা—

হাঁকে ফিরিওলা, কাগজ বিক্রি,
পুরোনো কাগজ চাই।
ঘর ভরি যত মিছে জঞ্জাল
জমাবার নাহি ঠাঁই।

কোথাও শুনি রূঢ় উদ্ধত কণ্ঠস্বর—

জীবনবিধাতা, আজি বিদ্রোহীর লহ নমস্কার!
লহ এই প্রীতিহীন প্রণিপাতখানি।

অব্যবহিত পরেই শুনি শান্ত নম্র সংগীত—

দেহের বীণাতে ওঠে ঝঙ্কারিয়া সুরের প্রণতি
নমো নমো নমো!
নয় বাণী, নয় স্তুতি, নহেক প্রার্থনা;
গান নয়, নয় আরাধনা,
শুধু দেহ দীপ হয়ে ওঠে শিখাসম
নমো নমো নমো!

একদিকে মানবলোকের সংকীর্ণ পরিধিতে 'লোহ-কাষ্ঠ-শিলা কারাগারে' 'যন্ত্রের চক্রান্ত',—'ষড়যন্ত্র লোহে আর লোভে'; অন্যদিকে বিরাট বিশ্বলোকে দেখি 'রাত্রির রহস্য আর আলো গন্ধ রূপ' এবং 'সীমাহীন আকাশের সুনীল বিস্ময়'। জগৎচরাচরের ও মানবজীবনের উভয় দিক্‌প্রান্তচুম্বী এই কবিমানসের উদার পরিধি দেখে অত্যন্ত অবাক হয়েছিলাম সেদিন। বিশ্বাস করাই কঠিন হয়েছিল যে, 'প্রথমা' কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ। রবীন্দ্রকাব্য-সংস্কৃতি, তার ছন্দ ও অলংকারশৈলীতে আদ্যোপান্ত সুপরিপুষ্ট, অথচ কবির নিজস্ব মননশক্তি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অম্লান দীপ্তি-শীল। এর বছর দুই পূর্বে ১৯৩০ সালে প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসুর 'বন্দীর বন্দনা'ও, মনে আছে, কিছু কম নাড়া দেয় নি আমার হৃদয়কে। অথচ সে ছিল আত্মাভিকেন্দ্রিক তরুণ মানসের সুতীব্র, কিন্তু অনেক সংকীর্ণতর, উচ্ছ্বাস। স্থানে স্থানে তাই পীড়িত হয়েছিলাম তার নবযৌবন-সুলভ বাক্‌বাহুল্যে। রবীন্দ্রনাথ যে সে-কাব্যের কাঁচি-ছাঁটা অংশমাত্র সেদিন পড়েছিলেন, এখন মনে হয়, উভয় কবির পক্ষেই তা যথার্থ হিতকর হয়েছিল। প্রেমেন্দ্রবাবু তাঁর 'প্রথমা' কাব্যের আপাত-বিপরীতধর্মী কয়েকটি কবিতাতে পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' কাব্যের ভাবপ্রেরণা অনেক ক্ষেত্রেই অনুসরণ করেছেন; কিন্তু উক্ত কাব্যের বহুসম্পদশালী বাক্‌প্রবাহের অবাধ অজস্রতাকে অনুকরণ করতে গিয়ে নিজের স্বভাবসংযমী প্রতিভাকে কোথাও তিনি বিপর্যস্ত করেন নি। তাঁর 'মুটে মজুরের' গান মোহ বিস্তার যে করতে পারে নি দীর্ঘদিনের জন্য আমার মনে, এ-কথা আজ অকপটেই বলব।—

কামারের সাথে হাতুড়ি পিটাই
ছুতোরের ধরি তুরপুণ,
কোন্ সে অজানা নদীপথে ভাই
জোয়ারের মুখে টানি গুণ।
পাল তুলে দিয়ে কোন্ সে সাগরে,
জাল ফেলি কোন্ দরিয়ায়;
কোন্ সে পাহাড়ে কাটি সুড়ঙ্গ,
কোথা অরণ্য উচ্ছেদ করি ভাই
কুঠার ঘায়।

এ ধরণের পংক্তির অতি সহজ প্রথম যে আকর্ষণ, অচিরেই তা আলগা হতে লাগল ওঅল্‌ট্‌ হিট্‌ম্যান্-এর (Walt Whitman) বলিষ্ঠতর বাণীর পরিচয় একটু ঘনিষ্ঠভাবে পাবার সঙ্গে সঙ্গেঃ

The young mechanic is closest to me,
he knows me well,
The woodman that takes his axe and
jug with him shall take me
with him all day,
The farm-boy ploughing in the field
feels good at the sound of
my voice,
In vessels that sail my words sail,
I go with fishermen and seamen
and love them.
—Song of Myself

অমন সহজ সুন্দর ধুয়া—"সময় যে হায় নাই", সেটি পর্যন্ত হিট্‌ম্যানের "I perceive I have no time to lose"-এর প্রতিধ্বনি মনে হতে লাগল।

কিন্তু এহ বাহ্য। সেদিনের সব চেয়ে বড়ো খবর হল, 'প্রথমা' প্রথম থেকেই আমাদের হৃদয় হরণ করেছিল। কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রের পরবর্তী নূতন কাব্যের প্রতীক্ষায় আমরা কাল গুনতে লাগলাম পরম আগ্রহসহকারে। এখানে উল্লেখ করলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, রবীন্দ্রনাথ "আগুনে ঢালাই করা হাতুড়ি পিটানো কবিতা" ব'লে 'প্রথমা'র কবিতাগুলির প্রশংসা ক'রে অবশেষে কবিকে কিন্তু অতি মূল্যবান দুটি কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেনঃ

"জীবনের যে ভূভাগে মরুর অধিকার পাকা হয়নি, যেখানে ফুল ফোটে, ফল ফলে, সেখানেও কবি বাঁশি বাজাবার বায়না পেয়েছে একথা মনে রেখো—কেবলি দুন্দুভি বাজাবার পালা তার নয়।"

বলা প্রয়োজন, কবিগুরুর এ মন্তব্য তখন জানতে পারি নি; জেনেছি দীর্ঘকাল পরে কবিপ্রয়াণ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত 'রবীন্দ্র-স্মৃতি পূর্বাশা'য় (পৃষ্ঠা ১১৯)। এবং জেনে নিভৃতে এই ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিলাম যে, 'প্রথমা'র কবির কেবলমাত্র দুন্দুভিধ্বনি শুনে আমরাও বধির হইনি, তাঁর বাঁশি-সাধুবার সযত্ন পরিচয়ও আমরা নিতে চেষ্টা করেছি তাঁর সেদিনকার কাব্যে।

সুদীর্ঘ আট বৎসর পরে ১৯৪০ সালে প্রকাশিত হয়েছিল প্রেমেন্দ্রবাবুর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'সম্রাট'। সমান দ্বাদশ-কালের ব্যবধানে ১৯৪৮ সালে (বৈশাখ ১৩৫৫) সম্প্রতি সিগ্‌নেট প্রেস থেকে আত্মপ্রকাশ করেছে তাঁর 'ফেরারী ফৌজ'। বাংলা আধুনিক কাব্যের বহুজনাকীর্ণ প্রাঙ্গণপ্রান্তে মিত্র-কবির দৃঢ়-দীর্ঘপদক্ষেপের এই যে পদচারণ, বাস্তবিকই এর একটি বিশিষ্ট মহিমা আছে।

যতদূর জানি, ভাষার দৈনন্দিন বাক্যের রাজ্যে প্রেমেন্দ্রবাবু মিতভাষী; রসাত্মক বাক্যের রাজ্যেও তিনি যে কী পরিমাণ মিতবাক্ অধার হয়েছি তার অব্যর্থ প্রমাণ পেয়ে এই দুটি কাব্যে। তাঁর 'সম্রাট'-যুগের (হয়তো এখনও) প্রিয় কবি ডি এইচ্ লরেন্স পর্যন্ত টলাতে পারেন নি তাঁকে তাঁর এই আদর্শ থেকে; দেখে যারপর নাই আশ্বস্ত হয়েছি তাঁর স্বকীয় প্রতিভা সম্বন্ধে। উক্ত গ্রন্থের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গদ্যকবিতা 'নীলকণ্ঠ'। সেটিতে লরেন্স-সুলভ হাওয়াই দ্বীপের হাওয়া অবিরাম বয়ে থাকলেও 'রাত্রি-নিবিড় অরণ্য-গহন আফ্রিকার' রোমাঞ্চিত উত্তাল সংগীতই শেষ পর্যন্ত প্রেমেন্দ্রবাবুর কবিপ্রতিভার প্রাণ রক্ষা করেছে। সার্থক সুরে বেজেছে তাঁর শেষ প্রার্থনা তাই আমাদেরও প্রাণে—

সভ্যতাকে সুস্থ করো, করো সার্থক।
আনো তীব্র, তপ্ত, ঝাঁঝালো, মৃত্যুর স্বাদ,
সূর্য আর সমুদ্রের ঔরসে
যাদের জন্ম,
মৃত্যু-মাতাল তাদের রক্তের বিনিময়।

বিষবিকারগ্রস্ত রুগ্ন-সভ্যতার রূপ পৃথিবীতে কোনো দেশেই আজ আর স্বাস্থ্য-সমুদ্দীপ্ত নয়। তাই চরম ধিক্কার জেগেছে লরেন্স প্রমুখ পশ্চিম-সাগরপারের কবিদের মতোই আমাদের কবিরও কণ্ঠে—

ভরাট-করা সমুদ্র আর উচ্ছেদ-করা অরণ্যের বুকে
কি লাভ গড়ে' কৃমি-কীটের সভ্যতা,
লালন ক'রে স্তিমিত দীর্ঘ পরমায়ু
কচ্ছপের মত?
অ্যামিবারও ত' মৃত্যু নেই।
—নীলকণ্ঠ

তবু বলব, এও হল হতাশারই অন্য এক-প্রকার রূপভেদ। 'প্রথমা'-য় এই বেদনারই প্রকাশ দেখেছিলাম মাঝে মাঝে তীব্র গভীর বিলাপে, 'সম্রাট'-এ সেই নৈরাশ্যবেদনাই বেজেছে যেন ধিক্কার ও ভর্ৎসনার উদ্ধত তির্যক ভঙ্গীতে।

কিন্তু এর মধ্যে শেষ পর্যন্ত রক্ষাকবচের কাজ করেছে প্রেমেন্দ্রবাবুর সহজ সম্প্রসারণশীল কবিমানস। প্রাচীন সভ্যতা-পুষ্ট প্রাচ্য দেশীয় কবিমাত্রেরই সহজাত হবার কথা এই প্রতীচ্য-দুর্লভ শক্তির অধিকার, অথচ অন্ধ অনুকরণের বৃত্তির চোরাবালিতে অনেক ক্ষেত্রেই এই শক্তির অপমৃত্যু ঘটতে দেখে হতাশ হয়েছি। মানুষ ও পৃথিবীর প্রতি যথার্থ প্রেম প্রেমেন্দ্রবাবুর স্বস্থ কল্পনাকে যুগপৎ ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক রসদৃষ্টির তৃতীয় নেত্র দান করেছে,

নৈরাশ্যময় চিত্তের বেদনান্ধকারে আশার সঞ্চার করেছে। তাঁর এই নবলব্ধ তৃতীয় ...র সঙ্গে বাস্তব জগতের খুঁটিনাটি-...র্য-সন্ধানী প্রাকৃত দৃষ্টির মিলন যেখানেই ... ও সুসংগত হয়েছে সেখানেই তাঁর কাব্যে ...তির সংহত-মাধুরী দেখে বিস্ময়ে স্তব্ধ ...ছি। বহুবার ক'রে পড়েছি তাঁর 'কাঠের ...ড়ি', 'অবতারণা', 'মৃত্যুত্তীর্ণ', 'পুরাতন ...' প্রভৃতি নব-আশার আলোক-মুখী কবি... ...কটি। 'অবতারণা'য় যে সংবেদনা ও ... চিন্তা সংশয়-প্রত্যয়ের দুই সীমায় ...লিত হয়ে কিঞ্চিৎ অস্পষ্ট আকারে প্রকাশ ...ছে, রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে তারই গভীরতর ...ম্পির বলিষ্ঠবাণী আমরা শুনেছি তাঁর ...তক' ও তৎপরবর্তী কয়েকটি গ্রন্থের বহু ...তে। সদ্য উল্লিখিত কবিতাগুলির সঙ্গে ... থেকে সাগ্রহে আরও পড়েছি, 'পথ', ... ও 'তামাসা'। 'তামাসা' কবিতাটি ... আকর্ষণ করেছিল বহু পূর্বেই, ১৯৪২ ... আশ্বিনে 'কবিতা' পত্রিকার সর্বপ্রথম ... প্রথম কবিতারূপে ওটি যখন প্রকাশিত ... এসবের উপরে আছে শান্ত সংযত ...সবের অতি আশ্চর্য একটি গদ্য-... 'শস্য-প্রশস্তি'।—

> ...ঠের শস্য গৃহে এল—
> ...র স্তোত্র রচনা কর কবি।
> ... ও পশু, আনন্দের বোঝার ভারে নত হয়ে এল
> ... নিয়ে,
> ... সোনাই হল।
> ... আরেকবার মৃত্তিকাকে দোহন করলে,
> ... পশ্চিমে, উত্তরে ও দক্ষিণে,
> ... ফ্রান্সে,...নীল নদীর তীরে....কানাডায়,—
>
> * * * *
>
> ... শস্য এল গৃহে—ধান্য ও যব,
> গম ও ভুট্টা, জোয়ারি..
> ... ও মেঘ, সূর্য ও বায়ুর মিলন সার্থক হল;
>
> * * * *
>
> ... শস্য গৃহে এল,
> ...লের শক্তি ও যৌবন,
> ...রীর রূপ ও করুণা
> ...র পৌরুষ,
> ... মানব-যাত্রীর পাথেয়।
> ... অনাকালের ইতিহাসে, মানবের কীর্তি-
> কাহিনীর তলায়
> ... অক্ষরে
> ... শস্যের আগমনী লেখা থাকবে না কি?

সে-আগমনী লেখার ভার ঐতিহাসিকদের ... নয়, কবিদের উপরে। মনে পড়লো, ...র কবির প্রতি উচ্চারিত রবীন্দ্রনাথের ... বাণী—"যেখানে ফুল ফোটে ফল ... সেখানেও কবি বাঁশী বাজাবার বায়না ...ছে একথা মনে রেখো।" 'শস্য-প্রশস্তি' ... নিঃসংশয় হলাম যে, কবিগুরুর বাণী ...ন্দ্র মিত্রের কবি-জীবনে নিষ্ফল হবার নয়। ...রভাবে আরও অনুভব করলাম, কাব্যটির ...টি নাম ভেরীদুন্দুভি-নিনাদাবিজড়িত আপাতবিভ্রমকারী ছদ্মনাম মাত্র। তাঁর 'চিত্রা' কাব্যে প্রেমের অভিষেকের প্রেরণায় রবীন্দ্রনাথ একদা নিজেকে গৌরবমুকুটিত সম্রাট বলে অনুভব করেছিলেন; —প্রেমেন্দ্রের 'সম্রাট' তারি সগোত্রীয়। 'অজেয় আত্মার অরণ্যপর্বতময়' যে দুর্গমতা, 'বেড়া দিয়ে যে সাম্রাজ্যের জরিপ করা যায় না', কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র মানব-মানস-লোকের দিগন্তবিস্তীর্ণ সেই 'কুরুবর্ষের' এক-ছত্র অধীশ্বর, যেমন অধীশ্বর তুমি, আমি ও আরো সকলে। 'সমবায় সমিতি'র অতি-উৎসাহী সদস্যদের সদাক্রিয়াশীল অযাচিত উৎসাহের কিন্তু বিরাম নেই মানব-সংসারে! তাদের অতর্কিত আক্রমণ প্রতিরোধ করবে কে? রক্ষা হবে কেমন করে মানব-আত্মার দুর্লভ এই সাম্রাজ্য—সর্বমানবের নিজস্ব এই সাম্রাজ্য —'সকলের' হয়েও যা 'যৌথ কারবার' বা 'সমবায় সমিতি' জাতীয় পদার্থ নয় একেবারেই।

মানবাত্মার সুবিপুল এই অলক্ষ্য সাম্রাজ্যের কালজয়ী রক্ষীদলের প্রতি সতেজ আহ্বানই প্রেমেন্দ্র মিত্রের **'ফেরারী ফৌজ'** কাব্যের আহ্বান।—

> —সূর্যসেনা তারা,
> রাত্রির সাম্রাজ্যে আজো
> সন্তর্পণে ফিরিছে ফেরারী।
>
> —ফেরারী ফৌজ]

এদের দুরকম মূর্তির সঙ্গেই কবি পরিচিত আছেন দেখলাম—

> নীলনদীতট থেকে সিন্ধু-উপত্যকা,
> সুমের, আক্কাড আর গাঢ় পীত হোয়াংহোর তীরে,
> বারবার নানা শতাব্দীর
> আকাশ উঠেছে জ্বলে, ঝলসিত যাদের উষ্ণীষে.

এদেরই আর এক পদাতিক মূর্তি অধিকাংশ সময়ে মিশে থাকে মানব-ইতিহাসে, 'সব জনতার মাঝে।' তখন—

> নাম তার জানিনাকো;
> শুধু জানি ধরণীর ধূলিম্লান আশার প্রতীক
> আছে এক করুণ পথিক,
> —যুগে যুগে সব যুদ্ধে ফেরে-ফিরে-আসা
> ক্লান্ত পদাতিক। —জনৈক]

একদিকে—

> ইতিহাসে নিরন্তর
> চিহ্নহীন তার পদধ্বনি
> বেজে বেজে চলে,
> বিপ্লব-আবর্ত ছন্দে
> কভু দ্রুত, কভু বা মন্থর
> দুর্বিসহ জীবনের ভারে।
>
> —জনৈক]

আবার কখনো কবির কালজয়ী কল্পনাপটে উদ্ভাসিত হয়—

> এক একটি সূর্য-কণা তুলে নিয়ে বুকে,
> দুরাশার তুরঙ্গে সওয়ার
> দুর্গম যুগান্ত-মরু পার হবে বলে,
> তারা সব হয়েছে বাহির।

পৃথিবীর সুদূর বিপরীত প্রান্তে গত শতাব্দীর মধ্যভাগে আমেরিকার কবি Pioneers! O Pioneers! বলে উদাত্ত কণ্ঠে যাদের হাঁক দিয়েছিলেন, তারাও অবশ্যই এই ফেরারী সূর্যসেনাদেরই দিগন্তপারের শিবির-সহচর! এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, প্রেমেন্দ্রবাবু 'ফেরারী ফৌজ' ও 'সংসপ্তক' নামক কবিতা দুটিতে একই বক্তব্যকে একই রূপকে উপমায় কিন্তু দুই ভিন্ন জাতীয় ছন্দো-ভঙ্গীতে প্রকাশ করার যে পরখ করেছেন, তা আমাদের দৃষ্টি এড়ায় নি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শেষ সপ্তক' গ্রন্থের এবং 'আফ্রিকা' প্রভৃতি অন্য অনেকগুলি কবিতা নিয়ে এক সময় এই ধরণের ছন্দোবৈচিত্র্যময় যেসব পরীক্ষা করে-ছিলেন, এর পেছনে তার প্রেরণা আছে কিনা, জানি না। তবে, রবীন্দ্রনাথের পরীক্ষাগুলি ছিল প্রধানত পদ্যছন্দ ও গদ্যছন্দের বিপরীত-ধর্মী রূপের মধ্যে; এক্ষেত্রে প্রেমেন্দ্রবাবু পরীক্ষা করেছেন অমিল পদ্যছন্দেরই মুক্তক ও সুপিনদ্ধ সংহততর রূপ নিয়ে।

সে যাই হোক, 'ফেরারী ফৌজ'-এর কবির গভীরতম আক্ষেপটির কথা আমাদের ভুললে চলবে না—

> ছড়ানো সূর্যের কণা
> জড়ো ক'রে যারা
> জ্বালাবে নতুন দিন,
> তারা আজো পলাতক,
> দলছাড়া ঘুরে ফেরে দেশে আর কালে।

দূর যুগান্তরের আলোকবাণীর সঙ্গে বর্তমানের বিশ্বময় বিচ্ছুরিত, বিক্ষিপ্ত আলোকবাণীর পরিণয় সাধন ক'রে তাদের দুঃসহ বন্ধ্যাত্ব ঘোচাবার স্বপ্ন জেগেছে নবীন কবির দৃষ্টিতে। সূর্যের উত্তরাধিকার শক্তিরই সাধক আমাদের কবি। তার রুদ্রতেজ দগ্ধ করুক এ-যুগের মানব-সভ্যতার যা মরণীয়; তার আলো সজীব সতেজ করে তুলুক, ফলবান করুক মানব-সংসারে যা প্রাণের ও প্রেমের নবনবোন্মেষ-সম্ভাবনায় নিত্য সত্য ও নিত্য সুন্দর। এইখানেই লক্ষ্য করি, প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাব্য-সাধনার গোত্রগত মিল ভারতের কবি-সাধক রবীন্দ্রনাথ ও বৃহৎ বিশ্বের অন্যান্য মহাকবিদের সঙ্গে। তাই প্রেমেন্দ্র মিত্র কবি হিসাবে শুধুই কেবল নূতন বা আধুনিক নন, তিনি নবীন ও সর্বকালীন। যুগ-যুগান্তরের, দেশ-দেশান্তরের সূর্যসেনাদের তিনি আহ্বান জানিয়েছেন উদ্দীপ্ত প্রবল কণ্ঠে:

> এখনো ফেরারী কেন?
> ফেরো সব পলাতক সেনা।
> সাত সাগরের তীরে
> ফৌজদার হেঁকে যায় শোনো;
> আনো সব সূর্যকণা
> রাত্রি-মোছা চরাচরের প্রকাশ্য প্রান্তরে।
> —এবার অজ্ঞাতবাস শেষ হলো
> ফেরারী ফৌজের

কবিতাটি অনেকবার আবৃত্তি করেছি মুক্তকণ্ঠে, প্রাণে গভীর প্রেরণাও অনুভব করেছি। কিন্তু তারি সঙ্গে বিষণ্ণচিত্তে স্মরণ হয়েছে নিষ্ফল পরিণামের কথা এর চেয়েও বলিষ্ঠ-কণ্ঠ আর-এক বিশ্ববিশ্রুত 'ফৌজদারের' আহ্বানের। ফরাসী মনীষী রমাঁ রলাঁকে (Romain Rolland) প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে যথার্থই ফেরারী হতে হয়েছিল তাঁর মাতৃভূমি ফ্রান্স থেকে সুইটজারল্যান্ডে, প্রায় আজীবনের জন্যে বললেই চলে। তাঁর ১৯১৯ সালে প্রচারিত DECLARATION OF INDEPENDENCE OF THE SPIRIT (বিশ্ব মানবাত্মার স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে ঘোষণা) তিনি ১০ এপ্রিল তারিখে (১৯১৯) ভিলেনিউভ্' হোটেল বায়রন (Villeneuve, Hotel Byron, Switzerland) থেকে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়েছিলেন তাঁর স্বাক্ষরের জন্যে। পৃথিবীর স্বনামধন্য বহু মনীষীর স্বাক্ষরসম্বলিত হয়ে এই ঘোষণা প্রথম প্রকাশিত হয় প্যারিস থেকে (L'Humanite', Paris, 26-6-1919)*। 'ফেরারী ফৌজ'-এর পাঠকদের প্রেরণা অধিকতর শক্তিলাভ করবে আশা করে এখানে তার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করলাম। রলাঁ এই আলোর সৈনিকদের সম্বোধন করেছেন, **Toilers of spirit**, companions, scattered all over the world বলে। যে-বিরুদ্ধ শক্তিকে 'সম্রাট'-এর কবি ব্যঙ্গ করে সংক্ষেপে বলেছেন, 'সমবায় সমিতি', তারই ব্যাপক বর্ণনা করেছেন রলাঁ—

—The elemental strength of **great collective currents!**

অবশেষে রলাঁর কণ্ঠ হাঁক দিয়েছে বিশ্ববাসীর নানা প্রান্তে ছড়িয়ে-পড়া চিত্তশক্তিকে—

Arise! Let us extricate the spirit from these compromises, these humiliating alliances, this secret slavery! The spirit is the servant of none. It is we who are servants of spirit. We have no other master. We are born to bear its torch, to defend it, to rally round it all those who have strayed. Our part, our duty is to maintain a fixed point, to point out the polar star, amidst the whirl of passions in the night....... We serve truth alone which is free, with no frontiers, with no limits, with no prejudices of race or cast. Of course we shall not dissociate ourselves from the interests of Humanity! We shall work for it, but for it as a whole.......

কিন্তু, কোথায় তলিয়ে গেল রসাতলে রলাঁর এই Alliance of the Free Spirit-এর স্বপ্ন-সংকল্প দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনা-মুখে। প্রথম মহাযুদ্ধের ফলাফল লক্ষ্য করে তিনি বলেছিলেন, The war has thrown our ranks into disarry। আরো কী পরিমাণ বীভৎস বুদ্বুদের আকারে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল তাঁর Toilers of the Spirit বা 'সূর্যসেনাদলের' বিশ্বব্যাপী ব্যূহ-রচনার নব চেষ্টা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আক্রমণে, সেতো চোখের উপরেই আমরা দেখলাম। আলোর সৈনিক কি চিরদিনের জন্যেই 'ফেরারী' হয়ে থাকবে? সেই কি তার অমোঘ বিধিলিপি!

মনে পড়ে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধের উপসংহার করতে গিয়ে বলেছেন,—'কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব।' সৌভাগ্যক্রমে 'ফেরারী ফৌজ'-এর কবি-ফৌজদার প্রেমেন্দ্র মিত্রও আমাদের পাঠক চিত্তে সেই বিশ্বাসের মুক্ত বাতায়নটিকেই উন্মুক্ত রাখবার সাধ্যমতো চেষ্টা করেছেন, অথচ মিথ্যা দিয়ে কোথাও সত্যকে ভোলাবারও চেষ্টা করেন নি।

'ফেরারী ফৌজ' কাব্য সম্বন্ধে এতক্ষণ যা আলোচনা করলাম, অনেকে হয়তো বলতে পারেন, সে তো এক হিসাবে প্রেমেন্দ্রবাবুর দুন্দুভি-বাজানো কবিতাগুলিকে নিয়ে। হবেও বা তাই! তবে এ তাঁর পরিণত-হাতের বাজনা, সে কথাও মনে রাখা প্রয়োজন। সাধা হাতের এই বাজনার সঙ্গে বাঁশীর সংগৎ তাঁর সর্বাধুনিক কাব্যটিতে কোথাও তাই অসম্ভব হয়নি। তারো চেয়ে সুখের বিষয়, বাঁশীর সুরে সুর সাধবার শক্তি প্রেমেন্দ্রবাবু যে হারিয়েছেন, এমন লক্ষণও কোথাও তিলমাত্র শ্রুতিগোচর হল না। এদিকেও তিনি উন্নততর নিপুণতার প্রমাণ দিয়েছেন। পড়ে দেখতে বলি সকলকে তাঁর 'ভৌগোলিক', 'কাক ডাকে', 'পাখী', 'নিঃসঙ্গ', 'ট্রেণ থেকে', 'গ্রামান্তে রাত্রি' প্রভৃতি কবিতা। বিশেষ করে পড়তে বলি 'নৌকো' গদ্য কবিতাটি। বস্তুত আশ্চর্য হয়েছি আমরা প্রেমেন্দ্রবাবুর উভয়বিধ কবিতা রচনার সার্থক পরিণাম দেখে। প্রতিভা-হীন অক্ষমের অত্যাচার যে যুগে রচনা-শৈলীর নূতন পরীক্ষণের ছদ্মনাম নিয়ে বুক ফুলিয়ে বিচরণ শুরু করেছে বাঙলার কাব্যক্ষেত্রে, প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতার ভাব ভাষা ও ছন্দের সুসমন্বিত আশ্চর্য প্রসাদগুণ সে-যুগে বিস্ময়ের উদ্রেক না করে পারে না। তাঁর কবি-জীবনের ক্রমপরিণতির মধ্যে একটি সঙ্গতিপূর্ণ সুষমা সর্বদা লক্ষ্য করেছি। দূরবিস্তীর্ণ পট-ভূমিকায় প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতার যে সত্তের স্বচ্ছন্দ বিবর্তন, ছিন্নমূল বৈসাদৃশ্যে কোথাও তা মনকে পীড়িত করে না। সাগরপারের প্রেরণা দেশের মাটি থেকে তাঁর কাব্যকে সমূলে উৎপাটিত করার পরিবর্তে তার পুষ্টিসাধন করেছে। মুটে-মজুর-কামার-কাঁসারির গান ক্রমে নম্র হয়েছে, আরও বেদনাগভীর হয়ে সত্য হয়েছে তাঁর বৃহত্তর সমাজবোধ ও জীবনাদর্শ-বোধের প্রভাবে। তবে কি প্রেমেন্দ্রবাবু তাঁর জীবন ও কাব্যাদর্শের পুরানো ভিৎ বদলাতে আরম্ভ করেছেন? যাঁরা এমন আশঙ্কাজনক চিন্তা করে থাকেন, তাঁদের জবাব দিয়েছেন কবি নিজেই—

> হয়তো আকাশে শুধুই মেঘ চরাই,
> কখনো বৃষ্টি কখনো আলো ছড়াই
> অথবা রং চড়াই।
> তবুও ভেবো না ভেবো না
> যার যা খাজনা দেবো না;
> ক্ষেতের ফসল আমিও কেটেছি
> শূন্য নয় মরাই।
> যদিও বাঁধন না মেনে হই উধাও,
> গরল যেমন তেমনি চাখি সুধাও,
> কিম্বা যা কিছু দাও।
> তবুও ভেবো না ভেবো না,
> মেলায় মজুরো নেবো না:
> দল ছাড়া বলে বদলেছি কিনা
> ও-কথা মিছে শুধাও।
> —যদিও মেঘ চরাই।

দলের বিচার দিয়ে কাব্য বিচার যদি শুরু হয়ে গিয়ে থাকে আজ আমাদেরও দেশে তবে ঈশ্বর রক্ষা করুন, শুধু প্রেমেন্দ্র মিত্রকে কেন, বাঙলা দেশের সকল শক্তিমান কবি ও সাহিত্যিককে। 'রাত যারা মুছে ফেলবে' বলে পণ করেছে, বৃথাই তবে সে-সব ফেরারী সৌর-সেনাদের কাব্য-পরিচয় নেবার প্রাণপাত চেষ্টা।

* বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত Rolland and Tagore গ্রন্থের ২০—২২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

# ঘুম
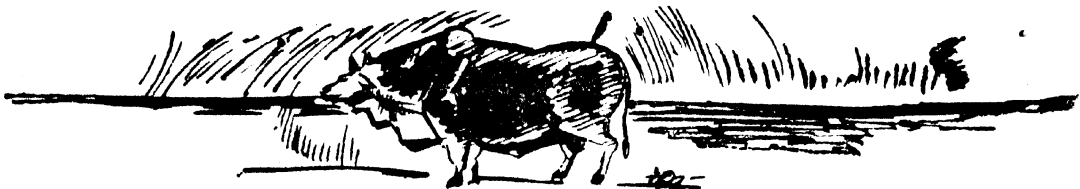
সুন্দরীকে সৃষ্টি করবার সময় নিশ্চয়ই বিধাতাপুরুষের নিদ্রাকর্ষণ হয়েছিল নইলে সুন্দরী সত্যি সুন্দরী, চমৎকার স্বাস্থ্য, অনেকের কাজ সে চটপট করে পনের মিনিটে করতে পারে অথচ ঘুমকাতুরে বলে বাড়িতে সব গুণ তার চাপা পড়ে গেছে, দুর্নাম রটেছে ঘরে-বাইরে। কেউ বেশী ঘুমালে তার তুলনা হয় সুন্দরীর সাথেঃ ওরে বাপরে, এ যে দেখি সুন্দরীর ঘুম!

সুন্দরীকে যদি তুমি প্রশ্ন কর ঃ সুন্দরী পৃথিবীতে সব চাইতে বেশি তুমি কি ভালবাস? নিঃসন্দেহে জবাব দেবে সুন্দরী ঃ ঘুম, গাঢ় আঁধারের মত জমাট বাঁধা ঘুম!

ঠিকমত ঘুমাতে না পারলে অমন যে শান্ত মেয়ে সুন্দরী সেও যাবে ক্ষেপে। এই ত সেদিন ঘুম নিয়ে বাড়িতে কুরুক্ষেত্র ঘটে গেল। রাতে ছোট ভায়ের দুধ গরম করতে গিয়ে উনুনের পাশে বসে দিব্যি একটা ঘুম দিয়ে দিল সে।

পোড়া দুধের গন্ধ পেয়ে মা এল ছুটে।

—দুধটা যে পুড়ে খাক হয়ে গেল হতচ্ছাড়ী। কেবল ঘুম আর ঘুম। এই ঘুমেই তোর কাল হবে দেখিস।

তার চুলের মুঠি ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যেতে যেতে মা প্রশ্ন করল ঃ ঘরে কি আর দুধ আছে। খোকাকে এখন খাওয়াই কি বলত?

সত্যিই অপ্রস্তুত হয়ে গেল সুন্দরী।

ছোট পিসি বলল, বিয়ের পর পরের বাড়িতে গিয়ে করবি কি শেষে?

পিসিরা, কাকারা, সবাই মিলে গালমন্দ দিল সুন্দরীকে।

মাঝে মাঝে নিজের উপর ভয়ানক রাগ হয় সুন্দরীর। পোড়া ঘুমের জন্যে এত হেনস্তা আর সহ্য হয় না তার!

গুড়ি গুড়ি বর্ষা শুরু হয়েছে সেই শেষ রাত থেকেই।

ভোর বেলা বৃষ্টির জলে ভিজে সোনাতলা থেকে ভুবন এসে উপস্থিত।

ভুবন সুন্দরীর মামা। সোনাতলা স্কুলে বাঙলা পড়ায় সে। ঘরে ঢুকে ভুবন একবার হাঁক ছেড়ে বললঃ বড়দি কই, তোমার সুন্দরীর যে বিয়ে ঠিক করে এলাম।

সুন্দরীর মা ডাক শুনে ছুটে এসে বললঃ ওমা, তুই যে একেবারে নেয়ে উঠেছিস রে ভুবন। ওরে সুন্দরী, জামা কাপড় নিয়ে আয় তোর মামার জন্যে।

সুন্দরীর ছোট কাকী এল কাপড় জামা আর চা নিয়ে।

ভুবন প্রশ্ন করল, কৈ সুন্দরী কোথায়?

ছোট কাকী উত্তর না দিয়ে বড় জা'য়ের মুখের দিকে চেয়ে হেসে চলে গেল!

সুন্দরীর মা বলল, ভাইকে ঘুম পাড়াতে গিয়ে নিজেও বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। ভগবান যে কি বিষ দিয়েছেন শরীরে।

সুন্দরীর ছোট কাকা বলল, ও হবার আগে ওমনি পড়ে পড়ে ঘুমাতে নিশ্চয়ই, তাতেই হয়েছে আর কি।

মা রাগ করে বলল, তোরা ত কেবল আমারই দোষ দেখবি! তোর টাইফয়েডের সময় রাত জেগেছিল তোর বউ?

ভুবন বলল, তোমরা থাম দেখি। ঘুম তাড়াবার অষুধ এনেছি আমি। বাড়িতে মেয়ে আর বউতে তফাৎ ঢের। ঘুম যাবে মাথায় উঠে।

সুন্দরীর মা আগ্রহের সুরে জিজ্ঞাসা করল, কি ব্যাপার খুলে বল দেখি?

ভুবন বলল, দামোদরের সতীশ দত্তের ছেলে মাণিক, আমারই ছাত্র। ম্যাট্রিক পাশ করে মশলার কারবার খুলে বসেছে খুলনার বাজারে। খাসা ছেলে বটে আমাদের মানুকে। দত্ত মশাই ত আমাকে একেবারে কথা দিয়ে ফেলেছেন। এখন মেয়ে দেখে পছন্দ হলেই হল!

কথাবার্তা শুনে সেজ কাকা ঘরে ঢুকে বলল, এক ঘুমকাতুরে স্বভাব ছাড়া মেয়ে দেখে অপছন্দ হবার ত কিছুই নাই।

আশঙ্কার সুরে মা প্রশ্ন করল, ঘুমের কথা শুনলে ওরা কি আর এগোবে?

মুরুব্বির চালে ভুবন বলল, বাজে কথা

ছাড় দেখি। পরশ্ব আসবে তারা মেয়ে দেখতে। জামাইবাব্ব এলে সব খ্বলে বল তাকে।

সন্ধ্যার সময় ছোট কাকী রান্নাঘরে একা বসে রাঁধছিল।

পেছন থেকে চুপি চুপি এসে ঢ্বকল সন্দরী। কাকীমার গলা দ্ব'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে একেবারে ফ্বঁপিয়ে কেঁদে উঠল সে।

বিস্মিত কাকী প্রশ্ন করল, কিরে কি হয়েছে সন্দরী? কাঁদছিস কেন? আঃ, কথা বল!

কান্না থামিয়ে সন্দরী বলল, মামা কি বলে গেল ছোট কাকী?

ছোট কাকী হেসে বলল, দামোদর থেকে তোকে দেখতে আসবে পরশ্ব, কেন তাতে হয়েছে কি?

ধরা গলায় সন্দরী বলল, ওরা সব বলছে ঘ্বম্বতে দেয়না তারা—

কথা আর শেষ করতে পারল না সন্দরী।

ছোট কাকী হেসে উঠল সশব্দে। সন্দরীর মাথাটা কোলের মধ্যে টেনে এনে বলল, ও এতেই কান্না! ওরে বোকা মেয়ে, এরজন্যে কাঁদে না কি কেউ! চুপ, চুপ, সবাই শ্বনলে হাসবে যে!

সতীশ দত্ত মেয়ে দেখে পছন্দ করে গেল। ঘ্বমকাতুরে স্বভাব সন্দরীর বিয়ে আটকাতে পারল না।

সবাই ঘ্বমিয়ে পড়েছে। বাসর ঘরে মাণিক নতুন বউএর সাথে একট্ব আলাপের লোভ ছাড়তে পারে নাই। পাশ ফিরে চুপি চুপি বলল সে, কি ঘ্বমোলে নাকি?

অমন যে ঘ্বমকাতুরে মেয়ে সন্দরী, সেও তখনও ঘ্বমায় নাই। ভবিষ্যতে ঘ্বম নাশের আশঙ্কায় রীতিমত শঙ্কিত হয়ে উঠেছে সে! ম্বখ না ফিরিয়ে মৃদ্ব স্বরে উত্তর দিল, না!

কিছ্বটা সময় চুপচাপ করে কাটল।

এতক্ষণ বলি বলি করেও যা লজ্জায় বলতে পারছিল না, অবশেষে সেই কথাটাই বলবার জন্য মাথাটা ঘ্বরিয়ে নিল সন্দরী। পাশ ফিরে ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করল সে, দামোদরের লোকেরা কি রাতেও ঘ্বমায় না?

সন্দরীর প্রশ্ন শ্বনে হাসি চেপে রাখতে গিয়ে খানিকটা জোরেই হেসে ফেলল মাণিক; বলল, দামোদরের সবাই যে সিঁদ কাঠির ব্যবসা করে সে খবরটা তোমাকে দিলে কে?

সন্দরী উত্তর দিলনা।

উত্তর দিল ও পাশ থেকে ছোট কাকী, কে, হাসে কে?

হাসতে গিয়ে যে এমন বিপদে পড়বে ব্বঝতে পারেনি মাণিক; বলল, আমি ছোট কাকী, বড্ড তেষ্টা পেয়েছে।

ছোট কাকীর বিয়ে বেশি দিন হয়নি। এমন রাতে জলতেষ্টা পেলেও যে হাসি আসে সেটা সে বোঝে; বলল, জল শিয়রে আছে। সন্দরী, উঠে গড়িয়ে দে।

সন্দরীর বাপের বাড়ি থেকে নদী পেরিয়ে এসে দৌলতপ্বরে স্টেশনে গাড়ি ধরতে হয়। ট্রেনে এসে নামতে হয় তালতলায়। সেখান থেকে কয়েক মাইলের পথ দামোদর।

যাবার সময় চোখের জল ম্বছে সন্দরীর মা মেয়েকে কানে কানে বলে দিল, লক্ষ্মী মা আমার, ঘ্বমটা একট্ব আগলে রাখিস। শ্বশ্বর বাড়ি গিয়ে একট্ব সামলে থাকিস মা!

দৌলতপ্বর থেকে তালতলা প্রায় দশ মাইলের পথ। দ্বপ্বরের গাড়িতে বর-বউ যাত্রা করল।

গাড়ি তালতলা পেঁ'ছিতেই বরযাত্রীরা সব হৈচৈ করে উঠল। মালপত্র নেমে গেলে, বরযাত্রীদের প্রায় সবাই নেমে গেল। সন্দরী আর ওঠে না। জানালার উপর হাতে মাথা রেখে দিব্যি ঘ্বমিয়ে পড়েছে সে।

প্লাটফর্ম থেকে কর্তারা চেঁচিয়ে উঠল, বউ নামল কৈ, নতুন বউ?

মাণিক তখনও গাড়ির ভেতর দাঁড়িয়ে। অতগ্বলি লোকের মাঝে বউএর গা'য়ে হাত দেবে কি করে সে!

সতীশ দত্ত বলল, আহা, বেচারা ছেলে-মানুষ, ঘ্বমিয়ে পড়েছে বোধ হয়। ওরে শিবে, যা তোর বৌদিকে উঠিয়ে নিয়ে আয়।

মাণিকের ছোট ভাই শিবনাথ গিয়ে ডাকল, বৌদি, উঠে আস্বন।

কে কার কথা শোনে!

স্টেশনে ঘণ্টা বাজল।

মাণিক আর চুপ করে থাকতে পারল না। দ্ব'হাত দিয়ে সন্দরীকে ঝাঁকানি দিয়ে বলল, আরে, গাড়ি ছেড়ে দেবে যে--

সন্দরী চোখ মেলে চাইলে।

মাণিকের ম্বখে বিরক্তি দেখা দিলঃ শিগ্বগির নেমে এস!

ধড়মড় করে উঠে এল সন্দরী।

প্লাটফর্মে নামতেই সতীশ দত্ত এগিয়ে এসে প্রশ্ন করল, শরীর খারাপ বোধ করছ মা?

লজ্জায় সন্দরীর ম্বখ লাল হয়ে উঠেছে। তার স্বভাব কি এরি মধ্যে সবাই জেনে ফেলল! শ্বশ্বরের প্রশ্নে ঘাড় নেড়ে অস্বস্থতার ভান করা ছাড়া আর উপায় কি!

আদর করে সতীশ দত্ত বলল, এইত প্রায় বাড়ি এসে গেছি। নেয়ে খেয়েই একচোট ঘ্বম দিয়ে দেবে।

এত লজ্জার মধ্যেও ভারী ভাল লাগল তার কথাগ্বলি। এমনটি না হলে আবার শ্বশ্বর!

মাণিকের বউএর প্রশংসা করলে শ্বধ্ব বাড়ির লোকেরাই নয়, পাড়াপড়শীরাও।

—খাসা বউ হয়েছে তোমার মাণিকের মা!

—রং, চোখ, চুল, এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ।

—এমন শান্ত মেয়ে আর হয় না।

ঘোমটায় ম্বখ ঢেকে সন্দরী প্রাণপণে প্রার্থনা করতে লাগল, ঠাকুর, ঘ্বমটা যেন একট্ব কম করে দিও দয়াময়!

কয়েক দিনের মধ্যেই কিন্তু সন্দরী হাঁপিয়ে উঠল। দ্বপ্বরে কাজকর্ম সেরে খাওয়ার পর একট্ব না ঘ্বমিয়ে পারে না সন্দরী। এখানে তা হবার জোটি নাই। একট্ব বসতে না বসতে বাড়ির সব মেয়েরা তাকে ঘিরে বসবে। পাড়ার মেয়ে বৌ আসবে। রাজ্যের গালগল্প আর তাস নিয়ে বসবে সেই তিনটে চারটে পর্যন্ত।

রাত্রে খাওয়া দাওয়া সারতে দশটা বাজবে। তার উপর আছে মাণিকের ব্বড়ো ঠাকুর্দা। সে ত যেন সন্দরীকে একেবারে পেয়ে বসেছে। আদর করে ডাকবে, কৈ নতুন গিন্নী কোথায় গেলে গো!

তামাক সেজে নিয়ে সন্দরীকে যেতেই হবে। ব্বড়োর পা' টিপে, গল্প করে ঘ্বম পাড়িয়ে দিতে বাজবে সেই রাত এগারোটা।

ভগবান সত্যিই কি তার প্রার্থনা শ্বনেছেন নাকি! কিন্তু এমন ভাবে না ঘ্বমিয়ে ঘ্বমিয়ে মরে যাবে, যে সন্দরী! বাড়ি ফিরতে ত এখনও আট ন' দিন বাকি। সন্দরী মাকে চিঠি লিখতে বসলঃ—

মাগো,

পঞ্জিকাতে কি শিগ্বগির কোন দিন নাই?

এ বাড়ির লোকগ্বলো একটুকুও ঘ্বম্বতে জানে না! এভাবে আরও ক' দিন থাকলে মরে যাব আমি।

এখানে চমৎকার ঠাণ্ডাজলের পত্নুর আছে একটা। কিন্তু থাকলে হবে কি! চান করতে যেয়ে চোখ ফেটে জল আসে আমার! চান করে খেয়েদেয়ে একটুকুও ঘ্বম্বতে দেবে না এরা। আর জ্বটেছে এক ব্বড়ো। তার চাই কেবল তামাক আর গল্প। জ্বালিয়ে মারলে আমাকে।

বড় জা'য়ের ছোট ছেলেটাও কি কম শয়তান ভেবেছ? সেই অন্ধকার থাকতেই আমার ঘরে এসে ঢ্বকবে। ঘাড়ের উপর চড়বে। শেষে বিছানা ভিজিয়ে দিয়ে পালাবে।

ছোট্‌কাকীকে বল, আমি শিগ্বগিরই মরে যাব। ছোট্‌কা এসে যেন নিয়ে যায় আমাকে।

মাগো, দ্বটো দিন একট্ব ঘ্বমিয়ে আসব আমি আর কিছ্বই চাই না।

ইতি—

চিঠি পড়ে বাড়ির সবাই হেসেই অস্থির।

সন্দরীর মা ছোট দেওরকে ডেকে বলল, সামনের ব্বধবার ত ওদের আসবার দিন। তুই

বাপু একদিন আগেই যা, তাতেই হতচ্ছাড়ী একটু শান্তি পাবে।

ছোটকাকী সায় দিয়ে বলল, সেই কথাই ভাল। এখানে এসে একটু হাঁপ ছেড়ে ত বাঁচুক, তারপর আস্তে আস্তে ও স্বভাব পালটে যাবে।

ছোটকাকাকে দেখে সুন্দরী আনন্দে নেচে উঠল।

বাপের বাড়ি রওনা হবার সুখে ঠাকুরদাকে প্রণাম করে সুন্দরী বলল, দাদু, বাড়ি যাচ্ছি।

বুড়ো বলল, ফিরতে দেরী কর-না ভাই। বেশি দিন তোমাকে না দেখলে আমি মরে যাব।

কথা শুনে হাড় জ্বলে যায় সুন্দরীর। না যেতেই, তাড়াতাড়ি ফিরো ভাই।

—যাও না মরে বুড়ো। আপদ বিদেয় হও! মনে মনে উচ্চারণ করল সুন্দরী।

কে কোথায় আবার বাধা দেবে; সুন্দরী ব্যস্ত হয়ে বলল, চল, ছোটকা, রওনা হই।

ছোট কাকা বলল, তুই ত আর একা যাবিনে, দাঁড়া, মাণিক আসুক!

শাশুড়ী হেসে বলল, পাগলীর আর তর সইছে না!

বাপের বাড়ির নিরবচ্ছিন্ন ঘুমের সুখ দুদিনের বেশি সইল না সুন্দরীর বরাতে। মাণিককে তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে হবে।

যাবার আগে মাণিককে ডেকে শাশুড়ী বলল, পাগলা মেয়ে আমার বড্ড বেশী ঘুমকাতুরে। বড় হলে শুধরে যাবে। ওকে বেশী গালাগাল দিও না।

একথাটা মাণিক শাশুড়ীকে দেয় নাই। কিন্তু পরে ছোটকাকীকে ডেকে হাসতে হাসতে বলে গেছেঃ যা ঘুমাতে পারে আপনাদের মেয়ে, শ্বশুর বেঁচে থাকলে তার কানকাটা পড়ত কবে!

বিয়ের পরও শ্বশুর বাড়ি যেতে এত কষ্ট হয় নাই সুন্দরীর। আজ তার ঘুমের অবস্থা দেখে সবাই কেঁদে ফেলল।

শ্বশুর বাড়িতে সুন্দরীর অবিমিশ্র প্রশংসা এখানে আর বড় শোনা যায় না।

—যাই বল না কেন নতুন বউ কিন্তু বড্ড বেশী ঘুমকাতুরে।

—এমনি ত বেশ, ওমা-মা ঘুমের জন্য যেন পাগল হয়ে যায়।

এমন যে মিষ্টি কথার মানুষ শাশুড়ী, সুন্দরীর ঘুম দেখলে সেও এখন আর মেজাজ ঠিক রাখতে পারে না।

মাণিক খুলনায় থাকে। মাঝে মাঝে বাড়ি আসে। সেও আজকাল রীতিমত ঠাট্টা করে সুন্দরীকে।

ক'দিন থেকে মাণিকের ঠাকুর্দার অসুখের বাড়াবাড়ি চলছে, এই যায় ত এই যায়। রাতে কারও চোখে ঘুম নাই। সুন্দরীর হয়েছে মহা-বিপদ, বুড়োর আবার তাকে চাই।

রাত তখন এগারোটা বেজে গেছে। সুন্দরী বসে বুড়োকে বাতাস করছে। হাতের পাখা বারবার বুড়োর কপালে গিয়ে ঠেকছে।

বুক মালিশ করছিল বড়জা। সুন্দরীর অবস্থা দেখে সে আর চুপ করে থাকতে পারল না! তুই যে বাপু বাতাস দিতে গিয়ে ওঁর ঘোমটা মাটি করবি। নে, রাখ পাখা—

শাশুড়ী যাচ্ছিল ঘরের ভেতর দিয়ে, সে ধমক দিয়ে উঠল, বাপের বাড়ি আস্কারা পেয়ে পেয়ে স্বভাবটি এমন হয়েছে। নাও, পাখা তুলে। ঘুম আসছে চোখে জল দিয়ে এসগে!

ভয়ে ভয়ে সুন্দরী চোখটা রগড়ে নিয়ে আবার পাখা নিয়ে বসল।

কিন্তু ঘুমকে ঠেকায় কার সাধ্য। সুন্দরী পাখা রেখে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, বড়দি, একটু জল খেয়ে আসি।

বারান্দায় এসে সুন্দরী দেখল শিবু পায়চারি করছে। তার হাত দুটি জড়িয়ে ধরে অনুনয়ের সুরে সুন্দরী বলল, ঠাকুরপো, ঘুম তাড়ানর অষুধ পাওয়া যায় না এখানে?

শিবু হেসে বলল, লোকে ত ঘুম আনবার জন্যে অষুধ খায়। ঘুম তাড়ানর অষুধ পাব কোথায়?

তবে উপায়?

সুন্দরী কেঁদে ফেলল একেবারে।

শিবু হেসে বলল, সত্যি, বড় ছেলেমানুষ তুমি। যাও শোও গিয়ে। আমি যাচ্ছি দাদুর ওখানে।

বাধা দিয়ে সুন্দরী বলল, না—না, আমিই যাচ্ছি।

সুন্দরী গিয়ে ঢুকল ভাসুরের ঘরে। ঘরে তখন কেউ নাই। তাকের উপর নস্যির কৌটা রয়েছে। হাতের তালুর উপর খানিকটা নস্যি ঢেলে নিল সে। এই ই দেবে সে চোখে, দেখি ঘুম তাড়ান যায় কি না।

বড়জা প্রশ্ন করল, ও কিরে, অমন করে চোখ রগড়াচ্ছিস কেন? কি দিয়েছিস চোখে?

ভয়ানক জ্বালা করছে চোখ। চোখ মেলে আর চাইতে পারে না সুন্দরী।

বড়জা ধমক দিয়ে বলল, আবার বুঝি যা তা ঢুকিয়েছিস চোখে। ঘুম তাড়াতে গিয়ে চোখ দুটি খাবি হতচ্ছাড়ি!

বুড়োর হাড় কত ভেলকিই জানে। বুড়ো মরল না। দিব্যি সেরে উঠল সে। মাঝ থেকে নস্যি ঢুকিয়ে ঢুকিয়ে চোখ ফোলাল সুন্দরী।

মাণিক এসেছে বাড়িতে। সপ্তাহে একবার বাড়ি আসে সে। এই ছদিনে কত কথা তার জমে ওঠে বৌ-এর কাছে বলতে। কিন্তু সুন্দরীর ঘুমের জন্য সেও বিরক্ত হয়ে ওঠে। রাত্রে বিছানায় গিয়ে গল্প আরম্ভ করতে না করতে সুন্দরীর নাক ডাকানি শুরু হয়। এমন বৌ নিয়ে কেউ সন্তুষ্ট থাকতে পারে?

কতদিন মাণিক রাগ করে সুন্দরীকে ধাক্কা মেরে খাট থেকে ফেলে দিয়েছে। চুলের মুঠি ধরে হেঁচকা টানও যে না মেরেছে তা নয়। সুন্দরীর স্বভাব কিন্তু বদলাল না।

সকাল বেলায় সুন্দরীর চেহারা দেখলে কিন্তু রাগ থাকে না মাণিকের। দৌড় ঝাঁপ দিয়ে কাজ করবে, হাসি গল্পে মাতিয়ে রাখবে সকলকে।

মাণিক খুলনায় ফিরে যাবার সময় সুন্দরীকে ডেকে বলল, সবাই কত কি জিনিস আনবার জন্য ফরমাস করলে, কৈ, তুমি ত কিছু বললে না?

সুন্দরী সচকিতে চারিদিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে স্বামীকে জড়িয়ে ধরে বলল, আনবে তুমি?

মাণিক বলল, বলেই দেখ না।

সুন্দরী বলল, যা গরম পড়েছে, এবার আসবার সময় আমার জন্যে ভাল একটা শেতল পাটি নিয়ে এস। আনবে ত লক্ষ্মীটি?

মাণিক জবাব দেবে কি, স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ভাল করে বুঝে নিল যে ঘুম ছাড়া দ্বিতীয় প্রিয়বস্তু কিছু নেই সুন্দরীর। অপমানে, আঘাতে কিছুতেই টলবে না সে।

ঘুমের জন্য বাপের বাড়িতে গালাগাল খেয়েছে সুন্দরী। এখন শ্বশুর বাড়ির সকলেও গালমন্দ শুরু করেছে।

শিবু, যে বৌদির সব দোষ চেপে রাখবার চেষ্টা করত, সেও আজ দুপুরে বলেছে সুন্দরীকে, সকলে গালমন্দ দেয় কি অমনি বিনা দোষে। তোমার ঘুম দেখলে মরা লোকেরও রাগ হয়।

নিজের স্বভাবের জন্য কত না কেঁদেছে সুন্দরী। শত চেষ্টা করেও ঘুম সে আটকাতে পারে না। গাল শুনে শুনে মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় তার চোখ দুটো উপড়ে টেনে বের করে নিতে। কতদিন রাতে খাবার আগেই ঘুমিয়ে পড়েছে, রাগ করে কেউ ডাকেনি তাকে সারারাত না খেয়ে কাটিয়েছে সুন্দরী। রাগ করে শাশুড়ী কোন কোন দিন পিঠের উপর কিল চড় বসিয়ে দিয়েছে। সুন্দরী অজ্ঞান, কোন আঘাতই তার গায়ে লাগেনি।

মাণিকের বড়দিদি, ভগ্নীপতি, তাদের ছেলেমেয়েরা এসেছে। অনেক দূর দেশে থাকে তারা। বিয়ের সময় আসতে পারেনি বলে বৌ দেখতে এসেছে। আরও কয়েকজন আত্মীয় স্বজন এসেছে বাড়িতে।

ছেলেমেয়ে আর পুরুষদের খাওয়া শেষ হতে দুটো বেজে গেল। সবাইকে ভাত দিয়ে চান করতে যাবার নাম করে সুন্দরী সেই যে বেরিয়ে গেছে আর তার খোঁজ নেই।

বড় মেয়ে বলল, নতুন বউ গেল কোথায়? ছেলে মানুষ এত বেলা পর্যন্ত না খেয়ে রইবে?

বড়জা কাজের ভিড়ে ছিল। ব্যস্ত হয়ে বলল, ওমা, চান কি তার এখনও হয়নি। গেল কোথায় সুন্দরী?

সবাই খুঁজছে সুন্দরীকে। এমন সময় বড় বৌএর বড় ছেলে নন্তু এসে হাঁপিয়ে বলল, কাকীকে চাও? এস আমার সঙ্গে।

সবাইকে ঠেলে নিয়ে সে চলল।

দোতলায় উঠবার সিঁড়ির নীচে ছোট্ট অন্ধকার চোর-কুঠরী আছে। সেখানে মাদুর পেতে সুন্দরী ঘুমুচ্ছে। পাশে পড়ে রয়েছে কলসি আর গামছা।

বিস্ময় প্রকাশ করে বড় ননদ বলে উঠল, ওমা, এ যে এখনও চানও করেনি।

শাশুড়ী রেগে বড়বৌকে বলল, বৌ, নিয়ে আয় ত ওর পা ধরে হিঁচড়ে টেনে।

ননদ ডাকল, ছোট বৌ, ও ছোট বৌ।

বড়জা গায়ে ধাক্কা মেরে ডাকল, সুন্দরী, এই সুন্দরী।

শাশুড়ি উঠল চেঁচিয়ে, চুলের মুঠো ধরে হিড় হিড় করে টেনে আননা তোরা।

কথাটি বলে কারও অপেক্ষায় না থেকে নিজেই চুলের মুঠি ধরে টেনে নিয়ে এল সুন্দরীকে।

সুন্দরীর ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ মেলে এতগুলি লোককে এক সাথে দেখে ভয়ে গা দিয়ে ঘাম ঝরতে লাগল তার।

ক্ষেপে গিয়ে শাশুড়ি বলল, এতদিন যা বলি বলি করেও বলতে পারিনি, আজ সেই কথাটি শুনে রাখ। এমন অলক্ষণীপনা এ বাড়িতে আর চলবে না। দূর করে তাড়িয়ে দেব যখন তখন ঠেলাটি টের পাবে।

এতদিন সুন্দরীর ঘুমের কথা মেয়ে মহলেই আলোচনা হয়েছে। এখন পুরুষেরাও আরম্ভ করেছে। মাণিকের দাদা ত সেদিন স্পষ্ট করে বলেছে, ও মেয়ের অসুখ আছে নিশ্চয়ই, নইলে এমন ঘুম কি আর সাধারণ মানুষের থাকে। ধাপ্পা মেরে বিয়ে দিয়েছে যেমন ভুবন মাস্টার, এখন এসে ভাগ্নির চিকিচ্ছে করুক!

এর ওর মুখ থেকে কথাটা পৌঁছে গেছে সুন্দরীর বাপের বাড়িতেও। খবর শুনে বাবা, কাকারা এসে সুন্দরীকে গালাগালি দিয়ে গেছে। মা রাগ করে চিঠি লেখা বন্ধ করেছে।

ভুবন এক কবিরাজ ঠিক করে দিয়েছে। সে ঔষধ দেয় সুন্দরীকে। কিন্তু ফল কিছুই হয় না। সকলের গালাগাল খেয়ে কেঁদে কেঁদে সে সেই ঘুমিয়েই পড়ে।

বেজেরডাঙ্গায় সুন্দরীর এক মাসী শাশুড়ী থাকে। তার পৌত্রের মুখে ভাত। বেজেরডাঙ্গা থেকে লোক এসেছে সকলকে নিয়ে যেতে।

সুন্দরী গিয়ে শাশুড়ীকে বলল, আমি যাব মা তোমাদের সাথে!

শাশুড়ী দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলল, তবেই হয়েছে আর কি! একহাট লোকের মাঝে আর কেলেঙ্কারী করে দরকার নাই। বেড়ান দিয়ে হবে কি তোর, তার চাইতে পড়ে পড়ে ঘুমো।

সুন্দরী আর একবার কথাটা পাড়তেই শাশুড়ী ধমক দিয়ে বলল, তুই কি মানুষ যে তোকে সাথে নেব, তুই জন্তু-জানোয়ারের একটা।

নাতি-নাতনীদের নিয়ে মাণিকের বাবা-মা বেজেরডাঙ্গায় চলে গেল। বাড়িতে রইল বড় বৌ, তার কোলের ছ'মাসের মেয়ে আর সুন্দরী। মেয়েটিকে সুন্দরীর কোলে তুলে দিয়ে বড় বৌ বলল, ওকে নিয়ে তুই থাক সুন্দরী। উত্তরের বাড়ি থেকে চিড়ে কুটে একেবারে চান করেই ফিরব আমি। বাচ্চাটা কাঁদলে দুধ গরম করে দিস, বুঝলি।

বড় বৌ চলে গেল। তার ফিরে আসতে তিন চার ঘণ্টা লাগবে। শিবু গেছে স্কুলে। ভাসুর বাড়িতে নেই। বুড়ো ও ঘরে শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে। বহুদিন পরে শ্বশুর বাড়িতে এই প্রথম একটা নির্জলা স্বাধীনতা পেলে সুন্দরী।

শীতের দুপুর। লেপটা পায়ের ওপর থেকে বুক পর্যন্ত ঢেকে দিল সুন্দরী। মেয়েটাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে দিব্যি আরামে চোখ বুজল সে।

...পরম নিশ্চিন্ত অসাড় হয়ে কতক্ষণ যে সুন্দরী ঘুমিয়েছে তা সে টের পায়নি। হঠাৎ ঘুমটা ভেঙ্গে যেতেই দেখল শরীরটা তার অনাবৃত হয়ে পড়েছে। গায়ের লেপ একেবারে পায়ের গোড়ায় গিয়ে স্তূপীকৃত হয়ে রয়েছে। কিন্তু মেয়েটা গেল কোথায়? বিদ্যুৎস্পৃষ্টার মত লাফিয়ে উঠল সুন্দরী। ছুটে গিয়ে খাটের তলাটা দেখল। এঘর ওঘর দেখল। না, নেই ত কোথাও! গেল কোথায় মেয়েটা?

নিজের ঘরে আবার দৌড়ে এল সুন্দরী। লেপটা টেনে তুলতেই ছোট পুঁটলির মত লেপের ভেতর থেকে মেয়েটা গড়িয়ে পড়ল। দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে সুন্দরী তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিল। কৈ মেয়ে ত সাড়া দেয় না। মুখটা তার তুলে ধরল সুন্দরী। ছোট্ট পাতলা ঠোঁটের কোণে সাদা সাদা ফেণা বেরিয়েছে। হাত-পা শক্ত হয়ে গেছে। তবে কি বেঁচে নাই মেয়েটা। সুন্দরী পাগলের মত হয়ে মেয়েটাকে একটা ঝাঁকানি দিয়েই চেঁচিয়ে উঠল।

একরাজোর কোটি কোটি ভয় এসে সুন্দরীকে ঘিরে ফেলল। নিবিড় কালো হিংস্র তাদের মূর্তি। তারা ক্ষমা করতে জানে না, ভালবাসতে জানে না। বুকের ভেতর তার হাতুড়ি পিটচ্ছে তারা। শ্বাস রুদ্ধ করে ফেলছে তার। টলতে টলতে ঘর ছেড়ে উঠে এল সুন্দরী। বুড়ো তখনও ঘুমাচ্ছে। শিবু স্কুল থেকে ফেরেনি। বড় বৌএর এখনও কাজ শেষ হয়নি। না, কেউ কোথাও নেই।

নিজের ঘরে ফিরে এল সুন্দরী। খাটের ওপর মরা মেয়েটার দিকে নজর পড়তেই দুহাত দিয়ে চোখ মুখ ঢেকে আতঙ্কে পালিয়ে গেল সুন্দরী। পা কাঁপছে, কাঁপছে আপাদ-মস্তক। ভয়ে কাঁদতেও পারছে না সে। পুকুরে ঝাঁপ দেবে? পালিয়ে যাবে? ঘরে দেবে আগুন? কিন্তু কোন কিছু করবার শক্তি যে নেই। হাত-পা জড়িয়ে আসছে তার। চোখের সামনে সুন্দরী যেন দেখছে—মরা মেয়েটা পড়ে রয়েছে তার পাশে। বাড়ির লোক, গাঁয়ের লোক এসে ভীড় করেছে তাকে ঘিরে। আরও পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে যারা, অদ্ভুত তাদের পোষাক, হাতে লাঠি। কি যেন বলছে তারা। শিকল বাজছে ঝন্ ঝন্ ঝন্।

—সুন্দরী একেবারে ভেঙ্গে পড়ল। ককিয়ে কেঁদে উঠল সে।

বড় বৌ ছুটে এসে ঘরে ঢুকল, সুন্দরী! দেখ দেখি কাণ্ড, মাটিতে পড়ে ওমন করে বুক দিচ্ছিস কেন? সুন্দরী—

লেপ জড়িয়ে খাট থেকে মেঝেয় পড়েছে সুন্দরী। বড় বৌকে সামনে দেখে পাগলের মত চেঁচিয়ে উঠল। চোখ দুটো জবাফুলের মত লাল হয়ে উঠেছে। সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে গেছে। পাতলা ঠোঁট দুটো থর থর করে কাঁপছে সুন্দরীর। কোন কথা বলতে পারে না। কাটা ছাগলের মত মেঝের এপাশ থেকে ওপাশে গড়িয়ে বেড়াচ্ছে।

সুন্দরীর অবস্থা দেখে বড় বউ আর স্থির থাকতে পারল না। চিৎকার করে পাড়ার লোক ডাকল সে।

সুন্দরী হঠাৎ দৌড়ে এসে বড় বৌকে জড়িয়ে ধরল; পুলিশ ডেক না বড়দি। আমাকে বিষ দিয়ে মার তোমরা!

পাড়াপড়শীরা এসে ঘটি ঘটি জল ঢালল সুন্দরীর মাথায়, কিন্তু কিছুতেই সে স্থির হতে পারল না।

হঠাৎ খাটের ওপর থেকে বড় বৌএর ছোট মেয়েটা কেঁদে উঠল।

সুন্দরী চমকে উঠে তাকিয়ে দেখল, হাত-পা ছুঁড়ে মেয়েটা কান্না জুড়ে দিয়েছে।

সুন্দরীর দম বন্ধ হয়ে আসছে। চোখ দুটি বিস্ফারিত করে অস্বাভাবিক সুরে সুন্দরী বলল, কাঁদে কি বড়দি?

বড় বৌ বলল, কেন ছোট খুকী, তোর পাশে শুয়েই ত ঘুমোচ্ছিল।

—তবে কি মেয়েটা এখনও মরেনি! ওকে যে লেপ চাপা দিয়ে মেরে ফেলেছিলাম আমি!

—তুই কি তবে স্বপ্ন দেখছিলি রে হতভাগী?

মাণিকের ঠাকুর্দা এ প্রশ্ন করল।

তার কথার সাথে সাথেই উপস্থিত সকলে সমস্বরে হেসে উঠল। সুন্দরী তবে স্বপ্ন দেখছিল!

অত্যদ্ভুত একটা মানসিক আতঙ্ক ধীরে ধীরে যেন যাদুমন্ত্র দিয়ে সুন্দরীকে নতুন মানুষ করে দিল।

সুন্দরীকে এখন কেউ আর বলতে পারে না যে সে সত্যিই ঘুম কাতুরে!

(পূর্বানুবৃত্তি)

অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে আছে দুজন মুখোমুখি। মাঝখানে ছোট্ট চায়ের টেবিল।

বে-বার্নিশ, কেরোসিন কাঠ দিয়ে তৈরী। টেবিলটির দৈন্য ঢাকবার জন্যে কালো কাপড়ে শাদা সুতোর ফুল ও প্রজাপতি তোলা একটা ঢাকনি।

টেবিলে ক'খানা কাপ-সসার জড়ো হয়েছে। বোঝা যায় কিছুক্ষণ আগে চা-পান পর্ব শেষ হয়েছে। পেয়ালার ধারে ধারে সরু মোটা রেখায় শুকনো বিবর্ণ চায়ের দাগ। আর সেই দাগ বেছে বেছে একটি দুটি মাছি বসে আছে। বাইরে ঝাঁ ঝাঁ রোদ।

দেবদারুর পাতাগুলো একটু নড়ছে না, মনে হয় সবুজের একটা মেঘ রোদ্রের আকাশে থেমে আছে যেন।

'এ'দের দু'জনকে আমি চিনলাম না।' অরুণা সুশীর চোখে চোখে তাকাল।

'আস্তে আস্তে চিনতে পারবে।' সুশীলা বলল।

ডাক্তার ও সাবরেজিস্ট্রার ছাড়া আরো দুই ভদ্রলোক এসেছিলেন এখানে আজ সকালে।

'ছুটির দিন ভদ্রলোকদের আনাগোনা একটু বেড়েছে মনে হয়।' অরুণা বাইরের দিকে চোখ রেখে কথাটা বলল।

সুশী চুপ।

'সাবরেজিস্ট্রারবাবু বেশি কথা কন।' অরুণা আবার সুশীর দিকে তাকাল।

'রসিক।' সুশী বলল অল্প হেসে।

'চুলে পাক ধরেছে কি না।' যেন নিজের মনে অরুণা বিড় বিড় করল। একটু থেমে পরে প্রশ্ন করল, 'তোমার কাকাবাবুটি কেমন?'

'কে, ডাক্তার?' সুশী গম্ভীর হয়ে গেল।

অরুণা মাথা নাড়ল।

প্রশ্নটা সে কাল রাত্রেই করত। ডাক্তার যখন অরুণা ও সুশীর সঙ্গে টিচার্স কোয়ার্টারের চৌকাঠ অবধি এসেছিল। আজ অরুণাদের রান্নার আয়োজন তদারক করতে যোগীন ডাক্তার সরাসরি রান্নাঘরে ঢুকে পড়েছিল। অরুণা অবশ্য ঘরে ছিল না তখন। মেয়েদের নিয়ে সে পিছনের আতাতলায় রিহার্সালের উদ্যোগ করছিল।

ফিরে এসে দেখে সুশী ডাক্তারকে নিয়ে রান্নাঘর থেকে বেরোচ্ছে।

অর্থাৎ শিক্ষয়িত্রীদের স্বাস্থ্য এবং সেই সঙ্গে তাদের রান্নাবান্নাও স্বাস্থ্যসম্মতভাবে সম্পন্ন হয় কি না ডাক্তারকে ফি রোববারে এসে পরীক্ষা করতে হয়। অরুণাকে বুঝিয়েছিল সুশীলা তখন।

'শিক্ষয়িত্রীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে এতটা উদগ্রীব ও উৎকণ্ঠিত অন্য শহরের কোনো ডাক্তারকে আমি দেখিনি!' অরুণা আস্তে আস্তে বলল এখন।

'ডাক্তার সম্পর্কে কেন জানি আমার বরাবরই অন্য রকম ধারণা।' সুশী বলল।

'কি রকম?' অরুণা ঢোক গিলল।

'পাহাড়ে কাটিয়েছে সারাজীবন, শুনি। কেবল কুলি আর জঙ্গল নিয়ে। হঠাৎ এখানে এতগুলো শিষ্ট পরিচ্ছন্ন স্বজাতীয় মুখ দেখে নাকি অতিমাত্রায় উল্লসিত হয়ে উঠেছে। মিশছে, হৈ হৈ করছে। খারাপ আমার মনে হয় না।'

অরুণা চুপ।

একটু হাওয়া উঠল।

টেবিল ঢাকনির একটা কোণা উঠে গিয়ে একটা ডিশের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ল।

'আর দুজন? অল্প বয়সের দুই ভদ্রলোক?'

'কি জানি, এই তো দুই রোববার দেখলাম, হাসতে গিয়েও সুশী আবার গম্ভীর হল।

'কি জানি, এই তো দুই রোববার দেখলাম', বলছিল অরুণা।

'তাই বলে তুমি এ'দের ওপর রাগ করতে পার না।' সুশী সোজা বলে ফেলল, 'একজন জুনিয়র উকিল, একজন উঠতি ব্যবসায়ী। স্কুল কমিটিতে না থাকলেও মেয়েদের স্কুল সম্পর্কে এ'দের মতামতের মূল্য খুব বেশি। একজন প্রেসিডেন্টের ভাগ্নে আর একজন সেক্রেটারীর শ্যালক।'

'তবে আর কথা কি। দুজনেরই অবারিত দ্বার।' অরুণা মাথা নাড়ল। 'ছুটিতে একজোট হয়ে গোটা কমিটির প্ল্যান বানচাল করে দিতে কতক্ষণ।'

'যা বলেছ।' সুশী এবার হাসল। 'বরং আমার তো মনে হয়, সেক্রেটারী ও প্রেসিডেন্টকে যত না শালা ভাগ্নেকে তার চেয়ে বেশি সমাদর করা উচিত। আমাদের ইনক্রিমেন্টের প্রশ্ন আছে, ডি এর!'

'চা খাইয়ে ভালই করেছি!' অরুণা বলল। সুশী এবার শব্দ করে হাসল। 'যা বলেছ।'

'তবে হ্যাঁ, এটা ঠিক', বেণী-খসা একটা চুল কানের ওপিঠে ঠেলে দিয়ে সুশীলা বলল, 'কমলা মাসী কুড়িয়ে কাছিয়ে যে খবরটি আনে মিথ্যা হয় না।' এবার অরুণা আর কথা বলল না। মেঝের দিকে নিবিষ্ট চক্ষু।

কমলা এই স্কুলের অন্যতম টিচার। চল্লিশোত্তীর্ণা। মেয়েদের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষয়িত্রীদেরও মাসী। ছোট মেয়েদের ড্রিল শেখান এবং বড় মেয়েদের ড্রইং। বিধবা। স্বাস্থ্যবতী। হাস্যরসিকা।

স্কুলের সময়ের বাইরের সময়টুকু শহরে ঘোরাফিরা করেন। এবাড়ি-ওবাড়ি। হাকিম থেকে মাস্টার মুহুরী পর্যন্ত।

নানা রকম কাজে। শহরে একটি অর্ফানাজ হচ্ছে তাতে কমলামাসী আছেন। লিলিদের মহিলা সমিতির তিনি অন্যতম প্রধানা এবং স্থানীয় অবলা আশ্রমের অনারারী সেক্রেটারী তিনি। নিজে গরীব। রাতদিন ঘুরছেন নারী সমিতির চাঁদার খাতা হাতে নিয়ে। হ্যাঁ, কমলা খাস্তগীরের মত অল্প সময়ের মধ্যে একসঙ্গে বেশি চাঁদা আর কেউ আদায় করতে পারে না। এই জন্যে শহরের নারী মহলে মাসী এত প্রিয়।

হেসে রং মাখিয়ে এমন সব কথায় তিনি বাবুদের মাত করে দেন যে, এক উকিল-পাড়া থেকেই এক দুপুরে সেবার মেয়েদের কি একটা অনুষ্ঠানের জন্যে উনি পঞ্চাশ টাকা তুলে এনেছিলেন।

হ্যাঁ সাহসিকা তো বটেই।

কারো কারো এমন ধারণা যে, শিক্ষয়িত্রী না হয়ে যদি বড় ঘরে জন্মাতেন তো কমলা খাস্তগীর এক দেশবরেণ্যা নেত্রী হতেন। এমন মেয়েই হয়। ফর্সা ফটফটে গায়ের রং। কালো পা গরদ পরেন। বিধবা, শঙ্খ রুলি কিছু

নেই হাতে। পায়ে পাতলা হরিণ-চামড়ার চটি। কালো চেনওলা ব্যাগ হাতে ফর্সা কোনো মহিলাকে দেখলেই বলে দেওয়া যায় কমলা-মাসী আসছে কি মাসী যাচ্ছে। চাঁদা তোলার কাজে বেরুলো। ব্যাগের ভিতরে খাতা। একটা কল্যাণী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং তারপর সেটাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে অর্থের প্রয়োজন-টাই বড় এবং প্রতিদিন এই অর্থ সংগ্রহের ব্যাপার কতটা অপ্রিয়কর তা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন।

কিন্তু কমলা খাস্তগীরকে দেখলে, অন্তত ওর মুখের দিকে তাকালে, তা আর মনে হয় না—মাসী হাসছেই।

আর হাসির সব কথা কুড়িয়ে কুড়িয়ে আসছে চাঁদার সঙ্গে, চাঁদা জমা দেওয়ার খাতার ব্যাগে লুকিয়ে।

কমলামাসী ইদানীং রোজ এসে বলছে, অমুক ডিপুটি অরুণার রূপের এই ব্যাখ্যা করল। অমুক মুন্সেফ অরুণা সম্পর্কে এমনটি বলে।

তাঁরা তাকে এই প্রথম দেখছে। কেননা, এখানে এসেই অরুণা বেরোয়নি। মাত্র ক'দিন একটু বাইরে টাইরে যাচ্ছে। আর গুঞ্জন উঠছে। নতুন হেড মিস্ট্রেস দেখতে এমন তেমন। কমলামাসী বলে, ডিপুটি, মুন্সেফ, উকিল, আমলা, কে নয়।

'হনো, জঘন্য সব।' মাসী বিড় বিড় করে। কমলার ঠোঁটে হাসি আর তখন থাকে না।

সেখানে যা ভাল ছিল এখানে তা ঘৃণ্য, অবাঞ্ছনীয়, অপ্রীতিকর। অপরাধজনক তো বটেই। 'পাকা চুল, চুল পাকিয়ে ফেললে সব পরিবার পাকিয়ে পাকিয়ে। এঁরাও, এঁদের মুখেও। বরং এদের মুখেই বেশি। ঘেন্না ধরে গেছে পুরুষ সমাজটাকে, পুরুষকে।' বলতে বলতে খবরটা অরুণা ও সুশীর সামনে প্রায় ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার মত করে মাসী নিজের ডেরায় ফিরে যায়। কমলার সময় নেই আর এক মিনিট দাঁড়াবার। রান্না-বান্না আছে, নিজের স্নানাহার। বেলা এখন তিনপহর।

অর্থাৎ খবরের ফলাফল অরুণার মুখে কি ছাপ ফেলল, প্রবীণা কমলা খাস্তগীর তা আর দাঁড়িয়ে দেখে না, তাড়াতাড়ি সরে যায়।

তা ছাড়া হেড মিস্ট্রেস নিয়েই যখন কথা। এর গুরুত্ব বেশি।

ধরতে গেলে প্রায় প্রস্তাবের মতনই. প্রত্যাশা জানানোর মতন। আপনাদের সমিতিতে মিস্ সেন আছেন তো? সবাই বলবে।

ও'কে বলুন না একদিন আমাদের বাড়ি আসতে। আমার এখানে। বুড়ো হাকিম প্রণব চ্যাটার্জি নাকি সেদিন নরম সুরে অনুরোধ জানিয়েছিল কমলা খাস্তগীরকে। 'আমার স্কুলে পড়বার বয়সের কোনো মেয়ে নেই অবশ্য'। অর্থাৎ, কারোর অভিভাবক তিনি নন। স্কুলে এখন পড়ছে, এমন একটিও আর তার দুহিতা নেই ছোট ঘরে। বিয়ে হয়ে গেছে সব ক'টির। নাতি-নাতনীগুলো মা-বাপের সঙ্গে দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এখানে এই মফঃস্বলে তিনি একা।

ছুটির দিনে কোনো কাজ থাকে না হাতে, তাই হেড মিস্ট্রেসের সঙ্গে বসে একটুক্ষণ স্থানীয় সামাজিক বিষয়গুলো নিয়ে আলাপ-আলোচনা করা।

দায়িত্বসম্পন্ন নাগরিক তিনি এবং অরুণার পক্ষে দায়িত্বসম্পন্না একজন বিশিষ্ট নাগরিকা হিসেবে এমন আসা-যাওয়া ও কথাবার্তা বলার প্রয়োজন আছে বৈকি।

তা লাইন ডিঙিয়ে হাকিম তো আর টিচার্স কোয়ার্টারে চু মারতে পারেন না, দয়া করে অরুণা একদিন আসুন না আমাদের হাকিম-পাড়ায়।

একটি 'বি' গেডেড মেয়ে-স্কুলের হেড মিস্ট্রেসের পক্ষে এতো গৌরবজনকই। 'উকিল, মোক্তার, আমলারা' আমন্ত্রণ জানাচ্ছে অন্যভাবে। স্থানান্তরিতা, অন্য স্থান থেকে সবে তিনি এলেন একলা এই শহরে চাকরি করতে। সেই মেয়ে দুঃসাহসিকা, তাঁকে দেখলে শ্রদ্ধা হয়। কমলা খাস্তগীরের কাছে সেদিন শ্রদ্ধা নিবেদন করছিল রমেন চাকলাদার। স্থানীয় পেস্কার। 'আমার মনে হয়, তাঁর ভিতরে কি যেন এক হ্লাদিনী শক্তিও আছে।' বলছিল চাকলাদার বার বার ভুঁড়ির ওপর হাত রেখে। 'দূরে থেকে মাঝে মাঝে দেখি। একদিন বলুন না তাঁকে আমাদের বাড়ি আসতে, আমার মেয়ে নীনা তো তাঁর ইস্কুলেরই ছাত্রী।' অর্থাৎ অভিভাবক হিসাবেই তিনি নতুন হেড মিস্ট্রেসের উপস্থিতিও প্রত্যাশা করছিলেন এবং আশা করছিলেন, নিশ্চয়ই অরুণাদেবী এতটা সামাজিক হবেন। মিশুক।

পর্যন্ত মোক্তার সুধীরবাবু। রোগা টিঙটিঙে লম্বা চেহারার ভদ্রলোক।

মোক্তারবাবুর মেয়ে রীণা পড়ছে এই স্কুলে। কমলা মাসীর কাছে নিবেদন করল, 'আজ পর্যন্ত তো নতুন হেড মিস্ট্রেসের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ কি কথাবার্তার সুযোগই পেলাম না।' সুধীর পাল দুঃখ করছিল এবং কথাবার্তা ও দেখা-সাক্ষাতের আগেই তিনি মাসী মারফৎ নিজের গাছের ফলন্ত একটা বড় পাকা কাঁঠাল পাঠাতে চেয়েছিলেন টিচার্স কোয়ার্টারে গত শুক্রবার দিন।

হরেন উকিলের পড়ছে দুই মেয়ে। তিনি পাঠাতে চাইলেন মাছ। তাঁর দেশের বাড়ি থেকে এসেছিল প্রকাণ্ড দুই কাতল।

কমলা আনেনি। বিধবা। মাছ ছোঁবে কোন্ দুঃখে। কাঁঠাল বয়ে আনার মত তার গায়ে জোর দেখল কোথায় টেকো সুধীর। অভদ্র, জানোয়ার।

আর আজ দুই ভদ্রলোক এসেছিলেন সেক্রেটারী ও প্রেসিডেন্টের আত্মীয়তার সূত্রে ধরে। শিক্ষয়িত্রীদের শুভানুধ্যায়ী। শিক্ষয়িত্রী-কোয়ার্টারের ওধারের জমির বন কেটে বাগান করা হবে। পিছনের ডোবাটা কাটিয়ে ঘাট-বাঁধানো পুকুর হবে। দরকার হয় আরো কাটাকা কমিটিকে দিয়ে স্যাংশন করিয়ে তাঁরা হেড মিস্ট্রেসের শোবার ঘরের বেড়া, দরজা জানলা এবং মেঝেটারও সংস্কার করবেন। কিছু বং কিছু সিমেণ্ট আর ক'খানা কাঠের তো মামলা। সত্যি বড় জীর্ণ, অত্যন্ত দরিদ্র চেহারা শিক্ষয়িত্রী-আস্তানার। ভদ্রলোকদের মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

একজন উচ্চশিক্ষিতা আধুনিকা মহিলার এভাবে এ-ঘরে থাকা চলে না। 'আমাদের শহর আমরা যদি নবাগতার, সুখ-সুবিধা, শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি মনোযোগী না হই তো লজ্জার কথা।'

বলছিলেন, পঙ্কজবাবু ও হীরেনবাবু একবার চায়ের বাটিতে চুমুক দিয়ে বার বার অরুণার দিকে চেয়ে।

'যাকগে ওসব।' যেন প্রসঙ্গটা চাপা দেবার জন্য অরুণা বলল, 'এবার তোমার গল্প বল।'

'আমার গল্প!' সুশী নিজের মধ্যে ফিরে এল। হঠাৎ কমলা খাস্তগীরকে টেনে এনে এবং তারপর হেড মিস্ট্রেসকে গম্ভীর হয়ে যেতে দেখে ও কেমন অপ্রস্তুত হয়েছিল। 'আমার গল্পের আর বাকী আছে কিছু, অরুণাদি? সব তো বললাম। এখন ভয় হচ্ছে—ভাবছি—তুমি যে আমায় করুণার চোখে দেখবে।'

'না, তা হবে কেন।' অরুণা সুশীর হাতে হাত রাখল। 'বরং শহুরে মনের সঙ্গে একটুখানি গাঁয়ের মন মিশে আছে বলেই তুমি বেঁচে গেছ।' (ক্রমশ)

# রয়েল বোটানিকেল গার্ডেন

গঙ্গার পশ্চিম তীরে শিবপুরের "বোটানিক্যাল গার্ডেনের নাম অনেকেই শুনেছেন। কিন্তু এই উদ্ভিদ উদ্যানের মধ্যে যে বিচিত্র কাহিনী লুকানো আছে তা খুব কম লোকই জানেন। বস্তুত অনেকেরই ধারণা নাই যে, এটা একটা প্রমোদ উদ্যান নয়, উদ্ভিদ গবেষণার এটা একটা বড় কেন্দ্র। ভারতের মাটিতে অনেক গাছপালা, শস্য চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ার আগে এখানে পরীক্ষা দিয়েছে। ২৭৩ একরের এত বড় উদ্যানের ইতিহাস খুব পুরোণো না হলেও যথেষ্ট ঘটনাবহুল।

১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল রবার্ট কীড তৎকালীন অস্থায়ী গভর্নর জেনারেল স্যার জন ম্যাকফরমজকে কলকাতায় উদ্ভিদ চর্চার জন্য এক উদ্ভিদ উদ্যান প্রস্তুত করার অনুরোধ জানান। উদ্দেশ্য ছিল, বিদেশী গাছগাছড়া ভারতবর্ষে ও কোম্পানীর অন্যান্য উপনিবেশে জন্মাবার আগে এই উদ্যানে পরীক্ষা করিয়ে নেবার ব্যবস্থা যাতে হয়। এটাও লক্ষ্য ছিল যে, মলয় দ্বীপে যে সকল মশলার গাছ আছে সেগুলি বাঙলায় এনে এখানে যাতে জন্মায়। সেজন্য কর্ণেল কীড প্রথমেই চেষ্টা করেন যাতে এখানে দারুচিনি, লবঙ্গ, জায়ফল জাতীয় গাছ জন্মায়। কিন্তু পরীক্ষায় দেখা গেল বিষুবরেখার অন্তর্গত দেশীয় গাছ উত্তর ভারতে ভাল জন্মায় না। ওদেশের বা য়ুরোপের ফলও এখানে ভাল ফলল না। কিন্তু তারপর অনেকগুলি দরকারী গাছ ভারতবর্ষের মাটিতে জন্মান হয় এবং সেগুলি প্রথমে এই উদ্যানে পরীক্ষা করে দেখা হয়। কুইনাইন, রবার, নানা-প্রকার শাল ও ভেষজ-লতা এই উদ্যানের বৈজ্ঞানিকগণ প্রথমে পরীক্ষা করে দেখেন। অনেকেই হয়ত জানেন না যে, ভারতবর্ষের দুটি সর্বজনপ্রিয় বস্তু এই উদ্যানে গবেষণার ফলে আজ পাওয়া যায়। চা ও আলুর চাষ এখানেই প্রথমে করা হয়। সিনকোনার চাষও এখানে এত অধিক পরিমাণে হয় যে, গভর্নমেণ্টের বহু হাসপাতালের কুইনাইন বহুদিন পর্যন্ত এই চাষ হতে সরবরাহ করা হয়। ভারতবর্ষ, এমনকি বর্মার, রাস্তার পারে ধারে যেসব নতুন গাছ লাগান হয় বা বাগানের সাজান লতা বা পাতা যা দেখা যায় তা প্রায় সবই এই উদ্যানে প্রথমে পরীক্ষা করা হয়। চীনে টাং তেল (Tung Oil) হতে বহু টাকা আসে। এই টাং গাছ এখানে জন্মাবার চেষ্টা হচ্ছে এবং গবেষণার ফলে মনে হচ্ছে হিমালয়ের নীচে বাঙলা ও আসামের শুকনো মাটিতে এ গাছ ভাল জন্মাবে। তুলা ও পাটের উন্নতির জন্যও এই উদ্যানে বহু গবেষণা হয়েছে।

এই উদ্যানের সবচেয়ে বড় বিস্ময় হচ্ছে এর Herbarium বা বিশুষ্ক-পত্রভাণ্ডার। ১৭৮৬ সালেই একটা পাঠাগার ও বিশুষ্ক পত্রভাণ্ডারের ব্যবস্থা হয়। বাগানের একদিকে দোতলা এক বাড়িতে যে ভাণ্ডারটি বর্তমানে আছে তা ১৮৮৩ সালে তৈরী হয়। এখানে প্রায় ৫০ লক্ষ পাতা ও ফুলের নমুনা রাখার ব্যবস্থা আছে এবং বাড়িতে আগুন ও স্যাঁৎসেতে হাওয়া ঢুকে ভাণ্ডার যাতে নষ্ট না কর[...] তার ভাল ব্যবস্থা আছে। শুধু ভারতবর্ষ ন[...] এশিয়ার অন্যান্য দেশ, য়ুরোপ অষ্ট্রেলি[...] আফ্রিকা ও আমেরিকার নানা জায়গার না[...] বিচিত্র গাছপালা, ফুল পাতার নমুনা এ[...] ভাণ্ডারে রাখা হয়। এইরকম উদ্ভিদ চর্চা[...] ব্যবস্থা ভারতের আর কোথাও নাই এবং ভারতে ও এশিয়ার মধ্যে এইটিই হচ্ছে সবচেয়ে ব[...] বিশুষ্ক ভাণ্ডার।

১৯৪৬ সাল হতে এখানে উদ্ভিদ গবেষণার জন্য দু'বছরের শিক্ষার ব্যবস্থা কর[...] হয়েছে। প্রতি বছর ভারতবর্ষের নানা প্রদে[...] হতে ৬ জন হতে ৮ জন ছাত্র এখানে এ[...] শিক্ষালাভ করেন। শিক্ষাশেষে এইসব ছা[...] ভারতের নানাস্থানে উদ্ভিদ অনুসন্ধান আরম্ভ করবেন।

এখানে যত গাছপালার সংগ্রহ আছে এশিয়ার কোথাও তা নাই। ১৬,০০০ গা[...] গাছড়া বাগানের চারিদিকে ছড়িয়ে আছে এগুলি ভারতবর্ষে এবং মাদাগাস্কার হতে
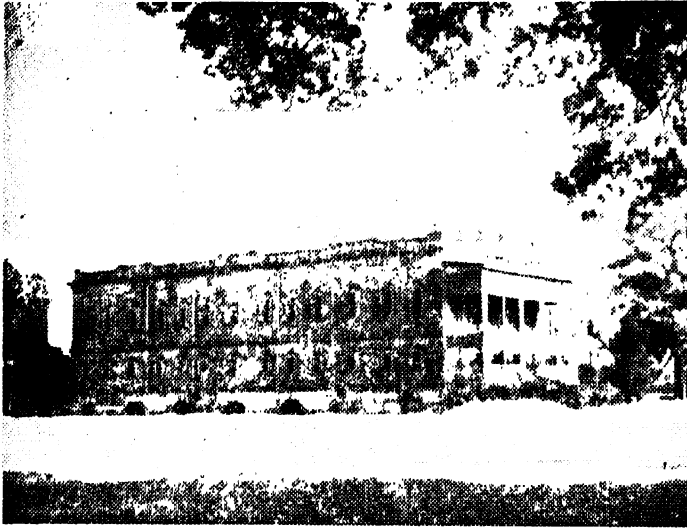
পাশে:—"হার্বেরিয়ম" বা বিশুষ্ক-পত্রাগার। এখানে প্রায় ৫০ লক্ষ পাতা ও ফুলের নমুনা রাখার ব্যবস্থা আছে। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দ থেকে এই সকল দ্রব্য সংগৃহীত হয়ে আসছে।

নীচে:—উদ্যানের তাল জাতীয় বৃক্ষের অংশে একটি আফ্রিকা দেশীয় শাখা-প্রশাখাযুক্ত তাল গাছ।

অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত অন্যান্য গরম দেশ হতে আনা হয়েছে। এখানে তালগাছ জাতীয় গাছ (Palm trees) বহু আছে। অনেকের মতে এখানে 'পাম' গাছের মত সংগ্রহ আছে পৃথিবীর কোথাও তা নাই। উদ্যানের এক অংশ পাম গাছে ও তাদের চারাতে ভর্তি। সুদৃশ্য ও বিশাল 'টালিপট পাম' গাছ এখানে দেখা যায়। সম্প্রতি সিংহল হতে সারিপুত্ত ও মোগাল্লানের পূতাস্থির সঙ্গে যে 'বো' চারা আনা হয় তা এখানে পোঁতা হয়েছে। বোটা-নিকসের বুড়ো বট অনেকে দেখেছেন। এই বুড়ো বটগাছের বয়স ঠিক কত জানা নেই। কিন্তু অনেকের মতে এটার বয়স প্রায় ১৭৯ বছর। গাছের গুঁড়ির বেড় মাটি হতে ৫½ ফুট উপরে নিলে প্রায় ৫ ফুট হয় এবং মাথার বেড় প্রায় ১০০০ এক হাজার ফুট। এটা লম্বায় ৭৯ ফুট এবং বটের যেসব শিকড় মাটিতে এসে নেমেছে তাদের সংখ্যা হবে ৬০১। ১৮৬৪ ও ১৮৬৭ সালের ঝড়ে অনেক গাছপালা নষ্ট হয় এবং এই বটগাছের পশ্চিম ও উত্তরদিকের অনেকগুলি শাখা নষ্ট হয়।

১৮৬৭ সালের ঝড়ের পর ডাঃ জর্জ কিং যখন ১৮৭১ সালে সুপারিনটেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হন, তখন তিনি সমস্ত উদ্যানটিকে নতুনভাবে সাজান। বড় বড় হ্রদ ও চওড়া রাস্তা তিনি তৈরী করান। তারপরে স্যার ডেভিড প্রেন সুপারিনটেণ্ডেণ্ট থাকাকালীন উদ্যানটিকে ভৌগোলিক বিভাগে ভাগ করেন। স্যার ডেভিড ১৯০৪ সালে অবসর গ্রহণ করেন কিন্তু তাঁর ঐ পরিকল্পনা অনুযায়ী এখনও উদ্যানটিতে গাছপালা লাগান হচ্ছে। উদ্যানের পশ্চিম অংশের মাঝখানে ত্রিকোণাকার জায়গায় ভারত-বর্ষ ও বর্মার গাছপালা রাখা হয়। এর মধ্যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের জন্য বিভিন্ন অংশ আলাদাভাবে রাখা আছে। ভারতের এই
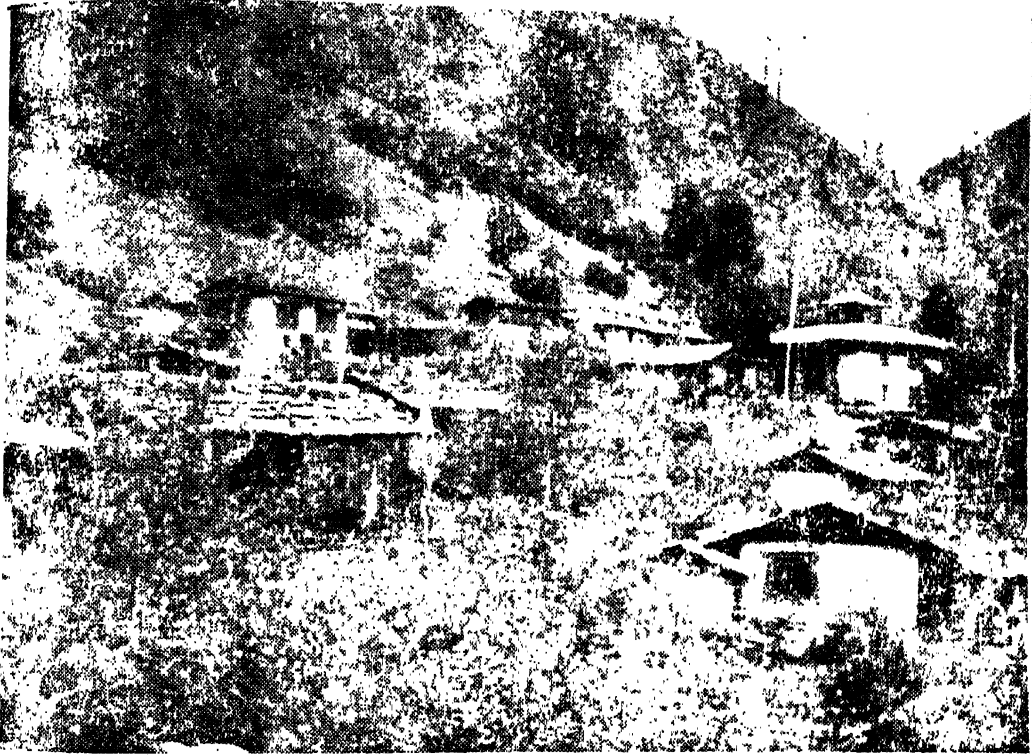
সিকিমের অন্তর্গত লাচেন পার্বত্যভূমি। রয়েল বোটানিক গার্ডেনের লোকজন প্রায়ই এখানে গিয়া দুষ্প্রাপ্য গাছগাছড়া সংগ্রহ করিয়া আনেন

...অংশের পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম এইসব দেশের গাছপালা আছে—উত্তর-... এশিয়া, য়ুরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা ...। আর ভারতীয় অংশের পূর্ব-... উত্তর-পূর্ব এশিয়া, চীন, জাপান, ... শ্যাম, আনাম, মালয় উপদ্বীপ ও ... এবং অস্ট্রেলিয়া। শেষোক্ত পাঁচটি ... শ্যাম, আনাম, মালয় উপদ্বীপ, দ্বীপ-... এবং অস্ট্রেলিয়ার গাছপালা ও ভারতের ...র মধ্যে পাম, পাইন ও বাঁশের সারি ...।

...ইসব গাছপালা দু'রকম উপায়ে সংগ্রহ ... (১) অন্যান্য দেশের গাছপালার সঙ্গে ...র গাছপালা বদল করা হয়। (২) উদ্ভিদ-... প্রায় প্রতি বৎসর ঘন জঙ্গলে, পাহাড়ে ... এই উদ্ভিদ-শিকারের আয়োজন করা ... কাজ খুব আরামের নয় বলা বাহুল্য ...তে প্রাণসংশয় হয়। সিনকোনা অন্বেষণে এণ্ডারসন প্রাণ হারান। ডাঃ ন্যাথানিয়েল

'হার্বেরিয়াম' বা শুষ্ক-পত্রাগারের ভিতরের দৃশ্য। এখানে বহু দুষ্প্রাপ্য গাছ-গাছড়ার নমুনা আছে। এখানে বৃক্ষতত্ত্ব সম্বন্ধে যে মূল্যবান পুস্তকাগার আছে তাহা ভারতে প্রাচীনতম
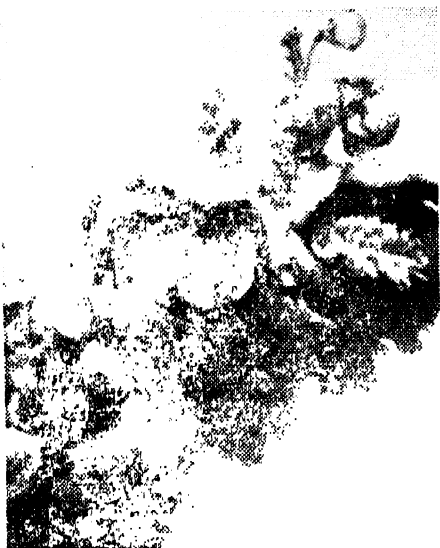
উপরে: অস্ট্রেলিয়ার "ক্যানন্-বল" নামক বৃক্ষ। ভারতবর্ষে ইহা 'নাগলিংগম' নামে পরিচিত

উপরে, বামে: 'নাগলিংগম' গাছের ফুল। ইহার গন্ধ সুমিষ্ট, কিন্তু ফলগুলি অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত

নীচে, বামে: উদ্যানের 'পাম হাউসে' জোড়া নারিকেলের চাষ

নানা জাতের গাছ-গাছড়াগুলিকে নম্বরযুক্ত করিয়া শুষ্ক করার জন্য বিশেষভাবে নির্মিত কাগজে রাখা হইতেছে

রয়েল বোটানিক গার্ডেনের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ডক্টর কে বিশ্বাস এবং লণ্ডনের হর্টিকালচারেল সোসাইটির মিঃ ষ্টার্ন সিকিমের ১১০০০ ফুট উঁচু পাহাড়ে দুষ্প্রাপ্য গাছ-গাছড়া সংগ্রহে ব্যাপৃত

ওয়ালীচ ভারতবর্ষ, বর্মা ও মালয়ে বহু উদ্ভিদ অনুসন্ধান করেন। কুমায়ুন, নেপাল, শ্রীহট্ট, দক্ষিণ বর্মার তেনাসেরিন, পেনাং ও সিঙ্গাপুরে তাঁর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি বহু গাছ-পালা সংগ্রহ করে। ভারতবর্ষের বহু স্থানে এখনও বহু উদ্ভিদ আছে যাদের বৈজ্ঞানিক সংগ্রহ আজও শেষ হয় নাই।

এই উদ্যানের ইতিহাসে কয়েকটি রোমাঞ্চ-কর ঘটনা ঘটেছে। ১৮৭৯ সালের জানুয়ারী মাসে উদ্যানের পরিচালক এডলফ বীয়ারম্যান পত্রভাণ্ডারের পরিচারক জন স্কটের সঙ্গে বাঁদরদের খেলা দেখছিলেন। এমন সময় গঙ্গা সাঁতার দিয়ে এক বাঘিনী এসে বীয়ারম্যানকে আক্রমণ করে। বীয়ারম্যান চোট সামলে উঠলেন, কিন্তু একবছর বাদে কলেরায় মারা যান। বাঘিনী অযোধ্যার শেষ নবাব ওয়াজিদ আলি

রক্সবরার "আইকন": ইহা ২৫ খণ্ডের এক বিরাট সংগ্রহ-গ্রন্থ। ইহাতে ভারতীয় গাছ-গাছড়ার প্রায় আড়াই হাজার বহুবর্ণের চিত্র আছে। রক্সবরা সাহেবের 'ফ্লরা ইণ্ডিকা' গ্রন্থে এই সকল গাছ-গাছড়ার বর্ণনা স্থান পাইয়াছে। উদ্ভিদ সম্পর্কিত মূল চিত্রের এই বিরাট সংগ্রহ গ্রন্থটি পৃথিবীর মধ্যে অদ্বিতীয়

শাহের খিদিরপুরের চিড়িয়াখানা হতে পালিয়ে এসেছিল। ছয় সপ্তাহ পরে একটা কাল চিতা-বাঘ ঐ একই জায়গা হতে পালিয়ে এখানে এসে পৌঁছেছিল এবং রাতে এখানে ছিল। পরদিন সকাল বেলা ডাঃ জর্জ কিং চিতাবাঘটিকে গুলী করে মারেন।

ভারতবর্ষে বহু উদ্ভিদ উদ্ধার করতে হবে এবং অনুসন্ধানের অনেক ক্ষেত্র অনাবিষ্কৃত আছে। এই উদ্ভিদ উদ্যান প্রায় পৌনে দু'শ বছর ধরে অনেক গবেষণা করেছে এবং বহু কাজ এখনও তার বাকী আছে। বর্তমানে প্রথম ভারতীয় সুপারিনটেন্ডেন্ট ডাঃ কে পি বিশ্বাস আশা করেন যে, ভারতবর্ষে উদ্ভিদ অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা এখন হতে আরও বিস্তৃত ও ব্যাপক হবে।

---

এই প্রবন্ধের ফটোগুলি আনন্দবাজার পত্রিকার স্টাফ ফটোগ্রাফার কর্তৃক গৃহীত।

রয়াল বোটানিকাল গার্ডেনের সুদৃশ্য বৃক্ষশোভিত রাস্তা—পামীরা এভিনিউ।

**প রোপকার** আর আত্মদান করে মানুষের যে তৃপ্তি, সেটা বিশ্লেষণ করলে দেখা র, অধিকাংশ স্থলেই তার মূলে রয়েছে াত্মপ্রীতি। নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে, নিজে ঃকষ্ট বরণ করে কিংবা অপরকে সন্তুষ্ট ও খী করবার জন্যে নিজেকে নিপীড়ন করে কটা বিশেষ ধরণের আনন্দ পাওয়া যায়। সেই নন্দটা নিজস্ব সামগ্রী, সেই সুখটা দৈহিক নুভূতির সামিল। অবশ্য এর মানে নয়, যে তোকবার যখনই পরের উপকার করবার জন্যে মাদের মন ব্যাকুল হয়, পরদুঃখ নিবারণের দ্দেশ্যে আমরা স্বার্থত্যাগ করতে উদ্যত হই, তবারই আমাদের মনের কোণে আত্মপ্রীতি া হতে থাকে। বিদ্যাসাগর মহাশয় কিংবা ন্ধীজীর পরার্থপরতার মধ্যে আত্মপরতার বীজ ল, এটা মেনে নিতে মন স্বতঃই দ্বিধাগ্রস্ত া। তবু, গড়পড়তা হিসেবে বলা চলে যে, ধারণ মানুষের অনেকের মধ্যেই আত্মত্যাগের হোর সঙ্গে আত্মগৌরবের আমেজ জড়িয়ে ছে। তা ছাড়া, এটাও ঠিক যে বেশির ভাগ য়ে আমরা পরের জন্যে যেটুকু স্বার্থ ছেড়ে ই, সেটার যথাযথ অথবা অতিরিক্ত বিজ্ঞাপন াহির করতে আমরা কসুর করি না। কখনো রি ইঙ্গিতে, বেশি বাক্যব্যয় না করে। কখনো রি অপরকে ধরে; কথা শুনিয়ে গায়ের জ্বালা বারণ করি। এ বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন ঘটে খন মানুষ মনে করে তার কৃতকর্মের অনুরূপ যোগ্য প্রতিদান মিলছে না। আপনারা নেকেই হয়তো লক্ষ্য করেছেন, অনেক বাড়িতে প্রৌঢ়া কিংবা বর্ষীয়সী মহিলারা বেশি কথা লেন এবং আপনাদের গুণপনা জাহির করেন। তিকথন দোষের ফলে আত্মকথন এসে যেতে ধ্য। তখন হয়ত ভ্যানর ভ্যানর কথা শুনতে ালো লাগে না, বিরক্ত হয়ে উঠি। কথায় কথায় দি কেউ শাসায়, "আগে চোখ বুজি, তখন ঝবে কত ধানে কত চাল।" তখন একথা াপনার মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, আগে াখ বুজেই দেখো কি হয়। তারপর দেখা াবে ধান থেকে চাল বের করা যায় কি না। ৃথিবীতে সব কিছুই আবশ্যক, অত্যাবশ্যক য়।

•

কিন্তু গৃহিণীদের এই ধরণের মনোভাব একেবারে অন্যায্য বা অসঙ্গত নয়। তাঁরা যে রিশ্রম করেন, অসঙ্কোচে আপনাদের জীবন-ারণকে সংকুচিত করে এনে বাড়ির পুরুষদের ন্যে অকাতরে নিজেদের ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধা বসর্জন করেন, সেটা কি পুরুষেরা সব সময়ে জির করেন, বোঝেন অথবা প্রয়োজনমত দুটো সহানুভূতির বাক্য প্রয়োগ করেন? যাঁরা করেন, তাঁরা বুদ্ধিমান মানুষ। সাধারণ কর্তব্যবোধ কিন্তু অনেকেরই নেই বা থাকে না। কিউ কেউ আছেন যাঁরা নিতান্তই নির্বোধ স্বার্থপরের মতন উলটে তম্বি করেন। এটা হোল না, ওটা কেন হাতের কাছে পাওয়া যাচ্ছে না বলে ক্রমাগত অনুযোগ করেন। চেঁচামেচি করে অশান্তির সৃষ্টি করেন, নয় তো নিজে হাত গুটিয়ে বসে থেকে সাধু সেজে আত্মক্ষালন করেন। নির্বিবাদে, চোখ বুজে গৃহিণীর স্কন্ধে সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব আর কর্তব্য চাপিয়ে দিয়ে নিজে অসহায় সেজে বসে থাকেন। এই ধরণের পুরুষদের নিয়ে কিন্তু ভারি মুশকিল হয়। এরা যদি শুধু দুর্বল আর অসহায় হয়েই ক্ষান্ত হতেন, তাহলে সংসারের শান্তি বজায় থাকত। তা নয়, অকর্মণ্যতার সঙ্গে এঁদের আবার মুখরতাও আছে। আছে অসন্তোষ, অহেতুক সমালোচনা আর অযথা হস্তক্ষেপ। ফলে, যাঁকে সংসার চালনা করতে হয়, তাঁর জীবন জেরবার হয়ে যায়।

স্ত্রীলোকের মনস্তত্ত্বে কি বলে জানি না। শুনেছি, দুরন্ত অসহায় এবং অবাধ্য পুরুষই তাঁরা পছন্দ করেন বেশি। নিজেরা জ্বলে মরেন, সে জ্বালা নিয়ে আক্ষেপ করেন। আত্মীয় স্বজন প্রতিবেশীদের কাছে সবিস্তারে আপনাদের দুর্ভাগ্যের কথা আলোচনা করেন। কিন্তু এই ধরণের পুরুষদের প্রশ্রয়ও দিয়ে থাকেন। পুরুষ যখন দেখে, দিব্বি সংসার চলে যাচ্ছে, খালি রোজগার করেই খালাস,—তখন সেদিকে আর সে মাথা ঘামাতে চায় না। কাঁধ নীচু করে রাখলেই তাতে জোয়াল আপনি এসে চেপে বসে। অতএব অকর্মণ্য হয়েও মাথা উঁচু ও মুখ খোলা রাখা দরকার। আপনার নৈতিক ও মানসিক দায়িত্ব অথবা তীক্ষ্ম বুদ্ধি এবং সজাগ দৃষ্টি সম্বন্ধে তিনি খুবই সচেতন থাকেন।

কিন্তু এস্থলে আমি দোষ দেব বাড়ির মেয়েদের—যাঁদের প্রশ্রয় এবং অপরিণামদর্শিতায় এমন অঘটন ঘটে। এঁরাই গোড়া থেকে সযত্নে এবং আতু-আতু করে পুরুষকে এতখানি অকর্মণ্য করে দেন এবং ক্রমশ আরও পঙ্গু করে তোলেন। একটা দৃষ্টান্ত দিই। এক ভদ্রলোককে দেখেছি, এমনিভাবে তিনি অকর্মণ্য হয়ে পড়েছেন। সাধারণ দৃষ্টিতে তিনি শিক্ষিত, উদার মতাবলম্বী। কোনও বিষয়ে নীচতা ও স্বার্থপরতা নেই তাঁর মনে। অর্থ উপার্জন করেই তাঁর রেহাই। কিন্তু কোনও কাজ তিনি নিজে হাতে করেন নি এবং করতে পারেন না—মানে তাঁর স্ত্রী তাঁকে করতে দেননি। একটি ছোট মোড়ক যদি আনতে হয় তাঁকে, সঙ্গে চাকর দিতে হয়। কাপড় বার করা, কলমে কালি ভরা, এমন কি, পোষাক পরা প্রভৃতি কাজেও তাঁর স্ত্রীর সাহায্য অত্যাবশ্যক। তিনি যখন বাথরুমে যান, সমস্ত বাড়িশুদ্ধ লোক শশব্যস্ত হয়ে ওঠে। তাঁর স্ত্রী একবার রান্নাঘরে ছোটেন, পরমুহূর্তেই স্বামীর 'ওগো' আর্ত কণ্ঠস্বরে তটস্থ হয়ে তোয়ালে, টুথব্রাশ নিয়ে হাতে তুলে দেন। তারপর আহারাদি পরিবেশন সেরে ওপরে ছোটেন পোষাক, জুতো, পার্স বার করে দিতে। যদি ট্রামের টিকিট দিতে ভুল হয়ে যায় গোলমালের মধ্যে, তাহলে অপরাধ তাঁরই। যদি পার্সে খুচরো পয়সা না থাকে, তাহলেও দোষ গৃহিণীর। যেহেতু আগে থাকতে ভেবে দরকার মত রেজকি তিনি ভাঙিয়ে রাখেন নি কেন! যদি ট্যাঙ্কে জল কম থাকে, তাহলে পাম্প না চালানোর জন্যে দায়িত্ব স্ত্রীর আর কল যদি খারাপ হয়ে যায়, মিস্ত্রি ডেকে মেরামত করানোর ভারও সেই গৃহিণীর। চা তিনি নিজে কখনও ঢেলে নেননি। কাজেই কর্মব্যস্ত স্ত্রী যদি একটু বিলম্বে চা দেন, তাহলে যথেষ্ট পরিমাণ গরম চা না পাওয়ার ফলে উপার্জনশীল অফিস-ফেরৎ স্বামীর মেজাজ তপ্ত হয়ে ওঠে। ভাত খেতে বসে টেবিলে হাত ধোবার জল আর খাবার জল যদি উল্টো-পাল্টা হয়ে যায়, তাহলে তাঁর খাওয়া হয় না। তিনি উঠে যান। বামুন কিম্বা চাকর যদি কোনও কারণে চলে যায়, দোষ স্ত্রীর। কেননা, যথা-সময়ে তাঁর অভ্যাসমত জিনিসগুলি হাতে-হাতে জুগিয়ে দেওয়ার ভার তাঁর গৃহিণীর। অধিকন্তু বাজার আর রন্ধনের দায়িত্ব তাঁর। এঁর কাল্পনিক কর্মপটুতা অশেষ। অথচ এক-পা নড়তে গেলে তাঁকে পঞ্চাশবার ভাবতে হয়। যদি দরকারী কোনও কাজ থাকে, যার জন্যে বাইরে বেরুনো প্রয়োজন, তখন তিনি বাইরে বেরুতে চান না এবং পারেন না। কিন্তু স্ত্রী যে কেন তাঁকে তাড়াতাড়ি সাহায্য করে বাইরে বার করে দেননি, তার জন্যে অপরাধ স্ত্রীরই। স্ত্রী সামনে আড়ালে গজর-গজর করেন, আক্ষেপ করেন। কিন্তু আমি যখনই এই সব দেখি ও শুনি, তখনই ভাবি—যায়সা কে ত্যায়সা। সমস্ত কিছু করে দিয়ে তিনি স্বামীকে এমন নাড়ুগোপাল করে তুলেছেন যে, এখন অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়ে আর কি হবে?

বিজ্ঞানের কথা

# পৃথিবীর বয়স

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় রায়

যে মাটির পৃথিবীতে আমরা বাস করি, যে পৃথিবীর আলো হাওয়া গায়ে মেখে আমরা মানুষ, যার সৌন্দর্যে আমরা প্রতিনিয়ত মুগ্ধ হই স্বভাবতই আমাদের জানতে ইচ্ছে হয় ওর বয়সের পরিমাণ, জানতে ইচ্ছে হয় কোন সুদূর অতীতে পর্ণ্য গুঞ্জরিত সোনালী প্রভাতে সৃষ্টি হয়েছিল ওর, জন্ম নিয়েছিল ও সৌর মন্ডলে।

জানার আগ্রহ হলেই সব কিছু জানা যায় না, বিশেষ করে এই প্রশ্নের জবাব। কারণ, পৃথিবীর জন্মক্ষণ কেউ লিখে রাখেনি খাতার পাতায়, সাক্ষী নাই তার কোন অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহ। তবু বুদ্ধিমান মানুষ খুঁজে বের করেছে ওর জন্ম ইতিহাস। ধর্মের সঙ্গে জড়িয়ে দিয়েছে, অলৌকিক কাহিনীর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি করে দিয়েছে ওর জন্মের ইতিবৃত্তকে। বাইবেলে, কোরাণে, বেদে, এশিরিয়া, বেবিলোনিয়া প্রভৃতি দেশের ধর্ম গ্রন্থে, তা ছাড়া সমস্ত জ্ঞাত অজ্ঞাত ধর্মগ্রন্থেই রয়েছে পৃথিবীর সৃষ্টি কাহিনীর মনোরম আর চাঞ্চল্যকর বিবরণ। এ' বিবরণ যতই শ্রদ্ধার দৃষ্টি করুক না কেন মানুষের মন তাতে তৃপ্ত হতে পারেনি। যুক্তির যুগে মানুষ বিশ্বাসকে দূরে সরিয়ে তথ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে পৃথিবীর বয়সের পরিমাণ। তাই তো দেখি ধর্মগ্রন্থের পাতা থেকে এই কাহিনী স্থান পেয়েছে বৈজ্ঞানিকের ল্যাবোরেটরীতে।

পৃথিবীর জন্ম ইতিহাস নিয়ে বৈজ্ঞানিকেরা সর্বপ্রথম গবেষণা আরম্ভ করেন ঊনবিংশ শতাব্দীতে। ভূতত্ত্বে ইউনিফর্মিটারিয়ান মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেই এই গবেষণা সহজসাধ্য হল। এর আগে ভূপৃষ্ঠের সমস্ত ভাঙ্গাগড়াই আকস্মিক ও দৈব দুর্ঘটনা বলে মনে করা হত। এই বিশ্বাসই পরে ক্যাটা-স্ট্রৌফিজিম্ বলে পরিচিত হয়েছিল। এই মতবাদ চালু থাকা সত্ত্বেও অনেক ভূতত্ত্ববিদ বিশ্বাস করতেন যে, পৃথিবীর অনেক প্রাকৃতিক পরিবর্তনই অকস্মাৎ হয়নি, ধীরে ধীরে তা হয়েছে, যেমন নদীর গতিপথ। বহুদিনের ক্ষয় ক্ষরণের পর এই গতিপথ নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। তারপর এই ক্ষয় ক্ষরণের কাজ সমান গতিতে সম্পন্ন হয়েছে ধরে নিয়ে ভূতত্ত্ববিদগণ হিসাব করেছেন যে, অনেক নদীর গতিপথ সৃষ্টি হতে দশ লক্ষ বৎসর লেগেছে। তাহলে দেখা যায়, যে পাহাড়ের উপর দিয়ে নদী তার পথ করে নিয়েছে তার বয়স দশ লক্ষ বৎসরের কিছু বেশী হবে।

ভূতত্ত্ববিদগণের এ' হিসাব অত্যন্ত অস্পষ্ট। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে বৈজ্ঞানিক জলি অন্যভাবে পৃথিবীর বয়সের পরিমাপ করতে চেষ্টা করেন। তাঁর হিসাব হচ্ছে এই ধরণের, যেমন, নদীর জলে খুব কম পরিমাণ লবণ থাকে। এই লবণ গিয়ে জলের সঙ্গে সমুদ্রে পড়ে। পৃথিবীর প্রধান প্রধান নদীগুলোর হিসেব করে দেখা গেছে যে, ১৫ কোটি ৬০ লক্ষ টন সোডিয়াম বিভিন্ন লবণের আকারে বৎসরে সমুদ্রের জলে মেশে। সুতরাং এই-ভাবে লবণ যদি মিশে থাকে তবে সমুদ্রের জলে

**তেজষ্ক্রিয় ধাতু থেকে অদৃশ্য রশ্মি নির্গত হচ্ছে। পৃথিবীর বয়স নিরূপণে এই রশ্মির দান অনেক।**

যে পরিমাণ লবণ আছে তা হতে ৮ কোটি ১০ লক্ষ বৎসর লেগেছে।

আপাতদৃষ্টিতে এ হিসেব ত্রুটিহীন মনে হতে পারে, কিন্তু আরও হিসেব করে দেখা গেছে যে, এটা নির্ভুল নাও হতে পারে। কারণ, নদী গিয়ে সমুদ্রে পড়ার আগে সমুদ্রের জলে কিছু লবণাক্ত পদার্থ বা লবণ থাকা স্বাভাবিক। এতে লবণের পরিমাণ বেশী হয়ে যাবে। তা ছাড়াও আরেকটা জিনিস আছে। সে হচ্ছে নদীর জলে সব সময় সম-পরিমাণ লবণ থাকতে পারে না। কারণ স্বরূপ দু'টো কথা বলা যেতে পারে। বরফের যুগে নদীর গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বিস্তীর্ণ এলাকা পাথর দিয়ে বেঁধে রাখা হত। সুতরাং সংকীর্ণ পথে যেতে হ'ত বলে লবণও থাকত নদীর জলে কম। তারপর প্রকৃতির বিধানে ভূপৃষ্ঠের অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। সুতরাং আজকে যেখানে বিরাট পর্বতমালা রয়েছে তা হয়ত ছিল অনেক নীচু, সঙ্গে সঙ্গে নদীর বেগও ছিল মন্দ; ফলে জলের সঙ্গে যে লবণ বাহিত হত তার পরিমাণও হত স্বল্প। এতেই ঐ হিসেবের গরমিলের সম্ভাবনা দেখা গেল। তবে হিসেবের সবটার ভিত্তিই ছিল নিছক অনুমান।

ওদিকে পদার্থবিদ্গণও পৃথিবীর বয়স নিরূপণের কাজে লেগে গিয়েছিলেন।

সূর্য থেকে পৃথিবীর জন্ম। সুতরাং সূর্যের অগ্নি-উত্তাপ থেকে বর্তমান ঠান্ডা অবস্থায় আসতে বহু বৎসর লেগেছে নিশ্চয়। এই ঠান্ডা হওয়ার কাজে পৃথিবীর চারধারে কঠিন আবরণ পড়েছে এবং এই আবরণের ভিতর দিয়ে উত্তাপ কি হারে পরিবাহিত হতে পেরেছে তার উপরই পৃথিবীর শীতল হওয়ার হিসেব নির্ভর করছে। লর্ড কেলভিন ভূপৃষ্ঠের কতকগুলি প্রস্তরের বস্তুর তাপ ও বিদ্যুত সঞ্চালন শক্তি' পরীক্ষা করে দেখেন। এই পরীক্ষার ফল কতকগুলি ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন হলেও মোটামুটি দেখা যায় যে, ২॥ কোটি থেকে ৪ কোটি বৎসর লেগেছিল পৃথিবী শীতল হতে।

জলি ও অন্যান্যদের নিরূপিত সময়ের সহিত উপরিউক্ত সময়ের পার্থক্য অনেক বেশী। কিন্তু তাহলেও এই পার্থক্যের উপরই গুরুত্ব আরোপ করা হল। কারণ, জীব বিদ্যা ও ভূতত্ত্বের মতে এই দীর্ঘ সময় লাগবারই কথা। ইতিমধ্যে বিবর্তন মতবাদ পরিমাণাত্মক বিশ্লেষণের রূপ নিয়েছিল। অর্থাৎ খনিবিদগণ বিবর্তনের বিভিন্ন স্তরের সময় নির্ধারণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। লর্ড কেলভিন যে হিসাব বের করেছিলেন এ'দের সঙ্গে তাঁর মিল নেই। এ'দের মতে সময় লেগেছিল আরও বেশী। তারপর খনি-বিদগণকে সমর্থন করেন ভূতত্ত্ববিদগণ। তাঁদেরই সহযোগিতায় জীববিদ্যাবিশারদগণ নিরূপণ করেন বিভিন্ন স্তরের প্রস্তর গঠিত হবার সময়। তাঁরা সময়ের যে হিসেব করেন তাও লর্ড কেলভিনের চেয়ে বেশী। অথচ ওদিকে কেলভিনের হিসেবে খুব সামান্য দু' একটা ত্রুটি ছাড়া কিছু পাওয়া গেল না। ফলে দু'দল বৈজ্ঞানিকের মধ্যে দ্বন্দ্ব বেধে গেল: একদল যাঁরা মনে করেন পৃথিবী বহু

. আরেক দল যাঁরা মনে ভাবেন
অপেক্ষাকৃত নবীন।
ন্দ্বন্দ্বের একটা ব্যাখ্যা পাওয়া গেল শতাব্দীর প্রথম দিকে। বেকেরেল ার করলেন রেডিও অ্যাকটিভিটি অর্থাৎ কোন বস্তুর অস্বচ্ছ পদার্থ ভেদ করে বিকিরণ ক্ষমতা। অন্যদিকে কুরি আবিষ্কার করলেন একটি তেজস্ক্রিয় ও-অ্যাকটিভ) মৌলিক পদার্থ। এই টি অত্যন্ত দুর্লভ—এর নাম হচ্ছে াম। এর ভেতর থেকে অবিরত বৈদ্যুত- ও আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। রেডিয়ামের ের মধ্যে বিপুল তেজ সঞ্চিত রয়েছে ব সময় এর ভিতর চলেছে ভাঙার কাজ। ামের এই বিশ্লিষ্ট হবার সঙ্গে সঙ্গে

য়ার ও মেরী কুরি রেডিয়াম আবিষ্কার করে অমর হয়ে আছেন।

তাপের বিচ্ছুরণ হয়। লর্ড র‍্যালে পের আবিষ্কার করলেন যে, ভূত্বকের ীর্ণ এলাকায় ছড়ান রয়েছে রেডিয়াম এবং ই প্রচুর তাপের সৃষ্টি করছে। তাঁদের ব মতে বর্তমানে ভূপৃষ্ঠ থেকে যে মাণ তাপ বিচ্ছুরিত হচ্ছে ঠিক সম পরিমাণ উৎপন্ন হচ্ছে তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে। রাং বর্তমানে তাপের কোন হ্রাস বৃদ্ধি ় না। তাপ ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে বলে ভিন যা ধরে নিয়েছিলেন তা ঠিক নয়। ণ তিনি ভূপৃষ্ঠ থেকে তাপ বিচ্ছুরণের ই জানতেন তেস্ক্রিয় পদার্থ থেকে যে তাপ ন্ন হচ্ছে তার সংবাদ জানতেন না। তবে উঠতে পারে তাপ বিচ্ছুরণ ও উৎপাদন সমান হারে চলে তবে পৃথিবী ঠাণ্ডা কি করে? এর জবাব হচ্ছে অতীতে ত্বকের তুলনায় অনেক বেশী তাপ-বিচ্ছুরিত ভূপৃষ্ঠ থেকে অথচ অন্য দিকে তেজস্ক্রিয় ার্থ থেকে যে তাপ উৎপন্ন হত তা থিবীর শীতল হওয়ার পক্ষে প্রতিবন্ধক ছিল না। কিন্তু তবু এটা ঠিক যে, পৃথিবী শীতল হতে যতটা সময় লেগেছিল বলে লর্ড কেলভিন ধরে নিয়েছিলেন, তার চেয়ে অনেক বেশী সময় লেগেছিল। সূর্যের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত হবার সময় পৃথিবীর ভাণ্ডারে যে তাপ মজুত ছিল তা নানা কারণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

পৃথিবীর বয়স অপেক্ষাকৃত কম বলে কেলভিন যে যুক্তি দেখালেন তাতে পৃথিবীর বয়স নিরূপণের আরও একটি পদ্ধতি আবিষ্কৃত হল। সে হচ্ছে রেডিয়ামের নূতন রূপ। দেখা গেল রেডিয়াম হচ্ছে কতকগুলি রাসায়নিক মৌলিক পদার্থের একটা দীর্ঘ সূত্রের একাংশ মাত্র—ঐ পদার্থগুলি হচ্ছে সবই তেজস্ক্রিয় পদার্থ। অর্থাৎ এগুলোর মধ্যে সর্বদাই চলছে ভাঙাগড়ার কাজ। রেডিয়াম কার্যত ইউরেনিয়াম থেকে তৈরী—যদিও এ দুয়ের মাঝখানে উপরি উক্ত সূত্রের আরও কয়েকটি মৌলিক পদার্থ রয়ে গেছে। একটি ভেঙ্গে আরেকটি পদার্থের সৃষ্টি হচ্ছে। এভাবে প্রত্যেকটি পদার্থই ভাঙছে এবং পরবর্তী পদার্থের সৃষ্টি হচ্ছে। ভাঙার সময় এদের পরমাণু থেকে প্রচণ্ড বেগে বেরিয়ে আসছে 'আলফা' ও 'বিটা' কণিকা। ঐ দৃঢ়-গ্রথিত সূত্রের শেষ পদার্থ হচ্ছে সীসে—এটা তেজস্ক্রিয় নয় অর্থাৎ এর আর ভাঙাগড়া নেই।

ঐ ভাঙাগড়ার আসল ফলটি হচ্ছে যে, একটি ইউরেনিয়াম পরমাণুর ভাঙার ফলে একটি সীসার পরমাণু ও হীলিয়মের আটটি পরমাণু সৃষ্টি হয়। (তা ছাড়া কিছু তাপ বিচ্ছুরণও যে হয় তা আমরা দেখেছি)। সুতরাং আমরা যদি হিসেব করে বের করতে পারি যে কতটা রেডিয়াম ভাঙতে কি সময় লাগে এবং কতটা ইউরেনিয়াম থেকে কতটা হীলিয়াম বা সীসের সৃষ্টি হয় তাহলে আমরা সেই মৃত্তিকা মিশ্রিত ধাতুর এবং সেই স্থানের পাথরের বয়স নির্ণয় করতে পারি। বর্তমানে ল্যাবোরেটরীতে কি হারে ইউরেনিয়াম বিশ্লিষ্ট হয় তা নির্ধারণ করা সম্ভব। তেজস্ক্রিয় পদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে এইভাবে নির্ভুল হিসাব করা সম্ভবপর হয়েছে।

এর আরও একটা সুবিধা রয়েছে এবং তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রেডিও অ্যাকটিভিটি থিয়োরী অনুসারে এটা পরিষ্কার যে, পৃথিবী সৃষ্টির আদিম কাল থেকে আজ অবধি ইউরেনিয়াম ভাঙার কাজ ঠিক সমান হারে চলেছে এর কোন পরিবর্তন হয়নি। দুটো বিভিন্ন ধারার পরীক্ষার ফলে এটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভূপৃষ্ঠে যে ধরণের চাপ, তাপ ও আবহাওয়া থাকার কথা ল্যাবোরেটরীতে ইউরেনিয়াম ভাঙার সময় ঠিক তেমনি অবস্থার সৃষ্টি করে দেখা গেছে যে, ইউরেনিয়ম-বিশ্লিষ্টতার হারের কোন পরিবর্তন হয়নি। দ্বিতীয়তঃ আমরা জানি ইউরেনিয়ম ভাঙা হলে হীলিয়ম কণিকা (আলফা কণিকা) সেখান থেকে বেরিয়ে কিছুটা দূরে পর্যন্ত যেতে পারে। কতটা দূরত্ব পর্যন্ত যেতে পারে তা ভাঙার বেগের উপর নির্ভর করে। কোন কোন খনিজ পদার্থ (যেমন অভ্র) এদের চারধারে সুন্দর গোলাকার আভা দেখা যায়। এর কেন্দ্রে থাকে একটুকরো ইউরেনিয়ম কণিকা। ইউরেনিয়ম ভাঙার ফলে যে আলফা কণিকা ছুটে দূরে গিয়ে থেমে যায় তা থেকেই সৃষ্টি হয় ঐ মণ্ডলীর। যতদিন যায় ততই ঐ মণ্ডলী কালো হতে থাকে। এইভাবে সৃষ্ট মণ্ডলীর দূরত্ব, নূতন ও পুরাতন, কোন ক্ষেত্রেই কমবেশী হয়নি। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, আলফা কণিকার দূরত্ব ও ইউরেনিয়ম ভাঙার হার

দিনে ও রাত্রে পিচিরেণ্ডের ছবি। এই থেকেই পাওয়া যায় ইউরেনিয়াম ও রেডিয়াম।

পৃথিবীর সৃষ্টি কাল থেকে একই রয়ে গেছে। বস্তুতঃ বিশ্লিষ্ট হবার ফলে যে আলফা কণিকা ছুটে বের হয় তা একটা বিশেষ দূরত্বে গিয়ে মণ্ডলী সৃষ্টি করে। ঐ সব মণ্ডলীর সমবায়ে সৃষ্টি হয় উজ্জ্বল মণ্ডলীর।

আমরা জানি হীলিয়ম হচ্ছে এক ধরণের বায়বীয় পদার্থ। ভূত্বকের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ে সঞ্চিত অনেক হীলিয়ম গ্যাস নষ্ট হয়ে গেছে। এখন যেটুকু হীলিয়ম পাওয়া যাচ্ছে তা খুব আধুনিককালে জমেছে। অর্থাৎ এর উপর নির্ভর করে পৃথিবীর বয়স নির্ণয় করতে চেষ্টা করা উচিত নয়। তবে প্রস্তরের শ্রেণী বিভাগ ও তার বয়স নির্ণয়ে ওর সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। এর মূল্যও ভূতত্ত্ববিদগণের নিকট কম নয়। তা ছাড়া, বিভিন্ন পাহাড় পর্বতে যে সব জীবাশ্ম বা ফসিল পাওয়া যাচ্ছে তাদের বয়ঃকাল নির্ণয় করাও হীলিয়মের সাহায্যে সম্ভবপর। ফলে বিবর্তনের একটা সময় নির্দেশও হয়ে যাচ্ছে। এই হিসেব মতে ১৮৫ কোটি বৎসর আগে

প্রস্তর গঠিত হয়েছিল বলে একটা হিসেব পাওয়া যায়।

সীসাকে ভিত্তি করে যে হিসাব কষা হয়েছে তা অনেকটা হীলিয়ামের হিসাবেরই মত। তবে এতে কিছুটা জটিল ব্যাপার রয়েছে। প্রত্যেক প্রস্তরেই সামান্য হলেও কিছুটা করে সীসা রয়েছে। এটা কেবলমাত্র ইউরেনিয়াম বিশিলষ্ট হবার ফলে উৎপন্ন হয়নি। সীসা উৎপন্ন হবার অন্য কারণও রয়েছে। তবে কতটা ইউরেনিয়াম বিশিলষ্ট হবার ফলে এবং কতটা অমনি সীসা উৎপন্ন হয়েছে তা বলা শক্ত। বৈজ্ঞানিক অ্যাসটন এ নিয়ে বিলাতে এবং মিঃ নিয়ার আমেরিকায় গভীরভাবে গবেষণা করেন। তাঁরা দেখতে পান যে, ইউরেনিয়াম এবং আরও অনেক মৌলিক ধাতুর মত সীসারও একাধিক 'ইসোটোপ' (isotope) রয়েছে।

শুধু হীলিয়ম ও সীসা থেকে প্রস্তরের বয়স নির্ণয় করা দুরূহ ব্যাপার। অতীতে এ নিয়ে পরীক্ষা করা হত তাতে ভুল ত্রুটি থেকে যেত। কিন্তু বর্তমানে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করার ফলে ভুলত্রুটি কম হয় বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই হিসাব প্রস্তরের বয়সের হিসাব, পৃথিবীর নয়। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে যে কোন প্রস্তরের যে বয়স নিরূপিত হয়েছে তা হচ্ছে ১৮৫ কোটি বছর। তবে ১৮৫ কোটি বছর আগেও যে প্রস্তর গঠিত হয়েছিল তারও প্রমাণ পাওয়া গেছে। সুতরাং আমরা স্বচ্ছন্দে বলতে পারি যে, পৃথিবীর বয়স হবে কম পক্ষে ২ শত কোটি বছর।

১৯৪৬ সালে রেডিও অ্যাকটিভ পদ্ধতির আরও উন্নতি হল। অধ্যাপক নিয়ার এই সময় সাধারণ সীসার কতকগুলি নমুনা নিয়ে পরীক্ষা করেন এবং ওর ইসোটোপের মিশ্রণে বিশেষ পার্থক্য দেখতে পান। তবে তাতে প্রস্তরের বয়স নির্ধারণে খুব বেশকম বিশেষ কিছু হত না। নিয়ার সিদ্ধান্ত করলেন যে, পৃথিবীর সৃষ্টিকালে প্রস্তর গর্ভে যে সব সীসা ছিল তা সাধারণ সীসা হয়ে ওঠার আগে রেডিও অ্যাকটিভ সীসার সংস্পর্শে আসত।

সাধারণ সীসার ইসোটোপের আনুপাতিক হার খুবই সুসমঞ্জস এবং যে যুগে সে সীসা উৎপন্ন হয়েছে সে যুগের প্রস্তরের সঙ্গে তার একটা সুস্পষ্ট যোগাযোগ রয়েছে। এডিনবার্গের অধ্যাপক হোমস ঐ হারের ক্রমকে পৃথিবীর বয়স নিরূপণের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তিনি নানাভাবে পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, পৃথিবীর বয়স হচ্ছে প্রায় ৩৩৫ কোটি বছর। ওঁর এই হিসেবকে আমরা গ্রহণ করতে পারি, কেননা যে সব উপপাদ্যের উপর নির্ভর করে তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন তা খাঁটি এবং বিশ্বাসযোগ্য। অবশ্য ভবিষ্যতে বৈজ্ঞানিকরা এ নিয়ে আরও গবেষণা করবেন এবং হয়ত এই হিসাবের সংশোধনও করবেন।

মিঃ সি রবার্টসন, কলিকাতা, বলেন,—"আমি কুকেশ ব্যবহারে অত্যন্ত ভালো ফল পেয়েছি।"
কুকেশঃ স্নানের আগে ব্যবহারেও পাকা চুল কালো চিরস্থায়ী হয়। ৩৷৷০ ষ্টাং : ৫৲।
হার্বাল প্রোডাক্টস্ : কালনা পশ্চিমবঙ্গ (এম)
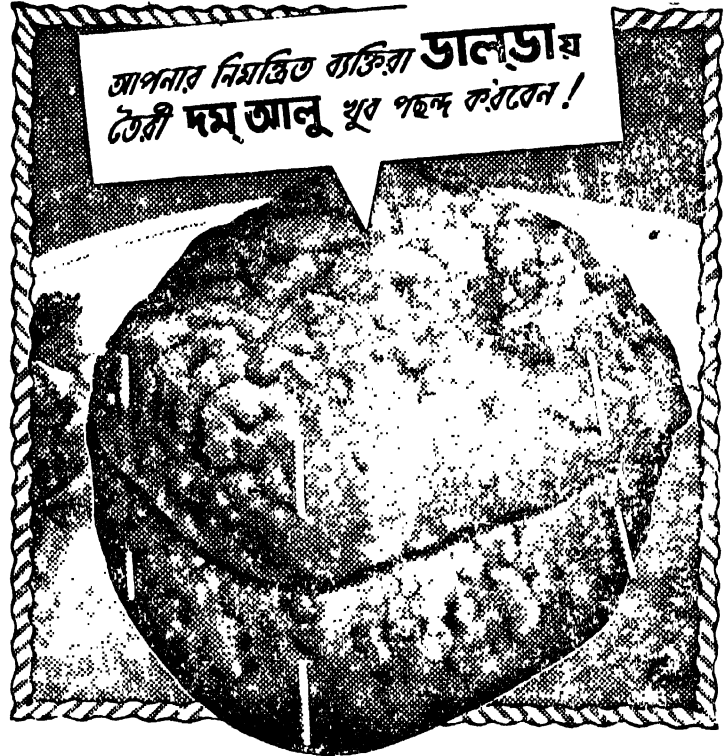
আলু ছাড়িয়ে, আধাআধি কেটে নিন্, ও তার ভিতরটা কুরে ফেলুন। থেঁতো করা কড়াইশুঁটির সঙ্গে পিঁয়াজ কাটা, লঙ্কা, নেবুর রস ও ইচ্ছামত নুন মিশিয়ে নিন্। কোরা আলুর মধ্যে এই পুর দিন ও আধাআধি কাটা আলু মুখোমুখি রেখে সরু কাটি বিঁধে জুড়ে দিন। গরম ডালডায় আলু ভেজে নিয়ে আলাদা রাখুন পরে, ডেগ্‌চিতে পিঁয়াজ, টোমাটো ও মশলা ভেজে নিন্। ইহাতে ভাজা আলুগুলি ঢেলে দিন। মাখা আটা দিয়ে ডেগ্‌চির ঢাকনা জুড়ে বন্ধ ক'রে দিন, আধঘণ্টা জোর আঁচে রাঁধুন, তারপর আর আধঘণ্টা নরম আঁচে দমে রাখুন। গরম গরম খেতে দিন।

ডালডা কি ভাবে আপনার দৈনিক খাদ্যের পুষ্টি বাড়াতে পারে?
বিনামূল্যে উপদেশের জন্য আজই লিখুন — অথবা যে কোনও দিন!
দি ডালডা এ্যাডভিসারি সারভিস্
পোঃ আঃ বক্স নং ৩৫৩, বোম্বাই ১
HVM. 97-172 BG

শিচমবঙ্গে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির শতাধিক সদস্য নূতন নির্বাচন চাহিয়া- নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির আসন্ন বশনের পরেই সে বিষয় বিবেচিত হইবে। র পূর্বেই মানভূমের যে সত্যাগ্রহ কংগ্রেসের াতির নির্দেশে স্থগিত রাখা হইয়াছে, াতি সে বিষয়ের আলোচনা করিবেন। আলোচনার জন্য মানভূম সত্যাগ্রহের অতুলবাবুকে আহবান করায় অতুলবাবু ন প্রতিনিধিকে সেই কার্যের জন্য ইয়াছেন। স্বয়ং আলোচনার জন্য গমন না া প্রতিনিধি প্রেরণে ইংরেজ সরকারের ত আয়ার্লণ্ডের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধ কিরূপ র, তাহার আলোচনার জন্য প্রধান মন্ত্রী ড জর্জ কর্তৃক আহূত হইলে আইরিশ । ডি' ভ্যালেরার স্বয়ং সেই আমন্ত্রণ রক্ষা তে না যাইয়া কয়জন প্রতিনিধি প্রেরণের স্বতঃই মনে পড়ে। আমাদিগের মনে হয়, গ্রসের সভাপতি ডক্টর পট্টভি সীতারামিয়া ার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন নীতি সম্বন্ধে ূপে দৌর্বল্যের পরিচয় দিয়াছেন, এ য়েও তেমনই করিয়াছেন। হয়ত সেই জন্যই গ্রসকর্মী অতুলবাবু এইভাবে কাজ করিয়া- । তিনি সত্যাগ্রহ স্থগিত রাখিবার জন্য পত্রে নির্দেশ দিয়াছিলেন. তাহা যে মান- ার যে সত্যাগ্রহী নেতার কার্য সমগ্র দেশের ্য হইয়াছে, তাঁহার নিকট প্রেরিত না হইয়া চমবঙ্গের অতুল্য ঘোষের নিকট প্রেরিত য়াছিল, তাহাতেই কংগ্রেস-দপ্তরের ত্রুটি কাশ। প্রায় এক বৎসর বিহার সরকারের াচার ও অত্যাচারের বিষয় কংগ্রেসকে নাইয়া—কোনরূপ প্রতিকার না হওয়ায়— তুলবাবু ও তাঁহার সহকর্মী লোকসেবকগণ ্যাগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কংগ্রেসের তর হইতে কি তাঁহাদিগের লিখিত পত্র- লিও কোনরূপে অদৃশ্য হইয়াছে যে, ডক্টর িতারামিয়া অতুলবাবুকে লিখিয়াছিলেন— নি ও তাঁহার সহকর্মীরা বিশৃঙ্খলভাবে ত্যাগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? তাঁহার সেই উক্তি অত্যন্ত আপত্তিজনক, তাহাতে সন্দেহ নাই। র্তমান ক্ষেত্রে ডক্টর সীতারামিয়া স্বয়ং মান- মে আসিয়া আলোচনা করিলেন না। বহুদিন ূর্বে একবার বাঙলায় কংগ্রেসী কলহ সম্বন্ধে নুসন্ধান করিতে প্রেরিত হইয়া তিনি করণশঙ্কর রায়ের নিকট যে অভিজ্ঞতা লাভ রিয়াছিলেন, তাহার স্মৃতিই তাঁহাকে ানভূমে আগমনে বিরত করিয়াছে কি না, লিতে পারি না।

প্রস্তাবিত বিজ্ঞান কলেজের ভিত্তি স্থাপন ন্য পশ্চিমবঙ্গের প্রধান সচিব জলপাইগুড়িতে মন করিলে কতিপয় বালক তাঁহার প্রতি অশিষ্ট ব্যবহার করিয়াছিল এবং তিনি যেমন বলিয়া আসিয়াছিলেন, কলেজ বন্ধ করিয়া দেওয়াই ভাল—কলেজের পরিচালকগণ তেমনই কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। বালকদিগের এই ব্যবহারে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল। গত ৮ই মে বৃটেনের প্রধান মন্ত্রী মিস্টার এটলী অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়াছিলেন। তিনি সেই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম-এ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। সেদিন তিনি যখন ভোজের পরে পরিদর্শনে ব্যস্ত ছিলেন, সেই সময় কতকগুলি ছাত্র আসিয়া তাঁহার মোটর গাড়ির চাকার বাতাস বাহির করিয়া দিয়াছিল—তাঁহার গাড়ির একটি জানালা দিয়া তাঁহার টুপী বাহির করিয়া লইয়া তাহার মধ্যে কাগজে লিখিয়া দিয়াছিল—"আগামী নির্বাচনে রক্ষণ-শীল দলের জন্য ভোট দিবেন।" তাঁহার যান-চালক আসিলে যখন ঐ দুখানি চাকায় 'হাওয়া দিবার' চেষ্টা হয়, তখন যুবকগণ অবশিষ্ট চাকা দুখানির হাওয়া বাহির করিয়া দেয়। শেষে গাড়িখানি একটি কারখানায় লইয়া যাওয়া হয়। তিনি যখন স্থান ত্যাগ করেন, তখন দ্বিতলের বাতায়ন হইতে তাঁহার উপর একপাত্র জল ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছিল। দেখা যাইতেছে, আমাদিগের নেতা বলিয়া পরিচিত ব্যক্তিরা যে দেশের অনুকরণপটু, সে দেশে ছাত্রগণ দেশের প্রধান মন্ত্রীকে লাঞ্ছিত করিতে সংকোচ বোধ করে না।

লোকে খাদ্যের দুষ্প্রাপ্যতা, পরিধেয়ের দুর্মূল্যতায়—নানা কারণে অধীর হইয়া উঠিয়াছে, তাহার মূল কারণ দূর করিতে না পারিলে কখনই ঈপ্সিত ফললাভ হইবে না। পূর্ববঙ্গ হইতে আগত নরনারীর আশ্রয়-সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের কোন সম্ভাবনাই দেখা যাইতেছে না। এই সকল কারণেই লোকের অসন্তোষ নানা স্থানে সচিবদিগের প্রতি অশিষ্ট ব্যবহারে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। মার্কাস ডরম্যান ফ্রান্সে অনুরূপ অবস্থা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:—

"As is usual in France when national affairs are unsuccessful, a great outcry arose, not only against the men who had jobbed and blundered, but against the system under which they worked."

ফরাসীরা বাঙালীদিগেরই মত ভাবপ্রবণ এবং সেই জন্য সহজে উত্তেজিত হয়।

অল্পদিন পূর্বে পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যোপকরণ বৃদ্ধির এক পরিকল্পনা প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে, ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ খাদ্য বিষয়ে স্বাবলম্বী হইবে। অর্থাৎ ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গে উৎপন্ন খাদ্যোপকরণের পরিমাণ ২ লক্ষ ২০ হাজার টন বর্ধিত হইবে। আগামী বৎসরেই অতিরিক্ত উৎপাদনের পরিমাণ ১ লক্ষ ৩৩ হাজার টন করা হইবে। যদি এক বৎসরে ৮ হাজার টন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়, তবে গত কুড়ি মাসে কিছুই করা সম্ভব হয় নাই কেন? সরকার যে কয়টি পাম্প ক্রয়ের কথাও ঘোষণা করিয়া-ছেন, তাহা কি হাস্যোদ্দীপনই করিবে না? আজও সরকার পশ্চিমবঙ্গে চাষের জমি ও বাসের জমি পরিমাপ করাইয়া চাষের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি ও চাষের জমিতে বাসের চেষ্টা বন্ধ করিবার কোন আয়োজন করেন নাই।

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন, ঝাড়গ্রামের রাজার বদান্যতায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তথায় কৃষি কলেজ স্থাপিত করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। শুনিয়াছি, হরিণঘাটায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কিছু জমি পাইবেন বলা হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কি এই উভয় স্থানে কৃষি বিষয়ে পরীক্ষার ও গবেষণার এবং ছাত্র-দিগকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে অগ্রসর হইবেন? ইহার প্রয়োজন সম্বন্ধে অধিক কিছু বলা বাহুল্য। অন্য প্রদেশ হইতে পশ্চিমবঙ্গের জল-বায়ু-সহনে অক্ষম গরু আনিয়া হরিণ-ঘাটায় দুগ্ধের ব্যবসা করিলে সরকার যে ভুল করিবেন, তাহা আমরা পূর্বে বলিয়াছি।

মৎস্য বিভাগ ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় প্রধান সচিব হইয়া স্বতন্ত্র বিভাগে পরিণত করিয়া-ছিলেন—তাহাতে সচিবের অধিক মনোযোগদান সম্ভব হইবে। কিন্তু এ পর্যন্ত সেই ব্যয় বৃদ্ধির কি ফল পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীরা পাইয়াছেন? রসায়নবিদ্ সাহা যে পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন, তাহা এত ত্রুটিপূর্ণ যে, তাঁহাকে সেরূপ কার্যের ভার প্রদান করা সংগত কিনা, তাহা বিবেচনা করা প্রয়োজন। মেদিনীপুর জিলায় কাঁথীতে সমুদ্রকূলে মাছ ধরার চেষ্টায় কত লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে এবং কত মণ মাছ কলিকাতায় আনিয়া কত টাকায় বিক্রীত হইয়াছে, তাহার হিসাব পাওয়া যাইতে পারে কি? উড়িষ্যা হইতে ধীবর (নুলিয়া) লইয়া যাইয়া—তাহাদিগকে উপযুক্ত নৌকা সরবরাহ না করায় কত টাকার অপব্যয় হইয়াছে? কেবল কলিকাতার কথা চিন্তা না করিয়া সমগ্র পশ্চিম-বঙ্গের বিষয় বিবেচনা করিয়া পরিকল্পনা প্রস্তুত ও কাজ আরম্ভ করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে

পল্লীগ্রাম যে অবজ্ঞাত হইতেছে, তাহা আমরা অবশ্যই বলিব।

আর এক বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের পল্লীগ্রামের দাবী উপেক্ষিত ও প্রয়োজন অবজ্ঞাত হইতেছে। ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় পশ্চিমবঙ্গের প্রধান সচিব হইলে অনেকেই আশা করিয়াছিলেন, পল্লী-গ্রামের লোকের স্বাস্থ্যোন্নতিকর ব্যবস্থা হইবে। অবশ্য লোক যদি খাইতে না পায়, তবে তাহাকে ঔষধ দেওয়া বৃথা। কিন্তু চিকিৎসার ব্যবস্থা কিছু হইতেছে কি?

এবার হাওড়া জিলার আমতা অঞ্চলে যে ম্যালেরিয়া বা অন্য কোন জ্বর দেখা দিয়াছে, তাহাতে ২৪ হইতে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে লোকের মৃত্যু হইতেছে। আমতা কলিকাতা হইতে অধিক দূর নহে। স্বাস্থ্যবিভাগের ডিরেক্টর-জেনারেল অবশ্যই যাইয়া অবস্থা দেখিয়া আসিয়া আবশ্যক ব্যবস্থা করিতে পারেন। গত বৎসরে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে কয়টি নূতন চিকিৎসালয় হইতে লোককে বিনামূল্যে ঔষধ-দানের ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইয়াছে?

আমরা জানিয়া আতঙ্কিত হইলাম, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের শিবপুর (হাওড়া) গুদামে—গত পক্ষকালের বর্ষণে জল প্রবেশ করায় রক্ষিত বহু বস্তা ধান্য বা চাউল নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বাঙলায় দুর্ভিক্ষের সময় সরকার শিবপুরে বোটানিক্যাল বাগানে যেভাবে ধান্য ও চাউল রাখিয়াছিলেন, তাহাতে বহু টাকার মাল নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। দুর্ভিক্ষ কমিশনের রিপোর্টে (৬১ পৃষ্ঠা ও ১০০ পৃষ্ঠায়) তাহার উল্লেখ আছে। সে সময় হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির বর্তমান চেয়ারম্যান শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় সর্বাগ্রে সে সংবাদ দিয়াছিলেন। সেই বিকৃত ধান্য ও চাউল শেষে জলায় ছড়াইয়া দেওয়া হয়—দুর্ভিক্ষ কমিশনের সদস্যদিগকে মুখোস পরিয়া তাহা পরিদর্শনে যাইতে হইয়াছিল। শিবপুরের গুদামে জল প্রবেশ করায় কত বস্তা—কত টাকার ধান্য ও চাউল নষ্ট হইয়াছে, তাহার সন্ধান কি শৈলবাবু করিবেন। আমরা বিভাগীয় সচিবকে ও মিস্টার বসাককে এ বিষয়ে সংবাদ প্রকাশ করিতে ও যাহার বা যাহাদিগের দোষে এই ব্যাপার সম্ভব হইয়াছে, তাহাকে বা তাহাদিগকে সমুচিত দণ্ড দিতে বলিতেছি।

দীর্ঘ ৭২ বৎসর পূর্বে ডক্টর মহেন্দ্রলাল সরকার কলিকাতায় বিজ্ঞান-সভা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সমগ্র ভারতবর্ষে তাহাই প্রথম বিজ্ঞান-সভা। ক্রমে তাহার চেষ্টায় বৌবাজার স্ট্রীটে ক্রীত ভূমিখণ্ডের উপর সভার গৃহ নির্মিত হয়। এই গৃহে নানা বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা নব নব আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। বাঙলা কখনও প্রাদেশিকতার সংকীর্ণতা চাহে নাই। সেইজন্য স্যার চন্দ্রশেখর রমণ ও ডক্টর কৃষ্ণন এই সভায় গবেষণার সম্পূর্ণ সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। যাদবপুরে—ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ও কাজ সম্বন্ধীয় গবেষণাগারের সান্নিধ্যে বিজ্ঞান-সভার জন্য গৃহ নির্মিত হইতেছে। বোধ হয়, ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে সভা সেই গৃহে স্থানান্তরিত হইবে। তখন পুরাতন গৃহের কি হইবে? নূতন গৃহের জন্য ৩০ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা প্রয়োজন হইবে। ভারত সরকার বিনাসুদে পাঁচ লক্ষ টাকা ঋণ ও এককালীন দান হিসাবে দুই বৎসরে যথাক্রমে ৩ লক্ষ ১০ হাজার টাকা ও ১ লক্ষ ২২ হাজার—মোট ৪ লক্ষ ৩২ হাজার

মঞ্জুর করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ন বৎসরে ৭ লক্ষ টাকা দিবেন। বর্তমান বিক্রয় করিলে ৭ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা যাইবে। অবশিষ্ট ১৪ লক্ষ টাকার জন্য ও ব্যবসায়ীদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা হইয়াছে।

যনি সর্বপ্রথম এদেশে বিজ্ঞান-সভার ঠা করেন, তাঁহার স্মৃতিবিজড়িত— তার কেন্দ্রস্থলে প্রতিষ্ঠিত পুরাতন ট যদি অন্য কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়, তাহা দুঃখের বিষয় হইবে। সেইজন্য য় বিজ্ঞান পরিষদ প্রস্তাব করিয়াছেন, টতে পরিষদের ও অন্যান্য বিজ্ঞান ষ্ঠানের কার্যালয় করিবার ও বিজ্ঞান নী প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গ সরকার । পশ্চিমবঙ্গ সরকার সে প্রস্তাবে কোন এখনও প্রদান করেন নাই। যদি তাঁহারা প্রস্তাবে সম্মত হইতে না পারেন—তবে রা প্রস্তাব করিব—বিজ্ঞান পরিষদ বেঞ্চার" করিয়া সাত লক্ষ পঁচিশ হাজার য় ঐ গৃহ ক্রয় করুন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ডিবেঞ্চারের সুদ যথানিয়মে প্রদানের দায়িত্ব করুন। তাহাতে সরকারকে বার্ষিক প্রায় হাজার টাকা দিতে হইবে। এদিকে পরিষদ যোর জন্য আবেদন প্রচার করিলে— চমবঙ্গ সরকারও কিছু দিবেন এবং জন- রণের ও শিল্পপতি প্রভৃতির নিকট হইতে পাওয়া যাইবে। সেই সকল দান হইতে বেঞ্চারের" টাকা শোধ করা যাইবে।

পরিষদ যদি গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত করিয়া তে বৃটেনের ইম্পিরিয়াল ইনস্টিটিউট প কাজ করেন, সেইরূপ কাজ করেন, হইলে সভার সভাগৃহ ভাড়ায় তেমনই য়র ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। বেঙ্গল ডক্যাল ওয়ার্কস, ক্যালকাটা মেডিক্যাল ার্কস, সালিমার পেণ্ট এণ্ড ভার্নিশ ার্কস, মুরারকা পেণ্ট ওয়ার্কস, নেপিয়ার ণ্ট ওয়ার্কস প্রভৃতির নিকট হইতে উল্লেখ- গ্য সাহায্য প্রাপ্তির আশা অবশ্যই করিতে রা যায়। বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠাতারা শে বিজ্ঞানচর্চার প্রসার বৃদ্ধির জন্য যে টা করিতেছেন, তাহা প্রশংসনীয় এবং সেই াই পশ্চিমবঙ্গের প্রধান সচিব উহাকে অর্থ- হায্য করিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। আমরা বশ্যই আশা করিতে পারি, বঙ্গীয় বিজ্ঞান রিষদ এইরূপ কোন প্রস্তাব করিলে পশ্চিম- গ সরকারের সহানুভূতিতে বঞ্চিত হইবে না। ক্টর মহেন্দ্রলাল সরকারের পরিকল্পনা যেস্থানে র্তি গ্রহণ করিয়াছিল, সেস্থান রক্ষায় সাহায্য রা জাতীয় সরকারের ও জনসাধারণের— শেষ ধনীদিগের কর্তব্য। আমরা আশা করি, গীয় বিজ্ঞান পরিষদ এই বিষয়ে সচেট ইয়া অবিলম্বে কার্যে প্রবৃত্ত হইবেন। চেষ্টার ফল্য হইবে।

পুরুলিয়া হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, যদিও কংগ্রেসের সভাপতির নির্দেশে মানভূম সত্যাগ্রহীরা সত্যাগ্রহ স্থগিত রাখিয়াছেন, তথাপি বিহার সরকারের কর্মচারীদিগের ও তাহাদিগের সমর্থন জন্য সংগৃহীত লোক- দিগের অনাচার কেবল সমভাবেই চলিতেছে না, পরন্তু বির্বর্ধিত হইতেছে। ইহা যে কংগ্রেসের পরিচালকদিগের ইঙ্গিতে বা বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদকে তুষ্ট করিবার জন্য হইতেছে, এমন বলা সঙ্গত নহে। সত্যাগ্রহ স্থগিত হওয়ায় অনাচারীরা মনে করিতেছে, তাহাদিগের জয় নিশ্চিত। সত্যাগ্রহের বিরোধিতায় তাহা- দিগকে প্ররোচিত করিবার জন্য আদিবাসীদিগের বিরুদ্ধে ক্রিমিন্যাল ট্রাইবস আইনের বিধান প্রযুক্ত হইতেছে। লোক-গণনার জন্য যে সকল বাড়িতে বাঙলায় সংখ্যা লিখিত হইয়াছিল, নানাস্থানে সে সকল গৃহের সংখ্যা চাঁচিয়া দিয়া হিন্দীতে সংখ্যা লিখা হইতেছে! কাজেই অবস্থা কিরূপ, তাহা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হইবে না

আমরা জানিয়া দুঃখিত ও লজ্জিত হইলাম, কলিকাতায় বাঙালী-অ-বাঙালীতে স্থানে স্থানে সংঘর্ষ হইতেছে। কয়দিন মাত্র পূর্বে রাস্তার কলে জল লওয়া লইয়া নীলমণি মিত্র স্ট্রীট ও চিত্তরঞ্জন এভিনিউয়ের সংযোগ- স্থলে এইরূপ একটি ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। তাহাতে কেমতা বিল্ডিংস হইতে দ্বারবানরা গুলী চালাইয়াছিল, এইরূপ অভিযোগ পুলিশে করা হইয়াছে। আমরা এ সম্বন্ধে পল্লীর বহু লোকের স্বাক্ষরসম্বলিত এক পত্র পাইয়াছি। ব্যাপারটি পুলিশের অনুসন্ধানাধীন বলিয়া সে সম্বন্ধে আজ কিছু বলা আমরা অসঙ্গত মনে করি। প্রয়োজন হইলে পত্রে লিখিত বিষয়ের আলোচনা করিব।


## ধবল বা শ্বেতকুষ্ঠ

যাঁহাদের বিশ্বাস এ রোগ আরোগ্য হয় না, তাঁহারা আমার নিকট আসিলে ১টি ছোট দাগ আরোগ্য করিয়া দিব, এজন্য কোন মূল্য দিতে হয় না।

বাতরক্ত অসাড়তা, একজিমা, শ্বেতকুষ্ঠ, বিবিধ চর্মরোগ, ছুলি, মেচেতা, ব্রণাদির কুৎসিত দাগ প্রভৃতি নিরাময়ের জন্য ২০ বৎসরের অভিজ্ঞ চর্মরোগ চিকিৎসক পণ্ডিত এস, শর্মার ব্যবস্থা ও ঔষধ গ্রহণ করুন। একজিমা বা কাউরের অত্যাশ্চর্য মহৌষধ "বিচার্চিকারিলেপ"। মূল্য ১,। পণ্ডিত এস শর্মা; (সময় ৩—৮)। ২৬।৮, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

## ভট্টপল্লীর পুরশ্চরণসিদ্ধ কবচই অব্যর্থ

দুরারোগ্য ব্যাধি, দারিদ্র্য, অর্থাভাব, মোকদ্দমা অকালমৃত্যু, বংশনাশ প্রভৃতি দূর করিতে দৈবশক্তিই একমাত্র উপায়। ১। নবগ্রহ কবচ, দক্ষিণা ৫,, ২। শনি ৩,, ৩। ধনদা ৭,, ৪। বগলামুখী ১৩,, ৫। মহামৃত্যুঞ্জয় ১৩,, ৬। নৃসিংহ ১১,, ৭। রাহু ৫,, ৮। বশীকরণ ৭,, ৯। সূর্য ৫,। অর্ডারের সংগে নাম, গোত্র, সম্ভব হইলে জন্মসময় বা রাশিচক্র পাঠাইবেন। ইহা ভিন্ন অভ্রান্ত ঠিকুজী, কোষ্ঠী গণনা ও প্রস্তুত হয়, যোটক বিচার, গ্রহ-শান্তি, স্বস্ত্যয়ন প্রভৃতি করা হয়। ঠিকানা—অধ্যক্ষ, ভট্টপল্লী জ্যোতিঃসংঘ; পোঃ ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা।

**একটি গ্রাম্য প্রেমের কাহিনী**—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। দিগন্ত পাবলিশার্স, ২০২, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা—২৯। মূল্য তিন টাকা।

শ্রীযুত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বর্তমান যুগের একজন শক্তিমান কথা সাহিত্যিক। তাঁহার লেখনী অক্লান্ত। তাঁহার সৃষ্ট নরনারীরা বহু বিচিত্ররূপে, বৈশিষ্ট্যে ও অভিব্যক্তিতে দেখা দেয়। এ জন্য তাঁহার নূতন কোন বই হাতে পাইলে খুশি হই ; এবারও তার মধ্যে নূতন মানুষের সন্ধান পাইব। অধুনা তাঁহার "একটি গ্রাম্য প্রেমের কাহিনী"তে এমন কয়েকটি নরনারীর সন্ধান পাইয়াছি যাহারা বুকজোড়া প্রেম, মমতা, দুঃখ দৈন্য আর প্রীতি প্রণয় লইয়াও সাহিত্যে এতদিন অজ্ঞাত ছিল। বীরভূম জেলার চাষী এরা। সেখানে তথাকথিত বড় লোকদের শোষণের নাগপাশে জড়িত হইয়া চাষাভূষাদের দুঃখদৈন্য কত চরমে পৌঁছিয়াছে, তাহাদের প্রাত্যহিক জীবন কত নীচু স্তরে গিয়া ঠেকিয়াছে তাহা অনেকেই জানেন। সেই ভূমিহীন চাষা পরিবারের হোরাং এই উপন্যাসের 'নায়ক'। নায়ক সে নামে মাত্র। বইটিকে 'থেকারে'র অনুকরণে Novel without a hero বলা যাইতে পারে। নানা রোগে ভুগিয়া হোরাং অস্থিচর্মসার। নিজের জমি নাই। পরের জমিতে জন খাটিয়া নিজের ও পরিবারের পেট চালাইতে পারে না। স্ত্রী কুড়ানি রূপসী যুবতী। সে উপন্যাসের এই বীরত্বহীন বীর দীনহীন স্বামীটিকে ভালবাসিতে অক্ষম হইলে, কিংবা উহাকে ভালবাসিয়া তাহার অন্তর ভরিয়া না উঠিলে তাহাকে দোষ দেওয়া যায় না—উহা যৌবনের ধর্ম। সে ভালবাসে কিশোর নামে ও পাড়ার একটি কিশোরকে। সে ভালবাসা প্রগাঢ় এবং ত্যাগ ও মমত্বপূর্ণ। কুড়ানি নানা ঝড়ঝাপটার মধ্যে সে ভালবাসা অমলিন রাখিয়াছিল, উহাতে মলিনতা যেমন ঢুকিতে দেয় নাই, তেমনি অশুচি ও রুচিহীনতা থেকে আপনাকে সে সযত্নে রক্ষা করিয়াছিল এবং পরিশেষে সে ভালবাসার বন্ধন কাটাইয়া নিজের রুগ্ন স্বামীকে লইয়াই পথে পা দিয়াছিল। এই রকম হৃদয়ের টানাপোরেনের মধ্যে লেখক দক্ষতা ও দরদ মিশাইয়া এই কটি নরনারীকে চিত্রিত করিয়াছেন। বীরভূমের গ্রাম্য কথাবার্তাগুলিকে তিনি অপূর্ব দক্ষতার সহিত পরিবেশন করিয়াছেন। তাহাতে সংলাপ যেমন শ্রুতিমধুর হইয়াছে, তেমনি সংলাপের মধ্য দিয়া চরিত্রগুলিও আয়নার মত স্বচ্ছ হইয়া উঠিয়াছে। বইটি উপন্যাসপ্রিয় পাঠক-পাঠিকাগণকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করিবে। ছাপা, কাগজ, বাঁধাই উত্তম হইয়াছে।

৪৭।৪৯

**তোমাদের গান্ধীজী**—

শ্রীদীনেশ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক—এইচ্ চ্যাটার্জি এণ্ড কোং লিঃ, ১৯নং শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৷৹ টাকা। "বইখানি সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্য" রূপে লিখিত হইয়াছে। বইটির রচনা মোটামুটি প্রশংসনীয়। শেষ অধ্যায়ে বিষয়বস্তুর সন্নিবেশে গুরুতর অসঙ্গতি রহিয়াছে, ইহা যে ছাপাখানার ভুল তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। এই ধরণের অনবধানতা ও শৈথিল্য উপেক্ষা করা যায় না। আশা করা যায় প্রকাশক ও লেখক ভবিষ্যতে এ বিষয়ে সতর্ক হইবেন।

৪৬।৪৯

**গল্পে এশিয়ার নেতাজী**—

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক এইচ, চ্যাটার্জি এণ্ড কোং লিঃ, ১৯নং শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৷৹। সুবিখ্যাত কথাশিল্পীর লিখিত এই শিশুপাঠ্য বইটি পড়িয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। বইখানি বিশেষভাবে ৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্রেণীর বালক-বালিকাদের জন্য লিখিত হইয়াছে। বইখানি পাঠ করিয়া তাহারা উপকৃত হইবে সন্দেহ নাই। বইটিতে কয়েকটি ছাপার ভুল চোখে পড়িল। ইহা না থাকিলেই ভাল হইত।

৪৭।৪৯

**শহীদ স্মরণে**ঃ—শ্রীসুনির্মল বসু প্রণীত। প্রকাশক—প্রাচী পুস্তক প্রতিষ্ঠান, ৯নং শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৷৷৵৹। মহারাজ নন্দকুমার হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, বাঘা যতীন, যতীন দাস প্রভৃতি বাইশজন শহীদের সংক্ষিপ্ত জীবন কাহিনী সরল পদে চিত্রসহ এই পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। সুনির্মল বাবু শিশু সাহিত্যের নিপুণ শিল্পী। এই পুস্তিকায় তিনি সেই নৈপুণ্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। পুস্তকের মলাটটিও সুন্দর, তবে উহা বোর্ড সহ বাঁধাই হইলে আরও ভাল হইত।


# দেশে বিদেশে

॥ ডঃ সৈয়দ মুজতবা আলী ॥

[এই মাত্র প্রকাশিত হ'ল]

মূলতঃ ভ্রমণবৃত্তান্ত হ'লেও এই চরিত্র সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। হাল্কা চালে পরিহাসপ্রিয়তার সঙ্গে তথ্য আর তত্ত্বের সমাবেশে অপূর্ব রসসৃষ্টি হয়েছে। স্বকীয় রস ছাড়া এর আর একটা দেশকাল উপযোগী মূল্য আছে—এই সাংস্কৃতিক বিভেদীকরণের যুগে বইটি যে সাংস্কৃতিক ঐক্যের বাণী বহন করে আবির্ভাব হয়েছে তার মূল্য অসাধারণ। বিশ্বনাগরিকতার উদার দৃষ্টিতে **"দেশে বিদেশে"**-র বর্ণাঢ্য কাহিনী বাঙ্গলা সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ। —পাঁচ টাকা।

নিউ এজ পাব্লিশার্স লিমিটেড

২২, ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা—১

# হিউএন্ চ্যাঙ্-এর ভারতভ্রমণ

## —শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু—

( পূর্বানুবৃত্তি )

### অযোধ্যা—প্রয়াগ—কৌশাম্বী

রপর, আবার যাত্রা কোরে পরিব্রাজক গঙ্গাপার হোয়ে অযোধ্যায় এলেন। ন তখনো হিউএন্‌চাঙের প্রিয় দুইজন ী পণ্ডিত অসঙ্গ ও বসুবন্ধু ভ্রাতৃ-যশে পূর্ণ ছিল। দুইশত বছর আগে ঘারামে এঁরা কিছুকাল অধ্যয়ন অধ্যাপনা সেই সঙ্ঘারাম তিনি দর্শন করলেন। ক দর্শনের প্রকাণ্ড 'অভিধর্মকোষশাস্ত্র' অমূল্য গ্রন্থ বসুবন্ধুরই রচনা। ভারতের বহুগ্রন্থের মত, এ গ্রন্থও ভারতবর্ষে যায় না। কিন্তু হিউএন্‌চাঙ কর্তৃক চীন অনূদিত সম্পূর্ণ গ্রন্থ পাওয়া গিয়েছে। নী থেকে বসুবন্ধু কী কোরে মহাযানী সে সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক তীর বিবরণ হিউএন্‌চাঙ দিয়েছেন। যোধ্যায় কতকগুলি বড় বড় স্তূপ আর ম দর্শন কোরে হিউএন্‌চাঙ আবার ীর ধরে চললেন। জনকুড়িক সঙ্গীসহ ৌকায় চড়ে তিনি প্রয়াগে এলেন। পথে তাঁর এক ভয়ানক বিপদ উপস্থিত তে তাঁর তীর্থযাত্রা এখানেই প্রায় শেষ । গঙ্গার উপর নৌকা কোরে মাইল এসে তাঁরা এমন এক জায়গায় উপস্থিত যেখানে গঙ্গার দুই তীরেই অশোক ঘন বন ছিল। এই বনের মধ্যে দস্যুদের শেক নৌকা লুকানো ছিল। হিউএন্‌-নৌকায় ৮০ জন যাত্রী ছিল। ঐস্থানে আসা মাত্র দস্যুরা যাত্রীদের নৌকা ফেলল। যাত্রীরা কেহ কেহ জলে ঝাঁপ অবশিষ্ট যাত্রীদের দস্যুরা ডাঙ্গায় নিয়ে । এইখানে যাত্রীদের কাপড় চোপড় নব জিনিস তারা কেড়ে নিল। বিপদের বিপদ, এই দস্যুরা আবার দুর্গার ক ছিল আর শরৎকালে দেবীর কাছে দেবার জন্যে একজন উপযুক্ত সুপুরুষ ছল।* হিউএন্‌চাঙের সুদর্শন সুগঠিত দেখে তাঁকেই এরা আনন্দে বলীদান দেবার আয়োজন করতে লাগল। তারা বললো —"দেবীর উপযুক্ত বলি না পেয়ে আমাদের পূজা দেওয়াই বন্ধ ছিল। এইবার একজন পাওয়া গেল। একেই বলি দেওয়া যাক্।" হিউএন্‌চাঙ তাদের বললেন—"আমার এই জঘন্য হেয় শরীর নিয়ে যদি তোমাদের কাজ হয়, তা হোলে আমার নিজের কোনও আপত্তি নেই। তবে আমি দূরদেশ থেকে এসেছি তীর্থ-যাত্রা করতে, শাস্ত্রগ্রন্থ সংগ্রহ করতে, আর ধর্ম শিক্ষা করতে। একাজ আমার সম্পূর্ণ হয়নি। তাই জন্যে হে দানশীলগণ' আমার ভয় হয়, আমার প্রাণবধ করলে তোমাদের অশেষ দুর্গতি হোতে পারে।" অন্য যাত্রীরাও দস্যুদের মিনতি করল। হিউএনচাঙের জায়গায় বলি হোতে চাইল। কিন্তু দস্যুরা তাতে কর্ণপাত করল না। দলপতির আজ্ঞায় দস্যুরা অশোক বনের মধ্যে থেকে গঙ্গামৃত্তিকা এনে এক বেদী তৈয়ারী করল। তারপর দলপতি দুজন দস্যুকে হুকুম করল যে হিউএন্‌চাঙকে বেদীর সামনে এনে খড়্গ দিয়ে বলি দেওয়া হোক্। হিউএন্‌-চাঙের মুখে কিন্তু কোনওরকম ভাবান্তর দেখা গেল না। দস্যুরা তাই দেখে আশ্চর্য হো'ল আর তাদের মনও হয়তো একটু নরম হোল। হিউএন্‌চাঙ, পরিত্রাণের কোনও আশা না দেখে তাদের অনুরোধ করলেন যে তাঁকে টানা-হেঁচড়া না কোরে অল্প কিছু সময় যেন দেওয়া হয়। "শান্ত আনন্দিত মনে আমাকে যেতে দাও।"

"তারপর ধর্মগুরু প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে বোধি-সত্ত্ব মৈত্রেয়ের ধ্যান করলেন, সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করলেন যে, পুনর্জন্মে যেন তিনি সেই পুণ্যাত্মাদের দেবলোকে জন্মগ্রহণ কোরে ঐ বোধিসত্ত্বকে আরাধনা করতে, ধর্মোপদেশনা শুনতে আর বোধিলাভ করতে পান। ,আর তারপর আবার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ কোরে এই লোকগুলিকে ধর্মশিক্ষা দিতে পারেন, যাতে তারা এই হীন বৃত্তি ত্যাগ কোরে পুণ্য কাজই করে। তারপর যেন সমস্ত জীবের সুখ শান্তির জন্যে ধর্মপ্রচার করতে পারেন। অবশেষে, তিনি দশমহাদেশের বুদ্ধদের আরাধনা কোরে মৈত্রেয়ের ধ্যানে বস্‌লেন আর অন্য কোনও চিন্তা মনে উদয় হোতে দিলেন না।

"সহসা তাঁর আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে মনে হোল যেন তিনি সুমেরু পর্বতের মত উঁচুতে উঠে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় স্বর্গ পার হোয়ে পুণ্যাত্মাদের প্রাসাদে গিয়ে দেখতে পেলেন যে, ভক্তিভাজন মৈত্রেয়, অসংখ্য দেবতাদের মধ্যে এক সমুজ্জল সিংহাসনে উপবিষ্ট রয়েছেন। এ সময়ে, তাঁকে যে বেদীর সামনে বলিদানের জন্যে দস্যুরা নিয়ে এসেছে, এ জ্ঞান তাঁর ছিল না; তিনি যেন সশরীরে এক আনন্দসাগরে ভাস্‌ছিলেন। এদিকে সঙ্গীরা কান্নাকাটি করছিলেন। এমন সময় হঠাৎ এক ভীষণ ঝড় উঠ্‌লো আর সেই ঝড়ে গাছপালা ভেঙে পড়তে লাগল, চারিদিকে বালি উড়তে লাগল আর নদীতে খুব ঢেউ হোল। দস্যুরা ভয় পেয়ে হিউএন্‌চাঙের সঙ্গীদের জিজ্ঞাসা করল— "এই শ্রমণ কোথা থেকে আস্‌ছেন? এঁর নাম কী?" তাঁরা জবাব দিলেন—"ইনি একজন বিখ্যাত সাধু। চীনদেশ থেকে ধর্মের অনু-সন্ধানে এসেছেন। এঁকে হত্যা করলে আপনাদের মহাপাপ হবে। এই ঝড় আর ঢেউ দেখে দৈবরোষ বুঝতে পারছেন না? এখনো ক্ষান্ত হন।"

দস্যুরা ভয়ে হিউএন্‌চাঙের পায়ে পড়ল। হিউএন্‌চাঙ কিন্তু সমাধিস্থ থাকায় কিছু জানতে পারেননি। একজন দস্যু যখন ভক্তি-ভরে তাঁর পাদস্পর্শ করলো, তখন তিনি চোখ মেলে ধীরভাবে জিজ্ঞাসা করলেন যে, সময় হয়েছে কি না? তারপর সমস্ত ব্যাপার শুনেও তিনি আগের মতই ধীরভাবে দস্যুদের উপদেশ দিলেন যে, তারা যেন ঐ দস্যুর ব্যবসা ত্যাগ করে। তারাও তাই প্রতিজ্ঞা করল আর সব অস্ত্র শস্ত্র গঙ্গায় ফেলে দিল। শীঘ্রই ঝড়, ঢেউ থেমে গেল। দস্যুরা আনন্দে ধর্ম-গুরুকে প্রণাম করে চলে গেল।"

এই বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে হিউএন্‌-চাঙ গঙ্গার দক্ষিণ তীরে, গঙ্গাযমুনার সঙ্গমে, প্রয়াগে উপস্থিত হলেন।

চতুর্থ ও পঞ্চম খৃষ্টাব্দে প্রয়াগ গুপ্ত সম্রাটদের অন্যতম রাজধানী ছিল। কিন্তু হিউএন্‌চাঙের সময়ে এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে বৌদ্ধ কমই ছিল। এখানে এক চম্পক-বৃক্ষের কুঞ্জে অশোক রাজার নির্মিত একটা স্তূপ ছিল। "এর ভিৎ বসে গিয়েছে, তবু এখনো দেওয়াল ১০০ ফুট উঁচু।" অশোক-স্তম্ভও দেখে থাকবেন কিন্তু বিশেষভাবে উল্লেখ করেননি। মাত্র হীনযানী বৌদ্ধদের দুইটি সঙ্ঘারাম ছিল কিন্তু বিধর্মীদের শত শত দেবমন্দিরে অসংখ্য ভক্তের ভিড় ছিল।

"সঙ্গমস্থলে একটা প্রশস্ত বালুর চর আছে। এখানে জমি সম্পূর্ণ সমতল। প্রাচীন-কাল থেকে রাজারা আর সম্ভ্রান্ত লোকরা দান করবার জন্যে এখানে আসেন। তাই জন্যে এ জায়গাকে "মহাদানের মাঠ" বলা হয়। একালে শিলাদিত্য রাজা ৭৫ দিন ধরে তাঁর

---

* উনবিংশ শতাব্দীতে খুনী ঠগীদের ীর মন্দির" ছিল মির্জাপুরের কাছে চলে।

পঞ্চম বাৎসরিক দান এখানে কোরেছেন। ত্রিরত্ন থেকে আরম্ভ কোরে দীনহীন ভিখারী পর্যন্ত কেউই তাঁর দান থেকে বঞ্চিত হয়নি।

নগরে সুন্দরভাবে অলংকৃত একটি দেবমন্দির আছে। বিধর্মীরা বিশ্বাস করে যে এ মন্দিরে জীবন ত্যাগ করলে স্বর্গে অনন্ত সুখভোগ হয়। এই মন্দিরের সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড গাছ আছে তার ডালপালায় ঘন ছায়া হয়। এই গাছে একটা দৈত্য আছে। সে সকলকে আত্মহত্যার প্ররোচনা দেয়।

এদেশের লোকের বিশ্বাস সংগমে স্নান করলে সমস্ত পাপ ক্ষয় হয়। তাই দলে দলে লোক এসে সাত দিন পর্যন্ত উপোস করে, তারপর কেউ কেউ জলে ডুবে মরে। এমন কি, সংগমের নিকটে দলে দলে বানর আর হরিণ জড়ো হয়; তাদের মধ্যে কেউ কেউ স্নান কোরে চলে যায়। কেউ কেউ উপোস কোরে প্রাণত্যাগ করে (!)

এদেশে শস্য আর ফলের গাছ খুব ভাল হয়। আবহাওয়া গরম, সুখদ। অধিবাসীরা ভদ্র ও বাধ্য। তারা বিদ্যায় অনুরক্ত আর ঘোর বিধর্মী।"

প্রয়াগ ছেড়ে হিউএন্‌চাঙ গভীর অরণ্যের মধ্যে দিয়ে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্য এক রাজধানী কৌশাম্বীতে গেলেন। ঐ অরণ্যে নানা হিংস্র পশু, হাতী ইত্যাদি ছিল। আধুনিক কোশাম গ্রামে অল্পদিন হোল কৌশাম্বীর ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। আর এর ভাস্কর্যের অনেক আশ্চর্য আশ্চর্য নিদর্শন এলাহাবাদ যাদুঘরে রাখা হোয়েছে। অশোকের নির্মিত ২০০ ফুট উঁচু একটি স্তূপও সে সময়ে এখানে ছিল আর বসুবন্ধু যে দুতলা স্তম্ভের উপরে একটি ঘরে তাঁর একখানা গ্রন্থ লিখেছিলেন, আর অসংগ যে আম্রকুঞ্জে বাস করতেন, হিউএন্‌চাঙ তাও দেখেন। কিন্তু এ সময়ে মাত্র দশটা বৌদ্ধমঠ এখানে ছিল আর তার অবস্থাও খুব খারাপ ছিল। হিন্দুমন্দির কিন্তু প্রায় পঞ্চাশটা ছিল আর তাতে বহু লোক পূজা দিতে আসতো। "একটি পুরাণো প্রাসাদের অংগনে খুব উঁচু একটা বিহারে রাজা উদয়ন কর্তৃক নির্মিত চন্দন কাঠের বুদ্ধ মূর্তি আছে। শাক্যধর্ম লোপ পাবার সময়ে সবশেষে এই প্রদেশ থেকে লোপ পাবে। তাই যাঁরাই এদেশ দর্শন করতে আসেন, প্রত্যেকেই শোকার্ত হৃদয়ে এখান থেকে বিদায় হন।"

## পুণ্যভূমি

কৌশাম্বী দেখবার পর হিউএন্‌চাঙ গংগাতীর ছেড়ে উত্তর অযোধ্যায় আর নেপালের দিকে বুদ্ধের জন্মভূমি দেখতে গেলেন। এই প্রদেশ বুদ্ধের জীবিতকালের নানা ঘটনার স্মৃতিতে পূর্ণ ছিল।

ভারতবর্ষ
(সপ্তম খৃষ্টাব্দী)

প্রথমে গেলেন অচিরবতী (আধুনিক রাপ্তী) নদীর তীরে শ্রাবস্তীপুরে (আধুনিক সাহেত মাহেত) যেখানে বুদ্ধের সময়ে কোশলরাজ প্রসেনজিতের রাজধানী ছিল।

একহাজার বছর পরে এর প্রায় সমস্তই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল তবু কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষ আর লোকালয় তখনো ছিল। কয়েকশত জীর্ণ সংঘারাম আর জনকয়েক ভিক্ষু ছিলেন। একশত দেবালয় আর বহু 'বিধর্মী'ও ছিল। প্রসেনজিতের প্রাসাদ, তাঁর নির্মিত সদ্ধর্মমহাশালা আর তিনি, বুদ্ধের মাতৃস্বসা, বিমাতা আর ধাত্রী প্রজাপতি ভিক্ষুণীর জন্যে যে বিহার নির্মাণ কোরে দিয়েছিলেন, এসবের ধ্বংসাবশেষের উপর স্তূপ ছিল। ভক্ত শ্রেষ্ঠী সুদত্তর প্রাসাদের ভগ্নাবশেষের উপরেও একটি স্তূপ ছিল।

শ্রাবস্তীপুরীর এক ক্রোশ দূরে জেতবন। ধনী শ্রেষ্ঠী সুদত্ত দানশীলতার জন্যে অনাথপিণ্ডদ নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যদের থাকবার জন্যে একটা বিহার নির্মাণ করতে ইচ্ছা করলেন। বুদ্ধ সারিপুত্রের সংগে গিয়ে নগরের বাইরে রাজকুমার জেতের যে বাগান ছিল সেইটি পছন্দ করলেন। জেতকে বলতে তিনি হেসে বল্লেন যে, "বেশ! যত স্বর্ণমুদ্রা বিছিয়ে দিলে বাগানটা ভরে যায়, সেই দামে বাগানটা বেচ্‌তে রাজি আছি।" অনাথপিণ্ডদ সানন্দে সেই দামেই বাগানটা কিনে নিয়ে বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যদের থাকবার জন্যে দিলেন। বুদ্ধ এই বিহারে থাকতে ভালবাসতেন আর তাঁর বহু উপদেশ যা ত্রিপিটকে বর্ণিত আছে, এই বিহারেই বলেছিলেন। হিউএন্‌চাঙের সময়ে বিহার, ভিক্ষুদের

র বাড়িগুলি প্রায় সমস্তই ধ্বংস হয়ে-
কেবল একটা ছোট বাড়িতে সোনালী
রা বুদ্ধের একটা পাথরের মূর্তি ছিল।
উদয়ন কৌশাম্বীতে চন্দনকাঠের বুদ্ধ-
তৈয়ারী করেছেন শুনে রাজা প্রসেন-
এই পাথরের বুদ্ধমূর্তিটি গড়ান।
জেতবনের পূর্ব তোরণের দুইদিকে
স্তম্ভ নির্মাণ করেন। হিউএন চাঙ সে
দেখেন। তার একটার উপরে ধর্মচক্র,
র উপর বৃষ মূর্তি গড়া ছিল।

কদিন বুদ্ধ যখন "অনবতপ্ত"* হ্রদের
উপদেশ দিচ্ছিলেন, তখন দেখলেন যে,
ত্র উপস্থিত নেই। তিনি মৌদ্গল্যায়নকে
ন সারিপুত্রকে ডেকে আনবার জন্যে।
ল্যায়ন ঋদ্ধি বা যোগবলের জন্যে আর
ত্র জ্ঞানবলের জন্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন।
ল্যায়ন মুহূর্তে মধ্যে জেতবনবিহারে সারি-
কাছে গিয়ে দেখলেন, তিনি তাঁর ছেঁড়া
সেলাই করছেন। সারিপুত্র তাঁকে একটু
া করতে বললেন। মৌদ্গল্যায়ন বললেন
এখনি যদি না যাও তো আমার যোগবলে
কে তোমার বাড়িশুদ্ধ উড়িয়ে নিয়ে যাব।"
সারিপুত্র তাঁর চাদরটি খুলে দিয়ে
ন, "আচ্ছা, যদি এটা নাড়াতে পার,
ল এখনি যেতে পারি।" মৌদ্গল্যায়নের
লে পৃথিবী কম্পমান হল, কিন্তু চাদর
না। তাই দেখে মৌদ্গল্যায়ন যোগবলে
নিমিষে বুদ্ধের কাছে ফিরে গিয়ে দেখেন
রিপুত্র আগেই পৌঁছে গিয়ে নির্বিবাদে
শ শুনছেন! তখন মৌদ্গল্যায়ন বললেন,
বুঝলাম যে, ঋদ্ধির (যোগবলের) চেয়ে
বড়।" সারিপুত্র যেখানে বসে সেলাই
লেন সেখানে, হিউএন চাঙ একটি
স্তূপ দেখেছিলেন।

দেবদত্ত বুদ্ধকে হত্যা করবার চেষ্টা
র জন্যে আর "ভিক্ষু কোকালিক" বুদ্ধের
করবার জন্যে আর ব্রাহ্মণ কন্যা চণ্ডমণা
র নামে বৃথা কলঙ্ক দেবার চেষ্টা করবার
যেখানে যেখানে সশরীরে রসাতলে গিয়ে-
ন, সেই তিনটা গর্ত হিউএন চাঙ
ন।

দস্যু অঙ্গুলীমালা, যে মানুষ খুন করে
র আঙুল দিয়ে মালা গেঁথে পরতো, আর
বুদ্ধের উপদেশে ভিক্ষু হয়েছিল, তার
আর বুদ্ধের সমাসাময়িক আরো অনেক
াই হিউএন চাঙ এখানে স্মরণ করলেন।
্যক ঘটনারই স্মারকস্তূপ ছিল।

তারপর দক্ষিণ-পূর্বে ১৪০ মাইল গিয়ে
এন চাঙ অবশেষে বুদ্ধের জন্মস্থান
লাবাস্তুর ভগ্নাবশেষ দেখতে পেলেন।
থান কালক্রমে জনশূন্য হয়ে গিয়েছিল।

তবে হিউএন চাঙ বলেন যে, রাজপ্রাসাদের ইষ্টক প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ তখনো ছিলো। তখনো বুদ্ধমাতা মায়াদেবীর ঘরের, বুদ্ধের বাল্যকালের আর যৌবনাবস্থার অনেক ঘটনার (যথা, মহানিষ্ক্রমণ ইত্যাদি) স্মারকস্বরূপ চিত্রাঙ্কিত স্তূপের ভগ্নাবশেষ ছিল। লুম্বিনী উদ্যানে যেখানে বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন বলে প্রসিদ্ধি ছিল, সেখানে অশোক এক স্তম্ভ নির্মাণ করেন। সেই স্তম্ভ আর শিলালিপি দেখে আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিকেরা এই স্থান নির্দেশ করতে পেরেছেন। দুই হাজার বছর পরে লুম্বিনীর আধুনিক নাম রুম্মিনদেঈ।

এইভাবে বুদ্ধের জীবনের নানা ঘটনা (এর মধ্যে অনেক ঘটনাই কিম্বদন্তীমূলক বা অলৌকিক) স্মরণ করতে করতে আর সেই সেই স্থানে নির্মিত স্তূপ দেখতে দেখতে কপিলাবাস্তু ছেড়ে হিউএন চাঙ গনডক নদীর তীরে কুশীনগর গেলেন, যেখানে বুদ্ধ নির্বাণ লাভ করেন। এখানে অনেকগুলি স্তূপ ছিল। বুদ্ধ যে-বাড়িতে তাঁর শেষ আহার করেন, সেই কর্মকার চুন্দর বাড়ি, যে শালকুঞ্জে মহানির্বাণ হয়, সেই স্থান, যে জায়গায় তাঁর দেহাবশেষ বিতরিত হয়, সেই সমস্ত জায়গায়ই একটা একটা স্তূপ ছিল। বুদ্ধের মৃত্যুর পর দেবরাজ, দানবরাজ আর পৃথিবীর ৮জন রাজা বুদ্ধের দেহাবশেষ নিয়ে যান। পরে অশোক সেই আট রাজার স্তূপ থেকে দেহাবশেষগুলি বার কোরে জম্বুদ্বীপের শেষ সীমা পর্যন্ত বিতরণ কোরে সেইগুলির উপর ৮৪০০০ স্তূপ নির্মাণ করেছিলেন।

এর পর হিউএন চাঙ বারানসীতে এলেন। তিনি এ নগরীর বহু অধিবাসী, মহাসমৃদ্ধি, পুরাতন সভ্যতা আর বহু হিন্দু মন্দিরের উল্লেখ করেছেন। "এই সব মন্দিরগুলি অনেক তলা উঁচু, আর এরা বহু ভাস্কর্যে পূর্ণ। মন্দিরের যেসব অংশ কাঠে তৈরি, সেগুলি হরেক রকম চকচকে রঙ করা। মন্দিরগুলির চারদিকে ফুলবাগান আর পরিষ্কার জলের পুষ্করিণী। এখানে অনেক সাধু-সন্ন্যাসী আছেন। বেশির ভাগই শৈব সন্ন্যাসী। কেউ চুল কেটে ফেলে, কেউ-বা জটাধারী। কেউ কেউ (জৈনরা) নগ্ন। অন্যেরা গায়ে ছাই মাখে বা মোক্ষলাভের জন্যে কঠোর তপস্যা করে।" কাশীর একটি মন্দিরে হিউএন চাঙ ১০০ ফুট উঁচু একটি তামার তৈরি শিবমূর্তি দেখেছিলেন। মূর্তিটি মহত্ত্বব্যঞ্জক। "দেখে মন ভয় ও ভক্তিতে পূর্ণ হয় যেন জীবিত মূর্তি।"

গুপ্তযুগে এদেশের শিল্পের যে কতটা উন্নতি হয়েছিল, হিউএন চাঙের মত গোঁড়া বৌদ্ধের মুখে এ কথায় তা কতক বোঝা যায়। হিন্দুর কাশী দেখে হিউএন চাঙ বৌদ্ধকাশী অর্থাৎ "মৃগদাবতে" (সারনাথ) গিয়ে দিনকতক বাস করলেন। বোধিলাভ করবার পর বুদ্ধ এইখানেই প্রথমে এসে পঞ্চ-শিষ্যের কাছে তাঁর বাণী প্রচার করেন। হিউএন চাঙ অবশ্য অশোকস্তম্ভের উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া বুদ্ধ এখানে এসে যে পুষ্করিণীতে স্নান করতেন, যেখানে কাপড় ধুতেন, যেখানে নিজের ভিক্ষাপাত্র পরিষ্কার করতেন ইত্যাদি সমস্ত জায়গাই সে সময়ে সযত্নে রক্ষিত হত। এই মৃগদাবতে একটা প্রকাণ্ড মঠ ছিল। এখানে হীনযানমতের ১৫০০০ জন ভিক্ষু থাকতেন। হিউএন চাঙ বলেন, এই মঠের বারান্দাগুলি ধ্যান-ধারণার পক্ষে খুব উপযুক্ত।

জাতকের বহু ঘটনাই বারাণসীতে ঘটেছিল বলে বর্ণিত আছে। আর সেই সব ঘটনার অনেক জায়গায়ই স্মারক-স্তূপ ছিল। কাজেই হিউএনচাঙের পক্ষে অনেক দ্রষ্টব্য এখানে ছিল। ঐতিহাসিকই হোক, কিম্বদন্তীমূলকই হোক, সব জায়গায়ই পুজো নিবেদন কোরে তিনি বারাণসী ত্যাগ কোরে উত্তরমুখে গণ্ডকতীরে বৈশালীতে গেলেন। এ সময় বৈশালী নগরের চিহ্নও ছিল না, তবু আম্রপালী সঙ্ঘকে যে আম্রকুঞ্জ দান করেছিল ইত্যাদি নানা ঘটনার কথিত স্থান আর স্তূপ তিনি দর্শন করেন। বুদ্ধের মৃত্যুর একশত বছর পরে বৈশালীতে সঙ্ঘের দ্বিতীয় সভা হয়েছিল।

এর পর হিউএনচাঙ আবার গঙ্গাতীরে মগধের রাজধানী পাটলিপুত্রে এলেন। চন্দ্রগুপ্ত, অশোক আর গুপ্ত-সম্রাটদের রাজধানী পাটলিপুত্রের তখন ভগ্নদশা। পুরাতন প্রাসাদগুলির কেবল ভিত্তি ছিল আর অসংখ্য সঙ্ঘারাম, স্তূপ ও দেবমন্দিরের মধ্যে কেবলমাত্র দুই-তিনটা তখনো খাড়া ছিল। হিউএনচাঙের সময় অশোকের রাজধানীর ধ্বংসাবশেষগুলি এত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ছিল, যে লোকে মনে করতো দৈত্য-দানবরা অশোকের

* অনবতপ্ত হ্রদ জম্বু দ্বীপের ঠিক মধ্যখানে।"

আমেরিকান মডেল
বক্স ক্যামেরা
শক্তিশালী লেন্স সমন্বিত। এমন কি শিক্ষার্থিগণও সহজে ব্যবহার করিতে পারেন। অতি উত্তম ফটো তোলা যায়। ১২০নং ফিল্মে $2\frac{1}{4}'' \times 3\frac{1}{4}''$ আকারের অত্যুত্তম ফটো তোলা যায়। সম্পূর্ণ সন্তুষ্টিলাভের গ্যারাণ্টী। আজই একটির জন্য অর্ডার দিন। মূল্য ১৮॥৹ আনা। অতিরিক্ত ব্যয় ১॥৹ টাকা। পত্রাদি ইংরাজীতে লিখুন।
**BENGAL CAMERA HOUSE**
(D. C.) Post Box No. 21, Aligarh.

জন্য এসব করেছিল। হিউএনচাঙ এগুলি দেখলেন। অশোকনির্মিত একটি স্তূপও দেখলেন। বুদ্ধ, মৃত্যু নিকট বুঝতে পেরে যে পাথরের উপর দাঁড়িয়ে মগধের কাছে শেষবারের মতো বিদায় নিয়েছিলেন, সেই পাথরের উপর তাঁর পবিত্র পায়ের ছাপ ছিল। গঙ্গাতীরে সেই পাথরে হিউএনচাঙ পূজো দিলেন।

হিউএনচাঙ মহারাজ অশোক সম্বন্ধে অনেক কাহিনীই লিখেছেন। তিনি বলেন, অশোক যখন প্রথম রাজা হন, তখন খুব অত্যাচারী ছিলেন। মানুষকে যন্ত্রণা দেবার জন্যে তিনি একটা "নরক" তৈয়ারী করেছিলেন। এর চতুর্দিকে খুব উঁচু উঁচু দেওয়াল আর স্তম্ভ ছিল। এ-নরকে গলিত ধাতুর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চুল্লী ছিল। প্রথমে সব রকম অপরাধীই এই বীভৎস সর্বনাশের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হত। পরে এই পথে যে কেহ আসা-যাওয়া করতো, সকলকেই ধোরে এর মধ্যে নিক্ষেপ করা হত। এক শ্রমণ ভিক্ষায় বার হোয়ে এই পথে যাচ্ছিলেন। নরাধম রক্ষী তাঁকে ধোরে বেঁধে ফেলল। তিনি পূজার জন্যে একটু সময় চাইলেন। ঠিক সেই সময়ে দেখলেন যে, একজন পথিককে বেঁধে আনা হল, আর মুহূর্তের মধ্যে তার হাত-পা কেটে ফেলে তাকে হামান দিস্তায় গুঁড়ো করে ফেলা হল। শ্রমণ তাই দেখে করুণায় পূর্ণ হোয়ে সংসারের অনিত্যতার জ্ঞানলাভ করলেন, আর অর্হৎপদলাভ করলেন। তার ফলে তিনি জীবন-মৃত্যুর পারে গেলেন—ফুটন্ত কড়াইটা তাঁর পক্ষে শীতল পুষ্করিণীর মত হয়ে গেল, আর তার উপর একটি প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর তিনি বসলেন। নরকের রক্ষী ঐ কথা রাজাকে বললে রাজা নিজেই এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখতে এলেন।

তখন রক্ষী রাজাকে বলল—"মহারাজ এখন আপনারও মরতে হবে।" "কেন?" "আপনার হুকুমে, এই নরকের মধ্যে যে আসবে, তারই মৃত্যুদণ্ড হবে। মহারাজ যে নিষ্কৃতি পাবেন, এমন কথা তো ছিল না।" রাজা বললেন, "তা ঠিক। কিন্তু তুমি নিজেই যে অব্যাহতি পাবে, সে কথা ছিল কি? অনেকদিন তুমি নরহত্যা করেছ। এখন আর এসব হবে না।" তখন রাজাজ্ঞায় রক্ষী নিজেই ফুটন্ত কড়াইয়ে নিক্ষিপ্ত হল। তারপর রাজা ঐ জায়গাটি ভূমিসাৎ কোরে ঐ বীভৎস ব্যাপার বন্ধ করলেন। এখানে এখন একটা স্মারক স্তম্ভ আছে। এই নরকের দক্ষিণে একটা স্তূপ ছিল। এটার এখন ভগ্নদশা, কিন্তু চূড়াটা এখনো আছে। অশোক রাজা যে ৮৪০০০ স্তূপ নির্মাণ করেন এটা তার প্রথম। নরকটা ভূমিসাৎ করবার পরে রাজা ভিক্ষু উপগুপ্তের সাক্ষাৎ পান ও বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। পুরাতন নগরের দক্ষিণ-পূর্বে কুক্কুটারাম সঙ্ঘারামের ভগ্নাবশেষ ছিল। অশোক রাজা এটা তৈরি কোরে এক হাজার ভিক্ষুর একটা সভা আহ্বান করেছিলেন।

পাটলিপুত্র থেকে বুদ্ধগয়ার পথে যেতে হিউএনচাঙ যে কী রকমভাবে বিভোর হয়েছিলেন, তা তার বিবরণ পড়লেই বোঝা যায়। বোধিদ্রুম আর বজ্রাসন দেখে তিনি বোধিসত্ত্বের বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির সমস্ত বিষয় চিন্তা করলেন। সেই অশ্বত্থের কাছেই বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের দুটি মূর্তি ছিল। কিম্বদন্তী ছিল যে, এই দুটি মূর্তি যখন মাটির মধ্যে চলে যাবে, বুদ্ধের ধর্মও তখন ভারতবর্ষ থেকে লুপ্ত হবে। হিউ এন চাঙ দেখলেন যে, একটা মূর্তি বুক পর্যন্ত মাটির নীচে চলে গিয়েছে। প্রগাঢ় ভক্তিসহকারে বোধিদ্রুমের দিকে চেয়ে থেকে তিনি সাষ্টাঙ্গ প্রণত হলেন। আর কাতরভাবে ক্রন্দন করতে লাগলেন—হায়। বুদ্ধ যখন বোধিলাভ করেন, কি জানি আমি সংসারচক্রে কীভাবে ঘুরছিলাম। আর এই মূর্তির শেষদশার সময়ে আমি এখানে এসে, আমি যে কত পাপী তা মনে করে কষ্ট হচ্ছে। এই কথা বলতে বলতে অশ্রুজলে তাঁর বুক ভাসতে লাগলো। এই সময়ে কয়েক সহস্র ভিক্ষু চারদিক থেকে এখানে আসছিলেন। ধর্মগুরুর ঐ ভাব দেখে তাঁরা কেউ-ই অশ্রুসম্বরণ করতে পারলেন না।

হিউএনচাঙ বুদ্ধগয়ায় আট নয় দিন থেকে একে একে সমস্ত পবিত্র স্থানগুলিতে পূজো দিলেন। অশোকের তৈয়ারী মন্দিরের ভগ্নাবশেষের উপর যে মন্দির গঠিত হয়েছে, সেটা হিউএনচাঙ দেখেছিলেন। সেইটাই এখনো আছে। বুদ্ধের কাপড় ধোয়ার সুবিধা কোরে দেবার জন্যে ইন্দ্রদেব যে পুষ্করিণী কোরে দিয়েছিলেন, অন্য যে পুষ্করিণীতে মুচিলিন্দের বাস ছিল (সেই নাগরাজ মুচিলিন্দ যিনি তাঁর সাতটি ফণা বুদ্ধের মাথায় ধরেছিলেন), যে কুটীরে থেকে বোধিপ্রাপ্তির আগে বুদ্ধ কঠোর তপস্যা করেছিলেন ইত্যাদি যেসব বহু স্থানে সে সময়ে বৌদ্ধরা পূজো দিতেন, হিউ এন চাঙ সেসব জায়গায়ই পূজো দিলেন, আর ঐসব কাহিনী স্মরণ করলেন। গয়া থেকে হিউ এন চাঙ নালন্দায় উপস্থিত হলেন। (ক্রমশ)


# ক্যালকাটা ন্যাশনাল
## ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস ঃ ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস্,
মিশন রো, কলিকাতা।

| | | | |
|---|---|---|---|
| **অনুমোদিত মূলধন** | ... | ২,০০০০০০০৲ | **টাকা** |
| **আদায়ীকৃত মূলধন** | ... | ৫০,০০০০০৲ | **টাকা** |
| **সংরক্ষিত তহবিল** | ... | ২৪,০০০০০৲ | **টাকার ঊর্ধ্বে** |

সম্পূর্ণ ভারতীয় প্রতিষ্ঠানরূপে "ক্যালকাটা ন্যাশনাল" এক রক্ষণশীল ঐতিহ্য বহন করিয়া চলিয়াছে। দেশীয় ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে "ক্যালকাটা ন্যাশনাল" একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। "ক্যালকাটা ন্যাশনালে" গচ্ছিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ। ভদ্র ব্যবহার ও কর্মদক্ষতা এই ব্যাঙ্কের বৈশিষ্ট্য। সমগ্র দেশব্যাপী শাখাসমূহের সহায়তায় "ক্যালকাটা ন্যাশনাল" আপনার যাবতীয় ব্যাঙ্কিং প্রয়োজন মিটাইতে সমর্থ।

**ব্যাঙ্কের সকল শাখাতেই কারেণ্ট ও সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খোলা হইয়া থাকে। সেভিংস ব্যাঙ্কের জমা টাকার উপর শতকরা ১½ টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। এক বৎসরের জন্য স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হয় ও শতকরা ২½ টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হয়।**

অনুমোদিত সিকিউরিটির বিনিময়ে ঋণ ও দাদন দেওয়া হয় এবং আমানতকারিগণের পক্ষে বিলের টাকা আদায় করা হয়।

**"ক্যালকাটা ন্যাশনালে" আপনার একটি একাউণ্ট রাখুন।**

# জীবন-তৃষা

## আর্ভিঙ্ স্টোন

অনুবাদক—**অদ্বৈত মল্ল বর্মন**

[ পূর্বানুবৃত্তি ]

**অবশেষে** তারা একেবারে তলায় পৌঁছাল। একটা লম্বা পথ যেতে হল হামাগুড়ি য়। মালপত্র রাখার একটা কুঠরী আছে। পথটা থান পর্যন্ত। বেরোবার রাস্তা থেকে রীটার দূরত্বই সবচেয়ে বেশি। সারি সারি নকগুলি 'সেল'। গম্বুজের গায়ে যেমন গ করা থাকে সেই রকম। মোটা মোটা ঠের ঠেকনা দিয়ে ঠেকানো। প্রতি 'সেলে' চজন মজুর কাজ করছে; দু'জন শাবল দিয়ে লা খুঁড়ছে, আরেকজন তাদের পায়ের কাছ কে কয়লা টেনে সরাচ্ছে; চতুর্থ ব্যক্তি সেইসব লা ছোট ছোট গাড়িতে ভরতি করছে; পঞ্চম টা সরু রাস্তা দিয়ে গাড়ি ঠেলে নিয়ে চ্ছে।

যে দু'জন শাবল চালাচ্ছে, তাদের গায়ে টা সুতি পোষাক। ময়লা আর কালো। যারা লা জড়ো করছে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তারা অল্পবয়সী তরুণ। তাদের কোমরে কেবল ক চিলতা কাপড় জড়ানো, এ ছাড়া সারা গা কেবারে খালি। আর তিন ফুট বেরোবার থ গাড়ি ঠেলে পার করে দেয় যে, সে মেয়ে। বক্ষেত্রেই এ কাজ মেয়েরাই করে। তারাও রুষের মতোই কালো। একটা মোটা কাপড়ে ার দেহের উপরাংশ ঢাকা। 'সেলে'র ছাদ কে জল চুঁইয়ে পড়ছে। জলের ফোঁটাগুলি লছে। দেখে মনে হয়, গুহার গায়ে রুপার মকি বসিয়ে দিয়েছে। আলো বলতে কেবল াট লণ্ঠনের আলো; তাও তেল বাঁচাবার ন্য সলতে কমিয়ে রাখা হয়েছে। বায়ু লাচলের পথ নেই। কয়লার গুঁড়োতে হাওয়া ারি হয়ে আছে। মাটির ভেতর আপনা থকে যে তাপ জমে থাকে, তারই গরমে জুরদের গায়ে ফোঁটা ফোঁটা কালো ঘাম মেছে। সামনের দিকের 'সেল'গুলি বেশ ড়। তাতে মজুররা সোজা দাঁড়িয়েও শাবল লাতে পারে। কিন্তু ভিনসেণ্ট যত ভেতরে গিয়ে গেল, দেখল 'সেল' ক্রমেই ছোট হয়ে াসছে। ক্রমে সেগুলি এত ছোট হয়ে গিয়েছে যে, মজুরদের মাটিতে শুয়ে কনুইয়ের দ্বারা শাবল চালাতে হয়। সময় যত কাটতে থাকে, মজুরদের গায়ে গরমে সেলের মধ্যে তাপও তত বাড়তে থাকে। কয়লার গুঁড়োয় বাতাসও ততই ভারি হয়ে উঠতে থাকে। শেষে এমন হয় যে, মুখ হা করে গরম কালো গুঁড়ো ভরতি হাওয়া টেনে নেওয়া ছাড়া তাদের আর উপায় থাকে না।

"এই সব লোক দৈনিক আড়াই ফ্রাঙ্ক করে মজুরী পায়। তাও পরীক্ষার ঘাঁটিতে ইন্সপেক্টর কয়লা পরীক্ষা করবে, ভাল বলে সাফাই দেবে, তবে পাবে।" জেক্‌স্ বলল, ভিনসেণ্টকে, "পাঁচ বছর আগে তারা দিনে পাঁচ ফ্রাঙ্ক করে পেত। তারপর থেকে প্রতি বছর মজুরী কমানো হচ্ছে।"

কাঠের ঠেকোগুলিকে জেক্‌স্ বেশ করে পরীক্ষা করল। এর একটা কোনো কারণে সরে গেলে মজুরদের সেখানেই সমাধিস্থ হতে হবে। পরীক্ষার পর সে কয়লা কাটিয়েদের দিকে ফিরে বলল, "তোমার ঠেকো কিন্তু ভাল নয়। ঢিলে হয়ে পড়েছে। আর একটু ঢিলে হলেই ছাদ ধ্বসে পড়বে। যে দুজন শাবল চালাচ্ছে, জবাব দিল তাদের একজন। সে কামীন দলটির মোড়ল। বলল, "ঠেক্‌না লাগাবার মজুরী কে দেবে শুনি? কাজ ফেলে ঠেক্‌না নিয়ে সময় নষ্ট করলে কয়লা তুলব কখন? মরতে হয় মরব। এখানে পাথর চাপা পড়ে মরা আর বাড়িতে গিয়ে না খেয়ে মরা আমাদের কাছে দুই-ই সমান।"

সব শেষের সেলটি ছাড়িয়ে গিয়ে তারা মাটিতে আর একটি গর্ত পেল। এখানে নামবার মইটুকুও নেই। ওপর থেকে আবর্জনা পড়ে নীচের মজুরদের চাপা দিতে না পারে সেজন্য মাঝে মাঝে তক্তা পেতে রেখেছে। ভিনসেণ্টের হাত থেকে বাতিটা নিয়ে জেক্‌স্ সেটাকে কোমরে ঝুলিয়ে দিল। বলল, মসিয়ে ভিনসেণ্ট, খুব আস্তে পা ফেলবে হুঁসিয়ার। আমার মাথায় আপনার পা ঠেকে গেলে কিন্তু পড়ে যাব। একেবারে গুঁড়ো হয়ে যাব।" আঁধারে পা টিপে টিপে তারা আরো পাঁচ মিটার নীচে নামল। গর্তের মাঝে মাঝে আবর্জনা জমে আছে। ধরতে গেলে হাত ফসকে যায়। যে পড়ে যাবে তার আর কোনো চিহ্ন থাকবে না। মাঝে মাঝে কাঠের ধাপ আছে। সেগুলিতে অনুমান করে ঠিক মতো পা দিতে হয়। পথটা এমনি বেয়াড়া।

নীচের স্তরে নেমে আর একটা 'কোঁচ', ওপরের স্তরে যেমন 'সেলে' ঢুকে কয়লা কাটা যায়, এখানে সে রকম নয়। এখানে দেয়ালের গায়ে সরু একটা কোণ থেকে কয়লা কেটে নামান হয়। সেজন্য হাঁটু মুড়ে উঁচু হয়ে শাবল ছুঁড়ে মারতে হয়। পাথরের গায়ে পিঠ ঠেকে থাকে। নড়বার উপায় নেই। এখানে কয়লা খুঁড়বার এই ব্যবস্থা। এখন ভিনসেণ্ট বুঝতে পারল, এখানকার তুলনায় ওপরের 'সেল'গুলি অনেক ঠাণ্ডা; এর চেয়ে সেখানে অনেক আরাম। এই নীচের স্তরে জ্বলন্ত চুল্লীর মতো উত্তাপ। মজুররা এখানে তীর-বেঁধা জন্তুর মতো কেবল হাপাচ্ছে। শুকনো জিব বেরিয়ে এসেছে। কুকুরের জিবের মতো ঝুলছে। তাদের খোলা গায়ে ময়লা ও ধুলোর একটা আবরণ পড়েছে। ভিনসেণ্ট কোনো কাজ করছে না, কেবল দাঁড়িয়ে আছে, তবু তার মনে হচ্ছে এখানকার গরম আর ধুলো সে আর এক মিনিটও সইতে পারবে না। ওরা সাংঘাতিক পরিশ্রম করছে। তার চেয়ে তাদের শ্রান্তি হাজার গুণ বেশী। তবু তারা একটু থেমে বা এক মিনিট জিরিয়ে নিতে পারে না। রোজগার পঞ্চাশ সেণ্ট, তার থেকেও কাটা যাবে।

মৌচাকের খোপের মতো এখানকার 'সেল'-গুলি। সেখানকার ঢোকার রাস্তা উঁচু হয়ে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে হয়। ভিনসেণ্ট ও জেক্‌স্ হাঁটু ও কনুইয়ে ভর দিয়ে সেই ভাবেই চলেছে। ছোট শিকের ওপর দিয়ে মাঝে মাঝে গাড়ি আসছে। পথ ছেড়ে দেবার জন্য দুজনকে প্রতিবারই দেয়ালের গা ঘেঁষে শুয়ে পড়তে হচ্ছে। এই রাস্তা ওপরের রাস্তা থেকে অনেক ছোট। এই রাস্তায় যে মেয়েরা গাড়ি ঠেলে বার করছে, তারাও ছোট। তাদের কারুর বয়স দশ বছরের বেশী নয়। কয়লার গাড়িগুলো বেজায় ভারি। শিকের ওপর দিয়ে ঠেলে আনতে মেয়েদের হিমসিম খেতে হচ্ছে।

পথের শেষ ধারে একটা সিঁড়ি কাত হয়ে লাগানো। সেটা কোনো ধাতুতে গড়া। মসৃণ গাড়িগুলিকে তারে লাগিয়ে তার ওপর দিয়ে নীচে নামানো হয়। জেক্‌স্ বলল, "আসুন, মসিয়ে ভিনসেণ্ট, আপনাকে আমি সবশেষের স্তরে নিয়ে যাব, একেবারে সাতশো মিটার

নীচে। সেখানে এমন কিছু দেখতে পাবেন, যা সংসারে আর কোথাও দেখা যায় না।"

মসৃণ সিঁড়িটিতে বসে তারা পিছলাতে পিছলাতে তেরছা পথে প্রায় ত্রিশ মিটার নীচে নেমে গেল। সেখানে একটা প্রশস্ত ও লম্বা সুড়ঙ্গ পথ। তাতে পাশাপাশি দুখানা গাড়ি চলবার মতো শিক পাতা রয়েছে। সুদূর পথের পিছনের দিক ধরে তারা আধ মাইল পর্যন্ত হেঁটে গেল। এইখানে সুড়ঙ্গ পথ শেষ হয়েছে। এখান থেকে একটা মই বেয়ে কিছু উপরে উঠে, হামাগুড়ি দিয়ে ওপাশে গিয়ে আর একটা গর্তের মধ্যে নামল। গর্তটি নতুন খোঁড়া হয়েছে। জেক্‌স্ বলল, "এটা একটা নতুন কোচ'। এখানে কয়লা তুলতে যা কষ্ট তা পৃথিবীর কোনো খনিতে নেই।"

এই গহ্বরের বারো দিক থেকে বারোটি ছোট গর্ত বেরিয়েছে। তারই একটির মুখে পা দিয়ে জেক্‌স্ বলল, "আমার পিছনে আসুন।" গর্তের মুখ এত ছোট যে, তাতে কোনোমতে ভিনসেণ্টের কাঁধটা মাত্র ঢুকতে পারে। ভিনসেণ্ট তার ভিতরে শরীরটা গলিয়ে দিল; হাতের ও পায়ের আঙুলে মাটি আঁচড়াতে আঁচড়াতে, সাপের মতো বুকে ভর দিয়ে এগুতে লাগল। তার ইঞ্চিতিনেক সামনেই জেক্‌সের পা—কিন্তু অন্ধকারে তাও দেখতে পাচ্ছে না। গুহা-পথ এখানে মোটে দেড় ফুট উঁচু, আড়াই ফুট চওড়া। যে গর্ত থেকে কয়লা খুঁড়তে যাবার পথ শুরু হয়েছে, সেখানে হাওয়া প্রায় নেই বললেই চলে। তবে গুহা-পথটির তুলনায় এখানে বেশ ঠান্ডা।

বুকে হেঁটে এগিয়ে যেতে যেতে একটা ফাঁকা জায়গা পাওয়া গেল। গম্বুজের ভিতরের দিকটি যে রকম ফাঁকা তেমনি। জায়গাটা যে রকম উঁচু তাতে একটা লোক বেশ সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু এত অন্ধকার যে কিছুই দেখা যায় না। ভিনসেণ্ট প্রথমে কিছুই দেখতে পেল না। কিছুক্ষণ পরে তার চোখে পড়ল, একটা দেয়ালের গায়ে চারটে আলোক-বিন্দু; যেন চারটে নীল চোখ মিটমিট করছে। ঘামে তার শরীর ভিজে উঠেছে। চোখের ভুরু থেকে কয়লার গুড়ো ঘামের সঙ্গে চোখের ভিতর ঢুকেছে। বার বার পলক ফেলেও চোখের জ্বালা জুড়ানো যাচ্ছে না। অনেকটা পথ ঢুকে হেঁটে এসেছে বলে তার নিশ্বাস নিতে ভয়ানক কষ্ট হচ্ছিল। এখন ফাঁকা জায়গাতে এসে একটু আরাম পাবে বলে, একটু হাওয়া পেয়ে বাঁচবে বলে সোজা হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু হাওয়া বলে যা সে টেনে নিল, সে যেন হাওয়া নয়, আগুন; গলানো তরল আগুন। ফুসফুসে ঢুকতেই মনে হল বুকের ভিতরটা যেন এখুনি জ্বলে যাবে, গলা থেকে বুক পর্যন্ত একেবারে পুড়ে খাক্ হয়ে যাবে। মার্কাসি খনিতে কয়লা তোলবার যতগুলি গর্ত আছে, তার মধ্যে সামন্ত যুগে মানুষকে নির্যাতন করার জন্য সবচেয়ে খারাপ যে কুঠরীতে ফেলা হত, তার সঙ্গে এই গর্তের তুলনা করা চলে।

হঠাৎ কে যেন চেনা স্বরে বলে উঠল, "আরে! মসিয়েঁ ভিনসেণ্ট, আপনি এসেছেন এখানে? কি ভাবে আমরা দিনে পঞ্চাশ সেণ্ট রোজগার করি, মসিয়েঁ বুঝি তা দেখতে এসেছেন?"

যেখানে চারটি বাতি জ্বলছে, ভিনসেণ্ট তাড়াতাড়ি সেখানে এগিয়ে গেল। বাতিগুলিকে পরীক্ষা করল। বাতিগুলির কোনোটাই ঠিক ভাবে জ্বলছে না, যেভাবে জ্বলছে তাতে কোনো এক সময়ে নিবে যাওয়ার আশঙ্কা আছে।

ডেক্রুক ভিনসেণ্টের কানের কাছে মুখ নিয়ে এল। তার চোখের শাদা অংশ আঁধারে জ্বলজ্বল করছে। বলল, " ও'র এখানে নেমে আসা ঠিক হয়নি।
এই গহ্বরের ভিতরে কাসির চোটে হয়ত তাঁর রক্তপাত শুরু হয়ে যাবে; তখন তাকে খাটিয়ায় করে চাকা ঘুরিয়ে ওপরে তুলতে হবে।"

জেক্‌স ডেকে বলল, "ডেক্রুক্ সারাটা সকাল বাতিগুলি এইভাবেই জ্বলেছে নাকি?"

ডেক্রুক তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে জবাব দিল, "হ্যাঁ, এইভাবেই জ্বলেছে।"

"'গ্রিসো'* যেভাবে দিন দিন বেড়ে চলেছে, তাতে একদিন এখানে বিস্ফোরণ ঘটবে। তখন আমাদের সকল যন্ত্রণা জুড়াবে।"

জেক্‌স বলল, "গত রবিবার না এই সেলগুলি থেকে পাম্প করে ও-সব বের করে দেওয়া হয়েছে।"

"তা হয়েছে। কিন্তু আবার আসে। জানলে, আবার আসে।" বলল ডেক্রুক। মাথার রক্তিম আবটা আরামের সঙ্গে চুলকাতে চুলকাতে বলল।

"তা হলে তোমরা এ সপ্তাহেরই কোন একটা দিন ছুটি নাও, তাহলে আবার আমরা ওটা পরিষ্কার করে দিতে পারি।"

জেক্‌সের এই কথায় কামীনদের পক্ষ থেকে প্রতিবাদের তুমুল ঝড় উঠল: "নিজে খেতে পারি না, ছেলেমেয়েদের খেতে দিতে পারি না। যা তোমরা দাও, তাতেই দিন চলে না। তার উপর বলছ একটা দিন কাজ বন্ধ রাখতে। পরিষ্কার যদি করতে হয় তো রাতে এসে করো, যখন আমরা এখানে থাকব না। আর সবাই যেমন খায়, আমাদেরও তেমনি খেতে হয়, একথা ভুলে যাও কেন?"

ডেক্রুক্ হেসে বলল, "সব ঠিক আছে। খনি আমায় মারতে পারবে না। আগে ও একবার আমাকে মারতে চেয়েছে, পারে নি। আমি যখন বুড়ো হব, তখন বিছানায় শুয়ে মরব। কিন্তু খনিতে মরব না। আর, খাওয়ার কথা যা বললে—এখন কটা বেজেছে ভার্নি?"

জেক্‌স নীল আলোর কাছে ঘড়িটা তুলে দেখল, বলল, ন'টা বেজেছে।"

"উত্তম। এখন আমরা খেতে বসতে পারি।"

কালো, ঘামে-ভেজা এই শরীরী জীবগুলি দেয়ালে ঠেস দিয়ে দিয়ে বসে গেল। যার যার খাবারের পুঁটলি খুলে খেতে শুরু করে দিল। হামাগুড়ি দিয়ে একটু ঠান্ডা জায়গাতে বেরিয়ে গিয়ে খাবার খাবে তারও উপায় নেই, কেননা খাওয়ার জন্য তাদের মোটে পনেরো মিনিট সময় দেওয়া হয়। উবু হয়ে একটু ফাঁকা জায়গায় যেতে আসতেই এই সময় কেটে যাবে। তাই তারা এই বদ্ধ গরমের মধ্যেই বসে পড়ল। দুটুকরা মোটা, শক্ত রুটি বের করল। বের করল গোঁজে যাওয়া একটু পনীর। হাত থেকে কয়লার গুঁড়োমাখা ঘাম শাদা রুটির উপরে পড়ে রুটি ভিজিয়ে দিচ্ছে। বোতলে করে তারা যে কফি এনেছে, তাই খানিকটা ঢেলে রুটি ধুয়ে নিল। দিনে তেরো ঘণ্টা তারা যে হাড়-ভাঙা খাটুনি খাটছে, তার পুরস্কার হচ্ছে কফি, রুটি, আর টক পনীর।

ভিনসেণ্ট অনেকক্ষণ হয় নীচে নেমেছে। প্রায় ছ'ঘণ্টা কেটে গিয়েছে এরই মধ্যে। হাওয়ার অভাবে তার মূর্ছা যাওয়ার উপক্রম হল; ধুলোয় ও গরমে তার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছে। তার বোধ হল, এই নির্যাতন সে আর দু'মিনিটও সহ্য করতে পারবে না। ঠিক এই সময়েই জেক্‌স জানালো এখুনি তারা ওপরে যাবে। শুনে তার প্রতি ভিনসেণ্টের কৃতজ্ঞতা জাগলো।

গর্তে ডুব দেবার আগে জেক্‌স ডেকে বলল, "শোনো ডেক্রুক, ঐ 'গ্রিসো'র দিকে ভালো করে নজর রেখো। যদি কিছু খারাপ দেখ, তাহলে বরং তোমার দল নিয়ে তুমি বাইরে চলে এসো।"

শুনে ডেক্রুক হেসে উঠল। বড় কর্কশ লাগলো সে হাসি। বলল, "বেরিয়ে আসতে বলছ! কিন্তু কয়লা না তুলে বেরিয়ে গেলে পঞ্চাশ সেণ্ট দিন-মজুরিটা আমাদের কে দেবে শুনি?"

এ জিজ্ঞাসার কোন জবাব নেই। ডেক্রুকও জানে, জেক্‌সও জানে, এ প্রশ্নের জবাব কেউ দিতে পারবে না। জেক্‌স কাঁধ গুঁজে গর্তে ঢুকে পড়ল, বুকে হেঁটে চলতে লাগল সেটা পেরোবার জন্য। কয়লামাখা কালো ঘামে ভিনসেণ্টের চোখ দুটি প্রায় কাণা হয়ে গিয়েছে। তবু এই চোখ নিয়েই সেও জেক্‌সের পিছু পিছু বুকে ভর করে এগিয়ে চলল।

তারা আধ ঘণ্টা ধরে হেঁটে চলল। তারপর যেখানে কয়লা ও কামীনদের ওপরে তুলবার

* 'গ্রিসো' (Grisou) এক রকম মারাত্মক গ্যাস।

...য় 'খাঁচা'তে পোরা হয়, সেখানে এসে ...েছিলো। একটা গহ্বার ভেতর গিয়ে ...ক্স কেসে খানিকটা কালো থুথু বের করে ...ল।

'খাঁচা'য় করে তীরের বেগে ওপরে উঠবার ...য়ে ভিনসেণ্ট বন্ধুর দিকে ফিরে বলল, ...সিয়ে, একটা কথা আমায় ভেঙে বলুন। ...পনারা খনিতে কাজ করেন কেন? এমন ...র্বনাশা কাজ নাই-বা করলেন। সবাই মিলে ...পনারা চলে যান না আর-কোনখানে; আর-...ান কাজের চেষ্টা করুন না গিয়ে?"

"হায় ভিনসেণ্ট ভাই, আমাদের যে আর ...নখানে চলে যাব সে উপায়ও নেই, কেননা, ...ব যে টাকা কোথায়। সারা 'বরিনেজে' এমন ...কটি কুলি-পরিবার পাবেন না যার হাতে দশটা ...ঙ্কও জমেছে। কিন্তু যাওয়ার সংস্থানও যদি ...কতো তবু আমরা যেতাম না। জাহাজে কত ...কম বিপদ ঘটে, নাবিক তা জানে, তবু সে ...খন ডাঙগায় থাকে, সাগরে ফিরে যাবার জন্য ...ন চঞ্চল হয়ে পড়ে; যতক্ষণ না যেতে পারে ...তক্ষণ তার শান্তি নেই। মসিয়ে, আমাদেরও ...য়েছে সেই দশা। খনিকে আমরা ভালবাসি। ...পরে থেকে আমরা সোয়াস্তি পাই না; ভিতরে ...া যাওয়া পর্যন্ত আমাদের শান্তি নেই। ...কন্তু তার জন্য আমরা বেশি কিছু তো চাইনে, ...াই কেবল দুটি খাওয়া পরার মতো মজুরি; ...মার চাই, আমরা যে মানুষ, সেইটে মনে করে ...মামাদের কাজের সময় বেঁধে দিক; আর ...বপদ আপদ যাতে কম ঘটে তার ব্যবস্থা ...রুক। আমাদের দাবী তো কেবল এইটুকু।"

'খাঁচা' ওপরে এসে থামল। প্রাঙগণে বরফ ...মেছে। মৃদু রোদ পড়েছে তার উপর। ...ভনসেণ্ট তার ওপর দিয়ে ওয়াশিং রুমে এলো। এ-ঘরে হাত মুখ ধোওয়ার ব্যবস্থা। সেখানে ...আয়নাতে নিজের মুখ দেখল। মুখ আল-...কাতরার মতো কালো হয়ে গিয়েছে। মুখ ...ধোওয়ার জন্য দেরী না করে সোজা ময়দানে ...নেমে পা চালিয়ে দিল। এতক্ষণ চেতনা হারিয়ে ...ফেলেছিল। মুক্ত হাওয়াতে নিঃশ্বাস টেনে, ...মাত্র অর্ধেক চেতনা ফিরে পেয়েছে। তার ভয় হল, তার আবার সান্নিপাতিক জ্বর না হয়ে পড়ে; দুঃস্বপ্ন দেখে ঘন ঘন তাকে চীৎকার করতে না হয়। কিন্তু ভগবান কি তাঁর সন্তান-দের এই নারকীয় দাসত্ব করতেই সংসারে পাঠিয়েছেন? তাই কি ঠিক? তা যদি না হয়, তবে এতক্ষণ ধরে কি-সে যা দেখে এসেছে তার সব কিছুই কি একটা স্বপ্ন মাত্র?"

পথে ডেনিসদের বাড়ি পড়ে। টাকাওয়ালা লোকের বাড়ি বলতে সারা পল্লীতে কেবল এই একটি বাড়ি। বাড়িটিকে পাশে রেখে ভিনসেণ্ট ডেক্রুকের কুঁড়ের দিকে এগিয়ে চলল। আন-মনাভাবে পা ফেলতে খাদের আঁকাবাঁকা রাস্তায় পা বেধে তাকে কয়েকবার হোঁচট খেতে হল। ডেক্রুকের ঘরের কড়া নেড়ে প্রথমে কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। কিছুক্ষণ পর একটি ছ' বছরের ছেলে বেরিয়ে এল। তার রঙ পাণ্ডুর, শরীরে রক্ত নেই, বয়স বেড়েছে কিন্তু সেই অনুপাতে শরীর বাড়েনি। তবু তাকে দেখলে মনে হয়, ডেকরুকের তেজ ও সাহস তার মধ্যেও খানিকটা রয়েছে, আর দুবছর পরেই সেও মার্কাসিতে নামবে। রোজ ভোরে তিনটেয় নামবে, তার কাজ হবে কোদাল দিয়ে কয়লা তুলে গাড়ি বোঝাই করা।

ছেলেটি সরু গলায় জোর দিয়ে বলল, "মা টিলাতে কয়লা কুড়াতে গেছে। আপনাকে একটু দেরী করতে হবে মসিয়ে ভিনসেণ্ট। আমি ভাইবোনদের নিয়ে খেলায় ব্যস্ত। আপনি বসুন।"

কয়েকটা কাঠের টুকরো আর খানিকটা লোহার তার নিয়ে ডেক্রুকের দুটি শিশু ঘরের মেঝেতে খেলা জমিয়েছে। শীতে এদের শরীর নীল হয়ে উঠেছে। যে ছেলেটি বয়সে সকলের বড়ো, সে উনুনে টিলা থেকে কুড়োনো কয়লা গুঁজে দিচ্ছে, কিন্তু তাতে মোটে তাপ বেরুচ্ছে না। শিশুদের এই অবস্থায় দেখে ভিনসেণ্ট ভয়ে কেঁপে উঠল। সে তাড়াতাড়ি শিশুদের বিছানায় শুইয়ে তাদের গলা পর্যন্ত ঢেকে দিল। কি মনে করে সে এখানে এসেছে, শোচনীয় অবস্থার এই খুপরির মধ্যে মাথা গলিয়েছে, তা সে নিজেই জানে না। বার বার একথাটিই তার মন তোলপাড় করছে যে, তাকে কিছু একটা করতেই হবে। ডেক্রুকদের মতো যাদের দুঃখ কষ্ট কল্পনার বাইরে চলে গিয়েছে, তাদের জ্বালাযন্ত্রণা কেবল দর্শকের মতো দেখে গেলেই চলবে না। যে-কোনো উপায়ে তাদের সাহায্য করতে হবে। তাকে একথা তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে যে, তাদের দুঃখকষ্ট সে অন্তত হৃদয় দিয়ে পুরাপুরি অনুভব করেছে।

মাদাম ডেক্রুক বাড়ি এলো। তার হাত মুখ সব কালিময়। ভিনসেণ্টেরও কালিমাখা বেশ। এজন্য মাদাম ডেকরুক প্রথমে তাকে চিনতে পারেনি। একটি ছোট বাক্সে তাদের খাওয়ার জিনিস রাখা হয়। সে তাড়াতাড়ি তার থেকে কিছু কফি বের করে উনুনে চড়িয়ে দিল। তারপর তা নামিয়ে ভিনসেণ্টকে খেতে দিল। কফি মোটেই গরম হয়নি। তার ওপর কালো, আর তেতো, ওপরে কাঠের গুঁড়োর মতো ভাসছে। সেবাপরায়না নারীটিকে খুশি করার জন্যই ভিনসেণ্ট কফিটুকু খেয়ে ফেলল।

মাদাম ডেক্রুক বলল, "আজকাল টিলাতে যে কয়লা পাওয়া যায়, তা অত্যন্ত খারাপ। কোম্পানী কিছুই এখন আর ফেলে না, কয়লার গুঁড়ো পর্যন্ত না। শিশুদের কি দিয়ে গরম রাখব বলুন। কাপড়চোপড় কিছু নেই। কেবল ওই ছোট সার্ট ক'খানা আর খানিকটা চট এই তো সম্বল। চট গায়ে দিলে তার ঘষা লেগে ওদের চামড়া উঠে যায়; যন্ত্রণা হয়; ওরা সইতে পারে না। ওদের সারা দিনরাত বিছানায় শুইয়েও তো রাখতে পারিনে; দিনরাত শুইয়ে রাখলে ওরা বাড়বে কি করে!"

চাপা কান্নায় ভিনসেণ্টের গলা বুজে আসছিল। সে কিছুই বলতে পারল না। মানুষের এত শোচনীয় দুঃখ কষ্ট কোনো দিন সে দেখেনি। আজ প্রথম তার চিত্তে এই সন্দেহ দোলা দিল যে, কাপড়ের অভাবে যে নারীর কোলের শিশু পর্যন্ত শীতে মরে যায়, তার কাছে প্রার্থনার কি দাম? বাইবেলের ধর্মবাণী তার কী উপকারে আসবে? এইসব দেখেও ভগবান কেন চুপ করে আছেন? তার পকেটে যা কিছু ছিল মাদাম ডেক্রুকের হাতে তুলে দিল। বলল, "এই দিয়ে শিশুদের পশমী কষ্ট পাবে।

কিন্তু এ দানের মূল্যে কতটুকু? দেশ-জোড়া দুঃখদৈন্যের মাঝে তার এই সামান্য দান কী কাজে লাগবে? 'বরিনেজে' আরো তো শত শত শিশু এমনভাবে শীতে কুকড়ে যাচ্ছে। এই পশমী গেঞ্জি যখন ছিঁড়ে যাবে ডেক্রুকের ছেলেরা তখন আবার শীতে কষ্ট পাবে।

সেখানে আর দাঁড়িয়ে না থেকে সোজ ডেনিসদের বাড়িতে চলে এল। রুটির উনুনটা তখনো বেশ গরম আছে। মুখ হাত ধোওয়ার জন্য মাদাম ডেনিস তাকে খানিকটা জল গরম করে দিলেন। গত রাত্রে খানিকটা মাংস রেখে দিয়েছিলেন। বেশ পরিপাটি করে 'স্টু' রেঁধে তাকে খেতে দিলেন। আজকে অভিজ্ঞতায় সে খুব ক্লান্ত ও বিচলিত হয়েছে দেখে তিনি তার রুটিতে একটু বেশি করে মাখন মাখিয়ে দিলেন।

(ক্রমশঃ

# ইন্দ্রজিতের চিঠি —

## আত্মচরিত

আমি এক রকম স্থির করেই ফেলেছি যে, আত্মচরিত লিখব না। আপনারা নিশ্চয় মনে মনে বলছেন—তুমি বাপ্‌ এমন কি ধনুর্ধর ব্যক্তি যে তোমার জীবন কাহিনী শুনবার জন্য আমরা বড় ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। ব্যস্ত আপনারা নন, ব্যস্ত আমি। খ্যাতনামাদের জীবন-চরিত লিখবার জন্য কত লোক ব্যগ্র হয়ে আছে, কিন্তু আমি জানি আমার জীবন কাহিনী আমি নিজে না বললে আর কেউ বলবে না। তথাপি আমি যে আত্মচরিত লিখবার সংকল্প ত্যাগ করেছি তার কারণ এই নয় যে, আমার জীবনে আত্মচরিত লিখবার মতো মালমসলা যথেষ্ট পরিমাণে নেই। আর সত্যিকারের আত্মচরিতে মালমসলার তেমন প্রয়োজনও আমি দেখিনা। আমি কি করেছি তার চাইতে আমি কি ভেবেছি তাই নিয়েই আমার চরিত কথা অর্থাৎ আত্মচরিত জিনিসটা কর্মকাহিনী নয় মর্মকাহিনী। অপরে যখন আমার জীবন-চরিত লিখবেন তিনি দেখবেন আমার বাইরের দিকটা, কর্মে যার প্রকাশ। আর আমি যখন নিজের কথা বলব তখন নিজেকে দেখব অন্তরের দিক থেকে। সে জিনিসটা নিছক কর্মতালিকা হতে পারে না। আমি যে আমার নিজেকে অপরের চাইতে ভালো করে জানি এইটি প্রমাণিত না হলে আত্মচরিত লেখার কোন সার্থকতা আমি দেখি না।

জীবনচরিত বা আত্মচরিতের লেখককে প্রধানত সাহিত্যিক হতে হবে। এদিক থেকে ঔপন্যাসিক এবং জীবনচরিত লেখকের মধ্যে বিশেষ তফাৎ নেই। উপন্যাস কাল্পনিক নায়কের কাহিনী, জীবন-চরিত বাস্তব নায়কের। নায়ককে জীবন্ত করে দেখতে হলে কেবলমাত্র উপকরণের উপরে নির্ভর করলে চলে না, প্রচুর কল্পনাশক্তি এবং সাহিত্যিক প্রসাদগুণ প্রয়োজন। হিটলারের বিরাট ব্যক্তিত্ব এবং কর্ম-কুশলতা কেউ অস্বীকার করতে পারেন না; কিন্তু যাঁরা 'মাইন কামফ্‌' নামক গ্রন্থ পাঠ করেছেন তাঁরা স্বীকার করবেন যে, উক্ত গ্রন্থ বহুলাংশে অত্যন্ত নীরস পাঠ্য। তার কারণ হিটলারের সাহিত্যিক প্রতিভা বিন্দুমাত্রও ছিল না। সেদিক থেকে হিটলারের জ্ঞাতিভ্রাতা মুসোলিনি তাঁর চাইতে শ্রেষ্ঠ। মুসোলিনি আত্মচরিত লিখবার আগে উপন্যাস লিখে হাত পাকিয়েছিলেন।

লিখবার আর্ট জানা থাকলে যে কোন ব্যক্তি তাঁর জীবন কাহিনী লিখতে পারেন, এবং সে কাহিনী সুখপাঠ্য হতে বাধ্য। অখ্যাত অজ্ঞাত চাষী কিম্বা মজুরের জীবন-কাহিনী নিয়ে যেমন প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস রচনা সম্ভব এও তেমনি। আত্মচরিত লেখককে খ্যাতনামা ব্যক্তি হতেই হবে এমন কোনো নিয়ম শাস্ত্রে লেখা নেই। একজন ইংরেজ লেখকের আত্মচরিত পড়েছিলাম। সে বইএর নাম—Myself not least—অর্থাৎ আমি কিছু ফ্যালনা লোক নই। সত্যি কথাই তো—সংসারে কেউ ফ্যালনা লোক নয়, সবার জীবনেই উল্লেখযোগ্য ব্যাপার আছে এবং সেই কারণে সবাই আত্মচরিত লিখবার অধিকারী।

অতএব—নাহি আমি অকিঞ্চন ব্যক্তি—ইত্যাকার কোনো নাম দিয়ে যদি আমার আত্মচরিত লিখতে শুরু করে দিই তাতে অপরের কোন আপত্তির কারণ থাকতে পারে বলে আমি মনে করিনে। প্রত্যেকের জীবন কাহিনীই Experiments with life. আবার lifeএর চাইতে বড় সত্য আর নেই, কাজেই জীবন-চরিত মাত্রই Experiments with truth.

আমার মতে স্বনামখ্যাত ব্যক্তিদের আত্মচরিত লিখবার কোনই প্রয়োজন নেই। তাঁদের সমগ্র জীবন দেশের এবং দশের সম্মুখে প্রসারিত। প্রতিদিনের সংবাদপত্রই তাঁদের ধারাবাহিক জীবন-কাহিনী—ক্রমশ প্রকাশ্য। জওহরলালের আত্মচরিতে তাঁর ছেলেবেলার ফাউন্টেন পেন চুরির কাহিনীটি ছাড়া জ্ঞাতব্য তথ্য কমই আছে যা আগে থেকে আমাদের জানা ছিল না। মহাত্মাজীর আত্মচরিত সম্বন্ধেও ঐ কথাই বলা যেতে পারে। বাল্যকালের দু একটি কৌতুকময় কাহিনী ছাড়া তাঁর জীবনের আর সব তথ্যই পূর্বাহ্নে সাধারণের সম্পত্তি হয়ে গিয়েছিল। তথাপি সাহিত্যিক প্রসাদগুণ আছে বলে এসব বই অতিশয় সুখপাঠ্য। তা যদি না থাকত তবে এঁদের জীবন-কাহিনীও as tedious as a twice told tale হয়ে যেত।

মহাপুরুষদের বাল্যলীলায় এক আধটু চৌর্যবৃত্তি এবং মিথ্যাচারের উল্লেখ অনেকটা যেন নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। মহাত্মাজী গোপনে গয়না বিক্রি করে দোকানের দেনা শোধ করেছিলেন, আত্মচরিতে সে কথাটির উল্লেখ করেছেন। ব্যক্তিগতভাবে এ ধরণের Confession জাতীয় উক্তিতে আমার আস্থা নেই। ভবিষ্যৎ জীবনের সঙ্গে এসব ঘটনার খুব একটা যোগ আছে বলে আমি মনে করিনে। ফাউণ্টেন পেন চুরি না করলেও জওহরলাল যা হবার তাই হতেন। ছেলেবেলায় রত্নাকর না হলে উত্তরকালে বাল্মীকি হওয়া যায় না এ ধারণা অনেক পাঠকের মনে বদ্ধমূল হয়ে আছে। আমি যে আত্মচরিত লিখবার সংকল্প ত্যাগ করেছি এও তার একটা কারণ। ছেলেবেলায় আমি কোন জিনিস চুরি করিনি এমন কথা হলপ করে বলতে পারিনে। কিন্তু স্মৃতি বিভ্রমের দরুণ সে সব কথা আমি ভুলে গিয়েছি। কাজেই আমার আত্মচরিতের শুরুতেই মস্ত বড় একটা ফাঁক থেকে যাবার আশংকা আছে। চুরির কথা উল্লেখ না করলে পাঠকরা গোড়াতেই ধরে নেবেন লোকটা ফাঁকি দিচ্ছে। ছেলেবেলায় চুরি করনি তো আত্মচরিত লিখতে বসেছ কোন্‌ সাহসে?

আমার বালককাল যে পরিমাণে নিষ্কলংক ঠিক সেই পরিমাণে নিষ্প্রভ। ওখানটায় আত্মচরিতসুলভ প্রাথমিক stuntএর যথেষ্ট অভাব। রবীন্দ্রনাথের মতো ইস্কুল পালাতে পারলেও না হয় কথা ছিল। দুঃখের বিষয় তাও করিনি। সত্যি কথা বলতে কি, ছেলেবেলায় ইস্কুল আমার ভালই লেগেছিল। রবীন্দ্রনাথ যে কোন পরীক্ষা পাশ করেননি সে কথা এমন প্রচ্ছন্ন গর্বের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন যে আমাদের মতো তিনটি চারটে পাশ দেওয়া ব্যক্তিদের মাথা আপনি হেঁট হয়ে আসে। সুভাষচন্দ্রের মতো কলেজ থেকে বিতাড়িত হতে পারলে অবশ্য আর কথাই ছিল না। এক ঢিলেই অনেক পাঠককে ঘায়েল করতে পারতুম। বেশ বুঝতে পারছি এসব রোমাঞ্চের অভাবে আমার আত্মচরিত পাঠক মহলে মোটেই পাঠরোচক হবে না। ছেলেবেলায় অত্যন্ত সুবোধ বালক হতে গিয়ে ভবিষ্যৎ একেবারে মাটি করে দিয়েছি। বাস্তবিক পক্ষে ভালো মানুষ হওয়ার মতো দুর্দৈব সংসারে আর নেই।

মহাপুরুষদের আত্মচরিত সম্বন্ধে আমার একটি অভিযোগ আছে। এঁরা নিজ নিজ বাল্যকাল সম্বন্ধে অত্যন্ত কার্পণ্য দেখিয়েছেন। দু একটা অসংলগ্ন ঘটনার উল্লেখ করেই জীবনের আদিকাণ্ড শেষ করেছেন। আদিকাণ্ডটা যে সপ্তকাণ্ডের একটা বিশেষ কাণ্ড একথা এঁরা ভুলে যান। ইদানীং বোধ করি, এর প্রয়োজনীয়তা এঁরা বুঝতে পেরেছেন। অল ইণ্ডিয়া রেডিয়ো থেকে 'মেরা বাচ্‌পন' নামে যে বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়েছে তাতেই তার প্রমাণ।

বাল্য ইতিহাস লিখবার প্রধান সার্থকতা এই যে, সাধারণ পাঠক তা থেকে বুঝতে পারবেন যে এঁরা একেবারে রেডি মেড্‌ মহামানব হয়ে ধরাধামে অবতীর্ণ হননি। দায়ে পড়লে আমাদের মতো এঁরাও চুরি করেছেন, মিথ্যে কথা বলেছেন। তবে উত্তরকালে এঁরা যে সাধু হয়েছেন সেটা দায়ে পড়ে হননি, নিজগুণে হয়েছেন। আমরা যদি বা সাধু হয়ে থাকি, হয়েছি দায়ে পড়ে। সেজন্যই আমরা মহাপুরুষ নই।

আমাদের দেশে একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোনো মহাপুরুষ আলাদা করে বাল্য-জীবনের ইতিহাস লেখবার প্রয়োজন বোধ করেননি। এই ধরণের লেখার একটি বিশেষ সৌন্দর্য আছে। এই স্বল্প-পরিসর আত্মচরিতে বালখিল্য ব্যক্তিটি নিজে অকিঞ্চন পাত্র। তাঁর চোখে আর সবাই হিরো। 'ছেলেবেলা' নামক গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ হিরো নন, হিরো ব্রজেশ্বর। অন্তত অনেক হিরোর মধ্যে ব্রজেশ্বর অন্যতম।

## ধ ঘরেই পরম শান্তি!

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে নিউইয়র্কের ব্রুকলিন ...লের পল্ মাকুশাক তার মাকে বলে যে, ... যেন তাকে ছ' ফুট খাড়াই আর তিন ফুট ... একটা ঘরের মধ্যে চারিদিক থেকে বন্ধ
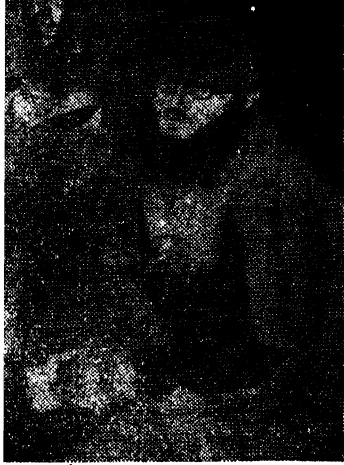
অন্ধকার ঘরের বন্দী পল্ মাকুশাক

...র রেখে দেন। তবেই তার সুখ শান্তি ...। পলের মা ছেলের এই ব্যাকুল দাবী ...ন নিয়ে তাকে ঐ রকম একটি অন্ধকার ...ই আবদ্ধ করে রাখেন। গত দশ বছর সে এই ...র মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। শুধু ঘরের ...দের ওপরের একটা গর্ত দিয়ে তাকে ...তদিন খাবার দেওয়া হতো। পল তার ঐ ... ঘরে দশটি বছর কাটিয়েছে, রেডিও শুনে ...র সামান্য কিছু পড়াশুনো করে। কিন্তু ... আর পলের মা ছাড়া এ ব্যাপারটা সেখানে ...র কেউ জানতে পারেনি। কিছুদিন আগে ...লের মাকে যখন অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ...তে হয়, তখন তিনি তাঁর প্রতিবেশিনী ...সেস এল সি কোবালিস্কিকে ডাকিয়ে গোপনে ... কথা জানিয়ে তাঁর ওপরই পলকে রোজ ...তে দেওয়ার ভার দিয়ে যান। মিসেস ...াবলিস্কি পুলিশকে এই রহস্যময় খবরটি ...নান এবং পুলিশ এসে দেওয়াল ভেঙে দশ ...র পরে পলকে ঐ বন্ধ ঘর থেকে বার করে ...নেন। পলের বয়স এখন তেত্রিশ বছর ...ভাবে আবদ্ধ থাকায় তার নখ, চুল দাড়ি বেড়ে ...য়ে অদ্ভুত চেহারা হয়েছে। সত্যিই পল ...ন অপরাধী না পাগল এই নিয়ে গবেষণা ...হে। কিন্তু পলকে বার করে আনার পর ...ল নাকি বলেছিল আমি আমার গুহায় ফিরে ...তে চাই—এই পৃথিবী ভাল নয়, ভাল নয়, ...ল নয়।

## ...ৃষ্টির প্রার্থনায় অনাসৃষ্টি

কলাম্বিয়ার বোগোটা বলে জায়গাটিতে নাবৃষ্টি ঘটায়—সেখানকার অধিবাসীরা এক ...র্থনা সভায় সমবেত হয়ে বৃষ্টির জন্য এক

উপাসনা অনুষ্ঠান করে। ফলে, কদিন পরেই সেখানে এমন বৃষ্টি হয় যে, বন্যার জলে ভেসে যাওয়া প্রায় ৫০টি পরিবারকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য সেখানকার অধিবাসীরা স্থানীয় সৈন্যবাহিনী ও রেড ক্রশ বাহিনীকে ডেকে পাঠাতে বাধ্য হয়েছিল। ভগবান উপাসনা-কারীদের উপাসনায় নিশ্চয়ই কিছুটা বেশী পরিমাণে খুশি হয়েছিলেন—তা না হ'লে বৃষ্টির প্রার্থনায় এই অনাসৃষ্টি।

## টেলিভিশনের সাহায্যে অস্ত্রোপচার দেখানো

লণ্ডনের গাইস্ হাসপাতালে গত ১১ই মে তারিখে টেলিভিশন যন্ত্রের সাহায্যে এক এপেণ্ডিসাইটিস্ রোগীর উপর অস্ত্রোপচার কিভাবে হচ্ছে, তা অস্ত্রোপচারের টেবিল থেকেই দেখানো হয়েছে। অস্ত্রোপচারের ঘরের ঠিক ওপরের ঘরটিকে ৪০ জন চিকিৎসাবিদ্যার ছাত্রকে টেলিভিশনের পর্দায় ব্যাপারটা গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত অদ্ভুত উপায়ে দেখানো হয়েছে। অর্থাৎ এই ব্যবস্থায় অস্ত্রোপচারের ঘরে ছাত্রদের ঠেলাঠেলিটা আর করতে হয়নি। অস্ত্রোপচারের ছবি টেলিভিশনে প্রতিফলিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শোনা যাচ্ছিল যে, সার্জেনটি অপারেশন করছিলেন।—তাঁর নিজের মুখের কথায় আবহ বর্ণনা। এই ব্যবস্থা করার জন্য 'অপারেশান থিয়েটার বা অস্ত্রোপচার ঘরে টেলিভিশনের গ্রাহক যন্ত্র ও ক্যামারা বহু বুদ্ধি খাটিয়ে ও রীতিমত পয়সা খরচ করে বানাতে হয়েছে। টেলিভিশনে বিশেষ রকম আলোর ব্যবহার হয় বলে কয়েকটি যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের সাদা রঙ বদলে সবুজ রঙ করে নিতে হয়েছিল।

## ডাকাতের ভদ্রতা জ্ঞান!

এক খবরে জানা গেছে যে, কয়েকদিন আগে এক রাত্রে ব্রুকলিনের এক কেরানী—হ্যারী জ্যাকের শোবার ঘরে দু'জন ডাকাত ঢোকে এবং তারা তার ঘরের অলঙ্কার ও মণি মানিক চায়, তারা বলে যে, "আমরা শুনেছি তোমার হীরে জহরতের ব্যবসা আছে"—জ্যাক জোর দিয়ে বলে—খবরটা ঠিক নয়। তবু তারা জ্যাকের মনিব্যাগ কেড়ে নেয় এবং তার স্ত্রীর হাত থেকে আঙটিগুলি খুলে নেয়। জ্যাক এর প্রতিবাদ জানায়। সঙ্গে সঙ্গে একজন ডাকাত বেশ বিনয়ের সঙ্গে বলে—"সত্যিই তো! এই সামান্য জিনিসগুলো নিয়ে বেকুব বনতে তো আমরা আসিনি—মাপ করবেন এই অসুবিধাটুকু ঘটানোর জন্য। এই বলে ডাকাত দুটি জিনিসগুলি ফিরিয়ে দিয়ে সরে পড়ে।
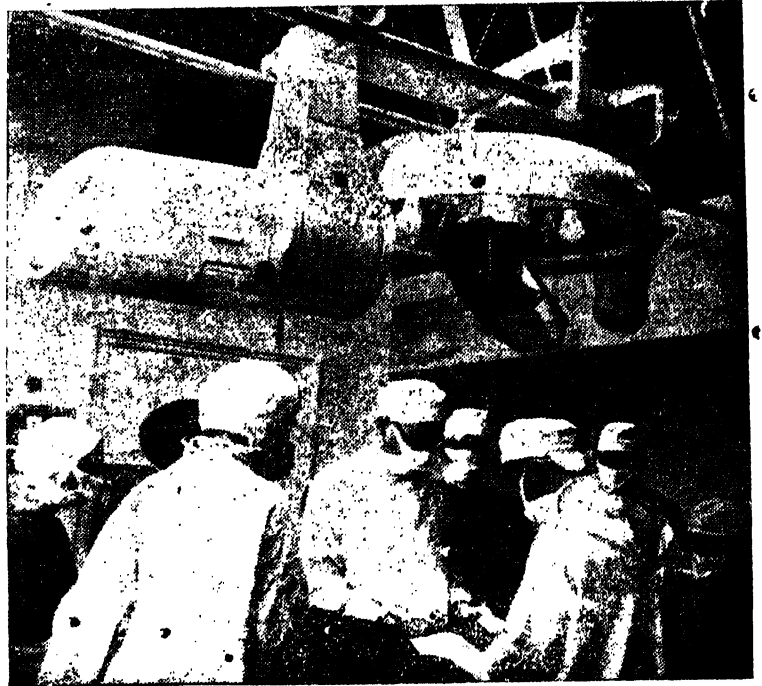
টেলিভিসন যন্ত্রের সাহায্যে অস্ত্রোপচারের খুঁটিনাটি দেখানোর ব্যবস্থা

মোহনবাগান পর পর দুইটি খেলায় ভবানীপুর ও এরিয়ান্সের কাছে পরাজিত হইয়াছে। সহযোগী স্টেটসম্যান বলিতেছেন—গোল্ করার দিকে মন না দিয়া খেলায় অতিরিক্ত কারদানি দেখাইতে গিয়াই এই বিপর্যয় হইয়াছে। বিশু খুড়ো বলিলেন—"তা হোক, কিন্তু প্রতিপক্ষের পেনাল্টি সীমানার মধ্যে সারাক্ষণ খেলে গোল না করার বাহাদুরীটাকে কি সহযোগী এতই সহজ মনে করেন, একবার চেষ্টা করে দেখুন না!"

* * *

প্রসংগত বাহির হইতে খেলোয়াড় আমদানীর কথাটাও আসিয়া পড়ে। আমরা স্থানীয় দলগুলির এই মনোভাবের বিরুদ্ধে মন্তব্য করিতেছিলাম। বিশু খুড়ো বলিলেন—"এখানে বাইরের জিনিসেরই নাম ও দাম—আমাদের দ্বারভাণ্গার আম চাই, বেনারসের শাড়ি চাই, সিলেটের নেবু চাই,

মজঃফরপুরের লিচু চাই, মুলতানী ষাঁড় চাই—আর খেলোয়াড়ের বেলাই হবে বাঙলার খেলোয়াড়, সে কি আর একটা কথা হলো?"

* * *

আমেদাবাদে "সর্দার প্যাটেল স্টেডিয়াম" স্থাপনের তোড়জোড় চলিতেছে। "What India is doing today Bengal will think day-after tomorrow—" —বলা বাহুল্য, এই মন্তব্যও খুড়োর।

* * *

আমাদের শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আজাদ ছোটদের আসরে বলিয়াছেন, তিনি ছোট বেলা কোন স্কুল-কলেজে যান নাই। —"ছোটরা নিশ্চয়ই মনে করেছে, পরীক্ষা পাশের জন্যে অসাধু উপায় অবলম্বন না করে যে উপায় নেই, সে কথাটা মন্ত্রী মশাই তাহলে কি করে

আর জানবেন"—মন্তব্য করিলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * * *

মাদ্রাজ প্রদেশে সিনেমা ও থিয়েটার হাউসগুলিতে ধূমপান নিষিদ্ধ হইয়াছে। শুনিলাম, অবিলম্বে এই আদেশ

শহরেও প্রযুক্ত হইবে। আমরা বলি—বিলম্বের প্রয়োজন কি, শুভস্য শীঘ্রম্। আর এই সংগে খাঁটি ও অকৃত্রিম ভারতীয় নস্য গ্রহণকে বাধ্যতামূলক অভ্যাস বলিয়া ঘোষণা করিলেই ভারত আবার মহিমায় সমুজ্জ্বল হইয়া ওঠে—"এবং এই সংগে নস্যের দেশ মাদ্রাজও"—শেষের কথাটা জুড়িয়া দিল শ্যামলাল।

* * *

একটি সংবাদে জানা গেল, বোম্বাই সরকার কলিকাতার মত টেলিফোনে "কল্" পিছু চার্জের ব্যবস্থা করিয়াছেন। —"কিন্তু কোলকাতার মতো কল্-পিছু wrong number পেলে কি করবেন?"—প্রশ্ন করেন বিশু খুড়ো।

* * *

কলিকাতায় সম্প্রতি একটি মেয়ে পুলিশ বাহিনী গঠিত হইয়াছে। আমরা তাঁদের কার্যকলাপ না দেখা পর্যন্ত অভিনন্দন জ্ঞাপনে বিরত হইলাম। "টেলিফোন বাহিনীকে" আগে-ভাগেই অভিনন্দন জানাইয়া একবার ঠকিয়াছি কিনা তাই!!

* * *

সামরিক সরবরাহ বিভাগের পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত নিশাপতি মাঝি হোটেলওয়ালাদের এক সভায় বলিয়াছেন—হোটেলে চোরাকারবার ও অত্যধিক মূল্য গ্রহণের অভিযোগ সম্বন্ধে সরকার তদন্ত করিতেছেন। —শ্রীযুক্ত মাঝি জানেন কিনা জানি না, সাধারণ হোটেলে ডাল পরিবেশন করিয়া নাকি বলিয়া দিতে হয়, সেটা কোন্ শ্রেণীর ডাল; কেননা, গংগার অতলতল হইতে ডালের প্রকৃত পরিচয় উদ্ধার করা ভোক্তার কর্ম নয়; — এদিক হইতে কোন সরকারী তদন্ত হইতেছে কি?

* * *

"ভারত দেশ, গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য সবই আমাদের আছে, শুধু একটি গুণ আমাদিগকে অর্জন করিতে হইবে, সেটি হইতেছে—পরস্পরের উন্নতিতে নিজেকে খুশি মনে করা"—বলিয়াছেন হাই-কমিশনার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ মেনন। বিশু খুড়ো বলিলেন—"পারস্পরিক উন্নতিতে সুখী মনে করার কথাটা যারা ট্রামে-বাসে চ'ড়ে দশটা-পাঁচটা করে তাদের জন্যে নয়। রাষ্ট্রপাল, প্রদেশপাল, প্রধান মন্ত্রী, সাধারণ মন্ত্রী, রাষ্ট্রদূত-হাই-কমিশনাররা এই গুণটি অর্জন করুন।"

* * *

পূর্ব-পাকিস্তানের এক সংবাদে প্রকাশ যে, ৫ সমস্ত পাঠ্য পুস্তক হইতে হিন্দু সংস্কৃতিমূলক বিষয়বস্তু নির্বিচারে বাদ দেওয়া হইয়াছে। সংবাদদাতা বলিতেছেন—রবীন্দ্রনাথের 'অপমান' কবিতাটি পর্যন্ত বর্জন করা

হইয়াছে। শ্যাম বলিল—"কাজে কাজেই, যাদেরে অপমান করেছ, অপমানে তাদের সমান হতে বলা যে রাজদ্রোহেরই সামিল!!"

* * * * *

"New words in English dictionary" — একটি সংবাদের শিরোনামা। বিশু খুড়ো বলিলেন—"আগেকার অনেক "word" ছিল ভাঁওতা মাত্র—এখন সত্যিকারের word সৃষ্টির প্রয়োজন হয়েছে—তোমরা কি বল?" —আমরা আর কী বলিব, খুড়ো কি কথায় কি কথা নিয়া আসিলেন, তাই ভাবিতে লাগিলাম।

## দানেশিয়ায় স্বাধীনতা সংগ্রাম

াষ্ট্রসংঘ কর্তৃক নিযুক্ত কমিশনের চেষ্টায় ২ই মে তারিখে ডাচ ও সাধারণতন্ত্রীদের যে 'প্রাথমিক' চুক্তি হয়, তার ফলে অচিরে নেশিয়ায় শান্তি ফিরে আসবে বলে যাঁরা করেছিলেন, তাঁরা ক্রমশ নিরাশ হচ্ছেন। ডিসেম্বর মাসে ডাচেরা আগেকার সমস্ত শ্রুতি ভেঙে ইন্দোনেশিয়ায় নূতন করে ব্যাপকভাবে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করতে করে ও সাধারণতন্ত্রী সরকারের রাজধানী কর্তা দখল করে নেয়। সেই সময়ে যে টকালীন সাধারণতন্ত্রী গভর্নমেণ্ট গঠিত তার হেড কোয়ার্টার এখন দক্ষিণ ত্রায়, ডাচ দখলের বাইরে। সেখান থেকেই সৈন্যদের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ চালানো ল এবং এখনো চালানো হচ্ছে। সঙ্কট-ীন সাধারণতন্ত্রী গভর্নমেণ্ট যাঁরা ছেন, তাঁরা ৭ই মে তারিখের চুক্তি মেনে ছেন বলে মনে হয় না। সুতরাং গেরিলা এখনও চলছে বলে খবর আসছে।

৭ই মে তারিখের চুক্তির মূল কথাগুলি —সাধারণতন্ত্রী গভর্নমেণ্ট যোগ্যকর্তায় র যেতে পারবে; সাধারণতন্ত্রী প্রেসিডেণ্ট র সোকর্ন এবং প্রধান মন্ত্রী ডক্টর হাতা atta) ব্যক্তিগতভাবে এই প্রতিশ্রুতি দেন তাঁরা যুদ্ধবিরতি এবং হেগ-এ প্রস্তাবিত নটেবিল বৈঠকে যোগদানের পক্ষপাতী এবং রা সাধারণতন্ত্রী গভর্নমেণ্টকেও অনুরূপে-ত গ্রহণ করাতে চেষ্টা করবেন। কিন্তু া যাচ্ছে যে ৭ই মে তারিখের চুক্তি কার্যকরী চ্ছ না। তার প্রধান কারণ বোধ হয় এই যে, ারণতন্ত্রী গভর্নমেণ্টকে যোগ্যকর্তায় ফিরে ত দিতে ডাচেরা রাজী হয়েছে বটে, কিন্তু জেদের পরিকল্পিত "ফেডারেল" শাসন র্তনের পূর্বে তারা বাকী জায়গার দখল ড়তে চায় না। অন্য পক্ষে সাধারণতন্ত্রীরা ছে যে জাভা, সুমাত্রা এবং নিকটবর্তী ীপগুলির ওপর তাদের কর্তৃত্ব স্বীকার না র নিলে কোন মীমাংসাই হতে পারে না। চদের মতলব সম্বন্ধে ইণ্ডোনেশিয়ার মনে ন্দহ তো আছেই, তার উপর আমেরিকার বন্ধেও ইন্দোনেশিয়ানদের মন সংশয়মুক্ত া। ইন্দোনেশিয়ার লোকেরা জানে যে, ামেরিকা এবং ইংরেজের সাহায্য ভিন্ন ডাচেরা কলা আর ইন্দোনেশিয়াকে পদানত করে খতে পারবে না। তারা এও দেখছে যে, দ্ধের পর থেকে ইন্দোনেশিয়ায় ব্যবসা বাণিজ্যে র্কিন মূলধনের পরিমাণ ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে, মন কি অনেক ক্ষেত্রে ডাচেরা আমেরিকানদের পর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। ুতরাং ডাচেরা ক্রমশঃ মার্কিন নীতি অনুসারে লতে বাধ্য হচ্ছে এবং হবে। আমেরিকা
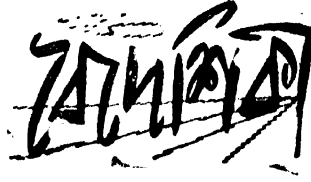
ইন্দোনেশিয়ায় শান্তি চায়, কিন্তু ডাচ শক্তিকে বাঁচিয়ে রেখে। সুতরাং আমেরিকার প্রভাবে যে নিষ্পত্তি হবে তাতে ইন্দোনেশিয়ানদের পূর্ণ স্বাধীনতালাভ সম্ভব কি না সেটা ভাববার বিষয়। দ্বিতীয়তঃ, ডাচদের পরিকল্পিত "ফেডারেশন"এর নামে ইন্দোনেশিয়ানদের ভীত হবার কারণ আছে। মালয়েও ইংরেজরা একটা "ফেডারেশন" তৈরী করেছে, ইন্দো-চীন ও কোচিন-চীনেও ফরাসীরা ঐ ধরণের একটা ব্যবস্থা করার চেষ্টায় আছে। ইন্দোনেশিয়ানদের পক্ষে এগুলোকে সাম্রাজ্যবাদী ভোল বদলানোর ব্যাপার বলে সন্দেহ করাই স্বাভাবিক।

সম্প্রতি রাষ্ট্রসংঘের অধিবেশনে ইন্দোনেশিয়ার কথা যখন ওঠে তখন ভারতের পক্ষ থেকেই ৭ই মে তারিখের চুক্তির উল্লেখ করে প্রস্তাব করা হয় যে, আপাততঃ বাকবিতণ্ডা স্থগিত রেখে চুক্তির ফলাফলের জন্যে অপেক্ষা করা হোক। রাষ্ট্রসংঘে এই প্রস্তাবই গৃহীত হোল, কিন্তু যে আশায় ভারত ইন্দোনেশিয়া সম্পর্কিত আলোচনা স্থগিত রাখার প্রস্তাব করেছিল তা এখন অমূলক বলে মনে হচ্ছে। ৭ই মে তারিখের চুক্তির পিছনে ডাচদের সদিচ্ছা সম্বন্ধে ভারতের প্রতিনিধিদের যে ধারণা হয়েছিল সেটা যে সম্পূর্ণ ঠিক নয় ধীরে ধীরে তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। ব্যাটাভিয়াতে ভারত গভর্নমেণ্টের যে প্রতিনিধিরা আছেন তাঁদের আরো সজাগ থাকা দরকার, কারণ তাঁদের প্রেরিত সংবাদ ও মতামতের উপর নির্ভর করেই ভারত গভর্নমেণ্টকে কর্তব্য স্থির করতে হয়।

## ইস্রায়েল

নব প্রতিষ্ঠিত ইস্রায়েল রাষ্ট্র বিশ্বরাষ্ট্র সংঘে স্থান পেয়েছে। যদিও এ বিষয়ে ভালোমন্দ অনেক কথা বলার আছে, তবে সকলেই স্বীকার করবেন যেন ইস্রায়েলের অভ্যুদয় বর্তমানকালের একটি বিস্ময়কর ঘটনা। ইহুদীদের সকল কাজ সমর্থনযোগ্য নয়, কিন্তু যে কর্মশক্তি একাগ্রতা, সাহস ও আদর্শনিষ্ঠার বলে তারা প্যালেস্টাইনের এক অংশে ইস্রায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে শত্রু মিত্র সকলকেই তার প্রশংসা করতে হয়। আরবদের হটিয়ে দিয়ে প্যালেস্টাইন ভাগ করার নীতি ভারতবর্ষ কোনদিনই সমর্থন করতে পারেনি। তবে ভারতবর্ষের এই মনোভাব যখন প্রথম গঠিত হয় তখনকার পরিস্থিতির সঙ্গে এখনকার পরিস্থিতির কোন তুলনা হয় না। তাহলেও এখন পর্যন্ত ভারত ইস্রায়েল রাষ্ট্রকে স্বীকার করে নেয়নি, যদিও এই স্বীকার না করার নীতির কোন বাস্তব মূল্য নেই। রাষ্ট্র সংঘে প্রবেশ করার জন্যে ইস্রায়েল যে আবেদন করে ভারত তারও বিপক্ষে ভোট দেয়। ভারতীয় মুসলমান ও প্রতিবেশী মুসলমান দেশগুলির প্রতি সহানুভূতি দেখাতে চায় বলেই ভারত ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে, তা না হলে বর্তমান পরিস্থিতিতে ইস্রায়েলকে স্বীকার না করা বা রাষ্ট্র সংঘে তাকে প্রবেশ করতে না দেওয়ার কোন কারণ নেই। আশ্চর্যের বিষয় এতে ভারতের প্রতি কৃতজ্ঞ না হয়ে পাকিস্থানী কাগজ "ডন" উল্টে ভারতকে গালাগাল করেছে। "ডন" লিখেছে যে ভারত আসলে ইহুদীদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন শুধু মুসলমানদের ভোলাবার জন্যে ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে। যদি তাই সত্যি হয়, তাহলে ইহুদীদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়েও যে ভারত মুসলমান দেশগুলির মন রাখবার চেষ্টা করছে সেটা কি পাকিস্থানের চক্ষে অপরাধ? "যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর।" তাহলে চুরি না করাই উচিত।

## চীনের গৃহ-যুদ্ধ

চীনে একটি বিরাট কম্যুনিস্ট বাহিনী সাংহাই দখল করার জন্য জোর আক্রমণ চালাচ্ছে। আর একদল কম্যুনিস্ট সৈন্য ন্যাশানালিস্ট গভর্নমেণ্টের অস্থায়ী রাজধানী ক্যানটনের দিকেও নাকি ধাওয়া করছে। কো-মিন-টাং-এর বর্তমান রণশক্তির যা পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে তাতে তারা সাংহাই রক্ষা করতে পারবে বলে বড় কেউ ভরসা করতে পারছে না। অথচ আমেরিকার "কৃশ্চান সায়েন্স মনিটার" নামক কাগজের সংবাদদাতা সম্প্রতি একটা খবর দিয়েছিলেন যে, চিয়াং-কাইশেখ স্বয়ং গোপনে সাংহাইতে এসে সাংহাইয়ের রক্ষা ব্যবস্থার তদারক করছেন। কিন্তু সাংহাই রক্ষা করার যদি কোনো সম্ভাবনাই না থাকে তবে এই অন্তিম অবস্থায় চিয়াং কাইশেখ নিজে এসে এ কাজে হাত দেবেন বলে মনে হয় না। ওদিকে আর এক গুজব যে ন্যাশানালিস্ট গভর্নমেণ্ট শীঘ্রই ক্যানটন ছেড়ে দক্ষিণ-পশ্চিম চীনে চুংকিংএ গিয়ে বসবেন। জাপানী যুদ্ধের সময়ে চীনা গভর্নমেণ্টকে এই চুংকিংএ আশ্রয় নিতে হয়েছিল।

সমগ্রভাবে চীনের চিত্র মনে মনে এঁকে নেওয়াও কঠিন। ন্যাশানালিস্ট গভর্নমেণ্ট কোথায় গিয়ে কম্যুনিস্টদের অগ্রগতি রোধ করতে পারবে বা আদৌ পারবে কিনা তা

কেউ বলতে পারে না। চীনের যুদ্ধের প্রকৃতিও অদ্ভুত। শোনা গেল দু পক্ষের লক্ষ লক্ষ সৈন্য মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়েছে, তারপর দু পাঁচ দিন ধরে যুদ্ধ হোল কি হোল না, তারপর শোনা গেল একপক্ষের জয় হয়েছে এবং দু তিনশো কিম্বা পাঁচশো মাইল দূরে আবার যুদ্ধের আয়োজন হচ্ছে। এত বড় বড় সৈন্য-বাহিনী যেন ইন্দ্রজালের মত কোথায় মিলিয়ে যায়। একবার পিছু হাঁটতে শুরু করলে, পিছু হাঁটা যেন আর শেষ হয় না। তবে সমস্ত চীন কম্যুনিস্টরা দখল করতে পারবে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ন্যাশালিস্টরা যদি এক জায়গায় গিয়ে "কোণ নিতে" পারে তবে তাদের নির্মূল করা সহজ হবে না। দ্বিতীয়ত কম্যুনিস্টরা ইতিমধ্যেই যে বিশাল ভূখণ্ড থেকে ন্যাশালিস্ট গভর্নমেণ্টকে উচ্ছেদ করেছে তার শাসন সমস্যাও কম জটিল নয়। একে অপরকে আঘাত করবে না, এই ভরসা যদি থাকত তবে হয়ত উভয় পক্ষই এখন থেমে যেত এবং বলাই বাহুল্য তাহলে চীনের জনসাধারণ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলত। কম্যুনিস্টরা যদি তাদের আদর্শ অনুযায়ী দেশের পুনর্গঠন করতে চায় তবে তার জন্যে অনেক চিন্তা অনেক কাজ, প্রচুর সংগঠন-মূলক সংঘশক্তির প্রয়োজন। অনেক বছর ধরে নানারকম ঘা খেয়ে খেয়ে চীনা কম্যুনিস্টরা খুব শক্ত হয়েছে বটে। প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে টিকে থাকবার শক্তিও তাদের কম নয়। তাহলেও চীনা কম্যুনিস্টদের সামনে যেসব বৃহৎ সমস্যা এবং তাদের কাঁধে যে ভারী দায়িত্ব তার তুলনায় তাদের শক্তির পুঁজি মোটেই যথেষ্ট বলে মনে হয় না। বিরাট চীনের বিশাল জনসমুদ্রের চাপে তাদের নামটুকু ছাড়া আর সবই হারিয়ে যেতে পারে। অল্প শক্তি নিয়ে যত বেশী জায়গা তারা দখল রাখবার চেষ্টা করবে তাদের রং তত ফিকে হয়ে যাবে, বাঁধনও তত আলগা হবে। সুতরাং মাও-সি-তাং যদি নির্ভয়ে থামতে পারতেন তবে হয়ত তিনি এখন আর না এগিয়ে যতখানি দখল করেছেন তত-খানিকেই কম্যুনিস্ট রূপ দিতে চেষ্টা করতেন। কিন্তু সে উপায় নেই। কারণ তাঁর ভয় যে কো-মিন্-টাংএর হাতে যদি সৈন্য থাকে তবে সে আজ হোক কাল হোক আঘাত করবেই। সেইজন্য শান্তির সর্ত হিসাবে তিনি ন্যাশালিস্ট সৈন্যবাহিনীকে কম্যুনিস্ট সৈন্যবাহিনীর মধ্যে আত্মসাৎ করতে চেয়েছিলেন। ন্যাশালিস্টরাও জানে যে তাদের সৈন্যবল যেদিন থাকবে না, সেদিন মাও-সি-তাংএর কাছে তাদের কথার মূল্য এক কাণাকড়িও থাকবে না. সুতরাং সৈন্যবাহিনী হাতছাড়া করে তারাও শান্তি কিনতে রাজী হয় নি। চীনের ভাগ্য-দেবতা হয়ত অলক্ষ্যে বসে হাসছেন। একশো বছর পরে হয়ত বৃদ্ধ চীন ন্যাশালিস্ট চিয়াং-কাই-শেখ এবং কম্যুনিস্ট মাও-সি-তাং-এর ছেলেমানুষীর কথা স্মরণ করে শুধু মুচকে মুচকে হাসবে।

## বর্মার পরিস্থিতি

বর্মায় অবস্থার কোন উন্নতি দেখা যাচ্ছে না। অশান্তি ও যুদ্ধ চলেইছে—কোথাও সরকার পক্ষ কোথাও বিদ্রোহীরা জোর করছে। সম্প্রতি আবার আর এক খবর এসেছে—বিদ্রোহী কারেনরা নাকি মধ্য বর্মার এক অংশকে পৃথক কারেন রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করেছে। বর্মা গভর্নমেণ্ট তো পূর্বেই জানিয়েছিলেন যে কারেনরা যদি অস্ত্রত্যাগ ও আত্মসমর্পণ করে, তবে বর্মার ঐক্য নষ্ট না করে তাদের স্বতন্ত্রতার দাবী মেটানো হবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে কারেনরা বর্মা গভর্নমেণ্টের কথায় বিশ্বাস করে অস্ত্রত্যাগ করতে রাজী নয় এবং বোধ হয় বর্মা গভর্নমেণ্ট যতখানি স্বতন্ত্রতা দিতে রাজী কারেনরা তার চেয়ে বেশি চায়। তারা নিশ্চয়ই ভেবেছে যে বাহুবলে বর্মা গভর্নমেণ্টের কর্তৃত্ব নষ্ট করে দিয়ে দেশের এক অংশে যাহোক একটা রাষ্ট্র ঘোষণা করে বসতে পারলে বর্মা গভর্নমেণ্টের সঙ্গে কথা চালাতেও সুবিধা হবে। তাছাড়া বর্মা গভর্নমেণ্টকে কমন্-ওয়েলথ্ থেকে সাহায্য করার যে প্রস্তাব হয়েছে তার সঙ্গেও বোধহয় পরোক্ষভাবে কারেনদের রাষ্ট্র ঘোষণার যোগ আছে। যদিও সাহায্য করার ব্যাপারে ভারত, পাকিস্থান ও সিংহলও বৃটেনের সঙ্গে থাকবে তবে আসল কর্তা হবে বৃটেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কারণ, অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র, যোগাবার সামর্থ্য বৃটেনেরই বেশি এবং বৃটেনই জোগাবে। কারেনদের প্রতি বৃটিশ-মনের সহানুভূতিও আছে প্রচুর। কারেন-বিদ্রোহের পিছনে সরকারী না হোক বে-সরকারী বৃটিশ উস্কানি ছিল এবং কারেনরা বৃটিশ সাহায্যও পেয়েছে বলে শোনা যায়। যেদিন থেকে কমনওয়েলথ সাহায্য বর্মায় প্রবেশ করবে সেদিন থেকে তার সঙ্গে সঙ্গে বর্মায় সরকারী বৃটিশ প্রভাবের পুনঃপ্রবেশও অবশ্যম্ভাবী। স্বতন্ত্র কারেন রাষ্ট্র যদি ইতি-মধ্যেই ঘোষিত হয়ে থাকে তবে বৃটিশ গভর্ন-মেণ্টের পক্ষে বর্মা সরকারকে নবঘোষিত কারেন রাষ্ট্র মেনে নেওয়ার উপদেশ দিতে কোনও অসুবিধা হবে না। খুব সম্ভব বৃটিশ গভর্নমেণ্ট বর্মা গভর্নমেণ্টকে বোঝাবেন যে কারেনদের স্বতন্ত্রতার দাবী মেনে নিয়ে তাদের সঙ্গে আপোষ করে বাকী পি-ভি-ও, কম্যুনিস্ট প্রভৃতি বিদ্রোহীদের দমন করা ছাড়া আর কোনো পথ নেই। এর ফলে কৃতজ্ঞ কারেনরা তো ইংরেজের তাঁবেদার হয়ে থাকবেই অ-কারেন বর্মীরাও নিজেদের দৌর্বল্যের কথা স্মরণ করে ইংরেজের আশ্রয় ত্যাগ করতে চাইবে না—সম্ভবত এই হচ্ছে বৃটিশ নীতির লক্ষ্য।

বর্মার প্রধান মন্ত্রী থাকিন-নু শীঘ্রই লণ্ডনে যাবেন শোনা যাচ্ছে। বৃটিশ গভর্নমেণ্ট যে সাহায্য দেবেন সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্যেই তিনি লণ্ডনে যাচ্ছেন। একদা মনে হয়েছিল বর্মার বিপদের দিনে তার সত্যিকার আত্মীয় ভারতবর্ষের সাহায্যই তার সবচেয়ে কাম্য হবে। ঘটনাচক্রের গতি এখন অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে। রেঙ্গুনের দৃষ্টি দিল্লী থেকে সরে ক্রমশ লণ্ডনের দিকে যাচ্ছে। সাহায্য দেওয়ার অবসরে বর্মায় বৃটিশ কূট-নীতির খেলা নূতন করে আরম্ভ হবে বলে আশঙ্কা হচ্ছে। আমরা গত সপ্তাহেই বলেছি যে, বৃটেনের লেজুড় হয়ে ভারতবর্ষের পক্ষে বর্মার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হাত দেওয়া যেমনি লজ্জাকর, তেমনি বিপজ্জনকও হবে। লাভ যা হবার হবে ইংরেজের, কেবল দুর্নামের ভাগী হতে হবে ভারতকে।

## স্পেন ও কমনওয়েলথ

রাষ্ট্র সংঘের অন্তর্ভুক্ত কোনো দেশ ফ্রাঙ্কো শাসিত স্পেনের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখবে না—এই ছিল রাষ্ট্র সংঘের নির্দেশ। তা সত্ত্বেও দক্ষিণ আমেরিকার কোনো কোনো দেশ স্পেনের সম্পর্ক ত্যাগ করেনি। তাছাড়া সোভিয়েট-বিরোধী বলে স্পেনের প্রতি ইঙ্গ-মার্কিন মহলের একটা গোপন টান আছে এবং প্রয়োজন হলে তারা স্পেনকে খোলাখুলি দলে টেনে নিতে হয়ত দ্বিধা করবে না। সম্প্রতি রাষ্ট্র সংঘে ফ্রাঙ্কো-দরদীরা স্পেনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার নিষেধটা তুলে দেওয়ার জন্যে একটা প্রস্তাব আনে। রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে ২৬টি দেশ প্রস্তাবের পক্ষে এবং ১৫টি দেশ বিরুদ্ধে ভোট দেয় এবং ১৬টি দেশ কোন-দিকেই ভোট দেয় না। সুতরাং দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের আধিক্য না হওয়ায় রাষ্ট্রসংঘের নিয়ম অনুসারে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়নি। তবে ভোট বিশ্লেষণ করলে একটা মজার ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। কমনওয়েলথ্এর অন্তর্গত দেশগুলির মধ্যে কেবল ভারত, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দিয়েছে। বৃটেন ও কানাডা ভোট দেয় নি এবং দক্ষিণ আফ্রিকা ও পাকিস্থান প্রস্তাবটির পক্ষে ভোট দিয়েছে। লণ্ডন কনফারেন্সের পরে প্রধান মন্ত্রীদের বিবৃতিতে ঘোষিত হয় যে, কমনওয়েলথএর দেশগুলি শান্তি, প্রগতি ও স্বাধীনতার আদর্শ অনুসরণ করে পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা করবে। আদর্শ সকলের এক না হোক্ যদি একরকমেরও হোত তাহলে কি কমনওয়েলথ-এর দেশগুলি স্পেন সম্পর্কে এভাবে তিন দলে তিন রকম মনোভাবের পরিচয় দিত?

২১।৫।৪৯

## ফিল্ম ডিভিশন

করের বোঝা একটার পর একটা কিভাবে শল্পের ও ব্যবসার ঘাড়ে চাপিয়ে যাওয়া তার পরিচয় আজ আর কারুর অজ্ঞাত। চিত্রশিল্পের বা ব্যবসার অবস্থা যদি ফলন্ত হ'তো তো তা নিয়ে কারুর উদ্বেগ না বা কর দেওয়া নিয়ে কোন আপত্তির উঠতো না। কিন্তু অবস্থা যখন সত্যিই পড়ন্ত হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, জেনেশুনে র থেকে তার ওপরেও কোপ মারার কে কি বলতে ইচ্ছে হয় বলুন তো! সরকার থেকে বারবারই আশ্বাস দেওয়া যে, একটা অনুসন্ধান কমিটি নিয়োগ হবে চিত্রশিল্প ও ব্যবসার প্রকৃত অবস্থা র জন্যে এবং সেই কমিটির সুপারিশ সরকার থেকে চিত্রশিল্পকে সহায়তা র ব্যবস্থা হবে। একথা চলে আসছে আমল থেকেই, কিন্তু কোন আমলেই প্রতিশ্রুতি পালনের কোন লক্ষণই দেখা না। তারপর এখন অবস্থা যা হ'য়ে ছে, তাতে সরকার থেকে যদি শেষ ঐ অনুসন্ধান কমিটি নিয়োগ হয়ও সে কমিটিকে বসতে হবে পোস্টমর্টেম ট লেখবার জন্যে অর্থাৎ চিত্রশিল্প তখন ই মৃত হয়ে যাবে।

মাত্র ক'দিন হ'লো বিভিন্ন প্রদেশে প্রমোদ-বাড়িয়ে দিয়ে চিত্রগৃহের খরিদ্দার কমিয়ে হ'য়েছে বেশ 'আঁতে ঘা' লাগবার মতো। সরকারী তহবিলে অবশ্য তার জের বে না, কারণ করটা বাড়িয়ে দেওয়া তে এমন বেশী পরিমাণে (বোধ হয় হিসেব ) যে সংগতিক্ষীয়মান দর্শকরা ছবি র জন্যে ন্যূনতম ব্যয়ে নেমে গেলেও অথবা র পরিমাণটা ঠিক আগের মতো রেখে দেখা কমিয়ে দিলেও আয় ব বৈ কমতে পারবে না। সুতরাং চিত্রের দুরবস্থার ছোঁয়াচটা সরকারী গায়ে তে পারছে না, কাজেই চলচ্চিত্র ব্যবসা ও নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকারও বোধ হন না ও'রা। চলচ্চিত্র ব্যবসা সম্পর্কে রী পক্ষ মনে হয় ইচ্ছে করেই অজ্ঞ থেকে ন, কারণ আসল ব্যাপার জেনে ফেললে র পর কর চাপিয়ে যেতে পাছে কোন র সৃষ্টি হ'য়ে যায়। প্রমোদ-করের ধাক্কায় চিত্রশিল্প ও ব্যবসা হুমড়ি খেয়ে পড়ার সঙ্গে তার ওপরই আর একটা প্রচণ্ড ত হানা হচ্ছে আসছে মাস থেকেই। আর এক ধরণের কর আদায় করার ম হ'য়ে গিয়েছে। এ নতুন করটা হ'চ্ছে দ-চিত্র ও শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রচারক ছোট দেখানো বাধ্যতামূলক ক'রে টাকা আদায়। হ'য়ে গিয়েছে যে, আগামী ৩রা জুন ভারতের সমস্ত চিত্রগৃহকেই অন্যূন

দু'হাজার ফিট ক'রে সরকারী ফিল্ম ডিভিসনের তোলা ও পরিবেশিত ছোট ছবি ও সংবাদ-চিত্র দেখাতেই হবে এবং তার জন্যে ভাড়া বাবদ প্রদর্শকদের টাকাও দিতে হবে।

সংবাদ-চিত্র বা শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রচারক ছবি দেখানো খুবই দরকার এবং আমাদের দেশের চিত্র-ব্যবসায়ীরা এ ব্যাপারে যেহেতু একেবারেই নিস্পৃহ, সুতরাং ওসব ছবি তৈরী ও পরিবেশন সরকার দ্বারা হওয়াও বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এ ব্যাপারে যা মনকে আঘাত দেয়, তা হচ্ছে চিত্র-নির্বাচন ব্যাপারে প্রদর্শকদের অগ্রাহ্য করা—কি ছবি দেখানো হবে, তা বেছে দেওয়ার ভার ঐ ফিল্ম ডিভিসনের ওপরেই, আর কারুর কোন কথা তাতে চলবে না। ছবি শুধু তোলাই নয়, ছবির পরিবেশনের অদ্বৈত অধিকারীও ফিল্ম ডিভিসন, আর সে ব্যাপারেও তাদের কথাই হ'চ্ছে আইন। ফিল্ম ডিভিসন যে চিত্রগৃহে যে ছবি দেবে এবং সেই ছবি দেখানোর দরুণ সেই চিত্রগৃহ থেকে যে টাকা দাবী ক'রবে, সে চিত্রগৃহকে সে সব ছবি দেখাতেই হবে এবং সে টাকাও দিতেই হবে। পৃথিবীর মধ্যে স্বাধীন বা পরাধীন ডেমোক্রেটিক বা ইম্পিরিয়ালিস্ট কোন দেশেই এ ধরণের নির্বিচার বাধ্যতামূলক চিত্র-প্রদর্শনের পরিচয় পাওয়া যায় না।

যদি বোঝা যেতো যে, এই বাধ্যতামূলক প্রদর্শনের পিছনে এমন একটা সারযুক্ত ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা আছে, যা দেশের ও দশের মঙ্গলসূচক হ'তে বাধ্য হবে, তাহ'লে এ নিয়ে কোন কথাই বলবার থাকতো না, উপরন্তু এ ব্যবস্থাকে সকলেই সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে মেনে নিতো। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তেমন কোন পরিকল্পনা আদপেই আছে কি না তার কোন লক্ষণই পাওয়া যাচ্ছে না। শুধু জানানো হয়েছে যে, ছোট ছবির ব্যবসা লাভজনক নয় ব'লে চিত্র-ব্যবসায়ীরা ওদিকে উৎসাহিত হয় না, আর সেই জন্যেই সরকার থেকে ও ভারটা নেওয়া হ'য়েছে। অর্থাৎ কথাটা এই দাঁড়াচ্ছে যে, পৃথিবীর সব দেশেই ডকুমেণ্টারী ও সংবাদ-চিত্র দেখানোর রেওয়াজ যখন ব্যাপক দেখা যাচ্ছে, তখন ভারতে সে ব্যবস্থা না থাকলে খারাপ দেখায়; আর এদেশে যখন ও নিয়ে কেউ মাথা ঘামাতে চাইছে না, তখন বাধ্য হয়ে সরকার থেকেই সে-ব্যবস্থা করতে হয়েছে—এর বেশী আর কোন উদ্দেশ্যই এর মধ্যে নেই। পুরোপুরি ব্যবসাদারি ছাড়া আর কিছু এতে নেই—ফিল্ম ডিভিশনের গঠন, কর্মীসংসদ ও কর্মপদ্ধতি সব কিছুই আজ সেই প্রমাণই দিচ্ছে। এবং এটা এমনি একচেটে কারবারে পরিণত করে নেওয়া হয়েছে যে, ব্যক্তিগতভাবে বা কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ছোট ছবি তোলার আর কোন সুযোগই রইলো না। এর চেয়ে যুদ্ধকালীন ইনফরমেশন ফিল্মস বরং অনেক ভালো ছিলো। তাতে আনুপাতিক ক্ষমতার হিসেবে তবু ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানদের ছোট ছবি তোলায় বাধ্য করে রাখা হয়েছিলো, যার ফলে সরকারী তোলা ছাড়াও স্বাধীনভাবে তোলা ছবি পর্দায় পৌঁছতো মাঝে মাঝে। বর্তমানে মুখে অবশ্য বলা হয়েছে যে স্বাধীনভাবে তোলা তেমন ছবি পেলে ফিল্ম ডিভিশন তা বিতরণের ভার নেবে, অবশ্য যদি তাদের পছন্দ হয়,—কিন্তু ফিল্ম ডিভিশনের কার্যধারাকে এমনিভাবে গঠন করে নেওয়া হয়েছে যার মধ্যে স্বাধীনভাবে তোলা কোন ছবিরই বাজারে কোথাও দেখাবার কোন ফাঁকই আর থাকছে না।

ফিল্ম ডিভিশনের ছবি দেখাবার ভাড়া বা কর ধার্য হয়েছে চিত্রগৃহের সাপ্তাহিক বিক্রীর অনুপাতে পাঁচ টাকা থেকে দেড়শো টাকা পর্যন্ত। ছোট ছোট মফঃস্বলের চিত্রগৃহ যাদের সাপ্তাহিক বিক্রী একশো টাকা থেকে দুশো তাদের জন্যে ধার্য হয়েছে পাঁচ টাকা তারপর বিক্রীর আনুপাতিক বৃদ্ধি ধরে ভাড়ার পরিমাণও আনুপাতিক হিসেবে বাড়তে বাড়তে সাপ্তাহিক পনেরো হাজার টাকা বিক্রীর ওপরে দেড়শো টাকা ধরা হয়েছে। এই সাপ্তাহিক বিক্রী কিন্তু এখনকার হিসেব ধরে নয়, মানে যখন নতুন করের চাপে বিক্রীর পরিমাণ প্রায় ৳ অংশ কমে গিয়েছে আগের চেয়ে—এ হিসেব ধরা হয়েছে গত বছর ও গত পূর্ব বছরের মরসুমী সময়ের কয়েক মাসের বিক্রীর হিসেব থেকে। এই গেলো একটা বেহিসেবী ফাও। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, বিলিতী শ্রেষ্ঠ একখানা ডকুমেণ্টারী ও একটা সংবাদ-চিত্র মিলিয়ে আইন মত দু' হাজার ফিট ছোট ছবি দেখাতে দেড়শো টাকা কোনকালেই ভাড়া পড়ে না, আনকোরা নতুন ছবির জন্যে সত্তর প'চাত্তর টাকাতেই যথেষ্ট হয়। সে জায়গায় ফিল্ম ডিভিশন ডবল ভাড়া আদায় করে নিচ্ছে আইনের সহযোগিতায়। বর্তমানে যারা বিলিতী পুরনো ছোট ছবি দেখাচ্ছিলো সেসব চিত্রগৃহকেও এখনকার তুলনায় ফিল্ম ডিভিশনকে ডবল এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তিনগুণ টাকা দিতে হবে। এথেকে হিসেব ক'রে দেখা যাচ্ছে যে, যেসব চিত্রগৃহের সাপ্তাহিক বিক্রী আট হাজার টাকার কম তাদের, প্রতি সপ্তাহে প্রমোদ-কর, পরিবেশকের অংশ, চিত্রগৃহ চালানোর ন্যূনতম খরচ বাদ দিয়ে যা থাকে তার শতকরা বোল থেকে

পঁচিশ টাকা তুলে দিতে হচ্ছে ফিল্ম ডিভি-শনের হাতে।

ইংলণ্ড, আমেরিকা ও অন্যান্য বহু আধুনিক রাষ্ট্রে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও প্রচারের জন্যে ছোট ছবি তোলার সরকারী বিভাগ আছে। কিন্তু কোথাও তা দেখানো বাধ্যতামূলক নয়, উপরন্তু অধিকাংশ রাষ্ট্রে ওসব ছবি বিনা ভাড়াতেই দেখানো হয়ে থাকে আর তাও ছবি নির্বাচন করা বা বাতিল করার পূর্ণ ক্ষমতা থাকে প্রদর্শকের ওপর। কথা উঠতে পারে যে, আমাদের দেশের প্রদর্শকরা এমনি যে, তাদের বিচারশক্তি নির্ভরযোগ্য নয়। কিন্তু যাদের ওপর এই সব ছবি তোলার ভার দেওয়া হয়েছে সেই ভাবনানী-বাদামীদের চেয়েও কি তারা অজ্ঞ? দেশের পঁয়ত্রিশ কোটি লোকের শিক্ষা ও সংস্কৃতির দায়িত্ব পালন করার ক্ষমতা-সম্পন্ন ব্যক্তি সমগ্র ফিল্ম ডিভিশনের মধ্যে ক'জনের আছে বলে ধরা যেতে পারে? এতো আমাদের দেশের ব্যাপার--আমেরিকায়, যেখানে সরকারের হ'য়ে ডকুমেন্টারি বা কোন প্রচারচিত্র অথবা শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক ছবি তোলার ভার ওদেশের শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতি ব্যাপারে দিকপালদের হাতে ন্যস্ত, সেখানেও ছবি নির্বাচনের ভার থাকে প্রদর্শকের ওপর। সরকারী ছবির প্রদর্শন বিষয়ে আমেরিকার প্রদর্শকরা যে কি পন্থা অনুসরণ করে তা বোঝা যাবে ১৯৪৭ সালে অনুষ্ঠিত আমেরিকার প্রদর্শক সমিতি "থিয়েটার ওনারস্ অব্ এমেরিকা"-র বার্ষিক অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব থেকে। তাতে তারা ঠিক ক'রে যে,--

In the majority of the cases, the Government through a Central Agency will submit scripts for comment and suggestion previous to production.

ছবি তৈরীর আগে চিত্রনাট্য অনুমোদনের জন্যে দেওয়া হচ্ছে বলেই যে সে ছবি দেখাতেই হবে তাও নয়। চিত্রনাট্য অনুমোদিত হ'লে তারপর নির্মিত চিত্র TOA'র Film Program Committee যদি পাস করে তবে দেখানো চলতে পারে। TOA'র অনুমোদিত কোন চিত্রনাট্যের ওপর ছবি তোলা হ'লে সে ছবি Film Program Committee-র কাছে পাঠানো যাবে এই সর্তে যে, সে-ছবি তোলার উদ্যোক্তা হ'চ্ছে সরকার, অথবা রাজনীতি ও ব্যবসাবর্জিত কোন জনপ্রতিষ্ঠান। এই জনপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে যাদের কর্মধারা সমগ্রভাবে দর্শক সমষ্টির কাছে আবেদন না পৌঁছিয়ে যদি তাদের ছবি একাংশ দর্শকের জন্য নির্দিষ্ট হয় তাহ'লে তাও বাতিল হবে। Film Program Committee-র বিচারের ধারা হবেঃ (১) ছবির প্রতিপাদ্য নিয়ে কারুর আপত্তির কিছু থাকলে না; (২) ছবি হবে রাজনীতিবর্জিত ও বিতর্কবিহীন (সাধারণত যেসব বিষয়ে মতবিভেদ অত্যন্ত ব্যাপক সেসব বিষয় নিয়ে যদি আইনসিদ্ধ কোন কার্যনীতি বা কর্মপন্থার নির্দেশ থাকে তো তাকে বিতর্কহীন বলে ধরা যেতে পারে;) (৩) ছবির দৈর্ঘ্য এমন যেন হয় যাতে প্রোগ্রামের কোন ব্যাঘাত না ঘটে; (৪) কলাকৌশলের দিক থেকে ছবির যথাযথ গুণ থাকা চাই। তারপর Film Programe Committee কোন ছবি অনুমোদন করলেও সে-ছবি দেখানোয় স্বতন্ত্রভাবে কোন প্রদর্শকই বাধ্য নয়। TOA'র সভ্যদের কারুর কোন ছবি আপত্তিজনক মনে হ'লে সে তা বাতিল ক'রতে পারে, তেমনি Film Program Committee কোন ছবি বাতিল

## জ্ঞাতব্য কয়েকটি তথ্য—১

# আমাদের খাদ্য সমস্যা

* পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যা আড়াই কোটি; এদের মধ্যে যারা খনি এলাকায়, চা-বাগানে ও শহর অঞ্চলে বাস ক'রে, তাদের সংখ্যা ৮০ লক্ষেরও বেশী। এই ৮০ লক্ষের মধ্যে প্রায় ২০ লক্ষ জন কলকারখানার শ্রমিক ও মজুর, যাদের প্রধান খাদ্য হচ্ছে গম।

* পশ্চিমবঙ্গে প্রতি বছর যে চা'ল উৎপন্ন হয়, তার পরিমাণ সাধারণতঃ ৩৬ লক্ষ টন; এর মধ্যে খাদ্য হিসেবে পাওয়া যায় মোট ৩৩ লক্ষ টন, কিন্তু বছরে প্রয়োজন হয় ৩৫ লক্ষ টন।

* বছরে আমাদের ২ লক্ষ ৫০ হাজার টন গমের প্রয়োজন; সেই স্থলে বছরে সাধারণতঃ উৎপন্ন হয় মাত্র ২৫ হাজার টন। বাকিটা বিদেশ থেকে আমদানী করা হয়।

* প্রতি বছর সাধারণতঃ খাদ্যশস্যের ঘাট্‌তির পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৪ লক্ষ ২৫ হাজার টন।

## প্রয়োজন যেখানে এত বেশী উৎপাদন সেখানে কত কম

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের

লে কোন প্রদর্শক তা প্রদর্শনযোগ্য মনে
লে তা সে দেখাতে পারে।

•আমাদের ফিল্ম ডিভিশনের পরিকল্পনা, গঠন ও নীতি একেবারেই উল্টো। প্রদর্শক- তো বাধ্য করা হয়েছেই এমন কি পছন্দ অপছন্দ ব্যাপারে জনসাধারণের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত অধিকার তাকেও খর্ব করে দেওয়া হয়েছে। আপনি চান আর নাই চান আপনাকে ল্ম ডিভিশনের ছবি যা-ই ওরা দিক পনাকে দেখতেই হবে।

**বী চৌধুরাণী—** (রূপায়ণ চিত্রপ্রতিষ্ঠান ন্দ্রপুরী)—কাহিনী ঃ বঙ্কিমচন্দ্র; চিত্ররূপ ও র্দশ ঃ প্রফুল্ল রায়, পরিচালনা ঃ সতীশ গুপ্ত; আলোকচিত্র ঃ শৈলেন বসু; শব্দ- ণ ঃ গৌর দাস; সুর ঃ কালিপদ সেন; শিল্প- র্দশ ঃ বটু সেন; ভূমিকায় ঃ ছবি বিশ্বাস, তিশ মুখোপাধ্যায়, উপেন সেন, প্রদীপ বটব্যাল, ন চট্টোপাধ্যায়, ফণী রায়, তুলসী চক্রবর্তী, তি চট্টোপাধ্যায়, সুমিত্রা, সুদীপ্তা, রেবা, ন্দনী, স্বাগতা, লীলাবতী, মনোরমা প্রভৃতি।

ছবিখানি মুভিস্থানের পরিবেশনায় গত শে এপ্রিল বীণা, বসুশ্রী ও আলোছায়াতে রিলিজ করেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার জন্য এখন আর কি পয়সা দেবার দরকার হয় না, যেকোন কই তার চিত্ররূপ বা মঞ্চরূপ দিতে পারে। ন্তু এই সুযোগটা আছে বলেই কি যে-সে ঙ্কম-রচনা নিয়ে যা-তা করবে আর তা বরদাস্ত রতে হবে! বঙ্কিম রচনা জাতীয় সম্পদ, তীয় প্রতীকেরই সমতুল্য। যার তার হাতে ছেড়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু দুঃখের ধ্যে তা রোধ করার কোন ব্যবস্থাই আমাদের তে নেই।

ইতিপূর্বে 'চন্দ্রশেখর'-এর বেলায় অনেক ক থেকে অনেক আপত্তি উঠেছিলো বং চিত্রনির্মাতাকে নিয়ে অনেক হৈহৈ য়েছিলো, শেষ পর্যন্ত পরিচালক দেবকী দ সাধারণ্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে তবে াহাই পান। তারপর আশা করা গিয়ে- ছলো যে, এই জাতীয় সম্পদের মর্যাদা নিয়ে ার কেউ ছিনিমিনি খেলতে আসবে না, কিন্তু দবী চৌধুরাণী' সে আশাকে ব্যর্থ ক'রে দয়েছে। এরপর আরও আসছে, 'রাধারাণী', কৃষ্ণকান্তের উইল', 'রজনী' এবং আরও য়েকটি বিনা পয়সায় পাওয়া বঙ্কিম রচনার চত্ররূপ।

লেখা গল্প আর সেলুলয়েডের ছবি এক য় একথা অনস্বীকার্য। রচনাকে চিত্ররূপ দতে গেলে পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের দরকারও য় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, কিন্তু তারও একটা সীমা আছে। যেমন কিছুই পরিবর্তন হোক রচনার প্রকৃতি ও চারিত্রিক বৈশিষ্টকে ক্ষুণ্ণ করার অধিকার কারুরই নেই। এ মর্যাদা রক্ষা করার ক্ষমতা যার না থাকবে তার হাতে এসব রচনা কিছুতেই নিরাপদ নয়।

বলা বাহুল্য 'দেবী চৌধুরাণী'র চিত্ররূপ বঙ্কিমচন্দ্রের মর্যাদা রক্ষায় মোটেই সক্ষম হয়নি। পরিবর্তন, ও পরিবর্জন রচনার মাহাত্ম্যকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেনি। বরং ছবি দেখে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাশক্তির যে পরিচয় পাওয়া যায় তা আর যে কোন সাহিত্যের হোক বাঙলা সাহিত্যের সম্রাটের উপযুক্ত নয় বলেই ধারণা জন্মে যায়।

'দেবী চৌধুরাণী'র পটভূমিকার সঙ্গে ইতিহাসের অচ্ছেদ্য যোগ রয়েছে। কিন্তু ছবিতে বেশভূষা, সাজসামগ্রী, ঘরদালান, চালচলন কোন বিষয়েই তৎকালীন ইতিহাসের কোন মিলই পাওয়া যায় না—অবশ্য কোনকালের ইতিহাসের সঙ্গেই তার মিল নেই বলতে পারা যায়। অথচ এই ঐতিহাসিক পটটাই হচ্ছে কাহিনীর নাট্যরস পাকিয়ে তোলার এক- মাত্র অবলম্বন। ছবিতে সেই দিকটাকেই অগ্রাহ্য করা হয়েছে ফলে নাটক বলতে ছবিতে কোন বস্তু আমরা পাই না।

কাহিনীর বিন্যাস হয়েছে একেবারেই মঞ্চের টেকনিকে অঙ্ক ও দৃশ্য-উপদৃশ্যের ধারায়, ছবির নেই কোনখানটিতেই। মূল কাহিনীর অনুসৃতি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা অনেক ক্ষেত্রেই স্পষ্ট। শেষের কতক দৃশ্য একেবারেই দুর্বোধ্য।

অভিনয়শিল্পী নির্বাচনে অধিকাংশ চরিত্রের ক্ষেত্রেই একটা গোঁয়ার্তুমি প্রকট হয়ে পড়েছে। কোন্ যুক্তিবলে লোলচর্ম এক বৃদ্ধকে ভবানী পাঠকের চরিত্র চিত্রণে নিযুক্ত করা যায়?

বঙ্কিমচন্দ্রের ভবানী পাঠকের কথা মনে ক'রে দেখুন আর তার পাশে দাঁড় করান উৎপল সেনকে—তাহ'লেই পরিচালকের দৃষ্টি ও রসানুভূতি সম্পর্কে আপনার ধারণা পাকা হয়ে যাবে। নাম ভূমিকায় সুমিত্রার অভিনয় বরং কপালকুণ্ডলার কথাই বার বার স্মরণ করিয়ে দেয়। চরিত্রের মধ্যে তিনি না দেবীত্ব আর না চৌধুরাণীত্ব কিছুই ফোটাতে পারেননি। নীতিশের রঙ্গরাজকে দেখে সূত্রধর বলে মনে হয়, অভিব্যক্তিহীন আবৃত্তির দ্বারা তিনি সেই পরিচয়ই দিয়েছেন—অতবড় ডাকাতদলের তিনি যে জেনারেল সে ব্যক্তিত্ব কোথাও ফোটেনি। ছবি বিশ্বাসের সাহেবিয়ানাটা একটা উদ্ভট সৃষ্টি—মঞ্চেতে ওটা কোন রকমে চলতে পারে কিন্তু পর্দায় ভারী অদ্ভুত একটা কিছু মনে হয়। অমন যে অনবদ্য সৃষ্টি সাগর-বৌ সে চরিত্রটিকেও রেখাপাত করবার মতো ক'রে সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি।

সঙ্গীতের দিকটা একেবারেই বেখাপ্পা ও বেঢঙের। ইতিহাসের সঙ্গে তারও কোন যোগ নেই। কলাকৌশলের মধ্যে আলোকচিত্রের কাজ সাধারণভাবে ভালোই, যদিও ক্যামেরার নাট্য- সৃজন ক্ষমতাকে বড় একটা খাটানো হয়নি কোথাও। শব্দগ্রহণ নিন্দনীয় নয়।

## "জলসা ঘর"এর সঙ্গীত অধিবেশন

গত ১৫ই মে রবিবার সকাল ৯ ঘটিকায় কলিকাতা কলেজ স্কোয়ারস্থিত বেঙ্গল থিও- সফিক্যাল সোসাইটি হলে "জলসা ঘর"এর মাসিক সঙ্গীতানুষ্ঠান হয়ে গিয়েছে। এই উপলক্ষে ভারত বিখ্যাত গায়ক আফতাব-ই- মৌসিকি ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ সাহেব উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পরিবেশন করেছিলেন। খাঁ সাহেবের সঙ্গে যথাক্রমে ওস্তাদ গুলাম রসুল খাঁ (বরোদা) এবং ওস্তাদ কেরামতুল্লা খাঁ, হারমোনিয়াম এবং তবলা সঙ্গত করেছিলেন। প্রারম্ভে "জলসা ঘর"এর সম্পাদক সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীযামিনী গাঙ্গুলী মহাশয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের জন- প্রিয়তা ও উন্নতিকল্পে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় সম্বন্ধে সুচিন্তিত অভিমত সুন্দর- ভাবে ব্যক্ত করেন।

এই প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকরূপে ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের ৫০০, (পাঁচশত টাকা) দান সম্পাদক মহাশয় আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করলে সভায় বিপুল হর্ষধ্বনি প্রকাশ হয়।

ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ সাহেব তারপর রাম- কেলী রাগের আলাপ আরম্ভ করেন। রাম- কেলী রাগের ধামার গাইবার পর খাঁ সাহেব ক্রমান্বয়ে খট্, সাউনী বিলাবল্ ও দেশী রাগের খেয়াল শোনানোর পরে ভৈরবী ঠুংরী আরম্ভ করেন।
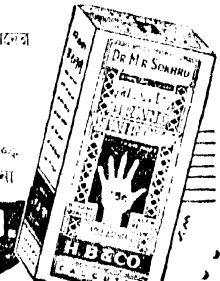
# দেশী সংবাদ

১৬ই মে নয়াদিল্লীতে ভারতীয় গণপরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হয়। প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কমনওয়েলথে ভারতের অবস্থান সংক্রান্ত লণ্ডন-চুক্তি অনুমোদনের জন্য গণপরিষদে এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। পণ্ডিত নেহরু বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, লণ্ডন চুক্তির দ্বারা কোনক্রমেই ভারতের সার্বভৌম সাধারণতন্ত্রের মর্যাদাকে ক্ষুন্ন করা হয় নাই। প্রস্তাবটি উত্থাপনের পর শ্রীশিবনলাল সকসেনা ও শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ সাহু দুইটি সংশোধন প্রস্তাব আনয়ন করেন।

বাঙ্গালোরে "স্বদেশ মিত্রম্" (মাদ্রাজ) পত্রিকার সম্পাদক শ্রী সি আর শ্রীনিবাসনের সভাপতিত্বে নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলনের অষ্টম বার্ষিক অধিবেশন আরম্ভ হয়। ভারতের রাষ্ট্রপাল শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। শ্রীযুত শ্রীনিবাসন সভাপতির ভাষণে বলেন যে, স্বাধীনতা লাভের পর ভারতীয় সংবাদপত্রগুলিকে এখন স্বাধীন দেশের সংবাদপত্রসমূহের সমপর্যায় উন্নীত হইতে হইবে।

গতকল্য বর্ধমান সহর হইতে ১৫ মাইল দূরবর্তী আরিচা গ্রামে এক গুরুতর সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে। এই হাঙ্গামার সময় এক সশস্ত্র মুসলমান জনতার আক্রমণে কয়েকজন হিন্দু জখম হইয়াছে।

ভারত গবর্ণমেণ্ট আগামী ১লা জুলাই হইতে রামপুর রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

রাজসাহী (পূর্ব-পাকিস্থান) সংবাদে প্রকাশ, জেলা সংখ্যালঘু বোর্ডের সদস্য শ্রীরমেশচন্দ্র ঘোষের কন্যা কুমারী মনোরমা ঘোষকে পুলিশ সম্প্রতি গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাঁহার গ্রেপ্তারের কারণ এখনও জানা যায় নাই।

১৭ই মে—দুইদিন বিতর্কের পর অদ্য ভারতীয় গণপরিষদে ভারতের কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত থাকা সম্পর্কে লণ্ডন সিদ্ধান্ত অনুমোদন করিবার জন্য পণ্ডিত নেহরুর প্রস্তাব তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে গৃহীত হইয়াছে। নূতন নির্বাচন পর্যন্ত এই অনুমোদন স্থগিত রাখিবার জন্য অধ্যাপক শিবনলাল সকসেনা যে সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা বাতিল হইয়া গিয়াছে। পণ্ডিত নেহরুর প্রস্তাবের সমর্থনে পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু, শ্রী কে এম মুন্সী প্রমুখ তের জন সদস্য বক্তৃতা করেন। অধ্যাপক কে টি শা এবং মিঃ হাসরত মোহানী প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন।

বাঙ্গালোরে নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলনের দ্বিতীয় দিবসের অধিবেশনে এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, সংবাদপত্রের মৌলিক অধিকার মঞ্জুর করিয়া যাহাতে একটি ধারা ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তজ্জন্য অনুরোধ জানাইবার উদ্দেশ্যে নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলনের একটি সাব-কমিটি গণ-পরিষদের প্রেসিডেণ্ট ও খসড়া প্রণয়ন কমিটির সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। সম্মেলন সংবাদপত্রের বিক্রয় ও বিজ্ঞাপনের উপর কর ধার্যের প্রতিবাদ জানাইয়াছেন।

১৮ই মে—ভারতীয় গণপরিষদে খসড়া শাসনতন্ত্রের ৬টি ধারা গৃহীত হইয়াছে। শাসনতন্ত্রের ধারাবাহিক আলোচনার শ্রমসাধ্য কাজ ইহা দ্বারা সমাপ্ত হইল। ইতিপূর্বে পরিষদে ৩১৫টি ধারার মধ্যে ৬৭টি ধারা এবং ৮টি তপশীল গৃহীত হয়। অদ্য গণপরিষদে গৃহীত একটি ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রসভার সদস্যপদপ্রার্থীর ন্যূনতম বয়স ৩০ বৎসর নির্ধারিত হইয়াছে।

কলিকাতা সহরের অবস্থার উন্নতি পরিলক্ষিত হওয়ায় কলিকাতা পুলিশ কমিশনার ১৯শে মে হইতে হেয়ার স্ট্রীট থানার অন্তর্গত দুইটি এলাকা ব্যতীত কলিকাতায় ১৪৪ ধারার আদেশ প্রত্যাহার করিয়াছেন।

ভারতের এডভোকেট জেনারেল মিঃ এন পি ইঞ্জিনীয়ার ছুটিতে যাইতেছেন, তাহার স্থলে শ্রী এম সি শীতলবাদ ভারতের এডভোকেট জেনারেল নিযুক্ত হইয়াছেন। শ্রী এম সি শীতলবাদ বর্তমানে লেক সাকসেস জাতিপুঞ্জ পরিষদে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করিতেছেন।

১৯শে মে—ভারতীয় গণপরিষদে এই মর্মে এক বিধান গৃহীত হইয়াছে যে, গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক স্থিরীকৃত না হওয়া পর্যন্ত ভারতীয় পার্লামেণ্টের সদস্যগণের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা বৃটিশ পার্লামেণ্টের সদস্যগণের সুযোগ-সুবিধার অনুরূপ হইবে।

হায়দরাবাদে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, স্পেশ্যাল ট্রাইব্যুনালের বিচারে আটজন কম্যুনিষ্ট নেতার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া হইয়াছে। তাহাদের বিরুদ্ধে নরহত্যা ও অন্যান্য অপরাধের অভিযোগ আনা হইয়াছিল।

নয়াদিল্লীর এক সংবাদে প্রকাশ, ভ্রমণকারী ছাড়া ভারত, পাকিস্থান ও সিংহলের অধিবাসীদের মালয়ে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

ভারত সরকার পশ্চিম বঙ্গ, আসাম ও বিহারে উদ্বাস্তুদের সংখ্যা গণনার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

ভারত সরকার সকল প্রাদেশিক সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক পরিচালিত এলাকাসমূহের চীফ কমিশনারগণকে তাঁহাদের স্ব স্ব এলাকায় কড়াকড়িভাবে খাদ্য আইন প্রয়োগের নির্দেশ দিয়াছেন।

২০শে মে—পার্লামেণ্টের সদস্যদের বেতন ও ভাতা সম্পর্কে বিতর্কের দ্বারা অদ্য ভারতীয় গণপরিষদের কার্য আরম্ভ হয়। খসড়া শাসনতন্ত্রের ৮৬নং অনুচ্ছেদ সম্পর্কে আলোচনাকালে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। এই অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে, পার্লামেণ্টের সদস্যগণ পার্লামেণ্ট কর্তৃক নির্ধারিত হারে বেতন ও ভাতা পাইবে এবং নির্দিষ্ট ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত এই ভাতা ভারত ডোমিনিয়নের আইন সভার সদস্যদের অনুরূপ হইবে।

নয়াদিল্লীর সংবাদে প্রকাশ, গতকল্য লাডাকের এক প্রতিনিধিদল ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুর সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি তাঁহাদিগকে এইরূপ আশ্বাস দেন যে, জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষা এবং সমগ্রভাবে রাজ্যটি ভারত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত করাই ভারত সরকারের আন্তরিক ইচ্ছা। তিনি আরও বলেন যে, লাডাক প্রদেশ জম্মু ও কাশ্মীরের অবিচ্ছেদ্য অংশ, সুতরাং উহা স্বভাবতঃই ভারতের অংশ বলিয়া বিবেচিত হইবে।

# বিদেশী সংবাদ

১৭ই মে—কমন্স সভায় আয়ার্ল্যাণ্ড বিল গৃহীত হইয়াছে। উহাতে কমনওয়েলথ হইতে আয়ার প্রজাতন্ত্রের সম্পর্কচ্ছেদ স্বীকার করা হইয়াছে।

আয়র্ল্যাণ্ড বিল সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ভোটদানের অপরাধে পাঁচজন পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারীকে পদচ্যুত করা হইয়াছে।

১৮ই মে—ইতালীয় উপনিবেশগুলির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সযত্নে রচিত "আপোষ প্রস্তাব" অদ্য রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠানের সাধারণ পরিষদে অগ্রাহ্য হইয়াছে। উক্ত প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনাকালে লিবিয়াকে দশ বৎসরের মধ্যে স্বাধীনতা দানের একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

পারস্যের তুদে দলের ৮ জন নেতা সামরিক আদালত কর্তৃক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। অপর ৯ জন বিভিন্ন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

১৯শে মে—নিরাপত্তা পরিষদে অদ্য পুনরায় হায়দরাবাদ সম্পর্কে বিতর্ক আরম্ভ হয় এবং আলোচনায় যোগদানের জন্য ভারত ও পাকিস্থানের প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ জানান হয়। স্যার বি এন রাও বলেন যে, প্রশ্নটি নিরাপত্তা পরিষদের সম্মুখে উত্থাপনের অধিকার হায়দরাবাদের নাই। তিনি আরও বলেন যে, হায়দরাবাদের অরাজকতার দরুণই ভারত সরকার শেষ পর্যন্ত ব্যবস্থা অবলম্বনে বাধ্য হইয়াছেন।

২০শে মে—রেঙ্গুণের সংবাদে প্রকাশ, কারেন বিদ্রোহীরা মধ্য ব্রহ্মে কারেন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংবাদ ঘোষণা করিয়াছে। কারেনরা তাহাদের নিয়াউংলেবিনস্থিত হেড কোয়ার্টার হইতে মুদ্রিত ঘোষণাপত্রে দাইকু ও টাঙ্গুর মধ্যবর্তী এলাকায় কারেন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংবাদ প্রচার করিয়াছে। দাইকু রেঙ্গুণের ৭৮ মাইল উত্তরে এবং টাঙ্গু আরও ৮৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত।

হংকং-এর সংবাদে প্রকাশ, অদ্য ফরমোজার আঞ্চলিক সৈন্যাধ্যক্ষের হেড কোয়ার্টার হইতে ঘোষিত হইয়াছে যে, অদ্য রাত্রি দ্বিপ্রহর হইতে সমগ্র দ্বীপে সামরিক আইন জারী হইবে।

নিউইয়র্কের সংবাদে বলা হইয়াছে যে, হংকংকে মার্কিণ নৌ-ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করার জন্য বৃটেন যে প্রস্তাব করিয়াছিল মার্কিণ নৌ-বিভাগ তাহাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন।

সাংহাই-এর সংবাদে প্রকাশ, গতকল্য রাত্রিতে সহরের পূর্ব উপকণ্ঠবর্তী ইয়াংসেপু অঞ্চলে সর্বপ্রথম কম্যুনিষ্ট কামানের গোলা নিক্ষিপ্ত হয়।

চীনের আইন পরিষদ অদ্য একটি প্রস্তাবে কম্যুনিষ্টদের সহিত গৃহযুদ্ধে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মধ্যস্থতা মানার জন্য মন্ত্রিসভাকে অনুরোধ জানাইয়াছে।

গতকল্য কুয়ালালামপুরের ২০ মাইল উত্তরে সন্ত্রাসবাদীদের আকস্মিক আক্রমণের ফলে একজন বৃটিশ সেনানী, একজন নন-কমিশণ্ড অফিসার ও একজন মালয়ী পুলিশ কর্পোরাল নিহত এবং ৪ জন ইংরেজ সৈন্য গুরুতর আহত হইয়াছে।

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক:—আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড ১নং বর্মন স্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদক ঃ **শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন**
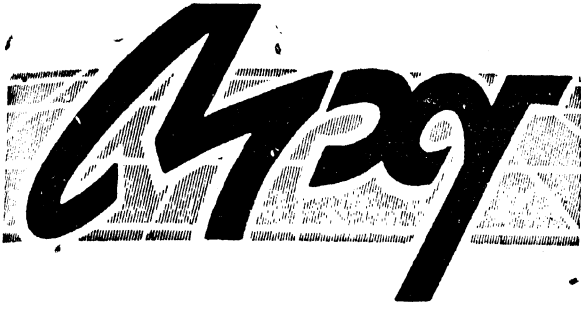
সহ সম্পাদক ঃ **শ্রীসাগরময় ঘোষ**

> সাগর গর্ভে, নিঃসীম নভে, দিগদিগন্ত জুড়ে'
> জীবনোদ্বেগে, তাড়া ক'রে ফেরে নিতি যারা মৃত্যুরে,
> মাণিক আহরি আনে যারা খুঁড়ি পাতাল যক্ষপুরী;
> নাগিনীর বিষ-জ্বালা সয়ে করে ফণা হ'তে মণি চুরি,
> হানিয়া বজ্রপাণির বজ্র উদ্ধত শিরে ধরি'
> যাহারা চপল মেঘ-কন্যারে করিয়াছে কিঙ্করী।
> পবন যাদের বাজনী দুলায় হইয়া আজ্ঞাবাহী,—
> এসেছি তাদের জানাতে প্রণাম, তাহাদের গান গাহি।
> গুঞ্জরি ফেরে ক্রন্দন মোর তাদের নিখিল ব্যেপে—
> ফাঁসির রজ্জু ক্লান্ত আজিকে যাহাদের টুঁটি চেপে।
> যাহাদের কারাবাসে
> অতীত রাতের নন্দিনী ঊষা ঘুম টুটি ঐ হাসে।
>
> —কাজী নজরুল ইসলাম

ষোড়শ বর্ষ ] শনিবার, ২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৬ সাল। Saturday, 4th June, 1949. [ ৩১শ সংখ্যা

**কলঙ্কের অপসারণ**

ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র হইতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য আসন সংরক্ষণের নীতি ও ব্যবস্থা বর্জিত হইল। গণ-পরিষদে সম্প্রতি প্রবল আনন্দধ্বনির মধ্যে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল কর্তৃক উত্থাপিত এতৎসম্পর্কিত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। অতঃপর মাত্র তপশীলভুক্ত হিন্দুদের জন্য দশ বৎসরের মত আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকিবে। শিখ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছয়টি অনুন্নত সমাজও তপশীলভুক্ত হইয়াছে। এই তপশীলভুক্ত হিন্দু ও কতিপয় শিখ সম্প্রদায় ছাড়া ভারতের শাসন-ব্যবস্থায় আর কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকিল না। গণ-পরিষদ কর্তৃক এই প্রস্তাব গৃহীত হওয়াতে ভারতের ইতিহাস হইতে পরাধীনতার গ্লানিময় স্মৃতি অপসারিত হইল। ব্রিটিশ শাসকবর্গ নিজেদের শাসন-নীতি এদেশে স্থায়ী করিবার দুরভিসন্ধি লইয়া সাম্প্রদায়িক নির্বাচনের প্রথা এদেশে প্রবর্তন করে। ইহার ফলে ভারতের রাষ্ট্রীয় সংহতি ভাঙিয়া যায় এবং সর্বনাশের পথ উন্মুক্ত হয়। সাম্প্রদায়িক নির্বাচনের ভেদবাদকে আশ্রয় করিয়া পশুত্ব এবং বর্বর হিংস্রতা এদেশের সমাজ-জীবনের সুখ-শান্তি ধ্বংস করে। ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিদেশী শাসকদের এই শয়তানী খেলায় আরণ্য জীবনের বিভীষিকায় বিমলিন হইয়া যায়। ক্রমে মোশ্লেম লীগকে ক্রীড়নক স্বরূপে অবলম্বন করিয়া ব্রিটিশ প্রভুরা ভেদবাদের যে নিদারুণ পৈশাচিক লীলায় প্রবৃত্ত হয় এবং তাহারা এদেশ ছাড়িবার পূর্বে মারাত্মক সেই ভেদ-নীতির চরম কৌশলটি প্রয়োগ করিয়া এদেশ হইতে প্রস্থান করে। নির্দোষের রক্তস্রোতে এদেশের মাটি আর্দ্র হয়। পৈশাচিক হিংস্রতার যে তাণ্ডব তখন চলিতে থাকে, জগৎ কোনদিন তাহা প্রত্যক্ষ করে নাই। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নীতির এই কলঙ্কময় স্পর্শ, পিশাচদের কূটনীতির এই স্মৃতি ভারত ধুইয়া মুছিয়া ফেলিয়া আজ নূতন জীবনে অগ্রসর হইতে চলিয়াছে। সত্যই জগতের ইতিহাসে ইহা এক স্মরণীয় ব্যাপার। এক জাতি এবং এক দেশ স্বাধীন ভারতের ইহাই নীতি হইবে। সর্দার বল্লভভাইয়ের উক্তির সমর্থন করিয়া আমরাও বলি, ভারতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বলিয়া যে কিছু ছিল, আমাদিগকে ইহা ভুলিয়া যাইতে হইবে। বাস্তবিকপক্ষে সাম্প্রদায়িক নির্বাচনের ভিত্তিতে কোন স্বাধীন রাষ্ট্রই গঠিত হইতে পারে না; কোন সভ্য-শাসন পরস্পরের প্রতি প্রতিহিংসা-পরায়ণ বিদ্বেষ ও হিংসায় তেমন প্রতিবেশ-প্রভাবের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। ইংরেজ নিজেদের স্বার্থগত হীন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্যই সাম্প্রদায়িক নির্বাচনের নীতি অবলম্বন করে; ভারতের উন্নতির জন্য নয়। তাহারা নিজেরাও ইহা না জানিত, এমন নহে। ইহার ফলে ভারতের উন্নতি যে চিরদিনের জন্য প্রতিহত হইবে, ব্রিটিশ রাজনীতিকেরাও ইহা বুঝিতেন। মণ্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্টে স্পষ্ট ভাষাতেই সে কথা বলা হয়। এই রিপোর্টেই প্রকাশ, 'সাম্প্রদায়িকতাকে ভিত্তি করিয়া পরস্পরবিরোধী রাজনৈতিক দল গঠনের এই নীতি দেশবাসীকে রাষ্ট্রের প্রতি সংহতি কর্তব্য ও দায়িত্ব প্রতিপালনে প্ররোচিত করিতে পারে না, পক্ষান্তরে তাহাদিগকে পরস্পরের বিরোধী করিয়াই তুলিবে। এই নির্বাচন-প্রথার ভিতর দিয়া রাষ্ট্রীয় সংহতির ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বমূলক নির্বাচনের ধারা কিভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে, বোঝা কঠিন।' বস্তুত সাম্প্রদায়িক নির্বাচন-নীতির ভিতর দিয়া দেশ ও জাতির প্রতি মমত্বকে ভিত্তি করিয়া রাষ্ট্রীয় চেতনা এদেশে জাগে নাই। এদেশে হিংস্রতা জাগিয়াছে; সমাজদেহে বর্বরতা আসিয়া জুটিয়াছে। ইহার বিষময় ফলে নির্বিবেক মূঢ়তায় ভাই-ভাইয়ের বুকে ছুরি বসাইয়াছে। ভারতের শত্রুদের পৃষ্ঠপোষকতায় মোশ্লেম লীগ সাম্প্রদায়িক নির্বাচন-প্রথার বিদ্বেষ-মূলক নীতিকে আশ্রয় করিয়া আরণ্য পশু-জীবনের বিভীষিকায় এদেশের সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে অভিভূত করিয়াছে। আজ সে গ্লানি হইতে ভারত মুক্ত হইল। ভগবানের এই আশীর্বাদ সমগ্র ভারত আনন্দের সহিত গ্রহণ করিবে।

**পাকিস্থানের নীতির গতি**

পাকিস্থানের পররাষ্ট্রসচিব জনাব জাফরুল্লা খানের অশ্রুবর্ষণের এক পর্ব একরকম শেষ হইয়াছে। কিন্তু মনে হয়, কাশ্মীরের জন্য অশ্রু-বর্ষণের শেষ পালা অতঃপর আসিতেছে। জাতি-সঙ্ঘের দরবারে হায়দরাবাদের স্বৈর-শাসনের সমর্থন করিয়া তিনি যে সুদীর্ঘ সওয়াল করেন, সঙ্ঘ সে দিকে কর্ণপাত করা প্রয়োজন বোধ করেন নাই। আলোচনাটি অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখা হইয়াছে; অতঃপর তাহা যে পুনরায় উত্থাপিত হইবে, ইহা মনে হয় না। এদিকে কাশ্মীর লইয়া পাকিস্থানের রাষ্ট্রনিয়ামকদের কূট খেলার অবসান ঘটে নাই। হানাদারদের সর্দার এবং পৃষ্ঠপোষকদিগকে লইয়া করাচীতে সম্মু-

পরামর্শ পাকানো চলিতেছে। কিছুদিন পূর্বে স্বয়ং শ্রীযুক্তা ফতেমো জিন্না প্রাণ ভরিয়া এই দস্যু-ডাকাতদের সুখ্যাতি করিয়াছেন। তিনি বিপন্ন ইসলাম রক্ষার গৌরবে ইহাদিগকে মণ্ডিত করিয়াছেন। তিনি ইহাদিগকে সঙ্কটকালের জন্য প্রস্তুত থাকিতেও আহ্বান জানাইয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং কাশ্মীরের ব্যাপারে গোল বাধাইবার জন্য এই সব উপদ্রবকারীর দল কসুর কিছুই করিবে না। স্বাধীনভাবে কাশ্মীরে গণভোট পরিচালিত হয়, ইহারা তাহা চাহে না। অন্ততপক্ষে কাশ্মীরের পার্বত্যময় উপত্যকাভূমির কতকটা অঞ্চল নিজেদের কব্জির মধ্যে ইহারা রাখিতে চায় এবং জবরদস্তির বলে গণভোট প্রভাবিত করিবে, ইহাই ইহাদের উদ্দেশ্য। মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধতাকে জাগ্রত করিয়া কিভাবে নিজেদের অভিসন্ধি সিদ্ধ করিতে হয়, পাকিস্থানী কূটনীতিকদের সে বিদ্যা ভাল করিয়াই জানা আছে। সেক্ষেত্রে সভ্যতা বা ভব্যতার কোন প্রশ্ন ইঁহাদের কাছে নাই, ফলতঃ শঠতার উপরই ইহাদের নীতি প্রতিষ্ঠিত। কাশ্মীরের ক্ষেত্রে পাকিস্থানী রাষ্ট্রনীতির কর্তারা সেই কৌশল প্রয়োগ করিবার সুযোগের প্রতীক্ষায় আছেন। সুখের বিষয় এই যে, ভারত সরকার এ সম্বন্ধে অনবহিত নহেন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কিছুদিন পূর্বে দেরাদুনে এবং পরে ২৮শে ও ২৯শে শ্রীনগরে পর পর কয়েকটি বক্তৃতায় কাশ্মীরের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া তাহা স্পষ্ট করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, কাশ্মীর ভারতেরই অংশ। এই প্রদেশকে ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার ক্ষমতা পৃথিবীর কাহারও নাই। কাশ্মীরের নিকট ভারত গভর্নমেণ্ট যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, তাঁহারা তাহার মর্যাদা রক্ষা করিবেন। বস্তুত কাশ্মীর সম্পর্কে গণভোটের ব্যবস্থা করিতে হইলে তৎপূর্বে আব্দুল্লা গভর্নমেণ্টকেই কাশ্মীরের যথা বিহিত গভর্নমেণ্ট বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। পরন্তু যাহারা কাশ্মীরের শান্তি বিপর্যস্ত করিয়াছিল, তাহাদিগকে সংযত রাখিতে হইবে। বর্তমানে কাশ্মীর বিধিসঙ্গতভাবে ভারতীয় রাষ্ট্রেরই অন্তর্ভুক্ত। পরে গণভোটের ফলে যাহাই ঘটুক, বর্তমানে কাশ্মীরে শান্তিরক্ষার দায়িত্ব ভারত গভর্নমেণ্টের ষোল আনা, অন্য কাহারও নয়। গণ-পরিষদে কাশ্মীর রাজ্যের প্রতিনিধি গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া ভারত এই দায়িত্ব প্রত্যক্ষভাবেই স্বীকার করিয়া লইয়াছে। এতৎসম্পর্কিত মূল প্রস্তাবটি উত্থাপন করিয়া শ্রীযুক্ত গোপালস্বামী আয়েঙ্গার খুলিয়া বলিয়াছেন যে, কাশ্মীর বর্তমানে পরিপূর্ণরূপে ভারত রাষ্ট্রেরই অন্তর্ভুক্ত। কাশ্মীর ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চায় কিনা প্রস্তাবিত গণভোট শুধু ইহাই নির্ধারণ করিবে। স্বাধীনভাবে পরিচালিত হইলে গণভোটের ফল কি দাঁড়াইবে, ইহাও একরকম সুনিশ্চিত হইয়া উঠিতেছে। কাশ্মীরের অধিবাসীরা শান্তিকামী। তাহারা মধ্যযুগীয় সাম্প্রদায়িকতার অন্ধ বর্বরতার হিংস্র বিক্ষোভের শীকারে পরিণত হইতে নিশ্চয়ই চায় না। বস্তুত ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িকতা রাষ্ট্রে শান্তি সুনিশ্চিত করিতে কোনদিন সমর্থ হয় না। পারস্পরিক জিঘাংসার প্রবৃত্তি তাহার মধ্যে বীজস্বরূপে থাকে এবং বিক্ষুব্ধ হইয়া সমাজকে বিপর্যস্ত করে। কাশ্মীরে যাহাতে এই বিপদ বিস্তার লাভ না করিতে পারে, ভারত গভর্নমেণ্টকে তাহা দেখিতে হইবে এবং প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। বলা বাহুল্য, কঠোর বাস্তবের এই ক্ষেত্রে সদিচ্ছামূলক উক্তি বা প্রতিশ্রুতির মূল্য নাই। বাস্তবিকপক্ষে পাকিস্থান-রাষ্ট্রের নিয়ামকদের তেমন প্রতিশ্রুতি অনেক ক্ষেত্রেই কপটতা বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। তাঁহাদের তেমন প্রতিশ্রুতির উপর ভারত সরকার নির্ভর করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিবেন না, পণ্ডিত জওহরলালের এ সম্বন্ধে দৃঢ়তাব্যঞ্জক উক্তি আমাদিগকে আশ্বস্ত করিয়াছে।

**অনর্থের বীজ কোথায়**

বাঙলাদেশ রাষ্ট্রনীতিকভাবে বিচ্ছিন্ন হইলেও পূর্ব ও পশ্চিম উভয়বঙ্গের মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক এখনও বিচ্ছিন্ন হয় নাই। উভয় রাষ্ট্রেই পরস্পরের প্রতি কতকগুলি দায়িত্ব আসিয়া পড়িয়াছে। সৌহার্দের পথে পারস্পরিক এই দায়িত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াই দুই রাষ্ট্রকে অগ্রসর হইতে হইবে। এজন্য উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে গতিবিধি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের সূত্র অবাধরূপে সম্প্রসারিত হওয়াই উচিত। দুই রাষ্ট্রের শুল্ক ব্যবস্থা পারস্পরিক এই স্বার্থের দিক হইতে শিথিল করা হইতেছে দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি; কিন্তু এ সব ব্যবস্থাও আমাদের মতে অনেকটা বাহ্য। বস্তুত পাকিস্থানী মতবাদ প্রচারের ফলে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার যে বিষ পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহা যদি উৎখাত না হয়, তবে সেখানকার সমাজ এবং অর্থনৈতিক জীবনে অব্যবস্থিত অবস্থা কিছুতেই দূর হইবে না। সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের উদ্বেগ এবং অস্বস্তির ভাব বিদ্যমান থাকিয়া রাষ্ট্রের শক্তিকে দুর্বল করিয়া ফেলিবে। পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মনে সাম্প্রদায়িক বৃত্তি কতকটা হিংস্রতা এবং অসংস্কৃত ও অনুদার নীতি-হীনতার সঙ্গে কাজ করিতেছে, ঢাকায় উকীল সভার নির্বাচনে আমরা তাহার পরিচয় পাইয়াছি। সম্প্রতি শান্তিবালা দাসীর অপহরণের মামলায় বিচারের যে প্রহসন অভিনীত হইয়াছে, তাহাতে সে পরিচয় আরও স্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। অপহৃতা বালিকাকে চার মাসেরও অধিককাল আইনের প্যাঁচ খেলাইয়া নির্লজ্জভাবে অপহরণকারীদের শয়তানী চক্রের চাপের মধ্যে রাখা হয়। সেই গণ্ডী হইতে মুক্ত হইয়া বালিকাকে স্বাধীনভাবে কোন কথা বলিবার অবসর দেওয়া হয় নাই। অপহরণকারী পক্ষেরই আওতার মধ্যে বালিকাকে দিয়া একখানা একতারনামা লিখাইয়া লইয়া আদালতে দাখিল করিয়া জানানো হয় যে, সে স্বেচ্ছায় ইসলাম-ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে এবং অপহরণকারী মোক্তারের পুত্রকে বিবাহ করিয়াছে। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে ঢাকার বড় হাকিম ছোট হাকিম, সকলেই নির্বিবাদে একটি অসহায় বালিকার উপর কতকগুলি মতলববাঁধা লোকের ঘোঁটকেই প্রশ্রয় দিয়াছেন। বালিকার অবস্থা বুঝেন নাই, বা বুঝিতে চেষ্টা করেন নাই। বালিকার পিতাকে বুকের ব্যথা লইয়া অবশেষে আদালত হইতে বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিতে হইয়াছে, এবং অপহরণকারীরা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ এবং বর্বর মনোবৃত্তির তৃপ্তিতে প্রমত্ত হইয়া বাদ্যভাণ্ড সহকারে পাকিস্থানের রাজধানীতে পথে পথে নিজেদের বিজয় গর্ব প্রকটিত করিয়াছে। নারীহরণ যেখানে বিচারের ক্ষেত্রেও মানবতাবিরোধী ক্রূর এবং অসংস্কৃত অভিসন্ধির পথে এমন পক্ষপাতিত্বমূলক প্রশ্রয় পায়, সেখানে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মধ্যে উদ্বেগ সৃষ্টি হইবে, ইহা স্বাভাবিক। আমরা পূর্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিব, ভাত-কাপড়ের কষ্ট বড় নয়। পূর্ব-বঙ্গের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ। শুধু অন্ন-বস্ত্রের কষ্টের জন্য তাহারা পিতৃপুরুষের ভিটামাটি ছাড়িতেছে না। প্রকৃত প্রস্তাবে নারীর মর্যাদাহানিকর এমন প্রতিবেশ প্রত্যহই তাহাদিগকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। ঢাকায় পূর্ববঙ্গের শিক্ষিত সমাজের কেন্দ্রস্থলে, শাসকদের সদাজাগ্রত দৃষ্টির সম্মুখে যদি এই ধরণের বিচার-প্রহসন সম্ভব হইতে পারে, তবে পল্লী অঞ্চলে কি ঘটা সম্ভব, বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না। এই ধরণের পাপাচার কঠোর হস্তে দমিত না হইলে পূর্ববঙ্গের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিবে না। ইহাতে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মধ্যে অসহায়ত্বের ভাব প্রবল হইয়া উঠিবে; কিন্তু এই পাপের সংক্রমণ-প্রভাব হইতে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ও নিষ্কৃতি পাইবে না। এ পাপ তাহাদের সমাজের ভিত্তিকে শিথিল করিবে। ইহা সমগ্রভাবে তাহাদেরও সর্বনাশের পথ উন্মুক্ত কবিবে। এইভাবে তাহাদের সাম্প্রদায়িকতান্ধ বর্বরতার বিজয়-গর্ব বিষাদে পরিণত হইতে দীর্ঘ দিন বিলম্ব ঘটিবে না। পূর্ববঙ্গের যাঁহারা প্রকৃত কল্যাণকামী, তাঁহাদের সর্বাগ্রে এদিকে অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

### মানভূমের সমস্যার প্রতীকার

মানভূমের সমস্যা সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি হইতে একটি কমিটি নিযুক্ত করা হইয়াছে, পাঠকবর্গ ইহাও অবগত আছেন। আমরা পূর্বে শুনিয়াছিলাম, বিহার প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি শ্রীপ্রজাপতি মিশ্র এই কমিটির অন্যতম সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন এখন জানা গিয়াছে, মিশ্র মহাশয় এই কমিটিতে নাই। ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ, শ্রীজগজীবন রাম, শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী এবং ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষকে লইয়া এই কমিটি গঠিত হইয়াছে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, কমিটিতে নিযুক্ত সদস্যদের সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য কিছুই নাই; কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটি তাঁহাদের কর্মের গণ্ডী যেভাবে নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, সেই সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার আছে। দেখা যায়, মানভূম সাধারণভাবে বাঙগালী সমাজের উপর কোন অত্যাচার হইতেছে কি না, সেখানে বাঙলা ভাষাকে উৎখাত করিবার জন্য চেষ্টা হইতেছে কি না, এবং লোকসেবক সঙ্ঘের সত্যাগ্রহ অবলম্বন করিবার পক্ষে সঙ্গত কারণ যথার্থই আছে কি না, কমিটির এইগুলি বিচার্য বিষয় হইবে। সুতরাং মানভূম অথবা বিহারের কোন অঞ্চল পশ্চিম বাঙলার অন্তর্ভুক্ত করার ঔচিত্য কিংবা ভাষার ভিত্তিতে বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের সীমানা পুনর্গঠনের প্রশ্নটি কমিটির বিচার্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। কিন্তু কমিটির সিদ্ধান্ত যাহাই হোক, কয়েকটি বিষয় অত্যন্তই স্পষ্ট। মানভূমে যাঁহারা সত্যাগ্রহ অবতারণা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই দেশপ্রেমিক এবং বহু অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কংগ্রেসকর্মী। অনর্থক একটা অশান্তি সৃষ্টি করিতে অগ্রসর হওয়া তাঁহাদের পক্ষে কখনই সম্ভব হইতে পারে না। অভাব-অভিযোগের কারণ নিশ্চয়ই কিছু আছে, তবে সেগুলির প্রতীকারের জন্য সত্যাগ্রহ অবলম্বন করা সঙ্গত হইয়াছে কি না ইহাই বিচার্য। এই বিষয় বিচার করিতে গেলে এ সম্বন্ধে বিহার সরকারের দায়িত্বের প্রশ্নও আসিয়া পড়ে। গুণ্ডা শ্রেণীর কতকগুলি লোকই যদি এই সব অভাব-অভিযোগের কারণ সৃষ্টি করিয়া থাকে, বাস্তবিক পক্ষে বিহার সরকার সে ক্ষেত্রেও নিজেদের দায়িত্ব এড়াইতে পারেন না। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বঙ্গভাষাভাষী প্রধান মানভূমকে কেন্দ্র করিয়া বিশেষভাবে এই সমস্যা দেখা দিয়াছে। ইহার কারণও সুস্পষ্ট। বাঙলা ভাষাকে উৎখাত করিয়া মানভূমকে হিন্দীভাষাভাষী অঞ্চলে প্রতিপন্ন করিবার একটা অভিসন্ধিই এই অঞ্চলে কাজ করিতেছে। ইহার প্রমাণ নানাভাবেই প্রকট হইয়াছে। সমস্যার প্রতীকার করিতে হইলে এই মূল কারণটি এড়াইয়া গেলে চলিবে না। অথচ কমিটির উপর যে ভার ন্যস্ত হইয়াছে, তাহাতে মূল কারণটি সুকৌশলে এড়াইয়া যাওয়া হইয়াছে; কিন্তু মূল ব্যাধির প্রতীকার যদি না হয়, তবে উপসর্গগুলিও স্থায়ীভাবে দূর হইবে না; পরন্তু ব্যাধিকে জটিল করিয়াই তুলিবে, ইহাই আমাদের আশঙ্কা। ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের প্রশ্নটি যদি বর্তমানে উত্থাপন করা একান্তভাবে অসমীচীন বলিয়া স্থির করা হইত, তবে আমাদের বক্তব্য কিছু ছিল না। কিন্তু তাহা হয় নাই। জয়পুর কংগ্রেস হইতে এ সম্বন্ধে বিচার করিবার জন্য প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এবং ডক্টর পট্টভী সীতারামিয়াকে লইয়া যে কমিটি গঠিত হয়, সেই কমিটি ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ পুনর্গঠনের নীতি স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের মতে সে নীতি শুধু দক্ষিণ ভারতের ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হওয়া উচিত, অন্যত্র নয়। বলা বাহুল্য, উত্তর ভারতে পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহারকে লইয়া এই প্রশ্ন মুখ্যভাবে দেখা দিয়াছে। কমিটি পশ্চিমবঙ্গের দাবী ধর্তব্যের মধ্যে আনেন নাই। কারণ, সীমানা সম্পর্কিত সে সমস্যা সামান্য। এদিকে দক্ষিণ ভারতে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের সমস্যা উত্তরোত্তর অনেক জটিলতার সৃষ্টি করিতে চলিয়াছে; অথচ পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের সমস্যা সহজেই মিটিতে পারে এবং এই সমস্যার সঙ্গে দুইটি প্রতিবেশী প্রদেশের মধ্যে ক্রমাগত যে বিদ্বেষ ও বিরোধের ভাব জমিয়া উঠিতেছে, তাহারও সমাধান হয়। কিন্তু এত সহজ প্রশ্নটির সমাধানই বিলম্বিত করা চাই। আমাদের এমন যুক্তি অদ্ভুত বলিয়াই মনে হয়। আমাদের মতে পশ্চিমবঙ্গের সম্বন্ধে এক্ষেত্রে সুস্পষ্টভাবেই অবিচার করা হইয়াছে এবং কংগ্রেস-গৃহীত সিদ্ধান্তের মূলীভূত আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের সীমানা ভাষার ভিত্তিতে পুনর্গঠনে প্রবৃত্ত না হইলে মানভূমের সমস্যার স্থায়ীভাবে সমাধান সম্ভব হইবে না। বাঙলার ভাষা ও সংস্কৃতি অত্যন্ত জীবন্ত এবং বলিষ্ঠ। জবরদস্তির দ্বারা তাহাকে উৎখাত করা যাইবে না, অথচ বিহারের নেতাদের প্রাদেশিকতামূলক মনোবৃত্তি সেই উদ্দেশ্যেই বিহার সরকারের নীতিকে প্রভাবিত করিতে প্রবৃত্ত রহিয়াছে। ইহার ফলে বাঙালী সমাজের মধ্যে অসন্তোষের ভাব ধূমায়িত হইতে চলিয়াছে। অবিলম্বে অনর্থের এই বীজ অপসারিত করাই ভারতের বৃহত্তর কল্যাণের দিক হইতে প্রয়োজন। মানভূমের সত্যাগ্রহ এই সত্যকে উন্মুক্ত করিয়াছে।

### ভারতে কমিউনিস্ট ব্যর্থতা

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ব্রিটিশ কমিশনার জেনারেল মিঃ ম্যাকডোনাল্ড লণ্ডনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলিয়াছেন, "এশিয়ার কমিউনিস্টদিগের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা ভারতেই সব চেয়ে বড় ব্যর্থতায় পরিণত হইয়াছে।" মিঃ ম্যাকডোনাল্ড ব্রিটিশ রাজপুরুষ; সুতরাং তিনি স্বভাবতই কমিউনিস্ট বিরোধী। তাঁহার উক্তিকে বেদবাক্য স্বরূপে গ্রহণ করিতে হইবে, এমন কারণ অবশ্য কিছু নাই; কিন্তু তিনি যে কথাটা বলিয়াছেন, তাহা সত্য। ভারত স্বাধীনতা লাভ করিবার পর দেশের মধ্যে একটা অরাজকতার ভাব সৃষ্টি করিয়া কমিউনিস্টরা এখানে নিজেদের প্রতিষ্ঠা অর্জনের জন্য নানা রকমে চেষ্টা করিয়াছে; কিন্তু তাহাদের চেষ্টা শেষটা ব্যর্থতায় পরিণত হইয়াছে, পরন্তু এ দেশের জনসাধারণ এই দলের উপর বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। ইহার কারণ কি? চীনে কমিউনিস্ট প্রভাব বিস্তৃত হইতেছে। ব্রহ্মে এবং মালয়েও তাহাদের তৎপরতা চলিতেছে; তথাপি ভারতে ইহাদের গতি প্রতিহত হইয়াছে, ইহা স্পষ্টই দেখা যায়। ইহার প্রধান কারণ এই যে, কমিউনিস্ট মতবাদের মধ্যে এমন কোন উচ্চ আদর্শ নাই, ভারতের সংস্কৃতি সাধনা এবং মনীষার মধ্যে যাহার অভাব আছে! সাম্য, মৈত্রী ও মানবসমাজের কল্যাণে উদার ভিত্তির উপর ভারতের সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত; পক্ষান্তরে কমিউনিস্ট মতবাদের মধ্যে সমাজ-সংস্থিতির কোন স্বাভাবিক, সহজ এবং পূর্ণাঙ্গ আদর্শ নাই। মানুষের স্বাধীনতাকে পিষ্ট করিয়া তাহার ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিয়া ব্যক্তিপ্রভুত্বময় স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করাই কমিউনিস্ট মতবাদের মর্মকথা। উচ্চতর মানব-সংস্কৃতি পশুত্বের এই দুর্নিবার দৈন্য স্বীকার করিয়া লইবে না রবীন্দ্রনাথ রাশিয়াতে গিয়া খোলাখুলি ভাবে এ কথা বলিয়া আসিয়াছিলেন। মতবাদে সাংস্কৃতিক দিক ছাড়া বাস্তব কার্যকারিতা দিক হইতেও কমিউনিস্ট মতবাদ ভারতে জনচিত্তের বিরোধী। কমিউনিস্টরা জন সাধারণকে দুঃখ-দারিদ্র্য হইতে উদ্ধার করিবা বড় বড় কথা বলিয়া থাকে; কিন্তু কার্যত তাহাদের নীতি নিদারুণ হিংসা ও বিদ্বেষ প্রজ্জ্বলিত করিয়া তোলে এবং তাহার ফলে সমাজ-সংস্কৃতি ভাঙিয়া যায়। কমিউনিস্টদের কর্মতৎপরতা অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিপর্যয় ঘটাইয়া দেশবাসীকে আরও ভয়াবহ অভাবের মধ্যে টানিয়া লইয়া যায়। তাহাদের সু বিদ্বেষের গতি বেশী দূর আগাইয়া যাইতে পারে না; ভারতের সুব্যবস্থিত সাংস্কৃতিক সমাজ-প্রতিবেশের মধ্যে অনতিকাল মধ্যে তাহাদের অন্ধ নীতির প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে।

# কাগজ

**সুশীল রায়**

ছোটো এক টুক্‌রো কাগজ
উঠোনের বাতাসের সঙ্গে শুরু করে মাতামাতি।
হিজিবিজি অসমান অক্ষম অক্ষরে
কত কী-যে লেখা;
অকস্মাৎ কোন্ খান থেকে উড়ে আসে।
ওদিকে জুঁই-এর ডালে উঁকি দেয় কুঁড়ি।

প্রাণমন সহসা উধাও!
পার হ'য়ে চলে মাঠ, পার হ'য়ে চলে একটানা
হাজার হাজার গতকাল,
অশ্বত্থে ও বটে ফেলে আগুনের মতন নিশ্বাস
পাড়ি দিয়ে চলে যায় পাইনের বন,
কাকের চোখের মতো টল্‌টলে ঝরণার কিনারে
হয়ত থম্‌কে থামে, চলে ফের হাওয়ার মতন,
নির্জন পল্লীর পথে পরিশ্রান্ত ক্লান্ত গোরু-গাড়ি
কাতর ক্রন্দনে আর্তনাদ ক'রে ওঠে,—
ক্ষণেক সে-স্বর শুনে চলে সে আবার।
শাল তাল পিয়াল পেয়ারা
পার হ'য়ে চলে যে কোথায়
কে জানে ঠিকানা।
আমের বনের ধারে ধু ধু মাঠ প'ড়ে আছে একা
নিকট কিনারে তার ধোঁয়া ওঠে ইঁটের খোলায়,
দুরন্ত দুপুরে সেইখানে
ঝাঁঝাঁ রোদে পুড়ে হয় খাক।
এইখানে ছিল বুঝি একদিন খাসা মৌচাক।
প্রাণমন তবুও উধাও?
সহসা সবলে রাশ টেনে ধরি যেই
সকল ঐশ্বর্য যেন ফিরে আসে এক নিমেষেই।

বনবীথি নেই আর, এসে গেছি প্রকান্ড সড়কে;
আলোয় মুখর রাজপথ চৌপহর।
রোদ নাকি আসে যায় প্রত্যহের মতো—
বহুকাল দেখি নি তো তাদের চেহারা।
ভুলে গেছি দুপুরে কেমন,
মধুচক্র কাকে বলে জানে ইতিহাস।
ছোটো এক টুক্‌রো কাগজ
সমস্ত জীবনে ঢেলে দিলো মৌতাত,
নিমেষে সর্বাঙ্গ থেকে পরিপূর্ণ আঠারো বছর
খোলসের মতো গেলো খুলে—
মসৃণ সুন্দর সাজে দাঁড়ালেম সম্মুখে তোমার,
রক্তে এসে গেলো যেন নতুন জোয়ার।
একবার দ্যাখো দেখি আমাকে চিনিতে পার কি না,
কোনো দিন দেখেছ কি পাইনের মতন সহজ
ঝরণার মতন স্বচ্ছ
আগুনের মতন উজ্জ্বল।
আমি সূর্য নই, তাই শিখি নাই, অনির্বাণ জ্বলা
নির্বাক গ্রহের মতো জানি শুধু অন্ধ পথ চলা।
মনের অরণ্যে ফুটে ওঠে মাঝে মাঝে
আশ্চর্য সৌন্দর্য নিয়ে যে ফুলের কুঁড়ি,
যে দেখায় বনপথ, তাহারি আলোতে
সচেতন হ'য়ে ওঠে পাথরের কঠিন সড়ক—
সে-ও মাঝে মাঝে।
প্রত্যহের শিরা তাই এখনো বন্যায় আছে ভরা।

নিভে এলো আলো যার, শেষ হ'য়ে গেছে যার জ্যোতি,
সে যদি জ্বলার চেষ্টা করে, কা'র ক্ষতি?
সে-চেষ্টা বিফল হোক, হোক নিরর্থক—
কিসের আক্ষেপ?
মুমূর্ষু চিতায় যদি দিয়ে যাও জল দু'কলস,
তাপ আর পরিতাপ ধুয়ে মুছে যাবে একেবারে।
জন্মের নূতন স্বাদ পাব
অদূরে প্রবাহ যদি বহে নিরন্তর
নম্র স্রোতে তোমার ও চোখের জাহ্নবী।

# রবীন্দ্র-জন্মোৎসব

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত

**র**বীন্দ্রনাথের জন্মদিন যে জাতির উৎসবের দিন, একথা কেউ না বলে দিলেও জাতি স্বতই স্বীকার করে নিয়েছে। আপনারা জানেন আমাদের দেশের গভর্নমেণ্টও এ দিনটিকে উৎসবের দিন বলে স্বীকার করেন নি; তবু দেশবাসীর মনে এ দিনটি চিহ্নিত হয়ে আছে।

রবীন্দ্র-জন্মোৎসব কি করে পালন করতে হয়, রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলন তার প্রকৃষ্ট উপায় দেখিয়েছেন। এ কয়দিন আপনারা রবীন্দ্রনাথের কাব্য সংগীত প্রভৃতির নিবিড় পরিচয় লাভ করেছেন, রবীন্দ্রনাথের কর্মজীবন, রাষ্ট্রীয় বন্ধনমুক্তির জন্য রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগ, শিক্ষাতত্ত্বে তাঁর দান, এসব বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ আপনাদের কাছে আলোচনা করেছেন। আজ উৎসবের শেষদিনে রবীন্দ্রনাথকে খণ্ডশ নয়, সমগ্রভাবে বুঝবার চেষ্টা করব।

রবীন্দ্রনাথ যে দেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তা পৃথিবীর অগ্রবর্তী দেশগুলির অন্যতম নয়; যে ভাষায় তিনি তাঁর সাহিত্য রচনা করে গিয়েছেন, তা আজো পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় ভাষাগুলির অন্তর্গত নয়—এই দেশে জন্মে, এই ভাষায় রচনা করে তিনি যে অসীম সম্পদ দিয়ে গেছেন, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে আসন গ্রহণ করেছেন, এ এক পরম বিস্ময়। তাঁর সাহিত্যের প্রসার অসাধারণ, পৃথিবীর ইতিহাসে এর সঙ্গে তুলনীয় দুটি-একটি মাত্র দৃষ্টান্ত মেলে, যেমন গ্যেটে। রবীন্দ্রনাথের কবিকীর্তির সঙ্গে তাঁর কর্মজীবনের কথা বিবেচনা করলে পৃথিবীর ইতিহাসেও এর কোনো তুলনা পাবেন না। সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগকে যিনি এমন সমৃদ্ধ করেছেন, তিনিই দেশের স্বাধীনতার জন্য উদ্যোগী হয়েছেন, দেশের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের কথা ভেবেছেন। আপনারা এ ক'দিন ধ'রে রবীন্দ্র-জীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে, তাঁর গান তাঁর নাটক তাঁর শিক্ষানীতি সম্বন্ধে আলোচনা শুনেছেন—মনে রাখবেন এসবই একজন মানুষেরই কাজ। শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি যা ভেবেছেন, শুধু তা যে চিন্তারাজ্যে আবদ্ধ ছিল তা নয়, হাতে কলমে তা তিনি প্রয়োগ করেছেন। গ্রামের উন্নতি সম্বন্ধে তিনি যা ভেবেছেন, হাতে-কলমে তাকে রূপ দিয়ে গেছেন। এ রকম মানুষ যে আমাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন এতে আমরা ধন্য হয়েছি, তাই এই দিনটিকে জাতি নিজ অন্তরের প্রেরণায় উৎসবের দিন বলে গ্রহণ করেছে। আপনারা জানেন, তিনি বার বার বলে গিয়েছেন—'আমি আপনাদের কাছে ভক্তি চাই না, আমি গুরু নই আমি কবি, কবির প্রাপ্য প্রীতি যদি আমি পাই তবেই আমার জীবন ধন্য।'—তাঁর সাহিত্য তাঁর সঙ্গীতের পরিবেশন ক'রে রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলন তাঁকে সেই প্রীতি দান করেছেন।

বাঙালী যেন একটা ভুল না করে, রবীন্দ্রনাথকে যেন প্রপ্যাগাণ্ডার বিষয় না ক'রে তোলে। বর্তমানে রাষ্ট্রনীতি এত প্রবল হয়ে উঠেছে যে, সবই প্রপ্যাগাণ্ডার বিষয় হয়ে উঠেছে। একথা বেশি করে মনে হচ্ছে নানা দেশে রবীন্দ্র-লেকচারশিপ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার আয়োজন দেখে।

রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে হলে তাঁর কাব্য তো রয়েছে—সে কাব্য তো কেবল বাঙালীর নয়, অন্যান্য মহাকবির মত তাঁর রচনাও পৃথিবীর সম্পদ; প্রতিভার জন্ম যে দেশেই হোক তা সব দেশেরই, জাতিতে জাতিতে ভেদ প্রতিভার কাছে নেই। রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রচারের জন্য আমরা সেই স্বীকৃতিরই অপেক্ষা করব, প্রপ্যাগাণ্ডার আশ্রয় গ্রহণ করব না, সেটা শ্রদ্ধা ও প্রীতির পথ নয়। সুখের বিষয় এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারা ভুল করেন নি, তাঁরা রবীন্দ্রনাথের মূল সৃষ্টিই আপনাদের কাছে উপস্থিত করেছেন, সে সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন—এই মুখোমুখি চাক্ষুষ পরিচয়ই তো রবীন্দ্রনাথকে জানবার প্রকৃত উপায়।

এই ক'দিন এখানে যে আলোচনা হয়েছে, তার মধ্যে রবীন্দ্র-কাব্যের আলোচনা বিশেষ স্থান পায় নি, তার কারণ রবীন্দ্রনাথের কাব্য এত বিস্তৃত যে, তার বিশেষ একটি অংশ না নিলে সাধারণভাবে তার আলোচনা করা যায় না। তাঁর মত লিরিক কবি পৃথিবীতে আর জন্মগ্রহণ করেন নি; ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলি, কীট্‌স্‌ প্রভৃতি যে সকল শ্রেষ্ঠ লিরিক কবি ছিলেন তাঁদের সকলেরই পরিধি রবীন্দ্রনাথের তুলনায় সংকীর্ণ। তাঁরা সকলেই যেন একতারা বাজিয়েছেন, আর রবীন্দ্র-কাব্য যেন সিমফনি।

আমরা বলে থাকি শেক্‌সপীয়রের নাটক 'অবজেক্‌টিভ', তাতে বিশেষভাবে কবির নিজের মনের ভাবমাত্র প্রকাশ পায় নি, নানা বিচিত্র নরনারীর মনের নানা ভাব ও ব্যাকুলতা তাতে প্রকাশ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের লিরিকও এই প্রকৃতির; এতে কবির মন প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু অন্তহীন সে মন। মানুষের মনের সকল বিচিত্র ভাবকে তিনি তাঁর লিরিকে চরম রূপ দিয়েছেন। আপনারা সকলেই জানেন রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে গতির কবি বলে আখ্যাত, গতির চাঞ্চল্য তাঁর মনকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছিল, নানা কবিতায় তিনি তা প্রকাশ ক'রে গিয়েছেন। আবার যখন তিনি হিমালয় সম্বন্ধে কবিতা লিখেছেন, তিনি তার স্থির রূপকেই ভাষা দিয়েছেন—গতির কবি হয়েও তিনি স্থিতির মাধুর্যেও আকৃষ্ট হয়েছিলেন। মানুষের মনের নানা বিরুদ্ধ ভাবকে তিনি লিরিকে রূপ দিয়েছেন। এইজন্যই তাঁর রচনাকে 'অবজেক্‌টিভ লিরিক' বলেছি। রবীন্দ্রনাথ যে 'নমো যন্ত্র' লিখে গিয়েছেন, যে-দেশে যন্ত্রকে বন্দনা করা হয় সে দেশেও সে রকম গান লিখিত হয় নি। তাদের মনোভাবকেই তিনি গানে প্রকাশ করেছেন। অথচ তিনি নিজে যে যন্ত্রের প্রতি অনুকূল ছিলেন তা নয়, যে নাটকে এই গানটি আছে, সে নাটকটিই যন্ত্রের বিরুদ্ধে, যারা যন্ত্রের পূজক তাতে তাদের নিন্দাই করা হয়েছে; যে মনোভাবের সঙ্গে তাঁর মতের মিল নেই তার জন্যও তিনি অপূর্ব কবিতা রচনা করে গিয়েছেন, সেই মনোভাব যে তাঁর তখনকার মনোভাব। এইজন্যই তাঁর কবিতাকে অবজেকটিভ বলি—সমস্ত মানুষের অন্তরের কথা তিনি ভেবেছেন, সমস্ত মানুষের সমস্ত বিচিত্র মনোভাবের প্রকাশ এমন আর কারও কাব্যে নেই, তাই তাঁকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ লিরিক কবি বলে গণ্য করি।

বাঙলা দেশকে বাঙলা ভাষাকে তিনি যে চূড়ায় তুলে দিয়ে গেছেন, তার তুলনা নেই—একজনের কবিকর্মে এ রকম নূতন জগৎ সৃষ্টি, এ কদাচিৎ দেখা যায়। এর তুলনা পাই মহাকবি দান্তের জীবনে—তিনি যে ভাষায় কাব্য রচনা করেছিলেন, তাঁর পূর্বে সে ভাষার সম্বল অল্পই ছিল, তিনিই তাকে বড় কাব্যের ভাষায় পরিণত করে গিয়েছিলেন।—জগৎ-কবি-সভায় আসন পেয়েও তিনি এই বাঙলাদেশকেই ভালোবাসতেন, অন্য দেশে যখন যেতেন, তখন এই বাঙলাদেশের আকাশের জন্যই তাঁর মন ব্যাকুল হয়ে থাকত—তাঁর সাহিত্যে তিনি বাঙলাকেই চিত্রিত করেছেন—এমনভাবে করেছেন যে, তা বিশ্বসাহিত্যে পরিণত হয়েছে; প্রতি মহাকবিই তাই করেন, তাঁরা যা সৃষ্টি করেন তা সমস্ত মানুষের সম্পদ—রবীন্দ্রনাথও তাই করেছেন—তাঁর কাব্য কেবল বাঙলার কাব্য নয়, সমস্ত মানুষের কাব্য।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে আরও একটা কথা বিশেষ করে মনে রাখতে হবে।

আজ পৃথিবীতে সংকটের দিন এসেছে। সেই সংকটের যেটা বাহিক রূপ, সে সম্বন্ধে অনেকে চক্ষুষ্মান্ হয়েছেন; জাতিতে জাতিতে যে হানাহানি দেখা দিয়েছে, এমন অস্ত্র তৈরি হচ্ছে যার ফলে সভ্যতাই ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। তা যে বন্ধ করা প্রয়োজন এ সম্বন্ধে অনেকে সচেতন হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথও এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলে গিয়েছেন, তাঁর মনের গড়নই এমন ছিল যাতে সহজে মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধকে তিনি স্বীকার করে নিতে পারতেন।

কিন্তু আজ পৃথিবীতে আরো একটি সংকটের কারণ উপস্থিত হয়েছে। আমরা যে জ্ঞানবিজ্ঞান আলোচনা করে থাকি তার দুটি দিক আছে, এক বিশুদ্ধ জ্ঞানের দিক, আর তার প্রয়োগের দিক। বিজ্ঞানের সেই প্রয়োগের দিকটাই আজ বড় হয়ে উঠেছে জ্ঞানের আনন্দ উৎসাহ নয়। এডিসন তার জ্ঞান ব্যবহারিক প্রয়োগে লাগিয়ে গিয়েছেন, কিন্তু আইনস্টাইন তাঁর মনীষাকে তো সে রকম কোনো কাজে লাগান নি। পৃথিবীর বহুসংখ্যক মানুষ আজ অন্ন-বস্ত্র থেকে বঞ্চিত বলে জ্ঞানের এই প্রয়োগের দিক কাজের দিকই মানুষের কাছে বড় হয়ে উঠেছে, আনন্দের দিকটা নয়। অবশ্যই বিজ্ঞানকে আমরা সহায়রূপে চাই; তবু তার যে অংশ কোনো কাজে লাগে না সেইটাই যে বড়, সেকথা যদি ভুলি তবে যে সভ্যতাই যাবে। ধরা যাক রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গান—তার থেকে আমরা একটা ফল পেয়েছি, স্বাধীনতার যুদ্ধে তা আমাদের উন্মাদনা জুগিয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অন্য গানই তো বেশি, তার কি ফল? তা নিজেই তার পরম ফল। অনেক সময় দেখা যায় রোগাক্রান্ত ব্যক্তি রোগের যে প্রতিষেধক দেওয়া হয় তারই ফলে সে মারা যায়, রোগের ফলে নয়; আমাদেরও সে পরিণাম হতে পারে। যারা নানাভাবে বঞ্চিত হয়ে আছে অবশ্যই তাদের তা থেকে মুক্ত করতে হবে, কিন্তু অন্য কিছুকে উপেক্ষা ক'রে নয়, তা করলে রোগপ্রতিরোধের প্রতিক্রিয়াই প্রবল হয়ে উঠবে। রবীন্দ্রনাথের জীবনে আমরা দেখি, কাজের প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে যে জ্ঞান ও আনন্দ তাকেই তিনি বড় আসনে বসিয়ে গেছেন। শরীরের প্রয়োজন মেটাবার দরকার আছে, কিন্তু সে প্রয়োজন ছাড়িয়েও কিছু আছে যাকে উপেক্ষা করলে চলবে না। খাওয়া পরার ব্যবস্থা প্রয়োজন, কিন্তু সেইটাই চরম এ ভুল যেন আমরা না করি। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত জীবন এই ভুলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। আমরা যারা কাজের কথা বলি তাদের চেয়ে রবীন্দ্রনাথ কম কাজ করেন নি, বিস্ময়কর বিচিত্র তাঁর কর্মজীবন, কিন্তু তাকে ছাপিয়ে ছিল তাঁর আনন্দ। তাঁর জীবনের এই চরম শিক্ষা যেন এই উৎসবে আমরা স্মরণ রাখি।

**[ রবীন্দ্র জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে মহাজাতিসদনে অনুষ্ঠিত সপ্তাহব্যাপী রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্মেলনের শেষ অধিবেশনে (৩১শে বৈশাখ, ১৩৫৬) মূল সভাপতির অভিভাষণের অনুলিপি। ]**

শিল্পী—**শ্রীনন্দলাল বসু** শ্রীগোলক দাসের সৌজন্যে

# ভারতের নব রাষ্ট্ররূপ

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়

## স্বাধীন ও সার্বভৌম ভারত

ভারতীয় গণপরিষদ নবভারতের যে শাসনতন্ত্র রচনায় ব্যাপৃত আছেন, তাহাতে ভারতবর্ষ পূর্ণ স্বাধীনতার অধিকারী হইয়া আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ পাইবে কি না, এই প্রশ্ন কেহ কেহ উত্থাপন করিয়াছেন। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট যখন আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয়গণের হাতে ক্ষমতা অর্পিত হইল, তখন মধ্যবর্তীকালীন ব্যবস্থারূপে ভারতবর্ষকে "বৃটিশ কমনওয়েলথের" অন্তর্ভুক্ত ডোমিনিয়নরূপে পরিগণিত করা হইয়াছিল। এই সুযোগেই সমালোচনাকারীগণ ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলিবার অবকাশ পান। অতঃপর কমনওয়েলথ সম্মেলনে যখন সিদ্ধান্ত হইল যে, ভারতবর্ষ কমনওয়েলথের সদস্যরূপে অবস্থান করিবে, বিরুদ্ধবাদীদের সমালোচনাও সুযোগ বুঝিয়া তখনই উগ্রতর আকার ধারণ করে। জনৈক বিশিষ্ট নেতা কমনওয়েলথ সম্মেলনের উক্ত সিদ্ধান্তকে "দেশের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা" আখ্যা দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। গণপরিষদে এতৎসম্পর্কিত বিতর্ককালে কোন এক বিশিষ্ট সদস্য কমনওয়েলথ সম্মেলনের ঘোষণাকে ভারতের বিরুদ্ধে বৃটিশ শাসকবর্গের এক নূতন কৌশল বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার মতে ইহা বৃটিশ ঔপনিবেশিক নীতিরই এক নূতন পর্যায়। এইরূপ আরও কোন কোন দলীয় নেতা কমনওয়েলথ সম্মেলনের ঘোষণার সমালোচনা করিয়া দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, স্বাধীনতা লাভের যে স্বপ্ন ভারতবর্ষ সুদীর্ঘকাল দেখিয়া আসিয়াছে, ভারতীয় নেতৃবর্গের অবিবেচনার ফলে তাহা আজ শূন্যে বিলীন হইল।

### অভিযোগ ভিত্তিহীন

কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার কি ইহাই? ভারত রাষ্ট্রের যে নবরূপ পরিকল্পিত হইতেছে, তাহাতে কি সত্যই ভারতের স্বাধীন ও সার্বভৌম অধিকার ক্ষুণ্ণ হইবার আশংকা আছে? ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কিত বৃটিশ পার্লামেন্টের আইন, গণপরিষদের সংশ্লিষ্ট বিধানসমূহ এবং কমনওয়েলথ সম্মেলনের ঘোষণা নিরপেক্ষ মন লইয়া পর্যালোচনা করিলে কিন্তু তেমন সম্ভাবনার লেশমাত্র দেখা যায় না। পক্ষান্তরে যাহা দেখা যায়, তাহাতে সুস্পষ্টরূপেই প্রতিভাত হইবে যে, ভারত রাষ্ট্র অপরাপর স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের মতই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হইতে চলিয়াছে।

### ভারতীয় স্বাধীনতা আইন

১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে বৃটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক যে 'ভারতীয় স্বাধীনতা আইন' রচিত হয়, এই প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে তাহারই উল্লেখ করা যাইতেছে। উক্ত আইনে ভারতবর্ষকে বৃটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত ডোমিনিয়নরূপে কল্পনা করা হইয়াছে সত্য, কিন্তু রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা বলিতে যাহা বুঝায়, ভারতীয় স্বাধীনতা আইনে তাহা সম্পূর্ণরূপেই স্বীকৃত হইয়াছে। উক্ত আইনের সংশ্লিষ্ট কয়েকটি বিধানের* প্রতি লক্ষ্য করিলেই তাহা সুস্পষ্ট হইবে। ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের ৬ষ্ঠ বিধানে বলা হইয়াছে—

১ম অনুচ্ছেদ

"নূতন ডোমিনিয়নের আইনসভা উক্ত ডোমিনিয়ন সংক্রান্ত যে কোন আইন প্রণয়নের অধিকারী হইবেন।"

২য় অনুচ্ছেদ

"ডোমিনিয়নের আইনসভা কর্তৃক রচিত আইন ইংলণ্ডের কোন আইন অথবা ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের অথবা বৃটিশ পার্লামেন্টের ভবিষ্যৎ কোন আইনের পরিপন্থী বলিয়া বাতিল বা অকার্যকর গণ্য হইবে না।"

৪র্থ অনুচ্ছেদ—

চতুর্থ অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে, নির্দিষ্ট দিবসের পর বৃটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক রচিত কোন আইনই নবগঠিত ডোমিনিয়ন সম্পর্কে প্রযোজ্য হইবে না, যদি না উক্ত ডোমিনিয়নের আইনসভা কর্তৃক উহা প্রযুক্ত হয়।

অতঃপর ৭ম ধারায় সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে,—

"নির্দিষ্ট দিবসের পর বৃটিশ ভারত নামে এতদিন যাহা পরিচিত ছিল, তাহার শাসনব্যবস্থা পরিচালনার কোনরূপ দায়িত্ব বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের থাকিবে না।"

[*Indian Independence Act, 1947 Sec. 6—Sub. Sec. 1—The Legislature of each of the new Dominions shall have full power to make laws for that Dominion, including laws having extra-teritorial operation.

Sub.-Sec. 2—No law and no provision of any law made by the Legislature of either of the new Dominions shall be void or inoperative on the ground that it is repugnant to the law of England or to the provisions of this or any existing or future Act of Parliament of the United Kingdom or to any order, rule, or regulation made under this Act. Sub-Sec. 4—No Act of Parliament of the United Kingdom passed on or after the appointed day shall extend or be deemed to extend to either of the new Dominions as part of the law of that Dominion unless it is extended thereto by a law of the Ltgislature of the Dominion."

Sec. 7—As from the appointed day, His Majesty's Government in the United Kingdom shall have no responsibility as respects to the Government of any of the territories which immediately before that day, were included in British India.]

ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের উদ্ধৃত বিধানসমূহ হইতে পরিষ্কারভাবে বুঝা যাইতেছে যে, ভারতীয় স্বাধীনতা আইন কার্যকরী হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ভারত সম্পর্কে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট তাঁহাদের দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়াছেন এবং সেইদিন হইতেই ভারতের আইনসভা ভারত রাষ্ট্র সম্পর্কে যে কোন আইন প্রণয়নের ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন। উদ্ধৃত বিধানে আরও দেখা যাইতেছে যে, নির্দিষ্ট তারিখের পর বৃটিশ পার্লামেণ্টের কোন আইনই ভারতীয় আইনসভার অমতে ভারতবর্ষ সম্পর্কে প্রযোজ্য হইবে না। স্বাধীন রাষ্ট্রের যে সকল অধিকার থাকা সম্ভব, দেখা যাইতেছে, ভারতীয় স্বাধীনতা আইনে ভারতের সেই সমস্ত অধিকারই পূর্ণমাত্রায় স্বীকৃত হইয়াছে।

### ক্ষমতা হস্তান্তর

ভারতীয় স্বাধীনতা আইন রচিত হইবার পর আসিল বৃটিশ গভর্নমেণ্ট কর্তৃক ভারতীয়গণের হস্তে ক্ষমতা অর্পণের ঐতিহাসিক ঘটনা। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট নয়াদিল্লীতে ভারতের তদানীন্তন রাজপ্রতিনিধি এবং বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেন বৃটিশ গভর্নমেণ্টের পক্ষ হইতে ভারতীয় গণপরিষদের হস্তে ভারতের শাসনক্ষমতা আনুষ্ঠানিকভাবে অর্পণ করেন এবং গণপরিষদ সেই ক্ষমতা গ্রহণ করেন। গণপরিষদের সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ এই প্রসঙ্গে যে ঘোষণাবাণী পাঠ করেন, তাহা এইরূপ—

"আমি প্রস্তাব করিতেছি মহামান্য রাজপ্রতিনিধিকে ইহা জানানো হউক যে, ভারতীয় গণপরিষদ অদ্য ভারতের শাসনক্ষমতা স্বীয় হস্তে গ্রহণ করিয়াছেন।" *

[*"I propose that it, will be intimated to His Excellency the Viceroy that the Constituent Assembly has assumed the power for the Government of India."]

### গণপরিষদের প্রস্তাব

ভারতীয় স্বাধীনতা আইন এবং ক্ষমতা অর্পণ—এই দুইটির পরেই বিচার করিতে হইবে গণপরিষদের সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবগুলিকে। ১৯৪৭ সালের জানুয়ারী মাসে ভারতীয় গণপরিষদে রাষ্ট্রীয় আদর্শ সম্বন্ধে যে সংকল্প * গৃহীত হয়, তাহাতে ভারতবর্ষকে "সার্বভৌম স্বাধীন প্রজাতন্ত্র"রূপে বর্ণিত হইয়াছিল।

[* "Wherein this Constituent Assembly declares its form and solemnly resolve to proclaim India as an "Independent Sovereign Republic" and to draw up for her future Government a constitution, the territories that now comprise British India, the territories that now form the India as are outside British India and the States as well as such other territories as are willing to be constituted into the independent Sovereign India shall be a Union of them all." etc.]

ডাঃ বি আর আম্বেদকারের সভাপতিত্বে গঠিত গণপরিষদের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটি "সার্বভৌম, স্বাধীন রিপাবলিক" শব্দগুলির পরিবর্তে "সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক রিপাবলিক" এই শব্দগুলি স্থাপনের সুপারিশ করেন। এই পরিবর্তনের কারণ সম্বন্ধে ডাঃ আম্বেদকার গণপরিষদের সভাপতির নিকট লিখিত মন্তব্যে বলেন যে, সার্বভৌম শব্দটির মধ্যেই স্বাধীন শব্দটির তাৎপর্য নিহিত রহিয়াছে। কাজেই 'সার্বভৌম' শব্দটির পরে আর 'স্বাধীন' শব্দটির কোন প্রয়োজন নাই। *

[* The Drafting Committee has adopted the phrase Sovereign "Democratic" Republic, because independence is usually implied in the word 'Sovereign,' so that there is hardly anything to be gained by adding the world "Independent"—Ambedkar.

সার্বভৌম ক্ষমতার তাৎপর্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বিখ্যাত রাজনৈতিক লেখক গ্রোটিয়াসের মন্তব্য এইরূপ:—

"It is the supreme political power vested in him whose acts are not subject to any other and whose will cannot be overridden."

ব্ল্যাকস্টোন বলেন—
"It is the supreme, irresistible, absolute uncontrolled authority....."

অপরাপর খ্যাতনামা লেখকগণও রাষ্ট্রের সীমাহীন অপ্রতিহত ক্ষমতার দ্যোতকরূপে সার্বভৌম ক্ষমতার কল্পনা করিয়াছেন।
বিশ্ববিশ্রুত আইনজ্ঞ অস্টিনের মতে—

"If a determinate human superior, not in the habit of obedience to a like superior receive habitual obedience from the bulk of a given Society, that determinate superior is Sovereign in that Society and the Society (including the Superior) is a society political and independent."]

### গণতান্ত্রিক রিপাবলিক

অতঃপর প্রশ্ন উঠিতে পারে, 'রিপাবলিক শব্দটির সঙ্গে গণতান্ত্রিক শব্দটি সংযোজনার বিশেষ তাৎপর্য কি? ডাঃ আম্বেকার ইহার কোন আলোচনা করেন নাই। তবে ইতিহাস পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন যে, রিপাবলিক শব্দটি গণতন্ত্রের সমার্থবোধকরূপে প্রচলিত হইলেও অনেক সময় অনেক রিপাবলিক রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের সম্যক মর্যাদা রক্ষিত হয় নাই।*

[*"The term 'republic was once used to signify in a vague way a Government of any sort which had no heriditary King"—Sir Henry Maine.]

স্পার্টা, এথেন্স, রোম, ভেনিস প্রভৃতি প্রাচীন রাষ্ট্রগুলি 'রিপাবলিক'রূপে বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু কোনটিই প্রকৃত 'প্রজাতন্ত্র' ছিল না। ফরাসী দেশে এমন দৃষ্টান্তও দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, রিপাবলিক বলিয়া বর্ণিত রাষ্ট্রে রাষ্ট্রের অধিনায়ক সম্রাটরূপে আখ্যাত হইয়াছেন। 'রিপাবলিক' শব্দটির এই বিচিত্র প্রয়োগের পটভূমিতে ভারতীয় শাসনতন্ত্রে 'রিপাবলিক' শব্দটির সহিত 'গণতান্ত্রিক' শব্দটির প্রয়োগ অবশ্যই সুবিবেচনাপ্রসূত হইয়াছে। ইহাতে সুস্পষ্টরূপে বুঝা যাইতেছে যে, ভারত রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে সার্বভৌম প্রজাতন্ত্ররূপে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিবে।

### কমনওয়েলথ সম্মেলনের সিদ্ধান্ত

কমনওয়েলথের সদস্যরূপে থাকিবার সিদ্ধান্ত করার ফলে ভারতের এই সার্বভৌমরূপ কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় কি না, এইবার তাহার বিচার করা যাউক। ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে ভারতীয় স্বাধীনতা আইনে ভারতবর্ষকে বৃটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত ডোমিনিয়নরূপে কল্পনা করা হয়, ইহা পূর্বে বলিয়াছি। যদিও উক্ত আইনের বিধান অনুসারে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের পর ভারতবর্ষ অপরাপর স্বাধীন রাষ্ট্রের অনুরূপ সর্ববিধ অধিকার লাভ করিয়াছে, তথাপি বৃটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত ডোমিনিয়নরূপে ভারতের রাষ্ট্রপাল বা গভর্নর-জেনারেলকে রাজানুগত্যের শপথ গ্রহণ করিতে হইতেছে। বাস্তবক্ষেত্রে ইহাতে ভারতের স্বাধীনতা কোন দিক দিয়া ক্ষুণ্ণ না হইলেও "আইনের দৃষ্টিতে" রাজানুগত্যের শপথ গ্রহণ বৃটিশরাজের প্রভুত্ব স্বীকার।

ভারতবর্ষ আইনগত পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করিলে যাহাতে কমনওয়েলথের সঙ্গে তাহার সম্পর্ক ছিন্ন না হয়, সেই উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যে লণ্ডনে কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রী সম্মেলন আহূত হয়। উক্ত সম্মেলনে যে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে, বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, তাহাতে কমনওয়েলথের প্রকৃতিই আমূল পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। যাহা এতদিন বৃটিশ কমনওয়েলথ অব নেশনস্ নামে পরিচিত ছিল, সম্মেলনের পর তাহা শুধু "কমনওয়েলথ অব নেশন্স নামে পরিচয় লাভ করিবে। ইহাই একমাত্র পরিবর্তন নহে। এতদিন বৃটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহের পক্ষে রাজানুগত্য যেরূপ বাধ্যতামূলক ছিল, এখন আর সেরূপ রহিল না। সর্বসম্মতিক্রমে সাব্যস্ত হইয়াছে যে, ভারতবর্ষ স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্ররূপে ঘোষিত হইলেও সে কমনওয়েলথের পুরাদস্তুর সদস্যরূপে আখ্যাত হইবে। অর্থাৎ এতদিন রাজানুগত্যের শপথ যাহা ছিল বৃটিশ কমনওয়েলথের সদস্য রাষ্ট্রসমূহের পারস্পরিক বন্ধনের সূত্র এখন তাহারই অস্তিত্ব লোপ পাইল।

### ইম্পিরিয়াল কনফারেন্স

১৯২৬ সালে লণ্ডনে আহূত ইম্পিরিয়াল কনফারেন্সের সিদ্ধান্ত ও ১৯৪৯ সালের বৃটিশ কমনওয়েলথ সম্মেলনের সিদ্ধান্তের তারতম্য এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করিবার বিষয়। ১৯২৬ সালের ইম্পিরিয়াল কনফারেন্সে ডোমিনিয়নসমূহের মর্যাদা অবস্থার পরিবর্তনহেতু নূতনভাবে ঘোষিত হয়। প্রত্যেক ডোমিনিয়নকে সমান মর্যাদাসম্পন্ন বলিয়া বর্ণনা করা হয় এবং স্বীকার করা হয় যে, কোন ডোমিনিয়নই আভ্যন্তরীণ বা বৈদেশিক ব্যাপারে অপর ডোমিনিয়নের অধীন নহে। কিন্তু এই সঙ্গে ইহাও ঘোষণা করা হয় যে, রাজানুগত্যের মাধ্যমেই পরস্পরের সহিত সংযোগ রক্ষিত হইবে।*

[*The Imperial Conference of 1926 defined Dominions as autonomous communities within the British Empire equal in States, in no way subordinate to another in any aspect of their domestic or foreign affairs, though united by a common allegiance to the Crown and freely associated as members of the British Commonwealth of Nations.]

### রাজানুগত্যের বিলোপ

১৯২৬ সালের ইম্পিরিয়াল কনফারেন্সে ডোমিনিয়নসমূহের মর্যাদা বৃদ্ধি পাইলেও দেখা যাইতেছে যে, বৃটিশরাজের নিকট আনুগত্য অপরিহার্য বিবেচিত হইয়াছিল। ১৯৪৯ সালের কমনওয়েলথ সম্মেলনে এই অপরিহার্য সর্তটিই বর্জিত হইয়াছে। *

[* সম্মেলনের শেষে সম্মিলিত রাষ্ট্রসমূহের পক্ষ হইতে যে ঘোষণা প্রচারিত হয় তাহার সংশ্লিষ্ট অংশটি এইরূপ—

"The Government of India have informed the other Governments of the Commonwealth of the intention of the Indian people that under the new constitution which is adopted, India shall become a Sovereign Independent Republic. The Government of India have, however, declared and affirmed

India's desire to continue her full membership of the Commonwealth of Nations and her "acceptance of the King as the symbol of the free association of its independent member nations" and as such the head of the Commonwealth. The Governments of the other countries of the Commonwealth, the basis of whose membership of the Commonwealth is not hereby changed accept and recognise India's continuing membership in accordance with the terms of this declaration."]

ভারতবর্ষকে রাজানুগত্যের শপথ যদি লইতে না হয়, তবে কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত অপরাপর দেশের সহিত তাহার যোগসূত্র রক্ষার কি উপায় রহিল? সম্মেলন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, আভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক সর্বরূপে ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীন ভারতবর্ষ মাত্র "কমনওয়েলথ অব নেশনস্" নামক এক প্রতিষ্ঠানের সদস্যরূপে রাজার প্রাধান্য স্বীকার করিবে এবং রাজা উক্ত কমনওয়েলথের অধিনায়ক হইবেন। বলা বাহুল্য, আভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক যাবতীয় ব্যাপারে রাজার আনুগত্য স্বীকার করিয়া অবস্থান করা এবং রাজানুগত্যকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিয়া কমনওয়েলথের সদস্য থাকার মধ্যে আইনের দৃষ্টিতে আকাশ-পাতাল প্রভেদ রহিয়াছে। ভারতের ডেপুটি প্রধান মন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল কমনওয়েলথ সম্মেলনের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে যে বিবৃতি দেন, তাহার একস্থলে তিনি এই পার্থক্যটি অতি পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। সর্দারজী বলিয়াছেন—

"India's Status of a Sovereign Independent republic is by no means affected because there is no question of allegiance to his Majesty the King, who would merely remain as a symbol of our free association as he would be of other members."

অর্থাৎ "ভারতের স্বাধীন ও সার্বভৌম মর্যাদা এতদ্দ্বারা ক্ষুণ্ণ হয় নাই, কেন না, রাজানুগত্য গ্রহণের প্রশ্নই নাই। রাজা আমাদের স্বেচ্ছায় গঠিত এক সম্মেলনের নামেমাত্র অধিনায়করূপে বিরাজ করিবেন।"

কোন রাষ্ট্রের স্বাধীন ও সার্বভৌম মর্যাদা যে উল্লিখিতরূপ কমনওয়েলথে যোগদানের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, তাহা অপর একটি দৃষ্টান্ত দ্বারাও সুহজে বুঝান যাইতে পারে। পৃথিবীর বহু রাষ্ট্র সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছে এবং কতকগুলি বিষয়ে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কর্তৃত্বও স্বীকার করিয়াছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কোন সদস্য রাষ্ট্রের স্বাধীন ও সার্বভৌম অধিকার ক্ষুণ্ণ হয় নাই। এই অবস্থায় রাজানুগত্য গ্রহণ না করিয়া কমনওয়েলথ অব নেশনস্ নামক রাষ্ট্র সমবায়ের সদস্যরূপে থাকিতে স্বীকার করাতেই ভারতের স্বাধীন সত্তা ক্ষুণ্ণ হইবে কেন? এই ক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, কমনওয়েলথ সম্মেলনে যাহা সাধিত হইল, তাহাতে সদস্য রাষ্ট্র হিসাবে ভারতের উপর কোনরূপ নূতন কর্তৃত্বের (super-state) সৃষ্টি হয় নাই। ভারতবর্ষ স্বেচ্ছায় এই রাষ্ট্র সমবায়ে যোগদান করিয়াছে এবং ইহাতে থাকা না থাকাও একান্তভাবে তাহার নিজ অভিরুচির উপরই নির্ভর করে। কাজেই তাহার স্বাধীন ও সার্বভৌম অধিকার ক্ষুণ্ণ হইবার কোন প্রশ্ন এই ক্ষেত্রে উঠে না। সুতরাং কমনওয়েলথ সম্মেলনের সিদ্ধান্ত ভারতীয় গণপরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার ভারতের স্বাধীন সত্তা অণুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইয়াছে এই কথাও নিশ্চয় বলা চলে না।

### প্রকৃত স্বাধীন ভারত

নিয়মতান্ত্রিক আইনের বিচারে ভারতের স্বাধীন ও সার্বভৌম সত্তা অক্ষুণ্ণ থাকিলেও কমনওয়েলথের সদস্যপদ গ্রহণের স্বীকৃতি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের স্বাধীনভাবে কাজ করিবার পক্ষে বাধার কারণ হইবে কি না, এই প্রশ্নও এই সঙ্গে বিচার্য। কোন কোন দলীয় নেতা ইতিমধ্যেই এইরূপ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার উত্তরে দেরাদুনে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে পণ্ডিত জওহরলাল যাহা বলিয়াছেন, তাহা অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য। পণ্ডিতজী বলিয়াছেন যে, পৃথিবীতে সত্তর আশীটি "স্বাধীন" রাষ্ট্র আছে। কিন্তু চারি পাঁচটির অধিক রাষ্ট্র সত্যকার স্বাধীনতার অধিকারী নহে। ভারতবর্ষ ঐ চারি পাঁচটি রাষ্ট্রের মতই প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন করিবে। পণ্ডিতজীর উক্তি কিছুমাত্র অযৌক্তিক নহে! ইউরোপে হল্যান্ড, বেলজিয়াম, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যান্ড প্রভৃতি আইনের বিচারে প্রত্যেকটিই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এবং স্বাধীন। কিন্তু সকলেই জানেন ইহাদের বৈদেশিক নীতি কোন না কোন শক্তিশালী রাষ্ট্রের ইঙ্গিতে পরিচালিত হইয়া থাকে। কিন্তু ভারত রাষ্ট্র নূতন হইলেও ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সে তাহার গুরুত্ব সপ্রমাণ করিতে পারিয়াছে। ইন্দোনেশিয়ার সমস্যা সম্পর্কে আলোচনাকালে ভারতবর্ষ যে নেতৃত্ব গ্রহণ করে, পৃথিবীর অন্য কোন বৃহৎ শক্তিরই তাহা মনঃপূত হয় নাই। ভারতবর্ষ স্বাধীনভাবেই তাহা করিয়াছিল। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ভারতের গুরুত্ব আরও কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রমাণিত হইয়াছে। বৃটিশ কমনওয়েলথের মূল ভিত্তির পরিবর্তন করিয়া বৃটেন এবং অন্যান্য সদস্য-রাষ্ট্র যে ভারতবর্ষকে দলে রাখিতে চেষ্টা করিল, তাহাতেও আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ভারতের অসামান্য গুরুত্বই প্রমাণিত হইয়াছে। ভারতবর্ষ দিন দিন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক এবং সাংস্কৃতিক দিক হইতে যতই উন্নত হইবে, বলা বাহুল্য, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তাহার মর্যাদাও ততই বৃদ্ধি পাইবে।

### কমনওয়েলথের সদস্য কেন?

কমনওয়েলথ সম্মেলনে ভারত যে সিদ্ধান্তে সম্মত হইল, ধীরভাবে সমস্ত অবস্থা পর্যালোচনা করিলেই বুঝা যাইবে যে, এই পথেই ভারতবর্ষ উত্তরোত্তর ঈপ্সিত শক্তিলাভ করিবার আশা করিতে পারে। বহুবিধ সংগঠনকার্য ভারতের সম্মুখে অপেক্ষা করিতেছে। প্রথমত ভারতীয় নৌ, বিমান এবং স্থলবাহিনীকে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করিয়া সময়োপযোগী করিতে হইবে। বিদেশের সহায়তা ছাড়া ইহা কদাচ সম্ভব নহে। তাহা ছাড়া, দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন কার্যের জন্য বৈদেশিক সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। বস্তুত সকল দিক দিয়া ভারতবর্ষকে একটি আধুনিক শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করিতে হইলে যাহা আবশ্যক, বৃটেন এবং আমেরিকার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যেই মাত্র তাহা সম্ভব হইতে পারে। এই অবস্থায় কমনওয়েলথের সদস্যরূপে অবস্থানের সিদ্ধান্ত করিয়া ভারতবর্ষ নিঃসন্দেহে সময়োচিত সুবিবেচনা এবং বাস্তববুদ্ধির পরিচয় দিয়াছে। কমনওয়েলথ সম্মেলনের সিদ্ধান্তের ফলে ভারত তাহার স্বাধীন সত্তা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ না করিয়াও বৃটেনের সহিত ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ থাকিবার সুযোগ পাইল এবং সেই সূত্রে সে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরও আস্থাভাজন মিত্ররূপে স্থানলাভ করিল। কমনওয়েলথের সদস্য থাকিতে অস্বীকার করিলে ভারতের পক্ষে শুধু বৃটেনের নয়, মার্কিনের আন্তরিক বন্ধুত্বলাভও সমস্যার বিষয় হইত। এই সমস্ত দিক বিচার করিলে কমনওয়েলথ সম্মেলনের সিদ্ধান্ত ভারতীয় রাষ্ট্রনায়কগণের রাজনৈতিক দূরদর্শিতার নিদর্শনরূপেই ইতিহাসে স্থান লাভ করিবে।

# সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক

## অজিত দত্ত

পৃথিবীতে প্রায় সকলপ্রকার লেখারই যথেষ্ট চাহিদা আছে। হিসেব লেখা, লেজার লেখা, বিজ্ঞাপন লেখা, দলিল লেখা, ছায়াচিত্রের সিনারিও লেখা, এমন কি শ্রুতি-লেখন পর্যন্ত সবই বিশেষজ্ঞের কাজ বলে স্বীকৃত। আপিসের এবং পয়সাওয়ালা লোকদের চিঠিপত্র লেখবার জন্যও মাইনে করা লোক রাখতে হয়। এমন কি যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং পর্যন্ত যাদের বিদ্যা, নকল-নবিশ হিসেবে তাদেরও একটা দাম আছে বৈকি। কাজেই লোকে যে বলে 'লেখাপড়া করে যেই, গাড়ি-ঘোড়া চড়ে সেই'—কথাটা নেহাৎ মিথ্যে নয়। পড়তে জানলে আর লিখতে শিখলে বেয়ারার কাজ থেকে বড়বাবুর কাজ, মুন্সির কাজ থেকে মন্ত্রীর কাজ সবই মানুষের আয়ত্তের মধ্যে এসে যেতে পারে। আর, পৃথিবীতে যে-কাজেরই চাহিদা আছে, সে কাজেরই আর্থিক মূল্য আছে, একথা বলাই বাহুল্য। ডাকঘরে যে-লোকটি নিরক্ষর লোকদের মনি-অর্ডার ফর্ম লিখে দেয়, তার এই স্বতঃস্বীকৃত ক্লেশবরণও কেবলমাত্র পরোপকারের প্রবৃত্তির প্রেরণাতেই কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। অতএব দেখা যাচ্ছে, লিপিকুশলতা একটা দামি জিনিস। এমন কি, অকুশল লিপিকারও একেবারে মূল্যহীন নয়। আর স্পেশালাইজড্ বা বিশেষীকৃত লিপি-কুশলতার তো মূল্য একটু বেশিই বলতে হবে। আইনসঙ্গত ভয়াবহ চিঠি লেখার কৌশলটি বিশেষভাবে যাঁরা আয়ত্ত করতে পারেন, তাঁদের দিয়ে একখানা চিঠি লেখাতে অনেক টাকা লাগে। 'কাট্', 'ফেইড্ আউট্', 'মিক্স' প্রভৃতি শব্দের যথাযথ প্রয়োগ-কুশলী-গণ ছায়াচিত্রের কল্যাণে জীবিকা নির্বাহের দুশ্চিন্তা থেকে অনেকাংশে মুক্ত। আয়ব্যয়ের হিসাব কিভাবে লিপিবন্ধ করতে হয়, এ-সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করলে অ্যাকাউন্টেন্ট', 'অডিটর', 'অ্যাকচুয়ারি' প্রভৃতি উপাধি ও মোটা উপার্জন সুনিশ্চিত।

এটাকে বর্তমান কালের বৈশিষ্ট্য বলে মনে করবার কোনো হেতু নেই। পূর্বকালে যে চতুর লিপিকারগণ পর্বতগাত্রে ও তাম্রফলকে রাজাদেশসমূহ উৎকীর্ণ করতো, তারা যথোপ-যুক্ত পারিশ্রমিক থেকে বঞ্চিত হয়নি, এটা আমরা অনুমান করতে পারি। যাঁরা বেদ-পুরাণাদি শ্রুত ও স্মৃত গ্রন্থগুলি লিপিবন্ধ করে রেখেছিলেন, তাঁদের মধ্যেও অনেকেই হয়তো এ-কাজ আর্থিক স্বার্থ প্রণোদিত হয়েই করে থাকবেন। কেননা, সেকালে সর্বাপেক্ষা লাভজনক বৃত্তিই ছিলো পুরোহিত-বৃত্তি; আর শাস্ত্র পুরাণাদি কণ্ঠস্থ অথবা তার অনু-লিপি হাতে না থাকলে ও ব্যবসা চালানো শক্ত হত সন্দেহ নাই।

অতএব দেখা যাচ্ছে সর্বকালেই, প্রায় সকলপ্রকার লেখারই একটা চাহিদা আছে—এবং সে অনুপাতে একটা দামও আছে। এ-দাম কাল্পনিক বা মনস্তাত্ত্বিক দাম নয়—নেহাৎই জাগতিক মূল্যে। এ-মূল্যে তেল-নুন-লকড়ির সমস্যারও একটা সুরাহা করা চলে।

অথচ আমরা যখন বলি 'অমুকে লেখে', কিংবা 'একটা লেখা পড়লাম' তখন এত প্রকার অর্থকরী লেখনকার্যের কোনোটাকেই বুঝি না—বুঝি সাহিত্য রচনা। আর 'লেখা' মানেই যদিও সাহিত্য লেখা আর লেখক মানেই সাহিত্যিক। তবু, একমেবাদ্বিতীয়ম্ এই লেখাই হচ্ছে সেই লেখা, যার বিনিময়ে জীবিকা সমস্যার সমাধান হতে পারে না। অবশ্য এটা অসঙ্গত নয়, এবং এ-নিয়ে অভি-যোগেরও কোনো অর্থ হয় না। কেননা, চিঠিই হোক কিংবা লেজারই হোক, হিসেবই বলুন আর বিজ্ঞাপনই বলুন, অপরের প্রয়োজন মেটাতে, অন্যের অর্থোপার্জনে সাহায্য করতে যখন লিখি, তখন অবশ্যই সে লেখার একটা আর্থিক মূল্য আমরা দাবী করতে পারি। যে যে জাতীয় লেখার চাহিদা আছে, সেই সব লেখা চাহিদা ও সরবরাহের অর্থশাস্ত্রীয় আইনের মধ্যে না এসে পারে না। কিন্তু কবিতা কার কী কাজে লাগতে পারে? কার অর্থোপার্জনে বিন্দুমাত্র সাহায্য করতে পারে গল্প-প্রবন্ধ কেবলমাত্র উৎকৃষ্ট সাহিত্যের দাবীতে? বলতে পারা যায় যে, অনেকগুলো ব্যবসায় ও বৃত্তি আছে—যা নানারূপ লেখা সম্বল করেই মাত্র চলতে পারে। কিন্তু সেখানেও চাহিদার তুলনায় সরবরাহ এত বেশী এবং সাহিত্যের তুলনায় সাহিত্যের নকল এত শত-সহস্রগুণে সহজলভ্য যে সাহিত্য হিসেবে সাহিত্য বিশেষ কোনো মূল্য আশা কিংবা দাবী করতে পারে না। কাব্যরচনা করেন বলেই কবি তাঁর জীবিকার মূল্য দাবী করেন কী করে? কবিতা লেখবার জন্য তো কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তাঁকে মাথার দিব্যি দেয় নি।

তবু চিরকালই কবি-সাহিত্যিকেরা লিখে-ছেন এবং তাঁদের মধ্যে অধিকাংশকেই উপবাসে মরতে হয়নি। সত্য বটে, প্রাচীন কাল থেকে অনেক সাহিত্যিক প্রতিভাই হয়তো বাধ্য হয়ে সাহিত্য ত্যাগ করে অন্য অর্থকরী বৃত্তি খুঁজে নিয়েছে, হতে পারে তারা সাহিত্যে মনোনিবেশ করবার সুযোগ এবং অবসর পেলে সাহিত্যকে আরো সমৃদ্ধ করে তুলতে পারতো, তবু অনেক বড় বড় লেখক যে শুধু লেখা নিয়ে থেকে জীবনটা বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে কাটিয়ে গেছেন, ইতিহাসে এ-কথা লিপিবন্ধ আছে।

কালিদাস, বররুচি, গুণাঢ্য, বাণভট্ট, উমা-পতিধর, জয়দেব, এমনকি এই সেদিনকার ভারতচন্দ্র পর্যন্ত রাজানুগ্রহে জীবিকার্জনের দায় থেকে মুক্ত ছিলেন। তাঁরা ক্ষমতা, রুচি ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী লিখতেন, মাঝে মাঝে দু'একটি শ্লোকে রাজাকে একটু তোয়াজ করতেন, এই পর্যন্ত। লিখতে বসবার সময় কালকের র‍্যাশন কী উপায়ে আনা যেতে পারে, এরূপ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে তাঁদের লেখনী ত্যাগ করতে হয়নি। অবশ্য মাঝে মাঝে কোনো পণ্ডিত বা পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তি 'যস্য সংসারিকী চিন্তা চিন্তা চিন্তামণেঃ কুতঃ তস্যৈব হি শিল্প-কল্প কঃ শিরোমণি ধারণম্' বলে আক্ষেপ করেছেন, কখনো কোনো সাহিত্যিক বা সাহিত্য যশঃপ্রার্থী 'দারিদ্র্যদোষো গুণরাশিনাশী' বলে খেদোক্তি করেছেন সত্য, কিন্তু সাহিত্যিক প্রতিভা সেকালে সাধারণতঃ রাজাদের দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত হোতো, এবং সর্বদাই হবার সম্ভাবনা ছিল। এমন কি যে-সব লেখক রাজ-সভায় স্থান সংগ্রহ করতে পারতো না, কিন্তু একটা লিখে নিয়ে রাজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালে তাদেরও খালি হাতে ফিরতে হোতো না। রবীন্দ্রনাথ 'পুরস্কার' কবিতায় রাজার কাছে কবির সমাদরের যে বর্ণনা দিয়েছেন, সেটা অবাস্তব বা অনৈতিহাসিক নয়, একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলেও তাকে মনে করা চলে না। এটাই তখন রীতি ছিল। সেকালে রাজাদের এবং অভিজাত সম্প্রদায়কে মৃগয়া, যুদ্ধবিদ্যা, রাজ-নীতি ও ধর্মশাস্ত্রের ন্যায় ললিতকলাতেও ব্যুৎপন্ন হতেই হোতো। স্বয়ং ললিতকলায় দক্ষ বা বিদগ্ধ না হলেও গুণীর পালক হওয়া তাঁর একটি কর্তব্যের মধ্যেই গণ্য হোতো। অতএব ঘরে চাল বাড়ন্ত হলে যে কোনো গৃহিণী স্বামীকে রাজদরবারে পাঠাবার জন্য বলতে পারতো—

> 'আমাদের রাজা গুণীর পালক
> মানুষ হইয়া গেল কত লোক
> ঘরে তুমি জমা করিলে শোলোক
> লাগিবে কিসের 'কাজে!'

এবং এইরূপে প্রেরিত হয়ে রাজদরবারে উপস্থিত হলে কবি-সাহিত্যিকেরা বড় একটা ঠকতো না। তা ছাড়া কয়েকজন লেখক, কিছু সংগীতবিদ্, কয়েকজন নৈয়ায়িক ও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত এবং কিছু চিত্রকর প্রভৃতি জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি স্থায়ীভাবে সমাদৃত না হলে কোনো

রাজসভাই সম্পূর্ণ বা উপযুক্ত শোভাসম্পন্ন হলে মনে করা হোতো না।

আমাদের দেশে শিল্প ও ললিতকলার সাধকদের পৃষ্ঠপোষকতা করার ঐতিহ্য সম্রাট, রাজা ও অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে অতি প্রাচীনকাল থেকে চলে এসেছে। বৈদিক যুগেও যজ্ঞাদিতে সূক্ত, স্তোত্র ও পুরাণেতিহাস রচয়িতা মুনিঋষিগণ প্রচুরভাবে দান লাভ করতেন। তা ছাড়া যে-কোন সময়েই একজন অধ্যয়ন ও লেখনী-সম্বল মুনি যে-কোনো রাজার কাছে উপস্থিত হলে তাঁর প্রার্থনা অপূর্ণ থাকতো না। তা ছাড়া তখন অভাব কম ছিল, দানপ্রাপ্ত গোধন, স্বচ্ছন্দজাত কিংবা অল্প-পরিশ্রমজাত ফল-মূল ও শস্য, সহজলভ্য পশু ও পক্ষী-মাংসের কল্যাণে নিশ্চিন্ত লেখনী-চালনায় সেকালে বিশেষ কোনো গুরুতর বাধা ঘটবার সম্ভবনা ছিল না। এই ঐতিহ্য চলে এসেছে বহুকাল ধরে এবং বহুকাল পর্যন্ত। এই সেদিনও মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ রায়—সাহিত্য ও সাহিত্যিকের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

বর্তমানে শিল্প বা ললিতকলার যাঁরা চর্চা করেন, তাঁদের পক্ষে এ জাতীয় সাহায্য বা পৃষ্ঠপোষকতা প্রত্যাশা করা বাতুলতা মাত্র। কেননা, শিক্ষায় ও সহানুভূতিতে, ঔদার্যে ও সম্পদে সমৃদ্ধ তৎকালীন অভিজাত সম্প্রদায় বর্তমানে লোপ পেয়ে গেছে। তাঁদেরই বংশধরদের অনেকেই এখন জীবিকার সন্ধানে ভ্রাম্যমান। বলা বাহুল্য এটা বিস্ময়কর নয়। যাঁদের ভাণ্ডার ব্রাহ্মণ, গুণী ও ভিক্ষুকের জন্য সর্বদাই উন্মুক্ত ছিল, তাঁদের ভাণ্ডার আর কদিন টিকতে পারে? এরা লোপ পেয়ে গেছে, ভালোই হয়েছে। আধুনিক প্রগতি-সম্পন্ন জনমতের বিচারে এঁদের অস্তিত্ব সমাজের একটা গুরুতর দুর্ভাগ্য বলেই গণ্য হোতো সন্দেহ নেই।

ক্ষত্রিয়ের হাত থেকে আজ সম্পদ স্থানান্তরিত হয়েছে বৈশ্যের হাতে, অপরে তার ছিটে ফোঁটা পাচ্ছে। সাহিত্য এবং ললিতকলার চর্চা বা পৃষ্ঠপোষকতার দ্বারা যখন বিন্দুমাত্র আর্থিক লাভের আশা নেই, অথচ এদের অনুশীলন যেহেতু প্রচুর অভিনিবেশ ও মূল্যবান সময়সাপেক্ষ, সে ক্ষেত্রে কোন্ বুদ্ধিমান ধনীর এসব জিনিসে বিন্দুমাত্র ঔৎসুক্য বা আগ্রহ থাকতে পারে? অবশ্য অর্থ প্রতিপত্তি কিংবা পদমর্যাদা হলে সাহিত্য সংস্কৃতি প্রভৃতি অকেজো অথচ নামজাদা বস্তুগুলির প্রতি গভীর অনুরাগের একটা সর্বজন দ্রষ্টব্য জাজ্বল্যমান পরিচয় প্রকাশ করতে হয়। কিন্তু সেজন্য বিশ্ববিখ্যাত চিত্রকরদের আঁকা ছবির নকল এবং বিশ্ববিশ্রুত লেখকদের রচিত গ্রন্থের দামি-সংস্করণ বাইরের ঘরে সাজিয়ে রাখাই যথেষ্ট, জীবনেও বইগুলির পাতা খুলবার দরকার হবে না। সাহিত্য সম্মেলনের কর্মকর্তা এবং সাহিত্য সভার বক্তা বা প্রধান অতিথির পদ ওতেই আয়ত্ত হতে পারে।

কাজেই জীবিত ও নিষ্ঠাবান, প্রকৃত শিল্পস্রষ্টা অথচ বিশ্ববিখ্যাত নয়, এরূপ সাহিত্যিক যদি কেউ থাকেন, তবে তাঁকে জীবিকার জন্য চাঁদার ঝুলি কাঁধে নিয়ে এসে দাঁড়াতে হবে সাহিত্য সম্বন্ধে কৌতূহলী, পঠনক্ষম সাধারণ লোকের দরজায়। গল্প শুনতে বা গল্প পড়তে সব মানুষেরই যে একটা স্বাভাবিক আগ্রহ আছে, তার দৌলতে গল্প-উপন্যাসের একটা বাজার জনসাধারণের মধ্যে পাওয়া সম্ভব, অবশ্য যদি সে গল্প-উপন্যাস জনসাধারণের রুচি ও মনোমত হয়, এবং যদি তার মূল্য তার আর্থিক আয়ত্তের মধ্যে এসে যায়। আর কবিতা বা সূক্ষ্মতর রসের রচনা সাধারণ লোকের মধ্যেও যারা অসাধারণ সেই অতি মুষ্টিমেয় লোকের কাছেই মাত্র যৎসামান্য দাম পেতে পারে। এই দাম এক টাকা, দু'টাকা বা তিন টাকা, খুব বেশি হলে চার কিংবা পাঁচ টাকা। এই পরিমাণ নগদ মূল্য সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য যাঁরা ব্যয় করেন, তাঁরা রাজা-মহারাজা না হোন, না হোন তাঁরা এক একজন কেউ কেটা, তাঁরাই হচ্ছেন আজ সাহিত্যের আসল পৃষ্ঠপোষক। কিন্তু এঁদের চেয়ে বড় পৃষ্ঠপোষকও আছেন। তাঁরা হচ্ছেন যাঁরা দু'আনা, চার আনা বা আট আনা মাসিক চাঁদা দিয়ে সাধারণ পাঠাগারের সভ্য হন। এঁদের রুচি ও পছন্দ অনুযায়ী বই গ্রন্থাগারগুলোতে রাখতে হয়, কিনতে হয়। তাতে সাহিত্যিক প্রতিপালিত না হন, উপকৃত হন, আরো লেখবার খানিকটা অবসর তিনি করে নেবার সুযোগ পান। কাজেই নিঃসন্দেহ—চার আনার থেকে পাঁচ টাকা করে' যাঁরা সাহিত্যের মাসোহারা দেন তাঁরাই সাহিত্যের আসল ও অকৃত্রিম পৃষ্ঠপোষক, এঁদের জন্যই সাহিত্যিক এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য বেঁচে আছে।

অতএব সাহিত্যিক যদি তাঁর এই আধুনিক প্রতিপালকদের পৃষ্ঠপোষকতা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে না চান, তবে তাঁর পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে এঁদের যথাসাধ্য তোয়াজ করে' চলা। আধুনিক কালে কৃতী ও 'সার্থক' সাহিত্যিক হতে হলে এই সাহিত্য-প্রতিপালকদের রুচি, মর্জি ও পছন্দ অনুযায়ী লেখা ছাড়া গত্যন্তর নেই। এঁরা যদি সমবেতভাবে রাজনীতির ভক্ত হন, তবে কোন দিক থেকে হাওয়া বইছে বুঝে নিয়ে চতুর ও কুশলী সাহিত্যিককে তাঁর রচনার সেই অভিমুখী রাজনীতির ময়াম দিতে হবে। যদি শিক্ষা চান—তবে জনশিক্ষার ভার নেওয়ার ভাণটুকু অন্তত না রাখলে আর গত্যন্তর নেই। যদি রহস্য-রোমাঞ্চের দিকে সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকগণের পছন্দের হাওয়া বইতে শুরু করে, তাহলে প্রেমের কাহিনীতেও একটু রহস্যের রোমাঞ্চ মিশিয়ে দেওয়া ভালো। ওতে মালিকেরা খুশি হন। আর ওঁরা খুশি হলে কেবল যে চাঁদার ঝুলিই ভরে ওঠে তা নয়, মুখে মুখে নামও ছড়ায় বিস্তর। সকলেই তখন বলতে শুরু করে—"সুধাকর দত্তের মত আর কেউ লিখতে পারে না।" আর যতোই একথা প্রচারিত হয়, ততই বই বিক্রী বাড়ে—সাহিত্যিক তখন জনসভার সভাকবির আসনে জাঁকিয়ে বসেন।

এ-যুগে প্রত্যেক সাহিত্যিকের পক্ষেই এরূপ সাফল্য লোভনীয়, তোষামোদ করার কথা যদি বলেন, সেকালেও রাজা-রাজড়াদের তোয়াজ না করে উপায় ছিল না। লেখকদের মত পর-নির্ভরবৃত্তিধারীদের কোনোকালেই অন্যকে খোসামোদ না করে চলবার উপায় নেই।

কিন্তু জনসাধারণের মর্জি পেলে সাহিত্যে 'সার্থক' এবং 'কৃতী' হওয়ার কিঞ্চিৎ বিপদও আছে। প্রতিপালকদের মনোভাব সর্বদাই বুঝে চলা বড়ই শক্ত ব্যাপার। একে তো জনসাধারণের মধ্যেও আছে বড় বড় ভাগ, বড় বড় দল। তার উপরে এদের পছন্দ ও মতামত কখন যে কোন দিকে মোড় নেয় বোঝাও শক্ত। কখন যে পান থেকে চুন খসবে অতো হিসেব করে চলাও বেশ মুশ্কিল।

কাজেই বিপদ আছে। আর সাহিত্যিক যতোই জনসভা অলংকৃত করে জাঁকিয়ে বসবেন, যতোই বেশি করে তিনি জনসাধারণের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করবেন, বিপদ ততই বেশি। একটু এদিক ওদিক হলেই পৃষ্ঠপোষকেরা পৃষ্ঠপ্রহারক হয়ে দাঁড়ানোটা কিছুই বিচিত্র নয়। যে সব লেখক জনপ্রিয় নয়, জনসাধারণ যাদের লেখকের মধ্যেই গণ্য করতে নারাজ, এ-জাতীয় বিপদ তাদের নেই বল্লেই চলে। পৃষ্ঠপোষকতা গ্রহণ করবার বিপদই এই। সেকালেও এ বিপদ সভাকবি, সভা-পণ্ডিতদের ছিলো; অজ্ঞাত ও অসমাদৃত, রাজসভা থেকে বহুদূরে যারা লেখনী চালনা করতো, রাজরোষের ভয় ছিলো তাদের খুবই কম। রাজা-রাজড়াদের পছন্দ ও মর্জিও যে সব সময় অপরিবর্তিত থাকতো না, গুণাঢ্য বা ফিরদৌসীর ভাগ্যবিপর্যয়ের প্রতি দৃক্‌পাত করলেই তা বোঝা যায়। এইজন্যই ভারতচন্দ্র বলেছেন—"বড়র পিরিতি বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ।"

কথাটা যদিও মিথ্যে নয়, তবু বড়র পিরিতির একটা সুবিধা এই যে বিরাগে যেমন হাতে, এমন কি গলায় দড়ি পড়াও বিচিত্র নয়, অনুরাগে তে[illegible]চাঁদও হাতে এসে যেতে পারে। জনসাধারণের পরিচর্চিতে সেরকম কোনো উজ্জ্বল সম্ভাবনা নেই। কিন্তু বিপদটা বেশি। রাজরোষে প্রাণটা যেতে পারে, কিন্তু সাধারণের মর্জিতে জুতোর বাড়ি, গলাগাল, নিন্দে, সভাপতিত্ব থেকে নাম খারিজ ইত্যাদি সবই কপালে জুটে যাওয়া সম্ভব! কাজেই যদি কখনো কোনো লেখক, বহুকাল ধরে বহু চেষ্টা করে সাধারণ লোকের মর্জি ও পছন্দমাফিক

লিখে লিখে জনপ্রিয় ও জনসমাদৃত হয়ে উঠতে সমর্থ হন, কিন্তু অবশেষে গ্রহের বৈগুণ্যে কিংবা সাময়িক অনবধানতাবশত জনসাধারণের রুচির কথা ভুলে গিয়ে সাহিত্য হিসেবেই স্যাহিত্য চর্চা করতে অগ্রসর হয়ে তাঁর পৃষ্ঠপোষকদের বিরক্তি ও উষ্মা জাগ্রত করে ফেলেন, তবে সেক্ষেত্রে জীবনের বাকি কটা দিন সুখে স্বচ্ছন্দে বেঁচে বর্তে থাকতে হলে, সেই কৃতী লেখকের একমাত্র করণীয় হচ্ছে—তাঁর এইরূপ অপচ্ছন্দসই লেখার জন্য পাঠকসাধারণের কাছে অনুনয় ও ক্রন্দন সহকারে ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং তাঁর রচনা তৎক্ষণাৎ তাঁর পৃষ্ঠপোষকদের রুচি অনুযায়ী পরিবর্তিত করে দেওয়া। তবেই তিনি তাঁর বহুকষ্টে অর্জিত জনসাধারণের পৃষ্ঠপোষকতা পুনরায় ফিরে পাবেন। তা না হলে তাঁকেও জনগণের দরবারই-আম্-এর বাইরের দরজায় এসে দাঁড়াতে হবে—আমাদের আর পাঁচজনের মতোই কিউ দিয়ে।

পশ্চিমবঙ্গের লোকের আর্থিক দুরবস্থার কি রূপ হইয়াছে, তাহা গত ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের শেষার্ধে প্রদেশে অপরাধ সম্বন্ধে পুলিশের বিবরণে সপ্রকাশ। এই ছয় মাসে পশ্চিমবঙ্গে নরহত্যা ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা ব্যতীত আর নানারূপ অপরাধের সংখ্যা পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে। পুলিশের মতে এই বৃদ্ধির কারণ -

১। লোকের আর্থিক দুর্দশা;

২। নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি;

৩। আশ্রয়প্রার্থীদের আগমনে লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি;

৪। সমগ্র প্রদেশে, বিশেষ হাওড়া, হুগলী ও বর্ধমান জিলায় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে হরতাল ও কোন কোন রাজনীতিক দলের সমাজদ্রোহী কার্যে পুলিশের নিয়োগ।

কেন যে ২৪ পরগণা ও কলিকাতার উল্লেখ নাই, তাহা বলিতে পারি না।

গত পূর্ব-সংখ্যায় আমরা বে-আইনীভাবে কলিকাতায় চাউল আনার দুইটি মামলায় বিচারকদিগের মত উদ্ধৃত করিয়াছি। একজন বলিয়াছিলেন, এই সকল লোক কলিকাতার অধিবাসীদের উপকার করিতেছে—অনশন হইতে রক্ষা করিতেছে। সম্প্রতি শিয়ালদহ আদালতে আর একটি মামলা হইয়াছে -রাজা (অর্থাৎ ইংলণ্ডের রাজা) বনাম খুকী দাসী। একদিকে রাজা আর একদিকে দরিদ্র খুকী দাসী—সে ২৫ সের চাউল লইয়া রাণাঘাট হইতে আসিয়া নৈহাটী স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে গত ৯ই এপ্রিল গ্রেপ্তার হয় এবং এক মাসেরও অধিককাল হাজতে থাকিয়া গত ১৯শে মে বিচারার্থ আদালতে উপস্থাপিত হয়। সে দীর্ঘকাল হাজতে বন্দী ছিল—এই যুক্তি দেখাইয়া দয়ালু বিচারক তাহাকে মামলার দিন আদালতের কার্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত আটক থাকার দণ্ড দিয়াছিলেন। পূর্বে দুটি মামলায় বিচারকরা আসামীদিগকে চাউল প্রত্যর্পণের আদেশ করিয়াছিলেন—এক্ষেত্রে বিচারক তাহা বাজেয়াপ্ত করিয়া বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের ভাণ্ডার পুষ্ট করিবার নির্দেশ দেন। "ভিন্ন রুচির্হি লোকাঃ।"

এই মামলার বৈশিষ্ট্য বিচারকের উক্তিতে "আমি দেখিতেছি, আসামী গত ৯ই এপ্রিল হইতে এ পর্যন্ত হাজতে ছিল। এই জাতীয় মামলায় পুলিশ রিপোর্টসহ আসামীকে বিচারার্থ উপস্থাপিত করা হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে চূড়ান্ত তদন্ত-রিপোর্ট কেন দেওয়া হইয়াছে, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। কেনই বা অভিযোগ উপস্থিত করিতে এত বিলম্ব হইল? বিলম্বের ফলে এই দরিদ্র নারী মাসাধিককাল হাজতে থাকিতে বাধ্য হইয়াছে। এই সকল ব্যাপার সম্বন্ধে বিশেষ তদন্তের প্রয়োজন।"

এই সঙ্গে বিচারক যদি আর একটি কথার উল্লেখ করিতেন, তবে আমরা তাঁহার প্রশংসা করিতাম। আসামী স্ত্রীলোক—সে সমাজের যে স্তরের লোকই কেন হউক না—এক মাস হাজত-বাসে তাহার নানারূপ ক্ষতির সম্ভাবনা যেমন থাকিতে পারে, তাহার সম্বন্ধে অনাচারের সম্ভাবনাও যে তেমনি থাকিতে পারে না, তাহা নহে। পুলিশ বিভাগ প্রধান সচিবের খাসমহল। তিনি কি এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া যে সকল লোক এই বিলম্বের জন্য দায়ী, তাহাদিগের উপযুক্ত দণ্ডের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন? কলিকাতায় পুলিশ টিয়ার গ্যাস ব্যবহারে ও গুলী চালনায় ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়াছিল কিনা, সে বিষয়ে তিনি যে অনুসন্ধানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, সেই অনুসন্ধানের ফল লোক এখনও জানিতে পারে নাই। পুলিশ যদি অনাচারের অনুষ্ঠান করে এবং সেজন্য তাহাকে দণ্ডভোগ করিতে না হয়, তবে তাহাদিগের ব্যবহার সমাজের শত্রুতাসাধক হইয়া দাঁড়াইতে পারে, ইহা বাঙলার সচিবরা অবশ্যই স্বীকার করিবেন। পুলিশ যেন লোকের—সমাজে শৃঙ্খলার রক্ষক হয়, শান্তি-শৃঙ্খলার ভক্ষক না হইতে পারে।

আমরা আশা করিয়াছিলাম, দেশ স্বায়ত্ত-শাসনশীল হইবার সঙ্গে সঙ্গে—দেশের নানা নির্বাচন-ব্যবস্থার অবসান ঘটিবে। সেইজন্য আমরা গত ১৮ই মে বর্ধমান হইতে পরিবেশিত নিম্নলিখিত সংবাদে প্রীতিলাভ করিয়াছি—

বর্ধমান জিলা বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান ও জিলার মুসলিম লীগের অন্যতম নেতা মিস্টার আবুল হায়াৎ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে তার করিয়াছেন—"ভারতের গণপরিষদের পরামর্শদাতৃ সমিতি যে মুসলমানদিগের জন্য স্বতন্ত্র আসন সংরক্ষণ-ব্যবস্থার উচ্ছেদ সাধন করিতে বলিয়াছেন—পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানরা তাহার সমর্থন করেন।"

এই সংবাদে আমাদিগের প্রীত হইবার বিশেষ কারণ এই যে, গণ-পরিষদের সহকারী সভাপতি ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় মুসলমানদিগকে বুঝাইয়া বলেন, তাঁহারা সম্প্রদায় অর্থাৎ ভারতীয় খৃষ্টানরা যখন স্বতন্ত্র আসন-সংরক্ষণ চাহেন না, তখন মুসলমানরাও তাহা দাবী করিতে বিরত থাকিতে পারেন। তাঁহার যুক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া ৮।১০ জন মুসলমান সদস্য সেই মর্মে এক পত্র লিখিয়াছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসী নেতা কেন মুসলমানের পরামর্শে ও প্রভাবে তাঁহারা সেই পত্র প্রত্যাহার করিয়াছেন। এই কার্য যদি তাঁহাদিগের পক্ষে দৌর্বল্যের ও মতের দৃঢ়তার অভাবদ্যোতক হয়, তবে তাহা তাঁহাদিগের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সম্বন্ধে কি বলিতে হয়!

পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে অনুরূপ দৌর্বল্য হইতে মুক্ত হইতে পারিতেছেন না, সরকারের—আরামবাগ মিউনিসিপ্যালিটি সম্বন্ধে প্রেস-নোটে তাহা বুঝিতে পারা যায়—

সরকার হুগলী জিলার আরামবাগ মহকুমার মিউনিসিপ্যালিটিতে মুসলমানদিগের জন্য স্বতন্ত্র আসন সংরক্ষণ বর্জন করিবেন স্থির করিয়াছেন বলিয়া যে সংবাদ কোন কোন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা অভ্রান্ত নহে।' সত্য বটে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ঐরূপ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া এক প্রাথমিক ঘোষণা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার কারণ এই যে, তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, মুসলমানেরা তাঁহাদিগের সংখ্যানুপাতে আসন পাইবেন, এমন কোন ব্যবস্থা করা যাইবে। স্থানীয় মুসলমানরা কিন্তু তাহাতে আপত্তি করেন এবং সরকারও দেখেন

হইতে দিতে পারার মত কোন ব্যবস্থাও করা গেল না। কাজেই তাঁহারা বর্তমান ব্যবস্থা বর্জনের আশা ত্যাগ করিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার আবশ্যক ব্যবস্থার উপায় নির্ধারণ না করিয়াই তবে কিরূপে ঐ প্রাথমিক ঘোষণা করিয়াছিলেন? আর কেনই বা তাঁহারা স্থানীয় মুসলমানদিগের আপত্তিতে ঘোষণা প্রত্যাহার করিলেন? লর্ড মিণ্টোর শাসন-সময়ে মুসলমান প্রতিনিধিরা যে যুক্তি দেখাইলে—লর্ড মিণ্টো তাঁহাদিগের দাবী সাগ্রহে সংগত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন, আরামবাগের মুসলমানেরা সেই যুক্তিরই পুনরুক্তি করিয়াছেন। লর্ড মিণ্টো বলিয়াছিলেন, (১লা অক্টোবর, ১৯০৬ খৃষ্টাব্দ)—

"The pith of your address, as I understood it, is a claim that in any system of representation, whether it affects a Municipality, a District Board, or a Legislative Council, in which it is proposed to introduce or increase an electoral organisation, the Mohommedan community should be represented as a community."....I am entirely in accord with you."

এই উক্তিতে যে বিষবৃক্ষের বীজ বপন করা হইয়াছিল, তাহার ফলেই ভারতে জাতীয়তার স্থানে সাম্প্রদায়িকতার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে—ভারতবর্ষ খণ্ডিত হইয়াছে। আজও যদি সেই ব্যবস্থা বর্জিত না হয়, তবে ভারত রাষ্ট্রেও আবার পাকিস্থান গঠিত হইবে। যে ব্যবস্থা জাতীয়তার ও গণতান্ত্রিক নীতির বিরোধী, তাহা বর্জিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। যে কারণ পশ্চিমবঙ্গ সরকার আরামবাগে সেই ব্যবস্থা বর্জন করিতে অসম্মত, সেই কারণ দর্শাইয়াই মণ্টেগু চেমসফোর্ড রিপোর্টে স্বতন্ত্র নির্বাচনের ব্যবস্থা বর্জন করিতে বিরত হইয়াছিলেন। ফল কি হইয়াছে?

কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি মানভূম সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা আমরা সন্তোষজনক বলিয়া মনে করিতে পারি না। সত্যাগ্রহ যেমন অজস্র অত্যাচারে দমিত করা যায় নাই, তখন কংগ্রেসের সভাপতি—অনন্যোপায় হইয়া—ইহা স্থগিত করিতে নির্দেশ দেন। যে পত্রে তিনি সেই নির্দেশ দিয়াছিলেন, তাহাতে একটি অসতর্ক উক্তিতে ইংরেজিতে যাহাকে ঝুলির ভিতর হইতে বিড়াল বাহির হওয়া বলে, তাহাই হইয়াছিল। তিনি সত্যাগ্রহীদিগকে বলিয়াছিলেন, তাঁহারা বিশৃঙ্খলভাবে—অকারণে সত্যাগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যে দপ্তর মানভূমের সত্যাগ্রহী-নেতা অতুলবাবুর কথা ভুলিয়া কলিকাতার অতুল্যবাবুর নিকট পত্র পাঠাইয়াছিলেন, সে দপ্তর হইতে যদি গত এক বৎসরকালে মানভূম হইতে প্রেরিত সকল পত্র কর্পূরের মত উবিয়া গিয়া থাকে, তবে তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ থাকিতে পারে না। সে সকল পত্র পাঠ করিয়া বিচার-বিবেচনা করিলে কংগ্রেসের সভাপতি কখনই ঐরূপ উক্তি করিতে পারিতেন না। ঐ উক্তিতেই যে বিহার সরকারের ও ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদের প্রভাব লক্ষিত হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই অবস্থায় ব্যবস্থা হইয়াছে—

ভাষা সম্পর্কিত ব্যাপারে মানভূম জিলার বাঙালী অধিবাসী ও বিহার সরকারের বিবাদ মীমাংসা করিবার জন্য শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী, ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, শ্রীজগজীবন রাম ও বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীপ্রজাপতি মিশ্র—এই চারজনে এক সমিতি গঠিত হইয়াছে।

মানভূমের সত্যাগ্রহীদিগের সহিত বিহার সরকারের বিবাদ কেবল ভাষা লইয়া—অর্থাৎ বাঙলা ভাষার উচ্ছেদ সাধন চেষ্টার প্রতিবাদে নহে। বিহার সরকারের নানা অনাচারের প্রতিবাদে সত্যাগ্রহ। কাজেই সত্যাগ্রহ কেবল ভাষা লইয়া—ইহা বলায় সত্যাগ্রহের কারণ সঙ্কীর্ণ করা—তাহাতে প্রাদেশিকতার আরোপ হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে সত্যাগ্রহীদিগের সম্বন্ধে অবিচার করা ও দেশকে সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করা হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে—বিহার সরকারের অন্যান্য অনাচার গোপন করিবার চেষ্টাও হইয়াছে। হয়ত বিহার সরকার সে সকল সম্বন্ধে কংগ্রেসের নির্দেশ মানিতে অসম্মত বলিয়াই কংগ্রেস আপনার সম্ভ্রম রক্ষার জন্য একাজ করিয়াছেন। যদি তাহাই হয়, তবে তাহা সত্যাগ্রহীর কাজ নহে। বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীপ্রজাপতি মিশ্রের এই অনুসন্ধান সমিতিতে স্থানলাভের অধিকার থাকিতে পারে না। কারণ, তিনি ইহার পূর্বেই একলার মানভূম ঘুরিয়া আসিয়া মতপ্রকাশ করিয়াছেন—

(১) মানভূমের বাঙালীরা মানভূম বিহারের অন্তর্ভুক্ত রাখিতে চাহে;

(২) তাঁহারা হিন্দী ভাষা শিক্ষা করিতেই আগ্রহশীল। এই মত গ্রহণের পরেই তিনি নিরপেক্ষভাবে বিবেচনা করিতে পারেন না। তিনি মনে করিতে পারেন, বিহারের বঙ্গভাষা-ভাষী বাঙালীরা—বিহারের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চল বাঙলার অন্তর্ভুক্ত করা সম্বন্ধে কংগ্রেসের সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি পদদলিত করিতে—তাঁহারই মত—প্রস্তুত তিনি যে মনে করিবেন, যে বাঙলা ভাষা অসাধারণ ঐশ্বর্য-সম্পন্ন, সেই মাতৃভাষা ত্যাগ করিয়া দীন হিন্দী ভাষা শিক্ষা করিতে আগ্রহশীল, তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ থাকিতে পারে না। তাঁহার এই উক্তি যে মানসিক বিকারদ্যোতক, তাহাও মনে করা যায়।

আমাদিগের মনে হয়, মানভূমের সত্যাগ্রহীরা এই ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হইতে পারিবেন না। এবার নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির এক গোপন অধিবেশন হইয়াছিল। কংগ্রেসের সভাপতি নাকি বলিয়াছেন, তাহাতে সচিব-দিগের ব্যবহারের ও সরকারের কাজ আলোচিত হইয়াছে। বিহার সরকারের কাজও কি আলোচনার বিষয় ছিল? কংগ্রেসের সহিত সরকারের সম্বন্ধ যে অনির্দিষ্ট, তাহা নাকি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ স্বীকার করিয়াছেন।

সম্প্রতি প্রচার করা হইয়াছে, সরকার গ্রামের নিকটস্থ পতিত বা নীচ জমিতে জ্বালানি কাঠের জন্য বন করিবার বিষয়ে অবহিত হইয়াছেন। সেই কাজের জন্য প্রত্যেক গ্রামের পার্শ্বে দশ বিঘা জমি স্বতন্ত্র রাখা হইবে—কোন গ্রামের পার্শ্বে ঐরূপ জমি না থাকিলে কয়-খানি গ্রাম লইয়া ব্যবস্থা করা হইবে। মেদিনী-পুরে ও বাঁকুড়ায় জঙ্গলের অধিকারীদিগকে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট জঙ্গল জমির হিসাব দাখিল করিতে নির্দেশ দান করাও নাকি হইয়াছে। বোধ হয়, পশ্চিমবঙ্গে জঙ্গলের পরিমাপ সরকার অবগত নহেন এবং সেই-জন্যই পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও আসাম যৌথ হিসাবে ধরিয়া হিসাব দিয়াছেন, মোট জমির শতকরা ১৪ হইতে ১৮ ভাগ জঙ্গল। বিহারের ও আসামের জমি লইয়া হিসাবে কি ফললাভ হইবে?

কয়লার ও কাঠের অভাবে লোক গোবর জ্বালানিরূপে ব্যবহার করায় যে মূল্যবান সার নষ্ট হইতেছে, তাহা বুঝিয়া অখণ্ড বাঙলার সরকার জ্বালানির জন্য বন করিবার পরীক্ষায় পূর্বেই প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং এই প্রস্তাবে মৌলিকতার একান্তই অভাব।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বন-বিভাগ না জানিলেও পশ্চিমবঙ্গের বহু লোক অবগত আছেন, নদীয়া জিলায় সরকার এই পরীক্ষা করিতেছেন। আমাদিগের মনে হয়, বন-বিভাগের কোন কর্মচারী (শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু) এ বিষয়ে সরকারকে প্রাথমিক উপদেশ দিয়াছিলেন। সরকার যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে বায়-বাহুল্যে সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনাই অনিবার্য হইয়াছে।

কলিকাতায় অধিবাসীদিগের যাতায়াতের জন্য ভূগর্ভে রেল লাইন পাতা যায় কিনা, সে বিষয়ে পরিকল্পনাও নূতন নহে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার পুরাতন দপ্তরে সন্ধান করিলে তাহার পরিচয় পাইবেন। তবে সেবার পরীক্ষার প্রচার-কার্যে বায়-বাহুল্য হয় নাই। দেখা যাইতেছে, তাহার পরে প্রচারকার্যে অধিক মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে। কলিকাতায় যদি ভূগর্ভে রেল চলাচল সম্ভব হয়, তবে তাহা নিশ্চয়ই অভিপ্রেত। কিন্তু পূর্ববার যদি বায়-বাহুল্য হেতু পরিকল্পনা ত্যক্ত হইয়া থাকে, তবে কি এবার সরকারের অর্থসামর্থ্য অধিক হইয়াছে বলা যায়? দামোদর, ময়ূরাক্ষী প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতায় ভূগর্ভে রেল প্রতিষ্ঠার পরি-কল্পনা যে পরিকল্পনাই থাকিয়া যাইবে না, তাহা কে বলিতে পারে? যে অর্থব্যয়ে কলিকাতায় ভূগর্ভে রেল চলাচল সম্ভব করা

যায়, তাহাতে যদি কলিকাতার নিকটবর্তী স্থানসমূহের উন্নতি সাধন করিয়া—লোকের অধিক অর্থব্যয়ের ক্ষমতা বৃদ্ধির পরে এই কার্যে হস্তক্ষেপ করা হইত, তবে কি তাহাতেই পশ্চিমবঙ্গের লোক অধিক উপকৃত হইত না? কলিকাতার যানবাহনে উন্নতি সাধনে বিলম্ব সহ্য করা যায়—কিন্তু সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য ও পথঘাটের উন্নতি সাধনের কার্যে বিলম্ব করা সঙ্গত নহে। অবশ্য বড় বড় পরিকল্পনায় বড় বড় কথা বলা যায়—বড় বড় ঠিকায় বহু অর্থের হস্তান্তর হয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের পল্লীগ্রামে কৃষকাদি কি দেশীয় সরকারের শাসনেও—

"Must remain the hunger-striken, over driven phantom he is?"

সব সুখ-সুবিধা কি কেবল রাজধানীর অধিবাসীদিগের জন্য? গ্রামবাসীরা কি কেবল তাহাদিগের সুখ-সুবিধার জন্য অর্থ যোগাইবে?

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার সেদিন বলিয়াছেন—"আমি মনে করি যে, জেলার মেডিক্যাল স্কুলগুলি উঠাইয়া দিয়া আমরা বুদ্ধিমানের কাজ করি নাই।" কারণ—"আমাদের দেশে পল্লীগ্রামের লোক এত দরিদ্র যে, তাঁহারা এম-বি, বি-এস পাশকরা চিকিৎসকের দর্শনী যোগাইতে পারে না। গ্রামের এল এম এফ বহু চিকিৎসককে রোগীর নিকট কলা, বেগুন, মূলা লইয়া খুশি থাকিতে হয়। এ শ্রেণীর চিকিৎসক দেশ হইতে লোপ পাইলে গরীবের বিশেষ অসুবিধা হইবে।"

এই উক্তির যাথার্থ্য কে অস্বীকার করিতে পারেন? দেশে মেডিক্যাল স্কুলগুলিতে শিক্ষিত—পাশকরা বা না-করা এলোপ্যাথিক চিকিৎসকরাই গত ৭০।৭৫ বৎসরকাল বাঙলার পল্লীগ্রামে চিকিৎসার দ্বারা বহুলোককে রোগ-মুক্ত করিয়াছেন। কতদিনে বিলাতের মত চিকিৎসা-ব্যবসা জাতীয়করণ সম্ভব হইবে, তাহা বলা যায় না। যতদিন তাহা না হইতেছে, ততদিন পল্লীগ্রামে কি হইবে? কিছুদিন পূর্বে ডক্টর কুমুদশঙ্কর রায়ও মেডিক্যাল স্কুলের উপযোগিতা ও প্রয়োজন স্বীকার করিয়া এক বিবৃতি প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি ন্যাশনাল মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্রদিগের কথায় বলিয়াছিলেন—

"This training which made them very efficient doctors enabled them to help the villagers in remote areas but left them unrecognised by the Bengal Government of those days although Madras and Bihar Government recognised some of them."

এই সঙ্গে আর এক শ্রেণীর চিকিৎসকের উল্লেখ করিতে হয়। তাঁহাদিগকে "নন-রেজিস্টার্ড" চিকিৎসক বলা হয়। ইঁহারা অনেকেই কোন-না-কোন মেডিক্যাল স্কুলে পড়িয়াছেন—পাশ করেন নাই; আবার কেহ কেহ কোন কোন চিকিৎসকের সঙ্গে কাজ করিয়া এবং পুস্তক পাঠ করিয়া চিকিৎসা আরম্ভ করিয়া অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন। ইঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা নির্দিষ্ট কাল চিকিৎসা-ব্যবসা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদিগকে—স্থানীয় লোকের মত গ্রহণ করিয়া বা অন্য কোন উপায়ে যোগ্যতা দেখিয়া চিকিৎসা করিবার সুযোগ প্রদান করা যায়। হোমিওপ্যাথ, কবিরাজ, হাকিম প্রভৃতিরও চিকিৎসা করিবার অধিকার স্বীকৃত। সে অধিকারে ইঁহারা কেন বঞ্চিত হইবেন, তাহা নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করা যায়। যদি সরকার গ্রামে গ্রামে মেডিক্যাল কলেজে পূর্ব শিক্ষাপ্রাপ্ত ডাক্তার বসাইয়া লোকের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে পারেন, তবে—তখন এই সকল ডাক্তারের ব্যবসা বন্ধ করিবার বিষয় বিবেচনা করিবার সময় হইবে—তাহার পূর্বে নহে।

গত ২৬শে মে রাত্রিকালে কলিকাতা নিমতলায় কাঠগোলাসমূহে আগুন লাগায় প্রায় এক কোটি টাকার কাঠ ভস্মীভূত হইয়াছে। প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে তিনবার ঐ অঞ্চলে এইরূপ ব্যাপার ঘটিল। প্রথমবারের ব্যাপারে দমকল বিভাগের দুর্নীতি সম্বন্ধে অভিযোগ উপস্থাপিত হয়। তখন 'ডেলি নিউজ' পত্রে বলা হয়, দমকলের লোক যে সকল স্থানে টাকা পাইয়াছিল, সেই সকল স্থান ব্যতীত অন্যত্র গৃহ রক্ষা করিবার চেষ্টা করে নাই। অভিযোগের অনুসন্ধান করা হয় এবং বিভাগের কর্তা য়ুরোপীয়কে চাকরি ত্যাগ করান হয়। এখন নিমতলায় দমকলের যে আড্ডা আছে, তাহা অগ্নিযোগের পরে বহুক্ষণ নিশ্চল ছিল কিনা এবং কলিকাতা কর্পোরেশনের কলে যখন জলের চাপ যথেষ্ট ছিল না, তখন কেন অবিলম্বে অদূরস্থ গঙ্গা হইতে জল আনিবার ব্যবস্থা করা হয় নাই, সে বিষয়ে কি অনুসন্ধান হইবে? টেলিফোন হাউসে অগ্নি নির্বাপণ সম্বন্ধেও দমকল বিভাগের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থাপিত হইয়াছিল।

## মধ্যবিত্ত

**জয়শ্রী চৌধুরী**

আমাদের ইতিহাস স্বর্ণাক্ষরে নয়
আমাদের ইতিহাস অজয় অক্ষয়
আমাদের নাম রয় সমস্যাপাথারে
কন্ট্রোলের লাইনেতে জনতার সারে।

বিপ্লবের বহ্নিমাঝে দুর্বার যে ডাক্
মানুষের ঘরে ঘরে যে বার্তা পাঠাক্
জীর্ণক্ষীণ শরীরের শ্লথ পেশী মাঝে
আমাদের আত্মা হ'তে মুক্তি গান বাজে॥

মর্মর মসৃণ ঘরে ফ্যানের তলায়
চাঁদার খাতার পৃষ্ঠা উড়ে উড়ে যায়
বন্যাফ্রন্টে ভিজে ক্যাম্পে ম্যালেরিয়া ক্ষীণ
মধ্যবিত্ত বাঙালীর আগত সুদিন!

আমাদের প্রাণ রয় মাধাম কোঠায়
জীবনের মাধুরিমা অচিরে শুকায়
প্রত্যহের দীনতার কালিমার পাকে
আমাদের প্রাণসত্তা ডাক দেয় কা'কে॥

যৌবনের গান কবে লুপ্ত হয়ে যায়
ঝঞ্ঝা আর বাদলের সঙ্গীতের ঘায়
জীবনের মধুরস ধীরে যায় সরে'—
দেবতার কোন বর আমাদের তরে?

কাজল চোখের স্বপ্ন আমাদের জয়
মেঘ ঘন দিবসের পথে আয়ুক্ষয়
বর্ষার সজল স্বপ্নে নই দিশাহারা'
মধ্যবিত্ত বাঙালীর রুদ্ধ কক্ষ কারা।

ভবিষ্যৎ আলোড়ন স্বপ্নে হানে তাল
বিশুষ্ক বিভ্রান্ত যত জাগিছে কঙ্কাল
ঝরে' যাওয়া পত্র মাঝে জাগিছে অঙ্কুর
স্তিমিত নয়নে ভাবি সেদিন সুদূর।

# পারাবত দূত

অমরেন্দ্রকুমার সেন

বে তার ও র‍্যাডার যন্ত্রের উন্নতির জন্য আজকাল যুদ্ধে শত্রুসীমা ভেদ করে' র্তা প্রেরণের খুব সুবিধা হয়েছে। কিন্তু ই সকল যন্ত্রপাতি থাকলেও বার্তা প্রেরণের না আজও একটি খুব প্রাচীন পদ্ধতি বহৃত হয়। সে পদ্ধতিটি হ'ল পায়রা রা বার্তা প্রেরণ করা। শুনলে অনেকে শ্চর্য হবেন যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় র্তা প্রেরণের জন্য হাজার হাজার পায়রা বহৃত হয়েছিল। অনেক সময় একই পায়রা য়ক হাজার বার্তার আদান-প্রদান করেছে।

বর্মায় যুদ্ধের সময় একদল মার্কিন সৈন্য পানী অধিকৃত এলাকার মধ্যে গোপনে মান থেকে অবতরণ করেছিল। অবতরণ রার সময় দুর্ভাগ্যক্রমে রেডিও অপারেটর রা যায়। রেডিও অপারেটর মারা যাওয়া ন যে উদ্দেশ্যে শত্রু এলাকায় অবতরণ করা ল, তা ব্যর্থ হয়ে যাওয়া—কেননা রেডিও পারেটর না থাকলে কে বার্তা প্রেরণ করবে? ন্ত সৌভাগ্যক্রমে এই দলের সঙ্গে একটি শিক্ষিত ও ধূর্ত পারাবত-দূত ছিল। এই রাবত-দূতের নাম "জাঙ্গল জো," তখন তার স মাত্র চার মাস। সেই মার্কিন অভিযাত্রী ল সাতদিন ধরে শত্রুপক্ষের অবস্থান ও বিবিধ সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগ্রহ করে াঙ্গল জো" মারফৎ নিজেদের নিকটস্থ টিতে পাঠিয়ে দেয়। "জাঙ্গল জো" উচ্চ হাড়ের ওপর দিয়ে এবং চিলের দৃষ্টি ড়িয়ে ২২৫ মাইল উড়ে সেই বার্তা নির্দিষ্ট নে পেঁৗছে দিলে। বার্তাটি খুবই জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কেননা সেই বার্তার ওপর ভর করে' বর্মার একটা বিস্তৃত এলাকা দখল করা সম্ভব, হয়েছিল।

বর্মার যুদ্ধে মিত্রপক্ষীয় সৈন্যের একটি ল শ্যাম দেশের সীমান্তে জাপানী সৈন্যের ক্রমণে মূল দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। াক্রমণ আশঙ্কায় ইতিমধ্যেই রেডিও দ্বারা র্তা প্রেরণের সঙ্কেতলিপি নষ্ট করে ফেলা ারাশুট দ্বারা কোন রকমে একটি পায়রা য়েছিল। এই দলের কাছে বিমান থেকে নামিয়ে দেওয়া হ'ল। সেই পায়রাটির নাম র্মা কুইন"। "বর্মা কুইন"কে সেই বিচ্ছিন্ন দল একটি বার্তা দিয়ে সকাল ছটার সময় আকাশে উড়িয়ে দেয়। "বর্মা কুইন" শত্রু-ব্যূহের ওপর দিয়ে ৩২০ মাইল উড়ে এসে সেই বার্তা বিকেল তিনটের সময় পেঁৗছে দেয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বর্মা কুইনকে মাত্র ১১ সপ্তাহের শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল এবং শিক্ষাকালে তাকে যে পথ চিনিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সেই পথ থেকে ১২০ মাইল দূরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।

"জি আই জো" নামে আর একটি পারাবত দূতের কথা জানা যায়, যার জন্য হাজার সৈন্যের প্রাণ বেঁচেছিল। ১৯৪৩ সালে ইটালির যুদ্ধের সময় জার্মানরা একটি গ্রাম দখল করে সেখানে সুদৃঢ় ব্যূহ রচনা করেছিল।

অবতরণের মুখে পারাবত দূত

"জাংগল জো"

"বার্মা কুইন"

গ্রামটির একটি সামরিক গুরুত্ব ছিল, কিন্তু মিত্রশক্তি অনেক চেষ্টা করেও যখন দখল ক'রতে পারল না, তখন তারা মার্কিন বিমান বিভাগকে অনুরোধ করল ঐ গ্রামের ওপর ভীষণ বোমা-বর্ষণ করতে। ১৮ই অক্টোবর প্রাতে বোমাবর্ষণের দিন ধার্য হ'ল। ঐদিন ঠিক যে সময়ে মার্কিনদের ফ্লাইং ফর্ট্রেস বিমান এরোড্রোম ত্যাগ করবার উপক্রম করেছে, ঠিক সেই মুহূর্তে "জি আই জো" এক বার্তা বহন করে নিয়ে এল। সেই বার্তায় লেখা ছিল—"বৃটিশ সৈন্যেরা গ্রাম দখল করেছে, আর বোমাবর্ষণের প্রয়োজন নেই।" "জি আই জো" যদি পৌঁছতে আর একটু বিলম্ব করত, তাহলে গ্রাম দখলকারী সেই বৃটিশ সৈন্যরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। এই বার্তা বহন করতে জি আই জো'কে কুড়ি মাইল উড়তে হয়েছিল এবং এই দূরত্ব অতিক্রম করতে তার সময় লেগেছিল মাত্র কুড়ি মিনিট, অর্থাৎ মিনিটে এক মাইল।

যুদ্ধান্তে জি আই জো'কে অ্যামেরিকা নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, কিন্তু তাকে আবার ইংলণ্ডে নিয়ে আসা হ'ল, "ডিকিন পদক" গ্রহণ করবার জন্য। ডিকিন পদক ভিক্টোরিয়া ক্রশের সমতুল্য, কেবলমাত্র জীবজন্তুদেরই দেওয়া হয়। জি আই জোকে লণ্ডনের লর্ড মেয়র ডিকিন পদক দ্বারা ভূষিত করেন।

গুয়াডালকানালে তখন ভীষণ যুদ্ধ চলছে। মার্কিন সৈন্যবিভাগের এক স্থান থেকে অপর এক স্থানে জরুরী অথচ অত্যন্ত গুপ্ত একটি সংবাদ পাঠাবার প্রয়োজন হয়। পারাবত দূত ছাড়া সেই সংবাদ প্রেরণের আর কোন সুবিধা ছিল না এবং এই উদ্দেশ্যে "ব্ল্যাকি হ্যালিগ্যান" নামে একটি পারাবত দূতের সাহায্য নেওয়া হ'ল। প্ল্যাস্টিকের তৈরী হাল্কা একটি আধারে সংবাদটি [illegible] ভাষায় লিখে তার পায়ের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হ'ল। "ব্ল্যাকি হ্যালিগ্যান" অবশ্য নির্দিষ্ট সময়ে সেই বার্তা পৌঁছে দিতে পারে নি, প্রায় পাঁচ ঘণ্টা দেরী হয়েছিল, তথাপি সে পৌঁছেছিল। পথে তাকে জাপানী ব্যূহ অতিক্রম করতে হয়েছিল এবং গন্তব্যস্থলে যখন সে পৌঁছল, তখন তার দেহ রক্তাপ্লুত, সম্ভবত শরীরের কোন কোন স্থানে গুলী লেগেছিল। পায়রা হলেও তার কর্তব্য সে ভোলে নি। গুরুতর আঘাত লাগবার পরও পারাবত দূত তাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছেছে, এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

এই সকল পারাবত দূতেরা কেবল সামরিক-বার্তা বহন করে নি, তারা অনেক সময়

যুদ্ধক্ষেত্রের সংবাদদাতাদেরও খবর বহন করেছে। সংবাদপত্রের কোন কোন প্রতিনিধির নিজস্ব পারাবত দূত ছিল।

পৃথিবীতে পারাবত দূতের প্রচলন বহুদিন থেকে চলে আসছে, সেই বাইবেলের নোয়ার সময় থেকে। নোয়ার গল্প আপনারা সকলেই জানেন। চারিদিক বৃষ্টির জলে যখন [illegible] হয়ে গেছে, কোনদিকে জল ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না, নোয়া সেই সময় নিজের পোতাশ্রয় থেকে একটি পায়রাকে ছেড়ে দিলেন। পায়রাটি কোথাও বসবার জায়গা না পেয়ে ফিরে এল। আবার কিছুদিন, পরে যখন পায়রাটিকে ছাড়া হ'ল, তখন সে একটি [illegible] অলিভ পাতা মুখে নিয়ে ফিরে এল। বলতে গেলে এই সময় থেকেই পারাবতরা দূতের কাজ করে আসছে। প্রাচীন গ্রীক, রোমান ও মিশরীয়গণ পায়রাকে দূতরূপে ব্যবহার করত। তারাও আধুনিকদের মতো যুদ্ধের সময় পায়রাকে দিয়ে বার্তাবাহকের কাজ করাতো। প্লিনির বইয়ে পারাবত দূতের উল্লেখ আছে। পরবর্তী যুগে আরব দেশে বার্তা প্রেরণের জন্য রীতিমত পারাবত ব্যবহার করা হ'ত।

ক্রুজেড যুদ্ধের সময়, ফরাসী-[illegible] যুদ্ধকালে উইলিয়াম অরেঞ্জের সময় এবং ফ্রাঙ্কো-প্রুসিয়ান যুদ্ধের সময়ও পায়রা ব্যবহার করা হয়েছে। ফ্রাঙ্কো-প্রুসিয়ান যুদ্ধের ১৮৭০-৭১ সালে যখন প্যারিস অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিল, সেই সময়ে বাইরে থেকে শহরের মধ্যে প্রায় দেড় লক্ষ সরকারী বার্তা পায়রারা বহন করে নিয়ে গিয়েছিল।

সামরিক কাজে জার্মানরাই প্রথমে রীতি-মত পায়রা ব্যবহার করতে আরম্ভ করেন। জার্মানদের দেখাদেখি ইংরেজ ও আমেরিকানরা

অন্তহীন সমুদ্রের মধ্যে পারাবত দূতকে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে।

সামরিক বিভাগে পায়রা ব্যবহার করতে শুরু করেন।

গত যুদ্ধের সময় মার্কিন সৈন্যবিভাগ ৫৪ হাজার পারাবতকে শিক্ষা দিয়েছিল, তার মধ্যে ৩৬ হাজার পায়রাকে বিদেশে পাঠানো হয়েছিল। এই সকল পায়রাকে শিক্ষা দেবার জন্য আবার তিন হাজার জন ব্যক্তি ও ১৫০ জন কর্মচারীকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। পায়রাগুলিকে এতই সুন্দরভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল যে, অনেক পায়রা একদিনে ৫০০ মাইল উড়ে যেতে পারত এবং অনেক পায়রা ঘণ্টায় ৭০ মাইল গতি আয়ত্ত করেছিল। যুদ্ধের সময় যেমন কোন সৈন্যকে নানাভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়, পায়রাদেরও সৈন্য পর্যায়-ভুক্ত করে নিয়ে নানাভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। রেসের ঘোড়া অথবা সখের কুকুরের যেমন যত্ন করা হয়, এইসব পায়রারও সেইরকম যত্ন করতে হয়। পায়রাদের শিক্ষা দেবার জন্য কেবলমাত্র ধীর, স্থির ও ধৈর্যসম্পন্ন ব্যক্তিদেরই মনোনীত করা হয়।

সামরিক বিভাগে দৌত্যকার্যের জন্য যে পায়রা ব্যবহার করা হয়, তার এক বিশেষ জাতি আছে। বহু পরিশ্রম ও যত্নসহকারে এই পারাবত প্রজোজন করানো হয়। ভাল পারাবত-দূতের লক্ষণ হ'ল যে, তার দেহ হবে বেঁটে খাটো মজবুত গড়নের, চওড়া বুক, কিন্তু পশ্চাৎভাগ সরু ও হাল্কা মতো। দেহের তুলনায় পা হবে ছোট। ডানা দেখেই মনে হবে যে, পালকগুলি সুসংবদ্ধ। এইরূপ একটি পায়রাকে যদি ওপর থেকে দেখা যায়, তাহলে তাকে একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের মতো দেখাবে। পুরুষ পারাবতের ওজন হবে ১৪ থেকে ১৭ আউন্স, আর স্ত্রী পারাবতের ওজন হবে ১৩ থেকে ১৬ আউন্স। ধব্ধবে সাদা অথবা অন্য কোন হাল্কা রং না হলেই ভাল। হাল্কা রংয়ের পাখীদের পরিষ্কার আকাশে চিল অথবা বাজ পাখি কিংবা নীচে থেকে শত্রু-পক্ষের লোকেরা সহজেই দেখতে পাবে।

যে কোন দূরে অজানা দেশ থেকে পথ চিনে বাড়ি ফিরে আসবার অদ্ভুত ক্ষমতা আছে পায়রাদের। অনেকে বলেন, পায়রাদের একটি "ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়" আছে, যার সাহায্যে পায়রারা বাড়ি ফিরে আসতে পারে। একবার নিউ-ইয়র্কের এক ভদ্রলোক ভেনেজুয়েলার এক জাহাজের কাপ্তেনের কাছে একটি পায়রা বিক্রয় করেছিলেন। কয়েকমাস পরে সেই পায়রাটি প্রায় তিন হাজার মাইল অতিক্রম করে নিউ-ইয়র্কে তার প্রাক্তন মনিবের কাছে ফিরে এসেছিল। কিন্তু আর একটি পায়রা সাইগন থেকে ফ্রান্সে ফিরে এসেছিল, ৭২০০ মাইল অতিক্রম করে। এই পথ চিনে এক স্থান থেকে পায়রা যাতে অপর স্থানে যেতে পারে, সেই হ'ল শিক্ষা দেবার আসল কৌশল এবং শিক্ষকের বাহাদুরীও হ'ল সেইখানেই।

পায়রার বাচ্চারা উড়তে পারবার আগে তাদের খাঁচায় পুরে গাড়ি ক'রে আশপাশের অঞ্চলে ঘুরিয়ে বেড়ানো হয়, যাতে সে সেই অঞ্চলের সঙ্গে শিশুকালেই পরিচিত হ'তে পারে। ২৮ দিন হলেই তাকে একটু একটু উড়তে শেখানো হয়। ডানায় একটু একটু করে জোর বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদেরও একটু একটু করে দূরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখান থেকে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। একশত মাইল দূরত্ব পর্যন্ত খুব সতর্কতার সঙ্গে শিক্ষা দেওয়া হয়। আবহাওয়া ভাল থাকলে প্রত্যহই পায়রাকে ওড়ানো হয়। খুব ধূর্ত পায়রা না হলে প্রথম বৎসরে একশত মাইল দূরত্ব অতিক্রম করা হয় না, তবে বিশেষ ক্ষেত্রে পাঁচশত মাইল পর্যন্ত দূরে পায়রাকে নিয়ে যেয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষাও কঠোর হয় এবং যে পর্যন্ত না সে হাজার মাইল দূর থেকে বাড়ি ফিরে আসতে পারে, সে পর্যন্ত শিক্ষার কঠোরতা শিথিল করা হয় না।

পায়ে বার্তা বেঁধে দেওয়া হচ্ছে।

পায়রাদের শুধু বাড়ি ফিরতেই শেখানো হয়

প্যারাশ্যুট বাহিনীও পারাবত দূত ব্যবহার করে।

না, এক স্থান থেকে অপর স্থানে যেতেও শেখান হয়। এক জায়গায় তাকে খাদ্য দিয়ে অপর জায়গায় জল খেতে দেওয়া হয় এবং এইরূপ ভাবেই তাকে এক স্থান থেকে অপর যে কোন স্থানে উড়তে শেখানো হয়। আরও একটি কৌশল শিক্ষাকালে অবলম্বন করা হয়, তা হ'ল এই ঃ—পায়রারা এক সাথীতেই সন্তুষ্ট, আজীবন তার সংগেই সে বাস করে। তার সংগীকে যে কোন এক স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়, তারপর তার সংগীর কাছে অপর একটি পায়রাকে এনে দূরে-পারাবতের মনে হিংসার উদ্রেক করিয়ে তাকে স্থানান্তরে নিয়ে যেয়ে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং যেখানেই তাকে নিয়ে যাওয়া হোক্ না কেন, সে তার সাথীর কাছে ঠিক ফিরে আসে। এছাড়া প্রয়োজনবোধে কোন কোন পায়রাকে দিনেরবেলায় ঘুমোতে অভ্যাস করিয়ে রাত্রে উড়তে শেখানো হয়। কিন্তু পায়রাদের মরুভূমি অতিক্রম করতে শেখানো বড়ই কষ্টকর। খুব কম পায়রাই মরুভূমি পার হতে পারে। পায়রা জল খেতে ও জলে স্নান করতে খুব ভালবাসে, কিন্তু মরুভূমিতে জলের অভাবের জন্যই তাদের মরুভূমি পার হতে শেখানো বড় কঠিন। পায়রার দেহের সাধারণ উত্তাপ ১০৭ ডিগ্রি সেইজন্যই বোধ হয় সে জল এত ভালবাসে।

পঁয়ত্রিশ হাজার ফিট ওপরে যেখানে ঠাণ্ডা শূন্য ডিগ্রিরও ৪৫ ডিগ্রি নীচে এবং যেখানে অক্সিজেনেরও একান্ত অভাব, বিমানে করে নিয়ে যেয়ে সেখান থেকে পায়রাকে ছেড়ে দিয়ে দেখা গেছে যে, অক্সিজেনের অল্পতার জন্য অথবা শীতলতার জন্য তার কোন অসুবিধা হয় না, সে ঠিক লক্ষ্যস্থলে পৌঁছয়। কুয়াশা, অল্প বৃষ্টিতেও তাদের কোন অসুবিধা হয় না এবং এইরূপ আবহাওয়ায় তারা সমুদ্রও পার হতে পারে। তবে তুষারপাত হলে তাদে[র] পক্ষে কিছু মুস্কিল হয়। পৃথিবীর কো[ন] কোন অঞ্চলে চুম্বক ক্ষেত্র আছে এবং এইরূ[প] কোন ক্ষেত্রের মধ্যে পড়ে গেলে তাদের দিক্‌ভ্র[ম] হয়ে যায়। এই রহস্যের কোন সমাধান কর[া] যায় নি, অথচ বেতার তরংগ তাদের কো[ন] বাধা দিতে পারে না।

কিন্তু পায়রা ঠিকানা চিনে কি ক[রে] উড়ে যায়? ..উত্তরে কেউ বলে ,আকাশে বিশে[ষ] আলোর রেখা আছে। কেউ বলে, তাদে[র] দৃষ্টিশক্তি প্রখর, কেউ বলেন, তাদের স্মৃতি শক্তি খুব ভাল, আবার কেউ বলেন, তাদে[র] এক সাথী প্রিয়তা। সবচেয়ে ভাল উত্ত[র] দিয়েছেন বোধ হয় একজন নামজাদ[া] মার্কিন পারাবত শিক্ষক। তিনি বলেন "এ রহস্য উদ্ঘাটন করতে হ'লে জবাবট[া] শুনতে হবে পায়রার কাছ থেকেই।"

# মিল

### অসিতকুমার চক্রবর্তী

( ১ )

শীতের বিষণ্ণ বিকেল।
শান্ত কলুটোলা।
গোলদিঘীর ধারে
একটি পত্রহীন গাছ
নিরাভরণ বিধবার মত
বিশুষ্ক মুখে দাঁড়িয়ে।
তার শোকের ছায়ায়
বাতাস হয়ে উঠেছে ভারী
আকাশ হয়েছে নিস্তব্ধ।
ফুট্‌ফুটে ছোট্ট একটি মেয়ে
গোলদিঘীর ধারে বেণী এলিয়ে
হাল্‌কা মেঘের মত লঘু-চাপল্যে
হাস্য-ক্রীড়ায় রত।
শোকার্ত সেই স্তব্ধতার
মূর্ত প্রতিবাদ এই মেয়ে।
চকিত তার হাসির উচ্ছলতায়
অফুরন্ত তার জীবনের উষ্ণ স্পর্শে
শোকে-সীমায়িত সেই পরিবেশ থেকে
মিলালো শোকের চিহ্ন যত।
রাত্রির অন্ধ অন্ধকার যেমন যায় মিলিয়ে
সূর্য-ওঠা-প্রাতের পরিচ্ছন্ন প্রসন্নতায়।

(২)

আর এক সন্ধ্যায় এসেছি
গোলদিঘীর সেই পরিচিত পরিবেশে।
আজও দেখছি সেই গাছ তেমনি দাঁড়িয়ে।
কিন্তু এ কী তার পরিবর্তিত রূপ,
কী এ নূতন সজ্জা!
তার পাতার সবুজে
জীবনের অফুরন্ত আশা।
নেই আজ জীর্ণ পত্র,
পত্রের মর্মরে তার
বলিষ্ঠ জীবনের ভাষা!
আর দেখছি সামনের রাজপথে
একটি মেয়ে—চোখে তার
হাজারো দিনের ক্লান্তি।
ডাস্টবিনের আবর্জনার সামনে
নিশ্চল হয়ে আছে
শব্দহীন যন্ত্রের মত।
মুখে তার দেখি
মৃত্যুর ম্লান ছায়া।

(পূর্বানুবৃত্তি)

সুশী চুপ করে রইল।

অবশ্য, অরুণাকে আর হেড মিস্ট্রেস লাগছিল না তখন সুশীর চোখে। একটি মেয়ে, সমান বয়সের, জীবিকার জন্যে মফঃস্বলের গরীব স্কুলে টিচারি করছে।

ভারি করুণ মনে হলো, করুণ ক্লিষ্ট বিমর্ষ, সুশীর মত স্তিমিত বিষণ্ণ আর একটি যৌবন।

যেন ছন্দোহীন হয়ে, ছন্দোপতনের ফলে গ্রীষ্মের কাঠফাটা রোদ্দের দুপুরে ঢেউটিনের বেড়া-দেওয়া গরম ঘরে শুকনো ধুলো আর হাওয়ার নিঃশ্বাস নিতে জেগে বসে আছে। কেন?

সুশীর তবু বিয়ে হয়েছিল।

ওর অবস্থা কি।

কার জন্যে চাকরি, কেন চাকরি।

রূপসী সন্দেহ কি। ভরভরতি যৌবন। ঈর্ষা হয়।·সুশী ঈর্ষা করে অরুণাকে, ওর রূপ।

কেমন যেন স্তিমিত মনে হয় অরুণাকে এক এক সময়, নিস্তেজ। সুশীর ভাল লাগে এটা।

অনেকক্ষণ একভাবে চুপ করে চেয়ে থেকে অরুণা আস্তে আস্তে বলল, হ্যাঁ, অভাবে না পড়লে কে আর সখ করে মাস্টারি করতে আসে।' একটু থেমে অরুণা বলল, 'কি তার সম্মান।'

সুশীলা অরুণার চোখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইল।

অরুণা আরো যেন কি বলতে যাচ্ছিল, সুশী বলল, 'থাকগে।' বাধা দিয়ে বলল, 'চল, স্নানের বেলা হল।'

অর্থাৎ সুশীলা আর চাইছিল না এখানকার সামাজিক জীবন নিয়ে হেড মিস্ট্রেসের সঙ্গে বেশি আলোচনা করে।

রিজার্ভ। ভয়ঙ্কর চাপা মেয়ে অরুণা।

এমনিতে সুশী ঝোঁকের মাথায় ঝপাঝপ নিজের সম্বন্ধে অনেকটা বলে ফেলেছে। অবিশ্যি তেমন কিছুই নয়। একটি গরীব বিধবা টিচারের চাকরি যাবে কমিটির বিচারে, এমন সে কিছুই করেনি অতীত জীবনে।

জীবনের অতীত।

কোন্ মিস্ট্রেসটির না ছিল, কার না আছে।

কিন্তু অরুণা নিজের সম্বন্ধে স্তব্ধ।

আজ অবধি কোন কথাই বার করতে পারলে না সুশী। অরুণা বলল না, বলবে না।

অথচ ঘুরে ফিরে আসছে সুশীর গল্পে।

যেন এই দিয়ে সখীত্ব বজায় রাখা।

তবু স্বাভাবিক ঠেকত, যদি না ক্ষণে ক্ষণে থেকে থেকে মিস সেন কমিটির মেম্বারদের নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে এত সন্দিগ্ধ সচকিত প্রশ্ন তুলত। কি শহরের কোনো ভদ্রলোক টিচার্স-কোয়ার্টারে এসেছিলেন বা আসতেন তাঁর সম্পর্কে।

'আমি তিনটে শহর ঘুরে এসেছি। আমার চোখে কোন ফাঁকি এড়াতে পারবে না।' যেন অরুণা বলে, বলতে চায় সময় সময় সুশীর চোখের দিকে অপলক চেয়ে থেকে।

চুপ করে সুশী তখন চোখ ফিরিয়ে নেয়। কি আর বলবে। 'পদমর্যাদা ও বিদ্যার জোরে এমন কথা তুমি বলতে পার বৈকি'—মনে মনে বলে সুশী। কিন্তু কেন, কোন্ দুঃখে বিয়ে সংসার ছেড়ে মাস্টারনির কাজে আত্মনিক্ষেপণ। কি উদ্দেশ্য?

সুশীর এক এক সময় বলতে ইচ্ছা করে, বলে না। কাজ কি। অবশ্য, কমিটি শক্ত। সুশী এ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত। না, একটি হেড মিস্ট্রেসের কথায় রাতারাতি নতুন কোন নিয়ম এখানে প্রবর্তন হবে, তা নয়।

তবু সুশী কথাটা চেপে গেছল।

আজ বলে নয়, চিরদিন, অন্তত শিক্ষয়িত্রী-দের তেমন বাইরে যাওয়ার রেওয়াজ না থাক, ছুটি-ছাটায়, অবসর সময়ে স্থানীয় ভদ্রলোকেরা এই কোয়ার্টারে এসেছেন, আসেন, ওর মা'র আমল থেকে দেখে আসছে সুশীলা। শহরের জল-হাওয়ার সঙ্গে এই রীতি মিশে গেছে।

অরুণার চোখে এটা খারাপ ঠেকল।

ওর পক্ষে এটা ভাল হচ্ছে কি, ভাবল সুশীলা, বরং উল্টো ফল দাঁড়াচ্ছে। শহরের স্কুলে, কলেজ, লাইব্রেরীতে, আদালতে, হাসপাতালে, বাজারে মাঠে রাস্তায়; ছেলে ও মেয়েদের আড্ডায় কেবল এই রব।

মেয়েটা অহঙ্কারী। একটু দেখতে ভাল তাই কি। না বিদ্যার দেমাক।

সেদিন কোন মোক্তারবাবুর চিঠিতে নাকি নলিনী মোক্তার বুড়ো আঙুলে তুলে নাকি মিস সেন ভুল-ইংরেজি বার করেছিল তিনটে। কাছারীতে বলছিল, 'রেখে দিক ইংরেজি-বানান, অই ইংরেজিতে হাকিম কাঁপে তো কোথাকার না কোথাকার হেড মাস্টারনী। লাল পেন্সিলের দাগ মেরেছেন উনি মেয়ের 'কনে-দেখা ছুটির' দরখাস্তের তলায়।

আরে নগদ আড়াই হাজার খরচা করে ইঞ্জিনীয়ার পাত্র বাগিয়েছি।

তোর বিদ্যা তুই গাছপালাকে শেখা।

আমার মেয়ে ঘর করতে চলল নয়াদিল্লী। গরমকালে যাবে দার্জিলিং।

তিনটে চাকর, দুটো আর্দালি।

তোর মতন শুট্‌কীর কাছে কে পাঠাচ্ছে আর মেয়ে। তুই এখন মেয়ের বাপের ইংরেজির ভুল ধরবি না তো করবি কি, খেয়ে-দেয়ে আর কাজ আছে কিছু?'

নলিনী কাছারীতে কমলা মাসীকে শুনিয়ে দিয়েছিল, গার্জিয়ানদের সঙ্গে ওসব বাজে ইয়ার্কি যেন না করে নয়া হেড মিস্ট্রেস, পাব্লিক পিছনে লাগলে ও'র চাকরি যাবে। উপোস করবেন। মেয়েছেলের অত ট্যাঙ-ট্যাঙানি ভাল না।'

মাসী গিয়েছিল চাঁদা আদায় করতে রিলিফের। শুনে এসেছে।

প্রশংসার সঙ্গে সঙ্গে নিন্দাবাদগুলিও এসে শুনিয়ে যায় কমলা খাস্তগীর। বেশ বর্ণনা করে। সেদিন নাকি ক্লাবে রীতিমত বৈঠক বসেছিল এই নিয়ে। নলিনী মোক্তার শহরের অনেক কিছু নেড়ে চেড়ে খায়। বৈঠক ডেকেছিল নলিনী বিচারের জন্যে। সরবে ঘটনাটা পেশ করেছিল শহরের মুরুব্বীদের দরবারে।

অটলবাবুও উপস্থিত ছিলেন।

আর ছিল যোগীন ডাক্তার। চেয়ারম্যান মোহিনী নন্দী, সাব-রেজিস্ট্রার মুরারী হাজরা, উকিল রাধানাথ, অধ্যাপক নিকুঞ্জবাবু ও হোমিওপ্যাথ হীরালাল রক্ষিত। জুতোর দোকানের কানাই শা ও কাপড়ের দোকানের বিপিন পালকেও দেখা গেছে। অর্থাৎ শহরের মাঝামাঝি জায়গায় যাঁরা রয়েছেন। যাঁরা স্থায়ীভাবে এ-শহরের মেরুদাঁড়া হয়ে আছেন। শহরের উন্নতির জন্য যাঁদের মাথা ব্যথা বেশি। নলিনী তাঁদেরই ডাকিয়েছিল।

হাকিম দারোগা জেলার ডাকবাবু নন। যে আজ এখানে আছেন তো কাল থাকবেন না।

'তাঁদের যুক্তি তাঁরা যা-ই দেখান, আমরা চাই অন্যরকম।' মোহিনীবাবুর গলা শোনা যাচ্ছিল।

অটলবাবু নাকি হেড মিস্ট্রেসের পক্ষ নিয়ে কি প্রতিবাদ করতে চেয়েছিলেন, চেয়ারম্যান টেবিলে চড় মেরে অটলবাবুকে থামিয়ে দিয়েছিলেন। আজকাল অটলবাবুর কোন 'ভয়েস' নেই।

আর দেখাও গেল শেষ পর্যন্ত নলিনীরই জয় হল। একলা অটলবাবু ছাড়া সভাস্থ সকলে শিক্ষয়িত্রীর অন্যায় ধরেছিলেন।

'সাধারণের সঙ্গে মেলামেশা করা তাঁর অভ্যাস নেই বলেই তিনি সাধারণের সেন্টিমেন্ট বুঝলেন না। তাই এমন মোটা কাজটি করলেন। কাঁচা কাজ।' সাব-রেজিস্ট্রার দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন সভায় অরুণার ব্যবহারে। তিনি এটা আশা করেন নি।

রাধানাথ উকিল বলছিল, 'তাঁর কাজ মেয়েদের পড়ানো, একজন রেসপেক্টেবল জেন্টেলম্যানের ভুল-ইংরাজি খুঁচিয়ে বার করা নয়।

মিশনারী সাহেব ধর্মপ্রচার করেন। কে পাপ কাজ করল, কে না করল, তা খুঁচিয়ে বার করা তাঁর কর্ম নয়।

দোষ তথা পাপ বিচারের ভার হাকিমের ওপর, দোষীকে বেঁধে আনবার জন্যে আছেন পুলিশ, হাজত বাসের ব্যবস্থার জন্যে রয়েছেন দারোগা এবং এখন মেয়েদের খাতার চৌহদ্দী ডিঙিয়ে নবাগতা প্রধানা শিক্ষয়িত্রী যদি অভিভাবকের আর্জির ওপর লাল পেন্সিল বুলিয়ে বিদ্যা ফলান তো সেটা শোভনও হয় না সংগতও না। যার যতটুকু কাজ।' অবশ্য সবাই যখন চটছিল, একলা যোগীন ডাক্তার হেসে বলছিল, 'অরুণা যদি বাইরে আসা-যাওয়া করতেন, গার্জিয়ানদের সঙ্গে বেশ একটু যোগাযোগ রাখতেন তো এই অপ্রীতিকর ব্যাপারই হয়তো ঘটত না। নলিনীবাবুর মেয়েকে দেখতে আসছে, সামাজিক অঙ্গ হিসাবে হেড মিস্ট্রেসের তো তা জানাই থাকত, ফর্ম্যাল একটা সিগনেচার দিয়ে দরখাস্ত গ্র্যান্ট করে দিতেন। ওটা কি আর তাঁকে পড়ে দেখতে হ'ত। না ভাষার ভুল চোখে ঠেকত।

ডাক্তারের মধ্যস্থতার ফলে মামলার সেখানেই নিষ্পত্তি হয় বটে। কমলা সুশীকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বলছিল সেদিন: এমনটি কি এর আগে হয়নি, খুব হয়েছে। কুমুদিনী সরকার, মানে অরুণার আগে যে হেড মিস্ট্রেস ছিল, জেলার বাবুর এক চিঠিতে নাকি এক ডজন ভুল-ইংরাজি বার করেছিল। কিন্তু তাতে কি হৃদয় দস্তিদার চটেছিল। বরং খুশি হয়ে কুমুদিনীকে জেলখানার বাগানের তিনটে বড় বাঁধা-কপি উপহার পাঠিয়ে দিয়েছিল কনস্টেবলের হাতে। কারণ কি। হৃদয়-গেছে জেলারের কোয়ার্টারে। ভালয়-মন্দয় খোঁজ খবর নিয়েছে। সম্ভাব ছিল। কেবল কি জেলার। যোগাযোগ রাখত কুমুদিনী শহরের মাথাগুলোর সঙ্গে। 'নলিনী চটবে না তো কি। অহংকারে দেবী ফাটো-ফাটো, তার ওপর এমন কাজ—চাকরি যায়নি এই বেশি। পারিকের মেয়ে পড়িয়ে তোমার অন্নসংস্থান। পারিককে চটিয়ে এক সন্ধ্যা এখানে টিকবে নাকি।'

অর্থাৎ, কমলা খাস্তগীরের ভাষায় অরুণার এই 'কাঠ-কাঠ' ভাবই নাকি ওর সর্বনাশের কারণ হবে।

দেখা-সাক্ষাতের সুযোগ পাচ্ছে না বলে রমেন চাকলাদার পেট চাপড়ায়, প্রণব চাটুজ্যে হায়-আফশোষ করে, কিন্তু চাকলাদার-চাটুজ্যে তো আর সবাই নয়, কাঠির বদলে কাঠি দিতে শহরে পুরুষের অভাব নেই। মাস্টারি ফলানো বেরিয়ে যাবে একদিন।

তারপর অবশ্য এরকম কাজ অরুণা আর করেনি। কিন্তু তাহলেও নতুন হেড মিস্ট্রেসের ওপর শহরবাসী সন্তুষ্ট নয়। সুশী পাঁচজনের পাঁচ রকম মন্তব্য শুনেছে। এই শহরে ওর জন্ম কর্ম। শহরের পুরুষ-মন সুশীর চেয়ে অরুণার তো আর ভাল জানবার কথা নয়। সুশী চাইছে একটু মেলামেশা। কাল একরকম জোর করে সে অরুণাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছিল রেস্টুরেন্টে। অর্থাৎ দুদিক বজায় রাখতে চাইছে সে। ডাক্তারবাবু, সাব-রেজিস্ট্রারবাবুরও ইচ্ছা না একজন নতুন মিস্ট্রেস এখানে আসতে না আসতে চাকরি থেকে বরখাস্ত হন। যুক্তি যা-ই থাক, শুনতে কি দেখতে এটা খারাপ ঠেকে—শত হোক প্রগতিসম্পন্ন একটা শহর তো। এ ধরণের অপ্রীতিকর ব্যাপার যত কম ঘটে, যোগীনবাবু, মুরারিবাবুরা তা-ই চাইছেন। তাই তাঁরা আগের চেয়ে এখানে একটু বেশি আসা-যাওয়া করছেন। কমিটির বাইরের দু'একজনকেও সঙ্গে নিয়ে আসছেন। যেমন আজ সকালে। অথচ অরুণা যদি এসব না বোঝে তো সুশী করবে কি। তেমনি 'কাঠ-কাঠ' ভাব। পঙ্কজবাবু তিনবার একটা কথা জিজ্ঞেস করার পর অরুণা কথা বলল। ভদ্রলোক কি ভাবলেন।

না, হেড মিস্ট্রেসের এই প্রকৃতিটা সুশীর মোটেই ভাল লাগছে না। চুপচাপ, চাপা—সারাটা সকাল কাটিয়েছে প্রফেসার পাড়ার ছোট মেয়েগুলোকে নিয়ে। রবিবাবুর নাটক করাচ্ছেন মেয়েদের দিয়ে। কিন্তু তাতে কি মুরুব্বীদের মন ভেজে।

ভাগ্যিস ক'খানা অতিরিক্ত চায়ের কাপ রেখেছিল সুশী নিজের ঘরে।

তিনবার সুশী নিজে গিয়ে ডাকবার পর তবে অরুণা এলো আতাতলা ছেড়ে। যেন ভীষণ অনিচ্ছা। যেন অভ্যাগতদের চেয়ে ওর 'ডাকঘরের' মহড়া বড়।

পদে বড়। তাই মুখের ওপর সুশী কিছু বলতে পারে না। বলবেও না। বরং এখন ও ভাবছিল নিজের সম্পর্কে এতগুলো কথা অরুণাকে না বলাই উচিত ছিল। বলা যায় না—বলা কি যায় কার মনে কি আছে। বলা যায় কি—হয়তো হঠাৎ এক সন্ধ্যায়, কি সন্ধ্যার পরেই খেয়ালের বশে নিশানাথ বেড়াতে এল এখানে—অরুণা যে তখন লম্বা এক রিপোর্ট খিঁচে দেবে না সুশীর বিরুদ্ধে তারই বা নিশ্চয়তা কি। অবশ্য এটা কোনদিন হবে না। সুশী আশাও করে না—কিন্তু তবু, তবু তো—নিশীথ না আসুক, পঙ্কজ গুপ্ত, কি হীরেন পালিত—এ'রা যদি......

'হঠাৎ বড় গম্ভীর হয়ে গেলে যে?'

'কই, না তো।' বুদ্ধিমতী সুশী হেড মিস্ট্রেসের প্রশ্নে চমকে না উঠে মুখখানাকে চট করে বেশ হাসি-হাসি করে ফেললে। 'ভাবছিলাম, এখন এই রৌদ্রে আবার বুঝি বেরোতে হল।'

'যাচ্ছ নাকি কোথাও?'

সুশী মাথা নাড়ল।

'তবে?' ভুরু তুলল অরুণা আনত সুশীর দিকে চেয়ে। 'কি ব্যাপার?'

ছড়ানো কাপ-ডিসগুলো সুশী একটা-একটা করে গুছোয়। মুখে শব্দ নেই।

বাইরে দেবদারুর গুঁড়ির কাছে চুপ করে একটা ছাগল-ছানা শুয়ে। একটা শালিক উড়ছে ছাগল-ছানার মাথার ওপর। হঠাৎ শুকনো পাতার ঘূর্ণী উঠল চকিত হাওয়ায়। সুশী চোখ তুলল।

'আমার এবেলার সাবান নেই গায়ে মাখার।'

'তা তুমি আমায়ও তো বলতে পার।' অরুণা ভুরু নামায়। যদি কিছুর দরকার হয়, আমার থাকে, আমি দিয়ে দিচ্ছি, দিই।'

সুশী কথা বললে না। অরুণা উঠে দাঁড়াল। বারান্দায় পায়চারী করল একটুক্ষণ। অর্থাৎ অরুণা এটা পছন্দ করে না, এখন এই অবেলায় সুশী বাইরে যাক।

আর যা-ই হোক, অরুণা ডিসেন্সি নষ্ট হতে দিতে রাজী নয়।

হ্যাঁ, এটা টিচার্স কোয়ার্টার।

শহর যতই আধুনিক হোক, এখানকার সম্বন্ধে নির্দিষ্ট নিয়মকানুনগুলো যাতে যথাযথ প্রতিপালিত হয়, সেটাই সে চাইছে।

কাপ-ডিসগুলো তুলে সুশীলা স'রে পড়ল।

সুশী গম্ভীর। অরুণা টের পেল।

অর্থাৎ বাইরের লোকজন আসায় অরুণা বিরক্ত বুঝতে পেরে সুশী নিজের গল্পটি বলাও বন্ধ করল। থেমে গেল। কিন্তু এর সঙ্গে ওর সম্পর্ক কি। তোমার জীবন আর বাইরের জীবন? ভাবতে ভাবতে অরুণা স্থির হয়ে দাঁড়ায়। 'সেখানে আমি হেড মিসট্রেস ছিলাম কি?' যেন প্রশ্ন করল অরুণা

ব্যর্থ, নিঃসঙ্গ,—অনুতাপের সলতে হয়ে ধিকিধিকি জেগে আছ এই ভাঙ্গা টিনের ঘরে। গরিব তো বটেই নইলে আর খেটে খাওয়া কেন। আমি কান পেতে শুনতাম, শুনেছিলাম তোমার কান্না, স্বপ্ন, ভুল। কিন্তু এক জায়গায় আমাকে নিয়মতান্ত্রিক হতে হবে, দেখতে হবে ডিসিপ্লিন,—যেন অরুণা এবার নিজের মনে বলল, 'দরকার হয় আমার এখানে কড়া হতে হবে,—কঠিন। হ্যাঁ, তোমার বয়সের আর একটি মেয়ে, আমারও শিক্ষয়িত্রী জীবন।' বলতে বলতে, ভাবতে ভাবতে অরুণা নিজের দিকে তাকাল। তিনটি সহর ঘুরে এসেছে ও।

সুশী স্নানের ঘরে ঢুকেছে অরুণা টের পেল। জলের ছপ্‌ছপ্ শব্দের সঙ্গে সাবানের গন্ধ ভেসে আসছিল। হ্যাঁ, অরুণার ভিনোলিয়া কেক্। কতকাল কতদিন সে ওটা তুলে রেখেছিল, ব্যবহার করছিল নিজে একটা সস্তা দরের সাবান। সুশী বেছে নিতে ভালটাই নিয়েছে।

গুন্‌গুন্ ক'রে গান গাইছিল সুশী স্নানের ঘরে।

তামাটে রুক্ষ মধ্যাহ্ন-আকাশের দিকে তাকিয়ে অরুণা চুপ করে রইল।

ক্রমশঃ

# সেণ্ট জর্জের গল্প

**ক্লাইভ বার্নলে**

প্রতি বৎসর চিলট্রানসে এক সময় না এক সময় আগুন লেগে কোন-না-কোন বাড়ি না হয় গোলাবাড়ি পুড়ে যেতো। তারপর সেই অগ্নিভস্মের মধ্য হতে দগ্ধ মাংসের যে গন্ধ উঠবে, সেই মাংস যে কিসের মাংস, তা না জেনেই তা বের করা হবে এবং সকলে খাবে।

যে সময়কার কথা বলছি, তখন চিলট্রানসরা আজকের থেকে প্রায় দশ হাজার ফিট উঁচু ছিল শারীরিক উচ্চতায়।

তারা বলতো, এ-আগুন লাগানো হোল ড্রাগনের কাজ।

রাজা অনির্বচনীয় ক্যালসিওলারিয়ার কানে একথা পেঁছাতেই তিনি প্রতিকারের ব্যবস্থা করলেন। তিনি তখন বাকিংহামশায়ারের সম্রাট। অবশ্য ক্ষুদ্র মিসেনডেন তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। তবে উত্তরাধিকারসূত্রে ব্রাসরিজ বোটম ও বেলিলি বেলিনজারের প্রভু তিনি ছিলেন। এ সমস্ত অবশ্য বহুদিন পূর্বেকার কথা। দিনক্ষণ হিসাব না করলে মনে হয়, মাত্র গত দিনের কাহিনী।

এ্যাণ্টিপ্রানডিয়াল শকের দ্বিসহস্র একাদশ বৎসরের বোরাস্কসের দশম দিবসে অগ্নিবর্ষণ-কারী শল্কাচ্ছাদিতদের উচ্ছেদকার্য পরিণত করার আইন রাজকীয় অনুমোদন লাভ করলো। সেই আইনে একটা প্রধান সূত্র রইলো যে, যখন কোন ব্যক্তি প্রমাণ করতে পারবে যে, সে কোন ড্রাগন নিহত করেছে, তখন এই বিধিবদ্ধ আইনানুসারে তাকে যুদ্ধ চ্যালকনটের আর্ল এই উপাধির সঙ্গে আটচল্লিশ কুয়াড্রনস্ স্বর্ণমুদ্রা (এখনকার পাঁচ লক্ষ স্টার্লিং) এবং সব থেকে সুন্দরী রাজকন্যা দেওয়া হবে।

টাইলার হিলসের স্যার কনভলভালামের বয়স তখন খুবই কম। নাইট হিসাবে সে তখন অগ্নিবর্ষণকারী শল্কাচ্ছাদিতদের বিষয়ে কিছু না জানলেও রাজকুমারীদের সম্বন্ধে অনেক কিছু জানে। তার মনে হোল, রাজকীয় ঘোষণা উপযুক্ত হয়েছে। সুতরাং যখন সে সংবাদ পেলো, আইভিন হো বেকনের তুষার-রেখার ঠিক নিম্নভাগে একটি গুহামুখ হোতে ধূম্রজাল উদ্গীরণ শুরু হোয়েছে এবং সাধারণ্যে বলাবলি করছে, হয় এটা আলবেরির আগ্নেয়-গিরির, যা তখন প্রায়ই লাভা উদ্গীরণ করতো, নতুন মুখ, না হলে কোন ড্রাগনের নতুন আবাস, তখনি স্যার কনভলভালাম তার বক্ষোত্রাণ বর্ম পরে একটা দ্বিমুখী তরবারি কোষবদ্ধ করে ফেললো। তারপর সে সামরিক দৃষ্টিভঙ্গীতে সমস্ত পরিবেশটা পর্যবেক্ষণ করার উদ্দেশে যাত্রা করলো। (পরে অবশ্য তার স্বহস্তে লিখিত জীবনীতে সে এই যাত্রার নামকরণ করেছিল সামরিক পর্যবেক্ষণের সূচনা অথবা নতুন সমরকুশলতার অভ্যুদয়ের স্মৃতিকথা)।

এ সমস্ত বহুদিন পূর্বেকার ঘটনা। খৃষ্টজন্মের কথা তখন সম্পূর্ণরূপে কল্পনাতীত ছিল।

তখন রাজধানী ছিল চেশহ্যাম। রাজধানী থেকে সে যাত্রা করলো, পার হোল এ্যামলি গ্রীনের স্ফটিক প্রাসাদ আর উগিনটনের মরকত দুর্গ। অনেক দূরে দাঁড়িয়ে বেকনের বিশাল হিমবাহের নীচে দাঁড়িয়ে সে লক্ষ্য করে দেখলো : গুহার মুখ হোতে ধোঁয়ার স্রোত কুণ্ডলী পাকিয়ে আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে; রেলগাড়ি চলে গেলে পাহাড়ী সুরঙ্গের ভেতর হোতে ধোঁয়ার স্রোত এইভাবে বেরিয়ে আসে। অবশ্য তার ঠিক এই উপমা মনে পড়ে নি। কেমন করে পড়বে। এ সমস্ত ব্যাপার ঘটেছে বহুকাল আগে।

মনে মনে সে বললো যে, রাজকুমারীর কেশগুচ্ছ রক্তিম আর যার কণ্ঠদেশে তিল রয়েছে, আমার তাকেই চাই। তারপর বর্মের প্রচুর শব্দ তুলে সাহসভরে সে সেই ধূম্রাচ্ছন্ন গহ্বরের সামনে এগিয়ে গেল, চীৎকার করে আহ্বান জানালো, ওহে অগ্নিবর্ষী শল্কাবৃত চূড়ামণি, বাইরে আয়, চেয়ে দেখ কে এসেছে।

সেখানে ছিল প্রাচীনপন্থী শল্কাবৃত। কারণ হোল যে, দ্বিসহস্র ষষ্ঠ বৎসরে মহাগ্যাডেসডেন সম্মিলনে কখনো ড্রাগনেরা যোগদান করে নি। সুতরাং এই সম্মেলনে আগুন, জল এবং আণবিক অস্ত্রশস্ত্রের শৌর্য-বিরোধী প্রয়োগ সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রস্তাব উত্থাপিত এবং গৃহীত হয়, সে বিষয়ে প্রাচীন শল্কাবৃত কিছুই জানতো না। স্যার কনভলভালাম আহ্বান জানাবার সঙ্গে সঙ্গে সেই গুহামুখ হোতে বিরাট মেঘ গর্জনের সঙ্গে এক প্রচণ্ড নিঃশ্বাসের হুঙ্কার নির্গত হোল। সে নিঃশ্বাসের তেজ এতো দাহ্যমান ও উত্তপ্ত যে, নাইটের ক্লাইসডেন ঘোড়া প্রভুকে পিঠ হোতে ফেলে দিয়ে তৃষ্ণাকাতর হরিণীর মতোন সুশীতল গিরিপ্রস্রবণের উদ্দেশে নিরুদ্দেশ হোল। অশ্বপৃষ্ঠচ্যুত স্যার কনভলভালাম সেই গুহাপ্রান্তে বসে অনবরত ঘামতে লাগলো। তাকে তখন দেখলে মনে হোত, ডেকচির মধ্যে তাপ দিয়ে লাল টম্যাটো পরিশুদ্ধীকরণ চলেছে।

—আবার একজন এসেছে। —একটা ক্ষীণ গলার শব্দ প্রচণ্ড বিরাগ মিশিয়ে স্যার কনভলভালামের কানে পেঁছাতে সে মুখ তুলে দেখলো, এক বিশালকায় ড্রাগন তার ওপর ঝুঁকে পড়ে এই কথাগুলো বলছে আর তার দুটো নাসাপথ হোতে রেল-ইঞ্জিনের মতোন আগুনের হল্কা বেরিয়ে আসছে। অবশ্য স্যার কনভলভালাম ঠিক এমনভাবে ভাবেনি। কেননা সে সময় রেল-ইঞ্জিন স্বপ্নের অগোচর ছিল। হ্যাঁ, স্যার কনভলভালাম আরো দেখেছিল, আর একজন শল্কাবৃত গুহার কিছুটা ভিতরে শুয়ে আছে। খুব সম্ভব সে নিদ্রিত।

প্রথম ড্রাগন বললো, আবার একজন এসেছে। ওদেরি একজন। একটু বিশ্রাম নেওয়ার জন্যে বসতে না বসতেই একজনের পর একজন

আসবে। এসেই চীৎকার করবে, বেরিয়ে আয়, এই যে তোকে পেয়েছি, অত্যাচারীকে ধ্বংস করো সেণ্ট জর্জ! এতো অভদ্র এই লোকগুলো যে এদের মুখ দিয়ে আর অন্য কোন কথা শোনা যাবে না। হাড়গুলো নরম—কোন রকম স্থায়ী স্মরণ স্তম্ভ কি অন্য কিছু তৈরি হবে না। ওই যে টিনের খোলা পড়ে আছে, ওটা থেকে মাংস বের করে দাও। তারপর কতক-গুলো মাছের পাতলা কাঁটা ছাড়া আর কিছু পাবে না।

স্যার কনভলভালামের মনে পড়লো আজ পর্যন্ত কতো যুবক ড্রাগনের সংগে যুদ্ধ করতে গেছে। কিন্তু তারা কেউ ফেরে নি। দীর্ঘদিন ধরে নিস্ফল প্রতীক্ষার পর প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের আত্মীয়স্বজনেরা ধর্মাধিকরণে এদের 'মৃত্যুঘোষণা-পত্র' অনুমোদন করিয়ে নিয়েছে এবং পৌরাগারের প্রাচীরে যে সম্মানিত মৃতের তালিকা বিলম্বিত করা আছে, সেই তালিকায় এদের নাম সংযোজিত হোয়েছে।

কিন্তু একটা কথা যেন তাকে গোলক-ধাঁধার মধ্যে ফেলে দিলো। আপন মনেই যেন সে বললো, কেউ আলাপ করে না!

ড্রাগন উত্তর দিলো, না, কেউ না। ওই যে বাঁধাগৎ আছে বেরিয়ে আয়। এই যে তোকে পেয়েছি, এছাড়া আর দ্বিতীয় কথা জানে না! রাগে গা জ্বলে যায়। গোটা কয়েক নিঃশ্বাস ফেলে স্রেফ তাদের পুড়িয়ে ছায়ের গাদা বানিয়ে দিই। ওই দেখো না, ওই রয়েছে—অবশ্য নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে অনেকখানি উড়ে গেছে।

বয়সের অনুপাতে স্যার কনভলভালামের বুদ্ধি ছিল অনেক বেশী প্রখর। ড্রাগনের কথা শুনে সে বললো, আহা, আমার কি সৌভাগ্য! আজ এখানে এসে আমি কি ভালোই না করেছি। জ্ঞানী ব্যক্তিদের সংগে আলাপ-আলোচনার থেকে এ পৃথিবীতে আমি আর কিছুই ভালোবাসি না। আমরা কি কথা দিয়ে আরম্ভ করবো? কাঠখোদায়ের ওপর বর্তমানে যে আলোচনা চলেছে সে সম্বন্ধে আপনার মত কি? বর্তমান বার্নাশিল্পের যে প্রভাব দেয়ালকাগজের নক্সার ওপর পড়ছে তা নিয়ে সত্যি আলাপ-আলোচনার প্রয়োজন আছে বলেই আমার মনে হয়। আচ্ছা, ওকথা থাক। আধ্যাত্মিক ব্যাপার নিয়ে আলোচনা সব থেকে চিত্তাকর্ষক হবে। আপনার বন্ধু, আমার মনে হয় উনি আপনার স্ত্রী আশা করি আমাদের আলোচনায় যোগ দেবেন। কথা শেষ করলো সে সেই গুহাচ্ছায় শায়িত নীরব ড্রাগনের দিকে আঙুল নির্দেশিত করে।

—মূর্খ! ড্রাগন পরম অবজ্ঞায় নাক ঝাড়লো। ফলে বুনসেন বার্নারের ঝলকের ঝলসিত হোয়ে উঠলো। এ কিন্তু অনেকদিন পূর্বেকার কথা। সে সময় ত্রিকালজ্ঞ কোনো দ্রষ্টাও বুনসেন সাহেবের নাম অথবা তার আবিষ্কৃত বার্নারের কোনো কল্পনা করতে পারেন নি। ড্রাগন নাকঝাড়া বন্ধ করে বললো, পূর্বেকার আগন্তুকদের মতোন তুমিও দেখছি একটি গোমূর্খ। কথাটা শেষ করে ড্রাগন আবার এক ঝলক আগুন ছড়িয়ে দিয়ে হেসে উঠলো, তোমার কথা হয়তো ঠিক। হোতে পারে ওই আমার বন্ধু, অথবা স্ত্রী! বলি স্কুলে কি পড়ো নি যে ড্রাগনেরা সরীসৃপ-জাতীয়!

নাইট বললো, শঙ্কাবৃত সরীসৃপ সম্বন্ধে কি যেন পড়ানো হোয়েছিল—

—ওই তো তোমাদের মানে শ্বেতচর্মাবৃত ইংরেজদের গোঁড়ামি! —ড্রাগন বাধা দিয়েছিল। অনেকদিন আগেকার ঘটনা হোলেও শ্বেতচর্মের অভিযান তখন নিশ্চয় ছিল। ড্রাগন বলতে লাগলো, সরীসৃপ ওই হোল আমাদের পরিচয়। সেই জন্যে তো আমরা আগ্নেয় নিঃশ্বাস ফেলি। রক্ত আমাদের হিমশীতল, কোনো তাপ আমাদের একেবারে ছুঁতে পারে না। সাপের মতোন ওই একই কারণে বছরে একবার করে আমরা খোলস ফেলে দিই। প্রতি বৎসর কারবোরুনডামের পনের তারিখে ঘড়ির কাঁটা যেমন সেকেণ্ডের পর সেকেণ্ড সময় মেপে চলে ঠিক অমন ধারায় গা থেকে আপনি খোলস খসে পড়ে। ওখানে যে রয়েছে ও আমার বন্ধুও নয়, আমার স্ত্রীও নয়—গত সপ্তাহে যে খোলস ছেড়েছি ওই হোল সেই স্খলিত নির্মোক।

—আহা কি চিত্তাকর্ষক কথাই না শুনছি, স্যার কনভলভালাম বললো, কতো কথা জানতে পারছি, কতো জ্ঞানের আলোকে আমি দীপ্ত-কীর্তি হোয়ে গেলুম। আপনি আরো কিছু বলুন।

—বেশ, শোনো তা হোলে। ড্রাগনের মেজাজ এতোক্ষণে বেশ ঠাণ্ডা হোয়ে এসেছে, তুমি পূর্বতন আগন্তুকদের চাইতে লোক ভালো। কথাবার্তা কইতে জানো, ভদ্রতা কিছুটা শিখেছো। তা না হোলে ওই অপোগণ্ড ছোকরার দল খট্‌খট্‌ ক'রে আসবে আর গলা হেঁড়ে ক'রে চীৎকার করবে, এই যে তোমাকে পেয়েছি, কিম্বা চলর্টন আর হার্ডির নাম মেনট্‌ সুইথিনস্‌ জয়যুক্ত করুন! যাক্‌, ওসব কথা। তোমার ধরণ-ধারণ দেখে মনে হোচ্ছে তোমার কাছে আমার চিন্তাধারা ও মতবাদ সম্বন্ধে কিছু বলতে পারবো। আমার উপস্থিত সিদ্ধান্ত হোচ্ছে এই যে, আমরা ড্রাগনের ইসরাইলের লুপ্ত জাতির কোনো শাখা অথবা এ্যাণ্টিরিহিনামের যে বিশাল পিরামিড আছে, তারি পঞ্চম স্তরের চতুর্ভুজ প্রস্তর খণ্ডের............দেখো অপর যতোগুলো এই তুষার শীতল রক্ত পর্যন্ত আগুনের মতোন জ্বালা করে। প্যাঁ প্যাঁ, প্যাঁ প্যাঁ ভালো লাগে না।

স্যার কনভলভালাম তখন বেশ উৎসাহিত হোয়ে উঠেছে। বেশ আন্তরিকতার সংগে সে বললো, আপনার থেকে যা শুনছি তা থেকে আমাকে দয়া ক'রে বঞ্চিত করবেন না। আমিও বারবার ভেবেছি যে, ড্রাগনেরা ইসরাইলের লুপ্ত শাখাসমূহের অন্যতম। আর ওই যে অন্যান্য ছোকরাদের সম্বন্ধে যা বললেন, আমার মনে হয়, আমি আপনাকে ওদের হাত থেকে আড়াল করতে পারি, হ্যাঁ, চিরদিনকার মতোন ওই জ্বালাতন বন্ধ ক'রে দিতে পারি।

জমিয়ে আড্ডা দেবার জন্যে বেশ গুছিয়ে বসতে বসতে ড্রাগন বললো, আমারও মনে হোচ্ছে, তুমি পারবে। আর এই জন্যে তোমার সংগে কথা বলে' আরাম পাওয়া যাবে বলে মনে হয়।

তারপর যে আলাপ শুরু হোলো তার জের চললো তিন ঘণ্টা প'য়তাল্লিশ মিনিট ধরে।

দু দিন পরে পনড পার্কের রাস্তা ভেঙে কনভলভালাম রাজকীয় নগরী চেশহ্যামে বিজয়ীর বেশে পদার্পণ করলো ঃ তার পশ্চাতে তিন অশ্ববাহিত প্রকাণ্ড এক গাড়ীর ওপর যে শুভ্র শল্কাবৃত অর্ধ স্বচ্ছ জিনিসটি বিরাজ করছিল তা যে ড্রাগনের চর্ম এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো কারণ কেউ পাবে না। স্যার কনভলভালাম জানালোঃ আটচল্লিশ ঘণ্টা ধরে লড়াই হোয়েছে। তার রক্তে ড্রাগন রক্তবর্ণ হোয়ে উঠেছিল আর ড্রাগনের সবুজ রক্তে সে প্রায় ডুবে গিয়েছিল। কিন্তু শেষাবধি যাদু-মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে তার প্রতিটি বিষদন্ত কনভলভালাম উৎপাটিত করেছে।

লোকে জিগ্যেস করলো, যাদুমন্ত্র কি?

স্যার কনভলভালাম বললো, আচ্ছা, আচ্ছা সে এক সময় শুনতে পাবে।

রাজা অনির্বচনীয় ক্যালাসিওলারিয়া তাঁর শপথ রাখলেন। কনভলভালামকে তিনি চাল-ফণ্ট সংগমের আর্ল করে দিলেন। মিডলসেক্স থেকে যে সমস্ত পণ্যাদি আমদানী হোত তার ওপর একটা বিশেষ শুল্ক ধার্য করে আটচল্লিশ কুয়াড্রুনস্‌ স্বর্ণমুদ্রা তোলা হোল। সেই রক্তকেশা রাজকুমারী যার কণ্ঠের ওপর কৃষ্ণ তিল ছিল, কনভলভালাম তাকে উপহার পেলো। এ ছাড়া সাত দিনের কর্মবিরতি ঘোষণা ক'রে সরকারীভাবে নগরীর সমস্ত ঝর্ণায় সুরা ভরে দেওয়া হোয়েছিল এই অপূর্ব বিজয়ী বীরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যে।

পরবর্তী বৎসরে চার্য়ট্রিজের উপান্ত অনল বর্ষণকারী কঠিন শল্কাবৃত ড্রাগনের প্রতাপে জর্জরিত হোয়ে উঠলো। একটা সুবিধা ছিল এই যে, ড্রাগনেরা লোকালয়ে এসে হত্যাকাণ্ড সচরাচর করতো না। যা হোক চার্য়ট্রিজে ——— ——— ——— (সকলেই কনভল

গলামের সৌভাগ্য দেখে ঈর্ষায় জ্বলেপুড়ে রেছিল ব'লে) একবাক্যে বললো, যেহেতু সে হলে একমাত্র লোক যে যাদুমন্ত্র জানে, সে-ই ই জানোয়ারের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাক। নমতের এই দাবীর অন্তরালে যে অভিসন্ধি ছল, তা কোনো কাজে লাগলো না। কেন না মস্ত রাজ্যের মধ্যে কনভলভালামই একমাত্র লাক, যে জানতো ড্রাগনেরা জাতে সরীসৃপ। তরাং সে যখন বেশ খুশী মনে যুদ্ধ যাত্রা রলো, তখন সকলেই আশ্চর্য হ'য়ে গেল। রপর কারবোরুনডামের পনের তারিখ পেরিয়ে লে একদিন সকালে সকলে দেখতে পেলো টি অশ্ববাহিত শকটের ওপর ড্রাগনের এক ষ্ক চর্ম নিয়ে সে ফিরে আসছে। নগরীর মস্ত তোরণ তাকে বিজয়াভিনন্দন জানিয়ে লে গেল, আর ঝর্ণাগুলিতে জলের পরিবর্তে ইতে লাগলো শেরীমদের স্রোত।

দেয়ালপঞ্জীতে সময় যেমন নির্ধারিত করা াছে, দু বছর ধরে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি য়েছিল। রাজ্যের মধ্যে 'ড্রাগননিধন প্তাহের' উৎসব প্রধান এবং জনগণে প্রচারিত সব হোয়ে উঠলো। এই উৎসবের ঢেউ জ্যের বাইরেও চ'লে গেল। বিশেষ ক'রে রা গোটা ষাঁড় সিদ্ধ আর ঝর্ণা থেকে বিশ্রান্ত মদ খেতে ভালবাসতো, তাদের তো থাই রইলো না। এই সপ্তাহভোর কোনো িধিনিষেধ থাকতো না। ফলে যে সমস্ত দেশে গনের উৎপাত ছিল না, সেখান থেকেও দলে লে উৎসবকামীরা এই অতিথিবৎসল নগরীতে পস্থিত হোত। কয়েক বৎসর পর দেখা ল রীতিমত যাত্রীর দল ঝাঁক বেঁধে এই গরীতে আসছে এবং সমস্ত নগরীতে কিম্বা পকণ্ঠে এমন কোনো অট্টালিকা নেই, যেখানে ন এবং প্রাতরাশের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় ।

এপাশে চ্যালফন্টের আর্ল কনভলভালামের স বাড়ছিল। তাছাড়া রাজকুমারীদের ম্বন্ধে তার আর কোনো উদ্দীপনা ছিল না। কন না, প্রতি বৎসর একটি ক'রে নতুন রাজ- মারী লাভের পর তার সমস্ত মোহের অবসান টেছিল। ধীরে ধীরে মানুষের সত্যিকারের ঙ্গল সাধনের একটা অভীপ্সা তাকে ভাবান্বিত করছিল। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে র একটা বৃহৎ পরিবর্তন তার মধ্যে এসে- ছল। প্রতি বৎসর ঘণ্টার পর ঘণ্টা ড্রাগনের ত্ব অথবা জ্যোতিষীবিদ্যা, নগ্নতা কিম্বা ংখ্যাতত্ত্বের ওপর গবেষণা শুনতে তার আর ৈর্যসাধ্য হ'য়ে উঠতো না। তাই বহু চিন্তার র অবশেষে সে বিশ্ববিখ্যাত হোরস্ ম্প্রদায়ের সূচনা করলো। এই সম্প্রদায়ের মার্থ হোল "স্বার্থত্যাগী এবং একমাত্র শ্বাসযোগ্য শল্কাবৃত সরীসৃপ নিধনকারী াহিনী।"

হোরস্ সম্প্রদায়ের আদিপুরুষ হিসাবে কনভলভালাম রইলো পুরোভাগে। সে অতীব সাবধানতা সহকারে এই সম্প্রদায়ের সদস্য নির্বাচন করতো এবং শল্কাবৃত সরীসৃপ নিধনের রহস্যমন্ত্র দান ক'রে তাদের করতো দীক্ষিত। এই সম্প্রদায়ের পুরুষেরা দুটো পাষাণ প্রাসাদ স্থাপন করলো। একটা হোল ডানস্টেবেলে আর অপরটি হোল নর্থ চার্চ কমনে। তাদের ড্রাগন নিধন চিহ্ন যা পরে রাজকীয় মুদ্রায় খোদিত হোত, তা তাদের ঢালের ওপর অঙ্কিত থাকতো এবং ড্রাগন নিধন সপ্তাহের বাৎসরিক উৎসবে নগরীতে এবং উপকণ্ঠে উৎসবের প্রতীক চিহ্ন হিসাবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হোত। এই সম্প্রদায়ের সদস্যরা ড্রাগনের শুষ্ক চর্ম নিয়ে এতো নিয়মিতভাবে প্রত্যাবর্তন করতো আর তাদের প্রচারকারী অনুচরেরা এমন সুচারুরূপে এই সমস্ত যুদ্ধের ভয়াবহ কাহিনী জনসমাজে বর্ণনা করতো যে, লোকে নিঃশ্বাস রোধ ক'রে শুনতো। কিছুকাল এইভাবে যাওয়ার পর দেখা গেল, এই ড্রাগন নিধনকারী যোদ্ধারা রাজ্যের মধ্যে এক বিশেষ আভিজাত্যপূর্ণ সামরিক বীর বাহিনী সংগঠিত করেছে। এদের এই আভিজাত্যের গরিমা এতো উজ্জ্বল হোয়ে ছড়িয়ে পড়লো যে, যখন তারা অক্সফোর্ডসায়ারের যুদ্ধে হেরে পালিয়ে গেল, তখনও তাদের এই ঔজ্জ্বল্য বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হোল না।

প্রায় ত্রিশ বছর ধরে এই ড্রাগন নিধন সপ্তাহের' উৎসব সমগ্র চেশহ্যাম নগরীকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখলো বললে অত্যুক্তি করা হবে না।

একত্রিশ বৎসরের প্রারম্ভে একটা সম্পূর্ণ অন্য ঘটনা এই বিশেষ বছরের সৃষ্ট পরিবেশ নষ্ট ক'রে দিলো। হুইটেলপোল পর্বতে বাস করতো বোগওর্ট। বয়স তার যৌবনের মধ্য-গগনে, স্বাস্থ্যের প্রদীপ্তি সুগঠিত সারা দেহে ঝলক দিচ্ছে। কথাবার্তা অসংযত এবং রূঢ় কাজ হোল তার মেষপালন করা। একদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে মেষ চ'রিয়ে নিয়ে বাড়ী ফিরে সে দেখলো শল্কাবৃত কোনো সরীসৃপের অগ্নিবর্ষী নিঃশ্বাসে স্ত্রী, তিনটি ছেলেমেয়ে আর একান্ত প্রয়োজনীয় আদরের কুকুর হানিবল পুড়ে ছাই হোয়ে গেছে। হানিবল যে জাতের কুকুর, সে জাত প্রায় লোপ পেয়ে এসেছে তখন। তাই বোগওর্ট প্রাণের চেয়ে বেশী ভালোবাসতো কুকুরকে। সেই সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে একটা মশাল জ্বালিয়ে সে ড্রাগনের লাঙ্গুলাপিষ্ট দলিত মাটির চিহ্ন অনুসরণ করে বরাবর এগিয়ে চললো। অনুসরণ শেষ হোল আইভিনহো বেকনের গুহায় এসে। ড্রাগন সেই গুহাতেই ছিল। কিন্তু থাকলে কি হবে, বোগওর্টের প্রতি সে দৃকপাত করলো না। ভাবলো হোরস্ সম্প্রদায়ের কোনো সদস্য এসেছে। এই অমনোযোগিতার সুযোগ নিয়ে বোগওর্ট তার কাঠকাটা কুড়ুল দিয়ে ড্রাগনের ঠিক কণ্ঠদেশে আঘাত হানলো। পর পর মাত্র তিনটি আঘাতে ড্রাগনের চৈতন্য সজাগ হোয়ে ওঠার পূর্বে সে ড্রাগনের মুণ্ড দেহ হোতে বিচ্ছিন্ন করে ফেললো।

সে দিনটা ছিল আমোনিয়ার একাদশ তিথি। প্রচলিত কারবোরুনডাম 'ড্রাগন নিধন সপ্তাহের' উৎসব আরম্ভ হোতে তখনও পূর্ণ ত্রিশ দিন বাকী আছে। কারবোরুনডামের পনের তারিখে হোরস্ সম্প্রদায়ের সদস্যরা যে স্থলে অশ্বপৃষ্ঠে নগরীতে প্রবেশ করতো আর তাদের পশ্চাতে তিন অশ্ববাহিত শকটে থাকতো তাদের বিজয়চিহ্ন, সে স্থলে বোগওর্ট এলো পদব্রজে আর নিজেরই পৃষ্ঠদেশে চর্মবন্ধনীতে ঝুলিয়ে নিয়ে এলো ড্রাগনের ছিন্নমুণ্ড। রাজা ক্যাল-সিওলারিয়া তখন মৃত। নতুন রাজা হোয়েছে উদ্দীপ্ত মেকোনোপসিস। সে নিজে হোরস্ সম্প্রদায়ের কোনো সদস্য ছিল না। সেই কারণে বোধ হয় সে বোগওর্টকে বোভিংডন উক ইয়ার্ডের আর্ল ক'রে আটচল্লিশ কুয়াড্রুনস স্বর্ণমুদ্রা এবং এক রাজকুমারী দান করলো এবং আদেশ জারী করলো যে ড্রাগন নিধন সপ্তাহের উৎসব এখনি স্থগিত হোক।

নির্ধারিত সময়ের পূর্বে উৎসবের সূচনা হোল বলে নগররক্ষীরা জয়ভেরী বাজাতে কোন-রূপ আলস্য দেখালো না। আর ঝর্ণার জল অপসারিত করে মদের প্রস্রবণ এতো প্রচণ্ড-বেগে উথলে উঠলো যে, নগররক্ষীদের চাইতে অধিক মাত্রায় অভিভূত হয়ে পড়লো বোগওর্ট স্বয়ং। গ্রাম্য ছেলে সে। এই সমস্ত বিলাস-ব্যসনের সঙ্গে চিরদিন সে অপরিচিত। সুতরাং সহজেই অনুমান করতে পারা যায় যে, কি পরিমাণে সে সুরাপান করেছিল এবং এক-পক্ষকাল সে সুরা-প্রভাবে অচেতন হোয়ে পড়ে রইলো। এছাড়া আরো অনেক অসংযত আচরণ সে করেছিল, যেজন্যে নাগরিকদের মনে হয়েছিল পূর্ববর্তী বৎসরের থেকে বর্তমান বৎসরের উৎসবের ঔজ্জ্বল্য বহুল পরিমাণে ম্লানকীর্তি হয়ে গেছে।

প্রাসাদে প্রাসাদে জনশ্রুতি ছড়ালো যে, হোরস সম্প্রদায় বোগওর্টকে সদস্য-পদ দিতে অস্বীকৃত হোয়েছে। একদিন দেখা গেল, প্রাসাদে প্রাসাদে নয়, জনশ্রুতির পরিবর্তে সুস্পষ্ট ঘোষণা করে হোরসরা জানাচ্ছে যে, ড্রাগন-নিধনের সময় তারা যে সময়োপযোগী যাদুমন্ত্র ব্যবহার করতো তা উল্লংঘন করে নিদ্রিত অবস্থায় ড্রাগনকে নিহত করার জন্যে তারা বোগওর্টকে দলভুক্ত করতে অনিচ্ছুক। হোরসদের ঘোষণা জনসাধারণের মধ্যে আগুনের মতোন ছড়িয়ে পড়লো। সকলে একবাক্যে বললো, এ আর কিছু নয় একজন গ্রামিকের সন্তানকে তার ন্যায্য প্রাপ্য, স্বহস্তে এবং স্ববীর্যে উপার্জিত বিজয়ীর সম্মান থেকে বঞ্চনার ষড়যন্ত্র করছে অভিজাত সম্প্রদায়। এ-অবিচার মর্মদাহ, অত্যাচার নির্মম, নিন্দারও অযোগ্য। বোগওর্টের স্বপক্ষে আন্দোলন প্রবল থেকে প্রবলতর হোয়ে উঠলো। চারপাশের পরিস্থিতি যখন এই, তখন একদিন রাজপ্রাসাদের একটা অত্যুচ্চ মিনার হোতে হোরস সম্প্রদায়ের আদিপুরুষ এবং প্রতিষ্ঠাতা আর্ল কনভলভালাম পথের উদ্বেলিত জনসমুদ্রকে সম্বোধন করে এক আবেগময়ী বক্তৃতা দিলেন। কনভলভালামের বয়স তখন অনেক হোয়েছে, মাথার সব চুল তুষারের মতোন সাদা হয়ে গেছে। ধীরে ধীরে কথার পর কথার জাল বুনে বিশ্বের প্রথম ড্রাগনজয়ী মহাবীর কনভলভালাম সেই সংখ্যাতীত জনতাকে হৃদয়ঙ্গম করালেন শিক্ষা এবং সংস্কৃতিহীন রক্তের সন্তান বোগওর্ট কি নিদারুণ ভুল করেছে।

কথা বলতে বলতে থরথর করে গলা কেঁপে উঠলো কনভলভালামের। সে বলে যেতে লাগলো, যাদুমন্ত্র ব্যবহৃত হয়নি। সেই কারণে এই দেশে আর কোন ড্রাগন থাকবে না। এই প্রসিদ্ধ নগরীর দীর্ঘকালের গৌরব এবং সমৃদ্ধি দিনাবসানে উজ্জ্বল রৌদ্রালোকের মতোন চিরকালের নিমিত্ত অবসিত হোয়ে গেল। তোমাদের যে সমস্ত প্রাসাদে এবং পর্ণকুটীরে শয়নের ও ভোজনের, বিলাসের এবং আনন্দদানের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া আছে, তা তোমরা নামিয়ে নাও। কারলোরুনডামের সপ্তদশ দিবসে বার্কশায়ার ও মিডলসেক্স থেকে, এমন কি সুদূর কেন্ট আর এথেন্স থেকে দলে দলে লোক তোমাদের এই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ নগরীতে উৎসবে যোগ দিতে আসবে না। যে সমস্ত ঝর্ণা থেকে সুরা উৎসারিত হোত, সেখানে সারা বৎসর শুধু জল ঝরে ঝরে পড়বে। যারা আসল শল্কাবৃত ড্রাগনের চামড়া হোতে মহিলাদের ব্যবহারোপযোগী প্রসাধনাধার প্রস্তুত করতো, তারা জেনে রাখুক, আর চামড়া পাওয়া যাবে না। তাদের জীবিকানির্বাহের পথ চিরকালের মতোন রোধ হোয়ে গেল। ধ্বংস, বেকারত্ব, এমন কি, জ্বালানির পরিমাণ হ্রাসের সম্মুখীন ওপর এই অনভিপ্রেত দুঃসহ দুর্ভাগ্যের বোঝা নিক্ষেপ করেছে, এখনও কি তার নাম তোমাদের বলতে হবে?

রাজকীয় কারাগারের অন্তরালে আবদ্ধ করে বোগওর্টকে হিংস্র জনতার হাত থেকে বাঁচানো হোল। এই ঘটনার পর প্রায় বাহান্ন বৎসর বেঁচেছিল বোগওর্ট। সেই বিশাল তোরণ-বিশিষ্ট দীর্ঘ দালানে সে এই বাহান্ন বৎসর ধরে নানা রকম সব্জীর চাষ করতো। এইভাবে সে আচ্ছাদিত স্থানে দুষ্প্রাপ্য এবং ঋতুবহির্গত চাষের প্রথম ভিত্তি স্থাপন করে। বহুকাল পরে তার উত্তরাধিকারীরা যখন জগতে বৈশ্যভাবের আবির্ভাবে সর্বোচ্চ সম্মানের আসন অধিকার করে, তখন অনুসন্ধান করে দেখা যায় যে, সমস্ত সৌভাগ্যের মূলে রয়েছে এই আচ্ছাদনের মধ্যে সব্জী চাষের সূচনা।

তবে হ্যাঁ, চেশহ্যাম সম্বন্ধে বৃদ্ধ কনভলভালাম ঠিক কথা বলেছিল। সেই সময় থেকে চেশহ্যামের পতন শুরু হয়। এ সমস্ত অনেক বহু, বহুকাল মানে অকল্পিতকালের কাহিনী বলতে পারো।

অনুবাদকঃ **সমীর ঘোষ**


সরলা ক্লান্ত ও নিরুদ্যম হ'ল। রাতের খাবার তৈরী করাও অসম্ভব হয়ে পড়ল। স্বামী অফিস থেকে ফিরে এসে অসন্তুষ্ট হলেন। সেদিন এক বন্ধুকে তার এই ক্লান্তির কথা বলতে প্রত্যহ প্রাতরাশের পূর্বে ক্রুসেন খাবার উপদেশ পেল। তিন সপ্তাহের মধ্যেই সরলা নূতন জীবন পেল। মৌনতা ও অবসন্নতা চলে গিয়ে প্রফুল্লতা ও সজীবতা ফিরে এল; পারিবারিক সমস্ত কাজ সহজ হয়ে গেল। নৈশভোজের সময়টি সমস্ত দিনের মধ্যে সবচেয়ে আনন্দপূর্ণ মুহূর্ত হ'ল।

ক্রুসেনের ধীর ও নিশ্চিত কার্য প্রণালী শুধু সৎকার্য সাধনাই করে না — রক্তকেও পুষ্ট করে এবং রক্তপ্রবাহের সাথে সমস্ত শরীরে প্রবেশ করে আপনাকে সতেজ করে। প্রায় সকলেই ইহা জানেন যে, ক্রুসেন বিরক্তিকর সত্তা ও জীবনের উগ্রতার মধ্যে স্বাস্থ্য ও সম্পদ দিয়ে জীবনী শক্তির প্রাচুর্য আনে।

KRUSCHEN SALTS

আপনিও ঐ 'ক্রুসেন্' ব্যবহারে আনন্দ পাইতে পারেন

# নাগতলা প্যাসেঞ্জার

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

ভোরের ট্রেনটা সব স্টেশনে থামে না। নাগতলা, ঝাপরডাঙ্গা, বলুই, মানচক, সালিশপুর, তারপরেই একেবারে বড় স্টেশন। এ ট্রেনটায় বেশির ভাগই শাকসব্জী, তরি-তরকারির ভীড়। লোকের সংখ্যা খুবই কম।

পরের ট্রেন নাগতলা প্যাসেঞ্জার। সমস্ত স্টেশন ছুঁয়ে ছুঁয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে চলে। আঠারো মাইল রাস্তা যেতে দু ঘণ্টার ওপর সময় নেয়। নাগতলার বরদা খুড়ো বলেন, নাগতলা প্যাসেঞ্জার তো নয়, কেরানী স্পেশাল। নাগতলা থেকে শুরু করে বাদশাপুর পর্যন্ত কেরানী গিলতে গিলতে আসে আর শেয়ালদায় এসে সব উগরে দেয়। বাবাঃ, কেরাণী হজম করা কি সহজ কথা।' কথার সঙ্গে সঙ্গে বাঁধানো দাঁতগুলো বের করে সশব্দে হাসেন। তারপর রুমাল দিয়ে চশমার কাঁচ দুটো মুছে নিয়ে ঝাপরডাঙ্গার দয়ালবাবুর দিকে চেয়ে বলেন, 'নাও ভায়া, দেরি করে লাভ কি। ছকটা পাতো।' একেবারে কোণের বেঞ্চিতে দুজনে মুখোমুখি বসেন। সামনে দাবার ছক।

বলুই থেকে দুই ভাই ওঠেন। বরদা খুড়ো বলেন, 'কানাই বলাই।' লম্বা ছিপছিপে চেহারা। দুজনেই এক অফিসে কাজ করেন। বড়ো ভাই নাস্য আর ছোট ভাই দোক্তা। একজনের নাকের তলা আর একজনের দাঁতের পাটি অমাবস্যার কালোকেও লজ্জা দেয়। বড়ো ভাই পা-দানিতে পা দিয়েই শুরু করেন, আজকের খবর শুনেছেন? উঃ, কী ভীষণ কাণ্ডই হচ্ছে?'

বরদা খুড়ো ছক থেকে মুখ না তুলেই বলেন, 'ভেতরে এসে ব্যাপারটা বলো কানাই। নয়ত পা ফস্কালে কালকের কাগজে তোমাকে নিয়েই ভীষণ খবর শুরু হবে।'

কানাইবাবু, ওঁর আসল নাম কেউ জানে না, ভিতরে এসে বসেন। কৌটো থেকে দু-আঙুলের সাহায্যে প্রচুর নাস্য নিয়ে নাকের গর্তে দিতে দিতে কথার খেই ধরেন, 'চীনে তো বিশ্রী ব্যাপার শুরু হলো। এদের একেবারে দাঁড়াতেই দিচ্ছে না। পিছু হঠিয়ে প্রায় চাইনিজ ওয়াল পর্যন্ত ঠেলে নিয়ে এসেছে।'

বলাইবাবু এদিকের বেঞ্চে বসে মুখের পানটা জিভ দিয়ে বাঁ কসে এনে বলেন, পেছনে ভাল্লুকের থাবা রয়েছে যে। খুঁটির জোরে মেড়া লড়ছে। নয়ত এ্যাংলো-আমেরিকান ক্যাপিটাল তো কম ঢালা হয়নি চীনদেশে—এরকম হবেই বা কেন?' বলাইবাবু কথা শেষ হবার আগেই জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে পিচ করে পানের রস ফেলেন। আশেপাশের যাত্রীরা এই সময় একটু সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন। হাওয়ার বেগে ছিটকে এসে গায়ে পড়লেই হলো।

অবশ্য কানাইবাবুর আর বলাইবাবুর এসব কথা আলোচনা করার হক আছে। নগদ চার পয়সা দিয়ে রোজ তাঁরা একখানা করে বাঙলা কাগজ কেনেন এবং কাগজের চার পৃষ্ঠা অন্তত দু ভায়ে মিলে ষোলোবার পড়ে কণ্ঠস্থ করে ফেলেন। কাজেই সাইবেরিয়া থেকে শুরু করে প্যারাগোয়ের চমকপ্রদ সমস্ত খবরই গড়গড় করে বলে যান নিজেদের টিকা-টিপ্পনী সহকারে। কানাইবাবুই বলেন, বলাইবাবু শুধু বরদা খুড়োর ভাষায় 'পো' ধরেন।

তারপর চকমারি থেকে ওঠেন নরহরিবাবু। কি শীত, কি গ্রীষ্ম, গলায় কম্ফাটার জড়ানো, কোটের প্রত্যেকটি বোতাম আঁটা। হাতে জরাজীর্ণ ছাতা। মুখের ভাবটা যেন 'আর কটা দিনই বা আছি।' উঠেই পকেট থেকে ঝাড়ন বের করে বেঞ্চটি মোছেন, তারপর সন্তর্পণে শরীরটি ঠেকিয়ে কোন রকমে বসেন। বলেন, 'দশজনের সঙ্গে যাওয়া মানেই দশজনের রোগ কুড়িয়ে নেওয়া। কার কি রোগ আছে বলা যায়। ওপর ওপর সবাই তো ফিটফাট নব কার্তিকটি
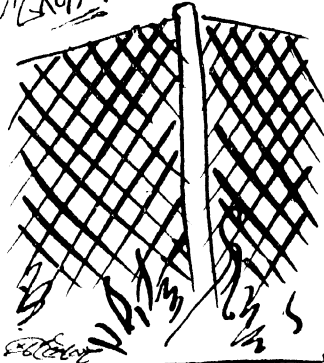
সেজে আছেন।' ইনি পারতপক্ষে কানাই-বলাই কোন ভাইয়ের পাশে বসেন না। অনেক আগে বলাইবাবুর কথার তোড়ে সুপুরির একটা টুকরো বুঝি নরহরিবাবুর থুতনিতে এসে লেগেছিল—সে এক মহামারি ব্যাপার। হৈচৈ চীৎকারে গাড়ি সরগরম। তারপর শেয়ালদা স্টেশনে নেমে কলের জলে মুখ রগড়ে রগড়ে নরহরিবাবু মুখের প্রায় ছাল তুলে ফেলেছিলেন। কার ভেতরে কি রোগ আছে বলা যায়। এমনি তো নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসেই হাজার হাজার বীজাণু কিলবিল করছে, মানুষের রেহাই নেই, তার ওপর এই রকম প্রত্যক্ষ যোগাযোগ। তারপর থেকে নরহরিবাবু দু ভাইকে অন্তত হাত তিন-চার ব্যবধান রেখে চলেন।

পরের স্টেশন সালিশপুর। ডিস্ট্যান্ট সিগন্যাল পার হলেই এ-কামরার যাত্রীরা উৎসুক হয়ে ওঠেন। যাঁরা প্ল্যাটফর্মের উল্টো দিকে বসেছেন, তাঁরাও মাথা নীচু করে এদিকে চেয়ে থাকেন। বরদা খুড়োর মত লোকও দাবার চাল থামিয়ে মুখ তুলে বলেন, 'একটু রাখো দয়াল। সালিশপুর এসে গেছে। লায়লা-মজনুর সিনটা দেখে নিই।'

এক-আধ দিন নয়, রোজকার ব্যাপার। রেল কোম্পানীর তারের বেড়া ঘেঁষেই একতলা লাল রংয়ের কোঠা। সামনে লাউ মাচা। মাচার ওপরে কালো হাঁড়ি উপুড় করা। বোধ হয়, পাখ-পাখালি তাড়াবার ব্যবস্থা। কঞ্চির গেট। গেটের ওপর অপরাজিতার ঝাড় লতিয়ে উঠেছে। সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে বেগুনী রংয়ের ফুলগুলো এতদূর থেকেও চোখে পড়ে।

সবুজ রংয়ের দরজা একটু ফাঁক করা। চুড়ি-পরা সুগৌর নিটোল একটি হাত, দরজার ফাঁকে টানা কাজল চোখ আর টিকোলো নাকের নীচে লাল টুকটুকে একজোড়া ঠোঁট। পটে-আঁকা দেবদেবীর ছবির মত। যতক্ষণ না ট্রেনটি স্টেশনের আওতা পার হয়ে যায়, ততক্ষণ মেয়েটি ঠিক একভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। বাতাসে হয়ত লালপেড়ে শাড়ির কোণটুকু একটু দুলে ওঠে, কিম্বা কপালের দুপাশের চুলের কুঁচিগুলো কেঁপে ওঠে, কিন্তু মেয়েটির চোখের দৃষ্টি নিষ্পলক। সারা ট্রেনের অর্ধেকের বেশি লোক যে চেয়ে থাকে, সেদিকে মেয়েটির যেন কোন খেয়ালই নেই।

ভদ্রলোকের চেহারাও বেশ ছিমছাম। কোঁকড়ানো এক মাথা চুল। ফিটফাট ধোপ-দোরস্ত জামা-কাপড়। ময়লার একটি আঁচড়ও নেই। মুখে হাসিটি সব সময় লেগে আছে।

কামরায় ঢুকতে বরদা খুড়ো প্রথমে কথা বলেন, 'এসো ভায়া, নাগতলা প্যাসেঞ্জার মাঝে মাঝে লেট হয়, কিন্তু আমার বৌমা ঠিক

অজিতবাবু, ভদ্রলোকটির নাম অজিত, কোন কথা বলেন না, কেবল মুচকি মুচকি হাসেন।

এরপর দয়ালবাবুর আক্ষেপ শোনা যায়, 'সবই বরাত দাদা। স্ত্রী-ভাগ্য কি সোজা কথা। আর আমি যখন বেরোই, দরজায় দাঁড়ানো চুলোয় যাক, পল্টুর মাকে সে তল্লাটেই দেখা যায় না। হয় কুয়োর পাড়ে কাপড় আছড়াচ্ছেন, নয় ছেলে ঠেংগাচ্ছেন। হাতের কাছে পাবার যো নেই।'

বলাইবাবু ডিবে থেকে পানের খিলি মুখে দিতে দিতে বলেন, 'খুড়ীমা বুদ্ধিমতী, এসে দাঁড়ান না, ভালোই করেন। পাকাচুল, তোবড়ানো গাল আর ফোকলা দাঁতে এরকম পোজ কি আর ফুটবে। ওঁরও কষ্ট, আপনারও মেজাজ খারাপ।'

দয়ালবাবু কৃত্রিম ক্রোধে চেঁচিয়ে ওঠেন, 'খবরদার বেল্লিক, সত্যের অপলাপ করবে না। তোমার খুড়ীর একটি দাঁতও এখনও পড়েনি, আর গায়ের চামড়া কাবলী বেড়ালের মতন চকচক করছে, তবে হ্যাঁ চুলে একটু পাক হয়ত ধরেছে।'

হাসির হুল্লোড়ে দয়ালবাবুর শেষের কথাগুলো চাপা পড়ে যায়। এর পর শারীরিক কুশল প্রশ্ন চলে। অজিতবাবুই শুরু করেন, 'নরহরিবাবুর শরীর আজ কেমন?'

নরহরিবাবু জানলার পাল্লাটা ফেলে দিয়ে এক কোণে বসেছিলেন। আস্তে উত্তর দেন, 'আর বলো কেন? কাল রাত্তিরে মাথার কাছের জানলাটা কে খুলে রেখে দিয়েছিল, হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে গিয়েছে।'

'কিন্তু এই গরমে আট-ঘাট বন্ধ করে শোওয়াও তো দুষ্কর, কে একজন বলেন।'

নরহরিবাবু ভুরু দুটো কুঁচকে বক্তার দিকে আড়চোখে একবার চেয়ে নিয়ে বলেন, 'হাওয়া খাবার বয়স আমাদের পার হয়ে গেছে কিনা, এখন একটু ঠাণ্ডা লাগলেই কাশিটা বেড়েই ওঠে।'

'তা এক কাজ করুন না', অজিতবাবুর গলা, 'পেপ্সের বড়ি কিছু কিনে রাখতে পারেন। গালে ফেলে দিয়ে চুষলে বেশ উপকার পাওয়া যায়।'

'এই বয়সে লজেন্স চোষাই কি আর মানাবে' পিছন থেকে কানাইবাবু বলেন।

'মানুষের কোন উপকারে তো লাগো না, কেবল ডেঁপোমি' নরহরিবাবু দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে ওঠেন, তারপর অজিতবাবুর দিকে ফিরে গলার সুর নরম করে বলেন, 'রাত্তির ছটা সাড়ে ছটা অবধি অফিস করে, কোথায় দোকানে দোকানে ঘুরি বলো। তখন বাড়ি আসতে পারলে বাঁচি। বিশ বছরের চাকরির মধ্যে একটিবারও সাতটা পাঁচের গাড়ি ধরতে পারলুম না। রোজই সেই আটটা বত্রিশ। বাড়ি

'আচ্ছা, আমি তো তাড়াতাড়ি ফিরি, আসবার সময় আপনার জন্য একশিশি পেপ্স কিনে নিয়ে আসবো। কাল গাড়িতে আপনাকে দিয়ে দেবো। চোখের সামনে আপনি কষ্ট পাবেন, একি একটা কথা হলো।'

'বেঁচে থাকো ভাই। তোমার মত ছেলে হয় না আজকাল,' নরহরিবাবু খুসি-খুসি মুখের ভাব করে পকেট হাতড়াতে থাকেন, 'কত দাম বলো তো, দামটা তোমায় দিয়ে রাখি।'

'কি আশ্চর্য', অজিতবাবু হাত তুলে বাধা দেন, 'আমি কাল নিয়ে আসি, তারপর দাম দেবেন।'

নরহরিবাবু দু-একবার আপত্তির ভাণ করেন, কিন্তু পকেট আর হাতড়ান না। মুখে বলেন, 'ঠিক খেয়াল করে কিন্তু কাল দামটা নিয়ে নিও ভাই। আমার আবার যা ভুলো মন।'

বলাইবাবু আর মনসাবাবু গা টেপাটেপি করেন, অবশ্য নরহরিবাবুর অলক্ষ্যে।

হরিণডাঙ্গা থেকে ওঠেন জনকবাবু। সাড়ে তিন মণি লাশ। ইঞ্জিনের গায়ের চেয়ে আরও মিশ কালো রং। লাল গোল গোল চোখ। কোন সওদাগরী অফিসের বুঝি বড়বাবু। আজ বছর চারেক ধরে একটা মোটর কেনার ইচ্ছা, কিন্তু পছন্দসই জিনিস আর পাচ্ছেন না। রং পছন্দ হয় তো দরে বনছে না, দরে কুলোচ্ছে তো মনের মত রং মিলছে না। গুঁতোগুঁতি করে রেলে আর পোষাচ্ছে না। আর কতদিন যে ডেলি-প্যাসেঞ্জারি করার এ দুর্ভোগ আছে তাঁর কপালে, তাই ভাবেন আর নিঃশ্বাস ছাড়েন।

'আর বেশিদিন নেই' মনসাবাবু টিপ্পনী কাটেন, 'এ-রেটে দেহ বাড়তে থাকলে প্যাসেঞ্জার ট্রেনে আর চড়তে দেবে না, মালগাড়িতে বন্দোবস্ত করতে হবে।'

ট্রেনের শব্দে কিম্বা যাত্রীর গোলমালে মনসাবাবুর কথাগুলো জনকবাবুর কানে যায় না।

এবার জনকবাবু বরদা খুড়োর দিকে ফেরেন, 'দাবা-তাস-পাশা, তিন কর্মনাশা। এসব খেলে কিযে সুখ পান, বুঝি না। দশ মিনিট ঘাড় গুঁজে বসে, একটা চাল দেন, সমস্ত সিস্টেমটা নষ্ট হয়ে যায়। বাত, মাথার রোগ, চোখের অসুখ—সব কিছুর মূলে ওই তিনটে খেলা। অভ্যেসটি ছাড়ুন দিকি নি।'

বরদাবাবু ছক থেকে মুখ না তুলেই হাসেন। ছক থেকে মুখ তোলবার এখন তাঁর যো নেই। দয়ালবাবু চমৎকার একটা চালে তাঁকে একেবারে কোণঠাসা করে ধরেছেন। এদিক ওদিক কোনদিকে নড়বার উপায় নেই। ভারি পাকা মাথা দয়ালবাবুর, এরকম লোকের সঙ্গে

অগত্যা জনকবাব‌ু কানাইবাব‌ুর দিকে ফেরেন, 'তারপর Morning News. অদ্যকার সংবাদ কি বলো?'

উত্তরে কানাইবাব‌ু সশব্দে একটা হাঁচেন। নরহরিবাব‌ু কোণের দিকে বসেও ভুর‌ু কু'চকে বলেন, 'আশ্চর্য, একটা র‌ুমাল ব্যবহার করলেও তো পারেন। দেখছেন ঘে'ষাঘে'ষি—এতগ‌ুলো লোক বসে আছে?'

কানাইবাব‌ু নাকটা ম‌ুছতে ম‌ুছতে বলেন, 'নস্যির হাঁচি কিনা, চট করে এসে যায়, তাল ঠিক রাখতে পারি না।' তারপর জনকবাব‌ুর কথার উত্তরে বলেন, 'মালয়ের অবস্থা তো মোটেই ভাল নয়। ইন্দোচীনও তো যায়-যায়।'

জনকবাব‌ু একগাল হেসে বলেন, 'আরে না, না, অত দ‌ূরের খবর জানতে চাইনি। আমাদের কাছে-পিঠের সালিশপ‌ুরের খবর বলো।'

এবার গাড়িশ‌ুদ্ধ সবাই হেসে ওঠেন। চেহারা ওরকম হলে হবে কি, জনকবাব‌ুর মাংসস্ত‌ূপের আড়ালে রসালো হ‌ৃদয় একটা আছে। বয়সকালে রসিক প‌ুর‌ুষই ছিলেন হয়তো। একদিনেই তো আর তাঁর এমন ভারিক্কি জাঁদরেল চেহারা হয়ে ওঠে নি।

দয়ালবাব‌ু ছক থেকে ম‌ুখ তোলেন, 'আজ বৌমার পরণে সব‌ুজ শাড়ি, টিয়াপাখী কিম্বা কচি কলাপাতা রং, এ বয়সে অতটা আর ঠাওর করতে পারি নি। দাঁড়াবার সেই সনাতন ভঙ্গী। গাড়ি ডিস্ট্যান্ট সিগন্যাল পার না হওয়া পর্যন্ত সেই পলকহীন দ‌ৃষ্টি।'

দয়ালবাব‌ুর বলার ধরণে সবাই হেসে ওঠেন।

জনকবাব‌ু এক সময়ে হাসি থামিয়ে বলেন, 'বরাত আমার। এ-দ‌ৃশ্য আমার আর দেখা হয়ে উঠলো না। মাঝে মাঝে মনে হয়, যাই উজান ঠেলে সালিশপ‌ুর স্টেশন অবধি। রোজ রোজ শ‌ুনে শ‌ুনে একটা লোভ জন্মে গেছে।'

মনসাবাব‌ু র‍্যাশনের থলির আড়াল থেকে গম্ভীর গলায় বলেন, 'লোভে পাপ, পাপে ম‌ৃত্যু শাস্ত্রের বচন।'

অজিতবাব‌ু মাথা নীচু করে কোঁচার খ‌ু'ট পাকাতে থাকেন। লজ্জায় স‌ুগৌর ম‌ুখ টকটকে লাল হয়ে ওঠে। আস্তে আস্তে বলেন, 'না, আপনাদের জ্বালায় আর পারা যায় না। আজই বাড়িতে গিয়ে বলে দেবো, সবাই ঠাট্টা করে, এরকমভাবে দরজায় আর দাঁড়িয়ো না।'

বরদা খ‌ুড়ো হাঁ-হাঁ করে ওঠেন, 'খবরদার, ও-কাজটি করো না। বৌমার শ‌ুভ-দ‌ৃষ্টির জোরে নাগতলা প্যাসেঞ্জার ঠিক টাইমে পেশছোয়। একচুল দেরি করে না। বউমাকে চটিয়ে দিলে কি হবে কিছ‌ুই বলা যায় না। ফিসপ্লেট্‌-খোলা অবস্থায় হঠাৎ—

নরহরিবাব‌ু কাঠের দেয়ালে মাথা দিয়ে চোখ বন্ধ করেছিলেন, বরদা খ‌ুড়োর কথায় লাফিয়ে সোজা হয়ে বসেন। চীৎকার করে বলেন, 'আপনাদের কি আর এসব সর্বনেশে কথা ছাড়া আর কথা নেই? ওইটি হলেই ব‌ুঝি আপনাদের চৌদ্দ পোয়া প‌ূর্ণ হয়। মরছে মান‌ুষ নিজের জ্বালায়, আর যত সব উদ্ভুটে চিন্তা।'

উত্তরে বরদা খ‌ুড়ো হাসেন, 'মিথ্যে ঘাবড়াচ্ছেন নরহরিবাব‌ু, এসব হতে পারে বৌমা দোর গোড়ায় না দাঁড়ালে। কিন্তু বৌমাকে না দেখলে পয়েণ্টসম্যান সিগন্যালই ডাউন করবে না। ট্রেন সালিশপ‌ুরে ঢ‌ুকতেই পারবে না।'

দয়ালবাব‌ু দাবার ছক গ‌ুটিয়ে ফেলেন। কানাইবাব‌ু শেষবারের মতন নস্যি আর বলাই-বাব‌ু ডিবে খ‌ুলে পানের খিলি ম‌ুখে দিয়ে তৈরি হয়ে নেন। বাকি সকলে পা নামিয়ে যার যার জ‌ুতো পায়ে গলিয়ে নেন। আর মিনিট দ‌ুয়েক। শেয়ালদা এসে গেছে।

যাবার সময় অবশ্য এমন জমে না। যাদের আগে ছ‌ুটি হয়, তারা ছটা দশের গাড়িতে চলে যায়। দ‌ু-একজনের বাতিক আবার অফিসের পরে বাজার ঘ‌ুরে রাজ্যের জিনিস দর করে ট‌ুকিটাকি দ‌ু-একটা জিনিস কেনা। বাকি অনেকেই পরের ট্রেনে আসেন। যাবার সময় কিন্তু কেমন ছাড়ো-ছাড়ো ভাব। সকলেই পরিশ্রান্ত। দ‌ু-একটা মাম‌ুলি কথা-বার্তা, অফিসের বড়ো সাহেবদের স্বাপদকরণ কিম্বা আগ‌ুন-লাগা বাজারের কথা। দ‌ু-একজন আবার উঠেই বেঞ্চে পা ত‌ুলে চোখ বন্ধ করেন, চোখ খোলেন নিজেদের স্টেশন আসবার দ‌ু-এক মিনিট আগে।

সালিশপ‌ুর স্টেশনে জানলার ধারে হ্যারিকেনের ম‌ৃদ‌ু আলো দেখা যায়। অন্ধকারে আর কিছ‌ু দেখা যায় না। শ‌ুধ‌ু অন‌ুভব করতে হয় অন্তরালবর্তিনীকে, যার হাতের ছোঁয়ায় হ্যারিকেনে দীপ্তি সঞ্চারিত হয়।

এক অজিতবাব‌ু ছাড়া আর সকলেই জাত কেরানী। প‌ুর‌ুষান‌ুক্রমে অফিস করে যাচ্ছেন। অজিতবাব‌ু কাজ করেন চৌরঙ্গীর এক নামকরা ফটোগ্রাফারের দোকানে।

বরদা খ‌ুড়ো এই নিয়ে ঠাট্টাও করেন, 'ঘরে এমন আঁকবার জিনিস থাকতে, পরের দোকানে পরের ফটোয় কি রং ব‌ুলোও?'

অজিতবাব‌ু ম‌ুচকি হেসে বলেন, 'ঘরের ছবিতে বাইরের ত‌ুলির রং কি আর ফ‌ুটবে? ও-ছবির ত‌ুলিই আলাদা।'

দয়ালবাব‌ু বলেন, 'সত্যি ভায়া। বেশ নির্ঝঞ্ঝাটে আছো। ছেলেপ‌ুলের বালাই নেই। আপনি আর কোপনি। আর আমাদের অবস্থা ঘাটের ধারে যেমন চারা পোনা কিলবিল করে তেমনি বাচ্ছা-কাচ্ছা কিলবিল করছে ঘরে। পা ফেলবার জায়গা নেই।

জনকবাব‌ু র‌ুমাল দিয়ে গর্দানটা ম‌ুছতে ম‌ুছতে বলেন, 'একদিন আমাদের পাঁচজনকে নেমতন্ন-টেমতন্ন করো তোমার বাড়ি পাত পেড়ে আশীর্বাদ করে আসি, বৌমার কোল-জোড়া করে রাঙা ট‌ুকট‌ুকে একটি খোকা আস‌ুক।'

অজিতবাব‌ু বাধা দেন, 'দোহাই আপনাদের ওই আশীর্বাদটি করবেন না। ঘরের জিনিস-পত্তর ওলট-পালট করে বিশ্রী কান্ড করবে। এত কষ্টের সাজানো ঘরদোর তচনচ করে দেবে।

বরদা খ‌ুড়ো হাসেন, 'ওই রকমই মনে হয় ভায়া। কিন্তু তখন কেবল মনে হবে, একট‌ু অগোছাল হোক জিনিসপত্তর, মোটা মোটা নরম আঙ‌ুল দিয়ে এখানকার জিনিস টেনে-টেনে কেউ ওখানে নিয়ে যাক। কাদা মাখা হাতে ছ‌ুটে এসে পরনের ফর্সা কাপড়ে বেশ করে দাগ লাগিয়ে দিক।'

অজিতবাব‌ু কেমন বিমর্ষ হয়ে যান কথার উত্তর না দিয়ে জানলার বাইরে চেয়ে থাকেন। টেলিগ্রাফের লাইনে একদল কালো কালো পাখী বসে থাকে। বাদশাপ‌ুরের খালের ওপর দিয়ে ট্রেন চলেছে। লোহা-লক্কড়ের ভীষণ ঝনঝন শব্দ।

সেদিন অদ্ভুত যোগাযোগ হয়ে যায় অজিতবাব‌ু কামরায় উঁকি দিয়েই থতমত খেয়ে যান। এক বরদা খ‌ুড়ো আর নরহরি বাব‌ু ছাড়া প্রায় সকলেই উপস্থিত। ফেরব ম‌ুখে এমন ব্যাপার বড়ো একটা হয় না। দ‌ু-এ মিনিট অজিতবাব‌ু একট‌ু ভেবে নেন। সা। ট্রেনে একটিমাত্র ইণ্টার ক্লাশ। থার্ডক্লাশে যাওয়া চলবে না। তরকারির খালি ঝাঁকা আর দ‌ুধের বালতি নিয়ে সব ফিরছে। অসম্ভব ভীড়। তাছাড়া এত সব জিনিস নিয়ে আজকের দিনে আর ঠেলাঠেলি করতে ইচ্ছে হয় না। কামরার মধ্যে পা দিতেই হৈচৈ শ‌ুর‌ু হয়।

বলাইবাব‌ু প্রথমে চে'চিয়ে ওঠেন, 'কি ব্যাপার অজিতবাব‌ু, অত সব ফ‌ুলের গোছা নিয়ে কোথা থেকে? এ্যাঁ, একি আবার জরি-দেওয়া মালাও রয়েছে? বিষয়টা ভেঙে বল‌ুন তো?'

পাতলা কাগজে মোড়া রজনীগন্ধার গোছাটা অজিতবাব‌ু সাবধানে দাঁড় করিয়ে রাখেন। গোড়ের মালা আর শাড়ির বাক্সটা বাঙ্কের ওপর তোলেন, তারপর র‌ুমাল দিয়ে বসবার জায়গাটা ঝাড়তে ঝাড়তে বলেন, 'আজ আমাদের বিয়ের তারিখ কিনা, তাই সামান্য একট‌ু আয়োজন।'

অজিতবাব‌ুর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই দয়ালবাব‌ু প্রকান্ড হাঁ করে ফেলেন, 'এ্যাঁ, বিয়ের তারিখ মনে আছে তোমার? আমাদের যে ঘটা করে কোনদিন বিয়ে-থা হয়েছিলো তাই মনে পড়ে না। গিন্নিকে দেখি আর ভাবি, এ যেন কর্ণের সহজাত কবচ-কুণ্ডলের ব্যাপার।'

মনসাবাবু চিবিয়ে চিবিয়ে বলেন, 'বিয়ের তারিখ অবশ্য আমাদের মনে আছে, কিন্তু ঘটা করে সে তারিখ পালন করবার কথা আমাদের কখনো মনে পড়েনি। বরং প্রাণপণে তারিখটা ভোলবারই চেষ্টা করেছি।

অজিতবাবু আমতা আমতা করেন, 'মানে, আমি বারণ করেছিলাম অনেক, কি দরকার এসব করে। বরং নতুন শাড়ি একটা এনে দেবো এখন, কিন্তু এই সব মালা-ফালার হ্যাংগামা না করাই ভালো, কিন্তু বাড়িতে কিছুতেই বুঝতে চায় না। বলে বছরে একটা দিন বৈ তো নয়।'

কানাইবাবু নস্যির তাল নাকের গোড়ায় দিতে দিতে আড়চোখে চেয়ে বলেন, 'হ্যাঁ, দাদার, মালা কি একজোড়াই আছে?'

মনসাবাবু বাধা দেন, 'দাদার এক কথা, এক জোড়া থাকতে যাবে কোন কর্মে? বৌমা গলা থেকে খুলে এঁর গলায় দেবেন আর ইনি সেইটি খুলে দেবেন বৌমার গলায়, তবেই তো জমবে। নয়ত আলাদা আলাদা মালা গলায় দিয়ে ইনি দাওয়ায় খবরের কাগজ খুলে বসবেন, আর বৌমা ঢুকবেন হেঁসেলে— তা হলেই তো হয়েছে।'

সবাই হেসে ওঠেন।

গাড়ী ছাড়বার পর জনকবাবু উঁকি মেরে বাইরের দিকে একবার দেখে নিয়ে বলেন, 'সবই তো একরকম হলো কিন্তু আকাশের অবস্থা মোটেই সুবিধের নয়। যে রকম মেঘ করেছে ঈশান কোণে, আজ রাত্রে বেশ ঢালবে। ভালোয় ভালোয় বাড়ী পেঁছোতে পারলে হয়।'

সকলেই জানলা দিয়ে বাইরের দিকে একবার চেয়ে নেন। সত্যিই আকাশের অবস্থা ভালো নয়। ঘুটঘুট্টি অন্ধকার, মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝিলিক দিচ্ছে। জোলো হাওয়ার আমেজ। কাছে পিঠে কোথাও হয়ত বৃষ্টি শুরু হ'য়ে গেছে। কদিন ধরেই এমনি হচ্ছে। এখনও রেল লাইনের দুপাশে নাবাল জমিতে জল চিক চিক করছে। ব্যাঙের ডাকের বিরাম নেই।

দয়ালবাবু জানলার পাল্লা নামিয়ে দিতে দিতে বলেন, 'আজ কপালে ভোগান্তি আছে। যা ব্যাপার দেখছি, বিষ্টি নামলো ব'লে। কিন্তু এমন বেয়াক্কেলে বিষ্টি তো দেখিনি। কোথায় শিয়রের খোলা জানলা দিয়ে ঝিরঝির ক'রে দক্ষিণের হাওয়া আসবে, বিছানার ওপর চাঁদের আলো এসে পড়বে, তা নয়—এ এক বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপার', অজিতবাবুর দিকে আড়চোখে চেয়ে দয়ালবাবু কথাগুলো শেষ ক'রেন।

জনকবাবু, দয়ালবাবু থামার সংগে সংগেই আরম্ভ করেন, 'আকাশের তো কোন দোষ নেই। পাঁচজনকে বলতো, বিশেষ কোন আয়োজনের তো দরকার নেই শুধু বৌমার হাতের তৈরী ফুলকপির সিংগাড়া আর গরম চা, ব্যস, দেখতেন মেঘ ঝড় কোথায় উড়ে যেতো, বিষ্টির ছিটে ফোঁটাও দেখতে পেতেন না, কি বলুন মনসাবাবু?'

মনসাবাবু সবেগে ঘাড় নাড়েন, 'সে আবার বলতে। আজ কতদিন ধরে অজিতবাবু যে আশ্বাস দিয়ে রেখেছেন। তীর্থের কাকের মতন হাঁ ক'রেই তো রয়েছি।'

অজিতবাবু কাঁচুমাচু হ'য়ে ওঠেন। কাঁপা গলায় বলেন, 'ছি, ছি, কেন অকারণ লজ্জা দিচ্ছেন বলুন তো? আপনাদের মতন লোকের পায়ের ধুলো আমার মতন গরীবের বাড়ীতে পড়া, আমার সাত পুরুষের সৌভাগ্য। বেশ তো, অজিতবাবু সোজা হ'য়ে বসেন, 'কাল শনিবার, কাল অফিস ফেরৎ আসুন না আমার বাড়ীতে। আমি আগে ফিরে স্টেশনে অপেক্ষা করবো। সামান্য চা জলখাবার—

অজিতবাবুর কথা শেষ হবার আগেই সারা কামরায় মহা সোরগোল।

গোলমাল একটু থামতে, দয়ালবাবুর গলা শোনা যায়, 'বেশ তো, খুব ভালো কথা। এতদিন বৌমার সুগোল হাতটি দেখে এসেছি, এবার সেই হাতের রান্না পরখ ক'রে আসবো। আমার কোন অসুবিধে নেই।'

দেখা যায়, অসুবিধা বিশেষ কারুরই নেই। একমাত্র জনকবাবুকেই উজান বেয়ে যেতে হবে, কিন্তু তাতেও তিনি গর-রাজী নন। বলেন, 'দরকার হ'লে অফিসই কামাই করবো কাল। অফিস রোজ আছে কিন্তু এ জিনিস তো আর রোজ হচ্ছে না। ঠিক আছে। বলো তো, সকাল থেকেই গিয়ে ব'সে থাকতে পারি।'

মোটামুটি একটা ব্যবস্থা হ'য়ে যায়। বেলা তিনটে সাড়ে তিনটের মধ্যে সালিশপুরে নামলেই হ'বে। ফেরবার বন্দোবস্তও ঠিক আছে। জনকবাবু ফিরবেন আটটা সাতাশে আর বাকি সবাই অনায়াসেই নটা তেরোর গাড়ী ধরতে পারবেন।

বাকি রইলেন বরদা খুড়ো আর নরহরি বাবু। কাল সকালে ও'দের বললেই হ'বে। এক কামরায় দেখা তো হ'বেই। তাই ঠিক হয়।

নামবার সময় জনকবাবু বলেন, 'আজকের মালা কালকের মধ্যে নিশ্চয় শুকিয়ে যাবে না; দুজনকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে দেখবার সাধ আছে।'

৫

অজিতবাবু জনকবাবুর কাপড়ের থলিটা জানলা গলিয়ে এগিয়ে দিতে দিতে বলেন, 'মালার কথা কিছুই বলা যায় না জনকবাবু। বুকের তাপে এবেলার মালা ও বেলা শুকিয়ে যায়। সেজন্য আপশোষ করবেন না। যুগল

বরদা খুড়ো দয়ালবাবুর কাছে কথাটা আগেই শোনেন। চশমার কাঁচটা বার বার মুছতে মুছতে বলেন, 'তাই তো বড্ড মুশকিলের কথা। সকালে বড় নাতিটার অবস্থা খুব খারাপ দেখে এসেছি। একে জোয়ান বয়স, তার ওপর আজ চোদ্দ দিন। সবই মঙ্গলময়ের ইচ্ছা।'

অজিতবাবু আশ্চর্য হ'য়ে যান, 'আপনি তো একথা কিছুই বলেন নি একদিনের জন্য? এতদিন ভুগছে নাতিটি অথচ রোজই তো দেখা হ'চ্ছে আপনার সংগে?'

বরদা খুড়ো শুকনো হাসেন, 'এ আর কি বলবো ভায়া। অসুখ-বিসুখ কার বাড়ীতে আর নেই। মিছিমিছি নিজের দুঃখ পরকে বিলি করা। নাও দয়ালভায়া, ছকটা পাতো।'

অজিতবাবু মৃদু গলায় বলেন, 'তাহ'লে আর আপনাকে কি ক'রে আসতে বলি আজ. বাড়ীতে এই বিপদ।'

বরদা খুড়ো মুখ তোলেন, 'তার আর কি, আর একদিন হ'বে, পাওনা রইলো। আজ মনের অবস্থাটা বড়ো খারাপ। অফিসেও বেরোতাম না, একে শনিবারের অফিস তার ওপর এক বদমেজাজী সায়েব জুটেছে। রিটায়ার করার মুখে আর বদনামটা কিনতে চাই না।' পুরু চশমার কাঁচ দুটোর অন্তরালে বরদা খুড়োর চোখ দুটো খুব ম্লান আর নিস্তেজ দেখায়।

অজিতবাবু ব্যস্ত হ'য়ে ওঠেন, 'না, না সে কি কথা। বাড়ীর বিপদ কেটে যাক, অন্য একদিন পায়ের ধুলো দেবেন।

নরহরিবাবুকে রাজি করানো শক্ত হয় না। তবে তিনি অনুনয় করেন, 'আমার শরীরের অবস্থা তো তুমি ভালোই জানো অজিত। যেতে আমার আপত্তি নেই, তবে ওই এক কাপ চা, ওর বেশী কিছু খেতে পারবো না। আমি কোথাও যাই না, তা তো জানো। আমার শালা ব্যারিস্টার, বালিগঞ্জে বাড়ী করেছে, তার বাড়ীতে কতবার যে যেতে বলেছে তার আর লেখাজোখা নেই, কিন্তু শালা আর শালাজের কাছে হাতজোড় ক'রে মাপ চেয়েছি। অবশ্য তোমার কথা আলাদা। তুমি আমার ঘরের লোকের চেয়েও বেশী।'

হরিণডাংগা স্টেশনে ট্রেন থামতেই বলাই-বাবু আর মনসাবাবু গা টেপাটেপি করেন। জনকবাবুর সাজ পোষাকই আলাদা। মটকার পাঞ্জাবী, মটকার চাদর, দিব্বি কোঁচানো কালো পাড় মিহি ধুতি, পায়ে ফুল মোজার ওপরে কালো পাম্প শু। পানের রসে ঠোঁট দুটি টসটস করছে।

কানাইবাবু নাকের তলায় নস্যির টিপ নিয়ে বলেন, 'যবে বিবাহে চলিলা বিলোচন।'

জনকবাবু এক গাল হাসেন, 'সাজসজ্জা দেখে গিন্নি তো মহা খাপ্পা। হাজার প্রশ্ন

জনকবাবু সাবধানে ধুলো ঝেড়ে অজিত-বাবুর পাশে বসে পড়েন।

'কথা ঠিক হ'য়ে যায়। ফেরবার সময় সবাই এক সঙ্গে দুটো পনেরোর গাড়ীতে ফিরবেন। অজিতবাবু সঙ্গেই থাকবেন।

নন্দীপুর স্টেশন। এক সময়ে ধু ধু করতো মাঠ। এখন দেখতে দেখতে অনেক-গুলো টালির ঘর উঠেছে এপাশে ওপাশে। স্টেখোলা হ'য়েছে অনেকখানি জমি জুড়ে। এদিকে অশোক ইঞ্জিনিয়ারীংয়ের কারখানা। নাট, বল্টু আরো কি সব তৈরী হয়।

স্টেশনে কুলি মিস্ত্রির ভীড়ই বেশী। তারা সবাই গাড়ীর পিছন দিকে ছোটে। ইণ্টার ক্লাশে কেউ একটা বড় আসে না, আসলেও বাবুদের ধমকে অন্য কামরার দিকে দৌড়ায়। কে একজন দরজা ঠেলতেই মনসা-বাবু চেঁচিয়ে ওঠেন, 'এ গাড়ী নয়, এ গাড়ী নয়, পিছন দিকে অনেক গাড়ী রয়েছে, সরে পড়ো।'

প্রথমে জানলার ফাঁক দিয়ে মুণ্ডিত মস্তকের কিছুটা দেখা যায়। তারপরেই ফোঁটা চন্দন তুলসীর মালা সমেত গোটা এক বাবাজীর চেহারা ভেসে ওঠে। গায়ে গেরুয়া চাদর, পরনেও গেরুয়া। এক গাল হেসে বলেন, 'দেড়া ক্লাসেরই টিকেট কিনেছি বাবারা, দয়া করে দরজাটা খুলে দাও দিকিনি।'

কানাইবাবু হাত বাড়িয়ে দরজাটা খুলে দিতেই বাবাজী কামরায় এসে ঢোকেন। এদিক ওদিক চেয়ে দয়ালবাবুর পাশে সন্তর্পণে বসার সঙ্গে সঙ্গেই হুইসিল দিয়ে ট্রেন ছেড়ে দেয়।

'বাবাজীর এখানে কি উদ্দেশে আসা হ'য়েছিলো' মনসাবাবু গলার স্বরটা যথাসম্ভব সাত্ত্বিক করার চেষ্টা করেন।

'এখানে আমাদের একটি আশ্রম তৈরী হচ্ছে, কথার সঙ্গে সঙ্গে বাবাজী হাত দুটি জোড় করে কপালে ঠেকান তারপর চোখদুটি খুলে আরো কি বলতে গিয়েই থেমে যান।

একদৃষ্টে কিছুক্ষণ অজিতবাবুর দিকে চেয়ে থেকে চীৎকার ক'রে ওঠেন, 'কে আমাদের অজিত না? তুমি বেঁচে আছো এখনো?'

অজিতবাবুর তরফ থেকে কোন উত্তর পাওয়া যায় না। বাবাজীর সুর সপ্তমে, 'আমাদের গাঁয়ে আমরা সব রটিয়ে দিয়েছি, তুমি মারা গেছো। তোমার বাবাও তাই বলে বেড়িয়েছিলেন। ছিঃ ছিঃ অত বড়ো বংশের ছেলে হয়ে, শেষকালে বাজারের এক নটীকে নিয়ে—

দয়ালবাবু ধমকে ওঠেন, 'আঃ থামুন, কাকে কি বলছেন?' বাধা পেয়ে বাবাজী তেতে একেবারে আগুন হ'য়ে ওঠেন, 'ঠিক লোককেই ঠিক কথা বলছি মশাই। চার বছরে কি সব ভুলে গেছি নাকি। ওঁকেই জিজ্ঞাসা করুন না—সত্যি বলছি, না মিথ্যে বলছি। চরণগড়ের বিষ্ণু ঘোষালের ছেলে কি না ও নিজের মুখেই বলুক। ছবি আঁকা শিখতে শহরে এসে কি কেলেংকারিটা করেছে আপনারাই শুধোন না একবার। বংশে কালি লেপে থিয়েটারের বীণা বাইজিকে নিয়ে হাওয়া হয় নি?' কে একজন বাধা দিতেই মনসাবাবু থামিয়ে দেন, 'আহা হা, বলতেই দিন না বাবাজীকে 'মিথ্যে হয়ত অজিতবাবুই বলবেন এখন। আচ্ছা বাবাজী, বীণা বাইজীকে দেখতে কেমন ছিল?'

বাবাজী চাদর দিয়ে মুখটা মুছে নেন। ভুরু দুটো কুঁচকে ভাবেন কিছুক্ষণ, তারপর বলেন, 'দেখতে? তা হ্যাঁ, দেখেছি বইকি বীণা বাইজিকে। ঘোড়ার গাড়ী ক'রে যেতে দেখেছি অনেকবার। ছাপানো হ্যাণ্ডবিলে ছবিও দেখেছি। অপরূপ সুন্দরী, মশাই, অপরূপ সুন্দরী। যেমনি ইহুদী মেয়েদের মতন গায়ের রং, তেমনি মুখ চোখের গড়ন। সে সব দিকে খুঁত নেই। রূপ না থাকলে আর ভদ্দর ঘরের ছেলে মজে।' বাবাজী একটু থেমে গলাটা ভিজিয়ে নেন তারপর অজিত-বাবুর দিকে চেয়ে বলেন, 'কি এখনো তাকে নিয়েই আছো, না অন্য কাউকে জুটিয়েছো? বলবো কি মশাই আপনাদের, বিষ্ণু ঘোষাল মরবার সময় ছেলের নাম মুখে আনে নি বটে, কিন্তু টপ্‌টপ্‌ ক'রে চোখের জল যে গড়িয়ে পড়লো, সে কার জন্য তা কি আর আমরা বুঝতে পারি নি! পাষণ্ড, পাষণ্ড, তোমার মত লোকের সংগে এক গাড়ীতে গেলেও পাপ হয়।' কথার সঙ্গে সঙ্গে বাবাজী দাঁড়িয়ে ওঠেন তারপর বাদশাপুরে ট্রেন থামতেই দরজা খুলে নেমে পড়েন। অন্য কামরায় যাবার মুখে জানলা দিয়ে বলেন, 'এখনও সময় আছে। পারো তো নিজেকে শুধরে নাও। বাপকে তো চোখে দেখতে পেলে না, এইবেলা মার কাছে গিয়ে দাঁড়াও। ওসব বদখেয়াল ছেড়ে দাও।'

অনেকক্ষণ পর্যন্ত চুপচাপ। সত্যি সত্যিই বোধ হয় সুঁচ পড়ার শব্দও পাওয়া যায়। অজিতবাবু মাথা নিচু ক'রে চুপচাপ ব'সে থাকেন। ট্রেনের ঝাঁকুনিতে কেবল কানাইবাবুর ছাতাটা দুলে দুলে ঠক ঠক শব্দ করে।

প্রথমে কথা বলেন জনকবাবু। সকলের দিকে চেয়ে গম্ভীর গলায় বলেন, 'ওঃ, ভগবান সহায়, নইলে আর একটু হ'লেই সর্বনাশ হ'য়ে গিয়েছিলো।'

মনসাবাবু ফোড়ন কাটেন, 'কার মধ্যে কি আছে বোঝা মুশকিল। দাও হে এক টিপ নস্যি দাও। মাথাটা এমন ধ'রে গেছে।'

কানাইবাবু টাঙানো ছাতাটা বগলদাবা ক'রে দাঁড়িয়ে ওঠেন, 'আপনারা হয়ত বিশ্বাস করবেন না, আমার কিন্তু কেমন সন্দেহ হয়েছিলো। যা রয় সয়, তাই ভালো। বিয়ে কোন চুলোয়, তার নেই ঠিক, বিয়ের তারিখ নিয়ে হৈ চৈ।'

যে যার ওঠার জন্য তৈরী হ'য়ে নেন। দয়ালবাবু জুতো জোড়া পায়ে গলাতে গলাতে বলেন, 'আমরা আপনার তো কোন ক্ষতি করি নি অজিতবাবু, আমাদের এ সর্বনাশ করার চেষ্টাটা অন্ততঃ না ক'রলেই পারতেন।

অজিতবাবু মাথা তোলেন না। বুঝতে পারেন, সারা দেহের রক্ত মুখে এসে জম হয়েছে। প্রসারিত হাতের আঙুলের ওপর টপ টপ ক'রে চোখের জল গড়িয়ে পড়ে।

শেয়ালদা স্টেশনে গাড়ী থামতেই সকলে তাড়াহুড়ো ক'রে নেমে পড়েন। বিরা অমঙ্গলের একটা ছায়া বুঝি পিছু নিয়েছে এমনি ভাব।

অজিতবাবু আস্তে নামতে গিয়েই পিছনে একটা স্পর্শ পেয়ে থমকে দাঁড়ান। মুখ ফিরিয়ে দেখেন নাগতলার বরদা খুড়ো পিঠে হাত রেখেছেন। অজিতবাবুর দিকে চেয়ে এক গাল হেসে বলেন, 'আমি অনেক ভেবে ঠিক করলুম ভায়া। নাতির পরমায় ভগবানের হাতে, কিন্তু নেমন্তন্নটা যখ আমার হাতে তখন সেটা ছাড়ি কেন। তা ছাড় এই বাজারে বোমার হাতের জিনিস ঠেলে আছে কখনো। ওই কথা রইলো, দুটো পনেরোর গাড়ীতে এক সঙ্গেই ফিরবে দেখো ভায়া, বুড়োকে যেন আবার ঠকিয়ো ন ঠিক এসো কিন্তু।'

বরদা খুড়ো রুমাল বের ক'রে চশম কাঁচ দুটো মুছতে মুছতে গেটের দিক এগিয়ে যান।

## অফুরন্ত হাসি!

সম্প্রতি লণ্ডনের হাইগেট অঞ্চলের মাইকেল হিপ্পিস লি নামে একটি চোদ্দ বছরের ছেলের অদ্ভুত রকমের হাঁচি রোগ দেখা দিয়েছিল। নয় দিন ধরে প্রতি মিনিটে কুড়িটি করে হাঁচি হাঁচতে হাঁচতে ছেলেটি প্রায় মরবার দাখিল হয়েছিল। যাক শেষ পর্যন্ত গত ১৭ই

এ রকম অলক্ষুণে হাঁচি না হলেই বাঁচি!

[...] তারিখে সে লেসলী ডেল নামে [...]ক আমেরিকান স্নায়ু চিকিৎসকের [...]রণাপন্ন হয় এবং তিনিই একটি [...]াটা রাত ধরে মাইকেলকে নানাভাবে শুইয়ে-[...]সিয়ে, ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তবে ঐ সর্বনেশে [...]চি বন্ধ করতে সমর্থ হন। মাইকেল যে [...]লের ছাত্রাবাসে থাকতো, সেখানে তার [...]গীরাও তার ঐ হাঁচির শব্দে কয়েক রাত [...]মোতে পারেনি। আর তাই তারা শেষ [...]র্যন্ত মাইকেলকে তার বাড়িতে পাঠাতে বাধ্য [...]য়েছিল। মাইকেলের হাঁচির ব্যামোটাও যেমন [...]ভুত, তেমনি আরও অদ্ভুত উপায়ে তার [...]কিৎসা করে হাঁচি বন্ধ করতে হয়েছে যে, [...]র সঙ্গের কয়েকটা ছবি দেখলেই বুঝতে [...]রবেন। খবরটা শুনে মনে মনে নিশ্চয়ই [...]লছেন—"এমন অলক্ষুণে হাঁচি না হলেই [...]চি।"

## [...]রা মানুষ জ্যান্ত হলো!

সম্প্রতি ক্যালিফোর্ণিয়ার এক খবরে জানা [...]ছে যে, গত ১৩ই মে তারিখে লস এঞ্জেলসের [...]ক হাসপাতালে রীড লুস নামে ৪৬ বছরের [...]ক বিমান-পরিদর্শককে তার দেহে [...]স্ত্রোপচারের সময় অজ্ঞান করতে গিয়ে—[...]ঠাৎ মারা গেলেন বলে চিকিৎসকরা মনে [...]রেন। ১২ থেকে ১৫ মিনিট এইভাবে মরে [...]কার পর—হঠাৎ তাঁর অস্ত্রোপচারকারী সার্জেনটির মনে হলো যে রোগীর একটা হাড় ভেঙে দিলে হয়তো তার ধাক্কায় প্রাণ ফিরে আসতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি লুইসের একখানা পাঁজরা ভেঙে দিলেন—সঙ্গে সঙ্গে লুইসের নাড়ী চলতে লাগলো এবং আস্তে আস্তে জ্ঞানও ফিরে এলো। এই ঘটনাটি ঘটায় সবাই স্বীকার করেছেন যে রীড্ লুইস্ মরে আবার প্রাণ পেয়েছেন।

## চুরি না বাহাদুরী!

অনেক রকম চুরির খবরই খবরের কাগজে বেরোয়, কিন্তু ফ্রান্সের এক কাগজে চুরি বাহাদুরীর সব সেরা খবর বেরিয়েছে—তাতে জানা গেছে রাতের আঁধারে গা ঢাকা দিয়ে এসে প্যারী শহরের ভ্যান রেয়েনেস্ট সার্কাসের পশুশালায় ঢুকে কারা যেন সার্কাসের সব চেয়ে দামী আর বড় সিংহটাকে বেমালুম চুরি করে নিয়ে গেছে। একে চুরি না বলে বাহাদুরীই বলা উচিত নয় কি?

## খুনীর সাহিত্য-বোধ!

নরওয়ের ক্রিস্টিয়ানস্ট্যান্ড বলে জায়গাটিতে —কারস্টিন ব্রেক্কী নামে খুনের অপরাধে অপরাধী নিজেই তাঁর অপরাধ স্বীকার করে 'স্বীকৃতি-পত্র' লেখবার জন্য এই বলে আবেদন করেছেন যে পুলিশ যদি তাঁর মুখ থেকে স্বীকারোক্তি শুনে —স্বীকৃতি-পত্র রচনা করে —তাহলে সেটাতো হবে সাহিত্য-রাগ বর্জিত একটা নিতান্ত তৃতীয় শ্রেণীর রচনা; অতএব কোর্ট যেন তাঁর স্বীকারোক্তি রচনাটি তাঁকেই নিজের হাতে করতে দেন। কোর্ট এই অপরাধীকে সাহিত্যানুরাগের জন্য সাজার সঙ্গে পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থাও করবেন নিশ্চয়ই।

রসবেত্তা খুনী

এক একজন মানুষ থাকে যারা চিরটা কাল পরের কাজেই ব্যস্ত থাকে, নিজের কাজ করে ওঠবার সময় পায় না। শুভার্থী আত্মীয়ের দল অনুযোগ করেন, কাজ-হারানো লোক। পরের বেগার খেটেই জীবন শেষ হল, নিজের কাজ গুছিয়ে নেবার ফুরসৎ মিলল না। কার ওগজামিন, কারুর মেয়ের বিয়ে, কারুর ছেলের অসুখ, কার শ্যালীকে শ্বশুরবাড়ি থেকে এনে বাপের বাড়িতে পৌঁছে দিতে হবে, চার মাইল হেঁটে কারুর জন্য বা জাগ্রত দেবতার মানতী পুজোর ফুল এনে দিতে হবে, চিত্রকূটের হাঁপানীর ওষুধ জোগাড় করে আনা দরকার, পুজোর বাজার করবার লোক নেই, ইত্যাদি নানা কাজ ও অকাজের ভার এই জাতীয় মানুষের ওপর অনেক সময় চাপানো হয়। চক্ষুলজ্জাই বলুন আর স্বাভাবিক ভদ্রতা বা উদারতাই বলুন, সে ভদ্রলোক মুখের ওপর না বলতে পারে না। ব্যক্তিগত সুখসুবিধার কথা না ভেবে, অনেক সময় রীতিমত দুর্ভোগ সহ্য করে এবং দরকার হলে গাঁটের পয়সা খরচ করে তাকে পরের বেগার দিতে হয়। এইতেই তার জীবনের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। কখনো আনন্দ ও প্রশংসা, কখনো বা দুঃখ এবং নিন্দা জোটে অদৃষ্টে। কিন্তু পরের কাজ না করেও উপায় নেই। সংসার ও সমাজ যাকে চিনে নিয়েছে, চিনির বলদ বলে নামাঙ্কিত করেছে, তার আর রেহাই নেই।

নিকট পরিবেশে অনেকেই এই ধরণের মানুষের সংস্পর্শে এসেছেন ও তার কার্যকলাপ অনুধাবন করেছেন। যাঁরা হিতাকাঙ্ক্ষী, তাঁরা ব্যথিত হন কর্মভোগের দৃষ্টান্ত দেখে। হয়তো একটু যত্ন, সহানুভূতি দেখান। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, যারা সবচেয়ে এই জাতীয় মানুষকে খাটিয়ে নেয়, তারাই আসলে জ্ঞানপাপী। হয়তো সারা দুপুর রোদ্দুরে টো টো করে ঘুরে এল মানুষটা, একটু জিরোতে না জিরোতেই তাকে আবার ফরমায়েস করা হল, অমুক জায়গায় গিয়ে অমুক জিনিসটা এনে দিতে পারবে? হয়তো ভদ্রভাবে কথা বলাই হয় না, অনেকটা আদেশের সুরেই অনুরোধ জানানো হয়। আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা এই, মেয়েরাই এই জাতীয় পুরুষকে খাটিয়ে নেন বেশি। একে তো তাঁরা নিজেরাই পরনির্ভর। ট্রামে-বাসে ঘুরে নিজেদের কাজ নিজেরা করে নিতে পারেন না। তার ওপর সংসারের পিছটান আছে, আছে শহরের বিভিন্ন স্থানের দূরত্ব সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা। এক বাড়ির গৃহিণী এমনি এক প্রৌঢ় ভদ্রলোককে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়ে নিতেন। কিছু বললে, তিনি বলতেন, 'ওর আর কাজ কি? অকর্মা লোক, পরের কাজ করেই ওর সময় কাটে।' তাঁর স্বামী একদিন বললেন, "তুমি যে ওকে চেতলার বাজার থেকে মশারির থান কিনে আনতে বললে, যাতায়াতের ট্রাম-ভাড়া ও জলখাবারের পয়সা

দিয়েছ আলাদা করে?" গৃহিণী অম্লান বদনে বললেন, "টাকা তো দিয়েছি, ঐতেই কুলিয়ে যাবে।"

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কুলোয় না। দৃষ্টিকৃপণ মানুষ, হিসেব করে এমন পয়সা দেন যাতে এক আধলা উদ্বৃত্ত হওয়া কঠিন। জলখাবার তো দূরের কথা। ট্রামের পয়সা হয় তো নিজেকেই দিতে হয় গাঁট থেকে। বাজার খরচ বাবদ দেওয়া হল হয়তো পাঁচ টাকা। কিন্তু যে জিনিসগুলি খরিদ করতে বলা হল, তাদের তালিকা এত দীর্ঘ যে, দশ টাকায় কুলোয় কি না সন্দেহ। তার ওপর জিনিসগুলো মনঃপূত এবং যথেষ্ট পরিমাণে সস্তা ও প্রচুর না হলে গৃহকর্ত্রীর মন ওঠে না। তিনি বলেন কিংবা ভাবেন, লোকটা একেবারে ওয়ার্থলেস্। কিন্তু এই শহরের ধুলো আর ভিড়, রোদ্দুর আর বৃষ্টিতে কষ্ট পেয়ে মানুষটা যে এত ঘোরাঘুরি করে মনোরঞ্জনের জন্য এতটা যত্ন ও পরিশ্রম করল, তার বদলে সে পেল কি? হিসেব দেবার সময়ে হয়তো ভ্রূকুটি, নয়তো স্পষ্ট অসন্তোষ।

বাঙালী ঘরের গৃহিণীদের নিন্দা করতে বসিনি। তবু সত্যের খাতিরে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, তাঁদের অধিকাংশই, বিশেষ করে মাঝারি ঘরের অর্ধশিক্ষিত এবং বাজারের হালচাল সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ গৃহিণীরা একটু অবুঝ এবং স্বার্থপর হয়ে থাকেন। পাড়ার বোসেদের গিন্নি হয়তো বললেন, বেলগেছের বাজারে সব্জি বড় সস্তা। কিংবা পাশের বাড়ির বৌটির স্বামী অফিস-ফেরৎ বৈঠকখানা থেকে অল্পদামে মাছটা তরি-তরকারিটা কিনে নিয়ে আসেন, এ কথা তাঁর কানে এল। ব্যস্, রক্ষে নেই। হয় স্বামী, নয় দেওর, নয় ছেলেকে কথা শুনতে হবে- সবাই নিষ্কর্মা। তিনি সংসারের জন্য সারাটা দিন বিশ্রাম করেন না, উঞ্ছবৃত্তি করে মরেন। কিন্তু বাড়ির বাবুরা গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ান, কুটোটি নেড়ে উপকার করতে পারেন না। আবার তম্বি। এটা নেই, ওটা হল না বলে বিরক্তি প্রকাশ করেন। অগত্যা অন্য লোক ধরতে হয় সস্তায় বাজার করার জন্যে। সে ব্যক্তি যদি আবার আশ্রিত হয়, অথবা আর্দালী, সরকারী পিয়ন, মুহুরী বা সরকার জাতীয় মানুষ হয়, তাহলে তো কথাই নেই। সে যখন স্বামীর তাঁবেদার, তাঁর অনুগ্রহে চাকরী করে খায়, তখন বাড়ির বাড়তি কাজ বিনা অনুযোগে তারই ঘাড়ে চাপানো চলে। উপরন্তু এখানে ওখানে নানা জায়গায় ফরমায়েসি জিনিস খুঁজে বেড়ানোর জন্যে তাকে অনায়াসে অফিস-ফেরৎ পাঠিয়ে দেওয়া যায়। যাঁদের স্বামী সরকারী চাকুরে, বিশেষ করে উঁচু মাইনের, তাঁদের গৃহিণীরা একটু অবুঝই হয়ে থাকেন। নিত্য সেলাম আর মেমসাহেব শুনে শুনে তাঁদের ধারণা জন্মে যায় যে, তাঁদের সন্তুষ্টি সাধনের জন্যেই কম-মাইনের চাকুরে-শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে। যাদের এইভাবে খাটিয়ে নেওয়া হয়, তাদের ব্যক্তিত্ব নেই বললেই হয়। সংসারে আর সমাজে তারা নির্যাতিত, অতএব কিছুতেই বিদ্রোহ বা প্রতিবাদ তারা করতে জানে না। নীরবে উচ্চতন কর্মচারী আর তাঁদের গৃহিণীর মনস্তুষ্টি বিধানে সমস্ত অবসর আর নিজস্ব কাজ-কর্ম ছেড়ে সমস্ত চেষ্টাটুকু ঐদিকে নিয়োগ করে থাকে। দুনিয়া শক্তের ঠাঁই। অশক্ত লোক পিছিয়ে থাকে। মাথা নীচু করে ঘানি টানে। হয়তো একটা মিষ্টি মুখের কথা, তাইতেই কৃতার্থ হয়ে যায়। অনেক সময়ে তাও মেলে না—যেমন মেলে না বুধ সরকারের ভাগ্যে রুটির সঙ্গে একটু মাখন কিংবা চায়ের সঙ্গে চিনি। পরোপকাররতী মানুষরা তাই প্রতিদানের আশা না রেখেই বাজার করে বেড়ান, অপরের মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ থেকে বিয়ের হাঙ্গাম-হুজ্জৎ পোহান, ভাগনীর বান্ধবীর শপিং করে দেন কিংবা বৌদির মাসতুতো বোনের জন্য পরীক্ষার সম্ভাব্য প্রশ্নমালা জোগাড় করে বেড়ান—এইতেই তাঁদের জীবনের সার্থকতা ও তৃপ্তি।

**AMERICAN CAMERA**
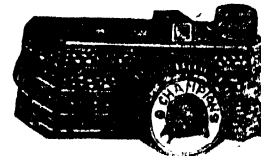
এমন কি সাধারণ অজ্ঞ লোক ও এই ক্যামেরার সাহায্যে বিনা ঝঞ্ঝাটে, সুন্দর সুন্দর ফটো তুলিতে পারিবেন। প্রতি ক্যামেরার সহিত ১৬ খানা ছবি তুলিবার ফিল্ম, একটি লেদার কেস্ বিনামূল্যে দেওয়া হয়। মূল্য ১৮৲ টাকা। ডাকব্যয় ১।০ আনা

**পার্কার ওয়াচ কোং**

১৬৬নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা—৭।

আলোকচিত্র গ্রহণের পক্ষে অভাবনীয় সুযোগ!

**ওরিয়েন্ট বক্স ক্যামেরা**
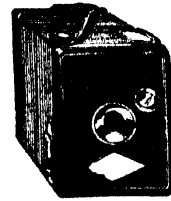
বিশেষ ক্ষমতাশালী লেন্স সমন্বিত। প্রথম শিক্ষার্থীরাও সহজেই ব্যবহার করিতে পারে

১২০নং ফিল্মে ২¼"×৩¼" আকারের উৎকৃষ্ট ফটো তোলা যায়। মূল্য—৭৷৷০; ডাকব্যয় ১৷৷০।

ইংরাজীতে চিঠিপত্র লিখিতে হইবে।

**ORIENTAL CAMERA HOUSE**

(22) ALIGARH CITY.

# হিউএন্ চাঙ্-এর ভারতভ্রমণ

## — শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু —

( পূর্বানুবৃত্তি )

### নালন্দা

আমাদের কিছু সৌভাগ্যবশতঃ চৈনিক পরিব্রাজকরা মুসলমান আক্রমণের প্রায় অব্যবহিত পূর্বে ভারতে এসে ভারতীয় সভ্যতার কিছু কিছু বিবরণ দিয়ে গিয়েছেন। তা না হোলে নালন্দার মত একটা আশ্চর্য বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে আমরা বস্তুতঃ কিছুই জানতে পারতাম না। হিউএনচাঙ্ এযাত্রা এখানে প্রায় দেড়বছর কাটিয়েছিলেন। তারপর পূর্ব ও দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের শেষে আবার ৮।৯ মাস এখানে ছিলেন। তিনি নালন্দা সম্বন্ধে যা বলেছেন, বৌদ্ধপৌরাণিক কাহিনী-গুলি বাদ দিয়ে তার প্রায় সমস্তটাই সংকলন কোরে দিলাম।

হিউএনচাঙ্ বলেন—"বুদ্ধের পরিনির্বাণের অল্প কিছুদিন পরে শক্রাদিত্য নামক এক বৌদ্ধ রাজা এখানে প্রথম সঙ্ঘারাম তৈয়ারী করেন। তারপর গুপ্তবংশীয় চারজন সম্রাট—বুদ্ধগুপ্ত, তথাগতগুপ্ত, বালাদিত্য ও বজ্র আর চারটি সঙ্ঘারাম এখানে তৈরী কোরে দিয়েছেন। তাছাড়া মধ্যভারতের এক রাজাও এখানে এক প্রকাণ্ড সঙ্ঘারাম তৈয়ারী করেছেন। এ ছয়টি সঙ্ঘারামের সমস্ত সৌধগুলি ঘিরে একটা খুব উঁচু ইঁটের প্রাচীর তৈয়ারী হয়েছে। ঢুকবার জন্য কেবল একটি তোরণ আছে। এত রাজা এখানে এত সৌধ নির্মাণ করেছেন যে এখন এ জায়গাটা একটা অদ্ভুত দৃশ্য, আর এখানকার ভাস্কর্য সত্যই অপরূপ। এখানে হাজার হাজার ভিক্ষু আছেন। এ'রা সকলেই অসাধারণ জ্ঞানী আর গুণবান। শত শত পণ্ডিত আছেন যাঁদের যশ বহু দূরে দেশ পর্যন্ত ছড়িয়ে গিয়েছে। এ'রা নির্দোষ পূতচরিত্র। ভারতের সব প্রদেশের লোকই এ'দের ভক্তি করে। সমস্ত ভারতের এ'রা আদর্শ।

এ সঙ্ঘারামের নিয়মগুলি খুব কঠোর আর সকলকেই সেগুলি মেনে চলতে হয়। সমস্ত দিন, সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত নানা বিষয়ের বিচার হচ্ছে। বৃদ্ধ, যুবা সকলেই পরস্পরকে সাহায্য করেন, আর যাঁরা ত্রিপিটক সম্পর্কীয় বিচার না করতে পারেন তাঁদের এখানে লজ্জায় লুকিয়ে থাকতে হয়। বিদেশী পণ্ডিতরা নিজেদের সন্দেহভঞ্জন করতে এখানে আসেন কেহ নিজেকে নালন্দার ছাত্র বলে মিথ্যা পরিচয় দিয়ে সম্মান পাবার চেষ্টা করে।

এখানে কেহ প্রবেশ করতে চাইলে, দ্বারপাল তাকে প্রথমে কতকগুলি কঠিন কঠিন প্রশ্ন করে। অনেকেই তার উত্তর দিতে না পেরে সরে পড়ে। অপরিচিত ছাত্রদের কঠিন পরীক্ষা করে প্রবেশ করানো হয়। এখানে বিচারের বিষয়গুলি এত দুরূহ যে, সাধারণতঃ শতকরা ৮০।৯০ জনই প্রবেশলাভ করতে অক্ষম হয়। আর যারা কৃতকার্য হয় তাদের মধ্যেও খুব কম লোকেই এখানে খ্যাতি অর্জন করতে পারে। কিন্তু যাঁরা স্পষ্টতঃ গভীর জ্ঞানী, মানসিক শক্তিশালী, যাঁরা পুণ্যের জ্যোতিতে দীপ্তিমান, যাঁরা দেশ বিদেশে খ্যাত, তাঁরা এখানকার পূর্বতন মহাপণ্ডিতদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। যথা ধর্মপাল, চন্দ্রপাল, যাঁদের উপদেশে আজ-পর্যন্ত অবিবেচক সাংসারিক লোকের নিদ্রাভংগ হয়; গুণমতি ও স্থিরমতি, দেশ বিদেশে যাঁদের অধ্যাপনার সুফল আজও ব্যাপ্ত হচ্ছে; প্রভামিত্র, যাঁর অধ্যাপনা অতি প্রাঞ্জল; বাগ্মী জিনমিত্র; জ্ঞানচন্দ্র যাঁর ব্যবহার ও কথাবার্তাই তাঁর গুণের প্রকাশক; শীঘ্রবুদ্ধ, শীলভদ্র ও আরও অনেক খ্যাতব্যক্তি যাঁদের নাম স্মরণ হয় না। এ'দের তুল্য জ্ঞানী ও পুণ্যবান বিরল। এ'রা প্রত্যেকেই বহু প্রাঞ্জল ভাষ্য ও গ্রন্থ লিখে গিয়েছেন যা আজও পঠিত হয়।

এক তোরণের ভিতর দিয়ে মহাবিদ্যালয়ের প্রধান সৌধে প্রবেশ করতে হয়। এর থেকে আবার সঙ্ঘারামের মধ্যে অবস্থিত অন্য আটটা সৌধ ভাগ হোয়ে গিয়েছে। অসংখ্য কারুকার্যময় স্তম্ভগুলি, পর্বতচূড়ার মত উঁচু, প্রবালখচিত সূক্ষ্মাগ্র শিখরগুলি সুশৃঙ্খলভাবে স্থাপিত। পর্যবেক্ষণশালার গম্বুজগুলি আর উপরের প্রকোষ্ঠগুলি যেন প্রাতঃকালের কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে যায়। উপরের জানালা দিয়ে মেঘের খেলা, চন্দ্রসূর্যের গ্রহণ দেখা যায়।

গভীর স্বচ্ছ পুষ্করিণীগুলিতে নীলপদ্ম, তীরে রক্তরাঙা কনকফুলের স্তবক আর মধ্যে মধ্যে ছায়াপ্রদ ঘনসবুজ আম্রকানন শোভাবর্ধন করছে।

বাইরের প্রাঙ্গণে ভিক্ষুদের আবাসগুলি সবই চারতলা। সব তালাতেই রঙীন কার্নিশে অলঙ্কৃত থামগুলি কারুকার্যময়; বারাণ্ডায় খোদাই করা ঝালরের রেলিঙ্। নানা উজ্জ্বল রঙের মসৃণ টালি দিয়ে ছাওয়া ছাদ থেকে সূর্যকিরণ নানা রঙে প্রতিফলিত হচ্ছে।*

ভারতে কোটি কোটি সঙ্ঘারাম আছে কিন্তু এত প্রকাণ্ড আর উঁচু একটিও নেই। এখানে সর্বদাই দশহাজার বিদ্যার্থী থাকেন। এ'রা যে শুধু মহাযান আর আঠারো বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের গ্রন্থই অধ্যয়ন করেন তা নয়, বেদ, হেতুবিদ্যা, শব্দবিদ্যা, চিকিৎসা বিদ্যা, অথর্ব বেদ, সাংখ্য ও অন্য সমস্ত শাস্ত্রের গভীর আলোচনা করেন। হাজার জন আছেন যাঁরা সূত্র ও শাস্ত্রের কুড়িটি সংগ্রহ ব্যাখ্যা করতে পারেন। পাঁচশজন তিরিশটি সংগ্রহ ব্যাখ্যা করতে পারেন। আর স্বয়ং ধর্মগুরু (অধ্যক্ষ) সহ বোধহয় দশজন আছেন যাঁরা ৫০টি সংগ্রহই ব্যাখ্যা করতে পারেন; কেবলমাত্র অধ্যক্ষ শীলভদ্রই (ইনি বাঙালী। সমতট রাজপরিবারের লোক ছিলেন।) সমস্তগুলি অধ্যয়ন করেছেন আর কেবল তিনিই সমস্তগুলি বুঝতে পারেন। ধর্মনিষ্ঠা ও প্রাচীন বয়সের জন্যে তিনি সকলের উপর প্রধান স্থান অধিকার করেছেন। তাঁর বয়স এসময়ে ১০৬ বৎসর হয়েছিল। এই সঙ্ঘারামে প্রত্যহ একশত স্থানে অধ্যাপনা চলে আর প্রত্যেক স্থানে ছাত্রেরা এক মুহূর্তও বিলম্ব না কোরো উপস্থিত হয়।

এখানে যাঁরা থাকেন তাঁরা সকলেই স্বভাবতঃই গাম্ভীর্য ও সম্ভ্রম রক্ষা কোরে থাকেন; সেই জন্যে এই সঙ্ঘারামের প্রতিষ্ঠা থেকে সাতশত বছরের মধ্যে একজনও এর নিয়মগুলি ভংগ করেন নি। দেশের রাজা এ'দের ভক্তি ও সম্মান করেন আর এই সঙ্ঘারামের ব্যয় নির্বাহের জন্যে ১০০টি গ্রাম দান করেছেন। প্রত্যহ এই সব গ্রামের দুইশত গৃহস্থ কয়েকশত মণ সাধারণ চাল আর কয়েকশত মণ ঘি ও দুধ যোগান দ্যায়। তাতেই ছাত্রদের সবরকম প্রয়োজন যথেষ্ট মেটে।"

প্রাকারের ভিতরে বহু বিহার ও স্তূপও ছিল। হিউএনচাঙ্ অনেকগুলির বিবরণ দিয়েছেন।

বালাদিত্য রাজার প্রতিষ্ঠিত একটা বিহার ৩০০ ফুট উঁচু ছিল। রাজা পূর্ণবর্মা কর্তৃক নির্মিত একটা প্রকাণ্ড আশীফুট উঁচু তামার তৈরী দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্তি ছিল। এটার উপর যে চাতালটি তৈরী হয়েছিল সেটা ছয় তালা উঁচু করতে হয়েছিল। হিউএনচাঙ্ যখন

---

*এ বিবরণের সংগে, কিম্বা Oxford or Heidelberg-এর সংগে কলকাতার স্কুল কলেজের চতুর্দিকে আবর্জনাময়, নেত্রপীড়াদায়কভাবে গঠিত অট্টালিকাগুলির তুলনা করলে অনেক ছাত্রের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি মমতার অভাব, নিয়মানুবর্তিতার অভাব ইত্যাদির অন্তত একটা কারণ হয়তো বোঝা

ভারতবর্ষ
(সপ্তম খৃষ্টাব্দী)

নালন্দায় ছিলেন, সেই সময়েই হর্ষবর্ধন একটা ১০০ ফুট উঁচু বিহার তৈরী কোরে সেটা পিতলের পাত দিয়ে মুড়ে দিয়েছিলেন।

সংঘারামের কর্তৃপক্ষ হিউএনচাঙ্কে সাদরে গ্রহণ করলেন। তাঁদের মধ্যে চারজন বিশিষ্ট ব্যক্তি সাত যোজন দূর থেকে হিউএন-চাঙ্কে অভ্যর্থনা কোরে নিয়ে এলেন। সংঘা-রামের কাছে যে বাড়িতে মৌদ্গল্যায়ন জন্মে-ছিলেন বলে প্রসিদ্ধি ছিল সেখানে তিনি একটু বিশ্রাম ও জলযোগ করলেন। তারপর সেখান থেকে দুইশত ভিক্ষু ও কয়েক সহস্র গৃহস্থ তাঁকে ঘিরে পতাকা, ফুল ও গন্ধদ্রব্য হাতে নিয়ে তাঁর গুণগান করতে করতে তাঁকে নালন্দায় প্রবেশ করালেন। সেখানে অন্য সকলে এসে কুশলপ্রশ্নাদি কোরে তাঁকে স্থবিরের পাশে বসালেন। অন্যরাও বসলেন। তখন আদেশ পেয়ে, 'কর্মদান' (ম্যানেজার) ঘণ্টা বাজিয়ে ঘোষণা করলেন—"ধর্মগুরু (হিউএনচাঙ্) যত-দিন সংঘারামে থাকবেন, সাধুদের রন্ধনপাত্র ও অন্য সামগ্রী অন্য সকলের মত, তাঁরও ব্যবহার করবার ক্ষমতা থাকলো।" তারপর দশজন সম্ভ্রান্ত অধ্যাপককে বলা হোল "এঁকে ধর্ম-রত্নের কাছে নিয়ে যান।" শীলভদ্রের প্রতি ভক্তি কোরে তাঁকে নাম ধরে না ডেকে 'ধর্মরত্ন' বলা হত।

তারপর তাঁদের পেছনে পেছনে হিউএন-চাঙ্ প্রবেশ কোরে গুরুর নিকট শিষ্যের দেয় যথাযোগ্য ভক্তি নিবেদন করলেন। হাঁটুর উপর ভর কোরে শীলভদ্রের নিকট গেলেন আর তাঁর পা চুম্বন কোরে মাটিতে মাথা ঠেকালেন। কুশলপ্রশ্নাদির পর শীলভদ্র আসন আনিয়ে সকলকে বসতে বললেন আর হিউএনচাঙ্কে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কোন দেশ থেকে আসছেন?" হিউএনচাঙ্ বললেন, "আমি চীনদেশ থেকে এসেছি আপনার কাছে যোগ-শাস্ত্র শিখবার জন্যে।"

এইকথা শুনে শীলভদ্র অশ্রুপূর্ণনয়নে তাঁর শিষ্য বুদ্ধভদ্রকে ডেকে পাঠালেন। এই বুদ্ধভদ্র শীলভদ্রের ৭০ বৎসর বয়স্ক ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। তিনি সূত্রজ্ঞ আর শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। শীলভদ্র তাঁকে বললেন, "সকলের অবগতির জন্যে ৩ বছর আগে আমার যে ব্যারাম ও কষ্ট হয়েছিল তার বিষয় বলো।" বুদ্ধভদ্র তাই শুনে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করে উঠলেন। তারপর শান্ত হয়ে বললেন—"উপাধ্যায় ২০ বছরেরও বেশী শূলবেদনায় কষ্ট পেয়েছিলেন। ৩ বছর আগে একবার যন্ত্রণা এরকম অসহ্য হয়েছিল যে, তিনি নিজের মৃত্যু ইচ্ছা করেন। এই সময়ে রাত্রে, তিনি এক স্বপ্ন দেখেন যেন ৩ জন দেবতা তাঁর কাছে আবির্ভূত। তাঁদের শরীর সুদর্শন, মুখ মহিমামণ্ডিত আর পরিধানে সূক্ষ্ম উজ্জ্বল বসন। এই তিনজন ছিলেন মঞ্জুশ্রী, অবলোকিতেশ্বর আর মৈত্রেয়। এঁরা আবির্ভূত হোয়ে তাঁকে আদেশ দিলেন যে, সূত্র ও শাস্ত্র অধ্যাপনা করবার জন্যে তাঁকে বেঁচে থাকতে হবে আর চীনদেশের একজন ভিক্ষু তাঁর কাছে অধ্যয়ন করতে চান। তাঁকে অধ্যাপনা করতে হবে। সেইথেকে উপাধ্যায়ের ঐ রোগ আর হয়নি।

ধর্মগুরু এই কাহিনী শুনে আনন্দ রোধ করতে পারলেন না। তিনি আবার প্রণাম কোরে বললেন, "তাই যদি হয় তা হ'লে আমার উচিত আমার যতদূর সাধ্য আপনার উপদেশ ও আজ্ঞার অনুবর্তী হয়ে চলা। গুরুদেব করুণা কোরে আমাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করুন।"

এই কথার পর বুদ্ধভদ্র তাঁকে "বালাদিত্য রাজার সংঘারামে" তাঁর নিজের (বুদ্ধভদ্রের) চারতলা বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ৭ দিন আতিথি সৎকার করলেন। তারপর "বোধিসত্ত্ব ধর্মপালের বাড়ির উত্তরে হিউএনচাঙের আবাস নির্দিষ্ট হ'ল। প্রত্যহ তিনি ১২০টি জাম, ২০টি সুপারী, ২০টি জায়ফল, আধছটাক কর্পূর আর সের দশেক (1 Peck) মহাশালি চাল পেতেন। "এ চাল এক একটা সিমের বিচির মতো বড়ো, চক্চকে আর এমন সুগন্ধ চাল আর নেই। এ কেবল মগধেই হয় আর কেবল রাজা বা বিশিষ্ট ধার্মিক লোকদেরই এটা দেওয়া হয়।" প্রতিমাসে তাঁকে তিনপ্রস্থ তেল আর দৈনিক প্রয়োজন মত ঘি ও অন্যান্য জিনিস দেওয়া হোত। তিনি চড়ে বেড়াবেন বলে একটা হাতী দেওয়া হোয়েছিল আর, একজন উপাসক আর একজন ব্রাহ্মণ তাঁর পরিচারক ছিল।

"শুধু ধর্মগুরুই না, এই সংঘারামে সব-দেশ থেকে আরও ভিক্ষু এইভাবে সংকৃত হয়। এরকম আদর তাঁরা আর কোথায় পাবেন?"

এতদিনে হিউএনচাঙ্ তাঁর অভীষ্ট গুরুর সন্ধান পেলেন আর শীলভদ্রের কাছেই তিনি প্রকৃত মহাযান ধর্মের তত্ত্বগুলি শিক্ষা করলেন। মহাযানপন্থী যোগশাস্ত্রের প্রণেতা অসঙ্গ আর বসুবন্ধু খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর লোক ছিলেন। এ'দের শিষ্য নালন্দার মঠাধ্যক্ষ ধর্মপালের অনুমান ৫৬০ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু হয়। আবার ধর্মপালের শিষ্য ছিলেন শীলভদ্র। সেই জন্যে হিউএনচাঙ্ এ'র কাছে মহাযানের আদি ও প্রকৃত মতগুলি শিক্ষা করতে পারেন আর পরে তাঁর নিজের লেখা 'সিদ্ধি' নামক দার্শনিক গ্রন্থে এই মতগুলি সন্নিবেশিত কোরে চীন ও জাপানে প্রচার করবার সুযোগ পান।

নালন্দায় থাকতেই হিউএনচাঙ্ নালন্দার উত্তরে মগধের পুরোনো রাজধানী 'রাজগৃহ' দেখতে যান। বুদ্ধের জীবিতকালে এখানেই মগধরাজ বুদ্ধশিষ্য বিম্বিসারের রাজধানী ছিল। বুদ্ধ অনেক সময়েই এখানে থাকতেন। পরে রাজধানী পাটলিপুত্রে চলে যায়। হিউএনচাঙ্ এই পরিত্যক্ত রাজধানীর ভগ্নাবশেষই দেখতে পান আর বুদ্ধের ইতিহাসের অনেক কিম্বদন্তীমূলক নিদর্শন দেখেন। যেখানে দেবদত্ত আর বিম্বিসারপুত্র অজাতশত্রু বুদ্ধকে মারবার জন্যে একটা মত্তহস্তী পাঠিয়ে দেয়, আর সেই হাতী তাঁর সম্মুখে এসে তাঁর আরাধনা করে, সেই স্থান; গৃধ্রকূট পর্বত, যেখানে বুদ্ধ 'প্রজ্ঞা পারমিতা' ও অন্যান্য বিষয়ে উপদেশ দেন, বেনুবন, যেখানে বিম্বিসার বুদ্ধকে একটা সঙ্ঘারাম নির্মাণ করে দেন, রাজা বিম্বিসার সমস্ত নগরবাসী সঙ্গে নিয়ে এসে যেখানে বুদ্ধকে অভ্যর্থনা করেন, ইত্যাদি বুদ্ধের সমসাময়িক অসংখ্য নিদর্শন এখানে হিউএনচাঙ্ দেখেন। তাছাড়া রাজগৃহেই বুদ্ধের মৃত্যুর পরদিন বুদ্ধের প্রকৃত উপদেশগুলি রক্ষা করবার জন্যে, তাঁর শিষ্যদের প্রথম সভা হয়।

হিউএনচাঙ্ নালন্দায় অন্ততঃ ১ বৎসর তিনমাস থেকে শীলভদ্রের নিকট যোগাচার শিক্ষা করেন। হিন্দু দার্শনিকতত্ত্ব ও সংস্কৃত ভাষাও এখানে ভালো করে শেখেন।

চীনের লিপি ভাবাঙ্কনমূলক (Ideograph)। এর প্রত্যেক অক্ষরই এক একটি সম্পূর্ণ বাক্য (word)। তা ছাড়া বিভক্তি আর ধাতুরূপ বদলে বদলে এক একটা বাক্যের নানারূপ দেওয়া চীন ভাষায় সম্ভব নয়। সেই জন্যে চীনভাষায় প্রায় ৪৫,০০০ অক্ষর প্রয়োজন হয়। হিউএনচাঙ্ ভারতবর্ষে এসে দেখলেন মাত্র কয়েকটা অক্ষরের সাহায্যে কি চমৎকারভাবে সমস্ত কথা লেখা সম্ভব হয়। আর পাণিনির ব্যাকরণ তো আধুনিক ইয়ুরোপীয় ভাষাতত্ত্বেরও আদর্শস্থানীয়। তাই সংস্কৃতভাষা ও ব্যাকরণ [illegible] হিউএনচাঙ্ চমৎকৃত হন আর এগুলি ভ্রমণকাহিনীতে এর অনেক বিবরণ তিনি দিয়েছেন।

## বাঙলা ও কামরূপ

নালন্দা থেকে বাঙলা দেশের দিকে বেরিয়ে প্রথমে হিউএনচাঙ্ দিনকতক 'কপোত' নামক এক মঠে থাকেন। "এই মঠের মাইলখানেক দূরে একটি চমৎকার নির্জন পাহাড় আছে। তাতে পরিষ্কার জলের ঝরণা, সুগন্ধী ফুল প্রচুর আছে। সেইজন্যে ঐ পাহাড়ের উপর অনেকগুলি দেবমন্দির আছে আর সেসব দেবমন্দিরে নানারকম অলৌকিক ব্যাপার প্রায়ই দেখা যায়। এই উপত্যকার মধ্যস্থলে অবলোকিতেশ্বরের একটি চন্দনকাঠে নির্মিত মূর্তি আছে আর কাছাকাছি অনেক জায়গা থেকে এখানে পূজা দিতে লোক আসে।" এই মূর্তির চারদিকে একটা রেলিঙ্ ছিল। রেলিঙের বাইরে থেকে ভক্ত যদি ফুলের মালা ছুড়ে এই মূর্তির হাতে পরিয়ে দিতে পারতো তা হলে বুঝতো যে দেবতা তার প্রার্থনা গ্রাহ্য করলেন। হিউএনচাঙ্ তিনটি প্রার্থনা করলেন—"প্রথম, আমার ইচ্ছা ভারতবর্ষে আমার শিক্ষা সমাপ্ত কোরে আমি যেন স্বদেশে ফিরতে পারি। এতে যদি সফলতার আশা থাকে তাহলে ফুলগুলি যেন আপনার পূজনীয় হাতে গৃহীত হয়। দ্বিতীয়তঃ একদিন যেন মৈত্রেয়কে পূজা করবার জন্যে দেবস্বর্গে আমার জন্ম হয়। এই ইচ্ছা পূর্ণ হবার আশা থাকলে ফুলগুলি যেন আপনার দুই হাতেই গৃহীত হয়। তৃতীয়তঃ, আমার নিজের সম্বন্ধে যথেষ্ট আশঙ্কা ও সন্দেহ আছে। বুদ্ধের প্রকৃতি যাঁদের শরীরে আছে আমি কি তাঁদের একজন? তা যদি হই আর ধর্মাচরণ কোরে ভবিষ্যতে যদি আমার কখনও বোধিপ্রাপ্তির আশা থাকে, তাহলে এই ফুলগুলি যেন আপনার গলায় পড়ে।" এই সব প্রার্থনা করে তিনি মালাগুলি মূর্তির দিকে ফেললেন, আর দেখলেন তিনি যেমন যেমন চেয়েছিলেন মালাগুলিও সেইরকম পড়ল।

তারপর হিউএনচাঙ্ গঙ্গাতীরে ইরিন পর্বতে এলেন। বর্তমান মুঙ্গেরের নাম ছিল ইরিন বা অনুর্বর পর্বত। সে সময়ে এখানে দশটা সঙ্ঘারাম আর হীনযানের সর্বাস্তিবাদিন শাখার দশ হাজার ভিক্ষু ছিলেন। ৬৩৮ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালটা হিউএনচাঙ্ এই মত শিক্ষা করবার জন্যে এখানে ছিলেন।

বাঙলা দেশে যাতায়াতের জন্যে নদীপথই সব চেয়ে সুবিধার ছিল। মুঙ্গের থেকে হিউএনচাঙ্ নিশ্চয়ই নৌকাযোগেই বাঙলা দেশে এসেছিলেন।

মুঙ্গের ছেড়ে তিনি প্রথমে এলেন চম্পাদেশে (আধুনিক ভাগলপুর)। চম্পার দক্ষিণে এ সময়ে গহন বন ছিল আর তাতে শত শত হাতী, গণ্ডার, নেকড়ে বাঘ আর কালো চিতাবাঘ বিচরণ করতো। এই প্রসঙ্গে হিউএনচাঙ্ বলেন যে, বাঙলাদেশের রাজাদের শত শত যুদ্ধ হস্তী ছিল।

চম্পা থেকে নদীপথে ৯০ মাইল ভাঁটিতে আধুনিক রাজমহলের কাছে কজঙ্গল নামে এক নগর ছিল। এখানে মহারাজ হর্ষবর্ধনের একটি প্রাসাদ ছিল। তিনি অনেক সময়ে এখানে থাকতেন।

৬৩৮ খৃষ্টাব্দে হিউএনচাঙ্ যখন বাঙলা দেশে আসেন, তখন হর্ষবর্ধনের প্রবল শত্রু শশাঙ্কের মৃত্যু হয়েছিল আর শশাঙ্কের সাম্রাজ্য কতকগুলি ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। এর মধ্যে পৌণ্ড্রবর্ধন রাজ্যের প্রধান নগরী পুণ্ড্রবর্ধন ছিল বর্তমানে বগুড়া শহরের সাত মাইল উত্তরে। এই নগরী করতোয়া নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। রাজমহলের দক্ষিণে গঙ্গানদীর সঙ্গে করতোয়ার দীপথে সংযোগ ছিল* আর উত্তর ভারতের বহু পণ্যদ্রব্য নদীপথে পুণ্ড্রবর্ধনে আসতো। হিউএনচাঙ্ পুণ্ড্রবর্ধনে আসবার সময়ে, দেশে নদীর তীরে তীরে নৌ-বাণিজ্য শুল্কের সরকারী কার্যালয়গুলি চমৎকার পুষ্পোদ্যান শোভিত দেখে খুসী হয়েছিলেন। তিনি বলেন, পুণ্ড্রবর্ধন জনবহুল নগরী। এদেশের ভূমি সমতল, খুব উর্বরা। বড় বড় কাঁঠাল গাছ প্রচুর কিন্তু খুব আদৃত। (কাঁঠাল গাছ আর ফলের বিবরণ দিয়েছেন।) অধিবাসীরা বিদ্যানুরাগী। ২০টি সংঘারাম, ৩০০০ ভিক্ষু আছেন। কয়েকশত দেবালয় আছে। সেখানে নানা সম্প্রদায়ের বিধর্মীরা জড়ো হয়। নগ্ন 'নিগ্রন্থ'-রাই সংখ্যায় বেশী।"

এই বিশাল নগরী এখন 'মহাস্থানগড়' নামক এক প্রকাণ্ড মাটির ঢিবিতে পর্যবসিত।

পুণ্ড্রবর্ধন থেকে আবার গঙ্গায় ফিরে এসে, হিউএনচাঙ্ ভাগীরথী তীরে বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলায়, শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ (আধুনিক 'রাঙামাটি') এলেন। এর সম্বন্ধে হিউএনচাঙ্ বলেছেন—এ রাজ্যের পরিধি আন্দাজ ২০০ মাইল। রাজধানীর পরিধি আন্দাজ ৪ মাইল। এখানকার অধিবাসীরা খুব ধনী আর সংখ্যায় বহু। জমি নীচু আর উর্বরা। খুব ভাল ফুল হয় আর নানা মূল্যবান শস্য হয়। আবহাওয়া সুখদ। লোকগুলির ব্যবহার সাধু ও প্রীতিজনক। এরা অত্যন্ত বিদ্যানুরাগী আর খুব যত্নসহকারে বিদ্যাচর্চা করে। (বৌদ্ধধর্মে) বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী দুইই আছে। গোটা দশেক সংঘারাম আর ২০০০ ভিক্ষু আছেন। ৫০টি দেবমন্দির আছে। বিধর্মীরা সংখ্যায় অনেক। রাজধানীর নিকটে—'রক্ত মৃত্তিকা' নামক একটা প্রকাণ্ড অনেকতালা উঁচু সংঘারাম আছে। সেখানে রাজ্যের সমস্ত বিখ্যাত পণ্ডিত আর বিশিষ্ট ব্যক্তিরা একত্র হন আর আত্মোন্নতির চেষ্টা করেন। কাছেই অশোক রাজা নির্মিত একটি স্তূপ আছে।

'রক্তমৃত্তিকা' সংঘারাম সম্বন্ধে হিউএনচাঙ্ একটি কাহিনী বলেছেন। দক্ষিণ ভারত থেকে এক দাম্ভিক গুণ্ডাজাতীয় পণ্ডিত কর্ণসুবর্ণতে এসেছিল। পেট ভর্তি বিদ্যার চাপে পেট যাতে ফেটে না যায়, সেইজন্য পেটের উপর একটা তামার থালা বেঁধে রাখতো। আর দুনিয়ার নির্বুদ্ধি বোকা লোককে আলো দেখাবার জন্যে মাথায় একটি প্রদীপ নিয়ে বেড়াতো।

এই সময়ে দক্ষিণ ভারত থেকেই একজন শ্রমণ শহরে আসেন। রাজা ঐ দাম্ভিককে আর সহ্য কোরতে না পেরে বললেন যে শ্রমণ যদি দাম্ভিক পণ্ডিতকে তর্কে হারাতে পারেন, তা হোলে তিনি একটা সংঘারাম স্থাপন করবেন। বলা বাহুল্য শ্রমণেরই জিত হয়েছিল।

গৌড়েশ্বর রাজা শশাঙ্ক শৈব ছিলেন আর হিউএনচাঙের পরম মিত্র হর্ষবর্ধনের শত্রু ছিলেন। হিউএনচাঙ্ শশাঙ্ককে ঘোর বৌদ্ধবিদ্বেষী বলেছেন। এমন কি তিনি বলেন, শশাঙ্ক বোধিদ্রুম সমূলে উৎপাটিত করবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু হিউএনচাঙ্ নিজেই শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ আর তাঁর রাজ্যের অন্যান্য স্থানের (পুণ্ড্রবর্ধন, সমতট ইত্যাদি) যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে শশাঙ্কের বৌদ্ধবিদ্বেষ সম্বন্ধে সন্দেহ থেকে যায়।

হিউএনচাঙ্ যদিও এ যাত্রায় কামরূপ যাননি, পরে গিয়েছিলেন, তবু কামরূপ সম্বন্ধে তিনি যে বিবরণ দিয়েছেন তা এখানে দিলাম। সেকালের কামরূপ রাজ্যের মোটামুটি সীমানা এখনকার আসাম প্রদেশের পশ্চিম অংশের মতন ছিল। হিউএনচাঙ্ বলেন—দেশটি পরিধিতে ২০০০ মাইল। জমি নীচু কিন্তু উর্বরা। পনস ও নারিকেল প্রচুর পরিমাণে হোলেও আদৃত। নদী বা বাঁধ থেকে খাল কেটে শহরগুলির চারিদিকে নেওয়া হয়। লোকগুলি সরল, সৎ, আকারে খাটো, গায়ের রঙ ঘোর হলদে। ভাষা মধ্য ভারত থেকে সামান্য তফাৎ। এদের স্বভাব একটু বুনো আর এরা সহজেই উত্তেজিত হয়। এরা বিদ্যাচর্চায় বেশ মনোযোগী আর এদের স্মরণশক্তিও ভালো। লোকগুলি দেবপূজা করে। বৌদ্ধধর্মে আস্থা নেই। সেইজন্যে এখানে আজ পর্যন্ত একটিও সংঘারাম হয়নি। বর্তমান রাজা ব্রাহ্মণ। নারায়ণদেবের বংশধর। এ'র নাম ভাস্করবর্মণ আর উপাধি কুমার। ইনি বৌদ্ধ না হোলেও বিদ্বান্; শ্রমণদেরও খুব আদর করেন।

এই বিবরণে হিউএনচাঙের উদার মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

হিউএনচাঙ্ সমতট বা দক্ষিণ বাঙলার সম্বন্ধে বলেছেন—জমি খুব উর্বরা। রাজধানীর পরিধি ৪ মাইল।* দেশে রীতিমত চাষ হয়—আর প্রচুর শস্য, ফুল, ফল জন্মে। আবহাওয়া সুখদ, লোকগুলি প্রীতিকর। তারা স্বভাবতই পরিশ্রমী, মাথায় খাটো, রং কালো। এরা খুব বিদ্যানুরাগী আর বিদ্যাচর্চায় রত। বৌদ্ধ ও বিধর্মী দুইই আছে। গোটা ৩০ সংঘারাম আর ২০০০ ভিক্ষু আছেন। সকলেই হীনযানী। শতখানেক দেবালয় আছে। সব সম্প্রদায়ের লোকই মিলেমিশে থাকে। নগ্ন নিগ্রন্থী বহু। একটা সংঘারামে নীল স্ফটিকের (blue jade) তৈরী ৮ ফুট উঁচু বুদ্ধমূর্তি আছে। এটা চমৎকারভাবে গড়া আর এর থেকে মধ্যে মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তি প্রকাশিত হয়।

তাম্রলিপ্ত সম্বন্ধে হিউএনচাঙ্ বলেছেন—"সমুদ্রের একটা বিস্তীর্ণ উপসাগর এ শহরে প্রবেশ করেছে। জলপথ আর স্থলপথ এখানে একত্র হয়েছে। সেইজন্য এখানে বহুমূল্য দুষ্প্রাপ্য জিনিস জমা হয় আর অধিবাসীরা সাধারণতঃ বেশ ধনী।"

তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকে সেকালে পূর্ব দ্বীপপুঞ্জ, চীন, জাপান ইত্যাদিতে বহু জাহাজ যাতায়াত করতো। ৬৭৩ খৃষ্টাব্দে আর একজন চৈনিক বৌদ্ধ পরিব্রাজক, ই-চিঙ্ সুমাত্রা দ্বীপ থেকে ভারতবর্ষে আসতে এই বন্দরেই নেমে ছিলেন। হিউএনচাঙ্ এখানে এসে জাহাজে বাঙালী নাবিকদের কাছে পূর্বদিকে দেশগুলির বিষয়ে নিশ্চয়ই সংবাদ নিয়েছিলেন—কারণ তাঁর বিবরণে ঐ সব দেশের নির্ভুল খবর পাওয়া যায়। "সমুদ্রতীর ধোরে উত্তরপূর্বদিকে যেতে যেতে শ্রীক্ষেত্রে আসা যায় (শ্রীক্ষেত্র ব্রহ্মের এক ভূতপূর্ব রাজধানীর প্রাচীন নাম) তারপরে ঈশানপুর রাজ্য (কম্বোডিয়ার 'ওঙ্কারধামের' আগে এখানেই রাজধানী ছিল) আরও পূবে 'মহাচম্পা' রাজ্য।" সে সময় আধুনিক আনামের উপকূলে সমৃদ্ধিশালী চম্পা রাজ্য ছিল)। (ক্রমশ

---

* সপ্তদশ শতাব্দীতে Vander Broucke-কৃত মানচিত্র দ্রষ্টব্য। সে সময়েও এ সংযোগ ছিল।

* রাজধানী ছিল সম্ভবত যশোর (Cunningham)।

## বিভক্ত আয়ারল্যাণ্ডের বেদনা

প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করে আয়ারল্যাণ্ড বৃটিশ কমনওয়েলথ থেকে বেরিয়ে এসেছে। ফলে আলস্টারের অর্থাৎ উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের দু'টি জেলার অধিবাসী বাদে অন্য সমস্ত আইরিশীয়দেরই বৃটিশ আইনের চক্ষে সম্পূর্ণ বিদেশী বলে গণ্য হবার কথা। কিন্তু তাহলে বৃটেনের পক্ষে মুশকিল। কারণ, হাজার হাজার আইরিশীয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৃটিশ সরকারী কাজে নিযুক্ত আছে, তাদের "বিদেশী" বলে গণ্য করতে হলে নানারকম আইনের বিভ্রাট ঘটবে। অন্য কারণও আছে যার জন্যে আইরিশীয়দের সম্পূর্ণ বিদেশী বলে গণ্য করা বৃটেনের পক্ষে খুব অসুবিধাজনক।

অন্য জাত হলে এমন অবস্থায় কী করবে ভেবে না পেয়ে আকুল হোত। কিন্তু ইংরেজরা তাদের পার্লামেণ্টকে সর্বশক্তিমান বলে মনে করে। তাদের বিশ্বাস যে পৃথিবীতে এমন সমস্যা নেই পার্লামেণ্টে বিল পাশ করে সমাধান করা যায় না। অতএব সর্বশক্তিমান বৃটিশ পার্লামেণ্টে এই মর্মে একটি বিল পাশ হাল যে, যদিও আয়ারল্যাণ্ড বৃটিশ কমনওয়েলথের বাইরে চলে গেছে তাহলেও বৃটেনে আইরিশীয়দের বিদেশী ("ফরেনার") বলে গণ্য করা হবে না। একজন জিজ্ঞাসা করেছিল আইরিশীয়রা যদি বৃটেনে বিদেশী না হয় তবে কি তাদের স্বদেশীয় বলে ধরতে হবে? বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী এ্যাটলী সাহেব উত্তর দেন—না। যদি তারা স্বদেশীয় না হয় এবং বিদেশীও না হয়, তবে তারা কি? এর উত্তরে এ্যাটলী সাহেব বলেন, তারা আইরিশীয়। এর পরেও যদি আবার কোন পার্লামেণ্টের সভ্য তার্কিকের মতো নতুন প্রশ্ন করতো তবে সবাই বুঝত যে, সে খাঁটি ইংরেজই নয়।

কিন্তু যে বিলে আইরিশীয়দের বিদেশীত্ব অস্বীকার করা হয়েছে তাতে আর একটি ধারা আছে যার জন্যে আইরিশীয়েরা মারমুখো হয়ে উঠেছে। সে ধারাটির মর্ম হলো এই যে, উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের অধিবাসীদের ইচ্ছা ব্যতীত বৃটেন উত্তর আয়ারল্যাণ্ডকে কমনওয়েলথের বাইরে যেতে দেবে না। আইরিশীয়েরা বলছে আয়ারল্যাণ্ডের বিভাগকে চিরস্থায়ী করার উদ্দেশ্যেই বৃটেন এই ঘোষণা বিধিবদ্ধ করছে। এই ঘোষণার ফলে আলস্টারের ঐক্য-বিরোধী দলের শক্তি বৃদ্ধি হবে। তাদের পক্ষে এখন ঐক্যের আহ্বান বা আপোষের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা আগের চেয়েও সহজ হবে। তারা ভাববে, "আমরা যদি ক্রমাগত বলতে থাকি যে আমরা আলাদা থাকবই এবং বৃটিশ কমনওয়েলথ ছেড়ে যাব না, তবে ডাবলিন কিছু করতে পারবে না, কারণ এখন বৃটিশ গভর্নমেণ্ট আমাদের সাহায্য
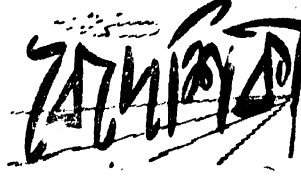
ভাবছে যে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট আইরিশ জাতি ও তাদের দেশকে বিভক্ত করে রাখতে বদ্ধপরিকর। সুতরাং ক্রমশঃ আইরিশ রক্ত গরম হচ্ছে। দক্ষিণ আয়ারল্যাণ্ডের অনেকে ভাবছে এর পরে আপোষের পথে দেশের ঐক্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা আর সম্ভব হবে না, আলস্টারের বৃটিশভক্ত দল ভালো কথায় কখনই কান দেবে না। আয়ারের গভর্নমেণ্ট অবশ্য এখনও মারামারি করার কথা বলছে না, কিন্তু বে-সরকারী মনোভাব ক্রমশই কড়া হয়ে উঠছে। শোনা যাচ্ছে যে, বে-আইনী ঘোষিত আইরিশ রিপাবলিকান সেনাবাহিনীর নামে আবার লোকসংগ্রহ আরম্ভ হয়েছে। নানারকম উত্তেজনামূলক পোস্টার ও পুস্তিকাও বার হচ্ছে যার মর্ম হোল এই যে খালি কথায় কাজ হবে না, শক্তির প্রয়োগ চাই।

আয়ারল্যাণ্ডে যদি আবার মারামারি কাটাকাটি শুরু হয় তবে তার জন্যে দায়ী হবে আলস্টারের তথাকথিত বৃটিশ রাজভক্ত দল এবং তাদের বৃটিশ পৃষ্ঠপোষকগণ। এদের পূর্ববর্তীরাই আয়ারল্যাণ্ডের রাজনীতিতে ব্যাপক হিংসানীতির প্রবর্তক। আয়ারল্যাণ্ডকে "হোম রুল" দেওয়ার সম্ভাবনা হওয়া মাত্রই এরা অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে বে-আইনী সৈন্যবাহিনী সৃষ্টি করে এবং প্রকাশ্য ঘোষণা করে যে তারা কিছুতেই উত্তর আয়ারল্যাণ্ডকে বৃটিশরাজের বাইরে যেতে দেবে না, দরকার হলে যুদ্ধ করে আটকাবে। বৃটিশ গভর্নমেণ্ট এই বে-আইনী সৈন্যবাহিনীকে দমন না করে বরঞ্চ তাকে প্রশ্রয় দেন এবং শেষ পর্যন্ত এই দলের দাবী মেনেই আয়ারল্যাণ্ডের অঙ্গচ্ছেদ করা হয়। আলস্টারের এই বে-আইনী সমরসজ্জার প্রতিবাদেই আইরিশ রিপাবলিকান সৈন্যবাহিনীর জন্ম। আলস্টারী পলিটিশিয়ান গুণ্ডাদের "ডাইরেক্ট এ্যাকশন" (direct action) এবং তার সঙ্গে বৃটিশ গভর্নমেণ্টের সহানুভূতি ও সহযোগিতা, এই দুয়ে মিলে আয়ারল্যাণ্ডে ব্যাপক অশান্তির গোড়াপত্তন করে। বহু রক্তক্ষয়ের পরে আইরিশ ফ্রি স্টেটের জন্ম হয়, কিন্তু অঙ্গচ্ছেদের বেদনা আয়ারল্যাণ্ড ভুলতে পারে নি, পারবেও না। সুতরাং আজ হোক, কাল হোক, উত্তর ও দক্ষিণ আয়ারল্যাণ্ডকে এক হতেই হবে। এই ঐক্যের প্রচেষ্টাকে সাক্ষাৎভাবে বা পরোক্ষভাবে যারাই প্রতিহত করতে চেষ্টা করবে তারাই আয়ার-

উত্তর আয়ারল্যাণ্ডকে নিজের সামিল করে রাখা বৃটেন সামরিক কারণে দরকার বলে মনে করে। দক্ষিণ আয়ারল্যাণ্ডের বন্দরগুলি ব্যবহার করতে না পারায় গত মহাযুদ্ধের সময়ে বৃটেনের খুবু অসুবিধা হয়েছিল। উত্তর আয়ারল্যাণ্ডও যদি হাতছাড়া হয়ে যায় তবে ভবিষ্যতে আরও অসুবিধা হবে এই আশঙ্কা বৃটেনের আছে। কিন্তু গত মহাযুদ্ধের সময়ে আয়ারল্যাণ্ড যে নিরপেক্ষ ছিল তার একটা কারণ ছিল অতীতের তিক্ত স্মৃতি এবং বিশেষ করে দেশ বিভাগের বেদনা। যতদিন পর্যন্ত সাক্ষাৎভাবে হোক বা পরোক্ষভাবে হোক বৃটিশ গভর্নমেণ্টকে আইরিশ জাতি আয়ারল্যাণ্ডকে দ্বিখণ্ডিত করে রাখার হেতু বলে মনে করবে ততদিন পর্যন্ত সংকটকালে বৃটেন আইরিশ জাতির আন্তরিক সহযোগিতা পাবে না। আয়ারল্যাণ্ডকে যদি ভাগ না করা হোত, তবে গত মহাযুদ্ধের সময়ে ডি'ভ্যালেরা আয়ারল্যাণ্ডকে নিরপেক্ষ রাখতেন কিনা সন্দেহ। সংকটকালে আইরিশ জাতির পূর্ণ সহানুভূতি পাবার সম্ভাবনার চেয়ে আইরিশ জাতিকে রুষ্ট রেখে উত্তর আয়ারল্যাণ্ডে কয়েকটা সামরিক ঘাঁটি রাখার অধিকারকে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট অধিকতর কাম্য বলে মনে করছেন। এটা দূরদৃষ্টির পরিচায়ক বলে মনে হয় না।

## সাংহাই-এর হাত বদল

চীনের বৃহত্তম নগর সাংহাই কম্যুনিস্টরা দখল করেছে প্রায় বিনা রক্তপাতে। শহরের মধ্যে যুদ্ধের ভয়ে যারা ভীত হয়েছিল তারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। কো-মিন-টাং সৈন্যবাহিনী সাংহাই রক্ষার জন্যে যুদ্ধ করবে বলে যে পাঁয়তাড়া কষছিল পরে দেখা গেল সে কেবল পালাবার রাস্তা ঠিক রাখার জন্যে। কো-মিন-টাং-এর সৈন্য যারা পালাতে পারে নি, তারা তাদের পোষাক পুড়িয়ে ভীড়ের মধ্যে মিশে গেছে। এ যেন মৌচাকে ধোঁয়া দিয়ে মৌমাছি তাড়িয়ে চাক দখল করার মতো ব্যাপার। চীনের যুদ্ধ, যুদ্ধ না ভোজবাজি বোঝার উপায় নেই। তবে আর যাই হোক য়ুরোপে যাকে গৃহযুদ্ধ বলে—অর্থাৎ যাতে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোক দ্বিধাবিভক্ত হয়ে একটা বিশেষ ধরণের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যে এক পক্ষ অপর পক্ষকে নির্মূল অথবা সম্পূর্ণ নির্বল করে দিতে প্রাণপণ চেষ্টা করে—চীনের যুদ্ধ আসলে সে রকম গৃহযুদ্ধই নয়। চীনে প্রভুত্বকামী দুটো পরস্পর-বিরোধী দলের সংঘর্ষ চলছে বটে এবং এই দুই দলের মধ্যে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক আদর্শেরও বিরোধ আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু গৃহযুদ্ধ বলতে সাধারণ লোকের মধ্যে যে সচেতন দ্বন্দ্ব ও পারস্পরিক বিদ্বেষের কথা মনে আসে চীনের যুদ্ধে সে-সব বেশি কিছু নেই। তা না হলে সাংহাইয়ের মত একটা

লের হাতে গেল অথচ শহরের পথে ঘাটে একটু হাতাহাতি পর্যন্ত হোল না। চীনের জনসাধারণ যেন সমুদ্রস্নানের কৌশল আয়ত্ত করেছে, হয় ঢেউ আসছে দেখে ডুব মেরে মাথার ওপর দিয়ে ঢেউ কাটাচ্ছে নয়তো উঁচু হয়ে ভেসে থেকে ঢেউএর বেগ সামলাচ্ছে। এই দেখে মনে হয় যে চীনের বহু বৎসরব্যাপী যুদ্ধে জনসাধারণের যদিও ক্লেশের সীমা নেই, বহু গৃহযুদ্ধের ফলে একটা জাতির সমস্ত মন যেমন বিষিয়ে যায় চীনে এখনও তা হয়নি। যুদ্ধটা চীনা মনের কাছে এখনও একটা বাহ্য এবং বিশ্রী ব্যাপার। এটা চীনের পক্ষে সৌভাগ্যের কথা।

চীনের দুই পক্ষই য়ুরোপীয় বুলি আওড়াচ্ছে বটে কিন্তু চীনের গণ-মনের ওপর তার স্থায়ী প্রভাব কতটুকু কে জানে!

য়ুরোপের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে বিখ্যাত সাংবাদিক জন গান্থার সম্প্রতি একটি প্রবন্ধে লিখেছেনঃ "ফ্রান্স এবং ইতালীর মধ্যে যেটা বড় প্রভেদ আমার মনে হয় সেটা হোল এই যে, রীতিমত একটা গৃহযুদ্ধ ছাড়া ফ্রান্সে কম্যুনিজমের প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়, কিন্তু ইতালীকে ঘুম-পাড়ানীর গান শোনাতে শোনাতে এক রাত্তিরের মধ্যে কম্যুনিস্ট অধীন করে ফেলা যেতে পারে। এর কারণ এই যে, ইতালীর জনসাধারণের, মায় সাধারণ ইতালীয় কম্যুনিস্টদের পর্যন্ত, কম্যুনিজ্‌ম্ যে কী সে সম্বন্ধে কোন সঠিক ধারণাই নেই।" য়ুরোপের নিজস্ব মাল কম্যুনিজ্‌ম্ সম্বন্ধে ইতালীয় জনসাধারণের জ্ঞান যদি এত অল্প হয় তবে কম্যুনিজ্‌ম্ সম্বন্ধে চীনা জনসাধারণের জ্ঞান কতটুকু হতে পারে সেটা সহজেই অনুমেয়। গৃহযুদ্ধ না করেই যদি ইতালীতে কম্যুনিস্ট কর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠা সম্ভব বলে ধরা যায়, তবে গান্থারের যুক্তি অনুসারে চীনে কম্যুনিজ্‌ম্ প্রতিষ্ঠার জন্যে গৃহযুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা তো আরো কম। আমাদের যা মনে হয় তা পূর্বেই বলেছি—য়ুরোপীয় রাজনৈতিক শাস্ত্রে যাকে গৃহযুদ্ধ বলা হয় চীনের যুদ্ধ সে পর্যায়ে পড়েই না। তবে ইতালী ও চীনের মধ্যে আরো একটি বড় প্রভেদ আছে,—কোনরকমে ইতালীতে একবার কম্যুনিস্ট প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে ইতালীয় জনসাধারণ তা মেনে নেবে, কিন্তু প্রাচীন অভিজ্ঞ চীন বেশি হাঙ্গামা না করে যে কোনো বিদেশী লেবেল মুচকে হেসে গায়ে এঁটে নিতে পারে, কিন্তু ভিতরের বস্তুটি যদি খাঁটি চৈনিক না হয় তবে সে কিছুতেই তাকে আত্মসাৎ করবে না, কৌশলে উগরে ফেলে দেবে। মাও-সি-তাং-এর জয়ে চীনে য়ুরোপীয় কম্যুনিজম্‌এর জয় সূচিত হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

ইতিমধ্যে সাংহাইতে বিদেশীরা বিশেষ করে ইংরেজরা কম্যুনিস্টদের প্রশংসায় যেরকম মুখর হয়ে উঠেছে সেটা বড়ই উপভোগ্য। কম্যুনিস্ট সৈন্যদের সংযম, নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতির প্রশংসায় চীনের বৃটিশ-পরিচালিত সংবাদপত্রগুলি একেবারে পঞ্চমুখ। তা থেকে মনে হয় যে, চীনের কম্যুনিস্ট রাজত্বে বৃটিশ বণিকের রুজি-রোজগারের পথ অনির্দিষ্ট-কালের জন্য উন্মুক্ত থাকবে বলে তারা আশা করছে।

## বৃটিশ কর্তৃক গুর্খা সৈন্যের প্রয়োগ

মালয়ের সংবাদে প্রায়ই গুর্খা সৈন্যদের তৎপরতার উল্লেখ পাওয়া যায়। তাতে মনে হয় যে, বৃটিশ কর্তৃপক্ষ মালয়ে অনেক গুর্খা সৈন্য কাজে লাগাচ্ছেন। এ থেকে অনেকের ধারণা হতে পারে যে, ভারত গভর্নমেণ্ট বৃটিশদের গুর্খা সৈন্য ধার দিয়েছেন। আসলে কিন্তু তা নয়। বৃটিশ সৈন্য বাহিনীতে এখনও অনেক গুর্খা সৈন্য নিযুক্ত আছে এবং বৃটিশ সৈন্য-বাহিনীর জন্যে এখনও গুর্খা সৈন্য সংগ্রহের ব্যবস্থা আছে। ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময়ে ভারত, বৃটিশ ও নেপাল গভর্নমেণ্টের মধ্যে গুর্খা সৈন্যদের সম্বন্ধে একটা চুক্তি হয়। তখন ভারতীয় সৈন্য বাহিনীতে যে গুর্খা রেজিমেণ্টগুলি ছিল তার মধ্যে কয়েকটি স্বেচ্ছায় বৃটিশ সৈন্য বাহিনীর এবং বাকীগুলি ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হয়। আরও ঠিক হয় যে, অতপর ভারতীয় বাহিনী যদেচ্ছা গুর্খা সৈন্য সংগ্রহ করতে পারবে এবং বৃটিশ গভর্নমেণ্টও প্রতি বৎসর একটা নির্দিষ্ট সংখ্যার অনধিক গুর্খা সৈন্য বৃটিশ বাহিনীর জন্য সংগ্রহ করতে পারবেন, আর তার জন্যে ভারত-গভর্নমেণ্ট বৃটিশ গভর্নমেণ্টকে দুটি রংরুটের আস্তানা এবং রসদ ইত্যাদি সংগ্রহের সুবিধা দেবেন।

এই ব্যবস্থা যখন হয় তখনই সেটা অনেকের কাছে আপত্তিজনক মনে হয়েছিল। যদিও নেপাল একটি পৃথক রাষ্ট্র, তাহলেও ভারতীয় ও নেপালীর মধ্যে সাধারণভাবে জাতিগত বা সংস্কৃতিগত কোন পার্থক্য নেই। সুতরাং বিদেশে ভারতীয়দের কৃতকর্মের সুনাম দুর্নামের ভাগ যেমন নেপালীদের বইতে হয় তেমনি নেপালী-দের কৃতকর্মের ফলও ভারতীয়েরা এড়াতে পারে না। এই কারণে বৃটিশের সৈন্য বা পুলিশ বাহিনীতে গুর্খা থাকা ভারতের পক্ষে বিপজ্জনক। বৃটিশ এশিয়ার নানাস্থানে বৃটিশ কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্যে গুর্খা সৈন্য ও পুলিশ নিযুক্ত রেখেছে, তার ফলে সে-সব জায়গার এশিয়াবাসীদের মনে স্বভাবতই গুর্খাদের তথা ভারতীয়দের প্রতি একটা অশ্রদ্ধা ও বিদ্বেষের ভাব বিদ্যমান। এটা জেনেশুনে ভারত গভর্নমেণ্টের পক্ষে বৃটিশ বাহিনীতে গুর্খা নিয়োগের ব্যবস্থায় সম্মতি দেওয়া উচিত হয় নি। নেপাল স্বাধীন রাষ্ট্র হলেও বৃটিশের ভারত ত্যাগের পরে ভারত গভর্নমেণ্টের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নেপালী সরকার বৃটিশ গভর্নমেণ্টের সাথে কোন চুক্তি করতে নিশ্চয়ই ইতস্তত করতেন।

সৈনিকের কাজ গুর্খাদের একটা জাতিগত বৃত্তি এবং তার ওপর নেপালের অর্থনীতিও অনেকটা নির্ভর করে। কিন্তু সৈনিকের কাজের জন্যে নেপালীদের বৃটিশ গভর্নমেণ্টের স্বারস্থ হবার কোন প্রয়োজন নেই। যত নেপালী সৈনিকের কাজ চায় তার জন্যে উপযুক্ত সকলেরই ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে স্থান হতে পারে। তাছাড়া ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে থাকলে গুর্খাদের 'ভাড়াটে' সৈনিকের বদনাম হয় না, কারণ জাতি ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে নেপালীদের পক্ষে ভারতবর্ষ বিদেশ নয়। বৃটিশের গৌরবে নেপালীদের গৌরব হতে পারে না, কিন্তু ভারতবর্ষের জন্যে অর্জিত গৌরবে নেপালীদের গৌরব বোধ করার কোন বাধা তো নেই-ই, অধিকারই আছে। বিদেশে নেপালী এবং ভারতীয়দের সুনাম ও দুর্নাম একসূত্রে বাঁধা। সুতরাং বৃটিশ বাহিনীতে গুর্খাদের কী কাজে লাগানো হচ্ছে তার প্রতি ভারতবর্ষ উদাসীন থাকতে পারে না। কিন্তু যতদিন বৃটিশ বাহিনীতে গুর্খা থাকবে ততদিন তাদের কোথায় কী কাজে লাগানো হবে, সেটা সম্পূর্ণ নির্ভর করবে বৃটিশ গভর্নমেণ্টের ওপরে, সেখানে অন্য কোন গভর্নমেণ্ট কিছু বলতে পারেন না।

সুতরাং বৃটিশ বাহিনীতে গুর্খা রেজি-মেণ্ট একেবারে না থাকলেই কেবল এ সমস্যার সমাধান হতে পারে। এর দুটো ধাপ আছে। একটা হোল বৃটিশ বাহিনীতে নতুন গুর্খা সৈন্য ভর্তি বন্ধ করা এবং দ্বিতীয়টা হোল বৃটিশ বাহিনীতে বর্তমানে যে গুর্খা রেজি-মেণ্টগুলি আছে সেগুলোর সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করা। প্রথম কাজটা একেবারেই কঠিন নয়। কারণ, নতুন যারা সৈন্যের কাজ নিতে আসছে তারা যদি ভারতীয় বাহিনীতে ভর্তি হতে পারে তবে তারা বৃটিশের চাকরী করার জন্যে ব্যস্ত কেন হবে? ভারতীয় বাহিনীতে গুর্খা ও ভারতীয়দের মধ্যে কোনো তারতম্য করা হয় না, গুণানুসারে পদোন্নতির সম্ভাবনা গুর্খা ও ভারতীয় উভয়ের পক্ষেই সমান, কিন্তু বৃটিশ বাহিনীতে গুর্খার স্থান চিরদিনই ইংরেজের নীচে থাকবে। সুতরাং বৃটিশ বাহিনীতে গুর্খা ভর্তি বন্ধ করার প্রস্তাবে নেপালীরা বা নেপাল সরকারের কোন ন্যায়-সঙ্গত আপত্তি থাকতে পারেই না।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হোল বৃটিশ বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত বর্তমান গুর্খা রেজিমেণ্টগুলো নিয়ে। তিনপক্ষ একমত হলে এই রেজিমেণ্টগুলোকে বৃটিশ বাহিনী থেকে ভারতীয় বাহিনীতে ফিরিয়ে আনা কিছু কঠিন কাজ নয়। প্রকৃত-পক্ষে ১৯৪৭ সালে এদের যেমন একবার 'অপশন' বা বেছে নেবার অধিকার দেওয়া হয়েছিল তেমনি

এখন আরেকবার তাদের ভারতীয় বাহিনীতে ফিরে আসবার সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। সুযোগ পেলে বর্তমান অবস্থায় গুর্খারা বৃটিশ বাহিনী থেকে ভারতীয় বাহিনীতে ফিরে আসতে চাইবে, এটাই সম্ভব ও স্বাভাবিক। ১৯৪৭ সালের ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট নিশ্চয়ই অনিচ্ছুক হবেন। কিন্তু ভারত ও নেপাল সরকার যদি একমত হয়ে একযোগে পরিবর্তন দাবী করেন তবে বৃটিশ গভর্নমেণ্টকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজী হতে হবে। বৃটিশ কর্তৃত্ব রক্ষার জন্যে এশিয়াবাসীদের বিরুদ্ধে গুর্খা সৈন্যের প্রয়োগ ভারত ও নেপালের জনমত কখনই সমর্থন করতে পারে না।

## বর্মার পরিস্থিতি

বর্মার প্রধান মন্ত্রী থাকিন নু'র বিলাত-যাত্রা কিছুদিনের জন্য স্থগিত হয়েছে। এদিকে বর্মায় বিদ্রোহীদের সাত দল যে যেখানে পারে 'রাজত্ব' করতে লেগে গেছে। বিদ্রোহীদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার অভাব সত্ত্বেও বর্মা সরকারের সৈন্যদের তেমন উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের সংবাদ কিছু আসছে না। যাকে বলে অচল অবস্থা!

## পারিস বৈঠক

প্যারিসে বৃটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া ও আমেরিকার পররাষ্ট্র-সচিবদের কনফারেন্সে গুঁতোগুঁতি চলছে। প্রশ্ন এই—পরিশ্রান্ত হলে পর দুই পক্ষের সুবুদ্ধির উদয় হবে, না যে যার বাড়ি ফিরে গিয়ে আগের চেয়ে দ্বিগুণ জোরে 'মুখ খারাপ' করতে থাকবে? এই লেখা ছাপা হবার আগেই বোধহয় উত্তর মিলবে।

২৮।৫।৪৯

**খাদ্যমন্ত্রী** শ্রীযুক্ত জয়রামদাস দৌলতরাম বলিয়াছেন—

"The Kisans have their destiny in their own hands".

বিশুখুড়ো বলিলেন—"বরাবর কিন্তু তারা তা-ই জানত কিন্তু মন্ত্রিদপ্তরের ঠাট দেখে হঠাৎ ভাবলে বুঝি তা নয়,—বোকা কি না!"

* * *

**স্থির** হইয়াছে ভারতীয় পার্লামেন্টে সদস্য হইতে হইলে বয়স কম পক্ষে ত্রিশ হওয়া চাই।—"বেশি পক্ষে অবশ্যি বাহাত্তুরেও আপত্তি নেই"—বলিলেন বৃদ্ধ খুড়ো।

* * * *

**গুজরাটের** অধিবাসীরা পণ্ডিত নেহরুর নিকট "গির" নামক বনের সিংহ সংরক্ষণের জন্য আবেদন জানাইয়াছেন। একটি অসমর্থিত সংবাদে প্রকাশ যে সিংহরা যদি খাঁটি ও অকৃত্রিম ভারতীয় হয় তাহা হইলে—পণ্ডিতজী নাকি আবেদনকারীদের প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন।

* * * *

**মধু** মক্ষিকাপালন বিশেষজ্ঞ বি. ডব্লিউ হাওয়ার্ড বলিয়াছেন—পাকিস্থানের মৌচাকে ভারতের মৌচাক অপেক্ষা তিন গুণ মধু বেশী—"এবং পাকিস্তানের মৌমাছিদের হুল নেই"—শেষের মন্তব্যটা অবশ্যি বিশু খুড়োর।

* * * *

**কলিকাতার** পুলিশ সম্প্রতি রাস্তা হইতে অনেক ষাঁড় পাকড়াও করিয়া স্থানান্তরে প্রেরণ করিয়াছে। আমরা তাহাদিগকে অভিনন্দন জানাইতেছি। আর বৃষ স্পর্শ করিয়া যারা ফাটকা বাজারে ব্যবসা করিতে যান তাহাদিগকে সবিনয়ে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই—ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে "ধর্মের ষাড়ের" প্রয়োজন ফুরাইয়া গিয়াছে।

**কলিকাতার** জনৈক সহযোগী জানাইতেছেন—"বহু পুরাতন পাপী গ্রেপ্তার"। বিশু খুড়ো বলিলেন—"এটা পুলিশের কৃতিত্বের পরিচায়ক হলেও সংবাদটায় আমরা আশ্বস্ত হতে পারিনি কেন না কোলকাতায় বর্তমানে নতুন পাপীর সংখ্যাই বেশী।"

* * * *

**গাঁজিকাসেবীরা** নাকি গভর্নমেণ্টের নিকট গাঁজার উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আবেদন জানাইয়াছেন। "গাঁজা আর চাল উৎপাদন বৃদ্ধির মধ্যে Priority কোন্ বস্তুটিকে দেয়া হবে তা নির্ধারণ করার জন্যে সরকার একটি কমিশন নিযুক্ত করেছেন" মন্তব্য করিলেন জনৈক সহযোগী। সরকারী কমিশনের খবর অবশ্য আমরা পাই নাই। কিন্তু মন্তব্য শুনিয়া মনে হইতেছে গাঁজা ঘাট্তির সংবাদ নেহাৎ বাজে।

* * * *

**কলিকাতার** টেলিফোন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সাধারণের অভিযোগের উত্তরে কর্তৃপক্ষ একটি সচিত্র প্রবন্ধ পরিবেশন করিয়াছেন। অনেক ক্ষেত্রেই যে ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য অপারেটার দায়ী নহেন ইহাই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়। উপসংহারে বলা হইয়াছে—They are women after all. বিশু খুড়ো বলিলেন—"এই শেষের কথাটা আগে বললেই তো হতো কেন না আমরা তো জানি Frailty, thy name is woman"!!

* * * *

**সৈন্য** বিভাগে কাজের জন্য মেয়েদের একটি ইউনিট গঠন করা হইয়াছে। কালীন W. A. C.-র মত গঠিত না হইলেও —it cannot be completely divorced from military requirements.

বিশুখুড়ো বলিলেন—"কিন্তু matrimonial requirements সম্বন্ধে এদের যোগাযোগের কথা না জানা পর্যন্ত ইউনিটটির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশ্বস্ত হওয়া যাচ্ছে না।"

* * * *

**শ্রীযুক্তা** রেণুকা রায় নাকি উনোতে মেয়ে-সদস্যের সংখ্যা বৃদ্ধির সুপারিশ করিয়াছেন।—"উনুনে পুরুষ সদস্যের সংখ্যা বৃদ্ধির আইন পাশের অপেক্ষা মাত্র"—এই মন্তব্যও খুড়োর।

* * * *

**ভারত** সরকার জাপানকে Wire সরবরাহের কন্ট্রাক্ট দিয়াছেন। Wire pulling-এর কন্ট্রাক্ট কে পাইয়াছেন তাহা এখনও জানা যায় নাই।

* * * *

**পশ্চিম** বঙ্গের স্টেট্ বাসে অতঃপর বাঘের পূর্ণ মূর্তির বদলে শুধু মস্তক থাকিবে।—"Heads I win tails you lose" গোছের ব্যাপার কিছু নয় তো—বলিলেন জনৈক সহযাত্রী। খুড়ো আলোচনায় যোগ দিয়া বলিলেন—"কি জানি, এর মাথা-মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি নে। শুনছি বাস্ নাকি ভাড়া খাটাবার পরিকল্পনাও হচ্ছে,—একে ভাঁড়ামি ছাড়া কি বলুব?"

* * * *

**খেলার** মাঠের অপ্রত্যাশিত জয়পরাজয় সম্বন্ধে আলোচনায় জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"খেলার মাঠ আর ঘোড় দৌড়ের মাঠ যদ্দিন কাছাকাছি থাকবে তদ্দিন এ হবেই"—তার কথা বিশ্বাস আমরা নিশ্চয়ই করি না, কিন্তু অর্থ তার অত্যন্ত প্রাঞ্জল। কণামাত্র সত্যও যদি এই রূঢ় অভিযোগে থাকে—তবে বলিতেই হইবে Thou too sports-

# জীবন-তৃষা

## আর্ভিঙ্ স্টোন

**অনুবাদক—অদ্বৈত মল্ল বর্মন**

**[ পূর্বানুবৃত্তি ]**

**ভিনসেণ্ট** উপরে উঠে তার ঘরে গেল। সুখাদ্যে তার পেট ভরেছে এবং শরীর রম হয়ে উঠেছে। তার বিছানাটাও বেশ বড়ো র নরম। বিছানার চাদর পরিষ্কার; বালিসের াড়টা ধবধবে শাদা। দেয়ালে টাঙানো বিশ্বের রা শিল্পীদের আঁকা ছবির প্রিণ্ট। বাক্স লে নিজের কাপড়চোপড়গুলি একবার খল। সারি সারি সার্ট, আণ্ডারওয়ার, মোজা, রেস্টকোট বাক্সে সাজানো রয়েছে। আলনার ছে গেল। সেখানে দেখতে পেল অতিরিক্ত জোড়া জুতো রয়েছে, আলনাতে ঝুলছে র একাধিক সুট আর গরম ওভারকোট। সব দেখে তার এই জ্ঞান হল, সে ভীরু, সে পুরুষ। খনিমজুরদের কাছে সে দারিদ্র্যের হাত্ম্য প্রচার করে বেড়ায় আর সে নিজে রাম ও প্রাচুর্যের মধ্যে আকণ্ঠ ডুবে আছে। ভণ্ড ছাড়া, অসাধু কথার ব্যবসায়ী ছাড়া র কিছুই নয়। আর তার ধর্ম অলস অকর্মা ভু ছাড়া আর কিছুই নয়। মজুরদের উচিত ল তাকে অবজ্ঞা করা, তাকে 'বরিনেজ' থেকে ড়িয়ে দেওয়া। সে তাদের সমব্যথী বলে ভান র; তাদের দুঃখের সাথী, দরদী বন্ধু বলে ন করে। কিন্তু এখানে রয়েছে তার সুন্দর ন্দর গরম কাপড়, শোবার পরিপাটি বিছানা। নিমজুরেরা সাতদিনে যা খেতে পায়, সে কবেলাতেই তার চেয়েও বেশি খাদ্য উদরসাৎ র। এই আরাম ও বিলাসের জন্য তাকে কি তে হয়? কিছুই না। একরকম বিনা শ্রমেই এসব ভোগ করছে। সে ভালো মানুষের ন করে কতগুলো ডাহা মিথ্যে কথা তাদের নাতে গিয়েছিল। তার একটি কথাও তাদের শ্বাস করা উচিত নয়। তার বাণী শুনতে সা, তাকে নেতা বলে মেনে নেওয়া তাদেব টেই উচিত হয়নি। তার সমস্ত আরামের বিনটাই জানিয়ে দিচ্ছে, সে যা বলে সব থ্যে, সব ঝুটো। সে আবার ব্যর্থ হয়েছে, দারুণভাবে এসেছে তার ব্যর্থতা। এমন শোচনীয় ব্যর্থতা তার এর আগে আর কখনো আসেনি!

এখন সে কি করবে? তার সামনে দুটি পথ খোলা আছেঃ তার এই মিথ্যার বেশাতি তাদের কাছে ধরা পড়ার আগেই সে রাত্রির আঁধারে বরিনেজ থেকে পালিয়ে যেতে পারে, তা যদি না যায় তো, নিজের চোখে সে যা দেখে এসেছে তার থেকে তার জ্ঞানচক্ষু খুলে গিয়ে সে সত্যিকারের ঈশ্বর-সেবক হতে পারে।

বাক্স থেকে সব কাপড়চোপড় বের করে তাড়াতাড়ি সেগুলো ব্যাগে পুরল। তার সুট, জুতো, বইপত্র আর ছবির প্রিণ্টগুলিও ব্যাগে পুরে ব্যাগ বন্ধ করে দিল। আপাততঃ কিছু-ক্ষণের জন্য ব্যাগটা চেয়ারের উপর রেখে, ছুটতে ছুটতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

খাদের একেবারে নীচের দিকে একখণ্ড সমতল জমি আছে। তার ঠিক পরেই চড়াই শুরু হয়েছে—সেখান থেকে পাইন গাছের বন ক্রমে উপরের দিকে উঠে গিয়েছে। এই পাইন বনে মজুরদের খানকয়েক কোঠা ঘর ইতস্তত ছড়ানো। কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা করে ভিনসেণ্ট জানতে পারল একখানা ঘর সেখানে খালি পড়ে আছে। ঘরটা খাড়া ঢালু জমিতে তৈরী একটি কুঠুরী বিশেষ। জানালা নেই, একটি মাত্র ঢুকবার পথ আছে। মাটির মেঝে অনেকদিনের অব্যবহারে খেবড়ে গিয়েছে। ঘরের যে-দিকটা নীচু জমিতে দাঁড়ানো সেদিকে ঘেঁসে গলিত বরফ হু হু ক'রে ঘরে এসে ঢোকে। সারা শীতকাল কেউ এঘরে বাস করেনি বলে পেরেকের ছেঁদা আর দেয়ালের ফাটলগুলি ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটায় বড়ো হয়ে গিয়েছে, ওগুলি বুজানো হয়নি।

একটি স্ত্রীলোক তাকে ঘর দেখাতে নিজে এসেছিল। ভিনসেণ্ট তাকে জিজ্ঞাসা করল, "এ জায়গার মালিক কে?"

"মালিক ওয়াসমেসের একজন ব্যবসায়ী।"

"ঘরের ভাড়া কত জানো?"

"মাসে পাঁচ ফ্রাঙ্ক।"

"বহুত আচ্ছা। ঘরটা আমি নেব।"

"কিন্তু আপনি এখানে বাস করতে পারবেন না মঁসিয়ে ভিনসেণ্ট!"

"কেন পারব না?"

"অত্যন্ত খারাপ। অত্যন্ত খারাপ এ জায়গাটা। এমন কি, আমি যেখানে থাকি, তার চাইতেও খারাপ। গোটা ওয়াসমেসে এমন খারাপ কোঠা আর একটাও পাবেন না। এটা সবচেয়ে খারাপ।"

"ঠিক এই জন্যই আমার এ ঘরটা দরকার।"

সে আবার টিলার পথ ধরে ডেনিসদের বাড়িতে চলে এল। একটা নতুন তৃপ্তির আমেজে আজ তার চিত্ত প্রসন্ন। সে যখন ঘরে ছিল না সেই সময়ে মাদাম ডেনিস কোনো একটা কাজে তার ঘরে গিয়েছিলেন এবং তার জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা অবস্থায় দেখে এসেছিলেন।

ভিনসেণ্ট আসতেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হয়েছে মঁসিয়ে ভিনসেণ্ট? হঠাৎ আপনি হল্যাণ্ড ফিরে যাচ্ছেন কেন?"

"আমি হল্যাণ্ড যাচ্ছি না তো? 'বরিনেজে'ই থাকব।"

"তবে ... ... ...।" তাঁর চোখে মুখে বিভ্রান্তির ছায়া।

ভিনসেণ্ট তাঁকে সব কথা বুঝিয়ে বলল। শুনে তিনি সুর নরম করে বললেন, "আমার কথা বিশ্বাস করুন মঁসিয়ে ভিনসেণ্ট, ওখানে গিয়ে থাকা আপনার পোষাবে না। কেননা, ওভাবে থাকা আপনার অভ্যেস নেই। যীশু খৃষ্টের দিন আর আজকের দিনের মধ্যে অনেক তফাৎ। আজকের দিনে আমরা সবাই যে যত ভালভাবে থাকতে পারি সেই চেষ্টাই করব। আপনি যে সজ্জন, লোকে তা জানবে আপনার কাজ দেখে; আপনার জীবন যাপন দেখে নয়।"

কিন্তু কিছুতেই ভিনসেণ্টের মত ফেরানো গেল না।

সে ওয়াসমেসের বণিকের সঙ্গে দেখা করে ঘরটা ভাড়া করল এবং সে-ঘরে বাস করতে চলে গেল। কয়েক দিন পর তার প্রথম মাইনের টাকা এলো। পঞ্চাশ ফ্রাঙ্কের একখানি চেক। তা দিয়ে সে ছোট একটা কাঠের খাট ও একটা পুরোনো 'স্টোভ' কিনল। এসব কেনাকাটার পর হাতে যা রইল তা দিয়ে অনায়াসে মাসের বাকি ক'টা দিনের রুটি, টক পনীর আর কফি কেনা যেতে পারে। ঘরে যাতে জল না ঢুকতে পারে সে জন্য ঘরের সব আবর্জনাগুলো পিছনের দেওয়ালের গায়ে জড়ো করে রাখল আর ছেঁড়া চট দিয়ে পেরেকের ছেঁদা আর ফাটলগুলোকে বন্ধ করে দিল। সে এখন জীবনযাত্রার দিক দিয়ে খনিমজুরদের সমান। তারা যেরকম ঘরে বাস করে, সেও আজ সেই-রকম ঘরের বাসিন্দা, যে খাদ্য তারা খায়, যে

বিছানায় তারা শোয়, আজ থেকে সেও সেই খাদ্য খাবে সেই বিছানায় শোবে। আজ থেকে সে তাদেরই একজন। তাদের ঈশ্বরের বাণী শোনাবার পুরো অধিকার আজ সে অর্জন করেছে।

( ১৩ )

'কারবনেজেস বেল্‌জিক' নামে প্রতিষ্ঠানটি 'ওয়াসমেসে'র এলাকার মধ্যে চারিটি কয়লাখনি পরিচালনা করেন। এর ম্যানেজার-টিকে ভিনসেণ্ট একটা সর্বগ্রাসী জন্তু মনে করেছিল। আসলে তিনি তা নন। তিনি একটু মোটাসোটা একথা ঠিক; কিন্তু তাঁর চোখদুটিতে সহানুভূতির ছাপ; প্রথম জীবনে তিনি কিছু কিছু দুঃখযন্ত্রণাও ভোগ করেছেন, সেটা তাঁর চালচলনে ধরা পড়ে।

ভিনসেণ্ট তাঁর কাছে যখন মজুরদের দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করল, তিনি তা মন দিয়ে শুনলেন। শুনে বললেন, "সবই আমি জানি মসিঁয়ে ভ্যান গোঘ্‌ সবই পুরোনো কাহিনী। লোকে মনে করে বেশি মুনাফার লোভে আমরা তাদের ইচ্ছে ক'রে না খাইয়ে মারি। কিন্তু আমায় বিশ্বাস করুন মসিঁয়ে, লোকের এ ধারণা একেবারে ভুল। প্যারিসে খনিসমূহের যে আন্তর্জাতিক ব্যুরো আছে, তাদের 'চার্ট' আমি আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি। তার থেকে আপনি আসল ব্যাপার বুঝতে পারবেন।"

তিনি একটি বড়ো 'চার্ট' টেবিলের ওপর মেলে দিলেন। চার্টের নীচের দিকে একটা নীল জায়গাতে আঙুল রেখে বললেন—

"এই দেখুন মসিঁয়ে। পৃথিবীতে যত খনি আছে তার মধ্যে বেলজিয়ামের খনি থেকে সব চেয়ে কম পয়সা আসে। এখানে কয়লা এত বেশী নীচু থেকে তুলতে হয় যে, সে-কয়লা খোলা বাজারে বিক্রি করে মুনাফা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এখানে কয়লা তোলার যা খরচ পড়ে, ইউরোপের আর কোনো দেশের খনিতে তত খরচ পড়ে না। অথচ লাভ হয় সব চাইতে কম। অন্যান্য খনি-ওয়ালারা কম খরচায় কয়লা তুলে যে দরে বিক্রি করে,' আমাদেরও সেই দরেই বিক্রি করতে হয়। এভাবে দিন দিন আমরা দেউলে হয়ে পড়ছি। কথাগুলো আপনি শুনছেন তো?"

"হাঁ শুনছি।"

মজুরদের যদি আমরা রোজ এক ফ্রাঙ্ক করে বেশি মজুরি দিই তা হলে কয়লার বাজার দর থেকে উৎপাদনের দর অনেক বেশি পড়ে যাবে। তা হলে আমাদের কারবার গুটিয়ে ফেলতে হবে। তখন ওরা সত্যি না খেয়ে মারা যাবে।"

কমাতে পারেন না? তাঁরা একটু কম লাভ করলে মজুররা কিছু বেশি পেতে পারে।"

ম্যানেজার মাথা নেড়ে বিষণ্ন মুখে বললেন, "না মসিঁয়ে, তা হয় না। কয়লাখনি কিসের জোরে চলে জানেন তো? পুঁজির জোরে। আর-সব শিল্পের মতো এটাও চলে পুঁজির জোরে। পুঁজি থেকে মুনাফা আসতেই হবে। তা না হলে সে-পুঁজি তুলে নিয়ে আরেক কাজে লাগিয়ে দেবে। 'কারবনেজেস্‌ বেলজিকে'র স্টক থেকে এখন মাত্র শতকরা তিন টাকা হারে ডিভিডেণ্ড দেওয়া হচ্ছে। এই ডিভিডেণ্ড যদি আর আধ পারসেণ্ট কম হয়ে যায়, মালিকরা তা হলে সব টাকা তুলে নেবে। তা যদি নেয়, আমাদের খনিগুলো সব বন্ধ করে দিতে হবে। কারণ মূলধন ছাড়া তো আর ব্যবসা চলবে না। মজুরদের তাহলে উপোস করে মরতে হবে। কাজেই দেখতে পাচ্ছেন মসিঁয়ে, মালিকরা কিম্বা ম্যানেজাররা বরিনেজের এই সাংঘাতিক অবস্থার সৃষ্টি করেন নি। এর জন্য দায়ী এখানকার খনির ভিতরের অবস্থা। আর এই অবস্থার জন্য মানুষকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। সে দোষ ভগবানের।"

কেউ ভগবানকে দোষ দিলে ভিনসেণ্ট অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে সে ক্ষুণ্ণ হল না। ম্যানেজারের কথাগুলি তাকে ভাবিয়ে তুললো। বলল—

"আপনারা আর কিছু না পারেন, মজুরদের কাজের ঘণ্টা তো কমিয়ে দিতে পারেন? খনিতে ঢুকে রোজ তেরো ঘণ্টা কাজ করছে; মরে যাবে যে। গ্রাম একেবারে ছারখার হয়ে যাবে।"

"না মঁসিয়ে। আমরা কাজের ঘণ্টা কমাতে পারি না। তা যদি পারতাম তো মাইনেই বাড়িয়ে দিতাম। কারণ তাদের মাইনে বাড়ালে আমাদের যেমন ক্ষতি হয়, কাজের ঘণ্টা কমালেও তেমনি ক্ষতি হবে। রোজ পঞ্চাশ সেণ্ট দিয়ে যে কয়লা পাই, কাজের ঘণ্টা কমালে কয়লা পাব তার চেয়ে অনেক কম। এর ফলে টন-পিছু উৎপাদনের খরচা বেড়ে যাবে।"

"আর একটা বিষয় আছে—সেটাকে আপনারা অবিশ্যি ভালো করতে পারেন—"

"খনির বিপজ্জনক অবস্থার কথা বলছেন তো?"

"হাঁ। আর কিছু নাই পারেন, দয়া করে অন্ততঃ খনির দুর্ঘটনা আর মৃত্যুর সংখ্যা কমাতে পারেন!"

ম্যানেজার শান্তভাবে ঘাড় নেড়ে বললেন, "না মঁসিয়ে, আমরা তাও পারি না। কেন পারি না তাও বলছি। আমাদের ডিভিডেণ্ড অত্যন্ত কম বলে, নতুন নতুন 'স্টক' বাজারে

আয় আমাদের একদম নেই। এমন এক হতচ্ছাড়া কাজ নিয়ে পড়ে আছি যে, কি বলব। এই আপদে যে কেউ মাথা গলিয়েছে সেই মরেছে। আমি কম করেও হাজার বার এর ভেতর গিয়েছি। গিয়ে যা দেখে এসেছি তাতে আমার বিশ্বাসের মূলে পর্যন্ত নাড়া দিয়েছে। খাঁটি, নিষ্ঠাবান ক্যাথলিক ছিলাম আমি। এখন হয়ে গিয়েছি নির্মম নিরীশ্বর-বাদী। একটা কথা আমি বুঝি না। লোকে বলে ঈশ্বর মানুষকে দুঃখের আগুনে পুড়িয়ে খাঁটি সোনায় পরিণত করেন। কিন্তু তিনি এই রকম অবস্থার সৃষ্টি কেন করবেন? এতে তাঁর কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে? ইচ্ছা করে মানুষকে দুঃখ দিয়ে তাঁর লাভ কি? যুগ যুগ ধরে বাঁধা পশুর মতো দুঃখের আগুনে তিনি তাদের দগ্ধাবেন কেন? এক ঘণ্টার জন্যেও তাঁর স্বর্গীয় অনুকম্পা তাদের ওপর বর্ষিত হবে না কেন? তিনি যে আছেন, এই কি তাঁর পরিচয়?"

( ১৪ )

ভিনসেণ্ট বলবার মতো কিছুই ভেবে পেলো না। সে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছে। সে নীরবে বাড়ি চলে এলো।

ফেব্রুয়ারী মাসটা বছরের সবচেয়ে কষ্টের মাস। এই পাহাড়ের ওপর দিয়ে হু হু করে হাওয়া আসে। অবাধ অবিচ্ছিন্ন দুরন্ত হাওয়া। তার ঝাপটায় পথে বেরুনো দায়। ঘরে থেকেও কষ্টের পার নেই। মজুরদের কুঁড়েগুলিতে তখন শীতের সাম্রাজ্য। ঘর গরম রাখার জন্য কালো টীলা থেকে কয়লার গুঁড়ো কুড়িয়ে আনার দরকার তখন অত্যন্ত বেশী হয়ে পড়ে। কিন্তু হাওয়া বরফের মতো ঠাণ্ডা। তার ওপর প্রচণ্ড তার বেগ। মেয়েরা কালো টীলায় উঠে কয়লার গুঁড়ো খুঁজবে তার উপায় নেই। এই প্রাণঘাতী শীতের হাত থেকে বাঁচবার জন্য দু'একখানা স্কার্ট, ব্লাউজ আর সুতী মোজা ছাড়া তাদের আর কিছুই নেই।

শিশুরা শীতে কুকড়ে যাবে, জমে যাবে। এজন্য তাদের দিনরাত বিছানায় শুইয়ে রাখা হয়। কয়লা নেই। স্টোভ জ্বলে না বলে গরম খাবার তৈরী করাও প্রায় সম্ভব হয় না। পুরুষেরা খনির ভেতরে আগুনের মতো উত্তাপের মধ্যে কাজ করে ওপরে ওঠে; ওপরে তাপ তখন শূন্য ডিগ্রিরও নীচে। এই মর্মান্তিক ঠাণ্ডার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করার তাদের সংস্থান কই? বরফ ঢাকা মাঠের ওপর দিয়ে হাওয়া ঠেলতে ঠেলতে যে যার বাড়িতে আসে। শীতে জমে গিয়ে কিংবা নিউমোনিয়া হয়ে সপ্তাহের সাতটা দিনই কারো না কারো ঘরে একটি দুটি লোক মারা যায়। সে মাসে ভিনসেণ্ট অনেকগুলি মৃতের শেষ কৃত

**আশাবরী (দ্বিতীয় সংস্করণ)**—শ্রীউপেন্দ্রনাথ গাপাধ্যায়। প্রকাশকঃ বেংগল পাবলিশার্স, ,বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। পৃঃ ২, মূল্য চার টাকা।

তিলে-শিবানীপুর গ্রামের ধ্বংসে-পড়া মুখুজ্জে শর শেষ বংশধরদের লইয়া এই উপন্যাসের ন্ড। দুই ভাই—জ্যেষ্ঠ দুর্গাপদ, অলস প্রকৃতির, পেরতা তাহার ধাতে সহিত না। কনিষ্ঠ হরিপদ শ্রমী কিন্তু দাদার প্রতি নির্ভরশীল। দুর্গাপদ য়াজন হইলেই জমিজমা বাঁধা দিয়া অর্থ সংগ্রহ য়া সংসার পরিচালনা করিত। কিন্তু সে পথ দ হইবার পর সে চোখে অন্ধকার দেখিল এবং ন্য দায়ী করিল হরিপদকে। হরিপদ ভাগ্য রবর্তনের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে লাগিল অচিরেই কমলার আশীর্বাদে তাহার বেশ দু আয় হইতে লাগিল। কিন্তু দৈবদুর্বিপাকে র ব্যবসা নষ্ট হইয়া গেল এবং অচিরে সে-ও মুখে পতিত হইল। তাহার নিরুপায় স্ত্রী রবালা একমাত্র কন্যা শক্তির হাত ধরিয়া আবার শুরের ভিটায় ফিরিয়া আসিল। এখান হইতেই ন্যাসের সুরু। বহু ঝড়ঝাপ্টা তাহাদের উপর া গেল। গিরিবালা গ্রাম্য উৎপীড়ন সহ্য করিতে পারিয়া মনক্ষোভে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। র পর পাদপীঠে আসিল নবগোপাল, অশোক দি। হরিপদ যখন কলিকাতায় ব্যবসা করিত ন জমিদার পুত্র অশোকের সহিত তাহার পরিচয়। শাকের ভাল লাগিত শক্তিকে শক্তিও মনে মনে ত অশোককে। গিরিবালার মৃত্যুর পর ঘটনা- ন শক্তির দায়িত্ব তাহাকেই নিতে হয়; কিন্তু র ভয়ে বিবাহের কথা সে আর তাহার নিকট পন করিতে ভরসা পায় না। অবশ্য এই কচেরও অবসান হয় একদিন। পিতা যাদব- এই অনুমতিক্রমে উভয়ের মিলন সম্পন্ন হয়।

উপেনবাবুর সুদক্ষ লেখনি চালনায় প্রতিটি চরিত্র ন্ত হইয়া উঠিয়াছে। নবগোপাল, মদন, ভূতোর রতি চরিত্র স্বকীয়তায় উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। জীবনের যে ছবি তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন; তারা, অজয়নাথ প্রভৃতি চরিত্র তাঁহার লেখনীতে জ্বলভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

উপন্যাসটি পাঠ করিয়া আমরা তৃপ্তি পাইয়াছি।

—৭৮।৫৯

**দুর্বার** (নাটক)—শ্রীসমরেশচন্দ্র রুদ্র। প্রকাশকঃ রূপ পাবলিশিং হাউস লিঃ, ৬৭।৫৭, স্ট্র্যান্ড ক রোড, কলিকাতা। পৃঃ ৬৪, মূল্য এক টাকা।

'দুর্বার' তিন অঙ্কে বিভক্ত একটি ক্ষুদ্র নাটক। খক নাটকটিকে যৌন সমস্যামূলকরূপে বিশেষ বে চিহ্নিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু নি যেভাবে চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহাতে ধারণভাবে সমাজ সমস্যারই একটি দিক পরিস্ফুট য়া উঠিয়াছে। অবশ্য এই সমস্যা নূতন নহে ং যে চরিত্র তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন তাহাও তনত্বের দাবী করিতে পারে না।

সংলাপ মন্দ নয়, তবে বিষয়বস্তুতে নূতনত্ব থাকায় নাটকটি তেমন জমাট বাঁধিতে পারে নাই।

—৭০।৫৯

**SYCHOLOGY & DISORDERS OF SEX —Ajit Kumar Deb, M.Sc., M.B., D.P.M. (Eng.) The Readers' corner, 5, Sankar Ghose Lane, Calcutta—6, Pp. 220. Price Rs. 6|8.**

যৌনবিজ্ঞান পাঠ ও যৌন জ্ঞান অর্জন করা নেকে অন্যায় বলে বিবেচনা করেন। কিন্তু ন্যান্য প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানের চেয়ে এই বিজ্ঞানের রুত্ব কম তো নয়ই, বরং বেশি। লেখক এই

গ্রন্থে যৌন জীবনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। যৌন জীবনের সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মানুষকে অনেক বিপর্যয় ও প্রলোভন অতিক্রম করে চলতে হয়। কিন্তু এই বিজ্ঞান সম্বন্ধে যদি জ্ঞান আহরণ করা যায়, তাহলে জীবনের পথে অন্ধের মতো চলতে হয় না। প্রথম যৌবন উন্মেষের সঙ্গে ছেলে ও মেয়েদের দেহে ও মনে কি কি পরিবর্তন ঘটে, কিভাবে তাদের চালিত করলে বিপথে তারা যেতে পারে না সে বিষয় লেখক আলোচনা করেছেন। বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে তাঁর আলোচনায় অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য পাওয়া গেছে। গ্রন্থশেষে কয়েকটি আর্টপ্লেট যুক্ত হয়েছে।

**CURRENT AFFAIRS—Edited by Dr. A. N. Bose, M.A., P.R.S., Ph.D , Published by A. Mukherjee & Co. Ltd., College Square, Calcutta. Price 5|8.**

পৃথিবী, ভারতবর্ষ ও পাকিস্থান সম্পর্কে বিবিধ বিষয়ক জ্ঞাতব্য তথ্যে এই গ্রন্থখানি পরিপূর্ণ। গ্রন্থখানি প্রধান দুই ভাগে বিভক্ত (১) পৃথিবী ও (২) ভারতবর্ষ (পাকিস্থানসহ)। প্রথম ভাগে দশটি অধ্যায় আছে। এই দশটি অধ্যায়ে গত মহাযুদ্ধের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, সম্মিলিত জাতি প্রতিষ্ঠানের বিবরণ, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ পরিচয় ও রাজনৈতিক অবস্থা, যানবাহন, অর্থনৈতিক সমস্যা, ব্যবসা বাণিজ্য, বিমান, শিল্প ও সাহিত্য, সংবাদপত্র খেলাধূলা প্রভৃতি সম্বন্ধে বহু প্রয়োজনীয় তথ্য পরিবেশন করা হইয়াছে। দ্বিতীয় ভাগেও ভারতবর্ষের (পাকিস্থানসহ) শাসনতান্ত্রিক বিবরণ, রাজনৈতিক অবস্থা, অর্থনীতি, আমদানী-রপ্তানি, বিজ্ঞান, শিক্ষা, শিল্প ও সাহিত্য, সংবাদপত্র, প্রবাসী ভারতীয়, খেলাধূলা প্রভৃতি সম্পর্কে বহু তথ্য দশটি অধ্যায়ে বিবৃত করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া ক্যালকাটা স্ট্যাটিস্টিক্যাল এসোসিয়েশন কর্তৃক প্রস্তুত পৃথিবী ও ভারতবর্ষ (পাকিস্থানসহ) সম্পর্কিত সংখ্যা বিবরণ গ্রন্থ মধ্যে দেওয়া হইয়াছে। এই গ্রন্থে দশখানা মানচিত্র দেওয়া হইয়াছে তন্মধ্যে একখানা রঙীন। জীবিত প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও গ্রন্থ মধ্যে দেওয়া হইয়াছে। ডক্টর এ এন বসুর সাধারণ সম্পাদনায় বিভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক এই গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায় লিখিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ভাগে Art & Literature শীর্ষক যে অধ্যায়টি আছে তাহাতে যে অংশে বাঙালী সাহিত্যিকদের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে তাহাতে লেখকের অধিকতর বিচারবুদ্ধির পরিচয় আমরা আশা করিয়াছিলাম। সাহিত্যিকদের মধ্যে যাঁহাদের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে এবং যাহাদের 'অন্যান্য'এর তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে তাহার উপর চোখ বুলাইলেই গলদ কোথায় তাহা ধরা পড়িবে। জীবিত প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের পরিবারের মধ্যেও এমন অনেক নাম বাদ পড়িয়াছে যাহা উহার অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত ছিল। এইরূপ সামান্য সামান্য ত্রুটি সত্ত্বেও গ্রন্থখানি যে সাংবাদিক, সাহিত্যিক, ব্যবসায়ী ও অন্যান্য সকল শ্রেণীর পাঠকেরই বিশেষ উপকারে আসিবে তাহা নিঃসংশয়েই বলা চলে। গ্রন্থখানির বিশেষ সমাদর হইবে বলিয়া আমরা আশা করি।

**এই বৎসরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস**
**'চার্বাকে'র**

# ছন্দহারা

মূল্য—সাড়ে তিন টাকা।

প্রকাশক—**দি গ্রেট ইষ্টার্ণ লাইব্রেরী**

১বি, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২

বিখ্যাত বামপন্থীনেতা

**অধ্যক্ষ ডাঃ অতীন্দ্রনাথ বসু বলেন—**

শ্রীযুক্ত............সমীপেষু

আপনার "ছন্দহারা" পড়লাম। বইটা ভাব ও চিত্রের দিক দিয়ে অসামান্য। ছোট ছোট সাধারণ ঘটনা যা প্রত্যেকের জীবনেই আসে, উপেক্ষিত হয়ে চলে যায়, তাকে শিল্পী ও ভাবুকের চোখ দিয়ে দেখা আমাদের সাহিত্যিক শ্রেণীর মধ্যে বিরল। সাধারণ জিনিষকে অপরূপ রূপ দেওয়াই রসিকের কাজ। সেদিক দিয়ে 'চার্বাক' সার্থক ।

কয়েকটা ত্রুটীর উল্লেখ করব যা না থাকলে বইখানি বাংলা ভাষায় একটী শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করতে পারতো। প্রথম ভাষার দুর্বলতা ও কোথাও কোথাও কটুতা। যেমন চলতি ভাষার মধ্যে "নি" স্থানে 'নাই'। কোথাও কোথাও চিত্রণ একটু অস্বাভাবিক এবং অপরিণত যেমন মণিকার আত্মহত্যার ভাণ, অপর্ণার চিঠির জন্য মাণিকের পড়া ছেড়ে দেওয়া ইত্যাদি। মাণিক একটু অতিরিক্ত মেয়েঘেঁষা, অথচ প্রতিপদেই সে মেয়েদের আত্মনিবেদনকে এড়িয়ে যাচ্ছে সে ব্রহ্মচারীর বাড়া—এটাও যেন কেমন অস্বাভাবিক ও আপনবিরোধী।

যাক এসব হ'ল ত্রুটী যা দিয়ে বইয়ের আসল গৌরব ক্ষুণ্ণ হবে না। বালক ও কিশোরদের মন আশ্চর্যভাবে ধরা পড়েছে। মনোদি ও কনক অন্তরে ছাপ মেরে রাখে। অতি সাধারণ দৈনন্দিনের মধ্যে থেকে তাহারা অসাধারণ। বইটা নিখুঁত না হ'লেও সার্থক।

(সি ৩১০৬)

## অনুমোদিত চিত্র

৩রা জুন থেকে বাধ্যতামূলকভাবে ভারত সরকারের ফিল্ম ডিভিসন কর্তৃক তোলা ছোট ছবি ভারতের প্রত্যেক চিত্রগৃহে নিয়মিতভাবে দু'হাজার ফিট ক'রে দেখাবার নির্দেশ ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বম্বে ও পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্র সংঘ, মোশন পিকচার্স এসোসিয়েশন অফ ইণ্ডিয়া ও বেঙ্গল মোশন পিকচার্স এসোসিয়েশনের প্রদর্শক শাখার অধিবেশন হয়। দুটি সংঘই এই বলে প্রস্তাব পাশ করে যে, যদিও তারা সরকারের তোলা ছোট ছবি দেখাতে রাজী আছে কিন্তু তার জন্যে তারা কোন রকম ভাড়া দিতে মোটেই রাজী নয়। ভারত সরকারের এই সিদ্ধান্তের তারা তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে এবং সমস্ত চিত্রগৃহকে এই ব'লে নির্দেশ দিয়েছে যে, তারা যেন ছোট ছবি দেখানো নিয়ে ফিল্ম ডিভিশনের সঙ্গে কোন রকম চুক্তিতে সই না করেন এবং এ নিয়ে যদি সরকার থেকে কোন রকম চাপ দেওয়া হয় তো ব্যাপার খুবই গুরুতর হ'য়ে দাঁড়াবে।

এদিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে ২৭শে তারিখে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ক'রে বলা হয়েছে যে, আগামী ৩রা জুন থেকে প্রদেশের সমস্ত চিত্রগৃহকে হাজার ফিট ক'রে ফিল্ম ডিভিশনের তোলা ছবি দেখাতে হবে। ছবি নিয়মিতভাবে সরবরাহ করার ব্যবস্থা হয়েছে এবং কলকাতায় অবস্থিত ফিল্ম ডিভিশনের অফিস থেকে সকলকে তা নিয়ে যেতে হবে।

আরও প্রকাশ যে, এবার থেকে সিনেমার লাইসেন্সের মধ্যে এই ব'লে এক নতুন ধারা যুক্ত ক'রে দেওয়া হ'চ্ছে যাতে চিত্রগৃহ ফিল্ম ডিভিশনের 'অনুমোদিত' ছবি দেখাতে বাধ্য থাকবে।

এখানে কথা উঠতে পারে যে, ৩রা জুন থেকে 'অনুমোদিত ছবি' দেখানো যখন আরম্ভ হবার কথা সেক্ষেত্রে চিত্রব্যবসায়ীরা এতো দেরী ক'রে অর্থাৎ তার মাত্র ৬।৭ দিন আগে, ২৬শে ও ২৭শে মে-তে তাদের প্রতিবাদ জানাচ্ছেন কোন্ আক্কেলে! এর কারণ হ'চ্ছে এই, প্রথমতঃ সরকার থেকে 'অনুমোদিত চিত্র' দেখানো বাধ্যতামূলক করা হবে ব'লে বহু মাস পূর্বেই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হ'লেও ঠিক কবে থেকে তা দেখাতে হবে তা জানানো হ'য়েছে মাত্র ২৪।২৫শে মে তারিখে। দ্বিতীয়তঃ, এ ছবি দেখাবার জন্যে ভাড়া ধার্য করা হবে তা যদিও জানানো হ'য়েছিলো, কিন্তু তার পরিমাণ কতো হবে তা মোটেই জানানো হয়নি এর আগে। বরং ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীদিবাকর এই কথাই বার বার আভাস দিয়ে এসেছেন যে, ভাড়াটা নামমাত্রই হবে। এখন দেখা যায় যে, সেই 'নামমাত্র' ভাড়া হ'চ্ছে বহুক্ষেত্রে চিত্রগৃহের ক্ষেত্রে বাজারে

যেসব ছোট ছবি পাওয়া যায় তাদের চেয়ে তিন-চার গুণ বেশী। এ ব্যাপারে সরকারী হিসেবের কোন যুক্তির বালাই নেই। যদিও চিত্রগৃহের সঙ্গে চুক্তি করা হ'চ্ছে দু' হাজার ফিট ছবির জন্যে কিন্তু বর্তমানে পর্যাপ্ত সংখ্যক ছবি না থাকায় তার জায়গায় সরবরাহ করা হবে এক-হাজার ফিট ক'রে। অথচ দু'হাজার ফিটের জন্যে যে পরিমাণ ভাড়া ধার্য রয়েছে একহাজার ফিটের জন্যেও তা-ই দিতে হবে। তারপর সিনেমা লাইসেন্সের মধ্যে বাধ্যতামূলক ধারাটি প্রবিষ্ট করা আইনসিদ্ধ হতে পারে কি-না তাও ভাববার বিষয়।

একেতো যে ভাড়া ধার্য করা হয়েছে সেটা নিতান্তই অন্যায় এবং তার মধ্যে কোন যুক্তিই পাওয়া যায় না। তারপর, এখনকার যা প্রদর্শন সময় নির্ধারিত রয়েছে তাতেই রাত্রের প্রদর্শনীর পর যানবাহন পাওয়া মুশকিলের ব্যাপার, অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাওয়াই যায় না। অতঃপর দু'হাজার ফিট আরও যুক্ত হলে অর্থাৎ আরও প্রায় সওয়া বাইশ মিনিট সময় বেড়ে গেলে রাত্রে ছবি দেখার পর দর্শকদের কি অবস্থা হবে বুঝতেই পারা যাচ্ছে—রাত্রের প্রদর্শনীতে নিতান্তই হাঁটাপথের দূরত্বের মধ্যে যারা থাকে তারা ছাড়া আর যে কেউ ছবি দেখতে যাবে তা আশা করা যায় না। তার মানে চিত্রগৃহের ব্যবসা প্রকৃতপক্ষে মাত্র দুটো প্রদর্শনীর মধ্যে নিবদ্ধ হয়ে যাবে। বম্বেতে রাত বারোটার পর কোন প্রমোদ অনুষ্ঠান চলতে পারবে না বলে একটা হুকুম বলবৎ আছে—সে হুকুমেরই বা কি হবে?

তৃতীয় কথা হচ্ছে যে, মন্ত্রণা পরিষদ জানাচ্ছেন যে, বছরের বাহান্নো সপ্তাহের জন্যে বাহান্নোখানি যে ছোট ছবির দরকার হবে তার মধ্যে ফিল্ম ডিভিসন তুলবে ছত্রিশখানি। বাকী ষোলখানি নেওয়া হবে বাইরে থেকে। এই ষোলখানি মধ্যে বিদেশের শ্রেষ্ঠ ছোট ছবিও ধরা হবে। অর্থাৎ এখন বিভিন্ন রাষ্ট্রের ভালো-ভালো ছবিগুলো বেছে নিতে গেলেই ষোলখানি অনায়াসেই ছাপিয়ে যায়। বিদেশী ছবি নেওয়া বন্ধ করে দেওয়াও অনুচিত হবে—কারণ বিদেশের বহু রাষ্ট্রে এমন সব সর্বসাধারণের শিক্ষাপ্রদ ও জ্ঞানগর্ভ ছবি তোলা হয় যা আমাদের দেশে বর্তমানে তোলা সম্ভব নয়—সেসব ছবি আমাদের দেশে ব্যাপকভাবে দেখাবার ব্যবস্থা করতেই হবে। সে ক্ষেত্রে খুব কড়াভাবে বিচার করলেও অন্তত বারোখানির কম বিদেশী ছবি না নিলে চলবে না। সুতরাং দেশের স্বাধীন প্রযোজকদের জন্যে বড় জোর মাত্র চার-খানি ছবি জুটিয়ে যাওয়ার সংস্থান থাকছে। দেশের নিয়মিত প্রায় সাড়ে তিন শো চিত্র-নির্মাতা ছাড়া সৌখীন ও আদর্শবাদী বহু ছোট ছবির প্রযোজকদের মধ্যে এই চারখানি ছবি নিয়ে যে কি রকম কেলেঙ্কারীর সৃষ্টি হবে তা অনুমান করা শক্ত নয়।

কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্ত খুব সুফলপ্রসূ হবে না। দেশের গুণী লোকেরা অবজ্ঞাত হয়ে থাকবে আর ছবিও উন্নততর হওয়ার আশা বিলুপ্ত হবে। তার কারণ, ফিল্ম ডিভিশনে ছবি তোলার জন্যে মাইনে করা লোক রাখা হয়েছে, তারা যা তুলবে বিষয়বস্তুর দিক থেকে হোক আর কলা-কৌশলের দিক থেকেই ধরা যাক, সেইটেই হবে ধারাবাহিক স্ট্যাণ্ডার্ড। একই লোকেদের আওতায় এই ধারাবাহিকতার ব্যতিক্রম আনা একরকম অসম্ভব—কিন্তু তা থেকে এগিয়ে পা বাড়াবার কোন উপায়ই রাখা হয়নি ফিল্ম ডিভিশনের মধ্যে। এখনই ফিল্ম ডিভিশনের মধ্যে বিভিন্ন বিভাগে যে সমস্ত লোক গ্রহণ করা হয়েছে তার মধ্যে এমন একজনকেও পাওয়া যায় না যাকে সত্যিকারের একটি 'talent' বলে আখ্যাত করা যায়। সুতরাং আসল গুণী লোকেরা যখন থেকে যাচ্ছে বাইরে, পেশাদারী চিত্রশিল্পের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তখন ফিল্ম ডিভিসনের কাছ থেকে কোন ভালো ছবি, কোন দিক থেকে কোন উন্নত ছবি আশাই বা করা যাবে কি করে! যার শুরুটাই হচ্ছে এই, পরে তা কি অবস্থায় দাঁড়াবে ধরে নেওয়া অসম্ভব নয়।

লেখবার সময় পর্যন্তও বম্বে, বাঙলা ও অন্যান্য প্রদেশ থেকে বাধ্যতামূলক 'অনুমোদিত ছবি' দেখাবার বিরুদ্ধে সরকারের কাছে যে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে তার কোন উত্তর পাওয়া যায়নি। ব্যাপারটা নিয়ে বেশ একটা ঝামেলার আশঙ্কা করা যাচ্ছে। পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রে কোন মন্ত্রণা পরিষদই যা করতে যায়নি অথবা চায়ওনি, ভারতে তা কিভাবে সম্ভব হয় এবং শেষ পর্যন্ত ব্যাপার কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় দেখবার জন্যে উৎসুক হয়ে রইলুম।

## ফিল্ম এডভাইসরী কমিটি

সরকারীভাবে জানানো হয়েছে যে, ফিল্ম ডিভিসন যে ছবি তৈরী করবে অথবা ফিল্ম ডিভিসনের আওতায় দেশী বা বিদেশী যেসব ছবি পরিবেশিত হওয়ার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে তা অনুমোদন করার জন্যে এই এডভাইসরী

মিটি গঠন করা হয়েছে। এটা খুবই যুক্তিযুক্ত বং এমন একটা কমিটির দরকারও আছে। রণ পঁয়ত্রিশ কোটি লোকের শিক্ষা ও জ্ঞান াহরণের জন্যে এবং সংস্কৃতি বিষয়ে তাদের পর আলোকপাত করার দায়িত্ব অসামান্য। াছাড়া ফিল্ম ডিভিসনের ছবি পৃথিবীর অন্যান্য শেও প্রদর্শিত হবে। সেক্ষেত্রে প্রত্যেকখানি বিরই গুণাগুণ বেশ করে যাচাই করে দেখা কান্তই দরকার, যাতে সেসব ছবি সর্ববিষয়ে থিবীর শ্রেষ্ঠতম ছবিগুলির সঙ্গে পাল্লায় ড়াতে পারে। কিন্তু ভারত সরকার, মনে চ্ছে যেন, এই বিরাট ও জটিল দায়িত্ব সম্বন্ধে ম্পূর্ণ সচেতন নন। এই এডভাইসরী মিটির সভ্যেরা প্রত্যেকেই শিক্ষা ও সংস্কৃতি াপারে এক একজন দিকপাল হওয়া দরকার পৃথিবীর যে যে রাষ্ট্রে সরকারী প্রযোজনায় বি তোলার ব্যবস্থা আছে এবং যেখানে ঐ পের সরকারী কমিটি গঠন করা আছে, তার বেতেই প্রতিটি সভ্য এক একজন দিক্‌পাল শেষ। আর সে জায়গায় আমরা পেয়েছি ড়জোর শ্রীমতী লীলাবতী মুন্সী পর্যন্ত, র ওপরের স্তরে আর ভাবা যায়নি, বোধ হয় নেমার ছবি বলেই! আর যারা আছেন যেমন । শান্তারাম—তার উপযুক্ত স্থান হচ্ছে ফিল্ম ডিভিসনের প্রযোজক বা পরিচালক হয়ে ছবি োলার কাজ নিয়ে থাকা; অথবা এম এ আয়ার পি সি চৌধুরী—এদেরই বা কোটি কোটি াকের শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রবর্ধক হবার াগ্যতা কতখানি?

আরও বলবার কথা হচ্ছে যে কমিটিতে দের নেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে কারুর র্মস্থল দিল্লী, কারুর বম্বে (বম্বেরই বেশী), াবার কারুর বা মাদ্রাজ—এরা সব একত্রে লবেনই বা কি করে? এও তো তাহলে ন্সার বোর্ডের মতো হয়ে দাঁড়াচ্ছে—সভ্য তে তালিকায় থাকেন পনেরো ষোল জন; ন্তু কাজের বেলায় যা করেন ইন্সপেক্টর। ল্ম এডভাইসরী কমিটিও হয়ে দাঁড়াচ্ছে তাই এর সভ্যদের একজনেরও এমন ফালতু সময়ও ই যে তারা আগাগোড়া সব ছবি চিত্রনাট্য থেকে ম্পূর্ণ অবস্থা পর্যন্ত দেখে বিচার করতে রবেন।

### চিত্রগৃহের হরতাল

বিভিন্ন প্রদেশে সাম্প্রতিক প্রমোদ-কর দ্ধির প্রতিবাদে ১লা জুন তারিখে ভারতের মস্ত চিত্রগৃহে হরতাল হওয়ার কথা ছিলো। ন্তু ঐ সময়ের মধ্যে সব কিছু গুছিয়ে ঠানো সম্ভব না হওয়ায় হরতালের তারিখ াছিয়ে ৩০শে জুন নির্ধারিত হয়েছে। বম্বের াই এম পি এ, বাঙলার বি এম পি এ, দিল্লীর ন পি এ, লক্ষ্ণৌয়ের ইউ পি এম পি এ প্রভৃতি রতের সব চলচ্চিত্র সংঘই একমত হয়েছে। মাদ্রাজ কেবল ১লা জুলাইয়ের পক্ষপাতী। তবে আশা করা যায় যে, ভারতের আর সবাই ৩০শে জুন ঠিক করে থাকলে তারাও ঐ তারিখই মেনে নিতে দ্বিধা করবে না।

### আন্তর্জাতিক চিত্র প্রদর্শনী

ফ্রান্সের ক্যানেতে প্রতি বছরই একটি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। পৃথিবীর মধ্যে এই প্রদর্শনীতে পাওয়া সম্মানই চিত্রনির্মাতাদের কাছে শ্রেষ্ঠ সম্মান বলে পরিগণিত। সম্প্রতি প্রদর্শিত 'নীচা নগর' ছবিখানি ১৯৪৭ সালে এখানে সম্মানভূষিত হয়েছিলো। এ বছর শোনা গেলো এখান থেকে নিউ থিয়েটার্স 'অঞ্জনগড়' ছবিখানি পাঠাবার আয়োজন করেছেন। ভারতের তথা বাঙলার চিত্রশিল্পের কাছে এটা একটা মস্তবড়ো আনন্দের সংবাদ। বম্বে থেকেও কয়েকখানি ছবি পাঠাবার কথা হয়েছে, কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্বের কথা ভাবলে 'অঞ্জনগড়'র চেয়ে ভালো নির্বাচনের কথা আর ভাবা যায় না।

## সাহিত্য সংবাদ

### প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ফলাফল

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব উপলক্ষে 'লোকনাথ সঞ্জীবন সংঘ' (তারকেশ্বর) কর্তৃক অনুষ্ঠিত প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ফলাফল নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

**প্রথম পুরস্কার**—রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' —শ্রীনরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় (তারকেশ্বর উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়)।

**দ্বিতীয় পুরস্কার**—প্রফুল্লকুমার সরকারের 'জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ'—শ্রীগোপালগোবিন্দ চক্রবর্তী (লোকনাথ)।


নির্ভীক জাতীয় সাপ্তাহিক

প্রতি সংখ্যা চারি আনা

বার্ষিক মূল্য—১৩৲    ষান্মাসিক—৬৷৷০

"দেশ" পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের হার সাধারণত নিম্নলিখিতরূপ:—

সাময়িক বিজ্ঞাপন

৪৲ টাকা প্রতি ইঞ্চি প্রতিবার

বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে অন্যান্য বিবরণ বিজ্ঞাপন বিভাগ হইতে জানা যাইবে।

**প্রবন্ধাদি সম্বন্ধে নিয়ম:—**

পাঠক, গ্রাহক ও অনুগ্রাহকবর্গের নিকট হইতে প্রাপ্ত উপযুক্ত প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।

প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালিতে লিখিবেন। কোন প্রবন্ধের সহিত ছবি দিতে হইলে অনুগ্রহপূর্বক ছবি সঙ্গে পাঠাইবেন, অথবা ছবি কোথায় পাওয়া যাইবে জানাইবেন।

অমনোনীত লেখা ফেরত লইতে হইলে সঙ্গে উপযুক্ত ডাক টিকিট দিবেন। লেখা পাঠাইবার তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে যদি তাহা 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত না হয়, তাহা হইলে লেখাটি অমনোনীত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। অমনোনীত লেখা ছয় মাসের পর নষ্ট করিয়া ফেলা হয়। অমনোনীত কবিতা টিকিট দেওয়া না থাকিলে এক মাসের মধ্যেই নষ্ট করা হয়।

সমালোচনার জন্য দুইখানি করিয়া পুস্তক দিতে হয়।

ঠিকানা:—আনন্দবাজার পত্রিকা
১নং বর্মন স্ট্রীট, কলিকাতা।

## ফুটবল

বৈদেশিক ফুটবল খেলা বাঙলার জাতীয় খেলায় পরিণত হইয়াছে, ইহা বর্তমানে কোনরূপেই অস্বীকার করা চলে না। বড় বড় শহর হইতে আরম্ভ করিয়া সুদূর পল্লীতে পর্যন্ত এই খেলায় যোগদান ও অবলোকন করিতে বাঙলার সকল ক্রীড়ামোদীই বিশেষ আনন্দ ও উৎসাহ লাভ করিয়া

**পশ্চিম বংগ শারীরিক শিক্ষক সমিতি পরিচালিত মহিলা শিক্ষা শিবিরে কুচকাওয়াজ অনুশীলনের একটি দৃশ্য**

থাকেন। এমন কি এই খেলার জনপ্রিয়তা বাঙলা দেশে বিশেষ করিয়া, কি বিদেশী, কি দেশী সকল প্রচলিত খেলা অপেক্ষা অধিক—ইহা প্রত্যেক বৎসরই ফুটবল মরসুমের সময় ভাল করিয়াই উপলব্ধি করা যায়। এই খেলার ইতিবৃত্ত যাঁহারা জানেন তাঁহারা সকলেই একবাক্যে বলিবেন "বাঙলার ফুটবল খেলোয়াড়গণই সারা ভারতে এই খেলা প্রচলনের জন্য দায়ী। কারণ তাঁহারাই সর্বপ্রথম ভারতীয় দল হিসাবে বৈদেশিক দলসমূহকে বিপর্যস্ত ও পরাস্থ করিয়া ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ফুটবল প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর সম্মান লাভ করেন। ফলে বাঙালী ফুটবল খেলোয়াড়গণ ভারতের আদর্শস্থানীয় হয়। কিছুকাল ধরিয়াই বাঙালী ফুটবল খেলোয়াড়গণ সেই গৌরবের অধিকারী থাকেন। তাহার পর হঠাৎ দেখা যায়, বাঙলার বিশিষ্ট ফুটবল ক্লাবের পরিচালকগণ দলের শক্তি বৃদ্ধির জন্য অবাঙালী খেলোয়াড় বাঙলার মাঠে আমদানী করিবার দিকে দৃষ্টি দিয়াছেন। ইহাতে অনেকেই মনে করেন অসাধারণ ক্রীড়ানৈপুণ্যের অধিকারী বলিয়াই বোধহয় সকল খেলোয়াড়কে বাঙলার মাঠে খেলিবার সুযোগ দেওয়া হইতেছে। পরে উহাদের ক্রীড়াকৌশল বাঙালী খেলোয়াড়গণ আয়ত্ত করিলে আমদানী প্রথা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু তাহা হইল না, ক্রমশই অবাঙালী খেলোয়াড়ের সংখ্যা বাঙলার মাঠে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বাঙলার ফুটবল খেলোয়াড়গণের প্রকৃত হিতৈষী কয়েকজন ক্রীড়া সাংবাদিক এই ধরণের খেলোয়াড় আমদানী প্রথার কুফল সকলের দৃষ্টির সামনে ধরিয়া, যাহাতে উহা বন্ধ হয়, তাহার জন্য চেষ্টা করিলেন। এমন কি তাঁহারা অনুরোধ করিলেন পরিচালকগণ যাহাতে উৎসাহী বাঙালী খেলোয়াড়গণকে নিয়মিত-ভাবে শিক্ষা দিয়া উন্নততর নৈপুণ্যের অধিকারী করিবার জন্য মনোযোগ দেন। সকল অনুরোধ, হইয়া ঐসব অবাঙালী খেলোয়াড়দের জন্য কিরূপ-ভাবে টাকা ব্যয়িত হইতেছে তাহা প্রকাশ করেন। ইহাতে পরিচালকগণ অসন্তুষ্ট হইলেন, তাঁহারা ঐ সাংবাদিকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করিলেন। বেচারী সাংবাদিক বাধ্য হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া আমদানী প্রথার বিরুদ্ধে আর কোনরূপ আন্দোলন করিবেন না এইরূপ প্রতিশ্রুতি লিখিয়া দিলেন। কারণ তখন তাঁহাকে কেহই সমর্থন করিলেন না। তবে তিনি সেই সময় যে ভবিষ্যদ্বাণী করেন তাহা বর্তমানে একরূপ সত্য হইতে চলিয়াছে। তিনি বলিয়াছিলেন "এই আমদানী বাঙলার ভবিষ্যৎ উৎসাহী ফুটবল খেলোয়াড়দের উন্নতির পথে বিরাট বাধা সৃষ্টি করিবে। ইহাদের সকলকেই দশ বৎসর পরে আর মাঠে দেখা যাইবে না। বাঙলার প্রত্যেকটি বিশিষ্ট ফুটবল দল অবাঙালী খেলোয়াড় দ্বারা পূর্ণ হইবে। বাঙালী উৎসাহী খেলোয়াড়-গণের মাঠে দর্শকের ভীড় বাড়ান ছাড়া আর কোনই কার্য থাকিবে না।" এই উক্তি সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও কিছুটা যে হইয়াছে ইহা স্বীকার না করিয়া পারা যায় না।

অবাঙালী খেলোয়াড়গণের বিভিন্ন দলে যোগদানের পশ্চাতে বহু টাকা "লেনদেনের" ব্যাপার আছে ইহা অনেক সময় অনেকেই উল্লেখ করেন, কিন্তু কেহই জোর করিয়া কিছু বলিতে পারেন না। কারণ এই সকল ব্যাপার এইরূপ গুপ্তভাবে হইয়া থাকে যে, তাহার সঠিক প্রমাণ জোগাড় করা একেবারেই অসম্ভব। সেদিন কয়েকজন ক্লাব পরিচালক কোন এক দলের খেলার পরে আলোচনা করিতেছিলেন "এরা খেলোয়াড় পাইবে না কেন এক লক্ষ টাকা খেলোয়াড় আমদানীর জন্য নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে।" যিনি এই কথাগুলি বলিতে-ছিলেন তিনি আবার হাসিয়া বলিলেন, "তবে আমি উহাদের বোকা বানাইয়াছি। ছয় হাজার টাকা আগাম দিয়া দুইটি খেলোয়াড়কে দলে খেলাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিল ঐ সংবাদ আমার নিকট পৌঁছিলে ঐ দুই খেলোয়াড় যখন কলিকাতা অভিমুখে আসিতেছিল তখন কলিকাতার বাহিরে কোন একটি স্টেশনে আমি উহাদের ধরিয়া মাত্র দুই হাজার টাকা দিয়া আমাদের দলে খেলাইবার জন্য রাজী করি। ইহার জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করিতে হয়। ৫।৬ দিন কলিকাতায় খেলোয়াড় দুইটিকে লুকাইয়া রাখিতে হয়।" তিনি বলিতে বলিতে বেশ একটুখানি গর্ব অনুভব করিলেন। অন্য কেহ ইহাদের কি শ্রেণীর লোক গণ্য করিবেন জানি না, তবে আমাদের মনে হইয়াছিল "এই শ্রেণীর লোক পরিচালনার দায়িত্ব লইয়া আছেন বলিয়াই ক্রমশই আমদানী বৃদ্ধি পাইতেছে।

আই এফ এর পরিচালকগণ কিছুদিন পূর্বে স্থির করিয়াছিলেন বৈদেশিক ফুটবল শিক্ষক বাঙলায় আনাইয়া উৎসাহী বাঙালী খেলোয়াড়দের নিয়মিতভাবে শিক্ষাধীনে রাখিবেন। আমরা যখন ঐ সংবাদ পাই তখন সত্যই উৎসাহিত ও আনন্দিত হইয়াছিলাম। কিন্তু সম্প্রতি আই এফ এর আর একটি সভায় ঐ প্রস্তাব বাতিল করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে, বর্তমানে এসোসিয়েশনের বৈদেশিক

বৈদেশিক ফুটবল শিক্ষার্থীদের দৌড় অভ্যাস করাইতেছে

টবল শিক্ষক আনাইবার জন্য অর্থ নাই। দেশিক শিক্ষকদের কলিকাতায় কয়েক মাসের না আনিতে কখনই ২০ হাজারের অধিক অর্থের য়োজন হইবে না। যতগুলি অবাঙালী ফুটবল লোয়াড় এই বৎসরে কলিকাতায় বিভিন্ন দলে াগদান করিয়াছেন তাঁহাদের প্রত্যেককে দলভুক্ত রিতে বিভিন্ন ফুটবল ক্লাব পরিচালকগণকে যে র্থ ব্যয় করিতে হইয়াছে তাহা নিশ্চয়ই বৈদেশিক টবল শিক্ষকের খরচা অপেক্ষা অনেক বেশী।

অবাঙালী খেলোয়াড় দলভুক্ত করার বিষয়ে লের সমর্থকগণকে আপত্তি করিতে তখনই দেখা য়, যখন দল পরাজিত হয়। কিন্তু দল যখন য়যুক্ত হয় এবং তাহা যদি ঐ অবাঙালী লোয়াড়ের ক্রীড়া নৈপুণ্যে হয় তাহা হইলে র্থকগণ উল্লাসে জ্ঞানহীন হইয়া পড়েন। ইহা তে উপলব্ধি করা যায় যে, দলের সমর্থকগণ বল দলের জয়লাভেই সন্তুষ্ট হন, উহা বাঙালী লোয়াড় বা অবাঙালী খেলোয়াড় দ্বারা হইল হা বিচার করেন না। এইজন্য দলের পরিচালকগণ শ্চিন্ত মনেই খেলোয়াড় আমদানী করিয়া থাকেন।

কেহ কেহ বলেন, আই এফ এর আইন দ্বারা ক খেলোয়াড় আমদানী বন্ধ করা যায়। যদি হাই হইত, তবে এত দীর্ঘকাল ধরিয়া ইহার রুদ্ধে আন্দোলন হওয়া সত্ত্বেও কেন এই নীতি রত্যক্ত হয় নাই? নিশ্চয়ই আইনের মধ্যে ফাঁক ছে অথবা যাঁহারা আইন প্রয়োগের কর্তা তাঁহারা ান আর্থিক অথবা কোনরূপ সুযোগ সুবিধার ্য আইনের প্রয়োগ করেন না, ইহাও হইতে পারে। া হউক না কেন, আইন প্রয়োগ দ্বারা আমদানী া করা হইতেছে না ইহা আমরা দীর্ঘকাল রয়াই দেখিতেছি। তবে প্রকাশ্য আদালতে সকল বিষয়ের মীমাংসার জন্য কেহ গেলে কি া হইত, তাহা আমাদের এখনও দেখিবার ভাগ্য হয় নাই।

খেলোয়াড় আমদানী বিষয়টিই যে কেবল ংলার ফুটবল খেলোয়াড়দের সকল সম্মান ও রব ধূলিসাৎ করিয়াছে তাহা নহে, বাঙালী উৎসাহী খেলোয়াড়দের মধ্যেও উন্নতির জন্য আন্তরিকতার যথেষ্ট অভাব দেখা দিয়াছে। এই আন্তরিকতার অভাবের কথা যদি কখনও বলা হয়, তাহা হইলে শুনিতে হয় "আন্তরিকভাবে খেলার উন্নতির চেষ্টা করবো তার উপযুক্ত খাদ্য কৈ? যদি কেহ বলে যে অন্য যাহারা আসিয়া বাঙলার মাঠে তাহাদের স্থানগুলি দখল করিতেছে, তাহাদের খাদ্যের অবস্থা কোন অংশেই বাঙালী ফুটবল খেলোয়াড়দের অপেক্ষা ভাল নহে। আশ্চর্যের বিষয় যে, তখন আর কেহ কোন উত্তর দেয় না।

সুস্থ ও সবল দেহ ছাড়া যে ভাল ফুটবল খেলা যায় না ইহা সকলেই জানে। অথচ সুস্থ ও সবল দেহ লাভের উপযোগী কোন ব্যবস্থাই কেহ অবলম্বন করে না। ঠিক মরসুমের পূর্বে দেখা যায়, বিশিষ্ট দলের খেলোয়াড়গণ মাঠে দৌড়াদৌড়ি অথবা কোনরূপ ব্যায়াম করিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিলে বলিবেন "ফুটবল মরসুমের জন্য প্রস্তুত হইতেছি।" সামান্য দুই এক মাসের ব্যায়াম ও ছোটাছুটি যে শারীরিক শক্তির উন্নতিতে যথেষ্ট সাহায্য করে না, ইহা খেলোয়াড়দের অনেকেরই জানা নাই। "আন্তর্জাতিক খেলোয়াড়গণ" যে সব ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, তাহাই তাঁহারা করিতেছেন ইহাও কাহাকেও কাহাকেও উল্লেখ করিতে শোনা যায়। ঐসব আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন খেলোয়াড়গণ সারা বৎসর ধরিয়া উহার সাধনায় লিপ্ত থাকেন তাহা কেহই অনুসন্ধান করিয়া দেখেন না। ইহার উপর খেলোয়াড়ের খেলায় উন্নতি নৈতিক চরিত্র ও নিয়মিত আহার বিশ্রামের উপর নির্ভর করে। বাঙলার বিশিষ্ট খেলোয়াড়গণের এইদিকে কোনই দৃষ্টি আছে বলিয়াই মনে হয় না। সর্বদিক দিয়া চরম উচ্ছৃংখলতার আশ্রয়ই তাহারা লইয়া থাকেন। ফলে খুব দ্রুত খেলার শক্তি যায়, খেলায় উন্নতিও করিতে পারেন না।

সেইজন্যই মনে হয় বাঙলার ফুটবল খেলায় প্রকৃত উন্নতি বিধান করিতে হইলে অনেক কিছুর উচ্ছেদ, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিতে পারিলে তবেই সাফল্য লাভ করা সম্ভব হইবে।

**কলিকাতার ফুটবল লীগ**

কলিকাতার ফুটবল লীগের প্রথম ডিভিসনে কে চ্যাম্পিয়ান হইবে বলা খুবই কঠিন। কারণ কোন দলেরই খেলায় কোন সঠিক "মাপকাঠি" নাই। এক-দিন যে দল ভাল খেলিল, তার পরের দিন অতি শক্তিহীন দলের নিকট সেই দলই পরাজয় বরণ করিল। এক কথায় বলিতে গেলে বর্তমানে বলা চলে "যে কোন দলই চ্যাম্পিয়ান হইতে পারে। তবে এই বিষয়ে ক্যালকাটা গ্যারিসন, ডালহৌসী, রেঞ্জার্স, ক্যালকাটা, রাজস্থান ক্লাব, স্পোর্টিং ইউনিয়ন, কালীঘাট প্রভৃতি দলের যে কোনই আশা নাই ইহা জোর করিয়া বলা চলে।

## শারীরিক শিক্ষা

গত কয়েক বৎসর হইতে পশ্চিম বঙ্গ শারীরিক শিক্ষক সমিতি প্রতি গ্রীষ্মের ছুটির সময় মহিলা-দের জন্য এক মাসব্যাপী ব্যায়াম শিক্ষাশিবিরের ব্যবস্থা করিতেছেন। ১৯৪৭ সালে যখন ইহারা এই ব্যবস্থা করেন মাত্র ২২ জন মহিলা যোগদান করেন। পরবর্তী বৎসরে ঐ সংখ্যা খুবই কমিয়া যায়, কিন্তু বর্তমান বৎসরে উহা বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১১২ জন মহিলা আবেদন করেন, কিন্তু অর্থাভাববশত ৬২ জনকে শিবিরে গ্রহণ করা হইয়াছে। অন্যান্য বৎসরে বাঙলার কয়েকটি জেলা হইতে মহিলা শিক্ষয়িত্রীগণ যোগদান করেন। কিন্তু এইবারের শিবিরে পশ্চিম বাঙলার সকল জেলার শিক্ষয়িত্রী যোগদান করিয়াছেন। ইহাদের নিয়মিত-ভাবে সামরিক ড্রিল ও কুচকাওয়াজ, ব্রতচারী, লাঠি-খেলা, ছুরি খেলা, ব্যায়াম নৃত্য (আইরিশ ও সুইডিস), সাধারণ খেলাধুলা, ছোট ছেলেমেয়েদের খেলাধুলা, সন্তরণ, খালিহাতে ব্যায়াম, প্রাথমিক প্রতিবিধান, পারিবারিক চিকিৎসা, এ্যাথলেটিক সংগঠন প্রভৃতি বহু বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।

মহিলা ব্যায়াম শিক্ষাশিবির পরিচালনার দিকে সমিতির বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া সম্পর্কে অনেকেরই মনে নানাপ্রকার প্রশ্ন উদিত হয়। প্রশ্নের জবাব সমিতির পরিচালকগণ কি দিবেন আমরা জানি না, তবে আমরা বলিব তাঁহারা অতি প্রয়োজনীয় এক ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি দিয়াছেন। মহিলা ব্যায়াম শিক্ষাকেন্দ্র বলিতে বর্তমানে কিছুই নাই। সরকারী যে প্রতিষ্ঠান ছিল তাহাও গত ছয় বৎসর বন্ধ হইয়া পড়িয়া আছে। এইটি পুনরায় খুলিয়া যাহাতে সুপরিচালিত হয় তাহার জন্য অনেক ব্যায়ামবিদ্ ও মহিলা চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইয়া-ছেন। সম্প্রতি এক বিশিষ্ট মহিলা ব্যায়াম-অনুরাগিনী বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, "পশ্চিম বঙ্গ সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ও প্রধান মন্ত্রীর নিকট দরবার করিতে করিতে আমার দুই পাটি স্লিপার ছিঁড়িয়া শেষ হইয়া গিয়াছে। দীর্ঘ এক বছর হাঁটাহাঁটির পর আশা ত্যাগ করিয়াছি। ইহাদের মহিলা সামরিক বিভাগ খোলার বিষয়ে উৎসাহ দিতে দেখিয়া আশ্চর্য হইয়াছি। যে দেশের মেয়েদের শারীরিক সুস্থতা লাভের ব্যবস্থা নাই সে দেশে সামরিক শিক্ষা কিভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইবে আমি কল্পনাই করিতে পারি না।"

মহিলার উক্তি যে সম্পূর্ণ সত্য ইহা আমরা বিশ্বাস করি এবং সেইজন্যই পশ্চিম বঙ্গ শারীরিক শিক্ষক সমিতির ব্যবস্থার প্রতি আমাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে।

## দেশী সংবাদ

নয়াদিল্লী, ২১শে মে—গণপরিষদ মহল হইতে জানা যায় যে, সামরিক প্রয়োজনে ভারতকে বর্তমানে যেভাবে সামরিক বিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, শাসনকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনের উদ্দেশ্যে উহার অনুকরণে প্রদেশগুলিকে লইয়া চারিটি অথবা পাঁচটি আঞ্চলিক ইউনিট গঠনের জন্য পরিষদের কয়েকজন সদস্য এক প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন।

ভারত ও পাকিস্থানের গুরুতর আর্থিক সমস্যাসমূহ সম্পর্কে সোমবার এখানে করাচীতে উভয় ডোমিনিয়নের ঊর্ধ্বতন কর্মচারীদের মধ্যে এক সম্মেলন আরম্ভ হয়।

২২শে মে—নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির দুইদিনব্যাপী অধিবেশন অদ্য শেষ হইয়াছে। অদ্য বেলা ২টায় নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির গোপন বৈঠক বসে। এই বৈঠকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলীকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেন। আচার্য কৃপালনী মন্ত্রিমণ্ডলীর বিরুদ্ধে তাঁর সমালোচনা করেন।

দেরাদুন, ২২শে মে—অদ্য আজাদ ময়দানে ৫০ সহস্র শ্রোতার সমক্ষে ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু বলেন যে, কাশ্মীরের গণভোটের পূর্বে তথায় শান্তি স্থাপন অত্যাবশ্যক। বাস্তুত্যাগীদের পুনর্বসতির ব্যবস্থা না করিয়া কাশ্মীরে গণভোট গ্রহণ অসম্ভব। যতদিন পর্যন্ত হানাদারগণ কাশ্মীরে অবস্থান করিবে, বাস্তুত্যাগিগণ তথায় প্রত্যাবর্তন করিতে পারে না। এই সমস্ত হানাদাররাই তো তাহাদের স্ব স্ব গৃহ হইতে বিতাড়িত করিয়া দিয়াছে।

২৩শে মে—অদ্য গণপরিষদে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা—এই দুইটি গুরুত্বপূর্ণ শাসনতান্ত্রিক নীতি সম্পর্কে তুমুল বিতর্কপূর্ণ আলোচনা হইয়াছে এবং মাত্র ৩টি ধারা গৃহীত হইয়াছে।

অদ্য সকাল ১০টায় দেরাদুন হইতে প্রায় ৩০ মাইল দূরবর্তী ডাকপাথার নামক স্থানে প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু যমুনা জল বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের ভিত্তি স্থাপন করেন।

২৪শে মে—সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজের উপর যে নিয়ন্ত্রণের আদেশ রহিয়াছে, তাহা ১লা জুন হইতে সম্পূর্ণ রহিত করা হইবে বলিয়া আশা করা যায়। নিউজ প্রিণ্ট এডভাইসরী কমিটি অদ্য এই মর্মে সর্বসম্মত সুপারিশ করিয়াছেন যে, নিউজ প্রিণ্টের উপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করা প্রয়োজন।

২৫শে মে—হিন্দু এবং শিখ তপশিলী শ্রেণী ব্যতীত অন্যান্য সংখ্যালঘুদের জন্য আইনসভায় আসন সংরক্ষণ ব্যবস্থা লুপ্ত করার যে প্রস্তাব উপদেষ্টা কমিটি করিয়াছেন, অদ্য পার্লামেণ্টে তাহা লইয়া আলোচনা সুরু হয়। উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল পরিষদে কমিটির প্রস্তাবটি উত্থাপন করিয়া সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়কে সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে উদার মনোভাবাপন্ন হইতে অনুরোধ জানান। সংখ্যালঘুদেরও তিনি অতীতের কথা বিস্মৃত হইতে বলেন।

২৫শে মে—গতকল্য আসানসোল সহরের সন্নিকটবর্তী এক মাঠে বজ্রপাতের ফলে ৮ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে। বৃষ্টির দরুণ লোকগুলি একটা গাছের তলায় আশ্রয় লইয়াছিল।

২৬শে মে—অদ্য রাত্রে নিমতলাঘাট ষ্ট্রীটের নিকট এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের ফলে কয়েক শত কাঠের ও টিনের বাড়ি ভস্মীভূত হয় এবং কয়েক হাজার লোক গৃহচ্যুত হয়। নিমতলা কাঠগোলা নামে পরিচিত অঞ্চলটির সমস্ত বাড়ি ভস্মীভূত হইয়াছে।

২৭শে মে—অদ্য ভারতীয় গণপরিষদে ১১টি অনুচ্ছেদ গৃহীত হইয়াছে। সুপ্রীম কোর্টের কর্মচারীবৃন্দের বেতন, ভাতা, পেন্সন ও সুপ্রীম কোর্টের ব্যয় নির্বাহ সংক্রান্ত ১২২নং অনুচ্ছেদটি বিশেষভাবে আলোচিত হয়। এই ধারার বিধান এই যে, সুপ্রীম কোর্টের কর্মচারীবৃন্দের বেতন, ভাতা ও পেন্সন প্রেসিডেণ্টের অনুমোদন সাপেক্ষে প্রধান বিচারপতি কর্তৃক নির্ধারিত হইবে এবং সুপ্রীম কোর্ট পরিচালনার ব্যয়-ভার ভারত গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব হইতে প্রদত্ত হইবে। কিন্তু তাহা পার্লামেণ্টের আওতায় থাকিবে না।

দেশীয় রাজ্যসমূহের আর্থিক সংস্থা ১৯৫০ সালের এপ্রিল মাসে সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার এই তারিখ হইতে বিভিন্ন দেশীয় রাজ্য সমবায়ের আয়কর, আবগারী ও উৎপাদন শুল্ক, লবণকর ও কেন্দ্র কর্তৃক আদায়যোগ্য যাবতীয় কর সংগ্রহ করিবেন এবং দেশরক্ষা, রেল পরিচালনা, ডাক ও তার আবহ ও বেতার প্রভৃতি বিভাগের কার্য পরিচালনা করিবেন।

অদ্য গণপরিষদে শ্রীগোপালস্বামী আয়েঙ্গার এই মর্মে এক সরকারী প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে, কাশ্মীরের মহারাজা প্রধানমন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া চারিজন মনোনীত সদস্য ভারতীয় গণপরিষদে প্রেরণ করিবেন। প্রস্তাবটি গৃহীত হইবার পর কাশ্মীর মহারাজার নিকট উল্লিখিতরূপ নির্দেশ প্রদান করা হয়।

২৯শে মে—অদ্য সন্ধ্যায় শ্রীনগর প্রতাপ-বাগানে এক বিরাট জনসভায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ঘোষণা করেন, "ভারতবর্ষ কাশ্মীরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছে, তাহা পালন করিবে—কোন অবস্থায় এই কর্তব্য হইতে সে বিচ্যুত হইবে না।" তিনি আরও বলেন, কাশ্মীর ভারতেরই একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ; বিশ্বের কোন অংশই কাশ্মীরকে ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না।

৩০শে মে—অদ্য গণপরিষদে দুই ঘণ্টার অধিক সময় প্রদেশপাল নির্বাচন সম্পর্কিত আলোচনা চলে। ছয়জন সদস্য এই আলোচনায় যোগদান করেন।

খসড়া শাসনতন্ত্রের ১৩১ ধারায় বলা হইয়াছে যে, প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রদেশপালগণ নির্বাচিত হইবেন। উক্ত ব্যবস্থা বাতিলের জন্য এই মর্মে এক সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করা হয় যে, প্রেসিডেণ্ট প্রদেশপাল নিয়োগ করিবেন।

## বিদেশী সংবাদ

২২শে মে—সরকারী সৈন্যেরা রেংগুনের দশ মাইল উত্তরে কারেন ঘাঁটি ইনসিন পল্লী দখল করিয়াছে। গত ৩১শে জানুয়ারী কারেনরা উহা দখল করিয়াছিল।

ডারবানের সংবাদে প্রকাশ, ২৩শে মে দায়রা আদালতে তিনজন ভারতীয়কে ৭ বৎসর পর্যন্ত বিভিন্ন মেয়াদের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে। গত জানুয়ারী মাসে এখানে যে দাঙ্গা হাঙ্গামা হয়, সেই সম্পর্কে তাহাদের বিরুদ্ধে প্রথমে হত্যার অভিযোগ আনীত হয়। পরে অপরাধজনক নরহত্যা অথবা মারপিটের বা উভয়বিধ অভিযোগে তাহাদের দোষী সাব্যস্ত করা হয়।

২৫শে মে—অদ্য প্রাতঃকালে চীনের কম্যুনিস্টবাহিনী সাংহাই-এর কর্তৃত্ব গ্রহণ করিয়াছে। কোন বড় রকমের সংঘর্ষ ব্যতিরেকেই এশিয়ার বৃহত্তম ও পৃথিবীর চতুর্থ নগরী সাংহাই-এর পতন হইয়াছে।

২৯শে মে—চীনের কম্যুনিস্ট হেড কোয়ার্টার হইতে প্রচারিত এক ইস্তাহারের উল্লেখ করিয়া পিপিং বেতারে দাবী করা হইয়াছে যে, ১৯৪৬ সালে চীনে গৃহযুদ্ধের সূচনা হইতে এ পর্যন্ত ৫২ লক্ষাধিক চীনা সৈন্য খোয়া গিয়াছে।

সম্পাদক ঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহ সম্পাদক ঃ শ্রীসাগরময় ঘোষ

> সফল ভবিতব্যতার আশ্বাস নিয়ে আজ যে কন্‌গ্রেস অসামান্য ব্যক্তিস্বরূপের প্রতিভার উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কালে কালে তার সংস্কার সাধনের তার সীমা পরিবর্ধনের প্রয়োজন নিশ্চয় ঘটবে তা জানি। কিন্তু চঞ্চল হয়ে বর্তমানের সংগে হঠাৎ তার সামঞ্জস্যে আঘাত করে একটা নাড়াচাড়া ঘটাতে গেলে মন্দিরের ভিত হবে বিদীর্ণ। প্রাণবান সৃষ্টির ধারাকে বাঁচিয়ে রেখেও বড় রকম বিপর্যয় সাধন করবার যোগ্য অসামান্য চরিত্রশক্তি এদেশে সম্প্রতি কোথাও দেখা যাচ্ছে না সে কথা স্বীকার করতেই হবে। দেশের যে একটা মস্ত মিলনতীর্থ মহাত্মাজীর শক্তিতে গড়ে উঠেছে এখনো সেটাকে তাঁরই সহযোগিতায় রক্ষা করতে ও পরিণতি দান করতে হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। —রবীন্দ্রনাথ
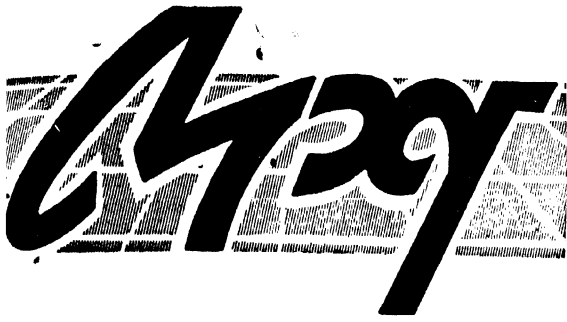
ষোড়শ বর্ষ ] শনিবার, ২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৬ সাল। Saturday, 11th June, 1949. [ ৩২শ সংখ্যা

### ...ার আত্মনিষ্ঠা

...দক্ষিণ কলিকাতার আসন্ন নির্বাচনে ...দের উদ্দেশ করিয়া রাষ্ট্রপতি ডক্টর ...রামিয়া নিম্নলিখিত বাণী প্রচার করিয়া- ...ঃ—

"...বাঙলা বহু ঝড়ঝঞ্ঝা অতিক্রম করিয়াছে। ...বিপদ কি করিয়া জয় করিতে হয়, সে তাহা ...। বাঙলার ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ...। স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ...নচন্দ্র পাল, শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ, গুরুদাস ...পাধ্যায়, সুবোধচন্দ্র মল্লিক, সতীশচন্দ্র ...পাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই ...তাবাদের দৃঢ় ভিত্তিমূলক প্রতিষ্ঠা করেন ...তাহার উপরই ভারতীয় স্বাধীনতার সৌধ ...ত হইয়াছে। যে সব শিল্পী এবং নৃপতি- ...প্রচেষ্টায় এই সৌধ গড়িয়া উঠিয়াছে, ...রা পূর্ব পুরুষগণের এবং তাহাদের মাতৃভূমির ...ও উত্তরাধিকারিবর্গ রাখিয়া গিয়াছেন। ...র যে অংশের সংস্কার সাধন প্রয়োজন তাহা ...দের ক্ষমতার বহির্ভূত নয়। উপনির্বাচন এই ...য় একটি সংস্কারের ব্যবস্থা। মূল সৌধেই সংস্কার সাধন করিতে হইবে। অতীতে ...বহু আকস্মিক বিপদের সম্মুখীন হইয়াছে। ...৫ সালের ১৬ই অক্টোবরের বঙ্গ ভঙ্গের ধাক্কা ...সামলাইয়াছে। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ...র নূতন অঙ্গচ্ছেদ হইয়াছে। আমি নিশ্চিত, ...আঘাত সহ্য করিবার শক্তিও সে লাভ করিবে ...বাঙলা ভারতের নব জাগ্রত অন্তরাত্মায় ...দের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠায় থাকিবে।"

রাষ্ট্রপতির এই বাণী আমাদিগকে আশ্বস্ত ...ছে। তাহাদের সাধনা কোনদিন ব্যর্থ ...না। আত্মোৎসর্গকারী বীরের শোণিত- ...নূতন শক্তি সঞ্চার করে। মানব- ...ব্রতী মনীষিগণ শক্তির অফুরন্ত উৎসের ...জাতির চিত্তকে সংযত করিয়াছেন, ...স্থিত জাতি গূঢ় সংবেদনে তাঁহাদের সেই ...নে অবদানের আশ্রয়ে পুনরভ্যুত্থিত হয়। ...বান্ মানবগণের আবির্ভাবে বাঙলা দেশ ...হইয়াছে। তাঁহাদের আবির্ভাবের সেই প্রভাব এবং তাঁহাদের তপস্যার শক্তি বাঙালী জাতির মনোমূলে অলক্ষ্যে অথচ অব্যর্থরূপেই কাজ করিবে এবং সাময়িক বিপর্যয়জনিত সব বিভ্রম তাহার ফলে কাটিয়া যাইবে। বাঙালী কাহারো কৃপার ভিখারী নয়, আত্মশক্তিতেই সে জাগিবে। ঈর্ষা, দ্বেষের আনাত্মিক একটা মোহ বাহির হইতে আসিয়া বাঙলা দেশের প্রাণধর্মকে আজ আচ্ছন্ন করিতে চেষ্টা করিতেছে। বাঙালী নিজের ঐশ্বর্য ভুলিয়া তাহার আকর্ষণে ছুটিয়া চলিয়াছে। কিন্তু এই দৈন্য তাহার থাকিবে না, নিঃস্বার্থ সাধনার পুণ্য জ্যোতি এই মোহান্ধকার হইতে তাহার সমষ্টি জীবনকে মুক্ত করিয়া সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিবে। বাঙলার বৈপ্লবিক শক্তি অতীতে ভারতকে প্রবল প্রাণরসে সঞ্জীবিত রাখিয়াছে। এদেশের জল মাটির সে ধর্ম এখনও ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

### পূর্ববঙ্গের প্রধান মন্ত্রীর আত্মতৃপ্তি

অকাল বারিদাগমে পূর্ববঙ্গের প্রধান মন্ত্রী জনাব নূরুল আমীনের কবিত্বশক্তি উদ্বুদ্ধ হইয়াছে। সম্প্রতি ঢাকা শহরের এক বেতার বক্তৃতায় তিনি প্রচুর কবিজনোচিত মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন। জনাব নূরুল আমীন পূর্ববঙ্গ সরকারের ব্যর্থতার অনেকটা অংশ সুকৌশলে অকাল বর্ষার ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়াছেন। পূর্ববঙ্গের প্রধান মন্ত্রী বলিয়াছেন যে, খাদ্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যখন তাঁহার মনে আশার সঞ্চার হইতেছিল, ঠিক সেই সময়ে অকাল বর্ষা আসিয়া পড়িয়া তাঁহার সব আশার বাসা ভাঙিয়া দিয়াছে। তবে প্রধান মন্ত্রীর ভরসা এই যে, বাধা যেমন আসিয়াছে, তেমনই পাকিস্থানের খাদ্য সচিব পীরজাদা আব্দুস সাত্তারেরও পূর্ববঙ্গে আবির্ভাব ঘটিয়াছে। বর্ষায় যেটুকু ক্ষতি করিয়া গেল, করাচী হইতে সদ্য-সমাগত খাদ্যসচিব তাহা পূরণ করিয়া দিবেন বলিয়া প্রধান মন্ত্রীর বিশ্বাস। খাদ্যের পরেই জনাব নূরুল আমীন ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে নিতান্ত নীরস বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন। তিনি প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে, ম্যালেরিয়াজনিত মৃত্যুর হার লীগ শাসনের দাপটে ইতিমধ্যেই অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে। পাঁচ বৎসরের মধ্যেই পূর্ববঙ্গের খাদ্য সমস্যার সমাধান হইবে, ম্যালেরিয়াকে সম্ভবত তৎপূর্বেই পূর্ববঙ্গ হইতে পলায়ন করিতে হইবে। শুধু কথার জোরে যদি এমনভাবে সব সমস্যার সমাধান হইয়া যাইত, তবে অবশ্যই চিন্তার কোন কারণ থাকিত না। কিন্তু পূর্ববঙ্গের সর্বত্র অন্নবস্ত্রের কষ্ট যেরূপ নিদারুণ হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে প্রধান মন্ত্রীর এই আত্মতৃপ্তিকে জনসাধারণ আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করিতে পারিবে না। আমরা যতদূর জানি, পূর্ববঙ্গের কোন স্থানেই চাউলের মূল্য মণকরা ৪০৲ টাকার কম নয়, ইহার উপরে অবশ্য আছে। পরিধেয় বস্ত্রখণ্ড অদ্যাপি নগদ দশ মুদ্রার কমে সংগ্রহ করা দুর্ঘট। পাকিস্থানের খাদ্য সচিবের শুভাবির্ভাবে এই সমস্যা কতটা কমিবে, এ বিষয়ে সন্দেহের কারণ আছে। কারণ, পূর্ববঙ্গে পদার্পণ করিবার পূর্বেই তিনি গর্বভরে প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, পূর্ববঙ্গকে তিনি খাদ্যের স্রোতে ভাসাইয়া দিবেন, পূর্ববঙ্গবাসীরা সে স্রোতের মধ্যে এখনও পড়ে নাই; কিন্তু অকাল বর্ষার তাড়নায় তাহাদের অন্নকষ্ট নিদারুণ হইয়া উঠিয়াছে।

অভাবের চাপ সহ্য করিতে না পারিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের লোকেরা পর্যন্ত দলে দলে আসামে গিয়া আশ্রয় লইতেছে। পূর্ববঙ্গের প্রধান মন্ত্রী সাহেব সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে তাঁহার বেতার বক্তৃতায় কিছু বলা প্রয়োজনবোধ করেন নাই। শিক্ষাকে ইসলামী করণের পরিকল্পনার প্রসঙ্গ তিনি চাপিয়া গিয়াছেন। সম্প্রতি ঢাকা শহরে শান্তিবালা দাসী নামে একটি বালিকাকে কেন্দ্র করিয়া যে বিচার প্রহসন হইয়া গেল, তাহাতে পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে কি পরিমাণ উদ্বেগের কারণ ঘটিয়াছে, জনাব নুরুল আমীনের তাহাও জানা না থাকিবার কথা নয়। অকাল বর্ষার উপর এ সব বিষয়ের জন্য দায়িত্ব চাপানো চলে না বলিয়াই বোধ হয়, পূর্ববঙ্গের প্রধান মন্ত্রী এ সব বিষয়ে কাব্যকুশলতা প্রকাশের প্রবৃত্তি সংযত করা সঙ্গত মনে করিয়াছেন। অকাল বর্ষার জন্য খাদ্যশস্যের সংকট অবশ্য কালক্রমে হ্রাস পাইবে কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের নৈতিক বুদ্ধির অভাব যদি রাষ্ট্রের গোড়ায় গিয়া আঘাত করে; সেস্থলে কথার কাব্য জাতিকে বাঁচাইতে পারে না। সাম্প্রদায়িক প্রভুত্বের বৈষম্যবুদ্ধি পূর্ববঙ্গের শাসন-নীতির সঙ্গে বিজড়িত হইয়া তথাকার রাষ্ট্রের পক্ষে সেই সংকট সৃষ্টি করিতেছে।

### যাত্রীদের দুর্গতির সমস্যা

রেলপথে যাত্রীদের দুর্গতির অবধি নাই। ভারত বিভক্ত হইবার পর হইতে যাতায়াতের এই সমস্যা আরও বাড়িয়া গিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ হইতে যাহারা পাকিস্থানের পথে পশ্চিমবঙ্গের অন্যত্র যাতায়াত করেন, বর্তমানে পাকিস্থানের সীমানায় গেলেই তাহাদের মালপত্র খানাতল্লাসী করা হইয়া থাকে। সম্প্রতি প্রকাশ পাইয়াছে যে, পশ্চিমবঙ্গের এক স্থান হইতে যাঁহারা পশ্চিমবঙ্গের অন্য স্থানে পাকিস্থানের ভিতর দিয়া যাতায়াত করিবেন, শুল্ক বিভাগ সম্পর্কিত কারণে নিতান্ত সন্দেহ না ঘটিলে তাঁহাদের মালপত্র তল্লাস করা হইবে না। আমরা আশা করি, উভয় বঙ্গের সরকার বিশেষ উদারতার সঙ্গে যাহাতে এই ব্যবস্থা অনুযায়ী কাজ হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবেন। বস্তুত বাঙলা দেশের দুই অংশ এখনও পাঞ্জাবের মত পারস্পরিক সম্পর্ক শূন্য হয় নাই। এক্ষেত্রে এই কথাটি বিশেষভাবে স্মরণ রাখা দরকার।

## দক্ষিণ কলিকাতার নির্বাচকগণের কর্তব্য

দক্ষিণ কলিকাতার উপনির্বাচনের প্রতি সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের দৃষ্টি আকৃষ্ট রহিয়াছে; শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, প্রকৃতপক্ষে গোটা ভারতের দৃষ্টি এই নির্বাচনের প্রতি সম্প্রসারিত হইয়াছে। দক্ষিণ কলিকাতার নির্বাচকমণ্ডলীর শিক্ষা-দীক্ষা ও সংস্কৃতি বাঙলার শীর্ষস্থানীয় এবং ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে তাঁহাদের অবদান জাতির ইতিহাসকে উজ্জ্বল করিয়াছে, সুতরাং এই নির্বাচনে তাঁহাদের সিদ্ধান্তের বিশেষ মূল্য রহিয়াছে। দক্ষিণ কলিকাতার দায়িত্বসম্পন্ন নির্বাচকমণ্ডলী আজ জাতির প্রতি কোন্ পথ নির্দেশ করিবেন?

দক্ষিণ কলিকাতার এই নির্বাচন যদি সাধারণ প্রাদেশিক উপ-নির্বাচন হইত, তবে এই প্রশ্ন এতটা গুরুত্ব লাভ করিত না; কারণ দক্ষিণ কলিকাতার নির্বাচকমণ্ডলী জ্বলন্ত স্বদেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত। দক্ষিণ কলিকাতা অসন্দিগ্ধ এবং একান্তভাবে কংগ্রেসকেই সমর্থন করিয়া আসিয়াছে। এক্ষেত্রে তাঁহাদের কর্তব্যের প্রতি তাঁহাদিগকে অবহিত থাকিবার জন্য আবেদন করিবার কোন প্রয়োজন থাকিত না; কিন্তু বর্তমানের এই উপনির্বাচন কয়েকটি কারণে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। দক্ষিণ কলিকাতার এই উপনির্বাচনে চারজন সদস্য প্রার্থীস্বরূপে দাঁড়াইয়াছেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেস-মনোনীত সদস্য এবং শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু—এই দুইজনের মধ্যেই এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিবদ্ধ রহিয়াছে। শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু বিশ বৎসরেরও অধিক কংগ্রেসের সেবা করিয়াছেন। কংগ্রেসকর্মীস্বরূপেই তিনি প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের তিনি অগ্রজ। বর্তমানে এই নির্বাচনে বসু মহাশয় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সদস্যপদপ্রার্থীস্বরূপে দাঁড়ানোতে দক্ষিণ কলিকাতার উপর উপনির্বাচনের অনেকখানি গুরুত্ব আসিয়া বর্তিয়াছে।

নির্বাচনের ভোট গ্রহণের বিলম্ব নাই; দুই-তিন দিন মাত্র বাকী। নির্বাচকমণ্ডলীকে অবিলম্বে তাঁহাদের কর্তব্য স্থির করিতে হইবে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন স্থান হইতে ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের পক্ষ হইতে যে সকল বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা আসন্ন নির্বাচনে নির্বাচকগণের কর্তব্য নির্ধারণে সহায়তা করিবে। দক্ষিণ ভারতের জননায়কগণ দক্ষিণ কলিকাতার নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট একান্তভাবে আবেদন করিয়াছেন, তাঁহারা যেন কংগ্রেস-মনোনীত প্রার্থীকেই সমর্থন করেন। শিখ সমাজের নেতৃবৃন্দ শিখ ভোটদাতাগণের নিকট অনুরূপ অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ হইতে নির্বাচিত গণ-পরিষদের সদস্যগণ কংগ্রেসকে সমর্থন করিবার যুক্তি ও হেতুসমূহ নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ কংগ্রেসের মনোনীত সদস্যকে সমর্থন করিবার জন্য দক্ষিণ কলিকাতার নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে আবেদন করিয়াছেন। বস্তুত এই নির্বাচন সম্পর্কে কংগ্রেসের বিভিন্ন দল ও উপদলের মধ্যেও কোন মতবিরোধ নাই। কংগ্রেসকর্মীরা সকলেই এক্ষেত্রে এক হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। দেশ এবং জাতির প্রতি কর্তব্যবোধ শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুর বিরুদ্ধতা করিতে তাঁহাদের সকলকে সমভাবে প্রণোদিত করিয়াছে।

বস্তুত কংগ্রেসের কোন বিশেষ নীতি বা কর্মপন্থার সমালোচনা করিবার অধিকার সকলেরই আছে। কিন্তু শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু মহাশয় এই উপনির্বাচনে কংগ্রেসের বর্তমান নীতির সংস্কারকামী বা সমালোচকস্বরূপে অবতীর্ণ হন নাই। ভারতের একমাত্র জাতীয়তামূলক প্রতিষ্ঠানকে সমূলে উচ্ছেদ করিবার জন্যই তিনি সংকল্পবদ্ধ হইয়াছেন বিচার-মূঢ়তার বশেই হোক কিম্বা কুপরামর্শ দাতাদের প্রভাবে পড়িয়াই হোক, কংগ্রেসের সব গুণ বর্তমানে তাঁহার দৃষ্টিতে দোষ হইয়া উঠিয়াছে এবং কংগ্রেসবিরোধী যে যেখানে ছিল, দেশের জাতীয়তা ও সংহতির যাহারা যত শত্রু, তাহারা সব বসু মহাশয়ের সমর্থনে জোট বাঁধিয়াছে।

ভারত বিভাগ প্রসঙ্গে যখন বঙ্গ-বিভাগ আন্দোলন দেখা দেয়, তখন হইতেই শরৎচন্দ্রের কংগ্রেসবিরোধী মনোভাব উৎকট হইয়া উঠিয়াছে। সমগ্র বাঙলা দেশ যাহাতে ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া না যায়, তজ্জন্য তখন জনসমাজে আন্দোলন দেখা দিয়াছিল সেই আন্দোলনের প্রতিকূলে শরৎচন্দ্র সুরাবর্দির সহযোগে স্বাধীন বাঙলা আন্দোলন তুলিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য সে আন্দোলন সাফল্যলাভ করিলে সমগ্র বাঙলা দেশ ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইত। জনসাধারণের প্রতিকূলতায় শরৎচন্দ্রের সে আন্দোলন ব্যর্থ হয়। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, শরৎচন্দ্র তখন যাঁহার সহযোগিতা অবলম্বন করিয়াছিলেন

সুরাবর্দি সাহেব লীগ গভর্নমেণ্টের আনুগত্য বিস্মৃত হন নাই। লীগের প্রতি দরদ অণুমাত্রও তাঁহার শিথিল হয় নাই। গত ২০শে জুনেও করাচীতে 'ইত্তেহাদে'র প্রতিনিধির নিকট তিনি লীগ গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধতা করিতে তাঁহার অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিয়া বলেন, "বিচার-বুদ্ধির উপরে কি ভাবপ্রবণতাকে স্থান দেওয়া উচিত? এই গভর্নমেণ্ট নূতন গভর্নমেণ্ট। আমাদের গায়ের রক্ত জল করিয়া ইহাকে গড়িয়া তুলিতে হইয়াছে। এই গভর্নমেণ্টকে শিশু অবস্থায় বিব্রত করা কি যুক্তিযুক্ত হইবে?' মিঃ সুরাবর্দী লীগ গভর্নমেণ্ট কর্তৃক লাঞ্ছিত ও বিতাড়িত হইয়াও তাঁহাদের বিরুদ্ধতা করিতে অস্বীকৃত; কিন্তু শরৎচন্দ্র উক্ত ব্যাপারের পর হইতেই কংগ্রেসের প্রতিকূলতার পন্থা গ্রহণ করিয়াছেন; কংগ্রেসের প্রতি কিছুমাত্র দরদ তাঁহার নাই।

বসু মহাশয়ের সমর্থকদল কংগ্রেসকে উৎখাত করিবার উদ্দেশ্যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিকীরণ করিতেছেন। কিন্তু তৎপরিবর্তে জাতিকে তাঁহারা কি দিতে চাহেন, তাহা কিছুই জানা যায় নাই। শরৎচন্দ্র বর্তমানে সোসিয়ালিস্ট রিপাব্লিকান পার্টির নেতা। এই দলের সদস্যদের সঙ্গে দেশের লোকের পরিচয় কিছুই নাই। এই দলের কর্মপদ্ধতি কি, দেশবাসীরা তাহাও জানে না। সুতরাং উক্ত দলের কর্মপদ্ধতি হইতে বসু মহাশয়ের ভবিষ্যৎ-নীতি নির্ধারণ করিবার কোন সুযোগ দেশবাসী পায় নাই। এদেশের কংগ্রেসবিরোধী কয়েকটি দল শরৎচন্দ্রের নির্বাচন সমর্থনের জন্য অতিরিক্ত আগ্রহপরায়ণ হইয়া উঠিয়াছে। শরৎচন্দ্রের ভবিষ্যৎ কর্মনীতির কিছু পরিচয় ঐ দলগুলির কাজের ভিতর দিয়াই প্রকৃতপক্ষে পাওয়া যায়। শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়ের এই দলগুলির মধ্যে কমিউনিস্ট দলের কথাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই দলের কর্মপন্থা দেশবাসীর কাছে সব চেয়ে সুস্পষ্ট। এই দল ভারতের স্বাধীনতার চিরশত্রু। কংগ্রেস যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে জীবনমরণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত ছিল, তখন এই দল ভারতের বুকে ছুরি বসাইয়াছে। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের প্রতিকূলতা সাধনের জন্য ইহারা হিংসার জ্বালায় ছটফট করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ভারতের স্বাধীনতা ইহারা চাহে না। ভারতের জনগণের কল্যাণের জন্যও ইহাদের কোন মাথাব্যথা নাই। সোভিয়েটই ইহাদের উপদেষ্টা এবং স্ট্যালিন ইহাদের মন্ত্রগুরু। স্বাধীনতার পথে ভারতের প্রতিষ্ঠা ক্ষুণ্ণ করিয়া ছলে বলে কৌশলে বিদেশী সোভিয়েটতন্ত্রীদের প্রভুত্ব পাকা করাই ইহাদের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য দেশের স্বাধীনতা এবং গণতান্ত্রিকতামূলক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধতার কোন সুযোগ পাইলেই ইহারা তাহা গ্রহণ করে। ধ্বংসমূলক নীতির পথে দেশে একটা এলোমেলোর ভাব কোনক্রমে সৃষ্টি করাই ইহাদের মতলব। তাহার ফলে দেশের লোকের দুঃখ কষ্ট বৃদ্ধির জন্য ইহাদের বিবেকে কিছুই বাধে না। দেশ ধ্বংস হোক্, দেশের স্বাধীনতা রসাতলে যাক্, শ্মশানভূমিতে রুশিয়ার স্বেচ্ছাচারী সর্বময় প্রভুত্বের পত্তন করিতে পারিলেই ইহাদের সর্বার্থ সিদ্ধ হইল। দক্ষিণ কলিকাতার উপনির্বাচনে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু মহাশয় দেশবাসীর কাছে গঠনমূলক কোন কর্মপন্থা উপস্থিত করেন নাই; পক্ষান্তরে ধ্বংসাত্মক কর্মপন্থার অনুসরণকারী

কংগ্রেস-মনোনীত সদস্য শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস

দেশের স্বাধীনতা এবং জাতীয়তার শত্রুদলের সমর্থন যে তাঁহার পক্ষে রহিয়াছে ইহাই স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। শরৎচন্দ্রের পক্ষ সমর্থনের উৎকট উত্তেজনায় ইহারা দেশপ্রিয় পার্কে সেদিন দৌরাত্ম্যের সঙ্গে কংগ্রেস পতাকা পোড়াইয়া দিয়াছে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র যে পতাকার মর্যাদা রক্ষার জন্য শোণিতোৎসর্গ করিয়াছিলেন, সেই পতাকার অবমাননা করিয়াছে। দক্ষিণ কলিকাতার নির্বাচকমণ্ডলীর বুকে এজন্য বেদনা কি বাজে নাই? তাঁহারা জাতীয় পতাকার মর্যাদা রক্ষায় নিশ্চয়ই সর্বাধিক সঙ্কল্পশীলতা অবলম্বন করিবেন। বেপরোয়াভাবে বোমা ছুঁড়িয়া গৃহে অগ্নিসংযোগ করিয়া এদেশের সমাজ-জীবনকে আজ যাহারা সকল রকমে বিপর্যস্ত করিয়া বিভীষিকা সৃষ্টি করিতে উদ্যত হইয়াছে, মানুষের প্রাণের জন্য যাহাদের দরদ নাই, নারীর প্রতি যাহাদের মর্যাদাবুদ্ধি নাই, দক্ষিণ কলিকাতার নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে নিশ্চয়ই তাহারা প্রশ্রয় পাইবে না।

কংগ্রেস গভর্নমেণ্টের দোষত্রুটি না আছে, আমরা এমন কথা বলি না। প্রকৃতপক্ষে জগতে কোন গভর্নমেণ্টই দোষত্রুটি হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারে না। দীর্ঘদিনের পরাধীনতা পর ভারত কিছুদিন হইল স্বাধীনতা পাইয়াছে মাত্র দুই বৎসর হইল ভারতে কংগ্রেস গভর্নমেণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই দুই বৎসরের মধ্যে আমাদের রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের সব অভাব অভিযোগের নিরসন হইবে ইহা সম্ভবও নয় তথাপি বলিব, এই দুই বৎসরের মধ্যে কংগ্রেস পরিচালিত গভর্নমেণ্ট ভারতের অনেক সমস্যা সমাধান করিয়াছে, অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারত সুব্যবস্থিত ও সুগঠিত হইতে চলিয়াছে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারত জগতের মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়াছে। দীর্ঘ দিনের বৈদেশিক শাসনের বিষক্রিয়া হইতে ভারত ক্রমেই মুক্ত হইতেছে এবং বিগত মহা যুদ্ধঘটিত সর্বগ্রাসী বিপর্যয় এশিয়া অপরাপর দেশের ন্যায় এ পর্যন্ত ভারতকে অভিভূত করিতে পারে নাই।

দক্ষিণ কলিকাতার নির্বাচকমণ্ডলী কর্তব্য আজ সুস্পষ্ট। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ত্যাগময় ঐতিহ্য যে কংগ্রেসে সুদীর্ঘ সাধনায় উজ্জ্বল, মহামানব গান্ধীজী তপস্যা এবং আত্মোৎসর্গে যে প্রতিষ্ঠান মহীয়া ভারতের ঐক্য এবং সংহতির যে প্রতিষ্ঠা উৎসস্বরূপ, সেই প্রতিষ্ঠানকেই তাঁহারা সমর্থ করিবেন। কংগ্রেসের মনোনীত সদস্য অগ্নি যুগের অন্যতম সাধক, সাক্ষাৎ সম্পর্কে বা যতীনের সতীর্থ, নিভৃত এবং নীরব কর্ম শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র দাস তাঁহাদের সকলে সমর্থন লাভ করিবেন, এ বিষয়ে কোন সন্দে থাকিতে পারে না। কংগ্রেসের প্রতি বিদ্বে মূলক প্রবৃত্তিতে উত্তেজিত অনর্থকার দল ভারতের স্বাধীনতাকে ধ্বংসা প্রভাবে বিপর্যস্ত করিবার জন্য যত রকমে সুযোগ হিংস্রতাপূর্ণ উৎকট আগ্রহে সহিত অন্বেষণ করিতেছে। দক্ষি কলিকাতার শিক্ষিত এবং বিবেচক নির্বাচ মণ্ডলী ইহাদের দৌরাত্ম্যের বিষ দাঁত ভা করিয়া ভাঙিগয়া দিবেন। বলা বাহুল্য, দে স্বার্থ এবং জাতির স্বার্থের কাছে ব্যক্তি ভাবাবেগের কোন স্থান নাই। দেশের হি এবং জনগণের কল্যাণ সাধন-ব্রতে কংগ্রে আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাবুদ্ধি লইয়া অগ্র হইবার কর্তব্য এক্ষেত্রে তাঁহাদের কা উপস্থিত হইয়াছে। সুদৃঢ় সঙ্কল্পশীলত সঙ্গে সে কর্তব্য তাহাদিগকে প্রতিপা করিতে হইবে। বৈদেশিক প্রভাপ নাশকতামূলক মতবাদের একটা বিচার মূঢ়তার আবর্তে দেশ ও জাতিকে বিভ্রান্ত করি উদ্যত হইয়াছে; দক্ষিণ কলিকাতার নির্বাচ মণ্ডলী এক্ষেত্রে নিশ্চয়ই কংগ্রেসের নির্দে ত্যাগ ও সেবার আদর্শকে জাতির সম্ম সুস্পষ্ট করিয়া ধরিবেন। হুজুগ বা সাম উত্তেজনার বশে দেশের বৃহত্তর স্বার্থ সম্বন্ধে গুরুত্ব ও দায়িত্বকে দক্ষিণ কলিকা নির্বাচকমণ্ডলী বিস্মৃত হইতে পারেন না।

## মধু মাস

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র

বীণা মোর হাতে ওঠেনিক' বহুদিন,
সারাটি বছর শঙ্খ ধূলায় প'ড়ে
কবির চিত্ত সংসারে ছিল লীন
অভিমানে প্রিয়া, দ্বার হতে গেছ ফিরে।

ন্যায়শাস্ত্রের সমস্যা নিয়ে শুধু
কবির বছর কেটেছে এবার হায়
রসায়ন মাঝে পরাণ খুঁজেছে মধু
স্তব্ধ নিশীথে শারদ চন্দ্রিকায়।

শীতের রজনী হিম-কম্পিত দেহ
বিরহের কথা মনে ওঠেনিক' মোটে
নিদ্রা পরশে নীরব সারাটি গেহ
বিনিদ্র কবি শুধু ব্যাকরণ ঘাঁটে।

মলয় বায়ের দীরঘ শ্বাস শুনি
কবির পরাণে ওঠেনিক' হাহাকার
তারকা খচিত নিশার আঁচলখানি
কবির পরাণে এঁকেছে অন্ধকার।

বৎসর শেষে আসিয়াছে মধুমাস
উল্লাসে চিত-তন্ত্রী বাজিতে চাহে
আজিকার সাঁঝে প্রকৃতির কলভাষ
কবির পরাণে শত সংগীত গাহে।

মলিন শঙ্খ আজ বেজে ওঠ তবে
আকাশ বাতাস ভরি দেরে আজ সব
আজি উচ্ছল সিন্ধুর ভীম রবে
ঢেকে দেরে আজ বিশ্বের কলরব।*

১৮ই চৈত্র, ১৩৩৮
মাহীগঞ্জ, রংপুর

## প্রস্তাব

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

হাওয়া-থম্‌থম্‌ আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে
দু'চোখে নাম্‌লে ঘুম নিঃঝুম
নিস্তরঙ্গ শান্তি—
কে আর সূর্যসন্ধানে ফেরে,
তমসার কারাগার কে
ভাঙে বলো যদি ভালো লেগে যায়
অসীম অন্ধকারকে?
ওরে মন, থেমে দাঁড়ালেই চোখে
নামবে করুণ ক্লান্তি,—
তার চেয়ে চলো অন্ধকারকে ছাড়িয়ে।

তার চেয়ে চলো অন্ধকারকে ছাড়িয়ে, রাত্রি তাড়িয়ে
খুঁজি ধূ-ধূ নীল বিস্তার। শুধু
চকিত কথার পান্না
ঝরিয়ে কি লাভ, দুহাতে ছড়িয়ে
অন্ধ খুশীর তৃপ্তি?
ডাকে উত্তাল সমুদ্র, আসে
জোয়ার, তাম্রলিপ্ত
ঘুম থেকে জেগে ওঠে ঃ ভুলে গিয়ে
তটিনীর মৃদু কান্না
চলো যাই সেই নীল সমুদ্রে হারিয়ে।

---

* 'থার্ড ক্লাস' 'দিবাকরী' প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক পরলোকগত রবীন্দ্রনাথের একটি অপ্রকাশিত কবিতা।

## দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভবিষ্যৎ

"যুদ্ধের পাপী" হিসাবে টোকিওতে যাঁদের বিচার হয়, তাঁদের মধ্যে জাপানের যুদ্ধকালীন প্রধানমন্ত্রী তোজোও ছিলেন। বিচারে তোজোর প্রাণদণ্ডের আদেশ হয় এবং গত ডিসেম্বর মাসে তাঁর ও আরও কয়েকজনের ফাঁসিও হয়ে যায়। সম্প্রতি তোজোর বিধবা পত্নীর কাছ থেকে ডক্টর রাধাবিনোদ পাল একখানি চিঠি পেয়েছেন। সকলেই জানেন যে, বিচারকদের মধ্যে একা ডক্টর রাধাবিনোদ পাল সমস্ত জাপানী অভিযুক্ত ব্যক্তিদের নির্দোষ বলে একটি পৃথক রায় দেন। বহুর বিরুদ্ধে এক-জনের মত বিচারের ফলাফলে কোন তারতম্য ঘটাতে পারেনি বটে, কিন্তু বিচারক হিসাবে ডক্টর পালের ব্যবহার এবং তাঁর রায় জাপানী মনের উপর যে গভীর রেখাপাত করেছিল, তার কিছু আভাস পাওয়া যায় তোজো-পত্নীর চিঠিতে।

টোকিও বিচারের জন্যে ভারতবর্ষ থেকে যখন একজন বিচারক নেওয়া হয়, তখন অনেকেরই সেটা ভালো লাগেনি, কারণ বিজয়ীর দ্বারা পরাজিতের এই বিচারকে বিচার বলে মানতে অনেকের মনই চায়নি; বরঞ্চ অনেকের মনে হয়েছে, এ কেবল নীতির দোহাই দিয়ে প্রতিশোধ গ্রহণের একটা নতুন কায়দা মাত্র। এই ধরণের ব্যাপারের সঙ্গে ভারতবর্ষের নাম জড়িত থাকবে, এই ভেবে বহুলোকের মন পীড়িত হয়েছিল। কিন্তু বিচার-নাট্যের অবসানে যখন ডক্টর রাধাবিনোদ পালের রায় প্রকাশিত হোল, তখন তাদেরই মনে হতে লাগল যে, ভারতবর্ষ থেকে ডক্টর পাল বিচারক নিযুক্ত হয়েছিলেন বলে ভারত-বর্ষ তথা এশিয়ার তবু মুখরক্ষা হয়েছে।

তোজো-পত্নীর চিঠিতে প্রকাশ যে, তাঁর স্বামী এবং অন্যান্য জাপানী আসামীরা বিচারকালে ডক্টর পালের ব্যবহারে শুধু কৃতজ্ঞতা নয়, গর্বও অনুভব করে গেছেন। তাঁদের চক্ষে ডক্টর পাল কেবল ভারতবর্ষ নয়, সমস্ত এশিয়ার বিচার-বুদ্ধির প্রতিনিধিরূপে প্রতিভাত হয়েছিলেন—যে এশিয়াকে ইউরোপ তিনশো বছর পায়ের নীচে রাখার চেষ্টা করেছে এবং এখনও তার রথের চাকার সঙ্গে বেঁধে রাখতে চায়। যুদ্ধে জাপান হেরেছে, কিন্তু শত দুঃখ ও অপমানের মধ্যেও এশিয়ার মন ও বুদ্ধি যে অপরাজিত রয়েছে, তার প্রমাণ দিলেন ডক্টর পাল। ভারত স্বাধীন হবার পরে যদি কিছুর দ্বারা বিশ্বমানবের দরবারে ভারতের মর্যাদা বেড়ে থাকে, তবে সে হয়েছে ডক্টর পালের জাপানী বিচারের রায়ের দ্বারা। ডক্টর পালের রায়ে যে ন্যায়-বুদ্ধি ও স্বাধীন চিন্তার পরিচয় আছে তাতে শুধু ভারতবর্ষ নয়, সমস্ত এশিয়ার নৈতিক মর্যাদা রক্ষা হয়েছে।

মৃত্যুর পূর্বে তোজোর মনের চিন্তাধারা সম্বন্ধে তাঁর পত্নী ডক্টর পালকে যা লিখেছেন তার মূল্য আছে। জাপানী নীতির অনেক ভুল-ত্রুটি ছিল। য়ুরোপের অনুকরণ করতে গিয়ে জাপান এমন অনেক কাজ ও মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে, যাতে ভারতবর্ষের মন সায় দিতে পারেনি, কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে জাপানী যুদ্ধের আঘাতেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে য়ুরোপীয় প্রভুত্বের শিকড় একেবারে ছিন্ন না হোক, অন্ততঃ আলগা হয়ে গেছে। জাপানের পরাজয়ের পরে শ্বেতাঙ্গেরা আবার নতুন করে ভোল বদলিয়ে নিজেদের প্রভুত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা এখনও করছে বটে, কিন্তু যে শিকড় একবার আলগা হয়ে গেছে, সে যে আবার মাটি ধরবে তার সম্ভাবনা অল্প। যুদ্ধের সময়ে জাপানী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কো-প্রস্পারিটীর (Co-Prosperity) যে ধুয়ো তুলেছিল তার মধ্যে হয়ত ফাঁকি ছিল, তার সঙ্গে হয়ত য়ুরোপীয় শোষণের বদলে জাপানী শোষণের মতলব জড়িত ছিল, কিন্তু মতলবের কথা ছেড়ে দিলে তার মধ্যে একটা বড় ঐক্যের আদর্শের আভাসও ছিল। জাপানী অস্ত্রের অস্তিত্ব এখন নেই, কিন্তু জাপানী অস্ত্রই য়ুরোপীয় শক্তিকে আঘাত করার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিকে এমন করে নাড়া দিয়ে গেছে যে, তাদের আর শান্ত করা যাচ্ছে না। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মত জাপানী যুদ্ধ বন্ধ হবার পরেও ভূমিকম্প থামছে না। একথা মানতেই হবে যে, গত মহাযুদ্ধের ফলে অন্তত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাতিগুলি স্বাধিকার সম্বন্ধে পূর্ণভাবে সচেতন হয়েছে এবং শত বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও সে অধিকার একদিন পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হবেই, কিন্তু হয়তো সহজে নয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাতিগুলির মধ্যে অধিকতর একতার প্রয়োজন প্রতিদিন স্পষ্ট হয়ে উঠছে। ইংরেজ, ডাচ, ফরাসী ও আমেরিকা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় শ্বেতাঙ্গ প্রভুত্ব রক্ষার জন্য পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা করছে, কিন্তু যে জাতিগুলি তাদের নাগপাশ ছিন্ন করতে চেষ্টা করছে, তারা একযোগে কিছু করতে পারছে না। অবশ্য তাদের বিচ্ছিন্ন করে রাখাই সাম্রাজ্য-বাদী নীতির একটি অপরিহার্য কৌশল। এই কৌশলকে ব্যর্থ করতে না পারলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীন ও সুস্থ হতে পারবে না। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কোন একটি জাতির পক্ষে একা স্বাধীনতা অর্জন ও ভোগ করা কঠিন হবে। সেই দিক থেকে জাপানের আবিষ্কৃত 'কো-প্রস্পারিটি'র ধ্বনির একটা মূল্য আছে। জাপানের উদ্দেশ্য যা তখন শুধু নাও থেকে থাকে, তবুও জাপান নিজের কাজ হাঁসিলের জন্যে ধুয়ো হিসাবে যেটা তুলেছিল, সেটাকে প্রকৃত আদর্শ হিসাবে ব্যবহার করতে পারলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া জীবনে নবশক্তির সঞ্চার হবে।

## চীনের অভিজ্ঞতা

বিশ্বভারতীর "চীন ভবনের" অধ্যা অধ্যাপক তান ইয়ুন সান আড়াই মাস স্বদেশে যাপন করে সম্প্রতি ভারতবর্ষে ফিরেছেন। ফিরে এসে অধ্যাপক তান যা বলেছেন, তাতে ইতিপূর্বে 'বৈদেশিকী'র স্তম্ভে চীন সম্বন্ধে আমরা যে আলোচনা করেছি, তার সমর্থ মেলে। অধ্যাপক তানের দুটি কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তার একটি হোল এই যে দুই দলের মারামারির ফলে চীনের সাধারণ লোকের ক্লেশের সীমা নেই, তাদের এখন স চেয়ে বেশি কাম্য হচ্ছে, চীনের ঐক্য শান্তি—ক্ষমতা কোন্ দলের হাতে থাকা উচি তাই নিয়ে তাদের মাথা ব্যথা নেই। অবি এটাও ঠিক যে, কো-মিন-টাংয়ের মধ্যে অনে সৎ ও কর্মদক্ষ লোক থাকা সত্ত্বেও মোটে উপর কো-মিন-টাং শাসন এতো বে অকর্মণ্য ও দুর্নীতিপূর্ণ হয়ে উঠেছে সাধারণ লোকের মধ্যেও অনেকের ধার হয়েছে যে, এর বদলে যা-ই আসুক, এর চে ভাল হবে। এই নেতিমূলক মনোভাব আপাত কম্যুনিস্টদের সহায়ক হচ্ছে সন্দেহ নে কিন্তু মোটের উপর চীনের জনসাধারণের এখনও মতবাদ-কেন্দ্রিক গৃহযুদ্ধের বি আচ্ছন্ন হয়নি। আধুনিক য়ুরোপীয় রা নৈতিক অর্থে যাকে গৃহযুদ্ধ বলে, অথ যাতে মতবাদের ভিত্তিতে সমাজ-মন দ্বি বিভক্ত হয়ে যায়, চীনের অন্তর্কলহকে ধরণের গৃহযুদ্ধ বলা যায় না। চীনে মতবা সঙ্ঘর্ষ নেই তা নয়, কিন্তু যে সঙ্ঘর্ষ অ সেটা সমাজ-মনের গভীরে এখনও প্র করতে পারে নি। চীনে একপক্ষের কাছে য অন্যপক্ষ হেরেছে, তখন একপক্ষের শক্তি কর্তৃত্বের ক্ষেত্র নিশ্চয়ই বেড়ে যাচ্ছে, কি তার সঙ্গে সঙ্গে চীনের সমাজ-মন মতবাদ থেকে আরেক মতবাদে উত্তীর্ণ হ একথা একেবারেই বলা চলে না। তার আগে

প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে অধ্যাপক তানের দ্বিতীয় কথাটি থেকে।

অধ্যাপক তান বলেছেন যে, এটা একটা খুবই সুলক্ষণ যে, কো-মিন-টাং অধিকৃত এবং কম্যুনিস্ট অধিকৃত উভয় অঞ্চলেই শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলি হাজার রকম অসুবিধা সত্ত্বেও তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। অধ্যাপক তানের মতে এ থেকে প্রমাণ হয় যে, রাজনৈতিক পরিবর্তন যাই হোক না কেন, জাতীয় সংস্কৃতির প্রতি লোকের অনুরাগ অক্ষুন্ন আছে। জাতীয় সংস্কৃতির ঐক্য যতদিন অক্ষুন্ন থাকবে, ততদিন জাতির মনের সত্যিকারের ভাগ হয়নি বলে বুঝতে হবে। শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলি বিবদমান রাজনৈতিক কর্তাদের নজর একেবারে এড়িয়ে যেতে পারছে বলে মনে হয় না। মধ্যে মধ্যে যেসব খবর আসছে, তা থেকে জানা যায় যে, কোন একটা অঞ্চল কম্যুনিস্টদের অধিকারে আসার পরেই সেখানকার সংবাদপত্রগুলিকে কম্যুনিস্টদের সমর্থন করতে বাধ্য করা হচ্ছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কম্যুনিস্টরাও শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলির কাছ থেকে রাজনৈতিক সমর্থনের অতিরিক্ত মানসিক বাধ্যতা আদায়ের চেষ্টা করছে বলে শোনা যায়নি। এটা কম্যুনিস্টদের সাময়িক নীতি মাত্র, একটু শক্ত হয়ে বসতে পারলেই তারা চীনের জাতীয় সংস্কৃতির ধারাকে উল্টে দিয়ে চীনের মনকে কম্যুনিস্ট ছাঁচে ফেলে নতুন করে গড়তে লেগে যাবে—এ আশঙ্কা অবিশ্যি অনেকের মনে আছে। কিন্তু চীন একটা একটুখানি মাটির তাল নয় এবং চীনের সভ্যতাও দু-পাঁচশো বছরের মাত্র সৃষ্টি নয় যে, গায়ের জোরে টিপে-টুপে যেমন খুশি তার রূপ বদলে দেওয়া যাবে।

চীনের বর্তমান উভয় দলের রাজনৈতিক রণকৌশলই য়ুরোপ থেকে শেখা। একটা দুমুখো সাপের দুটো মুখের মত কো-মিন-টাং ও কম্যুনিস্ট বিশাল চীনকে জড়িয়ে একে অপরকে দংশন করছে, কিন্তু তাদের বিষ চীনের গভীরতম সত্তাকে এখনো আক্রমণ করতে পারে নি। সেই জন্য চীনের সাংস্কৃতিক মনের ঐক্য—যে মন যুদ্ধ ও যুদ্ধব্যবসায়ীদের কোনদিনই প্রকৃত শ্রদ্ধা করতে পারে নি—সেই মনের ঐক্য এখনো ভাঙেনি। সেই জন্যেই চীন সংস্কৃতির প্রকৃত ধারকগণ, চীনের পণ্ডিত ও শিক্ষকগণ রাজনৈতিক ভাঙাচোরার দিকে যতদূর সম্ভব কম নজর দিয়ে অশেষ দুঃখকষ্টের মধ্যে যে যেখানে আছেন, স্বধর্ম পালন করে যাচ্ছেন। এটা সম্ভব হচ্ছে এই কারণে যে, চীনের জনসাধারণের মন আসল জায়গায় অর্থাৎ জাতির গভীরতম ঐতিহাসিক অনুভূতির ক্ষেত্রে এখনও দুভাগ হয়ে যায় নি। এটা খুব বড় আশার কথা। য়ুরোপ আজ এশিয়াময় দুমুখো সাপ ছেড়ে উপর দংশন করছে। যদি দেখা যায় যে চরম রাজনৈতিক সংঘর্ষেও চীনা সংস্কৃতির ঐতিহাসিক ধারা ও ঐক্য নষ্ট হয়নি তবে আশা করা যাবে যে, আপাতত যত দুঃখ ভোগই থাক না কেন, শেষ পর্যন্ত চীন এবং এশিয়ার অন্য জাতিগুলিও আত্মবিনষ্টি থেকে বেঁচে যাবে।

## শাম্বশিবমের প্রাণরক্ষার চেষ্টা

"আবোল তাবোলে"র ছড়ায় আছে, "শিবঠাকুরের আপন দেশে আইন কানুন সর্বনেশে"। মালয়ে কম্যুনিস্ট বিদ্রোহ দমনের জন্যে যে আইন করা হয়েছে তাতে স্রেফ অস্ত্র রাখার অপরাধেই প্রাণদণ্ড হতে পারে। এই আইন-দেবতার কাছেই গণপতিকে বলি দেওয়া হয়েছে। ভারত গভর্নমেন্টের প্রতিনিধিরা অনেক অনুনয় বিনয় করে গণপতির প্রাণভিক্ষা চেয়েছিলেন, কোনো ফল হয় নি। ঐ একই আইনের কবলে পড়েছেন আর একজন ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী—শাম্বশিবম্। তাঁরও ফাঁসির হুকুম হয়েছে। মালয়ের অন্তর্গত জোহোরের সুলতানী সরকারের কাছে শাম্বশিবমের প্রাণরক্ষার জন্য যে আবেদন করা হয়েছিল সেটাও অগ্রাহ্য হয়েছে। তারপর ভারত সরকার খরচ দিয়ে বিলেতের প্রিভিকাউন্সিলের নিকট শাম্বশিবমের পক্ষে আপীল করার ব্যবস্থা করেছেন। মালয় থেকে প্রিভিকাউন্সিলের নিকট ফৌজদারী মামলার এই নাকি হচ্ছে প্রথম আপীল। প্রিভিকাউন্সিলে এ মামলার আপীল আদৌ চলতে পারে কি না প্রথমে তার শুনানী হবে। আপীল চলতে পারে এই সাব্যস্ত যদি হয় তবে মামলার মূল বিষয়ের শুনানী হবে। সুতরাং প্রিভিকাউন্সিলের আপীলের ফলাফল একান্ত অনিশ্চিত। তবে আপীল করাতে এইটুকু হয়েছে যে আপীলের চূড়ান্ত না হওয়া পর্যন্ত শাম্বশিবমের ফাঁসী স্থগিত আছে।

কিন্তু আশ্চর্য হতে হয় মালয়ের বৃটিশ কর্তৃপক্ষের ব্যবহারে। সকলেই জানে যে মালয়ের সুলতানরা সাক্ষীগোপাল, বৃটিশ যা করে তাই হয়। গণপতির বেলায় ভারত গভর্নমেন্টের কোন অনুনয় বিনয়ে মালয়ের বৃটিশ প্রভুরা কর্ণপাত করেননি। শাম্বশিবমের বেলায়ও তাই দেখা যাচ্ছে। যদি বৃটিশ কর্তৃপক্ষ সদয় হতেন তবে জোহোরের সুলতানী সরকার বিনা দ্বিধায় শাম্বশিবমের প্রাণ ভিক্ষার আবেদন মঞ্জুর করতেন। আবেদন যে নামঞ্জুর হয়েছে তার কারণ যে মালয়ের বৃটিশ প্রভুরা শাম্বশিবমের মৃত্যু চান। আশ্চর্যের কথা এই যে, এ ব্যাপারে লণ্ডনের কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত কিছু করতে রাজী হচ্ছেন না। অথচ গণপতির ফাঁসির পরে একাধিক খ্যাতনামা বৃটিশ সংবাদপত্র গণপতিকে ফাঁসি দিয়ে ভারতবর্ষকে অহেতুক অসন্তুষ্ট করার জন্যে বৃটিশ গভর্নমেন্টের প্রতিনিধি মিঃ থিভী এ বিষয়ে যতদূর সম্ভব বিনীত ব্যবহার করে আসছেন। তিনি পরিষ্কার করেই বলেছেন যে, মালয়ে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ কম্যুনিস্ট দমনের জন্যে যে আইন করেছেন তার কোনরকম পরিবর্তন দাবী তিনি করেন নি। তিনি শুধু কর্তৃপক্ষকে কতকগুলি আনুষঙ্গিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে গণপতির প্রাণ রক্ষার জন্যে আবেদন জানিয়েছিলেন। শাম্বশিবমের বেলায়ও তিনি তাই করছেন। কিন্তু এতেই মালয়ের একদল ইংরেজ ক্ষেপে গিয়ে বলছে ভারত গভর্নমেণ্টের প্রতিনিধি মালয়ের নিজস্ব ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করছে। প্রভুরা শেষ পর্যন্ত মিঃ থিভীকে ফাঁসি দিতে না চাইলে বাঁচি!

## বর্মার পরিস্থিতি

বর্মার অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে না। প্রধান মন্ত্রী থাকিন নু কেন লণ্ডন যাওয়া স্থগিত রাখলেন ঠিক বোঝা গেল না। পার্লামেন্টের কাজে বৃটিশ মন্ত্রীরা ব্যস্ত থাকবেন, এই জন্যে তিনি গেলেন না। এটা নিতান্তই একটা ওজুহাত মাত্র বলে মনে হয়। যাই হোক ৭ই জুন থেকে বর্মার পার্লামেন্টের অধিবেশন আরম্ভ হবার কথা। দেশের বর্তমান অবস্থায় পার্লামেন্টের কাজে বর্মীদের মন দেওয়া কঠিন। বর্মার কনস্টিটিউশন অনুযায়ী আগামী ৪ঠা জুলাইয়ের পূর্বে সাধারণ নির্বাচন হওয়া আবশ্যক। বলা বাহুল্য দেশের এখন যা অবস্থা তাতে সাধারণ নির্বাচন অসম্ভব। গভর্নমেণ্ট ঘোষণা করেছেন যে, বর্ষার পর পর্যন্ত নির্বাচন স্থগিত থাকবে। পার্লামেণ্টকে দিয়ে এই সিদ্ধান্ত অনুমোদিত করিয়ে নিতে হবে। বর্ষার পরেই যে নির্বাচন হতে পারবে তারও কোনো সম্ভাবনা দেখা যায় না। যদি না ইতিমধ্যে অপ্রত্যাশিতভাবে সকল দলের মধ্যে একটা আপোষ হয়ে যায়। আর যদি বর্মা গভর্নমেণ্টকে যুদ্ধ করে বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করে সমস্ত দেশে শান্তি স্থাপন করে সাধারণ নির্বাচন করাতে হয় তবে যে কতদিন লাগবে তা কে জানে! কিন্তু আবার অনির্দিষ্টকালের জন্যে নির্বাচন স্থগিত থাকবে এ আশঙ্কাও বোধ হয় বর্মার সকলে করে না, তা না হলে হঠাৎ বর্মার সোস্যালিস্ট পার্টি আগামী নির্বাচনে কী নীতির ভিত্তিতে নির্বাচনদ্বন্দ্বে নামবে তা জাহির করার জন্যে এত ব্যস্ত হোত না। বর্মার পার্লামেণ্টে সোস্যালিস্টরাই এখন সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। বর্মার সোস্যালিস্ট পার্টি মার্কস লেলিনের মতবাদের প্রতি তাদের নিষ্ঠার কথা জোর গলায় ঘোষণা করেছে। বিদেশী দেবতার নাম-কীর্তন বর্মী রাজ (নৈতিক) ধর্ম সাধনের একটা অঙ্গ হয়ে উঠেছে দেখা যাচ্ছে।

# জাতির সেবায় কংগ্রেসের ৬৫ বৎসরের অবদান স্মরণ করুন

দক্ষিণ কলিকাতা উপ-নির্বাচন প্রতিযোগিতায় শ্রীশরৎচন্দ্র বসু কংগ্রেস-মনোনীত প্রার্থী শ্রীসুরেশচন্দ্র দাসের বিরোধিতা করিবেন। শ্রীশরৎচন্দ্র বসু বলিয়াছেন যে, তিনি কংগ্রেসের অপকার্যের ('misdeeds') কথা জনসাধারণকে স্মরণ করাইয়া দিয়া তাঁহার পক্ষে ভোট দাবী করিবেন। নির্বাচন প্রতিযোগিতায় কোন ব্যক্তি বা দলের পক্ষে এইরূপে শুধু অপর পক্ষের নিন্দাবাদ দ্বারা ভোট সংগ্রহের প্রয়াস, এই আমরা প্রথম দেখিলাম। নিজ দলের আদর্শ প্রোগ্রাম ও কৃতিত্বের তালিকা নির্বাচকমণ্ডলীর নিকটে উপস্থিত করিয়া স্বপক্ষে ভোট দাবী করাই সাধারণ নীতিসম্মত ও সভ্যতাসংগত পদ্ধতি। সোস্যালিস্ট রিপাব্লিকান পার্টি ও তাহার মনোনীত প্রতিনিধি শ্রীশরৎচন্দ্র বসু এই সাধারণ নীতিসংগত পদ্ধতি বর্জন করিয়া মাত্র কংগ্রেসের নিন্দাবাদ দ্বারাই প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইয়াছেন।

কংগ্রেসের অপকার্য? ইহার অর্থ কি? রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানরূপে গত পঁয়ষট্টি বৎসর ধরিয়া কংগ্রেস জনসেবা, সংগঠন সংগ্রাম ও আন্দোলনে যে কৃতিত্বের ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা কি অপকার্য? ভারতের কংগ্রেস যে কৃতিত্বের প্রমাণ দিয়াছে, তাহার শতাংশের একাংশও পৃথিবীর কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান দিতে পারে নাই। কংগ্রেসের এক আগষ্ট সংগ্রামেই দেড় মাসের মধ্যে ২৫ হাজার নিরস্ত্র মানুষ আত্মবলিদান করিয়াছে, কোন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ইহার তুলনা নাই। কংগ্রেসেরই সংগ্রামের ফলে বস্তুতঃ ভারত, সিংহল, বর্মা স্বাধীনতালাভ করিয়াছে, এশিয়ার অভ্যুত্থান সার্থক হইয়াছে।

তাহার পর, কংগ্রেস-পরিচালিত স্বাধীন ভারতের কৃতিত্ব ও সাফল্যের কথা ধরা যাক্। দেড় বৎসরের মধ্যে কংগ্রেস পরিচালিত স্বাধীন ভারত যাহা করিয়াছে, তাহা পৃথিবীর ইতিহাসে অতুলনীয় ও অসাধারণ। কংগ্রেস কি করিতে পারে নাই, তাহার দ্বারা কংগ্রেসকে বিচার করিব না। কি করিতে পারিয়াছে, তাহার দ্বারাই কংগ্রেসকে বিচার করিব।

দক্ষিণ কলিকাতার জনসাধারণ অনুধাবন করিয়া দেখিবেন, কংগ্রেসের নেতৃত্বে স্বাধীন ভারত কি পরিমাণ কৃতিত্ব ও সাফল্য অর্জন করিয়াছে, তাহারই বিবরণ অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইল।

(১) পৃথিবীর বৃহত্তম প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্ররূপে ভারতবর্ষকে প্রতিষ্ঠা দান। পৃথিবীর ইতিহাসে ৩৫ কোটি প্রজা লইয়া এই প্রথম প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে।

(২) কংগ্রেস ভারতের জাতীয় সংস্কৃতি, সভ্যতা ও চিন্তাধারাকে যেমন সচল করিয়াছে, তেমনি আধুনিকতম শিল্প-বিজ্ঞানকে ভারতের বৈষয়িক সমৃদ্ধির কাজে উদারভাবে নিয়োগ করিয়াছে। প্রাচীনতম সভ্য দেশ আধুনিকতম ও বৃহত্তম প্রজাতন্ত্র-রূপে প্রতিষ্ঠিত হইল, ইহা পৃথিবীর ইতিহাসে অভিনব। ইহা কংগ্রেসেরই কীর্তি।

(৩) ভারতের রাষ্ট্রীয় সংহতি ও ঐক্য সাধন—দেড় বৎসরের মধ্যে ভারতের ছয়শত বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন দেশীয় রাজ্যকে ভারত রাষ্ট্রের সহিত পূর্ণভাবে সমন্বিত করা হইয়াছে। ভারতের ইতিহাসে ইহা অভিনব, এত বড় ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষ আর কখনো হয় নাই। সাম্প্রদায়িকতা এবং প্রাদেশিকতা নামক দুইটি ভেদবাদ স্বাধীন ভারতবর্ষ দমন করিয়াছে।

(৪) ১৯৪৭ সালে খাদ্যবস্তুর অভাবে দুর্ভিক্ষ প্রায় ভারতের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছিল। স্বাধীন ভারতের গবর্ণমেণ্ট অসাধারণ দক্ষতার সহিত পৃথিবীর সকল অঞ্চল হইতে বহু বাধাবিপত্তির মধ্যেও খাদ্য সংগ্রহ করিয়া সদ্য স্বাধীন ভারতবাসীর জীবন রক্ষা করিয়াছে।

(৫) স্বাধীন ভারতের সামরিক বাহিনী, এশিয়ার বৃহত্তম শক্তিশালী বাহিনী। নানাভাবে খণ্ডিত ভারতীয় বাহিনীকে দেড় বৎসরের মধ্যে যে সুসংহত বাহিনীরূপে গঠন করা হইয়াছে, তাহার তুলনা কোন দেশের ইতিহাসে নাই। দেড় বৎসরের মধ্যেই ভারতবর্ষ এশিয়ার নেতারূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(৬) হায়দরাবাদ ও কাশ্মীর, এই দুই রাজ্যের অশান্তি দমন করিয়া ভারতবর্ষ দুইটি বৃহৎ বিরুদ্ধ শক্তিকে পরাভূত করিয়াছে।

(৭) চার মাসের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্থান হইতে ৬০ লক্ষ হিন্দু ও শিখকে অপসারণ করিয়া ভারতে আনয়ন এবং ৮০ লক্ষ আশ্রয়প্রার্থীকে পুনর্বসতি করাইবার যে দৃষ্টান্ত ভারত গবর্ণমেণ্ট দেখাইয়াছেন এবং যে প্রয়াস করিতেছেন, তাহা এক অসাধারণ কৃতিত্বের কাহিনী। এত বৃহৎ লোকাপসারণ এবং পুনর্বসতির ঘটনা ও সমস্যা পৃথিবীর ইতিহাসে হয় নাই।

(৮) দেড় বৎসরের মধ্যে ভারতে যন্ত্রোপেত শিল্প, কৃষি ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রসার যাহা হইয়াছে তাহা পৃথিবীর ইতিহাসে অভিনব। ২০টি বিরাট বাঁধ ও নদী পরিকল্পনা, ৩০টি বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, বিমান, জাহাজ ও মোটর নির্মাণের কারখানা স্থাপন, আনবিক শক্তি সম্বন্ধে গবেষণার উদ্যোগ, এশিয়ার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ তিনটি নূতন ইস্পাত উৎপাদনের কারখানা স্থাপনের উদ্যোগ, এশিয়ার বৃহত্তম সার উৎপাদক কারখানা, বয়লার, ইঞ্জিন ইত্যাদি নির্মাণের উদ্যোগ, সুরাসার শক্তির উৎপাদন, ব্যোমরশ্মি সম্বন্ধে গবেষণা, পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধে নূতন গবেষণা, হিমালয়ে বৈজ্ঞানিক অভিযান, পেনিসিলিন ও আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক ঔষধাদি প্রস্তুতের কারখানা, যন্ত্র নির্মাণের কারখানা এবং আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণের জন্য ব্যাপক উদ্যোগ।

(৯) বিমান চলাচলের ব্যাপক প্রসার। এ বিষয়ে ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে একটি প্রধান গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। ভারতের নিজস্ব বাণিজ্য জাহাজের চলাচল প্রসার। ১৪ হাজার মাইল রেলপথ বিস্তারের উদ্যোগ আরম্ভ। ২০টি নূতন রেডিও ষ্টেশন স্থাপন।

(১০) ১৯৫১ সালের মধ্যে খাদ্য সম্বন্ধে আত্মনির্ভর হইবার উদ্যোগ আরম্ভ। পতিত জমি আবাদ করিবার এক সুবৃহৎ পরিকল্পনা ও কাজ, যাহাকে 'প্রাচ্য জগতের বৃহত্তম উদ্যোগ' বলা হইয়াছে। চাষীদিগের সাহায্যের জন্য আবহাওয়া বিজ্ঞানের পরিচালনায় একশত স্টেশন কাজ করিতেছে।

(১১) শ্রমিক উন্নয়ন—গত দেড় বৎসরে শ্রমিকদিগের উন্নতি সম্পর্কে যে ব্যবস্থা, আইন ও উদ্যোগ হইয়াছে, গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে কোন দেশে সে পরিমাণ উদ্যোগ হয় নাই। ভারতবর্ষের নেতৃত্বে 'নিখিল এশিয়া শ্রমিক সংঘ'ও স্থাপিত হইয়াছে।

(১২) পৃথিবীর প্রত্যেক রাষ্ট্রের সহিত ভারতবর্ষের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত ও দূত বিনিময় হইয়াছে। ভারত তাহার পররাষ্ট্র নীতির দ্বারা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রধান স্থান লাভ করিয়াছে।

(১৩) নারী সমাজের উন্নয়ন—কংগ্রেসের আন্দোলনের ভিতর দিয়াই ভারতীয় নারীর সামাজিক মুক্তি সাধিত হইয়াছে। গত দেড় বৎসরের মধ্যেই রাষ্ট্রীয় কর্তব্যের সকল ক্ষেত্রে নারীর স্থান হইয়াছে। রাষ্ট্রদূত, মন্ত্রী, গবর্ণর ও উপদেষ্টারূপে রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে বর্তমানে নারীসমাজ যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, পৃথিবীর কোন প্রগতিশীল রাষ্ট্রেও তাহা হয় নাই।

(১৪) শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল ও ব্যাপক সংস্কার এবং উন্নতির উদ্যোগ। উচ্চ টেকনিক্যাল বা কারিগরী শিক্ষা কমিটি, বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন, বনিয়াদী শিক্ষা পদ্ধতির প্রসার, শিক্ষার মাধ্যম নির্বাচন, রাষ্ট্রভাষা গঠন, বয়স্কের শিক্ষা প্রসার, ঐতিহাসিক রেকর্ড কমিশনের উদ্যোগ, পরিভাষা কমিটি ইত্যাদির দ্বারা শিক্ষা ব্যবস্থাকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার উদ্যোগ চলিয়াছে।

(১৫) ভোর কমিটির নির্দেশ অনুসারে জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন, মারী ও ব্যাধি দূরীকরণের জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা অনুসারে কাজ অগ্রসর হইতেছে। যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া এবং কুষ্ঠরোগের প্রতিকারের জন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণাকার্য হইতেছে।

(১৬) মাদ্রাজে দুর্ভিক্ষ নিবারিত হইয়াছে, ২০ কোটি মানুষের খাদ্য রেশন ব্যবস্থার দ্বারা পরিবেষিত হইতেছে।

(১৭) যোগ্য শাসন কর্মচারী ট্রেণিং দিবার জন্য জাতীয় আদর্শসম্পন্ন 'ভারতীয় সার্ভিস' গঠিত হইয়াছে। বৈদেশিক দূত ও বাণিজ্যিক প্রতিনিধিরূপে কাজ করিবার জন্য 'কূটনৈতিক সার্ভিস' সৃষ্টি হইয়াছে। জল-স্থল-নৌ বাহিনীর জন্য সৈন্য ও অফিসার ট্রেণিংয়ের জন্য বিরাট উদ্যোগ হইয়াছে।

কংগ্রেস নেতৃত্বে স্বাধীন ভারত দেড় বৎসরে যে কৃতিত্বের প্রমাণ দিয়াছে, তাহা অন্য অনেক বৃহৎ স্বাধীন দেশের পক্ষেও দশ বৎসরের মধ্যে সম্ভব হয় নাই। ইহা ভারতের গৌরব, ভারতবাসীর গৌরব, কংগ্রেসের গৌরব।

এই বিরাট কৃতিত্বের অধিকারী কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন এমনই এক 'পার্টির' প্রতিনিধি, যে পার্টির কৃতিত্বের তালিকাটি একটি বিরাট শূন্য ছাড়া আর কিছু নহে।

## দক্ষিণ কলিকাতার নাগরিকদের প্রতি নেতৃবৃন্দের আবেদন

**পশ্চিমবঙ্গ হইতে নির্বাচিত গণ-পরিষদের নয়জন সদস্য, যথা—গণ-পরিষদের সহঃ সভাপতি ডাঃ এইচ সি মুখার্জি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রাক্তন সভাপতি শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, আনন্দবাজার ও হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার, পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র, গণ-পরিষদের সহকারী হুইপ শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ শ্রীসতীশচন্দ্র সামন্ত, শ্রীবসন্তকুমার দাস, শ্রীউপেন্দ্রনাথ বর্মণ এবং শ্রীমিহিরলাল চ্যাটার্জি এক যৌথ বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন। উহাতে তাঁহারা আসন্ন দক্ষিণ কলিকাতা উপনির্বাচনে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী ও দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীসুরেশচন্দ্র দাসকে একযোগে ভোটদানের জন্য দক্ষিণ কলিকাতা নির্বাচকমণ্ডলীর ভোটদাতাদের উদ্দেশে আবেদন জানাইয়াছেন।**

আবেদনে তাঁহারা বলেন, "দক্ষিণ কলিকাতা উপনির্বাচনে নিছক ব্যক্তিগত ও স্থানীয় প্রশ্নই জড়িত নহে; প্রকৃত প্রস্তাবে উহা বৃহত্তর বিষয়ের সহিতও সংশিলষ্ট। ভারতের রাষ্ট্রীয় মহাসভা দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীসুরেশচন্দ্র দাসকে নির্বাচনে শ্রীশরৎচন্দ্র বসুর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে মনোনীত করিয়াছেন। শ্রীযুত বসু সোস্যালিষ্ট রিপাব্লিকান পার্টির তরফে নির্বাচনপ্রার্থী হইয়াছেন। তিনি মুসলিম লীগ ও উহার প্রাক্তন নেতা জনাব সুরাবর্দির সহযোগিতায় একটি সার্বভৌম ও স্বাধীন বাঙলা গঠন করিয়া বাঙলাকে ভারতের অবশিষ্টাংশ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টায় ব্যর্থকাম [illegible] দল গঠন করেন। তাঁহার প্রচেষ্টা মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার যূপকাষ্ঠে বলি দেওয়া হইত। বাঙলার সকল শ্রেণীর জনমণ্ডলী কিরূপে ইহার বিরোধিতা করে, তাহার কাহিনী সুপরিজ্ঞাত। শ্রীযুত বসু কর্তৃক নবপ্রতিষ্ঠিত দলের প্রকৃত প্রস্তাবে কোন অনুগামী নাই। এই উপনির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া তাঁহার কি ফললাভ হইবে, তাহা আমরা উপলব্ধি করিতে অক্ষম। তিনি শুধু কংগ্রেসকেই দ্বন্দ্বে আহ্বান করেন নাই, আমাদের জাতীয় রাষ্ট্রের ভিত্তিমূলেও আঘাত হানিয়াছেন।

শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুর বিগত কালের দেশসেবার ইতিহাস আমাদের অগোচর নাই; তিনি যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, তাহাও আমরা বিস্মৃত হই নাই। ইহা সত্ত্বেও [illegible] ভূমিকায় আমরা তাঁহার নির্বাচনে বিরোধিতা করা কর্তব্য বলিয়া মনে করি। তাঁহার বর্তমান রাজনীতি গঠনমূলক বা সদর্থকবাচক নহে; পক্ষান্তরে তাহা সম্পূর্ণ নঙর্থক ও ধ্বংসাত্মক; মুখ্যতঃ এই কারণেই আমরা তাঁহার বিরোধিতা করিতেছি। আমরা ঘোর দুঃসময়ের মধ্যে কালাতিপাত করিতেছি। এই হেতু কষ্টার্জিত স্বাধীনতা রক্ষা এবং জাতির জনক কর্তৃক নির্দিষ্ট আদর্শ রূপায়িত করিবার উদ্দেশ্যে আমাদের একটি স্থায়ী ও দৃঢ়মূল গবর্ণমেণ্ট অবশ্যই প্রয়োজন।

বর্তমান শাসন ব্যবস্থার ভুলত্রুটি বিকৃত ও অতিরঞ্জিত করা সহজসাধ্য; কিন্তু ক্ষমতালাভের দেড় বৎসরের মধ্যে কংগ্রেস গবর্ণমেণ্ট যে কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছেন, তাহা বিস্মৃত [illegible] দেশীয়

জ্যর সত্তা বিলুপ্ত করিয়া কংগ্রেস গবর্ণ-ট আঞ্চলিক সংহতি বিধান করিয়াছেন। হায়দরাবাদের সমস্যা সমাধান করিয়াছেন; মীর সমস্যারও সন্তোষজনক সমাধান আসন্ন। লকাতা ও অন্যত্র "কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা তীত কংগ্রেস সরকার শান্তি" ও শৃঙ্খলা ার উচ্চ মান স্থাপন করিয়াছেন। অধিকন্তু ক সাম্প্রদায়িক নির্বাচন ব্যবস্থা রহিত রয়া জাতির মনস্তাত্ত্বিক সংহতি বিধান করা য়াছে; অথচ এই সঙ্গে সব কয়টি সংখ্যালঘু প্রদায়ের ন্যায়সঙ্গত অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা া হইয়াছে। আমাদের গবর্ণমেণ্ট যেসব স্যা সমাধানে উদ্যোগী হইয়াছেন তন্মধ্যে বাস্তুদের পুনর্বসতি সমস্যাই সর্বাধিক টল। ইহা এরূপ বিরাট যে, এমন কি রতের সমগ্র সম্পদ নিয়োগ করিলেও এক বা ই বৎসরেও উহার সুরাহা হইতে পারে না। বাস্তুদের পুনর্বসতি সংক্রান্ত পরিকল্পনা তমধ্যেই রূপায়িত করা হইয়াছে; কোটি টি টাকা এ সম্পর্কে ব্যয় করা হইয়াছে। লকাতার সন্নিহিত অঞ্চলে পূর্ববঙ্গের বাস্তুদের পুনর্বসতিকল্পে যে-উপনগর ষ্ট গড়িয়া তোলা হইবে, তজ্জন্য ৫ কোটি কা সাময়িকভাবে ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছে। বাস্তু ব্যক্তিদের ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পে নরায় আত্মনিয়োগের সুবিধা করিয়া দিতে দেশিক ও কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট যে প্রচুর রিমাণ অর্থ ঋণ দিয়াছেন ইহা তদতিরিক্ত বস্থা।

আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে বহুনিন্দিত গ্রেস গবর্ণমেণ্ট দুর্গত ও নির্যাতিতের মুখপত্র হিসাবে আমাদের মাতৃভূমির মুখোজ্জ্বল রিয়াছেন। দুইটি শক্তিগোষ্ঠীর কাহারও ধ্যে নিজস্ব সত্তা বিসর্জন না দিয়া এবং হাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত নীতি নিষ্ঠার সহিত নুসরণ করিয়া ভারত স্বীয় স্বাধীন নীতি নুসরণ করিয়া চলিয়াছে এবং সর্বদা ন্যায়ের ক্ষ অবলম্বন করিয়াছে। এইভাবে কখনও ক পক্ষ, আবার কখনও বা অন্য পক্ষের রুদ্ধে তাহাকে দাঁড়াইতে হইয়াছে। অধিকন্তু ামাদের প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্বে ভারত শিয়ার দেশসমূহের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছে। তি বৎসরের প্রারম্ভে নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত ন্দোনেশীয় সম্মেলনে প্রাচ্য ও দূর প্রাচ্যের যেসব দেশের প্রতিনিধি উহাতে যোগ দিয়াছিলেন, এমন কি তাঁহারাও স্বভাবতঃই এই বিষয়টি পরোক্ষে স্বীকার করিয়াছেন।

আমাদের অভিমত এই, সমস্ত বিষয় একসঙ্গে বিচার করিলে তাহা উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব বলিয়া গণ্য হইতে পারে। যে দল ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে, তাহার পক্ষেই ইহা সম্ভবপর। খাদ্য ও বস্ত্র সম্পর্কিত সমস্যার সমাধানের পথে যে অন্তরায় আছে, সে বিষয়ে আমরা বিশেষভাবে অবহিত আছি। তবে আমরা জনসাধারণকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, সমস্যাটি বিরাট; এই অল্প সময়ের মধ্যে কোন গবর্ণমেণ্টের পক্ষেই উহার সুরাহা করা অসম্ভব। আমাদের আরও মনে রাখিতে হইবে যে, ইহা স্থানীয় সমস্যাও নহে। পৃথিবীর সর্বত্র এই সমস্যা বর্তমান; আমাদের গবর্ণমেণ্ট সমস্যার গুরুত্ব সম্পর্কে অনবহিত নহেন; অথবা এ ব্যাপারে তুষ্টও নহেন। কিন্তু একটি সুশৃঙ্খলাবদ্ধ সমাজ এবং জনসাধারণের পূর্ণ সহযোগিতাই সংশ্লিষ্ট সমস্যার সমাধান করিতে সক্ষম।

যেসব পারিপার্শ্বিক অবস্থা আয়ত্তবহির্ভূত আমাদের গবর্ণমেণ্টের সেই সব অনিবার্য ত্রুটি-বিচ্যুতির উপর জোর দিয়া বিভেদমূলক শক্তি-সমূহকে উস্কাইয়া তোলা বিজ্ঞোচিত হইবে না। পূর্বোল্লিখিত দীর্ঘস্থায়ী সমস্যাসমূহ যেভাবে আমাদের গবর্ণমেণ্ট সমাধান করিয়াছেন এবং সমাধানে উদ্যোগী হইয়াছেন, তাহা উপেক্ষা করাও অসঙ্গত। বস্তুতঃ বিগত কিছুকাল যাবৎ শ্রীশরৎচন্দ্র বসু এই কাজই করিতেছেন। নূতন রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থায় গঠনমূলক প্রস্তাব ব্যতীত শুধু বিযোদগার ও প্রতিকূল সমালোচনায় কাহারও কোন উপকার হয় না। পক্ষান্তরে এজাতীয় অসহযোগিতামূলক মনোভাবে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে জনসাধারণের নিকৃষ্টতম প্রবৃত্তির স্ফুরণ ঘটিয়া থাকে এবং গবর্ণমেণ্টের অসুবিধা বৃদ্ধি পায়। এশিয়ার কয়েকটি দেশে যেসব ঘটনা ঘটিতেছে, তাহা হইতে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। ক্ষমতা করায়ত্ত করিতে উৎসুক ভুঁইফোড় দল সমূহ অধুনা জনসাধারণকে নিজেদের কাজে লাগাইতেছে; আমাদের দেশকেও অনুরূপ অবস্থা হইতে রক্ষা করিতে হইলে সাধারণ লোকে যাহাতে আর নূতন ধ্বনিতে বিভ্রান্ত না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আধুনিক রাজনীতিতে জনসাধারণের ভোটই ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করিয়া থাকে। যেসব দল (তন্মধ্যে শ্রীযুত বসুর দলও অন্যতম) নিজেদের কর্মসূচী লইয়া জনসাধারণের সম্মুখীন হইতে ভীত, তাহারা পরিণামের কথা চিন্তা না করিয়া জনসাধারণের মধ্যে উত্তেজনা সঞ্চার করাই সহজ মনে করে।

এই উপনির্বাচনে একজন সাধারণ ব্যক্তি শ্রীশরৎচন্দ্র বসুর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, শ্রীযুত বসু প্রতিক্রিয়াশীলদের পক্ষ গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীসুরেশচন্দ্র দাসের প্রভূত অর্থ অথবা ব্যক্তিগত প্রতিপত্তি কিছুই নাই। কিন্তু তিনি জনসাধারণের প্রকৃত সেবক। তিনি আজীবন নির্যাতিত কর্মী ও স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন অক্লান্ত সৈনিক। অর্থ না থাকিলেও রাজনৈতিক সততায় তিনি সম্পৎ-শালী। মানুষ হিসাবে তিনি সাধারণ, কিন্তু নির্যাতন, আত্মত্যাগ এবং স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের দিক দিয়া বিচার করিলে তিনি একজন অসামান্য ব্যক্তি। দক্ষিণ কলিকাতায় তিনি সুপরিচিত এবং তিনি দক্ষিণ কলিকাতা জেলা কংগ্রেস কমিটিরও সভাপতি।

এই সমস্ত ব্যক্তিগত গুণাগুণের কথা বাদ দিয়াই কংগ্রেস তাঁহাকে শ্রীশরৎচন্দ্র বসুর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য মনোনীত করিয়াছে। আমরা আশা করি যে, দক্ষিণ কলিকাতার প্রত্যেকেই কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী শ্রীসুরেশ-চন্দ্র দাসের পক্ষে ভোট দিবেন। দক্ষিণ কলিকাতার কংগ্রেস সর্বদাই শক্তিশালী। শাসন-গত কতগুলি বিষয়ের জন্য এই সম্পর্কে ভুল ধারণা হওয়া উচিত নয়। স্থানীয় ও সাময়িক কতগুলি ঘটনার জন্য যাহা অনেক সময় ব্যক্তিগত কারণে এবং অনেক সময় বিভিন্ন কারণে ঘটিয়াছে—আমরা সকলে কংগ্রেসের নিকটে কিরূপ ঋণী এবং একমাত্র কংগ্রেসই কি অর্জন করিতে পারে, তাহা আমরা ভুলিতে পারি না। এই অবস্থায় জনসাধারণ, বিশেষ করিয়া ভোটারদের নিকট আমাদের সনির্বন্ধ আবেদন এই যে, তাঁহারা যেন কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী শ্রীসুরেশচন্দ্র দাসকে সমর্থন করেন এবং একমাত্র তাঁহাকেই ভোট দেন।" —

দেড় হাজার মাইল দূরে এসে এই যে নীরব, পরিচ্ছন্ন সরকারী বাগানের একটি মনোরম স্থানে বসে আছি এবং আপনার মনের নিশ্চিন্ত আলস্যে, কিছুই-না-করার শীতল-কোমল আরামে সঞ্জীবিত হচ্ছি, এর প্রয়োজন ছিল। দিনের পর দিন একই কাজ, একই মুখ, একই আবেষ্টনী—তা সে যতই অর্থকরী এবং আকাঙ্ক্ষার বস্তু হোক্ না কেন, শেষ পর্যন্ত নিদ্রাকাতর মস্তিষ্কে ঘড়ির নির্ভুল ও নিয়মিত শব্দের মতই বিরক্তিকর, যন্ত্রণাদায়ক এবং মারাত্মক হয়ে ওঠে। জাগ্রত মন, উন্মুখ হৃদয়, উন্মীলিত দৃষ্টি, আশা, বিস্ময় এবং আদর্শ নিয়ে মানুষ জীবনের যাত্রা শুরু করে। আপনিও করেছিলেন; আমিও করেছিলুম। কিন্তু দশ-বিশ বছর বাদে আজ আপনার-আমার অবস্থা এমন শোচনীয় দাঁড়িয়েছে কেন? মন এত নির্জীব, দেহ অবসন্ন আর হৃদয় এত নীরস হ'য়ে উঠ্‌ল কেন? ইতিহাস-প্রশ্নের উত্তরে কোনও যুদ্ধ-বিপ্লবের একাধিক কারণ দেখিয়ে আমরা যেমন বলি প্রথমতঃ, দ্বিতীয়তঃ, তৃতীয়তঃ এবং সর্বশেষে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হ'ল এই, তেমনি এই অতি-সহজ ও সাধারণ মনোবিপর্যয়ের কারণ-সন্ধানে বলা যায়—প্রথমতঃ মহাযুদ্ধ, দ্বিতীয়তঃ স্বাধীনতার যুদ্ধ, তৃতীয়তঃ অর্থনৈতিক সংকট এবং সর্বশেষে যান্ত্রিক জীবনের গতানুগতিকতায়, জীবিকা-সন্ধানের গ্লানিময় বৈচিত্র্যহীনতায় মনের যাবতীয় সরসতা, সুকুমার বোধ-শক্তির বিলোপ ঘটেছে।

বৈচিত্র্য-সন্ধানী বিচিত্র এই মানুষের মন। সেই মনের তাগিদে মানুষ জীবিকার অদল-বদল করে, স্থান-পরিবর্তন করে, নিজের দেহ ও প্রাণকে শুধ্‌রে নেয়, আবার কখনও মদ খায়, চরিত্র নষ্ট করে। একটি মনের অবচেতনে কত আকাঙ্ক্ষা নিরুদ্ধ হয়ে থাকে, কত অপূর্ণ বাসনা সুপ্ত হয়ে আছে। কাজের আর রুটিনের বিলম্বিত বিষপ্রয়োগে আমাদের চৈতন্য আচ্ছন্ন থাকে। কোনও এক দৈব মুহূর্তে বৈরাগ্য, বিদ্রোহের ঐশ্বরিক আভাস ঘনিয়ে ওঠে। তখন হঠাৎ সবকিছু ছেড়ে দিয়ে, ভাসিয়ে দিয়ে, বাঁধা সড়কের ক্লান্তিকর, সুনিয়মিত পদক্ষেপ সরিয়ে নিয়ে বিপদ্‌, অনিশ্চয়তাকে বরণ করে। স্বাভাবিক জীবনের পরিচিত ছন্দ যায় কেটে। নূতন চরণে নূতন পদবিন্যাস, দুঃসাহসিক পরীক্ষায় নূতন সুর সংযোজনা তখন ঢের বেশি কাম্য ঠেকে। মানুষ ঘরোয়া আরাম, হাতে-গড়া নানা সুবিধা-অসুবিধার উত্তাপ ও কলরব বর্জন করে অভ্যস্ত জীবনের কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটা নতুন দৃষ্টির সন্ধান করে। খুঁজে বেড়ায় হারানো দিনের একটি পলাতক রেশ। খুঁজে পায় হাওয়ায় ভেসে-আসা একটা টুকরো কথার উন্মেষ—যে কথাটি নতুন পরিবেশে তার তুচ্ছতা হারিয়ে মহামূল্যে সত্য রূপে আবির্ভাব হয়। তখন বুঝতে পারি—রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁরই সমগোত্র তীর্থপথিক কেন স্থানান্তরে চিরচঞ্চল মন নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং কিসের সন্ধানে।

বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া না করে এবং আপনার মনের অকারণ মাহাত্ম্য কীর্তন না করে এইবার বলি—দূরে সরে এসে বড় আরামে আছি। ব্যক্তিগত অসুবিধা, অভ্যস্ত জীবনের মসৃণতা, শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য, নিয়মিত স্নানাহারের আরামটুকু হয়তো এখানে মিলছে না। কিন্তু সেই মারাত্মক একঘেঁয়ে সুর আর শুনতে পাচ্ছি না। পাচ্ছি এক নতুন অশ্রুত সুরের আভাস—যার দুর্ভেদ্য মায়াজালে স্তব্ধ হয়ে আছে এই বিচিত্র বন, বট-বাবুলের স্নিগ্ধ ছায়ায় আর আগুন-ধরানো পলাশ আর গুল-মোরের অজস্র এবং অকৃপণ বর্ণ-বিস্তারে, আলোয় কালোয়, সোনায় আর সোহাগায় যার বহুরূপী জীবনের স্পন্দন ধ্বনিত, কম্পিত এবং সঞ্চিত হয়ে উঠ্‌ছে প্রতিটি অমৃতক্ষণে। সেই নব-লব্ধ চেতনার আদিম গভীরতায় দূরের ঐ পশ্চিম ঘাটের বহু প্রাচীন পাথুরে চূড়ো-গুলি পর্যন্ত যেন প্রাণবন্ত প্রাগৈতিহাসিক জীব বলে মনে হচ্ছে। কত কী যে দেখছে ওরা। কত পুরাতন অতীতের কৌতূহলী দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ঐ সহ্যাদ্রি পর্বত, যার কথা পুরাণ-ইতিহাসে পড়েছি কিন্তু যার জীবন্ত সংস্পর্শে, নীরব অস্তিত্বের সংস্রবে আসতে পাইনি এতদিন! সাতবাহন, শক ক্ষত্রপ, চালুক্য, রাষ্ট্রকূট প্রভৃতি কত বিপুল রাজবংশের বিশাল ঐশ্বর্য-স্মৃতি বহন করে, তাদের ঐতিহ্যের নামাঙ্কিত শিলালিপি, প্রস্তরমূর্তি আর গুহা গর্ভে ধারণ করে আজও দাঁড়িয়ে আছে অটল স্থৈর্যে।

যদি এখানে না আসতুম, এসব কিছুই চোখে পড়ত না—না ভারতীয় ঐতিহ্যের সাক্ষ্য না ভৌগোলিক প্রকৃতির বিস্ময়কর পরিচয়, না আঞ্চলিক বিভাগের রীতি-নীতি আর মানুষের বিভিন্ন জীবন-প্রণালী। বিদেশের কথা আপনি মনে পড়ে যাচ্ছে। সেখানকার শিক্ষা-দীক্ষা, সুখ-সুবিধা তুলনায় লোভনীয় মনে হয় যখন ভাবি একটি স্যুটকেস আর তোয়ালে, টুথব্রাশ নিয়ে শিক্ষার্থীর দল য়ুরোপের সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে পারে। যথেচ্ছ গতিবিধি, অবসর আর উপভোগের পথে কোনো প্রতিবন্ধক দাঁড়ায় না। প্রতি তুলনায় আমাদের দেশে এখনও যে সব অতি-সাধারণ ত্রুটি-বিচ্যুতি সামাজিক আর রাষ্ট্রীয় জীবনকে জড়িয়ে আছে, সেগুলো বড় হয়ে দেখা দেয়। আমাদের দেশের ছাত্র-শিক্ষক-সাহিত্যিকের দল এমন নিঃসম্বল, সাহায্য-বর্জিত, সহানুভূতি-হীন জীবন যাপন করে যে দুঃখ আসাই স্বাভাবিক। চোখেই যদি না দেখল, শিখবে কি করে? অবসর যদি নাই মিল্‌ল জীবনে, রূপসৃষ্টি বা রসচর্চা কি নিরর্থক হ'য়ে ওঠে না? যার আয় সামান্য, সেও বিদেশে সপ্তাহান্তে শহর থেকে পালিয়ে বাঁচে। কেপ্রি আর রিভিয়েরা না যেতে পাক্‌, ব্রাইটন আছে। আছে ওয়েলসের পাহাড়-উপত্যকা। সেখানে গিয়ে দু' দণ্ড মনকে উজ্জীবিত করে নেয়, দেহকে জিরিয়ে নেয়, মাথা আর কলমকে বিশ্রাম আর উপভোগে সতেজ সরস করে তোলে। আমাদের যদি সেই সুবিধাটুকু থাকত! বলে কোনও লাভ নেই। শুনতে হবে অধ্যয়ন আর কৃচ্ছ্রসাধন হল বিদ্যার্থীর তপস্যা—অর্থাৎ ঘরের কোণে পরীক্ষার পড়া একটানা মুখস্থ। শিক্ষক-অধ্যাপকের স্বধর্ম হল নিঃস্বার্থ এবং নিষ্কাম কর্তব্য-সাধন আর কবি-সাহিত্যিকের নৈতিক দায়িত্ব না কি অসীম। অবাস্তব, অপ্রত্যক্ষ বিশুদ্ধ জ্ঞান ও সৌন্দর্য নিয়ে তাঁরা ডুবে থাকুন। তার বেশি চাহিদা কিসের?

কিন্তু মধ্যে মধ্যে চোখ না বদ্‌লালে যে চোখে নতুন রং ধরে না, এ কথা বলি কাকে! কোথা থেকে আসবে জীবনদায়ী উত্তাপ যদি শিরায় নতুন রক্তের জোয়ার না আসে? কোথা থেকে জন্মাবে জীবনবাহী রক্তস্রোত, যদি অজীর্ণ ও অপুষ্টিকর খাদ্যে যকৃৎ-বিকৃতি ঘটে?

তবু চেষ্টা করা উচিত। স্বার্থপরতাই বলুন আর নিছক পালিয়ে প্রাণ বাঁচানোই বলুন, ধার করেই হোক্ আর যে কোনও উপায়েই হোক্ মনটাকে চাঙ্গা করবার জন্য, দৃষ্টি-ভঙ্গী অর্জন করবার জন্য আর ভিন্ন দেশের মানুষ আর দৃশ্য-সম্পর্কে নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য কর্তৃপক্ষের অনুমতি না নিয়েও একদা রাত্রির অন্ধকারে পা বাড়িয়ে দিতে হয়........

**বিশেষ বিজ্ঞপ্তি**

**আগামী সপ্তাহ হইতে 'দেশ' পত্রিকায় শ্রীযুত প্রমথনাথ বিশীর নাটিকা 'পারমিট' ধারাবাহিকরূপে বাহির হইবে।**

# জীবন-তৃষ্ণা

## আর্ভিং স্টোন

**অনুবাদক—অদ্বৈত মল্ল বর্মন**

[ পূর্বানুবৃত্তি ]

ছ **লেমেয়েদের** পড়ানো সে ছেড়ে দিল। শীতে তাদের মুখ নীল হয়ে আসে। র পড়ানোর চেষ্টা করা বৃথা। সে সারাদিন াসি পাহাড়ে কাটিয়ে দিতে লাগল। সব যারা দুরবস্থায় পড়েছে তাদের ঘরে ঘরে রণ করবে বলে সে আপ্রাণ চেষ্টা করে ঘুরে র কয়লার গুঁড়ো কুড়োতে লাগল। সারা য় কালি জমে উঠেছে। ধোওয়ার তার অবসর দরকারও নেই। তার মুখের এ কালো খনির মজুরদের মুখের দাগেরই মত। এ তো কামাই। একে ঘসে তুলে ফেলার তার াজন কি? পেটিট ওয়াসমেসে নতুন কেউ ন এখন তাকে ধর্মপ্রচারক বলে চিনতেই রবে না। তাকে খনি-মজুর বলেই ধরে বে।

কালো টীলার ওপর-নীচ ঘুরে ঘুরে সে রাদিনে আধ বস্তা কয়লার গুঁড়ো ড়িয়েছে। বরফ ঢাকা পাথরের গায়ে হাতড়াতে তড়াতে তার হাতের নীল চামড়া ছড়ে য়েছে। চারটে বাজবার একটু আগেই ড়োনো বন্ধ করে ফিরে আসবে বলে স্থির রল। একটু পরেই খনি-মজুররা ঘরে ফিরে াসবে। গ্রামে গিয়ে তার কয়লাগুলো সেই ময়ে বিতরণ করলে অন্ততঃ কয়েকটি কুটিরে া-ঝিরা তাদের স্বামী-পুত্রদের কফি গরম রে দিতে পারবে। সে মার্কাসির গেটে যখন পৌঁছাল, মজুরদের জনস্রোত তখন ঠেলে বরুতে শুরু করেছে। তাদের কেউ কেউ তাকে চিনতে পেরে অস্পষ্ট স্বরে অভিবাদন জানাল। াকি সবাই দু'হাত পকেটে পুরে ঘাড় নীচু রে হন্‌হন্ করে চলে গেল।

সবার শেষে যে লোকটি গেট থেকে বরুলো, সে এক বুড়ো। কাসিতে তার শরীর কুঁকড়ে আসছে। খাড়া হয়ে হেঁটে চলাই তার পক্ষে অসম্ভব। তার হাঁটু দুটি কাঁপছে। বরফ ঢাকা মাঠে পা দিতে ঠাণ্ডা হাওয়া যখন তাকে ঝাপটা মারল, তখন তার প্রায় পড়ে যাওয়ার যোগাড়। যেন কেউ তাকে প্রাণান্তক এক ঘুঁসি মেরে থামিয়ে দিয়েছে। বরফের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে যাচ্ছিল। কিছুক্ষণ পর সাহস সঞ্চয় করে ধীরে ধীরে ময়দানটি পাড়ি দিতে শুরু করল। ওয়াসমেসের একটি দোকান থেকে খানিকটা চট যোগাড় করেছিল। সেটা এখন কাঁধে জড়ালো। ভিনসেন্টের চোখে পড়ল চটের ওপর কি যেন লেখা রয়েছে, বিস্ফারিত চোখে সে আখরগুলি পড়তে চেষ্টা করলে। বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে একটা শব্দ যার অর্থ 'সহজেই ভেঙে যেতে পারে।'

মজুরদের বাড়ি বাড়ি কয়লার গুঁড়ো দেবার পর ভিনসেন্ট নিজের ঘরে ফিরে এলো। তারপর তার যত কাপড়-চোপড় ছিল সব বের করে বিছানায় জড়ো করল। তার পাঁচটা সার্ট, ভিতরে পরবার তিনটে সুট, চার জোড়া মোজা, দু'জোড়া জুতো, ওপরে পরবার দুটি সুট, তার ওপর অতিরিক্ত একটা সৈনিকদের কোট! সে একখানি সার্ট, একজোড়া মোজা ও একটিমাত্র সুট বিছানায় রেখে বাকি কাপড়-চোপড়গুলি সুটকেসে ভরল।

সেইগুলো নিয়ে গিয়ে ভিনসেন্ট সেই বুড়োটাকে দিয়ে এলো। ভিতরে পরার সুট ও সার্টগুলি সে কেটেকুটে তার থেকে শিশুদের ছোট ছোট জামা করে দেবার জন্য বিলিয়ে দিল। মোজাগুলি দিল মার্কাসি খনির মজুরদের। তার গরম কোটটা দিল এক গর্ভবতী নারীকে। তার স্বামী কিছুদিন আগে খনিতে কাজ করতে করতে মারা পড়েছে। দুটি শিশু আছে। তাদের খাওয়াবার জন্য স্ত্রীলোকটিকে এখন খনিতে কাজ নিতে হয়েছে।

আগেই বলেছি 'সেলোন দু বেবি' নামে একটি পরিত্যক্ত নাচমন্দিরকে ভিনসেন্ট ধর্মসভার ঘর করেছিল। সে ঘর এখন বন্ধ থাকে। মেয়েদের কুড়োনো এত কষ্টের কয়লার গুঁড়ো এনে এখানে উনুন ধরিয়ে ধর্মসভা করার প্রবৃত্তি এখন আর তার হয় না। তা ছাড়া, লোকেও আসতে চায় না; বরফ ভেঙে ভিজে পায়ে এখানে আসতে তারা ভয় পায়। ভিনসেন্ট তাদের ঘরে ঘরে গিয়ে দু'চার কথায় প্রচারের কাজ শেষ করে দেয় আর সারাদিন তাদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ায়। শীঘ্রই সে বুঝতে পারল, কেবল ঘুরে বেড়ালেই চলবে না, হাতে-কলমে কিছু কাজও করতে হবে। সেই থেকে তাদের রোগ সারানো, সেবা-শুশ্রূষা করা, তাদের কাপড়-চোপড় ধুয়ে দেওয়া, তাদের গরম পানীয় ও ওষুধ তৈরী করে দেওয়া—এসব কাজে লেগে গেল। শেষে তাদের বাইবেল পড়ানো ছেড়ে দিল। বাইবেল সে বাড়িতে রেখে যেত, কারণ তাদের কাছে বাইবেল খোলারও অবসর পেত না। ভগবানের বাণী শোনা একটা বিলাসিতা। খনি-মজুররা গরীব। তাদের এ বিলাসিতা ভোগ করার সঙ্গতি কই?

মার্চ মাসে শীত কিছু কমে এলো। কিন্তু তার জায়গায় দেখা দিল জ্বর। ভিনসেন্ট নিজে প্রায় উপোস থেকে রোগীদের ওষুধ-পথ্যের জন্য তার ফেব্রুয়ারী মাসের মাইনে থেকে চল্লিশ ফ্রাঙ্ক খরচ ক'রে ফেলল। কম খেয়ে খেয়ে ক্রমেই সে শুকিয়ে যেতে লাগলো। তার জন্যে স্নায়ুপীড়া হয়ে তার মেজাজ দিন দিন রুক্ষ হ'য়ে উঠল। শীতে তার জীবনীশক্তি নষ্ট ক'রে দিয়েছে। এখন জ্বর গায়েই সে বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়াতে লাগল। গর্তে-বসা চোখ দুটি জবাফুলের মতো টকটকে লাল। যে-প্রশান্ত মস্তক ভ্যান গোঘবংশের বৈশিষ্ট্য, গাল-মুখ শুকিয়ে তা যেন এখন অনেক ছোট হ'য়ে গিয়েছে। গালে আর চোখের নীচে গর্ত হ'য়ে গেল; কিন্তু চিবুকটা তার তেমনি মজবুত মনে হতে লাগল।

ডেক্রুকের বড়ো ছেলেটার সেদিন টাইফয়েড হ'ল। তারা মুস্কিলে পড়ল ছেলের বিছানা নিয়ে। ঘরে বিছানা মোটে দুটি। একটিতে স্বামীস্ত্রীতে শোয়, বাকিটাতে মেয়ে-ছেলেরা। রোগীর বিছানায় যদি ভালো দুটি ছেলেকেও শুতে দেওয়া হয়, তা হ'লে তাদেরও রোগ হ'য়ে যেতে পারে। তাদের যদি মেঝেতে শুতে দেওয়া হয়, তাতে তাদের ঠাণ্ডা লাগতে পারে। যদি স্বামী-স্ত্রী দু'জন মেঝেতে শুয়ে রাত কাটায়, তা'হলে কাল তারা কাজেই বেরুতে পারবে না। এখন কি করা যায়! ভিনসেন্ট চট ক'রে বুঝে ফেললো, এখন কি করা যায়!

ডেক্রুক খনি থেকে ফিরে এলো, ভিনসেন্ট তাকে বলল, "ডেক্রুক, খেতে যাবার আগে আমাকে এক মিনিট সাহায্য করতে হবে, করবেন তো?"

ডেক্রুক্ খুবই ক্লান্ত হ'য়ে এসেছে। তার ওপর শরীরটাও তেমন ভাল নেই। তা সত্ত্বেও খোঁড়া পা টেনে টেনে নীরবে ভিনসেণ্টের পিছু পিছু এগিয়ে চলল। কোথায় যেতে হবে জিজ্ঞাসাও করল না। ভিনসেণ্ট তাকে নিজের ঘরে নিয়ে গেল। বিছানায় দু'খানা কম্বল ছিল, একখানা সরিয়ে রেখে বলল, "ওদিকটায় ধরুন তো। দু'জনে ধরাধরি ক'রে খাটটা আপনার বাড়িতে নিয়ে যাই। বড়ো ছেলেটা এতে শোবে।"

ডেক্রুকের দাঁতে দাঁত লেগে একটা শব্দ হ'ল। সামনে গিয়ে সে বলল, "আমাদের তিনটি ছেলে। ভগবান যদি চান, একটিকে আমরা দিয়ে দিতে পারি। কিন্তু সারা গাঁয়ের রোগীর সেবা করার জন্য 'মঁসিয়ে ভিনসেণ্ট' আমাদের একজন বই দুজন নেই। তাকে আমরা হারাতে পারি না। সে যে নিজেকে নিজে মেরে ফেলবে, আমি তা হ'তে দেব না।"

ঘর থেকে বেরিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে সে চলে যেতে লাগল। ভিনসেণ্ট একাই বিছানাটা কাঁধে তুলে ডেক্রুকের বাড়ি বয়ে নিয়ে এল। ডেক্রুক্ আর তার স্ত্রী তখন শুকনো রুটি ও কফি খেতে খেতে দেখলে : ভিনসেণ্ট বিছানা পেতে অসুস্থ ছেলেটিকে তাতে শুইয়ে দিয়ে পাশে বসে আদরের সঙ্গে সেবাযত্ন করছে।

সন্ধ্যার একটু আগে সে ডেনিসদের বাড়ি কিছু খড় চেয়ে আনতে গেল, বাড়ি এনে পেতে শোবার জন্য। মাদাম ডেনিস সব কথা শুনে অত্যন্ত বিচলিত হলেন। বললেন— "মঁসিয়ে ভিনসেণ্ট, আপনার আগের ঘর এখনো খালি পড়ে আছে। আপনি আমার কথা রাখুন। চলে আসুন এখানে।"

"মাদাম ডেনিস, আপনার দয়া আমার চিরদিন মনে থাকবে। কিন্তু আমি তো এখানে আসতে পারি না।"

"আমি জানি আপনি টাকাকড়ির চিন্তায় বিব্রত হচ্ছেন। কিন্তু আমি বলছি, চিন্তার কোন কারণ নেই। জিন ব্যাপ্টিস্ট আর আমি দু'জনে তো বেশ উপায় করি। আপনি ভাইয়ের মতো আমাদের সঙ্গে থাকবেন, কোনো খরচা দেবার দরকার নেই। আপনি নিজেই তো সব সময়ে বলে থাকেন, ঈশ্বরের সন্তান সবাই আমরা ভাই ভাই।"

ভিনসেণ্টের ঠান্ডা লেগেছিল। তার শীতে কাঁপুনি ধরে গিয়েছিল। তার উপর সে ভয়ানক ক্ষুধার্ত। সাত দিন থেকে জ্বরে ভুগছে সে, মাঝে মাঝে প্রলাপ বকে। কত দিন থেকে এক মুঠো ভালো খাবার পেটে পড়েনি, একটা রাত আরাম ক'রে ঘুমোতে পারেনি। এ সব কারণে ভয়ানক দুর্বল হ'য়ে পড়েছে সে। তার ওপর মানসিক দুশ্চিন্তা। গ্রামের লোকের দুর্নিবার দুঃখ-কষ্ট তাকে অভিভূত ক'রে ফেলেছে। পাগলের মতো হ'য়ে গিয়েছে সে। উপর তলায় যে বিছানা আছে, তা গরম, নরম, আর পরিষ্কার। ক্ষুধার তাড়নায় তার পেট কামড়াচ্ছে, মাদাম ডেনিস তাকে যা খেতে দেবেন, তার ধারণা, তাতেই সে সেরে যাবে। তার জ্বরে তিনি তার সেবা করবেন; শরীর থেকে শীতের কাঁপুনি ছেড়ে না যাওয়া পর্যন্ত গরম কড়া পানীয় দিয়ে চাঙ্গা করতে থাকবেন। সে কাঁপতে কাঁপতে অসাড় হ'য়ে মেঝেতে পড়ে যাচ্ছিল, এমন সময়ে হঠাৎ তার চৈতন্য এলো।

এটা ভগবানের অন্তিম পরীক্ষা। এই পরীক্ষাতে যদি সে ঠিক থাকতে না পারে, তা'হলে এ পর্যন্ত যা কিছু কাজ সে করেছে, সব ব্যর্থ হ'য়ে যাবে। গ্রামে এখন দুঃখকষ্ট চরমে উঠেছে। অবস্থা এখন সবচেয়ে ভয়াবহ। দুর্বল ব'লে সে কি তা এড়িয়ে যাবে? কাপুরুষের মতো সে সরে দাঁড়াবে? হাতের কাছে আরামের উপকরণ পেয়েই কি সে তা কাঙালের মতো আঁকড়ে ধরবে?

সে বলল, "মাদাম ডেনিস, ঈশ্বর সবারই মনের কথা জানেন। আপনার মনে যে দয়া, যে মহত্ব, তাও তিনি অবশ্যই জানতে পারছেন। এর জন্য আপনাকে তিনি নিশ্চয়ই পুরস্কৃত করবেন। আমার অনুরোধ, আপনি আমাকে কর্তব্যের পথ থেকে সরে আসতে প্রলুব্ধ করবেন না। আমি কেবল কিছু খড় নিতে এসেছি। যদি না দেন, আমাকে তা'হলে হয়তো মাটিতেই শুতে হবে। কিন্তু দোহাই আপনার, আমাকে আর কিছু দেবেন না। আর কিছু আমি নিতে পারব না।"

ঘরের এক কোণে ঠান্ডা মেঝের ওপর খড় পেতে, পাতলা কম্বল গায়ে দিয়ে সে শুয়ে পড়ল। সারা রাত তার ঘুম হ'ল না। সকাল বেলা কাসতে কাসতে দম আটকে আসতে লাগল। আর মনে হ'ল চোখদুটি যেন মাথার অনেক ভিতরে ঢুকে গিয়েছে। জ্বর বেড়ে চলেছে। শেষে তার চেতনা কমে এলো। সে অর্ধ-অচেতনের মতো উঠে বসল। স্টোভ ধরাবার জন্য ঘরে এক টুক্রোও কয়লা নেই। কালো টীলা থেকে যা সে কুঁড়িয়ে এনেছিল তা মজুরদের প্রাপ্য। তার থেকে এক মুঠো সে নিজের কাজে লাগাবার কথা ভাবতেই পারে না। কোনো রকমে উঠে কয়েক কামড় শুকনো রুটি খেয়ে তার দিনের কাজে বেরিয়ে পড়ল।

মার্চ গিয়ে এপ্রিল এলো। সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের অবস্থা একটু ভালো হ'য়ে উঠল। হাওয়া থেমে গিয়েছে। সূর্য অনেকটা উপরে চলে এসেছে। তার তেজও বেড়ে চলেছে। এভাবে গরমের দিন এলো। গরমে বরফ গলতে শুরু করেছে। কালো মাঠ ময়দান এতোদিন বরফে ঢাকা ছিল। বরফ গলে গিয়ে সে' সব এখন যেন ঘুম থেকে জেগে উঠেছে। এ সময় লার্কপাখীর ডাক শোনা যায়। বনের নানা জাতের গাছে নানা রঙের মুকুল ধরতে থাকে। গ্রামে এখন আর কারো জ্বর নেই। গরম পড়াতে গ্রামের মেয়েরা এখন মার্কাসির কালো টীলাতে কয়লা-কুড়োনোয় বেরুতে পারছে। শীঘ্রই ঘরে ঘরে আবার উনুন জ্বলে উঠেছে। আবার তারা আরামে আগুন পোহাতে শুরু করেছে। শিশুদের এখন আর দিনের বেলাতে বিছানায় ঢেকে রাখা হয় না। তারা এখন বিছানা ছেড়ে দিব্যি খেলা করে বেড়াচ্ছে।

ভিনসেণ্ট আবার 'সেলোন' খুলে সভার আয়োজন করল। প্রথম দিনের সভাতে ভিনসেণ্টের বক্তৃতা শুনতে সারা গাঁয়ের লোক জড়ো হ'ল, খনিমজুরদের চোখে এখন তৃপ্তির হাসি ঝিলিক দিচ্ছে। তারা এখন একটু মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছে।

ভিনসেণ্ট বেদীর উপরে উঠে এলো। আজ আনন্দে তার মনে বান ডেকেছে। গলা ছেড়ে বলল সে, "আসছে রে, সুদিন আসছে। ভগবান তোমাদের দুঃখ দিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। সেই দুঃখের আগুনে দগ্ধ হ'য়ে তোমরা আজ কাঞ্চন হ'য়ে বেরিয়েছ। আজ আমাদের চরম কষ্টের অবসান হয়েছে। মাঠে মাঠে ফসল পেকে উঠবে। দিনের কাজ সেরে তোমরা যখন দাওয়ায় বসে জিরোবে, রোদ তোমাদের সব কষ্ট দূর করে দেবে। লার্ক পাখীর ডাক শুনে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাদের পিছু পিছু ছুটবে। বনে গিয়ে তারা জাম কুড়োবে। দুঃখের কথা আর বলো না। দুঃখ কি আর থাকবে? সুদিন আসছে। ভগবানের উদ্দেশে একবার চোখ তুলে চাও, জীবনের সুখ-সম্পদ সব তাঁরই কাছে জমা রয়েছে। ঈশ্বর ক্ষমার আধার, দয়ার সমুদ্র। সবাইকে তিনি সমান চোখে দেখেন। যারা বিশ্বাসী, যারা সহিষ্ণু, তিনি তাদের পুরস্কৃত করেন। হৃদয় নিঙড়ে তাঁকে ধন্যবাদ জানাও। তাঁরই দয়াতে সুদিন আসছে—সুসময় আসছে।"

খনি-মজুররা আবেগের সঙ্গে ধন্যবাদ জানালো। খুশীর কলোচ্ছ্বাসে ঘর ভরে গেল। প্রতি জনে প্রতি জনকে ডেকে বলছে, "মঁসিয়ে ভিনসেণ্ট যা বলেছেন ঠিক বলেছেন। সত্যি আমাদের কষ্টের অবসান হয়েছে। শীত কেটে গিয়েছে। সুদিন সুসময় আসছে।"

(ক্রমশঃ)

# গ্রীষ্মকালে কি বই পড়বেন

লিন-য়ূ-টাঙ্

ন-য়ূ-টাঙের With love and Irony
A Suggestion for Summer
ng প্রবন্ধের অনুবাদ।

রম যখন ১০০ ডিগ্রীর কোঠায় ছট্‌ফট্‌ করে তখন বাসে চেপে চ'লে যাব ঠান্ডা পাহাড়ে, ঘুরব পাইনের বনে বনে, ঝর্ণার ারে, এ রকম ইচ্ছে সবারই হয়।

খন প্রধান অসুবিধা হ'ল পড়বার জন্য াছে নেওয়া। আমাদের বিভিন্ন মেজাজের াই বিভিন্ন রকমের বই। তাহলে ত' াক্স বোঝাই ক'রে শুধু বই নিয়ে যাওয়া া। তাই এমন একটা বই নিয়ে যাওয়া র যার মধ্যে পাব আমাদের সবরকম জের খোরাক। উপন্যাস হ'ল এদিক দিয়ে ৎকৃষ্ট বই, কিন্তু উপন্যাস নিয়ে যতই তে থাকব, ততই শেষ হ'য়ে গেলে কি , সেই ভয়টা বেড়ে উঠবে। আবার র গুমোটে একটানা অনেকক্ষণ ধ'রে যায় না। কাজেই এমন বই চাই যা বেশী চিত্তাকর্ষক হবে না, শোবার আগে বইয়ের মত যখন তখন ঘুম পেলেই রাখা চলবে।

রমকালে পড়ার জন্য চাই বস্‌ওয়েলের "জন্‌সনের জীবনী' জাতীয় বই। বেশ াগোছের হবে অথচ ওতে জানবারও অনেক কিছু। যে কোন জায়গায় ভও করা চলতে পারবে, আবার ঘুম পেলে কোন জায়গায় ফেলে রাখাও চলবে। এ র বইয়ে কোন একটা বিশেষ বিষয় নিয়ে ার করলে চলবে না, নানারকম বিষয় রকম খবর তাতে থাকা চাই। এ সমস্ত র জন্য আমি সত্যি সত্যিই সবাইকে ধান প'ড়তে বলি।

এ রকম অভিধান ইংরিজিতে একটি আছে। শুধু কথার মানে আর টীকার জন্যই নয়, সাধারণ পাঠ্য হিসেবেও চমৎকার। সব সমালোচকেরই তাই মত। ছোট্ট কার একটি বই; যত এগোনো যায় ততই আশ্চর্য হ'তে হয়, আর তারিফ করতে বইটি হ'ল—
ket Oxford Dictionary of Current
lish

ছোট্ট একটি বই দু'জোড়া মোজার চেয়ে জায়গা লাগবে না বাক্সে ভর্তে। আপনি গুলো উল্টে উল্টে এককে জায়গায় থেমে ট্‌ ক'রে চোখ বুলিয়ে যান, দেখবেন রন্ত মজার খোরাক র'য়েছে এই বইয়ে। যেমন ধরুন, "ঘোড়া" বা "হর্স" কথাটা। খুব সাংঘাতিক গোছের "রামগরুড়ের ছানা" ও নীচের এই প্রবাদগুলো প'ড়ে রোমাঞ্চিত না হ'য়ে পারেন না, যেমন—"মরা ঘোড়াকে চাবুক মারা"; 'ঘোড়ার ঘাড়ের ফাঁক দিয়ে হাসা' (মোটাগোছের রসিকতা করা); 'উপহার পাওয়া ঘোড়ার মুখ দেখে পছন্দ করা;' 'উঁচু ঘোড়ার পিঠে চড়া;' 'ঘোড়ার মত খাওয়া বা কাজ করা।' কতগুলো কথার আসল মানে জেনে আপনি খুবই আনন্দ পাবেন—'ঘোড়ার মাংস' আর 'ঘোড়ার নাবিক' ('ঘোড়ার নাবিকদের বল'); কিম্বা 'ঘোড়ার জোঁক' কথাটার ব্যবহার ('ঘোড়ার জোঁকের মেয়েরা'—একটি প্রবাদ) তারপর 'ঘোড়াদ্রাঘিমা' (উত্তর আট্‌লাণ্টিকের শান্ত অংশ)। 'ঘোড়ার আক্কেল' কথাটা অবশ্য এখানে পেলাম না, ওটা বোধ হয় একেবারেই আমেরিকান কথা। আমার নিজের ত 'ঘোড়ার অট্টহাসি' আর 'ঘোড়ার খেলা' কথা দুটো খুবই ভাল লাগে। আমরা কথা বলি বড্ড একঘেয়ে আর পুরণো ভাষায়, সেইজন্যই আমাদের কথাবার্তাও হয় নিষ্প্রাণ। ভাগ্যে আমাদের 'ঘোড়ার আক্কেল' আর 'ঘোড়ার অট্টহাসি' ছিল, নইলে এই বিরাট একঘেয়েমির চাপে মারা পড়তাম।

আমি চীনদেশের লোক; ইংরেজ নই—বোধ হয় সেই কারণে 'পি-ও-ডি' (পকেট অক্সফোর্ড ডিক্‌সনারী) আমার এত ভাল লাগে। কিন্তু এইটেই সব নয়। অত্যন্ত সাধারণ কথাগুলোর মানে কথাবার্তায় কি রকম অদ্ভুতভাবে বদলে যায়, তা জেনে খুবই মজা লাগে। প্রত্যেক রসিক লোকই এতে আনন্দ পাবেন। অবশ্য এটা ঠিক যে, আমি চীন দেশীয় বলেই আনন্দ পাই বেশী। তেমনি চীনে ভাষায়ও পি-ও-ডি'র মত একটা অভিধান যদি থাকত, তবে ইংরেজরাও তা' পড়ে প্রচুর আনন্দ পেতে পারতো।

ভেবে দেখুন এ রকম একেকটা কথা—"সে কথা বলে ঠিক যেন সোডা দেওয়া জল"। কিম্বা "পাহাড়ের পথ চলে গেছে ভেড়ার নাড়িভুঁড়ির মত এ'কেবে'কে," তারপর 'মৃত্যু চাইলেই, মরা যায় না; প্রাণ চাইলেই বাঁচা যায় না।" চীনভাষার জমাট-বাঁধা বাস্তব উপমাগুলো খুবই উপভোগ্য; 'তার মনের কথা আমি কি ক'রে জানব?' এই প্রশ্নের জবেই চীনেরা বলবে, 'আমি' কি তার পেটের কৃমি?' চীন-ভাষার সংক্ষিপ্ত কাটছাঁট ভাব দেখে আপনি মুগ্ধ না হয়ে পারবেন না। ইংরিজিতে যখন প্রায় বিশ ত্রিশটা কথায় আপনি বলবেন, 'তুমি যদি বাড়িতে ব'সে কুঁড়ের মত শুধু খাও, তবে পর্বতপ্রমাণ বিরাট সম্পত্তিও দুদিনে উড়ে যাবে"। চীনেরা তখন দু'তিন কথায় বলবে, 'বস, খাও, পাহাড় ফাঁক।'

'ঘোড়া' কথাটার চীনে প্রতি শব্দটাই ধরুন না। Ma বা 'ঘোড়া' শব্দে পাওয়া যাবে ঘোড়ার পেছনে পট্‌কা ফোটানো' গোছের প্রবাদ। এই প্রবাদে কাউকে প্রথমে খুব প্রশংসা ক'রে শেষকালে দু-এক কথায় একেবারে পথে বসিয়ে দেওয়া হয়; অনেক সময় কোন সরকারী কর্মচারী আবাস থেকে বেরোলে পরই তাঁর বিরুদ্ধে হৈ চৈ করাকেও বোঝায়। 'তোমার ছেলেমেয়ে নাতি-নাতনীদের কাছে ষাঁড় বা ঘোড়া হয়ো না'—আরেকটি প্রবাদ—তার মানে, অত কষ্ট ক'রে ছেলেমেয়ের জন্য টাকা জমিও না, তুমি চোখ বুঁজলেই ও'টাকা হাওয়া হয়ে যাবে। আরও আছে যেমনঃ—"আমি কেবল তোমার ঘোড়ার মাথার দিকে নজর রাখব (তুমি যেখানেই যাও, আমি ছাড়ছিনে), 'ঘোড়ার দাঁত এর মধ্যেই বড় হয়ে গেছে' (লোকটি এর মধ্যেই বুড়ো হ'য়ে গেছে, 'হাজার লম্বা হ'লেও আমার বেত ঘোড়ার পেট পর্যন্ত পৌঁছবে না (ব্যাপারটা আমার ক্ষমতার বাইরে); তারপর আছে 'অসামাজিক ঘোড়া' (ইংরিজিতে যাকে বলে 'কালো ভেড়া' মানে, দুষ্টু লোক)—এ ছাড়া আরও অনেক।

নানা জাতের, নানারকম চল্‌তি প্রবাদ তুলনা ক'রে দেখলে প্রত্যেক দেশের সাধারণ লোকের মনস্তত্ত্বটা বড় সুন্দর জানা যায়। চীনে প্রবাদে 'অন্ত্র বা নাড়িভুঁড়ি' আর 'পেট' কথাটা খুবই পাওয়া যায়। এইটেই চীনেদের মনস্তত্ত্বের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। ইংরিজি ভাষায় 'পেট' 'উদর' জাতীয় ব্যবহার প্রায় নিষিদ্ধ, এর থেকেই ইংরেজদের লজ্জাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। চীন ভাষায় কিন্তু 'পেট' আর 'অন্ত্র' নিয়ে কাব্য করাও চলে। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ চেয়েছিলেন, দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ কথাগুলোকে কবিতায় ব্যবহার করতে; চীনে কবিরা এদিক দিয়ে স্বয়ং ওয়ার্ডস্‌-ওয়ার্থকেও ছাড়িয়ে গেছেন। চীন সাহিত্যে নিষিদ্ধ কোন কিছুই নেই; এইটেই চীন সাহিত্যের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। পার্থিব জীবনটাকে আমরা খুব ভালবাসি ব'লেই কোন কিছুকেই কবিতার পক্ষে আমরা অতি নগণ্য তুচ্ছ ব'লে মনে করি না। নীচের এই কবিতাটি

দেখুন, এটি হ্যাংচাওয়ের এক রেস্তেরাঁয় দেয়ালের গায়ে দেখেছিলাম:

'বাঁশের পাতাগুলো নতুন আর তাজা, অথচ আমার ভাতের পাত্র খুবই ছোট।

মাছটাও খুব সুস্বাদু, কিন্তু আমার পেট এখন ফেঁপে উঠেছে মদের জন্য।'

কোন আমেরিকান কবি কি কখনও তাঁর কবিতায় হ্যাম, মিষ্টি আলু আর পেটের খবর দিতে সাহস করবেন?

'পেট' কথাটার অতি-ব্যবহার দেখেই বোঝা যায় যে, চীনেদের ভাবনা-চিন্তায় অনুভূতির প্রাধান্য ইউরোপীয়দের চেয়ে অনেক বেশী। আমাদের কাছে 'পেট'ই হ'ল আমাদের সব ভাবনা-চিন্তা, ভাল-লাগা, খারাপ-লাগা, এমন কি পাণ্ডিত্যেরও উৎস—তাই আমরা বলি, 'পেটভরা সাহিত্য', 'এক-পেট দুঃখ', পেট-ভর্তি পাণ্ডিত্য'। চীনভাষায় 'পেট' কথাটার ব্যবহারের কাছাকাছি আসতে পারে ইংরিজি বাওয়েলস্ বা কোষ্ঠ কথাটার ব্যবহার, অবশ্য তা'ও খুবই বাইবেলীয় অর্থে। আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদ্‌রাও আজকাল পেটকেই আমাদের ভয়, রাগ, ঘৃণা, দুঃখ প্রভৃতি অনুভূতির উৎস ব'লে প্রচার ক'রছেন—এমন কি 'ভালোবাসার'ও। তাঁরা বলেন যে, আমাদের উদরের আর শিরার এক-রকম রসনির্যাসই হ'ল আমাদের বিভিন্ন অনুভূতির কারণ। চীনেরা ডাক্টলেস গ্ল্যান্ড বা আধুনিক মনোবিজ্ঞানের কিছুই জানে না, কিন্তু তবুও দুঃখের উৎস হ'ল পেট, আর তাই শোকে দুঃখের সময় খেতে চায় না, একথা খুব সহজেই বুঝেছে। চীনদের মতে দুঃখ অন্তরে থাকে না, থাকে অন্ত্রে।

আমার মতে এই কারণেই চীনেদের ভাবনা-চিন্তা অনেকটা মেয়েদের মত। ইসাডোরা ডানকান ঠিকই ব'লেছেন, "মেয়েদের চিন্তা গজায় তলপেটে, তারপর ক্রমশ উঠতে থাকে ওপরের দিকে; ওদিকে ছেলেদের চিন্তা গজায় মাথায় তারপর নামতে থাকে নীচের দিকে।" চীনেদের চিন্তা নিশ্চয়ই মেয়েদের মত পেটের ভেতরেই প্রথমে গজায়। তাই আমাদের চিন্তাধারা যত বেশী অনুভূতিশীল হবে, ততই আমাদের পেট আর অন্ত্রের দায়িত্ব বেড়ে যাবে। চীনে জাতটাই যে কবিজাত, তার একমাত্র কারণ হ'ল যে, তারা ভাবে পেট আর অন্ত্রের সাহায্যে। ভাবের জন্য ইংরেজরা ঘামায় মাথা; আর কবিতার জন্য চীনেরা ঘামায় উদর।

তবেই দেখুন, অভিধানে কত হাজার মজার ছড়াছড়ি। এলোপাতাড়ি উল্টে যান, দেখবেন কতরকম শব্দের, কতরকম অদ্ভুত মানে। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হ'ল 'স্টুপিডিটি' বা 'বোকামী' কথাটা চীনেরা একেবারেই অন্য অর্থে ব্যবহার করে। কোন চীনে ভদ্রলোক অনায়াসেই নিজেরা 'বোকামীর রক্ষক' ব'লে জাহির ক'রতে পারেন। তাঁর কাজের ঘরের নাম পাবেন 'বোকামীর কুঁড়েঘর।' শুকনো ডাল বের-করা পাতাঝড়া সাইপ্রেস গাছের অদ্ভুত সৌন্দর্যের বর্ণনায় চীনেরা ব্যবহার ক'রবে 'বোকা বোকা' কথাটা। 'রোগে-ভোগা' 'রোগা', 'কুঁড়ে', 'ছট্‌ফটে' এই ধরণের স্থূলে কথা-গুলোও চীনে কবিতায় খুবই দেখা যায়। পি-ও-ডি'র মত কোন অভিধান অবশ্য এখন চীনভাষায় বেরোয় নি, কিন্তু আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে, কোন রসিক পণ্ডিত লোক নিশ্চয়ই একদিন এ কাজে হাত দেবেন।

অনুবাদক—**শ্রীশুভময় ঘোষ**

# স্যানেটোরিয়াম

**নির্মাল্য বসু**

জ্বর আসে নি আজ।
শরীরটা যেন অনেকটা ভালো।
এসে দাঁড়িয়েছি ফিমেল ওয়ার্ডের রেলিঙ্‌ ধরে।—
যেন কতদিন পরে সুন্দর লাগ্‌লো এই অপরূপ বৈকালী।
য়ুক্যালিপ্‌টাস্‌ আর ঘন দেবদারুর পাতার ফাঁক দিয়ে
ঝির্‌ঝির্‌ করে বয়ে যাচ্ছে বসন্তের এলোমেলো হাওয়া।
দূর পাহাড়ের চূড়োয় পড়েছে ক্লান্ত সূর্যের শেষ রশ্মি।
লাল সুরকির রাস্তা দিয়ে চলেছে গরুর গাড়ি
ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করে।
থেকে থেকে ভেসে আসে মৌ-মহুলের
এক এক ঝলক্‌ গন্ধ:
মাতাল হয়ে উঠি আমি।
জ্বর আসে নি আজ—দুদিন আসে না।
'আমি কি বাঁচবো?'
পৃথিবীটা কতো সুন্দর—কতো রঙ্‌—কতো গান—
কতো আলো—কতো ছায়া—
কোন বিচিত্রিতার বাসর আল্পনা।
'ডাক্তারবাবু—আমাকে বাঁচান'!
একটু থেমে—একটু ম্লান হেসে চলে যান ডাক্তারবাবু:
শুধু ভেসে আসে দূর ওয়ার্ডে বিলীয়মান অস্পষ্ট জুতোর শব্দ।
ম্লান সায়াহ্নের শ্রান্ত রশ্মির সাথে মিলে গেল হাসির রেশটুকু।
এমনি এক বাসন্তী সন্ধ্যায় কী যেন চেয়েছিলেম, সেদিন,
স্মরণ-মুকুরে কার ছায়া আজো যেন পড়ে—কে সে?
মনে নেই।
আকাশের ভাবনারা যেন পাখা মেলেছে আজ

কপালে জমে ওঠে বিন্দু বিন্দু ঘাম—হাঁপিয়ে উঠি—
ক্লান্ত পায়ে ফিরে আসি আমার তেরো নম্বর কেবিনে।

* * * * *

আজ আবার জ্বর আস্‌ছে।
ভীষণ দ্রুত বাড়ছে বুকের স্পন্দন
নিঃশ্বাস নিতে পারছি না।
'বাঁচতে চাই না আমি—এক মুহূর্তও বাঁচতে চাই না আর'
এখুনি আসুক মৃত্যু
আমার সমস্ত চেতনাকে অসাড় করে দিক্‌ তুহিন হাতের ছোঁয়ায়
ধন্যবাদ দিয়ে যাবো মৃত্যুকে।
এ পৃথিবীর কোনও দাম নেই আজ।—
শুধু প্রতীক্ষা—শুধু ব্যর্থতা—উঃ।
খোলা জান্‌লা দিয়ে হুড় হুড় করে হাওয়া আস্‌ছে:
গড়িয়ে পড়ছে সূর্যাস্তের ম্লান আলো
আমার বিছানায়—আমার শেষ বাসরের শয্যায়।
এখানে যারা আসে—কেউ ফেরে না তারা।
শীর্ণ কপোল বেয়ে ঝরঝর করে নেমে আসে তপ্ত অশ্রু—
আমার চোখে এতো জল!
'কী পেলাম—কী পেলাম আমি'—চিৎকার করে উঠি
'শুধু প্রতীক্ষা—শুধু ব্যর্থতা':
হঠাৎ কাসি—এক ঝলক তাজা রক্ত—। মাথাটা ঘুরে ওঠে।
টি বি স্যানেটোরিয়ামের ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে জ্বলে ওঠে বিজলী বাতি,
আমিই শুধু জ্বালি না আলো—আমার তেরো নম্বর কেবিনে।
কী হবে আলো জেলে?
সামনে যে গাঢ় অন্ধকার—হাত বাড়িয়ে ধরতে চাই তাকে—
আমার সকল চাওয়া পাওয়ার অন্তিম আলিঙ্গনে।—

(পূর্বানুবৃত্তি)

টির দিন সকালে সবচেয়ে বেশি সেজে-গুজে যাবে ডাক্তার-গিন্নী, হ্যাঁ চেরীর ীহারনলিনী।

ডাক্তার তো আর বাড়িতে বসে থাকে না। রের ছুটি অ-ছুটি নেই। সর্বদিনই বাইরে হ।

আর ডাক্তারের খোঁজে যতজন আসেন পেনসারীর বড় টেবিলের চারদিকে ভিড় বসেন তাঁরা নীহারকে ঘিরে। পলিটিক্স পড়ে থাকলে তো হয় না, পসারও দেখতে যেন এই অজুহাতে ডাক্তারের পস্থিতি মার্জনা ক'রে শহরের মান্যগণ্যরা র সকালে ডাক্তার-গিন্নীর সঙ্গে স্থানীয় নীতি, সমাজনীতি ও স্বাস্থ্যনীতি নিয়ে লাচনা করেন। লঘু-গুরু, গম্ভীর-অগম্ভীর কম আলোচনাই হয়। ছুটির সকালে পাড়া-বেশীরা একত্র জড়ো হলে যা হয়। রোয়াকে, কখানায়, ক্লাবে লাইব্রেরীতে। প্রত্যেক শহরে। তা ছাড়া যোগীনবাবু আছেন একেবারে রের মাঝখানে। আর তাতে যোগীন-গিন্নী ন মধুরভাষিণী, হাস্যময়ী, সত্যিকারের ুচিসম্পন্না প্রিয়দর্শিনী মহিলা।

যেন এইজন্যেই আরো বিশেষ ক'রে রোজ বার ডাক্তার সেনের ডিস্‌পেনসারীতে এসে কালোরকম ভিড় জমান সম্ভ্রান্ত পৌর-রা। আসেন পোস্টমাস্টারবাবু, ছোট রাগা, নাজীর সারদা রাহা, বরদা উকিল, -রেজিস্ট্রারবাবু, তৃতীয় মুন্সেফ হেম নাহা, পেক্টারবাবু এবং আরো অনেকে।

অনেকে আসেন। যেন ডাক্তার উপকার ছেন তাঁদের। তার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ সবাই টর সকালটিতে নীহার-নলিনীর সঙ্গে া করতে আসেন। এইখানেই সভ্যতা, এটাই ধুনিক রীতি। চেরীর মা তাতে গর্ববোধ র বৈকি।

একটা সভ্য শহরের মধ্যমণি হয়ে আছে ও, া যায়। নিশ্চয়ই, স্টাইলবোধ আছে তার, চমৎকার হিউমার জ্ঞান। নীহার বাক্‌নিপুণা, বুদ্ধিমতী, গৃহকর্মপটিয়সী তো বটেই।

ডাক্তারের মিসেস সর্বগুণসম্পন্না। সবাই বলছে।

সত্যিকারের আধুনিক মহিলা বলতে যা বোঝায় তাই হ'ল চেরীর মা। শহরে প্রবল জনশ্রুতি।

আর নীহার এসব মেয়েকে বোঝায়।

চেরী কতটা বুঝল কি শিখল সে সম্বন্ধে নীহার যদিও অতিমাত্রায় সচেতন, তবু যতটা সম্ভব ব'লে ব'লে ঘসে ঘসে দেখিয়ে শুনিয়ে অন্তত চলনসইরকমও ওকে দাঁড় করাতে পারে কিনা নীহারের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না।

'কত দ্রুত, কত তাড়াতাড়ি আমি বদ্‌লে গেলাম। সবাই বলছে। আর আজ, এখন পর্যন্ত, শহরের অত্যন্ত সাধারণ হালচালই তুমি আয়ত্ত করতে পারেল না।'

হ্যাঁ, নীহার মেয়েকে ধমক দেয়, বড়ো হয়েছ, আজও যদি অষ্টপ্রহর খেতে-বসতে চলতে-ফিরতে মাকে মেয়ের পিছনে লেগে থাকতে হয় তো বিপদের কথা। নীহার নিজের কাজ করে কখন। ধৈর্যের বাঁধ এক এক সময় ভেঙ্গে পড়ে তার।

বেজায় রুষ্ট হয়েছিল ও আজ চেরীর ওপর।

অর্থাৎ সকাল হ'তে ডাক্তারকে চা খাইয়ে বিদায় ক'রে দিয়ে নীহার যখন স্নানের ঘরে ঢুকছিল তখন ও বল্‌তে গিছল মেয়েকে রাত্রের কাপড়জামা ছেড়ে ডাইংক্লিনিং থেকে ধুয়ে আসা হল্‌দে মীর্জাপুরী শাড়িখানা এবং চায়নাপীস্‌এর ব্লাউজটা যেন পরে নেয়।

মেয়ে মিশনারী স্কুলে পড়ে। গির্জাঘরে সান্‌ডে ক্লাসে যোগ দেওয়ার যে বিশেষ পক্ষপাতী নীহার তা নয়।

এবং তাতে চেরীরও উৎসাহ নেই।

'তার চেয়ে ছুটির সকালটায় ও বাড়িতে থাকুক।' নীহার ডাক্তারকে বুঝিয়েছে। 'এ' ও' আসেন। চা করা আছে, এটা-ওটা কাজ। একলা আমি পারব কেন। মেয়ে বড়ো হয়েছে, ওর তো এখন এসব শেখা দরকার।'

'নিশ্চয়।' যোগীন ডাক্তার জোরে মাথা নেড়েছে। 'খৃস্টান-পাড়ার চেয়ে বাঙালীপাড়া অগ্রসর বেশি হয়েছে। চাল-চলনে কি ঠাট-ঠমকে।'

অর্থাৎ নীহারকে সাজতে দেখেই যেন ডাক্তার একটা চিম্‌টি কেটেছিল।

নীহার চুপ ক'রে ছিল।

অর্থাৎ ইদানীং নীহারের স্বাস্থ্যটা একটু বেশি ভালর দিকে যাওয়ায় এবং ও রোজ অন্তত ছুটির সকালবেলাটায় অতিরিক্ত সাজ-গোজ ক'রে থাকার দরুণ ডাক্তারের মনে যেন একটু ঈর্ষা জাগ্‌ছিল।

টের পেয়েও নীহার কিছু বলে না।

কেন না তাতে লাভ হবে না কিছুই। ভাবে নীহার, এই বাঙালী পাড়াতেই তোমাকে থাকতে হবে,—এই সমাজের গায়েই ছুঁচ ফুঁড়ে তুমি পয়সা কামাবে। যখনকার যা।

খৃস্টান-পাড়ার মায়ায় এখন আর পাহাড়ের চেঁকুর তুলে লাভ কি। মনে মনে বলে নীহার, 'একটা বুড়ো কার্টারের গায়ে ইঞ্জেকশন দিয়ে ক'পয়সা আর পকেটে আসতো।'

অর্থাৎ এই সমাজের এতটুকু নিন্দা আর এখন নীহারের সয়না। এখানে এসেই তুমি সম্মান পাচ্ছ; একটা ক্লাবের সেক্রেটারী হয়েছ, খেলায়, মিটিংএ, মেয়েদের সভায়, ছেলেদের জলসায়, ছোট বড় সকল আড্ডায় মাতব্বরী করছ,—আজ তোমার বাড়িতে এঁদের আগমনে এত ঘাবড়াচ্ছ কেন। নীহার আরও বলে, 'তুমি যেমন সামাজিক হতে চাইছ,—রাতদিন সোশ্যাল হবার জন্যে চোখে ঘুম নেই, তেমনি তাঁদেরও ইচ্ছা ডাক্তার-গিন্নীর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় রাখা, দেখা-সাক্ষাৎ করা। এটাই সভ্যতার লক্ষণ। সুতরাং আমায়ও সেজেগুজে এদের অভ্যর্থনার জন্যে তৈরী থাকতে হয়।'

আর বাড়িতে বয়স্কা কুমারী মেয়ে থাকলে তাকেও মার সঙ্গে সঙ্গে সাজতে হয়। টেবিলে উপস্থিত থেকে চা চিনির তদ্বির করতে হয়, কথা বলতে হয়, গান গাইতে হয়। তা মেয়ে তো তোমার কথা কওয়া কি গান গাওয়া আর শিখবে না, সুতরাং—

অবশ্য নীহার এ নিয়ে একেবারেই কথা কাটাকাটি করতে চায় না স্বামীর সঙ্গে। কেননা ডাক্তার একটুখানি চিম্‌টি কাটার পর সেই যে চা-এর বাটিতে মুখ লুকিয়েছিল সেদিন আর মাথা তোলেনি। কথা বলতে গেলে বেরোতে দেরি হবে সেজন্যে কি। এসব ব্যাপারে কথা কওয়াই মানে নীহারকে চটানো, আর তার অসুখটি ফিরিয়ে আনা। তার চেয়ে, তার চেয়ে বরং, ততক্ষণে—ডাক্তার এই ভাবছিল, যার

কোনরকমে চা-এর পাত্রটি শেষ ক'রে সোলার হ্যাট্‌টি হাতে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেছে। রোগী দেখা তো আছেই, অমুক ক্লাবের আজ আবার একটা ফাংশন। আজই কাদের এগ্‌জিবিশন-এর ওপেনিং ডে। দেরী হয়ে গেল কি?' যেন নীহারকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে ডাক্তার চৌকাঠ ডিঙোবার সময় স্ত্রীর দিকে চেয়ে ঈষৎ হেসেছিল। 'না দেরী আর কি, মোটে তো ছ'টা কুড়ি।' গম্ভীর হয়ে নীহার উত্তর করেছিল, 'এইবেলা বেরিয়ে পড়। পাংচুয়েলী পৌঁছুবে।'

অর্থাৎ বাড়ি থেকে ডাক্তার যত শীগ্‌গীর বেরোয় তত ভাল। বাইরেই তো ও থাকবে। চিরকাল বাইরে কাটিয়েছে। ভাবছিল নীহার।

হ্যাঁ, সেই পাহাড়ের যুগ থেকে।

বাড়ির বাইরেটা যেমন সামলায় ডাক্তার তেমনি ভিতরটা আগলায় নীহার। আগলে এসেছে। হ্যাঁ, সেই চা-বাগানের আমলেও।

'অর্থাৎ বাড়িতে কি হচ্ছে না হচ্ছে চোখ মেলে যখন দেখনি তো এখন আর চোখ ঘোরাচ্ছ কেন, এদিকে।' ডাক্তার চলে যাওয়ার পর নীহার স্বামীকে প্রশ্ন করে। যেন নীহার অনুপস্থিত স্বামীর সঙ্গে কথা কয় বিড় বিড় করে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে। প্রসাধনরতা নীহার সেযুগ এবং এযুগের তুলনামূলক সমালোচনা করে নিজের মনে।

তখন জীবন ছিল অনেক বেশি সরল। সহজ।

তখন কালেভদ্রে আধ-বুড়ো মাথা পাগ্‌লাটে কার্টার ছাড়া আর কে এসেছে বাড়িতে। সৌজন্য। জঙ্গলের ক্লার্কবাবু আর গুদাম-বাবু আড্ডা মারবে দূরে থাক্‌, চলে গেছে শাবল হাতে মাটির নীচের আলু তুল্‌তে আর একটি জঙ্গলে।

ছুটির সারাটা সকাল নীহার একলা বারান্দায় ইজি-চেয়ারে চুপ্‌চাপ শুয়ে থেকে শুক্‌নো জলপাই-পাতারা খসে খসে পড়ছে দেখত, আর নীহারের কোলে এসে পড়তো যতগুলো শুক্‌নো পাতা নীহার একটি একটি ক'রে গুণ্‌ত। তখন চেরী যত ছোট ছিল এখন তার চেয়ে ঢের বেশি বেড়েছে, এই পাঁচ বছরে।

হ্যাঁ, তখনকার চেয়ে এখনকার বাড়ির ভিতরের সমস্যা বেড়েছে ছাড়া কমেনি।

চেরী এখনও বেড়ার ধারেই দাঁড়িয়ে থাকে। আর তার ক্ষতিপূরণ করতে হয় নীহারকে।

কেননা এখন এখানে চুপ করে ইজি-চেয়ারে শুয়ে থাকলে চলে না। অবশ্য চেয়ারেই বসে থাকে নীহার।

এখন ছুটির সকালে শুক্‌নো জলপাই-পাতার পরিবর্তে সরস পরিচ্ছন্ন জেন্টলম্যানদের এক অতি-আধুনিক ডাক্তার-গৃহিণী নীহার-নলিনী।

বেশ সহজেই এই শহরের আধুনিক মনের চাবিকাঠিটি হাত করেছে ও।

'নিশ্চয়, তুমি সিরিঞ্জ হাতে ডাক্তারি করছ। দিনের শেষে মনিব্যাগ ভর্তি টাকা আনছ। কিন্তু কা'র জন্যে, কিসে এমন হ'ল পাঁচ বছর না পুরতে।' দুই হাত ভরে পাউডার নিয়ে গলায় মাখতে মাখতে নীহার স্বামীকে প্রশ্ন করে আয়নার মধ্যে। প্রতিবিম্বিত নীহার উত্তর করে, 'এখান থেকেই উকিলবাবুরা প্রেরণা পাচ্ছেন, অন্দরে অসুখ হওয়া মাত্র যোগীন ডাক্তারকে কল্‌ দেওয়া উচিত। মুন্সেফপাড়া থেকে রোজ জোর তলব আসছে যোগীনবাবুর।'

আমলা পাড়ায়। দক্ষিণ অঞ্চলে। প্রফেসার পাড়ায়। শহরের মধ্যবিত্ত বাবু বাঙালী সমাজের সর্বত্র।

'আমার গুণে।' নীহার বলে।

কেননা এ'দের সকলকে মিষ্টি হেসে চা খাইয়ে প্রীত করে রাখছে ও রোজ।

ঘরে অসুখ হওয়ামাত্র যোগীন ডাক্তার ছাড়া কে আর তাঁদের ডাক্তার আছে এখন নিজেদের। নীহার নিজে পপুলার হয়ে ডাক্তারকে পপুলার করে দিলে। এবং এই গৌরবে, ডাক্তারের চিম্‌টি কাটা সত্ত্বেও, নীহার গদ্‌গদ্‌ হয়ে সেদিন সকালবেলা অর্থাৎ এক রবিবার ছুটির সকালে নিজের ছোট্ট কোলিকো রুমালে আধশিশি লেভেন্ডার ঢেলেছিল।

হ্যাঁ, ঐ দিয়ে ও ডাক্তারের ডিস্‌পেনসারীর আইডিন আর লাইজোলের উগ্র গন্ধটা ঢেকে রাখে। ডাক্তারের বাড়িতে পা দিয়েই রুগী কি তার আত্মীয়স্বজনেরা উঁচানো ছুঁচ দেখতে চায় না। দেখে ফুল আছে কিনা বাগান, ফার্নিচারের বহর কেমন, ডাক্তারের আর্দালী-পেয়াদা ক'টা, দিশি কুকুর কি বিলাতী। আর, ডাক্তার-গিন্নী দেখতে কেমন। কি তাঁর সাজ কেমন ব্যবহার। অন্ধ কুলি নয়। শহুরে সমা-লোচকের চোখ।

তবু নীহার দীর্ঘশ্বাস ফেলে, আপ্‌-টু-ডেট্‌ সবকিছু হয়েও ও পুরোপুরি আপ্‌-টু-ডেট্‌ হ'তে পারল না। আর, চেরী যদি এমন না হয়ে একটু অন্যরকম হ'ত। একটু চালাকচতুর, করিৎকর্মা।

এদিনে উপযুক্ত স্ত্রী ও একটি উপযুক্ত কন্যা বর্তমানে পুরুষ সংসারে দশজনের একজন হয়ে ওঠেনি এই দৃষ্টান্ত যে-কোনো আধুনিক সমাজে বিরল।

সংসারটা আরো উঠত, আরো তুলে ধরত নীহার যদি চেরীর একটু পরিবর্তন হ'ত। সকালে বৈঠকখানায় পার্টি বসলে টেবিলে চা-এর কাপ এগিয়ে দিতে তো আর নীহার মেয়েকে ডাকে না। ডাকবে না কোনোদিন।

ক'রে নেয়। এই ইজি-চেয়ারে বসেই নীহার কল টেপে। কলের মত সব কাজ সম্পন্ন হয়। ঘরের। এক চুল এদিক ওদিক হয় না।

যে জন্যে নতুন দারোগা হিমাংশু ব্যানার্জি সেদিন বলছিল, 'মিসেস সেনকে দেখলে ঈর্ষা হয়, তার চেয়েও বেশি তাঁর সাজানো গুছানো ঘর।'

'পাকা গিন্নী, ডাক্তারের মিসেস পাকা মেয়ে।' বুড়ো সাব-রেজিস্ট্রার সকলের আগে উঠে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেয়। 'প্রথম দিনই দেখে বুঝেছিলাম। An intelligent woman.'

নাজীর সারদা রাহা রসিক ব্যক্তি। 'মিসেস সেন যখন অই ইজিচেয়ারে বসে চাকরটাকে অর্ডার করেন, সত্যি, বলব কি, আমার মনে পড়ে যায় কুইন্‌ এলিজাবেথের কথা। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার কথা।' কথার শেষে সারদা হাসে।

'কেন, আমি কি রাজ্য চালাচ্ছি নাকি।' নীহারও হেসে উত্তর দিয়েছিল।

'না, তেমনি মহিমান্বিতা।' উকিল বরদা তালুকদার বুঝিয়েছিলেন, 'ভূদেববাবুর প্রবন্ধের একটা উক্তি মনে পড়ে গেলঃ 'যিনি একই সঙ্গে বিবি এবং বাঁদী সাজিতে পারেন তিনিই প্রকৃত গৃহিণী।' হেসে তালুকদার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাকিয়ে দেখছিলেন নীহারের নিখুঁত সাজসজ্জা, ঘরের উজ্জ্বল শ্রী। আর নীহার চুপ ক'রে ছিল।

'বলতে কি, মিসেস সেন, আপনার এখানে এলে ছুটির সকালটা এমন অদ্ভুত আনন্দে কাটে।' এখানকার নতুন ট্রেজারার অনাদি পুরকায়স্থ প্রশংসা করছিল সেদিন নীহারের বারান্দার, বাগানের, তার গায়ের সুন্দর ব্লাউজের, কচি-পাতা-রং চায়ের পেয়ালাগুলোর, সর্বোপরি নীহারনলিনীর হাতের তৈরী চা, মনোমুগ্ধকর হাসি ও বুদ্ধিমার্জিত ভাষণের।

কিন্তু এত প্রশংসা পেয়েও নীহার মূক হয়ে থাকে। বুকের মধ্যের একটা ক্ষত চর্‌চর্‌ করে।

আরো পাওয়া উচিত ছিল, আরো হওয়া। নীহার ভাবে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা চেরীর দিকে চেয়ে।

মাংসের পুতুল।

রক্তমাংসের একটা ডল্‌ ছাড়া আর কি তুমি সংজ্ঞা দিতে পার ওর।

অবশ্য, বাড়িতে ঢুকবার সময়, কি যখন বেরোয় অভ্যাগতরা আড়-চোখে চেরীকে যে না দেখে তা নয়। ঐ পর্যন্ত।

মেয়ে সম্পর্কে আর কোনো উচ্চবাচ্য নেই চায়ের টেবিলে। কেননা, সামাজিকতার একটি তৃণখণ্ডও আঁকড়ে ধরতে পারল না যে-মেয়ে আধুনিক সমাজ তাকে অনুকম্পার চোখে দেখবে না তো কি। বেশ টের পায় নীহার। আর তার বুকের ভিতর হু হু করে।

(ক্রমশ)

# গন্ধ দ্রব্য

**শ্রীদানেশ সেন**

**আদিম** বন্য মানুষের গন্ধ দ্রব্যের প্রয়োজন ছিল না। জীবজন্তু বা গাছগাছড়া ...তের কাছে যাহা মিলিত তাহা দিয়া তাহার ...র পূরণ ছিল জীবনের একমাত্র সমস্যা। ...তাকার আহার প্রতিদিন তাহাকে সন্ধান ...রতে হইত, সঞ্চিত আহার বলিয়া ...হার কোন জিনিস ছিল না। আহারের ...স্থানের জন্য বনের জীবজন্তু পোষমানাতে ...রু করে, গাছ গাছড়ার জন্য চাষের। ধীরে ...রে গড়ে ওঠে তার গোষ্ঠী ও সমাজ, ...ইন ও সভ্যতা।

স্বভাবজাত সুগন্ধ বন্য ফুল বন্য মানুষ...ও আকর্ষণ করেছে নিশ্চয়, ক্ষণিকের জন্য ...ত শিকারের পিছনে ছুটতে ছুটতে থমকে ...ড়িয়েছে সুগন্ধ ফুলের কাছে। সভ্যতার ...মেষের সংগে সুগন্ধ বা গন্ধ দ্রব্য মানুষের ...ধিকতর প্রিয় ও প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে।

গন্ধ দ্রব্যের ব্যবহার অতি প্রাচীন। প্রাচীন ...ন্দুদের জীবনযাত্রায় সুগন্ধ ও গন্ধ দ্রব্যের ...হুল ব্যবহার ছিল। তাঁদের পূজা ও হোমে, ...নিক জীবনের নানা লীলা বিলাসে, গন্ধ ...ব্য ও সুগন্ধ ছিল অংগাংগীভাবে জড়িত। ...ীন দেশের অতি প্রাচীন পুস্তকেও এর ...বহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রাচীন মিশরে, ...ঃ পূঃ তিন হাজার বছরের বেশী আগে ...টেন খামেনের সমাধিতে গন্ধদ্রব্য ব্যবহারের ...নদর্শন মেলে। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে সভ্যতা-...র্বিত ইংরেজ বৈজ্ঞানিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকগণ ...টেনখামেনের সমাধি-দ্বার খুলে গন্ধদ্রব্য ...বহারের আধার দেখতে পেয়ে অবাক হন, ...ুকে দেখেন সেগুলিতে তিন হাজার বছরের ...গে রক্ষিত গন্ধ দ্রব্যর মৃদু গন্ধ তখনও ...গে রয়েছে।

গন্ধ দ্রব্যের ইতিহাস অনুসন্ধান করলে ...দখা যায়, এর ব্যবহার এশিয়ার থেকে অন্য ...দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এশিয়াই সভ্যতার জন্মভূমি, সভ্যতার শুরু থেকে হিন্দুরা গন্ধ ...ব্যের ব্যবহার জানতেন, পশ্চিমের পন্ডিতরা ঈষৎ সলজ্জে স্বীকার করেছেন। গন্ধ দ্রব্যর ...বহার সভ্যতার একটা বিশেষ সোপানে আরোহণের পরিচয়, ইউরোপে তখন গন্ধদ্রব্য ব্যবহারের গন্ধ পর্যন্ত মেলে না। প্রাচীন রোমক স্নানগৃহের গন্ধবিলাস সর্বপরিচিত বটে, কিন্তু রোমক সভ্যতা ভারতীয়, চৈনিক, মিশরীয় সভ্যতার অনেক পরে। পারসিক ও আরবীয়গণ গন্ধদ্রব্যের ব্যবহার জানতেন, এটা উপরোক্ত কোন সভ্য জাতির সংস্পর্শে প্রাপ্ত বলে অনুমান করা যায়।

ভারতের চন্দন জগদ্বিখ্যাত। তা ছাড়া বিভিন্ন সুগন্ধ মূল, পত্র, শাখা, ফুল, বীজ, বৃক্ষত্বকের ছড়াছড়ি এদেশে। এইসব সুগন্ধ উদ্ভিদ ও মশলা ভারতবর্ষ ও ভারত মহাসাগরের বুকে ছোট বড় দ্বীপগুলিতে আছে অপর্যাপ্ত। ইউরোপীয় বণিকের লোভ তাদের এখানে টেনে এনেছে বার বার। দুস্তর দুরন্ত সমুদ্রের তরঙ্গ ও ভীতির কোন বাধা মানেনি এরা, এই সব সুদূর দেশের উদ্দেশে তাদের ভংগুর নৌকা নিয়ে যাত্রা করেছে বারবার। লড়েছে নূতন দেশের মানুষ, জীবজন্তু, সমুদ্রযাত্রার শর্তবিপদ ও নিজেদের মধ্যে। অনেকে দেশে ফিরে যেতে পারেনি। আমাদের দেশের সদাগরেরাও তাঁদের নৌকা নিয়ে গেছেন দেশেদেশে, এই সব গন্ধদ্রব্য ও মশলার ভার নিয়ে, সংগে অবশ্য প্রবাল, মুক্তা আর অন্য জিনিসেরও ভার থাকত।

ভারতে গন্ধদ্রব্যের ব্যবহার, খালি দেবতার উদ্দেশ্যে প্রিয় জিনিসের অর্ঘ্য বা লীলাবিলাসের উপকরণ হিসাবে ছিল না। ওষুধ-স্থানে ব্যবহারও তাঁদের জানা ছিল।

বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে অনেক গন্ধদ্রব্যের 'ডিসইনফেকট্যান্ট' গুণ আবিষ্কার হয়েছে। 'ডিসইনফেকট্যান্ট' বা 'এণ্টিসেপটিক' হিসাবে গন্ধদ্রব্যের ব্যবহারের নিদর্শন আমাদের প্রাচীন সর্বৌষধি জলে স্নান প্রথা।

ঘর্ষিত বিভিন্ন সুগন্ধ কাঠ ও মূল, তাদের জলীয় নিষ্কাশন বা চোয়ান অংশ, তাজা ও শুকনো ফুল, ফুলের রেণু আমাদের প্রাচীন ব্যবহৃত গন্ধদ্রব্য। মুসলমান আমলে এদেশে আসে গোলাপ ফুল ও গোলাপের আতর। মৃগ কস্তুরী এর অনেক আগে চীন দেশ থেকে এদেশে আসে। মৃগকস্তুরী নাকি চীনাদের আবিষ্কার। বর্তমানে আমাদের প্রাচীন ব্যবহৃত গন্ধদ্রব্যগুলি পূজাপার্বণে চলে; অন্য সময় এদেশে ও বিদেশে মিশ্রিত ও তৈরী বিভিন্ন সুগন্ধ পুষ্পনির্য্যাস ও কৃত্রিম উপায়ে উৎপাদিত বিভিন্ন সুগন্ধ রাসায়নিক দ্রব্য, আমাদের বিলাসের উপকরণ। বছরের পর বছর আমরা এখন বিভিন্ন সুগন্ধ মূল ফুল বীজ কাঠ ইত্যাদি চালান দি, বিদেশে তার থেকে নিষ্কাশিত গন্ধ তেল সুদৃশ্য বোতলে আমদানী করি। কিছু কিছু নিষ্কাশন নিজেরাও করি।

সুগন্ধ ফুল কাঠ পাতা মূল থেকে যে গন্ধ পাওয়া যায়, তার জন্য দায়ী কতকগুলি উদ্বায়বীয় সুগন্ধ জৈব রাসায়নিক দ্রব্য। বিভিন্ন মাত্রায় ভিন্ন ভিন্ন ফুল, ফল, মূলে ঐ সুগন্ধ উদ্বায়বীয় রাসায়নিক দ্রব্যগুলি বর্তমান। ঐ দ্রব্যগুলিই উদ্ভিজ্জ সুগন্ধ তেল বা গন্ধদ্রব্য। এইগুলি বিভিন্ন মাত্রায়, নারিকেল, অলিভ, বাদাম প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ অন্য তেলের সংগে মিশ্রিত হইয়া সাধারণ পরিচিত গন্ধ তেল, সুরাসার বা অন্য দ্রাবকে দ্রব ও 'তরল' হইয়া, বিভিন্ন সেণ্ট, আরক, এসেন্স, বা আতর হিসাবে আমরা ব্যবহার করি। উদ্ভিদ অংশগুলি সুগন্ধ রাসায়নিক দ্রব্যগুলির উপস্থিতির জন্যই গন্ধবিশিষ্ট হয়। সাধারণতঃ স্বভাবজাত সুগন্ধ উদ্ভিদ অংগে এই গন্ধদায়ী রাসায়নিক দ্রব্য একক অবস্থান করে না; বহু রাসায়নিক দ্রব্যের একত্র সম্মিলনই স্বভাবজাত সুগন্ধ উদ্ভিদ অংগের সুগন্ধ দান করে। স্থান, কাল আবহাওয়ার উপর এই বিভিন্ন দ্রব্যগুলির পরিমাণ নির্ভর করে। তুরস্ক ও বুলগেরিয়াতে চয়িত গোলাপে, গোলাপ গন্ধর একটি বিশিষ্ট অংশ 'জিরানিয়ল'এর পরিমাণ সমান না হওয়াই সম্ভব।

উদ্ভিদদেহে এই গন্ধদায়ী তেলগুলি এমনি তেল অবস্থাতে থাকে, চাপ দিয়া, জলীয় বাষ্প সাহায্যে চোয়াইয়া নিষ্কাশন করা যায়। কখন কখন 'গ্লিসারাইড' হিসাবে বন্দী থাকে। বিশিষ্ট পচনক্রিয়া বা 'এনজাইম অ্যাকশন' দ্বারা এগুলি ভাঙ্গা হয়। 'এনজাইম অ্যাকশনের' ফলে আবদ্ধ সুগন্ধ তেল বাহির হইয়া আসে।

জৈব রাসায়নিকের ভাষায় এগুলিকে হাইড্রোকারবন, আলকোহল, ইথার, এলডি-হাইড, কিটোন, ফেনল, বিভিন্ন জৈব এসিডের 'এষ্টার' হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়।

'হাইড্রোকারবন' জাতীয় দ্রব্যগুলি যথা— ওসিমিন, মিরসিন, সাইমিন, পাইনিন; সিলভেষ্ট্রোরিন, লিমোনিন, ক্যাম্ফিন, ফেলানড্রিন, ফেনচিন, জিরানিওলিন, ক্যারিওফাইলিন, সাণ্টালিন প্রভৃতি।

'আলকোহল' জাতীয় যথাঃ—জিরানিওল, নিরল, সিট্রোনেলল, টার্পিনল, বোর্নিওল; লিনালোল, মেনথল, সাণ্টালল, পেরিল; এলকোহল, ফেনচিল, আলকোহল, সিড্রোল; ফেনিল ইথিল, বেনজিল ও মিথিল এলকোহল ইত্যাদি।

'ফেনল' জাতীয় যথাঃ—থাইমল, কার্ভা-কোল, ইউজেনল ইত্যাদি।

'ইথার' জাতীয় যথাঃ—এনিথোল, স্যাফ্রোল, ইউকেলিপটোল, ইত্যাদি।

'এলডিহাইড' জাতীয় যথাঃ—সাইট্রাল, সিট্রোনেলাল, এনিসালডিহাইড, বেনহালডি-হাইড, সিনামালডিহাইড ইত্যাদি।

'কিটোন' জাতীয় যথাঃ—ক্যামফর, আই-নোন, কার্ভোন, মেনথোন, ফোনচোন; পিপারি-টোন, এসিটো ফিনোন, ইত্যাদি।

'এণ্টার' জাতীয় যথাঃ—এসিটিক, বেন-জয়িক, স্যালিসিলিক, টাইগ্লিক, বু্যটিরিক প্রভৃতি এসিডের 'এণ্টার'।

উদ্ভিদ দেহ হইতে গন্ধ তেল নিষ্কাশন করা হয় মোটামুটি ৪ রকম ভাবে—

(১) ষ্টীম বা জলীয় বাষ্পের সাহায্যে চোয়াইয়া বা এমনি জলের দ্বারা চোয়াইয়া, (২) চাপ দিয়া, (৩) উদ্বায়বীয় দ্রাবক সাহায্যে, (৪) পরিশ্রুত চর্বির সংস্পর্শে রাখিয়া, পরে চর্বি হইতে উপযুক্ত দ্রাবক সাহায্যে।

উপরোক্ত চাররকম পদ্ধতি দ্বারাই গন্ধতেল নিষ্কাশন, সুবিধা বুঝিয়া, করা হয়। (১) বক্ যন্ত্র বা অনুরূপ যন্ত্রে ফুল কাঠ বা উদ্ভিদ দেহের যে অংশ হইতে গন্ধ তেল আশা করা যায়, সেগুলিকে জলের সহিত এক সঙ্গে রাখিয়া বকযন্ত্রের আধারটি গরম করা হয় ধীরে ধীরে। জল ফুটিয়া জলীয় বাষ্প বাহির হইবার চেষ্টা করে, এই জলীয় বাষ্পটি ধরা হয় পৃথক আধারে। জলীয় বাষ্প বাহির হইবার সময় সঙ্গে আনে, উদ্ভিদ দেহের গন্ধ-তেলটিকে। পরে জলের সঙ্গ হইতে গন্ধ তেলটিকে পৃথক করা হয়। কখনও কখনও পৃথক আধারে জলীয় বাষ্প উৎপন্ন করা হয়, এই জলীয় বাষ্পটি আনা হয় বকযন্ত্রের ভিতর উদ্ভিদদেহ ও জলের উপর, বক যন্ত্র হইতে নির্গত জলীয় বাষ্প ও গন্ধতেল ধরা হয় পৃথক আধারে। চোয়ান তাড়াতাড়ি করা যায়, উত্তপ্ত জলীয় বাষ্পের সাহায্যে। পৃথক আধারে উৎপন্ন জলীয় বাষ্প, উদ্ভিদদেহ ও জল বিশিষ্ট বকযন্ত্রে আনিবার পথে, উত্তপ্ত করা হয়। সাধারণ জলীয় বাষ্পের তাপ (টেম্পারেচার) প্রায় ১০০ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড্। উত্তপ্ত জলীয় বাষ্পের তাপ এর চাইতে বেশী থাকে। এর ফলে চোয়ান কার্য দ্রুত হয়। সব সময় উত্তপ্ত জলীয় বাষ্প বা 'সুপার হিটেড ষ্টাস' ব্যবহার করা হয় না, কারণ বেশী তাপে অনেক সৌখীন গন্ধ দ্রব্য নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে।

সাধারণ চোয়ান, বা জলীয় বাষ্পের সাহায্যে চোয়ান ও উত্তপ্ত জলীয় বাষ্পের সাহায্যে চোয়ান এই তিন প্রকার প্রথাতে অনেক সময় গন্ধতেল বিশিষ্ট উদ্ভিদ অংশ-গুলিকে চূর্ণ করিয়া নেওয়া হয়, না করিলে উদ্ভিদ দেহ হইতে সব তেলটা বাহির করা সম্ভব হয় না।

আগে বলা হইয়াছে উদ্ভিদ দেহের গন্ধ-তেল বিভিন্ন গন্ধ বিশিষ্ট জৈব রাসায়নিক দ্রব্যের একত্র মিশ্রণ ফল। চোয়ান তেলে এই একক রাসায়নিক দ্রব্যগুলির পরিমাণ নির্ভর করে, তাদের বিভিন্ন আণবিক ওজন ('মোলে-কিউলার ওয়েট'), তাদের 'বাষ্পীয় চাপ' (ভেপার প্রেসার) ইত্যাদির ওপর।

স্থান কাল আবহাওয়ার উপর নিষ্কাশিত গন্ধতেলের পরিমাণ নির্ভর করে। নিম্নলিখিত কয়েকটি উদ্ভিদ দেহ হইতে মোটামুটি চোয়ান দ্বারা নিষ্কাশিত তেলের পরিমাণ দেওয়া গেল।

| উদ্ভিদদেহ অংশ | গন্ধতেলের ভাগ (শতকরা) |
|---|---|
| যোয়ান বীজ | ·৭৭ |
| এনি সীড | ·৮ থেকে ১·২ |
| এনজেলিকা বীজ | ·২ |
| বে পত্র | ·৭৬ |
| সিডার কাঠ | ১ থেকে ১·৪ |
| আদার শিকড় | ·৩ |
| লবঙ্গ ফুল | ·৬ থেকে ·৯ |
| ভারতীয় চন্দন কাঠ | ·২ থেকে ·৩৪ |
| দারুচিনির ছাল | ·৩২ |

**(২) চাপ দ্বারা নিষ্কাশনঃ—**

অনেক ফলের ছালে থাকে গন্ধ তেল। লেবু-ফলের ছালের গন্ধতেল ষ্টাস ডিস্টিল বা জলীয় বাষ্পের সাহায্যে নিষ্কাশন করিলে নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। এমনি বহু তেল আছে।

এই ক্ষেত্রে ছালটিকে ফল হইতে পৃথক করিয়া লইয়া স্পঞ্জের ভিতর রাখিয়া চাপ দিতে হয়। চাপের ফলে তেলটা ছালের থেকে পৃথক হইয়া বাহির হয়। কখনও কখনও গোটা ফলটা বিশেষ যন্ত্রে রেখে, ফলের ছালটিকে চাঁছা হয়। যখন চাঁছা (স্ক্রপ) হয়, তখন পাতলা সোডিয়ম বাইকার্বনেট দ্রব ছিটানো হয় ফলটার উপর। পরে 'সেণ্ট্রি ফ্যুজ' মেসিনে এই জল থেকে গন্ধতেলটি পৃথক করা হয়। কখনও কখনও ফলের ছালটি খস্‌খসে ধাতু নির্মিত বিশেষ ছুরি দ্বারা ছোলা হয়। পরে এই ছোলা অংশগুলির থেকে চাপ দিয়া তেলটি পৃথক করা হয়।

(৩) তৃতীয় পদ্ধতিতে উদ্বায়বীয় দ্রাবকের সাহায্য নেওয়া হয়। টিউব রোজ, যুঁই নার্সি-শাস্ প্রভৃতি ফুল থেকে দ্রাবকের সাহায্যে গন্ধতেল পৃথক করা হয়। চোয়ান দ্বারা এদের গন্ধ নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা, চাপ নিষ্কাশন পদ্ধতিও সম্ভব নয়। দ্রাবকটি পেট্রোলিয়াম-এর অতি সহজ উদ্বায়বীয় (অল্প তাপে বায়ুর আকার প্রাপ্ত হয়) অংশ। আরও অনেক দ্রাবক আছে কিন্তু এটির ব্যবহার বেশী হয়। এটির গুণ গন্ধের সঙ্গে, ফুলের জলীয় অংশ টানে না, গন্ধ হিসাবে অপ্রয়োজনীয় ক্লোরোফিল ইত্যাদিও বেশী টানে না। এই দ্রাবক—গন্ধ তেল মিশ্রণ থেকে দ্রাবকটি সহজ উদ্বায়বীয় বলিয়া সহজে 'ডিস্টিলেশন' দ্বারা পৃথক করা যায়। ফলে তথাকথিত বিশুদ্ধ খাঁটি গন্ধতেল পাওয়া যায়।

(৪) চতুর্থ পদ্ধতি—পরিশ্রুত চর্বি সঙ্গে গন্ধবিশিষ্ট উদ্ভিদদেহগুলি একত্রে সপ্তাহের পর সপ্তাহ রাখিয়া দিতে হয়। নীচে এক থাক ফুল তাহার পরে এক থাক পরিশ্রুত চর্বি তার উপরে এক থাক ফুল, তার ওপর চর্বি, এমনি পরিষ্কার পাত্রে উল্টে পাল্টে চর্বি আর ফুল রাখা হয়। কিছুদিন পরে চর্বি ফুলের গন্ধ, বা গন্ধতেল নিজের মধ্যে টেনে নেয়। চর্বির গুণ হচ্ছে সংস্পৃষ্ট গন্ধবিশিষ্ট দ্রব্য থেকে গন্ধ টেনে নেওয়া। আঁশটে গন্ধের ভিতর মাখন রেখে দিলে মাখনেও আঁশটে গন্ধ ছাড়ে। পরে ঐ গন্ধযুক্ত চর্বির থেকে ঠাণ্ডা সুরাসার দিয়ে গন্ধতেলটি নিষ্কাশন করা হয়। ঠাণ্ডা দ্রাবক ব্যবহারের ফলে সৌখীন গন্ধ নষ্ট হইয়া যাইবার ভয় থাকে না।

বিভিন্ন পদ্ধতিতে নিষ্কাশিত বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ গন্ধ তেলে নিম্নলিখিত রাসায়নিক দ্রব্যগুলি থাকে—

**উদ্ভিজ্জ গন্ধ তেল ::** রাসায়নিক দ্রব্য শতকরা

**যোয়ান** (রাসায়নিক দ্রব্য শতকরা)—১৫ থেকে ৫৫ পর্যন্ত থাইমল; বাকী কার্ভাকোল, সাইসিন, পাইনিন, ডাইপেনটিন, ফেলানড্রিন ইত্যাদি।

**দারুচিনির ছাল** (রাসায়নিক দ্রব্য শতকরা) —৩০ থেকে ৭৫ ভাগ সিনায়ালডিহাইড, ৫-১০ পর্যন্ত ইউজেনল, বাকী বেনজালডি-হাইড, মিথিল কিটোন, ফেলানড্রিন, পাইনিন, সাইনিন, ননিলএলডিহাইড, ক্যারিওফাইলিন, লাইনালোল, আইসোবু্যটিরিক, এসিডের এণ্টার প্রভৃতি।

**দারুচিনি পাতা—ইউজেনল** ৭০-৯৫ ভাগ; বাকী সিনামলডিহাইড, বেনজালডিহাইড, পাইনিন, ফেলানড্রিন, স্যাফ্রল ইত্যাদি।

**লবঙ্গ** (ফুল)—৭৮ থেকে ৯৮ ইউজেনল; বাকী এসিটল ইউজেনল, এলফা ও বিটা ক্যারিও ফাইলিন, বেনজিল আলকোহল, মিথিল ইথিল কার্বিনল, মিথিল হেপ্টিল কার্বিনল, মিথিল ইথিল, মিথিল হেপ্টিল, কিটোন ইত্যাদি।

**ইউক্যালিপটাস** (প্রায় ৩০০ রকমের ইউক্যালিপটাস গাছ আছে, ইউকেলিপটাস তেল নিষ্কাশন করা হয় ৪।৫ রকমের গাছ থেকে।)

**ইউকেলিপটাস অস্ট্রেলিয়ানাঃ**—৭০-৯০ ভাগ সিনিওল; বাকী টাসমানল, পিপারিটোন,

লানড্রিন, পাইনিন; টার্পিনল, জিরানিওল, ট্রোল ইত্যাদি।

**আদা**—জিনজিবেরিন, ক্যাম্ফিন, ফেলান-ন, বোর্নিওল, সিনিঅল, সাইট্রাল, জিনজি-রল, ডেকালডিহাইড, লিনালোল।

**জিঞ্জার গ্রাস্‌** (সোফিয়া রোশা ঘাসের ল)—ডাইহ্রোকুমিক এলকহল, জিরানিওল, র্ভোস, ডাইপেনটিন, লিসোনিন, ফেলানড্রিন ত্যাদি।

**লেমন গ্রাস্‌** (লেবু গন্ধ ঘাসের তেল)—-৮০ ভাগ সাইট্রাল; বাকী এন্‌-ডেকালডি-ইড সিট্রোনেলাল, মিথিল হেপটেনোন, রানিওল, টার্পিনিওল, লিমোনিন, সাইসিন ত্যাদি।

**পামারোজা** (মতিয়া রোশা ঘাসের তেল)—-৯৫ জিরানিওল ও সিট্রোনেলাল, ১২-১৫ গ এসিটিক ও ক্যাপ্রয়িক এসিডের এণ্টার, কী ডাইপেনটিন ইত্যাদি।

**পাইন:** ৫০—৭০ টার্পিওনল, ৫—১০ র্নিওল; বাকী ফেনচিল আলকোহল, মফর, এনিথোল, সিনিওল, ডাইহাইড্রো-র্পিওনল ইত্যাদি।

**গোলাপ**—সিট্রোনেলাল, জিরানিওল, নেরল, র্নেসল, বিটা-ফেনিল ইথিল আলকোহল, রাল, সাইট্রাল, ইউজেনাল ইত্যাদি।

**চন্দন**—৯০—৯৭ সাণ্টালোল; বাকী টিন, সাণ্টিনোন, সাণ্টালোন, সানটেনল, রি-সানটালোল, এলফা ও বিটা-সাণ্টালিন, ণ্টালাল, সানটালিক, টেরি-সানটেলিক, ণ্টালোনিক এসিড ইত্যাদি।

গন্ধ তেলের গন্ধদ্রব্য হিসাবে ছাড়া ঔষধ সাবে ও শিল্পেও ব্যবহার আছে। ঔষধ সাবে যোয়ানের আরক, কর্পূর, দারুচিনি, ঙ্গ, ইউক্যালিপটাস আদা পাইন ও চন্দনের হার সুপরিচিত। সেলুলয়েড প্রস্তুত-লীন, কর্পূর ফেনা দ্বারা খনিজ একত্রী-ণে (ফ্রথ-ফ্লোটেশন) পাইন ও ইউক্যালিপ-স তেল, বার্ণিশ ও বস্ত্রশিল্পে পাইন তেলে ল ব্যবহার হয়।

প্রাণী দেহের বিভিন্ন 'গ্ল্যাণ্ড' নিঃসারিত ও গন্ধদ্রব্যও ঔষধ হিসাবে ব্যবহার হয়। গকস্তুরী ও আবিসিনিয়ার 'সিভেট' ডালের যোনি নিঃসৃত রস 'সিভেট', মূল্য-ন স্বভাবজাত গন্ধদ্রব্য। মার্জিতরুচি অনেকে ভিন্ন কারণে পছন্দ করেন না এগুলিকে, দের জন্য আধুনিক বিজ্ঞানের দান গিক উপায়ে' বা সিনমেটিক উপায়ে তুত গন্ধদ্রব্য আছে।

স্বভাবজাত উদ্ভিদ দেহ হইতে গন্ধ কাশনের এত পদ্ধতি মানুষের জানা ছিল তাজা ও শুষ্ক ফুল, ঘর্ষিত চন্দন, ন সাহায্যে গন্ধধূম সৃষ্টি, সুগন্ধ উপভোগ ার ছিল প্রাচীন প্রথা। গন্ধ তেলের ায়নিক পরিচয়, তাদের অণুতে পরমাণু-সংগঠন এসবও জানা ছিল না। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে এগুলি সম্ভব হইয়াছে। যৌগিক উপায়ে কৃত্রিম গন্ধ তেল প্রস্তুত করিয়া, স্বজাবজাত গন্ধতেল উন্নততর, এবং সর্বসাধারণের ব্যবহার ক্ষমতার মধ্যে আনিয়া দিয়াছে।

এসব পরিবর্তন একদিনে হয় নাই।

সভ্যতার উন্মেষের পরে কতকগুলি আইন ও সমাজ সৃষ্টি করিয়া মানুষ ক্ষান্ত হয় নাই, জীবনে সব ক্ষেত্রে প্রকৃতির উপর নির্ভর-শীলতা নষ্ট করিয়া স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিয়াছে বরাবর। ক্রমাগত চেষ্টার ফলে মানুষের আহরিত জ্ঞান ভাণ্ডার হইয়াছে সমৃদ্ধ; জীবনযাত্রার যন্ত্রপাতি হইয়াছে উন্নততর। প্রকৃতির উপর নির্ভরশীলতা কমিয়াছে অনেকখানি, যদিও পরিপূর্ণভাবে ঘোচে নাই। কিছুদিন আগে পর্যন্ত লোকে কুইনাইন-এর জন্য দক্ষিণ আমেরিকা, রবারের জন্য দক্ষিণ আমেরিকা ও পূর্ব এসিয়া, নীল রং ও সুগন্ধ গন্ধদ্রব্যর জন্য ভারতবর্ষ, চমকানো ঝক্‌ঝকে রুবি পাথরের জন্য ব্রহ্মদেশের উপর নির্ভরশীল ছিল। অস্ট্রেলিয়ার অনুর্বর বিস্তৃত প্রান্তর, রাশিয়ার স্বল্প-গ্রীষ্ম শীতপ্রধান বিস্তৃত অঞ্চলগুলি দেখিয়া মানুষ স্বপ্ন দেখিয়াছে কোন উপায়ে যদি এগুলিতে শস্য উৎপাদন সম্ভব হয়, তবে অন্নকষ্টের সমাধান হইবে অনেকখানি।

এর পর আসিয়াছে নবযুগ। নবযুগের এক ঋষি, জগতের একজন শ্রেষ্ঠ রাসায়নিক 'বার্থেলো' ভবিষ্যদ্‌ বাণী করিয়াছিলেন, "......আমাদের খাদ্যসমস্যা একটি রাসায়নিক সমস্যা। শক্তি সহজলভ্য এবং সস্তা হইলে কার্বনিক এসিডের কার্বন, জলের হাইড্রোজেন, বাতাসের অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন থেকে আমরা সব জিনিস তৈরী করতে পারি।......একদিন আসবে, যখন প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে থাকবে একটি 'নাইট্রোজেন' সমন্বিত ছোট বড়ী, ছোট একটুকরো মাখন বা চর্বিজাতীয় দ্রব্য, একটি ছোট চিনির প্যাকেট, আর একটি ছোট শিশিতে তার রুচিসঙ্গত মশলা নির্যাস। এগুলি তার পুষ্টি আনবে। ঋতু-বৃষ্টি অনাবৃষ্টির উপর নির্ভর করতে হবে না, এগুলির জন্য মানুষ হবে বেশী ভদ্র, তার নৈতিক চরিত্র হবে উন্নততর......কারণ তার জীবন ধারণের জন্য জীবন্ত প্রাণী দেহ ও লক্ষ লক্ষ জীবন্ত কোষের ধ্বংস ও লুণ্ঠনের উপর নির্ভর করতে হবে না।......ধরণী হবে প্রাচুর্যের মাঝে ফুলে ফলে ভরা হাস্যমুখ উল্লসিত নরনারীর অধ্যুষিত ভূমি,......"

বার্থেলোর স্বপ্ন বা ভবিষ্যদ দর্শন সফল হইয়াছে অনেকাংশে।

নবযুগে মানুষ জীবন রহস্যের খানিকটা সন্ধান পাইয়াছে, উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহের পরিবর্তন সাধন খানিকটা এখন তার আয়ত্তের। জড়বস্তুর ও অন্তরহস্যের সন্ধান পাইয়াছে অনেক। উন্নত যন্ত্রপাতি, অত্যুগ্র তাপ উৎপাদনের আকর বৈদ্যুত চুল্লীর আবিষ্কারের সঙ্গে তার নূতন বস্তু উৎপাদনের ক্ষমতা আসিয়াছে। পরিচিত বস্তু ভাঙ্গিয়া তার অন্তর্গঠন অনুসন্ধান সম্ভব হইয়াছে। বিভিন্ন বিষয়ে নবলব্ধ জ্ঞান, উন্নত যন্ত্রপাতি, বৈজ্ঞানিকের অন্তর্দৃষ্টির একত্র সম্মিলন জড়জগতে আনিয়াছে বিপ্লব, আমূল পরিবর্তন।

এখন ইউরোপের তরুণীরা নীল রংএ তাঁদের পোষাক রাঙাইতে ভারতীয় অত্যাচারিত কৃষক কর্ষিত বিস্তৃত শস্যক্ষেত্রের উপর নির্ভরশীল নন। আলকাতরাজাত রাসায়নিক দ্রব্য হইতে তাঁহাদের দেশেই টন টন নীল রং প্রস্তুত হইতেছে; যার সীমানার মধ্যে কোন দিন নীল গাছ জন্মায় নাই। গোলাপের আতর শুধু অলস ভারতীয় জমিদার নন্দনকে দিবাস্বপ্ন দেখায় না, কর্মঠ জনসাধারণ অতি ব্যস্ত সময়ের মাঝেও এখন গোলাপের সুঘ্রাণ অনুভব করিতে পারেন। পাতালভেদী কূপ অস্ট্রেলিয়ার অনুর্বর প্রান্তর করিয়াছে শস্য-শ্যামলা, 'ভানালেইজেসন' পদ্ধতি দ্বারা রাশিয়ার স্বল্পগ্রীষ্ম তুষারপ্রধান অঞ্চলে তুষার-ঝটিকার আগে গম উৎপন্ন হইতেছে রাশি রাশি। অত্যুগ্র তাপ দানক্ষম বিভিন্ন চুল্লীতে ব্রহ্ম দেশ হইতে বহু দূরে রুবি ছাড়া অনেক রকমের মূল্যবান পাথর রাশি রাশি এবং সস্তায় উৎপন্ন হইতেছে।

উদ্ভিদ দেহজাত সুগন্ধ বিভিন্ন সহজ উদ্বায়বীয় রাসায়নিক দ্রব্যগুলি বা গন্ধতেল যৌগিক উপায়েও উৎপন্ন করা সম্ভব। পিয়ার ফলের গন্ধ এমিল এসিটেট; এমিল এলকোহল ও এসেটিক এসিড; আনারসের গন্ধ ইথিল বুটিরেট; ইথিল আলকোহল ও বুটিরিক এসিড থেকে প্রস্তুত করা যায়। এই গন্ধগুলি পাকা ফল হইতে সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। গোলাপ গন্ধের মূল জিরানিওল; মৃগ-কস্তুরী, 'ট্রাই-নাইট্রো-বুটিল-জাইলিন' তাও প্রচুর পরিমাণে যৌগিক উপায়ে প্রস্তুত করা সম্ভব।

সুগন্ধের মৃদুতা বা তীব্রতা ইহাদের অনুসংগঠনে অঙ্গার পরমাণুগুলির স্থান ও পরস্পরের ভিতর 'বন্ধনী'র উপর নির্ভর করে।

স্বভাবজাত ফুলের গন্ধ, অনেকগুলি রাসায়নিক দ্রব্যের একত্র মিলনের ফল। যৌগিক উপায়ে প্রস্তুত গন্ধতেলের, অভিজ্ঞ ও দক্ষ ব্যক্তির দ্বারা মিশ্রণ করিতে পারিলে স্বভাব-জাত সুগন্ধের সুঘ্রাণ পাওয়া যায়। এটা সহজ নহে। সাধারণতঃ স্বভাবজাত সুগন্ধের মধ্যে অধিক পরিমাণে যে রাসায়নিক দ্রব্যগুলি পাওয়া যায়, সেইগুলি একত্র মিশাইলে, সেই-

গুলির ও স্বভাবজাত সুগন্ধের মধ্যে পার্থক্য, অভিজ্ঞ ব্যক্তি ভিন্ন ধরা সম্ভব নয়। বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে স্বভাবজাত গন্ধতেলে আরও অনেক রাসায়নিক পদার্থ আছে। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা এইগুলির অভাব ধরিতে পারেন। স্বভাবজাত গন্ধ তেলের সৌখীন সুগন্ধ এগুলির উপর নির্ভর করে অনেকাংশে।

গন্ধদ্রব্য মিশ্রণ একটি বিশিষ্ট শিল্প ও কলা; সব ক্ষেত্রে যোগ্য জৈব রাসায়নিক উপযুক্ত গন্ধ-শিল্পী নন। গন্ধদ্রব্য নিষ্কাশন ও গন্ধদ্রব্যের রাসায়নিক পরিচয় শিল্পও বিজ্ঞানের অন্তর্গত; উপযুক্তভাবে বিভিন্ন গন্ধ-মিলন, সুকণ্ঠ গায়কের সংগীতের ন্যায় 'আর্ট'। সা রে গা মা একক ধ্বনি কর্ণে বিভিন্ন সুরের অনুভূতি জাগায়, এ গুলির উপযুক্ত মিলনে হয় মনোহরণকারী সংগীত। তেমনি গন্ধবিশিষ্ট একক রাসায়নিক দ্রব্য-গুলির এক একটি বিশিষ্ট গন্ধ আছে। এগুলি সা রে গা মা'র ন্যায় সুঘ্রাণের একক বিশিষ্ট অনুভূতি জাগায়। এগুলির উপযুক্ত মিশ্রণে হয় চিত্তহরণকারী সুগন্ধ। ধ্বনির অযোগ্য সম্মিলনে আনে কর্ণপ্রদাহ, গন্ধের অযোগ্য সম্মিলনে তেমনি আনে নাসিকা প্রদাহ, আকর্ষণের জায়গায় আনে বিকর্ষণ।

রংএ রং নষ্ট করে, তেমনি বিপরীত গন্ধ সংযোগের ফলে সুগন্ধ একবারে নষ্ট হইয়া যায়। অতি উচ্চ সুর যেমন আমাদের ভাল লাগে না, তেমনি অতি উগ্র গন্ধও আমাদের সহ্য হয় না। অনেক উগ্র সুগন্ধ আছে যাহার সুগন্ধ আমাদের ঘ্রাণশক্তি সাময়িকভাবে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে। এগুলি উপযুক্ত দ্রাবকে পাতলা করিয়া আমরা ব্যবহার করি।

ভালো গন্ধ তেলের একটা প্রয়োজনীয় গুণ, গন্ধটা হইবে মৃদু, কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী। এর জন্য গন্ধ তেল সংমিশ্রণ আরও কঠিন হইয়া পড়ে। মিশ্রিত তেলের সব অংশগুলির অংশভাগ বজায় রাখিয়া উদ্বায়বীয় অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া দরকার। 'দ্রুত-উদ্বায়বীয়' অংশ আগে উড়িয়া গেলে, পড়িয়া থাকে 'ধীর-উদ্বায়বীয়' অংশটুকু, এতে মিশ্রণ ও গন্ধের মাধুর্য একেবারে নষ্ট হইয়া যায়।

পূর্বে বলা হইয়াছে, উদ্ভিজ্জ রাসায়নিক পদার্থগুলি গন্ধ তেল (এসেন্সিয়েল অয়েল) বলিয়া রাসায়নিকদের অভিধানে প্রচলিত। আমাদের পরিচিত সুগন্ধ তেল—পূর্বোক্ত গন্ধ তেলগুলি—উপযুক্ত দ্রাবকে দ্রব অবস্থায় নারিকেল, অলিভ, বাদাম প্রভৃতি তেলের সংমিশ্রণ। নারিকেল অলিভ প্রভৃতি তেলের পরিমাণের তুলনায় গন্ধ তেলের পরিমাণ খুব কম থাকে। উদ্ভিজ্জ অন্য তেলের সহিত না মিশিয়া ... দ্রাবকে দ্রব অবস্থায় হয় পরিস্রুত চর্বি, মোম প্রভৃতি বিভিন্ন দ্রব্যের সহিত হয় আমাদের পমেড্, স্নো, ক্রীম প্রভৃতি। সাবানের সহিত মিশিয়া হয় সুগন্ধ সাবান। এই সবগুলি সাধারণভাবে গন্ধ-দ্রব্য বলিয়া হয় পরিচিত। সময় সময় বিশেষ ভাগে মিশ্রিত গন্ধ তেল বিখ্যাত হইয়া পড়ে, সর্বজন প্রিয় হয়। কতকগুলির উপকারিতা থাকে, কতকগুলি বিজ্ঞাপনের জোরে ও পুরাতনের খাতিরে চলে। এই রকম কয়েকটি তেলের ভাগ-পরিমাণ গুপ্তবিদ্যা হিসাবে বিশেষ সাবধানে রক্ষিত হয়। পারিবারিক সম্পত্তির মতন বংশানুক্রমে মিশ্রণ প্রণালী চলিয়া আসে। আমাদের দেশে এই রকম কয়েকটি তেল আছে। বিদেশেও এ রকম 'পারিবারিক গুপ্ত-বিদ্যা বা সম্পত্তির অভাব নাই। সাধারণভাবে সবার প্রিয় 'অডিকোলন' এমনি একটি প্রাচীন রোমক বংশের সম্পত্তি। এ'দের তৈরী 'অডিকোলন' অন্যান্য 'অডিকোলন' অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। কথিত আছে, এই বংশের একজন পূর্বপুরুষ প্রথম 'অডিকোলনে'র ফরমুলো আবিষ্কার করেন। অডিকোলন বিশেষ পরিস্রুত সুরাসারে, অয়েল অফ বার্গামট, ল্যাভেন্ডার অয়েল প্রভৃতি কয়েকটি গন্ধ তেলের মিশ্রণ ফল। বিভিন্ন তেলের উপযুক্ত ভাগ ও পরিমাণ এবং মিশ্রণের ফলে কিছুদিন রাখিয়া দেওয়া, এই কয়েকটির উপর অডিকোলনের উৎকর্ষতা নির্ভর করে।

যৌগিক উপায়ে প্রস্তুত, আলকাতরাজাত বিভিন্ন গন্ধ তেল দামে সস্তা হইলেও প্রকৃতি-জাত গন্ধ তেলের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। কারণ স্বভাবজাত প্রিয় গন্ধতেলের, বিভিন্ন একক গন্ধ তেলের ভাগ অনুযায়ী, কৃত্রিমভাবে তৈরী গন্ধ তেল মিশ্রিত করা সহজসাধ্য নয়। তার জন্য স্বভাবজাত গন্ধ তেলের চাহিদা বিত্তশালী সৌখীন লোকের মধ্যে এখনও প্রবল আছে। অনেক স্থলে, কৃত্রিম গন্ধ তেল স্বভাবজাত গন্ধ তেলকে উৎকৃষ্টতর করিতে সাহায্য করে। স্বভাবজাত গোলাপের গন্ধ তেলের অনেক সৌখীন গন্ধ প্রস্তুতকালীন নষ্ট হইয়া যায়, কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত গন্ধ তেল দ্বারা নষ্ট হইয়া যাওয়া এই গন্ধ তেলগুলি পরিপূরণ করা যায়। ফলে মিশ্রিত গোলাপ তেল 'সৌখীনতর' ও 'উৎকৃষ্টতর' হয়।

আমাদের ঘ্রাণশক্তি দ্রব্য পরিচয় লাভের একটি প্রধান সহায়। অনেক স্থানে বর্ণ বিশ্লেষণ যন্ত্র অপেক্ষা কার্যকরী। বন্য মানুষের শিকার সন্ধানেও ঘ্রাণশক্তি বা গন্ধানুভূতি অনেক সাহায্য করিয়াছে। অন্য জীবদের সম্বন্ধে এ কথা খাটে। গন্ধানুভূতির জোরে হরিণ শিকারীর সন্ধান পায়। শিকারী কুকুর শিকারের পিছনে ছোটে। এক মিলিগ্রাম ওজনের ২০ লক্ষ ভাগের এক ভাগ গোলাপের গন্ধ আমরা বুঝিতে পারি। আরও কম পরি-মাণের দুর্গন্ধ 'মার্কাপটান' গ্যাস সহজে বোধগম্য হয়। আমাদের দর্শন-শক্তি দ্বারা 'ইথরের' স্পন্দন বুঝিতে পারি, শ্রবণ-শক্তি দ্বারা বুঝি বায়ু তরঙ্গের আলোড়ন ভঙ্গিমা। এগুলির শক্তি সীমাবদ্ধ, ঘ্রাণশক্তির সীমা এর চাইতে বেশী। অনেক ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ বর্ণ বিশ্লেষক যন্ত্রকেও হার মানায়। ঘ্রাণশক্তির সাহায্যে আধুনিক যুগের রাসায়নিকগণ দ্রব্য পরিচয় লাভ করেন। মোটামুটি ফলের গন্ধে 'এ্যালিফেটিক' ফুলের গন্ধের, অঙ্গার পরমাণুর মধ্যে এক বা একাধিক 'ডবল লিংকেজ' বা 'ডবল-বন্ধনী'র অস্তিত্ব; উগ্র গন্ধে ৬টি অঙ্গার পরমাণুর, তিনটি 'ডবল-বন্ধনী'র মৃদু ফুলগন্ধে '৬টি ডবল বন্ধনী'হীন অঙ্গার পরমাণুর অস্তিত্ব রাসায়নিকগণ আন্দাজ করেন।

সাহিত্য প্রসঙ্গ

# চলতি বাংলা সাহিত্য

নারায়ণ চৌধুরী

এই রকম একটি আক্ষেপ মাঝে মাঝে শোনা যায় যে, আধুনিক বাঙলা হিত্যে প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তিত্বময় সত্যিকার তিভাশালী লেখকের অভাব ঘটেছে। অবশ্য, খকের সংখ্যা অগুণতি—খ্যাত-অখ্যাত, তন-পুরাতন প্রবীণ ও অপ্রবীণে মিলে থক সম্প্রদায়ের সে এক মিছিল। কিন্তু কলেই তাঁরা মাঝারী। প্রতিভা আছে, কিন্তু তিভার চোখ-ধাঁধানো দ্যুতি তাঁদের লেখায় নুপস্থিত। তাঁরা গৌরবান্বিত, কিন্তু হিমান্বিত নন।

আক্ষেপটি সত্য। তবে এতে সংকুচিত ওয়ার কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। কথা খুবই অকাট্য যে, আজকের দিনের ঙলা সাহিত্যে কোন একজন বিশেষ াহিত্যিক সাহিত্য-সম্রাটের আসনে অধিষ্ঠিত াই। সাহিত্য-সম্রাটের আসন ও মর্যাদা কলে নিজেদের মধ্যে প্রায় সমানভাবে ভাগ 'রে নিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের অভ্রভেদী রাটত্ব, শরৎচন্দ্রের দুর্লঙ্ঘ্য শিল্পকুশলতা, থবা প্রমথ চৌধুরীর আশ্চর্যজনোচিত হিমা—এর কোনটারই আজ আর বাঙলা াহিত্যে দেখা মিলবে না। কিন্তু এতে ব্রত বোধ করবার কারণ দেখি না। সাহিত্যের র্বাঙ্গীণ উদ্যম ঠিকই আছে; শুধু উদ্যম হুধা-বিভক্ত হ'য়ে গেছে। একক প্রতিভার াখ-ঝলসানো ঔজ্জ্বল্য হয়তো নাই; কিন্তু হু ক্ষুদ্রতর প্রতিভার সাধারণ উত্তাপ ও ালোতে তার ক্ষতিপূরণ হয়েছে।

আসল কথা, বাঙলা সাহিত্যে সত্যিকার ণতান্ত্রিক পর্বের সূচনা হয়েছে। রচনায় মন গণতার জয়ধ্বনি, তেমনি রচয়িতাদের ্যক্তিত্বের মধ্যেও গণতার প্রতিফলন। আধুনিক াঙলা সাহিত্যের অনুশীলনে যাঁরা নিযুক্ত াছেন, সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁদের তিয়ান যদি আমরা নিই, তাহ'লে দেখ্‌বো— াঁদের মধ্যে প্রায় সকলেই মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে াহৃত। না, 'মধ্যবিত্ত' বলা ঠিক হ'লো না। লা উচিত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে তাঁরা াসেছেন। আভিজাত্য, বংশগত কৌলীন্য বং সামাজিক পদমর্যাদা ও প্রতিপত্তি আর য বাজারেই চড়াদরে বিকোক, সাহিত্যের াজারে ঠিক চড়াদরে বিকোচ্ছে না। সেখানে াধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষেরাই আসর াঁকিয়ে রেখেছেন। সাহিত্য-আন্দোলনের ঢেউয়ের চূড়ায় এখনও হয়তো দু'একটি আভিজাত্যের ঝিকিমিকি চোখে পড়ে। কিন্তু এ ঝিকিমিকি বুদ্‌বুদের; বুদ্‌বুদের মতোই তা ক্ষীণায়ু। পদমর্যাদা ভারাক্রান্ত যে ক'জন 'অভিজাত' সাহিত্যিক আজও বাঙলা সাহিত্যের সঙ্গে যোগ রেখে চলেছেন, তাঁদের সৃষ্টিক্ষমতা অস্বীকার না ক'রেও বলা যায়, তাঁরা কেউ আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের প্রতিনিধি নন। আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের ধ্যান-ধারণা আদর্শের সঙ্গে তাঁদের রচনার মানসিক ঐক্য নাই। বোধ করি আধুনিক গোষ্ঠীর লেখকদের প্রতি তাঁদের সহানুভূতিও নাই।

নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ধারার সঙ্গে যাঁরা অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত, তাঁরা সকলেই জানেন কী কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাঁদের দিন থেকে দিনে বেঁচে থাক্‌তে হচ্ছে। নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাহিত্যিক এই প্রাণান্তকর জীবন-সংগ্রামকে স্বীকার ক'রেও তাঁর সাহিত্য-প্রীতিকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে। সাহিত্যকে সে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে—কোন্ বাল্যকালে বিচিত্র কার্যকারণ-যোগে তার মধ্যে আন্তরিক সাহিত্য-প্রীতি সঞ্চারিত হয়েছিল; সে চাক বা না চাক, সেই নিয়তিকে তার আজীবন ব'য়ে বেড়াতে হচ্ছে। হয়তো আজীবন ব'য়ে বেড়াতে হবেও। কঠোর জীবন-সংগ্রামে তার বাইরের খোলসটার উপর যতোই পোড় বা দাগ ধরুক, তাব সাহিত্য-প্রীতিকে তা মলিন করতে পারে নি।

বাঙলা দেশের অল্পবিত্ত, সাধারণ ভদ্রঘরের সন্তান এ'রা—এ'দের কারও পিতা শিক্ষক, কারও পিতা কেরাণী, কারও উকীল, কারও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। বাল্যকালে এদের জীবন মোটামুটি অনভাবের মধ্যেই কেটেছে। স্বচ্ছলতার আস্বাদন হয়তো বিশেষ পায় নি, কিন্তু অর্থকৃচ্ছ্রতাও ভোগ করে নি। আর সংসারে অর্থকৃচ্ছ্রতা থাক্‌লেও তা বোঝ্‌বার মতো জ্ঞানবুদ্ধি বাল্য বা কৈশোরে কদাচিৎ আশা করা যায়। সুতরাং এ'দের বাল্য এক রকম নিরুপদ্রব আনন্দের মধ্য দিয়েই কেটেছে। এই নিষ্কলুষ আনন্দের আবহাওয়ায় বড় হ'তে হ'তে তারা পড়েছে বঙ্কিম-রবীন্দ্র ও শরৎ-সাহিত্য; পড়েছে অন্যান্য দেশের সৎ-সাহিত্য; পরম-আত্মীয় জ্ঞানে ভালোবেসেছে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রকে—এ'দের পরিণত চিন্তাধারার সঙ্গে নিজেদের অপরিণত চিন্তা-ধারাকে মিশিয়ে দিয়ে অনুভব করেছে নিজ জীবনে বৃহতের সাযুজ্য; সাহিত্যাচার্যদের জীবনের ছাঁচে নিজ জীবন গড়ে তোল্‌বার সাগ্রহ প্রচেষ্টার মধ্যে পেয়েছে এক পরম পরিতৃপ্তির অনুভূতি। এই অনুভূতি তাদের সত্তার সঙ্গে মিশিয়ে গেছে—যতোই তাদের বয়স হোক্, তার হাত থেকে তারা পরিত্রাণ পাবে তাদের সাধ্য কী?

আরও যখন বয়েস হ'লো, তারা ঠেকে শিখ্‌লো, জীবন-সংগ্রাম বড়ো কঠোর, কঠোর শুধু নয়, অলঙ্ঘনীয়। বর্তমান সমাজে নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের পক্ষে টিকে থাকাটাই একটা সমস্যা। আরও যে সব সমস্যা আছে, সেগুলির সমাধান তো পরের কথা। সাহিত্য-সেবা ক'রে দেশের লোককে আনন্দ দেবো, নিজে আনন্দ পাবো—খুব ভালো কথা। কিন্তু আগে বাঁচলে তবে তো সাহিত্য। নিজেকেই যদি বিনাশের হাত থেকে রক্ষা করতে না পারলুম, সাহিত্যকে রক্ষা করবো কী ক'রে? এই যে দুশ্চিন্তাপীড়িত মনোভাব, এটা অধিকাংশ সাহিত্যিককেই অন্তরে অহরহঃ ব'য়ে বেড়াতে হচ্ছে। কল্পনা ও বাস্তবের অসঙ্গতির মধ্যে যে গভীর হতাশা লুকিয়ে রয়েছে, তা তাদের প্রতিনিয়ত পীড়ন করছে। পীড়াটা মূলত মনস্তাত্ত্বিক; সুতরাং তার ক্রিয়া দৃশ্য নয়। বহিঃপ্রকাশ সামান্যই চোখে পড়ে। কিন্তু এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই যে, এই অগোচর ব্যাধি ভিতরে ভিতরে তাদের অন্তরকে কুরে কুরে খাচ্ছে। সুগভীর আশাভঙ্গজনিত মনস্তাপ ক্রমে ক্রমে তাদেরকে এই সিদ্ধান্তের দিকেই ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে যে, আজকের দিনে বাঙলা দেশের মানুষের পক্ষে সাহিত্য-প্রীতি নিয়ে বড়ো হওয়াটা আশীর্বাদ নয়, অভিশাপ এই অভিশাপ-চেতনা তাদের সাহিত্যিক জীবন দর্শনে, অস্পষ্টভাবে হলেও প্রতিফলিত।

তবু সাহিত্য-সাধনা তারা পরিহার করে নাই। বরং আধুনিক বাঙলা সাহিত্যকে তারা ধ'রে রেখেছে। তারাই আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের যথার্থ প্রতিনিধি। বাস্তব জীবনে বৈষম্য, ব্যর্থতা ও হতাশার পীড়নে জর্জরিত হ'য়েও তারা স্বপ্ন-সাধনাকে ত্যাগ করে নাই বাল্যের সুখস্বর্গ থেকে হয়তো তারা স্খলিত হ'য়ে পড়েছে, কিন্তু তাই ব'লে স্বর্গে পুন প্রবেশের পথ খুঁজে বেড়াবার চেষ্টা তা বিসর্জন দেয় নাই।

" এই চেষ্টারই ফল আধুনিক বাঙলা সাহিত্য। আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের বিরাট সৌরত উত্তুঙ্গ হ'য়ে উঠেছে, এই সব স্বপ্ন-সন্ধানী সাধারণ মানুষের একাগ্র সাধনার ভিত্তির উপর। একটি একটি ক'রে ইট গেঁথে তারা এই প্রকাণ্ড সৌধের বুনিয়াদ দাঁড় করিয়েছে। রাজমিস্ত্রী হয়তো তারা কেউ নয়, কিন্তু অগণন সাধারণ মিস্ত্রীর সম্মিলিত কৃতিত্বটাই বা কম কিসে? তা'ও চোখ মেলে দেখবার মতো নিশ্চয়ই।

কেন আজকের দিনের বাঙলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ কিম্বা বঙ্কিমচন্দ্রের মতো বিরাট প্রতিভাধর সাহিত্যিকের আবির্ভাব সম্ভব নয়, তা উপরের কথাগুলি অনুধাবন করলেই বোঝা যাবে। আধুনিক সাহিত্যসেবীদের সমাজ-তাত্ত্বিক পটভূমিই তাদের সাধারণ প্রতিভার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ক'রে রেখেছে। এই নিয়তিকে অতিক্রম করবার সাধ্য তাদের নাই। প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছতা গ্লানি, অপমান রূঢ়তা ও কুশ্রীতার দ্বারা যাদের মন ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছে, তারা যে আজও সাহিত্য-সাধনাকে আঁকড়ে রয়েছে, সেইটেই তো পরমাশ্চর্য বিশেষ। এর পর তাঁদের মধ্য থেকে রবীন্দ্রনাথ কিম্বা শরৎচন্দ্রের মতো প্রতিভার অভ্যুদয় হচ্ছে না ব'লে যদি আক্ষেপ করা যায়, সে আক্ষেপ কি পরিহাসের মতোই শোনায় না?

অবশ্য, শরৎচন্দ্র নিজেও নিম্ন-মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে এসেছিলেন। কিন্তু বলা দরকার, তাঁর সময়ে জীবন-সংগ্রাম এতো কঠোর ছিলো না। অন্ন-বস্ত্র সংস্থানের জন্যে যে প্রাত্যহিক সংগ্রাম সেইটেই তো সংগ্রামের একমাত্র চেহারা নয়। সে সংগ্রামের কতটুকু? আজকের দিনের জীবন-সংগ্রামের কঠোরতা তার চাইতেও সহস্রগুণে ব্যাপক ও আত্মক্ষয়কারী। শুধু আহার-বস্ত্র-বাসস্থানের সমস্যা সমাধানেই যদি হাঙ্গামা চুকে যেতো, তা হ'লে আর কথা ছিলো না। কিন্তু বর্তমান দিনের সংগ্রাম বহুমুখী এবং তার প্রত্যেকটি মুখই সমান সূচ্যগ্র। বেঁচে থাকার প্রাণান্তকর প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিনিয়ত লড়তে হচ্ছে মূঢ়তার সঙ্গে, হৃদয়হীনতার সঙ্গে, সমাজের চতুর্দিকে পরিদৃশ্যমান পর্বতপ্রমাণ দুর্নীতি ও অজ্ঞতার সঙ্গে। সমবেদনা নাই, প্রীতি নাই, সৌজন্য নাই, আত্মীয়তা ও সৌভ্রাত্র সমাজদেহ থেকে অন্তর্হিত—সবই এক অখণ্ড ও নীরন্ধ্র স্বার্থ-পরতার মধ্যে মিশে লীন হয়ে গেছে। অথচ এরই বিরুদ্ধে যুঝে টিকে থাকবার প্রয়াস করতে হচ্ছে। এ যে কী প্রাণঘাতী প্রয়াস, তীব্র সুখ-দুঃখবোধযুক্ত, অনুভূতিপরায়ণ মানুষমাত্রই তা জানে। দেহের মারের চাইতেও মনের মার সাংঘাতিক মার। স্নায়ু-যুদ্ধেই ঘায়েল হয় মানুষ বেশি। কাজেই এই সংগ্রামের ভারে ভেঙে না পড়াটাই আশ্চর্য। এর মধ্য থেকেও যাঁরা সাহিত্য-সাধনা করবার মতো মনে উদ্বৃত্ত, উদ্যম ও উৎসাহ খুঁজে পান, তাঁদের প্রচেষ্টাকে শ্রদ্ধা না জানিয়ে পারা যায় না। বিরাট প্রতিভার ছাপ হয়তো এ'দের কারও রচনাতেই চোখে পড়ে না, কিন্তু যেটা চোখে পড়ে, তা যে সম্ভাবিত বিরাট প্রতিভারই জ্বলে-পুড়ে-ক্ষ'য়ে-যাওয়া চুপসানো রূপ, তা কে অস্বীকার করবে?

কিন্তু তাই ব'লে বিরাট প্রতিভার জ্বলে-যাওয়া অঙ্গার তারা নয়। প্রত্যেকেরই একটা স্বাতন্ত্র্য আছে। সে স্বাতন্ত্র্য বড়ো মানের না হ'তে পারে; কিন্তু এই সর্বব্যাপী গণতান্ত্রিক যুগে মাঝারি বহরটাও কম বিস্ময় উদ্রেক করে না। সম্প্রতি বাঙলায় এমন সব ছোট গল্প বেরোচ্ছে, যা প'ড়ে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। নিতান্তই সাদামাঠা জীবনযাপনে অভ্যস্ত, (হয়তো) সাধারণ শিক্ষিত এই সব সাধারণ ঘরের লেখক-লেখিকারা এমন চমৎকার গল্প লিখতে শিখলেন কোথা থেকে? ভাষায় জড়িমা নাই, বক্তব্য স্পষ্ট ও সরল, অনুভূতি গভীর, সর্বোপরি, রচনার আঙ্গিকের উপর কী অসম্ভব দখল। সুবোধ ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সন্তোষ ঘোষ প্রভৃতির কথা ধরছি না। এ'দের সকলেই প্রতিষ্ঠিত লেখক—এ'দের কুশলতা বিতর্কাতীত। কিন্তু নিতান্ত তরুণ বয়সী অখ্যাত লেখকদের হাত থেকেও এমন সব লেখা বেরিয়ে আসছে, যা প'ড়ে সত্যই বাঙলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ভেবে আশান্বিত হ'য়ে উঠতে হয়। এই তো সেদিন একটি সাহিত্য-সঙ্কলন গ্রন্থে জনৈক অজ্ঞাতনামা লেখকের একটি গল্প পড়লুম। গল্পটির নাম "নীলকণ্ঠ।" লেখকের রচনা ইতিপূর্বে আর কখনও প'ড়েছি ব'লে মনে পড়ে না। হয়তো এইটিই তাঁর মুদ্রিত অক্ষরে প্রথম প্রকাশিত রচনা। কিন্তু কী সুন্দর হাত লেখার। আর মনটিও কী সংবেদনশীল। এমন লেখনী যাঁর হাতে, এমন অনুভূতি যাঁর মনে, তাঁর সাহিত্যিক ভবিষ্যৎ আগে থেকেই একরকম ছ'কে ব'লে দেওয়া যায়। কিন্তু বলেছি তো, আধুনিক বাঙালী সাহিত্যিকের অগ্রগতির পথে পদে পদে বিপত্তি। তাকে শুধু সাহিত্যের কথা ভাবলেই চলে না, জীবন-যুদ্ধের কথাও ভাবতে হয়। আর সে জীবন-যুদ্ধও এমন যে, তাকে ভিতরে বাইরে তছনছ ক'রে ছাড়ে। এই প্রাণান্তকর জীবন-যুদ্ধে অহরহঃ নিয়োজিত থেকেও যারা সাহিত্যানুশীলনের সময় পান তাঁরাই শেষ পর্যন্ত টিকে থাকেন; অপেক্ষাকৃত দুর্বলচিত্তরা আস্তে আস্তে ঝ'রে প'ড়ে আত্ম-অবলুপ্তির বিবরে মুখ লুকোন।

মাসিকে, সাপ্তাহিকে সাময়িক সংকলনে এই ধরণের উৎকৃষ্ট লেখা আরও অনেক বেরোয়। শুধু পড়বার অবকাশের অভাবেই হয়তো তারা চোখ এড়িয়ে যায়। যেগুলি বা চোখে পড়ে তাদের সম্পর্কেও আলোচনা হয় সামান্যই। অপরিচিত লেখকের লেখা নিয়ে আলোচনা করতে আমাদের সমালোচকরা উৎসাহ পান না। কিন্তু আলোচনা হওয়া উচিত। আর কিছুর জন্যে না হোক, বাঙলা ভাষা যে গড়পড়তা সাধারণ শ্রেণীর লেখকের কলমেও কতদূর পরিমার্জনা ও ঔজ্জ্বল্য লাভ করেছে, সেইটে বোঝাবার জন্যেও, সাধারণ পাঠকের সহিত অজ্ঞাত-পরিচয় নূতন লেখকদের রচনার পরিচয় ঘটিয়ে দেওয়া উচিত। সুনির্দিষ্ট স্বল্প-পরিসর সময়ের মধ্যে বাঙলা ভাষার এতদূর শ্রীবৃদ্ধি ইতিপূর্বে আর সংঘটিত হয় নাই।

কাজেই বাঙলা সাহিত্য বড়ো বহরের প্রতিভার অভ্যুদয় হচ্ছে না ব'লে যাঁরা আক্ষেপ প্রকাশ করেন, তাঁদের মনোভাবের সার্থকতা আমি বুঝি না। প্রথম কথা, বড়ো বহরের প্রতিভার অভ্যুদয় আজকের দিনে আর সম্ভব নয়, সামাজিক কারণেই সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, এতে সাহিত্যের যে ক্ষতি হচ্ছে, সে ক্ষতি পুষিয়ে গেছে আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের গণতান্ত্রিকীকরণে। একজনের ভালো অনেকের মধ্যে ছড়িয়ে গেছে। একটি আধারে বিরাটত্ব আর সংহত নাই; তার ক্রিয়া আজ সকলের মধ্যে। এ দুটি অবস্থার মধ্যে কোন্‌টি ভালো সে বিচারের ভার পাঠকদের হাতে ছেড়ে দিয়ে আজকের মতো এখানেই শেষ বিদায় নিচ্ছি।

# জাহ্নবীর প্রতীক্ষা

শ্রী পঙ্কজভূষণ সেন

গ্রীষ্মের মধ্যাহ্ন। ধূলো আর ঝ'ড়ো বাতাসের দাপটে পৃথিবী ম্রিয়মান। ঘাটে জনপ্রাণীর চিহ্ন নাই। সাঁইথিয়ার র রাস্তাটি রৌদ্রদগ্ধ অনুর্বর মাঠের দিয়া ধরিত্রীর সিঁথির মতন চলিয়া গিয়াছে ম দিক্‌চক্রবালের দিকে। রাস্তার রূপালি । উড়িয়া চলিয়াছে বাতাসের আগে, ঘন বটগাছের শীর্ষচূড়াও আজ ধূলার ন খেলায় ধূসর হইয়া উঠিয়াছে। রাস্তার সীমায় ময়ূরাক্ষী নদীর শীর্ণ চিকচিকে । চঞ্চল ঘুমন্ত শিশুর মতো বালির কোল । করিয়া পড়িয়া আছে।

বাতাসের মতো হীরালালের মনটাও আজ হু করিয়া উঠে। কান্দী সহরে আজ ছিল বার, এক ঝুড়ি পাটের শাক বিক্রয় করিয়া ফিরিতেছে হীরালাল—দাসনগর এখনও ঘণ্টার রাস্তা। প্রতি হাটবারের মতো আজও ঠ ও হাঁটুতে গামছা বাঁধিয়া হীরালাল গয এক গ্রাম্য ভঙ্গীতে আয়েস করিতেছে বটের ছায়ায়। দিগন্তের গায়ে কালচে হর সারির মধ্যে লুকাইয়া আছে তাহার ঘর। রালালের পিঙ্গল চক্ষু দুইটি ঘোলাটে য়ার ভিতর দিয়া দাসনগর গ্রামের দিকে দ্ধ হয়—ঠিক এটাইত হীরালালের গ্রাম—কানু মণ্ডলের নূতন টিনের কোঠায় রৌদ্র ঠিকরাইয়া পড়িতেছে।

হীরালাল ফতুয়ার পকেটে হাত ঢুকাইয়া দিল, হাতে ঠেকিল কাগজের ভারি পুরিয়া একটি—চীনা সিঁদুর। গৃহিণীর ফরমাসী জিনিস—চিন্তামণির সীমন্তের শোভা বর্ধন করিবে সিঁদুরটা। সিঁদুরের পরিপুষ্টতার সহিত যদি কিছুমাত্র সহযোগিতা থাকিত চিন্তামণির পতিপ্রেমের। বাপ মায়ের একমাত্র পুত্র হীরালাল। বিবাহের একমাসের মধ্যেই মা ও বাবার মৃত্যু হইল, বাপের ঋণ পরিশোধ করিতে গেল পৈত্রিক এক বিঘা জমি। পাড়ার লোকেরা বলিয়া বেড়াইল, "আচ্ছা অপয়া বউ!"

শুধু অপয়া হইলে ক্ষতি ছিল না। চিন্তামণি প্রাণ খুলিয়া হীরালালকে ভালবাসিয়াছে কি না তাহা হীরালাল আজও ঠিক করিয়া বুঝিতে পারে না। চিন্তামণি অবশ্য নির্বিকার চিত্তে হীরালালের 'ভাতজল' করিয়াছে, রোগ হইলে রাত্রি জাগিয়া সেবা করিয়াছে—ওদিক দিয়া এতটুকুও হয়ত অভিযোগ নাই হীরালালের। কিন্তু অভিরামের স্ত্রী জাহ্নবীর মতো না জানে হিল্লোলিত হাস্যের ভঙ্গি না জানে তাহার মতো মিষ্টি করিয়া কথা বলিতে।

জাহ্নবী!

জাহ্নবী হীরালালের গ্রামেরই মেয়ে। এখন তাহার বিবাহ হইয়াছে এই সাঁইথিয়া রাস্তার দক্ষিণ দিকে যে পথটা সোজা উত্তরদিকে চলিয়া গিয়াছে তাহার শেষ প্রান্তে ছোট্ট গ্রামে—রাজাপুরে। বয়সের সহিত মানুষ কত বদলাইয়া যায় কিন্তু জাহ্নবী যেমন ছোটখাটো মানুষ ছিল আজও ঠিক তেমনি আছে। অথচ চিন্তামণি যেন দিন দিন শুকাইয়া যাইতেছে—সে মাসে কয়বার হাসে হাত গুণিয়া বলিয়া দিতে পারে হীরালাল।

একটা হন্যে কুকুর ময়ূরাক্ষীর জলে ডুবিয়া আসিয়া হীরালালের একটু দূরে বসিয়া হা হা করিয়া দম লইতে থাকে। হীরালালের চিন্তার জাল ছিঁড়িয়া গেল কুকুরটার দিকে চাহিয়া, বলে—"কি রে?"

কুকুরটা একবার মাত্র হীরালালের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল, মনের ভাবখানা—কি আবার! তুমি আপনার মনে বসে আছ বসে থাক!

বাতাস নহে যেন আগুনের ঝাপ্‌টা! হীরালালের তৈলহীন হাতপায়ের প্রতি রেখাটি খড়ি দেওয়া দাগের মতো স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। বটগাছের স্নিগ্ধ ছায়ার স্পর্শে ঘুমের আমেজে

শরীর শিথিল হইয়া আসে, একটু ঘুমাইয়া লইলে কেমন হয়? বাড়িতে ত সেই কলের পুতুল চিন্তামণি!

কুকুরটা হঠাৎ উঠিয়া গা-ঝাড়া দেয়। হীরালালের গায়ে ছিটকাইয়া পড়ে উৎক্ষিপ্ত ধুলোবালি।

"দূর্......দূর্......পালা—" হীরালাল ধমক দেয়।

এক কাতে বেঁকিয়া কুকুরটা দৌড় দিল ময়ূরাক্ষীর ঘাটের দিকে, ক'জন মুড়ি খাইতে বসিয়াছে জলের ধারে—ব্যাস্, ঐত সাদর নিমন্ত্রণ!

জাহ্নবী চপল কটাক্ষ হানিয়া বলিয়াছিল—"একদিন যেয়ো ক্যানে আমাদের বাড়িকে।"

"যাব একদিন।"

"যাব যাবই কচ্ছ, বউয়ের আচল ছেড়ে যেতে পারবা আদৌ?"

চিন্তামণি মোটা মোটা চোখ দিয়া চাহিয়াছিল জাহ্নবী আর হীরালালের দিকে কিন্তু দৃষ্টিতে ছিল চাপা ঝড়ের সঙ্কেত। চতুরা জাহ্নবী পরমুহূর্তে অন্য মানুষ—চিন্তামণিকে খুশি করিতে বলে—"দিদিকে শাড়ীর পাড়টায় যা মানাইচে!"

অথচ হীরালাল অমন আমন্ত্রণের পরও কথা রাখে নাই! ইচ্ছা করিলে হীরালাল আজইত যাইতে পারে জাহ্নবীর কাছে, রাজাপুরে।

হীরালাল গামছা খুলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। খালি ঝুড়িটা উঠাইয়া লইয়া হাঁটা দিল পশ্চিম দিকে পায়ের নীচে রৌদ্রদগ্ধ উত্তপ্ত ধুলা-কণিকা আর শিরায় শিরায় কামনা-তপ্ত রক্তস্রোত।

এই রাজাপুরের পথ—কতদিনের না দেখা জাহ্নবী। হীরালাল দক্ষিণদিকের পথ ধরিয়া হন্‌হন করিয়া আগাইয়া চলিল আখের ক্ষেত আর তুঁত ঝোঁপের পাশ দিয়া—জাহ্নবীর দুর্দমনীয় হাতছানির টানে।

রাজাপুর গ্রামের বাহিরে দিঘি—দিঘির ধারেই জাহ্নবীর সহিত হীরালালের দেখা হইয়া গেল অপ্রত্যাশিতভাবে। জাহ্নবী টোকায় করিয়া চাল ধুইয়া লইয়া যাইতেছিল, অর্জুন গাছের ছায়ার নীচে দুজনে দাঁড়াইয়া গেল।

"তার পর?" হীরালাল ঝুড়িটি গাছের গায়ে রাখিয়া প্রশ্ন করে।

জাহ্নবী নিরুত্তর, পায়ের বুড়া আঙ্গুল দিয়া নক্সা কাটিতে থাকে গরম ধুলোর উপর—লজ্জায় রঙ্গীন আর কুন্ঠায় সঙ্কুচিত।

জাহ্নবীর আর এক না দেখা রূপ—হীরালাল রৌদ্রদগ্ধ পৃথিবীর উপর দাঁড়াইয়াও যেন দেখিতে পায় ক্ষান্ত বরষার অপরূপ স্নিগ্ধ শোভা।

জাহ্নবী আর চিন্তামণি—আকাশ আর পাতাল।

"জাহ্নবী?" হীরালাল ডাক দেয়।

নিবদ্ধ করে—এখন আবার অন্য মূর্তি, এক-বিন্দুও রক্ত নাই চোখেমুখে—উদ্ধত দৃষ্টি।—"তুমি এই ঝলাসে?" জাহ্নবী পুনরায় মাটিতে দৃষ্টি মিশাইয়া প্রশ্ন করে।

"তুমিই ত আসতে বলেছিলে, আমি যেচে আসি নাই" হীরালাল মুখ কালো করিয়া উত্তর দেয়।

জাহ্নবী শঙ্কিতভাবে চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলে, "আমি কবে কি বলেছি তাই মনে করে থুয়েচ।" তাহার পর গাছের গায়ে ঠেকানো ঝুড়িটা লক্ষ্য করিয়া বলে—"তাই হাট থেকেই চলে আইছ রাজাপুরে? না বাপু তুমি বাড়ি চলে যাও, চিন্তামণি হয়ত ভাবছে খুব—।"

হীরালালের আর কিছুই বলিবার নাই। তড়িৎগতিতে ঝুড়িটা উঠাইয়া লইয়া বলে "বেশ তাই যেছি! ভয় নাই, তোর বাড়িতে পাত পাততে আসি নাই! আর চিন্তামণি যদি আমার লেগে অত ভাববার লোক হ'ত তাহলে এই ছাতিফাটা রোদে কি আর তোর কাছে ছুটে আসতাম জাহ্নবী!"

"শোন।" জাহ্নবী ছোট্ট করিয়া ডাক দেয়।

"থাক।" হীরালালের সংশয়হীন দৃঢ় উত্তর। হীরালাল হন হন করিয়া আগাইয়া চলিল, ছাতিফাটা রৌদ্র ও ঝড়ের মধ্য দিয়া একবারও ফিরিয়া দেখিল না জাহ্নবীর দিকে। জাহ্নবী পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখে হীরালালের অপসৃয়মান মূর্তিটা উত্তপ্ত ঝড়ের মধ্যে মিলাইয়া গেল বহুদূরে।

জাহ্নবীর কয়েক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু গরম ধুলায় পড়িয়া মুহূর্তের জন্য সৃষ্টি করে কাল কাল বিন্দু, পরক্ষণেই নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় প্রখর সূর্যতেজে।

* * *

রুগ্ন অভিরাম জাহ্নবীকে চালের টোকা হাতে ফিরিতে দেখিয়াই মিনতি করে—"আজ আমাকে চাট্টি ভাত দিবি জাহ্নবী?"

"দেব।" জাহ্নবী ভারি গলায় উত্তর দেয়।

"সত্যি?" অভিরামের প্রত্যয় হয় না। কয়েকমাস ধরিয়া ভুগিতেছে। শহরের বড় ডাক্তার জাহ্নবীকে একান্তে বলিয়া গিয়াছে—বৃথা চেষ্টা, কাশির সঙ্গে রক্ত ওঠে, ঘুসঘুসে জ্বর, বিকালের দিকে জ্বরটা হয় বেশী, শরীরের হাড় ক'খানা গোনা যায় অক্লেশে। পরপারের সমন রীতিমতভাবেই জারী হইয়াছে —এখন শুধু হাজির হওয়া! সাধু আর সাধু! আর পারে না অভিরাম।

"সত্যি?" অভিরাম আর একবার জিজ্ঞাসা করিয়া লয়।

"হ্যাঁ......হ্যাঁ......সত্যি! খেয়ে দেয়ে ঝট্ করে বিদেয় হ' দেখি—তুইও বাঁচিস আমিও বাঁচি!" জাহ্নবী ঝাঁজের সঙ্গে বলে। তার পর জিজ্ঞাসা করে "বল কি রাঁধবো?"

ছেঁচ্‌কি আর কাঁচা আমের অম্বল।" কতদিন খায় নাই! রুগ্ন অভিরামের বিশুষ্ক মুখ সরস হইয়া উঠে।

"বেশ তাই রান্দ্‌চি'।" জাহ্নবী অভিরামের ফরমাস অনুযায়ী রাঁধিতে বসিয়া গেল—ভাত আলু ছেঁচকি আর আমের অম্বল। আজ অভি-রামকে তাহার আকাঙ্খা মিটাইয়া খাওয়াইবে—জাহ্নবীরও ত সহ্য করিবার একটা সীমা আছে! জগতে এত লোক থাকিতে অভিরামের সহিত তিলে তিলে মরিতে হইবে এমন কোন কথা নাই! খাইয়া লউক শেষ খাওয়া!

জাহ্নবী থালায় করিয়া অভিরামের কাছে আহার্য নামাইয়া দিল—ভাত আলু ছেঁচকি আর অম্বল, বাড়তি রান্নাও করিয়াছে গুড়ের পায়েস আর ডাল। বহুদিন পরে ভুরি ভোজনের আয়োজন দেখিয়া অভিরামের কোটরাগত চক্ষু দুইটি জ্বলিয়া উঠে। জাহ্নবী থালার সামনে বসিয়া আছে—দৃষ্টিতে বাঘিনীর আক্রোশ!

অভিরাম গোগ্রাসে গিলিয়া চলিল, প্রথম কয়েক গ্রাস—একবার আলু ছেঁচকি একবার অম্বল একবার পায়েস! কোন্‌টা রাখিয়া কোন্‌টা আগে খায়! তাহার পর আসিল অবসাদ, আকাঙ্ক্ষা থাকিলেও আগ্রহ নাই আর! এখন আহার্য লইয়া শুধু নাড়াচাড়া।

"কি, হ'ল কি?" জাহ্নবী জিজ্ঞাসা করে।

"ভাল লাগছে না—" অভিরাম কুণ্ঠিতভাবে উত্তর দেয়।

"ভাল লাগছে না ত মরতে খাটালি ক্যানে এত? খা খা, খেয়ে লে দু'গাস শেষ খ'—! জাহ্নবী যেন আগুনের স্ফুলিঙ্গ।

অভিরাম চোরের মত উঠিয়া পড়ে, চৌকাটের কাছেই জাহ্নবী হাত ধোয়াইয়া দিল তাহার পর পৌঁছাইয়া দিল বিছানায়। জাহ্নবীকে উচ্ছিষ্ট থালাবাসন উঠাইতে দেখিয়া অভিরাম বলে—"বেশ রেন্দেচিস—আজকের মতন আমার পাতে না হয় খা!"

জাহ্নবী অভিরামের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকে তাহার পর মুখ বাঁকাইয়া বলে—"বেশ বুদ্ধি ফেঁদেছিস। আমাকেও তোর পেছু পেছু লিয়ে যেতে চাস, লয়?"

জাহ্নবী তম তম করিয়া অভিরামের থালা-বাটি উঠাইয়া রাখিয়া দেয় রান্নাঘরে।

সন্ধ্যার পর হইতেই অভিরামের জ্বর ও কাশিটা বাড়িয়াছে বেশী। জাহ্নবী দাওয়ায় চুপচাপ বসিয়া আছে—মনটা আজ চঞ্চল হইয়া আছে মধ্যাহ্ন হইতেই খায়ও নাই কিছু। রাত্রি বাড়িয়া চলে, সমস্ত দিনের পর ঝড়ো হাওয়াটা বন্ধ হইয়াছে এতক্ষণে। আকাশে চাঁদের তেমন জ্যোতি নাই—আবছা ধুলায় কুয়াসায়।

জাহ্নবীর ভিতরটা জ্বলিয়া পুড়িয়া যাইতেছে বহু বিশ্লেষণেও তাহার সমাধান

...কোনো কোন গিরিনির্ঝরিণীর শীতল ...র স্পর্শে মনটা আচ্ছন্ন হইয়া উঠে ...কে সেই অতিথি?

...রের মধ্যে অভিরাম রোগযন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ ...ছে কাত্‌রাণীর শব্দটা কানে যাইতেই ...দন্তঘর্ষণ করিয়া গালাগালি দেয়— ...র অভাগীর ব্যাটা!"

...আমগাছের মাথায় একটা কোকিল ডাকিয়া ...কু.....উ......উ, কু......উ!"

জাহ্নবী ঝট্‌ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, ...মের ঘরের ভিতরে উঁকি দিয়া বলে ...ক তুই! আমি আসছি।"

জাহ্নবীর মাথায় জ্বলিয়া উঠিয়াছে কি চিন্তার আগুন—হন হন করিয়া হাঁটিয়া ...আখের ক্ষেত ও তুতঝোপের পাশ দিয়া ...রের দিকে—পায়ের নীচে সাঁইথিয়া ...ইযদক্ষ ঘুমন্ত ধুলো আর ধমনীতে ...কুটিল রক্তকণিকা।

* * *

...জাপুরের চাঁদ দাসনগরেও আজ তেমনি ...ই উঠিয়াছে—আবছা ধুলোর কুয়াশা। ...লাল নিজের দাওয়ায় বসিয়া আছে চিন্তা- ...তাহার কোলে মাথা রাখিয়া প্রাণ-খুলিয়া ...বলিতেছে। আজ হীরালাল চিন্তামণির ...অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করিয়াছে জাহ্নবীর ...খানের কথা—হাসিতে গল্পে চিন্তামণি ...সাতখানা।

"হীরাদাদা—" জাহ্নবী অপ্রত্যাশিত ...মত একেবারে উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। ...মণি শশব্যস্তে উঠিয়া পড়ে; হীরালাল থ। ...না করিতে চিন্তামণিই আগাইয়া যায়— ...দিদি। হঠাৎ এই রেতে?"

জাহ্নবী দেখিল হীরালাল আর চিন্তামণি কপোত-কপোতী! অথচ এই ক'ঘণ্টা আগে ...লাল কি বলিয়া আসিয়াছিল জাহ্নবীকে? ...মণির কথায় জাহ্নবী সম্বিত ফিরিয়া ...—"আমার বড্ড বেপদ দিদি! তার হয়ত ...কের রাতটা আর পার হবে না—" জাহ্নবী ...র আবেগে ভাঙিগয়া পড়ে।

"এর মদ্যে খারাপ হবার কথা ত লয়! ...গে লোক লিদেন ছ'মাসত বাঁচে।" হীরা- উত্তর দেয়।

কিন্তু জাহ্নবী কান্নাজড়িত স্বরে ...ইয়া দিল যে মৃত্যুর কাছে সময় অসময় নাই ছোট, বড়র পার্থক্য! এই চরম ...গ্যের দিন হীরালাল গ্রামের লোক হইয়া ...না সাহায্য করে তাহা হইলে জাহ্নবীর ...কি করিয়া?

"গাঁয়ের মেয়ে, উবগার করতে হয়। তু ...ন্ত মনে যা—" চিন্তামণি একরকম ঠেলিয়া ...ইয়া দিল হীরালালকে জাহ্নবীর ...যার্থে।

এক ঘণ্টার মধ্যে হীরালাল আর জাহ্নবী ...পুরে হাজির হয়। একই রাস্তায় আজ কতবার আসা যাওয়া—ক্লান্ত হীরালাল দাওয়ার উপর বসিয়া পড়ে। জাহ্নবী একখানা পাখা হীরালালের কোলে ফেলিয়া দিয়া বলে, "চিন্তার সঙ্গেত খুবই ভাব দেখলাম—!" এখন ঐটিই যেন জাহ্নবীর একমাত্র দুর্ভাবনা।

"বউয়ের সঙ্গে ভাব হবে নাত কি তোর সঙ্গে হবে!" —হীরালাল শ্লেষ মিশ্রিত গাম্ভীর্যের সহিত উত্তর দেয়।

"ও।" জাহ্নবীর সংক্ষিপ্ত গম্ভীর উত্তর।

হীরালাল পাখা ঘুরাইয়া বাতাস খাইতেছে, জাহ্নবী একদৃষ্টে তাকাইয়া আছে চাঁদের দিকে—সে দৃষ্টি দিয়া হয়ত অন্য কিছু দেখা সম্ভব কিন্তু চাঁদ দেখা যায় না। ঘরের মধ্যে মুমূর্ষু অভিরামের আর্তনাদ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিয়াছে। অভিরাম জল চাহিল—এত ক্ষীণ কণ্ঠে যে জাহ্নবীর স্পষ্ট বলিষ্ঠ দীর্ঘশ্বাসের নীচে তাহা ডুবিয়া গেল।

জাহ্নবী হঠাৎ উঠিয়া গেল রান্না ঘরের ভিতরে—তাহার পর আলো জ্বালিয়া এক থালা ভাত নামাইয়া দিল হীরালালের কাছে—ভাত আলু ছেঁচ্‌কি—মধ্যাহ্নের যাবতীয় খাদ্য-সামগ্রী।

"আমি কি ভোজ খেতে এসেছি" হীরা- লাল দৃঢ়কণ্ঠে প্রশ্ন করে।

"ক্যানে?" জাহ্নবী সন্দিগ্ধভাবে হীরা- লালের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে।

"ক্যানে কি! আমার খিদা নাই।"

"চিন্তামণির দিব্যি থাকে!"

হীরালাল সামান্য একটু দ্বিধা করিয়া খাইতে বসিয়া গেল। আর যাহাই হউক চিন্তামণির কোন অমঙ্গল কামনা করিতে হীরালাল কিছুতেই পারে না।

বেশ রান্না করিতে জানে জাহ্নবী। হীরা- লাল খাইতে খাইতে জিজ্ঞাসা করে "তুই খাবি না?"

"আমি? খাব বইকি! নিশ্চয় খাব, তোর পাতেই খাব!" জাহ্নবীর দৃষ্টিতে বাঘিনীর আক্রোশ।

হীরালালের খাওয়া শেষ হইলে জাহ্নবী হীরালালের থালায় খাইতে বসিল। কয়েক- গ্রাস খাওয়ার পর জাহ্নবী আপন মনেই হাসিয়া উঠে—সে এক বিকট অট্টহাস্য! হাসির স্রোতে মুখের ভাতগুলি দাওয়াময় ছড়াইয়া পড়ে। হীরালাল কি যেন এক অজ্ঞাত ভয়ে শিহরিয়া উঠে—একদিকে মৃত্যুপথযাত্রী অভিরাম আর একদিকে স্খলিত-বসনা হাস্যময়ী জাহ্নবী!

"হাসিচিস ক্যানে?" হীরালাল ভয়ার্ত- চিত্তে প্রশ্ন করে।

"ক্যানে স্বামী মরছে বলে হাসতে নাই? কিন্তু তুমাকে ত পেয়েছি! চিন্তামণির তুমি! এখানে না হোক এবার সেখানে আমরা ঘর করব দুজনে মিলে! এ রোগে ক'দিন বাঁচে বললে? ছ'মাস? ছ'টা মাস দেখতে দেখতে কোনদিক দিয়ে চলে যাবে! তখন—"

প্রচণ্ড গরমের মধ্যেও হীরালালের শিরা- উপশিরা দিয়া হিমশীতল শিহরণ বহিয়া যায়। জাহ্নবী কি পাগল হইয়া গেল নাকি? হীরা- লাল ঝট করিয়া উঠানে নামিয়া গেল "আমি বাড়ি যাব।"

"তা যাও, ছ'মাস বইত লয়! এ ছ'মাস চিন্তামণির, তারপর আমার। যমের পেসাদ খাওয়ালাম তুমাকে! ভয় নাই আমিও খেচি! আজকে আমি নাহয় গেরস্তর বউ, ছ'মাস পরে আমারও ছুটি তুমারও ছুটি হা......হা...... শোন?—"

হীরালাল আর এক দণ্ডও দাঁড়াইতে পারে না ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া চলিল জনবিহীন রাস্তা দিয়া— বিরাট এক রাক্ষসী যেন তাড়া করিয়াছে হীরালালকে—

* * *

প্রায় তিন মাস পরের কথা। কান্দীর হাট হইতে কেনা-বেচা শেষ করিয়া ক্লান্ত হীরালাল বটের ছায়ায় আসিয়া বসিল। দিন দিন শরীর ভাঙিগয়া যাইতেছে—কাশির সহিত জ্বরও দেখা দিয়াছে—পরপারের নোটিশ! চিন্তামণি বুদ্ধি- মতী, সময় থাকিতে কোথায় সরিয়া পড়িয়াছে


## ধবল বা শ্বেতকুষ্ঠ

যাঁহাদের বিশ্বাস এ রোগ আরোগ্য হয় না, তাঁহারা আমার নিকট আসিলে ১টি ছোট দাগ আরোগ্য করিয়া দিব, এজন্য কোন মূল্য দিতে হয় না। বাতরক্ত অসাড়তা, একজিমা, শ্বেতকুষ্ঠ, বিবিধ চর্মরোগ, ছুলি, মেচেতা, ব্রণাদির কুৎসিত দাগ প্রভৃতি নিরাময়ের জন্য ২০ বৎসরের অভিজ্ঞ চর্মরোগ চিকিৎসক পণ্ডিত এস, শর্মার ব্যবস্থা ও ঔষধ গ্রহণ করুন। একজিমা বা কাউরের অত্যাশ্চর্য মহৌষধ "চর্চচিকারলেপ"। মূল্য ১৲। পণ্ডিত এস শর্মা; (সময় ৩—৮)। ২৬।৮, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

## ভট্টপল্লীর পুরশ্চরণসিদ্ধ কবচই অব্যর্থ

দুরারোগ্য ব্যাধি, দারিদ্র্য, অর্থাভাব, মোকদ্দমা অকালমৃত্যু, বংশনাশ প্রভৃতি দূর করিতে দৈবশক্তিই একমাত্র উপায়। ১। নবগ্রহ কবচ, দক্ষিণা ৫৲, ২। শনি ৩৲, ৩। ধনদা ৭৲, ৪। বগলামুখী ১৩৲, ৫। মহামৃত্যুঞ্জয় ১৩৲, ৬। নৃসিংহ ১১৲, ৭। রাহু ৫৲, ৮। বশীকরণ ৭৲, ৯। সূর্য ৫৲। অর্ডারের সঙ্গে নাম, গোত্র, সম্ভব হইলে জন্মসময় বা রাশিচক্র পাঠাইবেন। ইহা ভিন্ন অভ্রান্ত ঠিকুজী, কোষ্ঠী গণনা ও প্রস্তুত হয়, যোটক বিচার, গ্রহ-শান্তি, স্বস্ত্যয়ন প্রভৃতি করা হয়। ঠিকানা—অধ্যক্ষ, ভট্টপল্লী জ্যোতিঃসংঘ; পোঃ ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা।

—পেটের জন্যই এত কষ্ট করা রোগাক্রান্ত হীরালালের।

হন্যে কুকুরটা আজও বসিয়া আছে বটের ছায়ায়। বহুদূরে কানু মণ্ডলের টিনের কোঠায় রৌদ্র পড়িয়া চক্ চক্ করিতেছে—ঐত হীরালালের গ্রাম। হীরালাল নির্নিমেষ নয়নে তাকাইয়া থাকে কানু মণ্ডলের উজ্জ্বল কোঠার দিকে—মনে পড়ে কত কথা—বাপ মা'র কথা, চিন্তামণির কথা, আর.........

* * *

সাঁইথিয়া রাস্তার ধারে বটের ছায়ায় জাহ্নবী ভাত রান্না করিতেছে—খড় ও শুকনা পাতা জোগাড় করিয়া। জাহ্নবীকে আর চেনা যায় না, জীর্ণ বসন, মাথায় তৈল বিহীন জটাধরা চুল। হন্যে কুকুরটা উনানের ধারে বসিয়া আছে পরম আত্মীয়ের মতন। কান্দীর হাট ফেরতা কত-লোক রাস্তা দিয়া ধুলো উড়াইয়া চলিতেছে—

"কে যায়?" কর্তব্যনিষ্ঠ দ্বারপালের মতন জাহ্নবী প্রশ্ন করে।

"আমরা গো—" পথচারীরা উন্মাদিনীকে বহুদিন হইতেই চেনে।

"যাও। হীরালালকে বলো এখানেই বসে আছি, ডেকে লেয় যেন।"—জাহ্নবী হুকুম করে।

"তা বলব।" পথচারীরা ক্ষণেকের জন্য দাঁড়াইয়া আবার আগাইয়া যায়।

জাহ্নবী এক অদ্ভুত অধ্যবসায়ের সঙ্গে হীরালালের যাত্রাপথ আগলাইয়া বসিয়া আছে এই বটতলায়। ভুলিয়া যায় যে, হীরালালকে দেওয়া মেয়াদি ছ'টা মাসও থাকিতে হয় নাই। আশ্চর্যের কথা জাহ্নবীর অন্য কোন রোগ হয় নাই। এক মস্তিষ্কের বিকৃতি ছাড়া। কোন-দিন রান্না করা ভাত নিজে খায় কোনদিন সবটাই ঢালিয়া দেয় কুকুরটাকে—"খা খা যমের পেসাদ খা—"

"কে যায়?"

"তাহের সেথ।" পথচারী উত্তর দেয়।
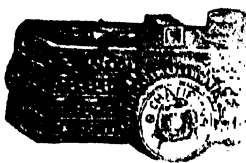
"যাও; হীরালালকে খবর দিও বাছা!"

"দেবো বৈকি—"

আজ রান্না করা ভাতকয়টি নিজে না খাইয়া ঢালিয়া দিল কুকুরটার মুখের কাছে আর নিজে বসিয়া থাকিল ধুলার উপর। পরক্ষণেই জাহ্নবী দুর্দান্ত আক্রোশে বড় এক মাটির ঢেলা ছুঁড়িয়া মারে কুকুরটার গায়ে—"খাবি নাত মরতে এত খাটালি কেনে? খেয়ে লে শেষ খা'—!" তারপর পরেই বহুদূরবর্তী দাসনগরে রৌদ্রদগ্ধ কানু-মণ্ডলের উজ্জ্বল টিনের কোঠার দিকে নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া থাকে জাহ্নবী—কি যেন মনে পড়ে আবার ভুলিয়া যায় মুহূর্তে।


**AMERICAN CAMERA**

এমন কি সাধারণ অজ্ঞ লোকও এই ক্যামেরার সাহায্যে বিনা ঝঞ্ঝাটে, সুন্দর সুন্দর ফটো তুলিতে পারিবেন। প্রতি ক্যামেরার সহিত ১৬ খানা ছবি তুলিবার ফিল্ম, একটি লেদার কেস্ বিনামূল্যে দেওয়া হয়। মূল্য ১৮৲ টাকা। ডাকব্যয় ১।০ আনা

**পার্কার ওয়াচ কোং**

**১৬৬নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা—৭।**

"এবার নূতন রকম লাক্স টয়লেট সাবান!"

LUX TOILET SOAP

" মনোহর নূতন সুগন্ধ!"

"নূতন গোলাপী কাগজে মোড়া!"

LTS. 194-172 BG.

☆ চিত্র-তারকাদের সৌন্দর্য্য সাবান ☆

# ইন্দোনেশিয়ার শিল্পকলা

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ইন্দোনেশিয়ার দান অসামান্য। এ কেবল একটি বীপপুঞ্জ। কিন্তু এখানে নানা বিচিত্র সংস্কৃতির বহুমুখী ধারা এসে সম্মিলিত হয়েছে।

এর নিজস্ব সংস্কৃতি এত পুরোনো যে, ইতিহাস তার গোড়া খুঁজে পাবে না। তারপর নানা ধারার, বিশেষ ক'রে ভারতীয় চিন্তাধারার সংযোগে ভাস্কর্যে চিত্রকলায় ও সংস্কৃতির অন্যান্য শাখায় যে রেনেসাঁ বা পুনর্জাগৃতি এসেছিল, তা-ও সুপ্রাচীন। সেই থেকে এক ইন্দোনেশিয়ার সাংস্কৃতিক সম্পদ থেকে সারা এশিয়ার রূপময় সত্তার সাড়া পাওয়া যায়।

তবে ভারতবর্ষের সঙ্গেই এর প্রাণের যোগ সবচেয়ে বেশী নিবিড়। কেন না, ভারতের হিন্দু-সভ্যতা ও বৌদ্ধ-সভ্যতা তাকে নানান রূপে উদ্ভাসিত করেছে। সে-ও তার মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে তন্ময় হয়ে গিয়েছে।

এখানে একটা প্রশ্ন স্বতঃই মনে জাগে।

অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে, একটা দেশ আর একটা দেশের সংস্কৃতি ও সভ্যতা গ্রহণ করেছে, কখনও স্বেচ্ছায়, কখনও বাধ্য হ'য়ে। কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই তাকে নিজস্ব করে নিয়ে সৃষ্টির এমন বিরাট প্রচেষ্টা দেখা যায়নি—যেমনটি দেখা গিয়েছে ইন্দোনেশিয়াতে। এখানে দিগ্-ব্যাপী গগনচুম্বী মন্দির, বহু বৈচিত্র্য রূপায়িত সংখ্যাবিহীন বুদ্ধমূর্তি, নানা যুগের চিত্রকলা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতিকে বরণ করেই কেবল নেওয়া হয়নি, তাকে জীবন্তও করে রাখা হয়েছে চিরকালের জন্যে। সাংস্কৃতিক ভারতের প্রাণকেন্দ্র তার রামায়ণ মহাভারত কাব্য দুটির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। এখানে অভিনয় ও নৃত্যকলার প্রাণধারার অদ্ভুত প্রকাশ দেখে আজ পর্যন্ত আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হই।

ইন্দোনেশিয়াতে নানা বিচিত্র সংস্কৃতির এক অদ্ভুত মিলন ঘটেছে — তার আজকের সংস্কৃতিতে ইন্দোনেশীয় ইতিহাসের একটা পরিণত রূপ। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে সুরু করে পূর্ব এশিয়া থেকে কত মানুষের ধারা মালয় ও ফিলিপাইনের পথে এখানে এসে মিশেছে। তার পরে সুদূর প্রাচীনকাল থেকে খৃষ্টীয় শতাব্দীর প্রথম দিক পর্যন্ত ভারতবর্ষ থেকে সমুদ্রপথে কত লোক যে সেখানে গিয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। সেখানকার দ্বীপগুলিতে তাহারা বসতি স্থাপন করে নিজেদের সংস্কৃতিকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। পুরাতন সেখানে নূতনকে যুগে যুগে অভ্যর্থনা করেছে, স্থান ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু যুগে যুগে নূতনের আবির্ভাবে পুরাতন একেবারে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গিয়েছে, তা মনে করার অবশ্য কোনো কারণ নেই। সুমাত্রা, বোর্নিও, সেলিবিস্ এবং আরও অনেক ছোট ছোট দ্বীপে সুদূরতম অতীতের আরণ্য-সভ্যতার আলো এখনও টিম্‌টিম্ ক'রে জ্বলছে।

সমাজ অর্থ ও ধর্মনীতির মতে শিল্প-কলাও ইন্দোনেশিয়ার জনগণের উপর কম প্রভাব বিস্তার করেনি। অন্য সব কিছুর মতোই চিত্রকলাতেও সেখানে মানুষের ইতিহাস প্রতিফলিত হচ্ছে। চিত্রকলার যে রূপ ও রীতি হাজার হাজার বছর আগে এখানে প্রবর্তিত হয়েছিল, আজও তাই চলে আসছে। যবদ্বীপ ও বলিদ্বীপে স্থাপিত হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দির ও মূর্তিগুলো হাজার বছরের পুরানো। কিন্তু সেখানকার লোকশিল্প যা জনসাধারণের মধ্যে এখনও চলে আসছে তা এর থেকেও অনেক পুরানো।

যে-সব হিন্দু এখানে বসতি স্থাপন করে-ছিল, যে-সব ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ প্রচারক এখানে

ইন্দোনেশিয়ার কাঠখোদাই শিল্প

**স্নানের ঘাটঃ আধুনিক ইন্দোনেশীয় চিত্রকলা**

ধর্ম প্রচার করতে এসেছিলেন, প্রধানতঃ তাঁরাই এখানে ভারতীয় সংস্কৃতি ও চিত্রকলার প্রবর্তন করেন। তাঁরা এখানে উপযুক্ত উর্বর ক্ষেত্র পেয়েছিলেন। স্থানীয় অধিবাসীদের সহ-যোগিতায় তাঁরা একরূপ সংস্কৃতির গোড়াপত্তন করেন। যে-সংস্কৃতি খাঁটি ভারতীয় বা খাঁটি ইন্দোনেশীয় ছিল না। উভয় সংস্কৃতির ভূমি থেকে রস গ্রহণ করে তা এক অপূর্ব রূপ নিয়ে বেড়ে উঠেছিল।

যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ কিংবা মালয়ের সংস্কৃতি যে দিক থেকেই পর্যালোচনা করা যাক্ না কেন, প্রাত্যহিক জীবনের রীতিনীতি, চাষবাসের প্রথা, বাড়িঘরের ছাঁচ, সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্ম সম্বন্ধীয় ভাবধারা এবং সাহিত্য—যে দিক দিয়েই বিচার করা যাক্ না কেন, তার বাইরের রূপকে যাই বলা হোক, বুনিয়াদটা ছিল সুপ্রাচীন। তথাকার প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদিম অধিবাসীদের জীবনযাত্রার সঙ্গে এ সংস্কৃতির একটা যোগসূত্র আবিষ্কার করতে কষ্ট হবে না।

ইন্দোনেশিয়া হিন্দু-বৌদ্ধ শিল্প সম্বন্ধেও একথা খাটে। পর্যবেক্ষকদের কাছে মনে হতে পারে যে, যবদ্বীপের পাথরের মূর্তি, ব্রোঞ্জ ও সোনার অলংকার প্রভৃতি শিল্পদ্রব্য বাতাক, দারাস প্রভৃতি আদিম শ্রেণীর লোকদের তৈরী দ্রব্যাদি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা বস্তু। তবু, হিন্দু-জাভানিক শিল্প থেকে যে ভাব-রশ্মি বিচ্ছুরিত হচ্ছে, তার থেকে আদিম মানবের ... মাধুর্যে প্রকাশ ক'রে... শিল্পকলা। শিল্পের 'ক্ল্যাসি... যুগে তাতে ভারতীয় রূপ পুরোমাত্রায় প্রকাশ পেয়েছিল। পরবর্তী সময়ে খাঁটি ভারতীয় আদর্শের সঙ্গে সেখানকার লোকদের রুচি ও আদর্শের মিশ্রণে তাকে অনেকটা বেশী ঘরোয়া ক'রে তোলা হচ্ছে। এটা খুবই শুভ লক্ষণ। যেখানটায় ভারতীয় মূল থেকে জাভানিক শিল্পের শাখা-প্রশাখা পত্রপুষ্প উদ্গত হয়েছে, কেবল তাকে দেখলেই চলবে না। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে হবে তথাকথিত 'আদিম' মানুষের বিভিন্ন শিল্প রূপ ও রীতিকে যা স্মরণাতীতকাল থেকে ছোট বড় নানা দ্বীপের অনগ্রসর লোকের মধ্যে চলে আসছে।

এই শিল্পরীতির সন্ধান পাওয়া যাবে বহু যুগের পুরানো পাথরের ও কাঠের কাজে। পূর্বপুরুষের মূর্তি তৈরী করে রাখার মধ্যেও এর নিদর্শন মেলে। মূর্তির সামনের দিকটাই কাঠে খোদাই করে রাখা হ'ত। অতি সহজভাবে বাস্তব রূপ দেবার চেষ্টাই এতে প্রকাশ পেতো।

কাঠ-পাথরে খোদাই-এর এই শিল্পরীতি এরা কোথায় পেয়েছিল—সে সম্বন্ধে প্রশ্ন মনে আসা স্বাভাবিক। নৃতাত্ত্বিকগণের বিশ্বাস, প্রস্তরযুগের (Stone Age) পরিণত অবস্থায় খৃষ্টজন্মের এক হাজার থেকে আড়াই হাজার বছর আগের কোনো এক সময়ে এ সকল লোক উত্তর দিক থেকে এখানে এসেছিল এবং এই দ্বীপপুঞ্জের নানা দ্বীপে গিয়ে ইন্দোনেশীয় ভাষার প্রবর্তন করেছিল। এই শিল্প-রীতিরও প্রবর্তক তারাই। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কোনো কোনো পাহাড়ী জাতির মধ্যে এই রীতির চরমোৎকর্ষ হয়েছে। সুমাত্রার পশ্চিমে নিয়াস দ্বীপে এই রীতি অধিকতর বিশুদ্ধ রূপ পেয়েছে। পরে যদিও এখানে নানা রকম বিচিত্র প্রভাব এসে এই শিল্পরীতিকে অনেকটা উন্নত ক'রে দিয়েছে, তবু এর মূল বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ন হয়নি। এই আদিম শিল্পরীতি পরবর্তী সময়ের নানা উন্নত রীতির সঙ্গে মিশে গিয়েছে। অনেক দ্বীপেই এই মিশ্রিত রূপ চোখে পড়বে। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই তার উৎসমূলকে চিনতে কষ্ট হবে না। ঐ রীতির মূল বস্তুই পরবর্তী সময়ের জাভানিজ সংস্কৃতিকে বিশেষরূপে প্রভাবিত করেছিল। চৌদ্দ ও পনেরো শতকের কতক-গুলি মন্দির পরীক্ষা করলে বোঝা যাবে, প্রস্তর যুগের ধারণাকেই যেন এগুলির মধ্যে দিয়ে হিন্দু রীতিতে চরমোৎকৃষ্ট রূপ দেওয়া হয়েছে।

খৃষ্টপূর্ব ৮ শতক নানা গোলযোগের জন্য ইতিহাস প্রসিদ্ধ হয়েছে। নানা যুদ্ধ-বিগ্রহ
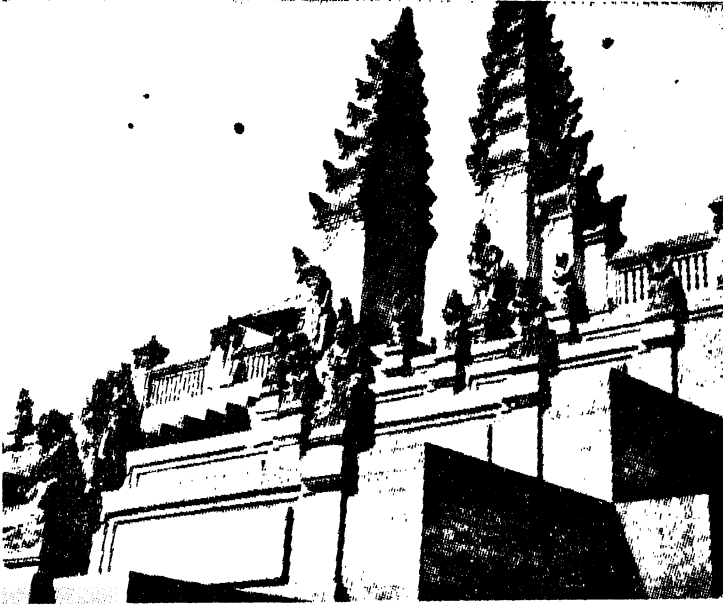
বেশাখীর মন্দির—বালিদ্বীপ

ও হাঙ্গামায় তখন প্রাচীন এশিয়া ও ইউ-রোপের গণ-জীবন বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ত। তারা বড় বড় দল বেঁধে জাতিকে জাতি পিতৃভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিরুদ্দেশের পথে ভেসে পড়ত। সেই বিশৃঙ্খলার দিনে দক্ষিণ রাশিয়া থেকে ককেশীয় অঞ্চল থেকে আর দানিউব নদীর তীরের দেশগুলো থেকে কয়েকটা জাতি দল

বজ্রসত্ব: জাভায় ৮ম শতকে নির্মিত মূর্তি

বেঁধে পূব দিকে যাত্রা করেছিল। তাদের কোনো কোনো দল মধ্য এশিয়াতে বসবাস শুরু করল। কতক ঢুকলো চীনে। অন্যেরা সোজা পাড়ি দিল দক্ষিণে। শেচুয়ান ও ইয়ুনান হয়ে তারা শেষকালে উত্তর ইন্দোচীনে পৌঁছালো। চীনে ও ইন্দোচীনে স্থানীয় অধি-বাসীদের সঙ্গে মিশে যেতে তাদের খুব বেশী দেরী হয়নি। তবে মিশে যাওয়ার আগেই তারা সেখানে নিজেদের নূতন ধরণের হাতিয়ার, গয়না, তৈজসাদি চালু করেছিল। সর্বোপরি, তাদের নিজস্ব শিল্প-রীতিও তারা প্রবর্তিত করেছিল। এই শিল্প-রীতি Mycenean নামক রীতিরই একটি শাখা। গ্রীস ও ঈজিয়ান অঞ্চল থেকে লুপ্ত হওয়ার পর বহুদিন পর্যন্ত এ রীতি তাদের স্বভূমিতে প্রচলিত ছিল। এ শিল্পে কারুকার্য অতি মনোহর।

চীনে প্রায় হাজার বছর ধরে একটি কারু-কার্যময় শিল্প-রীতি চালু ছিল। তা সম্ভব হয়েছিল এই গ্রীক ও ঈজিয়ান শিল্প উপাদানের মিশ্রণে। চাও বা হুয়াই রীতি নামে এর প্রসিদ্ধি। ইন্দো-চীনে শিল্পের অলংকরণ রীতি নাকি আগে জানা ছিল না, পশ্চিমের রীতিই নাকি কিছুটা বদলে হয়ে এখানে স্বীকৃতি পেয়েছে।

খৃস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে টঙ্কিন ও উত্তর আনাম চীনের দুটি প্রদেশরূপে পরিগণিত হয়। তার পূর্বে, অর্থাৎ খৃস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দী থেকে প্রথম শতাব্দীর মধ্যে কোনো সময়ে ডঙসন-সংস্কৃতি নামে এক নতুন সংস্কৃতির উদ্ভব হয়েছিল—উত্তর আনামের ডঙসন প্রাসাদ থেকে এর গোড়াপত্তন। এই সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য অবদান হচ্ছে ব্রোঞ্জের কুঠার, কারুকার্যময় ব্রোঞ্জের ছুরি ও বল্লম। আদিকালের ব্রোঞ্জ-মূর্তি এবং ব্রোঞ্জের বড়ো বড়ো জয়ঢাক। এ সকল ঢাকের গায়ে নানা রকম কারুকার্য থাকত, আর থাকত নৌকো, পালকের পাগড়ীমাথায় সৈনিক, আর মৃতের পারলৌকিক কাজের নানারূপ বর্ণনামূলক ছবি। এজন্য এই সংস্কৃতির নাম দেওয়া হয়েছিল ব্রোঞ্জ-সংস্কৃতি। এই ডঙসন সংস্কৃতির সঙ্গে চাও চীনা সংস্কৃতির রীতিগত মিল ছিল, কিন্তু ডঙসন সংস্কৃতি অনেক সহজ ঘরোয়া উপাদানের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল বলে তা বেশী জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

এই উভয় সংস্কৃতির রীতি ইন্দোনেশিয়ার জনসাধারণের শিল্পকলাকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছিল। সমগ্র দ্বীপপুঞ্জে এই রীতির প্রবর্তন সমগ্র ভাবে কোনো দল বা জাতি বিশেষের দ্বারা হয়নি। বণিক, শিল্পী এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঔপনিবেশিক দলের দ্বারা এর প্রবর্তন হয়েছিল। এরা ইন্দোচীন ও দক্ষিণ চীনের উপকূল থেকে ইন্দোনেশিয়ায় গিয়ে বসবাস সুরু করার সঙ্গে, নিয়ে যায় নিজেদের যুগ-প্রচলিত সংস্কৃতির ধারা। এই ধারা স্থানীয় লোকদের মুগ্ধ করে। এর নূতনত্বে ও শ্রেষ্ঠত্বে তারা চমৎকৃত হয়। তবে সংস্কৃতি ও শিল্পকলার দ্বারা তাদের মুগ্ধ করা সত্ত্বেও আগন্তুকগণ তাদের মধ্যে নিজেদের ভাষার প্রবর্তন করতে পারেনি সংখ্যায় তারা

প্রাম্বানমের শিবমূর্তি—মধ্য-জাভা
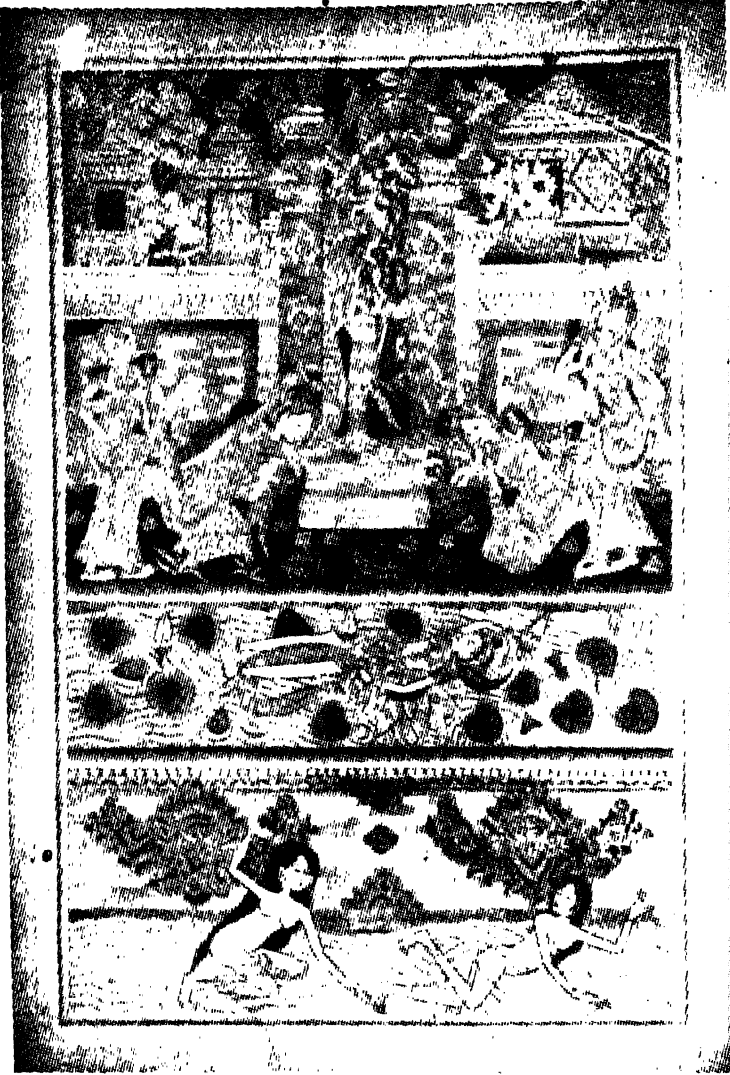
ইন্দোনেশিয়ার আধুনিক চিত্রকলা

অপ্রচুর ছিল বলে। শিল্পে, সাহিত্যে, ভাষায়, সংস্কৃতিতে সমগ্র ভাবে তাদের মধ্যে নব-জাগরণ এসেছিল এর কয়েক শতাব্দী পরেই। যারা এ জাগরণ ঘটিয়েছিল, তারা হিন্দু। তাদের কতক বৈষয়িক কারণে, কতক অন্যান্য প্রয়োজনে এবং অনেকে হিন্দু- সংস্কৃতির প্রচার উদ্দেশ্যে সেখানে যান ও বসতি স্থাপন করেন।

শিল্পে 'ডঙসন' ও 'চাও' রীতি ইন্দো-নেশিয়ায় জনপ্রিয় হওয়ার মূলে ছিল এর জাঁকাল কারুকার্য এবং সহজ প্রকাশভঙ্গী। প্রতীক পূজার সঙ্গে এর বিরোধ থাকলেও এবং এ যুগের 'আর্ট ফর আর্টস সেক' রীতির পর ভাবতে পারেনি, কেননা, এর সঙ্গে তাদের পূর্বপুরুষের রীতি-নীতি, মৃতের পারলৌকিক কাজ, পূজা-পার্বণে বলিদান, নরমুণ্ড শিকার, শস্যভূমিকে উর্বরা করার উদ্দেশ্যে এবং বিত্ত-লাভের আশায় নানা রকম ক্রিয়াকলাপ প্রভৃতি বিষয়গুলো ছিল তাদের স্থানীয় আদিম শিল্পের উপজীব্য। তাকেও তারা উক্ত 'ডঙসন' ও 'চাও' রীতির সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পেরেছিল।

'ডঙসন' সংস্কৃতি-জাত শিল্প-রীতি ইন্দো-নেশিয়ার স্থানে স্থানে এখনো মাঝে মাঝে দেখা যায়। প্রধানতঃ আলোর ও তানিম্বার দ্বীপ দুটিতে এবং গৌণতঃ আরো ছোট ছোট

পরিচয় মেলে। সুমাত্রার বাতাক দ্বীপে এবং সেলিবিসের সাদঙ তোয়াদ্জা দ্বীপে এই রীতিকে অবিকৃত ভাবে পাওয়া গিয়েছে। ডঙসন সংস্কৃতি-জাত অন্যান্য শিল্প-রীতির সন্ধান মেলে নিউগিনির উপকূল অঞ্চলে, বিশেষ করে উত্তর উপকূলে—এখানে ব্রোঞ্জ যুগের সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল বলে বিশেষজ্ঞ-গণ মনে করেন।

বোর্ণিও দ্বীপের দায়াক উপজাতিদের কারুশিল্পে 'ডঙসন' সংস্কৃতির অনেক উপাদান প্রবেশ করেছিল। নানা রকম অলঙ্করণ শিল্পে এর প্রভাব দেখা যায়। কাঠ খোদাই, হরিণের শিঙ দিয়ে তৈরি তরবারির বাঁট, বাঁশের কারু-কার্য প্রভৃতির মধ্যে এ রীতির প্রকাশ সুস্পষ্ট। বোর্ণিওতে এবং ফ্লোর্স-এ প্রবর্তিত এ রীতি খৃস্টপূর্ব চতুর্থ ও তৃতীয় শতকে ইন্দো-নেশিয়ায় প্রবেশ করে।

চিত্রকলাতে 'ডঙসন' সংস্কৃতির প্রভাব কম পড়েনি। মানুষ পরলোকে গিয়ে কিভাবে জীবনযাপন করে, দায়াক জাতি এ সকল কাল্পনিক ও লোক-প্রচলিত বিষয়গুলি কাঠের তক্তায় বা বাঁশের দ্রব্যাদির উপর চিত্রিত করত। তাদের পৌরাণিক কাহিনীগুলিকে তারা এভাবে চিত্রকলার সাহায্যে রূপদান করত। শুধু তাই নয়, সুমাত্রার তোবা বাতাকে এবং সেলিবিসের সাদঙ তোয়াজদা দ্বীপে ঘরের দেয়ালে তারা যেসব ছবি এঁকে রাখত, তাতে অনেক লোকজনের ছবি আঁকা হত। এ রীতিরও মূল উৎস ছিল ডঙসন সংস্কৃতি।

প্রস্তর যুগে ইন্দোনেশিয়ানরা কাপড় পড়ত কিনা নিশ্চিত ভাবে জানা যায়নি। তারা তখন গাছের ছাল পরত বলে অনেকের অনুমান। ডঙসন সভ্যতা চালু হওয়ার পর তাদের মধ্যে বস্ত্র বয়নের প্রবর্তন হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতার আরো অনেক উপাদান তাদের জীবনযাত্রাকে শীলবান করে তোলে। বস্ত্র রঙ করা সর্বযুগের ইন্দোনেশিয়ানদের একটি বড়ো সখ। ডঙসন-সংস্কৃতির সময়েই এ রীতিরও প্রবর্তন হয়েছিল তাদের মধ্যে। এই বস্ত্র রঙ করার প্রবৃত্তি থেকেই তাদের চিত্রকলায় রঙ ব্যবহারের অনুরাগী করে তোলে। পরিধেয় বস্ত্রে রঙের চমক লাগানোর স্পৃহা বোর্ণিওর দায়াক জাতি এবং সুন্ডা দ্বীপের অধিবাসীদের মধ্যে খুবই প্রবল ছিল। এই বর্ণের চমক দিয়েই তারা দায়াকের মানুষ, জন্তু-জানোয়ার, গাছপালা প্রভৃতির চিত্র প্রস্তুত করত। ঐ সময়ের আঁকা যেসব ছবি সুন্ডা দ্বীপে পাওয়া গিয়েছে তাতে আছে মানুষ, ঘোড়া, হরিণ, হাঁস, মুরগী, সাপ আর মাছের ছবি। শিকার-করা নরমুণ্ড দিয়ে সাজানো সারি সারি গাছও তাদের চিত্রকলায় স্থান পেয়েছিল। দক্ষিণ সুমাত্রার ক্রু দ্বীপে পূজায়

আরোহণ করেছে মৃত মানবের প্রেতাত্মারা। এই ধরণের কাজ পূর্বে ডঙসন-সংস্কৃতির সময়ে ব্রোঞ্জের ঢাকের গায়েও চিত্রিত হতে দেখা গিয়েছে।

ইন্দোনেশিয়ার অধিবাসীরা একটা আদিম শিল্পধারাকে যে দু'হাজার বছর ধরে নিজেদের মধ্যে চালু রাখতে এবং বহিরাগত কোনো কোনো রীতিকে স্বকীয় রীতির অন্তর্ভুক্ত করে নিতে সক্ষম হয়েছিল, তাতে তাদের রুচি ও সৌন্দর্যবোধের প্রখরতাই প্রমাণিত হয়। হিন্দুরা যখন এলো, তারাও দেখতে পেলো 'ডঙসন' ও 'চাও' সংস্কৃতিজাত রীতি-নীতি শিল্পকলাকে বহুভাবে প্রভাবিত করে রেখেছে।

বাণিজ্যিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত ছিল। সপ্তম শতকে মধ্য যবদ্বীপের একটি রাজ্য চৈনিক নামে পরিচিত ছিল, হো-লিঙ। এইটি এবং দক্ষিণ-পূর্ব সুমাত্রার শ্রীবিজয়ের রাজ্য সমগ্র ইন্দোনেশিয়াতে ক্ষমতার উচ্চতম শিখরে অধিরূঢ় ছিল। উভয় রাজাই ছিল বৌদ্ধ শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র-স্থল। বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে পড়াশোনা করার জন্য এবং বিশেষ করে সংস্কৃত ভাষা শিখবার উদ্দেশ্যে অনেক চৈনিক পণ্ডিত ঐ দুই রাজ্যে প্রায়ই আসতেন।

এইভাবে সপ্তম শতকে ইন্দোনেশিয়ার হিন্দু বৌদ্ধ দেশগুলি সভ্যতার এক অতি উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিল। তবে শিল্পকলায় মনে হবে জাভা শিল্পের শুরুতে এক চরমোৎকর্ষ ঘটেছিল।

এখানে জাভানিজ মন্দির ও ভাস্কর্যের ব্যাখ্যা হিসেবে দুএক কথা বলা যেতে পারে। ভারতে পাথরে-গড়া মন্দিরগুলো সব দেব-দেবীর উদ্দেশে নির্মিত। জাভাতে মন্দিরগুলো সাধারণত দেবতার উদ্দেশ্যে তৈরী হতো না। ওগুলো প্রধানতঃ রাজা ও রাণীদের চিতা-ভস্মের উপর স্মারক-গৃহ হিসেবে তৈরী করা হত। (কেবলমাত্র বৌদ্ধ মন্দিরগুলোতে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়)। ঐসব মন্দির 'মেরু পর্বতে'র প্রতীক স্বরূপ তৈরী করা হত। এদের সুউচ্চ চূড়ার মধ্য দিয়ে পরলোকগত রাজার স্বর্গগমন পথ কল্পিত হত।

ভারতীয় মূর্তি-শিল্পে কেবল দেবদেবী-দেরই রূপ দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু জাভার অধিকাংশ প্রস্তরমূর্তিতে দেখা যায়, রাজা ও রাণীদের রূপ দেওয়া হয়েছে। রাজা ও রাণীকে জীবিতকালেই দেবদেবীর প্রতীকরূপে গণ্য করা হত এবং মৃত্যুর পরে স্বর্গলোকে তাদের সঙ্গে মিলিত হওয়া লোকের পরম কাম্য ছিল। এজন্য রাজা ও রাণীদের মূর্তিতে সব সময়েই দেবত্ব আরোপ করা হত। এদের স্মারক মূর্তিগুলো ঠিক দেবমূর্তির মতই রক্ষা করা হত। একাদশ শতকের রাজা আয়ার-লঙের মূর্তি এর একটা চমৎকার উদাহরণ। মূর্তিটিকে গরুড়ের পৃষ্ঠে আরূঢ় বিষ্ণু-রূপে চিত্রিত করা হয়েছে। লীডেন মিউজিয়ামে বৌদ্ধ দেবী প্রজ্ঞাপারমিতার যে বিখ্যাত মূর্তিটি রক্ষিত আছে, সেটি নাকি তেরো শতকের এক জাভানিজ রাণীর, এবং মজোপহিত সাম্রাজ্যের স্থাপয়িতা রাজা কৃতরাজসের (মৃত্যু ১৩০৯ খৃঃ) মিলিত প্রতিরূপ—হরিহর, অর্থাৎ বিষ্ণু ও শিবের মিলিত রূপ দিয়ে মূর্তিটিকে মাহাত্ম্য দেওয়া

হংসচারণ : আধুনিক ইন্দোনেশীয় চিত্রকলা

কিন্তু সবকিছুকে আড়াল করে হিন্দু-সংস্কৃতি কি ভাবে প্রবল হয়ে উঠল তা আমরা পরে দেখতে পাব।

ভারতীয়েরা কবে থেকে ইন্দোনেশিয়ায় বসতি স্থাপন শুরু করেছিল তা জানা যায় না। আমরা জানি, খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ভারতীয় সওদাগররা ইন্দোনেশিয়ায় যাতায়াত করত। ২য় শতকে সুমাত্রা ও যবদ্বীপে ভারতীয়দের বসতি স্থাপিত ছিল এর প্রমাণ আছে। খুব পুরোনো শিলালিপি যা পাওয়া গিয়েছে, তাতে দেখা যায়, চতুর্থ শতকের কাছাকাছি সময়ে পূর্ব বোর্ণিও এবং পশ্চিম যবদ্বীপে ব্রাহ্মণ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। বৌদ্ধধর্মও ঐ সময়েই সেখানে প্রথমে প্রবর্তিত হয়েছিল। পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকে এ সকল দ্বীপে বিভিন্ন রাজত্ব স্থাপিত ছিল, এ তথ্য চীন-সূত্র থেকে জানা গিয়েছে। চীনের সঙ্গে তখন থেকেই রাজ্যের

তাদের চরমোৎকর্ষ দেখা দিয়েছিল আরো কিছু দেরীতে। ঐ সময়ের কিছু কিছু প্রাচীন বুদ্ধমূর্তিতে তার নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু সেগুলি তথাকার তৈরী নয়, দক্ষিণ ভারত কিংবা সিংহল দ্বীপ থেকে আমদানী করা। তখন মন্দির, প্রাসাদ, মূর্তি যা কিছু নির্মাণ করা বা কাঠের উপর খোদাই করা হয়েছিল, ঠান্ডা আবহাওয়ার দরুণ তা সবই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সম্ভবত এইজন্যই তখন প্রস্তরকে শিল্পের উপাদানরূপে গ্রহণ করে হিন্দু-যাভা মিলিত প্রচেষ্টায় শাশ্বত শিল্পের গোড়াপত্তন হয়।

দিয়েংএর হিন্দু মন্দিরগুলো যবদ্বীপের সবচেয়ে পুরোনো। অষ্টম শতকের গোড়ার দিক থেকে সপ্তম শতক এগুলোর নির্মাণকাল। এগুলোর গঠনে অনাড়ম্বর এক মহনীয়তার ছাপ পড়েছে। এদের কারুকার্যে গাম্ভীর্য ও কমনীয়তা এবং 'ক্ল্যাসিক্যাল' সৌন্দর্য দেখে

যাভার বৌদ্ধমূর্তি

হয়েছে। খাস ভারতে মূর্তিশিল্পে দেব-দেবীকেই প্রথম এবং একমাত্র স্থান দেওয়া সত্ত্বেও জাভার এই ভারতীয় শিল্পে এর ব্যতিক্রম কেন, তার কারণ, আদি জাভানিজের বংশগত প্রথা এতে প্রভাব বিস্তার করেছিল।

৭৩২ খৃষ্টাব্দের একখানি সংস্কৃত শিলা-লিপিতে মধ্য জাভার এক হিন্দু শাসনকর্তার পরিচয় আছে—তিনি একটি শিবলিঙ্গ স্থাপন করেছিলেন একথা শিলালিপিতে উৎকীর্ণ আছে। এর কিছু পরে ৭৭৮ খৃষ্টাব্দে জাভার চণ্ডী কলসন্ মন্দিরের প্রতিষ্ঠা। মন্দিরটি তারাদেবীর নামে উৎসর্গীকৃত। যে রাজা চণ্ডী কলসন মন্দির স্থাপন করেছিলেন, তিনি বিখ্যাত শৈলেন্দ্র রাজবংশের অন্যতম নৃপতি। এই বংশের রাজারা বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারে খুব সাহায্য করতেন। তাঁরা সুমাত্রার শ্রীবিজয় রাজ্যও শাসন করেছিলেন। তাঁদের কেউ কেউ নাকি ভারতবর্ষে এসেও বৌদ্ধ মঠ স্থাপন করেছিলেন।

মধ্য জাভার অধিকাংশ হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দির ও মঠ অষ্টম থেকে নবম শতকের। বোরোবুদুরের মন্দির এর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। এই মন্দিরে শত শত বুদ্ধ মূর্তি এবং যোজন-ব্যাপী রিলিফের কাজ একে পৃথিবীর শিল্প-ভাস্কর্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন করে তুলেছে। এর মধ্যে সমগ্র বিশ্বকে প্রতিফলিত করা হয়েছে।

নবম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মধ্য জাভাতে হিন্দু ধর্ম আবার প্রাধান্য বিস্তার করে। তবে বৌদ্ধ ধর্মও ম্লান হয়নি। দুটোই পাশাপাশি চলতে থাকে।

মধ্য জাভায়, প্রাম্বানমের কাছে "লারাজাঙ্-গ্রাঙ্গে"র শিবমন্দির হিন্দু ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। দশম শতকের গোড়ার দিক এর নির্মাণকাল।

৯২৫ শতকের কিছু পর থেকে মধ্য জাভার দ্যুতি নিষ্প্রভ হতে থাকে এবং পূর্ব জাভা রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়।

শিল্পকলায় পূর্ব জাভা বারো শতক থেকে বিশেষ প্রখ্যাত হয়ে ওঠে। রাজা সিংহসারী (১২২২—১২৯২ খৃঃ) এবং মজোপহিতের (১২৯২—১৩২০ খৃঃ) তখন রাজত্বকাল। এই সময়ে ভারতের সঙ্গে জাভার সাংস্কৃতিক যোগ আরো নিবিড় হয়ে ওঠে। বাংলা দেশ থেকে তান্ত্রিক বৌদ্ধমত ঐ সময়েই যবদ্বীপে প্রবর্তিত হয়েছিল।

ষোড়শ শতাব্দীতে যবদ্বীপের হিন্দু রাজত্বের পতন হয়। তখন থেকে ইসলাম তথায় প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আজ পর্যন্তও সেখানে শিল্পে, ভাস্কর্যে, সংস্কৃতিতে হিন্দু প্রভাবকে কেউই ম্লান করতে পারেনি। হিন্দুর দেবদেবী এবং হিন্দু নাট্য, নৃত্য প্রভৃতি কলার সর্বক্ষেত্রে প্রাধান্য পুরাণের বীরবৃন্দ আজিও সেখানে শিল্প, পেয়ে আসছে।


সুবর্ণ সুযোগ ! স্বল্প ষ্টক ! অভাবনীয় সুবিধা !

এই ঘড়িগুলি সুইজারল্যাণ্ডের বিখ্যাত বেসিস, টাইমস্, ওরিস এবং মেণ্টর কোম্পানী দ্বারা প্রস্তুত। প্রত্যেকটির জন্য ৩ বৎসরের গ্যারাণ্টী প্রদত্ত হয়। পছন্দ না হইলে মূল্য ফেরৎ। একটি ঘড়ি কিনিলে আপনাকে একটি পকেট ঘড়ি এবং দুইটি ঘড়ি কিনিলে একটি এলার্ম ঘড়ি বিনামূল্যে দেওয়া হইবে। সর্বত্র এজেণ্ট চাই।
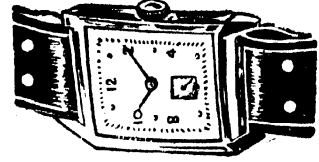
ব্রাইট ক্রোম ২৩৲ টাকা রোল্ড গোল্ড ২৫৲ টাকা — ৫ জুয়েল ক্রোম ৩৩৲ টাকা রোল্ড গোল্ড ৩৮৲ টাকা
৪ জুয়েল „ ২৪৲ „ „ „ ২৯৲ „ — ৭ জুয়েল „ ৩৪৲ „ „ „ ৩৯৲ „
৭ জুয়েল „ ৩২৲ „ „ „ ৩৫৲ „ — ১৫ জুয়েল „ ৪৬৲ „ „ „ ৫১৲ „
১৫ জুয়েল „ ৩৮৲ „ সুপিরিয়র ৪৫৲ „ — পকেট ঘড়ি ১০৲ „ এলার্ম ক্লক ২২৲ „

JOHNSON WATCH COMPANY, 137, COTTON ST. (D. C.), CALCUTTA-7

ফিলিপ্স — সম্পূর্ণ বিলেতে তৈরি ভালো সাইকেল

কারণ
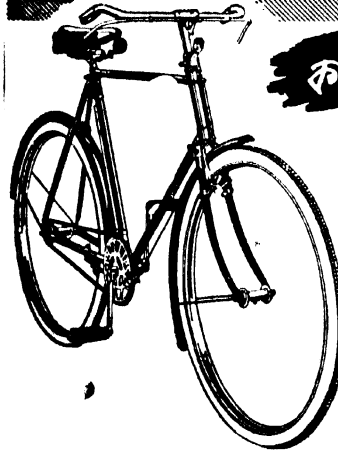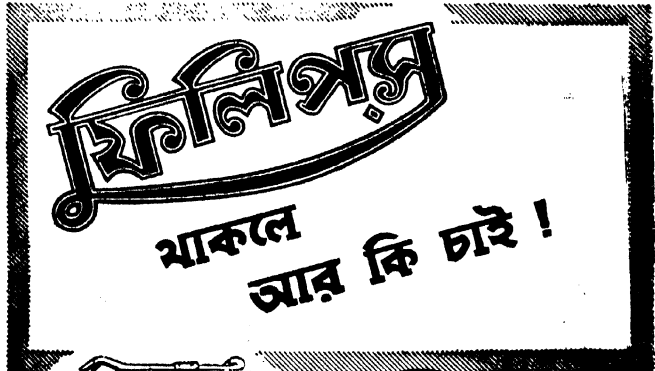
ফিলিপ্স যার আছে সেই জানে এদেশের খারাপ রাস্তায়ও কত আরামে চলা যায়। ধকল সইবার ক্ষমতা বাস্তবিকই ফিলিপ্স-এর অসাধারণ। আপনিও একটি ফিলিপ্স চড়ে দেখুন সাইকেল চালানো কতখানি নির্ঝঞ্ঝাট, অবাধ এবং আরাম-দায়ক হতে পারে।

RENOWNED THE WORLD OVER

PHILLIPS

J. A. PHILLIPS & CO. LTD.
BIRMINGHAM ENGLAND.

ফিলিপ্স — সম্পূর্ণ বিলেতে তৈরি ভালো সাইকেল

# মহাকবি হেমচন্দ্র

সরলাবালা সরকার

হেমচন্দ্রকে আজ বাঙালী ভুলিয়া গিয়াছে। 'ভারত সঙ্গীত' রচয়িতা মহাকবি হেমচন্দ্র আজ বাঙলা দেশে অজ্ঞাত ও অখ্যাত। মাইকেল মধুসূদনের 'মেঘনাদ বধ' কাব্য যেরূপভাবে আলোচিত হইয়াছে, হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার তাহার সহিত তুলনায় একেবারে অন্ধকারে পড়িয়া রহিয়াছে বলিলেও চলে। হেমচন্দ্র তাঁহার একটি কবিতায় বলিয়াছিলেন,

কিছু দিন পরে আমরাও সবে,
ক্রমে ক্রমে লীন হইব এ ভবে,
মধু, গন্ধ, শোভা কিছুই না রবে
কালেতে হইবে সকলি হারা।

কিন্তু কেবলই কি কালের প্রভাব বলিয়া এই প্রশ্ন ছাড়িয়া দেওয়া যায়। এই বৎসরের বাঙলা সাহিত্যের বি-এ অনার্সে, কবি ঈশ্বর গুপ্ত হইতে কাশীরাম দাস, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, ধর্মমঙ্গল প্রভৃতি কিছুই উপেক্ষিত হয় নাই, কিন্তু উপেক্ষিত হইয়াছেন 'ভারত সঙ্গীত' কবিতার কবি হেমচন্দ্র।

একদিন এমন দিন ছিল, যেদিন বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তকে সাহিত্যে 'ভারত সঙ্গীত' প্রথমেই স্থান পাইত। ছেলেমেয়েদের মুখে মুখে আবৃত্তি শোনা যাইত,

বাজরে শিঙ্গা বাজ এই রবে
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।
আরবা, মিশর, পারস্য, তুরকী,
তাতার, তিব্বত—অন্য কব কি,
চীন, ব্রহ্মদেশ, নবীন জাপান,
তারাও স্বাধীন তারাও প্রধান,
দাসত্ব করিতে করে হেয়জ্ঞান
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।

এই কবিতা যখন রচিত হইয়াছিল, সেই সময়ের তুলনায় এখন জগতের অবস্থা অনেক পরিবর্তিত হইয়াছে। ব্রহ্মদেশ তখন ইংরাজের কুক্ষিগত হয় নাই, নবীন জাপান—প্রাচ্যের সেই নবোদিত সূর্য—আজ পরাধীনতা মেঘে ঢাকা পড়িয়াছে, এবং ভারত চিরপরাধীন ভারত, আজ স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিতেছে।

হেমচন্দ্রের এই কবিতা আমাদের অর্দ্ধ-শতাব্দীরও অধিক দিন পূর্বের অতীত জগতের মধ্যে লইয়া যায়। পরাধীনতা ক্রমশ দেশবাসীর যেন অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, কালের সহিত খাপ খাওয়াইয়া ভারতবাসী নিজের জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছে। ইংরাজ প্রভুর বিন্দুমাত্র করুণা তাহাকে যেন স্বর্গে তুলিয়া দিতেছে। তাই মেটকাফের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া রহিল, এবং লর্ড রিপণকে দেশবাসী দেবতার আসনে বসাইয়া পূজা করিল।

হেমচন্দ্রের কবিতায় দেশের অবনতির জন্য ক্ষোভ, পরাধীনতার চিত্তদাহ অগ্নিপ্রবাহের ন্যায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে চাহিয়াও পূর্ণভাবে উচ্ছ্বসিত হইতে পারে নাই। হেমচন্দ্রের 'ভারত বিলাপ' নামক কবিতার শেষের কয়ছত্র এইরূপঃ—

ভয়ে ভয়ে লিখি কি লিখিব আর,
নহিলে শুনিতে এ বীণা ঝঙ্কার
বাজিত গরজে উথলি আবার
উঠিত ভারত ব্যথিত প্রাণ।

ইংরাজ কি গুণে জগৎজয়ী হইয়াছে তাহা কবি তাঁহার মন্ত্রসাধন 'ইউরোপ এবং আসিয়া' প্রভৃতি কবিতায় উল্লেখ করিয়া ভারতবাসী যে অধুনা তাহাদের সেই 'বীর্যরূপ পৈতৃক সম্পত্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে সেই দুঃখে তপ্ত নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছেন। সেই দীর্ঘশ্বাসই তাঁহার কবিতার রূপ ধরিয়াছে।

তাঁহার অন্তর্নিহিত 'স্বদেশপ্রেম' নানাভাবে নানা স্থলে কবিতায় প্রস্ফুটিত হইয়াছে,

ওরে কুলাঙ্গার হিন্দু দুরাচার
এই কি তোদের দয়া সদাচার,
হ'য়ে আর্যবংশ অবনীর সার
রমণী বধিছ পিশাচ হয়ে।

এই তীব্র তিরস্কারে স্বদেশের অবনতির জন্য দারুণ ক্ষোভই প্রকাশ পাইয়াছে।

তাঁহার খন্ড কবিতার মধ্যে কতকগুলি কবিত্বে অতুলনীয়, যেমন 'ইন্দ্রের সুধাপান', 'সুহৃৎ সমাগমে' প্রভৃতি। তাঁহার অন্যান্য কবিতা ও গ্রন্থগুলির সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে উল্লেখ না করিয়া কেবল বৃত্রসংহার কাব্য সম্বন্ধেই সংক্ষেপে কিছু বলিব।

'বৃত্রসংহার' যে একখানি মহাকাব্য তাহাতে সন্দেহ নাই' মহাকাব্যের লক্ষণ বিচারে সকল লক্ষণগুলি ইহাতে পাওয়া যায় কিনা তাহা লইয়া আমরা আলোচনা করিতে চাহি না। প্রকৃত কাব্যরসিক ইহার গুণাগুণ বিচারের অধিকারী। তবে আমরা এইমাত্র বলিতে পারি ত্রয়োবিংশ সর্গে রচিত এই কাব্যখানি চরিত্রাঙ্কন, ভাব বিস্তার, দৃশ্যাবলীর বৈচিত্র্যের সমাবেশে বঙ্গ-সাহিত্যের এক বিশেষ সম্পদ স্বরূপ।

কেহ কেহ এরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে, ইংরাজ কবি মিলটনের 'প্যারাডাইস্ লস্ট' হইতে এই কাব্যের ভাবগ্রহণ করা হইয়াছে। অবশ্য বিষয়বস্তু দুই কাব্যেই অনেকটা একরকম। কিন্তু প্যারাডাইস লস্ট অবলম্বন করিয়াই যে কবি বৃত্রসংহার কাব্য লিখিয়াছেন ইহা মোটেই বলা চলে না। ভাবগ্রহণ ও তাহা আত্মস্থ করিয়া সেই ভাবকে নবরূপ দান করা ইহা সাহিত্যক্ষেত্রে অকরণীয় নয় বরং কৃতিত্বেরই প্রকাশ স্বরূপ।

সুতরাং যদি হেমচন্দ্র প্যারাডাইস লস্ট হইতে কিছু ভাব গ্রহণ করিয়া থাকেন তাহা দোষের বিষয় নয়। তবে বৃত্রসংহারে প্রথম সর্গ ভিন্ন অন্য সর্গগুলির সহিত প্যারাডাইস লস্টের বিশেষ কোন সাদৃশ্য দেখা যায় না।

স্বর্গের দেবতাগণ দৈত্যরাজ বৃত্রের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হইয়াছেন, এখন তাঁহাদের আশ্রয়স্থান পৃথিবী-গর্ভে অন্ধকারময় পাতালপুরী। প্রথম সর্গে আমরা পাতালপুরীর বর্ণনা এইভাবে পাইঃ—

নিবিড় ধূমান্ধ ঘোর পুরী সে পাতাল—
নিবিড় মেঘাড়ম্বরে যথা অমানিশি।
যোজন সহস্র-কোটি পরিধি বিস্তার
বিস্তৃত সে রসাতল, বিঘূর্নিত সদা
চারিদিক ভয়ংকর শব্দে নিরন্তর
সিন্ধুর আঘাতে স্বতঃ নিয়ত উত্থিত।
বসিয়া আদিত্যগণে তমঃ আচ্ছাদিত
মলিন, নির্বাণ যথা সূর্য তিয়াম্পতি
রাহু যবে রবিরথ গ্রাসয়ে অম্বরে;
কিম্বা সে রজনীনাথ হেমন্ত-নিশীথে
কুজ্ঝটি-মণ্ডিত যথা হীন দীপ্তি ধরে,
পাণ্ডুবর্ণ সমাকীর্ণ, পাংশুবৎ তনু—
তেমতি অমর-কান্তি ক্লান্ত অবয়বে।
ব্যাকুল, বিমর্ষভাব, ব্যথিত অন্তর
অদিতিনন্দন যত রসাতল পুরে
স্বর্গের ভাবনা চিত্তে ভাবে সর্বক্ষণ
কিরূপে করিবে ধ্বংস দুর্জয় অসুরে।

এই ঘনান্ধকারে দেবগণের মন্ত্রণা-সভা বসিয়াছে। কিন্তু ক্ষুব্ধ দেবগণ কি কথা বলিয়া যে মনের ভাব জানাইবেন তাহা যেন বুঝিতে পারিতেছেন না।

ক্রমে দেবগণ-মুখে বহে গাঢ়শ্বাস,
ঝটিকার পূর্বে যেন বায়ুর উচ্ছ্বাস
বহে যুঝি চারিদিক আলোড়ি সাগর।
সে অস্ফুট ধ্বনি ক্রমে পূরে রসাতল
ঢাকিয়া সিন্ধুর নাদ গভীর নিনাদে।
কহিলা গম্ভীর স্বরে—শূন্যপথে যেন
একত্রে জীমূতবৃন্দ মন্দ্রিল শতেক
মহাতেজে সুরবৃন্দে সম্ভাষি কহিলাঃ
"জাগ্রত কি দানবারি সুরবৃন্দ আজ?
দেবের সমরক্লান্তি ঘুচিল কি এবে?
উঠিতে সমর্থ কি হে সকলে এখন?
হা ধিক! হা ধিক! দেব অদিতিপ্রসূত!
সুরভোগ্য স্বর্গে এবে দনুজের বাস!
নির্বাসিত সুরগণ রসাতল ভূমে।"
দেবনাসিকায় বহে সঘন নিশ্বাস
আন্দোলি পাতালপুরী, তীর ঝড়বেগে,
দেব-সেনাপতি স্কন্দ উঠিয়া তখন
অবসন্ন, তেজঃশূন্য, অশক্ত, অলস,
কহিলা, "দেবতাদ্বেষী দনুজ প্রবেশে
পবিত্র অমরধাম কলঙ্কিত আজ।
অজর, অমর, শূর, স্বর্গ অধিকার
দেববৃন্দ স্বর্গভ্রষ্ট পড়িয়া পাতালে
ভ্রান্ত কি হইলা সবে? কি ঘোর প্রমাদ?
"অসুর মর্দন" আখ্যা কি হেতু হে তবে
অবসন্ন যদি আজ দৈত্যের প্রতাপে?
চিরযোদ্ধা—চিরকাল যুঝি দৈত্যসহ
জগতে হইলা শ্রেষ্ঠ, সর্বত্র পূজিত
আজি কিনা দৈত্যভয়ে ত্রাসিত সকলে
আহ এ পাতালপুরে আপনাবিস্মরি?

দেবগণের এই সকল উক্তির ভিতর আমরা দেখিতে পাই গূঢ়ভাবে কবির যে জ্বলন্ত ক্ষোভ প্রকাশ পাইতেছে সে ক্ষোভ দুর্দশাগ্রস্ত ভারতসন্তানগণের অবনতিজনিত ক্লৈব্য অনুভব করিয়া। ইহার সহিত যদি আমরা 'ভারত সঙ্গীত' কবিতার উক্তিগুলি মিলাইয়া দেখি তবে একই সুর আমাদের হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত করে, সে সুরে ঝঙ্কৃত হইতেছে শ্রেষ্ঠত্ব বিসর্জন দিয়া দাসত্ব বরণ করিয়া লইবার দারুণ মনোবেদনা।

অই দেখ সেই মাথার উপরে,
রবি, শশী, তারা দিন দিন ঘোরে,
ঘুরিত যেরূপে দিক শোভা করে,
ভারত যখন স্বাধীন ছিল।
সেই আর্যাবর্ত এখন (ও) বিস্তৃত,
সেই বিন্ধ্যগিরি এখন (ও) উন্নত,
সেই ভগীরথী এখন (ও) ধাবিত,
পুরাকালে তাহা যেরূপ ছিল।
কোথা সে উজ্জ্বল হুতাশন সম
হিন্দু বীরদর্প বুদ্ধি পরাক্রম,
কাঁপিত তরাসে স্থাবর জঙ্গম
গান্ধার অবধি জলধি সীমা।

আবার 'ভারত বিলাপ' কবিতায় স্বর্গচ্যুত দেবতার হৃদয় বেদনারই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই:—

ত্রিতল, ত্রিতল, চৌতল ভবন
সুন্দর সুন্দর বিচিত্র গঠন,
গোধূলি রাগেতে রঞ্জিত কায়।
অদূরে দুর্জয় দুর্গ গড়খাই,
প্রকান্ড মূরতি জাগিছে সদাই,
বিপক্ষ পশিবে হেন স্থান নাই,

গড়ের সমীপে আনন্দ উদ্যান
যতনে রক্ষিত অতি রম্য স্থান,
প্রদোষে প্রত্যহ হয় বাদ্য গান
নয়ন, শ্রবণ, তনু জুড়ায়।
জাহ্নবী সলিলে ওদিকে আবার,
হের জলযান কাতারে কাতার,
ভাসে দিবানিশি, গুণ-বৃক্ষ যার
শাল-বৃক্ষ ছাপি ধ্বজা উড়ায়।
অহে বঙ্গবাসী, জান কি তোমরা
অমরা জিনিয়া হেন মনোহরা,
কার রাজধানী, কি জাতি উহারা
এ সুখ-সৌভাগ্য ভুঞ্জে ধরায়।
নাহি যদি জান, এস এইখানে,
চলেছে দেখিবে বিচিত্র বিমানে,
রাজপুরুষেরা বিবিধ বিধানে
গরবে মেদিনী ঠেকেনা পায়।
অদূরে বাজিছে, "রুল বিট্রানিয়া"
শকটে শকটে মেদিনী ছাইয়া
চলেছে দাপটে বিট্রেনবাসীরা
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব লাগে কোথায়!
হায়রে কপাল! ওদেরি মতন
আমরাও কেন করিতে গমন
না পারি সতেজে, বলিতে আপন
যে দেশে জনম যে দেশে বাস।
ভয়ে ভয়ে চাই, ভয়ে ভয়ে যাই,
গোরাঙ্গ দেখিলে ভূতলে লুটাই
ফুটিয়া ফুৎকার বলিতে না পাই,
এমনি সদাই হৃদয়ে ত্রাস।

পরাজিত স্বর্গবাসীর মনোবেদনার সহিত পরাধীন ভারতবাসীর মনোবেদনা কবির হৃদয়ে একই সুরে যেন বাঁধা ছিল, প্রথম সর্গ সম্পূর্ণ পাঠ করিলে পাঠক তাহা অনুভব করিতে পারিবেন।

প্রথম সর্গে দেবগণের বাদানুবাদের ভিতর দিয়া প্রত্যেক দেবতার স্বভাবগত পার্থক্যও কবির তুলিকায় প্রস্ফুটিত হইয়াছে। অগ্নির স্বভাবগত উগ্রতার বর্ণনা এইরূপঃ—

কহিলা সে হুতাশন সর্ব অঙ্গে শিখা,
প্রজ্জ্বলিত হৈলা তেজে পাতাল দহিয়া।

হুতাশনের প্রজ্জ্বলিত অগ্নিগর্ভ বচন এবং উগ্রতার প্রভাব অন্য সকল উৎসাহহীন দেবগণের অন্তরেও প্রবল উৎসাহ সঞ্চারিত করিল। তখনঃ—

অগ্নির বচনে মত্ত আদিত্য সকলে।
ছুটিল হুঙ্কার শব্দে পুরি রসাতল।
একেবারে শত দিকে শত প্রহরণে
কোটি বিজলীর জ্যোতি খেলিতে লাগিল।

সকলেই যেন একেবারে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত ঠিক এইরূপই ভাব দেখা গেল। এই সময় শান্তমূর্তি বরুণ দেব কিছু বলিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

ধীর মূর্তি—

পাশ-অস্ত্র শূন্যে পরে হেলাইয়া যেন
উন্মত্ত জলধি-জল প্রশান্ত করিল।
দেখিয়া প্রশান্তমূর্তি দেব প্রচেতার
নিস্তব্ধ অমরগণ, নিস্তব্ধ যেমন
স্নিগ্ধ বসুন্ধরা, যবে ঝটিকা নিবারে
ত্রিরাত্রি ত্রিদিবা ঘোর হুঙ্কার ছাড়ি।

বরুণ দেব বলিলেন, 'হে দেবগণ ক্ষণকাল শান্ত ভাব ধারণ করুন, ঔদ্ধত্যে কার্যসিদ্ধি উদ্ধার করিতে দেবকুলের মধ্যে এমন কে কাপুরুষ আছে যাহার অনিচ্ছা হইতে পারে? তথাপি কোন প্রতিজ্ঞাবাক্য উচ্চারণ করিবার পূর্বে অগ্রে তাহার ফলাফল বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত।

সর্বজন হাস্যাস্পদ হয়ে কিবা ফল?
অসিদ্ধ প্রতিজ্ঞ লোক অনর্থ প্রলাপি।
নমস্য জগতে কার্যে সুসিদ্ধ যে জন।
* * * *
কার্যসিদ্ধি নহে শুধু বাক্য-আড়ম্বরে।
* * * *
দেব-তেজ, দেব-অস্ত্র, দেবের বিক্রম
বার বার এত যার কর অহংকার
এতদিন কোথা ছিল অসুরের সনে
যুঝিলে যখন রণে করি প্রাণপণ?
কোথা ছিল সে বিক্রম, যবে দৈত্যকুল
নিক্ষেপিল সুরবৃন্দে এ পুরী পাতালে?

বরুণ দেবতাদিগকে পরামর্শ দিলেন যে, দেবরাজ ইন্দ্র এখন সুমেরু পর্বতের শিখরে বিরূপ ভাগ্যকে প্রসন্ন করিবার জন্য তপস্যা করিতেছেন, অন্তত তাঁহার প্রত্যাগমন পর্যন্ত ধৈর্য ধরিয়া অপেক্ষা করা উচিত। অথবা কোন দেবতাকে পাঠাইয়া আগে ইন্দ্রের উদ্দেশ লওয়া উচিত, নেতৃহীন হইয়া এরূপভাবে যুদ্ধে অগ্রসর হওয়া উচিত নয়।

কিন্তু বরুণের এই অনুরোধ রক্ষিত হইল না। সূর্যদেব উঠিয়া নিজের বক্তব্য এইভাবে বলিলেন,

ত্রিজগতে জীবশ্রেষ্ঠ, নির্জর, অমর,
অদিতি নন্দনগণ চির আয়ুষ্মান
অনশ্বর দেববীর্য, শরীর অমর,
সর্বকালে সর্বলোকে প্রসিদ্ধ এ বাদ।
অসুর অচিরস্থায়ী, অদৃষ্ট অস্থির,
চঞ্চল দানবচিত্ত রিপু-পরবশ,
মন্ত্রী, মিত্র, কেহ নহে চির আজ্ঞাবহ,
জয়োৎসাহ, প্রভুভক্তি অনিত্য সকলি।

অতএব সুরের সহিত অসুরের তুলনাই হয় না। যদি দেবগণ অবিরত যুদ্ধ করেন তবে সেই যুদ্ধে কতকাল দৈত্যগণ তিষ্ঠিয়া থাকিতে সমর্থ হইবে? এইরূপ যুদ্ধ চালাইয়া যাইলে পুত্র-পরম্পরা দানব নিয়ত ক্ষয় ক্ষতি ও শোকে দগ্ধ হইতে থাকিবে। এমনই যদি অদৃষ্টের বিধান হয় যে, দেবতারা কোনকালেই দৈত্যগণকে পরাজিত করিতে পারিবে না, তাহা হইলে আমরা যুদ্ধ চালাইয়া যাইব, বৃত্রাসুরকে নিষ্কণ্টকে কখনই স্বর্গভোগ করিতে দিব না। আর ইন্দ্র কবে ফিরিবেন কে জানে, যদি ইন্দ্র বহু যুগ প্রত্যাগত নাই হন তবে কি এইভাবে দেবতারা বিনা চেষ্টায় পাতালপুরী আশ্রয় করিয়া দিন কাটাইবে, আর বৃত্রাসুর দেবগণকে উপেক্ষা করিয়া পরম সুখে স্বর্গে রাজত্ব করিবে? ইহা আমরা কখনই ঘটিতে দিব না।'

সূর্যের এই উক্তির পর সমস্ত দেবগণই যুদ্ধের পক্ষেই সম্মতি দান করিলেন।

প্রথম সর্গের পর দ্বিতীয় সর্গে একেবারে

হইতে কবি একেবারে আমাদের স্বর্গের নন্দন কাননে আনিয়া উপস্থিত করিলেন।

হেথা ইন্দ্রালয়ে নন্দন ভিতর
পতিসহ প্রীতিসুখে নিরন্তর
দানব রমণী করিছে ক্রীড়া।
রতি ফুলমালা হাতে দেয় তুলি
পরিছে হরষে সুষমাতে ভুলি,
বদনমন্ডলে ভাসিছে ব্রীড়া।
মদন-সজ্জিত কুসুম আসন
চারিদিকে শোভা করিছে ধারণ
বিচিত্র সৌন্দর্য সুরভিময়।
হাসিছে কানন ফুলশয্যা পরি'
স্থানে স্থানে যেন মৃত্তিকা উপরি
কতই কুসুম-পালঙ্ক রয়।
* * * *
বসন্ত আপনি সুমোহন বেশ
ফুটাইতে ফুল কত যে আবেশ
হয়েছে অপূর্ব শোভার মেলা।

দেবগণ সকলেই স্বর্গত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, কেবল স্বর্গে রহিয়াছেন কন্দর্পদেব ও তাহার পত্নী এবং সখা বসন্ত ঋতু। স্বর্গের সহিত ইঁহাদের এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে, ইঁহারা কোনমতেই স্বর্গত্যাগ করিয়া থাকিতে পারেন না। অপ্সরাগণও অবশ্য রহিয়া গিয়াছেন এবং সকলেই দৈত্যপতি বৃত্রের দাসত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

দৈত্যপত্নী ঐন্দ্রিলা পরমা সুন্দরী কিন্তু এত গর্বিতা যে সে সৌন্দর্যে যেন মাধুর্য প্রকাশ পায় না। দৈত্যরাজের বীর্যে মোহিত হইয়া গন্ধর্বকন্যা হইয়াও দৈত্যকে বরণ করিয়াছেন এবং তিনি সর্বদাই মনে মনে অনুভব করেন যে, তাঁহার ইন্দ্রজয়ী স্বামীর অসাধ্য কার্য জগতে কিছুই নাই। তাঁহার একমাত্র সন্তান রুদ্রপীড় একাধারে মহাবীর্য ও পিতৃমাতৃভক্তির অধিকারী। পত্নী অতি কোমলস্বভাবা ইন্দুবালা, এই পত্নীর সঙ্গলাভ করিয়া রুদ্রপীড়ের বীর হৃদয়ে কোমলতার উৎস গোপনে প্রবাহিত রহিয়াছে। কবি এই সকল চরিত্র অতি সুনিপুণ তুলিকায় চিত্রিত করিয়াছেন।

মদন পত্নী রতি ঐন্দ্রিলার পরিচর্যা করেন এবং ঐন্দ্রিলা তাহাকে নানাভাবে শচীদেবীর প্রশ্ন করেন। শচীদেবী—যিনি এককালে স্বর্গের অধিশ্বরী ছিলেন,—এখন যিনি স্বর্গচ্যুতা হইয়া পৃথিবীতে আত্মগোপন করিয়াছেন সেই শচী কিরূপ ছিলেন জানিবার জন্য ঐন্দ্রিলার দারুণ কৌতূহল। রতির উত্তর শুনিয়া ঐন্দ্রিলার কৌতূহল খুব বেশী পরিতৃপ্ত হয় না, বরং তাঁহার মনে হয় শচীর বিষয়ে রতি যেন খোলাখুলি সব কিছু বলিতেছে না। ঐন্দ্রিলা বুঝিতে পারেন রতি আজিও মনে মনে স্বর্গচ্যুতা শচীকে যতটা শ্রদ্ধা করে ঐন্দ্রিলাকে ভয় করে বটে কিন্তু শচীর শ্রদ্ধার একাংশ শ্রদ্ধাও হয়তো তাঁহাকে করে না। নির্বাসিতা শচীর প্রতি ঈর্ষায় ঐন্দ্রিলার প্রাণ জ্বলিয়া উঠে, কিন্তু কি উপায়ে ইহার প্রতীকার হইবে? ঐন্দ্রিলা ভাবিলেন, শচীকে বন্দিনী করিয়া আনিয়া সেই প্রাক্তন স্বর্গের রাণীকে তাহার পরিচারিকা করিবে এবং রতি ও মদন তাহা দেখিয়া বুঝিতে পারিবে যে স্বর্গের রাণী হইবার মত ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে কাহার আছে।

ঐন্দ্রিলা যেন অভিমানিনী হইয়াছেন, যেন তাঁহার যথার্থ মর্যাদা রক্ষিত হইতেছে না, এই-ভাবে একদিকে অনুরাগ অপরদিকে অভিমানের ভাব প্রকাশ করিয়া স্বামীকে একটি অনুরোধ করিলেন,—

ধরি অনুরাগে পতি করতল,
কহে দৈত্যরামা নয়ন চঞ্চল,
হাব ভাব হাসি প্রকাশ তায়।
শুন দৈত্যেশ্বর শুন শুন বলি,
বৃথা এ বিলাস বৃথা এ সকলি,
এখন(ও) আমরা বিজেতা নয়।
বিজিত যে জন বিজেতা চরণ
নাহি যদি সেবা করিল কখন
সে হেন বিজয়ে কি ফলোদয়?
তুমি স্বর্গপতি আজি দৈত্যেশ্বর
আমি তব প্রিয়া খ্যাত চরাচর
ধিক লজ্জা তবু সাধ না পুরে।
কটাক্ষে তোমার আশুপ্রাপ্য যাহা,
তব প্রিয় নারী নাহি পায় তাহা
তবে বা কি লাভ থাকি এ পুরে।
স্বয়ম্বরা হয়ে করেছি বরণ
হেরিয়া তোমাতে মহেন্দ্র লক্ষণ
ইচ্ছাময়ী হব হৃদয়ে আশ
যে ইচ্ছা যখন ধরিবে হৃদয়
তখনি সফল হবে সমুদায়,
জানিব না কারে বলে নৈরাশ।
ছাড়ি নিজকুল গন্ধর্ব ছাড়িয়া
বরিলাম তোমা যে আশা করিয়া
এবে যে বিফল হইল তাহা।

এইরূপ অনেক ভণিতার পর ঐন্দ্রিলা নিজের মনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন,

রতি মুখে আমি শুনিনু যেদিন.
সুমেরু এখন হয়েছে শ্রীহীন
শচীর সৌন্দর্য দেহে না ধরি।
শুনেছি সে নাকি পরমা রূপসী
বড় গরবিণী নারী গরীয়সী
চরণে গৌরব ঝরিয়া পড়ে।

সেই শচীকেই ঐন্দ্রিলার চাই, তিনি আসিয়া সেবাকারিণী দাসীরূপে ঐন্দ্রিলার পরিচর্যা করিবেন।

এই ইচ্ছা চিতে শুন দৈত্যপতি,
শচী দাসী হবে দেখিবে সে রতি,
হয় কিনা পুনঃ সুমেরু আলা।

ঐন্দ্রিলার চরিত্র এই কথাগুলির ভিতর দিয়া এমনভাবে কবি সুস্পষ্ট করিয়াছেন, যেখানে আর কোন ব্যাখ্যারই প্রয়োজন হয় না।

এবার শচীর চরিত্রের মহিমা কবি যে ভাবে আঁকিয়াছেন সে সম্বন্ধে কিছু বলিব।

শচী স্বর্গচ্যুতা হইয়া নৈমিষারণ্যে একটি সহচরীর সহিত আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, সঙ্গে রক্ষক কেহ নাই, কেননা দেবগণ এখন পাতালে বাস করিতেছেন, পুত্র জয়ন্তও সেইখানেই আছেন। ইন্দ্রদেব কুমেরু পর্বতে তপস্যায় মগ্ন রহিয়াছেন, সুতরাং শচী কেবল যে স্বর্গরাজেশ্বরী হইয়াও আশ্রয়হীনা হইয়াছেন তাহা নয় আত্মীয়স্বজনের সঙ্গ হইতেও বিচ্যুতা হইয়াছেন। অহরহঃ স্বর্গের স্মৃতি তাঁহার অন্তর দগ্ধ করিতেছে, পৃথিবীর বদ্ধ বায়ু তাঁহার পক্ষে বিষম ক্লেশকর হইয়াছে, কতদিনে যে এ দুর্দশার শেষ হইবে তাহার কিছুই ঠিক নাই। এত দুর্দশাতেও শচীদেবী সেই একই শচী। তাঁহার ধৈর্য, তাঁহার গাম্ভীর্য, তাঁহার আত্ম-সম্মানবোধ প্রভৃতি বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। তাঁহার সঙ্গিনী চপলাই স্বর্গের মেঘাঙ্ক-বিহারিণী চপলা,—

পূর্বস্মৃতি স্মরণ করিয়া শচী তাঁহাকে বলিতেছেন:—

কেমনে ভুলিব বল, মেঘে যবে আখণ্ডল
বসিত কার্মুক ধরি করে,
তুই সে মেঘের অঙ্কে খেলাতিস কত রঙ্গে
ঘটা করি লহরে লহরে।

কোথায় আজ শচীপতি ইন্দ্রদেব! যে স্বামীর সহিত তাঁহার তিলমাত্র বিচ্ছেদ হইত না তিনি আজ এমনভাবে নিরুদ্দেশ হইয়া রহিয়াছেন যে, তাঁহার সংবাদ মাত্রও পাইবার উপায় নাই। "ইন্দ্রের সে মুখ কান্তি ঘুচায়ে নয়ন ভ্রান্তি" কতদিন শচীর নয়ন সমক্ষে উদ্ভাসিত হয় নাই। নন্দনবন, তরুরাজি, মন্দাকিনী প্রবাহিনী, সুমেরুশিখর সকলেরই স্মৃতি শচীর হৃদয়কে দগ্ধ করিতেছে, আর তিনি দেবদৈত্যের যুদ্ধের পরে একমাত্র সন্তান জয়ন্তকেও আর দেখিতে পান নাই। শচীদেবী সঙ্গিনী চপলার সহিত এই সকল আলাপে মগ্ন আছেন এমন সময় মদন আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন।

হেন কালে পুষ্পধনু নিত্য মনোহর তনু
চিরহাসি অধরে প্রকাশ,
আসি শচী সন্নিধান বাড়ায়ে শচীর মান
ইন্দ্রানীরে করিল সম্ভাস।

"নিত্য মনোহর তনু, চিরহাসি অধরে প্রকাশ।"
এই একটিমাত্র ছত্রে কবি মদনের চিত্র পরিপূর্ণ-ভাবে আঁকিয়াছেন।

মদনকে দেখিয়া স্বভাব-প্রখরা চপলা তাহাকে ব্যঙ্গ ও তিরস্কারের ভাবে যে কথাগুলি বলিল তাহাতে দেবতাগণের সঙ্গত্যাগ করিয়া, অসুরের অনুগ্রহভাজন হইয়া মদনের এই স্বর্গবাসের বিরুদ্ধে বেশ একটু অভিযোগ আছে,—

চপলা হেরি সত্বর কহিলা "হে পুষ্পশর
হেথা গতি কোথা হতে বল।
আছ তো আছ তো ভাল, গোরা ছিলে হলে কাল
তোমার ও রতির কুশল?
শুনি না কি মালাকার হয়ে এবে আছ মার
ঐন্দ্রিলার উদ্যান সাজাও
নিজ করে গাঁথ মালা সাজাতে দানব-বালা,
মালা গাঁথি অসুরে পরাও।
এত গুণপনা তব জানিলে হে মনোভব
নিত্য গাঁথাতাম পুষ্পহার,
থাকিতে হে অন্য মনে ত্যজি পুষ্প-শরাসনে
ত্রিভুবন পাইত নিস্তার।
বড় আগে হেলি হেলি পুষ্পধনু পৃষ্ঠে ফেলি
বেড়াইতে সুমোহন বেশ,
ত্যক্ত করি বারে বারে সর্বলোক সবাকারে,

ছি, ছি, তব নাহি লাজ, ধরি মালাকারসাজ
এখন(ও) আছ স্বর্গপুরে,
রতির কি লজ্জা নাই, মুখেতে মাখিয়ে ছাই
ঐন্দ্রিলারে সাজায় নূপুরে।

শচীদেবী চপলার এই ভর্ৎসনা শুনিয়া বলিলেন,

চপলা, তুমি কেন বৃথা কামকে গঞ্জনা দিতেছ? সে যদি স্বর্গপুরী ত্যাগ করিয়া এই সকল দুঃখকষ্ট বরণ করিত, তাহা হইলেই বা কি ফল হইত?

"যাতনা ভাবনা নাই, সদাসুখী সর্বঠাঁই
চিরজীবী হউক সে জন।"

তখন,

কন্দর্প অপাঙ্গ ঠারে শাসাইয়া চপলারে
সসম্ভ্রমে শচী প্রতি কয়,
সুখ দুঃখ ইন্দ্রপ্রিয়া সকলি বাসনা নিয়া
যুক্তির আয়ত্ত সে নয়।
ছাড়িয়া নন্দন বনে কোথাও বা ত্রিভুবনে
জুড়াইবে কন্দর্পের প্রাণ।
কামের বাঞ্ছিত যাহা নন্দন বিহনে তাহা
না পাইব গিয়া অন্যস্থান।
সেবিয়া অসুর, নর কি দানবী কি অমর,
তাই স্বর্গ না পারি ছাড়িতে।
যার যেথা ভালবাসা তার সেথা চির আশা
সুখ দুঃখ মনের খনিতে।

ইহার পর মদন শচীকে তাঁহার সম্প্রতি যে বিপদের সম্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছে তাহা জানাইলেন। ঐন্দ্রিলার অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য দৈত্যপতি শচীকে কৌশলে অথবা বলপ্রয়োগে যেরূপেই হউক ধরিয়া লইয়া যাইবার আদেশ দিয়াছে। সেই আদেশ অনুসারে 'ভীষণ' নামে দৈত্য তাহার অনুচর সঙ্গে লইয়া শীঘ্রই নৈমিষারণ্যে উপস্থিত হইবে, এখন শচী কর্তব্য নির্ধারণ করুন।

মদনের নিকট এই সংবাদ শুনিয়া শচীদেবী কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। অনেক ভাবিয়া শেষে পুত্র জয়ন্তকে মানস ধ্যানে আহবান করাই সঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন,—

ইন্দ্রাণী তো বীরপ্রসবিনী।
কোথা পুত্র হে জয়ন্ত, জননীর দুঃখ অন্ত
কর শীঘ্র আসিয়া হেথায়।
তোমার প্রসূতি হায় দৈত্যের দাসত্বে যায়
রক্ষ আসি পুত্র তব মায়।
এত কহি ইন্দ্রপ্রিয়া, ধ্যানে দৃঢ় মন দিয়া,
জয়ন্তরে করিলা স্মরণ,—
জননী ভাবেন যদি সে ভাবনা গিরি নদী
ভেদি সুতে করে আকর্ষণ।
জয়ন্ত পাতালদেশে শুনিয়া ক্ষণনিমেষে
মায়ের সে মানসের ধ্বনি,
ব্যথিত কাতর মনে কটি বাঁধি শরাসনে
অবনীতে চলিলা তখনি।

ইতিমধ্যে চপলা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। শচীকে তিনি বলিলেন, "কই, এখনও তো জয়ন্ত আসিতেছে না, যদি ইহার মধ্যে দৈত্য আসিয়া পড়ে তবে কি উপায় হইবে। আমি বলি;—

মর্ত্য ছাড়ি চল দেবি বৈকুণ্ঠ আলয়,
কিম্বা সে কৈলাস চল উমার নিকটে,
বিশ্বাস কর্তব্য কভু না হয় কপটে,
কমলা অথবা গৌরী ...

কিন্তু শচীদেবী এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না, বিপদের দিনে তিনি মর্ত্যে নৈমিষারণ্যে আশ্রয় লইয়াছেন, এখানে তিনি স্বাধীন, যে বিপদই ঘটুক না কেন, আশ্রয় প্রার্থনা অথবা আশ্রয়দাতার কৃপা ভিক্ষা শচী করিতে পারেন না।

চপলা আর একটি প্রস্তাব করিলেন, সেটি ছদ্মবেশ ধারণের প্রস্তাব। কিন্তু শচী এ প্রস্তাবেও সম্মত হইলেন না। শচী চিরদিন শচীই থাকিবেন, আত্মরক্ষার জন্য ছলনার আশ্রয় তিনি একান্ত ঘৃণ্য বলিয়া মনে করেন, তাই তিনি বলিলেন,

চিরদিন যেইরূপে জানে সর্বজন
সহচরি, সেইরূপ(ই) শচীর এখন।
আসিছে দংশিতে ফণী করুক দংশন।
নিজ রূপ সখী নাহি ত্যজিব কখন।

ইহার পর,—

বলিতে বলিতে অঙ্গে হইল প্রকাশ
অপূর্ব মহিমাচ্ছটা কিরণ আভাস।
নয়ন, ললাট, গণ্ড হৈলা জ্যোতির্ময়,
সৃষ্টির সৃজনে যেন নবসূর্যোদয়,
ঘোর ক্ষিপ্ত প্রচণ্ড উন্মত্ত যেই জন
হেরে স্তব্ধ হয় সেও সে নেত্র বদন।
নিরখি চপলা চিত্তে অসীম আহ্লাদ;

ইহার পর "ভীষণ" দৈত্য আসিলে চপলা যখন তাহাকে শচীর নিকটে লইয়া গেল তখন সেই দৈত্য শচীদেবীকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল।

ইন্দ্রপ্রিয়া বসে স্থির বেশ।
জগদ্-বরণ পৃষ্ঠে সুনিবিড় কেশ।
মুখে আভা ভানু যেন উথলিয়া পড়ে,
গাম্ভীর্য-প্রতিমা বিধি দেহ যেন গড়ে।
দেখিয়া স্তিমিত-নেত্র হইল ভীষণ,
বাকশূন্য শ্রুতিশূন্য করে দরশন।
বিশ্বসৃষ্টি করি যবে ব্রহ্মা অকস্মাৎ
করিলা মানবচিত্তে চৈতন্য প্রভাত,
আদিসৃষ্ট সেই প্রাণী নবসূর্যোদয়,
যেভাবে দেখিলা দৈত্যে সেই ভাব হয়,
সংজ্ঞা নাই চিন্তা নাই, নাহি আত্মজ্ঞান,
চক্ষুতেই গত যেন চৈতন্য পরাণ।
প্রহরেক কাল হেন স্তম্ভিত থাকিয়া—
চপলারে জিজ্ঞাসিল ভাবিয়া চিন্তিয়া—
"পুরন্দর-ভার্য্যা শচী এই কি ইন্দ্রাণী?"
চপলা কহিলা, "এই ত্রিদিবের রাণী।"

ইহার পর জয়ন্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং অসুরের সহিত যুদ্ধে জয়ন্ত অসুরকে নিহত করিলেন।

কিন্তু শচীর ইহাতেও বিপদ দূর হইল না। জয়ন্তের হস্তে ভীষণের নিহত হইবার সংবাদ পাইয়া ক্ষোভে ক্ষিপ্ত দৈত্যপতি পুত্র রুদ্রপীড়কেই শচীকে আনিবার জন্য পাঠাইতে মনস্থ করিলেন।

"রুদ্রপীড়, পুত্র শুন কহি সে তোমারে,"
কহিলা তনয়ে চাহি গাঢ় নিরীক্ষণে—
"যশোলিপ্সা চিতে তব অতি বলবতী,
কর তৃপ্ত জয়ন্তেরে করিয়া আহূতি,
শচীরে আনিতে চাহ অমরাবতীতে;
অনাথা না হয় যেন, যাহ ধরণীতে;
শত যোদ্ধা সুসৈনিক বীর অগ্রগণ্য

কিন্তু রুদ্রপীড় কিরূপে পৃথিবীতে যাইবেন, দেবতারা যুদ্ধার্থে উপস্থিত হইয়া স্বর্গ বেষ্টন করিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদের পরাজিত করিয়া পথ করিতে যদি হয় তবে সে তো অনেক সংকট ও অনেক সময় ক্ষেপণের প্রশ্ন। রুদ্রপীড়ের অবশ্য যুদ্ধ করাই ইচ্ছা, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে একশতজন সঙ্গী ছিলেন তাঁহারা ইহাতে মত দিলেন না, বলিলেন, "এক্ষেত্রে কৌশল অবলম্বন করা উচিত।"

কৌশলটি এইরূপ; তাঁহারা শ্বেত পতাকা তুলিয়া দেবশিবিরে একজন দূত পাঠাইবেন। দূত অবধ্য, সুতরাং সে দেবশিবিরে যাইবার সময় বাধা পাইবে না, দূত গিয়া বলিবে, "ঐন্দ্রিলার পিতা গন্ধর্বরাজ সহসা শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত ও বিপন্ন হইয়াছেন। তাই তিনি তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য একশত দৈত্য সৈন্য পাঠাইতে বলিয়া দৈত্যরাজের নিকট দূত পাঠাইয়াছিলেন, সেই একশত দৈত্য যোদ্ধাকে যদি দেবগণ পথ ছাড়িয়া দেন তবেই তাহারা যাইতে পারে।

এই প্রস্তাবে দেবগণের ভিতর একটি পরামর্শ সভা বসিল। বরুণদেব ধীর বুদ্ধি, তিনি দৃঢ়ভাবে আপত্তি জানাইয়া বলিলেন, "কপট দৈত্যের কথায় বিশ্বাস করা যায় না। ঐন্দ্রিলার পিত্রালয় হইতে যদি দূত আসিত সে কোন পথে আসিবে। আমার মনে হয়, কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দৈত্যরাজ এই দৈত্য যোদ্ধাদের পাঠাইতেছে। সূর্য বলিলেন, দৈত্যেরা যদি যাইতে চায় যাক তবে দেবপক্ষ হইতে কেহ তাহাদের অনুসরণ করিয়া দেখুক যে, তাহারা কি উদ্দেশ্যে ও কোথায় যাইতেছে। অগ্নি বলিলেন, শত্রু বাহিরে যাক বা ভিতরে থাকুক সমানই কথা। বায়ুর মতি স্থির নাই, একবার এ পক্ষে মত দেন একবার অন্য পক্ষে মত দেন। সর্বশেষে সেনাপতি কার্তিকেয় বলিলেন, "শত্রু যত বাহিরে যায় ততই ভাল, কেননা, স্বর্গে তাহাতে সংখ্যাল্প হইবে, সুতরাং বাহিরে যাইতে বাধা দেওয়া উচিত নয়।

সেনাপতির এই প্রস্তাব অনুসারে রুদ্রপীড়ের সৈনাপত্যে একশত দৈত্য সৈন্য নিরুপদ্রবে পৃথিবীতে রওনা হইল।

ইহার পর শত দৈত্য অনুচরসহ রুদ্রপীড়ের সহিত জয়ন্তের যুদ্ধ বর্ণনা অতি অপূর্ব ভাষায় লিখিত হইয়াছে। জয়ন্ত যেভাবে যুদ্ধ করিতেছেন সেই বর্ণনা পড়িলে মুগ্ধ হইতে হয়, অবশেষে জয়ন্ত মূর্ছিত হইলেন। দেবের মূর্ছাই মৃত্যুর তুল্য। শচী যখন পুত্রের মূর্ছিত দেহ ক্রোড়ে করিয়া বসিয়াছেন তখন রুদ্রপীড় নিজে তাঁহার অঙ্গে হস্তক্ষেপ করিতে পারিলেন না। একশতের ভিতর অবশিষ্ট

শ করিলে সেই অ
য়া শূন্যপথে লইয়া চ
• দেব দৈত্যের যুদ্ধেত আপনারা জানেন,
ইয়াছে. রুদ্রপীড় দেখিবার একটা রোগ,
ইতস্ততঃ মূর্চ্ছিত দেবদেহ সই কথা, কারণ
পড়িয়া রহিয়াছে। বৃত্রাসুরের পাওয়া যায়
যখন মূর্চ্ছিত শচীদেহ আনিয়া নামাজনের এই

শচীমূর্ত্তি দৈত্যপতি, । পর্যন্ত
নেহারি অনন্য গতি— সংখ্যা
চমকি সম্ভ্রমে শীঘ্র উঠি দাঁড়াইল। না"

দাম্ভিক দৈত্যেশ্বর এখানে 'অনন্য গতি; তাঁহাকে সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইতেই হইল।

শচী বন্দিনী হইয়া আসিয়াছেন, ঐন্দ্রিলার আনন্দের সীমা নাই, এখনও তিনি শচীকে দেখেন নাই, পুত্রের নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছেন,

কেমন দেখিতে শচী কিরূপ বরণ,
কিরূপ আকৃতি কিবা অঙ্গের গঠন
কিরূপ বসন ভূষা চলন কিরূপ
কত বয়ঃ কার মত কিবা তার রূপ
হাব ভাব হাসি ভংগী নাসা ওষ্ঠাধর
বক্ষ, বাহু, কটি, উরু, অংগুলি নখর,
দেখিতে কিরূপ জিজ্ঞাসয়ে শতবার,
জিজ্ঞাসয়ে কেশপাশ ভুরু কি প্রকার,
তিল তিল করি শচী রূপের বর্ণন,
শতবার শতছলে করিলা শ্রবণ
রুদ্রপীড় কহে শচী অতি রূপবতী
বর্ণিতে সে রূপ নাহি আইসে ভারতী,
রূপ হ'তে গাম্ভীর্য গভীর অতিশয়,
ক্ষণিক আমার চিত্তে সম্ভ্রম উদয়,
বসিল নৈমিষে যবে পুত্র কোলে করি,
দেখিয়া সে মূর্তি চিত্ত উঠিল শিহরি,
দেবী বটে, বটে শচী শত্রুর বনিতা,
তথাপি সে মূর্ত্তি চিত্তে আছে প্রভাবিতা,

পুত্রের মুখে শচীর এইরূপ বর্ণনা শুনিয়া ক্রোধে ঐন্দ্রিলার অংগ জ্বলিয়া গেল। ঐন্দ্রিলা শচীর রূপগুণের কথা আর কত শুনিবেন? এই সব কাহিনী শুনিতেই কি শচীকে নৈমিষারণ্য হইতে বন্দিনী করিয়া আনা হইল?

আছিল বিশ্বাস অগ্রে গরবে কেবল,
শচীর সুখ্যাতি ব্যাপ্ত ত্রিলোকমণ্ডল;
সৌরভ যে এত তার মাধুর্যে নির্মল,
না জানিত, এবে শুনি হইল পাগল।
তাহে পুত্র মুখে তার রূপের বাখানি
জ্বলন্ত গরলে যেন পড়িল পরাণী।

ইহার পর ঐন্দ্রিলা আর নিজের রাগ ও হিংসা দমন করিতে পারিলেন না, স্বামীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

শুন হে দানবপতি, শুন তোমা কহি,
আর সে তিলার্ধ কাল বিলম্ব না সহি
এখনি আনহ শচী কিঙ্করীর বেশে,
দাঁড়াক আসিয়া পার্শ্বে রূপব্যাখ্যা শেষে,
রূপ আছে আছে তার রূপ কেবা চায়,
দেখি আগে কেমনে সে চামর ঢুলায়
* * * *
জানে যদি ভাল মত হাব-ভাব-হাস,
রাখিব নিকটে তায় শিখাবে বিলাস,
নতুবা যেমন সিংহী—সিংহীর আচারে
থাকিবে পিঞ্জরাগারে চতুষ্পথ-ধারে;

সবে;
সবে।
ী;
লার।
তার পরিচয়
বলিলেন—

(খ) গ্রীষ্মাতিশয্যে ওয়েলিংটন সে দাসী;
জনসাধারণ সোডার বোতল নিয়েশ?
করেছেন। জননী ব্যাঘ্রীর
মং (গ) ল্যাংড়ার বাজারের তাপেন বলিলেন—
পুত্র অনেকের পকেটে নাকি অ যে নারীদের
মধ্যে অং তারই আঁচে কপ যদি অধিক
গৌরবের পাত্র। তাহা সহ্য করা
আমার পক্ষে একেমাঠের গ্যালারী। ইহার পরে
বলিলেন "শুন কহি ছেড়ে ম সুদৃঢ় বচন—
অলক্তে রঞ্জিবে শা !! জ এ চরণে।"

ঐন্দ্রিলার এই বাক্য লাসে ঈশানী শুনিতে পাইয়া মহেশ্বরকে তাহা জানাইলেন। শুনিয়া—

মহেশের ক্রোধানল
জ্বলিল প্রদীপ্ত করি গগনমণ্ডল,
বাজিল প্রলয়-শৃংগ শ্রুতি-বিদারণ
* * * *
টলমল টলমল ত্রিদশ আলয়,
মূর্চ্ছিত দেবতা-দেহে চেতনা-উদয়;
দোদুল্য সঘনে শূন্যে সুমেরু-শিখর;
ঘোর বেগে বৈজয়ন্ত কাঁপে থর থর।
ঐন্দ্রিলার হস্ত হ'তে খসিল কঙ্কণ,
রুদ্রপীড়-অংগে হৈল লোম-হরষণ;
নিঃশঙ্ক বৃত্রের নেত্রে পলক পড়িল,
"রুদ্রের ক্রোধাগ্নি চিহ্ন" বলিয়া উঠিল।

স্ত্রীর বশীভূত হইয়া কতখানি অন্যায় কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহা এতক্ষণে অসুররাজের কতকটা ধারণা হইল; ইহার মূলে অবশ্য শিবের ক্রোধভাজন হইবার ভয় ছিল। তিনি এবার শচীকে মুক্তি দিতে মনস্থ করিলেন এবং রতিকে দিয়া শচীর নিকট এই সংবাদ পাঠাইলেন। রতি খুব আহ্লাদিত হইয়াই শচীকে এই সংবাদ দিতে গেলেন।

শচী বন্দিনী হইয়া নিজ বাসভূমিতে এখন অবস্থিতি করিতেছেন, শচীকে পাইয়া আমরা আবার পুলকিত হইয়া উঠিয়াছি—

"শচী পেয়ে পুনরায় অমরার মাঝে
অমরা হাসিছে আজি।"

কিন্তু শচীর নিকট অমরা আজ অমরার আনন্দ লইয়া উপস্থিত হইতে পারে নাই। স্বর্গ এখন শচীর কারাগার কিন্তু চপলা তাঁহাকে বলিলেন—

অই যে বিজলী
কার রথচক্রনেমি ভাতিতে ছুটিছে?
শচী ঐন্দ্রিলার দাসী বলে কি উহারা?
কিম্বা বলে সুরেশ্বরী মহিষী তাদের?

এই উক্তি শচীদেবীকে আনন্দ দান করে কিন্তু তিনি নৈমিষারণ্যে পুত্র কোলে করিয়া যে স্বর্গসুখ অনুভব করিয়াছেন তাহা পুত্রহীন স্বর্গে নাই। ইন্দ্রানীর উক্তি তাঁহাতে আরও মহত্ত্বদান করিয়াছে—

পুত্র কোলে বসিনু যখন সে নৈমিষে।
কোথা স্বর্গ তার কাছে, হায় লো চপলে!
ক্ষিপ্ত হয়ে ভাবিলাম না হ'তে অধিক
সুখ এ অমরালয়ে! পুত্র পেলে কোলে
জননীর স্বর্গ সুখ সর্বত্র সমান।

ইহার পরে রতি শচীর নিকট আসিয়া শচীর চরণ বন্দনা করিলেন। রতি উৎফুল্ল-চিত্তে শচীদেবীকে তাঁহার আসন্ন মুক্তি সংবাদ দিলেন, কিন্তু শচীদেবী উৎফুল্ল হইলেন না—ঝড়ের পূর্বে প্রকৃতি যেরূপ গম্ভীর রূপ ধারণ করে শচীদেবীও সেইরূপ শান্তভাবে কহিলেন—রতি তোমাকে দানব ছলনা করিয়াছে। তাহার পর তেজস্বিনী শচীকে দেখি—ঝড়ের উদ্দামতার মতই তাঁহার উক্তির উদ্দামতা। তিনি বলিলেন—ইহা তো সুসংবাদ নয়—দানবপতি আমাকে মুক্তি দিতে চান,

রতি, শুভ সমাচার
শুনাতে আমায় যদি শুনাইতে আজ,
তাপিত শচীর নাথ বাসব আপনি
প্রবেশিলা অমরায় স্বহস্তে মোচন
করিতে ভার্য্যার দুঃখ; কিম্বা পুত্র মম
জয়ন্ত জননী-ক্লেশ করিয়া নিঃশেষ
আসিছে বসিতে কোলে; হে অনঙ্গরাম,
শচী কি সে দানবের আজ্ঞাবহ দাসী,
আদেশে ছুটিবে তার বলিবে যেখানে?
মোচন করিতে আমা নাহি কি সে কেহ,
অকুল অমরকুল থাকিতে এখানে?
না রতি, কহ'গে দৈত্যে, চাহি না উদ্ধার,
সহিব এ কারাবাসে অশেষ যন্ত্রণা
পতি হস্তে যতদিন মুক্তি নহে মম।

শচীর চরিত্র যেভাবে কবি বর্ণনা করিয়াছেন সংক্ষেপে এইখানে তাহার কিছু আলোচনা করিলাম। ইহার পর রুদ্রপীড়-পত্নী ইন্দুবালা সম্বন্ধে বলিয়া আমরা এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

ইন্দুবালা যেন দৈত্যগৃহের সকল অত্যাচার ও অমংগলের মধ্যে একটি মংগল-প্রদীপ। রতি ও ইন্দুবালার কথোপকথনের মধ্য দিয়াই ইন্দুবালা চরিত্রের মাধুর্য প্রকাশিত হইয়াছে। নারীর সকল প্রকার কোমলতা তাঁহার চরিত্রকে আশ্রয় করিয়াছে। সকলের ব্যথাই তাঁহাকে ব্যথিত করে। ইন্দ্রানীকে তিনি দেখেন নাই তবুও রতির নিকট সংবাদ লইতেছেন মতে ইন্দ্রানীকে রক্ষা করিবার কেহ আছেন কিনা মায়াময়ীর শচীর দুঃখে একথা মনে হয় নাই যে, যে বীর শচীকে রক্ষা করিবে তৎকর্তৃক তাঁহারই স্বামীর হয়তো অমংগল হইবে।

তিনি স্বামীর স্নেহ যত্ন পান তাই তিনি ভাবিতে পারেন না তাঁর সেই স্বামী অন্য এক নারীর প্রতি নির্দয় হইবেন কেন?

আমিও রমণী রমণীও শচী
তবে কেন তিনি তায়,
না করিয়া দয়া হইয়া নিষ্ঠুর
ধরিতে গেলা ধরায়?
কি হবে শচীর পতি নেই কাছে
মহাবীর পতি মম;

আমিও যদ্যাপি, পড়ি সে কখন
বিপদে শচীর সম!
ভাবিতে সে কথা থাকিয়া এখানে
আমার(ই) হৃদয় কাঁপে।

ইন্দুবালা বুঝিয়া পান না ঐন্দ্রিলার আচরণের হেতু। তিনি ভাবেন,

ঐন্দ্রিল-দুহিতা সেবিতে কিঙ্করী
স্বর্গে কি ছিল না কেহ,
ব্রহ্মাণ্ড-ঈশ্বর দানব-মহিষী
দাসী চাহি ভ্রমে সেহ!
আমারে না কেন কহিলা মহিষী
আমি সেবিতাম তাঁর,
পুরে না কি তাঁর সাধের ভাণ্ডার
শচী না সেবিলে পায়?
কেন আইলা দৈত্য এ অমরালয়ে
আঁহিল আপন দেশ;
পরে দিয়া পীড়া লভিয়া এ যশঃ
কি আশা মিটিবে শেষ?
* * * *
রতি কহে "আহা! তুমি ইন্দুবালা
না দেখি শচীরে তার শোকে এত
বিধুরা হইলা ধনি!
দেখিলে তাহারে না জানি সে কিবা
করিত তোমার চিতে;
* * * *
যে দেখেছে কভু চিরদিন তার
হৃদয়ে থাকিবে পশি।"

তখন,—

সুকুমার মতি কহে ইন্দুবালা
"হায়, রতি কি কহিলা,
এ হেন রমারে করিতে কিঙ্করী
দৈত্যেন্দ্রাণী আকাঙ্ক্ষিলা,
আমারে লইয়া কন্দর্প-কামিনী
চল সে পৃথিবী পর',
হইতে দিবনা নিদয় এমন
ধরিব পতির কর।"

স্বামীকে নির্দয় যদি কেহ বলে ইন্দুবালার তাহা সহ্য হয় না, তিনি তখন বলেন, উপরে কঠিন মনে হইলেও তাঁহার অন্তর অতি কোমল।

দেখ না কি কভু শৈল-অঙ্গে কত
স্বাদু নীরধারা বয়'।
শচীর লাগিয়া না নিন্দহ তাঁরে
বীর তিনি রণপ্রিয়;
শচীর বেদনা ঘুচাব আপনি,
ফিরিয়া আসিলে প্রিয়।
যাব শচীপাশে করিব শুশ্রূষা
যাতে সাধ দিব আনি
মহিষী-কিঙ্করী হইতে দিবনা
কহিনু নিশ্চিত বাণী।

ইন্দুবালা দৈত্যকন্যা, কিন্তু যুদ্ধ একেবারেই তাঁহার সহ্য হয় না। তিনি বলেন,

যুদ্ধেতে কি লাভ, যুদ্ধ করে যারা
বিচারিয়া যদি দেখে
তবে কি সে কেহ যশের আকর
বলিয়া উল্লেখে একে?
কত দৈত্য সুতা হয় অনাথিনী
কত পিতা পুত্রহীন,
কত দেবতনু পড়িয়া মূর্চ্ছাতে
অনুক্ষণ হয় ক্ষীণ!

দেশ
দেশ ও দৈত্য সম্বন্ধে ইন্দুবালার ... রচনার মাধুর্য, গাম্ভ
মিত্র বোধ নাই, উভয়ের দুঃখ তাঁহার সমান। একত্র সমাবেশের অ ... র্য প্রভৃতি নানারূ
হেমচন্দ্রের ... আস্বাদ গ্রহণ করা যায় না
মনোবেদন।
স্বামীর উপর তাঁহার যে প্রেম তাহার যাহার বিষয় ব ... নায় স্থানে স্থানে তিনি
সীমা নাই। স্বামীর জন্য সর্বদা তাঁহাকে যেন তাঁহার ... না করিতেছেন দু' এক ছত্রে
উদ্বেগে কাল কাটাইতে হয়। আবার স্বামী যেমন অ ... সম্পূর্ণভাবে পরিচয় দিয়াছেন,
যখন দূরে আছেন তখন অবিরত তিনি ... নদেবের বর্ণনায়,
তাঁহারই ধ্যান করিতেছেন,

এই ... ফুল তাঁর প্রিয় অতি
বলি কোন পুষ্প তুলে,
এই পালঙ্কেতে বসিবার সাধ
বলি তাতে বৈসে ভুলে।

সেই ইন্দুবালা ব্যাকুলভাবে ... কে ... যুদ্ধে পড়িল", এই প্রশ্ন করিয়া যখন "রুদ্রপী ... ড়" এই শব্দটি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ ... করিল সেই মুহূর্তেই তিনি মৃত্যুর ... অঙ্কে ঢলিয়া পড়িলেন। কোমল কুসু ... ঝটিকার স্পর্শ লাগিতে না লাগিতে ... ঝরিয়া পড়িল।

এই মহাকাব্যের প্রত্যেক চরিত্র ও বিষয়-বস্তুর সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা করিলে ইহার অপরূপত্ব বুঝানো সম্ভব হয় না। কখনো রণস্থলের বর্ণনা, কখনও বা পুষ্পময় নন্দনের শোভা বর্ণনা, কখনও বা বিশ্বকর্মার কর্মশালার

প্রসারিত বক্ষোদেশ, বাহু লোহবৎ
দেব শিল্পী ঘুরাইছে চক্র লোহময়
* * * *
ঘুরিতেছে একবার শিল্প শাল যুড়ি,
সংযোজিত পরস্পরে অদ্ভুত কৌশলে
লক্ষ লক্ষ লৌহযন্ত্র সে চক্রের সহ।

প্রভৃতি বর্ণনা যেন আমাদের শ্বাস রুদ্ধ করে। সম্পূর্ণ কাব্যখানি পাঠ না করিলে কবির

... অগ্রে অনল মূর্তি দেব বৈশ্বানর
প্রদীপ্ত কৃপাণ করে উন্মত্ত স্বভাব
কহিতে লাগিল দ্রুত কর্কশ বচনে
স্ফুলিঙ্গ ছুটিল যেন ঘোর দাবাগ্নিতে।

বরুণের বর্ণনায়,—

তখন প্রচেতা দেব বরুণ বিখ্যাত
উঠিল গম্ভীর ভাব ধীর মূর্তি ধরি
পাশ অস্ত্র শূন্যেপরে হেলাইয়া যেন
উন্মত্ত জলধি জল প্রশান্ত করিল।

বৃত্রাসুরের বর্ণনায়,—

নিবিড় দেহের বর্ণ মেঘের আভাস,
পর্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ
নিশান্তে গগনে পথে ভানুর ছটায়।
বৃত্রাসুর প্রকাশিল তেমনি সভায়।
ভ্রূকুটি করিয়া দর্পে ইন্দ্রাসন পরে
বসিল কাঁপিল গৃহ দৈত্য পদ ভরে।

নিয়তির মূর্তি,—

পাষাণ মুরতি, দৃষ্টি অতি নিরদয়।
নিত্য নিরীক্ষণ
করতলস্থিত ব্যাপ্ত ভবিতব্য পটে।

কবি হেমচন্দ্র সম্বন্ধে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সামান্য কিছু উল্লেখ করা হইল। ভরসা করি, ইহার পর রসপিপাসু সাহিত্যরথিগণ এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিবেন।


# পায়ের ঘা, ব্যথা-বেদনায়

## কেন কষ্ট পাইতেছেন?

### এই বিশ্ববিখ্যাত জাম্বক ব্যবহার করুন

জাম্বক ব্যবহারে আপনার ব্যথা-বেদনা ও ক্লান্তি সত্বর দূর করিবে। বনজ গাছ-গাছড়ায় প্রস্তুত এই মলম প্রদাহ উপশম করে, ফোলাকমায়, ক্ষতযুক্ত আহত ত্বক্‌কে আরোগ্য করে এবং আপনার পা'কে সুস্থ ও কার্যক্ষম রাখে। কড়া ও শক্ত ত্বক্‌কে জাম্বক এরূপ নরম করে যে, উহা তখন সহজেই দূর করা যায়। সম্পূর্ণ জান্তব চর্বি বর্জিত।

এজেন্টস্‌ঃ—স্মিথ্‌ ষ্ট্যানিষ্ট্রীট এন্ড কোং লিঃ, ইণ্টালী, কলিকাতা।

মেলাংকোলিয়ার কথা তো আপনারা জানেন, কিন্তু হাসিও যে আবার একটা রোগ, তা জানেন কি? না জানবারই কথা, কারণ এদেশে এ রোগের খবর কখনও পাওয়া যায় নাই; অস্ট্রেলিয়ায় একজন কি দু'জনের এই রোগ হয়েছে, আর সারা পৃথিবীতে এ পর্যন্ত যত জনের এ রোগ হয়েছে, তার সংখ্যা মোটে পনেরোও নয়। "হাড্ডি পিল্‌পিলায়া গয়া" শুনে চমকে গিয়েছিলেন আপনারা, কিন্তু এবার হাড্ডি নয়, বিলিতী ডাক্তারবাবুদের মতে সারা শরীরের রক্তই এতে দূষিত হয়ে যায়। তবে ভরসার কথা এই যে, দুশ্চিকিৎস্য হলেও মারাত্মক ব্যাধি এ মোটেই নয়। এ হেন বিদ্ঘুটে রোগে আক্রান্ত হয়ে কোনো জাহাজের এক ক্যাপ্টেন সিডনীর হাসপাতালে আছেন, আর তাঁর ওয়ার্ডের অন্যান্য রোগীদের হা-হা হাসির হুল্লোড়ে হাসিয়ে মারছেন। রোগের নামটিও বেয়াড়াঃ 'হেমাটোফোরোহাইরিনিউরিয়া' উচ্চারণ করতে দাঁত ছরকুটে গিয়ে এ রোগ আপনাদেরও চেপে ধরবে না তো? ছোঁয়াচে হাসির ভয়ে ঘাবড়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন বিশুখুড়ো।

* * * *

কলিকাতার ছেলেদের সংখ্যা শুনিলাম মেয়েদের সংখ্যার দ্বিগুণ। কিন্তু Quality-র দিক হইতে মেয়েদেরই জয়-জয়কার। এবারেও আই এ পরীক্ষায় একটি মেয়েই প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন।

ছেলেরা বলছে আমরা দেখে নেবো বি-য়ে-তে"—মন্তব্য করিলেন বিশু খুড়ো।

* * * *

আবহাওয়াতত্ত্ববিদগণ জানাইয়াছেন—কলিকাতার সাম্প্রতিক উত্তাপ একশত ডিগ্রীর উপরে উঠিয়াছে। তাঁদের গণনায় উত্তাপ ধরা পড়ে নাই, বিশু খুড়ো সেই বাদ দিয়া আমাদিগকে আরও ঘর্মাক্ত করিয়া ছাড়িলেন। তিনি বলেনঃ—

(ক) দক্ষিণ কোলকাতার উত্তাপে উডবার্ণ পার্কে সত্যি সত্যি উড্ অর্থাৎ কাঠখড় পুড়ে পুড়ে ছাই হচ্ছে!

(খ) গ্রীষ্মাতিশয্যে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে জনসাধারণ সোডার বোতল নিয়ে লোফালুফি করেছেন।

(গ) ল্যাংড়ার বাজারের তাপে জামাইষষ্ঠীর মুখে অনেকের পকেটে নাকি আগুন লেগে গেছে এবং তারই আঁচে কপালও পুড়েছে অনেকের।

(ঘ) খেলার মাঠের গ্যালারী গরম হওয়ায় কেউ কেউ নাকি আসন ছেড়ে মাঠে নেবে প্রলয় নাচন নাচার চেষ্টা করেছেন!!

* * *

বিলাতের কোন এক কাগজে নাকি জনৈক সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, "বন্দেমাতরম্" গানটি রচনা করিয়াছেন কবি রবীন্দ্রনাথ। "বঙ্কিমচন্দ্র গীতাঞ্জলি লিখে নোবল পুরস্কার পেয়েছেন এ সংবাদ ছাপা হয়েছে কি না জানা যায়নি"—বলিলেন বিশু খুড়ো।

* * *

শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী বলিয়াছেন—

"The women have a role to play in the world, but they are not playing it."—

"অতঃপর হলিউডে role সংগ্রহ করে দেওয়ার জন্য শ্রীমতীর সঙ্গে হয়ত অনেকেই পত্রালাপ করবেন"—মন্তব্য করিল আমাদের শ্যামলাল।

* * *

উক্ত Punch পত্রিকারই অন্য এক খবর—

Armour plated fish found in South American waters.—

"আমাদের দিশী মাছ এটম বম্ নিয়ে চলাফেরা করছে; কার সাধ্যি কাছে ঘেঁষে"—মন্তব্য করিলেন বিশু খুড়ো।

* * * *

শুনিলাম কলিকাতা কর্পোরেশন নাকি কতকগুলি খাটাল শহর হইতে অন্যত্র সরাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। বিশেষজ্ঞরা বলিতেছেন, এই কাজটি ৩০৫০ সালের মধ্যেই শেষ হইয়া যাইবে!!

* * *

বিলাতের "Punch" বলিতেছেন—

"Bright lights in London attracting moths by thousands."—

জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"আমরা এই রকম একটা কিছু হবে জানতাম বলেই কোলকাতার আলোর সুব্যবস্থা কিছু করিনি।"

সিনেমা অভিনেত্রী রিটা হেওয়ার্থের সঙ্গে প্রিন্স আলিখাঁর সাদিও সম্প্রতি সুসম্পন্ন হইয়াছে। "কোলকাতায় সম্প্রতি অনেকেই রিটার ছবি দেখে এসেছেন—"You were never lovelier"—মন্তব্য করিলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

মুঙ্গের হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গেল যে, জনৈক ব্যক্তির একটি বাঁদর নাকি Hair dressing শিখিয়াছে। রাস্তার পাশে বসিয়া সে অনেকের চুল dress করিয়া দিতেছে। আশ্চর্য কিছু নয়; কলিকাতার একটি বাঁদর লেখাপড়া শিখিয়াছিল। পাঠকের নিশ্চয়ই মনে আছে সে পথচারীর ফাউণ্টেন পেন দেখিলেই তাহা কাড়িয়া লইয়া সরিয়া পড়িত। "রাম রাজ্যে বাঁদরদের কৃতিত্ব দেখাবার সুযোগ ফিরে এলো"—এই মন্তব্য অবশ্যই খুড়োর।

* * * *

ষ্ট্যালিনের পুত্রের সঙ্গে মলটভের কন্যার বিবাহ নাকি সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। জামাই ষষ্ঠীতে কিছু ভারতীয়

আম সংগ্রহের জন্য নাকি মসিয়ে মলটভ পণ্ডিত জওহরলালের সঙ্গে পত্রালাপ করিয়াছিলেন। ফলাফল অবশ্য আমরা জানি না।

* * * * *

একটি সংবাদে প্রকাশ, রাষ্ট্র সঙ্ঘের অধিবেশনের পূর্বে নাকি নীরব প্রার্থনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বিশু খুড়ো বলিলেন—"এ আর এমন কী একটা নতুন ব্যবস্থা, নিজের টীমের দুর্বলতা সম্বন্ধে যখন বেশী সচেতন হই তখন হে মা কালী আমরা হামেশাই করে থাকি"।

**শয়তান**—লিও টলস্টয়। অনুবাদকঃ শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। মিত্রালয়, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৩,।

লিও টলস্টয়ের শয়তান (The devil) বইখানি তাঁহার মৃত্যুর পর প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু বইখানি তিনি রচনা করিয়াছিলেন তাঁহার যৌবনকালে। তাঁহার জীবিতকালে এই গ্রন্থ কেন অপ্রকাশিত রাখিয়াছিলেন তাহার কারণ অনুসন্ধিৎসু পাঠক সহজেই অনুমান করিতে পারিবেন গ্রন্থের উপসংহারটি পাঠ করিলেই। যৌবনকালে সাধারণ মানুষের ন্যায় টলস্টয়কেও দেহগত লালসার প্রলোভনে পড়িয়া মানসিক দ্বন্দ্ব আর গ্লানিতে প্রতিনিয়ত পীড়িত ও নির্যাতিত হইতে হইয়াছিল। সেই বাস্তব অভিজ্ঞতাই তিনি উপন্যাসের আকারে নির্মম লেখনী দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। জীবনে যৌন প্রবৃত্তি কোনো এক সময়ে মানুষকে শয়তানের পর্যায়ে নামাইয়া আনে এবং এই সংকট হইতে মুক্তি পাইতে হইলে মানুষকে নিজের সহিত সংযম ও আত্মনিরোধের অস্ত্র লইয়া সংগ্রাম করিতে হয়। নিজের জীবনের এই সংগ্রামই এই গ্রন্থের মূল উপাদান। যৌন জীবন সম্পর্কে টলস্টয়ের যে সুচিন্তিত ও স্পষ্ট মত ও বিশ্বাস, যাহার সহিত তৎকালীন চিন্তাশীল ব্যক্তিরা একমত হইতে পারেন নাই, তাহাই অত্যন্ত নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও সংযমের সহিত এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

এই বইখানি বাঙালী পাঠকের কাছে বহুকাল দুষ্প্রাপ্য হইয়াছিল, কারণ টলস্টয়ের মৃত্যুর পর বইখানি ইংরাজি ভাষায় একবার প্রকাশিত হইয়া আর পুনর্মুদ্রিত হয় নাই। অনুবাদক বইখানি সংগ্রহ করিয়া অনুবাদ করিয়াছেন, ইহার জন্য তিনি সকলের ধন্যবাদার্হ। বাঙালী পাঠকের কাছে এই অনুবাদ-গ্রন্থখানি টলস্টয়ের জীবন ও নীতির একটি নূতন দিকের সন্ধান দিবে। বইখানির অনুবাদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কঠোরে-ললিতে বোনা টলস্টয়ের ভাষা যেমন যাদুমন্ত্রবলে পাঠকদের অভিভূত করে অনুবাদকের লেখনীতে সেই যাদু-কাঠির স্পর্শ থাকায় আশ্চর্য দক্ষতার সহিত তিনি গ্রন্থখানিকে আগাগোড়া সুখপাঠ্য করিয়া তুলিয়াছেন। ভাষার প্রসাদগুণে অনুবাদ গ্রন্থখানি ইংরাজি হইতে কোনো অংশে নিকৃষ্ট তো হয়ই নাই, উপরন্তু কোনো কোনো স্থানে ইংরাজি অনুবাদকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। বইখানির ছাপা ও বাঁধাই প্রশংসার যোগ্য।

**সংগীত পরিক্রমা**—শ্রীঅরুণকুমার দত্ত প্রণীত। ৬৫।এ, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড, কলিকাতা—১৪, মূল্য—এক টাকা বারো আনা।

হিন্দুস্থানী ক্লাসিকাল গানে শিক্ষার্থীদের কাছে এই বইখানি মূল্যবান হইবে, কারণ মার্গ সংগীতের প্রাচীন ইতিহাস, ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা ও ঠুংরী প্রভৃতি প্রকার ভেদ; তান, আলাপ, তাল, লয় প্রভৃতি সংগীতের আলংকারিক রূপ সম্বন্ধে সংগীত শাস্ত্রের দুরূহ ও জটিল বিষয়গুলি স্বল্প পরিসরে অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। লেখক সংগীত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং দীর্ঘকাল সংগীত অধ্যাপনা করিয়াছেন। নবীন শিক্ষার্থীদের মনে যে সব প্রশ্ন জাগে এবং যে সব প্রশ্নের সদুত্তরের অভাবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মার্গ সংগীত সম্বন্ধে অস্পষ্ট রূপ থাকিয়া যায় লেখক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দ্বারা তাহা সহজ সরল ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত ভারতীয় মার্গ সংগীত সম্বন্ধে যাঁহাদের অহেতুক ভীতি বা অবজ্ঞা রহিয়াছে, 'দুর্বোধ্য' আখ্যা দিয়া যাহারা ইহা এড়াইয়া চলেন তাঁহারা আলোচ্য গ্রন্থখানি পাঠ করিলে লাভবান হইবেন। কারণ ভারতীয় মার্গ সংগীতের রস গ্রহণের পক্ষে গ্রন্থখানি প্রভূত সাহায্য করিবে। আমরা এই বইখানির বহুল প্রচার কামনা করি। ১৩১।৪৯

**পাহাড় দুর্গে**—শ্রীরামেন্দ্র দেশমুখ্য প্রণীত। দে ব্রাদার্স এন্ড কোং কর্তৃক ১৩।১, কলেজ স্কোয়ার হইতে প্রকাশিত। দাম এক টাকা।

ছোটদের জন্য লিখিত 'সত্যিকারের য়্যাডভেঞ্চারের কাহিনী'। রচনা চলনসই, ছাপা বাঁধাই ভাল। ৪৪।৪৯

**আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম**—শ্রীঅশোক গুহ লিখিত ও শ্রীপ্রকাশ রায় চৌধুরী কর্তৃক ৯, গোপী বোস লেন হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা দুই আনা।

অল্প পরিসরের মধ্যে সরল ভাষায় আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী ছোটদের জন্য নিপুণভাবে পরিবেশিত হইয়াছে। বইখানি পড়িয়া ছোটরা আনন্দিত ও উপকৃত হইবে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ছাপা ও বাঁধাই বেশ ভাল। ছোটদের জন্য লিখিত এই বইখানি সচিত্র হইলে ইহার উপাদেয়তা আরও বাড়িত। আশা করা যায় ভবিষ্যৎ সংস্করণে লেখক ও প্রকাশক আমাদের পরামর্শ কাজে লাগাইবেন। (১৫৪।৪৯)


গত দশ বৎসরের মধ্যে যে ক'জন কথা-সাহিত্যিক বাংলা সাহিত্যে বলিষ্ঠ পদসঞ্চারে অগ্রসর হ'য়ে সকল সাহিত্য-রসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, নরেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য। সেই শক্তিশালী লেখকের নতুন ধরণের নতুন উপন্যাস—

**নরেন্দ্রনাথ মিত্র** রচিত

**অক্ষরে অক্ষরে**

আড়াই টাকা

*

**অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত** রচিত

ও

**শৈল চক্রবর্তী** বিচিত্রিত

**ইনি আর উনি**

তিন টাকা

স্টেইট্সম্যান বলেন "Ini Ar Uni...... deals most divertingly with official life in small stations.

আনন্দবাজার বলেন—"হাস্যরস সমুজ্জ্বল বর্ণনাভঙ্গির গুণে সমস্তগুলি গল্পই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।"

*

অনেক সাহিত্য-রসিকের মতে সরস প্রবন্ধ গল্পের চেয়েও উপভোগ্য। লঘুরসাশ্রিত কয়েকটি ব্যক্তিগত প্রবন্ধের সংকলন

**জনান্তিকে**

**অজিত দত্ত**

দেড় টাকা

যদি আপনি সাহিত্য-রসিক হন তবে এ বই আপনার নিশ্চয়ই পড়া উচিত।

**অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের**

**একটি গ্রাম্য প্রেমের কাহিনী**

তিন টাকা

সম্পূর্ণ নতুন ঢঙের উপন্যাস। আনন্দবাজার পত্রিকা বলেন, "অচিন্ত্যকুমারের বলিষ্ঠ এবং আন্তরিক ভাষায় অপূর্ব হইয়া ফুটিয়াছে এই বিচিত্র প্রেমের কাহিনীটি।"

*

**হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়** রচিত

**ইরাবতী**

চার টাকা

আনন্দবাজার লিখেছেনঃ—"বাঙ্গালী পাঠকের অপরিচিত জীবনখণ্ডকে আঁকিবার চেষ্টায় লেখক যে সাফল্যলাভ করিয়াছেন এ এক দুরূহ কৃতিত্ব।" দেশ বলেছেন,—"তুলনা খুব অল্পই মিলিবে।"

*

**সারেঙ**

**অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত**

দু'টাকা বারো আনা

নিম্নস্তরের মুসলমান সমাজের নিখুঁত আলেখ্য। মাসিক সওগাত বলেন,—"স্বাস্থ্যহীন অশিক্ষিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন হৃতবল ও হতাশ্বাস কৃষকশ্রেণী বাংলার অন্ততঃ তিন-চতুর্থাংশ হ'য়েও সাহিত্যে এদের স্বাভাবিক আসন নেই। অচিন্ত্যকুমার কেমন করে এদের পরিচয় দিয়েছেন সারেঙে তা বিস্ময়কর।"

**দিগন্ত পাবলিশার্স**

২০২, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা—২৯

# হিউএন্ চ্যাঙ্-এর ভারতভ্রমণ

— শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু —

( পূর্বানুবৃত্তি )

(১২)

## দাক্ষিণাত্য

**তাম্রলিপ্ত** থেকে হিউএনচাঙ্ হীনযানাশ্রয়ী দেশগুলির মধ্যে প্রধান সিংহল দ্বীপে যাওয়ার জন্যেই বেশী ব্যগ্র হয়েছিলেন। এমন কি প্রত্যহ রাত্রে তিনি কল্পনায় যেন সিংহল দ্বীপের 'দন্ত স্তূপ' দেখতে পেতেন। কিন্তু দক্ষিণ দেশ থেকে আগত কতকগুলি ভিক্ষু তাঁকে বললেন যে, বহুদিনব্যাপী বিপদসংকুল সমুদ্র যাত্রা না কোরে ডাঙাপথে ভারতবর্ষের দক্ষিণ সীমা পর্যন্ত গিয়ে তারপর মাত্র তিনদিন সমুদ্র-যাত্রা কোরে সিংহলে নিরাপদে পৌঁছান যায়।

এই উপদেশ গ্রাহ্য কোরে হিউএন চাঙ দাক্ষিণাত্যের পূর্ব উপকূল দিয়ে দক্ষিণে যেতে লাগলেন। ওড্রদেশ ও কলিঙ্গ দিয়ে যেতে যেতে দেখলেন যে, বৌদ্ধধর্ম থেকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মই এ প্রদেশে অনেক বেশী প্রচলিত। অবশ্য উড়িষ্যার বিখ্যাত মন্দিরগুলির বেশীর ভাগই তখনও তৈরী হয়নি; তবু ভুবনেশ্বরের মুক্তেশ্বর মন্দির বোধহয় তখন ছিল।

কলিঙ্গ থেকে হিউএন চাঙ বিখ্যাত মহাযান • নাগার্জুনের স্মৃতিজড়িত দেশ দেখবার জন্যে উত্তর-পশ্চিমে গোণ্ড্ ইত্যাদি আদিম অধিবাসী দ্বারা অধ্যুষিত, পার্বত্য অরণ্যসংকুল প্রদেশ পার হোয়ে কলিঙ্গ থেকে প্রায় ৩৬০ মাইল দূরে "দক্ষিণ কোশলে" এলেন। বিদর্ভ দেশে আধুনিক ছত্তিশগড় অঞ্চলেরই নাম সে সময়ে দক্ষিণ কোশল ছিল।

নাগার্জুন ভারতের ইতিহাসে এক অদ্ভুত চরিত্র। ভারতবর্ষে, চীন ও মহাযানী সাহিত্যে, ইনি একজন অদ্ভুত প্রতিভাসম্পন্ন সমস্ত শাস্ত্রে ও বিদ্যায় অসাধারণ পণ্ডিত বোলে বর্ণিত হোয়েছেন। তাঁর সম্বন্ধে বহু অলৌকিক আখ্যায়িকাও প্রচলিত আছে। ঠিক কোন্ সময়ে তিনি জীবিত ছিলেন, নিঃসন্দেহ ভাবে বলা যায় না। সম্ভবতঃ বিদর্ভই তাঁর স্বদেশ ছিল। তিব্বতীরা বলেন, তিনি অনেক সময়ে নালন্দায় থাকতেন। আবার কণিষ্কের সভায় তিনি মহাযান প্রচার করেন বোলে শোনা যায়। কেউ কেউ বলেন, তিনি ৫৩০ বছরেরও বেশীদিন জীবিত ছিলেন। মহাযানী পণ্ডিত আর্যদেব তাঁর সঙ্গে বিচার করতে এসে তাঁর অদ্ভুত প্রতিভামণ্ডিত মুখের দিকে চেয়ে নির্বাক হন আর তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর লিখিত আর চীন ভাষায় অনূদিত ১৮।২০ খানা পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ ও কবিতা আজও সে দেশে পড়া হয়। জ্যোতিষ পরীক্ষা-মূলক রসায়ন ও চিকিৎসা শাস্ত্রেও তাঁর প্রতিভা ছিল। তাঁর লেখা নানা রোগের প্রেস্‌ক্রিপসন, বিশেষতঃ 'চক্ষু রোগের চিকিৎসা' সম্বন্ধে গ্রন্থ চীন ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মধ্যে কেবল লেওনার্দো-ডা-ভিঞ্চি কতকটা এঁর সঙ্গে তুলনীয়।

কোশল থেকে হিউএন চাঙ আবার দক্ষিণ দিকে ১৮০ মাইল অরণ্য ইত্যাদি পার হোয়ে অন্ধ্রদেশে এলেন। দক্ষিণ কোশল দেখবার জন্যে হিউএন চাঙের অন্তত শুইশত মাইল দুর্গম পথ বেশী অতিক্রম করতে হয়েছিল। বোধিসত্ত্ব (অর্হৎ)রূপে পূজিত অসামান্য মহাযানী পণ্ডিত নাগার্জুনের প্রতি তাঁর কি রকম ভক্তি ছিল, তা এর থেকে বোঝা যায়।

অন্ধ্রদেশ গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদীর মধ্যে আধুনিক তেলিঙ্গানায় ছিল। এর অল্প কিছুদিন আগে চালুক্য বংশীয়েরা এই প্রদেশ মহারাষ্ট্রদের কাছ থেকে জয় কোরে নিয়ে এলুরা হ্রদের তীরে বেঙ্গিপুরায় রাজধানী স্থাপন কোরেছিল।

প্রাচীন অন্ধ্রদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অংশ, যেখানে কৃষ্ণা নদীর দুই তীরে বেজওয়াদা ও অমরাবতী ছিল, সে অংশ সপ্তম খৃষ্টাব্দে ধনকটক নামে অন্য রাজত্ব ছিল। অমরাবতী থেকে উজানে আর কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণ তীরে গোলি আর নাগার্জুনিকুণ্ডা নামক পুরাতত্ত্বে প্রসিদ্ধ দুই স্থান ছিল। এ প্রদেশের অধিবাসীরা তেলেগু ভাষাভাষী হলেও এই সময়ে এখানে তামিল চোলদের রাজ্য ছিল।

অমরাবতী, গোলি, নাগার্জুনিকুণ্ডায়, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম খৃষ্টাব্দের হিন্দু শিল্পের অনেক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। এর নমুনা লণ্ডন, প্যারিস আর মাদ্রাজ যাদুঘরে রক্ষিত আছে। সামান্য কিছু কিছু কলকাতার যাদুঘরেও আছে।

হিউএন চাঙ অমরাবতীর বিহারগুলি দেখে দক্ষিণ-পশ্চিমে নাগার্জুনিকুণ্ডা হয়ে পেনার নদী ধরে দক্ষিণে কার্ণাটিক প্রদেশে এলেন। এই তামিল প্রদেশকেই তিনি 'দ্রাবিড় দেশ' বলেছেন। এই সময়ে এখানে পল্লভ-বংশীয়েরা রাজত্ব করছিলেন। তাঁদের রাজধানী ছিল কাঞ্চীপুরে (আধুনিক কাঞ্জিভেরাম) আর মহাবলীপুরমে এঁদের প্রধান বন্দর ছিল। এই পল্লভবংশীয়েরা খুব পরাক্রমশালী ছিল। হিউএন চাঙের সময়ে (৬৪০ খৃষ্টাব্দে) যিনি রাজা ছিলেন—নরসিংহ বর্মণ—তিনি পরে ৬৪২ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রবংশীয় পরাক্রান্ত রাজা দ্বিতীয় পুলকেশিনকে জয় ও বধ করেন। এঁদের রাজত্বকালে হিন্দু ভাস্কর্যেরও খুব উন্নতি হয়েছিল।

হিউএন চাঙ নিশ্চয়ই এর কিছু কিছু দেখেছিলেন। মহাবলীপুরমের ভাস্কর্যের মধ্যে অন্তত দুইটা—'যমপুরী' আর 'বলদলন্ধর' গুহায় বিষ্ণুর অবতারগুলির যে ভাস্কর্য আছে তা সপ্তম শতাব্দীতেই তৈয়ারী হয়। হয়তো তিনি বিখ্যাত ভাস্কর্য 'গঙ্গাবতরণ' যখন খোদা হয়, সে সময় নিজেই উপস্থিত ছিলেন। অবশ্য গোঁড়া বৌদ্ধ হিউ-এন চাঙ্ এ সমস্ত হিন্দু মূর্তি দেখে খুব খুশী হয়েছিলেন কিনা বলা কঠিন।

হিউএন চাঙ ৬৪০ খৃষ্টাব্দে পল্লভদেশে অনেকদিন কাটান। কাঞ্চীপুরে তিনি তাঁর গুরু মহাযানী দার্শনিকপ্রবর ধর্মপালের স্মরণচিহ্ন দেখেন। হিউএন চাঙ বলেন যে, ধর্মপাল কাঞ্চীপুরের এক রাজকন্যার সঙ্গে বিবাহ প্রত্যাখ্যান করে ধর্মজীবন অবলম্বন করেছিলেন।

যাহোক, এখানে এসে হিউএন চাঙ যে খবর পেলেন, তাতে তাঁকে সিংহল যাবার আশা ত্যাগ করতে হল। তিনি শুনলেন যে, এ সময়ে সিংহলে গৃহযুদ্ধ আর দুর্ভিক্ষ, দুই-ই আরম্ভ হয়েছে। এমন কি, হিউএন চাঙের কাঞ্চীপুরে অবস্থানের সময়েই জন-কতক ভিক্ষু সিংহল থেকে পালিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন, আর তাঁরা হিউএন চাঙকে সিংহল যাওয়ার সংকল্প থেকে নিরস্ত করলেন।

অগত্যা হিউএন চাঙ সিংহল যাওয়ার সংকল্প ত্যাগ করে দাক্ষিণাত্য পরিক্রমণেই অগ্রসর হলেন।

ফিরবার পথে হিউএন চাঙ আরব্যোপ-সাগরের তীরে কোন্‌কান্ ও মহারাষ্ট্র প্রদেশ পার হয়ে আসেন। এই প্রদেশে সেই সময়ে চালুক্যবংশীয়দের রাজত্ব ছিল। তারাই এ সময়ে দাক্ষিণাত্যের সমস্ত উত্তর-পশ্চিম ভাগের অধিপতি ছিল। হিউএন চাঙ এদেশের নির্ভুল বিবরণ দিয়েছেন। সমুদ্রের উপকূল আর ঘাটপর্বত থাকায় এদেশের জল-হাওয়া খুব গরম নয়। যুদ্ধপ্রিয় মারাঠাদের তিনি বিবরণ দিয়েছেন। "অধিবাসীরা দীর্ঘকায়;

আর সরল প্রকৃতি হোলেও এরা খুব গর্বিত আর কোপনস্বভাব। এরা যশ অন্বেষণে আর কর্তব্যে দৃঢ়। মৃত্যুকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। এদের কেউ উপকার করলে এরা খুবই কৃতজ্ঞ হয়, কিন্তু কেউ অপকার করলে এদের প্রতিহিংসা অব্যর্থ। অপমানের প্রতিশোধ নিয়ে এরা জীবন তুচ্ছ জ্ঞান করে। কিন্তু বিপদে কেউ সাহায্যপ্রার্থী হোলে এরা নিজের প্রয়োজন তুচ্ছ জ্ঞান কোরে তাকে সাহায্য করে। কোনও লোকের উপর প্রতিশোধ নিতে হোলে শত্রুকে এরা আগে সতর্ক করে। তারপর দুই পক্ষই প্রস্তুত হোয়ে বর্শা হাতে নিয়ে অগ্রসর হয়। যুদ্ধে পলাতককে এরা অনুসরণ করে কিন্তু শরণার্থীকে হত্যা করে না। নিজেদের কোন সেনাপতি যদি যুদ্ধে হেরে যায় তা হলে তার কোনও দৈহিক শাস্তি হয় না; কেবল তাকে স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদ পরিয়ে দেওয়া হয়। তার ফলে অনেক সময় অপমান থেকে উদ্ধার পাওয়ায় জন্যে সে আত্মহত্যা করে।"

এ সময়ে মহারাষ্ট্রের অধিপতি ছিলেন চালুক্যবংশীয় বিখ্যাত রাজা দ্বিতীয় পুলকেশিন, যিনি উত্তর ভারতের সম্রাট হর্ষবর্ধনের প্রত্যেক আক্রমণ রোধ করে তাঁর দাক্ষিণাত্যে অগ্রসরের চেষ্টা ব্যর্থ করে দেন। (ইনিই আবার পরে পল্লবংশীয় নরসিংহ বর্মণ দ্বারা পরাজিত হন, সে কথা আগেই বলেছি। হিউএন চাঙ যখন মহারাষ্ট্র দেশে আসেন, তখন পুলকেশিনের সমৃদ্ধির চরম অবস্থা।

হর্ষবর্ধন হিউএন চাঙের কী রকম সাহায্যকারী বন্ধু ছিলেন আর হিউএন চাঙ তাঁর কী রকম আন্তরিক গুণগ্রাহী আর ভক্ত ছিলেন, তা পরে দেখা যাবে। তবু হিউএন চাঙ্ পুলকেশিনের পরাক্রম বর্ণনা করতে কৃপণতা করেননি। তিনি বলেছেন—"পুলকেশিনের ধর্মমত উদার ও গভীর, তাঁর রাজ্য বহুদূরব্যাপী। তাঁর প্রজারা তাঁর অনুরক্ত, সেবাপরায়ণ।...তিনি সমরপ্রিয় আর সমরের গৌরবকেই তিনি প্রধান মনে করেন। তারই জন্যে তাঁর রাজ্যে পদাতিক আর অশ্বারোহী সৈনিকদের সমরোপযোগী সাজসজ্জার বিষয়ে খুব বেশী লক্ষ্য রাখা হয় আর সামরিক নিয়মকানুন কঠোরভাবে পালিত হয়।" হিউএন চাঙ্ আরও লিখেছেন,—এই রাষ্ট্রে কয়েক শত অসম-সাহসিক যোদ্ধা আছে। প্রত্যেকবার যুদ্ধে যাবার আগে তারা মদ্যপান কোরে এ রকম মত্ত হয় যে, সে সময়ে এদের এক একজন এক একটা বর্শা হাতে কোরে শত্রুর দশ হাজার সৈন্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। এ অবস্থায় তার পথরোধকারী যে-কোনও লোককে যদি সে হত্যা করে, তা হলেও আইনতঃ তার কোন শাস্তি হয় না। যুদ্ধের সময়ে এই বীরগণ দামামার শব্দে সব সৈন্যদলের সম্মুখে অগ্রসর হোয়ে যুদ্ধ করে।" এছাড়া মহারাষ্ট্ররাজ কয়েক শত হিংস্র হাতী তাঁর পিলখানায় রাখতেন। যুদ্ধের সময় উপস্থিত হোলে জোরালো মদ দিয়ে এদের মত্ত করা হোত আর তখন বিপক্ষের শত্রুদলে এরা ঝড়ের মতো পড়ে সমস্ত ধ্বংস করত। হিউএন চাঙ বলেন,—"বর্তমান সময়ে মহারাজ হর্ষ পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সমস্ত দেশ জয় করেছেন। সীমানার বাইরের জাতিরাও তাঁর বশীভূত আর প্রতিবেশী জাতিরা তাঁর ভয়ে কম্পমান —কেবল এই জাতিই তাঁর বশীভূত হয়নি। যদিও তিনি অনেকবার স্বয়ং পঞ্চ-ভারতের সমস্ত সৈন্যদল নিয়ে এদের বিরুদ্ধে এসেছেন, তবুও কখনই তিনি এদের হটাতে পারেননি। হিউএন চাঙ এদের যুদ্ধের বিষয়েই শুধু বলেননি। তিনি বলেন,—"অধ্যয়নে অধিবাসীদের প্রবল অনুরাগ।"

চালুক্যরা হিন্দু শৈব ছিলেন, তবে ভারতের রীতি অনুসারে বৌদ্ধরাও এখানে শান্তিতে বাস করতো। হিউএন চাঙ বলেন, —কোন্‌কান আর মহারাষ্ট্রে দুশো বৌদ্ধ মঠ আর অনেক শত দেবমন্দির আছে।"

হিউএন চাঙ ৬৪১ খৃষ্টাব্দের বর্ষাকালটা সম্ভবতঃ পুলকেশিনের রাজধানী নাসিকে কাটিয়েছিলেন। হিউএন চাঙ যে সময়ে মহারাষ্ট্র দেশে এসেছিলেন, সেই সময়েই এদেশের দক্ষ কারিগররা ভাস্কর্যের চমৎকার নিদর্শন নির্মাণ করছিলেন। 'বাতাশি' বা 'বাদামি'র 'মালেগিত্তি' শিবালয় ইত্যাদি, এলোরার 'রাবণ কা খই', ধুমার লেনা, 'রামেশ্বরম' ইত্যাদি মূর্তিখোদিত গুহগুলি এই সময়েই নির্মিত হয়। অবশ্য গোঁড়া বৌদ্ধ হিউএন চাঙের চোখে এ সমস্ত ভাস্কর্য বিশেষ ভালো লাগবার কথা নয়। তবে এই দেশেই বৌদ্ধ শিল্পের নিদর্শনেরও অভাব ছিল না। কল্যাণীর নিকটে বেদশার চৈত্য কারলির বিখ্যাত চৈত্য খৃষ্টাব্দের ২য় বা ৩য় শতাব্দীর তৈয়ারী। অজন্তার গুহাগুলি মহারাষ্ট্র দেশের মধ্যস্থলে পুলকেশিনের রাজ্যের ভিতরেই ছিল।

(ক্রমশঃ)


# ক্যালকাটা ন্যাশনাল
## ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস ঃ ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস্,
মিশন রো, কলিকাতা।

| | | |
|---|---|---|
| **অনুমোদিত মূলধন** | ... | **২,০০০০০০০৲ টাকা** |
| **আদায়ীকৃত মূলধন** | ... | **৫০,০০০০০৲ টাকা** |
| **সংরক্ষিত তহবিল** | ... | **২৪,০০০০০৲ টাকার উর্দ্ধে** |

সম্পূর্ণ ভারতীয় প্রতিষ্ঠানরূপে "ক্যালকাটা ন্যাশনাল" এক রক্ষণশীল ঐতিহ্য বহন করিয়া চলিয়াছে। দেশীয় ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে "ক্যালকাটা ন্যাশনাল" একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। "ক্যালকাটা ন্যাশনালে" গচ্ছিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ। ভদ্র ব্যবহার ও কর্মদক্ষতা এই ব্যাঙ্কের বৈশিষ্ট্য। সমগ্র দেশব্যাপী শাখাসমূহের সহায়তায় "ক্যালকাটা ন্যাশনাল" আপনার যাবতীয় ব্যাঙ্কিং প্রয়োজন মিটাইতে সমর্থ।

**ব্যাঙ্কের সকল শাখাতেই কারেণ্ট ও সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খোলা হইয়া থাকে। সেভিংস ব্যাঙ্কের জমা টাকার উপর শতকরা ১½ টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। এক বৎসরের জন্য স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হয় ও শতকরা ২½ টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হয়।**

অনুমোদিত সিকিউরিটির বিনিময়ে ঋণ ও দাদন দেওয়া হয় এবং আমানতকারিগণের পক্ষে বিলের টাকা আদায় করা হয়।

**"ক্যালকাটা ন্যাশনালে" আপনার একটি একাউণ্ট রাখুন।**

# নূতন ছবির পরিচয়

**দাসীপুত্র** (ভারতী চিত্রপীঠ—ইন্দ্রপুরী)—কাহিনী ও পরিচালনাঃ দেবনারায়ণ গুপ্ত, আলোকচিত্রঃ অনিল গুপ্ত, শব্দ-যোজনাঃ গৌরদাস গুণ ও শিশির চট্টোপাধ্যায়, সুরযোজনাঃ বিভূতি দত্ত, ভূমিকায়ঃ দীপক, অহীন্দ্র, সন্তোষ সিংহ, শ্যাম লাহা, নবদ্বীপ, আশু বসু, সরযূ, রাণীবালা, মণিকা, প্রীতিধারা প্রভৃতি।

বম্বে পিকচার্স ডিস্ট্রিবিউটর্সের পরিবেশনে ২০শে মে থেকে **শ্রী, প্রাচী ও আলেয়ায়** দেখানো হচ্ছে।

আমাদের চিত্রপরিচালকদের অধিকাংশই চলচ্চিত্রের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যে অজ্ঞতার

**নিউ থিয়েটার্সের হিন্দী 'ছোটে ভাই' চিত্রে শ্রীমতী মলিনা**

চয় দিয়ে আসেন 'দাসীপুত্র'কেও সেই দলের মধ্যেই ফেলতে হচ্ছে। ক্যামেরার সাহায্যে দৃশ্যের পর দৃশ্য তুলে যেতে পারলেই সেটা সিনেমা হয় না, মঞ্চের সংগে সিনেমার পার্থক্যও এইটুকু মাত্রই নয়। কিন্তু অধিকাংশের ক্ষেত্রে আমাদের সিনেমার টেক্‌নিক-এর চেয়ে আগিয়ে যায়নি। ফলে বহু ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর দিক থেকে রুচি ও পরিকল্পনার উৎকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া গেলেও পর্দায় যথাযথ রূপ সৃষ্টি হয় না। দোষটা শ্য তখন গিয়ে পড়ে দর্শকদের ওপরে, তারা বু বোঝে না ব'লে। 'দাসীপুত্রে'র ক্ষেত্রেও বিষয়বস্তু ভালোই বেছে নেওয়া হয়েছে, যার একটা অভিনবত্ব আছে, মানবিক স্পর্শও টা বোধকরা যায় কিন্তু তার সেই গুণ মায় ফুটিয়ে তোলা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হে সব দিক থেকেই। একে ছবি বলার মঞ্চাভিনয়ের প্রতিকৃতি ব'লে আখ্যাত

করাই ঠিক হবে। ঠিক নাটকীয় রীতিতে সাজানো দৃশ্য ও দৃশ্যাংশ, মঞ্চের মতই সংক্ষিপ্ত পরিবেশ ও সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র; রস-সৃষ্টির জন্যে মঞ্চের সেই বাঁধাধরা টেকনিক।

কাহিনী হ'চ্ছে অজয় নামে এক দাসী-পুত্রকে নিয়ে। নিতান্ত অসহায় অবস্থায় ওর মা ওকে নিয়ে ক'লকাতায় চলে আসে এবং এক বড়লোকের গাড়িতে চাপা পড়ায় তার ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটে যায়। ধনঞ্জয়বাবু অজয়কে নিজের বাড়িতে এনে চিকিৎসা করান এবং অজয় ভালো হয়ে ওঠার পর ওর মাকে ঐ বাড়িতে চাকরী দেন তার নিজের পুত্রকন্যাকে দেখা-শুনো করার জন্যে। অজয়ও ওদেরই সংগে বড় হ'তে থাকে। ওর লেখাপড়ার দিকে চাড় দেখে ধনঞ্জয়বাবু ওর সবখরচ বহন করতে থাকেন। অজয় ম্যাট্রিক ও আই-এ পাশ করে বৃত্তি পেলো। ধনঞ্জয়বাবু ওর গুণে মুগ্ধ হ'য়ে তার কন্যা মিলিকে পড়াবার জন্যে অজয়কে অনুরোধ ক'রলেন। মিলি অজয়ের প্রতি আকৃষ্ট হ'লো এবং প্রেম নিবেদন ক'রলে। অজয় তাকে নিবৃত্ত করার জন্যে একটি চিঠি লিখলে। দুর্ভাগ্যবশতঃ সে চিঠি গিয়ে পড়লো মিলির মার হাতে, ফলে পত্রপাঠ অজয় ও তার মা বিতাড়িত হ'লো। এর পর অজয়কে পাওয়া গেলো বি-এ পাশ ক'রে ডেপুটি হওয়া অবস্থায়। অজয়ের বন্ধু অজয়ের গুণে মুগ্ধ হ'য়ে তার বোন মীরার সংগে অজয়ের বিবাহ দিলেন। ওদিকে মিলির বিবাহের সম্বন্ধ হ'তে থাকে কিন্তু মিলি নিজেই চিঠি লিখে সেসব সম্বন্ধ ভেংগে দিতে থাকে। ঘটনাচক্রে মীরার আগ্রহাতিশয্যে অজয় কলকাতায় তার মাকে নিয়ে এলো চোখের চিকিৎসা করাবার জন্যে। কলকাতায় মিলির সংগে ওদের দেখা হলো। মীরা মিলিরই সতীর্থা ছিলো। মীরা জানলো যে, অজয় ও মিলির পূর্ব পরিচয় আছে। পরে অজয়ই তাকে জানালো যে মিলিদের বাড়িতে তার মা দাসী-বৃত্তি ক'রে তাকে মানুষ ক'রে তুলেছে। মীরা এ আঘাত সইতে পারলে না, দাসীপুত্রের সংগে তার পক্ষে ঘর করা সম্ভব হ'লো না। কথায় কথায় সে অজয়কে অপমান করতে থাকে। এমনি একটি বচসা অজয়ের মাকে মর্মান্তিক আঘাত দেয়, অজয়ের মা ঠিক করেন যে, তিনি বাড়ি ছেড়ে চলে যাবেন এবং উত্তেজনায় নামতে গিয়ে সিঁড়ি থেকে পড়ে মারা গেলেন। এর পর মীরার পক্ষে আর অজয়ের গৃহে থাকা গেলো না; চলে এলো কলকাতায় বাপের বাড়িতে।

অজয়ও তার আর খোঁজ নেয় না। কিন্তু কলকাতায় আসার পর মিলির কাছ থেকে অজয়ের সম্পর্কে সব শুনে মীরার মন অনু-শোচনায় ভরে ওঠে, ফলে যক্ষ্মা এবং অজয়কে ডেকে আনতে আনতেই মৃত্যু।

কাহিনীর গোড়া আছে কিন্তু শেষ নেই। দাসীপুত্রের জীবনধারার ছবিও স্পষ্ট নয়। সুরুতেই মোটর দুর্ঘটনায় পড়ে ধনঞ্জয়বাবুর আইনকে ফাঁকি দেওয়ার জন্যে আহতকে হাস-পাতালে না দিয়ে বাড়িতে চিকিৎসা করানোর কৌশল তো সেন্সরেরই আপত্তি করবার কথা। মীরা ছেড়ে আসার পর অজয় তার ছবি-খানি তার মার ছবির সামনে ধরে ক্ষমা চাওয়ানোর দৃশ্যটা অদ্ভুত ন্যাকামীর পরিচয়

**শ্রীমতী অনুরাধা দেবী চিত্রশ্রী লিমিটেডের 'চিন্তা বহ্নিমান' চিত্রে অবতরণ করেছেন**

দেয়। মিলি গোড়াতে দাসীপুত্র ব'লে অজয়ের কাছে পড়তে আপত্তি ক'রে একেবারে প্রেমে পড়ে যাওয়ার যোগাযোগ স্পষ্ট নয়। আরও বহু দৃশ্য সম্পর্কে অনেক কথারই উল্লেখ করা যায়। মোটকথা হ'চ্ছে যে, বিষয়বস্তুর তুলনায় ঘটনার বাঁধুনী খুব দৃঢ় নয় এবং তাতে অভিনবত্বও নেই। আর সহজাত আবেগকে নিয়ে খুব ক'রে নাড়া দেবার চেষ্টা হলেও চরিত্রগুলির ব্যক্তিত্বের একান্ত অভাবে তাও সাফল্যলাভ ক'রতে পারেনি।

অজয়ের ভূমিকায় দীপকের, এবং অজয়ের মার ভূমিকায় সরযূর ছাড়া আর কারুরই অভিনয় বলতে কিছুই পাওয়া যায় না। মিলি ও মীরার ভূমিকায় যথাক্রমে অভিনয় করেছেন মণিকা ও প্রীতিধারা কিন্তু দুজনের কারুরই ছাপ দেবার মতো একটুকুও ব্যক্তিত্ব নেই। কলাকৌশলের দিক সম্পর্কে প্রশংসা করার কিছু নেই। ছবিখানিতে দুখানি গান আমাদের ভাল লাগল, একটি ঘুমপাড়ানীর অপরটি রোগশয্যায় প্রীতিধারার কণ্ঠে গীত।

শেষের গানটি কথা ও সুরের দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য। ছবিটিতে বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব মনকে খানিকটা উৎসুক ক'রে তোলে বটে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারিফ করবার মতো কিছুই দিয়ে যেতে পারে না।

**বিদূষী ভার্যা**—কাহিনীঃ উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, পরিচালনাঃ নরেশ মিত্র, রূপায়ণেঃ পরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেশ মিত্র, শিবশংকর, মলয়া, কবিতা, প্রভা প্রভৃতি। এম পি প্রডাকসন্সের ছবি—

সমস্যা সংকুলতায় এবং জীবনের জটিলতায় আধুনিক সাহিত্য অনেক ক্ষেত্রে আজ রসহীন হ'য়ে পাঠক-পাঠিকাদের মনে সহজ সরল আনন্দ জুগিয়ে উঠতে পারছে না। বর্তমান রাষ্ট্র এবং সমাজ চেতনা সাহিত্যকে প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে গেলেও রসের ক্ষেত্রে উপযুক্ত লেখকের সুনিপুণ লেখনীর অভাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা প্রাণহীন হয়ে শুধু সমস্যাভারে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। নিছক গল্প ব'লে আসর জমানো —এটাও একটা বড় আর্ট। গল্প শুনবার প্রবৃত্তি আমাদের সহজাত। এদিক থেকে সুসাহিত্যিক শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের খ্যাতি অসামান্য। তাঁর রচনা শিল্প-রসজাত।

বাঙলা ছবিতে ভাল গল্পের অভাব অধুনা প্রায় সর্বত্রই দেখা যাচ্ছে। যে ক'খানি বাঙলা ছবি এখন কলকাতার সিনেমা-ঘর-গুলিতে চলছে তার অধিকাংশতেই কাহিনীর মাথামুণ্ডু বলে কিছু নেই। গল্পের ঘটনাগুলি কিভাবে সাজাতে হবে, কোথায় সে-ঘটনার ছেদ টানতে হবে এই সাধারণ Story sense-টুকু সিনেমা-গল্প লেখক ও পরিচালকরা খুইয়ে বসে আছেন। সাড়ে বত্রিশ ভাজার মত মুখরোচক কিছু একটা খাড়া করবার জন্যে কিছু গান, কিছু নাচ, কিছু ভাঁড়ামী আর কিছু চোখের জল দিয়ে সস্তায় কিস্তি-মাৎ করতে চান। পাণ্ডিতম্মন্য পরিচালকের দল আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য জোর গলায় দর্শকদের রুচিহীনতার দোহাই পেড়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। আর যাঁরা বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রমুখ সাহিত্যসম্রাটদের জনপ্রিয় কাহিনী নিয়ে ছবি তোলেন তাঁরা যে কমলবনে মত্ত হস্তীর মত সেইসব কাহিনীগুলিকে পদদলিত করে তছনচ করে দেন তার পরিচয় আমরা পেয়েছি চন্দ্রশেখর, নৌকাডুবি, দৃষ্টিদান আর দেবী-চৌধুরাণীতে। বোঝার উপর শাকের আঁটি চাপাবার জন্যে আবার আসছে রাধারাণী। তবু এই মত্ত হস্তীদের উৎপাতের মধ্যেও কমলবনে সরস্বতীর বাহনটিকেও মাঝে মাঝে দেখা যায়—যেমন দেখেছি কিছুদিন আগেই বিমল রায়ের 'অঞ্জনগড়', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'কালোছায়া', আর অনুপযুক্ত লেখকের রচনা অক্ষম পরিচালকের হাতে নিকৃষ্ট শ্রেণীর ছবি অবান্তর প্রহসনে পরিণত হচ্ছে এতো আকছার দেখতে পাচ্ছি।

বাঙলা ছবির এই দুর্দশার দিনে কুশলী পরিচালক নরেশ মিত্র বিদূষী ভার্যা ছায়াচিত্রে রূপ দিয়ে প্রশংসা-ভাজন হয়েছেন। বিদূষী ভার্যার লেখক উপেনবাবুর এ-কাহিনী দেশ পত্রিকার পাঠক-পাঠিকাদের অজানিত নয়। এম-এ পাশ করা শিক্ষিতা স্ত্রী ম্যাট্রিক ফেল করা স্বামীকে যে কমপ্লেক্স ব্যাধি থেকে পরিত্রাণ করলেন কাহিনীর সুসংগত পরিণতিতে তা চিত্তাকর্ষক। এই রসঘন কাহিনীকে ঠিক গল্পের মত ক'রে পরিচালক ছবির দৃশ্যে দৃশ্যে সাজিয়েছেন, অস্বাভাবিক মনোবিকার বা ঘটনার অবাস্তবতা কোথাও ছবিখানিকে প্রাণহীন করে তোলেনি। এককথায় নরেশবাবুর মস্তবড় গুণ তিনি গল্প জমাতে জানেন।

অভিনয় অংশে মলয়া এবং কবিতা নবাগতা হলেও সুষ্ঠু অভিনয়ে তাঁরা চরিত্র দুটিকে সজীব রূপদান করেছেন। নরেশবাবুর পরি-চালনার সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব এইখানে। নায়কের ভূমিকায় পরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয়ও সুখ্যাতির যোগ্য। গ্রাম্য সংরক্ষণশীল চরিত্রে নরেশবাবুর অভিনয় চমৎকার।

ফটোগ্রাফী সাধারণ স্তরের হলেও দু একটি দৃশ্যে ক্যামেরার কাজ প্রশংসনীয়। যেমন বিয়ে করে বউ নিয়ে ফেরার পথে রেলের দৃশ্যটি ফটোগ্রাফীর দিক দিয়ে এবং সেই সঙ্গে ঘটনা বিন্যাসের দিক দিয়েও উল্লেখযোগ্য কিন্তু এক বালতি দুধে একটি লেবুর থেকে রস ছাড়লে যেমন তা কেটে যায় তেমনি এমন একটি দৃশ্যের রসঘন পরিবেশকে বিসদৃশ করে দিয়েছে পরিচালকের অমার্জনীয় অত্যন্ত সাধারণ ত্রুটির জন্যে। নায়ক বিখ্যাত সেতার-বাজিয়ে। স্ত্রীর অনুরোধে তিনি রেলের কামরায় সেতার বাজাতে বসলেন। সুর যেখানে চড়ার দিকে চলেছে, সেতারের ঘাটের উপর আঙ্গুল চলেছে খাদের দিকে। যে অভিনেতা জীবনে কখনো সেতার স্পর্শ করেনি তাকে বিখ্যাত সেতারী নায়কের ভূমিকায় নামানোর কি প্রয়োজন? আর যদি নামাতেই হয়, ক্লোজ্‌আপে তার সেতার বাজনা না দেখালেই তো পারেন। তার সেতার বাজনা অন্য অনেক-রকম ভাবেই তো দেখানো যেতো। এগুলি আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় ছোটোখাটো ত্রুটি কিন্তু এগুলি মারাত্মক ত্রুটি। নরেশবাবুর মতো বিচক্ষণ ছায়াচিত্র ও নাট্য পরিচালকের কাছ থেকে এ ধরণের ত্রুটি আমরা আশা করিনি।

কলিকাতা ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার প্রথম ডিভিশনের খেলা দর্শকগণের মধ্যে প্রবল উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়াছে। ইস্টবেঙ্গল, মহমেডান স্পোর্টিং ও মোহনবাগানের খেলার দিন মাঠে স্থান সংকুলান অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে। ফলে অধিকাংশ দিনই মাঠের বাহিরে শান্তি রক্ষায় নিযুক্ত পুলিশ ও মাঠে প্রবেশাধিকার হইতে বঞ্চিত হতাশ দর্শকদের মধ্যে সংঘর্ষ হইতেছে। এই সংঘর্ষের পরে অনেককেই হাসপাতালের আহত সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে দেখা যাইতেছে। এই সকল অবস্থা দেখিয়া অপর দিকে কতকগুলি ক্রীড়ামোদী ও ক্রীড়া সাংবাদিক "স্টেডিয়াম" "স্টেডিয়াম" রব তুলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। স্টেডিয়াম ঠিক অবস্থা আয়ত্তে আনিতে সম্পূর্ণ সাহায্য না করিলেও কিছুটা করিবে ইহাতে কোন সন্দেহই নাই, কিন্তু স্টেডিয়াম কে করিবে বা কাহারা করিবেন ইহাই আমাদের প্রশ্ন। গত ২০ বৎসর ধরিয়া এই স্টেডিয়াম গঠনের বিষয় লইয়া আলোচনা, কমিটি গঠন প্রভৃতি হইতেছে। গত বৎসর পশ্চিমবঙ্গ সরকার এক কমিটি গঠন করেন। ঐ কমিটি গঠিত হইলে আমাদের প্রাণে আশা জাগে স্টেডিয়াম শীঘ্রই হইবে, কিন্তু কয়েক মাস পরেই আর কোন আলোচনা হইতে শোনা যায় নাই। যদিই বা হইয়া থাকে তাহার কি ফল হইল তাহা আমরা অন্ততঃপক্ষে জানিতে বা শুনিতে পাই নাই।

বোম্বাইতে স্টেডিয়াম আছে ইহার পরেও আর একটি বিরাটভাবে গঠনের চেষ্টা চলিয়াছে। জমি খরিদ করা হইয়াছে, সরকারও অর্থ সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। দিল্লীতে স্টেডিয়ামের অভাব নাই, তাহা সত্ত্বেও আরও একটি নূতন স্টেডিয়াম বিরাটভাবে গঠনের সকল পরিকল্পনা হইয়াছে। উড়িষ্যা প্রদেশ যেখানে খেলাধুলার উৎসাহ খুবে কম সেখানেও স্টেডিয়াম গঠিত হইয়াছে। অথচ কলিকাতা যেখানে ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা খেলাধুলার উৎসাহ ও উত্তেজনা অধিক সেখানে স্টেডিয়াম ২০ বৎসর ধরিয়া আলোচনা করিয়াও গঠিত হইতেছে না। ইহা খুবই পরিতাপের বিষয়। দিনের পর দিন দর্শকগণের দুঃখ-দুর্দশা, অবমাননা, আঘাত কর্তৃপক্ষদের কেন যে স্পর্শ করে নাই কল্পনাই করিতে পারা যায় না। গত ৪ঠা জুন ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের লীগ খেলার দিন ভোর হইতে দর্শকগণকে ভিড় করিতে দেখা যায়। মধ্যাহ্নের মধ্যে প্রবেশদ্বারসমূহ বন্ধ হইয়া যায়, তাহার পর লক্ষ লক্ষ হতাশ দর্শকের দুঃখ ও দুর্দশার কোনই সীমা ছিল না। সমস্ত দিন অনাহার, ঠেলাঠেলি করিয়া ক্লান্ত অবসন্ন দেহবিশিষ্ট দর্শকগণের খেলার সময় ধৈর্যচ্যুতি ঘটিবে ইহাতে আর বিচিত্র কি? ইহার ফলেই মাঠের চতুর্দিকে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে ও অনেকে আহত হইয়া মাঠ হইতে হাসপাতালে স্থানান্তরিত হয়। এই সকল আহতদের মধ্যে একজনকে বলিতে শোনা যায়, "আর মাঠের দিকে আসব না।" এই যে হতাশা ব্যঞ্জক উক্তি কতখানি মনোপ্রসূত তাহা পরিচালকগণ কি উপলব্ধি করিতে পারেন না?

### কে চ্যাম্পিয়ান হইবে

প্রথম ডিভিশন লীগ চ্যাম্পিয়ান কোন দল হইবে ইহা বর্তমানে বলা খুবই কঠিন, পূর্বেও আমরা বলিয়াছি এখনও বলিতে বাধ্য। বিশেষ করিয়া ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান ও মহমেডান স্পোর্টিং এই তিনটি দল সমান অবস্থায় উপনীত হওয়ায়। গত সপ্তাহে যেরূপ অবস্থা ছিল তাহাতে অনেকেই আশা করিয়াছিলেন ইস্টবেঙ্গল সহজেই চ্যাম্পিয়ান হইবে। কারণ ঐ সময় একমাত্র ইস্টবেঙ্গল দলই অপরাজিত থাকিবার গৌরব অর্জন করে। কিন্তু বর্তমানে সেই ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে মোহনবাগানের নিকট পরাজিত হইতে দেখিয়া কেহ আর পূর্বের ধারণা দৃঢ়তার সহিত পোষণ করিতে পারিতেছেন না। এখন অনেকেই আমাদের মত বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তিনটি দলের মধ্যে যে কোন একটি হইবে। এই উক্তি শেষ পর্যন্ত ফলবতী হইবে কি না বলা কঠিন, তবে হইলেও হইতে পারে। নিম্নে লীগ তালিকায় তিনটি দলের বর্তমান অবস্থা কি তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ—

| টীমের নাম | খেঃ | জঃ | ড্রঃ | পঃ | স্বঃ | বিঃ | পঃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ইস্টবেঙ্গল | ৯ | ৮ | ০ | ১ | ২৩ | ১ | ১৬ |
| মহঃ স্পোর্টিং | ৯ | ৭ | ১ | ১ | ১৭ | ৩ | ১৫ |
| মোহনবাগান | ১০ | ৭ | ১ | ২ | ১৪ | ৫ | ১৫ |

### ফুটবল শিক্ষার ব্যবস্থা

আই এফ এর পরিচালকমণ্ডলী ফুটবল শিক্ষাদান বিষয় আলোচনা করিয়াই সকল কর্তব্য শেষ করিয়াছেন, কোন কার্যকরী ব্যবস্থা করেন নাই। বৈদেশিক শিক্ষক আনিবার উৎসাহ প্রদর্শন করিয়া তাহা বাতিল করিয়াছেন। শেষ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন বাঙলার প্রবীণ খ্যাতনামা খেলোয়াড়গণ দ্বারা ব্যবস্থা করিবেন কিন্তু উহা কার্যকরী হয় নাই, ইহা আমরা জোর করিয়াই বলিতে পারি। তবে এই বিষয় কলিকাতা আই এস এস এর পরিচালকবর্গকে কিছুদূর অগ্রসর হইতে দেখা যাইতেছে। ইহারা রাজস্থান ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুত গজানন খৈতানের সাহায্যে দুইজন বিশিষ্ট অবাঙালী ফুটবল শিক্ষক লাভ করিয়াছেন। স্কুলসমূহ বন্ধ হওয়া সত্ত্বেও ইহারা শিক্ষা দিবার যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাতে ৫০।৬০টি ছাত্র যোগদান করিতেছে। অসুবিধা হইতেছে এই যে, এই উৎসাহী ছাত্রদের প্রবল রৌদ্রতাপের মধ্যে শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইতেছে। ইহার উপর শিক্ষকগণ অবাঙালী হওয়ায় ছাত্রগণ ঠিক মত তাঁহাদের নির্দেশ অনুসরণ করিতে পারিতেছে না। শিক্ষা পদ্ধতিও বিজ্ঞানসম্মত হইতেছে না। ধাপে ধাপে কিভাবে শিক্ষা পদ্ধতি পরিচালিত হওয়া উচিত সেই বিষয় উক্ত শিক্ষকগণের ঠিক জ্ঞান আছে বলিয়াও মনে হয় না। ইহা হইতেই বলা চলে যে, ফুটবল শিক্ষায় রত উৎসাহী ছাত্রগণের শ্রম ও কষ্টবরণ উপযুক্ত ফল প্রদান করিবে না, তবে কিছুটা জ্ঞান দান করিবে। বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষার ব্যবস্থা হইলে ইহা প্রকৃতই ফলবতী হইত। আই এফ এর পরিচালকগণ কি ইহার কোনই বিহিত ব্যবস্থা করিবেন না?

বৈদেশিক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফুটবল খেলোয়াড়গণের লিখিত ফুটবল খেলার কৌশল শিক্ষার অনেক প্রবন্ধই কলিকাতার কয়েকটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, ঐ সমস্ত প্রবন্ধ বাঙলা ভাষায় অনুবাদ করিয়া ছাত্রদের মধ্যে বিলি করিবার ব্যবস্থা হইলেও অনেক সুফল লাভ করা যাইবে।

সারে ক্রিকেট শিক্ষা-কেন্দ্রে ডি জি ফাদকার

### ফাদকার লণ্ডনে শিক্ষার জন্য প্রেরিত

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড বোম্বাই-এর তরুণ চৌকস ক্রিকেট খেলোয়াড় ডি জি ফাদকারকে ইংলণ্ডে সারে ক্রিকেট শিক্ষাকেন্দ্রে দুই মাসের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। এই কেন্দ্রে ফাদকারকে ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব টেস্ট ফাস্ট বোলার ওলফ গোভারের শিক্ষাধীনে থাকিতে হইবে। কেবলমাত্র ফাদকারকে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া না প্রেরণ করিয়া একজন ক্রিকেট শিক্ষককে ভারতে আনিলেই ভাল হইত। কারণ ইহার দ্বারা একটি খেলোয়াড়কে উন্নততর নৈপুণ্যের অধিকারী হইবার সুযোগ দেওয়া হইল। প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এইরূপ ব্যক্তিগত উন্নতি সাহায্য করা উচিত নহে। তবে ফাদকার দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া দেশের উৎসাহী ক্রিকেট খেলোয়াড়দের তাঁহার শিক্ষার কিছুটা যদি দান করেন তবে আমরা সুখী হইব।

# সাপ্তাহিক সংবাদ

## দেশী সংবাদ

**৩১শে মে**—বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রদেশপালগণ প্রেসিডেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন বলিয়া যে প্রস্তাব শ্রীব্রজেশ্বরপ্রসাদ কর্তৃক উত্থাপিত হইয়াছিল, অদ্য তাহা ভারতীয় গণপরিষদে বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হইয়াছে। নূতন শাসনতন্ত্রে প্রদেশগুলি রাষ্ট্র বলিয়া অভিহিত হইবে। প্রস্তাবের সমর্থনে পণ্ডিত নেহরু বলেন যে, কেবল বাস্তব দিক হইতে নহে, গণতান্ত্রিক দিক হইতেও মনোনয়নের প্রস্তাবই বাঞ্ছনীয়। পণ্ডিতজীর মতে নির্বাচন ব্যবস্থার ফলে প্রদেশসমূহে বিভেদমূলক মনোভাবের সৃষ্টি হইতে পারে।

১৯৪৯ সালের ১লা জুন হইতে সূতীবস্ত্রের উপর হইতে রপ্তানি শুল্ক প্রত্যাহার করা হইবে বলিয়া অদ্য এক প্রেসনোটে ঘোষণা করা হইয়াছে।

নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া শোভাযাত্রা বাহির করার জন্য রাজকোটে নয় শত ভূস্বামী গ্রেপ্তার হইয়াছেন। জমি হইতে প্রজা উচ্ছেদ নিয়ন্ত্রণ করিয়া সৌরাষ্ট্র গভর্নমেণ্ট যে আদেশ করিয়াছিলেন, তাহারই বিরুদ্ধে ভূস্বামীগণের এই বিক্ষোভ।

গতকল্য বোম্বাই অঞ্চলে একটি ত্রিতল ইমারত ধ্বসিয়া পড়ায় পাঁচজন স্ত্রীলোক নিহত এবং দশজন লোক আহত হইয়াছে।

**১লা জুন**—অদ্য গণপরিষদে মন্ত্রিসভা নিয়োগ ও মন্ত্রিসভার কর্তব্যসূচক দুইটি ধারা গৃহীত হইয়াছে। এতদনুসারে প্রদেশপাল প্রধান মন্ত্রী নিয়োগ করিবেন এবং প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে অন্যান্য মন্ত্রী নিয়োগ করিবেন।

কাশ্মীর কমিশনের যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব সম্পর্কে ভারত ও পাকিস্থানের নিকট হইতে প্রাপ্ত শীল-মোহরাঙ্কিত উত্তর অদ্য কমিশনের সদস্যগণের উপস্থিতিতে খোলা হয়।

অদ্য হইতে ভুপাল রাজ্য ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত চীফ কমিশনার শাসিত প্রদেশে পরিণত হইয়াছে।

**২রা জুন**—ভারতের ফরাসী এলাকায় আগামী গণভোট সম্পর্কে ভারতের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য এবং ভারত গভর্নমেণ্ট ফরাসী কর্তৃপক্ষকে 'অর্থনৈতিক চাপ দিতেছেন' এই অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য আন্তর্জাতিক আদালত পর্যবেক্ষক নিযুক্ত করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। এই সংবাদে নয়াদিল্লীতে বিশেষ বিস্ময় ও ক্ষোভ প্রকাশ করা হইয়াছে।

গতকল্য রাত্রিতে বোম্বাইয়ে এক মারাত্মক অগ্নিকাণ্ড হয়। শহরের সমগ্র দমকলবাহিনী তিন ঘণ্টা আপ্রাণ চেষ্টায় অগ্নি আয়ত্তে আনে।

পাটনার সমস্তিপুর মহকুমাতে মহীউদ্দীন-নগর থানার জেলা বোর্ডের নির্বাচনে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে চারিজন নিহত ও বহু আহত হইয়াছে।

ফরাসী ভারতে পর্যবেক্ষক পাঠাইবার জন্য আন্তর্জাতিক আদালতের দ্বারস্থ হইয়া ফরাসী গভর্নমেণ্ট যে একতরফা আচরণ করিয়াছেন, তজ্জন্য ভারত সরকার প্যারিসে ফরাসী সরকারের নিকট এত প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

**৩রা জুন**—গান্ধীজীর শেষ অভিপ্রায়ানুসারে ভারত গভর্নমেণ্ট ৬২ হাজার 'মিও'কে (রাজপুত মুসলমান) মৎস্য ইউনিয়নে তাহাদের আদি বাসস্থানে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার সংকল্প করিয়াছেন।

**৪ঠা জুন**—দেরাদুন হইতে ৬ মাইল দূরে ক্লেমেণ্ট শহরে একটি সামরিক বিদ্যালয়ের উদ্বোধন হয়। তদুপলক্ষে অনুষ্ঠিত কুচকাওয়াজ পরিদর্শনের পর ভারতের সহকারী প্রধান মন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, মারামারি ও হানাহানিতে পৃথিবী আজ ধ্বংস সম্ভাবনায় ক্লিষ্ট। শান্তিপূর্ণ অহিংস উপায়ে বিরোধ মীমাংসার প্রয়োজন যত উপলব্ধি হইবে ততই শান্তি ও নিরাপত্তা স্থায়িত্ব লাভ করিবে বলিয়া আমি মনে করি। বর্তমান পরিস্থিতি সম্যকভাবে উপলব্ধি করিয়া প্রস্তুত হইতে হইবে।

বেলগাঁওয়ে অদ্য গোয়া জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। অধিবেশনের সভাপতি মিঃ এস বি ডি'সিলভা দাবী করিয়াছেন যে, পর্তুগীজদিগকে বিনাসর্তে ভারত ত্যাগ করিতে হইবে, কারণ ইহা ভারতের অংশ বিশেষ।

**৫ই জুন**—অদ্য পশ্চিম পাঞ্জাব মুসলিম লীগ পরিষদে তুমুল বিতর্কের পর পশ্চিম পাঞ্জাবের গভর্নর স্যার ফ্রান্সিস মুডিকে অপসারিত করিয়া তাঁহার স্থলে একজন পাকিস্থানীকে নিয়োগ করার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। ইতিপূর্বে পশ্চিম পাঞ্জাব লীগের কার্যকরী সমিতিও এই দাবী জানাইয়াছিলেন।

অদ্য দেশপ্রিয় পার্কে আসন্ন দক্ষিণ কলিকাতা উপনির্বাচন সম্পর্কে কংগ্রেসপ্রার্থী শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র দাসের সমর্থকগণের যে জনসভা হইতেছিল, তাহাতে বিরোধীপক্ষের সমর্থকদের বেপরোয়া ...মের দরুণ কয়েকজন বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্মী সহ ৩০ জন লোক আহত হন। দুষ্কৃতকারীরা সভা-মঞ্চে উপবিষ্ট ব্যক্তিদিগকে বেপরোয়াভাবে আক্রমণ করে এবং কংগ্রেস পতাকা ও প্রচার ভ্যানে অগ্নি-সংযোগ করে।

**৬ই জুন**—গত ২৮শে এপ্রিল যুদ্ধবিরতির সর্তাবলী পেশ করিয়া বিনা ওজরে তাহা ... করিবার জন্য কাশ্মীর কমিশন কর্তৃক যে অনুরোধ করা হইয়াছিল, ভারত ও পাকিস্থানের ... গভর্নমেণ্টই তাহা মানিয়া লইতে অস্বীকার করিয়াছেন। অদ্য কাশ্মীর কমিশনের হেডকোয়ার্টার্স হইতে এক সরকারী বিবৃতিতে তাহা জানানো হইয়াছে।

## বিদেশী সংবাদ

**১লা জুন**—সাইরেনাইকার আমির ইদ্রিস অদ্য স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছেন এবং বৃটিশ অনুমোদন লাভের জন্য আবেদন জানাইয়াছেন। সাইরেনাইকার আড়াই লক্ষ যাযাবরের ধর্মগুরু সৈয়দ মহম্মদ ইতিপূর্বে সাইরেনাইকাকে একটি রাষ্ট্রে পরিণত করার আকাঙ্ক্ষা ঘোষণা করিয়াছিলেন।

**৩রা জুন**—বার্লিনের ভবিষ্যৎ শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনার জন্য অদ্য প্যারিসে চতুঃশক্তি পররাষ্ট্র সচিবদের ... বার্লিনে চতুঃশক্তি নিয়ন্ত্রণ পরিষদের বৈঠক যুগপৎ ... হয়।

মালয় জরুরী বিধি ... অস্ত্রশস্ত্র ... রাখার অভিযোগে ভার... ইউনিয়ন... শ্রীশাম্বশিবমকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছি... তাঁহার ফাঁসি স্থগিত রাখা হইয়াছে বলিয়া জ... গভর্নমেণ্ট সরকারীভাবে ঘোষণা করিয়াছেন।

**৪ঠা জুন**—অদ্য প্যারিসে চতুঃশক্তি পররাষ্ট্র সচিবদের গোপন বৈঠকের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে বার্লিনে চতুঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পুনঃ প্রতিষ্ঠাকল্পে সোভিয়েট ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাব আলোচিত হয়।


১০,০০০৲ টাকা মুল্যের গহনা এবং হাতঘড়ি দেওয়া হইতেছে

আমাদের বিখ্যাত ১নং বাল কালা তেল ব্যবহারে পাকা চুল স্বাভাবিক কৃষ্ণবর্ণে পরিণত হয় এবং চিরকাল উহা কাঁচা থাকে। ইহা ব্যবহারে কেশদাম কুঞ্চিত হয় ও চুলের জেল্লা বাড়ে এবং চুল উঠা বন্ধ হয়। নূতন কেশোদ্গমে ইহা সাহায্য করে এবং চক্ষুর পক্ষে বিশেষ উপযোগী। বুদ্ধিজীবীদিগকে ইহা ব্যবহার করার জন্য বিশেষভাবে সুপারিশ করা যাইতেছে। ইহা মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ শীতল রাখে এবং সুগন্ধিযুক্ত। ইহা চুলের কলপ নহে, ইহা অতীব দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান গাছগাছড়া হইতে প্রস্তুত। এক শিশির মূল্য ২৷৷০ টাকা, পুরা সেট তিন শিশির মূল্য ৬৷৷০ টাকা। ইহার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির জন্য এই কোম্পানী এক শিশি তৈলের ক্রেতাকে একটি ফ্যান্সী মিউট রিষ্ট ওয়াচ, একটি আংটি নাগদার এবং মিনার্ভা নিউ গোল্ডের তৈরী একজোড়া ইয়ার রিং প্রদানের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। যাহাতে বিলম্ব না হয়, তজ্জন্য অনুগ্রহপূর্বক আজই পত্র লিখুন ঃ

দি হলসন ওয়াচ ইম্পোর্ট কোং

বড়া কুঠি মেম (ডি সি), দিল্লী।



স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক ঃ—আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মন স্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত